নানা রসের ৯টি উপন্যাস

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৬৪

প্রকাশক
রামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রক
দুর্গা প্রিন্টার্স
১০/১বি, রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ
সুধীর মৈত্র

সূচিপত্র

ত্রৈকার্স

কাগজের প্রথম পাতার প্রথম খবরটা দেখে ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার চমকালেন। ধৈর্য ধরে পড়লেন খবরটা। সাধারণত এতটা মন তিনি আজকাল কোনও খবরে দিচ্ছেন না। কথাটা ক'দিন ধরেই মনে হচ্ছিল, আবারও হল। নাটক হচ্ছে চারদিকে মঞ্চে-মঞ্চান্তরে এবং রাস্তায়-রাস্তায়, বাড়িতে-বাড়িতে, জীবন-জীবনে। মঞ্চের নাটকগুলো আমরা ধরতে পারি, কেননা সেখানে স্থান কাল পাত্র সবই সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। নাট্যকার ইচ্ছে হলে তাকে প্রতীকী ব্যঞ্জনা দিচ্ছেন, জিনিসটা ভাবাচ্ছে। আয়োনেস্কো, ব্রেখ্‌ট, এদিকে হ্যারল্ড পিন্টার, দারিয়ো ফো, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র থেকে এখনকার বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র...

কথাটা হচ্ছে, প্রতিদিনকার জীবনে ছোট-ছোট যে-নকশাগুলো ঘটে, সংসারে যেসব প্রহসন এবং জীবনে সত্যিকার নাটক ঘটে, সেগুলোকে আমরা নাট্য বলে দেখি না। সবই কিন্তু মেলোড্রামা নয়। নিচুস্বরের ঘন গাঢ় নাটকগুলো একেবারেই ধরা পড়ে না বোধে। কিন্তু কখনও-কখনও এমন জিনিসও ঘটে, যেন মনে হয় পুরোটা কেউ স্ক্রিপ্ট লিখে তৈরি করেছে। কোথায় কেমন দৃশ্যপট হবে, কীভাবে আলো পড়বে কে-কে থাকবে কেন্দ্রে, কারা আশপাশে, জীবনভর্তি এক্সট্রার দল, সমস্ত কেউ সাজিয়ে রেখেছিল। পাখিপড়া করে পড়িয়েছে প্রত্যেককে। মডুলেশন, ঢোঁক গেলা, কায়িক অভিনয়, হাতের ভঙ্গি, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, আলোর দিকে অর্ধেক ফেরা, প্রবেশ-প্রস্থান একেবারে ইঞ্চি মেপে। মঞ্চের নাটকের সঙ্গে তফাত? এ তো কুড়ি-ফুটি স্টেজ নয়, এর হিসেব হবে মাইলেজে। কালকেও গুটিয়ে ছোট কবে আনা যাবে না, আর মূল নাটকের মূল কুশীলবের চলাফেরার ধন্দে উৎক্ষিপ্ত মানুষজনকে না ধরলে, এ নাটকের চরিত্রলিপি সম্পূর্ণ হয় না। শুধু ক্রাউড বা ১ নং ভদ্রলোক, ২ নং ভদ্রলোক বলে শেষ করা যাবে না এ তালিকা। আলোকসম্পাতে তিনি দেখতে পাচ্ছেন মেঘ-রোদের খেলা, প্রবল বর্ষণ, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, প্যাচপেচে গরম, আদুরে রোদ। ঝমঝম, রিমিঝিমি বাজতে থাকবে আবহসংগীতে। আসল পাখিদের ডাকাডাকি চলবে নিরন্তর কুঃকুঃ, কুবকুবকুব, আগুমবাগুম, রেডিয়োর টুকরো স্বর, কোনও জানলাপথে উপচে পড়া টিভির উচ্চারণ, ঘষঘষ গাড়ির আওয়াজ, ঢং ঢং ট্রামের, কুকুরের কেঁউকেঁউ, ঘেউঘেউ কী নেই! সব আছে এবং যথাযথ প্রয়োগে আছে। সংগীত পরিচালক যেখানে প্রকৃতি, সেখানে নৈঃশব্দ ও হট্টগোল, পক্ষবিধূননের সুদূর শব্দ, পিছলে পড়ার সড়াৎ, কোনও কিছুর জন্যই আলাদা ভাবাভাবির প্রয়োজন হয় না। আর আসল যে অভিনেতা-অভিনেত্রী? তারা আসল, তাই তাদের চলন-বলন স্বতঃস্ফূর্ত, উচ্চারণের দোষ থেকে, ভুলভাল কথা, আকস্মিক নীরবতা সবই সেখানে মানিয়ে যায়। কোনও ভিন্ন মানুষের খোলসে ঢুকতে হচ্ছে না তো! কোনও পরিচালকের নির্দেশও পালন করতে হচ্ছে না। যা কিছু মোটিভেশন সবই নিজস্ব বোধবুদ্ধি, উপলব্ধি, উদ্দেশ্য থেকে উঠে আসছে।

কে পরিচালক এই নাট্যের? অ-দৃষ্ট, যাকে এখনও দেখতে পাচ্ছি না? কোনও ব্যক্তি সে নয়। এক অমোঘ কার্যকারণের শৃঙ্খল, গেঁথে যাচ্ছে আপন মনে পুঁতির মালা। আহা, যদি ইনটুইশনের ভাষাতেও স্ক্রিপ্টটা পড়া যেত!

সংযুক্তা কফির ট্রে হাতে এসে গেলেন, "কী ব্যাপার? কাগজ হাতে এমন বোমভোলা হয়ে বসে আছ কেন?"

উত্তরে ধ্রুব কাগজটা এগিয়ে দিলেন।

সংযুক্তা একটু পড়েই বললেন, "ঠিক যেন নাটক না? ইশ্‌শ্‌।"

ধ্রুব হাসলেন, "কখনও-কখনও নাটক দেখেও আমরা বলি ঠিক যেন জীবন, না?"

অবসরে এখনও অভ্যস্ত হতে পারেনি মগজ। তাই-ই হয়তো দুপুরবেলা পাশের বাড়ির এফএম থেকে ভেসে আসা গান আর হাতের বই 'গ্রে হাউন্ডস ইন ব্রাসেল্‌স' নিয়ে যেটুকু ঢুল এসেছিল, তার মধ্যেই ধ্রুব দেখলেন পায়রার বুকের মতো ছেয়ে রঙের এতদিনের জীবনটাকে দলা পাকিয়ে পকেটে পুরে লম্বা জিন্‌স এক তরুণ লাফ দিল শেয়ালদা স্টেশনের দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে। মাছি না গলা ভিড়টাকে কায়দা করতে তার তেমন কোনও অসুবিধে হল না। কেননা, সে ছ'ফুট দুই। ছাতি ৪২ ইঞ্চি। কাঁধ দুটো নৌকার পাটাতনের মতো। কাঁধে ব্যাকপ্যাক। হাতের সুটকেসটাকে খেলনার মতো অনায়াসে দুলিয়ে সে দুলকি চালে ঢুকে পড়ল। কাঁধ দিয়ে একটু চাপ দিতেই ভিড়ের চোখ ভয়ে, রাগে ওপর দিকে চায়। সে গ্রাহ্যও করে না। "আহা দাদা, আপনারা এখনও অনেক পিছিয়ে। বয়সে এগিয়ে তো? স্যরি, আপনারা আফিস কাছারি যাবেন তো? তা আমারও একটা যাবার জায়গা আছে। একাধিক।" অস্ফুটে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

ছেলেটির ঠোঁটের কোণ হাসিতে বেঁকে গেল। বলল, "আমি যুবক, মানে ইয়ংম্যান।"

"কী বললে, কী ম্যান?"

"ওই দিকে দেখুন?" ছোকরাটি আঙুল দেখাল।

একটি বেশ সম্পন্ন-দর্শন ঘরের ভেতর টেবিলে বই খোলা, গালে-হাত একটি উদাস মুখকে দেখতে পেলেন ধ্রুব। গদিআঁটা কাঠের চেয়ারে বসে আছে। আপাতদৃষ্টিতে পড়াশোনা করছে, কিন্তু দৃষ্টি যেন কোথায় ভেসে চলে গিয়েছে। পরনে একটা ঝ্যালঝেলে শর্টস আর ততোধিক ঝ্যালঝেলে টপ। তার সমস্ত শরীরটা এই ঝোল্লার ভিতরে অদৃশ্য। ফুটে আছে খালি পা দু'টি আর মুখ। বেশ পা। লম্বা, নির্লোম, তবে খুব একটা অ্যাথলেটিক নয়। মুখটি বেশ ফুটফুটে। অল্প বয়সিদের সবাইকেই ধ্রুব আজকাল ফুটফুটে দেখেন অবশ্য। সংযুক্তা এখনও চাকরিতে আছেন, কিন্তু তাঁরও ওই দশা। অল্প বয়সের মেয়ে দেখলেই বলেন, "বাঃ কী চমৎকার!"

কাজেই সত্যটা ঘষে যাচিয়ে নেওয়ার জন্য কোনও কষ্টিপাথর ধ্রুবর ধারে কাছে নেই। "তা এমন মেয়ে, এমন ঘরটি তোমার, চোখ দুটি অমন বিষাদ-কাজল কেন মা?"

"সমস্ত সম্পন্ন-সুখের হৃদয়ে থাকে এক কাঙাল। যে অনেক কিছু পেলেও, একটা জরুরি কিছু, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে চাওয়া কিছু একটা পায়নি।" মেয়েটি বলে উঠল আস্তে আস্তে, "একলা রাতের অন্ধকারে সে হাহাকার করে ঘোরে। আমি আজকাল তার কান্না শুনতে পাচ্ছি। আগে জানতুম না, সুখের গর্ভে কোথাও এমন তলতলে কান্না আছে। সেটা দুঃখের তরল রূপ। 'সস্ট কোর' সেই চকোলেটগুলোর মতো। মামা সুইজারল্যান্ড থেকে এনে দিয়েছিল। গোল-গোল বল, ওপরটা শক্ত। ভাঙতেই মুখটা তরল মাদক স্বাদে ভরে যায়। মামা বলেছিল, 'বেশি খাসনি, নেশা হয়ে যাবে।' এই সুখের গর্ভে, দুঃখের কান্নারও বোধহয় একটা নেশা আছে, জানেন। জীবনটা যদি একটা নিরেট চকোলেটই হত আদ্যন্ত? প্রিয়ম বলে, দুর্দান্ত হত তা হলে। প্রিয়ম জানে না, মাঝখানের ওই তরলটুকু না থাকলে নেশা জানা হত না, ঘোর জানা হত না, হাহাকার জানা হত না এবং তা হলে কিছুই জানা হত না।"

"কার লেখা থেকে পড়ছ বাবা?"

অবাক চোখে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, "কারও লেখা তো নয়। আমি মানে দিয়া, আমি তো ভাবছিলুম।"

"ওইটুকু মেয়ে, তোমার এত কীসের দুঃখ? কিছু মনে কোরো না, প্রেম-ট্রেম?'

মেয়েটি হাসল, "আপনি খুব খু-উব পুরনো, না? প্রেম হলে তো হয়েই গেল।"

প্রেম হলে তো হয়েই গেল, মানে কী কথাটার? আর অমন হাসি? হাসির ভিতর দিয়ে যেন হাজার কথা বলে গেল। অথচ কিছুই বোঝা গেল না। তিনি কি সত্যিই খুব বুড়ো হয়ে গেলেন? মেয়েটি অবশ্য খুব ভদ্রতা করে বলল। পুরনো প্রেমের কথা বললে, পুরনো হতে হবে কেন রে বাবা? প্রেম তো চিরনতুন বলেই তাঁর ধারণা।

এই সমস্ত সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই তাঁর চটকাটা ভেঙে গেল। পাশের টেবিলে আজকের কাগজটা ভাঁজ করা। চোখে-মুখে জল দিয়ে তিনি আয়নার দিকে তাকালেন। বডি ফিট একেবারে। কেউ বলতে পারবে না তিনি কুঁড়েমিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু মুখে তো তাঁর অভিজ্ঞতার চিহ্ন থাকবেই। সংযুক্তা আজকাল মাথার চুলে লালচে রং দিচ্ছে। তিনি কিছু দেন না, তাঁর মাথা কাঁচা-পাকা। তেমন কোনও রেখা পড়েনি, কপালে দুই ভুরুর মাঝখানে একটি লম্বা তিলকের মতো রেখা ছাড়া। কিন্তু তিনি যে পুরনো, সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ওই দিয়া, উজ্জ্বল, এরা আশ্চর্যভাবে মানুষের প্রাচীনতাকে শনাক্ত করতে পারে।

হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল এই দুটো নাম দিয়া, উজ্জ্বল তিনি কোথা থেকে পেলেন? কাগজ, খবরের কাগজের লিড নিউজেই নাম দুটো পেয়েছিলেন। আশ্চর্য তো! কাগজটা তিনি আবার খুললেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন। রূপরাজ, আরিয়ান, বাব্বাঃ এসব হাই-ফাই নাম এরা কোত্থেকে পায়? শুকতারা, বাবাই। এই ছ'টা নামই তা হলে প্রধান কুশীলব।

কোত্থেকে আসছিল ইয়ংম্যান উজ্জ্বল? শেয়ালদা স্টেশনে নামল। আচ্ছা, ও তো বগুলা থেকে এল। বাসস্ট্যান্ডে মাছি থিকথিকে ভিড়। হ্যান্ডেলটা ও দূর থেকেই ধরে ফেলেছে। ব্যাকপ্যাক, গুটিকতক মুড়ো ছেঁচড়ে আপনিই জায়গা করে নেয়, তাকেও জায়গা করে দেয়। সুটকেশ হাতে নিয়ে সে এক হ্যাঁচকায় শূন্যে উঠে যায়। তলায় পিলপিল করছে মুখ। হঠাৎ একটা মুখ চেনা-চেনা লাগে। পেছনের লম্বা সিটটার ওপর সে বডি ফেলে দেয়। সুটকেসটা রেখে জায়গাটা রিজার্ভ করে, তারপর চেনা মুখের তল্লাশে যায়। অন্ধের মতো হাত চালিয়ে দেয় মুখের, কাঁধের, চাঙড়ে। হাতে এসে যায় একটা কাঁধ। তার পিছনে পিঠ, দুই কাঁধের তলায় শক্ত লোহার মতো হাতটা দিয়ে সে চাগিয়ে তোলে, "যা চট করে লেডিজ সিটে জায়গা নে।"

"ভাগ্যিস তুই ছিলি!"

"বলছিস?"

"তা না তো কী! আমার সাধ্য ছিল এই ভিড় ভেদ করে বাসে ওঠা? তিনটে ছেড়েছি অলরেডি।"

"কোথায় চললি?"

"কোথায় আবার, কলেজে। তুই?"

"দু'বার ছেঁচড়ে এবার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। যাচ্ছি শিবপুর।"

"কংগ্রাচুলেশন্স।"

সোমবারের রোদ একেবারে ঝক্‌কাস। যেন এরিনায় দাঁড়িয়ে বক্সার। চকচকে মাস্‌ল থেকে যেন তেল গড়িয়ে পড়ছে। হলুদ রঙের ট্রাঙ্কটা বাঘছালের মতো এঁটে আছে। হাতে লাল রঙের গ্লাভ্‌স। স্পিরিটটা ধাঁ করে ভেতরে ঢুকে যায়। তার জায়গা একেবারে পেছনের লম্বা সিটে, ব্যাকপ্যাকটা কোলে, সুটকেস নীচে, দু' পায়ের ফাঁকে। পিছলে যাচ্ছে পিলপিলে রাস্তা। বাসের পিছন-চাকার গজরানি *ঠিক* তার নীচে। পিছন ফুঁড়ে শালা শিরদাঁড়া বেয়ে সোজা ব্রহ্মতালুতে পৌঁছে যাবে। চাপের নাম বাবাজীবন। তোরা দিবি না, আমিও না নিয়ে ছাড়ব না। *ঠিক* মেরে দিয়েছি, "ম্যাঁয় নওজওয়ান হুঁ। সমঝ লে তুরন্ত। যো চাহুঙ্গা ওহি কবজেমে লাউঙ্গা।"

ঠিক সামনে এক ঘাড়-নড়নড়ে বুড়ো দাঁড়িয়ে। কেষ্টনগরের পুতুলের শোকেসে মানাত ভালো।

মেলা-ফেলায় ঢেলে বিক্কিরি হয়। পাশের ছেলেটি উঠে দাঁড়াল, "বসুন সার।"

"না, না, ঠিকাছি ঠিকাছি।"

"আমি জিষ্ণু সার, জিষ্ণু মণ্ডল। চিনতে পারছেন না?"

"ও ছাত্র! একেবারে আত্মনেপদী। তবে তো রাইট আছে।" নড়বড়ে বসে পড়ল।

"জিষ্ণু মণ্ডল, কোন্ ইয়ার?"

ছেলেটা ঝুঁকে পড়ে বলল, "মিলেনিয়াম ব্যাচ বলতেন তো আমাদের, ভুলে গেলেন?"

"বর্ষে বর্ষে দলে দলে, বুঝলে না? দুঃখ পেয়ো না, মুখখানা প্লেস করতে পারছি। মাধ্যমিকের ছেলে, চার বছরে দাড়ি গোঁফ গজিয়ে এমন হয়ে যায় না। তা বাবা, আমি যদি তোমার মাস্টারমশাই না হতুম, কী করতে?"

"তা হলেও উঠে দাঁড়াতুম সার! একথা আবার জিজ্ঞেস করছেন?"

"না দেখো, বাসে লেডিজ সিট আছে ঠিক আছে। গুঁতোগুঁতির মধ্যে লেডিজদের না দাঁড়ানোই ভালো। প্রতিবন্ধীদের সিট আছে, বাচ্চাদের সিটও দেখি, আহা পিঠে এক একটা পাপের বোঝা নিয়ে টলছে বাচ্চাগুলো। একটু ব্যবস্থা না করলে হয়? কিন্তু এই অ্যামনেস্টির ডেমোক্র্যাসিতে বুড়োদের কথা কেউ ভাবেনি কেন বলো তো?"

"ঠিক বলেছেন সার। কেন করে না, কে জানে?"

"আমি জানি জিষ্ণু। এই জন্যে করে না যে, এ ব্যাটার খোল থেকে ওয়ার্কিং ইয়ার যতটা পাওয়ার, নিংড়ে পাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন এ ব্যাটা ভুষি মাল। হয়তো বা পেনশনও খাচ্ছে। দে ব্যাটার লাইফ ডিফিকাল্ট করে। বসতে দিসনি, খেতে দিসনি, ওষুধ-বিষুধ আক্রা করে রাখ, যত তাড়াতাড়ি ট্যাঁসে," বলতে-বলতে হাসলেন ভদ্রলোক।

"আপনি সেই এক রকমই রয়ে গেলেন সার," জিষ্ণু বলল। "ইয়ংম্যানদের উপর আস্থা রাখছে সরকার। এটুকু তারাই করবে। গুড সেন্স।"

"গুড সেন্স ইয়ংম্যানদের? তুমি হাসালে জিষ্ণু। আমরা বাসে উঠলে লাস্টে উঠি। ততক্ষণে সিট সব অকুপায়েড। সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ইয়ংম্যানরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে কানে একটা গয়না পরে ফেলে, মোবাইল। এত টক-টাইম কোত্থেকে পায় বলো তো আজকের ব্রেকনেক কমপিটিশনের যুগে? আর এক টাইপ আছে, হঠাৎ বড় প্রকৃতি প্রেমিক হয়ে ওঠে। পাশ দিয়ে জীবন বয়ে চলেছে কিনা!"

তাকেই টার্গেট করছে নাকি কেষ্টনগর? সে নড়েচড়ে বসে। টাইট হয়ে গিয়েছে জায়গাটা। কিন্তু উঠে দাঁড়ালেও তার ব্যাকপ্যাক আর সুটকেশ তো উঠে দাঁড়াবে না। তা ছাড়া, মাথাখানাও ছাদে ঠেকবে। স্পন্ডিলোসিস বাধাবার ইচ্ছে তার নেই। এই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, তালতাল বাইসেপস, ট্রাইসেপস, অ্যাব্স, শক্তি, সাহস এসব এ যাত্রায় স্যাক্রিফাইসের জন্য নয় দাদু। আমি 'গৌতম বুদ্ধ' কিংবা 'মোহনদাস বকরম চাঁদ' কিংবা আপামর বাঙালির 'বোকাজি' নই। এগুলো যুদ্ধজয়ের জন্য, ক্লিন ভিকট্রি একটা। কোথায়? কখন? জানি না। যখনই হোক, যেখানেই হোক, ইন দ্য মিনটাইম ক্ষুদিরাম স্ট্যাচুতে থাকুন।

সামনে গাদাগাদি ভিড়। বাবাইটা বসতে পেল কি না কে জানে! তখন তো ফাঁকা লেডিজ সিটের দিকেই ওকে ড্রপ করেছিল। সুযোগটা যদি না নিতে পেরে থাকে, তো নাচার। আরে, ওই তো বাবাই যাচ্ছে। নেমে গিয়েছে কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে। এখন দোপাট্টা বাগিয়ে হাঁটছে দেখো, খুশি খুশি লাগে। স্যাক্রিফাইস নয়, কিন্তু টুক করে কাউকে হেল্প করে দিতে পারলে হেভি লাগে।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও সে ছিল অ্যাংরি ইয়ংম্যান। অ্যাংরি এবং হাংরি। শালা লিস্টটা প্রত্যেকবার তিন মানুষ উপরে উঠে থ্যাপাং গেড়ে বসে যায়, কেন রে বাবা? পিতৃদেব বলেছিলেন, যেমন বিএসসি-টা করে যাচ্ছিস করে যা। ঠিক একটা কিছু হয়ে যাবে। 'হওয়াচ্ছি,' সে বলেছিল মনে

মনে। দিন-রাত হাতড়ে অবশেষে থ্যাঙ্কস টু অদ্রি, পাকড়াও হল হিতেন সার। অনেক-অনেক দূর, মাল্লু নেবেও বিস্তর, কিন্তু টুইশান দেবে এ ওয়ান। দশটার মধ্যে ছ'টা চোখ বুজে এসে যাবে। উপকার করতে হলে অদ্রির করব। কেননা, সে উপকার করেছে। করব বাবাইয়েরও, কেননা সে পাশের রানাঘাটের মেয়ে। আমারই মতো, তার উপর মেয়ে। এর মধ্যে ঘাড় নড়নড়ে বুড়োফুড়ো আসে না।

চিৎপুরে নেমে গেল, বাঁচা গেল। পাশে যেন আস্ত একখানা শজারুর কাঁটা বসে ছিল। সেই জিষ্ণু না বিষ্ণু, বসে গেল তক্ষুনি। সে থাই দুটো চেপে বসে অগত্যা। সোমবারের রোদ্দুর জানলা গলিয়ে উঠে এসেছে হাতে কোলে কাঠবেড়ালির মতো। ভালোবাসার চোখে সে চেয়ে থাকে হাত-ভর্তি রোদ্দুরের দিকে। মনে-মনে বলে, তুই উজ্জ্বল আমার মতো, নওজোয়ান আমার মতো। তফাতের মধ্যে, তুই আজকের মধ্যেই আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে, ফিকে হয়ে মরে যাবি। আমি কিন্তু বেঁচে থাকব। জোশ নিয়ে বিন্দাস বাঁচব। যেদিন মরবার, মরব ঠিকই। মানুষ নশ্বর জীব। কিন্তু অমন ঘাড় নড়নড়ে বুড়ো হওয়ার আগে শালা আমি টাটা সেন্টারের ছাদ থেকে গোটা পৃথিবীটাকে বগলদাবা করে ঝাঁপ দেব।

ব্রিজে উঠছে বাসটা একটা ঝাঁকি দিয়ে। এপারে গঙ্গা, ওপারে গঙ্গা। মেজাজটা কাটা ঘুড়ির মতো সাঁ-সাঁ করে উড়ে গেল। আহ! পাশ থেকে জিষ্ণু বলল, "এই হাওয়াটার জন্যেই লম্বা জার্নি, গাদাগাদি ভিড় সব মাইনাস হয়ে যায়।"

"কবি-টবি নাকি?"

"কবি ছাড়া আর কারও গঙ্গার হাওয়া নিয়ে কথা বলার রাইট নেই বলছেন?"

হাঃ হাঃ, সে এবার গলা ছেড়ে হাসে। বলে, "ও মস্তানরা তো সেই রকমই ক্লেম করে। হাওয়া, ফুল, পাখি, প্রেম, বিদ্রোহ সব ওদের একার।"

"আমি জিষ্ণু। মেকানিক্যাল, সেকেন্ড ইয়ার।"

"আরে একই দিকে যাচ্ছি, আমি উজ্জ্বল। সবে ঢুকছি। এখনও হস্টেলের দেওয়ালের রং জানি না," হাত বাড়িয়ে দিল জিষ্ণু। ঝাঁকানি দিলে সে আচ্ছাসে। অবাক হয়ে তাকাল ছেলেটা, "ব্যায়াম করো?"

"তবে?"

তার উজ্জ্বল দাঁতের সারিতে জুলাইয়ের রোদ পিছলে গেল। বাস এসে দাঁড়াল। ফল গিজগিজ, পেচ্ছাপের গন্ধঅলা, মাথায় গামছা, কাঁধে গামছা টার্মিনাসে।

॥ ২॥

অনেকক্ষণ থেকে বেলটা বেজে যাচ্ছে। কী হল বিলুর? ধ্রুবজ্যোতি উঠে গিয়ে খুলে দিলেন। সংযুক্তা গলদঘর্ম। বলল, "একটা ট্যাক্সি নিলাম, যা ভিড়। বিলুটা কোথায় গেল?"

"কী জানি, ঢুকে তো পড়ো আগে।"

"আগে একটু চান করে আসি, বুঝলে? বিলুকে বলো একটু যদি উপ্‌মা করতে পারে। চা-টা আমি বেরোলে...জানো, ওই দিয়া মেয়েটা না আমাদের কলেজের।"

"তুমি চিনতে না?"

"হুঁ, ওরা বলতে মনে পড়ল, স্যাড। মেয়েটার মা-বাবা বিচ্ছিন্ন, মা-র কাছে থাকে। তিনি তো বিশাল কাজ করেন, ম্যানেজেরিয়াল জব।" বলতে-বলতে সংযুক্তা চলে গেলেন। ধ্রুবজ্যোতি বিলুর খোঁজে গেলেন। ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠে বসল, "আগে ডাকোনি কেন বাবা?"

"দরকার হয়নি, ঘুমোচ্ছিলি খুব।"

উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছে মেয়েটা। রেজাল্ট বেরোবার সময় হয়ে এল। দু'-তিনটি মেয়েকে ওঁরা আশ্রয় দেন। লেখাপড়া শেখান। যত্নে থাকে, যত্ন করতেও শেখে। বিলুর মর্নিং স্কুল, মিলুর ডে। সে-ও এখুনি এসে যাবে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল শীলু। সে ট্রেনিং নিয়ে কম্পিউটার শিখে এখন কলসেন্টারে কাজ করে। একঘরের ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে ওর অফিসের কাছাকাছি সল্ট লেকে। এখন বিলু কী করতে পারে দেখা যাক।

বিকেলে আজ একাই হন্টনে বেরোলেন ধ্রুবজ্যোতি। পায়ে স্নিকার্স, শর্টস, সাদা টি শার্ট। শরৎ ব্যানার্জি রোড থেকে বেরিয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউ পার হয়ে লেক। ত্রিপাঠী দম্পতি জোরে হাঁটছেন। মনু দীক্ষিত ওঁকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, "এক চক্কর হেঁটে আসুন, একটা কথা বলব দাদা," তিনি স্পিড দিলেন।

দিয়ার বিষাদের কারণ তা হলে এই, ব্রোকেন হোম? যেন এক ফ্যাশন হয়েছে আজকাল। ডিভোর্স না করতে পারলে আর মডার্ন থাকা যাচ্ছে না। অত্যাচার, নির্যাতন, দুশ্চরিত্রতা, এসবের কথা আলাদা। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত মানুষ, বিয়ে করেছে, সন্তান হয়েছে, কোনওমতেই মানিয়ে থাকতে পারবে না—এ তিনি বিশ্বাস করেন না। এ সব এক ধরনের আঁতলামো।

"মা যেদিন প্রথম বলল, দিয়া, আমি আর তোর বাবা একসঙ্গে আর থাকব না। তোকে ঠিক করতে হবে তুই কার সঙ্গে থাকবি, সত্যি বলছি জেঠু, আমি একেবারে যাকে বলে অ-বাক হয়ে যাই। একদম বাকরোধ। কেননা এরকম কিছু ঘটতে চলেছে, আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি। একটা এইটুকুনি ফ্যামিলিতে মা আর বাবার মধ্যে কী চলছে, তাদের বছর চোদ্দোর একমাত্র সন্তানের বোঝার কথা। কিন্তু অন গড জেঠু আমি বুঝতে পারিনি। মা-বাবা দু'জনেই বড় পোস্টে কাজ করে, অনেক দায়িত্ব। আরও ছোটবেলায় আমার দিদাই ছিল, মলিনাদি ছিল, ছিল আমার নিজস্ব ঘর। এখনও রয়েছে আমার ক্লাব, খেলাধুলো, বন্ধুবান্ধবের বিরাট দল। কোনও জিনিসের অভাব কী আমি তো কোনওদিনই বুঝিনি। আমি জানতামই বাবা অর্ধেক দিনই অনেক রাত করে বাড়ি আসবে, মা তার চেয়ে আগে। তবুও রোববার ছাড়া আমাদের একসঙ্গে খাওয়ার কোনও ব্যাপারই ছিল না। আমি তো ঘুমিয়েই পড়তাম, রাতে বাবা আসার আগে। আমি তো জানতামই, বাবা-মা সকালে দু'জনে দুটো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবে। বাবার তখন খেয়ালই থাকবে না, আমি কোথায় কী করছি। ল্যাপটপ খুলে বসে ব্রেকফাস্ট খাবে, খেতে-খেতে অন্যমনস্কভাবে হুঁ হাঁ করে মা-র কথার, আমার কথার জবাব দেবে। মা বরং বলবে, দিউ, আমার সঙ্গেই খেয়ে নে। ডায়েরি হারাস না, টাস্কগুলো ঠিকঠাক টুকে আনিস। বড় হয়ে যাওয়ার পর বলত, আই ট্রাস্ট ইউ দিয়া। সব সময়ে মনে রাখবি। যে-স্বাধীনতা দিয়েছি বা দিতে বাধ্য হয়েছি, প্রুভ দ্যাট ইউ ডিজার্ভ ইট। কাগজ পড়িস তো? চারদিকে কত বিপদ, কত যে ফাঁদ। খুব বুঝে-সুজে চলিস। গাড়িটা ব্যবহার করিস না কেন? নিজের গাড়ি একটা সেফটি মেজার। বাবা রবিবারে গল্প করত। ছোটবেলার ছেলেমানুষি গল্প, বড়বেলায় অ্যামবিশনের গল্প। আমাকে কেম্ব্রিজে পাঠাবে, না হাভার্ডে। আমি এই করব, তাই করব। খবরদার, আই টি লাইনে আসিস না। লাইফ বলে আর কিছু থাকবে না। এর মধ্যে বাবা-মা'র যে দূরত্ব, সেটা পেশাগত কারণে অনৈচ্ছিক দূরত্ব! ভিতরে-ভিতরে সত্যিকারের দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল, বুঝিনি তো একবারও! এত হাঁদা আমি? তোকে বোধহয় আগে থেকেই প্রস্তুত করা উচিত ছিল আমাদের, আমার বাকরোধ দেখে মায়ের প্রতিক্রিয়া। মা বলল, আসলে আমিও তো, আমরাও তো, প্রস্তুত ছিলাম না।

দপ করে মাথার মধ্যে প্রশ্নটা লাফিয়ে উঠল, হোয়াট ওয়েন্ট রং, তৃতীয় ব্যক্তি? নিশ্চয়ই তৃতীয় ব্যক্তি। কার, মায়ের? বাবার? দু'জনেরই? চোখের মধ্যে প্রশ্নটা রেখে আমি সোজা মায়ের চোখের দিকে চাই, কথার পিঠে কথা থাকলে উত্তর দিতে সুবিধে হয়। আমার কোনও কথা ছিল না, তাই মায়ের অসুবিধে হচ্ছিল।

বলল, আসলে কোনও দিনই আমাদের মধ্যে ঠিক যাকে বলে, মানে...ছিল না।

কী যে ছিল না, মা পরিষ্কার করে বলতে পারল না। হঠাৎ কেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠল, দিউ, মনে করিসনি আমরা তোকে ভালোবাসি না। আমরা দু'জনে শুধু তোর ব্যাপারেই খুব কাছাকাছি, খুব। ওইজন্যেই...এবার আমায় বলতে হল, আমি তো এখনও আছি। আমার প্রশ্নটাও স্পষ্ট নয়, তবু একজন মায়ের বা বাবার বোঝা উচিত।

ভুল বুঝিসনি। তুই আমাদের আছিস, থাকবি চিরকাল। কিন্তু আমরা পরস্পরের সঙ্গে আর থাকতে পারছি না।

কেন?

বলা খুব শক্ত।

তুমি বা বাবা কি আবার আর একজনকে?

না না। আমি তো নই-ই। ডোন্ট মেক আ মিসটেক দিয়া। অন্য কাউকে, কোনও পুরুষকে বিয়ে-টিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তোর বাবারও আপাতত তেমন কোনও ইচ্ছে আছে বলে জানি না।

কতক্ষণ তোমরা বাড়ি থাকো মা? আমার জন্য মাত্র এইটুকু সময়ও একসঙ্গে থাকতে পারবে না? আমার জন্য? আমার জন্য?

তখন মা এসে আমায় জড়িয়ে ধরল। আমার চোখের গরম জল মায়ের গায়ের উপর, খোলা হাতের উপর পড়তে লাগল। সেইজন্যেই তো ছিলাম, এখনও থাকতে চাই। কিন্তু তোর বাবাই আর থাকতে চাইছে না।

অথচ বাবার আর কেউ নেই! এটা তুমি আমায় বিশ্বাস করতে বলছ?

যতদূর জানি কেউ নেই। যদি থাকেও, আই জাস্ট ডোন্ট কেয়ার দিয়া, আমার কাছে ওর আর কোনও ইম্পর্ট্যান্স নেই। কেন বুঝতে হলে, তোকে বড় হতে হবে।

আমাকে তোমরা কেউই চাও না। আমি আসলে তোমাদের কাছে একটা ভার।

ভুল, একদম ভুল। আমরা দু'জনেই তোকে চাই। একমাত্র তোর মধ্যে দিয়েই আমরা স্বাভাবিক পৃথিবীতে বাঁচি, দিয়া।

তা হলে বললে কেন, আমি যার কাছে ইচ্ছে থাকতে পারি?

কী করব বল, সেটাই যে আইন। তোকে ঠিক করতে হবে।

মা, কোনও ছেলে-মেয়ে এটা ঠিক করতে পারে, তুমিই বলো?

একটু চুপ করে রইল মা। তারপর বলল, তবে তোকে সরাসরি বলছি, তুই কোর্টে বলিস মায়ের কাছে থাকবি। তুই মেয়ে দিয়া, বাবার কাছে থাকলে তোর খুব অসুবিধে হবে। জেঠু, তুমি কিছু বুঝলে?"

ধ্রুবজ্যোতি চমকে উঠলেন। আনমনে বললেন, "নাঃ।"

দিয়া বলল, "রাতে বাবার সঙ্গে যা হল সে আরও দুর্বোধ্য নাটক। বাবা টাইটা খুলতে খুলতে বলল, দিয়া, তোর মায়ের কাছ থেকে সব শুনেছিস তো?

শুনেছি। কিন্তু বুঝিওনি, মানতেও পারছি না। বাবা, দিদাই আর দাদা কি তোমাকে ফেলে চলে গিয়েছিল কেউ?

তা তো গিয়েছিলই। তোর দাদাই তো আমার চব্বিশ বছর বয়সে চলে গেলেন।

মৃত্যুর উপর কার হাত?

কিন্তু তোকে তো আমি ফেলে যাচ্ছি না, তুই তো অবশ্য আমার সঙ্গে যাচ্ছিস। বাড়ি নয়, বিশাল ফ্ল্যাট একখানা। কোনও কিছু ভাবতে হবে না, সব ইন-বিল্ট।

মা-ও, ওখানে মা-ও থাকবে? ইন-বিল্ট?

কী মুশকিল! এখন তো তুই বড় হয়ে গিয়েছিস, মায়ের আর দরকার কী?

মা-বাবা বুঝি দরকারের জিনিস? যেমন দুধের বোতল? যেমন ওয়াকার?

ওহ দিয়া, তুই তো খুব ইন্টেলিজেন্টলি কথা বলতে শিখেছিস। তুই আমার কাছে থাকবি, আমরা দু'জনে কত মজা করব।

বাজে কথা বোলো না বাবা, মজা করার সময় তোমাদের কারওই নেই। বাবা প্লিজ, তোমরা এক বাড়িতে আমাকে নিয়ে থাকো। কতটুকু সময় তোমাদের দেখা হয়। না হয় তোমার একটা ঘর, মায়ের একটা ঘর...আমার জন্য। শুধু আমার জন্যে, লক্ষ্মী বাবা।

বাবা খুব গম্ভীর মুখে বলল, তাই তো ছিলাম, এখনও রাজি আছি। কিন্তু তোর মা-ই আর থাকতে চাইছে না।

এক মুহূর্তে থমকে গিয়েছিলাম আমি। কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে? আমি ছুটে মা'র কাছ যাই, মা, মা, বাবা আমার জন্য এক বাড়িতে থাকতে রাজি হয়েছে।

মা প্লেট মুছতে-মুছতে ঠান্ডা গলায় বলল, বাবা মিথ্যে কথা বলছে। জিজ্ঞেস কর, সেক্টর ফাইভের কাছে বাবার ফ্ল্যাট কেনা, সাজানো স-ব হয়ে গিয়েছে। ও পারলে এখুনি চলে যায়।

মাকে টানতে টানতে বাবার ঘরে নিয়ে আসি আমি। তোমরা বলো, আমার জন্যে বাবা-মা হয়ে তোমরা এক বাড়িতে থাকবে। বলো, প্লিজ বলো। তোমাদের তো আর কেউ নেই কেন তোমরা থাকতে পারছ না? আমি জানি না, যদি বলবার মতো কিছু থাকে তো বলো। আমি বুঝব, বোঝবার চেষ্টা করব, কথা দিচ্ছি।

বাবা-মা দু'জনেই শূন্যের দিকে চেয়ে রইল। তখন আমি মায়ের হাত ছেড়ে দিলাম। বাবার হাত ছেড়ে দিলাম। আমার ঘরে চলে এলাম। শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কাঁদতে পারলাম না। কান্নাটা আটকাতে থাকল চকোলেটের মধ্যে লিকিওরের মতো। সারা জীবন এই কান্নাটা আমার মধ্যে টলটল করবে বুঝে গেলাম।"

মনু দীক্ষিতের সঙ্গে ধ্রুবজ্যোতির প্রায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

"সমানে আপনাকে থামতে বলছি, শুনতে পাচ্ছিলেন না? কী এত ভাবছিলেন?"

মনুর মাথায় বয়কাট চুল, পাক ধরেছে। কান দুটো কুলোর মতো চিতিয়ে থাকে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড়। ঠোঁট দুটি আশ্চর্য সুন্দর। ছোট্ট নাক, এমন কিছু মোটা নয়। সুগার হয়েছে, ডাক্তার বলেছেন হাঁটতে।

ধ্রুব বললেন, "কিছুই ভাবিনি। কী ব্যাপার বলো।"

"আজকাল লেকে হাঁটা নুইস্যান্স হয়ে যাচ্ছে। আপনারা কিছু করুন।"

"কীরকম?"

"আশপাশে তাকান, তা হলেই বুঝতে পারবেন। প্রকাশ্যে এইরকম নেকিং, কিসিং আগে দেখেছেন? এদের তো 'লভ' সম্পর্কে কোনও পবিত্রতাবোধও নেই। দিস ইজ স্যাক্রিলিজ্যাস!"

ধ্রুব বললেন, "পাখি বা কুকুর, ছাগল এরা কি তোমাকে, আমাকে তোয়াক্কা করে মিস দীক্ষিত?"

"ওরা ওই স্তরে নেমে গিয়েছেন বলছেন?"

ধ্রুব মৃদু হেসে বললেন, "না। ওরাই আমাদের আর ওদের মতো 'মানুষ' বলে মনে করছে না। পশুপাখির সামনে আর মানুষের লজ্জা কী? দে থিঙ্ক, উই এজেড পিপল আর আ ডিফরেন্ট স্পিসিজ।"

মনু চোখ আরও বড় বড় করে বললেন, "ধ্রুবদা, হাউ ক্যান ইউ বি সো ক্রুয়েল, সো শকিং?"

"শকিং আমি হলাম মনু? যা সত্যি, তাই বললাম। দেখে শুনে এটাই আমার মনে হচ্ছে। স্যরি, ইফ আই হ্যাভ হার্ট ইউ।"

"বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজন হলে কিন্তু কেলেঙ্কারি হবে," সুজিত বোস কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। "এরা সব আমাদের ছেলেমেয়ে নয়, বুঝলে মনু? আমাদের ছেলেমেয়েরা অন্য কোনও সেফ ভেনু খুঁজে নিচ্ছে।"

"তবু ভালো," বলে মনু আর দাঁড়ালেন না। জোর কদমে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন।

সুজিত বোস বললেন, "আসলে মনু চাইছে, আমাদের অ্যাসোসিয়েশন কিছু করে। এখন ধ্রুব বলো, এ নিয়ে কোনও মিটিংফিটিং করা যায় কি না।"

ধ্রুবজ্যোতি বললেন, "ভাবুন আপনারা, আমি আছি।"

তিনি তাড়াতাড়ি পা চালালেন, কেননা ছেলেটি চাপা রাগে গজরাতে গজরাতে বলছে, "বাড়ি ইকোয়ালস টু জাহান্নম, পাড়া মানে নরকে ছয় ঋতু, কলেজ ইজ অনন্ত বোরডম, বন্ধু-বান্ধব আহাম্মক। হাতে রইল যন্তর।"

ক্রুদ্ধ চোখে তাঁর দিকে চাইল, "কাল থেকে বলে রেখেছি দশটায় বেরোব। এখন মাই জেঠিমা দ্য গ্রেট বলছেন, 'এই তো কলির সন্ধে, সবে জলখাবারের পাট চুকল। রোববারের বাজার, ভাতে জল দিয়েছি। একটু সবুর কর।' হোয়াট দ্য হেল ডু দে ডু ফ্রম মর্নিং টিল নাইট? দিবারাত্র রান্নাঘরে ঘুসঘুস করছে। নো রেজাল্ট? নো প্রোডাক্ট?"

ওদিক থেকে মন্তব্য এল, "অত ইংরেজি বলছিস কেন? বলছি তো, একটু দেরি হবে। ধর, মিনিট কুড়ি, যাবি কোথায়?"

"বুন্দেলখণ্ড।"

বাপস। ফায়ার হয়ে আছে। এখনকার সব ইয়ংম্যানই কি এইরকম? অ্যাংরি এবং হাংরি? তবে এ ছেলেটি সেরকম বক্সার টাইপ চেহারার নয়। ন্যাদনেদেও নয় তাই বলে। একটা স্ট্রাকচার আছে, তারুণ্যের কমনীয়তার তলায় একটা ইস্পাতের আস্তর। ঠোঁট দুটো চেপে বেরিয়ে যাচ্ছে। পেছনে বোধহয় ওর জেঠিমা ডাকছেন, "ও কী রে। চললি কেন? মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করতে পারিস না? কী এমন কাজ তোর?"

ছেলেটি ততক্ষণে বাসস্টপে। একটা 'টু'তে উঠে পড়েছে। ভিড়ভাড়, জ্যামট্যাম ঠেলে বাসটা ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে বালিগঞ্জ স্টেশনে ঢুকে যাবে। ক'টা লালবাতি খাবে, সেই যা ভাবনা। হিতেন সারকে আজ ধরতেই হবে। কোথাও একটা পাও-ভাজিটাজি মেরে দেব। চার ঘণ্টার মতো নিশ্চিন্ত। খাওয়া-ফাওয়া ব্যাপারগুলো নিয়ে এরা এমন একটা করে না, যেন খেতেই এসেছে পৃথিবীতে। চব্বিশ ঘণ্টা দেখো, আশপাশে মানুষ গাঁউ গাঁউ করে গিলছে। গিলে যাচ্ছে। ডালপুরি, তেলেভাজা, ধোসা, চাউমিন, বিরিয়ানি গিলেই যাচ্ছে। কোনও নির্দিষ্ট টাইম নেই। অল টাইম ইজ গবলিং টাইম। আর যাই করো। যে-দেশি পদই পাতে দাও, ফুড়ুৎ হয়ে যাচ্ছে দেখতে না দেখতে। দা গ্রেট ইন্ডিয়ান ইটিং সার্কাস। মেডিক্যালের স্টপ থেকে আরিয়ান উঠল, "হাই রূপ্‌স।"

"হাই আরি!"

"চললি কোথায়, ক্লাস নেই?"

চোখ নাচাল আরিয়ান। মেডিক্যালটা মেরে দিয়েছে গত বছর, ক্যালি আছে। প্রথম বছরটা মিস করল কেন, কে জানে! আসলে সবটাই সেই আননোন এক্স ফ্যাক্টর। বিশাল একটা জটিল ছক কাটা রয়েছে প্রত্যেকের জীবনে। ছকটা অন্যদের জীবন। ভূ-গোলক তার অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা, তার অতীত, ভবিষ্যৎ, এই সমস্ত নিয়ে কাটাকুটি খেলতে-খেলতে চলেছে। কোথায় কেন কী হল না, আর কোথায় হঠাৎ কী হয়ে গেল, তা সেই ছকই জানে। কোনওটারই আপাতদৃষ্টিতে কোনও কার্যকারণ নেই। একটা পয়েন্টে যদি একশোটা গাড়ি ক্রস করে এক মুহূর্তে, কোনটা প্রথম যাবে, কোনটা কোনটার সঙ্গে ধাক্কা লাগাবে, কোনটার পেছনে পুলিশ লাগবে, তুমি বলতে পারবে? এ সেইরকম।

"কী রে আরি! এখন তো তোর অ্যানাটমি পড়ার কথা।"

আবার চোখ নাচাল আরিয়ান। নিচু গলায় বলল, "ট্যাটু ক্লাসে যাচ্ছি।"

"মিন্‌স?"

"রীতিমতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয় ইয়ার।"

"হঠাৎ ট্যাটু!"

"ইন-থিং!"

"তুই আবার কবে থেকে ইন-আউট করতে লেগেছিস?"

"আপকামিং ক্লাস, চড়চড় করে মই বেয়ে উঠছে ইয়ার। শুদ্দু ডান হাতের ফোর আর্মে একখানা ড্রাগন। যখনই হাত তুলব, নজরে পড়বে। আর দেখতে হবে না। দাম চড়ে যাবে এক লাফে।"

"ফান্টু!"

"ওল্ড ভ্যালুজ নিয়ে থেকে যা মেছোবাজারে," আরিয়ান ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

এইটা শুনলে তার ফাটাফাটি রাগ হয়ে যায়, ধ্রুব জানেন। এই সাউথের ছেলেগুলো উত্তর কলকাতা মানেই মেছোবাজার বুঝে চলেছে। কোথায় থাকিস? মেছোবাজারে। কোথায় যাচ্ছিস? মেছোবাজারে। সংযুক্তা গল্প করেছিলেন, 'জানো লোরেটোতে পড়তে গিয়েছি, একটা মেয়েকে বেশ ভালো লাগল। জিজ্ঞেস করি, কোথায় থাকো, না বালিগঞ্জ প্লেস।"

আমি বললাম, "ও বালিগঞ্জ?"

মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে বলল কী জানো, "তা কি মেছোবাজারে থাকব?" বলতে বলতে সংযুক্তা হেসেছিল।

"তুমি তো বাবা সেই বালিগঞ্জের মক্কেল, অমনি আপস্টার্ট নাকি? আমি তো প্রথমে না-ই করে দিয়েছিলাম।"

রূপরাজ ছেলেটি বলল, "আমার নিজের যে নর্থ পছন্দ, তা মোটেই নয়। কিন্তু গোয়াবাগানের ছেলে অত সহজে কিল খেয়ে, কিল হজম করার পাত্র আমি নই। তুই যা গেছোবাজারে," চেঁচিয়ে বলি। আশপাশের দু'-চারজন মিচকি হাসে। "আরে বাবা, এই নর্থ ক্যালকাটাই আসল কলকাতা। এখানেই রেনেশাঁস। রবীন্দ্রনাথ থেকে সত্যেন বোস। কী সাহিত্য, কী বিজ্ঞান, এখানকারই কোণ-কানাচ থেকে বেরিয়েছে, তবে না দাঁড়িয়ে আছিস! নইলে কোথায় দাঁড়াতিস দাঁড়কাক? চললেন ট্যাটু করতে, নাকি ইন-থিং! পত্রপত্রিকা, বোকা বাক্স যা খাওয়াচ্ছে, খেয়ে যাচ্ছে। খা বাবা, বোকা বন। তেরি লাইফ, তেরি চয়েস।"

আমার কতকগুলো প্রিন্সিপল আছে। প্রিন্সিপল ছাড়া কোনও অ্যাডাল্ট হয় আমি মানি না। প্রথম কথা, সব লোকে যা করছে জাস্ট দলে পড়ে, আমি তা করব না। যত প্রেশার দিবি, আমার কুকার তত চড়ে যাবে। ফার্স্ট ইয়ারেও কেউ আমাকে সিগারেট খাওয়াতে পারেনি। ঘুরতে-ফিরতে ঠাট্টা, ইয়ার্কি। আমি খাইনি। ইচ্ছে হলে স্মোক করব, মেরি মর্জি। ফ্যাশন বলে, ম্যাচো বলে, ইন-থিং বলে আমার ওপরে চাপিয়ে দিতে পারবি না কেউ কিছু। এখন খাচ্ছি, টেনশন হলে, ভালো দেখায় বলে, অনেক সময়েই সিগারেট ঝুলিয়ে রাখি ঠোঁটে।

উত্তর কলকাতা পুরনো, ঘিঞ্জি, সেকেলে। বেশ, কিন্তু এখানেই জন্মেছি, বড় হয়েছি এবং এই জায়গাটার একটা লম্বা ইতিহাস আছে। বিপ্লবও সেই ইতিহাসের অংশ। এখন এই জায়গাটাকে তাচ্ছিল্য করলে তো নিজেকেই তাচ্ছিল্য করা হয়, নিজের জন্মমাটির ইতিহাসকে তাচ্ছিল্য করতে হয়। নিজেকে তুচ্ছ করে কেউ কোনওদিন বড় হতে পারে? অন প্রিন্সিপল, আমি উত্তর কলকাতার হয়ে লড়ে যাই। আমি বলি বিবেকানন্দ। আমি বলি, পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো। আমি বলি, চিতপুরের যাত্রা পাড়া, হিন্দু কলেজ, বেথুন কলেজ, এবং বলি, নকশাল। এই রে, হাজরার মোড় থেকে জ্যাঠামশাই উঠলেন, হয়ে গেল আজ। একেবারে কোণ ঘেঁষে বসে পড়ি। বই খুলে পড়তে থাকি। জ্যাঠামশাই এখানে কী করছেন, এই বুড়োগুলো কি মন্তরে চলে নাকি? হেদুয়ার জ্যাঠামশাই, হাজরায়?

জ্যাঠামশাইটি আমার নিজের নয়। নিজেরও অবশ্য আছে, বহাল তবিয়তে আছে। তবে সেটিকে আমি গোয়াবাগানের বাড়িতে জুতো পালিশ করতে দেখে এসেছি। তিনি পালিশ-বিশারদ। এবং সক্কালবেলায় বাড়ির সব্বার জুতো ঝকঝকে করে পালিশ করাই এঁর বাতিক। তবে আপাতত বাসের

অন্দরে যে জ্যাঠামশাইটিকে দেখে আঁতকে উঠেছি, তিনি সর্বজনীন। সবচেয়ে মজার কথা এঁকে আমি একা নই, প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে কনসাল্ট না করে ওই একই নাম দিয়েছে। অর্থাৎ ওঁর জ্যাঠামশাইত্ব একেবারে স্বপ্রকাশ। ওই যে শুরু করে দিয়েছেন, 'আসলে কী জানেন, দি সিক্রেট অব সার্ভাইভ্যাল ইজ মেন্টাল স্ট্রেংথ। আর হাসবার ক্ষমতা। আজকাল সব লাফিং ক্লাব হয়েছে, আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ধরতে পারছে সকলে। তবে কী জানেন, হাসিটা যখন ভেতর থেকে অটোম্যাটিক্যালি আসে, তখনই সেটা আসল হাসি। উঁ হুঁহুঁ হল না, সেভেনটিএইট। সব্বাই এই ভুলটাই করে। এখনও রেগুলার ব্যায়াম করি। ধাঁ করে ঘরের এদিক থেকে ওদিক পিছলে চলে যাব ভাই শিঙি মাছের মতো, এমন বডি ফিট। আজ্ঞে কী বললেন, থামব? অ্যাঁ, শিয়োর। থামতেই তো এসেছি। আমিও থামব, আপনিও থামবেন। কেউই চিরদিন...যাক।'

কেউ স্নাবিং দিয়েছে আর কী! প্রায়ই স্নাবিংটা খান উনি। কে আর অত ভ্যাজর ভ্যাজর শোনে! তবু জ্যাঠামশাইয়ের শিক্ষা হয় না।

॥ ৩ ॥

আমি রাসবিহারী মোড়ে টুক করে নেমে যাই। এখান থেকে ট্রাম নিয়ে নিই। ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় করতে-করতে ট্রাম চলল। জ্যাঠামশাইয়েরই মতো, স্পিড নেই, বাক্য আছে। ওখার্ডের কাছটা কী নোংরা, বাপ রে! কাগজকুড়ুনিদের বস্তি মনে হচ্ছে। বস্তা বস্তা আবর্জনা জড়ো করে রেখেছে একদিকে। তার থেকে কিছু খুঁজে চলেছে তিন-চারটে বাচ্চা। দু'জন মেয়েলোক। একটা লোক বিড়ি ধরাল। ও বাবা, আবার তোলা উনুনে রান্না বসেছে। দেখতে-দেখতে ট্রাম-জ্যাঠা খুরখুর করে এগিয়ে গিয়েছে। এ দৃশ্য আমাদের নর্থে নেই, বুঝলি আরিয়ান! কোটি টাকার হাসপাতাল, ঠাকুরদেবতার মঠ, দু'পাশে বড় বড় দোকান, বড়লোকের বিবিরা সিল্ক-ব্রোকেড কিনছে, তার মাঝমধ্যিখানে কাগজকুড়ুনির বস্তি ইন ফুল সুইং। এরই কাছাকাছি কোথায় যেন থাকিস? দেশপ্রিয় পার্কের কাছেই বলেছিলি তো! রাস্তার নামটা ঠিকঠাক মনে পড়ছে না। তবু এ কথা সত্যি, রাসবিহারী ধরে একটু এগোলেই মনটা বেশ ফুরফুরে হয়ে যায়। সামহাউ প্রবলেমগুলো কেমন বাষ্পীয় হয়ে যায়। যেন চাকরি-বাকরির ভাবনা আবার কী জিনিস? ও তো হবেই, জাস্ট আ ম্যাটার অব টাইম। মিছিল নেই, চাক্কা জ্যাম নেই, রাস্তায় পড়ে থাকা লাশ নেই, দু'ধারে কালোয়ারদের দোকান নেই, ইচ্ছে হলেই কিছুমিছু খেয়ে নেওয়া যায়। এটুকু স্বীকার করতেই হবে।

গড়িয়াহাটে নেমে পড়ি। রোল-ফোল কিছু খেয়ে নিতে হবে। দু'পাশে হাজার রকম পসরা সাজানো। চিকমিক-ঝিকমিক করছে। ভিড় ঠেলে এইসব চিকিরমিকিরের মধ্যে দিয়ে যেতে বেশ লাগে। মনে হয়, চারপাশে একটা উৎসব চলেছে। যে-যার মতো করে এই উৎসবে অংশ নিয়েছে। কেউ রোল ভেজে যাচ্ছে, দ্যাখ-না-দ্যাখ এক টিপি পেঁয়াজ কেটে ফেলছে, কেউ-কেউ 'আসুন দিদি, আসল পপলিনের পেটিকোট' হাঁকছে, 'কী রে ঠকাবি না তো?' একজন জিজ্ঞেস করল। যেন ও বলেকয়ে ঠকাবে। ফুল কিনছে একজন, 'উঁহু, নীলে চোবানো রজনীগন্ধা নেব না। গ্ল্যাডিওলি কত করে?' একজন আমার পা মাড়িয়ে গেল, 'সরি দাদা, লেগে গেল।' দুটো রোল বেশ ফুর্তির মাথায় পেট্রায় করলুম। তারপর হন্টন।

বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, এই আর এক মাল। কী ঘিঞ্জি, কী ঘিঞ্জি! তেলিপাড়াকে হার মানায়। এখানে একটা গেস্ট হাউজ আছে। নামে গেস্ট হাউজ, আসলে ভাড়াবাড়ি। একখানা ঘর নিয়ে তুমি থেকে যেতে পারো। এখানে নাকি নামী লেখকরা থেকেছেন, উঠতি অভিনেতারাও। রীতিমতো পশ গেস্ট হাউস।

নীচে একজন থ্যাপাস-থ্যাপাস করে কাপড় কাচছে। আমি পাশের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম।

ডান দিকে হিতেন সারের ঘর। হিতেন দেশাই গুজরাতি। শুনেছি সুদ্দু এই কোচিং করেই কলকাতায় বাড়ি-গাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন। এই খাস্তা-গজা জায়গাটায় বোধহয় শুধু কোচিং করেন। দশ-বারোজন ছেলেমেয়ে অলরেডি বসে আছে। রিনাকে চিনলুম। বলল, "হাই!" ওদিকে ও ছেলেটা কে, ফ্যান্টাস্টিক চেহারা তো! বিজ্ঞাপনের পাতাটাতা থেকে উঠে এসেছে মনে হচ্ছে। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন ও-ই হিরো, হিতেন দেশাই ইজ নো বডি। আরিয়ান, তোর বাজার গেল রে!

দিয়ার পাশে গিয়ে বসি। ওর ভালো নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। কিন্তু আমরা ডাক নাম ধরেই ডাকি। মুখখানা প্রতিদিনের মতো দুঃখু-দুঃখু করে রেখেছে। কীসের যে অত দুঃখ বুঝি না বাবা। দামি-দামি জামাকাপড় পরিস, গাড়ি সব সময়ে তোর তাঁবে, মা ঘ্যাম কাজ করে, হাতখরচা দেয় বাবা, ঝমঝম করছে ব্যাগ। মা-বাবা একসঙ্গে নেই তো কী? থাকলেই তো ঝগড়া। রাত্তিরে কেন মুড়ো ঘন্ট করেছ? জানো না আমার কাঁটা লাগে? লাগ ধুমাধুম লেগে গেল। দিদির নাতির অন্নপ্রাশন, রুপোর সেটটা আনতে সে-ই ভুলে গেলে? নারদ-নারদ। এর গলা 'নি'-তে চড়েছে তো ও গলা চড়ায় 'সা'। কত অ্যাডভান্টেজ তোর, চেহারাখানাও পেয়েছিস জব্বর। ভগা না দিলে কে দেয় বল! এক ঘড়া তোর গঙ্গাজল, এক আধ ফোঁটা চোনা থাকবে না? ওতে কিস্যু হয় না।

"মলাটটা পালটা", আমি নিচু গলায় বলি।

"শাট-আপ!" জবাব আসে।

হিতেন সার সাদা চুলের কেশরের উপর দিয়ে সাদা হাতটা চালিয়ে বললেন, "রূপরাজ, তোমার খাতাটা এসে নিয়ে যাও। মেন্ড দ্য ক্রস্‌ড ওয়ানস।" খাতাটা নিয়ে আমি পাশের ঘরে চলে যাই। এখানে ক'টা টেবিল আর মোল্ডেড প্লাস্টিকের চেয়ার আছে। মার্জিনাল নোটস রয়েছে, পয়েন্টস দিয়ে দিয়েছেন, আধঘণ্টাটাক লেগে গেল। উনি খাতাটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলেন, বড় বড় রাইট চিহ্ন দিলেন। তারপর একগোছা জেরক্স বাড়িয়ে ধরলেন। ব্যাস, আমার কাজ শেষ। উঠে পড়লুম। বাই দিয়া, বাই রিনা। বেরিয়ে দেখি, সেই মডেলও নামছে।

আমি বললুম, "আমি রূপ, মাসকম। তুমি?"

"উজ্জ্বল, এবার বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং-এ ঢুকলাম।"

"এঞ্জিনিয়ারিং-এ যাচ্ছ কেন? মডেলিং-এ যাও। বস্তা বস্তা টাকা কামাবে, তারপর ফিল্ম।"

"বডিটার কথা বলছ? ফালতু কাজের জন্যে বানাইনি। সো ইউ বিলিভ ইন বস্তা-বস্তা টাকা কামানো? আমার বডিটা তোমায় দিয়ে দিচ্ছি, যাও কামাও। তোমার কলমটা আমায় দিয়ো, অ্যান্ড ইয়োর ইম্যাজিনেশন।"

"সে-সব মাল আবার কোথায় পাব?"

"হিতেন সার বলছিলেন, আছে। মানে তোমার।"

আমি হেসে ফেলি। মনটা হঠাৎ খুব হালকা হয়ে যায়। বলি, 'টাকা কামানো তো অবশ্যই, কিন্তু আসল হচ্ছে মিনিংফুল কিছু করা।"

"দাগ রেখে যাওয়া বলছ, বিবেকানন্দ বলেছিলেন না?"

"ওরে বাবা, দাগ রেখে যাওয়া-টাওয়া আমার কম্মো নয়। ভালো লাগে, এমন কিছু করতে ইচ্ছে করে।"

"আমি আবার যা ভালো লাগে না, জেদ করে তাই করছি।"

"কেন?"

"তাড়াতাড়ি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাব।"

ভালো লেগে যায় ছেলেটাকে। একটা কফিখানায় গিয়ে বসি।

॥ ৪ ॥

বারান্দায় কাগজ ছোড়ার বম্বেটে আওয়াজটা পাওয়া গেল। চোখটা একবার খুলেই আবার বুজে ফেললেন ধ্রুবজ্যোতি। সংযুক্তা বললেন, "ওঠো না, একদিন না হয় চা-টা দিলে।"

"দেব বলছ?" ধ্রুব আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়লেন। বিলুটা দেশে গিয়ে হয়েছে মুশকিল। মিলুর পরীক্ষা এসে গিয়েছে, সে ছাতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে পড়া তৈরি করে। দরজাটা খুলতে না খুলতেই দেখলেন, মিলু তিরের মতো সাঁ করে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। তিনি নিশ্চিন্তে মুখ-টুখ ধুয়ে, গরম চা হাতে বারান্দায় এসে কাগজের পাকানো লাঠিটি খুলে ধরলেন। ধরেই একটু ঝুঁকে পড়লেন তিনি। চা-টা চলকে পড়ল ডিশে। শুকতারা বলে একটি মেয়েকে কনট্যাক্ট করেছে পুলিশ। সে নাকি আরিয়ানের প্রেমিকা।

মেয়েটি পুলিশকে বলেছে, "প্রেমিক? বশ্ অ্যান্ড ননসেন্স? ডেট বলতে প্রেমিকা বোঝায় না ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন। ডেটিং একটা খেলা। এর মধ্যে কোনও সিরিয়াস ব্যাপারই নেই। আজ যদি আরিয়ান নামে কারও সঙ্গে বেরোই, পরশু হয়তো বেরোব জগদীশের সঙ্গে। তার দু'দিন পরে জাস্ট মিতালি। একে কি ওয়েস্টার্ন সেন্সে ডেটিং বলে। এখানে পড়াশোনা করতে হলে রীতিমতো খাটাখাটনি করতে হয়। অত শস্তা নয়। ডেট হুঁঃ! হ্যাঁ, নিশ্চয় আরিয়ানকে আমি চিনতাম। তো কী? বলুন কী বলব?"

আরিয়ান অ্যাকাডেমিক্যালি মধ্যমানের ছেলে ছিল শুকতারার কথা অনুযায়ী। ভীষণ আমেরিকা-হ্যাংলা। ও খুব হাল্‌কা ধরনের ছেলে ছিল, কোনও কিছুকেই সিরিয়াসলি নিতে শেখেনি। মতিস্থিরও ছিল না। স্পোর্টসম্যান ছিল ভালো। কিন্তু সেটাকে নিয়েও কিছু ভাবেনি। কেন যে নিরুদ্দেশ হল, দেখুন হয়তো মুম্বই গিয়ে 'খান-টান' কিছু হওয়ার চেষ্টা করছে। শুকতারা আরও বলেছে, সে সিরিয়াসলি ডাক্তারি পড়ছে। থানায় গিয়ে নষ্ট করার মতো সময় তার নেই। যখনই প্রয়োজন হবে, তাকে পাওয়া যাবে। অসুবিধে কী? প্রেসের ধারণা, মেয়েটি আরও কিছু জানে। পুলিশ কী ভাবছে, বলছে না।

আরিয়ান, রূপরাজ, বাবাই, দিয়া, প্রজ্ঞাপারমিতা, উজ্জ্বল পাঁচটি ছেলেমেয়ে উইক-এন্ডে দিঘা বেড়াতে যাচ্ছে বলে বেরিয়ে গিয়েছিল ২৫ ফেব্রুয়ারি। কেউ ফেরেনি। কোনও মুক্তিপণের ফোনটোন আসেনি। দিঘায় এদের ট্রেস করা যায়নি। পাঁচজনের ছবি দিয়ে খবর বেরিয়েছে কাগজে, দূরদর্শনের চ্যানেলে-চ্যানেলে। সেখানে আবার একাধিক ছবি নানা অ্যাঙ্গল থেকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এরা কেউই কাদের সঙ্গে যাচ্ছে তা নিয়ে বাড়িতে সত্যি কথা বলেনি।

শুকতারা, তুমিও কিছু সত্য গোপন করে গিয়েছ। আরিয়ান ছাড়াও অন্যদের তুমি চিনতে, চিনতে না?"

শুকতারা, দাঁতে নখ কাটতে-কাটতে উদ্ধত গলায় বলল, "সো হোয়াট?"

"বললে না তো সে কথা?"

"পুলিশ আর প্রেস এই দুই পি'র খপ্পরে সাধ করে পড়তে যাব কেন? বুদ্ধু পেয়েছেন নাকি আমাকে?"

"দিয়াকে চিনতে? ও তো তোমার খুব বন্ধু ছিল।"

"খুব কি না জানি না, বন্ধু ছিল।"

"রূপরাজ?"

"চিনতুম।"

"তুমি উজ্জ্বল, বাবাই এদেরও চিনতে?"

"চিনতুম।"

"বিভিন্ন কলেজের, বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলে-মেয়েগুলোকে চিনলে কোথায়?"

"কী আশ্চর্য। আমাদের কোনও কমন ফ্রেন্ডের বাড়িতে দেখা হতে পারে না?"

"শোনো, ঠিক করে বলো তো, কোনও জয়েন্ট ছিল? ক্লাবটাব গোছের?"

শুকতারা বলল, "আপনি বড্ড বাজে বকছেন। ন্যাচারালি থাকবেই, সো হোয়াট?"

মেয়েটি হাই হিলের খটাখট শব্দ তুলে চলে গেল। পরনে গোল-গলা টি শার্ট, ব্লু জিনস, কোমরে কেমন একটা শেকল মতো, আধুনিক যুগের চন্দ্রহার বোধহয়। গলাতেও লম্বা একটা শেকলে একটি রুদ্রাক্ষ, তার গলায় স্টিলের ওঁ। খুব ঝাঁকড়াচুল মেয়েটির। মাঝে মাঝেই তার সাদা পালিশ করা লম্বা-লম্বা আঙুলগুলো চুলের মধ্যে ঢুকে যায়। ওটাই তার মুদ্রাদোষ। কিংবা চুলটাকে বশে রাখবার কায়দা।

শুকতারা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল, জামাকাপড় বদলে নিল। মুখে চোখে জলের ঝাপটা। হাউজ্‌কোটের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কী করছে ওরা? এবার ফিরে এলেই তো পারে! সব জিনিসের একটা সীমা আছে। ফোন করতে পারবে না, টাওয়ারই নেই। থাকলেও বিপজ্জনক। অথচ নিজের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তার গুড়গুড় টের পাচ্ছে সে। তারও থাকার কথা ছিল, ঘটনাচক্রে অন্যরকম হল।

দরজায় টোকা পড়ল। হয় বাপি, নয় মা। আর কে হবে? দরজা খুলে শুকতারা দেখল, দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছে।

"কী ব্যাপার, তোকে থানায় ডেকে পাঠিয়েছিল কেন?" মা বলল।

"বুঝতেই তো পারছ, বন্ধুদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে।"

"এতদিন ডাকেনি, এখন ডাকল কেন?" বাপি।

"সব কমন ফ্রেন্ডদের নক করছে আর কী!"

"তুমি সত্যি কিছু জানো না?" মা।

"কী আশ্চর্য! কী করে জানব, আই অ্যাম ভেরি মাচ ওয়ারিড লাইক এভরিবডি এলস।"

বাপি খুব সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আমার কিন্তু তোকে একটুও ওয়ারিড মনে হচ্ছে না টুসি। দিব্যি খাচ্ছ-দাচ্ছ, সাজগোজ করে বেরিয়ে যাচ্ছ।"

"ঠিক আছে, এবার থেকে আর দিব্যি খাব-দাব না। তা হলে খুশি হবে তো?"

মা বলল, "টুসি তুমি অ্যাডাল্ট, তোমার কাছ থেকে দায়িত্বশীল ব্যবহার কি আশা করতে পারি না আমরা?"

"মা, আমি দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কিছু করিনি। করেছে দিয়া, আরিয়ান, উজ্জ্বল ওরা। আমাকে ব্লেম করছ কেন? বেশ তো।"

"ঠিক আছে, দরজা বন্ধ কোরো না," মা চলে গেল।

বাপি কিন্তু ঢুকে এল।

"ওহ্ টুসি, তোর মা না প্যারানয়েড হয়ে যাচ্ছে তোকে নিয়ে।"

শুকতারা ঠান্ডা গলায় বলল, "স্বাভাবিক।"

"আচ্ছা, দিয়া মেয়েটা কেমন রে?"

"কেন, তুমি অ্যাডপ্ট করবে?" শুকতারা মুচকি হাসল।

"না, যেটুকু দেখেছি ওকে খুব শান্ত, নিরীহ, ঘরোয়া মেয়ে বলেই তো মনে হয়। হঠাৎ এরকম একটা নিরুদ্দেশের ঘটনায় ওর জড়িয়ে পড়াটা খুব অস্বাভাবিক লাগছে। আর ওই আরিয়ান? ওর সঙ্গেও তো তোর খুব ভাব ছিল।"

"একসঙ্গে পড়ি, ভাব তো থাকবেই। দেখো বাবা, তুমি পুলিশগিরি কোরো না। খুব হাস্যকর হচ্ছে ব্যাপারটা। বন্ধু মানেই তার সমস্ত হিডন লেয়ার জানব, এমন কোনও কথা আছে?"

"হিডন লেয়ার?"

"হ্যাঁ, মানুষের পার্সোনালিটির মধ্যে কতকগুলো স্তর আছে আমরা জানি?"

বাপি বলল, "এনিওয়ে আমরা তোমাকে স্বাধীনতা দিয়েছি, তুমি তার যোগ্য বলে নিজেকে প্রমাণ করো। এমন কিছু কোরো না, যাতে তুমি বা আমরা বিপদে পড়ি। কিছু গোপন করা যদি বন্ধুত্বের শর্ত হয়, তা হলে টুসি, সে-শর্ত ভাঙবার সময় এসেছে। দশ দিন বোধহয় হয়ে গেল, তোমার বন্ধুরা নিরুদ্দেশ। যদি কিছু জানো, যদি কোনও পয়েন্ট, কোনও ক্লু দিতে পারো, দিয়ে দাও পুলিশকে। ওদের বাবা-মায়েদের কথা চিন্তা করো।" বাপি তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বলল, "কিছুই তো বলছ না।"

শুকতারা বলল, "কিছু বলবার নেই বাপি। ওদের মধ্যে কেউ-কেউ আমার পরিচিত হতে পারে। কিন্তু ওদের সব কিছু আমি জানি না। আমার সত্যিই ভাবনা হচ্ছে।"

॥৫॥

১০ মার্চ খবর বেরোল আবার। একটি তরুণকে অযোধ্যা পাহাড়ের উপর একটা ঝোরার ধারে, ঝোপে মৃত পাওয়া গিয়েছে। ডান হাতের ড্র্যাগন উল্কি দেখে শনাক্ত করা সহজ হয়েছে। মাথাটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। জামাকাপড় কাদামাখা, ছেঁড়াখোঁড়া। মতিলাল নেহরু রোডের মিত্র পরিবারে স্তব্ধতা নেমেছে। বাবা-মা উভয়েই ডাক্তার। ছেলেও ডাক্তার হচ্ছিল। আত্মীয় স্বজনরা সাধারণত ওঁদের পান না। ডাক্তার মিসেস প্রীতি মিত্র ব্যস্ত গাইনি। তাঁর স্বামী ডাক্তার অভ্র মিত্র অর্থোপেডিক ডাক্তার, বিরাট পসার। অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে ওঁদের পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আরিয়ানের মামা-মামিরা চারজন এসেছেন ফোন করে। ডাক্তার মিত্র পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। চুল উসকোখুসকো, নাইট ড্রেস ছাড়েননি। প্রীতি বিছানায় শোওয়া, একদম চুপ। বড়মামা, প্রীতিরও বড়। বললেন, "তোমরা কি একেবারে শিয়োর যে...আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না এখনও।"

প্রীতি বললেন, "ডান হাতের ওই ড্র্যাগন উল্কি আর কার হবে দাদা? ছেলেটা আমাদের একেবারে বসিয়ে দিয়ে গেল।"

হঠাৎ ডাক্তার মিত্র পায়চারি থামিয়ে বলে উঠলেন, "তা কেন? আমাদের জীবন তো ওকে একেবারে বাদ দিয়েই চলছিল প্রীতি, তাই চলবে। অসুবিধে কী?"

তিনি প্রীতির প্র্যাকটিসের বিরুদ্ধে ছিলেন। প্রীতি স্বামীর দিকে তাকালেন না। দাদাকে বললেন, "ওর চার বছর বয়স পর্যন্ত প্র্যাকটিস করিনি দাদা। তারপরে ও স্কুলে গেল, দুপুরে ক্রেশ-এ যেতে ও খুব ভালবাসত। আমিও শুরু করলাম। এত কষ্ট করে শেখা বিদ্যা কেউ প্রয়োগ না করে ফেলে রাখতে পারে, না রাখা উচিত?"

"ইন দ্যাট কেস এইসব মেনে নিতে হবে। অকুপেশান্যাল হ্যাজার্ড। মায়ের আনঅ্যাটেন্ডেড মৃত্যু। ছেলের হত্যা।"

ডাক্তার অভ্র মিত্রর মা ছোট ভাইদের কাছে থাকতেন। সেখানে পুরোপুরি একটি পরিবার ছিল। পুত্রবধূ মেয়েকে আনতে স্কুলে গিয়েছে। এসে দেখে, মা চলে গিয়েছেন। ডাক্তার বললেন, "হার্ট ফেলিওর।"

সেটা যে কেন প্রীতির উপর চাপালেন অভ্র ঈশ্বর জানেন। কিন্তু প্রীতি জানেন, উনি ওই রকমই। ভালো ছাত্রী ছিলেন, বিদ্যাটার উপর একটা ভালবাসা ছিল, দায়বদ্ধতা ছিল। তিনি যে প্র্যাকটিস করবেন, এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে প্রীতি মনেই করেননি। অভ্র তাঁর সহপাঠী। নিজে ডাক্তার। অথচ কী করে যে এত বড় কথাটা ভাবতে পারল! এ তো বিদ্যাটার প্রতি, রোগীদের অর্থাৎ সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। ট্যাক্সের টাকায় মেডিক্যাল কলেজ তার পরিকাঠামো, শিক্ষা, ল্যাবরেটরি, আউটডোর, এমার্জেন্সি! জনসাধারণের এত পয়সা, এত আশা খরচ করে বাড়ি বসে থাকাটা পাপ

না? অভ্র কি সেটা জানে না? খুব জানে। কিন্তু তার স্বভাবই হল, কোনও অঘটন ঘটলেই জিনিসটার জন্য প্রীতির উপর দোষারোপ করা। প্রীতির দাদা-বউদি, ভাই-ভাজ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। দাদা বললেন, "এ সময়ে আর..."

অভ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি এখন বাথরুমে যাবেন, দরজা বন্ধ করবেন, তারপর চুল ছিঁড়বেন নিজের। আর কী করতে পারেন? মেডিক্যালে ঢুকেছে, সেকেন্ড ইয়ার, বছর বিশেক বয়স। ছোট থেকেই যথেষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সমর্থ ছেলে। সে যদি বলে, বন্ধুদের সঙ্গে ক'দিন এক্সকারশনে যাবে জাস্ট তিনটে দিন, আপত্তি করার কী আছে? ছেলেটা খারাপ এমন কোনও নিদর্শন তো তাঁরা পাননি। জামাকাপড়, ফ্যাশন এসব দিকে একটু বেশি নজর ছিল। তাঁদের ওই বয়সে ছেলেরা এগুলোকে হাস্যকর মনে করত। কলেজের ছেলে রোলেক্স ঘড়ি পরছে, গলায় হার, কানে মাকড়ি, এসব তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না। অবশ্য তাঁর বাবা ছিলেন অধ্যাপক, মা গৃহবধূ। তাঁদের ছেলের বাবা-মা উভয়ের মিলিত আয় মাস গেলে কী অঙ্ক ধারণ করে, তা তাঁরা ছাড়া আর কেউ জানেন না। তাঁদের ছিল বড়জোর নিউ মার্কেট আর এদের মাল্টিপ্লেক্স, আইনক্স, শপিং মল, এসক্যালেটর। তফাত তো একটা হবেই। আত্মীয় স্বজনদের বাঁকা কথা, চোরা চাউনি তিনি এখনই শুনতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন। শুধু এক্সপার্ট হলেই কি হয়, টাকা রোজগার করলেই কি হয়? বাবা হতে হয়, যথার্থ বাবা। কাজের ঘোরে মানুষ যদি একমাত্র সন্তানের দেখভাল করতে না পারে, তা হলে সে কাজের, সে উপার্জনের মানে কী? বেসিনের দু'দিকে দুটো হাত দিয়ে আয়নার দিকে চেয়ে রইলেন অভ্র। চুলে সাদা বেড়ে গিয়েছে প্রচুর, গাল খানিক ঝুলে পড়েছে, চোখদুটো কেমন রাগী-রাগী। ছেলেটা কি তাঁকে ভয় পেত?

প্রীতির বউদি বললেন, "কোথায় যাবে বলেছিল?"

ফ্যাঁসফেঁসে গলায় প্রীতি বললেন, "দিঘার কথা তো বলেছিল। যাবে চার বন্ধু, ওর বন্ধুদের সবাইকে তো চিনি না।"

"মানে সবাই কি ছেলে?"

"হ্যাঁ বউদি, সবাই-ই ছেলে। এখন দেখা যাচ্ছে, সবটাই মিথ্যে কথা বলেছিল।

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, দিঘা বলে পুরুলিয়া যাবার মানে কী? পুরুলিয়া বললে কি আমরা বাধা দিতাম? জিনিসটা অ্যাক্সিডেন্ট না মার্ডার..." বলতে-বলতে তিনি কেঁপে উঠলেন।

ছোট ভাই বলল, "না দিদি। আমার মনে হয় জিনিসটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। হয়তো কোনও অ্যাডভেঞ্চার, আর তাই-ই আসল কথাটা বলেনি। ও তো খেলাধুলো করত খুব।"

"হ্যাঁ, ও তো অস্ট্রেলিয়া গিয়ে ওয়াটার স্কিয়িং, সার্ফিং সবই করেছে রে। অ্যাথলিট ছেলে, সে যদি কোনও অ্যাডভেঞ্চারেই যেতে চায়, আমরা বাধা দেব এ কথা সে ভাবল কেন?"

"তোরা কি খুব আতুপুতু করতিস? খুব আদর দিতিস?"

প্রীতি বললেন, "আতুপুতু করবার আমাদের সময় কই? আদর, শাসন এসব অতিরিক্ত মাত্রায় করতে হলেও সময় চাই। শনিবারটা আমি অফ নিতাম। রাতে আমার সঙ্গে খেত, রোববারে বাবার অফ বাবার সঙ্গে খেত। এ ছাড়া যে যখন চেম্বার ছেড়ে বা অপারেশন থাকলে সেসব শেষ করে আসতে পারত। ও ঠিকঠাকই মানুষ হচ্ছিল বলে আমাদের ধারণা। দাদা, আমি কিছু ভাবতে পারছি না। এখন কী করব! আমি আইডেন্টিফাই করতে যেতে পারব না বলে দিয়েছি। অভ্র খুব সম্ভব একটু পরেই যাবে। পুলিশের গাড়ি আসবে। তোমরা চাইলে কেউ সঙ্গে যেতে পারো।"

প্রীতির ছোট ভাই সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। এরা ধনী এবং ব্যস্ত লোক। কখনও কারও সাহায্য চায় না। করেও না সেভাবে। তবে ডাক্তার বলে কিছু না কিছু পরামর্শ, চিকিৎসা, চেনাশোনার সুবিধে পাওয়া যায়ই। এটা মস্ত সাহায্য। কেননা আজকালকার দিনে কোনও ডাক্তার, আত্মীয়-বন্ধুর মধ্যে না থাকলে বাঁচার আশা কম। অনেকেই ধনেপ্রাণে মারা যান।

বিকেলবেলা হন্টনে গিয়ে চারদিকে এই আলোচনাই শুনলেন ধ্রুবজ্যোতি। ইয়ং জেনারেশন কী হল, কী হয়ে দাঁড়াচ্ছে? বাড়িতে না বলে অজ্ঞাত স্থানে পাঁচটি ছেলেমেয়ে চলে যায় কীসের টানে? বাড়ির প্রতি, বাবা-মা'র প্রতি কি কোনও দায়িত্ব থাকতে নেই? নিজেদের তৈরি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং অলীক একটা জগতে বাস করে এরা। ইতিমধ্যেই খবরে নাকি বলেছে, ছেলেটি খুন হয়েছে কিনা পরিষ্কার বলা যাচ্ছে না। কেননা, সে ঝোরার খরস্রোতে বোল্ডারে-বোল্ডারে ঠোকাঠুকি খেতে-খেতে ভেসে এসেছে, এটা খুব স্পষ্ট। থ্যাঁতলানো, ডিকম্পোজড্ লাশ একটা। জামা-কাপড় নেই। কিন্তু কাদা, শ্যাওলামাখা শর্টস আটকে আছে। খালি আধখানা ড্র্যাগন-উল্কি ছাড়া শনাক্তকরণের আর কোনও উপায় নেই। ধ্রুব শুধু মন দিয়ে হেঁটে গেলেন, কারও সঙ্গে কোনও আলোচনায় গেলেন না। মনটা ভালো লাগছে না। একেবারেই ভালো লাগছে না।

বাড়ি থেকে পালানোর রোগ চিরকাল আছে। আগেকার দিনে বাড়িতে অমানুষিক প্রহার খেয়ে ছেলেরা পালিয়ে যেত, পড়াশোনার চাপ ভালো লাগত না বলে পালিয়ে যেত। অ্যাডভেঞ্চারের, অ-চিরাচরিতের নেশা ছিল, ছিল দেশে দেশে ভ্রমণ করা। তারপর সিনেমায় নামবার জন্য পালাবার ঝোঁক হল। অ্যাডাল্ট মানুষ, বিবাহিত ছেলে-মেয়ের বাবা, অনেক সময়ে বিবাগী হয়ে যেত। অমুক সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে, এরকম তো যখন-তখন শোনা যেত। আর প্রেমে পড়ে পালানোও বরাবরই ছিল। সেই পথ ধরে বেচাকেনা যা এখন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তা-ও ছিল।

কিন্তু এরা কেরিয়ার বোঝে, বিলাস-ঐশ্বর্য-ভোগ এই সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামায়। স্মার্টও খুব। তা হলে, এরা কোথায় গেল? কেন গেল? কার পাল্লায় পড়ল? ঐশ্বর্য, স্বার্থপরতা, স্মার্টনেস এসবও এদের বাঁচাতে পারল না?

বাড়িতে এসে আরও একটা ধাক্কা খেলেন ধ্রুবজ্যোতি। সংযুক্তা মুখ ভারী করে বসে রয়েছে।

চা-টা খাওয়া হল। মিলুই এনে দিয়ে গেল। সেই একই বারান্দা, সেখানে একই টেবিল, এলানো বেতের চেয়ারে একই কলমকারির কুশন। তবু সব কিছুর উপর একটা ভারী কুয়াশা ঝুলে রয়েছে। মিলুর মধ্যে যেন একটা অস্বস্তি, সংযুক্তা কেমন নির্বাক এবং বিমুখ। কোনও কথাই হল না পুরো চা-পর্ব জুড়ে। কথা বলার সময় এটা নয়, তিনি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝে গেলেন। অন্ধকার যখন রীতিমতো ভারী হয়ে নেমে আসছে, গোল আলোটা জ্বেলে দিলেন ধ্রুব। সংযুক্তা বললেন, "বিলু আর ফিরবে না। বিয়ে করছে।"

"মানে?"

"মানে যা শুনলে তাই।"

"হচ্ছে, না করছে? জোর করে ওর বাড়ির লোকে দিয়ে দিচ্ছে? সেক্ষেত্রে আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে।"

"বাড়ির লোক বলতে ওর কে আছে, কী যে বলো!"

"টাকা-পয়সা নিয়ে একখানা মেয়েকে ঝেড়ে দিতে তো এই জাতীয় মাসি-পিসিই লাগে।"

"না, উনি নিজেই করেছেন।"

"ডিটেলস?"

"ওদের ওখানে মনোহারী দোকান আছে। খুব নাকি বিক্রি। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। কিন্তু একেবারেই ছোকরা দেখতে।"

ওই লিখেছে নাকি এগুলো, ছোকরা-টোকরা?

"না, ওটা আমার টিপ্পনী। ও লিখেছে, অত বড় বলে মনে হয় না।"

"ওর কত হল?"

"আঠারো হয়ে গিয়েছে।"

"তবে আর কী!" ধ্রুবজ্যোতি হাত উলটালেন। সংযুক্তা উঠে গেলেন একেবারে নিঃশব্দে। ওঁর

বেশি লেগেছে। মেয়েদের আবেগ-আসক্তি বেশি তো! তিনি যেটা করেন একটা প্রজেক্টের মতো করে করেন হয়তো। তিনটি মেয়ে আপাতত। তিনটি প্রজেক্ট। শীলু, বিপিও, একেবারে স্বনির্ভর হয়ে গিয়েছে। বিলুটার অঙ্কে খুব মাথা। দেখা যাক, যদি অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে কিছু করতে পারে। মিলুর গল্প-কবিতায় খুব ঝোঁক, রাশি রাশি পড়ে। লাইব্রেরিতে ভর্তি করে দিয়েছেন, খুব পড়ে। দেখা যাক, ও কোনদিকে যায়। তিনি এভাবে ভাবেন। সংযুক্তা ভাবেন, মিলুটা ছটফটে, খুব চঞ্চল স্বভাবের, বিলুটা বরং ধীর স্থির, ভেবে চিন্তে কাজ করে। তবে ওদের কারওই শীলুর মতো প্র্যাকটিক্যাল সেন্স নেই, ওরকম সটান, স্মার্টও ওরা নয়। ওদের গাইড্যান্স লাগবে আরও বেশি। নিজের ছেলেমেয়ে নেই বলে সন্তানস্নেহ তো খানিকটা পড়বেই!

তাঁর খুব হতাশ লাগে। এদের কারও-ই মা-বাপ নেই, গলগ্রহ ছিল সংসারে। তাঁরা নিয়ে এসে যত্ন করে বড় করছেন, লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, ভালো-মন্দ চিনতে শেখাচ্ছেন। কিন্তু বয়োধর্ম যাবে কোথায়? আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ! কারুর বিদ্রোহ জাগে, হাতে রিভলভার দেশের শত্রুর দিকে তাক করার জন্যে হাত নিশপিশ করে। কারও শরীর জাগে, সিঁদুর, বাসর, ফুলশয্যা, সারা জীবনের অধীনতা, শুধু এইটুকু পাওয়ার জন্যে। তারপর একের পর এক সন্তান আসতে থাকবে। শরীর ভাঙতে থাকবে। নাঃ, হাজার চেষ্টা করেও বোধহয় কারও জন্য কিছু করা যায় না।

॥৬॥

'ভ্যালেনটাইনস ডে', বাবাই একটা বিদেশি চকোলেটের বাক্স পেয়েছে সুন্দর করে প্যাক করা। উপরে একটা লাল ভেলভেটের গোলাপফুল আটকানো। আসলের সঙ্গে তফাত করা যায় না। এক কথায় অপূর্ব। কে পাঠাল? বাবাই রানাঘাটের মেয়ে ছিল এক সময়ে। মফস্‌সলি। কিন্তু মাধ্যমিকের পর দুর্দান্ত রেজাল্ট করে সেই যে কলকাতামুখো হল, হস্টেলে-হস্টেলে কেটে গেল তিন বছর। চার বছরের মাথায় আর তাকে মফস্‌সলের বলে চেনা যায় না। গোলপার্কের কাছে একটা প্রাইভেট হস্টেলে থাকে সে। বাবাইয়ের চেহারা পাতলা, নরম। কিন্তু সে তার শহরে বেশ ভালো স্প্রিন্টার বলে নাম করেছিল। খেলাধুলায় অল্পবিস্তর ক্ষমতা অনেকেরই থাকে। কিন্তু সেটা খুব উচ্চস্তরের না হলে চট করে কেউ খেলাটা চালিয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করে না। যদি অন্য কোনও উপায় না থাকত, তা হলে হয়তো বাবাই খেলা নিয়ে পড়ে থাকত। কিন্তু সে খুব ভালো রেজাল্ট করল। উচ্চাশার মোড় ঘুরে গেল তারও, তার পরিবারেরও। তার দিদির অনেক দিন বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাবা-মা'র একটু বেশি বয়সের সন্তান সে। তাকে নিয়ে বাবা-মায়ের কিছু স্বপ্ন আছে। তা ছাড়া সে কিছু চায় বললে, সেটা যুক্তিসংগত হলে, বাবা-মা না করতে পারেন না। সুতরাং সে কলকাতায় এসে গেল। প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হল। বাবাই খুব চটপটে, বুদ্ধিমতী, সবই। কিন্তু তবু তার বন্ধু-বান্ধবেরা বুঝতে পারে, বাবাইয়ের মধ্যে মফস্‌সল এখনও বেঁচে আছে। সে লো-ওয়েস্ট জিন্‌স্ পরবে না, মিনিস্কার্ট পরবে না, ভুরু প্লাক করবে না, বেশি রাত করে আড্ডা, আমোদ-প্রমোদেও তার আপত্তি আছে। এগুলোকেই তার বন্ধুরা মফস্‌সলি মানসিকতা বলে চিহ্নিত করেছে। যদিও শহরেও এরকম মেয়ে হাজারে হাজারে আছে। এইগুলোই যদি সে খুব জোরের সঙ্গে করতে পারত, তা হলে লোকে বলত মেয়েটার ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু সে বলে, না বাবা না, আমার দরকার নেই। না বাবা না, অত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকলে আমায় হস্টেলে ঢুকতে দেবে না। এ ছাড়াও বাবাইয়ের মধ্যে একটা সরলতা আছে, সে চট করে মানুষকে বিশ্বাসও করে ফেলে। ওভাবে বিশ্বাস করতে নেই জেনেও। এটা স্বভাব। মাঝে মাঝেই তাই প্র্যাকটিক্যাল জোকের শিকার হয় বাবাই। বন্ধুরা তুমুল হাসে। বাবাই মুখে বলে, "যাক, তোদের একটা হাসির সুযোগ তো দিলাম, ধন্যবাদ দে আমায়।" কিন্তু নিভৃতে জিভ কাটে। আর কখনও সে এরকম বোকামি করবে না, প্রতিজ্ঞা করে নিজের কাছে।

আজ এই 'ভ্যালেনটাইন' পেয়ে সে প্রথমেই চকোলেটের মোড়কের মধ্যে বালি, নুড়ি ইত্যাদি খুঁজতে লাগল। খুব সাবধানে একটা চাখল তারপর। দারুণ তো? হাত দিয়ে সবগুলো ঘেঁটে মিশিয়ে দিয়ে চোখ বুজে আর একটা তুলল। এটা আবার অন্য রকম। বাদামে ভরা, চমৎকার। মিষ্টিস্বাদের সঙ্গে বাদামের নিউট্র্যাল স্বাদ মিশে অনন্য। তার রুমমেট শ্রেয়া এই সময়ে ঘরে ঢুকে দেখে, বাবাই চোখ বুজিয়ে হাঁ করে একটা তেকোনা চকোলেটে তুলছে। একটু-একটু করে মুখের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সামনে একটা বাক্স খোলা। ডালার গোলাপ ফুলটাও তার চোখে পড়ল। শ্রেয়া আসানসোলের মেয়ে। একটা বিপিও-তে চাকরি করছে। খুব বেশি সময় পায় না। সে বেরোবে বলে তৈরি হয়ে ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে বাবাইয়ের বিছানার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে শব্দ করে একটা চকোলেটের মোড়ক খুলতে থাকল। মুখে দুষ্টু হাসি। বাবাই চোখ মেলে অপ্রস্তুত। শ্রেয়া বলল, "কী রে, স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করছিস মনে হচ্ছে? একলা খাবি?"

"না রে শ্রেয়াদি। কেউ জোক করেছে কিনা পরীক্ষা করছিলাম। র‍্যানডম একটা বেছে নিয়ে মুখে পুরছি। এই নে, খা না।" শ্রেয়া অবাক হয়ে বলল, "ভ্যালেনটাইন পাঠিয়েছে কেউ, কে? জোক করবে কেন। তুই কি জামাই? জামাইদের লোকে ঠকায় বলে জানি।"

কাঁচুমাচু মুখ করে বাবাই বলল, "কার্ডে কোনও নাম নেই। কে আবার আমাকে ভ্যালেনটাইন-ফাইন পাঠাতে যাবে? আমি এসবের মধ্যে নেই সবাই জানে।"

"আরে বাবা কোনও নাছোড় রোমিও পাঠিয়েছে। মালদার পার্টি। অন্তরাল থেকে শরক্ষেপ করছে। কাউকে মনে করতে পারছিস?"

"না বাবা। অনেকের সঙ্গেই তো মিশি, স্রেফ বন্ধুত্বের বেসিস।"

"যাক, সিরিয়াসলি নেওয়ার কিছু নেই। তুই যদি উইলিং না হোস, কেউ থোড়ি তোকে ফোর্স করছে?"

তার থুতনিটা নেড়ে দিয়ে মা-মাসির কায়দায় শ্রেয়া বলল, "যা চার্মিং তুই, পিছনে লাইন লেগে যেতেই পারে। একদম পাত্তা দিস না। জাস্ট চারদিকে নজর ফেলে রাখবি, আর মন দিয়ে নিজের কেরিয়ার করবি। পৃথিবীটা হাতের মুঠোয় এসে যাবে বুঝলি তো? প্রেম-ফ্রেম বিয়ে-ফিয়ে আপাতত সিনেই নেই।"

শ্রেয়াদি বেরিয়ে গেল। এইসব ভ্যালেনটাইন-ফাইন অত্যন্ত অর্থহীন, বাজে, খেলো ব্যাপার বাবাইয়ের কাছে। কিন্তু সে দেখেছে, তার বন্ধুদের অনেকেই ব্যাপারটা খুব উপভোগ করে। সে যদি ব্যাপারটার হাস্যকরতা নিয়ে বেশি কথা বলে, শুনতে হয় 'সেই গাঁইয়াই রয়ে গেলি, জীবনটাকে চেটে-চেটে খেতে শেখ।' কোনও ছেলে বন্ধুর সঙ্গে একা একা সিনেমা যাওয়া, খেতে যাওয়া, এসব পর্যন্ত করেনি সে। এরা ব্যাপারটাকে ডেটিং বলে। জাস্ট ফান। ওদের কথাই হচ্ছে জাস্ট ফান। এত তাড়াতাড়ি কেউ থোড়ি জীবনসঙ্গী ঠিক করতে যাচ্ছে, জাস্ট ফান।

বাবাইকে বাবা-মা একটা মোবাইল দিয়েছেন। সে উজ্জ্বলকে ফোন করল। উজ্জ্বলকে সে খেলাধুলোর সূত্রে অনেক ছোট থেকে চেনে, "এই উজ্জ্বল, তুই কি আমায় ভ্যালেনটাইন পাঠিয়েছিস?"

"কী পাঠিয়েছি, ভ্যালেনটাইন? আমি? তোকে? বাবাই তোর মাথাটা দেখা।"

"না রে। কে একজন নাম-টাম না দিয়ে পাঠিয়েছে। আমাকে আর কে পাঠাবে ওসব বল।"

"তাই সব ব্যাটাকে ছেড়ে এই বেঁড়ে ব্যাটাকে ধরলি?"

"জাস্ট জিজ্ঞেস করছি, রাগ করছিস কেন বাবা? তোকে না বললে কাকে বলব?"

"বলেছিস ভালো করেছিস, আমি খেয়াল রাখব।"

আসলে এ কথাটা আর কাউকে বললে সে নির্ঘাত ঠাট্টা খাবে। হজম করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাবাই তৈরি হয়ে কলেজ চলে গেল। কলেজে খুব হইচই। শাশ্বত খুব উত্তেজিত। বলল, "ব্যাপারটা কী বল তো! ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ইকনমিওয়াইজ স্যাচুরেশন পয়েন্টে চলে গিয়েছে। সব বিজনেস এখন

সাবকন্টিনেন্টে। আর ব্রিটিশরাজের অভিজ্ঞতা থেকে এরা জানে যে, এই সাবকন্টিনেন্ট হল বুদ্ধির ঢেঁকি। বর্ন কাক ইন ময়ূরপুচ্ছ। যা খাওয়াবে, তাই খাবে। ভ্যালেনটাইনটি খাওয়াল, ভালো ব্যাবসা হচ্ছে। গভর্নমেন্টকে কেমিক্যাল হাব খাইয়েছে, নিউক্লিয়ার পাওয়ার খাইয়েছে, মাইক্রোলেভেলও খাওয়াচ্ছে। জিন্‌স, ব্যাগি, হটপ্যান্ট, নাইটক্লাব, ড্রাগ, বাচ্চা আর মেয়ে পাচার, কিডনি চুরি, স-ব ওই শালারাই খাইয়েছে।"

"হ্যাঁ, নিজেদের আর কোনও দোষ নেই। সব ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না, বাচ্চা কিনা!"

"দোষ নেই তো বলছি না। প্রথমেই তো বলে দিয়েছি বর্ন কাক ইন ময়ূরপুচ্ছ।"

"আফটার অল একটা হার্মলেস ফান, এ নিয়ে এত তুলকালাম করার কী আছে?"

ঈপ্সা বলল, "কী রে বাবাই, তোর কী মত?"

"আমি এর মধ্যে কোনও মজা খুঁজে পাই না। কীরকম ফরেন-ফরেন লাগে।"

"ফরেন মানে?"

"ধর, কেউ আমাকে একটা মেল পাঠিয়েছে ক্যালিফর্নিয়া থেকে। আমি কে, কী, কিচ্ছু না জেনে। কিংবা আইসল্যান্ড থেকে। ও মেলটার কোনও মানে আছে আমার কাছে?"

ঈপ্সা বলল, "ইট ডিপেন্ডস। আইসল্যান্ড থেকে কেউ তোর সঙ্গে ভাব করতে চাইছে, ইটস থ্রিলিং না? আমি হলে মেলটার জবাব দেব। আমি কে, কী, সে কে কী এগুলো ক্রমশ প্রকাশ্য। তখন যদি দেখা যায়, আমার সঙ্গে মিলছে না, বন্ধ করে দেব। অত চিন্তার কী আছে? সব কিছুকেই অত ফাইনাল ডিসিশনমার্কা ছাপ্পা দিতে হবে কেন?"

বাবাই বলল, "তুই কোনও ভ্যালেনটাইন পেয়েছিস?"

"লট্‌স" ঈপ্সা বলল। "আমার বন্ধুরা সব এক একটা করে পাঠিয়েছে। জাস্ট কার্ডস। দিয়াকে চিনিস তো? দিয়া একটা দারুণ কার্ড পাঠিয়েছে। অশ্বিন বলে একটা বন্ধু আছে সে পাঠিয়েছে, আরও অনেক। আরে আমার পিসি হয় সম্পর্কে আমার থেকে কয়েক মাসের ছোট তিন্নি, ও-ও তো একটা পাঠিয়েছে। আরও আছে। ছাড় তো, বদারেশন। আমিও গুচ্ছের কিনে রেখেছিলুম। কয়েকজনেরটা পেয়ে আবার রিটার্ন কার্ড পাঠাতে হল। যত্ত হুজুগ। তুই ক'টা পেয়েছিস?"

বাবাই হঠাৎ খুব স্মার্ট হয়ে গেল, বলল, "লট্‌স।"

"তাই, কে-কে দিল?"

"ব্লাইন্ড।"

"মানে?"

"যেমন ব্লাইন্ড ডেট।"

"বলিস কী রে!" ঈপ্সা উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "তা হলে তো সিরিয়াস রে।"

"তুইও যেমন, ঠাট্টা ধরতে পারিস না?"

ঈপ্সা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বাবাই রহস্যময় একটা হাসি দিল। যাক, সে ঈপ্সাকে ভড়কে দিতে পেরেছে। হঠাৎ তার মনে হল, অনায়াসে মিথ্যে কথা বলতে পারাটাই স্মার্টনেসের সবচেয়ে বড় লক্ষণ। ভালো ছাত্রীর মতো পয়েন্টটা সে বুঝে নিল এবং মনে-মনে হাসতে লাগল। আর তাকে কেউ হারাতে পারবে না।

ছুটির সময় ঈপ্সা বলল, "আয় না রে, আমাদের আড্ডায়। আজ উইক ডে বলে শনিবার ফেলেছি। তোর কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। উইক-এন্ডে একটু হল্লা করতে না পারলে টিকব? বেশি সাধাসাধি করতে পারব না কিন্তু।"

"কোথায়, তোদের আড্ডাটা?"

"এক একবার এক একজনের বাড়িতে হয়।"

"চাঁদা আছে তো?"

"তা তো আছেই। তুই প্রথম গেলে আমার ইনভাইটি হিসেবে যাবি।"

"কারা আসে?"

"অনেকে, যে যে-দিন পারে। পোস্ট ভ্যালেনটাইন আড্ডা ভালোই জমায়েত হবে।"

"ঠিক আছে যাচ্ছি একদিন। দেখি, কেমন লাগে।"

"আমি তোকে নিয়ে যাব," ঈপ্সা বলল, "তোর হস্টেল থেকে তুলে নেব।"

॥৭॥

মিলু নাকি জানত, বিলুর ব্যাপারটা। নিয়মিত চিঠিপত্র দিত মিলুকে, সংযুক্তা খবরটা দিলেন ধ্রুবকে। এখন সংযুক্তা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছেন। মেয়েরা ভেঙেও পড়ে তাড়াতাড়ি, সামলেও নেয় তাড়াতাড়ি। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ধ্রুব মুষড়ে যাচ্ছেন, প্রজেক্ট ফেল করেছে। ক্লায়েন্ট ছিছিক্কার করছে। কে ক্লায়েন্ট তাঁর? তিনি নিজেই নিজের ক্লায়েন্ট। ব্যর্থতা মেনে নেওয়া খুব শক্ত, বলা সোজা ইগোতে লাগছে। আজকাল এই কতকগুলো কথা হয়েছে। এগুলো মাঝে মাঝে অতি সরলীকরণ হয়ে যায়। তিনি আন্তরিকভাবে নিজের সামর্থ্যের মধ্যে কয়েকজনকে স্বাবলম্বী এবং মানুষ করতে চাইছিলেন। যে-সমাজ তাঁকে এত দিয়েছে, এইভাবে তাকে কিছু ফেরত দেওয়া। অনেক এনজিও যেমন একটা স্পনসর করা বলে ব্যাপার রেখেছে। অনেকেই অনেক বাচ্চাকে স্পনসর করে। তিনিও তাই করেছিলেন। তবে দায়টাও নিয়েছিলেন। ছেলেমানুষদের একটা নিজস্ব গোপন জগৎ থাকে, বোঝা যাচ্ছে। সেটার ঠিকানা তারা কাউকে দেয় না, অভিভাবক শ্রেণিকে তো একেবারেই নয়। আর যৌবন এমনই সময়, যখন ঠিক-ভুলের সংকেতটা ঠিক করে এনডোক্রিন গ্ল্যানডস্। ভয় কম, কৌতূহল বেশি, জেদ বেশি। সত্যিকারের বাবা-মা'র প্রতি দায়বদ্ধতা বা বাধ্যতা যখন থাকে না, এই উজ্জ্বল-আরিয়ান-দিয়াদের যেমন, তখন তাঁদের পালিত মেয়েগুলির তো আরওই থাকবে না। আর সত্যি কথা বলতে তো ওদের পুরোপুরি মেয়ের স্টেটাসও দেননি তাঁরা। ওরা সুখে-সম্মানে থাকা কাজের লোকই ছিল। যদি দু-তিন বছর বয়স থেকে ওদের বড় করার সুযোগ পেতেন, হয়তো মেয়ে করে নিতে পারতেন। কিন্তু ওদের তাঁরা পেয়েছেন কাউকে দশ, কাউকে বারো এমন অবস্থায়। তখন মুখের ভাষা, অভ্যাস, সংস্কার তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেখানে কাটাকুটি করার প্রয়োজন ছিল। কোলে-পিঠে করেননি তো কোনওদিন। হয়তো বিশ্বস্ততার ভাগে তাই কম পড়ে গিয়েছে। ধ্রুবজ্যোতির হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল। তিনি মিলুকে ডেকে পাঠালেন, "মিলু, মিলু!" বেশ জোরে চেঁচিয়ে ডাকলেন। উত্তাপটা যাতে টের পাওয়া যায়।

"কী বাবা, চা খাবে?" মিলু প্রায় ছুটতে-ছুটতে এল।

"শোন মিলু, আমাদের চা-কফি খাওয়াবার জন্যে তুই বা তোরা এখানে নেই। তোদের আমরা মানুষ, মানে মানুষ করতে চাই বুঝলি? তোরও যদি বিলুর মতো কোনও মতলব থাকে, তা হলে বলে দে। আমরা আর পণ্ডশ্রম করব না।"

মিলু একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছে, চোখে ভয়। ঠোঁট দুটো একটু-একটু কাঁপছে। শেষে বলল, "তাড়িয়ে দেবে বাবা?"

সংযুক্তাও হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। এখন বললেন, "তাড়িয়ে দেওয়া-টেওয়া আবার কী কথা? ছি, মিলু ওসব আজেবাজে কথা ভাবিসনি। তুই কী করছিলি এখন?"

মিলু আস্তে-আস্তে বলল, "গান শুনছিলুম।"

"তো যা, গান শুনতে যা।"

মিলু চলে গেলে সংযুক্তা ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী ব্যাপার, 'ছি'-টা কিন্তু আমি তোমাকে বললুম। তুমি হঠাৎ এরকম, ও কী ভাবল বলো তো?"

"বিলু ভেবেছিল আমরা কী ভাবব? একবার জানাবার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করেনি। এদের আমি গদ্দার বলি, গদ্দার।"

"ঠিক আছে। দোষটা করেছে বিলু, তুমি সেটা মিলুর ওপর ঝাড়লে কেন? ও একটা আলাদা মানুষ।"

"খবরটা গোপন রাখার বেলা ওর বিশ্বস্ততাটা তো বিলুর দিকেই গেল। বাবা-মা বলে আমাদের প্রতি ওর কোনও দায় নেই?"

সংযুক্তা একটু চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন, "ক্লাসের একটা ছাত্র দুষ্টুমি করলে অন্য কেউ যদি সেটা মাস্টারমশাইয়ের কাছে বলে দেয়, তা হলে কিন্তু লাগানে ছেলেটাকে সবাই একবাক্যে ছি-ছি করবে, গদ্দার বলবে। ওরা চট করে বন্ধুদের বিরুদ্ধে কিছু বলে না। তুমি কি চাও তোমার মানুষ করা একটা মেয়ে এরকম গদ্দারি শেখে?"

"কনফিউশন অব ভ্যালুজ," গোঁ গোঁ করে বললেন ধ্রুব।

কিন্তু হঠাৎ মিলুর মুখটা মনে পড়ে গেল তাঁর। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে, চোখে ভয়, তাঁর মনে পড়ে গেল মিলুকে কোথা থেকে পেয়েছিলেন তাঁরা। কী ভয়ংকর পরিস্থিতি! ও খুব ভয় পেয়েছে। কাজটা তাঁর ঠিক হয়নি, একেবারেই না। কিন্তু ছোড়া তির আর বলে ফেলা কথা তো ফিরিয়ে নেওয়া যায় না!

সংযুক্তা উঠে গেলেন। এই ঘর পেরিয়ে খাওয়ার ঘর। তার ওদিকে রান্নাঘর, রান্নাঘরের মুখোমুখি মিলুর ঘর। গান চলছে এফএম-এ, অনেকদিন পর প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় শুনলেন, 'ধূলির পরে প্রণামখানি দিনু রেখে...' একটু ইতস্তত করে মুখ বাড়ালেন। মিলু উপুড় হয়ে পড়ে আছে, পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে। চলে আসছিলেন, হঠাৎ তাঁর বুকটা কেমন হুহু করে উঠল। অল্প বয়সে তিনিই কি বকুনি খাননি? এমন বকুনি যাকে অপমান বলে মনে হয়েছে! কিন্তু সে সময়ে দিদি ছিল, বাবা বকলে মা ছিল শক অ্যাবজর্বার। মা বকলে, বাবা। মিলুর কেউ নেই, একেবারে অনাথ। তিনি ভেতরে গিয়ে ওর পাশে বসলেন, সন্তর্পণে পিঠে হাত রাখলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, ব্রথেল থেকে উদ্ধার হওয়া, এই পাচার হয়ে যাওয়া বাংলাদেশি মেয়েটিকে তিনি কোনওদিন স্পর্শ করেননি। আশ্রয় দিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন, স্নেহও যে না দিয়েছেন তা নয়। কিন্তু কী যেন একটা দেননি, দিলে অনেক আগেই ওকে ছুঁতেন। কেন ছোঁননি, ব্রথেল বলে? পাচার বলে? ছি! কিছুক্ষণ আগে স্বামীকে যেটা বলেছিলেন, এখন দ্বিগুণ ধিক্কারে তিনি সেটা নিজেকে বললেন।

"মিলু ও মিলু! কাঁদিসনি রে। বাবা আসলে বিলুর ব্যাপারে বড্ড কষ্ট পেয়েছে তো! বকুনিটা আসলে বিলুকেই, তোকে নয়।"

চোখ মুছে মিলু উঠে বসল। ধরা গলায় বলল, "মা একটু কফি খাবে?"

"দূর পাগল! আবারও বলছি মিলু চা-কফি করে দেওয়ার লোক দরকার হলে একজন কাউকে রেখে দেব। তোর পরীক্ষা, তোকে ডাকাডাকি করব কেন?"

"একটা কথা বলব মা, রাগ করবে না?"

"না না, রাগ করবার প্রশ্নই উঠছে না। একশোবার বলবি, বলিস না কেন সেটাই তো আমার প্রশ্ন।"

"আচ্ছা মা, বিলু যা করেছে ভালোই তো করেছে। তোমাদের জানায়নি, বাধা দেবে বলে। কিন্তু খারাপটা কী? একটা আশ্রয় তো দরকার। সেটা যদি জীবনে এমন সকাল-সকাল পাওয়া যায়, স্বীকার করে নিতে ক্ষতি কী?"

"কিন্তু ধর, যদি লোকটি খারাপ হয় বা হয়ে যায়? তা ছাড়া বয়সে কত বড়। বিলুরই কী বা বয়স! কত ভালো মাথা ছিল অঙ্কে, নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে-টিয়ে করা খুব রিস্কি মিলু।"

"মা, বিলু কিন্তু খুব বুদ্ধি ধরে। বেচারামদা এতদিন বিয়ে করেনি কেন বলো তো? দোকনটাকে

গুছিয়ে নিচ্ছিল। এখন খুব সলিড। বিলু তো এখনই বেচাদার অ্যাকাউন্টস সব দেখছে। অঙ্কটা যদি নিজের ব্যাবসার কাজে লাগানো যায়, সেটাও কি কাজে লাগা নয় মা?"

সংযুক্তা খুব দুর্বল গলায় বললেন, "আরও অনেক শেখবার সুযোগ ছিল।"

একটু পরে মিলু বলল, "বিলু তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে ঠি-ক আসবে মা, ভেবো না।"

বলবেন না বলবেন না করে সংযুক্তা বলেই ফেললেন, "তোরও কি মনের কথা তাই মিলু, সকাল-সকাল আশ্রয়?"

মিলু কেমন শিউরে উঠল, হঠাৎ ভেঙে পড়ে বলল, "মা, আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না। আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। আমি তোমাদের সব কাজ করে দেব, যা বলবে শুনব, দেখো।"

সংযুক্তা ওর মাথায় হাত রেখে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তারপরে বললেন, "তোর-আমার মধ্যে এই কথা হয়ে রইল মিলু। তাড়িয়ে দেওয়ার কথা কোনওদিন মুখে উচ্চারণ করবি না, আমাদের সব কাজ করার কথাও তুলবি না। গৃহস্থ সংসারে মেয়েদের যেটুকু করা উচিত, সেটুকুই তোদের করতে বলি। কিন্তু তোর যদি কোনওদিন অন্য কিছু করতে ইচ্ছে হয়, কোনও বিষয় নিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়, যদি কোনও ট্রেনিং নিতে ইচ্ছে করে অবশ্যই বলবি।"

॥ ৮ ॥

শুকতারা আর আরিয়ান এল একসঙ্গে। আরিয়ান চুলগুলোকে স্পাইক করে এসেছে। শুকতারার কোমর অবধি চুল কুচি-কুচি পার্ম করা। সাদা রঙের একটা কীরকম ঝিকমিকে টপ, জিন্‌স। স্টিলেটো বোধহয় সাড়ে তিন ইঞ্চি হবে। বাপ্‌স। একেই লম্বা, আরও লম্বা দেখাচ্ছে। বিরাট-বিরাট চোখ, কাজল, আইশ্যাডো এসব দিয়ে আরও বড় করেছে। ব্যস, আর কিচ্ছু না। বাবাইয়ের শুকতারার এই ড্রেস-আপ করার ধরনটা রাক্কুসি-রাক্কুসি লাগে। চেপে যায় অবশ্য সে। ঈপ্সা যখন বলে, "শুকতারার সেন্স অব ফ্যাশন অ্যান্ড গ্ল্যামার একেবারে টপ ক্লাস," সে দুর্বলভাবে মাথা নাড়ে শুধু। রূপরাজ রিনার সঙ্গে ঢুকল। রূপরাজ একেবারে যেভাবে কলেজে আসে, সেইভাবে চলে এসেছে। বাঘছালের মতো টপ, কালো জিন্‌স আর স্পাইক চুল আরিয়ানের পাশে দাঁড়ালে লোকে আরিয়ানকে ফিল্ম স্টার বলবেই। রিনা উপরে একটা চোলি জাতীয় জিনিস পরেছে। তার হাতায়, কনুইয়ের কাছে ঝালর, পেটটা সম্পূর্ণ খোলা। তলায় ফ্লেয়ার্স। চুলগুলোকে টপ নট করে রেখেছে।

বাবাই বলল, "কী রে ঈপ্সা, তোদের কি জোড়ায়-জোড়ায় আসা নিয়ম নাকি?"

"জোড়া, তবে বয়-গার্ল হতেই হবে, এমন কোনও মানে নেই। তুই-আমি এলাম কীভাবে?"

"এটা কাদের বাড়ি বললি না তো? বাড়ি বলে মনেই হচ্ছে না!"

"কার বাড়ি ডিসক্লোজ করা বারণ, জাস্ট এনজয় ইয়োরসেলফ।"

এই সময় একা-একা দিয়াকে আসতে দেখে চমকে গেল বাবাই। চারপাশে অনেক অজানা মুখ। একটি ছেলে ড্রিঙ্ক সার্ভ করছিল।

"আমি না," বাবাই বলল।

"সফট নাও," একটা আইসক্রিম সোডা ওর জন্যে এনে দিল ছেলেটি। বাবাই শুধু দিয়াকেই দেখছিল। দিয়াকে কীরকম অদ্ভুত অন্যরকম দেখাচ্ছিল। চোখদুটো চকচক করছে। ঠোঁট, গাল সবই চকচক করছে। একটা অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ মেখেছে। এসেই একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে ঘরের এক কোণে চলে গেল। জানলার পাটিতে ভর দিয়ে একটা ফিশ ফিঙ্গার তুলে নিল, তারপর সিপ করতে লাগল। যেন ও একলাই থাকতে চায়, কাউকে ওর দরকার নেই। দিয়া খুব সুন্দর এবং খুব দেমাকিও। বাবাইয়ের অন্তত এমনই ধারণা। খুব ধনী ঘরের মেয়ে হলে এরকম অনেক কিছুই খুব-খুব হয়ে থাকে। সবাই

কিন্তু দিয়াকে এতটা 'খুব' দেখে না। ঈপ্সাই বলে, "দিয়া একটুও সেক্সি নয়। ওর কোনও ড্রেস-সেন্সও নেই। ওর ওই ডিপ্রেশন-বিলাস নিয়েই থাকে। অবসেশন একটা। মা-বাবা আর কারও ডিভোর্স করে না। তোর তো বাবা তবু মায়ের অনেক টাকা, মায়ের সঙ্গে থাকতে পাচ্ছিস। বাবার সঙ্গেও খুব ভালো সম্পর্ক। আসল দুঃখ, আসল ব্রোকেন হোম কী জিনিস ও জানে? শান্তনুকে দেখ, মা ছেড়ে চলে গিয়েছে, বাবার সঙ্গে থাকে। দশ বছর বয়স থেকে মা একেবারে সাগর পার। বাবা ছাড়া বাড়িতে শুধু ঠাকুমা। ভদ্রমহিলা দিবারাত্র বউমাকে শাপ-শাপান্ত করছেন এখনও। বাবা খুব চুপচাপ। শান্তনু তিনটে টুইশনি করে পড়ে। লেখাপড়ায় যে দারুণ কিছু, তাও নয়। ওর জগৎটা কী তুই বল। তুই দেখ, শান্তনু ইজ ফুল অব জোক্‌স। কী হাসে ছেলেটা।"

এইসব কথা শুনে বাবাইয়ের কেমন গা শিরশির করে। বিবাহ-বিচ্ছেদ! মা দশ বছর বয়সে চলে গিয়েছে এসব কী জিনিস? তার বাবা রানাঘাটে হাসপাতালের ডাক্তার। মা বাইরে কিছু করেন না। কিন্তু বাড়ির মধ্যে সর্বেসর্বা। সেই বাবা-মাকে ছেড়ে চলে আসতে তার যে কী হয়েছিল প্রথম-প্রথম। এখন অনেকটা সয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন একবার করে বাবা-মা'র সঙ্গে কথা না বললে তার ঘুম হয় না।

"বাবাই রাস্তা দেখে চলিস তো, কলকাতায় গাড়ি ভীষণ বেড়ে গেছে?" মা।

"অতদূর হস্টেল নিলি কেন, কতটা সময় নষ্ট হয়! তা ছাড়া ট্র্যাফিকও তো..." বাবা।

"পড়াশোনায় কোনও অসুবিধে হলে বলিস, যদি টিউটর লাগে।" মা।

"লাইব্রেরি-ওয়র্ক করবি..." বাবা।

"কেমন আছিস, আবার গলাব্যথা হয়নি তো?" মা।

"গার্গল কর, ভেপার নে, সব ঠিক হয়ে যাবে।" বাবা।

এ ছাড়াও কত কথা হয়। পড়াশোনার বিষয়ে, বন্ধুদের বিষয়ে। সে যখন ইলেভেনে তখনই বাবা বলেছিল, "ভালো করতে পারলে তুই প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়ে যাবি। একা-একা থাকতে হবে, কিন্তু হস্টেলে থাকার অভিজ্ঞতাটা খুব ভালো। জীবনে কাজে আসে।"

যখন আসা ঠিক হয়ে গেল মা বলেছিল, "ফট করে যেন আবার কারও সঙ্গে ভাবটাব করে ফেলিসনি। বিয়ে-থা সবই হবে, তোর পছন্দমতোই হবে, কিন্তু এখন থেকে ওসব ভাবিসনি।"

বাবা বলেছিল, "শুনেছি এখন ছাত্ররা ভীষণ নেশা করে, সাবধানে থাকিস।"

মা-বাবা যে কী করে ভাবল সে ফট করে প্রেম করবে বা নেশা করবে। আসলে ভয় পায়। জানে না বাবাই নিজেই কতটা রক্ষণশীল, কত সাবধান।

এবার একটা কমলালেবুর জুস নিয়েছে সে। টুকটাক কত কী আসছে, পুঁচকে-পুঁচকে শিঙাড়া, সসেজ ভাজা, চিকেন লিভার। গান বাজছে মোহময়। স্প্যানিশ গিটার হাতে একটি ছেলে উঠে দাঁড়াল, কোনও ইংরেজি গান গাইছে। তাল দিচ্ছে দিয়া। হাতের ড্রিঙ্কটা রেখে হঠাৎ নাচতে শুরু করে দিল। এইসব নাচের মাথামুণ্ডু বোঝে না বাবাই। টিভিতে দেখেছে। সিনেমাতে তো আকছার। কিন্তু দিয়ার নাচটা ওর দারুণ লাগছে। 'কাম অন বাবাই, কাম অন, ঈপ্‌স,' কারা যেন বলল। ঈপ্সা তাকে একটা টান দিয়ে চলে গেল, "আয় না!" বাবাইয়ের হঠাৎ মনে হল, সবাই তো নাচছে। শুধু তালে তাল রাখা। ওরকম দিয়ার মতো শিক্ষিত নাচ কি সবাই নাচছে নাকি? ও যদি একদিকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, খুব বোকা-বোকা দেখাবে। সুতরাং ঈপ্সার টানের পরই সে হঠাৎ তার ছোট্টতে শেখা কত্থকের একটা চক্রদার করে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল।

"দ্যাটস লাইক আ গুড গার্ল।"

"দ্যাটস দ্য স্পিরিট!"

"ফ্যানটাস্টিক!"

চারপাশে তাকে, ঈপ্সাকে, দিয়াকে ঘিরে নাচতে-নাচতে এইসব মন্তব্য। আলো ক্ষণে-ক্ষণে রং

বদলাচ্ছে। 'ইউ আর লুকিং ইয়োর বেস্ট টু ডে' কে কাকে বলল। কেমন আবছা হয়ে আসছে কেন ঘরটা? বাব্বাঃ. আলো নিয়ে এত কারিকুরি কারও বাড়িতে থাকে। ঘোলাটে-ঘোলাটে লাগছে, মাথাটা কি একটু ঘুরে গেল? কে তাকে সাপোর্ট দিল? হুহ্ করে একটা আওয়াজ, আলো নিভে গেল। সে অজ্ঞান নয়, শিয়োর আলোটাই নিবেছে। ভাগ্যিস তাকে ধরেছিল ছেলেটা। এ মা তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, এ মা, চুমু খাচ্ছে যে! বাবাই বাধা দিতে পারছে না। শরীরটা কেমন আলগা-আলগা লাগছে, তার বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধরা-ধরা গলায় কেউ বলছে "আই লভ ইউ বেবি। পার্ট ইয়োর লেগস ফর মি।" অজ্ঞান হয়ে যেতে-যেতে বাবাইয়ের একটা তীব্র যন্ত্রণা হল যোনিস্থানে। তাকে কেউ বা কারা দুরমুশ করছে একেবারে।

বারোটা প্রায় বাজল। উজ্জ্বল একটা মস্ত আড়মোড়া ভাঙল, মোবাইল অফ করল। টেবল-ল্যাম্প নেভাল। উঠে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে একটু ছাড়িয়ে নিল। তারপর সোজা বিছানা এবং সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমে জুড়ে গেল চোখের পাতা।

অ্যালার্মে ঘুম ভাঙল তখন সাড়ে পাঁচটা। উঠে পড়ে মোবাইলটা অন করে দিল সে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে তীক্ষ্ণ স্বরে বেজে উঠল সেটা।

ও প্রান্ত থেকে কান্নামিশ্রিত একটা বিস্রস্ত, বিকৃত সুর শোনা গেল, "উজ্জ্বল, উজ্জ্বল বলছিস? শিগগিরই আয়, এক্ষুনি।" এ তো বাবাই বলছে, বাবাইয়ের নম্বর।

"কোথায় যাব? গোলপার্ক, কী ব্যাপার?"

"বাইশ নম্বর গ্রাহাম'স প্লেস, টালিগঞ্জ।"

"সে আবার কোথায়? আমি তো চিনিই না, ইংল্যান্ড-আমেরিকায়?"

"বললাম তো টালিগঞ্জে, ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োর কাছে। তুই একটা ট্যাক্সি নিয়ে যত শিগগির পারিস চলে আয়। এমার্জেন্সি।"

বাবাই একটা দোতলা ঘ্যাম দেখতে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর সালোয়ার কামিজটা কীরকম যেন হাঁড়ির থেকে বের করে পরা। পিঠের কাছটা ফুলে উঠেছে। শুকনো রক্তের দাগ। একটা কী রকম ভাঙাচোরা বাবাই।

"শেষ পর্যন্ত এলি?"

"কী ব্যাপার তোর, ভোরবেলা কোথায় পড়লি?"

"খুব বিপদে পড়েছি", বাবাইয়ের গলাটা কাঁপছে। সে বলল, "আয় দেখবি আয়।"

সে ভেতরে ঢুকল। কাঠের ওপর কার্পেট পাতা সিঁড়ি দিয়ে ওরা উপরে উঠল। বাবাই উঠছে যেন তার খুব কষ্ট হচ্ছে। ডানদিকে একটা বিরাট হলঘর। ঘরময় বোতল, সিগারেটের টুকরো, খাবারের টুকরো, থার্মোকলের প্লেট, বেশ কিছু একটা ওয়েস্ট বক্সে ফেলা। কিন্তু তার থেকে উপচে পড়েছে অনেক কিছু। ঘরটার মধ্যে দিয়ে আর একটা ঘরে ঢুকল ওরা ডানদিকে। উজ্জ্বল দেখল একটা মেয়ে মুখ ফিরিয়ে পড়ে রয়েছে, মৃতের মতো।

"আমি ওকে কিছুতেই জাগাতে পারছি না।"

উজ্জ্বল নিচু হয়ে মেয়েটির নাড়িতে হাত রাখল। হাত স্বাভাবিক গরম। চারদিকে মদের গন্ধ। উজ্জ্বল হাতদুটো ঝেড়ে বলল, "শি ইজ জাস্ট আউট, প্রচুর মাল সাঁটিয়েছে। কী ব্যাপার, দু'জনে কামড়াকামড়ি করছিলি নাকি? এ মেয়েটারও তো দেখছি একই দশা। এর তো জিন্‌স্ ছিঁড়ে গিয়েছে দেখছি। এ হে হে রক্ত-ফক্ত শুকিয়ে রয়েছে।"

কিছুক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, "বাবাই, তোর এসব গুণ তো আমার জানা ছিল না, ব্যাপার কী? এখানে তো কাল একটা মোচ্ছব হয়েছে মনে হচ্ছে।" বাবাইয়ের চোখ দিয়ে জল উপচোচ্ছে। সে কোনওমতে বলল, "আমার সফ্‌ট ড্রিঙ্কের সঙ্গে কেউ কিছু মিশিয়ে দিয়েছিল। কাল, মাত্র কালই আসতে রাজি হয়েছিলুম" তার গলার স্বর বিকৃত হয়ে গেল।

"মক্কেলটি কে?"
"মক্কেল কেউ না, আমি বান্ধবীর সঙ্গে..."
"ওই মেয়েটা?"
"না, অন্য একজন। ও-ও ভিকটিম বুঝতে পারছিস না?"
"ভিক্...বাবাই, এ তো পুলিশ কেস দেখছি।" উজ্জ্বল হঠাৎ সমস্তটা বুঝতে পারে।
"প্লিজ উজ্জ্বল র‍্যাশ কিছু করিসনি।"
উজ্জ্বল বলল, "বাথরুম কোথায়?"
"ওই যে।"
উজ্জ্বল দ্রুত ঢুকে যায়। জল নিয়ে আসে মগে করে, তারপর নির্মমভাবে মেয়েটির চোখেমুখে জল ছেটাতে থাকে। একটু পরে মেয়েটি মাথা ঝাড়ে, তারপর আবার পাশ ফিরে শুতে গিয়ে, হঠাৎ খুব দুর্বলভাবে উঠে বসে। চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে যায়।
বাবাই বলে, "তুই ঠিক আছিস তো দিয়া?"
"বা-বা-ই! আমি, তুই...এখানে...এ কি আমার জামাকাপড় এরকম ছিঁড়ল কে?" উঠে দাঁড়াতে গিয়ে প্রবল যন্ত্রণায়, তলপেট চেপে বসে পড়ল সে।
"কিছু মনে করতে পারছিস?"
"আমরা ভ্যালেন্টাইন পার্টিতে এসেছিলাম..."
"আমাদের ড্রিঙ্কের সঙ্গে কিছু মেশানো হয়েছিল। দিয়া, উই হ্যাভ বিন রেপ্‌ড।"
দিয়া মুখটা দু'হাত দিয়ে ঢেকে বসে রইল।
বাবাই বলল, "আমি আর দাঁড়াতে পারছি না উজ্জ্বল। কিছু একটা কর, এরকম চেহারায় বাইরে বেরতেও পারছি না।"
"আমি পুলিশকে কল দিচ্ছি।"
"হে, হু আর ইউ, স্টপ ইট!" দিয়া বলে উঠল।
বাবাই বলল, "ও উজ্জ্বল, আমার বন্ধু। শিবপুরে পড়ছে, ও কাল ছিল না।"
দিয়া বলল, "আমার ফোনটা, ফোনটা কই?"
"কাকে ফোন করতে চাও?" উজ্জ্বল গম্ভীর গলায় বলল।
"আমার ড্রাইভারকে, বাড়ি নিয়ে যাবে।"
"এর একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া অবধি তোমাকে বাড়ি যেতে দিচ্ছি না। এ জায়গাটা কাদের, কারা ইনভলভড, তুমি নিশ্চয় জানো? বলো, না হলে আমি পুলিশে..."
"স্টপ ইট। আগে বাড়ি যাই। বাবাই-ও আমার সঙ্গে যাবে, তোমাকেও আসতে হবে।"
"উই নিড আ ডক্টর ফার্স্ট।"
দিয়ার ফোন পাওয়া গেল না। সে উজ্জ্বলের ফোন থেকে একটা ফোন করল, "জয়দেবদা আমি দিয়া বলছি, কাল যেখানে পৌঁছে দিয়েছিলে হ্যাঁ...চট করে চলে এসো।"
সে একটু ভেবে আর একটা ফোন করল, "আঙ্কল, আমি দিয়া বলছি। আমি খুব অসুস্থ, মা-ও কলকাতায় নেই। আপনি একবার আসবেন? ধরুন ঘণ্টাখানেক পরে? হ্যাঁ চেম্বার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না।"
যখন হলটা পার হচ্ছে, চারপাশে ছড়ানো আবর্জনার মধ্যে একটা ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখল উজ্জ্বল। চিকচিকে রুপোলি ব্যাগ।
"ওইটা কি তোমার, দেখো তো।"
"ইয়েস, ওই তো," দিয়া বলে উঠল। খুলে দেখল। বলল, "সব আছে।"
দিয়ার বাড়িতেই থেকে যেতে হল বাবাইকেও। দু'জনেই খুব অসুস্থ। দিয়ার প্রচণ্ড জ্বর এসেছে।

বাবাই ব্যথায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ডাক্তার বললেন, "মেয়েটি এখানে থাক বুঝলে। কী নাম তোমার, উজ্জ্বল না? আমার দেখে যেতে সুবিধা হবে। এখন চোখে-চোখে রাখা দরকার।"

ঘর থেকে বেরিয়ে উজ্জ্বল বলল, "এফআইআর করি একটা?"

ডাক্তার চিন্তিত মুখে বললেন, "বাবাই মেয়েটি তো ওয়াশ করে নিয়েছেই। দু'জনের ক্ষেত্রেই লোকটাকে ওভাবে ধরবার উপায় নেই। এখন শুধু-শুধু টানাপোড়েন, পাবলিসিটি, ট্রমা তো একটা হয়েছেই। দিয়া তো এমনিতেই মেলাংকলিয়ায় ভোগে। খুব সাবধানে ওয়াচ রাখতে হবে। মা ইংল্যান্ডে, তাকে আমি একটা ফোন করে দিতে পারি। কিন্তু ভদ্রমহিলা আসতেও পারবেন না, অনর্থক ছটফট করবেন।"

"বাবা নেই ওর?"

"আছে, আবার নেইও। তুমি বোধহয় কিছুই জানো না। তোমার চেহারাটি বেশ, ভরসা হয়। দিয়ার মা-বাবা ডিভোর্সড। কেউ একজন থাকলে ভালো হত, অ্যাপার্ট ফ্রম দা ইউজুয়াল কাজের লোকস। তুমি?"

"আমি শিবপুরে বি ই কলেজ।"

"ঠিক আছে আমি একজন নার্সের ব্যবস্থা করছি। ডোন্ট ওয়ারি ইয়ংম্যান। তবু তুমি যদি একটু খেয়াল রাখো এদের, ভালো হয়। হোয়ট আ শকিং থিং টু হ্যাপন। ড্রিঙ্কের মধ্যে ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে, যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে, ইট উইল বি ক্রিমিন্যাল নট টু গো টু দা পোলিস।"

"আমারও তাই মত। এ তো রীতিমতো ক্রাইম!"

ডাক্তার বললেন, "এইসব জয়েন্ট হয়েছে আজকাল, নাইট ক্লাব-টাব। ইয়ং পিপ্‌ল কোন পথে যাচ্ছে? জুভেনাইল ক্রাইম কী রেটে বেড়ে যাচ্ছে! কিন্তু উজ্জ্বল, আমাদের ফার্স্ট কনসার্ন এই দুটি মেয়ের মেন্টাল হেল্‌থ।"

নার্স এসে গেলেন এগারোটা নাগাদ। তারপরে উজ্জ্বল বেরোতে পারল। সে আবার চলে গেল গ্রাহাম'স প্লেসের সেই বাড়ির সামনে। এখন সেখানে কিছু লোক ঘোরাফেরা করছে। ড্রামে করে আবর্জনা নিয়ে আসছে ওপর থেকে অর্থাৎ পরিষ্কার হচ্ছে। সে একটু এগিয়ে গেল। যে লোকটিকে সুপারভাইজার মনে হচ্ছিল তাকে বলল, "এ বাড়িটা কার?"

"কুলকার্নিদের। বিক্রি হবে না। এটা ওঁরা ভাড়া দেন, গেস্ট হাউজ হিসেবে ব্যবস্থা করেন।"

"গতকাল কে ভাড়া নিয়েছিল?"

"তা তো জানি না। আমাদের কাজ বাড়ি পরিষ্কার করা, করছি। আপনি কে, অত কথা জিজ্ঞেস করছেন?"

সে গম্ভীর গলায় বলল, "আমারও তো ভাড়া নেওয়ার দরকার থাকতে পারে।"

কুলকার্নিদের ফোন নম্বর ও ঠিকানাটা নিয়ে সে চলে এল।

বাস চলেছে হাওড়ার দিকে। উজ্জ্বল খেয়ালও করছে না কোথা দিয়ে যাচ্ছে। ভেতরটা শক্ত হয়ে উঠেছে। শক্ত এবং আগুনে পোড়ানো লোহার মতো গরম। নেমন্তন্ন করে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদেরই বয়সের একাধিক ইয়ংম্যান দুটি মেয়েকে অসাড় করে রেপ করল? বিশ্বাসঘাতকতা তো বটেই, কী সাংঘাতিক ক্রাইম। এটাতে ছাড়া পেয়ে গেলে এরকম আরও করবে, আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে। ইস্ বাবাইটা! একটা বুদ্ধিমতী, অ্যাথলিট মেয়ে এইভাবে ফাঁদে পড়ে গেল? ঠিক আছে বাবাই না হয় শহরের মেয়ে নয়, অনভিজ্ঞ। দিয়া? ও তো রীতিমতো আপার ক্লাস মড মেয়ে। ওর পক্ষে এরকম জালে পড়া কী করে সম্ভব হল? এবং অন্য যারা ছিল, সবাই কি এই ষড়যন্ত্রের অংশী? অন্য মেয়েগুলি, যে মেয়েটা বাবাইকে নিয়ে গিয়েছিল? জানত না, বাবাই হস্টেলে থাকে, তাকে জবাবদিহি করতে হবে? তার চেয়েও বড় কথা, সে তো বন্ধুকে সেধে ডেকে নিয়ে বিপদের মুখে ঠেলে দিল। কলেজের থার্ড ইয়ারের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে এইসব ষড়যন্ত্র, এই সব ক্রাইম

সম্ভব? হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, বাবাই একটা কী গিফট পেয়েছিল, ভ্যালেনটাইন না কী মডার্ন ন্যাকামি? তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, সে পাঠিয়েছে কি না। অর্থাৎ বুঝতে পারেনি কে পাঠিয়েছে। নামটা গোপন করার দরকার কী ছিল মক্কেলের? ইয়েস, সে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের তেলোতে একটা ঘুঁষি মেরে বলল, "গট ইট।"

আশপাশের লোক চমকে তাকাল।

॥ ৯ ॥

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল আজ হসপিটাল যাচ্ছেন। রুগির দায়িত্ব কত কাল ফেলে রাখা যায়। স্ত্রী মুকুল রান্নাঘরের দিক থেকে এসে কেমন অবসন্নভাবে দালানে রাখা একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়লেন। একবার তাকালেন ডাক্তার, তারপর মলিন গলায় বললেন, "ভালো থাকার চেষ্টা করো, আমি গেলাম।" আর একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, "পুলিশ তো খুব চেষ্টা করছে।"

"কোনও তো ফল দেখতে পাচ্ছি না, সতেরো দিন হয়ে গেল।"

"ওরা অনেক সূত্র বলেও না, চেপে রাখে। তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে হাল ছাড়েনি।"

স্বামী বেরিয়ে গেলে মুকুল তাঁকে বললেন, "আপনি কী বুঝছেন?"

ধ্রুবজ্যোতি বললেন, "বোঝবার চেষ্টা করছি, আশা হারাবেন না। আচ্ছা মিসেস ঘোষাল, আপনার মেয়েটির ভাবনাচিন্তা, তার অ্যাটিচুড এসব নিয়ে কিছু বলতে পারেন?"

মুকুল চোখে আঁচল চেপে ধরলেন।

ধ্রুবজ্যোতি বললেন, "অবশ্যই আমি বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা। যদি কষ্ট করে একটু বলতেন, আমার সুবিধে হত। মানে, আপনার মেয়ের ব্যাপারটারই একটা সমাধান করবার চেষ্টা করতে পারতাম।"

"আমার মেয়ে খুব প্র্যাক্টিক্যাল ছিল। আমি যতদূর জানি, ঠান্ডা মাথার মেয়ে। জীবনটাকে সহজভাবে নেয়। একটা কেরিয়ার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা ছিল ওর প্রথম লক্ষ্য। বাবা-মা'র সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।"

"কিন্তু এভাবে আপনাদের কিচ্ছু না বলে ওর কোথাও যাওয়াটা..."

"সেটাই তো আমাদের ভাবাচ্ছে, এ পর্যন্ত কখনও এরকম করেনি। হাতে সেলফোন রয়েছে, না বলার কী আছে? যা যুগ পড়েছে কেউ তুলে নিয়ে গেল কিনা..." বলতে বলতে ভদ্রমহিলা শিউরে উঠলেন।

"তা হলে আপনার ধারণা, মেয়ে আপনাদের না বলে কিছু করতে পারে না।"

"সেটা আমাদের ধারণা। আমরা তো ওর থেকে অনেকটাই বড়, আমাদের শেষ বয়সের সন্তান। জানি না, ওর এখন যে বয়স, ও কতটা বদলেছে। আমরা এটা মেনে নিতে পারছি না।"

ধ্রুবজ্যোতি ভাবলেন, শেষ যে ঘটনাটা বাবাইয়ের জীবনে ঘটেছে সেটাও সে মা-বাবাকে বলেনি। তার মানে ওর কোনও-কোনও লজ্জা বা অপমানের জায়গা আছে সেগুলো ও বাবা-মাকে জানাতে চায় না। কারণ কী? লজ্জা, ভয়? হয়তো বাবা-মা আর তার শহরে হস্টেলে থাকা অনুমোদন করবেন না। এ-ও হতে পারে বাবাই এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। নিজেই ব্যাপারটা হ্যান্ড্‌ল করতে চায়। কিন্তু একজনকে ও বলেছে, সে হল উজ্জ্বল। উজ্জ্বলের কাছে ওর লজ্জা নেই, ভরসা আছে প্রচুর।

বাবাইয়ের এসব ভাবার অবস্থা ছিল না। সে এবং দিয়া দু'জনেই শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর ছিল। উপরন্তু দিয়ার শক ফিভার। নার্স নির্মলাদি আর রান্নার বাসুদি তাদের দেখাশোনা করছিলেন। নির্মলাদি সবটাই জানেন, কিন্তু বাসুদি অতশত জানে না। তার ধারণা, একটা জোরালো দুর্ঘটনা থেকে ভাগ্যের

জোরে বেঁচে গিয়েছে তারা। দু'জনকে খাবার দিতে আসে আর বাবাইকে জিজ্ঞেস করে, "কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হল বাবুই?"

বাবাই কী বলবে, সে বলে "সে অনেক দূরে। তুমি চিনবে না বাসুদি।" বাবাইকে ভীষণ পছন্দ হয়ে গিয়েছে বাসুদির। মেয়েটা দিয়ার মতো গোমড়ামুখো নয়। কথা বলে, তার রান্নার প্রশংসা করে এবং দিয়ার খুব খেয়াল রাখে। এরই মধ্যে একদিন কী করে কে জানে, দিয়া বেশি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলেছিল। সকালে ঘুম আর ভাঙেই না, ভাঙেই না। বাবাইয়ের হঠাৎ কী মনে হল নির্মলাদিকে বলল, "দেখুন তো দিদি, ট্যাবলেটগুলো সব আছে কি না।" ট্যাবলেট দেখতে গিয়েই বোঝা গেল, ছ'-সাতটা ছিল, সব খেয়ে নিয়েছে দিয়া।

নির্মলাদি বললেন, "আরও কিছুক্ষণ ঘুমোবে ও, হয়তো বিকেলের দিকে উঠবে। স্টম্যাক ওয়াশ করার দরকার হবে না। তবু একবার ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করি।" ডক্টর সেন এসে স্টম্যাক ওয়াশ করলেন সঙ্গে-সঙ্গে। কোনও ওষুধই আর দিয়ার পাশের টেবিলে রাখা হল না। কেরোসিন, পেস্ট কিলিং সলিউশন সবই লুকিয়ে ফেলা হল।

বাবাই সেরে উঠছিল তাড়াতাড়ি। 'আমি ধর্ষিত হয়েছি, কী লজ্জা। ইস্‌স আমি সমাজের বাইরের হয়ে গেলাম', এই রকম কোনও চিন্তা বা আত্মগ্লানি তার একেবারেই হয়নি। বিশেষত অজ্ঞান অবস্থায় ঘটনাটা ঘটেছে বলে কোনও অনুভূতি নেই তার। কিন্তু কেউ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাকে বোকা বানিয়েছে এবং সে বা তারা তারই কাছাকাছি বয়সের ছেলে, এই ধাক্কাটা সে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। সে স্বভাবে রাগী নয়, কিন্তু তার মনে হচ্ছিল এই অপমানের উপযুক্ত জবাব সে যদি দিতে না পারে, তার নাম বাবাই নয়। স্থির সংকল্প একটা। দাউদাউ রাগ নয়।

একটু সেরে উঠতেই সে যখন হস্টেলে ফিরতে চাইল, ডক্টর সেন এবং বাসুদি উভয়েই তাকে অনুরোধ করলেন দিয়ার মা ফিরে না আসা পর্যন্ত থেকে যেতে। দিয়ার কখন কী মতি হয়, কেউই ভরসা পাচ্ছেন না।

আজই ডাক্তার দেখে গিয়েছেন। নাইট নার্স এখন কেউ থাকছে না। খাওয়াদাওয়ার পর রাতে বারান্দায় বসে দু'জন।

"তুই হঠাৎ অতগুলো বড়ি খেয়ে ফেললি কী করে?" বাবাই আস্তে-আস্তে জিজ্ঞেস করল।

দিয়া বলল, "আরও থাকলে আরও খেতাম।"

"আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয় দিয়া।"

"সমাধান নয়? আস্তে-আস্তে অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যাবে, বাঁচা যাবে।"

"আমি শুনেছি, অস্তিত্ব বিলোপ হয় না। অতৃপ্ত আধখানা অস্তিত্ব আরও ভয়ানক কষ্ট পায়।"

"কে বলল, বিজ্ঞান তো নয়?"

"বিজ্ঞান তো এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। সেক্ষেত্রে চিরকাল যাঁরা আত্মা আর পুনর্জন্মের কথা বলে এসেছেন, তাঁদের অবিশ্বাস করি কী করে? আর তা ছাড়া তুই আত্মহত্যা করবিই বা কেন, জঘন্য একটা অপরাধের শিকার হয়েছিস তুই, তাই তোকেই শাস্তি পেতে হবে? এ তো ভারী অদ্ভুত রিজনিং!"

"কে বলল তোকে ওই কারণে আমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছি?" দিয়া উদাস গলায় বলল।

"ওই কারণে নয়, তবে?" অকৃত্রিম বিস্ময় বাবাইয়ের গলায়।

"আমি কে বল, কে আমি? একটা একলা প্রাণ যাকে কেউ ভালোবাসেনি। বাবা না, মা না। বন্ধু বলে কিছু নেই, সবাই আমায় ভুল বোঝে। তা ছাড়া সত্যিই বলছি সবাই এত শ্যালো যে, আমার মিশতে ভালো লাগে না। তারপরে দেখ কেউ অর্থাৎ কোনও যুবক যদি আমাকে ভালোবাসত, সে আমার সঙ্গে আলাপ করে আস্তে-আস্তে একটা অন্তরঙ্গতায় পৌঁছোতে চাইত। তা কেউ করল না। দিয়াটা একটা ফালতু, একটা ক্র্যাঙ্ক, ওর শরীরটাকে নিয়ে একটু মজা করা যাক, বোকা বানানো

যাক, এই তো সেদিনের ঘটনার সাইকোলজি। তুই-ই বল, আই অ্যাম এক্সপেন্ডেবল। তাই আমাকে ড্রিঙ্কের সঙ্গে ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে ছিঁড়েফুঁড়ে অপমান করা যায়, আর চূড়ান্ত অবহেলায় একটা ভুতুড়ে বাড়িতে এঁটোকাঁটার মাঝখানে ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায়! নো বডি কেয়ার্স ফর মি।"

বাবাই আস্তে-আস্তে বলল, "আমাকেও তো তাই-ই করেছে।"

"সেটাই তো আমার আশ্চর্য লাগছে, "দিয়া বলল, 'ইউ আর লাভ্‌ড বাই সো মেনি পিপল। তোর বাবা-মা, দিদি, বন্ধুরা, উজ্জ্বল, তা ছাড়া তুই একেবারেই আমার মতো লোনার নোস। যথেষ্ট স্যোশালাইজ করিস। সবচেয়ে বড় কথা, তোর কিন্তু খুব কনসপিকুয়াস একটা পার্সনালিটি আছে। আমি তো আগে ভাবতাম, বাপ্ রে এই মেয়েটা অ্যাথলিট, চ্যাম্পিয়ন নিজের জেলায়। তারপরে আবার ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে, চলাফেরায় কী কনফিডেন্স। কাউকেই কেয়ার করে না। আমার সঙ্গে তো কোনওদিনও বন্ধুত্ব করবে না। অথচ সামহাউ আমার তোকে ভালো লাগত। তোর সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে করত।"

বাবাই একটু অবাক হয়ে তাকায়। এটা যদি সত্যি কথা হয়, তা হলে সে এটা কোনওদিন আন্দাজ করতে পারেনি। সে যেটা অনুভব করে, বেশ একটা শ্রেণি-সচেতনতা, এমনকী বৈষম্য আছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও। মফস্‌সলের ছাত্রী বলে একটা ঠোঁট বাঁকানো আছে। ভাগ্যে সে ইংলিশ মিডিয়মে পড়েছে, তা নয়তো সেখানেও একটা ঠোঁট বাঁকানো খেত। এরপর টাকাপয়সার প্রশ্ন। সে হ্যারিসন রোডের যাচ্ছেতাই হস্টেলে না থেকে গোলপার্কের পাঁচমিশালি কিন্তু অনেক ভালো বন্দোবস্তের হস্টেলে থাকছে। তার বাবা ডাক্তার, সুতরাং সে মফস্‌সল হলেও উচ্চ-ঘেঁষে মধ্যবিত্ত অন্তত। এরপর আছে কী সূত্রে টাকা! সে আবার আর একটা ক্লাস। মফস্‌সলি ডাক্তার না হয়ে সে যদি আইটি প্রফেশনাল বা বিজনেসম্যানের মেয়ে হত, আর একটু উপরের স্তরে উঠতে পারত। দিয়া সেই স্তরের। দিয়াকে বরাবর একটু নাক উঁচু মনে হয়েছে তার। চারপাশে কাউকে যেন লক্ষই করে না। হাওয়া দিয়ে হাঁটছে। এখন দেখা যাচ্ছে, দিয়া সেরকম নয়। এবং দিয়া তাকে যা ভেবেছে, সে-ও মোটেই তা নয়। অদ্ভুত তো! ফার্স্ট ইম্প্রেশন নিয়ে এত যে বড়-বড় কথা, মিলল না তা হলে। সে দিয়ার ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করল না। নিজের ইম্প্রেশনের কথাও বলল না। বলল, "দিয়া, আই লভ ইউ।"

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর দিয়া বলল, "আই ডোন্ট বিলিভ ইউ, সরি বাবাই।"

"কেন?"

"নিশ্চয় ডাক্তার আঙ্কল তোকে এরকম বলতে শিখিয়ে দিয়েছেন।"

"একথা তোর মনে হচ্ছে কেন, আশ্চর্য তো! ডাক্তার আঙ্কল শিখিয়ে দেবেন তোকে 'লাভ ইউ' বলতে, আর অত বড় কথাটা যেটা কাউকে কখনও বলিনি, সেটা আমি তোকে বলে ফেলব?"

"কেন উজ্জ্বল, উজ্জ্বলকেও বলিসনি?"

"উজ্জ্বল? তুই ভুল করেছিস দিয়া। উজ্জ্বল আমার বয়-ফ্রেন্ড নয়, ও আমার বন্ধু। আমরা দু'জনেই এক অঞ্চলের। দু'জনেই খেলাধুলো করতাম। সেই থেকে একটা জানাশোনা হয়ে গিয়েছে। এখানে যখন বিপদে পড়লাম, ওর কথাই আমার সর্বাগ্রে মনে পড়ল। কেননা ও আমার অনেক আগের, আমার বাড়ির চেনা, যে কাছাকাছি আছে।"

"তা বেশ তো...বয়ফ্রেন্ড হতেই বা ক্ষতি কী?"

"ক্ষতি কিছু নেই, কিন্তু নয়। একেবারেই না। কতকটা পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো আমরা।"

"পিঠোপিঠি ভাইবোন! কী অদ্ভুত ফ্রেজটা। কতদিন পর ব্যবহার হতে শুনলাম। ইস্‌স আমার যদি একটা পিঠোপিঠি থাকত, ভাইবোন যা হোক! থাকত, থাকত! কিন্তু আমার মা-বাবা তাকে নষ্ট করে ফেলেছে," দম আটকানো গলায় সে বলল, "ভাবতে পারিস বাবাই, ফাইভ মান্থ্স গন, মাই মাদার ওয়াজ ফোর্সড টু অ্যাবর্ট হিম।

"হিম? লোকে তো মেল ভ্রূণ অ্যাবর্ট করে না।"

"দে নেভার টোল্ড মি। কিন্তু আমি জানি, ওটা মেল ছিল।"

"মা-বাবা তখনও এত উপরে ওঠেনি। দারুণ কম্পিটিশন। মা তো সবে প্রোগ্রামার, বাবা বলল, "উই ডোন্ট হ্যাভ টাইম টু রেজ অ্যানাদার চাইল্ড নাও।' আর মায়ের অ্যাপেনডিসাইটিস হয়েছিল। তখন ডাক্তারের সঙ্গে যোগসাজশ করে ব্যাপারটা মায়ের অজান্তে করে ফেলেছিল বাবা।"

"ওরকম করা যায়?"

"স্বামীদের সবরকম রাইট আছে বাবাই। সেই থেকে মা ক্রমশ কোল্ড হয়ে গেল বাবার প্রতি, পুরুষ জাতটার প্রতি, আমি একটু বড় হওয়া অবধি অপেক্ষা করেছে। তারপর দু'জনে মিউচুয়াল ডিভোর্স নিয়ে নিয়েছে। মাঝখান থেকে আমাকে নিয়ে টানাটানি। দেখ, আমার ভাইটাকে আসতে দিল না বলে বাবা মাকে না জানিয়ে চোট্টার মতো অ্যাবরশন করালো বলে বাবার ওপর আমার রাগ হতেই পারে। কিন্তু সমস্তটাই তো ঘটেছে আমার অজ্ঞাতে। আমি তো বাবার প্রতি কোল্ড হয়ে যেতে পারি না। আমার ইচ্ছে করে দু'জনকে নিয়ে একটা নর্মাল ফ্যামিলিতে থাকতে। কিন্তু ওরা থাকতে পারবে না। বাবা আবার এখন ইংল্যান্ডে পোস্টেড কিছুদিনের জন্যে। আমাকে মোটা টাকা হাতখরচ দেয়। বোঝে না টাকা আমার আছে। আমার চাওয়ার জিনিসটা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। মা-ও এখন কাজে ইংল্যান্ডেই গিয়েছে। দেখ, আমার বিপদের সময়ে কেউ রইল না। ওটা যদি আরও মারাত্মক কিছু হত? একটা অনাথ মেয়ের মতো আমি বেপাত্তা বা খুন হয়ে যেতাম?"

বাবাই বলল, "আমার তো বাবা-মা সবাই আছে, তা-ও আমারও একই দশা হয়ে যেতে পারত। ভাইবোন না থাকা বা বাবা-মা'র অমিলের ওপর এসব নির্ভর করে নাকি? আমি জীবনে আর এদের বিশ্বাস করতে পারব না দিয়া। ঈপ্সার সঙ্গেও আমার কিছু দরকারি কথা আছে।"

শেষের দিকে তার কথাগুলো খুব গম্ভীর, কঠোর হয়ে গেল। রাত বাড়ছে। দিয়ার শুতে যাওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। বাবাই বলল, "দিয়া, আর নয়। এবার চল শুয়ে পড়ি।"

দিয়া হঠাৎ বলল, "একটা কথা বলব বাবাই, আমার খাটটা তো বেশ বড়, তুই আমার পাশে শো না রে, গল্প করতে করতে ঘুমোই।"

"বেশ তো," বাবাই বলল বটে কিন্তু তার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল।

ভোর রাতে একবার বাবাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখল, দিয়া শুয়ে আছে প্রায় গোল হয়ে। বুড়ো আঙুলটা মুখের মধ্যে। মাথাটা বাবাইয়ের কোলের মধ্যে ঢুকে এসেছে। নাকের পাশে শুকিয়ে যাওয়া জলের চিহ্ন। কখন কেঁদেছে দিয়া? সুখে কেঁদেছে না দুঃখে? কী ভীষণ অসহায়, করুণ মুখটা। আর সে নাকি একেই ভাবত গুমুরে!

বাকি রাতটুকু বাবাইয়ের ঘুম হল না আর। থেকে থেকেই মা-বাবার মুখ মনে পড়তে লাগল। সে মোটের উপর নিয়মিত মা-বাবাকে ফোন করে গিয়েছে। তার ওপর দিয়ে কী গিয়েছে না গিয়েছে, বিন্দুমাত্র বুঝতে দেয়নি। কত আলাদা। সত্যিই, এই এক জায়গায় তারা পড়তে এসেছে, অথচ প্রত্যেকেই যেন একটা দ্বীপ। ফার্স্ট ইমপ্রেশন কিছু বুঝতে দেয় না। সে দিয়াকে বুঝতে পারেনি, দিয়াও তাকে বুঝতে পারেনি। সে ঈপ্সাকে বুঝতে পারেনি। অথচ এই ঈপ্সাই সবচেয়ে বেশি কথা বলে তার সঙ্গে। পিএনপিসিও বাদ যায় না। তার যে ঈপ্সাকে খুব পছন্দ, তা নয়। কিন্তু সে যখন যেচে-যেচে এসে আলাপ করে, অত কথা বিশ্বাস করে বলে, তখন...অগত্যা। আর কে-কে গিয়েছিল তার চেনাজানার মধ্যে? শুকতারা, শুকতারার সঙ্গে তার আগেও অনেকবার মোলাকাত হয়েছে। ও নিজেও স্পোর্টস ভালোবাসে, টেনিস খেলে। শুকতারার সঙ্গে টেনিস খেলেছে সে, ওদের বাড়ির কোর্টে। খারাপ না। কিন্তু খুব সীমাবদ্ধ আলাপ। বড্ড ধনী এবং বড্ড লাউড। আরিয়ান গিয়েছিল। আরিয়ানের সঙ্গেও শুকতারার বাড়িতে আলাপ, উজ্জ্বলও ওকে চেনে বন্ধুর মাধ্যমে। ও-ও প্রচুর লাউড। জামাকাপড় নিয়ে ব্যস্ত ছেলেমেয়েদের, বিশেষত ছেলেদের তার একটুও পছন্দ হয় না। তার নিজের এক ক্লাস সিনিয়র রয়েছে রূপরাজ আর রিনা, দু'জনেই বেশ। তা হলে বদমাশটা কে, বা কারা? আরও রাশি-রাশি

ছেলে আসছিল, যাচ্ছিল। ভীষণ সব কায়দাবাজ ছেলে। কী কাপুরুষ! ছিঃ। অপমানটা সে কিছুতেই হজম করতে পারছে না। দিয়ার কী ধারণা, জিজ্ঞেস করলে হয়। ওর নিশ্চয় আরও অনেক মক্কেলের সঙ্গে জানাশোনা আছে, কিন্তু সাহস হয় না। দিয়া কেমন ভঙ্গুর ধরনের মেয়ে। যদি কোনও খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়!

সকাল দশটা নাগাত এক প্যান্ট, শার্ট, জ্যাকেট পরা লম্বা ভদ্রমহিলা তাদের ঘরে নক করলেন, "আসতে পারি?"

দরজা খোলা, পর্দাটা শুধু টানা রয়েছে। তা-ও, বাব্বাঃ! সাদা রং, উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ভোরের আলোর মতো। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। গোটা চেহারাটাই খুব উজ্জ্বল, যেন বিদেশি-বিদেশি। অনেকদিন বিলেত-আমেরিকায় থাকলে যেমন হয়। দিয়ার সঙ্গে খুব মিল। অথচ এফেক্টটা একেবারে আলাদা। ইনি ঘরে ঢুকলেন, যেন আত্মবিশ্বাস স্বয়ং হেঁটে-হেঁটে এল। অনেক ভার বইতে পারেন। এক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবেন, এই রকম একটা ভরসাও হয়। করবেন কিনা, সেটা কিন্তু এঁর মর্জির ওপর নির্ভর করছে। বাবাইয়ের সবে চান হয়েছে, সে একটা টেক্সট নিয়ে মন বসাবার চেষ্টা করছিল। দিয়া চানঘরে।

ঢুকেই উনি খানিকটা গোঁত্তা খেলেন, "তুমি? ও সরি, দিয়ার বন্ধু, না? ডক্টর সেন আমাকে বলেছেন তোমার কথা। সরি আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কী নাম তোমার?"

"বিভাবরী। সবাই বাবাই বলে ডাকে।"

"হোয়ট আর নাইস নেম। বিভাবরী, নাইটস। শর্ট করে যে ওকে বিভা বা বিভু করা হয়নি, দ্যাটস আ গ্রেট ফেস সেবার। বাবাই ইজ ওয়ান্ডারফুল। বাবাই, কী অ্যাক্সিডেন্ট তোমাদের হয়েছিল?"

"ডাক্তার আঙ্কল আপনাকে বলেননি?'

"না। শুধু বললেন, হি উইল বি এবল টু হ্যান্ডল ইট। বাইক চালাও তুমি, না? দু'জনেই পড়েছ তো?"

বাবাই ওঁর দিকে তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বলল, "উই হ্যাভ বিন রেপড।"

ভদ্রমহিলা চোখ বড়-বড় করে বাবাইয়ের পাশের চেয়ারে বসে পড়লেন, কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তারপর বললেন, "মাই গড। এটাকে মাইনর অ্যাক্সিডেন্ট বলে চালাচ্ছিলেন ডাক্তার। হাউ ডিড ইট হ্যাপন?"

বাবাই সংক্ষেপে বলল।

"গড! দিস ইজ ক্রাইম, কেউ স্টেপ নিল না? ইউ শুড হ্যাভ গন স্ট্রেট টু দ্য পোলিস।"

"আমাদের তখন সে অবস্থা ছিল না মাসি। আমার একমাত্র চেনা বন্ধুকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। ও-ও তাই-ই বলছিল। কিন্তু দিয়া বা আমি কেউই চাইনি, আমাদের স্বাভাবিক জীবন হ্যাম্পার্ড হোক। ডাক্তার আঙ্কলও তাই বললেন। বিশেষত দিয়া, দিয়ার কথা ভেবে..."

"দিদ্দিয়া কি..." ভদ্রমহিলা কথা শেষ করতে পারলেন না।

সেই মুহূর্তে দিয়া চানঘর থেকে বেরোল একটা বাথরোব গলিয়ে। এবং নিমেষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের উপর, "মা ম্মা, ওম্মা, মা-ম্মা-ম্মা।" উনিও ওকে চুমু খাচ্ছেন, শান্ত করার চেষ্টা করছেন, চোখে জল।

দিয়া মা-মা করছে আর ছোট-ছোট দুর্বল মুঠি দুটো নিয়ে ঘুঁষি মারছে মায়ের বুকে।

"আমি চেঞ্জ করে আসি দিউ?"

"ন্ না!"

"সে কী? এক্ষুনি চান করেই এসে যাচ্ছি।"

"আমি তোমাকে কোত্থাও যেতে দেব না। আমি বাবাইকেও কোথাও যেতে দেব না।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাবাই, তুমি কোথায় থাকো?

বাবাই বলল, "আমি গোলপার্কে একটা হস্টেলে থাকি, রানাঘাটে বাড়ি।"

"বলো কী? তোমারও বাবা-মা এখানে নেই, ওঁদের জানিয়েছ তো?"

"নাহ্। শুধু-শুধু ভাবিয়ে তো কোনও লাভ নেই। আপনি এসে গিয়েছেন এবার আমি হস্টেলে ফিরে যাব।"

"না না," দিয়া বলল, "মা যদি প্রতিজ্ঞা করে রোজ রাত ন'টার মধ্যে ফিরে আসবে, মাসে একটার বেশি ট্যুর নেবে না, তা-ও দু'-তিন দিনের, মা যদি প্রতিজ্ঞা করে ব্রেকফাস্ট-ডিনার আমরা একসঙ্গে খাব, তা হলে...না, তা হলেও বাবাইকে এখানে থাকতে হবে। ইফ বাবাই কেয়ার্স ফর মি।"

দিয়ার মুখ তার মায়ের বুকের মধ্যে, উনি দিয়ার চেয়েও লম্বা। দিয়ার মা বাবাইয়ের দিকে চেয়ে একটা মিনতির ভঙ্গি করলেন। তারপর বললেন, "ইটস অবভিয়াস দ্যাট বাবাই কেয়ার্স ফর ইউ। বাজে কথা বলো কেন দিউ? ও তো থাকবেই।"

দিয়া মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "লেট বাবাই সে ইট, তুমি কেন ওর হয়ে কথা বলছ?"

বাবাই বলল, "দিয়া, কী ছেলেমানুষি হচ্ছে? মোটেই আমি বলব না, মাসিকে যেতে দে।"

দিয়া এবার মাকে ছেড়ে দিল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলল, "কতদিন তোমাকে দেখিনি মা! মনে হচ্ছে এক জন্ম পরে দেখলাম। বাপি কবে ফিরছে?

"কী জানি, বোধহয় আরও মাস ছয়েক।"

"তোমরা মিট করোনি?"

"হ্যাঁ, একদিন করলাম তো। স্প্যানিশ খেলাম সোহোতে বারাফিনায়। তোমাকে খুব মিস করছে!"

একটা নিশ্বাস ফেলল দিয়া, "যাও, আমরা কিন্তু একসঙ্গে খাব।" বলেটলে দিয়া একটা মস্ত টেডিবেয়ার তুলে নিল নিচু ক্যাবিনেটের ওপর থেকে। তারপর একটা সোফায় সেটা বুকে জড়িয়ে বসে বুড়ো আঙুলটা মুখে পুরে দিল।

বাবাই তার বইয়ে মন দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। এই টেডিবেয়ার কোলে, মুখে আঙুল দিয়া তাকে ভাবাচ্ছে। এটা কি নতুন? না আগেও ছিল? যতই দিয়া চাক, ওদের বাড়িতে সে কতদিন থাকবে? বাড়িতে তো শুধু দিয়া নেই, তার মা-ও রয়েছেন। অতিরিক্ত আলট্রা মডার্ন, হাই-ক্লাস, আত্মসচেতন মা। তিনি কী মনে করবেন? দিয়ার আবদারে রাজি হচ্ছেন, কিন্তু মনে-মনে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা পছন্দ করছেন না। বা করবেন না। এভাবে কারও বাড়ি থেকে যাওয়া! না, বাবাই কিছুতেই মানতে পারছে না।

দিয়া আবার ঘুমিয়ে পড়েছে সোফার মধ্যে ওইরকম কুণ্ডলী পাকিয়েই। মুখ থেকে বুড়ো আঙুলটা একটু খসে গিয়েছে। সোনালি টেডিবেয়ার বুকের ভেতর আটকানো। ঘুমোলে এমনিতেই মানুষকে ভীষণ ছেলেমানুষ দেখায়। এখন ওই টেডিবেয়ার আর মুখে আঙুলের দৌলতে তাকে দেখাচ্ছে শিশুর মতো। ওর ভিতরে কোথাও একটা অস্বাভাবিকতা থেকে গিয়েছে। যেন পুরোপুরি বড় হয়নি। অথচ ভাবনা-চিন্তা, বুদ্ধি ইত্যাদিতে কোনও গোলমাল নেই। তবু তো ওর বাবা-মা'র মধ্যে বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্কই মনে হল। ঝগড়াঝাঁটি, অসভ্যতা, চিৎকার, মারামারি যেসব জিনিস বিবাহবিচ্ছেদের সঙ্গে বিশ্রীভাবে লেগে থাকে, সেসব নেই। উপরন্তু বাবা-মা দু'জনেই তাকে কত ভালোবাসে।

উজ্জ্বলের সঙ্গে মিস সোনা ঘোষালের দেখা হল রবিবার, সকালবেলা। উনি ওকে ব্রেকফাস্টের নেমন্তন্ন করেছিলেন, সেটা গড়াল লাঞ্চ অবধি।

দিয়া বলে, "বাবাই তো বটেই, উজ্জ্বল না থাকলে পরদিন আরও বিপদ হতে পারত। এবং এ ক'দিন তো যা কিছু দরকার সব উজ্জ্বল করেছে। মা, তুমি ওকে ডাকো, খাওয়াও, আলাপ করো, প্লিজ।"

সোনা নিভৃতে বাবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এই উজ্জ্বল ছেলেটি কেমন? তোমার সঙ্গে কি খুব আলাপ, ভালো করে জানো ওকে?"

ভালো করে কাকেই বা জানা যায়, বাবাই মনে-মনে হাসল। সে আর কারও সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বলতে পারে না যে, সে ভালো। ভালো কথাটার মানেই তো নানা রকম। কী হিসেবে ভালো? ভালো পরিবারের ছেলে, লেখাপড়ায় ভালো, স্বভাব-চরিত্রে ভালো, স্পর্ধায়, সাহসে ভালো? সোনা সম্ভবত সবগুলোই জানতে চাইছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে দিয়া কার-কার সঙ্গে মিশছে খুঁটিনাটি তাঁর জানা দরকার। বাবাই যেহেতু হাতের কাছে, তিনি তার সম্পর্কে অনেক কিছুই কথাচ্ছলে জেনে নিয়েছেন। চোখের সামনে দেখছেন, কথাবার্তা বলছেন, তিনি হয়তো তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত। হয়তো স্বাভাবিকই। তবু বাবাইয়ের কোথায় একটা লাগে। উজ্জ্বল মোটেই খুব বিনয়ী, নম্র ছেলে নয়। সে যদি টের পায়, সমাদর জানানোর সঙ্গে-সঙ্গে তাকে যাচাই করা হচ্ছে, এমন একটা ট্যারাব্যাঁকা কিছু করে বসবে, সোনামাসি বরদাস্ত করতে পারবেন না। সে কি উজ্জ্বলকে সাবধান করে দেবে? নাঃ, অনেক ভেবে সে ঠিক করে, না।

মুখে সে বলে, "মাসি, আমার সঙ্গে খেলাধুলোর সূত্রে আলাপ। এখানে ধরুন আমরা দু'জন প্রায় একই পাড়ার লোক। ও নো-ননসেন্স টাইপের ছেলে। যেটা করা উচিত মনে করে, করবেই।"

হঠাৎ সোনা বললেন, "অনেক-অনেক দিন পর কেউ আমায় মাসি বলল। এত ভালো লাগবে, আমি বুঝিনি। আজকাল সবাই একাধার থেকে আন্টি, আন্টি, আন্টি। কান ঝালাপালা হয়ে যায়। এই দিউর বন্ধুগুলো সব যেন হুক্কা হুয়া শেয়াল ডাকছে। বলে না, সব শেয়ালের এক রা!"

উজ্জ্বল এল সাড়ে ন'টা নাগাদ। একটা অফ-হোয়াইট স্পঞ্জি-স্পঞ্জি মতো কলার-অলা টি-শার্ট আর খাকি জিন্‌স পরে। খুব একটা নাটকীয় এফেক্ট হল উজ্জ্বলের আবির্ভাবে। সোনামাসি ওর সম্পর্কে আগাম কিছু জানতেন না বোধহয়। বাবাই তো বলেইনি। বোঝা যাচ্ছে, দিয়াও বলেনি। ছ'ফুট দু'ইঞ্চি, অত্যন্ত সুঠাম, শক্তিমান ছেলেটিকে দেখে কেন কে জানে সোনা ঘোষাল একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

"তুমি-ই উজ্জ্বল?" ওরা কিছু বলবার আগেই একেবারে সমস্ত নিয়ম ভেঙে উনি বলে উঠলেন।

উত্তরে পাপোশে পা ঘষে উজ্জ্বল ঢুকতে-ঢুকতে বলল, "আমার কি অন্য কেউ হওয়া উচিত ছিল?" তার মুখে মৃদু হাসি।

"না, মানে তুমি তো ব্যায়ামবীর দেখছি। সেই সিক্স প্যাক অ্যাবস না কি আজকাল উঠেছে?"

উজ্জ্বল নমস্কার করল, "গাঁয়ের ছেলে, শরীরটাকেও যদি শক্ত করতে না পারি, বাঁচতে পারব?"

সোনা বললেন, "আমি দেখি কত দূর কী করল। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে ডাকব," তিনি যেন এক রকম পালিয়ে গেলেন।

দিয়া সোফায় দু'বার বসে-বসে নেচে নিয়ে বললে, "উজ্জ্বল তুই যে এত হ্যান্ডসাম, মা এক্সপেক্টই করেনি। হি হি হি হি। আচ্ছা সারপ্রাইজ বল বাবাই!"

উজ্জ্বল বলল, "হ্যান্ডসাম বলছিস! তা হলে এঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে মডেলিংয়ে চান্স নেওয়া যায়?"

বাবাই বলল, "তা কেন, দুটোই করতে পারিস। তোর পড়াশোনার খরচটা উঠে আসবে।"

দিয়া বললে, "এই খবরদার, মডেলিং-এর নাম করবি না।"

"কেন, তোর আপত্তি কীসের?"

"তারপরেই তো বোকা-বোকা সিরিয়াল, তারপরেই ছ্যাতা-পড়া ফিল্ম, তারপর স্বগ্‌গে উঠে যাবি। বোম্বাই সে আয়া মেরা দোস্ত।"

"হলেই বা, সত্যিই যদি তেমন কিছু লেগে যায়, তা হলে টাকাপয়সার ভাবনাটা আর ভাবতে হবে না।"

"নো।" দিয়া রীতিমতো মিলিটারি গলায় বলল, "দিবারাত্র গার্লফ্রেন্ড বদলানো, রোজ-রোজ পাতায়-পাতায় ছবি, একগাদা ফ্যান মেল, ইয়ার্কি, না?"

উজ্জ্বল বলল, "তুই অত শিয়োর হচ্ছিস কী করে, ফিল্মে না নামলেও এবেলা-ওবেলা গার্লফ্রেন্ড বদলানো যায় না বা ফ্যান মেল আসে না?"

দিয়া কেমন মিইয়ে গিয়ে বললে, "তাই বুঝি?"

বাসুদি এসে ডাকল, "খেতে এসো।"

টেবিল জুড়ে লুচি, আলুরদম, স্যান্ডউইচ, ঘুগনি, নানারকম ফল, ফ্রেশ ক্রিম, মাখন, ফ্রুট জুস, দুধ, কফি, চা, কেক, সন্দেশ। উজ্জ্বল দুটো স্যান্ডউইচ, দুটো লুচি আর কালো কফি নিল। ফ্রুট জুস ছুঁল না। আপেল, কলা, আঙুর, শশা, লেবু দিয়ে একটা স্যালাড মতো করে নিল, বাসুদিই করে দিল। তাতে একটু নুন-মরিচ ছড়িয়ে খেয়ে নিল।

"এ কী, কিছুই তো খেলে না? তোমার তো সেই যাকে বলে, লোহা হজম করে ফেলা উচিত।"

"আমাকে স্ট্রিক্ট রেজিমেন মেনটেন করতে হয় মাসিমা। দারুণ খেয়েছি, একদম রাইট কম্বিনেশন।"

দিয়া বলল, "আমিই তো তোর চেয়ে বেশি খেলাম। লুচি আই লাভ, স্যান্ডউইচটা বাসুদি করে ফ্লুরিজের চেয়েও ভালো। দুধ না খেলে আমার চলে না। আর স্ট্রবেরি দিয়ে ক্রিম তো আমি খাবই। বাবাই খেয়ে দেখ।"

সোনা বললেন, "চলো আমরা উপরের বারান্দায় গিয়ে বসি। চমৎকার গাছপালা দেখা যায়।" তিনি এতক্ষণে উজ্জ্বলের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছেন।

॥ ১০ ॥

৭/২ বাড়িটা কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। তিন ভাই, প্রত্যেকের একটি করে স্ত্রী এবং সর্বসাকুল্যে পাঁচটি ছেলেমেয়ে বাড়িতে। বড়জন নিঃসন্তান, বাকিদের মধ্যে মেজ-র তিন ও ছোট-র দুটি। মেজ-র উপরের দুটি ছেলে, একজন কাজকর্ম করছে আর একজন খুঁজছে। ছোটটি মেয়ে, সে পড়াশোনা করছে। ছোটরও দুটি ছেলে। বড় রূপরাজ আজ পনেরো দিন ধরে নিখোঁজ। পুলিশ খোঁজাখুঁজি করছে। এখনও পর্যন্ত কিছু কিনারা করতে পারেনি।

জ্যাঠা বলছেন, "আরও বকো সবাই মিলে, এ আমাদের কাল নয় যে কেউ কানমলা সইবে।"

জেঠিমা বলছেন, "ছেলেটা জেদি সবাই জানে। জোর করে তাকে কিছু করা যাবে না, তবু সায়েন্স নিল না বলে তোমরা বাপ-দাদারা সব তাকে কম শুনিয়েছ?"

"সেইজন্য এতদিন পরে সে বাড়ি থেকে পালাল, কী যে বলো বউদি।" রূপরাজের বাবা বললেন।

বউদি বললেন, "আমি জেনারালি বলছি। আজকালকার ছেলেমেয়েদের কখন কীসে লেগে যায়।"

এত কিছুর মধ্যে রূপরাজের মা অজন্তা একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছেন। প্রথমটা ছিল শক, তারপর থেকে তিনি ভাবছেন, শুধু ভেবে যাচ্ছেন। রূপ যে বাড়ির কারও সঙ্গেই তার ভাবনা-চিন্তা ইদানীং ভাগ করত না এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। এঁদের একটু সেকেলে ধরনের বাড়ি। রূপ ভেতরে-ভেতরে একটু বিদ্রোহী ছিল। গতানুগতিক ভাবনাচিন্তা সইতে পারত না। একটু যেন রাফ, কর্কশ, রূঢ় হয়ে উঠেছিল ইদানীং। ভেতরে-ভেতরে কী চলছিল? 'বন্ধুদের সঙ্গে একটা আউটিং-এ যাচ্ছি', গুছোনো শেষ হয়ে গেলে এই তার প্রথম কথা।

"কোথায় রে?"

"ধরো সুন্দরবন।"

"ধরতে হবে কেন, সত্যি-সত্যি কোথায় যাচ্ছিস?"

"সব কিছুতেই তোমাদের কৈফিয়ত চাওয়ার কী আছে? বড় হয়ে যাইনি এখনও?"

"একে কৈফিয়ত বলে? যত বড় হয়েই যাক, লোকে বাড়িতে তো বলে যায়।"

"দিঘা যাচ্ছি। দু'-চার দিন থাকব। যদি ভালো লেগে যায়, আর একটু এক্সপ্লোর করব। ভাববে না একদম।"

বাস খতম। ওইটুকুর বেশি সে আর কিছু বলেনি। সাতদিন হয়ে যাওয়ার পর আরিয়ানের বাড়ি থেকে ফোন এল, "রূপরাজ কি ফিরেছে?"

"না, আমরাও ভাবছি। তবে ও বলে গিয়েছিল, একটু দেরিও হতে পারে।"

"তাই বলুন, যাক।"

চোদ্দো দিন হয়ে যাওয়ার পর ওঁরা পুলিশে ডায়েরি করলেন। আর তখনই জানা গেল, ওদের সঙ্গে গিয়েছে দিয়া আর বাবাই নামে দুটি মেয়ে এবং আরও একটি ছেলে যার নাম উজ্জ্বল। শুকতারা বলে একটি মেয়ের যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যায়নি। এবারই তো ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে গেল। বিশেষত রূপরাজের বাড়িতে। এটা কি একটা গ্রুপ ইলোপমেন্ট? হঠাৎ প্রেমে পড়বার ছেলে তো রূপ নয়। যদি বা পড়ে, বাড়িতে জানাল না, কারও সম্মতি বা আপত্তি আছে কিনা জানল না, হঠাৎ এরকম ডুব দিল? সকলেই ছাত্র, কারও কোনও রোজগার নেই। তখনই কোনও গ্যাং-এর হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কাটা সবাইকে চেপে ধরে। যা দিনকাল পড়েছে!

রূপ যতই রাফ হোক, মন্দ কিছু যে সে করতে পারে না এ বিষয়ে অজন্তা নিশ্চিত। তাকে চট করে কেউ কাবু করতে পারবে না, এ বিষয়েও তিনি নিশ্চিত। মেয়ে দু'টির জন্যেই কি ওরা বিপদে পড়ল? দিঘার পুলিশ চিরুনি তল্লাসি চালিয়েছে। কোনও পাত্তাই করতে পারেনি।

বাবাই যেদিন প্রথম কলেজ গেল হইচই, "এতদিন কোথায় ডুব মেরেছিলি?" বাবাই ঈপ্সাকে লক্ষ্য করছিল, ঈপ্সা বলল, "সত্যি, তুই একটা দেখালি বাবাই, দশ দিন অ্যাবসেন্ট। সেদিনটাই বা কী করলি?"

"কী করেছি?" বাবাই শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল।

"আরে, আলো নেভবার পর তো তোকে আর দেখতেই পেলুম না। আবার যখন জ্বলল অনেক খুঁজেও তোকে পেলুম না। কে যেন বলল, তুই চলে গিয়েছিস। আমার খুব খারাপ লাগছিল। হঠাৎ আলো নেভায় তুই বোধহয় খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলি, আমার ওপর রাগ করেছিস?"

বাবাই বলল, "কোথায়-কোথায় খুঁজেছিলি?" -

"এনটায়ার হল, বিহাইন্ড দ্য কাউন্টার, টয়লেট।"

"কে তোকে বলল আমি বাড়ি চলে গিয়েছি?"

"কে যেন কে যেন, দাঁড়া মনে করার চেষ্টা করি।"

"আমার চেনা কেউ?"

"উঁহু, তুই কী করে চিনবি? তোকে র‍্যান্ডম ক'জনের সঙ্গে আলাপ করালাম, তোর কি মনে থাকবে? আমিও সবাইকে থোড়ি চিনি।"

"আলো নিভে যেতে কী করলি?"

ঈপ্সা বলল, "সামবডি কিসড্‌ মি, সামবডি ট্রায়েড টু পাম্প মাই বলস্‌। দিয়েছি কামড়ে। তারপর তোকে খুঁজতে গিয়েছি টয়লেটে। সেখানে আবার দেখি দু'জন জড়াজড়ি। বেরিয়ে এসে আর একটা টয়লেট ফাঁকা ছিল, যতক্ষণ না আলো এল ওইখানেই ছিলাম। আলো এল, আমি বেরিয়ে তোকে আরও খুঁজলুম। ওঃ হো রণবীর, ওই পাঞ্জাবি ছেলেটা বলল, ও তো চলে গিয়েছে।"

"রণবীর?"

"তুই চিনবি না, রণবীর কপুর।"

"ঈপ্সা, তুই তো জানতিস এখানে এইসব হয়। আমাকে নিয়ে গেলি কেন? যদি বা নিয়ে গেলি, বলে দিলে পারতিস।

ঈপ্সা বলল, "তুই খুব রাগ করছিস না? আমি সত্যি জানতাম না রে দশ-পনেরো মিনিট এরকম আলো নিভিয়ে রাখবে। ভ্যালেনটাইন তো, মাফ করে দে। বাবাইয়ের চোখদুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল।

সে বলল, "ভ্যালেনটাইন মাই ফুট। ডার্টি ডগস্, অ্যাম সোয়্যারিং টু টিচ দেম আ লেস্ন"

তার জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল ঈপ্সা। বলল, "কী হয়েছে রে বাবাই?"

"নেভার মাইন্ড," বাবাই সেখান থেকে সরে গেল। হঠাৎ তার মনের মধ্যে একটা আগুনের শিখার মতো দপ করে জ্বলে উঠল, সেইসঙ্গে ঘেন্না। সে বরাবর মাথা-ঠান্ডা মেয়ে। কেন যে আজ ঈপ্সার সঙ্গে কথা বলার পর তার এই মুড বদল হল, সে জানে না। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে। ঈপ্সার কথা থেকে মনে হল, ও কিছুই জানে না। তবে একটু-আধটু এইসব ওরা ধর্তব্যের মধ্যে ধরে না। যদি শোনে তাকে আর দিয়াকে ড্রাগ দিয়ে অচেতন করা হয়েছিল, কী প্রতিক্রিয়া হবে ঈপ্সার? যদি শোনে সেই অচেতন দেহ দুটোর উপর জবরদস্তি চালিয়েছে কারা চূড়ান্ত কাপুরুষের মতো, তা হলে? তা হলেই বা কী অবস্থা হবে ঈপ্সার? শুধু তাকে আর দিয়াকেই এরা ভিকটিমাইজ করল কেন সেটাও একটা মস্ত বড় প্রশ্ন। দরকারের সময়ে উজ্জ্বলের সাহায্য পেয়েছে, দিয়া যে নিজে ভিক্টিম সে-ও অনেক সাহায্য করেছে। কিন্তু এবার তাকেই রাশটা নিতে হবে। ঈপ্সা যতটা দেখাচ্ছে, ততটা নির্দোষ কি? ওকে ওখানে নিয়ে যাবার জন্য অত পীড়াপীড়ি করেছিল কেন, বাজি ছিল নাকি কারও সঙ্গে? কাউকে কি সে কখনও অপমান করেছে নিজের অজ্ঞাতে? কোনওরকম কেতা নেওয়া, মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, এরকম কিছু? মনে করতে পারল না সে। একমাত্র সে-ই ভ্যালেনটাইন। সেটার কোনও জবাব সে দেয়নি। কিন্তু সেখানে তো কারও নাম ছিল না। পাশ থেকে ঈপ্সা ঠেলল, "সার তোর দিকে তাকাচ্ছেন, কোথায় হারিয়ে গিয়েছিস?" হুঁশে ফিরে আসে বাবাই।

ক্লাসের শেষে সে খুব হালাকা গলায় বলল, "রণবীর কপুর কে রে?"

"ওই তো, 'ক্রাশ'-এর সেক্রেটারি।"

"বুঝলাম, ওর পরিচয়টা কী?"

"পরিচয় মানে তো বাবার পরিচয়? ওর বাবা জেনসেন্স-এর সিইও, মা-ও কোথায় যেন এনজিও চালান। ব্যাপক কামায়।"

"ও নিজে?"

"ও নিজে...বোধহয় হোটেল ম্যানেজমেন্টের কোর্স করছে। কেন, ইন্টারেস্টেড?"

গা জ্বলে গেল বাবাইয়ের। বলল, "হোটেল ম্যানেজমেন্ট, তা হলে সেদিনের ব্যবস্থাও নিশ্চয় ও-ই করেছে সব।"

"তা বলতে পারি না, তবে সেক্রেটারি তো! ওর একটা দায়িত্ব আছে।"

"ওই বাড়িটা কার, রণবীর কপুরের?"

"না তো! ওটা তো ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।"

"তুই যে বলেছিলি, কারও না কারও বাড়িতে হয়।"

ঈপ্সার কাছে যেটুকু জানা গেল, রণবীর কপুর সেক্রেটারি। জনৈক দেবার্ক সরকার প্রেসিডেন্ট, মেম্বার অনেক। তবে নিয়মিত যারা যায় তাদের সংখ্যা কম। কার অত সময় আছে প্রতি শনিবার হল্লা করতে যাবে? কারও বাড়িতে হয়। তবে বাড়িগুলো একটু অদ্ভুত। যেদিন বাপ-মা কেউ থাকেন না, বা যার বাড়িতে অন্য আলাদা মহল আছে, সেখানেই হয় এগুলো। সাধারণত মিউজিকের সঙ্গে নাচ, আড্ডা, কেউ কেউ ড্রাগ নেয়, বোতলও চলে। ঈপ্সারা কেউ এই ক্লাবের আসল চরিত্রের কথা বাড়িতে বলে না, তা বললে যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। ওরা যেদিন যায়, বলেই দেয় ড্রাগ-ফাগ চলবে না। বিশেষ-বিশেষ দিনে খুব ফুর্তির আয়োজন হয়, যেমন সেদিন হয়েছিল। দেশাই সারের ক্লাসের সৌজন্যে ওখানে অনেক অন্য কলেজের বা স্ট্রিমের বন্ধুদের সঙ্গে জানাশোনা ওদের। রূপ যেমন সেদিন প্রথম গেল, দিয়া মাঝে মাঝে যায়। দিয়া খুব পিকিউলিয়ার, সবাই ওকে জব্দ করবার কথা ভাবে।

"সে কী? ও তো এমনিতেই ডিপ্রেস্ড্, ওকে জব্দ করবার ভাবনা ইনহিউম্যান।"

ঈপ্সা বলল, "দেখ বাবাই তুই সব কথা জানিস না, কমেন্ট করবি না। দিয়ার অনেক অ্যাডমায়ারার আছে। কিন্তু ও সবাইকে এমন তাচ্ছিল্য করে যে, আমাদেরই গা জ্বলে যায়। হয়েছে-হয়েছে তোর চেহারা সুন্দর, না হয় তুই অনেক টাকার মালিক, ওরকম যেন আর নেই! এই তো শুকতারাই বিশাল বড়লোক, গ্ল্যামারাস। কই অমন তো করে না?"

বাবাই বলল, "ও তাই ছেলেদের রাগ ওকে বাগে পাচ্ছে না বলে? আর তুই একটা মেয়ে হয়ে জিনিসটা সাপোর্ট করছিস, জাস্টিফাই করছিস? বাঃ।"

"ছেলেমেয়ে, ফেমিনিস্ট, জেন্ডার ডিফারেন্স এসব ইতিহাস হয়ে গিয়েছে বুঝলি বাবাই। তোরা গ্রামে থাকিস বলে টের পাস না। এখন সবাই সমান।"

বাবাই বলল, "হ্যাঁ, সবাই সমান বলেই কাগজভর্তি বধূহত্যা, বধূ নির্যাতন আর রেপের খবর। আচ্ছা ঈপ্সা, তোকে কেউ অজ্ঞান করে রেপ করলে তোর কেমন লাগবে?"

"অজ্ঞান কী করে করবে?" ঈপ্সা অবাক।

"ধর, তোর ড্রিঙ্কের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিল।" বাবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

"কার এত সাহস আছে?" ঈপ্সা তেড়ে উঠল।

"ধর না এমন ঘটল, কী করবি?" বাবাইয়ের হেলদোল নেই।

"পুলিশে খবর দেব, সে মক্কেলকে যদি পাই চোখ খুবলে নেব, জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব।"

"গুড, তুই প্রতিহিংসার কথা ভাবছিস, হিন্দি সিনেমা।"

"তুই কি বলতে চাস ছেড়ে দেব লোকটাকে?"

"তুই তো জানিসই না কে, জ্ঞান হতে দেখলি তোর জামাকাপড়ে রক্ত। সারা শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা, বিশেষ-বিশেষ জায়গা ফেটে যাচ্ছে যন্ত্রণায়।"

"বাবা, তুই এমন করে বলছিস, যেন সত্যি-সত্যি এরকম ঘটেছে।"

"ঈপ্সা, তুই কাগজ পড়িস না? ক'দিন আগেই গোয়ার আঞ্জুনা বিচে একটা মেয়ের অবিকল এই দশা হয়েছিল। তাকে আবার জলের ধারে ফেলে রাখা হয়েছিল, যাতে অজ্ঞান অবস্থায় মেয়েটা ডুবে মরে যায়। গেলও তাই। ওর জায়গায় নিজেকে কল্পনা কর। তারপর গ্রাম শহর, জেন্ডার ডিফারেন্স, দিয়াকে জব্দ করা, এসব বিষয়ে কথা বলতে আসিস।"

বাবাই ঈপ্সার পাশ থেকে বেরিয়ে গেল। রাগ চোখের জল হয়ে ফেটে বেরোবার উপক্রম হয়েছিল। সে অনেক কষ্টে বকে ধমকে তাকে ভেতরে পাঠায়।

॥ ১১ ॥

গরম ক্রমে বাড়ছে। সইয়ে-সইয়ে বাড়ছে। গোড়ায় দুম করে হাওয়াটা পড়ে গেল। আকাশে সাদাটে মেঘের আস্তর। তবে কি আবার বৃষ্টি, জলো শীত না একটা চাপা ভাব আবহাওয়ায়! তারপর মেঘ সরে গেল। উজ্জ্বল রোদ। বাইরে তাপ, ভেতরে এখনও আরামদায়ক। তারপর বাইরে তাপ, ভেতরে গুমোট। এখনও রাধাচূড়ায় কাগজকুসুম, সন্ধে হলে ঝিরঝিরে হাওয়া, কালবৈশাখীর তোড়জোড়। হঠাৎ সব শুনশান। আকাশের লাল চোখ সাদা। মেঘ সরে যাচ্ছে, ঝড়ো হাওয়ার ঠিকানা নেই, আবারও বসন্ত।

ধ্রুবজ্যোতি হাফ-হাতা পাঞ্জাবি ধরেছেন। বেশি হাঁটতে পারছেন না। এক পাক ঘুরতেই জামা ভিজে চুপচুপে। গাছের ছায়ায় বসে জিরোচ্ছেন। হঠাৎ খেয়াল হল, স্নিকার্স, শর্টস এবং গোলগলা হাতকাটা এক ধরনের টি-শার্ট পরে যে ছেলেটি দৌড়চ্ছে, তাকে তিনি চেনেন। চিনতে তো অনেককেই পারেন। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একে তিনি একটু বিশেষরকম চেনেন। কারণ এর নাম আরিয়ান। ছেলেটি ফরসা, বেশ সুগঠিত। ডান হাতে একটা চোখে পড়ার মতো উল্কি, নীল রঙের ড্রাগন।

ছেলেটার চেহারায়ও একটা ড্র্যাগন-ড্র্যাগন ভাব আছে কি? একটা লিকলিকে অথচ পেশি-কঠিন, নমনীয় শরীর। কত লম্বা হবে! পাঁচ দশ, কি এগারো। খোলা জায়গায় দৈর্ঘ্য ঠিক আন্দাজ করা যায় না। মাথায় এখন খুব ঝাঁকড়া চুল, মুখটাও বেশ বড়সড়। ছেলেটিকে কি হ্যান্ডসাম বলা চলে? তা হয়তো চলে। কিন্তু আকর্ষক বলা যাবে না। সব থাকা সত্ত্বেও, এক মাথা চুল, ফরসা রং, সুন্দর বডি, পুরুষালি ভুরু, লম্বা নাক, সবই রয়েছে। কী যেন একটা নেই বা আছে, যার জন্য শুধু অনাকর্ষক নয়, একটু যেন বিতৃষ্ণাকর। ছেলেটি সেকেন্ড রাউন্ডে যখন কাছাকাছি এল, তিনি ভালো করে লক্ষ করে দেখলেন। ওর চিবুক ছোট, ঠোঁটদুটো একেবারে একটি সরলরেখা, চোখ দুটো আবার বড়-বড় যেন ফেটে বেরোতে চায়। তাঁর খুব আনপ্লেজেন্ট লাগছে। কে জানে এই সবের ভিতরেই হয়তো 'টপ সেক্সিনেস' লুকিয়ে আছে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, রমণীরা দেখতে পায়। বিজ্ঞাপকরাও দেখতে পায়।

ওকে একটু তাতিয়ে দেবার জন্য তিনি মুখিয়ে উঠলেন। তৃতীয় রাউন্ডে ও দৌড়োচ্ছে আস্তে আস্তে, তাঁর কাছাকাছি এসে মন্থর হতে-হতে থমকে গেল একেবারে। হয়তো তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই তাঁর কাছাকাছি এসে বসল, একটু শিথিল হয়ে হাঁটুর উপর হাত লম্বা করে বসেছে।

"স্পোর্টসম্যান না কি?" তিনি সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করেন।

"আই লাভ স্পোর্টস," উত্তর এল।

"তোমার বডিটি তো বেশ, কোন স্ট্রিমে আছ?" অতি সন্তর্পণে তিনি জিজ্ঞেস করেন।

"মেডিক্যাল।"

"ইউ ক্যান বি অ্যান এগজাম্পল টু ইয়োর পেশেন্টস।"

"হু ওয়ান্টস পেশেন্টস? বো...রিং। বাবা মা'র জোরাজুরিতে। কিছু মনে করবেন না, আপনাদের জেনারেশন হেভি জুলুমবাজ।"

"শুনলে কেন?"

বুড়ো আঙুল দিয়ে তর্জনীতে টোকা দিয়ে আরিয়ান বলল, "এই জিনিসটা তো ওদেরই কাছে।"

"তুমি মডেলিং করে রোজগার করতে পারো কিন্তু।"

হঠাৎ আরিয়ান ঘুরে বসল, "ইউ থিঙ্ক সো, অ্যান্ড সে সো?"

"বলছি।"

"আপনার কাছ থেকে আশা করিনি। আপনি, ডোন্ট মাইন্ড, আমার মা-বাবার জেনারেশনের চেয়েও সিনিয়র।"

ধ্রুবজ্যোতি মৃদু হাসলেন। আরিয়ান একটু চেয়ে রইল। হাসিটার মানে যে সে অনুধাবন করতে পারছে না এবং তা না পেরে একটু বোকা বনেছে, এটা বুঝতে তাঁর অসুবিধে হল না।

সিনিয়র সিটিজেন বলে একটা কথা হয়েছে আজকাল, ষাটোর্ধ্বদের বোঝার। সোজাসুজি বুড়ো বা বৃদ্ধ না বলে সিনিয়র সিটিজেন। এখন ষাট বছরেও অনেকেই বুড়ো হন না। সিনিয়র সিটিজেন বলে দিলে আর কোনও গোল থাকে না। ৬১-ও সিনিয়র সিটিজেন, ৯১-ও তাই। কিন্তু আরিয়ানের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হল, জুনিয়ার সিটিজেন বলে শব্দগুচ্ছটাও তৈরি হওয়া উচিত। অল্পবয়স, ছেলেমানুষ, যুবক, তরুণ এইভাবে ভাগাভাগি না করে গড়পড়তা জুনিয়র সিটিজেন। ১৫ থেকে শুরু করে ৩০ পর্যন্ত। ৩০ থেকে ৬০ পর্যন্ত এদের কী বলা হবে, এন এস এন জে? নিদার সিনিয়র নর জুনিয়র।

তিনি বললেন, "তোমার মনেব কথাটা আন্দাজ করতে পেরেছি বলে অবাক হচ্ছ? সিনিয়র সিটিজেন হয়ে গেলে একটা উঁচু টিলায় উঠে দাঁড়ানোর মতো অনুভূতি হয়। বহুদূর পর্যন্ত সব কিছু, তাদের খুঁটিনাটি, তাদের পশ্চাৎপট নিয়ে দেখা যায়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তুমি সন্তুষ্ট নও। ভিতরে একটা বিটারনেস কাজ করছে, কেমন?"

"সর্ট অফ," আরিয়ান পুরোপুরি ধরা দিতে চাইল না।

তিনি বললেন, "দেখো, তুমি মেডিক্যাল পড়ার চান্স পেয়েছ, মানে কিন্তু তুমি এলেমদার ছেলে। জয়েন্টটা তো পার করতে হয়েছে। তার উপর তোমার বাবা-মা উভয়েই ডাক্তার..."

"কী করে জানলেন?" ভারী আশ্চর্য হল জুনিয়র সিটিজেনটি।

আবার সেই রহস্যময় হাসিটা হাসলেন তিনি, "আন্দাজ করলাম, মিলে গেল।"

"আপনি নিশ্চয়ই অ্যাস্ট্রলজার। কপাল-টপাল দেখে অনেক কিছু বলে দিতে পারেন।" খুব ব্যগ্রভাবে বলল সে।

"দূর, সিম্পলি আন্দাজটা মিলে গিয়েছে। ডাক্তারি সংস্কারটা তাই তোমার রক্তেই থাকার কথা বুঝলে? আজ বুঝতে পারছ না কিন্তু ভবিষ্যতে খুব সফল ডাক্তার হওয়ার সম্ভাবনা তোমার রয়েছে।"

"কে চায় সফল ডাক্তার হতে? নো ফান ইন লাইফ। কতকগুলো নেগেটিভ জিনিস নিয়ে জীবন কাটানো!"

"বলছ কী, জীবন বাঁচানোটা নেগেটিভ? এর চেয়ে পজিটিভ আর কী হতে পারে মাই ফ্রেন্ড? এই যে ফান কথাটা ইউজ করলে, এটা তো এনিওয়ে এখন পুরোপুরিই করে নিচ্ছ। আড্ডা, ডিসকো, নাইট ক্লাব, ডেটিং সবই তো হচ্ছে। খুব শিগ্‌গিরিই এগুলো আর ভালো লাগবে না, তখন?"

"জীবনটাকে প্রচণ্ডভাবে উপভোগ করে নিতে চাই আমি, প্রচণ্ডভাবে। যতদিন পারি, এই সময় তো চিরকাল থাকবে না।"

"ও সেটা তুমি জেনে গিয়েছ? সময়টা চিরকাল থাকবে না। কী জানো আরিয়ান, ভগবান বা প্রকৃতি যা-ই বলো, মানুষের জীবনের স্টেজগুলো উলটে দিলে ভালো করতেন। ধর, প্রৌঢ় বয়সটা প্রথমে এল, লেখাপড়া ট্রেনিং সব চমৎকারভাবে হয়ে গেল, তারপর তোমার যাকে বলে এনজয়মেন্টের কাল।"

"হোয়াট ননসেন্স!"

"আহা আমি একটা হাইপথেটিক্যাল কথা বলছি। কিন্তু একই সঙ্গে ট্রেনিংয়ের সময় আর যৌবনচাঞ্চল্য দিয়ে ভদ্রলোক আমাদের খুব মুশকিল করে দিয়েছেন। দুটোর ব্যালান্স করা সোজা কথা নয়।" তিনি দুঃখে মাথা নাড়তে থাকলেন।

আরিয়ান বলল, "একবার বললেন মডেলিং করে টাকা উপার্জন করতে, তারপর বলছেন ডাক্তারি করতে..."

"না, না, না, না। আমি কোনওটাই করতে বলিনি হে জেসি, স্যরি জুনিয়র সিটিজেন। তোমার সামনে এই দুটো পথ প্রবলভাবে খোলা আছে, সেটাই ডিসকাস করছিলাম।"

"আমিও প্রবলভাবে বলছি, আমি শো-ম্যান হতে চাই। আপনার যদি জ্যোতিষ-টোতিষ জানা থাকে কাইন্ডলি বলুন না, মডেলিংয়ে চান্স কেমন?"

"তুমি আজকালকার ছেলে, জ্যোতিষ বিশ্বাস করো?"

"বিশ্বাস না করার কী আছে?" আমাদের বন্ধুরা কতগুলো আংটি তাবিজ পরে তা জানেন?"

"তোমার হাতটা দেখি একেবার।"

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল আরিয়ান। হাতের তেলোর উপর দিয়ে আঙুল বুলোতে লাগলেন ধ্রুবজ্যোতি। এর ব্রেনলাইন আর হার্টলাইন এক, খুব বিরল কেস। ভেতরে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। হার্ট আর ব্রেন এক পথে এক মতে চলে। তিনি বিশেষ কিছুই জানেন না। তবু ভাব দেখাতে হল যেন অনেক জানেন। আয়ুরেখাটা শেষ পর্যন্ত পৌঁছোয়নি তবে একটা হেল্‌পলাইন রয়েছে। ভাগ্যরেখা মোটামুটি। সানলাইন বলে কিছু নেই।

"তুমি মডেলিং-এ চেষ্টা করেছ?" আস্তে আস্তে বললেন।

"নিজের অ্যালবাম করেছি, সিভি আপ টু ডেট রাখি। বন্ধু-বান্ধবের চেনাজানাতে দু'-একটা করেছি।

কই আর তো ডাকে না?" গলায় সামান্য হতাশার সুর।

"তুমি একটা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর সরু গোঁফ রাখো, তারপরে দেখো কী হয়। নাচ শেখো নাকি।"

"শিওর, না হলে শো-ম্যান হব কী করে?"

"দেখো, আমি কিন্তু হাত দেখে বলছি তোমার খুব যশস্বী হওয়ার ভাগ্য নয়। তা হলে শো-ম্যানটা হবে কী করে? অথচ দেখছি টাকাপয়সা, কর্মস্থান সব ভালোই।"

"মানে বস্ টাকা রেখে যাবে আর আমি হসপিটালের আরএমও হয়ে ঘষটাব এই আর কী! আচ্ছা বাই," জুনিয়র একটু লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তিনি বললেন, "হাত সব নয়। হাত তৈরি করা যায় সংকল্প দিয়ে, সব রেখা পাল্টে যায়।"

"কনসোলেশন প্রাইজ?" বলে একবার হাসল আরিয়ান। তারপর বড়-বড় পা ফেলে চলে গেল।

লোকটা কিছু জানে। কিছু ঠিকঠাক বলল, কিছু চেপে গেল। চাপলটা কী? এনি ওয়ে কপুরদের ফ্যামিলি অ্যাস্ট্রলজার আছে, তার কাছে যাওয়া যাবে একদিন। আংটি-ফাংটি যা বলবে পরে নেওয়া যাবে। সে বাড়ির দিকে চলল। হাঁটা পথ পাঁচ-মিনিটের। মেঘনাদ সাহার স্ট্যাচু পেরিয়ে চলে গেল। রাস্তা পেরিয়ে শরৎ বোস রোড, লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে পার হয়ে গেল। দেশপ্রিয় পার্কে তার বাড়ি। বাইরের ধাপগুলো একলাফে পেরিয়ে পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলল সে। সামনেই একটা আয়না। ওপরে ঢাকনা পরানো আলো। দরজা বন্ধ করে আয়নার সামনে দাঁড়াল সে। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর সরু গোঁফ, মন্দ বলেনি লোকটা।

॥ ১২ ॥

বসন্তকাল বলতে ঠিক যা বোঝায় তা এ শহরে বেশিদিন থাকে না। কিন্তু আসে, সামান্য তপ্ত আবহাওয়া কিন্তু হাওয়ার ক্লান্তি নেই। কেমন একটা সুগন্ধ ধোঁয়া ওঠে ভূতল থেকে। পুষ্প, তৃণ, নবোদ্গত পত্ররাজির গন্ধ কি? হঠাৎ-হঠাৎ কীসের স্পর্শে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। উত্তর ষাটেও এই বাসন্তী হরখিলা মুগ্ধতায়, প্রসন্নতায় মাখিয়ে দিয়ে যায় তাঁকে। ভালো লাগতে থাকে জীবন। শুধু বারান্দায় বসে বাঁচতে, শুধু কুসুম-বিছানো পথে হেঁটে হেঁটে বাঁচতে। সংযুক্তাও কেমন নতুন হয়ে ওঠেন। ত্বকের ওপর একটা নতুন আভা, ঘরে ফেরা ক্লান্তির ওপর লাবণ্য মাখানো। গা ধুয়ে, ভালো করে ট্যালকম পাউডার মেখে একটা আকাশি রঙের শাড়ি পরে বারান্দার চায়ের আসরে যোগ দেন সংযুক্তা। মিলু এবার পটে করে চা নিয়ে আসে, নানারকম বিস্কুট ওঁদের দু'জনেরই একটা বিলাস।

"আচ্ছা সংযুক্তা, তুমি কি টের পাও বসন্ত বদলেছে?"

"আমাদের কথা বলছ তো?"

"ন্যাচার্যালি।"

"তা হলে ভাবতে হয়। আমার তো আবার প্রত্যেক ঋতু পরিবর্তনকেই একটা করে বসন্ত মনে হয়। আগেও হত, এখনও হয়। কেমন একটা রোমাঞ্চ," ভেবে-ভেবে বললেন সংযুক্তা। "তবে কী জানো এখন সেটাকে ট্যাক্ল করতে পারি, আগে পারতাম না। কেঁদে, মন কেমন করে, বিষাদে, আহ্লাদে আকুল হয়ে যেতাম।"

"ভালোবাসতে না?"

সংযুক্তা হেসে বললেন, "আমি অন্তত সবচেয়ে ভালোবাসতুম নিজেকে। নিজেই নিজেকে নির্জনে প্রেমনিবেদন করতুম, একটা পছন্দসই চরিত্র খাড়া করে নিতুম। সে আমাকে খুব ভালো-ভালো কথা বলত।"

"প্রেম নিবেদন কতটা পর্যন্ত, ফিজিক্যালি যেত?"

"একদম অসভ্যতা করবে না," সংযুক্তা একটু লাল হয়ে বললেন।

"তবে হ্যাঁ যৌবনে, মানে প্রথম যৌবনে সারা বছরই বসন্ত," চায়ে চুমুক দিয়ে ধ্রুব বললেন।

"তোমাদের আর কী! আমাদের বর্ষায় কাপড় শুকোবার, চুল শুকোবার মুশকিল। গ্রীষ্মে, ঘামতে ঘামতে রান্না করা।"

"তুমি করতে নাকি?" ধ্রুব হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি না হলেও, আমার মাকে তো করতে হত।"

"তাঁর তো তখন নবযৌবন না, সেটা তোমার।"

"আজ্ঞে না, আমাদেরও করতে হত। চা, টোস্ট, কফি এসব করতে হত।"

"আচ্ছা সংযুক্তা একটু ভেবে বল তো," ধ্রুবজ্যোতি বললেন, "বসন্তটা কি শুধু প্রেমের, সেক্সের সুড়সুড়ি?"

"আমাদের ক্ষেত্রে অন্তত না।"

"আবার বহুবচন করছ কেন? বহুর কথা তুমি জানো না, তোমার কথা বলো।"

"আমার মন কোথায় উধাও হয়ে যেত। কার জন্য, কীসের জন্য যেন মন কেমন করে উঠত থেকে থেকে। ফুটন্ত ফুলে-ভরা গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে পথ চলতে-চলতে কেমন একটা উচ্ছ্বাস, একটা পুলক হত। সেটা এখনও হয়। হয়তো অতটা না, কিন্তু হয়। তোমার?"

ধ্রুবজ্যোতি বললেন, "সেই জন্যেই তো তোমায় জিজ্ঞেস করছিলুম। আমরা মেয়েদের দেখে পুলকিত হতুম ঠিকই, আমার কিন্তু বেশ ভালো মন্দ বিচার ছিল। তবে বেশিরভাগ বসন্তই গিয়েছে কবিতা লিখতে। আকাশ-বাতাসে কবিতা ভাসত। খুব পড়তুম তখন, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকতুম। যত না প্রেম, তার চেয়ে বেশি প্রেমের কথা ভালো লাগত,

সে ভোলে ভুলুক কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না আমি কভু ভুলিব না।

সুধীন দত্ত পড়তে পড়তে ফিদা হয়ে যেতুম। রবীন্দ্রনাথের 'অসম্ভব' আবৃত্তি করতুম মনে-মনে,

দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রব
মন শুধু বলে অসম্ভব, এ অসম্ভব।

আর সেই যে...

বোলো তারে, বোলো,
এতদিনে তারে দেখা হল।
তখন বর্ষণশেষে।
ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল্‌মোরের থোলো।

সেই সব বৈদেহী কল্পনা, নীল কুয়াশার মতো আচ্ছন্নতা, রোম্যান্টিক বিরহবেদনা, ব্যক্তিনির্ভর নয় একেবারেই। এসব কি ঘটে না এখনকার তারুণ্যে? তারুণ্য তা হলে জানকারি পেল অনেক, কিন্তু হারাল এমন এক ভরাট ব্যঞ্জনাময় প্রতীক্ষা, যার হিসেব অঙ্কে হয় না।

দুটি তরুণ-তরুণী বসেছিল তাঁর সঙ্গে একই বেঞ্চে। তিনিই প্রথমে বসেছিলেন। ওরা এল পরে। সুতরাং তাঁর উঠে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ পর সবিস্ময়ে শুনলেন, ছেলেটি মেয়েটিকে বলছে, 'অফ কোর্স শোব। কিন্তু বিয়ে-টিয়ে করতে পারব না।'

এই ভাষা এবং এই বক্তব্য একজন তৃতীয় ব্যক্তি ধারে-কাছে থাকলেও কিচ্ছু এসে যায় না। মিলনের যে রোমাঞ্চ বহু বহু যুগ ধরে মানুষ গড়ে তুলেছে, একটা কথায় তা ভূমিসাৎ হয়ে গেল।

এরা সব জেনে গিয়েছে, মিলন এদের ভেতর কোনও প্রতীক্ষা, কোনও দায়, কোনও রেশ রাখে না। দে জাস্ট হ্যাভ ফান। আর কোনও আড়ালও রইল না। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে, মানুষ-মানুষী কুকুরের মতো রাস্তায়-ঘাটে সঙ্গম করছে। যে-কোনও পার্কময় অসংখ্য উলঙ্গ, সঙ্গমরত যুগল। কখনও কখনও তৃতীয় একজন এসে কামড়াকামড়ি করছে, এদের পাশ দিয়ে সিনিয়র সিটিজেন কুকুরের চেন হাতে ধরে কিংবা নাতি-নাতনির হাত ধরে বেড়াচ্ছেন। কারওই হয়তো কোনও বৈলক্ষ্যণ্যও নেই। না বৃদ্ধের, না শিশুর, না কুকুরের। তার মানে, সেই আদিমতায় প্রত্যাবর্তন। যখনকার অবস্থান থেকে মানুষ ধীরে ধীরে অন্তরাল, আচ্ছাদন এসব সৃষ্টির সূক্ষ্মতা অর্জন করেছিল। মানুষ আর পশুর পার্থক্য তৈরি হয়েছিল।

তিনি ভাবতে লাগলেন, সেই অদূর অ-সভ্য দুনিয়ার ললিতকলা বলে কিছু থাকবে কী? ক্র্যাফ্‌ট হয়তো বেঁচে থাকবে, কিন্তু ফাইন আর্টস নয়। সূক্ষ্মবোধ ছাড়া সূক্ষ্মতার শিল্প কী করে থাকবে? যন্ত্র তৈরি হবে, আরও উন্নত যন্ত্র সব। কিন্তু শিল্প হবেও না, তার অভাবও কেউ বোধ করবে না। ভালোবাসা থাকবে না, প্রত্যেকটা সম্পর্কই কেজো। ভালোবাসা না থাকলে শিশুরা কী করবে? শিশুরা শুধু বেড়ে উঠবে, তাদের কাছেও সব কিছু খোলাখুলি থাকবে। তারা বুঝতে পারবে না। শিশুরা থাকবে, কিন্তু তারা শিশু থাকবে না। তা হলে তাদেরও একটা নতুন নামকরণ দরকার। কী নাম, কী নাম! আই সি? ইম্যাচিওর সিটিজেন?

ভাবতে-ভাবতে কেমন হাত-পা ভেতরে ঢুকে যেতে লাগল তাঁর। ‘স্মারং স্মারং স্বগৃহ চরিতং দারুভূতো মুরারি।’ তিনি জগন্নাথ হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মতো জগন্নাথ অনেকেই হচ্ছে, হবে। মনু দীক্ষিত তো বটেই। সংযুক্তা খুব প্র্যাকটিক্যাল, মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা খুব। তবু বোধহয় ও জগন্নাথ না হয়ে পারবে না। সারি সারি জগন্নাথ দেখতে-দেখতে তিনি বিন্দুবৎ হয়ে যাচ্ছিলেন, যদি না তাঁকে চৈতন্যে ফিরিয়ে আনত অন্য মানুষের উপস্থিতি। একলা একলা ভাবা খুব বিপজ্জনক তা হলে। অথচ একলা না হলে ভাবনাও আসে না। গভীর, ভরাট, বিস্তৃত হতে পারে না। না ভেবেই বা কী করে বাঁচবেন তিনি, ভাবনা ছাড়া বাঁচা যায়?

॥ ১৩ ॥

কারা এল? সর্বনাশ! আবার দুটি তরুণ-তরুণী। এবার কি মেয়েটিই ছেলেটিকে ওই কথা বলবে নাকি? ‘শোব, কিন্তু বিয়ে-টিয়ে করব না।’ তিনি উৎকর্ণ হয়ে রইলেন, কারণ ভয় পেলেও তাঁর কৌতূহল ছিল। শুনলেন ছেলেটি মেয়েটিকে বলছে, “আমি কিন্তু তোর উপরই ভরসা করছি। তুই-ই ওখানে নিয়ে গিয়েছিলি আমাকে। আধুনিকতায় আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বেলেল্লাপনায় আছে। আমি নাচ পর্যন্ত যেতে পারি, যদিও জিনিসটা কেমন অর্থহীন ন্যাকাপনা লাগে আমার। তবু যাই হোক, তুই নাচলি আমি একটু কোমর দোলালুম, কি স্টেপস নিলুম ঠিক আছে। এক পেগ দু’পেগ খেতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে সিগারেটে কোকেন? না বলে? দ্যাটস ক্রাইম। এবং রিনা, হঠাৎ আলো নিবে যেতে যে খামচাখামচি শুরু হয়েছিল তা সোজা-সরল-ভাষায় ডার্টি, ডার্টি, ডার্টি।”

“বিশ্বাস কর, আমি জানতাম না এরকম হবে,” মেয়েটি ক্ষীণ গলায় বলল। “আমি তো বেশি যাই না। যেদিন যাই মিউজিকের সঙ্গে নাচ হয়, আমার ভালোই লাগে।”

“রিনা, বি রেডি ফর ডার্টিয়ার অ্যান্ড মোর ডেঞ্জারাস থিংস। জানিস কী, ওখানে দু’জন মেয়ের ড্রিঙ্কে কিছু ড্রাগ মেশানো হয়েছিল যাতে ওরা অজ্ঞান হয়ে যায়? তারপর তাদের রেপ করা হয়েছে।”

মেয়েটি যেন শক খেয়ে সোজা হয়ে গেল। বলল, “যাঃ!”

"রিনা, অন্ধকার হতেই খামচানি খেতে-খেতে তোকে নিয়ে আমি বেরিয়ে এলুম। আমি ভেবেছি, জাস্ট লোডশেডিং। আমরা বাইরে বেরিয়ে কিছুদূর যাবার পর আলো এসে গিয়েছিল, কিন্তু আমরা আর ফিরিনি। যারা ছিল তারা কী অবস্থায় ছিল আমরা জানি না, কিন্তু উজ্জ্বল মিথ্যে কথা বলার ছেলে নয়।"

খুব চুপিচুপি দু'জনের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হল। তার সবটা তিনি শুনতে পেলেন না। রিনা বলে মেয়েটি বলল, "আমি দেখছি কী করতে পারি। কিছু তো জোগাড় করতে পারবই। তুই যা বলছিস তাতে তো...সত্যি বলছি...ওরা এতদূর যেতে পারে, আমার ধারণায় ছিল না। দূর, আমার বিশ্রী লাগছে, আমি বাড়ি চললাম।"

"যা, কিন্তু যা বললুম, মনে রাখবি। ইনফর্মেশন আমার চাই-ই।"

মেয়েটি উঠে পড়ে হঠাৎ আবার কেমন ভেঙে গিয়ে বসে পড়ল, মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

ছেলেটি ওকে সান্ত্বনা দেবার কোনও চেষ্টা করল না। একটু পরে বলল, "কাঁদছিস, রাগতে পারিস না? রাগগুলো কোন অকেশনের জন্য রেখে দিচ্ছিস তবে?"

মেয়েটি বেজার মুখ উপরে তুলে বলল, "সব কান্নাই কান্না নয় রূপ, দিস ইজ অ্যাঙ্গার, অ্যান্ড অ্যাঙ্গার হ্যাজ মেনি মেনি এক্সপ্রেশন্স," উঠে চলে গেল। ছেলেটি চুপচাপ বসে রইল। এই তা হলে রূপরাজ! আসলে কম দেখেছেন, তাই চিনতে পারেননি সাঁঝবেলার আলোয়।

একটু পরে সাহস করে তিনি বললেন, "তুমি তো বেশ কড়াধাতের ছেলে দেখছি ইয়ংম্যান।"

সে চমকে উঠল, তারপর তাঁর দিকে ফিরে বলল, "ও, আপনি, কিছু বলছিলেন?"

"বলছিলাম, তুমি তো বেশ কড়া ধাতের।"

"কেন?"

"গার্লফ্রেন্ড কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল, একটু সান্ত্বনা পর্যন্ত দিলে না। দিস ইজ টু ব্যাড।"

"রিনা গার্লও বটে, ফ্রেন্ডও বটে। কিন্তু গার্লফ্রেন্ড নয়।"

"আহা, শুধু বন্ধু হলেও কিছু দায় বর্তায়।"

"ওটা দায়ের ব্যাপার নয়। মানে, দু'জনেরই দায়ের ব্যাপার। আপনি বুঝবেন না। একটা ঘটনা ঘটেছে, তাতে আমরা দু'জনেই খুব ডিসটার্বড। উই শুড ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট।"

ছেলেটির ঠোঁটের রেখা দৃঢ়তর হল। একটু পরে সে হঠাৎ তাঁর দিকে ফিরে বলল, "আপনি হলে কী করতেন?" তারপর তিনি যা ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন, সেই দিয়া আর বাবাইয়ের ঘটনাটা নাম না করে সে তাঁকে বিশদ বলল।

"আমরা যখন তোমাদের বয়সি ছিলাম, এরকম ঘটত না," তিনি বললেন। "আমাদের মধ্যে এসব জিনিস তখন আসেনি। উই ওয়্যার ব্লেসেডলি পুওরার ইন আওয়ার রিসোর্সেস। ছোটদের মধ্যে মদ-হুল্লোড়ের পার্টি, এ তো বিজ্ঞাপনের সৃষ্টি। এইসব পোশাক, এইসব নাচ, সবই এইসব ঘটনার জন্য তোমাদের প্রস্তুত করে তোলা। একটা বিষচক্র, যাকে বলে ভিশাস সার্কল। তোমাদের জন্যেই পণ্যগুলো চলছে, ওরা চালাচ্ছে তোমরাও চলছ। কোনও সমাজ যখন সম্পূর্ণ টাকার খেলায় পরিণত হয়, তখন তার কোনও মূল্যবোধ থাকে না। তোমাদের দায় কেউ নেবে না রূপরাজ। আগুনের চক্র দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে ঘুরছে। তার ভেতর দিয়ে তোমাদের সার্কাসি লাফ দিতে বলা হচ্ছে। বেশিরভাগই ঝলসে যাবে, একেবারে পুড়ে কাঠকয়লা যদি না-ও হয়।"

"আপনি হলে কী করতেন?" ছেলেটি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করল। "ঠিক আছে আপনাদের সময়ে ছিল না, এখন হয়েছে। এখন এই সময়ে আপনি একজন প্রকৃত গুরুজন হলে আমাকে কী করতে বলতেন?"

"তোমাদের পুলিশে যাওয়া উচিত ছিল।"

"ভুল বলছেন, পুলিশ কাউকে ধরতে পারবে না। ওরা যদি তক্ষুনি ওই অবস্থাতেই যেত, তবু

একটা চান্স ছিল। কিন্তু এই পাবলিসিটি, ওদেরও দোষ দিতে পারি না। অজ্ঞান করা হয়েছিল বলে ওরা তো কাউকেই শনাক্ত করতে পারবে না, দে আর ডেডলি ক্লেভার।"

ধ্রুবজ্যোতি বললেন, "চিনতে পারার চান্স থাকলে মেরে ফেলত। যাতে খুন করতে না হয়, তাই প্ল্যান করেই করেছে।"

রূপরাজ একটু চমকে উঠল, তারপর গুম হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর স্প্রিং-এর মতো উঠে দাঁড়াল।

"কী হলঁ, চললে?"

সে কোনও কথা বলল না। একেবারে অন্যমনস্ক বা বলা যায়, কিছু ভাবতে ভাবতে চলে গেল। ঘাসটুকু পেরিয়ে যাবার পর হঠাৎ পেছন ফিরে বলল, "থ্যাংক ইউ।"

॥ ১৪ ॥

ঝুমঝুম করে সন্ধে নামতে থাকে। চতুর্দিকে হাওয়া বয়, দখিনা পবন। হাওয়ার সঙ্গে চারিদিকে ছুটে যায় পরিমল। গাছের ও ফুলের। এত ভালো লাগার জন্য তাঁর নিজেকে কেমন ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করল। এই ছেলেমেয়েগুলি এমন বিপদে পড়েছে, তিনি উপভোগ করছেন বসন্ত! উঠে পড়ে তিনি ঝরাপাতা আর শুকনো রেণুর ওড়াউড়ির মধ্য দিয়ে বড় রাস্তায় প্রদীপের মতো জ্বলে ওঠা বাতিগুলোর দিকে বিমুগ্ধের মতো তাকাতে-তাকাতে হাঁটতে লাগলেন। কত বসন্ত মনে পড়ে যাচ্ছে, কত গ্রীষ্ম, কত শীত, কত বর্ষাও। কেননা প্রত্যেকটা ঋতুর আরম্ভই ওইরকম অদ্ভুত মুগ্ধকর। সংযুক্তা ঠিকই বলেছে, এখন কি ইয়ং জেনারেশনের আর এ সব অনুভূতি হয় না? প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগ কি ছিন্ন হবার মুখে এইসব শহরে? ক্রিকেটারদের সেঞ্চুরি করে আকাশের দিকে তাকাতে দেখা যায়। আর কাউকে তো দেখেন না। কাচের বাইরে থেকে তাদের আড্ডারত দেখা যায় সচ্ছল কফিখানায়। টেলিস্কোপ নিয়ে আকাশ দেখেন কেউ কেউ। জগিং করতে দেখেন অনেককে। ছুটছে, হাঁটছে, খেলছে, কম্পিউটার নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছে। প্রকৃতি হল ট্যুরিজম, পিকনিক বা আউটিং-এর ক্ষেত্র। অনন্তের সংবাদ বহন করে আনা তো দূরের কথা, অকারণ পুলকে কাঁপিয়ে দেওয়া, কাঁদিয়ে দেওয়া এসবও আর বোধহয়...

এরকম একটা সিদ্ধান্তেই বা তিনি চট করে পৌঁছোচ্ছেন কী করে? তাঁর একটা ছেলেমেয়ে থাকলে হয়তো এই জেনারেশনের মনের কথাটা তিনি টের পেতেন। নেই বলেই তাই পাচ্ছেন না। তাঁরাই কি কাউকে ডেকে ডেকে বলতে গিয়েছেন?...আজ প্রথম দুমদাম করে কালবৈশাখী এসে গেল! এখন কীরকম আমের মুকুলের গন্ধ ভরা ঠান্ডা হাওয়া বইছে! মনটা অদ্ভুত ভালো লাগছে...বাঃ! দূর দিগন্তে একটা কালো হাতি ক্রমশই বড় হতে-হতে আকাশ ছেয়ে ফেলছে, দেখতে-দেখতে আশ্রয়ের খোঁজে তাড়াতাড়ি পা চালান। কিন্তু বারবার দেখা, মনের মধ্যে প্রথম আষাঢ়ের সজল মেঘ ঢুকে যাওয়া এই অনুভূতি কি তিনি কারও কাছে কখনও বলেছেন? না। কবিতা পড়েছেন, শুনেছেন, ভেতরে-ভেতরে বুঁদ থেকেছেন এই পর্যন্ত। এরাও হয়তো অনুভব করে, কিন্তু বলে না। জীবনযাপনের ভেতর দিয়েই ওইসব আমেজ, খ্যাপামি প্রকাশ পায়। তিনি ডেটার অভাবে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারলেন না।

আস্তে-আস্তে বাড়ি ফিরলেন ধ্রুবজ্যোতি। মনটা ভালোও, আবার খারাপও। দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত বোধ তাঁর ভিতরে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে। ধাক্কাধাক্কি বা কোনও দ্বন্দ্ব নয়। দুটোই আছে এবং ক্রমশ কলের ধোঁয়ার সঙ্গে উনুনের ধোঁয়ার মতো মিশে যাচ্ছে। এখন যদি কেউ তাঁকে কথার কথা জিজ্ঞেস করে, তিনি সোজাসুজি ভালো আছি বা ভালো নেই বলতে পারবেন না। সত্যি কথা বলতে হলে তাঁকে বলতে হবে, ভালো-খারাপ আছি।

সাংসারিক দিক থেকে তিনি সেই শতকরা পাঁচজনের একজন, যার কোনও বিকট বা ঘ্যানঘেনে

সমস্যা নেই। সংযুক্তা মাটিতে পা রেখে চলা খুব সহজ মেয়ে। তিনি হয়তো তা ছিলেন না, কিন্তু নিজের প্রতি সুবিচার করলে তাঁকে বলতেই হয় যে, সংযুক্তার ইতিবাচক প্রভাবটা তাঁর খুব কাজে লেগেছে। কর্মসূত্রে প্রথম জীবনে কাছাকাছি থাকতে পারতেন না। কে জানে হয়তো সেই জন্যই তাঁদের মধ্যে প্রণয় জিনিসটা অনেক দিন জাগ্রত ছিল। এখন বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বও কি প্রেম নয়? তাঁর শয্যা-জীবন তিনি কোনও বাইরের লোকের সঙ্গে আলোচনা করেন না। যারা করে, তাদের পছন্দ করেন না। কিন্তু সেখানেও প্রণয় টিঁকে আছে। সন্তান যখন হচ্ছিল না, তাঁরা উদ্বিগ্ন হননি। দু'জনে দু'জায়গায় থাকেন বলেও তো সমস্যা। সেগুলো একা সামলাতে হবে সংযুক্তাকেই। কিন্তু তারপর একদিন এল যখন তাঁরা ডাক্তারের কাছে গেলেন, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তারের রায় হল, না হওয়ার কোনও কারণ নেই। যে কোনওদিন কতকগুলো নিয়ম ফলো করলেই হয়ে যাবে। কিন্তু হল না। তাতে মেয়েরাই আগে ভেঙে পড়ে। কিন্তু ওই যে, সংযুক্তা অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল মেয়ে। সে বলল, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কী আছে? আমরা কিছু অলরেডি জন্মানো শিশুর ভার নিতে পারি। তবে কী জানো, কাঁথা-কানি, আর সইবে না। ওই সময়ে তাঁরা নানা সূত্রে অসহায়, দরিদ্র মেয়েদের সন্ধান করে করে প্রথম শীলুকে আনেন। সে তখন বারো বছরের মেয়ে। বোঝবার বয়স হয়েছে, বয়ঃসন্ধি এল বলে। শীলুকে ওঁরা এনেছিলেন সরকারি হোম থেকে। বহু কদর্য অভিজ্ঞতা তখনই হয়ে গিয়েছে মেয়েটির। তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে প্রথমে অনেকদিন বিশ্বাসই করতে পারেনি যে, এঁরা কোনও বদ উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে আসেনি। কুঁকড়ে থাকত, এই বুঝি মার খেল। সংযুক্তা ওকে আস্তে আস্তে তৈরি করতে লাগলেন। ধ্রুবজ্যোতির সহযোগিতা থাকত, কিন্তু প্রধান সংযুক্তা। তাকে স্কুলে ভর্তি করা, পড়ানো, স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, এ সবের কৃতিত্ব সংযুক্তারই পাওনা। শীলু যেন বাড়ির আশ্রিত মেয়ে, কাজকর্ম লেখাপড়া সবই করে। কোনও বাড়াবাড়ি ওঁরা করেননি কখনও। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কম্পিউটার স্কুলে ট্রেনিং শেষ করে তার যখন চাকরি হল, তাঁদের তিনজনেরই একটা অদ্ভুত আনন্দ হয়েছিল। বাড়িতে সেদিন খাওয়া-দাওয়া হয়। শীলুর বন্ধুবান্ধব আসে। প্রথম কয়েক মাস এখান থেকেই সে যাতায়াত করত। তারপর একটু দূর পড়ে গেল ওর কর্মক্ষেত্র। কয়েকজনের সঙ্গে মেস করে থাকতে শুরু করল। এখন তো দুই বন্ধু মিলে একটা ফ্ল্যাটে থাকে। মাঝে মাঝে আসে। খুব সংযত, বুদ্ধিমতী এবং বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মেয়ে। শীলু থাকাকালীনই বিলু এবং মিলু এসে গিয়েছে। বিলু এসেছিল গ্রাম থেকে, একেবারে বাড়ির কাজের জন্যই। তাঁদের একটি পরিচিত পরিবার বলেছিল ওর কথা, অনাথ মেয়ে, কাকা-কাকির কাছে খুব কষ্টে আছে। কাজ পারে খুব ভালো, পড়াশোনাতেও মাথা আছে। বিলু যখন এল দেখলেন, বেশ শ্যামশ্রী মেয়েটি। চোখদুটো নিচু করে রাখে। কিন্তু তুললে টের পাওয়া যেত, তাতে ঝিলিক আছে। গোড়া থেকেই অঙ্কে খুব মাথা। গ্রামে ন'ক্লাস পর্যন্ত পড়ে এসেছিল। একটু ঘষে মেজে নিতে বেশ ভালো হয়ে গেল। ওর উপর ধ্রুবজ্যোতির খুব আশা হয়েছিল। কাজকর্ম করত একেবারে নিখুঁত করে, আর অত বুদ্ধি। মাধ্যমিকে অঙ্কে একশো পেল, সংস্কৃতে নব্বুই, ইংরেজি, বাংলায় ভালো না। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রত্যেকটাতেই ষাটের উপরে। চার বছর পড়িয়ে তবে পরীক্ষা দিইয়েছিলেন উচ্চমাধ্যমিক। সেটা দিয়ে ছুটিতে ও গ্রামে গিয়ে আর ফিরল না। সেটাতেও ওই একইরকম আশ্চর্য-করা রেজাল্ট। খুবই ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, ব্যথিত হয়েছিলেন সংযুক্তা। খুব ভালো পরীক্ষা দিয়ে যদি শোনা যায় খাতা হারিয়ে গিয়েছে, তা হলে যেরকম নিজের হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে করে, মাথায় বাড়ি মেরে মরে যেতে ইচ্ছে করে, তেমন। সংযুক্তা অন্তত তাই বলেছিলেন।

তাঁদের রাগ-ঝাল-কান্না সবই যখন মিইয়ে এসেছে, তখন একদিন স-স্বামীক বিলুসুন্দরী দেখা করে গেলেন। গ্রামের মাখাসন্দেশ হাঁড়িতে করে আর পুকুরের বড়-বড় কই। চেহারায় খুশি-খুশি ভাব, বেশ ছলছলে লাবণ্যময়ী। তার বরটিকে সত্যিই কেউ পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি বলবে না। পেটা সরল গড়ন, মাথায় কদমছাঁট চুল, শার্ট-প্যান্ট পরা। গ্রাম্য জবুথবু ভাব বা মস্তানি কোনওটাই নেই।

ছেলেটি মুদির দোকান বাড়িয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর করেছে। নিজের ঘর পাকা করেছে, দু'বিঘের বাগান, বড় পুকুর জমির মধ্যে। নিজের জেনারেটর পর্যন্ত আছে। ব্যাবসাঅন্ত প্রাণ। দেখা গেল, বিলুরও তাই। মাত্র এই ক'মাসেই সে কত সঞ্চয় করে সার্টিফিকেট কিনেছে নিজের নামে দেখাল। সংযুক্তাকে বলে গেল, এখুনি বাচ্চাকাচ্চার প্ল্যান নেই ওদের। সংযুক্তা তাকে ওপ্‌ন ইউনিভার্সিটির কোর্স নিতে বললেন। সে-ও নাকি তাই ভাবছিল।

ভালো করে খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায়ের সময়ে ধ্রুবজ্যোতি বললেন, "আমরা কিন্তু তোমার ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলেছি বেলা। কোনও দিন বিপদে পড়ে আমাদের শরণাপন্ন হলে, আর পেরে উঠব না। নিজের ব্যবস্থা কী করছ?"

তখনই বিলু বলে, "তিন মাস অন্তর একটা করে সার্টিফিকেট কিনে রাখছি বাবা, নিজের নামে।" বেচারাম বলল, "ওর নামে ব্যাঙ্কে আলাদা অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছি বাবু। ও তো আমার অ্যাকাউন্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট সব কিছুরই কাজ করে। মাস-মাইনে দিই। আপনাদের শিক্ষার গুণে এখন লক্ষ্মীমন্ত বউ পেয়েছি মা," লজ্জায় মুখ নিচু করল ছেলেটি। সে-ও নাকি মাধ্যমিক পাশ।

চলে গেলে নিভৃতে নিজেদের মধ্যে তাঁরা বলাবলি করেছিলেন, সবদিক দিয়ে তো ভালোই হল, মেয়েটা সুখী হয়েছে। বুদ্ধি বার করেছে মগজ থেকে। সে-ও বাঁচল। তাঁরাও বাঁচলেন। একটা উঠতি বয়সের মেয়ের দায়িত্ব যতই হোক, মাথার থেকে নামল। ভিন্ন সংস্কৃতির কোনও ব্যক্তিকে কি শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নেওয়া যায়!

ওঠবার স্টেপে জুতোর তলা ঘষে ভেতরে ঢুকলেন ধ্রুবজ্যোতি। সংযুক্তার কোনও মিটিং-টিটিং আছে। এখনও বাড়ি ফেরেনি। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঢুকলেন, একতলা শুনশান। এ মেয়েটা গেল কোথায়? রান্নাঘরে, ওর নিজের ঘরে সর্বত্র খুঁজলেন। তারপর দোতলায় উঠলেন। বাইরে থেকে চাবি দেওয়া। সে তো বেরিয়ে গিয়েছে এমন হতে পারে না! তাঁর হঠাৎ কেমন ভয় হল। কোনও দুর্ঘটনা ঘটল না তো, মেয়েটা চাপা? কিছু ঘটাল না তো? তিনি পা টিপে-টিপে তেতলায় উঠলেন। ছাতে একটা চিলেকোঠা আছে শুধু, বাকিটা ছাত। খোলা। দাঁড়ালেন, এদিক ওদিক চেয়ে চোখে পড়ল একটা মনুষ্য আকৃতি পাঁচিলের কাছে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বটে, আর একটু এগিয়ে দেখলেন মিলু হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে তারার আলো পড়েছে। মুখটা জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে। আর একটু কাছে এগিয়ে শুনলেন মৃদুস্বরে গান গাইছে মিলু, '...সূর্য তারা দলে দলে কোথায় বসে বাজাও বেণু, চরাও মহাগগনতলে,...এই যে তোমার আলোকধেনু।'

তিনি পা টিপে-টিপে ফিরে আসছিলেন, মিলু টের পেয়ে গেল। একটু ছুটে এসে বলল, "বাবা, তুমি ফিরেছ? চলো চা করে দিই।"

"না, না তোকে চা করতে হবে না। ও আমি একটু করে নিতে পারব।"

"রাগ করছ কেন? আজ ছাতে কাপড় তুলতে এসে এমন হয়ে গেল।"

"রাগ করিনি। তুই গান গাইছিলি, ডিসটার্ব করতে চাই না।"

মিলু তরতর করে তাঁর আগে-আগে দু'চার সিঁড়ি টপকে-টপকে নীচে নেমে গেল। তিনি একটু চেঁচিয়ে বললেন, "সাবুর পাঁপড় আনবি। তোরও আনবি, বারান্দায় বসলাম।"

টেবিলে তাঁরা একসঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করেন। সকালের দিকে প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা। কিন্তু রাত্রে মোটের উপর একসঙ্গেই। ওদের বেশ কিছুদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, কিছুটা সহবত শেখাবার পরই ওঁরা এটা করেছিলেন। কিন্তু ওরা সংকুচিত হয়ে থাকত অনেকদিন। বিলু তো বটেই, মিলুও অনেকদিন পর্যন্ত পরে খাব, পরে খাব করে একসঙ্গে বসাটা এড়াতে চাইত। তাঁরা কোনও জোর করেননি। শীলু যখন চাকরি পেয়ে এল, আসতে থাকল, খাবার টেবিলে ওঁদের সঙ্গে অনেক কথা হত ওর। অফিস নিয়ে, কলিগ নিয়ে, কাজ নিয়ে। খুব সহজ হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা। তবু ওঁদের দু'জনকে একসঙ্গে খাওয়ার সুযোগ দিয়ে বিলু-মিলু এই আসছি-এই আসছি করে কাটিয়ে দিত।

বারান্দার চায়ের আসর একেবারে যুগলের। মিলু চা পাঁপড়ভাজা নিয়ে এসে বসল। বলল, "আমি কিন্তু টোস্ট খেয়েছি, পেয়ারা খেয়েছি। আর কিছু খেতে পারব না, তুমি খাও।"

"চা, চা-ও খাবি না?"

"চা তো আমি খাই না বাবা।"

"ঠিক আছে, না-ই খেলি। বোস।" কুড়মুড়-কুড়মুড় শব্দ হয় পাঁপড় খাওয়ার। চায়ে চুমুক দিয়ে ধ্রুব বলেন, "সন্ধেটা বেশ, না?"

মিলু বলল, "অপরূপ। কেমন হাওয়া সাঁতার দিচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, অন্ধকারটা আর অন্ধকার থাকছে না।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছিল। তোর গাঁয়ের সন্ধে রাতের কথা মনে আছে?"

মিলু থেমে-থেমে বলল, "আজ খুব মনে পড়ছিল। ওখানে যেমন বেশি মশা তেমনি বেশি তারাও। আকাশটা এরকম ভ্যাসকা নয়, একটু কালচে নীল রঙের বিরাট, জীবন্ত আকাশ। খাটুনি, মার, খেতে না পাওয়া সব না বাবা সয়ে যেত, ওই আকাশটা দেখতে পেতুম বলে।" অনেকখানি বলে ফেলে যেন লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল মিলু।

মিলুর ইতিহাস খুব ভয়ংকর। সে কথা আজকাল অসাবধানেও উল্লেখ করেন না তাঁরা। মাতৃহীন মেয়েটিকে দশ এগারো বছর বয়সে বাংলাদেশের বরিশালের কোনও গাঁ থেকে পাচার করা হয় পশ্চিমবঙ্গে। সম্ভবত তার সৎমা ও বাবাই বেচে তাকে। ইন্ডিয়ায় কাজ পাবে, এ-কথা বলায় সে বাড়ির অত্যাচার থেকে বাঁচবে মনে করে চলে আসে। হাসনাবাদে এক ব্রথেলে প্রথম রাখা হয় তাকে, পরে হয়তো মুম্বই কি দুবাই পাঠানো হত, কিন্তু সেখানেই ধর্ষিত হতে-হতে একজনের দু'চোখে আঙুল ঢুকিয়ে সে পালায়। দুদ্দাড় পালায়। তখন রাত, রাস্তাঘাট শুনশান। বহুদূর ছুটে একটা ট্রাক থামায়। ট্রাক ড্রাইভার তাকে থানায় নিয়ে যাবার আশা দিয়ে মদ খাওয়াতে চেষ্টা করে, অত্যাচার চালায়। ভোরের দিকে লোকটা যখন নেশার ঘোরে ঘুমোচ্ছে, তখনই সে পালায়। এবার কাউকে বিশ্বাস করে না, কাছাকাছি থানায় গিয়ে সব ঘটনা বলে। দারোগাবাবু তাকে নিজের বাড়িতে স্থান দেন। সেখানে অজস্র খাটুনি এবং প্রহার জোটে। সেখানে থেকে পালিয়ে সে কীভাবে সংযুক্তাদের এনজিওর এক ভদ্রমহিলার কাছে পৌঁছোয়, সে এক ইতিহাস। ও নিজেই সংযুক্তার কাছে থাকতে চায়।

তিনি বললেন, "যে-গানটা গাইছিলি, গা না।"

"ভালো করে জানি না, শুনে-শুনে তোলা বাবা।"

"তা হোক।"

অন্ধকার এখন গাঢ় সবুজ শাড়ি পরা মিলুকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। সেই অনামা অন্ধকার থেকে সে গেয়ে উঠল, 'চরাও মহাগগনতলে...এই যে তোমার আলোকধেনু/সূর্য তারা দলে দলে—কোথায় বসে বাজাও বেণু...'

ধ্রুবজ্যোতি আস্তে ধরিয়ে দিলেন, 'তৃণের সারি তুলছে মাথা, তরুর শাখে শ্যামল পাতা—আলোয়-চরা ধেনু এরা ভিড় করেছে ফুলে ফলে'

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এইটুকুই বারবার গাইল মিলু। তারপরে দু'জনেই চুপ করে বসে রইল। ধ্রুব আসলে মিলুর গানে খুব বিচলিত বোধ করছিলেন। খুব সুরেলা গলা, ভাবগভীর।

"বাবা, ভগবান আছেন, না?" মিলু ক্ষীণ স্বরে প্রশ্ন করল।

এ মেয়েটি জীবনকে কাঁচাখেকো হিসেবে দেখেছে, একে তিনি কী উত্তর দেবেন?

বেশ কিছুক্ষণ পরে বললেন, "ইটস নট রাইট টু টেক গড ফর গ্রান্টেড।"

"মানে?"

"ভগবান আছেনই তিনি আমার উদ্ধার করবেন, এরকম ভাবনা ঠিক নয়। তুই তো নিজেকেই নিজে উদ্ধার করতে পেরেছিলি।"

"তোমাদের কে মিলিয়ে দিল?"

"মিলু, তোর মাকে কিন্তু তুই-ই খুঁজে নিয়েছিলি। প্রথম কয়েকবার ঠকতে-ঠকতে তোর চোখ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তুই যে মাকে খুঁজে নিলি, অ্যাপিল করলি, এতে আমি কোনও ভগবান খুঁজে পাচ্ছি না।"

"তুমি কি ভগবানে বিশ্বাস কর না?"

"ক্রিয়েশনে বিশ্বাস করলে ক্রিয়েটরকে বিশ্বাস করতেই হয়। সেটা কথা না। কথা হচ্ছে, আমরা আমাদের আগে-পিছে কিছুই জানি না। এর মধ্যে নিজের বুদ্ধি, বোধ এগুলোতে শান দিতে হয়। নিজের লক্ষ্য স্থির করতে হয়। লেগে থাকতে হয়, আবার সুখী হবার ক্ষমতাও আয়ত্তে আনতে হয়। আমাদের লক্ষ্য উন্নততর মানুষ হওয়া, ভগবান অনেক দূরের ব্যাপার।"

"আমার কিন্তু সত্যি মনে হয়, কেউ এইসব তারা-সূর্য-চাঁদ সবাইকে চরাচ্ছে। শুধু মানুষের বেলাই আর পেরে উঠছে না, বা করছে না। কিন্তু খুব ডাকলে সাড়া পাওয়া যায়। গাঁয়ে যখন থাকতুম নিজেকে নিয়ে কিচ্ছু ভাবতুম না, দিনের পর দিন জীবন কেটে যেত। তারপর যখন বিপদে পড়লুম সত্যি বলছি বাবা, 'ত্রাহি মধুসূদন' ছাড়া আর কিছু ভাবিনি। এখনও আমি প্রতিদিন সর্বক্ষণ..."

"ভালো করিস, প্রেয়ার খুব ভালো জিনিস।"

মিলু উঠে গেল। আলো জ্বেলে দিল ঘরের, দালানের সিঁড়ির। ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিতেই দেখল, সংযুক্তা শুয়ে রয়েছেন।

"ও মা! তুমি কখন এসেছ?"

"মিনিট দশেক।"

"ডাকোনি কেন?"

"বেশ তো কথা বলছিলি, শুধু-শুধু ডিসটার্ব করব কেন?"

কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে ধ্রুবজ্যোতি ভেতরে এলেন, "ওহে, তুমি ফিরেছ!"

মিলু বলল, "মা, চা খাবে?"

"না, অনেক চা কফি খাওয়া হয়েছে আজকে, ম্যারাথন মিটিং চলছে তো চলছেই। রাত্রের রান্নাটা করে নিতে পারবি?"

"কেন পারব না?" মিলু চলে গেল।

ধ্রুবজ্যোতি হেসে বললেন, "তুমি কি ঘাপটি মেরে আমাদের কথা শুনছিলে?"

"শুনছিলুম," সংযুক্তা ক্লান্ত গলায় স্বীকার করলেন।

"কী বুঝলে?"

"ভালো লাগছিল। মেয়েটা এত কথা ভাবছে। তবে ধ্রুব সত্যিই বলছি সমস্ত বাড়ি অন্ধকার, বারান্দায় অন্ধকারে তোমরা দু'জনে, আমার মনটা ছ্যাঁত করে উঠছিল। হঠাৎ যেন সেই ঔরঙ্গাবাদ ফোর্টের অন্ধকার কুয়োয় পড়ে গিয়েছি।"

"কত দিন এরকম পরীক্ষা দিতে হয় মানুষকে?" একটু থেমে ধ্রুব বললেন।

"আজ বুঝলাম, আমরণ," সংযুক্তা বললেন। "শুধু তোমাকে নয়, আমাকেও মিলুকেও। সব মানুষকেই পরীক্ষা দিয়ে যেতে হয়। এটাতে এতদিনেও আমি তোমাকে বুঝলাম না, এ জাতীয় অভিমান কোরো না। কেননা, অনুরূপ সিচুয়েশনে তোমারও এমন হত।"

একটু পরে সংযুক্তা বললেন, "আমি চান-টান করে আসি। এতক্ষণ গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে পা ধোওয়া পর্যন্ত হয়নি।" তিনি চলে গেলেন।

ধ্রুবজ্যোতির মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। আসলে তিনি গোড়া থেকেই স্ত্রীজাতির শ্রেণি বিভাগটা

অনুভব করেন। ওইভাবেই তৈরি হয়েছেন, সংস্কারটা ওই রকমই। ব্যক্তি হিসেবে নিজের মধ্যেও এই রকমই তিনি। দিদিমা-ঠাকুমা, মা-কাকিমা, মাসি-পিসি, স্ত্রী-বান্ধবী, কন্যা-পৌত্রী। আজকাল চতুর্দিকে যা দেখা যায়, নাতনির বয়সি একটা মেয়ের সঙ্গে আদ্দামড়া বুড়ো প্রেম করছে। লিঙ্গ 'স্ত্রী' হলেই তার সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হচ্ছে মানুষ। এগুলো তাঁর মধ্যে বিবমিষার উদ্রেক করে। একটি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে তিনি পঁয়ষট্টি কোনও কাম সম্পর্কে হঠাৎ জড়িয়ে পড়লেন অন্ধকার আর নির্জনতার সুযোগ নিয়ে, এ জিনিস তাঁর কল্পনার বাইরে। তাঁর যদি মেয়ে থাকত, নাতনি থাকত, তা হলে তাঁর সামাজিক অবস্থানটা হয়তো আরও স্পষ্ট হত। তিনি একটি দাদু শ্রেণির মানুষ হতেন। যেহেতু তা হননি, শরীরটাকে রেখেছেন সুস্থ, সবল সুঠাম তাই হয়তো তাঁকে স্পষ্ট করে চেনা যায় না। কিন্তু মনের দিক থেকে মানুষের যে বছরে-বছরে পরিণততর হওয়ার কথা, সেটা তিনি হয়েছেন। কিন্তু তিনি সংযুক্তার উপর রাগ-অভিমান করতে পারলেন না। শুধু বুঝলেন, সহজ মানুষ হওয়া সহজ নয়, একেবারেই সহজ নয়। সংযুক্তা তো একেবারেই খোলাখুলি স্বীকার করে গেল, পরিস্থিতিটা সন্দেহজনক। সে গোয়েন্দাগিরি করেছিল, করে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

॥ ১৫ ॥

আরিয়ান, রূপরাজ আর উজ্জ্বল শরৎ বসু রোডের বারিস্তায় বসেছিল আড্ডায়। রূপরাজ তার বন্ধুদের সঙ্গে উজ্জ্বলের পরিচয় করাচ্ছে, ইতিমধ্যেই এই তিনজনের খুব জমে গিয়েছে।

রূপ বলল, "আমি জার্নালিজমটাই টার্গেট করেছিলুম। এখন যত খবর নিচ্ছি, মনে হচ্ছে বড্ড টাফ।"

"তুই কি মনে করেছিলি, তোকে কার্পেট বিছিয়ে ডেকে নেবে সব জায়গায়?"

আরিয়ান জবাবে বলল, "দেয়ার ইজ নো সফ্‌ট্ জব, ইয়ার। যাই করো, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আই. টি., পলিটিক্স, এমনকী টিচিং পর্যন্ত, বীভৎস রকমের টাফ হয়ে গিয়েছে।"

"আমি কিন্তু সেই টাফনেসের কথা বলছি না। বলছি, জার্নালিজমে ল্যাং মারামারির কথা। তারপর ধরো, এক একটা কাগজের এক-একরকম পলিসি। সেই মতো তোকে লিখতে হবে। আমারও তো একটা মতামত থাকতে পারে, সেটাকে চেপে অন্যের বলে দেওয়া কথা আমি কী করে লিখব? কোনও-ই নাকি স্বাধীনতা নেই!" সে হতাশভাবে বলল।

উজ্জ্বল বলল, "তা হলে জার্নালিজমে যাওয়াটা বুদ্ধির কাজ হবে না। 'মাসকম'-এ বহু লাইন খোলা পাবি।"

"জার্নালিজমে মনটা পড়েছিল রে। যা চাই, তা কেন যে কিছুতেই পাই না।"

"আর কী কী চাইছ গুরু? আরিয়ানের মুখে হাসি। যা চাও, স্ট্রংলি চাও ইয়ার। এ ভাবে হয় না। আমাকে দেখে শেখো।"

"তোকে দেখে কী শিখব, তুই নিজেই তো ডাক্তার হতে চাসনি। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে হচ্ছে না? নিজের জেদ বজায় রাখতে পেরেছিস? জেদটাও বড় কথা নয়, ডাক্তারি ইজ ফাইন। ভগবান সেজে মাল কামানো, এমন ডিভাইন শয়তানি আর হয় না। সে-কথা বলছি না, কিন্তু হতে চাস তো নটুয়া! আর কী হল?" রূপ বলল।

"হোয়াট ইজ নটুয়া?"

উজ্জ্বল বলল, "রাইমস উইথ বটুয়া, বুঝলে না?"

"মডেল, ক্রিকেটার, ফিল্মস্টার এইসব যে এঁচে রেখেছিলি?" রূপরাজ বলল।

আরিয়ান একটা চোখ ছোট করে বলল, "কে বলল এগোচ্ছি না? এমনও হতে পারে, ডক্টর-অ্যাক্টর হয়ে গেলাম। ফার্স্ট ইন দা ফিল্ম ওয়ার্ল্ড। কোথাও না কোথাও ফার্স্ট হচ্ছিই।"

'উজ্জ্বলের সঙ্গে পারবি?" রূপ বলল।

উজ্জ্বলকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আরিয়ান বলল, "হেভি সেক্সি গুরু, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই আমার লাইনে আসবে না?"

উজ্জ্বল কফিতে চুমুক দিয়ে সংক্ষেপে বলল, "না। আচ্ছা শুকতারা, বাবাই, দিয়া ওরা আসছে না কেন এখনও?"

"যা বলেছ, এফএম না থাকলে আড্ডা জমে?" আরিয়ান বলল।

"জমে না এমন কথা বলছি না," উজ্জ্বল বলল। "কিন্তু ওদের আসবার কথা ছিল।"

আরিয়ান বলল, "দেখো গুরু, তোমাদের কাছে হয়তো এফএম জাস্ট একটা অ্যাডিশন্যাল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম..."

"কিন্তু আমি তো মেডিক্যাল পড়ি না," উজ্জ্বল প্রতিবাদ করে উঠল, "পড়ো তুমি। তোমার কাছে তা হতে পারে। আমার যন্ত্রপাতি নিয়ে কারবার। আমি মেয়েদের মেয়ে হিসেবেই দেখি।"

"ইউ আর রাইট," আরিয়ান স্বীকার করে নিল। "মেয়েদের মেয়ে হিসেবে দেখাই ভালো। ছেলে হিসেবে দেখা ভালো নয়।"

সকলেই একটু হেসে উঠল।

এই সময়ে হাই হিল খটখটিয়ে খোলা চুল মেলে ঢুকল শুকতারা।

"আয়, আয়, এক্ষুনি তোর কথাই হচ্ছিল।"

শুকতারা অন্য একটা টেবিলের কাছ থেকে হিড়হিড় করে একটা চেয়ার টেনে বসে গেল।

"এই তো হিড়িম্বা এসে গিয়েছে," আরিয়ান বলল। "শূর্পনখা, তাড়কা এরা কত দূর?"

উজ্জ্বল আশ্চর্য হয়ে বলল, "তুমি রামায়ণ-মহাভারতের ক্যারেকটার্স জানো?"

"কবে কমিকস্-এ পড়েছি," আরিয়ানের গলায় বেশ গর্ব।

"তাই বলো! তা এরা যদি হিড়িম্বা, শূর্পনখা, তাড়কা হয় তা হলে তোমাকেও অলম্বুষ, ঘটোৎকচ, খরদূষণ জাতীয় কিছু হতে হয়।"

শুকতারা বলল, "যেতে দে, যেতে দে। হিড়িম্বা-ফিড়িম্বা বললে আমার কিছুই এসে যায় না। উজ্জ্বল আজকাল ভালো টেনিস খেলছে বুঝলি আরিয়ান। মিক্সড ডাবল্স হল গত শনিবার। একদিকে উজ্জ্বল-দিয়া, অন্যদিকে আমি-বাবাই।"

"তা হলে মিক্সড ডাবল্স হল কোথায়?" আরিয়ান বলল।

"আমি ধর আমাদের গ্রুপে মেল, আর কাউকে না পেলে কী করব?"

"জিতল কে?"

"উজ্জ্বলরা। আসলে ক্রমাগত র‍্যালি হয়ে যাচ্ছিল। আমরা দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। উজ্জ্বলরা সেই সুযোগটা নিল। ওই তো দিয়ারা আসছে।"

আরিয়ান গিয়ে আরও তিনটে কফির অর্ডার দিয়ে এল। আরও কিছু স্ন্যাক্স। দিয়া একটা লক্ষ্ণৌ চিকনের পাঞ্জাবি পরেছে প্যান্টের ওপর। ওকে খুব রোগা এবং ক্ষুরধার দেখাচ্ছিল। বাবাই স্কার্ট, ওকে একেবারেই স্কুল-বালিকা মনে হচ্ছিল। একমাত্র শুকতারাই তার বড় বড় চোখ, লম্বা নাক, মোটা ঠোঁট, অনেক চুল, বিরাট দৈর্ঘ্য আর লো-ওয়েস্ট জিন্স-টপের প্রচণ্ড মড আর গ্ল্যামারাস হয়ে বিরাজ করছিল।

"রিনা এল না?" দিয়া রূপকে জিজ্ঞেস করল।

"রিনা এখন কী সব প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত," রূপের জবাবের মধ্যে একটা সাবধান হেলাফেলার ভাব।

উজ্জ্বল বলল, "আমি শুশুনিয়ায় গিয়েছি মাউন্টেনিয়ারিং-এর ট্রেনিং-এ। অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চলটাও আমার খুব চেনা। স্কাউটের ক্যাম্পেই গিয়েছি দু'বার। একটু ওয়াইল্ড অথচ বিউটিফুল

ল্যান্ডস্কেপের জন্য অযোধ্যা পাহাড়, পুরো ঝাড়খন্ডই একেবারে ঠিক। শুশুনিয়া অঞ্চলটা ড্রাই। তোমরা ন্যাচারালি তোমাদের সাজেস্‌শন বলবে।"

দিয়া বলল, "আমি সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, হংকং গিয়েছি। এখানে কিছু কিছু সি-সাইড আর হিলস্টেশন। নির্জন জায়গা হিসেবে ডালহৌসি বা ল্যান্সডাউন ভালো। তবে ওসব তো যাতায়াতেই অনেকটা সময় যাবে, কী রে আরিয়ান?"

আরিয়ান বলল, "এই রূপ-টুপ আমাকে খুব স্নব-টব ভাববে, কিন্তু ফ্যাক্ট হল আমি অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, লন্ডন গিয়েছি একাধিবার। বাট আই নো নাথিং অ্যাবাউট ইন্ডিয়া। যাইনি, দেখিনি, সুযোগ হয়নি। তোরা যেখানে ঠিক করবি যাব। আই অ্যাম রেডি। বাবাই কিছু বলো, হিড়িম্বা, তোরই বা কী মত?"

বাবাই বলল, "আমার কোনও আইডিয়াই নেই, দার্জিলিং আর পুরী ছাড়া আমি কোথাও যাইনি।"

রূপ বলল, "যা বলেছিস, টিপিক্যাল মিড্‌ল ক্লাস হলিডেজ। আমি অবশ্য স্কাউটের সুযোগেই একটু এধার-ওধার গিয়েছি, তবে সে বলবার মতো কিছু নয়।"

"তোরা যা হয় ফিক্স কর, আমার কোনওটাতেই আপত্তি হবে না। খালি অ্যাডভেঞ্চারটা হওয়া চাই। রুকস্যাক, স্পোর্টস শু, নাইক, নাইলন স্ট্রিংস, অ্যান্ড অ' অ্যাম গেম," শুকতারা হাত ছড়িয়ে বলল।

"তা হলে উজ্জ্বল অ্যারেঞ্জ কর," আরিয়ান বলে উঠল। "উই আর আ পার্ফেক্ট সিক্সসাম।"

আরও কিছু গল্পসল্প, হইচই হল। দিয়া আর বাবাই কথা বলছে খুব কম।

আধ ঘণ্টা পর বাকিরা উঠে পড়ল। উজ্জ্বল আর রূপরাজ বসল আরও কিছুক্ষণ। যদিও ওদেরই যেতে হবে সবচেয়ে দূর।

রূপ তার সেলফোনটা বার করে একটা নম্বর লাগাল। লাউডস্পিকারটা অন করে দিল।

"হ্যালো, রূপ।"

"এলি না কেন?"

"অড নাম্বার ভালো না।"

"আর কিছু নতুন পেলি?"

"চেষ্টা চালাচ্ছি। একজনের সঙ্গে খুব জমিয়ে নিয়েছি।"

"কে?"

"গেস"

"রণবীর?"

"ও তো হাতের পাঁচ। দি আদার ওয়ান, ভীষণ শেয়ানা।"

"ও কে দেখা হবে।"

ফোনটা বন্ধ করে রূপ বলল, "শুনলি?"

উজ্জ্বলের মুখটা এখন গভীর ভাবনায় আচ্ছন্ন। সে বলল, "শুনলাম, দেখা যাক।"

মিলু উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। কমলা পাড় সাদা শাড়ি আর কমলা ব্লাউজ। মা-বাবাকে প্রণাম করল। সংযুক্তা কপালে দইয়ের ফোঁটা দিলেন। পরীক্ষার সময়ে গভীর মনোযোগ, বিশ্রাম, নিয়মানুবর্তিতা, ভালো খাবার। আবার সব মিলিয়ে চেহারার মধ্যে একটা ভীষণ 'পবিত্র শ্রী' আসে। মিলুকে মনে হচ্ছিল, অপাপবিদ্ধ, শান্তবুদ্ধি, সরস্বতীর মেয়ে। সংযুক্তা সস্নেহে বললেন, "পেপার দেখে একেবারে ঘাবড়াবি না। খুব মন দিয়ে লিখিস। রিসেসে তোর বাবা যাবে'খন।"

ধ্রুবজ্যোতি বললেন, "ক'টা কলম নিয়েছিস?"

"তিনটে," স্মিত মুখে মিলু বলল।

বাড়ি থেকে সামান্য দূরত্বের মধ্যেই স্কুল। তবু ছাতা নিয়ে ধ্রুব ওকে পৌঁছোতে গেলেন। সিট খুঁজে বসিয়ে দিয়ে, জলের বোতলটি পাশে রেখে, মাথায় একবার হাত রাখলেন। মিলু আবার প্রণাম করছে।

"ইতিহাস মানেই যে একগঙ্গা লিখতে হবে তা কিন্তু নয়।" শেষ উপদেশটা দিলেন।

তারপর চারদিকের কিচমিচ-কিচমিচের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এলেন। ফিরছেন, পাড়ারই এক ভদ্রলোক তাঁর ছোট মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে, তাঁরই সঙ্গে বেরোলেন।

"কেমন তৈরি হল আপনার ক্যানডিডেট?" ভদ্রলোক বিরস সুরে জিজ্ঞেস করলেন।

"ভালোই তো মনে হয়, আপনার মেয়ে তো নিশ্চয়ই খুব ভালো।"

"ভগবান জানেন, ধ্রুববাবু। পড়াশোনায় তো মন নেই, সদা-সর্বদা উড়ছে। আর আবদার, বাবা এই দাও, ওই দাও। তার মা-ও তাকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন, আহা বলছে দাও-ই না। ক্ষণে-ক্ষণে সেলফোনের মডেল পালটাচ্ছে। ওর বন্ধুরা যা ভালো বলবে, যা কিনবে, ওরও তাই চাই। আপনারা আছেন ভালো। ঝিয়ের মেয়ের জন্য যা করেছেন, তুলনা হয় না। বরাবর কৃতজ্ঞ থাকবে।"

"ও কিন্তু গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, কাজের লোক-টোক বলে আমরা দেখি না।"

"ও ই হল। কয়লাকে অঙ্গার বললেও সে কয়লাই থাকে।"

ধ্রুবর ভেতরটা চিড়বিড় করতে লাগল। তিনি বললেন, "আপনার বড় ছেলেটি কী করছে?"

"কী আবার করবে? ভ্যারেন্ডা ভাজছে। একটা চাকরিও রাখতে পারে না। ধরছে আর ছাড়ছে। ধরে যখন লাটসাহেবি করে, ছাড়বে তো ভিখিরি। আরে সঞ্চয় কর, আমার সঞ্চয় ছাড়া দাঁড়াতে পারতিস?"

'ধৈর্য ধরুন বিজয়দা। আজকাল চাকরির বাজার অন্য ধরনের হয়ে গিয়েছে। ট্রেনড্ লোকের কাজ পেতে অসুবিধে হয় না। তার উপর আজকাল এই লোন-ইকনমির মধ্যে ছেলেরা মাথার ঠিক রাখতে পারে না। সঞ্চয় এখন বুঝবে না। তবে আমার বড় মেয়েটি কল-সেন্টারে কাজ করতে-করতে কীভাবে যে ফারদার ট্রেনিং নিল, খুব ভালো চাকরি পেয়েছে টিসিএস-এ। মেজটি বিয়ে করেছে। কিন্তু ব্যাবসাদার স্বামী, তাকে কাজে সাহায্য করে। রীতিমতো মাইনে পায়। তার সঞ্চয়ে খুব মন, ফিনান্সে খুব মাথা।"

"আপনার মেয়ে, মানে ওই ঝিয়ের মেয়ে?" বিজয় সুর থতিয়ে গেলেন।

"অমন কথা মুখেও আনবেন না সুর-দা। পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট। শীলু টিসিএস-এ প্রোগ্রামার, বিলু বিজনেসওম্যান, আন্ত্রপ্রেনিয়র যাকে বলে।"

"আপওয়ার্ডলি মোবাইল লোয়ার ক্লাস," আলগা-আলগা করে কেমন ভ্যাবলার মতো উচ্চারণ করলেন বিজয় সুর। "কী করে সম্ভব করলেন?" পরে বললেন, আমার মেজটি ভালোই করছে। কিন্তু কী বলবো আপনাকে সার, সাঙ্ঘাতিক সেলফিশ। তৃণাকে বরং এই মাধ্যমিকটার পর আপনার কাছে পড়তে পাঠিয়ে দেব।"

ধ্রুবজ্যোতি বললেন, "এটা কিন্তু জাস্ট পড়ানোর ব্যাপার নয় সুর-দা। আপনি ভুল করছেন, জীবনযাপনের ব্যাপার। উই লিভ অ্যান আউটওয়ার্ডলি আনইনটারেস্টিং লাইফ। প্রাইম টাইমে টিভি দেখা নেই, সমস্ত হিন্দি ছবি দেখতেই হবে এইরকম পিআর-প্রেশার ওরা অনুভব করেনি কোনওদিন। খুব যে একটা বন্ধু-বান্ধবের বিরাট দল ছিল, তা তো নয়ই। আমাদের লাইফে একটা অলিখিত ডিসিপ্লিন আছে। আর একটা ইনওয়ার্ডলি ইনটারেস্টিং ব্যাপাব আছে।"

"সেটা কী?"

"সেটা আমি ঠিক কাউকে বোঝাতে পারব না। ধরুন, মানুষের তো একটা ইনারওয়র্ল্ড আছে। মানে ভাবজগৎ। ধরুন, আমি কী, আমি কেমন, আশপাশে কী হচ্ছে, ভেতরে সেগুলো কী আলোড়ন তুলছে, বই পড়া হচ্ছে, বইগুলো ভিন্ন সমাজে, ভিন্ন মনোভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। এইগুলোতে

ভালো লাগা, ইনটারেস্ট তৈরি হয়ে গেলে বাইরের নেশাগুলোর তুচ্ছতা বোঝা যায়।"

"ব্যস, এ তো ফিলজফি সার। এসব আমাদের ছেলেগুলোর কাছে বললে তো হেসে দেবে। ওরা ডিপেন্ডেন্ট, মানে ঝিয়ের..." কথা শেষ করলেন না বিজয় সুর।

"ওই ডিসঅ্যাডভান্টেজটাই ওদের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজ হয়ে দাঁড়িয়েছে ফর্চুনেটলি।"

"তবে কি আপনি বলতে চাইছেন আমরা সবাই মানে, ঝিয়েদের ছেলেপুলেদেরই প্রতিপালন করলে ভালো রেজাল্ট পাব?"

ধ্রুবজ্যোতি হেসে ফেললেন। বললেন, "দূর মশাই, ছাড়ুন তো। কী তখন থেকে ঝিয়ের-ঝিয়ের করে যাচ্ছেন। আপনার ছোট মেয়ে, মানে, ওই তৃণা তো? চমৎকার মেয়ে। কোনও ছেলেমেয়েই আপনার খারাপ নয়। মিথ্যে চিন্তা করছেন।"

কথা বলতে-বলতে তাঁর বাড়ি এসে গিয়েছে। ধ্রুব ঢুকে গেলেন। আপন মনেই হেসে যাচ্ছেন। সংযুক্তার সেকেন্ড হাফ-এ ডিউটি। তিনি চান সেরে হাওয়ায় বসে চুল শুকোচ্ছেন।

"কথাটা ভদ্রলোক খারাপ বলেননি কিন্তু," ধ্রুবজ্যোতি বলে উঠলেন।

"কী কথা? কোন ভদ্রলোক?"

"পালিত ছেলেমেয়ের ওপর কন্ট্রোলটা নিজের ছেলেমেয়ের থেকে বেশি থাকে। তবে পালিতকে জানতে দিতে হবে সে পালিত, কিন্তু নিজের ছেলেমেয়ের মতোই আমরা দেখি তাদের। বাধ্যতা বেশি পাওয়া যায়। অন্যরা জানে যে, এ পালিত। একজনের দয়ায় রয়েছে, কাজেই বেশি বিরক্ত করে না। 'ওমা ওই সিনেমাটা দেখিসনি? এমা, এই গানটা কে গেয়েছে জানিস না?' এইসব বলবে না এদের। আমরা দেখো, ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক আর অ্যানিম্‌ল প্ল্যানেটের উপর রেখেছি ওদের। আর কিছু বাছা বাছা প্রোগ্রাম। রেডিয়ো ছাড়া ওদের হাতের কাছে কিছু নেই। হাতখরচ নিতান্তই সামান্য। পোশাক-পরিচ্ছদ ওদের পছন্দের সঙ্গে আমাদের পছন্দে যা মেলে তাই।"

এতক্ষণে সংযুক্তা ধরতে পারলেন বিষয়টা। যদিও কেন উঠল, কোথা থেকে উঠল, বুঝতে পারলেন না। সংক্ষেপে বললেন, "মেয়ে নয়, কিন্তু মেয়ের মতো," সেই ক্ল্যাসিক উক্তি।

এই মেয়েগুলির প্রত্যেকে অসহনীয় দুর্ভাগ্যের ইতিহাস নিয়ে এই বাড়িতে এসেছে। ওরা জানে বাইরের পৃথিবী কী নিষ্ঠুর, অশ্লীল, ভয়ানক। প্রতি তুলনায় এই বাড়ি কত মমতাময়, নির্ভয়, শালীন। ওইরকম অতীত যদি না হত, সাধারণ দরিদ্র ঘরের মেয়ে হত, তা হলে? তা হলে কি ওরা তাঁদের এই সংযম-শাসন মেনে নিত? যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হত, তা হলেই বা কী হতে পারত?

মিলি মজুমদার আসলে ছিল জাহিরা শেখ। তার ডাক নাম মিলুটাকেই বরাবর রেখে দিয়েছেন তারা। স্কুলে ভর্তির সময়ে তারা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোর কী নাম দেব?"

ও-ই বলে, "মিলি মজুমদার।"

"কিন্তু তুই যে মুসলিম, তার কোনও চিহ্ন রাখবি না?"

"আমার বাবা তো আমাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। তার পদবি, তার নাম আমি নেব কেন? তোমরা যদি ওয়েস্টার্ন ট্রেডিং থেকে একটা ফ্রিজ কেনো, ফ্রিজটা তো তোমাদের হয়ে যায়। আর তো দোকানের থাকে না, কারখানারও থাকে না।"

খুব অদ্ভুত তুলনাটা। কিন্তু একটি সন্তান, এখানে মেয়ে-সন্তান যে আসলে ঘটিবাটির মতো বিক্রেয় সামগ্রী, সমাজের এই ফ্যালাসিটা মিলি যে ধরে ফেলেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ধর্মের জায়গায় কিছু তো লিখতেই হয়। সংযুক্তা সংক্ষেপে বললেন, "অত ভাবছ কেন? আমাদের মেয়ে আমাদের পদবি, ধর্ম, একটা নাম বসিয়ে দাও। কী মিলি ঠিক আছে?"

তিন বোনের মধ্যে মিলিই সবচেয়ে ফরসা। যত্নে শরীর চর্চায়, বয়সকালে এখন তাকে আর পাঁচটা ভালো ঘরের মেয়ের থেকে কোনওমতেই আলাদা করা যায় না। অনেকদিন পর্যন্ত একটা ভিতু-ভিতু ভাব ছিল তার মধ্যে। সম্প্রতি সেটা চলে গিয়েছে। চোখ দুটোয় এসেছে প্রশান্তি। গভীরতা।

চেহারায় একটা পালিশ। কমপ্লেক্সটা চলে গিয়েছে। জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা দিয়ে সেই মিলি আর বাড়ি ফিরল না। তখনও অ্যাডিশনাল পরীক্ষা বাকি। তার দু'-তিনজন বন্ধুর বাড়ি ফোন করলেন দম্পতি। সকলেই বলল, ওর পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছিল। তারপর কখন ও একা-একা বাড়ি ফিরে গিয়েছে কেউ লক্ষ করেনি। ও তো মোটের ওপর একা-একাই যেত।

দু'দিন পর উসকো-খুসকো ধ্রুবজ্যোতি বললেন, "আমি পুলিশে চললুম।"

সংযুক্তা ক্লান্ত গলায় বললেন, "কী দরকার? যে গিয়েছে, সে আপনি গিয়েছে। বিলু কি আপনি যায়নি?"

ধ্রুবজ্যোতি মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন।

॥ ১৬॥

আরও দু'দিন পর টেলিফোনে একটা কর্কশ স্বর বলল, 'পঁচিশ লক্ষ টাকা চাই। নইলে আপনাদের মেয়েকে পাবেন না।'

সারারাত দু'জনে নির্ঘুম বসে। সংযুক্তা বললেন, "কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ওই পঁচিশ লাখ টাকাই আমাদের এফডি শেয়ার সব মিলিয়ে আছে। এই অঙ্কটা কার মাথা থেকে বেরোল?"

ধ্রুব বললেন, "ওর সামনে আমরা কি কখনও ফিনান্স আলোচনা করেছি?"

"মনে তো পড়ছে না, বলাও তো কিছু যায় না।"

"তা হলে আর কথা নয়, টাকাটা জোগাড় করি।"

"পুলিশে বলবে না?"

"না। যদি ওর কোনও ক্ষতি করে? সংযুক্তা, তুমিই তো বলেছিলে, ও তোমার কাছে কান্নাকাটি করেছিল ওকে যেন আমরা কখনও তাড়িয়ে না দিই?"

"কিন্তু পঁচিশ লাখ টাকা! আমাদের সারা জীবনের সঞ্চয়।"

"তোমার মাস মাইনে থাকবে, আমার পেনশন থাকবে।"

"শোনো, একটু ভাবো।"

সুতরাং তাঁরা ভাবতে লাগলেন। ইতিমধ্যে টাকা জমা দেবার তারিখ বলে দেওয়া হয়েছে। সাত দিনের মধ্যে যে-কোনও দিন রাতে বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে যে ওভারহেড ব্রিজ রয়েছে, তার মাঝবরাবর রেখে চলে যেতে হবে।

পঞ্চম দিন মাঝরাতে দরজার বেল বাজল প্রাণপণ জোরে। স্বামী-স্ত্রী একজনের হাতে লাঠি, অন্যজনের হাতে ছুরি। সারা বাড়ির আলো জ্বেলে নীচে নেমে এলেন। ফুটোয় চোখ রেখে কিছুই দেখা গেল না।

"কে?" গম্ভীর গলায় ধ্রুবজ্যোতি বললেন।

"শিগগির খোলো, আমি মিলু।"

চট করে দরজা খুলেই স্তব্ধ দাঁড়িয়ে গেলেন দু'জনে। ছেঁড়া-খোঁড়া রক্তভেজা সাদা কমলাপাড় শাড়ি কোনও মতে জড়ানো, মিলু টলছে। ভেতরে ঢুকেই বসে পড়ল, তারপর ওখানেই শুয়ে পড়ল।

দু'জনে কোনও মতে ধরে-ধরে তাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। সংযুক্তা কাপড় ছাড়িয়ে, সমস্ত শরীর মুছে বেশ করে জল দিলেন মাথায়। সামান্য একটু হাঁ করল সে। জল দিলেন এক গণ্ডূষ। ধ্রুব নিজেই বুদ্ধি করে ফ্রিজ থেকে দুধ বার করে এনেছেন। এখন গরম করলেন একটু, এক গ্লাসের মতো দুধ খেল মিলু, তারপর পাশ ফিরে চোখ বুজল।

শরীরময় আঁচড় কামড়ের দাগ। সংযুক্তার গলা কাঁপছে। তিনি কোনও মতে একটা শাড়ি দিয়ে শরীরটা ঢেকে রেখেছেন। ধ্রুব বললেন, "ডাক্তারকে কল দিই?"

সংযুক্তা বললেন, "ফার্স্ট এড বক্সটা আনো, আমরাই পারব।"

ঘণ্টাখানেক পরে আবার একটু রাম মেশানো দুধ খাওয়ালেন সংযুক্তা। ধ্রুবকে বললেন, "তুমি পাশের ঘরে শুতে যাও, ডাকলেই যাতে আসতে পারো। আমি এখানেই শুচ্ছি।"

ধ্রুব সব ঘরের আলো নেভালেন একে-একে। টেলিফোন রিসিভারটা ক্রেড্‌ল থেকে নামিয়ে রাখলেন। তারপর কী ভেবে ভারী সদর দরজাটার কোল্যাপসিব্‌ল টেনে তালা দিয়ে দিলেন।

ধ্রুবর শেষরাতের দিকে ঘুম এসেছিল। যখন উঠলেন, তখন সকাল। রান্নাঘরে বাসন মাজার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি মিলুর ঘরে গিয়ে দেখলেন মিলুর নাকের তলায় হাত রেখে সংযুক্তা ঝুঁকে রয়েছেন। তাঁর পায়ের শব্দে তাড়াতাড়ি মুখ তুলে বললেন, "বেঁচে আছে তো?"

ধ্রুব এগিয়ে গিয়ে নাড়ি ধরলেন, "খুব ক্ষীণ।"! বললেন, "ডাক্তার ডাকা উচিত। কিন্তু সে যদি রটন্তীকুমার হয়, মুশকিল। তার চাইতে ওকে আগে জাগতে দাও।"

শাড়িটা এক ধারে পাকিয়ে রয়েছে। রক্তাক্ত। তিনি বললেন, "এত রক্ত! তারপর শাড়িটা ভালো করে ছোট্ট একটা পুঁটলি করলেন, খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিলেন।

বেলা বারোটার পর চোখ মেলল মিলু। সামনে ধ্রুবকে দেখে তাঁর একটা হাত ধরল। মুঠো করে ধরেই রইল। সংযুক্তা রান্না, চান এসব করতে গিয়েছেন।

"এখন একটু ভালো লাগছে?" ধ্রুব জিজ্ঞেস করলেন।

"কিছু খেতে দাও," মিলু বলল।

সংযুক্তা দুধ-ভাত মেখে, মাছ-ভাজা আর আলুভাতে নিয়ে এলেন। বেশ জ্বর মিলুর। তা-ও সবই খেল ভালো করে। সংযুক্তাই খাইয়ে দিলেন। তারপর নির্জীবের মতো পড়ে রইল। প্যারাসিটামল দুটো দিলেন ধ্রুব।

বিকেলে দু'জনে চা নিয়ে নীচেরই বসার ঘরে বসেছেন, মিলু টলতে টলতে এল। বোঝাই যাচ্ছে খুব দুর্বল, মাথা টলছে। ফিসফিস করে বলল, "বাবা, আমি দুটো লাশ ফেলেছি।"

"সে কী রে? কী বলছিস?"

"ওরা আমার গলায় ছুরি ধরে অত্যাচার করতে পারে, আমি খুন করতে পারি না? পাছে ওষুধ দেয়, মদ দেয়, তাই এই ক'দিন কিচ্ছু খাইনি মা। জলটা শুধু শুঁকে নিয়ে খেতুম।"

"কী করে খুন করলি?"

"বিবেকানন্দ পার্কের মোড় থেকে মুখে চাপা দিয়ে একটা সাদা মারুতিতে করে নিয়ে গেল। ক্লোরোফর্ম দিচ্ছিল, আমি ঝটকা দিয়ে তোয়ালেটা ফেলে দিয়েছি। তখন আমারই শাড়ির আঁচল মুখে গুঁজে দিল। হাত দু'টো পিছন দিকে ক্রস করে ধরে রইল। কালীঘাটের গলিতে নিয়ে গেল। গলায় ছুরি ধরে দু'জন পর-পর অত্যাচার করল। কী গালাগাল দিচ্ছিল।"

"তুই চিনিস না?"

"একটাকে চিনি পটকা। ইস্কুলের সামনে ঘোরাফেরা করত। পিছন-পিছন আসত। অন্যটাকে চিনি না।"

"বোস," ধ্রুব উঠে ওকে বসিয়ে দিলেন। সংযুক্তা চা আনলেন, "খা"। ওর হাত ঠকঠক করে কাঁপছে।

"রোজ মদ খেত, কাল খুব খেয়েছিল। আমার হাত বাঁধা, পা-দুটো খোলা ছিল। পিছলে-পিছলে এগিয়ে গিয়ে ছুরিদুটো জড়ো করে নিলুম। হাতের বাঁধন ছিঁড়তে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। তারপর একটু সাড় আসতে দুটো ছুরি দু'জনের ঠিক গলায় বসিয়ে দিয়েছি। উঃ কী রক্ত, মা গো! আমি দোর খুলে ছুটতে ছুটতে..."

তার হাত থেকে কাপটা পড়ে চুরমার হয়ে গেল। চা ছিটকে গেল চারদিকে। বসে বসে কাঁপছে মিলু। "আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিও না বাবা।"

ধ্রুবজ্যোতি ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন, "চুপ, ঘরে চল।" আবার প্যারাসিটামল দিলেন। পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন সংযুক্তা। ট্রাংকুইলাইজার দিয়েছিলেন। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল মিলু।

"ও কি সত্যি ওটা করতে পেরেছে?" সংযুক্তা ফিসফিস করে বললেন।

"বুঝতে পারছি না। যদি সত্যি ছুরি গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে, আমি জানি না। বেঁচে থাকলে কেলেঙ্কারি হবে।"

"অন্য কেউ যদি জেনে থাকে...পুলিশে যাবে না, রিভেঞ্জ নেবার চেষ্টা করবে। তুমি আমিও বাদ যাব না। ধরা পড়লে ম্যান স্লটার, সেলফ ডিফেন্সের কেস। অল্প সময়ের জেল, তবু সে জেলই। আর যদি একটাও মরে না থাকে, কি তৃতীয় কেউ জানে, তো জীবনভর রিভেঞ্জের ভয়। এখন ডাক্তার ডাকাও যাবে না। ও ক্রমাগত এই সব বলে যেতে থাকবে।"

কাজের লোকটি আসে যায়। শোনে মিলুদিদির অসুখ করেছে, তাই শয্যাশায়ী। রক্তমাখা কাপড়টা ছাদে নিয়ে গিয়ে কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন ধ্রুব। বলতে লাগলেন, "প্রমাণ লোপ করছি, প্রমাণ লোপ করছি।"

প্রতিদিন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে খবরের কাগজ দেখেন। তৃতীয় দিন খবরটা বেরোল তৃতীয় পাতার কোণের দিকে। কালীঘাট সেকেন্ড বাইলেনের একটি বাড়ির একতলার ঘরে কটাগোবিন্দ নামে একটি মস্তান থাকত, সে খুন হয়েছে। তার সঙ্গে আরও একটি মৃতদেহ, অল্পবয়সি একটি ছেলের। তার পরিচয় জানার চেষ্টা হচ্ছে। ঘরে মদের বোতল, দুটি ছোরা পাওয়া গিয়েছে। ছোরা দুটি রক্তে ভিজে গিয়েছে একেবারে। এবং লোক দুটি বদ্ধ মাতাল ছিল।

ধ্রুব বললেন, "ছোরায় আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে কি না বলছে না দেখেছ?"

সংযুক্তার গলা দিয়ে স্বর ফুটল না।

"ভাবো, একটা মেয়ে তার ষোলো-সতেরো বছরের জীবনে কতবার ধর্ষিত হল? সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে এর থেকে বেরোতে। আমরা চেষ্টা করছি বার করে আনতে। কিছুতেই পারছি না, পারছি না। এর চেয়ে ভয়ংকর কিছু আছে।"

সংযুক্তা অবশেষে বললেন, "আমি হলেও লোক দুটোকে খুনই করতাম। আমি ওর কোনও দোষ দেখছি না। এইসব মস্তান-গুন্ডাদের পুলিশ প্রোটেকশান দেয়। আমার ধারণা, ও যদি থানায় যেত ওর আরও বিপদ হত। আসলে সেই দারোগাবাড়ির অভিজ্ঞতা ওর মনে আছে। তাই ও থানায় যায়নি ভাগ্যিস!"

"কিন্তু কী কী পাওয়া যেতে পারে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে সেটাই আমাকে ভাবাচ্ছে," ধ্রুব বললেন। তিনি অনবরত পায়চারি করে যাচ্ছেন।

সংযুক্তা বিড়বিড় করে বললেন, "এই সমস্ত নিষ্ঠুর বাস্তবের সামনে এলে তোমাদের সব সাহিত্য-শিল্প কেমন যেন অর্থহীন মনে হয়।"

হঠাৎ ধ্রুবর মনে পড়ে গেল দিয়া আর বাবাইও ধর্ষিত হয়েছিল। ওদের পরিস্থিতি একেবারে আলাদা। হাই-ক্লাস, ডিসকো থেক, স্মার্ট, বুদ্ধিমতী টাকা-পয়সাওয়ালা মেয়ে সব। আর এ? লো-ক্লাস। বিজয় সুরের ভাষায় 'ঝিয়ের মেয়ে'। তাঁদের প্রযত্নে আছে, প্রাণপণে পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। গ্রাহাম্‌স প্লেসের হাই-ফাই ক্লাব আর কালীঘাট বাই-লেনের ঘুপচি ঘর, আকাশ-পাতাল তফাতের হলেও ঘটনাটা এক—ধর্ষণ। অত্যাচার একই, অপমান একই। মেয়েদের সব বয়সের পুরুষই যৌনসামগ্রী বলে দেখছে। ঈশ্বরগুপ্ত-টুপ্তর সময়ে মেয়েরা যখন প্রথম পড়তে বেরোল, তখন ধর্ষণ ছিল না। কিন্তু এই দৃষ্টিই ছিল। তবে তখন যে-বয়সে বিয়ে দেওয়া হত, বিবাহের মধ্যেও ধর্ষণ হত। এবং অনেক মেয়ে মারা যেত। তারপর সহবাসে সম্মতি অ্যাক্ট হল, বিয়ের বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হল, বাবুদের গণিকা-পল্লিতে যাওয়ার ফ্যাশন উঠে গেল। এখন গণিকাবৃত্তি, লালবাতি

এলাকা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। যৌন আহ্লাদের জন্য বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কও রয়েছে, লালবাতি সহাবস্থান করছে শিষ্ট সমাজের সঙ্গে। চতুর্দিকে বিরাট-বিরাট হোর্ডিং সুন্দরী মেয়েদের, স্বল্প পোশাক-বক্ষবিভাজিকা দৃশ্যমান। এইসব মডেল যে-পোশাক পরে, যে-পোজ দেয়, মুখচোখের ভাষা যা হয়, তাতে করে তো তার সোনাগাছি, হাড়কাটা গলির সন্ধ্যায় পণ্যস্ত্রীদের হাবভাবই মনে পড়ে যায়। সব সময়ে এই সব ছবি ওসকাচ্ছে ছেলে-বুড়ো সবাইকে। গুন্ডা-মস্তানের কথা তবু বোঝা যায়, কিন্তু ভদ্রঘরের ছেলেপুলেদের সাহস হয় তো? প্রবৃত্তিকে সংযত করার সামান্য ক্ষমতাও কি এরা চর্চা করতে উৎসাহ পায় না?

তাঁর ভিতরে হঠাৎ একটা সংকল্পের প্রচণ্ড জোর এল। এতদিন প্রজেক্ট হিসেবে নিয়েছিলেন, এখন তিনি মিলুকে একটা পবিত্র দায় বলে নিলেন। নিজের সমস্ত হিতকারী ক্ষমতার শেষ প্রমাণ হিসেবে, কন্যা হিসেবে নিলেন। ভিতর থেকে জোয়ারের স্রোতের মতো স্নেহ এল। কী রকম একটা সেন্টিমেন্টাল বোধ করলেন। জোর কদমে গেলেন মিলুর ঘরে। সে এখনও শুয়ে, পাশে সংযুক্তা বসে একটা বই পড়ছেন। ঘরে মৃদু স্বরে মিউজিক বাজছে, সেতার।

তিনি খাটের প্রান্তে সন্তর্পণে বসলেন। সংযুক্তা একটু অবাক হয়ে চাইলেন। তিনি মিলুর মাথায় আস্তে হাত রাখলেন। জ্বর নেই, কিন্তু কেমন নেতিয়ে আছে। ওকে একটু ট্রাঙ্কুইলাইজার রোজ দেওয়া হচ্ছে তো! সে কারণেও থাকতে পারে। মাথায় হাত অনুভব করে মিলু একটু নড়ে উঠল। অস্ফুটে বলল, "বাবা!"

"হ্যাঁ রে, ঘুম আসছে?"

"আসছে, কিন্তু হচ্ছে না"

"কেন? এখনও কি ভয় করছে?"

ওদিক থেকে সংযুক্তা ভুরু কুঁচকে চোখের ইশারা করলেন।

"কষ্ট হচ্ছে, ভয় হচ্ছে," মিলু বলল।

"কীসের কষ্ট বুঝতে পারছি, কিন্তু ভয় কীসের?"

"বাবা, খুনি বলে পুলিশ আমায় ধরবে?"

"ধরবে না, নিশ্চিন্ত থাক। আমি আছি, ওটাকে খুন বলে না। সেলফ-ডিফেন্স বলে। দিজ পিপ্‌ল শুড বি টার্মিনেটেড। দে আর মনস্টার্স অ্যান্ড ভার্মিনস অ্যাট দ্য সেম টাইম। কিন্তু মিলু, তোকে উঠে দাঁড়াতে হবে। এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। সব সময়ে জানবি, বাবা মা পাশে আছে। সব ভুলে যা।"

"কতবার ভুলতে হবে বাবা? আর তোমরা আছ কিন্তু ভগবান নেই।"

"অ্যাকসিডেন্ট যদি একটা মানুষের জীবনে একাধিকার ঘটে, কাটিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা তো প্রত্যেকবারই করবে সে। ট্রমা-ফমা বাজে জিনিস, আমল দিস না। আর ভগবান? তুই-ই ভগবান, আমরাই ভগবান, এখনও বুঝিসনি?"

মিলু আস্তে আস্তে ফিরে শুল। তারপর দুটো হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল।

"বাবা! কী বললে আবার বলো।"

"তুই-ই ভগবান। আমরা, এই সংযুক্তা আর আমি তোর মা-বাবা, আমরাই ভগবান।"

"সত্যি বলছ?"

"একদম সত্যি। আমাদের চারদিকে শয়তানের অত্যাচার তাই আরও বেশি।"

"তা হলে তো ভগবান না হওয়াই ভালো বাবা, এত শয়তান! এত শয়তান! কী করে যুদ্ধ করব?"

"প্রাথমিক লড়াইগুলো খুব শক্ত ছিল, সেগুলোতে জিতে এসেছিস। আর এরকম লড়তে হবে না। এবার অন্য রকম লড়াই, আনন্দের লড়াই।"

"কীরকম?"

"তোকে কবিতা পড়তে হবে, গান শিখতে হবে, যা-যা ভালোবাসিস তা করতে হবে।"

"বাবা, আমাকে গান শেখাবে সত্যি?"

"আমার মনে হয় তোর শেখা উচিত।"

"আমার ভীষণ ইচ্ছে বাবা।"

"শিখবি, কী শিখবি ভাব। গানের কথা ভাব। তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ।"

তিনজনে চুপচাপ বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর খাবারগুলো গরম করে একটা ট্রলি ঠেলে সংযুক্তা মিলুর ঘরে নিয়ে এলেন। তিনজনেই ওখানে বসে বসে খেয়ে নিলেন। লুচি, আলু-ছেঁচকি, মাংস আর ছানার লেবু সন্দেশ।

'তোর কী মনে হচ্ছে সায়েন্স নিবি না হিউম্যানিটিজ?"

"হিউম্যানিটিজ, সায়েন্স পাব না।"

"সায়েন্স পাবি না বলেই কি হিউম্যানিটিজ নিতে চাইছিস?"

"না, সায়েন্সও ভালো লাগে, কিন্তু আর্টস আরও ভালো লাগে।"

"মিশিয়ে নেওয়া গেলে নিস। গানটাও এখুনি শুরু করে দে। কার কাছে শিখতে পারিস, কোনও আইডিয়া আছে?"

'ভারতীদি শেখান এখানে। গীতবিতান আছে, দক্ষিণী আছে।"

"না, আগে বাড়িতে একটু বেস তৈরি কর। ক্ল্যাসিক্যাল শেখা দরকার। আমি দেখছি।"

।। ১৭ ।।

এ বছরটা একটা স্পেশ্যাল বছর—বাবাই ভাবছিল। ঠান্ডা আর যেতেই চাইছে না। একটু গরম পড়লেই বৃষ্টি চলে আসছে। আবার চারদিকটা এমন আরামদায়ক ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে! বাবাই নাম কে ওয়াস্তে হস্টেলে ফিরেছে বটে, কিন্তু তাকে দিয়াদের বাড়ি থাকতেই হয়। আর এখন কোনও অস্বস্তি নেই। সত্যি-সত্যিই বাবাইয়ের মনে হয় সে নিজের বাড়িতে রয়েছে। কত কথা দিয়ার। মুখে কথা, ডায়েরি ভর্তি কথা, খাতা ভর্তি কথা, বাবাই শোনে, পড়ে। দিয়া ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, "তোর কী মনে হয়, ঠিক ভাবছি?" নানারকম জীবনদর্শন নিয়ে আলোচনা হয় দু'জনের। বাবাই কখনও ভাবেনি ধনীর দুলালি, আপাতদৃষ্টিতে অপরিণত দিয়া এত কথা ভাবে।

একদিন সে বলল, "দেখ বাবাই, মা-বাবাকে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি, ভীষণ নির্ভরও করতাম। কিন্তু ওদের বিচ্ছেদের পর, আমার উপর দিয়ে এইসব ঘটে যাওয়ার পর আস্তে-আস্তে আমি বুঝতে পারছি আমি একটা আলাদা মানুষ। আমার জীবনটা একটা আলাদা জীবন। আমাকে শেষ পর্যন্ত একাই বাঁচতে হবে, একাই মরতে হবে। আমার বাঁচাটা কেউ বেঁচে দিতে পারবে না।"

উজ্জ্বল ছিল, কফি মাঝখানে নিয়ে তিনজনের আড্ডা চলছিল। সে বলল, "ধুর এটা আমি বহুদিন আগে বুঝে গিয়েছি। ঠিক এইভাবে বলতে হয়তো পারিনি কাউকে, কিন্তু বুঝে গিয়েছি। বেশিরভাগ ছেলেই বুঝে যায়। মানে, ভিতরে-ভিতরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায়। তোরা পারিস না। ওটা বহুযুগের অভ্যাসের ফল, কী করা যাবে! আজ যদি বিয়ে করিস আবার বরের উপর নির্ভর করতে শুরু করবি।"

বাবাই বলল, "বাজে কথা বলিসনি। ওটা মিউচুয়াল নির্ভরতা, পারস্পরিক। একটা নতুন ইউনিট গড়তে হচ্ছে। দু'জনের সহযোগিতা, সহমর্মিতা না থাকলে হওয়া সম্ভব?"

উজ্জ্বল বলল, "তুই একটা আইডিয়াল সিচুয়েশনের কথা বলছিস। রিয়্যালিটি তা বলে না। রিয়্যালিটি বলছে, মেয়েরা সব ব্যাপারে একেবারে বসের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বরের কথাই

বসের কথা। যারা উপার্জন করে সেসব মেয়েও বরকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করে না।"

"অথচ ছেলেরা যা ইচ্ছে তাই করে। করার যুক্তিও খুঁজে নেয়।"

উজ্জ্বল বলল, "দিয়া, এই স্বাধীনচিত্ততার একটা দায়দায়িত্বও আছে কিন্তু। আমার কাজের জন্য আমি, একমাত্র আমিই দায়ী এই মনোভাবটা মানুষকে দারুণ সিরিয়াস করে তোলে।"

"হ্যাঁ, বাবাই বলেছিল "ওই বদমাশ ছেলেগুলো তো বড়দের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদের উপর অত্যাচারটা করেনি, করেছে নিজেদের মর্জিতে। দায়িত্ব বৈকি, সিরিয়াসনেসও অবশ্যই।"

তার গলাতে তিক্ততা, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ফুটে উঠছিল।

উজ্জ্বল তার দিকে তাকিয়ে রইল। রানাঘাটের ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস মিটে যে-মেয়েটির সঙ্গে তার একদা আলাপ হয়েছিল সে ছিল যেমন সরল, তেমনই প্রতিক্রিয়াহীন। বাবাই নিজের কাজটুকু মন দিয়ে করে যেত। কিন্তু যেসব অন্তর্নিহিত পলিটিক্স, রাক্ষুসে প্রতিযোগিতা, খেয়োখেয়ির চোরাস্রোত এসব জায়গায় সর্বদা বয়, সে হালকা পায়ে সেখান থেকে সরে দাঁড়াত। কোনও অভিযোগ ছিল না। লং জাম্পে ওজন আর হাইট নিয়ে সেবার কী একটা কারচুপি হয়েছিল। বাবাই তার পাওনা পেল না। কিন্তু সে নির্বিকার। প্রাণতোষদার উপর সে কথা বলবে না। তবে হ্যাঁ, সে ছিল অবিসংবাদী স্প্রিন্ট কুইন। শেষের ল্যাপে যখন ক্যানটার করত, সে একটা দেখবার জিনিস। পাঁচ তিন-এর বেশি হাইট নয়। অথচ ক্যানটার করছে রেসের ঘোড়ার মতো। শিল্প একটা, নিজের শিল্পে বিভাবরী নিজেই মগ্ন। কোথায় কে কী অন্যায় করল তার উপর তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই, এখনও আপাতদৃষ্টিতে সেই ঝগড়াবিমুখ ঠান্ডাস্বভাব বাবাইয়ের কোনও পরিবর্তন অন্যে টের পাবে না। কিন্তু উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ দেখছে, রাগের স্ফুলিঙ্গ, তার মধ্যে অপমানের ক্রুদ্ধ অশ্রু মিশে আছে। তার খালি আফশোস হয় কেন বাবাই তাকে সেদিন ডাকল না। নতুন কিছু করলেই সে উজ্জ্বলকে বলে থাকে, অথচ সেদিনই...।

বাবাই লক্ষ করছিল উজ্জ্বলের ভাবান্তর। তার হঠাৎ কেমন মনে হল মফস্‌সল থেকে চলে এসে সে কি ভুল করেছে? বারবার সেইজন্যেই ঠেকে যাচ্ছে ভালোবাসাহীন, নীতিহীন, বিবেকহীন একটা চোরা জালে? দূর, তা-ও আবার কখনও হয় নাকি? উচ্চশিক্ষার জন্য, চাকরির জন্য, মানুষ ক্রমাগত যাতায়াত করছে গ্রাম থেকে গঞ্জে। গঞ্জ থেকে শহরে। আরও বড় শহরে, স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে। এক জায়গায় থেকে গেলে হয়তো একটা নিরাপদ জীবন পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা কুয়োর ব্যাঙেরও জীবন। আসলে সে যে কোথাও একটা হেরে যাচ্ছে, তাকে লোকে ঠকাতে পারছে, ঠকিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে এই ব্যাপারটাই ক্রমাগত তার আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে যাচ্ছিল। আর একটা জায়গায় এসে আত্মসম্মান আর আত্মবিশ্বাসে তেমন কোনও তফাত থাকে না। বাবাইয়ের আত্মবিশ্বাসটা তার অজান্তেই চুরচুর হয়ে যাচ্ছিল। যেহেতু আপাতদৃষ্টিতে দিয়া আরও ভঙ্গুর এবং তাকে ক্রমাগত মরাল সাপোর্ট দিয়ে না গেলে সে ভেঙে পড়তে পারে, তাই বাবাইয়ের নিজের ভঙ্গুরতা যেন মুলতুবি থাকছিল সমস্ত সময়টা। মানে, কাউকে সে বুঝতে দিচ্ছিল না তার কথা। সে যেন বরাবরের মতোই স্প্রিন্টকুইন, জিতবেই। একটুর জন্যে জয় ফসকে গেলেও কান্নাকাটির বান্দা নয়। উজ্জ্বল কি বুঝতে পারছে? কেউ যদি পারে, একমাত্র উজ্জ্বলই পারবে। কেননা ক্রীড়াজগতের নোংরা পলিটিক্সের মধ্যে তাকে দেখেছে একমাত্র উজ্জ্বলই। উজ্জ্বলই বোঝে তার স্বভাব। অনেকবার বলেছে, মাঝে মাঝে ফোঁস কর, সব সময়েই যদি সদাশিব আশুতোষ হয়ে থাকিস, বরাবর কিন্তু লোকে তোরটা লুটে নিয়ে যাবে। বস্তুত তার স্বভাবের মধ্যেই এই প্রশান্তি, স্থিরচিত্ততা আছে বলেই মা-বাবা তাকে কাছছাড়া করতে সাহস পেয়েছেন। দিদি যখন সংশয় প্রকাশ করেছিল মা বলেন, "না রে, ও খুব ধীরস্থির, চট করে ভড়কাবার, ভেঙে পড়বার মেয়ে নয়।"

উজ্জ্বল, উজ্জ্বল তুই কী ভাবছিস জানি না, কিন্তু আমার প্রশান্তি টুটছে, কোথাও-কোথাও একটা ঘোর পরিবর্তন আসছে, সেটা শেষ বিচারে ভালো কি মন্দ তা আমি জানি না। কিন্তু বদলটা যে আসছে, আমি হাজার মলম লাগিয়েও তার জ্বালা যে আটকাতে পারছি না. এ-কথা তুই অন্তত বুঝিস।

ঠিক সেই সময়েই রিনার গোয়েন্দাগিরির প্রত্যক্ষ ফলাফল পৌঁছে যাচ্ছিল রূপরাজের কাছে। এক নং, দু নং, তিন নং করে করে যতদূর সে বার করতে পেরেছে। শক্ত হয়ে যাচ্ছিল রূপরাজের ঠোঁট, চোয়াল। সংকল্প জমছিল ভিতরে। লৌহ-কঠিন সংকল্প। রিনা ভয় পাচ্ছিল, "রূপ, নিজেকে সামলা, এমন দেখাচ্ছে কেন তোকে?"

"দেখ রিনা, প্রথম কথা তুই যেন পুরোটা আমায় ফ্যাক্স করেছিস, আমার মুখের কী ভাব হল না হল তোর দেখার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এরপরও আমাকে কার্তিক ঠাকুরটির মতো দেখাতে হবে? বাঃ, আপাতত তুই ফোট্, আমায় একা থাকতে দে। অনেক কিছু ভাববার আছে, থ্যাঙ্কস্।"

"একটা বিদ্রোহ দরকার। একটা অজানা জায়গা, যেখানে কেউ তোমাকে খুঁজে পাবে না। কিছুটা নিশ্চিন্ত অবসর। সম্পূর্ণ একটা একলা, কারও উপর অ-নির্ভর নিজস্ব পৃথিবী, যেখানে নিজের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি পরিষ্কার কাজ করে। একমাত্র বন্ধুদের নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই। পৃথিবীতে এরকম কোনও জায়গা আছে যেখানে মানুষ নেই বা থাকলেও সম্পর্কের মধ্যে আসে না, বা আসলেও বিরক্তি উৎপাদন করে না, অনাবশ্যক কৌতূহল দেখায় না।"

"আছে, আছে, সব আছে। আমি এক ডজন জায়গার নাম করতে পারি," রূপ বলল।

"আই নিড ইট ভেরি মাচ," আরিয়ান বলল।

কথা হচ্ছিল, শুকতারার বাড়িতে একটা জোর টেনিস সেশনের পর। প্রত্যেকেরই কাঁধে সাদা তোয়ালে, সামনে লম্বা গ্লাস শরবত।

শুকতারা বলল, "উই আর আ পার্ফেক্ট সিক্সসাম। তিন ছেমরি, তিন ছ্যামরা। চল কেটে পড়ি।"

"আর একটু বেশি হলে জমত ভালো," উজ্জ্বল বলল। "আরিয়ান দেখ না তোদের ক্লাব থেকে যদি আরও জনা চার পাওয়া যায়।"

"ক্লাব, আরে ধুস ইয়ার! ওই ফান্টুস ক্লাবটার কথা তোর কী করে মনে এল? ওরা তো সব ব্যাবসাদার, টাকা-আনা-পাই ছাড়া কিছু বোঝে না। ওরা করবে অ্যাডভেঞ্চার?"

"ঠিক আছে, এবারে ছোট করে হোক পরে সার্কল বাড়লে দেখা যাবে।"

রূপরাজ বলল, "কিন্তু তোরা মেয়েরা বাড়িতে না বলে যাওয়ার সাহস দেখাতে পারবি?"

"আরে ক'টা দিনের জন্য তো!" শুকতারা বলল। "ম্যানেজ করে নেব।"

দিয়া বলল, "আমার মা-বাবা কেউই এখানে নেই, স্রেফ বাসুদিকে বলে বেরিয়ে যাব।"

বাবাই কাচুমাচু হয়ে গেল, "আমি অনায়াসেই মা-বাবাকে না বলে যেতে পারি। প্র্যাক্টিক্যাল ডিফিকাল্টি কিছু নেই। কিন্তু টাওয়ার থাকলে ফোন করব রে।"

আরিয়ান বলল, "একেই বলে 'যেতে যেতে চায় না যেতে ফিরে ফিরে চায়।'"

বাবাই অবাক, "তুমি রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা জানো?"

"মানে, হোয়াট ডু ইউ মিন? আমার মা বাড়িতে থাকলে সারাক্ষণ রবীন্দ্রসংগীত চালিয়ে রাখে।"

"রিয়্যালি," শুকতারা বলল। "তুই বোর হোস না?"

"হলে কী করা!" শি ইজ ডেড সিরিয়াস। আর শুনতে-শুনতে লাগসই লাইনগুলো কেমন মুখস্ত হয়ে গিয়ে কাজে দিচ্ছে বল? আই ক্যান ইমপ্রেস লটস অব পিপল। শুক্স, তুই সে জায়গায় একটা রবি-লাইন বল জনগণ ছাড়া, বন্দেমাতরম ছাড়া।"

সবাই হেসে উঠল।

"কী ব্যাপার, হঠাৎ এত হাসি?"

"তুমি কি ভেবেছিলে, বন্দেমাতরমটাও রবীন্দ্রসংগীত?"

"নয়? আয়াম সরি, রিয়্যালি সরি। কার ওটা?"

"বঙ্কিমচন্দ্রের।"

"দেবদাসের রাইটার?"
"ওঃ আরিয়ান তুই এবার ক্ষান্ত দে," শুকতারা বলল।
"'দেবদাস' শরৎচন্দ্রের, আর 'বন্দেমাতরম' বঙ্কিমচন্দ্রের, যিনি 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ' লিখেছিলেন।"
"ওঃ হো সেই কমিউন্যাল রাইটার?"
উজ্জ্বল বলল, "তোর মাথা, এইভাবেই কি তুই লোকজনকে ইমপ্রেস করিস?"
"আরে রাম, লোকজন ইজ অলরাইট, এই বন্ধুবান্ধবরাই দেখছি বড্ড টাফ।"
আবার একদফা হাসি উঠল।

॥ ১৮ ॥

ট্রেনটা যখন ছাড়ল তখন বন্ধুরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কোনও তিনজনের এক জায়গায় দাঁড়ানোর উপায় নেই। সেকেন্ড ক্লাস কামরা ঠাসাঠাসি ভিড়। ধ্রুবজ্যোতি চশমাটা একবার ভালো করে মুছে নিলেন। সেকেন্ড ক্লাস রিজার্ভেশনহীন। এখন সব সিট বোঝাই। শুকতারাকে বলতে শুনলেন, "আমি খড়্গপুরে নেমে যাব। এইরকম শুধু-শুধু গাদাগাদি—একে অ্যাডভেঞ্চার বলে না, এর নাম ম্যাডভেঞ্চার।"

আরিয়ান বলল, "আমিও তো এসি-তে থাকি। তুই না টেনিস খেলিস তোর স্ট্যামিনা এত কম হবে কেন?"

"স্ট্যামিনার কোয়েশ্চেন এটা নয়। কথা হচ্ছে শুধু-শুধু কেন এই নোংরা ঘেমো-ভিড়ে পিষতে-পিষতে যেতে হবে? দিস ওয়জ আননেসেসারি।"

কখন উজ্জ্বল তার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে, ওরা লক্ষ করেনি।

সে বলল, "ডোন্ট ওয়ারি শুকতারা। প্রয়োজনটা পরে বুঝতে পারবি, কখন যে মানুষের কোন অভিজ্ঞতাটা কাজে লেগে যায়!"

শুকতারা টয়লেটের দিকে যাচ্ছিল, ট্রেন স্পিড নিয়েছে। উজ্জ্বলও দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে দ্বিতীয় টয়লেটের দিকে গেল। শুকতারা কাছাকাছি হতেই সে আস্তে গলায় বলল, "ব্যাকিং আউট?"

"নট রিয়্যালি।"

উজ্জ্বলের পুরো ব্যাপারটাই কেমন রহস্যময় লাগল। ও কি আগেই ঠিক করে নিয়েছিল যাবে বলে যাবে না, কেন? ও এর মধ্যে থাকতে চায় না? না-ই থাকল, সে কথা বলতে দোষ কী? এই সমস্ত আপার ক্লাস মড মেয়েরা বড্ড খেয়ালি হয়। যা খুশি তাই করার লাইসেন্স নিয়েই যেন জন্মেছে, দায়িত্বজ্ঞান বলতে কিছু নেই। খুব বিরক্ত লাগছে তার। সে টয়লেটের ভিতরে গিয়ে ভাবতে লাগল। শুকতারা আবার কোনওরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো?

ঈশ্বর জানেন, শুকতারা কিন্তু খড়্গপুরে নামল না।

দিয়া তন্ময় হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, যদিও তখন রাতে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। উলটো দিকে দাঁড়িয়ে রূপরাজ। বাবাই পাশের সিট পেয়েছে। আরিয়ানকে উলটোদিক থেকে আসতে দেখল উজ্জ্বল। শুকতারাও বসার জায়গা পায়নি। নাঃ, কাজটা রূপের ভালো হয়নি। এত কষ্ট করার দরকার কী ছিল? নামেই 'এক্সপ্রেস' ট্রেন, বড্ড টিকিস-টিকিস করে চলেছে। তার উপর এইরকম রিজার্ভেশনহীন কামরা। পৌঁছতে রাত সাড়ে দশটা, লেট করলে ক'টা কে জানে!

দিয়া এইসময়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, "শুক, বোস। আমি তো কিছুক্ষণ বসলাম।"

বাবাইও তার সিটটা ছেলেদের কাউকে দিতে চাইল। উজ্জ্বল হেলাফেলার সঙ্গে বলল, "তোরা বোস, আমরা ঠিক আছি। একেবারে ফিট।"

"যা বলেছিস," আরিয়ান বলল।

"ছেলে বলে কি মাথা কিনে নিয়েছিস নাকি?" বাবাই বলল।

"মাথা তো প্রায় বিক্কিরি করে দিলুম রে," ওদিক থেকে রূপরাজ বলে উঠল। আস্তে-আস্তে সবাই মোটামুটি জায়গা পেল। পাশের লোক বিড়ি খাচ্ছে বলে দিয়া আরিয়ানের সঙ্গে জায়গা বদল করল। শুকতারার পাশে এক দেহাতি মহিলা ছেলে কোলে নিয়ে বসেছিলেন। শুকতারা গিয়ে উজ্জ্বলের সঙ্গে জায়গা বদল করল। মহিলাও গন্ধমাদন।

রূপরাজ বলল, "এইভাবেই তবে আমাদের ট্রেকিং শুরু হল, এক সিট থেকে আর এক সিটে?"

"যা বলেছিস!" উজ্জ্বল, শুকতারা একসঙ্গে হেসে উঠল।

কামরাটা যাকে বলে লোকে লোকারণ্য। দুটো সিটের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায়ও ছোট বাচ্চাদের বসিয়ে দিয়েছে লোকে। অনেকেই পরস্পরকে চেনে, গল্প জুড়ে দিয়েছে। সারা কামরাটা মানুষের এই গল্পগাছার আওয়াজে ঝমঝম করছে। উজ্জ্বল, বাবাই লম্বা-দৌড়ের বাসে উঠে অভ্যস্ত। এই ভিড়, এত আওয়াজ ওদের কাছে তেমন কোনও ব্যাপারই নয়। কিন্তু বাকিরা? বিশেষত, দিয়া, শুকতারা আর আরিয়ান একেবারে আনকোরা। কিন্তু বিরক্তি দেখা যাচ্ছে একমাত্র শুকতারারই। আরিয়ান একরকম উপভোগ করছে জিনিসটা। আর দিয়া লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুপ করে আছে। মাঝে-মাঝে অন্যমনস্কভাবে হাসছে। মাঝে মাঝে আবার তার কপালে ভাঁজ পড়ছে। কিন্তু কী ভাবাচ্ছে তাকে?

একটা দেহাতি লোকের সঙ্গে আরিয়ান খুব জমিয়েছে। লোকটি বলছে, "আপ তো ফিল্মস্টার যৈসা।"

আরিয়ান বলল, "ফিল্মস্টারই তো হুঁ!"

লোকটি সসম্ভ্রমে বলল, "টলিউড কা?"

আরিয়ান মুচকি হেসে বলল, "উও হম নহি বাতাউঙ্গা।"

"তো আপ এয়হি কামরে পে...কিঁউ জি?"

"উও ভি হম কিসিকো নহি বাতাউঙ্গা।"

রূপের সঙ্গে এক মাঝবয়স ভদ্রলোকের কথাবার্তা হচ্ছে, ভদ্রলোক বললেন, "না, ঠিক মাউন্টেনিয়ার নই, কিন্তু ট্রেকিং আমার নেশা ছিল। তোমাদের বয়সে ভাই নন্দাঘুণ্টি-টুন্টি কিছুদুর গিয়েছি। এভারেস্টেও ট্রাই করেছিলাম। বেস-ক্যাম্প থেকেই ফিরিয়ে দিল।"

"সে কী, কোনও ট্রেনিং না নিয়েই?"

"ট্রেনিং ছিল বই কী! শুশুনিয়ায়, তারপর অযোধ্যা পাহাড়ে। হিমালয়ের ট্রেনিং ছিল না। অভিজ্ঞতা আর উপদেশের উপর নির্ভর করেই, তোমরা কি অযোধ্যা পাহাড়ে যাচ্ছ?"

"ছাড়লেন কেন?" এড়ানে উত্তর দিল রূপ।

"সংসারে জড়িয়ে পড়লুম, আর রিস্ক নেওয়াটা ঠিক হত না। তোমরা যদি সিরকাবাদ দিয়ে যাও তো প্রাকৃতিক শোভা একটু কম দেখবে, বুঝেছ? প্রাকৃতিক শোভাটাই ট্রেকিং-এর বিশল্যকরণী। তোমার যত কষ্টই হোক, ঝরনা, পাহাড়ি ফুল, উঁচু-উঁচু গাছ, এসব দেখতে-দেখতে ক্লান্তি ভুলে যাবে ভাই। যদি বাঘমুণ্ডি পার হয়ে ট্রেকিং শুরু করো, ঘণ্টা ন'য়েকের পথ। সুন্দর, ভারী সুন্দর। তবে কী জানো ভীষণ মশা! মশার জন্যে তোমাকে প্রিকশন নিতেই হবে, নইলে...।"

উজ্জ্বল এতক্ষণে বাবাইয়ের উলটো দিকের সিটটা পেল। একবার তাকাল রূপ আর আরিয়ানের দিকে। ওরা এখনও গল্পে মত্ত, ট্রেন এবার খানিকটা ভদ্রস্থ স্পিড নিয়েছে। সে বসে পড়ল।

"কী রে বাবাই ঘুমোতে-ঘুমোতে চলেছিস?"

"ঘুমিয়ে নেওয়াই তো ভালো।"

"ভিতরে-ভিতরে জেগে আছিস তো?"

বাবাই হাসল শুধু।

"দিয়াও বোধহয় ঘুমোচ্ছে।"

বাবাই আস্তে বলল, "ভিতরে-ভিতরে জেগে আছে।"

"মেয়েটা খুব পালটে গিয়েছে, না?"

"আপাতদৃষ্টিতে," বাবাই উত্তর দিল।

"কেন, ভিতরে পালটায়নি?"

"তুই কি ওর পালটে যাওয়ার ওপর নির্ভর করছিস?"

"শি টু হ্যাজ আ ভাইট্যাল রোল টু প্লে!"

"আমি কিন্তু অন্য অর্থে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলুম।"

"আমি তোদের মতো অর্থবিদ নই," উজ্জ্বল যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বলল।

বাবাই ভাবল, ছেলেরা বড্ড জটিল এবং আত্মম্ভরি।

উজ্জ্বল ভাবল, মেয়েরা বড্ড জটিল এবং হিংসুটে ফর নাথিং।

বাবাই ভাবল, উজ্জ্বলও! সে-ই উজ্জ্বল!

উজ্জ্বল ভাবল, বাবাইও। সে-ই বাবাই!

খুব আশ্চর্যের বিষয়, দিয়াই একমাত্র যে পারিপার্শ্বিককে প্রায় পুরোপুরি টা-টা বাই-বাই করে নিজেকে তার মনের ভিতর বেশ গুটিয়ে নিয়েছিল। এবং এক ধরনের জাগর স্বপ্ন দেখছিল। এই প্রথম তার স্বপ্নে মা নেই, বাবা নেই, তার চিরসাথী সেই দুঃখ বা ডিপ্রেশন নেই। সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। একটা স্বাধীন রাজ্যের বাসিন্দা, তার পাশে একটা ছায়া আছে অবশ্য, জ্যোতির্ময় ছায়া। যতই অদ্ভুত হোক কথাটা, সেই ছায়া সব সময়ে তার ক্লান্তি, অবসাদ, রুক্ষ মেজাজ শুষে নিচ্ছিল। সে হয়ে উঠছিল শক্তিময় কর্মক্ষম, ভারসাম্য সমেত, বাস্তববোধসম্পন্ন অথচ ভাবুক এক মানুষ। এই দিবাস্বপ্ন এত আরামের যে, দিবাস্বপ্ন থেকে সে চলে গেল গভীর ঘুমে। কামরার কাঠে মাথা রেখে সে ঘুমোতে লাগল। চারপাশের কলরোল একটু ঝিমিয়ে এসেছে, আলো কিন্তু কটকট করে জ্বলছেই।

শুকতারা আবার বসতে পেয়েছিল দরজার পাশের সিটে। কিছুক্ষণ পর রূপ তার পাশে এসে বসল।

শুকতারা হঠাৎ বলল, "একটা জিনিস লক্ষ করেছিস রূপ?"

"কী?"

"এই যে আমরা, আমরা যে একদম এই কামরায় বেমানান, সেটা কিন্তু কেউ মার্ক করছে না। আমাদের দিকে তাকাচ্ছেই না। আমার কীরকম একটা অড ফিলিং হচ্ছে, উই আর ইনভিজিবল।"

রূপ হেসে বলল, "বন্যেরা বনে সুন্দর, শুকতারা টেনিস কোর্টে।"

শুকতারা বলল, "তোর কান মুলে দিতে ইচ্ছে করছে। আমি সুন্দর-টুন্দরের কথা বলছি না। ইন্ডিয়ানরা স্বভাবতই কৌতূহলী অথচ এরা আমাদের সম্পর্কে কৌতূহল দেখাচ্ছে না।"

"দেখিয়েছে ইয়ার। আরিয়ানকে জিজ্ঞেস করেছে সে-ও ফিল্মস্টার কিনা, আমাকে কী করতে, কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করেছে। মেয়েদের সঙ্গে আগবাড়িয়ে কথা বলাটা তো ইন্ডিয়ান সভ্যতা নয়, তাই-ই মনে হয়। তবে ঘাবড়াসনি শুক, মনে ওদের যথেষ্ট কৌতূহল। কোনও মহিলার পাশে বসলে টের পেতিস।"

"যাই বল, আমরা বড্ডই কনসপিকুয়াস। এখানে আমাদের তুলে তুই ভালো করিসনি।"

"তোদের একটু হার্ডন করতে চেয়েছিলুম, এখন মনে হচ্ছে হয়তো ঠিক করিনি।"

॥ ১৯ ॥

বর্ষা আর আসছেই না। ছোটখাটো বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু বর্ষা নয়। জুন শেষ হতে চলল। এই শোনা যাচ্ছে, সে আন্দামানে এসে গিয়েছে, এই শোনা যাচ্ছে কেরলে। কিন্তু কোথায় কী! তবে ঝড় উঠছে বিনা নোটিসে। প্রবল গরম তিন কি চার দিন, তারপরেই ঝটপট, ধেয়ে আসে গোঁয়ার ঝড়। বেশ

কিছু গাছ পড়ে, যানজট হয়, কিছু মানুষ মারা যায়, তারপর আবার যথারীতি তাপমাত্রা উঠতে থাকে। অথচ ধ্রুবজ্যোতি এবারে ভীষণ ব্যগ্র প্রকৃত বর্ষার চেহারা দেখতে। অকাল বর্ষা বা বৃষ্টি আর বর্ষাকালের বৃষ্টির তফাতটা ঠিক কোথায়, তিনি সরেজমিনে তদন্ত করতে চান। লোককে বললে হাসবে। লোকটার ষাটের বেশি বয়স হয়ে গেল, এতগুলো বর্ষা দেখল, ফাল্গুন কিংবা আশ্বিনের হঠাৎ-বাদলও বহুবার এঁর দেখার কথা, আসল আষাঢ়ে, শ্রাবণী, ভাদুরে বর্ষার তো প্রশ্নই ওঠে না ঠিকই। কিন্তু ধ্রুবজ্যোতি তবু মনে করছেন, তাঁর সেভাবে অকালবাদল আর আসলবাদল দেখা হয়নি।

হায়ার সেকেন্ডারিতে মিলু বেশ ভালোই করেছে। যদিও সংযুক্তা মনে করেন, ওর বাংলা পেপারের প্রতি পরীক্ষক সুবিচার করেননি। তবু বাংলা অনার্স নিয়ে জেইউ-তে ভর্তি হতে ওর অসুবিধে হল না। ভালো হবে এখন এমএ পর্যন্ত নিশ্চিন্তে চলে যাবে।

সংযুক্তা প্রথমেই বলে দিলেন, "কো-এড, মিলু নিজেকে 'সাবধান সাবধান' বলবি।"

মিলু রীতিমতো তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকাল সংযুক্তার দিকে। যেন বলতে চাইছে, কী ভাবো তুমি আমায়? এত কিছুর পরও আমি...

মিলু যে পুরুষজাতীয় কাউকে বিশ্বাস করে না, তাদের প্রতি যে তার সীমাহীন ঘৃণা, একমাত্র বাবা ছাড়া, এ-কথা ধ্রুবজ্যোতি আন্দাজ করতে পারেন। সংযুক্তা এখনও পারেন না। তাঁর ভয় 'বয়সকাল'কে। বয়সকালের হরমোন মানুষকে বড্ড বিভ্রান্ত করে, বিধ্বস্ত করে। এই ভাবনায় তিনি মিলুর সঙ্গে বেশ একটা সমবয়সিসুলভ দোস্তি পাতিয়ে ফেলেছেন, যাতে মিলু তার মনের-প্রাণের কথা তাঁকে বলে। রকম দেখে ধ্রুবজ্যোতি হাসেন, কিন্তু মিলুকে নিয়ে তিনিও একটু ত্রস্ত, অন্য কারণে। পটকা এবং কটাগোবিন্দর খুনের কিনারা পুলিশ করতে পারেনি। কিন্তু ঘরে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির প্রমাণ তারা পেয়েছে। তৃতীয় ব্যক্তি সম্ভবত মেয়ে, কেননা তারা ঘরে একটি মেয়ের ক্লিপ পেয়েছে। হাতের ছাপ নেই, পায়ের ছাপও কোথাও নেই। কিন্তু তাঁর ভয় হচ্ছে, সত্যিই কি নেই? পুলিশ সব প্রমাণের কথা তো বলে না! মেয়েটা যে পালিয়ে এল কাপড়ে অত রক্ত নিয়ে, পথে কি তার কোনও চিহ্ন ফেলে আসেনি? আসলে খুনটা আবিষ্কৃত হয়েছে তিনদিন পর, তার মধ্যে সব চিহ্ন ধুয়েমুছে গিয়েছে রাস্তাঘাটে। কিন্তু ঘরে? এবং পুলিশ ছাড়া, গুন্ডাগুলোর কোনও লোক যদি জেনে থাকে?

দুটো কুখ্যাত গুন্ডা খুন হয়েছে, ওম শান্তি। এ নিয়ে পুলিশের এত মাথা ঘামাবার দরকারই বা কী! কটাগোবিন্দ তিনবার খুনের দায়ে জেল খেটেছে। প্রত্যেকটা খুনই অনিচ্ছাকৃত বলে রায় দিয়েছে আদালত। ইচ্ছাকৃত হলেই বা কী! সাংঘাতিকের চেয়েও সাংঘাতিক নয় বলে কতজনেরই তো মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে না। কটাগোবিন্দর পিছনে কোন রঙের পলিটিক্স রয়েছে, তা-ও তো জানা যাচ্ছে না। মরেছে আপদ গিয়েছে, কাঁহাতক আর জনগণের পয়সায় খুনে পোষা যায়! কিন্তু ভয় তো তবু যায় না। মিলু আপত্তি করলেও তিনি শোনেন না। তাকে কম্পিউটার ক্লাসে পৌঁছে দেওয়া আর নিয়ে আসা তাঁর একটা কাজ হয়েছে। মেন গেটে মিলু নেমে যায়, তিনি আর একটা স্টপ গিয়ে নেমে পড়েন, ফেরত বাসে ফিরে আসেন। ছুটির সময় উলটো দিকে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকেন। মিলু রাস্তা ক্রস করলেই দু'জনে প্রথম বাসে উঠে পড়েন। এগুলো মিলুকে বন্ধুবান্ধবদের কাছে লজ্জা থেকে বাঁচাতে। এ ছাড়াও একটি কাজ তিনি সংযুক্তার সঙ্গে মিলে যুক্তি করে করেছেন। মিলুর ঝাঁকড়া চুল ছোট, প্রায় বয়কাট করে দেওয়া হয়েছে। তার চোখে পাওয়ার নেই কিন্তু পাওয়ারলেস মোটা ফ্রেমের চশমা পরছে সে। কলেজে যায় ঘাগরা, মিডি-স্কার্ট কিংবা জিনস-টপ পরে। তাকে সত্যিই আর পুরনো মিলু বলে চেনা যাচ্ছে না। আগে সে শাড়ি আর সালোয়ার ছাড়া কিছু পরত না। স্কুলেও শাড়িই ইউনিফর্ম ছিল। এই পরিবর্তনে মিলুরই সবচেয়ে কম সায় ছিল, বিশেষ করে জিন্‌স পরে হাঁটার সাহসই সে অনেকদিন পায়নি। অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে, বাড়িতে প্র্যাকটিস করে, জিনিসটা চালু করতে হয়েছে। তবে ক্রমশ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠছে সে।

বিজয় সুর তাঁর সেই প্রতিবেশী, একদিন খপাত করে ধরলেন তাঁকে।

"বুঝলেন দাদা, এদের লাই দিতে নেই।"

"কাদের কথা বলছেন?"

"এই ধরুন, ঝিয়ের মেয়ে-টেয়ে...ফ্যাশন কী ধরেছে, খেয়াল করেছেন? আপনার ওই..."

"কী, ঝিয়ের মেয়ে? প্লিজ বিজয়বাবু, ও কথাটা আর বলবেন না, বিশ্রী লাগে। মেয়েটিকে আমরা নিজের মেয়ের মতো পালন করছি। আবার যদি কথাটা বলেন, আমি অফেনস নেব। কী ফ্যাশন দেখলেন?"

"বাঃ চুলের কাট কী! চশমা পরে, প্যান্টুলুন পরে, যখন হেঁটে যায়, আমার-আপনার মেয়ের সঙ্গে তফাত ধরতে পারবেন না।"

"বাংলায় কত পেয়েছে জানেন? বাহাত্তর পারসেন্ট। ওর মা বলছে, আরও বেশি পাওয়া উচিত ছিল।"

"বলেন কী? তবে ইংরিজি, নিশ্চয় ধেড়িয়েছে?

"সেভেনটি পার্সেন্ট।"

"বলেন কী? ও তো তৃণাকে ছাড়িয়ে গেল তা হলে। কবে থেকে বলছি দাদা, আমার মেয়েটাকে একটু কোচ করে দিন।"

"আরে আপনার তৃণা চমৎকার মেয়ে। পিছনে লেগে থাকাটা একটু বন্ধ করুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মিলুর বাংলা ও ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে সংযুক্তা এমন পড়লেন যে, ধ্রুবজ্যোতি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলেন, "কী গো, ওকে দিয়ে কি খবর পড়াবে?"

উত্তরে সংযুক্তা একটা রহস্যময় হাসি দিলেন।

গানের জন্য বাড়িতেই এক উচ্চাঙ্গ সংগীতের ট্রেনারকে রেখে দিলেন ধ্রুব। অতবার নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসার হাঙ্গামা পোষায় না। মিলুর একটা গুণ হল, সে খুব বাধ্য। গান, লেখাপড়া দুটোই সে ভালোবাসে, উপভোগ করে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে রবীন্দ্রসংগীত শিখতে চাইছিল অথচ বাবা তাকে এক ক্ল্যাসিক্যাল ট্রেনার এনে দিলেন। কিন্তু বাবা যখন তাকে বোঝালেন যে, গানের ভিত্তি আগে তৈরি করে নিতে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক দরকার, তখন ভালো না লাগা সত্ত্বেও সে মেনে নিল এবং অচিরেই দেখা গেল সে রাগসংগীতে মজেছে। ভালো পারছে না। কিন্তু রেডিও খুলে শুনছে। মিলুর গলার আওয়াজ খুব পরিষ্কার নয়, অথচ ভাব আছে খুব। মাস্টারমশাই তাকে ক্রমাগতই পালটা সাধাচ্ছেন। জিনিসটা ক্লান্তিকর কিন্তু মিলুর অধ্যবসায় দেখার মতো।

ভোল, ভোল মিলু, ভুলে যা কোথায় জন্মেছিলি। কে তোকে বিক্রি করে দিয়েছিল, সেখানকার ক্লিন্ন অভিজ্ঞতা, ভুলে যা। দারোগার বুটের লাথি, দারোগা-গিন্নির চাবির বাড়ি, ভুলে যা। সব ভোলবার পর জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সময়ে আবার ফিরে-ফিরে আসা সেই একই চেহারার পৃথিবীতে। সবচেয়ে জরুরি ভুলে যাওয়া, তুই দুটো মানুষকে খুন করতে বাধ্য হয়েছিলি।

তবু কোনও-কোনও রাত্তিরবেলায় মিলু ঘুমোতে-ঘুমোতে হঠাৎ কঁকিয়ে ওঠে। সংযুক্তা বলেন, "দুঃস্বপ্ন দেখছিস, পাশ ফিরে শো।"

"না, বাবাকে ডাকো," মিলু এমন করে বলে যেন, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ধ্রুব আসেন। "কী হল?"

"বলো আগে আমায় ধরিয়ে দেবে না?"

"প্রশ্নই নেই, মিলু আমি মনে করি তুই ঠিক কাজ করেছিস।"

"পুলিশে যদি আমায় খুঁজে বার করে?"

"চান্স নেই," নিজের মনের সংশয় সত্ত্বেও ধ্রুব বলেন।

মিলু আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়ে। ওকে প্রায়ই একটা হালকা ঘুমের ওষুধ দিতে হয়। মিলুর জন্যে যোগব্যায়ামের শিক্ষকও রেখে দিলেন ধ্রুব। মহিলা। এবং অবশেষে এই বুড়ো বয়সে একটা গাড়ি কিনলেন, ছোট গাড়ি। তিনজনে আরামসে ঘুরে বেড়ানো যাবে।

অবশেষে বর্ষা এলেন, ভোরবেলা লেকের ধার থেকে ভদ্রমহিলাকে দেখলেন ধ্রুবজ্যোতি। ভুষো কালির রং। প্রবল মোটা। থাকে থাকে চর্বি। পেট, পিঠ, কোমর আলাদা করা যায় না। গম্ভীর, কতটা রাগী এখনও বোঝা যাচ্ছে না। পশ্চিমদিক থেকে আস্তে আস্তে উঠে আসছেন। দেখতে-দেখতে ছেয়ে গেল গোটা আকাশ। বিদ্যুৎ চিড়িক মারতে লাগল। মনু দীক্ষিত বললেন, "ফিরুন দাদা। ওরে ব্বাপ! মেঘ তো নয়, পাহাড় একটা।"

টপটপ করে জল পড়তে লাগল। ঠিক যেন কেউ কাঁদছে। ছাতা নেই, বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন ধ্রুবজ্যোতি। রাস্তা পার হতে না হতেই আকাশ ভেঙে পড়ল। কাকভেজা হয়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। গরম জলে চান, আদা দিয়ে চা। কিছুতেই কিছু না। মাথা টিপটিপ করছে, চোখে জ্বালা, নির্ঘাত জ্বর আসছে। আরও এক কাপ দিবি মিলু? মিলু কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ে আসে, "কেন যে ছাতা নিয়ে বেরোও না।"

"আরে তুক আছে, আমি ছাতা নিলে বৃষ্টি পড়ে না।"

"কী জানি বাবা, আমি তো বরাবর উলটোটাই শুনেছি," সংযুক্তা বললেন।

"আমি আসলে বর্ষার বৃষ্টি আর এই চৈত-ফাগুনের বৃষ্টির তফাতটা ধরতে চাইছিলুম," কেন কথাটা বললেন, কেন এ-তফাত ধরতে চান ধ্রুব নিজে জানেন। আর কেউ তো জানে না।

তাই সংযুক্তা হেসে কূল পান না, "তার জন্যে ভিজতে হল, তুমি যে কী বোকা।"

মিলু বলল, "চৈত-ফাগুনের বিষ্টি খুব লোক্যালাইজড হয়, বাবা। ঘনঘটা থাকে না। যখন হল, খুব বীরবিক্রমে হল। তারপর যেই হয়ে গেল, আকাশ যেমনকে তেমন। দিনের বেলা হলে রোদ-ঝিকমিক, রাত হলে তারা-চিকমিক। জমি সে জলটুকু শুষেও নেয়।

ধ্রুব সংযুক্তার সঙ্গে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কী সুন্দর বলল।

যেমনকে তেমন। রোদ ঝিকমিক, তারা চিকমিক!

ওপার বাংলার অখ্যাত সেই গ্রাম কি ভাবতে পেরেছিল তার অবহেলা, নির্যাতনের পাঁশকুড়ো থেকে এমন আকাশ দেখা যাবে? আকাশটা কি তাঁরা মিলুকে দিলেন না, সেটা ওর ভেতরেই ছিল? মনে পড়ে যায়, সেই শিল্পীর কথা—কেমন করে অত বড় পাথরে মূর্তিটা গড়লেন? শিল্পী বললেন, "মূর্তিটা পাথরেই ছিল, চারপাশে থেকে অতিরিক্তটুকু খালি ছেঁটে দিয়েছি।"

"নাঃ, বেশ ফ্যাঁচফ্যাচানি হচ্ছে, ধ্যাত্তেরি।"

"ভাপ নাও একটু," সংযুক্তা বললেন।

"আবার ভাপ?"

মিলু গরম জলের কেটলি নিয়ে এল, সংযুক্তা তোয়ালে বার করলেন। পাঁচ মিনিট ভাপ নেওয়ার পর গরম লুচি আর আলু-মরিচ এল। কোনওমতে খেয়ে নিয়ে বিছানায় কাত হলেন ধ্রুব। ঝিমঝিম করছে শরীর, মাথাটা যেন আর এখানে নেই, বনবন করে ঘুরতে-ঘুরতে কোথায় চলে গিয়েছে।

॥ ২০ ॥

পাহাড়ে ওঠার ভালো রাস্তা আছে। সবাই সেই পথ দিয়েই যায়। কিন্তু যদি নতুন কিছু করতে চান, দেখতে চান তা হলে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ট্রেক করাই ভালো। কী দেখবেন না দেখবেন আমি বলে দিচ্ছি না, নিজেরা আবিষ্কার করুন, আনন্দ পাবেন। তবে ওই পাহাড়ের মাথাটা তো ফ্ল্যাট, মালভূমি

যাকে বলে, মজা নেই। বড় জন্তুজানোয়ার নেই, বরা ছাড়া। ভয়ের কিছু নেই, মশা থেকে সাবধান। হিল ম্যালেরিয়া অবশ্য এ সময়টায় হয় না, তবু সাবধানের মার নেই। ট্রেকিং-এর যাবতীয় সরঞ্জাম বুঝিয়ে দিতে-দিতে পরেশ মাহাতো বললেন।

'পুরুলিয়া ট্রেকার্স-অ্যাসোসিয়েশন' ওদের সঙ্গে তিনটি মেয়ে আছে দেখে, প্রথমটা ওদের নিবৃত্ত করবারই চেষ্টা করছিল। একজন টেনিস প্লেয়ার, স্টেট লেভেলে খেলে, আর একজন ডিস্ট্রিক্ট লেভল স্প্রিন্ট চ্যাম্পিয়ন শুনে আর কিছু বলেনি। তবে মাল বইবার ও কিছুটা গাইডগিরি করবার জন্য একজন লোক দিতে চাইলে ওরাও আপত্তি করল না।

জিপে করে মাইল পঞ্চাশেক রাস্তা, বাঘমুণ্ডি পেরিয়ে একেবারে পাহাড়ের তলা থেকেই ওরা চড়তে শুরু করবে। এতটা আরাম অবশ্য রূপরাজদের প্ল্যানে ছিল না। কিন্তু দিয়া জেদ ধরে বসল। বলল, "এইটা আমি ফিনান্স করছি, না বলবি না। আসল সময়ের জন্য এনার্জি থাকবে না, অন্তত আমার।" সত্যিই দিয়াটা দুবলি, ডেলিকেট-ডেলিকেট একটা ভাব আছে ওর। খেলাধুলো একটু-আধটু করলেও, অন্যদের সঙ্গে এ-ব্যাপারে তুলনাই হয় না। নাচেও অবশ্য যথেষ্ট পরিশ্রম লাগে এবং দিয়া যেভাবে নাচটা অবলীলায় করে দেখাল, মনে হয় খুব সহজ। কিন্তু ততটা নমনীয়তা তো আর এক দিনে, কোনও ব্যায়াম ছাড়া সম্ভব হয়নি। ঠিক আছে, বলছে যখন পারবে না, জোর করার দরকার নেই।

একটু এগোতেই পাহাড় তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষের উপরে। ঝোপঝাড়ই বেশি কিন্তু গাছ যা আছে, তাদের গাছ বলে মনে হয় না। যেন মশালমানুষ। ইতস্তত পলাশ গাছে ফুল ফুটে পাহাড় আলো হয়ে রয়েছে। গাইড দেখিয়ে দিল, ওইগুলো কুসুমগাছ। পাতাগুলো লাল হয়ে ছোট-ছোট অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে। ওরা বেশিদিন এমন থাকবে না। ভাগ্য ভালো, এই কুসুমবন এখনও তার আগুনের রূপ ধরে রেখেছে। কেঁদ, মহুয়ার কালচে সবুজ, পলাশ-কুসুমের দু'রকম লাল, শিরীষের হালকাতর সবুজ, সেগুনের বড় বড় পাতার মধ্যে থেকে মাথা উঁচিয়ে থাকা মঞ্জরী। যতই ওঠে, এপাশে ওপাশে ঝোরা দেখতে পায়। খুব সামান্য জল কিন্তু কাচের মতো স্বচ্ছ জলের প্রতিভাই আলাদা। বনময়, পথময় বিছিয়ে আছে মহুয়ার ফল। কোলরা কুড়োচ্ছে কোথাও-কোথাও। মাতাল হয়ে আছে হাওয়া।

"কীরকম লাগছে?" রূপরাজ জিজ্ঞেস করল। তার পছন্দ করা জায়গা, তাই তার আলাদা খাতির এখন।

আরিয়ান বলল, "ফ্যানটাস্টিক। হ্যাটস অফ টু ইউ, রূপরাজ।"

উজ্জ্বল যোগ করল, "বনরাজ, ট্রেকরাজ, থ্রি চিয়ার্স।"

দিয়ার মুখে একটা মুগ্ধ, বিহ্বলভাব। সে সেই চোখ-মুখ উঁচু করে পলাশ দেখছে।

বাবাই পাথর টপকে-টপকে খেলতে-খেলতে যাচ্ছে। সে-ও কিছু বলল না।

শুকতারা বলল, "রূপ তোর স্টকে এরকম আর ক'টা আছে রে!"

বড় বড় পায়ে এগিয়ে যায় সবাই। আস্তে আস্তে উঠতে থাকে।

ঠিক হল, ক্যাম্প এক জায়গাতেই খাটানো হবে। সেটাকে ঘিরে কাছাকাছি জায়গাগুলো এক্সপ্লোর করা হবে। পথটাই লক্ষ্য, অযোধ্যা পাহাড়ের মালভূমির উপর কারও তেমন টান নেই। গাইডটি ক্যাম্প করবার মতো জায়গা খুঁজে দিল দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ। একটা মুণ্ডা বসতির মধ্যে দিয়ে উঠে এল ওরা। কিছু দূরে জঙ্গলের আড়ালে একটা ঝোরা আছে। সমতল, চওড়া, লম্বাটে জায়গাটা। ঝোপঝাড় কেটে ফেলল গাইডসহ বাকি তিনজন। একটা পাথরের উপর বসে লম্বা একটা সিগারেট ধরাল শুকতারা।

এই সুন্দর জঙ্গল আর মহুল গন্ধের সঙ্গে সিগারেট যায় না বলতে শুকতারার মন্তব্য হল, 'মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ।'

"দেখিস, আবার গাঁজা টানছিস না তো?" আরিয়ানের মন্তব্য। প্রথমে শুকতারা জবাব দিল না। *একটু পরে বিদ্রূপের সুরে বলল, "ওগুলো তোদের আর তোদের ওই ফক্কড় ক্লাবটার সমস্যা,* আমার না। ইনফেমাস ক্লাব একটা।"

দিয়া কিছুই শুনছে না, সে পাখি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ডাক শোনা যাচ্ছে, অথচ পাখি দেখা যাচ্ছে না। বাবাই একটা গাছে ঠেস দিয়ে নোটবই বার করল। সে খুঁটিনাটি লিখে রাখছে ভ্রমণের, কিন্তু কাউকে দেখাচ্ছে না।

একটাই ক্যাম্প, মিলিটারি সবুজ রঙের। রান্না বাইরে হবে। গাইড বলল, কাঠকুটোর অভাব হবে না। তবে ওরা তো সঙ্গে কেরোসিন-স্টোভ এনেইছে। ক্যাম্পের মধ্যে একধারে ওদের জিনিসপত্র নামানো হল, নেহাত কম নয়। শুকতারা মাঝখানে দাঁড়িয়ে হেঁকে বলল, "এইটুকু জায়গা, ছ'টা স্লিপিং ব্যাগ সেফ ডিসট্যান্সে ফেলে পাতবার জায়গা হবে? তোরা যদি আমাদের শ্লীলতাহানি করিস, বিশ্রী ব্যাপার হয়ে যাবে। কেননা আমার দুটো আঙুল স্রেফ তোদের দু'চোখে ঢুকে যাবে। নখগুলো দেখেছিস তো?" আঙুল ছড়িয়ে নখ দেখাল শুকতারা।

আরিয়ান হাসতে লাগল, "আরে ইয়ার, তুই আমাদের শ্লীলতাহানি করবি কিনা সেই গ্যারান্টি দে আগে।"

বাকিরা একটু-আধটু হাসলেও দিয়া অন্যমনস্ক। বাবাই তার নোটবুক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। সে একটু গম্ভীর, যতক্ষণ পেরেছে বাবা-মা'র সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গিয়েছে। বাঘমুণ্ডি থেকে আর টাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে না।

উজ্জ্বল একটা বড় চাদর বের করল নিঃশব্দে। তারপর ক্যাম্পের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সেটা পর্দার মতো খাটিয়ে ফেলল ঠিক মাঝখানটায়। বলল, "সিনেমা দেখিস না? এ-সব সিচুয়েশনে শাড়ি খুব কাজে লাগে। তোরা তো শাড়ি কী জিনিস ভুলে গিয়েছিস। কাজেই এই চাদরটা দিয়ে চালিয়ে নে। ও-পাশটা তোদের প্রাইভেসি, এ-পাশটা আমাদের।"

রূপ রাঁধল খিচুড়ি। সে তার স্কাউটিং দিনগুলোর মকশো করছে। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ একসঙ্গে চাপিয়ে দিয়েছে। হলুদ আর নুন, অনেকটা ঘি ছড়িয়ে দিয়ে নামাল।

"ভাল শেফ", আরিয়ান বলল।

উজ্জ্বলের মন্তব্য, "খাসা রেঁধেছিস।"

শুকতারা বলল, "এত ঘি রোজ দু'বেলা খাওয়াবি নাকি। তবে তো আমার টুয়েলভ ও' ক্লক বেজে যাবে রে!"

"কী রে তোরা কিছু বলছিস না?" রূপ একটু চিন্তিত। বাবাই আর দিয়া কেন যে এত চুপচাপ।

আরিয়ান বলল, "ওরা সামহাউ ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব হয়ে গিয়েছে।"

দিয়া বলল, "এই জায়গার সঙ্গে এই খিচুড়ি ছাড়া আর কিছুই মানাত না।"

বাবাই হেসে বলল, "চলে যায়" এতক্ষণে সে একটু হাসল।

খাওয়া শেষ হতে হতে চারটে বেজে গেল। সবাই যার যে-দিকে ইচ্ছে ছিটিয়ে পড়ল এবার। প্রত্যেকের হাতে টর্চ। একটা করে লাঠি। সূর্য লুকোচুরি খেলছে গাছগুলোর সঙ্গে। খেলতে-খেলতে একেবারে লুকিয়ে পড়ল। তাকে দেখা যাচ্ছে না। অথচ একটা মৃদু মোমআলোয় ছেয়ে রয়েছে চরাচর। সেই আলোয় ঘুরতে-ঘুরতে উজ্জ্বল এসে বলে গেল ওদের, "আর কিছু না থাকলেও শেয়াল আর হায়না আছে, অন্ধকারে খুব বেশি ঘুরিস না। ক্যাম্পের পাশে একটা কেঁদ গাছের ডালে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখল ওরা। অন্ধকার ভারী হয়ে নামতে লাগল।"

কী অদ্ভুত অন্ধকার! বাদুড়ের ডানা যেন ক্রমশ মুড়ে ফেলছে তাদের, আকাশে কৃষ্ণপক্ষের পাখসাট। ছিটকে যাচ্ছে তারার ফুলকি। গাছপালা, ঝোপঝাড় সব যেন মুণ্ডা-জুয়াংদের সাসানদিরি কিংবা তাদের নানা রকমের বোঙা, সব জীবন্ত। কিন্তু খালি অর্ধেকটা। চট করে জানান দেবে না কেউ যে তারা

জ্যান্ত। বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে বুনো পোকার এরোপ্লেন। গায়ের মলমের গন্ধে তারা ছিটকে বেরিয়ে যায় ঝোপঝাড়ে অন্য প্রাণীর সন্ধানে। ঝিঁঝি কোমল ধা-এ ঐকতান শুরু করে। ক্রমশ চড়ে, আরও চড়ে, তারপর পঞ্চমে গিয়ে অবশেষে ঝমঝম করে বাজতে থাকে ঘুঙুর। সাবধান, খুব সাবধান, ফিসফিস করে কে কাকে বলে। শহরের ক্লাবের হঠাৎ-অন্ধকারের থেকে এই প্রাকৃতিক অন্ধকার অনেকগুণ নিবিড়। কিন্তু...ওইরকম অশালীন কী, অশ্লীল? মনে তো হয় না। এই অন্ধকারের একমাত্র বিশেষণ হয়, 'সাবলাইম।" কিন্তু যে যেভাবে নেয়। টর্চের শহরে আলোর বিন্দু যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। জোনাকির চেয়ে জোরালো, স্থায়ী আলো। একমাত্র মালিকের ইচ্ছেতে নেভে, একদম মানায় না। এই জঙ্গলে আঁধারে হায়নার জ্বলজ্বলে চোখই বেশি মানানসই। মুণ্ডা বসতি থেকে হল্লার আওয়াজ, অস্পষ্ট গান, হাওয়ায়-হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়। কখনও নিকট, কখনও দূর। টর্চের খেলা চলে। দুটো বিন্দু একত্র হয়, তিনটে। তারপর টুক করে নিভে যায়। একটা টর্চ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে চলে যায়। যেখানে মিটমিটে হলেও মানুষের আলো, মানুষের হল্লা। জংলি হলেও মানুষ-গলার গান একঘেয়ে সুরে, ধামসা মাদল কখনও, অনভ্যাসের এবং দিশি হলেও মহুল মদ।

"আমি এত রিস্ক নিতে পারব না," অন্ধকারের মধ্যে একজনের চিন্তা ডানা মেলে উড়ে গিয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল কেঁদ গাছের নীচের ডালে।

"প্ল্যানটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছে, সেটাই এখনও জানা গেল না।" আর একজনের ভাবনা জোনাকিদের সঙ্গে উড়ে বেড়ায়। দপ করে জ্বলে উঠছে এখানে, ওখানে।

"আগাপাশতলা কিছুই তো জানি না। বিগিনিং, মিডল আর এন্ড।"

"এত ভয় জীবনে কখনও করেনি।"

"বেশ একসাইটিং লাগছে আমার। জীবনটা কী? একটা বাঁধা পথে চলা আর চলা, যতক্ষণ না বাঁধা পথ শেষ হয়। তার চেয়ে এরকম অন্ধকার, রহস্য এরকম সাসপেন্স ভালো।"

"কীভাবে ওকে একা পাওয়া যায়!"

"কোথায় গেল ও, যাকে নজর রাখতে বলেছিলাম সে কি রাখছে?"

"একজনের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করা খুব সহজ। কিন্তু তার উপর নজর রাখা হয়েছে।"

"কী করে ওকে একা পাওয়া যায়?"

"এত ভয় আমি জীবনে পাইনি।"

"এতটা রিস্‌ক নেওয়া কি ঠিক হচ্ছে?"

জোনাকি উড়ে যায়, তারা খসতে থাকে, রাতের আকাশ খণ্ড-খণ্ড আলোর দীপিকা হয়ে তাদের আয়ত্তের বাইরে থেকে যায়।

ধামসা-মাদল বাজতে থাকে, গান হতে থাকে অনেক রাত পর্যন্ত। মহুয়ার উৎসব বাঁধনছাড়া হয়ে যায়, তারপর তারায় ভরা আকাশের তলায় ঘুমন্ত দেহগুলি ছড়িয়ে থাকে।

কে যেন তার কানে কানে বলতে থাকে, "আরে ইয়ার বোল তো দো, কিসকো আচ্ছা লাগতা?"

সে বলে, "উও জো খিলাড়ি সেক্সি বেব হ্যায় না, উও মেরি দিল কী আগ।"

"দিল কী আগ তো দিল কী বাত করো।"

"আগ হ্যায় না আগ আগ!"

॥ ২১ ॥

ঘষা কাচের মতো ভোর। একটা নীলচে কুয়াশা ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। অদ্ভুত শান্ত, নির্জন ভোর। শীত-শীত করছে। দিয়া উঠে বসল। সে, সে-ই একমাত্র গাঢ় ঘুম ঘুমিয়েছে। শুয়েছিল মাঝখানে। একদিকে শুকতারা, আর এক দিকে বাবাই। এত চমৎকার ঘুম সে বহুদিন ঘুমোয়নি। বাবাইকে ঠেলল,

বাবাই ভোরের দিকে ঘুমিয়েছিল, জাগল না। তখন সে শুকতারাকে ঠেলল।

শুকতারা চোখ কচলে উঠে বসল, "হিসি, পটি নাকি?"

"আহ, চেঁচাস না," দিয়া বিরক্ত হয়ে বলল।

দু'জনে ছোট ঝোলা ব্যাগ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। চোখে পড়ল ঘষা কাচের মতো সেই ভোর, নীলচে কুয়াশা, ঘাসের ওপর টুলটুলে শিশির, পাখিদের ঘুমভাঙা গলার আধো-আধো ডাক। কাঠবেড়ালি ছুটে গিয়ে একটা শিরীষ গাছে উঠে পড়ল তুরতুর করে। বোঁ-বোঁ করে একটা গাঢ় হলুদ বোলতা ঘুরছে। সোঁদা-সোঁদা গন্ধ উঠছে মাটি থেকে।

দিয়া বলল, "পৃথিবী একদিন এমনই ছিল। দ্যাখ শুক, আমরা পৃথিবীর শৈশব দেখছি।"

"হল কী তোর?" শুকতারা আড়চোখে চেয়ে বলল।

ধুপধাপ শব্দ। দু'জনেই চমকে ওঠে, বাঁদর নাকি?

বাবাই ছুটতে-ছুটতে এসে উপস্থিত হল, "আমাকে ডাকিসনি?"

"কতবার ঠেললাম তুই চোখ চাইলিই না," দিয়া বলল।

"কী করব বল, সারারাত ঘুমোইনি। এরকম অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ঘুমোনোর অভ্যেস আছে নাকি?"

"আমি তো খুব ঘুমোলাম," দিয়া চোখমুখে একটা আরামের ভঙ্গি করল।

"সে তুই মাঝখানে ছিলি বলে।"

বাবাই আরও কিছু বলতে গিয়ে সামলে নিল।

তিনজনে উপর দিকে উঠতে লাগল জলের সন্ধানে।

ওদের প্রাতঃকৃত্যে রেখে আমরা ফিরে আসি তাঁবুর ভেতরে। জেগে গিয়েছে উজ্জ্বল, রূপ। খালি আরিয়ান অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

"এই কি ট্রেকিং-এর নমুনা?" আড়চোখে আরিয়ানের বাঁকাচোরা শরীরটার দিকে চেয়ে উজ্জ্বল বলল, "মুণ্ডা বস্তিতে গিয়ে নাচা-গানা-পিনা।"

"ওর মুখোশটা খুলে দিতে চাইছিলুম," রূপ বলল। "এসব জায়গায় এসে আদিবাসীদের নাচ-গান দেখতে অনেকেই যায়। আমরাই হয়তো যেতুম, অন্য সময়ে। সেটা কিন্তু না, পাল্লায় পড়ে এরকম মহুয়া গেলাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ও একা-একা চুপিচুপি গেল কেন? আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে, একেবারে আমাদের মতোই হাসিঠাট্টা করছে, যেন..."

উজ্জ্বল ঠোঁটে আঙুল রাখল, রূপ থেমে গেল। উজ্জ্বলের ইশারায় তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল।

বাইরে ভোরের গায়ে একটু রোদ-রোদ রং লেগেছে।

"ছেমরিগুলো গেল কোথায়?" উজ্জ্বল এদিক ওদিক চাইতে লাগল, "ও কিন্তু ভালো অ্যাক্টিং করতে পারে রূপ। মহুয়া গিলে ঘুমোচ্ছে বলে মনে করিস না ও সেফ, সামনে কোনও কথা বলবি না।"

রূপ বলল, "তোকে বলতে চাইছিলুম ও অ্যাক্টিংটা ভালোই পারে, আই নো দ্যাট। আমি অনেকদিন ধরে চিনি, ফান্টু একটা। ও যে এখানে আমাদের সঙ্গে এল, এইভাবে কথাবার্তা বলছে, যেন আমাদেরই একজন, এসব কাউকে ইমপ্রেস করার জন্যে।"

"ইজ হি রিয়্যালি ইন লাভ?"

রূপ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। একটু পরে দাঁতে নখ কাটতে কাটতে বলল, "তুই আমাকে বলতে পারিস উজ্জ্বল, হোয়াট দ্যাট ওয়ার্ড রিয়্যালি মিন্স!"

উজ্জ্বল একটু যেন ভাবুক। বলল, "সে যাই হোক, উদ্দেশ্য যদি ভালো না হয় তো?"

"উদ্দেশ্য ভালো নয় মানে?"

"মানেটা তুমি জানো না, ভড়কি দিচ্ছ উজ্জ্বল মিত্তিরকে?"

"না, না, বিয়ে-টিয়ের কথা বলছিস?"

"অতদূর না ভাবলেও অনেস্টলি মেলামেশা কর। হ্যাভ সাম রেসপেক্ট ফর হার। সিম্পলি পজেসিভ না হয়ে প্রোটেকটিভ হও। প্রধান হচ্ছে, ভালো লাগাটা কমন গ্রাউন্ডস-এর উপর কিনা।"

"দু'জনকে এক রকম হতে হবে বলছিস? এ নিউজিল্যান্ডকে সাপোর্ট করে বলে, ওর শ্রীলঙ্কাকে সাপোর্ট করা চলবে না?"

"ভাবালি তুই," উজ্জ্বল হেসে ফেলল।

এই সময়ে উপর থেকে শুকতারাকে পাথর টপকে-টপকে আসতে দেখল ওরা।

মুখে জল চিকচিক করছে, চুল খোলা, ফ্রেশ দেখাচ্ছে। শর্টস আর ঢোল্লা টপ পরে, শুকতারাকে এই শিরীষ-মহুল বনে বিদেশি গাছের মতো দেখায় যেন। ওদের দেখেই শুকতারা গলা সপ্তমে চড়িয়ে একখানা ইংরিজি পপ গান ধরল।

উজ্জ্বল বলল, "প্রাণে পুলক জেগেছে রে, কী ভাগ্য অযোধ্যা পাহাড়ের!"

নেমে এল শুকতারা। বলল, "তোদের স্পটটা চমৎকার, ট্রেকিং দুর্ধর্ষ হবে। খিচুড়িটাও ব্যাপক বানাচ্ছিস। কিন্তু হিসু-পটি পেলে মাইল-মাইল পাহাড় ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ানো শুকতারা পোষাবে না।"

রূপ বলল, "তা তুমি কি ভেবেছিলে, এখানে তোমার জন্যে ওয়েস্টার্ন স্টাইল ডব্লু সি কোলে নিয়ে বসে আছে প্রকৃতি?"

"আজ্ঞে না, কিন্তু নিজেরা যেখানে-সেখানে ছেড়ে দিতে পারো বলে আমাদের অসুবিধে বুঝবে না? অন্য দুই মক্কেলও আসছে তাদের জিজ্ঞেস কর। আমি কিন্তু আজকেই নেবে যাচ্ছি" গলা নামিয়ে বলল।" মোটামুটি স্পটটা আমার জানা হয়ে গেল, আই'ল ওয়েট ফর ইউ।"

"না না শুক, তা হয় না। দিস ইজ আনএক্সপেক্টেড, এভরিবডি ইজ নিডেড।"

"আরে বাবা, আই নো। কিন্তু ফিরে গিয়েও আমি তোদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারব।"

শুকতারা সাঁ করে টেন্টের মধ্যে ঢুকে গেল।

রূপ বলল, "চেষ্টা করে লাভ নেই। ওকে আটকাতে পারবে না।"

"বাট দিস ইজ বিট্রেয়াল।"

"আজ্ঞে না, বিট্রেয়াল নয়। আরিয়ানকে বলে দিবি শুকের শরীর খারাপ, পেট খারাপ তাই নেমে গিয়েছে। ইট ইজ পার্টলি ট্রু," শুকতারা টেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে বলল। তারপর আবার ঢুকে গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে নিজের ব্যাকপ্যাক, ঝোলাঝুলি সব গুছিয়ে পোশাক পরে তৈরি।

"এই যদি তোর মনে ছিল তো এলি কেন," রূপ বলে ফেলল।

"ইউ জাস্ট ট্রাস্ট মি ইয়ার," শুকতারা দু'জনের দিকে তাকাল। তারপর তরতর করে এগিয়ে গেল। নামতে-নামতে বাঁকের মুখে অদৃশ্য। দু'জনে আপাদমস্তক হতাশ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময়ে কলকল শোনা গেল। বাবাই আগে, দিয়া পিছনে আসছে। তাদের চান সারা। জামাকাপড় বদলানো হয়ে গিয়েছে, দু'জনেই ট্র্যাক্স পরেছে। মুখ খুশিতে উজ্জ্বল।

বাবাই উচ্ছ্বসিতভাবে বলল, "বাঁকের মুখে ঝরনাটা কী সুন্দর, কী সুন্দর। বলে বোঝাতে পারব না, ফিরতে ইচ্ছে করছিল না।"

"যাক, বাবা-মায়ের দুলালির মুখে হাসি ফুটেছে," রূপরাজ বলল।

দিয়া হাত ছড়িয়ে বলল, "এত বড় আকাশটা আমাদের, জঙ্গলটা আমাদের, ঝরনাটা, সব, স—ব আমাদের। না, আমার একার।"

বাবাই হঠাৎ টেন্টে ঢুকে চেঁচাতে লাগল, "আরিয়ান, এই আরিয়ান ওঠো। আমরা সবাই কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছি।

তড়াক করে উঠে বসল আরিয়ান, "এক কাপ কালো কফি দিতে পারো হানি, ওহ সরি।"

"বাইরে বেরিয়ে আয়। আকাশের তলায় বসে খাব আমরা। খোলা আকাশ দেখেছিস কখনও?"

একটু পরে ওদের খেয়াল হল শুক কোথায় গেল?

উজ্জ্বল বলল, "ওর খুব পেট খারাপ হয়েছে, মাইল-মাইল চড়াই ভেঙে অনবরত যাওয়া-আসা নাকি অসম্ভব, তাই ওকে আপাতত ওষুধটষুধ দিয়ে নীচে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

আরিয়ান একটু রেগে বলল, "মানে, ও তো ওষুধ খেয়ে এখানেই শুয়ে থাকতে পারত। কে বলেছে, ওকে তিন মাইল দূরে যেতে হবে?"

"আমিও তাই বলেছিলুম," রূপ বলল। "কিছুতেই রইল না। বলল, রাত্তিরে যাওয়ার দরকার হলে কী করব?

দিয়া বলল, "ছাড়, শুক ওরকমই। ভীষণ খেয়ালি। কোনও প্ল্যান ওর জন্যে করা যায় না।"

বাবাই বলল, "যাঃ, ভীষণ আনস্পোর্টিং। আমি ভাবতেই পারছি না, শুক চলে গিয়েছে।"

"চলে না-ও যেতে পারে, নীচে তো আপাতত নেমেছে। দেখা যাক।"

"এতটা বাস জার্নি করে যাবে অসুস্থ অবস্থায়?" আরিয়ান যেন গজরাচ্ছে।

"আরে না না, মাঠাবুরুতে একটা ডাকবাংলো আছে না? ওখানে দু'দিন থেকে ঠিকঠাক হয়ে চলে আসবে। যদিও তখন আমাদের চলে যাওয়ার সময় হয়ে যাবে।"

"আসলে শুক্স এত কষ্ট করতে পারে না। কষ্ট বলতে ফিজিক্যাল নয়, লিভিং-এর কষ্ট। ওর হট এন কোল্ড শাওয়ার, ওর এসি সুইমিং পুল...ওর নানান রকম আউটফিটস," আরিয়ান বলল।

"তা হলে তো কোনও দিনই অ্যাডভেঞ্চার করতে পারবে না। নতুন নতুন জায়গা দেখাও হবে না," বাবাই আশ্চর্য।

"কেন হবে না? ফাইভ স্টার ফোর স্টার হোটেলে থাকবে, স্কুবা ডাইভিং করবে কোরালরিফে, ওয়াটার স্কিয়িং করবে...এইসব অ্যাডভেঞ্চার।"

হতাশ গলায় বাবাই বলল, "ও কি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্স-এর অ্যাডভেঞ্চারগুলো দেখে না? ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে জন্মালেই পারত। তবে সেখানেও স্কুল ডে'জ থেকেই বাচ্চাদের নানা এক্সকারশনে নিয়ে যায়। সেগুলো বুনো, পাহাড়ি, জংলি জায়গাতেই হয়।"

আরিয়ান তার দিকে তাকিয়ে কালো কফিতে চুমুক দিল, "আমি কিন্তু ওর মতো নই।"

উজ্জ্বল বলল, "স্বাভাবিক, তুই আফটার অল একটা পুরুষমানুষ। কিছু হল না হল, পালিয়ে যাওয়ার কাপুরুষতা তোর কাছ থেকে এক্সপেক্ট করা যায় না।"

"দেখ, আমরা কে কতটা কাপুরুষ, কে কতটা মিন, কার অ্যাডজাস্ট করার ক্ষমতা কতটা, দায়িত্ববোধই বা কীরকম, সবটারই কিন্তু পরীক্ষা হয় এইরকম পরিস্থিতিতে।" বাবাই এত কথা বলে ফেলবে কেউ ভাবেনি।

দিয়া বলল, "শুধু তা নয়, আমরা কে কতটা ওপ্‌ন, একটা ছোট দল তারই মধ্যে পরস্পরের প্রতি কতটা দায়িত্বশীল, এগুলো খুব জরুরি। ওই সব ডিস্কোথেক-টেক কিন্তু এসব শেখায় না। তফাতটা এখানে এসে আমার আরও মনে হচ্ছে। থ্যাঙ্কিউ উজ্জ্বল, থ্যাঙ্কস রূপ। শুকস ঠিক করল না, ভেরি আনস্পোর্টিং।"

"ডিস্কোথেকের অন্য দিক আছে," আরিয়ান বলল। "মডার্ন ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে তো হবে? সে দিক থেকেও অ্যাডাপ্টেবল হতে হবে। তুই গেলি বিদেশে, নাইট ক্লাব-টাবে, জগন্নাথ হয়ে বসে রইলি, চলবে?"

উজ্জ্বল বলল, "বেশ তো। বহু বিদেশি, আমি হিপি-টাইপদের বাদ দিচ্ছি, বহু বিদেশি বাউলমেলায় যায়, তারা কি এসব আসরে নাচে?"

"সে তো এ দেশিরাও নাচে না। কেন বল তো? নাচ আমাদের ট্র্যাডিশনে নেই। নেচে-গেয়ে মজা করাটা আমরা জানি না।"

"বাজে কথা বোলো না," বাবাই হঠাৎ ঝেঁঝে উঠল। "আমরা যখন দল বেঁধে এক্সকারশনে

যাই, পিকনিকে যাই, গান গাই না কোরাসে? গান গাই, তালি দিই। প্লাস আছে আমাদের আড্ডা কালচার। প্রত্যেক দেশেরই কিছু-কিছু নিজস্ব জিনিস থাকে। শান্তিনিকেতনে দোলের দিনে ছেলে-মেয়েরা নাচে না? মাঠে ঘাটে যেখানেই খানিকটা জায়গা পাবে নাচবে, গাইবে। বাইরের লোকও তাতে যোগ দেয়। তাই বলে কি সারা বছর যখন-তখন ধেই-ধেই করে নাচতে হবে?"

"ফ্যান্টাস্টিক," আরিয়ান সংক্ষেপে বলল।

"কোনটা," রূপ পাশে বসেছিল আস্তে প্রশ্নটা রাখল।

"হার প্যাশন," উত্তর হল। একটু পরেই আরিয়ান বলল, 'তোমরা তো নাচতে জানো, আমিও জানি। নাচ-গান একটু না হলে জমে?"

অমনি উজ্জ্বল বলল, "আমি একটা গান জানি," বলেই সে ধরল, 'খর বায়ু বয় বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে, ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।'

টপ করে উঠে নাচ ধরল প্রথমে দিয়া। তারপর বাবাই, তারপর আরিয়ান। দিয়ারটা যাকে বলে মডার্ন বা ক্রিয়েটিভ ডান্স, বাবাইয়েরটা কত্থক। আরিয়ানেরটা ব্রেক। একটু পরে বেশিরভাগই গানে গলা লাগাল। রূপও দাঁড়িয়ে উঠে তালে-তালে একটু-আধটু কোমর দোলাতে লাগল। সবচেয়ে আশ্চর্য করল উজ্জ্বল, এদিক থেকে ওদিক লাফিয়ে, হাত-পা কারাটের ভঙ্গিতে ছুড়ে এমন জমিয়ে দিল যে, ঘুরে-ঘুরে গানটা হতে লাগল। এবং ওদের ঘিরে বেশ কিছু মেয়ে-পুরুষ জমা হয়ে গেল। হাতের ঝুড়ি, কাস্তে, কোদাল নামিয়ে রেখে ওরা তালে তাল দিয়ে দুলে-দুলে দারুণ উপভোগ করতে লাগল।

আরিয়ান বলে উঠল, "হোয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন আস?"

সবাই হেসে উঠল, ওরা কিন্তু ঠিকই বুঝেছে। উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভঙ্গিতে ওরা যথাসাধ্য নাচল। ওদের ছেলেগুলো উজ্জ্বলের মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে, এদিক থেকে ওদিক, নানান মোচড় দিতে লাগল। শেষকালটায় দাঁড়াল, এরা সবাই হাতে তাল দিয়ে গান করছে, আর উজ্জ্বল ও মুণ্ডারা নাচছে।

শেষ হলে একমুখ হাসি নিয়ে মুণ্ডারা তাদের কাজে চলে গেল। আরিয়ান সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা কী হল?"

বাবাই বলল, "মুণ্ডারা ছৌ-এর স্টেপ দিচ্ছিল। মার্শাল ডান্স।"

আরিয়ান বলল, "ওরা দুর্দান্ত। বাট আয়াম ইন্টারেস্টেড ইন উজ্জ্বল'স পার্ফরম্যান্স, ওটাকে কী বলে?"

উজ্জ্বল একমুখ হেসে বলল, "অ্যাডাপ্টেবিলিটি।"

॥ ২২ ॥

সংযুক্তা আস্তে বারান্দা থেকে ঘরে এলেন। ধ্রুবজ্যোতি কাগজ পড়ছিলেন, সংযুক্তা তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন। "রিঅ্যাক্ট কোরো না, পুলিশ আসছে।"

চমকে মুখ তুললেন ধ্রুব। তৃতীয় ঘর থেকে মিলুর এবং তার মাস্টারমশাইয়ের মিলিত গান ভেসে আসছে। দেশ রাগ শেখাচ্ছেন। হার্মোনিয়াম ও তানপুরার সংগতসুদ্ধ কর্কশ পুরুষ গলা ও ভাবগম্ভীর মেয়ে গলার গান রীতিমতো শুদ্ধ করে তুলেছে রবিবারের সকালটাকে। আকাশে পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘ।

ধ্রুব বললেন, "মাথার ঠিক রাখবে।"

সংযুক্তা বললেন, "আনএক্সপেক্টেড, ওকে কী করে সাবধান করব বুঝতে পারছি না।"

ধ্রুব বললেন, "পারবে, ঘাবড়িয়ো না।"

নীচে বেলটা বেজে উঠল, একবার, দু'বার। ধ্রুব চশমার কাচ মুছতে-মুছতে নীচে নামলেন। সংযুক্তা উপরের ঘরে বসে। হাতে খবরের কাগজ, হাতের কাঁপুনি থামাবার চেষ্টা করছেন।

দরজা খুলে, সামনে দু'জনকে দেখলেন ধ্রুব। একজন ইউনিফর্ম পরা, অন্যজন সাধারণ শার্ট-প্যান্ট।

"কী ব্যাপার, ভেতরে আসুন।"

ওঁরা পরিচয় দিলেন। একজন স্থানীয় থানার ইন্সপেক্টর, অন্যজন সি আই ডি থেকে।

"সরি আপনাদের বিরক্তি করছি। কয়েকটা প্রশ্ন ছিল। আপনাদের বাড়ির কোনও মেয়ে কি কমলিনী গার্লস স্কুলে পড়ে?"

"পড়ে না, পড়ত। এখন তো পাশ করে গিয়েছে। কেন বলুন তো?"

পলিথিনে মোড়া একটা শাড়ির ছেঁড়া কোণ ব্যাগ থেকে বের করলেন ইন্সপেক্টর, "এটা চিনতে পারেন?"

"একটা শাড়ির অংশ।"

"না, এটা ওই গার্লস স্কুলের ইউনিফর্ম।"

ধ্রুব বললেন, "হ্যাঁ, ওদেরও তো এই রঙেরই বোধহয় বর্ডার শাড়ির। একেবারে সেম কালার কি? আমার অত খেয়াল নেই, কেন বলুন তো?"

"এটা একটা মার্ডারের অকুস্থলে পাওয়া গিয়েছে। আমরা কমলিনী গার্লস স্কুলের মেয়েদের মধ্যে খোঁজ করছি।"

"বলেন কী মশাই, ওই অত মেয়ের প্রত্যেককে...সে তো বিশাল।"

সি আই ডি বললেন, "না, ওই সময়ে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা চলছিল। আমাদের অনুসন্ধান, ওই ক'টি মেয়ের মধ্যেই। লেক গার্লস-এ সিট পড়েছিল।"

"আপনাদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। বলুন, কী করতে পারি।"

"ফার্স্ট অফ অল, মেয়েটিকে একটু ডাকুন। ও কোথায়?"

"গান শিখছে, ওর গুরু এসেছেন।"

সেই মুহূর্তেই রাগ দেশের একটি তানতোড়া ঘুরতে-ঘুরতে বারান্দার পথে এবং সিঁড়ির পথে নেমে এল। গুরু গাইছেন, মাঝে-মাঝে ছাত্রীর গলা শোনা যাচ্ছে।

"কাইন্ডলি একটু ডাকুন।"

"শিয়োর।"

ধ্রুবজ্যোতি সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন। সংযুক্তা এগিয়ে এলেন, "কী?"

"ওকে ডাকছে. তেমন কিছু নয়।"

"সত্যি বলছ?"

"যদি না ও নার্ভাস হয়ে যায়, তুমি নীচে নেমো না। বেশি-বেশি কৌতূহল দেখানো ঠিক না।"

"প্রফুল্লবাবু, ছাত্রীকে একটু ছাড়বেন? দরকার আছে। ধরুন দশ মিনিট।" দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "মিলি আয়।"

বেরোলে বললেন, "পুলিশ এসেছে। শাড়ির টুকরো পেয়েছে, তোদের ইউনিফর্ম। তাই সব কমলিনী গার্লদের খোঁজ নিচ্ছে। আগে-আগে তোকে পুলিশের সামনে প্রশ্নোত্তর যা শিখিয়েছি, সেইমতো কথা বলবি। ঘাবড়াবি না।"

সি আই ডি বললেন, "তুমি? ও, কী নাম? তিনি যেন ঠিক এই রকম একটি মেয়েকে আশা করেননি।"

"মিলি।"

"কী পড়ছ এখন?"

"বিএ, বাংলা অনার্স।"

"কোথায়?"

"যাদবপুর ইউনিভার্সিটি।"

"এপ্রিলের সতেরো-আঠারো কোথায় ছিলে মা, একটু মনে করে বলবে?

"সতেরো-আঠারো, এপ্রিলের? একটু ভাবি। তেরোয় পরীক্ষা শেষ হল, তা হলে সতেরো-আঠারো বাড়িতেই। আর কোথায় থাকব? কেন, কী হয়েছে সার?" উদ্‌বিগ্ন মুখে বলল সে।

"সি আই ডি ভদ্রলোকটি ভালোমানুষের মতো মিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমরা একটা খুনের কিনারা করতে এসেছি, এইটা চেনো?" ফোল্ডারে শাড়ির টুকরোটা বের করলেন ইন্সপেক্টর। হাত বাড়িয়ে দিলেন তাকে। হাত পেতে নিল সে।

"উলটেপালটে দেখে বলল, "আমাদের স্কুলের ইউনিফর্ম এই রকমের শাড়ি। সার, আমাদের স্কুলের কোনও মেয়ের?"

"কোনও মেয়ে... কী?" সি আই ডি বললেন।

"আপনি বললেন, খ্‌খুন, খুন হয়েছে কোনও মেয়ে?"

"না, না, খুন হয়েছে দু'জন গুন্ডা। এই শাড়ির টুকরোটা ঘরের চৌকাঠের ফাঁকে আটকে ছিল।"

"ওহ।"

"দু'জনেই ঠিক গুন্ডা নয়, বুঝলে! একজন শিক্ষানবিশ গুন্ডা বলা যায়। দেখো তো, এই ছবিটা চিনতে পারো কি না?"

পটকার একটা পরিষ্কার ছবি তার নাকের সামনে তুলে ধরলেন ইন্সপেক্টর।

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, একে চিনি তো। যে-ছেলে ছুটির সময়ে স্কুলের কাছে ঘুরঘুর করে তাদের মধ্যে একে দেখেছি।"

"তোমার পিছনেও লেগেছে?"

"ওই ঘুরঘুর করল, কী একটা কমেন্ট করল, ইস্‌স এই ছেলেটাই..."

আর একটা ছবি বের করলেন ইন্সপেক্টর, "একে চেনো?"

"নাঃ, একে দেখেছি বলে...নাঃ। এ তো অনেক বড়, একে ওদের সঙ্গে দেখিনি তো।"

"তোমার স্কুলের শাড়ি আছে না কি?"

"থাকতে পারে, মা সাধারণত কাজের লোকেদের দিয়ে দেয়।"

"তুমি নিজেই তো একটি কাজের লোক," ইন্সপেক্টর দুম করে বলে উঠলেন।

মিলু একদম চুপ করে গেল। একটু পরে, ধ্রুবজ্যোতির দিকে চেয়ে বলল, "বাবা, তুমি এঁদের সঙ্গে কথা বলো, আমি যাচ্ছি।"

চোখের জল চাপতে-চাপতে সে একরকম দৌড়েই বেরিয়ে গেল।

ধ্রুবজ্যোতি অত্যন্ত আহত গলায় বলে উঠলেন, "এটা আপনারা কী করলেন? এসব কথা..."

"আপনার প্রতিবেশী বিজয় সুর আমাদের ইনফর্মেশনটা দিয়েছেন, ভুল নাকি?"

"ও, বিজয়বাবু? বাঃ! দেখুন, কথাটা ভুল। কাজের মেয়ে বলতে যা বোঝায়, সে রকম কিছুও নয়। আমরা ওকে পালন করছি। ও আমাদের মেয়ে। পুলিশ বলে কী আপনাদের মায়া-মমতা থাকতে নেই? এভাবে আঘাত দেওয়া...ছি! ছি! আমি বৃদ্ধ মানুষ। নিঃসন্তান। কাউকে পালন করছি, মানুষ করছি, এটা আমার আনন্দ।"

"সরি! বুঝতেই তো পারছেন, খুনের কেস। আপনার স্ত্রীকে দেখছি না?"

"দেখতে চান?"

"নাঃ থাক, উনি তো প্রোফেসার। না?"

"প্রোফেসর কথাটা ঠিক না, উনি রিডার এখন। আমিও তাই ছিলাম, রিটায়ার করেছি। আর কিছু?"

"নাঃ, সরি প্রোফেসর মজুমদার, মেয়েটিকে সত্যিই খুব ভালো মানুষ করেছেন। বিজয় সুর মশাই না বললে আমাদের সাধ্য ছিল না বুঝি। ওঁর মেয়ের সঙ্গেই পড়ত?"

"হ্যাঁ, ওঁর নিজের মেয়ের চেয়ে আমার পালিত মেয়ে অনেক ভালো রেজাল্ট করত। কোথায় উৎসাহ দেবেন, তা নয় ঈর্ষা, ছিঃ।"

"ঠিক আছে, আমরা চলি। পরে কোনও প্রয়োজন হলে..."

ধ্রুবজ্যোতি বললেন, "ইটস অল রাইট। আচ্ছা, একটা কথা বলব?"

"বলুন।"

"আমি জাস্ট আমার কমন সেন্স থেকে বলছি, এই পাড়ের শাড়ি কি আর কেউ পরে না? খুবই তো অর্ডিনারি, চলতি জিনিস।"

"ঠিকই বলেছেন, কথাটা আমাদের মাথায় আছে। সরি, আর কিছু বলতে পারব না।"

"নাঃ আমার মনে হল তাই বললুম। ঠিক আছে আসুন।"

উপরে উঠতে সংযুক্তা বললেন, "শেষ কথাটা আবার বলতে গেলে কেন? ওরা নির্ঘাত ভাববে, তুমি সাফাই গাইছ, কিংবা ভেতরের খবর বের করে নিতে চাইছ।"

"কথাটা যদি না বলতুম, তা হলেও কিন্তু ওদের সন্দেহ হতে পারত। কেন আমি এই সামান্য কথাটা বললুম না, কেন আমার কৌতূহল অত কম! ইট কাটস বোথ ওয়েজ সংযুক্তা। কী করা যাবে, আমি একটা বেছে নিলুম। মিলু কী করছে?"

"ওই তো, গানের ঘরে ফিরে গিয়েছে।"

"ভালো, তুমি পাঠালে না নিজেই গেল?"

"আমাকে সব বলল। বলে নিজেই চলে গেল।"

রাত্রের খাওয়ার সময়ে মিলু হঠাৎ বলল, "বাবা, আমি যদি ধরা দিই!" চমকে উঠলেন দু'জনেই।

"মানে?"

"এই টেনশন আমি সহ্য করতে পারছি না।"

"শুধু-শুধু একটা জেতা যুদ্ধে হার স্বীকার করবে কেন সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না। এর চেয়ে অনেক বেশি বিপদের মধ্যে দিয়ে তুমি আগে গিয়েছ।"

"তখন আমার কিচ্ছু ছিল না বাবা, কিছু হারাবার ছিল না, তাই সব রিস্ক নিয়েছি। এখন তো তা নয়। তোমরা আছ, আমার কেরিয়ার আছে, পড়াশোনা, গান। আর বাবা, সত্যিই তো আমি একটা অন্যায় করেছি।"

ধ্রুবজ্যোতি রাগ করে বললেন, "উলটোপালটা বকছ কেন মিলু, বারবার যে বলছি, তুমি যেটা করেছ সেটা অন্যায় নয়। এখন আমি তোমাকে শান্ত করার জন্যে মোটেই গীতা আওড়াতে পারব না," তিনি খাবার ফেলে উঠে গেলেন।

সংযুক্তা চুপচাপ রুটি ছিঁড়ে যাচ্ছেন, মুখ বিষণ্ণ।

একটু পরে মিলু উঠে পড়ল। বলল, "বাবাকে ডেকে আনছি, তুমি খাও মা।"

ধ্রুবজ্যোতি শোওয়ার ঘরের বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন।

মিলু পিছন থেকে ডাকল, "বাবা।"

তৎক্ষণাৎ বারান্দা থেকে ঘরে চলে গেলেন ধ্রুব। বললেন, "বলো।"

"খাবে এসো। আমি আর ওসব বলব না, ভাবব না।'

"কথা দিচ্ছ?"

"দিচ্ছি।"

ধ্রুব ফিরে এলেন। যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রফুল্লবাবু যে তোকে ইমন শেখাচ্ছিলেন, আজকে অন্যরকম কি শুনছিলুম যেন?"

"দেশ বাবা। বর্ষা পড়ে গিয়েছে বলে মাস্টারমশাই আগের দিনই দেশ ধরলেন। কী অপূর্ব সুর বাবা। সমস্ত ভুলিয়ে দেয়। মনে হয়, গেয়েই যাই, গেয়েই যাই।"

"বেশ। খাওয়া-দাওয়ার পর তুই আবার তানপুরা নিয়ে বোস। গেয়েই যা, গেয়েই যা, আমরা শুনব।"

"তোমরা কিন্তু তোমাদের ঘর থেকে শুনবে। আমি আলো নিবিয়ে গাইব। কে জানে বাবা, কত ভুল হবে।"

মিলির চলাফেরায় আগেকার ছন্দটা ফিরে এসেছে মনে হল। তবু সাবধানের মার নেই। তিনি সংযুক্তাকে নির্দেশ দিলেন, আজ মিলির সঙ্গে শুতে। উপরন্তু যেন আজকে ওকে ট্রাঙ্কুইলাইজার দেওয়া হয়। ধ্রুবর কেমন মনে হল, মিলু তাঁদেরও পরীক্ষা নিচ্ছে। তাঁরা ওকে কতটা ভালোবাসেন, সত্যি-সত্যি তার জন্যে বিব্রত বোধ করেন কি না, সত্যি-সত্যি তার জন্যে স্যাক্রিফাইস করতে রাজি কি না, এইসব সে জানতে চাইছে। হয়তো সচেতনভাবে নয়, কিন্তু তার হৃদয় চাইছে ভালোবাসার নিরাপত্তা। সত্যিই তাঁরা মিলুকে কতটা ভালোবাসেন, এটা একটা প্রশ্ন। নিজের সন্তানের মতো কি? নিজের সন্তান হয়নি, কী করে জানবেন, সে কী জিনিস? তাঁদের দুই বাড়িতে যে সামান্য ক'জন আত্মীয় আছেন, সংযুক্তার দাদা-বউদি, দিদি-জামাইবাবু, এঁদের ছেলেমেয়েদের কোনওরকম বাৎসল্য দেখাবার সুযোগ পাননি তাঁরা। সংযুক্তার দাদার একটিই ছেলে। ওঁর বদলির চাকরি বলে বরাবর বোর্ডিং স্কুলে মানুষ হয়েছে। দিদি-জামাইবাবু অনেক বড়। তাঁদের ছেলেমেয়েদের বাল্যাবস্থায় দেখেনইনি ধ্রুব। তিনি নিজে তো একমাত্র সন্তান। তাঁর বাবাও এক সন্তান। কাজেই মামাতো-মাসতুতো ছাড়া তাঁর গতি ছিল না। সে সব সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা কবে চলে গিয়েছে। অপত্য স্নেহ খানিকটা ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পড়ে ঠিকই। কিন্তু শিশুকাল থেকে দেখলে যে-মায়াটা হয়, সেটা সম্ভবত আলাদা। শীলুকে বড় করে, চরে খেতে শিখিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। টান আছে, কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়। বিলুর বেলায় টানটা আরও কম। কিন্তু মিলু? মিলু কোথাও চলে যাবে, মিলুকে পাওয়া যাচ্ছে না এরকমটা ভাবতে গেলে তাঁর বুকের কোথায় একটা ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে। তবে কি মিলুই তাঁদের প্রকৃত সন্তান হয়ে উঠছে? তাঁরা কি মিলুর প্রকৃত বাবা-মা হয়ে উঠতে পারছেন? সংযুক্তা আজকাল অনায়াসে মিলুর পাশে শুচ্ছে। কিন্তু তিনি তো মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে আদর কোনও দিনই করতে পারবেন না!

ওঘর থেকে দেশ-এর আলাপ ভেসে আসছে। কাঁচা গলার আলাপ, কিন্তু ভীষণ মিষ্টি লাগছে। চোখে জল ভরে আসছে। সংযুক্তা চুপচাপ আরামচেয়ারে বসে শুনছেন। তিনি বিছানায়, একটা হাত চোখের ওপর। সংযুক্তা ধীর গলায় বললেন, "এবার বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে দিই?"

তিনি আরও আস্তে বললেন, "একটা লোক এখনও পায়চারি করছে কিনা, খুব ক্যাজুয়্যালি দেখে নিয়ো।"

"দেখেছি। এখনও আছে, আমাদের বারান্দার নীচে এখন জলবিয়োগ করছে। এক বালতি জল ঢেলে দেব?"

"দিতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু তোমার মেয়ের কেস ঘেঁটে যেতে পারে, ছেড়ে দাও।"

সংযুক্তা বারান্দার দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দিলেন।

"আমরা যে শীলু, বিলু এদের কাউকে এই বিপদের কথা বলিনি, সেটা এক পক্ষে ভালো বুঝলে।"

তিনি বললেন, "ফোনে এ নিয়ে কোনও কথা চালাচালি না হয় এটা মিলুকে বলে দিয়ো। বি অ্যাবসল্যুটলি নর্মাল।"

"কিন্তু ওরা আবার পিছনে লোক লাগাল কেন?" সংযুক্তা চিন্তিত গলায় বললেন।

মিলুর অতীতটা যদি জানতে পেরে থাকে তা হলে ওদের ধারণা হতে পারে এই সব লোকেদের সঙ্গে মিলুর সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। এটা আমার একটা ধারণা। প্লাস্টিকের খামটা মিলুর হাতে দিল, আমার হাতে কিন্তু দেয়নি। যদি কোনও আঙুলের ছাপ-টাপ পেয়ে থাকে মিলিয়ে দেখবে।"

আঁক করে একটা শব্দ করলেন সংযুক্তা, "সে কী?"

"মিলু যেভাবে নিল, তাতে আঙুলের ছাপ উঠবে না। তবে অকুস্থলে ছাপ পেয়ে থাকলে যেমন করে হোক, ছাপ ওরা নেবেই।"

সারারাত কারওই ঘুম হল না। মিলুই একমাত্র ট্রাঙ্কুইলাইজার খেয়ে ঘুমোল। সকালে তার ঘুম ভাঙলে সংযুক্তা সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করলেন, "মিলু তোর কি মনে আছে ঘরটার ছিটকিনি ছিল, না খিল?"

"কেন মা?"

"খুব মনে করে বল তো ঠিক কীভাবে পালালি? পাঁচদিন ছিলি কীভাবে?"

"কেন মা, কত পায়ের ছাপ পেয়েছে?" মিলু নিভন্ত গলায় বলল।

"সব সম্ভাবনাগুলো আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মাথা পরিষ্কার করে ভাবতে হবে।"

সকালবেলায় চা-বিস্কুট খেতে খেতে মিলু বলল, "নিয়ে গিয়ে ঘরটাতে ফেলে দিল। একটা তক্তাপোশে, পাতলা চিরকুটে ময়লা বিছানা। তারপর দু'জনে পরপর অত্যাচার করল। পটকাটাকে ফেলে দিয়েছিলাম, কিন্তু অন্যটার গায়ে ভীষণ জোর, ভীষণ নিষ্ঠুর। আমার হাত-পা বেঁধে আঁচড়ে-কামড়ে কী বলব শেষ করে দিয়েছে।

"রাত্তিরে খেতে দিত কিছু?"

"শুধু দুধ, আমি টাচ করিনি।"

"জল?"

"একটা কুঁজো ছিল তা থেকে কাগজের গেলাসে করে জল দিত। শুঁকেটুকে খেতাম। তারপর ওরা গেলাসগুলো দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে দিত।"

"সকালে চা?"

"সে-ও কাগজের গ্লাসে, আমার তো হাত বাঁধা। পটকাটা গলায় ঢেলে ঢেলে দিত। বলত, "চা না খেলে টানবি কী করে? পাঁচদিন আর কিচ্ছু খাইনি।"

"বাথরুম?"

"একটা বালতি রেখে দিয়েছিল। ওরা যে কী নোংরা মা ধারণা করতে পারবে না।"

"তা হলে বলছিস কিছু হাতে করে ধরার সুযোগই হয়নি?"

"না মা। তারপর শেষ দিনে যখন দেখলাম মদ খেয়ে একেবারে অজ্ঞান, দুটো ছুরি পড়ে আছে, পা খোলা ছিল, গিয়ে পা দিয়ে ছুরিগুলো জড়ো করলাম। হাত দুটোর দড়ি কামড়ে ছিঁড়ে মরিয়ার মতো টানাটানি করে খুলতে পেরেছি। তারপর ছুরিদুটো সোজা ওদের গলায় বসিয়ে দিয়েছি। কীরকম ঘড়ঘড় শব্দ হল, রক্ত ছিটকে লাগল আমার কাপড়ে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছি দরজার দিকে। অনেক উঁচুতে খিল, মাথার ধাক্কা দিয়ে খিল খুলেছি। তারপর দৌড়োতে-দৌড়োতে বেরিয়ে গিয়েছি।"

"হাত, পায়ে রক্ত ছিল না?"

"না, রক্তটা ছিটকে আমার কাপড়ে লেগেছিল। মেঝেতে বোধহয় পড়েনি। কাপড় থেকে কি রক্ত পড়তে পারে? আমি জানি না। মাথা দিয়ে ঢুঁ মেরে খিলটা খুলেছিলাম. তারপর ছুটেছি। কাপড়ের কোণ আটকে গিয়েছে এ খেয়ালও আমার হয়নি," মিলু চুপ করল। তারপর তাঁর দিকে ফিরে শুল।

কলেজ গেল মিলু সঙ্গে ধ্রুব, যেমন যান। দু'জনেই চুপচাপ। ধ্রুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলবার চেষ্টা করছেন। মিলুও আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। নরক যন্ত্রণায় কাটল ক'দিন। মিলু ক্লাসে অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে। কিছুই মাথায় ঢুকছে না। চন্দনা লক্ষ করেছে। বলল, "মিলি তোর কী হয়েছে রে?"

মিলু বলল, "ক'দিন মাথায় কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে।"

“তো চোখ দেখা, নিশ্চয়ই পাওয়ার বেড়েছে।”

“ভাবছি তাই, বাবাকে বলতে হবে।”

এখানে মিলুর একটা স্বস্তি যে, তার স্কুলের কেউ আসেনি। ফলে সে যে পালিতা মেয়ে, সে কথা কেউই জানে না। তার নতুন চেহারা তার একটা স্বস্তির কারণ। মিলু নিজেই নিজেকে আয়নায় দেখে চিনতে পারে না। কারণ, ভিতরে ভিতরে সে এখনও শাড়ি পরে একটা বিনুনি করে রুটির আটা মাখছে, চা করছে। ভিতরে তার একটা বদল আসে, একমাত্র যখন সে গান গায়, মাস্টারমশাই আসেন। রাগ-রাগিণীর অথৈ গভীরে সে তার আইডেন্টিটি ভুলে যায়। কে জাহিরা শেখ, কে মিলি মজুমদার, এ সমস্ত অবান্তর হয়ে যায়। বান্ধবীরা আজকাল কেউ কেউ বাড়ি আসতে শুরু করেছে।

“ইস্‌স মিলি তোর বাড়িটা কী ভালো, বাবা-মা কী ভালো।”

“কেন, তোদের বাড়ি ভালো নয়? বাবা-মা-ভালো নয়?”

“বাড়ি তো নয় ফ্ল্যাট, এত স্পেস আছে নাকি? আর বাবা-মা দিন-রাত খিটির-মিটির।”

একজন বলল, “তুইও কী গুণী, কী সুন্দর খাবার করে খাওয়াস আমাদের, উপ্‌মাটা কী করে করেছিলি? দইবড়াটাও খুব ভালো করিস।”

“সব আমার মা শিখিয়েছেন।”

“আমাদের মা'রা তো সংসারের কোনও কাজই করতে দেয় না, এসব দেখতে হবে না, পড়াশোনা কর গিয়ে। জানিস, এখনও সেতার নিয়ে পড়ে আছে পিছনে। ভালো লাগে না, হবে না বুঝতে পেরে গিয়েছি। তবু কর। প্র্যাক্টিস কর।”

মিলির গান তার একটা অতিরিক্ত গুণ। বন্ধুরা খুব প্রশংসা করে। মিলি তার রেকর্ড থেকে তোলা রবীন্দ্রসংগীত, সারের কাছে শেখা ভজন শোনায়। বন্ধুরা খুশি হয়ে যায়।

এত সুখ কি তার সইবে, বিষণ্ণ মনে সে ভাবে। যতবারই গুছিয়ে বসতে গিয়েছে একটা না বিপদ এসে বুঝিয়ে দিয়েছে, সুখ-শান্তি তার জন্য নয়।

সি আই ডি অফিসারটি একদিন সংযুক্তার কলেজে হাজির। ভিজিটার্সরুমে কেউ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে শুনে সংযুক্তা গিয়ে দেখেন মক্কেল বসে আছে।

“আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না, অ্যাডমিশন?”

“আজ্ঞে না, আমি আপনার মেয়ে সম্পর্কে একটাই ইনফর্মেশন চাই। বুঝতেই পারছেন কোথা থেকে আসছি।”

“আশ্চর্য! আপনারা তো বাড়িতে খোঁজ করে গিয়েছেন। আবার কী? এত উত্যক্ত করলে তো মুশকিল। আমার কলেজে ধাওয়া করেছেন!”

“সরি, আসলে আমরা জানতে চাইছিলাম ১৩ এপ্রিল মেয়ের জন্য বেশ কয়েকটি বাড়িতে উদ্‌বিগ্ন হয়ে ফোন করেছিলেন আপনারা, কেন?”

“কী মুশকিল, সময়মতো বাড়ি না ফিরলে উদ্‌বিগ্ন হব না? আজকাল মেয়ের মা হওয়া কত জ্বালা তা জানেন না?”

“মেয়ে ফিরেছিল?”

“ন্যাচারালি। সেদিন শেষ পরীক্ষা, হয়তো একটু মেতে ছিল। আড্ডাটাড্ডা মেরেছে। ওর বায়োলজি ভালো লাগে না, পরীক্ষাটা নিয়ে আমরা একটু চিন্তিত ছিলুম আসলে।”

“আপনার মেয়ে কিন্তু অ্যাডিশন্যাল পেপার দেয়নি।”

“সে খোঁজও নিয়েছেন? নমস্কার আপনাদের ভাই,” সংযুক্তা একটু তেতো হাসি হাসলেন। “এই যে শুনি পুলিশ আজকাল কাউকে প্রোটেকশন দিতে পারে না, কোনও কম্মের নয়। কোন মেয়ে অ্যাডিশনাল পেপার দিল না সে নিয়েও আপনারা মাথা ঘামান?”

“ম্যাডাম, আপনার মেয়ে অ্যাডিশনালে অ্যাবসেন্ট কেন? পড়ুয়া মেয়ে, তাই না?”

"অ্যাডিশনালে ওর ম্যাথস ছিল, আমাদের জোরাজুরিতে নিয়েছিল। বলল কিছ্ছু পারবে না। পরীক্ষাটা দেওয়াও যা না দেওয়াও তা। আমরা আর জোর করিনি। দোষটা তো আমাদেরই, জোর করে চাপিয়েছি। আর কিছু?"

"না, ঠিক আছে। ম্যাডাম। আপনারা নমস্য ব্যক্তি, কিন্তু কী আর বলব, এই মন্ত্রীদের জ্বালায় আমরা পাগল হয়ে যাচ্ছি। কটাগোবিন্দ একটা দাগি খুনে গুন্ডা। বুঝতেই পারছেন কোনও মন্ত্রীর ডানহাত। উপর থেকে প্রেশার আসছে।"

সংযুক্তা চুপ করে রইলেন। কোনও মন্তব্য করা ঠিক নয়। লোকটি আবার ঘরের কথা বলতে শুরু করল, কী মতলবে কে জানে!

এতক্ষণে বোঝা গেল এঁরা কোন সূত্র ধরে মিলুকে টিপ করছেন। কমলিনী গার্লসের যে ক'টি মেয়ে হায়ার সেকেন্ডারি দিচ্ছে, প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। চেকিং ও ক্রসচেকিং-এর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। তেরোই তাঁরা দু'তিনজন বন্ধুর বাড়িতে ফোন করেছিলেন। ভাগ্যে মিলুর বন্ধু বেশি নেই, জনা তিনেকের বাড়িতে ফোন করেছিলেন তাঁরা। যত দূর মনে পড়ছে সাত সাড়ে সাত নাগাদ। ভাগ্যিস, বেশি রাতে করেননি। করলে মিলু পরীক্ষা শেষে হই-হল্লা করে ফিরে এসেছিল এ গল্প টিকত না।

ধ্রুবজ্যোতি সমস্ত শুনে বললেন, "একেই বলে পুলিশের জাল। সংযুক্তা, আমি মলিনার কথা ভাবছি।" মলিনা তাঁদের কাজের লোক। সে যে ক'দিন মিলুকে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকতে দেখেছে, তার অসুখ শুনেছে, তাঁদেরও খুব ব্যস্ত থাকতে দেখেছে, এগুলো যদি পুলিশের কাছে বলে তা হলে?

আবার একদফা জ্বালাতন।

"সাবধান সংযুক্তা," ধ্রুব বললেন। "মিলুর হারিয়ে যাওয়া আর পাঁচদিন পর ফিরে আসা ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে সত্য গোপন করবে না।"

"সে আমি জানি," সংযুক্তা বললেন। "কিন্তু আগ বাড়িয়ে কোনও খবর দেওয়ার দরকারও নেই। এখন মনে হচ্ছে মিলুর অতীতটা ওরা জানে না। হাসনাবাদ থেকে ওকে পেয়েছি আমরা। আশা করা যায়, বিশেষ কোনও সূত্র ছাড়া..."

হঠাৎ সংযুক্তা বলে উঠলেন, "এই রে!" পড়িমরি করে ছুটে গেলেন তিনি।

"কী হল রে বাবা?"

ওঁদের রান্নাঘর নীচে হলেও ছোট একটা ব্যবস্থা উপরে আছে। চা-কফি, জল-খাবার, রাত্রে কিছু ভাজবার দরকার হলে সেখানেই হয়। ধ্রুব ভাবলেন, কিছু কি চাপিয়েছিল সংযুক্তা দুধ-টুধ? একটু এগিয়ে দেখলেন দালানে মা ও মেয়ে দাঁড়িয়ে।

মিলু বলছে, "হ্যাঁ, রাখি তো, কিন্তু এসব কথা কিছু লিখিনি এখনও।"

"আগেকার কথা তো লিখেছিস, মা অধৈর্য হয়ে বলল।

"তাতে কী?"

"তাতে অনেক কিছু মিলু। ধর, বাড়ি সার্চ করল। ডায়েরিটা পেলে ওরা অনেক কিছু ভেবে নিতে পারে। ফাঁসাতে পারে।"

"কিন্তু ওটা আমি নষ্ট করব না মা, ওতে আমার সব কিছু আছে। আমি নিজে মরে গেলেও কেয়ার করি না—ডায়েরিটা থাকবে," গোঁ ভরে মিলু বলল।

"কী ব্যাপার?" ধ্রুব এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"শুনলে তো। ওর ডায়েরিটা একটা প্রবলেম হতে পারে," সংযুক্তা কালো মুখ করে বললেন।

মিলু বলল, "ডায়েরিটা আমি নষ্ট করব না বাবা, কিছুতেই না।"

"ঠিক আছে, নষ্ট কেন করবি? আমাকে দিয়ে দে, আমি ওটা লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করছি।"

"কোথায় লুকোবে বাবা?" হঠাৎ মিলুর চোখদুটো জলে ভরে গেল। "আমার সমস্ত জীবন, কত ভাবনা-চিন্তা, সে-সব আমার কাছে খুব দামি, সব ওতে আছে।"

"আমাকে কি বিশ্বাস করতে পারছিস না?"

"কোথায় রাখবে?"

"ব্যাঙ্কের লকারে। গয়নাগাটি, দলিলপত্রের সঙ্গে।"

"ধরো ওরা তোমাকে ফলো করল কিংবা যদি সার্চ ওয়ারেন্ট বের করে, লকার কি তার বাইরে?"

সংযুক্তা বললেন, "ওটা সিল করে আমার কলেজের লকারে রেখে দিতে পারি।"

"সার্চ ওখানেও করতে পারে মা।"

ডায়েরি-ডায়েরি করে যখন তিনজনেরই মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় তখন ধ্রুব বললেন, "দেখি তো, তোর ডায়েরিটা একবার।"

ডায়েরি মানে তিনটে একসারসাইজ বুক। এক, দুই, তিন...এইভাবে সাজানো। কিন্তু স্টেপল করাও নেই, নাম পর্যন্ত নেই।

ধ্রুব হেসে বললেন, "হার্ড বাউন্ড নয় কিছু নয়, এটা তো কোনও প্রবলেমই নয় রে। তোর মায়ের কোনও ছাত্রীদের খাতার সঙ্গে দিব্যি থাকবে। উপরে একটা কাল্পনিক নাম বসিয়ে দে ব্যস।

সংযুক্তা বললেন, "আমাদের সিস্টেম হল কেজের চাবির ডুপ্লিকেট পর্যন্ত আমাদের কাছে থাকে। রিটায়ার করার সময় কেজ খালি করে চাবিটা জমা দিয়ে আসতে হয়।"

পরদিন কাগজে একটি রাগী চিঠি বেরোল। লিখছেন, কমলিনী গার্লস-এর হেড মিসট্রেস, অন্যান্যদের সই আছে।

পুলিশ এক গুন্ডার হত্যায়, সামান্য একটা সাদা কমলাপাড় শাড়ির ছুটকো অংশ পেয়ে কীভাবে তাঁর স্কুলের মেয়েদের হয়রান করছে, জনগণকে জানিয়েছেন এবং তীব্র প্রতিবাদ করেছেন তিনি। এই শাড়ি কি আর কেউ পরে না? তাঁর ক্ষুব্ধ প্রশ্ন। কটাগোবিন্দজাতীয় খুনে গুন্ডারা যদি নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরে, তবে কার ক্ষতি? সমাজ তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচে! তবে কি উপরতলার কোনও পুলিশ, কি মন্ত্রীসান্ত্রীর পোষা খুনে লোকটি? ক্ষমতাবানরা কী ভাবেন নিজেদের? তাঁদের ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থে খুনোখুনির চক্র গড়ে উঠেছে, তাঁর সুরক্ষার জন্য স্কুলের মেয়েদের উত্যক্ত করবেন তাঁরা?

এর পরে চিঠির স্রোত বইতে লাগল। নীরব মশাল মিছিল দেখা গেল দু'দিন শহরের রাস্তায়। সাংবাদিকরা ডজনে-ডজনে কমলাপাড় শাড়ি পরা মহিলাদের ছবি বের করতে লাগলেন। একটি সাহসী দৈনিক কোনও রাজনৈতিক নেতার পেটোয়া গুন্ডা কে কে, নামধাম জানিয়ে এবং তাদের কীর্তিকাহিনি ছেপে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল। বিক্রি তুঙ্গে। অনেক নেতা মানহানির মামলা করবেন জানালেন। কিন্তু করলেন না। অনেকে বিবৃতি দিলেন, পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়! সেই নিয়েও অনেক চিঠি বেরোল। পাগল মানে কি সাংবাদিকরা? জনগণকে কি নেতা ছাগল বললেন? তাঁরা নিজেরা তা হলে কী?

তারপর শুরু হল প্রবল বর্ষা। টানা তিনদিন বৃষ্টির পর কলকাতাকে আর কলকাতা বলে চেনা গেল না। প্রায় সারা শহর জলবন্দি। বজ্রপাতে মৃত্যু, তড়িৎ-তারে মৃত্যু, ম্যানহোলে পড়ে মৃত্যু। জায়গায়-জায়গায় রাবারের নৌকো চলল। জল সাপ্লাই তো দিতে হলই। শুকনো খাবার পৌঁছে দিতে হল অনেক জায়গায়। আপাতত শান্তি।

এই ডামাডোলে ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার, উজ্জ্বলদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন। নিজের মেয়ে আর পরের ছেলের এই তফাত। তিনি ভাবলেন, মনে মনে। তাঁদের বাড়ির সামনে জল জমে না, কিন্তু আশপাশ একেবারে জলমগ্ন। চতুর্থদিন আকাশের মেজাজ ভালো হল। ষষ্ঠ দিনে আবার তুমুল বর্ষণ। বম্বেতে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। যানবাহন বলে কিছু নেই। মানুষ যেখানে-সেখানে আটকা পড়েছে।

এর মধ্যে কটাগোবিন্দ, পটকা, বেঁটে গোপাল, খটকা সব ভেসে গেল।

এই রকমই হয়। জনগণের সেন্টিমেন্ট কিছু একটা উপলক্ষ করে ফেটে পড়ে। তারপর কোনও দুর্যোগ, এখানে-ওখানে, সবাই সব ভুলে যায়। খালি পুলিশ ভোলে না, অবশ্য যদি মনে করে। কাজেই সামান্য স্বস্তি পেলেও ধ্রুব পুরো স্বস্তি পেলেন না। সাবধানতার কথা নিজেও ভুললেন না, অন্যদেরও ভুলতে দিলেন না।

"প্রঃ মজুমদার, ও ধ্রুবজ্যোতিবাবু?" পিছন থেকে বিজয় সুর ডাকছেন। "কী মশাই শুনতে পাচ্ছেন না?"

ধ্রুব বললেন, "শুনতে পাব না কেন? শুনতে ইচ্ছে করছে না।" বলে হনহন করে চলে গেলেন। জীবনে কখনও কারও সঙ্গে এত কঠোর ব্যবহার তিনি করেননি। কোনও-কোনও ব্যাপারে ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছে তাঁর। প্রচণ্ড রাগ হয়ে যাচ্ছে।

॥ ২৩ ॥

ঝোরাটা সবার প্রিয়। ঝিরঝিরে গোড়ালি ডোবা। পৌঁছে গেছে ট্রেকাররা। ফাল্গুন মাসের পরিষ্কার আকাশ। চাঁদের আলো ঝরে পড়ে জলে হিরের কুচি অভ্রের কুচি ভাসছে। এত জোরালো চাঁদের আলো যে, রাতের খাওয়া চন্দ্রালোকেই হয়ে যায়। আজকে বাবাই একটা পোলাও রেঁধেছে। কাজু, কিশমিশ, পেস্তা, টিনের মটরশুঁটি, আলু সব দিয়ে একটা সরল পোলাও। কে জানত, সেটা এত ভালো হবে!

কাগজের প্লেটে সবাইকে পরিবেশন করল দিয়া। একটা চমৎকার আমের আচার তার সঙ্গে। মুখে দিয়েই সবাই 'আহা-আহা' করে উঠল।

"কী রেঁধেছিস রে?" উজ্জ্বল বলল। "তোর এ গুণ আছে তা তো জানতাম না!"

"দূর, আমি রান্নার কী জানি! করে দিলাম একটা। সেই বিগিনার্স লাক বলে একটা কথা আছে না, বোধহয় তাই," বাবাই বলল লাজুক মুখে।

বলল বটে, কিন্তু বাবাই মোটেই রান্নায় অত আনাড়ি নয়। তার মা মফস্‌সলের মেয়ে, কন্যা যতই পড়াশোনা করুক, আর খেলোয়াড় হোক, রান্না, ঘর গোছানো, কাপড় কাচা এগুলোর একটাও বাদ যায়নি তার শিক্ষা থেকে।

দিয়া বলল, "আমিও পারি, আমায়ও একটা চান্‌স দে।"

"হিংসে হচ্ছে, নাকি?" আরিয়ান বলল।

"তা তো একটু একটু হচ্ছেই। আমি বরাবর বাবাইকে হিংসে করি তো," সাফ জবাব দিয়ার। "একে স্প্রিন্ট কুইন, তার ওপরে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ, পার্সন্যালিটি দ্যাখ...যাই হোক, কু—ল। আমার মতো ফ্যাঁচফ্যাঁচে নয়। এখন আবার দেখা যাচ্ছে, ফ্যান্টাস্টিক কুক। হিংসেটা আরও বেড়ে যাবে না?"

দিয়ার কথায় ছোটখাটো হাসির হাওয়া বয়ে গেল সবার উপর দিয়ে। শিরীষ-সেগুন মাথা নাড়তে থাকে। হাওয়াতে কীসের যেন রেণু গুঁড়ো-গুঁড়ো উড়তে থাকে। দিয়ার মনে হয়, ওগুলো চাঁদেরই গুঁড়ো। জ্যোৎস্না থেকে ভেঙে-ভেঙে তৈরি হয়েছে। পাথর ভেঙে-ভেঙে যেমন বালি হয়। বন যেখানে গভীর হয়েছে, সেখানটা যেন পাহাড়ের ভুরু। সেখান থেকে একটা ভীষণ সেক্সি বুনো গন্ধ আসছে। গন্ধটা তাকে এমন মাতাল করে দিচ্ছে, কী করে সে নিজেকে প্রকাশ করে। ভেতরটা টগবগ করে ফুটছে যেন। মনে হচ্ছে, সেই একজন। একটি মাত্র বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ রকম অর্থহীন ব্যাকুলতা তার আগে কখনও হয়নি। হঠাৎ দিয়া উঠে পড়ল, তারপর জ্যোৎস্না মাড়িয়ে মাড়িয়ে ওপর দিকে উঠতে লাগল।

"বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ ও ওদিকে যাচ্ছে কেন?"

"এন সি বোধহয়," আরিয়ান বলল।

"এন সি-ই হোক, আর যাই-ই হোক, একা এভাবে যাওয়া তো ঠিক নয়।" বাবাই বলল, "উজ্জ্বল তুই যা। প্লিজ, একটু নজর রাখ।" আরিয়ান বলল, "যা-যা, শিগগির যা।"

বাবাই বুঝতে পারছিল, নেচার্স কল-টল নয়, কিছু একটা হয়েছে দিয়ার। মান-অভিমান! তার রান্নার প্রশংসার সঙ্গে জড়িত কি? চরিত্রের জটিলতার দিক দিয়ে এইসব মেয়েদের কোনও তফাত নেই। শুকতারা আর দিয়া এখানে এক। একজন সবাইকে গাছে তুলে দিয়ে বাই-বাই টুকুও না করে স্রেফ পালিয়ে গেল। আর একজন এখন বনের দিকে যাচ্ছেন। উজ্জ্বল ছাড়া আর কেউ ওকে সামলাতে পারবে না। কী ঝামেলাই হয়েছে!

রূপ চুপচাপ ছিল। বলল, "চল বাবাই, আমরা এই প্লেট-ফ্লেটগুলো ঝরনার জলে ফেসে আসি।"

"পলিউশন হবে না?" বাবাই জিজ্ঞেস করল।

"প্লাস্টিক তো আর নয়, কী বল আরিয়ান।"

আরিয়ান কিছু বলল না।

দু'জনে প্লেট, গ্লাসগুলো কুড়িয়ে জড়ো করল। ভুক্তাবশেষ বলতে বিশেষ কিছু নেই। যেটুকু আছে, একটু দূরে গিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিল রূপ।

বলল, "পাখিগুলোকে পোলাও থেকে বঞ্চিত করি কেন, বল বাবাই?"

বাবাই হাসল, "পাখিদের বঞ্চিত করতে তুই চট করে পারবি না। প্রকৃতি নিজেই ওদের সহায়। রান্না করতে হয় না, লেখাপড়া শিখতে হয় না, সবটাই এক্সট্রাকারিকুলার। খুঁটে-খুঁটে খাওয়া সারাদিনের কম্মো।"

বলতে বলতে ওরা ঝরনার কাছাকাছি এসে পড়েছিল। বাবাই একটা গোল থালা, টেনি কয়েটের মতো ঘুরিয়ে ছুড়ে দিল জলে। সেটা হেলতে-দুলতে খানিকটা চলে, লাফিয়ে নামল জলের সঙ্গে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

রূপ বলল, "আমার মনে হয় এগুলো টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা ভালো। দেখ, জল বেশি নেই। স্রোতও তেমন নেই।"

বাবাই সায় দিয়ে জিনিসগুলো ছিঁড়তে লাগল। দাঁড়িয়ে একেবারে জলের পাশে, হঠাৎ পা হড়কে গেল বাবাইয়ের। রূপ তাড়তাড়ি তাকে হাত ধরে ওঠাতে গেল। এত কম জায়গা, এত পিছল যে, বাবাই এসে পড়ল সোজা রূপের বুকের ভেতর। দু'জনেই দু'জনের বুকের ধুকপুকুনি শুনতে পাচ্ছে। মাথার উপর নীলচে চাঁদ, শরীরময় জলকণার মতো জ্যোৎস্নাকণা লেগে রয়েছে, পায়ের নীচে জল। রূপ ধরা গলায় বলল, "একটু দাঁড়া, আমি তোকে টেনে তুলছি।"

পিছন থেকে কর্কশ গলা শোনা গেল, "হোয়াট দা হেল আর ইউ ডুয়িং হিয়ার? আমাকে একলা বসিয়ে রেখে কৃষ্ণলীলা হচ্ছে? একটা কাপল গিয়েছে ওদিকে, আর একটা আমার চোখের সামনে, বাঃ!"

রূপের কলার ধরে এক ঝাঁকুনি দিল আরিয়ান। বাবাই ছিটকে পড়তে গিয়ে কোনওমতে দু'জনের পিছন দিক দিয়ে উঠে এল। প্রাণপণে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল দু'জনকে। আরিয়ান এক ঘুঁষি মারল রূপকে। রূপ বাঁ চোখটা ঢেকে কোনওক্রমে ঘুঁষিটা ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করল, পারল না। আরিয়ান আবার খ্যাপা ষাঁড়ের মতো এগিয়ে আসছে। রূপ সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

পিছন থেকে হঠাৎ একটা গম্ভীর গলা, "কী হচ্ছে? কী হচ্ছে কী এটা?" উজ্জ্বল শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে দু'জনকে ছাড়াল। দু'জনে দু'দিকে ছিটকে পড়েছে।

"ব্যাপার কী, আরিয়ান?" আরিয়ান ঝেড়েঝুড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। এবার খুব খারাপ কয়েকটা গালাগাল দিল। উজ্জ্বল এক চড় মারল তাকে। "হোয়াট ননসেন্স! ব্যাপারটা কী? বল। ঠিকঠাক বল।"

"কাকে বলব?" আরিয়ান মাটিতে থুতু ফেলল। আরও একবার গালাগাল দিয়ে উঠল আরিয়ান। আরও একটা থাপ্পড়।

"শি ইজ মাইন," সে বাবাইয়ের দিকে আঙুল দেখাল।

"ইন হোয়াট সেন্স?" উজ্জ্বল বলল।

রূপরাজ উঠে আসতে আসতে বলল, "তাই কি ওকে ড্রাগ খাইয়ে রেপ করেছিলি?"

আরিয়ান প্রথমে হকচকিয়ে গেল। চাঁদের আলোয় মুখের রং বোঝা যাচ্ছে না। তারপর বলল, "কোন সোয়াইন বলেছে? কে? রণবীর? দেব?"

"সমস্ত বলে দিয়েছে," দিয়া বলে উঠল। "তুই ভাবছিস তোর "ক্রাশ' ক্লাবের ওই লম্পটগুলো তোকে প্রোটেকশন দেবে? ইউ আর স্যাডলি মিসটেকন ইয়ার।"

হিংস্র মুখ করে আরিয়ান বলল, "ও নিজে কী করেছে? জিজ্ঞেস করিসনি তো?"

"সব জানি। বিচার হবে ওয়ান বাই ওয়ান, কেউ বাদ যাবে না। তবে ওর বিরুদ্ধে তোর সাক্ষ্যটা দরকার।"

"সাক্ষ্য? ও-ই তো নাটের গুরু। দ্যাট সোয়াইন। ও বলেনি, তুই তোরটা পাবি, যদি আমি আমারটা পাই। ওরটা মানে, তুই দিয়া ঘোষাল।" উচ্চারণের অযোগ্য কিছু ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করল আরিয়ান।

"ব্যস আমাদের কাজ কমপ্লিট," উজ্জ্বল শান্ত গলায় বলল।

"যথেষ্ট এভিডেন্স বলে গ্রাহ্য হবে আশা করি ক্যাসেটটা," দিয়া বলল আরও শান্ত গলায়।

হঠাৎ আরিয়ান ছুটে গেল দিয়ার দিকে। উজ্জ্বল দু'পা এগিয়ে গিয়ে তাকে দিল এক ধাক্কা। রূপ আর এক ধাক্কা দিয়ে বলল, "জঘন্য কদর্য এই কাজটা দ্বিতীয়বার করিস না। মনে রাখিস লেসনটা। রেপের জন্য ক'বছর আর জেল হয়! ও কিছুই না। ওটা কেটে যাবে। কাটবে না যেটা, সেটা হল দুর্নাম। মা-বাবা আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখাবি কী করে ভাব।"

আরিয়ান উঠে এসে উজ্জ্বলকে আক্রমণ করল। উজ্জ্বল তার পাটাতনের মতো কাঁধ দিয়ে ওকে ঠেকিয়ে বলল, "আমরা তোকে মিছিমিছি মারধর করতে চাই না। জাস্ট আইনের হাতে তুলে দেব। দু'জন দু'দিক থেকে ঠেলতে ঠেলতে তাকে ঝোরার দিকে নিয়ে গেল। রূপ বলল, "বেশি ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করিসনি।" তারপর অন্যদের দিকে ফিরল, "চল আমরা ফিরি। আজকের রাতটা কোনওমতে কাটিয়ে, কাল সকালবেলাই ফিরব। গোছগাছ কমপ্লিট করে রাখিস সবাই।" তাঁবুতে ফিরে গেল চারজন।

উজ্জ্বল বলল, "দিয়া ক্যাসেটটা আমার কাছে দে। আর একটা কথা, ও যদি রাত্রে আবার এটার ওপর ডাকাতি করবার চেষ্টা করে, করবেই, আমাদের পালা করে জেগে পাহারা দিতে হবে।"

বাবাই বলল, "কিন্তু ও তো তাঁবুতে ফিরবেই। ওর জিনসপত্তর রয়েছে। শোবেও নিশ্চয়। আমার মনে হয়, এরপর ও কাকুতি-মিনতি করবে আমাদের কাছে। এই ধরনের কাপুরুষরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই-ই করে। সে পথটা খোলা রাখ।"

"মানে?" দিয়া চড়া গলায় বলে উঠল। "তুই কি ওকে মাফ করে দেওয়ার কথা চিন্তা করছিস?"

"না, না। আমি বলছি ডাকাতিটা ভিতরে এসে ইমোশন্যাল চেহারায় করবে, কাজেই সবাইকে সাবধান থাকতে হবে।"

একটু পরে আরিয়ান সত্যিই দুপদাপ করে তাঁবুতে ফিরে এল। নিজের মালপত্রের ভেতর থেকে একটা বোতল বের করল। তারপর আবার দুপদাপ করে ফিরে গেল।

"মাল নিয়ে এসেছে, আমি অনেক আগেই টের পেয়েছি," রূপ বলল।

বিরাট শব্দে কোথাও একটা বাজ পড়ল। উজ্জ্বল তাঁবুর বাইরে থেকে ঘুরে এল। বলল, "বৃষ্টি হবে, মনে হচ্ছে।"

কোথা থেকে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। উপরের দিকে ইতিমধ্যেই বৃষ্টি হয়েছে কি না কে জানে!

তাদের তাঁবু খাটানো হয়েছে মোটামুটি সমতল জায়গায়। কিন্তু বেশি বৃষ্টি পড়লে কী হতে পারে ভেবে, সবাই মালপত্র নিয়ে বসেই রইল।

ঘুমোব না, ঘুমোব না করেও ঘুম এসেই যায়। সকলেরই ঢুল এসেছে। দিয়া একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবাই স্বপ্ন দেখছে, সে হিমালয়ে চড়ছে। তেনজিং নোরগে সঙ্গে আছেন, সামনের উপত্যকায় নাকি মানস সরোবর। পৌঁছে দেখে, ও মা এ তো ওদের রোগাসোগা চূর্ণী নদী! মা-বাবা দু'জনেই নদীর জলে চান করে উঠে এল...নাঃ মা-বাবা তো নয়! শুকতারা আর আরিয়ান! এইরকম চলছেই চলছেই।

রূপ হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে বসে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু ও ভাবছে, ও জেগে আছে। পাহারা দিচ্ছে। কে যেন তাকে ঝাঁকাচ্ছে ঝাঁকাচ্ছে।

"কী রে?" উজ্জ্বল সামনে।

"সর্বনাশ হয়েছে!"।

"কী?"

"আরিয়ান ঝোরার জলে পড়ে গিয়েছে।"

"পড়ে গিয়েছে মানে?"

উজ্জ্বল বিরক্ত হয়ে বলল, "পড়ে গিয়েছে মানে পড়ে গিয়েছে। যাচ্ছিল তো। হামাগুড়ি দিতে গিয়ে পড়ে গিয়ে থাকবে।"

"তুই কী করে জানলি?"

"এত কথা না বলে শিগগির বের হ। তোর কাছে নাইলন রোপ আছে না? নিয়ে আয়। আমি এগিয়ে যাচ্ছি।"

ওদের কথাবার্তায় দিয়া আর বাবাইয়েরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সকলেই বেরিয়ে এল।

বাইরে ঝিপঝিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ঝোরার ধারে পৌঁছোতে পৌঁছোতেই ভিজে গেল সব।

ভোর হয়ে এসেছে। আকাশে যতই মেঘ থাক, সূর্য উঠলে চরাচরে একটা ঘোলাটে, সাদাটে ভাব আসেই। ওরা একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। ঝোরার মধ্যে একটা বোল্ডারের ওপর আরিয়ান বসে, বোতলটা ওর কোলে, আরিয়ান গলা ছেড়ে গান গাইছে। কী গান, কী বৃত্তান্ত এখান থেকে শোনা যাচ্ছে না।

"তার মানে পড়ে যায়নি," উজ্জ্বল বলল। "আমি যখন দেখেছি, ও কীরকম গুঁড়ি মেরে ওই বোল্ডারটায় যাওয়ার চেষ্টা করছিল।"

"আরিয়ান, আরিয়ান। চলে আয় ম্যান," রূপ চেঁচাল প্রাণপণে।

আরিয়ান শুনতে পেল বলে মনে হল না। পরক্ষণেই ওরা একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখল। হুড়মুড় করে একটা শব্দ। ঝোরাটার ওপর দিক থেকে ঝাঁপিয়ে আসছে জল। মুহূর্তে জল বেড়ে তো গেলই। ওরা দেখল আরিয়ান একটা পাক খেয়ে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

উজ্জ্বল পাড় ধরে দৌড়ে নামতে-নামতে দড়িটা ছুড়ে দিচ্ছে। "আরিয়ান ধর ধর, প্লিজ ট্রাই...ট্রাই।"

ওর সঙ্গে বাকি তিনজনও দৌড়ে নামছে। ঝোরার জল উপচে পড়ছে, পাড় ভাসিয়ে দিচ্ছে এখন। আরিয়ান ক্ষীণভাবে একবার দড়িটা লুফে ধরতে চেষ্টা করল, পারল না। ধাক্কা খেতে খেতে অদৃশ্য হয়ে গেল। নামতে নামতে অবশেষে ওরা স্থির হয়ে দাঁড়াল। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় রূপরাজ বলল, "তোরা সরে দাঁড়া, এ জলে ভীষণ স্রোত।"

একটা বাঁক ঘুরে ঝোরাটা ওদের চোখের বাইরে চলে গিয়েছে। উজ্জ্বল শুকনো উদ্‌বিগ্ন মুখে বলল, "সর্বনাশ!"

রূপ বলল, "যে করে হোক, ওকে উদ্ধার করতেই হবে," তার গলা এখনও ফ্যাঁসফেঁসে।

"এ টেকনিক্যাল লোকের কাজ, রূপ। আমরা এ জলে পা ঠেকালে পর্যন্ত ভেসে যেতে পারি।

লেটস হোপ, অল ইজ় নট লস্ট। আরিয়ান ইজ় আ রিসোর্সফুল গাই। সাঁতার জানে, জানে অনেক ট্রিক্স। হয়তো...হয়তো...”

“হুইস্কিটা যদি না খেত! পুরো বোতল শেষ করেছে বোধহয় বসে বসে,” দিয়া বলল।

কাকভেজা ভিজে ওরা আদিবাসী বসতিটার দিকে চলল।

এক-এক করে লোক জমতে লাগল। বিবরণ শুনে ওরা মাথা নাড়তে লাগল। ওদের মতে, কোনও আশাই নেই। এবং বডি উদ্ধার করবার জন্যে এখন কিছুই করা যাবে না। তবু উজ্জ্বল আর রূপকে নাছোড়বান্দা দেখে, তিন-চারজন লোক কয়েকটা মস্ত লম্বা বাঁশের লাঠি নিয়ে ওদের সঙ্গে চলল। উজ্জ্বল মেয়েদের বলল, “তোরা ফিরে যা টেন্টে। গোছগাছ করে নে।”

জামাকাপড় বদলে এখন ওরা চুপচাপ তাঁবুর ভেতরে বসে। জেদ করে হয়তো উজ্জ্বলদের সঙ্গে যেতে পারত। আরও আরও নীচে, জীবিত বা মৃত আরিয়ানের সন্ধানে। কিন্তু কোথাও তো একটা সীমা টানতেই হয়। দিয়া অতক্ষণ ভিজে ঠকঠক করে কাঁপছিল। তার এখন জ্বর এসে গিয়েছে। বাবাইয়ের সহ্যশক্তি আর একটু বেশি, কিন্তু সেও কাবু। দু'জনেই গরম চায়ে ব্র্যান্ডি দিয়ে খেয়ে নিল, সঙ্গে প্যারাসিটামল।

প্রকৃতিই কি শেষে শোধ নিল। প্রকৃতি অন্ধ নিয়মে চলে। প্রকৃতির তো কোনও বিবেক নেই! আমরা নিজেদের ইচ্ছেমতো তার উপরে অনেক গুণ বা দোষ আরোপ করি। আচ্ছা, আরিয়ান তো ওদের কাছে ক্ষমা চাইতে পারত! যেমনটা ওরা আশা করেছিল! তার বদলে ও হুইস্কির বোতল নিয়ে ঝোরার ধারে চলে গেল। কেন? ইগো? হার মানবে না? ক্ষমাপ্রার্থনাটা কাপুরুষের কাজ! ওর কি ধারণা ক্রাশ ক্লাবের কীর্তিটা বীরপুরুষের? এবং বীরপুরুষেরা ভাঙে, তবু মচকায় না? ওর না মচকানোর চিহ্ন হল তা হলে ওই বোতলটা। কিন্তু ঝোরার ধারে গেল কেন? ওখানেই জ্যোৎস্নালোকে ওদের শেষ বনভোজন। ওখানেই চারজনের এত দিনের পরিকল্পনার নাটকীয় ক্লাইম্যাক্স। এগুলোই কি মিলিতভাবে ওকে ঝোরাটার ধারে টানছিল? আচ্ছা, রেপের মামলার আসামি হওয়ার চেয়ে কি ও আত্মহত্যাটা ভালো মনে করেছিল? সুরার সাহায্যে মনে সাহস আনা। ওইরকম মাতাল অবস্থায় ও কেন ঝোরার পাথরে বসতে গেল? তা যদি বলো, মাতালের কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে?

এখন, ওর স্বীকারোক্তি আর সাক্ষ্য সংবলিত ওই ক্যাসেটটা বিপজ্জনক হয়ে গেল। পুলিশ বলবে, ওরা প্ল্যান করে মার্ডার করেছে। ঠান্ডা মাথায়। নষ্ট করে ফেলো ক্যাসেটটা। রণবীরের উপর আর প্রতিহিংসা নেওয়াও হচ্ছে না। কিল খেয়ে কিল হজম করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু ক্যাসেট বাদেও কি ওরা সন্দেহের ঊর্ধ্বে? ঠিক আছে। অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়েছ, দুর্ঘটনা ঘটছে, কিন্তু কেন তোমরা বাড়িতে ঘুণাক্ষরেও জানালে না? একটা এক্সকার্শনে যাচ্ছ বন্ধুরা মিলে, এর মধ্যে এত লুকোছাপার কী দরকার? গোপন কোনও উদ্দেশ্য তোমাদের অবশ্যই ছিল। সিক্রেট অ্যাজেন্ডা। দুটি মেয়ে সঙ্গে। তৃতীয় মেয়েটি মাঝপথে চলে এসেছে। অর্থাৎ গিয়েছিল, তিন ছেমরি, তিন ছ্যামরা, পার্ফেক্ট সিক্সসাম। সেক্স অ্যাঙ্গল তো দেওয়াই যায়। সেক্স ফলোড বাই মার্ডার। খুবই চলতি ফর্মুলা।

॥ ২৪ ॥

দিয়ার প্রবল শীত করতে থাকে। বাবাইয়ের শীত করতে থাকে। রেপ ভিকটিম থেকে খুনের আসামি! শাস্তি দেওয়া মানে কী? খুন করতে চাওয়াই তো একরকম। সেই ভিতরের প্রতিহিংসাটাকে আর একটু সামাজিক রূপ দেওয়া, এই তো? খুব জটিল প্রশ্ন। কিন্তু এ-ও তো অদ্ভুত! যে ছেলে তাকে ভ্যালেনটাইন পাঠায়, সে কী করে তাকে ড্রাগ খাইয়ে ধর্ষণ করে? এ তো বিকার, অতি ভয়ংকর। ও যদি তার প্রেমে পড়ত, তা হলে সামনে আসত, বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করত। এটাই তো স্বাভাবিক! প্রত্যাখ্যাত হলে অন্য কথা। কিন্তু ও তো সে পথেই যায়নি! এমন বাঁকা পথ ধরল, যা কোনও

স্বাভাবিক মানুষের মাথায় আসবার কথাই নয়। ওই দেবার্ক বা রণদেবের কেস আলাদা। ওরা শুধুই জব্দ করতে চেয়েছিল দিয়ার অহংকারকে, অপমান করতে চেয়েছিল। কিন্তু আরিয়ান? কী মনোবৃত্তি থেকে ও কাজটা করল? বাবাইয়ের টানেই যে ও এই অ্যাডভেঞ্চারে যোগ দিয়েছিল, এ বিষয়েও সন্দেহ নেই। এই চারটে দিন একসঙ্গে ঘুরেছে, কাটিয়েছে, অনেক সুযোগ দিয়েছে বন্ধুরা ওকে, বাবাইয়ের কাছাকাছি হওয়ার, কথা বলবার। কই? অথচ ঝগড়ার সময়ে স্পষ্ট বলে উঠল, "শি ইজ মাইন!" কী মানে এই কথার? এইসব ঘটনার? এইসব ব্যবহারের? কী মানে এইসব ছেলের?

জ্বরের ঘোরে, প্রবল ক্লান্তির অতলান্ত ঘুমে দু'জনেই স্বপ্ন দেখে। টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। চারজনের হাতেই হাতকড়া। উজ্জ্বলের ঘাড়ে ওরা চাপিয়ে দিয়েছে একটা ক্রস। অবিকল যিশুর ভঙ্গিতে, বিরাট ক্রস কাঁধে, সামনে ঝুঁকে পড়ে, সে চলেছে। ভিয়া ডলোরোসা, যন্ত্রণার সেই ঐতিহাসিক পথ ধরে। সবাই হাততালি দিচ্ছে। কেন? উজ্জ্বল শহিদ হচ্ছে বলে? দিয়ার ভিতর থেকে প্রবল কান্নার ঢেউ উঠছে। সে ঘুমের ঘোরেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। বাবাই তার ঘোর লাগা লাল-লাল চোখ দিয়ে দিয়াকে দেখছে। কাঁদছিস কেন? আরিয়ানের জন্য? হি ইজ নো মোর! এ ক'দিনে একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল, না?

দিয়া বলল, "স্বপ্ন দেখলাম, উজ্জ্বল ক্রুসিফিক্স কাঁধে নিয়ে যাচ্ছে। তাই..."

"তুই ওকে ভালবাসিস, না রে?"

"প্লিজ বাবাই, বলিস না। শুধু ভালবাসলেই হয় না, মিউচুয়্যাল হওয়া চাই। ও তোকেই..."

"দিয়া, তোকে অনেকবার বলেছি..."

"চুপ কর, ভাইবোনের মতো, ভাইবোন তো নয়। দেখলি না, তোর জন্যে কেমন জান লড়িয়ে দিল। এখন শহিদ হতে চলেছে।"

"কী উলটোপালটা বকছিস! স্বপ্নের সঙ্গে রিয়্যালিটি গুলিয়ে ফেলছিস?" বলেই বাবাই স্বপ্নের মধ্যেই বুঝতে পারে, ওটাও তার স্বপ্ন ছিল। দিয়া ঘুমিয়ে যাচ্ছে, ন্যাকড়ার পুতুলের মতো। শুকতারার সার্ভিস, ডাবল ফল্ট করল, তার পয়েন্ট। অ্যাডভান্টেজ শুকতারা। কে হাঁকছে? অ্যাডভান্টেজ বাবাই কেউ বলছে না। পুলিশের গাড়িতেও দিয়া ঘুমিয়ে যাচ্ছে। একজন পুলিশ বলল, "ও তো মরে গিয়েছে। দুটো ডেডবডি একসঙ্গে স্বর্গে যাচ্ছে।"

দিয়া ঝুঁকে পড়ল বাবাইয়ের উপর। "কী বিজবিজ করছিস? কারা স্বর্গে যাবে? কে যাবে, কে যাবে না, আমি দিয়া ঘোষাল ঠিক করে দেব। প্ল্যানটা কার? উজ্জ্বলের না রূপের? রূপরাজ?"

"হলেই বা, আমরা সবাই ডিসকাস করেছি। একা ওর দায় নাকি?"

"তুই কেন রূপের সাফাই গাইছিস? রূপই তো আমাদের এমন বিপদে ফেলল, সক্কলে একসঙ্গে পুলিশবাড়ি যাব। আদমসুমারি হবে, ছাড়া পাব কি না...জানিস তো শুকতারা রাজসাক্ষী হয়েছে?"

"ধ্যাৎ, শুকতারা তো জজ। ও কি আর আমাদের ডেথ সেন্টেন্স দেবে? আফটার অল বন্ধু তো।"

দিয়া ভ্যাংচাল, "আফটার অল বন্ধু তো! আরিয়ানকে কেন মারলি? আফটার অল বন্ধু তো!"

সমস্ত স্বপ্নটাই বাবাই দেখছিল নাকি দিয়াই? দু'জনের স্বপ্ন কি মিশে গেল?

বেলা তিনটের সময়ে কাকতাড়ুয়ার চেহারায় ফিরে এসে উজ্জ্বল আর রূপ ওদের এই অবস্থা দেখল। বিশাল জ্বর। ভুল বকছে। দুটো মেয়েই।

'হোপলেস," ওরা মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে।

"এই দিয়া, এই বাবাই," দু'জনে প্রাণপণ ডাকে। মাথা ধুইয়ে দেয়। বাবাইয়ের খাতা দিয়ে জোরে জোরে পাখা করে। "শিগগির উঠে বোস। ওষুধ গিলতে হবে।"

উজ্জ্বল কাঠ-কুটো জ্বালিয়ে চা করে। বিশেষ কিছু নেই, মুড়মুড় করে বিস্কুট খায় দু'জনে। তারপর মুণ্ডা বসতির দিকে চলে যায়। ওদের সাহায্যে পাহাড় থেকে নামতে রাত হয়ে যায়। ওরা ওদের খাটুলিতে করে দুটি অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে মাঠাবুরুর বনবাংলোয় পৌঁছায়, শেষ রাতে। প্রাণ বেরিয়ে

গিয়েছে। এখান থেকে যোগাযোগগুলো করা যায়, ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশন, থানা, হাসপাতাল। দুর্ঘটনার খবর জানিয়ে উদ্ধারের আর্তি পৌঁছে যায় সদর থানায়। 'রূপসী বাংলা' ধরে কলকাতায় ফেরা। নার্সিংহোম, আবারও সেই ডক্টর সেন।

দুর্ঘটনার খবর পুলিশকে জানানো হয়েছে, যত শিগগির সম্ভব। 'পুরুলিয়া ট্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশন'ও ওদের গতিবিধি সম্পর্কে যথেষ্ট জানে। তবু পুলিশের সওয়াল থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। পুলিশ মুণ্ডাবসতিতে গিয়ে ওদের সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। তার চেয়েও কঠিন বাড়িতে জবাবদিহি, পরিচিতজনের কৌতূহলী মুখ। মিডিয়ার কল্যাণে তাদের মুখগুলো এখন সবার চেনা। যে-যার মতো নিজের মতো ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা দিচ্ছে, তাইতে বিশ্বাস করছে। ত্রিকোণ প্রেম, দুটো, হতেই হবে। এর বাইরে জনগণের কল্পনা কাজ করে না। আরিয়ানকে যারা চিনত, তারা ছবিটা মিলিয়ে নিতে পারছে। মরিয়া ধরনের, চালবাজ, স্পয়েল্ট বরাবর। কিন্তু বাবাইকে, দিয়াকে যারা চিনত, তারা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। ছবি এক্ষেত্রে মিলছে না। রূপের বাড়িতে কোণঠাসা অবস্থা। উজ্জ্বল ফিরে গিয়েছে সোজা তার হস্টেলে। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে তাড়া করেছেন সেখানে। উজ্জ্বল শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছে, এরকম জিনিস আর হবে না। যেখানে যাবে, বলে যাবে, কোথায়, কতদিন, কাদের সঙ্গে। সবাইকারই ধারণা, ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যেই না বলে পালিয়েছিল। পরিষ্কার সেক্স অ্যাঙ্গল আছে, ওদের গল্পটাতে। অত দূরে, বন্য জায়গায়, শুধু সেক্সটুকুর জন্যে কেন যেতে হবে? এটা কেউ ভাবছে না। এই জনগণ জানে না, 'ক্রাশ'-এর মতো ক্লাবে, নানান রিসর্টে, এমনকী, এইসব ছেলেমেয়েদের শূন্য বাড়িতেও, যৌন মজা উপভোগ করার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধে বর্তমান।

আরিয়ানের দেহাবশেষের শেষকৃত্য হয়ে গেছে। শ্মশান থেকে ফিরে সকলেই যে-যার বাড়িতে গিয়ে চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। কথা বলার ইচ্ছে নেই। দু'দিন পরে শুকতারার বাড়িতে জমায়েত। এখন পাঁচজন।

লনে চেয়ার। শুকতারা বলল, "চা না কফি?"

বিকেল বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। ছাঁটা ঘাসের উপর জলের ফোঁটা চিকচিক করছে। ঘাসের গন্ধ বেরোচ্ছে। সেই সঙ্গে বিকেলের গন্ধ। বিকেলের একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধও আছে। এই কলকাতা, এইসব পথঘাট, এই ছাঁটা ঘাসের লন, বিকেলের ডিজেল-মেশা সোঁদা গন্ধ, গাড়ি-গাড়ি-গাড়ি, সবই যেন বহুদূরের। কেমন অবাস্তব! দশদিনের, ট্রেন যাত্রা ধরলে, বারোদিনের অভিজ্ঞতাটা যদি বাস্তব হয়, তা হলে এই শহর, এর রুটিন কী করে বাস্তব হতে পারে? এই বিস্ময়, বিভ্রান্তি, চার জনের চোখেমুখে শিশিরের মতো লেগে আছে। দুটো অভিজ্ঞতার মাঝখানে যে দৌড়ঝাঁপ, ট্রেকিং অ্যাসোসিয়েশন, হাসপাতাল, থানা-পুলিশ, জবানবন্দি, কাগজে-কাগজে নিজেদের ছবি, খুন না আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা: ব্রেকিং নিউজ টিভি-র চ্যানেলে-চ্যানেলে। সমস্ত চ্যানেল হুমড়ি খেয়ে পড়ছে চারজনের ওপর, যেন ঘেরাও করছে, পিষে ফেলছে, এটাই বা কী? রিয়্যাল?

"চা না কফি?"

"এনিথিং।"

"কাজু-কেক-পেস্ট্রি-স্যান্ডউইচ?"

কেউ কোনও কথা বলল না।

"তোরা অমন মুখ শুকিয়ে আছিস কেন?" শুকতারা বলল। "দেখ শ্রাদ্ধের পরে একটা নিয়মভঙ্গ অনুষ্ঠান তো আছে। লেটস হ্যাম সাম গুডিজ।"

সামনে দাঁড়ানো বেয়ারা জাতীয় লোকটিকে নির্দেশ দিল শুকতারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভর্তি পট, কাপ, প্লেট, চামচ, বিস্কিট, কেক, স্যান্ডউইচ...

"সকলেই ব্ল্যাক তো? খালি দিয়ার একগঙ্গা দুধ চাই। না রে?" শুক কি একটু হাসবার চেষ্টা করছে।

দিয়া বলল, "তোকে বলতে হবে, কেন দুম করে ফিরে এলি?" সে অত সহজে ভুলছে না।

"সত্যি বলছি, আমি প্রচণ্ড কুঁড়ে। একদম কামচোর। ক্রিচার কমফর্টস ভীষণ জরুরি আমার কাছে।"

"তা হলে গেলি কেন? গোড়া থেকেই তো না করতে পারতিস?"

"রিয়্যালাইজ করিনি। ঝোপেঝাড়ে কম্মো করতে গিয়েই বুঝলাম। একটা পোকা অস্থানে-কুস্থানে এইসা কামড়ে দিল।" হেসে উঠল শুকতারা অল্প একটু, থামল কিছুক্ষণ। তারপর নিজের রাঙানো নখগুলো দেখতে দেখতে আস্তে বলল, "আমি না গেলে আরিয়ান যেত না। আমি চাইছিলাম, ও যাক, শাস্তি পাক। কিন্তু ওর শাস্তির সময়ে আমি কী করে উপস্থিত থাকব? ভেরি অকওয়ার্ড। ও যে আমাকে ভীষণ বিশ্বাস করত।" হঠাৎ সে বড় বড় চোখে একটু তেরছা করে উজ্জ্বলের দিকে তাকাল, "সত্যি করে বল তো, ওকে মেরেছিস? হ্যাভ ইউ পিপল রিয়্যালি কিলড হিম? মেরে থাকলে আমার কিছু বলার নেই। পুলিশকে বলে দেওয়ার মতো নীচও আমি নই। বাট আই ওয়ান্ট টু নো দা ট্রুথ।"

রূপ খুব আহত চোখে তার দিকে চেয়ে রইল, "আমাদের খুনি বলে মনে হয় তোর? ছোট থেকে না হলেও কিছুটা তো চিনেছিস। এইটুকু বিশ্বাসও কি আশা করতে পারি না আমরা তোর কাছে?"

বাকি তিনজন কোনও কথাই বলল না। ব্ল্যাক কফিতে চুমুক দিয়ে কেউ কেউ নামিয়ে রাখছে কাপটা।

উজ্জ্বল হঠাৎ তার শার্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট ক্যাসেট বের করল, "দিয়া, ডিক্টাফোনটা এনেছিস?"

পুঁচকে জিনিসটা টেবিলের উপর রাখল দিয়া। ক্যাসেট ভরল, চালিয়ে দিল। সমবেত কণ্ঠে বেজে উঠল, আহা! আহা! কী রেঁধেছিস রে!

তোর এ গুণ আছে জানতুম না তো!...দূর, আমি রান্নার কী জানি!

সেই বিগিনার্স লাক বলে একটা কথা আছে না...

আমিও পারি, আমায়ও একটা চান্স দে।

হিংসে হচ্ছে নাকি? স্পষ্ট আরিয়ানের গলা।

ক্যাসেট চলছেই চলছেই। প্রত্যেকের গলা স্পষ্ট। পশ্চাৎপটে ঝিঁঝির আবহ সঙ্গীত পর্যন্ত কান পাতলে শোনা যায়। পাতার সরসর। কী একটা পাখি ডেকে গেল।

শি ইজ় মাইন, আরিয়ানের গলা।

তাই কি ওকে ড্রাগ খাইয়ে রেপ করেছিলি? রূপরাজ।

কোন সোয়াইন বলেছে? কে? রণবীর? দেব?

সমস্ত বলে দিয়েছে। তুই ভাবছিস তোর 'ক্রাশ' ক্লাবের ওই লম্পটগুলো তোকে প্রোটেকশান দেবে? ইউ আর স্যাডলি মিসটেকেন...

অবশেষে উজ্জ্বলের গলা, ব্যস আমাদের কাজ কমপ্লিট।

আমরা তোকে মিছিমিছি মারধর করতে চাই না। জাস্ট আইনের হাতে তুলে দেব।

মন দিয়ে শুনছিল শুকতারা, বলল, "তারপর?"

রূপ বলল, "আমাদের ওর কনফেশন আর রণবীরদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যটা দরকার ছিল। আর রেকর্ড করিনি। ওই মদের বোতলটাই ওর সর্বনাশ করল। ওটা না থাকলে ওর বোল্ডারে বসার সাধ হত না।

উজ্জ্বল বলল, "সেটা বলা যায় না। হি ওয়াজ ফিলিং এক্সপোজড, আইসোলেটেড। ছিপছিপে জলের মধ্যে একটা বড় সাইজের বাদামি-কালো বোল্ডার। ইচ্ছে হতেই পারে। আসলে ওই আনএক্সপেক্টেড জলের তোড়টা। উপর দিকে হেভি বৃষ্টি হয়েছিল। আমরা নীচে অতটা টের পাইনি। চোখের সামনে দেখলুম, ঝোরার জল বেড়ে গেল। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে এল জল, খ্যাপা বানের মতো।

ড্রাঙ্ক, অর নট ড্রাঙ্ক, ওই কিলার ঝোরার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া তখন অসম্ভব। কী ধার! কী তোড়! বাপ রে: এক যদি আমাদের দড়িটা ও ধরতে পারত।"

"দড়ি? দড়ি নিয়ে গিয়েছিলি কেন?" শুকতারা কেমন খাপছাড়া ভাবে প্রশ্ন করল। "আগে থেকেই জানতিস বুঝি, আরিয়ান ঝোরায় ভেসে যাবে, দড়ি ছুড়তে হবে।"

"কী আশ্চর্য!" হতাশ মুখ করে উজ্জ্বল বলল। "ট্রেকিং-এ যাচ্ছি। পুরো সেট আর অ্যাডভাইস নিচ্ছি পুরুলিয়ার অ্যাসোসিয়েশন থেকে, দড়ি, দড়ির মই, হাতুড়ি, হুক, সব থাকবে। থাকবে না? তুইও তো ছিলি সঙ্গে। এখনও কি আমাদের সন্দেহ করেই যাচ্ছিস? ভেরি ভেরি আনফর্চুনেট।"

"তা ঠিক নয়," শুকতারা শূন্যের দিকে চেয়ে বলল। "পুলিশ তো তোদের প্রশ্নগুলো করতে পারে।"

রূপ উজ্জ্বলকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "ট্রেকিং-এর সরঞ্জাম নিয়ে পুলিশের মনে কোনও সংশয় নেই শুকস। ওদের খটকাটা অন্য জায়গায়। প্রথম, তুমি কেন মাঝপথে চলে এলে? আর দ্বিতীয়, আমরা কেউ বাড়িতে ডিটেল কিছু বলিনি কেন? দেখো দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া যায়, আমরা এই জেনারেশন তো অলরেডি নোটোরিয়াস ফর আওয়ার রেকলেসনেস। আর নট উই? কে অত বলা-কওয়ার ধার ধারে। অবাধ্য এই একটা, প্লাস সঙ্গে মেয়েরা থাকছে। মেয়েদের সঙ্গে ছেলেরা, বাড়িতে মধ্যযুগীয় আপত্তি হতে পারে। সহজ জিনিসকে ঘোরালো করে দেখতে তো গার্জেনদের জুড়ি নেই! কিন্তু শুক, তোমার মাঝপথে চলে আসাটা কেউ ভালো বুঝতে পারছে না। রোম্যান্টিক মান-অভিমানের একটা অ্যাঙ্গল দিচ্ছে।"

শুকতারা আধখানা চোখে চেয়ে বলল, "আমার কৈফিয়ত আমি আগেই দিয়ে দিয়েছি। নতুন কিছু বলবার নেই। বাই এভরিবডি।"

সে উঠে দাঁড়াল। অন্যরাও। পুরোটাই যেন হঠাৎ।

টেবিলের ওপর কেক-পেস্ট্রি-বিস্কিট-স্যান্ডউইচের দল অসহায়, অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে। আধ-খাওয়া, সিকি-খাওয়া, একেবারে না ছোঁয়া কফির কাপ।

শুকতারা পিছন ফিরে চলে যাচ্ছে। ওর সাদা টপটা, নীল রঙের ট্র্যাকস-এর ওপর কেমন ঝুলছে। দিয়া হঠাৎ কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল। বলল, "শুকস, কাঁদছিস কেন? তোকে কি এ দুর্বলতা মানায়? বিশ্বাস কর, আমাদের সবার মন খারাপ, ভীষণ।"

একটু থমকে দাঁড়াল শুকতারা। তারপর চলে গেল, খুব তাড়াতাড়ি। নিঃশব্দে সবাই বেরিয়ে এল।

প্রায় জনহীন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। এখান থেকে দিয়ার বাড়ি হাঁটা পথ। ভরা গ্রীষ্ম এখন। বসন্ত এখানে পথ ভুলে আসে। ক'টা দিন পলাশ-কুসুম ফুটিয়ে চলে যায়। তারপর এ-বঙ্গ গ্রীষ্মের কবলে। সে চৈত্রই হোক, আর ফাল্গুনই হোক, ক্যালেন্ডারে। খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে এবার। গাছগুলো দুলছে, দেবদারু, গুলঞ্চ, দোলনচাঁপা, কৃষ্ণচূড়ার পাতা কেমন যেন রোমাঞ্চিত, থিরথির করে কাঁপছে।

বাবাই বলল, "দিয়া, তুই ঠিক দেখেছিস? শুকতারা কাঁদছিল? আমি ভাবতে পারছি না, শুককে কাঁদতে দেখব। অত শক্ত মেয়ে!"

দিয়া বলল, "তোরা তো কিছুই বুঝিস না। শি ওয়াজ ইন লভ উইথ আরিয়ান। তোর ওপর আক্রমণটাই বা ও কেমন করে মানবে? ওর মৃত্যুটাই বা কেমন করে সইবে? ওর দোটানাটা আজ দেখেও বুঝলি না?"

সকলেই পথের উপর থেমে গেল, যেন বজ্রপাত হয়েছে।

"যদি জানতিস, আগে বলিসনি কেন?" উজ্জ্বল আর রূপ একসঙ্গে বলে উঠল।

"জানতাম না তো! আজই চোখের সামনে দেখে জানলাম। দু'জনে একসঙ্গে পড়ে, একসঙ্গে অনেক জায়গায় যায়। তো কী? এ রকম ওয়র্কিং রিলেশনশিপ হাজারটা আছে। আরিয়ানও এভাবেই

নিয়েছিল। ইনসিনসিয়ার ফুল একটা! শুকস ওয়জ ডিফরেন্ট। তা ছাড়া জানলেই বা কী করতিস? শাস্তিটা দিতিস না? মাফ করে দিতিস? তাতেও সবচেয়ে আপত্তি হত শুকেরই। এসব অপরাধের ক্ষমা নেই। ক্ষমা হয় না। আমরা আর কী শাস্তি দিয়েছি? একটা কনফেশন আদায় করেছি বই তো নয়। আসল শাস্তি যে দেওয়ার, সে-ই দিয়েছে।"

"আমরা কেউ কিছু বুঝলাম না, তুই বুঝলি?" ক্ষীণ গলায় রূপ বলল।

"তোরা ছেলেরা কিছু মনে করিসনি, জন্মবোকা। তোরা কিছুই কোনওদিন বুঝিসনি, বুঝবি না। কারণ, বেসিক্যালি বুঝতে চাস না।"

দিয়া ওদের ছেড়ে বাড়ির দিকে চলে গেল জোর কদমে। তার এই চলে যাওয়াটা দেখাল একেবারে শুকতারার মতো। একলা, মাথা উঁচু, কিছু গোপন করছে। এই গোপন করার মধ্যেই যেন তার জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

বাবাই উজ্জ্বলের দিকে তাকায়, উজ্জ্বল বাবাইয়ের দিকে। রূপরাজ ঈষৎ বিভ্রান্ত, ওদের দু'জনের দিকে। তারপর ওদের ভেদ করে শুকতারার দিকে, আরিয়ানের দিকে। তিনজন, পাঁচজন, না ছ'জনকে ঘিরেই পাক খায় পাহাড়ি নির্জনতা, ধামসা-মাদলের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, মহুয়ার গন্ধ। আধুনিক শহরের ভুলভুলাইয়ায় যা বোঝা যায় না সেইসব শব্দ, সেইসব বোধ এক গভীর পাহাড়ের ভুরুর দিক থেকে এক দণ্ড চেয়ে থাকে তাদের দিকে। তারপর পাগলা ঝোরার মতো ঝাঁপিয়ে আসে, ভাসিয়ে দেয়, বোল্ডারে-বোল্ডারে ধাক্কা খেতে খেতে ভেসে যায় সব। ঠেকতেই হবে নিরাপদ ডাঙায়। সেভ আওয়ার সোলস, সেভ আওয়ার সোলস, এসওএস ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র রেডিয়ো ওয়েভে।

॥ ২৫ ॥

এইভাবে পাণ্ডুলিপিটা শেষ করে ধ্রুবজ্যোতি যে-দিন প্রকাশের জন্যে জমা দিলেন, তার দিন দুই পর এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ বেরোল। আরিয়ানের বলে যে লাশটিকে শনাক্ত করা হয়েছিল, করেছিলেন আরিয়ানের নিজের বাবা-মা, সেটা নাকি আদৌ আরিয়ানের নয়! যেটাকে ড্রাগন ট্যাটু বলে মনে হয়েছিল, সেটা আসলে বিছে। এ ধরনের উল্কি আদিবাসীরা ব্যবহার করেই থাকে। কিন্তু আরিয়ানের বাবা তার দেহ চিনতে পারলেন না! দায়িত্বশীল ডাক্তার একজন! ছেলেটির অন্য আত্মীয় বন্ধুরা তাঁদের সংশয় পুলিশকে জানান। ডেডবডির রং কালো। আরিয়ান ছিল টকটকে ফরসা। যতই পচ ধরা দেহ হোক, এতটা তফাত হবে? দেহের গঠনে অবশ্য খুব মিল। আরিয়ানের বাবা-মা চুপ। বেশি চাপাচাপি করলে বলছেন, "তা হলে তাকে ফিরিয়ে আনুন। নইলে আর আমাদের বিরক্ত করবেন না।"

ধ্রুবজ্যোতি কাগজে বেরোনো নামগুলো ব্যবহার করেই উপন্যাসটি লিখেছিলেন। না হলে মেজাজ আসছিল না। পরে প্রত্যেকের নাম বদলে দেন। তাঁর খুশিই হওয়ার কথা। কেননা পুরো উপন্যাসটিকে খবরের কাগজজাত বলে চিনতে পারলে পাঠকের একধরনের কৌতূহলপাঠ পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু তাতে তো লেখকের মান থাকে না। উপরন্তু লেখকের সৃষ্টিক্ষমতার ঘাটতি পড়েছে, এমন মন্তব্যও আসতে থাকে। লেখকের এগুলোতে কান দেওয়ার কথা নয়। কিন্তু তিনি নিজেকে একজন সন্ধিৎসু সমাজতাত্ত্বিক হিসেবেও দেখতে পছন্দ করেন। তাঁর উপন্যাস আর বাস্তব খবরের শেষ, একরকমের হল না বলে তো তাঁর স্বস্তি পাওয়ারই কথা। কিন্তু তিনি সেটা পুরোপুরি পেলেন না। ছেলে-মেয়েগুলো কোথায় গেল? তিনি যে এদের সৃষ্টি করেছেন! যেমন করেছেন, মিলুকে। তিনি পিতা, তিনি তো ঈশ্বরই। তাঁর ভাবনা হতে লাগল। কী হল? হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের পাতায় চোখ রাখলে ভয় হয়। এত মানুষ নিরুদ্দেশ? ক'দিন আগে একটা পরিসংখ্যান দিয়েছিল, বছর ভর

কতজন নিরুদ্দেশ হন। আর কতজন ফিরে আসেন। ভয়াবহ! কিন্তু এরকম একসঙ্গে নিরুদ্দেশ হওয়ার কেসও তো যখন-তখন হয় না।

খেতে-শুতে অন্যমনস্ক থাকেন তিনি। সংযুক্তা লক্ষ করেছেন, "কী নিয়ে এত ভাবছ? উপন্যাস শেষ হয়ে গিয়েছে?"

তিনি যদি বলেন উপন্যাসের কথা ভাবছেন না। উপন্যাসের বাস্তব মডেলদের জন্য ভাবছেন, সংযুক্তা নিশ্চয়ই বকাবকি করবেন। আমাদের কি এমনিতেই যথেষ্ট ভাবনা নেই যে, উড়ো ভাবনা ডেকে আনছ? তাঁদের দু'জনের মধ্যে সংযুক্তাই প্র্যাক্টিক্যাল মানুষ। তিনি তাই কিছু বলেন না। খালি গোরু খোঁজা করে খবরের কাগজে ওদের খোঁজেন, চোখ পেতে রাখেন টিভি নিউজে।

ইউনিভার্সিটি-ক্যান্টিনে মিলি সাধারণত যায় না। সে দিন দলে পড়ে গিয়েছিল। একটি যুবক যেচে এসে আলাপ করল।

"আমি রঞ্জন, আপনি মিলি, না?"

"হ্যাঁ," বলে মিলি পাশ কাটিয়ে বেরোতে যাবে, যুবকটি বলল, "আসুন না, কোথাও একটু বসি। এখানে বড্ড ভিড়।"

মিলি অবাক হয়ে চাইল, "আমি ক্লাসে যাব না? আশ্চর্য তো আপনি?"

"খুব জরুরি কথা ছিল।"

মিলি কোনও কথা না বলে ক্লাসে চলে গেল। কিন্তু তার মনে খটকা লেগে রইল।

বিকেলে বেরিয়ে দেখে, বাসস্টপে সেই চরিত্র দাঁড়িয়ে। উলটোদিকে ধ্রুবজ্যোতিও এসে গেছেন। সে দৃঢ় পায়ে রাস্তা ক্রস করে ওপারে গেল। চরিত্রটিও ক্রস করল।

"মেসোমশাই, মিলির সঙ্গে আমার একটু জরুরি আলাপ ছিল।"

"কে আপনি?"

যুবকটি পকেট থেকে তার আই-ডি কার্ড বের করে। সিআইডি। এবার ইয়াং ম্যান পাঠিয়েছে।

"কী চান?"

"মিলির সঙ্গে জাস্ট একটু আলাপ-আলোচনা, আলাদা।"

"অনেক তো হল। খুনে, জোচ্চোর, টেররিস্ট ধরতে পারেন না। সেই যে পাঁচটি ছেলে-মেয়ে উধাও হয়ে গেল গত বছর, তাদের পাত্তা করতে পারেননি এখনও। নিরীহ ভদ্রলোক, ছেলেমানুষ মেয়ে এদের হয়রান করছেন? ছিঃ ছিঃ।"

ছেলেটি বলল, "আমিও তাই বলি, বুঝলেন মেসোমশাই। কী করব, চাকরি তো! তবে আমার উদ্দেশ্য আপনাদের হয়রান করা নয়, হেল্‌প করা। শুনলেই বুঝবেন। কাছাকাছি একটা কফি হাউজ আছে। কিছু যদি মনে না করেন, ওপরওয়ালার নির্দেশ, আমার কি আর ইচ্ছে করে?"

মিলি বলল, "চলো বাবা। উনি কী বলছেন, শুনেই যাই।"

এখনও কফি হাউজে তেমন ভিড় হয়নি। মিলি আর যুবকটি যেখানে বসল, ধ্রুবজ্যোতিকে বসতে হল তার থেকে কিছু দূরের টেবিলে। একটা কফি নিয়ে বসে নজর রাখছিলেন মিলির ওপর। মুখ দুশ্চিন্তায় কালচে। এমন সময় পাশের টেবিলে দুটি ছেলেমেয়ের কথায় তিনি কান খাড়া করলেন।

"দীক্ষিত সারও তো সেই থেকে মিসিং। পাঁচ-ছ'মাস হয়ে গেল। এখন কোথা থেকে অত ভালো সার পাই বল তো?" মেয়েটি বলল।

ছেলেটি জবাব দিল, "এরকম টিচার আর দেখবি না। সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ-এ ফান্ডা এক। কর্মাসের অ্যাকাউন্টেসি এমন বুঝিয়ে দেবে জলের মতো।"

"দিয়া, রূপ, ওই মিসিং ছেলেমেয়েগুলো রে। সব ওঁর কোচিং-এ পড়ত।"

"সত্যি? তুই ওদের মিট করছিস?"

"দিয়া আর রূপকে বেশ কয়েকবার, উজ্জ্বলকে একবার, লিডার লাইক, জানিস? ওরা অন্য গ্রুপে ছিল।"

"কী হল বল তো ওই গ্রুপটার?"

"ইলোপ-ফিলোপ করেছে হয় তো।"

"যা খুশি করুক, সারটাকে যে কে কোথায় নিয়ে গেল?"

ছেলেটি হেসে বলল, "অতবড় সারকে আবার কে কোথায় নিয়ে যাবে! যেখানে গিয়েছেন, উনি স্বেচ্ছায় গিয়েছেন। ফ্যামিলি বলে তো কিছু নেই শুনেছি। তা ছাড়া ওঁকে তো মিসিং বলে কেউ খোঁজাখুঁজি করছে না! প্রচুর টাকা করেছেন, এখন কোথাও গিয়ে আরাম করছেন, দেখ গে যা।"

ওদের কথাবার্তার বিষয় পালটে গেল। কিন্তু আসন্ন বিপদ সত্ত্বেও ধ্রুব রোমাঞ্চিত হয়ে বসে রইলেন। তা হলে তাঁর অনুমান ঠিক? এদের একজন প্রাইভেট কোচ ছিলেন, সেখানেই বিভিন্ন স্ট্রিমের ছেলেমেয়েগুলির আলাপ। খুব জনপ্রিয়, ব্রিলিয়ান্ট কোচ। বাঃ দেশাইয়ের জায়গায় দীক্ষিত। এবং তিনিও মিসিং! কেমন একটা আপ্লুত হয়ে বসে রইলেন তিনি, যতক্ষণ না মিলি এসে ডাকল, "বাবা চলো।"

"চল।"

যুবকটি তাঁদের সঙ্গেই বেরোল, "নমস্কার। সেল ফোন নাম্বার দিয়ে দিয়েছি মিলিকে, দরকার হলে একটা ফোন করে দেবেন।"

মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি নিলেন তিনি। ট্যাক্সিতে কোনও কথা নয়। তাঁদের পুরো পরিবারে এই সাবধানতার অভ্যাস এসে গিয়েছে এখন।

"কী বলল মক্কেল? কে উনি উপকারী বন্ধু এলেন যে, ওঁকে একটা ফোন করে দিতে হবে।"

মিলি বলল, "ওপরে চলো।"

লোকটি মিলিকে বলেছে, পুলিশ নাকি একেবারেই স্থির নিশ্চিত যে মিলিই লোকগুলিকে খুন করেছে। বাধ্য হয়ে। কিন্তু সিআইড-র ওই রঞ্জন চায় না, মিলি পুলিশের হাতে পড়ুক। মিলি যা করেছে, বেশ করেছে। আত্মরক্ষার জন্য মানুষ যা খুশি করতে পারে। সে মিলিকে রক্ষা করতে চায়। তাই তাকে সতর্ক করে দিতে এসেছে। তার যদি কিছু বলার থাকে, ওখানে ফেলে আসা কোনও জিনিসের কথা মনে পড়ে, মিলি যেন রঞ্জনকে বলে। ও ওর সাধ্যমতো সেসব সরিয়ে আনবে। যেমন, ক্লিপ, রাবার ব্যান্ড হয়তো খুব ছোট্ট জিনিস...

"ও তোকে কী ভেবেছে? হাঁদা গঙ্গারাম? তুই কী বললি?"

"আমি ধৈর্য ধরে ওর কথা শুনলাম। কেননা, যতবার অসহিষ্ণু হই, ও বলে, 'আমায় বলতে দিন, আমায় বলতে দিন।' ঠিক আছে, বলতে দিলাম। শেষকালে বললাম, শুধু শুধু আমার বয়সের একটি মেয়েকে বার বার খুনি বলা হচ্ছে, এটা কি হিউম্যান রাইটস কমিশনে যাওয়ার যথেষ্ট কারণ নয়? পুলিশ বলে কি পাবলিকের মাথা কিনে নিয়েছে?"

লোকটি নাকি ওকে ডেট করতে চায়। মিলিকে ওর ভীষণ ভালো লেগেছে। মিলি রাজি না হওয়ায় খুব হতাশ। "বাবা, ওরা এমন কিছু একটা পেয়েছে, যাতে করে আমার ওপর এত সন্দেহ! কী হতে পারে সেটা? হাত-পায়ের ছাপ পেলে তো হয়েই যেত। তা যখন নয়, কী হতে পারে?"

ধ্রুব ভাবিত হয়ে পড়লেন। মিলির অ্যাডিশন্যাল পরীক্ষা না দেওয়াটা, পটকার ওর স্কুলের কাছাকাছি বস্তিতে থাকাটা, শাড়ির পাড়, বায়ো পরীক্ষার পর তাঁদের মিলির বন্ধুর বাড়ি খোঁজখবর করাটা...এইগুলোই গেঁথে-গেঁথে গল্প তৈরি করেছে ওরা।

তিনি ভাবলেন, মিলিকে আর একবার সাবধান করে দেবেন। আশা দেবেন। কিন্তু দেখা গেল, মিলিই তাঁকে সাবধান করছে, আশা দিচ্ছে।

"বাবা, খুব সাবধান! লোকগুলো কী মারাত্মক চালাক বুঝেছ তো? কিন্তু আমরা কোনও অন্যায়

করিনি, এইখানে আমাদের জোর। থানা-আদালত যদি সত্যিকার নিরপেক্ষ হত, ন্যায়বিচার করত...আমি এখুনি গিয়ে সারেন্ডার করে আসতাম। কিন্তু ওরা শয়তানের পক্ষে। দেখতে পাচ্ছে, দুটো গুন্ডা, মাতাল। বুঝতে পারছে, এখানে কোনও মেয়ে ছিল, পালিয়ে গিয়েছে। খুব ভালো করে বুঝতে পারছে, তার উপর কী নৃশংস অত্যাচার চলেছে! আমি পুলিশ চিফ হলে বলতাম, বাবা, এ কেসে আর এগোতেই হবে না। শয়তান, ঠিক শাস্তি পেয়েছে। অনেক কষ্টে, অনেক মূল্য দিয়ে আমি তোমাদের পেয়েছি, একটা মানুষের মতো জীবন পেয়েছি, কোনও মতেই আমি হারব না। যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায়, কনভিক্‌ট করে, আমি বলব, আপনাদের কাজ আমার দ্বারা হয়ে গিয়েছে বলে আমাকে আপনাদের মেডেল দেওয়া উচিত। আমি সমাজকে দুটো পিশাচের হাত থেকে বাঁচিয়েছি।"

এই মেয়ের ভিতর এত আগুন ছিল, ধ্রুব আগে বোঝেননি। এখন হঠাৎ ওঁর মনে হল, "খুব প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে বারবার বাধা পেয়ে যারা বড় হয়, যাদের জীবনী লেখা হয়, মিলি বোধহয় সেই জাতের। সত্যিই তো পাচার হওয়া মেয়ে, ব্রথেলে অত্যাচারীর চোখে আঙুল ঢুকিয়ে পালাল, ট্রাক ড্রাইভারকে নেশায় আচ্ছন্ন রেখে দ্বিতীয়বার পালাল, দারোগা বাড়ির নির্যাতন থেকে এনজিও অবধি পথ করে নিল, তারপর এমন একজনকে খুঁজে নিল, যে ওকে আশ্রয় ও ভালবাসা দেবে। এই পশ্চাৎপট মাথায় রেখে ও এতদূর এসেছে। কম্পিউটার তো করছেই, গানে প্রতিদিন উন্নতি করছে। এ তো যে-সে নয়, এ বিশেষ একজন। এ মেয়ের ভিতর এত গান ছিল, তা-ও তো তাঁরা আগে বোঝেননি! এত যখন ছিল, তখন আরও অনেক আছে। সবই একটু স্নেহের জলসিঞ্চনে, নিরাপত্তার শক্ত ভিতের উপর গড়ে উঠছে। কী, কী দিতে পেরেছেন তাঁরা, মিলিকে? সংগীত, বিদ্যার প্রতি আগ্রহ, সাহিত্য-পিপাসা, শেখবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আত্মবিশ্বাস, মানুষের উপর বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে ভারসাম্য, উপস্থিত বুদ্ধিটা ওর একেবারে নিজস্ব। খুব আনন্দের কথা, তাঁরা পেয়েছেন। যথেষ্ট বিনয় সত্ত্বেও তিনি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না যে, মিলির 'মিলি' হয়ে ওঠায় তাঁর একটা বিশাল ভূমিকা ছিল। সংযুক্তার তো বটেই। কিন্তু তাঁরও। অথচ মিলি একেবারেই তাঁর অচেনা সমাজের মানুষ। মজার কথা, চারপাশে যে ছেলেমেয়েদের দেখেন, কিছুদিন আগেও পড়ানোর সূত্রে অনবরত যাদের ধ্যানধারণার কাছাকাছি আসতে হয়েছে, তাদের ঘিরে যে কাল্পনিক কাহিনি লিখলেন, তা সত্য হল না। তিনি তো ব্যাপারটাকে প্লট হিসেবে নেননি। একটা অন্বেষণ ছিল ওটা।

ছ'মাস কেটে গেলেও পাঁচটি ছেলেমেয়ের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। পুলিশ শেষ পর্যন্ত থিয়োরি বার করল যে, তারা মাওবাদীদের পাল্লায় পড়েছে। যদি মাওবাদীরা ওদের মেরে ফেলে থাকে, তা হলে তাদের দেহাবশেষ কোথাও-না-কোথাও পাওয়া যেতে পারে। আর ওরা যদি মাওবাদীদের দলে যোগ দিয়ে থাকে, তা হলে তো হয়েই গেল। সে ক্ষেত্রে তাদের সন্ধানের জন্য যে অতন্দ্র দীর্ঘমেয়াদি নজরদারি দরকার, তার উপযুক্ত সময়, লোকবল কি পুলিশের আছে? অনবরত ঘটে যাচ্ছে, ব্যাঙ্ক লুট, গৃহস্থবাড়িতে ডাকাতি-খুন, জটিল সব হত্যার কেস, রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুণ বীভৎস খুন জখম। কার অত সময় আছে? মন্ত্রী-সান্ত্রিদের কাছের লোক হলেও বা কথা ছিল। কিন্তু এদের বাবা-মা'রা বোধহয় ঠিক ওই সার্কলের লোক নয়। ডাক্তার, প্রাইভেট ফার্মে এগজিকিউটিভ, এইরকম। তাঁদের দিক থেকে কোনও প্রেশার নেই কেন, সেটাও একটা প্রশ্ন। পুলিশ মন্ত্রীর ডান হাত খুনে-গুন্ডার হত্যার সমাধান করতে একটি ছোট মেয়েকে, যাকে বলে হাউন্ড করে চলেছে, অথচ পাঁচ-পাঁচটি তাজা ছেলে-মেয়ে উবে গেল, তাদের আদৌ কোনও হেলদোল নেই।

এইভাবে দিন কেটে যায়। ধ্রুব মনে করেন, তাঁর মাথা থেকে ওরা বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু যায়নি যে, সেটা ধরা পড়ে তাঁর এলোমেলো স্বপ্নে। আরিয়ান ছেলেটি মলিন মুখে বলছে, "আমাকে শেষ পর্যন্ত রেপিস্ট বানালেন! অন্য ছেলেমেয়েগুলি ছায়ার মতো ভিড় করে এল। আপনারা বড়রা, বুড়োরা, আমাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখতে পান না, না?" তিনি কথার উত্তর দিতে চান। ওরা হাতের ভঙ্গিতে চুপ করিয়ে দেয়। অনেক চেনা, আধচেনা মুখ ভিড় করে আসে।

সেদিন যেটা দেখলেন, মাঝরাত থেকে শেষরাতের মতো কোনও সময়ে। দেখলেন, ছ'টি গ্রিক ধরনের চাদর পরা মূর্তি কুয়াশার মধ্য দিয়ে স্লো মোশানে লাফাচ্ছে। লাফিয়ে-লাফিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে গিরিশৃঙ্গ, সমুদ্র, নদ-নদী, মেঘ, আকাশ। কে, ওরা কে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন। প্রতিধ্বনিময় জলদগম্ভীর গলায় কেউ বলল, "চিনতে পারলে না? ওরা তো দেশাই আর তার পঞ্চশিষ্য। ওরা খুঁজতে গিয়েছে।" কী? কী খুঁজছে? এর উত্তরে, একটা বিশাল রামধনু রঙের বুদবুদ উঠল। তারপর সেটা ফেটে গেল। ভিতরে ব্যাখ্যার অতীত কিছু রয়েছে। একটা গভীর উত্তেজনাময় আহ্লাদ তাঁর বোধে-বোধে ঢুকে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে তিনি রংহীন একটা মাঠের মধ্যে উত্তরের আশায় ঘুরে বেড়ালেন। কী দেখলেন? কিছু দেখলেন কি, না শুধু অনুভব করলেন? বাকি সময়টুকু তিনি কেমন নেশাগ্রস্ত, ধ্যানগ্রস্ত হয়ে রইলেন। গভীর নিশ্বাস পড়লে লাগল। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে তিনি কি প্রাণায়াম করছিলেন? স্বপ্নের বাইরে বেরোতে পারছিলেন না, চাইছিলেনও না। তিনি যদি ওদের সঙ্গে যোগ দেন, তাই হলে কি পাবেন না? ওরা যেখানে যায়, তিনিও যাবেন, যত দুর্গমই হোক। এই জটিল সন্দেহ, জিঘাংসা, কুটিলতা, বিশ্বাসভ্রষ্টতার মধ্যে তিনি আর নিশ্বাস নিতে পারছেন না।

"দিয়া, " তিনি ডাক দিয়ে উঠলেন। "আরিয়ান, উজ্জ্বল, আমি আসছি। এক মিনিট, মাই ডিয়ার বয়েজ অ্যান্ড গার্লস। বিভাবরী, রূপরাজ আমাকে ফেলে যেয়ো না। দেশাইকে বলো, আমি আসতে চাই, আমি আসছি।"

যত পরিষ্কারভাবে কথাগুলো স্বপ্নের মধ্যে বললেন, অত পরিষ্কারভাবে বাস্তবে শোনা গেল না। সংযুক্তা দেখলেন, একটা ছাই-ছাই রঙের শেষরাতে অর্ধস্ফুট হচ্ছে চারধারে। পাখা ঘুরছে, জানলার পর্দা নড়ছে, অস্পষ্ট অবয়ব আলমারি, টেবিল, চেয়ার আর তাঁর পাশের মানুষটির। কী যেন বিড়বিড় করছেন। শরীরটা কাঁপছে, ঠোঁট নড়ছে। তিনি উঠে বসলেন। দীর্ঘদিন ধরে বড়ই টেনশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। সবরকম দুশ্চিন্তার কথা ধ্রুব তো তাঁকে বলেন না। অনেক চিন্তা তাঁর লেখালেখির জগতের সঙ্গেও জড়িত। সেগুলো ধ্রুবর কাছে ভীষণ জরুরি। কীসে কার কী প্রতিক্রিয়া হয়, কে জানে! তিনি ধ্রুবর গায়ের ঘাম মুছিয়ে দিতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর সমস্ত শরীর কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে রয়েছে। কী স্বপ্ন দেখছেন ধ্রুব? ভালো কিছু? স্বপ্ন দেখা ভাল। দেখুন। সুখস্বপ্ন যখন।

অমৃতা

••••

ঠিক বেরোতে যাচ্ছে, আজকে ফার্স্ট আওয়ারেই ক্লাস আছে, এমন সময়ে ফোনটা বাজল, শ্বশুর ফোনটা ধরেছিলেন, চেঁচিয়ে বললেন—আবার তোমার বন্ধু, অমৃতা।

'আবার'টা উনি কেন বললেন অমৃতা বুঝতে পারল না। আজকে তো তার কোনও বন্ধু এর আগে ফোন করেনি! এ বাড়িতে এখন সবচেয়ে বেশি ফোন অবশ্য তারই আসে। খুব স্বাভাবিক। কলেজ ইউনিভার্সিটি ধরলে অনেক বন্ধু তার। সকলেই যে এক পর্যায়ের তা নয়। খুব ঘনিষ্ঠ, খানিকটা ঘনিষ্ঠ, পড়াশোনার সূত্রে বন্ধু, গানবাজনার সূত্রে বন্ধু... এইরকম অনেক শ্রেণী-বিভাগ আছে। তারা ফোন করে, করবেই। অমৃতা বেশিক্ষণ কথা না বলে বুঝিয়ে দেয় আগে যেমন ফোনটাকে একটা গল্প করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করত তারা, এখন আর তা চলবে না, চলে না, কিন্তু প্রাণ ধরে কিছুতেই কথাটা সোজাসুজি বলে দিতে পারে না সে কাউকে।

শ্বশুরমশাই অদূরে বসে কাগজ পড়ছেন। রিটায়ার্ড মানুষ। সারাদিন ধরে শুধু খবরের কাগজই পড়েন, উল্টে পাল্টে, পাল্টে উল্টে। দুপুরবেলা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, সন্ধেবেলায় অমৃতা চা নিয়ে যেতে হন্তদন্ত হয়ে বললেন—'কাগজটা, কাগজটা অমৃতা! কাগজটা কোথায় গেল?' আচ্ছা, অমৃতা তো দশটার সময়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, ঢুকছে এই পাঁচটায়। সে কী করে জানবে কাগজটা কোথায়! উনি কখনও খাবার টেবিলে পড়েছেন, কখনও বসার ঘরে পড়েছেন, কখনও শোবার ঘরে। অমৃতা সব জায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকে, আর উনি বলতে থাকেন—'পার্সপেকটিভটা পড়া হয়নি, কড়চাটাও বাদ পড়ে গেছে, এ হে হে, আজ সেন্টারস্প্রেডে সুনন্দ সান্যালের লেখাটার কনক্লুশন হল। দুটো মিলিয়ে না পড়লে...' যেন কাগজগুলো এইটুকু বাড়ি থেকে একেবারে ছুঁ-মন্তরে উড়ে গেছে।

কাগজটা শেষে বাথরুম থেকে পাওয়া যায়। রাজা-উজিররা বাথরুমে বই পড়তেন, বা রইস নেতা ব্যক্তিরা এখনও পড়ে থাকেন এমন কথা অবশ্য শোনা যায়। কিন্তু তার শ্বশুরমশাই অনুকূল গোস্বামী যদি তাঁদের চার বাই আট সরু লম্বা টয়লেটে কমোডের পেছনে সিসটার্নে কাগজটা রেখে আসেন, তাহলে ধরে নিতে হয় তিনিও বাথরুমে কাগজ পড়ে থাকেন। হোক সে জায়গাটা অপরিসর। পড়াশোনার ব্যবস্থা সেখানে না-ই থাক।

কাগজটা নিতে সে সময়ে কেমন একটু গা ঘিন ঘিন করে অমৃতার। অপরিষ্কার কিছু নয়। তাকে নিজেকেই চানের আগে দুটো বাথরুম ধুতে হয়। কিন্তু একটু পুরনো হতেই কমোড, সিসটার্ন, বেসিন সব কিছুতেই একটা বিবর্ণ ভাব এসে গেছে। মানুষের মল-মূত্রের কথাই কেন কে জানে তার মনে পড়ে যায় বারবার। তার বাবার যখন পা ভেঙেছিল, বাবাকে সে বেডপ্যান দিয়েছে, সামান্য একটু ঘেন্না কি আর করেনি? কিন্তু তাকে ছাপিয়ে ছিল বাবার জন্য দুশ্চিন্তা, যত্ন এবং সেবা করার আগ্রহ, ঠিক সেই ভাবটা শ্বশুরবাড়ির টয়লেট এবং শ্বশুর-শাশুড়ির মলমূত্র সম্পর্কে তার নেই, এটা বুঝতে পেরে একটু লজ্জাবোধ সে করে, কিন্তু ওই পর্যন্তই, ঘেন্নাটাকে আটকাতে পারে না। তবে, সেটা সে বুঝতে দেয় না। ঘেন্নাটাকে জয় করার চেষ্টাও করে যাচ্ছে অনলস। বাথরুম পরিষ্কার করার সময়ে, চান করে রাঁধতে রাঁধতে সেখান থেকে কাগজ আনবার সময়েও।—কে ফোন করল এখন?

—হা লো—

—অমৃতা, আমি রে! আজ তোর ছুটি কটায়?—শম্পার গলা পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে শুনলে চিনতে পারবে সে।

—সওয়া চারটে—শ্বশুরের দিকে আড়চোখে চেয়ে সে বলে।

—ইস্‌স্‌, দশটা থেকে চারটে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিস না ফ্যাক্টরিতে দিনমজুরি করছিস রে!

—ওই কাছাকাছিই হল।

—এত কাঠ-কাঠ করে কথা বলছিস কেন রে? হাতের কাছেই কেউ আছেন বুঝি?

—হু।

—আমাকে আড়াইটে নাগাদ একটু সময় দিতে পারবি?

—হুঁ।

—আবার হু!

—ঠিক আছে, ছাড়ছি—রিসিভারটা রেখে দিল অমৃতা।

তার আসলে আড়াইটেতে ছুটিই আজ। শম্পাকে সময় দিতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু এখানে সে ছুটির সময়টা জানায় না। এইটুকু, সারাদিনে এইটুকু সময় সে চুরি করে।

—বাবা আসছি—চটির স্ট্র্যাপে পা গলাতে গলাতে সে বলে। শ্বশুরমশাই ওরই মধ্যে একবার খাবার টেবিলের দিকে তাকিয়ে নেন। তিনটে বড় বড় ক্যাসেরোলে ওঁর আর শাশুড়ির দুপুরবেলার খাবার-দাবার গুছিয়ে রেখেছে অমৃতা। টেবিলের ওপর টেবল ক্লথ, তার ওপরে ম্যাট পাতা, সেখানে কাচের প্লেট উপুড় করে রাখা, একটা করে কাচের বাটি। দুটো হাতা ও চামচও পাশে রেখে দিয়েছে সে।

দশটার ক্লাসটা বোধহয় গেল। এগারোটারটা করতেই হবে, জে. বি.-র ক্লাস না করলে, এত কম সময় পড়াশোনা করে, অর্থাৎ এত ফাঁকি দিয়ে এম. এ.-টা টপকাতে পারবে না সে। অথচ, টপকানো দরকার, ভী-ষণ দরকার।

ঠিক পুকুরের ধারে নিমগাছটায় ফুল এসেছে। সাদা সাদা গুঁড়ির মতন। একটা মৃদু গন্ধ পেয়ে মুখ তুলেছিল। দেখতে পেল। এখন যদি যাদবপুর-হাওড়া মিনিটা ধরতে পারে তাহলে ভাল হয়। সোজা এসপ্লানেড চলে যাবে, সেখান থেকে কলেজ স্ট্রিট। নইলে গড়িয়াহাট পর্যন্ত অটো, তারপর চেঞ্জ করতে হবে। এখন আর নিমফুল-টুলে মন দিলে তার চলবে না। রাস্তা দিয়ে যে মানুষগুলো চলাফেরা করছে, খুব মড মেয়ে, মিনিস্কার্ট, কিংবা মডেলিশ চেহারার যুবক, শক্ত সমর্থ প্রৌঢ় বা টিপ ধেবড়ে যাওয়া প্রৌঢ়া, এই সমস্ত দেখতে, সব কিছুর দিকে মন দিতে তার ভীষণ ভাল লাগে। মনে মনে গল্প ফাঁদে। ওই প্রৌঢ়া যাঁর সিঁদুর টিপ ধেবড়ে গেছে? উনি সিঁদুর-টিপ পরেছেন কেন? আজকাল তো সব্বাই পেছনে আঠা লাগানো বিন্দি পরে। উনি পরেছেন সিঁদুর-টিপ। অথচ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে উনি অফিস যাচ্ছেন, ডালহাউসির টিকিট কাটলেন। অর্থাৎ বেশ আধুনিক। বেশিদিন একভাবে পরলে বিন্দির পেছনে চামড়ায় একটা দাগ হয়ে যায়। উনি বোধহয় এই দাগটাকে ভয় পান। আর তা নয় তো সিঁদুর-টিপ না পরলে বিবাহিতত্ব, সতীত্ব এ সব জাহির করা যাবে না মনে করেন। অনেকেই আজকাল কপাল থেকে সিঁদুর টানেন। এরকম মহিলা এখনও কত আছেন, প্রগতিশীলরা জানেনও না। কিংবা, এই সবচেয়ে সহজ সমাধানটাই তার মনে আসেনি। উনি হয়তো ভিতু মানুষ, কুসংস্কারও আছে, কিন্তু ওঁর একজন শাশুড়ি আছেন, শাশুড়ি ভিতু হোন বা না হোন আরও কুসংস্কারে ভর্তি। সেই সেকেলে শাশুড়িই ওঁকে সিঁদুর-টিপ পরতে বাধ্য করেছেন। ইস্‌স্‌, এখনও শাশুড়ির সর্দারি! কত বয়স হবে ভদ্রমহিলার। পঞ্চাশের এদিক ওদিক, ওঁর শাশুড়ি হয়তো ঠিক বাহাত্তর। বাহাত্তুরে। এম. এ.-টা পাশ, তারপর চাকরি, ব্যাস, তারপর তার শাশুড়ির খবরদারি থেকে সে মুক্তি খুঁজবে।

আর ওই যে মডেল চেহারার যুবক। শার্টের ওপরের বোতাম খোলা রেখেছে। ভেতরে ওর

বক্ষকেশ দেখা যাচ্ছে। এই যুবকটি ভেবেছে যেহেতু তার প্রকৃতিদত্ত গড়নটা আছে, এবং ব্যায়াম-ট্যায়াম করে সে তাকে আরও সংগঠিত করে তুলেছে, সেহেতু সে তার শার্টের প্রথম অথবা দ্বিতীয় বোতাম খোলা রেখে বক্ষকেশের পৌরুষ যথাযথ দেখাতে পারলেই মেয়েরা সব একেবারে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঠিক তার বর অরি, পুরো নাম অরিসূদন, যেমন ভাবে। তবু তো অরির এ যুবকটির মতো মুখশ্রী নেই। দেহখানা ভাল হলেও এমন সুসংগঠিতও নয় মোটেই। অরি ভাবে, পৃথিবীর যেখানে যত মেয়ে আছে, ওকে দেখলেই কাত হয়ে যাবে।

মিনিস্কার্ট পরা মেয়েটাকে অসহ্য লাগে অমৃতার। ও কী ভেবেছে কী। অতখানি পা বার করে রাখলে ওকে খুব সুন্দর লাগবে? সুন্দরও নয়, সেক্সি। এই এক হয়েছে আজকাল। সেদিন দোকানে গিয়েছিল। নিউমার্কেটে। বাচ্চাদের পোশাকের দোকানে দাঁড়িয়ে ও আর মিলি, ওর রমণী চ্যাটার্জি পাড়ার বন্ধু, এখন যাদবপুর পাড়ার বউ, মিলির ভাইঝির জন্মদিনে দেবার জন্যে একটা ফ্রক দেখছিল। পাশের ভদ্রমহিলা বললেন—দেখি দেখি। এরকম আর আছে?

দোকানি আর একটা ওরকম বার করে দিলে নিজের বছর চারেকের মেয়ের গায়ে ফেলে, অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করে মহিলা বললেন—ওহ, ইটস নট সেক্সি এনাফ।

মিলিব এত রাগ হয়ে গেল যে ফ্রক ওরা আর কিনলই না। খেলনার দোকানে গিয়ে একটা পেল্লাই টেডি-বেয়ার কিনে ফেলল। টেডিটা আবার মিলির এত পছন্দ যে ও বলছে ওটা প্রাণ ধরে কাউকে সে দিতে পারবে কি না সন্দেহ। আজকাল এখানেই চমৎকার চমৎকার সফ্‌ট টয় তৈরি হচ্ছে।

মেয়েটা ছোট স্টেপ কেটেছে চুলে। ওপরের টপটা ওর ঢিলে। কিন্তু স্কার্টটা হাঁটুর ওপর। সবাই তাকাচ্ছে। এই গড়িয়াহাট পাড়াতেও। সবচেয়ে আধুনিক পাড়া বলে যার নাম। চাউনিতে ঠিক যে কোনও লোভ আছে তা নয়। যেটা আছে তাকে বলে ডিসগাস্ট, ছেলেগুলো বোধহয় মনে-মনে মজা পাচ্ছে। মুখে কিছু জানতে দিচ্ছে না। শি ডাজ্‌ন্ট নো শি হ্যাজ মেড হারসেল্‌ফ এ পিস অফ এগজিবিট। আচ্ছা ওর কি মা নেই? যিনি ওকে বলে দেবেন, এটা কলকাতা, কলকাতা এখনও লস এঞ্জেলেস নয়, এবং কলকাতার অফিস-টাইমের রাস্তা, ডিসকোথেকও নয়, চ্যানেল ফাইভও নয়। ওর মা নিশ্চয়ই তার শাশুড়ির মতো, যিনি তাঁর দুই বাচ্চার মা মেয়ের বেলায় একেবারে অন্ধ। মেয়ে যখন পিঠ-খোলা, হল্টার ছাঁট ব্লাউজ পরে ঘোরে কিছুই বলেন না, কিন্তু তার বেলায় সালোয়ার-কামিজ পরাও বন্ধ করে দিয়েছেন।

কী সুন্দর সালোয়ার-কামিজগুলো সে করিয়েছিল বিয়ের আগে। কালো জর্জেটের ওপর মেটে লাল কারুকাজেরটা পরেই তো সে অরিসূদনের সঙ্গে আলাদা সাক্ষাৎকারে গিয়েছিল বালিগঞ্জ কোয়ালিটিতে। শ্বশুর-শাশুড়ি যেদিন দেখতে আসেন সেদিন ঘটনাচক্রেই একটা নীল টাঙ্গাইল পরে ছিল। ওরা তো জানত না ওঁরা আসবেন। অতর্কিতে এসে তাকে প্রসাধন-বিনা দেখতে চেয়েছিলেন নাকি। ইস্‌স্ সেদিন যদি সে একটা স্কার্ট পরে থাকত। তখন নাকি ওঁদের ওকে খুব পছন্দ হয়েছিল। এখন আর পছন্দ হয় না বোধহয়।

ইস্‌স—যাই-ই দেখুক, যাই-ই ভাবুক, যত দূরেই যাক—সেই শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ-বর প্রসঙ্গ এসে পড়েছে তার মনে। কত ছোট্ট হয়ে গেছে তার পৃথিবীটা, কত ছোট হয়ে গেছে তার জীবন, মনও কী!

বাসটা খুব স্পিডে এসেছে। এমন স্পিডে আসছিল এক এক সময়ে যে ভয় করছিল, বাসটা আবার না খবর হয়ে যায়। সেইসঙ্গে তার সহযাত্রীরা এবং সে-ও। আজকাল এরকম আকছার ঘটছে। স্টপে এসে থামতে, কী শান্তি। কী মুক্তি। পুরনো আকাঙ্ক্ষাগুলো ফিরে আসতে থাকে হুড় হুড় করে। সেই পরিচিত, চিরপরিচিত কলেজ স্কোয়ার, সেন্টিনারি বিল্ডিং, বিধ্বস্ত দর্শন আশুতোষ বিল্ডিং এক ঝলক, অমৃতা ছুটতে লাগল, মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে, জে. বি. নিশ্চয়ই ঢুকতে দেবেন। দৌড়তে দৌড়তে, সত্যিকার গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায় ক্লাসে ঢুকল সে।

—আসতে পারি, ম্যায়াম?

—এসে তো পড়েইছ, আর অনুমতির দরকার কী!

ক্লাসসুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। যাক্ বাবা, মজার ওপর দিয়ে গেছে। জে. বি. মোটেই সবদিনে এরকম মুড-এ থাকেন না। এ নিয়ে ক্লাসে প্রায়ই বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা হয়।

—দ্যাখ, এ. আর. রাগী মানুষ এটা আমরা জেনে গেছি। চোখ সব সময়ে রাগে গোল গোল হয়ে থাকে। পি. এম. আবার বড্ড হাসি-খুশি, হাসকুটে বললেই হয়। একটা কোনও মজার উপলক্ষ পেলে সেটাকে আর ছাড়তে চান না। তখন চুলোয় যাক মঙ্গলকাব্য, ক্লাসে খালি হাসির হর্‌রা ওঠে, কিন্তু জে. বি. যে কখন কী রঙে থাকবেন সেটা কেউ বলতে পারবে না। এমন কেন রে উনি? এই ঝড় এই বাঁশি। এই আগুন এই জল! বুঝি না বাবা।

অমৃতা কিন্তু আজকাল ব্যাপারটা বোঝে। এগুলো প্রোফেসর জে. বি.-র পেছনে যে সংসারী জে. বি. আছেন, তাঁর সেই বিশেষ দিনের অভিজ্ঞতার উপচোনি, যাকে বলে লেফ্‌ট-ওভার। যেদিন সকালে সকালে কিছুর জন্য কিছু না বরের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যায়, কি শাশুড়ি কি শ্বশুরের সঙ্গে একচোট সেদিন জে. বি. বিরক্ত হয়ে থাকেন। ভীষণ দায়িত্বশীল টিচার তাই লেকচারের ওপর সে সবের বিশেষ প্রভাব পড়ে না, কিন্তু লেকচারের বাইরে যেটুকু অবকাশ, সেখানে পড়ে। এগুলো যে জে. বি. তাকে ডেকে বলেছেন তা নয়। কিন্তু সে জানে। নিশ্চিত জানে।

এ কথা অমৃত যদি বন্ধুদের, মানে সহপাঠীদের বলে ওরা রৈ রৈ করে উঠবে একেবারে।

—প্রবলেম সবাইকার আছে অমৃতা, তার মানে এই নয় যে বাড়ির ঝালটা তুমি ক্লাসে ঝাড়বে।

'প্রবলেম সবাইকার আছে' এটা একটা কথার কথা হয়ে গেছে আজকাল। কেউ বুঝে বলে না, অনুভব করে বলে না। কী অভিজ্ঞতা আছে ওদের? কতটুকু? বাস্তবের কী জানে ওরা?

শর্মিষ্ঠার প্রবলেম কী? না ওর মা-বাবা চান ও দারুণ রেজাল্ট করে, রিসার্চ-টিসার্চ করে একটা অধ্যাপিকা-টিকা হোক, মা-বাবার এই চাওয়ার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার চাওয়া একদম মেলে না। শর্মিষ্ঠা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে স্রেফ আড্ডা দেবার জন্য। অধ্যাপিকা হয়ে সারাজীবন পড়াশোনা করা আর পড়ানো?—ওরে বাবা। তার চেয়ে কলেজ স্কোয়ারে ঝাঁপ দিয়ে সুইসাইড করাও ভাল—ও বলে থাকে।

কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধি আর স্মৃতিশক্তি প্রখর বলে ও বরাবর ভাল রেজাল্টটাও করে যাচ্ছে। ও এই ব্যাপারটা নাকি বাবা-মাকে বোঝাতে পারে না।

তিলকের কী প্রবলেম? না এত বড় ক্লাসে মাত্র নটি ছেলের অন্যতম ও। ওর বন্ধুরা যখন ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিকস এই সব পড়ছে, তখন ওকে বাংলার মতো একটা রদ্দি সাবজেক্ট পড়তে হচ্ছে। রদ্দি কেন রে? তুই জে. বি.-র ক্লাস, এ. কে. বি.-র ক্লাস, এ. আর.-এর ক্লাস উপভোগ করিস না? ভাল লাগে না তোর রবীন্দ্রনাথ খুঁটিয়ে পড়তে? ভাল লাগে না আধুনিক কবিতা বুঝে নেবার সুযোগ? —হ্যাঁ, লাগে, ভালই এনজয় করে, কিন্তু কোনও প্রসপেক্ট তো নেই! ভবিষ্যতে কী হবে এই ভাবনায়, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মেয়ে-ক্লাসে পড়তে বাধ্য হবার কমপ্লেক্সেই ছেলেটা মুখ শুকিয়ে থেকে থেকে নিজের মনের ওপর অহেতুক চাপ বাড়াচ্ছে।

অনিন্দিতার প্রবলেম তো আর এক। ওর দিদিকে ওর চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর, তাই লেখাপড়ায় তাকে ওর ছাড়িয়ে যেতেই হবে। বোঝো? এটা একটা প্রবলেম হল? দিদিটা তো তোরই, না কী!

অমৃতার একেক সময় মনে হয় নিজের দিনরাতগুলো সে ওদের ধার দেয়। ওই অনিন্দিতাকে, ওই তিলককে, শর্মিষ্ঠাকে, রণিতাকে, চঞ্চলকে। ধার দেয় অন্তত একটা সপ্তাহের জন্য। তখন হয়তো বাস্তব সত্যি সত্যি কী, ধারণা ওদের হবে।

আপাতত কল্লোল যুগ এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এবং জগদীশ গুপ্ত। অমৃতা ক্লাসে মন দেয়।

বেল বাজল, ক্লাস শেষ হচ্ছে। জয়িতাদি অর্থাৎ জে. বি. হঠাৎ বললেন—অমৃতা ব্যানার্জি।

—হ্যাঁ—সে উঠে দাঁড়াল, বাধ্য বিনীত মেয়ের মতো।

—আজ তিনটের সময়ে আমার সঙ্গে দেখা কোরো একবার। সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে থাকব।

সর্বনাশ! আবার দেখা-টেখা করতে বলেন কেন রে বাবা! বন্ধুরা বলতে লাগল—তোর ব্যাপারই আলাদা অমৃতা, তুই জয়িতাদির চোখে পড়ে গেছিস। এখন রোটেশন-এ উনিই হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট। তোর ফার্স্টক্লাস বাঁধা...

বিরক্ত অমৃতা যতই ওদের মন্তব্যগুলো ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে, ততই ফেউয়ের মতো পেছনে লেগে থাকে ওরা।

তিলক বলল—অধমের দিকে একটু কৃপাবর্ষণ করিস রে অমৃতা, একেই তো স্কুলমাস্টারি ছাড়া আর কিছু জুটবে বলে মনে হচ্ছে না।

অমৃতা রেগে-মেগে বলল—স্কুলমাস্টারি তোর মতো ছেলেদের না জোটাই উচিত। তাগড়া স্বাস্থ্য কর দিকি, রিকশ কি অটো চালাবি এখন, বেশ পুরুষালি কাজ। অন্তত নাকে কাঁদবার সময়টা পাবি না।

অমৃতার বাবা স্কুল-টিচার। স্কুল-টিচিং নিয়ে এসব কথা বললে ওর গায়ে লাগে। তিলকের মতো বা অনিন্দিতার মতো ও কমপ্লেক্সে ভোগে না। উচিত জবাব দেয়।

আজকে অর্থাৎ দুটো অ্যাপো। আড়াইটের সময়ে শম্পা, শম্পাকে সাধারণত ক্যানটিনেই দেখা করতে বলে ও। তো তারপর ছুটতে হবে সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে। খুঁজে বার করতে হবে জয়িতাদিকে। কেন ডেকেছেন কে জানে বাবা! বুকটা গুরগুর করছে। শম্পা আবার কথা শুরু করলে থামতে জানে না। কোথাও কমা, ফুল স্টপ নেই ওর। কথার সূত্রে কথা, তার সূত্রে আরও কথা, আর কাউকে কিছু বলতেই দেবে না ও। অর্থাৎ ফার্স্ট থিং ওকে আজ বলতে হবে,—শম্পা আমার সময় নেই, তিনটের সময়ে জয়িতাদি ডেকেছেন। মাস্টারমশাই, বুঝিস তো?

চৈত্র শেষ হলেও দিনটা বেশ ফুরফুরে আজ। হাওয়া-টাওয়া দিচ্ছে। দুটোয় ছুটি হতে ওরা সবাই কফিহাউজ যাচ্ছে, তুমুল আড্ডা হবে সেখানে, যে যার পকেট থেকে ব্যাগ থেকে টাকা-পয়সা বার করবে। মোগলাই আসবে, পকোড়া আসবে, কফি তো আছেই। ইংরেজির তিশান ছেলেটা আসলে আরও জমবে। তিশান হচ্ছে একটি সবজান্তা হামবড়া ছেলে। ভীষণ আঁতেল-আঁতেল ভাব করে। তো আঁতেলমিটাও তো কোথাও না কোথাও ফলাতে হবে। তিশান খুব সম্ভব এই তাদের গ্রুপটাকে সে জন্য বেছে নিয়েছে। তিশানের আসল নাম নিশান। এ হচ্ছে আর্ট বিষয়ে অথরিটি। সব জানে। প্রি-র‍্যাফেলাইট, ইমপ্রেশনিস্ট, পোস্ট-ইমপ্রেশনিজম, সুররিয়্যালিজম, ডাডাইজম স-ব। তা ও 'তিশান-তিশান' করত, অমৃতাই একদিন জিজ্ঞেস করে তিশান কে রে? কোন দেশের? কবেকার? তখনই বোঝা যায় ওরা যাকে টিশিয়ান বলে জানে তাঁর নামের আসল উচ্চারণ নাকি তিশান। ওরা যাকে জিয়োতো বলে, তাঁর নামটা উচ্চারিত হবে জত্তো। র‍্যাফায়েল নয়, র‍্যাফেইল। ওদের মুখে 'গয়া' শুনে তো নিশান বাঁকা হেসে মুখে একটার পর একটা মৌরি ফেলতেই লাগল, ফেলতেই লাগল, শেষে বলল—শুধু গয়া বলছিস কেন? 'গয়াগঙ্গাপ্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী মথুরা' সবগুলো বল। গয়া নাকি উচ্চারণ নয়। ওটা হবে 'গোইয়া'। তো সেই সূত্রেই শর্মিষ্ঠা ওর নাম দেয় তিশান। সেই তিশান আসলে আড্ডাটা ভাল জমে ওঠে। পারস্পরিক ঠাট্টায়, কথার পরে কথার খেলায়, তিশান তাদের যে জ্ঞান দান করে সেগুলোও নেহাত ফ্যালনা নয় : ভার্জিনিয়া উল্‌ফ নাকি একটা করে উপন্যাস লিখতেন আর পাগল হয়ে যেতেন, লরেন্স নাকি ভেগেছিলেন তাঁর নিজের মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে, শুধু অসকার ওয়াইল্ড নয়, ফরস্টার সাহেবও ছিলেন সমকামী, শেলির প্রথম বউ নাকি শেলির অবহেলায় বারনারী হয়ে গিয়েছিলেন...এইসব কেচ্ছা কেলেঙ্কারি কি পাগলামি না থাকলে না কি কোনওরকমের শিল্পীই হওয়া যায় না। সে যাক, আজ হয়তো তিশানের সঙ্গে ওদের খুব

জমবে, কিছুটা সময় তরলভাবে কাটতে পারত, কিন্তু অমৃতার তা কপালে নেই। শম্পা তার স্কুলের সময়কার বন্ধু। চিরকালই দুজনে যত ঝগড়া, তত ভাব। শম্পার ধারণা, অমৃতা হল যাকে বলে 'লাকি'। সেই জন্যেই বরাবর অমৃতার রেজাল্ট শম্পার চেয়ে ভাল, সেইজন্যেই অমৃতার মা-বাবা দুজনেই জীবিত, এবং সেইজন্যেই অমৃতার এত অল্পবয়সে অত ভাল বিয়ে হয়েছে। শম্পা চিরকালের 'আনলাকি'। বিধাতাপুরুষ আঁতুড় ঘরেই তার কপালে ঢ্যাড়া দিয়ে রেখেছেন তাই তার অল্পবয়সে বাবা মারা যান, তাই তার মামারা তাকে দেখে না, মাকে চাকরি করতে এবং ভীষণ ভুগতে হয়, তাই-ই শম্পা কালো, তাকে দেখতে ভাল না, অমৃতার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমতী হওয়া সত্ত্বেও তাই-ই তার রেজাল্ট অমৃতার চেয়ে খারাপ, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাল করে ভেবে দেখতে গেলে সম্পর্কটা ঈর্ষার। ইচ্ছে করলে অমৃতাও শম্পাকে হিংসা করতে পারত ঠিক যে যে কারণে শম্পা তাকে হিংসে করছে সেই সেই কারণেই। শম্পার মা চাকরি করেন বলে অমৃতার মায়ের থেকে তিনি অনেক বাস্তববোধসম্পন্ন, কাণ্ডজ্ঞান তাঁর অনেক বেশি, স্বাধীন ইচ্ছার মানুষ। শম্পা কালো বলেই তার চেহারার শ্রীটুকু চট করে চোখে পড়ে না, না হলে হয়তো অমৃতার মতোই অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যেত। অমৃতার যেমন ভাষাজ্ঞান, সাহিত্য-জ্ঞান ভাল, শম্পার যে তেমন অঙ্কের মাথা অনেক ভাল, যে কারণে সে বি.এসসি করেই কম্পুটার ট্রেনিং নিয়ে মোটামুটি ভাল একটা চাকরি করতে পারছে। সেও তার ইচ্ছেমতো স্বাধীনভাবে জীবনের সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারবে। শম্পা জানে না অমৃতার তুলনায় সে কত বেশি ভাগ্যবতী। একমাত্র দুর্ভাগ্য তার বাবার অল্পবয়সে মারা যাওয়াটা। সেটা মানতেই হয়। কিন্তু, অমৃতা জানে এসব কথা সে শম্পাকে বোঝাতে পারবে না। কখনও না।

ওই তো আশুতোষ বিল্ডিং-এর গেট দিয়ে শম্পা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছে। একটা হালকা রঙের ছাপা সালোয়ার কামিজ আর একটা পরিষ্কার বিনুনিতে শম্পাকে কত হালকা কত সুশ্রী, নির্ভার, স্বাধীন সুন্দর দেখাচ্ছে তা যদি ও জানত!

—অমৃতা, বাঃ এই তো তুই পাংচুয়ালি এসে গেছিস। চল কফিহাউজে যাই।

—না রে আমাকে আজকে প্রোফেসর বাগচি সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে তিনটের সময়ে যেতে ডেকেছেন। তোর কী বলবার আছে তুই তাড়াতাড়ি বল বরং। আমরা একটু ওইদিকে দ্বারভাঙার সিঁড়িতে বসি চল।

—এত তাড়া করলে হয়? এভাবে কিছু বলা যায়? আমি, তুই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিস প্রতিদিন...

এ নালিশও শম্পার বহুদিনের। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। অমৃতা বলল—কী করব বল, প্রোফেসর ডেকেছেন, না করতে তো আর পারি না। তুই বল না। আমি শুনছি। শুধু একটু ছোট করে বল। তোর নিশ্চয়ই কোনও জরুরি কথা আছে।

—জরুরি, বলে জরুরি। শম্পা মুরুব্বির মতো হাত আর কান নেড়ে বলে। কানে খুব বড় সাইজের রিং পরেছে ও। ওর মুখের পক্ষে অনেক বড়। কিন্তু রিংগুলো ওর মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুলতেই অদ্ভুত ভাল লাগে ওকে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে অমৃতা মনে মনে গেয়ে ওঠে 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি।' গানটা যে কবে গলা থেকে মনে চলে গেছে ও টের পায়নি। এখন যেন আর গানের দিন নেই।

—তোকে একটা কথা বলিনি অমৃতা, প্লিজ কিছু মনে করিস না, আমার ইমিডিয়েট বস, অর্থাৎ প্রোজেক্ট ডিরেক্টর বেশ কিছুদিন ধরে খুব মানে বেশ ইনট্রেস্ট দেখাচ্ছে আমার ওপর। তোর কী মনে হয়?

—আমার কী মনে হবে? সিচুয়েশন তোর, মনে হওয়াটাও তোর।

শম্পার চোখে অভিমান ঘনিয়ে আসে তক্ষুনি।

—কথাটা তোকে বলিনি, কারণ আমি খুব শিওর ছিলাম না। রাগ করছিস কেন?

—আরে! রাগ করিনি। কিন্তু আমি যে ভদ্রলোককে দেখলুম না, তোর সঙ্গে তাঁর ইনটার-অ্যাকশন দেখলুম না, কী করে আমার কিছু মনে হবে, বল!

—তোর সঙ্গে শিগগির একদিন আলাপ করিয়ে দেব, বুঝলি? খালি একটাই ভয় করে। তোর সঙ্গে আলাপ হলে হয়তো আর আমার দিকে ফিরেও চাইবে না।

অমৃতা উঠে দাঁড়াল, বলল—বাজে কথায় নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই রে শম্পা। তোর কথা যদি হয়ে গিয়ে থাকে তো এবার আমায় ছেড়ে দে।

তার হাত ধরে টানল শম্পা—কথা শেষ হয়নি, আসল কথাটা বলাই হয়নি। শোন প্লিজ। আমরা। মানে আমি আর ও, সৌমিত্র দাস, দু-চারটে সিনেমা একসঙ্গে দেখেছি, ওয়ালডর্ফে খেয়েছি কয়েকবার, এখন একটা উইক-এন্ড ও দিঘায় যেতে চাইছে আমাকে নিয়ে।

অমৃতা চমকে উঠল।

—ছেলেটা, মানে লোকটা কিন্তু ভীষণ ভাল। কোনওদিন একবার হাতটাও ধরেনি। ও বলছে আমাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু ফাইন্যাল বোঝাপড়ার জন্যে অন্য কোথাও যাওয়া দরকার। মা মত দিয়ে দিয়েছে। তুই কী বলিস!

অমৃতার চোখদুটোয় ক্রোধের জ্বালা। সে বলল—এটা যে অত্যন্ত অসম্মানজনক প্রস্তাব সেটা বোঝবার জন্যে তোর আমার কাছে আসতে হবে? শম্পা তুই দিনকে দিন অবোধ শিশু হয়ে যাচ্ছিস, না কী বল তো!

—শোন, আমি জানতুম তুই রাগ করবি। প্রস্তাবটা ওইরকম শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু সৌমিত্রকে দেখলে, জানলে তুই কথাটা বলবার আগে দুবার ভাবতিস। হি ইজ সো অনেস্ট অ্যান্ড অনারেব্‌ল। অফিসে ওর খুব নামডাক।

—সে যেমনই হোক, এটা যে 'তোর' পক্ষে অসম্মানজনক একটা প্রস্তাব, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তুই 'না' করে দিবি শম্পা।

—কিন্তু, কিন্তু তা হলে ও যদি বিয়ের প্রোপোজ্যালটা ফিরিয়ে নেয়?

—নিলে নেবে। শম্পা তোর বছর বাইশ বয়স হবে। এখনই কি তুই এমন অরক্ষণীয়া হয়ে গেলি যে তোকে বিয়ের জন্য একটা লোকের সঙ্গে উইক-এন্ড কাটাতে হবে?

—তোর বিয়ে হয়ে গেছে। তুই সেফ অ্যান্ড সিকিওর, তুই আমার কথাটা বুঝবি না ঠিক। কে আমার বিয়ে দেবে বল? বিনা যৌতুকে আমার মতন একটা কালো মেয়েকে কে-ই বা বিয়ে করবে?

—তুই পাগল হয়ে গেছিস শম্পা। তোর কথা শুনে আমার ছি ছি করতে ইচ্ছে করছে।

—তা তো করবেই। অমৃতা, তোর বিয়েতে মাসিমা মেসোমশাই কত ডাউরি দিয়েছিলেন, কী কী আইটেম আমি কিন্তু সব জানি।

রাগে জ্ঞান হারাল অমৃতা।

—তা তুই কি তা হলে ডাউরি নেই বলেই, সেই ছেলেটাকে বিয়ের আগে দুটো রাত উপহার দিতে চাইছিস?

—আর একটাও কথা তোর সঙ্গে আমি বলব না, শম্পা বলল।—তোদের ক্লাসকে আমার খুব জানা হয়ে গেছে। আরও জানা হয়ে গেল। তোরা সেই যাকে বলে না 'নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি, পরের বেলায় দাঁতকপাটি' সেই। যা তুই ভাল মেয়ে তোর প্রোফেসরের কাছে নোটস নিগে যা। শুধু যাবার আগে একটা কথা শুনে যাস, যে সৌমিত্র দাসকে না দেখেই চূড়ান্ত একটা অপমানকর মত দিয়ে দিলি সে মানে হি ইজ এ পার্ফেক্ট জেন্টলম্যান, তোর বরের মতো এগজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার না হতে পারে, কিন্তু ওর লাইনে ও-ও বহু দূর পর্যন্ত উঠবে, উঠবে, উঠবে।

শম্পা রাগে গরগর করতে করতে উড়ুনিটা উড়িয়ে, কানের রিং দুলিয়ে চলে গেল।

একটা অনেক কষ্টে তৈরি করা শান্ত দুপুর ভেঙে খান খান হয়ে গেল। যাঃ। সে-ই একমাত্র জানে কত সাবধানে, নিজের সমস্ত শক্তি কতখানি প্রয়োগ করে তবে এইরকম একটা শান্ত দুপুরে পৌঁছনো যায়। এখনও চারিদিকে স্তব্ধতার তরঙ্গ। আড্ডা-পিয়াসীরা ক্যান্টিনে কিংবা কফিহাউজে, পড়ুয়ারা ক্লাসে। একজন বৃদ্ধমতো মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছেন।—মা, অফিসটা কোথায় বলতে পারো?

—অফিস তো একটা না! আপনি কী কাজে এসেছেন বলুন।

—এই একটা রিভিউয়ের অ্যাপিল জমা দেওয়া হয়েছিল, ছেলের বি.এ. পরীক্ষার।

ঠিক উইন্ডোটাতে ওঁকে নিয়ে গেল অমৃতা। ফেরবার সময়ে আবার সেই অনর্থক চিন্তা তাকে খোঁচাতে লাগল। এই ভদ্রলোকের ছেলে বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছে? এঁর তো নাতির বি.এ. দেবার কথা। অদ্ভুত তো, ভদ্রলোকের শেষ বয়সের ছেলে বোধহয়, হঠাৎ হওয়া, তখনও কি নিরোধ-টিরোধ বেরোয়নি? আবার দেখো মজা, ছেলে নিজে আসেনি, বাবাকে পাঠিয়েছে। নাতিপ্রতিম ছেলের প্রতি হয়তো ভদ্রলোকের ভীষণ মায়া। আদর দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন একেবারে। এ ছেলের কিচ্ছু হবে না। কিচ্ছু হবে না।

সে-ও তো বাবা-মা-র একমাত্র সন্তান। খুবই আদরের। কিন্তু জীবনকে মুখোমুখি একটা লড়াই দেবার চেষ্টা তো সে করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে নিরন্তর। মা অনেক দিন থেকেই অসুস্থ। অনেক কিছুই নিজের হাতে করে নিতে অভ্যস্ত সে। নিজের ইউনিফর্ম বরাবর নিজে কেচে পরেছে। পি.টি-র জন্য কেডস-এ চক লাগানো, নিজের টিফিনটা গুছিয়ে নেওয়া, বাবাকে সময়মতো চা বা অন্য কোনও স্বাস্থ্য-পানীয় দিয়ে আসা, লোক না আসলে বাসন-টাসন মেজে নেওয়া। কোনওদিন এসব কাউকে বলতে যায়নি সে। কোনও নালিশও ছিল না—কে জানে তার ভাগ্যবিধাতা এইভাবেই তাকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন কি না।

এই সময়ে সেন্টিনারি বিল্ডিং-এর দিকে যেতে দেখল সে জয়িতা ম্যাডামকে। উনিও তাকে দেখতে পেয়েছেন। দাঁড়িয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় সে—আমি আসছি ম্যাডাম। উনি বললেন—ঠিক আছে লাইব্রেরিতে আর আসতে হবে না। আমার তোমাকে একটা ছোট্ট কথা বলার ছিল। সেটা বলেই ছেড়ে দেব। বলছিলাম—রোজ অত লেট করো কেন? থাকো কোথায়?

—যাদবপুর। মানে যাদবপুরের কাছে।

—দূর, মানছি। কিন্তু দূরত্বটা যখনই হয়ে গেছে তখন তো সময় হাতে নিয়েই বেরোতে পারো।

—না, ম্যাডাম, আসলে...

—অন্য কিছু না। তোমরা ভাল ছাত্রীরা, ভাল মেয়েরা এইভাবে নষ্ট হয়ে যাও এটা আমার ভাল লাগে না। অমৃতা, দুটো যদি না পেরে ওঠো, তা হলে একটাই চুজ করে নাও। স্বামীসঙ্গ বা লেখাপড়া। দুটো একসঙ্গে হয় না।

জয়িতাদি লিফ্‌টে উঠে চলে গেলেন। অমৃতা সেখানেই পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

ক্রোধ, নিজের ওপর, ম্যাডামের ওপর, তারপর নিদারুণ দুঃখ, নিজের জন্য, বাবার জন্য, মায়ের জন্য, তার পরে আবার ক্রোধ, নিজের ওপর, সম্পূর্ণ নিজের ওপর, একটা কথাও স্বপক্ষে বলতে পারল না বলে। ওই যে ছোট করে চুল ছাঁটা, ঈষৎ চৌকো মুখের আধা-ফর্সা, ভীষণ ব্যক্তিত্বঅলা মহিলা, যিনি এখন সম্ভবত তাদের ডিপার্টমেন্টে সবচেয়ে সমর্থ, সবচেয়ে আন্তরিক শিক্ষক, আসেন নিজস্ব একটা সাদা মারুতি এইট হানড্রেড নিজে চালিয়ে, উনি কী জানেন, কতটা জানেন, তার মতো একটি প্রায়ই-লেট ছাত্রীর জীবন সম্পর্কে? কী বোঝেন? যদি না-ই জানেন এবং না-ই বোঝেন তো কড়া-কড়া মন্তব্য করেন কেন? যেন উনি দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে অমৃতা স্বামীর অফিস যাবার. সময়ে দীর্ঘক্ষণ তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। কিংবা স্বামীর আহ্বানে তার অফিসে যাবার

আগেই একবার...। সিঁথির মধ্যে সরু সিঁদুরের রেখা দেখেই উনি সব বুঝে নিলেন? বাঃ।

উনি কেমন করে জানবেন তার বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির একটি কাজের লোক ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য লোকটিরও আসার কোনও ঠিক নেই। আসবে না এই ভয়ে সাত সক্কালেই তাকে তিনখানা ঘর আর খাবার-জায়গাটা ঝাঁট দিয়ে রাখতে হয়। শ্বশুর রিটায়ার্ড, কোনখানটা ঝাড়া ভাল হল না, কোন জায়গাটা ঝাঁট পড়ল না এসব ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য সে সময়ে তিনি হাজির থাকেন। শাশুড়ি স্কুলে চাকরি করেন। ভোর সাড়ে ছটায় আরম্ভ। তার আগে উঠে তাঁকে চা-জলখাবার তৈরি করে দেওয়া তার কর্তব্য। তার পরে শ্বশুর। তার স্বামী আর সে তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে বলে চা আর বিস্কুট ছাড়া আর কিছু খায় না সকালে। তার পরেই তাড়াতাড়ি চান সেরে তাকে দুটো গ্যাস জ্বালিয়ে সংসারের রান্না শেষ করে, ঠিক নটায় স্বামীকে খেতে দিতে হয়। তিন-চারখানা ক্যাসেরোলে বাকি দুজনের খাবার ঠিক করে রাখতে হয়, এতসব করে, রান্নাঘর ঝকঝকে করে মুছে অনেক সময়ে তার নিজের খাবার সময়ই থাকে না, কোনক্রমে কয়েক দলা ভাত গলার ভেতর পাঠিয়ে সে যেমন আছে তেমন বেরিয়ে আসে। সকালে চান করেই সে কলেজে যাবার কাপড় পরে নেয়। এপ্রন তো তাকে কেউ কিনে দেবে না, তাই একটা তোয়ালে ব্লাউজের দুপাশে কাঁধের কাছে পিন দিয়ে আটকিয়ে কোমরে গুঁজে একটার পর একটা কাজ সারতে থাকে সে। স্বামীসঙ্গই বটে!

বিকেলে বাড়ি ফিরবে। ছটা পর্যন্ত চায়ের জন্য অপেক্ষা করবেন ওঁরা। তবু নিজেরা করে নেবেন না। ছটা বেজে গেলে, করবেন, শুধু নিজেদের জন্য। তাকে তার নিজেরটা করে নিতে হবে। লোক না এসে থাকলে বাসন মাজো, ঘর মোছো। তারপর আবার বসে যাও রাতের রুটি তরকারি বানাতে। ফ্রিজ খুললেই তার শাশুড়ি বলেন—বউমা কী নিলে?—ওঁর ভয় যদি অমৃতা ফ্রিজ থেকে দুধ বা কোনও ফলটল নিয়ে খেয়ে ফেলে! অথচ তার শাশুড়ি একজন স্কুল-টিচার! স্কুল টিচার!

সওয়া তিনটে বেজেছে এখন। কিছুটা সময় হাতে আছে এখনও। সাড়ে চারটেয় ক্লাস ছুটি কবুল করা আছে তার। হঠাৎ সে টের পেল খিদেয় তার বত্রিশ নাড়ি পাক খাচ্ছে। আজ কাজ সারতে সারতে দেরি, তারপর শম্পার ফোন আসায় তার বরাদ্দ লপ্‌সিটা খেতে বেমালুম ভুলে গেছে সে। ভুলে গেছে জয়িতাদির ক্লাস করবার আগ্রহে, তাড়ায়। যে জয়িতাদি, সে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে ক'মিনিট আগেই রায় দিয়ে গেলেন।

হঠাৎ তার মায়ের কাছে যাবার একটা তীব্র ইচ্ছে হল। কিন্তু তার নিজের মা এখন অনেক দূর, সল্টলেক করুণাময়ী, সে হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হলে মায়ের আবার না হার্ট-অ্যাটাক হয়। অথচ ভেতরে তীব্র তীক্ষ্ণ একটা মা মা ডাক! সে গড়িয়াহাটের মোড়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো নেমে গেল, ডোভার লেনে তার ছোটবেলার বন্ধু সম্পদের বাড়ি। সম্পদ ছিল তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, এখন আই.আই.টি. কানপুর। হঠাৎ সে দেখল সে সম্পদের মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানের রাস্তাটা সে কীভাবে এসেছে, কীভাবে পার হয়েছে, কিছুই মনে নেই তার।

—তুই? অমৃতা? আজকে কোন দিকে সূর্য উঠল রে! মাসি অবাক হাসিতে মুখ ঝলমলিয়ে বললেন।

উত্তরে অমৃতা বলল—মাসি, আমাকে কিছু খেতে দেবে?

২

রোদে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে তার ভীষণ ভাল লাগে। চৈত্রেও, ফাল্গুনেও, এমনকি বৈশাখেও। প্রথম আলো ফোটবার সময়ে। মা বলে তার শরীরে ক্যালসিয়াম কম আছে তাই। পেছনে একটা কীসের যেন কাদের যেন কারখানা আছে। সেখানে একটা চিমনি আছে। চিমনি দিয়ে লকলকে আগুন

আর কালো ধোঁয়া ঠিক কখন বেরিয়ে আসবে, কখন বেরিয়ে আসে সে জানে না। খুব সম্ভব রাতে, যখন সে ঘুমোয়, একটা অতীন্দ্রিয় আঘ্রাণ তার স্বপ্ন জুড়ে, ঘুম জুড়ে থাকে, কিংবা হয়তো দুপুরে যখন সে বাড়ি থাকে না। সন্ধেবেলায় জানলা খুললে একটা উৎকট পোড়া-পোড়া গন্ধ সে পায়। সত্বর বন্ধ করে দেয় জানলার কপাট। কিন্তু এটুকু অসুবিধে সে সহ্য করে নিতে রাজি, যদি প্রতিদিন ভোরবেলায় স্রেফ জানলার জাফরির মধ্য দিয়েই ভোরের কমলালেবুকে একটু একটু করে কাঁসার জামবাটি হয়ে উঠতে দেখার অমূল্য সুযোগ সে পায়, এবং যদি কারখানার মালিকরা যত করোগেটের চালি, যত কুশ্রী ভাবেই তুলুক না কেন, দোলনচাঁপা গাছটা তার সতেজ পত্রসম্ভারের সবুজ নিয়ে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে! মৃদুল গন্ধের ওই ফুল আর গাঢ় সবুজ পাতার ওই গাছ যেদিন ওরা আরেকটা টিনের চালি কি আর একটা চিমনি বসাবার জন্যে কেটে ফেলবে, উঃ ভাবতেও গা শিউরোয়, মন ছমছম করে, তা সে যাই হোক সেই দিন থেকে সে পুবের জানলা বন্ধ করে দেবে, অন্য কোনও জানলার আশ্রয়ে চলে যাবার কথা ভাববে। ভাবলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় মিলে যাবে তার কোনও স্থিরতা নেই, এটুকু বাস্তববোধ তার আছে। খানিকটা অপেক্ষা করার ধৈর্যও তার মধ্যে দুর্লভ নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই দোলনচাঁপা, ওই কমলালেবুর আকাশে ওঠা, এই মিঠে রোদে পিঠ পাতা—এগুলো তার চাই-ই।

পিওন, শোনো, না না রানার, রানার!

রানারের জন্যে আমি কান পেতে আছি। কারণ তোমার চিঠি ওইরকম গতানুগতিতে আসবে না। হোক দেরি, কিন্তু রানার চাই। তার থলির ভেতর থেকে সাবধানে বার করবে, আমাকে শুধু আমাকেই দেবে আর কাউকে না, এমনকি চিঠি-বাক্সকেও না, তারপর? তারপরই ভেবেছ চিঠিটা আমি তাড়াতাড়ি খামের মুখ ছিঁড়ে পড়ব? ভুল ভেবেছ। চিঠিটাকে আমি অনেকক্ষণ ওম দেব, পাখিমায়েরা যেমন ডিমে তা দেয়! কত কাজ আমার করার থাকে। টেবিল গুছোনো, বই গুছোনো, বুদ্ধদেবের মূর্তি পালিশ করা, ডোকরার যে মূর্তিটা কিছুতেই চকচকে হবে না সেটাকে নিয়েও রোজ আমার পড়ে থাকতে হবেই। তারপর বাপি ডাকবে, বাপিকে খেতে দেবার সময়ে আমাকে উপস্থিত থাকতে হয়। আমার ভাল লাগে, ভাল লাগে রানারের চিঠিতে তা দিতে দিতে এই বসে থাকা। আমার বাপি খুব সকাল সকাল বেরিয়ে যায়। বেচারি! আমাকে আর মাকে সুখে রাখবার জন্যে বাপির কী কষ্ট! কী চেষ্টা! আমি তো বলি দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। আর কেন তুমি এত কষ্ট করো।

—এ হল সিন্দবাদের বুড়োর জোয়াল, বুঝলি তো? একবার কাঁধে নিলে আর নামানো যায় না। তা ছাড়া তুইও তো আছিস। তোকে পার, উঁহু সুখী করতে হবে না?—বাপি বলে।

এইখানটায় আমি আমার লুকোনো হাসিটা হাসি। এ কী রকমের হাসি জানো? ঠোঁটদুটো ছড়ায় না। অন্তত বাইরে নয়। ভেতরে, মুখের গভীরে হাসি। কেন তা তুমি নিশ্চয় জানো। দিদির বিয়েতে বাবাকে অনেক অ-নে-ক দিতে হয়েছে। সব ওরা মুখ ফুটে চায়নি। কিন্তু অন্য কোনওভাবে, হাবেভাবে, বডি-ল্যাঙ্গোয়েজে চেয়েছে। বাপি তো দিদিকে দিতই। গয়নায় রানি করে দিত একেবারে। কিন্তু তুমিই বলো, ওদের বাড়িতে কি টিভি নেই? সি.ডি. প্লেয়ার নেই? ওয়াশিং মেশিন, পি.সি. হয়তো না-ও থাকতে পারে। কিন্তু এ কেমন কথা যে একজন ম্যানেজমেন্টের মাস্টার্স ডিগ্রি-করা, পঁচিশ-তিরিশ হাজার মাইনে পাওয়া লোক মানে ছেলে এসব শ্বশুরবাড়ি থেকে নেবে? পার্থদা অবশ্য চায়নি। কিন্তু বাবা যখন পার্থদার বাবার বডি-ল্যাঙ্গোয়েজ বুঝে এসব দিল, আপত্তি করেনি তো! আমি যদি পার্থদা হতাম, তা হলে শুধু লজ্জা নয়, রাগ পেত আমার। তক্ষুনি সব ফিরিয়ে দিতাম।

ধুস কী সব লিখছি, একেবারে ধুত্তোর ছাই। এসব কি তোমার আমার কথা না কি? আমার মুখের ভেতরের হাসিটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এসব বলতে হল আসলে।

ফোন বাজছে। আসছি এবার। নিশ্চয় আমার ফোন।

—হ্যালো।

—হ্যাঁ দোলা, আমিই তো বলছি।

—হ্যাঁ, কয়েকদিন অমৃতা আসছে না। বোধহয় তিন দিন। না, আমরা কিছু ভাবিনি তো! সরি মাসি, সত্যি খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। তুমি সাত দিন খোঁজ পাওনি? ও ফোন করছে না? তুমিও পাচ্ছ না? ওদের ফোন খারাপ?

—অ্যাঁ? তোমার গলা শুনেই রং নাম্বার বলে রেখে দিচ্ছে? আর ইউ সিওর ওটা অমৃতাদেরই ফোন? ওর শ্বশুরের গলা? তুমি ঠি-ক চেনো? আচ্ছা, আমি দেখছি। কিন্তু তুমি, তোমরা একবার যাচ্ছ না কেন? আবার তোমার বেডরেস্ট? যাঃ।

মাসির হৃদয় কেন এত ঠুনকো, কিছুই তো বয়স নয়, তার মায়ের থেকে বেশ কিছু ছোটই হবেন। আশ্চর্য! ওই ভয়েই অমৃতটার সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলেন। তারা বন্ধুরা খুব খেপিয়েছিল অমৃতাকে সে সময়ে। অমৃতা বলেছিল—'আমাকে কেন? আমার বাবা-মা-কে খেপাগে যা। আমার পেছনে লাগলে ভাল হবে না।'

তা বেশ তো, তারা না হয় গিয়ে অমৃতার বাবা-মা-কেই খেপাল। সে এক্তিয়ার তাদের আছে। 'আচ্ছা মেসোমশাই, গৌরীদান করলেই তো পারতেন। এত ভাবনা যখন অমৃতাকে নিয়ে!'

মেসোমশাই পরীক্ষার খাতাগুলো সরিয়ে রেখে বললেন—'গৌরীদান? তা-ই বটে। তোমাদের মাসিমাকে বোঝাও। তাঁর ধারণা তিনি যে কোনওদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারেন। তখন মেয়েটাকে দেখবার তাঁর কেউ-ই থাকবে না। আ'য়্যাম নট রেস্পনসিব্‌ল এনাফ।'

বলতে বলতে মেসোমশাই যে সত্যি-সত্যিই খুব গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিলেন এটা ওরা বুঝতে পেরেছিল। অমৃতার মা কিন্তু সত্যিই খুব অসুস্থ। হাই ব্লাড প্রেশার থেকে হার্ট খারাপ, এর ওপর যখন ব্লাড সুগার হল, উনি আর অপেক্ষা করতে রাজি হলেন না। মেয়ের বিয়ের জন্যে পাগলিনীপ্রায় হয়ে উঠলেন। তা সত্ত্বেও তারা মাসিমাকেও খেপিয়েছিল।

কিন্তু অমৃতা? অমৃতাই বা রাজি হয়ে গেল কেন? ও যদি সেভাবে আপত্তি করত তা হলে জোর-জবরদস্তি করে তো আর ওঁরা বিয়েটা দিতে পারতেন না। আসল কথা, অমৃতাও বোধহয় ভয় পেয়েছিল। কিংবা এ-ও হতে পারে অরিসূদনকে দেখে ও তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

এরকম হয়, হয়েই থাকে, সে জানে। অমৃতার বাবা-মা-র যেমন প্রেমের বিয়ে। অমৃতার মা দেখতে কী সুন্দরী! কী সুন্দরী! সাধারণ গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু ওঁদের সময়ে ওই রূপের জোরেই তো ওঁর অ-নে-ক ভাল বিয়ে হতে পারত। কিন্তু ওই যে প্রেম! প্রেমে পড়লেন। অমৃতার বাবা তখন এম.এ.-র ব্রাইট স্টুডেন্ট, মাসিকে পড়াতেন। মেসোমশাইয়ের আগেকার ছবি সে দেখেছে। সাধারণ ভাল-ছেলে ভাল-ছেলে ভাবটা। অত রূপসী মাসি যে কী করে...। না, এভাবে বাবা মা-দের সম্পর্কে ভাবাটা ঠিক না। বরং নিজের উদাহরণটাই তার ভাবা দরকার। গেল পার্থদাদের ক্লাবের স্টিমার পার্টিতে, সরু সিঁড়িটা দিয়ে আপার ডেকে উঠছে, সিঁড়ির ওপরে যেন নিজের নিয়তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। প্রথম, একেবারে প্রথম দর্শনে এমনটা হতে পারে সে কোনওদিন ভাবেনি। সারাটা স্টিমার-পার্টি ছলচাতুরি করে ও-ও যেমন তার কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করেছে, তেমনি সে-ও করেছে। নির্লজ্জের মতো। এক টেবিলে খেতে বসেছে খুঁজে খুঁজে। এক একটা টেবিলে চারজনের করে জায়গা। ওরা দুজন ছাড়া ছিলেন দুজন বয়স্ক ভদ্রলোক। তাঁদের নিয়ে ঠারে-ঠোরে কী ঠাট্টা ওদের। কেটারারকে বলে যখন এক্সট্রা মাছটা ও তার পাতে দেওয়াল, তখন সেই মাছের টুকরোটা রাগের ভান করে সে কি ওর মুখে গুঁজে দেয়নি! পাতেই তো তুলে দিতে পারত! ওভাবে মুখে গুঁজতে গিয়ে তার ডান হাতের সব আঙুলগুলোর আগা যে ওর মুখের মধ্যে চলে গেল সে শিহরনের কথা জীবনেও ভুলবে না কি সে? ও-ও হয়তো ভুলবে না। হুল্লোড়বাজ, চঞ্চল, অস্থির, খেয়ালি, তবুও ও-ও ভুলবে না। সে স্থির জানে। আর এই ভাল লাগা, এই শিহরন, এই ফিরে ফিরে তাকিয়ে দেখার

ইচ্ছে, ফিরে ফিরে সামান্য ঘটনাগুলো ভাবার ইচ্ছে, এ একজনের সঙ্গেই হয়। সেই একজন যত দিন না আসে, তত দিন অনেককে ভাল লাগে, অনেকের দিকে একটু একটু ঝোঁকে মন, কিন্তু সে যখন আসে সিঁড়ির মাথায় ওইরকম বিজলি-চুম্বকের মতো তখন বোঝা যায় আরগুলো সব মিথ্যে, হাস্যকর রকমের ছেলেমানুষি। এইটা সত্য। এইটা অমোঘ।

অমিতকে দেখে তার যা হয়েছিল, অরিসূদনকে দেখে অমৃতার যদি তার কণাও হয়ে থাকে, তা হলেই বোঝা যাবে, কেন উনিশ বছর মাত্র বয়সে, ফাইন্যাল পরীক্ষা ঘাড়ের ওপর, মা শয্যায়-শোওয়া, অমৃতা হঠাৎ বিয়েতে রাজি হয়ে গেল। নইলে অমৃতার মতো অত লেখাপড়ামুখি মেয়ে, অত সিরিয়াস, তারপরে অমন মা-অন্ত প্রাণ, মাকে প্রাণ দিয়ে আগলে রাখত যে, বাবা-মার অমন বুকের ধন যাকে বলে সে কেন...

মাসি বেপথু হাতে ফোনটা নামিয়ে রাখছেন, বুঝতে পারল দোলা। অনায়াসে। এখন মানুষের মনের অনেক কথা, শরীরের অনেক ভাবের কথা সে চট করে বুঝতে পারে। প্রেম তাকে এই শক্তি দিয়েছে। একদিক দিয়ে ভাবতে গেলে এটা অমিতেরই দেওয়া। অমিতাভ। অমিতের জন্য সারা শরীরে একটা সজলতা নিয়ে, আর সীমা মাসি অর্থাৎ অমৃতার মায়ের জন্য একবুক করুণা নিয়ে, আর অমৃতার জন্য একমাথা ভাবনা নিয়ে সে অমৃতার ফোনটা ঘোরাল। রিং হচ্ছে, রিং হয়ে যাচ্ছে ওদিকে। ফল্‌স রিং না কি?

—হ্যাল্লো—একটি বয়স্ক নারীকণ্ঠ জবাব দেয়।

—অমৃতা আছে?

—কে বলছেন?

—আমি দোলা, মাসিমা, অমৃতার বন্ধু। দিন তিনেক কি চারেক হল ওর য়ুনিভার্সিটি কামাই হল, তাই...

—ধরো, ডাকছি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে অমৃতার গলা ভেসে এল—দোলা?

—হ্যাঁ আমি, তুই তিন দিন আসছিস না কেন?

উত্তরে অমৃতা বলল—জয়িতাদি খোঁজ করছিলেন? ও।

দোলা বলল—তোর শরীর-টরীর খারাপ না কি?

অমৃতা বলল—তোর আবার জ্বর হয়েছে? কতদিন বলেছি ঠাণ্ডা লাগাস না!

দোলা বলল—ব্যাপারখানা কী বল তো। মাসি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ফোন করেছিলেন। তোদের ফোন পাচ্ছেন না। পেলেও রং নাম্বার বলে কে নামিয়ে রাখছে!

—হ্যাঁ ঠিক আছে। রাখছি—

ফোনের মধ্যে একটা চাপা রাগত গলার 'এবার রাখো' শুনতে পেয়েছিল দোলা। সেটা নারী-কণ্ঠ কি পুরুষ-কণ্ঠ সেটা বুঝতে পারেনি।

অমৃতার সমস্ত কথাবার্তাই অসংলগ্ন। তার ওপর ওই 'এবার রাখো'। দোলা কেমন উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করল। কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এ সব?

মা জিজ্ঞেস করল—অমন করে খাচ্ছিস কেন দোলা? তেতো দিয়ে ডাল মাখলি যে!

—ওঃ ভুল হয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি মা,

—বুঝতে পারিসনি ওটা নিম-বেগুন? মাথায় কী ঘুরছে বল তো! ঠিক করে খা। ও ভাতটা সরিয়ে রাখ। আরেকটা মাছ ভাজা দেব?

দোলা বলল—এই তো, ঠিক আছে। খেয়ে নিচ্ছি। উঃ আরেকটা মাছ? বলে একটাই খেতে পারছি না।

মা নিজেও দোলার সঙ্গে খেতে বসেছে। বাবা সাত সক্কালে বেরিয়ে যায়। দোলা য়ুনিভার্সিটি যেতে আর মা মায়ের শখের নার্সারি স্কুলে যেতে একই সঙ্গে বসে। তবে দোলার কোনও কোনওদিন দেরিতে ক্লাস থাকে। সেদিনগুলোতে মা খেয়ে বেরিয়ে যায়। দোলা নিজের মতো বেরোয়। নিজের মতো খেয়ে। ওদের বাড়ির কাজের লোক অর্থাৎ অণিমাও কাজ করে, সকাল দশটার মধ্যে সব রান্না-বান্না সেরে গুছিয়ে, নিজে খেয়ে সে-ও চলে যায়, কোনও গেঞ্জি কারখানায় তৈরি গেঞ্জির সুতো কাটতে। আবার সন্ধে সাতটায় আসবে।

দোলাদের বাড়িটা এমন জায়গায় যে কোনও বাসের টার্মিনাস থেকে ওঠার উপায়ই নেই। এক যদি হাওড়া চলে যেতে চাও! ও অবশ্য পাতাল রেলে করে যায়। অটোয় করে কালীঘাট স্টেশনে উঠে ও সেন্ট্রালে নামে, কলুটোলাটা হেঁটে পার হতে হয়, পেছনের দরজা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকে ও।

—খিড়কির দরজা দিয়ে কারা আসে জানিস?—নিলয়, ওদের ক্লাসের সবচেয়ে বিচ্ছুটা বলেছিল একদিন।

—কে?—দোলা ওর ফিচেল হাসি থেকেও কিচ্ছু আন্দাজ করতে পারেনি।

—জমাদার।

—আমি জমাদার? আমি জমাদার?—চড় তুলে তাড়া করলে তো নিলয় পালাবেই। পালিয়ে কিন্তু বেশি দূর যাবে না পাজিটা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলবে—কেন? জমাদার খারাপ? স্ক্যাভেঞ্জার, সংসারের যাবতীয় আবর্জনা, জাল-জঞ্জাল যে পরিষ্কার করে আমাদের জন্য তাকে খারাপ বলছিস? দাঁড়া, জ্যোতিবাবুদের বলে দেব।

তখন অমৃতাই বলে—তুই কিচ্ছু জানিস না নিলয়, খিড়কি দরজা দিয়ে আরও অনেকে আসে, আসে ফুচকাওলা, আসে পাঞ্চা বরফ। দোলাটা তো নির্ঘাৎ ফুচকাওলা। ওর কাছে ফুচকাগুলো যা মচমচে না, আ-হ।

আবার অমৃতা। অমৃতার কথাতেই মাথাটা এখন ভর্তি হয়ে গেছে। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ক্লাসে ঢোকবার মুখে স্বভাবতই অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শর্মিষ্ঠা, তানাজি, নিলয়, অনিন্দিতা, লাবণি, তিলক—এক দঙ্গল একেবারে।

কাকে বলবে? নিজের দুশ্চিন্তার কথাটা? শর্মিষ্ঠাকে সে আদৌ নির্ভরযোগ্য মনে করে না, অনিন্দিতাটা অতিশয় তরল প্রকৃতির। লাবণিকে বলা যেত। কিন্তু সময় চাই। এখন ভিড়ের মধ্যে থেকে ওকে ডাকলেই সবগুলো শেয়াল একসঙ্গে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠবে।

—কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে? অ্যাঁ? আমরা বুঝি কেউ নই। কিছু নই!

তিলক পাশে বসেছিল বলে তিলককেই বলে ফেলল কথাটা দোলা।

—তিলক শোন, অমৃতার নির্ঘাৎ কোনও প্রবলেম হয়েছে।

—তিন চারদিন আসেনি! হ্যাঁ কোষ্ঠকাঠিন্য তো অন্তত পক্ষে বটেই!

—অসভ্যতা করিস না। ওর শ্বশুরবাড়িতে কাউকে ফোন ধরতে দিচ্ছে না। ওর মাকেও কথা বলতে দিচ্ছে না। আমি অনেক কষ্টে কনট্যাক্ট করেছি, উল্টো পাল্টা বকল।

—সর্বনাশ! তিলক বলল, —মাথাটা গেছে। যত বলি, অত পড়িসনি অমৃতা, অত পড়িসনি। আজ বলছি না কি?

—তুই কি কখনও সীরিয়াস হবি না?

—ইন্টারভিউয়ের চিঠি এলে নির্ঘাৎ হব।

—শোন তিলক, ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কারুর সঙ্গে ওকে কথা বলতে দিচ্ছে না, ব্যাপারটা খুব ফিশি লাগছে।

তিলক বলল—দেবে তো না-ই। শ্বশুর-টশুর টের পেয়েছে আমার মতো একটা লাল টুকটুকে ছেলের সঙ্গে ও পড়ে। সন্দেহ, স্বাভাবিক! তোর শ্বশুর-শাশুড়ি হলেও এগজ্যাক্টলি এমনিই করত।

দোলা কিছু না বলে তিলকের থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে বলল। এক্ষুনি এ. আর. অর্থাৎ অশেষ রায়ের ক্লাস শুরু হবে। এসেই আগে উনি ডিসিপ্লিন সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দেবেন। ছেলেরা বলে উনি অশেষ না আরও কিছু, উনি হলেন শেষন। নিজেও শেষ হবেন, আমাদের সবাইকেও পণ্ডিত বানাতে না পেরে শেষ করে দেবেন।

অমৃতার সঙ্গে দোলার বেশিদিনের বন্ধুত্ব নয়। বি.এ. ক্লাসেই। যাতায়াতের রুট এক হলে এইরকম বন্ধুত্ব কারও কারও সঙ্গে হয়ে যায়। তখন অমৃতারা থাকত রমণী চ্যাটার্জি স্ট্রিটে, দোলারা থাকত হিন্দুস্থান রোডে। এত কাছে থাকত অথচ কলেজে পড়তে যাবার আগে ওদের ভাব ছিল না। দোলার খুব ভাল লাগত অমৃতাকে রাস্তাঘাটে দেখে। হয়তো একটা শাড়ির দোকানে ঢুকল, কিংবা রাস্তা পার হচ্ছে। অনেক সময়েই ওর সঙ্গে ওর মাকেও দেখেছে। পোর্সিলেনের মতো রং মাসির। চোখ-মুখ-নাক খুব সুন্দর, বোঝাই যায় এক সময়ে খুব সুন্দরী ছিলেন, তবু ওঁকে ছেড়ে অমৃতার দিকেই চলে যেত চোখ। সুশ্রী তো বটেই, কিন্তু ভারী মিষ্টি। পুতুলের মতো মিষ্টি নয় কিন্তু। ওর চোখের চাওয়ায়, ঠোঁটের হাসিতে মিষ্টত্বের সঙ্গে একটা ব্যক্তিত্ব ছিল, যে ব্যক্তিত্বটা অত সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও ওর মায়ের ছিল না। অমৃতাকে হয়তো ওই ব্যক্তিত্বের জন্যই দূরের মানুষ দূরের মানুষ লাগত। হয়তো বা একটু উন্নাসিক। অন্তত দোলা তো কোনওদিনই যেচে ভাব করতে যায়নি।

আশ্চর্য! দুজনে যখন একসঙ্গে এক কলেজের ক্লাসে মুখোমুখি হয়ে গেল, তখন অমৃতাই জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি গড়িয়াহাটের আশেপাশে কোথাও থাকো না?

—তুমিও তো কাছাকাছিই, আমি তোমাকে দূর থেকে দেখেছি।

অমৃতাটা খুব ফাজিল ছিল, বলেছিল—আমি কিন্তু তোমাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, বন্ধুদের নিয়ে ফুচকা খেয়েই যাচ্ছ, খেয়েই যাচ্ছ, ঝালমুড়ি খেয়েই যাচ্ছ, আইসক্রিম খেতে খেতে বেরোচ্ছ, রোল কিনে গলির দিকে গেলে। তোমার রোজ কত টাকার ফুচকা লাগে?

দোলা হেসে হেসে বলেছিল—আজ প্রথম দিন বলে কিন্তু কিছু মনে করছি না। পরে ফুচকা তুলে কথা বললে আড়ি হয়ে যাবে।

অমৃতার সঙ্গে ভাব হওয়ায় দোলার এত ভাল লেগেছিল। যেন কোনও দূর গ্রহের সঙ্গে নিজের কক্ষপথে দেখা হয়ে যাওয়া। গ্রহ কিংবা নক্ষত্র। তার পর মেলামেশা করতে করতে সেই গ্রহত্ব নক্ষত্রত্ব কেমন আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যায়। কেন অমৃতার ওইরকম ব্যক্তিত্ব, অনেক টাকা বা অনেক বুদ্ধি থেকে নয়, মা চিররুগ্‌ণ বলে, মায়ের মা হয়ে থাকতে হয় বলে, এ সব দোলা ধীরে ধীরে বুঝেছে। আসলে ফার্স্ট ইমপ্রেশনটা বা ওপর-ওপর দেখাটা কিছু না। একটা মানুষের সামান্য একটু ভেতরে ঢুকলেই বোঝা যায়, সে কে, সে কী এবং কেন। অমৃতা দোলাকে কোনওদিন লক্ষ করেছে বলে দোলার মনে হয়নি, অথচ দেখো, ও দোলার সম্পর্কে দোলার চেয়ে বেশি জানত। জানত দোলা খুব আদুরে, জানত দোলা অনেক বন্ধুর সঙ্গে ঘোরাফেরা, হইচই করতে ভালোবাসে। কিন্তু দোলার মধ্যে যে একটা ভাবুক দোলা, কাঙাল দোলা বসে আছে, অমৃতার বন্ধুত্বের জন্য কাঙাল, তা সে কোনও দিনও বোঝেনি।

বন্ধুত্ব এমন একটা জিনিস যার মধ্যে আবার অন্যান্য আবেগ অনুভূতির কিছু কিছু মাত্রাও থেকে যায়। কখনও থাকে করুণা, কখনও থাকে শ্রদ্ধা, কিন্তু প্রায় সব সময়েই থাকে আস্থা, নির্ভরতা। এটা যদি না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সেটা বন্ধুত্ব নয়, খালি সঙ্গীত্ব। কিছুক্ষণের সঙ্গ দেওয়া নেওয়া।

অমৃতার সঙ্গে দোলার যে বন্ধুত্ব তার মধ্যে দোলার মনোভাবে খানিকটা শ্রদ্ধা সম্ভ্রম আছেই। অমৃতা দোলার মতে দোলার চেয়ে সুন্দর, লেখাপড়ায় ভাল, কেমন একটা ধৈর্য একটা রোখ আছে

তার জীবনযাপনে। তারও চেয়ে বেশি যেটা আছে সেটা হল ব্যক্তিত্ব। এটা হয়তো ওই রোখ, ওই ধৈর্য থেকেই আসে। আরেকটা কথা, অমৃতা নিজের কথা একদম বলে না। বলার অভ্যাসই নেই। তবে অন্যের কথা শোনে মন দিয়ে। অন্যের সমস্যার সমাধান করতে ওর কোনও আলস্য নেই। দোলা ওদিকে বক্তিয়ার, কোনও কথা পেটে রাখতে পারে না, যদি কারও ওপর রাগ বা অভিমান হয়, যেমন বন্ধুদের মধ্যে হয়েই থাকে, তাহলে দুদিন বড় জোর অপেক্ষা করবে তারপর নিজেই ওপর-পড়া হয়ে বলবে—এই জানিস আমার না তোর ওপর ভী-ষণ রাগ হয়েছে। কেন রাগ, কখন থেকে রাগ, রাগের মাত্রা কতটা এ সব নিয়েও সে রীতিমতো একটা বক্তৃতা দেবে, তারপরে বলবে—কী, এত কথা বললাম, আমার কাছে ক্ষমা চাইলি না? চা, ক্ষমা চা, সরি বল।

দোলা এমনই।

শেষনের ক্লাস হয়ে গেল, প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ পি.এম.-এর ক্লাস হয়ে গেল। তারপর একটা ক্লাস বিরাম। কাকে বলবে দোলা? তিলকের তো ওই ধরনের ফিচেল-ফাজিল প্রতিক্রিয়া।

লাবণির পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল সে। —এই লাবণি, লাবণি, একটু দাঁড়া। প্লিজ।

—কেন রে? আমি কমনরুমে যাচ্ছি, অনেকক্ষণ থেকে টয়লেট পেয়েছে।

—তা চল। কিন্তু রাস্তার দিকের বারান্দাটায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, টয়লেট সেরে আসিস একবার। ভী-ষণ দরকার আছে।

লাবণি আসতে যতটা পারে খুলে বলল কথাগুলো দোলা।

লাবণি বলল—দ্যাখ শ্বশুরবাড়ি-টাড়ির অনেক কমপ্লিকেশন থাকে, চাপা গলায় 'এবার রাখো'টা তুই ঠিক শুনেছিস?

—সেটা তো ঠিক শুনেছিই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি মিস্টিরিয়াস হল অমৃতার কথাবার্তা।

—কথাবার্তা মোটেই মিস্টিরিয়াস নয়, লাবণি বলল, বোঝাই যাচ্ছে সামনে এমন কেউ দাঁড়িয়ে আছে যার সামনে ও মুখ খুলতে পারছে না।

—কিন্তু মাসিকে ওই রং নাম্বার বলে ফোন নামিয়ে রাখা!

—মাসি ঠিক নাম্বার ঘুরিয়েছিলেন কি না দ্যাখ। ও রকম অনেক সময়ে নার্ভাস হয়ে গেলে হয়। আর অমৃতার মা তো নার্ভাস থার্টি।

—তা হলে তুই বলছিস ভাবনার কিছু নেই?

—না, তা কিন্তু বলিনি। আচ্ছা ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কেমন কিছু জানিস?

—টিপিক্যাল বাঙাল। বউ আসতেই রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

—এই খবর্দার বাঙাল বলবি না। আমি বাঙাল তা জানিস?

—তোদের নিয়মকানুন তা হলে তুই-ই ভাল বলতে পারবি। যে বউ য়ুনিভার্সিটিতে পড়ে, তাকে দিয়ে সকালে বিকেলে সব রান্না করানো এটা আমাদের ঘটিদের মধ্যে স্বাভাবিক নয়। চলে না।

লাবণি বলল—আমার তো দুই মাসতুতো বউদি আছে। খোদ শ্যামবাজারের। দুজনেই বেরোয়। রান্নার লোক আছে, তবে বউদিরাও ছোটখাটো ব্যাপারে যেমন চা-ফা করা বা লোক এলে ভাল কিছু এ সব করে। তাই বলে পুরো রান্না...

—তোরা মডার্ন। তা ছাড়া কোনকালে পিওর বাঙাল ছিলি রে? ওর শ্বশুরবাড়ি বোঝাই যাচ্ছে সেকেলে। দোলা বলল।

—তা ওঁরা কি চান না ও পড়াশোনা করুক!

—সেটা ভাই আমি জানি না। অমৃতা কোনওদিন বলেনি। যাবি?

লাবণি বলল—সেটা কি ঠিক হবে? চিনি না জানি না...

দোলা বলল—আহা, অমৃতা কেন যাচ্ছে না সে খবর নিতে যেতে পারি না! চল লাবণি প্লিজ।

পরের ক্লাসটা ওরা আর করল না। যদিও জয়িতা বাগচির ক্লাস। পাতাল রেল ধরল দুজনে,

কালীঘাট স্টেশনে নেমে একটা যাদবপুরগামী বাস পেয়ে গেল। লাবণি এখনও বলে যাচ্ছে—লোকেদের শ্বশুরবাড়ি। যাই বলিস, আমার যেতে কেমন-কেমন লাগছে।

ধৈর্য রাখতে পারে না দোলা, ঝাঁঝিয়ে ওঠে—ঠিক আছে, যা, তুই নেমে যা।

—নেমে গিয়ে করবটা কী? বাড়ি কতদূর বল তো!

—তাড়াতাড়ি নেমে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবি।

লাবণি গোমড়ামুখে বলল—অকওয়ার্ড সিচুয়েশন আসলে আমার খুব বাজে লাগে। তাই বলছিলাম। অমৃতার জন্যে দুশ্চিন্তা আমারও কিছু কম হচ্ছে না।

তবে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল। ওরা ঠিকানা খুঁজে খুঁজে গিয়ে দেখল 4/1/A, সেন্ট্রাল পার্কের এক নম্বর ফ্ল্যাটে তালা মারা। কোল্যাপসিব্‌লটা এমন করে বন্ধ, এমন করে তাতে সাত লিভারের বড়সড় একটা তালা লাগানো যেন কোনওদিন কেউ ওখানে ছিল না। ও বাড়ি বহুদিন খালি পড়ে আছে, বিক্রি হয়ে যাবে এবার।

অমৃতাদেরটা একতলার ফ্ল্যাট, দোতলায় ওঠবার সিঁড়িটা পাশ দিয়ে চলে গেছে।

লাবণি হঠাৎ বলল—চল না, দোতলার ফ্ল্যাট-ট্যাটে জিজ্ঞেস করি।

দোলার ভীষণ দুর্ভাবনা হচ্ছিল, সে বলল—হঠাৎ এত স্মার্ট হয়ে গেলি যে!

উত্তর দিল না লাবণি—দোতলায় উঠতে থাকল। বাড়িটা ছোট। তিন তলায় তিনটে ফ্ল্যাট।

দোতলার ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল টিপল ওরা। এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন।

—কে আপনারা?

—আমরা নীচের ফ্ল্যাটের অমৃতা মানে ওঁদের বাড়ির বউয়ের বন্ধু। ওর কাছে এসেছিলাম, দেখছি তালা মারা। আপনারা যদি কেউ কিছু জানেন।

—তালা মারা? সকালেও তো ভদ্রলোককে বাজার বেরোতে দেখেছি। তবে, কিছু মনে করো না ভাই, তোমাদের তুমিই বলছি, ওঁরা যেন কেমন। কারও সঙ্গে মেশেন না। বউটিকেও মিশতে দ্যান না। প্রতিবেশীর সঙ্গে তো প্রতিবেশীর স্বার্থের খাতিরেই একটু মেলামেশা করতে হয়। ওরা সেটুকুও করেন না। এসো না ভেতরে, বসো।

দোলা লাবণির দিকে তাকাল। লাবণি দোলার দিকে। এক পা এক পা করে এগোল, সোফার দিকে তাকিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন—বসো, বসো না। তোমরা মেয়েটির বন্ধু! মেয়েটিকে কিন্তু ভাল বলেই মনে হয়। একদিন আমি বেরোচ্ছি, ও-ও বেরোচ্ছে। বলল—বউদি, আপনাকে তো বেরোতে দেখি না!

—আমি বললাম—আজ একটু ব্যাঙ্কে যাবার আছে ভাই। এই পর্যন্ত বলেছি, দরজার ভেতর থেকে ওর শ্বশুরই বোধহয় ডাকলেন, অমৃতা অমৃতা, একটা কথা শুনে যাও। অবভিয়াস আমার সঙ্গে কথা বলতে দেবেন না।

—আশ্চর্য তো! দোলা বলল।

লাবণি বলল—উনি কথা বলতে না দেবার কে? উনি না বললেন আর অমৃতাও শুনে গেল? এত ভিতু মেয়ে তো আমাদের বন্ধু নয়? কেন, আপনাদের সঙ্গে ওঁদের কি কিছু নিয়ে কোনও মনোমালিন্য...

—আরে আলাপ হবে সম্পর্ক হবে তবে তো মনোমালিন্য। আচ্ছা, আমাদের না হয় ওঁরা পছন্দ করেন না, কিন্তু তিনতলা? তিনতলার ফ্ল্যাটের সঙ্গেও ওঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। আশপাশের কারও সঙ্গে আছে বলেও জানি না। বউটি, মানে তোমাদের বন্ধু কিন্তু ভাল। দেখো, হয় তো সবাই মিলে কোথাও বেরিয়েছে, তাই তালা। সবাই-ই তো কোল্যাপসিব্‌ল টেনে তালা দিয়েই বেরোয়।

ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। একতলায় নেমে লাবণি আবার জানলা-টানলা দিয়ে একটু উঁকি মারার চেষ্টা করল, জানলাগুলো ভেতর থেকে বন্ধ। খুব স্পষ্ট যে ভেতরে কেউ নেই।

রাস্তাটা পেরিয়ে একটা পুকুরের ধার পর্যন্ত ওরা এসেছে। একটা ছেলে হঠাৎ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। বছর পনেরো ষোলো হবে। বোধহয়, সবে গোঁফ গজিয়েছে। একটা টি শার্ট আর পায়জামা পরা।

ছেলেটা অমনি উর্ধ্বশ্বাসে বলে গেল—অমৃতা বউদির খুব শরীর খারাপ, কোনও হাসপাতাল-টাতালে নিয়ে গেছে। যখন নিয়ে গেল খুব সম্ভব অজ্ঞান মতো ছিল, একটা সাদা অ্যামবাসাডর। অরিদার অফিসের গাড়ি। কিন্তু ব্যাপারটা ভাল নয়।

বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে, দোলা বলল—কী হয়েছে অমৃতার? দিন তিনেক য়ুনিভার্সিটি যায়নি। কিন্তু আজ সকালে আমার সঙ্গে কথা বলল, তখনও তো কোনও শরীর খারাপের কথা বলেনি! তুমি কে?

—আমি সীজার, ওদেরই তিনতলায় থাকি। হেয়ার স্কুলে পড়ি তো, একসঙ্গে যাতায়াত করি। সেই থেকে ভাব হয়ে গেছে খুব। আমি জানি বউদির শরীর খারাপ। কোনও মেয়েলি ব্যাপার, তাই আমাকে বলতে পারেনি।

ছেলেটি একটু লাল হয়ে মুখ নিচু করল। তারপর বলে উঠল—আপনারা প্লিজ ওর বাবা-মাকে খবর দিন।

বিমূঢ়ের মতো খানিকটা হেঁটে লাবণি ডাকল—এই সীজার, সীজার, শোনো-ও।

অনেকটা রাস্তা চলে গিয়েছিল ও, রাস্তার কোনও চলতি লোক ওদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ও আবার ছুটে এল। লাবণি বলল—তোমার, মানে তোমাদের ফোন নম্বরটা দাও।

—ফোর টু-ফাইভ টু থ্রি সেভেন ওয়ান।

—তোমাকে ডাকলে বাড়ির সবাই ডেকে দেবেন তো?

—হ্যাঁ, আপনি...

—আমার নাম লাবণি দে, থাকি গোয়াবাগানে। ফোন নম্বরটা মনে রাখা সোজা। ট্রিপ্‌ল্ ফাইভ-ওয়ান টু ফোর থ্রি। কোনও খবর থাকলে আমাকে জানিও। একটু নজর রাখবে বাড়িটার দিকে।

—সে তো রাখবই—দোলার দিকে ফিরল ছেলেটি, আপনারটাও দিয়ে দিন।

—দোলা রায়, ফোন ফোর সিক্স ফোর নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান।

—আপনি তো তাহলে কাছেই থাকেন! ঠিকানাটা বলবেন?

দোলা ঠিকানা বলল।

সীজার বলল, ঠিক আছে। আমি এদিকে কোনও কিছু হলে জানাব।

—কোনও কিছু হলে মানে?

—কেন? আপনারা কাগজ পড়েন না? বধূ হত্যা টত্যা...

—তুমি বলছ কি?—দোলা শিউরে উঠে বলল, তার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

লাবণি বলল—এ কথা তোমার কী করে, কেন মনে হল সীজার?

—কী জানি! মনে হল! বউদির এত সুন্দর চেহারা ছিল, কী রোগা হয়ে গেছে, ওকে দিয়ে বাড়ির সমস্ত কাজ করায়। আমি জানি। খেতে দেয় না।

—কী করে জানলে? ও তোমাকে বলেছে?

—কিছুই বলেনি। একদিন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—বউদি, ডায়েটিং করছ না কি? বিউটি-কম্পিটিশনে নাম দেবে? তাইতে ও হেসে বলল—অনেকে ডায়েটিং করে, অনেককে কপাল করায় বুঝলি? তখন কথাটা সিরিয়াসলি নিইনি। এখন মনে হয়েছে। এই ক'দিনই মনে হচ্ছিল।

৩

অমৃতার কথাটা সর্বক্ষণ মাথায় ঘুরছে—'তোর ডাউরি নেই বলেই কি বিয়ের আগে দুটো রাত উপহার দিতে চাইছিস?' সৌমিত্র দাস যখন প্রস্তাবটা দিল, দিল এইভাবে—চলো শম্পা একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

শম্পা তো বেড়াতে পেলে আর কিছু চায় না। বলল—কোথায়?

—দ্যাখো ডায়মন্ডহারবার পুরনো হয়ে গেছে। আরেকটু দূর। ধরো দিঘা। পুরো রাস্তাটা গাড়িতেই যাব। এখনও খড়্গপুর টু দিঘা, বা এখানকার যে বাসগুলো স্ট্রেইট দিঘা যায়, সেগুলো তেমন ভাল হয়নি। খড়্গপুর টু দিঘাগুলো তো লজঝড়। আমার মারুতি জেন শাঁ শাঁ করে চলে যাবে। এ. সি.। তুমি বাইরের ধুলো, পলিউশন, গরম কিচ্ছু টের পাবে না। ঠিক দুদিন আগেই সৌমিত্র বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। শম্পা কিছু বলেনি, মনে মনে বলেছে—ইস্ সত্যি?

মুখে সে বলেছে—কেন?

—কেন মানে?

—বিয়ে করতে চাইছেন কেন?

—চাইছি কেন? আশ্চর্য! তুমি এতদিনেও বুঝতে পারোনি, আমি তোমায় বিয়ে করতে চাইছি! আজকে শুধু মুখ ফুটে বললাম এই পর্যন্ত।

শম্পার গলা ধরে গেছিল, সে বলেছিল—কী আছে আমার? কেনই বা আমাকে...

—তোমার এই কমপ্লেক্সগুলো আমার ভাল লাগে না শম্পা। সত্যি বলছি তোমার এই পার্টটাই সবচেয়ে ডিপ্রেসিং। তুমি একটা অ্যাট্রাকটিভ ইয়াং উওম্যান, পার্ফেক্টলি এডুকেটেড, ডুয়িং এ গুড জব, তোমার ভেতরে আজকালকার মেয়েদের তুলনায় কিছু বস্তু আছে। কেন তোমার এই সব কমপ্লেক্স আমি জানি না। তুমি কি বুঝতে পারো না আমাদের ললিত শা, অভিনাশ চোপরা—এরা তোমার সঙ্গে আলাপটা এগোতে খুবই ইচ্ছুক, খালি আমি তোমার প্রতি দুর্বল জানে বলেই এগোতে পারে না!

—ও তো পুরুষদের একটা মেয়ে দেখলেই র‍্যাগিং করার টেনডেনসি থাকে—

—নাঃ শম্পা, তোমাকে নিয়ে পারা যাবে না, আসলে তোমার বাবা অল্প বয়সে মারা গিয়েই, তোমার একটা পার্মানেন্ট সেন্স অফ ইনসিকিওরিটি এসে গেছে।

—বোঝেন যদি তো বলেন কেন?

সেদিন ওরা ব্লু-ফক্সে গিয়েছিল। ওয়লডর্ফ নয়।

মৃদু আলোর মধ্যে ওদের কথাবার্তা খুব জমেছিল।

যে লোকটা তাকে এত বোঝে, তার এত গুণের কথা খেয়াল করেছে, তার একমাত্র দোষের কথাও সরবে বলে তাকে সাবধান করে দিচ্ছে, তার প্রস্তাবটা কুপ্রস্তাব বলে মানতে মন রাজি হয় না।

মা, তার মা, নানা বিপদে-আতঙ্কে দিশেহারা বেচারি মা তার জীবনের অর্ধেক ব্যাপারই বোঝে না। বাবার মৃত্যুতে বাবার জন্য চাকরি একটা পেয়েছে, কিন্তু তা তো আর বাবার চাকরি নয়! মা পেয়েছে মায়ের বিদ্যে-বুদ্ধিমতো একটা কেরানির চাকরি। নেহাৎ টাটাদের কনসার্ন, ভাল পয়সাকড়ি দেয় বলে তাদের চলে যায়। ডাফ স্ট্রিটের বাড়িটাও আছে। যৌথ পরিবারের বাড়ি। তার বাবাই ভাগ করে পাঁচিল-টাচিল তুলে গিয়েছিলেন—তাই। তা নয় তো, ও পারে তার জ্যাঠতুতো জ্যাঠামশাইয়ের পরিবার তাদের কী অবস্থা করত তা একমাত্র ভগবানই জানেন। এখনও যথেষ্ট নাক গলায়। সৌমিত্রকে সে একদিনও বাড়িতে আনেনি। মায়ের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে বাইরে,

সুতানুটি উৎসবে গান-টান শুনতে গিয়ে। মা তো এক কথায় মুগ্ধ। অত সুন্দর পুরুষালি চেহারা, অত ভাল চাকরি করে? সেই ছেলেকে তিনি যে কোনও মূল্যে জামাই পেতে চান।

সৌমিত্রর প্রস্তাবটা শম্পা খুব হেলায়-ফেলায় রেখেছিল মায়ের কাছে। মা জানো, দিঘাতে একটা কাজ আছে আমাদের কম্প্যানির। সৌমিত্র বলছে আমাকেও ওর সঙ্গে যেতে।

—মানে তুই ওকে হেল্প করবি? না কি?

—তাই দাঁড়ায় ব্যাপারটা।

—আরে কে যাবে?

—আবার কে? আমি আর ও।

চমকে উঠল মা।

—তুই আর ও? অফিসে কথা হবে না এ নিয়ে?

—সমাজ অনেক এগিয়ে গেছে মা। দিনকাল বদলে গেছে টের পাও না?

—তা ছাড়া ও তো তোকে বিয়ে করবে কথা-ই দিয়েছে। তবু-তবু শম্পি ওখানে গিয়ে কিন্তু কাছাকাছি ঘরে থেকো না। আর সাবধানে থেকো। বিয়ের আগেই যদিও স্বামীর মতো ব্যবহার করতে চায়, তুমি কিন্তু রাজি হয়ো না।

—আচ্ছা মা, আমার বুদ্ধি-বৃত্তি, আমার আত্মসংযমের ওপর এতটা আস্থা তোমার এল কী করে?

—শম্পা মনে মনে ভাবে। এ কি আস্থা? না দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া, কিংবা দায়িত্ব একেবারে ছেড়ে দেওয়া! তাই, তাই-ই সে অমৃতার কাছে গিয়েছিল। অমৃতা এককথায় না করে দিল, বিষ উগরে দিল। সে বিষ কি তাকে, বিশ্বাসকেও আক্রমণ করেনি?

—কী? আমরা যাচ্ছি তো এই উইক-এন্ড-এ। —আবারও ব্লু ফক্স।

—এ সপ্তাহে যদি না যাই, তো কী হয়? শম্পা সৌমিত্রর চোখ এড়ায়।

—কী হয় মানে? আর আমার সময় হবে না কি? তুমি কি জানো না উইক-এন্ড-এও দস্তিদার আমার ওপর কী কাজ চাপিয়ে রাখে? আর তারপর তো আমাদের বিয়ের দিন এসেই যাবে। এই বৈশাখেই।

—আপনি তো আপনার বাড়ির কারও সঙ্গে পরিচয় করালেন না? আপনি স্থির করলেই স্থির হয়ে যাবে?

—ওহ, ইয়েস, হু এলস ইজ দেয়ার এনিওয়ে? দিদি জামাইবাবু থাকেন বম্বেতে, একটা বোন আছে সে জার্মানিতে, জার্মান বিয়ে করেছে। এগুলো তো তোমায় আমি বলেছি, বলিনি?

—না, দিদির কথা বলেছেন। আবছাভাবে বম্বের কথাও। তবে ছোট বোনের কথা, তার জার্মান সাহেবকে বিয়ে করার কথা বলেননি। তা আপনাদের পরিবারে সাহেব-জামাই থাকার জন্যই কি আপনারা এত পারমিসিভ?

প্রথমটা হাঁ হয়ে গেল সৌমিত্র। তারপর বলল—বাহ্ বাহ্ এই তো মাটির পুতুলের মুখে খই ফুটছে। গড নোজ কোনও ভেন্ট্রিলোকিস্ট মিষ্টি পুতুলটাকে নিজের কথা বলবার জন্য ব্যবহার করছে কি না!

—ঠিক আছে। তাই—শম্পার চোখ এবার জল চকচক—ভেন্ট্রিলোকিস্ট-ই ব্যবহার করছে, তাই বলে আপনিও ব্যবহার করবেন?

—কী বলছ শম্পা? কী বলছ তুমি জানো।

—হতে পারি আমি মাটির পুতুল. তো সেই মাটির পুতুলটাকে ভেঙে দেবেন না সৌমিত্রদা।

চোখ থেকে জল এবার উপচোচ্ছে। শম্পা উঠে দাঁড়াল। সামনে টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে স্মোক্ড হিলসা, বাটার নান। চিকেন দো পিঁয়াজা।

—আরে আরে শম্পা, চললে কোথায়? ডোন্ট ক্রিয়েট আ সিন প্লিজ।

—পরে যাতে এর চেয়েও বেশি সিন ক্রিয়েট করতে না হয় তাই, আমি কোয়ায়েটলি চলে যাচ্ছি। আপনি বসুন।

—এই এত খাবার আমি একা খাব?

—খেতেই তো পারেন। ছেলেরা তো একটু বেশিই খায়। কয়েক পেগ হুইস্কি নিয়ে নিলেই পেরে যাবেন। আর নেহাৎ না পারেন আর কাউকে ডেকে নিন না, কোনও কাচের কি পোর্সিলেনের পুতুলকে, কোনও বার্বি ডলকে যে আপনার সঙ্গে দিঘা যেতে রাজি হবে!

ক্রুদ্ধ হতভম্ব সৌমিত্রকে একা বসিয়ে রেখে বেরিয়ে এল শম্পা। ভেতরে এক বুক কান্না। তাদের মায়ের মেয়ের ভীষণ বিয়ের শখ। বিয়ে হলে একটা পুরুষ হবে তাদের সংসারে। সে মাকে এনে রাখবে নিজের কাছে তার বর যদি মায়ের বাড়ি থাকতে না-ও চায়। কিংবা মায়ের কাছাকাছি থাকবে। একটা সমর্থ পুরুষের যে কী ভীষণ দরকার জীবনে, তা তার বাইশ বছরের জীবনে হাড়ে হাড়ে বোঝে শম্পা। সে জানে না, সে ঠিক করল কি না। সৌমিত্রর হয়তো কোনও অসৎ উদ্দেশ্যই ছিল না। সে হয়তো এখনই তাকে বউ ভাবতে শুরু করেছে। কিংবা হয়তো সে তার সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করত। ওরা সত্যিই একটু হাই-সোসাইটির মানুষ। তারা যেমন বিয়ের আগে অদূরে ভাই কি মেসোমশাইকে বসিয়ে রেখে, মুখোমুখি বোঝাপড়া করে, ওদের সমাজে হয়তো সেটাই হয় এই রকম উইক-এন্ড ট্যুরে গিয়ে। আজকে সে তার আপাদমস্তক মধ্যবিত্ততাই প্রমাণ করে দিল সৌমিত্র দাসের কাছে।

পার্ক স্ট্রিট রাস্তাটা পার হওয়া খুব শক্ত। বিশেষত শম্পার চোখ ঝাপসা, মন বোধবুদ্ধি সবই কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আছে। রাস্তার আলোকস্তম্ভ, যেখানে হলুদ, সবুজ, লাল সংকেত জ্বলে নেভে সে সেটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলেও বুঝতে পারছে না যেন পুরোপুরি।

'ব্লাডি বাস্টার্ড, ডার্টি হোর'—সে জেব্রা দিয়ে পার হচ্ছিল না, মোটামুটি ফাঁকা রাস্তা দেখে পার হতে যাচ্ছিল। প্রায় চলে যাচ্ছিল একটা ফিয়েট য়ুনোর চাকার তলায়। গাড়ির বনেটের ঠাণ্ডা কঠিন স্পর্শ ঠিক মৃত্যুর স্পর্শের মতো তার কোমর ও ব্লাউজের মাঝখানের খোলা অংশে লেগে রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর স্পর্শের কিছু শব্দ তার শরীর হিম করে দিল। গাড়িটা তাকে পাশ কাটিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে একেবারে শাঁৎ করে চলে গেল। মুখে পাইপ এক মধ্যবয়সী মনে হল। না কি মধ্যবয়সী নয়? খুব বয়স্ক না কি? বিপরীত দিকের পেভমেন্টে সে এলই বা কেন? তাকে তো যেতে হবে উত্তরে, পার্ক স্ট্রিটটুকু সিঙ্গারের শোরুম আর এশিয়াটিক সোসাইটির পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চৌরঙ্গি রোডে পড়া। তারপর ট্রাম গুমটির দিকে যাওয়া, এই তো তার পথ। কেন সে রাস্তা পার হতে গেল। 'ব্লাডি বাস্টার্ড'টা না হয় পথ-চলতি মুখের কথা সাধারণ গালাগালি হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু 'ডার্টি হোর?' তাকে একটা নোংরা পণ্য মেয়ের মতো মনে হচ্ছে লোকের? আজকাল? সাধারণত সে সালোয়ার কামিজই পরে, আজ পরেছে মায়ের একটা লাল রঙের সিল্ক। ঘন গাঢ় রক্তের মতো রংটা, এটা পরে তাকে খুব ভাল দেখায়। সবাই বলে। সৌমিত্রও আজ বলেছিল। একটা মোটা বিনুনি এখনও তার মাথার পেছনে, সৌমিত্রর খুব ইচ্ছে সে স্টেপ কাটে। কিন্তু অতগুলো চুল! একেবার স্টেপ কাটলে আর কিচ্ছু করার থাকবে না। তাই সে প্রাণ ধরে কাটতে পারছে না চুলটা। মাথার পেছনে হাত দিল সে, হেয়ার পিন দিয়ে কতকগুলো লাল গোলাপ আটকানো। পার্ক স্ট্রিটের মোড়েই ফুলগুলো গছাল একটা অল্পবয়সী ছেলে। সৌমিত্র কিনল। নিজে অবশ্য পরিয়ে দেয়নি। হাত স্টিয়ারিং-এ। বলল—পরে নাও শম্পা প্লিজ। এই ফুলগুলোই কি ওই গালাগালের কারণ! তার ঠোঁটে কড়া লাল লিপস্টিক। গরম পড়ছে বলে সে অন্য কোনও প্রসাধন করে না। চোখে ম্যাসকারা লাগায়নি। খালি হালকা বাদামি একটা আই শ্যাডো ব্যবহার করেছে আর আইব্রো পেনসিল দিয়ে চোখের ওপর পাতায় পলক ঘেঁষে একটা সরু লাইন। বোঝাই যায় না কিন্তু চোখে একটা শ্রী আসে। এতেই তাকে 'ডার্টি হোর'-এর মতো দেখাল? সৌমিত্ররও তা হলে ওই জাতীয় কিছু

লাগে নিশ্চয়ই। একটা সস্তা মেয়ে যাকে উইক এন্ডে এ. সি. গাড়ি করে দিঘা নিয়ে গিয়ে কিছু ফুর্তি করা যাবে? ছি, ছি, বিয়ের আগ্রহে, একটা নোঙরের আগ্রহে সে এমন চোরাবালির ওপর এসে দাঁড়িয়েছে?

একটা ভাঙাচোরা পুতুল। হ্যাঁ, একটা মাটির পুতুল চোখের জলে যার অর্ধেকটা গলে গেছে, আর ক্রোধের আগুনে যার বাকিটা জ্বলে গেছে। এই হল শম্পা, বাড়ির রাস্তা পার হয়ে সে কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের দিকে চলে যেতে থাকল। আসলে তার বাড়ি সে পেরিয়ে গেছে সে খেয়ালই তার হয়নি। নিজের রাস্তা সে চিনতে পারছে না।

—এই শম্পাদি কোথায় যাচ্ছিস রে?—শম্পা সাড়া দিচ্ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়বার—'এই শম্পাদি' শুনে তাকে ফিরে তাকাতেই হয়।

বাবুল। প্রতিবেশী এই ছেলেটি একেবারে এক নম্বরের ভাল ছাত্র। এবার জয়েন্টে সেকেন্ড এসেছে। যাদবপুরে বোধহয় কম্পিউটার এঞ্জিনিয়ারিং কি ইলেকট্রনিক্স এরকম কিছু পড়ছে। বাবুলের ফর্সা নিষ্পাপ চশমা পরা মুখটার দিকে তাকিয়ে শম্পা যেন একটু একটু করে তার চেনা পৃথিবীতে ফিরে এল। ওই তো বাবুলদের বাড়ি, গায়ে গায়ে লাগা সুপ্রিয়াদের বাড়ি। সে তার বাড়ি পেছনে ফেলে এসেছে।

—কোথায় যাচ্ছিস?

—কোথাও না।

—তার মানে! আমি তো ভাবলুম তুই আমাদের বাড়িতেই আসছিস, দিদি এসেছে খবর পেয়েছিস।

—না, আমি মিন্টির কাছে যাচ্ছি না। কোথাও যাচ্ছি না। বাড়িও যাচ্ছি না।

বাবুল ওর পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল—তুই কি কেঁদেছিস না কি রে, গালময় জলের দাগ। তোর পাউডার ধেবড়ে গেছে।

—পাউডার আমি মাখি না।

—মেয়েরা পাউডার মাখে না! এটা তুই আমাকে খাওয়াতে পারবি না।

—ঠিক আছে, আমায় বিরক্ত করিস না।

—আরে মাসিমা বকেছেন তো হয়েছে কী? এমন বকলেন যে তুই লাল শাড়ি পরে একেবারে সুইসাইড করতে চললি! কোন সাইটটা বাছলি। হেদো তো পেছনে ফেলে এসেছিস? দেশবন্ধুর পুকুরই এখন নিয়ারেস্ট। তা মাইল দুয়েক তো হবেই! হ্যাঁ রে পুকুরটা এখনও আছে তো!

শম্পা বলল—আমাকে বিরক্ত করিস না।

—ও বুঝেছি। ট্রাম লাইনে মাথা দিবি। জীবনানন্দকে চাপা দেবার পর থেকে ট্রাম কোম্পানি খুব সাবধান হয়ে গেছে রে! একে তো লালবাতি জ্বলতে চলেছে তার ওপর যদি আরও কলঙ্ক বাড়ে...

শম্পা ফিরে দাঁড়াল। —ঠিক বলেছিস।

—কী ঠিক বললুম!

—ওই যে সুইসাইডের কথাটা!

—সত্যি তুমি সুইসাইড করতে যাচ্ছিলে?

—যাচ্ছিলাম না, কিন্তু তুই সাজেস্ট করতে এখন মনে হচ্ছে দ্যাট ইজ আ বেস্ট ওয়ে।

—একটা সাজেশন যখন নিলে শম্পাদি, তখন আরেকটাও নাও।

—মানে?

—আমি বলছিলুম তুমি সুপ্রিয়াদির সঙ্গে ঘণ্টাদুয়েক আড্ডা মেরে এসো। চমৎকার একটা সুইসাইডের অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে।

শম্পার মুখে একটা ফিকে হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের সুপ্রিয়া চাটুজ্জে একটি বিখ্যাত বিশ্বনিন্দুক এবং ঝগড়ুটে। ওর মতে একজন যদি হয় ডাফ লেনের ছাগল তো অন্য আরেকজন বেথুন রো-এর আরশুলো। বাবুলকে দেখলেই বলে—কী রে, যাদবপুর তো হয়ে গেল? এখনও মাস্টারগুলোকে তেল মারছিস? অবশ্য বাবুলকেই একমাত্র কথাটা সামনে বলে, অন্যদের ক্ষেত্রে বলে পেছনে। কে পাকা কুমড়ো কিন্তু কচি শশাটি হবার সাধ হয়েছে, কে আবার কার্বাইড দিয়ে পাকানো আম, কে বা কাকিনী, এই রকম। সুপ্রিয়াদির গুণমুগ্ধ একটা ছোট দল যে পাড়ায় নেই, তা নয়। কিন্তু বেশিরভাগই ওর এই স্বভাবে বিরক্ত। বাবুল যেমন শম্পাও তেমন ওকে এড়িয়ে যায়। সামনে পড়ে গেলে হয়তো বলবে—কী রে, মায়ার ছোটপিসির মতো ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস না কি? দেখতে পাই না কেন আজকাল? এর পরই মায়ার ছোটপিসির গল্পটা সবিস্তারে বলবার জন্যে ছটফট করবে সুপ্রিয়াদি। তখন তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়াই এক দুষ্কর ব্যাপার। প্রতিভার তোড় এসেছে তো!

বাবুলই বলে—কবিরা যেমন প্রেরণার তোড়ের মাথায় যা আসছে তা লিখে ফেলতে না পারলে খেপে যায়, সুপ্রিয়াদিও তেমন নিন্দের তোড় এলে আর সামলাতে পারে না। কাপড়-চোপড়ে হয়ে যায়, বুঝলি?

শম্পা এখন বলল—ভাল বলেছিস। সেই অর্জুনের আত্মঘাতী হবার জেদ চাপল আর কৃষ্ণ অমনি তাকে বুঝিয়ে দিলেন, বেশ খানিকটা আত্মপ্রশংসা করে নাও, তা হলেই আত্মহত্যার কাজ হয়ে যাবে!

বাবুল বলল—এটাও আমার অরিজিন্যাল রাখতে দিলি না? তোরা মহাভারত-টারত এত পড়ে রাখিস কেন রে? নাঃ এবার ল্যাটিন অ্যামেরিকান পড়তে হবে। নইলে আর তোদের কাছে পাত্তা পাচ্ছি না।

বাবুল পাশে পাশে হাঁটছে। যথেষ্ট ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, আবার সবার সঙ্গে মেলামেশাও করে খুব। চমৎকার হালকা কথাবার্তা বলতে পারে। হঠাৎ শম্পার মনে হল—এই যে নিষ্পাপ, হাসিখুশি বাবুল এ-ও তো ভাল পড়াশোনা করছে, সেই সুবাদে ভাল চাকরি-বাকরিও পাবে, তখন ওরও কিছু সাবর্ডিনেট মেয়ে থাকবে, আর একটা এ.সি. গাড়ি, আর ওয়ালেটে অনেক পয়সা, আর একটা মাত্র উইক-এন্ড ছাড়া ছুটিও থাকবে না। সারাক্ষণ কাজে যোতা। তা, ও-ও কি একটি পছন্দের সাবর্ডিনেট মেয়েকে ওর সঙ্গে উইক-এন্ড-এ দিঘা যেতে বলবে? তো সেই মেয়েটি হয়তো শম্পার মতো ডাফ স্ট্রিটের পুরনো বাড়ির বাপ-মরা লড়াই-করা মায়ের লড়াই-করা বিস্তর কমপ্লেক্সঅলা মেয়ে নয়, সে হয়তো 'দেবাঞ্জলি' কি 'আকাশ প্রদীপ' জাতীয় ফ্ল্যাটে থাকে, অনেক আধুনিক, অনেক মডার্ন। দিঘার হোটেলের ডাব্‌ল বেড এ.সি. রুমে বাবুল কন্ডোম বার করলে হয়তো সে মেয়েটি অবাক তো হবেই না, নিশ্চিন্ত হবে, কারণ তার ব্যাগেরটা আর বার করতে হল না। তারপর হয়তো চমৎকার বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে দুজনে দুদিকে চলে যাবে, বাবুলের অন্য কোনও উইক-এন্ড অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে যুগলে বেড়াতে যাবার পথে হিংস্র ফণা তুলে, কিংবা দুচোখ ভর্তি গরম জল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

আড়চোখে সে বাবুলের দিকে চাইল। চশমাটা ঠেলে নাকের ওপর ওঠাচ্ছে বাবুল। একটা মোটা-কালো ফ্রেমের চশমা পরেছে। তাতেও তার মুখের ছেলেমানুষি যায়নি। কিন্তু ভী-ষণ সেয়ানা ছেলে। শুধু পড়াশোনাতেই নয়।

—বাবুল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—কর না। আবার অনুমতির কী আছে? ওই সুইসাইড সম্পর্কিত নয়তো, যদি আমাকে কয়েক ফাইল সিডেটিভ জোগাড় করে দিতে বলিস, সেটা পারব না কিন্তু।

—বাজে বকিস না। তোরা, মানে তুই মেয়েদের সম্পর্কে কী ভাবিস? বলবি? আমি তোর দিদির মতো!

—তোরা, মানে তুই'টাতে আমার খুব আপত্তি আছে শম্পাদি। আমি হলাম একটা আলাদা ব্যক্তি,

আমি আমার মতো ভাবি, ওরা মানে আমার পেছনে যদি পুরো আমাদের জেনারেশনের ছেলেগুলোকে দাঁড় করিয়ে দিস তা হলে আমাকে ভেবে ঠিক করতে হবে, মানে একটু বিশ্লেষণ করে নিতে হবে এই আর কি। আমার দ্বিতীয় আপত্তি হল 'দিদির মতো' কথাটায়। মতো টতো কেন? তুই তো আমার একরকম দিদিই হলি, মিন্টির মতো নিজের দিদি নয়, কিন্তু পাড়াতুতো দিদি তো!

—আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোর পাড়াতুতো দিদি। কিন্তু তুই মেয়েদের সম্পর্কে তোর নিজস্ব ধারণার কথাও বল, আবার একটু জেনার‍্যালাইজও কর, প্লিজ।

বাবুল বলল—এইরকম হাঁটতে হাঁটতে? যদি গাড়ি চাপা পড়ি? কিংবা সুপ্রিয়াদি এসে পড়ে? জানলায় চোখ রেখে দেখছে হয়তো এখন।

—তা হলে কীভাবে বলতে চাস?

—একটু 'গজব'-এ খাওয়া না রে শম্পাদি। হেভি চাকরি করিস তো!

—তুইও তো হেভি স্কলারশিপ পাস?

—আমি? স্কলারশিপ? জানিস না ফ্যামিলির উপার্জন পাঁচ-টাচের বেশি হলে স্কলারশিপটা দেয় না। ওই কুমিরছানার মতো দেখিয়ে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে একটা সার্টিফিকেট দেয়।

—তাই বুঝি? জানতুম না তো!

—কত কিছুই জানিস না এ পৃথিবীতে। বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানিস বল, অথচ চাকরিতে ঢুকে অব্দি কেমন একটা সবজান্তা, সবজান্তা ভাব করিস। তবে ন্যাশন্যাল ট্যালেন্টেও আমি একটা স্কলারশিপ পাই। তোকে বাজে কথা বলব কেন? তা, সেটা তো বই-টই কিনতেই চলে যায়।

—কী খাবি?

—রেশমি কাবাব চিকেনের। আর আইসক্রিম। তোর রেস্তয় কুলোবে তো? দুজনেই খাব কিন্তু।

সত্যি খিদে পেয়েছে। দা-রুণ! শম্পা নিজের ব্যাগের ভেতরটায় উঁকি দিয়ে বলল—হ্যাঁ হয়ে যাবে। দাঁড়া মায়ের জন্যও একটা প্যাকেট করে দিতে বলি।

অর্ডার দেওয়া হয়ে গেলে, বাবুল বলল—এবার বল তোর হবু বর সৌচিত্র না সৌমিত্র, পদবি জানি না, তোকে এমন কী বলেছে যে তুই কেঁদে মুখের মেকাপ ধুয়ে ফেললি?

এত অবাক শম্পা জীবনে কখনও হয়নি।

সে বলল—সৌমিত্রর কথা তুই কী করে জানলি?

—সবাই জানে পাড়ায়। পাড়ায় জামাই আসছে, সব হাত ধুয়ে বসে আছে, কখন পাতে পোলাও পড়বে।

—সর্বনাশ! আলাপ, একটু বেশি আলাপ হলেই বিয়ে? এই তোর তোদের মেয়ে সম্পর্কে ধারণা?

—তোরা তো ঝুলে পড়তে পারলেই বেঁচে যাস। যে প্রথম অ্যাপ্লিক্যান্ট তারই সঙ্গে।

—সেটা উচিত নয় বলছিস?

—অবশ্যই নয়, প্রেমে হাবুডুবু খাস তো আলাদা কথা, তখন আর তোদের হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান থাকে না। কিন্তু আদারওয়াইজ একটু বাজিয়ে নেওয়া তো দরকারই।

—তুই, তুই কী ভাবে বাজিয়ে নিবি?

—আমি? আমার কথা উঠছে কেন?—বাবুল চোখ গোল গোল করে বলল।

—কেন, তুইও তো একদিন বিয়ে করবি?

—আমার কথা তো হচ্ছিল না, হচ্ছিল মেয়েদের কথা।

—বেশ। মেয়েদের কথাই বল। কী ভাবিস তোরা মেয়েদের?

—ছিঁচকাদুনে, রাগী, হিংসুটে, তিলকে তাল করা, তালকে তিল করা, কুচুটে...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে আর বলতে হবে না—শম্পা বলল। তার মুখে রাগ নেই। কিন্তু আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট পড়া যায়।

—আরে শোনই না, তারপরে মেয়েরা সেলফলেস, স্যাক্রিফাইসিং, অ্যাডজাস্টিং, অসম্ভব টলারেন্স, একটু রক্ষণশীল। খুব নির্ভরযোগ্য।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝেছি...প্রথমে গায়ে জ্বালা ধরিয়ে তারপরে তেল মারছিস। তুই যা বললি মানুষ সব মানুষই মোটামুটি এইরকম ভালমন্দের মিশ্রণ...

—এগজ্যাক্টলি। মেয়েরা আলাদা কিছু নয়। ঠিক ছেলেদেরই মতো। ধরন-ধারণগুলো একটু আলাদা, বুঝলি? নইলে এ-ও যেমন সময়ে কুচুটে, ও-ও তেমন সময়ে ক্লিকবাজ। আর এক্সপ্লয়েট করতে পেলে দুজনেই ছাড়বে না। যেমন দ্যাবা, তেমন দেবী। সুপ্রিয়াদি সুবিমলদাকে ভালমানুষ পেয়ে এক্সপ্লয়েট করছে, আবার আমার সমীরকাকু কাকিমাকে দুর্বল পেয়ে এক্সপ্লয়েট করছে। তবে ছেলেরা ছিঁচকাঁদুনে নয়।

—ছিঁচরাগুনে তা হলে...

—যা বলিস। আর একটা মস্ত ডিফারেন্স হল তোরা যেমন কাউকে পাকড়াও করতে পারলেই ঝুলে পড়তে চাস, ছেলেরা তেমন পাকড়িত হলেও পকৌড়ি হয়ে যেতে চায়।

—মানে?

—মানে ফুটে যেতে চায় আর কি! খাও, দাও, বেড়াও, এক্ষুনি আবার বিয়ে কী? অমনি তো বউয়ের দাঁত কনকন, পেট কনকন শুরু হবে। কে অত ঝামেলা পোয়ায়? বুঝলি না? তোদের চলনটা সেন্ট্রিপিট্যাল, আমাদের সেন্ট্রিফুগ্যাল। কেন্দ্রা—ভিগ, আর কেন্দ্রা—তিগ বুঝলি তো?

৪

আকাশ। আকাশ কি এমন শাদা হয়? হয়। নীল আকাশ সাদাটে হয়ে আছে, কিংবা সাদা মেঘে-মেঘে সাদা হয়ে গেছে এমনটা দেখা যায়। কিন্তু এমন ধোবার বাড়ির পাটভাঙা থান কাপড়ের মতো শাদা? চারদিকে একটা এমনই শাদা আকাশ। শাদা আকাশের কোলে শুয়ে একটা শাদা প্রেতের মতো মানুষ। চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে আরও কিছু শাদা প্রেত। শাদা শাদা বাসনকোসনে শাদা শাদা জিনিস রান্না করছে প্রেতেরা। নাঃ সে প্রেতেদের রান্নাঘর আর দেখতে পারে না। একটা শাদা ভেলায় সে হাত রাখে, অমনি তার পুরো শরীরটাই ভেলাটার ওপর আড় হয়ে পড়ে। কেউ তাকে ভেলায় তুলে নিতে চাইছে, কিন্তু তার সাধ্যে কুলোচ্ছে না। একটা গলে-যাওয়া ভ্যানিলা আইসক্রিমের কাঠির মতো সে ক্রমাগত সেই শাদা আকাশে না কি শাদা সমুদ্রে পিছলে পিছলে যেতে থাকে। ক্ষীণ কতকগুলো কণ্ঠ অনেক দূর থেকে ভেসে আসে।

হঠাৎ টলমল করতে থাকে শাদা সিলিংঅলা একটা ঘর। সবুজ পর্দা। শাদা শাড়ি টান টান করে পরা—ক্যাপ মাথায় কড়কড়ে একজন নার্স। তার হাতটা ধরে-থাকা, এপ্রন-পরা এক দোহারা চেহারার ভদ্রলোক। চশমা-পরা, সোনালি ফ্রেমের।

—সিস্টার, আপনি একটু যান তো। আমি পেশেন্টের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

সামনে থেকে শাদা ছায়া সরে যায়।

—আপনার নাম কী? মনে করতে পারছেন?

—অম্...রি...তা গোস্।

—থাক ঠিক আছে।

—আপনার স্বামীর নাম কী?

কোনও উত্তর এল না।

—আপনার স্বামীর নাম কী?

এবারও কোনও উত্তর নেই।

—আপনি কীভাবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন ঠিকঠাক বলুন তো।

—যাইনি।

—অজ্ঞান হয়ে যাননি? তা হলে...

—করে।

—করা হয়েছিল?

পেশেন্ট সামান্য একটু মুখ হাঁ করে, ডাক্তার ফিডিং-কাপ থেকে জল ঢেলে দেন মুখে।

—কত দিন পিরিয়ড বন্ধ হয়েছে আপনার?

—চা চা...

—চার মাস? কাউকে বলেননি?

—শুনুন, আমি বলছি আপনি শুনে যান। চোখদুটো খুলুন। হ্যাঁ সুদ্ধু শুনে যান—আপনার চার মাসের প্রেগন্যান্সি। আপনাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে এই নার্সিং হোমে আনা হয়েছে। ওঁরা মানে আপনার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি ক্লেইম করছেন, আপনি থেকে থেকেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। এই প্রেগন্যান্সি সুতরাং টার্মিনেট করে দিতে হবে। আপনারও কি তাই মত!

—জা-নি না।

—সত্যি, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন?

—না।

—শুনুন, এখন ব্যাপারটা রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। আর শুধু শুধু প্রথম সন্তান নষ্টই বা করবেন কেন? উনি আপনার লিগ্যাল স্বামী তো?

—বি...য়ে...হয়।

—বেশ, তা হলে বাচ্চা নষ্ট করার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না। আলট্রা সনো করে দেখে নিয়েছি, বাচ্চা পার্ফেক্ট। এখন শুধু শুধু সম্পূর্ণ বিনা কারণে ভ্রূণ হত্যায় মানুষ হিসেবে ডাক্তার হিসেবে আমার এথিক্‌স-এ বাধছে। আপনারও কি নষ্ট করাই মত!

—ওর বা চ্ চা।

—শুধু ও কেন? কী আশ্চর্য! আপনারও তো। আপনারও তো ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে। অধিকার আছে।

—ওর বা চ্ চা—না।

—অন্য কারও বাচ্চা?

—না, চাই না।

—ও, ওই স্বামীর বাচ্চা আপনি চান না?

পেশেন্ট আবার একটু মুখ হাঁ করে, ডাক্তার জল দেন।

—শুনুন, বুঝতে পাচ্ছি, স্বামীর ওপর আপনার আস্থা নেই। কিন্তু ওই ভ্রূণটির অর্ধেকটা আপনার। মোটেই ও পুরোপুরি আপনার স্বামীর নয়। আপনি ঘুমোন। আজকের দিনটা ঘুমোন। একটু পরেই আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আপনাকে দেখতে আসবে। তখন চোখ বুজিয়ে, অজ্ঞান থাকবার ভান করবেন। আপনি আরেকটু সুস্থ হলেই আপনার সঙ্গে আবার কথা বলব।

নার্সটি ঘরে এলেন। ডাক্তার তার সঙ্গে নিম্ন স্বরে কিছুক্ষণ কথা বললেন, তারপর চলে গেলেন। নার্স স্যালাইন লাগাবার আয়োজন করতে হাতটা টেনে নিতে চাইল সে। লাগল। সিস্টার এসে তাড়াতাড়ি হাত ধরলেন—স্যালাইন চলবে। হাত ঝাঁকাবেন না। শরীরের যা অবস্থা করেছেন! চুপ করে থাকুন।

কতক্ষণ পরে, তার খেয়াল নেই, সে কিছু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

অরিসূদনের গলা—কেমন আছে এখন?

সিস্টার—ভাল না। স্যালাইন চলছে, দেখছেন না?

অরিসূদন—জ্ঞান ফেরেনি?

—একবার ফিরেছিল, আবার...তবে এটা ঠিক অজ্ঞান অবস্থা নয়, শরীরটা খুব দুর্বল তো, তাই আবার একটা আচ্ছন্ন অবস্থা এসেছে। আপনারা যথেষ্ট যত্ন নেননি, যাই বলুন। ফার্স্ট প্রেগন্যান্সি।

—স্ত্রীকে কীভাবে যত্ন করতে হবে সে বিষয়ে আপনার মতামত আমি শুনতে চাই না।

—প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, আমি ট্রেইন্ড নার্স, আমার মতামত জানাবার অধিকার আছে।

ডাক্তারের গলা। বাইরে থেকে ভেতরে এলেন বোধহয়। —হ্যাঁ সব ঠিকই আছে মিঃ গোস্বামী। কিন্তু জেনারেল হেল্‌থের অবস্থা ভাল না। একটু সুস্থ হয়ে উঠুন তার পরে।

অরি—শুনন, পেশেন্ট আমরা বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

—সে কী? ডাক্তার হিসেবে আমি সেটা অ্যালাও করতে পারি না।

—আমরা বন্ড সই করে নিয়ে যাব।

—পেশেন্টের পার্টি যদি পাগল হয়, আমরা তো আর পাগলামো করতে পারি না। আই'ল আস্ক ইউ টু গো আউট নাউ, মিঃ গোস্বামী। দ্য পেশেন্ট ইজ ভেরি মাচ ইন ডেঞ্জার, শী মাস্ট বি লেফ্‌ট ইন পিস।

৫

সকাল সাতটা। কোল্যাপসিবল্‌-এ গোঁজা খবরের কাগজ টেনে নিল তিলক। ওর বাবা বললেন—আমাকে আগে দে। বাবা চা-এ চুমুক দিচ্ছিলেন। তিলক বলল—কাল পাকিস্তান-সাউথ আফ্রিকার ম্যাচটা কী হল দেখেই দিচ্ছি। লোডশেডিং-এ তো দেখতে দিলে না।

বাবা বললেন—তোর কি এখনও আশা পাকিস্তান ১৩৫-এর কম করবে; আর ইন্ডিয়ার মরা চান্স আবার জিইয়ে উঠবে? আমি বলে দিচ্ছি দেখে নে পাকিস্তান সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়েছে। তিলক বলল—শচীন-সৌরভ একা কী করবে বলো! বোলার নেই একটা। ম্যাচ-উইনিং বোলার দরকার।

বাবা বললেন—আমি তো অনেক দিন ধরেই বলছি—ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নয়, মেন অফ দ্য ম্যাচ করা উচিত। একটা ব্যাটসম্যান আর একটা বোলার। বোলাররা তো পায়ই না। এভাবেই মোটিভেশন নষ্ট হয়ে যায়। তার ওপর যেমনই খেলুক, টাকাটা বাঁধা। শচীনই তো একবার পারফর্ম্যান্স বেজড পেমেন্টের কথা বলেছিল। করুক না সেটা। দেখবে হই-হই করে ম্যাচ জিতে আসছে।

তিলক বলল—যেটা জানো না, সেটা নিয়ে কথা বোলো না বাবা। আ ম্যাচ ইজ আ ম্যাচ। খেলবার সময়ে অত মনে থাকে না কি টাকা পাচ্ছি কি পাচ্ছি না!

—বেশ মনে থাকে, ইনজামাম অতগুলো ছয় হাঁকড়াল কেন তা হলে তাক করে করে? সুপার সিক্স?

—ভেদডুশ মার্কা বোলিং হলে সিক্সার হাঁকড়াবে না তো কী! বলতে বলতে তিলক হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

বাংলা কাগজের প্রথম পাতার তলায় অমৃতার ছবি। হ্যাঁ, অমৃতা-ই তো! নামী নার্সিংহোম থেকে রোগিণী নিখোঁজ। অফিসঘর ভাঙচুর, ডাক্তার প্রহৃত। হেডলাইন থেকে বিশদে যায় সে—গতকাল সকাল সাড়ে দশটায় অমৃতা গোস্বামী নামে একটি বছর বাইশের রোগিণীকে 'উজ্জীবন' নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। মেয়েটি বারবার মূর্ছিত হয়ে পড়ছিল। রাত পর্যন্ত সে আচ্ছন্ন ছিল, তিন নং কেবিনের নার্স মায়াবতী সরকার জানিয়েছেন। সকালবেলায় দেখা যায় তার শয্যা শূন্য। মেয়েটি ঘোরের মধ্যে কোথাও চলে গেছে কি না—এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়, খোঁজও শুরু হয়, কিন্তু তিনতলা এই নার্সিংহোম তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি। অতঃপর ভিজিটিং আওয়ারে রোগিণীর স্বামী

ও শ্বশুর এ কথা জানতে পারলে, স্বামী অরিসূদন গোস্বামী ডাক্তারের চশমা কেড়ে নিয়ে তাঁকে মারধর করেন, বাইরে জনতা জমে। রোগিণী হারিয়ে গেছে এই অভিযোগে জনতা উত্তাল হয়ে ওঠে, ওই নার্সিংহোমের এনকোয়ারি কাউন্টার চেয়ার বসবার সোফা তছনছ করে দেয়। পুলিশ আসার ঘণ্টা দুই পরে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আসে। এখন প্রশ্ন, সরকারি হাসপাতাল থেকে না হয় কুকুরে গরিব মানুষের বাচ্চা মুখে করে নিয়ে যেতে পারে, গরিব মানুষ তো মানুষ বলেই গণ্য নয়। কিন্তু নামী নার্সিংহোমের মধ্যেও যদি এই জাতীয় কুকুরের নিঃশব্দ পদসঞ্চার আরম্ভ হয়ে যায়, এবং শিশুর জায়গায় সে কুকুর যদি যুবতী হরণ করতে থাকে তা হলে তো সত্যিকার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়!

—কী হল? তুলু?

—বাবা দেখো।

—কী পাকিস্তান জিতেছে।

—উঃ ও সব নয়, আমাদের বন্ধু, য়ুনিভার্সিটিতে একসঙ্গে পড়ি আমরা—অমৃতা গোস্বামী।

—কী হল? সিনেমায় নেমেছে?

—উঃ না, দেখো না খবরটা।

বাবার হাতে কাগজটা তুলে দিয়ে মুখোমুখি সোফাটায় ধপাস করে বসে পড়ে তিলক। হঠাৎ সব বন্ধু-বান্ধবের অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে থেকে ত্রিমাত্রিক ছবির মতো ভেসে ওঠে অমৃতার চেহারাটা। অমৃতা, একটু গম্ভীর, কিন্তু রসকষহীন মোটেই নয়, সেই অমৃতা যাকে কথায় কথায় ওরা খেপাত, জে.বি.-র ফেভারিট অমৃতা গোস্বামী। বিবাহিত মেয়ে বলে গোড়ায় গোড়ায় ওর দিকে বেশি ঘেঁষেনি তারা। কিন্তু দূরত্ব খুব শিগগিরই ঘুচে যায়। কত আড্ডা মেরেছে কফিহাউজে। ওর অবশ্য সব সময়ে একটা তাড়া থাকত, চারটের পর আর বসতে চাইত না। খুব দায়িত্বশীল মেয়ে। কী করল এই ডাক্তার? অযত্নে মেরে ফেলেছে, তারপর বডি কোথাও পাচার করে দিয়েছে? কেন? এতেও তো মার খেল। অযত্নে মরে গেলেও মার খেত। কী-ই বা এমন হল অমৃতার? হঠাৎ? এই গত সপ্তাহটায় বোধহয় ক'দিন আসেনি। তার আগে পর্যন্ত তো এসেছে, সমস্ত ক্লাস করেছে, নোট নিয়েছে, ক্যান্টিনে খেয়েছে। এক প্লেট মাংস নিয়ে পাঁউরুটি দিয়ে খাচ্ছিল। অনেকটা ঝোল নিয়েছিল। ওর পাশে ছিল দোলা, যাকে ওরা আদুরি কিংবা 'দোল দোল দোলুনি/রাঙা মাথায় চিরুনি' বলে খেপায়। দোলা বোধহয় একটা ফিশফ্রাই নিয়েছিল। তিলক বলল—'তোদের বেশ পয়সাকড়ি রয়েছে মনে হচ্ছে, এ অধমের দিকে একটু তাকা...

দোলা তাকে বলল—আজকে অমৃতা খেয়ে আসতে পারেনি, তা জানিস, ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে, ও বাসভাড়া ছাড়া পয়সা পর্যন্ত আনেনি। অমৃতার দিকে চেয়ে বলল—একটু চেক করে নিবি তো পার্সটা। আশ্চর্য! তারপর আবার তিলককে বলল, আমি ওকে খাওয়াচ্ছি। কিন্তু তিলক, তুই তো আর শ্বশুরবাড়িতে নেই যে শ্বশুরবাড়ির ডিউটি সেরে খেয়ে আসবার সময় পাসনি। আর তোদের তো শ্বশুরবাড়ি হলে তোরা রাজা লোক, তোদেরই সবাই খাওয়াবে আমরা হাঁ করে দেখব...

অমৃতা মন দিয়ে হাড় থেকে মাংস ছাড়াচ্ছিল দাঁত দিয়ে, 'শ্বশুরবাড়ির ডিউটি' বলতে সে শুধু একবার দোলাকে বকেছিল—'আঃ দোলা!' আর একটিও কথা না।

দোলার সাতকাহন শুনে তিলক বলেছিল—খাওয়াবি তো একটা ফিশফ্রাই কি একটা এগরোল। অত বক্তিমে কীসের রে? যাঃ তোকে খাওয়াতে হবে না। তিলক মজুমদারের পকেটেও পয়সা থাকে।

সেই অমৃতা, শেষ! শেষই তো! শেষ ছাড়া কী? কী আর হতে পারে!

ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ধরল তিলক—আমি নিশান বলছি। আজ সকালের কাগজটা...।

—হ্যাঁ এইমাত্র দেখলাম। দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি।

—হাইলি সাসপিশাস। বুঝলি? সামথিং ইজ ভেরি মাচ রং সামহোয়্যার।

—সে তো বটেই।

—সেই বন্দনা মুখুজ্জের কেসটা দেখলি না, আজও সলভ্‌ড হল না। একটা র‍্যাকেট আছে নিশ্চয়ই এর পেছনে।

নিশান ফোন রাখতেই দোলার নম্বরটা টিপল তিলক। দোলারই সবচেয়ে বন্ধু ছিল অমৃতা। দোলা হয়তো কিছু বলতে পারবে।

—দোলা আছে? আমি তিলক বলছি।

—এ মা! আমার গলাটা তুই চিনতে পারলি না? আসলে কাল থেকে ঠাণ্ডা লেগে...

—বাজে কথা রাখ। আজকের কাগজ দেখেছিস? বাংলা কাগজ আনন্দবাজার...

—আমাদের বাড়ি তো আনন্দবাজার শুধু শনি রবিবার নেওয়া হয় রে! কেন পরীক্ষাটা এগিয়ে এল, না কী?

—অমৃতার সম্পর্কে খবর বেরিয়েছে কাগজে।

—কী—ই—ই—ই? দোলার 'কী'টা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল, উপরন্তু তীক্ষ্ণ আঘাত করল তিলকের কানের পর্দায়।

—হ্যাঁ, 'উজ্জীবন' নার্সিংহোম থেকে নিখোঁজ। রাত্তিরবেলাও আচ্ছন্ন ছিল। ভোরবেলা দেখা যাচ্ছে নেই।

—বলিস কী রে? কালকে আমরা ওর বাড়ি গিয়েছিলাম। কেউ ছিল না।

—কে কে গিয়েছিলি?

—আমি আর লাবণি। পাড়ার একটা ছেলে, নামটা ভুলে যাচ্ছি, বলল ওকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় সাদা অ্যাম্বাসাডার-এ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওর বরের অফিসের গাড়ি।

—তা হলে তো সব মিলে যাচ্ছে। ডাক্তারটা একটা কেলো করেছে চিকিৎসা নিয়ে...তারপর...

—শোন তিলক, ওই ছেলেটা বলছিল, ওপরের ফ্ল্যাটের ওরাও বলছিল—ওরা লোক ভাল না। ছেলেটা আমাদের ওর বাপের বাড়িতে খবর দিতে বলেছিল।

—দিয়েছিলি?

—না। ওর মায়ের হার্টের অবস্থা জানিস তো? ভেবেছিলাম আজকে য়ুনিভার্সিটি যাব না। ওদের বাড়ি গিয়ে আবার খোঁজ নেব। খবরটা ওঁদের দিইনি।

—ভাল করেছিস। এখন খোঁজ নিয়ে কী করবি? তার তো বডি গাপ্‌ হয়ে গেছে।

—কী আজেবাজে বলছিস। —দোলা ককিয়ে উঠল—না, কক্ষনো না। ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে।

ফোনটা নামিয়ে রেখে দোলা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। মা ছুটে এল, বাপি ছুটে এল। সব শুনল।

বাপি বলল—ও বাড়িতে তুমি আর যেও না দোলা। খুব ফিশি ব্যাপার মনে হচ্ছে।

মা বলল—যাবে না মানে? তুমি তো অমৃতাকে চেনো। অমৃতার অত বিপদ। দোলা ওর বন্ধু। অমনি যাবে না বলে দিলে? ওকে এসকেপিস্ট হতে শেখাচ্ছ? স্বার্থপর হতে শেখাচ্ছ?

বাপি বলল—তারপর দোলা যাক আর অমৃতার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ওর পেছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দিক। তা হলে তোমার পরার্থকাতরতার লেস্‌নগুলো ঠিক-ঠিক কাজে লাগবে তো?

দোলার হাউ হাউ কান্না তখন ফোঁপানিতে এসে দাঁড়িয়েছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বাপিকে জড়িয়ে ধরে বলল—আমার ভীষণ ভয় করছে বাপি। অমৃতাকে ওরা ভাল করে খেতে দিত না। সংসারের সমস্ত কাজ করাত। ওর পাড়ার একটা ছেলে ছুটতে ছুটতে আমাদের বলে গেল ওর মা-বাবাকে খবর দিন। বধূ-হত্যার কথা কি আপনারা শোনেননি? আমি মাসির হার্ট খারাপ বলে কিছু বলিনি। এখন কাগজে এই খবর দেখে ওঁর কী হবে? কিছু করো বাপি, কিছু করো, কিছু একটা...

মা সব শুনে বলল—ব্যাপারটা তো আরও গোলমেলে হয়ে গেল। নার্সিংহোম থেকে উধাও শুনে ওরাই তো এসে ডাক্তারকে ঠেঙিয়েছে। তো ডাক্তারের সঙ্গে কি কোনও যোগসাজস না কী? লোক-দেখানো মারধর?

বাপি বলল—এ সব কেসে ফট করে একটা জাজমেন্ট দেওয়া খুব শক্ত। পুলিশ ঠিক খুঁজে বার করবে সত্য কী। এও বলি—অমৃতার বাবা মা দেখেশুনে একমাত্র মেয়ের ওইরকম বিয়ে দিলেন?

মা বলল—বাইরে থেকে দেখতে শুনতে তো খারাপ না। দোলা তো দেখেছে ওর বরকে? কী করে রে?

—সি.ই.এস.সি.-র এগজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার। বেশ ভাল চেহারা। তবে আমার একটু রাফ লেগেছিল মা। ছবিতে বেশ। সামনে কেমন রাফ।

—তবে? মা বাবার এক ছেলে, ভাল চাকরি করে, চেহারা স্বাস্থ্য ভাল, নিজেদের ফ্ল্যাট রয়েছে। সাধারণ মানুষ আর কী চায়?

—বাইরে নয়, ভেতরে দেখতে হয়। আশেপাশে খোঁজ নিতে হয়।—সব্যসাচী বললেন।

—আশপাশের লোক কি চট করে খারাপ কিছু বলবে? প্রথমত আজকাল এক ফ্ল্যাটের লোক আরেক ফ্ল্যাটের কিছু জানে না, তারপর খারাপ-টারাপ লোকে চট করে বলতেও চায় না। বলবে ভাঙচি দিয়েছে।

—আমার মেয়ের বিয়ের সময়ে কিন্তু আমি সব দিকে খোঁজ নিয়ে তবে এগোব, শার্ট উল্টো করে তার সেলাই দেখার মতো, যাকে বলে ইনসাইড আউট।—সংকল্পে ঠোঁটে ঠোঁট বসে গেল সব্যসাচীর।

বাবা মায়ের কথা শুনে দোলার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ ঢিপ্ শুরু হয়ে গেল। আজ অবধি মাকে লুকিয়ে তো কিছু করেনি! এই প্রথম। এর সঙ্গে মিশেছে অমৃতার নিরুদ্দেশের খবর।

শম্পাও দেখেছিল খবরটা। সকালবেলা কাগজ খুলেই অমৃতার ছবি। সে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

—মা, মা, ও মা!

—কী রে! অমন করে ডাকছিস কেন? পিঠে মশা কামড়াল?

—মা, শিগগিরি।

মা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ছুটে এলে সে শুধু কাগজটা মার হাতে ধরিয়ে দিতে পারল।

নিবেদিতা, শম্পার মা দু-চার লাইন পড়েই কাগজটা হাত থেকে ফেলে দিলেন। মানে, হাত থেকে পড়ে গেল কাগজটা।

—এ কী খবর? এ কি সত্যি?

শম্পা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল। আলগা গলায় বলল, এই তো গত সপ্তাহেই য়ুনিভার্সিটি লনে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। ও আমাকে কত উপদেশ দিল।...শম্পার চোখ উপচোতে থাকল, ধরা গলায় সে বলল—আমি কত ঝগড়া করলুম।

—কী তবে হয়েছিল মেয়েটার? কিছু বলেছিল?

—উঁহু।

শম্পা আর কথা বলতে পারছিল না। সে তার ঈর্ষার সবটাই উজাড় করে দিয়ে এসেছিল। কী যে বিশ্রী একটা তুলনামতো করেছিল অমৃতার পতিগর্বে আঘাত দিতে!

—অদ্ভুত অদ্ভুত অসুখ হয় একেক সময়ে। অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যাওয়া...নার্ভের কিছু। কিন্তু গেল কোথায়?

শম্পা বোবা গলায় বলল—মা, 'উজ্জীবন' নার্সিংহোম কোনটা বুঝেছ?

—কোনটা?

—প্রথমে যেটার নাম ছিল ‘জীবন’। বাবা যেখানে...মা কতদিন আগেকার কথা। তবু আমার স্পষ্ট মনে আছে ওই নার্সিংহোমটার পেছনে একটা বড় পুকুর ছিল...

—হ্যাঁ, তাই তো! বাঁধানো ঘাট, চারদিকে গাছপালা, নীলরতন সরকারের কম্পাউন্ডে যেমন আছে...অত বড় নয়।

—মা যদি ও ঘোরের মধ্যে চলতে চলতে...

নিবেদিতা মেয়ের মুখের ওপর হাত চাপা দিলেন। অমৃতার ভাগ্যকে তিনিও চিরকাল ঈর্ষা করে এসেছেন। কার ভাগ্যকেই বা করেননি। শম্পাদের ক্লাসে যত জন পড়ত—নূপুর, শর্মিলা, চন্দ্রা, মনীষা...যতজন মেয়ের বাবা বেঁচেছিলেন, যত জন মেয়ে শম্পার থেকে ভাল রেজাল্ট করত। তাঁর মনে হত, সব্বাই বিশেষ সুবিধে পাচ্ছে, আর তাঁর মেয়ে পিতৃহীন বলে, কালো বলে সব্বাই ওর ওপর অবিচার করছে। অমৃতা সেই ছোট্ট থেকেই খুব কর্মঠ, স্বাধীন ধরনের মেয়ে ছিল। বলত—‘মাসি, আমরা তো আছি, আমরা সবাই শম্পাকে দেখব।’ কথা রাখত অমৃতা। নিজের খাতাপত্র, নোটস সব নির্দ্বিধায় ভাগ করে নিত শম্পার সঙ্গে। ওর বাবা টিচার ছিলেন সায়েন্সের। তাঁর কাছে কত পড়েছে শম্পা। অথচ আজ এই পিতৃহীন মেয়েটাই পাশ করে ভাল চাকরি করছে। তার ভাল বিয়ে হতে যাচ্ছে। অমৃতা কোথায় হারিয়ে গেল। তিনি মনে মনে বললেন—হে ভগবান, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, রক্ষা করো, রক্ষা করো, রক্ষা করো শম্পাকে, রক্ষা করো অমৃতাকে। আরও যত মেয়ে তাঁর মেয়ের মতো, যে যেখানে বিপদে পড়েছে সবাইকে রক্ষা করো।

কাজকর্ম শেষ করে অল্প একটু ভাত আলু ভাতে দিয়ে খেয়ে ওঁরা বেরিয়ে পড়লেন সল্টলেকের উদ্দেশে। যখন ওরা ব্রাহ্ম বালিকায় পড়ত, তখন অমৃতারা থাকত মানিকতলায়, তারপর গেল দক্ষিণে রমণী চ্যাটার্জি স্ট্রিট। মেয়ের বিয়ে দিয়ে তবে ওঁরা একটা আস্তানা নিজের মতো করতে পেরেছেন সল্টলেক পূর্বাচলে। সে বাড়িতে কখনও যাবার দরকার পড়েনি তাঁদের। সম্পর্কটা অমৃতার সঙ্গেই আছে। মাসি মেসোর সঙ্গে নেই।

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে মা-মেয়ে যখন পূর্বাচলের বাড়িতে পৌঁছলেন তখন একতলা ছোট বাড়িটার মাথায় গন গন করছে রোদ। ছোট্ট একটু বাগান, সেখানে সামান্য কিছু ফুলের গাছ। দু-চারটে জবা। কিছু জিনিয়া। ফুল নেই কোত্থাও, শুধু গাছগুলোই সার। সাবধানে বেল বাজালেন নিবেদিতা। খুব আস্তে। সামান্য একটু পরে দরজা খুলে দিলেন বিশ্বজিৎবাবু, অমৃতার বাবা।

বোঝাই যাচ্ছে স্কুল কামাই করেছেন। গালে না-কামানো দাড়ি। পায়জামাটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, বাসিটাই পরে আছেন।

—ও শম্পা, এসো। আসুন আপনি।

—সীমা কই?

—ও ঘরে।

সীমা শুয়েছিলেন। ওদের দেখে উঠে বসলেন। বিস্রস্ত জামাকাপড়। চোখ মুখ বসে গেছে।

—দিদি কিছু খবর পেলেন?

—না ভাই।

—কী হয়েছিল?

—কিচ্ছু জানি না। কোনও খবরই ওঁরা আমাদের দেননি। মেয়ের শরীর খারাপ হয়েছিল বলেও কিছু শুনিনি। তবে...

—তবে কী?

—ওর একটু অনিয়মিত হচ্ছিল। আমাকে জিজ্ঞেস করছিল।

—তা হলে তো কনসীভ করেছিল!

—তাও ঠিক জানি না, ভাই। অন্য কোনও লক্ষণ তো ছিল না। খালি বলত খুব খিদে পাচ্ছে, খুব খিদে পায় মা।

চোখদুটো জলে ভরে এল সীমার।

—আমরা সল্টলেকে এসে থেকে তো বেশি আসতেও পারত না। আমাদের যাওয়া তো আরও অসম্ভব। কেন যে রমণী চ্যাটার্জি থেকে চলে এলাম। মেয়েটাকে বোধহয় হাত-পা বেঁধে জলেই ফেলে দিয়েছি।

—কেন? এ কথা বলছেন কেন? ছোট্ট ফ্যামিলি! জামাই অত গুণের!

কোনও কথা বললেন না সীমা। মুখ নিচু করে শুধু নিজের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে আঙুলগুলো ভিজতে লাগল। নিবেদিতার মনে হল কী অপূর্ব সুন্দরী এই ভদ্রমহিলা। কিন্তু কোনওদিন সুখের মুখ দেখলেন না। স্বামী দিবারাত্র কোচিং করেন। উনি দিবারাত্র শুয়ে বসে থাকেন। সকাল সন্ধে নিয়ম করে একটু হাঁটেন, হার্টের ব্যারাম। কোনওদিন ভাল থাকেন, বেশির ভাগ দিনই ভাল থাকেন না। সে ভাবে দেখতে গেলে ওর মেয়েও শম্পার থেকে খুব একটা সুখের ছোটবেলা পায়নি। ক্লাস টু থ্রি-এর মেয়েকে যদি নিজের ইউনিফর্ম ইস্ত্রি করে পরে আসতে হয়। ফাইভ সিক্সের মেয়ে দুধ জ্বাল দেওয়া, একটু ভাতে ভাত রান্না করাও শিখে নিয়েছিল। তাঁর পিতৃহীন মেয়েকেও অতটা করতে হয়নি।

ওঁর স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিতে না পারো, অন্তত মেয়েকে ফিরিয়ে দাও। হে ঈশ্বর, ওঁর মেয়েকে ফিরিয়ে দাও।

শম্পা বলল—আমি তোমার কাছে কয়েক দিন এসে থাকব মাসি?

—কী করবি থেকে? তোর তো অফিসও আছে...

—ছুটি নেব।

—তোর মায়ের অসুবিধে হবে।

—না না আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

নিজের শোক-দুঃখ নিয়ে একলা একলা থাকতেই স্বস্তি। অন্য কেউ এসব সময়ে থাকলে বড় অসুবিধে হয়, মন খুলে কাঁদা যায় না, স্বামীর সঙ্গে এই ঝগড়া-কথা কাটাকাটি আবার দুজনের একত্র শোকবিহ্বলতা এ সবই কেমন আটকে যায়। যতই হোক পরের মেয়ে, অতিথি, তার দিকেও একটু না একটু নজর দিতেই হয়। অথচ সে সামর্থ্য নেই, না মানসিক, না শারীরিক। তিনি অসহায়ের মতো একবার নিবেদিতা আর একবার শম্পার দিকে তাকান।

—দরকার নেই রে! উনি আছেন। হয়ে যায় আমাদের, চলে যায়।

—ঠিক আছে। দরকার হলেই কিন্তু ডাকবে। কোনও সংকোচ করবে না। ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে যোগাযোগ করেছিল?

—হ্যাঁ। আজ সকালেই। জামাই বলল ডাক্তারটা কিছু গণ্ডগোল করেছে। নার্সদের অসতর্কতায় কখন ও উঠেছে, বাইরে চলে গেছে কেউ খেয়াল করেনি। একটা নামী নার্সিংহোম, এত অসাবধান! ওরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছে। এই বলল, আর কী বলবে?

—নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে কেস করা উচিত।

—তা হয়তো করবে।

শম্পা বিকেলের চা করল। খাওয়াল সবাইকে। তারপর ওরা চলে গেল। মা-মেয়ে। বিশ্বজিৎ আর সীমাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। একটা অনভ্যস্ত গোপনতা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে ওঁদের। আজ খুব ভোরবেলায় অমৃতার ফোন এসেছিল—মা, আমি বেঁচে আছি। ভাল আছি, কোথায় আছি এখন বলব না। তবে যথাসময়ে জানতে পারবে। ভাবনা কোরো না। কাউকে বোলো না।

আসলে তার মনের মধ্যে একটা কঠিন সংকল্প জন্ম নিচ্ছে। সেই সঙ্গে আত্মধিক্কার। কেন সে বুঝতে পারেনি। কেন? কেন? শাশুড়ি যখন সেই গোড়ার দিনেই বলে দিলেন, আমাদের নিয়ম—শোবার ঘর বউ ঝাঁট দেবে, রান্না আমরা লোকের হাতের খাই না। এত দিন আমি একা করতাম, এখন তুমি আমি করব।

ওর ভাল না লাগলেও খুব খারাপ লাগেনি। ঠিক আছে, বাড়িতেও তো ছোট্ট থেকে রান্না করছে, ইদানীং একটি লোক রাখা হয়েছে। তাই সে পার্ট ওয়ান-এ ভাল অনার্সটা পেল। গীতবীথি থেকে থার্ড ইয়ারের গানের পরীক্ষাটাও ভালভাবে পাশ করে গেল। ওর খাওয়া-দাওয়ার ওপর যখন খারাপ নজর দিতে লাগলেন শ্বশুর ও শাশুড়ি উভয়েই, সবচেয়ে ছোট্ট মাছটা তার পাতে, সবাইকার ডিম রয়েছে, তারটা কুলোল না, তখন সে বুঝতে পেরেছিল, ইনি শিক্ষিত স্কুল-টিচার হতে পারেন, কিন্তু ইনি সেই সাবেক অন্ধ শাশুড়ি-যুগে পড়ে আছেন। জোর করে চেয়ে নিতে বা এদিকে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তার রুচিতে বাধত। এই রকমই দিনের পর দিন কাটে। স্বামী তাকে যা সামান্য হাতখরচ দেয়, তাই দিয়ে বাইরে সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, শাশুড়ি তার ঘরে পর্দা দিতে দিলেন না। ছেলে বাড়ি আসবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে তিনি অধিকার করে নিতেন। দুজনের কথাবার্তা বেড়ানো এসব এই তিন বছরে এমন পর্যায়ে এখনও যায়নি যে সে বলতে পারবে তার স্বামী অরিসূদন লোকটা কেমন।

চিনতে পারল যখন তার গর্ভে সন্তান আসার কথাটা সে তাকে বলল। অরি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।—এরই মধ্যে বাচ্চা কী? তোমার পরীক্ষা আছে না? সংসারই বা চলবে কী করে?

—সংসার কী করে চলবে ভাবলে তো কোনওদিনই আমাদের বাচ্চা হওয়া চলে না। আর পরীক্ষা, ও আমি ঠিক চালিয়ে নেব।

বাড়িতে ঘোষণা হয়ে গেল কথাটা। তার পর শাশুড়ি শ্বশুর স্বামী সবাই মিলে তাকে ছি.ছি করতে লাগলেন, যেন সে একটা অবৈধ সন্তান ধারণ করেছে। এরপর আর যা বলল তাতে আব আক্কেল গুড়ুম।

অরি বলল—সে যা হবার হয়েছে। টার্মিনেট করে দিলেই হবে।

—মানে?

—মানে জানো না! চলো খালাস হয়ে আসবে। একটা বেলার ব্যাপার। দিন তিনেক বিশ্রাম নিয়ে আবার নর্ম্যাল লাইফ।

—না। সে দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়েছিল—বিয়ের তিন বছর পরে প্রথম সন্তান। কোন অপরাধে তাকে খুন করব। আমি পারব না।—এই নিয়ে রোজ জোরাজুরি কথা কাটাকাটি চলতেই লাগল, চলতেই লাগল। অবশেষে এল সেইদিন যেদিন অরি বেলা বাড়তেই অফিস যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে না দেখে সে অবাক হয়ে কাছে গিয়ে কপালে হাত দিয়ে ছিল—জ্বর-টর হল না কি?

বিদ্যুৎ গতিতে তার মুখ চেপে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল অরি। নাকে চেপে ধরেছিল, একটা রুমাল। তাতে মিষ্টি কেমন একটা অবাক করা গন্ধ। সে বুঝতে পারছিল তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ব্যস আর কিছু মনে নেই।

গভীর রাত হবে তখন। তার সামনে কড়কড়ে পোশাক-পরা একজন সিস্টার; তাঁকে দেখতে দেখতে সে যেন অনেকদিনের ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। তার গায়ের ওপর সাদা চাদর টানা। সবুজ পর্দাটা দুলছে। সে তা হলে বাড়িতে নেই। অবশ্য তার বাড়িই বা কোথায়? সেন্ট্রাল পার্কের বাড়িটাও তার বাড়ি না, সল্টলেক পূর্বাচলের বাড়িটাও তার বাড়ি নয়। তার বাড়ি ছিল রমণী চ্যাটার্জি স্ট্রিট। সেই মিষ্টির দোকান, একদিকে পাহারার মতো সেই সরকারি ফ্ল্যাট, তাদের বাড়ির মধ্যে এক চিলতে

লম্বা উঠোনটায় সার দিয়ে দিয়ে কত গাছ! এমনকি সুপুরি গাছও! টগর ঝোপে অজস্র টগর ফুটত সাদা তারার মতো। আর ছিল একটা মুসাণ্ডা। আর কী ছিল? নয়নতারা তো ছিলই, তুলসী ছিল, তুলসীর পাতা তুলে না ধুয়েই সে কচকচিয়ে খেত বলে মা কত বকেছে! তার আগেও তার বাড়ি ছিল মানিকতলায়। সেখান থেকে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে যেতে তার ঠিক দশ মিনিট লাগত। সেই বাড়িটাতেও টবের গাছ ছিল দোতলার হাফ-ছাদে। ছাদ-ভরা ফুল, বিশেষত গ্রীষ্মকালের। বাবা যত্ন করত, তাকেও শিখিয়েছিল। তবে যেহেতু তাকে সংসারের অনেক কাজই করে নিতে হত, গাছেদের ভারটা বাবা কোনদিনই তাকে দেয়নি। সেই বাড়ির যে ঘরে সে থাকত, তার একদিকের মেঝের সিমেন্ট একটু ভাঙা ছিল। ভাঙা জায়গার জন্য তার খুব খারাপ লাগত। বন্ধুরা আসবার কথা থাকলেই সে জায়গাটাতে একটা শতরঞ্চি পেতে রাখত। সেই বাড়িগুলো তার। তাদের সঙ্গে তার কত সুখস্মৃতি, কত তুচ্ছ ব্যর্থতা, কত তুচ্ছ সুখ, কত শোকতাপের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মানিকতলার বাড়িতে তার ঠাকুমা মারা গেলেন। ছোট্ট সে তখন। কতদিন পর্যন্ত আশা করে বসেছিল ঠাকুমা আকাশ থেকে নেমে আসবেন, আবার তাকে মালঞ্চমামার গল্প বলবেন, কিংবা সেই একঠেঙে পেত্নী আর থালুমালুর গল্প। রমণী চ্যাটার্জি থেকেই তার বিয়ে হল। মা-বাবার নিত্য কথা কাটাকাটি। বাবা কিছুতেই বিয়ে দিতে রাজি নয়, মায়ের করুণ মিনতি। বাবা রেগে যেত, কেন তুমি শুয়ে থাকতেই কি ও সংসার পড়াশোনা সামলাচ্ছে না? ও পড়বে, প্রোফেসর হবে—তার পর আবার বিয়ের ভাবনা কী?

মা বলত—না গো, কুমারী মেয়ে একবার বাড়ির সংসারে জড়িয়ে পড়লে আর বিয়ে করতে পারে না। এ রকম আমি অনেক দেখেছি। আমি চলে গেলে মাতৃহীন মেয়েটার যে কী দুর্গতি...বলতে বলতে মায়ের কণ্ঠরোধ হয়ে যেত। সুন্দর চোখদুটো জলে ভরে উঠত।

বাবা বলত—দুর্গতিটা কি ওর আমিই করব? আমিই নিজের স্বার্থে ওকে বেঁধে রাখব বলছ? বাঃ।

—না, না। তুমি রাখবে না, ও ভীষণ দায়িত্বশীল মেয়ে, ও নিজেই তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। মাতৃহীন মেয়ের অনেক সমস্যা...

—আরে বাবা পিতৃহীন তো আর হবে না?

—যদি তা-ও হয়! মানুষের জীবন, কে বলতে পারে?

এই রকম কথা কাটাকাটির মধ্যে অমৃতা একদিন ঢুকে বলেছিল—ঠিক আছে। ঠিক আছে। বাবা কথা বাড়িও না। আমার বিবাহ না উদ্বাহ দিয়েই দাও। রোজ রোজ অশান্তি ভাল লাগে না।

তবে অমৃতার পছন্দ ছিল অধ্যাপক বর। তার বাবা আবার যেহেতু শিক্ষাজগতে আছেন, তার ঘাঁত ঘোঁত জানেন, তাই সে জগতের মানুষদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারতেন না। বেশি কথা নয়, সংক্ষেপে বলতেন,—ওঃ লেকচারার, কলেজের? ওদের আমি চিনি।

তিনিই দেখেশুনে ঠিক করলেন এঞ্জিনিয়ার জামাই। মা-বাবা ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। শাশুড়ি এখনও চাকরি করেছেন। স্কুলের টিচার। নিজেদের নতুন ফ্ল্যাট সেন্ট্রাল পার্কে।

অমৃতার পড়াশোনা নিয়ে কথা বলতে শ্বশুর বলে উঠেছিলেন—অবশ্যই। ও ভাল মেয়ে। পড়াশোনা করবে। চাকরি করবে, সেটাই তো আমরাও চাই।

ব্যস, আর কোনও কথার দরকার হয়নি। লাখ কথা ছেড়ে একটা কথাও বোধহয় হয়নি, এত সহজ সরল ছিল বিয়েটা।

অরিসূদনকে অপছন্দ হবার মতো তো কিছু ছিল না। তবে হ্যাঁ, একটা মানুষকে দেখেই, বা তার সঙ্গে দুটো কথা বলেই যে অনেক সময়ে একটা টান তৈরি হয়, তেমন কিছু হয়নি। অমৃতার তো তেমন আবেগপ্রবণ স্বভাবও না। হয়তো অরিসূদনের ব্যাপারটাও তাই। তার বন্ধু দোলা যেমন সহজে প্রেমে পড়ত, কি ছেলেদের কি নিজের মেয়ে-বন্ধুদের, অমৃতার প্রকৃতিটাই তেমন ছিল না।

সে ধৈর্যশীল, সহনশীল, প্রতীক্ষা করতে প্রস্তুত।

অরিসূদন তার পেশায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকত। অমৃতাও তার পড়াশোনায় ও সংসার-কর্মে। তার ওপরে শাশুড়ির ছিল ওই রোগ। ছেলেবউকে একা হতে দেবেন না। অরি বলল—চলো, "ফায়ার" এসেছে দেখে আসি। শুনছি খুব ভাল। শাশুড়ি কান এদিকে, বললেন, আমারও একটা টিকিট কাটিস। দেখতে দেখতেই এমন 'ছি ছি ওয়াক থুঃ' আরম্ভ করলেন যে তিনজনে হল থেকে বেরিয়ে আসতে পথ পায় না।

কিশোরী আমনকর-এর গান কলামন্দিরে। অমৃতাই বলল—শোনাও না গো। আমার ভীষণ ভাল লাগে আমনকর।

ক্ল্যাসিকাল গান শাশুড়ি ভালবাসেন না।

বেরোবার সময়ে কিন্তু ওঁর এমন পেটের যন্ত্রণা শুরু হল, যে অরিকে ডাক্তারের কাছে ছুটতে হল। দ্বিতীয় পর্বে ওরা পৌঁছল বটে, কিন্তু পেটব্যথাক্রান্ত শাশুড়িকে, সে ডাক্তার ডেকে দেখিয়ে হলেও, ওরা যে গান শুনতে গেছে, সেই রাগ কতদিন যে ভদ্রমহিলা ভুলতে পারলেন না! অরি তখন বলেছিল—এক ছেলের মা হলে, বউ-এর ওপর ভীষণ জেলাসি হয়, বুঝলে?

—জানতেই যখন, তখন বিয়েটা না করলেই পারতে!

—ইস্, মা জেলাস হবে বলে আমি বিয়ে করব না? বলতে বলতে রাতের অন্ধকারে জানলা দিয়ে আসা রাস্তার আলোর আবছায়ায় তার দিকে গভীর করে চেয়ে ছিল অরিসূদন। তার হাত চলে গিয়েছিল অমৃতার নাতিপিনদ্ধ বুকে। তারপর যা হয়! কে জানে সেই দিনই সাবধান হতে ভুলে গিয়েছিল কি না অরিসূদন গোস্বামী।

একজন ভদ্রলোক ঢুকছেন। নীল শার্ট কালো প্যান্ট। একটু ভারী চেহারা। লম্বার জন্য ভারী ভাবটা মানিয়ে গেছে। ফর্সাটে ভারী মুখ। একটু চৌকো ধরনের, জে.বি.-র মতো। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। কে ইনি?—ও ডাক্তার। গলায় তো স্টেথোস্কোপ ঝুলছেই।

—সিস্টার, পেশেন্টের ঘুম ভেঙেছে?

—হ্যাঁ।

—আপনি একটু কাইন্ডলি বাইরে যান।

—হ্যাঁ,—বেডের পাশে চেয়ার টেনে বসে পড়েন ডাক্তার—আপনি এখন কেমন ফীল করছেন?

—ভাল।

—সম্পূর্ণ সজাগ?

—মনে তো হচ্ছে।

—শুনুন, যখন পূর্ণ সজাগ ছিলেন না, সে সময়ে আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। কতগুলো ইনফর্মেশানও দিয়েছিলেন। মনে করতে পারছেন কিছু?

—না। আমার অ্যাবরশন কি হয়ে গেছে?

—কেন? আপনি অ্যাবরশন চেয়েছিলেন?

—না। হয়েই যখন গেছে তখন...

—তা হলে আপনার স্বামী, স্বামীই তো।

—কে? অরিসূদন গোস্বামী?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়েছিল।

—মাফ করবেন, এত অদ্ভুত অদ্ভুত সম্পর্ক নিয়ে এখানে লোকে আসে, তাই কথাটা জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা, ওঁরা কেন অ্যাবরশন চাইছিলেন?

—আই হ্যাভ নো আইডিয়া।

—তবু?

—ওরা আমার পড়াশোনার ব্যাঘাতের কথা বলেছিলেন। তা ছাড়া সংসারে আমাকে প্রচুর কাজও করতে হয়।

—আই সি। তা আপনি তাতে ওঁদের কী বললেন?

—আমি বলি—পড়াশোনা পরীক্ষা এসব আমি সামলে নেব। সংসারও। তবে সংসারের কাজ থেকে দশ-বারোদিন কি এক মাসের ছুটি দিতে হলে যদি বাচ্চা না হতে হয়, তো ওঁদের পরিবারে বাচ্চা কোনও দিনই আসবে না—এই জাতীয় কিছু।

—তা প্রেগন্যান্সির সময়ে আপনি মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যেতেন?

—অজ্ঞান? আমি জীবনে কখনও অজ্ঞান হইনি ডক্টর। ওই একবার ছাড়া। কী বলব! আপনাকে বলে কী লাভ?

—লাভের কথা পরে ভাববেন। ডাক্তারকে কিছু লুকোবেন না।

—আমার স্বামী আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কী যেন দিয়ে আমার নাক-মুখ চেপে ধরল—আর কিছু আমার মনে নেই।

—ওরা অজ্ঞান অবস্থায় এখানে আমাকে নিয়ে আসেন—বলেন, কনসেপশনের পর আপনার প্রায়ই ফিট হচ্ছে। তাই ওঁরা বউমাকে অ্যাবরশন করাতে নিয়ে এসেছেন। আগে তো বউমা বাঁচুক, তারপর নাতিপুতির কথা ভাবা যাবে।

—শিট!

—কী বললেন?

—কিছু না, বললাম ছিঃ।

—তা ওঁদেরই নাতি, ওঁদের না চাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে মিসেস গোস্বামী।

—আমি বুঝতেই পারছি না।

—শুনুন, আমি যতটুকু বুঝেছি ইউ আর ইন সীরিয়াস ডেঞ্জার। আমি বুঝেছিলাম আপনাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করা হয়েছে। তারপরে আপনার সব রকম মেডিক্যাল টেস্ট করাই। অস্বাভাবিক কিছু পাইনি। এদিকে আপনার চার মাস কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন এম.টি.পি করা খু-উব রিস্কি। আপনার প্রাণসংশয় হতে প্যারে। সুন্দর একটি মেল ভ্রূণ এসেছে আপনার গর্ভে, আমরা অ্যামনিও সেনটেসিস করে দেখে নিয়েছি। কোনও অস্বাভাবিকতা তার নেই। আপনি যদি এঁদের কাছে ফিরে যান, কোনও বাজে ক্লিনিকে অসাধু হাতুড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে এরা আপনার গর্ভপাত করাবেই। আপনি তাতে বাঁচবেন না। প্লিজ ডোন্ট গো ব্যাক টু দেম। আপনি আপনার বাপের বাড়ির ঠিকানা বলুন, আমি এক্ষুনি আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি।

—আমি এভাবে চলে গেলে আপনাদের তো বদনাম হবে, পুলিশ এনকোয়্যারি হবে?

—থ্যাংকিউ ফর স্পেয়ারিং সো মাচ থট ফর আস। আমরা ওগুলো সামলে নেব। আপনি চলে যান। সকাল হলেই হয়তো বন্ড সই করে পেশেন্ট নিয়ে যাবার জন্য জোর করবে। অলরেডি একবার করেছে।

সে শিউরে উঠল।

—ভয় পাবেন না। ঠিকানাটা বলুন।

—শুনুন আমার মায়ের দীর্ঘদিনের হার্টের অসুখ। বাবাকে একা সব সামলাতে হয়। ওঁরা...ওঁরা খুব দুর্বল। ওখানে আমি যাব না।

—তা হলে?

—তা হলে...তা হলে দুটো ঠিকানা আপনাকে বলছি, কেউই আমার আত্মীয় নয়, ওখানে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না। সেটা ঠিক হবে তো?

—পুলিশ-কেস হবে। হোক। তখন তো সত্য বেরিয়ে পড়বে, অপরাধের শাস্তিও হবে। করুক না কেস।

—তা হলে একটা ঠিকানা বলছি জয়িতা বাগচি, ওয়ান-এ এইট্টি থ্রি, সেক্ট-৩, সল্টলেক সিটি। আর একটা হল ৫/বি ডোভার লেন।

—এগুলো কার ঠিকানা?

—প্রথমটা আমার এক প্রোফেসরের, দ্বিতীয়টা আমার এক বন্ধুর। সে অবশ্য এখন কানপুরে, কিন্তু তার মা আমাকে খুব ভালবাসেন।

—শুনুন মিসেস গোস্বামী...

অবরুদ্ধ ক্রোধ এবার প্রকাশ পেল তার গলায়।

—বারবার মিসেস গোস্বামী বলে আমাকে অপমান করছেন কেন?—আমি অমৃতা

—নিশ্চয়ই, ডাক্তার ঝুঁকে পড়লেন একটু, বললেন হ্যাঁ অবশ্যই, আপনি তো অমৃতাই।

৭

টু-বি'তে চড়ে নামতে হবে গড়িয়াহাটের মোড়ে। তারপর অটো নিয়ে বিজন সেতু পার হয়ে কর্নফিল্ড-এর ঠিক পরেই দোলাদের নতুন বাড়ি। একটুও ভাল লাগে না জায়গাটা দোলার। বাড়ির পেছনে কারখানা, সামনে একটু ডানদিক ঘেঁষে একটা গ্যারাজ। তবে তাদের দোতলা বাড়িটা বেশ জায়গা নিয়ে, অতি আধুনিক মেজাজের ছিমছাম বাড়ি। বাড়িটা সুন্দর। তাছাড়া জায়গাটা খোলা, অনেকদূর পর্যন্ত চোখ চলে যায়। অবশ্য চারদিকে উঁচু-উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছেই, উঠছেই। কেন যে তারা ডোভার লেনে থাকতে পারল না। হোক না ভাড়াবাড়ি, সম্পদরা কত কাছে ছিল, অমৃতারা...। অমৃতার কথা মনে হতেই মনটা কীরকম তছনছ হয়ে গেল তার। এই অন্তর্ধান, অমৃতার এই কর্পূরের মতো উবে যাওয়া কি শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হবে তাদের? সেই বন্দনা ব্যানার্জি, তারও আগে লাভলি গুপ্তর মতো? টিভি খুললে আজকাল যখন নিরুদ্দেশের বিবরণ দিতে আরম্ভ করেন ঘোষক বা ঘোষিকা, সে আগে আরম্ভ হলেই অন্য চ্যানেলে চলে যেত, আজকাল কিন্তু ওই খবরগুলোর জন্যই বসে থাকে। দীপাঞ্জন চ্যাটার্জি, বয়স ১৭, হাইট : পাঁচ-সাত...হারিয়ে যাবার সময়ে পরনে ছিল খাকি ফুলপ্যান্ট আর লাল চেকশার্ট, সন্ধান দেবার ঠিকানা—ভবানী ভবন। অলকা মাজি—বয়স ২৯ হাইট—পাঁচ এক...গত তেরো জানুয়ারি ১৯৯৮ থেকে নিরুদ্দেশ...। আবদুস সামাদ বয়স বারো...রং কালো...হারিয়ে যাবার সময়ে পরনে ছিল...। যেগুলো মানসিক ভারসাম্যহীন সেগুলো বাদ দিয়ে বাকিগুলো বিশ্লেষণ করতে থাকে সে। এ অভ্যেস নাকি তিলকেরও হয়েছে। তিলকই তাকে ফোন করে জানায়—দোলা শিগগিরই টিভি খোল—অমৃতার খবর দিচ্ছে। ওর বিয়ের ঠিক আগের একটা ফটো দিয়েছে। এ ফটোটা খুব ভাল করে চেনে দোলা। কেমন কাঠ-কাঠ রাগী-রাগী উঠেছে। অমৃতা গোস্বামী—নিরুদ্দেশ 'উজ্জীবন' নার্সিংহোম থেকে, ফর্সা রং, উচ্চতা ৫'-৪" রোগা, নিরুদ্দেশ হবার সময়ে পরনে ছিল নার্সিংহোমের গাউন। সম্ভবত সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্যহীন।

দোলা সঙ্গে সঙ্গে তিলককে ফোন করে—'সম্ভবত সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্যহীন' মানেটা কী রে?

—অমৃতার মাথাটা যদি কাঁধের ওপর ঠিক জায়গায় বসানো না থেকে থাকে তো আমাদের কারও মাথাই নেই—তিলক বলল।

—এটা কী চাল বল তো ওর শ্বশুরবাড়ির?

সীজারকে টেলিফোন করে দোলা—সীজার আছে?

—বলছি

—আমি দোলা রায়, অমৃতার...

—বুঝেছি

—আজ নিরুদ্দেশের খবরটা দেখেছ?

—দু'দিন ধরে তো দিচ্ছে। প্রমাণ করতে চাইছে ওর মানসিক গোলমাল হয়েছিল। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেটা এপিলেপ্‌সি হতে পারে। তার পরে হয়তো খানিকটা অ্যামনেসিয়া...এখন তো সব জানাজানি হয়ে গেছে। পাড়ার ছেলেরা মারমুখো। নার্সিংহোমের ডাক্তারকে ধরেছিল পুলিশ। বেল পেয়ে গেছেন শুনেছি। অরিদাকে যে কোনওদিন পাড়ার ছেলেরা ধোলাই দেবে। ওর শাশুড়ি বেরলেই টিটকিরি খান।

—কীরকম?

—আমাদের ছেলেদের মধ্যে একটা এই ধরনের কথাবার্তা হয়, ধরুন।

—ধরুন বলো না ধরো...

—আচ্ছা ধরো—এক নম্বর বলল—কে যায়?

—দ্বিতীয় জন জবাব দিল—বউমারির খাল।

—কোথায় যায়?

—নদীনালায়

—কেন যায়

—বউ-মারার সুলুক দিতে

—কেমন সুলুক?

—ধোবার পাটে আছড়ে মারো, পাথর বেঁধে জলে ফেলে দাও

—আর?

—সুযোগ পেলে গলা টিপ্যা ভাসাই-আ দাও।

—কী রি-অ্যাকশন?

—কী বলবে? কিচ্ছু তো বলতে পারে না। মুখ কালো হয়ে যায়। হনহন করে চলে যায়। তবে রি-অ্যাকশন দেখতে হয় পাড়ার অন্য শাশুড়িদের।

—সেটা কীরকম?

—এক মাসিমা একদিন আমায় ডেকে চোখের জল মুছে বললেন—শাশুড়িদের পেছনে লেগেছ বাবা, আমাদের তাহলে ঘরেও খোয়ার, বাইরেও খোয়ার? আমি বললাম—বেশ মাসিমা, জানতে দিন, আমাদের জানতে দিন, কেমন খোয়ার কেন খোয়ার আমরা আপনার হয়েও লড়ব।

—সত্যি জীবনটা কী অসম্ভব রকমের জটিল, তাই না সীজার?

—না দোলাদি, জীবন-টিবন নয়, মানুষ, মানুষই বড্ড গোলমেলে। কোনও দরকার হলেই আমায় ডাকবেন,

—বা রে! কোনও দরকার হলেই তোমায় ডাকব? তোমার অসুবিধে হবে না?

—কোনও অসুবিধে হবে না। অমৃতা-বউদিকে আমরা, মানে আমি খুঁজে বার করবই, আপনাদের কারও অসুবিধে হলে আমি যদি কাজে লাগতে পারি...

দোলা খুব অবাক হয়ে গেল। ছেলেটা আচ্ছা ছেলেমানুষ তো। এখন দিনকাল যা দাঁড়িয়েছে মানুষ খালি ছুটছে। তাদের মতো যারা কেরিয়ার গড়ছে, তাদের তো কথাই নেই। তার মধ্যে হাইস্কুলে পড়া সীজারের মতো একটা ছেলে যদি সব দিদি, সব বউদি, সব শাশুড়িদের আশ্বাস দিতে থাকে যে কারও কোনও অসুবিধে হলেই সে সাহায্য করতে এক পায়ে খাড়া আছে, তবে একটু অবাক লাগে বইকি! ছেলেটা পড়াশোনা সত্যিই করে তো! না স্কুল ড্রপ-আউট? কোনও রাজনৈতিক দলের কেডার-ফেডার নয় তো?

সেদিন য়ুনিভার্সিটিতে গিয়ে একটা ভারী মজার ব্যাপার শুনল দোলা। দোলা কেন সব্বাই। লাবণির বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিল, লাবণি বেঁকে বসেছে। ওর মা না কি আজকে আসবেন য়ুনিভার্সিটিতে বন্ধুদের অনুরোধ করতে যেন তারা ওকে বোঝায়।

—কী ব্যাপার রে লাবণি? বন্ধুরা তো সব একখানা গল্পের গন্ধ পেয়ে হামলে পড়ল একেবারে।

লাবণি বলল—আমার ব্যাপার আমি বুঝব, তোদের কী? তোরা কেন নাক গলাচ্ছিস?

—আমরা একটা নেমন্তন্ন পেতে চলেছিলুম, সেটা যে ফস্কে যায়, সেটাই আমাদের নাক গলাবার কারণ,—চঞ্চল বলল।

—পেটপুজো ছাড়া আর কিচ্ছু বুঝিস না, না? কফিহাউজে গিয়েও বলবি খাওয়া, বিয়ের কথা উঠলেও হাত ধুয়ে বসে থাকবি। কেন বাড়িতে খেতে পাস না? আর শিওর হচ্ছিস কী করে তোকে নেমন্তন্ন করবই!

চঞ্চল বলল—করবি না? যদি না করিস কেন করবি না, তা-ও জানি।

—কেন? দোলা জিজ্ঞেস করল।

—কেন আর—বর বা বরযাত্রীরা যদি মনে করে এ মেয়েটার গুচ্ছের বয়ফ্রেন্ড আছে, তাই। নিলয় বলল, লাবণির বর মোটামুটি রক্ষণশীল, একটু গাঁইয়া মতো তো হবেই!

—মানে? লাবণি তো খেপে লাল।

—চটছিস কেন? চটছিস কেন? জেনার‍্যালি তোর মতো মেয়েরা একটু কনজারভেটিভ পছন্দ করে। গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে।

—এরই বা মানে কী?

—কেন? দ্যাখ কনজারভেটিভ বলে ওরা ডাউরি-টাউরি বাবদ তোর বাব-মা'র কাছ থেকে গুচ্ছের জিনিস বাগিয়ে নেবে। ধর নানান কিসিমের শাড়ি গয়না, আসবাবপত্র, ফিরিজ, ভি.সি.আর., আরও সব যা-যা আছে। তা শাড়ি গয়নাগুলো তো তোরই মাপসই হবে, তোর বর বা তোর শাশুড়ি তো আর পরবে না। জিনিসপত্রগুলোও তোর সম্পত্তি প্রধানত। গাছের খাওয়া হল তো? এইবারে তুই আধুনিকা ছিল নাকো হেনকাল ছিল না হয়ে যাবি। বুদ্ধিবৃত্তি আছে, লেখাপড়া শিখেছিস বরের নাকে দড়ি দিয়ে একবার উত্তর একবার দক্ষিণ একবার পূর্ব একবার...

তিলক বলল—ধুর, নিলয় এসব ফালতু ইয়ার্কি ছাড় তো। আমাদের মাঝখান থেকে একটা মেয়ে বেমালুম গায়েব হয়ে গেল, এখনও ইয়ার্কি মারছিস? ধ্যুৎ তোদের একটা ইয়েও নেই।

লাবণি এতক্ষণে মুখ খুলল—দ্যাখ, এদেরও একটা বাবা, একটা মা, একটা ছেলে, একটা মেয়ে। ঠিক অমৃতার শ্বশুরবাড়ির মতন। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে। আর সবচেয়ে ভয়ের কথা—এই ভদ্রলোকও এঞ্জিনিয়ার আর এর নাম হচ্ছে...নাম হচ্ছে অরিন্দম। ছোট করলে তো অরিই দাঁড়াই। ওর বাবা-মা যখন এসে অরি এই অরি তাই করতে আরম্ভ করেন না তখন আমার বুক হিম হয়ে আসে।

লাবণির আপত্তির কারণটা হয়তো খুবই হাস্যকর। কিন্তু ওরা কেউ হাসতে তো পারলই না, উড়িয়ে দিতেও পারল না। চঞ্চলসুদ্ধ ওর ভেতরে কী হচ্ছে সেটা বুঝতে পারল। তবু একবার ফাজলামির চেষ্টা করে বলল—এই অরিসূদন না ফরিসূদন অমৃতার অ-ভদ্রলোকটি এমন একটা কাজ করে বসলেন যে সারা পৃথিবীর অরিন্দম, অরিত্ররা আইবুড়ো হয়ে গেল।

কেউ হাসল না।

তিলক আবার জিজ্ঞেস করল—থাকেন কোথায়?

—কোথায়? শুনলে আঁতকে উঠবি। সিঙ্গাপুর। একটা বিদেশ-বিভুঁই, তারপর শুনেছি ইন্টারন্যাশন্যাল জোচ্চোরদের আড্ডা। সেইখানে আমার মতো একটা মেয়েকে হাপিস করে দেওয়া কোনও ব্যাপার? তোরাই বল। আবার ওর বাবা-মা যখন-তখন ওখানে গিয়ে থাকেনও। যদি তিনজনে মিলে...প্লিজ, আমার বাবা-মা এলে তোরা বুঝিয়ে বলিস।

—তুই অমৃতার ঘটনাটা বলেছিস মাসিকে?

—অমৃতার ঘটনা বিশ্বসুদ্ধ লোক জানে।

—তাতে মাসিদের কোনও দুশ্চিন্তা হয়নি?

—উঁহু। বাবা বলছে তুমি এরকম ভীরু দুর্বলচিত্ত মেয়ে আমার জানা ছিল না। আর মা বলছে যার ভাগ্য তার তার। একজনের দুর্ভাগ্য হয়েছে বলে পাঁচজনেরও তাই-ই হবে তার কোনও মানে নেই। আর আমরা খুব চেকিং ক্রস চেকিং করে নিয়েছি। কোনও ভয় নেই।

—তা হলে আর ঘাবড়াচ্ছিস কেন?—তিলক বলল।

—ওরে বাবা অরি নামের লোকেরা আমার জন্মশত্রু হয়ে গেছে। মা কালীর দিব্যি আমি কোনও বরকে অরি বলে ডাকতে পারব না।

—ওগো হ্যাঁগো বলে ডাকিস। তোর অত মড হবার দরকারটা কী?—এবারও চঞ্চল।

ওরা কথা বলছিল, ক্যান্টিনে বসে। এখানেই লাবণির মায়ের আসার কথা। এই সময়ে শর্মিষ্ঠা, রঞ্জনা, অয়ন সব হইহই করে ঢুকল, ওরাও লাবণিকে ঘিরে বসে গেল।

শর্মিষ্ঠা বলল—ইস্‌স্‌, আমার একটা এমন দুর্দান্ত সম্বন্ধ আসে না রে! পড়াশোনায় ইস্তফাটা দিয়ে দিই।

রঞ্জনা বলল—যা বলেছিস, পরীক্ষা ভাল্লাগে না আর।

একটি ভদ্রলোক মানে ওদের চেয়ে কিছু বড় একটি বেশ ঝা-চকচকে ছেলে এই সময়ে ক্যান্টিনে ঢুকল। আর সমস্ত ক্যান্টিনকে চমকে দিয়ে লাবণি বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মুখটা ঝট করে নিচু করে লুকিয়ে ফেলল।

—কী হল রে?

—ওই যে অরিন্দম ঘোষ।

তিলক তাড়াতাড়ি উঠে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল।

—আপনি লাবণি মজুমদারকে খুঁজছেন তো।

—হ্যাঁ মানে, এখানেই তো আসার কথা বলা হয়েছিল আমায়। কিন্তু...

—লাবণি ইজ দেয়ার। হাইডিং

—হাইডিং? হোয়াই? ফ্রম হোয়াট?

—ফ্রম ইউ।

—ওঃ, খুব অবাক করে দিয়েছি না? কী বন্ধুদের সামনে এমব্যারাসড্ না কী?

—আপনি আসুন। এই একটা চেয়ার নিয়ে আয় তো রে। গোপাল এখানে একটা এক্সট্রা চেয়ার দে বাবা। আমাদের জামাইবাবু এসেছেন।—চঞ্চল হাঁকল।

ক্যান্টিনে অন্য যারা বসেছিল সব চকিত হয়ে এদিকে তাকাল। কিন্তু ততক্ষণে হুল্লোড়ের মধ্যে লাবণি এবং অরিন্দম ঘোষ সবাই চাপা পড়ে গেছে।

—আপনারা সব লাবণির বন্ধু। চেয়ারটাতে বসতে বসতে অরিন্দম ঘোষ, সবার দিকে চোখ ঘুরিয়ে এনে বলল।

—হ্যাঁ, এই আমরা সবাই। আরও তিন চার গুণ বাইরে আছে। আমাদের সবাইকেই আপনাকে নেমন্তন্ন করতে হবে। আমরা ন'জন ব্যাটাছেলে আছি, আর সব মেয়েছেলে, আমাদের ন'জনকে স্পেশ্যাল গেস্ট করতে হবে।

—কেন? স্পেশ্যাল কেন?

—বুঝতে পারছেন না? এবারও চঞ্চল—আমরা এই ন'জন আপনার কুড বি রাইভ্যাল। ছেড়ে দিয়েছি।—মাছি তাড়াবার মতো একটা ভঙ্গি করল চঞ্চল।

লাবণি এই সময়ে জিভ ভেঙিয়ে বলল,—শখ কত?

—আপনাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ—অরিন্দম ঘোষ হাসতে হাসতে বলল।—কিন্তু শুভ ঘটনাটা আগে ঘটুক। শুনছি লাবণির নাকি প্রচণ্ড অমত। পাঁচ-ছ' মাস ধরে কেস-স্টাডি চলছে। হঠাৎ লাস্ট মোমেন্টে বেঁকে বসেছে।

নিলয় বলল, আপনার নামটা এফিডেভিট করে পাল্টে ফেলুন।

—কেন বলুন তো!

—আর একটি বোন অন্তত আমদানি করুন।

—আশ্চর্য ব্যাপার। একটা বোন? আমদানি? কোথা থেকে? কেন?

—তাহলে একটা অন্তত তফাত হয় অমৃতার কেসটার সঙ্গে।

—ব্যাপার কী? লাবণি, বুঝিয়ে বলো তো! আমি কিছুই...

—লাবণির বদলে আমি বোঝালে কোনও আপত্তি আছে?—তিলক বলল।

—আছে বইকি? লাবণির মুখ আছে, দু' পাটি দাঁত, জিভ, গলার স্বর, মাথায় বুদ্ধি অনুভূতি সবই তো আছে, লাবণির মাউথপিস লাগবে কেন?

—লাগবে। দোলা বল তো! একটু ইনট্রোডাকশন দে।

দোলার খুব নার্ভাস লাগছিল। অরিন্দম ঘোষ, খুব স্মার্ট, কিন্তু চালিয়াত টাইপ নয় একেবারেই। খুব সদয় এবং স্বাভাবিক দেখতে।

অরিন্দম বললেন—বলো। দোলা, বাঃ তোমার নামটা খুব নতুন ধরনের তো!

তখন দোলা বলল।

—আশ্চর্য! অরিন্দম ঘোষ বললেন, এই জন্যে? ইসস্ তোমাদের বন্ধু অমৃতা মেয়েটির কী হল তোমরা আর কিচ্ছু জানো না?

—কিচ্ছু না।—অনেকেই বলল একটু আগে পরে।

তিলক বলল, ডাক্তারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। জামিনে খালাস।

—দাঁড়াও দাঁড়াও এই যে তোমরা মেয়েটির স্বামীকে সন্দেহ করছিলে?

—ডাক্তারের সঙ্গে যোগসাজশ থাকতে পারে—তিলক বলল।

—হয়তো ওকে খুব মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছিল, সীজার বলে ওদের পাড়ার একটি ছেলে বলছে, আধা-অজ্ঞান অবস্থায় ওকে গাড়িতে তোলা হয়। তারপর হয়তো পরিচিত ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে। মারা যেতে...

দোলা, লাবণি দুজনেই এই সময়টা ককিয়ে উঠল—তিলক প্লি...জ।

অরিন্দম অসন্তুষ্ট গলায় বললেন—এ আবার কী! বিপদের প্রসঙ্গই সহ্য করতে পার না, তো সত্যিকারের বিপদ এলে তোমরা কী করবে? তোমাদের তো কোনও ডিফেন্সই নেই। তিলক প্লিজ কনটিনিউ।

—ও মারা যেতে, বডি পাচার করে এখন রটিয়ে বেড়াচ্ছে ও নিখোঁজ হয়ে গেছে। নিজেই উঠে ঘোরের মাথায় কোথাও চলে গেছে। এখন নিরুদ্দেশে অ্যানাউন্স করছে...এই ভাবে ব্যাপারটা এসট্যাবলিশ্‌ড হয়ে যাবে বুঝেছেন?

—ওয়েল, তোমার রিজনিং খারাপ না।—কখন যে ভদ্রলোক আপনি ছেড়ে ওদের তুমি বলতে শুরু করেছেন...

—এই নার্সিংহোম আর ওই ডাক্তারের নামটা আমায় দেবে?

—'উজ্জীবন', বালিগঞ্জ প্লেসে। আর ডাক্তারের নাম রঞ্জন কার্লেকার।

—আমি আজ উঠছি। লাবণি প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড,...অরিন্দম ঘোষ কেমন অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, যেন কিছু ভাবছেন।

—কোথায় যাচ্ছেন?

তিলক, চঞ্চল দুজনেই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—ওই ডক্টর কার্লেকরের সঙ্গে একবার...

তিলক বলল—আমি যাব।

দোলা বলল—আমিও।

—আমার একটা ছোট্ট মারুতি আছে বাইরে। তিনজনের বেশি নিতে পারব না। লাবণি তো অফ কোর্স যাবেই। যাচ্ছেই।

উনি চলতে শুরু করলেন, যেন আর কোনও কথা নেই। কথা হয় না। গাড়ির দরজা খুলে বললেন—তিলক তুমি ভাই ফ্রন্ট সিটে বসো। মেয়েরা পেছনে থাক। ও হ্যাঁ, তোমাদের বাড়িতে একটু জানিয়ে দাও—ফিরতে দেরি হতে পারে। মোবাইল ফোনটা ওদের হাতে দিলেন তিনি। তারপর গাড়ি ঘোরালেন।

'উজ্জীবন' নার্সিংহোমে ওরা যখন পৌঁছল তখন ভিজিটিং আওয়ার শুরু হতে যাচ্ছে। প্রচুর ভিজিটর ভিড় করেছেন লাউঞ্জে। ওদের দিকে না তাকিয়ে অরিন্দম সোজা চলে গেলেন অর্ধবৃত্তাকার এনকোয়ারি কাউন্টারে।

—ডঃ কার্লেকরের সঙ্গে একটু দেখা করিতে পারি?

—সার তো এখন নেই। সাতটার পর ভিজিটিং আওয়ার শেষ হলে আর.এম.ও.-কে নিয়ে রাউন্ড দেবেন।

—তো এখন ওঁকে কোথায় পাব?

—কী করে বলব? খুব সম্ভব উডল্যান্ডস-এ। অপারেশন আছে।

—সাতটার পরে এখানে আসবেনই?

—ওরে বাবা, কাঁটায় কাঁটায়। কী দরকার আপনাদের? কেসটা কী?

তিলকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—কেস জন্ডিস।

—রোগী অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে? ভীষণ বমি করছে?

—না, সেরকম কিছু নয়।—অরিন্দম তাড়াতাড়ি বললেন।

—সারের সঙ্গে দেখা করতে হলে সাতটা পর্যন্ত...

অরিন্দম বললেন—চলো, আমরা সময়টা কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে কাটিয়ে দিই। আলোচনাও করা যাবে।

বালিগঞ্জ ধাবায় ভীষণ ভিড়, অরিন্দমের পছন্দ হল না, কোয়ালিটিও তাই। ওরা একটা অল্প নামী দোতলার রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসল।

হালকা রং ভেতরটায়। স্বপ্ন-স্বপ্ন আলো জ্বলছে। খাবারের অর্ডার দেবার সময়ে দোলা আর লাবণি হাঁ হাঁ করে উঠল। আমাদের জন্য শুধু চা, বাস।

—সময়টা অনেকখানি। তিন ঘণ্টা এখানে কাটাতে হবে। এটাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা খালি পেটে যেমন বেদ বেদান্ত হয় না, তেমনি ইনভেস্টিগেশনও হয় না। কোনও কাজ ভালভাবে করতে গেলে শরীরটা চাঙ্গা রাখতে হয়। মনটাও। মনটা আবার শরীরের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। কী? খুব জ্ঞান দিচ্ছি? না, তিলক?

—তা একটু দিচ্ছেন, কিন্তু আপনি যে অমৃতার খোঁজে এই ডাক্তারকে ধাওয়া করতে পর্যন্ত পিছপা হবেন না, এটা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা, অন্তত আমি ভীষণ অশান্তিতে ভুগছিলাম। যে মেয়েটা গত মাসেও আমাদের সঙ্গে ক্লাস করেছে, ফুচকা খেয়েছে,

সে আজ হারিয়ে গেছে, অথচ আমরা এতগুলো দামড়া ছেলে মেয়ে কিছু করছি না, করতে পারছি না, এই অবস্থা আমি সহ্য করতে পারছিলুম না।

অরিন্দম বললেন—হ্যাঁ, অদ্ভুত কেস! কিন্তু এ ধরনের কেস এ দেশে বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে। কোনও প্রতিকার নেই। দ্যাখো তিলক, আমি এখানকারই ছেলে, এখানকারই ইনস্টিটিউশন থেকে পাশ করেছি। আমি এঞ্জিনিয়ারিং-এর ছেলেদের যে অধঃপতন দেখেছি তাতে করে যে কোনও বাবা-মাকে বলতে পারি—এঞ্জিনিয়ার? মেয়ের বিয়ে দেবার আগে দুবার ভাবুন। যে কোনও রেসিডেনশ্যাল কলেজের হস্টেলে যা চলে তার মধ্যে চরমতম ক্রুয়েলটি, ডিবচরি আমি দেখেছি। তোমরা বলবে, আমিই একা ভাল হয়ে এদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছি? হোয়াটস দা প্রুফ? আমি জোর দিয়ে বলছি তিলক, লাবণি, দোলা, আ অ্যাম ওয়ান অফ দা ফিউ হু হ্যাভ কাম ব্যাক আনটেইন্টেড।

এখন কী হয় জানি না, আমাদের সময়ে মেয়েদের ওখানে সাঙ্ঘাতিক র‍্যাগিং করা হত। তার ডিটেইল্‌স আমি এই মেয়েদের সামনে বলতে চাই না। ভাল ভাল রেজাল্ট করা ছেলেরা অমানুষের মতো ব্যবহার করে। তাদের ভেতর থেকে নিষ্ঠুরতম, কুৎসিততম সেডিস্ট বেরিয়ে আসে। ওরা জীবনের সবরকম অভিজ্ঞতা ওখানে স্বাধীন থাকার সুযোগে করে নিতে চায়। অন গড, লাবণি আমি ও সবের মধ্যে যাইনি। আমার মা-বাবা দুজনেই প্রোফেসর। একটা অন্য ধরনের ভ্যালুজ-এর মধ্যে আমরা বড় হয়েছি। আমি আর আমার বোন। বোনের যখন এঞ্জিনিয়ার-এর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ এল, আমিই ফার্স্ট না করেছিলাম। সবচেয়ে ভাল কী জানো দোলা, নিজেদের পছন্দে, অনেকদিন মেলা মেশা করে বিয়ে করা। এখন লাবণির আপত্তি হতেই পারে। দু-চার দিনের মেলামেশায় কে কাকে বুঝতে পারে? আমি তো বুঝতেই পারিনি লাবণি এত ভিতু, এবং...এবং লাবণির মধ্যে এত ফেলো-ফিলিং আছে।

—আপনি কী ভেবেছিলেন?—দোলা খুব আস্তে প্রশ্ন করল।

খাবার-দাবারগুলো আসতে শুরু করেছে।

অরিন্দম বললেন—এগুলোর সদ্ব্যবহার করো ভাই। তিলক প্লিজ। লাবণি বি প্র্যাকটিক্যাল।

কয়েক গ্রাস খেয়ে তিলক বলল—অরিন্দমদা বললেন না লাবণিকে আপনি কী ভেবেছিলেন?

—তুমি শুনে কী করবে ব্রাদার?

—কিছু না, আমাদেরও তো লাবণি সম্পর্কে একটা অ্যাসেসমেন্ট আছে! মিলিয়ে নিতুম।

—আমি ভেবেছিলাম ও খুব সাহসী, খুব স্মার্ট, যে কোনও সিচুয়েশনে ও মানিয়ে নেবে। ওর সঙ্গে যদি কেউ খারাপ ব্যবহার করে ও তার ঠিক উত্তরটা দেবে। কিন্তু সেই সঙ্গে লাবণি প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, সেলফিস নয়, জাস্ট সেলফ-সেন্টার্ড। দুটোর মধ্যে তফাত আছে বোঝো তো?

—ওটুকু ইংরেজি আমরা বাংলার ছেলেপুলে হলেও জানি।

—ভাষার কথা হচ্ছে না কনসেপ্টটার কথা বলছি। সেলফিশ লোক সব সময়ে নিজের সুবিধেটা দেখবে, কারও সঙ্গে কোনও সম্পদ শেয়ার করতে চাইবে না। একলা খাবে, একলা পরবে, একলা ভোগ করবে। আর সেলফ-সেন্টার্ড লোক নিজের বাইরের পৃথিবীটাকে দেখতেই পায় না। দেখিয়ে দিলে তখন হয় তো তার মনুষ্যত্ব কাজ করে, কিন্তু আদারওয়াইজ সে নিজেকে নিয়েই থাকে। আজকের পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই সেলফ-সেন্টার্ড, সমাজটাই এখন এই ধাঁচের হয়ে গেছে।—বলে অরিন্দম একটু হাসল—লাবণি, কিছু মনে করলে না তো? লাবণি শুধু মাথা নাড়ল, তার চোখ দুটো ভিজে ভিজে উঠছে যদিও সে একেবারেই আবেগপ্রবণ নয়।

তিলক বলল—ঠিক আছে। আমরা সেলফ-সেন্টার্ড। আপনি বুঝি এ জেনারেশনের নন? কত বড় হবেন আপনি আমাদের চেয়ে?

অরিন্দম হেসে বলল—তিরিশ ক্রস করেছি ভাই। আমি এখনও জানি না, আমি সেলফ-সেন্টার্ড কি না। চেষ্টা করি বুঝতে।

দোলা বলল—আচ্ছা অরিন্দমদা, আপনি পাত্রী দেখতে এসেছিলেন, হঠাৎ আমাদের কাছে অমৃতার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন কেন? লাবণির কাছে প্রুভ করতে যে আপনি আরেক অরিসূদন নন? মনে করবেন না কিছু। আপনি ফ্র্যাংকলি কথা বলেছেন, তাই আমিও বলতে সাহস পেলাম।

—তুমি যা বললে সেটা আমার সাবকনশাসে থাকতেই পারে, কিন্তু ফার্স্ট রি-অ্যাকশন যেটা হল সেটা হচ্ছে আমি চোখের সামনে দেখতে পেলাম এই দোলা এই লাবণি কী রকম ভ্যানিশ করে যাচ্ছে। পেছনে দু-চারটে ক্রুয়েল মুখ, আমাদের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্রদের মতো, যারা আমাদের ব্যাচকে র‍্যাগ করেছিল। আমার মাথার মধ্যেটা কেমন করে উঠল। আই রিজলভ্‌ড্ দেন অ্যান্ড দেয়ার টু সি ইট টু দা এন্ড।

—আপনাকে কী ভাবে র‍্যাগ করেছিল?—তিলক জিজ্ঞেস করল।

—দে মেড মি ড্রিঙ্ক মাই ওন ইউরিন, দেন দেয়ার্স।

—বলেন কী? আপনার বমি হল না?

—নাঃ, আমি মোরারজি দেশাইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে দু গেলাস খেয়ে ফেললাম।

—তারপর!

—তারপর অনেক আদিরসাত্মক খিস্তি করল। মা-বাবকে নিয়ে।

লাবণি-দোলা শিউরে উঠল।

দোলা বলল—আপনি সহ্য করলেন, কিছু বললেন না।—সে উত্তেজিত।

অরিন্দম বললেন—আমি কী বললাম জানো? বললাম আরে ইয়ার এ সব তো জানা কথা ঔর কুছ নয়া চিজ হ্যায় তো বাতাও।

—বললেন? এই কথা?

অরিন্দম এবার হেসে ফেললেন, বললেন—এখন ভাবি যে এইরকম বললে হত। তখন রাগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। অজ্ঞান মানে সত্যি-সত্যি অজ্ঞান। একটা বছর আঠারোর প্যাংলা ছেলে তো! ওভার প্রোটেকটেড।

—তারপর?

—তারপর আবার কী? জ্ঞান ফেরাবার নামে বালতি বালতি জল ঢেলে আমাকে ভিজিয়ে আমার বিছানা ভিজিয়ে ছেড়ে দিল। একজন ইউপির ছেলে ছিল—বলল, ডরপুক কাঁহিকা, ভাগ হিঁয়াসে।

—ইউরিন খাওয়াটা?

—ওটা সত্যি।

—ইঁহ্‌হ্‌হ্—লাবণি মুখ চোখ বিকৃত করে বলে উঠল।

—কী হল, ডিসিশন নিয়ে ফেললে না কি? লাবণি?

লাবণি বলল—চুপ করুন তো। তখন থেকে বক্‌বক্‌বক্। খুব গাবাতে পারেন।

—নিজের ঢাক মাঝে মধ্যে নিজেকেই পেটাতে হয়, বুঝলে ম্যাডাম?

ঘড়ির দিকে চোখ, দোলা বলল—সময় হয়ে এসেছে কিন্তু।

বেয়ারাকে ডেকে তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে দিলেন অরিন্দমদা। গাড়িতে উঠে তিলক জিজ্ঞেস করল—আমাদের লাইন অফ অ্যাকশন কী সেটা একবার বলুন।

—জাস্ট ফলো মি। নিজেরাই বুঝতে পারবে।

সন্ধের আলো জ্বলে উঠেছে নার্সিংহোমে। এখন কিছু কিছু ফিরতি মানুষের ভিড়। সাতটা বাজতে পাঁচ। এনকোয়ারির ভদ্রমহিলা বললেন—ও আপনারা? যান, সার ঘরে আছেন, দশ মিনিটের মধ্যে রাউন্ডে বেরোবেন। দোতলায় উঠে প্রথম বাঁ দিকের ঘর।

ঘরের সামনে লেখা ডঃ রঞ্জন কার্লেকর এম.বি.বি.এস., ডি.জি.ও., এম.ডি. (ও.এন.জি) এম.আর.সি.ও.জি (লন্ডন), এফ.আর.সি.ও.জি (এডিনবরা)।

পর্দা ঠেলে সোজা ঘরে ঢুকে গেলেন অরিন্দম। সামনে বসা একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন ডাক্তার। অতজনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে তাকাতে অরিন্দম বললেন—আমরা সবাই অমৃতার বন্ধু। অমৃতা সম্পর্কে জানতে চাই আপনার কাছ থেকে।

চশমাটা খুলে রাখলেন ডাক্তার, চোখের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন—মারবেন না কি?

—আমাদের দেখে কি সে রকম মনে হচ্ছে? তিলক বলল। অরিন্দম দোলাকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—এ হল দোলা, এ হল লাবণি, এর নাম তিলক, এখন এরা সব্বাই কলকাতা য়ুনিভার্সিটির বাংলা-বিভাগের ছাত্র, মানে অমৃতার সহপাঠী। আমরা ঠিক করেছি, অমৃতাকে আমরা খুঁজে বার করবই। প্রথমেই এসেছি আপনার কাছে। আই হোপ ইউ'ল কোঅপারেট।

সামনে বসা ভদ্রলোককে চোখের ইশারায় চলে যেতে বললেন ডাক্তার। কে জানে, কোনও সিকিওরিটি ম্যানকে ডাকতে পাঠালেন কি না। তারপর বললেন—অমৃতা গোস্বামী নিখোঁজ হয়েছে একমাসের ওপর হয়ে গেছে। তার বন্ধুরা এতদিন কী করছিল?

—আমরা ঠিক কী ভাবে এগোব বুঝতে পারছিলাম না। তিলক বলল।

—আমার যা বলার আমি পুলিসকে বলেছি। এস.ডি.জে.এম আলিপুরকে বলেছি। অমৃতার স্বামী এবং তার লোকজন এখানে ভাঙচুর করে, থানায় এফ.আই.আর. করে ওরা আমাকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল। এক রাত হাজতবাস করেছি। তারপর জামিনে খালাস। কেস যখন উঠবে তখন কথা বলব, এখন না। আমার রাউন্ড দেবার সময় হয়ে গেছে। আপনারা এখন আসুন।

ওপাশের একটা দরজা দিয়ে উনি ভেতরে চলে গেলেন। ওরা বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে বেরিয়ে এল।

তিলক বলল—অরিন্দমদা এবার?

—এবার বাড়ি। বাড়ি চলো।

গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে অরিন্দম বললেন—দ্যাট ডক্টর নোজ আ লট। অ্যান্ড হি ইজ বেসিক্যালি নট আ ক্রুয়েলম্যান। দিজ ইজ ইমপর্ট্যান্ট। উইদিন আ উইক উই উইল সল্‌ভ দা অমৃতা রিড্‌ল। হোপফুলি।

—এক সপ্তাহ?

—আবার কী?

—এত কনফিডেন্স আপনার? দোলা বলল।

—আমার নয় দোলা, ওই ডাক্তারের, কী যেন নাম? কার্লেকর। হি ইজ অ্যাবসলিউটলি শিওর অফ হিমসেলফ।

—তাতে কী হল? তিলক অবাক হয়ে বলল।

—দেখো তিলক, যারা হার্ডনড ক্রিমিন্যাল তাদের কথা আলাদা। কিন্তু একজন ডাক্তার যদি কোনও ক্রাইম করে ফেলেও থাকেন তিনি তো ক্রিমিন্যালের পর্যায়ে পড়েন না? পড়েন?

—সাধারণত না।

—ওঁদের কথাবার্তা হাবভাব প্রকাশ করে দেয় ভেতরে কোনও গণ্ডগোল আছে কি না। এখন এই ডাক্তারের মুখে তোমরা লক্ষ করেছ কি না জানি না, সামান্য হাসি লেগে ছিল। যাকে বলে দুষ্টু হাসি। খেয়াল করেছিলে?

লাবণি বললে—হ্যাঁ, আপনার মুখে যেমনটা মাঝে মধ্যে লেগে থাকে।

—থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, ওই ডক্টর কার্লেকর খুব মজা পাচ্ছিলেন আমাদের দেখে। ইনটারেস্টিং ম্যান। ক্রাইম করে ওরকম মুখের ভাব হয় না।

—হোয়াট ইজ আওয়ার নেকস্ট কোর্স অফ অ্যাকশান? তিলক জিজ্ঞেস করল।

—ভাবতে দাও, একটু ভাবতে দাও।

প্রথমে দোলাকে নিউ বালিগঞ্জে নামিয়ে সোজা উত্তরে গিয়ে লাবণিকে গোয়াবাগানে নামাল অরিন্দম। তারপর তিলককে আমহার্স্ট স্ট্রিটে নামিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল দক্ষিণের দিকে।

লাবণির মা জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় গিয়েছিলি রে?

লাবণি বলল—বেড়াতে।

—অরিন্দমের সঙ্গে?

—হ্যাঁ কিন্তু আরও বন্ধুরা ছিল।

—তা হলে কথাবার্তা কিছুই হল না?

—হলও বটে, হল না-ও বটে।

—কী যে হেঁয়ালি করিস! মত কি তার পুরোনো জায়গায় অনড় আছে? না বদলাল।

—হুঁ।

—কী হুঁ হুঁ করছিস! বদলেছে?

লাবণি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল—বদলেছে মা। —লোকটা বেশ! ওকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করব না—কথা দিচ্ছি। কিন্তু এম.এ. ফাইন্যালটা হয়ে গেলে।

—ওকে ছাড়া আর কাউকেই...বাব্বা, এত?

—কেন তোমার হিংসে হচ্ছে মেয়ে পর হয়ে গেল?

—হিংসে তো বটেই। কিন্তু এ হিংসেও যে কী সুখের, নিজে মা না হলে বুঝতে পারবি না।

—তবে একটা কথা মা। অন্য কোনও নাম ওর বার করতে হবে তোমাদের। অরি বা অরিন্দম বলে আমি ডাকতে পারব না। ওর বাবা মা তো অরি বলেই উল্লেখ করছিলেন। আর কোনও নাম নেই?

—আছে, মা খুব গম্ভীর ভাবে বললেন—ওর দিদিমা ওকে একটা অন্য নামে ডাকেন?

—বাঃ ভাল তো! কী নাম?

মা বললেন—নাড়ু। ডাকবি?

সেদিন রাত্রে লাবণি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। অনেক জল। অনেক, কিন্তু সমুদ্র নয়। স্থির জল। তার একূল ওকূল দেখা যায় না। সেই জলে একটা মড়া ভেসে যায়। কাছে এলে মনে হয় ওটা অমৃতার শব। একটা ফিকে নীল শাড়ি পরনে। চুলগুলো খুলে গেছে, জলে ছড়িয়ে গেছে। আরও কাছে এলে সেই শবের চোখ দুটি খুলে গেল, লাবণি দেখল চোখ দুটো তার। অমনি আয়ত। অমনি কাজল টানা। বড় বড় পাতা ছাওয়া বাদামি মণিওয়ালা চোখ। ভয় পেয়ে সে চিৎকার করে কার নাম ধরে ডাকল। তারপরই সে চমকে উঠে পাশ ফিরে শুল।

পরদিন সকালে ওর আট বছরের ছোট ভাই অবন, ওর পাশের খাটে শোয়, হাসতে হাসতে বলল, দিদি তোর হল কী? ঘুমের মধ্যে বুড়োদের মতো 'হরি হরি' করে ডাকছিলি? কবে থেকে তোর এত হরিভক্তি হল জানি না তো?

৮

—'আমি যাব না, যাব না, যাব না'—এই প্রতিজ্ঞা শম্পার। নিবেদিতা মাঝে মাঝে তাঁর কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভয়ে ভয়ে আড়চোখে তার দিকে চেয়ে দেখছেন। মেয়েটার মুখ চোখ কঠিন। তিনি কিছু বলতে গেলে ধমকে ধমকে কথা বলছে।

—দুধটা খেয়ে নে শম্পি।

—তুমি খাও।

—আমি তো এক্ষুনি অফিস যাব, ভাত খাব...

—আমিও তো

—তুই তো বললি অফিস যাবি না, ছুটি নিচ্ছিস।

—অফিস যাচ্ছি না মানেই বেরোব না, তা তো বলিনি।

—বেরোবি? কোথায়?

—তোমার না জানলেও চলবে।

অনেকক্ষণ সহ্য করেছেন নিবেদিতা। আর পারলেন না। বললেন—তা তো বটেই পাঁচ বছর বয়স থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত বড় করে তুললুম স্রেফ একা হাতে, নিজের অসুখ-বিসুখ গ্রাহ্য করিনি। একদিকে অফিস চলেছে আর একদিক মেয়ের জামা সেলাই, পড়া দেখিয়ে দেওয়া...

—প্লিজ মা, প্লিজ—শম্পা কেঁদে ফেলল—তুমি অমন করে বলো না। আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে আছে। মন খারাপটাই রাগ হয়ে বেরোচ্ছে।

—মন খারাপ তো হবেই। হওয়ারই কথা। নিবেদিতা বললেন, মন কি আমারই কম খারাপ? কোথায় গেল মেয়েটা?

—মাসি মেসোর কী রকম গা-ছাড়া ভাব দেখলে মা!

—ঠিক বলেছিস! ঠিক বলেছিস। অদ্ভুত একটা চুপচাপ ভাব। যেন নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন দুজনেই। নিবেদিতা বললেন, ভগবান না করুন, আমার যদি অমনি হয় তো আমি তো দেয়ালে মাথা ঠুকে রক্তারক্তি কাণ্ড করে ফেলব।

—আসলে মাসি-মেসোর সারা জীবনের দুঃখকষ্ট বোধ হয় এখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে মা। আমি যদ্দুর জানি মাসিদের বিয়েটা ওঁদের কারও বাড়িতেই মেনে নেয়নি বলে চিরদিন ওঁরা একা। একা একাই সব সামাল দিতে হয়েছে। অমৃতার ঠাকুমা বোধহয় নাতনি হওয়ার পর ওদের বাড়িতে চলে এসেছিলেন। অমৃতার মামার বাড়িতে কে আছে না আছে, আমি জানিই না। বুঝতে পারি, এঁদের ভীষণ সাফারিং। অত তো স্ট্রাগ্‌ল করে দিন কাটাচ্ছিলেন, তার ওপর হল মাসির ওই রকম দুরারোগ্য অসুখ। .

নিবেদিতা রান্নার শেষে এখন রান্নাঘর পরিষ্কার করছেন। তাঁর হাতে একটা ঝাড়ন আস্তে আস্তে তেলচিটে হয়ে উঠছে। শম্পা হঠাৎ দেখল তার মা যেন বড্ড রোগা হয়ে গেছে, যেন বুড়োটে, অথচ মায়ের মাথায় পাকা চুল দেখাই যায় না। কতই বা বয়স হবে মায়ের। চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ! সে অমৃতার মা বাবার দুঃখ-দুর্দশার কথা বলছিল, একাকিত্বের কথা বলছিল বটে, কিন্তু তার মায়ের দুঃখ-দুর্দশাও তো কিছু মাত্র কম নয়। তার পাঁচ বছর বয়সে হঠাৎ এনকেফেলাইটিস হয়ে তার বাবা চোদ্দো-পনেরো দিন ভুগে মারা গেলেন। তার মামারা যথেষ্ট অবস্থাপন্ন। বড় জন দিল্লিতে থাকেন। কিন্তু ছোট মামা তো থাকেন এখানেই কোম্পানির ফ্ল্যাটে দেওদার স্ট্রিটে। বাবার কাজকর্ম চুকে গেলে একমাত্র ছোট বোনকে না কি বলেছিলেন—আমার উচিত ছিল তোকে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু কম্প্যানির দেওয়া ফ্ল্যাট, আত্মীয়স্বজন অ্যালাও করে না বুঝলি তো!

নিবেদিতা না কি বলেছিলেন—না দাদা, এ বাড়ি আমার শ্বশুড়বাড়ি। ওঁর বাড়ি। এখান ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না। তা ছাড়া স্কুল এখান থেকে খুব কাছে।

নিবেদিতা তখনও তাঁর স্বামীর অফিস থেকে প্রাপ্য টাকা-পয়সার কিছুই পাননি। ছোট মামা টাকা-পয়সার দরকার আছে কি না আছে একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলেন না। আর এদিকে তার জ্যাঠামশাই? তিনি অবশ্য উদার স্বরে বললেন, বউমা ভেবো না, আমাদের যখন জুটছে, তোমাদেরও

জুটে যাবে, আলাদা সংসার আর রাখার দরকার কী? তবে আস্তে আস্তে নিবেদিতা তাঁর ভাসুরের রান্নাঘরে ঢুকে যেতে লাগলেন। এই সময়ে যেমন স্বামীর টাকা-পয়সাগুলো পেলেন, তেমন একটা চাকরি দেবার অফারও পাঠাল ওরা। নিবেদিতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর ভাসুর ও জা অনেক বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। শরীর থাকবে না বউমা, কেন তুমি চাকরি করতে যাবে? কিন্তু নিবেদিতা তত দিনে বুঝে গেছেন এ সব কুম্ভীরাশ্রুর মানে। কোনও মতে যদি মাঝের দেওয়ালটা ভেঙে দেওয়া যায়। গোটা বাড়িটাই ওঁদের হয়ে যাবে, উপরন্তু জুটবে একটি বিনা মাইনের রাঁধুনি, একটি ফাই ফরমাশ খাটার মেয়ে।

আশ্চর্য হয়ে শম্পা ভাবে—কেন সব মৃত্যুর গল্প, সব বিধবার গল্পই এ রকম এক রকম! কেন অন্য কিছু হয় না। স্বামী মারা গেলেই বিধবার ভাসুর দেবর জা-রা স্বার্থপর ধান্দাবাজ হয়ে ওঠে কেন? স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব তো বলে—আহা, এই বয়সে স্বামী মারা গেল, ওই টুকুনি মেয়ে নিয়ে বেচারি এখন কী করবে? খাওয়া-পরার বা শিক্ষা-দীক্ষার ভাবনা নেই, সে তো আমরাই আছি, ওর নিজেরও কিছু টাকা-পয়সা আছে, কিন্তু—শোক? এই শোক এই একাকিত্ব? এগুলো কাটিয়ে ওঠার কী মন্ত্র ওদের আমরা দিতে পারি?

শম্পাকে মা কোনওদিন সেভাবে সংসারের কাজ করতে দেননি। অসম্ভব কর্মঠ মানুষ নিবেদিতা। এখনও শম্পার ও নিজের ব্লাউজ পেটিকোট সেলাই করেন। সালোয়ার-কামিজ তো করেন হেলায়। আর এই সব করেন দশটা পাঁচটার চাকরি করে। রান্না করে। ঘর পরিষ্কার করা ও বাসন মাজার একটা ঠিকে লোক আছে তাদের। বাস। শম্পা মাঝে মাঝে শখের রান্না করে, ঘরদোরও অবশ্য গোছায়, বিছানা ঝাড়ে, কিন্তু কোনওটাই দায়িত্ব নিয়ে নয়। সে যদি একদিন তাড়াহুড়োয় বিছানা ঝাড়তে ভুলে যায়, মা কিছুই বলবে না। নিজে ঝেড়ে দেবে।

সে হঠাৎ মার হাত থেকে ঝাড়নটা কেড়ে নিয়ে বলল—কী এত পরিষ্কার করছ মা! দাও বাকিটা আমি করে দিচ্ছি।

নিবেদিতার একটু হাঁপানি আছে। তিনি বললেন—তুই পারবি? আমি তাহলে খোলা হাওয়ায় গিয়ে একটু নিশ্বাস নিয়ে বাঁচি। শোন গ্যাসটা ভাল করে মুছবি। ওভন দুটোয় আর এই তলার লোহার পাইপটায় একটু কেরোসিন ঘষে দিবি। তলায় সবুজ বোতলটায় কেরোসিন আছে। ওভন মোছার আর ধাপিটা মোছার ঝাড়ন আলাদা। একটু সাবান নিয়ে নিস। নইলে উঠবে না। সবশেষে একটু ফিনাইল দিবি। পারবি তো এত সব?

—এত করার দরকার কী মা?

—এত? ওভনগুলোয় মরচে ধরে জং ধরে গেলে পাল্টাতে হবে। ধাপিটা যদি ছেড়ে দিস এমন তেলচিটে হয়ে যাবে যে সে আর কহতব্য নয়। ফিনাইল দিলে পোকা-মাকড় আরশুলার হাত থেকে কিছুটা রেহাই। থাক তুই পারবি না। আমায় দে।

—না, না, পারব। জাস্ট জিজ্ঞেস করেছিলাম।

মা, রান্নাঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেলে, ঝাড়ন দিয়ে শম্পা তার নিজের যাবতীয় দুঃখ, সন্দেহ, অপমান সব প্রবল বেগে ঝাড়তে থাকল। দুঃখ মুছতে মুছতে কেমন একটা চকচকে আকার ধারণ করে, আর দুঃখ থাকে না শুধু, যেন ট্রাজেডি হয়ে যায়—ট্রাজেডি অফ শম্পা সেন, হু ট্রাস্টেড। না শুধু শম্পা কেন, ট্রাজেডি অফ নিবেদিতা সেন হু লস্ট হার হাজব্যান্ড অ্যাট দা এজ অফ থার্টি ওয়ান। মুছতে মুছতে তার সন্দেহ এক অমোঘ সত্য রূপে, বিশ্বাসঘাতকতা রূপে দেখা দেয়, তার অপমান হয়ে যায় আত্মসম্মান। শুধু আত্মসম্মান বললে যেন সবটা বলা হয় না, হয়ে ওঠে আত্মমর্যাদা। এতক্ষণ যে তার প্রবল মন খারাপ করছিল তার মধ্যে তো শুধু অমৃতাই ছিল না, সে নিজেও ছিল।

মা বেরিয়ে যাবার পরে, শম্পা আর একবার গা ধুয়ে নিয়ে ভাল করে সাজল। গরম পড়ে গেছে। একটা হালকা, নতুন ছাপা শাড়ি বাছল সে। ঠোঁটে একটু মেরুন ধাঁচের লিপস্টিক, চোখে

হালকা করে আই-ব্রো পেনসিল। বেণীটা ঝুলতে থাকল, কপালে একটা মেরুন রঙের ছোট্ট টিপ পরে সে ছাতা আর মেরুন ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রয়েজ কমপিউটার ফার্মে কাজ করতে করতেই আরও বেশ কয়েকটার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেছে। মনে হয় কোনও একটাতে হয়েই যাবে।

প্রথম সে ঢুকল 'উইলপাওয়ার'-এ—মিঃ মিশ্র আছেন? একটু দেখা করব।

—আপনার নাম?

—শম্পা সেন, ফ্রম 'রয়েজ'। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক পড়ল।

—আরে মিস সেন—কী ব্যাপার? 'রয়েজ'-এর জন্য কী করতে পারি, বলো।

—'রয়েজ' নয়, আমার জন্য করতে হবে।

—তোমার জন্য? তুমি ওখানে নেই?

—আছি এখনও। কিন্তু থাকবার ইচ্ছে নেই। প্লিজ কীপ ইট সিক্রেট।

—তা না হয় রাখলাম। কিন্তু তুমি ঠিক কী চাইছ?

—বেটার ওয়ার্কিং অ্যাটমসফিয়ার, অ্যান্ড ন্যাচার্যালি বেটার পে। অ্যানালিস্ট হিসেবে আমার তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেল। আমি কি একটা প্রমোশন আশা করতে পারি না?

—ওয়েল, অফ কোর্স, কিন্তু তুমি আবার যদি হুট করে 'উইল পাওয়ার'ও ছেড়ে দাও?

—তেমন কোনও কারণ ঘটলে তো ছেড়ে দেবই। আপনাদের নিজেদের স্বার্থেই তেমন কিছু ঘটাবেন না।

—তোমার ফ্র্যাংকনেস আমাকে মুগ্ধ করেছে মিস সেন। আমাকে দু'দিন সময় দেবে? আমি আমাদের পোজিশনটা একটু রিভিউ করে নিতে চাই।

—সময় দিতে পারব না মিঃ মিশ্র। আপনার যা রিভিউ করার এক্ষুনি করে নিন। ফ্র্যাংকলি স্পিকিং আমি এক্ষুনি আরও কয়েকটা অর্গ্যানাইজেশনে যাব। একটা না একটায় পেয়ে যাব ঠিক।

—আচ্ছা! এত তাড়া?

—এতই তাড়া।

—ঠিক আছে। তোমাকে রেখে নিচ্ছি। কিন্তু প্রজেক্ট নিয়ে বাইরে যেতে হতে পারে।

—মোস্ট ওয়েলকাম। শুধু থাকার বন্দোবস্তের সময়ে যদি মনে রাখেন আমি মেয়ে তাহলেই আর কোনও অসুবিধে থাকবে না।

তিন দিন পরে 'রয়েজ'-এ পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়ে 'উইলপাওয়ার'-এ যোগ দিল শম্পা। এ তিনদিন অফিস গেল না। অন্য কোথাও বেরোল না। খালি অমৃতার কথা ভাবল। অমৃতাই তাকে বলেছিল—প্রস্তাবটা তোর পক্ষে অসম্মানজনক এটা বুঝতে তোর আমার কাছে আসতে হবে শম্পা?

অমৃতা এমনিতেই যাকে বলে প্রাজ্ঞ। তার ওপরে বিবাহিত। বিয়ে মানুষকে অন্য অভিজ্ঞতা দেয়। অনেক পরিণত করে দেয় তাকে। কিন্তু সেই অমৃতা যে না-কি তাকে একটা মহাসর্বনাশ থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল, সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না, কেন? কেন? কী এমন সে পরিস্থিতি যা অমৃতার বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার বাইরে, যা তাকে এমনভাবে পরাজিত করতে পারে? কী সেটা? কী? কী? কী?

মাকে সে জানাল না পর্যন্ত যে সে চাকরি বদল করেছে। মায়ের প্রশ্নের মুখোমুখি এখনই সে হতে চাইছে না। কেন না মায়েরও তার কাছ থেকে কিছু তিরস্কার প্রাপ্য রয়েছে। সৌমিত্রর প্রস্তাবটায় মা না করেনি। অবশ্য, বেড়াতে যাওয়ার কথা সে মাকে বলেনি, কাজের কথা বলেছিল, কিন্তু একমাত্র সৌমিত্রর সঙ্গেই সে যাচ্ছে সে কথা তো গোপন করেনি! মা কী করে তাকে ছাড়তে চাইল! মা নিজে তো বিবাহিত। মা জানে না দিঘায় নির্জন মুহূর্ত আসতে পারে? মা জানে না সৌমিত্র আগেই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে? মা জানে না এরকম পরিস্থিতিতে একজন মেয়ের কাছে একজন পুরুষ কী হয়ে উঠতে পারে?

আসলে লোভ! অস্বীকার করে লাভ নেই তার মা যে কোনও মূল্যে এই বিয়েটা চেয়েছিল।

মায়ের মতো রক্ষণশীল আবহাওয়ায় বড় হওয়া, বাস করা একজন মহিলা। মেয়ের বিয়ে হবে, এই লোভে তিনি মেয়েকে বাঘের মুখে ছেড়ে দিতে দ্বিধা করলেন না। কী করে সে আর মায়ের ওপর আস্থা রাখবে? অমৃতা, অমৃতাই তাকে বাঁচার মন্ত্র দিয়ে গেছে। নিজে মরে। না, না, অমৃতা, তুই কখনও মরতে পারিস না, অমৃতা তুই অমৃতা। তুই কখনও অতি নশ্বর মানুষদের ভাগ্য স্বীকার করে নিস না। আমি শম্পা, তোর ছোটবেলার বন্ধু, কত ঈর্ষা করেছি তোকে, কত জ্বালিয়েছি অভিমান করে করে, কিন্তু আমি তোকে ভালবাসি, আমি তোকে শ্রদ্ধাও করি, পূর্ণ আস্থা আছে আমার তোর শক্তি, তোর বুদ্ধির ওপরে। অমৃতা তুই কোনও জ্যোতির্বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে একবার দেখিয়ে দে। সংসারে ভালমানুষদের, ভাল মেয়েদের ক্ষতি হয় না, কেউ করতে পারে না।

গরম চোখের জল টপ টপ করে পড়ে শম্পার চিবুক, গলা, ওপর বুক সব ভিজিয়ে দিতে লাগল। কী এখন করবে সে? অমৃতার জন্য কিছুই করতে পারবে না? কিছু না?

হঠাৎ একটা সংকল্প জাগল তার। সে টেলিফোন ডাইরেক্টরির পাতা খুলে কয়েকটা ফোন নম্বর টুকল।

—হ্যাললো, যাদবপুর থানা? ও.সি.র সঙ্গে একটু কথা বলব।

—বলছি।

—আপনাদের অঞ্চলে ৪/১এ সেন্ট্রাল পার্কে অমৃতা গোস্বামী...।

—আপনি কে বলছেন?

—ওর বন্ধু!

—নাম?

—নামে দরকার নেই। আমার বন্ধুকে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এবং 'উজ্জীবন' নার্সিংহোমের ডাক্তার মিলে কিছু করেছে।

—কিছু করেছে মানে কী?

—মানে খুন করেছে কি না জানি না। আপনাদের জানবার কথা, আপনারা ইনভেস্টিগেট করুন।

সে ফোন নামিয়ে রাখল। তারপর করল বালিগঞ্জ থানায়। ওঁরা বললেন ওটা কড়েয়ার কেস।

—হ্যাললো কড়েয়া থানা।

—ইয়েস

—ও.সি-র সঙ্গে একটু কথা বলব...।

—ধরুন...।

—একটু পরে ভীষণ গম্ভীর বাজে মতো গলায় প্রশ্ন এল—কে বলছেন? আমি কড়েয়া থানার ও.সি.।

—আপনাদের এলাকায় 'উজ্জীবন' নার্সিংহোম থেকে।

—দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনি কে?

—আমি অমৃতার বন্ধু। সে নিখোঁজ হয়েছে। এখনও খোঁজ দিতে পারছেন না কেন? 'উজ্জীবন'-এর পেছনের পুকুরটা দেখেছেন?

—মেয়েটি পুকুরে আত্মহত্যা করেছে এ ধারণা আপনার হল কেন?

—আত্মহত্যা নয়। কখনও নয়, হয় হত্যা করে ওকে ওখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আর নয় তো অ্যাকসিডেন্ট। রাতে হয়ত ওর ফোন এসেছিল ভাল বুঝতে পারেনি—নেমে আধা-আচ্ছন্ন অবস্থায় পুকুরে।

—ফর ইয়োর ইনফর্মেশন পুকুরটা চারপাশ থেকে জাল দিয়ে ঘেরা। আপনার নাম?

—শম্পা সেন।

—আবাস?

—কুড়ির-এ ডাফ স্ট্রিট—বলবে না বলবে না করেও শম্পা কী রকম বোকা আনাড়ির মতো বলে ফেলল।

—আপনার সন্দেহের কোনও কারণ? কাকে সন্দেহ করছেন? বাড়িকে? না ডাক্তারকে?

—জানি না। শুধু এইটুকু জানি পুরুষরা ভয়ানক। স্বামীই হোক, জ্যাঠামশাই-ই হোক।

—আর ও.সি-ই হোক। বাজের মতো গলাটা ওপার থেকে গমগম করে উঠল।

হঠাৎ ওরই মধ্যে শম্পার মনটা কেমন ভাল হয়ে গেল। এই কড়েয়া থানার ও.সি. ভদ্রলোক, বাজের মতো গলা, কিন্তু তার সঙ্গে একটু অপ্রত্যাশিত রসিকতা করলেন। এমন একটা সময়ে যখন একটি নিরুদ্দিষ্ট পেশেন্টের কেস ঝুলছে। তাহলে কি উনি অমৃতা সম্পর্কে আশাজনক কোনও খবর শুনেছেন? অবশ্য, সে ভাবে দেখতে গেলে খুন, জখম, রাহাজানি, দুর্ঘটনা, নিরুদ্দেশ সবই এঁদের কাছে জলভাত। এই সব ঘটনা, এই সব ভয়ঙ্কর দৃশ্য, সংশ্লিষ্ট আত্মীয়স্বজনের কান্নাকাটি বিলাপ সবই এঁদের প্রতি মুহূর্তে দেখতে শুনতে হয়। তবু, তবু, কেমন একজন নির্ভরযোগ্য; মানুষ-মানুষ মানুষ বলে মনে হল বজ্র-কণ্ঠকে। এবং পরের ফোনটা যখন এল সে সেটা এই মেজাজেই ধরল।

—আমি সৌমিত্র বলছি। ফোনটা রেখে দিল সে। আবার বাজল। তক্ষুনি।

—আমি সৌমিত্র বলছি। কী করেছি আমি?

কোনও কথা বলতে পারল না সে।

—'রয়েজ' ছেড়ে দিলে!

সে নীরব।

—'উইলপাওয়ার' জয়েন করছ?

সে নীরব।

—তুমি কী করে জানলে 'উইলপাওয়ার'-এ সৌমিত্র দাসের মতো খারাপ কোনও লোক নেই।

আস্তে খুব আস্তে সে বলল—জানি না।

—তবে?

—ধরেই নিয়েছি।

—কী ধরে নিয়েছ! ওখানেও সৌমিত্র দাস আছে?

—হ্যাঁ।

—তবে?

—ট্যাক্‌ল করতে পারব এবার।

—কী ভাবে?

—সর্বতোভাবে অ্যাভয়েড করে।

—ভাল।

ও পাশে ফোন রেখে দেবার শব্দ হল।

যে মন কড়েয়া থানার ও.সি. ভাল করে দিয়েছিলেন, সে মন সৌমিত্র দাস আবার খারাপ করে দিয়ে গেল।

—তুমি শম্পা না? অমৃতার বন্ধু।

—তুমি দোলা, য়ুনিভার্সিটিতে...।

অপ্রত্যাশিতভাবে ওদের দেখা হয়ে গেল পার্ক স্ট্রিট রাসেল স্ট্রিটের মোড়ে। শম্পা একা। দোলার সঙ্গে অবশ্য একটি অতি রূপবান যুবক। দোলা বলল—শুধু য়ুনিভার্সিটি কেন? আমি তো কলেজ থেকেই ওর সঙ্গে আছি। তোমার সঙ্গেও। তুমি সায়েন্সে ছিলে বলে বেশি দেখা হত না। অনেকদিন পর তোমায় দেখছি।

—আমি তো চাকরি করি।

—কোথায়?

—আগে 'রয়েজ কমপিউটার'-এ ছিলাম রফি আমেদ কিদোয়াই স্ট্রিটে। এখন এই রাসেল স্ট্রিটে 'উইলপাওয়ার'-এ এসেছি। তুমি?

তখন সবে গোধূলি ফুরোচ্ছে। শম্পা বাড়ি ফিরছে। সব দিন সে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে না অবশ্য। আজ দোলা, দোলাদের সঙ্গে দেখা হবে বলেই বোধ হয়...

শাঁ শাঁ করে গাড়িগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। আলো জ্বলে উঠছে রাস্তার। দোলা বলল—আইসক্রিম পার্লারে যাচ্ছিলাম। এ আমার বন্ধু অমিত।

—রে নয় তো? শম্পা হেসে জিজ্ঞেস করল।

—রে হতে হলে আবার অমিট্-ও হতে হয়। অমিত ছেলেটি বলল। রে আপাতত একজনই এ দেশে—সত্যজিৎ রে। স্ট্রেইট ফ্রম দা সান।

—আপনি অভিনয় করেন?—শম্পার আসলে মনে হল ছেলেটির এমন ফিগার, এমন চেহারা, মুখ চোখ, তার ওপর সত্যজিৎ রে-র কথা বলছে, ও হয়তো!...।

হেসে উঠল ছেলেটি, বলল—প্রতিদিনকার লাইফে যেটুকু অভিনয় বাধ্যতামূলকভাবে করতেই হয় তার বাইরে আর কোনও অভিনয় আমি করি না।

সন্ধেটা ঝপ করে নেমে গেল। দোলা বলল চলো না শম্পা, তুমি তো বাড়িই ফিরছ, আমাদের সঙ্গে চলো না প্লিজ

—টু ইজ কম্প্যানি, থ্রি ইজ ক্রাউড—শম্পা ভেতরে ভেতরে একটু কুঁকড়ে গিয়ে বলল।

অমিত বলল—টু ইজ কনভার্সেশন। থ্রি ইজ ডিসকাশন। প্লেজেন্ট, থ্রিলিং। চলুন। একটু মুখ ঠাণ্ডা করে আসা যাক। যা গরম!

শম্পা আর একটু গাইগুঁই করেছিল, কিন্তু দোলা কিছুতেই ছাড়বে না।

প্রথম সন্ধের এই পার্ক স্ট্রিট শম্পার ভীষণ পরিচিত, ভীষণ প্রিয়। তারা এদিকটায় এলে রাসেল স্ট্রিটেই নিজের গাড়ি পার্ক করত সৌমিত্র। বার্গেন কাউন্টার থেকে রিডাকশন সেল-এ তোয়ালে, বেড শীট কিনত শম্পা। ওই দিকে ব্লু ফক্স, আরও এগিয়ে ওয়ালডর্ফ। এগুলো তাদের নিজস্ব জায়গা। যেন মার্কা মারা আছে।

দোলার কোনও বয়ফ্রেন্ড আছে জানত না সে। থাকতেই পারে। কতদিন পরে দেখা হল তাদের। দোলা আগে খুব দোহারা গোলগাল মাখন মাখন ধরনের মেয়ে ছিল, দেখলেই বোঝা যেত, বড়লোকের আদুরি। গালগুলো শীতকালে লাল হয়ে যেত একটু ফেটে। কাঁধ পর্যন্ত সোজা চুল। দোলার বন্ধুদের একটা খেলাই ছিল দোলার ভুঁড়িতে কাতুকুতু দেওয়া।

এখন কি দোলা একটু লম্বা হয়েছে। আঠারো উনিশের পর মেয়েরা আর লম্বা হয়? সেই গোলগাল ভাবটা ওর আছেই এখনও। কিন্তু এখন আর কেউ ওর ভুঁড়িতে কাতুকুতু দেবে না। মোছা মোছা ভুরু, ছোট চোখ, ঠোঁট দুটো মিলিয়ে একটা গোল মতো কমলার কোয়ার মতো। তাইতেই লাবণ্য ফেটে পড়ছে ওর। লাইল্যাক রঙের একটা সালোয়ার কামিজ পরেছে, অদ্ভুত অ্যাট্রাকটিভ দেখাচ্ছে। শম্পা যেতে যেতে একবার পাশের দোকানের কাছে নিজের ছায়াটা দেখে নিল। লম্বা, কালো, পোড়খাওয়া, সাজগোজ করা একটা মেয়ে। দোলা যেন একটা আকাশের মতো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তার কোনও রঙ লাগে না। আর শম্পা একটা বাজ পড়া গাছ। গাছটাতে আদিবাসীরা গোবর মাটি আর সিঁদুর লেপে গেছে। আর দোলার সঙ্গের ছেলেটি? যেমনি লম্বা তেমনি অদ্ভুত সুন্দর একটা শ্যামের ওপর লালচে রঙ ধরা ত্বকের জৌলুষ। মুখ চোখ কেমন, তাকিয়ে তাকিয়ে তো আর দেখা যায় না। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ শম্পা বলল—মা ভাববে দোলা, আমি বরং চলেই যাই।

দোলা হঠাৎ ওর হাতটা ধরে ফেলল, কানের কাছে মুখ এনে বলল—প্লিজ ডোন্ট টেল এনিবডি।

অমিত বলল—কী হল?—সে একটু এগিয়ে গিয়েছিল।

দোলা বলল—দ্যাখো না শম্পা আসতে চাইছে না।

—তার মানে একজন অ্যাট্রাকটিভ লেডির সঙ্গ থেকে আমি বঞ্চিত হচ্ছি?

শম্পা বলল—মনে পড়ে গেল বাড়িতে একটু তাড়াতাড়ি ফেরার আছে। প্লিজ কিছু মনে করবেন না।

—আপনাকে দেখে কিন্তু এত গরমেও ঠিক বাড়ি ফিরতি মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এইমাত্র বিউটি পার্লার থেকে বেরোলেন কোনও বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে...।

শম্পা লজ্জা সামলে বলল—কম্পুটার-এর কাজ তো। সারাক্ষণ এ.সি.-র মধ্যে থাকি। আচ্ছা আসছি। ভাগ্যে থাকলে আবার দেখা হবে।

ফিরতে ফিরতে শম্পা ভাবল—কোন বুদ্ধিতে সে ওদের সঙ্গে যাবার উদ্যোগ করছিল? কে না জানে প্রেমিক-প্রেমিকারা একা থাকতে চায়?

মুখের কথা কখনও মনের কথা হয় না কি? দোলা মুখে বলছে এসো এসো, মনে মনে বলছে যাও যাও। তারও এমন দিন ছিল। সে আর সৌমিত্র অবশ্য ঠিক রোম্যান্টিক প্রেমিক-প্রেমিকা ছিল না। সৌমিত্র একটু প্র্যাকটিক্যাল গাদ্যিক ধরনের মানুষ। শম্পার ভেতরে রোমান্টিকতা কি আর ছিল না? কিন্তু সেই রোম্যান্টিকতার চাহিদা মেটেনি বলে তার কোনও নালিশ ছিল না। শক্তিশালী, প্র্যাকটিক্যাল পুরুষ। তারা হয় নির্ভরযোগ্য, দায়িত্বশীল, মিষ্টি মিষ্টি কথার ঝুড়ি নয়, হিম্যান। হঠাৎ সে চমকে উঠল—কী ভাবছে সে? সৌমিত্র দাস নির্ভরযোগ্য? দায়িত্বশীল? এই তার ধারণা তার চেহারা, কথা-বার্তা থেকে? না শুধু তাই নয়, অফিসের মধ্যে তার কাজ কর্ম থেকেও। কে জানত সেই দায়িত্বশীল মানুষটার মুখ থেকে এমন একটা উড়নচণ্ডে অশালীন প্রস্তাব আসবে?

এখন সমস্ত বাসে ট্রামে প্রচণ্ড ভিড়। শম্পা হাঁটতে লাগল। হাঁটতে লাগল। ট্রাম গুমটিতে গিয়ে দাঁড়াবে, লাইন দেবে। তারপর নিজের পালা এলে চড়তে পাবে ট্রামে, যদি না কেউ কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে এগিয়ে যায়। তার চেয়ে পাতাল রেলে যাওয়া ভাল। শোভাবাজার স্টপে নামতে হবে সম্ভবত। বেশ খানিকটা ফিরতে হবে তারপর। কিন্তু যাওয়াটা হবে খুব তাড়াতাড়ি। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট বড় জোর।

পাতালে নেমে ট্রেনে বসতে পেয়ে গেল শম্পা। হঠাৎ তার মনে হল—ভালবাসা জিনিসটা ঠিক কী? এই যে বাবা মা স্থির করে দিচ্ছেন ছেলে মেয়েরা বিয়ে করছে যেমন অমৃতা করেছিল—তার মধ্যে দেখাই তো যাচ্ছে ভালবাসা ছিল না, একটা পরের বাড়ির মেয়ে তার বাবা-মা নিজের কত অভ্যাস, কত ভালবাসার জিনিস ছেড়ে অন্যের বাড়ি আসছে, তাকে তো সাদর অভ্যর্থনা করতে হবে, ভালবাসা, স্নেহ, আশ্রয় দিয়ে নিশ্চিন্ত করতে হবে, অথচ প্রথমেই লোকে চোখ বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করবে—বউ কেমন হল? মানিয়ে নিচ্ছে তো? আরে বাবা তোমাদেরই তো তার সঙ্গে মানাতে হবে! তার যা কিছু অভ্যাস সে একদিনে পাল্টে ফেলতে পারবে কেন? আর পাল্টাবেই বা কেন? তার জ্যাঠতুতো দাদার বউ এল, জেঠিমা দু-দিন পরই মুখ বেঁকিয়ে বললেন—সকালে বাসিমুখে চা না খেলে তার মাথা ধরে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। আচ্ছা, সে বেচারি কী করবে? এই অভ্যেসটা সে গত দশ কি পনেরো কি তারও বেশি বছর হয়তো করেছে। তামাক তো আর খায় না! বেড-টি অনেকেই খায়। এখন শাশুড়ি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন বলে তাকে যদি এক্ষুনি অভ্যেসটা পাল্টাতে বলা হয় সে কি পারবে? এটা অন্যায় নয়? এরা একবাড়ি লোক, নিজেদের পরিবেশ নিজেদের লোকজন নিজেদের অভ্যেসের মধ্যে বাস করবে, আর সে সব ছেড়ে এসে বেমালুম এদের মতো হয়ে যাবে? সাধে কি আর তখনকার মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যেতে মরাকান্না কাঁদত? এখনও কাঁদে। যাদের একটু বয়স বেশি, পঁচিশ-ছাব্বিশ তারা তবু একটা লড়াই দিতে পারে, তার চেয়ে ছোটরা স্রেফ হতবুদ্ধি

হয়ে যায়। অসুখী হয়, অশান্তিতে জ্বলে। অমৃতাটার কী হয়েছিল কে জানে? বড্ড চাপা মেয়ে, তেমন কিছু বলত না। কিন্তু আজকে এই দোলার মুখে যে আভা সে দেখেছে, অমৃতার মুখে কোনওদিন তা দেখেনি। অর্থাৎ বিনা ভালবাসায় এক ছাদের নীচে সহবাস কতকগুলি সহানুভূতিহীন মানুষের সঙ্গে, একটি পুরুষের সঙ্গে সহবাস বিশেষ অর্থে। সে এমন শিউরে উঠল, যে পাশের যাত্রিনী তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে নড়েচড়ে বসলেন।

সৌমিত্রর সঙ্গে তার যেটা ঘটেছিল, সেটাও কিন্তু ভালবাসা নয়। একটা ব্যবস্থা। অ্যারেঞ্জমেন্ট। এই যে এতদিন তাদের দেখা হল না তার জন্য সে বা সৌমিত্র কেউই কি বিন্দুমাত্র বিচলিত? বিচলিত সে অপমানে, সৌমিত্রও নিশ্চয় অপমানিত বোধ করেছে, সে দিনের ফোনালাপে। সে তো বুঝিয়েই দিয়েছে সৌমিত্র দাসকে সে কতটা খারাপ ভাবে। তাদের পরস্পরকে না হলেও চলবে। একটা পারস্পরিক বন্দোবস্ত হতে যাচ্ছিল, হল না। ভাগ্যিস, অমৃতা তাকে সাবধান করেছিল! অথচ বাইরে থেকে লোকে তো এটাকে ভাব ভালবাসাই বলবে? বিয়েটা হলে সকলেই বলত, ওরা নিজেরা দেখেশুনে করেছে, প্রেমের বিয়ে। প্রেম জিনিসটা কী তা সে বুঝতেই পারছে না। কারও জন্যে তার কোনও টান নেই। অমৃতার স্বামী-ভাগ্যকে ঈর্ষা করে তার খুব শিক্ষা হয়েছে, তার পর থেকেই সে চারপাশের মানুষগুলোকে আরও ভাল করে বুঝতে শুরু করেছে। যেমন সে বুঝতে পেরেছে দোলা ওই অমিত ছেলেটির দারুণ প্রেমে পড়েছে। অর্থাৎ মোহাচ্ছন্ন হয়েছে। তা নয়তো দোলার মতো ধনী বাবা মায়ের আদরের মেয়ে তাঁদের লুকিয়ে ছেলেটির সঙ্গে বেড়াতে আসতে পারে? চুম্বকের মতো একটা টান আছে ওই ছেলেটির। সামলানো যায় না। সে নিজেও যে সে টান অনুভব করেনি তা নয়। যেই ছেলেটি তার দিকে চাইল, তার সমস্ত শরীর যেন শিউরে উঠল। একেই বোধহয় তাহলে সেক্স অ্যাপীল বলে। ছেলেটির চেহারা চিন্তা করলেই রক্তের মধ্যেটা কেমন রিমঝিম রিমঝিম করতে থাকে। রূপান্ধ। রূপের মোহ। সুন্দরী অভিনেত্রীদের যেমন প্রেমে পড়ে ছেলেরা। হ্রস্ব-দীর্ঘ তাল থাকে না। ধনসম্পত্তি তার পায়ে বিলিয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়!

কিন্তু অমিত ছেলেটি কী রকম? তার ধরন ধারণ আগে হলে সে বলত স্মার্ট। এখন মনে হল ওপর চালাক। বেশ চালাক-চালাক কথা বলবে, মেয়েদের কমপ্লিমেন্ট দেবে, ফ্লার্ট করবে। তার মন বলল এ রকম ছেলে নিরাপদ নয়, কিন্তু প্রেম তো! নিরাপদ খুঁজতে গেলে যদি প্রেমের বিরল অনুভূতি ফসকে যায়। তা হলেই বা জীবনে কী লাভ! খালি ভাল খেয়ে পরে, কর্তব্য করে বেঁচে থাকা? যেমন তার মা বেঁচে আছে এখন? অমৃতার বাবা-মা তো ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। দু পক্ষের বাধা অগ্রাহ্য করে। তা হলে তাঁদের রক্তে এই রিমঝিম লেগেছিল? কয়েক বছরের জন্যও তো লেগেছিল! সারা জীবন দুঃখ-ধান্দা করতে করতে সে-প্রেমের কতটুকু টিকে আছে, এখন? বিশেষত মেয়ের এই ট্রাজেডি ঘটার পরে? কে জানে? ওরা হয়তো পরস্পরের প্রতি এতই অনুরক্ত যে মেয়ের বিয়েটা একটু দেখেশুনে দিতেও গাফিলতি করলেন। বোকামি? না অবহেলা?

শম্পার মনে হল সে কেন বিয়ে করতে চেয়েছিল? আশ্রয়ের জন্য, নিরাপত্তার জন্য। আর কিছুর জন্য না। ভাল যদি বাসতেই হয় তো সে একমাত্র মাকে ভালবাসবে। সারা পৃথিবীতে আর কাউকে না। কাউকে না। যেখানে নিরাপত্তা নিশ্চিত সেখানে হয়তো বিয়ে করবে, কিন্তু মাকে চাই। মাকে ছেড়ে সে কোনও আশ্রয় আর খুঁজবে না, খুঁজবে না, খুঁজবে না।

ডাফ স্ট্রিটের বাড়িটা তাদের শক্তপোক্ত, পুরোনো। কিন্তু কেমন একটা মহিমা আছে, পুরনো কিন্তু ভাল জিনিসের যেমন মহিমা থাকে। সিঁড়ি তিনটে ভেঙে, বেল-এ হাত রাখল সে। মা এসে খুলে দিল। আর কে-ই বা দেবে? এ সময়ে তো কোনও লোকজন থাকে না।

মা বলল—আয় শম্পি, দেরি করলি যে?

—কেন? আজ অন্য দিনের চেয়ে তাড়াতাড়িই তো ফিরেছি মা।

দালান পার হয়ে বাইরের ঘরে ঢুকল সে। ঢুকেই স্থাণু হয়ে গেল। সৌমিত্র বসে আছে।

মা একটি কথাতেও তাকে জানতে দেয়নি। বাইরে ওর জেন ডিলুক্সটাও কই দাঁড়িয়ে নেই।

মা বলল—চা খাবি তো করি?

শম্পা কোনও কথা বলতে পারল না। মা একবার তাদের দিকে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সৌমিত্র উঠে দাঁড়াল। ওর রং কালো। সামান্য একটু ভুঁড়ি হয়েছে। মুখটা খুব পুরুষালি, পরিষ্কার কামানো, কিন্তু ঠোঁট দুটো খুব নরম। খানিকটা মেয়েলি। খুব লম্বাও নয়। শম্পা ওর কাঁধ ছাড়িয়ে যায়।

সে বলল—আস্তে আস্তে, খুব নিচু গলায়—আমি বুঝতে পারিনি। আমাকে এবারের মতো মাফ করে দাও শম্পা, দেবে?

আর এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শম্পার রক্তের মধ্যে শুরু হয়ে গেল রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম। কীসের টানে যে সে সৌমিত্রর দিকে এগিয়ে গেল স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো সে জানে না। তার চোখ দিয়ে জল ঝরছে।

সৌমিত্র খুব ভয়ে ভয়ে আলতো করে তাকে ধরল, খুব দামি মুক্তো ধরার মতো রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগল চোখের জল। খুব আস্তে বলল—এ ক'দিন কী ঝড় যে বয়ে গেছে আমার ওপর দিয়ে তা আমিই জানি। শম্পা, প্লিজ ডোন্ট মিসআন্ডারস্যান্ড মি, এভার। হয়তো নিজেকে ঠিক বোঝাতে পারি না, বাট আই অলওয়েজ মীন ওয়েল।

শম্পার ভেতরে অনেক কথারা ভিড় করে আসছিল। সৌমিত্র, সৌমিত্র, তুমি কেন বিয়ের আগে দিঘা বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দিলে? এটা তো আমেরিকা-ইয়োরোপ নয়, এখানকার একজন মেয়ে কী ভাবতে পারে এ কথা শুনলে? আমি ভুল বুঝেছি ঠিক আছে। কিন্তু তুমি কী বুঝেছিলে? আমাকে কী বুঝে, কী ভেবে তুমি...তুমিও তো কিছু ইয়াংকি নও। তোমারও তো কিছু কিছু ইনহিবিশন থাকার কথা, সামাজিক, ব্যক্তিক। এ তো শুধু আমার ভুল বোঝা নয় সৌমিত্র, সমস্ত সমাজ, সমাজের সমস্ত মানুষ ভুল বুঝত। একবার যদি ভুল করে—লোভে পড়ে দিঘা চলে যেতুম, ফেরবার পর আমি আর এই শম্পা থাকতুম না, সারা পৃথিবীর মূল্যায়নে আমি একটা আলাদা শম্পা হয়ে যেতুম, হয়তো বা তোমার চোখেও...হয়তো কেন নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই...।

কিন্তু এত সব কথার একটাও বলতে পারল না সে। চোখ দিয়ে একটার পর একটা ফোঁটা গড়াতে লাগল। পেছনের ফোঁটাটা সামনের ফোঁটার সঙ্গে মিশে একটা অবাধ অনর্গল অশ্রুধারা তৈরি করতে লাগল।

শুধু যখন চূড়ান্ত বিচলিত সৌমিত্র ভয়ে ভয়ে বলল, শম্পা, এত কাঁদছ কেন? তোমাকে হার্ট করে আমি ভীষণ অনুতপ্ত, প্লিজ শম্পা...তখন সে কোনওমতে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলতে পারল—'এরকম আর কখনও কোরো না। কখনও না।'

৯

ডঃ রঞ্জন কার্লেকরের সঙ্গে অরিন্দম ঘোষের কথা হচ্ছিল। এখন ভোর ছটা। এই সময়টার কার্লেকর কর্মমুক্ত থাকেন, হঠাৎ কোনও কঠিন ডেলিভারি কেস না এলে। এই সময়টায় তিনি তাঁর ছোট্ট বাগানে কাজ করেন। খুরপি দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি কুপিয়ে দেওয়া, সার টার দেওয়া, জল দেওয়া এগুলো সব তিনি নিজেই করেন। একজন মালি আছে, সে দু সপ্তাহ পরপর এসে ঘাস ছেঁটে দিয়ে, অন্য কিছু করবার থাকলে করে দিয়ে যায়। কিন্তু সেটা পাক্ষিক ব্যবস্থা। দৈনিকেরটা তিনি নিজেই করেন, যদি কোনও দিন পেশার কারণে করতে না পারেন তাঁর অস্বস্তি হয়। গাছগুলোও তাদের অভ্যস্ত পরিচর্যা না পেয়ে বোধহয় মনমরা থাকে। কিন্তু আর কারও থেকে কিছু আশা করে না।

কার্লেকরের স্ত্রী রম্ভা কার্লেকর নটার আগে ঘুম থেকে ওঠেন না। উঠে হাই-টাই তুলে আড়মোড়া-টোড়া ভেঙে তিনি বেড-টি খান। তারপর সংসারের কাজে লাগেন। রম্ভা ছিলেন রঞ্জনের ক্লাস ফেলো। তুমুল প্রেম করে দুজনের বিয়ে হয়েছে। রম্ভা উত্তর প্রদেশীয়, কিন্তু এমন ভাবে রঞ্জনের পরিবারের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন যে কোনও তফাত বোঝা যেত না। রঞ্জনের পদবি কার্লেকর হলেও এঁরা আর মারাঠি নেই। বাপ-ঠাকুর্দা—তাঁর ঠাকুর্দা এই রকম বহু পুরুষ বাংলায় বাস করা মানুষদের মতো তাঁরাও বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন। রম্ভাকে কিন্তু প্রেমিকের পরিবারের বাঙালিয়ানা শিখতে হয়েছিল। রঞ্জনের কেরিয়ার ডিগ্রির অর্থে যখন তুঙ্গে, অর্থাৎ ইংল্যান্ডে এম.আর.সি.ও.জি করেছেন তখন অন্য কোনও তরুণীর সঙ্গে রঞ্জন জড়িয়ে পড়ছেন বুঝে রম্ভা নিজের প্র্যাকটিস জলাঞ্জলি দিয়ে, লন্ডন পাড়ি দিয়েছিলেন। হয়তো তিনি যতটা উতলা হয়েছিলেন, ততটা কিছু হয়নি। কিন্তু সেই থেকে রঞ্জনকে চোখের আড়াল না করা তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। প্র্যাকটিস করেন না। উপভোগ করেন জীবন এমনি অলসভাবে, ছেলেটি দুন স্কুলে পড়ে, মেয়েটি দার্জিলিং লোরেটোয়। রঞ্জন বহুবার বলেছেন তাঁর নার্সিংহোমে যোগ দিতে, কিন্তু রম্ভা ওসব দিকে আর যাননি। সুন্দরী রোগিণী দেখলেই তাঁর বুক কাঁপত। এখন একটা বিউটি পার্লার করেছেন। পার্লারের সঙ্গে আস্তে আস্তে যোগ করে চলেছেন হেলথ ক্লাব, কসমেটিক সার্জারি ইউনিট, কিন্তু দুপুরবেলা অর্থাৎ বারোটা থেকে চারটে কি বড় জোর পাঁচটার পর তিনি আবার বাড়িতে। সল্টলেকের এই বাড়ির অঙ্গসজ্জা তিনি কয়েকমাস পরপরই পাল্টে দেন। কেউ যদি গৃহসজ্জা নিয়ে তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে আসে তাও তিনি সানন্দে দিয়ে থাকেন, সাহায্য করেন। কিন্তু সে অর্থে তিনি কোনও পেশার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েননি। তাঁর মন সব সময়ে সতর্ক হয়ে থাকে রঞ্জনকে নিয়ে। তার যত্ন হচ্ছে কিনা, সে ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া-ব্যায়াম করছে কিনা, তার পোশাক-আশাক, তার গাড়ি, তার শোফার, তার নার্সিংহোমের স্টাফ, রাত্তিরে নিতান্ত দরকার না পড়লে তার বেরোনো বা না বেরোনো—এই সবেরই তিনি খোঁজ রাখেন। এক হিসেবে তিনিই রঞ্জনের জগতের মালকিন। রঞ্জন তাঁকে জানতে না দিয়ে তাঁর কিছু মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা করিয়েছেন। ছেলে-মেয়েকে দূর স্কুলে পাঠাবারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু রম্ভাকে তাঁর বেছে নেওয়া জীবন যাত্রা ও সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়ানো যায়নি।

ভোরবেলার বাগান। খুব সুন্দর ভোরালো হাওয়া দেয়। হাওয়ার মধ্যে মিশে থাকে স্বাস্থ্যের গন্ধ, গাছপালার এবং মানুষের। এ দিকটাও তো একটু খোলামেলা, অনেক নিয়মিত পদচর্চাকারী এই সময়ে তাঁর বাগানের পাশ দিয়ে চলে যান। হয় যাচ্ছেন, নয় ফিরছেন। তাঁদের সকাল আরও অনেক আগে হয়। কিন্তু ডঃ কার্লেকর বহু চেষ্টা করেও এর আগে বাগানে নামতে পারেন না। তাঁর অনেক রাত পর্যন্ত কাজে যায়, অনেক দিনই রাতে নার্সিংহোম থেকে কল আসে, নার্সিংহোমের কাজ সেরে এসে তিনি দেখেন উৎকণ্ঠিত রম্ভা ঘরবার করছে। রোগীর জন্যে, স্ত্রীর জন্যে এই ডবল উৎকণ্ঠায় তাঁকে সিডেটিভ খেতে হয়। এর আগে তিনি উঠতে পারেন না। তবে এই সময়টুকু তিনি একেবারে পরিপূর্ণ উপভোগ করেন। মনটাকে করে দেন সম্পূর্ণ চিন্তাশূন্য। চোখ থাকে গাছের মূলে, হাতে থাকে আদিম লোহার স্পর্শ আর চিরকালীন মাটির ছোঁয়া। শরীরের ত্বকে লাগে অলৌকিক ভোরের হাওয়া।

—ডঃ কার্লেকর!

প্রথমে শুনতে পেলেন না উনি। এত নিবিষ্ট ছিলেন।

—ডঃ কার্লেকর।

এবার তিনি মুখ তুলে আর একটি মুখ দেখলেন। বাগানের জাফরি কাটা গেটের ওধারে। বেশ চমৎকার চেহারার একটি যুবক। মানে, এমন চেহারার যে তাকে সমীহ না করে পারা যায় না। সে যুবকটি ডেকে সাড়া পেতেই অভ্যস্ত।

—হ্যাঁ বলুন। —কোনও রোগিণীর বিবরণ আশঙ্কা করেছিলেন তিনি। এই সময়ে তিনি কোনমতেই

কোথাও যান না বলে হয়তো ছেলেটি প্রিয়জনের জন্য তাঁর কাছে ছুটে এসেছে।

কিন্তু তাঁর আশঙ্কা ও অনিচ্ছার কথা প্রকাশ করার আগেই ছেলেটি নমস্কার করে বলল—আমি অরিন্দম ঘোষ, সিঙ্গাপুর থেকে আসছি।

আশ্চর্য! ছেলেটি এমন করে বলল যেন সিঙ্গাপুরটা এই কয়েক ব্লক দূরে!

রঞ্জন কার্লেকর ততক্ষণে গেট খুলে দিয়েছে। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ছেলেটিও বলেছে...অশেষ ধন্যবাদ।

—আমার বিয়ের ব্যাপারে আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে ডক্টর।

এমন কথা কার্লেকর কখনও শোনেননি। বিয়ের পরের ব্যাপারে তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য অবশ্য লোককে আসতেই হয়, কিন্তু তিনি ঘটকালি তো কখনও করেননি।

—ঠিক এক সপ্তাহ পরে ফিরে যেতে হবে আমাকে। এর মধ্যে অন্তত রেজিস্ট্রেশনটা করে নিতে চাইছি। কিন্তু আমার হবু পত্নী আমাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছেন না, যদি আপনি আমাকে সাহায্য না করেন।

হতভম্ব হয়ে ছেলেটির দিকে চেয়ে রইলেন ডঃ কার্লেকর।

—মেয়েটির বন্ধু ওই অমৃতা নামের মেয়েটি, সে নিখোঁজ হয়েছে। যতদিন তার খোঁজ না পাওয়া যাচ্ছে...

—সে ক্ষেত্রে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে—এতক্ষণে ডাক্তার বলতে পারলেন।

—আর একটা কমপ্লিকেশনও আছে। অমৃতার স্বামীর নাম অরিসূদন, আমার নাম অরিন্দম, দুটোই অরি দিয়ে শুরু। সেইজন্য অরি নামের কলঙ্ক ঘোচাতে না পারলে মেয়েটি আমায় বিয়ে করতে চাইছে না।

—তা হলে বোধহয় আপনার এ বিয়েটা হচ্ছে না—বলেই ডঃ কার্লেকর আচমকা চুপ করে গেলেন।

অরিন্দম ঘোষ খুব আন্তরিক চোখে চেয়ে বলল—ওই লোকটাই কালপ্রিট, নয়? আমরা ঠিকই বুঝেছি।

—আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না।

—কিন্তু কেন ডঃ কার্লেকর? আমি তো পুলিশের কাছ থেকে খুব রিলায়েব্‌ল সোর্স থেকে জেনে এসেছি যে আপনি অমৃতার হোয়্যারঅ্যাবাউটস সম্পর্কে সঠিক সংবাদ ওদের দিয়েছেন। অমৃতা লিখিতভাবে তার স্বেচ্ছায় চলে যাবার কথা তাদের জানিয়েছে। মাঝখানের মিষ্টিটাই খালি সল্‌ভ করতে পারছি না। কেনই বা অমৃতা নার্সিংহোমে গেল, আর অরিসূদন যদি নিজেই কোনও অপরাধ করে থাকে তাহলে কেন আপনাকে মারধর করল, আপনার অফিস ভাঙচুর করল! এফ. আই. আর. করল!

—হাতের শিকার ফসকে গেলে রাগে মারধর করতে পারে না?—ডঃ কার্লেকর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বললেন।

—শিকার? অরিসূদন অমৃতাকে খুন করতে চেয়েছিল?

—ষোলো সপ্তাহের প্রেগন্যান্সির পর একটা চূড়ান্ত অ্যানিমিক মেয়েকে এম. টি. পি. করতে আনলে তাকে খুন করার মতলব ছাড়া আর কী বলা যায়?

চোখ বড় বড় করে অরিন্দম বলল—আই সি, আই সি। একটু পরে বলল—তা হলে আপনি ওকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে রেখেছেন।

—আমি কাউকে রাখিনি। নিরাপদ জায়গার চয়েসটা পেশেন্টের। আমি শুধু সাহায্য করেছি।

—কোথায় গেছে একটু যদি বলেন।

—কী করে জানব আপনি তার বন্ধু না শত্রু? কী করে জানব আপনি আর এক অরিসূদন নন!

—বাঃ সেদিন অতজন ওর বন্ধুর সঙ্গে আপনার কাছে গেলাম।

—বন্ধুদের হয়তো বুঝিয়েছেন আপনিও বন্ধু, আসলে...

—আমি তো সিঙ্গাপুর থাকি। জাস্ট বিয়ে পাকা করতে এসে এই ঝামেলায় পড়ে গেছি। আমি এসবের বিন্দুবিসর্গও জানি না। অমৃতাকে চিনিই না।

—আপনি তো অদ্ভুত লোক!

—সেটা অবশ্য ঠিক, অরিন্দম বলল—কোনও জিনিসের শেষ না দেখে আমি ছাড়ি না। তা ছাড়া লাবণির যদি সত্যি অরি নামে ঘেন্না এসে যায়, সত্যিই যদি তার অমৃতার নিরুদ্দেশের কিনারা না হলে বিয়ে করতে ভয় হয় বা অনিচ্ছা হয়, সেটা তো স্বাভাবিক মানবিক রি-অ্যাক্‌শন! আই অ্যাপ্রিশিয়েট হার কনসার্ন। মেয়েটা যে মানুষ সেটা প্রমাণ করেছে আমার কাছে... আজকাল এইগুলো কিন্তু মানুষের মধ্যে দেখা যায় না বড় একটা।

—দেখুন যত কথাই আপনি বলুন, পেশেন্টের ঠিকানা আমি আপনাকে বলছি না। ওরা কেস করেছে, পেশেন্টকে আমি অসাবধানে মেরে ফেলে ভয়ে কোথাও পাচার করে দিয়েছি। ঠিক সময়ে কোর্টে হাজির করে সব ফাঁস করে দেব। পেশেন্টের ঠিকানা যতই লোক জানাজানি হয়ে যাবে, ওরা ঠিক খবর পাবে, পিছিয়ে যাবে।

—সেক্ষেত্রে আপনি কেস করবেন, অমৃতা কেস করবে। আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

—আপনি কীভাবে সাহায্য করবেন, আপনি তো সিঙ্গাপুরে...

—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখানেও ওদের ব্রাঞ্চ আছে। তেমন হলে চাকরি ছেড়ে দেব। তাই বলে অরিসূদন গোস্বামীকে ছাড়ব না। সে আমার নামে কালি ছিটিয়েছে। শুনুন ডক্টর, আমাকে ওরা কেউ চেনে না, ফলো-টলো করবে না। আমি অমৃতার কাছে যাব, প্লিজ ঠিকানাটা বলুন, আর ওকে আমার পরিচয় দিয়ে একটা ফোন করে দিন।

১০

ভোর থেকে সকাল হচ্ছে। আলোটা অস্ফুট, আচ্ছন্ন ছিল, এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শিবানী দত্তর কাজের মেয়ে দরজা থেকে চেঁচিয়ে বলল—মা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

—বলে দে আমার ফিনাইল লাগবে না,—একটা কণ্ঠ ভেসে এল।

—জ্যাম আছে? জ্যাম—মেয়েটি বলল।

—জ্যামও লাগবে না—আবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এল।

—আপনাদের বাড়িতে বুঝি বসবার ঘর নেই?—ভদ্রলোক বললেন।

—কেন থাকবে না? অচেনা অজানা লোককে...বলতে বলতে মেয়েটি থেমে গেল।

শিবানী সবে চান করে একটা কালো নকশা পাড় শাড়ি পরেছেন। তাঁর কাঁচাপাকা ভিজে চুল গিঁট দিয়ে পিঠে ফেলা। হাতে একটা ঝোলানো পাত্র।

—তাড়াতাড়ি দুধটা নিয়ে আয় কমলি। পাত্রটা নিয়ে কমলি বেরিয়ে গেল, তিনি অরিন্দমের দিকে চেয়ে বললেন—এত সকালে? আপনাকে তো ঠিক?

—কেন? ডঃ কার্লেকর ফোন করেননি?

—ও, এক্ষুনি আসবেন আমি ভাবিনি। আপনাকে দোতলায় আসতে হবে।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে শিবানী উঠোন পেরিয়ে ঘরের পাশের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, আসুন, একটা অভিজ্ঞতা বটে!

—কার?

—ওর তো বটেই। আমারও, আমাদেরও। শুনুন, ও কিন্তু একটা ভীষণ ট্রমার মধ্যে দিয়ে গেছে। শরীরটাও খুব খারাপ। আপনাকে সাবধানে কথা বলতে হবে।

অমৃতা যে কেন ডঃ কার্লেকরকে জয়িতাদির নাম ঠিকানা বলেছিল সে জানে না। এইরকম চূড়ান্ত সময়গুলোতে বোধহয় মানুষের আস্থা, বিশ্বাস, ভালবাসা, এইসবের পরীক্ষা হয়ে যায়। কিন্তু সল্টলেকের দিকে খানিকটা এগোতেই তার মনে হল—এ সে কী করছে। ক্লাসের বাইরে জয়িতাদির সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ। এইরকম বিপন্ন অবস্থায় তাঁর কাছে গেলে তো তাঁকে বিব্রত করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। তখন সে ডক্টর কার্লেকরকে সম্পদদের বাড়িতে ডোভার লেনে নিয়ে যেতে বলে।

ডঃ কার্লেকর বলেছিলেন—মন ঠিক করো অমৃতা। ইনি নির্ভরযোগ্য তো! অমৃতার মনে পড়ল তারা রমণী চ্যাটার্জিতে আসার পর কেমন্‌ করে দুধের বুথে শিবানী মাসির সঙ্গে তার আলাপ হয়ে যায়। বিধবা, একটি ছেলে নিয়ে একা থাকেন। তারপর সম্পদের সঙ্গে কী ভাব! দুজনকে আলাদা করা যেত না। সম্পদের মা হয়তো অমৃতা সম্পর্কে কোনও আশাও মনে পোষণ করে থাকতেন। কিন্তু সম্পদ কানপুরে চলে যাওয়ার পরই যোগাযোগটা কমে যেতে থাকে। একদিন সম্পদের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল অমৃতা।

প্রিয় অমৃতা,

দারুণ আছি। এনজয়িং লাইফ। খুব চনমনে একটা জীবন। তোরা সেই ম্যাদামারা ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ে এই দারুণ ক্যামপাস লাইফটা মিস করলি। আমাদের এখানে মেয়েরাও পড়ে জানিস নিশ্চয়। একটা সাউথ ইন্ডিয়ান মেয়ে নাম তটিনী আয়েঙ্গার, খুব আমার পেছনে ঘুরছে। কী করি বল তো। ঝুলে পড়ব? সাউথ ইন্ডিয়ান মানে কিন্তু সেই রাজীব গান্ধীর খুনী ধানু মেয়েটার মতো মনে করিসনি। তটিনি রীতিমতো চার্মিং। আমি ওর অ্যাটেনশন উপভোগ করি। কিন্তু এখনও প্রেম-প্রেম ভাব হয়নি। অন গড। পরামর্শ দিস।

ইতি সম্পদ।

সম্পদের সম্পর্কে ওভাবে কোনওদিনই ভাবেনি অমৃতা। কিন্তু শিবানী মাসির আশার কথা সে বুঝতে পারত। যৌবনে বিধবা, একটিমাত্র ছেলে, এমন পুত্রবধূ চান যাকে চেনেন, জানেন। সহজেই ভালবাসার বিনিময় করতে পারবেন। কিন্তু সম্পদ তো প্রথমত তার একবয়সী বলেই তাকে ভাইয়ের মতো দেখতে অভ্যস্ত ছিল সে, তারওপর এই চিঠিই বলে দিল সম্পদেরও তার প্রতি সেরকম কোনও মনোভাব নেই। তবু শিবানী মাসির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। মাসি ভীষণ শক্ত মানুষ। মনের জোর সাঙ্ঘাতিক। সেইজন্যে ভীষণ খিদের মুখে সে যেন ঘুমের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে শিবানীমাসির কাছে পৌঁছে গেছিল।

কথায় কথায় মাসিও তার অনেক কথা জেনে গিয়েছিলেন। মা শুনলে হয়তো ভয়ে কেঁদে কেটে অজ্ঞান হয়ে যেতেন, মাসির এক চোখে আগুন আর এক চোখে জল। মাসি বলেছিলেন—অমি, তুই তো এরকম বোকা ভালমানুষ কোনওদিন ছিলি না! গোড়ার থেকে প্রতিবাদ করিসনি কেন, তোর বরকে বলবি তো, পড়াশোনা চালিয়ে এত কাজ আমি করতে পারছি না, বলবি তো তোর খাওয়া-দাওয়াও ঠিক মতো হচ্ছে না!

—মাসি পারিনি, আমার একটা আত্মসম্মানবোধ আছে, হয়তো এটাই ইগো। আমি এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম। আর গোড়ার থেকেই ওঁরা এমন বলতেন—ঘটির মেয়ে, দেখো এক ঘটি জল গড়িয়ে খায় কি না।

—এখনও বাঙাল-ঘটি! পঞ্চাশ বছর পরেও? তা তোর বরকে তোর খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধের কথা বলেছিলি?

—মাসি, তুমি পারতে?

—আমাদের জেনারেশন আর তোদের জেনারেশন?

—এটা তোমাদের ভুল ধারণা। খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে বেশিরভাগ মেয়েই এখনও লাজুক।

—লাজুক না কি অভিমানী?

—যা বলো। সকালে যাই হোক, রাত্রে তো একই সঙ্গে খেতে বসি। সবাইকার পাতে যা থাকে, আমার পাতে তার অনেকগুলোই থাকে না। ও দেখতে পায় না?

—আচ্ছা, তুই এখন ভাল করে খা। অনেক পুরুষই এগুলো জানে না। ওদের মাথায় আসে না।

—তা হলে আমরা যে অত যত্ন করে ওদের খাবার বেড়ে দিই, পছন্দসই রাঁধবার চেষ্টা করি এগুলো...অল দিজ আর টেক্‌ন ফর গ্রান্টেড?

—ঠিক ওই কথাই আমি বলতে চাইছিলাম। টেক্‌ন ফর গ্রান্টেড, বউ কি খেল না খেল নজর করলে পুরুষের পৌরুষ চলে যেত।

—যে-ত। এখনও কি যায়?

—অভ্যেস যে মা। বহু বহু যুগের অভ্যেস, মাথার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে।

—আমি মানতে পারছি না মাসি।

—বেশ তো মানতে না পেরে কী-ই বা করবি। কী করতে পেরেছিস বল? কর না কিছু? বাঁচি তো তা হলে।

মাসি থাকেন একদম একা। ডোভার লেনের ওপর দোতলা বাড়ি। নীচে দুটো ঘর আর রান্নাঘর। ওপরেও তিনটে? একটু বারান্দা। পেছনের দিকে। আর ছাদ। মাসির কাছে সে নিরাপদ আশ্রয় পাবেই। ডঃ কার্লেকরকে নিয়ে সেই শেষ রাতে যখন সে মাসির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটার আকস্মিতায়, রহস্যে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল, 'মাসি!' সে গলা চিরে ডেকেছিল। 'কে রে?' উনি বললেন, 'অমি?—ওমা তুই এখন? কোনও বিপদ-আপদ? উনি কে? জামাই না কি?'

—আমি ডাক্তার। একটু ভেতরে ঢুকতে দিন, আমার হাতে বেশি সময় নেই।'

সব খুলে বলে, নিরাপত্তা আর গোপনতার ব্যবস্থা ষোলো আনা করে উনি চলে গেলে প্রথম ফোনটা সে মা-বাবাকেই করেছিল। বলেই দিয়েছিল যেতে পারবে না, বেশিবার ফোন করতেও পারবে না। ওঁরা যেন না ভাবেন।

অবশ্য অনেক পরে দ্বিতীয় ফোনটা অনেক ভাবনা-চিন্তার পর করে ডঃ জয়িতা বাগচিকে।

—কে বললে? অমৃতা? তুমি না নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলে?

সব শুনে বললেন—ইস্ লোকটাকে মারতে পারলে না, টেনে একটা চড়? হ্যাঁ, অবশ্যই সাহায্য করব। পরীক্ষা তুমি দেবেই। এ বছরেই। হ্যাঁ সিক বেড-এ হলেও।

আত্মগত সে বলে—ব্যস এইটুকুই চাই জয়তীদি। আবার কী? আর কিছু আপনাকে করতে হবে না।

একমাত্র উঁচু পাঁচিল দেওয়া ছাদটাতে বেড়াতে পারে অমৃতা। দূরদর্শনে নিরুদ্দিষ্ট বলে তার ছবি দেখানো হয়েছে। এ পাড়ার অনেকে তাকে চেনেও। শিবানীর সঙ্গে তারাও আলোচনা করে মাঝে মাঝে। অনেক রকম শুনি বটে, কাগজেও পড়ি। কিন্তু সাক্ষাৎ আমাদের পাড়ার মেয়ে। ছোট্ট থেকে যাকে দেখছি তার এমন হতে পারে? ডাক্তারটাই বোধহয়...

তখন রুক্ষস্বরে শিবানী বলেন—তোমরা কোনও কিছু তলিয়ে ভাববার চেষ্টা করো না কেন বলো তো? ডাক্তারের স্বার্থ কী?

—ওর শ্বশুরবাড়িরই বা কী স্বার্থ?

—আমি জানি না। কিন্তু বধূহত্যা-টত্যা কি শোননি? সেগুলো তো শ্বশুরবাড়িই করে? স্বামী, দেওর, শাশুড়ি, শ্বশুর...

—হত্যাই যদি করবে তো নামী নার্সিংহোমে নিয়ে গেল কেন?

—দেখো পুলিশে কী বলে?

ছাদে বেড়িয়ে বেড়িয়ে সে থার্ড পেপার মুখস্থ করছিল। নিজেরই লেখা, তবু মুখস্থ করতে হয়। এখন তার শরীরে বেশ ভালমতো গর্ভলক্ষণ দেখা দিয়েছে। কিন্তু তার ফর্সা রঙে এখন লালচে আভা। শরীর একটু ভারী হয়েছে। হনহন করে হাঁটতে তার একটু অসুবিধে হয়। কিন্তু অন্যসব দিক দিয়েই শরীর সুস্থ। অন্যদের যা-যা হয় বলে সে শুনেছে তার কিছুই তার হয় না। বমি নয়, ব্যথা নয়, খাদ্যে অরুচি নয়। খালি অড়হর বা মটর ডালের গন্ধটা সে সহ্য করতে পারে না। আর কোকিল ডাকলেই সে কানে আঙুল দেয়। অর্থাৎ একটি শব্দ, একটি গন্ধ। বাকি পৃথিবীর রূপরস তার ওপর অত্যাচার করে না মোটেই।

শিবানীমাসি ছাদেই উঠে এলেন অরিন্দম ঘোষকে নিয়ে। সে থতমত খেয়ে গেল।

পাঁচ মাসের গর্ভিণী লম্বা দোহারা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের বাক্‌রোধ হয়ে গেল। এ মেয়ের চোখমুখ চলাফেরা সবই নির্ভুলভাবে জানিয়ে দিচ্ছে এ একজন ব্যক্তি, নরম, মধুর। কিন্তু প্রয়োজনে রুক্ষ হতে পারে। সে শুনেছিল গর্ভসঞ্চারে মেয়েরা সুন্দর হয়। বিশ্বাস করেনি, কেন না দেখেনি কখনও। তার থেকে সাত বছরের ছোট বোন যখন মায়ের গর্ভে তখন পেট উঁচু, চোখ বসা মাকে দেখে তার কেমন গা ঘিন-ঘিন করত। নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পেত অবশ্য। গর্ভ, অবাঞ্ছিত গর্ভ তার ওপরে, এ মেয়েটিকে কী যে শ্রী কী যে মহিমা দিয়েছে! এ যেন সেই ইম্যাকুলেট কনসেপশনের মেরি। ত্বক কী মসৃণ, চুল যেন ঝলমল করছে। মুখেচোখে একটা নরম আলো, খুব মনোযোগে এমনটা হয়। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, যে কাজটা এখন করছে, পড়া, সেটা ছাড়া আর সমস্ত কিছু, গোটা বিশ্বটাই ও ভুলে গেছে। ট্রমা? ও বোধহয় ওর অনতিঅতীত জীবন এবং জীবনসংশয়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে।

—নমস্কার, আমি আপনার বন্ধুদের পক্ষ থেকে আপনাকে দেখতে এসেছি। ডঃ কার্লেকর অনুমতি দিয়েছেন।

—বন্ধু? কে বন্ধু? অমৃতা অবাক হয়ে বলল...

—ওরা মানে দোলা, তিলক, নিলয়, লাবণি—এরা সবাই আপনাকে খুব খোঁজাখুঁজি করছে। ভী-ষণ মনখারাপ ওদের, ভয়ও।

—ও! অমৃতার চোখ দুটো অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একটু পরে বলল—আপনি কে? গোয়েন্দা? সত্যান্বেষী?

—এগজ্যাক্টলি। ওই শেষেরটা যেটা বললেন।

—ওরা কি আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে?

—অনেকটা তাই। মানে আমি নিজেও আগ্রহী। আপনি যদি বন্ধুদের বা মা-বাবাকে কোনও চিঠি দিতে চান, আমি পৌঁছে দেব।

—আমার মা-বাবাকে আপনি চেনেন?

—চিনে নিতে হয় একজন সত্যান্বেষীকে।

—ওঁদের কাছ থেকেই কি আমার ঠিকানা পেলেন?

—না, না। ওঁরা আপনার বিনা অনুমতিতে ঠিকানা দেবেনই না। কিন্তু ওঁদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমাকে জানিয়ে দেয় আপনি বেঁচে আছেন, ভাল আছেন। ডঃ কার্লেকরই আপনার ঠিকানা দিয়েছেন?

—তা এখন? এখন আপনি কী করবেন? ওদের সব বলে দেবেন?

—নাঃ, সেটা করা যাবে না। ডাক্তারের বারণ আছে, আমি শুধু ওদের একটু নিশ্চিন্ত করে দেব। কেসটির জন্য অপেক্ষা করতে বলে দেব। আর...

—আর?

—আর সিঙ্গাপুরে ফিরে যাব।

—রিপোর্ট করবেন?

—কাকে?

—আপনার বস্‌কে?

—হ্যাঁ সে তো করতেই হবে, কিন্তু অমৃতা গোস্বামীর নিরুদ্দেশের বিষয়ে না। আমার কোনও ডিটেক্টিভ এজেন্সি নেই। আমি তো একটা এঞ্জিনিয়ার। সিঙ্গাপুরে কাজ করি। ছুটিতে এসেছিলাম। একটু সত্যান্বেষণ করে গেলাম।

—আপনার নাম?

—নাম জেনে আপনার কী লাভ? ঘোষ আমি ঘোষ একজন।

বলতে বলতে অরিন্দম তাড়াতাড়ি পেছন ফিরল। যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

১১

আকাশের রং যে এমন মন-কেমনিয়া হতে পারে, বাতাসের স্পর্শ যে এমন শিহরন-জাগানিয়া হতে পারে, গাছের পাতাদের নড়ায়-চড়ায় যে এমন আসঙ্গ কামনা ভেতর থেকে উঠে আসতে পারে, খাদ্যের স্বাদ যে এতটা চমৎকার হতে পারে, সারা দিনরাত যে এমন প্রতীক্ষাময় হতে পারে, পৃথিবীর সব মানুষ যে অমন মোছা-মোছা জলরঙের ছবি হয়ে যেতে পারে, মা-বাবা যে অমন অচেনা অন্যলোক হয়ে যেতে পারে, দোলা কোনওদিন কল্পনাও করেনি।

সে চুপিচুপি একটা সোয়েটার বুনছে। আসলে দুটো বুনছে। একটা প্রকৃত বোনা, আর একটা ক্যামোফ্লাজ। দেখাচ্ছে বাপির জন্য বুনছে একটা রাস্ট কালারের পুলোভার, কিন্তু আসল বুনছে দুটো। যাতে কেউ বুঝতে না পারে। সবার সামনেই নিশ্চিন্ত মনে একটাতে জোড়াসাপ বুনতে থাকে সে। মায়ের অবশ্য নজর খুব। 'কী রে? কালকে আর্ম-পিট অবধি এসে গিয়েছিলি না? আবার ভুল করেছিস বুঝি?'

—হ্যাঁ মা, দোলা নির্বিচারে মিথ্যা বলে। আর্ম-পিট অবধি যেটা হয়ে গেছে সেটা ওর, এটা বাপির। এখন বর্ষা পড়ে না গেলেও মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু সোয়েটার দুটো সে শুরু করেছে ঘোর গ্রীষ্মে। যখন পশম হাতে করলেই মনে হয় একবার বরফজলে হাতটা ডুবিয়ে আসি। এখন অবশ্য বৃষ্টি নামছে। 'আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে যখন বৃষ্টি নামল।' তার সারা দেহ জুড়ে বৃষ্টি। কামনার স্বেদ-এর সঙ্গে গ্রীষ্মের ঘাম, বর্ষার রাঙা জল বাইরে থেকে তফাত করা যায় না। কিন্তু এ সেই কামনার স্বেদ, কামনার রোমাঞ্চ যার কথা জয়দেবরা বলে গিয়েছিলেন। পদকর্তারা বলে গিয়েছিলেন। এ-কি মানুষের জন্য? না দেবতার জন্য? বোঝা দায়। দোলা আগে জানত না দেবতা হয়, বিশ্বাসই করত না। কিন্তু এখন জানে, হয়, একটা মানুষের দেবতা। সব মানুষের অবশ্য হয় না। হাতে-গোনা যে কয়েকজনের হয় তাদের মধ্যে দোলন একজন। কখনও সে মেট্রোর সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসে, কখনও নন্দন চত্বরে ফোয়ারার পাশ থেকে ঈষৎ সিক্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসে। কখনও বা সিনেমা হলের অন্ধকারের অন্তরালে গাঢ় আকার নেয়, কখনও ভিক্টোরিয়া কি মিউজিয়ামের থামের আড়ালে একটা অদ্ভুত অভ্যন্তরীণ নেশা লাগানো স্বাদ-গন্ধঅলা চুম্বন হয়ে নেমে আসে। দোলার অন্তর্বাস ভিজে যায়। এই ভেজায় কী অস্বস্তি। কিন্তু কী অপার্থিব আনন্দ!

দোলার চেহারার মধ্যে আগে একটা বালিকা-বালিকা ভাব ছিল। এমন বালিকা, বড়রা দেখলেই যাঁদের গালে টুস্কি মেরে বলে কী রে কোন ক্লাস হল? কিন্তু আসলে বলতে চায় কী রে কত বড় হলি? কিন্তু সেই বালিকা-ভাবটা মুছে না গেলেও দোলার মধ্যে এমন একটা তরুণীত্ব, সময়ে সময়ে

যুবতীত্ব এসে গেছে, যে অনেক মানুষের কামনার ধন। কী যে একটা অধরা লাবণি তার অঙ্গে অঙ্গে বয়ে যায়। মেয়েবন্ধুরা বলে—যত দিন যাচ্ছে কী সুন্দর যে হচ্ছিস দোলা! কী মাখিস রে?

—কী আবার মাখব? চিরকাল যা মাখি। মনে মনে অবশ্য সে জানে মেখেছে, সে প্রেম মেখেছে।

ছেলেবন্ধুদের অনেকে বলে—দোলা তোকে কি ফ্যানটাসটিক লাগছে রে, কোথায় লাগে প্রীতি জিনটা, কোথায় লাগে আমিশা পটেল-ফটেল, রানি মুখার্জি-টুখার্জি!

ছবি তোলো, ভাল অ্যাঙ্গল থেকে, যত্ন করে কমপোজ করে—এ লাবণ্যের ছবি কিন্তু উঠবে না। এ এক অলৌকিক অশরীরী লাবণ্য। তিশান তো একদিন বলেই ফেলল—কিরে দোলা আমার সঙ্গে একদিন ডেট করবি নাকি? আইসক্রিমের বেশি কিছু খাওয়াতে পারব না কিন্তু।

দোলা বলল—দুটো আইসক্রিম তুই একাই খেগে যা, একটা আমার কথা ভেবে ভেবে খাবি।

দোলার দিদি ঝুলন বলে—মা, দোলার সেই বয়সটা এসেছে, যে বয়সে বিয়ে দিতে হয়।

মা বলে—সাত বুড়ির এক বুড়ি হয়েছিস তুই।

লজ্জা পেয়ে ঝুলন বলে—সত্যি মা, খেয়াল কোরো।

—কেন, এত সুন্দর সময়টা ও যদি মা-বাবার আশ্রয়ে থেকে জীবনটা সত্যিকার উপভোগ করে তাতে তোর আপত্তি কেন? কীরে দোল বল কিছু?

দোলা লজ্জা পেয়ে বলে—তাই তো!

ঝুলন বলে—আমাদের হাতে খুব ভাল একটা পাত্র আছে মা, যেমন দেখতে ভাল, তেমনই ভাল ছেলে, নেহাৎ অল্পবয়স তাই হয়তো পার্থর মতো অতটা এস্ট্যাবলিশড না। কিন্তু হবে, আস্তে আস্তে হবে।

দোলার বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে—এই বুঝি, এই বুঝি—তার নামটা করল দিদি।

—কেমন ছেলে, শুনি?

—সুপ্রতিম রায়চৌধুরী ওদের কলিগ, জুনিয়র এগজিকিউটিভ হয়ে যোগ দিয়েছে। আমার তো ভীষণ পছন্দ।

দোলা বলে ওঠে, তোর পছন্দ যদি তো তুইই বিয়ে করগে যা না। ভীষণ রাগ হয়ে যায় তার। অমন একটা জ্বলজ্বলে মানুষ রিলিফ ম্যাপের মতো বহুলোকের চ্যাপ্টা পশ্চাৎপটে উঁচু-উঁচু হয়ে রয়েছে, অথচ ওদের চোখে পড়ে না? সে অবশ্য এখনও জানে না পার্থদার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা ঠিক কী! পার্থদার ও দূরসম্পর্কের তুতো ভাইয়ের কাজিন না কী? ঠিক আছে তা না-ই হল, তাহলে পার্থদাদের অফিসের ডিনার-পার্টিতে এসেছিল কেন? এত কথা জিজ্ঞেস করেছে ওকে, এ কথাটা কখনও জিজ্ঞেস করেনি। 'পার্থদা আপনার কে হন?' এরকম একটা প্রশ্ন করে জবাব শুনেছিল 'ও পার্থদার কেউ বুঝি হতেই হবে? নইলে আমার সঙ্গে মিশবে না?' দোলাকে অপ্রস্তুত দেখে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কটা ব্যাখ্যাও করে দিয়েছিল। পার্থদার অফিসের একজনের সঙ্গে ওর সম্পর্ক। খুড়তুত শালা। বাব্বাঃ এইসব খুড়তুতো জ্যাঠতুতো পিসতুতো মাসতুতো বড্ড গুলিয়ে যায় দোলার। ওর ভাবখানা হল : আমি অমিতাভ। আমার নামের আগে-পিছে কিছু নেই। অতীত অবশ্যই আছে, কিন্তু তাকে তো ফেলে এসেছি! ভবিষ্যৎ? যখন আসবে, তখন আসবে। এখন, এই মুহূর্তটুকুকে এই মুহূর্তেই উপভোগ করে ফেলো, রোমন্থন করবার জন্য যেন ফেলে রেখে দিও না। দিলে শেষ পর্যন্ত পস্তাবে।

—অমিত, তোমার বাবা-মা মানে ফ্যামিলির কথা একদম বলো না—সে অনুযোগ করে।

অমিতের জবাব আসে সঙ্গে সঙ্গে—তাহলে আমার বাবা-মা মানে ফ্যামিলির সঙ্গেই তোমার ডেট করতে হয়! করবে? বলো! আমি সরে যাই।

—আহা! কী কথার কী উত্তর! বন্ধুদের বাবা-মা'দের বিষয়ে বুঝি জানতে ইচ্ছে হয় না! আমার

বাপি-মা-দিদিকে আমি ভীষণ ভালবাসি। আমার যত বন্ধু আছে, সবাইকার বাবা-মা'কে আমি চিনি, ওঁরাও আমাকে ভীষণ ভালবাসেন....

—আচ্ছা দোলা, তোমাদের মেয়েদের এই ভীষ্ষণ ভালবাসাটা খুব খুব সস্তা, না? খু-উ-ব ইজি!

আহত হয় দোলা, অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে।

—ডোন্ট বি হার্ট প্লিজ! বি প্র্যাক্টিক্যাল। বন্ধুদের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব কেন? একসঙ্গে পড়েছ বলে। আজ থেকে দশ বছর পরে কে কোথায় থাকবে তার কিন্তু কোনও ঠিক নেই। হয়তো শপিং করতে গিয়ে একজন পিসিমা মতো মহিলাকে দেখে বলবে...আরে! লাবণি না? কী মুটিয়েছিস রে! কিংবা তোমার হট ফেভারিট নিলয় চন্দরকে তোমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তুমি বিরক্ত হয়ে পেভমেন্ট বদলই করে ফেলবে, কেননা দাড়ি-না-কামানো উড়োখুড়ো চুল এই লোকটাকে তুমি আদৌ চেনো না।

—কেন? কেন? নিলয় কেন অমন হবে? বেশ তো!

—আরে বাংলায় এম.এ পাস করে আজকালকার দিনে একটা ছেলের চাকরি জোটানো কী অসম্ভব তা জানো? কী করবে ও? ট্যুইশানি। সারাটা জীবন ট্যুইশানি করে কাটিয়ে দেবে। তা ওর দাড়ি কামানো থাকবে না তো কার থাকবে না?

—এ ধরনের অ্যাসাম্পশন কিন্তু খুব বাজে যাই বল। হার্টলেস।

—আরে বাবা, হার্ট-ফার্টের ব্যাপারই এ নয়। প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল ট্রুথ।

—আর লাবণি? লাবণি কেন পিসিমা হয়ে যাবে? তুমি ওকে দেখেছ?

—জানতে হলে দেখতে হয় না। দেখতে হয় না, জি.কে অ্যাবাউট লাইন মেন অ্যান্ড উইমেন দিয়েই হয়ে যায়। জি.কে অর্থাৎ জেনার‌্যাল নলেজ বলে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মেয়ের বিয়ের দু-এক বছর পরেই বাচ্চা হয়, তার পরেই জমে মেটারনিটি ফ্যাট, পেটে, কাঁধে, বিশেষ করে আরও আরও প্রত্যঙ্গে, মুখচোখ অতি পরিশ্রমে-দুশ্চিন্তায় কালি-কালি হয়ে যায়। প্রেগন্যান্সির সময়ে চুল উঠে টিকটিকির ল্যাজ হয়, নয় টাক পড়ে যায়। তো তারপরেও একটা মেয়েকে পিসি-মাসি দেখানোটা এত কী আশ্চর্যের হল?

—মোটেই না, মোটেই এরকম আজকাল হয় না, সবার হয় না, এখন সবাই বিউটি-কনশাস, ফিগার-কনশাস। তা ছাড়া, আলাদা করে লাবণির কথাই যদি বলতে হয় তো ও তো সিঙ্গাপুর যাচ্ছে বিয়ের পর।

—সিঙ্গাপুরে তাহলে লোকের বাচ্চা-কাচ্চা হয় না, বলছ! ওখানে তো ওকে আরও খাটতে হবে। আরও কালি পড়বে চোখে। সিঙ্গাপুর তো শিশু, খোদ আমেরিকার নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ডি.সি-তে তো আর যাওনি। ওফ্ফ্ কিছু মোটা দেখেছি বাবা ওখানে। অত মোটা মহিলা আর তুমি কোথাও পাবে না।

—নিউ ইয়র্কে? ওয়াশিংটনে? অবিশ্বাসের গলায় দোলা বলে—যাঃ। কী ভাঁওতা তুমি কাকে দিচ্ছ বলো তো? যাদের দেশে জিম আর এরোবিক্স আর হেলথ ক্লাবের ছড়াছড়ি, মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা হয় যাদের দেশে...

—মিস ফ্যাটিয়েস্ট প্রতিযোগিতাটাও ওরা করলে পারে, প্রত্যেক বছর ওরাই ক্রাউনটা পাবে।

ব্যাস, অমিতের বাবা-মা, তার ভাই-বোন আছে কিনা, থাকলে তারা কী রকম, কে কী করে, অমিতের ব্যক্তিগত জীবন এ সমস্ত প্রসঙ্গই এই ধরনের তরল হাসাহাসি, তর্কাতর্কিতে চাপা পড়ে যায়। তারপর থাকে কোনও রেস্তোরাঁর মৃদু আলো, কোনও সিনেমাহলের অন্ধকার। সাধারণত হল অন্ধকার হয়ে যাবার পরই ওরা ঢোকে। অন্ধকারে দুটো হাত লতার মতো পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে, একটা বড় হাত, ছোট হাতকে চাপ দেয়, ছোট হাতের পাতা বড় হাতের পাতাকে চিমটি কাটে; অন্ধকারে অদ্ভুত অদৃষ্ট অশব্দ কায়দায় চুম্বন-বিনিময় হয়, হাতে হাত, পায়ে পা, গায়ে গা, সেই

উদ্‌ভ্রান্ত শরীরী অভিজ্ঞতার সময়ে কিছু মনে হওয়া সম্ভবই নয়। বাইরে বেরিয়েও আসে ওরা শো ভাঙবার বেশ আগে, জনস্রোতে যদি চেনা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! কী ছিল? কী ছিল ছবিটা? যাঃ কেউ জানে না। দোলার চোখে লজ্জা জড়িয়ে থাকে, ওর চোখে গাঢ়, গাঢ় প্রেম। অন্যদিকে যেন চোখ সরাতেই পারছে না। তারপর দোলা এক বাসে উঠে যাবে, সজল শরীর, তার পিঠ দিয়ে উরু দিয়ে আকাঙ্ক্ষার লাভা-ঢল নামবে, কিন্তু কিছু করার নেই। এরপর রাত হয়ে যাবে। তার বাস চোখের আড়াল হলে ও কোথায় যাবে? ওর শরীর কেমন করবে? ওর মন কেমন করবে? দোলা জানে না, জানে না, জানে না। শুধু সে এই জন-জঙ্গলে একা, একেবারে একা, তাকে কেউ অশোভন ধাক্কা দিলে এ সময়টা সে কিছু বুঝতে পারে না। তার হাত-ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে কিংবা কেটে পয়সাকড়ি নিয়ে নিতে এ সময়টায় পকেটমার, ছিনতাইবাজদের কোনওই অসুবিধে হবে না। রাস্তা দিয়ে, বিশেষত গড়িয়াহাটের কাছাকাছি সব সময়ে পুজোর ভিড়, দোলার মনে হবে রাস্তাগুলো কেন এত ফাঁকা, চারদিকে কেন এত অন্ধকার, অথচ লোডশেডিং হয়নি, রাস্তায় প্রচুর আলো, বিজ্ঞাপনের বড় বড় ল্যুমিনাস রঙের সাইনবোর্ড, বিজলির কত রকম কেরামতি, অন্ধকার একটা ফাঁকা কানা গলি দিয়ে দোলা হাঁটবে, অবশ্যই বুকের আলোয় পথ চিনে চিনে, যে চাঁদ আকাশে ওঠেনি, যে আকাশ শহরের সমস্ত দূষিত বাষ্প নিয়ে, বিজলি আলোর দাবড়ানিতে শাদা, একদম ময়লাটে শাদা হয়ে আছে, সেই আকাশকে আকাশ-নীল রঙে চুবিয়ে তারপর তাতে একটি স্নিগ্ধ দ্বাদশীর চাঁদ এঁকে দিলে তবে দোলার বুকের ভেতরটা তৈরি হবে। সেই চাঁদের চাঁদনিতে পথ দেখে দেখে সে কর্নফিল্ড রোড থেকে এক স্টপ এগিয়ে যাবে। একটা মস্ত খেলার মাঠ, কে জানে কতদিন থাকবে, একটা মস্ত পুকুর, কে জানে কতদিন থাকবে, তাদের যে-কোনও একটার পাশ দিয়ে দোলা বাড়ির ঘনিষ্ঠ রাস্তাটি ধরবে। যে কেউ এখন দোলাকে দেখলে বলে দিতে পারবে এ হল একটা প্রেমে-পড়া মেয়ে, প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া মেয়ে। অথচ তার বাবা-মা বোঝেন না, তার বন্ধুরা বোঝে না—কেননা সে তো বলেনি কাউকে! ঘুণাক্ষরেও বলেনি। তারা সবাই, বাবা-মা এবং বন্ধুরা সব্বাই মনে করে দোলাটা একটা আদুরি, দোল দোল দুলুনি, সে নিজের দায়িত্বে নিজেকে নিয়ে কিছু করতে পারে না, কখনও করেনি। তার চেয়েও বড় কথা, দোলার নিষ্পাপ মুখকে দোলার অকপট কথাবার্তাকে তারা সবাই বিশ্বাস করে। বাবা, মা, দিদি, পার্থদা, নিলয়, শর্মিষ্ঠা, লাবণি, চঞ্চল...সবাই, সব্বাই।

এই যে গোপনতা এ-ও কিন্তু দোলার পক্ষে সত্যিই স্বাভাবিক নয়। কেন সব কিছু গোপন করছে দোলা? আরও কত ছোটবেলায় ওর বাবার বন্ধু যখন ওর সবে কুঁড়ি-ধরা বুক চটকে চটকে আদর করেছিলেন তখন সে কথা সে মাকে বলে দিয়েছিল। হিস্ট্রির একটা ঝাঁকড়াচুলো মাকড়ামুখো ছেলে কী যেন নাম, তার সঙ্গে জমাবার চেষ্টা করেছিল প্রাণপণ সেটাও সে নিলয়, অমৃতা, লাবণি সব্বাইকে বলে দিয়েছিল। এমন যদি দাঁড় করানো যায় যুক্তিটা যে এদের দিকে তার নিজের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না তাই বলে দিতে তার বাধেনি, তাহলেও কিন্তু ভুল হবে। বাবার বন্ধু সেই পরিমলকাকুকে সে খুব ভালবাসত। তাহলে? তাহলে এই একটা সোয়েটার বোনবার ছলে দুটো সোয়েটার বোনা, লাইব্রেরি যাবার ছল করে সিনেমা যাওয়া, কেন? কেন য়ুনিভার্সিটিতে যাবার কথা বলে সারাদিন ওর সঙ্গে ঘোরা জলে ভিজে, রোদে পুড়ে, টই টই টই টই? সে তো বলতেই পারত—বাপি জানো, পার্থদাদের স্টিমার-পার্টিতে একজনের সঙ্গে আলাপ হল, অমিতাভ সেন। খুব মজাদার ছেলে, জানো বাপি? একদিন বাড়িতে ডাকব? এটাই তার পক্ষে ষোলো আনা স্বাভাবিক হত। বাপি নির্ঘাত বলত—তাই নাকি রে! আমার হবু ছোট সান-ইন-ল' মনে হচ্ছে? ডাক, ডাক, ডাক। মা শুনলেই বলত গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল। তোমার ওই স্বভাব আর গেল না। ঝুলনের সময়েও এগজ্যাক্টলি এমনি করেছিলে। বাড়িতে ছেলেবন্ধু আনলেই হবু সান-ইন-ল' মনে হচ্ছে। আচ্ছা লোক যা হোক।

এরপর অমিতাভ বাড়িতে আসত। বাপি-মা অবাক, মুগ্ধ হয়ে যেতেন। দুই বাড়ির মধ্যে কথা বলাবলি, খেতে ডাকাডাকি শুরু হয়ে যেত। বাপি-মা'র লাইসেন্স নিয়ে পরিষ্কার বিবেকে দোলা

লজ্জা-লজ্জা হাসিমুখে ওকে মিট করতে বেরত, ও পৌঁছে দিত। বন্ধুরা বলত—ওঃ দোলা, ফ্যানটাসটিক, কেউ হয়তো বলত—এৎ তূ দোলা?

কেন? কেন? কেন এমন ঘটাল না সে? তবে কি নিষিদ্ধ প্রেমের মতো গোপন প্রেমেও একটা আলাদা উত্তেজনা থাকে? মা-বাবাকে ঠকানোর, মিথ্যে কথা বলারও কি একটা আলাদা রোমাঞ্চ থাকে? আর বন্ধুদের?

সেদিন লাবণি যখন বলল—অমৃতাটার কী হল বল তো!

নিলয় বলল—ঘাবড়াচ্ছিস কেন? অরিন্দমদা তো বলছে ও ভাল আছে, সেফ আছে।

লাবণি মুখভঙ্গি করে বলল—আচ্ছা দোলা তুই-ই বল অরিন্দম ঘোষ কি পেশাদার টিকটিকি? শার্লক হোমস? না ফেলুদা? না ভাদুড়িমশাই? নিলয়টা এমন করছে যেন...

দোলার মনে হল—কে? কার কথা বলছে ওরা? কে অমৃতা? কে অরিন্দম ঘোষ? এদের কথা তো সে জানত না?

লাবণি বলল—বল না, তোর তো চিরকাল ও বেস্ট ফ্রেন্ড। তোর ওপিনিয়নের তো একটা আলাদা মূল্য আছে, তুই নিশ্চিন্ত হতে পারছিস?

হঠাৎ যেন বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ় আসার মতো অমৃতা তার মনে এল। ধোঁয়া ধোঁয়া। আবছা আবছা। কুয়াশার মধ্যে যেমন দেখা যায় বা ধুনো-গুগগুলের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে যেমন চেনা যায়! অমৃতা। অমৃতা, তাই তো! তার এক সময়ের হার্ট-থ্রব অমৃতা চক্রবর্তী-গোস্বামী হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল বটে। সে ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিল। লাবণিকে নিয়ে...। অরিন্দম ঘোষ তো লাবণির হবু? তার যেমন ও? না, না, লাবণির হবু আর তার হবুতে এক সমুদ্র তফাত, এক সমুদ্র তফাত তাদের সম্পর্কের সুর-লয়-তালেও।

কিন্তু অমৃতার কথা, তার নিরুদ্দিষ্ট হবার কথা সে একেবারে ভুলে গিয়েছিল? কী আশ্চর্য! কী ভীষণ লজ্জাজনক! বুকের মধ্যে একটা চিনচিনে ব্যথা, গলার কাছে একটা পিণ্ড অনুভব করে সে। বলে—অরিন্দমদা কী বলেছেন?

নিলয় বলল—উনি বলছেন ও সেফ অ্যান্ড সিকিওর।

লাবণি বলল—বাট দ্যাট ইজ জাস্ট আ হাঞ্চ!

নিলয় বলল—না রে লাবণি, আমার মনে হয় উনি ডেফিনিট কিছু জানেন।

—তাহলে বলছেন না কেন সেটা?—দোলা বলল।

—সেটাই তো! রহস্য করছে কেন? লাবণি বিরক্ত সুরে বলল।

সেদিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে দোলার মনে হল—ইস্‌স সে কী স্বার্থপর! যে অমৃতাকে সে চোখে হারাত, সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে সে ভয়ে, রাগে, ক্ষোভে অস্থির হয়ে গিয়েছিল, অরিন্দমদার সঙ্গে সেই নার্সিংহোম যাত্রা! এ সমস্তর ওপর একটা পর্দা পড়ে গিয়েছিল যেন। আজ নিজের কাছে স্বীকার করতেই হয় অরিন্দম ঘোষ যে বলছেন অমৃতা ঠিক আছে, ভাল আছে, কোনও প্রমাণ ছাড়াই এটা মেনে নিতে পেরে সে বেঁচে গেছে। অমিতাভ এখন তার মন থেকে সব কিছু, সব্বাইকে হঠিয়ে দিয়েছে। তার মগজে জায়গা নেই, হৃদয়ে জায়গা নেই। কাউকে কিছু বলবার তাগিদ নেই; আপনাতে সে আপনি মগ্ন, আপনি সম্পূর্ণ। একটা সুখ আর অলৌকিক আনন্দের বলয়ের মধ্যে এখন তার ঘোরাফেরা। কাউকে সে-সুখের কথা, আনন্দের কথা বলে সুখ ভাগ করে নেবার প্রশ্নই ওঠে না।

১২

ক'দিন ধরে শ্রাবণ অঝোরে ঝরছে। আকাশের মুখ দিনরাত দুপুর বিকেল সন্ধে-সকাল নীলগাইয়ের মতো নীলচে কালো। *'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে'*—গলা ছেড়ে গান গাইতে

গাইতে ডক্টর কার্লেকর ছাই-ছাই রঙের টি-শার্টের তলায় নীলচে কালো রঙের প্যান্ট পরছিলেন বোধহয় আকাশের সঙ্গে রং মিলিয়ে। রম্ভা ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলেন।

—কোথায় বেরচ্ছ? এখন? এই আনআর্থলি ওয়েদারে?

—তোমাদের বেবিরা তো ওয়েদার চার্ট-ফার্ট মানে না অপ্সরী!

মন খুব ভাল থাকলে রঞ্জন রম্ভাকে অপ্সরী বলে ডেকে থাকেন। আদরের ডাকে কান না দিয়ে রম্ভা বললেন—এত তাড়াতাড়ি তো তুমি নার্সিংহোমে যাও না? এখনও এগারোটা বাজেনি।

—এগারোটা না বাজলেও বারোটা বেজে যেতে পারে ডার্লিং। পায়ে মোকাসিন গলাতে গলাতে রঞ্জন বললেন।

—এই পোশাকে তুমি নার্সিংহোমে যাবে? রম্ভার অবাক হওয়া এখনও ফুরোয়নি।

—তা এই শ্রাবণধারাপাতে কি তুমি আমায় সুটেড বুটেড হয়ে যেতে বলো?

—তোমাকে কখনও ক্যাজুয়াল পরে নার্সিংহোমে যেতে দেখিনি।

—খেয়াল করোনি ডার্লিং। গেছি গেছি, এমন বর্ষায় গেছি।

—গাড়িটা তো বারান্দার তলাতেই দাঁড়াবে। ড্রেস করতে তোমার আপত্তি কী?

—সেটা এখানে। 'উজ্জীবন'-এ বারান্দার তলা নেই। সেখানে আর পাঁচজন গাড়িহীনের মতোই আমাকে ছাতা মাথায় ঢুকতে হবে।

—কী জানি বাবা! রম্ভার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে রঞ্জন নার্সিংহোমে যাচ্ছে না। তা না-ই যাক। অন্য কোথাও কোনও এমার্জেন্সি কল থাকতেই পারে। ডক্টর কার্লেকরের সব কেসই তো উজ্জীবনে আসে না! কিন্তু বলল না কেন সে কথা! রঞ্জন সাধারণত কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, আনুমানিক কত ঘণ্টা লাগতে পারে, কেস জটিল কি না এ সবই রম্ভাকে বলে থাকে। প্রথমত স্ত্রী একজন ডাক্তার, তারই মতো স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলে। দ্বিতীয়ত স্ত্রী সন্দেহপ্রবণ বলে।

রম্ভাকে একবার গম্ভীর পরক্ষণেই বিষণ্ণ হয়ে যেতে দেখে রঞ্জন বললেন—আরে, এর ওপর তো একটা এপ্রন চাপিয়ে নেব। তলায় ফর্ম্যাল শার্ট আছে না ক্যাজুয়্যাল আছে তখন কে দেখছে?

অনেক কথাই এর উত্তরে রম্ভার বলার ছিল। বলার ছিল নার্সিংহোমের স্টাফ যাতে সবসময়ে শতকরা শতভাগ পেশাদার চেহারায় থাকে, তাই ডক্টর কার্লেকরও নিজেকে তাদের আদর্শ হিসেবে গড়েছেন। এটাই নাকি তাঁর 'ইমেজ'। সেই 'ইমেজ' আজকে হঠাৎ ভাঙার কী দরকার পড়ল? কিন্তু এসব বলে রম্ভা কথা বাড়ালেন না। এই যে ঈষৎ বিষণ্ণ, সামান্য অবহেলিত, অবহেলিত বলেই সূক্ষ্মভাবে আহত তাঁর নিজের 'ইমেজ' এটাকে এই মেজাজটাকেও তিনি উপভোগ করেন। রঞ্জন বেরিয়ে গেলে, তার গাড়ি যতদূর দেখা যায় তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখবেন। এখন বৃষ্টি সোজা ছাটে পড়ছে, তবুও বারান্দায় রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ালে তিনি ভিজে যেতে পারেন। সেই সামান্য ভেজা কামিজটা তিনি বদলাবেন না। বর্ষাকালে এমনিতেই তিনি একটু অ্যালার্জিতে ভোগেন। ভিজলে তো আর কথাই নেই। সন্ধে নাগাদ জ্বরটা এসে যেতে পারে। তখন তিনি কপালে একটু বাম ঘষে নীল আলো জ্বেলে বিছানায় শুয়ে থাকবেন। চেম্বারে বসবার আগে রঞ্জন আর তিনি একসঙ্গে বসে একটু কফি খান। কফি খাওয়ার একটা সুন্দর জায়গাও আছে তাঁদের। খাবার ঘরের একদিকে দুটো কোণা জুড়ে এত বড় জানলা যে মনে হয় জানলা নেই, কাচের ওপারেই বাগান, বাগানের ওপারে শান্ত পথঘাট। এই কোণটাতে তাঁদের স্মোকড গ্লাসের কফি-টেব্‌ল পাতা। সেদিকে যেতে গিয়ে যখন রম্ভাকে দেখতে পাবে না, রঞ্জন ওপরে আসবেই। বেডরুমে।

—কী ব্যাপার? নীচে নামোনি এখনও?

—তুমি রেডি? চান করেছ?

—শিওর! ওডি কলোনের গন্ধটা পাচ্ছ না!

—নাঃ!, নাক বন্ধ।

—আবার সর্দি হল না কি?—রঞ্জনের গলায় থাকবে উৎকণ্ঠা।

—সর্দি হয় তো হয়েছে। চলো। —বলে রম্ভা মন্থর ভঙ্গিতে উঠবেন। নীল-এর ওপর ধূসর ছাপের সেই শিফনটা পরনে। রঞ্জন কাছে এসে গালে গাল রাখবে। রেখেই চমকে উঠবে।

—এ কী? তোমার তো বেশ গা গরম।

—ও, তাই মাথাটা ব্যথা করছিল।

—করছিল, এখন?

—কমে গেছে।

—থাক তা হলে নীচে গিয়ে কাজ নেই। এখানেই আনতে বলে দিই। বাজার টিপবেন রঞ্জন। কালীচরণ, ওঁদের বেয়ারা কফি পট সুদ্ধু ট্রলিটা বেডের পাশে রেখে যাবে।

কফিতে একটু করে চুমুক দেবেন আর রম্ভার জ্বর-লালচে মুখের দিকে চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে তাকাবেন রঞ্জন। কফিটা যখন দেড় কাপ মতো শেষ তখন রঞ্জন ঝুঁকে পড়বেন, রম্ভার বুকের ওপর।—ডার্লিং...

—আঃ, কী করছ? ছোঁয়াচ লাগবে।

—দূরে থাকলেও লাগতে পারে যখন তখন কাছেই থাকি। রঞ্জনের গলার স্বর এখন বদলে যাবে। গাঢ়, গভীর। সেই অনেকদিন আগেকার, বিবাহপূর্ব রঞ্জন, মেডিক্যাল কলেজের থার্ড ইয়ারের রঞ্জন আর রম্ভা।

সামান্য জ্বর গায়ে অসময়ের সেই গাঢ় সঙ্গমের জন্যে আজ অপেক্ষা করবেন রম্ভা। সারাদিন ধরে তার প্রস্তুতি চলবে, প্রস্তুতি এবং প্রতীক্ষা। এইরকম অসময়ে না হলে তো রঞ্জনের আর সময়ই হয় না।

১৩

'উজ্জীবন'-এর দরজায় দাঁড়াল ধূসর রঙের মারুতি এসটিমটা। ছাতা হাতে রহমান শোফার নেমে দাঁড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলল। নেমে গেট অবধি পৌঁছে হঠাৎ রহমানের হাত থেকে ছাতাটা কেমন কেড়ে নিলেন ডক্টর কার্লেকর। —'রহমান, ছাতাটা একটু রাখছি। বুঝলে?'

—ঠিক আছে সাব।

—গুড মর্নিং

—গুড মর্নিং

—গুড মর্নিং

নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন রঞ্জন। বেল বাজালেন। এনকোয়্যারি থেকে রিসেপশনিস্ট মেয়েটি উঠে এল।

—তুমি কেন? রজ্জাক কী করছে? আশ্চর্য তো? রজ্জাককে বলবে—আই ডোন্ট ওয়ান্ট হিম টু রিপীট দিস। যাই হোক সিসটার মাধুরীকে ডেকে দিও।

—সেন না দাশ?

—সরি, সেন।

মাধুরী সেন বেশ বয়স্কা। চল্লিশের বেশ ওপরে। কিন্তু দারুণ কর্মঠ, পটু এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন। দুই মাধুরীই। কিন্তু দাশ-এর বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, দেখতে-শুনতেও একটা আলগা চটক আছে। রম্ভা চান না মাধুরী দাশ রঞ্জনের কাছাকাছি আসে। মাধুরী দাশও খুবই নিপুণ। তবু, নিজের জীবনের এই জটিলতার কথা মনে রেখেই রঞ্জন মাধুরী সেনকে তাঁর কাজকর্মগুলো করতে দিতে পছন্দ করেন।

মাধুরী সেন আসতে রঞ্জন নিচু গলায় বললেন—আমি যাচ্ছি, রাউন্ডে আসতে একটু দেরি হতে পারে। আমার চেম্বারের বাইরে নট টু বি ডিসটার্বড-টা লাগিয়ে দিন। কোনও কারণেই যেন কেউ

আমাকে বিরক্ত না করে। আশা করছি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে যাব। পেছনের দরজায় একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে রাখুন। আপনিই। এলে আমাকে ডাকবেন। ছাতাটা নিয়ে যান।

কতকগুলো আলট্রাসনোগ্রাফির রিপোর্টের ওপর ঝুঁকে পড়লেন কার্লেকর।

একটু পরেই হলদু-আলো ট্যাকসিটা ছুটে চলল ডোভার লেনের দিকে।

খসখস খসখস করে খবরের কাগজের ওপর মুখস্থ উত্তর লিখে যাচ্ছে অমৃতা। স্পেশ্যাল পেপার...শর্ট নোট সব—বিজয় গুপ্ত কেতকা দাস রামেশ্বর ভট্টাচার্য দ্বিজ মাধব...। এগুলো স-ব সে আগে মুখস্থ করেছে, মুখেও বলে নিয়েছে। কিন্তু তার বাবা তাকে এই কায়দাটা শিখিয়ে দিয়েছেন। যতই বলে নাও, লেখবার সময় ঠি-ক ভুলে যাবে। সেইজন্যে লেখার অভ্যাস দরকার। বাবারা নাকি ছোটবেলায় এ সব কাজ বালি-কাগজে করতেন। সেগুলো অনেক কমদামি। এখন সে সব পাওয়া যায় না, কাগজ জিনিসটাই দুর্মূল্য হয়ে গেছে? একটা রুলটানা বা না-টানা লম্বা ফুলস্ক্যাপ সাইজের খাতা আট থেকে ন টাকার মধ্যে আসা-যাওয়া করে। অত পয়সা অমৃতা কী করে খরচ করবে? সে পুরোনো খবরের কাগজের ওপর শাঁই শাঁই করে লিখে যায়। মাসি মাঝে মাঝে বলেন—কী রে, খবরের কাগজের ওপর লিখছিস বুঝতে পারবি?

অমৃতা একটু হাসে। বুঝতে পারবার তত দরকার নেই। দরকার হল গড়গড় করে এই লিখে যাওয়াটা।

একটা নোট লেখা শেষ করে সে ফিরে মাসির দিকে তাকায়—তোমরা কেমন করে পরীক্ষার প্রিপেয়ারেশন করতে মাসি?

—আমি তো বার বার করে পড়তাম। ঘুরে ফিরে পড়তাম।

—নিজে উত্তরগুলো লিখতে না?

—কিছু লিখতাম, আর কিছু স্রেফ বই পড়ে চলে যেতাম?

—হত তাতে?

—ওই যা হত তা হত। বি.এ পাস কোর্সের পড়া তো, তা-ও জানতাম যে দেখাশোনা চলছে, পছন্দ হলেই বিয়ে হয়ে যাবে?

বিয়ের প্রসঙ্গে অমৃতার চোয়াল সামান্য কঠিন হয়ে যায়। লক্ষ পড়বার মতো নয়। চোয়ালের এই কঠিনতাও অমৃতার ভেতরের। সে জিজ্ঞেস করে—তোমার কী সাবজেক্ট ছিল মাসি?

—দূর, অত কি মনে আছে? ওই ফিলসফি, হিসট্রি, স্যানসক্রিট বোধহয়।

—পড়তে তোমার ভাল লাগত না?

—নাঃ।

—কী ভাল লাগত তাহলে?

—এই গপ্পো করা, নিন্দেমন্দ পরচর্চা, সিনেমা যাওয়া, আমাদের সময়ে তো প্রচুর সিনেমা-হল, প্রচুর সিনেমা, প্রতি সপ্তাহে একটা করে দেখতাম।

—যাঃ।

—মাসির ওপর অশ্রদ্ধা হচ্ছে না কি রে?

অমৃতার মুখ নরম, নরম, আরও নরম হয়ে গেল। সে বলল—

—অশ্রদ্ধা? কী যে বলো!

—তবে উনি যখন চলে গেলেন তখন আমার বয়স ঠিক পঁয়ত্রিশ। উনিশে বিয়ে হয়েছিল, ঠিক ষোলো বছর। সেই সময়টা...সম্পদ তখন এগারো বছরের। বারোয় পা দিয়েছে। ওকে দেখাশোনটা খুব বড় কাজ ছিল। তবু, তবু মনে হত কেন আর একটু ভাল করে পড়াশোনাটা করিনি! টাকা-পয়সার অভাব তত বুঝিনি। খুব ভাল ইনসিওরেন্স ছিল, অফিস থেকেও পাওনা ছাড়া অতিরিক্ত অনেক

দিয়েছিল, তা ছাড়া এই বাড়ি ছিল, মহানির্বাণ রোডের বাড়িটা ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেওয়া, কিন্তু তা নয়, কেমন শূন্য-শূন্য লাগত। মনে হত আমার নিজের ভেতরটায় কিছু নেই, কিছু জন্মায়নি।

—তাহলে আবার শুরু করলে না কেন?

—অভ্যেসটাই তখন চলে গিয়েছিল, বুঝলি অমি? কতকগুলো সাপ্তাহিক পত্রিকা, মেয়েদের পত্রিকা আর কখনও সখনও এক আধটা বাংলা নভেল ছাড়া কিছ্ছু পড়িনি এই ষোলো বছর। বয়সটাও তখন মনে হত অনেক। কেঁচে-গণ্ডুষ করতে লজ্জাও ছিল, আবার ওই যে বলছি অনভ্যাস। মনের মধ্যে গভীরতাই বলিস আর মনোযোগই বলিস—কণামাত্র ছিল না।

অমৃতা বলল—ধ্যাঃ। তোমার গভীরতা নেই? মনোযোগ নেই? বিশ্বাস করতে বলো?

বললেন—মগজ, মস্তিষ্কের কথা বলছি রে। মাথা দিয়ে কোনও কঠিন জিনিস সল্‌ভ করতে পারার ক্ষমতাটা চলে গিয়েছিল।

—চলে যায়নি মাসি। হয়তো ঘুমিয়ে গিয়েছিল। জাগাবার চেষ্টা করলেই জাগত। তা ছাড়া, তোমার কোনও মোটিভেশন ছিল না। টাকা-পয়সার যেহেতু অভাব ছিল না। তাই নতুন করে কিছু করার উৎসাহ বা প্রেরণা পাওনি।

– ঠিক বলেছিস। কত বুঝিস তোরা আজকালকার মেয়েরা।

—এমা, তোমাকে এভাবে বলা আমার উচিত হয়নি।

—দেখো কাণ্ড, আমি কি তাই বলেছি? সত্যিই আমার মনে হয়, তোরা কত কত এগিয়ে গেছিস। কত কী জানিস। কত ভুল করিস না। কত ভুল শুধরে নিতে পিছপা হস না।

—আমরা একটা নতুন প্রজন্ম মাসি, এটা আমাদের কোনও বাহাদুরি নয়। সায়েন্স, টেকনলজি, মাস-মিডিয়া এই সব কথা আমাদের শিখিয়েছে। ভাবনা উসকে দিয়েছে। তোমাদের সময়ের থেকে আমাদের সময় আর একটু এগিয়ে গেছে।

—ভেতরে ভেতরে কিন্তু রয়ে গেছে সেই পশুবৃত্তি, সেই লোভ, সেই হিংসা...একটু থেমে অমৃতা আবার বলল।

শিবানী বললেন—না, তুই পড়, আমি তোকে বড্ড বকাচ্ছি। অমৃতা হাসল। পড়া জিনিসটাও তো যান্ত্রিকভাবে হয় না। তার মধ্যে অন্য মানুষের উষ্ণতা, অন্য মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি, জীবনবোধ এসব না মিশলে আর যারই হোক, তার পড়া হয় না।

শর্মিষ্ঠা তো বেশিরভাগ সময়েই সর্বোচ্চ নম্বর পায়। কিন্তু ওকে একটা আলোচনার মধ্যেও আজ পর্যন্ত টেনে আনতে পারল না কেউ। রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরী রহস্যের মতো মুখরোচক মনোরোচক বিষয়ে পর্যন্ত না।

নিলয় প্রশ্নটা করেছিল। শর্মিষ্ঠা বলল—'কবিমানসী' তো পড়েছিস?

—তা পড়েছি উল্টেপাল্টে।

—তা হলে, তা হলে জিজ্ঞেস করছিস কেন?

—হায় কপাল! ওটা তো জগদীশ ভট্টাচার্যের দেখা-বোঝা, তুই কী বুঝিস, তোর কিছু মনে হয় না?

—না। আমি ওঁদের দেখিওনি। শুনিওনি।

—তাই বলে বুঝবিও না?—অমৃতা অনুযোগ করে।

—বুঝতে হলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতে হয়, কাদম্বরীর দেবীর সঙ্গে কথা বলতে হয়, প্ল্যানচেটে বসবি? তাতেও হবে না, টিকটিকি লাগাতে হবে।

—কী আশ্চর্য! রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলো তো রয়েছে। কবিতা, গান।

—তোরা বুঝগে যা।

অর্থাৎ শর্মিষ্ঠা, একটি সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া মেয়ে, যার হাতের লেখা, যে বানান ভুল করে না, প্যারাগ্রাফিং সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে। যথেষ্ট পড়ে, এবং যথেষ্টর চেয়েও বেশি মুখস্থ করে, সে তার অর্জিত বিদ্যাকে প্রয়োগ করতে পারে না। তার জীবন, মননের সঙ্গে ওই পড়াশোনার কোনও যোগ নেই।

অমৃতার পেটের ভেতরে এই সময়ে সে ডিগবাজি খেল। প্রচণ্ড একটা টান ধরল পেটে। টেবিলটা ধরে সেই ধাক্কা সামলাল সে। এই রকম সময়গুলো ছাড়া অমৃতার খেয়ালই থাকে না, তার ভেতরে একটি অঙ্কুর, জীবন্ত অঙ্কুর, তার নিজের সৃষ্টি, তার নিজের রক্তপ্রবাহের লালন, সে যা খায় ও-ও তার সারবস্তু পায়, তার অসুখ করলে ওরও অসুখ করবে। কোনও অনুভূতি নেই তার ওর জন্যে। অথচ ওকে বাঁচাবার জন্যেই সে একদিন প্রচণ্ড লড়াই করেছিল। যার ফলে তার নিকটজনদের মুখোশ মোচন হয় তার কাছে। আশ্চর্য, কোনও কৌতূহল পর্যন্ত নেই। ডক্টর কার্লেকর বলেছেন—ও ছেলে। সে কিন্তু জানতে চায়নি। কোনও বাৎসল্য, মাতৃত্ববোধ নেই আজ তার মধ্যে। একটা বাঘিনী যেন একটা বিড়ালী হয়ে গেছে। থাবার ওপর মুখ পেতে যে ঘুমোতে ভালবাসে। তার ক্ষেত্রে এই ঘুম অবশ্য এম.এ ফাইন্যালের পড়া। খবরের কাগজগুলো সরিয়ে রেখে সে একটা বই টেনে নিল, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের ওপর আলোচনা।

ডক্টর কার্লেকর যখন খালি পায়ে এই ঘরে ঢুকলেন, পেছনে তাঁর মিসেস শিবানী দত্ত, তিনি একটা অভিনিবিষ্ট পিঠকে ঝুঁকে থাকতে দেখলেন। দেখলেই বোঝা যায় এই অভিনিবেশ গভীর—মাথার চুলগুলো কিছু পিঠে, কিছু কানের পাশ দিয়ে সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। একটা সাদার ওপর হালকা ছাপের আঁচল, একটি কানের সোনার ছোট্ট মাকড়ি।

তিনি মিসেস দত্তর দিকে ফিরে তাকালেন। উনি হেসে বললেন—ঠিক আছে, আপনার কাজ তো আপনাকে করতেই হবে। আসুন। অমৃতা...ডাক্তারবাবু এসেছেন।

রুটিন চেক-আপ। প্রতি মাসে ডক্টর কার্লেকর নিষ্ঠাভরে কাজটা করে যাচ্ছেন। সব রোগিণীই তাঁর দায়িত্ব। কিন্তু এই মেয়েটি বিশেষ দায়িত্ব। বিশিষ্ট এই মেয়েটিও। এ রকম অদ্ভুত মেয়ে তিনি আর দেখেননি। স্বামী যাকে ক্লোরোফর্ম করে অজ্ঞান করে এম.টি.পি. করতে নার্সিং হোমে নিয়ে এসেছিল, যে জবরদস্তির ফলে সে মারা যেতেও পারত, সে সব ঘটনা যেন মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে মেয়েটি। সন্তান কবে ভূমিষ্ঠ হবে, কেমন করে হবে, এ সব নিয়েও তার কোনও ভয়-ভাবনা নেই। অদ্ভুত নির্ভীক। তিনি যে তাকে ওই পরিস্থিতি থেকে বাঁচালেন, এখনও নিয়মিত তদারকি করে যাচ্ছেন, এ নিয়ে কোনও কৃতজ্ঞতার বাড়াবাড়িও তার বাক্যে তো দূরের কথা, হাবে-ভাবেও তিনি দেখেন না। তার সমস্ত মনোযোগ সূচিবিদ্ধ হয়ে আছে কতকগুলি বইয়ে, কতকগুলি খাতার পাতায়।

অনেকটা... অনেকটা কি রম্ভার মতো? মেডিক্যাল কলেজের থার্ড ইয়ারের রম্ভা! যখনই ওর হস্টেলে যেতেন এই ধরনের একটা দৃশ্য দেখতেন। অভিনিবিষ্ট। ফিরেও তাকাত না কারও দিকে। তিনি...তিনিই জোর করে তার সেই অভিনিবেশে থাবা বসালেন, ভাগ চাইলেন সময়ের, কামমোহিত করলেন সেই অপাপবিদ্ধ কুমারীকে, তার গহনা বেচে সে রঞ্জনকে লন্ডনে পাঠাল এম আর সি ও জি করতে, নিজে তখনকার এক বিখ্যাত গাইনির সহকারী হিসেবে কাজ নিল মেডিক্যাল কলেজেই...। তারপর? তারপর? লন্ডনেই কি আর এক ডিগ্রিকামী শার্লটের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড মাখামাখি শুরু হয়ে গেল? তারপর? একদিন কোনও খবর না দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত রম্ভা কার্লেকর যখন তার অ্যাপার্টমেন্টের বেল-এ হাত রাখল, তার কিছুক্ষণ, অল্প কিছুক্ষণ আগেই মাত্র চলে গেছে শার্লট, সেদিনের সান্ধ্য সহবাস সেরে। সমস্ত ঘরে শার্লটের প্যারফিউমের মেয়েলি গন্ধ। বালিশের পাশে তার ব্রা কুণ্ডলীকৃত। নীচ থেকে কেয়ারটেকার ফোন করে জানাল ইন্ডিয়া থেকে এক মহিলা এসেছেন,

দেখা করতে চাইছেন, তখন রঞ্জন পাঁচ মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে দ্রুত হাতে প্যান্টের জিপার টানছেন, ব্রাটা ফেলে দিচ্ছেন ট্রাশ-ক্যানে, চুলে দ্রুত চিরুনি চালাচ্ছেন। টেপ-ডেকে জ্যাজ চলছিলই। মুখে উচ্ছ্বসিত হাসি নিয়ে তিনি রম্ভাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। দরজাটা খোলার আগে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উদ্বেগ মিশে ছিলই। দরজা খোলবার পর সেটা সত্যিকার উচ্ছ্বাস হয়ে গেল। উঃ কত, কতদিন পর আবার সেই পরিচিত প্রিয় মুখ, সেই দেহ, সেই গন্ধ! তিনি ভাবতেও পারেননি।

—তুমি!

—এলাম!

—প্যাসেজ মানি?

—জোগাড় করলাম।

—ছুটি?

—চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

—অ্যাঁ?

—কেন? অ্যাঁ কেন? এখন তুমি যা স্কলারশিপ পাচ্ছ তাতে আমি এখানে চালিয়ে নিতে পারব।

—মা-বাবা?

—আমার না তোমার?

—ধরো তোমার।

—তাঁরা তো লখনউ-এ রয়েছেন। যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন। আর তোমার বাবা-মার গ্রামের জমি-জমাতে যেমন চলে যাচ্ছিল তেমনি চলে যাবে।

—মঞ্জুর বিয়ে?

—মঞ্জু তোমার দায়িত্ব রঞ্জন। আমি তাকে ভালবাসি বলেই তার দায়িত্বটা আমার ওপর চাপিয়ে দেবার মতো অপুরুষ এবং সুযোগসন্ধানী স্বার্থপর কি তুমি?

তারপর সমস্ত আবহাওয়াটাকে রোমাঞ্চিত করে রম্ভা তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুটকেস মাত্র একটা, মাটিতে পড়েছিল। অশ্রুধারায় ভিজে যাচ্ছিল রঞ্জনের টি শার্ট।

রম্ভাকে তিনিই নষ্ট করে দিয়েছেন। কিছুতেই, কিছুতেই তার বিশ্বাস অর্জন করতে পারলেন না তিনি। রম্ভা আর পড়ল না, চাকরি করল না, প্র্যাক্টিস করল না, অথচ কী ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে ছিল, ডিফিকাল্ট ডেলিভারির কত খুঁটিনাটি তিনি রম্ভার কাছ থেকেই শিখেছেন। কত লক্ষ লক্ষ রোগিণীকে বঞ্চিত করলেন তিনি। দেশকে বঞ্চিত করলেন এক নিবেদিত কর্মী প্রাপ্তি থেকে। পরিবারকে বঞ্চিত করলেন এক চমৎকার দায়িত্বশীল, উপার্জনক্ষম বধূ থেকে। নিজেকে বঞ্চিত করলেন স্বাভাবিক দাম্পত্য-জীবন থেকে, ছেলেমেয়েকে বঞ্চিত করলেন মাতৃ-পিতৃসঙ্গ থেকে। আর রম্ভা? রম্ভাকে বঞ্চিত করলেন সবচেয়ে বেশি। বিষিয়ে দিলেন তার মন। মস্তিষ্ক আর সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল না। গাইনোকলোজি অ্যান্ড অবসটেট্রিক্স-এ গোল্ড মেডালিস্ট একটা গুডিভ স্কলার এখন বিউটি ক্লিনিক, হেল্‌থ ক্লাব এই সব চালায় তাও নাম কা ওয়াস্তে। ক্লিনিক থেকে, ক্লাব থেকে রম্ভা তার আরশুলা রঙের মারুতি নিয়ে সারপ্রাইজ ভিজিট দেবে 'উজ্জীবন'-এ, মেডিক্যালে, শহরের যেখানে যত নার্সিংহোমে তাঁর রোগিণী আছে, অপারেশন আছে সর্বত্র। রম্ভার এই প্যারানইয়া তাঁরই প্রতিদান তার প্রেম, তার গহনা-র মূল্যে কেনা ডিগ্রির পরিবর্তে।

এ মেয়েটি? এই অমৃতা? এ-ও কি ওইরকম উজ্জ্বল ছাত্রী? কী অখণ্ড অভিনিবেশ নিয়ে পড়াশোনা করে! এ বিবাহিত ছিল। সে বিবাহে প্রেম ছিল না, এ তিনি দুই পার্টির সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে জেনেছেন। এ নিজেকে তৈরি করছে। একা জীবনে দাঁড়াবার জন্য সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেই সংকল্পের কাঠিন্য তিনি প্রত্যেকবার এখানে একে পরীক্ষা করতে এসে টের পান। কিন্তু, বলা তো

যায় না, বাইশ-তেইশ বছরের বাচ্চা মেয়ে একটা। যদি কেউ দস্যুর মতো এসে এর প্রণয় লুঠ করে? নষ্ট করে দেয় এই সংকল্প? এই অভিনিবেশ? তাঁকে রম্ভা পালাতে দেয়নি। কিন্তু এর সেই হতে-পারে প্রণয়ী যদি পালায়? যদি অমৃতার কোনও অর্থবল না থাকে? যদি—যদি—য.দি।

—ব্লাড প্রেশারটা এত বেড়েছে কেন? পা-টাও ফুলেছে বেশ। নুন খাওয়া চলছে না কি পাতের পাশে?

—উহুঁ।

—ওকে জিজ্ঞেস করবেন না ডাক্তারবাবু, ও জানে না ও কী খায়। যখন যা ধরে দিই নির্বিবাদে খেয়ে নেয়। পাতে নুন দিই না।

—খিদে বাড়েনি?

—বাড়েওনি কমেওনি।

—বাচ্চাটা একটু ছোট। তা হোক। অমৃতা, একটু বেশি করে খাও। বুঝলেন মিসেস দত্ত। দুধ, একটু ফল, আর ডাল ভাত গ্রিন ভেজিটেব্‌লস আর মাছ। চিকেন-টিকেন না খেলেও চলবে, তবে মাছটা চাই-ই। একটু বেশি করেই। সম্ভব হলে একটু লিভার।

—চিকেন বা মাটনে আপত্তি নেই তো?

—মাটনটা থাক এখন, চিকেন ইজ ও কে। আর ওই যে বললাম লিভার।

মিসেস দত্ত মহিলাটির দিকে তাকিয়েও খুব অবাক হল ডক্টর কার্লেকর। মেয়েটি ঠিক বুঝেছিল কিন্তু কার ওপর ও নির্ভর করতে পারবে। চমৎকার চিনেছিল। তিনি ভেবেছিলেন এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা। কিছুদিন পর হয় মিসেস দত্ত, নয় অমৃতা নিজেই, তার আত্মসম্মানজ্ঞান যথেষ্ট, এখান থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা করবে। বাবা-মার কাছে এই পরিস্থিতিতে থাকাটা ওর বিপজ্জনক। তখন কী করবেন সেটা তাঁকে ভাবতে হচ্ছিল। এমন কথাও ভেবেছিলেন সিস্টার মাধুরী সেনকে অনুরোধ করবেন। যদিও মনে মনে জানেন সেটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। মাধুরী দুটি মাত্র ঘর নিয়ে থাকে। একটা ঘেরা বারান্দা। সেখানেই রান্না-বান্না। একটি ঘরে থাকেন মাধুরীর বৃদ্ধ বাবা, অন্য ঘরে তারা স্বামী-স্ত্রী। এর মধ্যে কোথায় আর একজনের জায়গা হবে। রম্ভাকে সব বলে নিজেদের বাড়িতে রাখবার কথাও ভেবেছিলেন। হৃৎকম্প হয়েছিল, তবু ভেবেছিলেন। কিন্তু এই মিসেস দত্ত সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিলেন। কথায় বলে না? যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন! কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলা যায় যার কেউ নেই তার প্রতিবেশী থাকে, বন্ধুর মা থাকে।

ডক্টর রঞ্জন কার্লেকর চলে যাবার পরও অমৃতা ফিরে পড়তে বসতে পারে না। প্রথমত, তার এইবার একটু ক্লান্ত লাগছে। শরীরটা একটু দুর্বল, মাথা টলছে। তারও ওপর ডাক্তার এলেই তার মনে পড়ে যায়, সব মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় তাকে নিয়ে একটা কেস চলছে, মনে পড়ে যায় তিন বছরের বিবাহিত জীবনের সেই বিরাট দুঃস্বপ্ন যেটাকে সে ঠিক দুঃস্বপ্ন বলে চিনে উঠতে পারেনি। খুব বেশি প্রত্যাশা ছিল না তো জীবনে। বরাবর পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে চলতে মনে হত এই ভাবেই চলতে হবে, অন্তত তাকে। অভিযোগ করে লাভ নেই। মা যাকে জন্ম দিয়েই হার্টের রোগ বাধান, জ্ঞান হওয়া থেকে সে তার মায়ের ধাত্রী, সে অভিযোগহীন, আবেগবর্জিত প্র্যাক্টিক্যাল মানুষ হবে না তো কে হবে? কেরিয়ার একটা গড়তে হবে এইটুকুই সংকল্প ছিল। তেমন রেজাল্ট হলে কলেজ, নইলে স্কুল, নইলে যা হোক একটা সম্মানজনক কিছু। বাইরে বেরোতে পারবে। পাঁচজন মানুষের সঙ্গে মেলামেশার একটা আলাদা জগৎ তৈরি হবে। এই কংসের কারাগার চিরন্তন লাগবে না তখন। হাতে থাকবে নিজের উপার্জন করা টাকাপয়সা, আলাদা একটা গুরুত্ব তৈরি হবে তার। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটল তা তো তার দুঃস্বপ্নেরও অতীত ছিল! সন্তান ধারণ করাটা দোষের কেন হবে, সে এখনও বুঝতে পারে না। ঠাকুমা-ঠাকুর্দাদের তো স্বপ্নই কচি-কাচা নাতি-নাতনি। সুদ্ধু সে আর অত কাজ করতে পারবে না বলে তাঁরা, নিজেদের প্রথম নাতিকে গর্ভে বিনষ্ট করতে

চাইলেন? তাদের বাবাও চাইল? সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা বোধের অগম্য প্রহেলিকা! এমন হয়! হতে পারে?

—আসতে পারি?

অরিন্দম ঘোষ বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করে।

একটা ডিভানে হেলান দিয়ে চোখ দুটো বুজে ছিল সে। বলল—আসুন। অরিন্দম আজও তাকে নিজের নাম বলেনি।

—মিঃ ঘোষ বলে ডাকলেই তো চলবে! সে বলে।

অমৃতা কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপাচাপি করতে পারে না। তবু বলেছিল—আপনি তো এখন বেশ চেনা মানুষ হয়ে গেছেন। এত চেনাকে কেউ মিস্টার বলতে পারে না কি?

—তা হলে ঘোষদা? অনেক অফিসে এটা চালু আছে। জানেন তো? বাঙালি দেখলেই ভারতের আপামর অবাঙালি বলবে দাদা। সেই আমেরিকান ইয়োরোপিয়ানদের ধারণা ছিল না? ইন্ডিয়া মানেই ম্যাজিক, ইয়োগী আর সার্পেন্টি। এদেরও তেমনি ধারণা বাঙালি মানেই দাদা, রসগোল্লা আর মছলি।

—আমি অবাঙালিও নই, আপনার অফিস কলিগও নই, ঘোষদা-টোষদা বলতে পারব না।

—আচ্ছা লালটু নামটা আপনার কেমন লাগে?

—আমার ভাল লাগার ওপর আপনার নাম নির্ভর করছে না কি?

—বেশ আপনি আমাকে লালটুদা বলেই ডাকবেন অমৃতা।

অমৃতা অবশ্য লালটুদা-টা বলে ডাকটা এড়িয়ে যায়। তবে স্বীকার করতেই হবে এই লালটুদা, অথবা ঘোষদা মানুষটি খুব মজার এবং খুব উপকারী।

—আসুন, বলতে বলতে সে উঠে বসল। পেটে একটু চাড় লাগল, সামান্য মুখ বিকৃত হল তার।

—খুব অসুবিধে করলাম বোধহয়...

এ কথার উত্তর দিল না অমৃতা।

কাছাকাছি একটা বেতের মোড়া টেনে বসে অরিন্দম ঘোষ পকেট থেকে দুটো খাম বার করলেন। এগিয়ে দিলেন অমৃতার দিকে।

প্রথমটা খুলতেই মা-বাবার চিঠি বেরোল। অরিন্দম ঘোষ তার বাবা-মার সঙ্গে দৌত্যের কাজটা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন। এক সময়ে ডঃ কার্লেকর এটা অপছন্দ করেছিলেন।—অমৃতার বাবা-মার বাড়ি ওরা নজর রাখবে।

ঘোষ তখন জানান—পেছন নেওয়া টিকটিকিদের ফাঁকি দেবার বহু উপায় না কি তাঁর জানা আছে।

মা লিখেছে :

খুকি,

তোকে না দেখে আমি আর থাকতে পারছি না। চার পাঁচ মাস হতে চলল, তোকে দেখিনি, তোর গলা শেষ কবে শুনেছি মনে পড়ে না। তোর শরীরের এই অবস্থায়, মনের এই অবস্থায় আমি মা হয়ে তোর কিছুই করতে পারছি না, আমার দিবারাত্র বুক ধড়ফড় করে। শিবানীর কাছে তুই খুব ভালই আছিস, ঘোষ ছেলেটি বারবার আশ্বাস দিয়ে যায়। কিন্তু আমার মন মানে না। যদি আমার ভালমন্দ কিছু হয়ে যায় আর দেখা হবে না। তুই সত্যি-সত্যি ঠিক আছিস কি না, কী অসুবিধে আমাকে খুলে লিখবি। নইলে ভাবব।

ইতি তোর
অভাগিনী মা।

বাবা লিখেছে,

অমৃতা,

আমার চিঠি তোমার মায়ের চিঠির পুনশ্চ বলে মনে করবে। আমার মনের অবস্থা আমি ভাষায়

প্রকাশ করতে পারছি না। দু হাজার টাকা আপাতত পাঠাচ্ছি। আরও পাঠাব দিন পনেরোর মধ্যে। যত তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে আসো, ততই ভাল।

ইতি
বাবা

এতই যদি না-দেখে-থাকতে-না-পারা তা হলে মেয়ে গ্র্যাজুয়েট না হতেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলে কেন মা? তোমার বুক ধড়ফড় কবে করত না মা? আমার অসুখ করলে বাড়ত। আমার পরীক্ষার ফলাফল বেরোবার সময়ে বাড়ত। আমি শাড়ি পরছি, আমার চুল কোমর ছোঁয় ছোঁয় দেখে বাড়ত। তোমার এ বুক ধড়ফড়ানি থামাতেই তো চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিলে? আর ভাল-মন্দ কিছু হয়ে যাওয়া? মানে মৃত্যু? একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়া মানেই কিন্তু তার বাবা-মার তার কাছে মৃত হয়ে যাওয়া। অন্তত সমাজ তাই প্রত্যাশা করে, এখনও। একটা মেয়ে বাইশ বছর তেইশ বছর বাবা-মার কাছে প্রতিপালিত হল, এতদিন পর্যন্ত মেশামেশি, মাখামাখি, তিনজনে কি চারজনে মিলে একটা ইউনিট। কিন্তু বিয়ের পরদিনই সেই নিজের বাড়ি বাপের বাড়ি হয়ে যায়। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কথা হয় বউ বেশি বেশি বাপের বাড়ি যায় কি না। দুই কুটুম্বে ভাব-ভালবাসা, মনের মিল, যেমন গল্প উপন্যাসে পড়া যায়, বাস্তব-জীবনে সে রকম খুবই কম হয়। হলে ভাল, না হলে ক্রমশ মেয়ের কাছে মেয়ের বাবা মা মৃত থেকে মৃততর হয়ে যেতে থাকেন। মা! মা গো! ও বাবা, কোথায় গেলে। কেন এমন ভুল করলে, হঠাৎ অসাবধানে অমৃতার চোখ ফেটে উষ্ণ প্রস্রবণ বেরিয়ে এল। দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে চোখে। পাহাড় ফাটিয়ে যখন গরম জল বেরিয়ে আসে তখন পাহাড়ের পাথরদেরও কি এমন লাগে? দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট টিপে বসে আছে অমৃতা, চোখ দিয়ে অবিরল উষ্ণ ধারাপাত। সামনে ঘোষ চুপ করে বসে সেই ধারাপাত দেখছে, পড়ছে। সোজা চোখে নয়, চোখ নিচু, কিন্তু প্রথম চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার দৃশ্যটা দেখেছে, দেখেছে সেই ঠোঁট কামড়ে ঠোঁট ফোলানো থামাবার আপ্রাণ চেষ্টা, দেখে নিয়েই চোখ নিচু করে ফেলেছে, এখন মনে-মনে দেখছে, গুনছে তেরো ক্কে তেরো, তেরো দু গুণে ছাব্বিশ, তিন তেরং ঊনচল্লিশ, চার তেরং বাহান্ন...নামতা পড়ছে। মনে মনে। কতক্ষণে থামে, কতক্ষণে। মেয়েদের অশ্রুপাতের সামনে পুরুষরা খুব অসহায়, অপ্রয়োজনীয়, অপ্রস্তুত বোধ করে। বিশেষ করে সেই অশ্রুর পেছনে যখন তাদের কোনও অবদান থাকে না।

১৪

একটু পরে চোখ মুছে অমৃতা বলল—আপনি কবে সিঙ্গাপুরে ফিরছেন?

অরিন্দম বলল—কেন? এতই গোলমাল করছি না কি?

—এত উপকার করছেন আর বলব গোলমাল? আমাকে এতটাই অকৃতজ্ঞ ভাবলেন?

—তা নয়, অমৃতা কিন্তু আপনার মনে হতে পারে কেন নিজের কাজ ছেড়ে এতদিন এখানে পড়ে আছি। তা ছাড়া আপনার এই রকম সময়ে আমি ফাজলামি, ফাজলামিও না, ছ্যাবলামি করে যাচ্ছি ক্রমাগত।

—ছ্যাবলামি-টামি আমার মনে হয়নি। ভালই তো আপনি আবহাওয়াটাকে হালকা করে দেন। সব সময়েই যদি মনে রাখতে হয় আমি একটা বিপদে পড়া মেয়ে, যাকে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে, তা হলে তো পাগল হয়ে যাব। তবে প্রথম প্রশ্নটা কৌতূহল থেকেই করেছিলাম। মানে কী করে অত ছুটি পাওয়া সম্ভব।

—ও চাকরিটা আমি ছেড়ে দিয়েছি অমৃতা।

—সে কী? কেন?

—কেন আপনি জানেন না, লাবণি বলেছে অমৃতা ফিরে না এলে সে-বিয়ে করবে না। তা ছাড়া সিঙ্গাপুর-টুর-এও সে যাবে না। অচেনা জায়গায় একা পেয়ে তাকে যদি আমি গুম করে ফেলি।

অমৃতার মুখে হাসি, তার পরেই সে অন্যমনস্কভাবে বলল—লাবণি? লাবণি আমাকে এত ভালবাসত বলে তো জানতাম না! আমার আজকাল পুরনো কথা বেশি মনে পড়ে না, তবু এটুকু মনে আছে যে আমার বেশি বন্ধুত্ব ছিল দোলার সঙ্গে। আর শম্পার সঙ্গে, শম্পা অবশ্য য়ুনিভার্সিটির গ্রুপ না। ওরা কেমন আছে, কী করছে, বিশেষত শম্পা...

—আমাকে ঠিকানা দিন, খবর এনে দেব। দোলা ভালই আছে। সেদিন দেখলাম একটি কার্তিক ঠাকুরের সঙ্গে ব্লু-ফক্স থেকে বেরোচ্ছে!

অমৃতা চুপ করে গেল।

দোলা? দোলা? দোলা কেমন করে? অমৃতা-অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান হল না, অথচ দোলা, অমৃতার ভক্ত-বন্ধু কার্তিক ঠাকুরের সঙ্গে ব্লু-ফক্স থেকে বেরোয়? আর লাবণি, যে লাবণির সঙ্গে য়ুনিভার্সিটিতে এসে মোটে দু বছরের কাছাকাছি সময় ভাব, সে ভাব খুব গভীরও নয়, সে-ই কি না চিতোরগড়ের রানার মতো প্রতিজ্ঞা করে বসল? লাবণির চেহারাটাও তার এখন ভাল করে মনে পড়ছে না। চোখগুলো খুব বড় বড়, সুন্দর, চোখ দুটোকে খুব সাজাতও লাবণি। হ্যাঁ, মনে পড়ে যাচ্ছে, দোলার মতো নাদুসনুদুস নয়। স্লিম চেহারার মেয়ে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। সেই লাবণি তার ফিয়াঁসে এই ভদ্রলোককে রহস্য-সমাধান করতে দিয়েছে? এমনই তার জেদ যে এই ভদ্রলোক সিঙ্গাপুরের চাকরিটা ছেড়েই দিলেন। আশ্চর্য! কী আশ্চর্য। তবু তো লাবণিকে সে ভাবে ভালবাসতে পারছে না সে, দোলাকে যে ভাবে বা শম্পাকে যে ভাবে...। ভালবাসা তা হলে কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে জন্মায় না? একটা মানুষ মানুষ হিসেবে ভাল বলে নিজেকে প্রমাণ করলেও না? তোমার কুশলের জন্য সে উৎসুক, উদ্বিগ্ন, খানিকটা আত্মত্যাগ। হ্যাঁ আত্মত্যাগই তো করছে লাবণি নামের একটি মেয়ে অমৃতা নামের আরেকটি মেয়ের জন্য, তবুও আসে না সেই অন্তঃস্রোত, সেই তুমুল টান যা একটি মানুষকে আরেকটি মানুষের কাছে এনে দেয়! শুধু নারী-পুরুষ না, নারী-নারী, বা পুরুষ-পুরুষ সম্পর্কেরও এই-ই কি শেষ কথা? কত উপকার করছেন তার এই ভদ্রলোকও। মোটামুটি সুপুরুষ, চমৎকার ব্যবহারও। মা-বাবার খবর-চিঠি নিয়ে আসেন। বন্ধুবান্ধবদের খবরাখবরও রাখেন। চাইলেই দেন, যদিও কেন যেন অমৃতা বন্ধুদের খবর জানতে চায় না, এক ঝটকায় সে যেন চলে গেছে কোনও চতুর্থ মাত্রার জগতে যেখান থেকে এদের কতকগুলো খেলনা-পুতুল, বড় জোর বালক-বালিকা বলে মনে হয়। সে যাই হোক এই সুশিক্ষিত, সুপুরুষ, সজ্জন, সুরসিক যুবকটি আসবে বলে সে কি পথ চেয়ে থাকে? তেমন কোনও আগ্রহ জন্মায়নি তো এঁর সম্পর্কে? সে কি তার সুপার-ইগো তাকে বারবার সাবধান করে দিচ্ছে বলে? সাবধান। সাবধান অমৃতা ভুলো না ইনি তোমার ক্লাস-বান্ধবী লাবণির বাগদত্ত! ভুলো না তুমি বিবাহিতা, সন্তানসম্ভবা! ভাল লাগা মানেই তো ভালবাসা নয়। কত বর্ণচ্ছায় ভালোবাসা বা ভাললাগা কথা দুটোর। বন্ধুর স্বামীকেও তো ভাল লাগতে পারে, সেটা প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কের মতো নয় মোটেই। কিন্তু এটা ঠিক এই লালটু ঘোষ-এর জন্য সে কখনও পথ চেয়ে থাকে না। বাবা-মার চিঠি বা বার্তা আনবেন বলেও না।

আর একটা অদ্ভুত কথা, সে খুব খারাপ হাতে পড়েছিল বটে, তার শ্বশুর শ্রীলশ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র গোস্বামী যিনি বরাবরই গুপ্তভাবে প্রতিকূল ছিলেন, তার শাশুড়ি সুষমা যিনি নিজেকে ক্রমাগতই বিষমা বলে প্রতিপন্ন করলেন, সর্বোপরি তার সেই অরিসূদন নামক স্বামী, যে শেষ পর্যন্ত পত্নীসূদন হয়ে দেখা দিল, এরা সবাই মিলে তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি একটা অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছিল। কেউ ছিল না তখন। কেউ জানত না, সে নিজেই জানত না এমন একটা ব্যাপার হতে যাচ্ছে! এ যেন ঘুমের মধ্যে কাউকে খুন করে ফেলা। তফাত এই যে কাউকে ঘুমের মধ্যে খুন টুন করলেও প্রমাণ থেকে যায়, প্রমাণ থেকে খুনি ধরা পড়ে, যদি পুলিশ ইচ্ছা করে, শাস্তিও হয় যদি আইন-আদালত

ইচ্ছা করে, কিন্তু একটি মেয়ে চার মাসের গর্ভিণী তার গর্ভপাত হয়েছে এবং সে তাতে মারা গেছে, এই পরিস্থিতিতে খুব শক্তপোক্ত শক্তিশালী সংকল্পে অটল কেউ না থাকলে কিচ্ছু করার থাকে না। তার বাবা-মা আদৌ এ জাতীয় লোক নন। কিন্তু তার পর থেকে, ক্লোরোফর্ম দিয়ে জোর করে অজ্ঞান করে সেই মেয়েটিকে মিথ্যা কথা বলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন সেই যে নার্সিংহোমে নিয়ে এল অমনি কে বা কারা যেন তার সমস্ত দায় তুলে নিল নিজেদের কাঁধে। কারা যেন চারদিক থেকে, দশ দিক থেকে বলে উঠতে লাগল—না না, এ সব বাজে, এ সব মিথ্যা। অমৃতা, অমৃতাই। অমৃতা...অমৃতা। অমনি অমৃতার জন্য এসে গেলেন সিস্টার মাধুরী সেন, এসে গেলেন ডক্টর রঞ্জন কার্লেকর। এসে গেলেন শিবানী মাসি, তারপর এই লালটু ঘোষ, এখন শুনছে এর পেছনে তার য়ুনিভার্সিটির বন্ধুরাও ছিল। এইভাবেই সব এসে যাবে। এসে যাবে যখন যা দরকার। এমন নয় যে সে প্রত্যাশা করে বসে আছে। কিন্তু সে নির্ভাবনায় নির্ভীক চিত্তে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। কোনও কিছুর জন্যেই আগ বাড়িয়ে কারও কাছে হাত পাততে যাচ্ছে না।

মাত্র একজনের কাছেই সে আশ্রয় চেয়েছিল। তিনি শিবানী মাসি। চাইতেও হয়নি—'মাসি' বলে একটা ডাক দিয়েছিল শুধু। কী ছিল সেই ডাকে? কাতরতা? আর্তি? প্রার্থনা?—কে জানে। কিন্তু কথা সব বললেন ডক্টর কার্লেকর এবং মাসি হাট করে খুলে দিলেন দরজা, বাইরের এবং ভেতরের। এখনও পর্যন্ত সে মাসিকে তার ভরণ-পোষণের জন্য মা-বাবার পাঠানো একটা টাকাও নেওয়াতে পারেনি।

—আমার অনেক আছে অমি। কোনও অসুবিধে নেই। তুই যদি আমার মেয়ে হতিস! মা-বাবারও তো ব্যাপারটা খারাপ লাগবে!

—ঠিক আছে ওঁরা যা পাঠাচ্ছেন নে, নিয়ে রাখ। কখন কী দরকার পড়ে তার ঠিক কী? তোর নিজের দরকার হতে পারে।

এই মাসিকে সে ছোট্ট থেকে ভালবেসে এসেছে। বালিকা হিসেবে এসেছিল মানিকতলার বাড়ি থেকে। উনি ডেকে ডেকে আলাপ করলেন মিল্‌ক-বুথে।—তোমরা নতুন এসেছ না? কী নাম তোমার? অমৃতা? ও মা! কী সুন্দর নাম!

শিবানী মাসির একটা মেয়ের শখ ছিল খুব। প্রত্যেক মা-ই বোধহয় ভেতরে ভেতরে একটা মেয়ে চান, যাকে দিয়ে যাবেন তাঁর সুখ-দুঃখ-অভিজ্ঞতা-অনুভূতির উত্তরাধিকার। মেয়েদের জীবনটা তো অদ্ভুতই। এক জায়গায় বড় হয়। একরকম পরিবেশে, ধ্যানধারণায়, তারপর তাকে চলে যেতে হয় অন্য পরিবেশে, অন্য পটে, বারবার কত ভূমিকা বদল! মায়েদের গোপন বাক্সে বাক্সে ঝুলিতে ঝুলিতে ভরা থাকে সেই সব।

অমৃতার মা একদিন এক গাঢ় দুপুরে তাকে বলেছিলেন—বাবা! বাবা যে আমাকে কী ভালবাসতেন তুই ধারণা করতে পারবি না খুকি! সেই বাবা আমার ডাক্তারের চেম্বারে আমাকে বসে থাকতে দেখে বেরিয়ে চলে গেলেন। একবারও মনে হল না—কেন? কার জন্য কেন এসেছিলেন। এটা কীরকম জানিস? তুই মনে করছিস সময়টা সকাল, আশপাশে যারা ঘুরছে তারা তোর চেনাজানা ভাল মানুষ ভদ্রলোক, হঠাৎ দেখলি, না, তুই ভুল করেছিস, ওটা আসলে সন্ধে, আশপাশের লোকগুলো চেনা তো নয়ই, ভদ্রলোকও নয়, ওরা সব গুণ্ডা, খুনি, মস্তান...বাবা আমায় সারাজীবন আর মায়ের কোলে ফিরতে দিলেন না,...বলতে বলতে মা নিঃশব্দে কেঁদেছিল।

অমৃতা তখন পনেরো ষোলো বছরের হবে, তার কেমন গা ছমছম করে উঠেছিল। সে বলেছিল—অমন চুপ করে থাকো কেন মা? হাউ হাউ করে, শব্দ করে করে কাঁদো না! ওই জন্যেই তোমার অত বুকে ব্যথা হয়।

—ওভাবে কাঁদতে পারি না খুকি, যদি তোর বাবা শুনতে পান?

—কেন, বাবা শুনলে কী হবে?

—উনি চান না আমি এ সব নিয়ে আর ভাবি। উনি তো খুবই অপমানিত হয়েছিলেন।

একজন মেয়ে তার বাবা-মার কথা ভেবে, তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা ভেবে কাঁদবে, তাতেও তার স্বামী আপত্তি করবেন? মা-বাবার সঙ্গে যাঁর জন্যে চিরবিচ্ছেদ! কী অদ্ভুত কথা! এমন করলে তো বুক ফেটে মরে যাবার কথা।

মায়ের বিয়ের সে কী ভয়াবহ অভিজ্ঞতা! দু বাড়িতেই আপত্তি। তার বাবা বিশ্বজিৎ মাকে আল্টিমেটাম দিলেন। তিন দিনের মধ্যে মনস্থির করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নইলে জীবনে আর দেখা হবে না। কী সঙ্কট একটি সতেরো আঠারো বছরের মেয়ের! বেরিয়ে তো এলুম এক কাপড়ে। উঠব কোথায়? খাব কী? শ্বশুরবাড়িতে সাত দিনের জন্যে জায়গা হয়েছিল চাকরদের থাকার ঘরে। ওঁরা ব্রাহ্মণ তো, আর আমরা সোনার বেনে! সাত দিনের মধ্যে বিশ্বজিৎ চাকরি ঠিক করলেন, একঘরের এক বাসাবাড়ি তাঁর কোনও বন্ধু জোগাড় করে দিল। তারপর? সংসার করতে গেলে কী লাগে কোনও ধারণা নেই সে মেয়ের। ঘর নোংরা হচ্ছে ঝাঁটা চাই, রান্না করতে হবে? স্টোভ চাই, কেরোসিন চাই, দেশলাই চাই। রান্নার বাসন, খাবার বাসন, চাল, ডাল, তেল নুন, মশলা কিছুই জানে না সেই বড়লোকের দুলালী। তখন পদে পদে মতান্তর, মনান্তর। ঠেকে ঠেকে ঠেকে যবে শেখা হল সব তখন সীমার সীমা পেরিয়ে গেছে। হার্টের অসুখে জবুথবু। এক অসহায়, অকর্মণ্য সুন্দরী, যাঁকে স্বামীর রান্না ভাতে-ভাত, কচি মেয়ের রান্না ডাল-ভাত খেতে হয়। অমৃতার দাদু খুবই ধনী ছিলেন, দুই মেয়ে, তিন ছেলে, আজও পর্যন্ত কেউ এই অসহায় ছোট মেয়েটিকে কোনও সাহায্য করেননি। দাদুর ছেলেরা ছোট বোনের প্রাপ্য বলেও কিচ্ছু দেননি, কিচ্ছু না। স্বর্ণবণিকের মেয়ে সারাজীবন নিরাভরণ রইলেন।

কত কথা! কত অভিজ্ঞতা! এ সবই দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে মেয়েকে। আর কাউকে দেওয়া যায় না। ছেলেকেও না। শিবানী মাসি হঠাৎ একদিন বললেন—অমৃতা, কাউকে কখনও বিশ্বাস করবি না।

—কাউকে বলতে? স্বামীকে যে বিশ্বাস করা যায় না সে তো শিখেই গেলাম মাসি।

—হ্যাঁ তাই বলছিলাম...চুপ করে গেলেন মাসি। হয় তো ঝুলিতে কোনও গুপ্ত কথা আছে, কোনও একদিন বলবেন, বলতে পারবেন অমৃতাকে, বলে মুক্ত হবেন।

এখন বলেন—মেথিফোড়ন দিয়ে চাটনি রাঁধবি। আর লুচির ময়দায় একটু জোয়ান মিশিয়ে নিবি—অম্বল হবে না, খেতেও ভাল হবে। ধোঁকার ডাল বাটায় একটু কুমড়ো কি একটু বাঁধাকপি কি একটু ফুলকপির ফুল বেটে মিশিয়ে নিই আমি, ধোঁকার টেস্টই আলাদা হয়ে যায়।

—তুমিও যেমন মাসি, আমি আর ধোঁকা রেঁধেছি!

সে যখন নতুন শ্বশুরবাড়ি যায় তখনও কতকগুলো টিপস দিয়ে ছিলেন মাসি। খিচুড়িতে নুন আর মিষ্টি একেবারে সমান পরিমাণে দিতে হয়। ডাল চালের চেয়ে একটু কম দিই আমি। অপূর্ব টেস্ট হবে দেখবি। যে সব রান্নায় ঘটিরা মিষ্টি দেয় না, আমরা ঢাকাই বাঙালরা সে সবেও কিন্তু মিষ্টি দিই, খুব সামান্য, ফোড়নের মতো, তাইতে রান্নায় অত লাবণ্য আসে।

১৫

অরিন্দম ঘোষ অনেকক্ষণ বেরিয়ে এসেছে। এবার অফিস যাবে। মনটা কেন কে জানে কেমন খিঁচড়ে আছে। আকাশটারই মতো। এমনিতে সে খুব রসিক, সরল-তরল লোক। কিন্তু মেজাজ একবার খিঁচড়ে গেলেই তার চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়। তার মা বলেন—'তুই হলি গুমো রাগী। রাগলি যদি তো গুম হয়ে গেলি একেবারে।' এখন অরিন্দমের সেই অদ্ভুত বিরল রাগটা হয়েছে। মুখটা ফুলে গেছে। কালো দেখাচ্ছে পুরো মানুষটাকে, বিশেষত মুখটা। গাড়িটা যখন তার অফিসের

দরজায় গিয়ে দাঁড়াল, নামতে নামতে সে শুনতে পেল কে যেন বলছে—'ঘোষ এল।' আরও খিঁচড়ে গেল মনটা। কেতাদুরস্ত অফিস। দারোয়ান গাড়ির দরজা খুলে সেলাম করে। এয়ার কন্ডিশনড, বিরাট হলে কর্মরত করণিককুল। কাচে ঢাকা নিজস্ব অফিসে বসে সে ড্রাফ্‌টসম্যানদের করা নকশা দেখে, ভুলগুলো দাগায়, কিছু বদলাতে হলে কম্পিউটার চলে। তার নিজস্ব স্টেনো আছে। টেবিলে দুটো ফোন। এমত অবস্থায় একটু দেরি করে অফিসে এলে কোনও অচেনা-অজানা কণ্ঠ যদি সাবেক কলকাতাই কায়দায় বলে—'ঘোষ এল'। তাহলে মেজাজ খিঁচড়ে যাবে না।

এইরকম খিঁচড়ানো মেজাজ নিয়েই সে বিকেলবেলা লাবণিদের বাড়ির পথ ধরল। ইচ্ছে ছিল না। ইচ্ছে ছিল বাড়ি গিয়ে জামাকাপড় জুতো সুদ্ধু মায়ের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। মা বাড়ি ফিরে ব্যাপারটা দেখবে। জ্বলে যাবে একেবারে। —আবার তুই জুতো পরে আমার বিছানায় শুয়েছিস।

—সিগারেটও খেয়েছি। চারদিকে ছড়ানো সিগারেটের টুকরোগুলো আঙুল দিয়ে দিয়ে সে দেখিয়ে দেবে।

ব্যস লেগে যাবে তুমুল ঝগড়া মায়েতে-ছেলেতে। একটু পরেই আসবে বাবা, বলবে—তুমিই তো লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ। এখন বোঝো!

—তাই বলে ও বৃষ্টিভেজা জুতো পরে আমার বিছানায় শোবে? শুতে পারত নিজের বিছানায়। ফুঁকত নিজের ঘরে। আমাকে কেন প্যাসিভ স্মোকিং করানো!

বাবা জানলাগুলো খুলে দিতে দিতে বলবে—এই তো ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে, নিকোটিন, ক্যাডমিয়াম সব, স-ব। কেন যে এগুলো করিস লালটু?

—করো তো সবে গোঁফ গজানো ফুলটুসদের পড়ানোর চাকরি। আমাদের রেসপন্সিবিলিটির তোমরা কী বুঝবে?—আরও কালো মুখে সে মায়ের বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বলবে—রাতদিন তো খবরের কাগজগুলো তোমাদের ফাঁকিবাজির নিন্দে করছে। তবু তো তোমাদের শিক্ষা হয় না?

—তুই, তুই এ কথা আমাদের বললি?—'আমাদের'টার ওপর জোর দিয়ে বলবেন তার লেকচারার বাবা-মা, না, বাবা আবার রিডার হয়েছেন। ভীষণ আহত তাঁদের গলা।

—বলবে না কেন? গোল্লায় গেছে যে! এক কথায় অমন সোনার চাকরি যে ছেড়ে চলে আসে তার আবার রেসপন্সিবিলিটির গুমোর!

এইরকম একটা সিন হলে তার ভেতরকার চাপা ক্রোধের বজ্রাগ্নি মুক্তি পেত।

কিন্তু তা হবার নয়। আজ আবার সেই ফাজিল ছোকরা, কী যেন নাম! অবন না পবন। লাবণির ভাই—ঢলো ঢলো লাবণি অঙ্গে অবন বহিয়া যায়! সেই ছোকরার জন্মদিন। সে গেলেই ফিচ ফিচ করে হাসবে—'জামাইবাবু, আপনি অরিন্দমদা হবেন কবে?' ফক্কড় ফড়নবিশ কোথাকার। তার জন্য আবার একটা 'সেরা সন্দেশ' কিনে নিয়ে যাচ্ছে সে। জন্মোদিনের উপহার। পছন্দ হলে হয় এখন। বড় হয়েছে তো যত্ত বাজে কমিক্‌স্ পড়ে, আর টিভি দেখে। হয়তো আশা করবে লেটেস্ট হিন্দি ছবির ভিডিও, কিংবা 'জীবনমুখী'র সিডি। করলে করুক, সে মনে করেছে একটা চোদ্দো বছরের ছেলের জন্য 'সেরা সন্দেশ' একটা সেরা উপহার। কত ঘটাপটা আবার করছে এরা একটা চোদ্দো বছরের দামড়ার জন্যে কে জানে! হয়তো বেলুন আর শিকলি ঝুলিয়েছে অবিকল ক্রিশ্চান কায়দায়, আর সেই 'হ্যাপি বার্থ ডে' গাইতে গাইতে কেক-কাটা? উঃ হরিব্‌ল।

গোয়াবাগানে গোড়ালির ওপর অবধি জল দাঁড়িয়েছে। হয়ে গেল! ফিরে যাওয়া যাক। টেলিফোন করে জানিয়ে দেওয়া যাবে জলের জন্যে যেতে পারা যায়নি। বর্ষাকালে জন্মাও কেন বাবা? যদি জন্মালেই তবে উঁচু রাস্তায় বাস করলে না কেন? গাড়িটা ঘোরাবার চেষ্টা করছে, প্রায় বনেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেই ছোকরা, যার নাম অবন।

—গামবুট এনেছি আপনার জন্যে অরিন্দমদা, রামধনিয়া তখন থেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে বসে পরে নিন। গাড়িটা কর্নওয়ালিসেই থাকুক।

—প্রাণ জল করে দিলে একেবারে। গামবুট নিয়ে কেউ কারও জন্য দাঁড়িয়ে থাকে জীবনে এই প্রথম দেখল শুনল অরিন্দম। মনে হল 'সেরা সন্দেশে'র প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলে—এই নাও হে ক্ষৌণীশ গামবুটে এটা জড়িয়ে নিয়ে বাড়ি যাও।

বলল না অবশ্য। প্যান্ট হাঁটু অবধি গুটিয়ে ঝপাস করে জলে নামল।

—এই এই কী করছেন কী করছেন... বলতে বলতে তার নিষ্ক্রমণ ও গঙ্গাবতরণ হয়ে গেছে।

—গাড়িটা থাকবে তো?

—থাকবে না তো যাবে কোথায়?

—কোথায় যাবে আমি কি জানি! তোমাদের গোয়াবাগান পাড়া তোমরা জানো।

—ইস্‌স্‌ অরিন্দমদা, আপনি বকুলবাগানের ছেলে বলে গোয়াবাগানকে এমন 'দূর ছাই' করছেন? ভেবে দেখতে গেলে কিন্তু গোয়া অর্থাৎ গো মানে গোরু, বকুলের থেকে অনেক গুণ উপকারী।

মনে হল ছোকরা, একটি আস্ত গোরুর রচনাই তাকে শোনাবার যোগাড় করছে।

—চলো, চলো, নিজে তো দিব্যি গামবুট পরেছ।

—বা রে! আপনাকেও তো এনে দিলুম একজোড়া। আমাদের বাড়িতে মোট পাঁচ জোড়া আছে। ব্যাঙে ইয়ে করলেও জল দাঁড়িয়ে যায় কি না।

ছোকরার শালীনতা জ্ঞানে আপ্যায়িত হওয়া গেল। সে জিজ্ঞেস করল—পাঁচ জোড়া কে পরে?

—কেন? আমি, বাবা, দিদি, বড়দি এলে বড়দি আর মা।

—মা-ও গামবুট পরেন?

—পরতে হলে হয় বইকি!

হবু-শাশুড়ির গামবুট-পরা চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই অরিন্দমের এতক্ষণের গুমো রাগ হাসির তোড় হয়ে বেরিয়ে এল। এবং হবু-জামাই-শালা এইভাবে হাসতে হাসতেই বাড়ি ঢুকল। হবু-শাশুড়ি উদ্বিগ্ন হয়ে সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন

—এত হাসি কীসের?

উত্তরে অরিন্দম জিজ্ঞেস করল—আপনিও গামবুট পরেন?

প্রথমটা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেননি ভদ্রমহিলা। তারপর দমকা হাসির তোড়ে তিনিও হাসতে হাসতে কাশতে আরম্ভ করে দিলেন।

লাবণি ছিল এসব থেকে দূরে। সে নিজেকে সহজলভ্য করে তুলতে চায় না। বিয়ের আগে অরিন্দমের বাড়ির একজন হয়ে যাওয়াটাও তার খুব পছন্দ নয়। কেন? তা সে বলতে পারে না। বিয়ের আগে থেকেই শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে মাইডিয়ার সম্পর্ক, শালার সঙ্গে গলাগলি—এসব থেকে লোকটা যেন কেমন সস্তা হয়ে যাচ্ছে না? খুব বড় নাকি চাকরি করে, প্রথম দিকের সিঙ্গাপুরি চাকচিক্যে আর একেবারে প্রাথমিক সৌজন্য-বিনিময়ের সময়ে তেমনটাই লেগেছিল। অভিজাত, দূরের মানুষ, দামি মানুষ। নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ কি না এটা নিয়ে ভয়-ভাবনা শুরু হল অমৃতার ব্যাপারটার পরে। কিন্তু ওই ব্যাপারটায় অরিন্দমের স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি, তার সক্রিয়তা, সপ্রতিভ সংবেদনশীল আচার-আচরণ তাকে একেবারে মুগ্ধ, অভিভূত করে দিয়েছিল। কিন্তু সে আরও কিছু চেয়েছিল। সকলকে এড়িয়ে একটা গোপন চাউনি, একটু হাসি যেটা লাবণি, শুধু লাবণিরই জন্য, এমন কিছু কথা যা তাকে রোমাঞ্চিত করবে, যা তাকে জানাবে অরিন্দমের কাছে সে কত দামি, কত বিশেষ! মধ্যযুগীয় বা রোমান্টিক কায়দার প্রেমনিবেদন সে সম্বন্ধ করে বিয়ের মধ্যে আশা করেনি। কিন্তু তার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়বার উদ্দেশ্য নিয়ে যে লোকটা সিঙ্গাপুর থেকে এল, সে হঠাৎ যেন দুম করে সবার হয়ে গেল। তিলকের, চঞ্চলের, নিলয়ের, দোলার, শর্মিষ্ঠার এবং তার বাবার, মা'র, অবনের, বড়দি আর সুজিতদা যখন বাঙ্গালোর থেকে আসবে তখন হয়তো এমনি সাবলীলভাবে তাদেরও হয়ে যাবে। এটাই তার নতুন ভাল-লাগায় কেমন একটা স্যাঁতা ধরিয়ে দিয়েছে।

লাবণি একটা উজ্জ্বল হলুদ লাল সাদা কালোর নতুন বাঁধনি পরেছিল। অবন তার জন্মদিনে নতুন জামাকাপড় পরুক না পরুক, তার দিদি পরবেই। চুলে সে সাধারণত দুটো বিনুনি করে, কাঁধ ছাড়িয়ে আর একটু পর্যন্ত তার ঘন চুলে বেশ মোটা মোটা দুটো বিনুনিই হয়। আজ কিন্তু সে একটা ক্লিপ দিয়ে আলগাভাবে চুলটা আটকে রেখেছে। চোখে কাজলটানা, ওপর পাতায় ম্যাসকারা, আই শ্যাডো, অথচ ন্যাচারাল রঙের লিপস্টিক মেখেছে। আয়নায় নিজেকে দেখে তার মনে হয়েছিল সে খুবই মূল্যবান, দামি মণিমুক্তোর মতো। তারপর জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। না অরিন্দমের জন্য নয়। বৃষ্টি দেখতে। নিজের বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে তার ভীষণ ভাল লাগে। সব বাড়িঘর রাস্তা বৃষ্টির প্রাবল্যে ধোঁয়া-ধোঁয়া, হাওয়ার তোড় অনুভব করা যায় জানলার ভেতর থেকেও। লোকেদের ছাতা বেঁকে যাচ্ছে, উল্টে যাচ্ছে, ছোট ছেলেমেয়েরা পেছনের বস্তি থেকে এসে জমা জলে ঝাঁপাই ছুড়ছে।

এমন সময়ে অবন এসে বলল—কই রে দিদি, অরিন্দমদা তো এখনও এল না?

—এত বৃষ্টিতে কী করে আসবে?—বলে জানলা থেকে সরে এল লাবণি।

—তোর সাজগোজ যে বৃথা যাবে রে!

—ফর ইয়োর ইনফর্মেশন আমি গতবার তোমার জন্মদিনেও এমনি বা এর চেয়েও বেশি সেজেছিলুম। তখন তোমার ওরিন্দমদা পিকচারে ছিল না।

—ফর ইয়োর ইনফর্মেশন দিদি—গত ঘণ্টাখানেক কি তারও বেশি তুই জানলার গারদ ধরে দাঁড়িয়ে আছিস।

—ফর ইয়োর ইনফর্মেশন বৃষ্টি হলেই বাড়ি থাকলে আমি এমনি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখি। বরাবর।

—ঠিক আছে তুই নয়, আমিই ওয়েট করছি। কী আনবে বল তো ওরিন্দমদা আমার জন্য? নিশ্চয়ই ভেবেছে আমরা খুব লোকজন নেমন্তন্ন করেছি, একদিকে উপহার রাখবার টেবিল। বাবা-মা সাজুগুজু করে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হিন্দি সিনেমার মতো আসুন বসুন হালুম হুলুম করছে। আর আমি নতুন সাফারি-স্যুট পরে এক হাতে বেলুন আর এক হাতে এয়ারগান নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হেভি সাজগোজ করে আসবে ব্যাটা, দেখিস! ঘিয়ে রঙের শার্ট, চিকিমিকি টাই, নেভি ব্লু, না না গ্রে স্যুট, চকচকে জুতো, সবসুদ্ধ হুড়ুম করে জলে পড়ে যাবে। কেন বল তো? আমি পাশ থেকে একটু ছোট্ট করে ল্যাং মারব।

—এই অবন, ভাল হবে না বলছি—লাবণি চড় তোলে।

তার কথায় কান না দিয়ে অবন বলল—তারপর কাদা মাখামাখি প্যান্তা-খ্যাচাং সেই পান্তভূতকে আমি তোর সামনে কলার ধরে দাঁড় করিয়ে দোব। বলব—সেলাম ঠোকো মেমসাবকো...আভভি ঠোকো!

এইসব বদমায়েশি করতে করতে অবন ঘর থেকে চলে গেল এক সময়ে। লাবণির কানে তখনও লেগে আছে—'সবসুদ্ধ হুড়ুম করে পড়ে যাবে জলে, কেন বল তো? আমি পাশ থেকে ছোট্ট করে একটু ল্যাং মারব।' তারপরে নাকি ও কাদামাখা সেই পান্তভূতকে কলার ধরে দাঁড় করিয়ে দেবে তার সামনে, সেলাম ঠুকতে বলবে। 'সেলাম ঠোকো মেমসাবকো।'

ঠাট্টাই। কিন্তু বিশুদ্ধ ইয়ার্কি কী? অবন কি তাহলে বোঝে তার আশা আর আশাভঙ্গ? সে কী চায়? কী চাইতে পারে তা বুঝে ফেলল চোদ্দো বছরের একটা ছেলেমানুষ যে এখনও স্কুলের গণ্ডিই পেরোয়নি, অথচ একত্রিশ বত্রিশ বছরের ওই ধাড়ি বিদেশে চাকরি করা লোকটা বুঝল না! আশ্চর্য!

তবে লোকটা যখন ঝপাস ঝপাস করে এক গোড়ালি জল ঠেঙিয়ে শেষ পর্যন্ত এল, অবনের কাঁধে হাত দিয়ে, প্রবল হাসতে হাসতে, দৃশ্যটা তার ভালই লাগল, নিজেকে অবশ্য সে বলল—দেখো কাণ্ড, আসছে যেন পাশের বাড়ির গুইরাম, হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা, কোনও একটা ইয়ে নেই। এই লোকের

সামনে অত বাঁধনি-টাঁধনি ম্যাসকারা-টারার দরকারটা কী? ভূশণ্ডির মাঠের পেত্নীর মতো তলায় একটা গামছা ওপরে একটা গামছা পরে চলে গেলেও ও ওই রকমই হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা করবে। ডিফারেন্সটা ধরতে পারবে না। এই সময়ে সে শুনতে পেল নীচের সেই অট্টহাসি, অবন আর ওই লোকটা তো আছেই, তার ওপরে মা তার সেই বিখ্যাত প্লেন টেক-অফ করার মতো হাসিটা হাসছে। সম্মিলিত হাসির মধ্যে থেকে প্রত্যেকটি স্বর, প্রত্যেকটি হাসির আলাদা স্টাইল চেনা যাচ্ছে। হাঁচির মতো হাসিও খানিকটা ছোঁয়াচে। তাই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সে খানিকটা হেসে ফেলল, তারপরে গোপন চোখের জল মোছার মতো করে হাসিটুকু মুছে ফেলল।

অরিন্দমের পা ধোওয়া, গোটানো প্যান্ট নামানো, ভিজে জবজবে জুতো মোজা পাখার তলায় দাঁড় করিয়ে শুকোতে দেওয়া, এক দফায় শরীর ওম্ করার চা খাওয়া, এ সমস্ত হয়ে যাবার পরও যখন লাবণি নামল না, লাবণির মা বনানী তখন মনে মনে একটু শঙ্কিত হলেন। বেশিরভাগ মা-ই তাঁদের মেয়েদের চেনেন। পড়া বইয়ের মতো আগাপাশতলা চেনা নয়, আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো চেনা। লাবণি যে সম্প্রতি অরিন্দমের ওপর একটু বিরূপ এটা তিনি কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু কেন সে সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণাই ছিল না। অরিন্দম ছেলেটিকে তিনি যতটা প্রত্যাশা করেছিলেন, তার চেয়েও বেশি ভাল লেগে গেছে তাঁর। এত নেটিপেটি, ঘরের ছেলের মতো আচার-আচরণ, সবচেয়ে চমৎকার হল তার রসবোধ, এখনই সে তাঁদের নিজস্ব পারিবারিক রসিকতাগুলোতে দিব্যি যোগ দিতে পারছে। হবু-শ্বশুরবাড়ির মধ্যবিত্ত পুরনো পাড়ার পুরনো পরিবেশে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে। মনেই হয় না এই ছেলে এখান থেকে সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রি করে আবার আমেরিকার ডিগ্রি নিয়েছে, সেখানে কিছুদিন চাকরি করে সিঙ্গাপুর চলে এসেছে। অবশ্য, একটা জিনিস থেকে ছেলেটির মনটা বোঝা যায় খুব। বাবা-মা দুজনেই অধ্যাপক। এবং এই এক ছেলে তাঁদের। বাবা-মা'র জন্যে যে ছেলের এত টান, অন্যদের জন্যও তার টান থাকা স্বাভাবিক। অবশ্য এক ছেলের বউয়ের অনেক সমস্যা হয়, এটাও তাঁর জানা আছে, কিন্তু থাকবে তো সিঙ্গাপুরে। তাঁর বড় জামাইও এমনি এক ছেলে, কিন্তু থাকে বাঙ্গালোরে। সিঙ্গাপুরের চাকরিটা অরিন্দম ছেড়ে দেওয়ায় তিনি একটু ঘাবড়ে গেছেন। মেয়েকে তা হলে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে থাকতে হবে! কে জানে তাঁরা কেমন লোক! বাইরে থেকে তো অতি ভদ্র সজ্জন বলে মনে হয়। এই যে বিয়ের আগেই লাবণিদের পরিবারের সঙ্গে অরিন্দমের এত মাখামাখি, এটা কি ওঁদের সায় ছাড়া সম্ভব ছিল? ওঁদের সঙ্গে খুব একটা আসা-যাওয়া না থাকলেও ফোনে কথা হয়। ওঁরাও নিজেদের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত যে ছেলের ওপর খবরদারি করবার ইচ্ছে বা উপায় কোনওটাই নেই মনে হয়।

কিন্তু দুঃখটা এই, বেশিরভাগ সময়েই মায়ের পছন্দে মেয়ের পছন্দে মিল হয় না। মা চান ছেলে, মেয়ে চায় পুরুষ। মা দেখেন শীল, মেয়ে দেখে রূপ। নিজের মায়ের অনুগত একটি অতি ভদ্র বিনয়ী অমায়িক ছেলেকে যে একটি মেয়ের পছন্দ হবেই তার কোনও মানে নেই। বেশিরভাগ সময়েই হয় না। কেন কে জানে! কী স্বপ্ন, কী প্রত্যাশা থাকে মেয়ের মনে যা তার নিজের মায়ের অনুগত পুরুষ পূরণ করতে পারে না?

বনানী বুঝছিলেন—অরিন্দম যত তাঁদের কাছাকাছি হচ্ছে, লাবণি তত দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু বুঝছিলেন হৃদয়ের একটা অস্পষ্ট বোধ দিয়ে। মগজ দিয়ে নয় মোটেই। তাই তিনি একটু উদ্বিগ্ন, উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করছিলেন। কী করে অরিন্দম তাঁর মেয়েকে সন্তুষ্ট করবে তার জন্য অরিন্দমের থেকে তিনিই বেশি ব্যাকুল। আরে বাবা, আজকালকার দিনে একটা ভাল ঘরের ভাল রোজগেরে, স্বাস্থ্যবান, ডিগ্রিমান ছেলেকে জামাই পাওয়া কি সোজা কথা? আর এ তো আশার অতীত পাওয়া। বড় জামাই সুজিতকে তো তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। মুখের কাছটা কেমন বাঁদর-বাঁদর। মাথার চুল এখনই পাতলা হয়ে এসেছে। তার ওপরে এত গম্ভীর, এত অন্যমনস্ক যেন তার চেয়ে পণ্ডিত আর পৃথিবীতে কেউ নেই, শ্রাবণীর ক্রেডিট আছে এই লোকের সঙ্গে সে বারো মাস তিরিশ দিন ঘর করে। একেক সময়ে

তাঁর মনে হয় অরিন্দমকে দেখলে, তার সঙ্গে মিশলে শ্রাবণীর যদি অভিমান হয়? আমার বেলা এক টাক-মাথা পণ্ডিতকে জুটিয়ে দিলে, কী না মস্ত বিদ্বান, য়ুনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর! অ্যাসিস্যান্ট প্রফেসর নিয়ে কি ধুয়ে খাব? বোনের বেলায় বেশ রূপবান, সুরসিক, চমৎকার পছন্দসই জামাই জোগাড় হল। হতেই পারে। বনানীরও আসলে এমনি হয়েছিল। তাঁর স্বামী একটু বেঁটে, কালো, তাঁর তো শুভদৃষ্টির সময়ে কান্নাই পেয়ে গেছিল। পরের দুই বোনের বেলা বাবা-মা দিব্যি ফুটফুটে জামাই খুঁজে নিয়ে এলেন। অভিমানও নয়, রীতিমতো রাগই হয়েছিল তাঁর সে সময়টায়। মেজ বোনের বিয়ের বউভাত বা ফুলশয্যায় তিনি যানইনি, হিংসায়। ছোট বোনের বেলায় অবশ্য আরও একটু পরিণত হয়েছিলেন, কাজেই রাগ ঝাল অভিমান কাউকে বুঝতে দেননি। তবে এখন তো তাঁর মা-বাবার তিন জামাই এ বলে আমার দ্যাখ ও বলে আমায় দ্যাখ। মেজ ভগ্নিপতির সে রং কবে জ্বলে গেছে, মাথাটি ডিমের মতো। এত চকচকে যে তাতে মুখ দেখা যায়, লম্বা হলে কী হবে একটু কোলকুঁজো মতো হয়ে গেছে এখনই, ছোট জনের টাব্বুশ ভুঁড়ি, বেখাপ্পা বেমানান, তার বউই তার নাম দিয়েছে ভুঁড়িদাস। সে তুলনায় তাঁর স্বামী অনেক ভাল আছেন, শক্তপোক্ত গাঁটাগোট্টা, মাথায় পাকা চুল খুঁজতে হয়, এখনও ব্রাশ দিয়ে চুল টানতে হয়। আসলে যার ভাগ্য তার তার।

তিনি অরিন্দমকে খুব যেন হালকা সুরে বললেন—কী? একবার ওপরে গিয়ে দেখবে না কি! লাবুটার কত দেরি আর?

অরিন্দম একটু ইতস্তত করছে, অবনের দিকে তাকাচ্ছে দেখে তিনি এ-ও বললেন—যাও না, ওপরে ওদের ঠাকুমাও রয়েছেন, একটু দেখা করে আসবে অমনি। অবন তুই একবার তোর বাবাকে ফোন কর তো—কেন এত দেরি করছে? কাকিমাকেও করবি—বলবি জল নেমে গেছে। আর যেন দেরি না করে ওরা।

অর্থাৎ অবনকে তিনি ব্যস্ত করে দিলেন। ফোনটা একতলার বৈঠকখানা ঘরে আছে। ঠাকুমার উল্লেখে দোতলায় একা লাবণির কাছে একা অরিন্দমের যাত্রাটাও নির্দোষ দেখাল বেশ।

অরিন্দম যেতে যেতে বলে গেল—কী আর করবে, গামবুট পরছে বোধহয়।

আর একটু হাসি হল।

লাবণি অবশ্যই গামবুট পরছিল না। সে খুব যত্ন করে, অশেষ মনোযোগ দিয়ে নেল ফাইল করছিল। একবার এদিকে, আবার ওদিকে। নখগুলোকে আজ এই মুহূর্তেই ওকে সুগোল চিকন করে ফেলতে হবে যেন।

—কী ব্যাপার, লাবণি?

দোতলায় উঠলেই লাবণি-অবনের ঘরটা পরিষ্কার দেখা যায়। দুদিকে দুটো সিঙ্গল খাট, মাঝখানে একটা ড্রেসিং টেব্‌ল। সম্ভবত লাবণির মায়ের বিয়ের যৌতুক, এখন মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ায়, সাজুনি মেয়ের ঘরে ট্রান্সফার্ড হয়েছে জিনিসটা। এই ড্রেসিং-টেব্‌লের সামনেই একটা টুলে বসে লাবণি নেল ফাইল করছিল।

—কী আবার ব্যাপার হবে?

—অনেকক্ষণ এসেছি। নামছ না! নীচে কত মজা হয়ে গেল।

—তা মজা করুন না। থামলেন কেন?

—আরে তুমি না এলে মজা হয়?

—কেন? আমি কি ক্লাউন? আপনার ইয়ার্কির পাত্র?

—রাগ হয়েছে মনে হচ্ছে! কার ওপর? আমি কিন্তু কিছু করিনি, আমার ওপর নিশ্চয়ই নয়। অবন ঠাকুরের আজ জন্মদিন, তার ওপরও রাগ করা যায় না। তা হলে? তা হলে বাকি রইলেন মা বাবা আর ঠাকুমা। ঠাকুমা বেচারি নিজের ঘরে নিজের মনে আছেন, চোখে ভাল দেখতে পান

না। তাঁর ওপর আর কে রাগ করবে? তবে কি বাবা? উঁহুঃ, আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে বাবাদের সঙ্গে ঝগড়া হয় না। —এইবার ধরেছি ঠিক। মা, নয়?

—যান না, যান, আপনি আমার মাকেই বিয়ে করগে যান।—মুখ ফসকে রাগটা বেরিয়ে গেল। কথাটা বলেই লাবণি মনে মনে জিভ কামড়েছে। ছোঁড়া তীর আর বলা কথা তো ফেরানো যায় না, কী করে লাবণি? কী করে? একটা অত্যন্ত অভব্য, অমার্জিত, গর্হিত কথা বলে ফেলেছে একজন অল্প আলাপি ভদ্রলোককে। সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

অরিন্দম একটা মস্ত ধাক্কা খেয়েছিল। এ কি রে বাবা? এ কী ধরনের কথা! এ তো একটা নেহাত বাচ্চা ছেলেমানুষ! য়ুনিভার্সিটি ক্যান্টিনে যে লাবণিকে দেখেছিল একটি সহপাঠিনী মেয়ের জন্য উদ্বিগ্ন, অনেক নির্ভরযোগ্য, অনেক পরিণত মানুষের মতো লেগেছিল তাকে। আর আজ এ কাকে সে দেখল? নীচে মায়ের সঙ্গে বেশি গল্প করেছি বলে ঈর্ষা? এ তো সাঙ্ঘাতিক গোলমেলে ব্যাপার!

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল! লাবণি চোখ মুছতে মুছতে বলল,

—সরি, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।

—কিন্তু লাবণি তোমার এ রকম অদ্ভুত রি-অ্যাকশান হল কেন?

—আই ডিডন'ট মীন ইট। প্লিজ ও-কথা আর তুলবেন না। আসলে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে কদিন।

—কেন?

—অমৃতার জন্য—লাবণির অন্তরাত্মা বুঝে নিয়েছে একটা অভব্য, অযৌক্তিক আচরণকে কাউন্টার করতে একটা খুব মানবিক, ভব্য, যুক্তিপূর্ণ কিছু বলতে হবে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো আপনা-আপনিই হয়ে যায়। এটাকে বলা যায় স্বতঃক্রিয়া। অমৃতার জন্যে এই মুহূর্তে তার কোনও দুর্ভাবনা নেই। অমৃতার ব্যাপারটা বেশ পুরনো হয়ে গেছে এখন। সয়ে গেছে। কিন্তু তবু সে কেমন করে যেন বুঝে গেল এই মুহূর্তে এই কথাটা বলা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

অরিন্দম বলল—কেন শুধু শুধু মন খারাপ করছ? অমৃতা ভাল আছে। এই তো আজই গিয়েছিলাম। দেখলাম খুব পড়ছে। পড়ে পড়ে ক্লান্ত একেবারে।

ও, ইনি আজই অমৃতার কাছে গিয়েছিলেন? কথার ধরন শুনলে মনে হয় প্রায়ই যান। অমৃতার কাছে যাওয়াটাই এঁর দস্তুর। নিয়মিত অতিথি একজন। বাঃ! অফিস ছিল না? অফিস কেটে অমৃতার কাছে গিয়েছিলেন? তারা যেমন ক্লাস-কেটে সিনেমা যায় কি বয় ফ্রেন্ড গার্ল ফ্রেন্ডদের সঙ্গে মিলতে যায়? তা হলে এই জন্যই ইনি সিঙ্গাপুরের চাকরিটা ছেড়েছেন? অমৃতার কাছে ফ্রম টাইম টু টাইম যাবেন বলে? অমৃতার ব্যাপারটাতে ইনি আগ্রহী হলেন তার জন্য, সে লাবণি ভয় পেয়েছিল বলে, তাকে বোঝাতে যে ইনি একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ, আর এক অরিসূদন নন। তো সবাই মিলে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, মোটামুটি জানা গেছে যে অমৃতা এখন নিরাপদ। শিগগিরই তার কেস উঠবে। অরিসূদনের করা কেস। ব্যস, মিটে গেল। ইনি কেন নিয়মিত সেখানে যান? এঁর তো লাবণির কাছেই নিয়মিত আসার কথা।

কী আছে অমৃতার? ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছাত্রী শর্মিষ্ঠা, সবচেয়ে সুন্দরী লাবণি, সবচেয়ে মজাদার ভাল লাগবার মতো মেয়ে দোলা। অমৃতা কে? অমৃতা কী? কেন প্রোফেসররা বেশির ভাগই অমৃতা-অমৃতা করেন? লম্বা, ফর্সা, কাঠ কাঠ চেহারা, তিন কোনা মুখ, চোখ মুখের এমন কিছু শ্রী-ছাঁদ নেই। হ্যাঁ এখন এটাই বলা যায় ক্লাসের সবচেয়ে দুর্ভাগা মেয়ে অমৃতা। এইটাই তার বিশিষ্টতা। তো এই দুর্ভাগ্যকে তো সে ভালই ব্যবহার করছে দেখা যাচ্ছে। একজন নামকরা ডাক্তার-সুদ্ধু একটা গোটা নার্সিংহোম, একটি বহুজাতিক সংস্থার এঞ্জিনিয়ার, কোথায় কার কাছে রয়েছে এখন, তাকেও, অনেককেই পাকড়েছে দুর্ভাগ্যের টোপ ফেলে।

এত রাগ, এত নৈরাশ্য, এত বিদ্বেষ হচ্ছিল তার যে বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছিল। রগগুলো দপদপ করছিল। মনে হচ্ছিল ড্রেসিং টেব্‌লে সাজানো তার প্রসাধন দ্রব্যগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, যেন সেগুলো সব গিয়ে পড়ে অমৃতা আর তার সো-কল্‌ড্‌ দুর্ভাগ্যের ওপর। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে অরিন্দমের গাল কি বুক কি যে কোনও খোলা জায়গা হাঁউ-মাউ করে কামড়ে দিয়ে যাতে তার ষোলো-ষোলো বত্রিশটা দাঁতের দাগ বসে যায় সেখানে।

এমন তার কখনও হয়নি, কক্ষনো না। সুন্দরী বলে, বরাবরই সে স্কুল-কলেজ-য়ুনিভার্সিটি, বাড়ি আত্মীয়-স্বজন সব জায়গাতেই খুব প্রশ্রয় পেয়েছে। নিজের চেহারা সম্পর্কে তার অহঙ্কার থাকলেও সে এত বোকা নয় যে নিজেকে নিজের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মনে করবে। সৌন্দর্য নিয়ে সত্যি কথা বলতে কি তার আকাঙ্ক্ষারও শেষ নেই। অন্যদের দেখে খালি মনে হয় ইস্‌স্‌ ওর ওইটে কী ভাল! যদি হত দোলার মতো রঙ। অমৃতার মতো ফিগার। যদি হত সুদীপার মতো টোল, অণিমার মতো চুল...নিজেকে নিয়ে মোটেই সে সন্তুষ্ট ছিল না। তাই সে ভাবে অহঙ্কারও সে কোনদিনও অনুভব করেনি, কিন্তু সচেতনভাবে কাউকে ঈর্ষা করার জায়গায়ও ছিল না সে। নিজের ভেতরের এই ক্রোধ-হিংসা-দ্বেষের প্রাবল্যও তার একেবারে অচেনা।

কিন্তু, তাই বলে তো সে সত্যিই প্রসাধন দ্রব্যগুলো, ময়শ্চারাইজার, নারিশিং ক্রিম, ট্যালকাম পাউডার, লিপস্টিক এগুলো ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে পারে না, পারে না অরিন্দম ঘোষকে কামড়ে দিতেও। তাই সে মুখে বলল—ঠাকুমা আপনার সঙ্গে কথা বলবে বলে বসে আছে। যান না। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

আর, লাবণির ঠাকুমার ঘরের দিকে যেতে যেতে অরিন্দমের আবার ফিরে এল সেই বদমেজাজ। সেই কালো ভিমরুলের চাকের মতো মুখ। এতই গম্ভীর, এত অস্বাভাবিক যে সে যখন নীচে নেমে এল, তার মুখ দেখে লাবণির মা তো বটেই, লাবণি নিজেও ভয় পেয়ে গেল। দুজনেই মনে করল লাবণির ব্যবহারের জন্যই এই গাম্ভীর্য, রাগ। কিন্তু তা নয়, লাবণির কাকা-কাকিমা আর তাঁদের একটি ছেলে একটি মেয়ে এল, ভাল করে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারল না অরিন্দম। বনানী আগেই জাকে বলে রেখেছিলেন খুব হাসিখুশি, মিশুকে, হুল্লোড়ে তাঁর হবু ছোট জামাই। জা যাবার সময়ে বলে গেলেন—কই দিদি তুমি যে বলেছিলে হাসিখুশি? এ তো দেখছি রামগরুড়ের আরেক অবতার, মনে কিছু করো না দিদি, লাবু তো অমন গম্ভীর লোকের সঙ্গে থাকতে গেলে হাঁপিয়েই মরে যাবে।

বনানী আমতা আমতা করে বললেন—না রে সত্যিই ও খুব হাসিখুশি, আজকে এলও তো খুব হাসতে হাসতে অবনকে জিজ্ঞেস কর।

লাবণির বাবা বললেন—মাথার ওপর কত দায়িত্ব এই বয়সেই। হঠাৎ হয় তো অফিসের কোনও প্রবলেম মনে পড়েছে...

বাবা যা-ই বলুন লাবণিকে তার মা সে রাতে শুধু মারতে বাকি রাখলেন।

—হাসতে হাসতে এল ছেলেটা, মুখে যেন আলো জ্বলছে। কী এমন তুমি বলেছ যে মুহূর্তে তার মেজাজ পাল্টে যায়! সুন্দরী-সুন্দরী করে লোকে মাথায় তুলেছে, মনে কোরো না তুমি দারুণ একটা কিছু। তোমার মতো চটকদার মেয়ে এখন কলকাতার রাস্তায় গুদো গুদো ঘুরছে। ওর কাছে তুমি কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, শুনে রাখো আমার এই কথা, আমি মা হয়ে তোমাকে বলছি—এমন বর তুমি ভূ-ভারতে আর কোথাও পাবে না। তোমার অনেক ভাগ্য যে আকাশের চাঁদ আমাদের হাতে ধরা দিয়েছে। তোমার অসভ্যতায় ও যদি চলে যায় তা হলে একটা মর্কট ছাড়া কিচ্ছু জুটবে না তোমার।

এত সব কড়া কড়া প্রাণ বিঁধোনো কথাও লাবণি কোনওদিন তার মায়ের কাছ থেকে শোনেনি। কিন্তু সে জানে সে কী করেছে, কী বলেছে। কেন অরিন্দম অমন পাল্টে গেল। সে দোষী, নিঃসন্দেহে।

কী কথায় অরিন্দম রাগ করল তা তো সে কোনওদিন মাকেও বলতে পারবে না! মায়ের তিরস্কারের উত্তরে সে শুধু নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

অবশেষে অবনই বলল—দিদি আর কাঁদিসনি। তোর চোখ মুখ ফুলে গেছে। অরিন্দমদা একটা আস্ত পাগল!

অরিন্দম জানে না তার মেজাজ কেন হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। লাবণি একটা বিশ্রী কথা বলেছিল সত্যি, কিন্তু তারপর তো সে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছে। লাবণিকে সে সান্ত্বনাও দিয়েছিল। তখনও লাবণি চুপ করে ছিল, তার মন খারাপ যায়নি, কিন্তু সেটা কোনও ব্যাপার না। তাতে তো তার রাগ করবার কিছু থাকতে পারে না। আর ওইরকম খারাপ মেজাজ! লাবণির কাকা-কাকিমার সঙ্গে আজ তার প্রথম দেখা হল, অথচ সে ভাল করে একটা কথাও বলতে পারল না। ওঁদের ছেলেমেয়ে দুটিকে তো স্রেফ ইগনোর করল। ভাল ভাল রান্না করেছিলেন লাবণির মা, —সে তো একটু নাড়াচাড়া করে উঠে এল। নিজে ওঁদের সঙ্গে অভদ্রতা করেছে বলে দ্বিগুণ তিক্ততায় তার মন ভরে আছে।

স্টিয়ারিং-এ হাত, আপনাআপনি যান্ত্রিকভাবে ঘুরছে, গিয়ার চাপছে, মন অন্যত্র, খুঁজছে, খুঁজছে, সকালের বদমেজাজ আর এই রাতের বদমেজাজ একই জাতের। কেন? কেন? কী? তারপর হঠাৎ সে লাবণির সঙ্গে তার কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে পিছু হাঁটতে হাঁটতে কারণটা পেয়ে গেল। অমৃতা। অমৃতার প্রসঙ্গ। সকালে সে অমৃতার কাছে তার বাবা-মায়ের পাঠানো চিঠি নিয়ে গিয়েছিল। আশা করেছিল কত খুশি হবে অমৃতা, কত কৃতজ্ঞতা জানাবে তাকে, বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলবে, সে দুঃখ আর বিষাদ থেকে অমৃতার মন অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু না, সে সব কিছুই ঘটেনি। সামান্য কিছু কথাবার্তা, অমৃতার নিঃশব্দ কান্না, তার পর অমৃতা এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল যে সে একটা মানুষ যে অতক্ষণ ধরে চুপচাপ তার সামনে বসে আছে, এটা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেল। সে যখন—'আজ আসি। অফিস যেতে হবে' বলে উঠে পড়ল তখন অমৃতা ঠিক সেইরকম অন্যমনে যান্ত্রিকভাবে ঘাড় নাড়ল। তার যাওয়া অথবা আসা কোনওটাই অমৃতার মনে বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারেনি। তাই, তাই তার অমন অমানুষিক মেজাজ খারাপ হয়েছিল। ইগো কী? ইগো আহত হয়েছে বলে? না, না, না বোধহয়। তারপর সে সেই ভয়ানক উপলব্ধির সম্মুখীন হল। সে ভালবাসে। না লাবণিকে না, আর কাউকেই না, শুধু অমৃতাকে, শুধু অমৃতা, শুধু অমৃতা।

১৬

ভরা শ্রাবণে যখন শেহনাই-শামিয়ানা-শামি কাবার সহযোগে শম্পা-সৌমিত্রর বিয়ে হয়ে গেল, তখন শম্পা অঝোরঝোরে কাঁদছিল। তার ইচ্ছে ছিল, মায়ের টাকা যেন একেবারে খরচ না হয়। রেজিস্ট্রি বিয়ে, কিন্তু মায়ের ইচ্ছে তা নয়। সৌমিত্রও এমনই অদ্ভুত, যে টোপর পরতে শতকরা নিরানব্বুই দশমিক নয় নয় জন বাঙালি বর প্রিয়জনদের ঘোল খাইয়ে দেয়, সেই টোপর পরতে সে রীতিমতো আগ্রহই প্রকাশ করল। সৌমিত্রর বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। সে মানুষ হয়েছে হস্টেলে হস্টেলে। পারিবারিক জীবনের প্রতি সামাজিকতার প্রতি তার ভী-ষণ টান। এটা সাধারণত হস্টেলি ছেলেদের হয় না। কিন্তু সৌমিত্রর দেখা গেল সামাজিক আনুষ্ঠানিক বিয়েটা খুব পছন্দ। তবে মায়ের টাকা বেশি খরচ হল না, সৌমিত্র বলল তার যে কজন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আছেন তাঁদেরও বিয়ের দিনেই আপ্যায়িত করা হবে। তার মেসোমশাই ও মাসতুতো বোন জামাইবাবু ব্যাপারটার ভার নিলেন। অর্ধেক খরচ সৌমিত্রই করল। পিচ রঙের কাঞ্জিভরম শাড়ি আর মায়ের গয়না স-ব পরে শম্পা সিঁথিময়ূর পরে আর পাঁচজন বাঙালি মেয়ের মতোই আলপনা কাটা পিঁড়িতে বসল। আশেপাশে তার জ্যাঠতুতোপিসতুতোরা। মামাতোরাও বেশ আগ্রহের সঙ্গেই যোগ দিয়েছেন দেখা গেল। বরটি

খুব কোয়ালিফায়েড ও ভাল চাকরি করে তো? শম্পার মায়ের মান রাখতে দুই মামা মিলে একটা ভাল মুক্তোর সেট এবং মাইসোর সিল্ক উপহার দিলেন, বরকে আংটি। জ্যাঠামশাইরাও একটা বারোমেসে সোনার হার দিয়েছেন, বরের কোয়ালিফিকেশন এবং ভাল চাকরির খাতিরে। নিবেদিতার আনন্দ ও গর্বের সীমা নেই দেখা গেল। খালি শম্পা যে কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলছে তা কারওরই জানা হল না। প্রথমত কারওর মনেই হয়নি, এটা একটা খোঁজ নেবার বিষয়। কেউ তো তেমন আপনও নেই তাদের। দ্বিতীয়ত বিয়ের দিনে মেয়েদের কান্নাকাটি একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। সেই যে কবে থেকে চলে আসছে কান্নার ট্র্যাডিশন।

বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে
সেই যে বোন গাল দিয়েছিল ভাতারখাকি বলে।

আত্মীয়রা একটু খেয়াল করলে বুঝতেন ব্যাপারটা শম্পার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নয়। আজকাল মেয়েরা বিয়ে হতে অত কাঁদেও না, অনেকেই নিজের নির্বাচিত পাত্র বিয়ে করে, বাবা-মার নির্বাচিতকেও দেখতে-শুনতে পায়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কাটা কিছুটা কম থাকায় তারা নিজেদের বিয়েটা মোটামুটি উপভোগই করে। তবে শম্পা কেন এত কাঁদছে?

এ কথা শম্পাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলত যে সে কাঁদবে না তো কাঁদবেটা কে? সেই পাঁচ বছর বয়সে বাবা অকালে মারা যাবার পর সে আর তার মা পরস্পরের প্রগাঢ় বন্ধু। শম্পার খুব আশা ছিল, সৌমিত্রর যেহেতু কোনও পরিবার নেই, ডাফ স্ট্রিটের বাড়িতে সে থাকতে রাজি হবে। কিন্তু মা অনেক করে অনুরোধ করা সত্ত্বেও শম্পা অনেক কাকুতি-মিনতি করা সত্ত্বেও এবং পারিবারিক জীবনের প্রতি তার টান থাকা সত্ত্বে সৌমিত্র প্রস্তাবটা নস্যাৎ করে দিয়েছে। একেবারে নস্যাৎ। সে তার সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ের ফ্ল্যাট থেকে কোথাও নড়বে না। এমনকী, শম্পার মা তাদের সঙ্গে বরাবর থাকুন এতেও তার আপত্তি। শম্পা জানে মা এ প্রস্তাবে রাজি হবে না, কিন্তু নিজের বিবেচনা বোধ থেকেও তো সৌমিত্র কথাটা বলতে পারত। বলল না দেখে শম্পা অগত্যা একটু ইঙ্গিতই দিল, —মা যে একা কী করে থাকবে—সে বলেছিল। সৌমিত্র তাতে বলল—কেন, বাড়ির অপর অংশেই তোমার জ্যাঠামশাইরা থাকেন! তা ছাড়া, এতদিন তো মা নিজেই নিজেকে দেখছিলেন। তুমি কি মনে করেছ তুমি মাকে দেখাশোনা করছিলে? হেসে বলল সৌমিত্র।

—স্বীকার করছি মাকে আমার চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্ব নিতে হয়েছে, কিন্তু শেয়ার করতে তো আমি ছিলাম! তা ছাড়া মায়ের শরীর-টরীর খারাপ হলে কে দেখত আমি ছাড়া? সঙ্গ বলেও তো একটা কথা আছে।

সৌমিত্র বলেছিল—আমিও তো এতদিন একা থাকতাম!

এর পর আর কী বলা যায়?

বিয়ে করতে বসে শম্পার মনে হচ্ছে সে ভীষণ স্বার্থপর। মাকে সে একটা অন্ধকার ধোঁয়াশা-ভরা একলা জীবনের মধ্যে ফেলে চলে যাচ্ছে। ঠিক একটা পাখির ছানার মতোই সে উড়তে শিখেই ফুড়ুৎ।

আরও একটা কারণ আছে। সেটা অবশ্যই অমৃতা। অমৃতা, তার বেস্ট ফ্রেন্ড, বলা যায় ফ্রেন্ড, ফিলসফার অ্যান্ড গাইড তার শ্বশুরবাড়ির ষড়যন্ত্রে নিখোঁজ হয়ে গেল। আর সে? সে? সে কী করছে? না বিয়ে করছে। দস্তুরমতো শানাই বাজিয়ে, বেনারসি পরে, পাত পেড়ে লোকজন খাইয়ে বিয়ে।

সীমামাসি আর বিশ্বজিৎকাকুকেও কাঁচুমাচু মুখে তারা নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল। ওঁরা খুব খুশি দেখালেন। মানে, ওঁদের পক্ষে যতটা খুশি দেখানো সম্ভব।

নিবেদিতা বলেছিলেন—আমাদের খুব খারাপ লাগছে—ভাই। অমৃতার এখনও কোনও...

সীমা বলেছিলেন—তাই বলে কি শম্পা বিয়ে করবে না? না—না খুব ভাল হয়েছে, নিজে দেখে

শুনে বিয়ে করছে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। এটাই দরকার। এই দুটোই—নিজে দেখা-শোনা, আর নিজের পায়ে দাঁড়ানো।

এসেছিলেনও ওঁরা। দুপুরে এসেছিলেন, লোকজনের ভিড়ের মধ্যে আসতে হয়তো সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন। খুব অদ্ভুত উপহার নিয়ে এসেছিলেন ওঁরা। একটা তো শাড়ি, আর একটা ছোট্ট অ্যালবাম, তাতে শম্পা আর অমৃতার টু না থ্রি থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছরের একটা করে স্কুলের গ্রুপ ফটো। কোনওটাতে ক্লাস-টিচারের সঙ্গে একাসনে বসে, কোনওটাতে পেছনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সব সময়ে দুজনে পাশাপাশি। গোলমাল বেবি-বেবি চেহারা থেকে সদ্য কৈশোরে পা রাখা দুই বন্ধু, যখন চেহারা, ব্যক্তিত্ব আলাদা হতে শুরু করেছে তখন পর্যন্ত। শেষ দিকের তিন-চারটে ফটো আবার শুধুই শম্পা আর অমৃতা, অমৃতা আর শম্পা, অমৃতা এক বিনুনি শম্পা দু বিনুনি, শম্পা স্কার্ট, অমৃতা মিডি। শম্পা শাড়ি অমৃতা সালোয়ার।

ছবিগুলো দেখতে দেখতে সব মনে পড়ে যাচ্ছিল। সব। স-ব। কীভাবে একবার অমৃতা অনেক নম্বর পেয়ে বাংলায় ফার্স্ট হয়েছিল বলে, শম্পা রাগে ফুঁসছিল—তুই আমাকে সব ক্লাস-নোটস্ দিসনি। না হলে দুজনের মার্কসের এত তফাত হয় কী করে? তোর সঙ্গে আর কখনও এক বেঞ্চে বসব না। তার রাগ আর জলভরা চোখ দেখে অমৃতা এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে বাংলার দিদি রেণুদিকে গিয়ে বলেছিল—আচ্ছা, দিদি, আমার মার্কস একটু কমিয়ে দিলে হয় না?

—মার্কস কমিয়ে দেব। —কেন? —রেণুদি এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

অমৃতা ঢোঁক গিলে বলেছিল—না, মানে আমাদের বন্ধুদের থেকে অত বেশি নম্বর আমি কী করে পেতে পারি?

—তুমি কি আমার জাজমেন্টকেই কোয়েশ্চন করছ? আচ্ছা স্পর্ধা তো তোমার!

—কী ব্যাপার?—শেফালিদি, রেণুদির রাগ দেখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

সব শুনে শেফালিদি বলেছিলেন—আমি বুঝেছি রেণু, বন্ধুরা নয়। ওই শম্পাই ওর ঘোরতর বন্ধু। সে নিশ্চয় কান্নাকাটি করছে কম নম্বর পেয়ে।

দুই দিদি মিলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন শম্পাকে। সমস্ত ঘটনাটা বলেছিলেন। তার পর তাকে মৃদু তিরস্কার করেছিলেন। নম্বর পাও তোমরা যে যার মেরিটে, অমৃতা এবার খুব ভাল করেছে, তুমিও আসছেবার ভাল করার জন্যে খাটো। নিশ্চয় পাবে। আর শম্পা, অমৃতা তোমাকে কী ভীষণ ভালবাসে সেটা বুঝেছ তো! তোমার চোখের জল ওর সয়নি বলে ও রেণুর কাছে নিজের নম্বর কমাবার জন্যে দরবার করতে এসেছিল। এ রকম অনুরোধ আমরা জীবনে কখনও শুনিনি, এরকম ঘটনাও আর কোথাও ঘটেছে বলে জানি না।

তবু তো শম্পা কীভাবে অমৃতাকে গঞ্জনা দিয়েছিল, তার কিছুই দিদিরা জানতেন না।

বিশ্বজিৎকাকুও একদিন বলেছিলেন—শম্পা, তোর বাংলা ইংরেজির প্রশ্নোত্তর সব সময়ে অমৃতার দেখে নিয়ে লিখিস কেন রে? অমৃতা কি অঙ্কগুলো তোর দেখে দেখে করে? সব সিঁড়ি নিজে নিজে ভেঙে ভেঙে উঠতে হয়। না হলে শেখাটা ঠিক হয় না।

এতেও শম্পার ভীষণ অভিমান হয়েছিল। সে বিশ্বজিৎকাকুর কাছে পড়তে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। একদিন স্কুল ছুটি হবার পর দেখে বিশ্বজিৎকাকু দাঁড়িয়ে আছেন ঘর্মাক্ত কলেবরে। শম্পাদের দেখে বললেন—চ, শম্পা অনেকদিন আমাদের বাড়ি যাস না।

তখন অমৃতারা রমণী চ্যাটার্জীতে উঠে গেছে। শম্পার মাকে ওঁর অফিসে ফোন করলেন বিশ্বজিৎকাকু, তার পর ওদের দুজনকে নিয়ে গেলেন বাড়িতে। কী আদর। কী আদর! কী খাওয়া! কী খাওয়া! সীমামাসি সেদিন তাঁর সমস্ত জ্ঞান উজাড় করে রেঁধেছিলেন বোধহয়, শম্পা যা যা খেতে ভালবাসে।

—কেন এতদিন আসিসনি রে? —বিশ্বজিৎকাকু জিজ্ঞেস করলেন খেতে বসে।

শম্পা অপ্রস্তুতমুখে বলল—বড্ড দূর হয়ে যায় যে।

—তা-ও তো হপ্তায় দু দিন ধরে আসতিস, এখন কি আর তোর উঁচু ক্লাসের অঙ্ক সায়েন্স পড়াতে পারছি না?

শম্পা ভীষণ অপ্রস্তুত।

অমৃতা বলল—তা নয় বাবা, মান হয়েছে মানিনীর।

সীমামাসি তার মুখে মাছের চপ গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন—কে মেরেছে কে বকেছে, কে বলেছে কী? তারপর কাকুর দিকে ফিরে বলেছিলেন—তোমাদের মাস্টারদের ওই বড্ড কড়া স্বভাব। একটা জিনিস জানবে ছেলেদের পড়ানো আর মেয়েদের পড়ানো এক জিনিস নয়। ছেলেদের তোমরা ঠেঙিয়ে শেখাতে পারবে। মেয়েদের বেলায় কিন্তু শেখাতে হবে ভালবেসে।

অমৃতা চোরা চোখে চাইছিল শম্পার দিকে, মুখে মিটি মিটি হাসি। সেই হাসিটা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শম্পা। তার মুখের ওপর পানপাতা চাপা দেওয়া, সেই পানপাতার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছে অমৃতা অদূরে দাঁড়িয়ে আছে, একটা বিনুনি করা নীল চেকচেক একটা ধনেখালি শাড়ি পরা, শাদা ব্লাউজ, অমৃতা হাসছে মিটিমিটি—মান হয়েছে মানিনীর? তাই কান্না? দেখতে দেখতে হু হু করে জল পড়ে শম্পার মুখের সব মেকাপ ধুয়ে গেল। ফুলে ফুলে উঠছে বুক।

এত স্পষ্ট কেন দেখতে পাচ্ছে সে অমৃতাকে? অমৃতা কি মারা গেছে? কথাটা মনে হতেই যেন ইলেকট্রিক শক লাগল তার বুকে। বিষ লাগতে লাগল শানাইয়ের সুর, কেটারারের খাবারের গন্ধ, জুঁইয়ের মালার সুবাস, নানান গয়নার কিঙ্কিণী, শাড়ির খস্‌খস্‌। ভুলে গেল সে সৌমিত্রের মুখ। কদিন পরেই আন্দামানে হানিমুন করতে যাবে সেই সুখ।

কেউ বোধহয় নিবেদিতাকে খবর দিয়েছিল শম্পা ভীষণ কাঁদছে। নিবেদিতা জানেন শম্পার মাকে ছেড়ে যেতে, থাকতে হবে বলে দারুণ কষ্ট হচ্ছে। তাঁদেরও কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু শম্পার মাতৃবিরহের প্রকৃতি আলাদা। তাঁরা যে কত বছর ধরে দুজন শুধু দুজনের। সেই নিভৃত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর কোনওদিনও কারও সঙ্গে হবে না শম্পার, হতে পারে না। তিনি সব ফেলে তাড়াতাড়ি এলেন।

—শম্পা এ কী করছিস? কাজল-টাজল সব ধেবড়ে গেছে, চোখের জলে মুখ ডোরা কাটা, এ কী?

মায়ের নতুন গরদ-শাড়ির বুকে মুখ গুজে শম্পা বলল—মা আমার অমৃতার জন্যে ভীষণ মন কেমন করছে। আমি আর থাকতে পারছি না।

অরিন্দম ঘোষ অনেক, অনেকক্ষণ বরযাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে বসে উসখুস করছিল। বরযাত্রীরা ভাবছে সে শম্পাদের পক্ষের লোক, শম্পার আত্মীয়রা ভাবছে সে বরযাত্রী। কে যে কী তা-ও সে আদৌ বুঝতে পারছিল না। বুঝে নিতে চেষ্টা করছিল। অমৃতা শম্পার খবর জানতে চায়। প্রথমটা চেয়েছিল উদাস ভাবে। একটিবার মাত্র উল্লেখ করেছিল। তারপর সে অরিন্দমকে সরাসরি অনুরোধ করে। সময় করে সে যেদিন আসতে পারল, দেখে বাড়িটার সদর দরজায় মাথায় লেখা—শম্পা ওয়েড্‌স সৌমিত্র। একবার ভাবল—এই তো খবর জানা হয়ে গেল। এবার ফিরে গিয়ে জানিয়ে দেওয়াই যায়—অমৃতা তোমার বন্ধু ওয়েড্‌স সৌমিত্র। জানাতে তার একটা নিষ্ঠুর আনন্দ হবে। যেন এতে করে বলা হয়ে যাবে—অমৃতা, সারা পৃথিবীতে কেউ তোমার জন্যে বসে নেই। সংসার চলছে তার নিজস্ব নিয়মে। তোমাকে সবাই ভুলে গেছে। তোমার জন্য বসে আছে—শুধু একলা আমি, অরিন্দম। তুমি একটু আমার দিকে ফেরো।

কিন্তু এই সময়ে কে খবর দিল, কনে ভী-ষ-ণ কাঁদছে। সৌমিত্রর কোনও বন্ধুই বোধহয় বলল—'এই শুনলাম অনেক দিন ধরে মন দেওয়া-নেওয়া চলছে, কেমন মন দিলি রে সৌমিত্র,

তোর বউ নাকি কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে!' কথাটা শুনে সৌমিত্র টোপরটা পাশে খুলে রেখে, খুব স্মার্টলি হঠাৎ অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল। অরিন্দম কৌতূহলী হয়ে বসে রইল, বসেই রইল, অন্তত 'আধঘণ্টা পরে সৌমিত্র ফিরল, মুখটা উদাস।

এক বন্ধু বলল—কী রে প্রসপেক্টটা একটু ফেরাতে পারলি?

সৌমিত্র বলল—ওর ছোটবেলার বন্ধু হারিয়ে গেছে, তাকে আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছে।

বন্ধু বলল—বিয়ের লগ্নে বন্ধু? এহ্ সৌমিত্র, তোর হয়ে গেল।

সৌমিত্র বলল—বাজে ফাজলামি করিস না। মেয়েটি ওর বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে হঠাৎ কীভাবে কোথায় সরিয়ে ফেলেছে। মনে হয় শী ইজ ডেড অ্যান্ড গন, বাই নাউ।

ডেড অ্যান্ড গন—ডেড অ্যান্ড গন—মাথার মধ্যে ভীষণ একটা কষ্ট অনুভব করল অরিন্দম। অমৃতা মারা গেছে—এই খবরটা মিথ্যা, তবুও সে সইতে পারছে না সেটা। শম্পা তার বিয়ের মুহূর্তে অমৃতার জন্য কাঁদছে, আর কারও জন্য নয়। অমৃতার জন্য অর্থাৎ 'শম্পা ওয়েড্‌স সৌমিত্র' এই সংবাদটা যতটা নিষ্ঠুর শোনাচ্ছিল, ততটা নিষ্ঠুর আর রইল না। কী গভীর তৃপ্তি। অমৃতা বেঁচে আছে। শম্পার স্মৃতি ও সত্তার মধ্যেও অমৃতা বেঁচে আছে। তার মনে হল, জীবনের এই শুভ মুহূর্তে শম্পাকে তাকে দেখতেই হবে। কে এই শম্পা যে বিবাহলগ্নে অমৃতার জন্য কাঁদে? সে উঠে পড়ে ভিড় ঠেলতে লাগল। এদিক ওদিক প্রশ্ন ছুড়তে লাগল—শম্পা কোথায়? শম্পা?—যেন সে শম্পার একজন বন্ধু। আর কাউকে এই বিয়ে বাড়িতে তো চেনে না। তাই, তা ছাড়াও উপহারটা তো তাকেই দিতে হবে। তাই সে শম্পাকে খুঁজছে।

একজন নিবেদিতাকে খুঁজে আনল। নিবেদিতা বললেন—শম্পাকে ওর বোনেরা একটু সাজিয়ে দিচ্ছে। একটু অপেক্ষা করবেন? আপনি কি 'উইল পাওয়ার'-এর।

উইল পাওয়ারই বটে—অরিন্দমের সেই মুহূর্তে মনে হল—ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তির কী প্রচণ্ড জোর। এত প্রবল তার আকর্ষণ; যে ঠিক সেই সময়টাই আপাত-উদাসীন অমৃতার শম্পার কথা জানতে ইচ্ছে হল, যখন শম্পার মনও অমৃতার জন্য উতলা। সে নিচু গলায় বলল—খুব ইমপর্ট্যান্ট একটা খবর এনেছি শম্পার জন্য। ভয় নেই, ভাল খবর। একটু যদি ডেকে দেন, খবরটা ভিড়ের মধ্যে দেওয়ার নয় কিন্তু।

নিবেদিতার মুখের চেহারা এমন পাংশু হয়ে গেল যে তাকে আবার বলতে হল,—ভয়ের কিছু নেই।

শম্পার মুখ পুরো ধুয়ে গিয়েছিল চোখের জলে। সৌমিত্র সেই অবস্থাতেই তার সঙ্গে দেখা করে—সৌমিত্র আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। অথচ অমৃতার কোনও খোঁজ নেই সে তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অমৃতার কথা আগে শুনেছিল সৌমিত্র ঠিকই, কিন্তু অমৃতা যে এত গুরুত্বপূর্ণ শম্পার শান্তির জন্য তা আগে বুঝতে পারেনি। সে কনেকে প্রাণপণে শান্ত করবার চেষ্টা করে—ঠিক খোঁজ পাওয়া যাবে, দেখো, খারাপ কিছু তো শোনা যায়নি, তবে?

—আজকালকার দিনে কেউ কাউকে খুন করে পুঁতে ফেললে কি আর খবর পাওয়া যায়?

সৌমিত্র তখন মনে, বাচনে দৃঢ়তা এনে তাকে বলে—অত সোজা নয় শম্পা। কেঁদো না, কেঁদে কিছু করতে পারবে? আমি বলছি—তুমি ভাল খবর পাবে।

এ-ও একরকম উইল পাওয়ার। হয়তো এই পাওয়ারই অরিন্দমকে অন্দরে শম্পার খোঁজে টেনে আনল।

বোনেরা শম্পার মুখ ধুয়ে, শুধু একটু পাউডার লাগিয়ে দিয়েছে। আর কোনও প্রসাধনের পুনরাবৃত্তি শম্পা কিছুতেই করতে চায়নি। নিবেদিতা গিয়ে মেয়েদের দঙ্গলকে ওঠালেন—শম্পা 'উইল পাওয়ার' থেকে একটি ছেলে তোর খোঁজ করছে, বলছে কী বলার আছে।

উইল পাওয়ার? শম্পা শূন্যে হাতড়ায়? কে? শুক্লা, না রাঘবন? ব্যানার্জি? কে এল? কেন? কী খবর? তাদের প্রজেক্টটা কি ফিরে এল? একলা ঘরে অরিন্দমকে নিয়ে নিবেদিতা ঢুকলেন।

কে? এঁকে তো চিনি না?—শম্পা ভাবল।

অরিন্দম দেখল কচি বাঁশগাছের মতো তন্বী নমনীয় শ্যামলী একটি মেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিয়ের কনের সাজগোজ বলতে তেমন কিছু নেই, যেটুকুও বা আছে তাকে দখল করে রয়েছে এক বিপন্নতা। এক মানুষের জন্য আরেক মানুষের এই বিষাদ মানুষকে এক অদৃষ্টপূর্ব শ্রী দেয়, সেই শ্রী শিশির বিন্দুর মতো লেগে আছে মেয়েটির সমস্ত অবয়বে। সে স্তব্ধ হয়ে ভাবল, কেন যে এতদিন অমৃতা এর খোঁজ করেনি সেটাই তো এক বিস্ময়।

সে সোজা শম্পার দিকে তাকাল, বলল—আমি অমৃতার কাছ থেকে আসছি।

শম্পা এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে সে কথা বলতে পারছিল না। নিবেদিতাও। অরিন্দম বলল—আপনার বিয়েতে অমৃতা শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে। আর ভালবাসা।

—আপনি কে? অমৃতা কোথায়? কেন সে....

শম্পা কথা শেষ করতে পারল না।

অরিন্দম বলল—কাঁদবেন না, অমৃতা ভাল আছে। ওই মামলাটার কারণে ওর ঠিকানা, খবর কাউকে দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আপনার কথা আলাদা। বিশেষত আজকের দিনে।

—আপনি সত্যি কথা বলছেন তো?

—মিথ্যা বলে আমার লাভ? ব্যাস এবার মন ভাল করে, হাসিমুখে বিয়ে করুনগে যান। আপনার বরটিও বেশ ভাল। বেশ ভাল লেগেছে আমার। আমারও শুভেচ্ছা রইল।

সে হাতজোড় করে নমস্কার করে বাইরে বেরিয়ে এল। মা, মেয়ে দুজনেই এত অবাক, যে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। নিবেদিতা যে ভদ্রলোককে কোনও সৌজন্য দেখাবেন, খেয়ে যেতে বলবেন, সে সবের অবকাশ যখন এল তখন অরিন্দম বাইরে চলে গেছে। বিধবার মেয়ের বিয়ে, আত্মীয়স্বজন নিজেদের মজা লুটতেই ব্যস্ত। ভদ্রমহিলার হয়ে অতিথি-আপ্যায়নের মানসিকতাই নেই। তার ওপরে আবার বরের বাড়ির অচেনা লোকেরাও আছেন। তাঁদের আপ্যায়ন করবার জন্যে স্বয়ং বরের মাসতুতো বোন ভগ্নীপতি, মেসোমশাইও এসেছেন। দায়িত্ব ভাগ হয়ে গেলে আর দায় থাকে না। খালি মজা থাকে। সুতরাং অরিন্দম নির্বিবাদে মাঝের দালান উঠোন পেরিয়ে, বরাসনে আর একবার বরকে দেখে সদরের বাইরে চলে গেল।

'শম্পা ওয়েড্‌স সৌমিত্র' এখন পেছনে পড়ে গেছে। সে ছুটে চলেছে এক নতুন প্রভাতের দিকে। নব আনন্দে জাগো। উইল পাওয়ার উইল পাওয়ার। অমৃতার যা শরীর ও মনের অবস্থা তাতে কোনও মানুষের প্রেমে পড়া কি সম্ভব? কিন্তু এই সময় তো আর চিরকাল থাকবে না। পরিস্থিতি পাল্টে যাবে, অরিসূদনের শাস্তি হবে। অমৃতার পরীক্ষা হয়ে যাবে, তার সন্তান জন্মে যাবে, সে তার মা-বাবার নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরতে পারবে। ততদিন পর্যন্ত অরিন্দম অপেক্ষা করে থাকবে। দু পায়ে ইচ্ছা নিয়ে, যেন পদব্রজে নয়, দু ডানায় ভর করে সে উড়ে যেতে থাকে তার মারুতির দিকে। তার পর তার খেলনা গাড়ি উন্মুখ হাওয়ায় জোরে ছোটে। উইল টু পাওয়ার। উইল টু লাভ। উইল টু বি লাভড।

১৭

প্রোফেসর জয়িতা বাগচির কাছে অল্প কিছু ছাত্র-ছাত্রী পড়তে যায়। তিনি সেভাবে কোচিং করেন না। কেউ জানেও না তিনি কোচিং করেন। দু-চারজন ছাত্র-ছাত্রী থাকে নাছোড়বান্দা। ক্লাস থেকে বেরোচ্ছেন—জয়িতাদি! স্টাফরুম থেকে বেরোচ্ছেন—জয়িতাদি! লাইব্রেরিতে ঢুকছেন—জয়িতাদি! এই নাছোড়বান্দাগুলোর মধ্যে কাউকে কাউকে তিনি পাত্তা দেন। পড়ানোর জন্য বেশ উচ্চ ফি নিয়ে

থাকেন। এরা অন্যদের লুকিয়ে টুকটুক করে জয়িতাদির বাড়ি যায়। পড়ে। নোট্‌স্‌ নেয়। তিলক এদের মধ্যে একজন। সে বেচারি মরিয়া হয়ে গেছে আসলে। পড়ছে বাংলা, এদিকে ছেলে, কোথাও কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। চাকরির দরখাস্ত সে এখন থেকেই পাঠাতে শুরু করেছে, কম্পিউটার শিখছে। কিন্তু একটা কথা—বিষয়টা পড়তে তার সত্যি-সত্যি ভাল লাগে। এই ভাল লাগাটা অদ্ভুত। তার বয়সী বেশির ভাগ ছেলের সঙ্গেই মেলে না। কিন্তু তার এই ভাল লাগাটা জীবনে কোনও কাজে আসবে না—ভাবতে তার খুব খারাপ লাগে। এই সব সাত-পাঁচ ভেবেও সে পাঁচশো টাকা দিয়ে জয়িতাদির কাছে পড়তে যায়। সপ্তাহে একদিন। একজন অধ্যাপক হতে গেলে কী এবং কতটা আয়ত্ত করতে হয় সেটাই সে জয়িতাদির কাছ থেকে জেনে নিতে চায়।

জয়িতাদির ক্লাসের পড়ানোটা অন্য রকম। সেটা যেন একটা পারফর্ম্যান্স, যেমন গায়ক গান করেন, নট অভিনয় করেন একটা পরিশীলিত, মার্জিত, বহুদিনের অভ্যাসে রপ্ত ব্যাপার। সেটা একটা শোনবার জিনিস। এত তাড়াতাড়ি একটা ভেতরের ভাললাগার তোড়ে বলে যান তিনি ছাত্র-ছাত্রীরা বেশির ভাগ সময়েই স্তব্ধ হয়ে শোনে। বিশদ নোট নিতে পারে না, কেননা তাতে করে রস উপভোগের বাধা হবে। টেক্সট হলে তার মার্জিনে, না হলে দু-চারটে কথায় তারা ধরে রাখতে চায় এই ম্যাজিক। কিন্তু বাড়িতে পড়ানোর সময়ে জয়িতাদি একটু একটু করে ইট গাঁথেন, সযত্নে লাগান সিমেন্ট, পলেস্তারা। সেটা থেকে শেখার সুবিধে হয়।

জয়িতাদির বাড়িতে যেতে কোনও অসুবিধেও নেই। আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে সল্টলেক সেক্টর থ্রি খুবই কাছে। কিন্তু অসুবিধেটা অন্য জায়গায়। জয়িতাদি হয় তো পড়াচ্ছেন, খুব মনোযোগ দিয়ে তারা লিখে রাখছে সব। জয়িতাদির স্বামী প্রোঃ সুপ্রতীক বাগচি, ভেতর থেকে হাঁক পাড়বেন—জয়িতা! জয়িতা!

হন্তদন্ত হয়ে জয়িতাদি চলে যান। কোনও দিন পাঁচ মিনিট, কোনও দিন দশ মিনিট, কোনও দিন তারও বেশি সময় চলে যায়। অনেক সময়ে ভেতরে একটা চাপা কথা কাটাকাটির আওয়াজ পাওয়া যায়। একটু পরে হয়তো অধ্যাপক সুপ্রতীক বাগচি বেরিয়ে যান। জয়িতাদি আবার এসে বসেন।

সেদিন তিলক গেছে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে। ভিজে ভিজে সে যখন পৌঁছল জয়িতাদির বাড়ির জানলাগুলো বন্ধ। সে বেল দেবার প্রায় পাঁচ মিনিট পরে দরজাটা খুলে দিলেন জয়িতা বাগচি নিজেই।

—ও তুমি এসেছ? এ কি? ভিজে গেছ যে একেবারে।

—হ্যাঁ এলোমেলো ছাঁট ছিল তো!

—এত ভেজা অবস্থায় আজকে নাইবা পড়লে তিলক। আর কেউ আসেওনি। উনি বসবার ঘরের আলো জ্বেলে দিতে দিতে বললেন।

—ঠিক আছে। তিলকের একটু একটু শীত অবশ্য করছিল। কিন্তু ভেজা জায়গাগুলো পাখার তলায় কিছুক্ষণ বসলেই শুকিয়ে যেত! মাসে পাঁচ শ' টাকা! দিদি তো অন্য কোনও দিন আর দিতে পারবেন বলে মনে হয় না। জয়িতাদি বললেন—অনেকদিন ধরে তোমায় একটা কাজ দেব ভাবছি। করবে?

—কেন করব না? বলুন।

—আমি তোমাকে একটা প্যাকেট দেব, তুমি সেটা অমৃতাকে দিয়ে আসবে?

—অমৃতা? তিলক হাঁ হয়ে গেছে।

—শোনো ও বেঁচে আছে, ভালই আছে, সমস্ত ব্যাপারটা সম্ভবত একটা পারিবারিক ষড়যন্ত্র, যার থেকে ও কপালজোরে বেঁচে গেছে। ও যেখানে আছে সেখান থেকে ও আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে ফোনে যোগাযোগ করে। কিন্তু ও বেরতে পারে না। নিরাপত্তার জন্য, বুঝতেই পারছ। এই প্যাকেটটা ওর কাছে পৌঁছে দিলে ওর খুব উপকার হবে। আমারও মনে হবে আমি একটি অসহায়

বিপন্ন মেয়ের জন্য কিছু করতে পারলাম।

অমৃতা বেঁচে আছে এ খবর সে অরিন্দমদার কাছে শুনেছে। কিন্তু জয়িতাদির সঙ্গে তার যোগাযোগ, জয়িতাদির হঠাৎ অমৃতার উল্লেখ সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। প্যাকেটটা তার হাতে দিয়ে জয়িতাদি সবে পেছন ফিরে দরজা বন্ধ করছেন সুপ্রতীকবাবুর গলা শুনতে পেল তিলক।

—মানে কী এর? মানে কী? দিলে কী ওটা? নোট্‌স? ওটা তো তোমার-আমার করা বেস্ট নোট্‌স—ওইগুলো দিয়ে দিলে?

জানলার মধ্যে থেকে আসছে কথাগুলো।

—তোমার আর কী করা? আমারই। আমি বুঝেছি দিয়েছি। কোনও কোনও সময়ে একটু অতিরিক্ত করতে হয়, যেমন তোমার জন্যে করেছিলাম।

—তোমার এই কথা আমি নিজের থুতু গেলানোর মতো করে গেলাব তোমাকে একদিন।

—গেলাও না। আমার চেয়ে বেশি শান্তি তাতে আর কেউ পাবে না সুপ্রতীক। অস্বীকার করতে পার এই চোদ্দো বছর এক জায়গায় অনড় হয়ে বসে আছ? কলেজ পলিটিক্স ছাড়া আর কিচ্ছু করছ না! অস্বীকার করতে পার দুজনের মিলিত দায়িত্বের ওয়ান থার্ডও তুমি নাও না—তুমি আমাকে তোমার স্যালারির যে অংশটা দাও তাতে কী হয়? হয় কিছু? আমার ভরণপোষণ তো দূরের কথা, তুতুর আর তোমারও কী হয়? হয় না!

—আমি যেমন উপার্জন করি, তুমি সেই স্ট্যান্ডার্ডে চললেই হয়। দ্যাট য়ু ওন্ট ডু, য়ু অ্যামবিশাস বিচ।

পাথরের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তিলক। অন্যের কথা এভাবে শোনা ঠিক নয়, সে জানে, কিন্তু পারছে না। জয়িতাদি, মাথার ওপর ঝুড়ি চুল, ঈষৎ চৌকো মুখের অত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জয়িতাদি যিনি নিজের মারুতি এইট হানড্রেড চালিয়ে য়ুনিভার্সিটিতে আসেন, যাঁর ডক্টরেটের থিসিস বাজারে বই হয়ে বেরিয়ে গেছে, তিরিশ থেকে শুরু করে নব্বই দশক পর্যন্ত যাঁর উপন্যাসের আলোচনাগ্রন্থ প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই তাঁকে তাঁর স্বামী—বিচ বলছেন? অ্যামবিশাস বিচ? আর সে শুনবে না!

—মাইন্ড ইয়োর ল্যাংগুয়েজ সুপ্রতীক। হোয়াট ডু য়ু মিন বাই ইওর স্ট্যান্ডার্ড? মদ সিগারেট আর আড্ডা মারার খরচ সামলে কত টাকা তুমি আমাকে দাও? নিম্নবিত্তের সংসারও আজকালকার দিনে আর ওতে চলে না। আর অ্যামবিশন নিয়ে প্রায়ই তোমায় বক্রোক্তি করতে শুনছি। ব্যাপারটা কী বলো তো? আমি তো তোমার মতো পলিটিক্স করি না, লবি-টবিও জানি না। নিজের ক্ষমতায় পড়াশোনা করে কিছু অর্জন করলে, মানুষের সম্মান শ্রদ্ধা পেলে সেটাকে ঘৃণা করতে হবে? অ্যামবিশন? আমি কি তোমার মতো প্রেমিকার নোট্‌স পড়া ফার্স্ট ক্লাস?

একটা চাপা গর্জন, একটা অদ্ভুত আওয়াজ, আর 'উঃ' বলে একটা ক্রুদ্ধ কাতর চিৎকার শুনতে পেল তিলক। সুপ্রতীকবাবু কি জয়িতাদিকে মারছেন? মারছেন একজন ফার্স্ট ক্লাস কলেজের প্রোফেসর তাঁর স্ত্রীকে যিনি য়ুনিভার্সিটির বিভাগীয় প্রধান? সম্ভব? এটা সম্ভব? সে এখন কী করবে? পালিয়ে যাবে এখান থেকে? সেটা কাপুরুষতা হবে না? আর যদি থাকে? যদি ঢোকে? সেটাও তো হবে পরের ব্যাপারে নাক গলানো। খুব তাড়াতাড়ি চিন্তাটা করছিল সে। এখন মন স্থির করে জোর বেল দিল। রিং রিং রিং রিং রিং। এতক্ষণ কোনও সভ্য মানুষ আরেক সভ্য মানুষের বাড়িতে বেল টেপে না।

দরজাটা খুলল বেশ একটু পরে। সামনে সুপ্রতীকবাবু। মুখটা লাল, চোখ দুটো দপদপ করছে। কিন্তু শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার? আবার ফিরে এলে যে?

—ম্যাডামকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।

—পরে জিজ্ঞেস করলে হয় না? শী ইজ বিজি নাও।

—অনেক দূরে থাকি সার, প্লিজ একবার ডেকে দিন।

সুপ্রতীকবাবু ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর জয়িতাদি এলেন, দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, মুখে চোখে জল দিয়েছেন। শাড়ির সামনেটা ভিজে। চুলে বোধহয় একবার চিরুনিও চালিয়ে এসেছেন। মারটা কি চুল ধরেই হয়েছিল?

—কী ব্যাপার? তিলক? একই প্রশ্ন দুজনে করলেন দুভাবে। সুপ্রতীকবাবু করেছিলেন রীতিমতো ক্রুদ্ধ গলায়। অভদ্রের মতো। জয়িতাদির প্রশ্নটায় সামান্য বিরক্তি। খুব সামান্য। কিন্তু গলার একটা থির থির কাঁপুনি তিলক টের পেল।

সে বলল—ম্যাডাম, আপনি অমৃতার ঠিকানাটা কিন্তু আমায় দিতে ভুলে গেছেন।

—ঠিকানাটা প্যাকেটের ওপরই লেখা আছে। দেখো!

—ও, একটু ভেতরে আসতে পারি ম্যাডাম?

—এসো, আমি আসলে এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম।

—একটু ডিরেকশনটা জেনে নিতাম।

—ও, তুমি ওদিকটায় যাও না, না? গড়িয়াহাটের মোড় আসবার দু-তিন স্টপ আগে রাস্তাটা, ওখানটায় একটু জিজ্ঞেস করে নিও। ফিরতে গিয়ে আবার মুখোমুখি হলেন উনি তিলকের। বললেন—অনেকটা চলে গিয়েছিলে, না?

তিলক বুঝল উনি নিশ্চিন্ত হতে চাইছেন। সে বলল—অনেকদূর, প্রায় ওই আইল্যান্ড পর্যন্ত, ছুটতে ছুটতে আসছি। সেই জন্যেই...

কথা শেষ না করে হঠাৎ তিলক তার স্বভাববিরুদ্ধভাবে জয়িতাদিকে একটা প্রণাম করল। উনিও অবাক হলেন। তিলকও। সে আর দাঁড়াল না। পেছন ফিরে প্রায় ছুট লাগাল।

এই সব দাম্পত্য-কলহে কথায় কথা বেড়ে যায়, সে জানে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে। করতে করতে এক সময়ে ব্রহ্মাস্ত্রের আগুন বেরিয়ে আসে। একেবারে বধ। এটা সে দেখেছে। এতটা দেখেনি। কখনওই না। কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু এর ছোট সংস্করণ বাড়িতে দেখেছে। কোনও বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হল। মা বাবাকে ঠেস, বাবা মাকে ঠেস। তারপরই বাবা অবধারিতভাবে মায়ের বাপের বাড়ির নিন্দা আরম্ভ করবে। ব্যাস ক্রোধ আর কষ্ট চোখের গরম জল হয়ে বেরিয়ে আসবে। মা খাবে না। বাবা বলবে একদিন না খেলে কিছু হয় না। তারা মাকে সাধবে। মা কিছুতেই উঠবে না। তিলক বিরক্ত মুখে বলবে—'তোমরা যা ইচ্ছে করো, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, আমি খেয়ে নিচ্ছি।' পরের দিন ঈষৎ গম্ভীর-বিষণ্ণ মুখে মায়ের অবতরণ, বাবার নির্দেশ—জলখাবার না খেয়ে মা যেন কোনও কাজ না করে...ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বাড়িতে এত ভদ্র মার্জিত, উচ্চকোটির ব্যাপার এঁদের, সল্টলেকে ছবির মতো বাংলো বাড়ি, বাইরের লনে একটি ফুটফুটে কিশোরী মেয়েকে দেখা যায় অনেক সময়েই। এইখানে 'য়ু অ্যামবিশাস বিচ?' এইখানে একজন প্রোফেসর স্বামী আরেকজন প্রোফেসর পত্নীকে মারেন?

বাসে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তিলকের মাথায় শুধু এই চিন্তাই ঘুরছিল। তার বাবা পদে ফোরম্যান, বিদ্যায় ডিপ্লোমা এঞ্জিনিয়ার, মা বি.এ পাসকোর্স। তাঁরা পর্যন্ত ঝগড়াকে মারামারি পর্যন্ত গড়াতে দেয়নি। আর এঁরা? জয়িতাদিই বা কী? ওই ভদ্রলোককে অমনি বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে না বললেই কি চলছিল না? তবে সত্যিই যদি ভদ্রলোক পলিটিক্স করেন, মদে সিগারেটে আড্ডায় নিজের উপার্জন বেশিটাই খরচ করে ফেলেন, স্ত্রীকে গোটা সংসার চালাতে হয়, তবে এসব কথা উঠতেই পারে। উপরন্তু, ওই নোট্স নিয়ে আদেশজারি? জয়িতাদির নোট্স তিনি কাকে দেবেন, তিনি বুঝবেন? সার কেন খবরদারি করতে আসেন? ওঁদের কথায় বোঝা যায় কোনও এক সময় ওঁদের প্রেম-পর্ব চলাকালীন জয়িতাদি তাঁর নোট্স দিয়ে সারকে সাহায্য করেছিলেন। তার ফলেই সার ফার্স্টক্লাস পান। কিন্তু তারপর থেকে আর কিছুই করেননি। অথচ ওঁর স্ত্রী করে চলেছেন—এই নিয়েই অশান্তি।

হঠাৎ একটা কথা তিলকের মাথায় খেলে গেল। ওঁদের কথাবার্তা থেকে এটা খুব পরিষ্কার, যে এই প্যাকেটে যা আছে তা হল নোট্স। অত্যন্ত মূল্যবান। এগুলো জয়িতাদির করা। এগুলো দেখবার লোভ সে সামলাতে পারছে না, পারবে না। হঠাৎ জয়িতাদিদের বাড়ির গোলমাল-অশান্তি, সুপ্রতীকবাবুর অভব্য আচরণ সব হুড়হুড় করে পেছনে সরে যেতে লাগল। সে জায়গায় সামনে যেন সমুদ্র মন্থন করে উর্বশীর মতো উঠে এল অপরূপ রূপবতী এক নগ্নিকা—নোট্স। জয়িতা ভাদুড়ি ভূতপূর্ব জয়িতা রায়ের রেকর্ড মার্কস পাওয়া নোটস্।

বাড়ি ফিরতে তিলকের আর তর সইছিল না। পথে আর একবার বৃষ্টি নামল। নোটস্-এর প্যাকেট পলিথিন-কাগজে মোড়াই ছিল, তবু সে দাঁড়িয়ে গেল একটা দোকানে। অনেক লোক জড়ো হয়েছে দোকানটায়। ছাতা গুটিয়ে সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে। বৃষ্টিটা দেখাচ্ছে ঘন কুয়াশার মতো। কুয়াশা স্থির থাকে, বৃষ্টিজনিত কুয়াশা খালি অস্থির। বাঁদিক থেকে ডানদিকে সরে যাচ্ছে। তার পেছনে আর একটা কুয়াশার পরদা। সেটাও সরে যাচ্ছে একইভাবে। তার পেছনে আর একটা।

একজন বললেন—সব কেলো হয়ে গেল, বুঝলি নিতাই। সন্ধেবেলা তেরপল তছনছ হয়ে যাবে। তার তলায় তোর ম্যারাপে জল ঢুকে গিয়ে রং ধেবড়ে জঘন্য একটা ব্যাপার হবে। সাতশো লোক নেমন্তন্ন হয়েছে। তিনশোও হলে হয়।

নিতাই নামধারী বললেন—এ-ও হতে পারে দ্বিজুদা, এই দিনের বেলা বিষ্টিটা হয়ে আকাশটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। সন্ধেবেলাটা ঠাণ্ডা, সাতশো না হোক ছশো নব্বুই জন লোক আরামে এসে গেল।

দ্বিজুদা বললেন—সবই নির্ভর করছে তোর এই বোনটা বাদুলে কি না তার ওপর।

—বা বা বা বা! বিয়ে ঠিক করবে শ্রাবণ মাসে, বিষ্টি হলেই কনের দোষ...

—ও দাদা একটু চেপে দাঁড়ান না...আর এক ব্যক্তি উঠে এলেন।

—দাঁড়ানোর আর জায়গা নেই, দেখতেই তো পাচ্ছেন।

—একটু মাথাটা বাঁচাতে দিন। অবস্থা দেখুন না...চশমা পুরো ঝাপসা—এক বিন্দুও দেখতে পাচ্ছি না।

—কই জামাইকে তো তোমরা বাদুলে-টাদুলে বলো না!

—পিতৃতান্ত্রিক, দ্বিজুদা বললেন, বুঝলি না পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, সবটাতেই মেয়েদের দোষ ধরে।

—ধরে আবার কী! ধরি বলো।

একজন জনান্তিকে আর একজনকে বললে—একে বৃষ্টিতে ছয়লাপ। এদিকে আবার নারীবাদের আলোচনা ধরেছে। হাড়ে দুব্বো গজিয়ে দেবে আজ।

—আঃ ঠেলছেন কেন? পড়ে যাব যে!

—দেখুন, এখানে ঠেলাঠেলি একটু হবেই। দশজনের জায়গায় কুড়িজন দাঁড়িয়েছে, আমি আপনাকে ঠেলছি না।

—তবে আমি ঠেলিত হচ্ছি কী করে?

—আজ্ঞে, ভিড়ের স্বাভাবিক চাপের জন্যে।

আর একজন বললেন গোটা দেশটারই তো অবস্থা তাই দাঁড়িয়েছে। ধরো পঁচিশ কোটি লোক খেয়ে-পরে শুয়ে-বসে আরাম করে থাকতে পারে, সে জায়গায় যদি নিরানব্বই কোটি লোক হয়ে পড়ে, তো সবেতে টান ধরবেই, সবেতেই ঠেলাঠেলি...

এই ঠেলাঠেলির মধ্যে দাঁড়িয়ে তিলক ভাবছিল—হাঃ হাঃ হাঃ তোমরা জানো না, এই উতলধারা বাদল ঝরে'র মধ্যে সাত কোটি নিরানব্বুই কোটির ঠেলাঠেলির মধ্যে একজন জাস্ট একজন দ্যাট চোজ্‌ন ওয়ান দাঁড়িয়ে আছে, যার হাতে-নাতে উর্বশী। জয়িতা রায়ের নোট্স।

এই সময়ে বৃষ্টিটা একটু ধরল। অনেকেই নেমে গেল। তিলকের ছাতা নেই। ছাতা আবার তার বয়সের ছেলে কবে ব্যবহার করে? কিন্তু আজ সে কোনও ঝুঁকি নিল না। একটা বুড়ো পাকশিটে

মতো রিকশাঅলার রিকশায় নির্লজ্জের মতো উঠে বসল। বসেই বলল, এই হ্যাট্‌ হ্যাট্‌।

রিকশাওলা তার ঠোঙার মতো পলিথিনের কভার-এর ঘোমটা সরিয়ে খিঁচিয়ে উঠল—হ্যাট্‌ হ্যাট্‌ বলছেন কেন? রিকশা চালাই বলে কি আমাদের জান-মান নেই?

তিলক মনে মনে একটা জিভ কেটে বলল—না রিকশাদাদা, কিচ্ছু মনে করবেন না, এই জলে আপনাকে পেয়ে আমার মনে হয়েছিল যেন পক্ষীরাজ ঘোড়া পেয়েছি একটা।

এ কথায় কিছুমাত্র সান্ত্বনা পেল না লোকটা। থুক করে একদলা থুতু ফেলল জলের মধ্যে। কোথায় যাবেন?

—আমহার্স্ট স্ট্রিট। এই আর একটু ভাই।

—আমহাস ইস্টিট অনেকটা।

—আরে না না, বেশিদূর না। বৈঠকখানার একটু আগে।

—তিরিশটা টাকা দিতে হবে কিন্তু।

—তিরিশ? আচ্ছা পঁচিশ দেব।

রিকশাঅলা ঠুং-ঠুং করতে করতে জল ভাঙতে লাগল।

বাদলের শেষ দুপুরে মাথা মুছে, জামাকাপড় পাল্টে এক কাপ চায়ের জন্যে রান্নাঘরের দিকে গেল তিলক। মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কাজের মাসি মিনু তাকে দরজা খুলে দিয়েছিল, সে মিনতির সুরে বলল—মিনুমাসানি একটু চা করে দেবে? বড্ড ভিজেছি ডিয়ার।

মিনু মাসানিটা শুনলে মিনু মাসি কেন যেন বড্ড খুশি হয়। সে হাসিমুখে ভ্রূকুটি করে বলল—সে তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু ডিয়ার ফিয়ার বললে দোব না।

আচ্ছা—ডিয়ার নয়, সুদ্ধু মাসানি। প্লিজ এক কাপ নয়, এক গ্লাস। মানে গেলাস।

কোণের ঘরে সে পড়ে। ছোট্ট ঘরটায় টেবিলে বইয়ের গাদা অগোছালো হয়ে আছে। দেওয়ালে একটা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। সে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললে—জয় বাবা দক্ষিণেশ্বরের পাগল ঠাকুর।

উর্বশীর ঢাকনা খুললে সে।

প্রিয় অমৃতা,

এতদিনে নিশ্চয় বুঝেছ, তোমাদের জয়িতাদিকে যা ভাবতে তিনি তা নয়। কঠিনকঠোর নয়, তিরস্কারপ্রবণ নয়, ছাত্রদের কাছ থেকে প্রাইভেট কোচিং-এ টাকা কামিয়ে বাড়ি-গাড়ি করার মতলবে ক্লাসটাকে অবহেলা করার ইচ্ছাও তাঁর নেই। তুমি এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়েছ, যখন তোমায় আর ছাত্রী, শুধু ছাত্রী বলে মনে করতে পারছি না। তোমার এই ঘটনা আমার ভিতসুদ্ধ নাড়িয়ে দিয়েছে। তুমি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্বামীর দ্বারা ক্লোরোফর্মড হয়ে নার্সিংহোমে প্রেরিত হয়েছিলে, একটা সম্পূর্ণ সুস্থ মায়ের সুস্থ ভ্রূণকে বিনা কারণে অকালে নষ্ট করার জন্য, সম্পূর্ণ তোমার সম্মতি ছাড়া? এটা জানবার পর থেকে আমার রাতের ঘুম চলে গেছে। অমৃতা, আমার দ্বিতীয় সন্তানকে আমি এমনিভাবেই হত্যা করেছিলাম। তখন আমাদের জীবনের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সময়। সল্টলেকের জমিতে বাড়ি শুরু হয়েছে। ঋণ নিয়ে গাড়ি কিনেছি। মেয়েকে অত্যন্ত দামি স্কুলে ভর্তি করেছি। আমার স্বামী যখন বললেন এ সম্ভাবনা বিনষ্ট করতে, ভয়ে চমকে উঠেছিলাম। তারপর ভেবে দেখলাম—আমার আর কোনও সহায়সম্বল নেই, নিজের মেধা এবং পরিশ্রম করবার শক্তি ছাড়া। স্বামী অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন, বুঝতেই পারছ কেন বিবাহিত দম্পতির পরিকল্পিত জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান আসে। দায় সম্পূর্ণ তার। সেই সে, অনায়াসে অবলীলায় নিজের সন্তানকে গর্ভে হত্যা করতে চাইছে, অর্থাৎ এর আর্থিক দায়িত্বও সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ একা আমার। তখন ভয়ে দুশ্চিন্তায় দিশাহারা হয়ে এম.টি.পি করাই, তখন অ্যাক্ট পাস হয়ে গেছে। অমৃতা, তখন সে সবে অঙ্কুরিত হয়েছে। জানি না তার লিঙ্গ। কিন্তু যা-ই হোক সে, আমার কাছে সে স্বাগত ছিল। জানি সে শুধু সম্ভাবনার তৃণাঙ্কুর। তবু তারপর

থেকে সে আমার দিনে-রাতে আমার চেতনা-অচেতনায় পেছু নেয়। অকাল-মৃত পিটার প্যানের মতো সে জানলার কার্নিশে বসে আমার দিকে তার শিশু চোখ মেলে থাকে, বলে, মা তুমি আমায় নিলে না? মা, তুমি আমার জন্যে কাঁদবে না মা? আমি তাকে নিইনি, কিন্তু তার জন্য বোধহয় আমরণ কাঁদব। তোমাদের ক্লাসে লেকচারের সময়েও সে হঠাৎ-হঠাৎ পেছনের বেঞ্চে এসে বসে থাকত। তখন আমি কথা খুঁজে পেতাম না। চোখে সব অন্ধকার দেখতাম। পড়তে গিয়ে আজকাল অনেক সময়ে বুঝতে পারি যে কিছু বুঝতে পারছি না। যেন গ্রীক ভাষা, লাতিন ভাষার গ্রন্থ খুলে বসে আছি। আমার সেই একান্ত নিভৃত জায়গা থেকে অমৃতা আমি তোমায় নমস্কার করছি। তোমার অবস্থানও আমার থেকে খুব ভিন্ন ছিল না। কিন্তু তুমি তাকে স্বাগত করছ, করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে। অমৃতা তোমার ভাল হোক। আজ থেকে, এখন থেকে আমি তোমার দিদি, দিদিও নয়, হয়তো বন্ধু। আমার কাছে তোমার দুয়ার খোলা। আমারই জন্য।

জয়িতাদি।

তিলক পাতা উল্টোল। ফিফথ্ পেপার রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ উল্টে যাচ্ছে, উল্টে যাচ্ছে, সিক্সথ্ পেপার থিয়োরি, থিয়োরি উল্টে যাচ্ছে, উল্টে যাচ্ছে, সেভেনথ্ পেপার মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ, এইটথ্ পেপার। প্রত্যেকটি টেক্সট ধরে খুঁটিনাটি আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দীর্ঘ রচনা, পড়তে পড়তে তিলকের আর দিনরাত জ্ঞান রইল না। গভীর কোনও উপন্যাস, কিংবা পাতায় পাতায় ছড়ানো কোনও মগ্ন কবিতা, কিংবা সরস আলোকিত নিবন্ধের মতো রসময় সে সব। বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। মননে, হার্দ্য গুণে গভীর ভাষার ওজস্বিতায়, সংক্ষিপ্ততায় আদ্যন্ত চমক সৃষ্টি করা।

সে বুঝতে পারল কেন জয়িতা বাগচি গত পঁচিশ বছরের শ্রেষ্ঠ ছাত্রী হিসেবে বিবেচিত, পুরস্কৃত। কেন তিনি সমস্ত য়ুনিভার্সিটি পলিটিক্স, পার্টি পলিটিক্সকে মাথা হেঁট করিয়ে তাঁর আসনে বসেছেন। এ-ও সে বুঝতে পারল—কেন জয়িতাদির আরও আরও কোনও উজ্জ্বল উত্তরণ ঘটছে না।

তারপরে তার চৈতন্যের মধ্যে যেন একটা বোমা ফাটল। মাসিক পাঁচশো টাকা দিয়ে সে জয়িতাদির কাছে পড়তে যায়, কিন্তু এর সিকি ভাগও তিনি কোনওদিন তাকে বা আর কাউকে দেননি। প্রচণ্ড ক্ষোভ, আক্রোশ হল তার একটা। তখন রাত নটা। সে ছুটল নোট্স ফটোকপি করাতে। বহু রাত অবধি খোলা থাকে নিখিলদার জেরক্স কাম এস.টি.ডি. বুথ। নিখিলদা বললেন—রেখে যা। কাল বিকেলে দেখি শেষ করতে পারি কি না।

সে বলল—তা হবে না নিখিলদা, যতটা আজ পারেন করে আমায় দিন, রেখে আমি যাব না।

পর দিন বিকেলের মধ্যে যখন সব হয়ে গেল, মার কাছ থেকে চেয়েচিন্তে নেওয়া কড়কড়ে তিনশো টাকার তিনটে নোট সে তুলে দিল নিখিলদার হাতে। তার পরে আবার বিশদ পড়া। আসলগুলো আগের মতোই পর্বে পর্বে স্টেপ্‌ল করা, যাতে কিছু বোঝা না যায়। অমৃতার প্রতি জয়িতাদির চিঠিটা আলাদা কোনও খামের মধ্যে ছিল না, ছিল নোটসগুলোর সবচেয়ে প্রথম পাতায়, যেন সেটা কোনও মুখবন্ধ। নান্দীমুখ। তারপর আবার শুরু করল বিশদে পড়া। নকলগুলো। দেখবার জন্যে যে সব ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে কি না।

পরিষ্কার গাঢ় কালো কালি দিয়ে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লেখা। কেনই বা তার ফটোকপি খারাপ হবে? কিন্তু এইবার তিলক আবছাভাবে বুঝতে পারল কেন এ নোট্স জয়িতাদি তাদের দেননি। তারা কেউ এর সদ্ব্যবহার করতে পারবে না। এগুলোর সঙ্গে যেই নিজেদের কথা, নিজেদের রচনা, একটা বাক্যও ঢোকাতে যাবে, তেলে জলে মিশ খাবে না। এসব তাদের জন্য নয়। অনেক পড়াশোনা থাকলেই এগুলো ব্যবহার করা যায়। অমৃতাকেই বা কেন দিয়েছেন? অমৃতা-ও সে দরের ছাত্রী নয়। সে-ও এগুলো ব্যবহার করতে পারবে না বলেই তার ধারণা, জয়িতাদি এগুলো ওকে দিয়েছেন অভিনন্দন, অভিবাদন, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা জানাবার জন্য। সে সময়ে তাঁর অধ্যাপকী বিচারবৃত্তি কাজ করেনি।

পরের দিন যখন সে এসপ্ল্যানেডে এসে পাতাল রেল ধরল, তার মনে হচ্ছিল সে যাচ্ছে এক দুঃসাহসিক অভিযানে। কতদিন পরে দেখবে অমৃতাকে। অমৃতার প্রতি যে তার বিশেষ কোনও টান আছে তা নয়। আজকাল সমপাঠিনীরা সমপাঠীদের বিশেষ পাত্তা দেয় না। খুব চালাক-চতুর হিসেবি হয়ে গেছে মেয়েগুলো। আগে কত শোনা যেত ক্লাস-বন্ধুদের রোমান্টিক প্রেম, রোমাঞ্চকর বিয়ে। ধুস্স্। মেয়েরা দেবে বাংলার অর্ডিনারি ছেলেকে পাত্তা? ওদের সঙ্গে সম্পর্ক বিশুদ্ধ বন্ধুত্বের, বন্ধুত্বও নয়, ক্লাস-বন্ধুত্বের। ওই একটু ক্যান্টিন কি কফিহাউজে হইচই। নোট্স আর বই দেওয়া নেওয়া, লাইব্রেরিতে চেইন-সিস্টেম তৈরি করে রাখা। শর্মিষ্ঠা ফেরত দিলে দোলা নেবে, দোলা ফেরত দিলে তিলক নেবে, তিলক ফেরত দিলে চঞ্চল। এইরকম। এক বেঞ্চে পাশাপাশি বসে সেন্টের গন্ধ পায় ছেলেরা, কিন্তু কোনও রকম সেন্টু দেওয়ার ধারকাছ দিয়ে যায় না। অমৃতা আবার তার ওপর বিবাহিত মেয়ে। কিন্তু তিলকের এটা বরাবরই মনে হয়েছে অমৃতা একটু আলাদা। বড্ড যেন ঋজু, মেয়েলিপনা কম, বড্ড বেশি ওর আত্মবিশ্বাস, পরীক্ষার ফলাফলে ওর হেলদোল সবার থেকে কম। অথচ ওরা সবাই জানে, অমৃতাও ওদেরই মতো একটা কেরিয়ার চায়। প্রয়োজন অনুভব করে। এম.এ. পার্ট ওয়ানে শর্মিষ্ঠার ফার্স্ট ক্লাস এসেছিল, তিলক এগারো নম্বর কম পায়, অমৃতা মিস্ করে মোটে তিন নম্বরের জন্যে। হেলায় বলে দিল পার্ট টু-তে মেক-আপ দেবার চেষ্টা করব। দেব নয়, চেষ্টা করব।

—তোর আফসোস হচ্ছে না? দোলা জিজ্ঞেস করে।

—দূর! আফসোস করে হবেটা কী? ফিরবে আর রেজাল্টটা?

দোলা পঞ্চান্ন পার্সেন্টও রাখতে পারেনি। কেঁদে কেটে একসা করছিল। অমৃতা ওকে প্রায় ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়।

—করছিস কী দোলা, তুই কি এখনও স্কুলের ছাত্রী? খালি ক্যাসেট বাজিয়ে আর লেট-নাইট মুভি দেখে সময় কাটাবি, আর রেজাল্ট বেরলেই কাঁদবি?

—বেশ, আমি নষ্ট করি আমার সময়, তোরটা তো আর করি না! তোর কেন এক্সপেক্টেড রেজাল্ট এল না? তুই কী করছিলি?

—আমি? আমি এই রেজাল্টই আশা করিনি। আর আমার সময় কী করে কাটে একদিন তোকে তার হিসেব দিয়েছিলাম, হারিয়ে ফেলেছিস হিসেবের খাতাটা?

এরপর দোলা চুপ করে গিয়েছিল। তিলক বলেছিল—ঠিক আছে তুই আশাতীত রেজাল্ট করেছিস। সময় পাস না পড়বার। তো তোর পেপারে পেপারে এত তফাত কেন?

—যেটা ভাল লাগে না সেটা আসলে আমি পড়তে পারি না। যা হোক করে সেরে দিই। বোধহয় এই জন্যেই...

—জানিস যদি তো চেষ্টাটা ঠিকভাবে করলেই পারিস!

—দূর। যেটা ভাল লাগে সেটাই পড়ে শেষ করতে পারি না!

সেই অদ্ভুত মেয়ে অমৃতার আস্তানায় সে যাচ্ছে আজ। যথাসম্ভব গোপনতা অবলম্বন করে। কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছেন জয়িতাদি।

তখন বিকেল বেশ গাঢ় হয়ে উঠছে। বর্ষার গুমোট ভেঙে একটা মেঘলা হাওয়া দিচ্ছে। কালীঘাট স্টেশনে নেমে সে গড়িয়াহাটের অটো নিল একটা। মোড়ের আগে নেমে পড়ল। এইবার খুঁজতে হবে রাস্তাটা। এমন সময়ে সে দোলাকে দেখল। দোলা একটা ট্যাক্সি থেকে নামল। ট্যাক্সিটা তার পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল। ভেতর থেকে একটি যুবক মুখ বার করে হাত নাড়ছে তখনও দোলার

দিকে তাকিয়ে। দোলাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। আজ ও ক্লাসে আসেনি। এইরকম কামাই করে প্রায়ই। তিলক প্রায় চেঁচিয়ে ডাকতে যাচ্ছিল—দোলা! এই দোলা! হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল তার অভিযানের গোপনতার কথা। সে সুট করে বাসন্তীদেবী কলেজের দেওয়ালে সেঁটে গেল, দোলা কেমন দুলতে দুলতেই রাস্তা পার হল। ওদিকে গিয়ে বোধহয় বাস ধরবে কসবার। অটো-ফটোও ধরতে পারে। কে জানে কোথা থেকে কোথায় অটো চলে এদিকে। ছেলেটা কে? বেশ মডেল মডেল দেখতে। স্টাইলিশ। ট্যাক্সিতে এখানে দোলাকে নামিয়ে দিয়ে মডেল কেন হুশ্‌ হয়ে যায়? দোলার বয়ফ্রেন্ড না কি? ক্লাস কেটে এর সঙ্গে ঘুরছে দোল দোল দুলুনি! ঘোর বাবা ঘোর। তোরাই ঘোর। বড়লোকের মেয়ে, ব্যাগ-ভর্তি পয়সা-টাকা ঝনঝনিয়ে আসিস। প্রায়ই খাওয়াস ক্লাস-বন্ধুদের। কেরিয়ারের ভাবনা নেই। মডেল বয়ফ্রেন্ডও নিশ্চয় চাকরি-বাকরি ভালই জুটিয়েছে। জীবনের যা কিছু মজা তোরাই লুঠে নে রে দোলা। তিলকদের জন্যে আছে খালি বাবার প্রাণপণ উপার্জনের পাঁচশো টাকা মাস-মাস খরচ। আবার তিনশো টাকা দিয়ে অন্যের নোট্‌স চুরি।

বাড়িটা খুঁজে পেতে বেশ সময় লাগল। একটা রাস্তা আরেকটা রাস্তার সঙ্গে কাটাকুটি খেলছে এখানে বারবার। এদিকে যাবে? না ওদিকে? এদিকটাও ডোভার লেন। ওদিকটাও ডোভার লেন। লোককে এদিক ওদিক জিজ্ঞেস করতে করতে সঠিক ঠিকানায় এসে যাবার পর বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিলক কুলকুল করে ঘামতে লাগল। এই সবুজ দরজা তো শুধু একটা দরজা নয়, একটা রহস্যের ঢাকনা। মিসেস শিবানী দত্ত। কে ইনি? অমৃতার বাড়ি সল্টলেকে করুণাময়ীতে। সেখানে থাকছে না অমৃতা। ওই শিবানী দত্ত কি ওর মাসি-পিসি জাতীয় কেউ হবেন? ওরা গোস্বামী মানে ব্রাহ্মণ। তবে কি আর ব্রাহ্মণদের কায়স্থ মাসি-পিসি হয় না? হতেই পারে। সে বেল টিপল। হাতটা বেশ কেঁপে গেল। একটু পরে দরজা খুলে গেল।

—কাকে চাই?

—মিসেস শিবানী দত্তর সঙ্গে একটু দেখা করব।

এই সময়ে ভেতরের কোনও ঘরে শাঁখ বেজে উঠল।

—ভেতরে আসুন।

যে ঘরটাতে বসতে দিল মেয়েটি সেটা একটা বৈঠকখানা ঘর। কিন্তু সোফাগুলোর ওপর ডাস্ট-কভার পরানো। বোঝাই যায় খুব বেশি বাইরের লোকের আনাগোনা নেই এখানে। কেমন একটা ধুলো-ধুলো গন্ধ। বন্ধ ঘরের আবহাওয়াটা। মেয়েটি সুইচ টিপে দিতেই টিউববাতি উলঙ্গভাবে আছড়ে পড়ল আধময়লা ঘরটার ওপর। পাখা চলতে ক্লিক-চিক করে একটা শব্দ হতে লাগল, ক্যানোপিটাতে লাগছে বোধহয়। একটু পরে এক দোহারা চেহারার ভদ্রমহিলা ঢুকলেন। কালো নকশা-পাড় শাড়ি পরা। কালো ব্লাউজ, বেশ ফিটফাট।

—তুমি...তোমাকে তো...

—আমার নাম তিলক মজুমদার। আমি অমৃতার য়ুনিভার্সিটির বন্ধু।

—অমৃতা? কে অমৃতা?

একটু ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে গেলেও তিলক বলল—জয়িতাদি মানে প্রোফেসর জয়িতা বাগচি আমার হাতে কিছু নোট্‌স পাঠিয়েছেন অমৃতার জন্য। আমি জানি এ ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে। জয়িতাদি বিশ্বাস করে আমাকে দিয়েছেন।

—বসো একটু। উনি চলে গেলেন।

একটু পরে কাজের মেয়েটি এসে তাকে ওপরে যেতে বলল। উঠোনের ওপাশে ঢাকা দালানের মাঝ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। মেয়েটি সিঁড়িটা দেখিয়ে দিয়েই চলে গেল।

সিঁড়ির ঠিক মাথায় অমৃতা দাঁড়িয়েছিল। তিলক বিস্ময়ে, ধাক্কায় আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল। অমৃতার বুকের তলা থেকে উঁচু হয়ে উঠেছে পেট। তাকে এত অন্যরকম দেখাচ্ছে যে তিলকের

প্রথম ধাক্কায় চিনতে অসুবিধে হয়েছিল। খুব তাড়াতাড়ি তার মনে পড়ল জয়িতাদির চিঠিতে অন্তঃসত্ত্বা কথাটা। কেমন লাল হয়ে যাচ্ছিল সে।

—তিলক! তি-লক! তুই এসেছিস? ওঃ আমার কী যে ভাল লাগছে। একেবারে অন্যরকম।

তিলককে প্রায় হাত ধরে একটা ঘরে নিয়ে গেল অমৃতা। একদিকে তার পড়ার টেবিল। স্তূপীকৃত বই আর খাতা। সব গোছানো। চেয়ারের পিঠে একটা তোয়ালে ঝুলছে। একদিকে একটা ডিভান। বড় বড় জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে। পর্দা উড়িয়ে।

তিলক বলল—এই নে, জয়িতাদি এই প্যাকেটটা তোকে দিয়েছেন।

—কী আছে রে এতে?

—নোট্‌স। আমার ধারণা।

—তোরা সব কে কেমন আছিস?

—ভাল। তুই?

—আমি? আমি আছি সেই রূপকথার রাজকন্যার মতো রাক্ষসপুরীতে ঘুমিয়ে। সোনার কাঠি রুপোর কাঠি বদল করে আমায় জাগান যিনি, 'তিনি অবশ্য কোনও রাজপুত্তুর নন। তিনি আমার শিবানী মাসি। আমার ছোটবেলার বন্ধু সম্পদের মা। যাঁকে তুই নীচে দেখলি।'

—তোর বিপদ কেটেছে?

—যতক্ষণ না কেসটা উঠছে, কিছু তো বলা যায় না। ও সব কথা থাক। তোকে দেখে আমার য়ুনিভার্সিটির কথা, কলেজের কথা, ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, সেই অ্যাটমসফিয়ারটা তুই বয়ে নিয়ে এসেছিস।

—তোর ছাত্রজীবন তো চলছে এখনও?

—না রে, আমি যেন কোনও বয়স্ক বিধবা প্রাইভেট পরীক্ষা দিচ্ছি। আমার কোনও বন্ধু ছিল না। সহপাঠী ছিল না। কোনও টিচার আমায় কোনও দিন...

—তুই অজ্ঞাতবাসে আছিস তাই। আমরা প্রত্যেকে তোর জন্যে ভাবি। গেলে দেখবি সেই আগের মতো।

—তোরা তেমনি কফিহাউজে গিয়ে গুলতানি করিস?

—যাই। গুলতানিটা খুব জমে না। তুই নেই তো।

—বাজে কথা বলিস না তিলক। মন-ভোলানো কথা বলছিস এবার।

—সত্যি বলছি। মাঝখান থেকে একজন উবে গেলে একটা ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়, হাওয়া সেখানে ঢুকতে পারে না।

—দূর, আমি জানি দোলা খুব খুশি আছে, লাবণি খুব ভাল আছে, শম্পা খুব...অবশ্য শম্পাকে তো তুই চিনিস না।

—হয়তো। ওদের কথা বলতে পারি না। আমি খুব, আমার খুব বাজে লাগত। অরিন্দমদা আমাদের আশ্বস্ত করলেন তাই...

—কে অরিন্দমদা?

—উনি লাবণির...মানে লাবণির সঙ্গে বিয়ের জন্যে সিঙ্গাপুর থেকে এসেছিলেন।

—আচ্ছা? লালটু ঘোষ? উনি তো প্রায়ই আসেন এখানে।

—সত্যি? আসলে তুই হয়তো জানিস না লাবণি তোর ব্যাপারটার পর খুব ভয় পাচ্ছিল বিয়ে করতে। ওকে আশ্বস্ত করতেই উনি আমাদের নিয়ে 'উজ্জীবন'-এ ডঃ কার্লেকরের সঙ্গে দেখা করেন। পরে ডঃ কার্লেকর ওঁকে কী বলেছেন জানি না। উনি আমাদের নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছেন। তা হলে তোর সঙ্গে ওঁর রেগুলার যোগাযোগ আছে।

—আরে উনিই তো মা-বাবার খবর আমায় এনে দেন। আমার খবর মা-বাবাকে দেন। তোদের খবরও মোটামুটি...

—এ সব কিছু কিন্তু উনি আমাদের বলেননি। শুধু বলেছেন ডঃ কার্লেকর তোর ব্যাপারে সব জানেন। ভয়ের কিছু নেই।

শিবানী মাসি প্রচুর খাওয়ালেন তিলককে।

পরদিন সকাল আন্দাজ সাতটা। তিলকদের ফোন বেজে উঠল। তিলকই ধরেছিল।

—হ্যাললো—

—তিলককে একটু ডেকে দেবেন।

—তিলক বলছি।

—ও, তিলক! আমি অমৃতা। শোন ভাল করে, তুই যা আমায় দিয়ে গেছিস সেগুলো অমূল্য রত্ন। ওগুলো আমি তোর সঙ্গে শেয়ার করতে চাই।

—সে কী? জয়িতাদি ওগুলো দিয়েছেন তোকে। আমি তো জয়িতাদির কাছে বাড়িতে কোচিং নিই। আমাদেরও নিশ্চয় দেবেন।

—দিলে ভাল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এগুলো স্পেশ্যাল নোট্‌স। উনি আমাকে বিশেষ ভালবেসে, করুণা করে...

—তবেই দেখ। তোরই জন্যে ওগুলো।

—ঠিক। কিন্তু তুই আমাকে এগুলো অখণ্ড, অমলিন পৌঁছে দিয়েছিস, তোর আর আমার স্পেশ্যাল পেপার এক। শোন, আমি এগুলো জিরক্স করিয়ে নিচ্ছি, দুটো করে কপি। একটা তোর, একটা আমার...

এবার তিলক আর থাকতে পারল না। সে অস্ফুট গলায় বলল—অমৃতা, আমি ওগুলো অল রেডি জিরক্স করে নিয়েছি। জয়িতাদির চিঠিটাও পড়েছি। প্লিজ, আমাকে ক্ষমা করিস।

ও প্রান্তে নীরবতা। কিন্তু তিলক ফোন ছাড়তে পারছে না। একটু পরে সে আবার বলল—বুঝতে পারছি, আমার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়। আমি নোট্‌স বুঝে ওগুলো দেখবার লোভ সামলাতে পারিনি রে। চিঠিটা তো কোনও খামের মধ্যে ছিল না। খুলতেই সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল। সত্যি কথা বলতে কি যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে, নোট্‌সগুলো ইউজ করবার ক্ষমতাই আমার নেই। কিন্তু চিঠিটার মর্ম থেকে বোধহয় কিছু শিখতে পারব...

ও পাশ থেকে ঈষৎ রুদ্ধ কণ্ঠ ভেসে এল—আমি তোর মনটা বুঝতে পারছি। কিন্তু...কিন্তু জে.বি. ওটা দেবার মতো বিশ্বাস একমাত্র তোকেই করতে পেরেছিলেন।—অমৃতা ফোনটা রেখে দিল।

সারাদিন ছটফট করতে লাগল তিলক। মা, বাবা, দাদা, সবাই লক্ষ করেছেন।

মা বলল—কী হয়েছে বল তো তোর? কাল বোধহয় সারারাত পড়েছিস। অমন করিস না। অত পড়লে পরীক্ষার সময়ে মাথায় সব গোল পাকিয়ে যাবে।

বাবা বলল—তোর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু আশা করে আমরা বসে নেই রে তিলু, তুই নিজেকে বেশি কষ্ট না দিয়ে যতটুকু পারবি, তাতেই হবে।

দাদা বলল—তা ছাড়া কম্পিউটারও তো শিখছিস। কিছু না কিছু একটা হয়ে যাবে। ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

সবাইকার কথার মধ্যে বাবার কথাগুলোই সবচেয়ে বিঁধল তিলককে। তার কাছ থেকে অসাধারণ কিছু আশা করেন না? কেনই বা আশা করবেন? একটা অর্ডিনারি ছেলের থেকে বেশি কী-ই বা সে? দাদা বেটার। কিন্তু, সব বাবা-মাই নিজের ছেলের কাছ থেকে বড় কিছু আশা করে থাকেন। তার বেলায় সে আশাটুকুও নেই বাবার?

দাদাই বা কী? কিছু না কিছু একটা হয়ে যাবে? দাদা স্ট্যাটিসটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করে ভাল রেজাল্ট করে আই এস আই-তে যোগ দিয়েছে। মাইনে-কড়ি ভাল। তার চেয়েও ভাল তার খাতির।

দাদার বিয়ের সময়ে ঘটা করে পাত্রী দেখা হবে। প্রকৃত গৌরবর্ণা, উচ্চশিক্ষিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। তার বেলায় জুটবে একটা খেঁদি-পেঁচি। কেউ তার জন্যে তার চেয়ে বেশি আশা করে না তো!

য়ুনিভার্সিটি যাবার ইচ্ছে ছিল না তার। যাই হোক। কম ক্লাস, এবং জে.বি-র ক্লাস নেই। সে আড়াইটের সময়ে বাড়ি ফিরে এল। তারপর তিনটে সওয়া তিনটেয় একটা ঝোলা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ক্লাসে দোলা এসেছিল আজ। প্রথমটা সে লক্ষই করেনি। পরে হঠাৎ দোলা সামনে দিয়ে যেতে সে দেখল দোলার মুখ চোখ কেমন বসে গেছে। রোগা হয়ে গেছে খানিকটা। কালোও।

সে কয়েকটা কথা ছুড়ে মারল দোলার দিকে—কী রে? খুব প্যার মারছিস?

দোলা চমকে ফিরে তাকাল, ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

—ফ্যাকাশে মেরে গেলি কেন? ভাল তো? প্রেম-ট্রেম তো খুব স্বাস্থ্যকর জিনিস, যে বয়সের যা!

—এ ভাবে বলার মানে?—দোলার গলায় রাগ।

—কী আশ্চর্য! দেখলাম মডেল-বাহার এক ছোকরার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিস! বলব না?

—আমার গার্জেন না কি তুই?

—কখনওই না। তোর বন্ধু, সখা। প্রাণসখা নই অবিশ্যি। তা জোটালি কোত্থেকে?

দোলা এবার খেপে গেল—ইয়ার্কি মারিসনি তিলক, ভাল হবে না।

—ভাল তো আমার এমনিতেও হবে না। অমনিতেও হবে না। ইয়ার্কিই তো সম্বল। তো বাড়িতে নুকিয়ে নুকিয়ে, ক্লাস কেটে প্রেম পরীক্ষার মুখোমুখি! খারাপ হলে আবার কাঁদিসনি—ভেউ ভেউ ভেউ।

তিলক সেখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে গেল। লাবণি আর শর্মিষ্ঠা আসছে। পেছনে চঞ্চল। এক্ষুনি বলবে—কী হয়েছে রে দোলা? তখন তিলকের চেয়ে দোলাই বেশি অপ্রস্তুতে পড়বে।

এখন ডোভার লেনের ঠিকানাটা পরিষ্কার চেনা হয়ে গেছে তার। সে নেমে, একটা দোকানে একটা চিকেন রোল খেল। আর একটা মুড়ে নিল পলিথিন ব্যাগে।

চারটে বেজে গেছে। আশা করা যায় অমৃতার বিশ্রাম হয়ে গেছে। সে বেল বাজাল। শিবানী দত্ত দরজা খুললেন। সে প্যাকেটটা ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—এটা অমৃতাকে দিয়ে দেবেন।—তারপর পলিথিন প্যাকেটে রোলটাও এগিয়ে দিল—এটাও। মানে আমি খেলাম তো...তাই...

—চলে যাচ্ছ কেন? বা রে ছেলে। এতটা পথ এসে মাসির বাড়ির দোরগোড়ায় ঢুকবার আগেই খেয়ে এসেছ, আবার চলে যাওয়া হচ্ছে!

—একটু তাড়া আছে আজকে মাসিমা।

—ও সব আমি শুনছি না। ওপরে যাও। তোমার প্যাকেট, রোল সব যার জিনিস তাকে দিয়ে দাও। আমি পারব না।

খুব চালাক মহিলা। একটা জিনিসও হাত দিয়ে ছোঁননি।—এসো। এসো বলছি!

অগত্যা, ভেতরে ঢুকতে হয়। ওপরে উঠতেও হয়, অমৃতা ডিভানে শুয়ে ছিল। তাকে দেখে উঠে বসে বলল—ওমা তুই! আয়! আয়!

—বসব না রে, কাজ আছে, তুই এই প্যাকেটটা রাখ, আর এই রোলটা খা।

রোলটা হাত বাড়িয়ে নিল অমৃতা। প্যাকেটটা নিল না। বলল—তোর?

—আমি খেয়ে ঢুকেছি।

—শিবানী মাসির বাড়ি কক্ষনো খেয়ে ঢুকবি না, উনি রেগে যাবেন।

—কে কীসে রেগে যায় আমি কেমন করে জানব বল।

রোলে একটা কামড় দিল অমৃতা।

—আ-হ। কদ্দিন পরে খেলাম। অমৃত, একেবারে অমৃত।

—ভাল লাগছে?

—বলছি তো—অমৃত। আমার এখন নিমপাতাও ভাল লাগে। সে জায়গায় এ তো চিকেন রোল।—তা ওটা কী?

—একটা প্যাকেট!

—আবারও প্যাকেট? এবার কে দিলেন। এ. আর.? সব্বাইকে আমার খোঁজখবর দিয়ে দিয়েছিস, না কী?

তিলক বলল—আমার একটু তাড়া আছে। চলি। পরে খুলে দেখিস।

হাত বাড়িয়ে তাকে খপ করে ধরল অমৃতা। —যাবি কোথায়?

—প্যাকেট খুলে আগে দেখব কী আছে এতে, তবে। যদি আর ডি এক্স থাকে? তিলক হাসল না। বসলও না। দাঁড়িয়েই রইল।

অমৃতা খুলে দেখল ফটোকপিগুলো।

তার দিকে তাকিয়ে বলল—খুব রাগ করেছিস?

—না, না। রাগ করব কেন?

—তবে? অভিমান? লজ্জা? অপমান? অনাদর? ক্ষোভ? অনুতাপ?

তিলক কিছুই বলল না।

—সবগুলোই, না রে? জয়িতাদি তোদের এই সব নোট্‌স দেন না কেন রে? কত টাকা ফিজ নেন?

—পাঁচশো।

—পাঁ-চ-শো?

—হ্যাঁ আমি পাঁচশো দিই, অন্য কেউ ছশোও দিতে পারে। সাতশো, আটশোও আছে।

—তবু তোদের নোট্‌স না দেওয়ার কী মানে?

—আমাদের ক্ষমতা কী যে এ সব নোট ব্যবহার করি। বাড়ি গেলে যত্ন করে পড়ান। দরকার মতো নোট্‌সও দেন বই কি।

—বোস তিলক, প্লিজ। আমি তোর কাছে মাফ চাইছি।

—আমার কাছে? কেন?

—আগে বোস।

তিলক বসলে সে বলল—আগে বল যা বলব তাতে কিছু মনে করবি না?

তিলক কিছু বলল না।

অমৃতা বলল—কাজটা তুই অনৈতিক করেছিস। আমার বিচারে জয়িতাদিও ন্যায় করেননি। এই যদি ওঁর মনে ছিল, উনি নিজে এসে দিতে পারতেন এগুলো। অবশ্য, দ্যাট ইজ এক্সপেক্টিং টু মাচ। সেটা উনি পারেননি। একজন ছাত্র যে পাঁচশো টাকা নিয়ে ওঁর কাছে পড়ে, তার হাত দিয়ে তিনি অমূল্য সব নোট্‌স পাঠালেন এমন একজনের কাছে, যে ওঁকে একটা বাড়তি পয়সাও দেয় না।

—অমৃতা, তোর কেস আলাদা। এটা আমরা বুঝি। তুই দিনের পর দিন ক্লাস করতে পারছিস না, লাইব্রেরি ইউজ করতে পারছিস না...। তা ছাড়া তোর এখন ভাল রেজাল্ট করা দরকার।

—কথাটা তা নয় রে, ছাত্রদের বিশেষত কোচিঙের ছাত্রদের প্রতি টিচারদের দায়বদ্ধতা থাকার কথা। ঠিক আছে, উনি তোদের যা দেন, তা-ই দিতে পারতেন আমাকে। দুরকম করলেন কেন? এটা উনি করেছেন ঝোঁকের মাথায়।

—না, না, উনি তোকে বিশেষ ভালবাসেন। ভালবাসার দানের কোনও বিচার নেই।

—ভালবাসা নয়, করুণা, নিজের ভেতরের পাপবোধ।

—আচ্ছা তাই। কিন্তু উনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অমৃতা তোকে উনি নমস্কার পর্যন্ত জানিয়েছেন।

—সেই ইমপালসিভ, নিজের বিবেক দংশনের শান্তির জন্য নমস্কার আমি গলবস্ত্র হয়ে নিতে পারি না তিলক কী এমন করেছি আমি? যখন অ্যাবরশন করাতে অরাজি হই, তখন কি জানতাম এ নিয়ে আমার প্রাণসংশয় হবে? ওরা আমার ওপর জবরদস্তি করবে? মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে? যদি জানতাম তা হলে অবশ্য পালাতাম। কিন্তু সেটা নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে। আমার মধ্যে যে বেড়ে উঠছে তার জন্যে কোনও বাৎসল্যবোধ থেকে নয়।

—এত বিশ্লেষণ করিস না অমৃতা, জয়িতাদির জন্যে তোর কষ্ট হয় না?

—হয়, হয়। কিন্তু সেটা আলাদা কথা। উনি যেটা করেছিলেন তার মধ্যে ওঁর স্বামীর চাপ ছিল ঠিকই, কিন্তু উনিও ওই বাড়ি, ওই গাড়ি, ওই জীবনযাত্রা, ওঁর প্রথম মেয়ের শিক্ষা ইত্যাদিকে বড় করে দেখেছিলেন। এখন কথা হচ্ছে, এখনকার আইনের চোখে এটা ক্রাইম নয়, কিন্তু নৈতিকতা-মানবিকতার দৃষ্টিতে চিরকালই এটা পাপ থাকবে। সেই মানবিকতা বোধ বিকল করে দিয়েছে জয়িতাদিকে। নিশ্চয় তাঁর জন্য আমি ফীল করছি। কিন্তু আমি সিচুয়েশনের সঙ্গে ওঁরটার কোনও ইকোয়েশন আসে না। কে বলতে পারে সে রকম সিচুয়েশনে আমি কী করব। অরিসূদন বলে লোকটা বা তার বাবা বা মা কেউ সামনে এলে এখন আমি অকাতরে এদের খুন করে ফেলতে পারি। একটা রিভলভার আর কিছু কার্তুজ চাই অবশ্য। ছুরি টুরি মারতে পারব না। তা এটাই কি মানবিক?

—না। ওঁরা তোর চরম ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন, কাজেই...এটা স্বাভাবিক।

—না স্বাভাবিক নয়। প্রাণ নেওয়ার অধিকার কারও নেই। আর সত্যিই আমি এটা কথার কথা বলছি না। আই ফীল লাইক কিলিং দা হোল লট অফ দেম। ইন কোল্ড ব্লাড, দেম অ্যান্ড দেয়ার লাইকস। ফার্স্ট আই ওয়ান্ট টু ক্যাসট্রেট দ্যাট ফেলো, অ্যান্ড দেন কিল। যদি না করি, সেটাও কিন্তু অন্যায় হবে। আর সেই অন্যায়টা আমি করব আইন আর সমাজের ভয় থেকে। জয়িতাদির পাপবোধ থেকে একটা মনস্তাত্ত্বিক বিকার এসেছে। সেই বিকার থেকেই এই নমস্কার। আমরা কেউ কারও শ্রদ্ধার যোগ্য নই রে, সবাই পরিস্থিতির শিকার। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সবাই।

—তোর হাজব্যান্ডও?

—না, ও পাপিষ্ঠগুলোকে বাদ দিচ্ছি। তবে আমি আজও জানি না ওদের মোটিভটা ঠিক কী? তুই ভাব না—নিজেদের প্রথম সন্তান, নিজেদের প্রথম নাতি আসছে, সংসার সচ্ছল। সুদ্ধু বউ কিছুদিনের জন্যে ওঁদের চাকরানিগিরি করতে পারবে না বলে...নাঃ ভাবা যায় না।

—তাই? এই রকম ব্যাপারটা?

—তাই তো বুঝেছি। আরও কিছু আছে। থাকলে থাকবে, না থাকলে না থাকুক। ইন দ্য মিন টাইম, তিলক আমরা এই নোট্‌সগুলো একটু ডিসকাস করে পড়তে পারি। এগুলো মুখস্থ করে উগরে দিলে কিছু শেখা যাবে না।

—বলছিস? তুই তাই চাস?

—ভী-ষণ উপকার হয় আমার তা হলে। যদি চাস আমি জয়িতাদিকে জানিয়ে দেব, আমি এগুলো তোর সঙ্গে শেয়ার করছি। বড্ড কঠিন বলে।

—তুই যা ভাল বুঝিস করিস। শনিবার-রবিবার আসছি তা হলে?

—হ্যাঁ। ঠিক দুপুর আড়াইটে। রাইট?

১৯

তিলক যেমন দোলাকে দেখেছিল, দোলাও ঠিক তেমনি তিলককে দেখতে পেয়ে যায়। মানুষই চোখের কোনা দিয়ে, আবার অনেক সময়ে সোজাসুজি না তাকিয়েও দেখতে পায়, এ সেই রকমের

দেখা। কিন্তু তখন সে রাস্তা পার হচ্ছে, তিলকের মতো বাসন্তী দেবী কলেজের গায়ে সেঁটে যাওয়ার উপায় তার ছিল না। আগে ট্যাক্সি থেকে দেখতে পেলে, আর একটু সাহসী হয়ে বিজন সেতুটা পার করে দিতে বলত সে অমিতকে। এমনিতে দেখা হয়ে গেলে সে এতটা বিব্রত হয়ে পড়ত না। শম্পার সঙ্গে যখন পার্ক স্ট্রিট-রাসেলের মোড়ে দেখা হল তখন তো শম্পাকে সে আইসক্রিম পার্লারে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলই। কিন্তু আজকে তার মন খিঁচড়ে ছিল। ট্যাক্সিটাকে তারা ধরে ঠিক সন্ধের মুখে, বিদ্যাসাগর সেতু পার হয়ে চলে যায় কোনা এক্সপ্রেসওয়ের মুখ পর্যন্ত। আবার ফেরে, তারপর জু গার্ডেনের পথে বেলভেডিয়ার আলিপুরের নির্জন রাস্তাগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বড্ড বেশি সাহসী হয়ে উঠেছিল অমিত। অতিরিক্ত। দোলার শরীর টং টং করে সরোদের মতো বাজছিল। বাধা দেবার কোনও ক্ষমতাই ছিল না। ইচ্ছেও না। কিন্তু এই সময়ে ট্যাক্সিচালক বলে ওঠে আপনারা বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন। হোটেলের ঘরে-টরে এসব করগে যান না, বেশ্যাদের তাই তো দস্তুর। আমার ট্যাক্সি ভদ্দরলোকের ট্যাক্সি।

অমিত তেড়ে উঠে বলেছিল—মুখ সামলে কথা বলবে। কে তোমার পরামর্শ চেয়েছে। এক্ষুনি থামাও, তোমার গাড়ি থেকে নেমে যাব আমরা।

—সেই ভাল, ট্যাক্সিচালক বলে, নইলে আমি সিধে আপনাদের আলিপুর থানায় নিয়ে যাব।

তারা ভাড়া চুকিয়ে নেমে যেতে ট্যাক্সিচালক হঠাৎ দোলার দিকে তাকিয়ে বলে—আপনারে তো বাইরে থেকে বেবুশ্যে বলে প্রত্যয় হয় না। সেকালে ওই ছোকরাটাই বেবুশ্যে। খানকি একটা।

হুস করে গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছিল তার পর।

আরেকটা গাড়ি ধরতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু তখন দোলার চোখ দিয়ে ক্রোধ ও অপমানের অশ্রু গড়াচ্ছে। অমিত ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে অনেকভাবে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিল, পারেনি।

তখন আপনমনে অমিত বলেছিল—ট্যাক্সির এই ধরনের ব্যবহার তো আজ নতুন নয়, অনেক প্রেমিক-প্রেমিকাই এভাবে ট্যাক্সিতে...এমন কি নববিবাহিত দম্পতিরাও, শুধু কলগার্ল আর তাদের ক্লায়েন্টদের সম্পত্তি নয় ট্যাক্সি, এ লোকটা অমন ভাবে রি-অ্যাক্ট করল কেন? আসলে ও নিজেও এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছিল বুঝলে? নিজে পাচ্ছে না। অন্যে পাচ্ছে।

ক্রোধ ও লজ্জার বদলে ঠাণ্ডা মাথার এই বিশ্লেষণে দোলার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। কিন্তু আর একটা কথাও সে বলেনি। বাড়ি ফিরে প্রথমেই বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়েছিল, সাবানের চন্দন গন্ধে অশ্লীল শব্দগুলোর নোংরা যেন নিজের গা থেকে ধুয়ে ফেলবে। কিন্তু স্মৃতিকে তো ধোওয়া যায় না। বাথরুম থেকে যখন বেরোলো মা অবাক হয়ে বলল—তোর কী হয়েছে বল তো? কার সঙ্গে ঝগড়া করে এলি? তিলক না লাবণি?

মুহূর্তে মায়ের জন্য করুণায়, আর নিজের জন্য অকথ্য গ্লানিতে মন ভরে গেল তার। বেচারি মা, এত বয়স, এত অভিজ্ঞতা, একটা মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, নাতিপুতি হল বলে, কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারে না। দোলা অনেকদিন ধরেই এ রকম অনিয়মিত আসা-যাওয়া করছে, আয়নায় চেয়ে দেখলে নিজের চোখের তলায় অনিয়মের কালি দেখতে পায় সে। খেতে পারে না ভাল করে। বেশি কথা বলে না কারও সঙ্গে। মা, বাপি কেউ তার এই পরিবর্তনকে অস্বাভাবিক মনে করেনি। বাপি সেদিন বলল—পরীক্ষাটাকে অত সিরিয়াসলি নিসনি দোলা। এ আবার কী ধরনের নার্ভাসনেস? টেক ইট ইজি, টেক ইট ইজি।

মা বলল—পুজোর সময়ে চলো কোথাও ঘুরে আসি। কদিন একটু ফ্রেশ হয়ে নেবে। তারপর পরীক্ষাটা শেষ হলে বেশ বড় করে বেড়ানো যাবে। কী রে দোলা? দোলা ঘাড় নেড়ে ছিল।

প্রেম তা হলে মানুষকে এমনি একা করে দেয়? মনটা হু হু করে ওঠে তার, এই মা, এই বাপি, এই বাড়ি, ওই জানলা সবই কেমন অবান্তর হয়ে গেছে আজকাল তার কাছে। কেমন উদ্বৃত্ত, অদরকারি! যে মা বিশেষত বাপিকে সে চক্ষে হারাত, তাদের এখন অল্প চেনা মানুষ বলে মনে হয় তার। মা

গা ঘেঁষে দাঁড়ালে তার বিরক্ত লাগে, বাপি মাথায় হাত রাখলে অস্বস্তি হয়। আর সত্যিই তো পরীক্ষা এগিয়ে আসছে!

দোলা বই খুলে বসে, অক্ষরগুলো পোকার মতো হেঁটে যায় তার চোখের সামনে দিয়ে টেব্‌ল ল্যাম্পের আলোর বৃত্তের মধ্যে। বইয়ের পাতায় মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রি সাড়ে নটা নাগাদ তাকে খেতে ডাকতে এসে তার মায়ের হৃদয় দ্রব হয়ে যেতে থাকে। উঃ কী খাটুনিই না যাচ্ছে মেয়েটার! কী যে সিলেবাস করে এরা।

তাঁদের সময়েও আটটা পেপার ছিল। একসঙ্গে পরীক্ষা দিতে হত। একদিন অন্তর অন্তর। একেবারে নিয়ম করে। এখন তো তবু দুটো পার্ট। নভেম্বরে চারটে পেপার আর দিতে হবে দোলাকে। পার্ট ওয়ানটাতে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট রাখতে পারেনি। আজকাল মুড়িমুড়কির মতো ফার্স্ট ক্লাস বেরোয়। সে জায়গায় ফিফটি-ফাইভ-ও না হলে দোলার মান থাকবে না। তাঁর ইচ্ছে এম.এ. করে দোলা কিছু কাজ-টাজ করুক। একটা টি.টি ট্রেনিং নিয়ে নিলে অনায়াসে তাঁদের স্কুলে নিয়ে নিতে পারা যায়। তাঁর কিন্ডারগার্টেন ট্রেনিং আছে। তিনি নার্সারি, কেজিগুলো দেখাশোনা করেন, তার ওপরের গুলোতে দোলা পড়াবে। মা মেয়ে দুজনে বেশ একসঙ্গে স্কুলে যাবেন। বড়মেয়ের বিয়েটা বড্ড তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়ে গেছে। কথাবার্তায় ধরন ধারণে সে যেন এখনই সাত গিন্নির এক গিন্নি। রান্না, শাড়ি, পরিচর্চা, বরের চাকরি এ ছাড়া আর ভূ-ভারতে কোনও কিছুতে আগ্রহ নেই। দোলাটা আর কিছুদিন কুমারী জীবনযাপন করুক। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুখ স্বাধীনতা উপভোগ করুক।

তিনি সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত রেখে আস্তে আস্তে ডাকলেন— দোল। খাবি না! আয় টেবিলে খাবার দিয়ে দিয়েছে।

দোলা তেমনি ঘুমিয়ে যেতে লাগল। মাথাটা জোর করে একটু তুলতে গেলেন তিনি। বই, বইয়ের পাশে খাতা। খাতার লেখাগুলোর কালি জলে ধেবড়ে গেছে। বইয়ের পাতাও ফুলেও উঠেছে। দোলার নাকের পাশে চোখের জলের নুন শুকিয়ে রয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। —অমৃতা! অমৃতাকে আজও পাওয়া যায়নি। দোলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কাঁদছে তার জন্যে। তিনি জানেন দোলার কাছে অমৃতা কী! ওর পরামর্শদাতা, বন্ধু, শ্রদ্ধামিশ্রিত একটা বন্ধুত্ব বোধ আছে দোলার অমৃতার জন্যে। এমনিতে তাঁর মেয়ে খুব খোলামেলা। কিন্তু ইদানীং ও অমৃতার কথা বলতই না। কথা তুললেও চুপ করে যেত। বেদনা যখন গভীর থেকে আরও গভীরে চলে যেতে থাকে তখন এই ধরনের গুমোট নেমে আসে একটা মানুষের মেজাজে। অমৃতার জন্য তিনিও কম উদ্বিগ্ন নন। একজন মা বলে, একজন নারী বলেও। কিন্তু দোলার সঙ্গে কি আর তাঁর উদ্বেগের তুলনা চলে? ইস্‌স্‌ কত কালো রোগা, গম্ভীর, আনমনা হয়ে যাচ্ছে তাঁর আদরের মেয়েটা।

—দোলা, দোলা,—এবার জোরে জোরে ডাকলেন তিনি।

দোলা আধখানা চোখ মেলল, লাল চোখ।

—চল, খাবি চল।

—ন্‌না!

—না বললে হয়?

—খিদে নেই।

—এমন কোরো না দোলা। বসবে তো চলো, বাপি কতক্ষণ ধরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। এ-সো—তিনি একটা টান দিলেন দোলার কাঁধে।

—উঃ, এমন জবরদস্তি করো না! একটুও ভাল্লাগে না।

খুব অনিচ্ছুক পায়ে উঠে গেল দোলা। খেতে তার গা বমি-বমি করছিল।

পরের দিন মা-বাপি বেরিয়ে গেলে যখন অমিতের ফোন এল, সে রুক্ষ গলায় বলল—আমি মাঠে-ঘাটে আর ঘুরতে পারব না। আমাদের বাড়িতে এসো। মায়েদের সঙ্গে কথা বলো।

—কী কথা?

—কী কথা মানে? ব্যাঙের মাথা।

দোলা ফোন রেখে দিল। য়ুনিভার্সিটি চলে গেল।

পর দিন আবার ফোন। মা বাড়ি ছিল। মা-ই ধরেছিল। বলল—তিলক ফোন করছে। তোদের য়ুনিভার্সিটির।

দোলা সত্যিই ভেবেছিল তিলক।

তিলকের আবার আমাকে কী দরকার পড়ল? ফাজিল একটা...ফোন ধরতেই ও পাশ থেকে গাঢ় গলা ভেসে এল—দোলা, দোলা, দে দোল দোল, এ মহাসাগরে তুফান তোল, বঁধুরে আমার পেয়েছি এবার ভরেছে কোল...

—কী হচ্ছে? দোলার গলায় ভাবের ছোঁয়া লেগেছে।

—প্লিজ দোলা, মনে হচ্ছে কতদিন দেখিনি।

—আমার যা বলবার বলে দিয়েছি তো! পড়াশোনা নেই? তোমার চাকরি নেই?—আড়চোখে মা চলে গেছে দেখে সে বলল।

—কাজ যার যার সে তো আছেই। আমি তো চিনসুরায় ট্যুর করব, আর তুমি তো লাইব্রেরি যাবে। যাবে না?

—না।

—শনিবার, তোমার ক্লাস নেই, আমারও হাতে সময় আছে। একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাব তোমাকে। দেখলে ভী-ষণ অবাক হয়ে যাবে, খুশি হবে।

—কোথায়? তাজ বেঙ্গল?

—দূর পেটুকরাম, দেখোই না, তাজ বেঙ্গল নয় একেবারে রয়্যাল বেঙ্গল।

সেই রয়্যাল বেঙ্গলেই আজ এসেছে সে। সল্টলেকের পূর্বাচলে একটা চমৎকার বাংলো বাড়ি। একটা অপরূপ ঘাসের লন পেরিয়ে, কয়েকটি সুদৃশ্য ধবধবে সিঁড়ি পেরিয়ে একটা আয়না পালিশের দরজা। তাতে পেতলের ওপর কাজ করা মোটা হাতল। দরজার মাঝখানে একটা পেতলের ভেনাস বসানো। সগর্বে তালা খুলল অমিত। শেষ দুপুরের ঝিমিয়ে পড়া আলোয় যেন স্বপ্নলোক উঠে এল। এ ঘরের সেন্টার টেবল হল একটা মস্ত তামার টাট। কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর আদর করে বসানো। চার পাশে নরম কোরা রঙের সোফাকৌচ, তাতে ঝলসাচ্ছে কতকগুলো নানান ডিজাইনের কুশন। চমৎকার একটা কোরা, লাল খয়েরির কার্পেট তলায়। পর্দাগুলোও কোরার ওপর ছোট্ট ছোট্ট ডিজাইন। পাশে পাশে সুন্দর নিচু নিচু শোকেস নানান উচ্চতার, কোনওটাতে বই, কোনওটাতে ক্রিস্ট্যাল, কাট গ্লাস, কোনওটাতে নানান জায়গা থেকে সংগ্রহ করা শিল্পদ্রব্য। প্রায় প্রত্যেকটা কেসের মাথায় পাশে পোড়া মাটি, ব্রঞ্জ, কি পিতলের আধারে সবুজ পাতা মেলা গাছ। একটা দেওয়ালে একটা বিরাট ছবি। মধুবনীর। নানান গ্রাম্য কাজকর্মের নকশা তাতে। তার ঠিক তলায় একটা লম্বা বেতের ডিভান। আর একটা দেয়ালে লম্বিত স্ক্রোল একটা। অজন্তার বুদ্ধ রাহুল যশোধরার।

সিডি প্লেয়ারের মধ্যে রেকর্ড পুরে চালিয়ে দিল অমিত। অমনি মধুর সেতারের আওয়াজে ঘরের দিবানিদ্রা ভেঙে গেল। চমকে উঠে এ ওর দিকে চেয়ে হাসতে লাগল গাছগুলো। পাখার হাওয়ায় সামান্য একটু দুলে উঠছে ওদের পাতা।

—কার বাড়ি এটা?

—ধরো যদি আমাদের হয়?

—ধরতে হবে কেন?

—যদি হয়। তুমি খুশি হবে?

দোলা কিছু বলল না, তার মুখে আবেশ।

—বিলায়েৎ, না?

—ওহ, ইয়েস।

—বলো না কার বাড়ি?

—আমার এক বন্ধুর, থাকে কানাডায়, এখানে একটা আস্তানা করে রেখেছে। যখন কালে-ভদ্রে আসে, এখানে থাকে। শোভাবাজারে সাবেক বাড়িতে একগাদা লোকজন, নোংরা, চেঁচামেচি—থাকতে পারে না।

—কে দেখাশোনা করে?

—কেয়ার-টেকার আছে। আমি আবার কেয়ার-টেকারের কেয়ার-টেকার আছি। একটুও মনে হচ্ছে, এ বাড়িতে কেউ থাকে না?

—সত্যি! গাছগুলো!

—সব আর্টিফিশিয়াল। বাইরে থেকে আনা। অন্য ঘরগুলো দেখবে?

—চলো।—দোলা এমন উৎসাহের সঙ্গে বলল যেন সে সত্যিই কিনবে বা ভাড়া নেবে বলে বাড়ি দেখতে এসেছে।

ডাইনিংরুমে সব বেতের আসবাব। বেতের ডিনার টেবল, চেয়ার, বেতের সাইড-বোর্ড, যামিনী রায়ের ছবি দেওয়ালে, সুইচ টিপতেই একটা স্বপ্ন-আলো নেমে এল ঘরটায়। টেবলের ঠিক ওপরে লাল কোনাচে শেডের বাতি জ্বলছে। টেবিল সাজানো।

—ও মা। কার জন্যে?

—তোমার জন্যে দোলা, আমাদের জন্যে।

—কে সাজাল?

—কেয়ার-টেকারকে বলে দিয়েছিলাম। ও এনে সাজিয়ে গেছে। ক্যাসেরোলে রয়েছে খাবারগুলো। মাইক্রো-ওয়েভও রয়েছে। কিন্তু ঠাণ্ডা হতে দেবে কেন?

—দূর, কে এখন অত সব খায়! আগে বলোনি কেন?

—বাঃ, তুমি যে তাজ বেঙ্গলের নাম করলে? তাজ-এ কি কেউ শুধু আড্ডা মারতে যায়? নাও হাত ধুয়ে নাও।

চিকেন ফ্রায়েড রাইস, আর গার্লিক প্রন ছিল। অল্প একটু খেল ওরা। ফ্রিজ থেকে আইসক্রিম বার করে আনল অমিত। দোলা হেসে বলল—এতক্ষণে একটু বুদ্ধির পরিচয় দিলে। পূর্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে আছে অমিত। দোলা দেখল অমিত কী অসহ্য সুন্দর! চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। ঘিয়ে রঙের একটা টি শার্ট পরেছে, একটা চকলেট রঙের জিনস। সুন্দর একটা আফটার শেভের গন্ধ সব সময়ে ঘিরে থাকে ওকে। মুগ্ধ একরাশ চুল, ইন্দ্রজালময় চোখ দুটো, টসটসে ঠোঁট দুটো। যেন একটু টোকা মারলেই মধু ঝরবে।

—আর ঘরগুলো দেখবে না?

—আর কটা রুম আছে?

—বাঃ, বেডরুম আছে, লাইব্রেরি বা স্টাডি যা-ই বলো আছে একটা, একটা গেস্টরুম আছে।

স্টাডিটা দেখেও দোলা অবাক। এত বই! পুরনো কালের স্টাইলের টেবল চেয়ার। বড় বড় রাজস্থানি কাজ করা পট। মাটির পট। মেহগনি রঙের সব বুক কেস বইয়ে ভর্তি। ফুল সেট রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়র, সংস্কৃত-সাহিত্য সম্ভার, ম্যানশনস অফ ফিলসফি, পুরো সেট হেমিংওয়ে। কত? কত?

—খুব পড়ুয়া তোমার বন্ধু, না?

—আরে দুর। সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা। যখন আসে, সময় কাটাবার জন্যে হয়তো একটু-আধটু পড়ল। এ সবও আসবাব।

—তাই?

—আবার কী? এসো বেডরুমটা দেখো!

—ন্ না।

একটি একলা পুরুষের বেডরুম দেখতে দোলার কেমন লজ্জা বোধ হল। সে বলল—আমরা বাইরের লোক, বাইরেই থাকি। যা দেখেছি তা-ই যথেষ্ট সুন্দর। আর সুন্দর দেখে কাজ নেই।

—অ্যাজ ইউ প্লিজ ম্যাডাম।

ওরা বসবার ঘরে বসে বাজনা শুনতে শুনতে মৃদু স্বরে গল্প করতে লাগল।

—আমার ওপর খুব কি রাগ করেছ?

—খুব না হলেও বেশ।

—কেন?

—এ ভাবে আমাকে মুগ্ধ করবার, সম্মোহিত করবার কী অধিকার তোমার আছে?—দোলা জল চকচকে দু চোখ মেলে বলল।

—দোলা!—দু হাতে দোলাকে বুকে টেনে নিল সে।

—সেদিন ওই কুৎসিত পরিস্থিতির জন্যে তোমার কাছে আমি কী ভাবে মাফ চাইব? দোলার কোলে মুখ ডুবে গেল।

দোলার হাত মাথা ভর্তি ঢেউ খেলানো চকচকে নরম চুলের ওপর। তার দুই উরুর অতীব স্পর্শকাতর সংযোগস্থলে ওর মুখ। ও মুখ ঘষছে।

—ওঠো! মুখ তোলো, তোলো প্লিজ... দোলা ওকে জোর করে তুলতে গেল। ও মেঝেতে কার্পেটের ওপর এখন। দোলা স্পর্শকাতর সোফায়। দু হাত দিয়ে দোলার কোমর জড়িয়ে ও তাকে ঘনিষ্ঠভাবে মৃদু আকর্ষণ করছে। তার হালকা সমুদ্র-সবুজ ওড়না খসে গেল।

—ওঠো, অমিত! খুব ক্ষীণ এখন তার কণ্ঠ। খুব কাতর। সে একটা কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। টলমল টলমল করছে।

কেমনভাবে যে দুজনের স্থান অনবরত বদলাতে লাগল, অমিত বুঝল কি না কে জানে, দোলা কিন্তু বুঝল না। সে একটা সমুদ্রের ব্রেকারের মাথায় চড়েছে, দুলছে, কখনও ওপরে, কখনও নীচে, কখনও সু-উচ্চে শৃঙ্গে, কখনও আবার দুই ব্রেকারের মধ্যবর্তী বিপজ্জনক খাতে। দাঁড়িয়ে এবং শুয়ে এবং বসে পাশাপাশি, মুখোমুখি, যতরকমভাবে পারা যায় তারা ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। হচ্ছে তো হচ্ছেই যতক্ষণ পর্যন্ত না দোলার সমস্ত চেতনা, সমস্ত প্রতিরোধ কূলপ্লাবী সমুদ্রস্রোতের মধ্যে হারিয়ে যায়। কখন যে অমিত তার মধ্যে প্রবেশ করেছে সেই নির্দিষ্ট ক্ষণটা পর্যন্ত সে বুঝতে পারেনি, এত বেসামাল এত অভিভূত ছিল।

অবশেষে প্রথম বিদ্ধ হবার সূচীমুখ যন্ত্রণা তাকে কিছুটা জাগিয়ে দিল। সে অস্ফুটে বলল—প্লিজ, অমিত প্লিজ।

এ কি তার সম্মতি না অসম্মতি সেটা পর্যন্ত রহস্যে রইল। এবং তারপর চূড়ান্ত হর্ষের শিখরে দুজনে কাঁপতে কাঁপতে উঠে গেল দমকে দমকে।

২০

অক্টোবরের পনেরো তারিখে বাংলা পয়লা আশ্বিন, তার মায়েরও জন্মদিনে অমৃতার পুত্র জন্ম নিল। গভীর ক্লেশে, যন্ত্রণায়, অবশেষে যন্ত্রণার উপশম ঘটিয়ে। প্রসবান্তে অমৃতা অজ্ঞান হয়ে গেল।

জ্ঞানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার মনে হচ্ছিল যে লোকটা এখন তার স্ত্রীকে হত্যা করবার চেষ্টার অপরাধে ভারতীয় পিনাল কোডের ৩০৭ ও ৩০৮ ধারা অনুযায়ী তিন বছর জেল খাটছে, সেই অরিসূদনের বংশধরের জন্ম দিচ্ছে সে। এক অনিচ্ছুক মা। ওই মাংসপিণ্ডের প্রতি তার বিন্দুমাত্র মমতা, দায়বদ্ধতা নেই। নিয়ে যাক ওকে কেউ ওর শয্যা থেকে রাত্রির অন্ধকারে, মানুষে অথবা কুকুরে, অমৃতা ফিরেও দেখবে না। একটা শয়তানের ছেলে। ওই শয়তানের জিন ওর শরীরে। শয়তানটা না কি আগেও একটা বিয়ে করেছিল। তখন থাকত উত্তরপাড়ায়, সেই বউকেও বিয়ে করেছিল অনেক যৌতুক নিয়ে, ঠিক এই একভাবে মেরে ফেলেছিল তাকে। এগুলো স-বই ঘটনা। কিন্তু কিছুতেই প্রমাণ করা যায়নি একেবারে ঠিকঠাক হত্যার উদ্দেশ্য ছিল তার বা স্বাভাবিকভাবে গর্ভপাত হয়নি। আগের বিয়ের খবরটা গোপন করেছিল, সেই গোপনতার জন্য চূড়ান্ত জেরার সম্মুখীন হয়েছে সে। আত্মপক্ষে তার বক্তব্য এক্ষুনি নাকি তারা সন্তান 'অ্যাফোর্ড' করতে পারবে না। তার মা অবসর নেওয়ার মুখে, বাবা বহুদিন অবসর নিয়েছেন, বাবা-মা ছাড়াও কিছু দায়-দায়িত্ব আছে তার, আছে বাড়ি করার দেনা, বাবার কিছু দেনাও নাকি সে এখনও মিটিয়ে চলেছে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শয়তানটা চমৎকার অভিনয় করছিল—অমৃতা, প্লিজ ফিরে এসো, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। আমাদের সন্তানকে আমরা যেমন করে পারি পালন করব। প্লিজ...

অমৃতা তখন কঠিন মুখে দাঁড়িয়েছিল, তার হালকা গোলাপি শাড়ির আঁচল কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের ওপর টেনে, যদিও তার উদরের স্ফীতি নিয়ে তার কোনও লজ্জা সংকোচ ছিল না। সাক্ষীর কাঠগড়ায় সে এক উদাসিনী। তখন শয়তানটা বলে উঠেছিল,—আমি তোমাকে ভালোবাসি অমৃতা—সারা কোর্টঘর হেসে উঠেছিল, ডাঃ রঞ্জন কার্লেকর মুখ ঘৃণায় বিকৃত করে বিচারশালা থেকে চলে গিয়েছিলেন। এসেছিল তার বন্ধুরাও। স-ব ক্লাসবন্ধু। তিলক তো বটেই, আরও। চঞ্চল, নিশান, লাবণি, শর্মিষ্ঠা, অণিকা ...সব স-ব। হাসিটা কি তিলকের নেতৃত্বে ওরাই হাসে? কে জানে? ছিলেন বাবা, মা, শিবানী মাসি, শম্পা, শম্পার বর...সব। ছিল না খালি দোলা।

—কী দিচ্ছে রে শালা, বলছে ভালবাসে। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন বলায় সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। জজ বললেন—অর্ডার অর্ডার। এবং অরিন্দম ঘোষ সারাক্ষণ মুখে তীব্র কৌতূহল নিয়ে চেয়ে ছিল অরিসূদনের দিকে। তার অর্ধেক-নামধারী এই গিধ্‌ধড়টার জন্যে তার জীবনে মননে অনুভূতিতে সম্পর্কে কতকগুলো অনভিপ্রেত জট পাকিয়ে গেছে।

প্রসব হয় ভোররাতে। আন্দাজ চারটে, সাড়ে চারটে। তারপর সে বোধহয় মিনিট দশ পনেরো অজ্ঞান হয়েছিল। জ্ঞান ফিরে আসতে দুর্বলতায়, রক্তক্ষয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, কে জানে হয়তো ঘুমের জন্য কিছু দেওয়াও হয়েছিল তাকে। ঘুম যখন ভাঙল তখন ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে। ডাক্তারের রাউণ্ডও শেষ। নিস্তব্ধ নার্সিংহোমে ঘরে ঘরে খাওয়া-দাওয়ার টুং টাং শোনা যাচ্ছে। অমৃতার ঘুম ভাঙল। সে দেখল জানলার নিচু পর্দার ওপারে শরতের নীল আকাশ, দু-এক টুকরো মেঘ ভেসে যাচ্ছে। কে জন্মাল? সে না ওই শিশুটি? তার মনে হল সে-ই নতুন করে জন্মাল। কী সুন্দর আকাশ, কী সুন্দর মেঘ আর তার ওই ধীর ভেসে যাওয়া! কোনও একটা ঝাঁকড়া গাছের মাথাও দেখা যাচ্ছে পর্দার ওপরের পটে। দুপুর আকাশে কয়েকটা চিল। পাখসাট মারছে। যেমন মারত তাদের মানিকতলার বাড়ির ছোটবেলার আকাশে। সুদ্ধু এইটুকু, এইটুকু দেখার জন্যেই বোধহয় মানুষ বারবার জন্মাতে পারে।

শরীরের ভেতরটা দুয়ে ধুয়ে-মুঝে সাফ হয়ে গেছে। অরিসূদনের ছেলের জন্য। আর মনটা স্বস্তিতে সুখে শান্ত, পরিষ্কার হয়ে গেছে অরিসুদনের শাস্তিপ্রাপ্তির জন্য। এখন সে পুনর্বার কুমারী। একটা পুরো জীবনের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে।

সিস্টার মাধুরী ঢুকলেন। বড় মাধুরী। ছোট মাধুরী দেখতে বেশি ভাল, বয়স কম। কিন্তু তার বড় মাধুরীকেই ভাল লাগে বেশি। ওঁর ওপর নির্ভর করা যায়। উনি জানেন। স-ব জানেন।

—কেমন লাগছে এখন?

—ভাল।

—খিদে পাচ্ছে?

—ভী-ষণ।

—মনে হচ্ছে আকাশ খাই পাতাল খাই?

অমৃতা হাসল।

—তবু আজ এ বেলা শুধু ক্লিয়ার চিকেন স্যুপ, আর চার পিস রুটি। মিষ্টি দিয়ে গেছেন মা, মাসি, বন্ধুরা, খেতে পারেন।

—ঠিক আছে—

—এবার বাচ্চাকে আনি!

—না। প্লিজ।

মাধুরী সেন হঠাৎ নরম গলায় বললেন—ওর ওপর রাগ করছেন কেন? ওর কী দোষ?

—না। রাগ করব কেন? অমৃতা একটু লজ্জা পায়।

—ফীড করতেও হবে আপনাকে। কালই দুধ এসে যাবে।

মাধুরী সেন চলে গেলেন। একটু পরে একটা চাকা-লাগানো ক্রিব টানতে টানতে নিয়ে এলেন অমৃতার খাটের পাশে। কাপড় জড়ানো শিশুটিকে তিনি অমৃতার কোলে তুলে দিলেন। অমৃতা অবাক হয়ে দেখল তার কোলে তার মা ছোট্টটি হয়ে শুয়ে আছেন। অরিসূদন বা অনুকূলচন্দ্র বা সুষমা, এমনকী তার নিজের সঙ্গেও কোনও সাদৃশ্য নেই ছেলের। একেবারে তার মা বসানো। অমনি টকটকে রঙ। মাথা-ভর্তি মিশকালো, কোঁকড়া চুল, লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটোতে অপূর্ব ঢেউ। চোখ বুজিয়ে আছে। কিন্তু চোখ মেললেই সেই অপূর্ব আকৃতির চোখ সে দেখতে পাবে তাতে তার আর কোনও সন্দেহই রইল না।

অমৃতার বুক টনটন করে উঠল। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে। আনন্দাশ্রু। সে দুর্বল হাতে বাচ্চাটাকে তুলে নিজের গালে ঠেকাল, বুকে ঠেকাল তারপর আবার কোলে নামিয়ে রেখে নির্নিমেষে চেয়ে রইল। মাকেও তো সে বারবার জননী স্নেহেই পালন করেছে। তার মা এক অসহায় বালিকা, যিনি ভুল করে চেয়েছিলেন, যা পেয়েছিলেন তা চাননি। সেই বিষাদ, সেই কারুণ্য সব সময়ে ঘিরে থাকত মাকে। ছোট্টখাট্ট মানুষটি। পাঁচ ফুটের বেশি লম্বা হবেন না। কিন্তু এমন অনুপাত আর এমন *সৌষ্ঠব তাঁর অঙ্গসংস্থানে যে দেখলে মনে হবে এই-ই-ঠিক।* এর চেয়ে বেশি দৈর্ঘ্য ভাল নয়। মার যখন শরীর খারাপ হত মায়ের পথ্য তৈরি করা থেকে, বেডপ্যান দেওয়া, স্পঞ্জ করানো সব সে করেছে এগারো বারো বছর বয়স থেকে। তার আগে করতেন বাবা, বাবাকে কচি কচি হাতে সাহায্য করত সে বারবার। বাবা সে সময়ে খুব বিরক্ত হতেন, গম্ভীর মুখে বেডপ্যান দিতেন। বার্লিটা যখন গ্যাসের ওপর নাড়তেন তখন তাঁর মুখে কোনও প্রসন্নতা থাকত না। মা কুঁকড়ে যেত প্রকৃতির ডাক এলে। যতক্ষণ পারত চেপে থাকবার চেষ্টা করত। ঈশ্বরকে ডাকত করুণ অস্পষ্ট কণ্ঠে। কিন্তু ঈশ্বর তো আজ পর্যন্ত কাউকে বেডপ্যান দেননি। তাই শেষ পর্যন্ত বাবাকেই আসতে হত, যতদিন না অমৃতা তাঁর হাত থেকে এ কাজের ভার নিয়ে নেবার মতো বড় হল। বাবা যেন বাঁচলেন, খাতা আর টুইশনির পাহাড়ে তাঁর কাঁধ পর্যন্ত নিশ্চিন্তে ডুবিয়ে দিলেন। মা কিন্তু বাঁচল না, তার চুলে চোখে গালে হাত বুলিয়ে মা বলত—কী ভাগ্য করেই এসেছিলাম! কত পাপ ছিল গত জন্মের কে জানে! কিন্তু যেটুকু পুণ্য করেছিলাম, সেইটুকুই আমার মেয়ের রূপ ধরে এসেছে।

মা এইসব বললে অমৃতা আরও স্নেহাতুর, আরও জনন্নী-জননী হয়ে উঠত, আরও যত্ন করে মায়ের খাবার তৈরি করত। মায়ের প্রশংসা, মায়ের প্রসন্নতার স্বাদই আলাদা। সে পড়ার টেবিলের পাশে টেব্‌ল-ক্লক নিয়ে বসত। ওষুধ খাওয়াবার সময়ের যেন একটুও এদিক-ওদিক না হয়। তবু

হয়তো মায়ের আপন জননীর তৃষ্ণা মেটেনি। ষোলো সতেরো বছর বয়স থেকে আর দেখেননি তাঁকে। লোকমুখে শুনেছেন তাঁর হঠাৎ মৃত্যুর কথা। সে শোক বুকে চেপে রেখে দিতেন। একটা ফটো পর্যন্ত ছিল না বাড়িতে। সেই জননীকে পাবার জন্যেই কি মা তোমার শিশু অংশটা আমার কোলে চল এল?

--বাঃ, এরই মধ্যে দুধ এসে গেছে?—সিসটার মাধুরী খুব খুশি গলায় বললেন—অমৃতার ব্লাউজ তখন চুপচুপে ভেজা, বোঁটকা গন্ধ বেরোচ্ছে। ব্লাউজটা পাল্টে দিলেন সিসটার। শিশুকে কোলে দিয়ে এক হাঁটুর নীচে বালিশ দিয়ে দিলেন, বললেন—খাওয়ান, এই ভাবে।

এবং অমৃতধারা একজনের বক্ষ থেকে আর একজনের মুখগহ্বরে বয়ে যেতে লাগল, নিশ্ছিদ্র, নিঃশব্দ স্রোতে, এমন একটা সম্বন্ধ সৃষ্টি হতে লাগল যা পৃথিবীতে বারবার হয়েছে মাতা আর সন্তানের মধ্যে, তবু যেন কখনও হয়নি। কেন না, কোথায় আর এমন মা আছে যে গর্ভাবস্থার প্রথমে তার শিশুকে বাঁচাতে চেয়েছিল, সবাইকার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, তারপর দিনে দিনে তার প্রতি উদাসীন হয়ে যায়, প্রসবের সময়ে যার হৃদয়ে ছিল শিশুর প্রতি দুরন্ত ঘৃণা, কিন্তু তাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে স্বামী নয়, মাতৃমুখ আবিষ্কার করে যে এমন আপ্লুত হয়ে যায় যে সঙ্গে সঙ্গে উৎসারিত হয় অমৃত-স্রোত?

শিশুটি পুংলিঙ্গ, তবু তাকে খাওয়াতে খাওয়াতে অমৃতা মনে মনে বলতে লাগল—খাও মা খাও, সুস্থ হয়ে ওঠো শরীরে ও মনে, আনন্দে থাকো মা, আর ভেবোনা, আর কেঁদো না, এই তো আমি আছি।

বিকেলবেলা ভিজিটিং আওয়ারে প্রথমেই এলেন শিবানী মাসি।

—কী রে কেমন লাগছে এখন?

—ভাল—সে হেসে বলল।

—দেখেছিস বাচ্চাটা অবিকল সীমার মতো হয়েছে?

—দেখেছি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল বাবা-মা। দুজনেরই মুখে আলো জ্বলছে। —কেমন আছিস খুকি?

—তুমি কেমন আছ মা?

বিশ্বজিৎ বললেন—এইবার নাতিকে তোর মায়ের কোলে ফেলে দে। ও ভাল হয়ে যাবে।

উপস্থিত সকলেই হাসলেন।

তৃতীয়জন এল অরিন্দম ঘোষ সঙ্গে লাবণি।

লাবণি এসেই ছুটে গেল বাচ্চাটার ক্রিবের কাছে।

—কী সুন্দর হয়েছে রে বাচ্চাটা! এইটুকু ছানা তো সাধারণত বাঁদর ছানার মতো হয়!

শিবানী মাসি বললেন—ওজন আট পাউন্ড তো! তাই মানুষের আকৃতিই পেয়েছে। মানে মানুষের ছানার।

সবাই হাসল।

লাবণি বলল—কিছু মনে করলি না কি রে তুই?

—দূর।

অরিন্দম যতক্ষণ রইল চুপ করেই রইল। এত চুপচাপ যে শিবানী মাসি ও অমৃতা দুজনেরই সেটা চোখে পড়ল।

অমৃতা বলল—কী ব্যাপার? অন্যদিন তো আপনার মুখে খই ফোটে। আজ এমন চুপ?

অরিন্দম শুধু হাসল। কিছুই বলল না।

চতুর্থজন এল তিলক।

—কী রে? তোকে কবে ছাড়বে? লেখাপড়া শুরু করতে হবে তো! নাকি এখন থেকেই জননী জন্মভূমিশ্চ হয়ে গেলি?

অমৃতা বলল—একটু তর দে আমাকে! আমার অবস্থাটা বোঝবার জন্যে তোরও একটা বাচ্চা হওয়া দরকার। তোর নিজের গর্ভে।

এ সময়টা বড়রা নীচে গিয়েছিলেন।

অমৃতার কথায় অরিন্দম পর্যন্ত হেসে উঠল।

তিলক বলল—যাক বাবা, ইয়ার্কি-ফাজলামির পরিচিত ওয়ার্ল্ডে ফিরিয়ে আনতে পারলুম তোকে।

—তুই পারলি? তুই কে রে? আমি নিজেই ফিরেছি।

অরিন্দম এইবার বলল—উঁহু! আপনার ওই বাচ্চাটা আপনাকে ফিরিয়েছে।

চতুর্থজন এলেন জয়িতাদি। লাবণি পালাল।

—অমৃতা!!!

সেই যেদিন তাকে সেন্ট্রাল লাইব্রেরির মুখে ধমকে ছিলেন, তারপর এই দেখা।

নিচু হয়ে তার কপালে গালটা একটু ছোঁয়ালেন উনি। তারপর তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বললেন—না, না। এখন তোমার কাছে যাওয়াটা ঠিক না। তোমাকে একটু ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, কিন্তু পার্ফেক্টলি নর্ম্যাল। তাই তো?

—হ্যাঁ ম্যাডাম, একটু দুর্বলতা শুধু।

—ম্যাডাম-ট্যাডাম আবার কী? এটা কি আশুতোষ বিল্ডিং না তার তিনতলার ঘর, না তার সেন্টিনারি বিল্ডিং?

—জয়িতাদি—অমৃতা হাসিমুখে বলল।

—বাচ্চাটা কই? দেখতে পারি?

—ওই তো! মশারি-ঢাকা ক্রিবটার দিকে দেখাল তিলক।

জয়িতাদি একা একা গেলেন কোণটায়, মশারির চালের ওপর মুখ রেখে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে এসে বললেন—এ তো একটা দেবশিশু?

তিলক বলল—অমৃতার পুত্র তো?

অমৃতা বলল, সব শিশুই তো দেবশিশুই দিদি!

—হেভ্‌ন লাইজ অ্যাবাউট আস ....

জয়িতাদি আস্তে আস্তে বললেন। বলতে বলতে কেমন দীর্ঘশ্বাসে মিলিয়ে গেল কথাগুলো। তারপর তার কাছে এসে আর একবার কপালে হাত ছুঁইয়ে মৃদুস্বরে বললেন—যখন যা দরকার হবে বোলো। একটু থেমে বললেন...শুধু পড়াশোনার ব্যাপারে নয়। একটা প্যাকেট রাখলেন তিনি অমৃতার মাথার কাছে।—এবার যাই?

তিলক ওঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। একা অরিন্দম।

অমৃতা বলল—আপনি এত চুপচাপ যে! কী হল?

অরিন্দম একটু ইতস্তত করে বলল—না, আসলে আপনার পার্সন্যালিটিটাই বদলে গেছে। যেন আপনাকে চিনতে পারছি না।

—আপনি কি তবে ভেবেছিলেন দুঃখ প্লাস বিষাদ প্লাস বিপদ ইকোয়াল টু অমৃতা?

—না, না, কখনওই না। তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল অরিন্দম।

লাবণি এই সময়ে ঢুকে ব্যস্তভাবে বলল—চলো অরিন্দম, যাবে না?—লাবণি আজকাল মা-বাবার আড়ালে অরিন্দমকে 'তুমি' বলে।

অরিন্দম তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, বলল—আজ আসি?

নার্সিংহোমের করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হচ্ছিল এই সুখ, এই ব্যক্তিত্ব যেন সে কোথায় দেখেছে, কোথায়? কিছুতেই মনে করতে পারছে না। লাবণিকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ফিরতে ফিরতে সে চিন্তা করছিল। পার্ক স্ট্রিট-চৌরঙ্গির ক্রসিং-এ পেয়ে গেল। আকারগত কোন

সাদৃশ্য নেই। কিন্তু যাঁর সঙ্গে অমৃতার মিল আজ সে দেখেছে তিনি হলেন ভার্জিন মেরি। সেই কুমারী মাতা, সান্‌ৎসিও রাফেইল্লোর আঁকা।

ডক্টর কার্লেকর ঢুকেই বললেন—সে কী! এত ফুল কেন? সিসটার সরান, সরান। বাচ্চাটার ক্ষতি হবে।

—বাচ্চাটাকেই বরং নার্সারিতে সরিয়ে দিই। আপনার পেশেন্টের ফুল খুব ভাল লাগছে।

—তা তো লাগবেই। আমার ঘরেও দু-চারটে পাঠিয়ে দিতে পারেন। কী অমৃতা আপত্তি আছে?

পরীক্ষা করার পর, মাধুরী সেন চলে গেলে, অমৃতা বলল—ডক্টর আমার জন্য পাঠানো ফুল কেন, আমি নিজেই তো আপনাকে ফুল দিতে চাই।

—কোথায় পায়ে? পুজো-টুজো করবে না কি?

—করাই তো উচিত।

—আচ্ছা এবার ভাল করে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও।

ডাক্তার চলে গেলে সে জয়িতাদির প্যাকেটটা খুলল—গোটা ছয়েক নানান রঙের ঝাপলা। এক প্যাকেট ন্যাপি। কয়েকটা সুন্দর নরম তোয়ালে, আর একটা কাঁচা হলুদ রঙের উলের সেট—জামা, টুপি, মোজা। সব কিছুর তলায় একটা অফ হোয়াইটের ওপর ছোট ছোট নীল মোটিফ-অলা-নরম ছাপা শাড়ি। এই উলের সেট কি জয়িতাদি নিজেই বুনেছেন?

২১

যে ভোররাতে অমৃতার সন্তান জন্মাচ্ছিল, দোলা সে সময়ে বিছানায় খালি এপাশ ওপাশ করছিল। সারা রাত ঘুমোতে পারেনি, এই ভোরেও ঘুম দূর অস্ত্। উঠে সে এক গ্লাস জল খেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বমির ধমকে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। মাথা ঘুরতে লাগল। 'মা' বলে একটা আর্ত চিৎকার করে সে মাটিতেই শুয়ে পড়ল।

তার মা ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলেন সেই ডাক। যেন দুঃস্বপ্ন দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। সেই মুহূর্তে আবার ডাকটা এলো—'মা-আ-আ' এবার আরও আস্তে, কিন্তু নির্ভুল। তিনি ছুটে গেলেন পাশের ঘরে। একঘর হড়হড়ে বমির মধ্যে দোলা নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে।

—দোলা!!! দোলা—তিনি প্রাণপণে দোলাকে তুলে বিছানায় শোয়ালেন, মুখ হাত এক দফা মুছিয়ে দিলেন। আস্তে আস্তে জামাকাপড় বদলে দিলেন। একটু জল খাওয়ালেন। দোলা পাশ ফিরে তাঁকে আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। যেন শুধু এই মাতৃস্পর্শটুকুর জন্যেই তার ঘুম অপেক্ষা করছিল।

আস্তে মেয়ের আলিঙ্গন ছাড়িয়ে তিনি উঠে মেঝে পরিষ্কার করলেন, বমির মধ্যে কঠিন বস্তু প্রায় নেই-ই। খালি জল, খালি জল, আর গলনালির ভেতরের স্বাভাবিক হড়হড়ানি। ফিনাইল দিয়ে ধুলেন সব। কী হল মেয়েটার। ইদানীং খাওয়া আরও কমে গেছে। জন্ডিস হল না কি? কপালে হাত দিয়ে দেখলেন জ্বর আছে কি না।

সকাল দশটা। খাবার টেবিলের দুদিকে মুখোমুখি বসে আছেন দুজনে। স্বামী আর স্ত্রী। একটু আগেই ডাক্তার তাঁদের মেয়েকে দেখে চলে গেছেন। বাড়ির ডাক্তার। সব কিছুতেই আগে ওঁকে ডাকা হয়।

—কী হল বলুন তো? রক্ত-টক্তগুলো পরীক্ষা করাতে হবে না কী?

—রক্ত নয়, ইউরিন।

—ইউরিন, ইউরিনারি কোনও ইনফেকশন...বাবা সব্যসাচী বললেন।

—না ইনফেকশন নয়, ডাক্তার বললেন, আ অ্যাম শিওর, তবু টেস্টটা করাব। শি হ্যাজ কনসীভ্‌ড্‌।

সেই থেকে সব্যসাচী আর সুমনা মুখোমুখি বসে আছেন। দোলা ঘুমোচ্ছে। তাঁরা বসে আছেন। কারও মুখে রক্ত নেই। অফিস যাবার জোগাড় নেই, স্কুল যাবার জোগাড় নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে যেন ইলেকট্রিক শকে তাঁদের আপাদমস্তক ঝলসে গেছে।

অনেকক্ষণ পর সব্যসাচী বললেন—তুমি কিছু জানতে না? এটা আমায় বিশ্বাস করতে হবে?

—কী জানব?

—কারও সঙ্গে ওর কোনও অ্যাফেয়ার চলছে কি না।

—তুমি জানো, আই, উই অ্যাবসলুটলি ট্রাস্ট হার। কিছু হলে ও আমাকে বলবে—এটাই তো প্রত্যাশিত? আই কান্ট টেক ইট সব্যসাচী। আই কান্ট টেক ইট ফ্রম হার।

—আশ্চর্য! তবে কি ওকে কেউ রেপ করল?

—সেটাও কি ও চেপে রাখবে? রাখবার কথা? বলতে বলতে সুমনার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে বড় বড় ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগল।

—এত দেখছে চারদিকে, এত শিখছে! স্কুল-কলেজে এ সব সোজাসুজি শেখায় না ঠিকই। তবু তো ঠারে ঠারে ওরা শিখেই যায়! টি.ভি. দেখছে দিনরাত্তির! সুমনার গলা যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

—তোমার নজর রাখা উচিত ছিল। —সব্যসাচী ঠোঁট চেপে রূঢ়ভাবে বললেন।

—একশোবার। কালো হয়ে যাচ্ছে, রোগা, ভাল করে খায় না, অন্যমনস্ক। সন্ধে পেরিয়ে বাড়ি ফেরে প্রায়ই। কিন্তু নাকের গোড়ায় পরীক্ষা, এ সব তে হবেই! হতেই পারে!

—কী হবে এখন? সব্যসাচী বললেন।

—প্রথম কথা জানতে হবে ব্যক্তিটা কে!

—ইটস আ ডেলিকেট কোয়েশ্চন...

সুমনা বললেন—ও বোধহয় জানেও না ওর কী হয়েছে। হঠাৎ জানলে বা হঠাৎ কিছু জিজ্ঞেস করলে যদি সাইকলজিক্যাল কিছু...

—কড়া হলে চলবে না—সব্যসাচী বললেন—যদিও ইচ্ছে করছে বেধড়ক ঠাঙানি দিই।

—প্লি-জ—ককিয়ে উঠলেন সুমনা—বলেনি যখন তখন এটা খুব গোলমেলে ব্যাপার হতে পারে। কোনও আধবুড়ো প্রোফেসর, কি বিবাহিত কেউ, কিংবা ক্লাসের কোনও ছেলে যার কোনও চালচুলো নেই। আচ্ছা—তিলক বলে ছেলেটা তো মাঝে মাঝেই ফোন করত!

—করত! তো সে তো চঞ্চল, নিশান, আরও কী কী নামের বন্ধু আছে ওর।

—তিলক একটু বেশি করত।

—ট্রাস্ট! বিশ্বাস! কাউকে করতে নেই সুমনা, এই বয়সের ছেলেমেয়েকে তো একেবারেই না। মা-বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, সব কথা আলোচনা হয়...এ সব স্রেফ যাকে বলে বকোয়াস। এজেড পিপ্‌ল আর এজেড, দা ইয়াং আর ইয়াং, দেয়ার ইজ নো পসিবিলিটি অফ এনি কমিউনিকেশন।

—'মা-আ'— দোলার ঘর থেকে আবার ডাক ভেসে এল।

—দেখো, কী চাইছে!

সুমনা গিয়ে দেখলেন দোলা উঠে বসে আছে, দু হাত দিয়ে মাথা টিপে ধরেছে।

—কী হল? মাথার যন্ত্রণা?

—না, ভীষণ ঘুরছে। কী হল বলো তো—স্পন্ডিলোসিস? এমন নিষ্পাপ ভঙ্গিতে সে বলল কথাটা যে সুমনার সেই মুহূর্তে মনে হল ডাক্তার একটা ভুল করেছেন। তিনিও খুব সরল মুখ করে বললেন—তোর পিরিয়ড ঠিকঠাক নিয়মিত হচ্ছে তো?

—আমি একটু ইরেগুলার, জানোই তো! আগের মাসে হয়নি।

এই সময়ে ফোনটা বাজল। দোলা উঠতে যাচ্ছিল, সুমনা আটকালেন। সব্যসাচী ধরলেন ফোনটা।

—আমি তিলক বলছি। দোলাকে একটু দেবেন?

—দোলা একটু অসুস্থ ঘুমোচ্ছে। কিছু বলার আছে।

—হ্যাঁ, অমৃতার আজ ভোররাতে ডেলিভারি হয়েছে। আমরা সবাই গিয়েছিলাম। আবার বিকেলে যাব। দোলা এল না দেখে...

—শোনো...তুমি একবার আমাদের বাড়ি এসো।

—আমি? আপনাদের? ডোভার লেনে, না?

—উহুঁ নিউ বালিগঞ্জ। ঠিকানাটা লিখে নাও।

—আজ পারব না মেসোমশাই, কাল 'উজ্জীবন' নার্সিংহোম হয়ে যাব। অমৃতাকে এখন আমরা রোজই...আপনাদের অসুবিধে হবে না তো?

—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না...

তিলক এল নীচের তলায়। দোলা জানতেও পারল না। ভী-ষণ দুর্বল শরীর। মাথা ঘুরছে, প্রতিদিন সকালে বমিও হচ্ছে একটু-একটু। কাঠ-বমি যাকে বলে।

সে শুয়ে শুয়ে কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে রবিশংকর-মেনুহিন শুনছে।

তিলককে চা এবং প্রচুর খাবার দিয়েছেন সুমনা।

তিলক হেসে বলল— দোলা বুঝি আপনাদের বলেছে আমি ভী-ষণ পেটুক?

জোর করে একটু হাসলেন ওঁরা।

সব্যসাচী বললেন—খুব বন্ধু তো তোমরা! প্রায়ই ফোন করো, একসঙ্গে বেড়াতে-টেড়াতেও যাও নিশ্চয়ই। খুব হালকাভাবে বললেন তিনি কথাটা।

তিলক মুখে একটা ফিশফ্রাই তুলছিল, একটু কামড় দিয়ে বলল—হ্যাঁ আমাদের গ্রুপটা মানে আমি, চঞ্চল, লাবণি, দোলা, অমৃতা আমরা খুব ক্লোজ। তবে কফিহাউজ কিংবা য়ুনিভার্সিটি ক্যানটিন...আর কোথাও যাবার সুযোগই পাইনি ...যা পড়ার চাপ। বাব্‌বাঃ। মাঝে মাঝে এক্সকারসানের কথা হয় আবার ধামাচাপা...।

—না আমি বলছি। ডোন্ট মাইন্ড, তোমার কোনও গার্লফ্রেন্ড নেই?

তিলক একটু অবাক হয়ে গেল, মুখে সেটা প্রকাশ করেও ফেলল—আমার গার্লফ্রেন্ড? বাংলার ছেলেদের কোন গার্ল পাত্তা দেবে, মেসোমশাই! তা এই কথা জিজ্ঞেস করতে আপনি আমায় ডেকে...

—না...না...তুমি অত আপসেট হয়ো না! তোমার না হয় গার্লফ্রেন্ড এখনও হয়নি। কিন্তু তোমার বন্ধুদের আর কারও? ধরো, দোলার?

এইবারে ব্যাপারটা বুঝল তিলক। এই জন্যে। এখন, দোলা যা গোপন করে গেছে সেটা ফাঁস করা বন্ধু হিসেবে তার উচিত কী? সে একটু দ্বিধায় পড়ে গেল, তারপর বলল—থাকলে দোলাই আপনাদের বলবে। তাই না? শী ইজ আ গ্রোন-আপ গার্ল।

—শোনো—সুমনা ব্যাকুল হয়ে বললেন এবার—দোলা ইজ ইন গ্রেট ডেঞ্জার। যদি কিছু জানো, আমাদের কাছে লুকিও না, প্লিজ—তিনি তিলকের দ্বিধাটা টের পেয়েই বললেন।

—মাসিমা, আমি দোলাকে একটা ছেলের সঙ্গে দেখেছি। প্লিজ দোলাকে বলবেন না আমি বলেছি, আমার ভী-ষণ বাজে লাগছে এটা বলতে হচ্ছে বলে।

—বলব না, তুমি যা জানো বলো।

—ছেলেটা আমাদের চেনা কেউ না। য়ুনিভার্সিটার না। কিন্তু খু-ব হ্যান্ডসাম চেহারা। ফিলমের হিরোদের মতো...কিংবা বলতে পারেন মডেলদের মতো।

—নাম জানো না?

—উহুঁ, একদিন দোলাকে এ নিয়ে ঠাট্টা করেছিলাম, ভী-ষণ রেগে গেল। ট্যাকসি থেকে গড়িয়াহাটের মোড়ে ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল একদিন। আরেকটা কথা মাসিমা, দোলা কিন্তু ক্লাসে খুব, খু-ব ইরেগুলার।

তিলক চলে গেলে আবারও দুজনে বসলেন মুখোমুখি। একটা সূত্র পাওয়া গেল। ক্ষীণ একটা সুতো। সুমনা হঠাৎ বললেন—তিলক বলে যে ছেলেটা প্রায়ই ফোন করে সে কিন্তু এই তিলক নয়।

—কেন?

—তার গলা একেবারে অন্যরকম। কথা বলবার ধরনও আলাদা। এই তিলক তো টিপিক্যাল একটা কলেজের ছেলের মতো চ্যাঁ-চ্যাঁ করে কথা বলে। যে ফোন করে তার গলা বেশ ভাল, পুরুষালি, খুব মার্জিত ভঙ্গি। ছেলেমানুষি নেই একদম।

—দোলা! দোলা শুনতে পেল না তার কানে ওয়াকম্যান, কিন্তু দোলা দেখতে পেল মা এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ খুলে কিছু বলছে। সে ওয়াকম্যানটা খুলে রাখল। মায়ের হাতে একটা রিপোর্ট। ডেফিনিটলি রক্ত আর ইউরিন পরীক্ষার।

—দোলা—মা বলল, মায়ের গলা কাঁপছে,—ছেলেটা কে? যার সঙ্গে তুই ট্যাকসি করে ঘুরে বেড়াস?

দোলার মুখ শুকিয়ে গেল। সে ঢোঁক গিলে বলল—কে বলেছে?

—অনেকেই দেখেছে, অনেকেই বলেছে—এই ভিড়ে ভর্তি শহরে এসব লুকোনো যায় না। দোলা, তোমার ইউরিন রিপোর্ট বলছে তুমি কনসীভ করেছ মাস দুয়েকের মতো।

রক্তশূন্য মুখে দোলা কিছু বলতে গেল বারবার, মুখে কথা ফুটল না। অবশেষে সে উপুড় হয়ে পড়ল বিছানার ওপর। যেন খরগোস নিজের বিবরে মুখ লুকিয়েছে। কিন্তু পেছনটা উন্মুক্ত। যে-কেউ থাবা মেরে তুলে নিতে পারে।

তার পাশে বসে সুমনা আস্তে আস্তে বললেন—আমাদের বলনি কেন দোলা? আমরা তোমার বাবা-মা কী দোষ করেছি তোমার কাছে?

কোনও উত্তর এল না।

—তোমাকে কীভাবে আমরা বিশ্বাস করেছি, চিরকাল, কীভাবে শিক্ষা দিয়েছি, বন্ধুর মতো মিশেছি—তা তো তুমি জান। তবে?

এবার দোলার উপুড় শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। সে কোনও মতে বলল—তোমরা ওকে অ্যাপ্রুভ করতে না। পার্থদার মতো বড় কিছু নয়... তা ছাড়া ও কিছুদিন লুকিয়ে রাখতে বলেছিল...

—'ও' বলেছিল বলে তুমি 'আমাদের' কাছে গোপন করলে? মা বাবাকে গোপন করতে বলে যে ছেলে, তোমার বোঝা উচিত ছিল সে ভাল নয়।

—না, না, ও ভাল, কিছুদিন সময় চাইছিল, এরিয়া ম্যানেজার হয়ে যাবে তারপর!

—ইতিমধ্যে সে এই কাণ্ড বাধিয়ে বসল?

দোলা লালমুখে নখ খুঁটতে লাগল।

—ইন এনি কেস, কে ছেলেটি? কী নাম?

—অমিতাভ সেনগুপ্ত। শুধু সেন লেখে। পার্থদা চেনে।

—পার্থ? পার্থ জানে ব্যাপারটা?

—না, না, পার্থদাদের অফিসের স্টিমার পার্টিতে আলাপ হয়েছিল।

—পার্থ? হ্যাললো পার্থ দত্ত, আছে? হ্যাঁ দিস ইজ হিজ ফাদার-ইন-ল'। ইয়েস ইট ইজ ভেরি-ভেরি আর্জেন্ট।

—ইয়েস, বাবা, কী ব্যাপার?

—অমিতাভ সেনগুপ্ত বা সেনকে চেন? তোমাদের অফিসের স্টিমার পার্টিতে এসেছিল?

—অমিতাভ সেন? কীরকম একটু যদি ডেসক্রাইব করেন...

—তোমার শালির সঙ্গে এত ভাব জমিয়ে ফেলল, আর তুমি এখন ডেসক্রিপশন চাইছ? হাউ ডু আই নো? তোমার রেসপনসিবিলিটি। তোমার জানার কথা।

তাঁর গলার স্বরে রাগ গোপন রইল না আর।

পার্থ বোধহয় কিছু মনে করল। করতেই পারে। বলল—ঝুলনকে জিজ্ঞেস করে বলব। এনিওয়ে কী হয়েছে? অ্যাফেয়ার?

—এসে শুনো।

ঝুলন আর পার্থ সন্ধেবেলায় এল। ওদের নীচেই বসালেন সব্যসাচী। সুমনা সর্বক্ষণ ওপরে দোলাকে পাহারা দিচ্ছেন।

পার্থ বলল—হ্যাঁ আমরা দুজনে মিলে প্লেস করতে পারছি। ছেলেটি খুব সম্ভব আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্টের শালা, সে-ই যদি হয় তো আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট বলছেন—একটা অত্যন্ত ইরেসপনসিব্‌ল ছোকরা। অমন চেহারা, স্মার্টনেশ শিক্ষা-দীক্ষা নিয়েও বছরের পর বছর ওষুধের সেলস পার্সন হয়ে আছে। কাজে মন নেই। খালি সিনেমা, থিয়েটার, গার্লফ্রেন্ড, মিউজিক। যা রোজগার করে স-ব উড়িয়ে দেয়। চেহারা দেখে যদি আপনারা পাত্র পছন্দ করে থাকেন তো ঠকবেন। পরিবার ভালই। মা সেতার-টেতার বাজান, বাবাও কোনও বড় কোম্পানিতে পার্চেজে আছেন। তিনিও ওইরকম, উন্নতি করতে, খাটতে খুবই অনিচ্ছুক।

—কিন্তু আমাদের কোনও উপায় নেই পার্থ। ওরই সঙ্গে দোলার বিয়ে দিতে হবে। দোলা আর কাউকেই বিয়ে করবে না।

—আমি একটু বুঝিয়ে দেখব বাপি?—ঝুলন বলল।

—নাঃ আর উপকার তোমাকে করতে হবে না। স্টিমার পার্টি বলে বোনকে নিয়ে গেলে, একটু নজর পর্যন্ত রাখলে না। কার সঙ্গে মিশল, কার সঙ্গে কথা বলছে...ছিলে কোথায় ঝুলন? ছি, ছি...

পার্থ পরে বিরক্ত হয়ে ঝুলনকে বলেছিল—একটা বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে তাকে কি পাহারা দিয়ে রাখতে হবে নাকি? তোমার বাবা-মার মাথা খারাপ হয়েছে। আমাদের কী দোষ?

অনেক চেষ্টা চরিত্র করে অমিতাভ সেনগুপ্তর বাবা-মাকে যদি বা খুঁজে পাওয়া গেল, অমিতাভকে আর পাওয়া যায় না।

টাউনসেন্ড রোডে, ওদের বাড়িতে গিয়ে প্রস্তাবটা রাখতে অমিতাভর বাবা আকাশ থেকে পড়লেন।

—অমুর বিয়ে দেব? বিয়ে করে দায়িত্ব নেবার মতলবই ওর নেই। কী দেখে আপনারা ভুললেন? চেহারা?

—আমরা ভুলিনি। আমাদের ছোট মেয়ে।

—তাই বলুন। এখন আমার ছেলে ভুলেছে কি না দেখতে হয়।

—দেখুন। সে কোথায়?

—সে ট্যুরে গেছে। ওষুধের কম্প্যানির সেলসম্যান। মাঝে-মাঝেই এদিক-ওদিক যেতে হয়।

দোলাদের বাড়ির দোতলার ঘরে একা অমিত ও দোলা। অমিত বলল—দোলা, আমাকে প্রেশারাইজ করাটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।

—মানে? এই অবস্থাকে তুমি প্রেশারাইজ করা বলছ?

—দেখো এসব ঘটনা ঝোঁকের মাথায়, ঘোরের মাথায় ঘটে যায়। কিন্তু ঘোরটা উভয় পক্ষেরই।

—মানে?

—তোমার সম্মতি না থাকলে কি আমি...

—বন্ধুর শূন্য বাংলো-বাড়িতে দুপুর কাটাবার প্ল্যানটাও কি আমার? আমার দায়িত্ব...? বলতে বলতে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে থাকল দোলা, তার আবার বমি পাচ্ছে। সেই প্রবল উকি দিয়ে দিয়ে কাঠবমি। কিছুক্ষণ মুখ ঢেকে সে নিজেকে সামলাল। যখন হাত সরাল, তখন সমস্ত মুখ টকটকে লাল হয়ে গেছে।

—কী হয়েছে তোমার, দোলা? অমিতের গলায় যেন দুশ্চিন্তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

—জানো না কী হয়েছে? তোমাকে তো বলা হয়েছে! হয়নি?

—দোলা প্লিজ, এম. টি. পি. করিয়ে নাও। কেন শুধু শুধু কষ্ট পাবে? আমি এখনও প্রস্তুত নই। এতটা দায়িত্ব...

দোলার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অমৃতার কেস। সে এম.টি.পি. করতে রাজি হয়নি বলে কী ভাবে তাকে...

—তুমি যদি পুরুষ হও, তাহলে যে মুহূর্তে একটা মেয়ের সঙ্গে ইলভলভ্‌ড হয়েছ, সেই মুহূর্ত থেকে তোমার দায়িত্ব এসে যায়। তুমি কি আমাকে নিয়ে খেলা করছিলে তবে? এ কী মারাত্মক খেলা?... থেমে থেমে কথাগুলো বলল দোলা। ভেতরটা তার ত্রাসে দুঃখে ক্ষোভে কাঁপছে। কিন্তু এগুলোই তার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন কথা। বলে ফেলে তার চোখ উপচোতে লাগল।

—আই লভ য়ু, দোলা, প্লিজ ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড মি, শুধু আমার অবস্থাটা তোমাকে বুঝতে বলছি।

—আর যদি না বুঝি? যদি আমার মা-বাবা না বোঝেন?-

—অগত্যা ...আর কী বলব? এম.টি.পি. আজকাল এত সোজা, বিশেষত তোমার এই স্টেজে। পরীক্ষাও তো তোমার সামনেই...

—'অগত্যা'? 'অগত্যা' কথাটার মানে কী—দোলার গলার স্বরে একটা অবাঞ্ছিত কর্কশতা একটা তীক্ষ্ণতা এসে গেল। যেন সে হঠাৎ একটা অতলস্পর্শ খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে, ঝুলছে। পেছনে রিভলভার হাতে খুনি, তার মাথা কিংবা হৃৎপিণ্ড লক্ষ করে অস্ত্র তুলেছে।

—আমি বুঝতে পারছি, তুমি বুঝবে না, দোলা, আসলে তুমি ভাবছ...

—কী ভাবছি?

—না থাক্।

এটা সকালের ঘটনা। দুপুরে আজও অফিস-স্কুল গেলেন না সব্যসাচী সুমনা কেউই, দুজনেই এই প্রথম অমিতাভকে দেখলেন। জামাই করলে ঘর আলো হয়ে যাবে, তাঁরা সত্যি-সত্যিই অবাক হয়ে গেছেন এই সিনেমা-সম্ভব রূপ দেখে। এ যেন সত্যি নয়। রুপোলি পর্দা থেকে কেটে নামিয়ে আনা হয়েছে। কথাবার্তাও অত্যন্ত মার্জিত, নম্র, সপ্রতিভ, অথচ পরিশীলিত। একমাত্র অপরাধ তার তেমন ভালো-নয় চাকরি, আর তার অখ্যাতি বা কুখ্যাতি। তার নিজের বাবা, জামাইবাবু পর্যন্ত তার সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ। মায়েরা ছেলেদের দোষ দেখতে পান না। কাজেই, অমিতাভর মা আর কী করে সোজাসুজি তার নিন্দা করেন। তিনি বলেছিলেন—অমিত একটু শিল্পীস্বভাবের ছেলে। এরা ভাল গৃহস্থ হয় না। বিয়ে যদি দেন, তা হলে নিজেদের দায়িত্বে দেবেন। পরে আমাদের দোষ দিতে আসবেন না।

সব্যসাচীর রাগ হয়ে গিয়েছিল, তবু রাগ চেপে বলেন—আপনি নিজেই তো একজন শিল্পী, তা আপনারও শিল্পীস্বভাব নিশ্চয়ই। তার জন্য আপনার গৃহস্থালির কোনও ক্ষতি হয়েছে?

ভদ্রমহিলা, নাম কৃষ্ণা সেন, বললেন—পুরুষ আর মেয়েদের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি অবশ্য স্বীকার করবেন না, যে আমার সেতার, তার জন্য রেওয়াজ, জলসা, রেডিও, দূরদর্শন—এসব ওঁকে কখনও সখনও অসুবিধেয় ফেলে, উনি অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু

আমার বদলে 'উনি' যদি শিল্পী হতেন তাহলে আমাকে চব্বিশঘণ্টা ঘরে-বসা আইডিয়াল গৃহিণীও হতে হত, আবার কিছু রোজগারপাতিও করতে হত। শিল্পীর আয়ে সংসার চলে না তো! আর দেখুন অমুর ব্যাপারটা হচ্ছে, ও শিল্পীস্বভাব, কিন্তু শিল্পী নয়। ও না শিখেও ভাল গান গায়, অভিনয় করতে পারে, স্প্যানিশ গিটার বাজিয়ে গান গেয়ে আসর মাতিয়ে দেবে, কিন্তু ও অস্থির, চঞ্চল, কিছুতে লেগে থাকতে পারে না, সবসময়েই একটা হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে ভাব। নাও, য়ু ডিসাইড।

এখন ওঁরা আলোচনা করছেন—অমিতাভ বিয়ের পাত্র হিসেবে আদৌ অভিপ্রেত কি না। মেয়ের অবস্থার জন্য তাড়হুড়ো করে বিয়ে দিলে, মেয়েটা যদি সারাজীবন অসুখী হয়? এ তো আর আগেকার কাল নয় যে কুমারী গর্ভিণীকে আইনমাফিক গর্ভপাত করানো যাবে না!

সুমনা বললেন—এই গর্ভপাতের সাইকলজিক্যাল এফেক্ট মেয়ের ওপর কী হবে, একবার ভেবেছ? পরে যখন ওর বিয়ে দেওয়া হবে, এ ঘটনা লুকিয়ে দিতে হবে, ধরা পড়ে যেতেই পারে, আর দোলা যা মেয়ে ও ঠিক বলে ফেলবে। তখন...

সব্যসাচী গম্ভীরভাবে বললেন—তা যদি বলো, গোপন করতে তোমার মেয়ে যে ভালই জানে, লোকের চোখে ধুলো দেবার চালাকি যে সে চমৎকার আয়ত্ত করে ফেলেছে, তা তো প্রমাণিতই হয়ে গেছে সুমনা! এ সব কথা আর কেন?

এম. টি. পি.-র কথাতে কিন্তু দোলা ভয়ে বাঁশপাতার মতো কাঁপতে লাগল। মুখ রক্তহীন। সে শুধু কোনওমতে বলতে পারলে—মা, ওটা তো টিউমার নয়, একটা বাচ্চা...আমার ...আমার মা...তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে সে তার পড়ার টেবিলে মাথা গুঁজল।

—ছেলেটি? তোমার ওই অমিতাভ? ও-ও তো একই কথা বলছে? ও-ও চায় না।

—ওরা ছেলে মা, বোঝে না এ সবের ইমপর্ট্যান্স, ফীলিং নেই। ওর একমাত্র আপত্তি টাকা-পয়সার। ফ্যামিলি সাপোর্ট করবার মতো আর্থিক অবস্থা ওর এখন নেই।

২২

সাতুই নভেম্বর বাংলা সেকেন্ড পার্ট ফিফ্‌থ পেপার পরীক্ষা দিতে এল অমৃতা, একজন সদ্য জননী, আর দোলা একজন সদ্য বিবাহিতা। অমৃতা এই তিন সপ্তাহে খানিকটা সেরে উঠেছে ঠিকই। কিন্তু মোটের ওপর সে দুর্বল। বাড়ি থেকে একটা কুশন নিয়ে এসেছে। এক ফ্লাস্ক গরম দুধ, টিফিন। বেশ কুসুম-কুসুম গরম করে দুধটা দিয়েছেন মাসি, খিদে পেলে সে টুক করে ফ্লাসকের ঢাকনা খুলে নামিয়ে দুধটা ঢেলে রাখে, লিখতে লিখতে এক ফাঁকে খেয়ে নেয়। তবু অমৃতা এটা পেরে যাচ্ছে, কেন না সে জয়িতাদির নোট্‌স থেকে একটা মূল্যবান শিক্ষা নিয়েছে। কী করে অল্প কথায় বেশি বলা যায়। ভাষার ওপর অসামান্য দখল না থাকলে, শব্দভাণ্ডার অফুরান না হলে এটা সম্ভব নয়। অতটা পারবে না অমৃতা, পারবে না তিলকও। শোনা যায় জয়িতা রায় তিন ঘণ্টায় লেখা শেষ করে, বাকি একঘণ্টা রিভিশন করতেন, রিভিশনে ভুল কিছু বেরোত না, শূন্যস্থানও কিছু না, কিন্তু আরও ভাল শব্দ আরও সুন্দর শব্দ বসানো হত কিছু, স্টার দিয়ে মার্জিনে মার্জিনে আরও কিছু নতুন চিন্তা, পরীক্ষকরা সেই মার্জিনের অতিরিক্তটুকু পড়ে ধন্য হতেন। অমৃতা-তিলক পেয়েছে সেই নোটিস। কিছুট তো পারবেই। সবচেয়ে বড় কথা পরীক্ষা দিতে, লিখতে ভীষণ ভাল লাগছে তাদের। অমৃতার প্রথমটা বাচ্চার খাওয়ার চিন্তায় কষ্ট হয়েছিল। পরীক্ষার সময়টার কথা মনে করে, ডাক্তারের পরামর্শে ওরা বাচ্চাকে বেবি ফুড খাওয়ানো অভ্যেস করিয়েছে। কিছুতে মুখে নিতে চায় না, চোখ বুজিয়ে ফেলে, ফুঁপিয়ে কাঁদে, আর অমৃতার মনটা স্নেহে গলে যায়, শরীরটাও তার হয়ে যায় যেন নবনীতে

তৈরি, গলতে থাকে। কিন্তু মাসি কড়া হাতে শাসন করেছেন মা ছেলে দুজনকেই। তাই খানিকটা নিশ্চিন্ত অমৃতা। আর, একবার প্রশ্নোত্তরের ভেতরে ঢুকে পড়বার পর তার আর জগৎ-সংসার কিছুই খেয়াল থাকে না।

দোলা পরীক্ষা দিচ্ছিল সিক-বেডে। ওদের থেকে আলাদা ঘরে। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে যখন দোলার রেজিস্ট্রেশন হল, তার সঙ্গে হল পশ্চিমি কায়দার একটা রিসেপশন। আশ্বিন মাসে বিয়ের লগ্ন থাকে না। তাই রইল না টোপর, আলপনা-পিঁড়ি, গায়ে-হলুদ, অধিবাস, ছাদনাতলা, কিচ্ছু না। তবে শানাই বাজল, বাজল কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত, সরোদ-সেতার-বেহালাও, স্বভাবতই রেকর্ডে। খাওয়া-দাওয়ার মেনুও খুব ভাল। কিন্তু কনের ফ্যাকাশে মনমরা চেহারায় বিয়ের সাজ ভাল ফুটল না।

আত্মীয়স্বজনরা মন্তব্য করলেন—পরীক্ষার মুখোমুখি বিয়েটা না দিলেই হত। মেয়েটা দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় যেন কেমন হয়ে গেছে। আমাদের সেই হাসকুটে টগবগে লাবণ্যময় মেয়েটা বলে চেনাই যাচ্ছে না।

উত্তরে একজন বললেন—বরপক্ষের নাকি ভীষণ তাড়া ছিল।

আর একজন বললেন—তাড়াটা কনেপক্ষেরও হতে পারে। জামাই যা দেখছি একে তো ফেলে রাখা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে বেহাত হয়ে যাবে।

দোলা বন্ধুদের নেমন্তন্ন করতে চায়নি। কিন্তু সুমনা-সব্যসাচী ধরে ধরে প্রত্যেককে করেছেন। অনেকেই আসেনি। অমৃতা একবার ঘুরে গিয়েছিল সকালের দিকে। ছেলের জন্য বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি। শর্মিষ্ঠা পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠছে না, তার কথা বাদ। কিন্তু লাবণি এসেছিল খুব সেজেগুজে অরিন্দমের সঙ্গে, আর এসেছিল সব কটা পেটুক ছেলে। পরীক্ষাই হোক, আর যা-ই হোক খাওয়া তার ওপর দোলার 'মালদার' বাবার দেওয়া রিসেপশনের খাওয়া ওরা মিস করবে না। আর একজনকে দোলা ফোনে নেমন্তন্ন করেছিল, কী ভেবে কে জানে। সে হল সীজার, অমৃতার শ্বশুরবাড়ির পাড়ার সেই পরোপকারী ছেলেটি।

দোলা সিক-বেডে পরীক্ষা দিচ্ছে শুনে সকলেই একটু অবাক। বিয়ে হতে না হতেই অসুখ বাধিয়ে বসলি? কী? না জন্ডিস। খালি তিলকের মাথায় একটা কথা কয়েকবার ঘুরপাক খেয়েছিল—'শী ইজ ইন গ্রেভ ডেঞ্জার।' পুরোপুরি বোঝার মতো সময় বা মনোযোগ তার ছিল না, কিন্তু কথাগুলো তার অজান্তেই তার মাথার ভেতর একটা সংকেত পাঠাচ্ছিল, রিং রিং রিং রিং...

২৩

অমৃতা যেন অনেক দূরের একটা তারা। বহু আলোকবর্ষ পার হয়ে তার স্নিগ্ধ স্তিমিত আলো এসে পৌঁছেছে অরিন্দমের কাছে। তা ছাড়াও আছে র‍্যাফেইলো, সেই ইতালীয় শিল্পীর তৈরি ম্যাডোনা ব্যক্তিত্ব। এখন আর অরিন্দমের আর ম্যাডোনার কাছে আসার কোনও যুক্তি নেই। তখন আসত বার্তা পৌঁছতে, বার্তা নিয়ে যেতে। অমৃতার বাবা-মা তাকে খুব পছন্দ করে ফেলেছেন। পছন্দ করেছেন শিবানী মাসিও। অরিন্দম ভেবে দেখে সব বাবা-মা-মাসি-মেসোদের কাছেই সে খুব প্রিয়। কিন্তু এইসব মাসি-মেসোদের মেয়েদের সে তেমন আকৃষ্টই করতে পারছে না আজকাল। লাবণি তো খুবই মোহিত হয়েছিল প্রথমটায়। কিন্তু তারপর রুক্ষ ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। খানিকটা ঠেস দিয়ে কথা। অরিন্দম বোঝে না কেন। লাবণিকে তার ভালই লাগে। কিন্তু যাকে বলে প্রেমে পড়া, সেটা ঘটে ওঠেনি। অরিন্দম একজন লোভনীয় পাত্র—সিভিল এঞ্জিনিয়ার, অমুক কোম্পানিতে এই পোস্টে আছে, এত টাকা মাইনে পায়। নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। বাবা-মা উভয়েই কাজ করেন। শিক্ষিত, কালচার্ড ফ্যামিলি। নিজেদের বাড়ি বকুলবাগানে। আর লাবণি এক লোভনীয় পাত্রী—এম. এ. পাশ

করতে যাচ্ছে, ফুটফুটে দেখতে, বেশ আকর্ষণীয় চেহারার একটি মেয়ে, যাকে তার বাবা-মা যত্ন করে বড় করে তুলেছেন, যাকে এবং যার বিবাহিত জীবনকে ঘিরে তাঁদের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা। ব্যাপারটা এই রকম। তাঁরা অরিন্দমকে মিনতি করে বলেছেন—বড় মেয়েকে এমন দিয়েছি, ছোটকেও আমরা তেমনই দেব। এটা ওদের প্রাপ্য। তুমি লক্ষ্মীটি না করো না।

—আপনারা কি সেইসব খাটবিছানা, ড্রেসিং টেব্‌ল, আলমারি-টালমারি স-ব দেবেন? সর্বনাশ! আমার মান থাকবে?

—এগুলো তো দেবই।

—যদি আমি সিঙ্গাপুরে কি আমেরিকায় থাকতাম?

—তবু দিতাম। এখানে থাকত, এলে ব্যবহার করতে। আর টি.ভি. ফ্রিজ তো আজকাল সবার ঘরেই থাকে। বাহুল্যটা সত্যিই বিশ্রী। ভাবছি একটা মাইক্রোয়েভ ওভন দেব আর একটা এয়ার-কন্ডিশনার।

—সর্বনাশ! মাইক্রো-ওয়েভও আমাদের আছে। মাকে সিঙ্গাপুর থেকে এনে দিয়েছিলাম। আর এ.সি. আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না। লাবণির ঘরের জন্য দিতে পারেন। তার যদি এতই শখ।

—বলছ কী! লাবণির আর তোমার ঘর কি আলাদা হবে না কি? অরিন্দমের মাই ডিয়ার হবু-শাশুড়ি শঙ্কিত হয়ে বললেন।

—এ.সি. থাকলে হতেই হবে।

—সিঙ্গাপুর-আমেরিকায় কী করতে?

—ওখানে? গ্রীষ্মের দিনে যতক্ষণ পারি বাড়ির বাইরে থাকতাম। শীতে অবশ্য সেন্ট্রাল হিটিংটা লাগতই আমেরিকায়। সিঙ্গাপুরে এ.সি-টা অফ করে দিয়ে জানলা খুলে দিতাম চুপিচুপি।

—তা হলে কী হবে? লাবণির জন্যেও তো ওর দিদির মতোই টাকা রাখা আছে আমাদের।

—এক কাজ করুন না, মেয়ের নামে ইনভেস্ট করে দিন সব টাকাটা। আর কিছু দিতে হবে না। ফার্নিচার আমরা পছন্দ করে করিয়ে নেব। আমি যদ্দুর বুঝেছি আর কিছু থাক আর না থাক লাবণির একটা পেল্লাই ড্রেসিং টেবিল চাই-ই!

সব্বাই হাসতে থাকে। লাবণি বলে—এইজন্যে আপনার সঙ্গে কথা বলতে ভাল্লাগে না। আমার সবকিছুই আপনার হাস্যকর লাগে। তাই না?

—কী মুশকিল, ড্রেসিং টেবিল কি খারাপ? আমি যেমন সেদিন একটা কম্প্যুটার স্ট্যান্ড কিনলাম। সাড়ে পাঁচ হাজার দাম নিল। ওটা না হলে আমার চলছিল না।

—হ্যাঁ এমনি করে বেশ বুঝিয়ে দিলেন, আপনার কম্প্যুটার, আপনি আঁতেল, টেকনোক্রাট, আর আমার ড্রেসিং টেবল,—একটা ফুলিশ ইম্‌ম্যাচিওর মেয়ে যে খালি রূপচর্চা করে।

লাবণির কথা শুনে অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। আশ্চর্য! সে ঠিক এই কথাগুলোই ভেবেছিল লাবণির সম্পর্কে। তবু যে সে তাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে, সেটা ওই দূর নক্ষত্র যে এখন ভার্জিন মেরি—তার কাছে অসম্ভব বলে। অমৃতার জন্য তার যা আছে, তা একটা শ্রদ্ধা, আর দুর্নিবার আকর্ষণও। শ্রদ্ধাটা ঠেকে যায়, অমৃতার ঠাট্টা-তামাশায়।

—কী নিজেকে লালটু ঘোষ বলতেন কেন? অরিসূদন আর অরিন্দম-এ অনেক তফাত, সাউন্ডের দিক থেকে। আপনাদের দুজনের পার্সন্যালিটিতেও তফাত আকাশ-পাতাল। বুঝলেন লালটু ঘোষ! হুঃ।

আর আকর্ষণ? আকর্ষণটা ঠেকে যায় যখন স্নেহার্দ্র সুখে অমৃতা তার দেবশিশুকে কোলে তুলে নেয়। আদর করে। মনে হয়, সারা জীবনে এই একটা সম্পর্কই তাকে কিছু দিতে পেরেছে, এই একটা সম্পর্ককেই সে স্বীকার করতে প্রস্তুত। সেই ভার্জিন মেরিমাতার কাছে অরিন্দমরা অবাস্তব, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। কোনও কোনও রাতে একটি 'অস্পষ্ট' মেয়েকে দূর থেকে হাতছানি দিতে দেখে সে স্বপ্নেই ডাকে 'অমৃতা, অমৃতা,' কখনও তার স্বপ্নমগ্ন মগজ নামটা গুলিয়ে ফেলে ডাকে

'মৈত্রেয়ী! মৈত্রেয়ী!' মেয়েটির যেন ছায়াশরীর, ছায়াতেই মিলিয়ে যায়। প্রথম দিকে স্বপ্নের মধ্যে অমৃতাকে মনে করে তার যেমন রেতঃস্খলন হত, এখন আর তা হয় না। কিন্তু গভীর একটা মায়া, মমতা, অরিন্দমের তরফ থেকে অমৃতাকে ঘিরে আছে। সে-ই তার ইঙ্গিতা অমৃত হরিণী। কিন্তু জীবন, প্রণয়, বিবাহ কোনওটাই এ জগতে খুব সরল ব্যাপার নয়। যাদের সরল, তাদের মধ্যে অরিন্দম পড়ে না। সে ভালবাসবে অমৃতাকে, কিন্তু কাছে যেতে পারবে না। কাছে যাবে লাবণির, কিন্তু ভালবাসতে হয়তো পারবে না। বিয়ে করবে লাবণিকেই। সে কথা দিয়েছে। আর বিয়ে তো একটা মানুষের সঙ্গেই শুধু হয় না। লাবণির মা, বাবা, তাকে আপন ছেলের মতো স্নেহ করেন। নিজেদের সঞ্চয়, আর্থিক ভবিষ্যৎ কী ভাবে সুরক্ষিত করবেন সে নিয়ে পর্যন্ত অরিন্দমের সঙ্গে আলোচনা করতে দ্বিধা করেন না। লাবণির ভাই অবন, একটা চার্মিং ছেলে। সে-ও তাকে দাদার মতোই দেখে। বিয়ের ব্যাপারে এদের কথাও তো তাকে ভাবতে হয়। আর এগুলোর চেয়েও বড় কথা বোধহয় সমাজের সম্মতিহীন কোনও কাজ করবার দুঃসাহসের অভাব। যে অমৃতার বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা চলছে, যার কোলে তার পূর্বতন স্বামীর ছেলে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে গেলে যে কলজের জোরের দরকার হয়, সাধারণভাবে সাহসী ছেলে অরিন্দমের সে জোর নেই। এটা হয়তো অরিন্দম বোঝে না, নিজেকে কে আর কাপুরুষ ভাবতে চায়? তাই সে নিজের সপক্ষে একটা প্লেটনিক থিয়োরি খাড়া করেছে। বিয়ে করে গতানুগতিক একটা জীবন যাপন করবার যে সমাজসম্মত সমালোচনাহীন সোজা পথ সেই পথেই অধিকাংশ মানুষের চলাফেরা। কাজকর্মও তো আছে না কী? অসম্ভব প্রেশার কাজের। তার মধ্যে যদি বিবাহ নিয়ে, প্রণয় নিয়ে জটিলতা ঢুকে পড়ে তাহলে তা সামলানো শক্ত।

উপরন্তু সে রকম জমজমাট প্রেমময় বিবাহ আর কটা লোকের ভাগ্যে জোটে? যদি জমাট প্রেমের বিবাহ হয়ও সে প্রেম ঠিক সেই অনুপাতে কখনও বেশিদিন থাকে না। একটা সমঝোতা থাকে। একটা মমতা থাকে এই পর্যন্ত। যেমন তার মা-বাবার। তা, সে যদি সেই সমঝোতা, আর মমতা দিয়েই বিবাহিত জীবন আরম্ভ করে, ক্ষতি কী? সত্যি বলতে কী তার তো আরও অনেক মনোযোগের বিষয় আছে। সে ভালবাসে তার পেশাগত কাজের চ্যালেঞ্জ, সে ভালবাসে গান—নানা ধরনের, সে ভালবাসে পড়তে—শুধু গল্প-উপন্যাসও নয় আবার শুধু সায়েন্স জার্নালও নয়। সবরকম। তার ওপরে আছে তার রসিক মেজাজ। মজাদার ফাজলামো, বুদ্ধিমান ইয়ার্কি, সহৃদয় রসিকতা দিয়ে সে অনেক অনেক পাল্টে ফেলতে পারে তার চারপাশের আবহাওয়া। কাউকে বেশিক্ষণ মুখ গোমড়া করে থাকতেই দেবে না। নিজেকেও না। এমনি সুখী, সদানন্দ তার স্বভাব।

জানুয়ারিতে সুতরাং লাবণি-অরিন্দমের বিয়ের ঠিক হয়। রীতিমতো ঘটাপটার বিয়ে। সাবেকি সব রকম নিয়ম পালন করে। লাবণির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের চারদিন নেমতন্ন। চঞ্চল আর নিশান তো গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এলেই ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ বাজাল। অবন বলল—চঞ্চলদা, নিশানদা বাজাল, তিলকদা তুমি একপাশে দাঁইড়ে দাঁইড়ে শুধু দেখলে? কেন?

তিলক গম্ভীরভাবে বলল—কারও বিয়েতে শাঁখ বাজালে আইবুড়োর নিজের বিয়ে হয় না।

চঞ্চল-নিশান তেড়ে এল সে কথা শুনে—আগে বলতে কী হয়েছিল? স্বার্থপর কোথাকার? এখন আমাদের কী হবে?

তিলক বলল—গোময় খেয়ে প্রাচিত্তির করে নিস। আসলে, কটা ট্রে পাঠাতে হবে দেখতে এত ব্যস্ত ছিলুম যে খেয়াল করিনি। মাফ করেছি, দোষ করে দে।

চঞ্চল বলল—তবে রে শালা, কটা ট্রে পাঠাতে হবে তার তুই কী জানিস? তার জন্যে লাবণির মা-বাবা-জামাইবাবু-কাকা-কাকিমা গুচ্ছের রয়েছেন। ফপরদালালি করার আর জায়গা পাসনি?

তিলক আবার গুরুগম্ভীর মুখে বলল—লাবণির বিয়ের ট্রে নিয়ে আমার কোনও মাথা-ব্যথা নেই। যে মাছ অন্যে খাবে তার দিকে নজর দিয়ে লাভ?

—কী বলতে চাইছ তিলকদা? অবন জিজ্ঞেস করে।

—আরে আমি দেখছি আমার বিয়েতে আমাদের কটা ট্রে পাঠাতে হবে। চল্লিশ হাজারি বরের বাড়ি থেকে এম.এ. সুন্দরীর বাড়িতে ক'টা ট্রে আসে, চার হাজারি বরের বাড়ি থেকে স্কুল-ফাইনাল ফেল খেঁদিপেঁচির বাড়িতে তো ঠিক তটা ট্রে যাবে না। হিসেবটা করেছিলুম। তা টেন পার্সেন্ট কমালেও দেখলুম আমার হিসেবে আসছে না।

—শ্‌শালা—নিশান বলল— বলে ভাত-মাংস খাবি? না আঁচাবো কোথায়? এম.এ.তে ফেল করবি কি পাশ করবি তার কিনারা হল না। চাকরি পাবি, অ্যাট অল পাবি, না কোচিং করে সারা জীবন চালাতে হবে তার কিনারা হল না উনি দেখছেন নিজের বিয়ের গায়ে হলুদের স্বপ্ন।

—অতটা না অতটা না, অবন তিলকদার হয়ে সাফাই গায়। —ও তো শুধু ট্রে গুনছিল। ট্রে আসবে তবে তো গায়ে-হলুদ হবে। দিদিকে তো সবে ছাদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হলুদ ট্রে থেকে আগে বার হোক! ওরিন্দমের গায়ের হলুদ!

শর্মিষ্ঠা, অনিন্দিতা, এমন কি চঞ্চল তিলক নিশান পর্যন্ত লাবণির গায়ে হলুদ মাখাল আচ্ছা করে। ছেলেগুলো বলল, হলুদ লাগাতে না দিলে কনের পিঁড়ি ওঠাব না।

এ তো আচ্ছা শয়তান! —লাবণির কাকিমা বললেন। ওরা তেল-হলুদ নিয়ে রৈ রৈ করে তেড়ে আসছে, লাবণি কনের লাজ লজ্জা ভুলে খ্যাঁক খ্যাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল—এই চঞ্চল, এই নিশান, খবরদার গায়ে মাখাবি না, হোলির মজা পেয়েছিস না? এই কপাল পেতে দিচ্ছি, যা খুশি করো।

নিশান ফক্কড় নাম্বার ওয়ান— বললে, যাঃ প্রিয় বান্ধবী বলে কথা, সবটাই অরিন্দম ঘোষ একাএকি পেয়ে গেল? গায়ে-হলুদের একটু নিষ্পাপ-নির্দোষ 'গা' সেটুকুও আমাদের জুটল না? ছ্যাঃ, কপালটাই গা প্লাস ধা'র।

লাবণি মুখভঙ্গি করে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ ছ্যাঃ! তোদের মতলব আমি বুঝি না ভেবেছিস? সব অরিন্দমকে বলে দেবো, দেবে তখন তোদের শয্যা-তুলুনির টাকা! তুড়ুং ঠুকে দেবে একেবারে।

এই সময়ে দোলা এসে হাজির হল। উদরের সামান্য স্ফীতিটুকু আড়াল করতে সে একটা জমকালো শাল গায়ে দিয়েছে। মুখটা বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। গাঢ় মেরুন শালের পটে ম্যাগনোলিয়া ফুলের মতো ফুটে আছে মুখটা। কানে দিয়েছে বড় বড় রিং। তাতে এক ফোঁটা মুক্তো টলটল করছে। দোলার কপালে ছোট্ট খুব ছোট্ট একটা তিলের মতো মেরুন টিপ। হাতে মোটা সোনার বালা, গলায় মফ চেন। তিন হালি করে পরেছে। সে সাধারণত সালোয়ার কামিজ, কিংবা মিডি-স্কার্ট পরত। বাইরে জিন্‌স। গয়নার ধার ধারত না। কানের নানারকম গয়নার শখ ছিল তার, ধুম্বো ধুম্বো আংটি, কিন্তু হাতে ও ঘড়ি ছাড়া কিছু পরবে না, গলায়ও না। সেই দোলা সোনার মোটা বালা, তিন হালির হার পরে এসেছে, কপালে ছোট্ট হলেও টিপ, সিঁথিতে সরু একটা লাল রেখা, তাকে দেখাচ্ছে একেবারে অন্যরকম।

লাবণিকে ছেড়ে সবাই এবার দোলাকে নিয়ে পড়ল।

—কী হল! হরতনের বিবি। তোর সাহেব কোথায়? —নিশান বলল।

—সাহেবদের সকালের দিকে চাকরি-বাকরি থাকে, তোদের মতো বেকার? দোলার জবাব।

—তা রাতে আসবে তো গুরু? একটু গায়ে গা ঠেকিয়ে নিতাম মাইরি!

ঈষৎ গর্বের সুরে দোলা বলল—তার চেয়ে একটু ব্যায়াম-ট্যায়াম করো দেখি! গায়ে গা ঠেকিয়ে নিতে হবে কেন? কে আমার এলেন রে?

—আহা হা, ব্যায়াম করে না হয় চাট্টি মাসকুল করলুম, কিন্তু স্ট্রাকচার? স্ট্রাকচার পাব কোথায়? অমন মলাট বলেই না তোর মতো মালদার বাপের একমাত্তর কন্যেকে গেঁথে তুলেছে!

—একমাত্র কোথায় আবার? আমার দিদি আছে, জানিস না?

—ওই হল। ওই হল। যাঁহা দুই মাত্তর তাঁহাই একমাত্তর। ছোট মেয়েকেই মেসোমশাই-মাসিমা বেশির ভাগ সম্পত্তি দিয়ে যাবেন, দেখিস!

—যা না বলগে যা না আমার দিদিকে। কী করে দ্যাখ একবার।

দোলার আজ মেজাজ অসম্ভব ভাল। আগের মতো। পুরোপুরি নয়, অনেকটা। তাদের বাড়ি থেকে স্থির হয়েছে যত দিন না তার বাচ্চা হয় সে বাপের বাড়িতেই থাকবে। ক দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি অবশ্য তাকে যেতে হয়েছিল। নাম তা ওয়াস্তে একটা বউভাত ও প্রীতিভোজের ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু সেখানে দোলার অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। তার শ্বশুরবাড়িটা একটা বাড়িই না।

টেবিলে ওঁরা এক সঙ্গে বসে প্রায় খানই না। বাবা সকালে আগে খেয়ে বেরিয়ে যান, মা ভোর থেকে রেওয়াজ শুরু করে খেতে বসবেন ঠিক এগোরোটা। অমিতাভ বেরিয়ে যায় কোনওদিন নটা। কোনওদিন দশটা। সেই সময়েই রান্নার লোক তার খাবার বেড়ে দেয়। দোলার এখন অখণ্ড অবসর। শরীরের মধ্যেও সর্বদাই খাই-খাই। শ্বশুরের খাওয়ার সময়ে সে একদফা জলখাবার খায়, শাশুড়ি নিজে খাবার সময়ে গম্ভীরভাবে বলেন—তুমি বরং পরে খেও। একটা নাগাদ রান্নার লোক এসে তাকে খেতে ডাকে। তখন খিদেয় তার বত্রিশ নাড়ি পাক দিচ্ছে। একদিন সে শুনেছিল রান্নার মাসি তার শাশুড়িকে বলছে—নতুন বউয়ের খাউন্তি দাউন্তি ভালই মা, মেয়েছেলের অতটা খাওয়া, ঘরে লক্ষ্মী থাকে কি না দেখেন। লোকটি নাকি এদের অনেকদিনের। শাশুড়ি শুধু বললেন—আচ্ছা আচ্ছা সে আমি বুঝব। তোমাকে আর কর্তাত্বি করতে হবে না।

রাত্রেও যে এরা একসঙ্গে খাবে তা প্রায় ঘটেই ওঠে না। হয় মা বাড়ি নেই, নয় বাবা এখনও ফেরেননি, নয় অমিত এত সকাল সকাল খেতে চাইছে না কি সে-ও ফেরেনি। দোলার খিদের কষ্টে চোখে জল এসে যায়, শাশুড়ি অনেক সময়ে তাকে খাটো গলায় বলেন—তুমি কারও জন্যে বসে থেকো না দোলন, খিদে পেলেই খেয়ে নেবে, তোমার এখন যা অবস্থা...। কিন্তু অপরের বাড়িতে গিয়ে তো আর অমন চেয়ে চেয়ে আগে আগে খাওয়া যায় না!

একদিন রাত্রে একসঙ্গে বসা হয়েছিল। অমিতাভ সবে একটা ট্যুর থেকে ফিরেছে। অমিতাভর বাবা বললেন—বিয়ে করেছ তুমি। বউকে আমাদের ঘাড়ে গছিয়ে দিয়ে যে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবে তা হবে না। এ মাস থেকে পাঁচশো করে টাকা বেশি দিও।

—পাঁচশো? তুমি তো জানো বাবা তা হলে আমার চলবে না।

—আজকালকার দিনে একটা মানুষের খাইখরচ পাঁচশোর থেকে বেশিই হয় অমু...।

দোলা রাত্রে অমিতের বুকে মুখ রেখে বলেছিল—আচ্ছা অমিত, তোমার সেই বন্ধু, সেই সল্টলেকের? তিনি তো থাকেন না, আমরা কিছুদিন সেখানে থাকতে পারি না? কেয়ার-টেকার তো সবই দেখে, রান্নাটা যা হোক করে আমি চালিয়ে নেব!

—উপাধ্যায়ের বাড়ি? ওরে বাবা সে মহা জেলাস হাউজ-ওনার। দেখি, বলে দেখতে পারি। তবে ও বাড়িটা আমার একটা দুঃস্বপ্ন।

—দুঃস্বপ্ন কেন? আহত, বিস্মিত দোলা বলেছিল।

—ওই আর কি! একটা আনন্দ, একটা উপভোগ, যদি বাধ্যবাধকতায় এসে দাঁড়ায়...।

—এ কথা তুমি বলতে পারছ আমিত?

—আই ডোন্ট মীন টু হার্ট ইউ ডিয়ার, অমিত তৎক্ষণাৎ তাকে আদর করে। দোলাও আর কথা বাড়ায় না। কিন্তু কথাগুলো তার বুকে কাঁটার মতো বিঁধে থাকে।

এরপর বাবা-মা যখন প্রস্তাব করলেন বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত সে তাঁদের কাছেই থাকুক, কেউ আপত্তি করল না। দোলা বাঁচল।

অমিত উইক-এন্ডে এসে ঘুরে যায়। কিন্তু তার রাতে থাকাটা সুমনা খুব পছন্দ করেন না। জনান্তিকে মেয়েকে বলেন—এ সময়ে সাবধান থাকতে হয়। একবার চরম সংযমহীনতার পরিচয় দিয়েছ দোলা, সেটা সামলানো গেছে, বাড়াবাড়ি করলে তোমার এবং বাচ্চার দুজনেরই ক্ষতি হবে।

এর মধ্যে অমৃতার সঙ্গে দোলার আবার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছে। অমৃতা এই অবস্থাটা সম্পর্কে

সব জানে, সে দোলাকে উপদেশ দেয়। ডক্টর রঞ্জন কার্লেকরই দোলাকেও দেখছেন। দোলার খালি একটাই ভয়। ভয়টার কথা সে নিজেকেও স্পষ্ট করে বলতে পারে না। ভয়টা হল—এতদিন দোলা-সংসর্গহীন অমিতাভ কী করবে? কী করতে পারে? কালীপ্রসন্ন সিংহর 'মহাভারত' তার পড়া আছে। সবটা না হলেও বেছে বেছে মূল গল্পটা, আর যা যা ভাল লাগে সে পড়েছে। সেখানে উল্লেখ আছে গান্ধারী যখন এক বৎসর গর্ভধারণ করেছিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্রের মনোরঞ্জন করত এক দাসী। অর্থাৎ গর্ভধারণের সময়ে স্ত্রীসংসর্গ না হলে স্ত্রীলোক-সংসর্গ দরকার হয় পুরুষদের। এই সময়টায় 'মহাভারতের কথা অমৃত-সমান' মনে পড়ে তার পুরো শরীর-মন-গরল-সমান বলে মনে হয়। বিশেষত এই এত দিনেও অমিতাভর মনের নাগাল সে পায়নি বলে। কী আছে ওই রূপবান পুরুষের মনে? ওর বাবা বলেন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন, মা বলেন ও চঞ্চলস্বভাব, সব মানুষ যারা ওর অল্পস্বল্প সংসর্গে এসেছে তারা বলে ও চা-র্মিং, ফ্যানটাসটিক, বউভাতে ওর অফিসের কাউকে নেমতন্ন করেনি অমিত। বন্ধু-বান্ধবী কজন এসেছিল। বান্ধবীরা বলল 'দেখি ভাগ্যবতীটি কে? কেমন?' আর বন্ধুরা বলল সেই এক স্ট্যান্ডার্ড কথা, ক্লিশে,—'লাকি গাই। লটারির প্রাইজ জিতে গেলি রে শালা।' তার নিজের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ দোলা করতে পারে না। যদি ভাল না লাগত তবে কি আর অমন উন্মাদের মতো প্রেমে পড়ত সে? কিছুতেই সে ভুলতে পারে না, অমিত তার সেই উন্মাদনার সুযোগ নিয়ে... না না অবশ্যই তারও অংশ আছে, আর কে এ কথা বলেছে যে অমিতও উন্মাদ হয়নি? তার সেই ফোনালাপ, হুগলি নদীর ধারে জেটিতে, জু-গার্ডেনে, ভিক্টোরিয়া বা মিউজিয়ামের অভ্যন্তরের পাতা সিটগুলোয় কি স্তম্ভের অন্তরালে সে-ও তো এক অমিতকে দেখতে পেয়েছিল, যে তার প্রেমে উন্মাদ! তবু, দোলার গর্ভিণী হওয়ার সংবাদে সে অত বিরক্ত কেন? প্রেশারাইজ করার কথাই বা কেন তুলল সে? বিয়ের কথায় বিষণ্ন হয়ে গেল কেন?

দোলার বিয়ের বাসর খুবই জমেছিল। দোলাকে ছাড়াই। কিছুক্ষণ হই-চই এর পর দোলার শরীর খারাপ লাগছিল, সুমনা তাকে অন্য ঘরে শোয়াতে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকেই সে বাসর ঘরে অমিতের উল্লাসভরা গান, সমবেত শালা শালিদের উচ্ছ্বাস, চিৎকার যাকে বলে হট্টরোল, আর হাহা হিহি হুহু শুনতে পাচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল তাকে যে-ভাবে সম্মোহিত করে ফেলেছিল অমিত, তার অ্যাপলো, না কি ডায়োনিসাস, ঠিক সেই একইভাবে সে সম্মোহিত করে ফেলছে এক ঘর মানুষ-মানুষীকে। অনেক মানুষ ঈর্ষা করছে ডায়োনিসাসকে তার রূপ, তার জমাবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে, কিন্তু সে আর কতটুকু? বড়র কাছে ছোটর তো হারই হয় সব ক্ষেত্রে। তাই আত্মসমর্পণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা চেলা বনে যাচ্ছে ডায়োনিসাসের। অনেক মানুষীও ঈর্ষা করছে তাকে, দোলাকে, এই অপরূপকে সে পেতে যাচ্ছে বলে, ঈর্ষার কাঁটা বুকে নিয়ে তারা অন্তত একটা রাত এই বাসররাতটুকু তাকে, ডায়োনিসাসকে মুগ্ধ করবার জন্যে নানা ছলাকলা প্রয়োগ করছে, দেবদাসী বনে যাচ্ছে, এবং তুমুল হয়ে উঠছে গান, রসিকতা, ইয়ার্কি। আদিরসাত্মক। আর ভিন্ন ঘরে গাঁটছড়া সুদ্ধ তার ওড়না তার অমিতাভের উত্তরীয় বুকে জড়িয়ে তার মনে হচ্ছে ওই গাঁটছড়াটা লাল নয়, নীল, কিংবা সবুজ, তার ঈর্ষার গরলে। এত তো বন্ধু তার। কত জন তার চেয়ে রূপসী, তার চেয়ে লেখাপড়ায় ভাল, তার চেয়ে সফল, জনপ্রিয়, কিন্তু কারও ক্ষেত্রে এই সর্বগ্রাসী ঈর্ষা তো তাকে কখনও আক্রমণ করেনি! তার ইচ্ছে করে, গাঁটছড়াসুদ্ধ ওড়না তার উত্তরীয় দুটোকে সে ছুড়ে ফেলে দেয় এক কোণে, লাল টকটকে বেনারসি আর প্রচুর অপূর্ব-অপূর্ব গয়নায়-প্রসাধনে সত্যিকারের রানির মতো ক্রোধে, অধিকার বোধে, মর্যাদায়, আদেশে—আপাদমস্তক শরের মতো সোজা করে সে প্রবেশ করে ওই বাসর ঘরে, বলে, বন্ধ কর বন্ধ কর এই স্যাটার্নেলিয়া—এই অশ্লীল উৎসব, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা সবাই। ওই পুরুষ, রাজাই বলিস আর দেবতাই বলিস—ও আমার, একা আমার। বড় কঠিন মূল্যে ওকে জয় করেছি, তবু ভয় যেতে চাইছে না। তোরা যা-আ-আ।

কিন্তু যাবে কী! বমির ভাব তার অনেকটা দূর হয়েছে। এখন সবকিছুতে সে একটা মারাত্মক

শ্বাসরোধী গন্ধ পায়, পেট বুক সব কিছু গুলিয়ে উঠছে রজনীগন্ধার গন্ধে, নানারকম সুগন্ধির সৌরভে, খাবারের গন্ধে। তার এই অবস্থার জন্য দায়ী পুরুষটি কেমন মুক্তমনে মুক্ত শরীরে মজা লুঠছে! সে, খালি সে, নারী বলে ওই পুরুষের সঙ্গে কামক্রীড়ার যাবতীয় দায় বহন এক ধনীর নিষ্পাপ আদরের দুলালী থেকে এক রোগগ্রস্ত, ভয়কাতর, ঈর্ষা-কাঙালিনী মানবীতে পরিণত হয়েছে। হে জিউস! হে ঈশ্বর! হে আল্লাহ্! এ তোমার কেমন বিচার?

ফুলের গয়নাগুলো ছুড়ে ছুড়ে খুলে ফেলে দেয় সে যেখানে সেখানে। সে, যে নাকি ফুল পাগল ছিল এককালে। ফুলের গন্ধে কেমন একটা বিশ্রী নারকীয় ভয়, যেন এ পৃথিবী মানুষের মন। ভূতের, পেত্নির, শাঁকচুন্নির, এখানে বড় বড় উনুনে বড় বড় কড়াইয়ে নরমাংস সেদ্ধ হচ্ছে।

এই সময়ে সুমনা আবার ঢুকলেন। সারাদিন মেয়েটাকে কঠিন কিছু খাওয়াতে পারেননি। এই মাঝরাত্তিরে নিজের হাতে চামরমণি চালের গলা গলা ভাত আর কইমাছের ঝোল নিয়ে এসেছেন। সময় মতো ঝোলটা রান্না করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলেন, ভাতটা এইমাত্র করলেন প্রেশার-কুকারে, তিনি জানেন বাসমতী খেতে পারছে না দোলা। গন্ধঅলা জিনিস সে যত সুগন্ধই হোক, তার কাছে বিষ লাগছে।

মৃদু আলো জ্বলছে ঘরে। চারদিকে মালা, ওড়না ছড়ানো। যেন বিয়ের রাতেই বিধবা হয়েছে মেয়ে। তিনি কাছে গিয়ে বুঝলেন, দোলা চোখ বুজিয়ে আছে বটে কিন্তু ভেতরের কান্নার আবেগে তার ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে। দোলা, তাঁরই দোলা, দোলনসুন্দরী।

তিনি নরম গলায় ডাকলেন—দোল।

অনেকদিন পরে মায়ের এই আদরের ডাক শুনতে পেল দোলা। তার কান্না আর বাধা মানল না। কূল ছাপিয়ে বন্যার মতো ফুঁসতে লাগল।

—দোল বড্ড কষ্ট হচ্ছে গন্ধে, না?

দোলা মায়ের বুকে মুখ গুঁজল। রুদ্ধস্বরে বলল—মা, আমার পেটে কে এসেছে? একটা রাক্ষস, না একটা দানো, না কী? যে আমার এমন...

তাকে জড়িয়ে ধরলেন সুমনা, বললেন—আমারও ঠিক এমনি হয়েছিল মা, ঠিক এমনি। কিন্তু জন্মালি তো তুই!

—সত্যি মা? তা হলে তোমাকে এত কষ্ট দিয়েছি বলেই কি আমি এমন...

—দূর। সন্তান জন্মের সময়ে হরমোনের যে বদলগুলো হয়, তার জন্যেই এমন হয়। পুরো সিসটেমটাই... যাই হোক তুই খেয়ে নে।

—আমি খেতে পারব না মা।

—পারবি। ঠিক যা যা তোর ভাল লাগবে তাই-তাই আমি এনেছি।

আগে ফুলগুলো ঘর থেকে বার করে দিলেন সুমনা। বিয়ের সাজ খুলে ফেলে—একটা পুরনো নাইটি পরিয়ে দিলেন। তারপর নিজের কোলের ওপর একটা মেয়ের কোলের ওপর একটা তোয়ালে পেতে—কই মাছের ঝোল দিয়ে চামরমণি চালের গলা-গলা ভাত মেখে, বললেন—খা।

ঘুমের ঠিক আগে তন্দ্রার আবেশে মার কোমর জড়িয়ে শুয়ে দোলার আবছাভাবে মনে হচ্ছিল যুগ-যুগান্ত শুধু এই চেয়ে এসেছে সে। মায়ের কোল, মাতৃসঙ্গ, এর চেয়ে বড় চাওয়া আর পাওয়া তার জীবনে আর নেই। কিন্তু এমনই আয়রনি জীবনের যে এক পুরুষ-আসঙ্গ না ঘটলে সে তো আসতই না মায়ের জীবনে, মা তো মা-ই হত না। এবং এই আশ্রয় ছেড়ে প্রকৃতির অমোঘ বিধানে সে স্বেচ্ছায় ধরা দেবে, দিয়েছে, পুরুষেরই বাহুতে যে তার এত যন্ত্রণার মূল। এবং আবারও সে জন্ম দেবে হয়তো এক কন্যার যাকে সে ভালবাসবে, আশ্রয় দেবে, জীবনসর্বস্ব মনে করবে, এবং এত সব জেনে, উপলব্ধি করেও সেই কন্যা আবার পুরুষকেই চাইবে। যার থেকে হবে আরেক জন্ম, আরেক মা, আরেক যন্ত্রণা... এইভাবে যুগের পর যুগ, যুগের পর যুগ, যুগের পর যুগ..

অদ্ভুত! আজ কিন্তু দোলা লাবণির বিয়েতে এসেছে প্রাণভরে ওই সুগন্ধি, নতুন শাড়ি, রজনীগন্ধারই গন্ধ নিতে। আর খুব লজ্জার কথা সে বিশেষ করে এসেছে—খেতে। গায়ে হলুদের সকালবেলায় ঘরযোগে একটা ভারী সুন্দর খাওয়া হয়। উত্তর কলকাতায় যে সামান্য কটি বাড়িতে হালুইকর বামুনের ট্রাডিশন এখনও চলছে, লাবণিদের বাড়ি তাদেরই একটা। আজ সে খাবে ছ্যাঁচড়া, বোঁটাসুদ্ধ লম্বা বেগুন ভাজা, মাছের মুড়ো দিয়ে মুগের ডাল, কষে কষে কষে এইটুকু করে ফেলা বাঁধাকপির ঘণ্ট, ওপরে বড়ির গুঁড়ো ছড়ানো থাকবে, আর বড় বড় মাছের দাগা দিয়ে কালিয়া। কে জানে হয়তো ডিম-ভরা পার্শে মাছ ভাজাও পাতে পড়বে। ভাবতেই জিভে জল এসেছিল তার। আর তাই সে তাড়াতাড়ি সেজে-গুজে বাবার গাড়িতে করে চলে এসেছে লাবণিদের বাড়ি। এসেই গরম-কফি খেয়েছে, তার পরেই বড় বড় দুটো কমলাভোগ, গায়ে-হলুদের তত্ত্বের শিঙাড়া, নিমকি। খাচ্ছে সে, পাল্লা দিয়ে খাচ্ছে তিলক, চঞ্চল, নিশানদের সঙ্গে। চেটেপুটে। এবং কেউ কেউ লক্ষ করছেন টসটসে সুন্দর মুখশ্রীর রঙ-ফেটে পড়া জলুষদার মেয়েটির অস্বাভাবিক খাওয়া। গিন্নি-বান্নিরা পরস্পরকে বলাবলি করলেন—ছেলেপিলে হবে। জনান্তিকে মানে মেয়ে-মহলে তাঁরা মেয়েটিকে বাগে পেয়ে জিজ্ঞেসও করেছিলেন। —'তোমার ক'মাস গো মেয়ে?'

দোলা লজ্জায় লাল হয়ে সেখান থেকে সরে যায়। বিয়ের রাতে সে আরও খাবে। তখন নাম-করা কেটারার। নিজের বিয়েতে যা-যা খেতে পায়নি, স-ব খাবে সে প্রাণ ভরে, আশ মিটিয়ে।

এবং রাতে আসবে তার অমিত, অমিতাভও। দুজনে আসবে যুবরাজ যুবরানির মতো সেজেগুজে হয়তো বা এ বাড়ির বর-কনেকে রূপজৌলুষে ম্লান করে দিয়ে।

'দোলা, দো-লা,' ট্যাকসিতে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল অমিতাভ। আইসক্রিম পিঙ্করঙের ছোট্ট ছোট্ট রুপোলি টিপ দেওয়া একটা শাড়ি পরেছে দোলা, মুক্তোর গহনা। তার সোজা চুল খোলা, আয়রন করা। কানের পাশ দিয়ে তীক্ষ্ণধার কালো স্রোতের মতো মাঝ-পিঠ অবধি নেমেছে। অমন অপূর্ব রূপবতী তাকে বুঝি কখনও লাগেনি অমিতাভর। তার নেশা লাগছে। নেশার ঘোরে সে ভাল করে নিশ্বাস নিতে পারছে না। বিয়ে-বাড়িতে অত সুসজ্জিত মেয়েদের মধ্যে দোলাকেই বারে-বারে, ঘুরে-ঘুরে দেখেছে সে। যেন নতুন বউ। ট্যাকসি-ড্রাইভারকে আগেই দেড়শো টাকা দিয়ে রাখল সে। বলল, চলো গঙ্গার ধার দিয়ে। ট্যাকসির মধ্যেই অদ্ভুত কায়দায় মিলিত হল তারা।

—অমিত, তুমি আমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসো না...না?

—চুপ, চুপ এখন ওসব কথা বলে না।

—অমিত, একবার বলো তুমি শুধু আমার, আমাকে ছাড়া আর কাউকে...

—সাইলেন্স ডিয়ার। —আগ্রাসী চুম্বনে মুখ ভরে যায়, কথা থেমে যায়। ভীষণ জরুরি কথা সব।

অনেক রাতে বাড়ি ফেরে তারা। যেন বিবাহিত দম্পতি নয়। প্রেমিক-প্রেমিকা। ঠিক তেমনি গোপনতার সঙ্গে বাড়ির দরজায় তাকে ছেড়ে দেয় অমিত।

সুমনা-সব্যসাচীও ঘরবার করছেন।

—কী রে? এত দেরি?

—ওরা ছাড়ছিল না কিছুতেই।

—এত গয়না-টয়না পরে, আমার খুব ভয় হচ্ছিল দোলা—সুমনা বললেন।

—সোনা তো পরিনি মা, ওইজন্যেই আরও... কথা শেষ করে না দোলা। ওইজন্যেই, কী? সাহস? দেরি? ব্যাখ্যা করে না কিছুই।

—অমিত কোথায়? নামল না একবার?

—না, বড্ড দেরি হয়ে গেছে যে! ওঁরাও তো ভাববেন।

ওঁরা বলতে কৃষ্ণা সেন এবং তাঁর স্বামী? একেবারেই ভাববেন না। সদরের আলাদা চাবি থাকে

অমিতাভর কাছে। সে কখন আসে, কখন যায়, আদৌ আসে কি না সে খবর ওঁরা রাখেন না। সাড়ে আটটায় ওঁদের রাতের খাওয়া, সাড়ে নটার মধ্যে শুয়ে পড়েন।

সুমনা বললেন—না হয় একদিন থেকেই যেত। একটা ফোন করে দিতাম!

—ছাড়ো তো!

দোলা আবার ফিরে এসেছে তার পুরনো মেজাজে, ফিরেছে গোপনতায়, মিথ্যায়, নির্লজ্জতায়, নইলে কী ভাবে সে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে...

মাঝরাত্তিরে তার ঘুম একটুর জন্য ভেঙে যায়, কে যেন বলে ওঠে 'আপনাকে তো বাইরে থেকে বেবুশ্যে বলে প্রত্যয় হয় না ; সেকালে ওই ছোকরাটাই বেবুশ্যে। খানকি একটা...।'

দোলা একবার চমকে ওঠে। তারপর পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

২৪

রেজাল্ট সম্পর্কে অনেক রকম গুজবে রটতে শুরু করেছে। কেউ বলছে শর্মিষ্ঠা পাইন ফার্স্টক্লাস পেয়েছে, সে হলফ করে বলতে পারে, ভেতরের খবর। কেউ বলছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবারের ফলাফল, কে? কে? দোলার ফোনটা যখন এল অমৃতা এরকম কিছু গুজবই আশঙ্কা করছিল। মা ডেকে দিল। দোলার মনের মধ্যে এত তাড়া যে সে অমৃতার মায়ের কুশল জিজ্ঞাসা করতেও ভুলে গেছে।

—কে?

—আমি দোলা বলছি।

—বল, চঞ্চল ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছে এই তো!

—না, না, ওসব না।

—তবে বল কেমন আছিস। দুজনে, না না, তিনজনে?

—ভাল না রে অমৃতা

—এখনও শরীরটা...

—শরীর ঠিকই আছে। মন...

—সে কী? কেন? —নিজের জীবনে চূড়ান্ত দুর্দৈব ঘটে গেছে, তবু যেন অমৃতার বিস্ময় আর ফুরোতে চায় না।

—একটু আসবি?

—তোদের বাড়ি? বড্ড দূর যে রে! টুটুলকে ছেড়ে অতক্ষণ

—তা হলে মাঝামাঝি কোথাও। ধর ব্লু-ফক্স?

—আমার সে রেস্ত কোথায় বল?

—খরচ তো করব আমি। তোর কী?

—ঠিক আছে।

ব্লু-ফক্সের আবহে অমৃতা আর দোলা। অমৃতার পছন্দের রং নীল, হালকা সমুদ্র-সবুজ, লাইল্যাক, দোলার পছন্দের রং কমলা, মেরুন, গোলাপি। অথচ দুজনেই আজ হলুদ বনের কলুদ ফুল হয়ে এসেছে। কলেজ হলে এই নিয়ে কত বিস্ময় কত উচ্ছ্বাসে ঘণ্টাখানেক তো কাটতই। সবই তো বুদবুদ, কথা ভাবের, ভাব মেজাজের। এখন বুদবুদ নেই, দুজনে একই রঙের শাড়ি পরে, সে সম্পর্কে একেবারে অচেতন হয়ে গ্রিল্‌ড্‌ ফিশ-এর সাজানো প্লেটের সামনে বসে আছে।

দোলার মুখ এমন যে আর দু-এক বছর আগে হলেই অমৃতা ভাবত দোলা এখ্‌খুনি বলে

উঠবে—জানিস অমৃতা, আমার তোর ওপর ভীষণ রাগ হয়েছে। তুই কেন...। চা, ক্ষমা চা। কিন্তু সেই ছেলেমানুষির মায়া আর বোধ হয় সে মুখে নেই।

সে বলল—এমন জরুরি তলব? কী ব্যাপার রে?

—অমৃতা, একটা বাচ্চাকে একা একা বড় করতে খুব কষ্ট, না রে?

—খুব কষ্ট, আবার খুব আনন্দও রে। পৃথিবীর সব মায়েরা কাজটা স্বচ্ছন্দে করে এসেছে। নইলে কি আর পারত!

—কিন্তু তাদের তো পাশে কেউ একজন থাকত! ন্যাপি-বদলে না দিলেও, ফিড না করলেও, একজন...। তুই এমন একা-একা...কথা শেষ করতে পারে না দোলা।

—হ্যাঁ, মাসি আছেন, মা-বাবা আছে, তবু শেষ পর্যন্ত আমি টুটুলের বাবা-মা দুটোই।

—কী করে পারিস?

—আমি তো গোড়ার থেকেই... জানতামই তো

—অমৃতা, তুই বিয়ের আগেও অনেক দায়িত্ব নিয়েছিস। নিতিস। হয়তো তাই পারছিস। কিন্তু আমি...আমার পক্ষে একা একা

অমৃতা চমকে বলল—একা? কেন?

দোলা মুখ নিচু করে ফেলেছে। ফর্সা মুখ কেমন রক্তহীন দেখাচ্ছে। সে বলল—কাউকে বলিস না অমৃতা, আমার কেমন মনে হচ্ছে বাচ্চাটাকে আমায় একা একাই মানুষ করতে হবে। ওর বাবা... ওর বাবা...

—ওর বাবা কী? ও কি তুই কাঁদছিস দোলা?

—বিয়েটা বোধহয় আমি ঠিক করিনি রে। সবার মতের বিরুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমার বাবা-মা, ওর বাবা-মা, দিদি-পার্থদা সব্বাই। কী জানি হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে, হয়তো এসব সংশয়ের কথা এখনই কাউকে বলাও আমার উচিত হচ্ছে না। কিন্তু একমাত্র তোকেই বিশ্বাস করে বলতে পারি। —দোলার স্বর ভেঙে গেছে।

—ব্যাপারটা কী বলবি তো?

—ও তো গোড়ার থেকেই বাচ্চাটা চায়নি।

অমৃতার মুখ শক্ত হয়ে গেল নিজের অভিজ্ঞতার কথা ভেবে। সে বলল—তো?

—আমিও এটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। বিয়ের আগেই...অমৃতা প্লিজ আমাকে খারাপ ভাবিসনি।

—ভাবছি না। তুই বল।

—আমি টার্মিনেট করতে চাইনি বলেই বিয়েটা হল।

অমৃতা তার চূড়ান্ত বিস্ময়কে যত কম পারে প্রকাশ করে বলল—টার্মিনেটট করা গেলে কি বিয়েটা হত না?

—আমি জানি না, জানি না অমৃতা—দোলার চোখে রুমাল। রুমালের আড়ালে চোখ রাঙা হতে থাকে।

—আমি ওকে বুঝি না। উন্মাদের মতো ভালবাসি ওকে। কিন্তু প্রতিদান পাই কি না বুঝতে পারি না।

উন্মাদের মতো? সে ব্যাপারটা কী রকম? নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলা কী অমৃতা জানে না। বইয়েতে পড়েছে, কবিতায়, উপন্যাসে কত গল্প লেখা হল এ নিয়ে, প্রচুর, প্রচুর। লিখেছে সে সেসবের কথা পরীক্ষার খাতায় খাতায়। কিন্তু কোনও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নেই তার। দোলা পারে। সে পারে না। কিন্তু দুজনেই শেষ পর্যন্ত এক অবস্থানে পৌঁছচ্ছে। এই এক রঙের শাড়ির মতো। দোলার কমলা লাল উন্মাদনাও তাকে রক্ষা করতে পারছে না, তার শান্ত নীল প্রসন্ন সুমিত সবুজ কাণ্ডজ্ঞানও তাকে পারেনি। সে কী বলবে দোলাকে? কী বলবে এখন?

—দোলা, একটু ধৈর্য ধর।

—থাকেই না রে, কোথায় কোথায় ঘোরে জানি না। কতটা ওর কাজ, কতটা শখ...। ট্যুরে গেছে বলে জানি অথচ পার্থদা একদিন ওকে জে-ইউয়ের ক্যাম্পাস থেকে একদঙ্গল ছেলেমেয়ের সঙ্গে বেরোতে দেখেছে। তিলক দেখেছে রবীন্দ্রসদনে।

—আর কেউ সঙ্গে ছিল?

—জানি না। তিলক বলল তোর রোমিওকে দেখলুম অথচ তুই জুলিয়েট পাশে নেই!...আমি ওকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না অমৃতা। এ যে কী কষ্ট, কী ভয়ানক যন্ত্রণা...বলতে বলতে দোলা একেবারে ভেঙে পড়ল।

এখন লাঞ্চের আগের সময়টা। টেবিলগুলো রেডি করা হচ্ছে। খুব বেশি লোক নেই ভেতরে। দু একজন বেয়ারা ফিরে তাকাল।

—দোলা প্লিজ

—অমৃতা, আমি যে এই অবস্থায় বাবা-মায়ের কাছে এতদিন আছি, ওর তো কিছু দেওয়া উচিত। বাবা-মাকে না-ই দিল, আমাকে? আমাকে তো দেবে? দেয় তো না-ই। উল্টে আমার কাছ থেকে পাঁচশো, পরের সপ্তাহে হাজার এমনি করে চায়। বলে শোধ দিয়ে দেব। অমৃতা এ আমি কী করলাম! এখন এই জালের মধ্যে থেকে...তা ছাড়া ওকে দেখলেই আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুল হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অমৃতা বলল—আমাকে কী করতে বলিস!

অমৃতা সেই অমোঘ বাক্য বলতে পারত। আমাকে জিজ্ঞেস করে তো এগোসনি, আমি কী বলব! কিন্তু বলতে পারল না। তার বিপদের দিনে দোলা ব্লু-ফক্স থেকে বেরচ্ছিল। কিন্তু তবু দোলা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

—কিছু বল, কিছু অন্তত বল। তোর কী মনে হচ্ছে, কী মত!

—এখনই এসব নিয়ে মাথা ঘামাসনি দোলা, সে বলল, হয়তো তিলকে তাল করে দেখছিস। বাচ্চাটাকে নির্বিঘ্নে হতে দে। তবে...টাকাকড়ি আর একেবারেই দিস না। বলবি এক পয়সাও আর তোর কাছে নেই। তোকেই বরং ও কিছু দিয়ে যাক। মা-বাবার কাছে চাইতে তোর মানে লাগে। মানের কথাটা বেশি করে বলবি। যেগুলো নিয়েছে সেগুলোও তাড়াতাড়ি ফেরত দিক। কারও কাছে ও যেন ছোট না হয়ে যায়। তুই যে অবিশ্বাস করছিস, এটা জানতে না দেওয়াই ভাল বুঝলি দোলা? ঝগড়া, মান-অভিমান করিস না। হালকাভাবে জিজ্ঞেস করতে পারিস—পার্থদাকে ও জে.ইউয়ের গেটে দেখতে পেয়েছিল কি না, রবীন্দ্রসদনে কেন তিলককে চিনতে পারেনি। নিজেকে শান্ত রাখ দোলা। বাচ্চাটার ক্ষতি হবে নইলে। কোনও উন্মাদনার দোহাই দিয়েই বাচ্চাটার ক্ষতি করবার অধিকার তোর নেই।

মুখ ঢেকে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল দোলা। অপরিমিত যৌন আকর্ষণ, সন্দেহ, নিরাপত্তাবোধের এই তছনছ হয়ে যাওয়া কীভাবে ভেতরের সেই ছোট্ট হতে থাকা মানুষটিকে প্রভাবিত করছে তাতে এখন তার বিন্দুমাত্র এসে যায় না। অন্তত এখনও না। হুঁশই নেই তার।

শেষে সে বলল—অমৃতা, ঈশ্বর, ঈশ্বরই তো এই আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। এ তো একটা ফাঁদ দেখছি। প্রকৃতি চায় যেন তেন প্রকারেণ জন্ম হোক। আমাদের জন্য কোনও ভাবনা তো করে না! তা হলে হোক জন্ম—এই সন্দেহে, সংকটে, হোক, এভাবেই, যদি হয়।

চৌরঙ্গির রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অমৃতা ভাবছিল—কী আশ্চর্য! বুঝতে পারছে লোকটা সৎ নয়, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নয়, তবু দোলা ছুটে যাচ্ছে? এ কী রকম ভালবাসা? একেই কি ভালবাসা বলে? প্রাকৃতিক, জৈবিক, রাসায়নিক! সংকট দেখে, ত্রিভুজ দেখে আয়েষা নিজেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল, লাবণ্য নিজেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল, অচলা পারেনি, যতই তাকে পরিস্থিতির শিকার করে এঁকে থাকুন না লেখক, সে পারেনি। কিন্তু মিথ্যা কথা বলে, টাকা নেয় এরকম চরিত্রেরা কি নায়ক হয়? শরৎচন্দ্রের

সেই 'শুভা'র স্বামী এরকমটা করত বটে। গোবিন্দলাল এবং নগেন্দ্র এবং মহেন্দ্রও অবিশ্বাসী হয়েছিল, কিন্তু তারা কেউ মিথ্যাবাদী, চোর বা ইতর ছিল না। অথচ জীবনের নায়কদের দেখো। এরা খল, প্রেমহীন, বিবেক ও মর্যাদাবোধশূন্য, সে অমিতাভ সেনই হোক আর অরিসূদন গোস্বামীই হোক।

লাল আলো জ্বলেছে। সে জেব্রা দিয়ে রাস্তা পার হয়ে ওদিকে যাচ্ছে। এখনও চিন্তামগ্ন।

—এত কী ভাবছেন? জওহরলাল নেহরু রোডে ভাবসমাধি? সর্বনাশ! চমকে সে ফিরে দেখে—অরিন্দম ঘোষ। তার ভঙ্গিতে খানিকটা গতিবেগ তখনও বোঝা যাচ্ছে।

লাল বাতিতে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। সারি সারি সারি। নিজের গাড়ি ছেড়ে ঝুঁকি নিয়ে নেমে এসেছে অরিন্দম।

—শিগগির আসুন, শিগগির...

এত তাড়া যে প্রতিবাদ করবার সুযোগই পেল না সে। অরিন্দমের পেছনে পেছন তার মারুতি এইট হানড্রেডের সামনের সিটে গিয়ে বসল।

—এদিকে কোথায় এসেছিলেন? আপনাকে এখানে দেখে একটু অবাকই হয়ে গেছি।

—পার্ক স্ট্রিটে এসেছিলাম, দোলার সঙ্গে।

—বাঃ খুব আড্ডা মারছিলেন? তা দোলা কই?

—ও তো সাউথে। চলে গেছে। আমি এখন সল্টলেক। তা আপনিই বা এমন উত্তরমুখো কেন? এই ঠিক দুপ্‌পুরবেলায়?

—বাঃ আমার শ্বশুরালয় যে গোয়াবাগানে। ভুলে গেলেন?

—দুপ্‌পুরবেলা...ছুটির দিন নয়...শ্বশুরবাড়িতে কেন যাচ্ছেন? ঢেলা মারতে?

—ঢেলাই বটে। আজ শনিবার ম্যাডাম, খেয়াল আছে? শনিবারগুলো আমাদের ছুটি থাকে। প্রজেক্টের কাজ পেন্ডিং থেকে গেলে অবশ্য যেতেই হয়। এ তো আর সরকারের খাস খিদমতের চাকরি নয়। তবে এ সপ্তাহে ফর্চুনেটলি আমার তেমন কিছু নেই। ছোট গিন্নি মানে আমার বউ বাপের বাড়িতে আছেন। রাত্তিরে খুব খ্যাঁট হবে। তারপর তাঁকে ট্যাঁকে নিয়ে বাড়ি ফিরব।

সুখী-সুখী, নতুন বিয়ে হওয়া, ফুরফুরে রসিক মেজাজের জামাই বেশ।

সে বলল—বউ তো বুঝলাম। ছোট গিন্নি কেন? আপনার কি দুই বিয়ে?

—ওহো! অরিন্দম হেসে উঠল—বাড়িতে আমার মাতৃদেবীই বড় গিন্নি পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, লাবণির কাজে কাজেই ছোটগিন্নি হতে হয়। তা, দুই গিন্নিতে দিব্যি জমে গেছে দেখছি। এখনও পর্যন্ত। নারদ ঠাকুরকে ডাকতে হয়নি।

অমৃতা হেসে ফেলল।

—খুব আদর আপনার সব বাড়িতে? না? মায়ের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি?

—অর্জন করতে হয়! গর্বের ভাব অরিন্দমের গলায়। এমনি এমনি হয় না। কত তেল যে মারি! কী বাবা-মা, কী শ্বশুর-শাশুড়ি-শালাকে—তা যদি জানতেন?

—আর লাবণিকে?

—লাবণি! ওরে বাবা। তাকে তো তেলের ওপরই রেখেছি। ভাসিয়ে। তেল কইয়ের মতো। তা আপনার খবর বলুন? আপনার দেবশিশু কেমন আছে?

—ভাল। কিন্তু দেবশিশুর খবরে আপনার কাজ কী?

অরিন্দম সামান্য চমকাল। একটু মন দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল। চিত্তরঞ্জন-হ্যারিসন রোডের বাঁকটা পেরিয়ে বলল—একথা কেন বললেন?

কেন যে বলল কথাটা অমৃতা জানে না। একটা সময় এসেছিল, যখন দৈব-দুর্বিপাকে পড়ে সে বহুজনের সাহায্য ও মনোযোগ পেয়েছে। সেটা তো চিরকাল চলতে পারে না! অথচ কেমন একটা অভিমানের সুর তার কথাগুলোয়। এ অভিমান কার প্রতি? সে এমন অভিমান করতে চায়নি তো!

—এখনও যদি আপনাদের খবর নিতে যাই, আপনি বা অন্য কেউ হয়তো ভুল বুঝবেন, খুশি হবেন না। অরিন্দম আস্তে আস্তে বলল।

—সে আবার কী! আমি কেন অখুশি হব!

অরিন্দম হেসে বলল—অখুশি হয়তো হবেন না। কিন্তু খুব খুশি হয়ে উঠবেন, এমন মানুষ কি আমি? হয়তো ভুলেই যাবেন আমি এসেছি, বসে আছি...

এ-ও তো অভিমান!

অমৃতা বলল—এরকম করেছি বুঝি কখনও?

অরিন্দম আবারও হাসল, বলল—কী জানেন? সবাই তো নায়ক হবার ভাগ্য নিয়ে ভবরঙ্গমঞ্চে আসে না। সামান্য সহ-নায়ক, পার্শ্ব-চরিত্র বেশির ভাগই। দূতিয়ালির বেশি কিছু বরাতে জোটে না।

—অরিন্দমদা, জানি না নিজের অজান্তে আপনাকে কোনও... আপনার কাছে কোনও দোষ করে ফেলেছি কিনা. আপনি যা উপকার করেছেন, সে ঋণ আমি সারাজীবনেও...আপনি ভাববেন না সে সব আমি ভুলে যাব।

—আরে, আরে, অরিন্দম শশব্যস্ত হয়ে বলে—এসব কী বলছেন? দোষ-টোষ, কৃতজ্ঞতা, ঋণ-টিন! ছি! ছি!

অমৃতা এভাবে কখনও দাদা ডাকেনি অরিন্দমকে। না, লালটুদাও না, ঘোষদা তো নয়ই। হয়তো এই-ই ভাল। এই দাদা ডাক। এই কৃতজ্ঞতা, এই ঋণ স্বীকার!

অমৃতাকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিল সে। নিজে কিছুতেই নামল না। শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে সে, শ্বশুরবাড়ি বলে কথা!

—আপনি এলে, আপনারা এলে, আমি, আমরা ভীষণ খুশি হব—অমৃতা গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল।

অরিন্দম ভাবল—এ-ও হয় তো ভাল। 'আপনি' থেকে চকিতে 'আপনারা'য় যাওয়া, 'আমি' থেকে এই 'আমরা'। এই খুশি হওয়ার প্রতিশ্রুতি। এই সুস্বাগতম জানানো। অভ্যাগতকে।

আর অমৃতা তার বাড়ির ঘন্টিতে হাত রেখে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সে 'জীবনে'র নায়কদের ব্যর্থতার কথা ভাবছিল না? এই অরিন্দম সুপুরুষ, বলিষ্ঠ, ক্ষমতাবান, উদার, মার্জিত, দায়িত্বশীল—এ-ই তো জগৎ সিংহ? নাকি মানিকলাল? না কি বেহারি? শ্রী-বিলাস? কেন এমন নির্ভুল মানুষ নায়ক হতে পারে না? কিংবা হয়তো পারে। সে-ই জানে না।

২৫

-খুকি, শম্পা ডাকছে। টুটুলকে কোল থেকে নামিয়ে সে ফোন ধরল।

-শম্পা, বল? অনেক দিন তোর কোনও খবর পাই না।

-আমিও তো তোর...তুই আমাকে ভুলেই গেছিস।

-কে যে কাকে ভুলে গেছে সে কথা এখন মুলতুবি থাক। কেমন আছিস?

-ওই একরকম। অমৃতা, একদিন আমাকে একটু সময় দিতে পারবি?

-বেশ তো! চলে আয় না। সারাদিন খাব-দাব, গল্প করব।

-না বাড়িতে না। একটু প্রাইভেট কথা আছে।

-তবে কোথায়? তুই-ই বল।

-ধর, ধর ওয়লডর্ফ? আমি তোকে খাওয়াব কিন্তু।

-টুটুলকে ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না।

-ঠিক আছে। ধর ঘণ্টাতিনেক। তোকে পৌঁছে দেব।

ওয়লডর্ফের ড্র্যাগনের তলায় বহুদিন পর শম্পা অমৃতা। এখন দুজনেরই শাড়ি, দুজনেরই এক বিনুনি।

প্রাথমিক দু চারটে কথাবার্তার পর শম্পা বলল—তোর কাছ থেকে একটা পরামর্শ চাইব?

অমৃতা হেসে ফেলল, বলল—এখনও? দোলার কথাই মনে পড়ল তার। গম্ভীর হয়ে বলল—তোর তো এখন পরামর্শ দেবার লোকই হয়েছে।

শম্পা হাসল না। বলল—সমস্যাটা তো তাকে নিয়েই।

—সে আবার কী? অমৃতার বুক টিপটিপ করছে।

—জানিস, কিছুতেই আমার মাকে মেনে নেবে না। আমি দ্যাখ, নতুন সংসার করছি, ও-ও তো তাই। মা কিছু সাজেশান দিলেই গম্ভীর হয়ে যাবে, বলবে—বড্ড ইনটারফিয়ার করেন তোমার মা।

মা বেচারি ভাল মনেই আমাদের হেলপ্ করতে আসে। ও বলে—আমরা সাবালক হয়ে গেছি দুজনেই। আমাদের সমস্যা আমরাই সামলাব।

মা একদিন বলেছিল—তোমাদের থেকে অনেক আগে পৃথিবীতে এসেছি, এটা তো অন্তত মানো? হয়তো তোমাদের মতো শিক্ষা নেই, বুদ্ধিও নেই, কিন্তু কত দেখলাম, শুনলাম, এ সবের থেকে একটা সমাধান করবার ক্ষমতা আপনা থেকে এসে যায়।

—ও বলল, আপনাদের অভিজ্ঞতা আর আমাদের অভিজ্ঞতা এক নয়। দুটো আলাদা জেনারেশনের। প্লিজ মা, ডোন্ট ইন্টারফিয়ার...

মা সেদিন অপমানিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে।

অমৃতা বলল—তোর হাজব্যান্ড কিন্তু কথাগুলো মোটামুটি ঠিকই বলেছেন। যদিও বড্ড রূঢ়। অন্তত তেমনই শোনাল।

—সেটাই। আর মায়ের ইন্টারফিয়ারেন্স-এর নমুনা শুনবি? একদিন আমি অফিস থেকে খুব ক্লান্ত হয়ে ফেরায়, আর লোক না আসায়, মা রান্না করে দিয়েছিল। ওর জন্মদিনে পায়েস-টায়েস গুচ্ছের রেঁধে এনেছিল, তো আমার মাইগ্রেন আছে, সে সময়টা ঘর অন্ধকার করে মাথায় বাম লাগিয়ে ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বলেছিল। এর কোনটা ইন্টারফিয়ারেন্স বল তো? মা অভিমান করে আর আমাদের বাড়ি আসে না। অথচ আমাকে না-দেখে মা'র থাকা বা আমার মাকে না দেখে থাকা, একেবারে অসম্ভব। আমার বুক ফেটে যায়।

ওয়েটার ওদের জন্যে চিকেন উইথ ডাম্পলিংস নিয়ে এসেছিল।

অমৃতা ন্যাপকিন বিছোতে বিছোতে বলল—খাই?

—নিশ্চয়ই।

—তুই হাত গুটিয়ে রয়েছিস কেন? এই নে আমি দিলাম, খা।

—বলবি তো কিছু?

—ইট ইজ সো অব্‌ভিয়াস!

—কী অব্‌ভিয়াস?

—তুই মায়ের মতো আর কাউকে ভালবাসিস না, এটা তো ঠিক শম্পা?

শম্পা একটু ভাবল, বলল—মায়ের প্রতি টানটা এক জাতের, সৌমিত্রর ওপর টানটা অন্য জাতের। তুই তো জানিস মা আমার কী? একাধারে মা, বাবা, বন্ধু, সব।

—খালি স্বামীটা না।

—ধ্যার!

—শম্পা তুই তোর মায়া-মমতা, তোর গভীর ভাবনা-চিন্তার, আদরের সবটা দিস মাসিকে। মাসিও তোকে তাই দেন, তাতে তুই ভীষণ রকম পরিতৃপ্ত হোস। হোস না?

—ইয়েস, অফ কোর্স।

—আর সৌমিত্রকে তুই দিস কেজো কথা, ছেঁদো গল্প, আর...আর...রাতটা।

—অমৃতা! ছিঃ।

—ছিঃ কেন? তুই তো পরামর্শ চেয়েছিলি। আমি জানি, আমি বুঝি রে শম্পা। ওই...ওই বাজে লোকটাও আমাকে ঠিক এই দিয়েছিল। আমি মানিয়ে নিয়েছিলাম। তোর সৌমিত্র মানতে পারছে না।

—তুই আমাকে অরিসূদনের মতো স্কাউন্ড্রেলের সঙ্গে তুলনা করলি?

—শোন, তুই স্কাউন্ড্রেল নোস, তোর কোনও মতলব নেই, তুই নিষ্ঠুর নোস। কিন্তু শম্পা বিশ্বাস কর, দেওয়া দেওয়ির এই ব্যাপারটা একই। এখন তোর সৌমিত্র ইজ গেটিং জেলাস অফ ইয়োর মাদার, জেলাস অফ হার হোল্ড অন য়ু।

কিছুক্ষণ চুপ করে খাবারগুলোর দিকে চেয়ে রইল শম্পা। শূন্য চোখে। শেষে জলভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল—তাহলে কি আমাকে বেছে নিতে হবে একজনকে? অমৃতা!

—দূর পাগলি!

—তা হলে?

—তোকে আরও অনেক কঠিন কিন্তু অনেক সহজ একটা কাজ করতে হবে।

—কী সেটা? কঠিন আবার সহজ?

—তোকে অভিনয় করতে হবে, দ্বিচারিতা করতে হবে রে শম্পা। মায়ের কাছে বলবি সৌমিত্র মায়ের সম্পর্কে কত ভাল-ভাল কথা বলে, সারাজীবন অনেকে করেছেন তো! তাই ও মনে করে মায়ের আর তোদের জন্য দুর্ভাবনা, তোদের সেবা এসব করার দরকার নেই। সে মাকে মুক্তি দিতে চায়। ও খুব স্ট্রেইট-কাট। সোজা সরল হিসেব ওর। মায়ের যে করতে ভাল লাগে এ সেন্টিমেন্ট বোঝবার মতো মনই ওর নয়। কোনও দিন ফ্যামিলিতে থাকেনি তো!

—আর সৌমিত্র?

—সৌমিত্রকে প্রত্যেকটি ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবি। কী রান্না হবে থেকে, কী পরবি, কার সঙ্গে মিশবি, কে ভাল, কে মন্দ, আর...আর...নিজেকে অনেক অনেক বেশি করে দিবি!

—এত সব কথা তুই কী করে জানলি, অমৃতা? মোটে তিন বছর তো...

—শম্পা ওই তিন বছর আমাকে তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে গেছে। বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, মানব-চরিত্রের অনে-ক খুঁটিনাটি। জানিস, তবু, সমস্ত সয়ে, অত খেটে, ওদের সংসারটাকে মাথায় করে রাখবার পরও কেন আমায় প্রকারান্তরে খুন করতে চেয়েছিল—এটা আমি এখনও বুঝি না। ধর, আরেকটা বিয়ে করত, ডাউরি পেত—শুধু সেইটুকু? সেইটুকু? বাইরে থেকে শ্বশুর-শাশুড়িকে আনকালচার্ড, পজেসিভ টাইপ মনে হত, আর ওই লোকটাকে খুব প্র্যাক্টিক্যাল আনসেন্টিমেন্টাল টাইপ লাগত, কিন্তু ওর যে তিন-তিনটে বছরেও আমার ওপর এতটুকু মমতা জন্মায়নি, ও যে একটা শয়তান-স্বভাবের মানুষ এ আমি বুঝতে পারিনি। কাজেই শম্পা মনে করিস না মার বোঝাটা, আমার পরামর্শটাই চূড়ান্ত। আমি আমার বোঝাটুকু বললাম। এরপর তুই নিজে ভাব, নিজে লক্ষ কর, কার কোন ব্যবহারে অন্য জনের কী প্রতিক্রিয়া হয়। তার থেকে তুই তোর আচরণের ক্লু পেয়ে যাবি।

—তার মানে, সরল মনে আর বাঁচতে পারব না? শম্পার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

—শম্পা, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, সরল মনে আমরা কোনওদিন বেঁচে ছিলাম না। জটিলতাটা তখন আসত ভেতর থেকে, আমাদের অজ্ঞাতসারে, এখন জেনেবুঝে জটিল হতে হবে, কপট হতে হবে—এই।

শম্পার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে।

অমৃতা বলল—কাঁদছিস কেন? তুই এভাবে ভাব না—লোকে অপরের ক্ষতি করবার জন্য কপটতা করে, তুই কপটতা করছিস নিজের এবং আরও দুটি প্রিয়জনের জন্যে। দুটো সম্পর্ককে বাঁচাবার জন্যে।

—জানিস, ও ওত জেলাস যে বাচ্চা চায় না।

—এই দ্যাখ, আমি তো তবে ঠিকই বুঝেছি।

—কিন্তু আমি যে চাই অমৃতা।

—কী বাহানা দেয় তোকে?

—বলবে, দুজনেই চাকরি করি, কী করে বাচ্চা মানুষ হবে? আমার অ্যাটেনশন তখন নাকি পুরোপুরি চলে যাবে বাচ্চার দিকে। নিজের কথা বলে না, বলে আমার কাজের কেরিয়ারের ক্ষতি হবে।

—তুই যতদূর পারিস অসাবধান হয়ে যা বুঝলি? বাচ্চাটা যখন সত্যি-সত্যিই এসে পড়বে, তখন দেখবি সৌমিত্র বদলে গেছে। ভালবাসার আরেকটা মানুষ পেয়ে বেঁচে গেছে। আর মাসিরও সম্ভবত তাই-ই হবে। আফটার অল সৌমিত্র তো অরিসূদন নয়!

তার অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অমৃতার।

শম্পা সন্তর্পণে বলল—তোর এখনও অরিসূদনের কথা মনে পড়ে? মানে...

দূর... অমৃতা বলল—আমার দুঃখ হয় ভেবে যে জীবনের তিন তিনটে বছর আমার বাজে খরচ হয়ে গেছে। অরিসূদনকে আমি মন থেকে কোনওদিনই ভালবাসিনি। এখন ওটাকে শরীর থেকেও মুছে ফেলেছি। শম্পা, আমার ওর সঙ্গে সহবাসেরও কোনও স্মৃতি নেই। সেটাই তো জানতে চাইছিস?

—সেটা কি সম্ভব? অ্যাট অল সম্ভব অমৃতা? একটা দাগ, একটা স্কার থেকে যায় না।

অমৃতা বলল—নেই। নেই। আমি এখন কুমারী। মনে মনে এত বেশি যে শরীরেও তাই হয়ে গেছি।

—তোর যে একটা ছেলে রয়েছে রে!

—তাতে কী! ও তো আমার, আমার মায়ের। ও সীমান্ত। সত্যি বলছি শম্পা, আমার কুমারী অনুভব হয়। সেই মহাভারতে পড়েছি না সূর্যর ঔরসে কুন্তীর কোলে কর্ণ এলেন। তারপর তিনি আবার আগের মতো, অক্ষতযোনি কুমারী হয়ে গেলেন! সেই রকম!

—তুই আবার বিয়ে কর অমৃতা।

উত্তরে অমৃতা হাসল, বলল—ন্যাড়া বেলতলায় এর মধ্যেই? তা ছাড়া বিয়ে কি হাতের মোয়া? সবৎসা গাভীর যে দাম, সবৎসা মেয়ের কি সেই দাম?

অমৃতা-শম্পা এবার দুজনে দুদিকে যাবে। শম্পা যাবে দক্ষিণে—মেঘনাদ সাহা সরণি, অমৃতা যাবে পুবে, সল্টলেক, করুণাময়ী।

সল্টলেকে মা-বাবার কাছেই এখন থাকে অমৃতা। ছেলে সাড়ে পাঁচ মাসের মতো হয়েছে। মা-বাবার কাছে থাকাটাই তার স্বাভাবিক। কিন্তু সেই স্বাভাবিকটা কিছুতেই ঘটছিল না। তার গাফিলতিতে, মাসির আন্তরিক অনিচ্ছায়। সে প্রায়ই বলত—মাসি, আর কেন? এবার আমাকে যেতে দাও।' মাসির চোখ ভারী হয়ে আসত—'আমাকে' বলিসনি, বল 'আমাদের'। তোকে আটকে রাখি এমন কী অধিকার আমার আছে?

—অমন কথা বোলো না মাসি, মা না হয়েও তুমি আমার মা-ই।

—বলছিস?

—বলছি। আরও বলছি, খুব কষ্ট হচ্ছে তবু বলছি, তুমি আমার মায়েরও বাড়া, বাবারও বাড়া। প্রোটেকশন, সন্তানের যে প্রোটেকশন দরকার হয়, তা আমার মা বাবা কোনওদিন আমাকে দিতে পারেনি। বেচারি। এ কথায় তুমি কিছু মনে কোরো না মাসি, কিন্তু আমার মনে হয় ওঁরাই যেন

আমার কাছ থেকে নিরাপত্তা চেয়ে এসেছেন বরাবর। সত্যিকার প্রোটেকশন—বাচ্চাকে বুক দিয়ে আগলানো, এ আমি পেলাম তোমার কাছে। এটা কী জিনিস জানতামই না।

শিবানী বললেন—তাহলেই বোঝ তুই চলে গেলে, টুটুল চলে গেলে আমার কেমন দিন কাটবে।

এই কথার উত্তরস্বরূপই যেন সম্পদ এল। অমৃতার দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে, তার সন্তান জন্মানো, পরীক্ষা—সব কিছুই তাকে জানাতেন শিবানী। আর কে-ই বা আছে তাঁর, জানাবার? সম্পদ আসবার সুযোগ পায়নি, বিশেষ করে অমৃতা রয়েছে বলেই সে যেন আরও নিশ্চিত হয়ে ছিল। তার প্রণয়পর্ব কতটা এগোল, এসব নিয়েও সে অমৃতাকে লম্বা লম্বা চিঠি লিখত পরামর্শ চেয়ে। যেন তাদের লিঙ্গ আলাদা হলেও এক।

"তোরা মেয়েরা কি যাকে ভালবাসিস তাকে ঠোনা মারিস?

তটিনী আমাকে যখন-তখন ঠোনা মারে, ঠাট্টা-তামাশা করে একেবারে নাস্তানাবুদ করে দেয়। এটা ন্যাচারাল না কি রে?"

কিংবা,

"কী ধরনের উপহার তোরা পছন্দ করিস রে? ফুল না আইসক্রিম?

শাড়ি-ফাড়ি দেওয়া আমার আসবে না। আমার দ্বারা অতটা গেরস্ত হওয়া সম্ভব না।"

জানুয়ারি নাগাদ সম্পদ ক্যাম্পাস-ইন্টারভিউতে চাকরি পেয়ে গেল। তার মা এম.টেক. করবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেও সে কান দিল না একদম।

চাকরি বম্বেতে। কিছুদিন কলকাতায় থেকে বম্বে চলে যাবে। সম্পদ একা এল না। তটিনীও এল। ওয়াই.ডাবলু.সি.এ-তে উঠল, তবে বেশিরভাগ সময়টাই কাটাত ডোভার লেনে। সম্পদের সঙ্গে সিনেমা যাচ্ছে, সম্পদের সঙ্গে বাইরে খেতে যাচ্ছে, সম্পদের সঙ্গে কোনও বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে। এক-আধবার অমৃতাকেও সম্পদ অনুরোধ করেছিল। শিবানীকেও, বিশেষ করে বাইরে খেতে যাবার সময়ে। দুজনেই এড়িয়ে গেছেন। শিবানী বাড়িতে রান্না করে খাইয়েছেনও মেয়েটিকে। খুব ভদ্র, কিন্তু একটু যেন দূরে দূরে থাকতেই ভালবাসে তটিনী। অমৃতা যে তার সমবয়সী আরেকটি মেয়ে আছে বাড়িতে, তার সঙ্গে বন্ধুতা হওয়াটাই স্বাভাবিক, এটা তটিনীকে দেখলে মনে হয় না। যখন সকলে একসঙ্গে বসে, তটিনী শুধু সম্পদের সঙ্গেই কথা বলে, অমৃতাকে যেটুকু গুরুত্ব দেবার সেটুকু দেয় সম্পদ।

—আরে, অমৃতা, সেদিনের খুকি তুই, তোর আবার একটা টুটুল। ভাবতেও পারছি না!

—তোর কি মনে হয় অমৃতা, তটিনী যদি অন্য জায়গায় চাকরি পায়, তাহলে কেরিয়ারে স্যাক্রিফাইসটা কে করবে? আমি না ও?

তটিনী বলে—উই'ল ক্রস দা ব্রিজ হোয়েন উই কাম টু ইট।

একদিন অমৃতা টুটুলকে সবে ঘুম পাড়িয়েছে, ঘড়িতে আন্দাজ রাত দশটা, তার ঘরে ভারী পর্দা টানা। সে শুনতে পেল তটিনী নিচু গলায় জিজ্ঞেস করছে—বাট হু ইজ দিস অমৃতা? —ও হয়তো মনে করেছে অমৃতা ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত দশটা বেজে গেছে তো!

সম্পদ বলল—ইটস আ লং হিস্ট্রি তটিনী, বাট শী ইজ লাইক মাই সিস্টার।

তটিনী বলল—লাইক, বাট নট রিয়্যালি, আই থিংক আই ক্যান স্মেল কাফ-লাভ।

সম্পদ খুব হালকা হেসে বলল—দা কোয়েশ্চেন ডাজন'ট অ্যারাইজ। এনি ওয়ে হোয়াট ডাজ কাফ-লাভ মীন হোয়েন য়ু হ্যাভ রিয়্যাল, গ্রোন-আপ লাভ?

তটিনী বলতে বলতে গেল—ওয়ান নেভার নোজ। ইয়োর মাদার সিমস টু হ্যাভ আ ফিক্সেশন অন হার। আই ডোন্ট ফীল কম্ফ...

বাকিটা আর শুনতে পেল না সে।

সে ঠিক করল, আর না, কিছুতেই না, আরও অপ্রিয়-কিছু ঘটবার আগে তাকে সল্টলেকে চলে যেতে হবেই।

শিবানী বললেন—এই সময়টাই যে তোকে আমার দরকার ছিল। বিয়ের বাজার-টাজার করতে হবে।

—আমার কথা যদি শোনো মাসি, বাজারটা তটিনীর পছন্দমতো করো। বাকিগুলোর ব্যাপারে আমি তো আছিই। আসা-যাওয়া করব। কী আছে?

সম্পদের বিয়ে হল হায়দ্রাবাদে, রিসেপশন হল কলকাতায়, হনিমুন কেরালায় এবং বসবাস বম্বে। তটিনীও একই ফার্মে কাজ পেয়ে গেল। কয়েকদিনের উৎসব, হইচই, লোকজনের ভিড় থিতিয়ে গেলে শিবানী যে একা সেই একা।

অমৃতা আসে, থাকেও হয়তো একটা দিনরাত। কিন্তু সে এখন সল্টলেকেরই বাসিন্দা। শিবানী মনে মনে জানেন, অমৃতা ঠিকই করেছে, কিন্তু তাতে সান্ত্বনা পান না।

ওয়ালডর্ফের গেট দিয়ে বেরোচ্ছে অমৃতা আর শম্পা, ঢুকছেন ডক্টর কার্লেকর। সঙ্গে একজন মহিলা।

আরে! অমৃতা যে! রম্ভা এই মেয়েটি আমার পেশেন্ট। আর তুমি তো বুঝতেই পারছ ইনি আমার ধর্মপত্নী।

অমৃতা শম্পার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ডক্টর কার্লেকরের। পরে বেরিয়ে বলল—কী করে সৌমিত্রকে ফাঁকি দিয়ে একটা বাচ্চা বানিয়ে নিবি, সে বিষয়ে ডক্টর কার্লেকরের পরামর্শ নিতে পারিস।

শম্পা বলল—ধ্যাঃ, তোর মুখে আজকাল কিচ্ছু আটকায় না।

রঞ্জন কার্লেকরের রগের কাছটা শাদা হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু খুবই ফিট ভদ্রলোক। পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের বেশি বয়স হবে কী? চলাফেরা করেন একেবারে যুবকের মতো।

শম্পা বলল—এই ডাক্তারই তোর জন্যে এত করলেন। কী ভাল না?

হ্যাঁ খুব—অন্যমনস্কভাবে বলল অমৃতা। সে আসলে মনে মনে দেখছিল ভাবছিল রম্ভাকে। ভদ্রমহিলা লম্বায় কার্লেকরের কাছ পর্যন্ত চলে যান। ম্যাজেস্টিক, যেন কুঁদে তৈরি করেছে কেউ গ্র্যানাইট থেকে। মাথার চুলগুলো কোঁকড়া, গাঢ়, হেনারঙ, খুব একটা কায়দাদুরস্ত ছাঁট, ঘাড় ঢেকে ছোট্ট ছোট্ট থলোতে নেমেছে, চকচকে শ্যাম গাত্রবর্ণের সঙ্গে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। যেন বিষাদপ্রতিমা, অথচ রানির মতো। কোথায় যেন এমন রানির কথা পড়েছে, ক্লিওপেট্রা? কুইন ক্রিস্টিনা? জাহাঙ্গিরের মৃত্যুর পরের নূরজাহান? সে ঠিক মনে করতে পারছে না।

আজকাল সে সল্টলেকে থাকে বলে ডক্টর কার্লেকরের গাড়িটা প্রায়ই দেখতে পায়। উনি তাদের বাড়ির রাস্তায় ঢুকে বাঁদিকে চলে গেলেন, কিংবা ডানদিকের গলিতে। হয়তো তাদের বাড়িই আসছেন মনে করে সে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। নাঃ, উনি চলে যাচ্ছেন। তবে টুটুলকে দেখতে উনি প্রায়ই আসেন। কিন্তু ওঁর মিসেসকে কখনও দেখা হয়নি তার। যেন ডক্টর রঞ্জন কার্লেকর সবসময়েই একজন ডাক্তার। একজন দেবদূত। তাঁর অন্য কোনও পরিচয় নেই। বা থাকলেও অবান্তর। আজ মিসেস রম্ভা কার্লেকরকে দেখে সে যেন হঠাৎ বুঝতে পারল ডক্টর কার্লেকরের একটা অন্য জীবন, অন্য পরিচয় আছে। খুব শক্তিশালী সেই অন্য জীবনের প্রভাব তাঁর ওপরে। রম্ভা যেন চুম্বক-টানে অমৃতার সমস্ত মনোযোগ টেনে নিচ্ছেন। এমন ঋজু অথচ অমন বিষণ্ণ কেন? শক্তি যেন ওঁর সমস্ত আকৃতিতে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে? তবে? ওই ডাক্তারের মতো সফল, সুপুরুষ রসিক স্বামী যাঁর...? সে সিসটার মাধুরীর কাছে শুনেছে ওঁদের দুই ছেলেমেয়েই বাইরে পড়ে। সেইজন্য কী? আশ্চর্য লোক তো এঁরা! টাকা রোজগার করে মানুষ কী জন্য? সুখে, শান্তিতে, সপরিবারে থাকবে বলে তো? তা সেই পরিবারের

সবচেয়ে চমৎকার সদস্যদের বাইরে রাখতে হলে আর পরিবারেই বা কাজ কী! অত রোজগারই বা কেন? তবে, ধনী লোকেদের আদত এরকমটাই! তার টুটুলকে ছয় কি সাত বছর বয়স হলে সে কি বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দিতে পারবে? অথচ তাকে তো চাকরি করতে হবেই। হয়তো সর্বক্ষণ টুটুলকে সঙ্গ দেওয়া যাবে না। তাতে কী? তার সমাধান তাকে তার মায়ের সঙ্গ থেকে এইভাবে বিচ্ছিন্ন করা? হস্টেলে রেখে মানুষ করলেই ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত, চমৎকার চরিত্রের জোর এ সব লাভ হয়, ফলে সফল হওয়ার স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। মানল। কিন্তু তাহলে একজন মানুষীর গর্ভে একজন মানুষের ঔরসে কেন সন্তান আসে! কেন আসে অত প্রাণ গলা স্নেহ-মমতা? না, ডক্টর কার্লেকর এটা ঠিক করেননি। অত হাসিখুশি, আত্মবিশ্বাসী, মানুষ হিসেবে অত চমৎকার ডাক্তারের স্ত্রী নইলে অমন অসুখী হবেন কেন? সে শুনেছে ডক্টর রম্ভা কার্লেকর ডাক্তারি করেন না, তবে ওঁর অনেক অন্য কাজকর্ম আছে, হেল্‌থ ক্লাব-টাব। এগুলো কি দু দুটো টুটুলের চেয়েও জরুরি?

২৬

সেইদিনই বাড়ি ফিরে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখবরটা পেল অমৃতা। তার, তিলকের দুজনেরই ফার্স্ট ক্লাস এসেছে। শর্মিষ্ঠা বেচারি চার নম্বরের জন্য পায়নি। লাবণি মোটামুটি, দোলা কোনওমতে। চঞ্চল, নিশানেরও খুবই ভাল হয়েছে। ইংরেজিতে নিশান শতকরা ছাপান্নরও বেশি পেয়েছে, রীতিমতো ভালই বলতে হবে। এই ফলাফল সে আর তিলক আশা তো করছিলই। তবু, যতক্ষণ না হচ্ছে একটা কিন্তু থেকে যায়ই। তিলকই তাকে ফোন করে জানিয়েছিল খবরটা। সে সর্বপ্রথম জানাল শিবানী মাসিকে।

মাসি বললেন—কম খেটেছিলি? তার দাম পেয়েছিস। তারপর করল জয়িতাদিকে। উনি বললেন—খুব, খুব ভাল লিখেছ অমৃতা।

—দিদি, আপনি তো জানেন কৃতিত্বটা কার!

—আমি যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। কিন্তু আয়ত্ত করার কৃতিত্বটা নিশ্চয়ই তোমার। একটা ভাল কলেজে লেকচারশিপ পাওয়ার আর কোনও বাধা তোমার রইল না। নেট-স্লেট-এ বসো। ইচ্ছে হলে আই.এ.এস.-ও দিতে পারো। কিন্তু তাতে বোধহয় টুটুলের অসুবিধে হবে।

তৃতীয় ফোনটা শম্পাকে।

শম্পার গলা ভিজে, বলল—কত যে আনন্দ হচ্ছে, বলে বোঝাতে পারব না রে। অমৃতা, যত বাধাই আসুক, তুই অনে-ক অনে-ক দূর যাবি।

—একটা রেজাল্ট থেকেই এই কংক্লুশনে এসে গেলি?

—আমার কেন মনে হচ্ছে রে। তা ছাড়া, এটা আমার উইশ-ও বটে। যেন যাস। যেন অনেক উঁচুতে উঠিস অমৃতা!

তারপরের ফোনটা সে করল ডক্টর কার্লেকরকে। সকাল আটটা, এই সময়ে ওঁকে পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

—ডক্টর কার্লেকর আছেন?

—কে বলছেন?

রম্ভার গলা সে শোনেনি, কিন্তু শুনেই বুঝতে পারল। কণ্ঠস্বরেও যে এমন বিষাদের স্পর্শ থাকতে পারে, আগে কখনও বোঝেনি অমৃতা।

—আমার নাম অমৃতা চক্রবর্তী, আমি এম.এ.-তে খুব ভাল রেজাল্ট করেছি, তাই ওঁকে জানাচ্ছিলাম।

—আচ্ছা, আমি বলে দেব।

অমৃতা হঠাৎ বলে ফেলল—আপনাকেও, আপনাকেও জানাচ্ছি।

—কংগ্র্যাচুলেশন্স্।

—আপনি ভাল আছেন দিদি? ছেলেমানুষের মতো বলে উঠল অমৃতা।

ও পক্ষ চুপ। কিছুক্ষণ পর টেলিফোনটা রেখে দেবার শব্দ হল। উনি কি কিছু মনে করলেন? এত অন্তরঙ্গ সম্বোধন, অন্তরঙ্গ প্রশ্ন কি তার করা উচিত হয়নি! ওদের মহলে এ রকম কি কেউ করে না? একটা মাখামাখি করবার চেষ্টা সে করেছে এমনটাই কি মনে করলেন উনি? ছি! ছি! এমন ভুল তো সে কখনও করেনি! ওঁর ব্যক্তিত্ব এত উঁচু দরের এত জোরালো যে খানিকক্ষণের জন্য যেন তাকে অভিভূত, ছোট্ট ছেলেমানুষ করে দিয়েছিল। ছেলেমানুষ হবার সুযোগ যে কারও কাছেই পায়নি সে। না। মা, বাবার কাছেও না। এত দাম্ভিক উনি! স্নব। কেন যেন তার বোধিসত্তা বারবার বলতে লাগল না, না, দম্ভ নয়, এ দম্ভ নয়, আর কিছু।

পরদিন, তখন খুব সুন্দর শীত-শেষ প্রথম-বসন্তের অপূর্ব সকাল, আকাশে-বাতাসে কোথাও যেন কোনও মালিন্য নেই, সে বেরোচ্ছিল শিবানী মাসির কাছে যাবে বলে। সাফল্যের হর্ষ ছোঁয়া লাগিয়েছে তার দেহে মনে, সুদ্ধু একটু সামান্য ধূসরতা, রম্ভা কার্লেকরের রহস্যময় আচরণের কারণে, ডক্টর কার্লেকরের গাড়ি এসে থামল।

—কী? ফার্স্টক্লাস হয়েছে?

—ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট।

—ওহ্, ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল। থ্যাংক গড। তিনি তোমাকে দেখছেন অমৃতা। গাড়ির বুট থেকে একটা মস্ত কিছু টেনে বার করলেন উনি। বললেন, টুটুল কোথায়?

—টুটুল মায়ের কাছে।

—দাঁত বেরোল?

—হুঁ, দুটো। ওল্টাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে, পিছলে পিছলে সর্বত্র যাচ্ছে...

—ওর জন্যে একটা প্লে পেন এনেছি।

—প্লে-পেন?

—হ্যাঁ, ওটা ফোল্ডিং, ফাইবারের তৈরি, লাগবে টাগবে না, খুলে চার-চৌকো করে পেতে ওকে ভেতরে বসিয়ে দেবে, ভেতরে খেলনা রাখবে, টীদিং রিং রাখবে একটা, দেখবে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা...

—ও, পাশ করলাম আমি, আর উপহার এল টুটুলের।

—টুটুল আমার ছেলে না হয়েও ছেলেই, এটা বোধহয় তুমি বুঝতে পারো না, না?

—বুঝি বইকি। আপনিই তো ওকে বাঁচিয়েছেন। ...আমাকেও।

—না অমৃতা, ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন ওকে, তোমাদের। কিন্তু তার জন্য তিনি নির্বাচন করেছিলেন আমাকে। দুরূহ সৌভাগ্য সেই বহি প্রাণপণে...।

—আপনার কবিতাও মনে আছে!

কোনও উত্তর দিলেন না কার্লেকর। আহত দৃষ্টিতে চাইলেন তার দিকে। তারপর বললেন—গিফ্‌ট তোমার জন্যেও আছে। নেবে?

অমৃতা কিছু বলবার আগেই পেছন ফিরলেন কার্লেকর, তারপর গাড়ির ভেতর থেকে এক বিশাল লাল গোলাপের তোড়া বার করে তুলে দিলেন অমৃতার হাতে। আর ঠিক সেই সময়েই ফাটল অ্যাসিড বাল্‌বটা।

বাঁদিকের শাড়ি তার কুঁকড়ে যাচ্ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে তার বাম অঙ্গ। অ্যাসিডের বিকট ঝাঁঝালো

গন্ধে, যন্ত্রণায় সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে, ডক্টর কার্লেকর বিদ্যুৎগতিতে তাকে তুলে নিলেন গাড়িতে। শোফারকে বললন—পি.জি., ছোটাও কুইক।

দুঃসহ যন্ত্রণার একটা গাছ। তার ডালে ডালে আগুনের ফল। পাতাগুলো সেঁকো বিষের। শিকড় চারিয়ে গেছে বুঝি অনেক গভীরে যেখানে পৃথিবী স্বয়ং জ্বলছে। মাটিতে আগুন, আকাশে আগুন, বাতাসে ড্রাগনের নিশ্বাস। আগুনের শিখাগুলো ছোট ছোট ছেলেদের মতো দাপাদাপি করছে।

তিনদিন তিনরাত। জ্ঞান ফিরলে যে শুধু কোনওমতে বলল—'টুটুল!'

—টুটুল তোমার মাসির কাছে। ভেবো না অমৃতা। ও ঠিক আছে। —সামনে ডাক্তারের সর্বরোগহর সেই মুখ দেখে সে চোখ বুজল।

চাপা কান্নার শব্দ। মা বোধহয়, ঘোরের মধ্যে ভাবল সে। কান্নাই মায়ের একমাত্র সম্বল। মায়ের নামে সে ছেলের নাম দিয়েছে সীমান্ত। শম্পা, শম্পা, সৌমিত্র কি বুঝল? দোলা তুই ধৈর্য ধরিস? কী করছে তোর রোমিও? লাবণি তুই আমাকে এত ভালবাসতিস...জানতাম না, অরিন্দমদা উঃ মাফ করুন। কী যে আনন্দ তুই ফার্স্টক্লাস সেকেন্ড হয়েছিস, তিলক! এবার একটা ভাল চাকরি পাবি...কলেজ সার্ভিস কমিশন, জয়িতাদি আপনার নোটসগুলো এবার ফেরত নিন...কী ভাল, কী ভাল তোরা সবাই। উঃ, মা-আ-আ।

নেট, স্লেট পরীক্ষার বিজ্ঞাপন বেরোল। ফর্ম জমা দেবার তারিখ পেরিয়ে গেল, তিলক-শর্মিষ্ঠা-নিশান বসল। তখনও অমৃতার চিকিৎসা চলছে। ফলাফল বেরোল, তারপর ভাইভা। তিলক নিশানের চাকরি হয়ে গেল, শর্মিষ্ঠাকে নর্থ বেঙ্গলে দিয়েছিল বলে সে গেল না, তখনও অমৃতার চিকিৎসা চলছে। কাচের ঘেরাটোপের মধ্যে, কেউ তার কাছে যেতে পারে না। অসম্ভব যত্নে, সেবায়, ওষুধে সতর্কতায় প্রথম পি.জি., তারপর উজ্জীবন', আবার পি.জি. অবশেষে ঘা শুকোল। বাঁ হাতের পোড়া অংশ প্লাস্টিক সার্জারি। হাসপাতাল থেকে অবশেষে যখন ছাড়া পেল, কার্লেকর বললেন—মিসেস দত্ত, আপনার কাছে না হলে তো ...

শিবানী বললেন—কী আশ্চর্য! সে তো বটেই...

—টুটুলকে নিয়ে পারবেন? না একজন সিসটার...

—রাখাই যায়, তবে টুটুলের তো প্লে-পেন আছে।

কথা শুনে এত কষ্টেও রোগিণী এবং তার ডাক্তার হাসলেন।

সীমা বললেন—টুটুলকে বরং আমি নিয়ে যাই।

—বাচ্চা ছেলের ধকল কখনও তুমি সামলাতে পারো?—বিশ্বজিৎ বললেন। অবসাদে চোখ বুজল অমৃতা।

সেই সময়ে সন্ধ্যার ভিজিটিং আওয়ারে ওরা সবাই দেখতে এসেছিল তাকে। শম্পা-সৌমিত্র, লাবণি-অরিন্দম, দোলা-অমিতাভ, তিলক, শর্মিষ্ঠা, নিলয়, চঞ্চল, নিশান সবাই। কেউ কোনও কথা বলতে পারছিল না। সব একেবারে চুপচাপ। রোগিণীই ক্ষীণ হাসল, ভাল ডান হাতটা একটু তুলল।

অনেক যন্ত্রণা দেখেছেন রঞ্জন। তাঁর পেশাটা তো যন্ত্রণা দেখারই! কত রকম ভঙ্গি দেখেছেন যন্ত্রণা সইবার। কিন্তু এত সাহস, এমন শান্ত সাহস একটি এই বয়সী মেয়ের—এ তিনি কখনও দেখেননি যেন। ও তো বলছে না একবারও—কেন এমন হল? কেন আমার কপালেই বারে বারে হয়! আমাকে মেরে ওদের কী লাভ? যতদিন ওদের কাছে ছিলাম, ওদের উপকারই তো করেছিলাম। তাহলে কেন? কিন্তু ও কিচ্ছু বলছে না। ফরিয়াদ বুঝি ফুরিয়ে গেছে আজ ওর। ও ধরে নিয়েছে এটাই, এরকমটাই ওর হবে। ও শুধু লড়ে যাচ্ছে। অবশ্যই ডাক্তাররা আছেন, নার্সরা আছেন, শিবানী

মাসি আছেন! কিন্তু, শেষ পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চাপা ভয়ঙ্কর লড়াইটা তো ওর একারই! অথচ জীবনের কোনও পর্বেই ও নিজের হাতে নির্বাচন তুলে নেয়নি। না বিবাহ, না সন্তানধারণ। এমনকি আইনি-লড়াই ও বিবাহ-বিচ্ছেদও ঘটেছে যেন কারণ ও ফলাফলের স্বাভাবিক যুক্তিতে। যে অত্যাচার, যে যন্ত্রণা ও ভোগ করল, করে চলেছে, তার কোনও দায়ভাগ ওর নেই। ও যদি আজ বিমূর্ত নৈর্ব্যক্তিক এই সমাজকে প্রশ্ন করে—কেন? তো করতেই পারে। যদি ছিঁড়ে খুঁড়ে দিতে চায় সব, ধ্বংস চায় তো চাইতেই পারে। তখন কারও কাছে কোনও উত্তর থাকবে না। সমাধান থাকবে না।

সেই কথাটাই আজ তিনি বলেছিলেন রম্ভাকে। বলছিলেন সেই কাচের জানলার সামনে বসে। সেখান থেকে খোলা আকাশ দেখা যায়, দেখা যায় গাছপালার এক সবুজ সমৃদ্ধ রূপ। প্রথমটা বলছিলেন বলিষ্ঠ দৃপ্ত ভঙ্গিতে, তারপর আবেগে আপ্লুত হয়ে—

বোঝ তো রম্ভা? শক! সুদ্ধু শকেই ওর মরে যাওয়ার কথা! কী প্রাণ যে মেয়েটাকে দিয়েছিলেন ঈশ্বর।

অনেক, অনেক দিন পর নিজের অভিজ্ঞতা, অনুভব, বিস্ময়, শ্রদ্ধার কথা অকপটে রম্ভার কাছে পেশ করলেন তিনি।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অমৃতা। দাঁড়িয়ে আছে প্রতীক্ষায়। কখন তিনি আসবেন। এ যদি ডোভার লেনের জানলা হয় তা হলেও আসবেন, যদি করুণাময়ীর জানলা হয় তা হলেও আসবেন। একটা ধূসর রঙের মারুতি একটিম। জানলার কাছে এসে গাড়ির স্মোক্‌ড গ্লাস একটু নামাবেন, ওপর দিকে তাকাবেন, ডান হাতটা ঈষৎ তুলে। সে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবে, ডান হাতটা একটু তুলবে। আবার একটা পুরো দিনের প্রতীক্ষা। ইতিমধ্যে আছে মা-বাবা এবং শিবানী মাসি, শম্পার ফোন, দোলার আর্তি, সম্পদের চিঠি, লাবণি-অরিন্দমের এক আধ দিনের আসা-যাওয়া, আছে তিলক, আছেন জয়িতাদি আর আছে টলটল পায়ে টুটুল, সীমান্ত। আগে ছিল তার রক্তের মধ্যে একটা ওতপ্রোত কর্তব্যবোধ, দায়িত্বনিষ্ঠা। সন্তোষ ছিল না, সবটাই শুষ্ক, এমন নয়। কোনও কাজ সময়মতো, সুন্দর করে শেষ করতে পারলে মনটা খুশি হত। অদ্ভুত একটা স্বস্তিবাচন শুনতে পেত ভেতরে। কিন্তু এ অন্যরকম। এ বেদনা, এ যন্ত্রণা, এ আনন্দও, অসীম অপার রোমাঞ্চক। সারা দিনের মধ্যে 'উজ্জীবন' যাবার পথে তিনি একটিবার এই পথ দিয়ে ঘুরে যাবেন। ওপর দিকে তাকাবেন। বেশিক্ষণ নয়, কিন্তু মনে হবে নির্নিমেষ, অনন্তকাল। তাঁর আত্মার গভীরে চোখ রাখবেন তিনি। এমন একটা কিছুর বিনিময় হবে যার অস্তিত্বের কথা সে-ও জানত না, তিনিও জানতেন না। এই প্রথম যেন সেটা আবিষ্কৃত হল পৃথিবীতে। অ্যান্টি-বায়োটিকের মতো, কোয়ার্কের মতো। রঞ্জন তো তাদের বাড়িতে আসেনই। আসেন টুটুলকে দেখতে, চোখের দেখা এবং ডাক্তারের দেখা, দেখেন তাকেও—'কী অমৃতা! কনুইয়ের কাছে সেই পেইনটা নেই তো আর? কী বললে? ডান কনুইয়ে? এঃ, ওটা তোমার কল্পনা।' বাম বুকের ওপর থেকে পা পর্যন্ত ঝলসে আংরা হয়ে গিয়েছিল। অসীম কষ্টে ও ধৈর্যে হাত সুদ্ধ ওপর দিকটা প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়েছে। দপদপে যন্ত্রণা এখনও ফিরে ফিরে আসে। কিন্তু সেটা বাঁ দিক। ডান দিকের কোনও ব্যথাকে স্বীকার করতে দেবেন না তিনি।

—মিসেস দত্ত নার্সিংটা পড়ে নিতে পারতেন, সুদ্ধু কতকগুলো টেকনিক্যাল জিনিস...দেখি গভীর করে নিশ্বাস নাও—হ্যাঁ ঠিক আছে।

—কী বিশ্বজিৎবাবু আপনাকেও একটু দেখে দেব না কি? আমার তো মনে হয় মিসেসের চেয়ে আপনারই ব্লাড-প্রেশারটা বেশি যাচ্ছে আজকাল। —টুটুলকে কোলে তুলে তিনি হাসবেন।

দুই পরিবারেরই বন্ধু। প্রায় পারিবারিক চিকিৎসক। ছোটখাটো হাসি-ঠাট্টা, টুটুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আধা-সিরিয়াস জল্পনা, মাঝেমাঝেই ঘোষণা—'টুটুল কিন্তু আমারই, সে আপনারা মানুন, আর নাই মানুন।'

অমৃতাও স্বাভাবিক। চা কিংবা কফি এনে দিচ্ছে।—আজ টুটুলের দু বছর পূর্ণ হল, পায়েস, মানে পরমান্ন, খাবেন না কি?

—সুগার-ফুগার আবার হয়নি তো? কী? মিসেস দত্ত?

—আপনার সুগার হয়েছে কি না আমি কেমন করে জানব?

—আমার কী হয়েছে, না হয়েছে জানবার সুযোগ পাই না কি? এই এরা, অমৃতার দিকে তাকিয়ে বলল—'এরা' সে সুযোগ দেয়? একদিন ধড়াস করে পড়ব আর মরব। —বলেই চোখ গোল করে ফেলবেন—এ কী! 'ষাটষাট, এ আবার কী কথা, ষেটের বাছা ষাট' এ সব কিছু বললেন না? নাঃ আধুনিককালের মাসি-পিসিরাও দয়ামায়ায় খাটো হয়ে পড়ছেন।

কিন্তু জানলার সামনে যখন গাড়িটার গতি ধীর হয়ে আসে। কাচ নামিয়ে উর্ধ্বমুখ হন যে রঞ্জন, তিনি অন্য রঞ্জন, যিনি কথা জানেন না, হাসি জানেন না, যাঁর শুধু চোখ ছাড়া আর অন্য ইন্দ্রিয় নেই। অমৃতাও স্থাণু হয়ে থাকে সেই দৃষ্টির সামনে। সে-ও তখন কথা হারা, দৃষ্টি, শুধু দৃষ্টি, আর কিছু না, কিচ্ছু না।

সেদিন গিয়েছিলেন 'উজ্জীবন' থেকে হাসপাতাল, হাসপাতাল থেকে অন্য একটি নার্সিংহোমে, আবার 'উজ্জীবন'। অপারেশন করতে হয়েছে ছোটয় বড়য় মিলিয়ে সাতটা। বাড়ি ফিরতে একটু রাত হয়ে গেছে। প্রায় এগারোটা। ভয়ানক ক্লান্ত তিনি আজ। না, এরকম শিডিউল চলবে না, চলবে না আর। চান করলেন, রম্ভা নামল না। একটা হুইস্কি নিলেন, রম্ভা নামল না।

—মেমসাব কোথায়?—তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মেমসাব' কথাটা তিনি পছন্দ করেন না আদৌ, কিন্তু তাঁর কেতাদুরস্ত বেয়ারারা করে। তাই তাঁকেও...। কত কাজই যে নিজের পছন্দের বিরুদ্ধে করতে হয় মানুষকে।

—কী জানি! জানি না তো! নামেননি।

আস্তে আস্তে ওপরে উঠলেন তিনি, অবসন্ন পা টেনে টেনে। কেন নীচে এল না রম্ভা যেমন আসে, কেন পানীয় নিয়ে বসল না, যেমন বসে? সবই তো দিয়েছেন তাকে। মেনে নিয়েছেন সন্তানসম্পর্কহীন, সদা-সতর্ক, প্রশ্ন আর সন্দেহের কূট স্পট-লাইটের তলাকার দিনরাত। এতেও কি তাঁর প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? এত দিনেও? ও কি জানে না ডাক্তারের জীবন? ডাক্তারের দায়? তবু এই অর্থহীন অবুঝ অভিমান? তাঁকে খুবই ক্লান্ত করে এসব আজ।

রম্ভা! রম্ভা! শোবার ঘরের ঠিক দোরগোড়ায় দুজনের দেখা হয়ে গেল। দ্রুত আসছে রম্ভা, উল্লাসের সুরে বলছে—রঞ্জন, রঞ্জন, আমার আবার হচ্ছে।

—কী হচ্ছে?

—বুঝতে পারছ না? আমি আবার যৌবন ফিরে পাচ্ছি, আবার কনসীভ করব, মা হব, রঞ্জন এই দ্যাখো...

রক্তরঞ্জিত একটা পেটিকোট রঞ্জনের দিকে জয়ের রক্তনিশানের মতো তুলে ধরেন রম্ভা।

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎগতি আসে রঞ্জনের অবসন্ন দেহে। লুকোনো ভাঁড়ার থেকে সঞ্চিত শক্তি কৌটোর ঢাকনা ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে।

—রম্ভা, রম্ভা কী বলছ? ঠিক? এ সত্যি?

স্বামীর কাঁধে মাথা পৌঁছয় রম্ভার। গলার স্বর থরথর করে কাঁপতে থাকে, ভীষণ যেন শীত শীত করছে, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।

—ঠিক রঞ্জন, ঠিক। চার বছর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসেছে। —স্বামীর

কাঁধে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন রম্ভা—আবার আমি তোমাকে সন্তান উপহার দিতে পারব। আবার পারব যা বলো সব, স-ব।

কী বলছে রম্ভা? একটা কোয়ালিফায়েড ডাক্তার সে এর মানে বোঝে না? পলিপ? ফাইব্রয়েড? হিস্টেরেকটমি? নাকি—ঈশ্বর, হে ঈশ্বর! তিনি ডাক্তার কিন্তু সব সময়ে তাঁর ঈশ্বরের কথা মনে হয়। সমস্তরকম বিপদে। সম্পদে।

—কবে? কবে থেকে এমন হচ্ছে?

—কতদিন, কতকাল তুমি কাছে আসো না, কত দিন বন্ধ করে দিয়েছ তোমার দ্বার সে আর আমার হিসেব নেই রঞ্জন। সাহস শুধু সাহসে বুক বেঁধে...

—রম্ভা, আমার সোনা, আমার মণি।—তিনি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেন তাঁর প্রথম প্রণয়িনীকে। বোঝেন এই তাঁর প্রথম, এবং এই তাঁর শেষও। এবার ডায়াগনস্টিক ডি.সি, তারপর অপারেশন, অপারেব্‌ল না হলে রেডিয়েশন বা কেমো বা রেডিওপ্লাস কেমো, এখানে, না হলে যত দূর দূরান্তেই হোক, যদি থাকে, যদি কোথাও এতটুকু অস্ফুট আশাও থেকে থাকে!

সোমবার। সকাল সাড়ে নটা। শাদার ওপর গোলাপি ডুরে শাড়ি পরা অমৃতা। চান করে চুল মেলে দিয়েছে। এখন আর কিছু সামনে নেই। শুধু একটি জানলা। আধঘণ্টা পার হয়ে যায়, পঁয়তাল্লিশ মিনিট, ধূসর এসটিম আসে না।

টুটুল ডাকে—ম্ মা-আ।

—কী সোনা?

—আমায় কোলে।

সে দু হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কোলে তুলে নেয়। চুমো খায়।

টুটুল ফিরে চুমো খায় তাকে। কপালে, গালে মিষ্টি মিষ্টি শব্দ করে। নাকে নাক ঠেকিয়ে।

মঙ্গলবার। নটা। সে নীলের ওপর শাদা ফুটি-ফুটি একটা তাঁতের শাড়ি পরেছে। যদি আগে চলে যান! এরকম হয় না, তবু... যদি...আধ ঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট, পঞ্চাশ মিনিট...

—খুকি, আজ যে তোর ইন্টারভিউ, ভুলে গেছিস?

—যাই মা!

বুধবার। দশটা। হয় না, তবু কোনও কারণে হয়তো কদিন দেরি হচ্ছে। ঘিয়ে রঙের ওপর তুঁতের আলপনা দেওয়া একটা ছাপা শাড়ি পরেছে সে। কপালে টিপ দিতে ভুলে গেছে। চুল ভালো করে আঁচড়ায়নি।

—বারোটা বাজল।

—টুটুল খেয়েছে মাসি?

—খুব ভাল করে খেয়েছে। এবার তুই বোস।

বৃহস্পতিবার। যেমন তেমন একটা শাড়ি। পরতে হয়, তাই পরা, চুলে চিরুনি চলেনি। ভুলে গেছে। নটা বাজল, দশটা বাজল, এগারোটা বাজল। টুটুল আবদার করে তাকে ধরে নিয়ে গেল। সে ঘুম পাড়াচ্ছে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে...খাজনা দেবো কিসে।

শুক্রবার। সে সল্টলেকের বাড়ির বাঁশের গেটে এসে দাঁড়িয়েছে। রোদ্দুর মাথায় করে। আজও না।

—'উজ্জীবন' নার্সিংহোম?

—হ্যাঁ, বলুন।

—সিসটার মাধুরী সেনকে একবার দেবেন?

—ডাকছি।

—হ্যালো!

—মাধুরীদি, আমি অমৃতা, ডক্টর কার্লেকরকে একবার পাওয়া যাবে?

—উনি তো নেই! আসছেন না।

—সে কী! কেন? অসুস্থ?

—উনি নন। ওঁর স্ত্রী। গত পরশু বম্বে রওনা হয়ে গেছেন।

—কী হয়েছে?

—কী আর! দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ টেলিফোনের তার তোলপাড় করে এসে পৌঁছয়।

রিসিভারটা অসাড় হাত থেকে খসে যায়। তার বোধিসত্তা বলে—রম্ভা কার্লেকর ফিরবেন না। রঞ্জন, রঞ্জন কার্লেকরও ফিরবেন না আর। এখন আর প্রতীক্ষা নেই, এখন আর জানলা নেই। এখন সব অন্ধকার। শিথিল হাতে ভবিষ্যযাত্রার সরু পেনসিল-টর্চটা সে হাতে তুলে নেয়।

উজান-যাত্রা

১) আমি তিনি ও সে

শুনেছি ওঁর বাবা গুজরাতের কটন কিং। ছিলেন, না এখনও আছেন, গত না জীবিত, অতশত জানি না। নিতাইদা পাঠিয়েছেন, ওঁকে নিতে এসেছি। হাওড়া-আমেদাবাদ এক্সপ্রেস পাক্কা সাত ঘণ্টা লেট। খোঁজখবর করে জানতে পারি নাগপুর পার হয়ে থেকেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে। ঠিক কী গোলমাল ওরা বলল না। সম্ভবত যান্ত্রিক। ভাল বাবা, খোঁড়াতে খোঁড়াতেই আসুক, দুর্ঘটনায় পড়ার চেয়ে ভাল। চারপাশে থিকথিক করছে লোক। অনেকেই এক্সপ্রেসটার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে খেপে যাচ্ছে। মুখ-খারাপ করছে খুব। কাজল সাধারণত চুপচাপ থাকে। তবে আজ ওর ভুরুতে কোঁচ ধরেছিল। পাশের ভদ্রলোককে বলল, আপনার কে আসছেন, জানতে পারি!

আরে আর বলবেন না—মেয়ে জামাই-বিয়ের পরে ফার্স্ট টাইম। এখন এই খচড়া দেশের খচড়া রেল তো কোনও কাজই টাইমে করে না!

কাজল ওঁর আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, সময়ে আসাটা ইমপর্টান্ট? না গোটা আসাটা?

মানে? কী বলতে চাইছেন?

যান্ত্রিক গোলযোগকে অগ্রাহ্য করলে যে-কোনও সময়ে অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যেতে পারে, জানেন তো?

ভদ্রলোক কটমট করে চেয়ে ওর থেকে কয়েক গজ দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। মুখখানা কালো হয়ে রয়েছে।

অলুক্ষুণে কথা বলিস কেন রে? আমি বিরক্ত হই।

কাজল উত্তর দিল না, একটু পরে বলল, একটা বাজল, চল কিছু খেয়ে আসি।

রেলওয়ে রেস্তোরাঁটা সুবিধের নয়। তবু অনেক ডেলি প্যাসেঞ্জার, কাছাকাছি অফিস-টাইমের লোক এখানে খেতে আসে। আমরা মশলা ধোসার অর্ডার দিয়ে বসি। সেফেস্ট, যদি-না আলু পেঁয়াজের পুরটা অলরেডি গেঁজে গিয়ে থাকে। কাজলের ভুরুর কোঁচ ফিকে হয়েছে কিন্তু এখনও পুরোপুরি যায়নি। কাপড়টাপড় ইস্ত্রি করতে গেলে পয়লাবার ইস্ত্রি চালাবার পর যেমন হালকা একটা অমসৃণ ভাব থেকে যায়, তেমন।

বলল, দেশটা কার? রেলটা কার?

বুঝি, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে ঝগড়ার দ্বিতীয় দফাটা আমায় শুনতে হবে।

নোংরা, লেট, চোর ঘুষখোর, অরাজক হলেই 'এই দেশ'। কিন্তু হরগোবিন্দ খোরানা, অমর্ত্য সেন, অরুন্ধতী রায় হলেই দেশটা আমাদের হয়ে যায়, 'আমাদের ছেলে, আমাদের মেয়ে।'

তুই ওঁকে বললি না কেন 'আমাদের এই খচড়া দেশ' বলতে? তা হলেই তো আর কোনও ব্যাকরণের ভুল থাকত না। মুচকি হাসি আমি।

থাকত। ও গম্ভীরভাবে বলল, বলা উচিত ছিল 'আপনাদের মতো খচড়াদের দিয়ে তৈরি দেশ।'

সর্বনাশ, খুব বেঁচে গেছি। তুই তো আর. ডি. এক্স-রে! সঙ্গে ঘোরা বিপজ্জনক! কখন ফাটবি, নিজেও যাবি, আমাকেও উড়িয়ে দিবি! ডেঞ্জারাস!

কথাটা তোর মনে হয় না? সোশাল সার্ভিস করিস তো? চেতনা বাড়াবার জন্যে কিছু করতে পারিস না? জাস্ট নাগরিক চেতনা! রাস্তায় ময়লা ফেলতে নেই, বাসে স্মোক করতে নেই, গাঁক গাঁক করে লাউডস্পিকার চালাতে নেই, কিউ ভাঙতে নেই, নিজের কাজটা করতে হয়।...

বাস, বাস, তোর 'নেই' আর 'হয়'-এর লিস্টটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে।

রিয়ালি? তো করিস না কেন কিছু?

করব, করব, শিগগিরই করব ভাবিসনি।

বিরক্ত মুখে ধোসার ওপর ছুরি চালাল কাজল। যেন আমজনতা, অর্থাৎ ওই 'নেই' আর 'হয়'গুলো যারা মানে না, তাদের ওপর দিয়ে। আমিও বাদ যাচ্ছি না। একে কিচ্ছু করি না, তার ওপর আবার ফাজলামি।

ছবিগুলো আর একবার ব্যাগ থেকে বার করে দেখি। একগাদা ভিড়ের মধ্যে কখনও আধা মুখ কখনও সিকি মুখ, কখনও দু'দুটো মাইক্রোফোনের পেছনে বক্তৃতারত ভ্যাটকা মুখ। দুর! এভাবে একটা মানুষকে শ'য়ে শ'য়ে যাত্রীর মধ্যে থেকে চিনে নেওয়া অসম্ভব। নিতাইদা তো ফোটোগুলো দিয়েই খালাস। কাজল ফট করে ওর ঝোলা থেকে একটা লম্বাচওড়া চার্ট পেপারের রোল বার করল। বলল, 'তোর হাতের লেখাটা তো ছাপা হরফের মতো, লিখে ফেল দেখি নামটা। বড় বড় করে।' একটা বেগুনি রঙের ফেল্ট পেনও বার করে দিল। সুতরাং হাতের লেখার সুনাম রাখতে আমি বড় বড় করে লিখি KASTURI BEN। লেখার সময়েই খেয়াল হয়েছিল ওঁর পদবিটা আমরা জানি না। সত্যি কথা বলতে কি এই গুজরাতিদের ভাই আর বেন-এর জ্বালায় পদবিটা উবেই যায়। ভুলাভাই, শরদভাই, নমিতা বেন, নীলম বেন। তবে আমরা কেউই স্বপ্নেও ভাবিনি উনি একটা সাধারণ স্লিপার বা শয়নযান থেকে কাঁধে একটি ঝোলা, আর হাতে একটা মাঝারি ক্যারি-অন নিয়ে নেমে আসবেন। উনি গটগট করে আসছিলেন একটা সচল গাছের মতো। আমাদের প্ল্যাকার্ডের দিকে। অর্থাৎ স্টেশনের উলটোমুখো। কেননা আমরা ওঁকে সামনের দিকে এ.সি. ফার্স্ট ক্লাস কোচগুলোয় খুঁজছিলাম। কিন্তু যেই দূর থেকে দেখলাম, এক লহমায় আবছা, আধা-সিকি ফোটোগ্রাফগুলোর খাপে খাপে বসে গিয়ে উনি জ্যান্ত হয়ে উঠলেন। দেখলে কে বলবে কটন-কিং-এর মেয়ে! স্মার্ট খুব, কিন্তু ড্যাশিং টাইপ লাগছিল না। খুব কেজো মহিলা। প্র্যাকটিক্যাল, শান্ত কিন্তু দৃঢ়। এরকমটাই আমার প্রথম মনে হল। সাদা ধবধবে মিলের শাড়ি পরেছেন। সাদা লেসের পাড়। শাড়িতে ছোট ছোট সাদা চিকনের ফুল। ভদ্রমহিলা ময়দার মতো সাদা ফরসা। মজবুত ফিগার। দারুণ একটা ব্যক্তিত্বের আঁচ পাচ্ছিলাম। থাকবেই। নইলে আর কাজগুলো করেন কী করে! ফোটোর চেয়ে অনেক কম বয়স, বেশি অ্যাট্রাকটিভ লাগে। তবে মাঝবয়সি তো নিশ্চয়ই। এবং গুজরাতি কটন কিং-এর মেয়ের নাকে কানে হিরে নেই। আশ্চর্য!

প্ল্যাকার্ড এবং পেছনে আমাদের দেখে উনি থেমেছিলেম, একটু টানযুক্ত বাংলায় বললেন নিতে এসেচ আমায়? কেন? সেকী? আমি ঠিক চলে যেতে পারতুম।—চলছেন আমাদের সঙ্গে সমান তালে। কিছুক্ষণ ওঁর সঙ্গে গটগট করে চলতে চলতে ভাল লাগে খুব। যেন আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

আপনি এত ভাল বাংলা বলেন।—বিগলিত হয়ে জিজ্ঞেস করি। কস্তুরী বেন চলতে চলতে বললেন, কেনো? নিতাই বোলেনি আমার ছুটবেলা কেটেচে কলকাতায়। জোম্মো থেকে।

একথাটা অবশ্য আমরা জানতাম না। শুধু জানতাম এখানে ওঁদের কিছু সম্পত্তি আছে। থাকতেই পারে। গুজরাতি মিলের শাড়ি ধুতি চাদর তো এখানকার বাজার ছেয়ে আছে।

সেই থেকে এতদিন পরেও মনে রেখেছেন?—আমি না বলে পারি না। একটু গম্ভীর অন্যমনস্ক গলায় উনি বললেন, ছুটোতে মানুষ যা শিকে আর ভুলে না। ছুটোবেলাই সব বেলা।

শেষ কথাটা ভাল বুঝলাম না! ছোটবেলাই সব বেলা? কী অর্থে? এই যে আমাদের উৎসাহ-ছটফট যৌবন, ওঁর এত কেজো সফল প্রৌঢ়ত্ব, এগুলো? এগুলোর চেয়ে ছোটবেলার গুরুত্ব বেশি? কাজলের সঙ্গে চোখাচোখি করি। মিটিমিটি হাসছে। মানে আমার ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা উপভোগ করছে। ভাল বাবা, কর। তুই সব কথার মানে বুঝিস, কখনও ভ্যাবাচ্যাকা খাস না, তোর কাছে প্রশ্ন কম, উত্তর বেশি। সে উত্তরগুলো দিতেও তোর যথেষ্ট কার্পণ্য। তোর উইজডম-এর চড়া দাম। আমি বাবা একটু অভিভূত ধরনের মানুষ। যারা বশংবদ থাকে, দূর থেকে পুজো করে, নিজেকে অন্যের তুলনায় সামান্য মনে করে, শেখবার জন্য, নতুন কিছু করবার বা দেখবার জন্যে যারা উন্মুখ হয়ে থাকে। এটা কিন্তু আত্মবিশ্বাসের অভাব জাতীয় জিনিস নয়। এটা আমি কাজলকে বোঝাতে পারি না। ও বলে 'হম কিসিসে কম নহি, কম নহি' মন্ত্র জপ করতে থাক, ঠিক হয়ে যাবি।

মন্ত্র জপ করলেই সব্বার থেকে তালেবর হয়ে যাব? এত সোজা!

তা তো বলিনি! ব্যাপারটা হল এই যে, তুমি হতে পারো নামকরা সেতারি কি সরোদিয়া, লাখ লাখ কামাও, ডিজাইনার জামাকাপড় পরে আসরে বসো, আংটি থেকে হিরে ঝলকায়, কিন্তু আমিও একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ। আমার কাজটা আমি ষোল আনা সৎভাবে করি। আমি জীবনের প্রতিটি ধাপ জানতে জানতে, বুঝতে বুঝতে, লড়াই করতে করতে এইখানে পৌঁছেছি।

আমি বলি, কার কথা বলছিস? তোর কথা?

ভীষণ রাগ করে কাজল, ইয়েস, আমার কথা। কিন্তু তোরও কথা। যে ছেলেগুলো খেত-মজুরি করে বই ভাগাভাগি করে পড়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে, জয়েন্টে চান্স পায়, তাদেরও কথা, যে ভদ্রলোক এই কাপুরুষের দেশে সাহস করে কোনও মেয়ের অপমানের জবাব দেন তাঁরও কথা, যে কুলি সারাদিন ঠেলায় লোহার রড বয়ে বয়ে রাত এগারোটায় রাস্তার কল থেকে জল নিয়ে ছাতু ভিজিয়ে খাচ্ছে, তারও কথা।

ওকে বোঝানো মুশকিল। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে একজন সেতারি কি সরোদিয়া যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, একজন সমাজকর্মী হিসেবে আমি বা অন্য যেসব সৎ আন্তরিক মানুষদের কথা ও বলল—আমরা কি আমাদের কাজের জায়গাতেও সেইখানে দাঁড়িয়ে আছি?

সততার, সিনসিয়ারিটির, স্ট্রাগল-এর কোনও ফার্স্ট সেকেন্ড হয় না মিঠু, কোনও সেলিব্রিটি স্টেটাস হয় না। ধান্দাবাজির সমাজসেবা তো আর করিস না!

কোথা থেকে কোথায় চলে গেল—যাঃ। এই হল কাজল।

ওর যুক্তি-তর্ক সত্ত্বেও কিন্তু আমার বীরপুজার বাতিক কমে না। আমি আমার দেবতাদের থেকে অটোগ্রাফ নিতে নিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি, বিহ্বল হয়ে যাই—সে গায়ক, বাদক, লেখক যিনিই হন না কেন। আমি তো কাজলেও মুগ্ধ, অভিভূত। একজন ট্রাইব্যাল ছেলে যতই কেন সুযোগ-সুবিধে পাক, এমন করে সব কমপ্লেক্স ঝেড়ে ফেলবে গা থেকে ময়লা ঝাড়ার মতো, তথাকথিত মূল স্রোতের ছেলেমেয়ের সঙ্গে সহ-ও প্রতিযোগিতা করে এইখানে এসে দাঁড়াবে এবং নিজের পদবি বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করবে, এটা মোটের ওপর অভাবনীয়। বাংলা ইংরেজি দুটোই বলে অবলীলায়, জলের মতো। নাক-উঁচুদের সঙ্গে যখন মেশে তখন ওর ব্যক্তিত্ব থাকে সবাইকে ছাড়িয়ে অন্য উচ্চতায়, যদিও সেভাবে বোঝা যায় না কথায়, পোশাকে, ব্যবহারে বা আদবকায়দায়। একদম সহজ। আলাদা হয়ে থাকে শুধু সামান্য একটু উন্নাসিকতা আর ওর কষ্টিপাথরের চকচকে চেহারাটা। একটু থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, চৌকো মতো মুখ, বডিবিল্ডিং না করেও প্রায় এক বডি-বিল্ডারের মতোই সৌষ্ঠব। ওকে পুজো করব না তো কী? ওর চেনাশোনা অনেক, জানি তারাও ওকে প্রশংসা সম্ভ্রমের চোখে দ্যাখে। কাজল! ওহ, ও তো এক্সসেপশন্যাল। কিন্তু তারা ওকে কাজল বলে মনে রাখে, মুণ্ডাটা ভুলে যায়। ইচ্ছে করেই কি না, জানি না। চেহারার আদিবাসী মহিমা অবিকৃত রেখে ত্বকের দ্যুতি ছড়িয়ে, বিদ্যাবুদ্ধি ঝলমলিয়ে যখন একমুখ বিরল হাসির ফোয়ারা ছুড়ে বলে, ওহ নো, নট মুন্ড্রা,

মুণ্ডা। কাজল মুণ্ডা। গট ইট? আমাদের কোনও এক কমন ফ্রেন্ডের একদিন কী দুর্মতি হয়েছিল, বলেছিল দ্যাখ, লোকে সরকারি সুবিধে পাবার জন্যে পদবি বদলে এস.সি. এস.টি. হয়ে যায়। গ্রামের দিকে বিশেষত। ভাবতে পারবে না, আমাদের বাবার কালের কাজের লোক শিডিউলড কাস্টে নাম লিখিয়ে রজক দাস হয়ে এল, শুনতে পাই সরকারি নিয়মের ফাঁকফোকর দিয়ে জমিজমা, ছেলেদের চাকরিফাকরি সব বাগিয়েছে। তা কাজল, তুমি তো উলটোটাও করতে পারো, কারও সাধ্য নেই বোঝে তুমি সাত পুরুষে শিক্ষিত নও। কাজল রাগ করেনি, শান্ত, হাসি ছিল চোখে, বলল, তোমরা চট করে রং বদল করতে পারো। আমি পারি না—নাকের ওপর হাত রেখে বলেছিল—আমার পরিচয় এইখানে দাগা আছে, অনাস। সেই ঋগ্‌বেদের যুগ থেকে। তা ছাড়া করব কেন? আমি ইতিহাস। ৭০০০ বছরেরর ইতিহাস। ব্রোঞ্জ যুগ থেকে বর্তমান স্যাটেলাইট, কম্পিউটারের যুগে মানুষের উৎক্রান্তির ইতিহাস। রেয়ার স্পেসিমেন। হোয়াই শুড আই ডেস্‌ট্রয় ইট!

হাওড়া স্টেশনে একটা মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন এলে ট্যাক্সির লাইন আদি-অন্তহীন হয়ে যায়। তবে কিছু কালোবাজারি ট্যাক্সি থাকে, তারা প্রি-পেড ট্যাক্সির মতো আগে থেকে ভাড়া ঠিক করে নিয়ে চুপিচুপি প্যাসেঞ্জার নিয়ে আউট অব টার্ন চলে যায়। অবশ্যই ভাড়া দেড়া, কি ডবল। এইরকম একটা ট্যাক্সি ধরবার চেষ্টায় ছিলাম, কস্তুরীবেন বললেন, কিউটা কীসের?

কিউয়ে দাঁড়ালে ভীষণ দেরি হয়ে যাবে দিদি—কাজল বলল।

আমরা অন্য ট্যাক্সি ধরার চেষ্টা করছি।—আমি তাড়াতাড়ি বলি, এখানে এরকম না করে কোনও উপায় নেই।

—কিউয়েতে দাঁড়াতে অসুবিদে কী? তোমাদের পায়ে বেথা বা তাড়া কিছু?

আমি বলি, না। আসলে আপনি এতটা ট্রেন জার্নি করে এলেন, সাত ঘণ্টা লেট।

আমাকে থামিয়ে উনি বললেন, লেট তো হচ্ছেই। এতো জার্নি তো শেষ হোয়নি এখনও। এখনও কি ঠিক অ্যাড্রেসে পৌঁছোতে পেরেছি?

এমনভাবে কথাটা বললেন যে, মনে হল 'ঠিক অ্যাড্রেস' বলতে উনি মোটেই তিনের এক ফার্ন রোডের রোডটাই বোঝাচ্ছেন না। আরও কিছু, তারও অতীত, তারও অতীত। এত দূর, দৃষ্টির অগোচর কোনও ঠিকানার দিকে চোখ রেখে কোনও মানুষ পথ চলতে পারে? সন্দেহ নেই, ইনিও আমার এক অটোগ্রাফ-হিরো বা হিরোইন হতে যাচ্ছেন।

কাজল বলল, আমি এখানে থাকা সত্ত্বেও আপনাকে কষ্ট করতে হবে কেন?

কস্তুরীবেন এতক্ষণে মিটিমিটি হেসে বললেন, সেটা এনডিওরেন্স ওয়াইজ বুঝতে হবে। তুমাকে হাটকাট লাগছে—খুব বেয়াম ওয়েটলিফটিং করো নাকি?

হাটকাট মানে হাট্টাকাট্টা আর কী!

কাজল বলল, সামান্য। অ্যাথলিট হিসেবেও মন্দ না। আপনাকে কাঁধে করে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি।

বোটে!—উনি হাসিহাসি চোখে বললেন।

আধ ঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। জ্যামট্যাম, লাল-বাতিটাতি পেরিয়ে যখন তিনের এক ফার্ন রোডে পৌঁছোলাম তখন সন্ধে হয়ে গেছে। বাড়িটা বেশ বড়, তিনতলা। একটু তেধেড়েঙ্গে-টাইপ, আজকালকার আর্টিটেকচার নয়। কেয়ারটেকার রামলাখনের কাছ থেকে চাবি নিয়ে উঠতে উঠতে আমাদের ওপরে ডাকলেন, দরজা খুললেন উনি। এই তেতলাতেই উনি থাকেন মনে হল। জানি ওঁরা ধনী। কিন্তু ফ্ল্যাটটা বা বলা ভাল তিনতলাটা, যত বিরাট তত সাজানো-গোছানো কিছু নয়। একটা ঘরে দেখলাম তক্তপোশ পাতা, ওপরে সাধারণ একটা তোশকের ওপর সাধারণ হ্যান্ডলুমের বেডকভার। একটা গোদরেজের আলমারি, একটা গদিঅলা হাতলহীন চেয়ার। সাধারণ টেবিল, দেওয়ালে লাগানো তাকে কিছু বই। এ ঘরে মালপত্র রেখে উনি আর একটা ঘর

খুললেন—বৈঠকখানা, তক্তপোশ, গদি, গোটা চার তাকিয়া, নিচু টেবিল, গদি দেওয়া কাঠের বেঞ্চি। পুরনো দিনের কিছু সুন্দর মোড়া। দেওয়ালে প্রচুর ছবি, যেমন সরকারি অফিসে টাঙানো থাকে—গাঁধীজি, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রকে চিনতে পারলাম। অন্যদের নামগুলো জ্বলজ্বল করে লেখা না থাকলে আমি অন্তত চিনতে পারতাম না—স্বীকার করাই ভাল। গোখেল, সুরেন ব্যানার্জি, বিপিন পাল, উল্লাসকর দত্ত, সূর্য সেন, লালা লাজপৎ রায়, বালগঙ্গাধর তিলক। ক্ষুদিরামকে চিনলাম ওঁর ফাঁসির গানের সঙ্গে সঙ্গে চেহারাটাও খুব পাবলিসিটি পায় তো! প্রফুল্ল চাকী আর সূর্য সেন বোধহয় এই প্রথম দেখলাম। কস্তুরীবেন দেখি ঘরটাতে দাঁড়িয়েই আছেন, দাঁড়িয়েই আছেন, যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

এই পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আমরা চলে যাব কিনা ভাবছিলাম। একটু অস্বস্তিও লাগছিল, মানুষটি এখন স্মৃতির রাস্তা দিয়ে পেছনে চলেছেন, বুঝতে পারি। কিন্তু উনি বেশ আদেশপূর্ণ গলায় বললেন, বসো।

কাজল দাঁড়িয়েই রইল, কিছু খাবারটাবার আনি দিদি।

সোব হোচ্ছে, সোব হোচ্ছে, ইমপেশেন্ট হোবে না। বসো।

অসহায়ের মতো বসে রইলাম দু'জনে। আর কী আমাদের করণীয় আছে কে জানে! নিতাইদা বলে দিয়েছেন, ওঁর দেখাশোনা করতে, কথা শুনতে। তো বসি। বৈঠকখানার ফাঁক দিয়ে একটা লাইব্রেরি মতো দেখা যাচ্ছিল। দেওয়ালে দেওয়ালে আঁটা আলমারিতে বই। টেবিল চেয়ার, একটা আরাম-চেয়ারও। সামনের দিকে তাকালে দেওয়ালে বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের ফোটো চোখে পড়ে। এই ছবি দুটো অর্থাৎ ওঁর শোওয়ার ঘরে স্থান পেয়েছে।

উনি ব্যস্ত হয়ে একবার ঘুরে গেলেন, চুপ বসে কেনো? গোপ্পো কর, গোপ্পো করতে বাধা নেই। ইস্কুল নয়, কি জেলখানা।

কাজল আমার দিকে তাকায়। অর্থাৎ কী আর করা! অপেক্ষা করো, কী দুরূহ ডিউটি এবার পড়বে, এবং ইতিমধ্যে গোপ্পো কোরো।

আমি গভীর কৌতূহলে লক্ষ করি গত শতাব্দীর এইসব সাজসজ্জা। উঁচু সিলিং, পুরু দেওয়াল, গরাদের জানলা, চার ব্লেডের ফ্যান, রদ্যাঁর থিংকারের একটা রেপ্লিকা রয়েছে, এতক্ষণ দেখিনি। উনি এঘর থেকে ওঘর ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করেছিলেন আর মঝে মাঝে—রামলাখন, রামলাখন বলে হাঁক পাড়ছিলেন। রামলাখনের 'হাঁ জি, হাঁ জি'ও শোনা যাচ্ছিল। কাজলও মনের মধ্যে সব টুকে রাখছে বুঝতে পারছি। তবে ব্যাটা মহা চালাক। জানতে দেবে না।

এমন সময়ে চানটান করে ফ্রেশ জামাকাপড় পরা কস্তুরীবেন ঢুকে বললেন, রাত হয়ে যাচ্ছে। এসো আমরা তিনজুনে এইখানে বসে খাওয়া সেরে নিই।

আমরা দু'জনেই হাঁ হাঁ করে উঠি। উনি এবার গম্ভীর চোখে চেয়ে বললেন, কেনো? বাড়িতে মাংস আছে? না ইলিশ রান্না হোচ্ছে, পাতুরি, কেলাপাতা মোড়া? তিনজনেই হেসে ফেলি।

রামলাখন তিওয়ারি খাবার দিয়ে গেল। গরম গরম মোটা মোটা আটার রুটি, তুলতুলে নরম, অড়হর ডাল, আর রসগোল্লা।

বাথরুম থেকে হাতমুখ অগত্যা ধুয়ে আসতে হয়। ন্যাপথলিনের গন্ধঅলা কবেকার সবুজ বর্ডার দেওয়া সাদা টার্কিস তোয়ালেতে হাত মুছে এসে বসি। উনি বললেন, কোতো সোকালে গেছ। কোতো কোষ্ট হয়েছে আমার জন্যে! দুপুরবেলা কী খেয়েছেন—মিষ্টি? বেচারা!

আমাদের যে তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি, অভুক্ত নেই—এসব বলে কোনও লাভ হল না। চামচ করে মাখন লাগিয়ে দিলেন রুটিতে। আমার ফিগারের বারোটা বাজল।

খাবার সময়ে উনি একটাও কথা বললেন না। কোনও নিয়ম মানেন? না কী? ওঁর মতো আধুনিক মনের মানুষ কোনও পুরনো নিয়মে আটকে আছেন ভাবতে ভাল লাগল না। কী আর করা যাবে! তবে ক্রমশই ওঁকে খুব আত্মমগ্ন লাগছিল। ঠিক চিন্তাগ্রস্ত নয়। কিন্তু কিছু একটা জরুরি বিষয় আছে

যা নিয়ে উনি ভাবছেন। রসগোল্লার রস টিপে খাচ্ছি দেখে হঠাৎ যেন সংবিতে ফিরে এলেন।

—ফিগার কনশাস?

আমি চমকে উঠি। একটু লজ্জা পেয়ে বলি, মিষ্টি বেশি খেতে পারি না।

—রসই যদি ফেলে দিলে তোবে আর রসগোল্লা কী? দিস ইজ আওয়ার স্পেশ্যাল ফেভারিট ইন আমেদাবাদ। আগে জানলে তুমাকে তিত গোল্লা খাওয়াতে পারতুম।

—কোত্থেকে? আছে আপনার কাছে?—কাজল হেসে জিজ্ঞেস করল।

উনি বললেন, আছে। জড়িবুটি দিয়ে বানানো গোলি। আমি রোজ সোকালে একটা করে খাই। কুনও রোগ কাছে ঘেঁষতে পারে না।

—কোথায় পাওয়া যায়?—আমাকে আমার স্বাস্থ্যবাতিকে বাবা-মায়ের জন্য অনেক কালমেঘ খেতে হয়েছে, তেতোকে আমি ভয় পাই না।

—কুত্থাও পাবে না। এ আমাদের ফেমিলির নিজস্ব ফরমুলা। আমরা সোব বাড়িতেই বানাই তো! আচার, মিষ্টি, ওষুধ—সোব।

—আপনাদের তা হলে ডাক্তার লাগে না বলুন।

—ফাংশন্যাল ডিজিজের জন্যে খুব কম। কোনও অর্গ্যান খারাপ থাকলে বেচারি কী করছে?

এ ভাবেই শেষ হয় কস্তুরীবেনের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

১) আমি ও ওরা

সমাজসেবা আজকাল আর চ্যারিটি ওয়র্ক নেই। রীতিমতো পেড জব। তবে হ্যাঁ, খাটতে হয়। সময়েরও ঠিক-ঠিকানা নেই, কোন জবেই বা আছে! আমি পাশ করার এক বছরের মধ্যেই ভাগ্যক্রমে একটা এন.জি.ও-তে কাজ পেয়ে গেছি। টাকাপয়সা নিয়মিত। সুতরাং আমিও একটু আধটু অনিয়মিত হতেই পারি। সাহিত্য নিয়ে পড়েছিলাম, কেননা বিজ্ঞানে চান্স পাইনি। তবে বিজ্ঞানে আমার ন্যাক নেই এটা সেন্ট পারসেন্ট সত্যি কথা। না পেয়ে আমার কোনও দুঃখ হয়নি। বাবা বলেছিল— তুই তোর যা ইচ্ছে পড়। বাবা নাকি সাহিত্য ভালবাসত। লিটল ম্যাগট্যাগ করেছে এককালে। বড়রাই বাবাকে জোর করে মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার বানালেন। তখন, ষাটের দশকে এঞ্জিনিয়ার উদ্বৃত্ত হতে শুরু করে। অনেকেই চেষ্টা-চরিত্র করে বিদেশ, বিশেষত, আমেরিকা চলে যায়। ওখানে তখন যথেষ্ট চাহিদা। আমার বাবা চাকরি পেল, কিন্তু সুদূর জামনগরে। দাদু ছিলেন, ঠাকুমা খুব রুগ্‌ণ, তার ওপরে মায়ের একটা খুব ভাল স্কুলে চাকরি ছিল। মাকে থেকে যেতে হয়। সারা জীবন বাবার একলাই কাটল। যা-ই হোক। এত কথা বলা— যা পড়তে চাই, যা করতে চাই— আর যা চাই না কিন্তু করতে হয়— এই বাধ্যবাধকতা যে কত বিরক্তিকর তা বোঝাতে। এতদিন যা পড়েছি শিখেছি তা সরাসরি প্রয়োগ করার তেমন সুযোগ নেই আমার জবে। কিন্তু এই বদলটা আমার মন্দ লাগে না।

কলেজ-ইউনিভার্সিটি জীবন আর তারপরে চাকরি বা বিয়ে যা-ই হোক, সে জীবনটার কেমন একটা সূক্ষ্ম তফাত হয়ে যায়। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু বদলে যায়। পোশাক দ্যাখো সেই একই, জিন্‌স আর টি-শার্ট, চটি কিংবা হিল, চট করে বাস-ট্রাম মেট্রোর হাতল পাকড়ে উঠে যাওয়া যায়। গোঁত্তা খেতে খেতে আঁচল-চুন্নি এসব সামলাতে কি ভাল লাগে! দেখে কেউ বুঝবে না কে ছাত্রী, কে কম্পিউটারবাগীশ, কে অফসর, কে বা অভিসারে যাচ্ছে। আমাদের এই পোশাক নিয়ে বড়দের মহলে একটু রি-অ্যাকশনারিপনা আছে। নীতা তো ওর কেমিস্ট্রি স্যারের বউয়ের কাছে হেভি ঝাড় খেয়েছিল। ওর অবশ্য একটু বেশি বাড়াবাড়ি। এত টাইট পরে যে মডেল, না ছাত্রী,

বোঝা যায় না। স্যারের স্ত্রী বলেছিলেন— 'এখানে পড়তে আসতে হলে তোমাকে আর একটু আলগা পরতে হবে। যখন র‍্যাম্প ওয়াকিং করবে তখন যা খুশি পোরো।' নীতা এক নম্বরের টেঁটিয়া মেয়ে। এরপরে ও সালোয়ার কামিজ পরে যেতে লাগল। নো ব্রা। স্যারের স্ত্রী বললেন—তুমি বরং অন্য কোনও টিউটর খুঁজে নাও। আমার বাড়িতে আমি বেয়াদপি সহ্য করব না। আর শোনো, অপরিণত আছ, তাই বুঝছ না, কিন্তু নিজের সম্মান নিজের হাতে।

ভোলেভালা স্যারকে নীতা খুব জোকস্ বলত, স্যারও হা-হা করে হাসতেন, তিনি ওর পোশাকের অ্যাটোমি খেয়াল করেছিলেন কিনা জানি না। তবে নীতা যখন বলে, স্যার আপনার বাড়ি পড়তে আসতে আমার অসুবিধে হচ্ছে, আমার বাড়ি আসবেন? গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাব। উনি বলেন, তোমার সাহস তো কম নয়!

নীতা গ্র্যাজুয়েশনের পরেই ফ্যাশন-ক্যাপিট্যাল মুম্বইতে চলে গেল। ঠিক কী করছে এখন জানি না। কে যেন বলছিল কল-সেন্টারে কাজ করছে। কোথায় সুপার মডেল হয়ে রাতারাতি ফ্যাশন-ক্যাপিট্যাল জয় আর কোথায় কল-সেন্টার!

ড্রেস নিয়ে কারও কারও বাড়িতে আপত্তি থাকলে আমাদের বন্ধুমহলে জোর আলোচনা হত। তখন আমরা কখনও আর্টস, কখনও সায়েন্স বিল্ডিংয়ের সিঁড়ির ধাপে বসে তর্কাতর্কি করতাম। কেউ বসেছে সবচেয়ে নিচু ধাপে, তার ঠিক ওপরে হয়তো তিনজন। তারও ওপরে দু'জন। কেউই সোজা হয়ে নেই, একটু এঁকেবেঁকে। নইলে মুখোমুখি হব কী করে! আমি অবশ্য শোনার দলে, মাঝে মাঝে মধ্যস্থতাও করতে হয়, 'বলি কম, ভাবি বেশি'—আমার এক্স-টিউটর দীপক শর্মার দেওয়া এই ভাবমূর্তিটা বজায় রেখে।

রাজদীপ হয়তো বলল, এই তোরা ফেমিনিন জেন্ডাররা চিরকাল কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট করে যাচ্ছিস। ফর নাথিং। কী পরবি, কী পরবি না—এটা কি একটা ইস্যু হল?

রৌনক তখন বলবে, আরে ইয়ার, একটু তদন্ত কর, দেখবে এখানেও সেই কজ অ্যান্ড এফেক্টের খেলা।

আমার কৌতূহল হবে। আমি বলব, কী রকম?

জেনারেশন গ্যাপ কারও বাড়িতে কম, কারও বাড়িতে বেশি। এই ধর পিয়া, ওর মা ওর থেকে জাস্ট বিশ বছরের বড়, গ্যাপ কম।

সাড়ে উনিশ— পিয়া শোধরাবে।

হোয়াটেভার...বিশ বছরের গ্যাপ হল হাফ জেনারেশন। পিয়ার মা-ও পেন্টুল পরেছে একসময়ে; কী রে পিয়া?

পিয়া সিগারেট ধরিয়ে বলবে, পেন্টুল ঠিক নয়। প্যারালেলস পরত মা, ছবি আছে। তখন স্লিম ছিল। এখন যা মুটিয়েছে!

তবে? ঠিক বলেছি কিনা!—রৌনক মহা খুশি— কিন্তু এই ধর মধুমিতা। শি ইজ দা থার্ড চাইল্ড অব আ লেট ম্যারেজ। তোর সঙ্গে তোর মায়ের কত গ্যাপ রে মধু?

মধুমিতা মুখ ঝামটা দিয়ে বলবে, তাতে শালা তোর কী?

ওয়েল, আমি পয়েন্টটা এসট্যাবলিশ করতে চাইছি। তোদের পোশাকে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসে গেছে। এনিওয়ে, মধুর মা মাস্ট হ্যাভ বিন ফর্টিজ হোয়েন শি ওয়জ বর্ন। অর্থাৎ কিনা বিগ বিগ গ্যাপ। বাস, পুজোর সময়ে ফ্রি-সাইজ ঢোলকের মতো সালোয়ার কামিজ চলে এল। নববর্ষে টাঙ্গাইল শাড়ি। খিটিমিটি। জিন্স-ফিনস্‌গুলো কিনতে ওকে লাগাতার ফাইট করে যেতে হয়। কী রে মধু, ঠিক বলেছি?

তুই তো সব জানিস। শেয়াল-পণ্ডিত। টাঙ্গাইল বানান কর তো?

রৌনক খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে হাসতে তিন নম্বর সিগারেটটা ধরাবে।

বিন্দি বলবে, এ ছাড়াও একটা কারণ আছে।

—কী কারণ? কী কারণ?

—শুট ইয়ার।

কেউ হয়তো বলল, এ তো রীতিমতো সোশ্যাল স্টাডিজের রিসার্চ পেপার হয়ে যাচ্ছে! এম. ফিল-এর ডিসার্টেশন। কুইক শেষ কর, লাইনে আরও টপিক আছে বাবা!

বিন্দি বলবে, ইফ য়ু ডোন্ট মাইন্ড, ফ্যামিলি স্টেটাসটা একটা বিগ ফ্যাক্টর। যার বাবা বিগ বস, সে জিনস্ কেন সুট-প্যান্ট, মিনি-স্কার্ট সবেতেই 'ইয়েস' পাবে। যার বাবা মাস্টার, তার কেস খারাপ। স্কার্টের ঝুল বাড়াও শাড়ি ধরো। আঠারো বছর বয়স হয়ে গেল...ইটস শোয়িং...

মনীষার বাবা অধ্যাপক। সে তুমুল অট্টরব অগ্রাহ্য করে বাঁকা হেসে বলবে, হ্যাঁ সেটা নামেও মালুম। স্টেটাসে আবার রুচিও বিদায় নেয়। ফেয়ার ওয়েল টু রুচি। আইডেন্টিটি তো আগেই ভোঁ ভোঁ! কী নাম! আ হা হা হা—বিন্দি, জুহি, পিঙ্কি.... হ্যাভ নো রেফারেন্স টু ওয়ান'স অরিজিন, ল্যাঙ্গোয়েজ...

—আর রিলিজনটা বললি না?—বিন্দির মুখে হাসি, চোখে ঝাঁঝ।

—তুই-ই বল না। আমি আর কেন কথা খরচ করি! সব তো জানিস!

—ইন্ডিয়ানিজম ইন্টারন্যাশন্যালিজ্‌ম্ ইয়ার! বঙ্গভাষা বঙ্গসংস্কৃতি বঙ্গসন্তান করতে করতে শেষপর্যন্ত নির্ভেজাল বং! ওহ। তোরা কবে বুঝবি? এখন ভাষা, সংস্কৃতি, অরিজিন এসব ম্যাটার করছে না। ভুলতে হবে। না ভুললে পৃথিবীর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারবি না। না পারলে পিছোতে হবে, পিছোতে পিছোতে মনু-যুগ-টুগে ফিরে যেতে চাস? নাকি ট্রাইব্যাল বেল্টে ফুড গ্যাদারার হান্টার স্টেজে। অ্যান্ড দেন? অবলিভিয়ন— কেউ আর তোকে চিনবে না, জানতে চাইবে না। শেষপর্যন্ত জিরো।

এ কথাগুলো বিন্দিরই, না রৌনকের? মনে পড়ছে না।

—ওই তো কতকগুলো কথা শিখেছিস! হিরো! জিরো! যে যা ব্রেনে ইনজেক্ট করে যাচ্ছে, কপচে যাচ্ছিস। বস্তাপচা হয়ে গেছে, বুঝছিস না। ভাবনা-চিন্তা করতে শেষ নিজে নিজে, ফ্রি-থিংকিং। নইলে আমি নাহয় জিরো, কিন্তু তোদের মতো আইডেন্টিটিলেসদের আন্তর্জাতিক বাজারে মর্কট বলে ডাকবে।

মনীষা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াবে, কারণ রৌনক বলতে শুরু করেছে, নো পার্সন্যালিটিজ ইয়ার। দিস ইজ নট ডান।

মনীষা চলে যেতে যেতে বলে যাবে, এই যে 'ইয়ার'টা ধরেছিস রৌনক, এটাও টুকলি। দিল্লি-বম্বে থেকে। নিজেদের ডাক-টাকগুলোও ভুলতে চেষ্টা করছিস পাছে কেউ বং বলে। তবে কী জানিস! যাদের হিরোটিরো বলিস, 'দাদা' ডাকটা তাদের সৌজন্যে বেশ মর্যাদালাভ করেছে। অশোককুমার, কিশোরকুমার হেমন্ত মুখার্জি এঁদের সবাই 'দাদা' বলত। এখনকার সৌরভ গাঙ্গুলিকেও টিমের সব ক্রিকেটাররা অঞ্চল-নির্বিশেষে 'দাদা'ই বলছে। কই বং তো বলছে না! ডিফারেন্সটা কোথা থেকে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, নেক্সট সেশনটা এই নিয়েই চালা। কাজে দেবে!

হেভি রেগেছে— বিন্দি বলবে।

মনীষা চলে যাচ্ছে, রৌনকের ইচ্ছে করছে এক লাফে গিয়ে ওকে আটকায়, মনীষা চলে গেলে অর্ধেক চার্ম চলে যাবে আড্ডার। ওর জন্যে।

শুনেছি কলেজে ওরা সব ফার্স্ট বেঞ্চে বসত। ছেলেগুলো পাশের জনকে এইসা ঠেলবে যে তাসের বাড়ির মতো একজন আর একজনের ঘাড়ে পড়তে থাকবে। এবার ঠেলাটা আসবে উলটো দিক থেকে। একদিকে রৌনক আর এক দিকে রাজদীপ, কিংবা পৃথ্বীরাজ। এগুলোই সবচেয়ে বিচ্ছু। মাঝখানে বিন্দি, জুহি, সম্পদ, রীতা সব হি হি হো হো করবে। প্রোফেসর এলেও থামবে না।

পাস কোর্সের ক্লাস আবার ক্লাস।

একদিন ওদের প্রোফেসর দত্ত বলেছিলেন, বুঝতে পারছি— এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে যে, সে এখনও মাতৃগর্ভে। তবে পরস্পরের স্পর্শজনিত পুলকটাকে একটু সামলে যদি এদিকে একটু মন দাও তো 'হিটলার-বধ'টা শুরু করতে পারি।

গল্পটা আমার মনীষার কাছেই শোনা।

ইউনিভার্সিটিতে স্বভাবতই একটু ম্যাচিওরিটি এল। বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড বদলে গেল। এ ওকে ডিচ করল, সে তাকে, তারপরে হাত ঝেড়ে বলল, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে ইয়ার, হাতে হাত মেলাও। এ সময়ে ঠেলাঠেলির জায়গা নিলে স-ধূম, স-তরল আড্ডা।

মজা হচ্ছে মনীষার পাশ করার বছরেই এক আমেরিকা-প্রবাসী হাইফাই ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। এক বছর পরে যখন আমাদের আড্ডায় এল, দেখা গেল জিন্‌স তো বটেই, টপটাও চোলিকাট। কানে বিশাল বিশাল রিং। ভুঁড়িতেও একখানা রিং লাগিয়ে এসেছে। বিন্দিটা একেন্নম্বরের বিচ্ছু, জিজ্ঞেস করে, কী করে আইডেন্টিটি, বাড়িতে কিছু বলছে না?

—আ' অ্যাম ওল্ড এনাফ টু থিংক ফর মাইসেলফ— গম্ভীর জবাব।

—আর তোর বঙ্গালি আই ডি কার্ড?

—ঠুনকো নয় যে ভেঙে যাবে। আই ক্যান টেক কেয়ার অব ইট।

প্রস্থান।

আরও মজা হল, বিন্দি প্রেম করে বিয়ে করল এক প্রচুর পয়সাঅলা ভদ্রলোককে। যাকে বলে ম্যান অব প্রপার্টি। বাড়িতে জাঁদরেল শাশুড়ি, দিদিশাশুড়ি। ভদ্র মেয়েরা শাড়ি ছাড়া অন্য কিছু পরে, পান ছাড়া অন্য কোনও নেশা করে— ভাবতেই পারেন না। বিন্দির সিগারেট ঘুচে গেল, জিন্‌স ঘুচে গেল, হাতের মেহেন্দি ঘুচে গেল। নাম পালটে হল বিনীতা। বিন্দি আবার কী? ফোর্ড আইকনে ফরসা ধবধবে, কালো ঢেউতোলা চুল, বনেদি হাজব্যান্ডের পাশে বসে বিন্দি যায়। হুশ করে চলে গেলেও ওর মাথার সিঁদুর, কপালের ভেলভেট টিপ, শাঁখাসমেত গোছা গোছা সোনার চুড়ি পরা হাত দেখা যায়।

এখন রৌনক, রাজদীপ, আকাশের সঙ্গে দেখা হলে ওরা হাসাহাসি করে। বলে, তোরা কী জানিস? জলের জাত। যখন যে পাত্রে রাখা যাবে তখন সেরকম। হিউম্যান বহুরূপী। পিয়ার-প্রেশারে পেন্টুল ধরেছিলি, সিগারেট ধরেছিলি। আবার ম্যারিট্যাল প্রেশারে শাঁখা-সিঁদুর ধরেছিস।

আমি বলি—অ্যাডজাস্টমেন্ট। একে বলে অভিযোজন। সার্ভাইভ করতে গেলে কখনও রোঁয়া গজাতে হয়, কখনও ঝরিয়ে ফেলতে হয়। আসল কথাটা দাঁড়াচ্ছে—সারভাইভ্যাল।

কে কী রকম সারভাইভ্যাল চাইছিস সেটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— রৌনক দাঁতে নখ কাটে। ও কিছুতেই ভুলতে পারে না রুচি-পোশাক-কালচার এগুলোই মনীষার সঙ্গে ওর খেচাখেচির প্রধান কারণ ছিল।

আমি এসব ব্যাপারে দর্শক-শ্রোতার ভূমিকায়। ওদের সঙ্গে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আলাপ। আমি শুনি বেশি, বলি কম। আমার টিউটর দীপকদা বলতেন— তোমার টেম্পারামেন্ট একেবারে আদর্শ। ঝড়-ঝঞ্ঝা চট করে কাটিয়ে উঠতে পারবে। লোকে তোমাকে বিশ্বাস করবে, ভরসা করবে। সত্যি বলতে, কতকগুলো কথা সত্যিই মিলে গেছে। কার কী অবসেশন যাচ্ছে, কে কার জন্য দৌড়োচ্ছে— এগুলো আমি চট করে বুঝতে পারি। যার যা প্রবলেম, মনের-প্রাণের কথা, বন্ধুরা বেছে বেছে আমাকেই বলে।

রৌনক মনীষার জন্য ফিদা। বিন্দি বহুদিন ধরে রৌনককে চেজ করে যাচ্ছে, নাথিং ডুয়িং। অর্পিতার মায়ের অ্যাফেয়ার। বুল্টু নিজের চেয়ে পাঁচ বছরের বড় পাড়ার দিদির জন্য দিওয়ানা— এসব আমাকে শুনতে হয়। শুনি। মতামত চাইলে দিই। সে হিসেবে মেলা কাউন্সেলিং করতে হয় আমায়। শুধু প্রেম নয়। পার্থর বহুবার পড়া জিনিস পরীক্ষার সময়ে গুলিয়ে যায়, রমিতা ওয়ান টু ওয়ান কথা

বলতে অসুবিধে বোধ করে না, কিন্তু দল হলেই আড়ষ্ট; আত্মসচেতন হয়ে যায়। কৃষ্ণার ভেতর নিজের বোনের ওপর কেমন একটা ঘৃণা, বিদ্বেষ জন্মাচ্ছে। মলয়ের ধারণা ওর বাবা-মা ওকে দেখতে পারেন না। হাজারখানা। সব বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে।

তবে সব ঝড়ঝাপটা আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। মায়ের মৃত্যু ভেতরে ভেতরে কোথাও আমাকে অবশ করে রেখে দিয়েছে। এবং দীপকদার বিশ্বাসঘাতকতা আমি ক্ষমা করতে পারিনি। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলেন। যখন এম-এসসি পড়তেন তখন ম্যাথস-সায়েন্সের জন্য আমাদের বাড়ি ঢোকেন। ওঁর বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না। প্রচুর পড়তেন, জানতেন। শুধু অঙ্ক বা বিজ্ঞান নয়, সাহিত্য, ইতিহাস সবই। আমি যা শিখেছি তার অর্ধেকের বেশি শিখেছি ওঁর কাছে। এরকম একজন টিচারকে টিন-এজ ছাত্রী হিরো-ওয়রশিপ করবেই। এক ধরনের ভালবাসাই তো! আমিও বেসেছিলাম। মুখে কখনও বলিনি। আসলে বাবা কর্মসূত্রে জামনগরে থাকতেন। আমি আর মা এখানে। আমার বোধহয় একটা ফাদার-ফিগার দরকার ছিল। দীপকদা কিন্তু ঠারে-ঠোরে বলতেন অনেক কিছু— বুঝলে মিঠু, আমি অনেককে পড়িয়েছি, পড়াই। জানোই তো, নইলে আমার চলে না। কিন্তু তুমি আলাদা। তুমি আমার গ্যালেশিয়া। তোমার ওই কচি কলাপাতা রঙের আঙুল আর শুকতারা কুচির মতো চোখগুলো ছাড়া বাকি তোমাকে আমিই তৈরি করেছি। তোমার ওপর আমার অধিকার আগে। কতজনের সঙ্গে পরিচয় হবে, কতজন মানে ইয়ে... কিন্তু ভুলো না।

আমি ভুলিনি। কিন্তু দীপক সেনশর্মা কোনও এক বড়লোক শ্বশুরের টাকায় ইংল্যান্ড যাবার লোভ সামলাতে পারলেন না। আমাকে তো ছাড়লেনই, কিন্তু যে বউয়ের বাবার পয়সায় বিলেতে গেলেন তাকেও রাম ঠকান ঠকালেন। মার্কিনি মেমসাহেবের সঙ্গে লিভ-টুগেদার, বাঙালি বউকে তালাক, আর এক মেমসাহেবকে বিয়ে করে মার্কিন নাগরিক, হুজ হু-তে নাম লেখানো, বিখ্যাত গবেষক, অধ্যাপক, ও বিখ্যাত দুশ্চরিত্র হতে ওঁর বছর তিনেকের বেশি সময় লাগেনি।

বাড়ি ফিরতে দশটা। বাবা বারান্দায় বসে ঢুলছিল। ভি. আর. এস. নিয়ে অবধি পিতৃদেবের মনমেজাজ ভাল নেই। টিভিটাও তো দেখলে পারে, সময় কেটে যায়। গল্পের গোরু কীরকম তাল গাছে উঠে যায়, ঝানু ব্যাবসাদার না দেখে দলিল সই করছে, প্লাস্টিক সার্জারি করে খালি মুখ নয়, দেহের কাঠামো, কণ্ঠস্বর অবধি বদলে যাচ্ছে, ক্যাসেট করা দুষ্কৃতীর শয়তানি গলা শুনেও নিজেদের বাড়ির মা-বউকে লোকে বিশ্বাস করছে না, একজনের জায়গায় অন্য একজন বাড়ির বউ হয়ে বসে গেছে বন্ধুর কথা রাখতে, প্লাস্টিক সার্জারির হরেক ব্যবহার। প্রচুর চিঠি লেখে বাবা ইংরেজি-বাংলা কাগজে। কোথাও একটা অঘটন ঘটল— অমনি চিঠি। কেন অমুক খুনের কিনারা আজও হল না। ফিল্‌মি হিরো গাড়ি চাপা দিয়ে মানুষ মেরেও কী করে এখনও বিজ্ঞাপনে মাস্‌ল্‌ ফোলায়, হাসপাতালে কুকুর কেন...। 'মিসেলেনি'তে বাবা দিব্য একটা প্রবন্ধ লিখতে পারত— 'দা ডিফরেন্ট ইউজেস অব প্লাস্টিক সার্জারি ইন হিন্দি সিরিয়্যাল্‌স্‌! হাউ দে এনটারটেন অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স পিপ্‌ল্‌!' তা করবে না। খালি আমার পথ চেয়ে আর কাল গুনেই কাটিয়ে দেবে।

এদিকে, আমার যে প্রেম চটকে গেল, আইডলকে ক্রমশ একটি বিশুদ্ধ লম্পট ধাপ্পাবাজে বদলাতে দেখে আমার মধ্যে যে কতকগুলো টেকটনিক প্লেট সরে গেছে, আমার ভেতরের ভূগোলই পালটে গেছে; যতই বাবাকে ভালবাসি, আমি যে এখন এন্টায়ারলি লিবারেটেড ফিমেল, তা বাবা বুঝবে না। স্যরি মি. সেনশর্মা। আপনার সব রিডিংগুলো মিলল না। নিজের বাবাকেই বুঝতে চাইছি না।

বাবা নীচে নেমে দরজা খুলে দিল।

কী রে? এরপর পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকিস। এত রাত অবধি জেগে থাকা আমার পোষায়?

এত রাত। মোটে তো দশটা! এগারো-বারো হলে কী করবে?

—সে ভদ্রমহিলা পৌঁছোলেন? —আর কথা বাড়ায় না বাবা। মেয়েকে বেশ ভয় পায়।

—হ্যাঁ, ওঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলাম। ট্রেন খুব লেট।

—তা একটা ফোন করে দিতে কী হয়েছিল? ভাবছি।

—শুধু কি ট্রেন লেট! উনি আবার আদর্শবাদী টাইপ। কিউয়ে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি নিলেন। জ্যাম-ফ্যাম পেরিয়ে যখন ফার্ন রোডের বাড়িতে পৌঁছে দিলাম, বাড়িময় ঘুরে ঘুরে রোমন্থন করলেন, তারপর আমাদের গলদঘর্ম বসিয়ে রেখে নিজে আচ্ছা করে চান করলেন, তারপর আবার না খাইয়ে ছাড়লেন না।

—প্রথম দিন এসেই? বাড়িতে লোকজন মজুত, না কী?

—কেয়ার-টেকার, হিন্দুস্থানি। ডাল, রোটি, রসগুল্লা...

—বেশ করেছ, এখন খাবারদাবারগুলো ফ্রিজে ঢুকিয়ে শুয়ে পড়ো।

চানটান করে শুতে আমার একটু দেরি হল। জানলার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা আমার বহুদিনের প্রি-ঘুম অভ্যেস। লাল তারাটা জ্বলজ্বল করছে। মেঘের মতো ভেসে যাই আকাশপাতাল ভাবনায়। দীপক শর্মা সুট পরে এসে দাঁড়িয়েছে— এটা করালাম মিঠু, কেমন হয়েছে? মায়ের সঙ্গে ভোরে স্কুল যাচ্ছি। টিফিন বাক্সটা খুলে পড়ে গেল। যাঃ। কী মেয়ে রে তুই? মা পয়সা দিচ্ছে— আজকের দিনটা চালিয়ে দাও। আজেবাজে জিনিস খাবে না কিন্তু। হরেক রঙের একটা বিরাট তাঁবু, এত বড় যে গোটা পৃথিবীটাই বোধহয় তার ভেতরে ধরে যায়। একজন ক্লাউন নানা কসরত দেখাচ্ছে। আসল খেলোয়াড়রা পুরো জায়গাটা জুড়ে দেখাচ্ছে। ও দেখাচ্ছে এক পাশে। বাঁটুল, গালে হলদে, কপালে লাল, থুতনিতে নীল, আর নাকের ডগাটা কটকটে সাদা, বোধহয় নাকে একটা টুপিও পরেছে। এখন, জরির জামা গায়ে ওই খেলোয়াড়গুলোই আসল? নাকি ওই ক্লাউনটা? কাকে যেন জিজ্ঞেস করি, সে ঘাড় নেড়ে বলে, উঁহুঃ, বড় শক্ত প্রশ্ন। হালকা ঘুমের মধ্যে মেঘ ভেসে যায়, কে যেন বলে ওঠে— ছুটোবেলাই সব বেলা।

আমার অনেক কথা থাকে। কিন্তু আমি কাউকে বলি না। বাবাকে পর্যন্ত না। কেননা, সকলেই দেখি নিজের কথা বলতে ভালবাসে। আমি মৈত্রী, মিতু, অনেকেই মিঠু বলে। আমার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমার কতকগুলো গবেষণা আছে। সত্যি কথা বলতে কী, আমি যেন ওদের একটু আড়াল থেকে দেখি, চোখ রাখি। তাতে আমার একটা সুবিধে হয়। বলতে পারা যায়, এটা আমার হবি। যা দেখছি, তা থেকে যা ভাবছি, সেটা মনের মধ্যে রেকর্ড করা রইল। এবার ফলেন পরিচীয়তে। অদূর ভবিষ্যতে চরিত্র ও ঘটনা একটা নির্দিষ্ট দিকে বাঁক নিল, ধরুন। তখন আমার সিদ্ধান্তগুলো আমি যাচিয়ে নিতে পারি। কতকগুলো মেলে, কতকগুলো মেলে না। মনীষারটা যেমন একদম মেলেনি। ও কোনওদিন ভুঁড়িতে উলকি এঁকে, নাভি থেকে আংটা ঝুলিয়ে দেবে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। রুচি, স্বদেশিয়ানা, একটু রক্ষণশীলতা, সীমাবোধ তো ওর ছিলই। আমি ওকে সোজাসুজি কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। রৌনকদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর ও-ই একদিন আমাকে ফোন করল। —মিঠু আসবি? আয় না রে। গেলাম। গিয়ে অবশ্য একটু কড়কানি দিলাম, নইলে মান থাকে না। —কী ভাবিস বল তো! আমার কাজ নেই?

বকিস না, বকিস না, দ্যাখ না তোকে কেমন পকোড়া আর আসলি বিন থেকে তৈরি কফি খাওয়াই।

হ্যাঁ, তোর কফি না খেলে তো আমার ঘুম হচ্ছে না!

রাগ করেছিস আমার ওপর? নারে?

তুই আমার কে, যে তোর ওপর রাগ করব?

মনীষা ওর পাজামা-পাঞ্জাবি পরা লম্বা বডিটা আমার কোলের ওপর ফেলে দিল।

তুই বিশ্বাস করতে পারবি না এই ট্যাটু আর রিং ওখানে এখন কী রেটে চলছে! আমার বরের বন্ধুর বউরা, বান্ধবীরা সব কিছু-না-কিছু এসব করছেই।

খুব ভাল, এখানেও তো প্রেশার ছিল। তোকে তো কেউ কাত করতে পারেনি।

এখানে আমার পরিবেশ ছিল মিঠু। মা-বাবা ছিলেন, তাঁদের ভ্যালুজ ছিল। ওখানে কী আছে? কে আছে? আমার বর ছাড়া? সে বহুদিন ওখানে। এসব পছন্দ করে।

তা হলে তো আরও চমৎকার। নিজের ইচ্ছেয় কিছু করিস বুঝি। এতদিন নিরামিষ্যি খেয়েছিস এখন একটু কাঁকড়ার ঝাল খেতে সাধ গেছে। কিন্তু যাক গে আমাকে এত কৈফিয়ত দিচ্ছিস কেন?

একটু চুপ করে থেকে মনীষা বলল— হয়তো নিজেকেই দিচ্ছি। হয়তো নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করছি। মা-বাবার ইচ্ছে ছিল না এখানে বিয়ে দিতে। অমিত আমাকে প্রথম দেখেই কাত। —আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি, প্লিজ। তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। আইল গিভ য়ু হোয়াটেভার য়ু ওয়ন্ট। ভুলে তো বিয়ে করলাম। তারপর নতুন দেশ দেখার আনন্দে মাতোয়ারা। তারপরে আস্তে আস্তে প্যান্ট, টপ— এখনও শাড়ি অর টিপ দেখলে ওখানে বাচ্চারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। একদিন আমার আঁচল এসক্যালেটরে আটকে গিয়েছিল জানিস! কী আতঙ্ক! তো তক্ষুনি একজন সুইচ বন্ধ তো করে দিলই। আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিল। শাড়ি খুলে কোথায় চলে গেছে। পা মচকে গেছে, দিশাহারা, লজ্জায় হতভম্ব, ইন মাই ব্লাউজ অ্যান্ড পেটিকোট। ওরা যখন আমার বরের নম্বর চাইল, দিতে বাধ্য হলাম, অত কিছু ভাবিওনি। কিন্তু সেই থেকে ও গম্ভীর হয়ে গেল। ড্রেস পালটালাম। দিবারাত্র আনস্মার্ট বলে আমাকে, যেটা চাইবে সেটা না করলেই মুখ গোমড়া। আর করলে কী আদর, কী ভালবাসা। আদারওয়াইজ, কোনও পার্টিতে ও আমাকে জাস্ট ডাম্প করে দিয়ে চলে যাবে। কী করি বল— ড্রেস বড়, না স্বামী বড়?

বলতে পারতাম, ড্রেসটা নয়। কিন্তু তোমার বর তোমাকে এক ড্রেসে ভালবাসবে আর এক ড্রেসে বাসবে না, এটা... এটা কী করে মেনে নেওয়া যায়?

শুধু বললাম— তোর যা ইচ্ছে হয় কর না, কে কী বলল তাতে কী আসে যায়! তবে ও রকম আউট অব ক্যারেকটার ড্রেস করে বন্ধুমহলে না গেলেই পারতিস। ব্রাভাডো! না কি!

হতে পারে। নিজেকে নিজেই সব সময়ে বুঝে উঠতে পারি না।

বিন্দির ব্যাপারে আমার তেমন কোনও বিস্ময় হয়নি। ও মেয়ে অত্যন্ত ধড়িবাজ। যা চায় তার জন্য ভোল বদল ওর কাছে কিছুই না। ও-ই আস্তে আস্তে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের, বিশেষত বরের রুচি পালটে দেবে। ধীরে ধীরে। জানি না। আমার ধারণা এই। ভবিষ্যৎই বলবে আমি ঠিক কিনা।

আমাদের এই বাড়িটা খুব অসুবিধেজনক হয়ে উঠেছে। যখন এদিকে ধুধু সব খালি জমি বেশ কম দামে বিক্রি হচ্ছিল, দাদু কিনে রেখেছিলেন। বোধহয় ষাটের দশকের গোড়ায়। দাদু যখন তিন কাঠার ওপর দোতলা বাড়িটা করলেন আশেপাশে গাছগাছালির জন্যে কিছুটা ফাঁকা রেখে, তখনও চারপাশ ধুধু। নারকেল, অশ্বত্থ, জারুল, অমলতাস ছিল চতুর্দিকে। গ্রামের মেয়েদের মতো অনেক গাছপালা চিনি আমি। পাকুড়, পুটুস, ঢোলকলমি, ভাঁটফুল। এই বাড়িতে আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল, এখান থেকেই রামকৃষ্ণ মিশন সেবাসদনে গিয়ে মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন। যখন চোখ ফুটল, তখনও অনেক ফাঁকা দেখেছি, আশেপাশে বাড়ি উঠছিল, আমাদেরই মতো দোতলা, দেড়তলা। পাশের প্লটটা ছিল বিরাট। একটা আমলকী গাছে এত আমলকী ফলত যে আমরা কাছাকাছি বয়সের সব ছেলেমেয়েরা আমলকী কুড়োতাম— শম্পা, অত্রি, দুর্জয়, সায়ন্তনী...। আমলকী কুড়িয়ে দুর্জয়ের ঠাকুমাকে দিতাম। উনি সেগুলো জিরে জিরে করে কেটে রোদে শুকিয়ে ছোট ছোট শিশিতে ভরে আমাদের দিতেন। ফুরিয়ে গেলেই আবার। দাদু বলতেন— আমলকীকে কবিরাজিতে কী বলে জানিস তো?— অমৃতফল। খেলে নীরোগ, দীর্ঘজীবন লাভ হয়। আমাকে রোজ একটা করে কাঁচা আমলকী ভাতে দিয়ো তো বউমা! সারা শীতকাল দাদু আমলকী ভাতে খেতেন। দাদু বেশ ফরসা ছিলেন। আমাদের লোভ দেখাতে বলতেন, এই দ্যাখ আমলকী খাই বলেই না রক্ত পরিষ্কার, রং পরিষ্কার। তবে ফরসা হবার লোভ দেখিয়েও আমলকী ভাতে তিনি আমাকে খাওয়াতে পারেননি।

ওই প্লটটাতে একটা মাল্টি-স্টোরিড কমপ্লেক্স হয়েছে এখন। জি প্লাস ফোর। হয়তো রোদ হাওয়া ততটা আড়াল করেনি, কিন্তু আমাদের গাছ, মাঠ, ফুল, খেলা, ছোটবেলা সবই কাটা পড়েছে। ভীষণ বাঁধা-বন্দি লাগে নিজেদের। অতটা অবাধ ছিলাম বলেই হয়তো। বাড়িটার নাম 'মহানন্দা', আমরা বলি 'নিরানন্দা'।

'নিরানন্দা'তে থাকে শুভজিৎ। কলেজে একসঙ্গে পড়েছি। তখন থেকেই ওর বিদঘুটেমির জন্যে সবাই ওকে শুভ থেকে অশুভ বানিয়ে দিয়েছিল। লোকের পেছনে কাঠি দিতে ওস্তাদ। নখর গোলগাল ভুঁড়িয়াল চেহারা, কিন্তু বেশ করিতকর্মা। আমি চান করে মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে বারান্দায় গাছে জল দিচ্ছিলাম, নীচ থেকে হাঁক মারল, এই মিতু কাতুকুতু।

আমিও বলি, কী রে অশুভ! এই সাতসক্কালে মুখখানা দেখালি তো?

—নীচে নেমে আয় না একবার!

—দেখছিস না জাস্ট চান করে বেরিয়েছি!

—তো কী! কবে থেকে আবার পরদানশীন হলি? না কী বলে তোদের এই সমস্কৃতে অসূর্য...অসূর্যম্...

—চেষ্টা করিসনি— বরং শোয়ার্ৎজনেগার কিম্বা ব্রবডিংনাগ বল, পেরে যেতেও পারিস।

—কী আমার পণ্ডিত এলেন রে, মাথায় টিকি কই? নর নরৌ নরাঃ।

—এই অশুভ, ব্যাপারটা কী জানিস, টিকি ইজ নট নেসেসারি, বিজ্ঞানে পণ্ডিত হলেও তাকে পণ্ডিত বলে, এমনকী গানবাজনায় হলেও— পণ্ডিত রবিশঙ্কর, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী...শুনেছিস নিশ্চয়ই। আমার মাথায় টিকি নেই। কিন্তু তোর মাথায় শিং থাকতে পারে, পাতলুনে ল্যাজ, জুতোয় ক্ষুর...পরশুরাম কোট করছি। বুঝতে পারছিস তো?

—চিনি না আবার। সেই ব্যাটা রাজাগুলোকে দা দিয়ে কেটে ফিনিশ করে দিয়েছিল, বাবার কথায় মাকে সুদ্ধু কেটে ফেলে।

—বাঃ, অনেক জানিস দেখছি। তবে এ পরশুরাম সে পরশুরাম নয়। ইনি রাজশেখর বসু, পরশুরাম ছদ্মবেশে দারুণ দারুণ লিখতেন। আর দ্যাখ নর নরৌ নরাঃ-টা যখন জানিস তখন গর্দভঃ গর্দভৌ গর্দভাঃ-টাও শিখে রাখ। দেখিস আবার, দ ভ পরপর উচ্চারণ করতে পারবি তো?

—না পারলে? —শুভ এখনও খুশমেজাজ।

—না পারলে? 'চুনে জল দিলে চুন তাজা হয়' তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করবি। চুন মানে লাইম, জলটা ফর্চুনেটলি জানিস। আর তাজা হল তা Z।

ক্লাস লেকচার দিয়ে দিলি যে রে! এস. এম.-কে মনে পড়ে যাচ্ছে। হাউ বোরিং!

এস. এম.-এর সঙ্গে আরেকটা এস যোগ কর। পাঠাচ্ছি মেসেজটা। নিয়ে নে— শ্যালো মোরোনিক শিপ।

লম্বা চুলে পনিটেল, মোটকা শুভ বলল, ওরে ব্বাবা রেগে আগুন তেলেবেগুন হয়ে আছিস যে রে!

—রেগে আগুন তেলেবেগুনটা জানিস তা হলে? কোথায় আছে বল তো?

—হে হে।

—বলতে পারবি না। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'-এ 'গোঁফ-চুরি'-তে। বেগুন কী জানিস তো? ব্রিঞ্জাল? না বাইগন? গন উইথ দা উইন্ড! আমি আর দাঁড়াই না। সত্যিই রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে।

শুভটাকে দেখলেই, বলা উচিত নয়, রাগে আমার গা জ্বলে যায়।

যেমন ফরসা, তেমন নাদুস, তার ওপর চুলে একটা পনিটেল। সব সময়ে আমাকে খোঁচাবে। অপরাধের মধ্যে বি.এ. পর্যন্ত আমার সংস্কৃত ছিল। কমপ্যারেটিভ লিটরেচারে এম.এ.-তে তার জন্যে এক্সট্রা সুবিধে তো কিছুই পেয়েছিই।

ওমা! শুভটা দেখি ভেতরে ঢুকে এসেছে। বললে, ভুলে গিয়েছিলাম বুঝলি, তুই হলি গিয়ে 'নারী নারৌ নারঃ।'

—নারী, নার্যৌ নার্যঃ। আমি সংশোধন করে দিই। বলি, তুই কিন্তু জলম জলে জলানি।

—মানে আমি জল? আহ প্রাণটা ভরে গেল রে! জল দাও আমায় জল দাও।

—জলটা মিন করিনি। লিঙ্গটা মিন করেছি। নিউটার জেন্ডার। যাঃ যা দিকিনি।

—তুই আমাকে যা খুশি তাই বলবি তাই বলে, কালিন্দী? —শুভর গলায় ঝাঁজ।

—যা খুশিটুশি বলিস না। নিউটার জেন্ডারকে যা খুশি বলে দ্যাখ না ইন পাবলিক। তোকে পোঁদিয়ে বৃন্দাবন পাঠিয়ে দেবে। দে আর অলসো হিউম্যান, রাইটস আছে আমাদের মতো।

—তা হলে আমাকে 'নিউটার জেন্ডার' বলে অপমান করলি কেন?

—স্যরি, এখন দেখছি ওদেরই অপমান করেছি। মানুষকে জানোয়ার বললে যেমন জানোয়ারদের অপমান করা হয়!

—তোর বড্ড বাড় বেড়েছে কালী। ভারী একটা চাকরি পেয়েছিস! এন. জি. ও-র চাকরি আবার চাকরি! ফরেন ফান্ডে ফুটানি। সমাজসেবার ছদ্মবেশে জোচ্চুরি!

—বাঃ বেশ ভাল বলে ফেলেছিস তো! না রে তোকে ক্ষমা করে দিলাম। এবার নিশ্চিন্ত মনে তোর সেলুনে যা, মানে ভ্যারেন্ডা ভাজ গে যা।

বাবা চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়েছিল। বলল, কী অসভ্যের মতন ঝগড়া করতে শিখেছ মিঠু! ছিঃ।

এইভাবে ঝগড়া করতে না শিখলে এদের সঙ্গে লড়ে বাঁচতে পারব না বাবা। প্লিজ, তোমার পুরনো ভদ্রতার কনসেপ্টগুলো আমার ওপর চাপিও না।

একটা জিনিস আমার অদ্ভুত লাগে। কত রকমের শ্রেণীবিভাগ আমাদের এই জেনারেশনের মধ্যেও! ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির তফাত তো হবেই। সেটা স্বাস্থ্যকর। যে মেয়েরা প্যান্ট পরে সিগারেট গাঁজা খায়। যারা অন্য কিছু পরে, ওসব খায় না। যাদের মায়েরা চাকরি করেন, যাদের মায়েরা করেন না। যারা সায়েন্স পড়ে, যারা আর্টস পড়ে, টেকনিক্যাল স্কুল, এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, ফ্যাশন ডিজাইনিং, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, এম. বি. এ., আই টি— সব কিছুর একটা অদৃশ্য গোপন রেটিং আছে। জেনারল সায়েন্স ও আর্টসের ছাত্র-ছাত্রীরা অচ্ছুৎ হয়ে যাচ্ছে। আবার অনেক সময়ে এই সমস্ত রেটিং সত্ত্বেও দু'জন আলাদা বৃত্তের কারও সঙ্গে কারও প্রবল বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তবে সবচেয়ে আকচাআকচি বাংলা মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়ামে। ইংলিশ মিডিয়াম 'বাংলা স্কুল'কে দীনহীন পারিয়া, নিম্নশ্রেণী, ন্যুইসেন্স ইত্যাদি মনে করে। 'বাংলা'রাও ইংলিশদের ভাবে নাক-উঁচু, ক্রীতদাস মনোভাবাপন্ন, আপস্টার্ট নকলনবিশ, মৌলিকতাহীন। সিংহচর্মধারী গর্দভ। একই প্রজন্ম, শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে উভয়েই, উচ্চাকাঙ্ক্ষার ধরনটা আলাদা হতে পারে কিন্তু উভয়েই ভালভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। নিশ্চয়, এখনও পর্যন্ত সৎভাবেই এই বাঁচতে চাওয়া। অথচ এত এত দূরত্ব! বাবা বলেন— আমাদের সময়ে গুটিকয়েক মিশনারি স্কুল ছাড়া ইংলিশ মিডিয়াম তো কই ছিল না! কিন্তু আমরা গোড়ার থেকেই ইংরেজি পড়তাম। ইংরেজি ক্লাসে গ্রামার, ট্রানস্লেশনের মধ্যে দিয়ে প্রচুর শিখতাম, উচ্চারণ হয়তো ফিরিঙ্গিদের মতন হত না। কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধে হত না। অনেকে চমৎকার অ্যাকসেন্ট রপ্ত করেও নিতেন।

ইউনিভার্সিটিতে শিখরিণী বলে একটি দারুণ সুন্দরী মেয়ে পড়ত। কোনও মফস্‌সলি রাজপরিবারের মেয়ে, সম্ভবত রানাঘাট। মফস্‌সলের শুনেই অনেকের নাক বেঁকে গেল। রানাঘাটে পড়াশোনা করেছে? এহ্, মেয়েটার ইহকাল পরকাল দুই-ই গেছে। ছেলেদের ক্ষেত্রে এটা অবশ্য ওপর ওপর। ভেতরে ভেতরে খুব উৎসাহ। চলাফেরা করে দুর্গাপ্রতিমার মতো। সরু কোমর, চমৎকার মসৃণ গলা, আর তার ওপরে একটা অপূর্ব মুখ, কোনওখানে কোনও খুঁত নেই। সে এদের একটু ঘা দিতে পেরেছিল। একদিন ক্যাম্পাস দিয়ে যাচ্ছে, আকাশ পেছনে থেকে ডাক দিল— শিখা, শিখা—

শিখরিণী যেমন চলছে চলতে লাগল। ধনেখালি শাড়ি পিন করে পরা। লম্বা চুলে মোটা বিনুনি। কপালে ছোট্ট টিপ, হাতে বালা, কানে কুণ্ডল, গলায় হার। একেবারে সালংকারা।

আকাশ ছুটে সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তখন থেকে ডাকছি শুনতে পাচ্ছ না? শিখরিণী অবাক। কখন ডাকলে? কে যেন শিখাকে ডাকছিল!

—তুমিই তো শিখা? অত বড় নামে কাউকে ডাকা যায়!

—তাহলে ডেকো না!

—কী আশ্চর্য, আমরা তো সবাই সবাইকে শর্ট নামে ডাকি— রণজয়কে বলি রনি, রোহিতকে রোহু, আমাকে ওরা বলে আক।

—রোহু মানে রোহু ফিশ, রুই মাছ, আর আক কি আখ? না চন্দ্রবিন্দু দিয়ে চেঁচাবার?

প্রথমে বেচারি বুঝতে পারেনি, তারপরে বলল— কী আশ্চর্য! এইটুকু শর্টনিং অ্যালাও করবে না? ক্রিকেট টিমে তো সব টিমমেটের এরকম একটা শর্ট নেম থাকে। থাকত চিরদিনই। সুনীল গাভাসকরকে সানি। বীরেন্দ্র সহবাগকে বীরু। হরভজনকে ভাজ্জি, যুবরাজ সিংকে যুবি।

শিখরিণী দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল, চোখে কোনও ভাবান্তর নেই।

—এইটেই এখন চলছে।

শিখরিণী বলল, আমার নামটার মানে জানো?

—শিখ শিখ শিখর—আই সি, পিক—ইট মিনস পাহাড়।

—রং। শিখরিণী মানে প্রথমত খুব সুন্দরী। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয় মানেটা শিখরচারিণী, ঝরনা। একটা ছন্দেরও নাম। সংস্কৃত ছন্দ অবশ্য। রোহিত রুই মাছ হয়ে আনন্দলাভ করতে পারে। তুমি আখ হয়ে সুমিষ্ট আহ্লাদ অনুভব করতে পার। রনি ডাকলে রণজয়ের মনে হতে পারে সে কোনও নীলচোখ সাহেবছানা। কিন্তু আমি শিখরিণী। শিখরিণী থাকতেই ভালবাসি। পিওর অ্যান্ড সিম্পল শুদ্ধ তৎসম— তার ছন্দত্ব ও ঝরনাত্ব নিয়ে। বড় নামে যদি ডাকতে না পারো ডাকবে না। আমি কি তোমাকে বলেছি ডাকতে?

শিখরিণী চতুর্দিকে চোখ ধাঁধানো রূপ ছড়িয়ে চলে গেল। আমি মনে মনে হাসি। বলি, জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী/অভয়াশক্তি বলপ্রদায়িণী, তুমি জাগো।

এইসব অসুরদের দলনের জন্য এইরকম দুর্গাই দরকার ছিল।

পরে শিখরিণীর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হয়ে যায়। শুনি ও নাকি মিস রানাঘাট, পরে একেবারে মিস নদিয়া হয়েছিল। আশ্চর্য নয়। এখন মিস ক্যালকাটা হয়ে যেতেই পারে। তবে নেংটি পরে স্টেজে দাঁড়িয়ে আগ-গলুই পাছ-গলুই দেখাতে বোধহয় ও রাজি হবে না। কিন্তু আসল কথাটা হল ও বাংলা আর সংস্কৃত দুটোই সাংঘাতিক ভাল জানে। ওর দাদু ছিলেন সংস্কৃতে স্কলার। রীতিমতো গবেষক। নাতনিকে পড়িয়েছেন ছোট থেকে। শব্দতত্ত্ব নিয়েই তাঁর কারবার। ভাষার ভিতটা নাতনির উনিই করে দিয়েছেন।

শিখরিণী বলছিল, সাধারণ বাংলা-মাধ্যম স্কুলে, বিশেষ করে সরকারি স্কুলে সত্যিই আজকাল কিচ্ছু হয় না। কিচ্ছু শেখানো হয় না, না ইংরেজি, না বাংলা, না সংস্কৃত, না ডিসিপ্লিন— বিশেষ করে ভাষা আর সাহিত্য জ্ঞান ভীষণ অশুদ্ধ। জার্মানিতে বলছে সংস্কৃত সবচেয়ে যুক্তিশীল ভাষা, কম্পিউটারের উপযুক্ত, এরা তাকে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছে। বাংলা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। এখন স্কুলে স্কুলে বাচ্চাদের শেখানো হচ্ছে বাংলা কোনও কাজে আসে না, ও না শিখলেও চলে এবং অন্যান্য প্রদেশের খুদে পড়ুয়ারা বাঙালি বাচ্চাদের বলে— এ বঙ্গালিবাবু রসগুল্লা খায়গা, চাবল বন জায়গা, মছলি খায়গা, বদবু নিকালেগা। বাচ্চাগুলো নিজেদের বাঙালি বলতে লজ্জা পায়। —এই হল আমাদের স্বাধীন ভারত।

আমি বলি, তুমি এত কী করে জানলে? রানাঘাটেও এরকম ঘটছে নাকি?

—ঘটেনি, ঘটবে। আমি এখানে আমার মামার বাড়ি আছি তো! লোক্যাল গার্জেন। ছোটমামার ছেলের মুখ থেকে শুনি। মামিমারাও তো ভীষণ বাংলাবিরোধী। বলেন— বাংলা চাকরি দেবে? স্মার্টনেস দেবে? লড়াই করবার প্রতিযোগিতা বাড়ার শক্তি দেবে? বাংলা পড়লে পিছিয়ে পড়তে হয়।

—যা ব্বাবা। একেবারে পড়লেই পিছিয়ে পড়তে হবে? তা তুই কী বলিস?

—কী বলব? প্র্যাকটিক্যাল দিক থেকে দেখতে গেলে কথাগুলো তো সত্যি। যে সময়টা বাংলার পেছনে দেবে সে সময়টা বিদেশি ভাষার পেছনে দিচ্ছে। সাহিত্যে সময় না দিয়ে সায়েন্সে দিচ্ছে। তুমি লীলা মজুমদারের 'পাকদণ্ডী' পড়েছ?

আমি অপ্রতিভ। না রে, পড়া হয়ে ওঠেনি, তবে নামটা জানি।

—'পাকদণ্ডী'তে লীলা মজুমদার লিখছেন— ইংরেজি নিয়ে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন। সুবিখ্যাত অধ্যাপক পি. সি. ঘোষের নাম শুনেছ তো? আমাদের দাদুরা পড়েছেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঈশানচন্দ্র ঘোষের ছেলে। ঈশান স্কলারশিপ যাঁর নামে। শুনেছি বলতে পেরে আমি হাঁফ ছাড়ি।

—সেই পি. সি. ঘোষের ক্লাসে গিয়ে লীলা মজুমদারের প্রথমটা নাকি খুব অশ্রদ্ধা হয়েছিল, কেননা তিনি শিলং পাহাড়ে দাস মেমসাহেবদের থেকে ইংরেজি শিখেছিলেন। পি. সি. ঘোষের সেই উচ্চারণ ছিল না। উনি তো কনভেন্টে পড়েননি।

—তাতে কী? লীলা মজুমদার তো অদ্ভুত!

শোনো না, তারপর পি. সি. ঘোষের পাণ্ডিত্যে, তাঁর পড়ানোয় একেবারে মুগ্ধ হলে গেলেন ক্রমশ। ব্যাপারখানা এই। ওঁদের কোনও অসুবিধে হত না। আমাদের জেনারেশনের হচ্ছে। কেননা, ইংরেজিটা আর শেখানো হচ্ছে না। ইংরেজি পড়াবার টিচারও আর নেই। টেলিভিশনে ভাষাটাকে আরও বিকৃত করে দিচ্ছে। 'এনিওয়েজ' শুনেছ কখনও?

—যা বলেছিস। 'এনিওয়ে'ই তো জানি ভাই। এখন হয়তো বহুবচন সিদ্ধ হয়ে গেছে।

—আর্য প্রয়োগ। বুঝলে না! টেলিভিশন যা বলবে তা-ই ঠিক, যা দেখাবে তা-ই ঠিক।

—স্ট্রিট-স্মার্ট আধুনিকরা বানিয়েছে কিনা দ্যাখ আবার! হয়তো খোদ আমেরিকা থেকে আমদানি।

শিখরিণী এইরকম। দারুণ সিরিয়াস। অনেক পড়াশোনা করেছে। রোজ খবরের কাগজ পড়ে, কোনও সমালোচনা বা গায়ে-পড়াটড়া পাত্তা দেয় না। প্রয়োজন বুঝলে কথার চাবুক মারে। ও শেষ দিকটা ভীষণ আনপপুলার হয়ে গিয়েছিল। একা। ভাব দেখাত কিছুই এসে যায় না ওর। ওর কথা উঠলে তখন অনেকেই বলত ওরে বাবা তর্কবিশারদ, পণ্ডিত ভার্গব, জ্যোতিষার্ণব, শ্রীল-শ্রীযুক্তা মডার্ন খনা। বেশ কিছু অধ্যাপকও ওর কাছ থেকে চাবুক খেয়েছেন। ও বলে না, শুনেছি। বুড়ো ভাম জি. কে-কে বলেছিল— আপনার লজ্জা করে না, আমার বয়সি আপনার মেয়ে আছে! ছিঃ!!

জি. কে. হকচকিয়ে গিয়ে রেগে বলেন, এত বড় অপমান! কন্যার মতো দেখি বলেই, তোমার পিঠে হাত বুলিয়েছি? খারাপ অর্থ করলে! পরীক্ষার খাতায় টের পাবে।

দ্যাট ইজ জাস্ট লাইক য়ু,. য়ু পিপল। আপনি যদি পারেন, কম নম্বর দেবেন, আমি রিভিউ করাব। আপনি আমাকে চেনেননি। কেস করব।

আর কোন স্যার যেন পূর্বরাগে ভুগছিলেন। চুল ঝামরে আছে। দাড়ি কামান না। তিনি সবসময়ে পেছনে পেছনে ঘুরতেন। তাঁকে বলেছিল, যা বলবার সোজাসুজি বলুন না স্যার। আপনি তো আর কলেজের খোকা নন! এনিওয়ে, আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। এইসব পেছন পেছন ঘোরা গুজগুজে প্রেমে আমার বিশ্বাস নেই। আপনার প্রতি কখনও আমার কোনও ফিলিং জন্মাবে না। স্যরি।

আরও নিশ্চয় অনেক গল্প আছে। ও তো বলে না, বলে অন্যরা। মেয়েরা অনেকেই বলে, যাই বলিস, প্রিন্সেস ডায়নারও এত চার্ম ছিল না।

হিংসা আর মুগ্ধতা কি একই অনুভূতির এপিঠ ওপিঠ?

আমি শিখরিণীতেও অভিভূত। যদিও সেটা কক্ষনও জানতে দিই না। জানলে ও বিরক্ত হবে। ও বলে থাকে, আমি জানি আমি দেখতে খুব সুন্দর। সেইজন্যে অনেকে খুব কদর দেখায়। কিন্তু আজ যদি আমার মুখটা পুড়ে যায়, কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসুখেবিসুখে নষ্ট হয়ে যায়, কোথায় থাকবে এই কদরদারেরা? চরিত্র, ভেতরের চেহারাটার প্রতি যদি কেউ আকৃষ্টও হয়, সেটা থাকে বাইরের চেহারার সঙ্গে জড়িয়ে। সুতরাং একা। কেউ আর তখন চারুপাঠ করবে না তোমার কানের কাছে। ফিরেও তাকাবে না। বড়জোর করুণা করবে।

—তাই বলে তুই বন্ধু-বান্ধবকে বিশ্বাস করবি না? প্রতি মুহূর্তে মাপতে থাকবি কে তোকে কিসের জন্য পছন্দ করছে? বাঁচবি কী করে? কী নিয়ে?

—কেন? বই নিয়ে, গান নিয়ে, আর সেই তাকে নিয়ে— যে আমারে দেখিবারে পায়/অসীম ক্ষমায়/ভালোমন্দ, মিলায়ে সকলি।

—তাই বল, তোর নোঙর তাহলে বাঁধা হয়ে গেছে!

—দুর, যদি ভাগ্যে থাকে পাব, নইলে পাব না। আর, না পেলেও সবার ওপরে তো একজন আছেনই যার কাছে সুন্দর-অসুন্দর ভালমন্দ বিচার নেই।

—কার কথা বলছিস? দাদু?

শিখরিণী হাসতে লাগল, বলল, তোমরা পারোও মৈত্রী। তোমাদের মতো নাস্তিক হয়ে বাঁচতে হলেই আমার হয়েছিল আর কী! কূল পেতাম না!

শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর! হায় কপাল! সে ভদ্রলোককে আমরা স্মরণ করি পরীক্ষার আগে, মাথার যন্ত্রণা হলে, কনস্টিপেশনে, চাকরির ইন্টারভিউয়ে। পুরোপুরি তৈরি থাকলেও ডেকে থাকি। ডাকটা আসে ভেতর থেকে। কেননা ডাকছি সেই অজানা অজ্ঞাতপরিচয় রহস্যময় এক্স-ফ্যাক্টরকে যা না কি সমান-সমানের মধ্যেও তফাত গড়ে দেয়। কিংবা নিচুকে উঁচু করে, উঁচুকে নিচু করে। তাই বলে, প্রাগৈতিহাসিক বুড়ো-ঠাকুরদাদের ঈশ্বর? কে বলছে? না গটগট চলে, কটকট বলে, চটপট নম্বর পায়, বেগুনি, নীল, মেরুন শাড়ি পরে রূপের বান ছোটায় সেই শিখরিণী পালচৌধুরী? ভাল। বেশ গয়নাগাঁটিও পরে, বদলে বদলে। খায়দায়ও ভাল—ফুচকা, চাট, চটপটি কিছুতেই অভক্তি নেই। বিন্দির বিয়েতে গিয়ে তো মুরগি মাটন দুটোই সাঁটাল। কোনওটা বাদ দিল না। দহি-বড়া, ফিশ-তন্দুরি, আমিষ নিরামিষ....এমনকী জিলিপি পর্যন্ত। ওরা সদ্য ভেজে ভেজে দিচ্ছিল।

একদিন বলেছিলাম, তোর ঈশ্বরের সঙ্গে কিন্তু এই গয়নাগাঁটি, মুরগি, মাট্‌ন, ফুচকা-চাট ঠিক যায় না। ঠিক যেন শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ ম্যাচ করেনি।

শুনে বেশ কিছুক্ষণ হাসল। সিরিয়াস হলেও রসিক বেশ, হাসতে ওস্তাদ। বলল, তুমি কি আমাকে মীরাবাইটাই ঠাওরালে নাকি? ম্যয়নে চাকর রাখ জি! তোমাকে হতাশ করতে হল। আসলে আমাদের পুরনো দিনের ঠাট-বাট সব গেছে। তবু তো বনেদি রক্ষণশীল বাড়ির মেয়ে। এইসব গয়নাটয়না পরার অভ্যাস ছাড়তে পারি না। আর, বাড়িতে আমাদের খাওয়াদাওয়ার কী তরিবৎ ধারণা করতে পারবে না। চলো, তোমাকে নিয়ে যাব একবার। তবে ধরনটা একটু আলাদা। গরমকালে আম-কাঁঠাল দিয়ে ঘন দুধ, শীতে ক্ষীর কমলা, ফলের পাহাড় বাড়িতে। মাংস মানে রেওয়াজি পাঁঠা। মাঝে মাঝে। মুরগির চল নেই। প্রচুর মাছ। কোনটা চাও বল না। তবে এই মুখরোচক কুপথ্যগুলো বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে নেই। সুযোগ পেয়ে তাই এগুলোর সদ্‌ব্যবহার করছি। বলতে বলতে ও বারোতম ফুচকাটা মুখের মধ্যে চালান করে দিল। ফুচকা-গদগদ গলায় বলল, দূর তুমিও যেমন। আমি সাধিকা-টাধিকা নই। বেশ রসেবশে আছি। একদম সাধারণ। প্লিজ মৈত্রী। আমার সম্পর্কে অনর্থক উচ্চ ধারণা কোরো না। পস্তাবে, মানে পছতাওগি।

তবে, ও যে ভীষণ ভাগ্যবাদী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আমি যত জনের সঙ্গে আজ অবধি মিশেছি তাদের মধ্যে শিখরিণী একেবারে আলাদা। যতই যা-ই বলুক ও আমাকে জীবন সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণাগুলোকে, কম্বিনেশনগুলোকে ভাঙতে শিখিয়েছে। মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ যাকে বলে। যেমন হাই-হিল, টপ-জিন্‌সের সঙ্গে নোলক চলতে পারে, ধনেখালি শাড়ির সঙ্গে শালা। পাতাখোর দেখলেই মনে করার কারণ নেই— ছেলেটা/মেয়েটা বড় দুঃখী, জীবনে প্রচুর সমস্যা, পরীক্ষায় ফেল ইত্যাদি। পাতার সঙ্গে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্টও চলে, যদিও কতদিন চলবে বলা যায় না।

কাজলের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা 'ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ'-এ। রাধিকাদি অর্থাৎ রাধিকা কৃষ্ণানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। পরীক্ষা হয়ে গেছে। কেন যেন সাহিত্যটাহিত্য আর ভাল লাগছিল না। ফরাসি, জার্মান, সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলার পাথর টপকে টপকে চলমান সাহিত্যের সঙ্গে ঘর করেছি দু'বছর। মনটা 'হেথা নয়, হেথা নয়' করছে। সেই সময়ে রাধিকাদির সঙ্গে আমার পরিচয় একটা সেমিনারে। প্রান্তিক মানুষের সংস্কৃতি নিয়ে একটা দারুণ পেপার পড়েছিলেন উনি। আমাদের কত পুজো, বারব্রত, উৎসব, শুভকাজের আনুষ্ঠানিকতা যে আসলে আদি-সংস্কৃতি থেকে এসেছে, তার কথা বলছিলেন উনি। আমার অনেক প্রশ্ন ছিল। যথাসম্ভব উত্তর দিলেন, তারপর দেখা করতে বললেন ইনস্টিটিউটে। ওঁর ঘরেই একটি ছেলে মানে যুবক বসেছিল কম্পিউটারের সামনে। খুব মন দিয়ে কাজ করছিল।

আমি ঢুকেই বলি, রাধিকাদি আমাকে আজ আসতে বলেছিলেন। আমি—

—বসুন।

দশ মিনিট হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম উনি কি আজ আসবেন?

—এসেছেন। একটা জরুরি কাজে গেছেন। এসে পড়বেন।

আরও দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম এ কি হাসপাতাল না কর্পোরেট হাউস বাবা যে জরুরি কাজে চলে গেলেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট অগ্‌গেরাহ্যি করে।

একটু পরে নিঃশব্দে চলে আসছি। কম্পিউটারের দিক থেকে গলা ভেসে এল, আর দশ মিনিট। পেছন ফেরেনি। মাথার পেছনে চুলে লুকোনো দুটো চোখ আছে না কি রে বাবা! না কি কম্পিউটার-স্ক্রিনে কোনওভাবে আমার ছায়া পড়েছে? জিজ্ঞেস করলাম, আর দশ মিনিটে এসে যাবেন?

—বোধহয়।

বলতে বলতেই রাধিকাদি ঢুকলেন। দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমার বায়োডেটা আনতে বলেছিলেন। কেন কে জানে! —হিসট্রির সঙ্গে তো কোনও সম্পর্ক নেই দেখছি। —বললেন।

আমি বলি— গ্র্যাজুয়েশন অবধি হিসট্রি ছিল। খুব ইনটারেস্ট ছিল জানেন। ওদিক থেকে যুবক বলল— এটা কী বললেন ম্যাডাম, হিসট্রির সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন মানুষ আছে?

উনি হাসলেন— ঠিকই। একরকম ঠিকই বলেছ— মৈত্রী, এ আমার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট কাজল। তবে কে কার অ্যাসিস্ট্যান্ট সবসময়ে বোঝা যায় না।

খানিকটা মৃদু হাসি। কাজল চেয়ার ছেড়ে এদিকে এসে বসেছে। চা এল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, আর মুণ্ডাটা বললেন না ম্যাডাম? কাজল সিং মুণ্ডা।

পরে আমি বলেছিলাম, তুই এত কমপ্লেক্সে ভুগিস কেন রে? ও বলেছিল— ভুগি না। কিন্তু কমপ্লেক্স আছে। থাকবেই। নিজে ব্যানার্জি হয়ে মুণ্ডা অভিজ্ঞতা বোঝা যাবে না।

তা হলে অ্যাফিড্যাভিট করে পাল্টে নে পদবিটা।

তাহলে আর কী করলাম জীবনে?

এ-ই কাজল। কী যে করতে চায়— বোঝা যায় না পরিষ্কার।

৩) তিনি

রাত্রে গভীর ঘুম হয়েছে। সারাদিনের ক্লান্তি, চমৎকার একটি চান, এবং একটা নিশ্চিন্ততা। যেন অনেক অনে-ক দিন নির্বাসিত ছিলেন। এত দিনে বাড়ি ফিরলেন। এই বাড়ির প্রতিটি কোণ তাঁর প্রিয়, খুঁটিনাটি সব চেনেন, মনে আছে। একটাই অসুবিধে। তিনি ঘুমিয়েছেন ছ' বছরের একটি বালিকার মতো, পঞ্চান্ন বছরের অভিজ্ঞ এক বয়স্ক মানুষের মতো নয়। এরকমটা যে হতে পারে তা কি তাঁর ধারণায় ছিল? ছিল না। কেননা যতক্ষণ তিনি আমদাবাদে, সুরতে, ততক্ষণ তিনি কস্তুরীবেন, কস্তুরী মেহতা। কিন্তু কলকাতায় পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে টাইম-মেশিন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পেছনের দিকে ছুটেছে। সত্যি বলতে কি ঘুমের মধ্যে তাঁর যেটুকু চেতনা ছিল সেটা কিকির চেতনা, কস্তুরীর নয়। ঘুমটা যখন ভাঙব-ভাঙব করছে, কেমন একটা অস্বস্তি লাগছিল। যেন অনেকখানি জায়গা জুড়ে শুয়ে আছেন। পাটা যেখানে শেষ হয়েছে তার পরেই শূন্য। তা ছাড়া, কই পাশেও তো কেউ নেই! তার পরেই খেয়াল হল এ সবরমতীর তীরে শাহিবাগের নতুন শ্বেতপ্রাসাদ নয়। শাহপুরের দুর্গবাড়িও নয়। অন্য কিছু। দপ করে মনে পড়ে গেল।

ভোরবেলাগুলো আগের মতো আছে কিনা বোঝবার জন্যে তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়েই সজাগ হয়ে রইলেন। চোখ বুজে। বোজা চোখের জগৎ আর খোলা চোখের জগৎ একেবারে আলাদা। তাঁর ব্লাইন্ড স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবার ফলেই হয়তো ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর এমন একটা পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেছে। দৃশ্য নেই, ধ্বনি আছে, গন্ধ আছে, স্পর্শও আছে। খড়খড় করে কিছু একটা যাবার শব্দ। কী এটা! হাতে-ঠ্যালা গাড়ি নিয়ে জমাদার হাতে পারে, কর্পোরেশনের গাড়ি যায় ছড়ছড় করে জল ফেলতে ফেলতে, রাস্তা ধুয়ে যায়। আবার এ-ও দেখেছেন সাইকেলে একগাদা দুধের ক্যান নিয়ে দুধওলা চলেছে। ভেতরে দুধ ছলকাচ্ছে তার আওয়াজ। সাইকেলে বাহিত হয়ে যাবার ফলে একটা অনির্দেশ্য শব্দময় গতির আওয়াজ। কোনটা? জানতে হলে বারান্দায় গিয়ে ভোরের কলকাতার প্রাচীন, বালিকা রাস্তায় চোখ রাখতে হবে। কেমন একটা রোমাঞ্চ হল। কোনটা হলে তাঁর ভাল লাগবে? খুব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন জমাদারের গাড়ির আওয়াজটাই তিনি শুনতে চাইছেন। কেন? কেননা স্মৃতির রাস্তায় ওই আওয়াজটাই রয়ে গেছে। এ মহানগর জঞ্জাল পরিষ্কারে ধ্যান দিচ্ছে কিনা জানতে তাঁর আগ্রহ নেই। হঠাৎ তিনি নির্ভুল ঘ্রাণ পেয়ে যান—গন্ধরাজের। আবারও গায়ে কাঁটা দিল। ওটা কি সত্যিই আছে? না, স্মৃতির অতলে যেখানে মাটি পেয়েছে সেখানেই শেকড় গাছটার? তার ঘন সবুজ পাতা, শুভ্র থোকা থোকা ফুল, হৃদয় মন আর্দ্র করা সুগন্ধের।

আর থাকতে পাকলেন না। কাল রাতে অত খেয়াল ছিল না, তখন ভিড়, ঘাম, ময়লা, রুদ্ধগতি, গাড়ির কালো ধোঁয়া, বাড়ি পৌঁছোবার তাড়া, দুটি নতুন সময়ের নতুন মুখ এবং ক্লান্তিও। নিশ্চয়! কে বলেছে তাঁর ক্লান্তি নেই! তবে হ্যাঁ, চট করে প্রকাশ করেন না। সহ্য করবার ক্ষমতা, মনোবল এসব তাঁর উত্তরাধিকার।

শাড়ির আঁচলটা গায়ে টেনে তক্তপোশ থেকে নামলেন, চটিজোড়া পায়ের আন্দাজে পরতে গিয়ে পেলেন না। খালি পায়েই বারান্দার দরজা খুললেন আর অমনি 'হ্যালো' বলে অভ্যর্থনা জানাল হাওয়া। হাওয়ার কোনও নতুন পুরনো নেই। গ্রাম-শহরের চেহারা বদল হয়। সভ্যতার চালচলন বদলে যায়। হাওয়া বদলায় না। সেই চির-পুরাতন, চির-নতুন হাওয়া তাঁকে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল। হাওয়ার বুকের মধ্যে স্থির হয়ে রইলেন তিনি যেন বহুদিন পরে ধরা পড়েছেন প্রিয়জনের আলিঙ্গনের মধ্যে। কিন্তু তারপর গন্ধ তাঁকে আবার উতলা করে দিল। বারান্দার রেলিংপটিতে হাত রেখে তিনি ভয়ে ভয়ে ডান দিকে তাকালেন। আশ্চর্য। ঠিক মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে গন্ধরাজ বৃক্ষ। পাতাগুলো ঘন সবুজ, ফুলে ভরা। ঠিক যেন ছোট ছোট পাখির ছানা পড়েছে গাছটাতে। পরিযায়ী

বকেদের সদ্যোজাত ছানাদের সঙ্গে অল্প দূর থেকে দেখা ওই ফুলগুলোর আপাতদৃষ্টিতে কোনও তফাত নেই। কিন্তু কী যে সুবাস বয়ে আনছে—টাটকা। হাস্নুহানার মতো তীব্র নয়। কেমন মগ্ন করা। গন্ধরাজের সুবাস-সায়রে এক ডুব, দুই ডুব দিয়েই দুঃখিনী কিকি পৌঁছে যায় বাহান্ন-তিপ্পান্নর-চুয়ান্নর কলকাতায়। তখনও ছিল এই গভীর সুবাস, ভোরবেলার ওই খড়খড় শব্দ।

একটু আগেই ধোয়া হয়ে গেছে রাস্তা, জমাদার চলেছে। সন্ধেবেলা কর্পোরেশনের যেসব বাতিওলা গ্যাসের আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে, এখন তারা লম্বা মই কাঁধে বাতি নিবোতে নিবোতে যাচ্ছে। গাছে গাছে ভরা রাসবিহারী। সন্ধেবেলা বাসা-ফিরতি পাখির কাকলিতে ঝরনার মতো একটা আওয়াজ হচ্ছে। ছেড়ে ছেড়ে বাড়ি। ট্রামরাস্তা চলে গেছে ভীষণ একটা বিস্ময়ের পথ হয়ে। কোথায় গেছে পথটা? দিল্লি? 'দিল্লি চলো' কথাটা মাঝে মাঝেই শোনা যেত কিনা! দিল্লি একটা লক্ষ্যস্থল। আবার পথটা বিলেতেও গিয়ে থাকতে পারে। যেখানে বিলিতি সাহেবরা সব তাড়া খেয়ে চলে গেছে। মাঝে যে সমুদ্র আছে, অতশত মনে পড়ত না। সমুদ্রটা কী, তাই-ই জানা ছিল না তো!

ফার্ন রোড চিরকালই সরু। সরু সরু শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে গেছে বলেই কি নাম ফার্ন রোড? ভোরবেলা বাবা-মা'র সঙ্গে লেকে যাওয়া এক মস্ত আনন্দের ব্যাপার! বাবা-মা পেছনে পেছনে। সামনে লাফাতে লাফাতে চলেছে কিকি। ওইখানেই সে পাটকিলে রঙের কুকুর কুৎরাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। ধুঁকছিল ছানাটা। একটু বড় হয়েই অবশ্য তার বিরাট বন্ধুবান্ধবের দল হয়ে গিয়েছিল। বখা কুকুরগুলোর ডাকে সে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যেত। কিকির বকুনিতে কান না দিয়ে। তবে রাস্তায় তাদের কাউকে দেখলেই এমন বাঁইবাঁই লেজ নাড়ত যে মনে হত লেজটা উপড়েই যাবে বুঝি বা! খাওয়ার সময়েও তিনের একের সামনে ঘুরঘুর করত। তবে তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে ওঠার তার উপায় থাকত না। দারোয়ানা দুরদুর করে তাড়িয়ে দিত। বাচ্চাবেলার কুৎরার ডাকটা তিনি ক্ষীণস্বরে শুনতে পেলেন। কত দূর থেকে ডাকছে কুৎরা? কাকে ডাকছে?

সেই ডাকেই কি বেবি-ফ্রক পরা বালিকাটি বেরিয়ে এল? বাবা তো হুশ করে গাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পাশে বসে শরদকাকা। ওটা ছিল একটা পুরনো মরিস মাইনর। বাবা কিকিকে বলেছেন এর পরে একটা স্টুডিবেকার, তারপরে? তারপর একটা ডেমলার। রোলস রয়েস রাক্ষুসে তেল খায়, দেখতেও কেমন বিদঘুটে মতো। বাবার পছন্দ নয়। কিকিরও পছন্দ নয়। সে অবশ্য ডেমলার বা রোলস রয়েস কিছুই দ্যাখেনি, তবু বাবার বা পছন্দ, তারও তাই-ই পছন্দ। বাবা তাকে চুপিচুপি বলেছেন, আমদাবাদে দুটো গাড়ি আছে— একটা বুইক আর একটা স্টুডিবেকার। বাড়িটা অনেক বড়, সুন্দর। কত আসবাবপত্র!

মা বেরিয়ে এলেন। ডুরে শাড়ি, মাথার ঘোমটা খসে পড়ে গেছে। সরু সিঁদুরের রেখা; মায়ের হাতে পল কাটা কাটা সোনার চুড়ি, হাত নাড়লেই ঝিকঝিক করত। ঘুমোবার সময়ে সে চুড়িগুলো নিয়ে খেলা করত। তবে গলার হারটার ওপরই.বেশি লোভ ছিল কিকির। সেটাও চিকমিক করত। মায়ের মুখটা মনে করতে গিয়ে শুধু সোনার চুড়ির ঝকমকানিটাই মনে পড়ল! চুড়ি, হার, দুল। তবে কি সোনাই মাকে হারিয়ে দিল?

গান্ধী-টুপি খদ্দরের ধুতি পরা বা না পরা কত লোক আসছেন বিকেল হতে না হতেই। সুধাকাকা, রবিজ্যাঠা, অজিতবাবু, নিবেদিতা মাসি আর মেসো, রমাপিসিমা, স্নেহকাকিমা, আত্রেয়ীদিদি, রবিনদাদা। কত। কত! মা একটা বিরাট ডেকচিতে চা চাপিয়েছেন। এটা পেল্লাই অ্যালুমিনিয়মের কেটলিতে সেই চা ছাঁকা হল। সবাইকার মাঝখানে মা বসিয়ে দিলেন কেটলিটা। অনেক মাটির ভাঁড়। বাইরে থেকে আলুর চপ কি বেগুনি, কিংবা কচুরি এসেছে। এক গামলা মুড়ি। খেতে গিয়ে কিকি দেখে উঃ কী ঝাল! কী ঝাল! মা বলছেন, তোমার মুড়ি আলাদা বাটিতে মেখেছি সোনা। এই যে! গমগম করে আলোচনা চলছে। বাবা আর শরদকাকাও আছেন। একটু পরেই দু'জনে বেরিয়ে গেলেন। কারবার আছে। কুৎরাকে নিয়ে কিকি খেলা করছে। বল নিয়ে, ছোটবেলাকার ঝুমঝুমি নিয়ে। ঝুমঝুমিটা

মুখে করে আনছে ছোট্ট মিষ্টি মতন কুৎরা। ঝুমঝুম, ঝুমঝুম করে শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ কস্তুরীর মনে হয় তাঁর জগৎ প্রধানত গন্ধময়। তারপরেই আসে শব্দ; তারপরে স্পর্শ, শেষে রূপ। কেননা তিনি তাঁদের দ্বিতীয় গাড়ি বুইকটার চেহারা মনে করতে পারছেন না। মায়ের মুখটাও না। কিন্তু মাতৃগন্ধ এখনও কোনও কোনও সময়ে তাঁকে উতলা করে। স্পর্শটা রয়েছে আরও গভীরে, ঘুমের মধ্যে পান, আঁকড়ে ধরতে গেলে উবে যায়। কুৎরার ডাকটা শুনতে পাচ্ছেন, মনে পড়ছে তার পাটকিলে রংটা, এবং যেহেতু সে অতি সাধারণ গড়পড়তা একটা নেড়িকুকুর যাদের রাস্তায়-ঘাটে দেখাই যায়, তাই হয়তো এখনকার কোনও পথকুকুরের আদলের ওপর পাটকিলেটা চাপিয়ে তিনি কুৎরাকে গড়ে নিচ্ছেন। তার হয়তো আলাদা কোনও ব্যক্তিত্ব ছিল, স্বরূপ ছিল, তিনি বুঝতে পারেননি। সুধাকাকা, রবিজ্যাঠা, নিবেদিতা মাসি এঁরাও সব যেন জল পড়ে ধেবড়ে যাওয়া ছবি। কতকগুলো অদরকারি তথ্য মনে পড়ছে, কে কীভাবে শাড়ি পরতেন, কার আসা-যাওয়ার ভঙ্গিটা কেমন।

খালি অজিতবাবুকে দপ করে পুরোটা মনে পড়ে গেল। কাঁচা পাকা দাড়ি বুক অবধি। তিনি সেটাতে প্রায় সবসময়ে হাত বোলাতেন। একটা মুদ্রাদোষ। সে জিজ্ঞেস করত— অজিতবাবু, দড়িটা কি তোমার কুৎরী?

কেন? কেন?

সবসময়ে আদর করো যে!

গোঁফদাড়ির মধ্যিখানে অজিতবাবুর কালচে লাল ঠোঁট হাসছে। গেরুয়া পাঞ্জাবি সমেত মোটাসোটা শরীরটা দুলে দুলে উঠছে। সবাই হাসছে। কিকি একটুও অপ্রতিভ নয়। বাবা বললেন, কিকি এখন তুমি ওপরে গিয়ে ছবির বই দেখো। হ্যাঁ আরও ছবির বই এনে দেব তোমাকে।

সে বুঝতে পারে, তার অজিতবাবু ডাকটা বাবা পছন্দ করছেন না। মা-ও দু-একবার শোধরাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আর সবাই ডাকটাতে খুব মজা পেত। অজিতবাবু নিজে তো বটেই। ঘরসুদ্ধু সবাই ভীষণ আপত্তি করে ওঠে। কিকির বাচ্চা গলার 'অজিতবাবু' ডাক প্রতিদিনের সভায় একটা কমিক রিলিফ।

রামলাখন দোকান থেকে ধোকলা কিনে এনেছে। দুধ ফুটিয়ে এনেছে। এই বাড়িতে রান্নাঘর আছে, কিন্তু উনুন নেই। শুকনো খাবারদরকার কিছু কিনে আনতে হবে। ফলটল। কিন্তু রান্না খাবারের জন্য রামলাখনের ওপরই নির্ভর করতে চাইছেন তিনি। কেরোসিন স্টোভ একটা কিনে এনে, কেরোসিনটিন দিয়ে রেডি রাখতে বলেছেন। তবে সেটা হঠাৎ কোনও দরকার পড়লে। এমনিতে এই-ই বেশ!

খাওয়া বেশ করে রামলাখন বাসন নিয়ে বেরিয়ে গেলে একটা পুরনো ডায়েরি বার করলেন তিনি ব্যাগ থেকে। মহামূল্যবান ডায়েরি। বহুব্যবহারে জীর্ণ। কিন্তু বাবার হাতে, মায়ের হাতে লেখা অজস্র নাম ঠিকানা টেলিফোন নম্বর লেখা। যেগুলো বিশেষ করে চাইছেন, দরকার, সেগুলোতে ফোন নেই। কবেকার ঠিকানা সব। সে জানে এখনও এই ঠিকানায় ঠিক লোক থাকে কিনা। থাক বা না থাক, তাঁকে তো চেষ্টা করতেই হবে। তাড়াতাড়ি চানটান সেরে তৈরি হয়ে নিলেন তিনি। একবার মনে হল— ওই ছেলেটি? কী যেন নাম? কাজল? কাজলকে সঙ্গে নেবেন? সুবিধে হত। নাঃ, কালকে অতক্ষণ সময় নিয়ে নিয়েছেন ছেলেটার। আজ ডাকলে ওর কাজের ক্ষতি হবে। কোথায় নিশ্চয় কাজটাজ করে। তিনি ডাকলে না করতে পারবে না। ঠিক হবে না। তা ছাড়া কস্তুরী মেহতা কবেই বা কার সাথ সঙ্গতের পরোয়া করেছেন!

রামলাখনকেই জিজ্ঞেস করলেন, বোসপাড়া লেন কীধর হোগা মালুম হ্যায়?

বাউস পাড়হা? জরুর মাজি! গাড়িয়াহাট সে এক ট্যাক্সি লে লিজিয়ে, উসকো বোস পুখখর জানে কো বোল দিজিয়ে। পতা আপ কি পাস হ্যায় তো উধার হি মিল জায়েগা। উও যো বিজুয়ান পুল হ্যায় না? উস কি বগল মে।

সত্যি কথা বলতে কী কীভাবে কোথায় পড়বেন তাঁর এইবার একটু গুলিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির দরজায় ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়ালে কোনও অসুবিধে ছিল না। কিন্তু রামলাখন পরম আস্থাভরে তাঁকে গড়িয়াহাট দেখিয়ে দিয়েছে, কোন না কোন বিজুয়ান পুল দেখিয়ে দিয়েছে। কী করেন? রাস্তায় বেরিয়ে এক মিনিট ভাবলেন। কাল বাড়ি আসবার সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের মস্ত বিল্ডিংটা চোখে পড়েছিল, ওই দিকেই চললেন। মিষ্টির দোকান রয়েছে। গোলপার্ক।

মোড়ে বেরিয়েই চোখে পড়ল বিল্ডিংটা। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার। সামনে একটা পুতুলের মতো বিবেকানন্দর মূর্তি। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। বিবেকানন্দর মূর্তির মধ্যে বিবেকানন্দকে দেখতে পেলেন না। ইনস্টিটিউটটা তার লম্বাচওড়া ভারিক্কি চেহারা নিয়ে তাঁকে বলতে লাগল— বোসপুকুর চেনো না? গড়িয়াহাট রোড চেনো না। শ্যামবাজার চেনো না, বিজন সেতু চেনো না, আমাকে চেনো না, বিবেকানন্দ চিনতে চাও? জান না, যত বয়স হয় মানুষ ছোট্ট থেকে আরও ছোট্ট হয়ে যায়! দেড়শো বছরের কাছাকাছি বয়স হল না ভদ্রলোকের? রবীন্দ্রনাথের থেকে মোটে দু'বছরের ছোট। তার ওপর বিংশ শতাব্দী দেখতে না দেখতে কেটে পড়েছেন। আর থাকেন? এ তো তবু পুতুল!

একটা মিষ্টির দোকানে জিজ্ঞেস করলেন, বোসপুকুর কোথায়?

ট্যাক্সিকে বলুন দিদি, বিজন সেতু পার করে কসবা, তারপর বোসপুকুর। সবাই চেনে, দারুণ ঠাকুর হয়— শিশি-বোতল, শনের দড়ি...দেশলাই...বিস্কুট...।

কেমন অবাক হয়ে তিনি একটা ট্যাক্সি ধরলেন। শিশি বোতল, শনের দড়ি... দেশলাই?

—চিনো? বোসপুকুরে বোসপাড়া লেন? যেতে পারবে?

—কেন পারব না, কলকাতা আমার হাতের পাতার মতো চেনা। বোসপুকুর যখন আছে তখন বোসপাড়াও থাকবে। একটু খুঁজে নিতে হবে আর কী!

আরে! এই তবে বিজন সেতু? বাঁয়ে একডালিয়া পড়বে না? কর্নফিল্ড রোড? ডাইনে বালিগঞ্জ স্টেশন! কী চমৎকার গাছগুলো! রাধাচূড়ায় এখনও ফুল আছে। কৃষ্ণচূড়ার ঝিরিঝিরি পাতাগুলো চমৎকার সবুজ। কাঁপছে। দুদিকে বড় বড় বাড়ি!

বললেন, বাঃ, এসব তো নতুন নতুন বাড়ি দেখছি!

ড্রাইভার বলল, আপনি নতুন, না? এসব জায়গা নতুন ডেভেলপ করছে। সব তো জলজঙ্গল ছিল। এখনই কী দেখছেন, বাইপাসে গিয়ে মিশবে রাস্তা। কত বড় বড় হাসপাতাল। একেবারে যেন বিলেত আমেরিকার মতো। হাসপাতাল, কী হোটেল, বুঝতে পারবেন না দিদি!

কিন্তু কলকাতা হাতের পাতার মতো চেনা ড্রাইভারটি কোনও বোসপাড়া লেন খুঁজে পেল না। পুকুরের পাশ দিয়ে, খোলা জমির পাশ দিয়ে দিয়ে সরু সরু রাস্তা, ঝকঝকে নতুন বাড়ি, কিন্তু না আছে রাস্তার নাম, না কোনও হদিশ! অনেককে জিজ্ঞেস করেও কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

শেষ পর্যন্ত আর এক ট্যাক্সি-ড্রাইভারই বলল, বোসপাড়া লেন তো নর্থে, বাগবাজারে বুদ্ধু আর কাকে বলে?

বেচারি ড্রাইভার অপ্রস্তুত। —যাবেন দিদি? এখান থেকে অনেক ভাড়া পড়ে যাবে কিন্তু। তারপরে...মানে...আমি তো চিনি না ঠিক। এইরকম ঘুরব আবার।

তুমার ঘুরতে ইচ্ছা করলে চোলো, আমার অসুবিধা নাই। —বলে কস্তুরী সিটে হেলান দিয়ে দীর্ঘযাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। একটা ট্যাক্সি, তার থেকে আবার আর একটা ট্যাক্সি, এত ঝামেলায় কাজ কী। পৌঁছোনো নিয়ে কথা।

বাগবাজার! তার মানে তিনের একে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনার জন্য সুদূর উত্তর থেকে অজিতবাবুরা আসতেন। একদিন দু'দিন ছাড়াই সভা বসত। কয়েকটা ঠিকানা দেখে তিনি বুঝতে

পারছেন কোন অঞ্চলে। যেমন বেহালা, শিবপকুর, হাওড়া, কিন্তু কলকাতা ৫,৬,১২—দেখে তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। তখন এই একডালিয়াই ছিল দক্ষিণের শেষ সীমানা। কসবা অঞ্চলে নিশ্চয়ই মানুষের বসবাস ছিল, কিন্তু সে কেমন তাঁর জানা নেই। জামির লেন মনে আছে খুব। জাদুকর পি. সি. সরকারের বাড়ি। বাবার সঙ্গে গিয়েছিলেন একবার। উনি তাসের ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এই মেয়েটি যেখানে গেল— লেক গার্ডনস, ছেলেটি যেখানে গেল— সল্টলেক-করুণাময়ী— এসব তাঁর জ্ঞানের বাইরে। পরে হয়েছে। ছোটবেলার সেই কলকাতাকে সবচেয়ে ভাল চেনা যায় তার ট্রামে। আর তার লেকে। ছুটির দিনে সারাদিনের টিকিট কিনে বাবা কয়েকবার কলকাতা ঘুরিয়েছিলেন। ময়দানের পাশ দিয়ে চলেছে ট্রাম। একদিকে অথই সবুজ। অনেক জায়গাও চিনিয়ে দিয়েছিলেন। টিপু সুলতানের মসজিদ, পার্ক স্ট্রিটের কবরখানা। জোড়া গির্জা, কলেজ স্কোয়্যার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ। অনেক কিছুই মনে নেই। বউবাজার, শেয়ালদা, শামবাজার। মা বলতেন, আসলে বহুবাজার, হু লিখতে শেখা হল, শিয়ালদহ, শ্যামবাজার, য-ফলা শেখা হল। এগুলো কিছুই ভোলেননি।

হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল কলকাতার গন্ধটা কেমন বদলে গেছে। আবারও সেই গন্ধ দিয়ে চেনা। একটা কেমন বিশ্রী পোড়া পোড়া গন্ধ জ্বলজ্বলে রোদের ঝাপটার সঙ্গে নাকে আসছে। জ্বালা করছে নাক-চোখ। চারপাশে ঠিক দুর্গাপুজোর মতো ভিড়। বড় বড় উড়ালপুল, আকাশছোঁয়া বাড়ি সব। খুব আধুনিক, জায়গায় জায়গায় গ্ল্যামারাস! হঠাৎ যেন কলকাতার খুব টাকাপয়সা হয়ে গেছে। আশ্চর্য! তাঁর ছোটবেলার দেখা দিল্লি কেমন আমূল পালটে গেল, পালটে গেল আমদাবাদ। ওল্ড আমদাবাদের দেওয়াল ক্রমে ভেঙে ভেঙে মিশে গেল মাটির সঙ্গে। নতুন নতুন ব্রিজ হল সবরমতীর ওপর, প্রীতম নগর, উসমানপুরি, বিদ্যাপতনগর কত এলাকা গড়ে উঠল। তিনি কি আশা করেছিলেন কলকাতা পঞ্চাশ বছর আগে থমকে থাকবে? এক প্রৌঢ়ার মনের শৈশবস্মৃতির ফসিল! গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ গলি। ঝকঝকে ধোয়া রাস্তা, খালি জায়গায় জায়গায় বাড়ির জঞ্জালের ছোট ছোট স্তূপ, যেগুলো জমাদার রাস্তা পরিষ্কার করে যাবার পরে পড়ত। মা খুব রাগারাগি করতেন। ঢং ঢং ভোরের ট্রামের শব্দ।

মনে হল কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে থাকেন। স্মৃতির শহর স্মৃতিতেই থাক। নতুন ছবি দেখলে যদি পুরনোটা মুছে যায়! মুছে গেলে স্মৃতিসত্তার বড় ক্ষতি! কিন্তু এটুকু ক্ষতি তো তাঁকে সইতেই হবে। তিনি তো কোনও ছবি ঝালিয়ে নেবার বিলাস নিয়ে আসেননি! বাস্তবকে জানতে, সত্যের মুখোমুখি হতে এসেছেন। পুরনো ছবির ওপর দাগা বোলানো তাঁকে সাজে না। তবু চক্ষুষ্মান হয়ে চলতে চলতে তাঁর মনে হল পুরনো ছবিটা ঠিক মুছে যাচ্ছে না। তার ওপর এখনকার ছবিটা সুপারইমপোজড হয়ে একটা কীরকম পরাবাস্তব ছবি হয়ে যাচ্ছে। এবং যতই উত্তরে যাচ্ছেন সার্কুলার রোড ফিরে আসছে তার চেনা চেহারায়। যেন গভীর জলের মধ্যে থেকে ঘাই-মেরে উঠে এল বসু বিজ্ঞান মন্দির, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়। এই বাড়িগুলো তিনি একদা চিনতেন।

আরে! ওই গোলাপি বাড়িটা ডান দিকে! বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ!!! মায়ের সঙ্গে এখানে তো তিনি অনেকবার বক্তৃতা শুনতে এসেছেন! বক্তৃতা শুনতে কিকি একদম ভালবাসত না। কিন্তু মা-বাবারা এসেছেন অতএব আসতেই হত। অখিলজেঠু বলতেন, আহা হা, ছোট্ট মেয়েটাকে কেন কষ্ট দেওয়া! আমি না হয় ওকে নিয়ে একটু গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আনি। বাস, নীল সবুজ কাঠি আইসক্রিম, কুলফি, বেলুন...মজা...।

অনেক ঘোরাঘুরির পর বোসপাড়া লেন খুঁজে পেয়ে তিনি এবং তাঁর ড্রাইভার যেন ডাইনোসরের কঙ্কাল আবিষ্কারের গর্বে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তবে গলিতে গাড়ি ঢুকবে না। তিনি ড্রাইভারকে ছেড়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু ছেলেটি বলল—আপনার কি খুব দেরি হবে? কলকাতার তো কিছুই চেনেন না দিদি! আমি বরং একটু দাঁড়াই। মিটার ডাউন করে দিচ্ছি, যা উঠবে তাই দেবেন।

এখন যা উঠেছে তা হলে দিয়ে দিই? —কস্তুরী বুঝলেন না ড্রাইভারটি তাঁর সঙ্গে এত ভদ্রতা করছে কেন। ওয়েটিং চার্জটাও নিতে চাইছে না!

আমার কিন্তু দেরিও হতে পারে। কী নাম তোমার?

আমেদ।

ঠিক আছে। আমি টাকাটা দিয়ে দিই। যদি বেশি দেরি হয় চলে যেয়ো।

ঠিক আছে—বলে, দিব্যি সিটে হেলান দিয়ে ঘুমোবার তোড়জোড় করল ছেলেটি।

গোলকধাঁধার মতো গলি ঘুরে পাঁচের বি-র সামনে যখন দাঁড়ালেন, ততক্ষণে আবারও বহুকাল আগেকার কোনও সুগন্ধপ্রবাহ তাঁকে একেবারে অধিকার করে নিয়েছে। স্মৃতির ঘরে অনেক জমা-খরচের স্তূপের তলায় এতদিন চাপা পড়ে ছিল। কড়হি, খেপলার গন্ধ ভেদ করে এখন ছোটবেলা তার মুসুর ডালে কালো জিরে ফোড়নের সুগন্ধ ছড়াচ্ছে, মাছের ঝোল হচ্ছে কোথাও, ধনে জিরে হলুদ— তিনি মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। ভেটকি মাছ তাঁর গন্ধ লাগত বলে মা লেবু দিয়ে গন্ধ কাটিয়ে নিতেন, বলতেন নে গরম গরম খেয়ে নে...নইলে আবার... প্রত্যেক বাড়িই যেন তার রান্নাঘরের জানলা এই সরু গলিপথের মধ্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে শুধু তাঁরই জন্য। যাতে তিনি কিকির কলকাতায় পৌঁছতে পারেন। এক ধরনের সুগন্ধ অভ্যর্থনা।

বেল নেই। ভাল করে খুঁজেও পেলেন না। কে জানে চোখে এখন ঠিকঠাক নজর আছে কিনা! কড়া নাড়লেন ঠকঠক। নিচু দরজা খুলে চৌকাঠের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে একটি ফরসামতো বউ— তিনি নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন। সেইভাবেই শাড়ি পরা, গলায় হার, হাতে চুড়ি, কানে দুল, কিন্তু সে নয়। এ সবই খাঁচা, খাঁচা ছেড়ে পাখি উড়ে গেছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে তার যাবতীয় নিজত্ব। এই যে সময়ের বিপুল তফাত এটা যেন এই বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি বুঝতে পারছেন না।

—কাকে চাইছেন?

—ওজিতমোহন বোস কি এখানে থাকছেন?

বউটি একবার ভেতরের দিকে তাকাল— শুনছ! কে একজন কী বলছেন, একবার এদিকে শোনো না।

খুব আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন কস্তুরী, যতক্ষণ না প্যান্টের ওপর একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে, হাতে দাড়ি কামানোর ক্ষুর, এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন।

—কে? কাকে চান?

—অজিতমোহন বোসকে খুঁজছেন উনি— বউটি বলল।

—আহ, তুমি চুপ করো না। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলছি। আপনি কে?

কী অদ্ভুত। তিনি কে না বললে কি এঁরা অজিতমোহন সংক্রান্ত কোনও খবরই তাঁকে দেবেন না?

—আমি আমেদাবাদ থেকে কলকাতা এসেছি কাল, উনি আমার বাবার বন্ধুলোক ছিলেন। তাই...

—আপনি ভেতরে আসুন, নমস্কার। অজিতমোহন বোস আমার দাদু ছিলেন, দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করবার পর এই মাস কয়েক হল ওঁর দেহান্ত হয়েছে। অনেক বয়স হয়েছিল।

—তা হলে আমি যাই।

—না, যাবেন কেন? একটু বসে যান— ভদ্রলোক দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন আপ্যায়নের ভঙ্গিতে।

একটু ইতস্তত করলেন কস্তুরী। তারপর তাঁর সংকোচের ওপর স্মৃতি, কৌতূহল জয়ী হল। তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

চৌকো উঠোনে রোদ, কয়েকটা কাক ছোট্ট কিছুর টুকরো নিয়ে ঝগড়া করছে। দৃশ্যটা তাঁর চোখ যেন শুষে নিচ্ছে। এরকম চৌকো উঠোন থাকত, সেখানে রোদ-হাওয়া। ভেতর-উঠোন যাকে বলে। তিনি দেখেছেন, কারও বাড়িতে দেখেছেন। ডান দিকের প্রথম ঘর। ভদ্রলোক বললেন— আসুন।

এবং ঢোকবামাত্র অজিতবাবুর গন্ধ পেলেন। নির্ভুল। গাটা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। সামনের দেওয়ালে একটা ফটো। এনলার্জ করা, এখনও চন্দনের ফোঁটা লেগে আছে। বেশ বৃদ্ধ, দাড়ি চুল সব সাদা হওয়ায় কেমন অসংসারী-অসংসারী ছাপ পড়েছে। যেন সৌম্য বিবাগী সন্ন্যাসী। গুরুটুরু জাতীয়।

ছবিটার তলায় একটা দেরাজ। তার ওপর একটি পালিশ করা ছড়ি শোয়ানো। আর একটা চমৎকার গজদন্তর কৌটো। আরও কতকগুলো রয়েছে— কোনটা শাঁখের কোনটা কাঠের।

তাঁর দৃষ্টি লক্ষ করে ভদ্রলোক বললেন, দাদুর এই নেশাটি জব্বর ছিল। এক ঘনিষ্ঠ গুজরাতি বন্ধু ওঁকে প্রত্যেক উপলক্ষে একটা করে নস্যদান প্রেজেন্ট করতেন। দেরাজের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি। এই ছড়িটা ওঁর শেষজীবনের অবলম্বন। অন্ধের নড়ি।

—আন্ধা? উনি কি আন্ধা হয়েছিলেন নাকি?

—না, না, তা নয়। ওটা একটা বলবার ধরন ম্যাডারম— ইনডিসপেন্সেবল, আর কি।

কাঠের চেয়ারের ওপর আসন পাতা, তার ওপরে বসালেন ভদ্রলোক কস্তুরীকে।

—চা খাবেন ম্যাডাম!

—না, আপনি এখন বোধহয় অফিস বেরোচ্ছেন, আমি আর...

—ঠিক আছে, আমি বেরোব, প্রায় রেডি, আপনি একটু বসে যান না। চা?

—না।

—কেন? খান না?

—খায়, তবে বিশি না।

—তা হলে শরবত দিই। কিছু মুখে না দিয়ে যেতে পারবেন না। ওগো শুনছ, একটু শরবত! আচ্ছা... আপনার বাবা?

বউটি দু গ্লাস শরবত এনে রাখল।

কস্তুরী বললেন— নরেন্দ্র মেহতা। এই দু'মাস আগে গোতো হয়েছেন।

আরে তবে তো ঠিকই ধরেছি! এই নরেন্দ্রভাই-ই তো খুব বন্ধু ছিলেন দাদুর। গল্প শুনেছি অনেক। উনি বলতেন নরেন্দ্রর কাছে যে আমি কতভাবে ঋণী! আপনি ওঁরই মেয়ে?

খুব কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। উনি কী জানেন, কতটা জানেন ভেবে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন কস্তুরী। হয়তো তিনি যা জানেন, অজিতবাবুর এই নাতিটি তার চেয়েও বেশি জানেন।

শরবতে চুমুক দিয়ে বেশ আরাম পেলেন তিনি। ছ্যাঁক করে তোলে পাঁচফোড়নের শব্দ হল। দু'টি ছেলে এসে দাঁড়াল— বারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে বয়স।

আমার দুই ছেলে— অমিত আর অরিন্দম। অসিত... আমি অসিতমোহন। এই তোমরা প্রণাম করো এঁকে। একজন দিদা হন।

না না, শরবতের গ্লাস রেখে দিয়ে তিনি পা ঢাকলেন। ছেলে দুটি দ্বিধা না করে একরকম ছুটে বেরিয়ে গেল।

তাদের বাবা হেসে বললেন, আজ ইনটার স্কুল খেলা আছে। দু'জনেই ফুটবল। আজকালকার ছেলেরা ... বুঝলেন তো। রোনাল্ডো, বেকহ্যাম, জিনেদিন জিদান সব রোল মডেল।

বা বেশ ভাল—কস্তুরী উঠে দাঁড়ালেন। —ওঁর কাছে বন্ধুরা কেউ আসতেন না?

আসতেন কেউ কেউ কিন্তু তাঁরা লোক্যাল লোক, আপনি চিনবেন কি? সুরেশ আচার্যি মশাই, বৃন্দাবন দাশ। রামমোহন লাইব্রেরির এগজিকিউটিভ কমিটিতে ছিলেন সব। ওঁরাই...।

এঁদের কাউকে চেনেন বলে মনে করতে পারলেন না কস্তুরী।

—আচ্ছা যাই, নমস্কার। পালটে বললেন 'আসি'।

—যদি কিছু মনে না করেন ম্যাডাম, দাদুর একটা ছোট্ট স্মৃতি নিয়ে যান না! এই অজস্র নস্যিদানি

রয়েছে, হয়তো সবই আপনার বাবার দেওয়া। দাঁড়ান, আমি বেছে দিচ্ছি।

ড্রয়ার থেকে ভারী সুন্দর একটা কাঠ-খোদাইয়ের কৌটো বার করলেন অসিতবাবু— এইটা পছন্দ হয়! এত দূর থেকে দাদুকে মনে করে এসেছেন।

এইবার কৌটোটা যেন সাড়ে চার দশক লাফিয়ে কস্তুরীর হাতে উঠে এল।

—অজিতবাবু এটা কী?

—এটা? আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্প শুনেছিস তো? এটা হল তেমনই একটা আশ্চর্য কৌটো।

—এটা যদি মাজি, দৈত্য আসবে?

—দূর পাগলি, এটা তো আর পেতল তামা নয় যে মাজবি! এটার মধ্যে একটা ঝোড়ো দৈত্য থাকে, তার সঙ্গে খালি আমার ভাব।

—আমার কাছে আসবে না?

—আসবে। তবে সে তো নাক দিয়ে ফুঁসে বেরোয়, তোর ছোট্ট নাকখানা না ভেঙে দিয়ে যায়। বল, নিবি?

—ন্ না! —যে দৈত্য কিছু দেবে না, মাঝখান থেকে নাক ভেঙে দিয়ে যাবে, তাতে কিকির দরকার নেই।

কিন্তু কৌটোটার ওপর তার ভীষণ লোভ ছিল। ওইটা পেলে সে ওর ভেতর ভাজা মৌরি কি লেবু জোয়ান রাখতে পাবে। ইচ্ছে হল একটু খেয়ে নিল। আজ নাতির হাত দিয়ে সেই কৌটো অজিতবাবু দিচ্ছেন কিকিকে।

—দাদুই দিচ্ছেন ধরুন— কেমন একটা রহস্য করে বললেন অসিতবাবু। অজিতমোহন কি নাতিকে বলে গিয়েছিলেন— যদি কোনওদিন নরেন্দ্রর মেয়ে আসে তাকে এই কৌটোটা দেবে!

হাসিমুখে কৌটোটা নিলেন কস্তুরী, খুললেন— আর সঙ্গে সঙ্গে নাক সুড়সুড় করে জ্বালা করে ঝোড়ো দৈত্য তাঁর নাক দিয়ে আপসে বেরিয়ে এল।

ইশ্‌শ্‌ আপনার নাক তো ভারী সেনসিটিভ ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না। ছি। ছি। কবেকার...কৌটো..

কস্তুরী লাল চোখে, নাকে রুমাল চেপে রুদ্ধস্বরে বললেন— ইটস ও.কে!

অসিতমোহন জানেন না, তাঁর দাদু কিকির কাছে ছোট্ট একটা পুরনো রহস্য ভেদ করলেন। চমৎকার একটা ঠাট্টা হয়ে গেল একজন পরলোকবাসীর সঙ্গে একজন জীবিতের। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের! ডিব্বাটা হাতে চেপে ধরে তিনি বললেন— থ্যাংকিউ ফর দিস। আচ্ছা আসি।

শুনছ—ভদ্রলোক আবার হাঁক পাড়লেন— ইনি যাচ্ছেন যে! ফরসা বউটি তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়াল। কী মনে করে তাঁকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করল। তিনি মাথায় হাতটা ছোঁয়ালেন।

আমেদ নিশ্চিন্তে গাড়ির মধ্যে বসে। চোখ বন্ধ। গান শুনছে। 'সিসা হো ইয়া দিল হো, টুট জায়েগা!' দরজা খুলে ধরল। ক্যাসেট বন্ধ করে দিচ্ছিল, কস্তুরী বললেন, থাক, গান চলুক না!... সিসা টুটে যায়, কিন্তু দিল কি টুটে?

কী মনে করে তিনি একটা বড় দেখে দোকানের সামনে দাঁড়ালেন। —রসগুল্লা আছে? স্পঞ্জ মতোন! বাগবাজারের? —দু' হাঁড়ি কিনলেন। ধবধবে সাদা। রসের ভেতর টুবটুব করছে। বাড়িতে নামবার সময়ে এক হাঁড়ি আমেদকে দিলেন। ওয়েটিং চার্জ কিছুতেই নেবে না। যদি রসগোল্লা নেয়, তাহলে ওয়েটিং চার্জ নয়। অনেক কষ্টে তাকে দুটোই নেওয়ালেন কস্তুরী। খুশিখুশি মুখে চলে যেতে, মনে মনে বললেন, স্মৃতিসত্তা তোমায় দিলাম। আটপৌরে, আন্তরিক, অতিথিবৎসল্ পুরনো কলকাতা— তোমায় দিলাম।

৪) তিনি স্মৃতি ও মাসি

কাঠের নস্যিদানিটা হাতে করে বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে রইলেন কস্তুরীবেন। এক টুকরো অতীত বা ছুটোবেলা। সে সময়ে শরদকাকাকে শরদকাকা বলেই জানতেন। বাবার ছোট ভাই। পরে, দুজনের মধ্যে যখন কোনও সম্পর্কই আর রইল না, তখন জিজ্ঞাসাবাদ করে আস্তে আস্তে জানলেন শরদকাকা বাবার ছোট ভাই নন। বন্ধু। আদর্শবন্ধু। দু'জনেরই তখন এক মন, এক প্রাণ, দেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে, দেশকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ না হোক উত্তম আসন দিতে হবে। হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে দেখে, তাঁর ভাষণ শুনে তখন বাবা বাংলায় আসবেন বলে ঠিক করেন। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে গ্রেফতার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে থাকাকালীন দু'জনের ঠিকঠাক আলাপ। যখন জেল ছেড়ে বেরোলেন কোথায় সুভাষ? তখন সুভাষ-পন্থার সঙ্গে গাঁধী-পন্থার ঘোর তর্ক। তাঁরা বলতেন গাঁধীর অনশন এক ধরনের ইমোশন্যাল ব্ল্যাকমেল, গুরুতর কোনও বিপদ ঠেকাতে, প্রতিবাদ হিসেবে ভাল। কিন্তু উনি সে অস্ত্র যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ শাসকের সঙ্গে যে চুক্তি তিনি করেছিলেন তার চেয়ে মূর্খামি আর হয় না। আর শেষ পর্যন্ত তো দ্যাখাই গেল তিনি আসল সময়েই অস্ত্রটা ব্যবহার করলেন না। জিন্নাকে শত্রুকে পরিণত করেছিলেন নেহরু-গাঁধীই। তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে যখন পার্টিশন হল, গাঁধী তো কোনও অনশনে গেলেন না আর! অথচ কথা দিয়েছিলেন নাকি তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে পার্টিশন হবে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন যাকে বলে কমপ্লিট লিডার। পূর্ণ নেতা, পূর্ণ মানুষ। তাঁর পরিকল্পনা ছিল স্বাধীনতার পর ঠিক কীভাবে দেশের মানুষ ও দেশকে গড়তে হবে। তাঁর আশা ছিল যে-মুহূর্তে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ভারতের মাটিতে পা দেবেন, পুরো ভারত তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে।

জেল থেকে বেরোনোর পর দু'জনে ঠিক করেন, কিছু করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং দু'জনে মিলে নানারকম ব্যাবসা আরম্ভ করলেন। বাবার পৈতৃক জুয়েলারির ব্যাবসা ছিল। সেই ব্যাবসাই ঠাকুরদার সাহায্যে কলকাতায় শুরু করলেন তাঁরা। তারপর বিজনেস এমন একটা জায়গায় চলে গেল যে দুজনেরই মনের তিন-চতুর্থাংশ চলে গেল সেদিকেই। বাড়িতে যেসব সভা বসত তাতে প্রায়ই গরহাজির থাকতে হত। অজিতবাবুই ছিলেন বোধহয় সবচেয়ে নিবেদিতপ্রাণ। কস্তুরীর কখনওই মনে হয়নি অজিতবাবুর নিজস্ব সংসার, ছেলেমেয়ে থাকতে পারে। ভাবতেন, শিশুমনে যতদূর ভাবা সম্ভব, যে, অজিতবাবু বোধহয় অকৃতদার। সন্ন্যাসী ধরনের মানুষ। যে-কোনওদিন উনি হিমালয়ে চলে যেতে পারেন, একমাত্র দেশের জন্যই পারছেন না। সন্ন্যাসী ধারণাটা মজবুত করেছিল দাড়ি। ঘাড় অবধি কাঁচাপাকা চুল, গেরুয়া খাদির পাঞ্জাবি। রবীন্দ্রনাথ মানেই যেমন দাড়ি। ওইরকম দাড়ি গোঁফওলা লোক হলেই বলা হয় রবীন্দ্রনাথের মতো। শুধু দাড়ি দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চেনা— হাস্যকর!

অজিতবাবু তা হলে মারা গেছেন! অতি বৃদ্ধ বয়সে? একটা পাতা শূন্য হয়ে গেল। পূর্ণ করা গেল না। কত কী জানবার ছিল, বোঝবার ছিল! —অজিতবাবু আপনারা কী চেয়েছিলেন? কীরকম দেশ ও দেশবাসীর কল্পনা ছিল আপনাদের? তাকে সাকার করতে কোন পথে চেষ্টা করেছিলেন আপনারা? আচ্ছা, দেশের কাজের সঙ্গে কি বিবাহ করা যায় না? বিবাহিতকে অবিবাহিতের জীবন কাটাতে হয়? বা ভান করতে হয়? আপনাদের এক আইকন গাঁধীজি কিন্তু এন্ডস অ্যান্ড মিনস-এর শুদ্ধতার ওপর জোর দিয়েছিলেন। অজিতবাবু, আমার বাবা কিন্তু জানতেন না আপনি বিবাহিত। কেন এই ছলনা! লজ্জা! আপনার নাতির বয়স যদি আজ ৩৪/৩৫ হয় তাহলে আপনার ছেলের কম করে হলেও ষাট। তাহলে সে সময়ে আপনি বিবাহিত। পিতা। অথচ পুরোটাই চেপে গিয়েছিলেন, কেন? অজিতবাবু আপনার জীবন আপনাদের দেশপ্রেমের চরিত্র সম্পর্কে একটা নতুন দিক উদ্ঘাটন করছে আমার কাছে। প্রাচীন ভারতের সবরকম ধর্মদর্শনে ব্রহ্মচর্য-সাধনাকে সবার ওপর স্থান দেওয়া হত। তাই কি আপনাদের এরকম সংস্কার হয়েছিল? এখনও পুরো জিনিসটার তাৎপর্য আমি বুঝতে

পারছি না। মিথ্যে দিয়ে শুরু করলে কি কিছু সত্য দিয়ে শেষ হয়?

কীরকম হতভম্ব মতো হয়ে ডিব্বাটা হাতে বসে রইলেন কস্তুরীবেন। ছোট্ট একটু মিথ্যা আবিষ্কার দিয়ে যে যাত্রা শুরু হল তাকে কি আরও দীর্ঘ করা উচিত! ভাবতেই লাগলেন। ভাবতেই লাগলেন। তিনি সত্য জানতে এসেছিলেন, তথ্যও। একজন ছোট্ট মেয়ে তার নিজস্ব ছেলেমানুষি চোখ দিয়ে যা বুঝেছিল, তাকে প্রাপ্তবয়স্কর চোখ দিয়ে যাচাই করে নেওয়া চাই। কত মোহভঙ্গ হবে, হতেই পারে, সেটুকুর জন্য তাঁকে প্রস্তুত থাকতেই হবে। তিনি তো স্বপ্নে বাঁচেন না তাঁর বাবা-মাদের জেনারেশনের মতো। কঠিন বাস্তব নিয়ে তাঁর কারবার। চতুর্দিকে দেখেন ঈশ্বরের উপেক্ষিত প্রাণ সব—অন্ধ, মূক, বধির—তাদের হেলেন কেলার হবার প্রতিভা নেই, পরিবেশ নেই, জড়বুদ্ধি, স্প্যাস্টিক, অটিস্ট—এদের পুরো জীবনটা দুর্বহ বোঝার মতো নিজেদের কাছে, পরিবার-পরিজনের কাছে, আছে অত্যাচারিত স্ত্রী, মেয়ে, পথের শিশু—এদের সঙ্গে দেশ, তার নেতা, তার রাজনীতি, ধর্ম, উন্নয়ন— এসবের কোনও সম্পর্ক নেই। অর্থহীন জীবন, তবু বেঁচে থাকতে হয়। এক অক্ষম ঈশ্বর এদের সৃষ্টি করেছেন, তার দায় বইতে হয় তাঁদের মতো মানুষদের, যাঁরা নিরপেক্ষ নিরাবেগ কিন্তু সস্নেহ, মমতা দিয়ে দেখতে পারেন সব। উদাসীন ঈশ্বরের জায়গায় মমতাময় মানুষ, যার হাতে কোনও দৈব ক্ষমতা নেই।

নিবেদিতা মাসিই ছিলেন বোধহয় ওঁদের মতো সবচেয়ে ছোট। কেননা তিনি মাকে দিদি বলতেন। মা-ও তো নিবেদিতাই বলতেন।

উঠে গিয়ে পুরনো ছাতাপড়া নোটবইটা নিয়ে এলেন তিনি। হাওড়া-৪৪৬। এ কবেকার ফোন নম্বর? এ বোধহয় অপারেটরের যুগের। তারপর গঙ্গা সবরমতী দিয়ে কত জল বয়ে গেছে। স্যাম পিত্রোদা টেলি কমিউনিকেশনকে ঢেলে সাজিয়ে দিয়ে গেছেন। ফোন করে, চেক ইয়োর নাম্বার শুনলেন, ওয়ান নাইন ফাইভ ওয়ান করে—'হমে খেদ হ্যায়, ইয়ে নাম্বার মজুত নহি' শুনলেন। কিছু হবার নয়। ঠিকানা পাঁচ নম্বর ব্যাপটিস্ট বেরিয়্যাল গ্রাউন্ড রোড, শালকিয়া, হাওড়া। এক কাজ করলে হয়। একটা গাড়ি ভাড়া নিলে হয়, সেক্ষেত্রে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে চলাফেরা করতে পারবেন। রামলাখনকে ডাকলেন।

—জরুর মায়ি, উও রেন্টাল তো বগলমেই হ্যায়, ম্যয় আভি জাতা হুঁ।

রামলাখনই ঠিক করে দিল।

দই চিঁড়ে খেয়ে বেরোচ্ছেন। জগদ্দল অ্যামবাসাডরটার ভেতরে সবে গুছিয়ে বসেছেন। মোবাইলটা বাজল। —হ্যালো দিদি, আপনি কেমন আছেন? সব ঠিকঠাক চলছে তো?

কাজল।

—হ্যাঁ, টিকই আছে।

—'ই' টা কেন? কোনও দরকার হলেই আমাকে জানাবেন কথা দিয়েছিলেন!

—কুনও 'ই' নাই। কোথার কোথা। আমি একটু দোরকারে বেরোচ্ছি।

—কোথায়?

—হাওড়া।

—হাওড়া? নতুন ব্রিজ দিয়ে যাচ্ছেন তো?

—নয়া ব্রিজ? কওন সা নয়া ব্রিজ?

—নতুন ব্রিজ আছে দিদি, বিদ্যাসাগর সেতু, ড্রাইভারকে বলুন বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে যেতে। জিটি রোডে পড়বে। কোনদিকে যাবেন?

—সালকিয়া।

—*সালা...ও শালকিয়া*। তার মানে আপনাকে হাওড়া ময়দানের পরও সোজা চলে যেতে হবে। রাস্তার নাম বলুন!

বললেন।

—এঃ, চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে পিলখানা বলে একটা জায়গা আছে, ওটাই মোটামুটি শালকিয়ার শুরু। ওইখান থেকে জিজ্ঞেস করতে করতে যেতে হবে। একটা রেন্টাল গাড়ি নিলে পারতেন।

—নিয়েচি।

—বেশ, আপনার কোনও অসুবিধে হলেই আমাকে ফোন করবেন। ঠিক হাজির হয়ে যাব।

—টিক আছে। ওতো ভেবো না।

পাঁচ মিনিটও যায়নি আবার মোবাইলটা বাজল। নাহ্, এই তথাকথিত প্রগতিশীল কলকাতিয়ারা তাঁকে লেডিজ সিটে না বসিয়ে ছাড়বে না। মেয়ে গলা। মৈত্রী।

দিদি, আমি স্নেহলতা ঘোষের ঠিকানা বার করতে পেরেছি। —খুব উত্তেজিত গলা মৈত্রীর।

—পেরেচো? তাঁর গলাও কম উত্তেজিত নয়। স্নেহলতা ঘোষের ফোন নম্বরও তিনি খোঁজ করেছিলেন। কোনও হদিশ পাননি। ঠিকানাটা ধেবড়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছে না। জিজ্ঞেস করলেন, কী করে? কুথায়?

উনি তো ফ্রিডম-ফাইটার। বাবার এক বন্ধু সেন্ট্রাল গভমেন্ট সার্ভিসে আছেন। উনি বললেন পেনশনার হলে আমি বার করতে পারব। পেয়ে গেছেন। আমি আপনাকে ওঁর কাছে নিয়ে যাব। আমারও খুব ইচ্ছে ওঁকে দেখি। আমি কখনও ফ্রিডম-ফাইটার দেখিনি দিদি।

টিক আছে।

মোবাইল বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইলেন কস্তুরী। কখনও ফ্রিডম-ফাইটার দেখিনি— কীভাবে বলল মৈত্রী। ফ্রিডম-ফাইটার যেন এক আজব চিজ। ম্যমি। কলকাতা মিউজিয়ামে এসেছে। দেখবার জন্যে লাইন দিতে হবে। না না, তিনি বায়াসড হয়ে যাচ্ছেন। এভাবে ভাবা ঠিক নয়। ওর গলায় উত্তেজনার সঙ্গে একটা সম্ভ্রমও ছিল। কিন্তু কেন যেন একটা দুর্নিবার তিক্ততা তাঁর মনকে প্রায় আচ্ছন্ন করে। তখন বিদ্যাসাগর সেতুর মুখে এসে পড়েছে গাড়ি। অ্যাপ্রোচটা ধরে শাঁ শাঁ করে যাচ্ছে। পথ বদলাচ্ছে, দৃশ্য বদলাচ্ছে, তিনি লক্ষ করলেন না। এদের সঙ্গে তাঁদের জেনারেশন গ্যাপটা অদ্ভুত চরিত্রের। বড়র ভাবনার জগৎ আর ছোটর ভাবনার গ্যাপ নয়। আরও বেশি কিছু। তাঁরা ইতিহাসে বেঁচেছেন। তাঁদের বাবা-মা, দাদা-দিদিরা ইতিহাস তৈরি করেছিলেন— সেই চেতনা চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রবেশ করেছিল তাঁদের মগজে। তাঁদের কখনও কল্পনাতেও ছিল না, রাজনীতিকে শুধু একটা বৃত্তি হিসেবে কেউ নিতে পারে। রাজনীতি মানেই দেশ, দেশের জন্য ভাবনা। এরা বোধহয় পোস্ট-ইতিহাস। স্বদেশ-সচেতনতাহীন। মাত্র অর্ধ শতাব্দীর সামান্য বেশি স্বাধীনতা পেয়েছে। এখনও কলোনিয়্যাল প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি, এ বোধই নেই। সবচেয়ে বড় কথা— দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ নেই, ভালবাসা নেই। এরা... এরা বাইরের লোক, অন্য কোনও জগতের ছেলেমেয়ে। রাস্তাঘাটে এদের দেখে তিনি চিনতে পারেন না। যেমন মুম্বই, তেমন দিল্লি, এখন এই কলকাতা। আগের চেয়ে সাধারণভাবে সপ্রতিভ, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধহীন। নৈতিকতার ধার ধারে না। হয়তো তাদের আগের প্রজন্মই শেখাচ্ছে এসব। কে বলতে পারে। যদি তাঁর স্বামী একদম অকালে চলে না যেতেন, যদি ছেলেমেয়ে থাকত, তা হলে হয়তো বুঝতে পারতেন কোন পথ ধরে তারা এই অচেনা গুহায়, গোলকধাঁধায় এসে ঢুকেছে। কিন্তু আপাতত কোনও সূত্রই পাচ্ছেন না।

তবে, কাজল ছেলেটিকে তাঁর ভাল লাগছে। আধুনিক, সপ্রতিভ অথচ খুব সহজ, কোনও কৃত্রিমতা নেই। এক এক সময়ে মনে হয় ওর সঙ্গে তিনি সমবয়সি বন্ধুর মতো ব্যবহার করে ফেলবেন। কাজলের মতো ছেলেরা আবহমান। স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তার প্রাসঙ্গিকতা বদলায়নি। ওর বাবা-মাকে বাহবা দেবেন, না বাহবাটা ওকেই দেবেন— বুঝতে পারলেন না। নিজের ভাবনার ধারায় নিজেই অবাক হয়ে গেলেন কস্তুরী। তিনি সম্পূর্ণ কর্মজগতের লোক। পরিকল্পনা

করেন, মগজ এখন এমনভাবে কাজ করে যে অনেক সময়েই পরিকল্পনাটা আপনাআপনি হয়ে যায়। যেমন হয়েছিল এবারের দাঙ্গার সময়ে। হয় ছোটখাটো দাঙ্গা, কিন্তু সেটা সাধারণত দরিদ্র সুন্নিদের পাড়ায়, এবার শিয়া, বোহরা, ইসমায়েলি কেউ বাদ যায়নি। বড়-ছোট ব্যাবসাদারের বাড়িঘর লুঠ হয়ে গেছে। দোকান থেকে ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেটস, কসমেটিকস নিয়ে হরির লুঠ হয়েছে। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে যখন তাড়া-খাওয়া এক দঙ্গল মানুষ তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ে, সেই ভুলে যাওয়া পঞ্চাশ রক্তের মধ্যে, পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠেছিল। তাঁর বাবা, কাকা, মা, মামিদের মতো নির্ভীকচিত্তে তিনি তাঁর গ্রিল, ডবল কোল্যাপসিবল সব বন্ধ করেন। ওদের তিনতলায় চলে যেতে বলে হাতে নিয়েছিলেন রিভলভার, কোল্যাপসিবলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে দিয়েছিলেন জাতীয় পতাকা। কার সাহস আছে এর ওপর পা দিয়ে দাঁড়া, দেখি কত বড় দেশদ্রোহী তোরা! মরবার জন্যে প্রস্তুত থাক।

গালাগালের হররা। অকথা। একটা গুলি বিঁধে গিয়েছিল তাঁর বাঁ হাতের কবজিতে। গ্রেনেড ফাটল, অন্ধকার, ধোঁয়া, তিনি পেছোননি। তাঁর বাড়ির লোকেরা, দোতলার বারান্দা থেকে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করেছিল। ফুটন্ত গরম জল ঢেলে দিয়েছিল। সাত-আটদিন এইভাবে কাটে। তাঁর বাড়ি গিজগিজ করছে, মেয়ে পুরুষ শিশু। আরও আসছে। আরও। আকবরনগর, কাপুরনগর, হিম্মতনগর। পক্ষকাল কেউ ঘরে ফিরতে পারেনি। ঘরে খিচুড়ি হচ্ছে, চাটনি, আর অফুরন্ত দুধ। তারপর চারদিকে শ্মশানের স্তব্ধতা। তাঁর বাড়িতে জন্ম হচ্ছে। জন্ম হচ্ছে। মানবশিশু তিনটি। কিন্তু অনেক বরাভয়, সাহস, আস্থাও কি জন্মায়নি? নিশ্চয় জন্মেছে। তিনি প্রাণপণ করেছেন। তাতেও যদি আস্থার গর্ভপাত হয়ে যায়, তিনি কেন বাঁচবেন আর?

টোল দেবেন দিদি— দশ টাকা— ড্রাইভার বলল।

এইবার চোখ চেয়ে দেখলেন কস্তুরী, দু'দিকে ত্রিকোণ তৈরি করে চমৎকার স্টিলের দড়ির ওপর ঝুলছে বিদ্যাসাগর ব্রিজ। দুপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঘোলা জলের গঙ্গা। তাতে নৌকো। জেটির কাছ থেকে তেরছা গতিতে যাতায়াত করছে স্টিমার। গাছ, বড় বড় উঁচু উঁচু প্রাসাদ। তিনি মনে মনে বললেন, বেশ দ্যাখাচ্ছে, হঠাৎ দেখলে ভারত বলে মনে হয় না। যেন কোনও সমৃদ্ধতর দেশ, কিন্তু তোমরা মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ কোরো না, গজদন্ত-মিনারে থেকো না। এ তোমাদের বিবেকের প্রশ্ন শুধু নয়, নিরাপত্তারও প্রশ্ন। খরা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অনাহার-অর্ধাহার মানুষ সয়, কিন্তু চিরদিন সয় না। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অর্ধনগ্ন মানুষ যদি গর্জন করতে করতে ঢুকে পড়ে তোমাদের ঘরে ঘরে, কতজনকে মারবে তোমার ওয়াচম্যান, তোমার রিভলভার! তোমার পুলিশ আর তোমার কানেকশনস! তবু, কস্তুরী মেহতা তোমার চিন্তা, বেদনা দু-এক নিমেষের জন্য সরিয়ে রাখো। জীবনে, দৃশ্যে কিছু সুন্দরও আছে, অবকাশও আছে। ক্ষণিক বিরতির, বিস্মৃতির সুযোগ আছে। দু'হাত পেতে নাও।

সংকীর্ণ জি.টি. রোডের মধ্যে ইটকাঠ, বহুতল, বাজার, দোকানের সারি, ভিখারি এবং ইত্যাদি ইত্যাদি দেখতে দেখতে মনটা আবার খিঁচড়ে গেল। তা হলে কি পূর্বাঞ্চলের রাস্তাঘাট এত বছর পরেও সেই একই কুশ্রীতার ভরে আছে! একই রকম দুঃখের আঁচড় কাটা, তার চেয়েও বেশি, শৃঙ্খলাহীন, কদর্য। তিনি শুধু প্রসাধন দেখে সমালোচনা করছিলেন বা মুগ্ধ হচ্ছিলেন। তাঁরই যদি ভুল হয় তাহলে আর সবার হবে না কেন? হয়তো বা এই দুঃখের আঁচড়ও সত্য। প্রসাধনও সত্য। দুই মেরুকে কি কোনওভাবেই কোনও মধ্যপথে মেলানো যায় না। রাজধানী এক্সপ্রেস নিউ দিল্লি স্টেশনের দিকে এগোচ্ছে। কামরার ভেতর থেকে দেখা যায় অকথ্য আবর্জনার স্তূপ, অসহ্য দুর্গন্ধ, চতুর্দিকে ছেঁড়া ন্যাকড়া-কানি ঝুলছে, মানুষেরই পরিধেয়। আর সেইসব শহরতলিতে যেসব বাড়ি দ্যাখা যায়, তাদের কুশ্রীতারও কোনও তুলনা নেই। দেশের-রাজধানীই যদি এই হয়, তা হলে অন্যত্র আর ভাল কী হবে!

এইরকম ক্রোধ-শান্তি, আশা-হতাশার মধ্যে দুলছিল মেজাজ, ড্রাইভার বলল, এই আমরা পিলখানা দিয়ে চলেছি দিদি।

জিজ্ঞেস করো, জিজ্ঞেস করো, ব্যাপটিস্ট বেরিয়্যাল গ্রাউন্ড রোড কোথায়।

কেউ বলতে পারল না।

জেলেপাড়ার কথা বলছেন?

জেলেপাড়া, মেছোপাড়া, তাঁতিপাড়া কিছুই তিনি জানেন না। তাঁর ড্রাইভারও না। একবার মনে হল ট্যাক্সি করলেই বোধহয় ভাল হত। ওরা রাস্তাঘাট অনেক ভাল জানে।

অবশেষে একজন বৃদ্ধ লোক বললেন, ও রাস্তাটার নাম এখন শৈলেন্দ্র বসু রোড মা, অনেকটা চলে এসেছেন। একটু পিছিয়ে ডান দিকে বেঁকে যান বেরিয়্যাল গ্রাউন্ডটা দেখতে পারেন। পাঁচ নম্বর? ও তো নিবেদিতা মুখার্জির বাড়ি। নামকরা স্বাধীনতা সংগ্রামী।

ওঁকে, ওঁকেই তো খুঁজছি— উত্তেজনায় কস্তুরীর চোখ ছলছল করতে লাগল। অবশেষে...।

ছোট একটা দোতলা বাড়ি। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বাগান। তার একদিকে প্রচুর গার্ডেন চেয়ার পরপর ডাঁই করা, কিছু টেবিলের লম্বা লম্বা কাঠ। এই রে! কোনও বিয়েবাড়ি-টাড়িতে এসে পড়লেন না কি?

দরজা খুলল একটি ফ্রক-পরা মেয়ে, তাঁকে দেখেই বলল— মেনু কার্ড আনছি। একটু দাঁড়ান। ভেজ, নন-ভেজের রেট সব লেখা আছে।

তিনি বললেন— এটা কি নিবেদিতা মুখার্জির বাড়ি?

এবার ফ্রকের পেছনে একটি শাড়ি দেখা গেল, মুখে রুক্ষতা।

—কাকে চাইছেন?

—নিবেদিতা মুখার্জি—

—আমার ঠাকুমা— মেয়েটি বলল।

—তুই চুপ কর, বউটি বলল। কী দরকার আপনার? জানতে পারি? কী নাম?

—কস্তুরী মেহতা, আমেদাবাদে থাকি। এখানে এসেছিলাম। ছোটবেলায় চিনতাম ওঁদের। দেখা করতে এসেছি। —বলতে বলতেই কস্তুরী বুঝতে পারছিলেন একটু বেশি কৈফিয়ত দেওয়া হয়ে যাচ্ছে। এমনই রুক্ষতা বউটির যে তাঁর মতো কিছুই পরোয়া-না-করা মানুষের মুখ থেকেও জবাবদিহি বেরিয়ে এসেছে।

আবার প্রশ্ন এল— উনি কি আপনাকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন?

—কেন বলুত তো? —এবার একটু চড়া হলেন কস্তুরী— আপনার কিছু অসুবিধে আছে? আমার ঠিকানাই ওঁর জানা নাই। চিঠি কী?

—না, তা নয়। বয়স হয়েছে তো, একটু সাবধান হতে হয়— জোঁকের মুখে নুন পড়েছে।

—আমার কোনও ইনফেকশাস ডিজিজ নাই— বিরক্ত সুরে বললেন তিনি।

—না, না, সে কী— আসুন...।

দোতলার উত্তর-পশ্চিমের একটা ছোট ঘরে পাত্তা পাওয়া গেল নিবেদিতা মাসির। রাস্তায় দেখলে চিনতে পারতেন না। হায় নিবেদিতা মাসি, আগুনের মেয়ে, আগুনের বউ, কোথায় তোমার সে উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস! চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে। বেশ শীর্ণ চেহারা, সাদা সবুজ পাড় একটা মিলের শাড়ি পরা। একটা কাঠের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাজ করছিলেন।

বউটি দাঁড়িয়ে রইল। কস্তুরী নিজের নাম পরিচয় বললেন। নিবেদিতা ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। চিনতে পারছেন না। কস্তুরী মেহতা? কিকি? কে? —বউটির দিকে তাকিয়ে বললেন— আবার কোনও নতুন চালাকি ধরেছ নাকি? মহিলা এনে আমাকে মিসগাইড করবার চেষ্টা করছ? —গলা বেশ কড়া।

দেখছেন তো কী রকম মাথা খারাপ...ওই জন্যেই...

মাথা খারাপ? আমার না তোমাদের? ওই ফুলচাঁদ একেবারে জোচ্চোর। ওর সঙ্গী-সাথী লাড্ডু, খোকন, বাচ্চু, সুবীর সব্বাই। ওরা পার্টির গুন্ডা তোমরা জানো না? নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারছ?

আপনি বকুন, আমি নীচে যাচ্ছি, কাজ আছে। বউটি পড়পড়িয়ে পালিয়ে গেল। তার গতিপথের দিকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন উনি। উঠলেন, বাইরে গেলেন, সিঁড়ি কয়েক পা নামলেন, হাঁটুতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠলেন। তারপর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন— যা আড়ি-পাতা স্বভাব! কিকি আজ আমার সঙ্গে খেয়ে যাবে। বুঝলে?

অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইলেন কস্তুরী— আপনি আমায়...

নরেন্দ্র ভাইয়ের মেয়ে— চিনব না! কী যে বলো? সমস্ত মুখটা হাসিতে ভরে গেল। —কেমন আছ? তোমার কাজকর্মের খবর কিছু-কিছু রাখি। অনেক ধন্যবাদ কিকি, মাসির কাছে আসার জন্যে।

—এরকম কেন? এঁরা! এসব কী?

—হবে না! ফ্রিডম-ফাইটার্স পেনশন পাই। তা দিয়ে নিজের খরচ পুরোপুরি চালাই। কেটারিং বিজনেস করে, তার ক্যাপিট্যালও অর্ধেক আমি দিয়েছি। এরা সব আমার মাসতুতো ভাইয়ের সংসার, আশ্রয় দিয়েছি। এরকম করবে না! কৃতঘ্নতাই মানবজাতির মূল চরিত্র কিকি, অকৃতজ্ঞতা নয়...একেবারে কৃতঘ্নতা। যে উপকার করেছে করো তার সর্বনাশ! কষে করো। ... আমার তো নিজের সংসার নেই...নিশ্চয় জানো...

—আপনি বললেন তাই জানলাম...নইলে...

—তোমার মনে আছে কি মেসোমশাই কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন! পুলিশের গুলিতে মারা যান। ফিফটিজ-এর গোড়াতেই। তখন খুব ধরপাকড় চলেছে। দু'জনেই নিজেদের মতো করে দেশসেবা করেছি, ছেলেমেয়ে হবার আর সুযোগ আসেনি।— চুপ করে রইলেন নিবেদিতা মাসি— এদের ডেকে আশ্রয় দিলাম, প্রোমোটারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বাড়িটি হাতাতে চাইছে। তবে তোমাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য জানিয়ে রাখি, আমি বাড়িটি উইল করে ভারত সেবাশ্রম সংঘকে দান করেছি। উইল ওঁদের কাছে। দ্যাখো কিকি, সেবা ছাড়া তো আমাদের আর কিছুই করবার নেই। আমাদের নেতারা তো একটা দুর্ভিক্ষ-খরা-বন্যাপীড়িত দেশ ছাড়া কিচ্ছু দিয়ে যেতে পারেননি। পেটে খেতে পারে, আশ্রয় প্রতি বছর ভেসে যাবে না, তবে তো তাকে বলতে পারি— শেখো, পড়ো, পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে যোগ করো। তাই আমার দিক থেকে, সেবাতেই আমি সবচেয়ে কৃত্য কাজ দেখি। আর্তত্রাণ। একটা বন্যা হল, চতুর্দিক থেকে কোটি কোটি টাকা এল, কেউ জানে না, সেসব কোথায় গেল! তার চাইতে যারা নিঃসংশয়ে কাজ করে, তাদের কাছেই আমার সামান্য টাকা যাক— থানায় ডায়েরি করে রেখেছি। এরা আমার ওপর মানসিক অত্যাচার করছে, মেরে ফেলতে পারে।

—একটু শিউরে উঠে কস্তুরী বললেন, সত্যিই কি সে ভয় আছে?

আছে। তবে কিকি, তোমার মাসি মরতে ভয় পায় না। দুঃখ কী জানো? দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে যেতে পারতাম তো দুঃখ ছিল না। যাদের স্বাধীন করেছি, তারা ষড়যন্ত্র করে আমাদের নিঃস্ব করতে চায়, মারতে চায়— এটাই অসহ্য লাগে। কী পরিহাস বিধাতার! ভাবো! আমরা কিছু নিইনি, যথাসম্ভব সাধারণ খেয়েছি, পরেছি। জেল খেটেছি, মিছিল করেছি, দিনে-রাতে কোনও অবসর ছিল না। আর এরা? আমাদের ত্যাগের ওপর সংগ্রামের ওপর ডিজনেস্ট ভোগের প্রাসাদ তুলতে চায়। এই আয়রনি সহ্য করতে পারছি না। আহত বাঘিনীর মতো ভয়ানক হয়ে উঠছি ক্রমশ। গড নোজ, হয়তো একদিন আমি এদের ফাঁসাব, সবাইকে...

—মাসি যা করবার তো করে রেখেছেন। আর কেন এইসোব...

—তুমি জানো না কিকি, আমি এমনভাবে আত্মহত্যার কৌশল বানাচ্ছি, যাতে এই ভাইপো,

তার বউ, ওই প্রোমোটার, ওদের সবগুলো ফেঁসে যাবে।

—মাসি, এসব করবেন না, ভাববেন না প্লিজ।

কস্তুরী এগিয়ে এসে তাঁর শীর্ণ পিঠটাতে হাত রাখলেন, এবং নিবেদিতা সেই হাতটা তাঁর সামনে বুকের কাছে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। এবং এই সময়ে এই দৃশ্যে বউটি আবার এসে দাঁড়াল।

কস্তুরী মাসির মুখটা হাতের ওপর নরম করে চেপে রেখে বললেন, শেষপর্যন্ত উনি আমাকে চিনতে পেরেছেন। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারেন। যদি হাতে সময় থাকে তো বসুন না। ওনেক ওনেক সত্যি গল্প শুনাব। সেই সোময়কার।

—কোন সময়কার?

—সেই যোখন দেশ সোবে স্বাধীন হয়েছে, এই এঁরা কোতভাবে লড়েছেন...স্যাক্রিফাইস করেছেন।

মুখ বেঁকিয়ে বউটি বলল— এ বাড়িতে এসে ইস্তক তো শুনছি।

নিবেদিতা মুখ তুললেন, রাগে ও চোখের জলে মাখামাখি মুখ। বললেন, শুনেছ তো! কিন্তু বুঝেছ কি? মুখ্খু! তো যাও, সেইসব বোরিং গল্পই আমরা মাসি-বোনঝিতে করব আজ। ভাতে ভাত চাপাচ্ছি, যাও, রান্নার সময়ে অশুচিতা আমি সইতে পারি না।

মুখ কালো করে বউটি চলে গেল। কোনও কথা না বলে চাল ধুতে লাগলেন নিবেদিতা।

কিছুক্ষণ সব চুপ। তারপর শান্ত স্নেহমাখা গলায় বললেন, ভাতে ভাত খাবে তো কিকি?

—হ্যাঁ, খুব ভালবাসি। একটু দই আনব মাসি!

—ও তোমরা আবার দই ছাড়া খেতে পারো না। নিয়ে এসো।

কস্তুরীর মনে হল মাসির মেজাজ এখনও ঠিক হয়নি। তাঁর নিরাড়ম্বর জীবনযাত্রার সরলতা বুঝি একটু দইয়ের আঘাতে ভেঙে যাবে। তিনি বললেন, আমার কোনও ওসুবিদা নাই মাসি। কিন্তু আপনাকে আমার একটু খাওয়াতে ইচ্ছে করছে। কিচুমিচু, একটু সোন্দেশ, একটু দই। কোতদিন পোরে দেখা।

—আনো, তবে ভদ্রতা করে আবার পুরো ফ্যামিলির জন্য এনো না।

—কেন মাসি? ওঁরা কুশি হোবেন।

—ওরা খুশি হলে আমার কিছু সুবিধে হবে না কিকি। ওরা যেমন তেমনই থাকবে। মাঝ থেকে তোমার ভদ্রতা অপাত্রে নষ্ট। অপাত্রে নষ্টটা বুঝলে তো?

—বুঝেচি— আসলে কস্তুরী নষ্টটা বুঝেছিলেন। অপাত্রেটা আন্দাজে বুঝে নিয়েছিলেন। মোট কথা মাসি চান না তাঁর ভাইপো-ভাইপো বউয়ের সঙ্গে তিনি কোনওরকম ভদ্রতা করুন। আর তাঁর চাওয়ার ওপর তো কথাই নেই! কস্তুরীও সে রকম আপ্যায়নকেন্দ্রিক সামাজিকতার ধার ধারেন না। ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ভাল লাগলে রসগোল্লা কিনে দিতে পারেন। কিন্তু যে-কোনও আত্মীয় বা পরিচিতকে লাড্ডুর বাক্স উপহার দেওয়ার বাধ্যবাধকতা তিনি স্বীকার করেন না। অতএব তিনি স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দই আর ভাল সন্দেশ কিনলেন, বেশ কিছু ফল। একটু দেরিই হল ফিরতে। ততক্ষণে মাসির রান্নাও শেষ।

গলা ভাতের ওপর মাখন ছড়িয়ে দিয়ে আলু-কাঁচালঙ্কা-ডালভাতের ভোজ চমৎকার হল। দইটাও চমৎকার। কিন্তু নিবেদিতা মাসি এত মিষ্টি আর ফল দেখে ভীষণ রাগ করলেন। সত্যি রাগ।

দ্যাখো কিকি, আমার ভাগ্য আর আমার সরকার আমাকে যেটুকু খেতে দিচ্ছে তার বেশি আমার দরকার নেই।

—বেশ এগুলো তা হলে আমি নিয়ে যাচ্ছি— কস্তুরী গম্ভীর, অভিমানী মুখে বললেন।

—ওই দ্যাখ অমনি রাগ হয়ে গেল। আচ্ছা আচ্ছা বাবা, রাখছি, ফল মিষ্টি সব তোমার রাখছি।

কস্তুরী মনে মনে একটু হেসে নিলেন। যাই বলো আর তাই বলো নিবেদিতা মাসি, তুমি আর সেই তুমি নেই। আগুনের মেয়ে, আগুনের বউ, তাতে অভিমানের নোনা জলে পড়ছে, একটু একটু করে নিবছ। অত সম্ভ্রমের বাড়াবাড়িও এক ধরনের আগুন, কিন্তু সে-ই পুরনো উদ্দীপনার ইতিবাচক

আগুন নয়। ডিপ্লোম্যাসি দিয়ে তোমাকে ভোলাতে হয়। বড়রা ছোটদের ভোলায়, যেমন একদিন তোমরা আমায় ভুলিয়েছিলে, আজ আমার পালা। আমি তোমাদের ভোলাব।

—নরেন্দ্রভাই কেমন আছেন? নিবেদিতা মাসি ঘরের তক্তপোশটার ওপর বসে বললেন।

সামনে একটা লাল রঙের মোল্ডেড চেয়ার। কস্তুরী সেখানে। এতক্ষণে খবরাখবরের পুঙ্খানুপুঙ্খ।

—তোমার কী মনে হয় মাসি, বাবা কেমন থাকতে পারেন।

অন্যমনস্ক স্বরে মাসি বললেন— ভালই। বয়স হয়েছে, কিন্তু যৌবনের ব্যায়াম করা শরীর, বাজে নেশা-ভাঙ নেই, অর্থ-কষ্ট নেই, কাজের চাপ আছে অবশ্য বেশ। এবং কিকিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। এইগুলোয় কাটাকুটি হয়ে শরীর ভাল আছে, মন ভাল নেই।

—আমার জন্য আবার চিন্তা কী?

—এই, কিকিটা বিয়ে করল না। হাঙ্গাম-হুজ্জুতে জড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ।

কস্তুরী বাবার প্রয়াণের খবর ভাঙলেন না। তাঁর স্বামী যে দু'বছরের মধ্যে মারা যান, সে খবরও না। বললেন, মাসি, তোমরা যারা সোর্বস্ব পোণ করেছিলে তাঁদের মুখে এমোন কথা মানায় না।

মাসি হাসলেন, বললেন, কিকি, তুমি কি এখনও বোঝো না, মানুষ কিন্তু আদতে স্বার্থপর, তার চেয়েও বেশি আত্মপর। পাবলিক ক্যালামিটি ইজ এ মাইটি লেভেলার। তাই গোটা দেশের মানুষের ওপর যখন সংকটের খাঁড়া নেমে এসেছিল, তখন কিছুদিনের জন্য তারা একত্র হয়েছিল। খাঁড়া সরে গেল, সব আবার যে যার ছোট্ট গর্তে। কেউ আর তার বাইরে দেখতে পাচ্ছে না। চাইছেও না। আমার ছেলে কোন লাখ টাকা উপার্জন করবে না, আমার মেয়ে কেন একটা ভাল বিয়ে করে ঘর-সংসার করবে না, কেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে...

শেষ দুপুরের জানলা দিয়ে হঠাৎ দমকা হাওয়া হুটোপাটি করে ঢুকে পড়ল। এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল কাগজপত্তর। মাসি তাড়াতাড়ি উঠলেন।

—কাগজগুলো ড্রয়ারে ঢোকাও, ড্রয়ারে ঢোকাও, জানলা বন্ধ কোরো না। মাসি চেঁচিয়ে উঠলেন। জানলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিবেদিতা মাসি ঈষৎ ভাঙা গলায় গেয়ে উঠলেন...

আয়রে আমার শুকনো পাতার ডালে ডালে
ঝড় নেমে আয় আয়...

দমকা মনে পড়ে গেল হারানো সুর। দোতলার বড় ঘর। শতরঞ্চি পাতা, কয়েকটা তাকিয়া। জড়ো হয়েছেন অনেক চেনা, আধো-চেনা মুখ। এগুলো সাধারণ সভা, অনেক সময়ে ঘর ছাড়িয়ে বাইরের দালানে, সিঁড়িতে পর্যন্ত লোক জমে যায়।

তোমার বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে।

সেটা বোধহয় তেইশে জানুয়ারি— সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন ছিল। গান হল।

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো ধরায় আসো।

আরও কত গান কত সুর মনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে আছে। তাদের এই আধো-স্মরণে কী যে একটা অদ্ভুত সুগন্ধ। যেন কোথা থেকে, কত দূর থেকে, কত কাল আগে থেকে ভেসে আসছে এই সুরভিত সুর। শুধু তাঁদের ছোঁবে বলে। ছুঁয়েই তার কাজ শেষ। আর সে দাঁড়াবে না। বয়ে যাবে, উধাও হয়ে যাবে। এখন তুমি যদি তার মানে বুঝলে, তো সে চিরদিনের মতো তোর মধ্যে বসে গেল। ভেতর থেকে ঠেলা দিতে লাগল মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে আবার বুঁদ করে রাখল, যেমন নিবেদিতা মাসিদের ক্ষেত্রে হয়েছে। 'আয়রে আমার শুকনো পাতার ডালে ডালে ঝড় নেমে আয় আয়—' এ শুধু গান নয়, গানের মধ্যে দিয়ে এখনও সেই যৌবনের বিশুদ্ধ ঝড়কে

উনি ওঁর বয়সের শুকনো ডালে আহ্বান করে চলেছেন। সম্ভবত আমৃত্যু চলবেন। ঝড়ের জন্য তাঁর প্রার্থনা ছড়িয়ে যাবে আরও কত মানুষের মধ্যে যাঁরা এখনও শুদ্ধ আছেন, সত্য আছেন, কিন্তু ঝড় জানেননি, কাকে বলে প্রণোদনা এখনও বোঝেননি।

আর তুমি যদি শুধু মুগ্ধ হও, তাকে চলে যেতে দাও, তাহলে সেই অলস মুগ্ধতার দাম তোমাকে দিতে হবে সারা জীবন ধরে। গানকে যাঁরা শুধু সাময়িক বিলাস বলে নেন, তাঁদের এই দাম দিতে হয় সারাজীবনের অচেতনায়। কস্তুরী খুবই আবেগবর্জিত, কেজো মানুষ। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর মনে হয় আগুন যদি তাঁর আহুতি নিত! যদি নিতে পারত সেই যজ্ঞফল যার জন্য একদিন সংকল্প করে আসনে বসেছিলেন তাঁর পিতৃপুরুষেরা!

আমার মা কোথায় মাসি? —এতক্ষণে হয়তো ওই সাধক, প্রেমিক, পাগলের 'প্রোচোদনা'তে, 'ওই ঝড় নেমে আয়'-এর প্রার্থনাতেই তিনি প্রশ্ন করলেন।

নিবেদিতা মাসি চুপ করে রইলেন। অনেক পরে বললেন...

আমি তো আর কল্যাণী মেহতার খবর রাখি না, সেই থেকেই...

কেমন যেন একটা খটকা! আমি তো আর কল্যাণী মেহতার খবর রাখি না। কল্যাণী মেহতা? নিবেদিতা মাসি মাকে কল্যাণীদি বলতেন না? খবর 'রাখি না'? 'জানি না' নয়?

৫) সে

এত সবুজ সত্ত্বেও গ্রীষ্মকালে সল্ট লেক ফার্নেস হয়ে থাকে। সন্ধের পর একটা মিনি কালবৈশাখী হল। চড়বড় করে একটু শিলাবৃষ্টি। যত না জল তার চাইতে বেশি শিলা। সকলেই বলছিল, রাতটা ঠান্ডা হবে। পার্কের পাশে একটা গাছ পড়েছে। এইগুলো খুব গোলমেলে ব্যাপার। কোন গাছটার মূল আলগা হয়ে গেছে, কোনটার ভেতর ফোঁপড়া, চট করে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। গাছটা পুরো রাস্তা জুড়ে আড়াআড়ি পড়েছিল। ভাগ্যিস ঝড়-বৃষ্টির সময়ে কেউ ধারেকাছে ছিল না! পড়ার সামান্য আগেই কাজল বাড়ি ফিরেছে। যাঁদের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট থাকে সেই অধিকারী মাসিমা খবরটা দিলেন।

ঝড়-বৃষ্টির সময়ে বাইরে থাকাটা খুব অনিরাপদ হয়ে যাচ্ছে, বুঝলে কাজল? ঝড় দেখলেই কোনও না কোনও শেড-এ দাঁড়িয়ে পড়বে।

অধিকারী দম্পতি তার একদা অধ্যাপক রমেন সান্যালের পরিচিত। ওঁর সূত্রেই এখানে ও জায়গা পেয়েছে। ঠিক যে ধরনের মধ্যশ্রেণীর জন্যে বিধান রায় সল্ট লেক সিটির পরিকল্পনা করেছিলেন এঁরা একদম সেই জাতের। সচ্ছল কিন্তু তার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। হিসেব করে চলতে হয়। ওঁদের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, সে বিদেশে থাকে। সাগরপার। ঠিক কোথায় কাজল জানে না। তার কৌতূহল নেই। আর ছেলেটি বাঙ্গালোরে পড়াশোনা করছে। ছেলেটির খরচের জন্যই বোধহয় ওঁদের পেয়িং গেস্ট দরকার পড়েছিল। জমানো টাকা প্রায় নিঃশেষ করে ছেলেকে পড়ানো! ও পেয়েছে মেজানিনটা। একতলায় দু'টি ঘর ও একটা কলঘর শেয়ার করে থাকে আরও তিনটি ছেলে। অধিকারীদের ছেলে যেমন পড়তে গেছে বাঙ্গালোর, এরা তেমন চাকরি করতে এসেছে কলকাতায়। একজন বোধহয় কম্পিউটার-বিশারদ, কাছাকাছি সল্ট লেকেই অফিস। অন্য দুজন দক্ষিণী— এরা মুম্বই থেকে বেসরকারি কোম্পানিতে এসেছে। আবার হয়তো মুম্বই ফিরে যাবে। কম্পিউটারের ফেরার কোনও নির্দিষ্ট টাইম নেই। অফিসেই বোধহয় খাওয়াদাওয়া করে। দক্ষিণীরাও বাইরে। ওদের খাওয়াদাওয়া আলাদা। তবু তিনজনকেই ব্রেকফাস্ট পাঠান মাসিমা। কাজলের সঙ্গে তিনবেলারই বন্দোবস্ত। কোনওদিন বাইরে আটকে গেলে, কোথাও খেয়ে নিতে হলে—ও মাসিমাকে ফোন করে

দেয়। যদিও কাজল কারও সঙ্গেই খুব ঘনিষ্ঠতা করতে চায় না, তবু এঁদের সঙ্গে তার একটা চমৎকার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। ছেলের মতোই স্নেহ করেন তাকে। ওঁদের খাবার সময় কাঁটায় কাঁটায় ন'টা। তার মধ্যে কাজল না ফিরলে ওর ঘরে ক্যাসেরোলে খাবার এসে যায়।

শেডে দাঁড়ানো সম্পর্কিত পরামর্শটা দিয়েই ওঁরা রাতের মতো বিদায় নিলেন। কাজল আগে চান করল ভাল করে। এই ঝরঝর চানটা তার একটা বাতিক। সব সময়েই মনে হয় কোথাও কোনও ময়লা রয়ে গেল। বড্ড বেশি ঘাম, দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে বোধহয়। বোধহয়। সত্যি হয় সবসময়ে। তাই এটাকে বাতিক বলাই ভাল। কোথায়, কোন অভিজ্ঞতায় এই বাতিকের মূল! শাওয়ারটা ছেড়ে সে ঊর্ধ্বমুখে চোখ বুজে দাঁড়ায়। কাজল কখনও উলঙ্গ হতে পারে না। একটা না একটা কটিবস্ত্র চানের সময়ে তার চাই-ই। একটা মেরুন রঙের মাদ্রাজি গামছা পরে সে শাওয়ার অনুভব করে। যেন সে বৃষ্টিতে ভিজছে। ভিজতে চাইছে। সব বৃষ্টি একরকম নয়, শাওয়ারের নবটা পুরোপুরি ঘুরিয়ে দেবার পর যখন ফিনকি দিয়ে জল ছোটে তখনও সেটা বর্ষার বৃষ্টি হয় না। বর্ষার বৃষ্টির ধারা কী মোটা এবং বল্লমের মতো ফলাঅলা। তেমন তেমন হলে তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। চামড়ার তলায় হাড়ের কাঠামোসুদ্ধ ভিজে যাবে। অন্য দুই ঋতুর বৃষ্টির স্বাদ মোটের ওপর শাওয়ারে বোঝা যায়— ফাগুনের বৃষ্টি, শালমঞ্জরীর গন্ধ মাখানো। আশ্বিনের হালকা বৃষ্টি, হাসির মতো। উচ্চরবে হাসছে কে আড়ালে, চট করে আকাশ নীল, তাতে কাশঝাড় ভেসে যাচ্ছে। উদোম, একেবারে উদোম একটা ছোট ছেলে ভিজছে, সপাটে ভিজছে, হি হি করে কাঁপছে ঠান্ডায়। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। বৃষ্টির তোড় তাকে ক্রমেই পেছনে ঠেলে দিচ্ছে, আবার কখনও কখনও পেছন থেকে দমকা হাওয়া এসে সামনে হুমড়ি খাইয়ে দিচ্ছে প্রায়। কিন্তু তার পলকা শরীর, পড়ে গেলেও সে উঠে দাঁড়াতে অসুবিধে বোধ করে না। ছুটছে, সে ছুটছে। হঠাৎ খেয়াল হয়, বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু আকাশ দেখা যাচ্ছে না। কী হল? এত জল সে রাতবিরেতে ব্যবহার করে ফেলেছে যে ট্যাঙ্কের জল শেষ?

মোছামুছি শেষ করে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে সে। পায়জামা শার্ট পরে নেয়। চোরের মতো চুপিচুপি নীচে চলে যায়। পাম্প ঘরে রাত্তিরের তালা লাগানোটা তারই কাজ। তালা লাগানো, নীচের সব কোল্যাপসিবল, গ্রিল চেক করা। সে পাম্পটা চালিয়ে দেয়। রাত্তিরে জল দরকার হলে কেউ পাবে না। একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে পাম্প চলতে শুরু করে। ভীষণ লজ্জা পায় কাজল। যদি ওঁদের ঘুম ভেঙে যায় শব্দে! কী মনে করবেন? কাজল মুণ্ডা সব জল শেষ করে দিয়েছে। ওঁরা এসব ব্যাপারে খুব সতর্ক। দু'বারের বেশি পাম্প চলে না। ছি, ছি, কী করল? কেন, কাজল কেন? কী এমন করেছ যে তোমার এত সংকোচ! হতেই পারে, একদিন হয়ে যেতেই পারে। ঈশ্বরের দেওয়া জলে, হাওয়ায়, ভূমিতে ও ভূমিজ উদ্ভিদে সকলের অধিকার। সেই অধিকার একটার পর একটা কেড়ে নেবে তারপরে কৈফিয়ত চাইবে? না কাজল। এ শুধু ঈশ্বরের দেওয়া জল নয়, এর ওপর মানুষের যান্ত্রিক হাত পড়েছে। ইলেকট্রিসিটি পোড়ে, খরচ বেশি হয়, বাঙ্গালোরে ছেলেটির জন্যে কত লাখ টাকা গুনে দিতে হয়েছে কে জানে? কম্পিউটার পড়ছে। পাশ করে বেরোলে অমন কত লাখ টাকা উশুল হয়ে যেতে পারে, আবার না-ও পারে। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। উপেন্দ্র, লখাই, গমস্তাপ্রসাদ, সুন্দরী, বুধুয়াদের থেকেও অনিশ্চিত? দূর, ভুল হল। ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই দুনিয়ায়, কে ভাবতে যাচ্ছে ভবিষ্যতের কথা? বর্তমানটাকে কোনওক্রমে টিকিয়ে রাখা। মরে গেছে? মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তেষট্টির বার্ধক্যে পৌঁছে মরে গেছে? পেট এসে পিঠে ঠেকেছিল। ভবিষ্যৎ আবার কী! বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ভীষণ শব্দে অদূরে বাজ পড়ল। উদোম ছেলেটা দেখল সেই উদোম বাজ— একটা যমজ নারকেল গাছ তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও জ্বলছে, জ্বলে যাচ্ছে। আবার পেছন দিকে দৌড়োনো, আবার পাশ কাটিয়ে সামনে। ভবিষ্যতের ভয়হীন। অথচ ভবিষ্যতের সন্ধানে অন্ধ দৌড়োনো।

ক্যাসেরোলের ঢাকা খুলতেই চমৎকার একটা গন্ধ নাকে আসে, দৃশ্যটাও চমৎকার। আজ বৃহস্পতিবার। এঁরা নিরামিষ খান। নিরামিষের সৌজন্যে ভাল ভাল কিছু পদ খাওয়া হয়ে যায়। বড় বাটিতে পোলাও। ছোট বাটিতে ছানার ডালনা। অধিকারী মাসিমা! এভাবে পোলাও টোলাও দেবার দরকার নেই। কেন কষ্ট করে করতে যান? ভাত— শুধু গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত, সঙ্গে একটু আলু পেঁয়াজ লঙ্কা— বিশ্বাস করুন— এই আমার রাজভোগ। এখনও। ছোটবেলায় মানুষ যা শেখে, আর কখনও ভোলে না।

খেতে খেতে সুস্বাদে স্বাস্থ্যবান জিভ লালায় ভরে যায়। একই সঙ্গে কাঁটা ফুটতে থাকে, মাছের কাঁটা, ক্যাকটাসের কাঁটা...ক্যাকটাস ঝাড়ে ঝাড়। বিস্তৃত টাঁড়ভূমি, ক্রমাগতই বৃক্ষচ্ছেদ, ভূমিক্ষয়, এবং মরুভূমি। তাকে ক্যাকটাস।

কাজল জানে আজকের এই অপরিমিত চান ও ঠাকুরের প্রসাদের মতো খাওয়ার পরে, কাজ করতে করতে তার চোখের ঝাঁপ পড়বে, ঝাঁপ পড়ে যাবে কন্টকময় মরুবালুতে, সে নিবিড় ঘুমোবে। সুস্থ শরীরের, স্বাস্থ্যবান মানুষের নিশ্ছিদ্র ঘুম। ঈষদুষ্ণ উদ্দীপ্ত আলস্যে ভরে থাকবে কালকের দিন। আলস্য ঠিক নয়— শান্তি। শরীরটা যেন ধ্যানমগ্ন কিন্তু অফুরন্ত কাজ করবার ক্ষমতা। মিঠু তার চকচকে চোখে কৌতুক ও বিস্ময় মাখিয়ে জিজ্ঞেস করে— তুই তো অদ্ভুত! দেখে তো মনে হচ্ছে শান্তস্য শান্ত, কিন্তু বেশ তো দুটো উচিত কথা শুনিয়ে দিলি। এমন করে দিলি আবার কিছু মনে করতেও পারবে না লোকটা। দেখে মনে হচ্ছে ঘুমন্ত পুলিশ, কিন্তু গুচ্ছেরখানিক ইনফর্মেশন, আর্টিকল ডাউনলোড করে ফেলেছিস। রাধিকাদির পেপারটা পুরো হয়ে গেল? চব্বিশ পাতা, ওই খুদি খুদি হাতের লেখায়! নমস্য বাবা তুই।

মিঠুকে কাজল ঠাট্টা করে বলে— হিরো-হান্টার। সবসময়ে নমস্য করার খোঁজে রয়েছে। 'ভক্তিমতী বালিকা' বলেও সে ডাকে ওকে। বেশ কথা কী, মিঠুর লাল-নীল সবুজ-হলুদ-গোলাপি হ্যান্ড-মেড পেপারের অটোগ্রাফ খাতায় জ্বলজ্বল করছে তার সই। এত চালাক যে অটোগ্রাফ বলে চায়নি। বলেছিল তুই বেশ সুন্দর সুন্দর বাণী জানিস, একটা লিখে দে না রে, তলায় বেশ তোর নাম লিখে দিবি।

তার মানে? অন্য লোকের বাণী দেব, তলায় লিখব আমার নাম!

তাতে কী হয়েছে? তুই কি কারও বাণী চুরি করছিস? তাঁর নামটাও লিখে দে, সোর্সটা জানতে আমার সুবিধে হবে, তোর কাছ থেকে পেয়েছি সেটাও জানা থাকবে। ভুলভাল লিখলে ক্যাঁক করে ধরব।

কী ব্যাপার বল তো!

তাড়াতাড়ি মিঠু বলে, ব্যাপার তেমন কিছু নয়। আই জাস্ট ওয়ন্ট টু লার্ন। বাণী জমাচ্ছি। ভীষণ দরকার হয়, আমাকে পপুলার আর্টিকল লিখতে হয় তো গুচ্ছের! জানিসই তো সব!

কাজলের ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ হয়নি মিঠু এইসব ভ্যানতাড়া করে তার অটোগ্রাফ নিচ্ছে। এ পর্যন্ত কেউ তার অটোগ্রাফ নেয়নি, ভবিষ্যতেও নেবে না। বাণী চাই? আরে! মানুষের কত বাণী দলে দলে/ অলক্ষিত পথে উড়ে চলে/অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে...। বাণীর অভাব কী? অভাব সেইসব মানুষের যারা সেইসব বাণী অনুযায়ী কাজ করবে। হঠাৎ কিছু না ভেবেই সে লিখে ফেলেছিল— লুক অ্যাট দা লিলিজ হাউ দে গ্রো— দি বাইবেল। নিউ টেস্টামেন্ট, সাপোজেড্‌লি আটার্ড বাই জিশাস। পরে নিজের নামটা কীভাবে দেবে ভেবে না পেয়ে অবশেষে লিখেছিল— কোটেশন কার্টসি কাজল মুণ্ডা।

সে কী খুশি মিঠু! যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে!

কেমন কায়দা করে তোর অটোগ্রাফটা নিয়ে নিলাম বল।

অটোগ্রাফ! আমার? তা বলতে হয়। লিখে দিতুম একটা লাগসই বাণী, যেটা তোর পক্ষে লাগসই হত।

মিঠু বিমর্ষ হয়ে বলেছিল, এ মা! তাহলে তো কায়দাটা বৃথাই গেল। এত বুদ্ধি খাটালাম। দে না রে নিজস্ব একটা বাণী!

আর হয় না। কাজল মুণ্ডা ইজ নট দ্যাট অটোগ্রাফ ফ্রেন্ডলি!

আচ্ছা, কেন খ্রিস্টের কথাগুলো সর্বপ্রথম তার কলমে উঠে এসেছিল! স্মৃতির খাতায় কীভাবে কী ক্রম অনুযায়ী কথারা সাজানো থাকে? নিজের কোনও বিশ্বাসের ক্রম? ভাল লাগার ক্রম? না কি প্রথমে ও বারে বারে শোনার ক্রম? ফাদার মরিসন তাদের মুণ্ডাদের সম্পর্কে কথাগুলো প্রায়ই বলতেন। সাঁওতাল, মুণ্ডা, লোধা, শবর! তিনি আরও বলতেন— ব্লেসেড আর দা মিক, ফর দেয়ার্স ইজ দা কিংডম অব হেভন। এখন, তিনি কি সত্যিই এই সারল্য পছন্দ করতেন, না তাদের খোশামুদি করতেন সে জানে না। ফাদার মরিসন তার জীবনের প্রথম মানুষ যাঁকে সে শ্রদ্ধা করেছে, বিশ্বাস করেছে। কিন্তু সারল্যই যদি কাম্য, তাহলে কেন শিক্ষা? কেন আপামর মানুষ ও সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলার ট্রেনিং? ঈষৎ তিক্ততার সঙ্গে মনে হল— হ্যাঁ স্বর্গের দরজা তো গরিবদের জন্যে বটেই। তাড়াতাড়ি চলে যায়।

ফাদার যাই বলুন, লিলির মতো সহজে গজিয়ে উঠে অপরের চিত্তবিনোদন করার বিন্দুমাত্র সাধ তার নেই। থাকা উচিত নয় কারও। শিক্ষা মানুষের সহজাত নয়। বুদ্ধি খানিকটা, স্মৃতি খানিকটা। কিন্তু তাদেরও অভ্যাসে অভ্যাসে বাড়াতে হয়। এবং সেই বুদ্ধি দিয়ে মনন হয়, আবিষ্কার হয় নতুন নতুন চিন্তাপথ। এটা সহজাত আহার-নিদ্রা-আমোদ-মৈথুনের বাইরে। সুতরাং খ্রিস্টের উক্তি নেহাতই কবিতার পঙ্‌ক্তি তার কাছে। লিলিজ? —অর্ধভুক্ত নেংটি পরা অকালবৃদ্ধ শরীর, যেটুকু বা টাঁড়জমি, মহাজনের গর্ভে গেছে। বনের কাঠকুটো, কন্দমূল, ইঁদুর, সাপ, ব্যাঙ ভরসা। ফসল ওঠার সময়ে নামলে হাওয়া, ইট-ভাটার হাড় ভাঙা খাটুনি, পরব বলতে কতকগুলো জটিল আচারের মিশ্রণ, ঠাকুরের ভোগে হাঁড়িয়া, আমোদে হাঁড়িয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধরা, শুধু হাঁড়িয়া খেয়েই ঢুলতে থাকে সন্ধ্যা হলে। এখন সে বোঝে মানুষ হয়ে জন্মে কোথাও কোনও সার্থকতার আনন্দের উপায় নেই, তাই এইভাবে হাঁড়িয়ায় ভুলে থাকা। দূরদেশি কোন রাখাল ছেলে..., রাখাল, বাগাল, বেগার,—দূর থেকে কী চমৎকার পল্লিদৃশ্য! লিলিজ?

আজ সে ছুটি নিয়ে নিয়েছে। ব্যায়াম সেরে ইডলি দিয়ে প্রাতরাশ সেরে সে কম্পিউটার নিয়ে বসে পড়ল। আজ সে সাড়ে তিনটের সময়ে কস্তুরীবেনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে। ভদ্রমহিলা সেই এসে থেকে কই একবারও তার সাহায্য টাহায্য চাননি। অথচ তারই ওপর ওঁর ভার দিয়েছেন কানাইদা। সে অবশ্য প্রায় প্রতিদিনই খবর নেয়। উনি সোব সময়েই ভালো আচেন, আর ওঁর কিছুতেই অসুবিদা হচ্ছে না। বললে হবে? উনি এখন একজন নামকরা মহিলা। চিরকালই ছিলেন। কিন্তু কে, কোথায়, কী ধরনের কাজ করছেন, সবসময়ে তো জানা সম্ভব হয় না! গুজরাত কাণ্ডের পর উনি ভারতবিখ্যাত হয়ে পড়েছেন। নিজের প্রাণ বিপন্ন করে কীভাবে উনি বন্দুক নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তিয়াত্তর জন মহিলা-পুরুষকে কীভাবে বাঁচান, সেসব এখন গল্প কথা। মিডিয়ার কল্যাণে মুখে মুখে ফেরে। সে সুদূর গুজরাতের হলেও। নিজের কী ব্যক্তিগত কাজে উনি একেবারে চুপিচুপি কলকাতায় আসছেন এবং সেই সূত্রেই কানাইদাকে চিঠি দিয়েছিলেন। কানাইদা কাজে গেছেন জলপাইগুড়ির দিকে ফালাকাটা সেন্টারে। তাকে এবং মিঠুকে ওঁর দেখাশোনার ভার দিয়ে গেছেন। তা ওরা ওঁর ভার নেবে কী? উনিই ওদের ভার নিলে ভাল হয়। তার ওপর তো ওঁর সারা ছোটবেলাই নাকি কলকাতায় কেটেছে। কলকাতার অনেক কিছুই ওঁর জানা। কলকাতা যে কত পাল্টে গেছে, এপাশ ওপাশ ঘিরেছে, উনি হয় সেগুলো জানেন না বা মানতেই চান না। —ও, এই সেই রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার। এখানে কতকগুলো কদমগাছ ছিল। খুব ফুল দিত। এইখানে তো বাঁকতে হোবে। আরে এ ড্রাইভারজি হমকো ফার্ন রোড জান্‌না। ছটফট করে সারাক্ষণ কলকাতা সম্পর্কে নিজের জ্ঞান প্রমাণ করতে করতে আসছিলেন। তবে এখানে ওঁর যে যথেষ্ট ভাল একটা বাড়ি আছে,

তার দারোয়ানও মজুত, অতশত ওরা জানত না। উনি না আসলে কী হবে? ওঁর চেনাশোনা বহু লোক কলকাতায় এলে সেই বাড়িতে ওঠে। অর্থাৎ একটা চালু ব্যবস্থা আছে। কী ব্যক্তিগত কাজে উনি এসেছেন তা তারা জানে না। কিন্তু এইরকম মজবুত ব্যাকগ্রাউন্ড যাঁর তাঁকে দেখাশোনার কাজটা বাহুল্য ছাড়া কী! সে ওঁকে খানিকটা বুঝতে পারে, জানে. স্বাধীনচেতা মানুষরা নিজেদের স্বাধীনতা স্বাবলম্বিতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর, হয়তো ভেতরে কোথাও বশ্যতা আছে বলেই। কিংবা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অসম্ভব বলেই। সে নিজেও তো এই চরিত্রের। কত জন তাকে নির্ভরযোগ্য, দারুণ সাহসী, একেবারে অচল-অটল বলে মনে করে। সে তো জানে কত সাবধানে নিজের ভেতরের শূন্যতা, ক্ষতগুলোকে লুকিয়ে রাখতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে সে মিশে গেছে এই জনস্রোতে। এদেরই একজন, নিজের কাজ নিয়ে থাকে। কিন্তু অনেক সময়ে সে সকালে ঘুম ভেঙে পারিপার্শ্ব চিনতে পারে না। এটা কি বাঁকুড়া মিশন? নাকি দেওঘর? নাকি মধ্য কলকাতার সেই নয়ানজুলির মতো সংকীর্ণ রাস্তাটার লাল বাড়ির অন্ধকার একতলায়? কী যেন নাম? ডিকসন লেন। তা হলে এত আলো কীসের? রোদ কেন এত?

মহুল পিয়াশালের পাতার মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে জোছনা। লাল-কাজল মাটি জোছনায় মাখামাখি, তার সঙ্গে মাখামাখি হাঁড়িয়ার তীব্র গন্ধ! মা-টা মাতাল হয়ে লাচছে? কে মা? কোন মা? বাবা? আপা নাই তার? আছে বটেক। দু'সন আগে নামাল খাটতে গেল আর আসলো নাই। তো কী? আমি তোর বাপ বটেক!

উঁহু না না, সে প্রাণপণে মাথা ঝাঁকিয়ে নেয়, সেই প্রাগৈতিহাসিক ছন্ন জোছনার মদগন্ধময় রাতে সে আর ফিরবে না। কোনও মোহ, মায়া নেই তার। এই বিরাট জঙ্গম পৃথিবীতে প্রকৃতির খেয়ালে— না, না, মানুষেরই ষড়যন্ত্রে সামান্য কিছু মানুষ আটকে গেছে মজা দঁকে, তাদের মাচায় তাদের মাদল ধামসায় এবং হাঁড়িয়ায় মহুলমদে। মিউজিয়ম-পিস। প্রাপ্য কী? অবহেলা, বড় জোর করুণা, ভাতের জন্যে ট্রাইব্যাল আইনের দোরে দোরে ভিখ মাঙা। নিজের মাটি হল ঝাড়খণ্ড। চৈতন্যচরিতের ঝারিখণ্ড। বুঝি ফিরে এল সেই ছত্রিশগড়ের স্বরাজের দিনগুলো। চাম্পাগড়। কত দূর থেকে ভাঙতে ভাঙতে আসছে! সেই হারাপ্পার কাছ থেকে এই সিংভূম, ধলভূম, মেদিনীপুরে। কোথায় সেই নতুন দিনের নতুন চাম্পাগড়? নিজের মাটিতে নিজের সরকার। সরেন, হেমব্রম, মুণ্ডা, হাঁসদা, মুর্মু...যে আসছে তার ঘরে ধনদৌলত উপছে যাচ্ছে। মানুষগুলি যে কে সেই। পরনে ত্যানা, অবিশ্রান্ত খাটুনির দড়িপাক শরীরে, ঝড়ে-জলে রোদে ঘামে। প্রতি বসন্তে এক একখানা গাছ নতুন হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনবৃত্তে এরকম কোনও প্রাকৃতিক নিয়ম নেই। এই নিয়ে আবার শিল্পী মানুষগুলির চূড়ান্ত ন্যাকামি। কতজন যে ধরে তাকে ওই জোছনারাতের মাতাল নাচ দেখাবার জন্যে। নাচের পেছনে অবশ্য আছে নাচনিও।

সে স্পষ্ট বুঝতে পারে। ওরা সোজাসুজি বলে না কেননা কাজল মুণ্ডাকে তারা চেনে। ভয় পায়। কিন্তু কাজল এ-ও বোঝে না টিভির পরদায় নিতুই যেসব লোভনীয় আধখোলা, সিকিখোলা নারী-শরীর দেখায় তার থেকেও অশ্লীল, আদিরসগন্ধী শরীর কি তার মুণ্ডানি-সাঁওতালনিদের? আবৃত হবার কাপড় পায় না, সিনেমার নাচে তো লাল পাড় সাদা ধবধবে শাড়ি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। আদতে কি তা আছে? নেই। খাটেখোটে, অত দরকারও মনে করে না, ধান রোয়া থেকে কাঠ কুড়োনো, খেতমজুরি, কুলিগিরি, খনির কামিন— 'মেঝেন' সর্বত্র পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অবিশ্রান্ত খেটে যাচ্ছে। দেহ দেখাবার জন্যে কি তারা দেখায়? তাদের সংস্কৃতির নিয়ম বা বলা উচিত সংস্কার আলাদা। তবে কেন টিভিনিদের ছেড়ে মুণ্ডানিদের দিকে লোভের দৃষ্টি হানছে ওরা? তারা সরল বলে? সহজলভ্যও না কি?

কাজলের রক্তে আগুন ঝলসে ওঠে এসব ভাবলে। সে যে ভাবতে চায় তা-ও না। কিন্তু কমলি ছোড়ে না। ঘুমের মধ্যে, ঘুম ভাঙার অসতর্ক মুহূর্তে অতর্কিতে হানা দেয়।

সে কি তবে এত করেও একলা হয়ে গেছে? কোনও দুঃখের কথা নয়। একটা জ্বলজ্যান্ত সত্য।

যাদের ছেড়ে এসেছে তারা তাদের মূল ছড়িয়ে রেখেছে তার দেহে, মনে। শালপাতার দোনায় করে খুদ সেদ্ধ আর বামলা আলু, যা নাকি তার মা বন থেকে তেড়ে নিয়ে আসত সে কি ভুলতে পারে! প্রত্যেকটি গ্রাসে এখনও তার যন্ত্রণাময় স্বাদ। সে কি ভুলতে পারে উপোসি বালক ছেঁড়া জামা গায়ে পাঁচ মাইল হেঁটে নিম্ন বিদ্যালয়ে যাচ্ছে— রাস্তায় হোঁচট খেয়ে গোড়ালি থেকে গলগল রক্ত বেরিয়ে এল। পণ্ডা মাস্টার ঠিক সেইখানটাতে খুঁচিয়ে দিল। উঃ! শয়তানি হাসি হাসছে, তারপরেই ক্রোধে চোখ লাল। বই আনিসনি কেন? আঁক কষিসনি কেন? লাঠির ডগা দিয়ে ছেঁড়া জামাটা আরও ছিঁড়ে বলল— জামা কিনতে পারিস না! নোংরা ছোটলোক, বজ্জাত। অন্ধ আক্রোশে সে ঘুসি চালাচ্ছে। ছোট ছোট হাতে খুসি। তারপর তার জ্ঞান নেই। কেননা চতুর্দিক থেকে ইট পাটকেলের মতো মার পড়ছে। পিঠে বুকে মাথায়, মুখে। ফাঁকা মাঠে মাঝরাত্তিরে জ্ঞান এল। এ কোথায় সে? ওই তো চেনা চাঁদ! না। ও চাঁদ আমার নয়, ও আকাশ, এ বাতাস, এ মাটি আমার নয় তো! ভোরবেলা বৃষ্টি এল। মুষলধারে বৃষ্টি। ভিজছে। বৃষ্টির ঠান্ডা লাগছে শরীরের ফোলা জায়গাগুলোয়, কাটা ঠোঁটে, থ্যাতলানো কানে, ব্যথায় ভেঙে পড়া হাড়ে। সাদা পোশাক পরা একজন সাহেব খুব আসেন তাদের বস্তিতে। শুনো, তুমরা লিখাপঢ়া শিখবে? হস্টেল, থাকিবে, খাইবে, পড়িবে, কোনও ব্যয় নাই।

মুখিয়া বললে, তা সাহেব মাঙনা দিবে সব? টিপছাপ লাগবে নাই?

না, তুমরা শিখবে, মহাজন ও দুষ্ট রিসিভার কিছু করতে পারবে না। ঠকিবে না।

মুণ্ডাবস্তি লোধাবস্তি ভেঙে পড়েছে —রাজকোঠিতে থাকছি এ মাস। যে কেহ পড়িতে চাইবে, পড়িবে। আমরা দিব। ক্রাইস্ট দিবেন। —উনি বললেন।

চলে গেলে জল্পনা-কল্পনা। এ বোধহয় ছোট ছেলেগুলোকে খাদানে নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র। নইলে আর কী হতে পারে!

ব্যথা ভুলে, দপদপে যন্ত্রণা বৃষ্টি সব অগ্রাহ্য করে সে ছুটছে, ছুটছে, ডুলুং নদীর পুল পার হয়ে যাচ্ছে, কনকদুর্গা পার, রাজকোঠি তুমি আর কত্তদূর।

রাজনীতিতে যাবার ডাক সে অনেকবার পেয়েছে। এতটা উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গী মিশে গেছে এমন ট্রাইবালে ক'জন আছে? সে শুধু কতকগুলো প্রশ্ন রাখে:

—দাঁড়াতে বলছেন? নির্বাচনে? বেশ, কোন দল? আমার কোনও দল নেই। ঢুকতে ইচ্ছা করি না।

বেশ তো, নির্দল হয়ে দাঁড়াবে।

নির্দল মানে কি সত্যি নির্দল? কারও সঙ্গে যোগ দেব না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে বোঝাপড়ায় যাব না 'রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা'র জন্যে। নিজের বিবেক মতো চলব!

তাহলে তো কোনও কাজ-কাম করতে পারবে না, উন্নয়ন তো করতে হবে।

উন্নয়ন বলতে?

ইস্কুল-কলেজ হবে, হাসপাতাল হবে, দেশের ধন দেশে থাকবে। আম-মানুষ খেতে পরতে পাবে, কামকাজ পাবে।

তা এ সবই তো ভাল কাজ। নির্বাচন বুঝি। কিন্তু এই কাজগুলো করবার জন্য দলে না ভিড়লে কাজ করতে পারব না? মানে?

নির্বাচনওয়ালারা এই 'মানে'র মানেটা বলতে পারেনি।

কাজল বলেছিল, আমার নিজস্ব কাজ আছে। কারও স্বার্থে লাগলেই মিথ্যে অপবাদে ফাঁসা কিংবা খুন হয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।

আমি সমাজ-সংস্কারক নই, রাজনৈতিক আদর্শ নামে সোনার পাথরবাটিতে বিশ্বাস করি না। আমি গবেষক। তবে হ্যাঁ, যথাসম্ভব মানুষের কাজে লাগা; আপাদমস্তক সৎ ও যুক্তিশীল থাকা— এগুলো আমার দায়। একটা জীবনে মানুষ আর এর চেয়ে বেশি কী করতে পারে?

—নতুন ওয়েবসাইট হচ্ছে ইনস্টিটিউটের, সে কাজে মগ্ন হয়ে গেল। খেয়াল হল তিনটেয়। লাফিয়ে উঠে সে প্রায় ছুটতে লাগল। গড়িয়াহাটের বাস ধরল। উলটোডাঙায় পড়তে না পড়তে হঠাৎ আকাশ কালো করে মেঘ জমল। এবং সে বুঝল নামবার সময়ে সম্ভবত তাকে প্রবল বারিপাতের মধ্যে পড়তে হবে। বাসে এক ভদ্রলোক আর একজনকে বলছিলেন ছাতা নিয়ে না বেরোলে বৃষ্টি হবেই। একরকম গ্যারান্টি, বুঝলেন দাদা। কিন্তু যদি ইচ্ছে করে ছাতা না নিয়ে বেরোন, তুকটা কাজ করবে না। তুক, তুকতাক এইসব শব্দ শুনলেই তার মনে পড়ে যায় আরও অনেক তুকের কথা। ছোট ছেলেমেয়ের কপালে ভুষো কালির টিপ। নজর লাগলে কয়লা আর ঠুঁটো ঝাঁটার কাঠি এক নিশ্বাসে দু'বার 'আহা' অর্থাৎ নজর লাগা লোকটির গায়ে বুলিয়ে নিজের পায়ের নীচ দিয়ে গলিয়ে বাস্তুতে ফেলে দেওয়া। আচ্ছা এই যে নজর লাগা মানুষটাকে 'আহা' বলে, বাংলার 'আহা রে—বেচারা' এর সঙ্গে কি কোনও সম্পর্ক আছে?

আর এক ভদ্রলোক বললেন, লোক্যালাইজ্ড্ রেন, শুরু হয়েছে তা ধরুন গত দশ বছর তো হবেই। নর্থ বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে দক্ষিণ খটখটে। দক্ষিণে হাঁটুজল, খিদিরপুরে ফার্স্টক্লাস কাজকর্ম হচ্ছে। মাল্টিস্টোরিড আর ডিজেল মিলে ওয়েদারের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। আরও কত কী দেখতে হবে কে জানে!

বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল কাজল। প্রবল হাওয়ার তোড়ে চলার গতি কমছে। কিন্তু বৃষ্টি মুক্তি এক অন্ধকার জীবনের কারাগার থেকে। দূরে বজ্রপাত হয়। যমজ তালগাছ জ্বলে যায়। জ্বলে চিত্তের গভীরে, এক ভয়ংকর দৃশ্য অভিজ্ঞান হয়ে থাকে মুক্তির। গতকাল রাতে শাওয়ার ছেড়ে কীরকম আলুনি লেগেছিল মনে পড়ল। প্রতিদিনই লাগে, খেয়াল করে না। কাল করেছিল বলেই কি বৃষ্টি তার নিজস্ব স্বাদ দিয়ে গেল তাকে? তবে হ্যাঁ, ভেবে-চিন্তে যদি খেয়ালটা করো তাহলে তুকটা খাটবে না। বাসের ভদ্রলোকটির যেমন বিশ্বাস।

৬) তিনি ও সে

কস্তুরী দেখলেন কালো পাথরের একটি ভাস্কর্য তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। ছাট আসছে বলে জানলা বন্ধ, ঘর আধো-অন্ধকার। যতক্ষণ পেরেছেন জানলা খুলে রেখে বৃষ্টিকে আসতে দিয়েছেন, কিন্তু একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছিল, বৃষ্টি তক্তপোশের বিছানার দিকে হাত বাড়াতে জানলা বন্ধ করতেই হয়েছে। একটা পুরনো তোয়ালে দিয়ে ঘরখানা নিবিষ্ট মনে মুছছিলেন তিনি। দুষ্কর্মটি নিজেই করেছেন, তার শাস্তি তাঁকেই ভোগ করতে হবে। টপটপ করে ঘরের মধ্যে জল পড়ছে কোনও অজানা উৎস থেকে। ছাত ফুটো হল নাকি? মুখ তুলে দেখলেন কালো পাথরের ভাস্কর্য। বৃষ্টিভেজা কালো জিন্স ব্রাউন শার্ট, সব গায়েই লেপটে, সেঁটে গেছে একেবারে। সেইসব ভাঁজও আদি অকৃত্রিম পাথরের। চুলগুলো মাথা থেকে নেমে এলোমেলোভাবে কী চমৎকার লেপটে আছে কপালে, কানে। তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল— বাঃ!

তাঁর প্রশংসাবাক্য বুঝতে পারে নি কাজল। সে ভেবেছিল ওটা ধমক। একেই ঘর ভরতি জল মুছতে হচ্ছে ওঁকে। তার ওপর সে একখানা মূর্তিমান জলস্তম্ভ হয়ে হাজির হয়েছে। কিন্তু কী করবে? রামলাখন নামে দারোয়ানটি দরজা খুলে খুব নিস্পৃহভাবে তাকে সিঁড়ি দেখিয়ে দিল। সে বাথরুমের কথা জিজ্ঞেস করেছিল।

রামলাখন বলে, পতা নেই।

আচ্ছা তো। থাকিস এই বাড়িতে। বাথরুম কোথায় জানিস না! তারপর মনে হল ও টয়লেট কথাটা ব্যবহার করেছিল। রামলাখন বোধহয় বুঝতে পারেনি।

—গোসল-কামরা নেই হ্যায়?

রামলাখন আবারও ওপরে দেখিয়ে দিল।

আশ্চর্য! এদের একতলায় কি কোনও কলঘর নেই? এ দারোয়ানপ্রবর যায় কোথায়? মাঠে-ঘাটে!

দু'চার কদমে সিঁড়ি টপকে সে তিনতলার ঘরে হাজির হয়েছিল। উনি নিপুণ বাইরের মতো ঘর মুছছেন। নিংড়ে একটা বালতিতে ফেলছেন আবার মুছছেন। যেন এটাই ওঁর একমাত্র কাজ। এ বাড়িতে ঠিকে কাজ নিয়েছেন, ঘর মোছামুছি করছেন তাই। আধো-অন্ধকারে ওঁর সাদা শাড়ি চমকাচ্ছে। মুখের সাদাও, সেটাকে এখন জ্যোতি-জ্যোতি দেখাচ্ছে। উনি বললেন— বাঃ। অর্থাৎ বেশ! আমি ঘর শুকনো করছি, তুমি এমনি বে-আক্কিলে যে দিলে তার বারোটা বাজিয়ে। কাজ দুনো করে দিলে।

সে অসহায় অপ্রস্তুতের মতো একটা বোকা হাসি দিল। উনি ন্যাতা ফেলে উঠে দাঁড়ালেন— ইস্‌স্‌ এতো ভিজেচো? যাও বাথরুমে যাও, আমি তোয়ালে দিচ্চি।

বিনা বাক্যব্যয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল সে। হাত বাড়িয়ে একটা তোয়ালে নিল। কিন্তু তোয়ালের সঙ্গে সঙ্গে একটা শাড়িও এল। সাদা চিকনের কাজ করা শাড়ি। কাজল খুব খানিকটা হেসে, ভাল করে গা-হাত পা মুছে, শার্ট প্যান্ট নিংড়ে জল ঝরিয়ে পরে ফেলল। বেরিয়ে দেখল ঘরের কোণে স্টোভ জ্বলছে— চা তৈরি হচ্ছে।

চা চিনি দুধ তেজপাতা গরমমশলা আদা দিয়ে ফোটানো জলের মার্কামারা গুজরাতি চা। একটা কাঁসার মোটা চাদরের পেটমোটা ঘটিতে চা-টা তৈরি করে দুটো মোটা মোটা কাচের গেলাসে ঢাললেন উনি। এক দিকের জানলা খুলে দিলেন, বৃষ্টির ধার কমেছে। বললেন, শাড়িতে ওপোমান হোলো?

কাজল একগাল হেসে বলল, মান-অপমানের কথা নয়। এই তো সব জল নিংড়ে নিয়েছি। আমি এরকম কত ভিজি! কিছু হয় না।

বেশ মহাশয়, বীরপুরুষ, চা খাও।

ওঁর কোনও জোরজারি নেই। তুমি ভিজে এসেছ, শুকনো তোয়ালে, কাপড় দিয়েছেন, তুমি তোয়ালে নিয়েছ, কাপড় নাওনি। বাস, মিটে গেল। —ও মা! গায়ে জল বসবে! শরীর খারাপ হবে। শিগগিরি শোনো, দিদির কথা শুনতে হয়। —এসব কিচ্ছু না। এইটাই ভালো, স্বস্তির।

এই যদি মিঠুর বাড়ি হত! বাবার পাজামা-পাঞ্জাবি নিয়ে এলে চরম আদিখ্যেতা করে তাকে জোরজুলুম করে পরাত। তারপরে দৈর্ঘ্যে ছোট পায়জামা পাঞ্জাবিতে তাকে মজার দেখাচ্ছে বলে হেসে হেসে চোখ থেকে জল বার করে ফেলত। এত জলও মেয়েদের টিয়ার-ডাক্টে থাকে। কাঁদলে জল, হাসলেও জল।

উনি বললেন, এই বৃষ্টিতে মৈত্রী কি আসচে? মোনে হচ্চে না।

মৈত্রীর পারগতা অপারগতার সম্পর্কে কোনও পূর্ব-ধারণা করে না নেওয়াই ভাল, কাজল অভিজ্ঞতা থেকে জানে। সে জানলার কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখল। ঘণ্টাখানেকের কাছাকাছি বৃষ্টি হয়েছে। এ গলিতে চট করে জল দাঁড়ায় না বোধহয়? কোলের দিকে জল বইছে। তবে বড় রাস্তায় যে গোড়ালি জল, তা সে দেখেই এসেছে। বৃষ্টিটা ধরে এসেছে। বাঃ চা-টা চমৎকার লাগছে তো! সে মশলা-চা তো কোন ছার দুধ দেওয়া চাও পছন্দ করে না। লিকর। ইনফিউশন শুধু। চিনি দেয় না। কিন্তু আজকের এই বৃষ্টি এবং ভিজে জাব জামা-কাপড়ের আবহাওয়ায় চা-টা সত্যিই দারুণ লাগছে।

চা-টা ফার্স্টক্লাস হয়েছে দিদি।

উত্তর এল— রান্নায় আমি ওলওয়েজ ফার্স্ট। আমদাবাদে গেলে প্রমাণ পাবে, একানে যদি ভাবো খিচড়ি-ওমলেট করে খাওয়াব তো সে বালি গুড়ে।

কাজল হাসি চাপল, কারেক্ট করে দিল না মোটেই। বাচ্চাদের ভুলভাল এত মিষ্টি লাগে। এখন তুমি যদি 'টু মেনি ব্রথস স্পয়েল দা কুক' বল তাহলে ইংরেজদের কানে তা তো মিষ্টি লাগবেই না, আমাদের এদেশিরাও হাসাহাসি করেটরে তোমাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে দেবেন। অশিক্ষিত উজবুক—

নিজেদের মধ্যে বলাবলি চলবে। এই এক যাত্রায় পৃথক ফলের প্রকৃত কারণ কী! ইংরেজি ভাষার কলোনি সূত্রে পাওয়া বিশাল বাজার, না আমাদের হীনম্মন্যতা, বলা মুশকিল। ইডিয়মে ভুল, উচ্চারণের অশুদ্ধতা রীতিমতো পদস্থ দক্ষিণী বা উত্তরপ্রদেশীয়দের মধ্যে খুবই দেখা যায়। সে নিয়েও আমরা প্রচুর ক্যারিকেচার করি। ওদের কিন্তু হেলদোল নেই। আমরাই লজ্জায় রেঙে যাই। অফ্‌ন বলব, না অফটেন বলব, ইডিওলজি বলব, না আইডিওলজি বলব, এ নিয়ে আমাদের চিন্তার শেষ নেই। অবশ্য এর মধ্যে একটা সঠিক জানা, সঠিক বলতে চাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আছে, শেখার আগ্রহ। এটা ভাল দিক।

সে কি বাঙালি? ঝাড়গ্রামে তাদের কত পুরুষের বাস। মানভূমের দিকেও তো তার পূর্বপুরুষেরা থেকে ছিল। সে বিহারি না বাঙালি বলা শক্ত। কোনও কোনও জায়গায় সীমান্তরেখা যে সত্যিই খুব ছায়াময়, তা স্বীকার করতেই হয়। তবে এসব নিয়ে সে ভাবলেও কাজল খুব সচেতন যে সে তার নিজস্ব আইডেন্টিটি তৈরি করেছে। শিক্ষাসূত্রে সে বাংলাটা খুব ভাল জানে। ইংরেজিও। এবং সংস্কৃতিসূত্রে সে তো বাঙালিই। এখন বাঙালি বলতে যদি শুধু কোঁচানো ধুতি, রসগোল্লা, আর ইংলিশ-চিংড়ি বোঝায়, তবে তো মুশকিল। ঠিক আছে সে আদিবাঙালি, ট্রাইব্যাল বাঙালি বেশ। এই জাতি-পরিচয়টা তাকে বেশ শান্তি-সন্তোষ দেয়।

কস্তুরীবেন বললেন, মৈত্রী যদি টাইম না রাখতে পারে আমরা চলে যেতেই হবে, কেন কী ওনাকে কথা দেওয়া আচে।

কাজল হাঁ হাঁ করে উঠল। এই মুষলধার বৃষ্টি যদি উত্তরেও হয়ে থাকে তা হলে এখন সেখানে মহাসাগর ও জ্যাম। শুনে কস্তুরীবেন বললেন, হ্যাঁ, পুরানো কলকাতা তো বোটে! আমাদের শোহরটা লম্বা লেজের মতো, কিসের লেজ, কে জানে?

—আপনার শহর তো আমদাবাদ, সেখানে তো এ সমস্যা নেই।

টিক, আমদাবাদও আমার শোহর— পিতৃভূমি, বাপুল্যান্ড। কলকাতাও আমারই মা-ল্যান্ড, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন— আমার জোন্মো তো একানেই।

কথাটা কাজল কয়েকবারই শুনল। উনি এখানে জন্মেছেন, ওঁর ছুটবেলা এখানেই কেটেছে, যে ছুটবেলা নাকি সব বেলা। এবং কলকাতার রাস্তাঘাটে উনি এমন বীরদর্পে হাঁটাচলা করেন যে এ শহরের ওপর ওঁর অধিকার কোনও সন্দেহ থাকে না।

কস্তুরী বললেন, তা ছাড়া আমদাবাদে ট্র্যাফিক প্রবলেম নেই কে বললে! বৃষ্টির দেখা নেই, এটা একটা সোমস্যা বোটে। তবে যোখোন হোয় তোখন ছোট্ট খুকি সবরমতী উপচে সে এক কাণ্ড। তাপ্তী-নোর্মদাও আছেন— ফ্লাড। তুমি কোখনও যাওনি না?

সেভাবে কাজল কোথাওই যায়নি। ভ্রমণের শখ নেই। মানুষের বিশাল বিশাল কীর্তি তার কাছে একটা বিরাট ঠাট্টা বলে মনে হয়। কাজে গেছে। দিল্লি গেছে ইনস্টিটিউটের কাজে। তাজমহলটা পর্যন্ত দেখে আসেনি। রাধিকা কৃষ্ণান অবাক হয়ে বলেছিলেন, তুমি তাজমহলটা দেখলে না?

—কত দেখেছি, কত কতবার দেখেছি, ছবিতে, রেপ্লিকায়, তাজমহল লাইভ অন টিভি, তাই আর দেখতে হচ্ছে করল না।

—তুমি কি নিরাশ হবার ভয়ে গেলে না? জাস্ট টু কিপ ইয়োর ড্রিম ইনট্যাক্ট? কাজল হেসে ফেলেছিল— তাজমহল নিয়ে আমার কোনও স্বপ্ন নেই। পৃথিবীতে সুন্দর এবং আশ্চর্য সব মানুষের কীর্তি তো প্রচুর আছে! তো থাক না। আমি সব দেখে শেষ করতে পারব? দেখলে কি আমার দুটো ডানা গজাবে ম্যাডাম?

একটু চিন্তিত মুখে উনি বলেছিলেন, তা যদি বলো, ডানা গজাতেও পারে। গজানোটাই ইন ফ্যাক্ট আসল। লোক্যাল প্রবলেম নিয়ে সবসময়ে ডুবে থাকলে, হয়তো সংকীর্ণ হয়ে যেতে পারে মন, ক্ষমতা।

—আ অ্যাম ডেফিনিটলি নট আ ট্যুরিস্ট অন দিস আর্থ, ম্যাডাম, নর আ পরিব্রাজক।

—তা হলে তুমি কী?

—লেটস সি। তাছাড়া মন সংকীর্ণ হওয়ার প্রশ্ন নেই। ইট হ্যাজ টু বি কিন, ইনটেন্স।

ইউ মিন ইনটেনসিটি ইজ অল?

এগজ্যাক্টলি।

এখন এই ম্যাডাম, কস্তুরীবেনও পরিব্রজনে বিশ্বাসী কিনা কে জানে! দেশভ্রমণ, দেশে দেশে মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ, বা হিপি বা ইসকন..। মিঠু বলে— তোর মধ্যে একটা দম্ভ আছে। কারওর ওপর কিছু চাপিয়ে দিচ্ছিস না, বা মানহানি করছিস না, এই যা বাঁচোয়া।

ভুল বলছিস। ওটা জেদ, কোনও গোপন আকাঙ্ক্ষা, অ্যাসপিরেশন আছে আমার মনের মধ্যে তাই সেটাতেই ধ্যান দিয়ে থাকি, তাই আমাকে অ্যালুফ দেখায়, সেটাই তোরা দম্ভ ভাবিস। ভাব, আমি বারণ করছি না, কে কী ভাবল তা নিয়ে আমার কোনও ভাবনা নেই। আসে যায় না।

—তুই যখন নিজেকে এত ভাল পড়তে পারিস বলে মনে করিস তখন আর সামান্য একটু ইনভলভ্ড্ হবার চেষ্টা কর। লোককে ভুল ইমপ্রেশন দিয়ে কী লাভ! পাঁচজনের সঙ্গে একটু জড়ালে তোর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

সামান্য একটু সেন্টিমেন্ট এখানে মিশিয়ে দিচ্ছে মিঠু, নির্ভুল বুঝতে পারে কাজল। ও হয়তো নিজেও জানে না। কিন্তু মিঠু জানে না, ওপর ওপর উদাসীন হলেও কাজলের ব্যারোমিটার কী নিখুঁত! পাঁচজন বলতে সাধারণভাবে মিঠু পাঁচজনকে বোঝাচ্ছে কিন্তু বিশেষভাবে বোঝাচ্ছে নিজেকে। নিশ্চিত।

—দি-দি। —ঠিক এই সময়ে বাইরে থেকে শোনা গেল। কাজল বলল, ওই তিনি এসে গেছেন।

হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গোটানো, একটা ওয়াটার প্রুফে ঠ্যাং ছাড়া সব ঢাকা। মাথায় ওয়াটারপ্রুফি বনেট— মিঠু বাইরে থেকে গলা বাড়িয়ে বলল— জলো জিনিসগুলো বাইরে রেখে, শুকনো আমি ভেতরে ঢুকছি দিদি। এখানে কি একটা হুকটুক আছে?

—বাম দিকে দেখো, ঠিক পেয়ে যাবে, পোর পোর হুক...

—পেয়েছি।

সানডাক খুলে ওয়াটার প্রুফ হুকে টাঙিয়ে শ্রীমতী পেল্লাই ব্যাগের ভেতর থেকে একটা ঝাড়ন বার করে পা মুছলেন। তারপর আঙুলে ভর দিয়ে হাসি-হাসি মুখে ভেতরে ঢুকলেন।

—ওয়ান্ডারফুল— কস্তুরীবেন বললেন।

—কী হিসেবে? কাজল জিজ্ঞেস করল।

—শি ইজ আ ওয়েল-অর্গ্যানাইজড ইয়াং লেডি। তুমার মুতন ভিজে ভাত নয়।

—ভাত? ভাতকে আপনারা কী বলেন দিদি? এরকম ইডিয়ম আছে গুজরাতিতে? আমরা বলি ভিজে গোবর। মিঠু বলল।

—ভাত ইজ ভাত। তা ছাড়া তুমরা ভুলে যাচ্চো আমার ছুটবেলা কেটেচে কলকাতাতে।

অর্থাৎ কথাটা উনি ওদের ভুলতে দেবেন না। ভুলে গেলে আহত হবেন। যদি ছুটবেলা কলকাতাতেই কেটে থাকে তা হলে উচ্চারণের তফাত কেন? জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না কাজলের। যদি কিছু মনে করেন! নিজেকে অকৃত্রিম কলকাতিয়া ভেবে উনি খুব খুশি আছেন। আমদাবাদ যেমন ওঁর শোহোর কলকাতাও তেমনই ওঁর। ওঁর বাপু-ল্যান্ড আর মা-ল্যান্ড। কতটা কৌতূহল বা ঠাট্টা-তামাশা ওঁর সইবে— সে এখনও বুঝতে পারেনি।

মিঠু বলল, আমি একবার বেরিয়ে প্রচণ্ড ভিজে আবার ফিরে গেছি, জানেন? তারপর একটু অপেক্ষা করলাম, বৃষ্টিটা একটু ধরতে আবার চেঞ্জ করে ধড়াচূড়া পরে বেরোলাম। ঠিকই করেছি।

আমাদের ওখানে জল নেই কিন্তু গোলপার্ক জলে জল। আবার দেখুন আপনাদের এখানেও তেমন কিছু নেই। নর্দমার দিকটা জমে আছে, ওখানটা লাফ মেরে পেরিয়ে এসেছি।

ঠিক করেচো—কস্তুরীবেন বললেন। —কাজল এবার কি যাওয়া যাবে? থ্রি মাস্কেটিয়ার্স!

বলতে পারছি না ম্যাডাম। দক্ষিণেশ্বর তো এখানে নয়, মাঝরাস্তায় গাড়ি যদি বিকল হয়ে যায়, বিপদে পড়বেন। মানে পড়ব। স্ট্র্যান্ডেড হয়ে যেতে পারি। এদিকেও আসতে পারব না, ওদিকেও যেতে পারব না।

দ্যাটস ব্যাড— কস্তুরীবেন খুব চিন্তিত হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। স্নেহলতা ঘোষের সঙ্গে দ্যাখা করা তাঁর খুবই দরকার। দরকারটা ব্যক্তিগত। কিন্তু সম্ভবত প্রথম দেখাতেই সেটা মিটবে না। দু'বার অন্তত যেতে হবে।

তা হলে কি আমরা চলে যাব? কাজল জিজ্ঞেস করল। হঠাৎ মিঠু একটু আবদেরে সুর ধরল। —এত দূর ভিজে টিজে কষ্ট করে এসেছি দিদি। মোটেই ফিরে যাব না। এই কাজল, তেলেভাজা মুড়ি নিয়ে আয় না।

ওই যে, মিঠুদেবীর পারগতা অপারগতা সম্পর্কে কোনও পূর্ব ধারণা করে নেওয়া ঠিক নয়! যা কাজল পারে না, মিতু তা অনায়াসেই পেরে যায়। এই ম্যাডাম বোঝাই যাচ্ছে কেমন অন্যমনস্ক, কিছু একটা প্রবলেম আছে ওঁর। কেউ ওঁর সঙ্গে ঘুরুক উনি চান না। নেহাত দক্ষিণেশ্বরের কাছে এই এঁড়েদ' জায়গাটার রাস্তা, বাড়ি ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত, তাই ওদের কথায় রাজি হয়েছেন। এখন এই তেলেভাজা, ওঁর সময়ের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ এসব ওঁর কত দূর বরদাস্ত হবে কে জানে!

কস্তুরী বললেন— কাজল, রামলাখনকে ডাকো। ও আনবে। তুমরা আরামসে বসো।

মিঠু তার আবদেরে ভঙ্গি অবিকৃত রেখে বলল, দিদি, আপনি আপনার দেশের গল্প বলুন। ছোটবেলার গল্পও তো আছে। প্লিজ দিদি...।

—তুমাদের মতুন আমাদের ছুটবেলা নয় মৈত্রী। আমরা খেলতুম কুকুর নিয়ে, বেড়াল নিয়ে, পুতুল নিয়ে, অ্যাসর্টেড ডলস— বেনেপুতুল, মুড়কি পুতুল, কাচের পুতুল, আলুর পুতুল...।

আলুর পুতুল? —মিঠু হেসে উঠল।

আলু নয়, সেলুলয়েডের ছিল, কিন্তু আলু বুলতো, কেন জানি না। তো আমরা খেলতে খেলতে পড়তে শিখে যেতুম, মেঝেতে চকখড়ি দিয়ে অ আ ক খ, এ বি সি ডি, যোগ বিয়োগ, গুণ, ভাগ—সমস্ত। পিঠে ক্রিশ্চানের পাপের বুঝা নিয়ে আমাদের স্কুল যেতে হত না। দুই চার পাতলা বই, খাতা, পেনসিল বক্স। বাস। হাতের লেখা করতে হত। চার পাঁচ ছে পাতা।

আমরাও করেছি দিদি, প্যাটার্ন ড্রয়িং দিয়ে কত ছোটতে শুরু করেছি। প্রিপেয়ারেটরিতে।

তাতে হাতের লেখা ভাল হয়েচে?

মিঠু অপ্রস্তুত হয়ে জিভ কাটল— এ মা! হ্যাঁরে কাজল, আমার হাতের লেখা ভাল!

—পাতে দেওয়া যায়— কাজলের চটপট জবাব, যদিও সে বলে থাকে মিতুর হাতের লেখা ছাপা হরফের মতো।

—তোরটা পাতে দেওয়াও যায় না।

কাজল বলল, একটু জড়ানো, পড়তে অসুবিধে হয়, তো আজকাল তো কম্পিউটারেই সব করি। আমার হাতের লেখা কেমন, ভুলেই গেছি।

আমারটা দেখবে? —উনি দারুণ উৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন— ব্যাগ খুঁজে একটা কার্বন কপি বার করে নিয়ে এলেন।

—এই দ্যাকো, নিতাইবাবুকে যে চিটি দিই তার কপি। ওনার ই-মেল নেই। তা ছাড়া আমি যেসব মানুষের সঙ্গে করেসপন্ডেন্স করি, তাঁদের ই-মেল থাকে না।

চিঠিটা হাতে করে কাজল, মিঠু অবাক। ইংরেজি নয়, পরিষ্কার বাংলায় লেখা। গোটা গোটা। খানিকটা পুঁথির মতো লাইন টেনে টেনে লেখা।

সহযোগীবরেষু নিতাইবাবু,

আমি ষোলো অগস্ট কলকাতা যাচ্ছি, আমদাবাদ-হাওড়া এক্সপ্রেসে। বেশ কয়েকজন পুরাতন স্বাধীনতা-সংগ্রামীর সহিত দেখা করিব। নামধাম গিয়া বলিব। আমার কিছু শূন্য পাতা পূর্ণ করিবার প্রয়োজন। আপনার সহায়তা লাগিবে। আশা করি নিরাশ করিবেন না। সম্মানপূর্বক নিবেদনমিতি

কস্তুরী।

পড়ে ওরা অবাক হয়ে গেল। কতকাল আগেকার ভাষা-ভঙ্গি। সাধুভাষা আজকাল প্রায় উঠে গেছে। 'ঠাকুরমার ঝুলি' সাধু ক্রিয়াপদে লেখা বলে বাচ্চারা পড়তে চায় না। এরকম ভাষা দাদুর পুরনো চিঠিতে মিঠু দেখেছে। সযত্নে বাবা রেখে দিয়েছেন একটা কাঠের হাতবাক্সে। একগোছা চিঠি, একগোছা চাবি, দাদুর সোনার ফ্রেমের পড়ার চশমা, আর একটা হিসেবের খাতা। আধ সের খয়রা মাছ ১ পয়সা, একজোড়া শান্তিপুরী শাড়ি ৯২টা ইত্যাদি।

কী সুন্দর হাতের লেখা দেখেছিস কাজল! ইস্‌স্‌। দিদি আমার হিংসে হচ্ছে!

স্পষ্টই দারুণ খুশি কস্তুরী। মুখে বললেন, হিংসা না করে প্র্যাকটিস করলে কাজে দিবে।

এখন এই বয়সে প্র্যাকটিস? দিদি? —মিঠু হেসেই আকুল।

কেনো? কোতো বোয়োস তুমার দিদিমোণি! যোতোদিন বাঁচে, ততদিন শিকে জানো না?

মিঠুর হাসি এবার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

পরিস্থিতি সামলাতে কাজল বলল, ম্যাডাম, কোন স্কুলে পড়তেন আপনি?

মুরুলিধোর চিনো?

হ্যাঁ। চিনি বই কী!

মুরুলিধোর কে ছিলেন জানো?

না, জানি না।

তুমরা কিছুই জানো না। শুনো মুরুলীধোর ছিলেন— বিখ্যাত আইনের লোক। উনি ওঁর তিন ছেলে সব আইন। অনেক দানধ্যান ছিল। আরও ছিলেন চারুচন্দ্র চ্যাটার্জি, সমাজসেবক, বিদ্বান লোক, সব এখানকার মানুষ।

হ্যাঁ দিদি ওঁর নামে একটা কলেজ হয়েছে এখন।

এখন কে বললে? সেই সাতচল্লিশ নাগাদই হয়েছে দিদিমোণি। মঙ্গিরাম বাঙ্গুর ছিলেন আরেক ধনী। বিড়লাদের থেকেও ধনী। ওঁর নামে তো হসপিট্যাল আছে। এঁরা সব এই সাউথ ক্যালকাটার গোড়ার দিকের লোক ছিলেন।

আপনি এত জানলেন কী করে দিদি? —অকৃত্রিম বিস্ময় মিঠুর গলায়।

বলেচি না আমার ছুটবেলা....

কাজলের ভীষণ হাসি পাচ্ছিল, হাসিটাকে প্রাণপণে সে প্রশ্নে পরিণত করল।

এই তো মিঠুরও ছোটবেলা কেটেছে কলকাতায়, আমার একটু বড়বেলা— আমরা তো জানি না!

এবার বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন কস্তুরীবেন— তুমরা জানতে চাও না, কেয়ার করো না। আমি পোস্ট-ইনডিপেন্ডেন্স জেনারেশন প্রচুর দেখেছি, নিজেদের নিয়ে মোত্ত। ডোন্ট কেয়ার আ ফিগ ফর দা পাস্ট। মোত্ত হও না কে বারণ করেচে? কিন্তু নিজের দেশের পাস্ট জানবে না?

—হিস্ট্রির লোকেরা জানে... খুব নার্ভাস গলায় মিঠু বলল।

—সে তারা কুঁটিনাটি জানুক, কিন্তু সাদারণভাবে য়ু সিম টু কেয়ার মোর অ্যাবাউট নোয়িং দা নেমস অব অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্টস, দ্যান দ নেমস অব ইন্ডিয়ান ফ্রিডম ফাইটার্স।

—না দি, স্যরি।

—নো স্যরি, য়ু শুড বি অ্যাশেম্‌ড্, তুমাদের লোজ্জা কোরা উচিত।

তারপরই কস্তুরী যেন তাঁর ভেতরের কাঠিন্যকে গলে যেতে দিলেন, নরম প্রায় ভয় পাওয়া গলায় বললেন, না, না, আ অ্যাম স্যরি, এভাবে বোলা আমার উচিত করেনি। আই কান্ট ইকোয়েট য়ু উইথ আদার্স। টিক আছে, সাদারণ, খুব সাদারণভাবে জানবে, শুদু নেহরু, মহাত্মা, পাটেল, বোস জানলে হচ্চে না। আরও একটু, আরও এক-টু। একটু থেমে বললেন, তুমরা টিক কী কাজ করো বলো দিকি!

—আবার সেই কাজ? মিঠু কাতরায়।

—বা। কাজেই তো তুমার পরিচয়, নোয়?

অসহায়ের মতো মিঠু কাজলের দিকে চায়।

কাজল বলল, আমি লোকসংস্কৃতি নিয়ে রিসার্চ করছি দিদি। একটু ঘুরতে হয়। থিয়োরিটিক্যাল কাজও আছে।

তুমি মনভূম গেচো?

মানভূম? আজকাল তো আর মানভূম বলছে না। যে জায়গাটাকে সাঁওতাল পরগনা বলত— গালুডি, রিখিয়া, শিমুলতলা, মধুপুর ও অঞ্চলের অনেক গ্রাম জানি। যাইনি। জাস্ট জানি।

—মঝিহিডা বলে কোনও জায়গা আছে?

—মাঝিহিড়া? অনেক রকম কাজকর্ম হয়। আপনি জানেন?

—কী ধোরোন? —জানা না জানার প্রসঙ্গ না তুলে উনি বললেন।

—এই ধরুন সর্ট অব গান্ধীয়ান বেসিক ট্রেনিং?

কাজলের থেকে হঠাৎ-ই মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে মিঠুর দিকে তাকালেন উনি।

—বালো বালো বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন ডিজাইনিং সোব ছেড়ে তুমি সোশ্যাল সার্ভিসে এলে কেন দিদিমোণি?

মিঠু সামান্য ঠোঁট উলটে বলল, দুর। কম্প্যারেটিভ লিটরেচার নিয়ে মাস্টার্স করেছি দিদি। খালি পাবলিক রিলেশন্‌স্ জব পাচ্ছিলাম আর টিচিং একদম বাজে। সবার মন রাখা আমার কর্ম নয়। পেয়ে গেলাম একটা এন.জি.ও.-য়। ভ্যাগর‍্যান্টস্ নিয়ে ওদের কাজ।

আচ্চা। ইনটরেস্টিং!

—কিন্তু আমি শুধু ডকুমেন্টেশনটা করি। প্রত্যেকের হিস্ট্রি রাখি। সি.ডি. করি, হেড কোয়ার্টার্সে, আরও কিছু কিছু রিসার্চ অর্গ্যানাইজেশনে পাঠাতে হয়।

—বা। হিস্ট্রি! কেমন এই ভ্যাগর‍্যান্টসরা?

—দিদি আজব আজব ব্যাপার। আপনি ভাবতেই পারবেন না, ভাল সচ্ছল পরিবারের ছেলে ছিল। স্বভাবেই ভবঘুরে-টাইপ, এখন ধরুন বিয়াল্লিশ মতো বয়স। বাড়ি থেকে পালিয়েছে তেরো বছর বয়সে। একটা ভিখারির সঙ্গে কোনও তফাত ধরতে পারবেন না। পিকিউলিয়ার।

কস্তুরী বললেন, কেনো যে মানুষ পালিয়ে যায়! কোতা থেকে কোতায়। পালাবার জায়গা আচে? —একটু কি নিশ্বাস ফেললেন? —বাড়ির কোঁজ করোনি?

—করেছি। বলতে কি চায়? অন্যদের থেকে ভাসাভাসা মতন জেনে, আমাদের ডিরেক্টর খোঁজ করতে পাঠিয়েছিলেন। বর্ধমানের এক গ্রাম শ্রীরামপুর, ওদের যথেষ্ট জমি-জায়গা। উগ্র ক্ষত্রিয় বলে ওদের। প্রচুর টাকা থাকে ওদের। মা বাবা বেঁচে নেই। এক দাদা বললেন— দুর, ওর আশা আমরা ছেড়ে দিয়েছি। বেশ পড়াশোনা করছিল কিন্তু থেকে থেকেই পালাত। কেন? কী অসুবিধে? কোনও

অসুবিধে নেই। ফেল করেনি, বাড়িতে অনাদর নেই। কে জানে, মন টেকে না, জাস্ট পালিয়ে গিয়ে কোনওরকমে খাবার জোগাড় করে কাটিয়ে দিত। তারপর হয় নিজেই ফিরে আসত। নয় বাড়ি থেকে খোঁজখবর করে ধরে নিয়ে আসত। শেষবার পালাল। তারপর ওই আমাদের থেকে ওর খবর পেলেন ওঁরা। দাদাটি বললেন— গিয়ে কোনও লাভ নেই। এমনিতেই ওর মন টিকত না, এখন তো মানাতেও পারবে না।

—তারাপদ টাইপ— কাজল বলল।

—তারাপদ কে? কস্তুরী জিজ্ঞেস করলেন।

—ও আপনি চিনবেন না। রবীন্দ্রনাথের একটা গল্পের...

—রাইট। ওতিথি নয়? কেনো চিনবো না— রবীন্দ্রনাথ আমার ওনেক পোড়া আচে। এই ফিল্মও আমি দেকেচি। বালো কাজ।

গল্পসল্প গড়াতে গড়াতে রাত ন'টা হয়ে গেল।

বেস্ট লাক দা নেক্সট টাইম! কাজল বিদায় নিল। মিঠু তখনও বসে। তার যাবার ইচ্ছে নেই। নিজেই নেই-আঁকড়ার মতো বলল— আর একটু থাকি দিদি, হ্যাঁ? কাজল তুই যা, কেমন? অধিকারী মাসিমা আবার মনে কষ্ট পাবেন।

এই হল মিঠুর মার্কামারা বিচ্ছুমি।

খোলা জানলা দিয়ে কস্তুরী দেখলেন— কাজল রাস্তা ক্রস করল। বাঁক ফিরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ফিরলেন মিঠুর দিকে। একটু ইতস্তত করে বললেন, দিদিমণি, এই চেলেটি মুণ্ডা মিনস সাঁওতাল, কোল, হো...

—হ্যাঁ দিদি। ও নিজেকে বলে আদি বাঙালি।

—মানে?

—আসলে বাঙালি তো সংকর জাতি দিদি। কাদের সঙ্গে কাদের মিশ্রণে বাঙালি হয়েছে বলা খুব শক্ত। সাদা কালো তামাটে সবকিছু মিশে গেছে পুবের এই মেল্টিং পটে। তাই ও নিজেকে আদি বাঙালি বলে।

—কিন্তু ও চোমৎকার বাংলা-ইংরেজি বোলে, সিম্‌স ভেরি ওয়েল এডুকেটেড!

—ওয়েল এডুকেটেড তো বটেই। ও হিস্ট্রির এম.এ. দিদি— সোশিওলজিতেও। ডক্টরেট করছে এই আদিবাসীদেরই ওপর। তা ছাড়া ও খুব ছোট থেকে ব্যাপটিস্ট মিশনে মানুষ, পরে রামকৃষ্ণ মিশন। ভীষণ ট্যালেন্টেড।

—মিশনে মানুষ? মা-বাবা নাই?

—এসব কথা আমি জানি না দিদি। ও কখনও এ আলোচনার মধ্যে যেতে চায় না। আমি... আমি কখনও জিজ্ঞেস করিনি। তবে মিশ্রনে মানুষ যখন, তখন ধরেই নেওয়া যায়— অনাথ। দিদি, আপনার কথা বলুন। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

কস্তুরী চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, নিতাই তোমাদের বোলেনি?

—হ্যাঁ, আপনি খুব বড় বিজনেসম্যান ফ্যামিলির। আপনি সোশ্যাল ওয়র্ক করেন।

—এই তো জানো। আর কী!

—বাস? —এত নিরাশ গলায় মিঠু বলল যে কস্তুরী হেসে ফেললেন, তারপরে মিঠুর গাল টিপে আদর করে বললেন, দুঃখো করবে না। শুনো তোবে। আমার বাবার নাম নরেন্দ্র মেহতা। কাপড়ের ব্যবসায়ে প্রচুর কামিয়েছেন। আমি কুড়ি-একুশ থেকে ওঁর সঙে আছি। আই টু হ্যান্ডল বিজনেস। কোতো নং সুতায় কুন মেশিনে কাপড় বুনলে আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে শাড়ি হোবে, রাজকুমারী একদিন পোরে ফেলে দিবে, জাহাজ জাহাজ সোনা দাম হোবে তার, চাঁদের মা চোরখায় সুতা কাটছে সুতা কাটছে, সোব আমি হাত পেতে নিতে জানি।

মিঠুর মুখচোখ ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, বিস্ময়ের গলায় বলল, দিদি, আপনি ক্ষীরের পুতুল, ঠাকুরমার ঝুলি— জানেন? পড়েছেন?

—তোবে? দিদিমণি তুমাকে কোতোবার বলতে হোবে, আমার ছুটবেলা কেটেছে কোলকাতায়। জোন্মো একানে, কোর্মো আমদাবাদে।

—চলে গেলেন কেন? কবে?

—সে কোতোকাল আগে কে জানে। বাবাকে চলে, যেতে হল। আমাকেও যেতে হচ্ছে, না কী!

—কী ধরনের কাজ করেন আপনি দিদি? মানে সমাজসেবা!

—ছাইয়ের সোমাজসেবা। কিচ্চু করি না। সোব ছুটো ছুটো বাচ্চাদের পোড়ানো খেলানোর বন্দোবস্ত করি। দুঃখী বাচ্চা— হিন্দু, হরিজন, মুসলিম... ব্লাইন্ড, ডেফ অ্যান ডাম, —সাপোর্ট করি। গরিবের হাতের কাজ শিখানো চাই। সেসব বিক্রি করি। সোবোরমতী জানো?

—হ্যাঁ, গান্ধীজির আশ্রম।

—তোবে তো তুমি ভাল মেয়ে। জানো। সোবোরমতী জানে না কোতো! উনি তো লোবোন সত্যাগ্রহের পোর আর গুজরাত ফিরলেন না, ওয়ার্ধায় চলে গেলেন। জানো?

—ওয়ার্ধা নামটা চেনা চেনা লাগছে।

—চিনা চিনা যোথেষ্ট। ডিটেল জানার দোরকার কী!

মিঠু বুঝতে পারল না উনি তাকে তিরস্কার করলেন কিনা।

—তো সে যা হোক, সোবোরমতী প্রোডাক্টস মার্কেটিং কোরবার চেষ্টা করি। বাস।

—আর মানে ওই দাঙ্গা...

—ও তো সারা ভারতের জানা হয়ে গেচে। ওই বাস। গুন্ডা এলিমেন্ট ওস্ত্রশোস্ত্র নিয়ে কাটছে, ভাঙচে, মারচে, মার-খাওয়া লোক পিছনের দোরজা দিয়ে ঢুকাচ্চি। উরা চেঁচাচ্চে, আমায় মেরে ফেলে দিবে। লুঠ কোরবে। বাড়ি জ্বালিয়ে দিবে। আমি শুনচি না। চোপ্। কোরো কী কোরবার। বাস। সোবাই বলতে লাগল কস্তুরী মেহতা বহুৎ কিচু করেচেন। মুসলমান লোকের মেসায়া। মেসায়া কিচু নোয় দিদিমোণি। ওন্যায় দেখলে রুকতে হোয়। আমার টাকা ছে, ফোর্টের মুতুন বাড়ি ছে, সাহস ছে, আমি যদি না করি, কে করবে?

দিদি, কিছু মাইন্ড করবেন না, এটা আপনার আয়রনি মনে হয় না, গান্ধীজি মুসলমানদের জন্য এত করলেন, কলকাতায়, খুলনা, নোয়াখালি, দিল্লি— সব জায়গায়। আর ওঁর নিজের জায়গা গুজরাতেই...

কস্তুরী বললেন— হিস্ট্রি ইজ ফুল অব আয়রনিজ, জানো না দিদিমোণি?

৭) তিনি ও স্মৃতিসত্তা

মনটা খিঁচড়ে গেছে। বৃষ্টি সুস্বাগতম। কিন্তু 'এভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে না পারায় কস্তুরী উদ্ভ্রান্ত। ধরো যদি কালও এমনি বৃষ্টি পড়ে! ধরো পরশুও। হেসে ফেললেন— কী অধৈর্য! এত অধৈর্য হলে কোনও কাজ হয় না। দু'-তিনবার স্নেহলতা ঘোষের বাড়ি ফোন করেছেন, পিঁ পিঁ করে যাচ্ছে। তারপর খবরে শুনলেন বৃষ্টিতে অনেক জায়গাতেই টেলিফোন বিকল হয়ে গেছে। বাঃ! অতঃপর কী করণীয়? সময় অনন্ত নয়। নাঃ ঠিক হল না। সময় অবশ্যই অনন্ত। কিন্তু তাঁর সময় খুবই সীমিত। বাবা বেশ কয়েক বছর পলিয়েস্টার খাদি শুরু করেছিলেন, তার নানারকম বৈচিত্র্যও আসছে, রঙে টেক্সচারে। নানা রং আরম্ভ হয়েছে ইদানীং। ভীষণ পপুলার হয়েছে। সারা ভারতবর্ষে যাচ্ছে, এখন

ভারতের বাইরেও প্রচুর চাহিদা। সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে তাঁর কাজ, ব্যস্ততা, কমেছে সময়। নিজের এলাকাতে ব্যাবসার দেখাশোনার বাইরে তাঁর যে কাজ তা-ও প্রচুর সময় দাবি করে। সবরমতী আশ্রমের উৎপাদন মার্কেটিং করা তাঁর কাছে একটা ব্রতর মতন। আছে ব্লাইন্ড স্কুল, মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংস্থা। দরিদ্র মেয়েদের উপার্জনের জন্য একটা বড় সংস্থাও রয়েছে, তারা শাখা-প্রশাখা বিস্তারও শুরু হয়েছে। এই সবগুলোরই তিনি কর্ণধার। কলকাতায় এসে অনির্দিষ্টকাল বিনা কাজে বসে থাকার সময় বা মানসিকতা কোনওটাই তাঁর নেই। কিন্তু এই ভিজে গরম ও মুষলধার বৃষ্টির দেশে অধৈর্য হয়ে তো কোনও লাভ নেই।

ক্রমশ রাত হয়। তাঁর বরাদ্দের রুটি ভাজি দহি খাইয়ে যায় রামলাখন যত্ন করে। কস্তুরী বই পড়বার চেষ্টা করেন। বিক্ষিপ্ত মন শান্ত করার যা যা উপায় আছে সবই একটু একটু চেষ্টা করেন। কিন্তু মন শান্ত হয় না। শেষে দুরন্ত শিশুর মতো ছুটে যেতে চায় পাঁচের দশকের কলকাতায় যখন ভোরের রাস্তায় হাইড্রান্টের মুখে পাইপ লাগিয়ে রাস্তা ধোয়ার শব্দে চোখ মেলছেন, আবার ঘুমিয়ে পড়ছেন, ছায়াময় রাস্তা নিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে, গান করতে করতে চলে যাচ্ছে প্রভাতফেরি, দৌড়ে এসেছেন বারান্দায়— 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নতশির নাহি ভয়/ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান হও সবে আগুয়ান সাথে আছে ভগবান, হবে জয়।'

কী অমোঘ সব উচ্চারণ, কত সরল অথচ সত্য! তখন তো কথাগুলোর মানে বুঝতে পারতেন না। গানের সুরে শব্দ বিভাগও হয়ে যেত আলাদা। হও ধরো, মেতে ধীর, হও উন, নত শির, নাহি ভয়। হও এবং ধরো, কী ধরতে হবে ভেবে পেতেন না। মেতে আবার ধীর কী করে হওয়া যায়! নত শির, মানে বড়দের সামনে মাথা নিচু করে থাকতে হবে তা হলেই আর ভয়ের কারণ থাকবে না, চড়চাপড় পড়বে না। কিন্তু উন জিনিসটা কী, আর কী করেই বা তা হওয়া যায়! ভেদাভেদটাকে ছোট্ট মেয়েটি অভেদানন্দের সঙ্গে মিলিয়ে ধরত, অভেদ ও ভেদাভেদ, তবে এঁদের তো মনে রাখতেই বলা হয়। ভুলতে হবে কেন? বাকিটুকু সোজা, বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গেলে যে দুষ্টু বন্ধুরা ঘাবড়ে যায় তা বেশ দ্যাখা আছে। একদিন একটা কী ছোট্ট প্রশ্ন করেছিল মাকে, তাইতেই মা বিদ্যের দৌড় বুঝে যান। খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন। ধরম বা ধর্ম মানে এইসব পুজো-অর্চনা করা নয়, নামাজ পড়াটড়া নয়, ধর্ম মানে ভারচু, অর্থাৎ কিনা মানুষের যে মৌলিক গুণ, মানবিকতা, সেই মনুষ্যত্বে ধীর থাকতে হবে, উন্নতশির। মাথা উঁচু করে চলতে হবে, মানে উদ্ধত নয়, কিন্তু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। অস্পষ্টভাবে হলেও কেমন গভীরভাবে সে বুঝেছিল কথাগুলো, মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল এক দফা মূল্যবোধ। মানবধর্ম থেকে কখনও বিচ্যুত হবে না। আত্মসম্মান হারাবে না। মানুষে মানুষে ভেদজ্ঞান ভাল নয়, কে কৃষক, কে বণিক, কে ধনী, কে দরিদ্র, কে উচ্চবর্ণ কে নিম্নবর্ণ, কে মুসলমান কে শিখ, এই বিভেদ ভুলে একটি অখণ্ড সামাজিক একক হয়ে এগোতে হবে— জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, মন্ত্র সাধনে, ঐশ্বর্য আহরণে, কুসংস্কার দূর করতে, সুসংস্কার রক্ষা করতে। এত কথা আস্তে আস্তে অনুভব করেছেন। একটা টেক্সট-এর ব্যাখ্যা যেমন ক্রমেই প্রসারিত হতে থাকে, এই দুটি সরল পঙ্‌ক্তির অর্থও তাঁর মননে, চেতনায় তেমন হচ্ছে। ঝোঁকটা যখন 'ধরম' থেকে 'ধীরে'র ওপর পড়ে, তিনি ভাবতে থাকেন। ধীর মানে কি শুধু স্টেডি? না। তোমার মানবিকতার ধর্মকে প্রয়োগ করার সময়ে তুমি শান্ত, ধীর থাকবে, মিলিট্যান্ট হবার দরকার নেই। কর্মে বীর হওয়া যে কত কঠিন তা তো তিনি হাড়েহাড়েই বোঝেন। সাহস, প্রচণ্ড সাহস প্রয়োজন হয়, ধ্যান দরকার হয় যে কোনও কর্ম সম্পন্ন করতে গেলে। অনেক খারাপ সময় এসেছে গেছে, শরদকাকার সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাবা এক সময়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। তখন শরদ শার সঙ্গে কথাবার্তা তাঁকেই বলতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যখন দেখলেন তাঁদের পারিবারিক গুডউইলের সুযোগ অন্যায়ভাবে নিয়েই চলেছেন কাকা, তখন তাঁকে একটা অত্যন্ত সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। জুয়েলারি থেকে তখন তিনি বাবাকে কাপড়ের ব্যবসায়ে আসতে পরামর্শ দিলেন। নরেন্দ্র অবাক হয়ে গিয়েছিলেন—

বলিস কী, কিকি? এত দিনের ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন....। নতুন ব্রাঞ্চ...আমি কি পারব?

—তুমি তো অনেক কিছুই পেরেছ বাবা, এটাও পারবে।

তখন তাঁর কত বয়স? বাইশ? তেইশ! সবে আইন পরীক্ষা দিয়েছেন।

তারপর কাগজে কাগজে ফলাও করে নোটিশ চলে গেল 'ইট ইজ হিয়ারবাই নোটিফায়েড দ্যাট নরেন্দ্রভাই অব নরেন্দ্রভাই শরদভাই ইজ নো লঙ্গার উইথ দা মেহতা জুয়েলার্স'। শরদকাকাকে নিজের অংশ যখন বেচে দিলেন অবলীলায়, তখন শরদকাকা খুব অনুনয়-বিনয় করেছিলেন। তিনি অন্যায় করেছেন, নরেন্দ্র যেন তাঁকে মাফ করেন।

নিজের ভাই-ই বিশ্বাসঘাতকতা করে শরদ, আর তুমি তো পাতানো ভাই। কোনও আদর্শই বিত্তলালসার ওপরে নয়— আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার অসুবিধে কীসের? গুড উইলটাই তো তোমাকে বেচলাম। আমাদের বাপ-বেটির চলে যাবে একরকম।

একেবারে চুপ শরদ শা। কোনও কথা বলতে পারেননি। উদ্ধত জবাব, অন্যায় অপমানজনক আচরণ, কিচ্ছু না। চলে গেলে বাবা বলেছিলেন, সত্যি চলে যাবে কিকি? সত্যি পারব?

—পারবে না কেন? আমি রয়েছি তো!

হঠাৎ নরেন্দ্র বলে উঠেছিলেন, হ্যাঁ, সে-ও একথাই বলত। আমি আছি তো!

—কে বাবা? আমার মা?

নিঃশব্দে মুখ নিচু করেছিলেন বাবা। কন্যা আর প্রশ্ন করেনি। কাপড়ের কারবার ফলাও করতে তাঁদের তিন বছরের বেশি সময় লাগেনি। প্রথমে নামী মিলের এজেন্সি নিলেন। তারপর মিলটাই কিনে নিলেন। এখন কোথায় শরদ শা'র জুয়েলারি আর কোথায় নরেন্দ্রর কটন সাম্রাজ্য।

বড্ড ছটফট করছে মনটা। বড্ড। ছেলেমেয়ে দুটো যতক্ষণ ছিল বেশ ছিলেন। বয়স হলে তরুণ-তরুণীদের সঙ্গ বোধহয় স্বাস্থ্যকর। অবশ্য তেমন তেমন তরুণ-তরুণী। চতুর্দিকে যাদের দ্যাখেন দেখে খুব আরাম পান না কস্তুরী। তাঁরা ছোটবেলায় কত অন্যরকম ছিলেন। কত সুন্দর ছোটবেলা কেটেছিল। বাড়িতে সর্বক্ষণই লোক। মাকে কম পেতেন। তাতেও কিন্তু কোনও অসুবিধে হয়নি। তাঁর নিজস্ব জগৎ ছিল, খেলাধুলো, পড়াশুনো, কুৎরী, বেড়াতে যাওয়া, গান শোনা, মায়ের হাতের মাছের ঝোল। আশ্চর্য! এখন আর মাছ মাংস খেতে পারেন না তিনি। গন্ধ লাগে। ঘিন্নাও লাগে। এখন থাকরা, কড়হি, পুরণপুরী, ধোকলা, গাঁঠিয়া খমণ্ড। বাবা যে বাবা দীর্ঘদিন মাছ ছাড়া অন্যান্য বাঙালি খাবার খেয়েছেন মায়ের হাতে, তিনি সুদ্ধ রোটলি, ভাকড়ি, মেথিলি ভাজি, চেওড়ো জলেবি— এসব ছাড়া খেতে পারতেন না। শেষ পাতে একটু দুধপাক তাঁর চাই-ই চাই।

শাহপুরের পুরনো বাড়ি। দাদা, দাদি। সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। একটা বিরাট উঁচু উঁচু ঘর। দালান। একটু উঁচু কিন্তু চওড়া চওড়া সিঁড়ি। জাফরির কাজ করা জানলা, আর ছোট ছোট ঝুলবারান্দা। একটু গম্ভীর, শান্ত। ছোট মেয়ের ভাল লাগার মতো নয়। কিন্তু আস্তে আস্তে ওই স্থাপত্যের গাম্ভীর্য থেকে শান্তি ছড়িয়ে গেল ছোট্ট মেয়েটির শরীরে, মনে। কেমন করে যেন বাবার বন্ধু হয়ে গেলেন। আগে তো বাবার সঙ্গে এত ভাব ছিল না! তাঁর আঠারো বছর বয়স থেকেই তো বাবা ব্যাবসার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। খাঁটি ব্যাবসাদারি রক্ত শরীরে, ঝলকে ঝলকে আসতে থাকত সমঝদারি, নতুন নতুন আইডিয়া। তাঁর, তাঁদের তারুণ্যও ছিল অন্যরকমের। এদের মতো নয়। শুধু নিজেকে নিয়ে কাটত না তো দিন। বাবা ছিলেন। ব্যাবসার চিন্তা ছিল, পড়াশোনা ছিল, সবরমতী আশ্রম ছিল, কত ছোট থেকে ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরে এনে পড়াতেন। কস্তুরীর মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। মহাত্মা গাঁধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একটা মহৎ সংসারের মধ্যে ছিল তাঁদের বসবাস। মারা গেছেন। তো কী? হাওয়ায় ভাসছে তাঁদের সুবাস। ট্রাম চলেছে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের তালে। 'মারের সাগর পাড়ি দেব গো' গেয়ে উঠলেন নিবেদিতা মাসি— এই বিষম ঝড়ের বায়ে/আমার হালভাঙা এই নায়ে।

নরেন্দ্র মেহতা ও শরদ শাহ আমদাবাদে সেবাদলে ছিলেন। হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছেন। তারপরে সুভাষচন্দ্রের ভাষণ, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর সংকল্প আস্তে আস্তে সম্মোহিত করে ফেলল তাঁদের। না, একানে আর নয়, সুভাষ, অরবিন্দ, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথের পবিত্র চুম্বকী চতুষ্কোণে যেতে হবে পথ খুঁজতে। বাবাকে লুকিয়ে চলে এসেছিলেন। পরে কুইট ইন্ডিয়ায় যোগ দিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে দ্যাখেন, আরে, সেবাদলের সেই শরদ না? গুজরাতি সাহিত্য সম্মেলনে হাঁ করে যমনালাল বাজাজের দিকে তাকিয়েছিল?

পাত্তা করতে পেরে বাবাই কিনে দিলেন ফার্ন রোডের বাড়ি। জাত ব্যবসাদার, বললেন, দেশের সেবা তো করবে, যুব আন্দোলন করবে, আধ্যাত্মিক করবে, কবিতা-কাব্য করবে তো পয়সা লাগবে না? হগ মার্কেটে দোকান দাও। তোমার ধর্মভাইকে নিয়ে ব্যাবসা করো। পয়সা না হলে কিচ্ছু হবে না। গলা ফাটিয়ে খালি চেঁচালে মুখে রক্তই উঠবে।

বাবার কাছ থেকে এইসব শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন কস্তুরী।

--বাবা তুমি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছ?

—একবার। অনেক দূর থেকে। জোড়াসাঁকোয়। জন্মদিন ছিল। অনেক লোক। এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

—কী দেখলে বাবা? কীরকম?

—তখন উনি বেশ বৃদ্ধ। পুরো মানুষটাই রুপোলি। সন্তের মতো মনে হচ্ছিল, যেন চারদিকে একটা প্রভা ছড়িয়ে যাচ্ছে।

—প্রভা, কিন্তু প্রভাব কি? বাবা? ওঁর মতো দূরদর্শী কর্মী এবং ভাবুক, অত হৃদয়বান। এ সবের কম্বিনেশন তো একসঙ্গে ঘটে না। তবু তো ওঁর দেশের লোকেরা শুনতে পাই ওঁর গান আর ডান্স ড্রামা নিয়েই মেতে রয়েছে।

—শান্তিনিকেতনও আর শান্তিতে নেই কিকি—বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন।

—তবে?

—কেউ প্রচার করল উনি মেয়েলি পুরুষ, কেউ বলল উনি সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গ ভালবাসেন, কেউ বলল নিজে নিজের ওপর গুরুদেব কথাটা উনিই আরোপ করেছেন। কেউ বলল উনি নিজের মান, যশ, খ্যাতি ছাড়া কিছু বুঝতেন না, কতরকম কথা, কিকি—কেউ দেখল না, জালিয়ানওয়ালাবাগের পর মহাত্মা যখন প্রতিবাদ করতে রাজি হলেন না, তখন একটি অতুলনীয় চিঠি দিয়ে কীভাবে তিনি নাইটহুড প্রত্যাখ্যান করলেন। এর মর্ম যে কী, আজকালকার ছেলেমেয়েরা বুঝবে না। একক প্রতিবাদ।

আজকালকার কেন বলছ বাবা! কোনওদিনই এর গুরুত্ব তেমন করে কেউ বোঝেনি। উনি তো কবি! রাজনৈতিক ব্যাপারে ওঁকে আন্ডারপাবলিসাইজ করাই বোধহয় সচেতন নীতি ছিল তখন।

রাইট। নরেন্দ্র হঠাৎ তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন। —কিকি, তুমি তার মতো করে ভাবো। কী করে শিখলে? উত্তরাধিকার?

রক্তেরও। শিক্ষারও। সেই পাঁচ-ছ' বছর বয়সে তাঁর মধ্যে কতকগুলো আইডিয়া ঢুকে গিয়েছিল, পরে তিনি সেগুলোকে নিয়ে মনের ভেতর অনেক নাড়াচাড়া করে তাঁর নিজস্ব দর্শন তৈরি করেছেন।

পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে কস্তুরীর মনে হয়, তাঁর সারা জীবনটা বাস্তব দিয়ে গড়া স্বপ্ন একটা। রূঢ়, কঠিন বাস্তব। তাঁকে একের পর এক কষ্ট ও সমস্যার মোকাবিলা করতে করতে বড় হতে হয়েছে। কিন্তু সবটাই স্বপ্নময়।

মা স্বল্পভাষী, অন্যমনস্ক। খেলাধুলোর ব্যাপারে কোনও বাধা দিতেন না। কিন্তু দুষ্টুমি বিশৃঙ্খলা সহ্য করতেন না একদম। বলতেন এই নাও 'ক্ষীরের পুতুল' পড়ো, তারপরে দশটা পর্যন্ত নামতা লিখবে, তারপর 'আবোল-তাবোল' থেকে যে কোনও একটা কবিতা মুখস্থ করবে। রাতে স-ব ধরব। বাস, আর একটা কথাও নয়। কত ছোটবেলায় পড়তে শিখেছিলেন ভুলেই গেছেন। মাকে দারুণ

ভয় পেতেন, কিন্তু সেই ভয়ের অঙ্গে অঙ্গে দুর্মর ভালবাসা জড়িয়ে দিল। কখন মা একবার তাকাবেন, চুড়ির আওয়াজ শোনা যাবে, কখন মা রান্নাঘরে ঢুকবেন এবং অপূর্ব সুগন্ধ বেরোবে। কখন মা সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরবেন—

তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে।

এই গানটা হলেই মনে হত, বুকের ভেতর দারুণ শক্তি সাহস এসেছে। কিকি আর কিকি নেই। সে মা-বাবা-কাকা-পিসি-মাসিমাদের গানের আসরে বসে তার বাচ্চা গলা মেলাত। বজ্রানলে, আপন বুকে পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে।

কত সময়ে সেসব আসরেও আলোচনার মধ্যে সবার অলক্ষ্যে বসে থাকতেন। সব বুঝতেন না, মনেও নেই সব। কিন্তু অহিংস পন্থা, আর সুভাষ পন্থার একটা তুলনামূলক আলোচনা প্রায়ই হত। এখন জানেন নরেন্দ্র ও শরদ মেহতা দু'জনেই গুজরাত ছেড়ে এসেছিলেন সুভাষের খোঁজে। সব উলটেপালটে গেল। কলকাতায় তখন সুভাষপন্থীদের সংখ্যা গাঁধীপন্থীদের থেকে অনেক বেশি। ওঁরা ভাবতেন— নিজেদের তৈরি করতে হবে, যে মুহূর্তে সুভাষ উত্তর-পূর্বে ভারত সীমান্তে এসে পৌঁছোবেন অমনি খুলে যাবে দ্বার। সমস্ত মণিপুর, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলা তাঁকে স্বাগত জানাবে। তারপরে যোগ দেবে সমগ্র ভারতবর্ষ। ভেঙ্গে যাবে আজাদ-হিন্দ ফৌজ আর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ইংরেজের সমস্ত প্রতিরোধ। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী সবই প্রস্তুত ছিল। তবু স্বপ্ন পূরণ হল না।

কিন্তু তখন তো ১৯৪৬, ৪৭, ৪৮-এর ৩১ জানুয়ারি সব পেরিয়ে গেছে। তখন এ ধরনের সভা-সমিতির কারণ কী?

—আমরা একটা সমন্বয় করতে চাইছিলাম, কিকি। কেউ কেউ ছিল কট্টর। কিন্তু সবাই মিলে চোখ রাখতাম নতুন নেহরু সরকারের ওপর, কীভাবে সুভাষের বলবীর্য, গাঁধীজির জনশিক্ষা ও নেহরুর আধুনিকতার একটা সুষ্ঠু মিশ্রণ হয় তারই জন্য আলোচনা করতাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একটা সম্পূর্ণ নতুন দল গড়ব, যার মধ্যে এই সমন্বয় থাকবে। কী হতে পারে আমাদের কনস্টিটিউশন, আমাদের ম্যানিফেস্টো...এই নিয়েই আলোচনা হত।

—করতে পেরেছিলে দলটা?

—না কিকি, পারিনি। আলোচনার স্তরেই ছিল। কেননা অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করতেন।

—কে, কে? বাবা!

এইখানে বাবা একেবারে চুপ করে যেতেন। বেশি চাপাচাপি করলে বলতেন—মনে নেই। সে আজ অনেক যুগ হয়ে গেল। তাছাড়া শেষ দিকটাতে তো আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ব্যাবসা শুরু করলে আর থামা যায় না কিকি।

হঠাৎ মনস্থির করে ফেললেন কস্তুরী। কালকেই স্নেহলতা ঘোষের বাড়ি যাবেন। যাবেনই। একটা গাড়ি ভাড়া নেবেন। এই শহর আর শহরতলি তো! যতই বদল হোক সেই কলকাতাই তো! রাস্তা ভরতি পথচলতি মানুষ, দোকানদার, ট্যাক্সি-ড্রাইভার, রিকশাঅলা। খুঁজে বার করতে অসুবিধে হতে পারে, অসম্ভব কিছু নয়। স্থির করে নিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ সরু মোটা গলায় নানান হাসি বাজে। সারারাত ধরে শুধু কথা, কথা আর কথা। কে কী বলছে ধরা যায় না। কিন্তু কেউ কেউ যেন খুব উত্তেজিত। রাগারাগি হচ্ছে নাকি? তোমরা হাসো, কথা বলো, গান করো। কিন্তু রাগারাগি কোরো না। কিকি ভয় পায়। তার বুকের মধ্যে থম ধরে যায়। বাবা মা যে বড্ড কথা কাটাকাটি করেন। বাবা খুব রেগে যান। মা'র মুখ থমথম করে। কী যেন একটা কঠোরভাবে বলেন, তারপর চলে যান। এই কস্তুরী তুই অ্যালিসের গল্প পড়েছিস?

এই কস্তুরী কিতকিত খেলবি? এই কস্তুরী তোর আলুর পুতুলটাকে একটু পাড় না, জামা পরিয়ে দেব। জামা তো পরানোই আছে। নতুন জামা পরাব। দে না রে! ন্‌না, মা রাগ করবেন, ওই পুতুলটার অনেক দাম, বাবা কিনে দিয়েছে। কাউকে দেব না।

কিকি! তুতুল তোমার বন্ধু অত করে খেলতে চাইছে পুতুলটা একটু দিতে পারছ না? ছিঃ! কে বলেছে আমি রাগ করব? যাও, টুলে ওঠো, পাড়ো, ওঠো বলছি। গোঁজ হয়ে বসে রইলে? ওঠো! নইলে...এই শিখেছ? বারবার বলেছি না সবার সঙ্গে সব ভাগ করে নিতে হয়! এত খারাপ হয়ে গেছ তুমি! কস্তুরী ফোঁপাতে ফোঁপাতে জেগে উঠলেন। একদম কিকির মতো। অনেকটা জল খেলেন, চোখ ভেঙে ঘুম আসছে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

খুব নিবিড় গান হচ্ছে— সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম। কী যে চমৎকার সুর এই গান, না স্তোত্রটার! না তো, মন্ত্র! ওঁরা সবাই বলেন এটা মন্ত্র। মন্ত্র কাকে বলে! পূজায় মন্ত্র লাগে, কার পূজা? দুর্গাঠাকুর? কালী? সরস্বতী— এইসব পূজার মন্ত্র সে কিছু কিছু জানে। যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমহ। মা দুর্গাকে এইভাবে ডাকতে হয়। মহালয়াতে সব গায়ক মিলে রেডিয়োতে ডাকেন। গায়ক হলে তবেই ওইভাবে ডাকা যায়, অন্ধকারে রাতে মন্ত্র মর্মে প্রবেশ করে যায়, মা বাবা উঠে বসে শুনছেন, এত সকালে ওঁদের চান হয়ে গেছে, দু'জনে মেঝেতে বসে পিঠ সোজা করে শুনছেন। কালী? কালীপূজার মন্ত্রও সে জানে। অত শক্ত নয়। গানই! —শ্যামা মা কি আমার কালো রে, শ্যামা মা কি আমার কালো/কালো রূপে জগৎ আলো...নির্ভুল বাণীতে সুরেতে মাখামাখি পঙ্‌ক্তিগুলো অবিশ্বাস্যভাবে বাজতে থাকে চেতনায়, একটুও ভুল হয় না। সরস্বতীরটা আর গান নয়, স্তব। শ্বেত পদ্মাসনা দেবী শ্বেত পুষ্পোপশোভিতা...এ তা হলে কোন দেবীর পুজোর মন্ত্র! অন্ধকার মনের গলিতে গলিতে খুঁজে বেড়াতে থাকে। ঝনঝন করে কে গেয়ে ওঠে— ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ওগো মা!

চমকে জেগে উঠলেন কস্তুরী, স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষ যেন স্মৃতি ফিরে পেয়েছে। সুধাকাকা গাইছেন, দরাজ গলায়, ঘরের কড়িবরগা কাঁপিয়ে গাইছেন। বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি/তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!

তাই তো! সুধাকাকার গলা যেত সবার ওপরে। মা বলতেন, সুধা, তুমি যদি অত চড়ায় ধরো, কী করে গাইব?

স্নেহকাকিমা বলছেন, সব গান সবাইকে গাইতেই হবে তার কী মানে আছে কল্যাণী! ও একা গাক। আমরা মনে মনে গাইব। একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে/গাহিবে একজন খুলিয়া গলা/আর একজন গাবে মনে।

ওঁর কথা বলতেন কবিতায়। অনর্গল, প্রত্যেকটি মানুষ। —বাংলা ছাড়া অন্য দেশের মানুষও আছে এখানে ভাবী— শরদকাকা বললেন— হ্যাভ সাম কনসিডারেশন ফর দেম।

মা অবাক চোখে চেয়ে আছেন— শরদভাই, বাংলাকে নিজভূমি মনে করেই এসেছিলেন না! বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, সুভাষচন্দ্রের বাংলা।

শরদকাকা লজ্জিত— না, না, ওটা এমনি ঠাট্টা।

মা গাইতে আরম্ভ করলেন— পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ— কী শরদভাই, এটাও তো আছে। আর তা যদি বলেন, বাংলা সবাইকে বুকে টেনে নিয়েছে, কেউ বাংলার পর নয়। বাংলার কবি, বাংলার দার্শনিক, বাংলার বিপ্লবী ছিলেন সবার।

বাবা বলছেন— বাংলা ভারতবর্ষের সেই ভূমি সেখানে আর্য-অনার্য রক্ত মিশেছে সবচেয়ে বেশি। কে জানে বাংলায় ভারতের ভাগ্য গড়া হবে কিনা।

ছাতে একটা পুতুল কিংবা কাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কিকি আর তোতাপাখির মতো মুখস্থ বলে

যেত যা যা শুনেছে সব। বাংলা ভারতবস্‌সের সেই ভূমি যেখানে আর্য্য, অনার্য্য রক্ত মিশেছে সবচেয়ে বেশি।

দপ করে মনে পড়ে গেল— কাজল মুণ্ডা। মৈত্রী বলছিল— আসলে বাঙালি তো সংকর জাতি দিদি। সাদা, কালো, ব্রাউন কীভাবে কখন মিশেছে কেউ বলতে পারে না। কাজল নিজেকে বলে আদি বাঙালি। ...কখনও জিজ্ঞেস করিনি...ও বলতে চায় না...মিশনে যখন মানুষ হয়েছে তখন নিশ্চয়— অনাথ।

অনাথ! অরফ্যান! তাঁর অনেক কাজ কারবার আছে অনাথ নিয়ে। তারা কত রকমের আলাদা আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছে। কই, তাদের কাউকে তো এভাবে দাঁড়াতে, বসতে, কথা বলতে দ্যাখেননি। বেশি কথা বলে না ছেলেটা, কিন্তু গভীর চিন্তাশক্তির নির্ভুল ছাপ আছে ওর মুখে। আদিবাসীদের নিয়েই ওর রিসার্চ। শুধু একটা পিএইচ. ডি-র জন্য গবেষণা? না কৌতূহল? না ইতিহাসবোধ! নাকি এ ওর ব্যক্তিগত অন্বেষণ! নিজের শেকড় খুঁজছে। পরিষ্কার জানতে চায় সব।

তার মানে কাজল মুণ্ডা ঠিক তাঁর মতো। তিনিও তো তাঁর অতীত জানতে এত দূর এসেছেন। আটচল্লিশ বছর অভিমানে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, তারপর আর পারলেন না, মনে হল নিজের উৎস না জানলে বৃথা জীবন। কোথাও কোনও রহস্য রেখে তিনি মরতে পারবেন না। বাবা পারলেন। কী করে যে রহস্যের ভার একা বইলেন, তিনিই জানেন, কিন্তু কস্তুরী তা পারবেন না।

চানটান করে পাও ভাজি আর চা খাচ্ছেন, ফোনটা এল।

—হ্যালো...

—দিদি আমি কাজল।

—হ্যাঁ বল।

—আজকের কাগজটা দেখেছেন? স্নেহলতা ঘোষ প্রাক্তন বিপ্লবী মারা গেছেন। বয়স হয়েছিল সাতাশি। দিদি আমি এক্ষুনি আসছি।

সঙ্গে সঙ্গে কাজল ফোন অফ করে দিল।

কস্তুরী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

৮) তিনি ও জেঠু

মৈত্রী যখন কাজলকে নিয়ে পৌঁছোল, কস্তুরী সেদিনের বাংলা কাগজ আর একটা পুরনো ডায়েরি হাতে করে বসেছিলেন। চুপচাপ। ওরা একবার সাবধানে চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। কাজল আবেগের সামনে অপ্রতিভ হয়ে থাকে। যদিও তার নিজের আবেগ যথেষ্ট এবং তা সে ভেতরে কোথাও লুকিয়ে রাখে। কিন্তু মৈত্রী সবকিছু সামলাতে পারে। সে এগিয়ে গিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে কস্তুরীর কোলে হাত রাখল।

দিদি যাবেন?

কোথায়?

স্নেহলতা ঘোষের বাড়ি, এঁড়েদ'! আমরা ঠিক নিয়ে যাব।

জানো মৈত্রী, একটা মাত্র বাংলা কাগজের ভেতরের পাতায় নীচের দিকে ছোট্ট করে খবরটা ছেপেছে। নো অবিচুয়ারি, নাথ্‌থিং। স্নেহলতা ঘোষ আরও কয়েকজনের মতো ছিলেন সুভাষপন্থী। উনি গাইতেন 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে— আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো।' শুনেচ গানটা?

হ্যাঁ, শুনেছি দিদি।

—উনি অতি ওল্প বোয়েস থেকে সুভাষচন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবোক দোলে ছিলেন। আমার বাবার ধারণা

ছিল উনি অতি গোপনে শোরৎচন্দ্র বসুর মারফত নেতাজির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' আসবে, তাদের অভ্যর্থনা জানাতে হবে বোলে উনি তোখনকার দিনে সাড়ে তিনশো মেয়ের একটি গুপ্তবাহিনী গোড়েছিলেন। কেউ জানত না। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছাড়া। এমিলি শেঙ্কলের সঙ্গে বিয়ের খবরে যখন সারা বাংলা তোলপাড়, নেতাজিকে ধিক্কার দিচ্ছে, তখন উনি একা বিবৃতি দিয়েছিলেন— সুভাষচন্দ্র যদি কাউকে বিয়ে করে থাকেন, সে মহিলা নিশ্চিত তাঁর উপযুক্ত, তাঁর কর্মসঙ্গী। যদি উনি ব্রহ্মচারী থাকবেন বলে কখনও স্থির করে থাকেন সে তাঁর ইচ্ছা। পোরে যদি তা ভেঙে থাকেন সেও তাঁর ইচ্ছা। তার পেছনে সঙ্গত কারণ থাকবেই। আর বিবাহ বা অবিবাহ কিছুতেই তাঁর মহিমা যাবে না।

দুজনে চুপ করে আছে দেখে উনি বললেন, চিনো না, না। শোরৎচন্দ্র বসু— চিনো না।

—চিনি দিদি, সুভাষচন্দ্রের দাদা।

—মেজোদাদা। বাট হি ওয়জ আ গ্রেট স্টেটসম্যান ইন হিজ ওন রাইট। ওঁর সোম্পর্কে কিচু জানো না তো স্নেহলতা ঘোষকে কী বুঝবে? নেতাজিকে কী বুঝবে? ডু ইউ নো হাউ বেঙ্গল, অ্যান্ড হিজ ওন পার্টি রি-অ্যাক্টেড অ্যাট দা নিউজ অব হিজ ম্যারেজ।

—জানতাম না দিদি, এইমাত্র জানলাম, আপনি বললেন না তোলপাড়, ধিক্কার।

কাজল চুপ করে ওঁর উত্তেজনা দেখছিল। উনি এসেছেন ওঁর মা-ল্যান্ডে। ওঁর কথা অনুযায়ী। কিছু খুঁজছেন, অতীতের কিছু সূত্র। উনি অতীতকে জানতে চান। এই মানুষটি, প্রাক্তন বিপ্লবী স্নেহলতা ঘোষ ওঁর একটা সূত্র ছিলেন। খুব গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ ওঁর এই খোঁজ। তার থেকেও! হ্যাঁ, বোধহয় তার থেকেও। কেননা সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের খোঁজ করছে। সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক তা বলা যায় না। কিন্তু এই প্যাশন তার নেই! নেই। সে ফিল্ডে যায় না এভাবে। এখনও যায়নি। সে প্রভূত রেফারেন্স বই নিয়ে কম্পিউটারে কাজ করে। ইন্টারনেট লাইব্রেরি...। কিন্তু কস্তুরীবেনের তাগিদ এতটাই যে উনি সোজা ফিল্ডে চলে এসেছেন। নিজের পুরনো ডায়েরি থেকে ঠিকানা বার করছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে উনি অনেককে খুঁজেপেতে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। ওঁর রেফারেন্স হলেন জ্যান্ত মানুষেরা। কস্তুরী মেহতা ওঁর অতীতকে এত ভালবাসেন! কী নিদারুণ ভালবাসা! ছুটবেলাই সোব বেলা। কী জানি ম্যাডাম, কত সুন্দর, সুখের ছিল সে ছোটবেলা যে আপনি একজন সফল ব্যাবসাদার, প্রখ্যাত সমাজসেবিকা এভাবে এই বয়সে ছুটে আসতে পেরেছেন!

সে? সে তার অতীতের প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করে। অজেয় বিতৃষ্ণা। কিন্তু সে একজন গবেষক, এই জনজাতিদের অতীত পরিচয় এবং তার ধারাবাহিকতা তাকে বার করতেই হবে, না হলে যেন সে, কাজল মুণ্ডা মিথ্যে হয়ে যায়। ওঁর যদি প্যাশন হয়, তা হলে তারটা হল মিশন।

মহেঞ্জোদড়ো হরপ্পা থেকে সে এই জনজাতিদের খুঁজতে খুঁজতে এসেছে। হিন্দিতে বলে— হড়প্পা। হড় মানে মানুষ, আদিবাসীরা সবাই হড়। শুধু বিরহড়রা নয়। তপা মানে সমাধি, হড়প্পা তা হলে মানুষের সমাধি। কোন বিস্মৃত অতীতে, বন্যা, ভূমিকম্প, কি অন্য দুর্যোগে একটা সভ্যতা মৃতের সমাধিতে পরিণত হয়েছিল। 'মহে'র সঙ্গে 'য়েন' দিলে 'মহেন' হয়, যার মানে প্রস্ফুটিত। 'জ' মানে ফল, মুণ্ডারিতে দারে বা দারু হল বৃক্ষ। এ শব্দ মুণ্ডারি থেকেই তাহলে সংস্কৃতে ঢুকেছে!

মহেঞ্জোদড়ো মানে তা হলে দাঁড়াচ্ছে— প্রস্ফুটিত ফল, বৃক্ষ। দুটি সিল দেখে তাদের পূজা-অর্চনা, সাজপোশাকের কথা এবং সাত পূজারীর কথা যা পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন, তা সাঁওতাল সংস্কৃতির সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়।

কস্তুরী বললেন, না। গিয়ে একটি হোতাশ বিফোল বৃদ্ধ মৃত মুখ দেখে আমারও কুনও লাভ না, ওঁরও না। তুমরা ভেবো না। শান্ত হও। শান্তি করে বস। যোদি ইচ্ছা হয় আমরা তিনজনে প্রে করতে পারি। উনি যেন ওঁর চাওয়ার জিনিস একদিন প্রান। যেন কোনওদিন সোৎ, শ্রেণীহীন, সুশাসিত ভারতবোর্ষ দেখতে পান। এ তো আমাদেরও চাহত, কী না?

হ্যাঁ দিদি, আমি প্রে করব, নিশ্চয়ই।

কাজল কোনও পরজন্মে বিশ্বাস করে না। কিন্তু সে গোঁড়া নয়, চুপ করে বসে থাকলেই তো হয়। এ জন্ম যাঁর শেষ হয়ে গেল তাঁর দেহাবশেষ পুড়ে যাবে, সামান্য কিছু অস্থি আর নাভি যাবে নদীগর্ভে। সেখানকার মাখনের মতো মাটির সঙ্গে ক্রমশ মিশতে থাকবে জলতলের অজানা রসায়নে। আর দেহের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু মিশে যাবে বাতাসের আবহমান দীর্ঘশ্বাসে। কেননা সে তো পৃথিবীরই বাতাস। মহাকাশের নির্লিপ্ততার সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। পৃথিবীর মানুষের প্রাণবায়ু নিয়ে সে যেমন ঋদ্ধ হয়, তেমনই বিষণ্ণও হয়। তবে হ্যাঁ, সৎ, শ্রেণীবৈষম্যহীন, সমৃদ্ধ, সুশাসিত, সুশিক্ষিত এক ভারতের স্বপ্ন সে দ্যাখে। তার জন্য প্রার্থনা করাই যায়। সে দেখতে পাবে না, ভোগ করতে পারবে না, কিন্তু ভবিষ্যতের মানুষ পারবে। কোনও সুদূর অপরিচিত ভবিষ্যৎ যেখানে সবই সম্ভব হতে পারে।

মিনিট দশেক নীরব প্রার্থনার পর কস্তুরীবেন উঠে পড়লেন— রামলাখন, রামলাখন!

—হাঁ মাজি, রামলাখন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। ছুটতে পারে না— একটু নোদল-গোদল করতে করতে আসে। উনি তাকে পাঁচশো টাকা গুনে গুনে দ্যান।

—গোলপার্ক সে ফুল লাও! মালা গুলাব, রজনীগন্ধা, অউর সোব।

মৈত্রী লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল— আমি যাচ্ছি দিদি, ও পারবে না।

তাহলে সোকালে খাওয়া এনো। রাধাবল্লভি আলুদম। অমৃতি, গোজা।

মৈত্রী হাসি-হাসি মুখ করে চলে গেল।

কস্তুরী উঠে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি ফটো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। বাইরে এলেন। বাঁ দিকে সিঁড়ি বরাবর সমান ব্যবদানে হুক আছে। আপন মনেই বললেন— এইখানে যতীন সেনগুপ্তো ছিলেন, এইখানে যতীন দাস, বৈকুণ্ঠ শুকুলের রেয়ার ছবি বাবা-মা রেখেছিলেন। ক্যাপ্টেন সায়গল, ধীলন, ঝাঁসি রানি, লক্সমি স্বামীনাথন। এখন মিসেস সায়গল হয়েছেন। কী স্টুডেন্ট হাঙ্গামা হল সিক্সটিজে-সেভেনটিজে, ভেতরে ঢুকে পড়ে কিছু মানুষ সব ভেঙে দিলে, ওরা ভাল নয়, তার ভাল। বিদ্যাসাগর বাজে, রাসবিহারী বসু বাজে, শ্যামাপ্রসাদ বাজে, আশুতোষ বাজে— তারা, তারা শুধু কাজের।

—ট্র্যাম পুড়াবে না তুমরা?

কাজল হেসে ফেলল। —দিদি আমাকে কি হুলিগান-টাইপ মনে হচ্ছে?

—হুলিগান দোরকার নাই। ক্রাউডে সোব হুলিগান হোয়। য়ু হ্যাভ আ পাওয়ারফুল বডি।

—তো তাই আমি ট্র্যাম-বাস ভাঙব? কাজল ঈষৎ হেসে বলল, আমি তাহলে চললাম।

—এই এই তুমি ঠাট্টা বুঝো না! বোসো, একানে চুপ করে বোসো, যোতখন না ফুল, খাবার সোব আসে।

ঘণ্টাদেড়েক পরে মিঠু ও রামলাখন রাশি রাশি ফুল আর মালা নিয়ে এল। চারজনে মিলে সব ছবিতে মালা পরানো হল। যাঁদের মালা কুলোল না, কস্তুরী বড় বড় প্রাচীন ফুলদানি বার করে ফুল সাজিয়ে তাঁদের ফটোর তলায় রাখলেন। বিবর্ণ পেতলের ফুলদানে জ্বলতে থাকল লাল গোলাপ, হলুদ সূর্যমুখী, সাদা রজনীগন্ধা। মুহূর্তে ঘর ফুলের গন্ধে ভরে গেল। কস্তুরী বললেন, ফুলের মতুন জিনিস নাই। এসো এবার পেটপুজো কোরা চাই।...ও কী! তুমরা ওতো হাসচো কেন!

মিঠু কিছুতেই তার হাসি থামাতে পারে না।

কস্তুরী আস্তে আস্তে বললেন— হ্যাভ য়ু নোন ডেথ?

মিঠু মাথা নাড়ল। তার মুখ থেকে সব হাসি হারিয়ে গেছে।

কে?

আমার দাদু...আমার মা!

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কাজলকে বললেন, তুমি, বীরপুরুষ?

খানিক ভেবে কাজল বলল, ফাদার মরিসন, মেদিনীপুরের ব্যাপটিস্ট মিশন চার্চের। স্কুলটার উনি রেকটার ছিলেন।

—ডেথ যদি খুব বোয়েসে আসে যেমন স্নেহলতা ঘোষ, যেমন আমার বাবা, যেমন আই গেস, তুমার ফাদার মরিসন— ইয়াং ম্যান— তেমন ডেথ ইজ রিলিজ অ্যান্ড ইউনিয়ন উইথ ইনফিনিটি। কিন্তু যোখন ইয়াং পিপল ডাই! মৈত্রী! মা কী ওসুখ করেছিল?

—দিদি আমি এ প্রসঙ্গ চাই না, প্লিজ।

তাদের অপরিচিত স্নেহলতা ঘোষের মৃত্যুতে যে বিষাদ আসব আসব করেও হঠাৎ অসময়ের মেঘের মতো হারিয়ে গিয়েছিল, সে ফিরে এল হাসিখুশি, ছটফটে মিঠুর চোখেমুখে। সেখান থেকে আবহাওয়ায়। এবং কস্তুরীর গাম্ভীর্যে, কাজলের নিশ্চলতায়।

একটা কচুরি ছিঁড়েছিল মিঠু, একটু নাড়াচাড়া করে হঠাৎ বলল, দিদি, আমি আজ চলি।

—মৈত্রী, মৈত্রী প্লিজ বসো। স্যরি, আ'য়্যাম স্যরি মাই ডিয়ার।

—না না, স্যরি কেন...এমনি....মানে আমার কাজ...মিঠু মুহূর্তে লম্বা লম্বা পায়ে চৌকাঠ পেরিয়ে সিঁড়িতে নেমে গেল। কোনও শব্দ হল না। যেন সে চলে যাওয়ার কোনও চিহ্ন রাখতে চায় না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কস্তুরী খুব অভিমানী স্বরে বললেন— কাজল, তুমিও কি খাবে না?

কাজল একঝলক হেসে বলল—এই তো খাচ্ছি। সে কচুরিতে আলুর দম মুড়ে মুখে পুরল—আপনি খান!

—এই যে খাই।

নিঃশব্দে দু'জনে খাচ্ছেন। চারদিক থেকে ফুলের গন্ধ ডুবিয়ে দিয়েছে আর যা যা গন্ধ আছে, হাওয়া আছে সব।

কস্তুরী ছোট্ট গলায় বললেন, মৈত্রীর মা কতদিন চলে গেছেন? ওঁর কী হয়েছিল কাজল!

কাজল একটা অমৃতিতে কামড় বসিয়েছিল। রসটা সামলে নিয়ে বলল, আই হ্যাভ নো আইডিয়া!

—হোয়াট?

—আমি জানি না দিদি। সত্যি, কখনও জিজ্ঞেস করিনি।

—স্ট্রেঞ্জ! তুমরা খুব বন্ধু না?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!

—তোবে?

তবেটা কাজল কী করে বোঝাবে? তার নিজের কোনও পরিবার নেই। সে মনে করতে পারে না তার বাবার মুখ। তার ছ'বছরে ছেড়ে-আসা মায়ের মুখ। ফ্যামিলি আপনজনহীন একটা সম্পূর্ণ একলা অস্তিত্ব সে। তার এসব সম্পর্কে কোনও কৌতূহল নেই। জিজ্ঞেস করার কথা মনেই হয়নি।

দেখেছে মিঠুর বাড়িতে ওর পাঞ্জাবি-পাজামা পরা গম্ভীর বাবা আরামকেদারায় শুয়ে শুয়ে ভগবদগীতা আর রাসেলের অটোবায়োগ্রাফি পড়ছেন। বাড়িতে আর কেউ নেই। মিঠু বলল— কী রে চা না কফি?

যেটা তোর সুবিধে!

কফিটাই করি তা হলে?

সুতরাং মিঠুর মা দৃশ্যমান নয়। নামাল খাটতে গিয়ে ফেরেননি? না কী? মিঠুর টেবিলে সিরিয়াস মুখ এক মহিলার ফোটো। কত বয়স হবে? চল্লিশের কোঠায় হবেন? চশমার কাচের আড়ালে ঝিলিক দিচ্ছে চোখ। ঠোঁটে হাসি নেই, কিন্তু চোখ হাসছে। প্রথম দর্শনেই যা নজর কাড়ে তা হল আলো। পরিপূর্ণ শিক্ষা মানুষের চেহারায় একটা অন্যতর আলো দেয়, সেটা কাজল যত তাড়াতাড়ি পড়তে পারে, আর কেউ পারবে কিনা সন্দেহ। মিতু চা-কফি করতে গেলে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফোটোটা

দেখত। অস্পষ্ট একটা টান। নাঃ, তার চরিত্রে সেন্টিমেন্ট নেই। সে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় রক্ত-সম্পর্কের দিক থেকে। তার ভয় করতে লাগল— এবার কি কস্তুরীবেন তার মা-বাবার কথা জানতে চাইবেন? তখন তো তাকেও বলতেই হবে— এ প্রসঙ্গ থাক দিদি, প্লিজ। মিঠু রূঢ়ভাবে বলেনি, কিন্তু তার গলায় নির্ঘাত রূঢ়তা এসে যাবে।

ফাদার মরিসন তাকে মাঝেমাঝেই জিজ্ঞেস করতেন— সে তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে চায় কিনা। সে কঠিন চোখে তাকিয়ে বলেছে, আমার কেউ নেই, ফাদার।

—আর ইউ শিয়োর?

—হ্যাঁ।

না, কস্তুরী কিচ্ছু জিজ্ঞেস করলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হল তাঁকে যদি কেউ এই ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি কী বলবেন? তাঁকেও হয়তো বলতে হবে— এ প্রসঙ্গ তিনি চান না। এভাবে বলবেন না, শুধু নিপুণভাবে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেবেন। এদের থেকে বয়স বলো, অভিজ্ঞতা বলো সবই তো তাঁর অনেক অনেক বেশি!

তিনি কাজলের অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ করেছিলেন। গ্র্যানাইট না কষ্টিপাথরের ছেলেটি এখন তার ভাস্কর্য-অস্তিত্বে ফিরে গেছে। ও কি দেখেছে ইলোরার কৈলাস মন্দির? ও জানে না ও অন্য কোনও জায়গা নয়, ওই কৈলাস মন্দির টন্দির থেকেই বেরিয়ে এসেছে। সর্বত্র যোদ্ধা দ্বারপাল প্রভৃতির মূর্তিতে এই আদল। হঠাৎ ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে তাঁর মনে হল তিনি যদি যুবতী হতেন নির্ঘাত এর প্রেমে পড়তেন। সেক্ষেত্রে মেহতা আর মুণ্ডা, আমদাবাদ, আর সাঁওতাল পরগনায় কী উত্তাল অশান্তিই না হত! আচ্ছা, ওই চমৎকার বুদ্ধিমতী মেয়েটি, মৈত্রী, যে নাকি তার মায়ের মৃত্যুকে এখনও মেনে নিতে না পারার মতো সহৃদয় আছে, ওই মেয়েটির সঙ্গে কাজলের সম্পর্ক কী? শুধু কি বন্ধুত্ব? না প্রেম? আজকালকার ছেলেমেয়েদের বোঝা যায় না। তাঁর অল্প বয়সে ডাণ্ডিয়া নাচের সময়ে কত ছোটখাটো রোম্যান্স হত, এখন ছেলেমেয়েগুলো যেন ডাণ্ডিয়ার লাঠিটার মতোই শুষ্কং কাষ্ঠং হয়ে গেছে। যদি বা কিছু বোঝে তো সে আদৌ রোম্যান্স নয়, মন নয়।

কাজল বলল, আপনার লিস্টে আর কে কে আছেন, যদি জানতে পারি অঞ্চল হিসেবে, একটা প্ল্যান ছকে ফেলতে পারি দিদি। আপনি অত সহজে পারবেন না। আমাকে বলেই দেখুন না। আমি জাস্ট আপনাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে চলে আসব। আপনার প্রাইভেসি আপনার থাকবে। ইউ নিড নট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট।

কিছু বললেন না উনি। গোজায় প্রচণ্ডভাবে মনোনিবেশ করলেন। ছেলেটার চোখ আছে।

আপনার নোটবুকটা বার করুন। আমাকে বলুন, দেখি একটা শর্ট লিস্ট করতে পারি কিনা।

কাজল অপেক্ষা করছে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে, মেহতা ম্যাডামকে সে হেল্‌প করবেই। কারণ ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে, উনি অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন।

ধীরেসুস্থে খাওয়া শেষ করে পড়ার চশমাটা চোখে লাগলেন কস্তুরী, নোটবইটা বার করলেন। যেন তিনি কাজলের প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালিত হচ্ছেন এই মুহূর্তে।

১। রবিপ্রসাদ বর্মন—৪৫, শিকদারবাগান লেন, কলকাতা-৪।

২। রমা সরকার—৩০/১/এ, গরচা ফার্স্ট লেন।

৩। যতীন মণ্ডল—৫, শিমলা স্ট্রিট।

৪। স্বরূপচাঁদ রোহাদগি—৩৩, নাগের বাজার, দমদম।

৫। সিরাজ আলি—২৫এ, সার্কাস রো।

৬। তৃপ্তিকণা মজুমদার—বেহালা? একটা প্রশ্নচিহ্ন। নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই।

লিস্টটা পড়ে কীরকম বোকার মতো কস্তুরী চোখ তুললেন। যেন উদ্ভ্রান্ত।

দিদি, কতকগুলো নর্থ ক্যালকাটা, বেশ দূর। আপনি যদি এই সার্কাস রো আর গরচা আগে যান।

অবশ্য আপনার প্রেফারেন্সটা কী বলবেন।

কাজল, আমি শিকদারবাগানে রবিজ্যাঠা মানে রবিপ্রসাদ বর্মনের বাড়ি যেতে চাই। আগে।

ঠিক আছে। আমরা তো এখনই যেতে পারি।

৯) ওরা, তিনি, জেঠু

মিঠু খুব ভারী পা ফেলে চলছিল। চারদিকে বাস-ট্যাক্সির আওয়াজ হঠাৎ যেন প্রবল বেড়ে গেছে। চারদিকে চলেছে অপরিচিত এমনকী বৈরী জনস্রোত। যে-কোনও মুহূর্তে এরা সব ভাঙবে চুরবে, গাড়িগুলো তাকে চাপা দেবার জন্যেই আসছে। সে একটা দোকানে ঢুকে বসে পড়ল। ঘামছে। মাথা ঘুরছে। একটা অন্ধ কষ্ট শরীর ছেয়ে ফেলছে ক্রমশ। কেন এরকম হল, হঠাৎ? সে কি প্রতিদিন একটু একটু করে ভুলছে না সেই কষ্ট, অসহ্য যন্ত্রণা দ্যাখার, কিছু করতে না পারবার সেই কষ্ট! একজন সদাব্যস্ত পুরো কর্মশক্তি ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন মানুষকে হঠাৎ অমন ভেঙে যেতে দ্যাখার নিদারুণ কষ্ট! ভুলছে তো! সময়ের নিজস্ব নিয়মেই ভুলছে! কষ্ট চলে যাবে, স্মৃতি থাকবে। স্মৃতি পবিত্র, স্মৃতির মধ্যে এই দহনকারী শোক নেই। থাকবে না। বাবার মধ্যে স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে একটা শূন্যতাবোধ আছে— সে বোঝে। কিন্তু এ-ও বোঝে ওই শূন্যতার সঙ্গে মোকাবিলা বাবাকেই করতে হবে! সে সাহায্য করতে পারবে না। বাবার স্ত্রী আর তার মা তো এক ব্যক্তি হয়েও এক নয়! দু'জনের অভিজ্ঞতাও আলাদা, মোকাবিলা করার রীতিও আলাদা। সে কষ্ট দেখা যায় না, তবু করে নিতে। সেই ভগবানকে অনন্যমনে ডাকত, যাঁর অস্তিত্বে তার বিশ্বাস পোক্ত নয়। বাবাও ডাকতেন, বাবা বিশ্বাসও করতেন, কিন্তু বাবা দেখতে পারতেন না, পালিয়ে যেতেন। ওহ্, দিদি আমাকে কেন ওই ভয়ংকর প্রশ্নটা করলেন?

—মৈত্রী, মৈত্রী, কী হয়েছে? এত ঘামছ কেন? শরীর খারাপ করছে?

ক্যাসেটের দোকানটা, এখন গাঢ় সকাল, খরিদ্দার কম। শিখরিণী। সি.ডি. কিনছে। শিখরিণী উঠে এসেছে।

নিজের ব্যাগ থেকে ঠান্ডা টিস্যু বার করে তার কপালে চেপে ধরতে লাগল শিখরিণী।—আপনাদের কাছে একটু ঠান্ডা জল হবে? একজন কাছাকাছি দোকান থেকে ঠান্ডা পানীয় কিনে আনল। খানিক মুখেচোখে দিয়ে, বাকিটা আস্তে আস্তে খাওয়াচ্ছে তাকে শিখরিণী।

মিঠু এবার হাসে, জোর করে হাসা, তবু তো হাসি। ভাল জিনিসের ভানও ভাল। আর হাসির মতো তাপহর আর কী আছে?

—কী করলি দ্যাখ তো! কপাল-টপাল সব চটচট করছে।

—করুক, একটু তো ঠান্ডা হলে! যা গরম! এখন একটু ভাল বোধ করছ!

—হ্যাঁ, ঠিক আছি। শিখরিণী, আমাকে এক্ষুনি এক জায়গায় যেতে হবে। খুব অভদ্রতা করে চলে এসেছি।

—এক্ষুনি যাবার দরকার কী! পরে গিয়ে ক্ষমা-টমা যা চাওয়ার চেয়ো।

—না, না, আমার ডিউটি আছে।

—ঠিক আছে। মিঠু, ভাগ্যক্রমে আজ আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। চলো তোমায় পৌঁছে দিই।

তিনের একের সামনে এসে মিঠু বলল, শিখরিণী, এখানে একজন অন্যরকম মানুষ আছেন, তুমি যখন এতটাই এসেছ, চলো না আলাপ করিয়ে দিই।

—আলাপটা তত জরুরি নয় মিঠু। তোমার সঙ্গে যাওয়াটা জরুরি, এখনও তুমি ফ্যাকাশে হয়ে রয়েছ।

—এসো তবে, এসো না!

কস্তুরী দরজার দিকে মুখ করে বসে ছিলেন। তাঁর পায়ের কাছে কাজল। শালপাতাগুলো সব জড়ো করছে। দেখলেন মিঠু উঠে আসছে, তার সঙ্গে— বাপ রে এ যে স্বয়ং দেবী অম্বিকা। তাঁকে কি বর দান করতে আসছেন? মা ভৈঃ, পারবে, পাবে! এই জাতীয় কোনও বর?

বিস্ময়ে তিনি প্রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। মিঠু এসে মেঝেতে বসে পড়ল। মেয়েটিকে দেখে কাজল বলে উঠল, শিখরিণী! তুমি এখানে?

শিখরিণী কড়া চোখে কাজলের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি না মৈত্রীর বন্ধু! ওকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছ, ও যদি গাড়ির ধাক্কা খেত, যদি অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে যেত...যদি...

কস্তুরী বললেন— সেকী! মৈত্রী!

হঠাৎ শরীরটা কেমন করে উঠল দিদি, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।

মাইন্ড করব কী! আমি কি পাগল? এসো তো!

তিনি ওর মাথায় হাত দিলেন। —এঃ চটচট করছে যে!

হেসে মিঠু বলল, এই যে আমার বন্ধু শিখরিণী, ও ঠান্ডা জল না পেয়ে, কোল্ড ড্রিঙ্কস ঢেলেছে আমার মাথায়।

—দাঁড়াও। তখনই কলঘর থেকে জল নিয়ে এসে তোয়ালে দিয়ে তার মাথা, কপাল, ঘাড় সব মুছে দিলেন কস্তুরী। মিঠু চেষ্টা করেছিল ওঁকে নিরস্ত করতে। পারেনি।

নিজের কোলের ওপর ওর মাথাটা রেখে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন কস্তুরী। প্রতিরোধহীন, মিঠু বসে থাকল ওইভাবে!

খুব খানিকটা আদর খেয়ে নিলি, হ্যাঁ! —কাজল মুচকি হেসে বলল।

শিখরিণী বলল, হ্যাঁ। তোমার যখন দরকার হবে, তখন তোমাকেও দেখব। কত আদর-যত্ন লাগে।

আমার প্রযোজন খুব অল্প— কাজল, অনমনীয়।

আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে। তুমি বীরপুরুষ, মৈত্রী একটু ভাল বোধ করছ?

মাথা হেলিয়ে জবাব দিল মিঠু। তার মাথা এখনও কস্তুরীর কোলের ওপর। খুব নরম গদির মতো কোলটা। শাড়ি থেকে খুব শুভ্র একটা আভা আর সুগন্ধ তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে। মিঠু চোখ বুজল।

—কাজল তুমি এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। কস্তুরী বললেন—

ও শিখরিণী, মিঠুর বন্ধু। খুব, মানে প্রাণের বন্ধু।

সে তো শুনলুম। আর...

শিখরিণী বলল, আমি আর মৈত্রী এক ইউনিভার্সিটিতে পড়তুম দিদি। ও তুলনামূলক সাহিত্য মানে কমপ্যারেটিভ লিটারেচার, আমি বাংলা। সেই থেকে ভাব। ওর সঙ্গে আসলে আমার মতামতের মিল আছে। এখানে তো আমি মামার বাড়ি থাকি এখন। কলেজে পার্ট-টাইম পড়াই।

—কোন কলেজে?

—মুরলিধর।

—মুরুলিধর? তবে তো তুমি আমারও বন্ধু।

—আমি এমনিই আপনার বন্ধু হতে পারি, মুরলিধরের সঙ্গে সম্পর্ক কী?

—আমি যে ছুটবেলায় মুরুলিধর স্কুলে পড়েচি।

কাজল বলল, উনি কস্তুরীবেন। কস্তুরী মেহতা। গুজরাতে থাকেন। সমাজসেবিকা। এখানেও সমাজসেবা করবার জন্য এসেছেন, দেখছ না মিঠুরূপ সমাজকে উনি কীরকম সেবা করছেন!

এবার মিঠু মাথা তুলে একটা মুঠো তুলে কাজলকে দ্যাখাল। তারপর সোজা হয়ে বসল।

ফিলিং ওয়েল?

শিখরিণী বলল, এরকম রুড বন্ধু হলে ভাল না হয়ে উপায় কী?

কস্তুরী এবার উঠে টেবিলের ওপর থেকে চ্যাঙারি-ভরতি কচুরি, ভাঁড়ে আলুর দম নিয়ে এলেন।

—স্যরি শিখরিণী, তুমাদের এই চ্যাংড়াতেই খেতে হবে।

—তাতে কী হয়েছে?

শিখরিণী তক্ষুনি উঠে শালপাতা আলাদা করে সাজাতে লাগল খাবারগুলো।

—না না। আমরা— আমি আর কাজল খেয়েচি। তুমাদের দু'জন বাকি আচে।

কাজল বলল, আমরা কি আজকে যাচ্ছি, দিদি?

—শিয়োর, আমার না গেলে চলবে না। মৈত্রীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমরা যাব।

—না, না, আমি যাব দিদি। আমি কখনও স্বাধীনতা-সংগ্রামী দেখিনি।

—ওর্কম ততো নন ইনি, তবে হ্যাঁ জেল খেটেচেন, কুইট ইন্ডিয়া করেচেন।

—আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? —শিখরিণী জিজ্ঞেস করল।

কাজল বলল, শিকদারবাগান, রবিপ্রসাদ বর্মনের বাড়ি!

—শিকদারবাগান? আমিই তো আপনাদের পৌঁছে দিতে পারি। আমার মামার বাড়ি হাতিবাগান গ্রে-স্ট্রিট। ওদিকেই তো যাচ্ছি। কস্তুরীদি, আপনার যদি অসুবিধে না থাকে আমিও স্বাধীনতা-সংগ্রামী দেখে আসতে পারি।

কাজল বলল— আমরা তো রেন্টাল গাড়ির ব্যবস্থা করছিলাম দিদি।

—আমার গাড়িতে যেতে কোনও আপত্তি আছে? আমরা বরং গাড়িতে যাই। তুমি পেছন পেছন মেট্রোয় এসো, এখান থেকে অটোয় কালীঘাট যাবে। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ে নামবে, তারপর..কলুটোলা পার হয়ে, কলেজ স্ট্রিট থেকে ট্র্যাম নেবে। চমৎকার পৌঁছে যাবে।

কস্তুরী হাসতে লাগলেন— যের্কম একটা জার্নি বললে শিখরিণী, তাতে ও বেচারার আর এবার ফ্রিডম ফাইটার দেখা হল না।

—আমি গাড়িটা পুরো এবেলার জন্য পেয়েছি দিদি। কোনও ভাবনা নেই। আসলে আমি কলেজ আসি তো, পার্ট-টাইম, এগারোটায় আজ আমার ক্লাস শেষ।

সামনে কাজল, পেছনে তিনজন— পুরনো অ্যামবাসাডর, ভালই ধরে গেল।

—তুষার পার্ট-টাইম কেন শিখরিণী! সময় পাচ্ছে না?

—আরে আর বলবেন না। এখন তো কলেজের চাকরির জন্য নেট স্লেট পরীক্ষা চালু করেছে কলেজে সার্ভিস কমিশন, স্কুলের চাকরির জন্য আছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। কখনও পাশ করবেন, কখনও করবেন না। কেন, এসব প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। তার ওপরে আবার সব জায়গায় এস.সি-এস.টি সংরক্ষণ। হাজারে হাজারে পোস্ট খালি পড়ে রয়েছে। এস.সি.-এস.টি পাওয়া যাচ্ছে না। পোস্টগুলোকে ফাঁকা কর! তা নয়, পড়েই রয়েছে। ভাল না! সরকারকে মাইনে দিতে হচ্ছে না। স্যরি কাজল, হঠাৎ থেমে গেল শিখরিণী, সে মিঠুর কাছ থেকে একটা চিমটি খেয়েছে।

আমাকেই শুধু দুঃখিত হতে হবে কেন— তোমরা দুঃখিত নয়, যে স্বাধীনতার ছাপ্পান্ন বছর পরেও উপযুক্ত এস.সি, এস.টি পাওয়া যায় না! কাজলের গলায় ঝাঁঝ নেই, খুব নির্লিপ্ত প্রশ্ন।

একটু পরে সে বলল, সংরক্ষণের একটা নীতি থাকা উচিত। স্পষ্ট নীতি। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং এসব পড়ার ক্ষেত্রে। সংরক্ষণ খুব বিপজ্জনক, গ্রেস দিয়ে তো ডাক্তারি পাশ করানো যায় না। কিন্তু সকলের জন্য যে মিনিমাম শিক্ষা এখনও চালু হল না তার কী কৈফিয়ত?

শিখরিণী বলল, অফিসের নিচুতলার চাকরিতে সংরক্ষণ থাক। কিন্তু স্কুল-কলেজে পড়াতে হলে উপযুক্ত প্রতিযোগিতা করে আসাই উচিত, তুমি যাই বলো কাজল।

—তার পরেও আমার প্রশ্নটা একই থাকে— স্বাধীনতার এত বছর পরেও সকলের জন্য মিনিমাম শিক্ষা কেন চালু হল না।

কস্তুরী বললেন— মিনিমাম শিক্ষা বলতে তুমরা কী বুঝো জানি না। আমি মনে করি— কারু জন্যেই মিনিমাম শিক্ষা চালু হোয়নি। কী শিখে? ডিসিপ্লিন? নিজেরটা নিজে করে নেওয়া! অন্যকে সাহায্য করা! হিউম্যান ভ্যালুজ কিছু শিখছে, কেউ? যে শিখে সে আপনি শিখে। কাউকে শিখানো হয় না, ব্যবস্থা নাই। সহবত নাই, কনসিডারেশন নাই, রেসপেক্ট নাই, সংযম নাই, খালি লোভ, খালি জিনিস, জিনিসের পিছন ছুটতে শিখাচ্ছে। আর হোতাশায়, ডেসপ্যারেশন, ডাকাত চোর আত্মহত্যা।

রবিপ্রসাদ বর্মনের বাড়ির সামনে এসে শিখরিণী বলল, এ বাড়ি আমি চিনি। বর্মন বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ছোটবেলায় খুব আলাপ ছিল। ওরই কি দাদু? রবিপ্রসাদ বর্মন? নামটা তো আমি শুনিনি। তবে একজন বুড়ো মানুষ এখানে থাকেন আমি জানি। অঙ্গনাদের দাদু, কি কী, আমি জানি না।

বাড়িটার সামনে এসে কাজল বলল, দিদি আপনি যান। আমরা ঘণ্টা খানেক পরে এসে ফ্রিডম-ফাইটার দেখব।

—না না তুমরা এসো না!

ওরা কিছুতেই এল না।

কস্তুরী সত্যি বলতে কি স্বস্তিই পেলেন। ছেলেমেয়েগুলির বিবেচনার প্রশংসা করলেন মনে মনে। এখন তিনি একা এবং অদূরে তাঁর অতীত। মোকাবিলা করতে যাচ্ছেন। মাঝখানে সময়ের সমুদ্র। তিনি জানেন না সেই সমুদ্রে ভাসতে জাহাজ লাগবে না নৌকো কি ভেলাই যথেষ্ট।

বাড়িটা বেশ পুরনো হলেও শক্তপোক্ত। লাল ইটের বাড়ি। মার্কামারা ব্রিটিশ সময়ের গাঁথিনি। সবুজ জানলা। সবুজ দরজা। একটা ছোট প্যাসেজ দিয়ে উঠোনে পড়লেন কস্তুরী। বড় বড় দরজা খোলাই ছিল।

উলটো দিকের ঘর থেকে এক বৃদ্ধ মানুষ বেরিয়ে এলেন। সাদা ফতুয়া, ধুতি, ভুরুগুলো পাকা। চোখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। একহারা মানুষটি, বেশ মজবুত।

গলাটা একটু তুলে কস্তুরী বললেন, এখানে কি রবিপ্রসাদ বর্মন থাকছেন?

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, আমিই। আপনাকে তো ঠিক...

আমি কস্তুরী মেহতা, কিকি, জ্যাঠামশায়। —উনি নিচু হয়ে প্রণাম করলেন। এত সহজে অতীতের মুখোমুখি হওয়া যাবে তিনি ভাবতে পারেননি। অজিতমোহন অন্য লোকে গিয়ে বসে আছেন। নিবেদিতা মাসির মধ্যে অতীতকে পাওয়া গেল, তবু আসল কেন্দ্রীয় প্রশ্নের উত্তর মিলল না। স্নেহকাকিমা এতদিন, সাতাশি বছর বেঁচে রইলেন। কিকির জন্য আর দু' এক মাস থাকতে পারলেন না। সব সময়েই তাই মনে হয় ফসকে গেল। বুঝি ফসকে গেল।

কিকি। কিকি। তুমি এখানে, এতদিন পরে...ভদ্রলোক বিস্ময়ে আনন্দে দিশাহারা হয়ে গেলেন। একটু সামলে বললেন, যাক, একেবারে চলে যাবার আগে এমন কারও সঙ্গে দেখা হল যার সঙ্গে কথা বলা যায়। এসো মা। এসো এসো।

এটাই ওঁর ঘর। বেশ বড়। একদিকে শোবার খাট। আর একদিকে টেবিল চেয়ার। মাঝখানে দুটো মুখোমুখি সোফা। মনে হয় এগুলো যেন নতুন যোগ হয়েছে। কোণে টেলিফোন, তার পাশে আলমারি।

বুঝলে কিকি— এদের সঙ্গে কথা বলা যায় না। নোবডি নোজ এনিথিং। কেউ কথা বলতে জানে না। আক্ষেপে ফেটে পড়লেন রবি জ্যাঠামশায়। বুদ্ধদেব সেই চিরন্তন আক্ষেপ ভুরু কুঁচকে বললেন— কী বিষয়ে কথা বলবে! জীবন সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে? জগৎ সম্পর্কে? এসব নিয়ে কখনও কিছু ভেবেছে? জিজ্ঞেস করলে বলে— দাদামশায়, বই লিখুন না, এখন আর মুখে মুখে ফিলসফি কেউ মানে চর্চা করে না। আরে বাবা, ফিলসফি কে চেয়েছে তোদের থেকে? ডাক্তারি

ইঞ্জিনিয়ারিং দুটোতেই চান্স পাচ্ছিস। ইঞ্জিনিয়ার হবার ইচ্ছে নেই। তবু তাইতেই ঢুকছে। ডাক্তারিতে এসট্যাবলিশ হতে সময় লাগে। তা ছাড়া ঝামেলা আছে। ডাক্তার পিটোচ্ছে, প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করে দিচ্ছে। আরে বাবা, অন্যায় করছিস তাই পিটছে। ভাল করে দরদ দিয়ে চিকিৎসা কর, মাথায় করে রেখে দেবে, তা না, দ্যাখাতে যাও চেম্বারে বসেই আছি, বসেই আছি। আরে আমার পরে এসে তিনটে টাই-পরা যুবক ছেলে ঢুকে গেল, হাতে ওই ব্রিফকেস। একেক জন কুড়ি মিনিট আধঘণ্টা নিচ্ছে। এ কী অন্যাই! কমপ্লেন করি, বলে কি ওরা নাকি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। বোঝো! রুগি বসে আছে ঘর ভরতি। আমার মতো বুড়ো মানুষ, তা ছাড়া হয়তো কারও জ্বর, মাথা ঘুরছে, কারও বা পেটের যনতন্না। সব বসানো রইল, দেড় ঘণ্টা ধরে দেনা-পাওনার মিটিং হচ্ছে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের সঙ্গে। পিটুনি এরা খাবে না তো কে খাবে!

হঠাৎ ওঁর চৈতন্য হয়— এ হে হে, দ্যাখো তো তোমাকে বসিয়ে রেখেছি। বক বক বক। আমার ছেলেরা বলে— বাবা, এবার আপনাকে দেখলে লোকে পালাবে। —খুব হাসলেন উনি। —তা কিকি, কত বড়টা হয়ে গেছ মা। দেখতে দেখতে কত দিন কেটে গেল। সেই ছোট্ট কিকি, কোলে কুকুর নিয়ে ঘুরত, কাঁখে পুতুল। —নাঃ আমি ভাবতে পারছি না। চেনা যায় না। তবে নরেন্দ্রর মুখের আদলটা— হ্যাঁ এইবারে ধরতে পেরেছি। রংটা, চুলের ধরন, জ্বলজ্বলে চোখ দু'টি। সে কেমন আছে?

তিনি শান্তি পেয়েছেন জেঠু। আমার মা কোথায়, আপনার কাছে কোনও খবর আছে? —কস্তুরী আর ভণিতা করতে পারছেন না।

একদম চুপ করে গেলেন বৃদ্ধ মানুষটি। অনেকক্ষণ পরে বললেন, কেন জানতে চাও কিকি? জানলে যদি কষ্ট পাও!

—কষ্ট পাব না। কষ্ট সহ্য করা আমার অভ্যাস আচে। আপনি বলুন।

—সে যে আমাকে সত্যবদ্ধ করে গেছে মা! তা ছাড়া দরকারই বা কী! সে তো তোমার সত্যি মা নয়?

—নয়?

—না, সৎমা যাকে বলে। তুমি নরেন্দ্র ভাইয়ের প্রথম পক্ষের মেয়ে। তোমার বাবার খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। উনি তো আন্দোলন করতে কলকাতায় চলে এলেন। এখানে নরেন্দ্র কল্যাণীকে বিয়ে করলেন, মাঝেমাঝে দেশে যেতেন। কী জানো, সে আগুনের মেয়ে, যখন জানল আগের বিয়ের কথা নরেন্দ্র গোপন করেছেন, ক্ষমা করেনি। তারপর তোমার মা আমদাবাদে তোমার জন্মের সময়েই মারা গেলেন। কল্যাণীর জেদেই তুমি এখানে এলে মা। ছোট্ট একটুকুনি পুতুলের মতো মেয়ে। তখনও কথা বলতে শেখোনি।

—তা হলে যাঁকে সৎ মা বলছেন, তিনিই তো আমার মা। বাবার যে আর একটা বিয়ে ছিল বাবা আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যে তাঁর মেয়ে একথা বাবা কখনও বলেননি। আপনারা ঠিক জানেন না। আমি এই মায়েরই মেয়ে।

—বেশ মা। তাই। তুমি যা ভেবে শান্তি পাও। হয়তো তুমি শক পাবে বলেই নরেন্দ্র বলেনি। আর...কিকি...হয়তো...হয়তো তুমি নিজের মেয়ে নয় বলেই সে তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে পেরেছিল। ওভাবে কেউ যায়?... কোথায়? আমি ঠিকঠাক জানি না। তবে নানান জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে সে আর সুধা এখন মেদনিপুরের কোন গ্রামে সেটল করেছে শুনি।

মাঝিহিড়া?

না না, ওরকম অদ্ভুত নাম তো নয়। ট্রাইবাল বেল্টেই বোধহয়। কিকি, ছেড়ে দাও মা। যে গেছে তাকে যেতে দেওয়াই ভাল। তার বয়সও কি কম হল? পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর! হ্যাঁ...তা হবে। তার বেশিও হতে পারে...। আমারই তো হল নব্বুই কমপ্লিট।

কাজল, মিঠু আর শিখরিণী যখন এক ঘণ্টা পরে ঘুরে এল, বাড়ির ভেতর থেকে চিড়ে-বাদামভাজা চা সন্দেশ এসে গেল। রবিপ্রসাদ বর্মনের পুত্রবধূ নিয়ে এলেন সব, তাঁর এক পুত্রবধূর সঙ্গে। খাওয়াদাওয়া হতে লাগল। কস্তুরী এদের সঙ্গে রবিপ্রসাদ ও তাঁর বাড়ির লোকেদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। রসিকতা, পুরনো দিনের বহু কথা গল্প করতে লাগলেন রবিপ্রসাদ। তাঁকে চট করে থামানো যায় না। রাসবিহারী বসু পুলিশ এড়াতে কীভাবে জমাদার সেজে মলভাণ্ড মাথায় নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সুভাষচন্দ্র কীভাবে আফগানের ছদ্মবেশ ধরেছিলেন, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে কীভাবে সুভাষের ছায়া পড়েছিল, বন্দেমাতরম জাতীয় সংগীত করা নিয়ে কত পলিটিকস হয়েছিল, জিন্না সাহেব কংগ্রেসের নেতাদের কাছ থেকে, বিশেষত মহাত্মাজির কাছে গুরুত্ব না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মুসলিম লিগে যোগ দিলেন, তারপরে পাকিস্তানের জিগির তুললেন, তাঁর সাহেবি পোশাক-আশাককে মহাত্মাজি কীভাবে উপহাস করতেন। একবার গোসলখানা থেকে জিন্না সাহেবের জন্য কুরসি আনতে বলেছিলেন তাঁর আশ্রমে চেয়ারের ব্যবহার ছিল না বলে, সুইজারল্যান্ডে কমলা নেহরুর মৃত্যুশয্যায় সুভাষ কীভাবে তাঁর ও জেনিভাতে বিঠলভাই প্যাটেলের সেবা করেছিলেন। বিঠলভাইয়ের নাম আজ কেউ জানে না, তিনি বল্লভভাইয়ের বড় ভাই ছিলেন, প্রকৃতই উদার স্বভাবের, কীভাবে সুভাষের বিদেশি প্রচারের জন্য উইল করা তাঁর একলাখ টাকা থেকে ট্রাস্টিরা পলিটিকস করে সুভাষকে বঞ্চিত করেছিল, সরোজিনী নাইডু কীরকম চোখা চোখা কথা বলতেন, ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরও কীভাবে সেই মন্ত্রীসভা আন্দামানের বন্দিদের মুক্ত করেনি, কেন ফজলুল হক লিগে যোগ দিলেন— এরকম অজস্র কথা দাঁড়ি-কমাহীন বলে যেতে লাগলেন। তাঁর পুত্রবধূ ও তাঁর পুত্রবধূ মুখ টিপে মুচকি হেসে চলে গেলেন, ওঁর এক নাতি এসে বলল, ওঃ দাদু, তুমি একটু থামবে, এইসব ইয়াং ছেলেমেয়েরা কী জানে! উনি বললেন, জানা উচিত, নাতি বললেন এইটুকু সময়ের মধ্যে এত আয়ত্ত করা যায় নাকি! ওরা বলল, না না। আমাদের ভাল লাগছে। কাজল বলল, আমি ইতিহাসের ছাত্র। আমার খুব ইনটারেস্টিং লাগছে, তাতে রবিপ্রসাদ উৎসাহিত হয়ে আরও বলতে লাগলেন, আরও আরও, কিন্তু মিঠু, কাজল এমনকি শিখরিণী পর্যন্ত অনুভব করল— পরিবেশের মধ্যে কোথাও অন্ধকার, কোথাও বেসুর এবং স্বভাব-স্নেহশীলা চটপটে ম্যাডাম চুপচাপ। গম্ভীর, অন্যমনা, নেই তাঁর প্রতিদিনকার কৌতুক, উৎসাহ, কস্তুরীবেন যেন এক ঘণ্টার মধ্যে আমূল পালটে গেছেন।

শিখরিণী নিজের বাড়ি অর্থাৎ মামার বাড়ি চলে গেল। যাবার সময়ে বলল, দিদি, যদি আমায় কোনও দরকার লাগে ডাকবেন প্লিজ। আমার আজকের দিনটা মনে থাকবে। মানিকতলায় নেমে গেল কাজল, নামবার সময়ে মিঠুর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল। তারপর ট্যাক্সি ছুটল পুরনো মারহাট্টা ডিচের ইতিহাসের ওপর দিয়ে মৌলালিতে বাঁক নিয়ে, আমির আলি অ্যাভেনিউ দিয়ে গোলপার্কের দিকে।

মিঠু খুব সন্তর্পণে বলল, দিদি আপনি কি খুব ক্লান্ত? আমি আপনার সঙ্গে থাকি একটু।

উনি তার হাতটা জড়িয়ে ধরে বললেন, সের্কম কিচু না, তুমি আসচ না। স্ট্রেট বাড়ি যাবে।

তিনের একে নামবার সময়ে উনি পুরো ট্যাক্সি ভাড়াটা দিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ মিঠুর কপালে একটু হালকা চুমু খেলেন। বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে, মিঠু দেখল ওঁর হাত, ওঁর ঠোঁট সব ঠান্ডা।

৯) তিনি ও পিসি

রাতটা আজকে যেন একটু বেশি আঁধার। ভেতরের অন্ধকার বাইরের অন্ধকার। কোনটা বেশি তিনি বুঝতে পারছেন না। কেমন একটা স্নায়বিক বিস্রস্ততা তাঁর শরীরে। গরম হওয়া সত্ত্বেও কেমন

একটা তিরতির কাঁপুনি। কস্তুরী চান সেরে অন্ধকার বারান্দায় বসে রইলেন অনেকক্ষণ। বেশ গুমোট। তবে মাঝেমাঝে গুমোট ভেঙে হাওয়া দিচ্ছে। গন্ধরাজের দিন বোধহয় শেষ হয়ে গেল। আর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো গন্ধ পাওয়া গেলেও তিনি সইতে পারতেন না। প্রথম সন্তান-সম্ভাবনার সময়ে যেমন হয়েছিল! অনেকক্ষণ তাঁর মাথাটা অসাড় হয়ে রইল। কীরকম একটা ক্রোধ হতে লাগল প্রয়াত নরেন্দ্র মেহতার ওপর। সত্য, সত্য থেকে কাউকে কখনও দূরে রাখতে নেই। কেন? কেন বাবা এমন করলেন? কত দুঃখ পেতেন তিনি? মায়ের চলে যাওয়ায় ছোট্ট মেয়েটির যে মৃত্যুশোক হয়েছিল তার বেশি কি? ওই যে মেয়েটি মিঠু, ভারী চমৎকার মেয়ে, ওর মায়ের মৃত্যু কবে ঘটেছে জানেন না, কিন্তু এখনও সে কথা তুললে ওর বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়, ওর চেয়ে বেশি কি? কী এসে যায় সৎমায়, তিনি যদি সত্যি মায়ের মতো হন! কিচ্ছু না। তিনি তো এখন এই উত্তর-পঞ্চাশেও সেই হাতের স্পর্শ, বুকের গন্ধ, চুড়ির টুংটাং, সব টের পান। দুঁদে ব্যাবসাদার, হাজার কাজের কাজি তিনি যে এখনও ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে তাঁকে দেখেই কেঁদে ওঠেন! নাঃ। তিনি পালিকা-মা হলেও কিছু এসে যায় না। আসলে ভয়ংকর ওই মন্তব্য— নিজের মেয়ে নয় বলেই বোধহয় চলে যেতে পারল! ওভাবে কেউ যায়! তা হলে তাঁর কাছে না যতখানি, মায়ের কাছে তিনি কি কোনওদিনই ততখানি ছিলেন না? মাতৃহীন একটি শিশুকে মানুষ করছিলেন এই মাত্র! এবার ক্রোধ হতে লাগল রবিপ্রসাদ বর্মন নামে ওই বৃদ্ধের ওপর। ঠিক আছে বলুন না সত্য কথা, মন্তব্য করার দরকার কী! ওঁর কি একবারও মনে হল না মা-মেয়ে সম্পর্কের এমন বিচার শুনে ছোট্ট কিকির কেমন লাগতে পারে। নাঃ, তিনি তো আর সেই ছোট্ট কিকি নন। এক প্রৌঢ়া। অভিজ্ঞতা যাঁর মুখে নিজের ছাপ মেরে দিয়েছে। বৃদ্ধ বোধহয় মনে করলেন এ তো প্রায় বুড়ো হয়ে এল। এর আবার মা-সংক্রান্ত ফিলিং কী। উনি বোঝেননি। সম্ভবত কেউ বোঝে না একটা বড় বয়স্ক মানুষের মধ্যেও একটা শিশু বেঁচে থাকে, যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে পারে, যে...নিবেদিতামাসি তাঁকে পেয়ে কাঁদেননি! এই রবিজেঠু...রবিপ্রসাদও যে তাঁকে পেয়ে দেড় ঘণ্টা-দু'ঘণ্টা পুরনো দিনের কথা বকবককবকবক করে গেলেন সে-ও তো শিশুমিই। শিশু যেমন আপন মনে তার নিজের জগতের কথা নিজেই বলে।

আরও রাত্তিরে রামলাখন রুটি আর আলুভর্তা নিয়ে এল।

কস্তুরী বললেন, দুধ মিলেগা রামলাখন?

হাঁ জি।

তো দুধ লাও থোড়া।

কঠিন কিছু আজ তাঁর গলা দিয়ে নামবে না। বেচারি রামলাখন। ওকে তাঁর আগেই বলা উচিত ছিল। এত রাত্তিরে কোথা থেকে দুধ জোগাড় করবে? তাঁর বাড়িতে তো আর ফ্রিজ নেই! হয়তো নিজের জন্য রেখেছিল। সেটাই তাঁকে দেবে।

মাঝরাত্তিরে কস্তুরীর কোলাপসিবলে দমাদ্দম আওয়াজ। প্রচণ্ড শব্দে একটা গ্রেনেড ফাটল। ধোঁয়াধোঁয়া। একটু পরিষ্কার হতে তিনি দেখলেন তাঁর মা, হালকা নীল রঙের কালো দাঁতপাড় শাড়ি পরা ছিন্নভিন্ন হয়ে লুটিয়ে রয়েছেন। হাতে জাতীয় পতাকা, এক ভাঁজ হয়ে শুয়ে আছে। অশোকচক্রের আধখানা দেখা যাচ্ছে। কোলাপসিবল্ খুলে তিনি উন্মত্ত জনতার মধ্যে, বোমা বন্দুকের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছেন, কারা পিছন থেকে তাঁকে বাধা দিচ্ছে। এখনও আশা আছে। অ্যাম্বুলেন্স, অ্যাম্বুলেন্স, কোথায় জনতা? নির্জন রাস্তা দিয়ে তিনি তাঁর মায়ের দেহ নিয়ে কোন অদৃশ্য অনস্তিত্ব হাসপাতালের দিকে চলেছেন। অনেক দূর থেকে আবছা মুখ কারা যেন তাঁকে অনুসরণ করছে। জাতীয় পতাকাটা মা'র হাত থেকে খসে পড়ে গেল। কিকি আর কেয়ার করে না। মাতৃমুখ ছাড়া ওই পতাকা একটা কাপড়ের টুকরোর বেশি কী!

শেষ রাত্তিরের হালকা ছায়া। কস্তুরী ঘর্মাক্ত জেগে উঠে সদ্য দ্যাখা স্বপ্নের প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। সন্দেহ নেই, ১৩০২ ফেব্রুয়ারির শাহপুরের সেই বিভীষিকা তাঁকে ছাড়ছে

না। কিন্তু মা কেন ছিন্নভিন্ন। এ কি সেই দেশ যাকে তাঁদের বাবার জেনারেশনের লোকেরা মা বলত, মা বললেই কি সবচেয়ে বেশি ভক্তি, ভালবাসা, দায়বদ্ধতা আসত! তা হলে এই মা কেন তাঁর মায়ের বেশে! একটা প্রসঙ্গের সঙ্গে আর একটা প্রসঙ্গ কি জুড়ে গেছে? তবে কি তাঁর অসাবধানতা, তাঁর অবিচারই ছিন্নভিন্ন করছে মাকে?

সকালবেলা উঠে চানটান সেরে, নিয়মিত ব্যায়াম ও প্রাণায়ামের পর তিনি মুখে একটি হরিতকী আমলকির বড়ি ফেললেন। দুটো মর্তমান কলা ছাড়িয়ে খেয়ে ফেললেন এক বাটি মুড়ি গরম চায়ের সঙ্গে। এবং সংকল্প করলেন— না, এখানেই ছেদ টানা নয়। তাঁকে যেতে হবে সিরাজচাচুর কাছে। সম্ভব হলে রমা পিসিমার কাছেও। ক্রস-চেক করো কস্তুরী। সবসময়ে ক্রস-চেক করবে। দলিলপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে। অডিট দেখবে। স্টেটমেন্ট অব অ্যাকাউন্টস ঠিকঠাক ফাইলে আছে তো? সেক্রেটারির ওপর পুরো নির্ভর কোরো না। যতই যোগ্য হোক, মানুষই তো। ভুলভ্রান্তি হতে পারে। ক্রস-চেক করো, ভেরিফাই করো কস্তুরী।

তিনি ঘড়ি দেখলেন, রামলাখনকে বললেন— ঠিক দশটার সময়ে তিনি বেরোবেন। ভাড়ার গাড়ি চাই। সুখের বিষয়, কোনওটাই খুব দূরে নয়।

সার্কাস রোয়ে গিয়ে দেখলেন একটা জি-প্লাস ফোর নতুন বাড়ি। তার লেটার বক্সে কোনও আলির নাম দেখলেন না। তিনি এ-ও জানেন না সিরাজচাচুর এটা নিজের বাড়ি ছিল কিনা। কো-অপারেটিভের অফিস রয়েছে না? ভেতরে এক ভদ্রলোক ঢুকছেন তালা খুলে। কস্তুরী গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন— এক্সকিউজ মি। ভদ্রলোক ফিরে তাকালেন— আই ওয়ান্টেড সাম ইনফর্মেশন।

—ইয়েস! ভদ্রলোক শুনতে প্রস্তুত।

—আই ওয়জ লুকিং ফর আর সিরাজ আলি, হু ইউজড টু লিভ হিয়ার।

—ওয়াজ হি বাই এনি চান্স দা ওনার অব দা ল্যান্ড?

—আই হ্যাভ নো আইডিয়া।

—স্যরি ম্যাডাম, অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো, দিস প্রপার্টি ওয়জ বট বাই আস ফ্রম মহম্মদ আখতার। হি হ্যাজ এ ফ্ল্যাট হিয়ার, ইউ ক্যান আসক্ হিম!

মহম্মদ আখতার! আলিরা তো নিজেদের আলিই বলবে! মহম্মদ আখতার! ঠিক আছে, তিনি দেখবেন। সবচেয়ে ওপরের তলার দক্ষিণ কোণের ফ্ল্যাটটা। বেল টিপলেন। দরজা খুললেন এক ভদ্রমহিলা। সালোয়ার-কামিজ পরা। বয়স্ক।

কাকে চান?

সিরাজ আলি বলে কুনও বৃদ্ধ মানুষ একানে থাকেন?

সিরাজ আলি? এ তো আমাদের বাড়ি। প্রোমোটার বাড়ি ভেঙে করেছে।

আগে, কে থাকত একানে?

ভাড়া ছিল অনেকগুলো।

তাঁদের মধ্যে কেউ? সিরাজ আলি?

আমি মোটামুটি এঁদের সবাইকে চিনতাম। সিরাজ আলি বলে কেউ... ওহো রিয়াজদের কেউ হতে পারে। তবে কোনও বুড়ো মানুষ আমি দেখিনি।

তার মানে সিরাজচাচু এই সিরাজদের কেউ হলেও এই ভদ্রমহিলা তাঁর বিয়ের পর তাঁকে দ্যাখেননি, মানে তিনি নিশ্চয়ই গত হয়েছিলেন।

মানুষ কেন এত তাড়াতাড়ি মারা যায়! আরও আয়ু দরকার। চল্লিশ বছর থেকে মানুষ সত্যি সত্যি সচেতনভাবে বাঁচতে আরম্ভ করে। করে না? সিঁড়ি দিয়ে তিনি মন্থর পদক্ষেপে নেমে যাচ্ছিলেন, পিছনে দরজা আধখোলা, ভদ্রমহিলা কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছেন। সাদা শাড়ি পরা এই মহিলাটি খুব হতাশ হয়েছেন, তিনি বুঝতে পারছেন।

দুরুদুরু বুকে গর্চা ফার্স্ট লেনে ঢুকলেন কস্তুরী। বেশ খানিকটা ঘুরেছেন। দোনামোনা করেছেন। সইবে তো? আরও আঘাত? তিনি কি এখানেই থামবেন? একটা ছন্ন গল্প নিয়ে ফিরে যাবেন? না, তা হয় না। সত্যের মুখোমুখি হবার সাহস তোমার আছে কস্তুরী, না হলে...পুরনো ধরনের বাড়ি তো রয়েছে, সভয়ে দেখতে লাগলেন কোনও বহুতল আছে কিনা।

এই বাড়ি ম্যাডাম— ড্রাইভার বলল। বেল বাজালেন। দরজা খুলল।

রমা সরকার এই বাড়িতে থাকেন?

মেয়েটি বোধহয় কাজের লোক। দরজা ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলল, ওপরে যান। সিঁড়ির মাঝ থেকেই চটি দেখতে পেলেন কস্তুরী। চটি, নানা রকমের। ছেঁড়া, ধুলোমাখা। ওপরে দালান। একটি ঘরের পরদা হাওয়ায় দুলছে। ভেতর থেকে সুর করে নামতা পড়ার আওয়াজ আসছে শিশুকণ্ঠে।

দালানে দাঁড়িয়ে কস্তুরী একটু চেঁচিয়ে ডাকলেন, রমাপিসিমা! রমাপিসিমা!

পাশের ঘরের পরদা সরিয়ে দু'-তিনটি বালক-বালিকা এসে দাঁড়াল।— দিদু চান করতে গেছে, তুমি বসো।

—কোথায় বসব বাবা!

—এইখানে।

কস্তুরী ঘরের একমাত্র চেয়ারটিতে বসে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে লাগলেন। নামতার পরে ওরা এখন স্লেট-পেনসিল বার করে লিখছে। নেহাতই বাচ্চা, কিন্তু মনে হল বেশ অখণ্ড মনোযোগে লিখছে। প্রথমে স্কেল দিয়ে স্লেটের ওপর পরপর দাগ কেটে নিল। একটি বাচ্চা তাঁকে জিজ্ঞেস করল— ধান্য বানান দন্ত্য নয়ে নয়ে হবে না য-ফলা হবে। তিনি উত্তর দিলেন। তারপর কৌতূহল হল, ছেলেটির কাছ থেকে স্লেট টেনে নিয়ে দেখলেন লিখেছে: ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা/তাহার মাঝে আছে সে দেশ সকল দেশের সেরা।/সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

বাচ্চাটি বলল, এই গানটা আমরা রোজ গাই। অপু গাইতে পারে না, ওর গলায় সুর নেই। আমার পাশে দাঁড়িয়ে গায় তো! আমারও সুর ভুল হয়ে যায়।

তখন বেশ একটা গোলমাল পড়ে গেল। একজন বলল, তুইও গাইতে পারিস না, লিখতেও পারিস না, খালি নালিশ করতে পারিস।

একজন বলল, তবুর গলায় সুর নেই তো কী হবে! ভগবান দেননি। কিন্তু ও তো সবার আগে যোগবিয়োগ কষে ফেলে।

কী হচ্ছে তোমাদের? এত গোলমাল কেন? এক বৃদ্ধা এসে দাঁড়িয়েছেন। লাল পাড় শাড়ি পরা, মাথার চুলগুলি কাঁচাপাকা। মুখটি প্রশান্ত।

কস্তুরী উঠে দাঁড়ালেন। প্রণাম করলেন। তারপর উঠে বললেন, চিনো? দেখো তো!

হাঁ করে চেয়ে রইলেন রমাপিসিমা, তারপর বললেন, কিকি, না?

তিনি কস্তুরীকে একেবার জড়িয়ে ধরলেন। বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে বললেন— তোমরা বসে বসে লেখা করো। আমি আসছি।

পাশের ঘরটি রমাপিসিমার শোবারঘর।

—বসো কিকি, পা মুড়ে বিছানায় ভাল করে বসো।

—তুমি কেমন আছো পিসিমা।

—খুব ভাল। এই তো এদের নিয়ে চমৎকার কেটে যাচ্ছে। তুমি?

—অতটা ভাল বলতে পারছি না।

কেন? নরেন্দ্রদাদা ভাল আছেন তো।

বাবা এই কো মাস আগে, ফেব্রুয়ারিতে চলে গেছেন।

রমাপিসিমা হাত জোড় করে নমস্কার করলেন, বললেন, দুঃখ কোরো না কিকি। ওঁর যা বয়স হয়েছিল তাতে... একসময়ে প্রিয়জনদের ছেড়ে দিতে হয়।

—পিসিমা, আমার মা-ও কি...

—না না, কিছু হলে শুনতুম...

—কোথা থেকে শুনতে পিসিমা...

বৃদ্ধা ওঁর মুখের দিকে তাকালেন, বললেন, কল্যাণী তো অনেক দিন চলে গেছে, এত দিন তো কেউ খোঁজ করেনি কিকি? আজ এই অবেলায় কেন?

আমি এখন আর ছুট্ট কিকি নেই। আর আমি যে-কেউ নই, তাঁর মেয়ে। আমার কি জানবার অধিকার নেই?

—তোমার বাবা তোমাকে কিচ্ছু বলেননি?

—না।

—তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে?

—মায়ের প্রসোঙ্গ উঠলেই উনি চুপ করে যেতেন, মনে হত খুব কোষ্ট পাচ্ছেন তাই... আমার তো আর কেউ ছিল না।

—কেন তোমার ঠাকুরদা-ঠাকুমা?

—ওঁরা তো কোবেই চলে গেলেন।

—যাই হোক, ওই কদিনের জন্যও ছেলেকে নাতনিকে কাছে তো পেয়েছিলেন!

—তা তো পান। কিন্তু আমার মা কোথায় গেলেন, কেন গেলেন, যদি গেলেন তো আমায় নিয়ে গেলেন না কেনো? বোলো গেলেন না কেনো?

—এতদিন পরে এদের কথা তোমার মনে জাগছে কেন? কেউ কি তোমাকে বুঝিয়ে বলেননি?—দাঁড়াও তোমার জন্যে চা করে আনি।

—আমার চা হয়েচে। পিসিমা।

—আমার জন্যে। একটু বারবার চা না খেলে আমার চলে না কিকি।

কস্তুরীর মনে হল, চায়ের নাম করে রমাপিসিমা একটু সময় নিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে উনি দু'কাপ চা আর গাঁঠিয়া নিয়ে ঢুকলেন, বললেন, আমাদের সেই বাঙালি খুকি তো আর নেই দেখছি। একেবারে গুজরাতি কিকি-ই হয়ে গেছে।

—বাঙালি, গুজরাতি, মারাঠি, পঞ্জাবিতে কী তফাত পিসিমা, সোবাই তো একই ভারতের!

—তুমি কি সত্যিই এখনও তাই মনে করো কিকি? তুমি কি এখনও আমাদের অতীতের মতো স্বপ্নে বাস করো? তাহার মাঝে আছে সে দেশ সকল দেশের সেরা! —রমাপিসিমা হাসলেন।

—একটু বুঝিয়ে বলুন কী বলছেন!

—তুমি অনুভব করো না এখন ভারত এক নয়, অনেক। গুজরাতি ভারত, মারাঠি ভারত, পঞ্জাবি, হরিয়ানি, বিহারি, অসমিয়া,... অজস্র ভারত। এক একটা রাজ্যেও আবার বহু ভারত, যাদব ভারত, জাঠ ভারত, ব্রাহ্মণ ভারত, আদিবাসী ভারত, জোতদার ভারত, মজুর ভারত। কোটিপতি ভারত, দারিদ্র্যসীমার নীচের ভারত, মুসলিম ভারত, হিন্দু ভারত এবং সবকিছু ছাপিয়ে ক্রমশ মাথা তুলছে মার্কিন ভারত। চারিদিকে মৃত্যু দেখতে পাই, দেহের মৃত্যু, মনের মৃত্যু, বুদ্ধি, যুক্তি, সততা, ভালবাসা, দেশপ্রেম...সবকিছুর মৃত্যু। তুমি পাও না?...পাবে না, কেননা কিকি তোমরা আমাদের বংশধর, কিন্তু সেই কথা আছে না? —এক পুরুষ খাটে, পরের পুরুষ গড়ে, তার পরের পুরুষ ভেগ করে, আর তার পরের জন নষ্ট করে সব। সমস্ত। তোমরা... তোমাদের গড়ার জেনারেশন ছিল, পারোনি, তারপরে ভোগীরা এসে গেল, আর তারপরে সব ছন্ন করা নষ্ট করার জেনারেশন উঠছে।

—এতটা হোতাশার কারণ নেই পিসিমা। বড় জটিল দেশ, জটিল। ফুল অফ ভ্যারাইটিজ। ভুল

হোবে, শুধরাবে, ধীরে ধীরে হোবে।

—কীসের জটিল? ধর্মবিশ্বাস তো ব্যক্তির ঘরের ব্যাপার, তাকে লাউডস্পিকার দিয়ে সর্বজনীন করার কী দরকার? কীসের জটিল? —খাদ্য, পোশাক, রুচি, ভাষা আলাদা তো থাক না যে যার সম্মান নিয়ে আলাদা, একজন কেন বহুজনকে গ্রাস করে? এক ভাষা কেন অন্য সব ভাষাকে গ্রাস করে দাবিয়ে পুষ্ট হচ্ছে। যারা বনেজঙ্গলে বাস করে ফুড গ্যাদারার আর হান্টার থেকে ধীরে ধীরে কৃষিকে তাদের জীবিকায় স্থান দিয়েছিল, তাদের রুজি-রোজগারের উপায়গুলোও কেন তোমাদের স্বাধীন ভারত কেড়ে নিচ্ছে। আর তাদের নামে যেখানে আলাদা রাজ্য হচ্ছে, সেখানে আরণ্যক মানুষ এক নষ্ট সংস্কৃতির ছোঁয়াচে কোটি কোটি টাকার গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছে কেন? পাবলিক মানি লুঠ হয়ে যাচ্ছে, কেউ যদি তা থামাতে যাচ্ছে তো খুন হয়ে যাচ্ছে। যেখানে যে সৎ মানুষ আছে হয় তার বদনাম, নয় সাইড লাইনড আর নয় সরাসরি খুন— সে ডাক্তার হোক, আই এ এস অফিসার হোক, দলনেতা হোক, সাধারণ গৃহস্থ হোক, গরিব কৃষক মজুর হোক, কেরানি হোক। একটা স্বাধীন দেশের তরুণদের কেন ডাকাত হতে হয়! দাঙ্গাবাজ গুন্ডা না হয়ে বাঁচবার অন্য উপায় থাকে না কেন? ...শোনো শোনো...বড় বড় অর্থনীতিবিদ আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের থিয়োরি আউড়িয়ো না। দে হ্যাড নো ইম্যাজিনেশন। ধর্মনিরপেক্ষ? ওরা জানে ধর্মের মানে? ধর্ম হল মানুষের মানবধর্ম, তার বেসিক মনুষ্যত্ব। মুণ্ডারিতে 'ধিরি' মানে পাহাড় বা পাথর। 'ধিরি' থেকে স্যানসক্রিটাইজড হয়ে হল 'ধৃ'। তার থেকে 'ধর্ম', যা পর্বতের মতো অচল অটল মূল প্রপার্টি মনুষ্যত্বের। সেই ধর্মই যদি না থাকল তা হলে কী রইল? হ্যাঁ, ধর্মমতনিরপেক্ষ বলা যেতে পারে বটে। শব্দগুলো সাবধানে চয়ন করা চাই।

দু'জনেই চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর রমা ধীর গলায় বললেন, কল্যাণী চলে গেছে সেইখানে যেখানে তাকে প্রয়োজন। কেউ কেউ আসে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে, তারা দেশকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়। টাকা-পয়সা-বিলাস-ব্যসন— এমনকী নিশ্চিন্ত ঘরসংসারের বাঁধনও তাদের বেঁধে রাখতে পারে না। তোমার হয়তো দুর্ভাগ্যই। কিন্তু এ দেশের সৌভাগ্য কল্যাণী মেহতা সেইরকমের একজন মা। আগে মানুষ, পরে মা। বলছি না সবাইকেই তার মতো হতে হবে। কিন্তু দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি সবাইকার মিনিমাম কমিটমেন্ট থাকলে একজনকে এত আত্মত্যাগ করতে হয় না। কিকি ফিরে যাও, তার খোঁজ কোরো না। এতদিন যখন কেটে গেছে, বাকি দিনগুলোও যাবে। এখন এই বয়সে তোমাকে দেখলে ও বড় ব্যক্তিগত কষ্ট পাবে, তুমিই তো ওর একমাত্র বাঁধন। ছিঁড়তে যে কত দুঃখ পেয়েছে আমি জানি!

—রমাপিসিমা, মায়ের এখন বোধহয় আটাত্তর বছর পার হয়ে গেছে। দেশকে যা দেবার এতদিনে দেওয়া হয়ে গেছে। এখনও যা পারেননি তা আর কাউকে পারতে হবে। আমার মাকে আমি অন্তত দেখতে চাই। মিলতে চাই মা'র সঙ্গে। কুনোও ওজর আপত্তি আমি শুনবো না। সোবই যদি নোষ্ট মিথ্যা তো বাচ্চাগুলোকে স্বোপ্নো দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা শিখাচ্ছেন কেন? ইলিউশন নিয়ে বড় হলে, ওদের কী দোশা হবে? স্বোপ্নো মানেই তো স্বোপ্নোভাঙ্গো। —কস্তুরীর গলায় এখন জেদ, তিনি তর্কের জন্য প্রস্তুত।

রমাপিসিমার মুখটা হঠাৎ হাসিতে ভরে গেল। উনি বললেন, বুঝতে পারলে না? আমাদের মতো আর একটা জেনারেশন তৈরি করতে চাইছি। যারা ভালবাসবে। স্বপ্নটা বড় নয়, ভালবাসাটা বড়। কিকি, ওরা স্ট্রিট চিলড্রেন, অনেকে আছে যাদের মায়েরা এবাড়ি ওবাড়ি কাজ করে। এদের জন্য ভাববার কেউ নেই। নাম-কা-ওয়াস্তে কর্পোরেশন স্কুল হয়। চক-ডাস্টার, বসবার জায়গার অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। স্নেহের অভাবে উপস্থিতি থাকে না। ওদের ভালবাসা দিচ্ছি। আর শেখাচ্ছি, শুধু অক্ষর পরিচয় নয়। —ভাল-মন্দের তফাত, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার যেন ওরা করতে পারে। দ্যাখো কিকি, সবাই ভাবে লেখাপড়া শিখলেই একটা চাকরি করব আর একটা টিভি কিনব। গ্রামে-গঞ্জে

কিষানের ছেলে লেখাপড়া শিখে শহরে পিয়োন হয়। মাঠ পড়ে থাকে, মাটি কাঁদে। আমার লক্ষ্য পিয়োন বেয়ারা গড়া নয়। সেই মানুষ গড়া যে এদেশকে নিজের বলে জানবে, মায়ের মতো ভালবাসবে। আর স্বপ্নভঙ্গ বলে ওদের কিছু নেই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। বাজে ধূপ, শ্মশান-সমাধির ফুল এইসব ওদের হাতে ধরিয়ে দেয় ওদের মালিকেরা, করুণ বাচ্চা মুখগুলো—তা-ও বিজ্ঞাপন। আর বাড়িতে সাত বাড়ি কাজ করা মা গালি দেবে, মারবে, এতে আর আশ্চর্য কী। এরাই আমার কুমোরের মাটি, ভদ্দরলোকেরা নয়। স্বপ্ন কিছু নেই। স্বপ্ন মানে ইলিউশন নয় কিকি। স্বপ্ন মানে আশা। দুর্জয় আশা, আর দুর্মর ভালবাসা। যে কাজ ওরা করুক, আশা করি পথশিশু হয়ে ওদের আর থাকতে হবে না। আমার এখানকার অনেকেই অনেক কিছু করছে। এরাও করবে। আমি যত দূর পারি ওদের সাহায্য করব। এইভাবেই নিজের ক্ষুদ্র চেষ্টায় যত দূর পারি কল্যাণীর কাজ করছি। দেশের, ঈশ্বরের কাজ করছি। আমাদের মধ্যে যাঁরা ধনী তাঁরা তো মুখ ফেরালেন। একটু পরে উনি বললেন, কিকি, ভেবো না আমি কস্তুরীবেনের কাজকর্মের কোনও খবর রাখি না। যে যেখানে আছে, নিজের সাধ্যমতো কাজ করে গেলে একদিন সমস্ত ভুলের সংশোধন হবে। হয়তো হাজার বছর পরে। হয়তো বা তারও পর। কোনও সময়সীমা নেই। আমাদের জীবনকালটাই আমাদের সময়সীমা। কিকি, তোমার মা অনেকদিন মেদিনীপুরে ছিলেন। এই মুহূর্তে কোথায় আমি বলতে পারছি না। পুরুলিয়ায় খুঁজে দেখতে পারো। গোড়ায় ঝাড়গ্রামে যাও।

১০) তিন থেকে চার

যাদবপুর কফিহাউজে ঢুকে মিঠু আর কাজল দেখল রৌনকদের পুরো দলটা মজুত। —হাই। হাই!

—এত হাই তোলবার কী আছে! আমরা তো হাতের কাছেই রয়েছি। —মিঠু বলল।

স্বরূপ বলল, কী জানি বাবা, তোরা চাকরি পাওয়ার দলে। একটু high না করলে কি পদধূলি দিবি? যেরকম ডুব মেরে আছিস!

বেশ অনেকদিন এই গ্রুপটার সঙ্গে দেখা হয়নি তাদের। কাজল অবশ্য নিয়মিত আড্ডার প্রয়োজনই অনুভব করে না। কিন্তু মিঠু করে, ভিন্ন ভিন্ন জলে সাঁতার কাটতে তার মজা লাগে। জীবনটা একঘেঁয়ে হয়ে যায় না হলে। আর সত্যিই তো, তার কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, নির্বাচনের সুযোগও বিশেষ নেই জীবনে। তাই যা ঘটছে, যা হাতের কাছে এসে যাচ্ছে, তাই নিয়েই সে যথাসাধ্য খুশি।

রৌনক এদের মধ্যে ধনীর সন্তান। একমাত্র তো বটেই। ওর আর্টস নিয়ে পাশ করাটা ওর বাড়ির একটা প্রচণ্ড দুর্ঘটনা। বাবা, মা দু'জনেই ব্যারিস্টার। ওঁরা এখন চেষ্টা করছেন রৌনকের যেন অন্তত একটা লিগ্যাল কেরিয়ার হয়। ও আইন পড়ছে। কিন্তু ওর মন শুধু টাকা ওড়ানোয়। বলল, যায্যাঃ, চাকরি করিস তো করিস— আয় এক প্লেট করে চিকেন বিরিয়ানি খাইয়ে দিচ্ছি। কোথায় যেতে চাস চল। এখানে যে কেন একটা বারও রাখে না বুঝি না। ঠান্ডা বিয়ার হলে জমত ভাল।

স্বরূপ কমার্সের ছেলে— ব্যাঙ্কের পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, হয়ে যাবে একটা। কিন্তু রণজয় বা রণি তার ইংরেজির মাস্টার্স নিয়ে কিছুতেই স্লেটটা ধরতে পারছে না। সকলে বলছে স্কুল-সার্ভিসেও পরীক্ষা দে। রণির তাতে প্রচণ্ড অমত। সে এখন টিউশনি করে ভাল উপার্জন করে। ভাবছে অগত্যা ডাবলু বি সি এস-এ বসবে।

রিমি রীতা দুই বোন, খুবই ভাল ছিল সব দিক দিয়ে। এখন প্রচণ্ড ড্রাগ-অ্যাডিক্ট। কোথাও দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারে না। এখন মিঠুদের দেখেই লাফ দিয়ে উঠে চলে গেল। বিশেষ করে কাজলের সঙ্গ ওরা সহ্য করতে পারে না। কে জানে কেন!

—কী রে কাজলদা, একটু হাল-হদিশ দে!

—কম্পিউটার শিখছ তো!

—ও তো ঘরের খেয়ে, গুচ্ছের খানেক ঢেলে শিখছিই।

—তা হলে কিছু একটা হয়ে যাবে।

অমিতাভ ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। কোনও অজ্ঞাত কারণে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ে ও চান্‌স্ পায়নি। চুপ করে বসে ছিল।

রৌনক বলল, আসলে অমিতাভ বুঝলি তুই বাংলা-মিডিয়াম স্টাফ। অত ভাল ছেলে, কেরিয়ারটাই নষ্ট করলি, গড়বেতা না ফেতা ইস্কুলে। ফটাফট চলাফেরা করতে পারলে, বলতে পারলে— তোর চাকরি খায় কে?

অমিতাভ উঠে চলে গেল।

এই সময়ে শিখরিণী হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল।

তোদের কতগুলো বুথ থেকে কনট্যাক্ট করার চেষ্টা করছি। মিঠু শোন!

মিঠু আর কাজল দু'জনেই উঠে গেল। রৌনক চোখ নাচিয়ে মন্তব্য করল।—কারেন্ট খেয়ে গেল।

—কী ব্যাপার?

—কস্তুরীদির কাছে গিয়েছিলাম ক্লাসের পর। গিয়ে দেখি খুব জ্বর। তার ওপরে ধরেছেন কোথায় গ্রামের দিকে যাবেন। কালই। আমি ঘাবড়ে গেছি। আমাকে ওঁর ওখান থেকে কিছুতেই ফোন করতে দিলেন না। আমার তো মোবাইল নেই। আশা করিনি তোমাদের এখানে পাব।

ডাক্তার এসে বললেন ভাইর‍্যাল না-ও হতে পারে। তাঁর নির্দেশে শিখরিণী মাথা ধুয়ে দিল দিদির। মিঠু প্যারাসিটামল দিল।— দিদি কী খাবেন? সুপ করে দিই?

আরে ডোন্ট বদার। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে নেই।

তা বললে তো চলবে না। স্ট্রেংথ ঠিক রাখতে হবে— কাজল বলল।

সে ঘর থেকে বিনা বাক্যব্যয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। তার বেশ একটু পরে প্লেটের ওপর গরম কাচের গ্লাস নিয়ে ঢুকল। ধোঁয়া উঠছে সুপ থেকে। অর্থাৎ সে দোকানে গেছে, প্যাকেটের সুপ কিনে এনে তৈরি করেছে।

এক্ষুনি খান দিদি, একটু একটু করে, মিঠু, ওই ছোট কাপটা ধর তো, আমি ঢেলে ঢেলে দিচ্ছি। সে না-ছোড়। এবং গলায় বেশ কর্তৃত্বের সুর।

একটু পরেই রামলাখন গরম দুধ নিয়ে এল।

—তুমরা আমাকে কী ভাবচো বলো তো?— কস্তুরী প্রতিবাদ করে উঠলেন। তাঁর জ্বর কমতে শুরু করেছে। এখন গলায় একটু জোর এসেছে। ঠাট্টা করবার মেজাজও। বলে উঠলেন, কাজল য়ু নো হোয়াট, য়ু উইল মেক আ ফাইন হাজব্যান্ড! হেসে বললেন, সো কেয়ারিং অ্যান্ড কমপিটেন্ট।

—আমরা, আমরা বুঝি কিছু নই? মিঠু হইহই করে ওঠে। তার সঙ্গে শিখরিণী যোগ দেয়। কস্তুরী একটা হাত তার মাথার ওপর রাখেন, আর একটা হাত দিয়ে শিখরিণীকে খোঁজেন।

—তুমাদের তো প্রশ্ন উটচেই না। উইমেন আর ইনস্টিংটিভলি কেয়ারিং, এফিশিয়েন্ট, বাট মেন আর জেনার‍্যালি সাচ বাঙ্গলার্স। কাজল ইজ অ্যান এক্সেপশন।

কাজলের কোনও ভাবান্তর নেই। সে বলল, মিঠু, তোরা একটু পরে বাড়ি চলে যা। আমি আজ রাতটা এখানে থাকব।

কস্তুরী যথাসম্ভব প্রতিবাদ করলেন। কোনও ফল হল না। মিঠুও থাকতে চাইছিল, কিন্তু কাজল বা কস্তুরী কেউই তার কথায় কান দিলেন না।

ওরা দু'জন নামছিল। ক'দিন পরই নাকি কস্তুরী ঝাড়গ্রাম না পুরুলিয়ার দিকে যাবেন। মিঠু বলল, আমি যাবই। যেতেই হবে।

শিখরিণী হঠাৎ বলল, আমিও।

কাজল তো নিশ্চয়ই যাবে— মিঠু বলল, তুমি আবার কেন? দু'জনই যথেষ্ট না?

—এই স্টেপটাতে একটু বসবে মিঠু— শিখরিণী বলল— তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে। ভীষণ জরুরি।

একতলা-দোতলার মাঝের বড় ধাপটাতে বসে পড়ল শিখরিণী।

—কী এত জরুরি কথা! তোর বাড়িতে ভাববে না! কত দূর যেতে হবে এখন। যতই গাড়ি থাক।

না না ঠিক চলে যাব। ভাবলে আর কী করতে পারি, চাকরি করি, সঙ্গে গাড়ি আছে, ড্রাইভার আছে, এর পরও ভাবলে কিছু করার নেই।

—বল কী বলবি!

শিখরিণী নিজের চুড়িগুলো একটু নাড়াচাড়া করল। তারপর বলল, তুমি জানো, কাজল ইংল্যান্ডে একটা অফার পাচ্ছে।

—তাই? কাজল আগেও পেয়েছে অনেকবার, নেয়নি। ওর পেপারগুলো ওরা খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করে।

—এটা আলাদা। অ্যামাউন্ট খুব ভাল। সব রকমের সুবিধে। ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ। আমার ইচ্ছে এটা ও নিক।

—তোর ইচ্ছে? কাজল নিজের ছাড়া আর কারও ইচ্ছেকে পাত্তা দিলে তো! তা ছাড়া তুই কোত্থেকে জানলি? হঠাৎ ওর উপদেষ্টাই বা হতে যাচ্ছিস কেন?

—জেনেছি। কাজলের থেকেই। কথায় কথায় বলছিল। মিঠু, তুমিও ওকে একটু জোর করো। আর একটা কথা। ওর নাম তো কাজল সিং মুণ্ডা। মুণ্ডাটা ওকে বাদ দিতে বলো প্লিজ। জাস্ট কাজল সিং। সেটা সিংহর শর্ট ফর্ম বলে মনে হবে।

কেন?— মিঠু কখনও এমন আশ্চর্য হয়নি! তুই জানিস না পদবিটা ও কখনও গোপন করে না! ওটা ওর একটা স্যাটিসফ্যাকশন, গর্ব, জয়নিশান বলতে পারিস।

জানি, সবটাই জানি মিঠু। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেক সময়ে অনেক ছেলেমানুষি অহংকার জেদ থেকে যায়, যেটা বর্তমান ও ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকারক।

—তুই তা হলে ওকে ছেলেমানুষ মনে করিস!

—ও তো ছেলেমানুষই, ইম্যাচিয়োর।

—আর তুই?

—আমি ট্রাডিশন্যাল সমাজকে দেখতে পাই মিঠু, তাকে বদলাবার কথা যে ভাবি না, তা নয়। কিন্তু জোর করে বদলাতে গেলে উলটো ফল হয়। আমি সইয়ে সইয়ে, ভুলিয়েভালিয়ে বদলাবার পক্ষপাতী।

—তো তোর সেই যুক্তি তো কাজলের ক্ষেত্রেও খাটে! জোরজার করতে গেলে ওর জেদ চেপে যাবে।

—আমি তো জোর করতে বলছি না। সইয়ে সইয়েই করবে। কেননা ও তোমাকে বন্ধু বলে ভীষণ বিশ্বাস করে, মানে।

—আমি? তাই আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব?

—প্লিজ মিঠু বোঝবার চেষ্টা করো, বিশ্বাস করে বলেই তোমার যুক্তিটা নিয়ে ও ভাববে। ভাবতে ভাবতে একসময়ে মেনে নেবে।

কিন্তু আমার তো কোনও যুক্তি নেই। ও যদি কাজল মুণ্ডা নাম নিয়ে মাথা উঁচু করে থেকে থাকতে পারে, যদি ও মিস্টার মুণ্ডা নামে ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ স্কলারশিপ নিয়ে যায়, তাতে ক্ষতিটা কী। তোর কি পালচৌধুরী পদবি নিয়ে, আমার কি ব্যানার্জি পদবি নিয়ে কোনও আপত্তি আছে? থাকলেই অ্যাফিড্যাভিট করব!

একটু বিষণ্ণ হেসে শিখরিণী বলল, আমাদের অ্যাফিড্যাভিট করার দরকার নেই। এমনিতেই আলাদা পদবি হয়ে যাব।

মিঠু বলল, সেটাও কিন্তু আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ। আমাদের ডিগ্রি টিগ্রি সবই বাবার পদবিতে। কর্মস্থলে পালটাবার অসুবিধে আছে। অনেকেই আজকাল পদবি পালটাচ্ছে না, যাই হোক শিখরিণী, কেন যে এই উদ্ভট প্রসঙ্গ তুললি। আর কেন যে এমন একটা কাজ যাতে আমার সায় নেই— আমাকে দিয়ে তা করাতে চাইছিস, আমি বুঝলাম না! আজ চলি, বাবা ভাববে, কাল কাজ আছে, এখানেও আসতে হবে।

—তোমাকে আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

—ধ্যাত, তোকে উলটো দিকে যেতে হবে না? আমার কোনও দরকার নেই। আমি অটো নিয়ে চলে যাচ্ছি।

মিঠু উঠে পড়ল।

সত্যি কথা বলতে কী তার ভীষণ বিরক্ত লাগছিল। সমস্ত জিনিসটাই অর্থহীন। হঠাৎ কাজলের গোপন অভিভাবক হয়ে ওঠার অধিকার ওকে কে দিল? করবি করবি, নিজে কর। এখন ভেবে দেখলে শিখরিণীর সত্যিই একটু সর্দারি দিদিগিরির ভাব আছে। ও অনেক জানে, বোঝে, শুধু নিজেরটাই নয় অন্যেরটাও। মিঠু যখন এন. জি. ও-তে কাজ নিল, তখন কলেজ সার্ভিসে পরীক্ষা দেওয়াতেই যে মোক্ষ সেটা ও মিঠুকে বোঝাতে অনেক যুক্তি খরচ করেছিল। হঠাৎ এখন কাজলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে। ভাবুক। তাকে দিয়ে কেন?

বাড়ি ঢুকে আগেই সে চান করতে ঢোকে।

বাবা চেঁচিয়ে বলল, এ সময়ে চান কোরো না। একটু হাত পা ধুয়ে নাও ব্যস।

সে চেঁচিয়ে বলে ঠিক আছে। —কিন্তু গায়ে জল ঢালে ঠিকই। আফটার অল বাবা তো তার গোপন অভিভাবক নয়, আসল এবং খোলাখুলি। বাবার কথা সবসময়ে অমান্য করা তার একটা বিশ্রী অভ্যাস হয়ে গেছে। বাবা তো থাকত জামনগরে, বছরে খুব জোর দু'বার দেখা হত। মা-ই ছিল তার অভিভাবক। একটু বড় হওয়ার পরেই সে-ও মা'র। বাবাকে সে চিরদিনই অতিথি হিসেবে দেখেছে। মানছে যে— এই বিশ্বাসটুকু বেচারি বাবার থাক।

গায়ে জল ঢালতে ঢালতে হঠাৎ স্ক্রিনে ভেসে ওঠে শিখরিণীর সুন্দর মুখটা। কী এক দুশ্চিন্তায় মুখটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। রোদ ঠিকই। কিন্তু বিকেলবেলার রোদ। এবং তখনই লাফিয়ে ওঠে কারণটা। মনের ওপর দিয়ে ভেসে যায় কস্তুরীদির মন্তব্য— 'য়ু নো হোঅট কাজল, য়ু উইল মেক আ ফাইন হাজব্যান্ড, সো কেয়ারিং অ্যান্ড কমপিটেন্ট।' শিখরিণী কাজলকে ভালবাসে, ওকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মুণ্ডা পদবিটা বোধহয় ওর পরিবারের সম্মতি পাবে না। তাই...। মুণ্ডাকে ও সিং, সিংহের এক সংস্করণ বলে চালাবে। অদূর ভবিষ্যতে কাজল দাঁড়াবে কাজল সিংহ আ ফাইন হাজব্যান্ড, কেয়ারিং অ্যান্ড কমপিটেন্ট, অব শিখরিণী সিংহ। বিয়ে করেই চলে যাবে লন্ডন। থেকে যাবে ওখানে। তারপর কে আর কার অতীত ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে!

এটা অনুমান। কিন্তু সঠিক অনুমান। অনুমানটা তাকে অনেকক্ষণ অসাড় করে রেখে দিল। মগে জল নিয়ে মিনিটের পর মিনিট বসেই আছে, বসেই আছে।

বাবা ডাকল আবার। বেচারি!

—যাই বাবা— সে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে বেরোয়।

—সেই চান করলি?

—না তো!

বাবাই টেবিল সাজিয়ে ফেলেছে। ইলিশমাছ আজকে। খুব উৎসাহের সঙ্গে টেবিল সাজিয়েছে বাবা। খাবারগুলোও গরম করেছে। একটা কাঁটা ফুটে গেল তার মাড়িতে। আবার ওঠো, সাইলিসিয়া খাও। ধুত্, বাবার খাওয়াটাই মাটি করে দিল সে আজ। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তরই জিজ্ঞেস করছে— গেছে! গেছে!

—আস্তে আস্তে যাবে বাবা।

—হ্যাঁ, বুঝতেই পারবি না কখন গলে গেছে।

তাই-ই তো বলছি। তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন!

সে দেখল বাবা তার ঘরের দেওয়ালে মায়ের ছবিটার দিকে করুণ চোখে চেয়ে আছে। বাবা জানে— কেন মেয়ের এই অবাধ্যতা, কেন দু'জনের মধ্যে এই দূরত্ব!

সারারাত অজ্ঞাত অস্বস্তিতে ঘুম আসে না। ঘুম আসে না। নিজেই নিজেকে আয় ঘুম যায় ঘুম করতে থাকে সে। ভোরের দিকে দেখল মা বসে আছে একটা চেয়ারে। সামনে আর একটা চেয়ারে কস্তুরীদি। মায়ের পরনে সাদা চিকনের কাজ করা শাড়ি। কস্তুরীদির নীল শাড়ি। এই হালকা নীলটা মায়ের খুব প্রিয় ছিল। কেন যে এই শাড়ি বদলাবদলি সে বুঝতে চাইছিল না। কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপর যেন নিজেই নিজের বোকামিতে লজ্জা পেল, একটা সোজা অঙ্ক না পারলে যেমন পায়। ঠিকই তো আছে! আরে!!

১১) যাত্রা শুরু

ভোরবেলা ইস্পাতে যাচ্ছি আমরা— আমরা চারজন— কস্তুরীদি, মিঠু, শিখরিণী ও আমি। গতকাল সকালে কস্তুরীদি খুব রহস্যময় ব্যবহার করছিলেন। দেখি ওঁর ক্যারি-অনটা গোছাচ্ছেন। —কী ব্যাপার দিদি, ফিরে চললেন?

প্রথমে জবাবই দেন না। তারপরে যখন মুখ তুললেন, দেখি মুখ থমথম করছে, বললেন, ফিরে যেতে তো আসতে চাইনি!

—তবে কোথায় চললেন?

—আমাকে একটু পশ্চিমবঙো বর্ডারে ঘুরতে হবে। কিছু খুঁজচি।

—তা বলবেন তো!

—তোমাকে বলব কেনো?

—কেননা, নিতাইদা আমার ওপর আপনার দেখাশোনার ভার দিয়েছেন।

—তো দেকাশোনা তো করলে। মাতায় জল, ওষুদ, গর্ম সুপ, রাত থাকা কিচু তো বাদ নেই।

—আপনি যদি আমদাবাদ, আপনার নিজের জায়গা ছাড়া আর কোথাও যেতে চান, আমাকে আপনার সঙ্গী হতে হবে দিদি। আপনাকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারি না।

—কোতোবার বলবো এ-ও আমার নিজের জায়গা। জায়গা দিবে না, না কী! নিজের জায়গা পোরের জায়গা এ সোব কী! একটা এডুকেটেড ইয়াং ইন্ডিয়ান তো তুমি। না কী।

—ঠিক, দিদি— এ আপনারও নিজের জায়গা। কিন্তু সব কিছুর তো একটা পরিপ্রেক্ষিত থাকে।

—শোক্ত কোথা বলবে না।— অর্থাৎ 'পরিপ্রেক্ষিত' উনি বোঝেননি, এবং ওঁর মুড খারাপ।

একটু পরে, আমার দৃঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপাতত জাড়গ্রাম যাব। শোক্তো কিচু? ইস্পাত ধরব চলে যাব।

—ঝাড়গ্রাম!!!

—কেনো। পাণ্ডবরা যায়নি নাকি? টিক আচে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন না গেলো, আমি যাব।

—না, তা নয়। আমাকে যেতে হবে। ঝাড়গ্রাম কেন বুঝতে পারছিলাম না।

সোব বুঝা সোজা নয়।

খুব মন্থর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়ালাম। মিঠুকে ফোন করলাম কাল সকালের ইস্পাত ধরে ঝাড়গ্রাম যাচ্ছেন দিদি। বেজায় চটেছেন— কেন জানি না। তোর যাওয়া উচিত, নিতাইদাকে এক্সপ্ল্যানেশন তোকেও দিতে হবে। চট করে চলে আয়। আর শিখরিণীকে একটা ফোন করে জানিয়ে দে। আমাকে বলেছিল সব প্রোগ্রাম জানাতে।

—তুই-ই দে না।

—অসুবিধে আছে। কনজারভেটিভ ফ্যামিলি। কাজিয়া আমার ভাল লাগে না।

আধ ঘণ্টার মধ্যে মিঠু এসে পড়ল। অসম্ভব ফাস্ট। সবসময়ে এক পায়ে খাড়া। ওকে দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিৎ হওয়া যায়।

—তুমি! তুমিও যাবে!

—হ্যাঁ দিদি, যতদিন পারি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে দিন। আমার ভাল লাগছে।

সস্নেহে তার কাঁধে হাত রাখলেন দিদি।— টিক আচে। তুমি যতদিন আমার সঙে থাকতে চাও, থাকবে। কিন্তু কোস্টো হোবে!

—কী যে বলেন দিদি! আমি এন. সি. সি. করেছি, মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স নিয়েছি। দার্জিলিং থেকে সন্দকফু ট্রেকিং করেছি, তখন আমি কলেজও পেরোইনি।

বোলো কী? তুমার এতো বীর তা তো বুজিনি!

অর্থাৎ মিঠু চট করে পেয়ে গেল অনুমতিটা, যার জন্যে আমাকে যথেষ্ট কসরত করতে হয়েছে। মিঠুর অ্যাপ্রোচ আলাদা। সাংঘাতিক পাবলিক রিলেশনস সেন্স।

আমি টিকিট করতে যাচ্ছি, দেরি হতে পারে। ভাববেন না। —বললাম, চলে আসছি, মোবাইলটা বাজল।

মিঠু বলল, ধর, ওটা শিখরিণীর।

তাই তো দেখছি।

শিখরিণী বলল, আমিও যাচ্ছি। আমার একটা টিকিট যেন থাকে।

বললাম— দিদিকে দিচ্ছি।

উনি বলছেন শুনছি— না না। তুমি পারবে না। কোষ্টো হোবে। এন. সি. সি. করেচো? মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স নিয়েচো? সন্দকফু ট্রেকিং করেচো? আমি আর মিঠু তাঁর কথা শুনে হাসছি।

হাসিহাসি মুখেই বললেন, বেশ, রাজকন্যের যকন দেশ দেখার সাদ হয়েচে তো দেকবে। কিন্তু বিপদের জন্য রেডি থাকতে হোবে।

মোবাইলটা হাত দিয়ে চাপা দিয়ে বললেন, কাজল, দিস আই ডোন্ট লাইক। এতো জন গেলে আমার কাজটা না হোতে পারে। তারপোর ওতো সুন্দরী মেয়ের দায় নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ডিসকারেজ হার। দিদিমোণি!

মিঠু বলল, আমি পারব না দিদি। কাজলকে দিন।

মোবাইলটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিলেন উনি। কী আর করি। বললুম, শিখরিণী প্রবলেমটা বোঝো। বুঝতে চেষ্টা করো। এ একরকম নিরুদ্দেশযাত্রা। দিদি কোথায় কোথায় যাবেন, নিজেই ভাল করে জানেন না। তোমার মতো সুন্দরী মেয়েকে এরকম যাত্রায় নিতে উনি ভয় পাচ্ছেন। কানট ব্লেম হার। দেশকাল বড় খারাপ।

—শিখরিণী বলল, কেন তুমি তো আছ?

আমি বলি, আমি আছি ঠিকই। কিন্তু আমার সব শক্তি যদি তোমাকে প্রোটেকশন দিতেই চলে যায়, আমার আসল দায়িত্বটা পালন করব কখন?

—আমি নিজেই নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারব। প্লিজ কাজল, একঘেয়ে জীবনে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আমাকে একটু চান্স দাও।

ওদের দিকে তাকিয়ে আমি বলি, নাথিং ডুয়িং। ও যাবেই, অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজ।

ঈষৎ বিরক্ত হয়ে দিদি বললেন, ও জানল কী করে?

মিঠু খবর দিয়েছে বোধহয়— অম্লানবদনে আমি বললাম।

মিঠু কটমট করে আমার দিকে তাকাল একবার।

সুতরাং আমরা যাচ্ছি চারজন। দিদি, মিঠু, শিখরিণী ও আমি। শিখরিণী অবশ্য তার নিয়মভঙ্গ করে সালোয়ার কামিজ পরে এসেছে। অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে তৈরি। যাই হোক তবু একটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। বললাম, একটা কুকরি নিয়েছ?

—কুকরি? কুকরি কেন?

—ওই যে নিজেকে প্রোটেক্ট করবে।

—আমিই সবাইকে প্রোটেক্ট করব— একটু জেদি, গর্বের সুরে বলল ও। এইটা ওর অহঙ্কার আমি লক্ষ করেছি। নেত্রী-নেত্রী ভাব। নেতৃত্ব দেবার জোর ওর ভেতরে সত্যি-সত্যি আছে কিনা যাচাই না করেই ওর এমনি ভাব। মনে মনে হাসি।

১২) প্রথম পর্ব

কতকাল পরে ঝাড়গ্রাম দেখলাম। গাছ ঝুঁকে আসা লাল কাঁকুরে রাস্তা, রাজবাড়ি, ওই পুব দিয়ে বয়ে গেছে ডুলুং নদী। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে সরু আঁকাবাঁকা রাস্তা। এই বুনো রাস্তা দিয়ে চললে কনকদুর্গার মন্দির। আরও গেলে গিধনি। দলমা-পাহাড়ের কোলে। হঠাৎ যেন টুরিস্টের চোখ দিয়ে দেখতে পাই। কত অন্যরকম এবং কী সুন্দর আমার জন্মভূমি! এই সৌন্দর্য কখনও দেখতে পাইনি। গাছপালা ভাল লাগত, কিন্তু সে আমার পাড়া বলে, আড়াল বলেও কতকটা। পরিষ্কার পোশাক পরিচ্ছদ পরা লোকগুলোকে দেখে আমরা খরগোশের মতো পালাতাম। ডাকলেও পেছন ফিরতাম না। ওরা অন্য গ্রহের জীব, আমাদের সঙ্গে কোনও মিল নেই।

লোক্যাল গাইডরা বিরক্ত করতে লাগল— মন্দির দেখবেন? সাবিত্রী মন্দির! সবিতা, সূর্যের মানুষ-মেয়ে তিনি। মূর্তি নেই, খালি কেশগুচ্ছ আর খড়া আছে। চতুর্মুখ শিব আছেন দিদি, লোকেশ্বর বিষ্ণু, মনসা দেবী? আচ্ছা তবে চিড়িয়াখানা, হর্টিকালচারাল গার্ডেন? দিদি চুপ, কেমন টেন্স হয়ে আছেন। শুনছেনই না। একটি হোটেলে খাওয়াদাওয়া সারা হল, ওঁরা অনেক কষ্টে একটা জিপ জোগাড় করে দিলেন। রাজবাড়ির চত্বর গাড়িতে গাড়ি। এখানে ধনী লোকেরা গাড়িতেই আসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে, এখানে অ্যামবাসাডর থেকে টাটা সুমো সবই আছে। এক একটা গাড়ি থেকে নামছেন সুসজ্জিত, ভুঁড়িঅলা, টি-শার্ট প্যান্ট, পায়জামা পাঞ্জাবি, শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, টাইট জিন্‌স, হাতে মোবাইল, হাই হিল। সব গটগট করে চলে গেল। আমরা খাওয়ার জন্য প্রথম ওখানেই গিয়েছিলাম। ওখানে নাকি ঘণ্টা দুই-তিন আগে অর্ডার না দিলে কিছু পাওয়া যায় না। এই প্রথম ঝাড়গ্রামের মল্ল রাজবাড়ির ভেতর ঢুকলাম। চৌকোনো চত্বরে ফোয়ারা, ফুলের কেয়ারি, সিঁড়ি বেয়ে এই প্রথম উঠলাম রাজবাড়ির ডাইনিং হলে! এটাই নাকি সবচেয়ে রাজকীয়। পুরনো রাজবাড়ির এই ঘরটি সম্ভবত দরবার ছিল। বহু ঝাড়। ধবধবে চাদর পাতা টেবিল। পুরনো আমলের রাজকীয় সাইডবোর্ড। তবে আমাদের ভাগ্যে রাজভোগ হল না। দিদি হঠাৎ বললেন, গিধানি যাব।

গিধানি নয়, গিধনি— ড্রাইভার সংশোধন করে দেয়।

আমি কিছু বলিনি। এবার দিদির ইচ্ছা আর আমার ভবিতব্য।

তবে তাড়াতাড়ি ফোন করি ঝাড়গ্রামের ফরেস্ট অফিসারকে। যদি একটা ইন্‌স্‌পেকশন বাংলো বুক করা যায়।

এইভাবে বলি— আমদাবাদের বিখ্যাত কটন কিং নরেন্দ্র মেহতার মেয়ে বিখ্যাত সমাজসেবিকা কস্তুরী মেহতা এসেছেন। গিধনিতে হয়তো দু'-তিন দিন থাকবেন। ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল। বললেন, নিশ্চয়ই, আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এসব কথা কস্তুরীবেনকে বলা ঠিক বিবেচনা করলাম না। জেদি মানুষ, হয়তো বলবেন আমি গাছতলায় বসে থাকব।

ক্রমশই পথের পাশে লম্বা লম্বা শাল দেখা দেয়। শালমঞ্জরীর গন্ধে ভারী বাতাস। মিঠু আর শিখরিণী দেখি বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে।— আ-হ! শুধু এই হাওয়া খেয়েই থাকা যায়। বিশুদ্ধ অক্সিজেন! তবে কি এই বিশুদ্ধ অক্সিজেন খেয়েই বেঁচে থাকে এখানকার মানুষ। কতকগুলো ছাগলছানা উলটোপালটা লাফাতে লাফাতে পথ পার হয়ে গেল। রাস্তায় থেকে থেকেই মস্ত চারকোনা মাদুরের মতো ধান শুকোচ্ছে। খুব কৌতূহলে দেখি, স্থানীয় মেয়ে-বউরা ধানগুলো উলটেপালটে দিচ্ছে। একটা বাচ্চা ছেলে গোরুর গলা ধরে ঝুলছিল। একজন মহিলা এসে তাকে তাড়া দিলেন। সে গোরু ছেড়ে দৌড়ে কোথায় চলে গেল। কালো কালো ছেলেটা কিন্তু বেশ পুষ্ট। গা খালি, পরনে একটা নীল রঙের ইজের।

আমি বললাম, এখানে যদি গাড়িটা একটু থামাই দিদি, অসুবিধে হবে?

তুমার দোরকার তো যাও—

আমি রাস্তা ছেড়ে ভেতর দিকে নেমে গেলাম। যত যাচ্ছি খড়ের ঘর, তার গায়ে বিচিত্র ছবি। একটা টালির চালওয়ালা পাকা একতলা। দেখি লেখা আছে সাধন মুর্মু নিম্নবিদ্যালয়। নামটা আলাদা, চেহারাটা আলাদা, কিন্তু মনে হচ্ছে এইখানেই আমার সেই স্কুল ছিল, যেখানে ঘায়ের ওপর বেতের খোঁচানি খেয়েছিলাম। ছাতার বাঁট দিয়ে ছেঁড়া জামাটা দু'ফালা করে দিয়েছিলেন মাস্টার। ভেতরে মনে হল ছেলেরা পড়ছে। রাস্তায় একটি লোক দুটো গোরু নিয়ে যাচ্ছিল। একগাল হেসে বলল— ইটা ছেল্যাদের, মেয়্যাদেরও আছে।

কোথায়?

কিছু দূরে দেখিয়ে দিল, বলল— চলুন যাচ্ছি। আপনি টুরিস্ট? দেখতে এসেছ?

আশা করি মাস্টারদের চরিত্র পালটেছে। লোধা বা সাঁওতাল বলে আর ঘেন্না করে না।

হেসে বলি, হ্যাঁ।

সুন্দরী মল্লিক নিম্নবিদ্যালয় দেখি। ভেতরে পড়ার কলরোল। লোকটি বলল, ঝাড়গ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি পরিষদ আর এই সাধন মুর্মু, সুন্দরী মল্লিক মিলে করেছেন। ল হইছে নতুন নতুন। ওঁদের ঠেকাতে পারবেক নাই। গুরু লোক। সব জানে। রিসিভার ঘেঁষতে পারবে নাই।

রিসিভার হল সেইসব লোক যারা লোধাদের দিয়ে চুরিটা করায়। চোরাই মাল বহু দামে বেচে। লোধারা ফুটো কড়ি পায়, আর পুলিশের মার খায়।

আমি বলি, আচ্ছা এখানে আপনারা এখন কেমন আছেন?

—মোটের ওপর ভালই। এই গোরু, ছাগল, মুরগি করছি। আমার ছেল্যা পোলট্রি করেছে মিতের সঙে। এরকম আরও সব নূতন নূতন কাজকাম হইছে। ওই ইস্কুলে আমাদেরই লোক শিক্ষক আছে গ'। শবর, সর্দার, সরেন...।

—আচ্ছা, এখানে একটা মুণ্ডাপাড়া ছিল না? খুব গরিব। মোহন সিং, বাসন্তী মুণ্ডা, লক্ষ্মণ... লোধা পাড়ার পাশেই...

লোকটি ভুরু কুঁচকোল। ভাবছে। এর বয়স কত হবে? পঞ্চাশের কাছাকাছি। একটু পরে বলল। —মুখিয়ার কথা বলছ্যান? একটা মুখিয়া ছিল, টিবি হয়ে মরে গেল। অনেকগুলি ছেল্যামেয়্যা। উদের মা ছেলেগুলি নিয়্যা কুথায় চল্যা গেল একদিন। আমি শুন্যাছি। নিজে দেখ্যি নাই। উঃ ত্যাখন উয়ারা সবসময়ে টং থাকত। সাঁঝ হল্যাই বসে গ্যালো।

এখন?

বাপ রে। সব নিজের নিজের ছেল্যার মাথায় হাত রেখে, মাকে কথ্যা দিয়্যাছি ছুঁব না। পাপ জিনিস।

কোন মায়ের কথা বলছে? কালী? এখানে একটা ছোট কালীমন্দির ছিল বটে।

হর্নের আওয়াজ পাচ্ছিলাম। ড্রাইভার, সঙ্গে সঙ্গে দিদি আর তাঁর স্যাঙাতরা— সকলেই অধৈর্য।

আমি দৌড়োই। ছোটখাটো টিবি, গোবরের স্তূপ টপকে টপকে দৌড়োই।

শিখরিণী বলল, কোথায় গিয়েছিলে? এতক্ষণ লাগল?

এটা আমার ছোটবেলার চেনা জায়গা। দেখতে গিয়েছিলাম। মিঠু দেখি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। ও বোধহয় আন্দাজ করেছে।

কস্তুরীবেন বললেন, আসোল কোথা, বুঝলে কাজল, ছুটবেলাই সব বেলা।

আপনি কী বলতে চাইছেন? মর্নিং শোজ দা ডে?

নো, নো। তা টিক নয়। ছুটবেলাই আমাদের গোড়ে। সোব কিছুর রুটস ছুটবেলায়।

যদি ধরুন ছোটবেলায় কেউ খুব সাফার করে, শিক্ষা-সংস্কৃতির স্বাদ না পায়?

সে তখন জিদ করবে। তুমার মতুন হবে।

দিব্যি বসে নাচতে নাচতে চলেছেন। মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারলাম না, বুঝে বললেন, না না-বুঝে বললেন।

আমি আমার মুখ বাইরের রুক্ষ হাওয়ার দিকে ফিরিয়ে বসি।

...গোলমতো আলপনা দেওয়া হয়েছে, তাকে বলে ঘঁড়। চালের গুঁড়ি মেথি সিঁদুর সব দেওয়া হয়েছে। কিছু আতপচাল, দূর্বা ঘাস দিয়ে দিহরি পুজো শুরু করলেন। ঘঁড়ের ওপর একটা ধপধপে সাদা ডিম। ধরিত্রী মাতার প্রতীক। রাখালরা সব গোরু দিয়ে আসছে পুজোর থানে। যে বলদ বা গাভী এই ডিম ছোঁবে সেই উৎসবের মধ্যমণি। তাকে তেল-সিঁদুর মাখানো হবে। তার মালিককে সবাই কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ মাঝি সবাইকে হাঁড়িয়া খাওয়াচ্ছে। প্রথম পুজো মারাংবুরুর। তাঁর ভাগে একটি সাদা মোরগ। তারপরে সব যে-যার বংশের দেব্‌তার পুজো দিচ্ছে। পাঁচ দিন ধরে পুজো। সহরায় উৎসব। শরতের পরে হেমন্ত এসেছে। মাঠে মাঠে ধান। চাষি খেটেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ভগবতীও তো খেটেছে সমানে। তাই গো-মহিষদের পুজো, সারহাও মানে প্রশংসা। গো-মহিষরাই কেন্দ্র এই উৎসবের

ও হি রে—
জাগো মা লখিনি
জাগো ভগবতী
জাগোই তো অমাবইসার রাতরে-এ-এ।

আতপচালের গন্ধ, বলির রক্তের গন্ধ, এই দিনের বেলায় শেষবেলার মধ্যে সহরায়-এর গান ভেসে আসে। আকণ্ঠ উৎকর্ণ শুনি। সাদা মোরগটির জন্য বড় কষ্ট, আমার নিজের মোরগ কিনা! মারাংবুরুর কি মোরগ না হলে চলে না? এই মোরগটা কঁক কঁক করে দৌড়োত... আমি ওর পেছনে ছুটতাম।

কী শিখরিণী। কেমন বুঝছ? গাড়ি কেমন কত্থক নাচছে?— হেসে জিজ্ঞেস করি।

উত্তরে সে বলে, যতখানি আতুপুতু আমাকে মনে করো ততখানি আমি নই হে!

তখন তো কিছু বুঝতাম না— সাদা ডিমটি যে পৃথিবীর প্রতীক সে কথা জানতাম না। জানতাম না, মারাংবুরু পশুপতি জঙ্গলপতি, যাঁকে এরা শিব বলে, জানতাম না সিংবোঙা সূর্য। প্রতিদিনের আধপেটা জীবনে গো-মহিষের কাঁধে ভর করে একটা আনন্দের দিন এসেছে, শুধু এটুকু বোঝাই যথেষ্ট ছিল। খিচুড়ি রাঁধা হবে বলির শুয়োর ভেড়া মুরগি দিয়ে। ভাগ পাব নিশ্চয়। অনেক দিনের পর পেটভরে খেতে পাব। সাঁওতাল, মুণ্ডা, কুর্মি, ভূমিজ, লোধা সবার উৎসব সহরায়। যদিও লোধাদের জমিজমা সামান্যই, ওরা কাঠকুটো পাতা কুড়োয়, ইঁদুর পেলে পুড়িয়ে খায়, গোসাপ খেতে তো ওস্তাদ। আমার বন্ধু ছিল সমীর কটাল। চৌধুরী মাস্টার খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে বলত, সমীর, সমীরণ— ভদ্দর নাম নিতে সাধ হয়েছে! মরি মরি! কী ভদ্দর! চান করিস? সাবাং মাখিস? তেল তো বোধহয় জীবনে মাখিসনি। জামাকাপড়? এই ছেঁড়া ত্যানাগুলো পরেই হাগিস, মুতিস, খাস, ঘুমোস, আবার পড়তে এসেছিস? সমীরের আর আমার অনেক কষ্ট করে জোগাড় করা বইখাতা অন্য ছেলেরা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে রেখে দিত। শেষকালে সমীর একদিন মাস্টারের কাছে বেধড়ক মার খেয়ে, আবার ঘরে ফিরে গিয়ে বেধড়ক মার খেল বাপের কাছে।

লিখাপড়ার শক হঁইছে? ঘরে চাল নাই। মা, বুন শাক তুল্যা রাঁধছ্যে, তুমি বাবু হঁতে যাইছঁ? পরদিন গোঁজ মুখে আমাকে বলল— তুই যা, আমি আর যাবক নাই। লিখাপড়াতে মার, না লিখাপড়াতেও মার। আমি জঙ্গলে শিকার যাব। খরগোশ পেলে একা একা পুড়িয়ে খাবো। যাঃ।

কে জানে সমীর কী করছে এখন! এখন আমি ওই সমীর কটাল, লক্ষ্মণ মাঝি, বাসন্তী মুণ্ডাদের সঙ্গে একাত্ম বোধ করি না। দায়িত্বও বোধ করি না কি? আমার জগৎ উন্মুক্ত উদার, আমি সিংহবিক্রমে বিচরণ করি স্বনামে, স্বপরিচয়ে, গর্তের ইঁদুর বার করার কাজে উৎসর্গ করার জীবন আমার নয়। এইটুকু বুঝি। তরোয়াল দিয়ে ঘাস কাটার কাজ হয় না। ওই তো আদিবাসী সংস্কৃতি পরিষদ হয়েছে জায়গায় জায়গায়। স্কুল হয়েছে, ছেলেদের, মেয়েদের, ওখানে আমাদের সাঁওতাল, মুণ্ডা, মাস্টারমশাই। ওরা নিশ্চয় কারও ঘা খুঁচিয়ে দিয়ে মজা পায় না, ছেঁড়া জামা আরও ছিঁড়ে দেওয়ার নিষ্ঠুরতা নিশ্চয়ই ওদের নেই! আমি যে মুণ্ডা পরিচয়কে শিক্ষিত সমাজে সম্মানের যোগ্য করে তুলতে পারছি। এটাও তো অনেক।

হঠাৎ খেয়াল হল— কস্তুরীদি চুপ। আমিও চুপ। দু'টি মেয়ে, বিটি ছেল্যা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

মিঠু বলছে, আমি মধুপুর এসেছি। গিরিডি যখন গেছি তখন উশ্রীর জল অমন শুকিয়ে যায়নি। তুই সাঁওতাল পরগনা একেবারে দেখিসনি? বাঙালির ছুটি মানেই তো হয় দিঘা, পুরী, দার্জিলিং আর নয়তো শিমুলতলা, মধুপুর, ঘাটশিলা।

শিখরিণী বলল, তা কেন? এখন যেখানে যাবে বাঙালি ট্যুরিস্টের ভিড়, একগাদা ট্রাভল এজেন্ট হয়েছে তারা তো অমরনাথ, কেদার, ছাঙ্গু লেক, সর্বত্র নিয়ে যাচ্ছে। জানো তো, গত বছর দক্ষিণ ভারত গিয়েছি। কন্যাকুমারীতে দেখি ছ'-সাতজন একেবারে গ্রাম্য বুড়ি হাত ধরাধরি করে ঘুরছে! হাত ধরাধরি কেন বলো তো? পাছে হারিয়ে যায়!— শিখরিণী হাসতে লাগল।

মিঠু বলল, ওরা কিন্তু তিন সমুদ্রের সঙ্গম দেখতে যায়নি। তীর্থযাত্রায় গেছে। যে কদিন থাকবে মন্দিরে দু'বেলা হাজিরা দেবে, আর ভারতীয় অন্তরীপের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে গুচ্ছের ফুলপাতা দিয়ে সমুদ্রপুজো করবে। উপরি পাওনা বিবেকানন্দ মন্দির। বিবেকানন্দ কে বলো তো? রামকৃষ্ণের শিষ্য, পরবর্তী গুরু। বাস।

অতটা আন্ডারএসটিমেট কোরো না। রামকৃষ্ণ লিটরেচার, বিবেকানন্দ রচনাবলী তো আজকাল অনেকেই পড়ে, অন্ততপক্ষে ধর্মগ্রন্থের মতো।

তা হলে বলো, এমন দশা কেন? কী রে কাজল! কিছু বলছিস না যে বড়!

আমার কিছু বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, তবু বললাম, গ্রেট মেন কাম অ্যান্ড গ্রেট মেন গো। **বাট** দা আমজনতা গোজ অন ফর এভার। সেই কবিতাটা মনে করতে পারো না, অনবরত **পঠিত** ও আবৃত্ত হয়ে চলেছে— ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে/ক্ষমাহীন সংসারে।

মিঠু বলল, ক্লিশে হয়ে গেছে কাজল, ব্যবহৃত হতে হতে, ব্যবহৃত হতে হতে— ওর ভেতরের ম্যাজিক হারিয়ে গেছে। নতুন কবিকে নতুন বাণী দিতে হবে।

আমি হেসে বললাম, তুই এখনও বাণীতেই স্টিক করে আছিস তা হলে? গুড!

এটা কি উপহাস?— মিঠু জিজ্ঞেস করল।

যা বলিস!

১৩) দ্বিতীয় পর্ব

গিধনি এসে গেছে। কস্তুরী বুক ভরে শ্বাস নিয়ে জিপ থেকে নেমে দাঁড়ালেন। দলমা পাহাড় দেখা যাচ্ছে অদূরে, তবে নিশ্চয়ই খুব কাছে নয়। এ জায়গাটায় বেশ জঙ্গল আছে, খেতও যথেষ্ট। ইনস্‌পেকশন বাংলোটি খুব পুরনো পুরনো মতো। যেন অনেক দিন ব্যবহার হয় না। চৌকিদার হাত জোড় করে এসে দাঁড়াল— ডি এফ ও সায়েব ফোন করেছেন। আপনাদের দু'খান ঘর রেডি রেখেছি। কী খাবেন আজ্ঞা? মুরগি ভাত?

—আমি ভেজ, নিরামিষ খাই— যা হোক দেবে— কস্তুরী হুকুম করলেন, তুমার নাম কী?

—আজ্ঞা রতন, রতন কিস্কু।

—সাঁওতাল?

—যা বলেন মা।

—কেনো? যা বুলবো কেনো, তুমি যা তাই বুলবো!

ভয়েভয়ে লোকটি বলল— রান্না সব আমিই করি।

—করবে। লোকে তুমার হাতে খায় না, নাকি?

—খায় মা, আবার কারও কারও কদাচিৎ আপত্ত থাকে! তাই জিজ্ঞেস করে নিই। এই দিদিমণিরা, এখন কী খাবেন!

—এখন খাবার কী আছে রতন? শিখরিণী জিজ্ঞেস করল।

—রতনদা, চা পাওয়া যাবে তো? এই তোরা মুড়ি খাবি?

ঠিক হল মুড়ি আর চা-ই প্রশস্ত এখন। বিকেল মরে এসেছে। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে, জামাকাপড় পালটাতে সময় লাগল।

কস্তুরী বললেন, আমি একটু বেরোব।

—এই অন্ধকারে?

—এখুনও তো আলো আছে। কেমন অদ্ভুত শোনাল ওঁর কথা। যেন উনি আর কিছু বলতে চাইছেন।

কাজল কিছু বলল না, খালি তার পাঁচ সেলের টর্চটা নিয়ে রেডি হল।

—তুমি কুথায় যাবে? কস্তুরী সন্দিগ্ধ করে বললেন।

—আপনার যেমন কাজ আছে, আমারও তেমন একটু কাজ আছে দিদি।

—সে কাজ কী? আমার পিছন পিছন আসতে নিতাইদা বলে দিয়েচেন?

—না। আমার নিজস্ব কাজ। কৌতূহল। আপনি আলাদা যেতে পারেন। কিন্তু এই পাথুরে রুক্ষ জায়গায় যদি চোট পান, আপনার আসল কাজ তো হবে না দিদি।

বাংলোর বাইরে বেরিয়ে উনি বললেন, কী আমার আসল কাজ? তুমি আমার চে বেশি ভাল জানো মনে হচ্চে।

খুব অবভিয়াস দিদি যে আপনি কাউকে খুঁজছেন, আপনার অতীতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। এইসব জঙ্গলমহলে তেমন কাউকে যদি আপনি খুঁজতে চান, আমার সাহায্য ছাড়া পারবেন না। আমি আফটার অল লোক্যাল লোক, এদের নিজেদের লোক। আমার কাছে ওপন-আপ করবে, আপনাকে কিছুই বলবে না।

হঠাৎ সেই আধা-অন্ধকারে কাজল বুঝতে পারল কস্তুরী কাঁপছেন। তারপর ওই ব্যক্তিত্বময়ী দুঁদে সমাজসেবিকা, ঝানু ব্যাবসাদার, মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।

—কাকে খুঁজছেন দিদি! আপনার ছোটবেলার চেনা কোনও প্রিয় বিপ্লবীকে? আমাকে বলুন। আমি কাউকে বলব না। যথাসাধ্য চেষ্টা করব খুব কোয়ায়েটলি পাত্তা করতে। য়ু ক্যান ট্রাস্ট মি।

বেশ কিছুক্ষণ সময় নিলেন উনি।. তারপর নিজেকে সামলে ধরাধরা গলায় বললেন, য়ু নো হোয়ট কাজল! য়্যু ক্যান বি আ ফাইন ফ্রেন্ড, সো কেয়ারিং অ্যান্ড কমপিটেন্ট। অন্ধকারে কাজল হাসল, বলল, বুঝতে এত দিন সময় নিলেন দিদি? আমারই ভুল। সম্পূর্ণ একজন আউটসাইডারকে আপনি কী করে বিশ্বাস করবেন!

—না কাজল, ভুল আমারই। জেদ, বহোৎ জিদ্দি হুঁ ম্যায়। অ্যান্ড ইগো। আই সি আই হ্যাভ টেরিবল ইগো।

কাজল কিছু বলল না। অন্ধকার টর্চের আলোয় চিরে পথ ধরে দু'জনে খানিকটা এগোলেন, একটা শাল গাছের তলায় মোটামুটি বাঁধানো বেদি। কাজল বলল, এইখানে এদের গরাম দেবতার থান দিদি, শাল গাছের তলায় দেখছেন কত্ত আতপচাল পড়ে আছে? আরও কিছু থাকতে পারে, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। এখানে একটু বসুন।

—না না, দেবতা আছেন। রাগ করলে?

—কে রাগ করবেন? দেবতা? দেবতারা রাগ করেন না, আপনি জানেন না দিদি? রাগ মানুষই করে। যাদের থান তারা এখন এই মহুয়া শালের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় তাদের ছোট্ট গ্রাম আছে সেইখানে ঘুমোনোর তোড়জোড় করছে। দেখতে আসছে না কে তাদের গরামথানে বসল, কি না বসল।

সে একটা বড় রুমাল বিছিয়ে দিল।

—তুমি?

—আমিও বসছি। আমার এই জিন্‌স হল সর্বংসহা। জাস্ট একটু ঝেড়ে নিলেই হাঁসের পাখা থেকে জলের ফোঁটার মতো পড়ে যাবে। কাকে খুঁজছেন দিদি? আপনার মা?

চমকে উঠলেন কস্তুরীবেন।

—আপনার মা কি বাই এনি চান্স আদিবাসী ছিলেন?

—এ কোথা কেনো মনে হল?

—এই জায়গায় তাঁকে খুঁজতে এসেছেন বলে। এইসব জঙ্গলমহলে ট্রাইব্যালরা ছাড়া আর কেউ বাঁচতে পারে না দিদি। দু'বেলা পেটে অন্ন নেই। ইঁদুর, গোসাপ, ঢ্যামনা সাপ যা পায় জাস্ট পুড়িয়ে খায়। বনের মধ্যে কেঁদ পাতা তুলে বিক্রি করত। কেঁদ পাতায় বিড়ি হয় তো! তো সরকার তা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন তুললে বেচতে হবে সরকারকে, অনেক কম দামে। কাঠকুটো কুড়োয়, মাইল মাইল দূরে হাটে বিক্রি করে যেটুকু পয়সা পায় তেল নুন, কখনও কখনও চাল কিনে আনে। সন্ধেবেলা হয়তো পৌঁছোল তারপর কাঠকুটো জ্বেলে রান্না হবে। স্রেফ ভাত নুন, আর শাক পেলেই যথেষ্ট। তার ওপর বন থেকে খুঁড়ে কাঁটা আলু, চুড়কা আলু কি বাঁউল্যা আলু পেল তো রাজভোগ। সারাদিন পরিশ্রম। তারপর বাড়িতে বাড়িতে হাঁড়িয়া পচুই হয়, বড়রা সেই নেশায় মেতে যায়,

সব-ভোলা নেশা, ছোটরা ঘুমিয়ে পড়ে। এর মধ্যে সভ্য জগতের কোনও মহিলা বাস করবেন—বিশ্বাস করা যায় না। সম্ভব নয়। তাই বলছিলাম...

--আমার মা বাঙালি, কাজল। আমার সমুস্ত শিক্ষা তাঁর কাছে। আমি তখন আবছা বুঝতে পারতুম, এখন পরিষ্কার দেখতে পাই শি ওয়জ অ্যান এক্সেপশন্যাল উওম্যান। ওঁরা, ওঁদের জেনারেশন। প্রি-ইনডিপেডেন্স। ওঁরা বহু আশ্চর্য মানুষের কাছে কাছে এসেছিলেন। আমি যতদুর বুঝি, ওঁরা পথ খুঁজছিলেন, কী ওঁদের কাজ হবে স্বাধীনতার পোরে। আমি সেসব কোথা কিছুই বুঝতাম না। খালি আই ইমবাইবড দা অ্যাটমসফিয়ার। খুব হ্যাপি, উৎসাহ ছিল। মা ছিলেন সেন্টার, বাবার কাচে শুনেচি—ওঁরা পার্টিশন আর দাঙা দেখে এতো শকড হয়েছিলেন, যে প্রথমটা বুদ্ধি কাজ করেনি। তারপর দে ওয়েটেড ফর সুভাষচন্দর টু কাম ফর আর লং টাইম, ইভন আফটার দা রিউমর অব প্লেন ক্র্যাশ। ওঁরা নিজেদের রেডি করছিলেন এই পার্টিশন চলে যাবে আবার ভারতে শান্তি ফিরে আসবে। সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে...গাঁধীজি যে বলেছিলেন গ্রামে চলে যাও শিক্ষা বিস্তার করো—সেকথা কাজ করছিল, জওহরলাল যে ইনডাস্ট্রির কথা বলছিলেন, ওঁরা তাতে উৎসাহ পাচ্চিলেন, কিন্তু পুরা নয়। তারপর ফিফটিজ-এ আরও দাঙা হল। দে ওয়্যার ব্রোকন-হার্টেড। বাবা-মা'র মধ্যে কী হল জানি না, কিছুদিন ধরে হচ্চিল, টের পাচ্চিলাম। একদিন সকালে উটে মা দেখতে পেলাম না। কেউ খুঁজল না। বাবা দেখলাম খুব রাগ। আমাকে নিয়ে আমদাবাদ চলে গেলেন। ভেঙে গেল সোব আসর, ভাবনা-আদর্শ। ...আমার জীবন। লেখাপড়া করলাম, বিজনেস। বাবাকে খুব ভাল বাসলাম। কিন্তু মা'র কোথা তুললে তিনি, আমার দাদা, দাদিমা সব খুব বিরক্ত হোতেন।

—এখন? এখন আপনার বাবা কিছু বললেন না?

—এখন? হি হ্যাজ পাসড অ্যাওয়ে।

—কোনও হিন্ট দেননি? কোথায় তিনি থাকতে পারেন? কেন বিচ্ছেদ হল?

—নাঃ, হি হ্যাড আ স্ট্রোক, আফটার দা ফার্স্ট স্ট্রোক উনি কীরকম হয়েছিলেন। ভাবনা করতেন, চুপিচুপি কাঁদতেন, আমি জিজ্ঞেস করেচি হোয়ট ওয়াজ বদারিং হিম। কিচু বলেন না। ডাক্তার বললেন সেরিব্র্যাল স্ট্রোকের পর এর্কম হয়। কন্ট্রোল থাকে না। সেকেন্ড স্ট্রোকের পর উনি চলে গেলেন। কাজল, দেন অ্যান্ড দেয়ার আই ডিসাইডেড, আই'ল প্রেব দিস মিস্ট্রি।

কাজল অবাক হয়ে রইল অনেকক্ষণ। একজন বাঙালি ভদ্রমহিলা হঠাৎ গৃহত্যাগ করলেন, তাঁর খোঁজ করল না কেউ, আজ এত বছর পর তাঁকে তাঁর মেয়ে খুঁজতে এসেছেন এই পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড বর্ডারে? সে নিজেও একদিন পালিয়েছিল। কিন্তু সে ছিল বাচ্চা। যখন বড় হল, উন্নত জীবনের স্বাদ পেল, তখনও তার নিজের মানুষদের খোঁজে যাওয়ার সুযোগ ছিল, ফাদার মরিসন এবং পরে দেওঘরের হৃদয়াত্মানন্দজি যখন নিশ্চিন্ত হলেন যে সে আর আদিম জীবনে ফিরে যেতে চাইবে না, তখন তাকে একরকম আদেশই করেছিলেন— মায়ের সঙ্গে বাবার সঙ্গে দেখা করে আসতে। সে তখন কোনও পিছুটান অনুভব করেনি। মা বলতে তখন তার চেতনায় ঢুকে গেছে রাফেলের মেরি, রামকৃষ্ণ মিশনের সারদা মা, নিবেদিতা। সে নিজেকে হাঁড়িয়া খেয়ে চুরচুর, শেষের দিকে তো দিনে রাতে সব সময়ে, সেই বাসন্তী মুণ্ডার সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কিত মনে করতে পারত না। আজও পারে না। একটা নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি আছে। সেই ট্রাইব্যাল গ্রাম। গরাম-থান, করম পূজা, শিকার খেলা, সেই হতদরিদ্র ও হতকুৎসিত পাড়া।

উন্নত জীবন থেকে কলকাতার সবচেয়ে ভাল জায়গার তিনের এক ফার্ন রোড স্বাচ্ছন্দ্য, আদর্শ, স্বামী এবং বন্ধুদের সঙ্গে মতামতের আদানপ্রদান, ছোট্ট একটি মেয়ে এইসব ছেড়ে এই আদিম পৃথিবীতে?

সে বলল, কী করে আপনার ধারণা হল তিনি এদিকে এসেছেন? যাঁদের সঙ্গে দেখা করছিলেন, তাঁরাই বললেন?

উনি মাথা নাড়লেন, চাঁদ উঠছে, পরিষ্কার সামন্তভূমির চাঁদ। সেই আলোয় সে দেখল— ওঁর চোখ থেকে এক ফোঁটা জলও পড়ল।

কস্তুরী বললেন, ওঁরা কেউ কেউ হিন্ট দিলেন মা আর সুধাকাকু একসঙে এসেচেন। তাইতে বাবার রাগ-অভিমান আমি বুঝতে পারি। আই কান্ট চেঞ্জ দা পাস্ট। কিন্তু মাকে এক্সপ্ল্যানেশন দিতে হবে— তিনি একটা ছোট মেয়েকে ফেলে, স্বামীকে ফেলে এসেচিলেন।

এতক্ষণে ছবিটা স্পষ্ট হল কাজলের কাছে। সেই চিরন্তন ত্রিকোণ। তৃতীয় ব্যক্তি, কখনও পুরুষ, কখনও নারী। আদর্শ, মায়া, মমতা, প্রেম, বন্ধুত্ব সমস্ত কিছু শেষ পর্যন্ত এই ভয়ানক ত্রিকোণের সামনে এসে নিরুত্তর দাঁড়িয়ে যায়। তাই এত ক্রোধ, এত জেদ, এত অশ্রু। এবং তাই সবকিছু এরকম জীর্ণ বাসের মতো ফেলে যাওয়া। সে নিরুত্তর বসে রইল। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ। চাঁদ উঠল শালগাছের মাথায় মাথায়। সেদিকে তাকিয়ে তার মনে হল— এই ব্যাখ্যাতীত— এই-ই কি তবে প্রেম? যার জন্য সব ত্যাগ করা যায়! তার সমস্ত সত্তার মধ্যে একটা আলোড়ন যেন একটা প্রশ্নের মতো মাথা তুলল। সে কি এই প্রেম জানে না? কোনওদিন জানবে না? সে সত্যিই এখনও বোঝে না প্রেমের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়। ক্ষোভ, ঘৃণা, জিদ, কাজ, এখনও পর্যন্ত তার মনোলোক এই দিয়েই ভর্তি। কোনওরকম সেন্টিমেন্টের জায়গা সেখানে নেই। কিন্তু হঠাৎ সে পরিষ্কার বুঝতে পারল— পালচৌধুরী বাড়ির ওই সুন্দরী মেয়েটি কেন এই নিরুদ্দেশযাত্রায় শামিল হয়েছে। আসবার জন্য ও মরিয়া ছিল। ও কাজলকে চায়। এসব নিয়ে কাজল বাস্তবিকই কোনওদিন কিছু ভাবেনি, নিজের সমাজের কাউকে ও কোনওদিন চাইতে পারবে না। এটা নিশ্চিত। কিন্তু হিন্দুদের বাড়ির একটি সুন্দরী শিক্ষিত ব্যক্তিত্বশীল মেয়ে, তার জন্য একটা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হবে সে কখনও ভাবেনি।

তার অস্তিত্বই ছিল কাজের মধ্যে। সারা পৃথিবীর আদিবাসীদের ইতিহাস, ভূগোল, মনস্তত্ত্ব, পুরাণ, বঞ্চনা, কেন তারা আটকে গেল পাথরের ফাঁকে বহতা নদীর নুড়ির মতো? নদী বয়ে চলে গেল, পাথরের নুড়ি পড়ে রইল সেই এক জায়গায়। ক্রমে শ্যাওলা জমল। ঘন কালচে সবুজ শ্যাওলা, তার তলায় লুকিয়ে থাকতে থাকতে একদম ভুলে গেল নুড়ি তার জন্মকথা। তাকে কোথাও যেতে হবে, যাবার কথা ছিল। স-ব। এখন তার কাজ চলছে আমেরিকায় আদিবাসীদের নিয়ে। অ্যাকোমা, থাকত নিউ মেক্সিকোয় গ্যালাস ও অ্যালবুকার্কের মাঝামাঝি ৬০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের ওপর প্রাচীনতম জনবসতি। শহরটিকে ইস্পাহানিরা আশমান নগর বা স্কাই সিটি নাম দেন তার মনে পড়ল অ্যালগনকুইয়ানদের কথা, উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম গোষ্ঠী, যার মধ্যে বিভিন্ন উপজাতির মানুষ রয়েছেন। আটলান্টিক থেকে রকি পর্বতমালা পর্যন্ত এঁরা ছড়িয়ে রয়েছেন।

পশ্চিম ওরেগনের সিলেৎজ উপজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অ্যাপাচে ইন্ডিয়ানরা তো খুব বিখ্যাত। 'আপাচু' মনে শত্রু। এঁরা কিন্তু নিজেদের ন'দে বা দিনেহ বলেন, যার অর্থ জনগণ। ঠিক যেমন তারা সবাই— সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, হো, লোধা, শবর সব্বাই নিজেদের 'হড়' অর্থাৎ মানুষ বলে— শুধু বিরহড় নয়। পুরাকালে 'ঘেরওয়াল' বা বনবাসী থাকার সময়ে সবাই ছিল হড়। কোনও সময়ে এদের মধ্যে কিছু বনচর হনুমান খেয়ে ফেলায় জাতিচ্যুত হয়। সম্ভবত শবর, খেড়িয়া, লোধারা। কুর্মিরা হিন্দু হয়ে গেল, সাঁওতালরা এঁদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর, মুণ্ডারাও পিছিয়ে নেই। কিন্তু তার জন্মপল্লিতে দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর হাঁড়িয়া খাওয়ায় মুণ্ডারা লোধাদের মতোই তো ছিল। কথিত আছে এঁরাই নাকি রাবণরাজার বিরুদ্ধে রামচন্দ্রকে সাহায্য করেন। ফাঁকাতে থাকত এই হড় জাতি, পাহাড়ে জঙ্গলে, কিন্তু জমি পরিষ্কার করলেই দিকুরা নিয়ে নিত। দীর্ঘদিন পরস্পরের প্রতি তারা ঘৃণা জিইয়ে রেখেছে, প্রকৃতপক্ষে কে-ই বা তাদের বন্ধু, না সাদা চামড়া, না দিকু, না, তুড়ুকরা। সবারই লক্ষ্য তাদের পরিষ্কার করা জমির ওপর খাজনা বসানো, কিংবা একেবারে নিয়ে নেওয়া। হরপ্পার দিন থেকে তারা আছে এবং ক্রমাগত তাড়া খাচ্ছে। তিলকা মাঝি, বা বীরসা মুণ্ডাও কিছু করতে পারেননি। সিদু-কানহোও না।

আচ্ছা, কুর্মিরা হিন্দু হয়ে গেল। কিন্তু করম পুজা, বাধনা, সারহাও সবই তো ওদের আছে! সঙ্গে সঙ্গে কালীপুজোর ফুটো ফুটো হাঁড়ির মধ্যে দীপ বসিয়ে আলোও তো জ্বালায়। ক্রিশ্চান হতে হলে অনুষ্ঠান লাগে, তুড়ুক বা মুসলমান হতে গেলেও, কিন্তু হিন্দু হতে গেলে কিছু লাগে না। কবে যে কে দুর্গাপুজোয় ঢাক বাজাতে লেগেছে, কেউ খেয়ালই করে না। সঙ্গে সঙ্গে তুমি করম করো, পাঁচ বছর পরপর সিংবোঙার পুজো করো, কোনও অসুবিধে নেই। কোনও কোনও হাইওয়ের কাছে গরাম-থান তো বিখ্যাত। সবাই ওখানে মানত করে, মানে, পয়সা দেয়। সেখানে প্রধান পুরুত লোধা। ব্রাহ্মণ বসে লোধা পুরুতের নীচে।

শিখরিণী মেয়েটিকে সে হিন্দু বলল। কিন্তু নিজেকে তার থেকে কীভাবে আলাদা করবে ভেবে পেল না। তার গলায় ক্রস নেই, তার শুক্রবার নামাজ নেই। আসল কথা সে সম্পূর্ণ ধর্মমতহীন। শিখরিণী যদি চায়, তার সঙ্গে মিলিত হতে তার কোনও বাধা নেই। এবং হয়তো এমন মিলন ভাল। কেননা আর্য-অনার্য বিবাহের ফলে পরের প্রজন্ম আরও বুদ্ধিমান, আরও মৌলিক হয়ে জন্ম নেবে। দু'ধরনের জিন মিলবে উন্নততর জিন তৈরি করতে। সভ্যতা এগিয়ে যাক। উন্নততর মানুষ তৈরি হোক। আরও আরও মানবিক মানব, যেমন হবে তাদের উদ্ভাবন, মগজ, তেমনই হবে তাদের হৃদয়ের গুণ। আর দ্বিধাহীন মেশামেশির ফলে এক হয়ে যাবে সবাই। আলাদা করে এ আর্য, এ অনার্য ছাপ মেরে দেওয়া যাবে না। বাঙালিদের মধ্যে যেমন হয়েছে। শিখরিণী সম্পূর্ণ আর্য। খাড়া নাক, টানা চোখ, কাঞ্চনবর্ণ, পূর্বপুরুষের থেকে এই জিন পেয়েছে। তবে কোনও কোনও পরিবার অনেককাল ধরে মিশ্রণ থেকে নিজেদের সন্তর্পণে বাঁচিয়ে এসেছে। তাই সব গাঁই গোত্র, দক্ষিণ রাঢ়ি, উত্তর রাঢ়ি, তাই বৈদ্য, বারেন্দ্র। বৈদ্যরা যেমন অসম্ভব বুদ্ধিমান, ব্রাহ্মণ কায়স্থর মিশ্রণে হয়েছে। তাদের তো ব্রাহ্মণরা জাতিচ্যুতই করেছিল। শিখরিণীদের পরিবারেও হয়তো খুব গোঁড়া। কিন্তু মিঠুকে দেখলে বোঝা যাবে না, শিখরিণী যদি বাঙালি হয় তো সে-ও বাঙালি। মিঠু কালো। নাক খুব উঁচু নয়, আবার তার মতো থ্যাবড়াও নয়, মিঠুর চোখ বড় নয়। কিন্তু কী উজ্জ্বল! মিঠুর ঠোঁট পাতলা নয় একটু পৃথুল, কিন্তু ছোট। কপাল বড়, কোঁকড়া চুল, একটু তামাটে। মিঠু শিখরিণীর মতো না হলেও লম্বা। খুব সুগঠিত। কেননা, শরীরচর্চা খেলাধুলোর মধ্যে ও জীবন কাটিয়েছে। একেবারে বেতের মতো, স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে ওঠে। কে জানে কী অতীত মিঠুর পরিবারের। উর্ধ্বতন তিন পুরুষ পর্যন্ত সাধারণত মানুষ জানে, তার আগে? তারও আগে? উত্তর ভারত থেকে আসা কোনও ব্রাহ্মণ এই বঙ্গভূমে কোনও সাঁওতালনি কি মুণ্ডানিকে ঘরে তুললেন। নিশ্চয়ই প্রচুর কোলাহল তুলেছিল সমাজ। তবে, তখন হয়তো পুরো বাংলাই জঙ্গলমহল ছিল। এখানে বুদ্ধ আসেননি, মহাবীর এসে তাড়া খেয়ে ফিরে গেছেন। সেই পাণ্ডববর্জিত মহলে একমাত্র ব্রাহ্মণ, কি সামান্য একদল ব্রাহ্মণ কী করেছিলেন না করেছিলেন ক্রুদ্ধ সমাজ-চোখ তার ওপর পড়েনি। তাই ব্যানার্জির ঘরে এমন কৃষ্ণা। তাদের নিজেদেরও তো স্বগোত্রে বিয়ে হয় না। স্বগোত্রের ছেলেমেয়ের ভাইবোনতুল্য। পারসিরা অন্তর্বিবাহ করেন, আজ তাঁদের লোকসংখ্যা এত কমে গেছে যে তাঁরাই ভয় পাচ্ছেন।

কস্তুরীবেন ভয়ে ভয়ে বললেন, কাজল, আমার মা যা-ই করে থাকুন, দেশকে, দেশের ভালবাসাকে ত্যাগ করেননি। তুমি নিউ জেনারেশনের ছেলে আমাকে মাকে ওল্ড ভ্যালুজ দিয়ে বিচার করবে না।

কাজল উঠে দাঁড়াল, কী বলছেন দিদি! তাই কখনও করতে পারি?

—তা হলে এতক্ষণ কোথা বলোনি। সিরিয়াস মুখে ছিলে, কেনো?

—আসলে আপনি তো বোঝেনইনি, এইসব জায়গা আমার নিজের জায়গা, ছোটবেলা। আপনার ছোটবেলা যেমন কলকাতা। আপনাকে সেখান থেকে চলে যেতে হয়েছিল আমদাবাদ গুজরাতে। দুটোই আপনার জায়গা হয়ে গেল। আমি কিন্তু ছোটবেলায় সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছি। সে একটা দুঃস্বপ্ন, আমি হয়তো জীবনেও ভুলতে পারব না। আমি নিজেই এখান থেকে পালিয়ে যাই, ক্রমে

বাঁকুড়া ক্রিশ্চান মিশন হয়ে দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন। তারপর কলেজে পড়তে কলকাতা। তাই কলকাতাও আমার নিজের জায়গা, এই জঙ্গলমহলও আমার নিজের। এইসব ভাবছিলাম।

তো তুমি কী খুঁজো!

আমি তো কিছু খুঁজতে আসিনি দিদি, আপনার বন্ধু হয়ে এসেছি। আমার খোঁজ বইয়ের পাতায়, www ডট কম-এ, নানান ওয়েবসাইট। আমি রিসার্চ করছি। খোঁজ করছি এইভাবে। তবে এখন বুঝতে পারছি নিজেকে খোঁজা আমার বাকি রয়ে গেছে। আসুন, আর দেরি করবেন না। পোকাটোকা কোথায় কামড়াবে।

১৪) তৃতীয় পর্ব

বাংলোর চত্বরে বসে ছিল মৈত্রী আর তার বন্ধু শিখরিণী। প্লাস্টিকের মোল্ডের্ড চেয়ার পেয়েছে দুটো। কিন্তু মশা না পোকার বেশ উৎপাত। অন্ধকারে চড়-চাপড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। মিঠু মিটিমিটি হেসে বলল, দেখিস আবার আমাকে মেরে বসিসনি।

শিখরিণী চিন্তিত স্বরে বলল, তুমি শিয়োর যে আমি ইতিমধ্যেই তোমাকে মেরে বসিনি?

—রতনদা— মিঠু হাঁকল।

—তোমার বেশ দা-টা বলা অভ্যেস আছে, না মিঠু? ইউ রিয়্যালি হ্যাভ চার্মিং ওয়েজ!

মিঠু আবার জোর গলায় হাঁকল, রতনদা!

অন্ধকারের মধ্যে রতন কিন্তু এসে দাঁড়িয়েছিল ঠিকই। বলল, বলুন দিদিমণি!

—একটা লণ্ঠন দিতে পারবে? আর ওই পোকার কী করি বলো তো!

—পোকার একটা তেল আমরা লাগাই। আপনি নিবেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। কী সুন্দর ছমছমে রাত, জোছনা, শালফুলের গন্ধ— ভাল লাগছে বসে থাকতে। কিন্তু এই পোকাদের জ্বালায়।..

একটু পরে রতন থালায় বসিয়ে দুটো টিবি টিবি কাপে চা-ও নিয়ে এল।

—চা আনলে কেন? দিদিরা এলে খেতাম!

—তখন আবার আনব— এখন বিস্কুট নিল— উঁরা এলে চেঁড় ভেজে দোব।

—এ কীসের তেল রতনদা, বিচ্ছিরি গন্ধ!

—করঞ্জার তেলে সব মশলা ভরা হইছে। মশলার গন্ধ দিদি।

—এ মাখলে কিছু হবে না?

—কিচ্ছু হবে না, আপনি মেখেই দ্যাখো না!

—চায়ে চুমুক দিয়ে শিখরিণী বলল, আমার কী যে ভাল লাগছে! এরকম অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনও হয়নি। বাড়িসুদ্ধু সবাই দক্ষিণ ভারত ঘুরেছি গাড়িতে। কোনও জায়গাটার চরিত্র বুঝতে পারিনি সত্যি কথা বলতে। মন্দির-ভাস্কর্য দেখেছি, আর আবার গাড়িতে...

—এ জায়গাটার মতো চরিত্রও তুই সাউথের শহর বাজারে পাবি না। ওখানে ওই মন্দির আর বড়জোর সমুদ্রই দেখবার, বোঝবার। আমি তোকে বলছিলাম না— আমি মধুপুর, গিরিডি গেছি। জায়গাগুলোই একেকটা মানুষের মতো ব্যক্তিত্বঅলা। ধর— মধুপুর যেন এক পুরাকালের রাখাল, প্রকৃতির শোভায় বুঁদ হয়ে মেঠো সুরে গান গাইতে গাইতে চলেছে। গিরিডি হল ধর— বেশ একজন গাইড, তোকে একথা সেকথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা রেভিলেশনের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে, তারপর লুকিয়ে পড়বে। হি হ্যাজ হিজ ওন মাইন্ড। আর এই গিধনির শালবন, মহুয়া, কুসুম...সব মিলিয়ে আমার কী মনে হচ্ছে জানিস?

—কী?

—তির ধনুক নিয়ে 'রাজকাহিনী'র কোনও ভিল যোদ্ধা রাতপাহারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তোর কিছু মনে হচ্ছে না?

—হচ্ছে, তোমারই মতো অনেকটা, তবে ভিল যোদ্ধা নয়, কালপুরুষ। আমার ভাগ্য নির্ধারণ করছে।

—তুই তা হলে এই জায়গাটাকে নিজের জীবনের দিগুনির্দেশক বলে মনে করছিস?

—হ্যাঁ। কিন্তু মিঠু তুমি আমার আগের প্রশ্নটার জবাব দিলে না।

—কী প্রশ্ন? আমি মনেই করতে পারছি না।

—আমি তোমাকে কোথাও আঘাত করেছি কিনা! আজ কিছুক্ষণ আগে তোমাকে আমার অনেক কথা বললাম। তুমি চুপ করে ছিলে। আঘাত পেয়েছ?

—নাঃ। শিখরিণী, আমার সত্যি কথা বলতে কী আঘাত পাওয়ার মনই নেই। আমার মায়ের, একমাত্র প্রিয়জনের ক্যান্সারে তিল-তিল করে যন্ত্রণাময় মৃত্যু দেখেছি কত বছর বয়সে! সতেরো-আঠারো, হায়ার-সেকেন্ডারি মিস হয়ে গেল। নিজের হাতে সেবা করেছি। মায়ের সঙ্গে তখন আমার আর কোনও আড়াল ছিল না। কে মা, কে মেয়ে— বোঝা যেত না। তারপর থেকে আমি, আমার ধাতটাই শক্ত হয়ে গেছে। জীবনে কিছুতেই আমি ভয় পাই না, দুঃখ পাই না!

—দুঃখ পাবার মতো কিছু ঘটলে, সেটাকে হজম করে নাও এই তো?

বললাম যে দুঃখ পাওয়ার মনটাই নেই। স্যরি। তুমি ঠিক বুঝবে না বোধহয়। তোমার জীবন আমার জীবনে বিশাল ফারাক।

—সেটা তো সব মানুষের ক্ষেত্রেই সত্যি, মিঠু। আমি তোমার কষ্ট বুঝতে পেরেছি। জীবনটা ঠিক আরম্ভ হবার সময়েই তুমি মস্ত বড় আঘাতটা পেলে। তাতে করে তোমায় খানিকটা অসাড় করে দিয়েছে। আমি তুলনা দিতে চাইছি না, তুলনা হয়ও না। আমিও কিন্তু মাতৃহীন। আমার জ্ঞানের আগেই। বাবা আবার বিয়ে করেছেন। দ্বিতীয় মা খারাপ কিছু না, কিন্তু আমি মানুষ হয়েছি দাদুর হাতে। কিছুটা মামার বাড়িতেও। তুমি পরিষ্কার করে বলো মিঠু, কাজলের ব্যাপারে তুমি আঘাত পাবে না?

—হঠাৎ তোমার এ কথা মনে হচ্ছে কেন?

—তোমরা খুব বন্ধু। লাইক-মাইন্ডেড। তোমার ভেতরে ওর মতো একটা মানুষের জন্যে...

—হ্যাঁ। কাজল আমার খুব বন্ধু, ভরসাও বলতে পারো। কিন্তু সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়। প্রফেশনে। আইডিয়ায়।

যাক, আমার মনের ভেতর থেকে একটা ভার নেমে গেল মিঠু। আমি গভীরভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। জানি আমাদের ভাগ্য নির্দিষ্ট। কিন্তু কী সেই ভাগ্য তা তো জানি না। ইতিমধ্যে কারও কষ্টের কারণ হওয়ার চেয়ে ত্যাগ করা অনেক ভাল। আমি এরকম করেই ভাবি। আমার মন থেকে সত্যিই একটা ভার নেমে গেল আজ।

মিঠুর মন থেকে কিন্তু ভার নামল না। তার সঙ্গে কাজলের বন্ধুত্ব। সত্যিই প্রেম-ট্রেমের কথা তার মাথাতেই আসেনি। কিন্তু যবে থেকে রাধিকা কৃষ্ণানের অফিসে কাজলের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, তখন থেকেই কাজল খুব দ্রুত তার জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। কেমন নিবিড় একটা সম্পর্ক, কোনও মান-অভিমান নেই, দু'জনে দু'জনের মেজাজ ও রসিকতা চট করে বুঝতে পারে, মোটামুটি ভাবনা-চিন্তার ধারাও একই রকম। কাজল যেন তারই পুরুষ-সংস্করণ, আরও অনেক পরিণত, আরও অনেক জ্ঞানী এবং কর্মী। কিন্তু দু'জনের চরিত্রের উপাদান একই। আশ্চর্য, তারা পরস্পরের অতীত নিয়ে কখনও কোনও খোলাখুলি আলোচনা করেনি অথচ, দু'জনেই জানে দু'জনের ভেতরে কোথাও একটা শূন্যতা আছে। একসঙ্গে কাজ করতে করতে পথ চলতে চলতে কী এক অদ্ভুত জাদুমন্ত্রে

সেই শূন্যতা নিজেকে ভুলে যায়। সে জানে না এটা ভালবাসা কি না। তবে এর চেয়ে নিবিড় সম্পর্ক কি আর হয়! মিঠুর বুকের মধ্যে যেখানে সেই চিরস্থায়ী ক্ষতটা রয়ে গেছে, সেখানটা ব্যথা করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল চিৎকার করে বলে ওঠে— মা, আজকে কিন্তু আমি টিফিন খাইনি, খাই নি-ই, খাব না...। কী অর্থহীন প্রতিক্রিয়া! কিন্তু তার ভেতরটা অজানা অচেনা, বা অনেক দিন আগেকার চেনা, এখন ভুলে যাওয়া অভিমানে থমথম করতে লাগল। এটা রৌনকের মনীষার জন্য ফিদা হওয়া নয়। বা বিন্দির রৌনকের জন্য দিওয়ানা হওয়া। এ অন্য কিছু। অন্যরকম। কিন্তু কাজল মুণ্ডা তার পাশে থাকবে না— এটা তার বুকের মধ্যে ক্রমশ লোহা পুরে দিচ্ছে। গৃহস্থ হয়ে গেলে কি আর মানুষ মানুষের বন্ধু থাকে?

দূরে টর্চের শক্তিশালী আলো দেখা দিল। আলোটা বাংলোর দিকে হেঁটে আসছে। শিখরিণী বলল, ওই যে বাবুদের এতক্ষণে আসা হচ্ছে।

মিঠু চেঁচিয়ে ডাকল, রতনদা!

—এই যে দিদিমণি।

—ওই ওঁরা আসছেন, চা নিয়ে এসো। সঙ্গে তোমার চেঁড় ভাজা।

হাওয়া দিচ্ছে না কোথাও। কিন্তু কেমন ঠান্ডা। গিধনির অন্ধকার আকাশে তারা ঝলমল করছে। দূরে গাছপালা ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তারা চুর শাল-মহুয়ার পাতায় পাতায় লেগে আছে।

লণ্ঠনটার দিকে এগোচ্ছে ওরা।

—তোরা এখানে?

—বাঃ অন্ধকারে কোথায় গেলি, বাঘ-ভালুকে খেল কিনা জানতে হবে না!

অল্পস্বল্প আলো পড়ে শিখরিণীকে কেমন অলৌকিক সৌন্দর্যসম্ভূত মনে হচ্ছে। কাজল আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল। আগে তো তার এই মুগ্ধতা আসেনি। হ্যাঁ মেয়েটি খুব সুন্দর, কিন্তু তার মধ্যে এই বিস্ময়, আবেশ ছিল সে খেয়াল করেনি। কেন? দিকুদের মেয়ে। মুণ্ডাদের শত্রুপক্ষীয়। হয়তো তাই। কিন্তু মেয়েটি যে তাকে পছন্দ করছে সেটা হাবে-ভাবে প্রকাশ করতেই কী একটা বিপ্লব ঘটে গেল। অন্ধকারেও শিখরিণী তার দৃষ্টি বুঝতে পেরেছে। মোহ চোখে মেখে নিয়ে সেই দৃষ্টি সে ফিরিয়ে দিল।

—দিদি, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

—একানে ওকানে। কাজলের জায়গা খুব সুন্দোর। চোমৎকার। মানুষকে একদম ঢেকে নিচ্চে।

মানে কী এ কথার কেউই বুঝল না। কিন্তু এর মধ্যে যে দারুণ একটা প্রশংসা লুকিয়ে আছে সেটা বুঝতে কারওই অসুবিধে হল না।

এই সময়ে রতন আর চিঁড়েভাজা-চা এল।

—খুব খিদে পেয়েছে, না কাজল? —কস্তুরী বললেন, তারপরে ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে বললেন, চেঁড়ো? চেঁড়োভাজা কোতোদিন খাইনি। ইস্‌স তুমাদের খেপলা খাওয়ালে আর ভুলতে পাচ্ছো না। মেহতা বাড়ির রান্নাঘরে তৈরি খেপলা। চলো, তোমাদের সবাইকে কলকাতায় ফিরেই খাওয়াব।

কাজল বলল, আপনি কিন্তু বলেছিলেন দিদি, আমদাবাদ না গেলে কিছুই খাওয়াবেন না। তার মানে আমদাবাদের নিমন্ত্রণটা আপনি ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

—তুমাদের যা হেল্‌পফুল, তাতে তুমরা আমার রান্নাঘর, আমার অফিসঘর সোব তচনচ করে দিচ্চো। হেল্‌প, হেল্‌প! তোখন কাকে ডাকব তুমাদের হেল্‌প থেকে বাঁচতে!

অর্থাৎ ঝাড়গ্রাম এবং সেখান থেকে গিধনি আসা পর্যন্ত পুরো পথটা যে মেজাজ খারাপ ছিল, তা আবার ভাল হয়ে গেছে। কী রহস্য আছে কস্তুরীবেনের এই ভ্রমণে! কাকে খুঁজছেন? কী খুঁজছেন? আজ সন্ধ্যায় অন্ধকারে গিয়ে কি তার কোনও হদিশ পেলেন? কাজলকে একা পেলে মিঠু নিশ্চয়ই জেনে নিত। কিন্তু এখন, এখানে অনেক জন। জিজ্ঞেস করা যাবে না। যা-ই হোক, তা ওঁর ছোটবেলার

সঙ্গে জড়িত, বারেবারে যেভাবে বলছেন ছুটবেলাই সোব বেলা।

এবং কলকাতা নাকি ওঁর মাতৃভূমি— মা-ল্যান্ড। কলকাতার মেয়ে ছিলেন নাকি ওঁর মা? কলকাতা-প্রবাসী গুজরাতি বা অন্য কিছু? নাকি বাঙালি? এই স্বতন্ত্র চরিত্রের কস্তুরীবেনের-অর্ধেকটা বাঙালি— ভাবতে তার খুব ভাল লাগল। তবে নিজের কাছে নিজেই সে লজ্জিত হল এ ভাবনায়। ওঁর যে অর্ধেক গুজরাতি, তা-ও খুব ভাল লাগছে। গোটা মানুষটার জন্যই তার এমন একটা শ্রদ্ধা, এমন একটা টান আসছে যে উনি কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাবেন ভাবতে তার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

শোবার আগে একটা বিদঘুটে ঘটনা ঘটল। রতন ওদের জন্য খিচুড়ি রেঁধেছিল, খিচুড়ির মধ্যে কিছু কিছু তরি-তরকারি দিয়েছে। কী তা বোঝা যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে খেতে মন্দ লাগছে না। কাজল বলল, রতনদা এর মধ্যে আবার রাজ ব্যাং, কি মেঠো ইঁদুর দাওনি তো!

—কী বললে! ব্যাং? ইঁদুর?— শিখরিণী লাফিয়ে উঠে মুখ বিকৃত করে চলে গেল। ওয়াক তুলছে।

—ওয়াক, ওয়াক।

—রাজ বেং কী জিনিস? ইঁদুর বুঝলুম— কস্তুরী বললেন।

—কিচ্ছু না, ঠাট্টা করছিলুম। শিখরিণী-ই— গলা তুলে কাজল বলল— আমরা কিন্তু এরকমই খাই। ঢ্যামনা সাপ, বিষধর সাপও মাথা কেটে খাই, তারপরে গোসাপ। গোধিকা মনে আছে মিঠু, ফুল্লরা কালকেতুর উপাখ্যানে? সেই যে কিচ্ছু না পেয়ে অবশেষে গোধিকা পেল একটা—

—যেটা স্বর্ণগোধিকা হয়ে গেল?

—স্বর্ণগোধিকাই তো ছিল! আসলে দেবী চণ্ডী। কালকেতুর ঘরের দাওয়ায় নিজরূপ ধরে বসেছিলেন আর সেই সুন্দরী দেখে ফুল্লরা ভয়ে, হিংসায় একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল। ভাবল— কালকেতু ওই সুন্দরীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ঘরে নিয়ে এসেছে। ফুল্লরার লম্ফঝম্ফ কান্নাকাটি দেখে কালকেতু অবাক।

শাশুড়ি ননদী নাই, নাই তোর সতা
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কইলি রতা!

—বলে কাজল হাসতে লাগল। আবার একবার হাঁক পাড়ল— শিখরিণী-ই। খিচুড়িতে আলু আর স্কোয়াশ ছাড়া কিচ্ছু নেই। খেয়ে নাও। রাতে খিদে পেলে কিছু জুটবে না কিন্তু।

কস্তুরী বললেন, আমার কাচে বিস্কুট আচে। লাড্ডু আচে। কুচি নিমকি আছে। তুমরা কবিতা করো, আমি প্যাকেট বার করি।

শিখরিণী এই সময়ে এসে বলল, দিদি, আমার এখন বমি পাচ্ছে, খেতে বলবেন না।

সে রাগী চোখে কাজলের দিকে চেয়ে বলল, খাবার সময়ে বিশ্রী বিশ্রী কথা! ছিঃ!

কাজল বলল, বিশ্রী কথা কেন হবে? কলকাতার ভদ্রলোকেরা লালচে লালচে নরম মেঠো ইঁদুরের কাবাব দিব্যি খেতে ভালবাসেন। আর ব্যাং তো চিন, জাপান, কোরিয়া এসব জায়গায় ডেলিকেসি। ইউরোপীয়, আমেরিকানরাও দিব্যি খায়। হাঙর, কুড়কুড়ে করে ভাজা অক্টোপাস! কলকাতার হোটেলে মুরগির কাটলেট বলে তো ব্যাং কি পায়রাই দেয়। খাও তো!

—আচ্চা আচ্চা অনেক মেনু বলে ফেলেচ। একন একটু সামলাও। কস্তুরী হেঁকে উঠলেন।

—না, এরা সব সামন্তভূমিতে এসেছে। ট্রাইব্যাল-বেল্ট। আমরা কী খাই, কী পরি, কীভাবে বাঁচি— না-জেনে, না-দেখেই ফিরে যাবে?

—সামন্তভূমিটা কী? —মিঠু জিজ্ঞেস করল।

—আদিবাসীরা তো প্রাগৈতিহাসিক। তাদের নিয়ে অনেকরকম স্পেকুলেশন আছে। সামন্ত থেকে সাঁত। সাঁওতাল, সাঁওতাড়। এরকম একটা ধারণা আছে।

—তার মানে সাঁওতালরা সামন্ততন্ত্রে বাস করত? ফিউড্যাল সোসাইটি!

—হতে পারে ওরা সাদা মানুষদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় এসেছিল। সামন্ত হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখত। শেষ পর্যন্ত নিজেরাই নিজেদের পরিচয় ভুলে যায়। আবার উলটোটাও হতে পারে, সাঁওতাল থেকেই সামন্তভূমি, যেমন ধিরি থেকে ধৃ। তবে আদিবাসীরা সবাই নিজেদের 'হড়' বলে। 'হড়' মানে মানুষ।

—হড় কুথা থেকে এলো, তুমার শাস্ত্র কী বলে?

—সে এক গল্প। বাইবেলের জেনেসিসের সঙ্গে মিল আছে খানিকটা।

—কীর্কম?

—দিদি, আমি যা পড়ে জেনেছি, তা হল, ঠাকুর আর ঠাকরান থাকতেন পুব দিকে। পৃথিবী তখন জলময়। মাটি অনেক নীচে। ঠাকুর জিউ কাঁকড়া, হাঙর, কুমির, রাঘববোয়াল, কচ্ছপ সব সৃষ্টি করলেন। তারপর মাটি দিয়ে মানুষ গড়লেন কিন্তু আকাশ থেকে সূর্যের ঘোড়া সিঞ সাদম একটা রুপোলি সুতো— তড়ে সুগম দিয়ে নেমে ভেঙে দিল। তখন নিজের বুকের ময়লা দিয়ে হাঁস আর হাঁসালি গড়লেন, ফুঁ দিলেন। তারা উড়ে বেড়াতে লাগল। তবে হাঁস হাঁসালি কিন্তু কণ্ঠার দু'দিনের দুটো হাড়েরও নাম। গড মেড ম্যান ইন হিজ ওন ইমেজ। আর আদমের পাঁজর থেকে ইভ তৈরির গল্পও তো আমরা সবাই জানি। বিয়ের সময়ে আমাদের কনেকে হাঁসুলি উপহার দেওয়া হয়, কণ্ঠার হাড়ের ওপর লেগে থাকে— তাই হাঁসুলি।

—আমাদের মঙ্গলসূত্রের মুতো! —কস্তুরী বললেন।

—তাই। এই হাঁস হাঁসালি থেকেই হাড়াম ও আয়ো বা পিলচু হাড়াম, আর পিলচু বুড়ি অর্থাৎ প্রথম মানব-মানবী জন্মাল। আদম-ইভের সঙ্গে সাদৃশ্যটা আরও স্পষ্ট হল— তাই নয়?

—সত্যিই তো! মিঠু অবাক হয়ে বলল।

শিখরিণী গুটিগুটি এসে বসেছিল তার ফেলে যাওয়া পাতে। ভীষণ খিদে পেয়েছে। এখানকার জল এত ভাল! সে এক গ্রাস মুখে দিল।

কস্তুরী বললেন, গুড গার্ল।

—আমাদের ব্রহ্মার বাহনও কিন্তু হাঁস। কোথাও একটা যোগাযোগ থাকতে পারে। —গুড গার্ল শিখরিণী বলল।

হতে পারে— কাজল বলল— হিহিরি পিপিড়ি দ্বীপে শ্যামা ঘাস আর সুস্তুবুকুচ ঘাসের বীজ ছড়িয়ে দিলেন ঠাকুরজিউ। ইতিমধ্যে লিটা তাদের বাখার বা হাঁড়িয়া করতে শেখালেন। মারাং বুরুর নামে হাঁড়িয়া নিবেদন করে যে-ই না প্রসাদ খাওয়া অমনি হয়ে গেল বিপ্লব। হাড়াম আয়োর লজ্জা হল, বটপাতা পরলেন— কী দিদি, আদম ইভ আর শয়তানের গল্পের সঙ্গে মিলছে?

মিলছে তো বোটেই। এরকম কহানি তুমাদের মিশনারি শিখায়নি তো? সরল মানুষ নিজেদের মুতো করে নিজেদের ভাষায় তৈরি করে নিয়েছে?

—বোধহয় না। এগুলো ওর‍্যাল ট্র্যাডিশন, শ্রুতি, বহুকাল ধরে বংশপরম্পরায় চলে আসছে। তবে একটা বৈশিষ্ট্য বা তফাত— বাইবেলে শয়তান হল ভগবানের শত্রু, খারাপ লোক। কিন্তু এই লিটা বা মারাংবুরু আদিম জনগোষ্ঠীর একজন প্রধান দেবতা। মানে, জ্ঞানবৃক্ষের ফলকে সাদরে গ্রহণ করেছিল এরা। দুঃখের বিষয় জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে কিছু জাতি বিজ্ঞান, বিদ্যা, শাস্ত্র, সাহিত্য, ভাষাচর্চা করে কোথায় উঠে গেল! এদের জ্ঞান শুধু হাঁড়িয়ার ইনটকসিকেশনেই সীমাবদ্ধ রইল। হাঁড়িয়া উৎসবে, পূজায়— সর্বত্র ছড়িয়ে গেল।

শিখরিণী বলল, আমরা যে-সোমরসের কথা শুনি, তা-ও তো একরকম লতার নির্যাস। সুরা, ইনটকসিক্যান্ট। দেবতারা সোমরসের ভোগ খুব ভালবাসেন। কিন্তু সোমরসে তো তাঁদের বুদ্ধি লোপ হয়নি!

—মানে যোতো দিন মানুষ তোতো দিন নেশা— কস্তুরী বললেন। আসল কথাটা চাপা পড়ে গেল।

ওরা দেখেনি রতন কিসকু ওদের খেতে দিয়ে অন্ধকারে এক জায়গায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। এই সময়ে বলে উঠল, দাদাবাবু, পারিশ ভাগের কতা তো কই বুললেন না।

কাজল চমকে উঠল। আর সবাইও তারই মতো চমকেছিল। ঠিক যেন কোন অতীতের সামন্তভূমি এই অতিথিদের কাছে তার ইতিহাস অসম্পূর্ণ রয়ে যায় দেখে কথা কয়ে উঠল।

—তুমিই বলো না। সে আস্তে করে বলল।

—রতন বলল, ইঁদের ছেল্যা মেয়্যা হঁল। সাঁত জুড়ার সাঁত কুঠরি হঁল বিয়্যা হঁল। তবে না হড়হপন জাতি। ঠিক হঁল ভাই-বুনে বিয়্যা হবে না। তাই পারিশ ভাগ হঁল। সাঁত পারিশ। মুর্মুগণ পূজারী, কিসকু রাজা, হাঁসদা মার্ণ্ডি ধন লিয়ে লাড়েচাড়ে। হাঁসদা বড় ছেল্যাটি, হেমব্রম জাগিরদার, সরেন সৈন্য, যুদ্ধ করে। টুডু-বাজনদার, কামার, আর মার্তি— কন কঁরত্যান স্মরণ নাই।

তাঁর পর সব লক খারাপ হঁইয়া গেল। ঠাকুর সাত দিন সাত রাত্রি আগুন জল বর্ষা করিলেন। সব মরিল। শুধু হারাতা পর্বতের গুহায় যাঁরা বসত ছিলেন, তাঁরা বাঁচল। তারপর বর্ষা থামিলে সব বার হয়্যাঁ অনেক পশু-পক্ষী পাইলেন, আবার সব বসাল। সাঢ়াংবেডায় বাস করিল। সিখানে সাবেক সাত খুঁট বাদে আর পাঁচ খুঁট হঁল— বাস্কে, বেশরা, পাঁউরিয়া, চঁড়ে, আর এক খুঁট হারাঁয়্যা গেছে বডয়া। বাস্কেরা ব্যাবসা বাণিজ্য করত্যাঁ থাকেন— এইটুক জানি।

—হারাতার সঙ্গে আরারাতের মিল দেখেছেন দিদি? —কাজল বলল।

—ঠিক বুলেচো তো! আমার চিনা চিনা লাগচিল। ডেলুজ, ক্রিশ্চান ও হিন্দুদের। প্রথমে সোব জোল ছিল, না? পুরা কাহিনীই এর্কম। জোলে পৃথিবী ভাসল, প্রথমে মৎস্য অবতার হল, তারপর কূর্ম অবতার, স্থোলে জোলে বিচরণ কোরে। তারপর স্থোলের জীব বরাহ। তারপোর পশু মানুষ মিলিয়ে নৃসিংহ। তারপোর বামন। ডোয়ার্ফ। প্রথম এক্সপেরিমেন্ট কোরতে গিয়ে ভোগোবান প্রোপোর্শন ঠিক রাখতে পারেননি। সোব গোল্পেই আদিবস্তু জোল। তা থেকে ইভলিউশন! তুমাদের মিথ খুব সুন্দর।

উষা এসেছে দিগ-বিদিক আলোয় বিদীর্ণ করে। সরে গেছে সামন্তভূমির ঘনীভূত অন্ধকার। কস্তুরী উঠে পড়েছেন খুব সকাল সকাল। ভোর দেখছিলেন। রাত্রি কালো, সব ঢেকে দেয়, তাই সে রহস্যময়ী, অথচ দিবারই নিজের উল্টো পিঠ সে। প্রকৃতির দুই দিক। কেমন করে এই অমানিশা দিবায় এসে মেশে, সন্ধিলগ্নটা দ্যাখবার তাঁর বড় ইচ্ছে ছিল। জীবনে বহুবার দেখেছেন। কিন্তু ঠিক এই পটভূমিতে নয়। গত রাতে খুব ভাল ঘুমিয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন চাঁদ অস্ত গেছে। কিন্তু তারার কী জোরালো পেনসিল টর্চের মতো আলো! আশ্চর্য! নিঃশব্দে মশারি তুলে উঠে পড়লেন, মুখটুখ ধুয়ে সোজা বাইরের চত্বরে এসে দাঁড়ালেন, তখনও মনে হচ্ছিল দূরে যেন গুঁড়ি মেরে কে বা কারা দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে। সিঞ সাদাম। সূর্যের ঘোড়া সব ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে। শাল গাছের ফাঁক দিয়ে একটা তির্যক আলোর রেখা এসে পৌঁছে গেল লাল মাটিতে। 'তড়ে সুগম', 'তড়ে সুগম'। *পবিত্র সুতা— এই রশ্মিরেখা ধরেই মনুষ্যলোকে পৌঁছোয় সূর্যের ঘোড়া।* কাল যেন কাজল কথাগুলো ব্যবহার করেছিল। মনে থাকেনি। এখন দিনের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে— 'সিঞ সাদম' 'তড়ে সুগম'।

কস্তুরী যেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। এ যাত্রা এত তীর্থযাত্রার মতন। কেদার বা অমরনাথ যাত্রার চেয়েও দুর্গম। কিন্তু পথ ওই রকমই সুন্দর। যেমন পাহাড় তার ঐশ্বর্য— তুষার, ফুল, ঝরনা, রং ছড়িয়ে রাখে যাত্রাপথে, এই ভূমিও তেমনই উদার হাওয়ায়, শান্ত নীল সমুদ্রের মতো আকাশে, আশ্চর্য জ্যোতির্ময় সব জ্যোতিষ্কে এবং মানুষের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গাছে গাছে সুন্দর করে রেখেছে পথ। *কী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে এই পথের শেষে!*

মিঠু যে কখন এসে পাশে বসে আছে তিনি বুঝতেই পারেননি। কয়েক দিনের মধ্যেই এই মেয়েটির মধ্যে কী একটা পরিবর্তন এসেছে তিনি ধরতে পারছেন না। ওর চঞ্চল হরিণের মতো চোখে যেন এখানকার সমুদ্র-নীল আকাশের ছায়া পড়েছে। ও সাধারণত খুব উজ্জ্বল, স্মার্ট— মাউন্টেনিয়ারিং করেছে, হবে না? কিন্তু ও-ও যেন এই জায়গাটার সম্মোহনে পড়ে কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। অবশ্য এ-ও হতে পারে, এটাও ওর একটা রূপ। কাজের মধ্যে মেলামেশার মধ্যে একরকম। আবার কাজের বাইরে, শান্ত বনগন্ধঅলা ভোরবেলায় অন্যরকম। এর মধ্যে তিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী ছেলেমেয়েদের দুর্বিনীত ডেভিল-মে-কেয়ার ধরনধারণ দ্যাখেননি ঠিকই। কিন্তু ইতিহাস নিয়ে কোনও মাথাব্যথাও দেখেননি।

দূর থেকে হঠাৎ চাপা পুরুষালি গলায় গান ভেসে এল

হিহিড়ি পিপিড়ি রেবন জানামলেন,
খজ-খামান রেবন খজলেন,
হারাতা রেবন হারালেন।
সাসাং বেডারবন জাতেনা হো।
হিহিড়ি পিপিড়ি...হিহিরি পিপিড়ি...

কেরোসিনের ঝাঁঝ পেলেন যেন। একটু পরেই রতন কিসকু, সামন্তভূমির পূর্বতন রাজবংশের সন্তান, মোটা মোটা কাচের গেলাসে চা অ্যালুমিনিয়মের থালা— বসিয়ে নিয়ে এল।

—আর দাদাবাবু দিদিমণি কখন আসবেন?

—একটু কাজ করবে রতন, আমাদের ঘরে কাপড়ের ব্যাগ আছে—একটু নিয়ে আসবে? কুচি নিমকি দিয়ে আমরা চা-টা খেতে পারি। —কস্তুরী বললেন।

—দিদিমুনি ঘুমাচ্ছেন— খুব সংকুচিত স্বরে রতন বলল।

—আমি নিয়ে আসছি দিদি— আবার সেই এন.সি.সি, ট্রেকার। টক করে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক লাফে বাংলোয় চলে গেল।

কয়েকটা লতাপাতার গোড়া, একদল ডেঁও পিঁপড়েকে পাশ কাটিয়ে লাফ দিয়ে পার হয়ে মিঠু উঠে গেল। ওর গায়ে এখনও কী রকম কাঁটা দিচ্ছে... ওই গানটা হিহিড়ি পিপিড়ি রেবন জানামলেন, হিহিড়ি পিপিড়ি। রতন কি ওদের জন্মের সময়কার গান গাইছিল? 'জানামলেন' কি জন্মালেন! হিহিড়ি পিপিড়িতে জন্মালেন! একটা শিশু জন্মালে যেমন তার জন্য নানা রকম আচার পালন হয়—আটকৌড়ে, ষষ্ঠীপুজো...ছড়া গান...একটা মানবগোষ্ঠীও তেমন তার জন্মের গান বেঁধেছে। হিহিরি গিগিড়ি...

ঘরের মুখে ঢুকতে গিয়ে সে একটা ধাক্কা খেল। শিখরিণীর বিছানা পরিপাটি করে গোছানো, অর্থাৎ সে উঠে পড়েছে। এবং পাশের ঘর অর্থাৎ কাজলের ঘর থেকে দু'জনের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে।

শিখরিণী একটু উত্তেজিত— তোমার কাছ থেকে এটা আমি আশা করিনি কাজল, তোমার জানা উচিত আমার মতো একজন মেয়ে খাওয়ার সময়ে সাপ ব্যাঙের কথা বললেই রি-অ্যাক্ট করবে?

কাজল— কী করে জানব? বললামই তো আমার দেশে যখন এসেছ, আমাদের কথা তোমার জানা উচিত। বলিনি?

—কিন্তু তুমি তো এখান থেকে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে গেছ। নিশ্চয় আবার ফিরে আসতে চাও না?

—যদি চাই?

—শুধু শুধু আমাকে রাগাচ্ছ কাজল। ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে তোমার জন্য কত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে। ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল।

মিঠু আর শুনল না। দিদির পুঁতির কাজ করা গুজরাতি ঝোলাটা নিয়ে নিঃশব্দে চলে এল।

কুচো নিমকি দিয়ে রতনের কড়া চা মন্দ লাগছিল না।

কস্তুরী বললেন, দ্যাখো, রাজার ভাত রাজার বংশ আজ চা করচে। টুরিস্টদের সেবা করচে।

—দিদি, আপনি কি সত্যিই মনে করেন চিরকালই যারা রাজা তারাই রাজা থাকবে? মিঠু চায়ের কাপটা পাশে নামিয়ে রেখে বলল, তাদের শিখতে হবে না, নিজের কাজ নিজের হাতে করে নেওয়া, অন্যের সেবা করা!

ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন তো এই নিয়েই হয়েছিল! ড্রিঙ্কিং চকোলেটটা পর্যন্ত নফর জমিদারের মুখে ধরছে, তবে তিনি কোনওক্রমে খেয়ে নিচ্ছেন। খাওয়াটা তো আর অন্য কেউ করে দিতে পারবে না! জমিদারদের অত্যাচারে রাশিয়ার ভূমিদাসদের কী অবস্থা হয়েছিল মনে করুন। আজ সেই জমিদাররা কোথায়? ইংরেজ দুশো বছর ধরে আমাদের শাসন করে গেছে, মুঘল পাঠানরা তারও আগে ছশো বছর। কোথায় তারা? এরা তো তবু হালদার। দেশের মধ্যেই জাতির মধ্যেই কি ক্ষমতার হাতবদল হয় না? এটাই তো স্বাস্থ্যকর দিদি! এটাই তো ঠিক।

কেন যে মিঠুর গলায় একটু তার্কিক সুর— তিনি বুঝতে পারলেন না।

মিঠু বলল, বহু শতাব্দী ধরে বঞ্চিত— ঠিক কথাই। কিন্তু এখন যে নিজেদের রাজ্য হয়েছে, প্রাকৃতিক সম্পদে এত ধনী, ওই মার্ণ্ডি, ওই হেমব্রম, সরেন, হাঁসদা যাদের কথা সাঁওতালি হিস্ট্রিতে শুনলেন— তারা কি পারছে সামলাতে! তারা কি ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের পেটমোটা করছে না! জাস্ট লাইক আদার্স? দিস ইজ ডিসগ্রেসফুল। আর ধরুন, যারা আধুনিক শিক্ষা পাচ্ছে, সুযোগ পাচ্ছে, তারা কি নিজের দেশের জন্য, নিজের মানুষদের জন্য কিছু করছে? করছে না। স্বার্থপরের স্বর্গে বাস করছে তারা।

কাদের কথা বলছিস রে মিঠু! পেছনে কাজল এসে দাঁড়িয়েছে, তারও পেছনে কালোর সঙ্গে চমকপ্রদ কনট্রাস্টে শিখরিণী।

হঠাৎ এক ঝলক হাসল মিঠু, রাগ ঝাল কিছু নেই। সে বলল, তোদের মতো লোকদের কথা ভাবছিলাম কাজল। আমি জানি না, কেন তুই তোর নিজের সমাজের জন্য কিছু করিস না!

—আগে কথাটা কখনও মনে হয়নি তোর?— কাজল একটু যেন উত্তেজিত।

—না হয়নি, কেননা তখন আমি এখানে আসিনি, রতনদাদের দেখিনি, হিস্ট্রিটা শুনিনি। কিছুই জানতাম না।

—তবু তো হিস্ট্রির কিছুই শুনিসনি। হড় জাতির এক্সোডাস শুরু হয়েছে সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে। সাসাংবেডা থেকে গোত্র ভাগ হয়ে জারপি দেশ, সেখানেও টিঁকতে পারা গেল না, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে এক বিশাল পর্বত পথ আটকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মারাংবুরুর অর্থাৎ জঙ্গলের দেবতার পূজা করে সে পথ বা সিংদুয়ার খুলল। সেখান থেকে বাঁয়ে এসে 'আয়রে' দেশ, তারপর 'কাঁয়ডে' দেশ, তারপর 'চাঁই' দেশ— দুটো পথ ছিল চাম্পাদুয়ার আর চাঁইদুয়ার। চাম্পাতে আমরা স্বাধীন ছিলাম, প্রত্যেক গোত্রের আলাদা গড় ছিল। তারপর সেই একই ইতিবৃত্ত। দিকুরা এসে সব কেড়ে নেয়। জঙ্গল পরিষ্কার করে বসত স্থাপন করলেই দিকুরা নিয়ে নেয়। চাম্পা পর্যন্ত আমাদের হড় জাতির এক ইতিহাস। তারপর মুণ্ডা, শবর, কুঁড়বি ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে গেল। চাম্পা থেকে তড়েপুখুড়ি, আবার তাড়া তারপর বাড়িবারওয়া। তারপর শিরে দেশ বা শিকার দেশ। শিকার রাজার সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করলাম কিন্তু দিকুরা সেখান থেকেও আমাদের তাড়াল। অজয় নদ পার হওয়া আমাদের পূর্বপুরুষের বারণ ছিল। কিন্তু পেটের দায়ে গুটিপোকার মতো এই সাঁওতাল পরগনায় চলে এসেছি। আর একদিন আর কোথাও চলে যাব। ঝাড়খণ্ড কি আর শেষ পর্যন্ত আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে। মনে হয় না। ভারতের তাবৎ জাতি কাঙাল প্রকৃতির, বেসিক্যালি। কাঙালদের শাকের খেত দেখালে যা হয় আর কি।

কস্তুরী বললেন, তুমরা হিস্ট্রি নিয়ে এতো কী ঝগড়াচ্ছো! হিস্ট্রি এক বিশাল আমাজন নদীর

স্রোতের মুতো। সে তার নিজের ভেতরকার লুকুনো কারেন্টে বয়ে যায়। কেউ জানবে না কুথায় নিয়ে আমাদের ফেলবে!

—সবাই যদি পূর্বনির্ধারিত দিদি, হিস্ট্রি যদি তার নিজের দুর্বোধ্য পথেই চলে, তা হলে আর এত বিপ্লব, এত শিক্ষাসচেতনতা, এত লড়াই, সমাজসেবা কেন?— মিঠু দাঁতে নখ কাটছে।

—না দিদিমোণি, আমি বলতে চায়ছি কি এইসোব বিপ্লব, লোড়াই, সোব সেই ইতিহাসের ওঙ্গ, তার নিজের একটা গোতি আচে।

—তা হলে আপনি কেন, আপনারা কেন আপনাদের সময়ের স্বপ্ন পূর্ণ হল না বলে দুঃখ করেন? কেন গান্ধীজি অনশন করে পার্টিশন আটকালেন না, কেন সুভাষ রহস্যময়ভাবে মারা গেলেন, কেন জওহরলাল, বল্লভভাই, জিন্নাহ, মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে মাঝরাতের সমঝোতায় কেনা খণ্ডিত স্বাধীনতা অ্যাকসেপ্ট করলেন— এসব তো আজ ঘটে-যাওয়া ইতিহাস। সে নিয়ে দুঃখ করে তো লাভ নেই! ইতিহাসের নিজস্ব গতি!

আর দ্যাখ কাজল, হঠাৎ যে তুই এই দিকু-দিকু করে আমার সঙ্গে, শিখরিণীর সঙ্গে, হয়তো বা দিদির সঙ্গেও তোদের শত্রুদের ইকোয়েট করছিস— এটা কিন্তু ঠিক করছিস না। তুই হঠাৎ কেন ক্যারেড অ্যাওয়ে হয়ে গেছিস। তোর আত্মপ্রত্যয়, সেলফ-পজেশন আমার শ্রদ্ধার জিনিস। তোর থেকে এটা আশা করিনি।

—তা হলে কী আশা করেছিলি। তোদের শ্রদ্ধার পাত্র হবার জন্যে যা যা ছকে দিচ্ছিস, তাই আমায় করতে হবে? হতে হবে? আ অ্যাম নট অ্যাফরেড টু লুজ ইয়োর রেসপেক্ট অ্যাজ লং অ্যাজ আ'অ্যাম মাইসেলফ।

কস্তুরীবেন বৃথাই ওদের কুচি নিমকি আর লাড্ডু নিয়ে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কাজল দূরে গিয়ে বুকের ওপর হাত আড়াআড়ি করে দাঁড়িয়ে রইল। মিঠু চেয়ারে বসে রইল রাগত মুখে। আর শিখরিণী সামনে বলতে লাগল, মিঠু এত রেগে গেলে কেন? কী হল? দুর তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। কবেকার কী হিস্ট্রি, সেটাকে এমন ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছ কেন? তুমিও আর সেই দিকু নেই, কাজলও আর সেই মুণ্ডা নেই।

কাজল পেছন ফিরে শান্ত গলায় বলল, য়ু আর রং শিখরিণী, আই'ল রিমেন আ মুণ্ডা অল মাই লাইফ। আমি কিছুর জন্যই আমার জাতি পরিচয় বিসর্জন দেব না। সে তাদের জন্য পলিটিকস বা পতিতোদ্ধার জাতীয় কিছু করি বা না করি।

কোথায় সুর কাটছে, কেন, কস্তুরী বুঝতে পারছেন না। এতদিন একটা পারস্পরিক ভাল লাগা, বিবেচনার, এমনকী বশংবদতার মধ্যে এদের পরিচয় পেয়েছেন। মিঠু ছেলেমানুষ, সবচেয়ে প্রাণোচ্ছল, সবকিছু করতে তৈরি, আপাতদৃষ্টিতে চঞ্চল, কিন্তু ওর ভেতরে লুকোনো সমুদ্র আছে। হয়তো বা দুর্বিনীত ভয়ংকর ঘূর্ণিপাক। মাঝেমাঝে, চকিত দর্শন দিয়েই তা আবার ঢেকে যায়। নীল আকাশে হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানি। শিখরিণী মেয়েটিকে তিনি এখনও ঠিক বুঝতে পারেননি। ও মিঠুর বন্ধু। কিন্তু কোনওভাবেই মিঠুর মতো নয়। অনেক শান্ত, মিঠুর মতো চটপটে নয়, চটপটে হতে ওর ইচ্ছেও যে আছে তা মনে হচ্ছে না। ওর ব্যক্তিত্বটা একেবারে তৈরি হয়ে গেছে। বেশ সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব, কিন্তু সেটা আর পালটাবে না। ও জীবনকে যেভাবে বুঝেছে সেভাবেই বুঝবে, বুঝতে ইচ্ছুক। ওর নিজের পটভূমি কলকাতায় ও অনেক স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, কিন্তু এই যাত্রাটাতে যেন ওর মহিমা ফুটছে না। ও প্রকৃতি উপভোগ করছে ঠিকই, কিন্তু কেমন বাইরে থেকে। ও অভিভূত হয় না। একটা দার্শনিক প্রকৃতিস্থতা আছে ওর মধ্যে। যেন কোনও লুকোনো অভিপ্রায়। সেই অভিপ্রায়ে ও অচল অটল।

কাজলকে তাঁর সবচেয়ে পছন্দ। কাজল সত্যি সত্যি এ যাত্রায় তাঁর যথার্থ যাত্রাসঙ্গী। কেননা দু'জনেই এক ধরনের অন্বেষণ-সূত্রে বাঁধা। তিনি খুঁজছেন তাঁর হারানো দিন, তাঁর মাকে। কাজল

অবশ্য তার দেশ ও ইতিহাসকে খাতায়কলমে খুঁজছে, তবু জন্মস্থানে এসে হারানো শৈশব, হারানো আপনজনের প্রতি ওর কেমন একটা নৈর্ব্যক্তিক আগ্রহ। সেটাকে টান বলা যাবে না, তাঁরটা যেমন টান। কিন্তু....কিন্তু কী এক মমতা ছেলেটাকে এই মুহূর্তে অধিকার করে রেখেছে একটা মায়ার মতো সেটা তিনি টের পাচ্ছেন। ও বলছে ও পলিটিকসে জয়েন করবে না, এটাতে কিন্তু নিজের লোকেদের উন্নয়নের কিছু সুযোগ ছিল। ও সমাজসেবাও করতে চাইছে না। ও কী চায়? ও কি বিশুদ্ধ অ্যাকাডেমিক! ধাতটাই বিজ্ঞান-গবেষক, পণ্ডিতের?

—আমি ভিতরে গিয়ে চান করে নিচ্চি। আজ আমি ওই জঙ্গলের ইনটিরিয়রে যাব। তুমাদের যদি ঝোগড়া থাকে তো তাই করবে। আমি একা যাবো। ইন ফ্যাক্ট একা যেতেই আমার পোছন্দ হচ্ছে।

তিনি আর অপেক্ষা না করে পুঁতির কাজ করা লাল থলিটা চেয়ারের ওপর ফেলে রেখেই চলে গেলেন। ইয়াং পিপল মানেই ঝোপড়া আর ঝোগড়া, আর ওল্ডার পিপল মানেই সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি— তবে কোথায় যাবেন তিনি? কাউকে নিবেন না, ডাকা তো দূরের কথা। তিনি তাড়াতাড়ি করে নিজের ঘরের দিকে চলতে লাগলেন।

এখানকার জল কীরকম ঠান্ডা। কিন্তু ছ্যাঁক করে ওঠে না শরীর। রতন বলছিল কুয়ার জল কখনও বেশি ঠান্ডা, বেশি গরম হয় না। শীতল যাকে বলে। চান করে মনে হয় একটা নতুন জীবন পেলেন। পোশাক পরে একেবারে নীচে নেমে গেলেন। মনে মনে আবার বললেন— কাউকে নিব না। একা একা যাব। কারো তুমরা ইয়াং জেনারেশন তুমাদের ঝগড়া।

রোতন, আর একটু চা হোবে? —চা-টা প্রায় শেষ করে এনেছেন, হঠাৎ পেছন থেকে লাফ মেরে সামনে চলে এল মিঠু— দিদি পিলচু বুড়ি এসে গেছে। সে এখন রীতিমতো ট্রেকার, টাইটস আর টিশার্ট পরা, কোমরে বেল্ট, যেখানে টাকা পয়সার থলিটা থাকে সেখানটা দেখিয়ে বলল, কুকরি। পিঠেও একটা ছোটখাটো রুকস্যাক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাজির কাজল— সে শুনতে পেয়েছে মিঠুর কথা। হাসছে, বলল, হাড়াম আয়ো সব হাজির দিদি।

পেছনে পেছনে শিখরিণীও হাজির। সে আজকে সবুজ পাতার রঙের একটা সালোয়ার কামিজ পরেছে। দেখাচ্ছে খুব সজীব। বলল, আমরা কি এবার যাব, দিদি?

—হাড়াম আয়ো হড় হপন সোব যুদি রেডি তো ঠাকরান আর কী কোরে! মৃদু হেসে কস্তুরী বললেন।— সৃষ্টির আদি ওগাধ জোলে ভেসে পোড়া যাক। তুমরা চান করলে না?

—তা হলে ঠাকরান জিউকে ধরা যেত না। যেরকম মেলট্রেনের মতো ছুটছিলেন! —কাজল বলল— তা ছাড়া, কোথায় যাব, কত ময়লা, ধুলো, মাটি, ঘাম— এসে চান করাই ভাল।

তারও কাঁধে একটা ঝোলা। বলল, আপনার নিমকি লাড্ডুর থলিটা নিয়ে নিন দিদি। কাজে লেগে যেতে পারে।

শিখরিণীর কাঁধে একটা বড় চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ।

চতুর্দিকে পুটুস ঝাড়। সাদা-হলুদ কুটিকুটি ফুল ফুটে আছে। বনতুলসীর ঝোপ এত দুর্ভেদ্য যে তার মধ্যে দিয়ে পথ বার করাই দুষ্কর। ঝাড়ের পর ঝাড় এড়িয়ে পথ বার করে কাজল। সার বেঁধে সবাই ঢোকে।— শিখরিণী, তোমার জুতো কিন্তু এই যাত্রার উপযুক্ত নয়, পোকামাকড় পিঁপড়ে...মিঠু ওকে বলে দিসনি স্নিকার কি কেডস পরে আসতে!

মিঠু বলল, আমার একদম খেয়াল ছিল না।

ক্রমে শালের চারা বড় হতে থাকে, মহুয়া আরও গাঢ় সবুজ। কেঁদ গাছ দেখিয়ে দিল কাজল— মহুয়ার সঙ্গে খুব একটা তফাত বুঝতে পারল না কেউই।

এর কাঠ দিয়ে তোদের ফার্নিচার হয়। শাল দিয়ে তো হয়ই জানিস নিশ্চয়। শালপাতায় করে হিঙের কচুরি— আহ স্বাদই আলাদা।

শিখরিণী আর মিঠু চোখাচোখি করে হাসল। এই খুনসুটিটা বোধহয় কাজল আজ সারাদিনই করে যাবে।

অনেকক্ষণ চলবার পর ওরা দু'-একজন মেয়ের দেখা পেল, তারা শালপাতা ছিঁড়ে বোঝা করছে। ক্রমশই এরকম মেয়ে সংখ্যায় বাড়তে থাকে।

—কী করছ গ— কাজল একজনকে শুধোয়!

—তাতে তুমার কী? —মেয়েটি নিজের কাজে মগ্ন, উত্তর দেবার সময় নেই।

—এখানে কাঁচা শালপাতাও খুব চলে বুঝলেন দিদি! কাঁচা, শালপাতায় করে যদি স্রেফ ভাত আর ডাল কিংবা শাক খান, আপনার আর কিচ্ছু লাগবে না, শালপাতার এমনই চমৎকার গন্ধ। তবে এই আমিষাশী শহুরে মেয়েদের কী লাগবে বলতে পারছি না!

—শালের গোন্ধও চোমৎকার, তা তুমার পিছনে কাটিও চোমৎকার। উত্তর এল দিদির কাছ থেকে।

আস্তে আস্তে ছাগলছানা, ছানাপোনা সমেত ছাগলি, একাবোকা রামছাগল একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে শিং বাঁকিয়ে দিগন্ত দেখছে। একটা-দুটো বাছুর হামলাচ্ছে। কচি গলা, শুনলেই বোঝা যায়। গোরু চলে গেল কয়েকটা, পেছনে পাচনবাড়ি হাতে একটি বয়স্ক লোক।

—ছুট ছেল্যা নাই, বাগালি কঁরছো? —কাজল আবার শুধোয়।

ছোট ছেলেমেয়েরা পড়তে গেছে ইস্কুলে— সোজা সরল বাংলায় বলল লোকটি।

একটু অবাক হয়ে মিঠু আবার শিখরিণীর দিকে তাকাল।

আর খানিকটা গিয়ে শস্যখেত। —জুনুর— মানে ভুট্টা— কাজল বলল। মনসাপুজো না হওয়া পর্যন্ত জুনুর খাওয়া বারণ। বুঝলেন দিদি?

শিখরিণী বলল, আমরা যেমন সরকারী পুজোর আগে কুল খাই না।

বাজরার খেত পড়ল। আলু, অড়হর ডাল। তারনর আস্তে আস্তে দুটো-একটা করে কুটির। একটি কুটিরের দাওয়ায় এক মা তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল, কৌতূহলী চোখে তাদের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বুকের কাপড় টেনে, বলল— টুরিস্ট? আসেন না, বসেন না গ,—মহিলার বিস্মিত দৃষ্টি শিখরিণীর দিকে।

এক পা দু'পা করে এগিয়ে ওরা দাওয়ার বসছিল। মেয়েটি ভেতর থেকে পাতার মাদুর এনে দিল। —এই ঠেঁ বসেন। বাচ্চাটিকে বোধহয় ভেতরে শুইয়ে এল।

—এ কার ঘর? —কাজল জিজ্ঞেস করল।

—ইটা হারান মল্লিকের ঘর।

—লোধা হও?

—লোধা বলেন লোধা, মুণ্ডা বলেন মুণ্ডা। আমরা তো আর বনের জংলি নাই। আমারদের খেতিবাড়ি আছে। ছাগল পালি। মোরগ আছে।

—ছেলেপুলেরা সব কই?

—উরা সব ইস্কুলে পড়তে যাঁইছে।

—স-ব?

—স-ব! এ-লোধা, মুণ্ডা, কিসকু, হাঁসদা— স-ব ছেলেমেয়ে পড়ছেঁ।

—বাড়ির বড়রা?

—কাজ ক'রছে। —খেতি আছে, পশু-পক্ষী আছেন তাঁদের তো খাওয়া-চরা চাই! ওঁরা কজন পড়ছে। বয়স্ক বিদ্যালয় হঁইছে না?

—কোন দিকে স্কুল? ওই সাধন মুর্মু নিম্ন বিদ্যালয়?

—না না, সি তো উই দিকে। ওই আমাদের কুলি-থে' বরাবর, সিধা।

—আচ্ছা, দেখি গে যাই, হ্যাঁ— আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

হঠাৎ শিখরিণী নিজের ব্যাগ খুলে এক মুঠো লজেন্স দিল মহিলার হাতে। —বাচ্চারা এলে দেবেন।

হাত পেতে নিল বউটি, তারপর বলল, উদের বলব অম্বিকা দেবীর প্রসাদ আছে!

—না, না, সেকী! সেকী! স্টেশনারি দোকান থেকে কেনা, কোনও প্রসাদ নয়।

বউটি মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, কিছু বলল না।

কস্তুরী রাস্তায় উঠতে উঠতে বললেন, দেকো কাজল, আমি যেখান প্রথম শিখরিণীকে দেকি তোখন আমারও মনে হোয়— অম্বা, আমাদের ওকানে অম্বার পূজা হয় তো! ব্যাঘ্রবাহিনী দেবী। তুমাদের দুর্গারই মুতো। তবে এতো ছেলেমেয়ে নাই। —তিনি কাজলকেই বললেন কথাগুলো।

—আপনাদের তো দুর্গাপুজো নেই, না দিদি!

—না, কিন্তু ও সোময় শুক্লা প্রতিপদ থেকে নওরাত্রি হয়, সে নয়দিন ধরে চণ্ডীপাঠ, ঘটপূজা, উপবাস। ডাণ্ডিয়া নাচ, দশেরার দিন পর্যন্ত। সেদিন রাবণও বধ হল। আমরাও মুক্তি পাচ্ছি।

বউটি যেমন বলেছিল— একটু দূরেই ব্যারাকবাড়ির মতো বিদ্যালয়। সুধীন্দ্রনাথ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। রাস্তা থেকেই দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটি ঘরে ক্লাস হচ্ছে। একটা কোণের ঘর থেকে একজন বেরিয়ে এলেন। শার্ট প্যান্ট পরা। কিন্তু কাজলেরই মতো।

আপনারা দেখতে এসেছেন?

—হ্যাঁ। ভাল লাগছে। আপনি?...

—আমি বালিরাম ভুক্তা। হেড মাস্টার এ স্কুলের।

—বাঃ, চলুন আপনার অফিস ঘরে বসি।

—নিশ্চয়! আসুন। আসুন মা, দিদিরা।

হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরে একটি কাঠের বেঞ্চি, একটি টেবিল, দু'টি চেয়ার। চেয়ারগুলো প্লাস্টিকের। একটি আলমারিতে পরপর ফাইল রাখা।

দেখতে দেখতে মিঠু বলল— এরা মাধ্যমিক পড়ে কোথায়?

—এখানেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সব।

—অ্যাফিলিয়েশন আছে?

—নিশ্চয়ই। অনেক সংগ্রাম করে জোগাড় করেছি দিদি। কলেজটি এখনও করতে পারিনি। জিলায় জিলায় যেখানে পায় পড়তে পাঠিয়ে দিই। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, হুগলি, বর্ধমান। যে যে-বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে পায়। এ পর্যন্ত ওরাই আমাদের স্কুলের টিচার। অনেকে কারিগরি শিখেছে। এখানে ডোম কমিউনিটি আজকাল দারুণ বাঁশ-বেতের কাজ করছে, কার্পেন্ট্রি আছে, আমাদের লোক্যাল চাহিদা সবই মিটে যায়। বেত-বাঁশ বিদেশে যাচ্ছে।

—মেয়েদের স্কুল নেই?

—ওই তো। এই স্কুলের পেছনে খানিকটা রাস্তা গেলেই, অনেকটা বাগান আছে। হঠাৎ একটু ইতস্তত করেন বালিরাম ভুক্তা— মা, একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন।

—মা, দিদি, দাদা আপনাদেরও কাছে প্রার্থনা— যা দেখে গেলেন কাগজে ছাপবেন না।

—আমরা কাগজ টাগজের লোক নই— কিন্তু কেন? শিখরিণী আশ্চর্য হয়ে বলল।

—কাগজে হইচই হবে। রিপোর্টার আসবে, শতেক ইন্টারভিউ নেবে, সরকারি লোক আসবে, সে খুব ঝামেলা। শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে আমাদের। ছেলেমেয়েদের মন উচাটন হবে। লেখাপড়ার সময়টা খুব শান্তিতে অভিনিবেশে কাজ করতে হয়। এ শুধু আমার কথা নয়। আমাদের বাবার কথা।

—কার বাবা? কাজল শুধোয়।

—আমাদের সবার বাবা। প্রাণপাত করে যিনি এই গ্রাম গড়ে গেছেন। আমাদের পচুই ছাড়িয়েছেন, আলসে-কুঁড়েমি ছাড়িয়েছেন। নানান কাজে-কামে উৎসাহ দিয়েছেন। আমরা এ দেশের মানুষ, আর সবার মতো আমাদের সব অধিকার আছে, কর্তব্যও আছে, যিনি শিখিয়েছেন...দিকুরা আর আমরা আলাদা নই— একই দেশের...

—কে তিনি?

—সে অনেক দিন হবে। পঁচিশ তিরিশ বছর। শুনলাম কে আসছেন। দূর পাহাড় থেকে। ওঁরা নেমে এলেন আমাদের এখানে— এক হাঁটু কাদা মেখে, হাতে দু'টি বাক্স। কাঁধে ঝোলা, বললেন আশ্রয় দেবে? তা মা, আমরা আশ্রয় দেব কী? তাঁরাই আমাদের আশ্রয় হয়ে উঠলেন। সে সময়ে আমাদের বাবা-মা'রা বলতেন স্বয়ং ঠাকুর আর ঠাকরান আমাদের কষ্ট দেখে, কান্না শুনে, মানুষের বেশে নেমে এসেছেন। আস্তে আস্তে পাহাড় থেকে সব ট্রেনার নেমে আসতে লাগলেন, কত কিছু শিখলাম। মা যখন এখান থেকে পাহাড়ে চলে যাবেন বললেন, কেঁদে কেঁদে সব পথ আটকিয়ে ছিলুম। উনি বললেন— তোরা কি শেষ পর্যন্ত আমার মারাংবুরু হলি? সিংদুয়ার দিবি না? আমার কিরে কেটে বল— আর কোনওদিন হাঁড়িয়া খাবি না। আমি চলে যাচ্ছি আমার আরও অনেক সন্তান আছে, কাজ আছে। তোদের বাবা তো রইল।

কস্তুরী জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর নামেই এই বিদ্যাভোবোন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মা। কোথায় না কোথায় গেছেন তিনি আমাদের শিক্ষা, চাষবাস, আমাদের হাসপাতালের জন্যে। এই ভূমি এরকম ছিল না মা। রুক্ষ, পাথুরে, তিনি আমাদের দিয়ে এইসব পথ বাড়ি ঘর দুয়ার কুয়া সব করলেন। আমার বাল বয়সে আমি ছোট ছোট হাতে এই স্কুলবাড়ির নতুন শাখা গড়ার জন্য কড়াইয়ে সিমেন্ট-বালি মেখেছি। আমি তাঁর ছায়ে ছায়ে বড় হয়ে উঠেছি। কলেজে পড়েছি, টিচার্স ট্রেনিং নিয়েছি মেদিনীপুরে, তারপর এখানে।

—তিনি কোথায়?

—তিনি তো আর নেই মা। স্বদেহে নেই। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি তিনি সবসময়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছেন। আমরা বাবার থান গড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু মা লিখে পাঠালেন। না। ভীষণ ক্রুদ্ধ। আর কত বোঙ্গা চাস তোরা? খবরদার বাবার থান গড়বি না। তাঁর আসল থান হল এই গ্রাম, এই রাস্তা, এই স্কুল, চিকিৎসালয়। সব পবিত্র। সব থানে তিনি। এই পবিত্রতা রক্ষা করবি।

কাজল বলল, তা আপনাদের কি আর এখন কোনও দেবতা নেই?

—তা কেন থাকবে না। এখনও মায়েরা তুলসী তলায় মড়লি দ্যান। মড়লি জানেন তো? গোবরের দু'টি গোলাকৃতি মণ্ডল। ভূমণ্ডল কল্পনা করে নেন। এখনও সহরায় পরবে মা ভগবতীর গুণ গাই, সারারাত নাচগান করি। গড়াম-থান তো আছেই। পাঁচ বৎসর বাদ বাদ সিং-বোঙার পূজা করি। আপনারও যেমন দুর্গা, সরস্বতী, নারায়ণ পুজো করেন। কত দিনের আচার উৎসব চলে আসচে কিনা! কিন্তু নিজেদের কাজটুকু কোনও দেবতা করে দেবেন এ বুদ্ধি তো নাই? কী? আছে?

বালিরাম ভুক্তার মাথার কাছে বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র ও গাঁধীজির ছবি। উনি নমস্কার করে বললেন— এঁরা আমাদের সবার জন্য কত ভেবেছেন, খেটেছেন, নতুন-নতুন ভাবনা, প্রাণ দিয়ে গেছেন সবার জন্যে— আমরা জানি।

আরও কিছুক্ষণ কথা হল। তারপর মেয়েদের স্কুল হাসপাতাল দেখতে যাবেন বলে সবাই উঠলেন। পেছন ফিরে দাঁড়াতেই দরজার ওপরের দেওয়ালে কস্তুরী দেখলেন— স্থানীয় শিল্পীর হাতে আঁকা, কাঠকয়লার স্কেচ। তলায় লেখা— প্রতিষ্ঠাতা সুধীন্দ্রনাথ। আর কিছু না, পদবি না, কোনও ভক্তির কথা না, এঁরা যে তাঁকে ঠাকুর বা বাবা বলে মানেন, সে কথা পর্যন্ত না। শুধু প্রতিষ্ঠাতা— সুধীন্দ্রনাথ।

কীরকম আচ্ছন্নের মতো বেরিয়ে এলেন কস্তুরী। ভাল করে পথ দেখতে পাচ্ছিলেন না। হোঁচট খেলেন। কাজল এক দিক থেকে মিঠু এক দিক থেকে না ধরলে একেবারেই পড়ে যেতেন। মাঝখানে

কস্তুরী। চোখ ঝাপসা, দু'পাশে কাজল আর মিঠু চোখাচোখি করল। কাজল জিজ্ঞেস করল, দিদি, আর কি আজ যাবেন? আজ এই পর্যন্ত থাক না! একটা বেজে গেছে। আবার কাল আসা যাবে।

কস্তুরী হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। দু'জনেই বুঝতে পারল সরল গাছের মতো সোজা এই মহিলার মধ্যে ঢেউ উঠছে। তিনি প্রাণপণে সে তরঙ্গ রোধ করতে চেষ্টা করছেন। তাঁকে আর একটা কথা বললেই হয়তো ভেঙে পড়বেন। সেটা তাঁর লজ্জার কারণ হবে। ব্যবসায়ী কন্যা ব্যবসায়িনী সমাজসেবিকাদের তো আবেগ থাকতে নেই! আমরা প্রত্যাশা করি তাঁরা সবসময়ে খুব ধীর স্থির আত্মস্থ হবেন। তাঁদের সমস্ত কাজের পেছনে একটা নৈর্ব্যক্তিক দর্শন থাকবে, যান্ত্রিক অনুভবশূন্য বাস্তববুদ্ধি দিয়ে তাঁরা কাজ করে যাবেন।

শিখরিণী তাকাল মিঠুর দিকে, মিঠু তাকাল কাজলের দিকে, চোখে চোখে ইশারা হয়ে গেল। কাজল বলে উঠল আমরা এগোচ্ছি দিদি, আপনি আস্তে আস্তে আসুন। আজকের এপিসোড এইখানেই শেষ কিন্তু। পেটের মধ্যে রাজব্যাং টুঁ মারছে। তিনজনে তাঁর অনুমতির অপেক্ষা না করে এগিয়ে যায়।

—কী সুন্দর গ্রাম রে তোদের! মিঠু বলল।

—আমি এরকম দেখিনি, কাজল সংক্ষেপে বলল।

শিখরিণী বলল, আমি বিশ্বাস করি না এরা ইঁদুর খায়। সাপ খায়...

কাজল হেসে বলল, দ্যাখো গোরু-শুয়োর খেতেও তো তোমাদের একদিন খুব আপত্তি ছিল। এখন খাচ্ছ। তো! সাপের মাংস অনেকেরই খুব প্রিয়। আর মেঠো ইঁদুর সত্যিই ফার্স্ট ক্লাস, তুলতুলে নরম।

—আঃ—

—তুমিই তো টপিকটা শুরু করলে বাবা।

—আমি জাস্ট বলেছি এদের ফুড-হ্যাবিট বদলে গেছে।

—আরে বাবা, তোমরা চাওমিন, হ্যামবার্গার খাও বলে তো আর চিংড়ি মাছের মালাইকারি খাওয়া ছাড়োনি, ছেড়েছ?

মিঠু বলল, ফিরে গিয়ে তো আবার রতনের শ্রীহস্তের খিচুড়ি খেতে হবে, মালাইকারি-টারি বলে আর মন খারাপ করে দিসনি।

—দ্যাখো আজকে তো দ্বিতীয় দিন। রতন হয়তো নতুন কিছু সারপ্রাইজ দেবে। বনমোরগের কালিয়া আর....

শিখরিণী ঝেঁঝে উঠে বলল, আমি এখানে নিরামিষ ছাড়া আর কিছু খাচ্ছি না।

সুধীকাকা! সুধীকাকা যিনি কল্যাণী মেহতার সঙ্গে ইলোপ করেছিলেন বলে তিনের এক ফার্ন রোডের আসর ভেঙে গেল, যার জন্য মেয়েকে নিয়ে নরেন্দ্র মেহতা আমদাবাদ ফিরে গেলেন, যার জন্য দাদা-দাদি কোনওদিন মাতৃপ্রসঙ্গ উঠতে দেননি, সেই সুধীকাকা! এদের বাবা। তাঁর জন্য এরা থান গড়তে চেয়েছিল।

গলার জোরে সবাইকে ছাপিয়ে সুধীকাকা গাইছেন— বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি/ তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী। —মা বলছেন সুধা, তুমি অত চড়ায় ধরলে আমরা গাইব কী করে?

ছোট্ট কিকির মনে হচ্ছে— গাক না। সুধীকাকা একলাই গাক। চোখ বুজিয়ে বুজিয়ে সে বাংলাদেশের হৃদয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। বাংলাদেশ জানা আছে, হৃদয়ও মোটামুটি জানা, কিন্তু বাংলাদেশের হৃদয় একটা অদ্ভুত মমতাময় স্বপ্ন-দোলনা, সেই দোলনার গভীর আরামে বুঁদ হয়ে একটা অপরূপ ঘুম!

ছ'বছর বয়সে শেষ দেখা। তবু আজ চারকোল স্কেচটা দেখার পর হুবহু মনে পড়ে যাচ্ছে সুধাকাকাকে। স্কেচটা স্বভাবতই আরও অনেক বেশি বয়সের। কিন্তু সুধাকাকার মুখের কাঠামো একই

রকম আছে। লম্বাটে। গালের হাড় সামান্য উঁচু, উজ্জ্বল শ্যাম, চোখ দুটো কেমন ঘোর-লাগা, নাকটা বেশ স্পষ্ট, সব মনে পড়ে যাচ্ছে। ধুতির ওপর শার্ট পরতেন সুধীকাকা। গোঁফদাড়ি কিছুই ছিল না। পরেও রাখেননি দেখা যাচ্ছে। একেবারে এক মুখ, শুধু তার ওপর বয়সের বদল। কত দিন মারা গেছেন সুধীকাকা! এদের মনে জীবন্ত আছেন এখনও। কতদিন থাকবেন? আমরা কি কেউ মনে রেখেছি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের? তাঁরা কি ইতিহাসের পাতায়, কি সরকারি অফিসে, কি পুরনোপন্থী বাড়ির দেওয়ালে ছবি হয়ে নেই? শুধু ছবি। আর কিছু নয়। ওঁরা প্রাণপাত করেছেন, আমরা এ.সি. রুমে থাকব বলে, বিদেশি গাড়িতে করে শপিং মলে বিলিতি ফতুয়া কিনতে যাব বলে। ডবল দামে। উপার্জন বাড়লেই আস্তে আস্তে বাড়িতে ঢুকবে জিনিস, আরও জিনিস! ফিরে তাকিয়েও দেখব না রাস্তায় কুকুরের মতো ঘুরে বেড়ানো শিশুদের দিকে। কিশোর বয়স থেকে সংগ্রাম করতে করতে তাঁর বড় হওয়া বিবেকানন্দকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখে সারা জীবন ব্রিটিশের কারাগারে। অসুখ, অসুখের পরে আরও অসুখ, তারই মধ্যে লিখে যাচ্ছেন দেশবাসীর উদ্দেশে অমিত চিঠি, লিখছেন 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'—দেশ, দেশ ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা নেই। বিদেশে ইতালি থেকে অস্ট্রিয়া, সেখান থেকে জার্মানি, জাপান, রাশিয়া নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মানুষটি। প্রত্যেকটি সুধীজন, প্রত্যেকটি শক্তিমানের সঙ্গে দেখা করছেন বৈদেশিক সহানুভূতি ও সাহায্যের আশায়। কী মৃত্যু, কী অবসান ওই মহান জীবনসাধনার! এয়ার-ক্র্যাশ। যদি সত্যিই হয়ে থাকে! তাঁকে আমরা মনে রেখেছি? ২৩ জানুয়ারি কোনওক্রমে ছবিতে আর মূর্তিতে মাল্যদান, জাতীয় পতাকা উত্তোলন। কে চেয়েছে তাঁর কাজের ভার কাঁধে তুলে নিতে? তিনি হিন্দু মুসলমান, হিন্দিভাষী উর্দুভাষী, বাংলাভাষী, ধনী-দরিদ্র, বনেদি ঘর, সাধারণ ঘরে কোনও তফাত করেননি। আপামর ভারতবাসীর উন্নয়ন ছিল তাঁর লক্ষ্য। কোথায় এঁদের স্বপ্নের ভারত। যাঁরা সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরাও কি প্রকৃত সমস্যা দেখতে পেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেখতে? না নিজের মনগড়া কল্পমূর্তিকে রূপ দেওয়ার অহংয়ে সমস্ত বাস্তবতা বোধ বিসর্জন দিয়েছিলেন। যার ফলে আজ চতুর্দিকে ঘুষরাজ, কলঙ্করাজ, দুর্নীতিরাজ, ইঁদুরের গতিতে মানুষের বংশবৃদ্ধি হয়। ইঁদুরের মতোই খুঁটে খায়, মরে, মানুষের এ চরম অপমান কি কোনও দেশ-প্রেমিকদের গড়া দেশে হতে পারে? না, এখন দেশ-প্রেমিকরা গদিতে বসেন না, বসে রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা— নরেন্দ্র বলতেন। কেননা তিনি রবীন্দ্র-সুভাষ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ এই জাদু চতুষ্কোণে চলে এসেছিলেন। তাঁর কাজ আরও সহজ হবে ভেবেছিলেন, এখনকার হাওয়ায় তাঁদের প্রতিভা, কল্পনা, দর্শন ও প্রেমের চূর্ণ হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসছে কিনা!

কী নিয়ে কল্যাণীর সঙ্গে নরেন্দ্রর মতভেদ এত সাংঘাতিক হয়ে উঠল? বাবা যখন নতুন স্টুডিবেকারটা কিনলেন, তখনই, বোধহয় তখন থেকেই। মা বললেন— এটায় কি খুব দরকার ছিল?

বাবা—বিজনেসের ব্যাপার, বুঝবে না।

মা—পুরনো গাড়িটা কি খারাপ ছিল? আমাদের তো উদ্বৃত্ত দিয়ে ফান্ড গড়ার কথা ছিল?

—আমার একার উপার্জনে দেশ গড়বে? বাবার গলায় বিদ্রুপের সুর, হাসি।

—তোমার একার নয়, তোমার মতো অনেকের। এক একটা গ্রাম বা অঞ্চল ধরে যদি আমরা কাজ করতে যাই— এ টাকা তো কিছুই নয়! আর অন্য ব্যবসায়ীদের এতে শামিল করার দায়িত্বটাও তোমার আর শরদের। কস্তুরী বুঝতে পারলেন না এই সংলাপ তিনি নিজে এখন বানাচ্ছেন কিনা! অবিকল না হলেও ভাবটা যেন ছিল এই রকমই। নতুন গাড়ি নিয়ে কথা কাটাকাটি তাঁর মনে আছে। সোনার ভারী ভারী গয়নার একটা সেট মা বাবার হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছেন স্পষ্ট মনে আছে। হিরের নাকছাবি, কানের দুল ঝকঝক করছে, গলার মস্ত বড় চাঁদের মতো লকেট। মা'র ভুরু কুঁচকে উঠছে— এ তুমি কী করছ? এসব কী হবে? —কিকির মনে হচ্ছে-এই হিরেগুলো তো মা তার জন্যেও রেখে দিতে পারতেন! সে বড় হয়ে পরত বেশ!

—ব্যক্তিগত কিছু থাকা দরকার, কল্যাণী, দুঃসময়ে কাজে লাগে।

—দুঃসময়ে? এর চেয়েও দুঃসময়? দেশ স্বাধীন হয়েছে, অথচ নির্দোষ মানুষের রক্ত চারদিকে, কার দেশ নরেন্দ্র? যে নিজের দেশ থেকে, জমি বসত থেকে উৎখাত হত, দেশটা তা হলে তার নয়! তোমাকে লোভ পেয়ে বসছে, লোভ আর স্বার্থচিন্তা, এখনও শোনো, এখনও ফেরো। চারদিকে মানুষের হাহাকার শুনতে পাচ্ছ? মেয়ে, বাচ্চা, পুরুষ সবার! শুনতে পাচ্ছ না, চতুর হাসি ধুরন্ধর সুযোগসন্ধানীদের? ঘোলা জলে যে ওরাই মাছ ধরবে এবার।

—দেশের লিডার, যাঁদের হাতে আসল ক্ষমতা, তাঁরাই যদি দুর্নীতি দেখতে না পান, চোখ বুজিয়ে থাকেন, আমি একা কী করব?

—একা কেন? তোমার মতো আদর্শবাদী ব্যবসায়ী কি আর কেউ নেই? আমরা, আমি, সুধী, অজিতবাবু, স্নেহদি, নিবেদিতা, আমরা কি নেই?

—তোমরা? শুধু মনোবল নিয়ে কিছু করা যায় না কল্যাণী, স্রোতের মুখে কুটোর মতো ভেসে যাবে। সুধী? অজিতবাবু? কী করবে ওরা? টাকার দাম বোঝে? পাঁচ হাজার টাকা একসঙ্গে চোখে দেখেছে?

প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীরবতা। ধুধু করছে গভীর জল। বিষ পান করে নীলকণ্ঠ।

না, তিনি বানাচ্ছেন না— গাড়ি, সোনা, হিরে এবং মায়ের বিরক্তি তাঁর মনে আছে। বাবার আক্ষেপ— লিডাররা কিছু করছেন না, তা-ও। আর ওই কথাটা খুব মনে আছে— পাঁচ হাজার টাকা একসঙ্গে চোখে দেখেছে?

পাঁ-চ হাজার! অত টাকা কেউ চোখে দেখে? একসঙ্গে? বাপ রে?

কিন্তু কস্তুরী কখনও হিরে ছোঁননি। তাঁর দাদির গহনা সব তোলা আছে। সোনার চুড়ি কিংবা বালা আর সামান্য মুক্তো শোভা পায় তাঁর অঙ্গে। এর চেয়ে বেশি কিছু হাজার চেষ্টা করেও তাঁকে পরাতে পারেননি দাদি। নাকছাবিতে ছিল রীতিমতো ঘৃণা। এখন দেখেন, ছোট ছোট মেয়েরাও নাকছাবি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কানে রাজস্থানিদের মতো দুটো-তিনটে ফুটো করে হাজারও গয়না পরছে। ভারী ভারী সোনার গহনা, কুন্দন অনন্ত হাঁসুলি পরছেন এমনকী প্রৌঢ়ারাও। চতুর্দিকে গয়নার দোকানের বিজ্ঞাপন। সুন্দরী মেয়েরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত গহনা পরে স্বর্ণহাসি হাসছে। দেখতে তাঁর বড় বিতৃষ্ণা হয়, কেমন একটা বিরাগ, যা কল্যাণী মেহতা মাত্র ছ'বছরের মেয়ের মনে গেঁথে দিয়েছিলেন।

বাবা, তুমি এই সুধাকাকার ওপর তোমার নীরব ঘৃণা, আর কল্যাণী মেহতার ওপর তোমার আহত অভিমান কোনওদিন মেয়ের কাছ থেকে লুকোতে পারোনি। আজ স্পষ্ট দেখছি, এদের সুধীন্দ্র আর তোমার ঘেন্নার সুধী এক নয়। তুমি যেমন মাকে বুঝতে পারোনি, তেমনই আরও সুধীকাকাকেও পারোনি। সুধীকাকাই ছিলেন মায়ের আদর্শের সবচেয়ে কাছাকাছি। একসঙ্গে পড়াশোনা করেছিলেন, সুধীকাকা সবচেয়ে সুপুরুষ এবং গুণীও বটে, প্রবল উৎসাহ। একাই দশজনের মনে আলো জ্বালিয়ে দিতে পারেন, সেই চারণকবি মুকুন্দদাসদের মতো।

বাবা, তা হলে অনেকদিন থেকেই তুমি সুধীন্দ্র সম্পর্কে ঈর্ষা পোষণ করেছ? সেই ঈর্ষা-বিদ্বেষের ছোঁয়া লেগেছে রবি জ্যাঠাদের মনেও নিবেদিতা মাসি! একই ধারণা। বাবা, আমি জানি না মা ও সুধীকাকার ইলোপমেন্টের মধ্যে বিবাহবহির্ভূত প্রেম ছিল কিনা। কিন্তু সৃষ্টিছাড়া দেশপ্রেম মানবপ্রেম যে ছিল সেটুকু জানাই তোমার মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

অন্ধকার বাংলো চত্বরে ঝমঝম করে গান বাজতে লাগল। বহু মানুষের সম্মিলিত গান। স্পষ্ট করে মুখগুলো বোঝা যায় না, কিন্তু তারা আজকের নয়। অনেকদিন আগেকার, যখন ভারত নবীন ছিল, অসহ্য গর্ভযাতনার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। স্নেহলতা ঘোষ এলো করে শাড়ি পরে আসতেন, রমা সরকারও, নিবেদিতা মাসি ঘুরিয়ে পারতেন, মা যখন বাড়িতে সভা হত, এলো করে, বাইরে যেতে হলে কুঁচি দিয়ে ঘুরিয়ে।

'ব্যক্তিগত বা দলগত আত্মপরতা, অপরকে দাবিয়ে রাখার প্রবৃত্তি আর সাম্রাজ্যবাদে চরিত্রগত কোনও ফারাক নেই।' সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন। কথাটা স্বাধীন ভারতবর্ষে বড্ড খেটে গিয়েছিল, গেছে। ব্যক্তিগত, দলগত আত্মপরতা—এই নিয়েই আমরা ঘর করছি। দেশপ্রেম আর নেই। দলপ্রেম। কমিটমেন্ট আর দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি নেই। কমিটমেন্ট দলের প্রতি। সবসময়ে ঘুরে-ফিরে আসত এই আক্ষেপ, বাবা কথাটা বলতেন— কারণে, অকারণে। কল্যাণীর থেকে দূরে গেলেও আকস্মিক আঘাতে তিনি বোধহয় স্থৈর্য ফিরে পেয়েছিলেন। তাই কটন কিং-এর সাম্রাজ্য নানাবিধ সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত ছিল। মেয়েকে নিয়ে তিনি যথাসাধ্য অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন।

সমাজতন্ত্র একশ'বার। কিন্তু রাশিয়ার থেকে আলাদা। বাদ যাবে জড়বাদ, ঢুকবে জাতীয়তাবাদ, সুভাষচন্দ্রের কথা— বাবা মন্ত্রের মতো জপ করতেন। গুজরাত-কাণ্ডের পর বাবার এক বন্ধু রমেশকাকা বললেন— জাতীয়তাবাদের পরিণাম তো এই নরেন্দ্র। স্বাধীনতার পর কতগুলো দাঙ্গা হল, কতগুলো রাজ্য বিচ্ছিন্ন হতে চাইল, দ্যাখো। সারা ভারত কোনওদিন এক জাতি হবে না, জাতীয়তাবাদ প্রচার করলে এইরকম উগ্র রূপই নেবে।

বাবা বলেছিলেন, ভারতকে সেভাবে এক জাতি হতে কে বলেছে? ইউরোপকে দূর থেকে আমরা এক জাতি বলে ভাবি, তুমি তো জানো, তা নয়। ইংরেজ চরিত্রে আর ফরাসি চরিত্রে আকাশপাতাল ফারাক। আমরা তেমনই আলাদা হয়েও পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুভাবে থাকব। আর দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি আমাদের ভালবাসা দায়িত্ববোধ আমাদের চালিত করবে।

অ্যাবস্ট্রাকশন, ভাবের কথা নরেন্দ্র। ভালবাসা? এক পরিবারে দম্পতির মধ্যে, বন্ধুত্ব ভালবাসা নেই, আনুগত্য নেই, তার এত বড় বিচিত্র দেশ!

ব্যক্তিগত সমস্যা সব দেশেই আছে রমেশ। কিন্তু নিজের দেশের শিশুদের ফুডে, রোগীদের ওষুধে ভেজাল মিশিয়ে দিচ্ছে, সদ্য সদ্য স্বাধীন হয়ে— এ আর কোথাও পাবে না। নিজের রাস্তা নোংরা করছে, ট্রাম-বাস পোড়াচ্ছে যা নাকি নিজেদের টাকা দিয়েই কেনা— এ-ও তুমি আর কোথাও পাবে না। কোটি কোটি টাকা তছরূপ করছে সরকারি দফতর, নেতাদের কথা তো বলাই বাহুল্য, এ-ও তুমি কোথাও পাবে না। সততা দেখাতে গেলে অবধারিত মৃত্যু... স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করলে কণ্ঠ চেপে ধরবে...এ জিনিসও অচিন্তনীয়।

বুশ— পিতা-পুত্র তো বাকি পৃথিবীর কাছে শয়তান— কস্তুরীর মনে হল—কিন্তু নিজের দেশের ছেলেদের আফগানিস্তানে ইরাকে পাঠাতে তাদের বুক কেঁপে যায়, জবাবদিহি করতে হয় পাবলিকের কাছে— আমাদের ছেলেরা কেন এত মরবে? আর আমাদের এখানে কী হল? কারগিল। জয় এবং চিরদিনের জন্য কারগিল থামাবার জন্য যখন সেনাধ্যক্ষরা অনুমতি চাইলেন, রাজনীতি সে অনুমতি দিল না। একটার পর একটা জাতীয় পতাকা-মোড়া কফিন আসছে। মিলিটারি স্যালুট পাচ্ছে, দূরদর্শনে প্রচারিত হচ্ছে— বীরের এই সম্মান। কেন প্রাণটা দিল ওরা জানে না, প্রাণ দিয়ে যদি কিছু পাওয়া যেত, তার মানে থাকত। কিন্তু অর্থহীন এই প্রাণদান। জয়ের দোরগোড়া থেকে পিছু হঠে যারা, তাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিরর্থক প্রাণদান। মানে এই নীতিকাররা জনসাধারণকে আসলে মানুষ বলে গণ্যই করেন না। শহিদ মৃত্যু গ্ল্যামারাইজ করে আরও কিছু হতাশ বেকার সংগ্রহ করা, তারপর তাদের উদ্দেশ্যহীন মৃত্যুর মুখে পাঠানো। একটা প্রতিবাদ উঠেছে এত বড় দেশের কোনও কোণে! বিধবা মা, পত্নীদের দিয়ে বলানো হয়েছে— তাঁরা নাকি দেশের জন্য তাঁদের প্রিয় মানুষটির আত্মত্যাগে গর্বিত। কোন দেশের জন্য? যে-দেশ তাদের বন্দুকের খাদ্য ছাড়া আর কিছু মনে করে না? নগণ্য? আর রাজনীতিকরা? তাঁরা এত দামি যে একটার পর একটা লজ্জাকর অপরাধ-চুরি-জোচ্চুরি ধরা পড়লেও বুক ফুলিয়ে জেলের মধ্যে দরবার বসান। যদি অ্যাট অল জেলে যেতে হয়! সাধারণ চোর জোচ্চোরদের যখন জেলে পোরে ওদের মুখে তোয়ালে টোয়ালে চাপা থাকে, অর্থাৎ এতর পরেও তাদের মুখ খেতে লজ্জা করছে। কিন্তু মহান রাজনীতিকরা, নেতারা? তাঁদের সহাস্য, সদম্ভ, পারিষদবেষ্টিত মুখের ছবি কাগজে বেরোয়। ছিঃ!!

কস্তুরীর শরীরে তিরতির করে ছড়িয়ে যাচ্ছে উত্তেজনা। লাল হয়ে যাচ্ছেন, অন্ধকারে। কী করেছেন? কতটুকু করেছেন— এতদিনে? কিচ্ছু না। কাউকে স্বাবলম্বী করতে পারেননি। কোনও গোষ্ঠীকে সপ্তদশ শতক থেকে বিংশ শতকে এনে ফেলতে পারেননি। ব্লাইন্ডদের জন্য, অসহায়দের জন্য সামান্য কিছু চেষ্টা, কুটিরশিল্পকে বাজারজাত করবার প্রচেষ্টা। আর উন্মত্ত গুন্ডাদের থেকে কিছু অসহায় মানুষকে রক্ষা করা। বাস। এতেই তাঁর এমন ভারতজোড়া নাম যে চুপিচুপি, খুব চুপিচুপি পশ্চিমবঙ্গে আসতে হয়েছে। জানতে পারলেই সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরবে। বাণী দিন কিছু। বাইট, জাস্ট ওয়ান, ম্যাডাম। নিতাই নস্কর তাঁর জন্য এই গুণী ছেলেমেয়েগুলিকে তাদের কাজকর্ম ফেলে আসতে আদেশ দিয়েছে। তারাও এই অকিঞ্চিৎকর মানুষটির সঙ্গলাভ করে নিজেদের ধন্য মনে করছে।

দিদি, শুতে যাবেন না? —খুব মৃদুস্বরে কে বলল। ফিরে দেখেন মিঠু।

অনেক রাত হল।

চলো যাচ্ছি— খুব নরম গলায় মেয়েটিকে বললেন তিনি। তুমি ঘুমিয়ে পড়োনি?

না, আপনি আসছেন না দেখছি, যদি বাইরে ঘুমিয়ে পড়েন, ভাবনা হচ্ছিল।

কস্তুরী জানেন না, ওরা তিনজনেই যে যার বিছানায় শুয়ে মিনিট গুনছিল। কতক্ষণে দিদি হুঁশে আসেন, কতক্ষণে তাঁর এই বাহ্যজ্ঞানহীন দশা শেষ হয়। ওঁকে যে একলা থাকতে দেওয়া উচিত— সেটা তো ওরা বুঝছিলই। খাবার সময়ে কী খাচ্ছেন, কতটা খাচ্ছেন ওঁর কোনও হুঁশ ছিল না। অথচ আজকে রতন বেশ ভাল ব্যবস্থা করেছিল। আলুভাতে মাখন, মটর ডাল, আর হলুদ জিরে দেওয়া পোস্তর ঝোল। শিখরিণী তার সেই অদ্ভুত ব্যাগের ভেতর থেকে আচারের শিশিও বার করেছিল।

রাত দশটা এখানে অনেক রাত। শেয়াল টেয়াল বেরোতে পারে। বুনো শুয়োর। কাজল বলল, তোরা যা! ডেকে নিয়ে আয়!

শিখরিণী বলল, তুমিই যাও, উনি তোমাকেই সবচেয়ে মানেন।

মিঠু উঠে দাঁড়াল। আর কোনও অনুরোধ-উপরোধ তর্ক-বিতর্কের মধ্যে গেল না।

সারা সন্ধে ওদের মধ্যে নানান জল্পনা হয়েছে। কাজল সাধারণত কারও গোপন কথা বলে না, হয়তো মিঠুকে বলত, শিখরিণী না থাকলে। কিন্তু কস্তুরীবেন-এর ব্যাপারে শিখরিণী একেবারেই বাইরের লোক।

শিখরিণী বলেছিল, এত অভিভূত হবার কী আছে? আজকাল আদিবাসী উন্নয়নের জন্য সরকার কতরকম প্রকল্প নিচ্ছে। তার সুফল তো কেউ কেউ পাচ্ছেই। এই ভদ্রলোক সুধীন্দ্র খুবই করিতকর্মা লোক, সমস্ত সুবিধাগুলো আদায় করেছেন ওদের জন্য। এইভাবেই সেনসিবল মানুষ কাজ করে থাকে।

মিঠু ভাবছিল, এই কি সেই প্রিয়জন যাঁকে কস্তুরীবেন খুঁজছেন? তিনি আর নেই। মারা গেছেন। তাই মৃত্যুশোকটা ভয়ানক লেগেছে! কত দশকের ব্যবধান কে জানে? এই সুধীন্দ্র ওঁর বাবা নয়, তবে কে? ইনি গুজরাতি নন, বাঙালি মনে হচ্ছে। ওঁর খুব আপনজন কী? কাকাটাকা? ভাই? নাকি কোনও বাঙালি বিপ্লবীই যাঁকে উনি সেই ছোট্টবেলাতেই 'গুরু' বলে মেনেছিলেন? একজন ছোট্ট মেয়ে যাঁকে হারিয়েছিল, একজন প্রৌঢ়া কি তাঁর শোকে মূহ্যমান হতে পারেন? সময় চলে যায়, সময়ের ও জীবনের বহু স্তর যা পার হতে গেলে অনেক কিছুই ধুলোর তলায় চাপা পড়ে যায়। তবু মনে থাকে। মনে রাখে মানুষ।

উঠতে গিয়ে কস্তুরী দেখলেন— তাঁর পায়ে প্রচণ্ড ঝিঁঝি ধরে গেছে, নাড়াতে পারছেন না। এক একটা পা ফেলেন আর ঝনঝন করে ওঠে পা দুটো। উঠে দাঁড়িয়ে রইলেন আর পায়ের ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুতের কারেন্ট বইতে লাগল।—কী হল দিদি?

কিকি বলল, ভীষণ ঝিনঝিন ভূত ধরেছে।

ঝিনঝিন ভূত? সে আবার কী? মা চোখ বড়বড় করে বললেন, মাসি পাশ থেকে বললেন—

কে তোকে বললে রে ঝিনঝিন একটা ভূত?

দীপ্তি বলেছে, আমার বন্ধু। ও সব জানে!

খুব জানে! মা হেসে ফেলেছেন— ঠিক আছে, বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা চেপে ধর তো!

—ঝিঁঝি ধরেছে? দিদি? হঠাৎ মিঠু নিচু হয়ে তাঁর দুই পায়ের বুড়ো আঙুল চেপে ধরল। তবু একটু সময়ে লাগল ঠিক হতে।

দু'হাত জুড়ে নমস্কার করলেন কস্তুরী। প্রণাম করাই উচিত ছিল। মা পায়ে হাত দিয়েছেন। কিন্তু বড্ডই ছোট হয়ে এসেছেন যে মা!

আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লেন। মিঠু চারপাশ থেকে মশারি গুঁজে দিল। তখন দক্ষিণ কলকাতায় বেশ মশা ছিল। সন্ধে হলে ধুনো দেওয়া তো হতই। মশারি টাঙাতে হত। কিকিকে শুইয়ে দিয়ে মা বলতেন— আমি মশারি গুঁজে দিচ্ছি কিকি, ঘুমিয়ে পড়ো। —তাই তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সে এক হইচই কাণ্ড। কল্যাণী মেহতা মিঠু ব্যানার্জিকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন— দেখছিস কিকি! এই আমার মেয়ে।

অজিতবাবু ভারী গলায় বললেন— ও কেন তোমার মেয়ে হতে যাবে— এক টিপ নস্য নিলেন অজিতবাবু— মেয়েটি আমার, তোমার ছেলে কালো বলে তাকে ডিজওন করছ নাকি?

যে ঢুকল সে সুধীন্দ্র, কিন্তু কিকি দেখলেন যে কাজল মুণ্ডা। সুধীকাকা এইরকম পালটে গেছেন! বুড়ো হলে কি লোকে পালটে যায়? কিন্তু বুড়োবুড়ো তো লাগছে না!

রবি জ্যাঠা বললেন— হয়েছে ভাল। তোমরা কি আমাকে কাউন্ট করছ না!

নিবেদিতা মাসি বললেন— তেলেভাজা আরও আনতে গেছে। আপনি খান না। খেতে খেতেই আরও এসে যাবে।

চা-টি দিব্যি— সিরাজ চাচু বললেন। কাকে ফুল আনতে দিলে? রমা সরকার বললেন— আনতে তো দিইনি। ওরাই পাঠিয়ে দেবে। ধুতি চার বান্ডিল, শাড়ি, পাঁচ, ছোট বড় দু'সাইজের ফ্রক আছে। জাঙিয়াও। দু'সাইজের শার্ট প্যান্ট। আপাতত এই তো বলেছে।

যদি কম পড়ে?

আরও এসে যাবে— কে দেবে? আকাশ থেকে পড়বে— সিলিঙের দিকে তাকিয়ে বসে থাকব, পড়বে।

থপ থপ করে শব্দ করে বাণ্ডিল পড়তে লাগল। কী বোঝা যায় না। খালি বোঝা যায় ওগুলো ব্যাঙ। কুনো ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ। রাজ ব্যাঙ?

শরদ তোমার কাজটা ভুলো না।

না ভাবী—শরদ শাহ সাইকেলের চাকার মতো ঘুরতে ঘুরতে চলে যাচ্ছেন। সিঁড়ি দিয়ে গড়াচ্ছেন, শাঁ শাঁ করে আকাশে চলে গেলেন। বাঁইবাঁই করে ঘুরছে আগুনের চাকা।

কল্যাণী, ও যে একেবারে আকাশে চলে গেল।

উপায় কী! কাউকে না কাউকে তো যেতেই হবে!

এইসময় খুন ম্লান মুখে ঘরে ঢুকে শিখরিণী বলল— মা আমি যাব? আমার তো কোনও কাজ নেই।

কল্যাণী মেহতার মুখ ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। আবছা হতে হতে টুকরো টুকরো কাচের মতো এর মুখ ওর হাত তার পা সব তালগোল পালিয়ে যাচ্ছে। তখন একটা ক্যালাইডোস্কোপ হাতে নিয়ে কাজল বলল— দেখুন দিদি, কী সুন্দর নকশা সব। কী চমৎকার।

এখনও ভোর হয়নি। কাক ডাকেনি। চরাচর স্তব্ধ। কস্তুরী মশারি গুটিয়ে আস্তে আস্তে নামলেন। পা টিপে টিপে পাশের ঘরে গেলেন— কাজল! কাজল!

—কে? তুই ভাবিস না। সব ঠিক করে দেব। ও কিছু নয়।

—কাজল, আমি দিদি।

—ওহ্ হো, বলুন দিদি, এত রাতে! ঘুমোননি?

—রাত আর কই? কাজল, কাল ওঁদের কাছ থেকে আমার মায়ের হোয়্যারঅ্যাবাউটস তোমায় আনতে হবে।

১৫) চতুর্থ পর্ব

টাটা সুমোয় বলরামপুর। মাঠটা পেরিয়ে ড্রাইভার অর্জুন সিং বললেন, এবার আপনারা একটু বিশ্রাম করে আহার করে নিন। এই দুকানে আমরা খাই। মা, আপনারা খেতে পারেন।

শালের খুঁটির ওপর পাতার ছাউনি। ভেতরে দু'-চারখানা বেঞ্চি। নিচু আর উঁচু।

কীসে দেব? খালি না শালপাতা? দোকানে পাতা মাটির উনুনের পাশে বসা লোকটি বলল।

শালপাতা শালপাতা—কলরব করে উঠল দুই মেয়ে। কাঁচা শালপাতায় ভাত আর শাক!

এত লোক! —কস্তুরী বললেন, বারোমাসই কি এদের রথযাত্রা? কে জানে কে কোথায় যাচ্ছে! কাজে, নিজের বাড়ি, আমোদ-প্রমোদের সন্ধানে, বিশুদ্ধ প্রকৃতি দেখতে ভ্রমণ-পিপাসুরা। তাঁর মতো কি কেউ আছে? এমন পাগল? আতুর?

বুঝলি, বিভূতিভূষণ এসব জায়গা চষে ফেলেছিলেন।

তখন এসব আরও দুর্গম ছিল, জঙ্গল ঘন, জন্তু-জানোয়ার ছিল অনেক। এখন কী আছে জিজ্ঞেস করবে ওই অর্জুন সিংকে? —শিখরিণী ভয়ে ভয়ে বলল।

আমার মনে হয় এইসব বনে-জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতেই প্রথম 'চাঁদের পাহাড়'-এর কল্পনা ওঁর মাথায় আসে।

হতে পারে। একেবারে জঙ্গল-খ্যাপা লোক। অথচ দ্যাখো বাংলার ঝোপ-ঝাড় থেকে শুরু করে সাঁওতাল পরগনা, সিংভূম, পালামৌ, ছোটনাগপুর— জাস্ট একজন মার্কামারা ডাল-ভাত খাওয়া মানুষ এসব গহন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তুমি ওঁর ডায়েরিগুলো পড়ো— অভিযাত্রিক, বনে পাহাড়ে, তৃণাঙ্কুর...।

কথা হচ্ছিল মিঠু আর শিখরিণীর মধ্যে। মাঝেমাঝে ওরা বিভূতিভূষণ ও তাঁর অরণ্য-প্রেমের কথা পাশে বসা অন্যমনস্ক কস্তুরীর কাছে ব্যাখ্যা করছিল। একবার উনি বললেন হ্যাঁ, হ্যাঁ, 'পথের পাঞ্চালি' আমি জানি।

সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'। —শিখরিণী বলল।

সত্যি কীভাবে যে একজন মহৎ লেখক একজন মহৎ পরিচালকের আড়ালে অস্ত গেলেন। সবাই জানে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'।

কস্তুরী বলে উঠলেন, আমি জানি— বিভূতিভূষোণ ব্যানার্জির। মিঠু, তোমার মতো ব্যানার্জি। তোমার গোর্ব কোরা উচিত।

মিঠু জিভ কাটল— এ মা, ব্যানার্জি পদবির যে কত চোর, জোচ্চোর, বদমাশ, স্বার্থপর লোক আছে কে জানে দিদি! সবাই কি আমরা বিভূতিভূষণের বংশধর। কয়েক জন্ম ঘুরে আসতে হবে।

কাজল খাচ্ছিল কি খাচ্ছিল না, খালি স্থানীয় লোক খুঁজে খুঁজে আলাপ করছিল। —এখানে কি কোথাও মা...মানে মা থাকেন?

মা? সবার ঘরেই তো মা রয়েছেন।

না, অন্যরকম মা। ধরুন কেন সবাই মা বলে তাঁকে।

কীরকম! কথা বাড়ায় না লোকটি, বলে, আপনি খুঁজে দেখুন না। তারপর তাকে আর দেখতে পায় না। এরকম দু'-তিন বার হল। চতুর্থ লোকটির বেলায় একটু কাজ হল।

আপনার নাম কী?

নিরঞ্জন মাহাতো, আপনি?

কাজল মুণ্ডা।

আচ্ছা! আচ্ছা! আপনি কি পলিটিকসের লোক?

না, না, আমি কলকাতায় থাকি, গবেষণার কাজ করি।

লোকটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল— গবেষণা! গবেষণা কথাটা সে কখনও শোনেনি।

হ্যাঁ ধরুন, এখন আমি ট্রাইব্যালদের ইতিহাস নিয়ে কাজ করছি।

ট্রাইব্যাল? এস. টি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে....আপনি যদি মুণ্ডা হন, যদি কী বললেন? ইতিহাস লেখেন? তো বাগমুণ্ডিতে মাধব মুণ্ডার কাছে যান, দাদা, উনি অনেক জানেন।

তা-ই? আচ্ছা এখানে কাছাকাছি কোনও মহিলা নেই, যিনি...ধরুন শিক্ষা-সংস্কৃতির কাজ করেন!

ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ারের কথা বলছেন?

না। সরকারি কিছু নয়।

আপনি মাধব মুণ্ডার কাছে যান, উনি অনেক খবর রাখেন। আমি তো পুরুলিয়া শহরে কম্পাউন্ডারি করি, এসেছি লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে, অত জানা নাই।

বালিরাম ভুক্তা বা ও অঞ্চলের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ কানাই সরেন কেউই ঠিকঠাক মায়ের ঠিকানা বলতে পারেননি। পারেননি, না চাননি কাজল খুব ভাল বুঝতে পারেনি।

কানাই সরেন বললেন, তিনি বিহান হতে না হতে চলে যান। যাবার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কবে কখন তো বলেননি! একদিন উঠে চারদিকে শোর পড়ল— মা নাই, মা নাই। তখন বাবাই আমাদের বুঝালেন, শান্ত করলেন। কেউ না কেউ কখনও না কখনও আমাদের খবর ঠিক নিয়ে যায়। কিন্তু তিনি পুরুলিয়া জিলার কোথাও আছেন এ বাদে আর কিছুই বলতে পারব না।

—এখানে উনি কী করতেন?

—ওঁর ছিল সব মেয়্যাদের নিয়ে কাজ। নার্সিং, ফেমিলি প্ল্যান, মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা, বিশ্বের কথা জানানো, গান শিখানো। কত বড় বড় মানুষদের কথা বলতেন। সন্ধেবেলা আমরা সব স্কুল বাড়িতে কি বাগানে জড়ো হতুম। কত গান, গল্প, ট্র্যানজিস্টর রেডিও চলত। খবরাখবর জানতুম। তারপর যেদিন ওঁর মনে হল কাজ শিখে গেছি, চলে গেলেন। তবে কাজ চলছে। এখনও! ছড়াচ্ছে কম। লোকপাড়া থেকে একটু দূর দূর।

—মাধব মুণ্ডা মশায়ের ঘর কোথায় বলতে পারবেন?

—ওস্তাদ? কেন পারব না? ওই যো লইতন খড়ের চাল ছাওয়া ঘরটি? সামনে দুটা ঝিঙা খেলা করে। লোকটি স্নেহের হাসি হাসল।

—মাধব মুণ্ডা মশায়, ওস্তাদজি! ঘরে আছেন হে!

—কে?

নিচু চালের তলা দিয়ে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। মাথায় টোপরের মতো সাদা চুল, পাকা দাড়ি গোল করে কাটা।

—কে বটে?

—আমি কাজল মুণ্ডা, কলকাতার কলেজ থেকে আসছি।

—কাজল মুণ্ডা? চিনতে লারলাম। কার ছেল্যা? বাপ কে? মা কে?

—বাপ মনোহর মুণ্ডা, সাকিন জামবনী, ঝাড়গ্রাম। মা বাসন্তী মুণ্ডা।

—দূর থেকে আসা হচ্ছে?

—আজ্ঞে।

—এঁরা কাঁরা?

—ওঁরাও সব আমার সঙ্গে এসেছেন।

—ইন্টারভিউ লিবেন? টিবি পগ্রাম?

—না দাদু, টিভি. নয়। আমি ইতিহাস গবেষণা করি। রিসার্চ।

—অ। টেপ-ক্যাসেট আনছো?

—আছে দাদু।

—তো বসতে আজ্ঞা হোক মায়েরা। বুঢ়ার দোষ লিবেন নাই। বুঢ়ার সব স্মরণ থাকে না। লিন, শুরু করুন।—মাধব মুণ্ডা সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত। কাজলও রেডি। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন—

—আচ্ছা দাদু, এই যে আমাদের নামের সঙ্গে একটা করে সিং জুড়ে আছে— এটা কেন?

টেপ চালিয়ে দেয় সে। বৃদ্ধের মনে যেন কোনও সন্দেহ না জাগে।

একগাল হেসে মাধব মুণ্ডা ইন্টারভিউ দিতে শুরু করেন। একেবারে মহড়া দেওয়া, তৈরি। ভাঙা সুরে বলেন—

কে বলে বুঢ়া মরলো
কে বলে আছে
ঝাড় কোলে বসিয়া
রাঙ্গা মাটি মাখিয়া
বুঢ়া কুরমুরে গ
বুঢ়া কুরমুরে

না মা এ বুঢ়া মরে নাই। কুরমুরায় নাই। রাগঝাল নাই। এই কথাটো জানবেন। কথাটো হল সকল ঘেরওয়াল তো একসময়ে এক ঘরই ছিল। কিন্তু শবর মানুষ ঠেলু মারলো, খেলো— ঠেলু আপনারা যারে বানর বলেন, উ তো আমাদেরই আগের জাতি কিনা। বানর মারা বারণ আছে। শুনলো নাই, খিদা লাগলো। কাঁড় মেরে দিল। তো সেই হতেই তারা আর মোদের জাত না। সাঁওতাল, মুণ্ডা, কুঁড়বি সব আলাদা আলাদা হল। কুঁড়বি তো হিন্দুদের সঙ্গে লেনাদেনা খানাপিনা— হিন্দুই হঁয়ে গেল। মুণ্ডাগণও হিন্দু সিং-দের সঙ্গে খানাপিনা করায় তাঁদের ছেল্যারা অনেকে সিং হইল। পুরাতন দেশে মুণ্ডা সিং এখনও রাজা আছে। সেই রাজ্য আর নাই। কিন্তুক রাজা এখনও থাকে। বলি শুনো মা-বাবাগণ, পূর্বকালে একজন সিং-এর কিসকু রাজার মেয়ের সঙ্গে পিরিত হয়। একটি সন্তান হয়, তাকে বনে পেয়ে কুড়িয়ে আনে এক মারাণ্ডি। টাকাপয়সাঅলা লোক। সে ছেলের নাম হয় মান্দো সিং। মস্ত বীর ছেল্যা, তেমন বুদ্ধি। দেওয়ান হইল। তো বিহার বয়স হইল। কেহ বিহা দেয় না। বলে কী জারজ। জন্মের ঠিকা নাই। মান্দো কুপিত হইল। বলে কী, সকল মেয়্যাঁর কপালে সিন্দুর ঘষিব। সব লন্ডভন্ড করিব। ভয়ে অনেক পলাইয়া যায়।

কিছু লোক আবার বলে— মন্দো বড় বীর, তুড়ুকদের সঙ্গে এমন যুদ্ধ করলো, যে সূর্য ঢাকা পড়ে যায়। লাদলুদ লাদলুদ কর্যাঁ তুড়ুক পলাইয়া গেল।

এহসব রাতকহানি আছে কতক। শুনছি কতদিন বুঢ়া-বুঢ়িদের থেকে। রাতের বেলা পিড়িতে বসে। আরও বলি শুনো— পুঞ্চা থানার ন'পাড়ায় হইল কৈড়া মৌজা। তার নির্ভয়পুর গ্রাম। উত্তরে কংসাবতী নদী। ওই ঠে দুই দেবদেবী আছেন। বাঁইড়্যার থান বলে। হাজার বসর পূর্বে মুণ্ডারা প্রতিষ্ঠা করেন।

—আচ্ছা! মুণ্ডারা বেশ প্রভাবশালী ছিল, বলুন— মিঠু একটু ভরসা পেয়ে কথা বলে।

যত সময় যায় কস্তুরীবেনের মুখ শুকনো হয়ে যেতে থাকে। বুঢ়ার চোখ এড়িয়ে কাজল তাঁকে ধৈর্য ধরতে ইশারা করে। শিখরিণী চমৎকৃত হয়ে ভাবে পুরাকালে মুণ্ডারা রাজা ছিল? বহুদিন স্বাধীন রাজা হিসাবে বাস করেছে। সেই 'আরণ্যক'-এর রাজকন্যা ভানমতীর কথা মনে পড়ে যায় তার। সেইজন্যে?— সে আপন মনে হাসে।

কাজল বলল, আচ্ছা দাদু, এই ধরুন নতুন নতুন রাত কহানি তৈরি হয় না আপনাদের? প্রাচীন কথা নয়, এই ধরুন পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কী হয়েছে না হয়েছে।

বুঢ়া শুনতে পেল বলে মনে হল না।

—আদিনারায়ণ সিং, বিহারের রাজা— সে হঠাৎ দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে শুরু করে— তাঁরার পুত্র দেবনারায়ণ সিং শ্রীজগন্নাথ দরশনে পুরী যাচ্ছেন, লক-লশকর, রানি, বান্দি সব। চলতে চলতে রানির প্রসব বেদনা হল। কিছু লক, লশকর, ব্রামহন, রেখে তাঁরা সব চলে গেলেন। জঙ্গলে রানির চাঁন্দের মতো ছেল্যা জন্মায়। দিনের পর দিন যায় কেহ আসে না, খাবার নাই, রানি বিপদে পড়ল্যান। ওই রাজাটি ছিল মহাবীর সিং মুণ্ডার। ছোটনাগপুর—গ্রাম—উলিডি। রাজা এঁরার কথা জানতে পারলেন। বাগিচা বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। সে ছেল্যার নাম হয় নিরঞ্জন সিং মুণ্ডা। মহাবীর তাঁকে খুব ভালবাসতেন, রাজ্যের ভার দিল্যান। রাজ্য সব মেনে যায় মুণ্ডা কিনা রাজা! রাজার কন্যা শক্তিশ্বরীর সঙ্গে বিহা হল। সুখে থাকেন। রাজ্য সুখে থাকে। ওঁরাদের সাত ছেল্যা। ক্রমে মহাবীরের ছেল্যাদের সঙ্গে বিবাদ হল। তাঁরা এঁরাদের তাড়াই দিলেন। কৈড়া গ্রামের রাজাকে হারিয়ে ওইখানে এঁরা বাস-বসত করলেন। নিরঞ্জন সিংয়ের ছেল্যারা আর সঙ্গে কুলের দেবতা। ছয় ভাই ক্রমে চারদিকে চলে যান। কিন্তু পাঁচ বসর পরপর সব কৈড়াতে মিলা হয়। বড় ভাই একদিন দ্যাখেন— কাঁড় হাতে, শিরে পুষ্প এক পরম সুন্দরী শিকারিণী দাঁড়িয়ে আছেন।

পেরনাম করে বলেন, কে মা তুমি?

উনি বললেন, আমি তোমারদের দেবী দুর্গা, কিরাতিনী বেশে শিকার করছিলাম। এখানেই আমার পূজা করিবে।

সব মূর্খ লক কিরাতিনী বলতে পারে না, বলে কিয়াইসনি। এই যেমন এই মা, দশটি বাহু নাই, কাঁড় নাই, কিন্তু কিয়াসিনি বটে।

বুঢ়া অপলকে চেয়ে থাকে অপ্রতিভ শিখরিণীর দিকে। হাত জোড় করে নমস্কার করে। তারপর ঘুরে ঘুরে সবাইকে নমস্কার করে, বলে— নিরঞ্জনের বড় পুত্র যখন কুলদেবতা বাঁইড়্যাকে আনতে গেলেন, দেবতা বললেন— আমি লকালয়ে যাবো নাই। নিরালায় থাকবো।

সেই বাঁইড়্যার থান। বড় জাগরূক দেবতা। আর কিয়াইসিনী। নদীর দক্ষিণ কিনারে পূজা হয়। সিখানে শবরদের কুলি উঠেছে। কিয়াইকচা ঘাটের নাম হয় কিয়াইসিনির ঘাট।

আচ্ছা দাদু— কাজল বলল, এই যেমন বনের মধ্যে রানি, কি হঠাৎ কিরাতিনী বেশে মা দেখা দিলেন। তেমন আপনাদের কালে আপনারা দেখেননি!

উত্তরে বুঢ়া বলল, বাঘরাই সিং মুণ্ডা ওই বংশের পূজারী। কিন্তু খুব বীর। পঞ্চকোট রাজদরবারে আঁরার কাজ হল। বাঘরাইয়ের এমন দাপুট যে রাতের পাহারা সব নিদ্রা গেলে বাঘরাই একাকীই প্রাসাদ পাহারা দিতেন। মানবাজারের রাজার সহিত লড়াই হল। রাজা ভাল লক নয়, তাঁকে ভুলিয়ে ডেকে এনে খুন করলেন। তো তাঁরার ভূতপ্রেত বিরাট মূর্তি যুদ্ধ করতেই লাগল। তখন রাজা হার মানলেন— তাঁর মন্দির গড়লেন। প্রতি মঙ্গলবার হাট হয়। এ যদি ইতিহাস লিখো তো ছেল্যা ওইখানে যাবে। ছোট ডুংরিতে দেবতার থান। বাঁইড়্যা কি বানর, লেজ নাই। কোনও মূর্তি নাই, মাটির ঘোড়া, সিন্দুর, আতপ চাল, তুলসী, ধূপ, দীপ সব দিয়া পূজা হয়। যা মানসিক করবে পেয়েঁ যাবেক। কংসাবতী সেকালে ছিল সোঁতা। এখন নদী বটে। আপনারা পৌষ সংক্রান্তি, কি ফালগুন মাসে সাত তারিখে আসবেন, দেখবেন ভারী মেলা, মোরগ লড়াই।

শিখরিণী কাজলের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে বলল, তাই বলি! এমন বীরপুরুষদের বংশধর তো বীরই হবে!

কাজল হেসে বলল, তাই বলি! এমন শিখরিণী দেবীর বংশধর তো শিখরিণীই হবে।

বুঢ়া বলল, আপনারা এই সময়ে আসছেন। না পাবেন শিকার পরব দেখতে, না পাবেন ছো-নাচ। জাঁক গানও তো হইয়াঁ গেলঁ। এ বসরের মতো মা মনসার পূজা শেষ।

আপনি তো ছো নাচেরই ওস্তাদ, দাদু?— কাজল বলল।

আমি আর তেমন ওস্তাদ কী। ওস্তাদ হইলেন প্রহ্লাদ সইস, যাঁর ঠে আমি শিখেছি।

কখন হয় ছৌ নাচ?— শিখরিণীর খুব দেখবার ইচ্ছে।

মার্চ মাসের পয়লা তারিখ আখ্যান যাত্রার দিন থেকে আখড়ায় মহড়া লিতে হয়। চৈত সংক্রান্তির দিন থেকে নাচ শুরু হয়। রহিন-এর দিন পর্যন্ত চলে। রহিন হল্য পয়লা জ্যৈষ্ঠ। রহিন ফল খায় সব। সাপে কাটে না। তবে এখন কেউ সময়কাল মানছে না। বারো মাসই নাচ করছে। আপনারা দেখবেন মা?

হঠাৎ কস্তুরী বললেন, আপনার দোল আছে? কারা কোরে নাচ?

ই সব সিং, মড়ল, মাহাতো, হাড়ি, মুচি, কামার, কুমার, রাজুয়াড়— এরা বারো মুনিস খাটে, ভাতুয়া খাটে, কি হয়তো তাদের কিছু জমি কাছে। আজকাল বড় লোকেরাও করছে। পুরুষ মানুষের নাচ মা। দল আমার আছে। হাঁক দিলেই সব জড়ো হবে। দূর দূর থেকে চলে আসবে। পাহাড় থেকে নামবে, ইদিক উদিক। ছো-র বাজনা অসুরা বাজনা। বাজনা একেবারে চঁ করে লিবেই। বিশ-পঁচিশ লোকের নাচ!

কস্তুরী কাজলকে একান্তে ডেকে বললেন, উনি বলছেন দূর দূর থেকে সব আসে। কাজল, তাদের কাছে খোঁজ পাবে না?

অন্যমনস্কভাবে কাজল বলল, পেতে পারি। খারাপ আইডিয়া না। আসলে সে ভাবছিল— কেমন একটা গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে। সে টের পাচ্ছে। বালিরাম ভুক্তা বলেছিলেন সাংবাদিকরা এসে বিরক্ত করে, ইন্টারভিউ... অভিনিবেশ নষ্ট হয়।— যত এদিকে আসা যাচ্ছে— সেই গোপনীয়তা যেন বেড়ে যাচ্ছে। সে একদম নিশ্চিত যে এই মাধব সিং একবার-দু'বার তার প্রশ্নের জবাব দেননি। কথা ঘুরিয়ে নিয়েছেন।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। হ্যাজাক জ্বলছে চারদিকে। ঢোল, মাদল, ধামসা বেজে উঠল। অসুরা বাজনাই বটে। লোক জড়ো হয়েছে খুব। মাঝখানে চমৎকার সব মুখোশ পরা নাচিয়ের দল। শিঙা হাতে এক বাজিয়ে তুড়ুক করে লাফিয়ে উঠল।

মাধব সিং মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

শোনেন সব— ভাই, বুন, মা, যে যিখানে আছেন। ছো হল কি খাটিয়ে লকদের ডান্স। সারাবছর খাটেখুটে, কখন কখন নাচ করে। এক আনন্দ ফুর্তির নাচ।

চড়িদা থেকে ভাল মুখোশ আছে ওস্তাদের ঘরে। সানাই, ঝাঁঝ স-ব আছে। সিবার একাডেমি টাকা দিয়েছিল। সাজ-বাজনা কিনেছি মা।

—আমার কথা কী—রাজনীতি করে দলগুলি ভাঙেন না। মানুষের ফুর্তি আনন্দ লষ্ট করেন না। আমি দেখছি— সব ভাঙছে, দলাদলি বাড়ছে। ছো-এর মধ্যে কোনও পার্টি নাই। এ একবার লষ্ট হয়ে গেলে পরে পস্তাবেন।

ওরা বসেছে সামনে। কতকগুলো প্লাস্টিক চেয়ারে। কাজল সবার অলক্ষ্যে উঠে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেল।

—কোথাখে আসছেন গ!

—অযোধ্যা পাহাড় থে।

—জোর নাচ, না? বাজনা একবার বাজলে হল।

—যা বলিছেন— লোকটি সাদা দাঁত বার করে হাসল।

—পাহাড় এখন কেমন?

—পাহাড় আর আগের পাহাড় নাই। ম্যালেরিয়ার মশা খুব।

—ওখানে আপনাদের ইস্কুল— পাঠ কিছু হয়েছে। তেমন!

—তা হঁয়েছে, তবে তেমন তেমন হল্যেঁ...

গণেশ-বন্দনা শুরু হল। লোকটি মুখে কুলুপ আঁটল।

সিঁদুর বরণ অঙ্গ
মুষিকবাহন
সর্ব আগে পূজা করি
হর-গৌরীর নন্দন
নমঃ নমঃ নারায়ণ

গুড় গুড় গুড় করে বাজনা আরম্ভ হল। মাদল ধামসা ক্রমেই উত্তেজক হয়ে উঠছে— ঝাগিন গেঝাগিন, একজিন, গেজাগিন, গেজাগিন ঝাঁ।

গণেশের নাচ শুরু হল বাজনার সঙ্গে।

—কী বলেছিলেন তেমন...তেমন!

লোকটি উত্তর দিল না। একমনে নাচ দেখছে, তালে তালে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। কাজল আস্তে আস্তে সরে যায়। একদম অন্য দিকে চলে যায়। ভিড়ের সঙ্গে মিশে সে-ও তালে তালে মাথা ঝাঁকায়। আলগাভাবে বলে, ওস্তাদ ঠিক বলিছে, এমন নাচ-ফুর্তি রাজনীতিতে সব লষ্ট করি দিল। তাই তো মা বলেন— আর যা করিস করিস— হাঁড়িয়া ছুঁবি নাই। রাজনীতি করবি নাই।

পাশের লোকটি বলল, ঠিক। রাজনীতিটি কেমন হল জানেন? আরেক নাচ, আরেক বাজনা। অসুরা বাজনা।. চঁ করে টেনে লিবে।

আর একজন বলল, মা যেমন পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরেন, উখানে রাজনীতি ঘিঁষতে পারবেক নাই। কিন্তু যখন টাড়িতে আসেন, খুব বলেন— নিজের পড়া কর, চাষ কর, তাঁত বুন, ঘট গড়, আর আনন্দ কর। হাঁড়িয়া-আনন্দ নয়।

আর একটি গলা, রাজনীতিও এক রসি জিনিস।

কার্তিক আসছে, কার্তিক আসছে, শোর উঠল।
আসিছে যে জন ময়ূর বাহন
চড়া দিয়া ধনুর্বাণেতে
ও ভাই আজ কী হইবে রণেতে।

গেড়েন, ঝাঁ ঝাঁ গেজাঘেন— বাজনা বাজে— ঔর তা তেরে কেটে তা ঝাঁ-গেঁজাগেন, ঝাঁ গেঁজাগেন, তাক্, তাক্ তাক্

—মার উখানে কুনও রাজনীতি নাই, দলাদলি নাই— কাজল বলল

—কুন সেন্টারের কথা বলছেন? —নিমডি?

—হাঁ, উখানেই তো উঁর কথা শুনেছি...কাজল বলল। ভিড়ের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে আর এক দিকে চলে গেল— দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

অনেক রাত হল— মাধব সিং আবার মাঝখানে চলে এলেন— আপনারা সব চলি যাবেন না। ইখানে আজ পরব— দিনের খাওয়া। এক মা এসেছেন গুজজর পদেশ থেকে। নাচ দেখছেন, পরব দেখছেন, আমাদের হিস্ট্রি শুনছেন— বড় পণ্ডিত আছেন মায়ী—সঙ্গে তেনার ছেল্যা ছুলা। উনি আপনাদের সব ভোজ দিবেন।

একটা বিরাট শোর উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চত্বর পরিষ্কার হয়ে গেল, পাতা পড়ে গেল। বিরাট বিরাট ডোলে কড়ায় খাবার হয়েছে। আর্টিস্ট, দর্শক, আচার্য, অতিথি, সব বসে গেলেন। খিচুড়ি, লাবড়া, মাছভাজা, চাটনি আর বোঁদে। এখানে কোনও মতেই ভাল রসগোল্লা জোগাড় করা গেল না।

—উনি আমিষ খান না। মাকে আলাদা দাও। মা, আলুভাজা খাবেন তো? বেগুন ভাজা?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

—আমিও মাছ খাব না—কাজল গিয়ে একটু দূরে বসে পড়ল কস্তুরীর পাশে। খেতে খেতে বলল, দিদি, কাজ হয়ে গেছে।

চমকে উঠলেন কস্তুরী।

—একসাইটেড হবেন না। জায়গাটার নাম বার করতে পেরেছি। তবে ওঁর একাধিক সেন্টার আছে। দেখি কী করতে পারি!

মাধব সিং বললেন, ছেল্যা। শেষ পালাটি বুঝলেন তো? মায়েরা বুঝেছেন?

কাজল তেমন মন দিয়ে কিছু দেখেইনি।

শিখরিণী বলল, ওটা তো মা-দুর্গার মহিষাসুর বধ মনে হল, কী মিঠু? তাই না? মিঠু মাথা নাড়ল।

চারদিকে একটা হো-হো মতো শব্দ উঠল। মাধব সিং এক হাত তুলে সবাইকে থামালেন। বললেন, না মায়েরা ওইটি মহিষাসুর নন, উনি হলেন দৌরদণ্ডপ্রতাপ হড়দের রাজা— হুদুড়-দুর্গা। আর্য-মানুষদের সর্দার ইন্দ্র তাঁর সঙ্গে রণে এঁটে উঠতে লারছিলেন। তখন একটি কৌশল করিলেন। এক পরমাসুন্দরী আর্য কন্যাকে হুদুড়-দুর্গার সকাশে ভোট পাঠশইলেন। এই হইল রাজার কাল। তিনি আর কিছু চক্ষে দেখেন না। সমরকালে মনে পড়ে থাকে যুবতীতে। শেষে মহারণ হইল। হুদুড় জিততে লারলেন। পরাজিত হয়্যা মৃত্যুবরণ করলেন। হড় জাতি চাম্পা রাজ্য থেকে তাড়া খেয়ে অন্যত্র চলে গেল। লককথা বলে কী এই সুন্দরীর জন্য হুদুড়কে জয় করেন তাই ইন্দ্রর আজ্ঞাক্রমে এঁরই নাম হয়ে গেল দুর্গা। পূজা পেতে লাগলেন। দুর্গা বললেন আপনারা, কিন্তু দুর্গা শব্দে সাঁওতালিতে ছেল্যা বুঝায়। বিটিছেল্যা হলে হবে— দুর্গী।

আশ্চর্য হয়ে কাজল বলল, এমন গল্প তো কখনও শুনিনি ওস্তাদজি!

ওস্তাদ বলেন, লককথায় আছে। এ দেশ মাটি তো ঘেরওয়াল হড়হপনদেরই ছিল বাবা। সেই ঠাকুরজিউ যবে থেকে সৃষ্টি করলেন। আর্য মানুষ এসে তাদের ক্রমেই তাড়ায়, ক্রমেই তাড়ায়। এরা তো পূর্বে জংলিও ছিল না। শহর বাজার ছিল, জমি-মাটি, গড়, সেনা স-ব। স-ব যাঁইছে। তারপর তুড়ুক এল, তারপর গোরা সাহেব এল, ব্যস, সব শেষ হইয়্যা গেল।

১৬) পঞ্চম পর্ব

গর্তের মধ্যে পড়ে প্রচণ্ড লাফিয়ে উঠল গাড়ি। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। যাত্রা শুরুর সময়ে মেঘ-ছাওয়া ছিল আকাশ। কিন্তু এমন বৃষ্টি হবে ড্রাইভারজিও ভাবতে পারেননি। না হলে হয়তো একটা দিন থেকে আসতেই হত।

চাণ্ডিল থানার ছোট্ট গ্রাম নিমডিতে যাচ্ছি আমরা। রাস্তা খুব খারাপ, আশেপাশে কিছু নেই,

খালি ধুধু লাল ডাঙায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু কিছু গাছ। গর্ত এড়াবার প্রাণপণ চেষ্টায় এক এক সময় গাড়ি একদিকে বিশ্রীভাবে হেলে যাচ্ছে। শিখরিণী পড়ছে আমার গায়ে, আমি নিজেকে প্রাণপণে সামলাচ্ছি, পাছে দিদির ঘাড়ে পড়ে যাই। সবসময়ে যে সামলাতে পারছি তা-ও না। কাজল যেহেতু সামনে বসেছে ওর কোনও হেলদোল নেই। দু'পাশ থেকে ছিটকে উঠছে কাদা। গাড়ির কাচ বন্ধ করে আমরা ঘামছি।

আপনি ঠিক যাচ্ছেন তো ড্রাইভারজি! কাজল জিজ্ঞেস করল।

ঠিকই তো! চিনা জায়গা।— বলে বেশ নিশ্চিন্তে স্টিয়ারিংয়ের ওপর হাত রাখেন অর্জুন সিং।

এসব ফাঁকা জায়গা বাজ পড়লে খুব বিপদ! কাজল আরও নিশ্চিন্ত গলায় বলল।

কস্তুরীবেন বসে আছেন একদম নিশ্চুপ। তিনি কিছু শুনছেন, গাড়ির লাফানি টের পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। একবার আমাকে বললেন, তুমি তো মাউন্টেনিয়ারিং করেছ দিদিমোণি। দার্জিলিং থেকে সন্দকফু ট্রেকিং তুমি কেন ঘাবড়াচ্ছো?

আমি ঘাবড়াইনি দিদি, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমার কুনও কোষ্ট নাই। তুমি ওতো এমব্যারাসড্ হচ্ছো কেন? ঠেসো, যত খুশি ঠেসো আমাকে। কিচ্ছু হোবে না। দিদি ট্রেকিং না পারে, পাহাড় চড়া না পারে, কিন্তু দুবলা নোয়, স্ট্যামিনা আচে।

বাগমুণ্ডি থেকে উনি আমাদের দু'জনকে ফিরে যেতে বলছিলেন।

ওনেক অ্যাডভেঞ্চার তো হল, এবার অগাস্ট গরম, বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তা ভাল নোয়। তুমরা ফিরে যাও। কাজলও ফিরে যেতে পারে।

কাজল কোনও মন্তব্যই করেনি। কোনও জোরজার, যুক্তি দেখানো কিচ্ছু না। খুব পরিষ্কার যে সে তার দায়িত্ব পালন করবেই। শিখরিণীর বোধহয় ফেরবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি ফিরছি না বলে ও-ও ফিরবে না। হয়তো বাধোবাধো ঠেকছে। কিংবা হয়তো অন্য কোনও কারণ আছে। যাক, স্পেকুলেট করে লাভ নেই। আমি যাচ্ছি, দায়িত্ব আছে বলে, আবার ভাল লাগছে বলেও। কত নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হল। সাধারণত আমি যখনই বেরোই একটা ডায়েরি রাখি। এবারেও রেখেছি। তবে মাধব সিং মুণ্ডার উচ্চারণ বুঝতে আমার একটু অসুবিধে হয়েছে। পরে কাজলকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। উনি আবার ভাল ভাল শব্দ ব্যবহার করছিলেন, মাঝখানে মাঝখানে স্থানীয় উচ্চারণে ক্রিয়াপদ। আমাদের কথা ভেবেই বোধহয় আবার কখনও কখনও উচ্চারণটা শুদ্ধ করবার চেষ্টা করছিলেন। হইয়্যাঁ আবার হয়ে। একটা অনুনাসিক টান আছে। খুব অদ্ভুত লাগছিল। গ্রাম, গাছপালা, স্থানীয় মানুষ, ছো নাচ সব কিছু মিলিয়ে খুব চমৎকার মানিয়ে গিয়েছিল এই অনুনাসিকতা। আমি ছৌ আগে দেখেছি, কিন্তু সে শহুরে আবহাওয়ায়, খুব জাঁকজমকের মধ্যে। এরকম বৃষ্টিহীন ভাদুরে সন্ধ্যার দিকে আকাশের তলায়, হ্যাজাকের আলোয় নয়। আলো পড়ে মুখোশের ঘামতেল জ্বলজ্বল করছিল। তাইই, এখন মনে করে দেখলুম শেষের পালাটাতে অসুরকেই প্রধান করে দেখাল। জনা দশেক সঙ্গী-সাথী, কালো মুখোশে সাদা লাল ঠোঁট। তামাটে বাবরি চুল, ওদের হাতে ছিল বল্লম, কাঁধে ধনুক, বাণ। আরও জনা দশেক ছিল— সাদা মুখোশ, কালো চুল, লাল ঠোঁট। তার মানে কালোরা হচ্ছে অসুর বা হড় জাতি, যারা মহেঞ্জোদড়ো থেকে সরতে সরতে মেদিনীপুর পর্যন্ত এসেছে। এরপর কোথায় যাবে জানে না। আর সাদারা হচ্ছে সুর বা আর্য জাতি। দুর্গার মুখোশ সবচেয়ে সুন্দর। চাঁপা রঙের মুখোশ। কুঁচি কুঁচি চুল। টানা টানা চোখ, ভ্রূ। হাতে একটা ছোট ঢাল আর বল্লম ছিল ঠিকই। কিন্তু দুর্গা দুই দলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে যেন খেলাখেলা লড়াই করছিলেন। অন্যদের লড়াইয়ের প্রচণ্ডতা নেই। তা হলে এ সবই সেই আর্যকুমারীর ছলনা।

দুর্গা-অসুরের এই সাঁওতালি মিথ আমাকে স্তম্ভিত করেছে। এক পক্ষের কাছে যিনি দেবী, অন্য পক্ষের কাছে তিনি মায়াবিনী! এক পক্ষের কাছে যিনি বীর, অন্য পক্ষের কাছে তিনি দস্যু। এই 'মোহিনী' ব্যাপারটা তো আরও আছে আমাদের পুরাণে। শিখরিণীকে বললাম। ও এসব ভাল জানে।

ও বলল, সুন্দ-উপসুন্দর গল্পেও তো এমনই তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করলেন দেবতারা! আর শুম্ভ নিশুম্ভ জানিস তো? কৌশিকী নামে এক অপূর্ব সুন্দরী নারী বা চণ্ডিকা সৃষ্টি হল। তবে এবারে ওদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নয়। যুদ্ধে হারলে তবে কৌশিকীকে পাবে এই শর্ত হয়েছিল। কৌশিকী-চণ্ডীই ওদের মারেন। প্রতিবারেই মোহিনী নারীর দরকার পড়েছে, আর দেবতারা তাকে বানিয়ে নিয়েছেন। এমনকী অমৃত ভাগের সময়েও অসুরকে কী অন্যায়ভাবে ঠকাল দেখ দেবতারা! বিষ্ণু নিজে 'মোহিনী' সেজে অসুরদের মোহিত করে অমৃতের বাটি সরিয়ে নিলেন! অথচ দুই পক্ষ মিলেই সমুদ্র মন্থন করেছিল। তবে কী জানো মিঠু! পুরাণের অসুর— অশুভ প্রতীক, আর দেবতা— শুভ শক্তির।

কিন্তু প্রতীক হলেও তো তাকে এথিকস্ঠা মানতে হবে!— আমি বলি। আসলে আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম— আমরা কে! হুদুড় দুর্গাদের? না অভয়া বরদা মহিষাসুরমর্দিনীর। যিনি অতুল রূপলাবণ্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রত্যেক দেবতার কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্রও পেয়েছিলেন।

দেবতারা অমৃতভাণ্ড চুরি করে নিয়েছিলেন, সেই থেকে অসুররা হাঁড়িয়া খাচ্ছে। এই আর কী! নাকের বদলে নরুন।—সামনের সিট থেকে কাজল বলল। তার গলায় সামান্য হাসির ছোঁয়া।

আমি বললাম— তুই এই সাঁওতালি মিথটা জানতিস? —আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিল জানতে যে ও জানে কিনা।

না। এখন জানলাম।

তা হলে তুই কীসের গবেষণা করছিস?

সামহাউ ওটা আমি মিস করে গেছি।

ছৌ তো আরও দেখেছিস, এই পালাটা দেখেছিস?

নাঃ! এই প্রথম। আমি এতদিন তেমন ফিল্ড-ওয়ার্ক করিনি মিঠু। স্যরি। ভেরি স্যরি।

মা, বাঁদিক বরাবর রেললাইন গেছে। ওই দেখুন দূরে ট্রেন যাচ্ছে। আদ্রা-চক্রধরপুর ধরে এলে আপনাদের আর এত কষ্ট করতে হত না। অর্জুন সিং বললেন।

আমরা তো কলকাতা থেকে সোজা আসিনি, কাজল বলল— ঘুরতে ঘুরতে এসেছি।

এবার আমরা একেবারে মাটির রাস্তা দিয়ে যাব— সতর্ক করলেন অর্জুন সিং। আর বলতে না বলতেই গাড়িটা ঝপাং করে এটা গাড্ডায় পড়ে গেল। বৃষ্টি থেকে গেছে, জানলার কাচ খুলেছিলাম, একগাদা কাদাজল ছিটকে এসে শিখরিণী আর আমাকে ভিজিয়ে দিল। এমা!! শিখরিণী প্রায় কেঁদে ফেলে আর কী!

কাজল তার অবস্থা দেখে বলল— দিদি তো বলেইছিলেন— তোরা ফিরে যা। দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারবার— সে অ্যাডভেঞ্চার কি আর শখের অ্যাডভেঞ্চার থাকে শেষ পর্যন্ত?

কিন্তু গাড়ি চলছে না। গাড্ডা থেকে তুলতে হবে। আমাদের দিকটাই কাত হয়েছে। কাজল লাফ মেরে নামল। অর্জুন সিংও কাজলের পেছন পেছন। দু'জনেই কাদা-মাখা।

এ দু'জনের কাজ নয়।—কাজল বলল। তারপর ওরা দু'জনে পরস্পর কী আলোচনা করে সামনের দিকে এগোতে থাকল। মেঘে-ঢাকা সাদাটে আকাশের তলা দিয়ে ওরা ছোট হতে হতে একটা বাঁশ ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি বললাম, আমরাও একটু নামতে পারলে ভাল হত।

শিখরিণী রাগ করে বলল, আমাদের আর নামতে হবে না। গাড়ি তো অর্ধেকটা নামিয়েই দিয়েছে, বাকিটুকুও দেবে।

দিদির দিকটা উঠে আছে। উনি খুব অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছেন।

মিনিট দশেক এইভাবে কেটেছে। হঠাৎ দেখি আমাদের গাড়ি ঘিরে এক গাদা ছেলে। প্যান্ট গুটিয়ে পরা, গায়ে গামবুট। সবজে মতো জামা, হাতে সরু সরু বন্দুক না কী! স্থানীয় ছেলেই হবে মনে হয়।

—কে আপনারা?

—কোথায় যাচ্ছেন?

—কোথা থেকে এসেছেন?

—ড্রাইভার কোথায়?

একটার পর একটা বুলেটের মতো প্রশ্ন ছুটে আসছে। শিখরিণী ভয়ে ভয়ে কাঁপছে। দিদি বললেন, তুমরা কে? কোথায় যাচ্ছো? কোথা থেকে এসেচো?

কথার উত্তর দিন। কঠিন গলায় নির্দেশ এল।

—নিমডি যাব— আমি বলি।

—এটাই তো নিমডি!

—একানে কি কুনও সোশ্যাল সার্ভিস সেন্টার আচে? দিদি বললেন।

—তাতে আপনার দরকার?

আমরা সেকানে যাবো। গাড্ডায় পড়েচি। গাড়িটা তুলে দিলে যেতে পারবো— দিদি অমায়িকভাবে বললেন।

হঠাৎ একটা ছেলে দরজা খুলে তড়াক করে লাফিয়ে গাড়িতে উঠল।

শিখরিণী আঁক করে উঠেছে।

এই চোপ— ছেলেটি রাগত চোখে পেছন ফিরে বলল।

শিখরিণী আমার হাত দুটো এমন খামচে ধরেছে যে আমার রীতিমতো লাগছে। ওর হাত সাপের গায়ের মতো ঠান্ডা। আমি প্রাণপণে আমার তাপ থেকে ওকে ধার দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। বিপদে পড়লে আমার শরীর দিয়ে হলকা ছোটে। চরম সর্বনাশের জন্য আমরা প্রস্তুত। অন্ততপক্ষে আমি এরকমই হয়। জীবনটা এক গিয়ারে চলেছে। তিরিশ-চল্লিশ সাবধানী স্পিড রেখে যাচ্ছে। হঠাৎ কিছুর মধ্যে কিছু না স্পিড বেড়ে গেল। ষাট সত্তর আশি নব্বুই শ' একশ চল্লিশ ক্র্যাশশ্।

বাবা, তুমি হয়তো কাগজে পড়বে পুরুলিয়া জেলার নিমডি গ্রামের রাস্তার দু'টি তরুণী ও একজন প্রৌঢ়ার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সম্ভবত খুন হবার আগে এঁরা প্রত্যেকেই ধর্ষিত হয়েছিলেন। বডি পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে। রুটিন খবর। তুমি আজকাল এইরকম খবর পড়তে চাও না। তবু বাবা, এইটুকু যদি পড়ে ফেলো, হয়তো তোমার চোখে পড়বে নীচে তিনটে ছাপকা ছাপকা ছবি। তুমি সেভাবে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না, কেননা বন্দুকের গুলিতে, বাঁটে, চুরি দিয়ে ওরা আমাদের মুখ তো ফালাফালাই করে দেবে। আরও কিছু! হয়তো যোনিদ্বারে গুলি করবে ধর্ষণের প্রমাণ লোপ করতে। মণিপুরে জওয়ানরা মনোরমাকে যেমন করেছিল। আমি জানি না এরা কারা। কিন্তু যে-কোনও দলের হাতে মেয়েদের এখন এই-ই নিয়তি! তাই প্রস্তুত হচ্ছি। এই কাদাজল এবড়ো-খেবড়ো মাটির ওপর দিয়ে ওরা টানতে টানতে আমাদের নিয়ে যাবে। শিখরিণী, ইসস্, তোকে কত বারণ করেছিলেন কেন এলি? আর দিদি, দিদি! সেই সুদূর উত্তর-পশ্চিমে অত প্রাণ-বাঁচাবার পর এই হতভাগ্য দক্ষিণ-পূর্বে প্রাণটা দিতে এলেন! কী খুঁজতে এসেছিলেন দিদি! কী কুক্ষণে!

হঠাৎ শুনতে পেলাম একটা গলা বলছে, আমি এস্টার্ট দিচ্ছি, তোমরা জোরসে ঠ্যাল। দু'পাশেও থাক। পেছনেও যা। অনেকগুলো হ্যান্ড লাগবে।

তারপর স্টার্ট দেবার শব্দ। হড়হপন হড়হপন করে গাড়িটা গাড্ডা ছেড়ে রাস্তায় উঠে গেল।

একটু শ্বাস নেওয়ার সময়। ওরা আপাতত গাড়িটাও চুরি করছে। এই জঙ্গলের মধ্যে চট করে কেউ খুঁজতে আসবে না। এলেও গ্রেনেড, ল্যান্ডলাইন সব রেডি আছে।

দিদি বললেন, ইউ হ্যাভ ডান আ গুড জব। ভাল কাজ করেচো। থ্যাঙ্কিউ। আমাদের ড্রাইভারজি আসছেন বোধহয়। হ্যাঁ ওই তো। তুমাদের আর কোস্টো করতে হোবে না। ব্লেস ইউ বয়েজ, আশিস করছি তুমাদের।

দুর থেকেই অর্জুন সিং হেঁকে বলছেন শুনছি, কাজলবাবু, গাড়ি উঠে গেছে। উঠে গেছে। আসুন।

ছেলেগুলি বলাবলি করছিল, ওহ্, অর্জুন! অর্জুন সিং।

ওরা একটু দৌড়ে গেল। অর্জুন সিং ও কাজলের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর যেমন এসেছিল তেমনই উবে গেল আশপাশের বনবাদাড়ে!

ওরা দু'জনে গাড়িতে উঠলে দিদি বেশ খুশিখুশি গলায় বললেন— তুমরা এত দূর গেলে, চেষ্টা করলে, পারলে না। দ্যাকো আমি এইকানে বসে বসে লোক জোগাড় করে ফেললুম।

কাজল বলল, ভালই হল, ঠিকঠাক ডিরেকশনটাও পেয়ে গেলাম। এবার স্ট্রেট চলে যাব। কী রে ভয় পেয়েছিলি নাকি মিঠু, শিখরিণী? কথা বলছিস না কেন?

আমাকে আর জবাব দিতে হল না। দিদিই বললেন, ট্রেকিং করেচে দার্জিলিং থেকে সন্দকফু, মাউন্টেনিয়ারিং শিকেচে, তুমার মুন্ডু ভয় পেয়েচে।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু পথ। কোনওক্রমে গাড়িটা দুলতে দুলতে যাচ্ছে। অনেকগুলো বাঁক নিল। এইবার বুঝতে পারছি আস্তে আস্তে কমছে বন, বাড়ছে খোলা জায়গা। একটা বিশেষ এলাকায় ঢুকছি। দিগন্তে মেঘমেঘ পাহাড়। ধানের খেত। মাঝখানে দিয়ে পেটা সুরকির রাস্তা। বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু জলে ছলছল করছে চারদিক। শুরু হল দু'ধারে শাল, মহুয়া, সেগুন, ছাতিম ছাওয়া পথ। দু'ধারে দুটো বিশাল অশত্থগাছের মধ্য দিয়ে আমরা ঢুকলাম। এখনও বীথিকা ফুরোয় না। কাজল হেঁকে বলল, দিদি, দেখুন দু'পাশে পলাশ, কুসুমগাছ। বসন্তকালে এই গাছগুলোতে আগুন জ্বলে। দেকোরা দলে দলে দেখতে আসে, বুঝলি মিঠু?

মোড়ের মাথায় বাঁক নিল গাড়ি। রে রে করে দু'পাশ থেকে ছুটে এল কিছু লোক। হাঁটু অবদি ধুতি পরা। চকচকে গা। ঝাঁকড়া চুল, হাতে লাঠি।

কে? কে? কোথায় যাচ্ছেন?

অর্জুন সিং মুখ বাড়িয়ে বললেন, সেন্টার।

ভোটের লোক আনোনি তো? সেবারের মতো টিভির লোক?

না না— অর্জুন সিং পেছন ফিরে আমাদের দিকে তাকালেন —কী দিদি আপনারা টিভি-র লোক নন তো! ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে এসেছেন?

দিদি বললেন, কখুনোই না।

আপনি যদি ডিরেকশন সব জানতেনই আমাদের এত ভোগালেন কেন? —কাজল জিজ্ঞেস করল।

বাপ রে! মেরে ফেলে দিবে— অর্জুন সিংয়ের নিজস্ব বুলি বেরিয়ে এল। তাঁর মুখে চাপা হাসি।

দু'দিকেই টালি ছাওয়া খড়ে ছাওয়া বেশ বড় বড় কুটির। পাকা ছাদঅলা একতলা বিল্ডিংও দেখা গেল। কী অদ্ভুত এক গন্ধে ভরপুর জায়গাটা। গাছের, ফুলের, ভেজা মাটির।

দিদি থামতে বললেন, অর্জুন সিংকে। তারপর কেউ কিছু বোঝবার আগেই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। হাঁটছেন গটগট করে, যেন এতক্ষণ একভাবে বসে আসেননি, পা ধরে যায়নি, যেন গাড়ি গাড্ডায় পড়ে যায়নি, যেন বন্দুকের সামনে পড়তে হয়নি। আমরাও নামলাম। কাদায় ভিজে জামাকাপড়, পাঁক লেগেছে দু'জনের মুখে। হাতের তালু দিয়ে মুখে নেবার চেষ্টা করলাম। লোকগুলি পেছন পেছন আসছে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গড়গড় করে এগিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। শুধু আমরা কেন, কাজলও পেছনে পড়ে যেতে লাগল।

মেঘ ভেঙে এবার নীল আকাশ বেরিয়ে এসেছে। সেই ঝাড়গ্রাম থেকেই এই অদ্ভুত উজ্জ্বল নীলমণি আকা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসছে। তবু যেন আজকের আকাশ আরও নীল। পৌরাণিক নীল। গোলাপি আভা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। দূরে পাহাড়গুলোর মাথা কমলা, গোলাপি বেগুনি। একটা মস্ত দাওয়া-অলা কুটির। দু'পাশ থেকে ভিজে মাধবীলতা জড়ানো। মাঝখানে এটা চেয়ারে

লাল পাড় গেরুয়া রঙের শাড়ি পরা ঠাকরান। বেশি পাকা কম কাঁচা চুলের চালচিত্রের মাঝখানে একটা ঝলমলে হাসিমুখ ফুটে রয়েছে।

কস্তুরীদি বললেন, মিঠু, কাজল, শিখরিণী, ওই দ্যাখো আমার মা।

আমরা ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছি। দিদি এগিয়ে যাচ্ছেন, উনি দু'হাত বাড়িয়ে বলছেন— আয় কিকি। জানব না কেন? রমাই তো খবর পাঠিয়েছিল।

আমরা বুঝতে পারছি দিদির ভেতরে ঢেউ। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে দ্যাখা। এক হারানো জেনারেশনের সঙ্গে এক সন্ধানী জেনারেশনের। কখনও পাঁচজনের সামনে আবেগ প্রকাশ করেননি। ভীষণ যুঝছেন নিজের সঙ্গে।

পরস্পরকে চোখের ইশারা করি। ঘাসজলের ওপর দিয়ে ছপছপ করে হাঁটতে থাকি পেছন ফিরে। আশেপাশে ছেলে, মেয়ে, ছোট বড়, ওদের জিজ্ঞেস করতে থাকি।—কোথায় কী? কেন? কী ভাবে?

ওই যে তাঁতঘর। ওখানে আমাদের কাপড় বোনা হয়। ওই দেখুন টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার। দোতলা বাড়িটা স্কুল। না, ওই একটাই, কো-এডুকেশন। না, কলেজ সেভাবে নেই, হায়ার এডুকেশনের জন্যে আমরা বাইরে যাই। ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, আরও যা টেকনিক্যাল ট্রেনিং। এখানে বৃত্তিশিক্ষা। অ্যাগ্রিকালচার, পিসিকালচার, দূর দূর থেকে ট্রেনিং নিতে আসে। ধরুন বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, ওদিকে রাঁচি, হাজারিবাগ...আমাদের সেন্টার তো একটা নয় দিদি। অযোধ্যা পাহাড়ে আছে, পুঞ্চায় আছে। দলমার ওপর ঘন জঙ্গলের মধ্যে আছে। সারা পুরুলিয়ায় কুয়ো কাটছি, রাস্তা গড়ছি আমরা। এই যেসব বিল্ডিং দেখছেন— সব করেছে সেন্টারের লোক।...মা তো দলমাতেই থাকেন। বর্ষায় নিমডি কি আর কোথাও নেমে আসেন। নিমডিতেই বেশির ভাগ। হ্যাঁ— ফুলের চাষও হয়, এখন বেল, জুঁই, কামিনী...হ্যাঁ ওটা গন্ধরাজেরই বাস। মা এনে পুঁতেছিলেন। কী জানি আমাদের এখানে সারা গ্রীষ্ম, সারা বর্ষা ফোটে। ফুটে ফুটে হদ্দ হয়ে যাই ভাই। তবে হ্যাঁ, ফুল দেখতে হয় শীতকালে। একেবারে রঙিন। সেসব ফুল মার্কেটিং হয়। আমাদের মৌ, ছাতু এসব নিয়মিত বাজারে যায়। মুরগি চাষ হয়, দুধ প্রচুর। আমাদের খেয়েও প্রচুর থাকে। ঘি, মাখন, ক্ষীর হয়, বাজারে যায়।

ওঁরা দেখান— ওই যে দেখছেন পাহাড় সব— তিল্লা, ভাঙ্গাট, দলমা, চাণ্ডিল পাহাড়। পাহাড়ের দিকে এগোলে দেখতে পাবেন ঘাঘরা নদী। এখন তো খুব জল। এ বছর বৃষ্টি হচ্ছে খুব। আমরা বড় বড় চৌবাচ্চায় ধরে রাখি। কাল ঘাঘরা দেখিয়ে আনব। তবে আমাদের সীমানার মধ্যেও একটা নদী আছে। ঠিক নদী নয়, ঝরনা। আমরা বলি কপিলা। সেটাতে বাঁধ দিয়েছেন আমাদেরই পুরনো ছাত্র— এক ইঞ্জিনিয়ার। নিশ্চয়ই! যাঁরা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বা অন্য কোনও টেকনিশিয়ান হয়েছেন তাঁরা সাহায্য করেন, নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন। এখন হাসপাতালে আছেন ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ বাস্কে। নার্সিং সেন্টার আছে, অ্যাম্বুলেন্স আছে। তবে কী জানেন— এখানকার জলহাওয়া এত ভাল, আর আমাদের জীবনযাত্রা এত স্বাস্থ্যকর, সে নার্সরাই বেশির ভাগ সামলে দিতে পারেন। ওই তো কপিলা। বর্ষার জল আর তার আওয়াজ শুনেছেন? কাছেই ওটা আমাদের আর্ট স্কুল। সামনের মূর্তিটি আমাদের বাবার। গড়েছে এখানকার ছাত্র সুধন্বা কোটাল। এখন দিল্লির ললিতকলায় আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের এখানে আটকে থাকার দরকার নেই তো! বহু দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছেন আমাদের লোকেরা। মা তো তা-ই চান। যাক। কত দূর থেকে এসেছন সব, কী কষ্ট করে, এই আমাদের অতিথিনিবাস। সব রেডি আছে। গরম জল, সাবান— আসুন আপনাদের ঘর দেখাই। চানটান করে নিন। খাওয়াদাওয়া করুন।

সময়ের ব্যবহার কী অদ্ভুত! কত কাল আগের ঘটনা, মনে হয়, এই তো কাল ঘটল! আমার মাত্র দু মাস আগের কথা মনে হয় কত দিন! মায়ের যন্ত্রণা, মায়ের চলে-যাওয়া, প্রতিদিনকার খুঁটিনাটি

কথাবার্তা সমস্ত এখনও আমার মনের মধ্যে টাটকা। এখনও সেই তীব্র কষ্ট পাকিয়ে উঠতে থাকে নাভি থেকে চোখ পর্যন্ত, ছড়িয়ে যায় মাথার তন্তুতে তন্তুতে। মানি নি, মানব না। মা একটা জলজ্যান্ত সত্য আমার জীবনে। মায়ের কষ্ট একটা জলজ্যান্ত সত্য। কিন্তু কস্তুরীদির সঙ্গে ক'মাস, ঝাড়গ্রাম, জামবনি, গিধনি, পুরুলিয়া, নিমডি...রতনদা...মাধব মুণ্ডা....নির্ভয়পুর...?

এই তো সেদিন পুরো জেলা সার্ভে করে মোটা মোটা খাতা নিয়ে ফিরলাম! রীতিমতো ফিল্ড-ওয়ার্ক, মানুষ নিয়ে, মানুষের দশা তাদের গল্পকথা সমস্ত নিয়ে। অথচ মনে হয় কতদিন! এই তো সেদিন কস্তুরীদিকে হাওড়া-আমদাবাদের ফিরতি ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম! তাঁকে আসতেই হল। ফিরতেই হল। কিন্তু সে যেন আরেকবার মায়ের নাড়ি ছেঁড়ার কষ্ট। আমাদেরই তো ছিঁড়ে নিয়ে আসতে হল। নিঃসংকোচে কাঁদছিলেন। এই তো সেদিন! অথচ মনে হয় কত কত দিন আগে! হয়তো বা স্বপ্ন দেখেছিলাম। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাজ সেরে রাসেল স্কোয়্যারের পেভমেন্ট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা বলাবলি করি।

—কী রে, স্বপ্ন হলেও সত্যি, না?

—কিংবা সত্যি হলেও স্বপ্ন!

বলি, পাহাড়টার নাম ভাঙ্গাটই তো? ভাঙা ঘাট! আর ঝরনাটা? কপিলা, না কলকল্লোলা!

আর যারা তোদের ধরেছিল? কী করে ভাবলি ওরা রেপিস্ট? ওরা কি পুলিশ? জওয়ান?

—স্যরি। কিন্তু এনকাউন্টার উইথ মাও-গেরিয়া, বেঁচে ফিরেছি— বিশ্বাসই হয় না। এখনও নিজেকে নিজে চিমটি কাটি।

—তা যদি বলিস তুই ইনকরিজিবল স্কেপটিক একটা। তোকে কিছুই বিশ্বাস করানো যায় না। আমাকে বিশ্বাস করিসনি। আমরা যেটা করছি সেটা যে মূল্যবান কিছু, নিছক পণ্ডিতি গজল্লা নয়, সেটাও বিশ্বাস করিস না।

—বলি, আর তুই!

—তুইই বল।

—অ্যান ইনকরিজিবল রোম্যান্টিক!

জনবহুল লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে কপিলা কলকল্লোলে বইতে থাকে। মেঘের ওপারে দলমা....তিল্লা...ভাঙ্গাট....। জল ছলছল ঘাসের ওপর দিয়ে আমরা স্বপ্নের দিকে সম্ভবের দিকে হেঁটে যাই।

সমুদ্র-যাত্রা

ঘুমের মধ্যে আমি বাড়ি দেখি। জঙ্গলের মতো জনহীন, দিঘির মতো অথই, দুর্গের মতো নিশ্ছিদ্র, ফাংগাসের মতো ছত্রাকার, আবার ফাঁকা হাতায় লম্বা দেউড়ি নিয়ে ব্যাপক বাড়ি। কোনওটাই ছোটখাটো নয়। এত বিরাট যে তাদের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো, নীচ থেকে ওপরে যেতে অনেক সময় লাগে। অত সময় ঘুম কাউকে দেয় না। তাদের আদি-অন্ত, নীচ-মহল ওপর-মহল আমার অজানাই থেকে যায়। দেউড়ি থেকে শুরু করি, কখনও কোনও রহস্য-চাতালে, কখনও অফুরান বারান্দার মাঝ-মধ্যিখানে শেষ।

দুর্গ-বাড়িটা একটা কালো মাঠের মধ্যে। কালো, খোলা মাঠ। কিন্তু সে খোলা মাঠ আটকে দিয়েছে গম্ভীর পাঁচিল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি দিনের পর দিন। ছায়া-শরীরেরা ইশারায় আমায় ডেকে নিয়ে যায়। এ ঘর থেকে ও ঘর, ও ঘর থেকে সে ঘর, সব ঘর থেকে সব ঘরে যাওয়া যায়। কিন্তু একটা দরজা বন্ধ করে দিলেই সব শেষ। ভেতরে-যাওয়া কিংবা বাইরে আসা। কোথাও কোনও জানলা নেই। ভয় পেয়ে ছুটে বেরিয়ে আসি। দরজার পাল্লাগুলো মরচে-ধরা কব্জার ওপর কঁ্যাচ-কোঁচ শব্দে নড়ে। ভয়াল ভ্রূকুটি করে চাপা গর্জন করে দুর্গ। যেন ভীষণ বদমেজাজি রাগী মানুষ একটা, কথার অবাধ্যতা সইতে পারে না। তারপরে দেখি আমার পরনে একটা সুতোও নেই। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি। কেন না অনেক দূর দিয়ে ছায়া-মানুষেরা যাচ্ছে। তাদের কেমন চেনা-চেনা মনে হয়। ঘামে ভিজে গেছি দেখি।

ছত্রাকার বাড়িটা আরও অদ্ভুত। তার ঘর উঠোন বারান্দা সব আলাদা আলাদা দাঁড়িয়ে আছে। যেন কেউ বাড়িটাকে একটা বিশাল কৌটোর মধ্যে ঢুকিয়ে প্রচণ্ড রকম ঝাঁকানি দিয়ে দশ-পঁচিশের ঘুঁটির মতো ছড়িয়ে দিয়েছে। সব ঘর বারান্দার ছাত খুলে গেছে। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে আমি লাফ দিয়ে চলে যাই। নষ্ট কুয়োর মতো গোল ঘর। শ্যাওলার চৌবাচ্চার মতো চৌকো ঘর। ঘুরে বেড়াই নিশ্চিন্তে। কেন না আমি উড়তে পারি। আগে যে কথাটা জানতুম না সেটা আশ্চর্য মনে হয়। আফসোস হয়, আগে জানা থাকলে কত নতুন দেশে ভেসে যাওয়া যেত। লোকে কি সেভাবেই যায়? দেশভ্রমণে, তীর্থযাত্রায়? অথচ ট্রেন, অথচ বাস, জাহাজ, উড়োজাহাজ! কেন? কেন! তখন বুঝতে পারি অন্য কেউ পারে না, আমি একাই পারি, জলের তলার অদৃশ্য ডাঙায় লগি দিয়ে ঠ্যালা মেরে যেমন নৌকাযাত্রা, সেরকমই। গুপ্ত ক্ষমতা। আমার একার।

আবার অনেক সময়ে প্রশস্ত হাতায় উড়ে বেড়ায় শুকনো শালপাতা, খড়কুটো, বহুদিনের চাপা ধুলো। বড় বড় থামের মাথায় কবুতর কুবকুব করে, দেখে বুঝি। আওয়াজ শুনি না। তিন মানুষ উঁচু সিং দরজা। খোলা হা হা করছে। চলে যাও, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না, ঢুকে যাও। রোয়াক দিয়ে ঘেরা চৌকো উঠোন দ্যাখো। ওপর দিকে চেয়ে দ্যাখো আদ্যিকালের সিসে রং আকাশ, যেন কোনও বহুদিনের পুরনো সিন্দুক থেকে বার করে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছ্যাতলা-পড়া সাদা পাথরের ঘর। দরজার মতো বড় বড় জানলা। বাইরে তাকালে পড়ো জমি, চোখ অন্ধ করা ভগ্নস্তূপ—কোনও ঘর, ছাত, দালান ধসে পড়ে আছে। বাড়ি ঘিরে ভেতর বাড়ির গোলবারান্দা, বাইরেও দোতলা তিনতলা চারতলা ঘিরে বারান্দা চলেছে এক অন্তহীন পথের মতো। বাড়ির গাঁট থেকে দেওয়াল ফাটিয়ে, ফুঁড়ে উঠেছে ভূতের মতো বট-পাকুড়। তাদের বিস্তৃত শেকড়ের নিশ্বাস আমি শুনতে পাই। ছড়িয়ে যাচ্ছে দেওয়ালময়। ভয়, বিস্ময়, আহ্লাদ তেমন কিছু তো কই হয় না। বাড়িটা তার ঘর, দোর,

দালান, উঠোন, বারান্দা, থাম, তার ভগ্নতা ও ভয়াল আগাছা নিয়ে এক ধরনের বাস্তব। ছায়া-বাস্তব। কোথাও ওর কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার করা যাবে না। আমি এখানে কেন? আমার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? কী খুঁজছি? কিছু খুঁজছি কী? না কি কেউ আমাকে এই বাড়িগুলো পর পর দেখিয়ে যায়, বাড়ির দালালরা যেমন দেখায়। যদি কোনওটা পছন্দ হয়।

সারা জীবন এই স্বপ্নগুলো না-ছোড় ফিসফিস করে। ফিরে ফিরে আসতে ওদের কোনও ক্লান্তি নেই, লজ্জা নেই।

যারা খুব অন্তরঙ্গ একমাত্র তাদেরই আমি এই স্বপ্নের বাড়ির কথা বলেছি। এরকম মানুষ আমার জীবনে খুব কম। যেমন দাদু। দাদুই বোধহয় ছিলেন সবচেয়ে কাছের মানুষ। তাঁর, একমাত্র তাঁরই সারাদিনের কার্যক্রম আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করতুম। একই কাজ করছেন, কিন্তু প্রতিদিন যেন নতুন করে, কেমন একটা ছন্দ আছে, তাতে কোনও একঘেয়েমি নেই। বামুন ঠাকুরের পড়া পাঁচালি নয়, বেশ যত্ন নিয়ে শব্দ বেছে বেছে লেখা এক উপাধ্যান পুরনো দিনের একটা রাজকীয় স্টুডিবেকারে চড়ে স্যুট-কোট-টাই পরে, হাতির দাঁতের মুণ্ড-অলা ছড়ি নিয়ে তিনি হুস করে অফিসে যেতেন। সেটা ছিল তাঁর কর্মজীবনের শেষ দিক। তাঁর চুলগুলো সব ধবধবে সাদা হয়ে গিয়েছিল। তিনি এক কোটি-কোটিপতি ব্যক্তির এস্টেট-ম্যানেজার ছিলেন। কোনও কোনও সংস্থার ডিরেক্টরও ছিলেন। যেমন এক গ্লাস ফ্যাক্টরি। বাব্‌ল উঠে যাওয়া কাচের জিনিস আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসত। বড় বড় রঙিন ফুলদানি, সুন্দর সুন্দর গ্লাস, কিন্তু একেকটা একেক রকম, প্লেট আসত ছাপ ঠিকমতো ওঠেনি, ভাল পালিশ হয়নি। এইসব খুঁতো, বুড়বুড়ি ওঠা জিনিসই ডিরেক্টরদের বাড়ি আসত। কেউ এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলল না, খালি মা দুঃখিত গলায় মাঝে মাঝে বলতেন— কখনও কি নিঁখুত জিনিস আপনাকে দেওয়ার কথা মনে হয় না কারও? এত করছেন!

দাদুকে বলতে শুনেছি— মানুষ যেমন নিঁখুত হয় না, জিনিসও তেমন। যা পাচ্ছি, যা পাচ্ছ বউমা, যার হাত দিয়ে যেমনই আসুক সব ঈশ্বরের দান, খুঁতো বলে কি তুমিই ফেলে দিয়েছ? কত যত্ন করে যে সাজিয়ে রেখেছ!

আমার নিজের ঠাকুমা আমার জন্মের আগেই মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু আরও দুই ঠাকুমা ছিলেন—বড়দিদা আর ছোড়দিদা। আর কোনও দাদু বেঁচে ছিলেন না। জ্যাঠামশাই বিয়ে করেননি, কোথায় যে থাকতেন, তখন জানতুম না, কাকা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে, খুব বদলি হতেন, আমার যখন জ্ঞান হয়েছে তখন কাকা আমেদাবাদে। পরে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কানাডা চলে যান, আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। আমার বাবা, বলবার মতো বড় কিছু করতেন না, কিন্তু তাঁর দাপট ছিল খুব। নাম রাজকুমার। দাদুকে গরিব-গুর্বো লোকেরা ভালবেসে রাজাবাবু বলত, তারাই বোধহয় মুখে মুখে রাজকুমার নামটা চালু করে। দাদুর দ্বিতীয় সন্তান আমার বাবা ছিলেন রীতিমতো সুপুরুষ। একটা বি. এ ডিগ্রি ছিল। দাদুর দৌলতে বড় বড় চাকরি পেতেই পারতেন। কিন্তু নিতেন না। তাঁর মত ছিল বাবার বন্ধু বলে যাঁরা তাঁকে স্নেহ করেন, খাতির করেন, তাঁদের তিনি ওপরওয়ালা ভাবতে পারবেন না। সাফ কথা। ভাল ছাত্রও ছিলেন, কিন্তু ইউনিভার্সিটির ছায়া মাড়ায়নি। ডিগ্রি নিয়ে কী হবে? তিনি কি কোনও ডিগ্রিধারীর থেকে কম পড়াশোনা করেন? সুতরাং তিনি থাকতেন তাঁর মর্জি মেজাজ অনুযায়ী রাজকুমারেরই মতো। বাড়িতে তিনটি বুড়ো মানুষ ও নিজের মেজাজি স্বামীকে সামলাতে মা হিমশিম খেতেন। আমরা জ্ঞান হয়ে থেকে তাঁর সঙ্গ তেমন পাইনি। বাবাকে ঘোর ভয় পেতুম এবং অপছন্দও করতুম। আমার একমাত্র আকর্ষণ ছিল দাদু নামে সেই বৃদ্ধ অথচ কর্মঠ, বাস্তববোধসম্পন্ন অথচ স্নেহশীল মানুষটির প্রতি।

সন্ধেবেলা দাদু ফিরে এসে শরবত কি এক গ্লাস হরলিক্স খাবেন, তারপর আমাদের নিয়ে বসবেন।

দাদা এত ভাল ছাত্র ছিল যে নিজেই সব বুঝে করে নিতে পারত। খুব মাঝে মাঝে ছাড়া সাহায্য দরকার হত না। ফিনকি আমার বোন সন্ধে হলেই মায়ের আঁচল ধরে ধরে ঘুরবে। বাকি রইলুম আমি। পড়ি, গল্প করি। যত প্রশ্ন যত মনের কথা পাঠ্য এবং পাঠ্যের বাইরে সবই দাদুর কাছে, দাদুর সঙ্গে। পড়ছি, পড়ছি হঠাৎ হয় তো বইটা ঠেলে সরিয়ে রাখলুম।

—কী হল? বুঝতে পারছ না? না ভাল লাগছে না?

—আচ্ছা দাদু, স্বপ্নের কোনও মানে থাকে?

—খারাপ স্বপ্নের মানে থাকে না। ভাল স্বপ্নের মানে থাকে— দাদু হেসে বললেন— কী স্বপ্ন দেখেছ, ভয় পেয়েছ?

—না বাড়ি। খালি বাড়ি...

স্বপ্নগুলো দাদুকে সবিস্তারে বলি।

দাদু কখনও আমার কোনও কথা উড়িয়ে দিতেন না। মন দিয়ে শুনতেন, তর্ক-বিতর্কও করতেন যেন আমি তাঁর সমান বয়সি। ভুরু কুঁচকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন— তুমি তো মার্বল প্যালেস দেখেছ?

—হ্যাঁ। তুমিই তো নিয়ে গিয়েছিলে!

সারা শীতকাল দাদুর সঙ্গে মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, হুগলির ইমামবাড়া, ব্যান্ডেল চার্চ, চন্দননগরের স্ট্র্যান্ড, কিছু না হোক আমাদের গঙ্গার ঘাট, ফোর্ট উইলিয়ামের ঢালু জমির ওপর বেড়াতে বেড়াতে মাঝ গঙ্গায় নোঙর করা বড় জাহাজ দেখা ছিল আমাদের তিন ভাইবোনের কাজ।

—স্বামী বিবেকানন্দর বাড়িটাও দেখেছ!

—হ্যাঁ, উনি কোন ঘরটায় জন্মেছিলেন সেটাও।

—ঘিঞ্জি, পড়োমতো, না?

—হ্যাঁ।

—আর দেবেদের বাড়ি? ও বাড়ির একটি ছেলে তোমার বন্ধু না? গেছ?

—কতবার।

—তা হলে ওই বাড়িগুলোই স্বপ্নে নানারকম ভোল পাল্টে পাল্টে আসে। খুব একটা ইমপ্রেশন পড়েছে তোমার মনে, ভাল লেগেছে, বুঝেছ? নাও এবার এসেটা কী লিখলে দেখি।

—আমার ভাল লাগেনি।

—তা হলে খারাপ লেগেছে?

—তা-ও না। আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। ভালও না খারাপও না। তুমি থাকলে হয়তো ভাল লাগত।

—ঠিক আছে, এবার থেকে তোমার স্বপ্নের মধ্যে আমায় ডেকে নিয়ো।

আমি স্বস্তি পাই না— স্বপ্ন যদি তোমায় ঢুকতে না দেয়?

—ঠিক কথা— দাদু চিন্তিত মুখে বলেন— জোর করে কি আর কারও স্বপ্নে ঢোকা যায়? যায় না বোধহয়। তাই আমার স্বপ্নগুলো ছিল জনহীন।

আমাদের বাড়ি আর স্কুলের খুব কাছেই গঙ্গা, বাগবাজারের ঘাট। ঘাটে নাও এসে লাগে। বড় বড় খড়বোঝাই। আবার ছোট ছোট দাঁড়ের নৌকো। তার পাটাতনের তলায় কী আছে কে জানে, ছই থাকলে তার ভেতরটা দেখতে পাই না। একটা অন্ধ কোটর মতো। পাটাতনের ওপর কুণ্ডলী করা জাল, কাক ঠুকরোচ্ছে। জালের সুতো ঠোঁটে চেপে ধরে একবার এদিক একবার ওদিক। তারপরে হঠাৎ হয় তো একটু পাখনা ঝেড়ে নিল। গলা অবধি সমস্ত শরীরটা তখন পালক-পালক। কাক আমার ভাল লাগে। খুব কর্কশ ডাক কাকের, এঁটো কাঁটা খায়, মাথায় ঠোক্কর মারে, বাসা বাঁধতে

জানে না, চামচ মুখে করে নিয়ে চলে যায় হরদম। কিন্তু কাক যখন হালকা গরমের দুপুরে একলা গাছের মাঝডালে বসে থাকে, চুপচাপ, চোখ বাঁকানো নেই, খাবার খোঁজা নেই, কেমন যেন উদাস, ধ্যানস্থ, তখনই কাকের আসল রূপটা ধরা পড়ে। প্রতিদিনের উঞ্ছতা ছাড়িয়ে কাক তখন একা একা জীবন ভাবে, অদ্ভুত নির্লিপ্ত দেখায় তাকে। কালো গা, মিশকালো নয়, কেমন ছাতারে কালো। যা-ই খাক না কেন, কাকের চেহারা খুব সাফসুতরো, আমি কোনওদিনও কোনও মোটা কাকও দেখিনি। ছিপছিপে, হালকা পলকা।

কাকটা জাল ঠোকরাচ্ছে। মাঝি খুব অলসভাবে একবার তাড়া দিল হু শ্ শ্...কাক একটু পিছিয়ে যায়। আবার তুড়ুক তুড়ুক ফিরে আসে। মাঝি আর ফিরে দেখে না। উবু হয়ে বসে গভীর ভাবে বিড়ি টানে। যেন বিড়ি টানাটা একটা ভীষণ জরুরি কাজ। একটা ঝুপসি গাছের তলায় বসে আমি এইসব দেখি। আশেপাশে তাকিয়ে একটা দুটো ঢিল খুঁজি। তারপর একটার পর একটা জলে ছুঁড়ে দিই। খুব বেশি দূর হয়ে যায় না। কেন? হাতের জোর নেই আমার? ইচ্ছের জোর? পুলুও তো আমার মতো রোগা, ওর ঢিল তো অনেক দূর যায়। নৌকাটার আশেপাশে যদি পড়ত ঢিলটা! শব্দ হত টু প্ প্ প্। মাছি মুখ তুলে দেখত। যে যদি একবারও আমাকে লক্ষ করে তো আমি কৃতার্থ হয়ে যাই। সে নৌকা বায়, দূর-দূর দিক-দিগরে যায়, জাল ফেলে মাছ ধরে, মাছের গায়ে রুপো চিক চিক, দুপুরের রোদ চলকে চলকে পড়ছে মাঝির গায়ে, নাওয়ের গলুইয়ের, গঙ্গার ঘোলা জল তখন আর ঘোলা থাকে না, অজস্র চকচকে আঁশ তার জলে চলকায়। এক জীবনে সে কত ঘাট জানল, জলের কত নিবিড় খবর তার কাছে। মাঝি খুব অবাক মানুষ। কেমন একটা সম্ভ্রম হয়, বিশেষ করে যখন দূরে নিজের ডিঙিতে বসে দোল খায়।

পুলু এসে ডাকল— ঠিক জানি তুই এখানে বসে আছিস। কী গরম! রোদের কী ভাপ রে এখানে?

কথা বলি না। মাথার ওপর ঝুপসি গাছের ছাউনিটা দেখিয়ে দিই। পাতা-পাতলির মধ্যে দিয়ে চকরাবকরা রোদ এসে পড়েছে আমার শাদা শার্টের ওপর। কালো কালো ছায়া-পাতার নকশা।

—তাতে কী? ভাপটা তো বেরোচ্ছে মাটি থেকে! গরম হচ্ছে না?

—আমার হচ্ছে না। তোর হলে চলে যা।

তখন গরমের ছুটি। স্কুলে একটা স্পেশ্যাল ক্লাস হয়। হেড সার নিজে পড়াতেন, অঙ্কের জন্যে ছিলেন যতীনবাবু, সব বাঘা বাঘা মাস্টারমশাই। কোচিং ক্লাস সেরে বাকি দুপুরটা বাড়ি যেতে মন চাইত না। নিঝঝুম বাড়ি। দিদারা ঘুমোচ্ছেন। দাদা খুব শান্ত ধরনের, ভীষণ পড়ুয়া ছেলে, তার থাকা না থাকা সমান, ফিনকি গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে, মা খুটুর খুটুর করে আলমারি গোছাচ্ছেন, কী সব সেলাই টেলাই নিয়ে বসেছেন, তারপর একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়েছেন ফিনকির পাশে। কেমন স্যাঁতসেঁতে মরা বাড়ি। আমি নিজেও যে খুব হই-চইয়ে দুরন্ত ছেলে, খুব বলিয়ে-কইয়ে তা তো একেবারেই নয়। আমার ভেতরের স্তব্ধতাটা যেন আরও জো পেয়ে যেত এমন দুপুরে। তার চেয়ে গঙ্গার ধারে ঝুপসি বটতলায়...— ভাল। অনদিন দুপুরে বেরোলে বলে বেরোতে হত, খালি স্পেশ্যাল কোচিং-এর দিনগুলোয় কোনও জবাবদিহি নেই। দেড় ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, আড়াই ঘণ্টা ক্লাস, তারপর স্কুলেই হুটোপাটি। গান, গল্প। যতক্ষণ না দীনবন্ধু দারোয়ান চাবির তোড়া নিয়ে উদয় হত ততক্ষণ দু চারখানা খোলা ঘরে আড্ডা। গলা খাঁকারি, চাবির ঝন ঝন, তার মানেই দীনবন্ধুদা আসছে, উঠে পড়ো এবার।

অন্যান্য দিনে স্কুলে কী রকম একটা গমগমে ভাব। সারেদের পড়ানোর আওয়াজ। ছেলেদের যাওয়া-আসা একটু-আধটু কথা হাসি সব মিলিয়ে একটা জমজমাট হাওয়া। কিন্তু এই সব গ্রীষ্ম দুপুরের তাতে স্কুলটা যেন একটা অতিকায় কিন্তু খুব নিরীহ জন্তু। তার বিশ্রামের সময়ে কয়েকটি বালখিল্য সামান্য উৎপাত করছে তাতে সে কিছু মনে করত না। সামান্য আওয়াজ করলেই সেটা

যেন লাউড-স্পিকার-এ ঘোষণা হয়ে যেত। আমি খুব সন্তর্পণে কান পেতে স্কুল বাড়িটার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেতুম। একটা ভারী শরীরের শ্বাসযন্ত্রে যেমন হয়। আড্ডা হয়। কিন্তু আমি যে তাতে যোগ দিই না, শুধু হাসি, অনেক সময়ে হাসির জায়গায়ও হাসি না, কেমন অন্যমনস্ক থাকি এটা একমাত্র পুলুই লক্ষ করত।

—কী ভাবিস রে? এই সমু?

—কই কিছু না তো!

—কিছু হয়েছে?

—কী হবে?

—তা হলে এরকম চুপচাপ...

—কিচ্ছু ভাবি না।

—বলবি না তাই বল। —এক ঝটকায় ইয়ো-ইয়ো ঘোরাতে শুরু করে পুলু।

আমি অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলে উঠি— যা মাঞ্জা বানাব না! এবার গোপালদের সব ঘুড়ি কাটতে হবে।

—কী রং দিবি?

—ম্যাজেন্টা, ঘোর ম্যাজেন্টা, আকাশেও সুতোটা দেখা যাবে!

—আমি হলে অরেঞ্জ দিতুম...অরেঞ্জটাও খুব ...টিউটোরিয়্যাল থাকলে খুব মজা না রে তোর? —মাঞ্জার প্রসঙ্গ থেকে ছিটকে টিউটোরিয়্যালের প্রসঙ্গে চলে যায় ও। ও আমার কাছ থেকে কথা বার করতে চাইছে। আমার ভেতরে বসে কে যেন ক্রমাগত বলতে থাকে— বলে না এসব বলতে নেই...বলতে নেই...।

বটগাছতলায় বসে গঙ্গার অনর্গল বয়ে যাওয়া দেখছি। ক্লান্ত কাকের ক্কঃ ক্কঃ...মাঝির দোল খাওয়া...পালতোলা নৌকো দূর দিয়ে যাচ্ছে...পুলু বলল— তুই এমন চুপ করে বসে থাকিস কেন রে?

—ভাল লাগে।

--ভাল তো আমারও লাগে। কিন্তু এ রকম চুপচাপ না। দ্যাখ কী রকম এক দফা সাঁতার দিয়ে নিই।

সাঁতার আমিও জানি। দেশবন্ধু পার্কের পুকুরে শিখেছি। ফ্রি-স্টাইল যাকে গোরাদা বলেন আনতাবাড়ি, তার পরেও চিৎ সাঁতার ডুব সাঁতার। ডুব সাঁতার দিচ্ছি একদিন, হঠাৎ জলের মধ্যে থেকে কে আমায় ডাকল—সমর্পণ। স ম-র্পণ। আমার নাম সমর্পণ নয়, তবু মনে হল আমাকেই ডাকছে। কোন পাতালঘর থেকে ভুড়ভুড়ি কাটতে কাটতে ডাকটা বেরিয়ে এল। আমার কানের কাছে এসে যেন ফেটে গেল। তাড়াতাড়ি ভেসে উঠি। এইভাবে দ্বিতীয়বার ডাকলে আমাকে ডুবতে হবে আরও গভীরে। সেখান থেকে ভেসে ওঠবার ক্ষমতা আমার হবে কি না আমি জানি না।

এর পরেই একদিন একটা দুর্ঘটনা হল। ঘোষেদের বাড়ির মনু, মনসিজ পুকুরটাতে ডুবে গেল। বাড়িতে মাকে ভাত বাড়তে বলে এক ছুটে চান করতে গিয়েছিল। চান করা মানে একবার অন্তত এপার-ওপার করা। মনু খুব ভাল সাঁতার জানত। সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল ওর মতো চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু কী করে ডুবে যায়! আমি আন্দাজ করতে পারি। ওকে কেউ ডেকেছিল। ডাকটা পুকুরের অতল থেকে পাক খেতে খেতে উঠে এসে মনুর কানের কাছে ফেটে যায়। ও ডাকটায় উৎস খুঁজতে গিয়েছিল। আর ওপরে উঠতে পারেনি। সকলে বলত পুকুরের ভেতর একটা কুয়ো আছে, মরণফাঁদ। জানি না, কিন্তু আমার মনে হত ওই কুয়োর মধ্যে ঠিকঠাক মতো ডাইভ দিতে পারলে সোজা অন্য কোনও অজানা ভূখণ্ডে পৌঁছনো যায়। সেখান থেকে কারা আমাদের ডাক পাঠায়, বড্ড একা লাগে ওদের। ওরা কেমন? মানুষই হবে, কিন্তু খুব একা, সঙ্গী-খোঁজা ছায়ামানুষ। তাদের খোঁজে

যাব কী। পুকুরটা এরপর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল। ট্রেনিং বন্ধ রইল এবং মা দাদুকে বলে আমার পুকুরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

—যাবি না সাঁতারে? পুলু শার্টটা খুলে আমার দিকে ছুড়ে দিল। তারপর ঝাঁপ দিল। কিছুক্ষণ পরে সোঁপাট ভিজে উঠে এল প্যান্ট নিংড়োতে নিংড়োতে।

—গেলি না?

—আমি তো যাব বলিনি!

—ভয় পাস?

—আমার এখন সাঁতারের সময় নয়।

—কীসের সময় এখন তা হলে! পুলু একটা তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে, তারপর শার্টটা ছিনিয়ে নিয়ে প্যান্টের জল নিংড়োতে নিংড়োতে চলে গেল। রাগ হয়েছে।

সত্যিই তো! সাঁতারের সময় নয়তো কিসের সময়? পড়ার সময়, খেলার সময়, শোওয়ার সময়... তেমন কি সাঁতারেরও নির্দিষ্ট সময় থাকে?

গাছের গুঁড়ি বেয়ে কাঠপিঁপড়ে নেমে আসে। ঝুরি বেয়ে কাঠবেড়ালি উঠে যায়। এত সুন্দর প্রাণী, আমার ধারণা ছিল ওদের ডাক পাখির শিসের মতো হবে। ইঁদুর-কিচকিচ শুনে প্রথমটা খুব অভক্তি হয়, এখন সয়ে গেছে। ঘাটে এই পড়তি দুপুরেও চানে নেমেছ জনা দুই লোক। গামছা পরা। গামছার তলা থেকে বেরিয়ে আছে খুব লোমওলা শুকনো ডালের মতো পা। বুক জলে নেমে ওরা সামনের জল সরিয়ে সরিয়ে ডুব গালছে, কুলকুচি করছে। একজন কুলকুচির জলটা গাল ফুলিয়ে সামনে ফেলে দিল, আর একজন ফোয়ারার মতো উঁচুদিকে মুখ করে ছুড়ছে। ...ওরা উঠে আসছে। ভিজে গামছা নিংড়িয়ে পরল। ভেতরে ইজের পরা। একজন কুচকুচে কালো, আরেকজন একটু কম। আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছে।

—কী খোকা ইস্কুল পালিয়েছ?

আমি চমকে উঠি। ওদের গায়ের আঁশ-আঁশ জল-চিকচিক চামড়া, কড়া বুড়ো ঘাসের মতো হাত পায়ের লোম, না কামানো নারকোল-ছোবড়ার মতো মুখ...খুব মন দিয়ে দেখছিলুম, ওরা যে আমাকে লক্ষ করতে পারে ভাবিইনি। কেন না আমি তো নিশ্চিহ্ন হয়েছিলুম। গঙ্গার জলে, ভাসমান নৌকোয়, গুটোনো জালের কুণ্ডলীতে, বটের ঝুরিতে একেবারে ঢুকে গিয়েছিলুম, আমার ফুটকির মতো দেহটার একটা দৃশ্যমান অস্তিত্ব আছে এটা একেবারে ভুলে। তাই থতমত খেয়ে যাই।

বলি— এখন গরমের ছুটি তো!

—কোথায় থাকো? বাড়িতে বকেছে?

—না তো!

ওদের বোধহয় বিশ্বাস হয় না। আমার দিকে মাঝে মাঝে চাইতে চাইতে, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ওরা চলে গেল। ওদের পায়ের ছাপ ধুলোবালিতে শুষে নিয়েছে।

একদিন কোচিং ক্লাসের পর পুলুকে বললুম— পুলু আরেকটু থাক তোকে একটা জিনিস শোনাব। সবাইকার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে, খাতাপত্তর মুড়ে রেখে বললুম— শোন!

—কী শুনব বল!

—বলব না। তুই শোন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে শোন।

মিনিট দুই তিন হয়ে গেলেও অধৈর্য হয়ে কনুই দিয়ে ঠ্যালা মারল আমাকে— কী রে, কী শুনব?

—একটা ঝিঁঝির ডাকের মতো আওয়াজ পাচ্ছিস না?

—না, আমি কোনও ঝিঁঝি টিঁঝি শুনতে পাচ্ছি না।

—আশ্চর্য! শুনতে পচ্ছিস না? অমন স্পষ্ট!

—না, বেশ, ওটা কী? দিন দুপুরে ঝিঁঝি ডাকে না— না হয় ডাকলই, তো কী?

—ঝিঁঝি নয় ওটা। আমাদের সবাইকার, সারেদের, পিওনদের, ছেলেদের সবাই সারাদিন যত কথা বলে, হইচই করে সব রেকর্ড করা রয়েছে।

—কী করে বুঝলি আমাদেরই। অন্যকিছুরও তো হতে পারে।

—অন্য কিছু?

—ধর ভূত! —বলেই পুলু উঠে দাঁড়াল।

—ভূত নয়— আমি জোর দিয়ে বলি, ভূত-টুত নয়— আমি হেডসারের গলা মাঝে মাঝে চিনতে পারি, অবিনাশবাবুর, তমোনাশদার, ফার্স্টক্লাসের বিজয়মুকুলদা আর তথাগতদা ডিবেট করছিল একদিন। আমরা বাড়ি চলে যাই, আমাদের গলা থেকে যায়।

পুলুর চোখে অস্বস্তি, বলল— তুই শুনতে চাস শোন, আমি চললুম।

দোতলায় হচ্ছিল আমাদের ক্লাস। রুম নাম্বার ইলেভেন। পুলু চলে গেল, আমি বসেই রইলুম। কান পেতে শুনছি, বোঝবার চেষ্টা করছি। ক্রমে যেন ধ্বনি পরতের পর পরত খুলে যায়, খুব পাতলা পরতগুলো, একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া, ক্রমেই ভেতরের পরতের দিকে যেতে থাকি। আশ্চর্য হয়ে শুনি মেয়েদের গলার আওয়াজ। ভারী, সরু, মিঠে। সরু গলার চিৎকার, ভারী গলার ধমক। সবই কিন্তু খুব আবছা। কী এগুলো? আমাদের স্কুলে ভোর সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে দশটা মেয়েদের ক্লাস হয়। সেই আওয়াজগুলো কি এখনও রয়ে গেছে! তার মানে আজকের, গতকালের, পরশুর, অনেক বছর আগেকার ধ্বনিরাও রয়ে গেছে? রয়ে যায়?

এই সময়ে পুলু হাতে খাতা নিয়ে ফিরে আসে। ভয়-ভয় গলায় বলে— এই সমু। আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারছি না। ভয় করছে, চল, আমার সঙ্গে চল, লক্ষ্মীটি।

—ভয়? কেন?

—তুই-ই তো ওইসব ভূতুড়ে কথা বলে ভয় ধরিয়ে দিলি আমার!

এখন সাড়ে তিনটে তো বেজে গেছেই! চারদিকে ঘেরা বারান্দা, মাঝখানে উঠোন। বারান্দা দিয়ে নীচের দিকে চাই। কেমন একটা চৌকো কুয়োর মতো, তার ভেতর জলে পড়ে রয়েছে, ঝরা পাতা, খড়কুটো। যে কোনও সিঁড়িতে পৌঁছতে হলেই আমাদের খানিকটা হাঁটতে হবেই। পুলু প্রায় আমার গা ঘেঁষে চলেছে। ওর ঘামের গন্ধ পাচ্ছি। চটচটে হাত, ঠান্ডা। সিঁড়িতে পা দিয়েই চিৎকার করে ডাকল— 'দীনবন্ধুদা—আ—আ।' ডাকটা সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর চলে গিয়ে আবার ফিরে এল। 'দীনবন্ধুদা—আ—আ— আ— আ— আ।' শিঁউরে উঠল পুলু।

আমি বললুম— ও তো প্রতিধ্বনি। ভয় খাচ্ছিস কেন?

আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি প্রায়, স্কুলের দোতলার তিনটে ঘর খোলা, সদর ফটক, কোল্যাপসিব্‌ল সব খোলা। কী করে যাই? পুলুকে বলি— চল, দীনবন্ধুদাকে ডেকে আনি। খুব অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও পুলু আমার সঙ্গে চলে।

পেছন দিকে স্কুলবাড়ি থেকে নেমে প্লে গ্রাউন্ড। তার একদিকে ছোট্ট একটা ঘর দীনবন্ধুদার। ঘরে তালা মারা। কোথায় গেল? জানে না গেটে তালা দিতে হবে? আমরা আবার সামনে আসি। খোলা গেটের সামনের ধাপে বসে থাকি। পশ্চিমে ময়লা কাপড়ের মতো রোদ ঝুলছে বাড়িগুলোর বারান্দা, ছাত থেকে। তাপ নেই তেমন। কিন্তু ঘাম হচ্ছে, আবার যখন গঙ্গার দিক থেকে হাওয়া আসছে ঝলক ঝলক তখন ঘামের ওপর হাওয়া লেগে খুব আরাম।

পুলুর এখন ভয় অনেকটা কেটেছে। সামনে রাস্তা দিয়ে লোকজন যাতায়াত করছে। হেঁটে, সাইকেলে। রিকশা চলে গেল কয়েকটা ঠুনঠুন করতে করতে।

আজকে আর গঙ্গার ধারে যাওয়া হল না। নির্মলদা যাচ্ছিল, সাইকেল থামিয়ে বলল— কী রে। এখানে বসে?

আমরা কৈফিয়ত দেবার আগেই দীনবন্ধুদা এসে গেল। হাতে মাটির ভাঁড়, একটা কাগজের ঠোঙা, ঠোঙাটা তেলে ভিজে উঠেছে।

—কোথায় গিয়েছিলে?

—খাবে? তেলেভাজা?

—দাও— আমি, পুলু, নির্মলদাও হাত বাড়ায়, আমাদের হাতে একটা করে লম্বা লম্বা বেগুনি দেয় দীনবন্ধু। প্রত্যেকটাতে একটা করে কাঁচা লংকা সাঁটা।

—হরি ঘোষের ইস্ট্রিট থেকে ভাজিয়ে আনলুম। কখন গেছি, তখন তোমরা ক্লাস করছ খোকা। বেজায় ভিড়।

বেগুনি মুখে দিয়েই খিদে পেয়ে গেল। পুলুকে বলি—চ', আমাদের বাড়ি থেকে খেয়ে খেলতে যাব।

—ধুৎ, আমার খেলার মেজাজ নেই।

—কেন?

—কেমন মন খারাপ লাগছে।

—বাড়ি গিয়ে কী করবি?

—তা-ও তো! চল তোদের বাড়িই যাই। তারপরে দেখা যাক।

লুচি ভাজার গন্ধ আসছে। প্রায় পাঁচটা। এই সময়ে আমি, দাদা, বোন কয়েক মিনিট পর পর ফিরি। বোন এখন ছুটিতে বাড়িতেই আছে। এই সময়ে রোজ লুচি কিংবা পরোটা ভাজা হয়। ডালডায়। প্রতি মাসে এত এত ডালডার টিন আসে আমাদের বাড়িতে। ফুরিয়ে গেলে সেগুলো আমরা দখল করি। যত বড় হচ্ছি, ডালডার খালি টিনগুলো অবান্তর হয়ে যাচ্ছে। মার্বেল ভর্তি, সমুদ্রের ঝিনুক কড়ি ভর্তি, খুচরো পয়সা ভর্তি টিন সব। অনেক সময়ে মা আমার কাছ থেকে খুচরো পয়সা চান— দাও তো তিন টাকা, পরে দিয়ে দেব। মা সেভাবে আর কোনওদিনই ফেরত দেন না। তবে টাকাপয়সা তো আমরা মোটামুটি পাই-ই। জন্মদিনে, পয়লা বৈশাখে, দোল, রথ, সরস্বতী পুজো, দুর্গা পুজো, এরকম অনেক উপলক্ষ আছে। লুচি ভাজার বোদা জ্বলা-জ্বলা গন্ধটা আমার ভাল লাগে না। কিন্তু খাবার সময় অত গন্ধ পাই না। আলু চচ্চড়ি দিয়ে মুড়ি খেয়ে নিই। আলু মরিচ করলে মা একটু মাখন দ্যান, সেটা খেতে আমি বেশি ভালবাসি।

সদর-দরজাটা আধ-ভেজানো, ভেতরে আমাদের উঠোনের একটা সরু দেখা যাচ্ছে। খুলি। রোদ ঢুকে যায়, একেবারে পড়তি বেলার ঝিমঝিমে রোদ। উঠোনে ঢুকেই কিছু দূরে একটা পেয়ারা গাছ, এটা আমাদের বাসনমাজার লোক মঙ্গলা পুঁতেছিল। চকচকে মচমচে গাঢ় সবুজ হালকা সবুজ পাতা নিয়ে সুন্দর দাঁড়িয়ে থাকে গাছটা। পেয়ারা গাছের পেছনে লোকজনেদের কলঘর। বেশ বড় একটা চত্বর জুড়ে জায়গাটা। বড় চৌবাচ্চা, ভেতরে কল বাইরেও কল। কাপড় মেলার জায়গা আছে। পায়খানা ডানদিকে। আমি দেখেছি। ওটা রোজ পরিষ্কার করান দাদু। লোকজন যে-ই ব্যবহার করুক, কিন্তু তবু আমার ঘেন্না করে। কী রকম একটা কৌতূহলও হয়, মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে দেখি— একটু পুরনো রঙের সাদা প্যান। দুটো ধাপি, পাশেই কল, কলের তলায় একটা এত বড় পেতলের গাড়ু বসানো থাকত আগে। সেটা চুরি হয়ে যাবার পর এখন একটা মরচে ধরা টিনের মগ থাকে। আমার মনে হয়, এই জায়গাটুকু একটা ভিন্ন দেশ, অচেনা, অজানা, পুকুরের মধ্যেকার কুয়োর উল্টো দিকের দেশের মতো। কখনও কখনও জলভর্তি চৌবাচ্চাটার ধারে দাঁড়াই। ভেতর বাড়ির কলঘরে এত বড় চৌবাচ্চা নেই। দাঁড়ালে জলের মধ্যে আমার ছায়া পড়ে।

—তুমি এখানে থাকো? জলের মধ্যে? —কেমন ঝাপসা চুল ঝাপসা চোখ মুখ ছেলেটার। টুপটাপ করে পেয়ারা পাতা খসে পড়ে, সামান্য একটু চিড় খায়-জল, ছায়া ভেঙে ভেঙে যায়। ও আমার কথার জবাব দেবে না। লুকিয়ে পড়ল। ওকে ধরতাই দিল পেয়ারা গাছ, হাওয়া, হাওয়ার ভেতর

মিশে থাকা ধুলো, আলো, ছায়া। জানি ওটা আমারই ছায়া। কিন্তু জলের মধ্যে সে যেন অন্য কেউ। চেনা আবার অচেনা। ছায়া মানুষ। আর এক জীবন, অন্য ধরনের। সে আমাকে কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দেবে না।

লুচি দিয়ে কুমড়োর ছোঁকা খেয়ে আমরা লুডো খেলতে বসি। আমি পুলু আর বোন, প্রত্যেকবার কী কৌশলে বোন জিতে যায়, বেস্ট অব থ্রি, বেস্ট অব ফাইভ, বেস্ট অব সেভেন...তাতেও। নিজের ঘুঁটি হোমে উঠিয়ে ও বলে— তোরা খেলা শেষ কর। আমি চট করে ঘুরে আসছি। —ঘুরে আসছি মানে ও পুতুলদের কাপড় পাল্টাবে। ছোট বড় কাঠ মাটি কাচ গাদা পুতুল ওর। সেগুলো নিয়ে খেলে। নাইলন ডল সাজিয়ে রেখে দেয়।

ও আমার চেয়ে বেশ ছোট। আমি যেমন শান্ত, চুপচাপ, ও তেমন দস্যি। মুখে খই ফুটছে। বাবার খুব আদুরে ও। একমাত্র ওকেই বাবা কখনও বকেন না। দাদা এখন কলেজে, তবু দাদা মাঝেমধ্যে বাবার খারাপ মেজাজের আঁচ পায়। আমি তো পাই-ই। তবে আমি পারতপক্ষে বাবার ত্রিসীমায় যাই না, বকা-ঝকা খাওয়ার মতো কিছু তো করিও না। তবুও কোনও কারণে মেজাজ খারাপ হলেই বাবা গর্জন করে আমাকে আর মাকে বকেন।

—কী খেতে দাও ছেলেটাকে? এত রোগা? এত কালো? নিজেও যেমন হচ্ছ, এ ছেলেটাকেও তেমন করছ। অ্যাই সমু কোনওদিনও যেন আর না শুনি যে তুমি দুধ খাওনি। ট্যাং ট্যাং করে রাস্তায় ঘুরতে দেখি না যেন।

বাবা কী করে আমায় রাস্তায় ঘুরতে দেখবেন? ফেরেন তো রাত নটার আগে নয়। তখন আমার খেলাধুলো, পড়াশোনা, খাওয়াদাওয়া সব শেষ। তখন আমি কোনও বই বা পত্রিকা পড়ছি। আর দুধ? দুধ যে কবে শেষ খেয়েছি আমি মনে করতেই পারি না। দুধ দেখলে আমার বমি আসে। মা, দিদারা এমনকী দাদু পর্যন্ত এই কঠিন সত্যটা মেনে নিয়েছেন যে আমাকে দুধ বা ছানা খাওয়ানো যাবে না। আর বাবা সে খবরই রাখেন না! বাবাকে আমি খুব এড়িয়ে চলি। যত বড় হচ্ছি তত ভয়বোধটা চলে যাচ্ছে, তার জায়গা নিচ্ছে বিরক্তি। দাদার সঙ্গে তো ক্রমে বাবার কোনও কথাবার্তাই থাকছে না। দাদা, আমি, ফিনকি সবাই একসঙ্গে খেয়ে নিই। তখন বাবা কোথায়? জুতোর মচমচ শব্দ শুনলেই দাদা শেষ গরসটুকু হাপুস-হুপুস করে খেয়ে নিয়ে, বা পাতে ফেলে রেখে উঠে পড়ে, চৌকাঠ পেরিয়ে পগারপার। নিজের থালাটা পর্যন্ত দাদা উঠোনে কলের নীচে নামিয়ে রেখে যায়। আর আমি? মা যদি 'তোমার বাবা'... দিয়ে কোনও কথা শুরু করেন, আমি বলি—আহ্—ছাড়ো তো।

দাদু বাবাকে খোকা বলেন, খুব সমীহ করেন, কিন্তু দাদুর মতামত, আমাদের সঙ্গে ব্যবহার বাবার একেবারে বিপরীত। দাদু আমাদের এগিয়ে দ্যান, সাহস দ্যান, বাবা বাগড়া দ্যান। বয় স্কাউট-এ ভর্তি হব, বাবা বললেন—না দাদু বললেন—ডিসিপ্লিনের শিক্ষা হবে খোকা ও ভর্তি হোক।

—বাবলুর বেলায় তো বলনি?

—বাবলু চায়নি। যে যেটা ভালবাসে, আপনি করে।

—তবে ও বয় স্কাউটে যাবেই!

—আমি তো সেটাই উচিত মনে করি।

বাবা শব্দ করে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখেন। ভীষণ জলদ গলায় হাঁকতে হাঁকতে চলে যান ওপরে—আমি আজ সাড়ে আটটায় ভাত খেতে নামব। তরকারি যেন কাঁচা না থাকে।

মা মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়ে দাদুর ঘরে ঢোকেন।

—কী হল, বাবা?

—সমু বয় স্কাউট করতে চাইছে।

—পছন্দ নয়?

—না।

—কেন?

—পছন্দ নয়, পছন্দ নয়। খোকার অপছন্দের কি কোনও মাথামুণ্ডু থাকে বউমা! দেখো কতকাল হয়তো আপিসে হিসেব মেলেনি।

মাসের শেষে হিসেব মেলাটা ছিল বাবার প্রতি মাসের ক্রাইসিস। ওই সময়টা বাবা একেবারে অন্যমনস্ক এবং তিরিক্ষি হয়ে থাকতেন। আসল কথা, বিদ্যা, ঝোঁক, মেজাজ সব ধরতে গেলে বাবার হওয়া উচিত ছিল অধ্যাপক। কিন্তু হতে হয়েছিল হেড-আপিসের বড়বাবু। ছোটবাবু থেকে শুরু করে আমাদের যখন ভালমতো জ্ঞান হয়েছে তখন বড়বাবু। ওই কাজ করতে ওঁর ভাল লাগত না। এদিকে নিজের পায়ে কুড়ুলটি তো নিজেই মেরেছেন। তার ওপর ষোলো আনার জায়গায় তাঁর কাজে নিষ্ঠা ছিল ষোলো আনা, ভয় আঠারো আনা। টাকাপয়সা নিয়ে কারবার! কাজেই ক্রাইসিস, মেজাজ খারাপ।

বাবাকে স্বাভাবিক সাবধানতায় এড়িয়ে চলতুম। আর এই সময়টা একেবারে ধারেকাছে থাকতুম না। সেবার হল কি রাত্তিরে ফিরেই বাবা হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছেন।

দাদুকে বলছেন—কত বার বলেছি তুমি রাতে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না। বুড়োমানুষ ঠিক সময়ে খাওয়া ঘুম চাই, কিছুতেই কথা শুনবে না?

দাদু—আমি যদি বুড়ো মানুষ হই তো তুই কী! আমার তো মনে হয় তুই-ই বুড়োমানুষ। বাহাত্তুরে ধরলে তখন মানুষ খামোখা এমন অশান্তি করে। কী হল তোর? আবার হিসেব মেলেনি!

—আর বোলো না, কে যে ভুলটা করে বসে আছে এখনও ধরতেই পারিনি।

—মাথা ঠান্ডা করে, টেন্‌স্‌ না হয়ে দ্যাখ ভাল করে। ঠিক বেরোবে।

—বলছ?

—বলছি। না বেরোবে তো যাবে কোথায়?

—কালই বেরোবে তো? তোমার মনটা কী বলছে?

—কালই বেরোবে।

— দেখি। তোমার কথা তো সচরাচর মিথ্যে হয় না। একটু ঠান্ডা হলেন এইভাবে, তারপরেই—বাবলা, বাবলা কোথায়?

বাবলা মানে আমার দাদা।

—তার খোঁজে তোর কী দরকার? দাদু বলে উঠলেন।

—সারাদিনের পর বাড়ি ফিরে নিজের সন্তান-সন্ততির খবর নিতে পারব না! বা বাবা বা!

মা মাথার ঘোমটাটা একবার তোলবার ভঙ্গি করলেন, ধীর গলায় বললেন, বাবলা খেয়েদেয়ে এখন পড়াশোনা করছে।

—এত রাত্তির অব্দি? চোখ-ফোক খারাপ হয়ে গেলে?

দাদু বললেন—এখন মোটে সাড়ে ন'টা, বাড়ি ফেরবার পক্ষে দেরি কিন্তু বি. এসসি-র পড়া করবার পক্ষে দেরি নয়। তুই যা, হাত পা ধুয়ে খেতে বোস গে।

সে সময়ে আমরা মেঝেতে খেতুম। ছোট কিন্তু খুব পরিষ্কার সবুজ মেঝের ঘরখানা। গরমকালে খুব শীতল থাকত। শতরঞ্চির চৌকো চৌকো আসন পাতা থাকত। সোজা উল্টো বোঝবার জন্যে মেজদিদা আসনের এক পিঠে একটা চিহ্ন দিয়ে রাখতেন। সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে খানিকটা গিঁট পাকানো। যদি কোনওদিন ভুলক্রমে উল্টো দিকটা ওপরের পিঠে পড়ত তো বাবার বিরক্তি দেখতে হয়! তার ওপরে আবার লুচি ফোলেনি। বেগুনভাজা ভেঁতরশক্ত, মাংসের ঝোলটা কেন জলের মতো...একটার পর একটা বাবা খুঁত ধরতে থাকতেন। রাঁধুনি কাঠ হয়ে যেত। শেষে দাদু ডাক পাড়তেন

ফিনকি! ফিনকি! ফিনকি আমার বোনের নাম। ও তখন ঘুমে ঢুলছে। আমি ওকে বেশ করে নাড়া দিয়ে বলতুম—শুনতে পাচ্ছিস না! দাদু ডাকছেন, একবার নীচে গিয়ে দ্যাখ।

মুঠো দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে নোদনগোদল করে নেমে যেত ফিনকি—বাঁব্‌বাঃ, এঁকটুখানি ইতিহাঁস পঁড়ছিলুম। তোমার আমাকে একটু পঁড়তেও দিলে না। পঁরীক্ষাতে খাঁরাপ হঁলে বলতে পারবে না কিন্তু। খালি কাঁজ আর কাঁজ আর কাঁজ...এইভাবে গজ গজ করতে করতে নেমে যেত ফিনকি। আর তার মিষ্টি গলার পাকা পাকা কথা শুনতে শুনতেই বাবা ক্রমে অট্টহাস্যে ফেটে পড়তেন।

দাদু ফিনকিকে ডেকে দিয়েই ঘটনায় ইতি টেনে দিতে পেরেছেন জেনে এবার শুতে চলে যেতেন। এবার উনি বই পড়বেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে যে-ই ঘুমে চোখ বুজে আসবে, অমনি বেড সুইচটা টিপে অফ্ করে দিয়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়বেন। পরদিন ভোর চারটে সাড়ে চারটেয় উঠে ছোটখাটো ব্যায়াম করবেন, চান করবেন। বেলপোড়া আর কাঁঠালিকলা খাবেন। তারপর গীতা কিংবা মহাভারত কিংবা ভাগবত একটা কিছু পড়বেন।

এদিকে ফিনকি খাবার ঘরে ঢুকে বলবে—একটু শান্তি করে পঁড়তেও তুমি আমাকে দেবে না বাঁবা। উঃ! কী চিৎকার, কী চিৎকার, ঠিক যেন বাঁড়িতে ডাঁকাত পড়েছে।

বাবা হাসতে হাসতে বলবেন—তা তুই যে ডাকাতদলনী আছিস! ভয়টা কী! এই নে একটা লুচি খা তো এখন!

—আমরা বিকেলে লুচি খেয়েছি বাবা, আর খাব না। রাত্তিরে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাই। আমার পেটটা ঠাসা।

—একটা খা না! ওগো, ফিনিকে একটা লুচি আলুভাজা দিয়ে দাও তো!

—ও পারবে না, অসুখ করবে— মায়ের জবাব।

—অসুখ করবে? না, থাক তবে...

তারপর বাবার প্রবল উৎসাহে গল্প শুরু হয়ে যাবে। একটু পরে ফিনকি ঢুলতে ঢুলতে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়বে। বাবা বলবেন জোছনায় ফিনিক ফুটেছে।

আঁচিয়ে টাঁচিয়ে কোলে করে ফিনকিকে নিয়ে ওপরে উঠবেন বাবা, মায়ের বিছানায় শুইয়ে দেবেন আস্তে।

আমি এই পুরো সময়টা, দাদার টেবিলে-চেয়ারে বসে গল্পের বই পড়তুম। রবিনসন ক্রুসো, মাস্টারম্যান রেডি, টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস আন্ডার দা সি। এই সব। আমার চারপাশ ঘিরে জল, অরণ্য কিংবা আকাশ। মাঝে মাঝে নীচ থেকে হাসি, কথার টুকরো ওপরে উঠে আসছে, যেন মহাকাশে একটা স্যাটেলাইট চলে গেল। সমুদ্রে একটা ভেলা, কোথায় ভেসে চলে যাচ্ছে, সমুদ্র যেমন তেমনই। আমার সমুদ্র আকাশ অরণ্যে কখনও চিড় ধরে না। হঠাৎ দাদা বলে ওঠে— কী রে সমু, কখন থেকে ডাকছি শুনতে পাচ্ছিস না?

তবে কি দাদা অনেকক্ষণ ধরেই ডাকছে? আমি শুনতে পাইনি তো!

দাদা বলে— এই ডায়াগ্রামটা আমায় করে দে তো! আমি ততক্ষণ চ্যাপারটা শেষ করে নিই। লেবেলিং করতে হবে না, আমি করে নেব।

ডায়াগ্রামটা কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখি। তারপরে সেট স্কোয়্যার, কম্পাস, রুলার দিয়ে এঁকে ফেলি।

—বাঃ তুই এগুলো এত চমৎকার আঁকিস, তুই আর্কিটেকচার নিয়ে পড়িস, বুঝলি? এত গল্পের বই পড়িস কেন?

—পড়ব না? পড়লে কী হয়!

—পড়বি না বলিনি। এত পড়াটা ঠিক নয়। মগজটা অলস হয়ে যাবে।

—গেলে?

—গেলে আর কী! ডিফিকাল্ট কিছু ধরতে পারবি না? ধৈর্য চলে যাব।

আমি বইটা উল্টে রেখে দিই।

সত্যি কথা বলতে কি আমার অসুবিধে হয় না। নানান রকম ভাবনা-চিন্তা বই-টই সত্ত্বেও লেখাপড়ার ব্যাপারটা আমার ভালই আসে। হাতের লেখা ভাল। ছোট্ট করে গুছিয়ে সব লিখে দিতে পারি। অঙ্ক বেশির ভাগই ঠিক হয়। আশি নব্বুই কক্ষনও পাই না। সব সারই বলেন, তুমি বড্ড কম লেখো সমুদ্র, সুন্দর স্পষ্ট উত্তর, কিন্তু বড্ড ছোট্ট। এ কথার মানে কী আমি বুঝি না। যেটার ব্যাখ্যা চাওয়া হচ্ছে সেটা তো পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে পেরেছি। তবে? এর চেয়ে বেশি বলতে লিখতে আমার ভাল লাগে না। তাতে ফার্স্ট সেকেন্ড না হলুম তো না-ই হলুম।

দাদা বলল— তুই কেন এত নির্জীব রে? ভাল করে খাস না, না কি!

সত্যি কথাই, আমার খাওয়া একটু কম। ঠাকুমারা এ নিয়ে অনেক বকাবকি করেছেন। মা বলেন ওর পেটের খোল যদি ছোট হয় তো ও কী করবে বড়মা?

—খেলাধুলো করো না —দাদু জিজ্ঞেস করেন।

—খেলি তো!

—কী, কী?

—ফুটবল না। কিন্তু ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন তো প্রায়ই খেলি।

দাদা বলল— একটু এক্সারসাইজ কর দেখি। স্বাস্থ্যটা ভাল হবে। রোজ রোজ এই কালো রোগা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য শুনতে শুনতে বিরক্ত লাগে।

তখন আমি সত্যিই ব্যায়াম করতে আরম্ভ করি। গোরাদাদেরই একটা ক্লাব আছে। সেখানে খালি হাতে ব্যায়াম, যোগাসন, বার্বেল, ডাম্বেল মুগুর এসব নিয়ে সব রকমেরই শেখায়। আমি বললুম— গোরাদা, আমার যাতে চেহারাটা বেশ তাগড়াই হয়, খাওয়া বাড়ে তেমন কিছু শেখান তো!

—যাতে খাওয়া বাড়ে? কে বলেছে? এই মাগ্‌গি গণ্ডার দিনে? গোরাদা হাসতে লাগল।

—সব্বাই, আমিও হেসে বলি।

ভাল করে দেখে শুনে গোরাদা বলল— তুই দু'চারটে ফ্রি হ্যান্ড কর, তারপর তোকে যোগ-ব্যায়াম শেখাব। দেখবি চমৎকার চেহারা হয়ে যাবে।

সত্যিই কিন্তু আমি যখন হায়ার সেকেন্ডারিতে কলেজে ভর্তি হই তখন আমার খুব চমৎকার স্বাস্থ্য! আয়নায় নিজেকে দেখতে নিজেরই গর্ব হয়। ঠিক যাকে বলে পেশিবহুল দেহ তা নয়। কিন্তু দৈর্ঘ্যের অনুপাতে ঠিকঠাক চওড়া, পেশি দিয়ে সুন্দর ভাবে ঢাকা কাঠামোখানা, তার ওপরে মাছি পিছলোনো চকচকে চামড়া। এখন আর কণ্ঠা জেগে নেই। চোখের কোল বসা নয়, আঙুলগুলো খ্যাংরা ঝাঁটার কাঠির মতো নয়। আমার অখণ্ড মনোযোগের ক্ষমতা পরীক্ষার কাজে লেগেছে। বাড়িতে সবাই খুশি। আমাকে নিয়ে আর তেমন সমস্যা নেই।

সমস্যা অবশ্য আগেও ছিল না। কিন্তু আমি অত রোগা-টোগা বলে, খাওয়া-দাওয়া তেমন করে করতুম না বলে, আর লোকের সঙ্গে মিশতে পারতুম না বলে বোধহয় ভাবনা ছিল, মা আর দাদুর মধ্যে এ নিয়ে নিশ্চয় কথা হত। কেন না একদিন দাদুই কথাটা বলেছিলেন— যাক সমুভাই, এখন তোমার স্বাস্থ্যটা আর ভাবাচ্ছে না।

—ভাবাচ্ছিল বুঝি? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

—হ্যাঁ তা তো খানিকটা বটেই। স্বাস্থ্য ভাল না হলে মানুষ ঠিকঠাক জীবন উপভোগ করতে পারে না। আর উপভোগ না হলেই মনমরা হয়ে থাকে।

—আমি কি মনমরা থাকতুম, দাদু? কই, আমি জানি না তো।

—জান না? নিজে অনেক সময়ে বুঝতে পারা যায় না।

তখন আমার ইলেভ্‌ন্‌ থেকে টুয়েলভে ওঠার পরীক্ষা এসে গেছে। প্রিপারেশনের ছুটি চলছে। পরীক্ষার জন্যে আমার আলাদা করে পড়ার দরকার হত না। তাই সারা বছরের রুটিনই চলত। কিন্তু তাতে তো সবার মন উঠত না। দাদাই তো ধমক মারত। একগাদা প্রবলেম দিত সল্‌ভ্‌ করতে। বেশির ভাগই পারতুম। কয়েকটা হয়তো পারলুম না। দাদা বলত— দেখছিস তো? প্রাকটিস চাই। ভাল রকম অনুশীলন।

বাবা নিজের ভুল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন বলেই থেকে থেকে বলছিলেন পড়াশুনো ঠিকঠাক হচ্ছে তো? দেখো ফাঁকি দিয়ো না, পস্তাবে।

মায়েরও খুব টেনশন হচ্ছে ভেতরে ভেতরে, বোঝা যেত। একটু বেশি করে মাছ দিলেন হয়তো, খেতে আপত্তি করলে বলতেন— মাছ খেলে মগজ পরিষ্কার হয় সমু।

সেই সময়ে একদিন দাদু একটু সকাল-সকাল বাড়ি ফিরলেন। মুখটা গম্ভীর। হাত-মুখ ধুয়ে বাড়ির ঢোলা পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরলেন। আমিও তখন সবে বাড়ি ঢুকেছি। দাদু বললেন— সমু ভাই, তোমার একটু সময় হবে?

—হ্যাঁ, কেন হবে না? —আমি বসে পড়ি।

দাদু অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখতে থাকেন। যেন জরিপ করে নিচ্ছেন কিন্তু একটু অন্যমনে। আমি ধৈর্য ধরে বসে থাকি। হঠাৎ দাদু কথা বলেন।

—সাম হাউ আমার মনে হয়, তুমি একটু আলগা, মানে বাড়ির সঙ্গে তোমার সম্পর্কর কথা বলছি।

আমি চুপ করে থাকি।

—শুধু বাড়ি কেন, সমু, পুরো সংসারটার সঙ্গেই যেন তোমার কোনও ঘনিষ্ঠতা নেই। ঠিক কি না?

এটা সরাসরি প্রশ্ন। জবাব দিতেই হয়।

—কেন এ কথা বলছ? আমি তো আজকাল বাজার পর্যন্ত করি। ফিনকিকে পড়া দেখিয়ে দিই, আমি ভাবতে থাকি তারপর বলি, আর ধরো হঠাৎ ডাক্তার ডাকতে হলে,ওষুধ কিনতে হলে...বাড়িতে কেউ এলে মিষ্টি-টিষ্টি কিনতে হলে...।

দাদু বললেন— সেটাই তো ভাবাচ্ছে। এমন নয় যে তুমি দায়িত্বশীল নও, কিছু করতে বললে সেটা তুমি পালনও কর। আমি জানি, তোমার বয়সে একটু বাইরের টান বেশি হয়। বন্ধু-বান্ধব। কিন্তু এটা আজকের ব্যাপার নয় সমু। ছোট্ট থেকেই তোমাকে এমন দেখছি। পুলু ছাড়া কোনও বন্ধুকেও তো আসতে দেখি না। বন্ধু হয়নি তোমার? কলেজে, ক্লাবে?

—হ্যাঁ, অনেক তো!

— না, না, আমি জাস্ট পরিচিত সমবয়সিদের কথা বলছি না। বন্ধু, যার সঙ্গে তোমার কোনও বন্ড আছে, যাকে তুমি সব কথা বলতে পার।

আমি চুপ করে থকি। ভেবে দেখতে গেলে সত্যিই তেমন প্রাণের বন্ধু কেউই নেই আমার। অথচ কতজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। ক্লাবে ব্যায়ামের পর খালি গায়ে, তোয়ালে কাঁধে যখন বসে থাকি, কত গুলতানি হয়, অমি তো থাকি, মাঝে মধ্যে ফোড়নও দিই।

—অখিলদা আজকাল খুব ডাঁটে থাকে....দেখেছিস? মোটরবাইকটা কেনার পর থেকে... কেউ হয়তো বলল।

—এবার পেছনে কোমর জড়িয়ে বসার কেউ এলে তো আর দেখতে হচ্ছে না, কী বল সমু? বিনুনি উড়বে, আঁচল উড়বে। পথ যদি না শেষ হয়... আরেকজন।

আমি হাসি।

—এবার জুনিয়র সেকশনে বান্ধব-সমিতির একটা ছেলে নিখিল ভারত যোগকুমার হয়েছে...কী নাম রে ছেলেটার? ...আমি বলি।

—সঙ্কর্ষণ বোধহয়...

—গোরাদার ক্ষমতা নেই ওরকম একটা বার করে, কী বল সমু? একজন মন্তব্য করে।

—কেন? আমরা তো বেশ ভালই আছি!

—এতদিন শরীর-চর্চা করছি, একটা অ্যাম্বিশন থাকবে না?

—আমার তো একটা অ্যাম্বিশন ছিল। ভাল স্বাস্থ্য, সত্যিই আজকাল সব সময়ে বেশ ফ্রেশ লাগে। —আমি বলি।

কলেজের আড্ডা আবার অন্য রকম। বেশির ভাগ ছেলেই মেয়েদের দিয়ে আলোচনা করে।

—প্রীতি খুব স্মার্ট, কীরকম গটমট করে যায়, টকাটক উত্তর দেয়!

—মুখটা ভ্যাঁটকা। সুইট হল রীনা...মুখার্জি না মিত্র রে?

—কেন তাতে কী দরকার? পদবি মিলিয়ে প্রেম করবে গুরু? কী বলে সেই? পাল্টি ঘর?

—যাঃ, প্রেম-ফ্রেম কে করতে চাইছে?

—পেটে খিদে, মুখে লাজ, বাবা! আছ হোস্টেলে, চুটিয়ে যা করবার করে নাও এই বেলা।

মেয়েদের বিষয়ে আমার যে খুব একটা শুচিবাই আছে তা কিন্তু নয়। আমিও দেখি—প্রীতিকে। ওর স্মার্টনেস আমার ভাল লাগে। রীনা সত্যি সুন্দর। এত সুন্দর হাসে। এ ছাড়াও আছে রত্নাবলী, নন্দিতা, সুমিতা। সুমিতা খুব ভাল ছাত্রী, চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা, ও খুব পড়ুয়া টাইপ। কারও দিকে বড় একটা মন দেয় না। রত্নাবলী ধনী লোকের মেয়ে, গাড়িতে আসে যায়, গা থেকে ভুরভুরে সেন্টের গন্ধ বেরোয়, একেক দিন একেক রকম শাড়ি। নন্দিতা কালো, রোগা, গম্ভীর। মনে হয় ও অম্বলের অসুখে ভুগছে। এছাড়াও অনেক আছে— অর্ণব, সুকান্ত, চঞ্চল, আদি প্রণব...অনেক, অনে-ক।

আমি গ্যালারির সর্বোচ্চ বেঞ্চে বসে ওদের কালো কালো মাথা দেখি, একটা স্থির কালো নদী যেন। বাবরিতে, বিনুনিতে, কদম ছাঁটে, বব-চুলে বয়ে বয়ে চলেছে। ক্লাস শেষে নদীতে ঢেউ ওঠে, ভেঙে ভেঙে যায় সব।

পুলক বলে—কী রে, যাবি না!

যেন ঘুম ভেঙে উঠি--অ্যাঁ? হ্যাঁ! চল।

দাদু আবার বলেন—বন্ধু না থাকাটা একটু...

আমি বলি—বন্ধু নেই, তা নয়, আছে। তবে মনের কথা বলার মতো...তা ছাড়া মনের আবার আলাদা করে কথাই বা কী! কোনও কথা নেই তো!

—তুমি যে সেই বাড়ির স্বপ্নের কথা বলতে! জানলাহীন বাড়ি। বট অশ্বত্থ গজিয়েছে... দেওয়াল থেকে।

আমি চমকে উঠি। আগের রাতেই দেখেছি। ঘরের পরে ঘর, তারপরে আরও ঘর, ভগ্নস্তূপ। দেওয়াল আঁকড়ে আছে শেকড়বাকড়। চুন বালি খসা দেওয়াল...

—দেখি, মাঝে মাঝে।

—শোনো, প্রায়ই যখন দ্যাখো ও স্বপ্নের কোনও একটা মানে আছে। আমার একটু আগ্রহ হয়। আমিও নিশ্চিত স্বপ্নটার কোনও মানে আছে। কিন্তু সেটা কী ধরনের মানে তা আমি বুঝতে পারি না। যেভাবে বলা হয় ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়। ভবিষ্যতের ছবি দেখা যায়। সাপের স্বপ্ন মানে বংশবৃদ্ধি। এইভাবে কী? আমি জানি না, কিন্তু জানতে চাই। নিজে নিজে বুঝতে পারলেই সবচেয়ে ভাল।

—তুমি কি কবিতা লেখ? —দাদু জিজ্ঞেস করেন।

—না, না,—আমি খুব প্রতিবাদ করে উঠি।

—কেন সমু, কবিতা লেখা তো খারাপ কিছু নয়? তোমাদের বয়সে তোমাদের বাবাও অনেক কবিতা লিখেছে। সে স্টেজটা স্থায়ী হয়নি। যাদের স্থায়ী হয় তারাই কবি হয়।

—আমি কবিতা লিখি না দাদু, কিন্তু আমার প্রতিদিন কত কী মনে হয়।

—শোনো সমু, সেই মনে-হওয়াগুলো অনর্থক মনের মধ্যে না রেখে একটা ডায়েরি-টায়েরিতে লিখে ফেল। তুমি...তুমি বোধহয় তোমার বয়সের তুলনায় বেশি ম্যাচিওর, হয়তো সেই জন্যেই সমবয়সিদের মধ্যে বন্ধু পাও না। যেটুকু কথা বলো সে এই বুড়ো মানুষটার সঙ্গে, কেমন?

দাদুর কথা শুনে আমি হাসি।

—আজকে তোমাকে কয়েকটা দরকারি কথা বলতে ডেকেছি ভাই।

—বলো!

দাদু বললেন— কীভাবে বলব...তুমি কী এসব শোনবার মতো বড় হয়েছ? জানি না। সমু আমাদের আয়টা অনেক কমে যেতে চলেছে। আমি এবার অবসর নেব ভাবছি।

আমি শুনছি চুপচাপ।

দাদু থেমে থেমে বলতে লাগলেন— পালিতসাহেব মারা যাবার আগে একটা উইল করে গেছেন বলে শুনেছিলুম। উনি নিজেই আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছিলেন। যতদিন চাকরি করব, ততদিন তো ধরো স্যালারি ড্র করবই, তা ছাড়াও...কিছু পার্কস...ধরো টেলিফোন, ইলেকট্রিসিটি, গাড়ি উইথ শফার, পেট্রল, বাইরে বেড়াতে যাবার খরচ, বাড়িতে কোনও উৎসব-টুৎসব হলেও উনি আমাকে সওগাত পাঠাতেন। ...ধরো তোমার বাবা-মা'র বিয়েটা বা তোমাদের অন্নপ্রাশন আমি খুব ঘটা করে দিতে পেরেছিলুম... কেন না অনেকগুলো খাতে খরচ পালিতসাহেবই করেছিলেন। কিন্তু কেউ জানে না তোমায় বলছি সমু, উনি আমাকে আমার যোগ্য মাইনে দিতেন না। জমিদারি যাবার পর ওঁরা টাকাপয়সা লাগান কোলিয়ারিতে। চা-বাগানে। লসে চলছিল। আমি আসার পর ওঁরা ফুলে ফেঁপে ওঠেন, বহু স্থাবর সম্পত্তি, ঘোড়া এ সমস্ত আমার উদ্যোগেই হয়েছে। কুর্গ ভ্যালির চা-বাগান আমারই প্ল্যান। তা ছাড়া রেসহর্স। এইসব সম্পত্তির চার ভাগের তিন ভাগই আমার করা। উনি বলতেন গাড়িটা তুমি অবসর নেওয়ার পরও পাবে। ওটা তোমারই ম্যান্ডেভিলার বাড়িটা তোমায় দিয়ে যাব, কিছু ভাল শেয়ার, পেনশন তো থাকবেই। পালিতসাহেব তো হঠাৎই মারা গেলেন। উইল পড়ে দেখা যাচ্ছে, ওসব কিছুই উনি আমাকে দ্যাননি। শুধু হাজার টাকা পেনশন...আমার ধারণা জুনিয়র পালিতেরও কিছু কারসাজি আছে এতে। ও কোনওদিন আমাকে তেমন...। আসলে ওর বাবা আমাকে বেশি বিশ্বাস করতেন তো!...এখন কিছুকাল ওর আন্ডারে কাজ করলুম। সুবিধে হচ্ছে না। সংসারের কথা ভেবে...আর বোধহয় চালানো ঠিক হবে না। মানীর মান রাখতে জানে না। কী? ঠিক করছি তো? বয়সও আমার অনেক হল। অন্য চাকরি করলে কবে রিটায়ার করে যেতুম।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যেখানে মান থাকবে না...দাদু এত বৈষয়িক কথা আমাকে বলছেন! আমাকে!

—এগজ্যাক্টলি। যেখানে আমিই হর্তা-কর্তা ছিলুম সেখানে পদে পদে—বিসাইডস ও ছেলেটা ভাল তৈরি হয়নি, বুঝলে? এ সম্পত্তি ও রাখতে পারবে না। তখন খুব কষ্ট পাব, তিল তিল করে গড়া একটা সাম্রাজ্য তো...তবে তোমার বাবার সঙ্গেও কথা বলেছি... সে-ও একই কথা বলেছে। সে সব ঠিক আছে। আমার কথাটা হল, স্টেটাস, আয় সবই কমে যাবে। তোমরা এখনও কেউ তৈরি হওনি... তোমাদের ওপর এর প্রভাব অনেকটাই... তোমরা যদি বলো তো আরও কিছুদিন...।

—না, না, দাদু। আমাদের জন্যে...অসম্ভব। তা ছাড়া আমি তো গাড়িও চড়ি না, টেলিফোনও তত ব্যবহার করি না। ছোটবেলায় অবশ্য তোমার সঙ্গে অনেক বেড়িয়েছি।

—জানি। তুমি বললে শুনে ভাল লাগল। তোমার দাদার...কিন্তু মত অন্য রকম।

—অন্য রকম?

—হ্যাঁ, ও খুব ক্ষুব্ধ মনে হল। এম. এসসি ফাইন্যাল ইয়ার ওর, কী করবে না করবে...আমি যেটা বলছিলুম সমু, তুমি যদি হায়ার সেকেন্ডারিটা পাশ করে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ো, তা হলে চট করে দাঁড়িয়ে যাবে। আমি জানি তোমার সাহিত্য-দর্শন এসবের দিকে ঝোঁক। তাই-ই...একটু...

—কে বললে? না তো! সাহিত্য পড়তে আমার ভাল লাগে। ফিলসফিক্যাল থটস নিয়ে পড়তেও ভাল লাগে...। কিন্তু ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে।

—থ্যাংকিউ, আমার একটা ভাবনা গেল। তোমার দাদা আমাকে কেস করবার কথা বলছিল।

—কীসের কেস!

—ওই যে উইলটা! আমাকে এক রকম বলেছিলেন, আরেক রকম বার হল! কনটেস্ট করতে বলছিল। এ বিষয়ে তোমার কী মত?

—মুখে বলেছিলেন, সেটা উইলে সত্যিই লিখেছিলেন কিনা...শিওর না হয়ে তো...আমি অবশ্য এ সব ব্যাপারে...।

—সেটাও একটা কথা, তা ছাড়া পালিতসাহেব খুব কৃপণও ছিলেন। একটু মীন মাইন্ডেড যাকে বলে। কাজ করিয়ে নিয়ে পরে হাঁকিয়ে দেওয়া ওর চরিত্রে ছিল। আনপ্রেডিক্টেবল। আমার উচিত ছিল সোঁদা কথায় না ভিজে স্যালারিটা বাড়িয়ে নেওয়া। লোকের জন্য এত বিষয়সম্পত্তি করলুম অথচ নিজের বেলায়...ঠকে...ঠকেই তো গেলুম। ইমপ্র্যাকটিক্যাল!

দাদু মাথা নিচু করে বসে রইলেন। এরকম পরাজিত রূপ তাঁর কখনও দেখিনি। এভাবে নিজের কর্মক্ষেত্র, বিষয়সম্পত্তি, মালিকের সম্পর্কে কথা তাঁকে বলতেও শুনিনি। অদ্ভুত মানুষ, আমাদের কাছেও উনি এক রকম জবাবদিহি করছেন, পরামর্শ চাইছেন।

আমার দাদুর জন্য কেমন কষ্ট হল। কেমন একটা ধূসর কষ্ট। তীক্ষ্ণ নয়। সমস্ত মনটাতে যেন শীতের সন্ধে নামল। ইতি এত স্বচ্ছল ছিলেন যে এঁর ছেলে রাজকুমার আখ্যা পায়। ইনি গাড়ি চড়ে চলাফেরা করতেন। সাহেব-সুবোর মতো ধরনধারণ। এখন কী অপমানজনক ভাবে ইনি বঞ্চিত হয়েছেন। ঠকে গেছেন। দাদুর সঙ্গে আমার সুখ-দুঃখ যে অনেকটাই গাঁটছড়া বাঁধা ছিল সেদিনই স্পষ্ট বুঝেছিলুম। এবং হয়তো সেই দিন থেকেই আমরা প্রকৃত বন্ধু হলুম। সতেরো আর সাতাত্তর।

২

রাত আর বেশি নেই। আকাশ ময়লাটে, ঘোলাটে, হঠাৎ কদিন একটু বৃষ্টিবাদলও হচ্ছে। সময়টা বর্ষাই। পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল। উঠোনের পেয়ারা গাছ, পাশের বাড়ির মিনারের মতো চিলেকুঠুরির ওপর ফ্ল্যাগ-স্টাফ। দু তিন বাড়ির মাঝখানে লেবু, বেল, নিম গাছ। এই জায়গাগুলো সবই পাখিদের আর প্রজাপতিদের প্রিয়। এখন ওই পাশের বাড়ির ফ্ল্যাগ-স্টাফের ওপর বসে ছোট্ট কালো পাখি শিস দিচ্ছে। দোয়েল বোধহয়। অনেকক্ষণ ধরে শিস দিচ্ছে দোয়েলটা। আমিও শুয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে শুনছি। আমার প্রিয় পাখি কাক একটা জানলার পাটে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে ডাকল ক্বঃ। একদম সকালে ওদের গলা কী রকম আধো আধো থাকে। বাচ্চার মতো। বৃষ্টি-ভেজা হাওয়া ঢুকল এক ঝলক। আমার মনে হল ঠিক এই রকম দোয়েল এবং কাক, এই রকম ভেজা হাওয়া, ঠিক এই রকম ভোরের বিছানা আমার জীবনে আরও আরও অনেক বার এসেছে। ভোরের একটা কী রকম স্পর্শ তো থাকেই, কী রকম একটা গন্ধও। সেই গন্ধটা পাবার জন্য আমি বুক ভরে প্রশ্বাস নিই। ঠিক এই রকম কোথায়? কবে? এবং এই অনুভূতিটাও যে আমার এরকম আগেও হয়েছিল কোথাও? কবে? ঠিক এই রকম। এ ঠিক গতানুগতিক মনে হওয়া নয়।

আজ থেকে আমি হস্টেলে চলে যাচ্ছি। কাল থেকেই মায়ের মুখ একটু শুকনো হয়ে আছে। ফিনকি কান্নাকাটি করছে। দাদা গত মাসেই অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে দিল্লি চলে গেল। দাদু বলেছিলেন—দিল্লির খরচ-খরচা বেশি বউমা। আজ ও হস্টেলে জায়গা পেয়েছে। হয়তো চিরকাল পাবে না, তারপর ...ধরো চোখের আড়ালে চলে গেল, মানসিকতার পরিবর্তন হবে। তুমি ওর থেকে বেশি কিছু আশা কোরো না।

মা ম্লানমুখে বললেন—সে যদি বলেন বাবা, আমি আপনি ছাড়া কারও কাছেই কিছু আশা করি না।

ঠিক এই সময়টাতেই আমি ঢুকলুম।

—মা আমি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছি। কালো প্যান্টটা কোথায় বলতে পার?

—ওটা ডাইংক্লিনিংএ দিয়েছি। পরের বার এসে নিয়ে যেয়ো। আর কী কী দরকার মনে করো। শেষে...

দাদু বললেন—একটা লিস্ট করেছ কী? বইপত্তর, জামাকাপড়, মিসেলেনিয়াস?

—করেছি। তবে আমি তো সব জিনিস একসঙ্গে নিয়ে যাব না। যদি দেখি ওখানে কাপড়-জামা কাচতে বেশি খরচ, কি বেশি সময় লাগছে, তো সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়িতে দিয়ে যাব।

মা একটু উজ্জ্বল মুখে আমার দিকে চাইলেন। বললেন, প্রতি সপ্তাহে আসতে পারবে তো?

—পারতেই হবে। ফিনকিতে কথা দিয়েছি, রবিবার রবিবার ওকে পড়িয়ে দেব। আর দু' বছর পরেই তো...

আমি ফিনকির কথাটাই বললুম। কিন্তু আসলে আমি পুরো বাড়িটার কথাই ভাবছিলুম। দাদুর কথা, মায়ের কথা। যদিও তার কোনও বহিঃপ্রকাশ ছিল না। আমাদের পরিবারের সবাই-ই খুব শান্ত এবং চাপা, বাবা আর ফিনকি ছাড়া। বাবা অনর্গল কথা বলেন, অনর্গল রাগারাগি করেন, সামান্য কারণেই চেঁচামেচি, পাঁচজনের মুণ্ডপাত। আর ফিনকি সর্বক্ষণ কলকল করে। কোথায় ওর নতুন বন্ধু অদ্ভুত নামের প্রিসিলা। সে নাকি একেবারে মেমসাহেব, একমাত্র মনীষা অর্থাৎ আমাদের ফিনকিকে ছাড়া কাউকে পাত্তা দেয় না। ওদের প্রিন্সিপ্যাল কত রাগী, বাংলার টিচার বানান ভুল করেন। হিস্ট্রির টিচারকে ওরা কত ভালবাসে, পড়ান মোটামুটি কিন্তু চমৎকার চমৎকার শাড়ি পরেন, খুব গ্ল্যামার। গ্ল্যামারই, ঠিক সুন্দর নয়। সে যদি বলো সায়েন্সের বল্লী নায়ার খুব মিষ্টি। কালোর ওপর এত সুন্দর যে...।

এত কথা, প্রতিদিনের খুঁটিনাটি, তা ছাড়া মনের কথা প্রাণের কথা ফিনকি মোটের ওপর সবাইকেই বলে। দাদু থেকে শুরু করে আমি পর্যন্ত। দাদাকে ও একগাদা ফরমাশ করেছে। গালার চুড়িবালা, সালোয়ার কামিজ এবং দিল্লির চটি।

দাদা ভুরু কুঁচকে মিটিমিটি হেসে বলেছিল—মনে হচ্ছে আমার কলেজের পাশেই তোর গালা না ফালার দোকান, চটিগুলো বোধহয় গেটের কাছেই ফুটপাথে বসে।

—ওসব জানি না—মাথা ঝাঁকিয়েছিল ফিনকি—আমি কাগজের ওপর আমার পায়ের মাপ ভাল্লো করে এঁকে দিয়েছি। চটি ভীষণ সস্তা ওখানে, লাল, সবুজ সব রকম দেখে এনো ঠিক।

দাদার দিল্লি যাওয়াটা ওর কাছে বেশ একটা আনন্দের ব্যাপার। দিল্লি একটা সব পেয়েছির দেশ—ওর কাছে। সে সব সরবরাহ করবার জন্যেই দাদা যাচ্ছে, চাকরি-টাকরি গৌণ। কিন্তু আমি হস্টেলে যাচ্ছি শুনে ওর ঠোঁট ফুলতে লাগল।

—তুই না দেখলে আমি পাশ করব কী করে?

বাড়িতে একমাত্র ফিনকির সঙ্গেই আমি অনেক সময় কাটাই। সব বিষয়ে পড়াশোনার জন্য ও আমার ওপর নির্ভর করে। ওকে আর মাকে আমিই আত্মীয় বাড়ি, সিনেমা ইত্যাদি নিয়ে যাই।

বলি—এই তো এইখানে শিবপুর, প্রতি সপ্তাহে আসব, ভাবনা কী?

—ঠিক আসবি তো?

—ঠিক। না হলে তুই পাশ করবি কী করে?—দুজনেই হাসি।

এই রকম একটা ভূমিকা তৈরি হয় আমার হস্টেল-যাত্রাকে ঘিরে। বড় একটা স্যুটকেস মা দিয়েছেন। বোধহয় মায়ের বিয়ের সময়কার। ভাল চামড়ার। ভেতরে বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় থেকে যে বইগুলো আপাতত কিনতে পেরেছি সেগুলো, দাদুর দেওয়া ডায়েরিটা পর্যন্ত সবই আছে। মা

গুছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি জানি মায়ের বহু কাজ, সময় বার করা খুব শক্ত। ফিনকি একটু আধটু সাহায্য করেছে। ব্যাস।

কিন্তু মা ও কথাটা বললেন কেন? —তা যদি বলেন বাবা, আমি আপনাকে ছাড়া কারও কাছেই কিছু আশা করি না।

এই প্রথম বাড়ির কারও কথা আমার মনে ঢেউ তুলল। সত্যিই, মায়ের কথা আমরা কে কতটুকু ভাবি? দাদা আর আমি নিজেদের নিয়ে থাকি। বাবাও এক রকমের তাই। আমরা নিঃশব্দ বাবা সশব্দ এইটুকু তফাত। আদুরে বোনটাও মায়ের চেয়ে বাবার কাছেই ঘেঁষে বেশি। বাকি তো থেকে যাচ্ছেন দাদুই। দিদারা দুই বৃদ্ধা, জপতপ, পুজো-অর্চনা নিয়ে থাকেন। তাঁদের প্রয়োজনগুলো মাকেই মেটাতে হয়। মটকার কাপড় পরে পুজোর জোগাড় করে দেওয়া, নিরামিষ রান্না উনুন পেড়ে করে দেওয়া। আমাদের রাঁধুনি মেয়েটি বামুন নয়। তার হাত ওঁরা খান না। আমাদের এমনিতেই তিন চার রকম রান্না হয়, দিদারা পুরো নিরামিষ, দাদুর হাই ব্লাডপ্রেশার, নুন চলে না, বাবা মশলাদার রান্না ছাড়া খেতে পারেন না, আমরা তিন ভাই বোন মোটামুটি অল্প মশলা পছন্দ করি, কিন্তু কেউ এ ডাল খায় না, কেউ ও ডাল খায় না, কারও কাঠি আলুভাজা চাই, কারও গোল, মায়ের ঠিক কী পছন্দ, শেষ পর্যন্ত মা কী খান, জানি না। জানবার কথা আগে মনেও হয়নি। ইদানীং দাদু নিজের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের কথা আলোচনা করার পর থেকে একটু-আধটু লক্ষ করি। তারপর থেকে আমি রাত্তিরে মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। বাজার আমিই করি। মা মাংস আনতে বললেও একদিনের বেশি আনতুম না। বলতুম— যাঃ ভুলে গেছি। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন মাংস না হলে বাবা বড্ড চ্যাঁচামেচি করতেন। বকুনিটা খেতেন মা। সেদিন অমনই চুপচাপ বকুনি খাচ্ছিলেন। আমি নীচে নেমে গেলুম। খাবার ঘরে ঢুকে বললুম— মা আনতে বলেছিলেন, আমিই ভুলে গেছি। একটু চুপ করে বললুম, জিনিসপত্রের দাম খুব। ওই টাকায় কুলোতে পারি না। আমি চাকরি করি, তখন তোমাকে রোজ মাংস খাওয়াবো...।

বাবা আমার ইঙ্গিতগুলে বুঝেছিলেন মনে হয়। চুপ করে গেলেন। বাবা বোধহয় আমাদের অর্থাৎ দাদাকে ও আমাকে কিঞ্চিৎ ভয় করতেও শুরু করেছিলেন। আমরা তাঁকে যতটা, তিনি আমাদের তারও বেশি।

মা ইদানীং খুব রোগা হয়ে যাচ্ছিলেন। আমার কেমন মনে হচ্ছিল আমাদের ঠিক আগের মতো খাওয়াতে গিয়ে মা নিজের খাওয়া-দাওয়া কমাচ্ছেন। এমনিতেও তেমন যত্ন-আত্তি করতেন না। নিজেকে নিজে যত্ন করতে মায়েরা চিরকাল লজ্জা পেয়ে এসেছেন। তখন পরীক্ষা শেষের ছুটি চলছিল, একদিন দুপুরে সন্তর্পণে নীচে নেমে গেলুম, খাবার ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি মা এক থালা ভাত খাচ্ছেন, সুদ্ধু ভাত, একটু গলা-গলা, দুটো কাঁচা লংকা, দুটো পেঁয়াজ, একটু কাঁচা সর্ষের তেল ঢেলে নিলেন।

আমাকে মা দেখতে পাননি। চুপচাপ ওপরে চলে এলুম। পর দিন খাবার সময়ে বললুম— মা, আমার একটা জিনিস খেতে ইচ্ছে করছে, দেবে? মা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, মুখটাতে কালি নামছে, ছেলে কী চাইছে, তিনি দিতে পারবেন কি না। আমি বললুম— দুটো কাঁচা লংকা, দুটো কাঁচা পেঁয়াজ যদি থাকে, আর একটু কাঁচা সর্ষের তেল।

মা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না যে আমি মাকে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বকাবকি করি বা মা তা নিয়ে আর কিছু বলেন।— যা দিচ্ছি এখন খাও তো! পাকামি করতে হবে না-গোছের। মাছ খাওয়াও আমি ছেড়ে দিলুম। বললুম— ওয়াক ওঠে।

এরপর দাদু একদিন খাওয়ার পরে ডাকলেন— সমু। তুমি আজকাল মাছ খাচ্ছ না। ওয়াক ওঠে তোমার মা বলছিলেন। এ তো মুশকিলের কথা, ডাক্তার দেখাতে হয়, জনডিস-টিস হল না কি?

তুমি না কি সর্ষের তেল দিয়ে ভাত মেখে কাঁচা লংকা, পেঁয়াজ দিয়ে খাচ্ছ!

আমি বললুম— গরিব লোকেরা তো এ রকমই খায় দাদু।

দাদু বললেন— তুমি অনর্থক আমার অবস্থাটা বড্ড বেশি খারাপ মনে করছ ভাই, এতটা দরিদ্র হইনি যে তোমাকে পেঁয়াজ লংকা দিয়ে ভাত খেতে হবে। ওসব কথা তোমাকে বলা বোধহয় আমার ঠিক হয়নি।

আমি বললুম— মা'র রেগুলার এই-ই ডায়েট আজকাল, যতদিন মা খাবেন আমিও ওই-ই খাব। আমার কোনও অসুবিধে নেই।

দাদুর মাথা ঝুলে গেল। কোনও কারণে খুব দুঃখ পেলে, লজ্জা পেলে দাদুর এটাই ছিল ভঙ্গি।

আমি বারবার ফেল করছি— উনি বললেন— তোমার মা সারদিন শরীর পাত করে আমাদের সেবা করছেন। আমি ওঁর কোনও খোঁজ রাখিনি, ছিঃ! তুমি আমায় মাফ করো সমু।

মাকে উনি কী বলেছিলেন জানি না, পরদিন মা দুপুর দুটোর সময়ে আমাকে ডাকলেন। নীচে নামতে বললেন— কী খাচ্ছি দেখে যাও সমু। এই দ্যাখো আমার ডাল, মাছ, তরকারি। আশা করি কাল থেকে আর আমায় জ্বালাবে না।

—আমি তো রোজ রোজ ইন্‌স্‌পেকশনে আসতে পারব না!

—আচ্ছা, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।

—আশা করি, তোমার মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর আমার চোখে চোখ রেখে বললেন— না।

—মা আমি কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করছি।

৩

বাড়ির জীবন নিস্তরঙ্গ নিরাপদ। হস্টেল যে তা হয় না, হতে পারে না সেখানে যে প্রতিপদে বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে হবে এ সব কথা আমি ভাবিনি। জানতুমই না। পুলু একবার যেন বলেছিল, আমি খেয়াল করিনি। বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে আসবার পরের দিনই সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারের কিছু দাদা আমাকে ডেকে পাঠাল। কী নাকি ভীষণ দরকার আছে।

কথাবার্তা হল খুব অদ্ভুত। ওদের প্রশ্ন আর আমার উত্তর। কোনওটার জন্যেই আমি প্রস্তুত ছিলুম না।

—এই তোর ফ্যামিলি স্ট্রাকচার কী রে?

—যেমন হয়। মা-বাবা-ভাই-বোন-দাদু-ঠাকুমা-দাদা-বউদি-ভাইপো-ভাইঝি-মেজদা-মেজবউদি-সেজদা-সেজবউদি-জ্যাঠা-জেঠি-কাকা-কাকিমা-জেঠতুতো-ভাই-বোন-দাদা-বউদি-খুড়তুতো।

—মারব এক থাবড়া, ইয়ার্কি হচ্ছে আমদের সঙ্গে? তোর জ্ঞাতিগুষ্টির কথা কে জানতে চেয়েছে? তুই যে বাড়িতে থাকিস সেইখানে।

আমি অবাক হয়ে বলি— সেই বাড়ির কথাই তো বলছি!

—এত বড় জয়েন্ট ফ্যামিলি তোদের?

—ইয়েস।

—তোর কটা ভাই, কটা বোন?

—বড়দা-মেজদা-সেজদা-ন'দা-ক'নেদা-নতুনদা-রাঙাদা-ফুলদা...

—বাস বাস বুঝতে পেরেছি। এতগুলো কি তোর নিজের মায়ের পেট থেকে বেরিয়েছে?

—কেউ কেউ জেঠিমা, কাকিমাদেরও, তবে আমরা এইভাবেই নিজেদের কাউন্ট করি।

—বোন ক'টা, সাফ বলবি?

—এই অচিন্ত্য এক্ষুনি নামতা পড়বে রে। অন্য কোয়েশ্চন কর?

—সবচেয়ে সুন্দর বোন কোনটা!

—আমার নিজের ছোট বোন।

—চিয়ার্স চিয়ার্স হিপ হিপ হুররে। বোনটার সঙ্গে শুতে দিবি? ক'জনের সঙ্গে দিবি সেটাও ঠিক করে নে, রাইট?

—গ্ল্যাডলি। হিসি করবে, কাঁথা পাল্টাতে যতজন থাকে ততই ভাল, একজনের ওপর চাপটা বেশি পড়ে যাবে।

—রাম রাম, কত বয়স তোর বোনটার?

—মাস পাঁচেক হবে।

—বাপ রে, দাদা এঞ্জিনিয়ার হতে এয়েছে। বোন পাঁচ মাস? তোর বাবা-মা তো এখনও দিব্যি চালু রে! বয়স কত তোর মায়ের?

—মা? ...আমি চোখ কপালে তুলে একটু ভাবি— ঠিকঠাক বলতে পারছি কিনা জানি না। চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে বোধহয়।

—ইয়ার্কি পেয়েছিস? মাত্র সতেরো বছরের বড় তোর থেকে?

নিষ্পাপ মুখ করে আমি বলি— কেন, সতেরো বছরে বুঝি ছেলে হয় না?

অ্যাকশন— আড়াল থেকে কে বলল।

অমনি আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিল ক'জন। তারপর কয়েকবার দুলিয়ে ছুঁড়ে দিল। আর কয়েকজন আমাকে লুফে নিল।

মাথাটা ঝুলে পড়ল। আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি। মুখটা অল্প হাঁ, আস্তে আস্তে নিশ্বাস পড়ছে।

পুলুর গলা শুনতে পেলুম— সর্বনাশ। ওর যে হার্টের একটু গোল... আছে। শিগগির ডাক্তার ডাকুন।

—এই খবর্দার। ঢপ অনেক দেখেছি, হেল্‌থ এগজামিন হয়নি? হার্টের গোল! এই কাতুকুতু দে তো রে!

যে কোনও কারণেই হোক, আমার কাতুকুতু লাগে না। মাথা একদিকে নেতিয়ে গেছে। চার হাত পা ছেতরে মড়ার মতো পড়ে আছি।

—জল ঢাল মাথায় জল ঢাল।

পুলু বলল সাবধানে ঢালবেন। নাকে মুখে ঢুকে গেলে চোক করে যাবে। দাঁড়ান আমি দেখছি—সমুদ্র, এই সমুদ্র। চোখ মেলে দ্যাখ আমি পুলু রে। আর আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের দাদারা। —সারা মাথা ভিজে, শার্টের ভেতর দিয়ে জল গলে যাচ্ছে, আমি বেশ পাঁচ মিনিট পরে চোখ একটু খুলি...

—আরেকটু হলে খুনের দায়ে পড়ে যাচ্ছিলেন ইশ্‌শ্‌... পুলু বলল,—আমাকে যা করার কালকে করবেন। আজ ওকে নার্স করতে হবে। একজন কেউ কাইন্ডলি ডাক্তার ডেকে আনুন।

—এত রাতে ডাক্তার কোথায় পাব! মালকে ঘরে নিয়ে যা।

কয়েকজন কাঁধে পিঠে করে আমাকে বয়ে নিয়ে গেল। পুলু জামাকাপড় পাল্টে দিল, পাজামা সুদ্ধু।

ঘর নিশ্চয় ফাঁকা হয়ে গেছে। কেন না পুলু বলল— এই সমু এবার চোখ খোল। তুই যে এত ভাল অ্যাক্টিং করতে পারিস আমি জানতুম না।

কথাগুলো ক্ষীণভাবে আমার কানে এল। যেমন আরও কিছু-কিছু কথাও আমি শুনতে পেয়েছিলুম। আমি কিন্তু সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। একটা ঝাঁকুনি, তারপরে আর কিছু মনে নেই। অন্ধকার। একটা বিশাল পরিত্যক্ত বাড়ি। ঘরদোর হাঁ হাঁ করছে। অন্ধকারের মধ্যে থেকে কয়েকটা দূরবর্তী

স্বর, তারপরে জল থাবড়া পড়তে আস্তে আস্তে আবার ঘরটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। দূরে জানলা, বাইরে অন্ধকার, গাছপালার মধ্যে দিয়ে একফালি চাঁদের আধখানা। চতুর্দিকে ঝিঁঝি ডাকছে। খুব আর্তস্বরে কে কী বলছে, কারা কী সব বলছে, আর্ত গলা, কড়া গলা, আর্ত, কড়া, কড়া, আর্ত।

—তুই কথা বলতে পারছিস না কেন? কী রে সমু?

—আমি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম পুলু— আমি খুব কষ্ট করে বলি।

—বলিস কী রে! কাল সকাল হলেই দাদুকে ফোন করব। কী কাণ্ড!

আমি বলি— সকালের কথা পরে। এখন শোন চুপ করে। কিছুক্ষণ চুপ করে শুনল পুলু। তারপর বলল— কী শুনব, কিছু তো শুনতে পাচ্ছি না!

—অনেক গলা, কাঁদছে, অনুনয় করছে, অন্য পক্ষ ধমক দিচ্ছে, গালাগালি দিচ্ছে, কত কত দিন এই ঘরে কত ছেলেদের ওপর অত্যাচার হয়েছে, ঘরটা সব রেকর্ড করে রেখেছে।

—তুই একটা পাগল!

আমি হাসি। দেখাই যাচ্ছে আমার শোনা সবাই শুনতে পায় না, আমার দেখা সবাই দেখতে পায় না। সুতরাং আমি পাগল। আমি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘুম ভাঙতে দেখি ঘর রোদে ভেসে যাচ্ছে, সুপার দাঁড়িয়ে, তাঁর পাশে স্টেথো হাতে ডাক্তার। বললেন— নিশ্বাস নাও জোরে জোরে।

পরীক্ষা শেষ হলে বললেন— এর কয়েকটা পরীক্ষা করাতে হবে। আমি লিখে দিচ্ছি। তোমার আগে কখনও এমন হয়েছে?

আমি মাথা নাড়ি। না।

—স্বাস্থ্য তো চমৎকার।

আমি চেয়ে আছি।

উনি বললেন— এর বাড়িতে খবর দিন। ইনভেস্টিগেশনগুলো করিয়ে নিতে হবে।

আমি এবার আস্তে বলি— বাড়িতে খবর দেবেন না। ওঁদের ডিস্টার্ব করার দরকার নেই।

—তার মানে? বিনা চিকিৎসায়...?

—হ্যাঁ। আমার তাতে কোনও অসুবিধে নেই। অচিন্ত্যদা, সুব্রতদাদের জন্যে যখন হয়েছে... হস্টেলের ঘরে, তখন হস্টেলেরই দায়িত্ব...। আমার বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। এসব ঝামেলা পোয়াবার ক্ষমতা নেই।

সুপার বললেন— এগুলো তো আমাদের করবার কথা নয়। এমার্জেন্সি হলে আলাদা কথা।

—মানুষ ছোড়াছুড়িটা তা হলে আপনাদের করবার কথা, কিন্তু তার ফলগুলোর দায়িত্ব নেবার কথা নয়। আমি ক্ষীণ গলায়, কোনও রাগ ছাড়া শান্ত ভাবে বলি।

ডাক্তার বললেন— সিচ্যুয়েশন এ রকম হলে আমি আপনাদের হায়ার অথরিটিকে জানাব। তাতেও কাজ না হলে পুলিশ। ইন এনি কেস— এ ছেলেটির যদি কোনও ইনজুরি হয়ে থাকে, তাতেও প্রসিডিওরটা একই থেকে যাচ্ছে। এর বাড়িতে জানালেও...

সুপার বললেন— তোমরা সবাই চাঁদা তুলে ফেলো, দ্যাখা যাক কী হয়। সুব্রত অধিকারীর চোখে ভয়ের ছায়া দেখে আমি আবার চোখ বুজলুম।

নিজের সম্পর্কে এই কথাগুলো আমার জানা ছিল না। সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে আমার মন যে আপনাআপনি এরকম একটা নীতি ঠিক করে নিতে পারে, শরীর তাতে সাহায্যও করে, —এটা নতুন খবর। খবরটাকে আমি শান্ত ভাবে হজম করি। পুলু অনেকবার বলে তোর বাড়িতে জানাই। আমি না করি। একজন বৃদ্ধ, একজন ভিতু, আর একজন অনুপস্থিত এই তো আমার বাড়ির

সত্যিকার স্ট্রাকচার। নিজেই যতটা পারি নিজেকে দেখব। চিরকালই সম্ভবত এমনটাই করে এসেছি। এখনও না করার কোনও কারণ নেই।

ইনভেস্টিগেশনে অবশ্য তেমন কিছু বার হল না। স্নায়বিক ব্যাপার— ডাক্তার বললেন। নিউরোলজিস্ট দেখাবার সময় নেই।

সুব্রতদা বলল— দেখিয়ে নে সমু, আমরা টাকা দিচ্ছি। সত্যি যদি কোনও গণ্ডগোল হয়ে যায় তা হলে বাড়ির লোকেদের জানা দরকার।

আমি রাজি হইনি।

সত্যি কথা বলতে কি সুব্রত অ্যান্ড কোং যখন আমাকে অকথ্য অশ্লীল কথাগুলো বলছিল, আমার কিছু মনে হয়নি। কথার পিঠে শুধু কথা সাজিয়ে দিয়েছিলুম। মিথ্যার পিঠে মিথ্যা। শরীরিক আক্রমণটা যতটা লেগেছিল মানসিক আক্রমণটা তার দশ শতাংশও না। অথচ এসব কথা আমি কখনও শুনিনি। আর হস্টেলে আসবার আগে কেউ আমাকে সাবধানও করেনি। কিন্তু আমার অসুবিধে হয়নি। কার কথা ওরা বলছে— মা, বাবা, ভাই, বোন... কতগুলো শব্দ শুধু। তার পেছনে যদি অনুভূতি ও আবেগ থাকে তা হলেই শব্দগুলো অর্থপূর্ণ। নাহলে তো নয়। সুব্রতদাদের মুখে ওই শব্দগুলো শুধু শব্দই ছিল। প্রাণহীন অর্থহীন শব্দ। পরে যখন পুলু বলল— 'সমু তোর রাগ হয়নি? আমাকে ওরকম বললে আমি তো লাফিয়ে পড়ে ওদের আঁচড়ে কামড়ে দিতুম...' আমি বললুম— না রে কিছু মনে হল না। যে মুহূর্তে ওরা দল বেঁধে ঘরে ঢুকল আমার মনে হল একদল ছায়া মানুষ ঢুকল, যারা কিছু না কিছু অত্যাচার করে যাবে, আমার লাগবে না, কেন না সবটারই ভিত্তি মিথ্যে। মিথ্যেটাকে মিথ্যে দিয়ে আটকাতে তাই আমার অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু মনটা আমার আয়ত্তে হলেও শরীরটা তো নয়। ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যখন আমাকে ছুড়ে দেওয়া হল তখন একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, একটা মারাত্মক স্নায়বিক ভয়। এক্ষুনি মাটির ওপর আছড়ে পড়ব। থেঁতলে যাব। শরীরটা কুঁকড়ে ঠান্ডা হয়ে গেল, কালঘাম ছুটতে লাগল, বেগতিক বুঝে সেই কটা মুহূর্তের জন্যে শরীরটা মরে গেল। ওটা শরীরের নিজস্ব ডিফেন্স মেকানিজ্‌ম্‌।

পুলক বলল— কিন্তু তুই তো পুরো অজ্ঞানও হোসনি। আমাদের কথাগুলো তো শুনতে পাচ্ছিলি!

—হ্যাঁ, কিন্তু কেমন যেন অনেক দূর থেকে। খুব হালকা গলা, যেন অনেক কুয়াশা ভেদ করে আসছে দু'চার ছিটে রোদের কণা। তবে সেটা ঠিক কী, কেন ওরকম হল পুলু আমি বলতে পারব না। আমি তো ডাক্তার নই। তা ছাড়া ধর মৃত্যুর সময়ে কী হয়? চারপাশের কান্না, হাহাকার তো এমনই দূর থেকে চেতনায় এসে পৌঁছয়, তাই না?

—মৃত্যুর সময়ে কী হয় আমি কী করে জানব? পুলক অবাক হয়ে বলল, তুই-ই বা কী করে শিওর হচ্ছিস যে ও রকমই হয়?

—জানি না, কেমন মনে হল।

—তুই একটা কিম্ভূত।

পুলু বা পুলক আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। পাড়ার বন্ধু, স্কুলের আবার ক্লাবেরও বন্ধু। একজন ছোট্ট থেকে যেহেতু দু'জনে সর্বত্র একসঙ্গে একই জায়গায় যাওয়া আসা করেছি সেইজন্যেই প্রধানত ওর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা। ও যে আমাকে সব সময়ে বোঝে তা না। কিন্তু কখনও আমাকে ঠাট্টা-তামাশা করে না, বিশেষত অন্য কারও সামনে। কেমন একটা টানও ওর আছে আমার ওপর।

বয়-স্কাউটের দলে সেবার আমরা জাম্বোরিতে গেছি গিরিডি। দিন সাতেকের ক্যাম্প। খাণ্ডোলি পাহাড়ের কাছাকাছি ক্যাম্প পড়েছে। একটু দূরে তিরতির করে বইছে উশ্রী নদী। খুব সরু, জল কম। সন্ধেবেলায় ক্যাম্প ফায়ার ঘিরে প্রতিদিনই আমাদের নানা রকম আনন্দ অনুষ্ঠান হত। গান হচ্ছে আবৃত্তি হচ্ছে। সুকুমার ছিল হরবোলা। পশুপাখির ডাক তো নকল করতে পারতই। নানান

মানুষের গলা অবিকল তুলে নিতে পারত নিজের গলায়। আমাদের, স্কাউট মাস্টারদের— সবার।

সেদিন ওই রকম অনুষ্ঠান হচ্ছে। কেউ করছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, কেউ নজরুল, বেশ গরম গরম কবিতাও আবৃত্তি হচ্ছে। সুকান্ত, নজরুল। হঠাৎ আধো-অন্ধকার থেকে শম্ভুদার গলা এসে আমাকে বিঁধল— সকলেই কিছু না কিছু করছে, তুই কেন চুপ করে বসে আছিস সমুদ্র? কিছু বল! কর!

আমি কিছুই পারি না। অন্যরা যেটা করে আমার ভাল লাগে।

গানের সুরটা জানা থাকলে বা কবিতাটা মুখস্থ থাকলে গলা মেলাবার চেষ্টা করি। কিন্তু নিজে না পারি সে ভাবে গান করতে, কবিতা-টবিতা আওড়াতে, কমিক-টমিক তো আমার একেবারেই আসে না। এ-ও জানি এখানে সবাই কিছু না কিছু করতে বাধ্য। না করলে পুরো মেজাজটাই নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়াও 'আমি কিছু জানি না পারব না' এসব বলাও আমার কেমন ন্যাকামি মনে হত।

বিনা ভূমিকায় ছাই-পাঁশ যা মনে হল বলে গেলুম অতএব— দেখ স্কাউট ভাইরা, মালদা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, শিলিগুড়ি, কলকাতা, হুগলি, নদিয়া আরও কত জায়গা থেকে আমরা এখানে এসে মিলেছি। আমাদের জীবনযাত্রা, পরিবার, ভাল-লাগার জিনিস, আলাদা আলাদা। দক্ষতাও সব বিষয়ে সবাইকার একরকমের নয়। কিন্তু এক জায়গায় আমরা সবাই এক। এই জাম্বোরিতে। একদিকে দেখ ওই ঝিরঝিরে নদী, আর একদিকে পাহাড় দিয়ে আমরা ঘেরা। নদী যদি শুরু হয় তো পাহাড় দাঁড়ি। মাঝের ফাঁকটায় ক্যাম্প পড়েছে আমাদের; আগুন জ্বেলেছি, হাত-পা সেঁকে নিচ্ছি শীতের রাতে, গ্রীষ্মে ওই নদীর জল যত কষ্ট হোক ঝাঁপিয়ে স্নান করব। আমাদের সারা জীবনের যা কিছু জানা বোঝা সব আমরা অন্যদের কাছে উজাড় করে দিচ্ছি। এর পর আগুন নিবে যাবে, জাম্বোরি শেষ। সব গান কবিতা, অভিনয় সবরকমের খেলাধুলো, একসঙ্গে কাজ-কর্মের দিন, বক্তৃতা, নির্দেশ ডুবে যাবে, জেগে থাকবে শুধু পাহাড়। এসো আমরা পাহাড়ের কথা ভাবি।

কিছুক্ষণ সব চুপ। তারপর সুকুমার চেঁচিয়ে উঠল— জল ঢেলে দিলি সমুদ্র। একেবারে বালতি বালতি ঠান্ডা জল ঢেলে দিলি। তোকে কিছু করতে বলাই আমার ভুল হয়েছে। ধুস্।

তখন বুঝতে পারলুম শম্ভুদার গলা নকল করে সুকুমারই ফরমাশটা আমাকে করেছিল। শম্ভুদা ওখানে নেই-ই।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা অন্য কেউ কোনও শব্দ উচ্চারণ করল না। আমরাই তখন সবচেয়ে সিনিয়র। আমাদের থেকে ছোটও অনেক ছিল। কেউ কিছু বলল না।

শুধু পুলু বলে উঠল— যার যা মনে হয়েছে করেছে, বলেছে, সমুকে বলতে বলেছিলি ও ওর মতো বলেছে। সুকুমার তুই যা করেছিস সেটা ক্যাম্পের স্পিরিট নয়। চুপ করে যা।

আমিই ছিলুম শেষ বক্তা। তখনও আগুন জ্বলছে। ছোট ছোট শিখা। মাঝে মাঝে হুস করে জ্বলে উঠছে। তলায় কাঠগুলোর ধিকি ধিকি দেখা যাচ্ছে, একটা ঠান্ডা হাওয়া উঠল, শিরশির করছে গা, সেই নিবন্ত আগুন মাঝখানে নিয়ে আমরা বসে আছি সব্বাই সুকুমার সুদ্ধু। যতই রাত বাড়ছে অন্ধকার আকাশের পটে আরও জমাট অন্ধকার হয়ে ফুটে উঠছে ধূম্র পাহাড়। কতক্ষণ বসেছিলুম কে জানে, শম্ভুদা বিপ্লবদারা এসে ডাকলেন। 'খাবার রেডি। দেখি আজ কে ক'টা রুটি খেতে পারিস।' আসলে অন্যান্য দিন রান্না ওঁদের সাহায্য নিয়ে আমরাই করতুম। আজকে ওঁরা করেছেন।

আমাদের চুপচাপ দেখে বিপ্লবদা বললেন— 'কী রে তোরা কি মেডিটেশন করছিস? প্রসঙ্গত, ধ্যানও আমাদের ক্যাম্প-জীবনের একটা প্রাত্যহিক করণীয় ছিল। তবে বিপ্লবদা ক্যাম্প-জীবনে বৈচিত্র্য আনতে পুরো রুটিনটাকে একেক দিন ওলোটপালোট করে দিতেন। ধ্যান যে কখন হবে তা কেউ বলতে পারত না। একদিন সকালবেলা আমরা অনেকে মিলে ডিমসেদ্ধ, পাউরুটি টোস্ট করলুম। কয়েকজন মাখন লাগাল, কয়েকজন চা তৈরি করল। কয়েকটা শালপাতার থালায় খাবারগুলো রাখা হল রোজকার মতো, মাটির ভাঁড়ে চা, কয়েকজন মিলে একসঙ্গে গোল হয়ে বসা একটা থালায় দিস্তে দিস্তে টোস্ট, আরেকটাতে ডিম, এরকম অন্তত দশটা দল তো থাকতই।

খাওয়া শেষ? বিপ্লবদা আধঘণ্টা সময় দিয়ে হাঁকলেন— ব্যস হাত মুখ ধুয়ে সমবেত হও বৎসগণ।

আমরা এঁটো শালপাতা মাটির ভাঁড় জড়ো করে ফিরে এলুম।

বিপ্লবদা বললেন— মেডিটেশন, গেট সেট গো...।

ব্যস সব্বাইকে যে যেখানে আছে পদ্মাসনে বসে পড়তে হবে।

তারপর ধ্যান। চোখ বুজে। বিপ্লবদা স্টপওয়াচ দেখে ঠিক দশ মিনিট পরে মিলিটারি গলায় বলবেন— ওভার।

এইরকম।

সে রাতে কি তারা-জ্বলা, নিচাঁদ আকাশের তলায় পাহাড়ের নিশ্চলতা গাম্ভীর্য, অবশ্যম্ভাবিতা...প্রাকৃতিক বস্তুর এবং মৃত্যুর...আমরা সবাই-ই কিছুক্ষণের জন্যে অনুভব করেছিলুম? তাতে আমার উল্টোপাল্টা কথাগুলোর কি সত্যি কোনও ভূমিকা ছিল?

টেন্টগুলো ছিল ছোট ছোট। বদলে বদলে থাকতে হত আমাদের, যাতে সবাই সবাইকার সঙ্গে থাকার সুযোগ পায়। সে রাতে আমার সঙ্গে ছিল দুটি জুনিয়র ছেলে— হাফিজ আর মাইকেল। এটাও স্কাউটমাস্টারদের প্ল্যানের অন্তর্গত। নানা ধর্মের ছেলেদের পারস্পরিক মেলামেশা, যৌথ জীবন। শুয়ে শুয়ে গল্প করাটাকে খুব একটা উৎসাহ দেওয়া হত না। তবে সারাদিন খেলাধুলো, সাঁতার এবং অত রকম কাজ-কর্ম করে বিছানায় শোওয়ামাত্র আমরা ঘুমিয়েই পড়তুম। দূর থেকে বিপ্লবদার হুইসেলের শিস্, সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে ঘুম।

হয়তো সেদিন রাত্রের রান্নাটা মাস্টারমশাইরা করায় আমাদের ক্লান্তি একটু কম ছিল, হাফিজ বলল,— সমুদা ঘুমোলে?

—না।

—মাইক্‌ল ঘুমিয়েছিস?

—উঁহু।

আমারও ঘুম আসছে না। —তারপরে কেমন কাঁপা-কাঁপা গলায় হাফিজ বলল— আমি চিতাকে ভয় পাই।

—চিতাকে আবার কে না ভয় পায়? বিশ্বের দ্রুততম হিংস্র প্রাণী। তবে এখানে চিতা-টিতা নেই। —আমি আশ্বাস দিই।

—জানোয়ার চিতার কথা বলিনি। ওই মড়া পোড়ানোর কথা বলছি।

—তোরা হঠাৎ চিতা-টিতার কথা ভাবছিস কেন?

—তুমি যে বললে পাহাড়ের কথা ভাব।

আমি চুপ করে যাই। সেই মুহূর্তের একটা নিজস্ব অনুভবের কথাই তো আমি বলেছি, সমস্ত আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে প্রকৃতি আমাকে এমন একটা এক্স-ফ্যাক্টরের উপমা দেখিয়েছিল যেটা নাকি সনাতন।

—মৃত্যুর সঙ্গেও চিতা বা কবরের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। মৃত্যু একটা অজানা দিগন্ত, পাহাড় যেমন রহস্যময়, তেমনই। তাই থেকেই তুলনাটা এল। মৃতদেহের তো নানা জনে নানারকম সৎকার করে। মৃত্যু একটা অন্য অভিজ্ঞতা।

—তোমার কথা বুঝতে পারলুম না।

আমি নিজেই কি বুঝি? তাই হেসে বললুম— বুঝতে হবে না। কী করব, বলব ভেবে না পেয়ে ওই সব উল্টোপাল্টা বকেছি।

দূর থেকে হুইসল বেজে উঠল। বিপ্লবদা বোধহয় কোনও কোনও টেন্টে কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন। তাই দ্বিতীয়বার হুইসল।

—ঘুমিয়ে পড়। আমার ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

পরদিন দুপুরবেলা। তখন আমরা বাসন মাজছি। বড় ছেলেরা কড়া হাঁড়ি ডেকচি এইসব নিয়ে বসেছি। ছোটরা জল ঢেলে দিচ্ছে। কেউ কেউ দূরে শালপাতা মাটির খুরি গেলাস ফেলে আসছে, সুকুমার চাপা রাগত গলায় বলল— তোকে আমি দেখে নেব সমুদ্র। বাড়ি ফিরি। তোকে আমি ছাড়ব না।

আমি অবাক।

—আমার ওপর রাগ করে আছিস এখনও? শুধু কালকের ওই কথাগুলোর জন্যে?

—আমার বাবা-মা ক'দিনের মধ্যে মারা গেছে, আমি মামার বাড়িতে থাকি তুই জানিস না? সবে ভুলতে শুরু করেছি, ক'দিন একটু আনন্দ করছি, মজায় আছি, তোর সেটা সইছে না, কেমন? মীন। মীন একটা...

—আমি সত্যি জানতুম না সুকুমার। কী করে জানব, বল।

—কোথাও থেকে জেনেছিস। বেস্ট স্কাউটের দৌড়ে আমি এগিয়ে আছি। জেনে বুঝে তুই আমাকে দমিয়ে দিতে চেষ্টা করছিস, তোর ওই চামচা পুলকটা সেকেন্ড প্লেস পাচ্ছে বলে!

এত অবাক হয়ে গেছি যে মুখ দিয়ে কথা সরছে না আমার।

বলি— আমায় বিশ্বাস কর, আমি কিছু জানতুম না। এভাবে কাউকে দমিয়ে দেওয়া যায় তা-ও আমার ধারণায় নেই। ওটা একটা কী বলব... যে মুহূর্তে বললুম সেই মুহূর্তের ভাবনা। আমার তো তোদের মতো কোনও গুণ নেই। যা মনে হল তাই বলে ফেলেছি। তুই ওসব আজে-বাজে কথা ভাবিসনি।

সুকুমার অতবড় শক্তপোক্ত ছেলেটা হঠাৎ মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

কিছুক্ষণ কাঁদবার পর যখন একটু শান্ত হয়েছে তখন সাহস করে ওর কাঁধে একটা হাত রাখি। —সুকুমার, আমি বুঝতে পারছি। তোর কষ্টটা ঠিকঠাক বুঝতে পারছি। ভুলে যা। কালকের কথা ভুলে যা। আজ খুব দারুণ কিছু একটা করবি। আজ শেষ।

—আমি আর কিছুই করতে পারব না, সমুদ্র। আমার বাবা মা ওই পাহাড় থেকে আমায় ডাকছে। কী জোর সেই ডাকের তুই বুঝবি না। কান্না ভেজা ফুলো লাল চোখমুখ নিয়ে সুকুমার বেরিয়ে গেল।

পুলুকে জিজ্ঞেস করি— কী করব? এই ব্যাপার।

—অদ্ভুত তো!—পুলু অবাক, এরকম হয়?

আমরা দুজন পরামর্শ করে সেদিন টেন্টগুলোর পেছনে একেবারে তিরতিরে নদীটার ধারে বন ফায়ার জ্বালালুম। সারেরা বললেন— কী একটা স্পট বাছলে?

—রোজ রোজ এক জায়গায় ভাল লাগে না সার।

পাহাড়ের দিকে মুখ জায়গাটা পুরো ভর্তি। সুকুমারকে বসতে হলে নদীর দিকে মুখ করে।

ক্রমশ ক্রমশ জমে উঠতে লাগল আমাদের জাম্বোরির শেষ রাত। হই-হল্লা। এক সারের বাকসো থেকে বেরোল একটা লজঝড়ে স্প্যানিশ গিটার। একজন বার করল মাউথ অরগ্যান। স্টিলের থালা আর লম্বা হাতা নিয়ে রেডি আরও একজন। নাচবে বলে কয়েকজন দাঁড়িয়ে উঠল, মুখে মুখে গান তৈরি, হাতে হাতে বাজনা... একেবারে যাকে বলে আবোল-তাবোল। বিপ্লবদা ধরলেন— হেই হেই আশিয়ানা ট্যাংগো।

পুলু পরের লাইন— যত পারো করে নাও ব্যঙ্গ

সমীরদার লিডে সবাই— কেউ থামাবে না গান, কেউ থামাবে না নাচ।

কেউ দিচ্ছে না রণে ভঙ্গ, ভ্যাংগো—ও-ও।

হাফিজ— হো হো আমারে ট্যাংগো

তপন— আমাদের দেশিয়ানা ম্যাঙ্গো
সবাই— চেখে দ্যাখো সয়ে যাবে, না চাখলে বয়ে যাবে
এর নাম রঙ্গ, র‍্যাংগো...

৪

সেই থেকে আমি সতর্ক হয়ে যাই। যেসব কথা আমার মনে হয়, তা আমারই কথা। আর কাউকে বলার নয়। বললে তার অদ্ভুত অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এমনিতেই চুপচাপ। আমি আরও চুপ হয়ে যাই। ক্লাস করি, ওয়ার্কশপ করি, ল্যাবের সময়ে ল্যাব, রাত্তির অবধি পড়ি। বটানিকসে গিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াই, যখন দলের সঙ্গে তখন দলের মতো। যখন একলা তখন নিজের মতো। বটানিক্যাল গার্ডেনটাই আমার ঘরবাড়ি হয়ে ওঠে এক এক সময়ে। নদী সামনে নিয়ে বসতে আমার কেমন একটা স্বস্তি হয় আসলে। হস্টেলের ঘর বড় ছোট মনে হয়। নিজেকে ছড়াতে পারি না। ফার্স্ট ইয়ারে পুরনো বাড়িতে থাকতুম। সেগুলো অনেক উঁচু ছিল। এক এক সময়ে মনে হয়, এত ছাত কেন? এত দেয়াল কেন? ওপর থেকে একটা বোমা-টোমা পড়ে যদি ছাতটা ভেঙে যায় তো বেশ হয়। ঠিক একটা পুরনো অব্যবহৃত কুয়োর মতো ছন্ন দেখতে হবে ঘরখানা! নিজের ভাবনায় নিজেই এক এক সময়ে বিরক্ত হই। এরকম ধ্বংসাত্মক ভাবনা-চিন্তা কেন আমার? এদিকে তো আমি গড়তে শিখছি। তবে এ কেমন বিপ্রতীপ আচরণ মনের?

সকলে প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যায় না। এগুলো ওদের নানা রকম মজার সময়। কী মজা আমি জানতে চাই না। ঠারে-ঠোরে যেটুকু শুনি। বাড়ি চলে যাই, সবাই খুব স্বস্তি পান, দাদুর মুখটা আলো হয়ে যায়। আর ফিনকির তো কথাই নেই। সারা সপ্তাহ কী কী কৌতুকজনক ঘটনা ঘটল, বাবা কতবার শুধু শুধু চেঁচালেন, দাদা চিঠিতে কী লিখেছে সব তার বলা চাই। সবচেয়ে কম সময়টা সে দেয় পড়াশোনাতে যার জন্য না কি প্রতি সপ্তাহে আমার আসাটা বাধ্যতামূলক।

—কী রে ফিনকি? তোর জোমেট্রি আজ? রাইডারগুলো পেরেছিস?— শোন না— ফিনকি এক পাক নেচে নিল,—দাদা না প্রেম করছে।

—কী?

—হ্যাঁরে। বউদিটার নাম সন্তোষ, হি হি মেয়েদের এ রকম নাম শুনেছিস?

—সন্তোষ?

—তুই কী করে জানলি প্রেম?

দাদু মাকে বলছিলেন— বউমা, সাগর প্রতি চিঠিতেই এই পঞ্জাবি মেয়েটির কথা লিখছে। মনে হচ্ছে হি ইজ ইন লাভ।

—মা কী বললেন?

—কিচ্ছু বলল না। কিন্তু মা কাঁদছিল।

—কাঁদছিলেন? কেন? তুই কী করে বুঝলি?

—মা দাদুর ঘরের বাইরে এসে চোখ মুছছিল।

খবরটা নতুন। মায়ের কোনও আলাদা সুখ-দুঃখ আছে বলে আমি জানতুম না। মা যেন এক কর্তব্যপুতলি। কারও কোনও ব্যবহারেই মায়ের কোনও বিকার দেখিনি। কথা দরকারের বেশি বলতেন না। নানা জনের সেবা করতে করতে, ফরমাশ খাটতে খাটতে নিজের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনাই মা করে উঠতে পারেননি। মায়ের অভাব আমরা তেমন করে বুঝিওনি। দুই ঠাকুমারই তখন আর একটু কম বয়স ছিল। ভাত মেখে, গল্প বলতে বলতে খাইয়ে দিচ্ছেন এরকম একটা দৃশ্য আবছা মনে পড়ে। তারপর একটু বড় হতেই তো দাদুর আওতায়। দাদার এ নিয়ে বোধহয় একটু ক্ষোভ

থেকে থাকবে। মাঝে মাঝে বলত— সবাইমিলে মাকে কেটেকুটে ভাগ করে নিয়েছে। আমাদের ভাঁড়ে মা ভবানী।

যখন কোনও জিনিস খুঁজে পেত না, বিশেষ কিছু খেতে ইচ্ছে করত, কিংবা অসুখবিসুখ করত, তখন এই ক্ষোভগুলো ওর চেগে উঠত। সেবার জল-বসন্ত হল। খুব গুটি বেরিয়েছে। দাদা মশারির মধ্যে শুয়ে থাকত একা। আমাকে দাদুর ঘরে শুতে দেওয়া হত তখন। দাদার ঘরের পাশেই অবশ্য মায়ের ঘর। মাঝখানের দরজা মা রাতে খুলে রাখতেন। কিন্তু একদিন শেষ রাত্তিরে কেমন হাউমাউ করে দাদা মশারি ছিঁড়ে, ঘর থেকে দালানে এসে রাগ আর কান্না মিশিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

—বেশ, বেশ, বাঃ, বাঃ একটা রুগ্‌ণ ছেলেকে একা ফেলে নিজেরা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কেমন মা, কেমন বাবা? এরা কেমন?

মা ঘুম চোখে বেরিয়ে এলেন— কী হয়েছে বাবলা?

—হ্যাঁ এখন বাবলা!— দাদা ভ্যাঙাল— চুলকোনিতে সারারাত ঘুম নেই!

—আমি যে চন্দন লাগিয়ে দিলুম, নিমের পাতাসুদ্ধু ডাল দিলুম? চুলকোলেই বুলোতে হবে বলে দিলুম যে!

—ঘুমোব? না নিম বুলোব? জলপটিটাও নিজে দিয়ে নেব! থার্মোমিটারটাও নিজে নিজেই লাগিয়ে টেম্পারেচার দেখব! এবার এ ঘরে একটা স্টোভও রেখে যেয়ো, নিজের হরলিক্স-টিকসগুলো নিজেই করে নেব। চমৎকার।

বাবাও বেরিয়ে এসেছিলেন চেঁচামেচিতে!

—কী হল? জ্বর বেড়েছে, না কী?

—তোমাকে আর ওস্তাদি করতে হবে না। যাও যাও লুচি মাংস খেয়ে আড্ডা দিগে যাও। —দাদা চেঁচিয়ে উঠল।

—কী? আমাকে এত বড় কথা, এত্ত বড়! রুচি কাল থেকে আমাকে আর লুচি-মাংস দেবে না...কাল থেকে আমাকে...

দাদু উঠে এসেছেন নীচ থেকে।

—খোকা কী হচ্ছে? ছেলেটা অসুস্থ।

দাদা আবার হাইমাই করে উঠল— আমার মাথার কাছে রোজ পেতনি দাঁড়িয়ে থাকে জানো? আজকে গলা টিপে ধরবে বলে হাত বাড়িয়েছিল।

মা বললেন— ঠিক আছে, আজ থেকে আমি তোমার ঘরে থাকব, ব্যস আর কান্নাকাটি কোরো না।

দাদু বললেন,—এই রোগে এটা একটা খুব কমল হ্যালুসিনেশন বাবুভাই। মাথার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। যারা জানে না তারা বলে মা শীতলা।

তা যেন হল। কিন্তু আমার যেটা খারাপ লাগল মা সারাদিন ঠিক তেমনই উদয়াস্ত খেটে সারা রাত দাদার পাশে বসে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, ছটফট করলে জল। সারাদিন তো সবকিছু করছেনই, সাবান, অ্যান্টিসেপটিক কাপড় পাল্টানো। কেউ নেই বলবার যে এটা একটু অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে। শেষকালে আমি বলি— দাদু, আমিই দাদার ঘরে থাকব।

দাদু আকাশ থেকে পড়লেন— তুমি? তুমি সেবার কী জান? এইটুকু ছেলে?

—এত মা কেমন করে পারবেন? সারা দিন...তারপর সারা রাত...

দাদু অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন— তুমি ঠিকই বলেছ। আমরা তোর মায়ের কাছ থেকে বড্ড বেশি ডিমান্ড করি। আমি, আমিই বরং বাবুর কাছে থাকব।

—তুমি?

—তুমি জানো না সমু। তোমার তিন বছর বয়সে টাইফয়েড হয়েছিল। এই ঘরে রেখে তোমার সেবা আমিই করেছি।

—কিন্তু এখন তোমার...তুমি তো এখন...

—বুড়ো হয়েছি? ঠিক কথা। কিন্তু মানুষ একবার যেটা শেখে সেটা ভোলে না। সাঁতারই বল আর সেবাই বল। এ রকম সঙ্কটের সময়েও আমি নিজের রুটিন নিয়ে আছি। আমার শেয়ার করা উচিত ছিল।

—আমি তা বলিনি দাদু। মা তোমাকে করতে দেবেনও না।

আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। রাতে দাদার বিছানায় মশারি ফেলে জল, নিমডাল সব গুছিয়ে রেখে মা যেমনি বেরিয়ে গেছেন অমনি আমি দরজা বন্ধ করে দাদার পাশে নিজের তক্তপোশে শুয়ে পড়লুম।

—তুই শুলি যে? —দাদা অবাক।

—আজ থেকে তোর কাছে আমি থাকব।

—কে বলেছে? দাদু?

—না।

—তবে কে ঠিক করল?

—কেউ না, আমি নিজে।

—কিন্তু তোর তো একবারও হয়নি। ছোঁয়াচ লাগলে?

—লাগবে, কী করা যাবে! তুই ভাবিস না, যেই দরকার হবে ডাক দিবি, আমি ঠিক উঠে পড়ব।

মা আরও রাত্তিরে এসে দরজার কড়া নাড়লে, আমি জানালা দিয়ে বললুম— দাদার কাছে আমি থাকছি। নিজের ঘরে ছাড়া আমার ঘুম হচ্ছে না।

—ওর অসুবিধে হবে সমু।

—হবে না। আমার ঘুম খুব পাতলা। তুমি যাও শুয়ে পড়ো গে।

মা আর কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে তর্ক করলেন। কিন্তু মায়ের চিরকালই কথা কম, কাজ বেশি। শেষে রণে ভঙ্গ দিলেন।

আমি দাদাকে জিজ্ঞেস করি— তোর কি মাকেই বিশেষ করে দরকার? বাচ্চারা অসুখ করলে বেশি-বেশি মা-মা করে, সেই রকম?

দাদা বলল— একটা সত্যি কথা বলব?

—বল।

—তুই থাকলেই আমার বেশি সোয়াস্তি হবে। মা সারা রাত জেগে বসে থাকবেন। বললেও কিছুতেই শোবেন না। মাঝে মাঝে ঢুলে পড়ে যাচ্ছেন তার পরেই আবার চমকে জেগে উঠে হাতে পায়ে নিম ডাল বুলোতে থাকছেন। যেন কী রকম নিঃশব্দে স্যাক্রিফাইস করে চলেছেন বাবার জন্যে, দাদুর জন্যে, এবার আমার জন্যে। আই ডোন্ট লাইক ইট। আনইজি লাগে।

রাত ছমছম করছে। খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার আলো ঢুকছে ঘরে। আমার মশারি, তার বাইরে খালি স্পেস। তারপরে দাদার মশারি, ভেতরে দাদার বিছানা। দাদার শরীরভরা জলবসন্তের ফোস্কা ফোস্কা গুটি, শরীরের দাদা এক, ভেতরে আর একটা দাদা, অভিমান, রাগ আবার অস্বস্তিতে ভুগছে, ভয়েও। তারও ভেতরে আর একটা দাদা যে পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে। যে হৃদয়ঙ্গম করেছে মায়ের শ্রান্তি। আমার আন্তরিক ইচ্ছার সেবা, সে এখন স্বস্তিতে। শান্তিতে। আরও ভেতরে আছে এই সাময়িক অসুস্থতা ও বিকারের বাইরের অন্য দাদা, যে টেবিলের ওপর কনুই রেখে অনন্য মনে পড়ে যায়, খালি পড়ে যায়, লেখে, অঙ্ক কষে, অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, বি বি সি শোনে, কদাচিৎ কদাচিৎ একদম একা একা সিনেমা দেখে আসে, কী সিনেমা জিজ্ঞেস করলে শুধু মিটিমিটি হাসে। আমরা দুজন মানুষ এক ঘরের দুই প্রান্তে। এক বাড়ি এক পরিবার। একই বাবা-মা'র রক্ত, বংশের

জিন আমাদের শরীরে, এই তো দাদাকে জল এগিয়ে দিচ্ছি। হরলিক্স দিলুম, ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে, টেম্পারেচার দেখলুম, খুব কম, নিরানব্বুই মতো .... সবই...কিন্তু কোনওদিনই আমাদের চেনাশোনা হবে না। একজন আলাস্কান কিংবা জাপানি আমার কাছে যেমন অচেনা তেমনই থেকে যাবে। অথচ একই মনুষ্য লক্ষণ, রক্ত, একই জৈবনিক ওঠাপড়া। মস্তিষ্কের গঠন, কোষসমূহ।

—সমু! সমু! দাদা চাপা ভিতু গলায় চিৎকার করছে। হ্যাঁ। চাপা কিন্তু চিৎকারই।

—সমু আমাকে তোর পাশে শুতে দে। সেই সাদা কাপড় মহিলা— যেই ঘুম আসছে অমনি।

আমি বললুম— তুই শুয়ে পড়, আমি যাচ্ছি। তখন রাত পাতলা হয়ে এসেছে। দপদপ করছে শুকতারা একটা স্টেনলেস স্টিলের টিপের মতো। একটু পরেই প্রথম ভোরের আলো ইরেজার দিয়ে ঘষে মুছে দেবে ওকে। দাদার বিছানার পাশে বসে কপালে আলতো হাত রাখি। এখন ওর সারা শরীরের অগুনতি গুটি শুকিয়ে এসেছে। কিন্তু মুখেরগুলো বেশির ভাগই দগদগে।

আধো ঘুমের ঘোরে দাদা বলল— কে হাত রাখল রে মাথায়? ওই সাদা কাপড় নয় তো! দেখিস।

শেষ রাত বড় অদ্ভুত সময়। অপার্থিব। মনে হয় এক মহাজাগতিক অনন্তে আস্তে আস্তে ফুটে উঠছি। আমার অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব দুটোই সমান সত্য। পৃথিবীতে যেমন একটা সত্যি হলে অন্যটা মিথ্যে হয় তেমন নয়। খুব অদ্ভুত জায়গা, যদি জায়গাই বলা যায় ওটাকে, যেখানে সব বিপ্রতীপ সমান ঔদাসীন্যে অবস্থান করে। খুব বেশিক্ষণ এই অনুভবের মধ্যে থাকলে জীবনের সবকিছু খুঁটিনাটি কীরকম যেন অবান্তর হয়ে যায়। ঠিক ভয় করে না, কিন্তু আস্তে আস্তে আমি ওই মেজাজের বাইরে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করি। খুব বেশি জোর নয়। সামান্য চাপ দিলে যেমন কোনও কোনও বাক্সের ডালা খুলে যাবার একটা ব্যবস্থা থাকে সেই রকম। সামান্য চাপ। ধীরে ধীরে অনন্তর ভেতরের ঢাকনা খুলে যায়, সেই স্বল্প, অভ্যস্ত স্পেসের মধ্যে ঢুকে পড়ি এবং ঘুম এসে যায়। বুঝিওনি যে ঘুমিয়ে পড়েছি। ধীরে ধীরে আমার পাশে এসে দাঁড়ান একজন— সাদা কাপড় পরা, মাথায় ঘোমটা, মুখ দেখা যায় না, শেষ রাতের আবছায়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। তিনি হাত বার করেছিলেন কি না বুঝিনি। কিন্তু স্পষ্টই দেখলুম দাদার মাথার ওপর একটা হাত। সেই হাতটার শীতল শুশ্রূষা আমার মাথাও ছুঁয়ে গেল মৃদু এক ঝলক হাওয়ার মতো।

আমি পুরোটাকেই সত্যি ভেবেছি। ঘুমের মধ্যেই ডেকেছি— মা? মা নাকি? কোনও উত্তর নেই।

ঝলমলে রোদে ঘর ভেসে যাচ্ছে। চোখের ওপর জ্বালা ধরানো সূর্যশলাকা। জেগে উঠে দেখি, বহু বেলা পর্যন্ত দুজনে ঘুমিয়েছি। জানলার কাছ থেকে মা আস্তে ডাকছেন সমু, সমু, এবার ওঠো, দরজাটা খুলে দাও।

দরজাটা খুলে দিতে মা খুব মৃদু গলায় বললেন— দেখেছ তো, রাত জাগার ফল কী! এখন তো স্কুলে যেতে হবে। চান করে নাও। একেবারে ভাত খাবে।

উঁকি মেরে দেখলেন— বাবলা ঘুমোচ্ছে? খুব, না?

—হ্যাঁ, ওর জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে।

৫

সেই দাদা প্রেম করছে? ভিন্ন প্রদেশীয় মেয়ের সঙ্গে? আমার কী রকম অদ্ভুত লাগল। দাদা আমাদের বাড়িতে আলগা। সেভাবে দেখতে গেলে আমিও আলগা। মা-ই কি আলগা নয়? বাবা তো বাড়িটাকে হোটেলের মতোই ব্যবহার করেন। বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একমাত্র দাদু আর ফিনকির। কিন্তু যারা আলগা তারা স্বভাবেও আলগা, একা বলে আমার ধারণা ছিল। দাদা এই বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে তার একাকিত্ব ঘোচাবার চেষ্টা করছে? যে দাদা সিনেমা পর্যন্ত একা-একা যেত, তার প্রথম

বন্ধুই একজন মেয়ে, ভিন্ন সংস্কৃতির, ভিন্ন আচার-আচরণের মেয়ে। তা ছাড়া, দাদা যতই যা-ই হোক, যেটুকু ভরসা করে আমাকেই করে, আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানাল না। তবে কি যেটুকু বাঁধন ছিল সেটুকুও এবার ছিঁড়ল। আমাকে খুব আশ্চর্য করে আমার বুকের পেশিতে একটা টান ধরল। দাদা চলে যাচ্ছে। দাদা চলে যাচ্ছে। অথচ দাদার কত ডায়াগ্রাম এঁকে দিয়েছি, দাদা আমার কত প্রবলেম দেখে দিয়েছে। এক ঘরে থাকতুম, পাশাপাশি তক্তপোশে শোওয়া, মাঝখানে জানলা ঘেঁষে বড় টেবিল। তার একদিকে আমি আর একদিকে দাদা। জলবসন্তের রাত আমি দাদার পাশে। দুজনের কপালে একই স্পর্শ। 'তুই থাকলেই আমার বেশি সোয়াস্তি' দাদা বলছে। অথচ দাদা আমাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে চলে যাচ্ছে।

যথেষ্ট আলোড়ন ভেতরে। আমি আমার নিশ্চিন্ত রুটিন মানতে পারছি না। এতই উদ্বেগ যে পুলক লক্ষ করেছে।

—কী হয়েছে রে তোর, সমু?

—কিছু না তো!

—ঠিক জানতুম এই কথাই বলবি। থাক, আমাকে কিছু বলতে হবে না তোর।

রাগ করে পুলু চলে যায়।

তখন বুঝতে পারি, হঠাৎ-ই, যে একটা মানুষের আর একটা মানুষের যতখানি কাছে আসা সম্ভব, পুলক আমার কাছে এসেছে। এর কারণ কী আমি জানি না। কেন না আমাদের রুচি, স্বভাব কিছুই এক রকমের নয়। এক স্কুলে পড়েছি, এক ক্লাবে ব্যায়াম করেছি, দুজনেই এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি। যদিও আলাদা আলাদা বিষয়। তো কী? এইগুলোই যদি ঘনিষ্ঠতার কারণ হয়ে থাকে তা হলে তার গভীরতা বেশি নয়। আমি কোনও হিরো নই। তবু পুলক আমার শাগরেদ। আমাকে ও সমর্থন করে, কতবার বাঁচিয়েছে, কেন না সমবয়সিরা আমাকে বড্ড ভুল বোঝে।

—এই পুলু শোন।

চৌকাঠে পা দিয়েছিল, বলল— বল শুনছি, এ ঘরে আবার বহু দূর অতীতের কোনও ক্ষুধিত পাষাণটাষাণ শুনতে পাচ্ছিস, না কী?

—নাহ্। চলে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কাছ থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে পায়ের শব্দ।

—অনেক পা! না এক জোড়া? এক জোড়া যদি হয় তো সেটা আমার। আর অনেকের যদি হয় তা হলে নতুন ফার্স্ট ইয়ারের। করিডর দিয়ে এক্ষুনি চলে গেল।

—ঠাট্টা নয়, শোন না।

—বল। পুলু উৎসাহিত হয়েছে খুব কিন্তু সেটা দেখাবে না।

—পুলু। দাদা বোধহয় বিয়ে করছে।

—বলিস কী রে? পুলু লম্ফ দিয়ে উঠল— তবে তো ভোজ ভোজ মহাভোজ।

আমার মুখে ফিকে হাসি দেখে ও রেগে উঠল— দাদা কি তোর প্রেমিকা? যে দাদার বিয়ে হচ্ছে বলে কাঁদতে বসেছিস?

—কাঁদলুম আবার কই? কী যে বলিস! দাদা তো দূরেই থাকে, আরও দূরে চলে যাবে। এই!

—দূরে মানে? দিল্লিতে চাকরি, যাবে না? তুই যদি এখন তিরুবনন্তপুরমে চাকরি পাস— যাবি না? আরও দূরে মানে? তোর দাদার শ্বশুর কি জামাইকে বিলেত পাঠাচ্ছে? বিলেত একবার গেলে অবশ্য ফেরা শক্ত। আমাদের যে যেখানে বিলেত-আমেরিকা গেছে আর ফিরে আসেনি, মায়াবিনীর দেশ মাইরি। থাক ডিটেল বল।

—ডিটেল কিছু নেই। অন্তত জানি না।

—কবে, কার সঙ্গে, কী দিচ্ছে থুচ্ছে...

আমি হাসি— কিছুই জানি না।

—এই যে বললি বিলেত যাচ্ছে।

—ওটা তুই বলেছিস পুলু, আমি নই।

—তো আমি যেগুলো বলিনি সেগুলো বল। কবে ডেট ঠিক হল।

—কিছুই হয়নি। দাদার চিঠি পড়ে দাদুর মনে হয়েছে, দাদা বিয়ে-টিয়ে করতে চায়।

—এই, ব্যস? তুই দেখালি একখানা সমু। চাকরি-বাকরি করছে। সোমত্থ ছেলে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হচ্ছে। বিয়ে করতে চাইবে না?

আমি চুপ করে যাই। বীজ থেকে গাছ হল, গাছ থেকে ডালপালা, পাতাপুতি, ফুলফল, বনস্পতি হলে তার আর ফুল নেই, শুধু ফল। ফুলন্ত বৃক্ষের শোভা কি কোনওদিন আমার দাদুর বাড়িতে ছিল? দাদুর বড় দুই ভাই ঝরে গেছেন, দুই ঠাকুমা দুটো অর্ধছিন্ন শাখা, দাদুর ছোট ছেলে কতদিন মাদ্রাজ-প্রবাসী। আগে আসতেন, ফিনকিকে জন্ম দিয়ে কাকিমা মারা গেলেন তখন সেই শিশুকে আমার মায়ের কাছে জমা রেখে তিনি ফিরে গেলেন, ওখানকারই একজন মেয়েকে বিয়ে করলেন। আর এলেন না ফিনকি জানেই না কাকা ওর বাবা। পাছে ওকে নিতে হয়, চেনা দিতে হয় তাই-ই হয়তো কাকা...একপক্ষে ভালই। কিন্তু সেই কাকিমা আর তাঁর ছেলেমেয়েরা যদি এখানে মাঝে মাঝে আসত আমরা যেতুম, ফিনকি যদি ছোট্ট থেকেই জানত যাকে মা বলে ডাকে তিনি ওর জ্যাঠাইমা, তবে কী ক্ষতি হত? এত লুকোছাপা কীসের?

আর জ্যাঠামশাই? খুব রেগে যেতেন, লাল চোখ ঘুরত, যেটুকু মনে আছে, জ্যাঠামশাই আছেন আছেন বেশ আছেন, হঠাৎ প্রচণ্ড হয়ে উঠতেন, জিনিসপত্র ভাঙচুর, এ এক ভীষণ কাণ্ড। এখন শুনতে পাই জ্যাঠামশাইকে কোনও মানসিক হাসপাতালে রাখা হয়েছে। দাদু দেখতে যান খুব মাঝে মাঝে। আর কেউ না, কখনও না। আমার খুব ছোটবেলার স্মৃতিতে ছাড়া জ্যাঠামশাই আর কোথাও নেই। অথচ জ্যাঠামশাই ছিলেন দাদুর ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী।

এত কথা তো পুলু জানে না, জানার দরকারই বা কী! কিন্তু আমার সেই ভগ্নশাখা বনস্পতির কথা মনে হয় যার ডালের পর ডাল ভেঙে পড়ছে। সব সময়ে যে কালের প্রকোপে তাও নয়। কোথা থেকে কুঠার চালাচ্ছে কেউ।

অবশেষে একদিন চিঠি পাই। দাদার।

সমু,

কেমন আছ? ভালই করছ শুনছি। আমার পিএইচ. ডি. গতকাল পেলুম। থিসিস উচ্চ-প্রশংসিত। প্রকাশ করবার চেষ্টা চলছে। রীডার হয়ে গেছি। এখানে ক্যাম্পাসে আঁতেল স্নবারি খুব। মেলামেশা করতে গেলে লাইফ-স্টাইল মেনটেন করতে হয়। খরচে কুলিয়ে উঠতে পারছি না। তোমার আর এক বছর এটাই ভরসা। আমার গাইড দলজিৎ অরোরা খুব বিবেচক। একলা কিছুই চালিয়ে উঠতে পারছিলুম না। টাকাপয়সা, জিনিসপত্র সব চুরি হয়ে যাচ্ছিল। এখন পেয়িং গেস্ট হয়ে আছি অরোরাজির বাড়িতেই। ওঁর কেউ নেই এক মেয়ে আর স্ত্রী ছাড়া। ভদ্রমহিলা খুব স্নেহময়ী! পঞ্জাবি রুটি খেলে তুমি আর ভুলতে পারবে না। এখানে চলে এসো একবার। ছুটিতে। সিরিয়াসলি বলছি। আমার পি জি অ্যাকমোডেশন ঠিকই, কিন্তু কুল্যে দু'খানা ঘর, একটা টয়লেট, একটু বারান্দা। ভদ্রমহিলা আর তাঁর মেয়ে সবই টিপটপ রাখেন, আমি শুধু মাসান্তে টাকাটা দিয়ে খালাস। দ্বিতীয় ঘরটাতে একজন গেস্ট রাখতেই পারি। কোনও অসুবিধে নেই।

চিঠিটা এইটুকুই। কিন্তু চিঠির লাইনের মাঝে মাঝে আরও অনেক না-বলা কথা উঁকিঝুঁকি মারছে। যেমন, তুমি তাড়াতাড়ি পাশ-টাশ করে সংসারের দায়িত্ব নাও। আমি পেরে উঠছি না। যেমন, আমার লাইফ-স্টাইল অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। তার যা যা ফলাফল তা-ও ক্রমশ প্রকাশ্য। যেমন, বাড়িতে আমি যে স্নেহ-যত্ন পাইনি, এখানে তা পাচ্ছি। এবং সমু একবার এসো, মুখোমুখি তোমার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা বলা দরকার, যে কথাগুলো দাদুকে লিখতে পারছি না।

সেই রবিবার আমি বাড়ি গেলুম না। ফোন করে দিলুম। কাজ জমে গেছে বাজে কথা। আমার কাজ কোনওদিন জমে না। আসলে দাদার চিঠি পাবার পর থেকে একটা ভীষণ মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য শুরু হয়। যার পরিণতি হয় এক প্রবল শরীরী আলোড়নে। ঘুমের মধ্যে নিম্নাঙ্গের এই কঠিনতা এই প্রবল আবেগ যে জানিনি তা তো নয়! কিন্তু এ ক'দিন যা হচ্ছে তা অসহ্য। শরীর গরম। এখুনি কাউকে আক্রমণ করতে না পারলে যেন শান্ত হতে পারব না। হস্টেলের সবচেয়ে তুখোড় ছেলে মৃণাল। ওদের ঘরে গেলাম।

—কী রে ভাল ছেলে? বাড়ি যাসনি?

—নাঃ, তোদের সঙ্গে বেরোব।

—আমাদের সঙ্গে? —ওরা মৃণাল, সুজন, নৃপেশ চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

—পুলককে ডেকে নে, তোর বডিগার্ড!

—পুলক বাড়ি গেছে।

—ভাল ছেলে ডুডু খাবে।

—বাজে কথা রেখে চল—বেরো।

সুজন বলল মৃণালকে, মদনার ঠেকে যাবি? না গোবরদার!

কার ঠেক নিয়ে বেশ মতবিরোধ হল ওদের।

মদনার ঠেকে মাল্লু ভাল, না গোবরদার, এই নিয়ে বিতণ্ডা হল। নতুন শিক্ষানবিশকে নিয়ে যেতে হবে তো!

—পয়লে তো মদনার ঠেকে চল, আড় ভাঙতে হবে না?

—হ্যাঁ, আড়মোড়া।

আমি বললুম— আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি-ফিয়ার্কি মারিসনি। কোথায় যাস চল।

একটা ছোট দোকান। পেছন দিকে লম্বা। অর্থাৎ ঢোকবার দরজাটা ছোট। মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। টিমটিম করে আলো জ্বলছে।

আমরা কয়েকজন গোল হয়ে মেঝেতে বসেছি। কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। প্রচণ্ড গন্ধ। তার সঙ্গে চোখ জ্বালা করা ধোঁয়া। ওরা প্রত্যেকে সিগারেট ধরাল। আমাকেও একটা দিল।

মৃণাল বলল— লেসন ওয়ান।

—কী আছে এতে? কী ভরেছিস?

—কী আবার? গঞ্জিকা? সাধু-মহাত্মারা খেয়ে থাকে। আস্তে টান দিবি।

টান দিই আস্তে। মাথাটায় ঝিম ধরে যায়। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে ঝিমুনিটা। সব ভুলে যাচ্ছি। দাদা, সন্তোষ অরোরা, ফিনকি, দাদু, বাড়ি, বাড়ির পেছনে বাড়ি, আরও বাড়ি ঘরের শেষ নেই। অফুরন্ত বারান্দা। হঠাৎ খেয়াল করি আসলে ভুলতে ভুলতে ফিরে গেছি সেই বারান্দাতেই। ছাতিম ফুলের গন্ধ বেরোচ্ছে। আমি হাঁটতে পারছি না, গড়িয়ে যাচ্ছি, গোল একটা বেলনের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে...।

চোখ লাল, মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াই। ওরা আমাকে ধরে ধরে হস্টেলে নিয়ে আসে। সারারাত মড়ার মতো ঘুমোই। সকালে ওরা এসে জিজ্ঞেস করে— কেমন আছিস?

—ভাল।

—কেমন লাগল?

—ভাল।

—আজ যাবি?

—যাওয়া যায়।

এইভাবে আস্তে আস্তে আমার প্রোমোশন হয়। দ্রুত শিখে ফেলি। বিশেষ কষ্ট করতে হয় না। সিগারেট প্যাকেটের রাংতার ওপর সাদা সাদা গুঁড়ো। সরু চোঙানল দিয়ে হুস করে টেনে নিই। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা, মাথাটা ফেটে যায়। তারপর শূন্যে সাঁতার কাটতে থাকি।

শনি রবি এইভাবেই কেটে যায়। বাড়ি যাওয়া হয় না। খচ খচ করে মনের মধ্যে। দাদু বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছেন। ফিনকি ঠোঁট ফোলাচ্ছে। ফোন করে দিই। বড্ড বেশি কাজের চাপ পড়েছে। দু'তিন সপ্তাহ যেতে পারব না।

পুলু বলল— তোর কী হয়েছে রে?

—কী আবার হবে? তুই তো সব সময়েই আমার কিছু না কিছু হতে দেখছিস।

—হয়েছে বলেই দেখছি। দেখছি বলেই বলছি। চোখ লাল, বিড়বিড় করে বকিস। বাড়ি যাসনি কেন?

—কাজ পড়েছে।

—কাজ তো আমারও। ভাল লাগে উইক-এন্ডে হস্টেলে থাকতে? জঘন্য খাওয়া!

পুলু চলে যায়। আমি মৃণালদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। বাসে চড়ে একবার বদল করে চলে আসি। ওরা টেপা হেসে বলে— এ জায়গাটার নাম বাঁধাঘাট। ওদিকে গঙ্গা, ফেরিঘাট, স্টিমার চলছে, কিন্তু বাঁধাঘাটে একবার এলে বাঁধা পড়তে হবে।

কাছেই একটা সিনেমা হলে আমরা ছবি দেখি। মাঝ-সময়ে ওরা আমাকে টেপে, উঠে পড়ি।

সরু গলি, কাদা-কাদা, ভাঙা-ভাঙা বাড়ি দরজায় একজন নথ পরা গিন্নিবান্নি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখে বলে— এসো খোকাবাবুরা—

—এই খবর্দার খোকাবাবু বলবে না।

—আচ্ছা আচ্ছা মরদের বাচ্চা সব, এ বাবুকে নতুন দেখছি!

—আজ ওর হাতেখড়ি। এই সমু যা! মাসির সঙ্গে যা!

একটা নিচু মতো ভাঙা ভাঙা ঘরে মাথা নিচু করে ঢুকি। কড়া দেশি মদ এক গেলাস রাখে মাসি।

—ওব্যেস আচে নিশ্চয়ই। দেখো বাপু, ঘরদোর ভাসিও না। মাসি চলে যায়। আমি গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখি। তার পরেই ভেতরের দরজা খুলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায় নাঙ্গা এক দুঃস্বপ্ন। ডাকিনী যোগিনী ঘিরে আছে কালীমূর্তিকে। গলায় নরমুণ্ডের মালা। আমি কোনওক্রমে বেরিয়ে আসি। টেনে এক চড় মারি মৃণালকে তারপরে ওইভাবেই টলতে টলতে একলা ফিরে আসি হস্টেলে।

৬

কোথা থেকে টাকা জোগাড় করি! দিল্লি যাওয়া-আসার, এবং যদি কোথাও নিজের থাকবার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়, বলা তো যায় না। দাদা যখন দরকারি কথা বলতে চাইছে, তখন কথাটা শোনা দরকার। কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকে কিছু ধার নিলুম। বাড়ি। ফিনকির ছুটে আসা। মায়ের মাথার আঁচল খসে পড়ে যাওয়া। দুই ঠাকুমার নিদন্ত মুখে ছেলেমানুষি হাসি। বাবা পিকনিকে গেছেন। এবার গিয়ে দেখলুম দাদু বুড়ো হয়ে গেছেন। এত দিন এককাথা পাকা চুল সত্ত্বেও, 'বুড়ো মানুষ বুড়ো মানুষ' বলা সত্ত্বেও দাদুকে বুড়ো ভাবা যেত না। এখনও, চুল একটু পাতলা হয়ে গেলেও দাদুর দাঁত অটুট, একটুও ঝুঁকে পড়তে দেখলুম না। তবু যেন স্বাস্থ্যের মধ্যে সেই ইস্পাত নেই, কোথাও একটা শীর্ণতা, শুষ্কতা। আমাকে দেখে দাদু তেমন কিছু বললেন না। কেন দু সপ্তাহ আসিনি, জিজ্ঞেসও করলেন না। আমিই ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বলি— দাদু কেমন আছ?

দাদু উত্তর দিলেন না। অভিমান হয়েছে না কি? দাদু এত প্র্যাক্টিক্যাল চরিত্রের মানুষ যে মান-অভিমানে তাঁকে খুব বেশি বিচলিত হতে দেখিনি।

—দাদা আমাকে একটা চিঠি লিখেছে, যেতে বলছে খুব করে।

—যাও। থাকবে কোথায়?

—দাদা ব্যবস্থা করবে বলেছে।

—তা হলে শুধু গাড়ি-ভাড়া আর কিছু হাত-খরচ?

—হ্যাঁ, সেটা আমি জোগাড় করে নিয়েছি।

—ধার?

—হ্যাঁ।

—বেশ।

—দাদার পিএইচ. ডি. হয়ে গেল, রীডার হয়ে গেছে, তোমায় লিখেছে নিশ্চয়।

—এখনও না। লিখবে...হয়তো।

—নিশ্চয়। এতদিন তো আমাকে একটা চিঠিও লেখেনি। এই প্রথম। বোধহয় মনে করে একজনকে খবরটা দিলেই সবাই পেয়ে যাবে।

—হতে পারে। দাদু চুপ করে রইলেন। আমি একই ভাবে বসে থাকি। আমার মনে হল দাদুর আর আমার মাঝখানে একটা ভ্যাকুয়াম। শব্দ পৌঁছয় না, চিন্তাতরঙ্গও না। শুধু আলো কখনও হার মানে না। জানলা দিয়ে বেলা ন'টার ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছে দাদুর সাদা চুলে। ফতুয়ার বাঁ কাঁধে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসে আছেন, বাহু পেরিয়ে গিঁটবহুল আলগা চামড়ার হাতে পাতার উল্টো পিঠে। সেই একই আলো এক ছিট ছিটকে এসে পড়ে আছে আমার হাঁটুতে।

—আমি জাস্ট যাব আর আসব।

—কেন? জীবনে প্রথমবার দিল্লি যাচ্ছ, ভারতের বহু শতাব্দীর রাজধানী। ইতিহাস দেখে এসো। শুনে এসো। তোমার দাদার কথা বিশেষ কিছু শোনবার নেই।

আমি চমকে দাদুর দিকে চাই, মাথাটা ঝুলে গেছে। দাদুর সেই বহুদিনের পরাজিতের ভঙ্গি।

কেন জানি না আর কোনও প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করল না। কেন ও কথা বললেন, তার কিছুটা তো আন্দাজ করতে পারিই। দাদুর ওই ভক্তির মধ্যে এমন একটা দাঁড়ি টেনে দেওয়া সমাপ্তি আছে, যার পর যে কোনও সান্ত্বনাই স্তোক বচনের মতো শোনায়।

—যাও, চান-টান করে ফেলো, একটু থামলেন— তারপর বললেন— তুমি বড় হয়ে গেছ।

এক পক্ষকালের মধ্যে কী এমন বড় হয়ে গেলুম। ভেতর থেকে একটা লজ্জা উঠে আসে। এই দু সপ্তাহের মিথ্যে, অনাচার কি দাদু ধরতে পেরে গেছেন? কী করে? আমার চেহারায়, ব্যবহারে কি কোনও ছাপ পড়েছে? হ্যাঁ, মৃণালের চেহারায় একটা চোয়াড়েমি, চোখের চাউনিতে কেমন একটা অশ্লীলতার ছাপ পড়েছে নিশ্চিত। কিন্তু নৃপেশ নিয়মিত পাতাখোর, ওর চোখে একটা রোম্যান্টিক ভাবালুতা ছাড়া কিছু বোঝা যায় না তো! দু-চার দিন অনিয়ম করেই আমার কী এমন পরিবর্তন হল? চান করি অনেকক্ষণ ধরে, ঘরে আসি। এ ঘরে এখন দাদার ভাগ নেই। আমি সাত দিন গেলে তবে আসি। কখনও কখনও আসিও না। কেমন একটা অব্যবহারের ছাপ পড়েছে ঘরখানায়। যেন ঝাঁট দেওয়া হয়, অথচ মোছা হয় না, একই চাদর, বেডকভার, বালিশের ওয়াড় যেন পরানো অনেকদিন ধরে। অপেক্ষা করছিল, অপেক্ষা করছিল, ঘরের মালিক আসেনি, নিশ্চেতন বস্তুর নিজেকে সাফ-সুতরো রাখার, নতুন করে নিজেকে পাওয়ার কোনও উপায় নেই, সচেতনের সাহায্য ছাড়া। দেয়ালে টাঙানো গোল আয়নাটার ওপরেও কেমন একটা ছ্যাৎলা। আমি আমার মুখ রাখি আয়নায়। একটু দাড়ি উঠেছে। ভিজে চুলগুলো একটু বড়। ঘাড়ের কাছে গুটিয়ে রয়েছে। আয়না বলল— আমি তোমাকে চিনি না।

—আমি সমুদ্র, বিশ্বাস কর আমি সমুদ্রই।

—হতে পারে, কিন্তু সমুদ্র তো একটা নয়। তুমিও অন্য। অন্য সমুদ্র। ও চলে গেছে।

আমিই আমাকে বলছি আমি চলে গেছি! বিশ্বাসও করছি কোথাও একটা সমূহ চলাচল চলছে।

দরজায় ধাক্কা পড়ল। ফিনকি। এক মুখ হাসি। লুটিপুটি চুল। নরম গালগুলো দেখা যায়। ফিনকির উচ্চ-মাধ্যমিক টেস্ট হয়ে গেছে। ওর উত্তরগুলো কষে দেখেছি ঠিকঠাক হয়েছে। ফিনকিকে দেখে আমি প্রাণপণে ফিরে আসার চেষ্টা করি।

—এতক্ষণ কী করছিলি রে?

—এ-ই। চান করে ঘরে এসে দেখি সব কেমন ধুলো পড়া। ভাবছিলুম পরিষ্কার করব কি না। একটা চাদর আর বালিশের ওয়াড় দিতে পারিস?

অবাক হয়ে ফিনকি বলল— কাল রাতেই তো পাল্টে দিলুম। সব ধোপার বাড়ির। ধোপার বাড়ি গিয়ে গিয়ে বোধহয় রংগুলো একটু কটে গেছে।

—তা হলে একটা ঝাড়ন দে। আয়নাটা মুছি।

—ঝাড়নে হবে না। দাঁড়া আমি ঠিক করে দিচ্ছি।—কোথা থেকে খবরের কাগজ আর এক মগ জল নিয়ে এল ফিনকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আয়না পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি চোরা চাউনি দিই আয়নাটার দিকে। চাউনিটা রিবাউন্ড করে আমার দিকে ফিরে আসে। আঘাত করে। আয়না আমার প্রতিবিম্ব নেবে না।

ঘরের মেঝেয় সাধারণ ছাইরঙা সিমেন্ট। খানিকটা মসৃণ, কিন্তু জায়গায় জায়গায় কেমন খরখরে হয়ে গেছে।

খেতে বসে দেখি দুই দিদাও এসে ঘুরে গেলেন। মেজদিদার খুব শুচিবাই। উনি এক ধারে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন— দাদুভাই, এক মাত্তর রোববারগুলোয় তোমার দেখা পাই। জানি কাজ পড়েছিল, তবু, বুড়োবুড়িগুলোকে মনে রেখো, হঠাৎ আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছলেন উনি। আস্তে আস্তে চলে গেলেন। বড়দিদা বয়সে বড় কিন্তু শক্ত বেশি, বললেন— আর একটু মাছের তরকারি দাও দাদাভাইকে, ও বউমা। পার্শে মাছ আনিয়েছি দাদা, তুমি ভালবাস। খাও ভাল করে। হস্টেলে কী-ই বা খাও!

হারাই-হারাই ভয় যেন চোখে। এতদিন গেছে কখনও ওঁদের এভাবে আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে খোঁজ করতে দেখিনি। আমি হাত দিলে থালা ঢাকবার আগেই মা আর দুটো পার্শে মাছ আমার পাতে ফেলে দিলেন। ফিনকিকে বললুম— তুই একটা তুলে নে তো আমি খেতে পারব না।

—দে—ফিনকি থালা বাড়াল।

—তুই তুলে নে।

দিদারা চলে গেলে ফিনকি বলল, মাছটা দিদারা আনিয়েছেন, তোর জন্যে— বলে হাত চাটতে চাটতে নিগূঢ় হাসি হাসতে লাগল।

শেষ বেলায় আমরা তিনজন সিনেমা দেখতে গেলুম। আমি, ফিনকি আর মা। কোনওমতেই মাকে রাজি করানো যায় না। ফিনকি বলল— তা হলে আমিও যাব না। কতদিন থেকে 'বর্ন-ফ্রি' দেখব বলে বসে আছি।

আমি এভাবে জোর করতে পারতুন না। ফিনকি যা পারে আমি তা পারি না। শুধু ফিনকি কেন, অনেকেই যা পারে, আমি তা পারি না।

৭

নিউ দিল্লি স্টেশনে দাদার আসার কথা। দেখলুম না। নিজের ব্যাগটা দু পায়ের মধ্যে রেখে পকেট

থেকে দাদার ঠিকানা বার করি। গ্রেটার কৈলাস। প্রথমে দাদা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের মধ্যেই থাকত। এখন গ্রেটার কৈলাস, মানে সেই অরোরাদের বাড়ি। স্টেশন থেকে কতটা দূর কোনও ধারণাই নেই আমার। এখানে শুনেছি ট্যাক্সি, অটো কিছুই মিটারে চলে না। চললেও টুপি পরাবার বন্দোবস্ত করে। একটু ভেবে নিতে হবে, কালীবাড়িটাড়ি গিয়ে আস্তানা নেওয়া ভাল। ওখানে মোটের ওপর সস্তা শুনেছি। তারপর ফোন করব। আমার পিঠে হাত পড়ল। দাদা।

—ভীষণ জ্যামে পড়েছিলুম। তুমি খুব ভাবছিলে?

—হ্যাঁ, ভাবছিলুম কোথায় যাই। কালীবাড়িটাড়ি...

—আরে! আমার একটা দায়িত্ব নেই।

—তুমি পুরো সাড়ে তিন বছর এসেছ দাদা। একবারও বাড়ি যাওনি।

—থিসিস শেষ করতেই তো তিন বছর চলে গেল! তার সঙ্গে চাকরি, খুব টাফ্। অ্যাডজাস্ট করতে সময় লাগে। দিজ পিপল আর সো স্মার্ট! আমাদের ঐতিহ্য তো... ভেতো আপ ব্রিঙ্গিং একেবারে!

দাদার পোশাক-আশাক চলন-বলন সত্যিই এখন খুব স্মার্ট। ইংরেজি সিনেমায় যেমন দেখা যায়। চেহারাটাও খুব ভরেছে। পুরো স্যুট পরনে। চকচকে জুতো মোজা। চশমার ফ্রেমটা পাল্টেছে।

বাইরে দেখলুম একটা কালো অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে।

—ওঠো। দাদা আমার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে পেছনের সিটে চালান করে দিল। তারপরে ড্রাইভিং সিটে বসল।

—তুমি গাড়ি কিনেছ?

—তুমিও যেমন! অরোরাজির গাড়ি। আমি ড্রাইভিং শিখে গেছি। ও বাড়ির সবাই-ই জানে। আর একটা ফিয়েটও আছে। যখন যার যেটা দরকার হয়...

দাদাকে দেখে আমার সম্ভ্রম জাগার কথা ছিল, কিন্তু আমার ঈষৎ মজাই লাগছিল। দাদা যেন বিশেষভাবে আমাকে অভিভূত করবার চেষ্টা করছিল। এর আগে দাদার সঙ্গে আমার দিনগুলো ছিল খুব চুপচাপ। একটা দুটো কথা, কাজ, দুজনের দুদিকে চলে যাওয়া। এত কম কথা বলত, এত একা-একা থাকতে পারত যে মনে হত দাদার পছন্দের মানদণ্ড এমনই যে হয় দাদার কাউকে পছন্দ হয় না, নয় দাদাকে কেউ পছন্দ করে না, এবং দাদা সেটা জানে। সেই চুপচাপ প্রায় ধ্যানস্থ মানুষটা যদি হঠাৎ খুব হাসি উপছে-পড়া, বাচাল মতো হয়ে যায়, তখন অনেকগুলো সম্ভাবনা মনে আসে। হয় তো বাইরের কর্মজগৎটা এতটাই ওর স্বভাবের বিপরীত এবং সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া ওর এতই অসম্ভব যে সেই জগতের বাইরের পোশাকটা ও পরে ফেলেছে, এক রকম ঝাঁকের কই হবার মরিয়া চেষ্টা এটা। আবার এও হতে পারে, আমার কাছে ধরা পড়ে যাবার একটা শঙ্কা ওর মনে কাজ করে যাচ্ছে। ও কিছু লুকোতে চায়। এমন আমূল বদলে যাওয়া কি সম্ভব?

—মা কেমন আছে? কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করল।

—যেমন থাকে।

—বোন?

—অনেক বড় হয়ে গেছে।

—দাদু?

—বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।

—তুমি কি ভেবেছিলে, দাদু ইয়াং হয়ে যাবেন? দাদা ছোট্ট একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসল। আমি কিছু বললুম না। ভেবে দেখতে গেলে দাদুর বুড়ো হয়ে যাওয়ার তথ্য তো আমি দিইনি। দিতে চেয়েছি সম্পর্কের সুতো ধরে একটু টান, দাদার মধ্যে দাদুর লালিত যে বড় নাতি লুকিয়ে আছে তাকে। ভেবে দিইনি। তবে দাদা বুঝতে পেরেছে। না হলে ওই হাসি আর ওই মন্তব্যের আড়াল খুঁজত না।

গ্রেটার কৈলাসের প্রথম দিনটা ছিল নির্মল, স্বচ্ছ, স্ফটিকের একটা দানার মতো। খুব সুন্দর জিজাইনের একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালুম। বাইরে থেকেই বোঝা যাচ্ছে, প্রচুর লেভেল ব্যবহার করা হয়েছে বাড়িটিতে। যিনিই করে থাকুন অল্প জায়গাকে বেশি করবার মন্ত্র তিনি জানেন। একেবারে ডান দিকের দরজা চাবি দিয়ে খুলল দাদা। ভেতরে একটা দারুণ সাজানো ঘর। মোটা মোটা সোফা, তাতে ঝলমলে কভার। দেয়াল থেকে নানা রকম জিনিস ঝুলছে। যিনিই সাজিয়ে থাকুন খালি দেওয়ালে তিনি বিশ্বাস করেন না।

—বোসো। দাদা সগর্বে চাবির রিংটা ঘোরতে লাগল।

—তোমার ঘরে তুমি বাইরে থেকে যখন খুশি ঢুকতে পারো তা হলে?

—না হলে আর স্বাধীনতা কী?

—পুরো স্বাধীনতা নয়, তুমি অন্যের ওপর নির্ভরশীল তো বটেই।

—পার্টলি। বাট আ অ্যাম পেয়িং ফর ইট।

পাশের ঘরটা দাদার শোবার ঘর। এখানে কাজ করবার টেবিল-চেয়ার, পাতলা একটা খাট, দেয়ালের সঙ্গে আটকানো আলমারির পাল্লা। বইপত্রের জন্য তাক।

—তুই আমার খাটটায় শুবি, বুঝলি। আমি এই ঘরে ডিভানটা পেতে নেব। নিশ্চয় চান করবি। চলে যা। শোবার ঘরের সঙ্গে টয়লেট, শাওয়ার অ্যান্ড এভরিথিং পাবি।

অনেকক্ষণ পরে দাদা আমাকে তুই বলল। অর্থাৎ আড়ষ্টতাটা একটু কেটেছে।

—কী খেতে চাস? ভাত না রুটি!

আমার মনে পড়ল দাদার চিঠির কথা। বললুম—রুটি। দাদার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল আয়।

একতলা থেকে একটা মেজানিনের মতো ঘরে গেলুম। এটা খাবার ঘর। দাদা হিটারে কিছু একটা গরম করল। একটা কৌটো রাখল টেবিলে।

—মাংস আর রুটি, এখানে নানান রকম চাটনি আছে। ক্ষীরা খাবি তো?

—ক্ষীরা?

—শসা, শসা।

আমি জানাই হ্যাঁ। তখন দাদা ফ্রিজ থেকে কাটা আধখানা করা তিন-চারটে শসার প্লেট মাঝখানে রাখল।

—অসুবিধে হবে?

—একেবারেই না।

আমি বয়-স্কাউটে ছিলুম বলে ঘর গোছানো, রান্না করা, বাসন মাজা, বিছানা করা সবই শিখে গেছি। কিন্তু দাদা ছিল মার্কামারা বাঙালি বাড়ির ছেলে। এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতেও আপত্তি। মা ওর টেবিলে একটা ঘটিতে জল রেখে চাপা দিয়ে পাশে একটা গ্লাস উপুড় করে রেখে দিতেন। এখন দূর বিদেশে একলা চাকরি করতে এসে দাদাও দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু শিখে গেছে।

—ভাল না?

—ভাল, তবে একটু বেশি ঝাল। ঠিকই আছে।

—রুটিটা?

—খুব ভাল।

এই 'ভাল', 'খুব ভাল'গুলোও যেন দাদার যথেষ্ট বলে মনে হল না। মুখ দেখে একটু হতাশ মনে হল।

—এ বাড়ির লোকেরা কোথায়?

—অরোরাজি তো ইউনিভার্সিটিতে। মাম্মি সোশ্যাল সার্ভিস করেন, একটা সংস্থা আছে। এই

ধর, গরিবের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, দুঃস্থ মেয়েদের স্বাবলম্বী হতে শেখানো। শি ইজ এ প্যারাগন অব ভার্চু। সবাইকার কাছেই একেবারে মায়ের মতো।

—আর?

দাদার মুখ একটু লাল হল, বলল— সোনু, মানে ওঁদের মেয়ে এয়ার লাইনস-এ কাজ করে। তাই...আমি তো ছুটি নিয়েছি।

আমি বললুম আমি কিন্তু কালই ফিরতি ট্রেনে চাপব দাদা।

—বলিস কী রে! দিল্লি দেখবি না?

—পরে, এখন না। দিল্লি দেখা পালিয়ে যাবে না।

—কলেজ?

—হ্যাঁ,—আমার অন্য কারণও ছিল, সেগুলো বলি না।

বসবার ঘরে— অলস ভাবে বসে দাদা একটা সিগারেট ধরাল।

বলল— কী ওয়র্মথ আর কী লাইফ তুই কল্পনা করতে পারবি না।

কার আমি জিজ্ঞেস করি না।

—এরা জানে কীভাবে লাইফ এনজয় করতে হয়। বুঝলি? খোলামেলা দরাজ হাসি। যেমন রোজগার করে তেমন খরচ করে। ফ্যান্টাস্টিক।

আমি চেয়ে থাকি।

—তুই চিন্তা করে দেখ, এরা কিন্তু লাহোরের উদ্বাস্তু। এরই মধ্যে পুরো দিল্লি শহর এদের দখলে। মানে, ডমিনেটেড বাই পঞ্জাবিজ। ড্যাশিং পিপল, অনেক কিছু শেখার আছে...

এতক্ষণে আমি বলি— এঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের ঢালাও সাহায্য পেয়েছিলেন দাদা। দিল্লির আশেপাশের অঞ্চল, প্রপার দিল্লিসুদ্ধু কলকাতার মতো ক্রাউডেডও ছিল না তখন।

—ইয়া, দে স্টার্টেড উইথ অ্যান অ্যাডভান্টেজ। রাইট।

একটু চুপ। তারপর সিগারেটে দুটো টান দিয়ে বলল— সমু, আমি কলকাতা ফিরে যাবার কথা ভাবতে পারি না। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।

আমি হেসে বলি— কে বলেছে ফিরে যেতে? যেখানে তোমার কর্মক্ষেত্র সেখানে তো থাকতেই হবে। আজ যদি তুমি ভারতের বাইরে ভাল সুযোগ পাও, যাবে না?

—ব্যাপারটা তা নয়, বুঝলি? এঁরা আমাকে জামাই করতে চাইছেন। সোনু মানে মেয়েটি, ডিভোর্সি। এখন এই পরিস্থিতিতে আমাদের রক্ষণশীল বাড়ি চাইবে না বিয়েটা, তাই না?

—আমার তা মনে হয় না।

—হয় না? সোনুর একটি বাচ্চাও আছে, ছেলে, স্কুলে যায়। পাবলিক স্কুল। ভেরি ব্রাইট। বুঝতে পারছিস সিচুয়েশনটা একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

আমি একটু ভাবিত হয়ে পড়েছিলুম ঠিকই। কিন্তু দাদাকে সেটা জানতে দেওয়া ঠিক মনে করলুম না।

দাদা বলল এই যে বাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ওর বাবার, কিন্তু ওর ব্যবসায়ী স্বামীর কাছ থেকেও ও অ্যালিমনি বাবদ এককালীন থোক টাকা নিয়ে নিয়েছে বুদ্ধি করে। ইনভেস্ট করেছে। ভাল ভাল শেয়ার।

শী ইজ কোয়াইট রিচ।

আমি চেয়ে আছি।

দাদা খুবই অস্বস্তিতে পড়ল। প্রশ্নের উত্তরে কথা বলা যত সহজ, প্রশ্নহীনতার মুখোমুখি ততটা নয়।

বলল— তুই কি রাগ করছিস?

—না তো! তুমি বলছ আমি শুনছি।

—আসলে ওদের একটা শর্ত আছে। ওরা চায় বিয়েটা কোয়ায়েটলি এখানেই হয়ে যাক। এবং এই বাড়িতেই আমাকে থাকতে হবে। কিন্তু বাড়ি বা সম্পত্তির ওপর সোনুরই অধিকার। আমি যেন না ভাবি এই বাড়িতে আমার আত্মীয়স্বজনকে... মানে...রাখতে-টাখতে পারব।

—বিয়ের সময়েও আমরা কেউ উপস্থিত থাকতে পারব না? —আমি বিরক্ত হয়ে বলি,—এ কেমন শর্ত!

—না না, বিয়েতে অবশ্যই যে যে পারবে উপস্থিত থাকবে। যার যার সুবিধে হবে। ধর দাদু তো পারবেন না। মা-বাবা এঁদের পক্ষেও তো সম্ভব নয়। ধর তুই, ফিনকি। তোরা...

আমি দাদার সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকি। খোলামেলা কথা কোনওদিন দাদার সঙ্গে বলিনি। বাড়িতে টাকা-পয়সা পাঠাবে কি না, এটাও জিজ্ঞেস করতে পারলুম না।

—রাতে ঘুম হয়নি। আমি একটু ঘুমোতে চাই দাদা। এইখানে ডিভানেই আমার হয়ে যাবে।

—শিওর, একটু ঘুমিয়ে নে, তারপর বিকেলবেলা তোকে দিল্লি দেখিয়ে আনব। কালকেও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কিন্তু ওঁরা তো এটা চান না!

—কী?

—এই যে তোমার পরিবারের কেউ এখানে আসুক!

—ননসেন্স। এই স্পেসটার জন্যে আমি খরচ করছি। তা ছাড়া তোর কথা আলাদা।

—কেন?

—তুই একটা বাডিং এঞ্জিনিয়ার...

আমি একদম চুপ করে যাই।

—ওরা এমনিতে কিন্তু খুবই অতিথিবৎসল। সে সব না। একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে তো। তাই একটু সাবধান।

দাদা আমাকে কুতুবমিনার চত্বর হয়ে লাল কেল্লার সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শো দেখাল। ইন্ডিয়া গেট যেতে আসতেই দেখা যায়। শহরের কেন্দ্রে পার্লামেন্ট হাউজ, রাষ্ট্রপতি ভবন হয়ে চাণক্যপুরী দেখে দাদা গ্রেটার কৈলাসের পথ ধরতে আমি বলি— দাদা, রাতের খাওয়াটা কোনও একটা ধাবা-টাবায় খেয়ে নিলে হত না? দিল্লির পরোটাগলির খুব নাম শুনেছি!

—সে তো অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। পুরনো দিল্লিতে। বলবি তো আগে? কিন্তু আজ ডিনারে ওঁরা তোর জন্যে অপেক্ষা করবেন, আলাপ করবেন।

—সো কাইন্ড অব দেম। কিন্তু আমি আর ওখানে ফিরতে চাইছি না। এখানে কোথাও একটা থেকে নিতে পারব। তুমি যে এই আমাকে গাড়িতে এত ঘোরালে পেট্রলের দামটাও...

—কী বলছিস? পেট্রল আমি দিই! দে নো যে তুই আসছিস। আমাদের বাড়ির প্রতিনিধি। ওঁরা কথা বলবেন তোর সঙ্গে।

এত ক্রুদ্ধ যে আমি হতে পারি আমার জানা ছিল না। বললুম— আমি আমার বাড়ির প্রতিনিধি নই দাদা, হতে পারি না। আমি এসেছিলুম শুধু তোমার ভাই হিসেবে। তোমার কী সব বলবার কথা আছে...শুনতে। শোনা হয়ে গেছে। এবার ওখান থেকে ব্যাগটা নিয়ে আমি চলে যাব।

—সমু, তুই এত রাগ করবি— আমি বুঝতে পারিনি। প্লিজ বি রিজনেবল। আমার কথা থেকে যতটা তোর মনে হয়েছে ওঁরা অতটা ওরকম নন। তুই চলে গেলে ভীষণ ইনসাল্টেড ফিল করবেন!

—আমরা যে কতটা ইনসাল্টেড হচ্ছি সেটা তা হলে তুমি বুঝতে পারছ না। তাতে তোমার কিছু যায় আসে না!

—শোন শোন, তোকে যা-যা বললুম, মানে বাড়ির লোক আসা-যাওয়ার কথা, সে সব ওঁরা

ইন সো মেনি ওয়র্ডস বলেননি কখনও। এগুলো আমি জাস্ট বুঝে নিয়েছি।

এত জোর করতে লাগল যে আমি যেতে বাধ্য হলুম। বেশি না না করা আমার কোনওদিনই আসে না।

দাদার ঘরে ঢুকে চান করে একটা পাজামা-পাঞ্জাবি পরলুম। ভিজে চুল আঁচড়ালুম। বসার ঘরে ঢুকে দেখি এক বিশাল বপু সালোয়ার কামিজ পরা মহিলা খুব জমজমে গলায় কথা বলছেন, তাঁর পাশে একটি বছর আট-দশের ছেলে।

আমি নমস্কার করে দাঁড়িয়ে থাকি।

—বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে। আপ তো মেরি বেটা জৈসা। সোনু সোনু! উনি গলা তোলেন, এবং একটি লম্বা-চওড়া লালচে ফর্সা মেয়ে ঘরে ঢোকে।

—নমস্তে।

আমি নমস্কার করি।

মেয়েটির কোনও জড়তা নেই। অভিজ্ঞতার ছাপ মুখটাতে, ব্যক্তিত্ব। ও আমার মেরুদণ্ডহীন দাদাকে চালিয়ে নিতে পারবে। আমার দাদা যোগ্য হাতে পড়েছে দেখে আমি নিশ্চিন্ত হই।

বিনা বাক্যব্যয়ে ডিনার সারতে যাই। দলজিৎজি স্ত্রীর মতো অতটা বেঢপ নন। দিল্লি ইউনিভার্সিটির সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন, একটু অহঙ্কার আছে বোধহয়। সরসোঁ কি শাক, দু তিন রকমের আচার, তরকা, শুকনো মাংস, ঘন ডাল। এত রকম পদ। আমার কথা ভেবে ওঁরা ভাতও রেখেছিলেন।

—আপ তো সাগর সে ভি হ্যান্ডসাম হ্যাঁয়— সোনু বলল।

—রাইট— তার বাবা একমত হলেন।

দাদা জানাল আমি কীভাবে যোগ-ব্যায়াম করে আমার শরীর তৈরি করেছি।

ওঁরা জানতে চাইলেন— ওঁদের মেয়েকে আমার কেমন লেগেছে।

আমি জানাই খুব ভাল। ওঁদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করেন বিবাহ-প্রস্তাবে আমার সায় আছে কি না। আমি জানাই আমাদের নিয়ম বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠতম অর্থাৎ আমার গ্র্যান্ডফাদারকে ওঁদের লিখতে হবে। মনে হয় না কেউ আপত্তি করবেন। ওঁরা স্বস্তি পান।

তখন প্রায় ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। দাদা একটু কঠিন স্বরে বলল— তা যদি বলিস, আমরা কী পেয়েছি ওই বাড়ি থেকে? রাজকুমারকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ওখানে জীবন। মায়ের মতো নির্লিপ্ত, ছেলেদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন মা আমি আর দেখিনি। পাগল জ্যাঠামশাইয়ের খরচ কেন আমাদের বইতে হবে? কাকার মেয়ের ভারই বা কেন আমাদের? দুই বুড়ি তো চিরটাকাল দাদুকে আর মাকে এক্সপ্লয়েট করে গেল। এখন আমাকেও করছে। দাদুকে বলিস টাকাপয়সার জন্যে কাকাকে ওঁর লেখা উচিত। কোনওক্রমে রান্না, একটা মুখে দেবার মতো জিনিস নেই, ওটা একটা হানাবাড়ি। তুই যা-ই-ই মনে করিস আমি ওখানে আর ফিরছি না। তুই-ও যত তাড়াতাড়ি পারিস কেটে পড়। রাজকুমার বুঝুক।

সারারাত ঝমাঝ ঝম করে গাড়ি চলে। বাইরে ভেতরে। একটু ঘুম আসে, আবার চলতি স্টেশনের আলো চোখে পড়ে, ভেঙে যায় ঘুম। তারপর শেষ রাতে ঘোর নিদ্রা আমায় অধিকার করে। ভাবনা, চিন্তা, রাগ, দুঃখ সমস্ত লয় পেয়ে যায়, এক সমৃদ্ধ প্রশান্তির মধ্যে আমি জেগে উঠি এবং মাটিতে পায়ের সামান্য ধাক্কা দিয়ে শূন্যে উঠে যাই। পাখা নেই, তবু মহানন্দে উড়তে থাকি। নীচে বাড়িঘর, ট্রেন, ট্রাম, বাস, মানুষের ভিড়, পুকুর, হ্রদ এবং সমুদ্র। আমার পায়ের সামান্য তলায় গজরাচ্ছে সমুদ্র। যেমনটা বয়স্কাউটের দলের সঙ্গে পুরী গিয়ে দেখেছি। ফুঁসে উঠছে ঢেউয়ের সাদা পাগড়ি। এক্ষুনি বুঝি ছুঁয়ে ফেলল। কিন্তু আমি শূন্যেই পায়ের একটা ধাক্কা মারি। গিয়ার বদলে উঠে যাই আর একটু ওপরে। চন্দ্রতারকাহীন মহাকাশ এবং অকূল সাগর। কোথা থেকে একটা আলো আসছে। মৃদু। এ কি আমাদের ঘরের রাত-আলো? জানলার বাইরে থেকে ঢুকে পড়া রাস্তার আলো? সূর্য

গ্রহণের সময়ে একটা না-আলো না-আঁধার নেমে আসে চরাচরে। এ কি সেই? আকাশ এবং সাগর নিয়ে আমার কোনও প্রশ্ন নেই। তাদের অবস্থান এবং দুইয়ের মাঝখানে আমার ওড়া যেন একরকম স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু আলোটার উৎস এবং প্রকৃতি নিয়ে আমি ভেবে চলেছি। উড়তে উড়তে ভেবে চলেছি। এমন একটা রহস্য এটা যা আমায় ভেদ করতে হবে।

বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত এই ঘোর আমার ছিল।

৮

বাড়িটা তিন রাস্তার মোড়ে অর্থাৎ কোণে। দুটো রাস্তা থেকে সোজা আমাদের কোনাচে বাইরের ঘরের অন্দর দেখা যায়। একজন বৃদ্ধ, সাদা ফতুয়া, সাদা লুঙ্গি পরে বসে রয়েছেন। বহুদূর পারাপার পার হয়ে একটা মহাজাগতিক ছবি এসে পৌঁছচ্ছে আমার কাছে অনেক আলোকবর্ষ পরে। কিন্তু ফুরিয়ে যাওয়া, লয় পেয়ে যাওয়া ছবি নয়। এ ছবি স্থির হয়ে আছে অনেক দূরে। বার বার কাছে পৌঁছচ্ছি আবার হারিয়ে ফেলছি। দাদু কি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন? সোজা গিয়ে ঘরে উঠি।

—দাদু!

দাদু আমার দিকে তাকান। দৃষ্টিতে কোনও উৎসাহ নেই। আমি ব্যাগটা রেখে মুখোমুখি চেয়ারে বসি।

—সমু!

—বলো। তোমার কী হয়েছে?

—কী হয়েছে সেটাই বুঝতে পারছি না।

—শরীর খারাপ?

—না।

—মন? দাদু, দাদার জন্যে মন খারাপ?

—না। কোনও রকম মন খারাপ নেই ; সেটাই অদ্ভুত।...আমার বিরাশি কমপ্লিট হয়ে গেল সমু। যে রকম জোরের সঙ্গে সবকিছু মুঠোয় রেখেছিলুম, সেই ... মুঠোটা আলগা হয়ে যাচ্ছে। তুমি দিল্লি থেকে যে খবর এনেছ, যাই এনে থাকো, আমায় না বললেও চলে। কিছু এসে যাবে না।

কী গভীর অভিমান থেকে দাদু কথাগুলো বলছেন অনুভব করি। প্রসঙ্গ ঘোরাই।

—বেশ ভাল লাগলো ওঁদের। ওই অরোরাদের ... যাঁদের মেয়ের কথা দাদা তোমাদের আগেই জানিয়েছে। ওঁরা তোমাকে চিঠি লিখবেন। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করতে চায় দাদা, ওখানেই।

দাদু কেন জিজ্ঞেস করলেন না। আমার মনে হল এখানে বিয়ে হওয়ার মূল অসুবিধেটা ওঁকে জানিয়ে দেওয়া ভাল।

—আসলে দাদু, মেয়েটি ডিভোর্সি। ওঁরা চান না এ নিয়ে কোনও কথা উঠুক। —ঘটা পটা আনুষ্ঠানিক বিয়ে ইত্যাদি ওঁরা কিছুই তাই চান না।

—বেশ।

মা এসে ঢুকলেন— ও তুমি এসে গেছ? কী হল?

আমি শুধু কথাগুলো আবার বলি।

কিছুক্ষণ পরে মা বললেন— আজকে একটা প্রচণ্ড চ্যাঁচামেচি হবে বাবা।

—হোক। কিছুতে কিছু এসে যাবে না। সমু একটা কাজ করবে?

—বলো।

—আমাকে দুটো জিনিস খাওয়াবে?

অবাক হয়ে বললুম— কী?

—ফুচকা আর আইসক্রিম। দিদিভাই খুব ফুচকা খায়, কী এমন জিনিস, একটু চেখে দেখব। আর আইসক্রিম। বহুদিন বহু অভ্যাসে সংযত খাওয়া-দাওয়া করেছি। হঠাৎ হঠাৎ আইসক্রিমের গন্ধ পাই। ওইখানটা একটু বাকি আছে।

শেষ কথাটার মানে বুঝলুম না। মা খুব চিন্তিত চোখে চাইলেন, একবার আমার দিকে, একবার দাদুর দিকে।

মায়ের দিকে চাইলেন দাদু। —আমার ইচ্ছে হয়েছে বললুম। তোমাদের ইচ্ছে না হয়— দিয়ো না।

যখন আনলুম আইসক্রিম দু-তিন চামচ খেয়ে বললেন কোনও বিশেষ স্বাদ তো টের পাচ্ছি না। সমু, আমাদের অল্প বয়সে আইসক্রিমের খুব ভাল স্বাদ-গন্ধ ছিল। ম্যাগনোলিয়া, ম্যাগনোলিয়া বোধহয়। তা ছাড়া মালাই-বরফের খুব চল ছিল। সিদ্ধি দেওয়া, হালকা সবুজ, বুঝলে? কে জানে তারই গন্ধ পেলুম কি না। তফাত করতে পারছি না।

ফুচকা খেয়েও দাদু কিছু তফাত করতে পারলেন না। বললেন— তোমার খই দুধের সঙ্গে এই দিদিভাইয়ের ফুচকার কিছু তফাত বুঝছি না। আমাদের যৌবন বয়সে, বুঝলে সমু, হাতে ছোট বালতির উনুন ঝুলিয়ে পকৌড়িঅলা যেন, আর তোমার বাবাদের সময়ে পাওয়া যেত লড়াইয়ের চপ। সেসব খেলে দিদিভাই আর এসব আনতাবড়ি জিনিস খেতে চাইত না।

দাদু নীচের ঘরে একলা থাকেন। পাশের ঘরে দুই দিদা। আমি মাকে বলি ক্যাম্পখাটটা আমি দাদুর ঘরে পেতে নিচ্ছি। আজ এখানেই শোব।

গভীর রাতে দাদু বললেন— সমু ঘুমোলে?

—না দাদু।

—তোমায় কটা কথা বলি।

—বলো।

—যতদূর মনে পড়ছে বলি। আমি খুব সম্ভব খুব স্ট্রাগল্ করে আমার জায়গায় পৌঁছেছিলুম। আমার দাদারা হঠাৎ পরপর মারা গেলেন। তোমার জ্যাঠা খুব বড় স্কলার ছিলেন। উনি কাউকে ভালবেসেছিলেন, মেয়েটি ওঁকে ঠকায়, সেই থেকে মাথার গোলমাল হতে হতে একেবারে উন্মাদ। কিন্তু এখন উনি একরকম ভাল হয়ে গেছেন। ভায়োলেন্স আর নেই। খুব নিরীহ। ওঁকে আমাদের নিয়ে আসাই উচিত। তোমার কাকা এখন কানাডায়, তার দ্বিতীয় স্ত্রী মারা গেছেন। একটি ছেলেও। অন্যটি দিদিভাইয়ের থেকে বছর চারের ছোট। তাকে নিয়ে তোমার কাকা খুব মুশকিলে পড়েছে। এখন চাইছে দিদিভাই ওখানে গিয়ে থাক। আমার মনে হয় ও মরিয়া হয়ে দিদিভাইকেও এরপর লিখবে। তোমাকে খুব সম্ভব একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। দিদিভাই এখনও তুমি এত বড় হয়নি যে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারবে। তুমি ওকে সঠিক পরামর্শ দিয়ো। একটা ইমোশন্যাল আপহিভ্যাল হবে। আমার বয়সে পৌঁছলে বুঝবে তার কোনও সত্যি মূল্য নেই। তোমরা, আমার দুই ছেলে, বউমা, দুই নাতি, কাউকে ভালবাসনি। বড্ড আলগা। তোমার দাদা ভালবাসবার লোক খুঁজে পেয়েছে বলে আমি নিশ্চিন্ত। বড় ছেলেটি ভালবেসে কষ্ট পেল, আর বাকি সবাই না ভালবেসে। ফিনকিই একমাত্র আশা তোমাদের।

দাদু চুপ করে গেলেন।

পরদিন হস্টেলে চলে গেলুম। আমার ফাইন্যাল সেমিস্টারের পরীক্ষার দিনে রাত এগারোটা নাগাদ ফোন এল দাদু চলে গেছেন। খুব ভোরে, নিঃশব্দে, আমার পরীক্ষা ছিল বলে আমাকে খবর দেওয়া হয়নি।

তা হলে এই! দাদুর শেষ উপলব্ধি যদি ঠিক হয় তা হলে একদিকে স্বার্থপরতা আরেক দিকে শুকনো কর্তব্যপরায়ণতার উত্তরাধিকার আমাদের। কাকা চলে গেছেন, দাদা চলে গেল, বাবা থেকেও নেই। কিন্তু কর্তব্য, শুধু শুকনো কর্তব্য? এ সব কথা সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া শক্ত। মা? দাদাও মাকে উদাসীন বলেছিল। আমি দেখেছি মায়ের সুখদুঃখের অনুভূতি দৃশ্যত কম। ভেতরটায় কী? স্বল্পবাক মানুষের ভেতরটা জানা কঠিন।

কাকার চিঠি। গোটা চারেক। দাদুর ক্যাশবাকসো থেকে নিয়ে পড়ি। একই কথা। ছেলে এখন হাইস্কুল। তাঁর চাকরি খুব কম সময় দেয় তাঁকে। ফিনকি এলে সব দিক রক্ষা হয়। আমরাও বাড়ন্ত একটি মেয়ের দায় থেকে বাঁচি, কাকারও সুবিধে হয়।

জ্যাঠার অ্যাসাইলাম থেকে চিঠি। তাঁদের ফিজ বাড়ছে, তা ছাড়া দেবকুমারবাবু ভাল আছেন। ওঁকে আমরা নিয়ে আসতে পারি।

এই চিঠিটা দেখাই বাবাকে।

—এত ফিজ তো আর দেওয়া সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে সরকারি গারদে রাখবার কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

—কিন্তু দাদু বলেছেন ওঁকে নিয়ে আসতে।

—বাবার ভীমরতি ধরেছিল। এসব ঝামেলা বাড়িতে ঢোকাতে নেই।

—তুমি একবার না হয় দেখে এসো—আমি বলি।

—আমি খুব নার্ভাস হয়ে যাই এসব ব্যাপারে সমু। দেখতে হয় তুমি দেখে এসো।

—মা, কী করব!

—তোমার দাদু যা বলে গেছেন তাই করা উচিত। ভাসুরঠাকুরের ওপর আমাদের কিছু কর্তব্যও তো আছে!

সুতরাং দক্ষিণ শহরতলি প্রান্তে সেই অ্যাসাইলামে আমি যাই। চতুর্দিকে কোল্যাপসিবল গেট। দারোয়ান। আমাকে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে বলা হয়। ঘরটা বেশ বড়, উঁচু সিলিং-এর। টেবিল চেয়ার নিয়ে একদিকে গম্ভীর মুখ এক ভদ্রলোক ফাইল খুলে বসে আছেন। এত শক্ত মুখ কেন ওঁর? পাগল সামলাতে কী কী লাগে? গায়ের জোর, দৃঢ়তা দরকার, বুঝি। কিন্তু দরদ? একটু সমবেদন নরম মুখ, শান্ত আশ্রয়শীল ব্যবহার লাগে না এসব? সাতপুরনো জাবদা খাতার মতো এমন মুখ?

চারদিকে পিঠ তোলা কাঠের বেঞ্চি পাতা। ব্যবহারে ব্যবহারে তেলতেলে হয়ে আছে।

আমার সামনেই দু'তিনটে 'কেস' ঢুকে গেল। রীতিমতো জবরদস্তি করে নিয়ে গেল দু'তিন জন লোক। সবাই উর্দিপরা। চোখ লাল, বিড়বিড় করছে মানুষটি। আমার চেয়ে হয়তো সামান্য বড় হবে। ও কি বুঝেছে? এই পৃথিবী এই সব মানুষ খুব অন্যরকম? ওর সঙ্গে মিলছে না? কে জানে হয়তো ও-ই ঠিক। ওর ভাষা কেউ বুঝছে না, তাই...। না, দেবকুমারকেও নিশ্চয়ই এমনি ভাবেই নিয়ে আসা হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন মানুষের ওপর। গ্রহান্তরের কোনও ব্যাপার—ছিল না তো!

অন্য দুজন নিশ্চুপ। কোনও প্রতিরোধ নেই। নিজেদের অন্যদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। যা হয় হোক। তবে যা হয় হোক। এক ব্যাখ্যাতীত হতাশা সমস্ত শরীরে। হাতে পায়ে স্বাভাবিক অথচ আচরণে আলাদা মানুষগুলিকে দেখতে দেখতে মনে হল ওরা কিছু একটা মেলাতে পারেনি। কোনও অঙ্ক। ওদের দুয়ে দুয়ে চার হয়নি। প্রাণপণে হাতড়েছে, হাতড়েছে। এখন হতভম্ব হয়ে গেছে— তা হলে এ প্রশ্নের উত্তর কী উত্তর যদি না-ই থাকবে তবে প্রশ্ন কেন?

শীর্ণ এক ভদ্রলোককে নিয়ে আসে গার্ড। পাজামা আর ফতুয়া পরা। এক মাথা পাকা চুল।

চোখে খুব ভীত দৃষ্টি। দাদুর সঙ্গে, আমার বাবার সঙ্গে, এমনকী আমার সঙ্গেও মিল স্পষ্ট। আমি এঁকে জীবনে সেভাবে দেখিনি। আমার পুরো জ্ঞান হবার আগেই ইনি স্থানান্তরিত হয়েছেন। দাদা দেখেছে, দাদার এঁর সম্পর্কে স্মৃতি খুব তিক্ত।

—বাবা কই? বাবা? ভদ্রলোক দিশেহারা ভাবে বললেন। তারপর আমার দিকে চোখ পড়ল।

—রাজ, তুমি এসেছ? —এগিয়ে এসে খুব আদরে উনি আমায় জড়িয়ে ধরলেন। একটা অস্বস্তিকর গন্ধ। আমি শক্ত থাকবার চেষ্টা করি। তার মানে বাবার চেহারা ওঁর মনে আছে।

—এখানে এরা আমাকে রোজ চারাপোনা খেতে দেয় রাজ, আমাকে দিয়ে জামাকাপড় কাচায়, একটা লোককে সারাক্ষণ হাত-পা টিপে দিতে হয় আমায়। জানো ভাই, আমার ঘরে একটা লোক গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। ভয়ে মরি। পুলিশ-টুলিশ! যত বলছি আমি কিছু করিনি বিশ্বাস করছে না। —উনি কাঁপতে থাকেন। আমি ওঁকে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসিয়ে দিই। বলি— আপনি বাড়ি যাবেন?

—বাড়ি? উনি অবাক হয়ে তাকান— আমার বাড়ি আছে?

—আছে।

—তা হলে এদের এই অত্যাচার থেকে আমায় বাঁচাও ভাই। নিয়ে চলো। বাবার কাছে।

একটু অপেক্ষা করি, তারপর বলি— আমি কিন্তু আপনার ভাই রাজকুমার নই। আমি আপনার ভাইপো নাম সমুদ্র।

উনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকান। —আমার ভাই কি বেঁচে নেই?

—না, না, উনি আছেন।

—বাবা? বাবা আসেনি কেন?

একটু চিন্তা করতে হয় আমাকে। খবরটা এখানে দেব, না বাড়িতে গিয়ে দেওয়া ভাল? বাড়িতে গিয়ে যদি প্রতিক্রিয়া খারাপ হয়, তো আমরা কি সামলাতে পারব? এখানে যদি বলি— ওঁর রাতটা খুব যন্ত্রণায় কাটবে। কিন্তু এখানে অন্ততপক্ষে সামলাবার লোক আছে। আমি আস্তে আস্তে বলি— দাদুর তো অনেক বয়স হয়ে গেছে। একাশি-বিরাশি পার।

—বাবার বয়স? একাশি? বিরাশি? তাতে কী হয়েছে! বাবাই তো আমার দেখাশোনা করেন!

তখন আমি বলি— এখন আপনি ভাল হয়ে গেছেন। আর আপনাকে দেখাশোনা করতে হবে না। আপনি নিজেই পারবেন। পারবেন না?

উনি ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চান।

আমি বলি— এত বয়সে কি আর কেউ বেঁচে থাকে জেঠু! দাদু কিন্তু মারা গেছেন।

—অ্যাঁ? আঁক করে উঠলেন। তারপরে চুপ করে গেলেন, একেবারে চুপ। মুখের কালি গাঢ়তর। চোখে যন্ত্রণার ছাপ।

—আমার জন্যেই। আমি বাবাকে কষ্ট দিয়েছি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

একসময়ে ওঁর কান্না থেমে গেল। জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছলেন উনি। আমি বললুম— জেঠু আপনি এখন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। দাদু বলে গেছেন— এবার থেকে আপনিই আমাদের দেখবেন। আপনিই অভিভাবক।

—তোমরা জানো না আমার মাথা খারাপ?

—মানুষের কত রকমের অসুখ হয়, আবার সেরেও তো যায়! এঁরা খবর দিয়েছেন আপনি একেবারে সেরে গেছেন। ওষুধপত্র খেতে হবে অবশ্য। নিয়ম করে...

—চলো তা হলে যাই— উনি উঠে দাঁড়ালেন।

—আমি কালকে আপনাকে নিয়ে যাব। আপনার ঘর-টর ঠিক করতে হবে তো?

—ঠিক নিয়ে যাবে তো? —করুণ সুরে উনি বললেন।

—ঠিক— আমি ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি।

বাবা সেদিন রাতে খেলেন না। সিঁড়ির ওপর পায়ের শব্দ হতে লাগল ধম ধম ধম ধম। মায়ের দিকে তাকিয়ে খুব খারাপ লাগল। এঁর ভার দুর্বহ। সারা জীবন ধরে বইছেন, আমি আরও ভার চাপাতে চাইছি। আমার উপায়ই বা কী!

ফিনকির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলি।

—তোর কি ভয় করছে?

—কামড়ে দেবেন না তো!

—না, সেরকম কিছু নয়।

—জেঠুর কথা কখনও শুনিনি কেন রে ছোড়দা?

—কী জানি, আনপ্লেজেন্ট বলে তোকে কেউ বলেনি হয়তো!

—ঠিক করেনি। আমার কিন্তু সত্যিই খুব ভয় করছে। ওঁকে হাসপাতালেই রাখলে ভাল হত না?

—ফিনকি, এখন আর হাসপাতালের খরচ চালাবার সাধ্য আমাদের নেই। আর ওঁর দিকটাও ভেবে দ্যাখ, উনি ভাল হয়ে গেছেন। এখন অ্যাবনর্ম্যাল লোকেদের সঙ্গে থাকা কি খুব ভয়ানক নয়?

—আমাকে যত শিগগির সম্ভব পাশ-টাশ করে একটা চাকরি করতে হবে। বুঝলি ছোড়দা!

—যত শিগগিরই হোক, যা সময় লাগার তা তো লাগবেই— আমি হেসে বলি, তারপর ওর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলি— তোর অবশ্য একটা বিকল্প আছে।

—বিকল্প? মানে?

—মানে, কাকা তোকে কানাডা নিয়ে যেতে চাইছেন। ওখানে তুই অনেক ভাল ভাল সুযোগ পাবি। ধর তোর জীবনটাই বদলে যাবে।

—হঠাৎ? ওর ভুরু কুঁচকে গেছে।

—হঠাৎ-ই। আসলে কাকিমা আর ওঁর ছোট ছেলে মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। বাড়িতে উনি আর ওঁর বড় ছেলে। তাই...

—তাই বলো! —ঠোঁট বেঁকে গেল ওর—স্বার্থ। কিছুদিন পরে দাদার যখন অসুবিধে হবে, ধর বাচ্চাকে কার কাছে রেখে যাবে, দুজনেই চাকরি করে, তখনও আমি এরকম এটা অফার পেতে পারি। তাই না? —আমি হাসি।

—তোকে ছেড়ে, মা-বাবাকে ছেড়ে, দিদুদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

—বিয়ে হয়ে গেলে?

—সে যখন হবে তখন দেখা যাবে। আপাতত আমি এখান থেকে নড়ছি না।

পরদিন ফিনকিকে সঙ্গে নিয়ে জেঠুকে আনতে গেলুম।

দাদুর ঠিক ওপরের ঘরে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। চারদিকে দাদুর ছবি, ওঁর যৌবনের ছবি, বাবা উনি আর কাকা একসঙ্গে, স্কুল বয়, পাশ করে সবে চাকরিতে ঢুকেছেন, উজ্জ্বল চেহারা, যত পারি দেয়ালে দেয়ালে টাঙিয়েছি, টেবিলের কাচের তলায় কিছু। ভেবেচিন্তে। চেনা মানুষদের চেনা চেহারা তো আর জীবনে দেখতে পাবেন না। অচেনা ফাঁকগুলোর মধ্যে চেনাগুলো যদি ফিট করে দেওয়া যায় তা হলে হয়তো একটু সহনীয় হবে নতুন জীবন।

সবই অবশ্য করেছে ফিনকি। আমি বলেছি, ও করেছে। ছবি সাজাতে সাজাতে বলল— মাঝখান থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর হারিয়ে গেছে, ছোড়দা, কী ভয়ংকর না?

খুব সংকুচিত হয়ে ট্যাক্সির এক ধারে বসে উনি বাড়ি এলেন। ঘরের মধ্যে যে ঢুকে গেলেন, বাস। দিদারা কান্নাকাটি করে জড়িয়ে ধরলেন, মা প্রণাম করলেন, পা কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন উনি। তারপর ঘরে ঢুকে নিশ্চিন্ত।

আর ঠিক তিনদিন পরে আমাকে অফিস জয়েন করতে হবে। বেশির ভাগই পেয়েছিলুম কলকাতার বাইরে। কিন্তু সেগুলো নেওয়ার পরিস্থিতি নেই।

এই যে কতকগুলো সিদ্ধান্ত নিলুম, এগুলো কি আমার? না কি দাদুর? দাদার কথা শুনতে দিল্লি যাওয়া, জেঠুকে নিয়ে আসা, ফিনকির কাছে কানাডা যাবার প্রস্তাব রাখা, এবং এই দূরে চাকরি না নেওয়া! দাদুকে অনুসরণ করেছি, ঠিকই। কিন্তু আমি তো মানতে না-ও পারতুম। বাবা তো আমার সঙ্গে কথাই বলছেন না। দিদারা সিঁটিয়ে আছেন। অশান্তি কে চায়? মা যন্ত্রের মতো তাঁর কর্তব্যের রুটিন পালন করে যাচ্ছেন। দাদুর জায়গা নিয়েছেন জেঠু। সেই বারবার খাবার দিয়ে আসা, বসা, নিয়ে আসা, প্রতিদিনের জামাকাপড় গুছিয়ে রেখে আসা, ছাড়া কাপড় কাচতে দেওয়া। দাদুর সঙ্গে মায়ের কথোপকথনের মধ্যে যে উদ্দীপক অংশটুকু ছিল সেটা শুধু আর নেই। জেঠু সসংকোচে চুপ করে থাকেন।

প্রথম রবিবারে আমি নিজের খাবার থালা নিয়ে জেঠুর ঘরে যাই। টেবিলের কাচের ওপর দুটো থালা রাখি খবরের কাগজ বিছিয়ে। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন উনি। আমি লক্ষ করি না।

বলি— জেঠু আমাদের রান্না আপনার ভাল লাগছে?

অনেকখানি ঘাড় নাড়ে উনি।

—কী কী ভালবাসেন?

—সব। তোমার মা যা দ্যান ...। উনি চারাপোনা দ্যান না। খেসারির ডাল দ্যান না।

এগুলো হাসপাতালে দিত বুঝতে পারি। সম্ভবত রোজ।

—আমি কিছু করি না।

—খান। এই দেখুন আপনার সঙ্গে খাব বলে আমার থালা নিয়ে এসেছি।

—রাজ আসে না। ও বেঁচে আছে?

—হ্যাঁ। আসলে বাবার অফিসে ভীষণ কাজ পড়েছে।

—আমরা দুজনে সিনেমা দেখতে যেতুম। মহল, কবি, গ্যাসলাইট, জোন অব আর্ক, আমরা একই ক্লাবে খেলতুম।

—কী খেলতেন জেঠু? কী নাম আপনাদের ক্লাবের?

—বন্ধুদল। সব রকম খেলা। টেনিস ছাড়া সব। রাজ ইনডোর ভালবাসত। ক্যারম। ওপরে আলো টাঙিয়ে— জেঠু ওপরে হাত দ্যাখান। —এখন খেলে? ক্যারম? চেস?

—কী জানি! আপনি জিজ্ঞেস করবেন।

—না, না, আমি সে বারব না। তুমি জিজ্ঞেস করো। তুমি সাগর, না?

—আমি সমুদ্র, জেঠু। সাগর দিল্লিতে থাকে।

—মেয়েটি কে?

—আমার বোন, ফিনকি।

—ভাল মেয়ে?

—খুব ভাল।

আমি অফিস যাই। ফিনকি কলেজ যায়। বাবা অফিস যান। বাড়িতে দুই বৃদ্ধা এক মানসিক রোগগ্রস্ত বৃদ্ধের দায়িত্ব একলা মায়ের ওপর। প্রতিদিন যাই অপরাধবোধ নিয়ে, প্রতিদিন ফিরি অপরাধবোধ নিয়ে। দেখতে পাই ফিনকি আস্তে আস্তে জেঠুকে ওষুধ খাওয়ানো, তাঁকে একটু-আধটু সঙ্গ দেওয়ার কাজটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। রাত্তিরে ঠিক ন'টার সময়ে খাওয়াদাওয়া হলে ওঁকে ঘুমোতে দেওয়া হয়। বাবা ফিরলে বাবা আর ফিনকি খেতে বসে, আমি মায়ের সঙ্গে বসি। বাবার খাওয়ার সময়টা আমি অনেক সময়েই দিদাদের ঘরে একটুখানি বসি। খুব নিপাট পরিষ্কার চন্দনের গন্ধ বেরোয়। একদিকে দেয়ালে গাঁথা ছোট্ট একটু তাক মতো। তার ওপর বালগোপালের

রুপোর সিংহাসন। দুটো খাটে দুটো কম্বলের আসন পাতা। ওখানে বসে ওঁরা জপতপ করেন। দুজনেই নিঃসন্তান, আমদের ছোটবেলা কেটেছে মোটামুটি ওঁদের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু বড় তাড়াতাড়ি ওঁরা নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন। আমার নিজের ঠাকুমা হলে কি পারতেন? কেন এমন হল? ওঁরা যেন এ পরিবারের কেউ নয়। আমি যদ্দুর জানি দুজনেই উইডো পেনশন পান। তাতে দাদু কোনওদিনই হাত দেননি। মাঝেমধ্যে নিজেদের ইচ্ছেয় সংসারের জন্য কিছু খরচ করেন, উপহার দেন। মাকে পুজোয় একটা শাড়ি, আমাদের পাশ করবার পর একটা কলম। দাদাকে হাতঘড়ি দিয়েছিলেন। ফিনকিকে ছোটবেলায় ফ্রক কিনে দিতেন। এখন কি দ্যান? আমি জানি না। এসব কথা আমার মাথায় আসেনি এতদিন। দাদার কথা, দাদুর কথা, মায়ের ভাবনা এইসব থেকে ইদানীং আসছে। ভাসমান দুটি দ্বীপ। অনেক দিন দেখেছি বাবার খাওয়ার সময়ে দুজনের একজন গিয়ে বসেছেন। কিন্তু বাবার নিত্যদিনের চেঁচামেচি বোধহয় সহ্য হত না, আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি এই জলধির নির্জন দ্বীপগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা করে যাই। দুই দিদা, জেঠু এমনকী মা...। আমরা সবাই কি এক জায়গায় বাস করি? বোধ হয় না। এক বাড়ি, কিন্তু আলাদা ঘর, প্রত্যেক ঘরে ঢুকতে হাওয়া নিজেকে একটু পাল্টে নেয়। এ যেন পান্থনিবাস। একসঙ্গে অথচ আলাদা আলাদা আমরা কোথায় চলেছি?

হঠাৎ শুনি— খাবার ঘরে যেন একটু জোর গলা শোনা যাচ্ছে। দুই বৃদ্ধা চকিত হয়ে উঠলেন। গলাটা কিন্তু বাবার নয়। একটু শুনে বুঝতে পারি ফিনকির।

—এর কোননও মানেও হয় না, ক্ষমাও হয় না— ফিনকি বলছে। ওর কানের রিং দুলছে। গাল চকচক করছে। এক হাত দিয়ে ওড়নাটা পিঠে ফেলল। ও বাবাকে একটুও ভয় বা সমীহ করে না।

—আমার যদি ইচ্ছে না হয়...বাবার গলার স্বর এমনিতেই গম্ভীর। এখনও গম্ভীর শোনাল। কিন্তু তার ভেতরে কোথাও একটা দুর্বলতা আছে। ফিনকির ক্রুদ্ধ মূর্তির সামনে বাবা নিরস্ত্র।

—আমারও যদি ইচ্ছে না হয় তোমার সঙ্গে এরকম গল্প করি, মায়ের যদি ইচ্ছে না হয় প্রতিদিন তোমার ফরমাশ খাটতে, ছোড়দার যদি ইচ্ছে হয় দাদার মতো বিদেশে চাকরি নিতে...

—মানে? সমু কি অন্য জায়গায়...

—ছোড়দা জামশেদপুর কি বম্বে গেলে অনেক বেশি মাইনে পেত। যায়নি। কেন সেটা তোমার বোঝা উচিত। সবাইকার কথা ভেবে কিছু কিছু জিনিস অনিচ্ছাসত্ত্বেও করতে হয়। জেঠু আজও তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। উনি ভাবছেন উনি কাজকর্ম করেন না বলে তুমি রাগ করেছ। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি বাবা, রোজ তোমার ওই একঘেয়ে গল্প শুনতে আমার ভাল লাগে না, লাগে না, লাগে না। শুধু তোমার ভাল লাগবে বলে শুনি।

মায়ের গলা শুনি— আঃ, ফিনকি!

—কাল থেকে আর শুনব না। আসব না। আমার কী দরকার! তা ছাড়া ইচ্ছে হলেই তো আমি কানাডায় চলে যেতে পারি।

—অ্যাঁ? বাবা একটা ফ্যাঁসফেঁসে চিৎকার করলেন।

—হ্যাঁ, কাকা আমাকে অফার দিচ্ছেন, আমি যেতেই পারি, আমার জীবনটাই অন্যরকম হয়ে যাবে।

হাতে গরস বাবা, লুচির ঝুড়ি হাতে মা স্থাণু হয়ে বসে এবং দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি সেই সময়ে ঢুকি। ফিনকিতে এসে বাবার পথ মায়ের পথ মিলে গেছে। ফিনকিই আমাদের একমাত্র ভরসা।

—আমার ভয় করে। সে সময়ে দাদার বাই চাপলে আমাকে মেরে পাট করে দিত। পাঁজরে চিড় খেয়েছিল একবার। সমু তুমিই বলো আমার ভয় করাটা কী অন্যায্য?

—কীসের ভয়? —কীসের কথা হচ্ছে, মা?

বাবা বললেন—তোমাদের জেঠুর কথা হচ্ছে। তোমরা তো নিয়ে এসে খালাস। এখন আমাকে জোর করছ কাছে যেতে। আই ডিটেস্ট হিম।

—একবার গেলে হয়তো আর অতটা ... থাকবে না, তুমি গিয়েই দেখ না। আজ জেঠু ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাল একবার যেয়ো। ফিনকিকে সঙ্গে করেই না হয় যেয়ো। —আমি খুব হালকা চালে বলি।

—তোমরা! আমাকে...বাবা রাগে আবেগে থরথর করতে করতে উঠে গেলেন। আমি ফিনকিকে বললুম— তুই বাবার খাবার সময়ে কথাটা তুললি কেন?

—আর কখন পাই? এক খাওয়ার পরে ওপরে বাবার ঘরে গিয়ে বলতে হয়। কাছেই জেঠুর ঘর, জেঠুর কানে গেলে কী হবে বল তো! বাবা তো আস্তে কথা বলবেন না!

বলে ফিনকি ফিক করে হেসে ফেলল— বাবার খাওয়া প্রায় হয়েই এসেছিল, দ্যাখ একটা মাত্র লুচি পড়ে আছে, বাটিতে একটাই আলুর দম। মা, এবার তোমার পাখির আহার নিয়ে এসো, ছোড়দাও এসে গেছে।

—আমার একটু পড়া আছে মা, উঠি? একটু পরেই ফিনকি উঠে গেল। তখন মা, একটু ইতস্তত করে বললেন— সমু, কানাডার কথা ও কী বলছিল!

—দাদুর বাক্সে কাকার চিঠি পেয়েছি কতকগুলো। উনি ওকে নিয়ে যেতে চাইছেন।

—ও কি জানে?

—না। আমার মনে হয়েছিল অফারটার কথা ওকে জানানো দরকার। ওটা ওর প্রাপ্য মা।

—ঠিকই বলেছ। ওটা ওর প্রাপ্য— কথাগুলো কেমন মন্ত্রের মতো আউড়ে গেলেন মা। মা'র মুখ সাদা হয়ে গেছে। থালার ওপর একটা হাত, থেমে গেছে।

—ও অফারটা নিতে চায়নি মা। ওর ধারণা, হয়তো ঠিক ধারণাই। যে কাকা এখন একটু বিপাকে পড়েছেন, তাই-ই নিয়ে যেতে চাইছেন।

—তা হলে বলল কেন?

—হয়তো বাবাকে ভয় দেখাতে।

—কিন্তু ও যদি জানতে পারে আসল কথাটা ও তো রাগ করতে পারে আমাদের ওপর। তখন? তা ছাড়া নবকুমারের অধিকারটা তো বেশি বটেই।

—মা, সেই আসল কথাটাই এখন নকল হয়ে গেছে। অবান্তর। ওগুলো বলার ভাবার কোনও প্রয়োজন নেই। আর অধিকারের কথা যদি বলো— ফিনকির আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে। এখন ডিসিশন ওর। একটু খেয়ে বলি— যেমন চলছে চলতে দাও। ভেবো না।

—না, ভাবব আর কী! আমার ভাবনার কী-ই বা মানে?

১০

দাদু মারা যাবার পর আমার ঘাড়ে অতিরিক্ত বোঝা চেপেছে, তবু আমার কী রকম হালকা লাগে। কেন আমি বুঝি না। দাদুই ছিলেন আমার একমাত্র বন্ধু। দাদুকে যা বলতে পারতুম, অন্য কাউকেই তা পারতুম না। ঘোর বন্ধন একটা। হস্টেল থেকে বাড়ি আসতুম, শুধু ফিনকির জন্যে নয়, দাদুর জন্যেও। দাদুকে বুঝিয়ে দিতুম না। আমার প্রকাশ চিরকালই কম। তবু দাদু হয়তো বুঝতেন, তাঁর প্রকাশ বেশি, কিন্তু তিনিও আমাকে কোনওদিন বুঝতে দ্যাননি যে তিনি আমার টান বুঝেছেন। আর যেহেতু দাদু পুরো পরিবারটার ভাল-মন্দের সঙ্গে অমন নিবিড় ভাবে যুক্ত, তাই দাদুর আগ্রহগুলোতে অংশ না নিয়ে আমি পারতুম না। আর এমনই অন্তর্দৃষ্টি ছিল ওঁর আমাদের বিষয়ে! কী যেন বলেছিলেন দাদার বিষয়ে— ওর কাছ থেকে বিশেষ কিছু আশা কোরো না! কী যেন বলেছিলেন আমাকে— হেরোইন খেয়ে, খারাপ পাড়ায় যাবার পর!—তুমি বড়ো হয়ে গেছ। আর ফিনকি? ফিনকিই একমাত্র আশা তোমাদের। আমাকেও কি উনি ডিসমিস্ করে গিয়েছিলেন? তা হলে শেষ কথাগুলো কেন

আমাকে বললেন? আর কেউ বলবার ছিল না, অথচ কথাগুলো বলা দরকার ছিল বলে?

এখন কথাগুলো, দাদুর সে সময়কার আচরণ মনে মনে তোলাপাড়া করি, মেট্রো রেলের কাজ হচ্ছে। সাইটে আছি। ক্রেন, থিয়োডোলাইট, মিক্সার, স্তূপীকৃত স্টোন চিপস্ ও অজস্র শ্রমিকের মাঝখানে খোঁড়া গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। একটানা আওয়াজ, আমি হঠাৎ বুঝতে পারি ঘটনাটা। দাদু জীবন সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এটা কোনও মান-অভিমানের প্রশ্ন নয়। বাড়ির সকলের উদাসীনতা আত্মপরতার শূন্যতা দাদু নিজের প্রবল আসক্তি দিয়ে সারাজীবন পূর্ণ করে গেছেন। ওঁর মনে হত উনি ছাড়া আর কোনও কাণ্ডারী নেই। ওঁর দাদারা মৃত, দুই বিধবার বিপুল ভার, বড় ছেলে উন্মাদ, তার সমস্ত দেখাশোনা ও আর্থিক দায়িত্ব আর কেউই তো নিতে চায়নি। ভালবাসার সঙ্গে আসে কর্তব্যবোধ। তিনি করেছিলেন, মেজ ছেলের কোনও দায়িত্ববোধ ছিল না। অথচ পরিবার বলতে যা বোঝায় তা তো তাঁরই। ছোট ছেলে স্রেফ চুপচাপ পালিয়ে গেল। পরের প্রজন্মে দাদা অবিকল কাকার পথ অনুসরণ করল। এদের সবাইকার প্রেমহীনতার উল্টোদিকে তাঁর প্রবল ভালবাসা, নিঃশব্দ, নির্বিচার, কিন্তু সবসময়ে সক্রিয়। এই আসক্তিই জীবন। জীবনকে আঁকড়ে ছিলেন তিনি। একদিন কার জাদু ছোঁয়ায় খসে পড়ল আসক্তি। মৃত্যুর আগে যদি এই নিরাসক্তি না আসে তা হলে জীবন ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট! শেষকালটায় তাই দাদুর হৃদয়ে আমরা কেউ, আমাদের কোনও সমস্যার জড় আর ছিল না। আমি ব্যাপারটা টের পেয়েছিলুম। পুরোপুরি বুঝতে পারিনি যদিও। আমার মনে হচ্ছিল— দাদু হঠাৎ বদলে গেছেন, এই বদলটা শুভ নয়। কিন্তু সেই রাতে ওঁর ঘরে আমার থাকায়, হয়তো নয়-নয় করেও কিছু ভাবনা-চিন্তা ওঁর নিরাসক্ত মনে বুদবুদের মতো ভেসে উঠেছিল। আমি না থাকলে বলতেন না। ছিলুম বলেই জোর করে পরলোক থেকে ফিরে এসেছিলেন। অর্থাৎ দাদু আগেই মারা গিয়েছিলেন।

আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আমার একেবারে বনে না। তার মানে যে ঝগড়া তা নয়। আমি বাইরের আচরণে সৌজন্য, ভদ্রতা সব সময়ে বজায় রাখি। কিন্তু এদের বেশির ভাগই এত ধড়িবাজ, এত পরশ্রীকাতর এবং আদিরসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত যে এদের সঙ্গ আমি আদৌ সইতে পারি না। আমি জানি এরা আমাকে নিজেদের মধ্যে উন্নাসিক বলে। আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমারও তো ওদের খুব অপূর্ণ লাগে। যেন কোন ফসিল-স্তরে আটকে আছে।

আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার, আমার সমগোত্র আরও জনা সাতেক আছে। কেউ কেউ সামান্য বড়। তিনজন মহিলা আছেন, এঁদের এরা অসম্ভব বিরক্ত করে। এদের মধ্যে একজন দীপা বেশ একটু রোখা টাইপের। অন্য দুজন জয়ন্তী আর মুকুলিকা চুপচাপ সব হজম করে যায়। এরা সকলেই আমার ব্যাচমেট। তবে অন্য কলেজের। দীপা ছাড়া।

একদিন জয়ন্তী জিজ্ঞেস করল— আপনি পুলককে চেনেন?

আমরা তখন অফিসার্স ক্যানটিনে খাওয়া সারছি। লাঞ্চের পরে আবার ফিরে যেতে হবে চৌরঙ্গিতে। কাজের হিসেব-পত্র নিয়ে অফিসে ফিরতে হবে। এবং রিপোর্ট। চিফ এঞ্জিনিয়ারের কাছে রিপোর্ট জমা দেবার পর অন্য কোনও কাজ না থাকলে ছুটি।

জয়ন্তীর কথায় আমি হুঁশে ফিরে আসি— পুলক? নিশ্চয়ই। আজীবন আমার ক্লাস-মেট।

—আমার কাজিন।

কোথাও থেকে কেউ বলল— কী পুলক!

জয়ন্তী ডাকল বাকি দুজনকে— দীপা, মুকুল, এদিকে এসো।

আমার টেবিলেই বসল এসে তিনজনে।

দীপা বেশ চড়া গলায় বলল— এখানে বোধহয় বসা যায়, তুমি ঠিকই ধরেছ জয়ন্তী। ইঁদুরের গর্ত-টর্ত নেই।

—বেড়াল আছে— আবারও কেউ বলল।

—ওসব কথায় কান দেবেন না, আমি নিচু গলায় বলি।

—ফিগার ভাল, চৌত্রিশ চৌত্রিশ চৌত্রিশ।

—দেখছেন তো। এতটুকু স্বস্তি দেবে না।

—ইগনোর করুন। কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

—ধ্যাৎ, ঠিক বলিসনি। বাস্টের তফাত আছে, ছত্রিশ তো নিশ্চয়ই, চল্লিশও হতে পারে।

—আমার তিরিশ হওয়াও অসম্ভব নয়।

প্রত্যেকে খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে কথাগুলো বলছিল। কেউ ধরতে পারবে না, দীপা বলল—তুমি বোধহয় আমায় চিনতে পারছ না সমুদ্র, আমি কিন্তু বি.ইরই। এই জাতীয়রা ওখানেও আমার জীবন অতিষ্ঠ করে দিয়েছে।

আমি দীপাকে চিনতুম ঠিকই। দূর থেকে দেখা এক জটলা গাছের মতো। একটা থেকে আরেকটা আলাদা করা যায় না।

বলি— চিনেছি বই কী! কিন্তু সেরকম আলাপ-পরিচয় তো ছিল না!

—সে কী? চেনা ছিল না? জয়ন্তী অবাক।

আসলে, মেয়ে ছিল মোটে চার-পাঁচজন। নিজেদের মধ্যে থাকত একটু ডাঁট নিয়ে। ইলেকট্রনিক্স, আর্কিটেকচার-এ ওদের দুগুণ, তিনগুণ, কিন্তু সিভল-এ সংখ্যা এরকমই।

—চেনবার মতো চাঁদমুখ থাকলে তো চিনবে। ওদিক থেকে মন্তব্য এল।

দীপার মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। হাত দুটো মুঠো করা।

—নো একসাইটমেন্ট প্লিজ— আমি আস্তে বলি।

—আসলে কী জান, গাঁইয়া তো। শহুরে মেয়ে দেখেনি। বুঝলে সমুদ্র, এখনও রিপোর্টে বানান ভুল করে। বাজে অসভ্যতাগুলোই ছিল ওদের ডিফেন্স।

জয়ন্তী বলল— আমাদের যাদবপুরে গোড়ায় গোড়ায় একটু টিজিং হত বটে, তবে কিছুদিন পরই আর ফারাক থাকত না।

মুকুলিকা বলল—আসলে কী জান...অনেকেই ফার্স্ট জেনারেশন লিটারেট।

আমি বেগতিক দেখে উঠে পড়ি, বলি— আমাকে এক্ষুনি সাইটে যেতে হবে, নিচু গলায় বলি—তোমরাও প্লিজ বেরিয়ে এসো।

পরদিন পুরো দলটা আমায় ধরল।

—সেন, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন?

—আমার যাত্রা একদম ভাল লাগে না। থিয়েটার সিনেমা বরং পছন্দ হয়। শম্ভু মিত্র আর একবার দেখতে বলো দেখব। কিংবা সত্যজিৎ রায়-তপন সিনহা। এনি থিং।

—ফান বই তো কিছু না, সিরিয়স কিছু তো না!

—দেখো অনিন্দ্য নিজেকে নিয়ে মজা করো কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু অন্যকে নিয়ে ফান ...এসব ছেলেমানুষি অসভ্যতার অভ্যেসগুলো তোমাদের ক্যাম্পাসের ফার্স্ট ইয়ারেই ফেলে আসার কথা। ইটস ভেরি ভেরি আনফর্চুনেট ইফ ইউ ডোন্ট।

—এটা শুধু মজা নয় সেন, তুমি চিন্তা করো চাকরির এই বাজারে, এত খরচ করে খেটেখুটে পাশ করছি। ওদের কী রাইট আছে আমাদের চাকরিগুলো এইভাবে বাগিয়ে নেবার? —বিজিত বলল।

—ওরা খেটেখুটে খরচ করে পাশ করেনি বলছ?

—দরকারটা কী! সিটটা আটকাচ্ছে তো! বিয়ে করলেই তো ওদের হিল্লে হয়ে যাবে। আমাদের? আমাদের হবে? সেই তো শ্রাবন্তী বলে মেয়েটা বিয়ে বসে গেল। সে তো মাঝপথে? থার্ড ইয়ারে গিয়ে ছেড়ে দিল! একটা ছেলে তো পেতে পারত সিটটা। ছেলেদের ফ্যামিলি দেখতে হয়।

—অনেক সময়ে মেয়েদেরও ফ্যামিলি দেখতে হয় কিন্তু, তুমি দুটোর তফাত কী করে করবে। যে চাকরি দেবে সে যোগ্যতা দেখে দেবে, প্রয়োজন দেখে কক্ষনও দেবে না। ওই জায়গাটায় বরঞ্চ আন্দোলন করলে একটা কাজের কাজ হয়।

—হুঁঃ আন্দোলন! আমরা ওদের লাইফ হেল করে দেব, তাড়াব।

—চেষ্টা করো। ওরা যদি কমপ্লেন করে তা হলে কিন্তু আমি সঠিক সাক্ষ্য দেব।

—ওরা ফিল্ড ওয়ার্ক করতে পারবে? ওদের দেখবে বেশির ভাগ ডেস্ক জব দেওয়া হবে এর পর।

—কিন্তু ওয়ার্ক তো করছে বলেই জানি। আর যদি মেয়েদের শুধু ডেস্ক জব দেওয়া হয়, তখন আপত্তি কোরো। এগুলো কোরো না। এগুলো ঠিক নয়। তোমার বোন কিংবা বউ যদি এই জায়গায় থাকত, তা হলে কিন্তু করতে না।

—ওরা চিফদের পটায়, স্রেফ মেয়ে বলে সুবিধে আদায় করে।

—সেইজন্যেই আরও বলছি কমপ্লেন হলে তোমাদের চাকরি যাবে, খামোখা।

খুব ঠান্ডা গলায় কথাগুলো বলে চলে এলুম। আমি একা ওরা পাঁচজন, ইতিমধ্যেই উন্নাসিক, ডাঁটিয়াল বলে নাম কিনেছি। একটুও উত্তেজিত হইনি আজ। কে আমার ভেতর থেকে কথাগুলো বলল? আমার মনে হল— আমি বলিনি। দরকারের সময়ে, আমার ভেতর থেকে কেউ শীতল যুক্তি সাজায়, তেমন তেমন হলে বৌদ্ধিক প্রতি-আক্রমণ। এই ক্ষমতাটা আমার ছিল বলে আমি জানতুম না। আমি একলা, ভিড় অপছন্দ করি, অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারি না, বলতে কি পুলক দুর্গাপুর চলে যাওয়ার পর আমার একজনও বন্ধু নেই। এ ধরনের অমিশুক লোকেরা একটু পাশ-কাটানো, ভিতু ধরনেরও হয়। আমি তাহলে তেমন নই? নার্ভ নেই আমার, না কী? স্নায়ুকোষ দিয়ে কোনও উদ্দীপক মাথায় পৌঁছয় না? হরমোন বেশি নেই? অ্যাড্রিন্যালিন? আমার ব্রেন সেল গুলো কী অন্যরকম?

দাদার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতেও এই শীতলতা, বা শীতল যুক্তিবোধ আমায় সাহায্য করেছিল। দাদা দাদুর শ্রাদ্ধে এসেছিল। উপস্থিত ছিল, কিছু টাকাও দিয়ে যায়। আমি দিল্লি থেকে ফিরে আসার দিনকয়েক পরেই ওরা রেজিস্ট্রি করে। কিন্তু সোনু আসেনি. বা দাদুর মৃত্যুর পরও ওদের দিক থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক সান্ত্বনা বাক্যও না।

বাবা উপোস করতে পারবেন না, তাই কাজটা আমাকেই করতে হল। শেষ হলে, একেবারে বিকেলবেলায় অতিথি-অভ্যাগতরা চলে গেলে খুব ক্লান্ত লাগল। অশৌচপালন, লোকের বাড়ি গিয়ে গিয়ে আমন্ত্রণ। শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা সব করা। পুরোহিত মশায় কিছু আনলেন, কিছু আমাকেই আনতে হল। হালুইকর বামুনের বন্দোবস্ত। সেখানেও বাজারের ঝামেলা। নিজের ঘরে চুপ করে শুয়ে আছি, দাদা ঢুকল। ওর একানে তক্তপোশ এখনও ওধারে। আজকে এক রকম বেড-কভার বালিশ দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে ফিনকি।

—তুমি... তোমরা...বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছ সমু। বলতে বাধ্য হচ্ছি।

আমি শুধু তাকাই।

—মানে, এই সবের তো কোনও মানেই হয় না। এ তো টাকার শ্রাদ্ধ...

—টাকার শ্রাদ্ধ না দাদুর শ্রাদ্ধ...

আমি আমার কথা অসম্পূর্ণ রেখে দিই।

—টাকাটা যদি দাদুর চিকিৎসায় খরজ হত, তা হলে কিছু বলার ছিল না, কিন্তু এই ভূত ভোজন...

—প্রচলিত রীতি-নীতির কিছু তো আমাদের মানতেই হয় দাদা। জীবিতকালে দাদুর চিকিৎসায় যে খরচ করতে হয়নি, সেটা আমাদের ভাগ্য, কিন্তু শ্রদ্ধা জানাবার এই রীতিই চালু। কী করা যাবে!

—একটা উচ্চশিক্ষিত ছেলে হয়ে যে তুমি কী করে অন্যের কথায় চলো। অন্যের মতামতকে একটা গুরুত্ব দাও!

—তুমিও তো তাই করছ, অন্যের মতে চলছ।

—কী ভাবে?

—মজা হচ্ছে তুমি হয় সেটা জানই না আর নয়তো সেটা মানছ না। না মানাটা বুদ্ধির পরিচয় নয় দাদা, আর যদি না মানো, তা হলেও সেটা খুব পৌরুষের লক্ষণ বলতে পারি না। তুমি অরোরাদের কাছে তোমার আত্মা বিক্রি করে দিয়েছ দাদা। তারা তোমাকে যেভাবে যা করতে বলছে তুমিও তাই করে যাচ্ছ, খুব সম্ভব ইজি লাইফের লোভে। এভাবে যদি নিজের অসম্মান করো, অন্যের মানে এমনকী অরোরাদের সম্মানও তুমি পাবে না।

—একদম বাজে কথা বলছ সমু না জেনে। দে আর ভেরি ভেরি কনসিডারেট। আমাকে এখানে ওরাই আসতে বলেছে, ইনফ্যাক্ট যে টাকাটা দিলুম সেটা সোনুই হাতে গুঁজে দিয়েছে।

—এই তো প্রমাণ হয়ে গেল, তুমি নিজেই প্রমাণ করে দিলে,—আমি হাসি,— যে ওরা যা বলছে তুমি তাই করছ। ভাল হোক মন্দ হোক সিদ্ধান্তটা ওদেরই। আর টাকাটা যদি বউদির হয় তা হলে... দাদা ওটা আমি ফেরত দিতে বাধ্য। এই নাও, আমি ড্রয়ার খুলে নোটের বান্ডিলটা দাদার দিকে এগিয়ে দিই।

দাদা রাগে লাল হয়ে গেছে— তুমি আমাকে এভাবে অপমান করতে সাহস করো!

—তুমি যে নিজেই নিজেকে অপমান করলে! সোনু টাকাটা দিয়েছে বললে! মানে যে সোনু বা অরোরা ফ্যামিলি দাদুর মৃত্যুতে একটা চিঠি দিয়েও সহানুভূতি জানানো দরকার মনে করেনি, সে। তারা। তাদের টাকা দাদু কেন নিতে যাবেন? আমিই বা কেন নেব? দাদা ঠান্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখো বুঝতে পারবে, তোমার টাকায় আমাদের ষোলো আনা অধিকার, কিন্তু ওঁদের টাকা হল ভিক্ষার মতন, ওটা নিতে পারি না।

—এর পরে কিন্তু আমার থেকে আর কিচ্ছু আশা কোরো না সমু। দাদা এখনও লাল, কিন্তু ওর ফোঁসানি বন্ধ হয়ে গেছে।

—আশা করব না দাদা, দাবি করব। খুব অনুত্তেজিত ওঠাপড়াহীন গলায় বলি। যে দাদু তোমাকে পালন করেছেন, যে মা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, যে দিদা মায়ের সঙ্গে তোমাকে বড় করেছেন, যে বাবা তোমার লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছেন, যেখানেই যাও তাঁদের সবাইকার ন্যায্য দাবি আছে তোমার ওপরে। তুমি সেটা এড়িয়ে যেতে পারো, কিন্তু দাবিটা সত্যিই থাকে, থাকবে।

দাদা চলে গেল, মাকে প্রণাম করল, দিদাদের প্রণাম করল, তাঁদের কান্নার জবাবে শুকনো চোখে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, বাবার পায়ের দিকে একটু নিচু হল, এবং ফিনকি যখন সেই ছোটবেলার মতো দাদাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল, দাদা হঠাৎ বোকার মতো বলল— দিল্লির চটি, না? লাল, সবুজ? ফিনকি মজা পাওয়া হাসি হেসে বলল— দুৎ, ওসব চটিফটি আমার চাই না। তুমি বউদিকে নিয়ে আসবে এবার।

ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে, আমি দাদার স্যুটকেসটা বুটে ভরে দিয়েছি, ড্রাইভারের পাশের আসনে বসেছি। ডাক দিলুম— তাড়াতাড়ি এসো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সারাক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে দিয়ে দাদাকে তার এ.সি কোচে তুলে দিলুম। একটু বসলুম— দাদা পকেট থেকে টাকার খামটা বার করে বলল— বিশ্বাস করো সমু। এটা আমারই টাকা। তোমার ইমপ্রেশন যাতে ভাল হয় তাই সোনুর নাম করেছিলুম। ওরা কি অত জানে টাকা ফাকা দেওয়া না দেওয়ার কথা? দে বিলং টু অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড, নেবে না?

আমি হাত বাড়িয়ে নিই।

—মাকে দিয়ে এলেই পারতে, ভাল হত।

—মা! ঠিকই! কিন্তু মা এত এত ডিসট্যান্ট, কীরকম অপর-অপর, তোমাকেই আমার সবচেয়ে কাছের মনে হয়। প্লিজ!

—ঠিক আছে, আমি মাকে দিয়ে দেব— আমি হেসে বলি, এটা মায়েরই প্রাপ্য। রাইট?

—তুমি যা মনে করো!

সত্যিই বলছি আমার কিন্তু কোনও আত্মবিশ্বাস ছিল না। আত্মবিশ্বাস ব্যাপারটা নিয়ে মাথাটাথাও ঘামাইনি কোনওদিন। যে অবস্থায় যা করেছি বলেছি একেবারে তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রত্যেকবার এরকম ঘটে আর পরে ব্যাপারটার কথা মনে করে আমার অবাক লাগে। এগুলো কী? কোথা থেকে আসে? এগুলোর সঙ্গে আমার চেতনার কোনও যোগ নেই তো! বুদবুদের মতো ওঠে, বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায়। কিন্তু নিটোল বর্ণালি এক একটা। যা কিছু শিখছি সারাজীবন ধরে, করছি, বলছি কোনওটার সঙ্গেই আমার ভেতরের কোনও আদানপ্রদান নেই। মাঝে মাঝে, খুব মাঝে মাঝে কিছুর প্রতিক্রিয়ায় একটা শক্তিশালী অনুভূতি আমাকে অধিকার করে বটে। রাগ, বেশির ভাগই ক্রোধ, কখনও কখনও কাম। কিন্তু আবার ফিরে যাই। কোথায় যাই? ভেবে দেখতে গেলে কোথাও না। কোনও দুশ্চিন্তা আমার আসে না। খারাপ বা খুব আহ্লাদে মেজাজে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। কোন আমিটা সত্য, এই দাদাকে, সহকর্মীদের উচিত কথা শুনিয়ে দেওয়া লোকটা, না সেই লোকটা যে কোনওরকম ভার বোধ না করে জীবনের যাবতীয় দায় পালন করে যায় এবং যে ঘুমের মধ্যে জেগে ওঠে, পার হয়ে যায় সীমান্ত, উড়ে চলে যায় দিক-দিশাহীন শূন্যে, এবং পায় সেই আহ্লাদ যা জেগে জেগে কখনও কোনও সফলতার সময়েও সে পায়নি!

সুতরাং আমি দাদাকে চলে যেতে দেখি। প্রায় কোনও অনুভূতি ছাড়া। ট্রেন ছেড়ে দিল। আমি ওকে আর দেখতে পাচ্ছি না, ওর কিন্তু আমাকে দেখতে পাবার কথা। দাদা কি দেখছে? নাকি এখনই বহুদূর চলে গেছে, গ্রেটার কৈলাস, অরোরাদের জগতে! দেখুক না দেখুক আমি হাত নাড়তে থাকি, যতক্ষণ না ট্রেন প্ল্যাটফর্মের সীমা পার হয়ে চলে যায়, আমার উত্তোলিত হাত একটা আলিঙ্গন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যাই ভাবুক দাদা রূঢ় ভাবতে পারবে না কিছুতেই। দু এক বছরের তফাতে এই দেখা-সাক্ষাৎ একটাও লাবণ্যময় হল না। আমার মধ্যে কোনও তিক্ততা নেই। দাদার মধ্যে যদি থাকে, যদি তৈরি হয়, তা হলে সেটা দাদার জীবন-যাপন, তার মন, তার সিদ্ধান্ত থেকেই উঠে এসেছে। এই তিক্ততার একটুও আমি নিলুম না। সুতরাং সবটাই দাদার কাছে ফিরে যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে মাকে টাকাটা দিই। তার পেছনের দীর্ঘ ইতিহাস, দেওয়া-নেওয়া-ফিরিয়ে দেওয়া-আবার নেওয়া সেসব কিছুই আমি বলিনি। মা টাকাটা আমারই হাতে দিয়ে বলেন— খরচ মিটিও।

—সে সব হয়ে গেছে। তুমি যা বুঝবে কোরো।

১১

একই পুলকারে আমি আর জয়ন্তী ফিরছি আজকাল, অনিন্দ্য আর সুমিতকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা আমাকে যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউয়ে নামায় তারপর জয়ন্তীকে নিয়ে চলে যায় পাইকপাড়া। শেষ নামিয়েছি সুমিতকে ওয়েলিংটন। জয়ন্তী বলল— তুমি কি মন্ত্র জানো?

—আমি?

—ওদের র‍্যাগিং থেমে গেছে।

—আমি তো বলেই ছিলুম কিছুদিন যেতে দাও আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

—উঁহু, তোমার এতে কোনও ভূমিকা আছে। জানো, ওরা আমাদের বাড়ির খোঁজখবর করছিল!

—কী রকম?

—অনিন্দ্য আর আমি দুজনেই কালীঘাট সাইটে যাচ্ছি কদিন, অনিন্দ্য হঠাৎ বলল— যা হয়ে

গেছে তার জন্যে কিছু মনে করবেন না। ওসব জাস্ট ফান। তারপরে বাড়িতে কে কে আছেন, কে কী করেন জিজ্ঞেস করছিল।

—তুমি কী বললে আমিও একটু শুনে রাখি।

জয়ন্তী হাসল, বলল— বলি আর কি! তারপরে সে ডেটাগুলো নিয়ে আবার কী করবে কে জানে?

—ও অফেন্স নিল না?

—আমি কি ওকে বলেছি যে বলব না। আমি বেশ ভালমানুষের মতো মুখ করে কতকগুলো উল্টোপাল্টা বকে গেলুম। বাবা রিটায়ার্ড স্কুল-টিচার, মা এখনও রাইটার্সে চাকরি করেন, ছোট ভাই আর্টস নিয়ে পড়ছে স্কটিশ চার্চে।

—সব মিথ্যে?

—সব নয়। আমার বাবা বেঁচেই নেই। অনেক দিন চলে গেছেন। মা স্কুলে হেডমিস্ট্রেস, কাছেই স্কুলটা, ছোটভাই পড়ছে, তবে এঞ্জিনিয়ারিং, খড়্গপুর আই.আই.টি-তে।

ওদের ছেলেমানুষিতে আমার হাসি পেয়ে যায়। অনিন্দ্য কেন কথাটা জিজ্ঞেস করেছে আন্দাজ করতে পারি। সেদিন বলেছিলুম অনেক মেয়েদেরও সংসার চালাতে হয়, তাই গোয়েন্দাগিরি করছে। আর জয়ন্তী স্রেফ সত্যি কথা ওকে বলবে না বলেই মিথ্যে বলেছে।

—একটা সুবিধে এই যে আমি চাকরিটা পেয়ে গেলুম, তখন আমার ভাই ঢুকল। মায়ের ওপর না হলে প্রচণ্ড চাপ পড়ত। —জয়ন্তী যোগ করে।

তা হলে আমার তির লক্ষ্যভেদ করেছে ঠিকই! সাধারণভাবে বলেছিলুম। সেটা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে মিলে গেল।

—একদিন আমাদের বাড়ি যাবে?

—গেলেই হয়। কেন?

—এমনি, পুলক খুব তোমার কথা বলত। ও তোমায় খুব অ্যাডমায়ার করত। মা তোমার কথা শুনে দেখতে চায়। পুলকের বন্ধু!

—বলে কী! পুলক আমার অ্যাডমায়ারার? সর্বক্ষণ তো বকত আমাকে, উঠতে বসতে জ্যাঠামশাইয়ের মতো ধমক। ও তো আমাদের পাড়াতেই থাকে, মানে ওর ফ্যামিলি, ও দুর্গাপুরে এখন। কী রকম কাজিন তোমার? যাও না?

—আগে খুব যেতুম। আমার মায়ের মাসতুতো বোন ওর মা।

—মাসতুতো মাসতুতো?

—ঠিক, জয়ন্তী হাসল। হাসলে ওর মুখটা খুব ঝলমলায়।

—যাক ঠিক হয়েছে তবু। আমি আবার এগুলো খুব গুলিয়ে ফেলি। আমার বোনের এরিয়া এটা।

—তোমার বোন?

—হ্যাঁ ফিনকি। ও হিস্ট্রি নিয়ে পড়ছে। ওর ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে ছিল। আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারিনি।

—ডাক্তারি থেকে হিস্ট্রি? খুব দূর হয়ে গেল না?

—ও তো বলে—না। ডাক্তারিটা পড়তে চাইছিল একটা ইন্টারেস্ট থেকে, হিস্ট্রিটা আবার একটা আলাদা ইন্টারেস্ট। খুব প্র্যাকটিক্যাল মেয়ে।

—প্র্যাকটিক্যাল না হয়ে আর উপায় কী বলো। জয়ন্তী যেন একটু নিশ্বাস গোপন করল— তোমার বোন ডাক্তারি পড়তে চেয়েছিল, তোমরা পড়াতে পারনি, আমার ম্যাথ্‌স্ নিয়ে পড়বার ইচ্ছে ছিল, মাকে ছুটি দিতে হবে, ভাইকে পড়াতে হবে বলে এটাই পড়তে হল। তাড়াতাড়ি ভাল মাইনের চাকরি পাওয়া যায়।

আমি চুপ করে থাকি।

—অথচ...একটু ইতস্তত করে জয়ন্তী বলল— পরে ভাই কিন্তু এটা মনে রাখবে না!

আমিও অভিজ্ঞতা থেকে জানি এইরকমই হয়, একেবারে এইরকম। কেউ সিঁড়ির পেছনের ধাপের দিকে ফিরে চায় না। নিজেদের কর্তব্যের কথা মনে রাখে না। মনে করে সে স্বয়ম্ভু। তার কেরিয়ার স্বয়ম্ভু। দাদু মাকে বলেছিলেন বাবলার থেকে তুমি বেশি কিছু আশা কোরো না। আমাকে বলেছিলেন ফিনকিই তোমাদের একমাত্র আশা।

তবু জিজ্ঞেস করলুম— এ রকম মনে হচ্ছে কেন তোমার? সবে তো ঢুকেছে। এখনও যাকে বলে ছেলেমানুষ।

—ও ঠিক বোঝা যায় সমুদ্র, একেক জন ছেলে দেখবে একটু বড় হওয়া মাত্র প্রচুর বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে ফেলবে। আমাদের বাড়িতে মা আর আমি দুজনেই মেয়ে। কিন্তু ও ক্রমাগত একটা ম্যাসকুলিন ওয়ার্ল্ডে হারিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না এটা একটা উল্টো প্রতিক্রিয়া কি না।

আমি ভাবি। আমরা দুই ভাই চিরকালই পুং-জগতে ছিলুম। মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়নি। দাদু, দাদু, দাদু। ফিনকিই একটা ফুলকির মতো আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ত। কিন্তু আমাদের বর্ম কোনওদিন ভেদ করতে পারেনি। দাদার তো নয়ই, আমারও না। অথচ ফিনকি আমার খুব কাছাকাছি।

একদিন জয়ন্তীর সঙ্গে চিলড্রেন্স পার্কে যাই। চারদিকে খেলা হচ্ছে, ফুটবল, ক্রিকেট। আরও বাচ্চারা স্রেফ বল ছোড়াছুড়ি করছে। খুব প্রাণচঞ্চলতা আমাদের চারিদিকে। চুপ করে বসে থাকি।

জয়ন্তী বলে— আচ্ছা সমুদ্র, তুমি কি চিরকালই এই রকম ইনট্রোভার্ট?

আমি হাসি— কেউ কি হঠাৎ ইনট্রোভার্ট বা এক্সট্রোভার্ট হয়ে উঠতে পারে? ব্যাপারটা জন্মগত, স্বভাবগত বলেই তো জানি।

—তোমার কী ভাল লাগে বলো তো? ধরো খেলা, মুভি, থিয়েটার, গানবাজনা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা।

—ওই শেষটা ছাড়া সবই।

—আড্ডা ভাল লাগে না, এমন ইয়াং ম্যান আমি তো দেখিনি। কেন বলো তো!

—সেটা তো ভেবে দেখিনি। তবে জিজ্ঞেস করছ যখন তখন একটু ভাবা যেতে পারে। একটু ভাবি তারপর বলি— বহুজন মিলে হই-হল্লা করছে, উল্টোপাল্টা গপ্পো মানে গসিপ, কেচ্ছা—এগুলো বোধহয় আমার ঠিক...আসলে আমি বোধহয়, আমি বোধহয় একটু বুড়োটে টাইপ বুঝলে!

জয়ন্তী হেসে খুন। সেই মুহূর্তে। জয়ন্তীর সেই মজা পেয়ে হাসতে থাকার মুহূর্তটা আমার হঠাৎ খুব ভাল লেগে যায়। হঠাৎ যেন আকাশময় হালকা রোদ ছড়িয়ে পড়ল দীর্ঘ বর্ষার পড়ন্ত বিকেলে। একটু আগেও যেখানে বিশ্রী পুরনো কালির দাগের মতো মেঘ ছিল ছাপকা ছাপকা হঠাৎ সে সব অদৃশ্য। মেঘ গলিয়ে দিয়ে শেষ বেলার সূর্য, শান্ত গর্বে হাসছে। আমি আছি, এখনও আছি।

—হাসছ কেন? আমি বোধহয় একটু গোমড়ামুখোও, কী হবে বলো তো?

ওর হাসি বেড়ে গেল। হাসতে হাসতেই বলল— উঃ নিজেকে কেউ বুড়োটে বলে, গোমড়ামুখো বলে—আমি, আমি এই প্রথম দেখলুম।

—সত্যি কথাটা স্বীকার করে নেওয়াই তো ভাল, অন্য কেউ আবিষ্কার করার আগে।

আবার হাসি। তারপর কোনওমতে হাসি থামিয়ে বলল— আমি কী রঙের শাড়ি পরেছি বলো তো! না দেখে, সামনের দিকে চোখ রেখে বলো, এই একদম টেরিয়ে তাকাবে না কিন্তু। নো চোট্টামি।

—নীল—

—হল না, হয় তুমি কিচ্ছু লক্ষ করো না, আর নয় তুমি রং কানা। বেশির ভাগ ছেলেই অবশ্য সবুজকে নীল, নীলকে সবুজ বলে, খেয়াল করেছ? কেন বলো তো।

—এ খবরটা তো আমি জানতুমই না, কী করে বলব? আমার চিরকালই ধারণা নীলটা হল নীল আর সবুজটা হল গিয়ে সবুজ।

জয়ন্তীকে আজ হাসিতে পেয়েছে। বলল, তুমি কবিতা পড়ো?

—খুব কম।

—কবিরা অনেক সময়ে ঘাসকে নীল বলে থাকেন। তবে সবুজ আকাশ আমি এখনও পড়িনি। তুমি পড়েছ? যদি চোখে পড়ে তা হলে আমাকে বলবে তো, আমার থিয়োরিটা একেবারে কাঠ-সত্যি প্রমাণিত হয়ে যাবে। তুমি হয় খুব মন দিয়ে কিছু করো। নয়তো একেবারে আনমনা, মানে মনোযোগ আছে কিন্তু অন্য কোনও কিছুতে।

—তুমি তো আমাকে রীতিমতো স্টাডি করেছ দেখছি। আর কোন বিষয়টা জানলে আমার সম্পর্কে তোমার থিয়োরিটাও কাঠ-সত্যি বলে প্রমাণিত হবে বলো তো! —আমি মজা পেয়ে থেমে ওর মুখের দিকে তাকাই। জয়ন্তীর মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেছে।

আমি নিজেও এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যে অপ্রস্তুত হয়ে যাই। ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটাতে মাথা চুলকোতে থাকি।

—থ্যাংকিউ সমুদ্র, দীপা হাত বাড়িয়ে দিল। কেন আমি বুঝতে পেরেছি, তবু জিজ্ঞেস করি—কী ব্যাপার?

—তোমার আসলে মার্কেটিং-এ যাওয়া উচিত। কিংবা এমব্যাসিতে।

—কেন?

—জানো না? ডিপ্লোম্যাসিতে এ প্লাস। কাউকে কোনওরকম ভাবে অফেন্স না দিয়ে অপ্রিয় সত্যগুলো বুঝিয়ে দেওয়া, সমালোচনা করা, এগুলো পারতে হলে বিশেষ ক্ষমতা থাকতে হয়। মাগনা হয় না।

—কাকে কী বুঝিয়ে দিলুম আবার?

—এই তো চ্যাংড়াগুলোকে? দিব্যি সামলে দিয়েছ।

—কী করে জানলে?

—জানতে হয়, তোমার যেমন ডিপ্লোম্যাসি আছে আমারও তেমন একটা থার্ড আই থাকতে পারে।

দীপা মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। তারপর বলল—

বি.ই. কলেজে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে এলে আওয়াজ খেতে। এখন তো আর সে পরিস্থিতি নেই। আফটার অল আমরা ক্লাসমেট, চলো একদিন তোমাদের বাড়ি নিয়ে চলো। খুব সন্দিগ্ধ টাইপের বাড়ি যদি না হয়।

—সন্দিগ্ধ টাইপের বাড়ি, মানে?

—এই! মেয়ে-বন্ধু নিয়ে এলেই বাড়িতে সাড়া পড়ে যায়। যাহ্, ছেলেটা হাত থেকে বেরিয়ে গেল, প্রেম-ফ্রেম করে ফেলল রে!

দীপাও হাসতে থাকে. আমিও।

—আমার বাড়ি সন্দিগ্ধ টাইপের কি না আমি জানি না। কখনও বান্ধবী নিয়ে তো যাইনি, কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে, জানি না।

—কক্ষনও কোনও বান্ধবী হয়নি তোমার? বছর চব্বিশ বয়স তো হলই?

—তা হল। পেরিয়ে গেছে।

—তা হলে? এই বয়স পর্যন্ত তুমি মেয়েদের সঙ্গে মেশোনি?

অবাক করলে।

—কেন? এ রকম হয় না? আমার সে রকম সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

—আমি কিন্তু অন্য কারণে আশ্চর্য হচ্ছি।

—অন্য কারণ? কী?

—একদম মনে হয় না। তোমার কিন্তু একদম আড়ষ্টতা নেই।

—এটা কি কমপ্লিমেন্ট?

—শিওর।

—তা হলে এক কাজ করো। তোমরা তিনজনেই একদিন আমাদের বাড়ি এসো।

—তিনজনে? তার মানে বাড়িতে দুয়ে-দুয়ে চার করবে না? তুমি একটা দুঁদে চালাক। উকিল হলে পারতে।

—যাক্, তিনটে সম্ভাবনার কথা জানা গেল। মার্কেটিং ডিপ্লোম্যাসি, ওকালতি। আমার আর কোনও ভাবনা নেই।

কথা সেরে নিজের টেবিলে ফিরে গেল দীপা। একটু চেঁচিয়েই বলল— ডেটটা জানিয়ে দিয়ো কিন্তু।

ইচ্ছে করে করল, বুঝতে পারলুম। কী চায় কে জানে?

অবধারিত ভাবে পুং-সহকর্মীদের টনক নড়ে।

কিছুতেই আর একা পায় না আমাকে। এটাই যা রক্ষা। অফিসে থাকলে ক্যান্টিনে তিন সহকর্মিণীও এসে আমার টেবিলে বসে যায়। সাইটে যাই একা। বাড়ি ফেরার সময়ে অনিন্দ্য সুমিত দুজনেই আগে নেমে যায়।

বিজিতই একদিন ধরল।

—ডেটটা কবে?

—কীসের ডেট?

—দীপার সঙ্গে ডেট?

—ওহ্, দীপার সঙ্গে সে রকম কোনও ডেট-ফেট নেই। মানে তোমরা যা বুঝছ।

—বেশ তো কী রকমের, তুমি যা বুঝছ সেটাই শুনি না!

—ওরা তিনজনে একদিন আমার বাড়ি যাবে।

—তুমি নেমন্তন্ন করলে, না ওরা যেচে নিল?

—ওরাই।

বিজিত বাকি দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল— কী বলেছিলুম। ঠিক নয়?

—কী বলেছিলে বিজিত?

আমি ওদের নাম ধরে ডাকলেও ওরা কেন কে জানে আমাকে সেন বলেই ডাকে। সমুদ্র নামটা কি ওদের উচ্চারণ করতে অসুবিধে হয়?

অনিন্দ্য হাত নেড়ে বলল— বিজিতই বলছিল। তুমি ডুবে ডুবে জল খাও। বেশি পটিয়ে নিলে। নিলে নিলে তিনজনকেই?

আমি ভালমানুষের মতো বলি— তিনজনকে নেওয়া সম্ভব? আইনে আটকে যাচ্ছে না? তা কাকে ছাড়লে তোমাদের সুবিধে হয়? তা ছাড়া এই অফিসের বাইরেও তো লক্ষ লক্ষ মেয়ে রয়েছে। তোমরা হঠাৎ এদের ওপরেই এমন হামলে পড়লে কেন? আশ্চর্য তো।

এই কথাটার উত্তর ওরা দিতে পারল না।

আমি জানি এটা এক ধরনের হিংসে। সেই ধরুন দুই বোনকে ফ্রক কি পুতুল কিনে দিলে একজন বলে না, ওরটাই বেশি ভাল! ওইটাই চাই। ঠিক সেই মানসিকতা। সমুদ্রের মেয়েগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। কেন হল? আমাদেরও চাই। ওই তিনজনকেই। পৃথিবীর আর সব মেয়ে বাদ। সমুদ্রকে

ওরা তিনজনে কেন পছন্দ করবে? আমরা কেন হেরে যাব। এই আর কি।

আমি বললুম— দ্যাখো অনিন্দ্য, ভদ্র আর স্বাভাবিক ব্যবহার করলে সাধারণত সেগুলোই ফেরত পাওয়া যায়। তোমরা ওদের নাজেহাল করতে, ওরা তোমাদের পছন্দ করেনি। কারণ তো পরিষ্কার। আমি ভদ্র থেকেছি, ওরা বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে এসেছে। একই অফিসে কাজ করি। একটা মিনিমাম বোঝাপড়া তো চাই। সকলেই চায়।

—বন্ধুত্ব না পিরিত?

—এখনও পিরিতে পৌঁছয়নি, পৌঁছতেই পারে। সমস্ত রকম সম্ভাবনার দরজাই খোলা আছে।

—দ্যাখ বলেছিলুম কি না—সুমিত বলে।

—কী বলেছিলে?

অনিন্দ্য গোড়া থেকেই বলছে তুমি উদ্দেশ্য নিয়ে ওদের সঙ্গে মহান-টাইপের সাজছ সেন।

—তা তোমরাও উদ্দেশ্য নিয়েই মহান-টাইপ সাজো না! ফল পেতে পারো, আর দ্যাখো আমাকে সেন-সেন বলে ডেকো না। আমার একটা নাম আছে।

আমি বেরিয়ে আসি। হাতে একটা ওভারনাইট ব্যাগ। বম্বে যেতে হবে। একটা অল ইন্ডিয়া কনফারেন্স আছে। আমাকে আর দীপাকে পাঠাচ্ছে ফার্ম।

১২

এত বড় জঙ্গল, এত ঘন নিবিড় কিন্তু আমি আর দেখিনি। দেখেছি ঝাড়গ্রামের কাছে কোঁকড়াঝোড় কিন্তু এরকম গহিন নয়। লম্বা লম্বা গাছ। কী এগুলো? শাল না কি? কিন্তু অনেক ধরনের গাছ আছে। লম্বাই, কিন্তু একরকম নয়। গাঢ় সবুজ প্রায় কালচে পাতা, আবার কিছুটা হালকা সবুজ। হাঁটতে হাঁটতে পথের সামনে আড়াআড়ি পড়ে থাকে গাছের ভাঙা ডাল, পায়ের ধাক্কায় সরিয়ে ফেলি, ঝোপ ঝাড়ে নিশ্ছিদ্র হয়ে যায় পথ। একটু এদিক-ওদিক দেখে টপকে পেরিয়ে যাই ঝোপ। সড়সড় করে চলে যাচ্ছে ওটা কী সাপ? এ রকমের সাপের কথা আমি জানি না। ঘোর বাদামি রং, বেশ কাছির মতো মোটা। আলো পিছলোচ্ছে এমন মসৃণ গা। কোথা থেকেই বা এই আলো আসছে? তারপর বুঝি, সাপটা, সাপটার ভেতর থেকেই আসছে আলোটা। আলোর সাপ। বিজ্ঞানীরা তো বলেন সাপের মাথার মণি-টনি সব বাজে কথা। কিন্তু এটার কী ব্যাখ্যা দেবো? কোনও অভ্যন্তরীণ মণি থেকেই এ-আলো যদি বেরোয়। পৃথিবীতে কত আশ্চর্যই তো আছে। না হয় একটা বাড়লই। মনে মনে নোট করতে থাকি কী লিখব, এটা নিয়ে একটা অন্তত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লেখা উচিত। ইতিমধ্যে সাপটা আমার খুব কাছে চলে এসেছে, খেয়াল করিনি। ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। ফণাও আছে তা হলে? ফণার ওপর ধবধবে সাদা সব চিহ্ন, কী সুন্দর প্রাণী! আমার ভয় করছে না কেন। আমার কি ভয়ও নেই? সাপটা আমাকে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠছে। কেমন ভয় না পাও দেখি! একেবারে গলার কাছে চলে এসেছে, আমি প্রাণপণে টেনে তাকে নামাবার চেষ্টা করছি। পারছি না। তারপর গলাটা বুজে আসতে লাগল, আমি একটা ঝটকা মারলুম। আইলের সিট আমার, পাশে এক ভদ্রলোক নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলেন, আমি বোধহয় ঝটকাটা সত্যি মেরেছি। ঘুমে লালা চোখ আড় নয়নে দেখছেন। ঝটকাটা আমি মেরেছি না উনি নিজেই নিজেকে মেরেছেন স্থির করতে পারছেন না।

আমি বলি— স্যরি, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী করেছি...

খুব বিরক্ত চোখে উনি অন্যদিকে চাইলেন। আমাদের তিনটে সিট মাঝখানে দীপারটা ওদিকে, বাঁয়ের প্রথম। ও বেচারি এই সিটটা ভদ্রলোকের কাছ থেকে চেয়ে ছিল। উনি বলেছিলেন— স্যরি, আই কান্‌ট ওবলাইজ ইউ।

আমার বেশ হাসি পেল। দীপার কথা শুনলে এই ঝটকাটা ওঁকে খেতে হত না। দীপাই খেত।

খুব বেঁচে গেছে মেয়েটা, ভদ্রলোক এখনও গালে হাত বুলোচ্ছেন। ঝটকা খেলে দীপা আমার যা খোয়ার করত। আমিও সে হিসেবে বেঁচে গেছি।

হোটেলে নিজের নিজের ঘরে গিয়ে স্যুটকেস রাখি, টয়লেট যাই, মুখ হাত ধুই, এ বার এখান থেকে সোজা কনফারেন্স-রুমে। এই হোটেলেরই দোতলায় কনফারেন্স-রুম। দেখি দীপা পাশের ঘর থেকে একইসঙ্গে বেরোলো কিন্তু পোশাক আমূল পাল্টে গেছে। এসেছিল সালোয়ার কামিজ পরে, এখন একটা একরঙা সিল্কের শাড়ি পরেছে। একটু বোধহয় প্রসাধনও করে নিয়েছে। খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল— ড্রেসটা ঠিকই আছে। কোনও ওডিকলোন কি আফটার-শেভ মাখো না?

—নাঃ।

—কেন? শেভ করে কী লাগাও তা হলে?

—অ্যালাম। ফটকিরি।

—এখানেও এনেছ? হেসে ফেলল দীপা।

—নিশ্চয়ই, কখন কী ইনফেকশন লেগে যায়, রক্তটক্ত পড়লে বন্ধও তো করতে হবে।

দীপা বলল— দাঁড়াও, আগে একবার গ্রাউন্ডে চলো তো।

—কেন?

—চলোই না।

গ্রাউন্ড মানে বেসমেন্ট। প্রচুর আলো, ঝলমলে সব দোকান। দীপা চট করে একটা দোকান থেকে এক বোতল কিছু কিনল। বাইরে এসে স্প্রে করে দিল আমার গলায়। হাতের কবজিতে। বলল— শার্টটা একটু ফাঁক করো।

যা ইচ্ছে করুক বাবা, আমি শার্টের ওপর বোতাম খুলি।

ও গেঞ্জির ওপর স্প্রে করে দেয়,—কেমন গন্ধটা?

—চমৎকার, থ্যাংকিউ। তোমাকেও তবে কিছু কিনে দিই একটা?

—পরে। এখন দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক কনফারেন্স নয়। ওয়ার্কশপ ব্যাপারটা। অন্তত ছ-সাতটা রাজ্যের প্রতিনিধি এসেছে। দুটো বক্তৃতা— একটা তার মধ্যে বেশ ক্লান্তিকর। তারপর দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমরা আলোচনায় বসলুম, লাঞ্চের পর, প্রত্যেক গ্রুপের আলোচনা সংক্ষিপ্তসার শোনা হবে।

খানিকটা ওয়ার্কশপের সময়ে, খানিকটা লাঞ্চেও অন্তত সাত-আটজনের সঙ্গে রীতিমতো ভাব জমিয়ে ফেলল দীপা। ও ছাড়া আর একজনই মেয়ে। মহিলা। খুব সম্ভব দিল্লির হবেন, পাঞ্জাবি। ইনি পরের দিন বক্তৃতা দেবেন। একটু বয়স্ক। রাশভারী এই মহিলা তাঁর পরিচিতদের সঙ্গেই কথা বলছিলেন। দীপা তারই মধ্যে ফাঁক খুঁজে ওঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে এল। হাতে খাবারের প্লেট। অন্য হাতে ফর্ক, দেখি রাশি রাশি কথা বলছে। উনিও বলছেন। চোখে বেশ আগ্রহ। পারেও।

সেদিনের কাজ শেষ হবার পর, দীপা প্রস্তাব দিল, বেড়াতে যেতে হবে। ঠিক আছে বাবা।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা যাই মেরিন ড্রাইভ। চৌপাটিতে খাই। তখন এলিফ্যান্টা থেকে টুরিস্টরা ফিরে আসছে। একটার পর একটা বোট। স্বল্প তরঙ্গ এই সাগর, ফিরতি বোটের ফুটকি, একটু সাদাটে আকাশ, এখনও যথেষ্ট আলো। পুরো দৃশ্যটাই আমায় একটা শান্ত, স্থির নীরবতায় নিয়ে যায়। মাথার মধ্যে একটা আলো জ্বলছে, স্নিগ্ধ প্রদীপের মতো, ক্রমশ সন্ধ্যা হয় আর তিন দিকে হিরে জহরতের জৌলুসে জোড়া বম্বে শহর জেগে ওঠে।

—কী হল সমুদ্র, ধ্যানস্থ হয়ে গেলে না কি?

সত্যিই উদ্ভট আমার এই নীরবতা। পাশে একটি মেয়ে, এত আগ্রহ করে আমাকে বেড়াতে

নিয়ে এসেছে। আর আমি চুপ। জেগে জেগেই যেন ঘুমোই মাঝে মাঝে।

—ভাল লাগছিল খুব। জাস্ট চুপ করে ভাল লাগাটা এনজয় করছিলুম। তুমি কিছু মনে করলে?

—বেশ কিছুদিন ধরে তোমাকে স্টাডি না করলে মনে করতুম।

—স্টাডি?

—ইয়েস। আচ্ছা সমুদ্র তুমি কি মানে যোগটোগ করো?

—যোগব্যায়াম আমি নিয়মিত করি। সকালে চা আর খবরের কাগজের মতো যোগব্যায়ামটাও আমার অভ্যাস।

—সেইজন্যেই তোমার স্বাস্থ্য এত ভাল, টাচ উড, আর কী বলব— চেহারার একটা গ্লো আছে। কিন্তু আমি ব্যায়ামের কথা বলিনি। যোগ, মানে ধ্যান প্রাণায়াম, এ সবের কথা বলছি।

—তুমি জানো না ধ্যান প্রাণায়ামও যোগাসনের একটা অঙ্গ। তাদের অবশ্য শাস্ত্রটাস্ত্রর ছোঁয়াচ বাঁচাতে বলা হয় মেডিটেশন, ব্রিদিং একসারসাইজ।

দীপা হাসল— তুমি কি খুব শাস্ত্র মানো? দীক্ষা-টিক্ষা নিয়ে ফেলেছ না কি?

—না তো? আমি অবাক হয়ে বলি। কেন না আমাদের বাড়ির ত্রিসীমায় কোনও দীক্ষা জাতীয় ব্যাপার নেই। দাদু অশীতিপর মারা গেলেন, ঘরে অবশ্যই কিছু মহাপুরুষের ফটো ঝুলত। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ শুধু আধ্যাত্মিক নয়, অন্য ক্ষেত্রেরও মহামানবদের। কিন্তু দীক্ষা নিয়েছেন বলে কখনও শুনিনি। দিদারা বালগোপাল, লক্ষ্মী, কালী সব পুজো করতেন। তাঁরা কোনও গুরুর কথা কখনও বলেননি। কিন্তু জপ করতেন। দীক্ষা ছাড়া কি কেউ জপ করে? জানি না। বাবার তো কথাই নেই। মাকেও আমি কখনও ভাঁড়ার ঘরের তাকে রাধাকৃষ্ণর মূর্তিকে ফুল জল দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করতে দেখিনি। তবুও শপথ করে কিন্তু বলতে পারব না— এঁদের আধ্যাত্মিক মত কী। সত্যিই কারও বা কোনও পথের অনুসরণ করেন কি না। কী আশ্চর্য! নিজের পরিবার সম্পর্কে কত কম জানি আমি। আমার বোধহয় লজ্জা হওয়া উচিত।

—কীসে তোমার মনে হল?

—তোমাকে কী রকম আনরিয়্যাল বলে মনে হয় সমুদ্র।

—আনরিয়্যাল? —কথাটা আমার মনের মধ্যে একটা টইটম্বুর জলাশয়ে যেন ঢিলের মতো পড়ল, চারদিক ঘিরে বৃত্ত রচনা হতে লাগল। বৃত্তে বৃত্তে আলোড়ন...আনরিয়্যাল... আনরিয়্যাল...ঠিক এই শব্দটাই আমাকে মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যায়। চারদিকে যা দেখছি, যা শুনছি, যা শিখছি সবই যেন অবাস্তব। কখনও বাস্তব, কখনও অবাস্তব। বেশির ভাগ সময়েই একটা বায়বীয় শূন্য পেরিয়ে আমি এখানে পৌঁছই। এটা আমাকে কখনও কখনও মৃদু ভাবিয়েছে। কিন্তু আমি জলজ্যান্ত মানুষটা...আমি কী করে অবাস্তব বলে প্রতিভাত হতে পারি কারও চোখে?

—আমাকে তোমার ভূত-টুত মনে হয় না কি?— হাসবার চেষ্টা করে বলি।

—না, ঠিক তা নয়, দীপা এখন খুব গম্ভীর— কেমন যেন মনে হয় তুমি...তোমার সঙ্গে কিছুর কোনও যোগ নেই। যে-কোনও জায়গা থেকে তুমি হঠাৎ কর্পূরের মতো উবে যেতে পার। কংক্রিট নয় একেবারে। অথচ তুমি খুব র‍্যাশনাল, এফিশিয়েন্ট, ভদ্র...এনিওয়ে ছাড়ো, আজ প্লেনে ওই ভদ্রলোক আর তোমার মধ্যে ছোটখাটো একটা কী যেন হয়ে গেল? কী?

—আরে আর বোলো না, আমি ফিরে আসি অন্য মেজাজে— ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। উনিও। উনিও অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঝটকা দিয়েছি। সেটাতে ভদ্রলোকের খুব লেগেছে।

—হঠাৎ দুঃস্বপ্ন? তোমাকে তো দুঃস্বপ্ন দেখার লোক বলে মনে হয় না।

—দুঃস্বপ্ন দেখারও আবার লোক আছে না কি? হাসালে দীপা, দুঃস্বপ্ন সবাই কোনও না কোনও সময়ে দেখে। তুমি আমাকে কী ভাবো বলো তো? কোনদিন বলবে তোমাকে তো খিদে-টিদে পাওয়ার, ঘুম-টুম পাওয়ার লোক বলে মনে হয় না।

দীপা হাসল। —খিদে তোমার শারীরিক নিয়মে পায় ঠিকই। কিন্তু আমার মনে হয় না কোনও বিশেষ চাহিদা তোমার আছে খাবার-দাবার বিষয়ে। তা ছাড়া দেখো স্বপ্ন লোকে দেখে, মনের ভেতরে কোনও অবদমিত ভয়, চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে। তুমি বিগতস্পৃহ টাইপ। তোমার ভয়, আকাঙ্ক্ষা কিছুই আছে বলে মনে হয় না। এনিওয়ে কী স্বপ্ন দেখলে?

—সাপ। একটা বাদামি রঙের অদ্ভুত চকচকে সাপ আমাকে পেঁচিয়ে ধরছে। গলার কাছটায় আসতে দমবন্ধ লাগল। ঝটকাটা তখনই মারি।

দীপা সমুদ্রের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। মুখে কথা নেই। আমি বলি— সাপের স্বপ্ন দেখলে বংশবৃদ্ধি হয় শুনেছি, আমার দাদা দিল্লিতে, বিয়ে থা করেছে। নিশ্চয় আমাদের একটি বংশধরের শুভাগমন হচ্ছে এবার।

দীপা আমার দিকে তাকাল— এই সব কুসংস্কারে তুমি বিশ্বাস করো?

আমি ঠোঁট ওলটাই— বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা কে বলছে? লোকে বলে, বিশ্বাসটা তাদের অনেক যুগের, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কী আসে যায়? তা ছাড়া স্বপ্নের আর মানে কী?

দীপা আমার দিকে তাকাল, বলল— স্বপ্নের কিন্তু মানে থাকে সমুদ্র। তোমার স্বপ্নেরও মানে আছে। সাপের স্বপ্ন আরও দেখেছ না কি? প্রায়ই দেখো।

ভেবে দেখলুম— হ্যাঁ তা দেখি। দেখি বটে। বলি কথাটা ওকে।

এ একটু লালচে মুখে চাইল— কিছু মনে করবে না তো?

—কেন? মনে করব কেন?

—ইউ নিড এ উওম্যান।

—হঠাৎ? একটু চুপ করে থেকে, লাল হয়ে আমিও জিজ্ঞেস করি।

—হঠাৎ নয়। ওই স্বপ্নটার ব্যাখ্যা দিলুম। সাপের মনস্তাত্ত্বিক একটা মানে আছে, প্রতীক, মেল সেক্স।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে থাকি। মনের ভেতরে বহু কথা ঘুরতে থাকে। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সেই দিনগুলো, যখন হঠাৎ বন্ধুদের সঙ্গে খারাপ পাড়ায় গিয়েছিলুম। দাদু বললেন— 'তুমি বড় হয়ে গেছ।'

—তুমি কিছু মনে করবে না দীপা, আমিও একটা কথা বলি?

—না, না মনে করব কেন? আই লাইক ফ্র্যাংকনেস।

—মেয়েরা কি কখনও সাপের স্বপ্ন দেখে না? আমার বোন ফিনকি একদিন বলছিল— ছোড়দা, একটা কী ভয়ানক সাপের স্বপ্ন দেখেছি রে! তো? তুমিও কি দেখ না?

—দেখি তো! তখনও তার মানে একই থাকে। মেল সেক্স সিম্বল। বেসিক ইনস্টিংক্ট।

সাগরের জল এখন কালো। চারপাশের জড়োয়া আলো তার মধ্যে বিম্বিত হয়ে আছে স্থির। দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট জাহাজ। তার মাস্তুলে একটা আলো। হাওয়ায় তারা উড়ছে, চাঁদ উড়ছে, সেই ওড়ার ভাঙা ভাঙা ছবিও সাগরে। এই বিম্বরা তো সব সাগরেই। হঠাৎ দেখলে তো মনে হতেই পারে সবই আছে সাগরের ভেতরে। জল ভেদ করে উঠে আসছে আলো। শিশু হলে নিশ্চয় হাত বাড়াবে, চাঁদ ধরতে যাবে, 'আয় চাঁদ আয় চাঁদ' ছোটবেলা থেকে শুনেছে যে! সেই চাঁদকে হাতের এত কাছে পেয়ে ধরতে ঝাঁপ দিতে চাইবে না? অথচ সবই বিম্ব, সমস্ত আলো, সমস্ত রূপের অবস্থান অন্য কোনওখানে। কোনটা সত্যি? যদি আমি, আমরা সবাই, স-ব বিম্ব হই?

—তোমার সেক্স-এক্সপিরিয়েন্স আছে? —দীপা পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞেস করল। —উত্তর দিতে আমি তোমায় জোর করছি না। বেশির ভাগ পুরুষেরই থাকে তাই জিজ্ঞেস করছি।

—আছে আবার নেইও।

—সেটা কী রকম?

তখন আমি আমার থার্ড ইয়ারের সেই অভিশপ্ত শনি রবির কথা ওকে বলি। কীভাবে নেশা সত্ত্বেও মেয়েটির উলঙ্গ দশা আমার মধ্যে বিবমিষা জাগিয়েছিল। মুহূর্তে চলে গিয়েছিল সব ক্ষুধা। সে যে কী কুৎসিত, কী কুৎসিত। গলিত কুষ্ঠের মতো, জঘন্য যৌনরোগের ক্ষতর মতো, অকথ্য আস্তাকুঁড়ের মতো।

এ সব কথা আমি কাউকে কখনও বলিনি। এমনকী পুলককেও না। শুধু পাপবোধে নয়, সত্যি-বন্ধু কেউ ছিল না বলে। সাক্ষী আছে মৃণাল। সাক্ষী আছে নৃপেশ। সেদিন নিষ্ঠুর ঠাট্টায় আমাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়েছিল। আমি ন্যাকা, আমি পুরুষত্বহীন, আমি সমকামী...আরও কী কী সব। সে সব কথা শুনলে পুলক খেপে যেত, পিটিয়ে ছাতু করে দিত ওদের। কিন্তু আমার তখন পেটের সমস্ত নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসার জোগাড়। আমি টলতে টলতে চলে আসি। পরে যখন ওরা সাহস দেয়, বলে প্রথমটা ও রকম লাগলেও পরে ঠিক হয়ে যাবে, আমি ওদের কীভাবে ঠান্ডা গলায় বলি— আমি নপুংসক, তোমরা আমাকে ফার্দার বিরক্ত করবে না।

এই সমস্ত আমি বলি। দীপাকে।

আর একটু রাত হলে বিচে হাঁটতে থাকি। দীপার সাদা-কলো সিল্ক শাড়ির সাদাগুলো ঝলকায়, কালোগুলো সাদার পটে ফুটে ওঠে। ওর ছোট ঢেউ খেলানো চুলের দোল দেখতে পাই। এগুলো আগে কখনও দেখিনি। অন্ধকারে ওর সাদা চৌকো গড়নের চোয়াল জেগে থাকে, চোখে মাঝে মাঝে আলো পড়ে, মাঝে মাঝে অন্ধকার। হাতের সোনার বালা সোনালি সরীসৃপের মতো ঘিরে থাকে মণিবন্ধ। আমার সাদা পাঞ্জাবি ওড়ে। রুমাল বার করে মুখ মুছি, হঠাৎ হাত থেকে রুমালটা উড়ে যায়। কোথায় কে জানে? চলতেই থাকি, চলতেই থাকি, কিছুক্ষণ পর পেছনে— সাব, সাব, মেমসাব, মেমসাব! ভেলপুরিওয়ালা আমার রুমাল দিয়ে যায়। তাতে ভিজে বালি আটকে আছে।

ঘুম আসে না। যদি বা একটু আসে, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। নিশুত রাতেও বম্বের বহুতল হোটেলের সর্বোচ্চ তলায়ও রাস্তার আলো ঢুকে অন্ধকারকে পাতলা করে দেয়। রাত-আলো জ্বালবার দরকার হয় না। লাল কার্পেট এখন জমাট রক্তের মতো কালচে দেখায়। টেবিল-চেয়ার-কৌচ— সব আলোর উল্টোদিকে বস্তুপিণ্ডের শিলুয়েৎ। আমি টয়লেটে যাই; চান কি করব এই মাঝরাতে? সাদা মার্বেলের বাথ-টবটা আমার খুব লোভ দেখায়। ঠান্ডা জল, ঠান্ডা স্বচ্ছ, তলা অবধি দেখা যাবে। কোথাও কোনও রহস্য নেই। ডুবে থাকব, শীতল হয়ে যাবে কঠিন শরীর। যদি চান করতে করতে ডুবে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ি! যদি মাথাটা পিছলে জলের মধ্যে পড়ে যায়? জলের তলায় বিম্ব। অনেক আলো, অনেক শ্বেত-শুভ্র, অর্চিষ্মান, অনেক অবর্ণনীয় রূপ!

স্টপার লাগিয়ে টবটা ভরতে দিই। অনেকটা সময়ে নেয়, কিন্তু ভরে যাওয়ার পরেও আমি তাতে পা ডোবাই না। খুব কৌতূহলের সঙ্গে দেখি। বিরাট টব। চমৎকার জল। তারপর হঠাৎ ফিরি। ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসি, চাবি দিই। একটা ঘর পরে দীপার ঘর। নক করি। সামান্য সময়, তার পরে দরজা খুলে যায়।

রাত-পোশাক পরা কোনও মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। অসাধারণ সুন্দর এই পোশাক। লেসে-লেসে ভরা, সেই এলিজাবেথীয় কিংবা ভিক্টোরীয় যুগের গাউন-টাউনের মতো। শুধু কোমরের কাছ থেকে ওই রকম কৃত্রিম ভাবে ছড়িয়ে যাওয়া নেই। কুঁচিতে কুঁচিতে কোমর ঘিরে বড় মোহন ভঙ্গিতে লুটিয়ে রয়েছে। দীপা আমার পেছনে দরজা বন্ধ করে দেয়।

—দীপা আই নিড ইয়ু।

—ইউ নিড আ উওম্যান সমুদ্র, আই টোল্ড ইউ। মনে হল ওর চোখে জল চকচক করছে। জল? না আলো! বুঝতে পারি না। জল ভেতর থেকে আসে, আলো বাইরে থেকে। জিজ্ঞেস করি— তফাতটা কী?

—তফাত? তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি।

—আই মীন তুমি, তোমাকেই আমার বড্ড দরকার।

—তুমি কি নিশ্চিত? না আজকের কথাবার্তার একটা ফল...

—হতে পারে। কিন্তু ভেতরে তো ছিলই।

—সমুদ্র, সাপ থাকে বাইরে...ভেতরে...ভেতরেরটাকে হয়তো বাইরেরটা উসকে দেয়। কথা...পরিবেশ...নির্জনতা এই সব সুযোগের অপেক্ষায় থাকে সে...। আমি হয়তো সেই সাপিনী, ...এসব সময়ে মনে থাকে না,...শরীর শুধু শরীর থাকে।

আমি অনভ্যস্ত আবেগে দৃঢ় থেকে বলি— আমি কখনও কোনও ভগবানকে ডাকিনি দীপা, কেন না কারও কাছে আমার কোনও প্রার্থনা ছিল না। আজ আজই একমাত্র আমার ভেতর থেকে প্রার্থনা উঠে আসছে, তোমার জন্য।

দীপা দু'হাতে মুখ ঢাকল। আর আমার যে কী হয়ে গেল। আমি তার হাত সরিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট রাখি। অসহ্য সুস্বাদ, তুলতুলে, আমার ভেতরটা যেন ক্রমে গলে যাচ্ছে। নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরি তাকে বুকে। আমার স্ফীত পেশির ওপর তার তুলতুলে বুক এক দাহহীন জ্যোতির্ময় আগুন জ্বালায়। আমার ইস্পাত ক্রমাগত মহাসুখে মহাপ্রেমে ও মহা নিষ্ঠুরতায় আঘাত করতে থাকে তাকে যতক্ষণ না সে আমাকে পথ করে দেয়।

আহ্ সমুদ্র আহ্! আরও আরও ছিঁড়ে ফেলো আমাকে, ধ্বংস হয়ে যাই।

'নক্, নক্ নক্'—ভোর-চায়ের জন্য ডাক এসেছে। জানে না এখানে দু'জন মানুষ খুন হয়ে গেছে। আমার বুকের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে সে। আস্তে জাগিয়ে দিই। জেগে সে ছেলেমানুষের চোখে চারদিকে তাকায়। তারপর লাফিয়ে নামে, কার্পেটে একটা বেড়াল লাফাবার হালকা শব্দ হয়। বড় বড় পা ফেলে দরজা খোলে সে, সামান্য—'চায় নহি চাইয়ে', দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার বুকে, এবার আমি ভোরের আলোয় তার চোখ দেখি। নাক, কান, ঠোঁট, যাকে সমগ্রে পেয়েছিলুম তাকে খণ্ডে খণ্ডে পেতে চাই। নরম হাতে আদর করি, তার রাত পোশাকের ফাঁস খুলে দিই, তারপর ভোরের বিছানায় সেই বাদামি সর্পিণীকে দেখি। ভেতরের আলোয় ভাস্বর। ফণায় শুভ্র আলপনা। এক হাতে তার চিত্রিত ফণা আর এক হাতে তার উত্তেজক লেজ মুঠো করে ধরে আমি তার অমৃত ছোবল নিই, ফিরিয়ে দিই, বারবার, বারবার।

রাতের ধরা ঠান্ডা জলে ডুব স্নান। মাথায় শ্যাম্পু। বাথসল্টের গভীর থেকে সুগন্ধ। কী সব ছোট ছোট বোতল। বডি লোশন। মেয়েরা মাখে, না কী? পুরুষ বোর্ডারের ঘরে মেয়েদের জিনিস রাখবে এমন দরের হোটেল তো এ নয়? ফাইভ-স্টার না হোক ফোর-স্টার। লোশনটা মেখে ফেলি। সুগন্ধ চারিয়ে যায়। খুব তাজা লাগে। গায়ে শার্ট চড়াই, ট্রাউজার্স। নাঃ টাই আমার আসে না। টাইটা বেশি পরে এগজিকিউটিভ ক্লাস। আমাদের কাজ করতে হয় ভাই। মোজা পরে জুতো গলাই, ফিতে বাঁধি। ঘরের দরজা বন্ধ করি। চাবিটা কাউন্টারে জমা দিই। সবটাই একটা ঘোরের মধ্যে। কনফারেন্স রুমে শেষ বক্তৃতা। তারপর এরাই হোটেল থেকে বন্দোবস্ত করে আমাদের কিছু সাইট-সিয়িং-এ নিয়ে যায়। সমুদ্রের মৃদু ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে কেটে বোট এলিফ্যান্টা যায়। দাঁড়িয়ে থাকি ছ'ফুটের লম্বা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের দেবমূর্তির সামনে। সৃষ্টি হয়ে গেছে, স্থিতি চলছে, এবার প্রলয়ের অপেক্ষা।

—সমুদ্র। —দীপা আস্তে করে ডাকল। এতক্ষণ ও দিল্লির সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটার পর একটা শিবমূর্তি দেখে বেড়াচ্ছিল। যেন ও প্রত্ন-গবেষক, শিবমূর্তির এক্সপার্ট।

আমি মুখ ফিরিয়ে তাকাই— দেখো দীপা শিবমূর্তি। এত শিবমূর্তি। ইনি তো ধ্বংসের দেবতা, এঁকে লোকে শিবই বা বলে কেন, ভালই বা বাসে কেন? —আমি জিজ্ঞেস করি।

দীপা আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—স্যরি। আ অ্যাম স্যরি সমুদ্র।

কেন এ কথা ও বলল আমার ভাল বোধগম্য হল না। ও কি মনে করছে ও আমাকে সিডিউস করেছে? আমার অনুতাপ হচ্ছে? উঁচু-নিচু পাহাড়ের গা টপকে টপকে নেমে আসতে থাকি। সব মূর্তি, পাহাড়, সমুদ্র, এতগুলো মানুষ, দূর থেকে ক্রমশ এগিয়ে আসা গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া সমস্ত কেমন অবাস্তব লাগে। উজ্জ্বল হলুদ সালোয়ার কামিজ পরা ওই বিষণ্ণ কিন্তু তীব্র মেয়েটি কে? বোধহয় অলৌকিক।

১৩

আজকাল সংসারের অবস্থা বেশ স্থিতিশীল হয়েছে। ফিনকি খুব ভাল রেজাল্ট করেছে। পাশ করা মাত্র ইউ. জি. সি স্কলারশিপ পেয়ে গেল। মেজদিদা সামান্য পেটের অসুখে মারা গেলেন। জেঠু ক্রমশ নিজের ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে রোজ বাইরে বেড়াতে যাচ্ছেন। সবচেয়ে কাছে চিলড্রেন্স পার্ক, আর একটু দূরে গঙ্গার ধার। এখানকার কেউ জানে না, জেঠু একদিন মনোরোগী ছিলেন। একদিন আমাকে ডাকলেন— সমু!

এখনও খানিকটা সংকুচিত। কিন্তু তার মধ্যে আগের মতো অস্বাভাবিকতা নেই।

—বলুন।

—আমি কিছু কাজ করতে পারি না?

—কী কাজ? আপনিই বলুন।

—আমার খুব লজ্জা করে। কিছু করি না।

—লজ্জা করার কিছু নেই জেঠু।

—না না লজ্জা, ভীষণ লজ্জা। ওইটুকু মেয়ে ফিনকি পর্যন্ত কত কাজ করে। তোমার মা, তোমার বাবা। তোমার তো কথাই নেই। এতটুকু ছেলে তুমি!

—এতটুকু ছেলে? আমি? লোকে শুনলে হাসবে জেঠু।

—না না, আমি ঠিক বলছি। আমি একটু পড়াশোনা শুরু করেছি, যদি একটু ছাত্র পড়াই?

আমি একটু ঘাবড়ে যাই। ছাত্র পড়ানোর পরিশ্রম কি ওঁর সইবে? মাথার ওপরই তো প্রেশারটা বেশি পড়বে।

—আমি একটু ভেবে দেখি জেঠু।

বাবাকে বলতে তো বাবা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। ব্রিলিয়ান্ট ছেলেদের বেশি মগজ খাটাতে খাটাতে এই রকম হয়। বাবার আরও কেস জানা আছে। মা বললেন-- যা করবে ভেবেচিন্তে করো সমু। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

শেষ পর্যন্ত জেঠুর ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করি।

উনি একবার দেখতে চাইলেন জেঠুকে। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন, বেশ সময় নিয়ে কথাবার্তা বললেন। আমাকে ডাকলেন— উনি ঠিক আছেন। ইচ্ছে হয়েছে যখন করুন। তবে বেশি চাপ যেন না নেন। আর দুষ্টু বা বিরক্ত করে কি খুব বোকা এ রকম ছাত্র ওঁকে যেন পড়াতে না হয়। আর...একটা কথা...কোনও মেয়েও নয়, বাচ্চা হলে ঠিক আছে। কিন্তু তরুণী-যুবতী মেয়ে কদাপি নয়।

আসল সময়ে কিন্তু দেখলুম উনি হাইস্কুলের ছেলেদের খুব অনায়াসে বিজ্ঞান ও অঙ্ক পড়িয়ে দিচ্ছেন। বেশি কথা বলেন না। খুব ধৈর্য ধরে আস্তে আস্তে নিচু গলায় বোঝান। খাতায় কষে দ্যান অঙ্ক। ক্রমে কলেজের ছাত্ররাও আসতে লাগল। উনি আমার কাছ থেকে সিলেবাসের বই চান, খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন। চট করে পাতা উল্টে দ্যান। কোনও কোনও জায়গায় আমাকে জিজ্ঞেস করেন। স্মৃতির একটু অসুবিধে আছে বুঝি। উনিও বোঝেন, কাগজে বড় বড় করে ফর্মুলা লিখে রাখেন, কোনও কিছু সংজ্ঞা, নিয়ম, ঠিকঠাক ভাষায় লিখে রেখে দ্যান চোখের সামনে। কিন্তু ওঁর

যুক্তি বুঝতে বা বোঝাতে কোনও অসুবিধে নেই।

আমি মাঝে মাঝেই বসি। ইচ্ছে করে। নজর রাখা দরকার। উনি প্রথম প্রথম একটু লজ্জা পেতেন। তারপর অভ্যেস হয়ে গেল।

জেঠু একদিন তাঁর উপার্জনের হাজার ছয়েক টাকা আমার হাতে দিয়ে বললেন— বউমাকে দিতে লজ্জা করল, সমু, তুমি ওঁকে দিয়ো। চোখমুখে খুশির ছাপ এতই স্পষ্ট, যে আমার না বলতে মন সরল না।

অতএব আমি দীপাকে বলি— দীপা আমাদের বাড়ি চলো। জাস্ট হঠাৎ একদিন। আমি শুধু শিওর হয়ে নেব ফিনকি থাকছে কি না।

—কিন্তু তুমি যে বলেছিলে আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে নিয়ে যাবে?

ভেবে-চিন্তে দেখি। ঠিকই। বলেছিলুম বটে। যদি জয়ন্তী মুকুলিকা জানতে পারে আমি একা দীপাকে নিয়ে গেছি, ওদের খারাপ লাগবে। শুধু শুধু কাউকে আঘাত দেওয়া তো আমার উদ্দেশ্য নয়। তা ছাড়া সত্যপালন। সত্যপালনের দায় আছে। অথচ সময় পার হয়ে যাচ্ছে। পার হয়ে যাচ্ছে। এত কাজ, দীপার সঙ্গে কথা হচ্ছে না।

—সে ক্ষেত্রে দীপা বাড়িতে একটু নোটিস দিয়ে অর্থাৎ জানিয়েই নিয়ে যেতে হবে। বাড়ির সবাই একটু হতবুদ্ধি হয়ে যেতে পারেন।

—কেন? খুব প্রাচীনপন্থী না কি!

—এটা আমি বলতে পারব না। আমি আমার বাড়ির লোকেদের খুব একটা বুঝি না।

দীপা অদ্ভুত ভাবে হাসল।

আমি বললুম আমার দাদা দিল্লিতে পঞ্জাবি মেয়ে বিয়ে করেছে। কোনও সমস্যা হয়নি।

একটু চুপ করে থেকে দীপা বলল— উনি কি কারও মতামতের ধার ধেরেছিলেন? খুবই সংসারাভিজ্ঞ ও স্পষ্টবাদী মেয়েটি।

আমি হেসে বলি— ধরেছ ঠিকই। কিন্তু তার তো পরও আছে। দাদা এসেছে, সবাই তাকে স্বাভাবিক ভাবেই নিয়েছেন তো!

—তুমি বলছ তোমার দাদা-বউদি এখন তোমাদের বাড়িতেই থাকেন!

—তা কী করে থাকবে? দুজনেরই কর্মস্থল দিল্লি।

—তাই। এসে থাকলে কী হত তুমি জানে না, তাই না?

—এসব ছাড়ো। দীপা, আমাদের বাড়ি অতিথি-অভ্যাগতের আসা-যাওয়া একটু কম, ছোট থেকেই দেখছি। তাই-ই বলছি তোমরা তিনজনে হঠাৎ গিয়ে পড়লে ওঁদের ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। ঘাবড়ে যাবেন আর কি!

—না-মঞ্জুর।

—সে কী?

—ওই আগে যা ব্যবস্থা ছিল, ফিনকি থাকছে কি না শিওর হয়ে বা ওকে আলাদা করে বলে উইদাউট নোটিস নিয়ে যেতে হবে।

—মামার বাড়ির আবদার?

—তাই বলো তো— তাই।

—ঠিক আছে, যা থাকে কপালে।

আমি আসলে আমার বাড়িকে প্রস্তুত করে নিতে চাইছিলুম। চাইছিলুম দীপা একাই যাক। সেই যাওয়াটাই হবে উপক্রমণিকা। তারপর পাঁচজনের মতামত। বিশেষ করে ফিনকির। ফিনকির কাছ

থেকে মা-বাবা এঁদের মতামত জানতে পারব। জানা দরকার। যদিও তার জন্য কিছু আটকাবে না। তবু জানা দরকার। তিনজনকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব আমিই দিয়েছিলুম। তার কারণ ছিল অন্য, জয়ন্তীকে আমি আলাদা করে দেখিনি, অথচ ও গেলে সেটাই এক রকম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত। কিন্তু দীপা কেন তিনজনে যেতে চাইছে তাও আবার উইদাউট নোটিস— আমি বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে যা বলছে তাই-ই করি অতএব। ফিনকিকে বলব ঠিক করি।

ফিনকি এত ভাল পাশ করে গবেষণা করছে, হেঁজিপেঁজি বিষয় নয়, মুদ্রা নিয়ে কাজ। কিন্তু প্রায় এক রকমই আছে। দেখায় সেই ছটফটে অষ্টাদশীটি। জেঠুর সঙ্গে কত গল্প করে, বড় দিদার পান ছেঁচবার সময়ে ছ্যাঁচা পান টুক করে তুলে নিয়ে রাগায়, মাকে সাহায্য করে, বাবার মেজাজ সামলায়। আমার সময় হলে আমার সঙ্গেও বসে গল্প করে।

—কী রে ছোড়দা— কী করছিস? —একেবারে ডাকাতের মতো এসে পড়ল। ওর ছোটবেলাকার ডলি-ডলি শিশুমুখ খুব একটা ছাঁদ পাল্টায়নি। বড় বড় চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত, কোঁকড়া ছোট চুল, কাটেনি, কিন্তু বাড়ে না বিশেষ। ফর্সা নয়, একেবারেই কিন্তু খুব উজ্জ্বল, কোনওদিন ব্রণ হতে দেখিনি। আমাদের বিশেষত দাদার তো ব্রণ হয়ে হয়ে গালে দাগই হয়ে গেল। দাদু বলতেন 'বয়ঃব্রণ', ঘাবড়িও না, হরমোন্যাল চেঞ্জের সময়ে ছেলে-মেয়ে সবারই হয়।' কিন্তু ফিনকির মুখে কোনওদিন কোনও ব্রণ দেখিনি। মুখে দাগ না থাকলে মুখটা খুব নিষ্পাপ নির্মল দেখায়। প্রচুর বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ফিনকিকে তেমনই নির্মল দেখায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির শাণিত ভাবটা ওর মুখে একেবারেই নেই।

একদিন শীতের রোববার। কুয়াশা ভাল কাটেনি। কুয়াশা ভেদ করা স্যাঁতা রোদ ঘরে, ঠিক যেন একটা উজ্জ্বল বাঘ নিস্তেজ হয়ে ঘুমোচ্ছে। জানি ঘুম ভাঙবে, লাফিয়ে উঠবে তখন, আর সঙ্গে সঙ্গে বাঘের গায়ের রং মেখে শীত-সকালের গায়ে-হলুদ হয়ে যাবে। একটু দেরি করে উঠেছি। মনে হচ্ছে একটু বেশিই দেরি হয়ে গেছে। প্রত্যেক ঘর-সংসারের বিভিন্ন সময়ে কিছু বিশেষ শব্দ-গন্ধ থাকে। তাতে সকালে-বিকেলে তফাত হয়ে যায়। ঠিক যে কী, বলতে পারব না। মাংসের গন্ধ কি হাওয়ায়? হ্যাঁ, খুবই সুবাস।

ফটাস ফটাস করে বাবা নেমে গেলেন। প্রত্যেকটা ফটাসে যেন এক একটা করে পটকা ফাটছে। বাবাও রোববার দেরি করে ওঠেন। জেঠুর একটু কুণ্ঠিত কাশির শব্দ, কেউ চান করে গেছে, বাথরুমের দরজা বোধহয় খোলা, হুড়হুড় করে একটা ভাল কোনও সাবানের গন্ধ আসছে। ফিনকির উপস্থিতিতেই সেই গন্ধ। ও-ই তবে চান করে এল এইমাত্র।

আমার মুখোমুখি চেয়ারে বসে ছ্যাঁক করে দুটো চিঠি রাখল আমার সামনে। একটা দেখি এরোগ্রাম, আর একটা লম্বা অফিশিয়াল চিঠি।

—কী ব্যাপার? এগুলো কোথা থেকে? বিদেশে চাকরি পাচ্ছিস? কোথায়?

—পেলে যেতে দিবি তো?

আমি ওর দিকে একটু তাকিয়ে থাকি। —কী যে বলিস ফিনকি? তুই চাকরি পেয়েছিস। পাচ্ছিস। নিবি তোর নিজের সিদ্ধান্তে, আমি কেন বাধা দেব?

—তোর কথা বলছি না ছোড়দা, ধর মা, বাবা, জেঠু, দিদা।

—বাবা একটু চেঁচামেচি করতে পারেন। আর কেউ কিচ্ছু বলবেন না।

—বলবেন না হয়তো। কিন্তু মা মনের কষ্টে গুমরে শেষ হয়ে যাবে। জেঠু খুব অসহায় বোধ করবেন, দিদুও তাই।

আমি চুপ করে থাকি।

—ছোড়দা তোরা কারও মনের খবর রাখিস না, না?

ভেবে দেখলুম সত্যিই রাখি না। যাকে যেমন দেখছি তেমনই মেনে নিয়েছি। না। এমনকী দাদুরও না। মন? মন কোথায় থাকে? পৃথিবীর কোন দুর্গম গুহায়? কত অধ্যবসায় স্বীকার করে তবে সেখানে

যাওয়া যায়? খুব তাগিদ না থাকলে সে অধ্যবসায়ও আসে না, গুহায় পৌঁছনোও হয় না। নিজের মনকেও কি খুব ভাল করে জানি আমি? যা কিছু চারপাশে ঘটছে, বাইরে ও ভেতরে সবই যেন এক অন্তহীন জলছবি। টলটল করছে জলে, ঠিকমতো উঠছে না খাতায়, বা কিছু উঠছে কিছু উঠছে না। ডগডগে রং ফিকে হয়ে গেছে অপ্রত্যাশিত ভাবে।

—রাগ করলি?

—না। ভাবছি। তুই যেটা বললি...সত্যিই...আমি কি কোনও কর্তব্যে অবহেলা করেছি! সেটাই...

ফিনকি এবার ভারী রেগে উঠল— কর্তব্যের কথা কে তোকে বলেছে? আমি কি সে সবে কোনও গাফিলতির কথা বলেছি? কর্তব্য ছাড়া আর কিছুর কথা ভাবতে পারিস না, না?

—আমি জানি না রে ফিনকি। সত্যিই তুই, তুই-ই কিন্তু সবাইকার একমাত্র আশা।

যে কথাটা দাদু মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, সেটাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

—গ্যাস দিচ্ছিস? শোন্‌, আমি দুটো দু-রকমের চাকরি পাচ্ছি। একটা এশিয়াটিক সোসাইটিতে ওদের ইনসক্রিপশন সেকশনে, সংরক্ষণ, ক্যাটালগিং রিসার্চ...সবই। আর দ্বিতীয়টা কানাডায় কাকার কাছে। কী ধরনের চাকরি তা জানি না, যিনি স্ত্রী মারা যেতে দুধের শিশুকে ফেলে চলে যেতে পারেন, বছর না ঘুরতেই বিয়ে করে পগার পার, কোনওদিনও সে মেয়ের খোঁজ নেন না, তিনি হঠাৎ এ রকম দরাজ হয়ে উঠলেন কেন? কী চাকরি...সেটা? তোরা ওঁকে জানাসনি আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছি, আমার আর গার্জেনের দরকার নেই?

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

ও একটু রাগী হাসি হাসে। —কাকা আমাকে আগেও একটা চিঠি দিয়েছিলেন তাতেই নিজের গুণপনা ব্যক্ত করে ফেলেছেন। এখন লিখছেন আমাকে উচ্চশিক্ষা দেবেন। আমার ভাই বড় হয়ে যাচ্ছে, কাকিমা ওঁকে ছেড়ে গেছেন তো! আবার বিয়ে করেছেন।

—সে কী? আমার তো জানি মোটর দুর্ঘটনায় উনি আর ওঁর বড় ছেলে মারা গেছে।

—আমিও তো তেমনই কানাঘুষো শুনেছিলুম। তা উনি যদি নিজে লেখেন কাকিমা ডিভোর্স করে অন্য এক ধনকুবেরকে বিয়ে করেছেন। এক ছেলে তিনি নিয়েছেন, আর এক ছেলে এঁর। তা হলে তো ওঁর এই কথাটাই সত্যি বলে মেনে নিতে হয়।

আমি বিমূঢ়।

—কী বল?

—কী বলব ফিনকি? স-বই তোর। এ বাড়ি ও বাড়ি। তুই যেখানে যেতে চাস...

এবারে ফুঁসে উঠল ফিনকি— এত নিষ্ঠুর তুই? একবার মুখ ফুটে বলতে পারছিস না— ফিনকি তুই আমাদের, যাস না, কোথাও যেতে দেব না! ভারী বিবেচক ভদ্রলোক হয়েছিস, না?

ওর চোখ জলে ভরে উঠছে।

—শোন শোন। আমি আমরা তোকে যেতে দিতে চাই না, ভুল বুঝিস না। কিন্তু তোর বাবার কাছে যদি তুই যেতে চাস?

—কে আমার বাবা? রাজকুমার না নবকুমার? কে আমার ভাই, তুই না সেই এঁচড়ে-পক্কটা?

—শুধু-শুধু কেন গালাগাল দিচ্ছিস, কেন? বেচারা ছেলেটাকে?

—না রে গোল্লায় গেছে, কাকার চিঠি পড়ে আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি।

—সে দোষটা পুরোপুরি ওর কি? ব্রোকন ফ্যামিলি...

—দরদ উথলোচ্ছে যে রে। এবার বলবি না তো আহা তুই দিদি হলি। মা-হারা ছেলেটার জন্যেও যা! বল্‌। কর্তব্য। কর্তব্যটা তো খুব বুঝিস!

—ঠিক আছে তাই বললে তুই কী বলবি?

—বলব পৃথিবীতে কত শত ব্রোকন ফ্যামিলি আছে, ছেলেমেয়ে অসহায়, বখে যাচ্ছে। ভেসে

যাচ্ছে— অত দায় নেবার সাধ্য কী আমার! ...ওহ্, আর একটা চিঠিও আছে। তোর। কার যেন বিয়ের কার্ড।

স্বস্তিকা আঁকা হ্যান্ড-মেড পেপারের একটা শুভভিবাহের কার্ড আমার হাতে দিল ফিনকি।

সবিনয় নিবেদন,

আগামী...অমুক তারিখে অমুক লগ্নে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া দীপার সহিত শ্রীযুক্ত অমলেন্দু ও উষা চক্রবর্তীর একমাত্র পুত্র কল্যাণীয় আঞ্জনেয়র শুভবিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে। অনুগ্রহ করিয়া....

কে রে মেয়েটি?

—ওই যে আসছে শনিবার যে তিনজন আমাদের বাড়ি আসবে বলেছে, তাদেরই একজন।

—তোর তো ছেলে-কলিগও আছে। তাদের ডাকলি না তো?

—আমি এদেরও ডাকিনি ফিনকি, ওরা নিজেরাই...অন্যরা ওদের বড্ড হেক্‌ল করত, আমি করতুম না। এই থেকে...

—যাক তিন থেকে এক কমে গেলে দুই।

ও কী বলতে চায় আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপাতত আমার মাথায় কিছু মৌমাছি। তাদের তাড়াতে পারছি না। ফিনকির কথার জবাবে কিছুই আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

ও বোধহয় ঘাবড়ে যায়। এত ফাজলামি ছোড়দা পছন্দ করছে না,—বলে— কী খাওয়াব ছোড়দা?

—তুই যা ভাল বুঝিস!

—বাঃ! আসছে তোর অ্যাডমায়ারার, আর বুঝব আমি?

—আমি কী-ই বা বুঝি?

—তার মানে আমার অ্যাডমায়ারার এলেও মেনুটা আমাকেই বানাতে হবে? কী রে?

ইয়ার্কির উত্তরে পাল্টা ইয়ার্কি করতে পারি না। বলি— তখন দেখা যাবে। এখন যা তো! আমার কয়েকটা ড্রয়িং দেখবার আছে।

—তুই যেন কেমন! —ফিনকি হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

কুয়াশাটা বোধহয় কেটে গেছে। জানলা দিয়ে ঘর-ভাসানি রোদ। কিন্তু কুয়াশাটাকে তো কোথাও যেতে হবে! তাই আমার কাছে এসেছে। আমাকে সাত পাকে জড়িয়ে। ঘরটা যেন টং ঘর। কত উঁচুতে? সাত ফুট? আট ফুট? না তার চেয়েও বেশি? মাটির সঙ্গে সম্পর্ক তার কতকগুলো লম্বা লম্বা খুঁটির। কুয়াশা, ভোঁতা শীত, আমি। আমি, ভোঁতা শীত, কুয়াশা। কাজকর্ম? চলছে, যেমন চলে। আমি বুঝেও বুঝতে পারছি না। আমি উঠে দাঁড়াই, আমার কোল থেকে কুয়াশা গড়িয়ে যায়, উঠে দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে হেঁটে বইয়ের দিকে যাই। চোখ বুলিয়ে যাই পরপর। —'ডাব্‌ল হেলিক্স' 'শিওরলি য়ু আর জোকিং মিঃ ফেইনম্যান' 'সামার লাইটনিং', রিলকে। 'সঞ্চয়িতা', 'ছাড়পত্র', 'টাইম-মেশিন', 'আরণ্যক', আমার বিষয়ের কিছু বই। সব উল্টেপাল্টে দেখি কোথাও যদি কিছু পাই, যার এই মুহূর্তে আমার কাছে বিশেষ মানে আছে।

'আই লাভ দা ডার্কার আওয়ার্স অব মাই এগজিসটেন্স
হোয়্যার ইন, অ্যাজ ইন ওল্ড লেটার্স, আই ডিসকভার
মাই ডেইলি লাইফ অলরেডি লিভ্‌ড্ অ্যান্ড ওভার
অ্যান্ড লাইক সাম লেজেন্ড লস্ট ইন ফার্দেস্ট ডিসট্যান্স...'

রিলকেরও তা হলে এমন মনে হয়েছিল? বারবার হচ্ছে। যেভাবে বাঁচছি সব বারবার ফিরে আসছে। খুব পুরনো, 'মাই ডেইলি লাইফ অলরেডি লিভ্‌ড্ অ্যান্ড ওভার'। সব অভিজ্ঞতাই সুদূর

অতীতের ছেঁড়া পাতা হঠাৎ উড়ে আসছে। উড়ে আসছে যেন নতুন পাতা, নতুন চিঠি। কুড়িয়ে দেখি, ওহ্ হো! এ তো সেই পুরনো গল্প লোককথায় কথায় যা পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর পাতায় আমি একটা পুনরাবৃত্তি। অথচ এই অন্ধকারতম অস্তিত্ব কেমন দপ্‌দপ্ করছে। পুনরাবৃত্তি বলে চিনলে কেন এই অন্ধকার? কেন এই দপদপানি?

তবে? তবে কি আমি দীপাকে এতই ভালবাসি? আর কেউ যে দুঃখবোধ আমাকে দিতে পারেনি, সে পেরেছে! কিন্তু দীপার প্রতি বন্বের সেই রাতের আগে আমি তো সত্যিই কোনও ভালবাসা বোধ করিনি? এখনও, এখনও দীপার অদর্শনে আমার কোনও কষ্ট তো হয় না, দেখা করার জন্য কোনও উদগ্র বাসনা নেই, অন্য সবাইকে জীবনে যেভাবে নিয়েছি, এই বন্ধুটিকেও তাই। কাকে তা হলে ভালবাসা বলে? কেনই বা এই তিমিরবোধ? অপমান? প্রতারণা? আমাকে একজন ঠকিয়েছে সেই লজ্জা, সেই নৈরাশ্য? ব্যস?

আমি চুপ করে বসে থাকি আর জাগ্রতেই এই বাড়ি ছাপিয়ে আমার চোখে ভেসে ওঠে অন্য এক বাড়ি। বিরাট। ভাঙা ভাঙা গাবদা থাম। আগাছা গজিয়েছে, আস্তর খসে পড়ছে। দূরে সাপের মুখে ব্যাঙের অদ্ভুত চিৎকার। ঢুকতে চাইছি ঢুকতে পারছি না। যে দিকেই যেতে চাই হঠাৎ যেন পা আটকে যায়। শুধু প্রশস্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি ঘরের পর ঘর, ঘরের পর ঘর, সব কার ঢোকবার অপেক্ষায় আছে। অপেক্ষার রুদ্ধ নিশ্বাস টের পাচ্ছি।

১৪

—গুড মর্নিং সমুদ্র! —জয়ন্তী। —গুড মর্নিং— আমি।

—হ্যাললো! —অনিন্দ্য। —হ্যালো— আমি।

—মর্নিং—মুকুলিকা। —মর্নিং—আমি।

—কেমন কাটল উইক-এন্ড?—ভাল—আমি।

—সার, এই ফাইলগুলো রাখুন। চিফকে নোট পাঠাতে হবে। ঘণ্টা দুয়েক পরে এলে হবে? —রাঘব কর। ড্রাফট্‌স্‌ম্যান।

—দীপা ম্যাডাম কোথায় স্যার? সাহেব ডাকছেন।

—জানি না।

দীপা আসেনি, আসে না।

জয়ন্তী মুকুলিকা দু'জনেই বলে— শনিবারের প্রোগ্রামটা ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ। ঠিক।

—দীপার অসুখ-বিসুখ করল কিনা...

—ফোন করো। করে দেখো।

—করেছি, ক্রমাগত এনগেজ্‌ড় টোন আসছে। খারাপ আছে বোধহয়।

দীপার বিয়ে। অথচ দেখা যাচ্ছে এরা কেউই জানে না। অবশ্য দেরি আছে। দেড় মাসের মতো দেরি। আমার চিঠিটাই সবচেয়ে আগে গেছে। আমাকে নিশ্চিন্ত করতে বোধহয়।

তৃতীয় দিন রাতে ফোন আসে।

—প্লিজ সমুদ্র, স্যরি। আ অ্যাম স্যরি। কাল অফিসের পর কোথাও এসো, দরকার আছে।

—কেন?

—দরকার, প্লিজ।

—আমি জানি না কোথায় যেতে হয়।

—শরৎ বোস রোডে লেকের একেবারে উল্টো দিকে একটা রেস্তরাঁ আছে, নামটা বলছি, আসবে

তো? আটটা সুবিধে হবে? —নামটা শুনে নিই। ফোন রেখে দিই। হ্যাঁ না কিচ্ছু বলি না।

সারাদিন কাজে যায়। রোদ্দুরে ঘুরি, ডেসকে কাজ করি, রিপোর্ট তৈরি করি। সারাক্ষণ কুয়াশা আমায় ঘিরে থাকে। দীপা আজ অফিসে এসেছে দেখেছি।

—কী হয়েছিল? —অনিন্দ্য।

—মাইগ্রেন। —দীপা।

অস্পষ্ট গুঞ্জন ভেসে আসে। আমার মাথার ভেতর মৌ ঘোরে। ভিন ভিন ভিন ভিন।

—প্লিজ সমুদ্র, আমার অফিসে ঢুকে নিচু গলায় বলে দীপা, আমি মাথা তুলি না। আটটায় কিন্তু, আটটায়, আমি একা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকব। একা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে...রাত আটটা...থাকব দাঁড়িয়ে...দাঁড়িয়ে থাকব কিন্তু...ঠিক...।

পুলকারের সঙ্গীরা বলল কী হল? ওঠো। সমুদ্র!

—আমার আর একটু কাজ বাকি আছে। তোমরা যাও। আমি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব এখন।

ওরা চলে গেলে আমি হাঁটতে হাঁটতে ময়দানে চলে আসি । শীত সন্ধ্যা জেঁকে বসছে। মশা বেশ। ধুলোয় ডিজেলের গন্ধ। চারদিকের ধুলোয় ময়লা গাছগুলো। একটা উঁচু টিলা হচ্ছে আস্তে আস্তে পাতাল রেলের খোঁড়া মাটিতে। ইতিমধ্যেই কিছু ছোট ছোট চারা গজিয়ে উঠেছে, বুনো ফুলও। অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে সব। শুধু গাড়ির আলোর রক্তচোখ, আর আকাশ থেকে ঝুপ ঝুপ করে ঝুলতে থাকা বাদুড় অন্ধকার। কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। যাব, না যাব না। ট্যাক্সি নেব, না নেব না। ভাবতে ভাবতে দেখি হেঁটেই চলেছি, হেঁটেই চলেছি। হাঁটছি। বাস নিই না। শেয়ার ট্যাক্সি না। একলা ট্যাক্সি এখন পাওয়াও খুব মুশকিল। মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ে দেখছি, কী হুড়োহুড়ি বাসের লাইনে। দেখছি একেকটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে যেন ভোজবাজিতে সব ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। মানুষ উগরোচ্ছে, মানুষ খাচ্ছে। পা চালাই, পেরিয়ে যায় বিড়লা তারামণ্ডল, সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল, পেরিয়ে যাচ্ছে নেহরু চিলড্রেন্‌স্ মিউজিয়াম। এখানে বোধহয় বাচ্চাদের কিছু ক্লাস-ট্লাস হয়ে। বেরিয়ে আসছে অনেক। সঙ্গে তাদের মায়েরা। চলতে চলতে বুঝতে পারছি এই পথ আমি আগেও হেঁটেছি। ঠিক এমনি করে। অফিসের পর। বিধ্বস্ত। পাতাল রেলের মাটির পাহাড়টা তখন একটা উইঢিবি ছিল, তারামণ্ডল ছিল না। কিন্তু ক্যাথিড্রালটা বোধহয় ছিল, কিংবা কী জানি আমার ভুলও হতে পারে। এত উঁচু উঁচু-অট্টালিকা ছিল না তখন, আকাশ দেখা যেত, এত গন্ধ ছিল না ডিজেলের। কী জানি কী ছিল তখন যানবাহন। যা-ই থেকে থাক, আমার এই হেঁটে চলাটা সত্য। একেবারে ডুবে গিয়েছিলুম পড়া বইয়ের হলদে পাতায়। ঝুর ঝুর করে ভেঙে যাচ্ছে সব, অক্ষরগুলো পুরো বুঝতে পারছি না।

আমার ভেতরে কোথাও টং টং করে আটটা বাজল। কেউ গম্ভীর গলায় বলল— সময় হল। ভেসে উঠেছে ল্যান্সডাউন রোডের মোহনা, সাদার্ন অ্যাভিনিউ মিশবে। দীপা।

আমরা দু'জনে চিনে রেস্তরাঁয় ঢুকি। চিনে লণ্ঠনের মৃদু আলোর ঢুলুনিতে ড্রাগন ফুটে ওঠে দরজার মাথায়।

—তুমি কী ভীষণ ঘেমে গেছ সমুদ্র, কীসে এলে? এত ঘাম? মোছো।

এতক্ষণে বুঝতে পারি কম দেখছিলুম কেন। চোখের ওপর অবিরল ঘাম ঝরে পড়েছে। তাই। আমি বুঝতে পারিনি। সাদা রুমাল বার করে মুখ মুছি, ফিনকি আমার রুমালের তদারকি করে। ইস্ কালো হয়ে গেছে একেবারে! এত বালিও ছিল! মেনু-কার্ড নিয়ে এসেছে। হঠাৎ জেগে উঠি। দীপা কী খাবে জিজ্ঞেস করি না। অর্ডার দিয়ে দিই।

—সমুদ্র তোমাকে আমার কিছু বলার আছে। খুব জরুরি কিছু। কথাগুলো তুমি কীভাবে নেবে জানি না। কিন্তু আমাকে বলতেই হবে।

আমি ওর দিকে তাকাই।

—এই বিয়েটা আমার অনেকদিন থেকেই ঠিক ছিল। দাদার বন্ধু। দু'জনেই দু'জনকে মানে অ্যারেঞ্জড নয়...জাস্ট সব মিলে গিয়েছিল। ও এখন ওয়াশিংটনে। জর্জ টাউনে। অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর—মাইক্রোবায়োলজি।

আমি উঠে পড়ি। ওর চোখে ভয়। আমি বলি— মুখ হাত ভাল করে ধুয়ে আসি, চটচটে করছে সব। —টয়লেটে যাই। এতক্ষণের জমা জল নামাই, মুখ হাত দুই-ই তরল সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলি। এখন একটু তাজা লাগছে।

এসে বসি। খাওয়া শুরু করি। ও-ও এক চামচ খায়। আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

—কারও গুণের ফিরিস্তি শোনবার জন্যে আজ আসিনি কিন্তু— বলি।

—না, সত্যিই, ওটা আমার বলার আসল কথা ছিল না।

—যেটা বলার ছিল বলো, অপেক্ষা করছি।

—আমি...আমি তোমাকে দেখে জ্ঞান হারিয়ে ছিলুম সমুদ্র। তুমি জানো না, তোমার একটা সাংঘাতিক ম্যাগনেটিজম আছে, মুখ নিচু করল। তুলে বলল,

—অ্যাপিল যাকে বলে। অ্যাকচুয়ালি বি.ই.-তে আমরা সবাই তোমায়...চাইতুম। দীপার মুখটা ঝলসে উঠল— এখানেও জয়ন্তী, মুকুল সবাই তোমায়...।

—বাজি ধরেছিলে নাকি?

—বিদ্রূপ কোরো না, পতঙ্গ যেমন আগুনের টানে...কিন্তু সমুদ্র তুমি মনে কোরো না যা বলেছিলুম তা উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছিলুম, মনে করো না আমার কোনও অভিসন্ধি ছিল। তুমি যখন এলে আমি জাস্ট— জাস্ট নিজেকে সামলাতে পারিনি। যা দিয়েছি আনন্দে দিয়েছি, আনন্দ পেয়েছি। পেয়েছি মানে কি? ইট ওয়জ অ্যান এক্সপ্লোশন। এক্সপ্লোশন অ্যান্ড এক্সট্যাসি।

—তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান...

—কিন্তু তুমি আমাকে ভালবাসনি, সমুদ্র আমার ব্যঙ্গ অগ্রাহ্য করে বলল ও।

—সেটা কী করে বোঝা যায়?

—কীভাবে বলি...তুমি...তুমি অদ্ভুত আনরিয়্যাল...আমাদের মতো জীবন্ত নও। অন্যদের মতো রাগ, লোভ, আসক্তি, ইগো কিচ্ছু নেই তোমার মধ্যে।

—মড়া না মহামানব?

—আমি বোঝাতে পারছি না। তুমি কারও সঙ্গে সেভাবে চিরদিন বাঁচতে পারবে কি না...আমার সন্দেহ আছে। অন্তত আমি সে নই। আমি খুব স্ট্রং, তো দেখতেই পাচ্ছ, আমি প্রচণ্ড ভাবে বাঁচতে চাই। সমুদ্র তুমি তখন ঝলসে উঠেছিলে। কিন্তু অন্য সময়ে ঠান্ডা, ভীষণ...মনে আছে...এলিফ্যান্টায় তুমি কতক্ষণ ত্রিমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলে, মনে আছে?

—অত সুন্দর ভাস্কর্য দেখব না? আমিও তো কিছু গড়ি!

—না। তা নয়। অন্য জায়গায় যেন চলে গেছ, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

—সন্ন্যাসী? গুপ্ত যোগী?

—হতে পারে। সেটা আমার চেয়ে তুমিই ভাল বলতে পারবে। কিন্তু সমুদ্র তোমার জীবন অস্তিত্ব যেন অন্য জায়গায়। শিব ধ্বংসের দেবতা তবু কেন তাঁকে শিব বলে জিজ্ঞেস করেছিলে না? যে শিব ধ্বংসের দেবতা তার দিকেই তোমার নজর পড়ল?

কথা বলি না। চুপচাপ খাই। অসম্ভব খিদে পেয়েছিল। অবশেষে বলি— খটকা। আমার সম্পর্কে তোমার খটকা ছিল, থাকতেই পারে, ঘনিষ্ঠ ভাবে না মিশলে কাকে চেনা যায়? কিন্তু তোমারও তো একটা ফিলিং...।

—সেটাও ভালবাসা নয় সমুদ্র। টু বি অনেস্ট। সুদ্ধু উন্মাদনা। ওইটুকুর বাইরে যে মানুষটা তাকে আমি ভালবাসিনি। আজ যদি আবার সে রকম সুযোগ ঘটে, আবার হয়তো ওইভাবেই ঝাঁপিয়ে

পড়ব, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনও মনের মিল নেই, হবে না— দীপা আর লজ্জা পাচ্ছে না, সোজা তাকিয়ে আছে।

—আমাকে বলতে পারতে তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে পছন্দের মানুষের সঙ্গে!

—তা হলে তো তোমায় পেতাম না। —দীপার মুখ লাল। আমি অবাক।

—যদি তোমার ভাবী বরকে সব জানিয়ে দিই? —শেষে বলি।

—দিয়ো। কিন্তু তারপরেও আমি তোমাকে বিয়ে করব না। তুমি কি সত্যিই মনে করো একদিনের শারীরিক মিলন থেকে সারাজীবনের সম্পর্কের ঝুঁকি নেওয়া যায়? আমি মনে করছি অঞ্জুকে কোথাও ঠকাচ্ছি না। তুমি যদি অন্য ভাবে ভাবতে, আমার কোনও বিবেকদংশন হত না। কিন্তু তুমি সেভাবে ভাবো না, আনফর্চুনেটলি। তাই তোমার জন্যে খুব খারাপ লাগছে।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরি।

মা রান্নাঘরের দরজায়। ওপর থেকে বাবার তর্জন। ফিনকি ছুটে এল।

—কী রে। কোথায় গিয়েছিলি?

—আচমকা কাজ পড়ে গিয়েছিল।

—একটা ফোন তো অন্তত করে দিবি!

—হ্যাঁ...ফোনটা...তোরা খেয়ে নে।

—আমাদের খাওয়া কবেই সারা। মা-ই না খেয়ে বসে আছে।

আমি হঠাৎ রান্নাঘরের কপাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মায়ের কাছে চলে যাই, মুখোমুখি দাঁড়াই— মা, এই রিচুয়ালগুলো কেন?

—কী?

—রিচুয়াল। বাড়ির সবাইকে না খাইয়ে তুমি খাবে না এই ধরনের রিচুয়াল। আরও আছে সেগুলো এখন থাক। তুমি নিশ্চয়ই জানো আমরা প্রত্যেকে অ্যাডাল্ট। আমাদের কোনও কাজ পড়ে গেলে আমরা খেয়ে নিতে জানি। পাকস্থলীর পাচক রসগুলো নিয়ম করে বেরিয়ে আসে। খাবার না পেলে নিজেকেই খায়। ফলে আলসার। তোমার না খেয়ে থাকা আমাদের কোনও আনন্দ দিচ্ছে না। তোমার আলসার হলেও সে যন্ত্রণাটা আমরা ভোগ করব না। তোমার মনে হচ্ছে এই স্যাক্রিফাইসটা, আলসারটা...এগুলো তোমার পত্নীত্বের, মাতৃত্বের মহিমা প্রচার করবে। ব্যাপারটা আদৌ তেমন নয়। তোমার যদি এসব কারণে দুরারোগ্য কোনও রোগ হয় আমরা ডাক্তার পথ্য সবই করব। কিন্তু খুব বিরক্তও হব। ভাবব মা শুধু-শুধু একটা ঝামেলা ডেকে আনল।

হতভম্ব মা আর ফিনকিকে রেখে আমি ওপরে উঠি। বাবার দরজা খোলা, ঢুকে যাই। উনি লুঙ্গির কষি খুলে কোমর চুলকোচ্ছিলেন। আমাকে দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। ওঁর প্রাইভেসি নষ্ট করার সাহস এ বাড়িতে কারও নেই।

—তু ওুমি!

—হ্যাঁ বকুনিটা খেতে এলুম। গর্জন করছিলে শুনছিলুম।

—ন্‌ না। এত রাত, কোথায় গেলে...।

—তার জন্য দায়ী কে? মা? আমি যদি কোথাও যাই— তেমন খারাপ কোথাও বা একেবারে দাদার মতো অনেক দূরে। কিছু করতে পারবে? চেঁচিয়ে? মাঝ থেকে নিজের রক্তচাপ বাড়বে। বেশি বাড়লে সেরিব্রাল স্ট্রোক। আর সে রকম স্ট্রোক হলে জীবন্মৃত হয়ে থাকবে। হাতি কাদায় পড়া যাকে বলে। তখন ব্যাঙেও লাথি মেরে গেলেও কিছু করতে পারবে না। আবার এ-ও হতে পারে তোমার না হয়ে স্ট্রোকটা, সেরিব্রাল বা করোনারি— মায়ের হল, হতেই পারে, বয়স হয়েছে, সর্বক্ষণের টেনশন সহ্য করতে করতে হার্ট বিদ্রোহ করতেই পারে। মা শুয়ে পড়লে বা মারা গেলে তোমাকে দেখবার আর কেউ থাকবে না।

বেরিয়ে আসি। জেঠুর ঘরে ঢুকি। জেঠু বিছানায় বসে। অবাক হয়ে দেখি উনি জপ করছেন। বেরিয়ে আসছি, ডাকলেন— সমু!

—হ্যাঁ, বলুন। ওষুধ খেয়েছেন? শুয়ে পড়ুন এবার জেঠু। ওষুধটা দেব?

—ফিনকি দিয়েছে বাবা। তোমার কী হয়েছে?

আমার হঠাৎ কী রকম অদ্ভুত একটা কথা মনে হল। জেঠুকে, একমাত্র জেঠুকেই বলতে পারি কী হয়েছে, কেন না ওঁর এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। জেঠুর যা হয়েছিল আমারও তা-ই হল। ঠিক যেমন কাকা যা করেছে, দাদাও তাই করল। কিন্তু জেঠুকে বলা যাবে না। তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার সে-সব হয়নি। হবে না। কিন্তু উনি যেহেতু ভুক্তভোগী তাই সহজাত শক্তিতেই বুঝে ফেলছেন আমার কী হয়েছে।

—শুয়ে পড়ুন জেঠু, মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?

—পারবে? ক্লান্ত হয়ে ফিরেছ!

—ক্লান্ত কোথায়! খিদে পেতেই খেয়ে নিয়েছি। একটা ফোন করে দেওয়া উচিত ছিল।

জেঠু পাশ ফিরে শোন।

আমি আস্তে আস্তে জেঠুর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। উনি আস্তে আস্তে বললেন— তুমি একটু থাকো সমু, তুমি থাকলে আমার ভাল লাগে।

জেঠু খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন। উনি যথেষ্ট কড়া ওষুধ খান। আমি একটু দাঁড়িয়ে থাকি। নীল রাত ঢুকে পড়েছে ঘরে। নীল রাত মাথায় করে আমি দাঁড়িয়ে থাকি বিষে নীল এক মনুষ্য আত্মার দিকে ফিরে। যদি আত্মা থাকে সে কি বিষে নীল হয় আদৌ? মনটা হয়, চেতনাও মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়, কিন্তু আত্মা? যা না কি আমাদের ভেতরের আসল সারটুকু! মৃত্যুর পরেও থাকে! নৈনং দহতি পাবকঃ। বিশ্বাস করি না, প্রমাণ নেই বলা খুব সহজ। কিন্তু যে চেতনার কথা এতদিন পাত্তা দিতেন না, আজ সেই কনসাশনেস নিয়েই তো এত কথা বলছেন বিজ্ঞানীরা! তিন। তিন এমন একটা সংখ্যা যা সর্বত্র রহস্য সংখ্যা বলে মনে হচ্ছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ফাদার, সন, হোলি গোস্ট। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। বুদ্ধ, সংঘ, ধর্ম। এর মানে কী? দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান সবকিছুর মধ্যে একই যোগসূত্র একটা আছে। সেটা আমরা ধরতে পারছি না। একটা মানুষ যদি একই সঙ্গে দার্শনিক, বিজ্ঞানী এবং শিল্পী হয় তবে ধরতে পারবে কী? আইনস্টাইন একই সঙ্গে বিজ্ঞানী ও শিল্পী ছিলেন। বেহালা বাজাতেন অর্থাৎ ভেতরে শিল্প ছিল ধরে নিতে পারি। সত্যেন্দ্রনাথও ভায়োলিন বাজাতেন, এগুলো কি গুরু চিন্তার ভার থেকে মুক্তি? না তার চেয়ে বেশি কিছু? ফেইনম্যান এক সময়ে অনুভব করেছিলেন তিনি ফিজিক্সের তত্ত্বগুলো ছবি দিয়ে প্রকাশ করতে চান। রীতিমতো শেখেন ড্রয়িং— প্যাস্টেল, জল রং, তেল রং। জেরি নামে এক শিল্পীবন্ধুকে ফেইনম্যান বোঝাচ্ছেন কী করে বৈদ্যুতিক চুম্বক কাজ করে। পেঁচিয়ে একটা ছোট্ট বৃত্ত করেছেন, এবারে সুতো দিয়ে একটা পেরেক ঝুলিয়ে দিলেন ওপর থেকে। তারের মধ্যে ভোল্টেজ দেবার সঙ্গে সঙ্গে পেরেকটা তারের ঘূর্ণির মধ্যে সোজা ঢুকে গেল। জেরির মন্তব্য— ওহ্‌, ইটস জাস্ট লাইক ফাকিং।

আশ্চর্য, যাতে একজন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বর প্রয়োগ দেখছেন বিস্ময়ে, আনন্দে, সেখানে আর একজন তার সঙ্গে 'ফাকিং'-এর বেশি কিছু খুঁজে পেলেন না। একই প্রক্রিয়া, কিন্তু আলাদা-আলাদা মনে হওয়া। কত রকমের মনে হওয়া আছে পৃথিবীতে! 'ফাকিং' সম্পর্কে জেরির মনোভাবটাও বোঝা যায়। প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের আরেকটা, ব্যস। ফান। অনেক মানুষ, আমি নিজেই যেমন দীপার সঙ্গে মিলনে যে অলৌকিক আনন্দ পেয়েছিলুম তার কিছুই 'ফাকিং' দিয়ে বোঝানো যায় না।

হঠাৎ আমার মনে হয় দীপা মেয়েটিকে যেন বুঝতে পারছি। আমি এমনই তুষার-শীতল, ঠিক

জিনিসটা ঠিক সময়ে করছি। বলছি, কারেক্ট যাকে বলে। কিন্তু আমার মধ্যে কোনও উত্থান-পতন নেই। আছে শুধু একটা ক্লান্তিকর একমাত্রিকতা। আমি যে ওভাবে জ্বলে উঠেতে পারি, সেটা দীপা প্রত্যাশাই করেনি। দেশলাইয়ের কাঠি খড়ের স্তূপে আগুন জ্বালাল। কিন্তু নিজে হয় নিভে গেল, নয় সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। সেই স্বল্পায়ু দেশলাইয়ের কাঠিকে ভয় পেয়েছে প্রবল ভাবে বাঁচতে চাওয়া দীপা।

যতক্ষণ না ঘুম আসে ভাবনা যায় না। আমি নিজেকে যা বুঝি, অন্যে আমাকে তার চেয়ে অনেক বেশি বোঝে। কেন? দাদু বলেছিলেন— তোমার যেন বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা আলগা-আলগা। তুমি দায়িত্বশীল, তাই ব্যাপারটা আরও ভাবায়...তোমার বন্ধু নেই?...যার সঙ্গে একটা বন্ড...যাকে তুমি সব কথা বলতে পারো...সত্যিই...কাকে বলব? কী বলব? কী যেন বলেছিল পুলু?...তুই একটা পাগল...আমি তো পাগল নই পুলু। পাগল আমার জ্যাঠামশাই। এখন আর নেই। যে জ্যাঠামশাই আগে জিনিসপত্র ছুড়ে ছুড়ে ফেলতেন, তিনি এখন সাবান ঘষে ঘষে দু'খানা গেঞ্জি কাঁচেন, দু'খানা রুমালও কেঁচে ঝেড়ে শুকুতে দ্যান, টেবিলের ওপর বই-খাতা গুছিয়ে রাখেন, একটা লাল কলম একটা নীল কলম, একটি ছুরি চিরুনি। সেফটিপিন দিয়ে ভেতরের ময়লা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করেন। কলের জলের তোড়ের তলায় রাখেন। রোদ। যে জ্যাঠামশাই আগে নাকি আমার বাবাকে ধরে মারতেন, মাকে অকথ্য গালাগাল করতেন, দাদুকে দেখলেই চোখে লাল রং এসে যেত, সেই জেঠু এখন বাবাকে ভয় পান, মা'র দিকে চোখ তুলে চান না। ফিনকির সঙ্গে হাসিমুখে গল্প করেন আর আমাকে বলেন— কাছে বসো। তুমি থাকলে আমার ভাল লাগে।

কিন্তু দীপার মনে হয়েছে— আমি আনরিয়্যাল। 'তোমাকে কী রকম আনরিয়্যাল বলে মনে হয় সমুদ্র।' এবং আমি আনরিয়্যাল কিনা জানি না। কিন্তু আমার চারপাশটা সত্যিই অবাস্তব লাগে বেশিরভাগ সময়ে।

'...যে কোনও জায়গা থেকে তুমি কর্পূরের মতো উবে যেতে পারো।'

আমার এই তথাকথিত অবাস্তবতাকে ভয় পেয়ে দীপা সরে গেল। মানে, কেটে পড়ল আর কি। সারা রাত বৃষ্টির মতো চিন্তাপাত। আস্তে আস্তে বৃষ্টির ধারা ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের আরাম হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও সকালবেলা যেমন সময়ে রোজ ভাঙে ঠিক সেই সময়েই ঘুম ভেঙে যায়। দেখি খুব অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছি। পা-দুটো দু'দিকে ফাঁকা। যথাসম্ভব আলগা, হাত দুটো দু'দিকে প্রায় ঝুলে পড়েছে। যে কোনও যোগাসনের পর শবাসনে যেভাবে শরীরটা শিথিল করে দিতে বলে— এ যেন ঠিক সেই রকম। প্রত্যেকটা অঙ্গ থেকে সাড়, বোধ চলে গেছে। আমাকে রীতিমতো চেষ্টা করতে হয় হাত নাড়াতে, পা নাড়াতে। আমি তাদের আলাদা আলাদা করে ডাকি। তোমরা কি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ? আমার ডাকের মধ্যে কোনও ভয় নেই, দুশ্চিন্তা নেই। খুব ঠান্ডা মাথায় নিজের অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করি।

—কী রে ছোড়দা? ফিনকির মুখটা আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

—ছোড়দা!

হঠাৎ আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গে সাড় ঢুকে যায়। বলি— উঠছি।

—এ রকম অদ্ভুত ভাবে...

—স্ট্রেচ্ করছিলুম। —আমি পাশ ফিরে যাই, বুঝে নিই কোমরে জোর এসেছে কি না। তারপর উঠে বসি।

—ঠিক আছিস তো?

—একেবারে— আমি হাসি।

—দেখিস বাবা।

ফিনকি যায় না। সকালের ঘরটার পটে ফিনকি খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে বরং। কোনও সন্দেহ

নেই ও বাস্তব, পুরো ঘরটাকে ও এমন একটা অর্থ দিচ্ছে, যেন ফাঁকা লাইন ছিল একটা, কিছু ঠিকঠাক চমৎকার শব্দ এসে সেখানে বসে গেল।

আমি মুখ ধুতে যাই, ফিরে এসে দেখি ফিনকি দাঁড়িয়ে রয়েছে, দাড়ি কামাই, জলজ্যান্ত পার্থিব বাস্তব আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

—চা আনব!

—না। একেবারে চান করে নীচে নামব। একটু দেরি হয়ে গেছে। আমি খুব হেলাফেলার সঙ্গে বলি।

ও একবার আমার দিকে চেয়ে চলে যায়।

নীচে নেমে দেখি— আমার সঙ্গেই খেতে বসেছে।

—তুই? এখন খাচ্ছিস?

—বেরোব সকাল-সকাল।

জুতোর র‍্যাকের কাছে এসে নিচু হয়ে ফিতে বাঁধছি, ফিনকি জুতো পরতে পরতে বলল— তুই আজকে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিস।

—কেন?

—তোকে ভাল লাগছে না দেখতে। আমি ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখব, তোর অফিসে যাব। ধর পাঁচটা নাগাদ। রেডি থাকবি।

—বাজে চিন্তা করিছিস। আমি অনেক রাত অবধি জেগে ছিলুম। শেষ রাতটা মড়ার মতো ঘুমিয়েছি। তাই কী রকম একটা লেথার্জিক লাগছিল।

—তুই শিওর?

—শিওর। তুই এগিয়ে পড়, আমার গাড়ি এক্ষুনি আসবে।

১৫

দেয়ালের ধার ঘেঁষে পিঁপড়ে চলেছে। লম্বা সারি। লাল-পিঁপড়ে। গরম পড়েছে খুব, তাই ওরা বেরিয়ে আসছে। দেয়ালের কোণ বরাবর ওপর দিকেও যতদূর চোখ যায় পিঁপড়ে। কোথাও নিশ্চয় এর একটা আছে, অন্তত। কিন্তু সেটা কই দেখতে পাই না। কোথাও কোনও চিনি, মধু, সন্দেশের গুঁড়ো কিচ্ছু না। তবে খাটটা দেয়ালের ধার থেকে সরিয়ে আনতে হয়। একেবারে মাঝখানে, পাখার তলায়। নইলে পিঁপড়েরা সার বেঁধে বিছানায় উঠে আসবে এবং তখন আমিই ওদের চিনি হয়ে দাঁড়াব। কত লক্ষ যুগ ধরে এই কীটেরা ঠিক এক রকম আছে। একই শৃঙ্খলাবোধ, একই দলবদ্ধতা, একই খাদ্যস্পৃহা, বাড়ি বানবার রীতি। কোনও বিবর্তন হয়নি ওদের। আরশোলাও শুনতে পাই এ রকমই আর এক আদিম সৃষ্টি। ওদের চোখের সামনে দিয়ে কত তুষারযুগ পার হয়ে গেছে। কত মহাজাগতিক বিস্ফোরণ, কত ধ্বংস, কত সৃষ্টির প্রক্রিয়া অবিরাম চলেছে। এদের তো দেখতে পাচ্ছি। যাদের পাচ্ছি না! কত শত সহস্র ব্যাকটিরিয়া ভাইরাস! ঠিক কীভাবে এই বিপুল প্রাণীময় পৃথিবী চলেছে? কোনও নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হচ্ছে না কেন আর? মানুষই কি বিবর্তনের, প্রকৃতির উদ্ভাবনার শেষ ধাপ? আমি কি সেই ধাপের অন্তর্গত? আমার মধ্যে এত প্রতিক্রিয়ার অভাব কেন? এই এক সময়ে ঘুম থেকে ওঠা। প্রাতঃকৃত্য, চা, মধ্যাহ্নভোজন যা ঠিক মধ্যাহ্নে হয় না। এই অফিস যাওয়া, পুলকারে, অভ্যস্ত নিপুণতায় যে বিদ্যা শিখেছি তার প্রয়োগ সারাদিন ধরে, কারও সঙ্গে তেমন আদানপ্রদান নেই, আবার বিকেলে বা সন্ধ্যায় ফিরে আসা, সবার প্রতি যা করণীয় তেমন ব্যবহার করা...এর মধ্যে একটা যান্ত্রিকতা নেই? আমার মা, দিদারা, বাবা এঁদের মধ্যেও, এমনকী আমার প্রবাসী দাদার মধ্যেও একটা যান্ত্রিকতা নেই? না, দাদা নয়। দাদা বোধহয় একটা দুঃসাহসিক অন্যরকম

কাজ করেছে, স্বার্থপর কাজ কিন্তু অন্যরকম। জেঠুর ছিল তুমুল প্রতিক্রিয়ার জগৎ। অ-যান্ত্রিক ভাবে ভালবেসেছিলেন, প্রতারিত হওয়া সহ্য করতে পারেননি, দুঃখ, লজ্জা, ক্ষোভ, বিশ্বাসঘাতকতার অপমান— তাই তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন। সেই অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার জগৎ থেকে উনি আবার আস্তে আস্তে যান্ত্রিকতায় ফিরে আসছেন। প্রতিক্রিয়াহীনতাই তা হলে যান্ত্রিকতা! ফিনকি কিন্তু যান্ত্রিক নয়। অভ্যস্ত রুটিনের বাইরেও ওর একটা চিন্তাজগৎ আছে। কাকার সম্পর্কে নিঃশব্দে ভাবনা-চিন্তা করে ও একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ওর একটা আলাদা আলাদা সম্পর্ক। তার বাইরের ফিনকি, স্কুল-কলেজের গবেষণা-ঘরের ফিনকি কেমন সে ব্যাপারে আমরা কোনও ধারণা নেই। কিন্তু আমি আন্দাজ করতে পারি, সেখানেও ও অগতানুগতিক, অযান্ত্রিক। যদি দীপাকে বিয়ে করে ফেলতে পারতুম, তা হলে নিঃসন্দেহে আমার এই প্রতিক্রিয়াহীন যান্ত্রিকতারই বিস্তার হত। মুম্বইয়ের ওই অঘটন বা অতিঘটনের পরেও তো আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠিনি! কোনও রকম উপছে পড়া তো ছিল না আমার মধ্যে! আহার-নিদ্রা-ঔপার্জনিক কর্ম-মৈথুন— এই চক্রে বাঁধা আমি এক মানুষ পিঁপড়ে। তাই, সেটাই বুঝতে পেরে দীপা সরে গেছে, তাকে দোষ দিতে পারি না।

মানুষ স্বপ্ন দেখে। কেরিয়ার নিয়ে। বিবাহ নিয়ে, সন্তান নিয়ে। আমি তো কোনওদিন কোনও স্বপ্ন দেখলুম না! আমার কোনও দিবাস্বপ্ন নেই। যা আছে তা রাতের ঘুমে। যখন আমার যান্ত্রিক উপর-চৈতন্য ঘুমিয়ে পড়ে ভেতর থেকে জেগে ওঠে প্রাচীন প্রত্ন বাড়ি সব এবং স্বাধীন এক অস্তিত্বের ছায়া-উড়ান, সে কখনও চার চৌকো ঘর কখনও বাদামি সাপের আয়ত্ত ছাড়িয়ে উড়ে যায়।

দীপা, দীপা কী অসাধারণ বুদ্ধিমতী তুমি। কীভাবে আমাকে খুঁটিয়ে দেখেছ, বিশ্লেষণ করেছ, না কি এটা বুদ্ধির ব্যাপারই নয়। ইনস্টিংক্ট! বাহবা দীপা, বাহবা। তাই আমার মধ্যে যেটুকু লোভনীয় সেটা নিয়ে আমাকে ফেলে দিয়েছ। ঠিক যেমন বহু মানুষ বহু সুন্দরী মেয়েকে ভোগ করে ফেলে দেয়! আমি সাধারণ বাড়ির মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছেলে। আমার ধারণা দৈহিক মিলনের সঙ্গে বিবাহের একটা অবিসংবাদী সম্পর্ক রয়েছে। তাই ধরেই নিয়েছিলুম দীপা ও আমি বিয়ে করব। ভেবে দেখিনি দীপাকে আমার কতটা ভাল লাগবে। তার দৈহিক আকর্ষণটাই বা আমার কতটা গভীর। সে আমার নারী কি না। ভাবিনি, কিন্তু দীপা চমৎকার ভেবেছে। বেশ পরিকল্পনা করে আমার কৌমার্যভঙ্গ করে দীপা এক রাত্রির উন্মাদনা ভেতরে নিয়ে নির্ধারিত পাত্রের গলায় মালা দিতে চলে গেল। তার ভেতরে কোনও দংশন নেই। তার চেয়েও বড় কথা, দংশন আমারও নেই। দীপার অর্থে নয় অবশ্য। প্রথমে বিস্ময় কিছুটা রাগ এসব তো হয়েছিলই। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সেটা কাটিয়ে উঠেছি। দীপা নামে একরাত্রির বনিতার জন্যে আমার কোনও বিরহবোধ নেই। প্রত্যাখ্যানে তেমন কোনও জ্বালা নেই। খালি টের পাচ্ছি, আমি একটু অদ্ভুত, যাকে আমি যান্ত্রিক বলছি, তাকেই কি দীপা আনরিয়্যাল বলছে? তুমি কী রকম আনরিয়্যাল সমুদ্র... যে কোনও মুহূর্তে কর্পূরের মতো উবে যেতে পার।

আমি আনরিয়্যাল কী? চারপাশের জগৎটাকেই তো আমার আনরিয়্যাল লাগে! ক্রমাগত হর্ন বাজাতে বাজাতে ঝড়ের বেগে ট্যাক্সি চলে গেল। কিছু লোক রাস্তা পার হচ্ছে, কেউ দেখে-শুনে, কেউ হাত তুলে গাড়ি থামাতে থামাতে। পুলুর ফোন— 'সমু কেমন আছিস রে? আমাদের এখানে কেউ কাজ করে না। খালি ইউনিয়নবাজি, টিকতে পারব কিনা জানি না, সুযোগ পেলেই বাইরে চলে যাব, তুইও চেষ্টা কর।' সমু বলে একটি ছেলে ছিল। পুলু বলে আর একটি ছেলে ছিল। পুলু খুব বিশ্বস্ত বন্ধু। অনেক সময়েই রক্ষকের ভূমিকা নেয়। সমু? সমু কোনও ভূমিকা নেয় না। তার কোনও উদ্যোগ নেই। পুলু অন্যত্র চাকরি পেয়ে চলে গেল। মাঝে মাঝে তার কথা মনে হতে হতে সমু একদিন পুলুকে একেবারে ভুলে গেল। তখন একদিন জয়ন্তী বলল— পুলককে চেনেন? আমার কাজিন। তাই তো? —অবশ্যই পুলু সমুর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। একদিন পুলু ফোন করল— 'সুযোগ পেলেই বাইরে চলে যাব, তুইও চেষ্টা কর।' ---

পুরোটাই একটা গল্প। তার খুঁটিনাটি ভুলে গেছি। সেই সমুকে, সেই পুলুকে মনে আছে ঠিক

যেমন ভাবে ছোটবেলায় পড়া গল্পের অনুভূতিটা মনে থাকে, আবছা-আবছা। আবার পড়তে গেলে সেরকম ভাল লাগে না আর।

জেঠু খুক খুক করে সন্তর্পণে কাশছেন, কোনও গল্পের জেঠু। মা, বাবাকে খেতে দিয়েছেন। সমু ঢুকছে। মা মুখ তুলে না তাকিয়েই বললেন— বসো সমু, ডালটা সম্বরা দিতে বাকি। —একটা ছবি, ভিডিয়োতে তুলেছি কোনও সময়ে, দেখছি আবার। অ্যামবাসাডারের সামনের সিটে অনিন্দ্য, পেছনে জয়ন্তী, আমি ঢুকে যাচ্ছি। ঠ্যালাগাড়ি লোহার বোঝা চাপানো— লোহার রড। এগুলো আমাদের দরকার হয়, সামনে দুজন পেছনে দুজন ঘামে চুপচুপ হয়ে টানছে, পেছনে এসে ধাক্কা মারে। শুয়োরের মতো মুণ্ডু নিচু করে একটা নির্দিষ্ট গতিতে আসছিল, টাল সামলাতে পারেনি। ড্রাইভার নেমে যাচ্ছে। প্রচণ্ড হুঙ্কার দিচ্ছে। গাড়ির সাইডটা টাল খেয়ে গেছে। অনিন্দ্য নেমে দাঁড়ায়— 'আঃ সুদর্শন। ছাড়ো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ঢোকে সুদর্শন— জানেন না সার, মারুতি হলে সাইড ফুটো হয়ে যেত। মেমসাহেবের গায়ে সোজা এসে ফুঁড়ে যেত...নেহাত...গোঁ-ও-ও করে স্টিয়ারিং ঘোরায় সুদর্শন যেন ম্যাটাডরের হাতের লাল কাপড় দেখা খ্যাপা মোষ শিং বাঁকিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

আমি মৃদু হেসে বলি— জয়ন্তি আজ খুব বেঁচে গেলে কিন্তু।

—ঠাট্টা নয় সমুদ্র, সত্যি! মৃত্যুর থেকে মোটে আড়াই ইঞ্চি দূরে।

—রিয়্যালি, আজ জয়ন্তীর একটা ফাঁড়া গেল। অনিন্দ্য বলল, তবে তোমারও স্বস্তিতে থাকবার কিছু নেই সমুদ্র! ভেবে দেখ ঠিক কী ছিল মোমেন্টামটা, গাড়ির খোলটার রেজিস্ট্যান্স কতটা, ব্যাটা জয়ন্তীকে ফুঁড়ে তোমার দিকে এগোত, না ওকে জাস্ট একটা ঝটকা মেরে তোমার দিকে এগোত...কষে না ফেললে তা বোঝা যাবে না?

যতীন্দ্রমোহন থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ পার হয়ে আমরা এসপ্ল্যানেড ঢুকে যাই। কে যেন কোথাও থেকে বলেছিল 'অ্যাকশন রিপ্লে', এখন বলল— 'কাট'। সারা দিন ধরে কাজে, অকাজে, অফিসে, বাইরে, একা, সহকর্মীদের সঙ্গে, ক্যান্টিনে, ইউরিন্যালে...দুঃশ্রাব্য কণ্ঠ নিচু স্বরগ্রামে অমোঘ স্বরস্থাপনা করে যায়— 'অ্যাকশন', অ্যাকশন রিপ্লে' 'কাট'—'ওভার।'

'মৃত্যুর থেকে আড়াই ইঞ্চি দূরে'— এই শব্দযূথ আমার মাথা থেকে কিছুতেই যেতে চায় না। সারাদিন ঘুরে ফিরে কথাগুলোর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। এমন ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যাই যে ক্যান্টিনে বেয়ারাকে আর একটু হলে বলে ফেলেছিলুম, ফিসফিস করে।

শিবেন বলল—কী বললেন সার, আড়াই ইঞ্চি দূরে?...

—উঁহু, —আমি সজোরে মাথা নাড়ি, আড়াই ইঞ্চি পুরু বুঝলে? ওমলেটটা করবে আড়াই ইঞ্চি পুরু।

—সে আবার হয় না কি সার? চার পাঁচটা ডিম দিয়ে সে যে একটা ছোট মতো যাচ্ছেতাই হবে...

—আহা হা, তোমরা ময়দা দিয়ে ডিম দিয়ে কী যে একটা করো না?

—ও, মোগলাই পরোটার কথা বলছেন? তাই বলুন সার, ওপরে কিমা দেব তো!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো বুঝেছ...আমি ওকে ভাগাই।

—হঠাৎ আজ তোমার মোগলাই পরোটার শখ?— পাশের টেবিল থেকে সুমিত বলল।

—হল...আমি প্রশ্নটাকে ওইখানেই থামিয়ে দিই। ওই যে বললুম কারও সঙ্গে আমার ঠিক জমে না। শুধু শুধু বেকার কথা কতকগুলো...আসে না। মোগলাই পরোটার সুতো ধরে অনেক দূর যাওয়া যেত। সুমিত তো অনায়াসে পারত। তৈরি হয়েই ছিল। ক্যান্টিনের রান্নার কোয়ালিটি। অফিসার গ্রেডের জন্যেই বা একটা সার্টন পার্সেন্টেজ সাবসিডি থাকবে না কেন? সেটা কি আমাদের পার্কস-এর অন্তর্গত

হওয়া উচিত নয়?...এর থেকে মোগলাই কোথায় কোথায় ভাল করে, কোন রেস্তরাঁয় আলাদা করে মোগলাই ঘর খুলছে...এই মতো এক শব্দ-শৃঙ্খল, অবসর কাটানোর, শুধু সময় কাটানোর একটা খেলার মতো। এ একটা বলল, ও আর একটা যোগ করল। সে একটা...যে কোনও প্রসঙ্গ ধরে চলতে পারে এই খেলা— মোগলাই কুইজিন, অসুখ, মোজা, ফিলম, এন্টার দ্যা ড্রাগন, এম্পারার...ডাক্তার, নারী, লায়েবিলিটি, ভ্রমণ, ট্রাম-বাস, রাজনীতি, যুদ্ধ, পারমাণবিক অস্ত্র। যে কোনও, যে কোনও বিন্দু থেকে এক অনন্ত শব্দঘর তৈরি হতে পারে, হয়ে চলেছে অবিরাম। গমগম করছে পৃথিবীর প্রতিটি কোণ এই রকম নানান অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গে। হয়তো অপ্রাসঙ্গিকও নয়। আসলে খুব দায়িত্বহীন লঘু জল্পনা, শব্দ থেকে শব্দে বয়ে যাচ্ছে শুধু। কোনও সিদ্ধান্ত বা সমাধানের ঘাটে ভিড়ছে না।

কে যেন বলে ওঠে জীবনটা তো শুধু সিদ্ধান্ত নয়। সমাধানও নয়। সমাধান হলে তো হয়েই গেল। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলে তো মন-মগজের আর কোনও কাজ থাকে না।

—তাহ হলে কী? তা হলে কী?

—তাই এই টেবিল। চারপাশে চেয়ার। উৎসাহী মুখ, তাই-ই এই শব্দযোগ। এ কোনওদিন শেষ হবে না। এটাই মজা এ খেলার।

—অর্থহীন মনে হয় যে! আধ-পাগলের সিকি-পাগলের প্রলাপ।

—অর্থ নেই। মানে নেই, শেষ মানে কে বলবে? অথচ বেঁচে থাকতে হলে, ভাবতে হয় মানে আছে। শব্দ শুধু শব্দ নয়, তার পেছনে মানে, তার পেছনে আইডিয়া। এমন একটা মোহচক্র তৈরি করতে পারাই বেঁচে থাকা।

ক্রমাগত তারিখ পেছোতে পেছোতে শেষ পর্যন্ত আজ ত্রিমূর্তি— সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অর্থাৎ জয়ন্তী, মুকুলিকা ও দীপা আমাদের বাড়ি এসেছে। মেয়ে বলতে এতদিন আমি কয়েকটা রকম বুঝতাম। মা-রকম বোন-রকম সহকর্মী-রকম আর যৌনটান-রকম। তাই কোনওদিন তাঁদের দিকে ভাল করে তাকাইনি। কেন না মা একটা বলয়, তেল-হলুদ-ধনে-জিরে-সাবান-সিঁদুর, মৌন নম্রতা যাকে ইদানীং আর নম্রতা নয় উদাসীনতা বলে মনে হয়। বোন অবশ্য, বিশেষ করে আমার বোন, ঠিক শুধু একটা বলয় নয়। সে সমকেন্দ্রিক বৃত্তের মতো। মধ্যবিন্দুতে সেখানে ভালবাসা, যেখানে বিশ্বস্ততা সেখানে ঠিক আছে। কিন্তু তার বাইরে যে তরঙ্গ ক্রমাগত বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে তার সবটা আমি চিনি না। তবু জানি এইখানে একটা অনুকূল হাওয়া বয়, সারা দিন-রাত, ইচ্ছে করলেই সেই হাওয়ায় আমি স্নান করতে পারি। আমি ইচ্ছে করি না যখন-তখন। কিন্তু ফিনকি এখনও পর্যন্ত আছে। জয়ন্তীরা এতদিন ঠিক অনিন্দ্যদের মতোই ছিল, কেবল মেয়ে বলে তাদের সঙ্গে একটু বেশি সৌজন্য, বেশি দূরত্ব ছিল, দূরত্ব তো সবার সঙ্গেই। সৌজন্যেরও কোনও কমতি নেই। তবু জয়ন্তীরা লেডিজ সিট, লেডিজ ফার্স্ট। আর যৌন-টানটা ছিল নারী-নিরপেক্ষ। এক সময়ে, এখনও মাঝে মাঝে নিজের ভেতর থেকেই সেই টান অনুভব করি। ঠিক অন্য দৈহিক টানগুলোর মতো। মেয়েদের সংস্পর্শে যে যৌনতা জাগে তার সম্পর্কে আমি খুব সতর্ক। সেই চুম্বক কোথাও টান মারছে বুঝলেই আমি সরে যাই। দীপা আমাকে নারীস্পর্শের সম্মোহনের কথা দারুণ চিনিয়ে দিয়েছে। তাই আমি আর একটু চক্ষুষ্মান হয়েছি। ব্যক্তিস্বরূপিণী নারী কে কী সে সম্পর্কে আমি আর অত অবোধ অত অন্ধ নেই। তাই-ই বললাম সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।

জয়ন্তী সব সময়ে আগে এগিয়ে আসে। তার সমস্ত ধরনের মধ্যে একটা সরল আহ্বান আছে যা এক ভারহীন সম্পর্ক তৈরি করে। —আপনি পুলককে চেনেন? —আমার কাজিন... ওর কাছ থেকে আপনার কথা কত শুনেছি।... একদিন আপনাদের বাড়ি নিয়ে যাবেন... উঁহু বলে নয়...না বলে...ফিনকি কে?...ঠিক আছে ওকে, শুধু ওকে...এই রকম আধা-অন্তরঙ্গ কথায় জয়ন্তীর উপস্থিতি। ফর্সা, একটু মোঙ্গলীয় ধরনের চাপা মুখ। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা চোখের বাঁকে, নাকের টানে। মুকুলিকাকে

আমি আগে কোনওদিন দেখিনি ভাল করে, কেন না ও খুব চুপচাপ, নিজেকে লুকিয়ে রাখে। খুব হালকা রঙের শাড়ি পরে, প্রসাধন করে না, রং উজ্জ্বল কিন্তু ফর্সা নয়, ওর চুল কাঁধের একটু নীচে পর্যন্ত ঢেউ খেলানো। একটা ক্লিপ দিয়ে আটকে রাখে। মুখটা একটুও ভাল মানুষ ভাল মানুষ নয়। অথচ আন্তরিক। ও কিন্তু সোজা মুখের দিকে চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। যেন কিছু বলতে চায়। বলবার আছে। কিন্তু বলবে না। নিজের ভেতরে রেখে দেবে। না বলা কথার রহস্য মুকুলিকাকে কী রকম দুর্বোধ্য করে রেখে দিয়েছে। দীপা আজ এসেছে মোহিনী বেশে নয় একেবারেই। তার ছোট চুল একটু বড় হয়েছে বুঝি বা। চৌকো গড়নের মুখে স্মার্টনেস খেলা করে বেড়াচ্ছে, সাদা শাড়ি পরেছে একটা। তাতে ওকে খুব অধ্যাপক-অধ্যাপক লাগছে দেখতে।

জয়ন্তী বলল— জানেন তো মাসিমা, পুলু যে আমাকে সমুদ্রর কথা কত বলেছে! কত বলেছে! এক অফিসে কাজ করবি তো, দেখবি কী ম্যাচিওর, সব ঠিক করে দেবে।

মা মৃদু হাসলেন— কী ঠিক করে দেবে? ঠিক করে দেবার কী আছে!

—বাইরে তো আর বেরোননি মাসিমা, কর্মক্ষেত্র যে একটা কী জিনিস। —দীপা বলল।

—তা সমু সব ঠিক করে দিয়েছে? মা মুকুলিকার দিকে তাকিয়ে বললেন। ও শুধু হাসল। সে হাসির অনেক রকম মানে হতে পারে। হয়তো বলতে চায়। —হ্যাঁ সব ঠিক করে দিয়েছে। হয়তো বলতে চায়— ঠিক করে দেবে? অত সহজ? আবার হয়তো কোনও মতামত দিতে চায় না। কোনটা আমি বুঝতে পারিনি।

মা বললেন— হ্যাঁ আমার ছেলে খুব করিৎকর্মা।

এই প্রথম আমি মায়ের মুখে কোনও বিশেষণ, আমার কোনও বর্ণনা শুনলাম। 'আমার ছেলে'টুকু প্রথমে একটা তীব্রতায় এসে আছড়ে পড়ল আমার বেলাভূমিতে। তাই তো! মা তা হলে জানেন, স্বীকার করেন আমি মায়ের ছেলে? 'আমার ছেলে' না বলে তো 'ও' বলতে পারতেন, 'সমু' বলতে পারতেন, তা হলে আমার কিছুই মনে হত না। কিন্তু 'আমার ছেলে' বলার মধ্যে একটা মালিকানার স্বীকৃতি এমনকী অহঙ্কার আছে সেটা একটু পরে আরও স্পষ্ট হয়—'করিৎকর্মা'। এই বিশেষণটা আমার সম্পর্কে আদৌ প্রযোজ্য তা কখনও মনে করিনি তো? কোনও হীনম্মন্যতা আমার নেই। কিন্তু আমি একটা করিৎকর্মা মানুষ। মানে অনেক কিছু চটপট পারি? কী-ই বা পেয়েছি আমি কতকগুলো রুটিন কাজ ছাড়া? কীই বা পারতে চাই?

দীপা বলল— সেটা কিন্তু আমরা প্রথম-প্রথম একেবারেই বুঝতে পারিনি। হি নেভার শোজ অফ্। কিন্তু কাজের সময়ে দেখি জাস্ট দু-চারটে কথা দিয়ে সব ঠান্ডা করে দিল।

ফিনকি চোখ বড় বড় করে বলল, ঠান্ডা করে দিয়েছিস? ছোড়দা? তেড়ে মেরে ডাণ্ডা, না কি?

সেটাই তো— জয়ন্তী হাসল— সমুদ্রকে ডাণ্ডা ধরতে হয় না। ওই যে দীপা বলল জাস্ট দু-চারটে কথা!

—তা-ও উঁচু গলায় না, রেগেমেগেও না, এতক্ষণে মুকুলিকা বলল। এই মেয়েটিও তা হলে সব লক্ষ করেছে! আমি রাগি না, উঁচু গলায় কথা বলি না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

—তাই তো আমরা বলাবলি করি— দীপা বলল— একজন ডিপ্লোম্যাট হবার সব গুণ আছে সমুদ্রর। কী? কিছু বলো সমুদ্র? আমরা এত কিছু বললাম।

আমি মৃদু হেসে শুধু বলি—'তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান, গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।'

দীপার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। রংটা ফর্সা বলে ফ্যাকাশে হওয়াটা চট করে সবাই বুঝতে পারবে না। কিন্তু ওর মুখ-চোখ, কথা-বলা, চলন সবকিছুর মধ্যেই একটা উচ্ছ্বাস, সজীবতা আছে। সেটাই নিভে গেল। তবে সে-ও ডিপ্লোম্যাট কম নয়। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল— বাপ রে কতক্ষণ ধরে আর এই তেলানো চলবে তোদের জয়ন্তী! মাসিমা স্যরি। একেবারে কবিতা-টবিতা, সেন্টিমেন্টালিটির

চরম। চলো চুমকি তোমাদের বাড়িটা খুব ইন্টারেস্টিং। তুমি কোন ঘরে থাক, চলো দেখে আসি।

—চুমকি নয়, ফিনকি।

—এমা, স্যরি ভাই।

—স্যরি হয়ে আর কী করবে! এই ভুল অনেকেই করে। আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। চলো, দেখবে তো! ছোড়দা তোর বন্ধু, তুইও আয়।

ফিনকি ওদের নিয়ে এগিয়ে যায়। আমি মায়ের দিকে চাই— কিছু আনব টানব? শিঙাড়া কচুরি মিষ্টি...

—না, ফিনি তো খুব কষেটযে মাংস রাঁধল। আমাকে বলে গেল লুচি করতে। আমি রান্নাঘরে যাই। তুমি ওপরে যাও। —যাবার সময়ে মা বলে গেলেন— মেয়েগুলি বেশ।

আমার দিকে বিশেষ ভাবে তাকালেন না। অথচ কথাগুলোর মধ্যে কোথাও একটা বিশেষ সুর আছে। মা যেন তাঁর সম্মতি জানাচ্ছেন। হ্যাঁ ঠিক আছে। গো অ্যাহেড।

আমাদের এই সব পুরনো বাড়ির এই রকমের সেকেলে ধাঁচ। বাড়িতে কোনও মেয়ের আগমন হলেই এঁরা ভাবেন, এটা বিয়ের জন্য দেখতে আসা, দেখাতে আসা। চাপা বিরক্তিতে আমার গা গুলিয়ে ওঠে। সেই কোন কাল থেকে মেয়েদের সঙ্গে ক্লাস করছি, ওয়ার্কশপ করছি, এখন চাকরি করছি। মেয়ে-বন্ধু মানেই প্রেমিকা এই বস্তাপচা ধারণাটার বাইরে আমাদের অন্দরমহল কিছুতেই আর ভাবতে পারল না। অন্তত পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে এখনও। আমি বেরিয়ে যাই। কাছাকাছি এক বিখ্যাত দোকান থেকে দু'রকম মিষ্টি কিনি, এই সন্দেশগুলো খেতে খুব ভাল। ভেতরে বাদামের পুর দেওয়া, ওপরে গোলাপ গন্ধ। আর লেডিকেনি এরা করে একেবারে বিয়েবাড়ির ভিয়েনের মতো। মিষ্টিগুলো মায়ের কাছে জমা দিই। মাকে বলি— একটা প্লেটে কিছু মিষ্টি দিতে। জেঠুকে দেব। উনি মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসেন।

মিষ্টি নিয়ে জেঠুর ঘরে ঢুকছি, পাশের ঘর থেকে ঝনঝনে হাসির ঝঙ্কার এসে কানে লাগল। আমাকে দেখে জেঠু ভিতু খরগোশের মতো মুখ তুলে বললেন— কে সমু। কে, ওরা কে?

—ওরা তিনটি মেয়ে জেঠু, আমার কলিগ। জাস্ট বেড়াতে এসেছে।

—ফিনকির মতো?

—হ্যাঁ। আর একটু বড় হবে। আপনার জন্যে মিষ্টি নিয়ে এসেছি। খেয়ে নিন।

—খুব মাংসের গন্ধ পাচ্ছি।

—হ্যাঁ। রাতে খাবেন। লুচি দিয়ে।

—না, না রুটি। গ্যাস ভাল না। আমার গ্যাস হয়। সমু, ওঁদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে না?

—আপনি করে বলছেন কেন? ওরা আপনার মেয়ের মতো।

—তবু...

—তবু নয়, আপনার মতো বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ আপনি-আপনি করলে কারও ভাল লাগবে না।

উনি আমার মুখের দিকে ব্ল্যাঙ্ক চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ। তারপর জানলার দিকে তাকিয়ে বললেন,

—ওখানে কোনও মেয়ে ছিল না, জানো। রাঁধুনি না, ঝি না, নার্স না, সব ধুম্বো ধুম্বো ব্যাটাছেলে। কী বলব আমার দম আটকে আসত সমু। একেবারে রিভোল্ট করত মনটা...

—আরে এখানে?...

মুখটা আস্তে আস্তে নরম হয়ে এল— এখানে মা আছেন, মেয়ে আছে, ঠাকুমা আছেন, আহ্— কী শান্তি! কী শান্তি! আমি বড় শান্তিতে ঘুমোই সমু।

কী বলতে চাইলেন জেঠু। মেয়ে থেকে ওঁর আর ভয় নেই? পুরনো বিশ্বাসাঘাতের জ্বালা জুড়িয়ে গেছে? উনি কি এখন মেয়েদের প্রকৃত মূল্য, মানুষের জীবনে কোথায় তাদের স্থান— তা উপলব্ধি

করেছেন? কে জানে? তবে আমার সামান্য একটু দ্বিধা ছিল সেটা কেটে গেল। যদিও ওঁর কথা আমি পুরোপুরি বুঝেছি বললে ভুল হবে।

হইচই করতে করতেই ওরা ফিনকির সঙ্গে এ ঘরে এল। জেঠু তখনও তাঁর লেডিকেনি শেষ করেননি।

চট করে উঠে উনি হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। হাত থেকে স্টিলের রেকাবি আর চামচ ঝনঝন করে পড়ে গেল। আধখানা লেডিকেনিও।

—এমা! ও জেঠু এ কী করলেন? নমস্কার করতে আপনাকে কে বলেছিল? কলকল করে উঠল জয়ন্তী।

—ছি ছি, ফিনি দাঁড়াও মা আমি তুলে দিচ্ছি। —ফিনকিকে কিছুতেই তুলতে দিলেন না ওগুলো।

—খালি অপাট। খালি অপাট— তোমার নমস্কার আগে না লেডিকেনি আগে? কৌতুকের স্বরে ফিনকি বলল, ঝটিতি একটা ন্যাতা নিয়ে এসে মুছে নিল লেডিকেনির রস।

ওরা তিনজনে নিচু হতেই জেঠু কাঠের পুতুলের মতো হাতজোড় করে চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ রকম একটা গরুড়ের স্ট্যাচু যেন আমি কোথায় দেখেছি।

জেঠুর ঘরে বসে, দাঁড়িয়ে ওরা অন্তত মিনিট দশেক গল্প করল। দেয়ালে সাঁটা বোর্ডের ওপর ফর্মুলাগুলো দেখল। তারপর চলে আসতে আমি বাঁচলুম।

লুচি-মাংস-মিষ্টি ইত্যাদি চেটেপুটে খেয়ে একেবারে বিদায় হতে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

—ওফ্ফ্ফ্।

—তুই তো এত ভিতু অধৈর্য ছিলি না ছোড়দা!

—তাই বলে বাড়ি এসে ঘরে ঘরে ঢুকে ইন্সপেক্ট করবে? চলো তোমার ঘরটা দেখে আসি। এনক্রোচমেন্ট নয়?

—তোর ঘরটা কিন্তু দেখাইনি। বন্ধ করা ছিল। বাইরে থেকে ছিটকিনি দেওয়া আমি খুলিনি।

—কেন? বলেনি 'সমুদ্রের ঘরটা দেখব!' মুখে তো কিছুই আটকায় না! আমি যদি ওদের কারও বাড়ি গিয়ে এর ঘর ওর ঘর দেখতে চাই, শোভন হবে!

লুটিয়ে লুটিয়ে হাসতে লাগল ফিনকি। তারপরে চোখে হাসির জল নিয়ে মুখ তুলে বলল— তুই রাগ করছিস, দিস ইজ গুড।

কেন কী বৃত্তান্ত আমি আর জিজ্ঞেস করিনি। তখন থেকে অফিসের পোশাক পরে আছি। ওদের যার যার বাসে তুলে দিয়ে তবে মুক্তি। চান করি। পাজামা-পাঞ্জাবি চাপাই। বেশ শীত পড়েছে, কিন্তু এমনই আমার অভ্যেস। দরজাটা তখনও খুলি না। কেন না ফিনকি নিশ্চয়ই কৌতূহলে বেলুন হয়ে রয়েছে। আমার বেরনোর যা অপেক্ষা। জানলাগুলো শেষ দুপুরের দিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়, মশার জন্য। এখন সন্ধে উতরে গেছে। আমি জানলা দুটো খুলে দিই। আমার জানলার বাইরে কুড়ি ফুট মতো রাস্তা। তার ওদিকে দোতলা বাড়ি— সামন্তদের। বহুদিন আমাদের প্রতিবেশী। পুলুদের বাড়ি এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। শীত মানেই ভারী বাতাস, ধোঁয়া-মেশা, ময়লাটে। এই ময়লাটে হাওয়া ভেদ করে আকাশের আসল মুখ দেখতে পাওয়া যায় না। এ যেন অস্বচ্ছ পর্দার ওপারে কোনও পর্দানশিনের মুখ, উৎসুক হয়ে যাত্রা দেখতে বসেছে। দেখা যায় না। দেখতে খারাপ লাগে। এত বিকৃতি। তবু ওই দিকেই তাকিয়ে থাকি, মনে প্রশ্ন নিয়ে, অস্বস্তি নিয়ে আর কোন দিকেই বা আমরা তাকাতে পারি!

জয়ন্তীকে প্রথম তুলে দিই বাসে, বন্ধুদের দিকে চেয়ে খুব অর্থপূর্ণ হাসি হেসে ও বাসের হ্যান্ডেল ধরে উঠে গেল। শীত বলেই বোধহয় তেমন ভিড় নেই।

মুকুলিকা লাল চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিল— আস্তে করে বলল— আপনি কি লাকি! বাড়ির লোকেরা সবাই কী ভাল! শুধু আপনার বাবাকে দেখা হল না।

আমি ঘড়ির দিকে তাকাই— আটটা বাজে, আর ঘণ্টাখানেক টেনে থাকতে পারলে শুনতে পেতে!

—শুনতে পেতুম? কী?

—আমার বাবার আগমন বা আবির্ভাব যাই বলো।

—দেখা নয়? শোনা? —দীপা বলল।

—শোনাও শুধু নয়, টের পাওয়া যাকে বলে।

দুজনে দুরকম স্বরে হেসে উঠল।

—তা হলে তো উনি তোমার মতো নয়।

—না, উনি বাড়ির সবার প্রাণশক্তি একাই ধারণ করেন।

—ইন্টারেস্টিং— দীপার উক্তি।

আমি বলি— তোমার দেখাশোনার সবটাই কি ইন্টারেস্টিং আর আন-ইন্টারেস্টিং-এ বিভক্ত?

তাকাইনি তবু বুঝতে পারছি মুকুলিকা মিটি মিটি হাসছে।

—তোমার জীবনের সবটাই যেমন কর্তব্যে আর অকর্তব্যে বিভক্ত।

আমি উত্তর দিতে যাই না আর। কেন না এ তো স্পষ্ট ও জিততে চায়। যা চায় তা ওকে পেতেই হবে। আমাকে চেয়েছিল, পেয়েছে। এখন কথার খেলায় জিততে চাইছে। জিতুক।

মুকুলিকার বাস এসে গেল, ও থাকে উল্টোডাঙার দিকে, সল্টলেকের মুখে।

—তুমি একটা ট্যাক্সি নিলে পার— আমি দীপাকে বলি।

—ওহ্, আর একটুও আমাকে সহ্য করতে পারছ না, না? ঝাঁঝিয়ে উঠল দীপা।

আমি জবাব দিই না। ওর অভিযোগ হোক, অনুযোগ হোক সেটা তো সত্যিই! আমি কি বলব? —ঠিক বলেছ দীপা, তুমি বড় আনইন্টারেস্টিং।

বলা যায় না। এ ধরনের অভদ্রতা, ঝগড়া-কাজিয়া আমার চরিত্রে নেই।

—মৌন মানেই সম্মতি। ঠিক আছে আমাকে সইতে পারছ না। ইটস ন্যাচার‍্যাল। যাই হোক, তোমার জেঠু একটু...মানে বই-টইগুলো দেখছিলাম— খুব পণ্ডিত লোক মনে হল, বিয়ে করেননি কেন?

আমি ধীর গলায় বলি— দীপা, যে বাড়িতে তোমার আসার কথা ছিল, অথচ আসনি, সে বাড়ির সব কথায় তোমার এত কৌতূহল কেন? এটা ঠিক নয়।

ও একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে— স্যরি। কৌতূহল নয়। আমার কেমন মনে হল উনি খানিকটা তোমার মতো। চেহারায়, স্বভাবে। তাই—

—হতেই পারে। বাড়ির একজনের সঙ্গে আর একজনের চেহারার, স্বভাবের মিল থাকতেই পারে। কিন্তু তাতে কী? আমার সম্পর্কে জানার প্রয়োজন তো তোমার ফুরিয়ে গেছে। আমার জেঠু আমার মতো না আমার কাকু আমার মতো এ খবরে তোমার কাজ কী!

রাস্তার আলো ওর মুখের ওপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছে। আমি বুঝতে পারছি ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি নিবিষ্টমনে টু বি বাসের আসার পথের দিকে চেয়ে আছি।

—সমুদ্র। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। আমার জন্যে না, আমি জয়ন্তী আর মুকুলের জন্যে খোঁজখবর করছিলাম। ওরা দুজনেই তোমাকে দারুণ পছন্দ করে। তুমি বয়স বাড়লে কীরকম হবে...

এইবারে আমার ধৈর্যভঙ্গ হয়। আমি বুঝতে পারি আমার মাথা দিয়ে চিড়িক বিজলি হেনে যাচ্ছে ক্রোধ। আমার তা হলে ক্রোধ আছে!

বলি— তুমি তা হলে একদিকে আমার আর আর একদিকে তোমার দুই বান্ধবীর গতি করতে চাইছ। তুমিই আমার, আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা! স্পর্ধা বটে! তবে শোনো, আমার জেঠু যে রকম ব্রিলিয়ান্ট ছিলেন তাঁর ধারে কাছে আমরা কেউ নেই। কিন্তু তিনি আমার ধাতুতে গড়া ছিলেন না। একটি মেয়ে প্রেমের ভান করে তাঁকে রাম ঠকান ঠকায়, তিনি উন্মাদ হয়ে যান। ভায়োলেন্ট। দীর্ঘ

আঠারো বিশ বছর তিনি অ্যাসাইলামে ছিলেন। মানে পাগলা গারদ। প্রাইভেট। সম্প্রতি আমি নিয়ে এসেছি। তোমার বন্ধুদের সুযোগ-সুবিধে মতো এই ভেতরের কথাটা জানিয়ে দিয়ো। নাউ, গেট ইনটু দিস ট্যাক্সি।

আমি একটা ট্যাক্সিকে দাঁড় করাই।

—দেশপ্রিয় পার্ক ভাই, ঠিক সে লে যানা।

ট্যাক্সি ছাড়বার আগেই আমি ছেড়ে যাই।

১৬

আমি কি নারীবিদ্বেষী হয়ে যাচ্ছি? কিংবা হয়েই জন্মেছি! আমার মা'র সঙ্গেও তো আমার সম্পর্ক হয়নি! সেটা কার দোষ, মায়ের না আমার? নাকি পরিস্থিতির? কোনও মেয়েকে আজ পর্যন্ত আমি চাইনি। কেন? এ কি সেই তরুণ বয়সে কুৎসিত উলঙ্গ বেশ্যাকে দেখার ফল? যা সুন্দর, যা স্বাভাবিক, সৃষ্টির প্রথম যে শর্ত আমাদের শরীর জুড়ে রয়েছে তাকে বিকৃত উৎকট চেহারায় দেখাল আমার নিয়তি। অথচ, আমার সহপাঠীদের তো কিছু হল না! তারা প্রথম যৌবনের কৌতূহল ও প্রবৃত্তি মেটাতে বেশ্যাসঙ্গ করল, তারপর একদিন কোনও মেয়েকে ভালবেসে বা গুরুজনের ব্যবস্থাপনায় বিয়ে করে জীবনভর আইনসঙ্গত নারীসঙ্গ করছে, কোথাও কোনও কাঁটা ফুটছে না, বিষ উগরাচ্ছে না! যদি বা সুন্দর আমাকে দেখা দিল, স্বর্গ আমার জানা হল, পরমুহূর্তে এ কী অদ্ভুত প্রতারণা! আমার ভাগ্যেই ছিল? এখন আবার জানতে পারছি আরও দুটি মেয়ে আমার অনুরক্ত। এমনই নাকি আমার চুম্বক টান! তা এরাও বোধহয় সেইভাবেই আমাকে চাইছে। এক রাতের বনিতাগিরি!

কিন্তু, আমিই কি সত্যি চিরকালের জন্য কাউকে চাইছি। দীপাকে চেয়েছিলুম কেন না সেটাই সামাজিক রীতি। সামাজিক কর্তব্য, দায়িত্ব। যদি ঘটনাটা না ঘটত তা হলে তো চাইতুম না। এই প্রথম আমার মনে হল প্রশ্নটাকে না এড়িয়ে সোজাসুজি এর মুখোমুখি দাঁড়াই। কীভাবে দাঁড়াব? সোজাসুজি জিজ্ঞেস করব? তা কি করা যায়! আমার চাপা স্বভাব। স্বভাবের বিরুদ্ধে কি এতখানি যাওয়া যায়? ঠিক আছে। আমি পর্যবেক্ষণশীল হব। জীবনকে সহজে নিতুম। এবার সহজে নেব না। জটিলে নেব। নিজেও জটিল হব, সতর্ক।

ছোড়দা, তোর কী হয়েছে বল তো? —আমার দিকে চোরা চাউনি হেনে ফিনকি অবধারিত বলল। ফিনকির চুল ফুলে রয়েছে। সালোয়ার কামিজ পরে আজ ওকে আরও ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। কনুই ভেঙে হাতের পাতায় মুখ রেখে ও আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

—কী আবার হবে?

—তা অবশ্য। আমাকে বলবিই বা কেন। কে একটা খুড়তুতো বোন।

আমি হেসে ফেলি। ও-ও হাসে।

—তুই প্রেমে পড়েছিস, না রে?

আমি চমকে উঠি— ইস্‌স্ কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি ফিনকি বুঝলি। তুই নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছিস। আমার খোঁজ রাখা উচিত ছিল। কিন্তু কী জানিস জারতুতো ভাই তো! নিজের দাদা হলে যতটা...

ফিনকি আমাকে একটা রাম-চিমটি কাটল। চোখ হাসিতে চকচক করছে।

হঠাৎ আমার মনে হল আমি এক তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। পুরো দৃশ্যটা আধো-অন্ধকার। চারদিকে ভূতের মতো কয়েকটা গাছ। আকাশে তিন চারটে তারা জ্বলজ্বল করছে। বহুদূর থেকে কে আমার দিকে আসছে। মেয়েই বোধহয়। ফিনকি? ফিনকির মতোই তো দেখায়,

কেমন একটা কালো মতো পোশাক পরেছে— ছায়ার সঙ্গে মিশে আছে যেন। আসছেই আসছেই, কিন্তু এগোচ্ছে না, একটুও এগোচ্ছে না।

—কী রে? একটা ঝটকা দিল ফিনকি।

—হ্যাঁ, কী বলছিলি?

—বলছিলুম খুড়তুতো বোনকে প্রেমে পড়ার গপ্পো করা যায় না।

—করা যায়, কিন্তু মজাটা হচ্ছে কিছুতেই প্রেম ঘটছে না।

—তুই চেষ্টা করছিস?

—ধুর, চেষ্টা করে হয়? তুই-ই বল্।

—চেষ্টা করাটা দরকার, তোর বিশেষ করে।

—কেন? আমার আবার বিশেষ করে কেন?

—ছোড়দা তুই বড্ড একা। এত একা হওয়া ভাল না।

—তুই একা নয় তো?

—না আমি একা নই। আমার অনেকে আছে। মা বাবা জেঠু, দিদা, বন্ধুবান্ধব, মাস্টারমশাই। তোর কেউ নেই!

আমি এবার গম্ভীর ভাবে বলি— তুইও নেই?

—আমি তো থাকতে চাই। কিন্তু তোর ঘরের ছিটকিনি তুই সব সময়ে লাগিয়ে রাখিস। তুই কাউকে ঢুকতে দিস না।

—হয়তো আমার মন নেই।

—মন যে আছে সেটা জানার জন্যে কারও দরকার হয় ছোড়দা, তুই প্রেমে পড় প্লিজ।

আমি হাসি সামলাতে গিয়ে কেশে ফেলি, তারপর ও একটুও হাসছে না দেখে, গম্ভীর ভাবে বলি— প্রেমে পড়লেও যদি একা থেকে যাই?

—দুর, প্রেমে পড়া মানেই দরজা খুলে গেল। মুখোমুখি দুটো দরজা। সেই খোলা দরজা দিয়ে একা মানুষটা বেরিয়ে যায়, অন্তত আর একটা মানুষের কাছে। ছোড়দা আমার কিন্তু তোর তিন কলিগকেই খুব ভাল লেগেছে।

—তা হলে তুই-ই ওদের প্রেমে পড়েছিস?

—ঠাট্টা নয় রে। তুই যাকে ইচ্ছে পছন্দ করতে পারিস, বাড়িতে কোনও আপত্তি হবে না।

মনে-মনে ভাবলুম— হায় হায়, বাড়ির আপত্তির কথা কে কখন ভেবেছে! নিজের আপত্তিকেই সামলে উঠতে পারছি না।

বলি— ছাড় ফিনকি, আমার এই প্রসঙ্গ ভাল লাগছে না, তোর কথা বল।

—আমার কোন কথা? এত কথা আছে, কোনটা বাছব?

—বাপ রে! বলিস কী! এত?

—হ্যাঁ, যেন এটা স্বতঃসিদ্ধ এমন ভাবে বলল ও। অনেক কথা থাকাটাই যেন স্বাভাবিক।

—তো আমাকে তার এক গণ্ডূষ দে।

—ছোড়দা তুই কী নিয়ে ভাবিস জানি না, আমার মনে হয়, নিজেকে নিয়ে। মানে তুই স্বার্থপর, নিজের ছাড়া কারও কথা ভাববার তোর মন নেই এটা কিন্তু একেবারেই বলতে চাইছি না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তুই বরঞ্চ উল্টোটাই। তুই জেঠুর কথা এত করে ভেবেছিস, মাকে সেদিন কীভাবে বোঝালি আত্মত্যাগের ইউসলেস মোহ, দাদাকে আমাদের পারিবারিক প্রয়োজন থেকে ছেঁটে ফেলে মান বাঁচিয়েছিস আমাদের। এ সবই। কিন্তু ছোড়দা তুই নিজেকে নিজের সমস্ত সম্ভাবনাসুদ্ধ একটা কৌটোর মধ্যে আটকে রেখেছিস। তোর যেন অনেক দূরে একটা আলাদা বাড়ি আছে, সেখান থেকে এসে তুই আমাদের কাজগুলো করে যাস। তারপর ফিরে যাস তোর নিজের বাড়িতে।

ফিনকি সব সময়ে হাসি-খুশিতে ভরা, ইয়ার্কি-ফাজলামিতে ভরা ফিনকি এইসব অপ্রত্যাশিত কথাগুলো বলছিল আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল বাড়ির পরে বাড়ি। বিরাট, ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, পাঁচিল দিয়ে ডালপালা মেলে অট্টহাসি হাসছে বট পাকুড় অশথ, ঘরদালান সব খালি পড়ে রয়েছে। আওয়াজ করলে তার প্রতিধ্বনি উঁচু সিলিং-এ, দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে ফিরে আসে, চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। জানলা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে ধ্বংসস্তূপ, কত দেয়াল, কত ছাদ ভেঙে পড়ে রয়েছে, দালান দিয়ে উঠোনে, উঠোন থেকে ঘরে, ঘরের পর ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একজন ছোট্ট ছেলে, কিছু খুঁজছে। কিন্তু কী খুঁজছে তা আমার জানা নেই।

সত্যিই তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে ওই নাম-না-জানা তল্লাশিতে। মন বলো মন, প্রাণ বলো প্রাণ। আর তাই-ই হয় তো সে পথ চলে আনমনে, কাজ করে যান্ত্রিক, সব বুঝতে পারে, যা করার করে যায় কিন্তু আধখানা সিকিখানা মন দিয়ে। বাকি আধখানা, বা তিন চতুর্থাংশ নিখোঁজ। কেউ কি নেই, কিছু কি নেই যা আমাকে ওই রহস্যাধার বাড়ি থেকে ছুটিয়ে বাইরে বার করে আনতে পারে?

চুপ করে ভাইবোন মুখোমুখি বসে থাকি। এই যে ফিনকি, এ সত্যি-সত্যি কে? আমি একে বেশ পছন্দ করি, এ আমার খুব আদরের ছাত্রীও। কিন্তু এ কে? এ বাড়িতে এ-ই আমার ঘনিষ্ঠতম, এ জেনে ফেলেছে আমার অন্য বাড়ির কথা, আমিও জানি ওর সমকেন্দ্রিক বৃত্তীয় স্বভাব-কথা। এই জানা ইনস্টিংকটিভ, বা ইনটুইশন জাত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তেমন কোনও দৃঢ় সেতু নেই যা বেয়ে আমরা পরস্পরের কাছে পৌঁছতে পারি।

—ও বলে— এই ছোড়দা, মন খারাপ করছিস না কি, আমার কথায়?

দূর ও জানেই না সে-অর্থে আমার মন খারাপ হয়ই না।

—আমি জানি তুই এই উদাসীনতাটা পেয়েছিস মায়ের কাছ থেকে।

এই তো একটা শব্দ পাওয়া গেছে। অন্ধের নড়ির মতো নির্ভরযোগ্য একটা শব্দ— 'উদাসীনতা।' শব্দটা আমরা চিনি, তার অনুষঙ্গগুলো আমাদের চেনা ফিনকি। 'বাড়ি' থেকে 'উদাসীনতা'য় পৌঁছলে বড় স্বস্তি পাই। আমাকে যেন কে খোলামকুচির মতো ছুড়ে দিয়েছিল এক চলন বিলে। হাবুডুবু খাচ্ছিলুম। সযত্নে সেখান থেকে তুলে এনে কেউ স্থাপন করল পাথরের গর্তে জমে থাকা বৃষ্টির জলে। আমার কাজটা সোজা হয়ে গেল।

আমি হাসি, —তো তারপর?

—তারপর মানে, মায়ের উদাসীনতাটা কিন্তু কতকগুলো ঘটনার কারণ, মোটেই স্বভাব নয়। জানিস?

—না তো! কী?

—এই দ্যাখ, কোনওদিন মানুষটাকে জানবার চেষ্টাই করিসনি! আমরা যে একেক জন একেক রকম গড়ে উঠি তার পেছনে একটা কার্য-কারণ থাকে। স্বীকার করছি সহজাত স্বভাবও থাকে খানিকটা। কিন্তু কার্য-কারণটা ভীষণ ইমপর্ট্যান্ট!

—তা তো বটেই, —আমি ঠেকা দিয়ে যাই। ফিনকি বাজুক। নিজের ইচ্ছে মতো বাজুক।

—জানিস কি? মা একজন স্কলারশিপ পাওয়া মেয়ে! লজিক আর সিভিক্স-এ মায়ের হায়েস্ট মার্কস ছিল ইউনিভার্সিটিতে? সে সময়ে ইনটারমিডিয়েট পড়তে হত।

এ খবর সত্যিই আমি জানতুম না। আরও কিছু শোনবার আশায় চেয়ে থাকি।

—মা শুধু পড়াশোনায় ভালই ছিল না। ভালবাসত খুব। পড়াশোনাটাই প্রাণ ছিল। তার ওপরে মা অপূর্ব গাইত। তুই মায়ের গান শুনেছিস?

আমি অবাক হয়ে বলি— কই না তো!

—আমি মায়ের বাথরুমে গুনগুন থেকে ধরে ফেলি। তারপর জেরা, জেরা। শেষে স্বীকার করতে

বাধ্য হল প্রথমে উস্তাদের কাছে, তারপর পঙ্কজ মল্লিক, শৈলজারঞ্জন এঁদের কাছে গান শিখেছিল। কিন্তু সুদ্ধু কালো মেয়ে বলে মায়ের বাবা-মা তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে মনস্থ করেন। যেদিন যেদিন মেয়ে দেখতে আসত মা কলঘরের ছিটকিনি দিয়ে বসে থাকত। কিছুতেই বেরোত না। আমাদের দাদু সব কথা শুনলেন, তারপর নিজে কলঘরের দরজায় ঘা দিয়ে বলেন— মা, আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে কলেজে পড়াব, তুমি গান শিখবে— ঠিক যেমন আগে ছিলে তেমনই থাকবে। আমরা তোমার মতো গুণী মেয়েই চাই মা।

এইভাবে বয়স্ক মানুষের পীড়াপীড়িতে আর আদরে মা বেরিয়ে এসেছিল।

—তারপর?

—তারপর? তোর তা হলে কৌতূহল আছে বলছিস!

—নিশ্চয়ই—(ওই যে বললুম আমি শুধু ঠেকা দিয়ে যাই)।

—তারপর খুব ঘটাপটা করে বিয়ে হল। মা থার্ড থেকে ফোর্থ ইয়ারে ওঠার পরীক্ষাটা মিস করল। তা সত্ত্বেও অত ভাল ছাত্রী বলে কোনও অসুবিধে হয়নি, কিন্তু তারপরই প্রেগন্যান্সি, মায়ের প্রাণান্তকর কষ্ট হয়েছিল, হাসপাতালে থাকতে হয় বহুদিন। ড্রিপ চালাতে হয়। দাদা হল ফাইন্যাল পরীক্ষা এসে গেল, বইয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন বহুদিন। মা বলল— পরীক্ষা দেব না।

দাদু বললেন— ঠিক আছে, পরের বছর দিয়ো। পরের বছর মায়ের দ্বিতীয় সন্তান হল, মেয়ে এবং মারা গেল, পরীক্ষা দেবার প্রশ্ন নেই। তারপরে মা কলেজ যেতেও চায়নি। পরীক্ষা দিতেও অস্বীকার করে।

—আর গান?

—ওরে বাবা, দাদু লিবার‍্যাল হলে কী হবে, আমাদের ঠাকুমা ছিলেন ভীষণ গোঁড়া। ঠাকুমারা সবাই। বাড়ির বউ গান শিখবে?

—কিন্তু সেই কথা দিয়েই তো আনা হয়েছিল!

—এরকম ঠকানো তো অনেক মেয়েকেই হয়! এখনও হচ্ছে!

ঠকানো! প্রতারণা! মেয়েকে! 'ঠকানো' এবং তার শুদ্ধ সংস্করণ 'প্রতারণা' দুটোই আমার ভীষণ চেনা-চেনা লাগে। জীবনে কত শব্দ ব্যবহার করি, তার পুরো মানে না বুঝেই তো করি। ভাষাটা শিখি শুনে শুনে, আবৃত্তি করে করে, তারপর তার শব্দাবলি নিয়মাবলি শিখি। কিন্তু একটা শব্দের পেছনে যে অনেক সময়েই একটা অনুভূতি থাকে, সেটাকে না বুঝলে শব্দটাকে জানা হয় না। 'ভক্তি'— কী মানে এর? জানি না, বুঝি না শব্দটা ব্যবহার করি। 'বিরহ' মানে কী? ব্যবহার করে যাচ্ছি। তার বাইরের খোলসটাকে ছুঁচ্ছি। কিন্তু ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ আসল মানেটা জানবে না। 'ঠকানো', 'প্রতারণা' এগুলো সাধারণত টাকাপয়সা বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারেই ব্যবহার হয়। টাকাপয়সা, বিষয়সম্পত্তি যেহেতু স্থূলতর বিষয় তাই ঠকানোর চতুর উল্লাস, ঠকে যাওয়ার ক্রোধ কিছুটা-কিছুটা বুঝি। কিন্তু প্রতারণা যে কত করম হতে পারে! মা বুঝেছিলেন প্রতারণার মানে, জেঠু বুঝেছিলেন, আমি বুঝেছি। মা পাষাণ হয়ে গেলেন, জেঠু পাগল হয়ে গেলেন, আর আমি কী হলুম? সিনিক, সিনিক বোধহয়। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা আমার মনে হল।

এই যে মা, জেঠু, আমি— আমাদের প্রতারণা, এটার মধ্যে কি একটা পরিকল্পনা আছে? কার? তা জানি না। কিন্তু মা, একজন নারী তাঁকে যেভাবে ঠকানো হল তার প্রতিক্রিয়া আশেপাশে চুপিচুপি রয়ে গেল। সুযোগ খুঁজতে লাগল। জেঠুর ঠকে যাওয়াটা একরকম বদলা। আমারটাও তাই। মায়ের বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়েছিল, অন্য নারীরা সেই বিশ্বাস ভঙ্গের প্রতিশোধ নিল। প্রতিহিংসার ইচ্ছে এবং ফলাফল পরের প্রজন্মে ফিকে হতে থাকে। তাই জেঠু যেভাবে যাতনা ভোগ করলেন, আমি ঠিক সেভাবে করলুম না।

—দাদু কিন্তু ঠকাতে চাননি। ফিনকি বলল— যতদূর সম্ভব সাহায্য করে গেছেন মাকে। প্রথম

কথা, প্রতিদিন সন্ধেয় দাদু ফিরলে মা গান শোনাত, ঠাকুমারাও ভক্তিভরে শুনতেন, দাদু চুপিচুপি বাপের বাড়ি নিয়ে যাবার নাম করে মাকে উস্তাদজির কাছে নিয়ে যান। কিন্তু মা বলে— কাউকে লুকিয়ে মা কিছু করতে পারবে না।

—অর্থাৎ তথাকথিত সততাও এক ধরনের বোকামি, তাই নয়? আমি বলি— তারপর জিজ্ঞেস করি— এই সমস্তর মধ্যে বাবার কোনও ভূমিকা ছিল না?

—নাঃ।

—খুব অদ্ভুত, না?

—নয় বোধহয়। খুব আত্মসর্বস্ব করে ওঁকে তৈরি করা হয়েছিল তো। মা আসাতে বাবার অনেকগুলো প্রয়োজন চমৎকার মিটে গেল। তারপরে সেই মেয়েটিকে পরিবার কেমন ভাবে চালাবে, কী দেবে না দেবে সেটা পরিবারের ব্যাপার।

এইবারে ফিনকি আমার দিকে ফেরে। ওর মনোযোগের কেন্দ্রে আমি। বলল— শুনলি তো, মায়ের ব্যাপারটার পেছনে কতকগুলো কারণ আছে। তোরটার কোনও কারণ নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হয় তুই উদাসীনতাটা মা'র কাছ থেকে পেয়েছিস, আত্মকেন্দ্রিকতাটা বাবার থেকে নিয়েছিস। কিন্তু তুই সে অর্থে উদাসীনও নোস, আত্মকেন্দ্রিকও নোস। এগুলো আমি বুঝি। তুই দাদুর খুব ফেভারিট নাতিও তো ছিলি।

—তা হলে ধরে নে, দাদুই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল। দাদু নেই, তাই বন্ধুও নেই।

—শোন, ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই। এতদিন ধরে কারও শোক একরকম থাকে না। থাকা সম্ভব নয়। তার ওপরে তুই যে-রকম হাড়-হিম-করা প্র্যাকটিক্যাল!

—শোকের কথা হচ্ছে না ফিনকি। বন্ধুত্বের কথা হচ্ছে। যে বালক একজন প্রতিষ্ঠিত, জীবনের সব অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ, সদাশয়, সমব্যথী টাইপের বয়স্ক মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, সে আর কারও সঙ্গে সেটা পারবে কেন? সবটাই কি তার জলো আনইন্টারেস্টিং লাগবে না?

হঠাৎ ফিনকির চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। চোখ মুছতে মুছতে বলল।

—আমি জলো, আমি আনইন্ট্রেস্টিং?

—আরে বাবা, এতে কান্নার কী হল? তোর কথা বলেছি না কি? বন্ধুদের কথা বলেছি।

—দ্যাখ্ যার সঙ্গে যে সম্পর্কই থাক, বন্ধুত্ব হতে কোনও বাধা নেই।

—ঠিক আছে। তোকে একটা ছোট বোন বলে দেখি তো! সেইজন্যে হয় তো! কিন্তু কথা দিচ্ছি, বলবার মতো কোনও কথা হলেই আমি তোকে বলব। ইন দা মীন টাইম ওই মায়ের উদাসীনতা আর বাবার আত্মকেন্দ্রিকতার কম্বিনেশনটা চলুক। হ্যাঁ?—ফিনকি, ছোট্ট একটা ভেংচি কেটে উঠে গেল। ফিনকি আমার ভিন্ন বাড়ির কথা জেনে গেছে। কী করে? জেনেও ও আমাকে কাছে টানে। সবাই ওর মন ছোঁয়, কী করে জানি না। হয়তো কোনওদিন ও কাকাকেও বুঝে ফেলবে, বিশ্বাসঘাতকের প্রতি নৈতিক অসমর্থন থাকা সত্ত্বেও কাছেই টানবে।

১৭

শুনলুম বেশ ঘটাপটা করেই বিয়ে হয়ে গেছে শ্রীমতী দীপার। তিনি কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন। শ্রীমান আঞ্জনেয়র সঙ্গে ওয়াশিংটন উড়ে চলে যাবেন। ভিসা পেতে সামান্য দেরি। আমি যাইনি কেন বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি অফিসের কাজে ব্যাঙ্গালোর গিয়েছিলুম। কাজেই এড়িয়ে যাওয়ার অপবাদটা দিতে পারলেন না। উনি আজ এসেছেন রেজিগনেশন দিতে এবং সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে। সব বন্ধুদের এড়িয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এগুলো ইনি কীভাবে ম্যানেজ করেন

জানি না। তেমন কিছু সাজগোজ করেননি। ঠিক আগেকার মতোই আছেন, খুব সরু একটু লাল সিঁথিতে, তাই দিয়ে যায় চেনা।

—হ্যাললো সমুদ্র, মাস দুই তিনের মধ্যে চলে যাচ্ছি। যাবার আগে জেনে যেতে চাই তুমি আমায় মাফ করেছ।

ওর সমস্ত চেহারার ভেতর থেকে কৃত্রিম স্মার্টনেস ঝরে গেছে। অথচ ও এখনও স্মার্ট। এটা যে ওর অভিনয় নয়, আন্তরিক কিছু সেটা আমি বুঝি। আমার মুখ দিয়ে সুভদ্র হাসি বেরিয়ে আসে।

—কী মুশকিল দীপা, মাফ করার কী হল? কিচ্ছু নেই। আমি এখন এক্কেবারে নিশ্চিত যে আমার সঙ্গে কোনও স্থায়ী সম্পর্ক না হওয়ায় তোমার তো ভাল হয়েইছে, আমারও ভাল হয়েছে। আবেগের মাথায় কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভাল।

এত কথা আমি সাধারণত বলি না।

ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ঠোঁট দুটো একটু কেঁপে উঠল। খুব আবছা স্বরে বলল— আনন্দের মুহূর্তগুলোর কথাও কি মনে রাখবে না?

—দ্যাখো দীপা, কী মনে রাখব আর কী রাখব না, সেটা তো আমি ঠিক করি না, আমার জীবন, আমার স্বভাব ঠিক করে। আমি ওসব এক্কেবারে ভুলে গেছি। বিশ্বাস করো। প্রথমটা সামাজিক অভ্যাসে একটু রাগ হয়েছিল ঠিকই, খানিকটা অপমানবোধ। কিন্তু তুমি তো জানই আমার ইগো তেমন স্ট্রং নয়। তাই এখন কিচ্ছু নেই। সাফ সব। স্মৃতি আসে স্মৃতি যায়, মনটা একটা ফাঁকা স্লেটের মতো, স্মৃতি আঁচড় কাটে, ঘটনাস্রোত মুছে দেয়, আবার আঁচড়...আবার মুছে যাওয়া...

দীপা এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। চোখ টলটল করছে। তারপর পেছন ফিরে চলে গেল।

এতগুলো কথা ওকে বললুম, একেবারেই না ভেবে-চিন্তে। কিন্তু সর্বৈব সত্য কথা। অনেক স্মৃতি কাঁটা হয়ে বেঁধে কিন্তু কোনও না কোনওদিন কাঁটা আপনি গলে যায়। এটাই সত্যি। তবে অন্যের ক্ষেত্রে যেভাবে হয়, আমার ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শুরু ও শেষ হয় এই প্রক্রিয়া। দীপা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভ বিরক্তি যেটুকুও বা ছিল, আমার মন সেটাকে শুষে নিল, বেলাভূমির বালি যেমন জল শুষে নিয়ে সূর্যের তলায় বিছিয়ে থাকে, সব আর্দ্রতা শুকিয়ে যাবে বলে।

কিন্তু ও কী চেয়েছিল? আমি ওকে মনে রাখি? মুম্বইয়ের রাত সারাজীবন প্রাণভোমরার মতো হৃৎ-কৌটোয় রেখে দিই? রেগে যাই, বিষণ্ণ হই, বিষাক্ত হই! আমি যেমন প্র্যাকটিক্যাল দীপাও তো তেমনি, কম ক্যালকুলেশন তো করেনি! সোজাসুজিই তো জানিয়ে দিয়েছিল আমি ওকে ভালবাসিনি ও বোঝে, এবং ও আমাকে ভালবাসে না সেটাও বোঝে। তা হলে? এ কী রকম ধর্ষকাম মেয়েটির মধ্যে? ও চায় ও আমেরিকার ভূস্বর্গে আঞ্জনেয়কে নিয়ে জীবন চূড়ান্ত আনন্দে বাঁচবে। আর সেই আনন্দের একটা উপকরণ হবে সমুদ্র নামে যুবকটির ওকে না পাওয়ার দুঃখ, মাঝে মাঝে ও দুঃখবিলাসে হঠাৎ সমুদ্রের জন্য কষ্ট পাবে, ঈশ্‌শ সমুদ্র! আহা সমুদ্র! সমুদ্রকে যা দিয়েছি তা সে কোনওদিন ভুলতে পারবে না, মাঝে মাঝেই ছটফট করবে মনে ও শরীরে। আর সমুদ্র দেবকুমারের মতো পাগল হয়ে গেলে ওর আনন্দটা তুঙ্গে উঠবে। আহা কী আনন্দ আমি একটা যে-সে-নয় এমন যুবককে পাগল করে দিতে পেরেছি। আহা রে, ও এখন গোবরার পাগলা-গারদে থাকে, জানিস মেবল্, জানো কুর্চি, জানো তহমিনা। এসব তো আঞ্জনেয়কে বলবার নয়। তাই তোদের...তোমাদের না বললে মনটা হালকা হচ্ছিল না!

এইভাবে পরিষ্কার আমি পড়তে পারলুম দীপাকে। নিজের বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলুম। আমার মনে হল, জেঠুকে যে মেয়েটি ঠকিয়েছিল, সে তো আরও গভীর ভাবে ঠকিয়েছিল। একেবারে প্রেমে পৌঁছে গিয়েছিল। তাকে যদি খুঁজে বার করা যায়! এখন নিশ্চয় বুড়ি। মাথার চুল সব পাকা, যদি কলপ লাগিয়ে না থাকে, মোটা খসখসে হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। গিন্নিবান্নি, খেয়ে কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচায়। হয়তো বুড়ো বরকে খ্যাঁকখ্যাঁক করে, উল্টে খ্যাঁকখ্যাঁকানি খায়।

ছেলে মেয়েগুলো কথা শোনে না। বউ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে সব। এইভাবে ভেবে ভারী আনন্দ হল।

বাড়ি ফিরে ফিনকিকে সেদিন বললুম— একটা কাজ করতে পারবি?

—কী কাজ?

—জেঠুর সেই প্রেমিকার নাম-ধাম জোগাড় করতে পারবি? দেখিস যেন আবার জেঠুকেই জিজ্ঞেস করতে যাস না।

—পাগল? কিন্তু কেন?

—কর না।

—অদ্ভুত তো তুই! কোন কালের কথা তুই খুঁড়ছিস কেন?

—প্রত্নতাত্ত্বিকরা ঠিক যে কারণে ঢিপি-ঢাপা খোঁড়ে!

—তারা খোঁড়ে অ্যাকাডেমিক কারণে, ইতিহাস জানবে বলে।

—আমিও তাই।

—তুই কি জেঠুকে নিয়ে রিসার্চ করছিস? গল্প লিখবি? জীবনী?

—হুঁ।

এই ধরনের উদ্যম আমি সত্যিই আগে কখনও অনুভব করিনি নিজের মধ্যে। কী যেন ভেতরে আসছে, ইচ্ছা, উদ্যোগ, সিদ্ধান্ত। এ সবই নতুন, একেবারে নতুন।

জেঠুর কাছে বসি, ঘনিষ্ঠ আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলি। খুব সাবধানে অবশ্য। পরে নিজের ঘরে এসে নোট করি।

দেবকুমার সেন— এখন বয়স সাতান্ন। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ আগে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, একটি সহপাঠিনীর সঙ্গে গভীর প্রেম ছিল। মেয়েটি অন্য একজনকে বিয়ে করে চলে যায়। দেবকুমার ফিজিক্স ও অঙ্কে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজ পান। বিকারগ্রস্ত হয়ে যাওয়ায় স্বভাবতই তাঁর চাকরি যায়। বছর চারেক বাড়িতেই হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজি চিকিৎসা হয়, তারপর তাঁকে দীর্ঘ বিশ বছর অ্যাসাইলামে রেখে চিকিৎসায় তাঁর পিতার খরচ হয় প্রতি মাসে গড় 6000, অর্থাৎ $6000 \times 12 \times 20 = 14,40000$, এ বাদেও আরও কিছু অতিরিক্ত ধরলে পনেরো লাখের ওপরে যায়। এই তথ্যগুলো আমি পাই দাদুর হিসেবের খাতা থেকে।

এতদিনে একটা করার মতো কাজ পেয়েছি যেন। এমন একটা গবেষণা যা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কাঠ, লোহা, সিমেন্ট কাঁকরের ড্রাফট নয়। আমার জীবনের প্রত্যেকটা ধাপ আমি সহজে উতরেছি, প্রত্যেকটি কাজ সহজে করেছি, বোধহয় সেই জন্যেই কোনও উত্তেজনা ছিল না সেগুলোতে। সবই যেন আমার ছায়া, একটা ছায়ামানুষ আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছে। সব করে দিচ্ছে। খুব নিশ্চিন্তে, নির্লিপ্ত হয়ে থেকেছি। প্রথম উত্তেজনা, প্রথম ধাক্কা, প্রথম অসাফল্য দীপা। দীপাকে মনে না রাখলেও, দীপার দেওয়া উন্মাদনা জুড়িয়ে জল হয়ে গেলেও ওটা একটা বিসদৃশ ঘটনা, আমার জীবনে।

ফিনকির প্রতিভা কিন্তু অসামান্য। ঠিক বার করে ফেলল। মেয়েটি, উঁহু মহিলার নাম সৃষ্টি। সহপাঠিনী নয়, জেঠুর দু বছরের জুনিয়র ছিলেন। জেঠুর কাছে পড়ে, জেঠুর নোটস্, বই নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন। তারপর জেঠুরই সহপাঠী, তেমন ব্রিলিয়ান্ট নয়, কিন্তু ধনীঘরের ছেলেকে বিয়ে করে পগারপার হয়ে যান। একেবারে ইংল্যান্ড।

'সৃষ্টি' নামটা খাতায় লিখে আমি বসে থাকি। এরকম ধরনের সৃষ্টিছাড়া নাম সে সময়ে হত? তখন তো নমিতা, সবিতা, মিনতি, বড়জোর শ্রীলা, মধুশ্রী এই সবের কাল। ভদ্রমহিলা ইংল্যান্ডে। তা হলে তাঁকে ধরবই বা কী করে? বাড়িটা হাজরা রোডের এক ঠিকানায়।

—কী করে এসব জোগাড় করলি? ফিনকিকে জিজ্ঞেস করি।

—বলব কেন? তুই বলেছিস নিয়ে কী করবি?

—ধর যদি ওঁর বাড়ি যাই, কৈফিয়ত দাবি করি?

—দুই যুগ পরে কৈফিয়ত? কৈফিয়ত নিতে যাচ্ছিস আবার তুই? জেঠুর ভাইপো? এসব তোর মাথায় এল কী করে?

—জেঠুর জীবনের এতগুলো বছর অকথ্য দুর্গতিতে কেটেছে, আর জীবনটা বরবাদ হয়ে গেছে। যে কোনও জীবন নয়, একজন খুব উজ্জ্বল মানুষের, প্রচুর সম্ভাবনা ছিল যাঁর। এবং পনেরো লাখের ওপর টাকা দাদু ও বাবার খরচ হয়ে গেছে তাঁকে সারাতে।

তখন ফিনকি কতকগুলো অদ্ভুত কথা বলল।

—জেঠুর জীবনের সঙ্গে তুলনা করছি না, ছোড়দা, কিন্তু মায়ের সম্ভাবনার যে অপমৃত্যুগুলো হল, গায়িকা হিসেবে, স্কলার হিসেবে তার কৈফিয়ত তুই কার কাছে চাইবি? ধর মা যদি গান গাইত রেডিয়োতে। সিনেমাতে, জলসাতে, মা যদি প্রোফেসর হত, হতে হতে এখন যদি প্রিন্সিপ্যাল-ট্যাল হয়ে ভাইস-চ্যান্সেলরই হয়ে যেত, তা হলে ইভন ইন টার্মস অব মানি, মা কতটা লুজ করল হিসেব কর। মায়েরও যেটা হয়েছে সেটা দুর্গতিই। তুই একটা সিভিল এঞ্জিনিয়ার, তোকে যদি কোনও বাড়ির চাকরের কাজে রেখে দেওয়া হয়, তোর কী হবে? কেমন দুর্গতি? ভেতরে হেমারেজ হয় ছোড়দা, সমস্ত মনে ছড়িয়ে যায়, তারপর মনটা অসাড় হয়ে যায়।

আমি ওর কথার জবাব দিতে পারি না। দুটো দুর্গতি দুদিকে দাঁড়িয়ে তাদের বিকৃত প্রস্তরীভূত মুখ আমাকে দেখায়। দাদামশাই দিদিমা আর বেঁচে নেই, দাদু-ঠাকুমাও আর বেঁচে নেই। বাবা আছেন। ওঁকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলে হাঁ করে থাকবেন। বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারবেন না। তারপরে হবে একটা অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়া, উনি চেঁচাবেন, গর্জন করবেন, তখন মা ওপরে উঠে আসবেন, হাতে ডালের কাঠি, বলবেন-- কী হচ্ছে এখানে? সমু, ফিনকি? যাও, তোমরা এখান থেকে যাও। আমরা চলে যাব, বাবা চাপা গর্জন করে চলবেন। মা ডালের কাঠি নিয়ে নীচে নেমে যাবেন। জিজ্ঞেসও করবেন না কী হয়েছে? কেনই বা আমরা বাবার ঘরে। কেনই বা তিনি গর্জন করছেন। কৌতূহলশূন্য পাথর-প্রতিমা নীচে নেমে গিয়ে আবার ডালে কাঠি দেবেন, সাঁতলাবেন। ডালে নুন কম, ভাত শক্ত, ঝোলে নুন বেশি, মাছ বড্ড বেশি ভাজা। উচ্ছে সেদ্ধ হয়নি।

ফিনকি বলল— আর ধর যারা উজ্জ্বল নয়, সাধারণ, চেষ্টা করে যাচ্ছে, চেষ্টা করে যাচ্ছে যেটুকু ক্ষমতা আছে তাই দিয়ে কোথাও পৌঁছতে। তাদের কারও বা অনেকের জীবন যদি অন্য মানুষদের লোভের জন্য হৃদয়হীনতার জন্য সুবিধেবাদের জন্যে বরবাদ হয়ে যায়। তাতে তোর কিছু বলবার নেই? সে কৈফিয়ত তুই কার কাছে চাইবি? মাফিয়ার কাছে না রাজনীতির কাছে না ভণ্ড সমাজসেবকের কাছে, কার কাছে?

আমার ছায়া দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনও বক্তব্য নেই তার। এখন ফিনকি আমাকে এমন কয়েকটা প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যার উত্তর আমি জানি না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

—ছোড়দা তুই কোন জগতে থাকিস জানি না, কিন্তু জীবন তো এরকমই! কে যে সুযোগ পাবে কে যে পাবে না, তুই জানিস না। সম্ভাবনাময় মানুষ ব্যর্থ হল, যার কোনও গুণ নেই সে দিব্যি হেসে খেলে জীবন কাটিয়ে গেল এরকমই তো হয়।

এবার আমি স্বর খুঁজে পাই।

—এগুলো সবই ভাববার জিনিস ফিনকি, কিন্তু এটা তো স্বীকার করবি যেটা আমাদের ব্যক্তিগতভাবে গায়ে লাগে সেটার কথাই আমরা বেশি অনুভব করি, ভাবি, প্রতিকারের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠি!

—তার মানে জেঠু তোর ব্যক্তিগত, জেঠুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার হয়ে তুই তুলকালাম লাগিয়ে দিচ্ছিস। মানে জেঠুর সঙ্গে তুই আইডেনটিফাই করছিস। কেন রে? তোরও এ রকম কিছু হয়েছে,

না? ও, আমাকে তো আবার বলবি না। আমার সঙ্গে আইডেনটিফাই করতে পারিস না। আমি অবশ্য এ-ও বুঝি এর পেছনে কে।

ফিনকি বলে যায় আর আমি হতবাক হয়ে বসে থাকি।

কী করে ও এত বুঝল?

তা হলে দেখা যাচ্ছে আমি এতই আত্মকেন্দ্রিক নিজের স্বার্থে লাগলেই আমি টলে যাই। আমার নির্লিপ্ততা সুতরাং একটা রূপকথা। এবং মোটের ওপর আমি অন্যদের সম্পর্কে অনুভূতিহীন। দ্বিতীয়টা আমি আন্দাজ করেছিলুম, কিন্তু আমার নির্লিপ্ততার গায়ে এমন একটা দুর্বল জায়গা আছে আমি জানতুম না। আমি কি লজ্জা পাব? আমার কি সঙ্কুচিত হওয়া উচিত? মুখ নিচু, যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছে কাপুরুষ— এই জাতীয় কিছু?

ফিনকি বলল— যারা নিজেদের খুব বীরপুরুষ ভাবে তারা কোথাও হেরে গেছে স্বীকার করতে চায় না। এটাই তোর ইগো ছোড়দা, আর তোর ইগোয় লেগেছে অর্থাৎ জিনিসটা আছে এটা একটা ভাল লক্ষণ। দীপা, না রে?

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ দিই। ফিনকির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না।

—ঠিক কীভাবে কতটা সিরিয়াসলি ও তোকে ঠকাল, জানতে চাইছি না, তোর বোধহয় অসুবিধে আছে। কিন্তু ছোড়দা আমার ধারণা এটা তোর দরকার ছিল। তুই কি এখনও দীপাকে ভালবাসিস?

—ওকে আমি কখনও ভালবাসিনি। ও-ই...

—ও তোকে বুঝিয়েছে ও তোকে ভালবাসে, তুই বিশ্বাস করেছিস, ও চলে গেছে। এই তো।

—কতকটা!

—তা হলে তোর জ্বালাটা, আবারও বলছি, অপমানের জ্বালা।

এবার আমি মুখ তুলি,—আমার কোনও জ্বালা নেই ফিনকি। বিশ্বাস করা না করা তোর ব্যাপার। আমি আর নিজের মনস্তত্ত্ব কী করে বুঝব বল। বরং মনে হয়েছে— ভাগ্যিস! খুব বাঁচা বেঁচে গেছি। কিন্তু জেঠুর ব্যাপারে আমার ধারণা বা দায়িত্বও বলতে পারিস—একটু অন্যরকম। উনি বহু বছর উন্মাদ ছিলেন। এটা আমি ভুলতে পারছি না।

একমুখ হেসে ফিনকি বলল— যা, তা হলে ভদ্রমহিলার ঠিকানাটা জোগাড় কর, বেশ করে গালাগাল দিয়ে একটি চিঠি লিখে দে।

—গালাগাল দিতে তো আমি পারি না জানিস। ওটা আমার সিসটেমে নেই। আমি যাব হাজরার ওই বাড়িতে, আর তোকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—যাক বাবা, অ্যাদ্দিনে পাত্তা দিলি। আমি সাবালক এটা তোর কাছে প্রমাণ করার জন্যে লাগাতার চেষ্টা করে যাচ্ছি। ঠিক আছে, গালাগাল যদি না দিস তোর সঙ্গে যেতে রাজি আছি। এখন এই নে তোর নামে দাদার একটা চিঠি এসেছে। পরে বলিস কী লিখেছে...

আমার নামাঙ্কিত একটা খাম ফিনকি আমার হাতে তুলে দেয়। খামটা আমি হাতে নিয়ে অবাক হয়ে থাকি। ফিনকি চলে যায়।

রাত আটটা মতো হবে। আমাদের রাতের খাওয়ার সময় নটা থেকে সাড়ে নটা। কিছুদিন আগেও বাবার সঙ্গে খেতে পছন্দ করতুম না। এখনও যে খুব করি তা নয়। কিন্তু মায়ের সুবিধে হবে বলে, আর আমি থাকলে বাবা বিশেষ গোলমাল করেন না বলে আমি একসঙ্গেই বসি।

কী লিখেছে দাদা? বিজয়ার সময়ে একটা করে পোস্টকার্ড আসে জানি। কিন্তু তার চেয়ে বেশি সম্পর্ক তো রাখে না দাদা! আমরা মানে আমিও রাখি না, মা-ও রাখবেন না, ধরে নিতে পারি। বাকি রইলেন বাবা আর ফিনকি। এঁদের কথা এঁরা না বললে আমি বলতে পারব না। চিঠিটা অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করি। তারপর সাবধানে কাগজ কাটার ছুরি দিয়ে কাটি এক দিকটা। ভেতর থেকে বেরোয় একটা ব্যাংক ড্রাফট। পঞ্চাশ হাজার টাকার। সঙ্গে চিঠি।

সমু,

এতদিন পরে আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয় ভাববে কোনও স্বার্থে ডাকাডাকি করছি। ভাবতেই পার। কিন্তু তোমায় আমার বড্ড দরকার। তুমি একা-একা পরিবারের সব দায় বইছ ভেবে, বিশ্বাস করো আমার আত্মগ্লানি হয়। কিন্তু আমার হাত পা বাঁধা। আমার স্ত্রী সমস্ত টাকাপয়সার হিসেব রাখে। এবং যেহেতু শ্বশুরের আন্ডারে কাজ করি, আমার মাইনেপত্র ডি.এ সমস্তই তিনি জানেন। আমার নিজস্ব রোজগারের ওপর কেন যে এঁরা গোয়েন্দাগিরি করেন, সেটা দেখে আশ্চর্য লাগে। এঁরা কিন্তু আদারওয়াইজ লোক খারাপ নন। শুধু ওই নিজের বাড়ির সঙ্গে আত্মীয়তার ও আর্থিক সম্পর্ক রাখি এটা একেবারে চান না। কেন সেটা এখন রহস্য আর নয় আমার কাছে। আসলে সোনুর প্রথম বিয়েটা কেঁচে যাওয়ার মূলে ওর শ্বশুরবাড়ির বেশ হাত ছিল। অন্তত ওঁরা তাই মনে করেন। একমাত্র মেয়ে এবং যথেষ্ট সম্পত্তি থাকায় ওঁরা একটু সন্দেহ বাতিকগ্রস্তও হয়ে পড়েছেন। আমাকে খুব ভাল করে, স্টাডি করে, নিরাপদ মনে করেছেন বলেই এগিয়েছেন। তুমি জেনে শকড হবে আমার কোনও সন্তান হবে না এমন শর্তও ওঁরা করে নিয়েছেন, পাছে ওঁদের নাতির কোনও অযত্ন হয়, বা তার উত্তরাধিকারে কিছু কম পড়ে। তুমি বলতে পার— এভাবে দাসখত আমি লিখে দিলুম কেন। তোমাকে একটা সত্যিকথা বলি সমু, আমি চিরকাল ভীষণ ইনসিকিওর ফিল করেছি। বাবা-মা, এঁরা যেন আমার কেউ না, আমি একটা সমুদ্রে ভাসা কাঠের টুকরোর মতো ওই সংসারে পড়ে রয়েছি। তুমি ছাড়া কারও সঙ্গে আমার কোনও বন্ড ছিল না। এখানে আমি সেই আত্মীয়তা, যত্ন, এরা বলে 'আপনাপন' পেয়েছিলুম। তার ভেতরে ওঁদের কিছু স্বার্থের অঙ্ক অবশ্যই ছিল। কিন্তু খুব একটা ফাঁকি ছিল না। এখন মুশকিল হচ্ছে সোনুর ছেলে বলবীর এই ক'বছরে বেড়ে চোদ্দো বছরের হয়েছে। ছেলেটি আমাকে একেবারেই পাত্তা দেয় না। পুত্রস্নেহ ও নাতিস্নেহে অন্ধ এঁরা সেটা দেখেও দেখেন না। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি, ইউ.এস.এ-র কয়েকটা ইউনিভার্সিটির সঙ্গে চিঠিপত্র চলছিল। হয় বার্কলি, নয় কেম্‌ব্রিজে পাচ্ছি। আরও একটু বেশি ডলারের জন্য বারগেন করছি। যারা রাজি হবে, তাদের ওখানেই যাব। এখানে কেউ সেটা জানে না। আমি ন্যাচার‍্যালি এক্সপেক্ট করব আমার স্ত্রীও আমার সঙ্গে যাবে। বলবীর যেহেতু তার দাদু-দিদিমার খুব প্রিয় এবং দিল্লি পাবলিক স্কুলে পড়াশোনা করছে ও অনায়াসেই এখানে থেকে যেতে পারে। আমি বলব ওঁর পড়াশোনাটা ডিসটার্ব করা ঠিক হবে না। তা ছাড়া, ওর ডিফেন্সে যাবারও খুব ইচ্ছে। সেক্ষেত্রে ওর ইউ.এস.এ আসবার দরকারই হচ্ছে না। এইভাবে আমি ও দেশে আমার একটা আলাদা জীবন গড়ে তুলতে পারব। আমার নিজের সন্তান হবে, সোনুকেও কিছুটা বোঝাতে পারব। ইতিমধ্যে এই ড্রাফটা রাখো, কীভাবে কার থিসিস লিখে দিয়ে এটা রোজগার করেছি, সে এক গল্প। ফিনকিকে বলো আমি ওকে ভুলিনি, ওর প্রত্যেকটা চিঠি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। মা বাবা এবং আর সবাইকে প্রণাম দিচ্ছি। তুমি আমাকে মর‍্যাল কারেজ দাও সমু, আমার কোনও বন্ধু নেই যার কাছে পরামর্শ নিতে পারি। তোমাকে আমি ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্টাল ফোন নম্বরটা দিচ্ছি। মঙ্গলবার বাদ দিয়ে যে কোনও দিন ফোন করো। প্লিজ।

—সাগর

'দাদা' লেখেনি। 'সাগর', শুধু 'সাগর'। দাদার সঙ্গে আমার যে একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, বাইরে থেকে বোঝা যেত না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ছিল সেটা আমি জানতুম। কিন্তু দাদা বিয়ে করে দিল্লি প্রবাসী হবার পর তাতে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গিয়েছিল বলেই জানতুম। বিশেষ করে দাদুর শ্রাদ্ধের সময়ে এসে দাদা যে ব্যবহার করেছিল, সমস্তটাই দাদাকে আমার জীবন থেকে বার করে দিয়েছিল। আমার কোনও অভাববোধ ছিল না। শুধু মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যেত, কে যেন বলে উঠত— আমার ভীষণ ভয় করছে। সমু! সমু! কার পায়ের শব্দ দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে টের পেতুম। কোনও কষ্টবোধ নেই, খালি শুনতে পাওয়া। দাদা খুব ভিতু লোক ছিল। ভিতুরাই বোধহয় স্বার্থপর

হয়। তবে একটা কথা মনে হওয়ায় আমার খুব হাসি পেল। সব প্রডিগ্যালরাই গিয়ে আমেরিকায় জড়ো হচ্ছে। এক নম্বর নবকুমার, দু'নম্বর দীপা, তিন নম্বর দাদা—সাগর। আত্মগোপন করার ভারী চমৎকার জায়গা মহাদেশটি। পলাতকদের মহাদেশ। পলাতকদের শেষ আশ্রয়।

তুমি নিয়মিত লিখিস দাদাকে? ফিনকিকে চিঠিটা দিয়ে জিজ্ঞেস করি। কাঁচুমাচু মুখে মেয়েটা বলে—নিয়মিত মানে কিছু ঘটলে, ধর ছোড়দিদা মারা গেলেন, ধর আমি এইচ.এস, বি.এ, এম.এ পাশ করলুম। রিসার্চে ঢুকলুম। এই রকম। জেঠু এলেন...এখন কোচিং করছেন, খুব চমৎকার মানুষ—এটাও লিখেছি।

—দাদা উত্তর দিত?

—সবগুলো না হোক, কতকগুলো দিত। বেশি নয়, দু-চার লাইন। কিন্তু...আমার দাদার জন্যে বড্ড মন কেমন করে রে! রাগ করিস না!

—রাগ করব কেন? আশ্চর্য তো!

—না। মা-বাবা কেউ তো নাম করে না দাদার। তুইও তো করিস না...

—নাম না করা মানেই তাকে মনে না করা তো নয়!

—তুই মনে করিস?

—স্বজ্ঞানে না করলেও স্বপ্নে যখন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না তখন বোধহয় করি।

—লক্ষণ ভাল।

এই ধরনের কথা ফিনকি আমাকে প্রায়ই বলছে আজকাল। লক্ষণ ভাল, দিস ইজ গুড। আবার...তোর ঘরের ছিটকিনি তুই সব সময়ে লাগিয়ে রাখিস...মনের কথা কাউকে বলিস না...তুই বড্ড একা—এত একা হওয়া ভাল না।

আমি যেন একটা রহস্য গল্প। ফিনকি আমাকে আস্তে আস্তে পড়ছে। যেমন যেমন বুঝছে সাজিয়ে যাচ্ছে তথ্যগুলো। কম্পিউটারে ভরে দিচ্ছে যাতে ওর চেয়েও উন্নত নির্ভুল মস্তিষ্ক আমাকে আপাদমস্তক পড়ে ফেলতে পারে। আমি অপেক্ষা করে আছি কবে সেই নির্ভুল পাঠ ডাউনলোড করবে ফিনকি। আমিও নড়বার সুযোগ পাবো।

দাদাকে ফোনে কিন্তু আমি দু'তিন দিনের চেষ্টাতেও পেলুম না। দুটো তিনটে অর্থাৎ সবচেয়ে ব্যস্ত সময়ে ছাড়া করার উপায় নেই। পাই-ই না। খালি বলে—'দিস লাইন ইজ বিজি, প্লিজ ট্রাই আফটার সাম-টাইম।' ট্রাই করতে করতে আমার ধৈর্য চলে যায়, তারপর কাজকর্মের ফেরে ভুলেই যাই। তেমন কিছু দরকার যদি থাকে তা হলে দাদা নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে। আবার ভুল না বোঝে, তাই ফিনকিকে বলে দিই। দাদাকে দু লাইন লিখে দিতে।

আসলে এখন আমার নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই। আমাদের অফিস কমপিউটারাইজড হচ্ছে। সেই নিয়ে প্রচুর কর্মী-আন্দোলন, কোর্ট কেস, কলিগদের মধ্যেও বাগ্-বিতণ্ডা হয়েই চলল। ইতিমধ্যে অফিস আমাকে ব্যাঙ্গালোর পাঠিয়ে দিল। কমপিউটারের সমস্ত খুঁটিনাটি শিখে নিতে। এটা একটা নতুন যান্ত্রিকতা। প্রথমটা বেশ আগ্রহ হয়। ফিরে এসে আমার কাজ হল অফিসের কর্মীদের কমপিউটার শেখানো। ক্রমে বেশি দায়িত্ব পাচ্ছি। জয়ন্তী একদিন এসে অভিনন্দন জানাল। কী ব্যাপার? না আমার এগজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার পদে প্রোমোশন হচ্ছে।

পুরুষ কলিগরা দেখা হলে শুধু করমর্দন করে সংক্ষিপ্ত কংগ্র্যাটস বলে চলে গেল। কিন্তু জয়ন্তী মুখে বলে গেল ঘরে এসে, আর মুকুলিকা এমন উজ্জ্বল হেসে আমার দিকে তাকাল যে অভিনন্দনটা আর মুখ ফুটে জানাবার দরকার হল না। সন্দেহ নেই, মেয়ে দুটি আমাকে প্রতিযোগী ভাবে না।

—লগনচাঁদা ছেলে সমুদ্র তুমি— কে যেন বলল একদিন। তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছ। নো ফ্রিকশন।

জয়ন্তী অমনি তড়বড় করে বলল— বাঃ ওর বুঝি কোনও ক্রেডিট নেই? সবই চাঁদের কৃপায় হয়ে গেল?

বিজিত চোখ নাচিয়ে বলল— দেখো, নিজেরাই দেখো কেমন চাঁদ কপালে!

জয়ন্তী বিরক্ত হয়ে বলল— পাঁচ ছয় বছর হয়ে গেল একসঙ্গে কাজ করছি। এখনও ভুলতে পারলে না আমরা মেয়ে, না? আশ্চর্য!

অনিন্দ্য চেঁচিয়ে বলল— ভুললে খুশি হবে? অন গড বলো দেখি।

জয়ন্তী পেছন ফিরে বলল— ডিসগাস্টিং।

কাজে ডুবে থাকি। মাঝে মাঝেই টুর, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর। কোনও কোনও সময়ে ওদের কেউ সুমিত টুমিত সঙ্গী হয়। জয়ন্তী বা মুকুলিকা থাকলে আমি এমন ভাবে আমার অক্ষমতা জানাই...বসের সাধ্য নেই বোঝে আমার আপত্তির আসল কারণ। অনর্থক জটিলতার মধ্যে যেতে চাই না। এভাবেই আমি ভাল থাকি। আমার ঘরের মধ্যে আরেকটা ঘর। সেই প্রতিধ্বনিতে ভরা, কত মানুষ বেঁচে গেছে এই জমিটুকুতে। হয়তো কোন যুগে এখানে রাজপ্রাসাদ ছিল। এখানেই ঘটেছে কত গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র। হয়তো ছিল বৈরাগীর কুঁড়ে, ভজনগানে ভরে থাকত বাতাস। দুর্ধর্ষ খুনি ডাকাতদের আস্তানা থেকে থাকাও অসম্ভব নয়। যেখানে আমার খাট সেখানে ছিল ডাকাতে কালীর ভয়াল মূর্তি হয়তো। এত চরমেই বা যাব কেন?। কত নাম-না-জানা সাধারণ মানুষ। অতি সাধারণ। রেখে গেছে তাদের জীবধারণের শব্দ-গন্ধ এইখানে। যা এখন আমার ঘর। এই অর্থহীন পরিণামহীন চলমানতাকে মেনে নিতে হয়। মেনে নিই।

একেক সময় রাস্তার পাশে কোনও আধখোলা ঝুপড়িতে দেখি দুটো ইটের মাঝখানে কাঠিকুটো জ্বেলে, কুচকুচে কালো হাঁড়িতে কেউ রান্না বসিয়েছে, কোলে ছেলে নিয়ে বা না নিয়ে এসে দাঁড়ায় ভিখারি মেয়ে। মুখে দুঃস্থতা, খিদে কী অদ্ভুত একটা ব্যাকুলতা দিয়েছে মুখকে। কিংবা বিশাল গাড়ি করে এসে থামলেন এম.জি ইনি খুব ভালবাসেন সাহেব সেজে থাকতে। চোস্ত স্যুট, টাই। মসমস করে চলে গেলেন নিজের কামরার দিকে। যেন বেশ বড় কিছু একটা অধিকার করে রেখেছেন। পুরো জীবনটাই বোধহয়। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে জনতা যেই একটা বাস এসে থামল। যেতে হবে, কোথাও পৌঁছতে হবে। পৌঁছে কী হবে? একটু রাত হয়ে গেলেই বা কী ক্ষতি? কয়েকটি মেয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে কী একটা কথায় হাসতে হাসতে, হাসি চাপতে চাপতে চলে যাচ্ছে, মুখে হাত চাপা দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে একজন, একজন হাসতে হাসতে পেছনের দিকে হেলে গেছে। আর দুজন দুজনকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে হাসছে। একেবারে নিমগ্ন কোনও তুচ্ছতায়। হাসির কারণটা জানতে হয়তো আর কারও হাসি পাবে না।

দেখতে দেখতে মনে হয় যদি খেতে না পেতুম, কিংবা যদি প্রচুর টাকা আরও টাকা, আরও বিলাস আরও বিলাসের অভ্যেস হয়ে যেত, যদি এমন দৌড়ে, ঝুলে ঝুলে বাস ট্রাম ট্রেনে যেতে হত, যদি এমন অকারণে আধাকারণে উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে পারতুম, তা হলেই বোধহয় স্বাভাবিক হতুম। কেউ বলত না তুমি কেমন আনরিয়্যাল ... তুমি বড় একা ... তুমি কেমন আলগা-আলগা। তার বদলে আমি নিরবধি কালের পুনরাবৃত্তির চলচ্চিত্র চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে দেখতে পাই। এ সব নয় অন্য কিছু অন্য কিছু। সেই অন্য কিছুর সন্ধানেও আমি তেমন উৎসুক নই। কারণ সন্ধানে সব ধরা দেয় না। এ সত্য আমি বুঝে গেছি।

১৮

বোশেখ মাসের এক সন্ধেয় ফিনকিকে নিয়ে আমি বেরোই। খুব হাওয়া দিচ্ছে, চতুর্দিকে কৃষ্ণচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, যেন লাল হয়ে রয়েছে আকাশ মাটি। ফিনকি খুব উচ্ছল, উজ্জ্বল, ডগডগে সবুজ রঙের শাড়ি পরেছে। ছাপা। কী শাড়ি, কী ব্যাপার অতশত জানি না। মুখটা খুব পরিষ্কার মাজা। গোলাপি লিপস্টিক লাগিয়েছে। ক্লিপ দিয়ে আটকানো। চুলগুলো ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলে রয়েছে।

—এত সেজেছিস কেন? বিউটি কমপিটিশনে যাচ্ছিস না কি?

—আশ্চর্য, এরকম আমি রোজই সাজি। এই শাড়িটা নববর্ষে তোরই টাকা দিয়ে কিনেছি, তা জানিস?

আসলে আমরা আজ অভিযানে বেরিয়েছি। সেই, জেঠুর প্রেমিকার ঠিকানা খোঁজার অভিযান। সত্যি বলতে কি আমার রাগের আঁচ কবে ছাই হয়ে গেছে, উৎসাহও নিভে গেছে। মনেই ছিল না আমার। ফিনকিই ডাকাতের মতো চড়াও হল।

—কোনও প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিস না, না?

—কী আবার প্রতিজ্ঞা?

—সেই হাজরায় যাওয়া, আমাকে নিয়ে, ঠিকানা...

—হাজরা? —আমি আকাশ থেকে পড়ি।

—সব ভুলে গেছিস? সেই ভদ্রমহিলার ঠিকানা বার করতে হবে না? ইংল্যান্ডে না কোথায়? জেঠুর সেই রে?

—ওহ্, দুর, ওসব ছাড়।

—ছাড়িব না, ছাড়িব না— সুর করে বলল ফিনকি।

তাই ফিনকির নির্বন্ধেই বেরিয়ে পড়া। মনটা মাঝে মাঝে সায় দিচ্ছে, মাঝে মাঝে দিচ্ছে না। কী হবে ও সব করে? অত বছর আগেকার প্রেম, বিশ্বাস, বিশ্বাসাঘাত সব এখন সময় মুছে দিয়েছে। সে দেবকুমারও নেই, সে সৃষ্টিও নেই। দেবকুমার একজন ভেঙে-যাওয়া প্রায়-বৃদ্ধ যিনি বাকি জীবনটা মোটামুটি শান্তিতে কাটিয়ে যেতে চাইছেন। সৃষ্টি নিশ্চয় এখন মেমসাহেব। এত বছর ধরে যিনি বিদেশে কাটিয়েছেন, সেখানেই যাঁর ছেলেমেয়ে হয়েছে তাঁর মধ্যে কোথাও কি পুরনো প্রেমের স্মৃতি বেঁচে আছে? উনি সব ভুলে গেছেন। চিঠি একটা লিখব নিয়মরক্ষা, উনি জবাব দেবেন বলে মনে হয় না।

—কী রে ট্যাক্সি নেব?

—তা নিবি না? আচ্ছা কিপটে তো।

সুতরাং একটা ট্যাক্সি নিই।

হাজরা বেশ গোলমেলে রাস্তা। ট্যাক্সিচালক না থাকলে ঠিকানাটা খুঁজে বার করা আমাদের সাধ্য ছিল না। কিন্তু কলকাতার ট্যাক্সিচালকরা সব জানে। একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াই। রং হচ্ছে, সাদা রং। ভারা বাঁধা, একদিকে এক মিস্ত্রি সিমেন্ট ছুড়ছে তাল তাল, কর্নিক দিয়ে সমান করছে, আরেক দিকে রং হচ্ছে। সদর দরজা খোলা, সেখান দিয়েও মাথায় সিমেন্টের কড়াই নিয়ে বেরিয়ে আসছে মজুরনিরা। ওদের বোধহয় ফুরনের কাজ। সাতটা বেজেছে, এখনও কাজ চলছে।

আগেকার বাড়ি, খুব শক্তপোক্ত, মোটা দেয়াল, কুড়ি ইঞ্চি হবে। এসব বাড়ি আজকাল আর লোকে সারাচ্ছে না। প্রোমোটারকে দিয়ে দিচ্ছে। বেশ বনেদি বাড়ি মনে হয়। আমাদের বাড়িটার মতো গেরস্থ-গেরস্থ নয়। বেশ চওড়া ঝুল বারান্দা। তলার লোহার স্ট্রাকচারটা রং করা হয়ে গেছে। গাঢ় সবুজ রং।

মজুরনিদেরই জিজ্ঞেস করে ফিনকি— ভেতরে কেউ আছেন? কোই হ্যাঁয়? উদাসীন ভাবে মাথার কড়াই সামলাতে সামলাতে ঘাড়ের একটা ভঙ্গি করল মেয়েটি। —অর্থ, ভেতরে যাও, নিজে খোঁজ করো।

আমরা উঠোন পেরিয়ে, নিচু রোয়াকের ওপরে উঠি। অগত্যা।

—কেউ আছেন, বেশ কয়েকবার ডাকবার পর সাড়া মিলল।

এক মাথা সাদা চুল, বেশ ফিট চেহারার এক বৃদ্ধ বেরিয়ে আসেন।

—কে?

—আপনি আমাদের চিনবেন না, আমরা আসলে একটা কাজে এসেছি।

—কী কাজ? এ-বাড়ি আমরা বিক্রি করব না। ভুল খবর পেয়েছ তোমরা।

—বাড়ি নয়, কথাবার্তার ভারটা ফিনকিই তুলে নিয়েছে,—আমরা সৃষ্টিদেবীর বর্তমান ঠিকানাটা জানবার জন্য এসেছি।

—সৃষ্টিদেবীর ঠিকানা? কে তোমরা? কেন? —চূড়ান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন।

—কারণটা একেবারেই ব্যক্তিগত।

উনি হঠাৎ অ্যাবাউট টার্ন করে ভেতরে ঢুকে গেলেন। একটু পরে বেরিয়ে আমাদের বললেন— এসো।

ভেতরে ঢুকে খুব পুরনো বেত-কাঠের ঢাউস ঢাউস কৌচে বসলুম। ভদ্রলোক হুইল-চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হুইল-চেয়ারে এক শীর্ণ ভদ্রমহিলা। চুল কাঁচা-পাকা, মুখটা এই বয়সেও খুব মিষ্টি, স্নেহশীলা স্নেহশীলা মনে হয়। সুন্দর দাঁত, কথা বললেই ঝিলিক দেয়। আমাদের দেখে কেমন একটা দুর্বোধ যান্ত্রিক হাসি হাসলেন।

—ওঁর একটা সেরিব্র্যাল স্ট্রোক হয়েছিল, এখন ফিজিয়োথেরাপি চলছে।

আমি ফিনকির দিকে তাকাই। ফিনকি আমার দিকে।

আমি ইতস্তত করে বলি— উনি ইংল্যান্ডে কোথাও থাকতেন না?

—হ্যাঁ, সে অনেকদিন হল, শেষ বছর পাঁচেক উনি এখানেই থাকেন।

—আপনি?

—আমি ওঁর হাজব্যান্ড। তোমরা কী কারণে এসেছ বলো এবার।

এখন কী বলব? সেরিব্র্যাল স্ট্রোকে পঙ্গু ভদ্রমহিলা, বৃদ্ধ স্বামী সেবক। আর কেউ আছে বলেও মনে হচ্ছে না। ওঁরা কি একা? ছেলে মেয়ে? আমি তো আর গিন্নিদের মতো জিজ্ঞেস করতে পারি না—'ছেলেপিলে কটি?'

খানিকক্ষণ মুখ নিচু করে থাকি, ফিনকি হঠাৎ বলে— কিছু না আমরা দেবকুমার সেনের ভাইপো-ভাইঝি। তাই...

ভদ্রমহিলার কোনও ভাবান্তর হল না। অর্থাৎ ওঁর মস্তিষ্কও ঠিক নেই। আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন— তাই তোমাকে বড্ড চেনা চেনা লাগছিল। যেন কোথায় দেখেছি, কোথায় দেখেছি। আমি সঞ্জীব সাহারায়। দেব এখন কেমন আছে?

—কী রকম আর থাকবেন? বহু বছর উন্মাদ ছিলেন, অ্যাসাইলামে ছিলেন, এখন সবাই বলছে সেরে গেছেন। বাড়ি নিয়ে এসেছি।

—ওই কি আমাদের খোঁজ করতে বলেছে তোমাদের?

—না না। এসব উনি...আমরা ওঁকে কিছু বলিনি, ফিনকি বলল— আমার এই ছোড়দা বলছিল ওঁর মানে জেঠুর সারা জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির পনেরো লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে। তাই ওঁকে...

—ওঁকে কী? ভদ্রলোক যেন বিদ্রূপের হাসি হাসলেন। পনেরো লাখ টাকা ওঁর থেকে দাবি করবে?

আমি এবার গলা ফিরে পাই, বলি, না, কিছুই দাবি করব না, শুধু যাঁর জন্যে ওঁর জীবনটা গেল তাঁকে দেখতে এসেছিলুম। অবশ্য দেখা পাব ভাবিনি। ইংল্যান্ডের ঠিকানাটা চাইছিলুম, একটা চিঠি দেব বলে।

—কীসের চিঠি?

—কিছু না, আমি ওঠবার ভঙ্গি করি।

ফিনকি বলে— জানাতে চেয়েছিলুম, ওঁর জানা উচিত জেঠু এত কষ্ট পেয়েছেন এখন ফিরে এসেছেন। এ সব কেন?

দুজনেই উঠে দাঁড়াই। জানি আর কোনও উত্তর নেই। আর কোনও জবাবদিহিরও সময় চলে গেছে। এ একটা আনপড় ছেলেমানুষি। আমি এমন করি না, কেন করলুম জানি না।

উনি হঠাৎ হাত তুললেন— দাঁড়াও দাঁড়াও। যেয়ো না। বসো আমি আসছি।

—আমরা যাই। উনি অসুস্থ, আমাদের আর কিছু বলবার নেই— আমি বলি।

—আমার বলবার আছে মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান। তোমরা বসো, আমি ওঁকে ভেতরে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

ভেতরে চলে গেলেন। দূর থেকে ওঁর গলার আওয়াজ ভেসে এল গীতা...গীতা...।

একটু পরে এসে বসলেন। —বলো এবার কী বলেছিলে।

আমি বললুম— বলেছি তো! এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। উই আর স্যরি ফর হার। খুব খারাপ লাগছে।

—তোমরা তা হলে এতকাল এই গল্পটা বিশ্বাস করে এসেছ যে সৃষ্টির জন্যেই, অংশত আমার জন্যেও, দেব মানে তোমাদের জেঠু উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন।

আমরা কথা না বলে ওঁর দিকে চেয়ে থাকি।

—আমার স্ত্রীকে একটা মিথ্যে রটনার হাত থেকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য বলে আমি মনে করি। কী নাম তোমার?

—মনীষা।

—তোমার?

—সমুদ্র।

—বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ইচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘদিন আগেকার ভুল বোঝাবুঝি আজ শেষ হোক। সৃষ্টিকে দেব পড়াত, অত্যন্ত মেধাবী ছেলে, সৃষ্টিও ছিল এক নম্বর। আমি দুই কি তিন নম্বর হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টি আমাকেই ভালবেসেছিল। গড নোজ হোয়াই। এ সবের কোনও ব্যাখ্যা হয় না। আমাদের ব্যাপারটা ছিল পারস্পরিক। একদিন এই বাড়িতে, সৃষ্টির মা-বাবার বাড়িতে দেব ওকে আক্রমণ করে। ভয়ে দিশেহারা হয়ে ওর মা-বাবা আমাকে ফোন করেন। আমি এসে দেবকে সামলাই। দেখি ওর চোখ অস্বাভাবিক লাল, ঠোঁটের পাশ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। দেখেই বুঝতে পারি ও পাগল হয়ে গেছে। সৃষ্টির জন্যে পাগল নয়, পাগল বলেই আক্রমণটা ও করে। দেব ছিল অস্বাভাবিক মেধাবী। তার ওপর অঙ্ক-পাগল। যেসব প্রবলেম কেউ আজ পর্যন্ত সলভ্ করতে পারেনি, ধরো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূক্ষ্ম সব প্রবলেম...সে সব নিয়ে দিবারাত্র ভাবত। আমার মনে হয় তাইতেই ব্যালান্সটা নষ্ট হয়ে যায়। সৃষ্টি মানে লাভ্-টাভ্ কোনও ফ্যাক্টরই নয়। খুব খুউব স্যাড মনীষা, তোমার নাম কী বললে? —সমুদ্র? উই ওয়্যার গ্রেট ফ্রেন্ড্স বুঝলে! কিন্তু সৃষ্টি আমাকেই...কিছু তো করার থাকে না। আমরা বিশেষত আমি কিন্তু বহুদিন ওর খবরাখবর রেখেছি। আমাদের বিয়ের তারিখটা...তারিখটা লক্ষ করো ১১ই জুলাই, ও অ্যাসাইলাম যাবার পাঁচ মাস পরে। ফেব্রুয়ারি, মার্চ...ভদ্রলোক গুনতে লাগলেন, হ্যাঁ, পাঁচ মাস পর, আর তারপরই এডিনবরায় একটা টিচিং অ্যাসাইনমেন্ট পাই। এই। ও সেরে গেছে, এর চেয়ে ভাল খবর...।

কিছুক্ষণ মুখটা নিচু করে রইলেন, সামলাচ্ছেন নিজেকে, বাইশ-চব্বিশ বছর আগে খোয়ানো বন্ধুর জন্য এত?

—আমি তেমন কিছু ছিলুম না, তবু আমিই ছিলুম ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সৃষ্টিও...মানে জুনিয়র

তার ওপরে মেধাবী ছাত্রী তো! ...ওর সঙ্গে একটা ইনটেলেকচুয়াল বন্ড ছিল কিন্তু ও আমাকেই...আমি দেবকে দেখতে যাব। দিন পাঁচেক পর আমার মেয়ে আসবার কথা আছে। তখন তার কাছে তার মাকে রেখে...।

আমি বললুম— না।

—কী না?

—যাবেন না।

—তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ না?

—অবিশ্বাসও করছি না। কিন্তু ব্যাপারটা অত সরল নয়। আপনাকে দেখে ওঁর কী রি-অ্যাকশন হবে...যদি খারাপ কিছু হয়? সেক্ষেত্রে ক্ষমা নেই, মানে আপনাদের বা আমাদেরও।

—ঠ্ ঠিক আছে যাব না। তোমাদের ফোন নাম্বারটা দিয়ে যাও, আমি খোঁজ নেব।

—খোঁজ নেবার কিছু নেই। উনি শান্ত হয়ে গেছেন, কোচিং-টোচিং নিয়ে ভালই আছেন।

—বলো কী? মাথার কাজ ওকে করতে দেওয়া ঠিক নয়।

—জানি। উনি স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের পড়ান। আমরা খেয়াল রাখি।

—আমাদের নম্বরটা নিয়ে রাখো। মাঝে মাঝে খবর দেবে।

ফিনকি বলে উঠল— এসব আর দরকার নেই। কী থেকে কী হয়! আমরা শান্তি চাই।

—বেশ।

ট্যাক্সি পেতে অসুবিধে হল। নর্থে অনেক ট্যাক্সিই যেতে চায় না। খুব হাওয়া দিচ্ছে। প্রচুর হাওয়ার একটা সন্ধে রাতে মিশতে চলেছে বহু কোটি বারের পর আরও একবার। আমার চুল এলোমেলো ওড়ে, আমার দিকে কাচটা তুলে দিই। ফিনকি একেবারে চুপ। ওর চুল ওড়ে না, কোঁকড়া জমাট চুল।

এসপ্লানেড অবধি আসার পর ও বলল— তোর দুঃসাহসিক অভিযানের অপমৃত্যু হয় গেল ছোড়দা। দেবকুমার সেনের জীবনীতে লেখার মতো কোনও ইন্টারেস্টিং চ্যাপটারই আর রইল না।

—দারুণ একটা কথা কাটাকাটি, ঝগড়া-কাজিয়া হলে কি তুই খুশি হতিস?

—তা নয়। কিন্তু 'জাস্টিস'? 'জাস্টিস' এমনই একটা নেশা যে সে সব সময়ে ইনজাস্টিস খোঁজে। একটা ভারী বই তুই সমস্ত শক্তি দিয়ে তুলতে গেলি, হুস করে বইটা উঠে এল। কী রকম বেকুব লাগে না?

আমি কিছুক্ষণ পর বলি— একটা ছেলেমানুষিই হয়তো করে ফেলেছি ঝোঁকের মাথায়। কিন্তু কতকগুলো জিনিস তো ক্লিয়ার হয়ে গেল। আমরা তো জানলুম জেঠুর দুর্গতির পেছনে কারও নিষ্ঠুরতা নেই। ওঁরাও জানলেন এতদিন আমরা ওঁদের দায়ী করে এসেছি এজন্য।

—তুই কি ওঁর সবটাই বিশ্বাস করে এসেছিস? ফিনকি অবাক চোখে বলল— আমি কিন্তু করিনি। এর ভেতরে ডেফিনিটলি আরও কথা আছে।

আমি বললুম— ইচ্ছে হলে সন্দেহটাকে পুষে রাখতে পারি। কিন্তু বিশ্বাস করে নেওয়াটাই বোধহয় বেশি স্বাস্থ্যকর। কী হবে আর?

১৯

ওঁদের বাড়িটাও আমার পিছু নেয়। বিরাট বাড়ি, আগেকার, একশ বছর তো হবেই। শক্ত ভিত, মোটা দেওয়াল, বড় বড় ঘর, আসবাব, যাদের বয়স সত্তর-আশি পেরিয়ে গেছে। অব্যবহারে মলিন,

কিন্তু কাঠামোটা ঠিক আছে। একজন অশক্ত বৃদ্ধা আরেকজন এখনও পর্যন্ত সক্ষম বৃদ্ধ। অথচ, এই বাড়িটাকে উনি নতুন করে সারাচ্ছেন। কী উৎসাহ! বাইরেটা পুরো আস্তরণ ছাড়িয়ে নতুন করা হচ্ছে। ভেতরের কাজ সে ভাবে দেখিনি, কিন্তু হচ্ছে, হবে। ওইসব আসবাবপত্র নতুন করে পালিশ হবে, গদি কুশন পাল্টানো হবে। নতুন নতুন ওয়াড়। আলোর ব্যবস্থায় কিছু নতুন, কিছু পুরনো তো থাকবেই। বৈঠকখানার ক্রিস্ট্যালের ঝাড়বাতিটা কি ওঁরা পাল্টাবেন? কখনওই না। বাড়ি সারানোর রকম দেখেই মনে হচ্ছে এটাকে ওঁরা রক্ষা করবেন— হেরিটেজ বিল্ডিং— কিন্তু সেইসঙ্গে নতুন করে বাসযোগ্য। নতুন জীবন, নতুন আশা, নতুন উৎসাহ। অথচ দু'জনেই ষাট পেরিয়েছেন। একজন এখন জড়পিণ্ড প্রায়, উদ্ধারের আশা আছে কিনা জানি না। ডাক্তার তো নই! তারপরে বাড়িটা তো একটা ঐতিহাসিক বাড়িও বটে। সামান্য অর্থে কত জন্ম মৃত্যু বিবাহ কত জেনারেশন ধরে এ বাড়িতে ঘটে গেছে। আর অসামান্য অর্থে এক কালে এক ব্রিলিয়ান্ট ছেলের সমাধিভূমি, প্রেতভূমি এই বাড়ি। এখানেই কে জানে কী অসম্বন্ধ কারণে সে তার প্রেমিকাকে আক্রমণ করে। এবং সেই চোখ লাল মুখে-ফেনা-ওঠা পশ্চাৎপট জেনেও এই শক্ত বনেদের মহলে সানাই বেজে ওঠে।

ফাইলপত্তর সামনে নিয়ে আবছা ভাবে এ সবই ভাবছিলুম। একশ বছরের পুরনো বাড়িও লোকে শেষ জীবনে সারাই-ঝালাই করে বসবাস করবার কথা ভাবে? ভাবছিলুম একজন দুর্ধর্ষ মেধাবী মানুষ শুধু বুদ্ধিচর্চা করছিল বলে উন্মাদ হয়ে গেল? মানসিক আঘাত বা দুর্ঘটনার প্রশ্ন যতক্ষণ ছিল, একটা ব্যাখ্যা ছিল। এখন যে দেবকুমারের সবটাই অর্থহীন হয়ে গেল! প্রকৃতি কি তবে চায় না মানুষ বুদ্ধিচর্চা করুক! নিজের সীমাকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করুক! প্রকৃতি কি শুধু গতানুগতিকতাই পছন্দ করে! কতকাল ধরে, পৃথিবীর কত পরিবর্তন হয়ে গেল, পিঁপড়ে একভাবে সার বেঁধে চলেছে, খাদ্য-সংগ্রহ ও বণ্টন করছে, গরমে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে। খাবারের টুকরো কিছু পড়ে থাকলে, যেন মাটি থেকে হাওয়া থেকে আবির্ভূত হচ্ছে। পিঁপড়েদের মধ্যে কোনও ফেইনম্যান, কি এনরিকো ফার্মি হবে না, দেবকুমার হবে না। আরশোলাদের মধ্যে আরশোলাদেরই মানদণ্ডে কোনও রবীন্দ্রনাথ হবে না। পরিবর্তন নেই। উদ্বর্তন নেই। টিকে আছে। কোনও মানে নেই কিন্তু যুগযুগান্ত ধরে টিকে আছে। অথচ যাদের টিকে থাকার মানে ছিল সেই রামানুজ শেষ। সেই দেবকুমার শেষ। দেবকুমার সাবান ঘষে ঘষে গেঞ্জি কাচছেন। নিজের বিছানা নিজেই ঝেড়ে নিতে শিখেছেন, এগুলো নিশ্চয়ই অ্যাসাইলামে তাঁকে অভ্যেস করিয়েছিল। আর হাইস্কুলের পাশকোর্স সায়েন্সের টেক্সট বই, অঙ্ক অনার্সের টেক্সট বই ঘাঁটছেন। এতদিন অনভ্যাসের পরেও যা তাঁর কাছে জলের মতো সোজা। নাকি সঞ্জীব সাহারায়ই একটা উপকথা বলে গেলেন? একজন কখন কী ভেবে অন্যের দিকে চলে যায় সে রহস্যই বা কে বুঝবে? স্থাবর বস্তু তো নয়!

—সমুদ্র!

মুখ তুলে তাকাই। সামনে মুকুলিকা, যাকে এখন আমরা সবাই-ই মুকুল বলে ডাকি।

—কী ব্যাপার? কিছু অসুবিধে হয়েছে? বসো না!

জয়ন্তী বা মুকুলের কোনও অসুবিধে হলে ওরা আমার কাছে আসে। ওদের অসুবিধে দূর করবার জায়গায় এখন আমি পৌঁছেছি।

মুকুল বসল। ও যেমন পরে একটা হালকা হলুদ শাড়ি। মুখ দেখলে মনে হয় না এ মেয়েটি এঞ্জিনিয়ার। যেমন কোনও জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই, তেমন বিশেষ লক্ষণীয় কোনও স্মার্টনেসও নেই, যা দীপার ছিল, জয়ন্তীর আছে।

ফাইলটা ঠেলে সরিয়ে দিই।

—বলো, ব্যাঙ্গালোরে এবার যেতে অসুবিধে আছে?

কোনও জবাব দিল না মুকুল। একটু পরে দেখি ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছে, পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে, ও দু'একবার মোছবার চেষ্টা করল, তা-ও পড়তেই লাগল। মুখটা নিচু। আর জল মোছবার চেষ্টা ও করছে না, কালি শাড়ির ওপরাংশ ভিজে যাচ্ছে লোনা জলে।

নির্বাক দু'জনে বসে আছি। আমি বুঝতে পেরেছি। কী যেন একটা উথলে উঠছে আমার বুকের মধ্যে। কী নিরুপায় ও! কত দীর্ঘদিন দুঃখ নিয়ে কাটিয়েছে, কতদিনের খরার পর এই বৃষ্টিপাত! কোনওদিন এ রকম অনুভূতি হয়নি আমার...এমন করুণা, যেন আমার শেকড় ধরে টান দিচ্ছে!

—মুকুল। তুমি কি আমায় বিয়ে করতে রাজি আছ?

অসহায় কান্নার মুখোমুখি এই কথাগুলোই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

কিছু ভাবিওনি।

ও চুপ।

—বলো কিছু বলো! এখনই কেউ এসে পড়তে পারে।

তাড়াতাড়ি রুমাল ঠেকাল চোখে।

—আমি আজই বাড়ি গিয়ে বলব। ধরো মাস দুই তিন! ঠিক আছে?

টেবিলে পড়ে থাকা মুকুলের হাতদুটো তুলে নিয়ে ওর মুখের দিকে গভীর ভাবে চাই। চোখে চোখ মেলে না। ওর নিচু মুখটা লালে লাল হয়ে আছে।

—তোমাকেও বাড়িতে বলতে হবে। আমি যাব। ঠিকানা, ফোননম্বরটা কি দেবে?

একটা কার্ড বার করে দেয় মুকুল। তারপর বলে— এগোবার আগে একটু কথা বলতে হবে। একটা সন্ধে দাও আমাকে। দেবে?

মনে মনে বলি...জীবনের সব সন্ধ্যা তোমাকে দেবার আয়োজনই তো করছি! আবার কেন সন্ধ্যা চাও মুকুল? তুমি কি দীপার কথা কিছু জিজ্ঞেস করবে? ও কথা জানলে তুমি বড় কষ্ট পাবে, আর যদি জেনে ফেলে থাকো...

—আমি জানি না কীভাবে...মুখে বললুম— ঠিক আছে। বলো কবে?

—যদি শনিবার হয়? এই শনিবার? কোথায় গিয়ে একটু কথা বলা যায়?

—আমি তো জানি না। যেখানেই যাই, বড় ভিড়। তুমি বলো। আমি চলে যাব।

আজ এসেছি। লিন্ডসে স্ট্রিটের ও প্রান্তে ছোট লম্বা রেস্তরাঁ। সত্যিই খুব শুনশান। দু'একজন পান করছে, খাচ্ছে, নিচু গলায় কথা বলছে। উঠে চলে যাচ্ছে।

আমি পৌঁছবার দশ মিনিট পরে মুকুল পৌঁছলো।

আমার একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল, কিন্তু ওকে ভাল করে দেখলুম। সাদার ওপর ছোট্ট ছোট্ট নীল নকশা, সাদা ব্লাউজ, সাদায় শ্যামবর্ণ কোনও যুবতীকে যে এত ভাল দেখাতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

এতক্ষণ একটা নরম পানীয় নিয়ে বসেছিলুম। ও কী খাবে জিজ্ঞেস করি।

—যা হোক কিছু।

—যা হোক? কোনও বিশেষ পছন্দ নেই?

—এখন ও সব ভাবতে পারছি না। ও মুখ নিচু করেই রয়েছে।

—সমুদ্র!

—বলো!

—তুমি কোনও ভূমিকা ছাড়া হঠাৎ ও কথা বললে কেন?

ও কি শুনতে চায় আমি বহুদিন থেকে ওকে ভালবেসে এসেছি! কথাটা তো সত্যি নয়। যার

সঙ্গে জীবন বাঁধতে যাচ্ছি তাকে এমন মন-ভোলানো কথা বলব! না বললেও তো ও কষ্ট পাবে! একটু ভেবে বলি—

—মুকুল আমি নিজের সম্পর্কে খুব নিশ্চিত নই। প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলো আমার আসে, সহজে করে যাই। যাকে তোমরা এফিশিয়েন্সি বলো। কিন্তু হৃদয় বা আবেগের ব্যাপারে আমার ভেতর থেকে একটা বাধা আছে। জানি না কেন। তোমাকে বরাবরই আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু তুমি সেদিন ওইভাবে ভেঙে পড়তেই আমি বুঝতে পারি আমাদের দু'জনের দু'জনকে দরকার।

—সমুদ্র, তুমি জানো না এই রেস্তরাঁয় বসে আমরা মানে আমি, দীপা, জয়ন্তী তোমাকে নিয়ে কত আলোচনা করতাম। আমরা...তিনজনেই কিন্তু তোমাকে...। দীপার বিয়েটা স্থির ছিল। তাই হয়তো...জয়ন্তী এখনও...ও খুব দুঃখ পাবে।

—মুকুল কেউ দুঃখ পাবে বলে তো আমি নিজেকে সবাইকার মধ্যে ভাগ করে দিতে পারি না। পারি?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল— জয়ন্তী তোমাকে আগে অ্যাপ্রোচ করলে কী করতে?

—ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটত নিশ্চয়। তখন জয়ন্তীর কাছে আমি ভাববার সময় চাইতুম। আর একটু সময়, আর একটু...। তাতেই জয়ন্তী বুঝে যেত। তা ছাড়া ওর সেন্স অব হিউমার আছে বেশ। তোমার মতো কান্নাকাটি করার পাত্র নয়।

একটু হাসল— তা হলে আমি ছিঁচকাঁদুনে বলেই...।

আমি হেসে ওর হাতটা ধরে বলি— অত বিশ্লেষণ করতে নেই। আবেগ হল আবেগ। অনুভূতি হল অনুভূতি। কী হতে পারত আর কী হবে এ সবে আমাদের দরকার কী?

ফিনকিকে দেখতে হয়। কী হাসি! কী লম্ফঝম্প।

—একটা কাজের মতো কাজ এতদিনে করলি ছোড়দা। এর পরে আমারও একটা ভাল দেখে বিয়ে দিবি তো?

—শিওর, আমি বলি, ওর গালে ঠোনা মারি। যদিও এসব আমার আসে না। বাবা খুশি। —ডেকে বললেন— তোমার সিদ্ধান্তে আমি নিশ্চিন্ত হলুম সমু। এটা আমাদের কর্তব্য ছিল, কিন্তু কখনও তোমাকে বলতে পারিনি। এমন একটা ডিসট্যান্ট ধরন তোমার! মেয়েটি সগোত্র নয় বলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তোমাকে সংসারী দেখতে চাই। তারপরে ফিনির একটা...।

মা কিছু বললেন না। কিন্তু কয়েকদিন মায়ের ঘোরাফেরার একটা ছন্দ একটা প্রাণ এসেছে বুঝতে পারি।

আষাঢ় মাসে দিন ঠিক হল। প্রায় প্রায়ই দেখি ফিনকি মুকুলের সঙ্গে ফোনে কথা বলছে। দু'জনে সময় ঠিক করে কেনাকাটা করতে বেরিয়ে যাচ্ছে। জেঠুও জানতে পারলেন। রাতে গুডনাইট করতে যাই প্রতিদিন। সেদিন বললেন— 'সমু একটু বসো।' একটু বসে ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া আমার অভ্যেস। একটু পরে বললেন— 'সমু বড় ভাল ছেলে, বড় ভাল। ভাল হোক, সমুর ভাল হোক...' ঘুম-জড়ানো গলায় বলতে বলতে কথাগুলো মিলিয়ে এল। আরও কিছুক্ষণ বসলুম। তারপর ওই কথাগুলোর রণন নিয়ে নিজের ঘরে আসি। একজন অসহায়, পরনির্ভরশীল, প্রায় আত্মবিস্মৃত মানুষ বলছেন, সমু বড় ভাল ছেলে। সাদা শাড়ি পরা প্রসাধনহীন একটি শ্যামা কেঁদে চলেছে। কেঁদে চলেছে, একটি প্রাণোচ্ছল মেয়ে বলছে, এবার আমার একটা ভাল দেখে বিয়ে দিবি তো? মায়ের মুখে হাসি-হাসি ভাব, বাবা আপাতত হম্বিতম্বি ভুলে গেছেন। আর জয়ন্তী একমুখ হেসে বলেছে— ব্যাড লাক।

—কার?

—আমার। আর কার?

দুজনেই হাসি।

আর দাদা এবার জরুরি ফোন করেছে— সমু। তোমাকে ভীষণ দরকার। খুব সঙ্কটে পড়েছি। আমার আপন লোক দরকার, পরামর্শ দেবার।

প্লেনের টিকিট কাটি। দাদাকে জানিয়ে দিই। দাদাই থাকবার ব্যবস্থা করতে চাইছিল। টেলিফোনেই সব স্থির হয়ে যায়। কিন্তু আমার একটা সুবিধে হবে। গুরগাঁওয়ে কিছু অফিস-সংক্রান্ত কাজ আছে। কাকে পাঠাব ভাবছিলুম। নিজেই মিটিয়ে আসতে পারব। মা বিয়ের চিঠিটা দিয়ে দিলেন,—এই প্রথম দাদার সম্পর্কে কোনও মন্তব্য শুনলুম মা'র কাছে। —ওর বিয়ের সঙ্গে তো আমাদের কোনও সম্পর্ক রাখতে দেয়নি। বোলো বউ নিয়ে যেন আসে।

একটু হাসি পেল আমার। দিল্লির চটি। দিল্লির চটি নিয়ে ছুটিতে আসার কথা দাদার। এখনও ফিনকি চটি পরছে।

প্লেন ছুটেছে আর আমি ভেবে চলেছি। কী এমন পরামর্শ দরকার হতে পারে দাদার? সে তো বাইরে চলে যাবে ঠিকই করে নিয়েছে। অরোরাদের আওতা থেকে বেরোবার আর কোনও রাস্তাও তো নেই! যেটা বুঝেছে সেটাই করুক। আমার পরামর্শ ছাড়াই তো এতখানি ভেবে ফেলতে, ব্যবস্থা করে ফেলতে পেরেছে। তা হলে? আমি কোন জাদু জানি যে আমার উপস্থিতিতে কিংবা পরামর্শে দাদার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? হঠাৎ মনে হয়, ও সব আসল কথা নয়। দাদা বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে খুব সুখে নেই। অন্যদের মুখোমুখি হবার সাহস ওর নেই। খালি আমাকে, একমাত্র আমাকেই ও সেইরকম আপন মনে করে যাকে নিজের ভুলচুক, সঙ্কট সব বলা যায়।

যাবার সময়ে প্লেন-এ। আসার টিকিট ট্রেনের। হেড অফিস থেকে ওরাই এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে আসে। ওরাই গেস্ট-হাউজে পৌঁছে দেয়। গুরগাঁওয়ের কাজ সারি। সরেজমিনে মার্কেট-কমপ্লেকসের সাইট দেখা, প্রারম্ভিক হিসেবপত্র করা। আমার মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করে কোটেশন দেওয়া হবে। তিন-চারদিন চলে যায়। তারপর দাদাকে ফোন করি। সাদা মারুতি চড়ে গেস্ট হাউজে চলে আসে দাদা।

এ কী চেহারা হয়েছে দাদার? এত থসথসে মোটা? বয়স কত। মাঝ-তিরিশ? ফ্যাটটা তো ভাল লাগছে না! ও কি ড্রিংকস ধরেছে নাকি?

কে রোগা হল, কে মোটা হল, এসব কথা আমি কখনওই কাউকে বলি না। কিন্তু আমার দৃষ্টিটা যে মুহূর্তে দাদার মুখের ওপর স্থির হয় ও বুঝতে পারে। মনের ভেতর একটা দংশন নিশ্চয়ই আছে ওর।

কৈফিয়ত দেবার ঢঙে বলে— কী জানিস, বসে বসে মাথার কাজ তো! গুচ্ছের খানেক আবার রিসার্চ করছে আমার কাছে। আমার তো মনে হয় যে কোনওদিন রক্তে চিনি কি হার্টব্লক ধরা পড়বে। নাও ইনসুলিন, করো অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি... যাক গে যাক গে। তোর চেহারাটা বলতে নেই চাবুকের মতো। ফর্মটা ধরে রেখেছিস। অনেকদিন বাঁচবি। আরাম সে।

আমি হাসি— একটু যোগ-ব্যায়াম কি ফ্রি হ্যান্ড-ট্যান্ড করলেও তো পারো। কিছু না হোক হাঁটাহাঁটি? মাথার কাজ-টাজ অজুহাত।

—কী জানিস, তেমন উৎসাহ পাই না, কিছুতেই না।

কেন কী বৃত্তান্ত আমি কিছুই জিজ্ঞেস করি না। ওর যদি বলার তাড়া থাকে ও-ই বলুক।

—চল তোকে পরোটা গলিতে খাইয়ে আনি। আগের বার খেতে চেয়েছিলি, মনে আছে?

পরোটা গলিটা যে একটা অছিলা ছিল, কোনও সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষা ছিল না এসব কথা ওকে না বলাই ভাল। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আছে।

আমাদের বড়বাজারের মতো বিশৃঙ্খল ঘিঞ্জি জায়গাটা। একটা বিরাট গুরুদোয়ারা পেরোলুম। গাড়ি অনেক দূরে রেখে হেঁটে যাই। শীতকাল। কিন্তু দাদার একটু হাঁফ ধরছে। দু'চারটে দোকানে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করল।

—আমি কখনও আসিনি বুঝলি? দাদা একটু বোকার মতো হাসল,—সেই আজীবন কলকাতায় থেকেও লোকে 'পরেশনাথ' দেখে না, না? সেই রকম।

—এ হে-হে-হে, এ যে সবই ভেজ রে?

—তাতে কী হয়েছে? আমি বলি— আমার কোনও অসুবিধে নেই। তুমি কি একেবারেই..।

—আরে না না। ভেজ আমার ভালই লাগে, সেই মায়ের হাতের লাউ-মটরশুঁটি? অবশ্য যেদিন নুন-মিষ্টিটা ঠিক হত—দাদার সঙ্গে আমিও হাসি।

কাঠের বেঞ্চি, স্কুলের মতো হাইবেঞ্চ, লো বেঞ্চ। মাটির গর্তয় গনগনে উনুন তার ওপর পেল্লাই চাটু চাপানো। একজন ফর্সা লোক তাল তাল ময়দা ঠাসছে। কাঠের বারকোশের ওপর নানারকম পুর ভাগ করা রয়েছে। দাদা বলল— মেথি পরোটাটা আগে টেস্ট কর বুঝলি সমু? আলু পরোটা তো ওখানেও পাওয়া যায়।

আমার কোনও বক্তব্য নেই। ডাল, আলুর তরকারি, আর চাটনি আসে। মেথি পরোটা, গোবি পরোটা...মটর পরোটা। এরা বলে পড়েঠা।

—বুঝলি সমু, আমার স্ত্রী যেতে চাইছে না।

—যেতে চাইছে না? —আমি অবাক— বস্টন কেম্‌ব্রিজ...যেতে চাইছে না?

—বলছে এখানে ওর অনেক দিনের চাকরি। ওখানে গিয়ে কী করবে?

—ওখানে গিয়ে ওয়র্ক পারমিট-টিট পেয়ে গেলে তো কাজ করতেই পারে?

—সে কথা ওকে কে বোঝায়? তারপর ছেলের এখন যে স্টেজ! ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। সেটাই..

—তাই বলে তোমার এত উন্নতি— সেটা ভাববে না? ছেলে তো স্কুল লেভেল শেষ করে ওখানেই চলে যেতে পারে? বাবা-মা থাকলে তো ওর আরও সুবিধে হয়ে গেল! কত ছাত্র যাচ্ছে!

—তবে! দাদা হতাশ গলায় বলল— বলবীর আসলে ওর দাদু-দিদার চোখের মণি, ওঁরা ওকে ইন এনি কেস ছাড়বেন না।

—বড় হয়ে ও যদি নিজেই সে ডিসিশন নেয়?

—ওই তো বলে কে!

আমি দাদার দিকে তাকাই— এমন চান্স কিন্তু জীবনে বারবার আসবে না দাদা।

—তুই বলছিস? মিস করা ঠিক নয়, না? —দাদা খুব চনমন করে উঠল।

—নিশ্চয়ই।

—তা হলে আমি যে যাচ্ছিই সে কথা জানিয়ে দিই, না কী?

—ভেবে দ্যাখো।

—আবার ভেবে দ্যাখা-ট্যাখা কেন? সিদ্ধান্তটা যাতে নিতে পারি তাই তো তোর সাপোর্ট চাইছি!

—হ্যাঁ পরে বউদি নিশ্চয় বুঝবেন, মত পরিবর্তন হবে।

—সে গুড়ে বোধহয় বালি— দাদা খুব বিমর্ষ মুখে বলল— ও আদৌ যাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। হয়তো...হয়তো বা ডিভোর্সই চাইবে।

—সে কী? আমি আপাদমস্তক অবাক হয়ে যাই।

দাদা করুণ মুখে মাথা চুলকোতে থাকে।

—এমনই কি সম্পর্ক তোমাদের যে যখন-তখন ডিভোর্স চাওয়া যায়।

—কী জানিস, যার একটা নিজের সন্তান হওয়ারই অধিকার নেই, তার সঙ্গে আর কী রকম সম্পর্ক হবে! তারপর ছেলেটাও তো বাবা বলে অ্যাকসেপ্ট করল না। অ্যাকসেপ্ট না করলে আমি কী করতে পারি, বল! চেষ্টার তো কসুর করিনি। উদ্ধত, বেয়াড়া ছেলে একটা, লাইফটা হেল করে দিলে।

বুঝতে পারি দাদার পরিস্থিতি খুবই খারাপ।

—তুমি তোমার সিদ্ধান্তে স্থির থাকো, আপাতত তোমার কি খুব অসুবিধে হবে বউদি না গেলে? অত সহজে ডিভোর্স চাইতে পারে সে কেমন মানুষ?

অন্যের সম্পর্কে মতামত প্রকাশ আমি কখনও করি না। প্রত্যেককে তার ভাবনার স্বাধীনতা দিই। কোনও ভাবে নিজের ছায়া পড়তে দিই না। আজ কেন দিলুম? মনে হচ্ছিল— দাদা একেবারে কূল হারিয়েছে। তাই কী?

—ঠিক বলেছিস। আমি কী জানিস, একটা আইডেনটিটি কার্ড, একটা মলাট। সোনুর স্বামী, বলবীরের বাবা। এ ছাড়া আর কোনও দরকার ওদের আমাকে দিয়ে নেই।

—বউদিও কি এভাবেই ভাবে?

—কী জানি। বোধহয়! এদের মনের গড়নটা একটু অদ্ভুত। সেন্টিমেন্ট-টেন্ট ধার ধারে না।

—তা ছেলের জন্যে তো খুবই আছে। কত লোকে চান্স পেলে বাবা-মা'র কাছে ছোট বাচ্চা রেখে চলে যায়। পরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিয়ে যায়। আর এ তো একটা বড় ছেলে?

—ঠিক বলেছিস। সেন্টিমেন্ট আছে, আমার জন্যেই নেই।

—সে ক্ষেত্রে দাদা তোমার চলে যাওয়াই উচিত। ডিভোর্স-টিভোর্স এখুনি দিয়ো না। পরে তো পরিস্থিতি বদলাতেও পারে।

—ফাদার ইন-ল'টা প্রবলেম করতে পারে। কিছুদিন হল রিটায়ার করেছে অবশ্য।

—পুরো জিনিসটা তুমি সিক্রেটলি হ্যান্ডল্ করো। যাবার আগে ক'দিন অন্য কোথাও গিয়ে থাকো, চলে যাও, তারপর খবর দিয়ো।

—জানি না পারব কি না। তুই একটু হেল্প কর। আমি যদি ক'দিনের জন্যে কলকাতায় চলে যাই! ...তোর কমপিউটার আছে? ফ্যাক্স?

—সবই আছে, অফিসে।

—কলকাতার বাড়ির ঠিকানা দেব বুঝলি। পাসপোর্ট, ভিসাও ওই আড্রেস। ইতিমধ্যে যা কিছু খুচরো খবর তোর ফ্যাক্স নম্বর-এ কি ই-মেলে করবে।

—রিলিজ?

—আরে ওদিকটা সম্পর্কে শিওর হয়ে গেলেই আমি রেজিগনেশন দিয়ে দেবো।

—নোটিস দিতে হয় তো?

—ধুর, কনট্রাক্ট সারভিস্ তো আর নয়। ফর্ম্যালিটি...জাস্ট ফর্ম্যালিটি...। আর পি.এফ-এর টাকা আমি বেশির ভাগটাই তুলে নিয়েছি। এই লোন, সেই লোন। সোনুকে একটা চিঠি লিখে রেখে যাব— তোমার জেদের জন্যে তো আর আমি আমার কেরিয়ার নষ্ট করতে পারি না। সুতরাং আমি চললুম। তুমি যখন ইচ্ছে চলে আসবে। ড্রাফটটা করে ফেলি বল!

আমি হেসে ফেলি— ড্রাফট করাটা আর এমন শক্ত কাজ কী। ও সব কারও চোখে-টোখে পড়ে গেলে...।

—ঠিক বলেছিস। কাগজপত্র কি আর তেমন সেফ? ড্রয়ারের একটা ডুপ্লিকেট চাবি করানোর এমন কী হাঙ্গামা?

বেশ জটিল অবস্থা দাদার। যা ভেবেছিলুম তার চেয়েও ঘোরালো।

যে আশ্রয়কে অনিরাপদ ভেবে দূরে সরে গিয়েছিল, সে আশ্রয়েই ফিরে আসতে চাইছে নিরাপত্তার জন্য। কী পরিহাস! দাদা কি কখনও নিরাপদ হতে পারবে?

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষুনি স্পিড নেবে। দাদার ফুলো-ফুলো বিধ্বস্ত চেহারাটা কেমন ঢেউ ওঠা জলের তলার ছবির মতো বেঁকেচুরে যায়। কাচের লেভেলে কিছু দোষ থাকলে এ রকম হয়। দাদার চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাই। আরও আরও দূরে চলে যাচ্ছে দাদা। কে জানে হয়তো আর দেখা হবে না। দাদা কি সিদ্ধান্তটা শেষপর্যন্ত নিতে পারবে? দাদা কি কোনওদিন নিরাপদ হবে? আমি কেন মতামত দিলুম? কখনও তো দিই না! দাদার জীবনের সঙ্গে আমার মতামতের কী সম্পর্ক? তবে কি আমার কোনও জল-বসন্তের রাত এলো, যখন আমি ছাড়া দাদার কোনও শুশ্রূষা নেই!

আমার বার্থ নম্বর তেইশ। গুছিয়ে বসি, ওভারনাইট ব্যাগ একটা তলায় চালান করে দিই। চব্বিশ নম্বর অর্থাৎ ওপরের বাঙ্কের মালিক একটি মারোয়াড়ি ছেলে। নাম ভিনিত। অর্থাৎ আমাদের 'বিনীত'। প্রচুর মোটা, তেমনি ফর্সা, সবই যেন ওর ফেটে পড়ছে। খুব হাসিখুশি মিশুক ছেলে। 'দাদা দাদা' করে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ ভাব জমিয়ে নিলে। আমাকে কিছু বলতে হয় না, ও-ই একনাগাড়ে বকে যায়। দিল্লিতে মৌসির কাছে থেকে চার্টার্ড পড়ে। বাবার বিজনেস কলকাতায়। কিন্তু ও কলকাতায় যোগ দেবে না। কলকাতার, কিছু মনে করবেন না দাদা, কোনও ভবিষ্যৎ নেই। সুবিধে পেলেই ও অন্য কোথাও বিজনেস উঠিয়ে আনবে। দিল্লি ইউ.পি-র বর্ডার নয়ডা খুব ডেভেলপ করছে...ওইখানেই।

নিজেই নিজের ভুঁড়িতে টুসকি মেরে হাসতে থাকে— আমাকে আর কী মোটা দেখছেন দাদা, আমার মা ঔর ভি, পাপ্পার প্যান্ট বানাতে পুরা ছ'মিটার কাপড় লাগে। মোটা-মোটি কি ফ্যামিলি, দুবলি-দুবলা কোই নহি।

—খুব ঘি খাও তো?

—আরে কী বলেন দাদা, ঘিউসেই তো খানা পকতা হ্যায়, হোনাই তো চাহিয়ে। আপনি কী করে এমন চেহারাটি বানিয়েছেন দাদা?

আমি হেসে বলি— এ আর এমন সিক্রেট কী? আমি তোমাকে বলতেই পারি। কিন্তু তুমি পারবে না।

—বোলিয়ে না দাদা! ওয়েট-লিফটিং, ইয়োগা? বোলিয়ে না, লড়কিলোগ পসন্দ করতি নহি।

—তবে তো বলতেই হয়, আমি মজা পেয়ে বলি, ওসব ইয়োগা টিয়োগা পরের কথা। আগে ঘি খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

—ও হি তো! উও মুঝসে নহি হোগা দাদা।

উল্টো দিকে হেঁটো ধুতি পরা এক ভদ্রলোক মনের সুখে খইনি ডলছেন, বলে উঠলেন— দুধ পিও ভাই, লোটাভর দুধ পিও। ভঁইস কা দুধ। লড়কিলোগ আপসে আ যায়েঙ্গি। ইৎনা গ্ল্যামার হোতা, ইৎনা গ্ল্যামার! তাকত! হিম্মৎ!

অন্য দুজন ভদ্রলোক ব্যবসায়ী মনে হল। নিজেদের মধ্যে নিজেদের ভাষায় জোর গলায় আলোচনা করে চলেছেন। ফ্লাই অ্যাশ অ্যান্টি পলিউশন মেজার, গ্যাসকেট, সেরামিক ব্রিক...এ রকম নানা টুকরো টুকরো কথা কানে আসছে। এঁরা বোধহয় অন্ধ্রের লোক। তেলুগুতে কথা বলছেন। খুব ভরাট গলা দুজনেরই। নিজেদের জগতে একেবারে মগ্ন, ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টি নেই।

সাইডের সিটে ওঁরা নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী, দুজনে মুখোমুখি পা ছড়িয়ে বসে আছেন, কখনও বাইরে চোখ রাখছেন, কখনও নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। কিন্তু শোনা যায় না। শব্দ নেই শব্দ নেই করেও ট্রেনের একটা কেমন অন্তর্নিহিত ধ্বনি থাকে যা সব কথাবার্তা, সব আওয়াজ দূরে পাঠিয়ে দেয়। একবার চকিতের জন্য মনে হল, অদূর ভবিষ্যতে এরকম একটা দৃশ্যে থাকতে পারে মুকুলিকা পালিত এবং এই মানুষটা যাকে 'আমি' বলে চিনি। কেমন অবাক লাগল কথাটা ভেবে। এতদিন এক ভাবে বেঁচে এসেছি, এখন এরপর কি অন্য ভাবে বাঁচব? সেই বাঁচাটা কেমন আমি আন্দাজ করতে পারছি না। আমি কি এই আমিই থাকব না অন্য কোনও আমি হয়ে যাব? টুপ করে একটা দুটো পেয়ারা পাতা খসে পড়ে, হাওয়া বয়, জলের মধ্যে ছবি ভেঙে ভেঙে যায়!

বাইরেটা যতক্ষণ দেখা যায় দেখি। তারপর কাচে শুধু এই কামরারই বিম্ব। এই আমি, ওই ভিনিত, খইনি, ব্যবসায়ীযুগল, দম্পতি। একটা সিনেমার দৃশ্য দেখছি, আমার একটা নগণ্য ভূমিকা আছে ছবিটাতে, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ তার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।

মাঝখানের পর্দাটা টেনে দম্পতিদের আড়াল করে ব্যবসায়ীযুগল আবার একটু পানও করে নিলেন। 'হোপ য়ু ডোন্ট মাইন্ড' জাতীয় একটা নাম কা ওয়াস্তে অনুমতি নিয়ে। ভিনিত বলল— দাদা চলে? আমি প্রশ্নটা একে ফিরিয়ে দিই। মৌসি-মৌসা নাকি ওকে বাড়ি থেকে বার করে দেবে ড্রিংক করলে। খৈনি দেখি হঠাৎ একটা কুঁড়োজালি মতো নিয়ে জপ করছেন। এতক্ষণে খেয়াল করি ওঁর গলায় কণ্ঠি। বিহারি বৈষ্ণব আমি এই প্রথম দেখলুম। উনি গ্ল্যামারেও আছেন, কুঁড়োজালিতেও আছেন।

আটটা পেরোতে না পেরোতে ওরা খাবার দিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ সেটা রেখে দিই, ঠায় বসে থাকা আর খাওয়া ছাড়া এ সব সুপার ফাস্টে তো আর কিছু করার থাকে না! কাজেই একটু পরে অ্যালুমিনিয়ম ফয়েলের খোসা ছাড়াই। সেই এক আধা-হলুদ পোলাও, আধা-কালো চিকেন, ডাল, একটা অখাদ্য তরকারি যাকে এরা 'সবজি'। একটু স্যালাড। মায়ের বা রাঁধুনির রান্না নুন-খরো মিষ্টি-বেশি আলুনি আতেলা সবই তো খেয়ে নিই। এই ট্রেন প্লেনের তথাকথিত সুখাদ্য কেন কে জানে গলা দিয়ে নামে না! এর পরে বোধহয় দই বা আইসক্রিম দেবে, সেটাই ভরসা।

ভিনিত তো খাবারটা নিলই না। স্বাভাবিক। সে যেখানেই যাক না কেন তার ঘিও সঙ্গে যাবেই। একটা ডিব্বা খুলল, ঘিয়ের গন্ধে ভরে গেল আমাদের কুঠুরি, মোটা মোটা পরোটাগুলো আচার দিয়ে খেয়ে নিল চটপট। খইনি দেখি জুলজুল করে দেখছেন।

একটু বকবক শুনি ভিনিতের, চুপচাপ চিন্তাহীন বসে থাকি কিছুক্ষণ। সাড়ে নটা বাজতে না বাজতেই ভিনিত ওপরে উঠে যায়, ঝাড়ছে সশব্দে বাঙ্কটা, বিস্তঁরা বানাবে। ব্যবসায়ী দুজন না উঠলে আমি বা খইনি কেউই শুতে পারছি না। শেষকালে খইনি এক আকাশ পাতাল জোড়া হাই তুললেন শব্দ করে।

—'ওই সরি, আপকো সোনা হ্যায়'...একজন সেরামিক ব্রিক খইনির ওপরের বাঙ্কে উঠে গেলেন, আরেকজন অন্য খুপরিতে চলে যান। নিভাঁজ বিছানা করি অতঃপর। বাড়তি চাদর মাথার দিকে ভাঁজ করে দিই। কম্বলের কুটকুটোনির থেকে সুরক্ষা-চাদরটা গায়ে দিয়ে শুয়ে পাড়ি একটা চটি বই নিয়ে। 'নিদ্রাযোগ' বা 'নিদ্রাইয়োগো', নামটা এভাবেই লেখা। কিন্তু বইটা ইংরেজিতে। নিদ্রা ছাড়া কী-ই বা করবার আছে ট্রেনে? লেখক নিদ্রাকে নিদ্রাতেই আটকে রাখতে চাইছেন না। তাকে যোগ পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, একটা সচেতন মানসিক ব্যায়াম। এভাবে যদি নিদ্রাকে ব্যবহার করা যায়, তা হলে নিদ্রা যে আরও কতগুণ বিশ্রাম ও এনার্জি দিতে পারে তার হিসেব অঙ্ক কষে দেওয়া আছে। মজা লাগে, আশ্চর্যও লাগে সেই সমীকরণ পড়তে। নিদ্রাযোগ, মোহনিদ্রা যোগনিদ্রা ও মহানিদ্রা— এই রকম শ্রেণিবিভাগ করেছেন ভদ্রলোক। নিদ্রাযোগ থেকে যোগনিদ্রায় পৌঁছলে

প্রাণশক্তিকে পর্যন্ত মুলতুবি রাখা যায়। আমরা যেসব সাধু-সন্ন্যাসীর কথা শুনি ক্বচিৎ কদাচিৎ যাঁরা মাটির তলায় দীর্ঘক্ষণ জীবন্ত সমাধির পরও বেঁচে থাকেন, তাঁরা এই যোগনিদ্রা ব্যবহার করেন। কিছুই না, খালি চর্চা। যোগনিদ্রার অভ্যাস পাকা হলে মহানিদ্রা অর্থাৎ চিরনিদ্রার ক্রান্তি খুব সহজ সুন্দর হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। একটু কৌতুক বোধ করি। নিদ্রা মানেই তো চেতনাকে মুলতুবি রাখা, তার আবার সচেতন ব্যবহার কী জিনিস? শবাসনের মতো কী? ঘটনাহীন ট্রেন-যাত্রায় করার মতো কিছু পেয়ে আমি একটু হাঁফ ছাড়ি। মাথার কাছের সুইচটা অফ্ করে দিই। তারপর হাত পা সব শিথিল করে দিতে শুরু করি। পা থেকে ওপর দিকে উঠতে হয়। রিল্যাক্স, রিল্যাক্স...।

একদম গোড়ার দিকে কোথাও কারও নাসিকাগর্জন শোনা যাচ্ছিল। তারপর কামরায় খালি ঘুমের শান্তি, যার ভেতরে আমি তলিয়ে যেতে থাকি। চেতনার অতলেও কিন্তু ট্রেনের ঝড়ো গতি শরীরে জেগে থাকে, কামরা মৃদু মৃদু দোল দেয়, শিশুকে দোল দেওয়ার মতো। কত গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, অ্যাস্টারয়েড, কত তারা, মহাজাগতিক বর্জ্য অকল্পনীয় গতিতে ঘুরছে মহাকাশে। আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠে তার কিছুই তো বুঝি না। শুধু দিনরাত, শুধু ঋতুবদল দেখে বুঝতে শিখেছি আমরা চলেছি। হোক একই কক্ষপথে, তবু চলেছি। এখন ঘুমের মধ্যে হিমোগ্লোবিনে হিমোগ্লোবিনে, নিউরোনে নিউরোনে গতি বয়। সেই গতির সঙ্গে শরীরের ভেতরের সমস্ত উপাদান প্রতি মুহূর্তে সমঝোতা করে নিতে নিতে চলেছে। এই ক্ষীণ বোধ চেতনার অবতলে জেগে থাকে। হে আপাত ঘুমন্ত মানুষ তুমি থেমে নেই। বাহিত হয়ে যাচ্ছ স্থান থেকে স্থানান্তরে, গতি থেকে স্বস্তিতে, স্বস্তি থেকে শান্তি, শান্তি থেকে উপশম।

তবু, এখানেও নিদ্রা আমাকে পুরোপুরি অধিকার করতে পারে না, কেন না আমার সব পথ গ্রাস করে দাঁড়ায় এক বিশাল প্রত্ন অট্টালিকা। উঁচু উঁচু মোটা মোটা... ডরিক থাম, গুপ্তযুগীয় খিলান, পলেস্তারা খসে গেছে। যেখানে কোনওকালে দেয়াল চিত্র ছিল, এখন সে দেয়াল আঁকড়ে রয়েছে দানব-বিছের মতো বট-পাকুড়ের শেকড়ের মানচিত্র। ঘরের পরে ঘর পার হয়ে যাই। শূন্য। উঠোন, বারান্দা, দালান শূন্য। অথচ কোথা থেকে প্রতিধ্বনি আসে, কত রকম ডেসিবেল-এর, পায়ের আওয়াজ, ছুটে যাওয়া, হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠা, কলকল করে রুদ্ধ হাসি বয়ে যায়। বাচ্চা গলা ঘ্যানঘ্যানায়, বুড়ো মানুষের শ্লেষ্মাজড়িত কাশি, কথা কাটাকাটি, প্রেমিকের ফিসফিস, প্রেমিকার শীৎকার...পেছন ফিরে দেখি, পায়ের শব্দ থেমে যায়, হাসিতে হাসি মেলাতে যাই, হাসি থেমে যায়, কে কাঁদছ? বারান্দায় ধুলোর আস্তরণ, তার তলায় চাপা পড়ে গেছে কান্না, ঝুঁকে দেখি বাইরের একদা বাগানে স্তূপীকৃত পড়ে রয়েছে ভাঙা দেয়াল-ছাতের ইট কাঠ পলেস্তারার জঞ্জাল, ইঁদুর বেরিয়ে আসে, হুলো বেড়াল চাপা রাগে গজরায়। আর হঠাৎ সেই সমস্ত শূন্যতা, প্রতিধ্বনি, পতিত জমি, পরিত্যক্ত প্রাসাদ বেড়ে তার কুণ্ডলীকৃত শরীর পাকে পাকে খুলতে খুলতে উঠে দাঁড়াতে থাকে এক মহাসর্প। অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যে, গরিমায়। তার রং গাঢ় বাদামি, চিকন, উজ্জ্বল, ভেতরের আলোয় জ্যোতিষ্মান, ফণায় ধবধবে সাদা নকশা। যেন কোনও মহানর্তক ধীরে ধীরে অপাবৃত করছেন তাঁর করছেন তাঁর মুদ্রা মহিমা।

ধুন্ধুমার গর্জনে সেই প্রাসাদ ভেঙে পড়ে। ভেতরে ভেতরে এত জীর্ণ এ যেন হওয়ারই ছিল। এই রহস্য কুঠির সব কোণ-কুলুঙ্গি দেখা হল না। খেদ নেই তেমন, কিন্তু ভেঙে পড়ার প্রতিঘাতে সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। ভূকম্পের আওতা থেকে প্রাণপণে বেরিয়ে আসতে চাইছি, পারছি না। আমার নিদ্রাযোগ বা যোগনিদ্রা আমাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছে। আপার বাঙ্ক থেকে বিরাট আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে ভিনিত। ওদিক থেকে অস্ত্র-ব্যবসায়ী তাঁর বাঙ্কসুদ্ধু ভেঙে পড়েন ভিনিতের ওপর। উল্টো দিকের বার্থ থেকে খৈনিখাদক ছিটকে আসেন আমার বার্থের কিনারায়।

আবার ছিটকে যান ওদিকে। এদিকে ওদিকে, এদিকে ওদিকে যতক্ষণ না তাঁর ওপর পর্দার ওপার থেকে ভীষণ শব্দে ভেঙে ছিটকে আসে তাদের বার্থসুদ্ধ দম্পতি এবং সবাই মিলে তালগোল পাকিয়ে যায়। জানলার শাটার কাচ ভেঙে পড়ছে চতুর্দিকে। আমার ওপরও, কিন্তু আমার অসাড় শরীর কিছুই অনুভব করছে না। গায়ে রক্ত, কিন্তু সে যেন সদ্যোজাত শিশুর গায়ে মায়ের রক্ত। গোঙানি চলতে থাকে, হাহাকার, আর্তনাদ। তারপর চুপ। খালি ভাঙা জানালাপথে তুমুল চিৎকার শুনতে পাই। ক্রেন...ক্রেন, গ্যাসকাটার গ্যাসকাটার, দমকলের আওয়াজে রাত কাঁপতে থাকে। আমি শুধু শুয়ে থাকি তীক্ষ্ণ কাচের ফলা বুকে নিয়ে, তৃষ্ণার্ত, কখন কে মাটি ফুঁড়ে জল দেবে তার প্রতীক্ষায়।

চারদিকে অন্ধ দেয়াল। হাতড়াই। পেছল বেয়ে বেয়ে এগোতে চাই, অথচ কুয়োর ঢাকনি খোলা, দেখা যায় বর্তুল মুক্তি। কুয়োর কিনারা থেকে ঝুঁকে থাকে ছায়ামুখ, চিনি, চিনি, চিনতে পারি না। চারিদিকে জল খেলতে থাকে, মুখগুলো আপসাতে থাকে, ঝাপসা হয়ে যায়। কীরকম অন্তহীন জ্যোৎস্না ওপরে। পৌঁছতে চাই। পৌঁছতে চাই। কী করে? কীভাবে? মাথা খুঁড়ি। তারপর মনে পড়ে যায় আমার সেই একান্ত নিজস্ব গুপ্ত ক্ষমতার কথা।

নিরেট শূন্যে পায়ের একটু ধাক্কা, উড়ে যাই গিয়ার বদলে বদলে ওপরের আলোকিত অন্ধকারে। নির্বাধ উড়ে যাই। নীচে অজস্র বুদবুদের বর্ণালি রঙের হলকা ছুটিয়ে ফেটে যায়।

বৃত্তের বাইরে

শেয়ার-বাজারে লাখ তিন চার ডুবে গেল। ক বছর ধরেই তেজী চলছিল বাজার। দালাল প্রকাশ দেওরা যেমন যেমন বলেছে তেমন তেমনই করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন বিজু রায়। তিনি নিজে শেয়ারের পাতাটা খেলার পাতার মতোই একবার উল্টে দেখেন মাত্র। দেওরা শেয়ারের ঘুণ, এমন ভুলটা কী করে করল বিজু রায়ের মাথায় আসে না। মুখ দেখাচ্ছে না লজ্জায়। রক্ষা এই যে আরও যায়নি। কেবল ম্যানুফ্যাকচারিং-এর বিরাট বিজনেস তাঁর মূলত। টেন্ডার ধরতে, সরকারি বেসরকারি এক্সপার্টদের তুষ্ট করতে, লেবারকে মুঠোর ভেতর রাখতে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা হচ্ছে ইদানীং। ইলেকট্রিকাল ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের এজেন্সিও আছে অনেকদিনের। ইচ্ছে আছে একটু বাজার দেখেশুনে ইলেকট্রনিক্স্-এও ম্যানুফ্যাকচারিং-এ নেমে পড়বেন। অরোরা, শেঠ, বসাক এরা তো হাজারটা বিজনেস করছে। স্বনামে, বেনামে। তিনিই বা নামবেন না কেন? তিনটে পলিটিক্যাল পার্টিকে বছর বছর মোটা চাঁদা দিয়ে যাচ্ছেন, যার যেমন ওজন তার তেমন। তো সেখানেও তো আজকাল মেলা ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে। ভুঁইফোঁড় কিছু মস্তান, পলিটিক্যাল ক্রেডেনশিয়াল্স্ আছে কি নেই, হুটহাট করে তোলা চাইতে শুরু করেছে। আইচকে তিনদিন ফোন করে পাচ্ছেন না। মিনিস্টারের সঙ্গে আইচের ওঠাবসা। তার মাধ্যমেই এসব ঝামেলাগুলো তিনি মেটান। হাতে চাবির রিং লুফতে লুফতে চোখ গরম দেখিয়ে যাবে তাঁকে, এ জিনিস তিনি বরদাস্ত করতে পারবেন না।

লাল রঙের টেলিফোনটার দিকে হাত বাড়িয়েছেন, আইচকে যত শিগগির সম্ভব কনট্যাক্ট করা দরকার, উমেশ রক্ষিত ঢুকল। এর সামনে আইচের সঙ্গে কথা বলা যাবে না। অথচ এ আসাতে তিনি টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন এটাও একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। উমেশ রক্ষিতের কৌতূহল বাড়বে, নিজেকে খামোখা খুব কেউকেটাও ভাবতে শুরু করতে পারে। অতএব তিনি একটা বানানো নম্বর টিপে গেলেন চোখ বুজে। সুখের বিষয় ওদিকে 'দিস নাম্বার নো লংগার এগ্জিসটস' বাজতে লাগল। ঠাস করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন বিজু রায়। মুখে দারুণ বিরক্তির কুঞ্চন।

'বসুন।'

—'পেলেন না নম্বরটা?'

—'নাঃ। আজ আবার কী মনে করে? পেমেন্ট তো হয়ে গেছে!'

—'পেমেন্টের জন্যে কি আমার ঘুম হচ্ছিল না রায়সাহেব? আরে বাবা, মাল আপনার গুদোমে পৌঁছে দিয়েছি। আবার কী? আমি ঘুমোলেও আপনার পেমেন্ট সময়মতো পৌঁছে যাবে। আসলে একটা ভাল জিনিস পেলুম...'

উমেশ রক্ষিত ছোট ব্যবসাদার। ওর কাছ থেকে কিছু পার্টস নেওয়া হয় তাঁর কারখানাতে। নিতেই হবে তার কোনও মানে নেই। উমেশ, রমেশ, দিনেশ, ধীরেশ এদের মধ্যে এসব ছোটখাটো ব্যাপারে কোনও তফাত করবার দরকার হয় না। ফেভার, জাস্ট ফেভার। তবে তোষামোদে ভুলে নয়। তোষামুদিগুলো ওর বড্ডই মোটা দাগের। আপনার মতো উদার, সচ্চরিত্র বাঙালি-ব্যবসাদার দেখা যায় না। কীভাবে হাল ধরে রেখেছেন! ছবির মতো কারখানা। এসব দেখে শেখবার ইত্যাদি ইত্যাদি, কোনও দিনই এই ঘ্যানঘেনে কথাগুলো ভাল লাগে না বিজু রায়ের। ওকে অর্ডারগুলো দেন স্রেফ

ওর পরিবারের সাইজের কথা মনে করে। নিজের চারটি। বড় ভাই অকালে গেছে। তার পুরো ফ্যামিলি ওর ঘাড়ে। বুড়ো বাবা-মা এরা তো আছেই।

উমেশ ঝোলার থেকে একটা প্যাকেট বের করল। ভেতরে অনেক কিছু ঠেসেঠুসে জিনিসটাকে চৌকো আকার দেবার চেষ্টা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বোতলের গড়ানে গোলালো দিকটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে।

গলোগলো হয়ে উমেশ রক্ষিত বলল—'আমার এক শালা ফ্রান্সে থাকে, সে-ই... মাঝে মাঝে...খুব ভাল...'

দুম করে বিজু রায় বললেন, 'কজন শালা আপনার রক্ষিতবাবু?' যখনই কিছু উপহার দেবে, শালার নাম করবে উমেশ রক্ষিত। বিজু রায়ের প্রশ্নে থতমত খেয়ে বলল, তি তিন। তিনজন নিজের শালা আমার।'

—'সব্বাই-ই বাইরে থাকে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেট্‌লড্‌।' ভেতরের সন্তোষে গর্বে রক্ষিত ফুলে ওঠে। শালাদের ইন্ডিয়ার বাইরে থিতু হওয়ার চেয়ে বড় গৌরব যেন আর নেই।

—'তাহলে "খেতে বসল জামাই শালা" এ সৌভাগ্য আপনার বড় একটা হয় না, কী বলুন?' বিজু রায় বলেন।

—'হাঃ হা, তা যা বলছেন। তা যা বলেছেন। ওদিকেও যেমন জামাইষষ্ঠীর পাট নেই, এদিকেও তেমনি নো ভাইফোঁটা।' রসিকতাটাতে যোগ দিতে পেরে রক্ষিতের মুখ উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

—'তা যদি বলেন মশাই। তিন তিনখানা এন আর আই আপনার হেপাজতে। বাজেট দেখেছেন তো? এন আর আই মানেই জামাই। দিন না সব কটাকে বিজনেসে নামিয়ে। দেশের মাটিতে কিছু ডলার, স্টার্লিং ঢালুক। অর্ডারগুলোও সব আপনিই ধরে নেবেন। বি বি রায়কে আর গিফট দেবার দরকার হবে না।'

শুনতে শুনতে ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে রক্ষিত। ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে এমনি ভাব। কতক্ষণে সামলে ওঠে মৃদু কৌতূহল নিয়ে দেখতে থাকেন বিজু রায়। শিগগিরই সামলে উঠবে। কোনও সন্দেহ নেই। একটু আচমকা হয়ে গেছে ধাক্কাটা!

—'আপনি আজ আসুন। সময় হাতে বড্ড কম।' এ ফাইল ও ফাইল টেনে বিজু রায় অতিরিক্ত ব্যস্ততার ভানটুকু চমৎকার ফোটালেন।

—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। খেজুরে গপ্প করবার সময় আছে নাকি আপনার?' উমেশ শশব্যস্তে উঠে তাঁকে নমস্কার করে কেমন পেছু হটতে হটতে বেরিয়ে গেল। যেন যতক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় রায়সাহেবকে চোখের আড়াল করতে চায় না। বিজু রায়ের হাসি পেল। তিনি তা হলে এতদিনে নবাব-বাদশা শ্রেণীর হতে পেরেছেন। নবাব-টবাবদের এইভাবে তসলিম জানাতে হয় না? পেছন ফেরা যায় না তাদের সামনে। উমেশ রক্ষিতটা আসলে পুরনোকালের সাম্পল। প্রথম তিনি যে সময়ে ব্যবসায় নেমেছেন সেই তখনকার, তখন এই সব চাল-চলন চালু ছিল। এখন যুগ পাল্টে গেছে। এখন আসছে স্মার্ট ছোকরা-ছুকরির দল। গটগট করে আসে, ফুটফাট ইয়াংকি ইংরিজি কি হিন্দি বলে, আসে প্রার্থী হয়ে। কিন্তু ভাবখানা যেন উদ্ধার করে দিতে এসেছে। প্রত্যেকেই যেন বলতে চায়, আরে আমার মতো একটা খানদানি, এ-ক্লাস, সেন্ট পার্সেন্ট কমপিটেন্ট সাপ্লায়ারকে ওবলাইজ করবে না? ইজ দ্যাট পসিবল বস? এরা নিজেদের প্রোডাক্টের খুঁটিনাটি জানে। শুনিয়ে তবে ছাড়ে। ব্যবসার জগতে এরা নতুন ক্লাস। মূলধন জামাকাপড়ের বাহার, কায়দা, আর আজকালকার ভাষায় 'এনথু'।

উমেশ রক্ষিত বেরিয়ে গেলে ফাইলগুলো ঠেলে সরিয়ে দিলেন বিজু রায়। রক্ষিত-দত্ত পার্সেলটা টেবিলের এক কোণে বিরাজ করছে। সেটা নিজের ব্রিফকেসের মধ্যে চালান করলেন। একটু পরে

সত্যিই তাঁকে বেরোতে হবে। ঘুসুড়ির দিকে একখানা হাই-রাইজ তুলছেন। খুব ঝামেলা পাকিয়েছে সেখানে চোর্পোরেশন। লোহার রডের মাপ নাকি ঠিক হয়নি। আরও কী কী সব গলতি রয়েছে। তিনি যখন প্ল্যান সাংশন পেয়েছিলেন তখন জি-প্লাস এইটের পান। তো এখন বলছে জি-প্লাস ফোরের বেশি করতে দেবে না। বিরানব্বই-এর আইন উননব্বইয়ের প্ল্যানের ওপর খাটবে কি না এখনও তিনি ঠিক জানেন না। সুখেন্দু তাঁর লিগ্যাল অ্যাডভাইজার, তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে দুটো তলা তাঁর কমপ্লিট। দোতলায় লোক এসে যাচ্ছে এক মাসের মধ্যে। হঠাৎ ইনসপেকশন। ইনসপেকশন করে বলে গেছে বাড়ি নাকি ভেঙে দিতেও পারে। ভেঙে দেবে না আরও কিছু। আসলে নোলা বেড়েছে। কিন্তু কেমন রোখ চেপে গেছে বিজু রায়ের। পরিষ্কার দলিল, জমির মালিকের সঙ্গে কোনও অবনিবনা নেই, তৎসত্ত্বেও আগের কাউন্সিলারকে খাওয়াতে হয়েছে। এবার ভোটে জিতে নতুন কাউন্সিলার এসেছিস, তোকেও খাওয়াতে হবে? কভ্‌ভি নহি। দে বাড়ি ভেঙে, কত মুরোদ দেখি। দুঁদে মারোয়াড়ি সব মালিক আছে। এখনই অন্তত চারটে। কোটিপতি লোক। তাদের হিন্ট দিয়ে রেখেছেন বিজু রায়। বলেছে, দেখ লেঙ্গে শালে কো। তবু একবার আজ সাইটে যাবেন ঠিক করেছেন। লোহার রডে কনট্র্যাক্টর যদি সত্যি চারশো বিশ না করে থাকে, সিমেন্টে যদি গঙ্গামাটি পাইল না করে থাকে তো ওই চোর্পোরেশনকে তিনি খাওয়াবেন ঠিকই। তবে ঘোল। ঘোল খাইয়ে ছাড়বেন। আর কনট্র্যাক্টর যদি সত্যি গোলমাল করে থাকে তাহলে তাকে তো ফায়ার করবেনই, ড্যামেজ আদায় করবেন গলায় গামছা দিয়ে। এর পর সে খায় কী করে তাও দেখবেন বিজু রায়। এখন, কোর্ট কাছারি যদি করতেই হয় তো আটঘাঁট বেঁধে এগোতে হবে। সিভল এঞ্জিনিয়ার জয়দীপ চাটুজ্জেকে নিয়ে যাচ্ছেন আজ। চারতলার ছাদ ঢালাই হবার কথা আজকেই। সিমেন্ট, বালি, লোহা, চিপস, সব দেখাবেন। বদনামি বরদাস্ত করবেন না বিজু রায়। যাবার পথে ওর নেতাজী সুভাষ রোডের অফিস থেকে জয়দীপ চাটুজ্জেকে তুলে নেবেন এমন কথা আছে। একটু আগে ফোনে কনফার্ম করে নিয়েছেন।

কীরকম একটা তেতো মুখ, তেতো মনে অফিস থেকে বেরোলেন বিজু রায়। দু ধারে ফলের পসরার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছে গাড়ি। বাজারের শ্রেষ্ঠ কমলালেবু, মুসাম্বি, আপেল, আঙুর, আনারস, ডালিম সাজানো দুদিকে। বিজু রায় লোহা, লক্কড়, নাট, বল্টু, যন্ত্রপাতি ছাড়া কিছুই বড় একটা দেখতে পান না। অর্জুনের এই গুণটি তিনি পেয়েছেন। একাগ্রতা। তাঁর ড্রাইভার সমর ফলগুলোর দিকে চেয়ে ফলওয়ালাকে ধমকে উঠল, 'এই আবদুল, ডালিমগুলো বেদানা-বেদানা করে হাঁকছিস কেন?'

—'আফগানিস্তানে গণ্ডগোল বাবু, ও বেদানা আর পাওয়া যাবে না, এই বেদানাই নিতে হবে!'

দার্জিলিঙে গোলমালের পর সেখান থেকে লেবু আসাও বন্ধ হয়ে গেছে। চারদিকে শুধু নাগপুর আর নাগপুর। তবু এখানে যা মেলে, শহরের অন্য কোথাও তা মেলে না। দামেও নিউ মার্কেটের থেকে শস্তা। খানদানি মারোয়াড় রেজিমেন্টের ঘাঁটি এখানে। আসলি ঘিউ, আসলি ফল, আসলি মসালা সব আসলি এখানে। অতএব বিজু রায়ের অফিসের অনেকেই এখান থেকে ফল কিনে নিয়ে যায়। একমাত্র বিজু রায়ই কেনেন না। তিনি অবশ্য জানেন না, তাঁর ড্রাইভার কেনে, তাঁরই বাড়ির জন্য। প্রমীলা, তাঁদের বাড়ির নামে-রাঁধুনি আসলে হাউজ-কিপার ফরমাশ করে, সমর কেনে। দু চারখানা যে নিজের পরিবারের জন্য সরায় না, তা নয়। তবে বেশিরভাগটাই রায়ভবনের তিনশো লিটারের পেল্লাই রেফ্রিজারেটরের মাথায় কখনও ত্রিপুরি বাঁশের নৌকায়, কখনও পোড়ামাটির ডোঙায়, কখনও ক্রিস্ট্যালের পাত্রে শোভা পায়। বিজু রায়ের পাতে যখন পড়ে তখন অফিস-সংলগ্ন ফল-বাজারের সওদা খাচ্ছেন বলে বুঝতেই পারেন না তিনি।

জয়দীপ চাটুজ্জেকে খুব অন্যমনস্ক দেখাল। কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন না বিজু রায়। এসব জিজ্ঞেস করবার মতো ঘনিষ্ঠতা জয়দীপের সঙ্গে তাঁর নেইও। তবে তাঁর যদি মেজাজ খিঁচড়ে থাকে,

তো জয়দীপেরও থাকতেই পারে, কে জানে ও-ও কোথাও মার খেল কি না। জয়দীপ ছেলে ভাল। বছর ত্রিশ-বত্রিশের ব্রাইট ইয়ং ম্যান। বসাকের পার্টিতে আলাপ। সবে নিজের ফার্ম খুলেছে তখন। আর এখন তো সিভল এঞ্জিনিয়ার আর্কিটেক্টদের পোয়াবারো। খুব কামাচ্ছে। তিন চার বছর আগে বসাকের পার্টিতে দেখেছিলেন পাতলা ধরনের চেহারা। চোখে, খুব স্মার্টনেস সত্ত্বেও একটা খরগোস-খরগোস ভাব তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। সেই ছেলেরই এখন পেটের ফাঁদ বেড়েছে। কথা বলা শেষ করলেই থুতনির তলায় আর একটা বেড় দেখা দেয়।

ব্রিজ থেকে নামবার মুখে গাড়ি আটকে গেল। মুখ বাড়িয়ে দেখলেন বিজু রায় এখন কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। নিজের হোল্ডারে একটা সিগারেট লাগিয়ে জয়দীপ সিগারেট কেসটা বাড়িয়ে ধরল বিজু রায়ের দিকে। সিগারেটের জন্য না সুদৃশ্য দামি সিগারেট-কেসটার জন্য বিজু রায় ঠিক বুঝলেন না। যাই হোক, তিনি একটা নিলেন। বললেন, 'পরের বাড়িটা বুঝলে চ্যাটার্জি তোমার কাছ থেকেই আগাগোড়া প্ল্যানিং টল্যানিং করে নিয়ে নামব। এটার বেলায় আসলে অতটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল না। দুলিচাঁদ নামিয়ে দিল। নেমে পড়লুম। এখন কেমন নেশা ধরে গেছে, বুঝলে?'

জয়দীপ গম্ভীভাবে বলল, 'হ্যাঁ। প্ল্যান-টল্যানগুলো পরিষ্কার থাকা দরকার। প্ল্যান একরকম সাবমিট করলুম। পরে চতুর্দিকে ক্যান্টিলিভার করে বেশ কয়েক হাজার স্কোয়ার ফুট বাড়িয়ে নিলুম এ তো আজকাল আকচার হচ্ছে। তা ছাড়া, রেসিডেনশ্যাল কমপ্লেক্স একটা সেক্রেড রেসপনসিবিলিটি, পবিত্র দায়। লোকে ঠেকায় পড়ে কিনছে বলেই প্রোমোটার-ডেভলপার কতকগুলো বিপজ্জনক খাঁচা বানিয়ে ছেড়ে দেবে—দ্যাটস নট জাস্টিস!' সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল জয়দীপ জানলার দিকে মুখ করে।

বিজু রায়ের মাথার মধ্যে কে একটা ছোট্ট ওয়ার্নিং বেল বাজাচ্ছে। এই বক্তিমের মানে কী? অন্তত পক্ষে পঁচিশ বছরের ছোট এই ছোকরা কোন সাহসে আপার হ্যান্ড নিচ্ছে রে বাবা! ইতিমধ্যেই আবার কার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল? কেনই বা? তিনি তো ওকে রীতিমতো পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন! আড়চোখে জয়দীপের মুখটা একবার দেখে তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা কি জানো! হাজাররকম ধান্দায় থাকি। নেহাত একটা খেয়ালের মাথায় বাড়িটা করা। বাট নাও অ্যায়াম সিরিয়াস। এরপর যদি করি, যেগুলো করব, সেগুলো হবে প্রতিটি স্কোয়ার ইনচ প্রি-প্ল্যানড। একেবারে ছবির মতন। কোন্নগরের দিকে একটা চোদ্দো কাঠা জমি দেখেছি। শিগগিরই সব ফাইনাল হয়ে যাবে। এবার আর...।'

কথাটা শেষ করলেন না বিজু রায়। কোন্নগরের চোদ্দো কাঠাটা আসলে ধাপ্পা। জয়দীপ চাটুজ্জে কতটা উৎসাহিত হয় সেটা দেখবার জন্য টোপ ফেলা। তিনি যদ্দূর জানেন, পেটের ফাঁদ বাড়লেও তেমন সন্তোষজনক কিছু জয়দীপ এখনও কিছু করতে পারেনি। খুঁটে তুললেও এ লাইনে ভাল কামাই হয়। কিন্তু একটা মান-মর্যাদার ব্যাপার আছে, পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে—বিশেষত এসব আধুনিক কেতার কোয়ালিফায়েড ছেলেদের।

'মিডল্ ইনকাম-গ্রুপের জন্য করব। কিন্তু হবে রাজপ্রসাদের মতো। যতদূর সুবিধে দেওয়া যায়...' ধোঁয়ার রিং ছাড়ার মতো বিজু রায় ছেড়েই যাচ্ছেন। আসলে এগুলে সুতো। জয়দীপ যদি ধরে।

জ্যাম ছেড়েছে। আই সি বোস রোড ধরে জি টি রোড নিল সময়, তারপর হু হু করে সাইটে পৌঁছে গেলেন। একতলায় অফিসঘর। পরে এটাই এদের অ্যাসোসিয়েশনের ঘর হবে। এখানেই সব কাগজ-পত্তরের ডুপ্লিকেট থাকে। সুপারভাইজ করছিল মিস্ত্রি। কড়কড় কড়কড় করে সিমেন্টে চিপসে মাখা হচ্ছে মেশিনে। বিজুবাবুকে দেখে একবার উঁকি মেরে সেলাম করে গেল। ব্রোশিওরের পাতা উল্টে যাচ্ছে জয়দীপ। এবার উঠছে।'

—'এলিভেশনটা তো ক্লিয়ার এসে গেছে!' বিজু রায় বললেন।

'সো ফার সো গুড' কাঁধ নাচিয়ে বললে জয়দীপ, 'চলুন একটু ঘুরে দেখে আসি।' দোতলায় [redacted] উঠতে বলল—'প্ল্যানে অনেক ডিফেক্ট আছে দাদা। মাঝখানে একটা করে ছোট ফ্ল্যাট স্কুইজ

করে দিয়েছেন, অথচ ডাক্ট রাখেননি। অর্থাৎ এরা জাস্ট একটা দিক পাচ্ছে। এ ছাড়াও আছে অনেক টেকনিক্যাল গণ্ডগোল। তবে সে সব তো এখন কিছু করার নেই। আমি জাস্ট বিল্ডিং মেটিরিয়্যালসগুলো যদ্দুর পারি একটু দেখে নেব।'

থাকে থাকে সাজানো সিমেন্টের বস্তাগুলোর মধ্যে একটা আঙুল দেখিয়ে বার করতে বলল। গনির লোক সেটাকে বার করে খুলে দেখাল। দেখতে দেখতে মুখ বিকৃত করল জয়দীপ। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'গভর্মেন্টের মডুলার ইটগুলো নিলেন না কেন? স্ট্যান্ডার্ড ইট!' বিজু রায় একথার উত্তর জানেন না। জানে তাঁর কনট্র্যাক্টর। লোহা সব ঢালাই হয়ে গেছে। সামান্য কিছু পড়ে আছে। জয়দীপ একটু নিচু হয়ে দেখে নিল। তারপর বলল—'চলুন আমার দেখা হয়ে গেছে।'

নিচের অফিস ঘরে বড় করে জলযোগের আয়োজন ছিল। এক কাপ চা ছাড়া জয়দীপ কিছু ছুঁল না। —'তাড়া আছে দাদা, বাড়িতে গেস্ট আসবার কথা আছে।'

গাড়ি ব্রিজে উঠতে আয়েস করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল—'সিমেন্টের কোয়ালিটি খুব খারাপ দাদা। নামী কোম্পানির লেবেল লাগিয়ে আপনাকে ভুসিমাল গজিয়েছে। লোহার রড কোয়ার্টার সুতো মতো কম আছে। কর্পোরেশনের ইনসপেক্টর ভুল রিপোর্ট দেয়নি।'

—'বলো কি?' বিজু রায় সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

—'ওই যে বলছিলেন খেয়ালের মাথায় করেছেন। সিরিয়াসলি নেননি! আপনার সেই অ্যাটিটিউডটারই সুযোগ নিয়েছে কনট্র্যাক্টর। আমার তো সরাসরি আপনাকেই রিপোর্ট দেবার কথা। আমি সরকারি লোকও না। কিছুই না। কোথাও ওবলিগেশন নেই। জাস্ট কনসেন্স। বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। বাড়িটা ভাল হচ্ছে না দাদা।

—'আপনি শিওর? আমি কিন্তু বেস্ট মাল দেবার কথাই গোড়ার থেকে বলে আসছি। শিবশঙ্কর মানে ওই কনট্র্যাক্টর আমার চেনা লোক। ইন ফ্যাক্ট আমার সল্ট লেকের বাড়ি ও-ই করেছে!'

জয়দীপ কাঁধের একটা ভঙ্গি করল। মুখে কিছু বলল না। জয়দীপকে ওর অফিসে নামিয়ে দিয়ে বেশ কিছুদুর, প্রায় নিজের অফিসে পৌঁছে গিয়েছিলেন বিজু রায়। হঠাৎ মনে হল রক্ষিতের দেওয়া প্যার্সেলটা জয়দীপের টেবিলে ফেলে এসেছেন। ব্রিফ কেস থেকে কর্পোরেশনের ইনসপেকশন রিপোর্টটা বার করবার সময়ে পার্সেলটাকে টেবিলের ওপর রাখতে হয়েছিল। তারপর ঢোকাতে ভুলে গেছেন। ওটা আবিষ্কার করলে জয়দীপ ঘুষ মনে করতে পারে। ঘুসুড়ির বাড়িটা ওভাবে বাতিল করে দেবার পর ঘুষ দেওয়ার অর্থ খুব খারাপ দাঁড়াবে। মানসম্মান আর কিছু থাকবে না বিজু রায়ের ওইটুকু একটা ছেলের কাছে। তিনি গাড়ি ঘোরাতে বললেন। নেতাজী সুভাষের গলিতে ঢুকছেন, জয়দীপের গাড়িটা ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। জয়দীপ নিজেই ড্রাইভ করছে। পাশে শিবশঙ্কর না? তাঁর কনট্র্যাক্টর জয়দীপের গাড়িতে কী করছে? দুজনে যেন গভীর আলোচনায় মত্ত। বিজু রায় এত অবাক অনেকদিন হননি। শিবশঙ্করের সঙ্গে জয়দীপের আদৌ কোনও জানাচেনা আছে বলে তিনি শোনেননি। ও কি টের পেয়েছে জয়দীপ ওর সমস্ত ব্লাফ ধরে ফেলেছে? তাই ওর অফিসে ছুটে এসেছে? আগে তো তাঁরই কাছে আসা উচিত ছিল। কারণ কোর্টে জজের মুখোমুখি হতে হবে বিজু রায়কেই। শিবশঙ্করকে দেখিয়ে দিয়ে তিনি পার পাচ্ছেন না। তবে শিবশঙ্করকেও মুখোমুখি হতে হবে বিজু রায়ের। তাঁর নিজস্ব আদালতে। সেখানের আর কারুর দিকে আঙুল দেখিয়ে শিবশঙ্করও পার পাবে না। পার্সেলটা আনতে ড্রাইভার সমরকেই পাঠাবেন ভেবেছিলেন। কি মনে করে নিজেই লিফটে উঠলেন। বিশ্রী অন্ধকার বাড়িটা। চারদিকে ঝুল ঝুলছে। পানের পিকে সিঁড়ির কোণ-টোন ভর্তি। দেখলে কল্পনাও করা যায় না, এরই পাঁচতলায় জয়দীপ সাতশো' স্কোয়্যার ফুট মতো জায়গা অমন ছিমছাম করে দিতে পেরেছে। স্লাইডিং ডোর, কাচ, কাঠ। বড় বড় পোস্টার। রবার গাছ। অচেনা ক্রোটন। মোল্ডেড চেয়ার-ফেয়ার।

পি সি নিয়ে কাজ করছিল একটি লোক। ঢোকবার মুখে টুলের ওপর পিওন। টেবিলে ওটি

বোধহয় ড্রাফটসম্যান। বিজু রায়কে দেখে সেই বলল 'মিঃ চ্যাটার্জি তো এইমাত্র গেলেন কাজে। কিছু বলতে হবে?'

বিজু রায় গম্ভীরমুখে বললেন—'ভেতরে একটা পার্সেল আছে। আমার। ভুলে ফেলে গেছি।'

—'এইয্ যাঃ। স্যার তো অফিসের চাবি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। খুব দরকারি নাকি?'

বিজু রায় বললেন—'ফিরে এলে ওটা রেখে দেবেন। আমার ড্রাইভার সমরকে কাল কোনও সময়ে পাঠাব, তুলে নিয়ে যাবে।'

—'ঠিক আছে। খুব দুঃখিত স্যার। উনি কখনও এত ছোটাছুটি করেন না। কোনও জরুরি ব্যাপার আছে মনে হয়। একটি ভদ্রলোক কদিন ধরেই আসছেন, তাঁকে নিয়ে কর্পোরেশনে গেলেন।'

ছোকরা একটু বেশি কথা বলে। অন্তত জয়দীপ ফিরে যদি শোনে তার অনুপস্থিতির এই কৈফিয়ত সে বিজু রায়কে দিয়েছে সে নিশ্চয়ই ছোকরাকে একটি বকর-বকর-বোক-চন্দর মনে করবে। কিন্তু তখন তারও আর কিছু করার থাকবে না। কিন্তু একটি ভদ্রলোক...মানে শিবশঙ্কর কদিন ধরেই আসছে? জয়দীপের কাছে? কেন? বাজে মাল দিয়ে তো সে আসলে ফাঁসিয়েছে তাঁকে? তাহলে কর্পোরেশনে যাবে কেন? তিন জনে, মানে তিনি, জয়দীপ আর শিবশঙ্কর মিলে পরামর্শ করে কর্পোরেশনে যেতে পারতেন। তা-ও ঠিক কর্পোরেশন-অফিসে নয়। গোটাকতক কাউন্সিলার, দরকার হলে, মেয়রের বাড়ি। ডিলিং ক্লার্কদের শিবশঙ্কর একাই ম্যানেজ করতে পারত। কিন্তু এরা দুজনে মিলে...তাঁর অজ্ঞাতে...গোপনে...? কীভাবে তাঁকে ফাঁসাবে আর? শিবশঙ্কর নিজেও তো পার পাবে না!

অফিস বন্ধ করতে বলে চাবি নিয়ে বিজু রায় আবার গাড়িতে উঠলেন। আজকে আর ভাল লাগছে না। এবার বাড়ি। সেই বাড়ি যা এই শিবশঙ্করেরই করা। শ্রেষ্ঠ আর্কিটেক্টের প্ল্যান। কিন্তু তাঁকে কংক্রিটে রূপান্তরিত করেছে শিবশঙ্করই। সে সময়ে নিজের বাড়িরও বেশ কিছু সংযোজন ও আগাগোড়া সারাইয়ের কাজ করে নিয়েছিল। ভাল করেই জানেন তিনি। এ জিনিস সব কনট্র্যাক্টারই অল্পবিস্তর করে। শিবশঙ্কর একটু বেশি করেছিল। তো তিনি কিছু বলেননি। তাঁর বাড়িখানা তো বানিয়ে দিয়েছে সলিড! সল্ট লেকে বহু বাড়িই চেয়ে দেখবার মতো। তা তার মধ্যেও বিশেষ বোধহয় বিজু রায়ের বাড়ি। এক সময়ে যে এইভাবে ঘর তৈরি করে দিল, সে-ই এখন ঘর ভাঙতে লেগেছে! বিনা প্ররোচনায়! ভাল রে ভাল! কিন্তু শিবশঙ্করকে তো তিনি খুব সহজে ছাড়বেন না! তার লাইসেন্সটি তো বাতিল হয়ে যাবে! কিন্তু কর্পোরেশনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলে? পারবেন কী? সে যা-ই হোক। খামোখা এই শিবশঙ্কর যাকে তিনি বহুদিন ধরে কাজ দিয়ে আসছেন, আর এই জয়দীপ চ্যাটার্জি যাকে সবে দিতে শুরু করেছেন এরা হঠাৎ তাঁর ক্ষতিসাধন করতে তৎপর হয়ে উঠবে কেন? দূর হোক গে ছাই, হয়তো রজ্জুতে সর্প দর্শন করছেন! হয়তো অন্য কোনও ব্যাপারে শিবশঙ্করের জয়দীপের পরামর্শ দরকার হয়েছে। অন্য কোনও কেস। কিন্তু...শিবশঙ্কর তো একদিনও বলেনি সে জয়দীপকে চেনে, তার কাছে যায়! জয়দীপও তো কই...

নাঃ মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে। এভাবে চললে প্রেশার বাড়া ছাড়া আর কিছু লাভ হবে না। বিজু রায় একটু চেষ্টা করে শিবশঙ্কর-জয়দীপ সংক্রান্ত দুর্ভাবনার সুইচটা অফ করে দিলেন।

গত ষোলোই অক্টোবর মায়ের কাজ নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে। তারপর সাতাশে বিজু রায় আটান্ন পূর্ণ করে ঊনষাটে পা দিলেন। সরকারি চাকরি জীবনে থাকলে অবসর, পেনশন ইত্যাদি হয়ে যেত। বাবার মতো ইউ. ডি. ক্লার্কের একখানা পোস্টে টিকে থাকতে পারলে এখন তিনি বাতিল বুড়ো, নিজের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিতে সরকারি দফতরে জুতোর সুকতলা ক্ষওয়াতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। তাঁর ভাগ্য ভাল বাবা তাঁর ভাগ্য এই পথে চালিত করবার আগেই সময়মতো সরে আসতে পেরেছেন। স্টিল-গ্রে সুটের ভেতরে সময় তাঁর শরীরে কোথায় কতটা থাবা বসিয়েছে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। শরীরের ওপর সময়ের প্রভাব তিনি খুব একটা বুঝতেও পারেন না। ডাক্তার বললে মানতেই

হয়। দুশো চিনি, একশো একশো-সত্তর রক্ত চাপ। এটা খাবেন না, ওটা খাবেন না, ফ্রি হ্যান্ডএক্সারসাইজ একটু। প্রাতর্ভ্রমণ। কিন্তু মন? আটান্ন বছরের জীবন এমন অন্ধিসন্ধি পর্যন্ত কাজ দিয়ে ঠাসা যে তিনি যুবক হবারও যেমন অবসর পাননি, প্রৌঢ় হবার ফুরসতও তেমনি না। এদিক থেকে ভাবলে বলতেই হয় তিনি খানিকটা ক্লিওপ্যাট্রার মতন। সময়ের আয়ত্তের বাইরে কোনও একটা বিন্দুতে তাঁর মনটা কাজ করে যায়। চিরসবুজ? ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা? তা হয়তো নয়। কিন্তু চিরহলুদও নয়।

মায়ের দীর্ঘদিন বেঁচে থাকাও তাঁর সময়কে থোড়াই কেয়ার-করা জীবনচর্যার একটা গোপন কথা। ছোট খোকা! ছোট খোকা! কখনও বিজু! এসব বলে ডাকতে তো কেউ ছিল! বস্তুত মায়ের এই বিজু ডাক থেকেই বিজনেস-সার্কলে তিনি বিজু রায়। উননব্বুই বছর বয়সে মা গেলেন। শেষের পনেরো-ষোলো বচ্ছর একরকম শুয়েই। প্যারালিসিস-টিসিস কিছু নয়। মাঝ সত্তর থেকে হাত পা ভাঙতে আরম্ভ করল, পুরনো বইয়ের পাতা ভাঙবার মতো, কিংবা পুরনো গাড়ির কল-কবজা বিগড়োবার মতো। আজ ব্রেক ঠিক করে আনা হল তো কাল গেল ক্লাচ, আজ কারবুরেটরে গণ্ডগোল তো কাল ফিউয়েল-ট্যাঙ্ক ফুটো। নড়বড়ে হাড়গুলো নিয়ে ফোকলা বুড়ি শুয়ে থাকত আর লোকে জিজ্ঞেস করলেই বলত—'কী বলি দাদা, আমার হাড়-মুড়মুড়ির ব্যায়রাম ধরেছে। দিবি নাকি খোক্কসের তেল এনে?' ষোলো বছর মানে প্রায় দেড় যুগ। এই সময়ের মধ্যে একটা শিশু জন্মে লায়েক হয়ে যায়, এই এতদিন শুয়ে শুয়ে, তা সে যত আরামেই হোক, একটা মানুষ যে কী করে অত হাসি হাসতে পারে, কাউ কাউ করে অত কথা বলতে পারে সে-ও একটা বিস্ময়। বিজু রায়ের বাড়িতে প্রচুর লোকের আনাগোনা। তার শতকরা কজন ছেলের কাছে, আর কতজন মায়ের কাছে বলা শক্ত। ছেলের কাছে লোক এসেছে নেহাত কাজে, স্বার্থের তাগিদে, হাজার চেষ্টা করেও সেটা তাদের পক্ষে লুকোনো সম্ভব হত না। কিন্তু মায়ের কাছে তো লোকে ঠিক কাজে আসত না! কত কত দূর সম্পর্কের কাকা, ভাইপো, ভাইঝি, বোনপো বোনঝি-জামাই, নাতবউ, নাতকুড়, সারা বছর ধরে আসতেই থাকত। আসতেই থাকত। তাদের মধ্যে অনেকে নীচে দাঁড়াতেও সাহত পেত না, কলকেও পেত না, সোজা উঠে যেত তিন তলায়। খয়েরি ক্যামবিসের জুতো, তাপ্পি-মারা ছাতা, খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ি এক বৃদ্ধ যাঁকে মা নতুন ঠাকুরপো বলে ডাকত, যেন সেই সুবাদে বিজু রায়ও নতুন কাকা বলতেন, তাঁকে এই বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে হলে তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউ বোধহয় চিনতেও পারবে না। এ বাড়িতে ওই কিসিমের লোক ঢুকতে পারে তা-ও কেউ ভাবতে পারবে না। কিন্তু এই নতুন কাকা না কে অবলীলায় খপ খপ করে তেতলায় উঠে যেতেন যত দিন মা ছিলেন। কিছুক্ষণ পর চা আর জলখাবারও এসে যেত। এই বৃদ্ধ থাকাকালীন মায়ের ঘরে ঢুকলে বিজু রায়ও মাঝে মাঝে যোগ দিয়েছেন কথাবার্তায়, ঠাট্টা ইয়ার্কিতে হেসেওছেন। মা যাবার পর থেকে বৃদ্ধ উধাও। আর এলেও বোধহয় দারোয়ান ঢুকতে দেবে না। বিজু রায়ই কি কথা বলবেন? এই যে নতুন কাকা, কখন এলেন? বলতে বলতে নীচে নিজের অফিস ঘরে নেমে যেতে থাকবেন না? নিজের ঘরের পর্দা সরিয়ে তনুশ্রী ভুরু কুঁচকে চাইবে, বুঝতে পারবে না এই বৃদ্ধটি কে এবং কেন। ছেলে এবং মেয়ে খুব সম্ভব 'বদার' করবে না। একমাত্র প্রমীলাই আগেকার কথা স্মরণ করে, দিলেও দিতে পারে এক কাপ চা, দুটো বিস্কুট।

কিন্তু মায়ের কাছে যে লোকে কাজে আসত না, এটাও বোধহয় ঠিক কথা নয়। রান্না শিখতে অর্থাৎ লিখে নিতে আসত কেউ কেউ। 'মালাইয়ের পুর দিবি দিদি, পোস্ত আর নারকেল সামান্য, এই এতটুকু।' ঘরে ঢুকতে ঢুকতে একদিন শুনতে পেয়েছিলেন যেন। তিনি ঢুকতেই মায়ের নাত-বউটি 'ওমা! ছোটকাকা' বলে হুট করে উঠে গেল। আবার এও দেখেছেন বিয়ে-থা কি পুজো-আচ্চা, কি শ্রাদ্ধ অশৌচ ইত্যাদি সম্পর্কেও মার কাছে অনেক আত্মীয়-স্বজন উপদেশ নিতে আসছে। ছাউনি-নাড়া ফুল, ছিরি, বরণ ডালায় কী কী থাকবে, হলুদ মাখানো সুতোটা কপাক বেড় দিতে

হবে—অশৌচান্তর নাপিত না পাওয়া গেলে মেয়েরা কী করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকালকার মেয়ে-বউরা এসব খুঁটিনাটি অনেক জানে না। কিন্তু ফেলেও দিতে পারে না বোধহয়। তাই মায়ের কাছে ছুটে আসত। একেকটা বিয়ের মরশুমে এই জাতীয় অতিথি বাড়িতে খুব বেশি হয়ে যেত। অত কথা বলে মা অসুস্থ হয়ে পড়ত। বিজু রায় তখন ঘরে ঢুকে বলতেন—'আমি এবার সব বারণ করে দিচ্ছি। এ কী কাণ্ড! বুড়ো মানুষকে এভাবে জ্বালাতন করার কোনও মানে হয়?' মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি। মা বলত,

—'বারণ করিসনি বিজু। বারণ করবি কী জন্যে?'

—'কী জন্যে? একটা কিছু হলে?'

—'কী হবে?' ক্ষীণ কণ্ঠ, কোটরাগত চোখ বিজুর চোখে। অন্য সময়ে এই চোখই কৌতুকে ঝিকমিক করে। আজ ক্লান্ত তাই স্তিমিত। অস্থি চর্মসার দেহ। মাথায় কিছু সাদা তুলোর কুণ্ডলি। চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছে না মা। বিজু রায় বুঝতে পেরেছেন মা কী বলতে চায়।

কত অল্প খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, মাকে দেখে জানা গেল। মায়ের জন্য গত পনেরো বছর ধরে সকাল আর রাতের আয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রথমটা তিনি ভেবেছিলেন মা আপত্তি করবে, একটা মহা সমস্যা তৈরি হবে। কিন্তু আপত্তি ছেড়ে, কোনও অসন্তোষও মা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেনি। তিনিই বরং একদিন আগ বাড়িয়ে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন—'আতুরে নিয়মো নাস্তি। কী বলো, মা?'

'নিয়ম? কিসের নিয়ম?' মা অবাক হয়ে বলেছিল। তার পরে ছেলের কথার প্রসঙ্গ ধরতে পেরে বলেছিল 'আতুরে সব কিছুই নাস্তি ছোটখোকা। স্বস্তিই সব।' মায়ের অভিমান ছিল কি না বলতে পারবেন না তিনি। থেকে থাকলে সেটা অযৌক্তিক, আবার অযৌক্তিক নয়ও। বিজু রায়ের যা কাজকর্ম তাকে তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে মায়ের সেবা করা অসম্ভব! তনুশ্রী যদি সাধারণ গেরস্থ ঘরের বউ হত, তাকে করতে হত, কিন্তু তা তো সে নয়। কেন করবে? মাকে যতদূর জেনেছেন খুব গোঁড়া, প্রাচীনপন্থী, শুচিবায়ুগ্রস্ত, নিজের সম্পর্কে লাজুক বলেই জেনেছিলেন। কিন্তু মা নির্বিবাদে মাইনে করা আয়া জাত-জন্মের ঠিক নেই, তার কাছ থেকে বেডপ্যান নিল। তার কাছে স্পঞ্জ করল, হরলিকস খেল, পরে ভাতও খেল। এই মেনে নেওয়াটা মার বয়সে সম্ভব হল কী করে তিনি জানেন না। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তো মা মেনে নেয়নি। দাঁতে দাঁত চেপে মা যে নিরুপায় হয়ে মেনে নিল, এমনও বলা যাবে না। মা একটা লড়াই দিতে পারত। দাঁতে দাঁত টিপে রইল, কিছু খেল না, অশক্ত হাত-পা নিয়ে বাথরুমে যেতে গেল, পড়ে গেল। এই রকম। তা সেসব কিছু তো মা করেনি। বরং ওই দুটি আয়া, সুলতা আর শিবানী ওদের সঙ্গেই খুব ভাব-ভালাবাসা হয়েছিল মার।

মা ছেলে-মেয়েকে যতটা দেয়, ছেলে-মেয়ে মাকে ততটা তো কিছুতেই দিতে পারে না। বাবা সাত বছর শুয়েছিলেন। ঠাকুমা ছ বছর। দুজনেই পক্ষাঘাতে। তাঁরা ভাইবোনেরা যখন-তখন। সে সময়টা কী অসুখই না করত! টাইফয়েড? চলল একাদিক্রমে একুশ দিন, চিকেন পক্স, আবার চলল মাসখানেকের কাছাকাছি। ইনফ্লুয়েঞ্জা? থাক শুয়ে অন্তত পক্ষে পনেরো দিন। তারপরে আছে রক্ত-আমাশা, খোস-পাঁচড়া, বেরিবেরি, ন্যাবা...কী নয়? যখন-তখন। সবাইকে মা একা হাতে সেবা করেছে। করে সংসার দেখেছে। কী করে করেছে মা-ই জানে। তখন মনে হত এটাই স্বাভাবিক। ঠাকুমাকে বেড-প্যান দিয়ে, বড় ছেলের গা মুছিয়ে, চান করে মা নতুন টাইফয়েড থেকে ওঠা দুই ছোট ছেলেমেয়ের শিঙি মাছের ঝোল-ভাত পথ্য নিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে অন্যদের দুপুরের খাওয়া, জলখাবার, রাতের আহার, বিছানা করা, টেবিল গুছোনো, আলনা গুছোনো। একটিমাত্র ঠিকে কাজের লোক বাড়িতে। দিদি যখন ছিল সামান্য সাহায্য করত। কিন্তু মা সেটা চাইত না। তোরা পড়। মায়ের ওই এক বাক্য, এক মন্ত্র, এক চাহিদা। তোরা পড়। পড়লেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দারিদ্র্যের সুরাহা হবে। সামাজিক মানমর্যাদার নাগাল পাওয়া যাবে। বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ি 'তোমরা তো ঘরের লোক' বলে অসাগর খাটুনির পর শেষ ব্যাচে মাংসের শুধু ঝোল, মাছের ছাল, আর

ভাঙা ভাঙা লেডিকেনি এসব। সব কিছুর সুরাহা। যাক গে। মা দিয়েছে। সেবা, যত্ন নিজের কিছু রাখেনি। আদর্শ। আদর্শও মা দিয়েছে। জীবনে বড় হবার মূলমন্ত্র। সেটা কাজে লাগাতে পারেননি বিজু রায়, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু মা দিয়েছিল। তিনি ছেলে, ছেলে হিসেবে ফেরত দিয়েছেন সেবা যত্ন। সবই ঠিক। কিন্তু মা নিজের হাতে দিয়েছিল। মা বোকা। তিনি আয়ার হাতে দিচ্ছেন। তিনি কেজো, তিনি চালাক।

মা সারাজীবন এত ব্যস্ত থেকেছে যে মাকে কোনও দিন ভাল করে দেখা হয়নি। কখনও সবুজ পাড়ের শাড়িতে ঘেরা মুখ, কখনও আলুথালু খোঁপার নীচে শাড়ির পাড় হেলায় পড়ে আছে। বেশি বয়সে আবার সেই একই মুখ শুভ্রতার ঘেরে। মা যে কবে কী খেয়েছে, পরেছে, কীভাবে কী করেছে মনে পড়ে না। বড় দাদা-দিদিরা জানত হয়তো। বিজু লাটিম থেকে ঘুড়ি, ঘুড়ি থেকে বিড়ি, বিড়ি থেকে ফেরি, বেওসা...তারপর সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে অনেক ওপরে এসে যখন দেখবার অবসর হল দেখলেন এক বৃদ্ধা ফিমর বোন ভেঙে শুয়ে আছেন। নার্সিংহোমের শয্যায়। একটি খুব সুসজ্জিত যুবতী পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল। 'চলো এবার মাকে ও-টিতে নিয়ে যাবে', যুবতী বলল। চমকে উঠে বিজু রায় দেখলেন তাঁর মা। পড়ে গিয়ে মোক্ষম হাড় ভেঙেছে। ভেতরে লোহার রড ঢোকাতে হবে। নার্সরা তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত, তাঁর স্ত্রী হাত-ব্যাগ দোলাতে দোলাতে বাইরে চলে যাচ্ছে। বলল—'সেজদাকে ফোন করে দিয়েছি। দিব্য ধরেছিল। ও-ই সব্বাইকে খবর দিয়ে দেবে।' সেজদা? দিব্য? মানে তাঁর সেজদা কানন। হ্যাঁ হাঁ তাই-ই তো! সেজদা সরকারি চাকরি করে না? কোন ডিপার্টমেন্টে যেন? ফুড বোধহয়। দিব্য, দিব্যদ্যুতি সেজদার বড় ছেলে তাঁর ভাইপো হল সম্পর্কে। ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে না? সেজদা, এই সেজদার ফ্যামিলিটাই যা একটু...। তাই তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে ওর স্ত্রী-পুত্রদের একটু বেশিই...। আর কে কে যেন আছে? বড়দা, বড়দা ছিল জড়বুদ্ধি। ভাগ্য ভাল মায়ের শরীর থাকতে থাকতে মারা গেছে। মেজদা গগন? গগনবিহারী। একটা মনোহারি দোকান আছে। ব্যবসাই যদি করবি, একটু ফলাও করে করলে কী হয়! মাথায় গোল টাক গগনবিহারীর। ধারে ধারে চুল। ঠিক যেমন বাবার ছিল। মেজদাই ছেলেবেলায় ধরে বেঁধে পড়াত আর মাথায় গাঁট্টা মেরে বলত—'বিজুটা পয়লা নম্বরে ফাঁকিবাজ। ওটার কিস্যু হবে না।' তা এম-কম পাশ করেই বা মেজদার কী হল? দোকানদার। লেখাপড়া করে যে-ই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে-ই। মেলেনি। মেজদার ডিগ্রিটা এমন দামে এখনও পর্যন্ত বিকোল না যে একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়িও কিনতে পারে। সেজদার সরকারি চাকরি, প্রশ্নই নেই। একমাত্র বি-কম বিজনবিহারীরই গাড়ি আছে। চকচকে নতুন। একখানা নয়, তিনখানা। বাড়ি সোনারপুরের দিকে মেজদাও করেছে, শ্বশুরের দেওয়া জমিতে। কিন্তু বিজনবিহারী রায়ের নিজের গায়ে খেটে মাথায় খেটে উপার্জন করা টাকায় কেনা জমি, তৈরি বাড়ি, বাড়ি নয় একটা শিল্পদ্রব্য। মেজদা মেয়ের বিয়েতে খাইয়েছিলও খুব ভাল, কিন্তু মেজদার সঙ্গে ঠিক...। ভীষণ গম্ভীর মুখ, পকেটে বিড়ি আবিষ্কার করে শাসন করছে সেই দিদি। দিদিই বা কী করছে! কেমন প্রার্থী-প্রার্থী চেহারা দেখেছিলেন যেন একবার? থানে-ঘেরা সেই ন্যুব্জতা, তার সঙ্গে ছেলেবেলার দিদি ধারণাটা কিছুতেই খাপ খায় না। কোথায় থাকে দিদি? মায়ের মাজে এসেছিল। সুদ্ধু কাজের দিন। সঙ্গে ছেলে? না নাতি? কেয়ারি করা ঘাড় পর্যন্ত চুল, বড় বড় নখ রেখেছে। হাতে মেহেদির ছাপছোপ। কী অদ্ভুত! তিনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, ওই অদ্ভুত দর্শন ছেলেটির পরিচয় জিজ্ঞেস করেননি। সম্ভবত কেউ করেনি। দিদি শ্রাদ্ধ শেষ হলে ফল-মিষ্টি খেয়ে চলে গেল। বলল—'নিয়মভঙ্গে আর আসব না, আমার নিয়ম তো আর ভঙ্গ হবে না। আসতে বড় কষ্ট হয়!' সমরকে ডেকে বলেছিলেন, শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে দিতে। ওই লাইনেই কোথায় যেন থাকে। আর ছুটকি? যার সঙ্গে পাশাপাশি টাইফয়েডের শয্যা ভাগ? শিঙ্গি-মাছের ঝোল-ভাত ভাগ? সেই ছুটকি নাহ...ছুটকির কথা বিজু রায় কিচ্ছু জানেন না। এমনকি তনুশ্রী, তাঁর স্ত্রী ছুটকির অস্তিত্বের কথাই জানে না। ছুটকি লজ্জা। ছুটকি মুছে গেছে।

এত সব ভাববার সময় সাধারণত বিজনবিহারীর থাকে না। রাত সাড়ে আটটা নটার আগে তিনি বাড়ি ফিরতে পারেন না। রবিবারের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু বেশিরভাগ রবিবারেই প্রচুর লোক দেখা করতে আসে। সন্ধেবেলায় তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। যতদিন মা বেঁচে ছিল রবিবার সকালে নিয়ম করে আধঘণ্টা মায়ের কাছে বসতেন। অন্যান্য দিনও খুব বেশি দেরি না হয়ে গেলে অন্তত পনেরো-কুড়ি মিনিট। আজ মঙ্গলবার, মা না থাকায় ফেরার সেই তাড়ার বোধটাও ছিল না। কিন্তু হাতের কাজগুলো ফুরিয়ে গেল। মনটা খারাপও হয়ে গেল খুব। প্রোমোটারের ব্যবসায়ে তিনি নামতে চাননি, দুলিচাঁদ নামাল। দুলিচাঁদের ব্যবসা রমরম করে চলছে। তিনি প্রথমটাতেই মুখ থুবড়ে পড়লেন। সামলে দেওয়া যাবে ঠিকই। কিন্তু বদনাম তো একটা হল। এর আগে বদনাম তাঁর কখনও হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, বুকের মধ্যে গলার মধ্যে ট্যাংরামাছের কাঁটার মতো খচ-খচ করছে ওই দৃশ্যটা। ছাই-ছাই রঙের স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড। পুরনো গাড়ি কিনেছে জয়দীপ। সামনের দিকে দুটো মুখ খুব কাছাকাছি। শিবশঙ্করের সঙ্গে জয়দীপ আলোচনায় মত্ত। জয়দীপের সঙ্গে শিবশঙ্করের কী? শিবশঙ্কর তাঁর লোক, জয়দীপকেও, তিনি বসাকের পার্টিতে চিনে অবধি সাহায্য করছেন। ওরা কেউ কাউকে চেনে না, অন্তত চেনবার কথা নয়। অথচ দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছে। তাঁকে গোপন করে কর্পোরেশন অফিসে গেল। বিজু রায় যখন ব্যবসায়ে নামেন দুজন ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য পরামর্শ ইত্যাদি পেয়েছিলেন। এই বসাকের বাবা, নৃত্যগোপাল বসাক, সংক্ষেপে এন. জি। আর দুলিচাঁদ। এন.জিকে তিনি এখনও নিজের বাবার মতো শ্রদ্ধা করেন। প্রতি জন্মদিনে ধুতি-চাদর, ফুল, মিষ্টান্ন নিয়ে দেখা করেন। বোঝাই যায় বৃদ্ধ এখন ভিমরতির পর্যায়ে। বাড়িতে কেউ তাঁর খোঁজ রাখে না। বিজু রায় কিন্তু যান। সময় পেলেই যান। প্রায় বদ্ধ কালা বৃদ্ধের সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপ করে আসেন। তাঁর বিষণ্ণ মুখে যতক্ষণ না হাসি ফুটছে ততক্ষণ অব্দি তিনি অপেক্ষা করেন। আর দুলিচাঁদ! দুলিচাঁদের কোন পরামর্শটা তিনি আজ অব্দি ফেলেছেন? দেওরাকে শেয়ারের দালাল ঠিক করেছিলেন দুলিচাঁদের অনুরোধেই। ডুবোল তো? রিয়্যাল এস্‌টেটে নামাল দুলিচাঁদ। তিনি নেমেছেন সুদ্ধু দুলিচাঁদের পরামর্শের মান রাখতেই। এই দুলিচাঁদই না তাঁকে কচি বয়সে ব্যবসার ঘাঁত ঘোঁত শিখিয়েছে? কিন্তু জয়দীপ? আজকালকার পাশ করা ঝা-চকচকে সিভল এঞ্জিনিয়ার! এই অল্প দিনের পরিচয়েই যথেষ্ট ব্যবসা পাঠিয়েছেন তিনি ওকে। হঠাৎ এমন ব্যবহার করল? আর শিবশঙ্কর তো একরকম তাঁর খেয়ে-পরে মানুষ! ওই রক্ষিতের মতো! তবে?

বাড়ি পৌঁছে বিজু রায় দেখলেন বাড়িখানা আপাদমস্তক শূন্য। মস্তকে মা ছিলেন, মা চলে গিয়ে সেখানটায় টাক পড়ে গেছে। ছেলে মেয়ে স্ত্রী এরা সব কোথায় তিনি তো জানেনই না। লোকজনরাও বিশেষ কিছু বলতে পারল না। তাঁর চান হয়ে গেল। শামি কাবাব, হুইস্কি আর স্টার টিভি নিয়ে ঘণ্টা দুয়েক পার হয়ে গেল। সাড়ে নটা। ঘড়িটা কিছুক্ষণ অন্তর-অন্তরই পাখা মেলে নানান ক্যারদানি করে সময় জানান দিচ্ছে। দশটা বাজল, এখনও বুড়ি এল না। সাড়ে দশটা বাজল, এখনও বুড়ি এল না। টিভি অফ্ করে বিজু রায় উঠে পড়লেন।

এই জায়গাটা তাঁর বাড়ির বিখ্যাত সেন্টার পার্লার। এখানে তাঁরা নিজেরা এবং ঘনিষ্ঠজনেরা ছাড়া কেউ আসতে পায় না। তাদের জন্য নীচে আলাদা বসার ঘর আছে। দেয়ালজোড়া নরম কার্পেট। দেয়ালে হালকা বেগনি রং। তার ওপর বনসাইয়ের ছায়া পড়েছে। কোণে একটা ব্রোঞ্জের গাছদান থেকে একটা বিরাট সাদা লিলি সুললিত আঙুল মেলে দিয়েছে। বাটিকের বুদ্ধ যশোধরা রাহুল ঝুলছে আর একটা দেয়াল থেকে। ওদিকে আবার ভ্যান গখের বিদ্‌ঘুটে আত্মপ্রতিকৃতি। যেদিকেই তাকালেন বিজু রায়, দুলিচাঁদ কানোরিয়ার ঘর, রাকেশ গুপ্তর ঘর, অনিল চৌধুরী বা এন.জির ছেলে শরদিন্দু বসাকের ঘর দেখতে পেলেন। ইনটিরিয়র ডেকোরেটর এসে সাজিয়ে দিয়ে গেছে; চরিত্রহীন ঘর। বিজু রায় অবাক হলেন ভেবে আগে কেন কখনও এসব মনে হয়নি, কেন লক্ষ পড়েনি তাঁর সেন্টার পার্লারের এই বেয়াড়া নৈর্ব্যক্তিকতা! বিজু রায় বিরক্তির আওয়াজ করে তাঁর স্ত্রীর শোবার ঘরে গেলেন।

ডবল বেড খাটে টান টান বেডকভার। ফুলোফুলো মতন, যেন তুলো বা স্পঞ্জের তৈরি। ব্যাপারটা কী তিনি হাত বুলিয়ে দেখে নিলেন। একদিকের দেয়াল জুড়ে বিরাট ড্রেসিং টেবল্‌। কিছু কিছু প্রসাধন-দ্রব্য সাজানো রয়েছে। ড্রয়ারগুলোতে চাবি। প্রসাধন দ্রব্যগুলো তুলে তুলে শুঁকে শুঁকে দেখতে লাগলেন বিজু রায়। ডিওডোরান্ট, হেয়ার-স্প্রে। আর কিছু নেই। খুব সম্ভব এইগুলো সবশেষে ব্যবহার করে ড্রয়ারে তুলতে ভুলে গেছে তনুশ্রী। বিজু রায় লক্ষ করলেন ড্রেসিং টেবলে, দেয়ালের নানান জায়গায়, খাটের মাথায় সর্বত্র বিভিন্ন ভঙ্গিতে তনুশ্রীর ফটো। একটা অবশ্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আছে, তারা তখন খুব ছোট, তনুশ্রীও একেবারে কাঁচা। কিন্তু আর সবই তনুশ্রীর একার কিংবা নানান বাইরের লোকের সঙ্গে তোলা। এদের মধ্যে শিল্পপতি, গাইয়ে, বাজিয়ে, পলিটিকসের লোক সবরকমই আছে। যেগুলো তনুশ্রীর একার, সেগুলো বেশ ফিলম্‌স্টার ফিলম্‌স্টার ভঙ্গিতে তোলা। মাথায় তোয়ালে বাঁধা, বুকে তোয়ালে জড়ানো, কামানো বগল দেখিয়ে হাত দুটো ওপরে তোলা—এ ছবি কে তুলেছে কে জানে? আর একটা ওড়না টেনে, নাকে নথ পরে নাচের পোশাকে চারদিকে কুঁচি ছড়িয়ে বসে। এক পা সামনে ছড়ানো। কানের পাশে হাত। তনুশ্রী কি কখনও নাচ-গান জানত? বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিগুলো আজ দেখলেন বিজু রায়। যেন নতুন চোখে। আগেও তো এগুলো এ ভাবেই ছিল। তিনি যে এ ঘরে ঢোকেন না তা-ও নয়। কিন্তু আজই ছবিগুলো যেন প্রথম দেখলেন। ছবিগুলোর মধ্যে দিয়ে তনুশ্রীর সারা জীবনের চাওয়াও বেশ স্পষ্ট করে যেন দেখতে পেলেন তিনি। তনুশ্রী মোটামুটি ভাল দেখতে। প্রাণপণ চেষ্টা করে চেহারা রেখেছে। সে অনেক পেয়েওছে, সম্ভবত যা যা চেয়েছে সব। পোশাক পরিচ্ছদ, বিউটি সেলুন, কসমেটিক সার্জারি, মাসাজ-ক্লিনিক, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পদ, বড় বড় লোকের সঙ্গে ঘোরাফেরা। কিন্তু বিজু রায় পরিষ্কার আয়নার মধ্যে দিয়ে প্রতিবিম্ব দেখার মতো করে দেখতে পেলেন তনুশ্রী আসলে বেশ্যা হতে চায়। টান টান ত্বক সমেত সরু লম্বা পা, ভাঁজহীন পেট, নধর গোল হাত, মসৃণ কাঁধ, এই সমস্ত তনুশ্রী সবাইকে দেখাতে চায় ভীষণভাবে। নির্দোষ এই চাওয়া হয়ত। কিন্তু সন্দেহ নেই তনুশ্রী চাইছে, চতুর্দিকে প্রেমিকদের, স্তাবকদের কোলাহল, কেউ পায়ে হাত বুলোচ্ছে, কেউ বুকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, কেউ চোখে চোখে ইশারা করছে—এইসব তনুশ্রী অন্তরের অন্তস্থল থেকে বহু বাসনায় প্রাণপণে চাইছে চাইছে চাইছে।

চাইছে শুধু? না পাচ্ছেও? পাচ্ছে নিশ্চয়ই। টাকা। অনেক অনেক নিজের অনর্জিত টাকা। তিনি তনুশ্রীকে আলাদা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে দিয়েছেন অনেক দিন। তাঁর নিজের সঙ্গে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টও আছে বেশ কয়েকটা। কিন্তু কথাটা হল তনুশ্রী পেয়ে যাচ্ছে। স্রেফ বিজু রায়ের স্ত্রী হওয়ার সুবাদে। টাকা, পদ, সামাজিক মর্যাদা, খোসামোদ এই সব পেয়ে যাচ্ছে এক্স অফিসিও। বিজু রায়ের ধর্মপত্নীর গুরুত্বপূর্ণ পদে আছে বলে। এই পরিমাণ টাকা এবং মর্যাদা একটা গুণহীন মেয়েমানুষ যদি ফোকটে পেয়ে যায়, এবং তাকে যদি সমস্ত সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয় তা হলে সে কী করবে? হয় বোর হবে নয় অকাজের কাজ করে বেড়াবে। একেকজন একেক ভাবে। নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী। এই সংসারে কোথায় কী লাগে, কতটা চাল ডাল, কী পরিমাণ চা-দুধ-কফি-চিনি, কে কী খায়, কখন খায়, এসব তিনি যেমন জানেন না, তনুশ্রীও তেমনই জানে না বলে তাঁর ধারণা। কারণ একেকদিন দুজনে কি তিনজনে, কদাচিৎ চারজনে খেতে বসলে তনুশ্রীকে যেন জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন '*প্রমীলা! আজ কী মেনু?*' তাঁদের অল্পবয়সে ভাইবোনেরা খেতে বসলেও এ প্রশ্ন কেউ-না-কেউ করত। তিনি করতেন। ছুটকি করত। বাবাও করতেন। 'আজ কী রান্না হয়েছে?'

—'কী আবার হবে? থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়!' মায়ের জবাব।

—'বলোই না বাবা, অত বিনয় করছ কেন?' ছুটকি হয়তো বলল।

—'শুকতো', মেজদা মুখ বিকৃত করল, 'শাকে ডালে', বাবা উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'মুলো দিয়েছ তো?' 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ।' 'ডাঁটাচচ্চড়ি।' বিজু বলল—'আগে বাড়ো, এখনও আমার পছন্দমতো

কিছু শুনছি না।' মা মুখ টিপে হেসে বলছে, 'আলু পোস্ত' 'হুররে'। সশব্দে বলছে বিজু, অন্যরা নিঃশব্দে। 'আজকে মাছ নয়, ডিম।' মা বলছে। 'তবে তো আরও ভাল, হাঁস না মুরগি?' বিজুর প্রশ্ন। 'মারব এক থাবড়া, বামুনবাড়িতে মুরগি!' 'মুরগির ডিম কিন্তু সহজপাচ্য মা' ছুটকি বলল, 'তা ছাড়া একটা পাখির ডিম খেতে যদি আপত্তি না থাকে তো আরেকটাতে কেন আপত্তি হবে! বলো বাবা!'

বাবা রাশভারী লোক। ছুটকি ছাড়া আর কেউ বাবাকে এভাবে আলোচনায় টানতে সাহস পায় না। বাবা বললেন 'হাঁসের ডিম বড়ও বেশি, খেতেও অনেক ভাল।'

—'তুমি মুরগির ডিম খেয়ে দেখেছ বাবা!' সঙ্গে সঙ্গে ছুটকি তৈরি। 'না, মানে, লোকে বলে।'

এই ঘরোয়া দৃশ্য এবং কথাবার্তা স্মৃতির কোন কোনায় এত যত্নে এমন নিখুঁত নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত ছিল ভেবে অবাক হতে হতে বিজু রায় নিজের ঘরটাতে ঢুকলেন। একটা গুমসোনি গন্ধ নাকে এল প্রথমেই। জানলা খুলে দিলেন। গেল না। খুব মৃদু একটু তামাক, একটু হুইস্কির কড়া গন্ধ—তা-ও মিশে আছে ঘরের বাতাসে। কিন্তু মূল গন্ধটা খুব বিশ্রী, অচেনা। সকালে তিনি ঘর ছেড়ে বেরোবার পর এরা কি পরিষ্কার-টরিস্কার করেনি? বেডকভার সরিয়ে চাদর দেখলেন তিনি। বেশ পরিষ্কার চাদর। চাদর সরিয়ে গদি দেখলেন, পরিষ্কার গদি। দেয়ালের কোণে আয়না-সুদ্ধ ছোট্ট তিন কোনা আলমারি ফিট করা। এখানে তিনি দাড়ি কামান। দাড়ি কামানোর যাবতীয় সরঞ্জাম এখানেই থাকে। ছেলেবেলায় মায়ের খুড়তুতো পিসেমশাইয়ের বাড়ি তিনি এইরকম দেখেছিলেন। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল পরে যখন তাঁর নিজের বাড়ি হচ্ছে, সবই পেশাদারি হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন খালি এইটা বলে দেন। 'আমার ঘরের উত্তর-পুব কোণের দেয়ালে একটা তিন সাড়ে তিন ফুট লম্বা আলমারি ফিট করে দিয়ো। চওড়া যতটা পারমিট করে। ভেতরে তাক থাকবে। তেকোনা ন্যাচার্যালি। আমি ভালভাবে মুখ দেখতে পারব, এমন হাইটে কোরো।' দাড়ি কামান, চুল আঁচড়ান, টাই বাঁধেন সব এই আয়নার সামনে। আরাম চেয়ার রয়েছে একটা। বই, রেডিও, কাগজপত্র রাখবার ড্রয়ার, ওয়ার্ডরোব সব একত্র করে একটা মালটিপারপাস ফার্নিচার করে দিয়েছে এরা। ফুলদানে টাটকা ফুল, টাটকাই তো! আশ্চর্য! তবু চিমসোনি গন্ধে গা গুলিয়ে উঠছে।

বিজু রায় আলো নিবিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। চারদিকে গাছপালা। বাগান। অপূর্ব নকশার সব বাড়ি। আকাশ মালিন্যহীন। এক টুকরো চাঁদ ফিক ফিক করে হাসছে। পাটের ফেঁসোর মতো দু চারটে মেঘ অনেক দূরে দূরে স্থির হয়ে আছে। বারান্দায় বেশ মশা। দু চারটে চটাচট গায়ের ওপরেই মেরে ফেললেন তিনি। তারপর কি ভেবে পার্লারে বেরিয়ে, গোল জায়গাটা পেরিয়ে ওদিকে ছেলের ঘরে ঢুকলেন। ঢুকতেই একটা জীবন্তপ্রতিম পোস্টার তাঁকে অভ্যর্থনা করল। খুব সুন্দর একটি মেমসাহেবের আবক্ষ ছবি। গোলাপি বুক ঠেলে উঠেছে। তলপেটে যেন একটা ধাক্কা খেলেন বিজু রায়। হাসছে মেমসাহেবটি। তলায় কি সব লেখা। কাছে গিয়ে আবছা আবছা পড়তে পারলেন—'ওহ্ মাই ম্যাডোনা। আই লাভ ইউ।' ম্যাডোনা? ম্যাডোনার ছবি এই রকম? বিজু রায় অবাক হয়ে গেলেন। সে তো গোল ধরনের মুখ। কোমল লাবণ্যে ভরা। মৃদু হাসি। চুলগুলো সিঁথি কেটে আঁচড়ানো। এ লেখাটা কি চিন্টুর? চোখে পড়ার চশমা নেই বলে ভালভাবে অক্ষরের ছাঁদ দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। চিন্টু কাকে ম্যাডোনা বলে ডাকছে রে বাবা! দেয়াল-ভর্তি আরও পোস্টার। কোথাও এক যুবক হাতের মাস্‌ল ফুলিয়ে কপ্‌নি জাতীয় কিছু একটা পরে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও যুবক-যুবতী নিবিড় আলিঙ্গনে। চুম্বনে মত্ত। এই ছবিগুলো দেখতে দেখতে ঘুমন্ত বিজু রায় নির্ভুলভাবে জেগে যাচ্ছিলেন। ভাবছিলেন—'বারে বিজু ষাটের কাছেও তুই তো বেশ'...তার পরেই লজ্জা পাচ্ছিলেন। এ সমস্ত উন্মাদনার উপকরণ তাঁর ছেলের। তিনি বাবা না? মুখ ফিরিয়ে টেবিলের ওপর তাকালেন। স্তূপীকৃত বই, পত্রিকা। উল্টে প্যাল্টে দেখলেন স্পোর্টস ফিল্‌ম। বইগুলো একটু আধটু পড়বার চেষ্টা করলেন। কিছু বুঝতে পারলেন না। কী অদ্ভুত ইংরিজি! কত বয়স হল

নীলাদ্রির? একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছেন। ছেলেটির বোধহয় একুশ-বাইশ। কী পড়ছে, শুনছে? কমার্স পড়ছিল না? নাকি অন্য কিছু? এর সম্পর্কে অর্থাৎ কেরিয়ার সম্পর্কে এবার ভাবতে হয়। কমার্স পড়ে তাঁর ফার্মে যোগ দেবে এটাই স্বাভাবিক ইচ্ছে। ফার্মে দু-এক বছর বসে গেলেই বিয়ের জন্যে পাত্রী দেখতে হচ্ছে। তনুশ্রীর ঘরে যেমন তার আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা পুরো ছবি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, এখানে যেন তেমনটা পেলেন না। কিংবা হয়ত পেলেন খানিকটা, নিজের অজান্তেই সেটাকে মেনে নিলেন না। এ সব ছবি প্রকাশ্যে এ ভাবে টাঙানো হয়েছে, এ তাঁদের সময়ে কল্পনা করা যেত না। তবু এই জাতীয় কিছু বই খাতার ফাঁক ফোকর থেকে আবিষ্কৃত হলে সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকরা বিয়ের কথা ভাবতেন। মধ্যবিত্ত ঘরে চাকরি-বাকরি বা অন্য কোনও রোজগার না করলে তখন বিয়ের সম্ভাবনা থাকত না। তবু, মেজদার বইয়ের ভেতর থেকে মধুবালার ছবি বেরোতে বাবা ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। নানা জায়গায় যুগপৎ মেজদার চাকরি এবং বিয়ের জন্যে হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিয়েছিলেন। নীলাদ্রির বিছানার ওপরও একগাদা অডিও এবং ভিডিও ক্যাসেট ছড়ানো। ভি সি আরটা মেঝেতে কার্পেটের ওপর নামিয়ে রাখা। কেউ কি ওর ঘরখানা একটু গুছিয়েও দেয় না! নিজে তো গুছোতে জানেই না। মা, বোন, এতগুলো কাজের লোক। কেউ রায় সাহেবের একমাত্র ছেলের ঘরখানা গুছিয়ে দেবে না! আচ্ছা এই কাজের লোকেরা, এরা তো কখনও কখনও এ ঘরে ঢোকেই। এই সব ছবি-ছাবা দেখে কী মনে করে? দূর হোক গে! লোকের ভাবনা তো তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না! পাছে জয়দীপ তাঁর প্যাকেটটাকে ঘুষ মনে করে তাই তিনি পুরো পথটা আবার গিয়েছিলেন। তার অফিস পর্যন্ত। অফিসের লোকগুলোকে ভাল করে জানিয়ে এসেছেন ওটা তাঁর নিজের জিনিস। জয়দীপের কাছে নিজের মান রাখতে তিনি এতটা করেছেন। কিন্তু ছেলের ব্যাপারে, ছেলের মানরক্ষার জন্য আপাতত তিনি কীই বা করতে পারেন? তাঁর হাত পা বাঁধা। নিচু হয়ে কতকগুলো ভিডিও ক্যাসেট তিনি তুলে নিলেন হাতে। পরক্ষণেই জ্বলন্ত কাঠের টুকরোর মতো সেগুলো ফেলে দিলেন। আর একটুও দাঁড়ালেন না। ঝঞ্ঝাবাত্যার মতো বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। যেন তিনি ভেজিয়ে দিলেই এ সব অদৃশ্য থাকবে। তারপর আর একটু দূরত্বে মেয়ের ঘরে ঢুকলেন।

কিছু দেখলেন পা প্রথমটায়। টেবিলের সামনে চেয়ার রয়েছে। ভেতরে ঢুকোনো। কিন্তু তিনি গিয়ে বিছানায় বসলেন। বেশ কিছুক্ষণ বসেই রইলেন। বসেই রইলেন। তারপর চোখ মেলে দেখলেন সামনের দেয়ালে একটা ক্রুসবিদ্ধ যিশুর ছবি। বেশ সুন্দর সৌম্য করুণকান্তি যিশু নয়। কেমন হাড় জিরজিরে বুড়ো মতো। চোখকে ধাক্কা দেয়, অপ্রসন্ন করে। টিভি-র ওপরে একটি অচেনা ছেলের ফটো একটু একটু হাসছে। দাঁত বার করে নয়। মুখখানা কোনওক্রমে একটু স্মিত এইটুকু বলা যায়। সাদা-মাটা চেহারা। গেরস্থ ঘরের ছেলে। চিন্টু বা তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বা যে-সমস্ত ছেলেপুলে নিত্যদিন আশে-পাশে চোখে পড়ে তাদের মতো নয়। গালে একটা হাত। বইয়ের র‍্যাকে বেশ কিছু ইংরিজি, বাংলা বই রয়েছে। সবই পাঠ্য বই মনে হল। ড্রয়ারগুলো আপাদমস্তক বন্ধ। ওয়ার্ডরোব চাবি লাগানো। ওকে বুঝতে পারলেন না বিজু রায়। চিন্টুর ঘরে ঢুকে মনে হয়েছিল ওর মনটা অস্পষ্ট, নিজেই জানে না কী করবে, কী চায়। কোনও অ্যামবিশন নেই, ইচ্ছাশক্তি, সংকল্প এসব কিছু নেই ও ঘরে। এটা প্রথম মনে হওয়া। তার পরে মনে হল সর্বনাশ, এ তো একটা বিকৃতরুচি, বিকৃতবুদ্ধি পার্ভার্ট। কিন্তু তিতি যেন খুব কঠিন মুখ করে অনেক কিছু লুকিয়ে রেখেছে। তিতির মুখখানা এই মুহূর্তে চেষ্টা করেও মনে করতে পারলেন না বিজু রায়। তিতি কি উনিশে পড়ল? টিভির ওপর গালে হাত দিয়ে ছেলেটি কে? বয়স তার বেশি নয়। খুব মধ্যবিত্ত চেহারা। একে কোনওদিন নিজের বাড়িতে দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না তিনি। অথচ কেমন চেনা-চেনা লাগল।

পার্লারে এসে চোখে পড়ল একটা মোটাসোটা ঘুঘুর মতো দেখতে মহিলা ঘুরঘুর করছে। পরিচ্ছন্ন পোশাক-আশাক। তিনি কৌচে বসতেই সাঁত করে সরে গেলে। ঘুঘু নয়। কেমন কেঁদো ভিজে বেড়ালের

মতো। যথেষ্ট ওজন সত্ত্বেও অমনি ক্ষিপ্রতা চলাফেরায়। একটু ধূর্তামি। সব বুঝে জেনেও না বোঝা না জানার ভান। তিনি চিনতে পারলেন এটি তাঁদের রাঁধুনি। তিনি আজকে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ ধরে এখানে ঘোরাঘুরি করছেন তাই ও বোধহয় টিভি দেখতে পাচ্ছে না। গলা খাঁকারি দিয়ে উঠে পড়লেন বিজু রায়। মহিলা বলল, 'সাহেব খাবার দেব?' গলাটা সম্ভ্রমে ভয়ে যেন কাঁপছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিজু রায় দেখলেন সত্যিই তো! এগারোটা বেজে গেছে। আর কখন খাবেন?

তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়েই বললেন, 'তোমার মেমসাহেব,...ছেলেমেয়েরা এরা সব কোথায় গেল? কেউ কিছু বলতে পারল না।'

—'ওরা জানে না সাহেব। তিতিদিদি বন্ধুদের সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গেছে, দু দিন হল। মেমসাহেব কিছু বলেন নি। তবে মনে হয় কোনও নাচ-গানের জলসায় গেলেন। দাদার কথা আমি জানি না।' থেমে থেমে বলল মহিলা।

—'হুঁ।' বিজু রায় কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। মহিলাটি সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি বললেন—'খাবার দাও।'

খাবার ঘরে যেতে যেতে হঠাৎ গন্ধটা চিনতে পারলেন বিজু রায়। তাঁর ঘরের চিমসোনি গন্ধটা মর্গের। একবার তাঁকে একটা কেস শনাক্ত করবার জন্য যেতে হয়েছিল। গন্ধটা বাসি মড়ার। প্রভূত বাসি মড়ার।

মুখটা বিকৃত করে তিনি বসে রইলেন চেয়ারে। রাঁধুনি মহিলাটি যত্ন করে তাঁর রাতের খাবার এনে টেবিলে সাজিয়ে দিল। চিকেন সুপ, গরম, ধোঁয়া উঠছে, সুজির রুটি, তিনটে, ফুটবলের মতো ফুলে রয়েছে একখানা এখনও। দু টুকরো মাছ সসে ভেজানো। এবং অনেকটা কাঁচা স্যালাড। খাবারের সামনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন বিজু রায়। তারপর হঠাৎ খাবারগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলেন। বেশ তাক তাক করে। সুপের বাটিটা সাইডবোর্ডের কানায় লেগে ভেঙে গেল। তরল পদার্থটা সাইডবোর্ডের গা বেয়ে মেঝেয় গড়াচ্ছে। মাছগুলো জানলার কাচে তাক করলেন। থুপ থুপ শব্দ করে সেগুলো কাচে লেগে জানলার তলায় পড়ে রইল। সালাডের শশা, টোম্যাটো, গাজর ইত্যাদির চাকা দেয়ালের গায়ে নতুন ডেকোরেশনের মতো লেগে আছে। সবচেয়ে বেশি দূরে গেল রুটিগুলো। একটা একটা করে সেগুলোকে জানলার বাইরে পাঠাতে চেষ্টা করলেন বিজু রায়। লতা পাতার গ্রিল। আশপাশ দিয়ে টুকটুক করে বেরিয়ে গেল সেগুলো। বেশ নিশ্চিন্ত হলেন এবার বিজু রায়। শব্দ শুনে রাঁধুনি ছুটে এসেছিল। হতভম্ব মহিলাকে বিজু রায় বললেন, 'আমার ঘর পরিষ্কার হয়নি কেন? যাচ্ছেতাই গন্ধ বেরোচ্ছে।'

তিনি বেশ ধীর দৃঢ় পায়ে তেতলায় উঠে যেতে থাকলেন। সিঁড়ির বাঁকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতেই রাঁধুনী মহিলা যার নাম প্রমীলা, সে তার সাহায্যকারী ও বন্ধু বদনকে ডাকতে গেল। বদন এগুলো পরিষ্কার করে দেবে, সাহেবের ঘরটাও দেখবে কী হল, ব্যাপারটা সম্পর্কে তারা আলোচনাতেও বসতে পারবে।

তিনতলাটায় অর্ধেক ছাদ। তাতে একরঙা টালি বসানো। গাছ প্রচুর। ফুলগাছই বেশি। মা ওসব পাতাবাহার টাহার পছন্দ করত না। একটা বেশ ঝাড়ালো তুলসীগাছ। একদিকে ঠাকুরঘর, আরেক দিকে মায়ের ঘর, টয়লেটসহ। মাঝখানের পথটা দিয়ে প্রথমেই ছাদে এসে বুক ভরে নিশ্বাস নিলেন বিজনবিহারী। গভীর করে প্রশ্বাস নিলেন, শ্বাস ছাড়লেন বার কয়েক। প্যাসেজের মাঝখানে একটা গোল আলো জ্বলে। সেই আলো খানিকটা গিয়ে পড়েছে ছাদে। আকাশের আলোও আছে। মঞ্জরিত তুলসী দেখা গেল। নীচে তাঁর যে বাগান, তাতে সবুজ লন আছে, মরশুমি ফুলের বেড আছে। কিন্তু ছাদের বাগানে মা শুধুই গন্ধকুসুম রাখত। গন্ধহীনদের মধ্যে একমাত্র জবা আর নয়নতারা। আধা-অন্ধকারে ফুটে আছে দেখতে পাওয়া গেল। এবং সাদা নয়নতারা। কোনও ফুলের গন্ধ পাওয়া গেল না। রজনীগন্ধা বা গোলাপ এদের তো ফোটার কথা! তিনি ফিরে মায়ের ঘরের দরজাটা খুলে

ফেললেন। এ বাড়িতে কোনও ঘরেই কখনও তালা চাবি ইত্যাদি দেওয়া থাকে না। ড্রয়ার, ক্যাবিনেট, আলমারি ইত্যাদি বন্ধ থাকে, কিন্তু ঘর খোলা।

মায়ের ঘরে মায়ের পুরনো আমলের সেগুন কাঠের পালঙ্ক। আলমারি। লোহার সিন্দুক চৌকির ওপর বসানো কিছু তোরঙ্গ। বাবার আরাম-চেয়ারটা। তা ছাড়াও গোটা দুই চেয়ার। একটা নতুন ডিজাইনের আলনা। এটাই একমাত্র এ যুগের জিনিস ঘরটাতে। পালিশ-টালিশ অন্যান্য আসবাবের সঙ্গে মানানসই। কিন্তু জিনিসটা ঘরের মধ্যে মূর্তিমান ছন্দপতনের মতো দাঁড়িয়ে আছে বলে বিজনবিহারী সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন। তাঁর চোখ এখন সুরুচি-সুছন্দে নতুন যুগের সুষমা-সৌন্দর্যের ধারণায় বড্ড বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। খুব সম্ভব সন্ধেবেলায় ধূপ জ্বেলে দেওয়া হয়ছিল, ধূপদানির তলায় কুণ্ডলিকৃত ছাই পড়ে আছে। গন্ধটাও আটকে আছে ঘরে। মৃদু কস্তুরী গন্ধ। কিন্তু গন্ধটা সইতে পারলেন না তিনি। তাড়াতাড়ি জানলা খুলে দিলেন। এক ঝলক হাওয়া ঢুকল। পরিষ্কার হলেও, ঘরটাতে অব্যবহারের দরুন কেমন একটা শূন্যতার ছাপ পড়ে গেছে।

আরাম-চেয়ারটাতে বসলেন বিজনবিহারী। সোজা হয়ে এটাতে বেশিক্ষণ বসা যায় না। চেয়ারের বাঁকানো পিঠটা কেমন টানতে থাকে। অভ্যাসবশত পকেটে হাত চলে গেল, সিগারেট ও লাইটারের খোঁজে। কিন্তু ঠিক সিগারেটটা ধরানোর মুহূর্তে ছাদের দিকের জানলা দিয়ে একঝলক ফুলের গন্ধ ঢুকল। গন্ধটা চিনতে পারলেন না বলেই বিজনবিহারীর গায়ে যেন কাঁটা দিল, যেন মা ঢুকল। সাদা থান, গলায় সোনায় গাঁথা রুদ্রাক্ষের মালা। শুকনো বৃদ্ধা এক। মায়ের সামনে এতটা বয়সেও সিগারেট খেতেন না বিজন। একদিন অনেকক্ষণ মার কাছে বসবার পর ছটফট করেছিলেন সিগারেট না খেয়ে। মা বলল—'যা না, একটু বাইরে যা না। ছাদে ঘুরে আয় একটু।'

বিজন হেসে বলেছিলেন—'ছাদে খাবার দরকার কী মা! বয়সটা তো কম হল না। তোমার সামনে খেলে কী হয়! এমন নয় যে গন্ধটা তোমার কোনও দিন অভ্যেস ছিল না। বাবা ছিলেন চেইন-স্মোকার, সিগারেটের পয়সা কুলোতে না পারলে বিড়ি খেতেন।' সে কথা মনে করেই কথাটা বলেছিলেন মাকে।

মা গম্ভীর হয়ে বলল—'গন্ধটা আমার কোনও দিনই ভাল লাগেনি। সে উনিই খান, কি আর কোনও গুরুঠাকুরই খান। কিন্তু সে কথা নয়, মায়ের সামনে ছেলের ধূমপান আবার কী।'

—'এতো সংস্কার ত্যাগ করতে পারলে মা, এটা পারছ না?'

—'এটা তো সংস্কার নয় বিজু, এটা সভ্যতা, সম্ভ্রম। মা ছেলে যত ঘনিষ্ঠই হোক, সম্পর্কটার মধ্যে শ্রদ্ধা আছে তো!'

—'কিন্তু মা, আমার ছেলেকে আমাকে অনুমতি দিয়ে দিয়েছি। নেশা করতে হয় সামনাসামনি করুক।

—'ভাল করিস নি। বয়সধর্মে যা করে করুক, একটু নলচে-আড়াল থাকা ভাল।'

মায়ের এই সব কথা স্মরণ করে লাইটারটা নিবিয়ে দিলেন তিনি। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকবার পর হঠাৎ কী মনে হল তিনি উঠে পড়ে আলোটা জ্বেলে দিলেন। লুকোনো জায়গা থেকে সিন্দুকের চাবি বার করলেন। দুটো চাবি দুটো দিকে ঘুরিয়ে খুলে ফেললেন সিন্দুকটা। দুটো তাক। ভর্তি কাগজপত্র। ওপর তাকে একটা মোটা বাঁধানো খাতা। চট করে পাতা উল্টে বাবার হস্তাক্ষর দেখতে পেলেন। কিছু হিসেব-পত্র যেন। সংসার খরচের হিসেব মনে হয়। খুদে খুদে কালো পিঁপড়ের সারির মতো লেখা। তিনি এক পঞ্চাশ, চার এক পঞ্চাশ, এভাবে পর পর সাত আট দিন। হলুদ দু পয়সা, কালো জিরে দুই আনা, ধোপা বারো আনা, কাগজ চার আনা। এইভাবে চলেছে। আশ্চর্য! মা এ খাতাখানাকে সিন্দুকের মধ্যে হীরে-জহরতের মতো করে রেখে দিয়েছে? কেন? পঞ্চাশ সালের বাজার-দরের একটা দলিল হতে পারে অবশ্য খাতাটা। বাবা যেন প্রাণপণে উত্তর-কালের কোনও অর্থনৈতিক মীমাংসার জন্যে এক সামান্য নিম্নবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন ব্যয়ের পরিমাণ খুঁটে খুঁটে লিখে গেছে।

বাবার কি এরকম অভ্যেস আদৌ ছিল? মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। অমনি যেন কত শতাব্দীর ওপার থেকে ঠাকুমার খনখনে গলার স্বরটা ভেসে এল। খনখনে কিন্তু বড় প্রিয় স্বর। শিশুকালে ওই স্বর এবং তার সঙ্গে মেশানো ছাঁচিপানের গন্ধ ভীষণ মিষ্টি লাগত। ঠাকুমা এইভাবে খনখন করে উঠলেই বাবা একটা খাতার ওপর বা কাগজপত্রের ওপর উপুড় হয়ে পড়তেন। এটা মনে পড়ে গেল। সে কি এই খাতা?

ঠাকুমা বলছে—হ্যাঁ রে বঙ্কু, বাপ-পিতেমোর ভিটে নয়, কিছু নয়, আর একখানা বাড়ি দেখতে কী হয়?'

—'কেন মা খারাপ কী, গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছ তো বিনা পয়সায়।'

—'চিতের হাওয়াও খাচ্ছি! ছিতের হাওয়া খেয়ে খেয়ে বাড়িটার পরকাল যে ঝরঝর হয়ে গেল!'

—'চিতের হাওয়াতেই তো সংসারটার পত্তন হল মা। সমুদ্দুরে বাস যার, শিশিরে কী ভয় তার?'

গঙ্গার ধার ঘেঁসে বাড়ি। মাঝখানে গাড়ি চলাচলের রাস্তা। পার হলেই ওদিক দিয়ে ঘাট নেমে গেছে। শ্মশান খুব কাছে। সেখান থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি মাঝেমধ্যেই পাকিয়ে পাকিয়ে দোতলা ছাদের হাওয়া ছুঁয়ে যায়। এই ধোঁয়া নিয়েই ঠাকুমার আক্ষেপ। পক্ষাঘাত হয়ে যখন প্রায় সুস্থ মানুষটা শুয়ে পড়লেন তখনও তিনি এই চিতের ধোঁয়ারই মুণ্ডপাত করেছিলেন।

মায়ের কাছে বিজুরা শুনেছিল। নিতান্ত গুড়গুড়ে বয়সে ঠাকুর্দাদা মারা যাবার পর বাবাদের ক'ভাই-বোনের হাত ধরে ঠাকুমা নিজেই গাঁয়ের দোতলা বাড়ি জমি-জমা-পুকুর সব বিক্রি করে দিয়ে এই বাঁধা ঘাটের কাছে বাসা নিয়েছিল, ভাইদের কাছাকাছি থাকবে বলে। সেইখানে, বাবারা তিন নাবালক ভাই বড় হল, বড় জন একদিন কোথায় পালিয়ে গেল। লোকে বললে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। মেজ ভাই মামাদের দৌলতে ক্রমে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট হল, বড় ঘরে বিয়ে করল, অন্যত্র বসবাস—আপনি আর কপনি। পিসির বিয়ে হল অনেক দূরে, পঞ্জাবে না কোথায়, খালি ছোট ভাগনেটির বেলাতেই মামাদের দাক্ষিণ্যে কম পড়ে গেল। বড় মামা মারা গেলেন। তিনিই ছিলেন মাথা, অন্যরা নিজেদের নিজেদের সামলাতেই ব্যস্ত। অনেক কষ্টে হুগলি-ডকের চাকরিটা জুটেছিল তাই। ত্রিশ টাকায় ভাড়ায় ওইরকম দোতলা বাড়ি আর কেউ দেবে? বাড়ি নিয়ে এই জাতীয় তকরার বাবা আর ঠাকুমার মধ্যে মাঝে মাঝেই হত।

খুব ছোটবেলা। দাদা-দিদিরা সব বেরিয়ে গেছে, বিজু প্রস্তুত হচ্ছে। বাবা ভেতর-রকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটাতে ধুতি গুটিয়ে মোড়ায় বসেছেন।

—'বলি শুনছ! ছেলে মেয়েগুলো কোথায় গেল সব?'

—'কোথায় আর যাবে? গঙ্গায় ঝাঁপাই জুড়তে গেছে।'

—'বারণ করলে না?'

—'খেলাধুলো করছে, খারাপ কিছু তো নয়! বারণ করতে যাব কেন?'

—একটা বিপদ হলে?

—'ও সব কথা মনেও স্থান দিয়ো না। গরিবের ছেলে ওইটুকু যে খেলেধুলে আনন্দ করবার সুযোগ পেয়েছে...' মা বারবার কার উদ্দেশে যেন নমো করছে।

—'আর সময়ই বা কোথায় আমার তোমার ছেলেমেয়েদের পেছনে খবরদারি করবার? ওদিকে মা পড়ে পড়ে কোঁকাচ্ছেন, তাঁর এটা ওটা সারাক্ষণ আছে, এরই মধ্যে তুমি রাজ্যির কচুর শাক, থোড়, মোচা সব একই দিনে এনে ফেললে, উনুন খাঁ খাঁ করছে।' মা দ্রুত পা ফেলে রান্নাঘরে চলে যাচ্ছে। মাথায় ঘোমটা।

বিজনবিহারী চোখ দুটো ভাল করে মুছে নিলেন। এত ভাল করে এ সব দৃশ্য, এ সব শব্দাশব্দ, চেহারা তাঁর মনে আছে? আশ্চর্য! সে তো অন্য এক জীবন! অন্য এক জগৎ! অকল্পনীয় সস্তা ভাড়ায় পুরো দোতলা একখানা বাড়ি। দোতলার ঘরগুলোর জানলা খুললেই গঙ্গার হাওয়া ঝাঁপিয়ে

পড়ে। কোলে দালান। দূর প্রান্তে কলঘর। নীচেও অমনি সব ঘর। ঠাকুমা নীচে থাকতেন। মা-বাবাকেও তাই নীচেই থাকতে হত। দোতলাটা পাঁচ ভাইবোনের রাজত্ব।

কয়েকটি পাতা উল্টিয়ে গেলেন বিজনবিহারী।

'আজ বিজু নিরুদ্দেশ হইল। —চলিয়া গিয়াছে এক বছর হইতে চলিল। তাহার পর হইতেই ছোট খোকা সম্পর্কে অস্বস্তিতে ছিলাম। অন্যমনস্ক। উদাসীন। সংসারের কারও প্রতি, কোনও কর্তব্যের প্রতি যেন টান নাই। আঁট নাই। — গেল, গেল। আমার সংসারটিকে আগাগোড়া দুরমুশ করিয়া গেল। পত্নী যেন নীরবে আমাকেই দোষারোপ করেন। বড় মেয়ে কলঙ্কের ভয়ে কি কী জানি, হয়তো লজ্জায় এদিক মাড়ায় না। বড় খোকা—এর ন্যাওটো ছিল। তাহাকে দেখাশোনার ভার সে নিজে হইতেই লইয়াছিল। বড় মায়াবী শরীর। ধাতটাই মায়ের। সে এমন করিতে পারে ইহাতে বিশ্বাস হয় সংসারে অসম্ভব কিছু নাই। বিজুর খোঁজ করিব কোথায়? তাহার বন্ধুবান্ধব—সবগুলিই তাহা অপেক্ষা বয়সে বড়, বলিতেছে সে ভাগ্যান্বেষণে গিয়াছে। বিবাগী হইবার পাত্র সে নয়। কিন্তু তাহার জ্যাঠা গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। কোনও দিনই আর তাঁহার খোঁজ পাওয়া গেল না। হায়, আমি দরিদ্র মানুষ। কী-ই বা করিতে পারি। পুলিশে একটি ডায়েরি ভিন্ন আর কিছুই আমার হাতে নাই।—এর জন্য আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখাইতে পারি না। বিজু ছোটখোকা আমার বড় প্রিয় ছিল। হায়, ছিল বলিতেছি কেন? আছে আছে, শতবার আছে।'

বাবার এই কথাটুকু পড়ে চমৎকৃত হয়ে গেলেন বিজনবিহারী। 'ছোটখোকা আমার বড় প্রিয় ছিল।' তার যতটুকু মনে পড়ে, গঙ্গার ধারের সেই নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়ি তখন তাঁর কাছে জ্বলন্ত কটাহস্বরূপ। বি. কম দ্বিতীয়বার ফেল করে তিনি সবার চক্ষুশূল। মেজদা প্রায় কথাই বলে না। সেজদা সুযোগ পেলেই উপদেশ দেয়। বাবা হাপরের মতো দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। যেন সে ইচ্ছে করে ফেলটা করেছে। একমাত্র মা-ই, মুখের হাসি অটুট রেখে শত কাজের মধ্যেও মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছে—'ছোটখোকা আশা হারাসনি, আবার চেষ্টা কর, পারবি, ঠিক পারবি।' যদিও অন্যদের তাড়নার চেয়ে মায়ের এই স্নেহবাক্যই তাঁর বাড়ি থেকে পালানোর মুখ্য কারণ হিসেবে কাজ করেছে। আবার চেষ্টা? মা এই 'আবার চেষ্টা'র বাইরে কোনও পথ দেখতে পেত না। অত কল্পনাশক্তি ছিল না মায়ের। কিন্তু আরেকবার চেষ্টার সম্ভাবনাতেও বিজুর গা গুলোত, মাথা ঘুরত, ভেতরে প্রচণ্ড বিদ্রোহ জন্ম নিত। মনে হত সংসারের সব জিনিসপত্তর টুকরো টুকরো করে ভেঙে ছিঁড়ে, মানুষগুলোকে যাচ্ছেতাই গালাগাল-টাল দিয়ে সে উধাও হয়ে যায়। উধাও-ই হল। তবে তার পূর্ববর্তী কাজগুলো সে করে নি। একটি পক্ষাঘাতের রোগী, একটি জড়ব্যাধিগ্রস্ত এবং আরও একটি সামাজিক দুর্ঘটনার আঘাতে টলটলায়মান সেই সংসারকে আঘাত করার মতো নিষ্ঠুরতা বিজুর ছিল না। বাবার ডায়েরির ড্যাশ অংশগুলো হঠাৎ যেন তাকে কুড়ি একুশ বছর বয়সের সেই ধাক্কা-খাওয়া দিনগুলোয় নিয়ে গেল। ক্ষতটা যেন এখনও টাটকা! এরকম হয়? সল্ট-লেকের এই বাড়ি নেই। নেই ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী! নেই আটান্ন-উনষাট বছর বয়স, তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, সাফল্য, নানান ব্যবসা সহচর। সমস্যা। কুড়ি-একুশের বিজু একখানা শূন্য ঘর, শূন্য বাড়ি, শূন্য ছাদে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনুক্ত যন্ত্রণা! ছুটকি ছুটকি ছুটকি!

খোলা পাতাগুলোয় হাত রেখে অনেকক্ষণ বসে রইলেন বিজনবিহারী। কোথাও একটা ঘড়িতে ভীষণ শব্দ করে একটা বাজল। তিনি চমকে উঠলেন। পুরনো খাতা, হাতের চাপে একটু ভেঙে গেছে। যাঃ।

খুব সাবধানে পাতা উল্টে দেখতে লাগলেন তিনি আর কী আছে খাতাটাতে। হিসেব। মেজদার বিয়ের খবর। বেনারসী শাড়ি—এক, একশত পঞ্চাশ টাকা। মুর্শিদাবাদি সিল্ক—পঁয়তাল্লিশ, তাঁত শাড়ি—চার খানি—চার ইনটু পঁচিশ মোট একশত। এইভাবে এয়োডালা, প্রসাধনদ্রব্য, বরের জোড়, ব্র্যাকেটে লেখা—কাশীর সিল্ক দিলাম, গরদের জোড় দিতে পারিলাম না। আমার বিবাহে যাহা

পাইয়াছিলাম তাহা বেনারসী জোড়। এক্ষণে পিঁজিয়া গিয়াছে। তাহা মেজখোকা পরিতে চাহিল না। ষাট সালের তারিখ দেওয়া। বিস্তৃত হিসেব—ঘর খরচ, বউ ভাত, প্রীতিভোজ, কার্ড! তিনি সে সময়ে ছিলেন না, পলাতক। এখন শোনেন বাবা মেজদা সেজদা উভয়ের বিয়েতেই বেশ দাঁও মেরেছিলেন। মেজ বউদি একদিন কথায় কথায় শুনিয়েছিল খবরটা। সত্যি কথাই। মেজদা-সেজদার বিয়ে বোধহয় কমাসের আড়াআড়ি হয়। সাল হিসেবে আলাদা। কিন্তু মাসের তফাত ছ-সাত মাসের। এত অল্প সময়ের মধ্যে বাবার মতো ডাইনে-আনতে-বাঁয়ে কুলোয়-না মানুষ দুখানা বিয়ে দিয়ে উঠলেন কী করে। বিজন আপন মনেই হাসলেন।

বাবা দেখা যাচ্ছে নিয়মিত হিসেব রাখতেন না। কোনও কোনও গুরুত্বপূর্ণ হিসেব। বিয়ে ইত্যাদির। নইলে মাঝে মাঝে পুজোর খরচ, অন্য কোনও পার্বণ, সত্যনারায়ণের ফর্দ ইত্যাদির। দৈনন্দিন হিসেব মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছে। দৈনন্দিন হিসেবের ব্যাপারে বাবা যেন ঠিক মনঃস্থির করতে পারেননি। রাখবেন কি রাখবেন না। তেড়েফুঁড়ে এক হপ্তামতো রেখেছেন, আবার ছেড়ে দিয়েছেন। কেমন একটা অস্থিরচিত্ততা প্রকাশ পাচ্ছে এই হিসেব রাখারাখির ব্যাপারটার মধ্যে দিয়েও। অথচ বাবা যে আদৌ অস্থির হতে পারতেন, কোনও বিষয়ে দ্বিধা, দ্বিমত, মত পাল্টানো ইত্যাদির মধ্যে যেতে পারতেন, সে কথা তাঁর ছেলে হিসেবে বিজনের কখনও মনে হয়নি। বাবা যেন অচল, অনড়, জগদ্দল এক পাথর। কিছুতেই তাঁকে তাঁর সংকল্প, ধারণা ইত্যাদির থেকে নড়ানো যাবে না।

'বৃদ্ধ' মানুষ, না মানুষ বলা ঠিক হইল না। বৃদ্ধ ব্যক্তি, না ব্যক্তিই বা কেন? যখন কাহাকেও একটি স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় তখনই সে ব্যক্তি। বৃদ্ধের ব্যক্তিত্ব আর কাঁটালের আমসত্ত্ব একই বস্তু। সুতরাং শুধু বৃদ্ধ বলাই ভাল। এই বৃদ্ধ খিড়কির দুয়ার দিয়া পাঁশকুড়ায় ফেলিয়া দিবার যোগ্য একটি অবাঞ্ছিত বস্তু। বিনষ্ট ভ্রূণ যেমন পাপী পাঁশকুড়ায় ফেলিয়া দেয়, বৃদ্ধ নামক মনুষ্যত্বের অপভ্রংশটিকেও তেমনই জীবন পাতক, রাস্তার ধারে, অবহেলায়, লজ্জায়, ক্ষোভে ফেলিয়া দিয়া যায়। বৃদ্ধের না আছে মূল্য, না আছে মান। পরমহংসদেব বলিতেন মান আর হুঁশ দুই মিলিয়া মানুষ। বৃদ্ধের হুঁশ নাই, সুতরাং মানও গিয়াছে। সে আর কোন মুখে মনুষ্য-পদবি যাচ্ঞা করে? কিন্তু ইহা কি বৃদ্ধের দোষ? সে তো সাধ করিয়া বৃদ্ধ হয় নাই! পারিলে সে বার্ধক্যকে ঠেকাইয়া রাখিত। বলিতে কি ঠেকাইয়া রাখিবার প্রাণান্তকার প্রয়াস বৈজ্ঞানিক মহলে চলিয়াছে। গেরন্টোলজি নামে একটি নূতন শাস্ত্র হইয়াছে শুনিয়াছি। নূতন কী?'

প্রশ্ন চিহ্ন দিয়ে শেষ করেছেন বাবা। এ কি বার্ধক্য সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক ভাবনাচিন্তা? না বাবা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায় সার-মর্ম লিখে গেছেন! সালটা কী! সাতষট্টি। বাবার বাঁ দিকটা পড়ে গিয়েছিল। এ সময়টা বাবা ঠিক কোথায় ছিলেন তিনি মনে করতে পারলেন না। মেজদা তো প্রায় ঘর-জামাই-ই হয়ে গিয়েছিল। সোনারপুরে শ্বশুরবাড়ির লাগোয়া জমিতে আস্তে আস্তে বাড়ি করে। তাহলে কি সেজদা? সেজদার কাছেই থাকতেন বাবা এ সময়টায়। সাতষট্টি মানে দাদাদের বিয়ের বছর পাঁচ পরে। বাবা তখন শয্যা নিয়েছেন। আর তার কিছুকাল পরেই বিজন ফিরে এলেন রূপকথার সওদাগরের মতো। ময়ূরপঙ্খী সপ্তডিঙা কূলে ভিড়িয়ে।

বার্ধক্য সম্পর্কে বিজনবিহারীর ধারণা কিন্তু আদৌ তাঁর বাবার অনুরূপ নয়। তার কারণ অবশ্যই তাঁর দাদামশাই ভবানীচরণ। ছোটতে দিনের পর দিন মামার বাড়ি গিয়ে থাকতেন তিনি আর ছুটকি। সে সময়ে মামাবাড়ির প্রধান আকর্ষণ ছুটকির কাছে কে ছিলেন কে জানে কিন্তু বিজুর কাছে নিঃসন্দেহে ভবানীচরণ।

দুপাটি পরিষ্কার বাঁধানো ডেঞ্চার ছিল। নাতি নাতনিরা কোনও দিনই বুঝতে পারেনি-যে তাঁর দাঁত পড়ে গেছে বা ফেলে দেওয়া হয়েছে। চুলগুলো-ছিল নিকষ সাদা। সেই সাদার কী চমক। সকালে বেল খেতেন। নিয়ম করে বারো মাস। খাওয়ার সময় পুব আকাশ থেকে নতুন রোদটুকু এসে পড়ত সে চুলে, রুপোর মতো ঝিলিক দিত। সূর্য মধ্য-গগনে ওঠবার খানিক আগে আরম্ভ

হত দাদামশাইয়ের স্নান-পর্ব। স্নান-যজ্ঞই বলা উচিত তাকে। নাকের ফুটোয়, কানের ফুটোয়, নাভিকুণ্ডে, পায়ের বুড়ো আঙুলের নখের ফোকরে টোপা টোপা তেলের ফোঁটা দিয়ে শুরু হত যজ্ঞ। সে সময়ে দাদামশাইয়ের চুলগুলো হা-হা হো-হো করে হাসত। তাঁর মুখময় গা-ময় যেন সূক্ষ্ম রেশমের কাপড়। তাতে একটা সুতো টেনে দিয়েছে কেউ। সূক্ষ্ম কুচি কুচি ভাঁজ। একেবারে পাতলা গরদ হেন চামড়া। বাড়িতে কাচা সাদা থান পরতেন। দৈবাৎ কাপড় টান টান হয়ে লেগে গেলে সেই গরদের চামড়া কেটে গিয়ে ফুটফুট করে রক্ত বেরিয়ে আসত।

রাতের খাবার ছিল খই দুধ। জুঁইফুলের মতো একরাশি খই কানাওয়ালা বড় খাগড়াই কাঁসার বাটিতে দুধের ওপর যেই ফেলতেন শোঁ করে একটি আওয়াজ হত। সোঁদা সোঁদা গন্ধ ছড়িয়ে যেত চারদিকে। সেই আওয়াজটা শোনবার জন্য, সেই গন্ধের শ্বাসটুকু নেওয়ার জন্যে সন্ধে সাতটা থেকে দাদুর কাছে ঘুরঘুর করত বিজু। রুপোর বড় গোল চামচ দিয়ে সাপ সুপ খইগুলো শেষ করে শেষের দুধটুকু বাটির কানা দুহাতে ধরে যখন এক চুমুকে শেষ করতেন দাদুর মুখটা বুকের ওপর থেকে পিঠের দিকে আস্তে আস্তে একশো ষাট ডিগ্রি কোণে ঘুরে যেত। সে দৃশ্যটাই বা কী চমৎকার। সামনে চেয়ারে বসে রয়েছেন বড় মামিমা। ফরাসডাঙার একটু নীলচে কোরওয়ালা কালো পাড় শাড়ি ছাড়া বাড়িতে পরতেন না। কপালের সিঁদুর টিপটা সব সময়েই একটু ধেবড়ে থাকত। মামিমার মুখ আড়ের দিকে চওড়া। ঘোমটা থেকে বেরিয়ে আসা চুলগুলো চারভাগের তিনভাগই পাকা। মুখে একটা আলগা হাসি ভেসে থাকত, দাদু গোমড়া মুখ পছন্দ করতেন না বলে। এমনি কত ছবি। প্রত্যেকটি স্মরণ করলে এখনও বিজনবিহারীর অনুভব হয় বার্ধক্যটা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। খ্যাতি, সম্মান, শ্রদ্ধা, সমীহ আর সেবার শীর্ষ চূড়ায় তার অবস্থান। চারিদিকে বিশ্বাস, আস্থা, নির্ভর। যা-কিছু জীবনের সংসারের সমাজের শ্রেষ্ঠ ফসল সব টুকরি-ভর্তি উৎকৃষ্ট আমের ভেটের মতো বৃদ্ধর পায়ের কাছে নামানো।

মনে আছে মামাবাড়ির গোয়ালা ডার্বির টিকেট জিতে দশ হাজার টাকা পেয়েছে। অত টাকা দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে সুবল। ভেউ-ভেউ করে কাঁদছে আর বলছে— 'হমাকে জরুর ফাটকে নিয়ে যাবে বুঢ়াবাবু। হাপনি বাঁচাও।'

—'ফাটকে নিয়ে যাবে কী রে? এ তোর হকের টাকা।'

—'তো তুমার পাস রাখিয়ে দাও।'

—'হ্যাঁ, তারপর আমি মরে যাই আর তুই টাকা নিয়ে ঝামেলা করিস আমার ছেলেদের সঙ্গে।'

—'ওরে বাপ্! বজরংবলী তবে হমাকে মাফ্ করবে নাই বুঢ়াবাবু। তুমি যো করবে সো হোবে।'

সুবলের ছোট ছেলেটি শোনা যায় আই. পি. এস. হয়েছে মতিহারীর দিকে। বড়গুলি হাতে দামি ঘড়ি, পরনে সিল্কের লুঙ্গি, মুখে সিগারেট এখনও জোর দুধের ব্যবসা করছে। গাই, ভঁইস। দেহাতে ওদের বিরাট জমি-জমা। পাঁচটি মেয়ের বিয়ে দিতে সুবল গোয়ালা প্রচুর টাকা খরচ করেছিল।

সেই বাল্যকালেই বিজু পুবের বারন্দায় আরাম-চেয়ার পেতে হাতে দুধের জামবাটি নিয়ে বসে পড়বার জন্য রেডি-স্টেডি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বাবা বঙ্কুবিহারী রায়, দেখা যাচ্ছে এই বার্ধক্যের সন্ধান পাননি। সে আরাম-চেয়ার থেকেও ছিল না। সে দুধের বাটিও ভোঁ ভাঁ। তার সবচেয়ে অভাব হয়ত সামনে বসা ওই হালকা-হাসি মুখ বয়স্ক বধূটির সজাগ উপস্থিতি।

কিন্তু বধূ কেন? বাবার তো নিজের পত্নীই বর্তমান ছিলেন। মা ওই বয়সে বাবার খুঁটিনাটি সেবা সমস্তই করেছে। নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করবার জন্যে এই খাতা এগিয়ে দেওয়া, এ-ও নিশ্চয়ই মারই কাজ ছিল।

আর কয়েক পাতা পরে তিনি বাবার আরও কিছু চিন্তা নথীকৃত দেখতে পেলেন। বিষয় ওই একই।

'জরাকে আমি আদৌ ভয় পাই না। জানিতাম জীবন এক হাতে লইয়া থাকে। কিন্তু অন্য হাতে

পুরাইয়া দেয়। তাহা ব্যতীত ইহা জীবনের ফসলের সময়। স্বর্ণাভ হেমন্তকাল, কোন কবিতায় যেন পড়িয়াছিলাম মাঠের আলের পাশে সে গভীর আলস্যে ঘুমাইতেছে। ফসল-উঠিয়া-যাওয়া ক্ষেত ন্যাড়া হইলে কী হইবে নূতন ধান্যে নবান্ন হইবে না! গোলা ভরিয়া স্বর্ণময় ধান্যের স্তূপ উপচাইয়া পড়িবে না! ঘর ভরিয়া তিন পুত্র, দুই কন্যা। স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম ছেলেরা মানুষের মতো মানুষ হইয়াছে। নাতি-নাতনিরা চারদিকে সুকারের বলের মতো ছিটকাইতেছে। কন্যারা সুখী শ্বশুরগৃহ হইতে মাঝে মাঝেই আসিয়া পড়িতেছে। গৃহিণী তাদের জন্য বিশেষ ভোজের আয়োজন করিতেছেন। হইল না। জানি না কাহার ইচ্ছায়। কে সেই সর্বশক্তিমান, মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছায় বাদ সাধিতে যাঁহার এমন নিষ্ঠুর রঙ্গ!'

বাবা কষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই কষ্টের কথা লিখে যাবার মতো মনও তো বাবার ছিল? বাবা সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে তাঁর ছোট খোকার ধারণা খুব অস্পষ্ট।

'অর্থ জীবনের রং বদলাইয়া দেয় : ইহা জানিতাম। কিন্তু সে চরিত্রের কাঠামো, পারস্পরিক সম্পর্কের চেহারা, ইহলোক-পরলোক ধর্মাধর্ম সবই বদলাইয়া দেয় তাহা ঠিক এইভাবে উপলব্ধি করি নাই।'

বিজনবিহারী খুব আগ্রহসহকারে পড়তে লাগলেন।

'ছোটখোকা কৃতী হইয়া আসিয়াছে। কৃতী অর্থে পণ্ডিত, ডিগ্রিধারী নয়। সে বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করিয়াছে। তাহাকে খরচের খাতায় ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। তাই তাহার এভাবে আসা যেন দ্বিগুণ আহ্লাদের। কিন্তু তাহার দাদারা তো সেভাবে আহ্লাদিত হইল না! মেজ খোকা বলিয়া গেল—"অত হ্যাট-কোটে আপনি ভুলবেন না বাবা, খোঁজ করুন ও কী ভাবে কী করছে।" সত্য কথাই হয়ত। উহারা ছোটকে সেই ছেলেমানুষ, দস্যি, পড়াশোনায় অষ্টরম্ভা হিসাবেই মনে রাখিয়াছে। তাই সতর্ক করিয়া দিতেছে। সেজবাবুও সেদিন বলিলেন—"এক সংসারে একজন মাস মাইনের ছাপোষা চাকুরে, আরেকজন লাখপতি ব্যবসাদার একসঙ্গে থাকতে পারে না বাবা। আপনি বুঝুন ব্যাপারটা। আমার দিকটা ভাবুন।" কী ভাবিব? তোমরা তিনজনেই আমার ঔরসজাত পুত্র বই তো নও! আমি অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, বিছানায় পরের হাত তোলা হইয়া আছি। আমি ভাবিবার কে? শুইয়া শুইয়া ছোটকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ করি। সে বরাবরই তাহার মায়ের ভক্ত। তবু আমার শয্যার পাশে পাঁচ মিনিট হইলেও আসিয়া বসে। সদা অন্যমনস্ক। অর্থাগমের যে পথ সে ধরিয়াছে তাহাতে বিরাম নাই। বিশ্রাম বা স্বস্তি সে জীবনে পাইবে না। কিন্তু তাহা ছাড়াও আমি লক্ষ করি তাহার দাদা বউ-দিদিদের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছে। কাহার দোষ বলা শক্ত। সম্ভবত উভয় পক্ষেরই। আমি বুঝিতে পারি ছোট এখন যে জগতে বাস করে তাহার সহিত আমাদের জগতের মেজবাবু বা সেজবাবুর জগতের মিল নাই। সেদিন মেজ বউমা ঠাট্টা করিয়া বলিল—"সংসার খরচের টাকা দিচ্ছ দু'হাজার টাকা? শুধু খাই খরচ? তুমি বোধহয় একটা ট্যাঁকশালই খুলেছ তাই না?"

ছোটর উত্তরের জন্য উৎকর্ণ হইয়াছিলাম, সে বলিল—"তোমার কথার অর্থ কী হয় ভেবে বললে মেজ বউদি? সোজা অর্থ হয় ফর্জারি। আমি কি টাকা জাল করছি বলে তোমাদের ধারণা?" লক্ষ করিলাম ছোট বহুবচন ব্যবহার করিল। তাহার দাদারা বিদ্যায় বড়, সে বিত্তে বড়। দুটিতে মিলিতেছে না। বিজু এখানে থাকিতে পারিবে না। এখন আমি ও নীলিমা কী করিব?'

বাবা নৈর্ব্যক্তিকভাবে আরম্ভ করেছিলেন। ব্যক্তিগত সমস্যায় এসে পৌঁছলেন শেষ পর্যন্ত। সে সময়ে তাঁর সল্ট লেকের জমি কেনা হয়ে গেছে। দুহাজার টাকার খাইখরচ দেওয়াতে সেজবউদির প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি সাবধান হয়ে যান। জমির কথা কাউকে বলেননি। সাংসারিক ব্যয়ের ব্যাপারে হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। মেজদার তখন সোনারপুরে বাড়ি উঠছে। মাস্টারি ছেড়ে সে গড়িয়াহাটের দিকে দোকানে বসছে। মেজদা সেজদার হাঁড়ি আলাদা। বাবা-মা সেজদার সঙ্গে, সুতরাং তিনিও সেখানেই উঠেছিলেন। সুবিধে হয়ে গেল। বছর দেড়েকের মধ্যেই সেজদা বললে, 'সরকারি কোয়ার্টাস

পাচ্ছি সি. আই. টি রোডে। ছাড়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?' কথাটা বলল খাওয়ার সময়ে। মা, সেজবউদি এবং সে তিনজনের উপস্থিতিতে। বিজু বলল—'কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না সেজদা। যতদিন চাকরি, ততদিন কোয়ার্টার্স। ইতিমধ্যে তুমি ধীরে ধীরে নিজের বাড়ি করে নিতে পারবে।'

সেজদাই আগে গেল। তারপরে মেজদা। বাঁধাঘাটের গলিতে মা বাবা আর বিজু। রই-রই করে উঠে যাচ্ছে সল্ট লেকের বাড়ি। মেজদাদাদের যাবার চার পাঁচ মাস পরেই তাঁরা চলে এলেন সল্ট লেকে। শয্যাশায়ী হলেও যতদূর সম্ভব আরামে ছিলেন বাবা শেষ ক বছর।

আর কী আছে সিন্দুকটাতে। চিঠিপত্রের তাড়া। দুটো তিনটে পলিথিনের ঠোঙার মধ্যে, হলুদ রঙের সরু ফিতে দিয়ে বাঁধা। একটা প্যাকেট খুললেন বিজু রায়। মেজবউদি, সেজবউদি, ছোট মামা, বড় মাসি, ...প্রচুর চিঠি। সব রেখে দিয়েছে মা। অবসর মতো পড়তে হবে। এটা? দ্বিতীয় প্যাকেটটা খুলে ফেললেন তিনি। অন্তর্দেশীয় পত্র। হাতের লেখা দেখেই চমকে উঠলেন বিজু রায়। সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেললেন চিঠিটা। হাত কাঁপছে।

'শ্রী চরণেষু মা,

তোমার ১০/৯-এর চিঠি পেয়েছি। তোমার এতদিন বেঁচে থাকার কষ্ট বুঝি। কিন্তু আমার আগের জীবনের তুমিই তো একমাত্র সূত্র। তোমার জামাই যত সুখেই রাখুক আমার জীবনের কুড়িটা বছর তো আমি কিছুতেই মুছে ফেলতে পারব না। মা, জীবনটা সামনে এগোনো সেটা বুঝি। প্রতিদিন পৃথিবী হু হু করে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব বার হচ্ছে, কাল তা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মতো মগজ বসবে কম্পুটারে শিগগিরই। কিন্তু পেছনে কেউ নেই, কিছু নেই, খাঁ খাঁ। এ যে কী কষ্ট। সে যার না হয়েছে সে বুঝবে না। মা তুমি চলে গেলে, গেলে কেন যাবেই যে কোনও দিন, আমার আর কেউ থাকবে না। মা, মা গো। স্বার্থপরের মতো কথা বলছি। শুধু আমার জন্যেই তুমি আর ক বছর অপেক্ষা করো মা। যেমন করে হোক একবার তোমায় দেখে আসব।'

তলায় কোনও সই সাবুদ নেই। তবু বিজু রায় সেখানে অদৃশ্য-কালিতে লেখা নামটা দেখতে পেলেন—ছুটকি। ধাক্কাটা এত অপ্রত্যাশিত, এত তীব্র যে তিনি চিঠিটা প্রায় মুঠো করে ফেলেছিলেন। ঠিকানা আছে? এ চিঠিটাতে ঠিকানা নেই। ঠিকানা নেই কেন? ছুটকি, ছোড়দি তুই ঠিকানা দিসনি কেন? আরও কয়েকটা চিঠি উল্টে-পাল্টে দেখলেন তাড়াতাড়ি, আছে। নানান ঠিকানা। কিন্তু সবই বিভিন্ন পোস্ট অফিসের।

চটপট করে লোহার সিন্দুকের সব কাগজপত্র, মায়ের খাটের তলায় রাখা একটা ডাকব্যাকের বড় সুটকেসে ভরে নিলেন বিজু রায়। তারপর দরজা বন্ধ করে নীচে নেমে এলেন নিজের ঘরে। সেখানেও অনেকক্ষণ ধরে কাগজপত্র, চেক বই, পাস বই, ইত্যাদি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেন। ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ যখন তিনি চুপচাপ গোটা দুই সুটকেস নিয়ে বাড়ি থেকে নিঃশব্দে গেলেন তখন তাঁর ওই চিঠিগুলি, তাদের ঠিকানা এক। তাদের লেখিকা ছাড়া আর কিছু মনে ছিল না। জাতিস্মরের যেমন হঠাৎ পূর্বজন্মের কথা মনে পড়লে এ জন্মের সব কিছু ফিকে হয়ে যায় বলে শোনা যায় এ-ও কতকটা তেমনি। বিজু রায় বেরিয়ে গেলেন সম্পূর্ণ উদভ্রান্তের মতো, এবং একমাত্র সেই অক্লান্ত ঘড়িটাই উড়ে উড়ে তাঁর নিষ্ক্রমণের সময়টা নোট করে রাখল।

॥ ২ ॥

ডান-পাশে বসা বসাক বলল—'এরই মধ্যে?'

মুখে হাত-চাপা দিয়ে ছোট্ট একটা হাই তুললেন মিসেস রায়—'ভী-ষণ ঘুম পাচ্ছে। দু নাইট পর পর। আর পারা যাচ্ছে না।'

—'কাল আসছ তো?' রাজেশ পাইন বলল।

—'কাল তো আবার মিড নাইট?'

—'আর তাতে অসুবিধে কোথায়?

মিসেস রায়ের মুখে একটা দুর্বোধ্য হাসি। জীবনকে নানাভাবে উপভোগ করার এই জীবনদর্শন ভাল। খুব ভাল। কিন্তু এই পাইন-বসাকগুলো বুঝবে না পর পর তিনটে রাত জাগলে চেহারার ওপর কী জাতীয় ধস নামতে পারে। তনুশ্রী যে গান-বাজনা দারুণ একটা ভালবাসেন তা নয়। তাঁর আসল পছন্দের জিনিস হল নাচ। শেখার ইচ্ছে ছিল একসময়ে। বাবা মা কেউই সে ইচ্ছেটাকে আমল দেন নি। নাচ দেখতে দেখতে এখনও ভেতরটা ধা-ধিন-ধিন ধা করতে থাকে তনুশ্রীর। কিন্তু নাচ এসব কনফারেন্সে প্রথম দিকেই হয়ে যায়। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে খেয়াল বা সেতার-টেতার শোনবার খুব একটা ধৈর্য থাকে না তনুশ্রীর। গায়ক বা বাদক যখন তবলার সঙ্গে মেতে ওঠে, তবলা যখন বাজনাকে ছাপিয়ে যায়। বা দু পক্ষই তাল ঠুকে হুহুঙ্কার দিতে থাকে, সে সময়টার উত্তেজনাটা উপভোগ করেন তিনি। কিন্তু অন্য কোনও বিশেষ প্রোগ্রাম না থাকলে এ সব কনফারেন্সে তাঁকে আসতেই হয়। তিনি পেট্রন। না এলে মান থাকে না। অনেক গাইয়ে-বাজিয়ে-নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। তাঁর ইচ্ছে বিরজু কি কেলুচরণের মতো কাউকে কিছুদিন বাড়িতে অতিথি রাখা। ব্যাপারটা শিগগির করতে হবে। ভারতবর্ষের সংগীত-নৃত্যের বিস্তৃত ভূগোলে মিসেস রায় তাঁর সল্ট লেকের বাড়ি সমেত একটু জায়গা পেতে চান।

খেয়ালটা থেমেছে। এইবেলা চট করে বেরিয়ে যেতে হবে। রাজেশ পাইন উঠে পড়ে এগোচ্ছে। পেছন পেছন নিজেকে যতদূর সম্ভব মুছে ফেলে বেরিয়ে যেতে হবে। কালো শালটা দিয়ে মাথায় ভাল করে ঘোমটা দিয়ে নিলেন মিসেস রায়। তাঁর বিরাট কানবালা দুটো ঘোমটার বাইরে এসে মৃদু মৃদু দুলতে লাগল।

বাইরে বেরিয়ে বোঝা গেল রাত আর নেই। বেশ পাখি ডাকতে শুরু করেছে। ভোরের পাতলা সর শেষ রাতের গায়ে। লেকের জল স্থির। লোক জমতে আরম্ভ করেছে। স্বাস্থ্য শিকারিরা শর্টস আর কেডস পরে প্রস্তুত। গাড়ি অনেক দূর। উদ্যোক্তারা কেউ কেউ বেরিয়ে এসেছিল।

—'চললেন তনুশ্রীদি? শরীর খারাপ নাকি?'

—'না না, আসলে, সকালে মানে বারোটা নাগাদ একটা জরুরি মিটিং আছে ভাই। আই মাস্ট গেট সাম স্লিপ।'

—'এবার যেন তেমন জমল না, না?'

—'আরে বাবা আর্টিস্টরাও তো মানুষ' বসাক খসখসে ভারী গলায় বলল। ওর এই গলাটার জন্যেই মিসেস রায় বিশেষ করে ওকে পাত্তা দেন। গলাটা তাঁকে কেমন চেতিয়ে তোলে। সামহাউ। পাইনের কথা আলাদা। পাইন খুব করিতকর্মা। অনুগত। অনুগত বসাকও। কিন্তু পাইনের মতো করিতকর্মা নয়। মিসেস রায় সমানে পাইনকে তালি দিয়ে দিয়ে বসাককে বাজিয়ে চলেছেন। অথচ দুজনে এমনিতে খুব বন্ধু। বসাকই পাইনকে তাঁর বৃত্তে আনে।

—'কী? হোম সুইট হোম?' রাজেশ হেসে জিজ্ঞেস করল।

—'আবার কী?' মিসেস রায় ভ্রূভঙ্গি করে জানালেন।

বসাক পেছনে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে। মাথাটা সিটের ওপর কাত। মিসেস রায় আড়চোখে দেখে ভাবলেন ইস্‌স্‌ আকাটটা বসেছে দেখো! মুখটা সুদ্ধু হাঁ করে ফেলেছে, এবার বোধহয় নাক ডাকবে। তাঁর ভেতরটা চট করে নিবে গেল। বসাকের জন্য। রাজেশের জন্য এখনও ভেতরটা জ্বলছে। তার সুপুষ্ট আঙুলগুলো স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরে আছে। আঙুলে হিরের আংটি। বেশ বড়। হঠাৎ মিসেস রায়ের মনে হল তিনি যদি এখন বসাকের মতন বসতে পারতেন। ওহ্‌ কেন পারেন না? কেন পারবেন না? চলাফেরা কথা বলা খাওয়া শোওয়া সব কিছু ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রিত করে কে? কেন এই অনুশাসন? ভেতর থেকে? না বাইরে থেকে? বুকের ভেতরে না মাথার ভেতরে যেন

একটা তর্জনী সব সময়ে উঁচিয়ে আছে। এভাবে নয়, ওভাবে। ওটা ঠিক হল না। এইটে ঠিক। তর্জনীটা এক কোপে কেটে ফেলতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। কিন্তু তর্জনীর পেছনে আছে একটা আরও ভয়াবহ বুড়ো আঙুল। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

ভোরবেলার গাড়ি তরতর করে ভেসে চলেছে। পালে হাওয়া লাগছে। কানের পাশ দিয়ে শনশন হাওয়া। মিসেস রায় জানেন না কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাড়ির ড্রাইভ-ওয়ে দিয়ে ঢোকবার সময়ে তলার নুড়িতে কড়কড় মড়মড় শব্দ। চটকাটা ভেঙে গেল তখনই। দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে বসাক। চোখে ঘুম। বাড়ির দরজা খোলা। এখন থেকে খোলাই থাকে। শিথিল শরীরটাকে এক ঝটকায় টান টান করে নেমে দাঁড়ালেন মিসেস রায়।—'থ্যাঙ্কস।'

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়ে একবার যেন বদনের শ্রীমুখখানা দেখতে পেলেন। ঘরের কাছাকাছি আসতে প্রমীলা। হাত থেকে শালটা নিয়ে গুছিয়ে রাখল। ব্যাগটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে, শাড়ি-টাড়িগুলো টেনে টেনে খুলতে লাগলেন মিসেস রায়। প্রমীলা বেরিয়ে যাচ্ছে। —'চা দেবো?'

—'না।'

—'অন্য কিছু?'

—'এখন কিছু না।'

ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। এখন কিছু না, কেউ না। আলগা হয়ে শিথিল ঘুম শুধু। তর্জনী নেই। বুড়ো আঙুল নেই। বসাক, রাজেশ, অম্বুজ, তিমিরকান্তি, মিসেস দস্তুর, তানিয়া ঘোষাল... কেউ নেই। অনু ডালমিয়া, প্রীতা সোম সব ঘুমের তলায় তলিয়ে গেছে। ঘুম! ঘুম! ঘুম!

প্রথম পর্যায়ে নিশ্ছিদ্র বিস্মরণের অন্ধকার। দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্ধকার কাটতে থাকে। আস্তে আস্তে একটা জলপ্রপাতের ওপর ভর দিয়ে শাঁ করে নেমে আসতে থাকে দুটো পা। ছড়ানো দুদিকে। জিন্‌স পরা। পায়ের ওপর কোমর। খোলা। তার ওপর পেট, খোলা। নাভি অর্ধেক দেখা যাচ্ছে। তার একটু ওপরে পাঁজরার ঠিক তলায় একটা শক্ত গিঁট। লাল নাকি নীল তা তো ঠিক...আবছা ধূসর ধূসর, না গোলাপি বোধহয় টপটা। বেবি পিঙ্ক। ঝুঁকে আছে সোজা সোজা চুল, শেষগুলো ভেতর দিকে একটু পাকিয়ে গেছে। তার মধ্যে মুখ একটা। অনু ডালমিয়ার? ব্রুক শিল্ডস? না জুলিয়া রবার্টস? ভাল করে যতই দেখতে যান ততই মুখটা চুলের ঝাপটায় লুকিয়ে লুকিয়ে যায়। উঁহুঃ ও বোধহয় কামসূত্রর সেই অ্যাড-গার্লটা না? কী যেন নাম...না তো! ও তো তনুশ্রী! তনুশ্রী স্লিপ খেয়ে নেমে আসছে। আবার নামছে। আবার নামছে। টিভিতে ছবিটা তলার দিকে সমানে রোল করে যাচ্ছে। একটা পেটমোটা হাঁস উড়ছে। উড়ছে না তো! থপথপ করে কেমন পেছন দুলিয়ে হেঁটে হাসছে। হঠাৎ কে যেন তনুশ্রীকে প্রচণ্ড জোরে ছুঁড়ে ফেলছে। জলপ্রপাতটা এতক্ষণ ছিল নিষ্পাপ স্লাইড একটা। এখন ফুঁসে উঠেছে। হাবুডুবু খেতে খেতে তনুশ্রী শেষ কুটোটুকু আঁকড়ে ধরার মতো করে চেতনাকে ধরেছেন। একটা কুটো ক্রমশ শেকড় হয়ে যায়। শক্তপোক্ত সেই শেকড়টা ধরে মিসেস রায় হাঁকপাঁক করছেন।

শেকড়টা আস্তে আস্তে তিতির মুখ হয়ে যাচ্ছে। —'মা, মা, ওঠো। প্রমীলাদি কী বলছে শোনো।' তিতি মাকে নির্মমভাবে ঝাঁকাচ্ছে।

তনুশ্রী চোখ দুটো আধো খুলে তিতির মুখটা জলের মধ্যে শক্ত গাছের শেকড়ের মতো ভাসতে দেখেছিলেন। তিতি...তিতি... কে যেন তিতি...মেয়ে...ও তাঁরই মেয়ে...বেড়াতে গিয়েছিল না? কোথায়? কে জানে। কবে ফেরার কথা ছিল? ফিরেছে তাহলে? বেশ তো ফিরেছে তো এখানে কেন? এখন, এখানে তাঁকে এভাবে ঝাঁকাবার মানে কী? ভুরু কুঁচকোচ্ছে যে!

হাজার চেষ্টা করেও মুখে কথা আনতে পারছেন না মিসেস রায়। জিভটা অসাড় হয়ে গেছে যেন।

—'মা, এখন দশটা বেজে পঁচিশ মিনিট। বাবা সকাল থেকে বাড়ি নেই।' অনেক কষ্টে জিভটা

নেড়ে তনুশ্রী বললেন, 'নেই তো কী। আসবে!'

—'প্রমীলাদি বলছে সকালে চা দিতে গিয়ে ঘর খালি দেখেছে। বাবা ঠিক সাড়ে পাঁচটায় চা চায়। রাতে বিছানায় শোয়নি। ঘরে ছিল না বোধহয়।'

এবার তনুশ্রী এপাশ ওপাশ করে দু হাতে ভর দিয়ে কোনওক্রমে উঠে বসলেন। ভুরু কুঁচকে গেছে।

—'তোমার বাবা কোনদিনও এ সময়ে বাড়ি থাকে?' সদ্য ঘুম ভাঙা গলাটা ভারী, ভাঙা-ভাঙা, 'হয়ত সকালে কোনও বিশেষ কাজ আছে। কেউ বাড়ি ছিল না, তাই বলে যেতে পারেনি।'

প্রমীলা দরজার ওদিকে ছিল, কাছিয়ে এল।

—'মেমসায়েব, সায়েব কালকে কেন জানি বড্ড রাগ করেছিলেন। খাবার...ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।'

তনুশ্রী খুব আশ্চর্য হলেন এবার। তাঁর স্বামী বিজু রায় খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক। প্রমীলার রান্নাও একেবারে স্ট্যান্ডার্ড। এদিক-ওদিক হয় না। তা ছাড়া বিজু রায়ের জন্য কীই বা রান্না! ব্লাড শুগার আর উচ্চ রক্তচাপের জন্যে মাপা বাঁধা-ধরা খাওয়া ইদানীং। খাবার ছুঁড়ে ফেলার কোনও কারণ থাকার কথা নয়।

—'আমায় জিজ্ঞেস করলেন মেমসায়েব ছেলেমেয়ে কোথায়...' প্রমীলা আর একটু সাহস করে বলল।

—'তুমি কী বললে?'

—'আপনি গান শুনতে গেছেন, দিদি বেড়াতে গেছে বললুম, দাদার কথা জানি না, তাই বলতে পারিনি।'

—'সাহেব তাতে কী বললেন?'

—'কিছু না। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে খেতে ডাকলুম, এলেন, দিলুম, তারপর সব খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে গেলেন।'

তনুশ্রী এবার সম্পূর্ণ হতভম্ব চোখে তিতির দিকে তাকালেন। তিতিও মায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিছু বলছে না। —'চিন্টু চিন্টু কোথায়! সেই বা এখনও ফেরেনি কেন? চিন্টু রাতে ফেরেনি? প্রমীলা!'

প্রমীলা খুব অপরাধী গলায় বলল, 'না।'

—'এ কথা আগে বলনি কেন? তনুশ্রী হঠাৎ কঠোর গলায় বললেন। চিন্টুর ফেরা না ফেরার দায় যেন সম্পূর্ণই প্রমীলার।

প্রমীলা আরও ভয়ে ভয়ে বলল, 'দাদা তো মাঝে মাঝেই অমন রাতে ফেরে না। আমি কী করে জানব আপনি জানেন না!'

'আচ্ছা। এখান থেকে যাও এখন!'

হঠাৎ তনুশ্রীর খেয়াল হল প্রমীলা একটা কাজের লোক। বড্ড বেশিক্ষণ পারিবারিক কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে। এটা ঠিক না।

প্রমীলা চলে গেলে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'হঠাৎ এত রাগের কী হল?'

তিতি অসন্তুষ্ট গলায় বলল, 'কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ বলে গেলেও তো পারো।'

—'তুমি কি বলে গিয়েছিলে?' তনুশ্রী মেয়ের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ মাঠে নেমে পড়েন।

—'আমি তোমাকে বলে গেছি। তুমি বাবাকে বলবে এটাই আমার ধারণা। চিরকাল এরকমই হয়ে এসেছে।'

—'তোমার দাদা? সে বলে গেছে?'

'দাদার জবাবদিহি দাদার কাছে চেয়ো। আমি কী বলব?'

—'বলে যাওয়ার কথা তুলছ তাই বলছি।'

তিতি কিছু বলল না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তনুশ্রী উঠে পড়লেন। চানে ঢুকতে হবে এবার। অনেকক্ষণ সময়ে নেবেন আজকে। ইতিমধ্যে কোনও একটা খবর আসবে। ফোন হোক, মেসেঞ্জার হোক। বিজু রায় নিজেই চলে আসতে পারেন। এত ভোরে হঠাৎ কী কাজ পড়ল এটাই কৌতূহলের বিষয়। তিতি বা প্রমীলার যে তর্জনীসংকেত অর্থাৎ কিনা বিজু রায় প্রধানত তাঁর ওপর রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন, এই ধারণাটাকে এক মুহূর্তের জন্যেও প্রশ্রয় দিচ্ছেন না তিনি। অল রাবিশ! বিজু রায় তাঁর ব্যবসার সুবাদে কখন কোথায় যান, কেন যান, সেটা যেমন তনুশ্রী জানেন না, তনুশ্রী তাঁর সামাজিক কাজকর্মের সুবাদে কখন কোথায় যান বিজু রায়েরও তেমনি জানার কথা নয়। তিতি তাঁর মেয়ে। কিন্তু ওর রকমসকম একেবারে ভাল লাগে না তাঁর। কথাবার্তা বলার খুব একটা সুযোগ হয় না। কিন্তু যখন বলে কেমন একটা সমালোচনার সুর, একটা জবাবদিহির ভঙ্গি থাকে। চাউনি-টাউনিগুলোও কেমন যেন! কে যে বয়সে বড় বোঝা দায়। চিন্টুকে তিনি খানিকটা বুঝতে পারেন। তিতিকে পারেন না। ওর বন্ধুবান্ধবদেরও না।

অনেকক্ষণ ধরে চান করেও মাথাটা তেমন পরিষ্কার হল না। চোখ দুটো লাল হয়ে ফুলে আছে। ঘুমের বিকল্প আসলে কিছু নেই। পাঁচ সাড়ে পাঁচ থেকে বারোটা একটা পর্যন্ত একটা নিশ্চিন্ত ঘুম ঘুমোতে পারলে ক্লান্তিটা কেটে যেত। কিচেনের দিকে গেলেন তনুশ্রী। বদনেতে প্রমীলাতে গল্প জুড়েছে 'কেউ নেই গো, না ছেলে, মেয়ে, না বউ, একে মা গিয়ে থাকে মানুষটা থম মেরে আছে! আমি তো মুখ দেখে ভয়ে মরি!'

তনুশ্রী কড়া গলায় বললেন, 'প্রমীলা আমায় কড়া করে কফি দিয়ো।'

রান্নাঘরের ভেতরের কথাবার্তা চট করে থেমে গেল। তনুশ্রী পার্লারে এসে বসলেন। মুখটা থমথম করছে। তিন চারটে কাগজ ম্যাগাজিন হোল্ডারের ওপর থাক করা। একটা আলতোভাবে তুলে নিয়ে চোখ বুলোতে লাগলেন। কিন্তু ভেতরে ঢুকছে না। একটা চিটচিটে রাগে ভেতরটা জ্বলছে। একটু পরে বদন ট্রেতে করে তাঁর ব্রেকফাস্ট নামিয়ে দিয়ে গেল। ফলের রসে একটা চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন তনুশ্রী। 'প্রমীলা!' রাগী গলায় ডাকলেন। ঝাড়নে হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল প্রমীলা।

—'জুস তেতো হয়ে গেছে, নিয়ে যাও।'

বিনা বাক্যব্যয়ে জুসটা তুলে নিয়ে গেল প্রমীলা। ওদিকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে পেছন ফিরে বলল, 'চিন্টুদাদা ফিরেছে। ঘুমোচ্ছে ঘরে।'

—'কৃতার্থ হলুম', মনে মনে বললেন তনুশ্রী। যত জ্বালা আমার। কেন রে বাবা! স্বাধীনতা যে যখন ইচ্ছে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদের বালাই ছাড়াই নিয়েছ, কী ছেলে, কী মেয়ে, কী তাদের বাবা! তাদের ফেরা-না-ফেরার দায় আমায় নিতে হয় কেন? আমাকে কথা শুনতে হয় কেন ঝি-চাকরের কাছ থেকে? এই সব জবাবদিহির বাধ্যবাধকতা এক ধরনের পরাধীনতার লক্ষণ। ষোলো বছরের বড় ব্যবসায়ী বরকে এইজন্যে বিয়ে করা হয়নি। কৈফিয়ত চাইবে না বলে, যত খুশি খরচ করবার অনুমতি কিংবা বিনা অনুমতিতে চলবার অলিখিত কাগজে সই করে দেবে বলেই আরও যুবক, আরও কোয়ালিফায়েড পাত্র প্রত্যাখান করে একে নির্বাচন করা!

ব্রেকফাস্ট শেষ করেও অনেক, অনেকক্ষণ একই জায়গায় বসে কাগজ পড়ার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন তনুশ্রী। আজকে সন্ধ্যেবেলায় পার্টি আছে। লাঞ্চ স্কিপ। এখন তিনি প্রতি মুহূর্তেই বিজু রায়কে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে দেখছেন। এভাবেই বারোটা বেজে গেল। তিতি ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। চুলের ওরে তোয়ালে জড়ানো—'মা, খাবে নাকি? দাদাকে ডেকে তুলব।'

—'আমি এ বেলা খাচ্ছি না।'

কেন? জিজ্ঞাসা করার জন্য মুখটা খুলেছিল তিতি। গিলে নিল প্রশ্নটা। তনুশ্রী লক্ষ করলেন। এবং লক্ষ করে বিরক্ত হলেন। নিজের মাকে একটা প্রশ্ন করবে তারও কত ধানাইপানাই! দাদার

ঘর থেকে গম্ভীর মুখে ফিরে আসছে তিনি। দাদাকে তুলতে পারেনি তাহলে! তনুশ্রী ভেতরে ভেতরে এত রেগে গেছেন যে কোনও কথা জিজ্ঞেস করবার দরকার মনে করছেন না। এখান থেকে খাবার টেবিলের একটা দিক দেখা যায়। বাঁ চোখের কোণ দিয়ে। তিতি খাচ্ছে। উঠে গেল। হাত ধুচ্ছে। সামনে দিয়ে খাবার সময়ে বলে গেল, 'মা, দাদা নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। তুলতে পারলুম না। আমি কলেজ যাচ্ছি। লাইব্রেরি হয়ে ফিরতে পাঁচটা বেজে যেতে পারে।' দেখাচ্ছে। আসলে দেখাচ্ছে ওর কত দায়িত্ববোধ। কত শৃঙ্খলবোধ। মাকে বলে যাচ্ছে। একেবারে সময়টা পর্যন্ত বলে যাচ্ছে! কখন ফিরবে, কোথায় কোথায় যাচ্ছে! হুঁ!

তনুশ্রী টেলিফোনটা তুললেন। বিজু রায়ের অফিসে ডায়াল করলেন তনুশ্রী। বেজে যাচ্ছে বেজে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না। আর একটা নম্বর রয়েছে। ডায়াল করলেন।

এবার ধরেছে। 'হ্যাললো।'

—'মিঃ রায় আছেন?'

—'না। উনি এখনও আসেননি। ওঁর অফিসঘর বন্ধ।'

—'কে বলছেন? সাধনবাবু?'

—'হ্যাঁ, আমি সাধন বিশ্বাস। বউদি নাকি?'

বি বি রায়ের অফিসের একমাত্র এই সাধন বিশ্বাসই তনুশ্রীকে বউদি বলে ডেকে থাকেন। তনুশ্রী সেটা মেনে নেন। বহুদিনের লোক। তনুশ্রী বললেন—'শুনুন সাধনবাবু, সাহেব এলেই আমাকে ফোন করতে বলবেন। বাড়ির নম্বরে না পেলে আরেকটা নম্বর দিচ্ছি, সেইখানে।' নম্বরটা বললেন তনুশ্রী।

সাধন বিশ্বাস তাড়াতাড়ি বললেন—'আজ সাহেবের এত দেরি কেন? বুঝতে পারছি না তো! কখন বেরিয়েছেন বাড়ি থেকে। অনেকগুলো দরকারি কাজ আছে...'

বোতাম টিপে কানেকশনটা অফ্ করে দিলে তনুশ্রী। বিজু রায় যে শেষ রাত থেকে বাড়ি নেই এ কথাটা অফিসে জানানো ঠিক হবে কিনা তিনি বুঝতে পারছেন না। তবে এখনও, ফোনটা রেখে দেবার পরও তিনি প্রত্যাশা করছিলেন বিজু রায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসবেন। বা কোনও ফোন আসবে তাঁর।

তবে গিয়ে একবার আয়নার সামনে দাঁড়ালেন তনুশ্রী। ওপরের জোরালো আলোটা জ্বেলে দিলেন। চোখের তলায় বেশ কালি। মুখটা যেন চুপসে আছে। দু রাত্তির পর পর জাগা! সয় নাকি! মুখে-গলায় ভাল করে নারিশিং ক্রিম মেখে তিনি বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। আরেকটা ঘুম দরকার। অ্যালার্মটা সাড়ে তিনটেয় সেট করে দিলেন। কী মনে হল, একবার প্রমীলাকেই ডাকলেন আবার।

—'সাহেব এলে আমায় জাগিয়ে দিয়ো। সাহেবের ফোন এলেও।'

—'সাহেব কি আপিসে আছেন? বউদি!' প্রমীলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

—'না, কাজে অন্য কোথাও গেছেন।' কাঠ-কাঠ গলায় বলে তনুশ্রী আবার মুখটা বালিশের ওপর রাখলেন। প্রমীলার মুখ থেকে দুশ্চিন্তা এবং অবিশ্বাসের ছায়া গেল না। সে আড় চোখে একবার মেমসাহেবের শায়িত শরীরটার দিকে বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে চেয়ে সেখান থেকে চলে গেল। এই মেমসাহেবকে সামনাসামনি সে ভয় করে। পেছন ফিরলে একটুও না। বরং একটা তাচ্ছিল্য, একটু ঘেন্না মেশানো থাকে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে। এই মেয়েছেলেটার পুরো সংসার তার হাতে। সে-ই চালাচ্ছে সব। সে আর বদনই প্রধান। সকাল পাঁচটা বাজলেই দারোয়ান দরজা খুলে দিয়ে ঘুমোতে চলে যাবে। সকালের দারোয়ান এসে বসবে। বদন আরও একটা ঠিকে লোক নিয়ে সমস্ত বাড়ি ঝকঝকে করে পরিষ্কার করবে। টাটকা ফুল তুলে আনবে, তখন প্রমীলা ফুলদানগুলোয় ফুল ভরে ডিনার-টেবিলের ওপর রাখবে। বদন সেগুলো সব জায়গামতো বসাবে। ব্রেকফাস্ট তৈরি করা, সারা দিনে কোন সময়ে কী খাওয়া হবে সে-সব মেনু ঠিক করা—সবই প্রমীলার হাতে। একমাত্র লোক-টোক

খেলে এরা হয় বাইরে থেকে পুরো খাবারদাবার আনায়, নয় কিছুটা বাইরে থেকে আসে। আর কিছুটার জন্য প্রমীলার ওপর খবরদারি করে মেমসায়েব। নিজের রান্নাঘরে কোথায় কী আছে যে জানে না, যার সোয়ামি-পুত্তুরকে অন্য লোকে খাবার বেড়ে দেয়, উপরন্তু যার ঘরের ওপর কোনও আঁট নেই, দিবারাত্তির বেরিয়ে যাচ্ছে আর একেক সময়ে একেক রকম সেজে বাড়ি আসছে আর আয়না দেখছে তেমন মেয়েমানুষের ওপর কোনও শ্রদ্ধা নেই প্রমীলার। সে ইচ্ছা করলেই এ সংসার থেকে অজস্র অপর্যাপ্ত চুরি করতে পারে। করেও। টাকা পয়সা পারে না, কিন্তু অন্যান্য জিনিস, যথেচ্ছ।

যে মানুষটাকে বাইরে ভেতরে উভয়তই ভয় করত সে মানুষটা সাহেবের মা। তিনতলার ঘরে একরকম শোয়াই। নামলেন একেবারে কাঁধে চড়ে। তার আগে একবার উঁকি দিয়ে দেখতেও নীচে নামতেন না। কিন্তু চোখে চোখ রাখতে ভরসা পেত না প্রমীলা। একদিন বদনকে দিয়ে প্রচুর চাল ডাল মশলা বাইরে পাচার করবার পর ওপরে মায়ের খাবার নিয়ে গেছে। মা চোখে চোখ রেখে বললেন—'প্রমীলা, আমার ছেলে-বউ দুজনেই নানা কাজে ব্যস্ত, সংসার দেখতে পারেনা। নাই-পারল। তুই তো রয়েছিস। এদের জিনিস-পত্তর বুক দিয়ে আগলে রাখবি, দেখভাল করবি, আমার ছেলে তোকে ঠকাবে না।'

মা কি ধরে ফেলেছিল সে কী করেছে? অন্তর্যামী নাকি? হতেও পারে। ঘরে সব সময়ে ধূপের গন্ধ, সন্ধে হতেই তুলসীতলায় পিদিম, ঠাকুরের ছবির গলায় ফুলের মালা। সব সময়ে জপ করছে। তো সে মানুষ অন্তর্যামী হলেও হতে পারে। তারপর থেকেই সে একটু সাবধান হয়ে যায়। আর সত্যি কথাই। সাহেব কাউকে ঠকাবার মানুষ না। তার মাইনে বেড়ে-বেড়ে এখন নশো টাকা হয়েছে। সে বেওয়া মানুষ, ছেলে-পুলে নেই। এখানে সে কত সুখে আছে, সেটা থেমে গেলেই টের পায়। দু-এক দিনের বেশি টিকতে পারে না। সেবার তার পেটের একটা বড় অপারেশন হল, তা সরকারের পি. জি. হাসপাতালে রেখে কী চিকিৎসাটাই করালে সাহেব। হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসার পরও একমাস নিজের ঘরে স্রেফ শুয়ে বসে থেকেছে আর খেয়েছে। তখন আর একটা ঠিকে লোক রেখে বদনই কাজ চালাত। তা সে-ই সাহেব মানুষটা রাত্তিরে কাউকে না বলে কোথা গেল গো? বউ-ছেলেমেয়ে কারুরই তো কোনও গা নেই! কিছু একটা মেমসায়েব তার কাছ থেকে লুকোচ্ছে। রকম দেখলেই সে বুঝতে পারে। ব্যাটাছেলেরা যতই যাই হোক নিজের পরিবারের কাছ থেকে একটু যত্ন-আত্তি আশা করে। দিনের পর দিন এতটা অছেদ্দা! লোকটা শেষপর্যন্ত বিবাগী হয়ে গেল গা! এভাবেই প্রমীলা মনে মনে দুই প্রতিপক্ষ খাড়া করে সাহেবের পক্ষ নিয়ে নেয়।

ঠিক চারটের সময়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তনুশ্রী। রাত্রের পার্টির জন্যে তৈরি হতে তিন সাড়ে তিন ঘণ্টা তো লাগবেই। এই বিউটি-সেলুনের ফোন নম্বরটাই সাধন বিশ্বাসকে দিয়ে এসেছেন তনুশ্রী। বিজু রায় এখানে ফোন করলেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। পার্টিটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। বিজু রায়ই বলে দিয়েছেন। পুরনো স্টিভেডোর ফ্যামিলির মেয়ের বিয়ে হচ্ছে বিজনেস ম্যাগনেট কে শর্মার ছেলের সঙ্গে। মেয়ের পরিবারের কানেকশন্‌স্ অসাধারণ। প্রভাবশালী এমন কেউ নেই যাদের সঙ্গে ওদের দোস্তি নেই। বিখ্যাত উইমেনস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ার পার্সন মেয়ের মা। তাঁর সঙ্গে জমিয়ে একটা মেম্বারশিপ আদায় করে নিতে পারলেই, প্রতি বছর কনফারেন্সে কনভেনশনে উড়ে বেড়ানোর একটা সুযোগ খুলে যেতে পারে তাঁর জন্যে। আর তাঁর স্বামীর যে কী সুবিধে হবে, ভাবতে গেলে তনুশ্রী রায় কূল পান না। বাঁকুড়ায় বিশাল একটা জায়গা নিয়ে কী নাকি কারখানা খুলবে। বড় বড় হাউজের সঙ্গে টক্কর লাগিয়েছে বিজু রায়। এই পার্টিতে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, ডি. এম সবাই আসছে। তার ওপর শর্মার সঙ্গে বিজু রায়ের বিশেষ খাতির। শর্মা ওকে সাহায্য করছে। এই ব্যাপারটা করতে পারলে ও বোধহয় ঠিকঠাক শিল্পপতি নামের যোগ্য হবে। ইনডাসট্রিয়ালিস্ট। টপ-নচার। বি. বি. রায় গ্রুপ অফ ইনডাসট্রিজ। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

সেই তনুশ্রী, হ্যাঁ? দুপুরবেলা মর্নিং কলেজ থেকে ফিরে ডেঙর ডাঁটার চচ্চড়ি আর চিংড়ি-পোস্ত দিয়ে ভাত খেতে বসত মায়ের সঙ্গে! বাবা ফিরলেই সন্ধেবেলা সামনে বসে বসে রাজ্যের শার্টে পাঞ্জাবিতে বোতাম বসাও, মোজা রিফু করো, সারাদিন কী করেছ তার ফিরিস্তি দাও। পাঁচ পাঁচখানা মেয়ের বিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক কেমন খ্যাপা-পাগলা মতন হয়ে গিয়েছিলেন। উঠতে-বসতে বলতেন, রূপেগুণে পার হও।' ময়লা জামা-কাপড় পরে থাকলে, চুল না বাঁধলে কী বিরক্তই না হতেন। 'টিপ দাওনি কেন কপালে? পাটভাঙা কাপড় পরবে সব সময়ে। গলার যে হারখানা গড়িয়ে দিয়েছিলুম পরোনি কেন? আমার ছেরাদ্দের খরচে লাগবে বলে তো আর দিইনি। মেয়েদের সাজসজ্জা অলঙ্কারেই শ্রী। কখনও শ্রীহীন থাকতে যেন না দেখি!'

মা একেক সময় বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'তোমার এক বাই হয়েছে। মেয়েদের ব্যাপারে তোমার অত নজর কেন! এ কেমন ব্যাটাছেলে রে বাবা!'

'সাধে হয়নি, একদিনে হয়নি', বাবা বলতেন, 'তুমি সব হিসট্রিটাই জানো। তবু বলবে বাই?'

সম্বন্ধটা যখন এল, ঘটক বলেছিল, 'বয়সে একটু বড় ঠিকই। কিন্তু এসট্যাবলিশ্‌ড পাত্র পেতে গেলে বয়সের দিকে তাকালে তো চলবে না। দেখলে বুঝতেই পারবেন না। একমাথা চুল, দোহারা চেহারা, খাটিয়ে লোক, এইবারে বিয়ে করে থিতু হতে চাইছে, মানে বেশ ভালই জমিয়ে নিয়েছে। দায়িত্বঅলা লোকেদের রকম-সকমই আলাদা।'

বিজু রায়কে তনুশ্রী প্রথম দেখেন মামার বাড়ির এক নেমন্তন্নে। এল স্যুট-টাই পরা সাহেব। একটা হাজার টাকার গিফ্‌ট্‌ চেক উপহার নিয়ে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে চলে গেল। গ্ল্যামারাস। এক দেখায় পছন্দ হয়ে গেল। তখন সুবিমলের সঙ্গে জোর প্রেম চলছে। সুবিমল মার্চেন্ট অফিসে কাজ করে, টাই-ফাই হাঁকাক আর যাই করুক অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে কেরানিই। বাড়িতে বেশ কিছু পোষ্য। এক ভারাক্রান্ত সংসার থেকে আরেক ভারাক্রান্ত সংসারে যেতে মনে মনে ইতস্তত করতে শুরু করেছে তনুশ্রী। জীবনে অ্যাডভেঞ্চার চাই। সুবিমল ভিতু-ভিতু, ক্লান্ত, যেন এখন থেকেই হেরে বসে আছে। বি. বি. রায়ের পাশে সুবিমল যেন রেসের ঘোড়ার পাশে ছ্যাকরাগাড়ির ঘোড়া। একদিন ছুতো করে খুব ঝগড়া করল তনুশ্রী, কাপুরুষ, অকালবৃদ্ধ, ন্যাকাচণ্ডী। সুবিমল রাগ করে সম্পর্ক ছেদ করল। এটাই চাওয়ার ছিল। মাস তিনেকের মাথায় বিজু রায়ের সঙ্গে বিবাহ এবং আন্দামান আইল্যান্ডস্‌-এ হনিমুন। সেই প্রথম তনুশ্রী বারমুডা পরল, সুইমিং কসটিউম পরল। তা তারপর থেকে কোনও জিনিস চেয়ে পায়নি এমন হয়নি। নাকটা বোঁচা ছিল, ঠিকঠাক করিয়ে নিয়েছে, তিনটে ল্যাংঙ্গোয়েজ কোর্স করেছে, ইংরিজি ছাড়া আর দুটোই অবশ্য আধা-খামচা, বিউটিশিয়ানস কোর্স, কুকিং এসবও হয়েছে। তা এখন সে সব দিন গত। এখন উৎসাহ অন্য খাতে। অ্যাডভেঞ্চারের জৌলুস আর কুকিং-ফুকিং-এ ল্যাংঙ্গোয়েজ-টেজ-এ পাওয়া যায় না।

বিউটি-সেলুনে ফেসিয়াল, ওয়্যাক্সিং ম্যানিকিওর, পেডিকিওর সব করার পর চুল-টুল সেট করে আপাদমস্তক সাজগোজ শেষ হয়ে গেলে ওদের চারদিকের আয়নায় নিজের ভায়োলেট জামেয়ার শাড়ি-পরা চেহারাটা দেখে নিজেই চমৎকৃত হয়ে গেলেন মিসেস রায়।

সাড়ে সাতটা নাগাদ সাজগোজ শেষ হলে তাঁর খেয়াল হল প্রত্যাশিত ফোনটা আসেনি। সেলুন বন্ধ হবার মুখে, চিনে মেয়েগুলো বিরাট বিরাট হাঁ করে হাই তুলছে, তনুশ্রী টিপ টিপ করে ফোন করলেন—'কী বললেন? নেই? কখন বেরিয়েছেন? সে কী? সেই সকাল থেকেই আসেননি? সমর কোথায়?' ঘড়ি দেখতে দেখতে সমরের জন্যে অপেক্ষা শুরু হল। 'আমি সমর বলছি মেমসাহেব, সকাল থেকে গাড়ি নিয়ে প্রথমে বাড়িতে তার পরে অফিসে এসে অপেক্ষা করছি, সায়েব এলেন না।' সমরের গলায় উৎকণ্ঠা। ফোনটা রেখে দিলেন তনুশ্রী। আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। বিজুকে ছাড়া পার্টিতে যাওয়া একটু অকওয়ার্ড। কিন্তু বিজু রায়_যে কারণেই ভোরবেলা থেকে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে থাকুন এই পার্টিতে তাঁর টিকি বাঁধা আছে। এখানে তাঁকে আজ আসতেই হবে। এখন একাই

যেতে হবে। বাহানা কিছু বানাতে হবে একটা। এতক্ষণ সময় এবং টাকা খরচ করে এই ভুবনভোলানো মেকাপ হল...এরপর...। মুহূর্তে মনঃস্থির করে তনুশ্রী বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসলেন। ড্রাইভারকে বললেন—'চলো গুরুসদয়।'

গেটের কাছেই শর্মা। দুরকম রঙের গাঁদাফুল দিয়ে আজকাল গেট সাজায়। পুরো গেটটাই ফুলে ফুল। হলুদ আর কমলা। সবুজের ওপর হলুদের নক্‌শা। ডেকোরেটররা বানায় আজকাল সব একরকম। মিসেস শর্মা অবধারিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন—'কী ব্যাপার? মিঃ রায়? কি পরে আসছেন?'

তনুশ্রী অনেকক্ষণ ধরে একটা উত্তর ভেবে রেখেছিলেন। 'ভীষণ জ্বর এসেছে বুঝলেন? একেবারে হঠাৎ! তো আমরা ঠিক করলাম কেউ একজন না এলে...'

কিন্তু আসল পরিস্থিতিটার মুখোমুখি হলে বুদ্ধির চর্চা যারা করে তাদের বুদ্ধি অনেক বেশি খুলে যায়। সত্যি কথা বলতে কি বিত্তবানদের জ্বর-ফর হয় না। হয় হার্ট অ্যাটাক, সিরোসিস অফ দা লিভার, বড় জোর হাই ব্লাড সুগার, প্রেশার। এই পর্যন্ত। জ্বর-ফর এলেবেলে ব্যাপার। তনুশ্রী নিজেকে বলতে শুনলেন—'আর বলবেন না, আমাকে সাতটায় ফোন করল, কী নাকি ভীষণ জরুরি কাজে আটকে গেছে। বলল "তুমি এখুনি চলে যাও। আমি একটু পরে, কাজটা সেরে যাচ্ছি।" তো এত তাড়াতাড়ি কথা বলেই ফোনটা রেখে দিল আমি জিজ্ঞাসা করতেও সময় পেলাম না, কী কাজ, কোথায় কতক্ষণে আসবে।'

মিসেস শর্মার প্রশ্নের ফলেই এই জবাবটা তৈরি হয়ে গেল। ধন্যবাদ মিসেস শর্মা। যদিও তোমাকে হাড়গিল্লে ঠাকুরানি বলি আমরা কজন আড়ালে। যদিও তুমি প্রচণ্ড জেলাস!

মিঃ শর্মা বললেন, 'সে কী? রায় আটকে গেল?' সঙ্গত কারণেই তিনি খুব চিন্তিত। বাঁকুড়ার ব্যাপারটা বোধহয় রায়-শর্মা গোছের কিছু। তনুশ্রী বিশদ জানেন না।

মিসেস শর্মা বললেন 'এসো তনুশ্রী আমার বউমার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।'

জায়গাটা বিরাট। খোলা আকাশ ওপরে। মাঝে মাঝে শামিয়ানা-ঘেরা নানান আয়োজন। খোলা জায়গাটায় ফুলের টব, গাছগুলোতে টুনি জ্বলছে। লম্বা লম্বা হ্যালোজেন বাতি। মিসেস শর্মার বউমা হাতে টোম্যাটো জুস নিয়ে আরও কয়েকজন প্রায় সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল।

'এই যে প্রমা, দিস ইজ দা গ্ল্যামার-কুইন অফ আওয়ার সেট তনুশ্রী রায়। তোমাকে আগেই বলেছিলাম!'

জুসটা সঙ্গে সঙ্গে কাছের টেবিলে রেখে খুব পাতলা লম্বা দুটো হাত জোড় করে নমস্কার করল প্রমা, নতুন বউ। এত ফর্সা আর এত রোগা যে নীল শিরাগুলো যেন দেখা যাচ্ছে, গালে হাতে। ফুটে ওঠেনি এখনও। একটা নীলচে ছায়া মতন। একটা গরদ-রঙের ভারী সিল্কের শাড়ি পরেছে। পাড়টা বিরাট চওড়া ঢালা সোনালি জরিতে আর একটা অদ্ভুত হলুদে। অনেক সোজা চুল মেয়েটির। কোমর পর্যন্ত। খোলা। চলার তালে সাটিনের ঝিলিক মেরে ঢেউ খায়। কানে হীরের কান। গলায় একটা সরু হীরের হার ঝিকঝিক করছে। ডান হাতে দু-চার গাছি সোনার চুড়ি। আর সিঁথিতে সিঁদুর। একটা টিপ নেই। লিপস্টিক নেই, কোনও প্রসাধন নেই। অদ্ভুত! সাদা শাড়ি পরা, নির্গহনা, বা এত কম গহনা, সব কিছুতে ম্যাচিং নেই, এরকম বউ তনুশ্রী কখনও দেখেননি। নতুন বউ বলে বোঝাই যাচ্ছে না। বেশ নিচু গলায় নমস্কারটা বলল। অত নিচু গলা অথচ বেশ স্পষ্ট, পরিষ্কার শোনা গেল। পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড্ড বেশি প্রসাধিত, ভীষণ উচ্চকিত লাগছে তনুশ্রীর। যদিও প্রমার বা অন্য কারও দৃষ্টিতে সেরকম কোনও ইঙ্গিত নেই। তনুশ্রী একটুখানি দাঁড়িয়ে কথা বললেন, ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল বলে যত তাড়াতাড়ি পারেন চেনা অন্য এক মহিলার শরণ নিলেন। মিসেস চৌবে। তারপর কে যেন কখন তাঁকে আইসক্রিম পার্লারে ঢুকিয়ে নিল। সেইখানে নিজের বৃত্তের সঙ্গে ফেমিনিজমের বিষয়ে আলোচনায় অনেকক্ষণ মত্ত হয়ে রইলেন তনুশ্রী রায়। প্রমার মায়ের সঙ্গে এখানেই আলাপ হল। দেখে আশ্বস্ত হলেন তনুশ্রী, ইনি মেয়ের চেয়ে বেশি সেজেছেন। অত্যাচারিত মেয়েদের নিয়ে

এঁর সঙ্গে তনুশ্রী অনেকটা সময় আলোচনা করলেন। প্রমার মা রাধা চ্যাটার্জির কাছ থেকে তাঁদের অ্যাসোসিয়েশনের পরবর্তী অধিবেশনে নিমন্ত্রণের একটা প্রতিশ্রুতি আদায় হয়ে গেল। সেমিনার হবে বিভিন্ন বিষয়ে। মিসেস চ্যাটার্জি বললেন কার্ড পাঠাবেন। তনুশ্রী যেন অবশ্যই আসেন। ইতিমধ্যে ললিতা বিশ্বাসের সঙ্গে প্রমাকে নিয়েও খানিকটা মনোজ্ঞ আলোচনা হয়ে গেল।

—'জানো না? ও মা! ও তো সাদা ছাড়া পরে না।'

—'কারণ কী?'

—'ওর ওটাই স্টাইল, তবে মন্দ লোকে অন্য কথা বলে।'

—'যেমন!'

—'কাউকে বোলো না। কাজিনের সঙ্গে বাল্য প্রেম। কাজিন মারা গেছে বছর পাঁচেক হল। ব্লাড ক্যানসার। সেই থেকে সাদা।'

—'এদিকে বিয়ে করছে। ওদিকে সাদা!'

—'ওই তো বলে কে?'

—'ফার্স্ট কাজিন নাকি?'

—'তবে? যত বড় ঘর তত কেচ্ছা!' ললিতা বিশ্বাস কথাটা কেমন আক্ষেপের সুরে বললেন। আক্ষেপের হাওয়া তনুশ্রীর মনেও লাগল। ইস্‌স্‌, তাঁর বাড়িতে কোনও কেচ্ছা নেই, কেচ্ছা না থাকলে উচ্চ কোটির লোক বলে গণ্য হওয়া মুশকিল বোধহয়। হঠাৎ মনে হল কেচ্ছা ছিল না, কিন্তু শুরু হয়েছে একটা। বোধহয়। বিজু রায়ের সহসা নিরুদ্দেশ হওয়াটা...। কোনও মহিলাঘটিত ব্যাপার যদি হয়? সোজা কথায় ঢেঁকির পাড় পড়ল তনুশ্রীর বুকের মধ্যে। সে ক্ষেত্রে তো জীবনের ভিতটাই ধসে যাবে! বিজু রায় তাঁর আছেন বলে তিনি তনুশ্রী রায়। তিনি এই তিনি সেই। যে মুহূর্তে বিজু অন্যের হয়ে যাবেন, যত সহানুভূতিই তাঁর জন্যে লোকে দেখাক, তার আয়ু বেশিদিন থাকবে না। উপরন্তু বিজু রায় যেখানে যাবেন তাঁর বিত্ত, তাঁর সামাজিক সুযোগ সুবিধাও যাবে সেই দিকে। তাঁর স্বামী আটান্ন উনষাট হতে পারে। দেখায় না। এরকম বয়সে যাকে বলে ভিন্ন মেয়ের চক্করে কি আর লোকে পড়ে না? পড়েই থাকে পুরুষরা।

বসাক ব্যস্ত হয়ে ঢুকে বলল—'আরে ও কী ভাবী তুমি এখানে! ওদিকে রায় তো এখনও এল না, শর্মাজি বলছেন মিনিস্টারের সঙ্গে তোমাকেই আলাপ করতে হবে। কাম অন, কুইক!'

খোলা আকাশের নীচে গার্ডেন চেয়ার পাতা রয়েছে। কাছাকাছি গাছ থেকে আলোর ছটা স্নিগ্ধ হয়ে পড়ছে। হাতে হাতে ঘুরছে গেলাস। এখানটাতেই সবচেয়ে মধু আছে মনে হচ্ছে। থিকথিকে লোক। সকলেই অবশ্য পরস্পরের মধ্যে ভদ্র দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিনিস্টার, প্রতিমন্ত্রী, ব্যুরোক্র্যাটরা এখানে। শর্মাজি, বসাক, পাইন এবং আরও কিছু ভীষণ মোটা, রাশভারী চেহারার শিল্পপতিকে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তনুশ্রী। মিসেস শর্মাই আপ্যায়ন করছিলেন এঁদের। তনুশ্রীকে দেখে তাড়াতাড়ি মিনিস্টারের সঙ্গে আলাপ করালেন। হঠাৎ তনুশ্রী দেখলেন মিনিস্টারের চোখ আটকে গেছে। মিসেস শর্মার ইঙ্গিতে তিনি মিনিস্টার আর তাঁর ডিরেক্টরের মাঝখানে বসলেন। মিনিস্টার তাঁকে তাঁর হবি-টবির কথা জিজ্ঞেস করছেন। তনুশ্রী জানাচ্ছেন উচ্চাঙ্গসঙ্গীত। হ্যাঁ হ্যাঁ কনফারেন্স গিয়েছিলেন বই কি! আজকেরটাই শর্মাজির ছেলের জন্য স্যাক্রিফাইস করেছেন। কণ্ঠসঙ্গীতের মান নেমে গেছে মিনিস্টার তাঁর সঙ্গে একমত। মিনিস্টার বলছেন সে সব গান তাঁর শোনবার কথা নয়, যদি শোনাতে পারতেন। তনুশ্রী জানাচ্ছেন তিনি শুনেছেন খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি উচ্চাঙ্গের ভক্ত। বাড়িতে ট্র্যাডিশন? ছিল বই কি! বাবা তো ভীষণ ভাল সেতার বাজাতেন। মা শ্যামাসঙ্গীত। না তিনি কোকিল বংশে কাক। উঁহুঃ, পিয়ানো বাজান। সে তেমন কিছু নয়। তনুশ্রী কথাবার্তার মাঝে মাঝে কিছু ফরাসি ঢুকিয়েছেন। মিনিস্টার স্বভাবতই সেগুলো বুঝতে পারেননি। কিন্তু বিস্মিত মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে

দেবেন বলছেন। ছোট্ট পার্টি, মিনিস্টার, তাঁর স্ত্রী। ডিরেক্টর, তাঁর স্ত্রী, তনুশ্রীরা হাজব্যান্ড-ওয়াইফ এবং শর্মারা। মিনিস্টার বললেন তাঁর স্ত্রী আসতে পারবেন কি না বলা যাচ্ছে না, কারণ তিনি সম্প্রতি গুরু নিয়ে ভীষণ মেতেছেন। গুরুদের সম্পর্কে তনুশ্রীর কী মত। তিনি গুরু করেছেন কি না জানতে চাইছেন মিনিস্টার, কৌতূহলের জন্য ক্ষমা চেয়ে। তনুশ্রী সামান্য একটু শ্রাগ করে গুরু সম্পর্কে তাঁর মত বোঝালেন। না গুরু তিনি করেননি। রামকৃষ্ণ কিংবা অরবিন্দ বেঁচে থাকলে করে ফেলতেন সন্দেহ নেই। সকলেই খুব তারিফের হাসি হাসল। এইভাবে নরম পানীয়র গ্লাস হাতে একবার এদিকে ঘাড় হেলিয়ে আর একবার ওদিকে ঘাড় হেলিয়ে বকতে বকতে তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন বিজু রায়ের জন্য উদ্বেগটা। ডিনারের জন্য এঁরা সবাই উঠতে শর্মাজি চোখের ইশারায় ডাকলেন, অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, বিজু রায় ক্যান বি থ্যাঙ্কফুল যে তাঁর কাজটা তাঁর ওয়াইফই অর্ধেক করে দিয়েছেন। দুম করে কথাটা আবার মনে পড়ে গেল তনুশ্রীর।

—'আচ্ছা, ও এখনও আসেনি?'

হতাশ গলায় শর্মা বললেন, 'কই! দেখছি না তো!"

রাত সাড়ে নটা। তিনি বাড়িতে একটা ফোন করলেন।

—'মা? তুমি কোথা থেকে বলছ?'

—'শর্মাজির ছেলের বিয়ের পার্টি। তোমার বাবা জানে। তার আসা ভীষণ জরুরি ছিল। ইন ফ্যাক্ট আমি ভাবছিলাম এখানেই ও টার্ন আপ করবে।'

—'বাবার দেখা নেই। অফিস থেকেও অনেকবার ফোন এসেছে। সাধন কাকা বলছেন খুব জরুরি সব সিদ্ধান্ত নেবার ছিল।'

—'আশ্চর্য! তোমার দাদা কোথায়?'

—'এইমাত্র ফিরল।'

—'জানে?'

—'সকালে বোধহয় প্রমীলাদির কাছ থেকে শুনে থাকবে। এখন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল। মা তুমি তাড়াতাড়ি এসো, এবার আমাদের কিছু একটা ঠিক করতে হয়।'

ফোন ছেড়ে তনুশ্রী দেখলেন তাঁর শীত শীত করছে। দু চোখে উৎকণ্ঠা নিয়ে তিনি সুবেশ পুরুষ-সমুদ্রের মধ্যে আর একবার বিজু রায়কে খুঁজলেন। না, আসেনি। ডিনারে প্রায় কিছুই তেমন উপভোগ করতে পারলেন না। যদিও মিসেস শর্মা নিজে তাঁর সঙ্গে বসেছিলেন।

রাত এগারোটা নাগাদ অনেক কষ্টে মিনিস্টারের কবল ছাড়িয়ে বাড়ির পথ ধরতে পারলেন তনুশ্রী। বাইরে কিছু দূরে প্রচুর বিসদৃশ ময়লা জড়ো হয়েছে। বেশ কিছু ভিখারি বাচ্চা। সেই সঙ্গে ঘেয়ো কুকুর, তাড়ালেও যাচ্ছে না। আতিপাতি করে জঞ্জালের পাহাড় খুঁজছে।

বাড়িটা থমথম করছে। সর্বাঙ্গে আলো। রাত বারোটার কাছাকাছি এইরকম আলোময় বাড়ি, অথচ মনে হচ্ছে ভূতের বাড়ি। বারান্দায় মেয়েকে যেন বসা দেখতে পেলেন তনুশ্রী। দরজা খুলে দিল বদন। খুটখুট করে দোতলায় উঠতে উঠতে নিজের জুতোর শব্দে নিজেরই গা ছমছম করতে লাগল। পেছনে প্রমীলা আসছে। পার্লারে পৌঁছে দেখলেন তিতি এসে বসে আছে চিন্টুর ঘর থেকে মৃদু স্বরে রক মিউজিক আসছে ভেসে। চিন্টুও এসে দাঁড়াল। ছেলেকে বোধহয় দেড়দিন পর দেখছেন। এত ঘুমিয়েছে যে মুখচোখ কী রকম অস্বাভাবিক ফুলে গেছে। থমথমে মতন হয়ে রয়েছে মুখটা।

তনুশ্রী বসতে তিতি বলল, 'সমরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি।'

চিন্টু তার দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। অপ্রাসঙ্গিকভাবে তনুশ্রী বললেন, 'খেয়েছ তোমরা?'

—'হ্যাঁ' তিতি জবাব দিল।

তনুশ্রী বললেন, 'চিন্টু কাল রাতে ফেরোনি কেন? কোথায় ছিলে?'

—'সেইটা কি খুব জরুরি? এখন এই সিচুয়েশনে?' চিন্টুর গলায় যথাসম্ভব বিরক্তি।

—'হ্যাঁ জরুরি। একজন কাল রাতে বা আজ ভোরে কাউকে না বলে কোথাও গেছেন ফিরছেন না। এটা তোমার ক্ষেত্রেও হতে পারত। কী করতাম আমরা?'

—'চিন্টু বলল, যদি নিয়ে কথা হচ্ছে না। আমি ফিরেছি। বস ফিরছে না। বস ফিরছে না বলে কি আমার ওপর রিভেঞ্জ নেবে না কি?' সে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

সমর এসে গেছে। বলল, 'কোনও খবর পাওয়া গেল সাহেবের?'

—'সেটা তো আমরাও তোমায় জিজ্ঞেস করতে পারি', তনুশ্রী বললেন।

তনুশ্রীর বলার ভঙ্গিতে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল সমর। সে বলল, 'আমি তো সকাল নটা চল্লিশে যেমন আসি এসে গেছি। নীচে অপেক্ষা করছি। বারোটা বাজল দেখে বদনকে জিজ্ঞেস করলুম তো বলল সাহেব আগেই চলে গেছেন। গাড়ি নিয়ে আমি অফিসে গিয়ে বসে আছি তখন থেকে। চ্যাটার্জিসাবের অফিস থেকে একটা প্যাকেট আনতে বলে রেখেছিলেন কালকে। সেটা এনে আবার অফিসে। বিশ্বেসবাবু বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন আমি কিছু বলতে পারিনি।' তনুশ্রী বললেন, 'প্যাকেট? কী প্যাকেট?'

—'আছে গাড়িতে। দেখবেন?' কিছু একটা করতে পেরে সমর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

একটু পরে প্যাকেটটা এনে দিতে তাড়াতাড়ি সেটা খুললেন তনুশ্রী। চিন্টু আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্যাকেটের মধ্যে একটা ওয়াইনের বোতল দমপেরিওঁ, সাতশো পঞ্চাশ মিলিমিটারের। একটা শ্যানেল নং ফাইভ সঙ্গে। প্রচুর কুচো কাগজ দিয়ে প্যাক করা জিনিসগুলো।

তিতি মায়ের মুখের দিকে তাকাল। মেকাপের তলায় ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে তনুশ্রীর মুখ। সে প্রমীলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাতে বাবা খাওয়া ছেড়ে উঠে গেল, তারপর কী হল? কোথায় গেল? বলো তো ভাল করে।'

—'তেতলায় উঠে গেলেন।'

—'তেতলায়? আগে বলোনি তো!' তনুশ্রী বললেন।

—'সারারাত তেতলাতেই ছিল?' তিতি বলল।

—'তা আমি কী করে জানব? চিন্টুদাদার জন্যে আরও খানিক সবুর করে আমি নীচে শুতে চলে গেছি। যতক্ষণ ছিলুম ওপরে খুটখাট আওয়াজ শুনেছি। এখন বুঝতে পারছি খুব রেগে গেসলেন রাত্তিরে। ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। আমি তো ভয়ে মরি।'

চিন্টু বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা তুমি এবার যাও। তোমরা যাও বদন, সমর যাও।'

যাবার ইচ্ছে ছিল না কারুরই। কিন্তু আদেশ জারি হয়ে গেছে। আর থাকা চলে না। অনিচ্ছুকভাবে চলে গেল তিনজনে।

চিন্টু বলল, 'ইটস ডেফিনিটলি আ কেস অব কিডন্যাপিং।'

তনুশ্রী ফ্যাকাশে মুখে বললেন, 'কী করে জানলে?'

—'বুঝতে পারছ না? একটা হিউজ অ্যামাউন্ট ক্যাশ চেয়েছিল বসের থেকে, বস সেটা দিতে চায়নি। লাইফ-রিস্ক নিয়েছে। আমাদের একটা হিন্ট দেবার কথা ভেবেছিল। কাউকে বাড়িতে পায়নি। তাই রেগে গেছিল। তেতলায় সেফটির জন্যেই উঠেছিল। এখন গ্যাঙের লোকেরা আগে থেকে সেখানে ছিল কি না। বসকে ক্লোরোফর্ম করে, শেষ রাতের দিকে বিরজু ঘুমোলে নিয়ে গেছে কি না কে বলবে। হয়তো শিগগিরই আমাদের কাছে র‍্যানসম চেয়ে চিঠি আসবে।'

তিতি আর থাকতে পারল না, বলল, 'এই ফোর্থ ক্লাস থ্রিলারই কি একটু আগে চিত হয়ে পড়ছিলি?'

চিন্টু বলল, 'ফোর্থ ক্লাস থ্রিলার? দিস ইজ হোয়াটস হ্যাপনিং অ্যারাউন্ড। পেপার পড়িস? আর তা নয়ত বি. বি. রায়ের মতো একটা টু হানড্রেড পার্সেন্ট সলভেন্ট লোক উইথ সো মেনি আয়রনস্ ইন দা ফায়ার, হঠাৎ ওয়ান ফাইন মর্নিং গেটস আপ অ্যান্ড ডিসাইডস হি উড ওয়াক আউট? কোনও সেন্স আছে এ গল্পটার? তিতি বলল, 'কে বলতে পারে বাবার মনের মধ্যে কী ছিল?' বলেই সে

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পারল তার মুখ থেকে একটা ভীষণ সত্যি কথা বেরিয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে বলল, 'আমরা কেউই বোধহয় জানি না, বাবা...বাবা কী ভাবত, কী ছিল বাবার মনের মধ্যে। আচ্ছা মা, তুমি বলতে পার বাবার স্পিরিচুয়াল লীনিংস ছিল কি না!'

তনুশ্রীর মনে পড়ল লালাবাবু বলে কে একজন হঠাৎ সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে যান। একটা এই জাতীয় পদ্য পড়েছিলেন কোনও সময়ে। কিন্তু স্পিরিচুয়াল লীনিংস বিরজু রায়ের! মাস কয়েক আগে একজন বাবা এসেছিলেন এদিকে। দলে দলে লোক তাঁকে দেখতে, তাঁর কীর্তন শুনতে যাচ্ছিল। তনুশ্রীদের দলের অনেকেই যায়। তনুশ্রী বিজুকে বলেছিলেন দুজনে যাবার কথা। বিজু রায় বলেন, 'বাবা ফাবা ওসব বুজরুকের জন্যে আমার সময় নেই। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি যাও না, কে বারণ করেছে! তবে মজে যেয়ো না, এসব বাবারা ডেঞ্জারাস হয়।'

তনুশ্রী বললেন, 'না।'

—'কিন্তু মা, ঠাম্মা কীরকম রিলিজিয়াস ছিল, বাবা তো ঠাম্মার সঙ্গে রোজ নিয়ম করে খানিকটা সময় কাটাত। কী করত তখন? তাছাড়া একটা কথা আমাদের মনে হয়নি, ঠাম্মা মারা গেছে, অক্টোবর মাসে আর এটা ডিসেম্বর।'

—'তো কী?' চিন্টু বলে উঠল, 'সেঞ্চুরি করতে আর কটা বছর বাকি ছিল ঠাম্মার? মারা যাবে না তো কি চিরদিন বসে থাকবে?'

তনুশ্রী বিরক্তি হয়ে বললেন, 'তুমি থামো। তোমার ঠাম্মাকে তোমার বাবা ভীষণ ভালবাসত। তিতি ঠিকই বলেছে।'

—'বস ভালবাসত? ঠাম্মাকে? কী করে বুঝলে?' ঠাট্টার হাসি চিন্টুর গলায়। 'হি ওয়াজ আ মানি-স্পিনিং মেশিন। কীভাবে আরও টাকা, আরও আরও কামানো যায় সবসময়ে তাই-ই ভাবত। অ্যান্ড হি ওয়াজ মেড আপ অব ডিউটিজ, ফর্ম্যালিটিজ। রোজ বাঁধা আধ ঘণ্টা সময় দিত ঠাম্মাকে। ছোটতে মনে আছে কী একটা বানাচ্ছিলাম, মাঝে মাঝে হেলপ করছিল। হঠাৎ ঘড়ি দেখে উঠে পড়ল। আমি বললাম কোথায় যাচ্ছ ড্যাড, বোসো না! বলল, 'তোমার জন্য নির্দিষ্ট সময় ছিল পঁয়তাল্লিশ মিনিট, পার হয়ে গেছে মাই বয়।' উঠে পড়ল। এক সেকেন্ডও দাঁড়াল না। হুঁঃ!'

তিতি বলল, 'মা একবার ওপরে গেলে হয় না?'

তনুশ্রী উঠে পড়ে বললেন 'চলো। চিন্টু তুমিও চলো। ওদের কাউকে ডাকব? বিরজু, সমর?'

'তুমি কি এখনও দাদার গল্পটার ঘোরে রয়েছ?' তিনি জিজ্ঞেস করল।

ঘরে ঢুকতেই শাশুড়ির নতুন করা ফটোগ্রাফটা যেন সকৌতুকে তাকাল তনুশ্রীর দিকে। এটা অনেক আগেকার ছবি। এই বাড়িতে নতুন আসার পর তোলানো বোধহয়। তারপর থেকে আর ফটো তোলবার কোনও সুযোগ হয়নি। তনুশ্রীর সব কিছু মেনে নিতে পারতেন না ভদ্রমহিলা। একটু টিকটিক করতেন। বিরক্তিকর। কিন্তু কোনও দিন জোর করে কিছু চাপাননি। বা খুব অশান্তি টশান্তি করেননি। ক্রমশ ক্রমশ ওপরে বন্দী হয়ে গেলেন, আর নীচে নামতেন না। ওপরে যাবার সময়ে পেড়ে শাড়ি পরে, মাথায় ভাল করে সিঁদুর দিয়ে, হাতে লোহা গলিয়ে যেতে হত। শখের গয়না পরলে বলতেন—'কেন বউমা, বিজু যে তোমায় সবসময়ে ব্যবহারের জন্যে পাঁচ ভরির মটরমালা গড়িয়ে দিল? গলায় ও সব পুঁতি-টুতি পরেছ কেন? এয়োস্ত্রী মানুষকে কি ওসব মানায়?' আস্তে আস্তে নিয়ম করে ওপরে যাবার অভ্যাস চলে গেল তনুশ্রীর। উনি কিছু বলতেন না। তিন চার দিন পরে পরে হয়ত একবার ওপরে যাবার সময় হল, মন হল। চুল কেটে ফেলার পর, ভাল করে ঘোমটা দিয়ে যেতেন। প্রথম প্রথম বুঝতে পারেননি। একদিন দমকা হাওয়ায় অসাবধানে ঘোমটা খসে যেতে অনেকক্ষণ চেয়েছিলেন। চুলের দিকে। কিছু বলেননি।

ছাতের দিক থেকে দমকে দমকে ফুলের মিশ্র গন্ধ ঢুকতে লাগল। চিন্টু ছোটবেলায় ঠিক যে মাত্রায় ঠাম্মা ভক্ত ছিল বড় হতে হতে ঠিক সেই মাত্রায় উদাসীন হয়ে গিয়েছিল। খালি উপদেশ

দেবে, নাতি বড় হয়ে গেছে বুঝতে চাইবে না। ও মেয়েটা কে দাদু? তোমার সঙ্গে বাড়ি ঢুকল! তোমার বন্ধু! বাবা-মা জানে? দুপুরে তো বাবা-মা কেউ ছিল না! কেউ না থাকলে মেয়ে-বন্ধু বাড়ি এনো না! একদিন চিন্টু রেগে বলেছিল, 'আমার ঘরে তোমায় পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাব নাকি? দেখে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে।'

—'ফ্ল্যাট হয়ে যাবার মতন আবার কী রেখেছ ঘরে?'

—'সে গেলেই দেখতে পাবে!'

—'তোমার বাবা-মা দেখেছে তো? তাহলেই হল। আমার আর দেখে কাজ নেই।'

—'ওল্ড হ্যাগ'—মনে মনে বলত চিন্টু।

এ ঘরে নিচু খাট ঢোকাতে চেয়েছিলেন বিজু। মা রাজি হননি। তাঁর পুরনো পালঙ্ক সুজনি ঢাকা পড়ে আছে। আলমারিতে চাবি নেই। তিতি একটু হাত দিতেই খুলে গেল. পুরনো দিনের পেল্লাই আলমারি।

তিতি বলল, 'মা এটা কিন্তু খোলা।'

তনুশ্রী বললেন, 'কী হাতি ঘোড়া থাকবে ওর মধ্যে?' তাঁর অধৈর্য লাগছে। কোনও কাজের কাজ হচ্ছে না, এরা শুধু ছেলেমানুষি করছে। আলমারির দুটো তাক ভর্তি ঠাম্মার জামাকাপড়। আর একটাতে ঠাসা গরম জামা। ঠাম্মা খুব শীতকাতুরে ছিল। ড্রয়ারগুলো টেনে টেনে দেখছে তিতি।

—'মা এ চাবিটা কী?'

—'সিন্দুকের চাবি,' ক্লান্তভাবে বলে শাশুড়ির বিছানায় ধুপ করে বসে পড়লেন তনুশ্রী।

—'সিন্দুক! খোল তিতি!' চিন্টু উত্তেজিতভাবে বলে উঠল।

কয়েকবার চেষ্টার পর তিতি খুলে ফেলল সিন্দুকটা। দুটো তাক। ওপর নিচ একদম খালি। 'চিন্টু বলল, 'মা। হিয়ার অ্যাট লাস্ট ইজ সাম ক্লু।'

তনুশ্রী সিন্দুকের শূন্য গহ্বরটা দেখছিলেন। বললেন, 'কী থাকবে ওর মধ্যে? কিছু ছিল না।' ফাঁকা সিন্দুক এভাবে কেউ চাবি দিয়ে রাখে না। বাবা নিশ্চয় এর মধ্যে আনডিক্লেয়ার্ড মানি, সোনার বিস্কিট ফিস্কিট রাখত।'

তিতি বলত, 'মা, ওদিকে একটা সুটকেস ছিল। নেই।'

—'কী সুটকেস?' তনুশ্রী বললেন।

—'একটা ডাকব্যাকের সুটকেস। আমার ছিল ওটা। ঠাম্মার ঘরে রেখে দিয়েছিলাম।'

—'বুঝতে পারছ এতক্ষণে যা বলেছি ঠিক বলেছি কি না?' চিন্টু বলল, 'বাবা সিন্দুক থেকে সমস্ত টাকা বার করে ওই সুটকেসটাতে ভরেছে, তারপর গ্যাঙের নির্দেশমতো দিতে গেছে। ওরা বাবাকে ধরে নিয়ে যায়নি। বাবাই ওদের টাকাটা দিতে গেছে।'

তনুশ্রী বললেন, 'বারবার এক কথা বোলো না। ওই সিন্দুকে ওসব কিছু থাকত না। তোমার বাবা অত কাঁচা কাজ করবার লোক নয়।'

—'কিন্তু সুটকেসটা ছিল, এখন নেই মা,' তিতি বলল।

—'এর থেকে প্রমাণ হয় সুটকেসটা তোমার বাবা নিয়ে গেছে। যেখানেই গিয়ে থাক। আর কিছু না।'

চিন্টু বলল, 'বাবার কি ভাল লাগেজ নেই, যে একটা পুরনো ব্যাগ ওভাবে নিয়ে যাবে? আসলে এটা হালকা, নোট ভরার পর শুধু কাগজের ওয়েটটা বাড়বে তাই...।'

তিতি বলল, 'যাই হয়ে থাক, এবার আমাদের পুলিশে খবর দিতে হয়।'

—'না, না' তনুশ্রী বলে উঠলেন, 'পুলিশ কেন? একটা বিশ্রী স্ক্যান্ডাল হবে। ওয়েট করো। দেখো কালকেই হয়তো এসে পড়বে।'

এত ক্লান্ত তবু বিছানায় শুয়ে একফোঁটাও ঘুম এল না তনুশ্রীর। তিনি প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে গেছেন।

বিজু রায় দুটো তিনটে সূত্র ফেলে গেছেন। তিনি যে স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে চলে গেছেন এটা বোঝাই যাচ্ছে। ওপরে হালকা সুটকেসটা নেই। নীচে বিজু রায়ের ঘরে একটা মাঝারি সুটকেসে সব সময়ে কিছু জামাকাপড় গোছানো থাকত, সেটাও নেই। বেরিয়েছেন একটা চাপে পড়ে। মহিলাটি চাপ দিচ্ছিল। বিজু আরও অনেক পুরুষের মতোই হয়ত যেভাবে দীর্ঘদিন দু নৌকোয় পা দিয়ে চলছিলেন সেভাবেই চলতে চাইছিলেন। কিন্তু মহিলাটি তা হতে দেবে কেন? মায়ের মৃত্যুর পর থেকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছে। বিজু রায় হয়ত কাল রাতে তাঁকে বলে একটা ফয়সালা করতে চেয়েছিলেন। সেটা সম্ভব নয় দেখে আপাতত যা হাতের কাছে পেয়েছেন, নিয়ে চলে গেছেন। এখন একটা হনিমুন পর্ব চলবে। চিঠি-পত্র, কোর্ট-কেস এসব পরে। কিছুদিন পরে। ওই দমপেরিওঁ আর শ্যানেল নং ফাইভ বিজুকে ধরিয়ে দিয়েছে। শ্যাম্পেনটা যদি একা হত আলাদা কথা ছিল কিন্তু তার সঙ্গে পারফ্যুম মিলে বুঝিয়ে দিয়েছে উপহারটা কেমন মানুষের প্রতি উদ্দিষ্ট। বয় কাট, লম্বা ফিনফিনে, সিগারেট খায়, মদও যেমন খায়। জিন্‌স পরা, শীতে হয়ত একটা পুরুষদের পোলো নেক সোয়েটার পরে। কানে বড় বড় রিং। আঙুলে মস্ত পাথর। খুব সম্ভব বিজুরই দেওয়া। মুখটা খালি তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। দেখতে পাচ্ছেন নিজের মুখ আয়নায়। কখন উঠে বসেছেন, রাত-আলোর ভুতুড়ে আভার আয়নার সামনে টুলে এসে বসেছেন নিজেই জানেন না। ভাল করে মেকাপ তোলা হয়নি আজ। গ্রে রঙের ওপর গোলাপি লেস দেওয়া রাত জামার ওপর থেকে ঝাঁকড়া চুলঅলা মাথাটা ভেসে আছে এবং মুখের ওপর জলের দাগ। চোখের জল।

তেইশ বছরের মতো হল না তাদের বিবাহিত জীবন? আর দু বছর বাদেই রজত জয়ন্তী। শর্মাজি, বসাক, পাইন সকলেই বলে রেখেছে পার্টির কথা রায় দম্পতিকে ভাবতে হবে না। ওরাই সব ব্যবস্থা করবে। দুলিচাঁদ বলেছিল তরল জিনিসের খরচ ওর। তেইশ বছর একসঙ্গে বাস করে তনুশ্রী বিজু রায়ের এই গোপন জীবনের সংবাদ জানে না। কবে থেকে আরম্ভ হয়েছিল এটা? তনুশ্রীর ভেতরটা শিউরে উঠল ভেবে যে বোধহয় একেবারে নির্দিষ্ট একটা দিন দেখতে পাচ্ছে।

এই বাড়ির গৃহপ্রবেশ আর তনুশ্রীর বিয়ে ঠিক সাতদিনের আড়াআড়ি হয়েছিল। ঝকঝকে নতুন প্রাসাদ। দামি আসবাব, লোকজন, অষ্টমঙ্গলায় ঘুরে এসে এইরকমটাই দেখেছিল তনুশ্রী। খালি পাশাপাশি দুটো আলাদা ঘর দেখে সে ভুরু কুঁচকেছিল, দাঁত দিয়ে তলার ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছিল। বিজু বললেন, 'কী? পছন্দ হল? ঘর?'

স্ত্রী জবাব দিচ্ছে না দেখে মুখটা ভাল করে দেখতে দেখতে বিজু বললেন, 'কী হল? কান্না কান্নাভাব দেখছি যেন!'

—'আমার সঙ্গ এর মধ্যেই ভাল লাগছে না?'

—'সে কী? কেন?'

—'ওঃ হো!' হেসে উঠেছিলেন বিজু। মাঝখানের দরজাটা খুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'এই তো একটা ঘর হয়ে গেল। গেল না? দুজনেরই প্রাইভেসি রইল। আবার... তা ছাড়া এটাই চলে। আমাদের সোসাইটিতে এরকমই হয়।'

সত্যিই পরে তনুশ্রী দেখেছে বসাকদের, শর্মাদের সবারই স্বামী-স্ত্রীর ঘর আলাদা। ব্যাপারটা নিয়ে শাশুড়িরও কম আপত্তি ছিল না। ঠারে-ঠোরে নানান কথা জানতে চাইতেন। অবশেষে কয়েক মাসের মধ্যেই চিন্টু পেটে আসতে নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ বাপু, যতই হ্যাট কোট পরে বেড়াক, ছোটখোকা বেশি বয়সে থিতু হল। যত তাড়াতাড়ি ছেলেপিলে হয় ততই ভাল। মানুষ করতে হবে তো?'

এই উচ্চকোটির প্রাইভেসি। এই জিনিসটা অতিশয় সন্দেহজনক। সারাদিনই তো কাজের ঘোরে আলাদা আলাদা ঘুরছ। রাত্রেও স্ত্রীর সঙ্গে খোলামেলা হতে পারো না? অবশ্য, সত্যি কথা বলতে কি তনুশ্রীর নিজের তাতে সুবিধেই হয়েছে। তার অনেক রকম নার্সিসীয় পাগলামি আছে। কোনওদিন

নিজের পা, কোনওদিন হাতের আঙুল, কোনওদিন পেট এসব দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায় তনুশ্রী। আরে আঙুলগুলো একটু থ্যাবড়া থ্যাবড়া লাগছে কেন আজ? ইস্‌স্‌ কী সমান পেট, কেউ বলবে দুই সন্তানের মা তনুশ্রী! পায়ের সৌন্দর্য এ জীবনে আর কাউকে দেখানো যাবে না। সেই হনিমুনে আন্দামান আইল্যান্ডস-এ বিজু রায় দেখেছিলেন। তারপরে আর...। অথচ এই তিতি তিতির বন্ধুরা কেমন স্বচ্ছন্দে পা দেখিয়ে দেখিয়ে বিচরণ করছে! এ ছাড়াও একলা ঘরের হাওয়ায় ভাবনাগুলোকে যত সহজে রঙিন বেলুন করে দেওয়া যায়, পাশে আর একজন ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোলে সেটা করা যায় কি? কত রকমের বর্ণালি, স্বপ্ন, তার ঘোরে তনুশ্রী আপনমনে হাসে, ভ্রূকুটি করে, কথা বলে—সে সব কি অপরের কানে শোনবার? না, দেখবার? তেইশ বছরের বিবাহিত জীবন একটা লম্বা আনন্দের দিন। বিজুর এজন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য। এই আমোদের উপকরণ সে জুগিয়ে গেছে অকাতরে। কিন্তু নিজে? নিজে যেন থেকে গেছে বাইরের মহলেই। বরাবর। লোকটা মনে-প্রাণে কাজ-পাগল ছিল। কিন্তু যা কিছু করণীয় সেগুলো ঘড়ির কাঁটার মতো নির্ভুলভাবে করে গেছে। চিন্টু বলছিল ডিউটিজ-এর কথা। নাকি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি সময় তাকে দিতে পারেনি। ওইটুকুই তার জন্য নির্ধারিত ছিল। তনুশ্রী নিজেও অনেক সভাসমিতি করে। সে বোঝে চূড়ান্ত রকমের অর্গানাইজড ছিল লোকটা, ব্যবস্থিত। না হলে ওইভাবে উন্নতি করা যায় না। আর সব সময়ে ঠাণ্ডা, কু-ল। কিন্তু কাজের বাইরে বিজু রায়ের অন্য একটা জীবন ছিল না সে কথা এখন গ্যারান্টি দিয়ে বলা যাচ্ছে না। তনুশ্রীর সঙ্গে তেইশ বছরের সম্পর্কে বিজু রায়কে সে কখনও উত্তাল-উদ্দাম হতে দেখেনি। সেই প্রথম ক সপ্তাহ ছাড়া। অথচ সে তনুশ্রী বিজু রায়ের থেকে ষোলো বছরের ছোট, বলতে গেলে স্বামীর তুলনায় তরুণী। আরও তরুণী, আকর্ষক রেখেছে সে নিজেকে। কিন্তু...। বিজু রায় কেন যেন কোনওদিনই তেমন আকৃষ্ট হলেন না। মাঝের দরজাটা রাতে খুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছে সম্ভবত বছর তিনেক। তার আগে কমছিল। কিন্তু একদম বন্ধ বছর তিনেক। তনুশ্রী বেঁচেই গিয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই তিন কি বড় জোর চার বছরই হল বিজু রায়ের জীবনে নতুন নারীর, নতুন গল্পের আয়ু।

গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে তনুশ্রীর। সে উঠে বসে জল খেল ঢকঢক করে অনেকটা। কান জ্বালা করছে। হাতের পাতা জ্বালা করছে। তনুশ্রী টয়লেটে গিয়ে হাতে কানে জল দিয়ে এল। কেচ্ছা! স্ক্যান্ডাল! যে স্ক্যান্ডালের কথা আজকেই আলোচনা হচ্ছিল সেই স্ক্যান্ডাল এখন তনুশ্রীর নিজের ঘরে। কে ভেবেছিল স্ক্যান্ডাল শুধু ফ্যাশানেবল মোটেই নয়, বরং জ্বালায়! তনুশ্রীর চোখ দিয়ে এত জল পড়ছে কেন? এটা যদি কোর্টে ওঠে, তনুশ্রী কিছুতেই বিজু রায়কে ডিভোর্স দেবে না। কিছুতেই না। সব কিছুই তার পক্ষে। ছেলে, মেয়ে, বন্ধুবান্ধব, সোসাইটি। লড়ুক না কেন বি. বি. রায়। যত পারে লড়ুক। ডিভোর্স হলেও কী পরিমাণ অ্যালিমনি বিজু রায়কে দিতে হবে তা তার কল্পনার বাইরে। স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে এই বাড়ি এবং অস্থাবরের মধ্যে লিকুইড ক্যাশ সমস্ত নিয়ে নেবে তনুশ্রী। সমস্ত। কিন্তু তারপর? তাতেও হবে তো! সন্তুষ্ট হতে পারবে? না। কক্ষনো না। স্বয়ং বিজু রায়কেই চাই। এই বাড়িতে তার অভ্যস্ত চলাফেরার চেনা শব্দ। একত্রে পার্টিতে যাওয়া। বাড়িতে কোনও উৎসব হলে একটু আধটুও আলোচনা। এটুকুই। এটুকু চলে গেলে তনুশ্রীর জীবনের ভিত ধসে যাবে। সে তখন আর কোনও অত্যাচারিত মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট নয়। একজন সাধারণ পরিত্যক্ত গৃহবধূ। সে কারওর জীবন সম্পর্কে সভা বসিয়ে সবার মতামত নিচ্ছে না। তার জীবন নিয়েই সভাটা বসেছে। প্রেসিডেন্টের আসন খালি। প্রেসিডেন্ট মিসেস তনুশ্রী রায়, ডিভোর্সড হতে যাচ্ছেন, পরিত্যক্ত, ন্যাচারেলি তাঁর স্বামীর দ্বারা। কেন? দুজনের মতান্তর? মনান্তর? বিজু রায় বাঘের মতো নাক ডাকেন? বা শারীরিক অত্যাচার করেন মদ খেয়ে যা আর সহ্য করা যায় না বলে মিসেস তনুশ্রী রায় ডিভোর্স নিতে বাধ্য হচ্ছেন? না, তা নয়। চুপ চুপ। ফিসফিস। বিজু রায়, বি. বি. রায় দা গ্রেট ইজ অ্যাট লং লাস্ট ইন লভ উইথ আ গার্ল, লেডি, উওম্যান? কে। কে সে? অবশেষে। বেচারা বিজু রায়।

স্ত্রীটি তো সাজানো পুতুল। হৃদয় মন বলে কিছু ছিল না। স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। চার বছর ধরে অ্যাফেয়ার চলছে, জানত না পর্যন্ত, এত বোকা? না, না, শি ডাজন'ট কেয়ার। তাছাড়া ওর নিজের নেই? একটা ছেড়ে, দশটা...।

কিছুদিন হল বসাক আর পাইনকে বড্ড প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে গেছে। মিউজিক কনফারেন্স, থিয়েটারে, ফিলম্ ফেস্টিভ্যালে যেতে হলে, যেতে হয়ই, এ ছাড়া উপায়ও নেই। কেন না বিজু যাবেন না। বিজুর অত সময় নেই। বসাক পাইনের এসব ঝোঁক আছে। ওরা যায়। ওদের স্ত্রীদের নেই। বিজু রায়ের নেই। কাজেই এই জাতীয় জুটি। এসব বিজু জানেন। কোনও ব্যাপারই নয়। কিন্তু ইদানীং এটা শুধু গান-পাগলামি বা থিয়েটার-ফিলমের ঝোঁকের মধ্যে নেই। বসাক আর পাইনের মধ্যে তাঁকে নিয়ে একটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা তিনি ঘটতে দিয়েছেন। ফ্লার্ট করতে বরাবরই ভাল পারেন তনুশ্রী। সেই স্কুলের ফ্রক পরার বয়স থেকে। এ একটা নেশা। এখনও এ নেশার জের কাটাতে পারে না তনুশ্রী। বিশেষ করে শাশুড়ি মারা যাবার পর বোধহয় একটু বেশি রকমের বেহিসেবি হয়ে পড়েছে। কিন্তু সবটাই বিজু রায়, তার স্বামী পেছনে আছে বলে, একটা শক্ত মাটি পায়ের তলায়, মাথার ওপর একটা দৃঢ় ছায়া। আশ্রয়। বিজু কি কিছু টের পেলেন? কানাঘুসো? তাঁদের সোসাইটি অত ঠুনকো নয় যে দু এক দিন তনুশ্রী রায়কে বসাক বা পাইনের সঙ্গে দেখলে একেবারে মুচ্ছো যাবে। রাজেশ পাইনের সঙ্গে দু দিন সুন্দরবন ট্যুর করে এলেন কদিন আগে। বিজু রায়কে বলেই যাওয়া। তবে একা রাজেশ যাচ্ছে এটা খুলে বলা হয়নি। একেবারে লাস্ট মিনিটে টিকিট করা, তাদের লঞ্চে কেবিন পাওয়া গেল না। সজনেখালি ট্যুরিস্ট লজে রাত কাটাবার জন্যে নামিয়ে দিল। এ বিঘত করে ঘরে। টেকা যায় না এত ছোট। সাদা ফুলের মতো বিদেশি নাইটির ওপর কালো শাল জড়িয়ে অতএব তনুশ্রী বেরিয়ে এল বাইরের কাঠের বারান্দায়। ইলেকট্রিক আলো নেই। দরজার সামনে একটা করে হ্যারিকেন-লণ্ঠন বসানো। কী অদ্ভুত ঝকঝকে একটা জড়োয়া সেটের মতো আকাশ! আর তাতে জমকালো পোশাক পরা মানুষের মতো সব নক্ষত্র। যেন জীবন্ত জোড়া জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে, তোমার দিকে, বলছে গল্প কর। বেরিয়ে এস। দেখ। দেখাও। তখন আর নিজেকে সীমাবদ্ধ মানুষী বলে মনে হয় না। রাজেশ যখন সেই নির্জন রাতের বারন্দায় চারদিকে সুন্দরবন, জল, আর মাথার ওপর জ্যান্ত আকাশের তলায় তাকে অর্কিডের গুচ্ছের মতো জড়িয়ে ধরল, যখন তারপর দুজনে দুজনের শরীরের স্বাদ নিতে নিতে বাঘ আর বাঘিনী হয়ে গিয়েছিল, তখন কোনও অপরাধবোধ তো হয়ইনি, বরং মনে হয়েছিল এতদিনে এই প্রথম জানল কী ছিল ভেতরে, কী প্রবল আবেগ, কী শক্তি। রাজেশ তনুশ্রীর চেয়ে কয়েক বছরের ছোটই হবে। বলেছিল, 'আই অ্যাম ফিলিং লাইক আই ওয়াজ আ ভার্জিন বিফোর দিস।' সেই এক অনুভূতি তনুশ্রীরও। কিন্তু সে অনেক সতর্ক, সাবধান। রাজেশ পরে যতই এখানে সেখানে যাবার প্রস্তাব দিক। কর্ণপাত করেনি। ঠিকসময় সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় আছে। তনুশ্রী অত সস্তা না। সিংহেরা সিংহীরা না বারো বছরে একবার? ইতিমধ্যে বসাক তাদের দুজনের মধ্যে একটা গোপন বৈদ্যুতিক আঁতাতের আঁচ পায়। ও-ও তো তালে আছে। কিন্তু ওই আঁচ পাওয়া পর্যন্তই। প্রমাণ কিছু নেই। কিছু নেই কি? পুলিশি তদন্ত হলে, প্যাসেঞ্জার লিস্টে দেখা যাবে না রাজেশ পাইন আর তনুশ্রী রায়? কোনও মিসেস পাইন নেই! আচ্ছা রাজেশই তো বুক করেছিল ঠিকঠাক পাইন আর রায় নামেই বুক করেছিল তো? তার জানবার কথা নয়। সর্বনাশ! জনা পঞ্চাশেক লোক ছিল লঞ্চে। এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদিও তার চোখে ছিল প্রায় মুখ-ঢাকা গগ্‌ল্‌ল্! চুল সেট করানো ছিল এমনভাবে যে মুখের অর্ধেকটা প্রায় ঢাকা। জিন্‌স আর শার্ট পরেছিল। দুটি বেলজিয়ান ছেলে ছিল। ভ্যাগাবন্ডের মতো দেখতে, রং জ্বলা তাপ্পি দেওয়া শর্টস পরা, তলায় সুতো ঝুলছে, আসলে য়ুনিভার্সিটির ছাত্র কিন্তু, ভারত দর্শনে বেরিয়েছে। ওদের সঙ্গেই এক টেবিলে বসে লাঞ্চ খেয়েছে। কথা বলেছে। আর একজন ছিল এক দিল্লিওয়ালা বুড়ো! মজবুত গাঁট্টাগোঁট্টা বুড়ো অবশ্য। সে বাঘের পাগ-মার্ক, আর

হরিণের খুরের গর্ত দেখিয়েছিল নেতি ধোপানিতে। এর সঙ্গেও অনেক সময় কাটানো হয়েছে। লঞ্চের কেউ তাকে আদৌ বাঙালি বলে বুঝতে পেরেছে কি না সন্দেহ। অন্যান্য যাত্রীরা বেশির ভাগই ফ্যামিলি নিয়ে এসেছে। মিনিটে মিনিটে বাচ্চাদের পোশাক বদলাচ্ছে, মেয়েরা নিজেদের কার্ডিগান, শাল পালটাচ্ছে আর হরেকরকমের ড্রাই ফুড বার করছে। যে যার গ্রুপে জমে ছিল। লক্ষ করবার মতো কেউ ছিল না। সে লক্ষ করেনি। কিন্তু কেউ যদি তাকে লক্ষ করে থাকে, কেচ্ছার গন্ধ পেয়ে থাকে...বিজু রায়কে কেউ কিছু বলে থাকে। বলবেই বা কী? রাত্তিরবেলা সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সজনেখালির টুরিস্ট লজে নিশ্চয়ই কোনও চোখ ছিল না। বিজু রায় তো জানতেনই, তনুশ্রী রাজেশের সঙ্গে সুন্দরবন যাচ্ছে। তবে?

তনুশ্রীর বড্ড গা শিরশির করতে লাগল। বারবার বাথরুম পাচ্ছে। তিনি, তাঁরা শর্মা বা বসাকদের মতো তিন পুরুষে বড়লোক তো নন। এই সেদিন পর্যন্ত শাশুড়ি ওপরে যখের মতো পুরনো সব মূল্যবোধ আঁকড়ে শুয়ে থাকতেন। এ সবের তো একটা প্রভাব আছেই। দু জোড়া চোখ। এক জোড়া কোটরাগত, প্রশ্নে ভরা কিন্তু কেমন একটা তীক্ষ্ণ কৌতুক সে চোখে, শাশুড়ির চোখ। আর এক জোড়া বিজু রায়ের, অন্যমনস্ক। সব সময়ে কিছুতে যেন মগ্ন হয়ে আছে লোকটা। মা বলল—'বারান্দা দিয়ে দেখে আয়, বর এসেছে, বুড়ো-বুড়ো করছিস, কেমন বুড়ো বর তোর।' আগেই দেখেছিল তনুশ্রী, সে কথা ভাঙা হয় নি। বারান্দা দিয়ে দেখল, স্বাস্থ্যবান, জোড়-টোড় পরে চমৎকার মানিয়েছে, মাথায় চুলগুলো দেখবার মতো, বেশ পুলক জাগাবার মতো। কিন্তু বিজু রায় কিরকম যান্ত্রিক ধরনের মানুষ ছিলেন। কোনও যেন রসকষ নেই। যদিও অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ। আসলে মানুষের ধাত। যে মানুষের যা। বলবার কিছু নেই। তনুশ্রীর নিজেরও খুব একটা ভাবাবেগ-টেগ ছিল না। তার একটা দিক ছিল প্রচণ্ড হিসেবি। এখনও আছে। এই যে রাজেশকে ঠেকিয়ে রেখেছে এটাও সেই হিসেবি মন থেকে এসেছে। তখন ছিল সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা। যা কোনও দিন স্বপ্নেও আশা করেনি, সেই বিত্ত, সেই মান পেয়ে তনুশ্রী উচ্চাকাঙ্ক্ষার লাগাম ছেড়ে দিয়েছিল। দারুণ দারুণ সেজে পার্টিতে যাব। ফ্যাশন-ম্যাগাজিনের জীবন। বহু বহু পুরুষ তাকে ঘিরে। সে মাতালের মতো দুলছে, দুলে দুলে হাসছে। পাশে বিজু রায়। ঘুরছে, ফিরছে, অদর্শন হচ্ছে আবার কাছে চলে আসছে। মিসেস তনুশ্রী রায়ের স্বামী। 'স্বামী', 'কর্তা' প্রভুত্ববাচক বলে তাঁদের সংস্থা আজকাল শব্দগুলো ব্যবহার করতে দ্বিধা করছে। কিন্তু লোকটা পাশে থাকলে গর্বে বুক ফুলে যেত। নির্ভরযোগ্য পুরুষ বটে। স্বামী। ঠিকই কিন্তু বিজু কোনও দিনও প্রভুত্ব খাটায়নি। অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। একদম ভোরের দিকে তনুশ্রী ঘুমিয়ে পড়লেন।

॥ ৩ ॥

রাত্রি সাড়ে দশটা। শীতের কলকাতা প্রায় নিঝুম হয়ে এসেছে। রাস্তার মোড়ে কিছু লোক আগুন করে বসে জুয়ো খেলছে। ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় ট্রামের শব্দ। ট্রাকের প্রতাপ বাড়ছে রাতের সঙ্গে সঙ্গে। সামনের মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে বিজু রায় একেবারে অবাক হয়ে রইলেন। নিতাই ভট্‌চায্যি বলল—'কী হল রায়বাবু, তুলুন?'

মণিময় বলল—'গামছাটা ভাল করে কাঁধে ঠেসে ঠুসে নেবেন। না হলে লাগবে কিন্তু।'

প্রতুল বিশ্বাস বলল—'ভয় খাচ্ছেন কেন? আমরাও পাঁচজনে আছি তো। কাঁধ বদল করে নেবেন একটু পরেই।'

বিজু রায় দুঃখের হাসি হেসে বললেন—'ওজন তো শুধু এই খাটিয়াটারই।'

—'না না দাদা, ভুল করছেন', নিতাই ভট্‌চাজ্যি বললেন—'যত সময় যায় মড়ার ওজন বাড়ে।

সে যত রোগাই হোক। এনার আত্মীয়স্বজনের হদিশ খুঁজতে আমাদের কম সময় গেল? ছিল ইঁদুর, দেখবেন হাতি হয়েছে।'

—'বলো হরি, হরি বোল'...মণিময় বলে উঠল। চারজনের কাঁধে কাঁধে উঠে পড়ল নলিনীকান্ত করের লাশ।

আহিরিটোলার এই আস্তানার খোঁজ পেয়েছিলেন বিজন এই নলিনী করের কাছেই মাত্র তিনদিন আগে। একটা ট্যাকসি নিয়ে প্রথমেই গিয়েছিলেন সেই বাঁধাঘাট। শ্মশানের ধারের বাড়ি। নেই। বহুতল উঠছে। দুলিচাঁদের মতো কোনও ঘাঘু প্রোমোটার কিম্বা বিজু রায়ের মতো কোনও অ্যামেচার কলকাতা, বৃহত্তর কলকাতা এবং সমস্ত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চেহারা পাল্টে দেবার সংকল্প নিয়েছে। আকাশ কিনছে, আকাশ বেচছে। সুতরাং বিজু রায়ের ছেলেবেলা ধূলিসাৎ। দেখে কেন কে জানে খারাপ লেগেছিল। তিনি সেন্টিমেন্টাল লোক নন। এও ভাল করেই জানেন গঙ্গার ধারের সেই বালিখসা নোনা ধরা বাড়ি আজও টিকে থাকার কথা নয়। তাকে আগাগোড়া সংস্কার করলেও টিকত কিনা বলা যায় না। কী আশা নিয়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন বলা শক্ত। ঘুসুড়ির বাড়িটার জন্যে তো কতবার জি.টি. রোডের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। একবারও তো মনে হয়নি, ছেলেবেলার সেই বাড়ি দেখে আসি। এখনই কেন হল, বলা সত্যিই শক্ত। আশাভঙ্গ কেন হল সেটা বলা আরও শক্ত। কিন্তু হল। ট্যাকসিটা ছেড়ে দিয়ে ছিলেন, খানিকটা ঘোরাঘুরি করে বাঁধাঘাটের একটা দোকান থেকে গরম গরম জিলিপি আর চা খেলেন, বেশ কয়েক ভাঁড়। তারপর অনেককাল আগেকার মতো লঞ্চে চেপে বসলেন। ওপারে আহিরিটোলা যাবেন। স্রেফ যাবার জন্যেই। কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। বেরিয়ে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য, ছুটকি। ছুটকিকে খুঁজে বের করা। কিন্তু সেটা সহজ নয়। চিঠিগুলো এখনও সব পড়া হয়নি। কিন্তু যতগুলো পড়েছেন কোথাও ঠিকানা নেই। অথচ মা, সবগুলোর না হলেও কোনও-কোনওটার জবাব দিয়েছে। ঠিকানাটা এই কাগজের স্তূপের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করতে হলে একটু সময় চাই। কোথাও বসতে পারা চাই। কিন্তু কোনও হোটেলে গেলে হঠাৎ কেউ তাঁকে চিনে ফেলতে পারে। তাঁর সময় চাই। বাসে, ট্রামে, ট্রেনে তো আর পুরনো চিঠি খুলে পড়া যায় না। আহিরিটোলার জেটিতে বসে এইসবই ভাবছিলেন। খেয়াল করেননি একজন কেউ তাঁকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছে।

—'মহাশয়ের কি এদিকে এই প্রথম আসা?'

চিন্তাক্লিষ্ট বিজু রায় মুখ তুলে দেখলেন রোগা লম্বা এক প্রৌঢ়। চওড়া পাড়ের ধুতির ওপর গরম ফ্লানেলের পাঞ্জাবি, তার ওপর জামেয়ার শাল। চকচকে বার্নিশ করা নিউ-কাট। মুখের রং, বোঝা যায় একসময়ে ফর্সা ছিল, জ্বলে গেছে। খয়েরি খয়েরি ছোপ নানা জায়গায়। চুলে বোধহয় কলপ দিতেন, সম্প্রতি ছেড়েছেন। অর্ধেক চুল পানের বাসি ছোপের মতো লাল।

বিজু রায় তখনও ঠিক করতে পারেননি কী বলবেন। ভদ্রলোক বললেন—'হাতে দু দুটো সুটকেস, বাঁধাঘাটের স্টিমারে এলেন, এসে থেকে বসে আছেন, আর আকাশ পাতাল ভাবছেন, কী ব্যাপার বলুন তো। অবিশ্যি যদি বলেন পরের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি কেন তো চলে যবো। কিন্তু ভাবব। ভাবনার ওপর তো ট্যাক্স বসাতে পারেন না?' পারেন? কী দাদা পারেন?

বিজু বললেন—'আসলে খুঁজতে এসেছি একজনকে। কিন্তু কোথায় উঠছেন, কীভাবে খুঁজব ভেবে পাচ্ছি না।' বিজু রায়, বি. বি. রায় এই কথা বললেন একজন সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোককে।

—'কে পালিয়েছে। ছেলে না মেয়ে? পুলিশের কাছে যাচ্ছেন না কেন। জানি ওরা একটি ওয়ার্থলেস লট। তবু লোকে তো যায়। আপনি গোপন রাখতে চাইছেন? না কি?

বিজু রায় এমনভাবে হাসলেন যার মানে 'হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন' এরকম হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে।

—'থাকতে পারেন তো আমার বাসায় নিয়ে যেতে পারি। ভাড়া খাই খরচ লাগবে। তবে

হোটেলে-ফোটেলের থেকে কম। যাবেন?'

এভাবে একজন অচেনা লোকের কথায় হুট করে কোথাও যাওয়া বিপজ্জনক, সেটা স্বভাবতই বিজু রায় জানেন। কিন্তু তিনি তো আর ছেলেমানুষ নন। উঠতে উঠতে বললেন—'পেয়িং গেস্ট রাখেন বুঝি? বাঃ এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হতে পারে না।'

ভদ্রলোকটির চেহারা পড়তি বড়লোকদের। টাকার থলিতে বেদম টান পড়েছে। এখন এইভাবে পেয়িং-গেস্ট রেখে চালান নিশ্চয়। দেখলেই বোঝা যায়। বিজু রায়ের কথার জবাবে ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন...'চলুন। দেখুন পছন্দ হয় কি না।'

—'আপনার নাম কী?'

—'বিজন রায়। বিহারীটা বাদ দিলেন বিজু রায়। তাঁর নাম যে বিজনবিহারী এ বোধহয় তাঁর অতি ঘনিষ্ঠরা ছাড়া কেউ জানে না। এমন কি ছেলে-মেয়েও জানে কি না সন্দেহ।

—'আমি এন. কে. মানে নলিনী কর। মাঝে এক কান্ত ছিল, বহুদিন ছেঁটে দিয়েছি।'

পলেস্তারাহীন, একঠেঙে, আদ্যিকালের যে বাড়িটাতে তাঁকে নিয়ে ঢুকলেন নলিনী কর, সেটা কোনওকালে ধনী লোকের বাড়ি ছিল না। ঠ্যাংঠেঙে উঁচু উঁচু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নলিনীবাবু গলা বাড়িয়ে বললেন—'ঠাকুর, আমার গেস্ট আছে। একটা মিল বেশি নিয়ো।' ডালে সম্বরার ঝাঁজ আসছে। বিজু রায় হেসে ফেলে বললেন—'হোটেল নাকি?'

—'এখন দু কাপ চা আর টোস্ট পাঠিয়ে দিয়ো ঠাকুর, টোস্টে একটু চিনি দেবে।'

গালে সাবান হাতে ক্ষুর, দোতলার ঘর থেকে দু'চারজন বেরিয়ে এসেছিল। বেশির ভাগই বয়স্ক, কেমন খিঁচড়ে মুখ। দু এক জন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীও আছে। একজন বললেন—'কী ব্যাপার নলিনী দা, আপনার গেস্ট?'

—'কেন, তোমরা কি ভাব নলিনীদা বাপে-তাড়ানো মায়ে-খ্যাদানো বলে তার গেস্ট থাকতে পারে না। নলিনীবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন। বিজু রায়কে দেখে সবাই চুপ করে গেল। তিনতলার ঘর। একখানাই ঘর। এক চিলতে বাথরুম। বাকিটা ছাদ। একখানা তক্তাপোশ পাতা। কোণে মাটির কুঁজো। দেয়ালে গোঁজ দেওয়া। তাই থেকে একটা ধবধবে পাঞ্জাবি ঝুলছে। তক্তাপোশের বিছানাটায়ও একটা নতুন ঝকঝকে জয়পুরি বেডকভার।

—'চলবে?' নলিনী কর বললেন 'এটা মেস। যা এখন কলকেতার শহরে প্রায় অবসলিট হয়ে গেছে। এই আমার ঘর। আপনাকে একটা স্টিলের ফোল্ডিং খাট পেতে দেব পাশে। রাত শোয়ার জন্যে। যদ্দিন ছেলে বা মেয়েকে চুপিচুপি খুঁজবেন ততদিন থেকে যান এখানে। কেউ ডিসটার্ব করবে না। আমার ঘরভাড়া একশো পাঁচ, আপনি হাফ সাড়ে বাহান্ন দেবেন। গেস্টের মিল, এরা মাছের মিল দশ টাকা, মাংসের পনেরো নেয়, নিরমিষ্যি আট। ব্রেকফাস্ট চার টাকা। চা এক টাকা পঁচিশ পয়সা। বড় কাপে দেয়। ভাল আসাম। ঠাকুর রাঁধে ভাল। ডালে ফেন চালায়। স্টিল্‌ল্।

বিজু রায় বললেন—'একলার একটা ঘর পাওয়া যায় না?'

—'একলা? সব ফিল্ড আপ। নো ভেকান্সি। আপনি যে থাকবেন সেটা আমার খাতিরেই। তাছাড়া আপনার ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি মোস্ট নন-ইনটারফিয়ারিং লোক। বুঝলেন কিছু?'

এই সময়ে একটা গেঞ্জি আর গামছা-পরা লোক, কলাইয়ের থালার ওপরে দুটো মোটা মোটা কাপে চা, এবং চার পিস টোস্ট নিয়ে এল।

—'নিন খেয়ে নিন'—ঘরের একমাত্র টিনের চেয়ারটা টেনে বিজু রায়কে বসতে দিয়ে নলিনী কর বললেন।

বিজু রায় টোস্টে চিনিগুলো কলাইয়ের বাসনটার ওপর যথাসাধ্য ঝেড়ে ফেলে দিতে লাগলেন।

—'মধুমেহ?'

—'আজ্ঞে?'

—'ডায়াবিটিস?'

—'এখন ঠিক নয়, ব্লাড শুগার আছে।'

—'তবে তো মশাই এ চাও আপনার চলবে না। চিনি দেওয়া আছে।'

—'একবার খেলে কিছু হবে না' বিজু রায় চায়ে চুমুক দিলেন। বেশ কড়া, কিন্তু রীতিমতো ভাল চা। বিজু রায় উচ্চতম দামের দার্জিলিং খান, লিকার পাতলা, কিন্তু এই কড়া লিকারের চা যে যথেষ্ট ভাল সন্দেহ নেই। পাউরুটিখানাও তিনি খুব তৃপ্তির সঙ্গেই খেতে লাগলেন। মোটা মোটা পাঁউরুটি, টাটকা রুটির গন্ধটা বেরোচ্ছে। তাঁর খিদে পেয়েছে।

নলিনী তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—'ভাল। না? আসলে কি জানেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা আমরা এখানে নিজেরাই দেখি। চাঁদু মিত্তির আছে দোতলায়। এক্সপার্ট লোক। মাসকাবারি বাজারটা সে-ই করে। ডেলি বাজারও এরা পালা করে করে। নয়ত এন. কে এখানে থাকত?'

তারপরে গালের কুঁচকানো চামড়ায় আরও ভাঁজ তুলে হাসলেন—'আমার তো ডায়াবিটিস।'

বিজু বললেন—'তবে এত চিনি-টিনি?'

—'কে দেখছে?' যেন এইমাত্র কেউ দেখে ফেলবে বলেই রোগীর যা-কিছু সাবধানতা।

—'বয়স কত হল বলুন তো?'

বিজু রায়ের মনে হল—বাহাত্তর, তিয়াত্তর অন্তত, বললেন—'চৌষট্টি পঁয়ষট্টি হবে।'

—'ফিফটি নাইন রানিং।'

—চমকে উঠলেন বিজু রায়।

একটা কিং সাইজ সিগারেট বার করে নলিনীকান্ত বললেন—'জীবনে কী করেছি আর কী করিনি হিসেব দিতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে মশাই। বছর তেইশ বয়সে বাড়ি থেকে পালালুম। তারপর জাহাজের খালাসি হওয়া থেকে জাহাজ কেনা পর্যন্ত করেছি। করতে পেরেছি। শেয়ারে কামিয়ে লালে লাল হয়ে গেছি। আবার বেগার, একেবারে ভিক্ষুক। ধরুন, অবস্থা যখন ছিল পাল পাল আত্মীয়স্বজনকে গ্র্যান্ডে খাওয়ানো থেকে, ব্যালকনির টিকিটে সিনেমা দেখানো, বক্সে থিয়েটার দেখানো, দামি দামি উপহার কিনে দেওয়া—কী না করেছি। যখন পকেট গড়ের মাঠ হয়ে গেল, নিজের ভাই, আমার পয়সায় যে এঞ্জিনিয়ার, সেই ভাই গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিল। নিন ধরুন একটা।' 'নলিনীকান্ত সিগারেটের প্যাকেট তাঁর দিকে এগিয়ে ধরলেন।

বিজু রায় ইতস্তত করছিলেন। নলিনীকান্ত বললেন—'রেসট্রিকশান? একদিন একটায় আসবে আসবে যাবে না।'

এই সময়ে একটি যুবক ঘরে মুখ বাড়াল—'আসতে পারি।'

—'আবার জিজ্ঞাসা করছো কেন? কৌতূহলে তো ছটফট করছ সবাই। এসে যাও এসে যাও। নীচে গিয়ে রিপোর্ট দিয়ো।

—'আঃ আপনি না নলিনীদা! কোনও জিনিসটাই সহজভাবে নিতে পারেন না। এলুম আপনার ফরমাস খাটতে। এই নিন আপনার টুথপেস্ট, আর এই সুপার সফ্‌ট ব্রাশ। ক্রিমটা অফিস-ফেরত আনব।'

যুবকটি একটা দামি টুথপেস্ট আর ব্রাশ এগিয়ে দিল।

—'*এ হে হে হে হলদে আনলে কেন হে? হলদে আমি মোটে পছন্দ করি না। গ্রিন, গ্রিন আনতে হয়।*'

—'ভুল হয়ে গেছে দাদা। দয়া করে ফেরত দিতে বলবেন না।'

—'এসেছ যখন কৌতূহল নিবৃত্তি করে যাও। ইনি আমার বন্ধু বিজন রায়, মানে জুনিয়র ফ্রেন্ড। *এই তুমি যেমন। আর বিজনবাবু ইটি মণিময়। নামেও রত্ন, স্বভাবেও রত্ন।* আচ্ছা এবার এসো গিয়ে, তোমার আপিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

মণিময় বলল—'নমস্কার বিজনদা, পরে আলাপ হবে।'

—'ছেলে-মেয়ে নয় মনে হচ্ছে', মণিময় চলে গেল এন. কে. বললেন, 'ছেলে-মেয়ে হলে এতক্ষণে দাপিয়ে বেড়াতেন, তবে কি ভাইপো-ভাইঝি, ভাগনে-ভাগনি গোছের কেউ?' বলেই জিভ কেটে বললেন—'ছি ছি এই দেখুন, ইনটারফেয়ারেন্স হয়ে গেল দাদা, মনে কিছু করবেন না।'

বিজন হেসে বললেন—'ও সব কেউ নয়। অনেকদিন থেকে সম্পর্ক নেই এমন এক জনের ঠিকানা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছি।'

—'বুঝেছি।' এন. কে বললেন, তারপর ঘরটা বিজনকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজে, ভগবান জানেন কী কাজ, চলে গেলেন।

দিদির চার পাঁচটা চিঠি পেলেন বিজন। প্রত্যেকটাতেই কিছু টাকার প্রাপ্তিস্বীকার আছে। তাঁর মনে পড়ল, মা যতদিন ছিল মাসে হাজার টাকা করে মাসোহারা দিতেন তিনি। খুব আস্তে টাকাটা মায়ের বালিশের তলায় ঢুকিয়ে রাখতেন। মা একদিন, একদিনই বলেছিল—

—'আমি তো একটা শোয়া-মানুষ, সব কিছুই তো অপরের ওপর। নিজে হাতে খরচ করার সাধ্যও নেই। এত আমায় দিস কেন?'

বিজু বলেছিলেন, 'এ টাকা নিয়ে তুমি যা খুশি করবে মা।'

'এত টাকা নিয়ে সত্যিই কখনও নাড়া-চাড়া করি নি', দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল মা। টাকা নিয়ে মা কী করত বিজন জানেন না। জানার আগ্রহও বোধ করেননি কোনও দিন। দিয়ে দিয়েছেন ব্যস। তবে মা হয়তো নাতি নাতনিদের, বউমাদের কিছু উপহার-টার দিত অনেক সময়ে। তিতি যেন একদিন কাকে বলছিল—'ঠাম্মার টাকা দিয়ে এই চুড়িদারটা করিয়েছি। কেমন হয়েছে?' কাকে বলছিল? তাঁকে তো নয়ই। ওর মাকে কি? মনে করতে পারলেন না বিজন। শুধু 'ঠাম্মার টাকা' কথাটা মনে লেগে আছে। কিন্তু সেদিন আলমারি, সিন্দুক ঘাঁটাঘাঁটি করে শুধু একটা সোনার হার ছাড়া আর কোনও মূল্যবান জিনিস পাননি। সামান্য কিছু খুচরো পয়সা ব্যস। সোনার হারটা ঝকঝকে নতুন, মা কোনও সময়ে করিয়ে রেখেছে। বাক্সের মধ্যে চিরকুটে লেখা 'ছোটখুকুকে আশীর্বাদ'। ভাই-বোনদের মধ্যে দিদিই সবচেয়ে অভাবী। চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে সে টাকার অধিকাংশই দিদিকে পাঠিয়েছে মা। কাকে দিয়ে পাঠাল? খুব সম্ভব সুলতা আর শিবানী ওই দুটি নার্সকে দিয়ে। তারা যে মেরে দেয়নি এটা মায়ের ভাগ্য, দিদিরও ভাগ্য। কিন্তু তাঁরও তো দিদির কথা ভাবা উচিত ছিল। মায়েরও বলা উচিত ছিল। তিনি দিদির কথা ভাবেননি, তার প্রধান কারণ তিনি অতটা জানতেন না। দিদি এমন কিছু দূরে থাকে না। কিন্তু দিদি, দিদির ছেলেরা কেউ কখনও সল্ট লেকের বাড়িতে এসেছে বলে তিনি মনে করতে পারলেন না। সল্ট লেক কেন? ছুটকি চলে যাবার পর থেকেই দিদি বাঁধাঘাটের বাড়িতেও আর আসেনি। ও। এই জন্যে। দিদির শ্বশুরবাড়ি খুব গোঁড়া, আচারপরায়ণ, বিজু একবার দিদির সুখচরের বাড়িতে গিয়ে দিদির শ্বশুরমশাইয়ের কাছে ভর্ৎসনা শুনেছিল, বামুনের ছেলে হয়ে আহ্নিক করে না বলে। প্রসাদী মাংস ছাড়া ওদের বাড়ি ঢুকত না। তাহলে ছুটকির কারণেই দিদির সঙ্গে রায়বাড়ির যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। তাই-ই দিদির কথা ভাবেননি তিনি কখনও। মেজদার মেয়ের বিয়েতে যেন একটুখানির জন্যে দেখা হয়েছিল। আর? ও মায়ের কাজে।

দিদি লিখেছে—'মনি-অর্ডার পেয়েছি। না পেলে যে কী হত তা জানি না। ভাগ্যে তুমি ছিলে। ভাইয়েরা তো থেকেও নেই। এবারের মতো সামলে দিতে পেরেছি। তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করো...' দিদিকে প্রয়োজনের সময়ে মনি-অর্ডার পাঠাবার জন্যেই কি মায়ের দীর্ঘ জীবন লাভের প্রার্থনা?

শ্রী চরণেষু মা,

তোমার দেওয়া মূলধনে তোমার ছোট নাতি নূতন করে ব্যবসা শুরু করেছে। খুবই ভাল চলছে। *ওই টাকা শাঁটুল বলছে ফিরিয়ে দেবে। দিতে পারলেই আমার সোয়াস্তি।* কত দিলে মা! মেয়ের বিপদে মা ছাড়া আর কে করে। সবই ঠিক। তবু লজ্জা হয়। শাঁটুল শিগগিরই বাড়ির কলি ফেরাবে।'

আশ্চর্য! দিদির এত বিপদ গেছে তবু কখনও বিজনের কাছে হাত পাতেনি? মাকে জানিয়েছে। মার সাধ্য ছিল তাই করেছে, না হলে? হঠাৎ বিজন স্থির করলেন তিনি দিদির বাড়িই আগে যাবেন। একটাই মুশকিল। তাঁর প্রাণটা এখন ছুটকির জন্য দাপাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে তিনি ভীষণ অস্থির। ছুটকিকে খুঁজে বার না করে, তার সঙ্গে কথা না বলে বাড়ি ফিরে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তাঁর নেই। তা ছাড়া, বাড়ির লোককে...তনুশ্রী, তিতি আর চিন্টু এদের একটু ভোগাবার ইচ্ছে তাঁর। এ অবস্থায় দিদির বাড়ি গেলে তিনি গোপনতাটা রাখতে পারবেন কি? বাড়ি থেকে তাঁর জন্যে বিজ্ঞাপন-টন দিলে এই আহিরিটোলার বাসও তাঁর উঠবে। দেখা যাক।

নলিনী কর ফিরে আসবার আগেই তিনি চান সেরে নিয়েছেন। বেরোবার জন্য প্রস্তুত। —'এ কী? চললেন কোথায় মশাই? খেয়েছেন?'

—'বাইরে কোথাও খেয়ে নেব এখন।'

—'সে কী? আমি মিল বলে দিয়েছি যে। দশটা টাকা গচ্চা যাবে না।'

ভদ্রলোক কিছুতেই ছাড়বেন না। একতলার খাবার ঘরে আসন পেতে বসে, থালার চারদিকে জলের ছিটে দিয়ে, বাঁ কনুই বাঁ হাঁটুর ওপর রেখে বিজু রায়ের সঙ্গে খেলেন নলিনী। চানের কথা উড়িয়ে দিলেন। শীতকালে নাকি উনি অর্ধেক দিন চান করেন না। ভোজনের পর পরিষ্কার হয়ে নেবেন।

রান্না সত্যিই খুব ভাল। এ ভাবে চুড়ো-করা ভাতের সঙ্গে সুক্তো, মাছের মুড়ো দিয়ে বাঁধাকপি, বড় বড় পার্শে মাছের ঝাল, কুমড়ো, বেগুনের অম্বল—এসব কবে শেষ খেয়েছিলেন মনে পড়ে না বিজু রায়ের। বাঙালিরা ধনশালী হলেই তাদের খাদ্যাভ্যাস পর্যন্ত আমূল পাল্টে ফেলে। তাঁরা ছোটবেলায় জলখাবার খেয়েছেন এক পয়সার চারটে করে বলের মতো হিঙের কচুরি আর খোসাসুদ্ধ আলুর তরকারি। নয়ত দুধ-জিলিপি। বাঁধা জলখাবার। তাঁর ছেলেমেয়েরা খায় দুধের মধ্যে কর্নফ্লেক্স, আধ-সেদ্ধ ডিম, দুটো করে সিঙ্গাপুরি কলা। প্রমীলাকে তিনি হোটেলের বয়-বাবুর্চির মতো বলতে শুনেছেন—'ডিম সেদ্ধ না ভাজা?' সেদ্ধ ভাজার বাইরে স্ক্র্যাম্বল্‌ড্-এগের ফরমাসও হত। দুপুরে ভাত খান না বিজু রায়, আটার রুটি, গোনা দুখানা। নলিনী বললেন—'আপনি বোধহয় টেবিলে খান, না? খুব অসুবিধে হচ্ছে!'

বিজু রায় বললেন—'রান্না খুব ভাল।'

—'ভাল তো খাচ্ছেন কই? এ যে মেয়েদের খাওয়া মশাই।'

আরেক বাটি ডাল চেয়ে নিলেন বিজু রায়। বললেন-ব্লাড শুগার, বললাম না?

—'ওঃ হো তাই বলুন। তা আমার তো ইউরিনেও চিনি এসে গেছে। তাই বলে বাঁধাকপি দিয়ে ভাত মেখে খাব না। এমন পার্শে মাছের সর্ষে-বাটার ঝাল, ভাতে মেখে না খেলে রোচে?'

খেয়ে-দেয়ে বিজু রায় সুখচরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

এই তাহলে এখনকার সুখচর? বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর আগে দেখা সেই ছায়া নিবিড় মফস্বলের সঙ্গে কোনও মিল নেই। বড় বড় সুন্দর সুন্দর বাড়ি। বহুতল। কিছুকাল আগেও একটা সময় ছিল যখন বিলেত-আমেরিকা থেকে ফিরে এসে লোকে বলত—'এ কী? তিরিশ বছর আগে যা দেখেছি, যেমন দেখে গেছি, এখনও তো অবিকল তাই-ই?' ইদানীং আর সেটা বলতে পারবে না তারা। অন্তত সুখচরের চেহারা দেখে বিজু রায়ের তাই মনে হল। তিনি নিজের চেষ্টায় ভটচাজ্যি বাড়ি খুঁজে বার করতে পারলেন না। রিকশা-অলা, পান-সিগারেটের দোকান, লন্ড্রি ইত্যাদিতে জিজ্ঞেস করতে করতে পৌঁছলেন যখন দেখলেন সারা সুখচর বদলে গেলেও তাঁর দিদির বাড়ির পরিবেশ এতটুকুও বদলায়নি। সেই সামনে একটা পচা ডোবা এই দুপুরবেলায়ও যার ওপর থিকথিকে মশা। এবং পেছনে বিয়াল্লিশ বছর আগে দেখা দোতলা বাড়ির কঙ্কাল। খিলেন থেকে একটা অশথ গাছ গজিয়ে প্রায় মহীরুহ হয়ে গেছে। বাড়ির গায়ে কোনও দিন কোনও পলেস্তারা ছিল বলেও মনে

হয় না। বিরাট দরজাটা বহু কাল রং-টং না হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত কাঠের সেগুনত্বর গুণে এখনও অটুট আছে। ভেতরে ঢুকে বিজু গলা তুলে ডাকলেন—'দিদি! দিদি।'

সদর দিয়ে ঢুকে একটা ছোট গলি মতো। তার দুধারে বাঁধানো রক। আগেকার বড়সড় বাড়িতে এমনই থাকত। গলি পেরিয়ে চৌকো উঠোন। শান জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে, সেখানে আগাছা। শেয়ালকাঁটা, পাথরকুচি। শানের ওপর শ্যাওলা, তার ওপর ধ্যাবড়া করে চুন ফেলা হয়েছে। বিজুর মনে পড়ল উঠোন পেরিয়ে কলঘরে যেতে হত। এখনও তা হলে তাই আছে। বড়দির ছোট ছেলে শাঁটুল তাহলে কলি ফেরাতে পারেনি। ব্যবসাটা ফেল মেরেছে হয়ত। তিনি আবার গলা তুলে ডাকলেন—শাঁটুলবাবু। শাঁটুলবাবু। দিদির খুব সম্ভব দুই মেয়ে, দুই ছেলে। মেয়েদের নাম যেন ছিল খুকি আর টুকি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বড় ভাগনের নাম মনে করতে পারলেন না। পোশাকি নামগুলো তো নয়ই। অগত্যা শাঁটুলবাবু! শাঁটুলবাবু!

এবারে দাওয়ার ওপরের ঘরের ভেতর থেকে একটি বউ বেরিয়ে এল। হাতে খুন্তি। তার রকম দেখে বিজু রায়ের মনে হল—সে এইভাবেই মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে এবং গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়ে দেয় তাঁর মতো বে-আক্কেলে মিনসেদের।

তাঁকে দেখে বউটি জ্বলজ্বলে সিঁদুরের ওপর গাছকোমর থেকে টেনেটুনে একটু ঘোমটা টানল। এখানে এখনও বউয়েরা বাইরে লোক দেখে ঘোমটা টানে? কলকাতার থেকে কত দূর সুখচর?

—'কাকে চান?' স্বরটি ভাল।

—'আমি বিজু, শাঁটুলের ছোটমামা। দিদি আছেন?'

বউটির চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিল, সে এক ছুট্টে ভেতরে গেল। বোধহয় রান্না এবং খুন্তির একটা ব্যবস্থা করে আর একটু ভদ্রস্থ হয়ে বেরিয়ে এসে ঢিপ করে পেন্নাম করল, —'মা ভেতরের ঘরে শুয়ে আছে। আসেন।'

—'মা দেখো, কে আসছেন।'

দিদি ওপাশ ফিরে শুয়েছিল। বউয়ের কথায় এদিকে ফিরে ভুরু কুঁচকে বলল—'কে?'

ঘরটা অন্ধকার। বউটি এসে টিমটিমে আলো জ্বেলে দিন।

—'আমি বিজু দিদি।'

—'বিজু! বিজু! ছোট খোকা!' দিদি উত্তেজনায় উঠে বসল।

—'তুমি কেন? কোথা থেকে? কী করে খবর পেলে?'

বিজু রায় বললেন—'কেন? আসতে নেই? তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হল।'

—'আমাকে দেখতে?' দিদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—'কী হয়েছে দিদি তোমার? শুয়ে কেন?'

—'ডাক্তার তো ধরতে পারছে না কিছু। পেটে যনতন্না! তোমাকে, তাহলে এরা খবর দেয়নি! এমনিই এসেছ! —বউমা! ছোটমামার খাবার জোগাড় করো।' দিদি শেষ কথাটা গলা তুলে বলল।

বিজু বললেন, 'আমি খেয়ে-দেয়ে এসেছি দিদি। কাউকে ব্যস্ত করতে হবে না। ভাগ্নেরা কোথায়?'

—'ভাগ্নেরা?' দিদি অবাক হয়ে বলল 'রা কোথায় পেলে? বাঁটুল তো সেই কবেই ছোটতেই...'

তখন বিজু বুঝতে পারলেন কেন বড় ভাগ্নের নাম মনে পড়ছিল না। খুব সম্ভব তিনি যখন নিরুদ্দিষ্ট, তখনই...। তাঁর কোনও দোষ নেই।

গলাটা একটু পরিষ্কার করে বললেন—'খুকি, টুকি সব ভাল তো?'

—'আর কে ভাল, কে মন্দ! মেয়ে-সন্তান বিয়ে দিয়ে দিলেই পর, তার ওপর নিজের ছেলেপিলে সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়লে তো আর কথাই নেই। পরস্য পর। খুকি থাকে মজফ্ফরপুর। টুকির বর খুব উন্নতি করেছে, আগে কটকে থাকত, এখন বোম্বাই। এদ্দিকে ওদের কেউ নেইও। মাঝে-সাঝে চিঠি দেয়।'

—'শাঁটুল? শাঁটুল কোথায় গেল?'

দিদি অনেকক্ষণ পরে বলল '—জানি না।'

—'জানি না মানে?'

দিদি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল—'লেখাপড়ায় তো তেমন চৌকস ছিল না। গোড়ার থেকেই এ ব্যবসা সে ব্যবসা করে বাপের পয়সাগুলো সব ফুঁকে দিলে। তার পরেও অনেক অনেক দিয়েছি। শেষের দিকটা বেশ দু'পয়সা আসছিল। তারপর একদিন...' দিদি চুপ করে গেল।

এই সময়ে বউটি এক কাপ চা, আর দুটো দানাদার এনে রাখল।

বিজু বললেন—'আমার মিষ্টি চলে না, ব্লাড সুগার আছে। চা-টা খেয়ে নিচ্ছি। এগুলো নিয়ে যাও মা।'

বউটি দানাদারের প্লেট তুলে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পর দিদি আবার এদিকে তাকিয়ে মাথাটা একটু তুলে চুপি চুপি বলল—'হিন্দুস্থানী'।

—'কে?'

—'বউ।'

—'তো কী? ভালই তো!'

—'ভাল-মন্দ জানি না। শিগগিরই বোধহয় কাটান-ছাড়ান হয়ে যাবে।'

—'তাই?'

—'আর কী হবে বলো! শাঁটুল তো পুলিশের হাত এড়িয়ে বেড়াচ্ছে।'

—'সে কী? কেন?'

—'কি জানি। সিমেন্ট বলে নাকি গঙ্গামাটি পাইল করে দিয়েছে, একদিন রাতে সাতখানা মোটর বাইক গর্জন করে বাড়ি ঘিরে ধরল। এদের সব বসিয়ে দিয়েছে নাকি। খিড়কি দিয়ে শাঁটু পালিয়ে গেল। বউ আটকে আছে আমার জন্যেই। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে শাঁটুকে বিয়ে করেছিল। তা অ্যাদ্দিনে বোধহয় বাপ একটু নরম হয়েছে। ছেলেটাকে নিয়ে গেছে। বউটা হাজার হোক মানুষ তো, এমন অবস্থায় আমার ফেলে যেতে পারছে না।'

দিদির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ময়লা বিছানায় শীর্ণ বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বিজুর মনে হল—দিদি, ইনি বি. বি. রায়ের দিদি। শুয়ে থাকতে থাকতে দিদি হঠাৎ কুঁকড়ে যেতে লাগল। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বিজু উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বললেন—'কী হল দিদি! ব্যথা?'

—উঃ, মাগো! মাঃ আর পারছি না যে!'

বিজু বাইরে এসে ডাকলেন—'বউমা।'

বউটি এসে দাঁড়াল।

—'ডাক্তার দেখেছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী বলেছে?'

—'ক্যানসার।'

বিজু রায় দাওয়ার ওপর কাঠের বেঞ্চে বসে পড়লেন।

বউটি কাঠ-কাঠ গলায় বলল—'ওর ছেলে ফেরার। এই রোগ বাধিয়েছে। আমার গলায় পড়েছে। আমার কোনও ক্ষমতাই নাই। আপনি ওর ভাই। শুনেছি রইস লোক। অনেক পয়সা। নিয়ে যান। নিয়ে এই নরক থেকে আমায় ছেড়ে দিন।' বলে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে রুক্ষ গলায় বলল—'আপনি যদি এত পয়সা-অলা লোক তো আপনার দিদির, ভান্‌জার এমন অবস্থা হয় কেন? আমার পিতাজিও বেওসা করেন, আমাদের মতিহারী থেকে যে দেশোয়ালি যখন এসেছে কোনও না কোনও হিল্লে

লাগিয়ে দিয়েছেন। নিজের লোকের তো কথাই নাই। আপনারা বঙ্গালিরা কেমন মানুষ?' রাগে মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সে আবার রান্নাঘরে ঢুকে গেল। এত কী রাঁধছে সে ভগবানই জানেন।

বিজু রায় গালে চড় খেয়ে বসে ভাবতে লাগলেন। এক করা যায়, দিদিকে নিয়ে এখুনি সল্ট লেকের বাড়ি চলে যাওয়া যায়। মায়ের ঘর খালি পড়ে আছে, দিদি অনায়াসেই থাকতে পারবে। নার্স রেখে দেওয়া যাবে, মায়ের মতো। তনুশ্রী সম্ভবত ব্যাপারটা পছন্দ করবে না। এরকম ঘটনা এর আগে ও বাড়িতে হয়ওনি। কিন্তু তার জন্য কিছু এসে যাবে না। দিদি থাকবে ওপরে, সব কিছু আলাদা। তার সেবার ভার মাইনে-করা লোকেদের। তনুশ্রীর বলবার কিছু থাকতে পারে না। হঠাৎ বিজু রায়ের একটা কথা মনে পড়ে গেল, তিনি গালে আরেকটা চড় খেলেন। তাঁদের বিয়ের কিছুদিন পরই তনুশ্রীর বাবা মারা যান। মা একা পড়ে গেলেন। ছয় মেয়ে। তনুশ্রীই একমাত্র খাস কলকাতায়। সে মাকে নিজের কাছে এনে রাখতে চেয়েছিল। বিজু রায় রাজি হননি—যুক্তি দেখিয়েছিলেন অনেক। দুই পক্ষের মা এক সংসারে থাকলে জটিলতা বাড়বে। অনর্থক। তাঁর বাড়ির কতকগুলো নিজস্ব নিয়ম, শৃঙ্খলা আছে, সেগুলো নষ্ট হওয়া তাঁর শুধু অনভিপ্রেত তাই-ই নয়। তাঁর জীবিকা ইত্যাদির পক্ষে ক্ষতিকর। শাশুড়ি যদি সেগুলোতে হাত লাগান। অল শাশুড়িজ আর গ্র্যাবিং, ডমিনেটিং টাইপস, তখন শুধু-শুধু সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। তাছাড়া, ভদ্রমহিলার আরও পাঁচ মেয়ে রয়েছে। সাধ্যের বাইরে গিয়ে সবারই মোটের ওপর ভাল-ভাল বিয়ে দিয়েছেন, তা তারাও তো রাখতে পারে। তনুশ্রীর মুখটা কেমন হয়ে গিয়েছিল। একবার তবু বলেছিল—'ঠিক আছে মাকে একবার জিজ্ঞেস করতে পারি তো?'

বিজু রায় বলেন, —'তা পারো। কিন্তু মা রাজি হলেও আমি রাজি হতে পারব না।' তবু তনুশ্রী জিজ্ঞেস করেছিল মাকে। খুব স্বস্তি পেয়েছিলেন বিজু যখন মা-ও তাঁর মতে মত দিয়েছিল। 'না, কুটুম্বকে ও ভাবে বাড়িতে রাখলে অশান্তি হবার সম্ভাবনা, তার চেয়ে বিজু একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিক। বউমা গিয়ে গিয়ে দেখাশোনা করুক।'

তনুশ্রীর মার হার্টের অসুখ ছিল। ঠিক কী জাতীয় তা বিজু রায় জানেন না। তিনি মাসোহারা দিতেন, চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তনুশ্রীর মা নিজের ঘরে একদিন মরে কাঠ হয়ে পড়েছিলেন। প্রতিবেশীরা দরজা কেটে বার করে। বিজু রায় গিয়েছিলেন। শাশুড়ির চোখের সেই ভয়ে ঠিকরে আসা চোখের মণি দুটো তিনি কখনও ভুলতে পারবেন না। একাকিত্বের আতঙ্কেই হঠাৎ উনি মারা গেলেন, না হার্টের অসহ্য যন্ত্রণায় ওইরকম অবস্থা হয়েছিল, কে বলবে! বিজু রায় কুঁচকে গেলেন। কেমন মনে হল, দিদিকে ওখানে তুললে তিনি তনুশ্রীর কাছে খুব ছোট হয়ে যাবেন।

দিদির চিৎকার ক্রমশ বাড়ছে। মেয়েরা এমনিতেই খুব সহনশীল হয়। তা সত্ত্বেও একজন চুয়াত্তর পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা যখন এই ভাবে ডাক ছেড়ে কাঁদছে তখন অনুমান করা যায় তাঁর যন্ত্রণার তীব্রতাটা কী রকম! বিজু রায় ভাবলেন—'আর এই সময়ে আমি কারও কাছে ছোট হওয়ার কথা ভাবছি। কী অদ্ভুত একা মানুষ! ভাই-বোন-ছেলে-মেয়ে সব আছে। সব থাকে। অথচ কেউ নেই। কিছু থাকে না। কিছু থাকে না। থাকে শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে খাড়া হয়ে চূড়ান্ত অহমিকা। অহম্, অহম্, অহম্।

তিনি তাড়াতাড়ি দিদির ঘরে ঢুকলেন। বললেন—'দিদি। ব্যথা বাড়লে কোনও ওষুধ খাও?' হাত বাড়িয়ে একটা পাতা দেখাল দিদি। তুলে বিজু রায় দেখলেন স্পাজমোপ্রক্সিভন। হতাশ হয়ে বললেন—'এতে হয়?'

—'কী জানি! হয় হয়তো!' দিদির গলা রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওষুধটা দিদিকে খাইয়ে দিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে বউটিকে ডাকলেন—বললেন—'এখানে কোথায় কোন ডাক্তার বসেন আমি তো জানি না, একটু বলে দেবে কোনদিকে পাব?'

বউটি বলল—'আপনি বসেন, আমি ডাকছি। ফি-এর টাকা বত্রিশ, আগে না দিলে আসবে না।'

পকেট থেকে তাড়াতাড়ি বার করে দিলেন তিনি টাকাটা। বললেন—'অবস্থাটার কথা বলে ইঞ্জেকশন ওষুধ যা লাগে নিয়ে আসবে বোলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দেব।'

টাকা নিয়ে বউটি চলে গেল। একটা ক্যানসারের রোগী, মরণাধিক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ডাক্তার আগে থেকে ফি না পেলে আসবে না? বিজু রায় অবাক হয়ে রইলেন। এঁরা তো এখানকার বহুদিনের বাসিন্দা! আদি বাসিন্দাদের মধ্যেই! জমিদারশ্রেণীরই ছিলেন বোধ হয়। এখন টাকা না থাকলেও সেই পুরনো মান-মর্যাদা! তারও কি কিছুই নেই? ডাক্তার! ডাক্তার! কত লাখ টাকার সরকারি খরচে একটা ডাক্তার হয়?

ডাক্তারটি যখন এল, বিজু রায় দেখলেন নেহাতই ছোকরা। চটপট পেথিডিন ইনজেকশান দিয়ে দিল। তিনি দামটা দিয়ে দিলেন। তারপরে বললেন—'শুনলাম, আপনি নাকি আগে থেকে ফি না পেলে আসেন না?'

—'কে বললে?' ডাক্তারটি চোখ তুলে বলল—'রত্না! ওকে জিজ্ঞেস করুন তো কত বার ইনজেকশন দিয়ে গেছি এ বাড়িতে, এক পয়সাও পাইনি।'

—'পাননি কেন সেটা চারদিক দেখেই নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। এক জনের কাছ থেকে ফিজ না পেলে আপনার বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না এমন অবস্থা নিশ্চয়ই আপনার নয়।'

—'আপনি কে?' ডাক্তারটি রাগত স্বরে বলল, 'কী রাইট আছে আপনার এখানে ডেকে এনে আমাকে অপমান করবার? আমি যদি চিটেড হতে না চাই, সেটা আমার অপরাধ?'

—'চিটেড? ডু য়ু নো ইয়াং ম্যান দ্যাট ইয়োর্স ইজ দা নোবলেস্ট প্রফেশন? জানো সরকার তোমার জন্যে কত টাকা খরচ করেছে? জানো ইউ আর ডিলিং উইথ হিউম্যান পেইন, সাফারিং! মানুষের অমানুষিক শারীরিক যন্ত্রণার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি একটা ডাক্তার, চিটিঙের কথা মুখে আনতে পারছ?'

—'ওহ্, রত্নার কাছে শুনলাম শমিতবাবুর বড়লোক মামা এসেছেন। বিজনেসম্যান। আমরা ডাক্তাররা অনেক পেইন, সাফারিং, ডেথ দেখতে দেখতে ইমিউন হয়ে গেছি, বুঝলেন? অ্যান্ড উই ডোন্ট কজ সাফারিং, ডোন্ট কজ পেইন। আর আপনারা? আপনাদের মতো অসাধু, কালোবাজারিদের জন্যে যে দেশটা ভিখিরিতে আর নবাবে দু ভাগ হয়ে গেল, তার বেলা? গরিবের মুখের অন্ন কেড়ে খান না? আপনাদের জন্যেই না গরিবি টিকে আছে! এই তো গরিব আত্মীয়, উপায় না দেখে চিটিংবাজি সুদ্ধু ধরেছে, কিছু করছেন তাদের জন্যে? আবার বড় বড় কথা।'

হনহন করে বেরিয়ে গেল দুর্মুখ লোকটা। বিজু রায় অনুভব করলেন তিনি ঘামছেন। এভাবে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার... না তিনি মনে করতে পারছেন না কেউ করেছে বলে। তাঁদের কথা কাটাকাটির মধ্যে রত্না বউটি বেরিয়ে এসেছিল। ঈষৎ উৎকণ্ঠার গলায় বলল—'কী করলেন মামা, ও তো আর হাতে-পায়ে ধরলেও আসবে না।'

—'ওর আসবার দরকার নেই। লেট হিম গো টু হেল।' কোন মতে বলতে পারলেন বিজু রায়। একটা কালো হয়ে যাওয়া হাত পাখা আর এক গ্লাস জল নিয়ে এল রত্না। —'আপনাকে খুব হয়রান দেখাচ্ছে, জলটা খেয়ে নিন।' হাওয়া করতে লাগল সে। তারপর বলল—'বয়স হয়ে গেছে, একসাইটমেন্ট ভাল না। ওসবের মধ্যে যান কেন'?

'আশ্চর্য, মেয়েটি ঠিকই বুঝতে পেরেছে তাঁর বয়স হয়েছে। অথচ নলিনী কর, তাঁর সমবয়সী লোকটি, সে বুঝতে পারেনি। যুবক-যুবতীরা ঠিকই বুঝতে পারে। খুব সম্ভব চোখের দিকে তাকিয়ে পারে। বড় কাঁসার গেলাসের জলে নিজের চোখের ছায়া দেখতে দেখতে ভাবলেন বিজু রায়। তিনি বললেন, 'অমানুষিকতা, অন্যায় আমি সইতে পারি না।' বলেই মনে হল—'সত্যি? পারি না কি?' মেয়েটির ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি। বোধ হল সে-ও মনে-মনে এই কথাই বলছে। পারো না। পারো না। সইতে না পারা তো দূরের কথা। অন্যায় অমানুষিকতা তুমি নিজেই প্রশ্রয় দাও। নিজেই করো।

তিনি বললেন—'শাঁটুল কখনও আমার কাছে যায়নি কেন?'

'কী ব্যাপারে?'

'নিজের কাজকর্মের ব্যাপারে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রত্না, তারপর বলল—'ও বলত স্নব, আমাদের দেখলে চিনতে পারে না। চিনতে চায়ও না, না খেয়ে মরব তবু ওই মামার কাছে কাঁদাকাটি করতে যাব না। ...কিছু মনে করবেন না বললুম বলে।'

বিজু রায় অবাক হয়ে রইলেন। চিটিংবাজের তাহলে এইরকম আত্মসম্মান বোধ থাকে? না খেয়ে মরব, জেলে যাব, তবু স্নব মামার কাছে যাব না! এ কী মুখ তাঁর। কী ভয়ঙ্কর বীভৎস হাস্যকর মুখ আয়নায়। একেক মানুষের কাছে কি তাঁর একেক রকম মুখ?

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। রত্না বলল—'চলে যাচ্ছেন! রাগ করলেন?' তার গলায় দারুণ উৎকণ্ঠা।

বিজু বললেন, একটু হেসে বললেন—'ভয় নেই। আমার দিদির ভার বইতে তোমাকে আটকে রাখব না। এখুনি ওঁকে হাসপাতাল ভর্তি করতে হবে। তার ব্যবস্থা করছি।'

রত্নার মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে বিজু বললেন—'শাঁটুল তো অনেক দিন নেই। আসবার সম্ভাবনাও নেই। চলছে কী করে? তুমি এই টাকাটা রাখো।' তিনি পার্স থেকে হাজার খানেক টাকা বার করতে লাগলেন।

রত্না মেয়েটি হঠাৎ তীব্র গলায় বলল—'আপনার অনেক পয়সা-টাকা আছে, না? লোকের মুখের উপর ছুঁড়ে মারতে পছন্দ করেন! জানেন আমি আমার গয়না বিকিয়ে সংসার চালিয়েছি, শাসের ইলাজ করিয়েছি।'

বিজু রায় শান্ত গলায় বললেন—'খুব ভাল করেছ। মানুষের কাজই করেছ। কিন্তু ওভাবে গুরুজনদের সঙ্গে কথা বোলো না। আমাদের ছোটতে বাবা-টাবা আমাদের ওপর অন্যায় করেছেন জানলেও আমরা কিছু বলতাম না, কেন জানো? স্রেফ গুরুজন বলে। বিদ্রোহ ভাল। মুখের ওপর উচিত কথা শুনিয়ে দেওয়াও ভাল। কিন্তু জায়গা বুঝে, মানুষ বুঝে। আমি টাকা তোমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারছি না। হাতে দিচ্ছি। তোমার দরকার বলে। আর আমি মামা বলে।'

রত্না কেঁদে ফেলল। সম্ভবত এই কান্নাটা তার অনেকদিন ধরে জমা ছিল। সে টাকাটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। দিদি ঘুমোচ্ছে। বিজু রায় বেরিয়ে এলেন।

নিজের চেনা ডাক্তারদের কাছে যেতে পারছেন না। চেনাশোনা প্রভাবশালী লোকদের রেফারেন্স দিতে পারছেন না। শুধু টাকাটা আছে। বিজু রায় ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন টাকা তুলে এনেছেন। আরও আনবেন দরকার হলে। ব্যবস্থা করেছেন। একজন সম্পূর্ণ আনকোরা, পরিচিতিহীন নাগরিক হিসেবে বিজু রায় কোথাও কোনও সুযোগ পেলেন না। ডাক্তার, যিনি ভর্তি করবেন হাসপাতালে, আগে নিজে দেখে রায় দেবেন তার পরে ভর্তির কথা। দিদির কোনও মেডিক্যাল রিপোর্ট টিপোর্টও নেই। স্রেফ আন্দাজের ওপর ডায়গনোসিস। কিন্তু কোনও ডাক্তারই এখান থেকে সুখচরে গিয়ে রোগী দেখে আসতে পারবেন না। পুরোটা রাস্তা গাড়িতে নিয়ে যাওয়া আসা করলেও না। অবশেষে রাত্রি নটা নাগাদ নিজের জেদ ছেড়ে বিজু রায় চলে গেলেন ডক্টর পি. চ্যাটার্জির কাছে। প্রচুর রোগী অপেক্ষা করছে। কলকাতার সেরাদের মধ্যে একজন মেডিসিনে। নিজের একটা কার্ড পাঠিয়ে দিলেন বিজু রায়। সমুদ্র দুভাগ হয়ে গেল মন্ত্রবলে, মাঝখান দিয়ে এক ত্রাণকর্তা বি. বি. রায় আরেক ত্রাণকর্তা পি. চ্যাটার্জির কাছে চলে গেলেন।

ধৈর্য ধরে সব শুনলেন ডক্টর চ্যাটার্জি। কোনও প্রেসক্রিপশন, ডায়াগনোসিস, প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট, বায়পসি কিছু নেই। বললেন—ফোন করে দিচ্ছি, আমার নার্সিং হোমের অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে চলে যান, নিয়ে আসুন, এখুনি ভর্তি করে নিচ্ছি। তারপর দেখছি কী করা যায়।

রাত্তির সাড়ে এগারোটার পরে দিদিকে ভর্তি করে, রত্নাকে তার বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আহিরিটোলায় ফিরলেন বিজু রায়। সর্বক্ষণ গামছা পরে থাকা সেই হরিহর নামে লোকটি দরজা খুলে দিল। হা-ক্লান্ত বিজু রায় তিনতলায় চিলেকোঠায় উঠে দেখলেন নলিনী কর পেশেন্স খেলছেন। —'এই যে, এসো বিজনভায়া। আমি গেস করতে পেরেছিলুম দেরি হবে। শেষপর্যন্ত কি পুলিশেই গেলে?'

'না, আপনাকে তো বলেইছ এ পুলিশের ব্যাপার নয়।'

'ওঃ হো, ভুলে গিয়েছিলুম এ সেই অনে-ক কালের হারানো একজন। না? বুঝি, বুঝি বিজনভায়া, বুঝি সবই! ইন্টারফেয়ার করতে চাই না, তাই...বুঝলে না?'

শীতের রাতে বিজন বালতি বালতি জল ঢেলে চান করলেন। হরিহর রুটি বেগুনভাজা আর আলু-কপির তরকারি গরম করে নিয়ে এল। বিজন বললেন—'এ সবের দরকার ছিল না। খেতে ইচ্ছে করছে না।'

নলিনী কর বললেন—'ভাগ্য হল চোরের মতন, বা বলতে পারো জোচ্চোর। তো সেই চোর-জোচ্চরের ওপর রাগ করে মুখের খাবার কেউ ফেরায়? ফিরিয়ো না ভায়া, বড় দাদা বলছি, খেয়ে নাও, তারপরে ওষুধ দেব। গায়ের ব্যথা মরবে।'

বিজন দেখলেন হঠাৎ তাঁর পেটের মধ্যে থেকে দারুণ খিদে চাড়া দিয়ে উঠছে। তিনি রুটি, বেগুন ভাজা নিয়ে বসে গেলেন।

নলিনী কর বললেন—'আলু কপির ডালনা থেকে আলুগুলো বাদ দিয়ে খাও ভায়া। একদিনে বড্ড অত্যেচার হয়ে যাবে নইলে।' তিনি চৌকির তলা থেকে একটা ট্রাঙ্ক বার করলেন টেনে। তার ভেতর থেকে একটা লম্বা গোল বোতল বার হল। বিদেশি হুইস্কি। বললেন—'চলে না বললে শুনব না ভায়া, একটু খাও, ক্লান্তি দূর হবে, গায়ের ব্যথা মরবে, ভাল ঘুম হবে।'

নিজের তক্তাপোশটিতে তিনি নতুন চাদর পাতলেন। বালিশের ওয়াড় বদলালেন। ট্রাঙ্ক থেকে একটি বিলিতি রাগ বার করলেন। বললেন—'দেখলেই বোঝা যায় ভায়া শৌখিন মানুষ। চোখের সামনেই সব বদলে দিলুম। এবার আরাম করে শুয়ে পড়ো।'

—'আপনি?'

—'আমি এই ক্যাম্প খাটে! দুদিনের তো ব্যাপার।'

তো সেই নলিনী করই এখন খাটিয়াতে ফুলের মালা ইত্যাদিতে শোভিত হয়ে শুয়ে আছেন। মেস-বন্ধুরা ট্রাঙ্ক থেকে তার চুনোট করা ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি বার করে পরিয়ে দিয়েছে।

বিজন কদিন দিদির জন্য নির্দম ছোটাছুটি করছেন। ডাক্তার বলছে অপারেশন করার ঝুঁকি আছে। আবার করলে ভালও হতে পারে। অপারেশনের তারিখ পড়েছে দুদিন পর। দিদিকে ফলের রস খাইয়ে, কিছুক্ষণ গল্প করে, ওষুধপত্র সব কিনে দিয়ে, রত্নাকে আবার পৌঁছে দিতে হল। সে নার্সিং হোমে এসে বসে আছে। বলল, একাই চলে যেতে পারবে। কিন্তু বিজু তা দিতে পারেন না। তিনি তাকে বাপের বাড়ির গলি অব্দি পৌঁছে দিলেন। যাবার সময়ে মুখ নিচু করে বলল—'কাল গুড্ডুকে নিয়ে যাব মামা? খুব দাদি-দাদি করছে। ওঁর হাতেই তো মানুষ।'

'এনো'—বিজন বললেন।

তারপর ফিরে দেখলেন এই ব্যাপার। এঁরা সবাই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। নলিনীকান্তর ট্রাঙ্ক-বাক্স হাঁটকে নাকি কোনও ঠিকানাই পাওয়া যায়নি। মণিময় বলল—'আপনি ওঁর অনেকদিনের বন্ধু, আপনিই মুখে আগুনটা দিন, বামুনও বটেন।'

বিজন হেসে বললেন—'কে বলল আমি ওঁর অনেকদিনের বন্ধু? যেদিন ওঁর সঙ্গে এলাম তার আগে চিনতাম না পর্যন্ত!'

চাঁদু, যে মাসকাবারি বাজার করে সে বলল—'বলেন কী?' একটু পরে বলল—'নলিনীদার কারবারই আলাদা। আপনার হাত থেকে আগুনটা নেবেন বলেই বোধ হয়...আগুনটা আপনারই হাতে মাপা ছিল।'

আহিরিটোলার মেসবাড়ির চিলেকুঠুরির ভাড়ার উত্তরাধিকার বিজু রায়ই পেলেন। ট্রাঙ্ক-বাক্স হাতড়ে যা টাকাপয়সা পাওয়া গেল তাতে কোনওমতে মেসের পাওনা চুকল। সবাই চাঁদা করে শেষ কাজের টাকাটা তুলল, গঙ্গার ঘাটেই কাজটা হবে ঠিক হয়ে গেল। বিজুকেই করতে হবে। কেউ শুনল না। তিনিই নাকি নলিনী করের একমাত্র ওয়ারিস।

॥ ৪ ॥

শুক্তি মেয়েটি ছোটখাটো, রোগা, রং-ও ময়লা, কিন্তু মুখটা ভীষণ মিষ্টি। খুব বুদ্ধিযুক্তও বটে। সে শার্ট-প্যান্ট ছাড়া পরে না। গরমকালে শর্টস। এই শুক্তি তার নিজের মহলে যাকে বলে ক্রেজ। শুক্তির এম. এ. ফাইন্যাল ইয়ার। কিন্তু সে ইতিমধ্যেই অন্য অনেক কিছু করছে। যেমন টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে মডেলিং। স্টেটসম্যানের 'নাউ অ্যান্ড এগেইন' কলামে লেখা। বস্তির বাচ্চাদের নিয়ে নাইট স্কুল। আনন্দবাজারেও দু-একবার আর্টিকল লিখেছে। তাব বন্ধুরা তাকে জিজ্ঞেস করে থাকে সে ওইসব হাই-ব্রাও কাগজে অ্যাট অল পাত্তা পেল কী করে! কনসিটেড পিপল, ওরা তো ঢোকবার পথেই পাবলিককে আটকে দেয়।

এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শুক্তি তার সম্মানের পক্ষে হানিকর বলে মনে করে। সে মুখের ওপর একটা মৃদু তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে ডান হাত দিয়ে ক্রমাগত সামনে ঝুঁকে-আসা চুলগুলোকে পেছনে ঠেলে দেয়। শুক্তির মধ্যে দুটো জিনিস খুব শক্তিশালী। এক, সে যা করতে চায় তা করেই ছাড়ে। ভীষণ জিদ্দি, তার মা বলে থাকেন তাকে বাধা দিয়ে কিছু লাভ হয় না এমত সময়ে। একটি সাময়িক পত্রিকায় সে একবার খিদিরপুরের ফ্যান্সি মার্কেট সম্পর্কে একটা আর্টিকল লিখেছিল। সম্পাদকের নামেই সে সেটা পোস্ট করে দেয়। খুবই স্পর্শকাতর অথচ কৌতূহলপ্রদ বিষয় বলে সম্পাদক তাকে ডেকে পাঠান, এবং তার চেহারা ও বয়স দেখেশুনে হাঁ হয়ে যান। বেশ কিছুটা সম্পাদনা করে, তেমন তেমন ফটো বাদ দিয়ে লেখাটা ছাপা হয়েছিল। কিন্তু শুক্তি এই সম্পাদনায় অত্যন্ত আহত অপমানিত বোধ করে। সে সম্পাদকের ঘরে গিয়ে বেশ ভালই ঝগড়া করে আসে। যেমন সে বলে—'আপনি আমার কাছ থেকে আরও কৌতূহলপ্রদ বিষয়ে লেখা পেতে পারতেন, কিন্তু পাবেন না। এবং একজন বিকচমান সংবাদদাতাকে আপনি হত্যা করলেন।' শুক্তি যখন বাংলা বলে ইংরিজি ব্যবহার করে না এবং শুদ্ধ পরিষ্কার বাংলা বলার চেষ্টা করে। যাই হোক তার ক্রোধ দেখে সম্পাদক মুচকি হেসে তাকে চা খাওয়ালে সেটা সে খেয়ে নিয়েছিল। শুক্তির দ্বিতীয় ব্যাপার তার পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে রূপ। পতিত-পতিতা সে যেমনভাবেই যে অর্থেই হোক, তাকে সে রেহাই দেয় না। এটাতেই সবচেয়ে গণ্ডগোল বাধে। যেমন ড্রাগ বিক্রেতা এক পান-সিগারেটওয়ালকে ধরে ফেলতে পেরে সে নিত্য সেখানে পান খেতে এবং সিগারেট পিতে যেতে আরম্ভ করে। ফাঁকে ফাঁকে তার ধর্মোপদেশও চালায়। ফলে পানওয়ালা ঠিক জায়গায় খবর পৌঁছে দেয় এবং সে উত্তম-মধ্যম ধোলাই খায় এক সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরবার পথে। শুক্তির চরিত্রে প্রতিহিংসা নেই। তাই তার আতঙ্কিত বাবা-মা পুলিশে এফ আই আর ইত্যাদি করলেও সে এ ব্যাপারটাতে আর কোনও কৌতূহল দেখায় না। না হলে কী হত বলা যায় না। মার খাওয়ার পর তখনও ঘা শুকোয়নি, কপালে ব্যান্ডেজ, হাতে পায়ে নানা জায়গায় স্টিকিং প্লাস্টার...এই অবস্থায় সে সেই পানওয়ালার কাছে যায়। কোমরে দু হাত রেখে পান ও সিগারেট চায়। দুটোই কেনবার পর সেগুলো সজোরে মাটিতে ফেলে পিষে দেয় পা দিয়ে তারপরে পানওয়ালাকে ডেকে ডেকে যথেষ্ট ঘৃণা সহকারে নিজের ক্ষতচিহ্নগুলো

দেখাতে থাকে। বলে—'দেখো ইয়ে তুমহারী জওয়ানী কী রোশনি, ঔর ইয়ে সব তুমহারী মর্দানগী কী নিশানী।' তারপর ধীর পদক্ষেপে এমনভাবে চলে আসে যে পানওয়ালার বোধে আসে যে এই মেয়েটিকে ঠেঙিয়ে ঠেকানো যাবে না।

সংস্কারক শুক্তির সাম্প্রতিকতম লক্ষ্য হল নীলাদ্রি ওরফে চিন্টু। সংস্কারক শুক্তির করুণা আকর্ষণ করার জন্যে অবশ্য তার অনেক বন্ধুই এক পায়ে খাড়া। এ নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে ফাটাফাটিও হয়ে যায়। ষড়যন্ত্রও হয়। যেমন বন্ধুমহলে রটে গেল সোহন তার গার্লফ্রেন্ড তাকে ডিচ করবার পর ভীষণ ডিপ্রেশনে ভুগছে। শুক্তির ছোট ছোট কান দুটো খাড়া। কিন্তু সে কিছু বলছে না। —'শুক্তি জানিস, সোহনটা বোধহয় পাগলই হয়ে যাবে!' দীর্ঘশ্বাস।

দু-তিন দিন পরে শুক্তি ঠিক সোহনের ঘরে পৌঁছে গেছে। সোহনের একমুখ দাড়ি। পরনে ময়লা পাজামা, একটা অনুরূপ ফতুয়া। সে যেন শুক্তিকে লক্ষই করেনি এমন ভাব। শুক্তি তার সামনে গিয়ে নিজে একটা সিগারেট ধরাল, সোহনকেও একটা দিল। সোহন আস্তে মাথা নেড়ে মুখ ফিরিয়ে রইল। শুক্তি তখন সোহনকে পুলকিত করে তার কোলের ওপর বসে পড়বে এবং তার ময়লা ফতুয়া ছিঁড়ে ফেলতে থাকবে।

—'এই শুক্তি কী হচ্ছে, কী হচ্ছে, এই এই ছাড় বলছি।'

কিন্তু এর ক'দিন পরে যখন শুক্তি সোহনকে নিয়ে তাদের আড্ডায় যাবে এবং সোহন উজ্জ্বল মুখে একহাতে চায়ের কাপ আর এক হাতে শুক্তির কাঁধ জড়িয়ে ধরে—'শুক, লেটস লীভ দিস স্টিংকিং জয়েন্ট' বলবে তখন সোহনেরই পরম বন্ধু এবং ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী পারভেজ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কোথা থেকে একটা পেনসিল কাটা ছুরি আস্ফালন করে বলবে—'দাস ফার, সোহন, নো ফার্দার।' এর পর স্বভাবতই পারভেজে-সোহনে একটা বিরাট ঝটাপটি লাগবে; অন্য বন্ধুরা দুভাগে ভাগ হয়ে যাবে এবং মোরগা-লড়াইয়ের মতো দুজনকে উত্তেজিত করতে থাকবে। এই সময়ে সকলের অলক্ষ্যে শুক্তি বেরিয়ে আসবে। তার মুখের ভাব শান্ত, ধীর, উজ্জ্বল। সে সোহনকে, প্রাণচঞ্চল, মজাদার ছেলে সোহনকে লড়াইক্ষম করে দিতে পেরেছে। তার কাজ ফুরিয়েছে। সে সফল। এই ধরনের একটা তৃপ্তি নিয়ে সে ফেরে।

নীলাদ্রির মুশকিল হল সে কোনও কিছুতেই মন বেশিদিন বসাতে পারে না। শুক্তিও খেয়ালি। কিন্তু সে যেটা করে সেটা খুব সুন্দরভাবে করে। নীলাদ্রি কিছুই করতে পারে না। এম এ পড়ছিল, পরীক্ষা দিল না। ফ্রেঞ্চ ক্লাসে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু জে সুই নীলাদ্রি, ভু জেৎ মঁসিয় বানার্জি আর এলে মাদমোয়াজেল শুক্তি পর্যন্ত শিখে আর এগোতে চাইছে না। তার দিক্‌তে অর্থাৎ ডিকটেশন থেকে রাশি রাশি ভুল বার হচ্ছে, মঁসিয় বানার্জি ধৈর্য রাখতে পারছেন না। এমনকি নীলাদ্রি যে শুধু সুন্দর সুন্দর মেয়েদের দেখবার জন্যেই অলিয়াঁস ফ্রাঁসেতে এসে জুটেছে এ কথা তিনি প্রকাশ্য ক্লাসেই বলেছেন।

'অব্যবস্থিতচিত্ততা!' শুক্তি দাঁতের তলায় চেপে নিজের মনে বলেছে। এর যা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, একে সাহায্য না করলে শেষপর্যন্ত সাট্টাবাজ, ড্রাগ-পেড্‌লার, খুনি যা খুশি হয়ে যেতে পারে।

ডেনিমের একটা মিডি স্কার্ট আর বাসন্তী রঙের পুলোভার পরে অতএব শুক্তি নীলাদ্রির বাড়ির সিঁড়ি টপকে টপকে উঠছে। তার কাঁধে একটা খাদির ব্যাগ। নীলাদ্রিদের বাড়ি সবসময়ে ফাঁকা। বাবা থাকেন না, মা থাকেন না, বোন আছে একটা, তার চেহারা পর্যন্ত কখনও দেখেনি শুক্তি। দূরে দূরে কিছু লোকজন ঘুরে বেড়ায়। তাদের রকম-সকম পিংপং বলের মতো। শুট্ করে কোথায় ছিটকে সরে যাবে আবার শুট করে কখন নেটের ঠিক পাশটিতে এসে ড্রপ খাবে বলা যায় না। এইরকম নির্জন শীতালো দুপুরে শুক্তি নীলাদ্রির ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে।

নীলাদ্রি তিন-চারটে বালিশ মাথায় দিয়ে বিছানায় আধশোয়া। হাতে একটা ছোট্ট অ্যালবাম মতন। অখণ্ড মনোযোগে দেখছে। শুক্তি এসেছে, ঘরে ঢুকেছে, এবং নিঃশব্দে তার মাথার পেছনে এসে

দাঁড়িয়েছে সে কিছুই বুঝতে পারেনি। শুক্তি বিদ্যুদ্বেগে অ্যালবামটা ছিনিয়ে নিল। চমকে বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠল চিন্টু।

'এই, এই দে দে, প্লীজ দে শুক্তি।'

মন দিয়ে অ্যালবামের ছবিগুলো দেখতে দেখতে শুক্তি বলল—'ওহ্ নীল তুই তাহলে একটা বুড়ো ভাম। আউটওয়ার্ডলি ইয়াং, ইনওয়ার্ডলি রটন।'

—চিন্টু বলল, 'এই শুক্তি ধ্যাত, ওগুলো দে।'

—'কোথায় পেলি এগুলো?'

—'মেট্রোর পাশের গলিটায় একজন সেল করছিল। জাস্ট আউট অফ কিউরিয়সিটি! নাথিং সিরিয়াস। এই শুক্তি প্লীজ।'

শুক্তি ততক্ষণে পুরো ঘরটায় চক্কর দিচ্ছে আর সব জিনিসপত্র উল্টে-পাল্টে দেখছে। চিন্টু তার পেছন পেছন ভিক্ষুকের মতো হাত বাড়িয়ে আসছে আর ক্রমাগত বলে যাচ্ছে, 'শুক্তি প্লীজ!'

শুক্তি বলল—'তাই ভাবি, একটা যুবক ড্রাগ খায় না, অতিরিক্ত মদ্যপান করে না, প্রেমে পড়ে না অথচ হয় ফেল করছে আর নয়ত ড্রপ। পরীক্ষা দিচ্ছে না। গোপন কথাটা তা হলে এই!' বলে সে আবার ঝটিকাবেগে একটা ক্যাসেট তুলে নিয়ে ভি. সি. পি-তে চাপিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটি প্রায় উলঙ্গ নর-নারী টিভি-র পর্দায় ওলটপালট খেতে লাগল। শুক্তি দেখছে খুব কৌতূহল নিয়ে। চিন্টু মাথাটা দু হাতে ধরে বসে পড়েছে একটা চেয়ারে। কিছুক্ষণ পর টিভি-র সুইচ অফ করে দিয়ে শুক্তি ক্যাসেটটা বার করে নিল, তার পরে অ্যালবামটা তুলে ধরে বলল, 'এগজিবিট নম্বর এক, তারপর ক্যাসেটটা লুফতে লুফতে বলল—এগজিবিট নম্বর দুই। নীলাদ্রি রায়ের বিচার হবে।'

চিন্টু মুখ তুলছে না।

শুক্তি বলল—'এগুলো কারা দেখে জানিস? বুড়ো ভামরা, আর গেরুয়াধারি স্বামীজী জাতীয় লোকেরা। তোর মতো একটা অল্পবয়সী ছেলের মধ্যে সেক্স প্রকাশ পাবে প্রেমের মধ্যে দিয়ে, আর যদি খুব ওভারসেক্সড হোস তো জাস্ট হ্যাভ হেলথি সেক্স উইথ সামবডি উইলিং! তাই বলে নীল ছবি দেখবি বাড়ি বসে বসে? এসপ্লানেড থেকে উলঙ্গ মেয়ের ছবি এনে দেখবি? রিয়্যালি...।' শুক্তি পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পেছনে পেছনে চিন্টু চেঁচাচ্ছে 'শুক্তি! এই শুক্তি। প্লীজ।'

দু-চারটে করে সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে শুক্তি তার ঝোলা নিয়ে নীচে নেমে গেল। চিন্টু হতাশ হয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রইল। তার এখনও আশা শুক্তি দয়া করে জিনিসগুলো তাকে দিয়ে যাবে। এদিকে শুক্তি বেরিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নীচে গাড়ি এসে দাঁড়াল। চিন্টু দেখল তার মা নামছে। সাদার ওপর লাল ছোপ ছোপ একটা সিল্কের শাড়ি। কপালে ধ্যাবড়ানো তেল-সিঁদুরের ফোঁটা। গলায় একটা জবাফুলের মালা। হাতে বেতের ছোট চ্যাঙারি। দৃশ্যটা এত অবাস্তব যে চিন্টু হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তার মা তনুশ্রী রায় উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে, গলায় জবাফুলের মালা। মাথাতেও সিঁদুর মাখামাখি। সে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে বলল—'এ কি? মাম্মি? কোথায় গিয়েছিলে?'

তনুশ্রী জবাব না দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যেতে লাগলেন তাড়াতাড়ি। সমস্ত ব্যাপারটাই চিন্টুর কেমন অস্বাভাবিক লাগল। সে মায়ের পেছন-পেছন যেতে যেতে আবার জিজ্ঞেস করল—'কোথায় গিয়েছিলে? মাম্মি?'

তনুশ্রী এবার কেমন নিস্তেজ গলায় বললেন—'ঠাকুরবাড়ি।'

তখন চিন্টুর মনে পড়ল আজ তিন-চার দিন হয়ে গেল বস বাড়ি নেই। কোথাও থেকেই কোনও খবরও পাওয়া যায়নি।

সে বলল 'ওসব ঠাকুর-ফাকুর কী হবে? অল বোগাস। আমি বুঝতে পারছি না তুমি এখনও পুলিশে খবর দিচ্ছ না কেন? তিনদিন হয়ে গেল চারদিন চলছে। ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে।'

তনুশ্রী তার কথার জবাব না দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। চিন্টু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁধ দুটো শ্রাগ করে ফিরে এল।

ঘরে এসে সে চটপট তার ঝোল্লা জিন্‌স আর টি শার্ট পরে তৈরি হতে লাগল। আসলে এখন এম.এ. পরীক্ষা চলছে। তার দেওয়ার কথা ছিল, সে বসছে না। তার য়ুনির্ভাসিটির বন্ধুরা সকলেই পরীক্ষা দিচ্ছে। অন্যান্য বন্ধুরাও যে যার কাজে ব্যস্ত। দুপুরবেলায়·শুধু শুধু ঘরে বসে কেউ নেই। ধুস্। বাড়িতে ভাল লাগছে না। মায়ের যে রকম মুড তাতে ঘরে মিউজিক-টিক চালানোও বোধহয় ঠিক হবে না। কোথাও থেকে ঘুরে আসা যাক।

সিঁড়ির মাথায় এসে পৌঁছেছে। এমন সময়ে তনুশ্রীর ঘরের দরজা খুলে গেল। তনুশ্রী বললেন—'পুলিশে যাচ্ছ নাকি, চিন্টু! খবর্দার থানায় যাবে না কিন্তু।'

—'বাট হোয়াই?' চিন্টু ফিরে দাঁড়াল।

—'সে তুমি বুঝবে না। ইউ নো নাথিং।'

হঠাৎ চিন্টুর শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে একটা হিম স্রোত নেমে গেল। মা কি বাবাকে খুন-টুন করেছে নাকি? লাশটা লুকিয়ে রেখেছে! কী অদ্ভুত ব্যবহার করছে! সে এগিয়ে এসে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়াল—বলল—'অল রাইট। জানি না। কী জানি না? যা নাকি তুমি জানো!'

তনুশ্রী কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন—'বিজনেসের ব্যাপার। কোথায় কী করে রেখেছে কে জানে, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যদি সাপ বেরোয়!'

—'এই তো সেদিন তুমি বলছিলে বাবা কাঁচা কাজ করে না।'

তনুশ্রী ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিছু বলতে পারলেন না।

—'কিছু লুকোচ্ছ আমার কাছে। ডেফিনিট। কী লুকোচ্ছ বলো তো?' চিন্টু কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল।

—'ঠিক আছে। যাও, তোমার যদি ইচ্ছে হয় থানায় যেতে পারো। কিন্তু ফল ভোগ করতে হবে তোমাকেই। যাও, ঠিক আছে যাও।' কেমন অসংলগ্নভাবে কথাগুলো চেঁচিয়ে বলে তনুশ্রী আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন।

গারাজের কাছে বাগানে একটা ঢিপির ওপর সমর বসেছিল, চিন্টুকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। বলল— 'দাদা, সাহেবের কোনও খবর পাওয়া গেল?'

চিন্টু বলল—'বাবা হঠাৎ এস.টি.ডি পেয়ে পাটনা গেছে।'

—'পাটনা?' সমর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

—'সাহেব কি ফোন-টোন করেছিলেন?'

—'না হলে আর জানছি কোথা থেকে?' রুক্ষ গলায় বলল চিন্টু।

—'বিশ্বাসবাবু বড্ড ব্যস্ত হচ্ছেন। ওঁকে তো কেউ জানায়নি, তাহলে বলে আসব খবরটা?'

—'বলতে পারো। তবে ড্যাড দু-চার দিনের মধ্যেই এসে যাচ্ছে।'

সমর ড্যাবড্যাব করে চিন্টুর দিকে তাকিয়ে রইল। সে একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। সে সাহেবকে চেনে কিন্তু তাঁর এই ছেলেমেয়েদের একেবারেই চেনে না। এরা তার কাছে বিলেত-আমেরিকার মানুষ। কিন্তু শুধু-শুধু মিথ্যে কথাটা কেন বলল সাহেবের ছেলে সেইটা তার মাথায় কিছুতেই এল না। চিন্টু তার পাশ দিয়ে গাড়িটা নিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল। শীতের হাওয়ায় তার চুল উড়ছে। চোখে সানগ্লাস, তলায় চোখের ভাব কিছুই পড়া যায় না।

মায়ের সঙ্গে থানা-পুলিশের কথা হলেও চিন্টু কিন্তু আদৌ সে দিকে গেল না। এই সিদ্ধান্ত নিতে হলে মায়ের সমর্থন চাই। তাই জীবনের বৃত্তের মধ্যে থানা-পুলিশ এসব গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল ব্যাপার পড়ে না। সে বাইরে শিস দিতে দিতে গাড়ি চালালেও ভেতরে-ভেতরে এসব ভয় পায়। প্রথমটা কোথায় যাবে সে ঠিক করতে পারেনি তার পরে ভেবে-চিন্তে সোহনের বাড়ির দিকে গাড়ি চালাল।

সোহন ফটোগ্রাফার, তাকে এ সময়ে তার ডার্করুমে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। বেথুন কলেজের পেছন দিকের গলিতে থাকে সোহন। একটা বিরাট পোড়ো বাড়ির একতলায়। বিডন স্ট্রিটে ঠিক বেথুন কলেজের গেটের দিকে মুখ করে সে বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি থামিয়ে বসে রইল। তেমন কেউ যদি বেরোয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার হঠাৎ শুক্তির সমস্ত কথাগুলো মনে পড়ে গেল। সে বলল—'ধুস, মুডটাই দিলে নষ্ট করে।' তারপর সোহনের বাড়ি গিয়ে হাজির হল।

এ বাড়ি কলকাতার আদি ধনীবাড়ির একটা। শরিকে শরিকে ভাগ হয়ে গেছে। অনেকে এ বাড়ি থেকে চলেও গেছে। একতলার বাঁ দিকে বিরাট একটা লাইব্রেরি। ঠাসা আইনের বই এবং বাঁধানো জার্নাল। এটাতে বসেন সোহনের কোনও কাকা-টাকা। ডান দিকে দু খানা ঘর। প্রথমটাতে সোহন বসে, আড্ডা মারে। ঘরটা ভর্তি তার তোলা নানা ফটোর প্রিন্টে। কিছু বাঁধানো, কিছু সুদ্ধু বোর্ডের ওপর পিন দিয়ে আটকানো। ভেতর দিকটায় সোহনের ডার্করুম। দরজায় টোকা দিয়ে চিন্টু চেঁচিয়ে বলল—'সোহন, কাম আউট ম্যান!'

—'কে দুপুরবেলা চিল্লাচিল্লি করছিস! উল্লুক কাঁহাকা!"

চিন্টু গলা ছেড়ে বলল—'কুইক'।

ডার্করুমটার ভেতর থেকে সাবধানে শুক্তি বেরিয়ে এল। চিন্টু তাকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ঢোক গিলল। তারপর বাঁকা হাসি হেসে বলল—'মাদ্‌মোয়াজেল কি ডার্করুমে লাল ছবি দেখছিলেন?'

শুক্তি গম্ভীরভাবে কেটে কেটে বলল—'একজিবিটগুলো এখনও পীপলস কোর্টে পেশ করিনি।' এই সময়ে সোহনও বেরিয়ে এল, বলল—'এই শালা, চাঁচাইছিলি ক্যানে?

চিন্টু বলল—'না মানে, আমি ঠিক তোদের ডিসটার্ব করতে চাইনি। আই কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড। পারভেজ মে গেট ম্যাড। বাই আই আন্ডারস্ট্যানড।'

শুক্তি ঝোলার ভেতর থেকে অ্যালবামটা বার করে চট করে সোহনের দিকে ছুঁড়ে দিল, বলল 'পেশ করলুম, এগজিবিট এ।' জিনিসটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল চিন্টু কিন্তু সোহন তার থেকে অনেক ক্ষিপ্র। সে একেবারে সোজা ক্যাচ লুফে নিয়ে অ্যালবামটা খুলেই বলল—'হা! দিস ইজ সামথিং। কার কাছে তোলালি রে শুক্তি! আমি তো মনে করতে পারছি না তুলেছিলুম বলে।'

চিন্টু টেবিল চাপড়ে বলল—'হিয়ার হিয়ার!'

শুক্তির রাগে কথা বলতে পারছিল না, ফুঁসতে ফুঁসতে শুধু বলতে পারল—'ইউ মীন থিংস!' সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সোহন লম্বা হাত বাড়িয়ে, তার চুলের ঝুঁটিটা খপ করে ধরে ফেলে বলল—'আরে রাগ করিস কেন?'

চিন্টুর হঠাৎ তার সমস্যাটার কথা মনে পড়ে গেল। সে বলল—'শুক্তি তুই তো নিজের আই কিউ নিয়ে খুব বোস্ট করিস। আমার একটা প্রবলেম সল্‌ভ্‌ করে দিতে পারবি?'

—'তোর প্রবলেম? তুই তো বিরাট একটা নিজেই প্রবলেম, আশিরনখদন্তহস্তপদ।'

—'কী কী বললি? বিরাট একটা গালাগাল দিলি মনে হচ্ছে?'

শুক্তি বাঁকা হাসি হেসে বলল—'এবারটা থাক। পরের জন্মে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবি। আশা রাখ। আশা হারাস না।'

চিন্টু বলল—'না রে রাগ-টাগ রাখ। সোহন উই আর ইন আ ফিক্স। আমার বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

সোহন কাগজ পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিতে দিতে বলল—'কী বললি। আবার বল? কানে শালা এমনি খোল জমেছে। তোর বাচ্চাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে কবে আবার বাচ্চা পাড়লি বাওয়া।'

চিন্টু বলল—'দিস ইজ নো জোক সোহন। আজ নিয়ে সাড়ে তিনদিন পুরো হয়ে গেল ড্যাড বাড়ি ফিরছে না। ভোরবেলায় দুটো সুটকেস হাতে করে বেরিয়ে গেছে। কোনও খবর নেই। কাউকে কিছু বলেও যায়নি।'

—'দ্যাখ, ইনকাম ট্যাক্স থেকে রেইড-টেইড করবে খবর এসেছে হয়ত।'

চিন্টু রাগ করে বলল—'ঠিক হ্যায়। চললুম। মনে থাকবে। বিপদের সময়ে সো-কলড্ বন্ধুদের ব্যবহার মনে থাকবে। সানগ্লাসটা সে মাথার ওপর থেকে নামিয়ে নাকের ওপর বসিয়ে দিল। পেছন ফিরছিল।

শুক্তি বলল—'কী ব্যাপার? একটু আগেই তো তোর বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি। তখন তো বলিসনি কিছু!'

চিন্টু বলল—'সরি। একদম ভুলে গিয়েছিলাম। ইনফ্যাক্ট উই আর নট অ্যাকাসটম্ড টু হ্যাভিং আওয়ার ড্যাড অ্যারাউন্ড। তুই চলে যাবার পর আমার মা কোথা থেকে পুজো-টুজো দিয়ে মা-কালী সেজে বাড়ি ফিরল তখন মনে পড়ে গেল। ইট ইজ সীরিয়াস। মাকে আমার কেমন অ্যাবনর্ম্যাল লাগল। অথচ কিছুতেই পুলিশে খবর দিতে দেবে না।'

শুক্তিকে দেখে মনে হল তার দুর্গে দুর্গতিনাশিনী রূপটা আগেকার পতিতোদ্ধারিণী রূপটার দখল নিয়ে নিয়েছে। সে বলল—'সোহন এদিকে একটু মন দে, কানটা পরে পরিষ্কার করিস। ইজিয়ান স্টেবল্ একদিনে পরিষ্কার হয় না।'

সোহন তার চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে এসে বলল—'বল কী বলবি।'

চিন্টু মুখ গোমড়া করে বলল—'আর কী বলব? আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইয়ু। অ্যাবাউট থ্রি ডেজ ব্যাক, ড্যাড জাস্ট ওয়াকড আউট উইথ টু ব্যাগস।'

—'কে দেখেছিল?'

—'ন্যাচারেলি নো বডি। নো বডি ওয়াজ দেয়ার টু সি। এনি ওয়ে ইট ওয়াজ ইদার আফটার মিডনাইট, অর দ্য স্মল আওয়ার্স।'

—'কী করে জানলি দুটো ব্যাগ না কী নিয়ে গেছেন?'

—'ওই দুটোই মিসিং। একটা ভি. আই. পি, মাম্মি বলছে সব সময়ে ট্যুরের জন্যে রেডিকরা থাকতই। আর একটা।'

—'তাহলে হয়তো ট্যুরেই গেছেন। বলছিস বাড়িতে কেউ ছিল না? হাউ কাম?'

চিন্টু বিরক্ত মুখে বলল—'এগুলো আনইমপর্ট্যান্ট। ছিল না কেউ। বাস।'

শুক্তি বলল—'কেউ নেই সারারাত, এরকম তোদের বাড়িতে প্রায়ই হয় না কি?'

চিন্টু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—'কেন? তুই তাহলে যাবি? না কী? নাইট স্পেন্ড করতে?'

শুক্তি খুব রেগে-মেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চুপ করে গেল। তারপর, বলল—সোহন, এত স্পর্শকাতর সাক্ষী হলে তদন্ত সম্ভব নয়। আমি চললাম।' সে আর একটুও দাঁড়াল না। বলতে বলতেই চলছিল, একেবারে চৌকাঠের বাইরে, নাগালের বাইরে চলে গেল।

চিন্টু রাগে মুখ লাল করে বলল—'সোহন তোর হিপক্রিসির একটা সীমা থাকা উচিত। তুই জানিস না মনডে নাইট আমি কোথায় ছিলাম? রাসকেল একটা!'

সোহন ডানহাতটা তুলে বলল—'ঠিকাছে ঠিকাছে। আম্মো যেখানে, তুম্মো সেখানে। কিন্তু বেবি, তোমার সিসু, তোমার মা? তারাও কি সেখানে বা ওইরকম কোথাও ছিল?'

চিন্টু বলল—'জবান সমহালকে সোহন, য়ু আর টেকিং টু মেনি লিবার্টিজ। দেয়ার্স নো নীড টু পোক ইয়োর ব্লাডি নোজ ইনটু আওয়ার প্রাইভেট অ্যাফেয়ার্স।'

—'অ রাইট, অ রাইট, বাট ইয়োর পা ইজ অ্যাবসকন্ডিং, দ্যাট টু ইজ ইয়োর প্রাইভেট অ্যাফেয়ার। তো সেই থলি কা বিল্লি ভি তুমি এখানে ছাড়লে কেন? এতো যদি টাচি।'

চিন্টু বলল—'অ্যাবসকন্ডিং? হোয়াই ডু ইউ মীন সোহন?'

—'আরে খেপছিস কেন?' সোহন এবার চেয়ার আরেকটু এগিয়ে নিল, পা দুটো সোজা করে ঝুলিয়ে দিল, পিঠ সোজা। —'আফটার অল আমাদের তো ইনভেস্টিগেটিং স্পিরিটেই সবটা দেখতে

হবে। কী কী সম্ভাবনা আছে, থাকতে পারে? এতে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো থেকে থেকেই ঠোঁট ফোলাবার কী মানে? ইভন শুক ইজ মোর ম্যাচুওর দ্যান য়ু।'

—'ঠিক আছে বলো, কী বলছ!'

—'তোমার বাবা বড় বিজনেস ম্যান। দুটো বড় বড় স্যুটকেস হাতে মাঝরাতে কি তোর ভোর সকালে বেরিয়ে গেছেন, অ রাইট?

—'রাইট।'

—এখন প্রথমেই যেটা মনে হবে সেটা হচ্ছে, বাড়িতে ঠেসে রাখা সোনার বিস্কুট-টিস্কুট, টাকা, না বিস্কুট ওনলি বিস্কুট, এনি ওয়ে দা ডিটেইলস মে বি সেট্‌লড্ লেটার। এই সমস্ত নিয়ে কোথাও রেখে আসতে গেছেন আই. টি. থেকে রেইড করবে জানতে পেরে।'

—'তা, তিনদিন হয়ে গেল রেইড কই হল না তো? কোনও চিহ্নই নেই।'

—'ঠিকাছে। বাবার অফিস, টফিস এরা কী বলছে?'

—'ড্রাইভার থেকে, ওয়ার্কস ম্যানেজার থেকে সব্বাই ফোন করে জানতে চাইছে, সাহেব আসছেন না কেন! ইনকাম ট্যাক্‌স ফ্যাক্‌স নিয়ে কোনও কথাই কেউ বলেনি।'

—'অ রাইট। তোর বাবার ইনকম-ট্যাকস্ নিয়ে কে ডীল করে, জানিস?

—'নো। আই নো নাথথিং।'

—'জেনে নিতে পারবি তো? অফিসের কোনও কর্মচারী নেই, যাঁর সঙ্গে এসব কথা বলা যায়?'

—'ও, নো,' চিন্টু বলল, তারপর তর্জনী নেড়ে বলল—'আছে একজন। সাধন বিশ্বাস, বোধহয় সবচেয়ে পুরনো লোক। কিন্তু আমার সঙ্গে কোনও কানেকশন নেই।'

—'ওঁর কাছ থেকে জানতে চা, ইনকাম-ট্যাক্স কে দেখে। আয় আমি ডায়াল করছি। নম্বরটা বল।'

চিন্টু ভীষণ ইতস্তত করতে লাগল, বলল—'আমি কখনও ড্যাডের অফিসে কারও সঙ্গে...মানে দা হোল থিং উইল বি আউট!"

—'তোর ড্যাড যদি আজকালের মধ্যে ফিরে না আসেন, তাহলে এনি মোমেন্ট ইট উইল বি আউট, সেই জন্যেই একজন বিশ্বস্ত লোকের কথা বলছি। অলরাইট কী নাম বললি ভদ্রলোকের সাধন বিশ্বাস? কী বলে ডাকিস?'

—'ছোটতে সাধনকাকা বলতাম। এখন কিছু বলি না।'

—'নম্বরটা বল, তুই বুঝতে পারছিস না, আমাদের এক-একটা করে সম্ভাবনা বাদ দিতে হবে। প্রসেস অফ সায়েন্টিফিক এলিমিনেশন। নম্বরটা বল, কুইক! কিছু হবে না। ঘাবড়াও মাত।'

নম্বরটা শুনতে শুনতে ডায়াল করতে লাগল সোহন।

—'মে আই স্পিক টু সাধন বিসোয়াস প্লীজ।' সোহন নিজেই কথা বলতে লাগল।

—'ও, সাধনকাকা! আমি চিন্টু মানে নীলাদ্রি বলছি। ড্যাডের ইনকাম-ট্যাক্স কারা দেখেন?'

ওদিক থেকে সাধন বিশ্বাস আর্তগলায় বললেন—'কেন চিন্টু! দাদা কোথায়? আমাদের এদিকে একগাদা কাজ-কারবার সব আটকে আছে। কোথায় গেলেন দাদা?'

—'আরে ড্যাড তো রাঁচি গেছে।'

—'রাঁচি? এই যে সমর বলছে, তুমি বলেছ পাটনা!'

চিন্টু এদিক থেকে লাফিয়ে উঠে ঢোক গিলল, বলল—'সর্বনাশ!' সোহন তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বাঁ হাতটা নাড়ল, তারপর ফোনের মধ্যে বলল—'সরি, সাধনকা, অ্যাকচুয়ালি ড্যাড কোথায় গেছে, কাউকে বলে যায়নি। মানে আমরা কেউ সে সময়টা ছিলাম না। কিন্তু গেছে, খুব কাজে এটুকু জানি।'

—'তো ইনকাম ট্যাক্সের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

—'মানে, ইজ ইট ইন অর্ডার?'

—'প্রতিটি পাই-পয়সা। দাদা এসব বিষয়ে খুব সাবধান।'

—'ওকে, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে বাজি ছিল, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম, বা-ই।' ফোন রেখে দিল সোহন।

চিন্টু চোখ বড় বড় করে তার দিকে চেয়েছিল। সোহন বলল—'বাকআপ বেবি, দিস সাধনকা ম্যান সীমস রিলায়েবল। ইটস নট আই. টি.।'

—'তা হলে?' চিন্টু বলল।

—'ঘাবড়াসনি। ধর কোনও বদমাশ তোর ড্যাডের কাছ থেকে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট চেয়েছে। প্রাণের ভয় দেখিয়েছে। তোর প্রাণও হতে পারে। ওই ত্রিপুরা আসামের মতন। হয়ত সেটাই পৌঁছে দিতে গিয়ে বিপদে পড়ে গেছে।'

—'এই কথাটা আমি একেবারে গোড়ার থেকেই বলে আসছি। যখন দেখলাম আয়রন-চেস্ট একদম ফাঁকা। মাম্মি কিছুতেই মানতে চাইছে না। খালি বলে যাচ্ছে ও চেস্টে কিছু থাকত না। এদিকে মাই মাম্মি ইজ অ্যাক্টিং মিস্টিরিয়াস। পুলিশে খবর দিতে দেবে না। ড্যাড কোনও বদলোকের খপ্পরে পড়েছে মানবে না।'

চোখ সরু করে সোহন বললে—'কী বললি? মাম্মি অ্যাক্টিং মিস্টিরিয়াস! পুলিশে খবর দিতে দিচ্ছেন না?'

—'হ্যাঁ। এদিকে ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে গিয়েছিল।'

—'ডোন্ট মাইন্ড নীলাদ্রি, তোর বাবা-মা'র মধ্যে সম্পর্ক কেমন?'

—'কেমন?' চিন্টু আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল।

—'মানে ঝগড়া, মন-কষাকষি, ফাইটিং।'

—'নট দ্যাট আই নো অফ' চিন্টু বলল, তারপর বলল—'মাই মাম্মি ইজ আ গ্রেট লেডি। শী ডাজ লটস অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক। অ্যাকচুয়ালি শী হ্যাজ আ লাইফ অফ হার ওন।'

—'প্যারালাল?' সোহন জিজ্ঞেস করল।

—'কী বললি?'

বললাম, '—ইজ ইট আ লাইফ রানিং প্যারালাল টু ইয়োর ড্যাড'স? দা টোয়েন শ্যাল নেভার মীট...টাইপ?'

চিন্টু কিছুক্ষণ ভেবে বলল—'আমি ঠিক বলতে পারছি না। ইন ফ্যাক্ট, আমি বাড়ি-টাড়ি মা-বাবা-টাবা নিয়ে কোনও দিন ভাবিনি।'

সোহন হঠাৎ গম্ভীরমুখে বলল—'চিন্টু, লেটস ড্রপ ইট। মানে তোর মা যখন বলছেন পুলিশে খবর দেবার দরকার নেই, তখন...ইটস হার প্রবলেম। আফটার অল।'

—'সো আই অ্যাম ব্যাক টু স্কোয়ার এ?' চিন্টু আরও গম্ভীর মুখে বলল।

—'দ্যাখ না, দু-চার দিনের মধ্যেই একটা কিছু খবর পেয়ে যাবি।' হালকা গলায় সোহন বলল, 'ডোন্ট ওয়ারি। চল বরং একটু ঘুরে আসি। তোর ঘোড়াটা রয়েছে তো?'

চিন্টু বলল—'চল।'

সোহন তার ব্যাগের মধ্যে একটা ক্যামেরা বেছে ভরে নিয়ে বলল, —'চল আজ ফুলের ছবি তুলব। হর্টিকালচারে চল।'

অন্যমনস্কভাবে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে গাড়ি ঢোকাচ্ছিল চিন্টু। সোহন বলল—'এই, এই, সোজা বিডন স্ট্রিট দিয়ে সার্কুলার রোড ধরে নে। পার্কসার্কাস থেকে পারভেজকে তুলে নেব। যদি খচ্চরটা থাকে।'

চিন্টু বলল—'বিডনি স্ট্রিটটা কী বস্তু?'

—'জানিস না? বিডনি স্ট্রিট, কলেজে স্কোয়ার, হরি ঘোষের স্ট্রিট—এসব শুনিসনি?'

—'নেভার ইন মাই লাইফ।'

—'আরে বাঙালি জিভ ইংরিজি যুক্তাক্ষর উচ্চারণ করবার আগে একটু দম নিত, ফট করে হসন্ত থেকে যুক্তাক্ষরে যেতে চাইত না। আমার ঠাকুর্দা, বাবার মুখে শুনেছি, জ্যাঠাদেরও বলতে শুনেছি। বিউটিফুল লাগত শুনতে।'

—'হরিব্‌ল' চিন্টু বলল, 'বাস-ড্রাইভারগুলো বর্বন রোড বর্বন রোড করে চেঁচায়!'

—'ওহ্ নো নো নো' সোহন সজোরে প্রতিবাদ করে উঠল, 'এই জ্যাঠা-কাকারা কিন্তু যখন ইংরিজিতে সওয়াল করবে, তর্কবিতর্ক করবে, পরিষ্কার বলবে। কিন্তু বাংলায় বলবার সময়েই ইনভেরিয়েবলি কলেজে স্ট্রিট। অদ্ভুত সাইকলজি আর অদ্ভুত জিভ। জিভের সাইকলজি বলতে পারিস। এই চিন্টু দাঁড়িয়ে গেলি কেন?'

চিন্টু বলল, 'একটা মেয়ে রাস্তা ক্রস করছে দ্যাখ।'

সোহন দেখল, তারপর বলল, 'তোর সানগ্লাসটা দে একবার।' চিন্টুর সানগ্লাস পরে ভাল করে মেয়েটিকে দেখল। চিন্টু বলল—'লিফট দিতে চাইব?'

—'চা' সোহন সানগ্লাসটা পরে সিটে হেলান দিয়ে চূড়ান্ত বিশ্রামের ভঙ্গিতে নিজেকে ন্যস্ত করল। চিন্টু শাঁ করে গাড়িটা নিয়ে মেয়েটির পাশে সার্ক করল। মেয়েটি বাস স্টপে দাঁড়িয়েছে। সালোয়ার কামিজ পরেছে, কোনও শীতের পোশাক নেই। কাঁধ থেকে একটা বড়সড় ব্যাগ ঝুলছে।

—'হাই!' চিন্টু বলল।

প্রথমে মেয়েটি চমকে উঠেছিল, তারপরে বলল—'হাই।' সামান্য একটু হাসির আভাস মুখে।

—'হোয়্যার ক্যান আই ড্রপ য়ু?'

মেয়েটি দাঁত ঝিকিয়ে হাসল। একটা খুব মনোহর গজদাঁত বাঁদিকে।

রাস্তার দিক থেকে চিন্টুর কাঁধের ওপর হঠাৎ একটা থাবামতো হাত পড়ল।

—'হোয়াটস হ্যপনিং হিয়ার?' একটি লম্বা-চওড়া যুবক।

চিন্টু খানিকটা কুঁকড়ে গিয়ে বলল—'ওহ নাথিং। ওনলি অফারিং হার আ লিফট। নো ট্রাবল।'

—'গেট অ্যালং।' তার কাঁধের ওপর একটা থাবড়া দিয়ে যুবক সরে গেল। চিন্টু গাড়িতে স্টার্ট দিল।

যুবকটি মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল, বলল—'যত্ত বড়লোকের বকা ছেলে! এক পয়সা রোজগার করতে হয় না। ফান্টু সেজে ঈভ-টিজিং করে বেড়াচ্ছে। দোব শালা একদিন এমনি চাবকে...'

চিন্টুর গাড়ি দ্রুত সার্কুলার রোডের দিকে চলে যাচ্ছে। সোহন সিটে এলিয়ে থেকেই বলল—'শুনলি?'

চিন্টুর ভেতরটা চিড়বিড় করছিল। সে চুপ করে রইল। সোহন একটু পরে আবার বলল—'কী রে ডাম নাকি?'

—'ইয়া ডেফ অ্যান্ড ডাম। এবার বল তোকে কোথায় নামিয়ে দেব।' টোম্যাটোর মতো লাল হয়ে চিন্টু বলল।

—'কোথায় নামিয়ে দেব, মানে? পারভেজকে তুলে হর্টিকালচারে যাবি না?'

—'ন্ নো। তুই এইখানে তোর এই বিডনি স্ট্রিটে নেমে যা। যা বলছি।' কাঁধ দিয়ে সে সোহনকে জোরসে ঠেলা দিল।

—'যা বাব্বা', সোহন গাড়ির দরজা খুলে টলমল করতে করতে নেমে গেল।

—'সি ইউ।' কোনও জবাব দিল না চিন্টু। শাঁ করে সে সার্কুলার রোডে পড়ল। তারপর দক্ষিণের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

যত জোরেই গাড়ি ছোটাতে ইচ্ছে থাক, ছোটানো যায় না। প্রত্যেক মোড়ে গোঁত্তা খেয়ে খেয়ে থেমে যেতে হয়। এবং দাঁতে দাঁত পিষে গালাগাল দিতে হয়। হোয়াট আ কানট্রি! হোয়াট আ স্টেট! হোয়াট আ সিটি! হোয়াট স্ট্রিটস! হোয়াট পীপল! মাই গড! রাগে উন্মত্ত হয়ে থামতে থামতে,

গোঁত্তা খেতে খেতে অবশেষে লোয়ার সার্কুলার রোডে এসে রাস্তা একটু স্বচ্ছন্দ হল। বালিগঞ্জ সার্কুলারে পৌঁছে সে ভেবেছিল এবার একটা ছোট্ট ট্র্যাফিক লাইট পেরোলেই সব ফাঁকা! কিন্তু তা হল না। সে দেখল বুড়োমতো একটা মুখ তার দিকে চেয়ে আছে, গাড়ি কাটিয়ে কাটিয়ে চলে এল পাশে।

'নীলাদ্রি! কোথায় যাচ্ছ?'

মেজ জ্যাঠা। বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই। সম্প্রতি ঠাম্মার কাজে না দেখে থাকলে চিন্টু চিনতে পারত না।

—'তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

—'যাব বাড়ি। গড়িয়াহাট পর্যন্ত একটু পৌঁছে দেবে নাকি? ও দিকেই তো যাচ্ছ!'

—'এসো।' চিন্টু গাড়ির দরজা খুলতে টুক করে ঢুকে ধুপ করে বসে পড়ল মেজ জ্যাঠা। আড়চোখে দেখল চিন্টু। মাথায় গোল টাক। ধারে ধারে চুলগুলো সবে গজাতে শুরু করেছে। সাদা হয়ে আছে। তার ড্যাডের মাথায় প্রচুর চুল। দু-পাঁচটা সাদা হয়েছে কি হয়নি! যেগুলো সাদা হয়েছে মাথাময় কেমন বিউটি সৃষ্টি করে ছড়িয়ে থাকে। ঠাম্মা মারা যেতে মেজ জ্যাঠা, সেজ জ্যাঠা সবাই ন্যাড়া হল, খালি ড্যাড হয়নি। ঠাম্মা নাকি বারণ করে গিয়েছিল। গড নোজ হোয়াই। ওল্ড হ্যাগ। যত রকম কুসংস্কারের ডিপো একটা। হঠাৎ ড্যাডের চুলের ওপর থেকে ধর্মীয় অনুশাসনে উঠিয়ে দিল কেন সে জানে না।

—'তোমার এম. এ পরীক্ষা চলছে না?'

বাস। নাও এবার। চ্যারিটির ঠেলা সামলাও। বুড়ো। আরেকটা বুড়ো। সব খবর রাখে। মাস্টারি ব্রেইন। সব টুকে রেখেছে। কবে পরীক্ষা আরম্ভ, কবে কী পেপার, কবে রেজাল্ট বেরোচ্ছে। এভরিথিং!

—'আজ নেই।' সে আন্দাজে একটা ছুঁড়ে দিল।

—'নেই?' মেজ জ্যাঠা বিড়বিড় করে বলল। 'আমার ধারণা ছিল আজ সেকেন্ড পেপার।'

চিন্টু উত্তর দিল না।

—'বউমা, তিতি সব ভাল আছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বিজু?'

আড়চোখে আরেকবার চাইল চিন্টু। জানে নাকি? জেনে গেছে? দিস ওল্ড নেভ? জেনেশুনেই বোধহয় আরও জানবার জন্যে গাড়ির অলিগলি পেরিয়ে এসে জুটল। সে বলল, —'কী মনে হয়?'

মেজ জ্যাঠা হতভম্ব হয়ে তার দিকে চাইল। —'কী মনে হয়? মানে?'

—'মানে, ড্যাড, তোমার ছোট ভাই কীরকম থাকতে পারে?'

মেজ জ্যাঠার চোখের ভাবটা বদলে গেল। সেখানে একটা রাগ বা ক্ষোভ ধরনের কিছু দেখতে পাচ্ছে চিন্টু। সে বলল—'ভাল আছে। আবার কী?'

—'সেটা গোড়াতেই বললে পারতে। দেখা হলে আপনার লোক কুশল প্রশ্ন করেই থাকে।'

—'অলরাইট, সরি, ইট ওয়াজ আ জোক।'

—'জোক!' মেজ জ্যাঠা কিছুটা আহত কিছুটা হতবুদ্ধি চেহারা নিয়ে বসে রইল। চিন্টু একবারও জানতে চাইল না মেজ জ্যাঠা, রবিদা, কুমকুমদি, টুলটুলদি, কুমকুমদির বর এদের সব কী খবর। কে কেমন আছে। ড্যাম ইয়োর সোশ্যাল ফর্ম্যালিটিজ—সে একটা বুড়ো নয়। বুড়ো ভাম। কে যেন কথাটা ব্যবহার করেছিল? অনেকক্ষণ ভাববার পর মনে হল শুক্তি। তাকেই বলেছিল বুড়ো ভাম। বুড়োটা বোঝা গেল। ভামটা কী? ভ্যাম্প নাকি? বিডন স্ট্রিটকে বিডনি স্ট্রিট বানানোর মতো কোনও বেঙ্গলিফিকেশন করেছে ভ্যাম্প শব্দটার?

গড়িয়াহাটের মোড়ে নেমে গেল মেজ জ্যাঠা। গম্ভীর মুখে বলল—'আচ্ছা। কষ্ট দিলাম তোমাকে।'

'প্লেজার! প্লেজার!' যথাসাধ্য হাসিমুখ করে চিন্টু বিড়বিড় করল। মেজ জ্যাঠা দুটো স্টলের মাঝখান

দিয়ে যাবার সময়ে কী জানি কী ভেবে একবার ফিরে তাকাল। হঠাৎ যেন একটা আচমকা ধাক্কা খেল চিন্টু। ড্যাড। অবিকল তার ড্যাড। বুড়ো। টাক মাথা। রোগা। ধুতি পাঞ্জাবি-ছাতা-তালতলা-শালে একেবারে বিপরীত। তবু তা সত্ত্বেও তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে নির্ভেজাল তার ড্যাড।

ড্যাডকে বড় হওয়ার পর সেভাবে চেয়ে দেখেনি সে। ছোটবেলায় সাংঘাতিক অ্যাডমায়ার করত। ড্যাড যেন স্পাইডারম্যান, টার্জান, যেখানে যা কিছু বীরত্বব্যঞ্জক, পুরুষালি, সব কিছুই ড্যাড। গ্রে সুট, মেরুন টাই পরে মসমস করে চলে যাচ্ছে ড্যাড। একটা মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে গেল বাতাসে। সমর গাড়ির দরজা খুলে ধরেছে। —'ড্যাড, ড্যাড।'

চিন্টু একটু দেরি করে ফেলেছে। ড্যাড বোধহয় শুনতে পায়নি। কেননা গাড়িটা হুঁশ করে বেরিয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি সেই থেকেই, এরকম কারুর নাকের ওপর দিয়ে হুশ করে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে যেতে ভালবেসেছে সে। রাত্রে একসঙ্গে ডিনার খায় না তারা কত দিন হয়ে গেল। অর্ধেক দিন মাম্মি থাকে না। তিতি আর ড্যাডের সঙ্গে বসে খেতে তার ভাল লাগে না। কেমন যেন উদোম বোধ করে সে। মা থাকলে একটা ভদ্র আড়াল। একটা সুচারু অনুষ্ঠান। নইলে কে কী বলে উঠবে, কার দৃষ্টি কিসের ওপর পড়বে—সে জানে না। সে বদনকে বলে রেখেছে মা না থাকলে তার ডিনার যেন ঘরে সার্ভ করা হয়। তাই-ই চলে আসছে। তিনি জেনে গেছে। কিছু বলে না। ড্যাড কোনও দিন ভুলেও জিজ্ঞেস করেনি—চিন্টু কোথায়। সে কেন টেবিলে বসেনি। অন্তত সে শোনেনি। জিজ্ঞেস করলে বদন কি প্রমীলা তাকে বলত একবারও। অবশ্য এমন নয় যে সে তার জন্য অভিমান করে বসে আছে। শিট! এসব কথা মনেই হয়নি তার। এখন তিন দিন ধরে ড্যাড বেখবর বেপাত্তা হয়ে থাকায়, মেজ জ্যাঠাকে হঠাৎ অবিকল ড্যাডের মতো দেখানোয় ঝট করে কথাগুলো তার মনে এল। কোথায় গেল বস? সোহন হঠাৎ তার বাবা-মা'র সম্পর্কের কথা জিজ্ঞেস করল। তারপর দুম করে সাবজেক্টটা ড্রপ করল কেন? সোহনেরও কি সন্দেহ হয়েছে তার মা কিছু একটা করেছে। পেপারে কত রকম উদ্ভট খবর বেরোয়! ছেলে মা-বাবাকে খুন করছে, মেয়ে মা-ঠাকুমাকে খুন করছে। সেই ছেলে বা সেই মেয়ের বাবা-মা'রা কি আন্দাজ করতে পেরেছিল কার হাতে তাদের মৃত্যু নাচছে? বাবা-মা আফটার অল হাজব্যান্ড-ওয়াইফ! তাদের সত্যিকারের সম্পর্ক কী, কে তা বলতে পারে? মা যে কিছু একটা জানে, লুকোচ্ছে সেটা খুব স্পষ্ট। আবার, পুজো দিতেও তো গিয়েছিল! স্ট্রেঞ্জ! কে জানে হয়তো নিজের সেফটির জন্যেই পুজো দিতে গিয়েছিল! ইয়েস, দ্যাটস কোয়াইট পসিবল। মা, তার মা, তাকে কোলে করে ঘুম পাড়াত, স্কুলে যেতে চাইত না বলে, কিসি দিত, একটা দুটো তিনটে চারটে...। সেই মাম্মি! ঘরের দরজাটা বারবার বন্ধ করে দিচ্ছিল কেন মাম্মি? ওই ঘরেই কি? ওয়ার্ডরোবের ভেতর? চিন্টুর বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যেতে থাকল। সোহন। সোহন ইজ ডেভিলিশ ক্লেভার! আঁচ করেছে বোধহয় ব্যাপারটা।

চিন্টু রাসবিহারী দিয়ে বেরিয়ে গেল। আরেকটু হলে একটা অ্যাকসিডেন্ট হত। কোনও মতে মহানির্বাণ রোডে ঢোকাল সে গাড়িটা। তাকে যেতে হবে বালিগঞ্জ সার্কুলারেই। ওইখানেই তার গন্তব্য ছিল। মেজ জ্যাঠার জন্য এতটা সময় গেল। যাকগে। সময়টা বড় কথা নয়। সময় তো কাটতেই চাইছে না! তার ওপর ওয়ারিজ। তার একদম অভ্যেস নেই এসব। যাক দেখা যাক, সঞ্জয় হিরানীর ওখানে গেলে হয়তো একটা হিল্লে হতে পারে তার।

॥ ৫ ॥

ঝিমঝিম ঝিমঝিম করে সন্ধ্যা নামার শব্দ হয়। ধোঁয়ার সঙ্গে অন্ধকার মিশিয়ে সিমেন্টের বড় বড় বস্তায় ভরে কেউ অনেক উঁচুর আকাশ থেকে ফেলছে। থলির পেছনের কোণ দুটো ধরে উল্টে দিচ্ছে। উড়ছে ধোঁয়া এবং অন্ধকার আকাশময়। নামছে অলিতে-গলিতে। এই শীতকালীন সন্ধ্যারও

আবার কত রকমফের আছে। সল্ট লেকের সন্ধ্যা আর আহিরিটোলার সন্ধ্যা, সাদার্ন অ্যাভেন্যু-এর সন্ধ্যা আর বাঁধাঘাটের সন্ধ্যা যেমন এক নয়, তেমন চিলেকোঠার সন্ধ্যায় আর একতলার সন্ধ্যায় তফাত আছে। দশতলা বারোতলায় যে সন্ধ্যা দেখা যায়, দেড়তলার বাসিন্দা কখনওই সে সন্ধ্যা দেখতে পারে না। অঞ্চলভেদে, উচ্চতাভেদে প্রকৃতির দয়া-দাক্ষিণ্য ভাগ হয়ে গেছে।

আহিরিটোলার চিলেকোঠার সন্ধ্যায় নলিনী করের তক্তাপোশের পাশে একমাত্র টিনের চেয়ারে বসে হরিহর আনীত চায়ের সঙ্গে বড় বড় বেগুনি খাচ্ছেন বিজু রায়। এমন সময় বাঁদিকের বাড়ির ছাদ থেকে সরু বাচ্চা-গলার ডাক শুনতে পেলেন,—'দাদু, দাদু! অ দাদু!'

কে কাকে ডাকছে, বুঝতে পারলেন না বিজু। তবু একবার বেরিয়ে এলেন। বাঁদিকের বহু পুরনো বাড়িটা গায়ে গায়ে লাগা। পাঁচিলের ফোকরে পা দিয়ে একটা ছোট্ট মুখ ঝুঁকে আছে পাঁচিলের ওপর থেকে। বিজু এগিয়ে গেলেন। —'কে তুমি? কাকে ডাকছ?'

—'তুমি কে?'

—'আমি...আমি...' বিজু রায় ভেবে পেলেন না তাঁর কোন পরিচয়টা এই বাচ্চাটির কাছে গ্রাহ্য হবে। আজ গুড্ডু এসেছিল তার দাদিকে দেখতে। রত্নার নির্দেশে গুড্ডু তাঁকে দাদু বলে ডেকেছিল। এইটুকু বাচ্চাদের জগতে কারও নাম বলে কিছু থাকে না বোধহয়। খালি সম্পর্কবাচক শব্দ দিয়ে পরিচয় তৈরি হয়। মা, বাবা, মাসি, মামা, পিসি, কাকা, দাদু, দিদা, এইরকম। এই জগতের পরিচয়পত্রে বিজনবিহারী রায় বা নলিনীকান্ত কর এসব চলবে না। তিনি বললেন—'আমি দাদু।'

—'আমার দাদু কোথায় গেল?' বিজু বুঝতে পারছিলেন বাচ্চা মেয়েটি কার কথা বলছে, কাকে চাইছে। তবু তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'কোন দাদু?'

—'ওই তো টঙের দাদু! লালচুলের দাদু! রোগা দাদু! ফর্সা দাদু!'

যাক অনেকরকম বর্ণনা পাওয়া গেল। বাসস্থান, চেহারা...মেয়েটি তখনও বলছে চকলেটের দাদু...। বাঃ আদান-প্রদানের বস্তু দিয়ে সম্পর্ক নির্ণয় হচ্ছে। বিজু রায় বাচ্চাদের কোনও দিন ভাল করে দেখেননি। বাচ্চাদের আদর-টাদর করা, তাদের সঙ্গে আধো-আধো কথা বলা এসব কোনও দিনই তাঁর অভ্যেস নেই। তাঁর এই বাচ্চাটির সঙ্গে কথা বলতে বাধো বাধো লাগছে। বাৎসল্য-রসে ভরা হাসি, আদিখ্যেতার নানা শব্দ তাঁর আসছে না। তিনি বললেন—'তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

—'বীর চাঁদে।'

—'বীর চাঁদ? সে কোন জায়গা?'

—'বীর চাঁদ জানো না? আমার মামার বাড়ি। চিলড্রেন্স পার্ক আছে। বড় বড় রাস্তা আছে। দিদাই আছে।'

বীর চাঁদ নামে কোনও টাউনের কথা বিজু মনে করতে পারলেন না। যাই হোক, জায়গাটায় বাচ্চাটির মামার বাড়ি। কদিন সে সেখানে ছিল। সম্ভবত তাই-ই টঙদাদুর মহাযাত্রার কথা জানে না। তিনি বললেন—'তোমার টঙদাদুও মামার বাড়ি গেছে নিশ্চয়ই।'

খুক খুক করে হাসল মেয়েটি, বলল—'অত বড়দের আবার মামার বাড়ি থাকে নাকি?'

—'কেন থাকবে না? বাঃ!'

—'বারে! তাদের মামারা, মামিরা, দিদাইররা ভীষণ বুড়ো হয়ে যাবে না?'

—'হোক না। ভীষণ বুড়ো হলেও তো তারা মামা-ই, মামি-ই, দিদাই-ই নাকি?'

—'তুমি বুঝতে পারছ না। ভীষণ, ভীষণ বুড়ো, তার চেয়েও বুড়ো, তার চেয়েও বুড়ো।'

তখন বিজু রায় বুঝতে পারলেন বাচ্চা মেয়েটি এইভাবেই মৃত্যুকে বুঝেছে।

—'কথা বলছ না কেন? আমি মামার বাড়ি থেকে এলেই টঙদাদু চকলেট দেয়।'

—'তাই? আচ্ছা, এদিকে আসবে?' বিজু হাত বাড়িয়ে দিলেন। একটু চেষ্টার পর তাকে নিজেদের ছাদে আনতে সমর্থ হলেন। ছোট্ট মুখ। চোখ দুটো একটু বসা, বড় বড়। কচি নাক আর ঠোঁট,

কচিপাতার মতো নরম শ্যামলা রং। একটা নানা রঙের পশম দিয়ে বোনা, পুরোহাতা সোয়েটার পরে আছে সে। পায়ে ফুলমোজা এবং বকলস লাগানো জুতো। শীতের বিরুদ্ধে লড়াইটা দরকার জেনে তার মা তাকে ভালভাবেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাজিয়েছে। হাতে একটা টুপি।

—'তুমি টুপিটা পরোনি?'

—'আমার টুপি পরতে বিচ্ছিরি লাগে।'

—'ও। এসো টঙে এসো।'

—ঘরে ঢুকে সে বলল—'এ মা! তুমি ভাল চাদরটা পেতে রেখেছ কেন? ওটা তো সাইমন কিংবা রফিককাকু এলে দাদু পাতে!'

—'কে সাইমন? রফিককাকু কে?'

—'ওমা, সাইমনকে চেনো না? রফিককাকুকে চেনো না! ওরা যে টঙদাদুর জন্যে টাকা আনে! না হলে দাদু আমাকে চকলেট কিনে দেবে কী করে?'

বিছানায় বসে মেয়েটি বললে—'তুমি টঙদাদুর কে হও গো?'

—'ভাই।'

—'ধ্যাঃ।' টঙদাদু বলত, 'আমার ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, বাবা নেই, বউ নেই, ছেলে নেই, মেয়ে নেই। এসব কোনও দিন ছিল না। একদিন ভীষণ বিষ্টি হচ্ছিল পুজোর সময়ে, ভীষণ বাজ পড়ছিল, তখন পৃথিবীটা ফাঁকা হয়ে গেল আর আমি বেরিয়ে এলুম।'

—'এই কথা বলত বুঝি!'

—'হ্যাঁ বলত। সত্যি কথা, বলবে না?'

—'আমি তাহলে ভাইয়ের মতো। ধরো বন্ধু।'

—'তাই বলো।' খুব নিশ্চিন্ত হয়ে বলল খুকুটি। তারপরে বলল—'আমার চকোলেট দাও?' সে ডান হাতটা পেতে আছে। পেছন ঘসটে এক পা মাটিতে রেখেছে। শরীরটা এখনও তক্তাপোশের ওপরেই।

বিজনবিহারীর হঠাৎ মনে হল জীবন ওই বাচ্চা খুকুটির মতো। অমনি ভাবে হাত পেতে আছে। চোখে অবোধ বাসনা। যতক্ষণ তুমি আছ তোমাকে ওর হাতে মিষ্টান্ন দিয়ে যেতে হবে। তিনি বললেন, 'তুমি বোসো, আমি কিনে আনছি।'

—'দূর তুমি কিচ্ছু জানো না, ওই তো টেবিলের টানাটায় থাকে। খোলো না?'

বিজনবিহারী চেয়ারে বসেছিলেন, তাঁর পেছনে টেবিল, তিনি ড্রয়ারটা টেনে খুলে ফেললেন। খুকু ছুটে এল। ড্রয়ারের মধ্যে ম্যাগনিফাইং গ্লাস একটা, কিছু সিগারেটের প্যাকেট, লাল রিবন, গোলাপি রঙের ক্লিপ, নাইলন পুতুল একটা আর বেশ কিছু টফি।

—'ওই তো আমার ফিতে, আমার ক্লিপ, ওই তো আমার পুতুল,' ড্রয়ারটা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুকু বলল, 'কই চকলেট দাও! ওই তো!'

টফিগুলো তুলে খুকুর হাতে দিলেন বিজু। এগুলোকেই ও চকলেট বলছে। এগুলো কি সেই দাঁতের সঙ্গে আটকে যাওয়াগুলো! তিনি বললেন—'সবগুলো যেন একসঙ্গে খেয়ো না। আর খেয়ে ভাল করে মুখ ধোবে, দাঁত ঘসে ঘসে ধোবে, নয়তো দাঁতে পোকা লাগবে, ভীষণ ব্যথা করবে কিন্তু।'

একটা টফি মুখে ফেলে খুকু বলল—'আমার দাঁতে পোকা আছে তো! আমি বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজি তো! শীতকালে রাত্তিরে যে মা মুখ ধুতে বারণ করে।'

—'তোমার দাঁতে পোকা আছে? যন্ত্রণা হয় না?'

—'হয় না আবার! মা বলেছে এ দাঁতগুলো পড়ে যাবে, তখন আর হবে না।'

বিজু বললেন, 'নাও, তোমার লাল রিবন, ক্লিপ, তোমার পুতুল সব নাও।'

—'এখন কি নিউ ইয়ার? এখন কি আমার জন্মদিন? যে নোব!'

—'তাই বুঝি: তোমার জন্মদিন কবে?'

—'সে তো আঠারই ডিসেম্বর। সেইদিন আমি পুতুলটা পাব তো। টঙদাদু বলেছে।'

—'আর রিবন-ক্লিপ?'

—'ওগুলো তো ফাস্ট জানুয়ারি নিউ ইয়ারে পরবো।'

—'টঙদাদু যদি তখনও না ফেরে? তুমি এখনই বরং নিয়ে যাও।'

—'ন্ না। আমার জন্মদিনে টঙদাদু নেমন্তন্ন আসবেই। কেউ তো দাদুকে পায়েস খেতে দেয় না। আমার মা লাল পায়েস করবে, দাদু আসবেই। আচ্ছা আমি যাই, না আসি বলতে হয়; আসি টঙদাদুর বন্ধু। মা ভাববে ভীষণ।'

—'চলো তোমায় দিয়ে আসি।' বিজু রায় পাঁচিলের কাছে গিয়ে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর একটু হাত বাড়িয়ে পাশের পাঁচিলে দাঁড় করিয়ে ধরে রইলেন, মেয়েটি ধুপ করে লাফিয়ে পড়ল ওদিকে।'

—'তোমার নামটা কী? নাম বললে না তো?'

—'আমার নাম কুমারী মণিদীপিকা রজক দাস, বলে ছোট্ট দেহ আর মস্ত নামের ভার বইতে বইতে খুকুটি ছুট লাগাল।

ঘরে ফিরে এসে বিজু দেখলেন ড্রয়ারটা তখনও খোলা। রিবন ক্লিপ এবং পুতুল দেখা যাচ্ছে। নলিনী কর নিশ্চয়ই কিছুদিন আগে এগুলো সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। আশ্চর্য মণিদীপিকা জানে এসব তারই, তবু একটা জিনিসও ছুঁল না। সময়, লগ্ন। সে তার ওইটুকু মন দিয়ে লগ্নের গুরুত্ব বুঝতে পারে। দরিদ্রের মেয়ে, দেখলেই বোঝা যায়। এইরকম বয়সে হয়ত ছুটকিরও এরকমই চেহারা ছিল!

ছুটকি! ছুটকি কোথায়। এমন ফেরে পড়েছেন, যে চিঠিগুলো তন্ন তন্ন করে পড়বারও সময় পাচ্ছেন না। তবে ছুটকি যে বেঁচে আছে, ভাল আছে, স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে সুখী এটাও অনেক। সে তো হারিয়েই গিয়েছিল। জীবনের কোনওখানে আর তার কোনও স্মৃতি ছিল না, চিহ্ন ছিল না। হঠাৎই শূন্য থেকে রসগোল্লা পড়বার মতো ছুটকি নেই থেকে আছে হয়ে গেল। বিজু কী করে তাকে হারিয়ে থাকতে দেবেন। অনেক যে বয়স হয়ে গেল! বয়সটা যে অনেক হয়েছে এ কথা তাঁর একবারও মনে হয়নি, মনে হত না। এন কে বা নলিনী কর তাঁকে মনে করিয়ে দিয়ে গেল। ফিফটি নাইন রানিং, বলেছিল। তখনই বুঝতে পেরেছিলেন লোকটি তাঁর বয়সী। আজ খুকুটি যা বলল তার মধ্যে 'পুজোর সময়ে ভীষণ বিষ্টি পড়ছিল, বাজ পড়ছিল।' কথাগুলো তাঁর কানে আটকে আছে। মা বলত 'বাপ রে, পুজোর সময়ে সে কী বিষ্টি! পাড়ার ঠাকুর জল পড়ে গলে গেল। সে এক কাণ্ড। অমন তাণ্ডবের মধ্যে জন্মেছিলি, তুই দস্যি হবি না তো হবে কে?'

নলিনী করও ওই পুজোর সময়েই জন্মেছিল। কোন দিনে? জানবার আর বোধহয় উপায় নেই। কিন্তু দু-একদিনের এদিকে ওদিকে আর কী-ই বা আসে যায়। তিনি নলিনী করের একেবারে একবয়সী, যতই নলিনী তাঁকে 'তুমি তো ভায়া পঁয়তাল্লিশের এদিকে হবে তো ওদিকে হবে না' বলুক। বয়স জিনিসটাও কত আপেক্ষিক! তিনি চূড়ান্ত সুখে আছেন। নিয়মে আছেন। বিধিদত্ত কাঠামোটাও নিশ্চয় ছিল, সবচেয়ে বড় কথা কাজের মধ্যে আছেন। নিশ্ছিদ্র কাজের মধ্য দিয়ে একটা দিন কোথা দিয়ে পার হয়ে গিয়ে আরেকটা দিন শুরু হয়, তিনি বুঝতেই পারেন না। হয়ত তাই। তাই-ই তিনি পঁয়তাল্লিশের এদিকে তবু ওদিকে হবেন না। নলিনীর জীবনে ভাঙা-গড়ার খেলা খেলেছে কেউ নির্মমভাবে, সে নিয়মের ধার ধারেনি। এখন কর্মহীন। দুপুরবেলায় কী করতে বেরোত কে জানে! ওই সাইমন আর রফিকের কাছে? এরা কেন? যাই হোক, নলিনীতে জীবনটা আটান্নতেই শেষ হয়ে এসেছিল। তাই স্রেফ সিগারেট ধরিয়ে কাশতে কাশতে জীবনটা গলার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্যের

কথা নলিনীও তাঁরই মতো বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। জাহাজের খালাসি হওয়া আর জাহাজ কেনা সে আক্ষরিক অর্থে বলেছে না আলঙ্কারিক অর্থে, জানা যাবে না। কিন্তু খুব নিচু অবস্থা থেকে দারুণ পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে সে খুব ধনী হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে অদ্ভুত মিল। তারপর কোন লগ্ন, কোন ক্ষণের তফাতের ফলে বাকিটা তফাত হয়ে গেল কে জানে! বিজু রায়, জ্যোতিষ-ট্যোতিষ মানেন না। অথচ এভাবেই ভাবলেন। ভাবলেন—হঠাৎ সিগারেট ধরিয়ে কাশতে কাশতে কত সহজে তাঁর সমবয়সী মানুষটির প্রাণ বেরিয়ে গেল, আগের দিনও মেঝেতে আসন পেতে মুরগির কালিয়া খেলেন কবজি ডুবিয়ে, বিজু রায়ের পাশে বসে। মৃত্যু এইভাবে যখন-তখন জানান না দিয়ে আসতেই পারে। সেই বয়স হয়েছে বিজু রায়ের। নলিনীর ভেতর দিয়ে মৃত্যু যেন এই কথাটাই তাঁকে জানিয়ে দিয়ে গেল। এবং মৃত্যু খুব কাছেই বসে দু চোখ মেলে তোমাকে দেখছে জানলে—হঠাৎ সমস্ত কেমন দূরে সরে যায়! সব সম্পর্ক, সব অর্জন, সব নির্মাণ। না, সব নয়। একমাত্র ছুটকি দূরে সরে না। ছুটকির সঙ্গে সাক্ষাৎ এখনও জীবনের মস্ত বড় আরব্ধ কর্ম। বাকি রয়ে গেছে।

আপাতত এই নলিনী কর নামে লোকটিকেও তাঁর খুব জানতে ইচ্ছে করছে। যেন একই সালে, একই মাসে জন্মের দরুন শুধু তাঁর সমবয়সীই নয়, আরও ঘনিষ্ঠ কিছু, তাঁর নিজেরই আরেকটা চেহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে। ওকে যত জানবেন, নিজেকেও তত জানা হবে। রাতে হরিহর তাঁর রুটি তরকারি নিয়ে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা হরিহর, করবাবুর কাছে কেউ আসত না?'

—'তেমন কেউ না।'

—'তেমন কেউ মানে?'

—'এই ধরুন, আপনার মতন, আসতেই করবাবু মিল বলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জলখাবার।'

—'কিন্তু কেউ না কেউ তো আসত।'

—'শুনুন বাবু, করবাবু এমনিতে খুব ভাল লোক ছিলেন। কিন্তু...কিন্তু...'

—'কিন্তু কী?'

—'মরা মানুষের নামে বলব? পাপ হবে না তো?'

—'কিছু হবে না, তুমি বলো।' বিজু রায় কখনও এই ধরনের লোকদের সঙ্গে এরকম অন্তরঙ্গভাবে কথা বলেননি। বদন, প্রমীলা, তাঁর দারোয়ান বিরজু বা তার বাবা বীরখা। একমাত্র ড্রাইভার সময় দিবারাত্র তাঁকে নিয়ে এখান-ওখান যাতায়াত করত বলে তার সঙ্গে অনেক প্রকার কথা বলতে বাধ্য হতেন তিনি। একমাত্র ওই সমরই।

হরিহর বলল—'করবাবু বড্ড জুয়ো খেলতেন। অনেক রকম। সে সব তো আমি জানি না। কিন্তু আমার কাছ থেকে মাঝে মাঝেই টাকা ধার করতেন।'

—'শোধ করেছিলেন?'

—'সব শোধ করে দিতেন, কাউকে বলবেন না বাবু, তবে শেষেরটা আর পারেননি, খাস দফতরের পরোয়ানা এসে গেল কি না!'

বিজু রায় চমৎকৃত হলেন। এই মেসের চাকর লোকটি যে প্রায় সব সময়েই ঝলঝলে ইজেরের ওপর একটি গামছা পরে থাকে সে জুয়োখেলাকে পাপ মনে করছে? যখন সারা কলকাতা, সারা ভারত, সারা বিশ্ব জুয়ো খেলে যাচ্ছে। স্বয়ং সরকারবাহাদুর লটারির খেলা বার করেছেন সেই কবে থেকে। সরকারও জুয়ো খেলছে! দ্বিতীয় কথা ওই খাস দফতরের পরোয়ানা। এরকম লাগসই শব্দ কেমন অনায়াসে ব্যবহার করে ফেলল হরিহর! পরোয়ানাটা শোনা যায়। 'মৃত্যুর পরোয়ানা'—এ জাতীয় শব্দ যেন পড়েছেন কোথাও। কিন্তু 'খাস দফতর?' হয় এটা হরিহরের সম্পূর্ণ মৌলিক উদ্‌ভাবন। না হলে কোনও জায়গা থেকে সংগ্রহ। শুনেছে একবার, মনে রেখেছে। তাকেও প্রায় মৌলিকই

বলা যায়। শব্দ বা শব্দবন্ধ আর কজন বানায়! সবাইই তো শোনে। শুনে শুনেই মনে রাখে। তিনি বললেন—'শেষেরটা কত?'

—'পাঁচ হাজার।'

—'অ্যাঁ?' চমকে উঠলেন বিজু রায়। মেসের চাকর হরিহর অবলীলায় পাঁচ হাজার টাকা ধার দিতে পারে? সেটা মার খেয়ে গেলে তার কোনও হাহাকার পর্যন্ত থাকে না? তিনি বদনকে পাঁচশো টাকা মাইনে দেন, পুজোয় দেড় হাজার টাকা বোনাস। এ লোকটি কত মাইনে পায়? লোকে মাইনের কথা জিজ্ঞাসা করা অভব্যতা। তবু, উপায় নেই, তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'এখানে তোমাকে কী রকম দেয়-টেয়?'

'আজ্ঞে ইনকিমেন্টো হয়ে হয়ে এখন তিনশো দশ হয়েছে। বাবুরা বলেছেন সাড়ে তিনশোয় শেষ। কেল রিচ করে যাব। আপনি অত টাকা ধার দিয়েচি বলে জিজ্ঞেস করছেন? আজ্ঞে বাবু আমি গরিব মানুষ আমার চলে কী করে বলুন, আমি আজ্ঞে টাকাটা খাটাই। সুদ নিই টেন পার্সেন্টি।'

—'তাই? কাদের কাছে খাটাও?'

—'সে অনেক আছে, এখানকার বাবুরাও দরকারে অদরকারে হরিহরের কাছেই হাত পাতেন।'

—'ও। করবাবুর টাকাটা কি সুদসুদ্ধ বললে?'

হরিহার জিভ কেটে বলল—'না বাবু, তাই কখনও পারি? ওঁর কাছ থেকে আমি এক পয়সা সুদ নিতুম না আজ্ঞে। বাবুর তো কোনও চাকরি-বাকরি, বাঁধা আয় ছিল না। জ্ঞানত কখনও পাপ করিনি বাবু।'

—'তা এখন যে টাকাটা মারা গেল!'

—'কী করব বাবু, ভাগ্য। সবই ভাগ্য। মেনে নিতে হচ্ছে।'

—'সাইমন বা রফিক বলে কাউকে চেনো? এখানে আসত!'

হরিহরের মুখে একটা ভয়ের ভাব খেলে গেল। সে বলল 'আপনি কী করে জানলেন বাবু!'

—'বলোই না।'

—'বাবু কাউকে বলবেন না। করবাবু বলতে বারণ করে দিয়েছিলেন। একটা বেঁটে মতো ফিরিঙ্গি আসত বটে। কালো, সাহেব বলে কেউ বুঝবে না। বাজে লোক। আর রফিক, সুবিধের নয়। দেখলে ভয় লাগে। ইয়া চেহারা। করবাবু বোধহয় ওর কাছেও...। মাঝে মাঝে আমার কাছে প্যাকেট রেখে যেত করবাবু না থাকলে।'

—'কখন আসত?'

—'কখন? মেসের বাবুরা ঘুমিয়ে পড়লে। ঠাকুররা ছুটি নিয়ে চলে গেলে। আমি খুলে দিতুম।. শনিবার সন্ধেতে মেস খালি। শনিবার সন্ধেয় কি রোববার সকালেও আসত অনেক সময়ে।'

—'আচ্ছা শোনো, এরা কেউ এলে, বলবে না করবাবু মারা গেছেন, আমি থাকলে সোজা ওপরে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। বুঝেছ?'

হরিহর বড় করে ঘাড় নাড়ল।

কেন এটা করলেন বিজু রায় জানেন না। কে সাইমন কে-ই বা রফিক, তাদের সঙ্গে নলিনী করের কী সম্পর্ক। তাঁর এ সবের মধ্যে ঢোকবার কী আছে! ভেবে করেননি। তেমনি না ভেবেই আজই তিনি করবাবুর ট্রাঙ্কটা টেনে বার করলেন—চৌকির তলা থেকে। দু-তিন খানা ধুতি, চারটে পাঞ্জাবি, তার মধ্যে একটা সেই গরম ফ্লানেলের যেটা পরে তিনি নলিনীকে প্রথম দেখেছিলেন। কয়েকটা রুমাল। সেই জামেয়ার শালখানা। একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটের মধ্যে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। ভাল তোয়ালে দুটো। এ ছাড়াও একটা চৌখুপি নকশা-কাটা খাদির বেড কভার, সাদা চাদর, বালিশের ওয়াড়। বেডকভারটা তুলে ভাল করে গুছিয়ে রাখতে গিয়ে তার ভেতর থেকে ঠক করে একটা ছোট নোট বুক পড়ল। খুব পুরনো। মণিময়রা বলছিল—এঁর কোনও আত্মীয়স্বজনের খোঁজ পাওয়া

যায়নি। কিন্তু নোট বুকটাতে তিনি দেখলেন তিন, চারটে ফোন নম্বর ও ঠিকানা রয়েছে। এগুলো কি ওরা দেখেছে? জিজ্ঞেস করতে হবে। তারপর একটা পাতায় লেখা—'ওপেনিং-এর খেলায় দুয়া চৌয়া পঞ্জা লাকি নং। ক্লোজের খেলায় দিনের পর দিন এক্কা দুয়া নওকা। পাত্তি টু পাত্তি চান্স নিতে হবে একবার। জিতলে পঞ্চাশ। হারলে পাঁচ, কুছ পরোয়া নেই। জীবন-জুয়ায় অমৃত বা বিষ যা উঠল তা আমার। লক্ষ্মী যদি ওঠে তো সে দাদু পাবে।'

ঠিক সাড়ে নটায় চিত্তরঞ্জনে পৌঁছে গেলেন বিজন। তিনি ঢোকবার পাঁচ মিনিট পরেই এল রত্না। এই মেয়েটি যে কেন এখনও নিয়মিত যাওয়া-আসা করছে তিনি জানেন না। শমিত বা শাঁটুল যার সঙ্গে সম্পর্কের ফলে এর সঙ্গে দিদির সম্পর্ক, সে তো ফেরার, এবং দিদি কাটান-ছাড়ান-এর কথাও উল্লেখ করেছিল। মেয়েটি তাঁকেও খুব রুক্ষভাবে তাঁর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, মুক্তি চেয়েছিল। মেয়েটিকে তিনি মুক্তি দিয়েছেন। ও তবুও আসছে।

দিদিকে ও.টিতে নিয়ে গেল। যাবার সময়ে বিজন সাহস দেবার চেষ্টা করলেন, দিদি কিছুই বলল না। শুধু দু ফোঁটা জল শুকনো গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। রত্না নিচু হয়ে কিছু বলল দিদির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে।

দুজনে বসে আছেন। রত্না হঠাৎ মৃদুস্বরে বলল—'মামাবাবু ও ফিরে এসেছে।'

বিজন অন্যমনস্ক হয়ে ছিলেন। চমকে উঠে বললেন—'কী বলছ?'

—'ও, মানে আপনার ভাঞ্জা ফিরে এসেছে।'

—'ফিরেছে? কোথায়?'

—'এখনও বাড়িতে আসেনি। আমার সঙ্গে দেখা করেছে।'

বিজন অপেক্ষা করছেন।

রত্না বলল—'কাল রাতে আমি ও বাড়ি সব সাফা করে এসেছি। আজ রাত হলে ও পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে ভিতরে শুতে পারবে।'

বিজন অপেক্ষা করছেন।

—'ও বলছে বাড়িটা বিক্রি করে আমরা যদি অন্য কোথাও চলে যাই!'

বিজন বললেন—'কিন্তু ওর নামে শুনেছি ওয়ারেন্ট আছে। যেখানেই যাক ও ফেরারি আসামি।'

—'আপনি যদি বাড়িটা বিক্রির ভার নেন।'

—'আমি তো তোমায় বললাম ও যেখানেই যাক ফেরারি আসামিই থাকবে।'

—'আচ্ছা ও যদি ওই টাকাটা দিয়ে দেয়!'

—'কী টাকা? কাকে?'

—'মা আপনাকে কিছু বলেনি?'

—'পরিষ্কার করে বলো কী বলতে চাইছ।

—'যাদের ভেজাল সিমেন্ট সাপ্লাই করেছিল, সাত আটটা পার্টি, তাদের যদি কমপেনসশন দিয়ে দেয়!'

—'কত টাকার?'

—'আমার ঠিক জানা নেই, তবে লাখখানেক তো হবেই।'

—'এত টাকা কোথা থেকে দেবে?'

রত্না ইতস্তত করতে লাগল, কিছুক্ষণ পর বলল—'আপনি যদি টাকাটা অ্যাডভান্স করেন।'

বিজন মনে মনে বললেন—ও আমি লাখ বা ততোধিক টাকা অ্যাডভান্স করব, আমি বাড়িটা বিক্রি করিয়ে দেব। ও অন্যত্র গিয়ে থাকবে। ভাল।

মুখে বললেন—'সুখচরের বাড়ি কার নামে?'

—'সেটাই তো মুশকিল। এখনকার কানুন তো মেয়েদেরও ভাগ দেয়, আমার দুই ননদের ভাগ আছে, মার ভাগ আছে, ওরও আছে। এই সময়ে যদি ওটা বিক্রি করে দেওয়া যেত! ছ-সাত লাখ টাকা তো নিশ্চয়ই হবে। আপনার টাকাটা আমরা শোধ দিয়ে দিতাম!'

বিজন বললেন—'কিছু মনে কোরো না রত্না, শমিত যাকে তুমি বিয়ে করেছ, বাঁকা পথে ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না দেখছি। এ মতলবটা নিশ্চয় ওরই। বর্ন চিট। তুমি যদি ঠিক করে থাক ওকে ডিভোর্স করবে। তবে করতে পার।'

—'ও বলছিল আপনি বিজনেসম্যান আপনি ব্যাপারটা বুঝবেন, হ্যান্ডল্ করতেও পারবেন।'

তখন বিজন বুঝলেন বিজনেসম্যানের সংজ্ঞা অন্ততপক্ষে শমিতদের কাছেও কী দাঁড়িয়েছে! শমিত, তাঁর ভাগ্নে তাঁকে ঠগ-ই মনে করে। একজন সফল ঠগ। তাই-ই সে প্রস্তাবটা সময়-সুযোগ বুঝে তাঁর কাছে পেশ করেছে। ব্যাপারটা তাঁকে ভাবাল। কতটা ঠগ তিনি? কিছুটা তো নিশ্চয়ই! কিন্তু কতটা? রত্না মুখ নিচু করে বলল—'মামাবাবু, আমি ওকে ডাইভোর্স করতেই পারি। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। আমার পিতাজি আমাকে আলাদা সম্পত্তি লিখে দেবে। গুড্ডুও ভালভাবে মানুষ হবে। যে লোক সাচ্চা নয়, তাকে নিয়ে এমনি ভেসে পড়বার মুশকিল আছে আমি জানি। কিন্তু আমি ওকে ছেড়ে দিলে ও একদম তলায়, নীচে ঔর ভী নীচে চলে যাবে। এখন, আমার পিতাজি এ সাদি দিতে চাননি। আমার শাস ভী না। ও-ও তখন পিছু হটছিল। আমি জিদ্দি আছি। আমিই জোর করে এটা করেছি। এখন যদি ও গাড্ডায় পড়েছে বলে ভেগে যাই আমার সাচ্চাই কোথায় থাকবে? নিজেকে, আমার নিজের অন্দরে যে ভগোয়ান আছে তাকেই বা কী জবাব দেব?'

বিজন মন দিয়ে শুনছিলেন মেয়েটির কথা। তাঁর ভাগনে-বউ। এ কদিনে জেনেছেন ও মাত্রই স্কুল ফাইন্যাল পাশ। হায়ার সেকেন্ডারিতে আটকে গিয়েছিল। শমিত নাকি ওকে পড়াত। কী যে পড়াত ভগবান জানেন। বি. কম ফেল করেছে দুবার। হঠাৎ যেন বিজন ইলেকট্রিকের শক খেলেন। তিনিও বি.কম ফেল করেছিলেন। তিনি গ্র্যাজুয়েট নন। তৃতীয়বার পরীক্ষায় বসবার ভয়েও বটে, ছুটকি চলে যাওয়ার পরের গভীর অন্ধকার সইতে না পেরেও বটে তিনি পালিয়েছিলেন। বাবা ছুটকির নাম মুখে আনতেন না। মা! মাও কি খড়্গহস্ত হয়েছিল! মায়ের ওরকম বিভীষণ চেহারা আর কখনও দেখেন নি বিজু। ওর নাম কেউ আমার সামনে উচ্চারণ করবে না, ভুলে যাও, ওকে তোমরা ভুলে...। গর্ভধারিণী মায়ের চেয়ে সন্তানকে কেউ বেশি ভালবাসে? সেই মা যখন ভুলে যায়, ভোলবার ম্যানডেট জারি করে, তখন অন্য কে আর...। তবে মা সন্তানকে সবচেয়ে ভালবাসে এটা একটা ধারণা। ছুটকি যা করেছিল তা, বা তার চেয়েও বেশি কত কত লোকে করছে আজ। জল-ভাত হয়ে গেছে। অন্তত তাঁদের সোসাইটিতে। কে জানে বিত্তবানের সমাজে হয়তো বরাবরই মূল্যবোধ আলাদা ছিল! শর্মাজির বর্তমান স্ত্রী রেণুকা শর্মা তাঁর আট বছরের মেয়েকে ছেড়ে চলে এসেছিলেন। সে মেয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে বলেও তিনি জানেন না। কাজেই মা সন্তানকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসবেই—এটা একটা ধারণা। সংস্কার। মা ছুটকিকে চিঠিতে কী লিখেছিল, বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। গর্ভধারিণীত্ব শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছিল। কিন্তু শেষ জীবনে, একেবারে শেষে। তাঁর মনে পড়ল সে সময়ে তিনি ছুটকির জন্য ভীষণ গুমরোতেন। কাউকে বুঝতে দিতেন না। বাইরে যেমন হাসি খুশি, চঞ্চল ইয়ার্কিবাজ তেমনই। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতেন। বাইরের হাওয়াটা যেমন হু হু করত, ভেতরটাও তেমনি হু হু করত। যেন বুকের ভেতরটা শূন্য মাঠ একটা। খাঁ খাঁ মাঠ। বাতাস বয়ে যাচ্ছে সেই মাঠের ওপর দিয়ে। শূন্য, শূন্য। জীবনের সামান্য সেই লেখাপড়া তা-ও শেষ করতে পারলেন না। পারল না বিজু। বিজনেস অর্গানাইজেশন, কম্পানি ল, ইনকাম-ট্যাক্স, অডিটিং অঙ্ক কিচ্ছু মাথায় ঢুকত না। সমস্ত ডেবিট ক্রেডিট, জার্নাল লেজার ফোলিও, অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্টেন্সির সমস্ত থিয়োরি, ফর্মুলা, ইকোয়েশনের ওপরে ছুটকির মুখ ভেসে উঠত, ছুটকির ঈষৎ ঢেউ খেলানো মাঝ-পিঠ-ছাপানো বানে ফেঁপে ওঠা গঙ্গার মতো চুল। ছুটকির চোখ, গাঢ় বাদামি, দুষ্টু দুষ্টু আবার ভাবুক বড় বড়

পল্লবওলা। ছুটকির ছোট্ট তীক্ষ্ণ নাক। ভীষণ মিষ্টি ঠোঁট ছুটকির। তার শ্যামলা রঙের গালে সোনার মাকড়ির ছায়া। ডুরে শাড়ি, সরু সরু ছোট ছোট আঙুল। পারল না বিজু। বি.কমটা পাশ করতে পারল না। অথচ সেই বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনই এখন করছে! তখন অদ্ভুত এক অপারগত্ব। ভীষণ সময়! কোনও স্থির লক্ষ্য সামনে নেই। ভয়াল বাস্তব উদ্যত হয়ে রয়েছে। নতুন কিছু নেই। কেউ নেই। অথচ পুরনো প্রিয়কে, ঘনিষ্ঠকে হারানো। কী ভয়াবহ সময় গেছে বিজুর জীবনে! শ্মশান ধারের সেই বাড়ির ছাদে সমস্ত কথা, তা যত গোপনই হোক, ছুটকির সঙ্গে। ছুটকি এক বন্ধু আর নিতাইদা আর এক। নিতাইদা অনেক অশ্লীল কথা বলত। অশ্লীল কথা উচ্চারণে তখন কেমন একটা মজা পাওয়া যেত। যেন চুরমুর খাওয়া, মুচমুচে সব শব্দ। আবার ইংরিজিও জোগাড় করে আনত, বলত 'ফাক' 'ফাক' মানে জানিস? জানিস না? মানেটা বুঝিয়ে দিত, দুজনে মিলে হাসত খুব খানিকটা, তারপর বলত 'কক' মানে কী বল তো' 'কেন মোরগ' বিজুর জবাব। নিতাইদার হাসি চমৎকার ভাবে বেড়ে যেত। তারপর মানে টানে সব শেষ করে বলত 'এই খবর্দার। এ সব যেন তোর ওই ছুটকি না ছোড়দিকে বলবি না। তুই তো আমার তোর ছোড়দির সামনে ন্যাংটোও হতে পারিস।' এটা নিতাইদার বাড়াবাড়ি। কিন্তু সত্যিই নিজের অনেক গোপন অভিজ্ঞতার কথা বিজু ছুটকিকে বলত, কিন্তু ছুটকি কি কিছু বলত? বিজুকে? কিচ্ছু না। নেহাত বাধ্য না হলে না। কিন্তু ভান করত যেন সব বলছে। সবচেয়ে গুরুতর কথাটাই তো একদম চেপে গিয়েছিল। কেউ বিশ্বাস করেনি। ছুটকির প্রাপ্য প্রহারটা বাবার কাছ থেকে দাদাদের কাছ থেকে তাকেই খেতে হয়েছে।—'জানিস সব, বলছিস না।' শেষকালে মা এসে মাঝখানে দাঁড়াল, 'অতবড় ছেলেকে চোরের ঠ্যাঙানি দিচ্ছ সবাই মিলে কি জন্যে? ও তো বলছে জানে না। আর জেনেও যদি এত মার খেয়েও হজম করে থাকতে পারে। থাকতে দাও।' ছুটকি তাকে বলেনি, ভাই তো! ওইটুকু দিদিগিরি। কিংবা ভাইয়ের কাছে নিজের আব্রু রক্ষা। ছুটকি চলে যাওয়ার পর অনেক ভেবে সে এটাই বুঝেছে।

রত্না বলল 'মামাবাবু, আপনি তো কিছু বললেন না!'

বিজন দেখলেন ডাকাবুকো মেয়েটির চোখ ছলছল করছে। তিনি বললেন 'শমিত কিছু জানে না। কিস্যুই জানে না। আয়্যাম সরি বউমা। আমাকে একটু ভাবতে দাও। আগে দিদির এ ব্যাপারটা চুকে যাক। এখন অন্য কিছু মাথায় নেই।' বললেন বটে, কিন্তু বলেই বুঝলেন এক দিক থেকে দেখতে গেলে এই যুবক-যুবতীদের যাদের এখনও অনেক দিন বাঁচতে হবে, একটি শিশুকে মানুষ করে তুলতে হবে, তাদের সমস্যা অনেক গুরুতর, দিদি তো মেরে এনেছে। তিনিও। হয়ত তিনিও।

ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। বিজন এগিয়ে যাচ্ছেন। উনিই প্রধান সার্জন, ভেতরে পুরো একটা টিম। বললেন—'সরি, মিঃ রায় গোটা লিভার, সপ্লিন, ইনটেসটাইন সর্বত্র স্প্রেড করে গেছে। কিছু করার নেই। আমরা হাত দিইনি। ওপন করে দেখেই আবার সেলাই করে দিয়েছি।'

—'এখন তাহলে?'

—'অপেক্ষা পাঁচ ঘণ্টাও হতে পারে, পাঁচ দিনও হতে পারে, আবার পাঁচ মাসও।

—'কিন্তু পেইন? ওই অমানুষিক পেইন সহ্য করতে হবে যে কটা দিন বাঁচবে?'

—'কেমোথেরাপি করতে পারেন। কিছু লাভ হবে না মিঃ রায়, শুধু গুচ্ছের সাইড এফেক্ট। লেট হার গো ইন পীস।'

—'পীস?' বিজু রায় তিক্ত কণ্ঠে বললেন।

—'ওই হল।' ডাক্তার মুখ নিচু করে ধীর পদক্ষেপে করিডর বেয়ে চলে গেলেন। অভিজ্ঞ। বয়স্ক মানুষ। অনেক দেখেছেন, যন্ত্রণা, মৃত্যু। তবু যখন এভাবে হেরে যান, প্রতি পদক্ষেপে গভীর হতাশা, ক্লান্তি, দুর্মর একটা অভিমান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রত্না এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল 'কী হল মামাবাবু?'

—'কোনও আশা নেই বউমা!'

রত্না হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর জোর করে নিজেকে সামলে নিল। আরও কিছুক্ষণ

পর ও.টির দরজা খুলে গেল—দিদি বেরিয়ে আসছে, সাদা চাদরে ঢাকা। মুখটা নীল। বিকেলের দিকে জ্ঞান হবার দুতিন ঘণ্টা পরেই মারা গেল দিদি। ঘোর-লাগা দৃষ্টিতে চারদিকে দেখল, ঘোর-ঘোর গলায় ডাকল—'বিজু!' বিজু রে!' তারপর চুপ হয়ে গেল।

বিজু সারাদিন ফেরেননি আর। রত্নাও না। কাছাকাছি দোকান থেকে দুপুরে খেয়ে নিয়ে ম্যাটিনিতে একটা ফিলম্ দেখে দুজনে সময় কাটিয়েছিলেন। ভিজিটিং আওয়ার হতে না হতেই হাজির। তা শেষপর্যন্ত ওই হল। জ্ঞান ফিরল, তারপর চিরকালের মতো চলে গেল। মাঝখান থেকে বিজু অবাক হয়ে রইলেন। দেখা নেই, শোনা নেই, সম্পর্ক নেই, আজ পঁয়ত্রিশ বছরেরও অধিক হল। শুধু শেষ কটা দিন। তবু জীবনের শেষ আলো আঁধারির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দিদি ঘড়ঘড়ে গলায় বিজুকেই ডাকল? তবে কি দীর্ঘ জীবনের দীর্ঘ অদর্শনের মধ্যেও দিদির ছোট ভাইয়ের জন্য একটা করুণ আকুলতা ছিল! সেই বিরহবোধই কি তবে দিদির জীবনের শেষতম কথা! আশ্চর্য! তিনি কি দিদির শেষ-কৃত্য করবার জন্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন? না। না। শুধু দিদি তো নয়। আরেক জনেরও। সম্পূর্ণ অচেনা একটি সমবয়সী লোকেরও। সে লোকটিও যেন দিদিরই মতন তাঁর হাতের আগুনের জন্য অপেক্ষা করে ছিল।

রত্না তখন কাঁদতে কাঁদতে বলছিল বিয়েতে অমত করলেও পরে মা তাকে কত ভালবাসত। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কী অসামান্য সেবা করেছে। গুড্ডুকে হাতে করে মানুষ করেছে। কিন্তু বিজু রায় অর্ধেক শুনছিলেন। অর্ধেক শুনছিলেন না। অর্ধেক মন দিয়ে ভাবছিলেন, ভাল ফল। কৃতজ্ঞতা ভাল। বড় বিরল প্রজাতির মানবিক গুণ। ভালবাসা নয়। শুধু অন্তত এইটুকু ছলছলে কৃতজ্ঞতা। আর মনের অপরাধ দিয়ে তিনি ভাবছিলেন—এ কি কাকতালীয়? এই সব দেখা-শোনা মৃত্যু এ সব কি দৈবাৎ ঘটে? দৈবাৎ ঘটল? নাকি...সময়। লগ্ন, সঠিক লগ্নেরই একটা সঠিক টান আছে? ঠিকঠাক সব ঘটিয়ে দেয়! মণিদীপিকার জন্মদিনে লাল পায়েস আর নাইলন ডলের মতো! একদিন আগেও নয়। একদিন পরেও নয়।

।। ৬ ।।

কেমন একটা অতীন্দ্রিয় অনুভবে অর্জুন বোঝে যে তিনি তাকে ডাকছে। তার মনে হয় এটা অতীন্দ্রিয় অনুভব। সিক্সথ্ সেন্স। কিন্তু কতকগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কারণও আছে এই অনুভবের। এটা অস্বীকার করা যায় না। যেমন তিতি দুবার তাদের কেমিস্ট্রি ল্যাবের সামনে দিয়ে ঘুরে গেল। শুধু শুধু। তিতির সঙ্গে একজন বন্ধু ছিল। গোপা বোধহয় মেয়েটার নাম। ভীষণ শব্দ করে গলা খাঁকারি দিল, অসভ্যের মতো। সার মুখ তুলে তাকালেন। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের পর সে বাইরে বেরিয়ে দেখল ফুলে ভরা জারুল গাছের তলায় তিতি দাঁড়িয়ে আছে। একা। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—'ডাকছিলি?' তিতি কিছু না বলে চলতে আরম্ভ করল। কম্পাউন্ড পার হয়ে সে মেন বিল্ডিঙের চত্বরে উঠল। গোপা এবং আরও কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের কিছু বলল, তারপর তর তর করে সিঁড়ি নেমে এসে কলেজ গেটের বাইরে বেরিয়ে এল। অর্জুন সারাক্ষণই তার পেছন পেছন এসেছে, খালি মেন বিল্ডিঙের ওপরে ওঠেনি, একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল তিতি এখনও চলছে। খুব হনহন করে না হলেও খুব ধীর লয়েও নয়। তার উদ্দেশ্যটা কী এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সে কি সত্যিই অর্জুনের সঙ্গে কিছু কথা বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে, না সেরকম কিছু নয়? অন্য কোথাও যাচ্ছে। হয়তো বাড়িই। সেটা অর্জুন পুরোপুরি বুঝতে পারছে না। অথচ ভেতরে ভেতরে তার স্পষ্ট ইন্দ্রিয়াতীত ষষ্ঠ অনুভব তিতি তাকে ডাকছে।

একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে সে তিতিকে প্রায় ধরে নিল। বলল—'আস্তে চল। আরেকটু আস্তে।' তিতি পেছন ফিরল না। থামলও না। তাদের মধ্যে এইরকমই হয়। ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের একটা তীব্র

টানা-পোড়েন চলে, চলতেই থাকে। কখনও অর্জুন ডমিনেট করে, কখনও তিতি। আজ যেমন। এতটা পথ পেছন পেছন ছুটে এসেও অর্জুন তিতিকে ধরতে পারছে না। তিতিই কর্তা। তিতি ডমিনেট করছে।

অথচ কটা দিন আগেই তিতি যখন তাদের চুঁচড়োর বাড়িতে গিয়েছিল, তিন দিন থেকেছিল তখন, সেই পুরো সময়টা তিতি অর্জুনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অর্জুনই ছিল কর্তা। সে তিতিকে ইচ্ছেমতো হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, রাগিয়েছে।

প্রথমটা তিতি যেতে চায়নি। সে বন্ধুদের সঙ্গে যখন যেখানে খুশি যায়, বন্ধু থাকে বান্ধবও থাকে। কোনও ব্যাপারই নয়। কিন্তু অর্জুনের বেলায় সে 'বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি'টা বলতে চাইছিল না। একটাই কথা বলেছিল—'তুই তো আমার বন্ধু নয়, ভাই। মিথ্যে বললে নিজেকে ছোট করা হয়।'

অর্জুন অবাক হয়ে বলেছিল—'কথাটা তুই বলতে পারলি তিতি? তোর সঙ্গে যখন আলাপ হয়, তুই জানতিস আমি তোর ভাই হই সম্পর্কে? আমি জানতুম তুই আমার বোন হোস?' কেউই জানতুম না। এই সেদিন জেনেছি। সুতরাং বন্ধু পরিচয়টাই প্রথম, আদি পরিচয়।'

—'কিন্তু গোপা, শৃঞ্জয়, বিশ্বজিৎ, পৌলমী কেউ যাবে না... আমি একা!' খুবই দ্বিধা প্রকাশ করে তিতি।'

—'দেখ তিতি, বাজে কথা বলিসনি। তুই খুব ভাল করেই জানিস তোর ওই গোপা শৃঞ্জয় এবং বিশ্বজিৎদের আমি দু-চোখে দেখতে পারি না। পৌলোমী আসতে পারে। যদি সে চায় এবং তুই চাস। কিন্তু আমি চাই না। আমি নিমন্ত্রণকর্তা, আমি চাইছি না, সে ক্ষেত্রে পৌলোমীর আসাটা কি খুব সম্মানজনক হবে? আর তুই তো জানিস তোকে নিয়ে যাচ্ছি আমার নিজের বাড়িতে আমার মা, কাকিমা সবার কাছে। সেখানে নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে তোর শ্লীলতাহানির ভয়টা নেই। না কী?'

—'বাজে কথা বলিস না অর্জুন, তুই আবার আমার শ্লীলতাহানি করবি কী রে? আমি বরঞ্চ তোর এই মভ রঙের শার্টটা টেনে ছিঁড়ে দিতে পারি। কত দিন পর পর তোকে এই একই শার্টে দেখছি।'

—'আরও কদিন দেখতে পারিস, রাতে কেচে দিনের বেলায় যদি পরে বেরোতে না পারি তাহলে আর 'সিনথিটিক পোশাকের মানে কী?'

—'কিন্তু কেন? তোর কি আর নেই?'

—'নেই তা নয়। তবে কমই আছে। কমই রাখতে চাই। এবং বিশ্বজিতের মতো ফ্যাশন-প্যারেড করা ছেলেদের দেখলে আমার একই সঙ্গে বিবমিষা এবং করুণা হয়। একটা উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক হ্যাংলার মতো ওয়ার্ডরোব ধুর, কাপড়ের আলমারির দিকে তাকিয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে ভাবলে আমার কী যে হয়, রাগ না ঘেন্না না অবিমিশ্র অবজ্ঞা ঠিক আমি বোঝাতে পারব না রে তিতি। আর তা ছাড়াও জেনে রাখ আমি তোদের মতো বড়লোক নই। তিনটে বিধবার আমি একমাত্র সন্তান। তারা আমাকে নিজেদের সব দিয়ে অনেক কষ্ট করে বড় করছে। আমাকে তাদের দেখতে হবে। আমার কটা শার্ট, আর সে শার্টটা কদিন পরলুম এসব নিয়ে ভাবলে আমার চলে না। এগুলো ভাববার যোগ্য বিষয় বলেও আমার মনে হয় না।

অতএব তিতি অর্জুনদের চুঁচুড়ার বাড়ি গেল। এবং গিয়ে একাধারে মুগ্ধ এবং বিষণ্ণ হয়ে গেল। তিতি একটু অদ্ভুত। অর্জুনও অদ্ভুত কিন্তু তিতি আরও অদ্ভুত। সে যখন তার আগেকার বন্ধুদের অর্থাৎ ওই এবং বিশ্বজিৎদের সঙ্গে থাকে তখন তিতি পাক্কা ফিরিঙ্গি। এই কলকাতার শতকরা পঞ্চাশ জন কলেজি তরুণীর মতো। পরিসংখ্যানটা অর্জুনের নিজের। ওরা নিজেদের মধ্যে এটাকে বলে 'হাই-ফাই কালচার', যদিচ কালচার বলে এর ভেতরে কিছু নেই বলে ওর মত। এ নিয়ে তিতির সঙ্গে তার ফাটাফাটি তর্ক হয়েছে এক সময়ে। অর্জুন বলে 'যদি ব্যুৎপত্তিগত' অর্থে ধরিস তাহলে

এটা কালচার। কারণ এরা মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমির সব কিছু ত্যাগ করে মার্কিন জীবনযাত্রার ধন "রপ্ত" করেছে। কালটিভেট করেছে অতএব—কালচার বলতে পারিস। নিজের দেশের বাতাসে শ্বাস নেয়। সরকারি টাকার অর্থাৎ ট্যাক্সপেয়ারদের টাকার মুণ্ডুপাত করে বড় বড় পড়াশুনো করে, তারপর প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে বিলেত-আমেরিকায় উড়ে যাবার। সেখানে গিয়ে এদের শতকরা নিরানব্বুইজন পাত্তা পায় না। কোনওরকমে চাকরিটা সেরে নিজেরা যে দেশি কলোনি গড়েছে সেইখানে শামিল হয়। একটাও বিলিতি বা আমেরিকান লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে না। বাইরে থেকে তাদের অনুকরণ করে আর যে সংস্কৃতি এখানে ময়লা কাপড়ের মতো ত্যাগ করে গেছে সেই সংস্কৃতির বহিরঙ্গ ওইখানে প্রতিষ্ঠিত করবার হাস্যকর চেষ্টা করে যায়। দুর্গাপুজো, সরস্বতীপুজো, জলসা।

তিতি বলে—'তুইও বাইরে থেকে দেখে বিচার করছিস। সুতরাং অবিচার করছিস। যারা বাইরে যায় শুধু আরাম আর ডলার রোজগারের জন্যে যায় না। কাজ করবার জন্যেও যায়। এখানে কাজ করবার পরিবেশ আছে? জানিস আমার জারতুত দাদা দিব্যদা ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। কোলাঘাটে আছে। বলে ইউনিয়নের ঠ্যালায় কাজ-কর্ম করাই দায়। দুর্নীতির চোটে হাত-পা বাঁধা জগন্নাথ হয়ে থাকো।

—'ওকে ঠুঁটো জগন্নাথ বলে' অর্জুন সংশোধন করে দেয়।

'বেশ ঠুঁটো জগন্নাথ। তা হলে? কাজের জন্যে লোকে বিদেশে যাবে না কেন? সব প্রতিভা এখানে অপচয় করতে হবে? না কি? খোরানা, কি নারলিকর এখানে বেরোল?'

—'তুই সরকারি সংস্থার কথা বললি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কি এদেশে নেই? গবেষণাগার কি এদেশে নেই?'

—'আছে। থাকবে না কেন? সেখানেও কি অসুস্থ প্রতিযোগিতা নেই ভাবছিস? প্রফেশন্যাল জেলাসি, ক্লিকবাজি এসব সর্বত্র আছে।'

—'বিলেত দেশটাও মাটিরই রে! বহুদিন আগেই এক ভদ্রমহিলা এ কথা বলে গেছেন। এখন তো তাড়িয়ে দিচ্ছে। নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে যারা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে আজীবন কাটায় তাদের আমি ধিক্কারই দেব। আর কিছু আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না।'

—'দিস। ধিক্কারই দিস। কিন্তু জেনে রাখিস তারা সবাই অবজ্ঞার পাত্র নয়, করুণার পাত্র বরং। দিব্যদার এক বন্ধুর কথা জানি, ফৈজাবাদে ওয়ার্কাস ম্যানেজার না কী হয়ে গিয়েছিল। সে অঞ্চলের লোকেদের অত্যাচারে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বাংলো ঘেরাও করে ফেলেছিল মারবে বলে। অপরাধ কী? না কোম্পানির উন্নতির জন্যে কতকগুলো মেজার নিতে আরম্ভ করেছিল। ম্যানেজিং কমিটিই সেটা পাস করে দেয়। ইউনিয়ন লিডাররাও তখনকার মতো সায় দেয়। তারপর ওই ব্যাপার। ইউনিয়ন লিডারগুলো দু পক্ষেরই খায়।

'বঙ্গালি মনজারকো হঠাও'—এই স্লোগান দিয়েছিল। তা এই তো নিজের দেশের নাগরিকত্ব!'

তিতি সেবার জিতে যায়। অর্জুন তাতে কিছু মনে করে না। তিতি মেয়ে বলেই তাকে হেরে যেতে হবে এতোটা পৌরুষাভিমান নেই তার। কিন্তু 'বা বা ব্ল্যাকশিপ' দিয়ে পড়ুয়া জীবন-শুরু করা বাচ্চাদের বাবা-মাদের ওপর তার কোনও শ্রদ্ধা নেই। সে তিতি যতই বলুক। তিতি বলে—'ইংরিজিটা জানা না থাকলে কাজকর্ম পেতে অসুবিধে হচ্ছে। বিয়ে-টিয়ে হতেও অসুবিধে হচ্ছে, এটা ঘটনা। বলতে পারিস দাসত্বের উদ্গার...'

এইখানে আবার অর্জুন তাকে সংশোধন করে দেয়—'দাসত্বের উদ্গারটা আবার কী? গুরুভোজন হয়ে গেলে উদ্গার বা ঢেকুর ওঠে। কিন্তু গুরুভোজনটা একটা বিলাস। দাসত্বের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্গারটা ঠিক—বুঝতে পারছিস জুতসই হচ্ছে না। বরং দীর্ঘস্থায়ী দাসত্বের অভ্যাস, অভ্যাসই বল।'

—'ঠিক আছে বাবা তুই বাংলা ভাল জানিস, তুই যা বলবি আমায় মেনে নিতে হবে। কথার মাঝখানে কথা বলায় তিতি একটু অসন্তুষ্ট।

অর্জুনকে তখন বোঝাতে হয়—'দ্যাখ তিতি, তোর সঙ্গে আমার ভদ্রতার, ভব্যতার সম্পর্ক নয়। দুজনেই আমরা বেড়ে উঠছি। তোর ভুল আমি আমার ভুল তুই যদি শুধরে দেওয়া-দেওয়ি না করি তো দুজনেই অসম্পূর্ণ হয়ে থাকব। সেটা কী ভাল?'

তিতির মুখ তবুও গোমড়া।

—'আচ্ছা তোকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, স্বস্ত্যয়ন বানানটা বল তো!' তিতির বানান ভুল হল। সে গোমড়া মুখে বলল, 'জানি না তো কী করব!'

—'ঠিক আছে! জানিস না। হেমারেজ বানান বল তো?' তিতির বানান আবার ভুল হল, সে লজ্জা পেয়ে বলল—'ইস্ কথাটা তো যখন-তখন ব্যবহার করি, অথচ বানানটা বলতে পারলাম না, এ মা!'

অর্জুন বিজয়ীর হাসি হেসে বলল—'বানান এক আধটা ওরকম ভুল হতেই পারে, ওটা কোনও ব্যাপার না, কিন্তু মাতৃভাষার বহুব্যবহৃত শব্দটা যখন ভুল করলি তোর প্রতিক্রিয়া হল—জানি না, তো কী করব!' আর ওই ইংরেজি হয়ে যাওয়া ক্ল্যাসিক্যাল শব্দটা ভুল করে তুই লজ্জা পেলি, বললি এ মা! —এর মানে কী? কী দাঁড়ায়? তু-ই বল! আমরা এখনও পরাধীনই আছি। গোলাম। সর্ব বিষয়ে। শুধু বাক-স্বাধীনতাটাই একমাত্র স্বাধীনতা, যা আমরা অর্জন করতে পেরেছি। কথার ওপর কেউ ট্যাক্স বসাতে পারছে না।' বলে অর্জুন হাসতে থাকে। তিতি ভাবিত। তিতি এই পর্বে হেরে গেছে। কিন্তু সে মনে করছে না কিছু।

তিতি অদ্ভুত। চুঁচড়োয় অর্জুনদের বাড়ি গিয়ে সে আনন্দে একবারে আত্মহারা হয়ে গেল। 'খড়খড়ি খড়খড়ি! গরাদ-দেওয়া জানলা! ফ্যানটাসটিক্!'

প্রথমে গিয়ে দাঁড়াল বাগান পেরিয়ে তিন চার ধাপ উঠে কাঠের বিরাট দরজা খুলে ভেতরের প্রশস্ত দালানে যার এক দিকে ঠাকুর দালান, অন্য দিক দিয়ে কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছিলেন অর্জুনের মা। ধবধবে ফর্সা। একটু মোটাসোটা। কাঁচা পাকা চুল। কালোপাড় সাদা শাড়ি। খালি পা। তিতি প্রণাম করল। অর্জুনের মা বললেন—'এই তোর প্রতীতি?'

অর্জুন গম্ভীরভাবে বলল—'আমার প্রতীতি আমার নিজের কাছেই আছে মা, ও বরং তোমারই প্রতীতি, দেখো তোমার তনু-বোনের সঙ্গে মিল পাও কি না!'

—'প্রতীতি, তোমার মা তনু আমার আপন পিসতুত বোন ছিল জানো তো? খুব মামার বাড়ি আসত। কী খেলতুম আমরা! রান্নাবাটি! পুতুল!'

সেই সময়ে তিতি বলে উঠেছিল 'খড়খড়ি! খড়খড়ি! গরাদ!' বলেই দু-সিঁড়ি টপকে টপকে ছুট। সিঁড়ির বড় চাতালটায় পৌঁছে বোধহয় তার খেয়াল হয় সে মুখ ফিরিয়ে বলে—'মাসি আমি ওপরে আসতে পারি তো?'

—'নিশ্চয়ই!' মৃদু হেসে বললেন অর্জুনের মা।

আসলে সিঁড়ির সেই বড় চাতালেই একটা পেল্লাই জানলা ছিল। সেটা দিয়ে পেছনের বাগান দেখা যায়। এই বাগানের পেছনে গঙ্গা। সেটাই ছিল তিতির আহ্লাদের কারণ। জানলায় প্রশস্ত ধাপ ছিল। সেই ধাপের ওপর বসে পড়ে সে দুটো গরাদের মধ্যে নিজের মুখটা চেপে ধরেছিল, আরও দুটো গরাদ হাত দিয়ে ধরে। বলেছিল—'জানিস অর্জাই, যেখানে যাব খালি গ্রিল গ্রিল গ্রিল, আমার প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। আজ কতদিন পর গরাদ দেখলাম! গরাদে মুখ রাখলাম।'

অর্জুন বলল—'তিমি তোর মুখ ডোরা কাটা হয়ে গেছে।'

অর্জুনের মা খুব লজ্জিত হয়ে বললেন—'এত জানলা, দরজা এ বাড়িতে যে নিয়মিত ঝাড়া-মোছা করতে পারি না, ইস্ প্রতীতি তোমার মুখটা কী হয়েছে!'

—'মাসি আমাকে তিতি বলো। এই শাটারগুলো খোল্রা যায়?'

—'কেন যাবে না? তবে খুব ধুলো।'

—'আমি একটু এগুলো ফাঁক করব? ফাঁক করে করে দেখব? ভেঙে যাবে না তো?'

—'না না ভাঙবে না, ও-সব খুব শক্ত।'

তিতি খড়খড়ি ফাঁক করে দেখতে লাগল, বন্ধ করে দেয়, আবার খোলে।'

অর্জুন এই সময়ে বলে ওঠে—'ওপরে চল, এক জানলা থেকে আরেক জানলায় ছুটে যাবার সুযোগ পাবি, তবে অপেরা-গ্লাস-টলাস কি বাইনোকুলার আমার কাছে নেই আগে থেকেই বলে দিচ্ছি।'

—'কেন অপেরা গ্লাস কী হবে?'

—'না হলে চারুলতার ছবিটা ঠিক সম্পূর্ণ হচ্ছে না, হচ্ছে কি?'

খড়খড়িগুলো তখনকার মতো বন্ধ করে দিয়েছিল তিতি। গম্ভীর মুখে বলেছিল—'তোর অনেক গুণ অর্জুন, কিন্তু এই এক দোষে সব নষ্ট।'

—'গুণগুলোর কথা ভাল করে জানি না। বলছিস অনেক, তাই জিজ্ঞেস করছি না এখন, বড্ড সময় যাবে। কিন্তু একটা দোষ বলছিস, দোষটা কী জানতে পারি!' অর্জুন হেসে জিজ্ঞাসা করে।

—'সিনিসিজ্‌ম্। এক ঘড়ি গঙ্গাজলে এক ফোঁটা ইয়ে...।'

"ঘড়ি" নয় রে "ঘড়া" এক ফোঁটা ইয়ে নয় "চোনা", চোনা মানে গরুর হিসি। খুব পবিত্র জিনিস।'

অর্জুনের মা ধমক দিয়ে উঠেছিলেন এই সময়ে—'আঃ কী হচ্ছে টুটুল!'

—'ওহ জননী। তিতি কি তোমাদের সময়ের মেয়ে যে হিসি শুনলে মুচ্ছো যাবে? ওরা যে সব ইংরিজি স্ল্যাং জানে তা শুনলে আমি সুদ্ধু লাল হয়ে যেতে পারি। তা জানো?'

—'আচ্ছা অনেক জ্ঞান দেখিয়েছিস তুই। তিতি আয় ওপরে, আগে মুখ ধুয়ে নিবি।'

যে মুহূর্তে 'তিতি আয়' বলে ডাকলেন অর্জুনের মা, সেই মুহূর্তে তিতি এক ছুটে গিয়ে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরল, ময়লা মুখটা তাঁর কাঁধের ওপর রেখে ঘসতে লাগল। কে জানে কাঁদছে কি না!

অর্জুন বলল—'অবিকল কুকুরের মতো করছিস।'

—'বল—বলে যা, অপমানিত হচ্ছি না। ডগ্‌স্ আর নোব্‌ল অ্যানিমল্‌স।'

—'আমি তো শুনেছিলাম ঘোড়া, ঘোড়াদের সম্পর্কে এটা বলা হয়ে থাকে, এক কবি তো ঘোড়া হবার প্রার্থনাই জানিয়েছেন।'

"মানবজীবন খোঁড়া করে প্রভু ঘোড়া করো ভগবান।

অবশ্য, 'বেতো ঘোড়া নয়—ছ্যাকড়া টানিয়া আবার যাইবে প্রাণ।"

—'তোদের ঝগড়া থামাবি?' অর্জুনের মা বললেন।

—'তাহলে "তিতি আয়"-টা আবার বলো মাসি! তিতির সকাতর প্রার্থনা!

অর্জুনের মা আবারও বললেন অতএব,—হেসে—'আয় তিতি, মুখ ধুয়ে নিবি আয়।'

এবার অর্জুনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মাসির সঙ্গে ওপরে উঠে গেল তিতি। ওপরে দুই কাকিমা ততক্ষণে গা ধুয়ে বেরিয়েছেন। সামান্য আগে-পরে বেরিয়ে এলেন দুজনে ঘর থেকে। মেজ কাকিমা, অর্জুনের মায়ের থেকেও কিছু বড়। সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ। খুব কেতাদুরস্ত। লম্বা মানুষ, সাদা কালো পাড় শাড়ি কুঁচি দিয়ে পরেছেন। কাঁধে রুপোর ব্রুচ। চুলটাকে তুলে একটা অদ্ভুত কায়দায় বাঁধা। ঠোঁটের ওপর একটা আঁচিল। তিনিই তাঁর টয়লেটে নিয়ে গেলেন তিতিকে। ছোটজনও অর্জুনের মার থেকে সামান্য কয়েকমাসের ছোট। তিনি একটা নীল নকশাপাড় টাঙ্গাইল শাড়ি কুঁচি দিয়ে পরেছিলেন। ইনিও ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে এসেছিলেন, বেশ ধনী ঘরের মেয়ে, অহঙ্কার আছে বনেদিয়ানার। বাপের বাড়ির লোকেদের প্রসঙ্গ উঠলেই ফুলে ফুলে ওঠেন। কিন্তু এ সবই বাহ্য। ভেতরে ভেতরে তিনজনেই করুণ বিধবা। অর্জুন বড় হতে হতে বিধবায় পর্যবসিত হয়েছেন সবাই। ঠিক পর পর, স্ব স্ব স্বামীর বয়ঃক্রম অনুযায়ী। প্রথমে গেলেন অর্জুনের বাবা। নেফ্রাইটিস। তারপর

অর্জুনের মেজকাকা, ওই একই রোগ ধরা পড়ল। কিছু খেতে দেওয়া হত না। সব বারণ। মেজকাকা খ্যাংরা কাঠির মতো রোগা হয়ে গিয়েছিলেন। ঢলঢল করত কোট, প্যান্ট। তারপর একবার বেড়াতে গেলেন, মুসৌরি-দেরাদুন। মেজকাকি একা ফিরলেন। হয়তো কাকা কিছু অত্যাচার-অনিয়ম করে ফেলেছিলেন। হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন এ ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে একদিন জীবনটা ভোগ করে মরে যাওয়াও ভাল। অর্জুন জানে না। ছোটকাকা মেজকাকার বিয়ে হয়েছিল একই দিনে। মেজকাকা মারা যাবার পর ছোটকাকা নিজের থেকেই সাবধান হয়ে গেলেন। প্রোটিন খাওয়া কমিয়ে দিলেন। টাকাপয়সা, সম্পত্তি সব গুছিয়ে বিলিব্যবস্থা করে বউদিকে, স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। অর্জুন যে বছর ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠল, ছোটকাকা তাকে বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের মতো বোঝাতে লাগলেন শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ফিক্সড্ ডিপজিট, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, সেভিংস। নাইনে পড়তে পড়তেই ছোটকাকার রোগ ধরা পড়ল—নেফ্রাইটিস। তিনজনের নামে সব কিছু ট্রান্সফার করলেন ছোটকাকা। অনেকানেক সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গেল। সে সব বোঝালেন অর্জুনকে। তারপর এক সকালে বেশি রোগা হবার আগেই মারা গেলেন।

'তোদের বাড়িটা অদ্ভুত।' শুনে করুণ, বিষণ্ণ স্বরে বলেছিল তিতি।

'পৃথিবীটাই অদ্ভুত, জীবনটাও অদ্ভুত।' এটা তোর মনে হয় না কখনও তিতি?

—'অদ্ভুত? পৃথিবীটা? জীবনটা? কেন?'

—'দ্যাখ সামগ্রিকভাবে বোঝবার চেষ্টা কর। দেখবার চেষ্টা কর। কোনও কিছুর কোনও মানে নেই। মানুষ জন্মাচ্ছে, বড় হচ্ছে, কত কি তার জল্পনা-কল্পনা, কত আয়োজন, তারপরে মরে যাচ্ছে, আবার তার পরের প্রজন্ম, পরের প্রজন্ম। গাছ হচ্ছে, ফুল ফুটছে। ফল পাকছে, আবার গাছ, আবার ফুল আবার ফল।'

—'এ তো তুই আউটলাইনটা দেখছিস। ভেতরটা মানুষ কী দিয়ে ভরাট করছে দ্যাখ, কত সাহিত্য, শিল্প, ইনডাস্ট্রি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, চিন্তা দর্শন।'

—'তো কী? কী হল? সমস্ত কিছুরই যোগফল শূন্য।'

—'শূন্য কেন হবে? শেষে মৃত্যু আছে বলে বলছিস? মৃত্যু যদি না থাকত তা হলেই কি জীবনটা অর্থময় হয়ে উঠত?'

—'না, তা-ও নয়। বিজ্ঞানীরা যদি কোনওদিন মৃত্যুকে জয় করবার ফর্মুলাও আবিষ্কার করেন, যদি কৃত্রিম উপায়ে প্রাণের জন্ম দিতে পারেন, তবুও, তবুও সব শূন্য। তিতি পৃথিবীর সঙ্গে, পৃথিবী একটা কংক্রিট ব্যাপার, আর জীবন, জীবনটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস, এ দুটোর কোনওটাকেই আমরা নিয়ন্ত্রণও করতে পারি না, এদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগও স্থাপন করতে পারি না। কোনওদিন পারব না। পাহাড়, পর্বত, নদী, জঙ্গল, এরা কেন, তার ভৌগোলিক, বৈজ্ঞানিক কারণটা নির্ণয় করতে পারি। কিন্তু এদের সঙ্গে কম্যুনিকেট করতে পারি না।'

—'কী করে কম্যুনিকেট করবি? এগুলো তো জড়?'

—'জড়? জড় কি না—তাও জানি না। জড় একটা কনসেপ্ট। সেই কনসেপ্টটা দিয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে তুই ভাব। জীবনের বা জড়ের ধারণাটা আমাদের একটা ধারণা। জাস্ট ধারণা। দীর্ঘদিন ধরে ভেবে এসেছি বলে তার বাইরে ভাবতে পারি না। কিন্তু যতদিন এই সমস্ত পাহাড় পর্বত নদী নালা জঙ্গল স্পেস, এই সবের সঙ্গে কম্যুনিকেট করতে না পারছি ততদিন শূন্যতা, ব্যর্থতাই আমাদের নিয়তি। যান্ত্রিকভাবে বেঁচে যাচ্ছি, একটা প্রোগ্র্যামিং করা আছে শরীরের মধ্যে, মনের মধ্যে, সেইটের নিয়ম অনুযায়ী। যতই কবিতা লিখি, আর ছবি আঁকি, আর আবিষ্কার করি। কোনও মানে নেই। মানে নেই কিচ্ছুর।'

তিতি বলল—'কী অদ্ভুত নেগেটিভ চিন্তা তোর! তুই কি কোনও ফিলসফির বই-টই পড়ে এভাবে ভাবতে শিখেছিস?'

'না, না জীবনই এভাবে ভাবতে শিখিয়েছে আমাকে। সেই অ্যাকস্ট্রাক্ট সোর্স, জীবন। বিমূর্ত শক্তি। আমার বাবা আর কাকারাও এটা বুঝে গিয়েছিলেন, বিশেষত দুই কাকা। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বাবা অতটা বোঝাবার সময় পাননি। কিন্তু কাকাদের আগে ছিল এরকম অর্থহীন মৃত্যু, পেছনে ছিল অর্থহীন জীবন। ওঁরা বুঝেছিলেন। আমি মেজকাকার, ছোটকাকার মুখের ভাব এখনও দেখতে পাই। একদম ভাবলেশহীন পাথরের মুখের মতো। তৃষ্ণা নেই। বিতৃষ্ণা নেই। ভয় নেই, ভরসাও নেই। সবটাই শূন্য। সবটা একটা বিরাট ফাঁকি, বুঝেও সেই চেক, শেয়ার অ্যাকাউন্টস বুঝিয়ে যাওয়া সমানে আমাকে, মাকে, মেজকাকিমা, ছোটকাকিমাকে। সে যে কী অদ্ভুত গা-ছমছমে ব্যাপার, তুই, তোকে ঠিক বোঝাতে পারছি না।

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?"

তিতি, কবিতাটা বললাম বটে, কিন্তু আমি ঠিক ব্যথিত বেদনের কথা যাতনার কথা বলতে চাইনি। বেদনা, যাতনা দিয়ে আমার অনুভূতি আমি বোঝাতে পারব না। আমি বোঝাতে চাই জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে যেমন একটা দুস্তর ফারাক, যে বুঝেছে আর যে বোঝেনি তাদের মধ্যে ওইরকমই দুস্তর পার্থক্য! শূন্যতার আশীবিষে দংশন করেছে আমাকে। যে শূন্যতা সমস্ত কিছুর বাইরে নিঃশব্দ ধৈর্যে অপেক্ষা করে আছে।'

তিতি বলল—'মাসিরা? মাসিরাও কি এভাবে ভাবেন?'

—'মাসিরা? কুন্তী, মাদ্রী আর গান্ধারী?'

—'কেন এইসব মহাভারতের নামে মাসিদের ডাকছিস কেন?'

অর্জুন বলল—'এই যে আমি অর্জুন, অর্জুনের ওপরেই সমস্ত ভরসা ন্যস্ত করে সব কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করে যাচ্ছে। সব বিলুপ্ত। কোনওদিন ফিরবে না, বংশের সেই গৌরব সেই ধনসম্পদ সব ফিরিয়ে আনবে তাঁর অর্জুন, এইরকম একটা মানসিকতা লালন করে চলেছেন বলে জ্যেষ্ঠা মুখুজ্জে-গিন্নি কুন্তী। আর মেজকাকিকে কেন মাদ্রী ডাকি জানিস? আমার ধারণা মেজকাকিই মেজকাকার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ।

—'সে আবার কী?'

'হ্যাঁ, দা, হ্যাপলেস মার্ডারেস। তোর মনে আছে মেজকাকার মুসৌরি যাবার কথা বলেছিলাম!

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেখান থেকেই তো আর ফিরলেন না।'

—আমরা সকলেই ভেবেছিলাম অত্যাচার-অনিয়ম। ঠিকই ভেবেছিলাম। কাকা এবং কাকিমার দুজনেরই হয়তো মনে হয়েছিল একদিনের জন্যে হলেও বেঁচে নিই। অত্যাচার-অনিয়মের প্রকৃতিটা কী হতে পারে বলে তোর মনে হয়? মেজকাকার মাঝরাত্তিরে হঠাৎ হার্ট ফেল করেছিল। প্রোটিনহীন ডায়েট। দিনের পর দিন সুদ্ধু দুধ-ভাত। দুধ ভাত, দুধ-ভাত খেতেন। কোনও শারীরিক উত্তেজনার বিদ্যুৎ সহ্য করবার মতো ক্ষমতাই ছিল না মেজকাকার। মেজকাকি জানত। দুজনে প্ল্যান করেই গিয়েছিল। ফিরে এল ধবধবে সাদা থান পরে। ওখানেই শেষকৃত্য করে। জানত সব শেষ করতেই যাচ্ছে। কে জানে থানটাও হয়তো সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিল।'

তিতি শিউরে উঠে বলল—'কী বলছিস, চুপ কর অর্জাই?'

—'না রে, হয়ত মেজকাকা-কাকি একটা সন্তানের জন্য শেষ চেষ্টা করেছিল মুসৌরী-পাহাড়ে। একটা নকুল বা সহদেব। কিংবা ভাগ্যে থাকলে উভয়েই। ভাগ্য হল না। মেজকাকাকে আমি বলি বীরপুরুষ, মেজকাকিকে বীরাঙ্গনা। দেখে, ভেবে বিস্ময় লাগে, বড় বিস্ময়।'

এই সব কথা হচ্ছিল অর্জুনদের বাগানে বসে। বাগানে বড় বড় গাছ। নীচেটা ঝোপে-ঝাড়ে ভর্তি, কাঠ পিঁপড়ে আছে, কাঠবেড়ালি আছে। মেঠো ইঁদুর-টিঁদুরও আছে। কোথাও কোনও শ্রী-ছাঁদ নেই। আর আছে বাঁধানো চত্বর। পাড়ে বেঞ্চ। বসলে গঙ্গা দেখা যায় অদূরে। এই সব কারণেই

তিতির বাগানটা ভীষণ ভাল লেগেছে। এটা বাড়ির পেছনে। সামনে যেটুকু আছে সেখানে কিছুটা ঝাঁট পড়ে। ঘাস খুব বড় হয়ে গেলে বা লতার ঝাড় খুব ঝাঁপালো হয়ে গেলে লোক এনে কাটানো হয়। কিছু কিছু পুষ্পচর্চাও করেন মা-কাকিরা। কসমস, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা আছে। মাঝারি আকারের। গ্রীষ্মের ফুলগাছ আছে অনেক। কিন্তু পেছন দিকে সেই সব প্রাচীন গাছ-গাছালি যা হয়ত অর্জুনের প্রপিতামহ করে গিয়েছিলেন। সেই আদি বকুল, জামরুল, আম, ডালিম, বলরামচূড়া, সেই কলকে, দোলন চাঁপা। বাগানটার ওপর তিতির ঝোঁক দেখে অর্জুনের মা আবারও লজ্জিত হয়ে বললেন—'দ্যাখো না, অতখানি জায়গা—একটা মালি পাওয়া যায় না, কিছু না। বছরে একবার পুজোর আগে একটু পরিষ্কার করাই...।'

অর্জুন বলল—'মালি পাওয়া যায় না বলছ কেন মা। সোজাসুজি বলো রাখতে পারি না। অত আবার ঢাক-ঢাক কিসের?'

তিতি অর্জুনের কথায় কোনও কান না দিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল—'মাসি, বাগানটা কিছু কোরো না। প্লিজ এমনিই থাক। কেয়ারি-করা ফুলের বেড, গাদা গুচ্ছের সিজন-ফ্লাওয়ার, কৃত্রিম পুকুরে শালুক...

—'ওহ হরিব্‌ল্..আমার দুচোখের বিষ।'

মাসি অবাক হয়ে বললেন—'অদ্ভুত মেয়ে তো তুমি। সাজানো বাগান তোমার ভাল লাগে না?'

—'উহুঃ, সাজানো বাগান, সাজানো ঘর, সাজানো মানুষ, সাজানো জীবন, সাজানো কিছু না কিছু না।'

—'সাজানো জীবনও না?' মাসি কেমন করুণ গলায় বললেন, বলে চলে গেলেন।

—'মাসির মনে কি কষ্ট দিলাম?' তিতি একটু অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞেস করল। অর্জুন বললেন—'নাঃ। মা তো সাজানো জীবন পেয়েছিল, চেয়েছিল। তাই হয়ত খুব অবাক হয়ে গেছে।'

—'কিন্তু আমি সত্যি বলছি রে অর্জাই আমার সাজানো কিছু, মানে প্ল্যান্‌ড্ জিনিস ভাল লাগে না। অসহ্য লাগে। এম. এ. পাশ করব। বিয়ে হবে। মাপামাপি দুটো ছেলে মেয়ে হবে। বছরে একবার কি দুবার বেড়াতে যাব। ছেলেমেদের স্কুলে ভর্তির জন্য ছুটোছুটি করব, পড়তে বসাব, তারা বড় হবে...উঃ।'

—'তোর এমন কেন হবে?' অর্জুন বলল। 'তোর এম. এ পর্যন্ত পড়তে ইচ্ছে না হলে পড়বি না। প্রিন্স-টিন্স জাতীয় লোকের সঙ্গে মহা ধুমধাম করে বিয়ে হবে। একটা বাচ্চা হবে, আরেকটা দেখে-শুনে অ্যাডপ্ট করবি। বছরে একবার কেন, একশোবার বেড়াতে যাবি, বাইরে, মানে সমুদ্র পার। ...আর তোর ছেলে মেয়ের স্কুল? বি.বি রায়ের নাতি-নাতনির খুব সম্ভব ইংল্যান্ডেই স্কুলিং হবে। তাদের ভেকেশনের সময় তুই একলা একলা উড়ে যাবি। তোর প্রিন্স-বর ব্যস্ত থাকবে তো?

—'তারপর সিনিক দা গ্রেট?' তিতি মুখে খুব তেতো হাসি ফুটিয়ে বলল। অর্জুন বলল—'তারপর আবার কী? চক্রবৎ ঘুরতে থাকবে সব। এক সময়ে ফুটে যাবি। প্রচুর মালা-ফালা দিয়ে নিমতলায় নিয়ে যাবে। তোর নাতিপুতি ঘটা করে শ্রাদ্ধ করতে করতে মনে মনে বলবে—'বুড়ি অ্যাদ্দিনে কাটল।'

তিতি বলল—'আজ্ঞে না।'

—'কোনটা না?'

—'কোনওটাই না। লাইফ হবে আনপ্রেডিকটেব্‌ল্। এইরকম ছকের জীবন তোর হোক, আমার নয়।'

—'আমার ছক গোড়াতেই উল্টে গেছে। তো সে কথা থাক। তোর লাইফ কী রকম হবে? শুনি?'

—'বললাম তো আনপ্রেডিকটেব্‌ল্। আগে থেকে কিছু বলা যাবে না। ধর আজ-কাল-পরশুর মধ্যেই একটা হলিডে-করতে আসা ফরাসি কি বেলজিয়াম্ কি নরওয়েজিয়ানের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। ধর মাস তিনেকের মধ্যে তাকে বিয়ে করে ফেললুম। তারপর চলে গেলুম তার সঙ্গে প্যারিস,

কি ব্রাসেলস কি অসলো। লোকটা আসলে চিট, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলেই একটা বিয়ে করে রেখেছিল। একদিন সেই মেয়েটা এসে ধুন্ধুমার ঝগড়া করল। সাহেবটাকে ছেড়ে সেই মেয়েটার সঙ্গে বাস করতে লাগলুম...'

—'থাম থাম, তুই একটা আস্ত পাগল। কোনও ম্যাচিওরিটিই হয়নি। বার্বারা কার্টল্যান্ড পড়ে পড়ে বড় হয়েছিস না কি?'

—'বারবারা কার্টল্যান্ডে তো গরিব সুন্দরী মেয়েরা দারুণ জমকালো সব রাজপুত্তুর, কর্নেল-ফর্নেলের সঙ্গে প্রেম করে, তাদের অবস্থা ফিরে যায়।

—'তাই বুঝি। আমি কখনও পড়ে দেখি নি। তা তুই কি উল্টোরকম চাইছিস?'

—'না ধর' এখন তিতি উত্তেজিত হয়ে গেছে, 'ধর। আমার বাবাই বিয়ে দিল। তারপর কয়েকদিন, কি মাস, কি বছর পরে বরটা দুম করে মরে গেল। কিংবা ধর বাচ্চাটা হারিয়ে গেল।...'

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে বুঝে নিয়েছি, আর বলতে হবে না'...অর্জুন বলল।

—'কী বুঝলি?'

—'বারবারা কার্টল্যান্ড নয়। তুই হিন্দি ফিলম্ দেখে বড় হয়েছিস। তোর বাচ্চাটা হারিয়ে গেলে কী হয়, অবিকল তোর বরের মতো দেখতে হবে। একদিন তোর বাড়িতে ডাকাতি করতে আসবে। দেখেই চিনতে পারবি "মেরা লাল, মেরা লাল" করে কেঁদে দুনিয়া ভাসিয়ে দিবি—এইরকম ডাবল রোল খুব চলে।

—'ধুস—আমি হিন্দি ছবি দেখিই না।' তিতি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে।

—'দিবারাত্র দেখাচ্ছে। তোর ঘরে বসে দেখতে পাচ্ছিস। দেখি না বললেই বিশ্বাস করব?'

—'করিস না,' তিতি বলল, 'আসলে আমার কিছু ভাল লাগে না। সব কিছু এত একঘেয়ে, বিরক্তিকর। এমন নয় যে আমি সব সময়ে খুব উত্তেজনা চাইছি। একেবারেই না। কিন্তু আমার পরিচয় কী? চারপাশে যা যা ঘটে যাচ্ছে সেই রুটিন ঘটনা প্রবাহের মধ্যে আমার বিশেষ কী কাজ? আমি কেন? নাঃ আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। ...তিতি থেমে গেল। অর্জুন বলল,

—'তা, তোরও তো আমারই মতে অবস্থা।'

—'না। তোর মতো নয়।' তিতি প্রতিবাদ করে উঠল, 'তোর থেকে আমি কিছু গ্রহণ করতে পারি. কিন্তু আমার ভেতরে যে মৌলিক খিদেটা আছে সেটা অন্য, অন্যরকম।'

অর্জুন বলল—'তাহলে আর কিছুই না, তুই একধরনের রোম্যান্টিক।'

—'দ্যাখ অর্জাই। লেবেল সাঁটাটা বন্ধ কর। একটু আগেই বলছিলি না—জড় একটা কনসেপ্ট। ওইভাবে ভেবে আসছি, তাই ভাবি। যে একথা বলে সে আবার কোন মুখে লেবেল নিয়ে আঠা হাতে ঘোরে রে?'

'ঠিক আছে। আঠা ফেলে দিচ্ছি। লেবেলগুলো এই কুচি কুচি করলাম। আমার আত্মখণ্ডনদোষ দেখিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ।'

ছোটকাকি নিজের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে ওদের ডাকলেন। ওরা উঠে পড়ল। চা খাবার সময় হয়েছে। খিড়কি দরজার কাছাকাছি এসে তিতি চুপি চুপি বলল—'একদম ভুলে গিয়েছিলাম। ছোটকাকিকে গান্ধারী বলিস কেন রে?'

অর্জুন হেসে ফেলে বলল—'বলি প্রধানত দুজন কুন্তী-মাদ্রী হলে একজনকে গান্ধারী হতেই হয় বলে। তবে কোথাও কোথাও গান্ধারীর সঙ্গে মিল আছে। নিজের চোখ দুটো যেন বেঁধে রেখেছে। ছোটকাকা যা যা বলে দিয়েছে ঠিক তাই তাই করে যাচ্ছে। ছোটকাকা বলেছে পাড়-অলা শাড়ি পরবে, তাই পরে। ছোটকাকা বলে দিয়েছে মাছ খাবে, তাই মাছ খায়। ডিম-মাংস খায় না। ছোটকাকা বলে গেছে...নিজের অংশ অর্জুনকে লিখে দেবে। তো তাই দিয়ে রেখেছে। ছোটকাকার নির্দেশের অর্থ যে বৈধব্যের নিয়ম কানুন পালন না করা, সেটা কাকি বুঝতে পারেনি।'

—'কিন্তু গান্ধারী তো এ রকম ছিলেন না। খুব ব্যক্তিত্বশালিনী ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধনকে খুব বকা-ঝকা করতেন! কৃষ্ণকে শাপ দিয়েছিলেন।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ আমার গান্ধারী তেমন নয়। কিন্তু ব্যক্তিত্ব আছে। সেটাকে ছোটকাকার ব্যক্তিত্বের তলায় ইচ্ছাকৃতভাবে চাপা দিয়ে রেখেছে। ওইটুকুতেই কাকির গান্ধারীত্ব। বেশ কিছুদিন বাস করলেই টের পাবি।

এখন তিতি দু নম্বর বাসের দোতলায় উঠছে। উঠছে বেশ মেপে মেপে। দৌড়ঝাঁপ করে নয়। অর্জুনও সুতরাং পেরে যাচ্ছে তার পেছন পেছন উঠতে। অর্জুনের ঘড়িতে এখন প্রায় আড়াইটে। দু নম্বরের দোতলা প্রায় ফাঁকাই। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বসল তিতি। পাশে অর্জুন বসে পড়ল। কেউই কিছু বলছে না। কিছুক্ষণ পর অর্জুন আর থাকতে পারল না। বলল—'বিজনেস ম্যাগনেটের মেয়ে যে কেন সরকারি বাসে চড়ে কলকেতা দেখতে যায় বুঝি না।'

তিতি কিছু বলল না।

—'বিজনেস ম্যাগনেট নিজে, অথবা তাঁর সমাজসেবিনী স্ত্রী, অথবা তাঁদের সাহেব যুবরাজ যদি দেখে ফেলেন মেম রাজকুমারী গরিব-গুরবো আত্মীয়র ছেলের সঙ্গে এক সিটে বসে সাত পায়েরও বেশি চলে যাচ্ছে, তবে কী হবে?'

তিতি তখনও কিছু বলছে না।

অর্জুন বলল—'বি. বি. রায় অবশ্য চিনতেই পারবেন না আত্মীয় বলে। শুধু দরিদ্র কুমার বলে উদ্বিগ্ন হবেন। আর সমাজসেবিনী তনুদেবী? তিনিও...তিনি চিনেও চিনবেন না। যেমন সাধারণত করে থাকেন। যেমন করাটা কেতা। আর প্রিন্স যুবরাজ!'

এসব কথা অর্জুন প্রায়ই তিতিকে বলে। বি. বি. রায় তার বাবা যে আত্মীয়স্বজনদের কারও সঙ্গে মেলামেশা করেন না। কারুর জন্য কিছু করেন না। কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটিও নাড়েন না কারও জন্য, এক কথা অর্জুন আগেও বলেছে। অর্জুনের বাবা যখন মারা গেলেন বি. বি. রায়-তনুশ্রী রায়ের নামে একটা অতিকায় সাদা পদ্মের রীদ এসেছিল। শ্রাদ্ধের দিনও এঁরা কেউ আসতে পারেননি। আর তার বাবার অসুখের খবর শুনে দীর্ঘদিন পরে তনুশ্রী রায় যে 'গেট-ওয়েল' কার্ডটা পাঠিয়েছিলেন, সেটা শ্রাদ্ধের দিনই এসে পৌঁছেছিল। তার দাদা যে কলকাতায় যাচ্ছেতাই সব জয়েন্টে যায়, এই বয়সেই সর্বক্ষণ ট্যাকে মেয়ে নিয়ে ঘোরে, তাদের কিছু কিছু যে অন্তত ভাড়া-করা বান্ধবী এ কথাও তিতি অর্জুনের কাছ থেকে শুনেছে। শুনেছে মুখ নিচু করে, কখনও প্রতিবাদ করেনি, কারুর সাফাই গাইবার চেষ্টা করেনি। এমনকি মায়ের পুরুষ-বন্ধু নিয়ে ঘোরার ব্যাপারটাও অর্জুন তাকে তার স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গের সঙ্গে শুনিয়েছে। তিতি শুধু মায়ের ব্যাপারেই একবার মাত্র বলেছি—'নব্বুইয়ের কলকাতায় বসে পুরুষদের সঙ্গে মেলা-মেশা বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করছিস না কি?'

উত্তরে অর্জুন বলেছিল—'দুর আমি অতটা অনাধুনিক না। তবে মিসেস রায় আবার বন্ধুদের বুকের ওপর ঘুমিয়ে পড়েন কিনা! আমি আবার মিউজিক কনফারেন্সে নিয়মিত যাবার নেশাটা করে ফেলেছি। তাই এ সব দৃশ্য দেখতে হয়।'

তিতি আর কিছু বলেনি।

অর্জুন আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল। তিতি হঠাৎ মৃদুস্বরে বলে উঠল—'আমি কিন্তু তোমাকে ঠিক ডাকিনি অর্জুন।'

—'তা হলে গোপা কেমিস্ট্রি ল্যাবের সামনে গিয়ে আওয়াজ মারছিল কেন?'

—'আমার নির্দেশে নয়। তবে আমার একটা ক্ষীণ ধারণা হয়েছিল, একজন বন্ধুর সঙ্গ এই সময়ে আমার ভাল লাগবে। সহানুভূতি চাইছি না, কিন্তু সমালোচনাও চাইছি না। ভাল লাগছে না। তুমি নেমে যেতে পারো অর্জুন।'

তিতি জিতে গেছে আজকে। অর্জুন একেবারে বোল্ড। ইয়র্কার ছিল বুঝতে পারেনি। সমানে ঝাঁটা টেনে যাচ্ছিল। টেনে যাচ্ছিল। এমন সময়ে ইয়র্কার। কিন্তু বোল্ড হয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল অর্জুন। —'তিতি, কী হয়েছে রে?'

—'বি. বি. রায় আজ সাতদিন হল নিরুদ্দেশ। চিঠি নেই। পত্র নেই। কোথাও কোনও হদিশ নেই। শেষ রাত্তিরে দুটো সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। দাদার ধারণা ওতে বহু টাকা ছিল, কোনও অ্যান্টি-সোশ্যাল গ্রুপ চেয়েছিল। টাকাটাও নিয়েছে, বাবাকেও...।' তিতি ঘাড়টা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

।। ৭ ।।

সাত-আট দিন হয়ে গেল অথচ হারানো-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ কলমে নিজের ছবি ইত্যাদি ইত্যাদি কোনও কাগজেই না দেখে খুবই বিস্মিত হলেন বিজু রায়। টিভি দেখবার সুযোগ অবশ্য পাননি। কিন্তু এতদিনে তাঁর যেটুকু গোঁফ দাড়ি বেরিয়েছে, তাদের সযত্নে ট্রিম করছেন তিনি। চোখেও কালো চশমা এঁটে বেরোন। তবু একটা অস্বস্তির কাঁটা বিঁধে থাকে। তিনি কয়েকটা রেডিমেড পায়জামা-পাঞ্জাবি, জহর কোট কিনে নিয়েছেন, একটা আলোয়ানও। এই বেশ তাঁর অনভ্যস্ত। বলতে গেলে এই বেশে তাঁর স্ত্রী ছাড়া বড় কেউ একটা দেখেনি তাঁকে, তা গত কুড়ি বছর তো হলই। সকালে এক কাপ চা খাবার পরই চান-টান করে, দাড়ি কামিয়ে একেবারে ফুলহাতা শার্ট এবং ট্রাউজার্স পরে ফেলেন তিনি। অফিসে যাবার সময়ে এর ওপরেই চাপে কোট, টাই। গরমকালে হয়তো ফুলহাতার জায়গায় হাফ হাতা। একেবারে শোবার আগে, চান সেরে তবে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেন। ভোরবেলা চা দিতে এসে বদন বা প্রমীলা এ বেশে দেখে থাকতে পারে। বাস্। কাজেই এখন বেশ কদিনের না কামানো দাড়ি গোঁফ ট্রিম করে, পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর আলোয়ানটা ভাল করে মুড়ি দিয়ে ঘোরাফেরা করলে তেমন ভয় কিছু নেই। তবে সন্ধ্যা হলে আর সানগ্লাসটা পরতে পারেন না।

দিদিকে দাহ করে ফিরতে অনেক দেরি হল। দিদির দেহ আর সুখচরে নিয়ে যাবার হাঙ্গামা করেননি। তবুও। রত্না একাই এসেছিল। সে-ও সুখচরে দেহ নিয়ে যাবার কথা বলেনি। সুখচরের আপাত-পরিত্যক্ত বাড়িতে এখনও খুব সম্ভব শাঁটুল বাস করছে। গোপন। এটাই বাস্তব অসুবিধে। বলতে গেলে যে ছেলের হাত থেকে শেষ পাথেয় নেবার কথা দিদির, সেই ছেলের জন্যেই দিদি নিজের বাস্তুতে ফিরতে পারল না। দিদির বোধহয় ফেরবার ইচ্ছেও ছিল না। লিভারের ক্যানসার এমনই ভয়ানক রোগ, যে তা মানুষকে নিশ্চিতভাবে ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রেম-অপ্রেম, আসক্তি-সংস্কার সমস্ত কিছুর বাইরে নিয়ে যায়। হাসপাতালে ভর্তি হবার পর দিদির চোখের দৃষ্টিতে সেই চরম ঔদাসীন্য দেখেছিলেন তিনি। যখন শাঁটুলের ফেরবার খবর রত্না ফিসফিস করে জানাল, তখনও কোনও ভাবান্তর দেখেননি। দিদি, জড়বুদ্ধি বড়দার পরে বিজু রায়র প্রথম রক্তের সম্পর্ক, মায়ের পেটের রক্তের পোম আপন বলতে তিনটি বোন, তা সেই প্রথম সম্পর্ক এখন মহাপৃথিবীর মাটিতে, জলে, হাওয়ায় মিশে গেল। তিনি ডেকেছিলেন, মেসের পরিচিতদের। মণিময়, নিতাই ভট্টাচার্য চাঁদু মিত্তির প্রতুল বিশ্বাস বলে আরও একটি যুবক এবং কিছু বয়স্ক মানুষও তাঁর সঙ্গে নিমতলার শ্মশানঘাটে গেলেন। মণিময় বলল—'দিদির অসুখের খবর শুনেই তা হলে আপনি এসেছিলেন বিজনদা!' খানিকটা ভাবুক স্বরে, 'হুঁ', দিয়ে বিজন দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এইভাবে শোককাতরতার ভান করতে তাঁর খারাপ লাগছিল। তবে শোককাতর না হলেও এক ধরনের দার্শনিক ভাবুকতা তো তখন তাঁকে পেয়েই বসেছিল! তিনি তো গঙ্গার জলরেখার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেনই। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু শুরু হয়। ভাই-বোনেদের মৃত্যু দিয়ে সেই মৃত্যুর পদক্ষেপ আরও দৃঢ় হয়। মৃত্যুর কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেল তাঁর জীবনে। এখন

জীবনটাকে বুঝে নিতে হবে। অবশ্য কতটুকুই যা জীবনের দেখেছেন তিনি। বোঝবার ক্ষমতাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবু! যতটুকু পারা যায়।

এই সময়ে রত্না এসে তাঁকে ডাকল। একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল—'মামাবাবু, মায়ের বাপের বাড়ির কাউকে কি খবর দেওয়া উচিত?'

তখন বিজু রায়ের মনে পড়ে গেল যতক্ষণ অসুখ ছিল, চিকিৎসা ছিল ততক্ষণ দিদি ব্যক্তি, তিনি ব্যক্তি, রত্নাও একজন ব্যক্তি। যে যা পেরেছে, করেছে। কিন্তু মৃত্যু হওয়ামাত্র সমস্ত ব্যাপারটা সমাজের হাতে চলে গেল। এখন কাকে খবর দেওয়া হল আর কাকে হল না—এ সমস্ত ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তিনি খুব ভাবনায় পড়ে গেলেন। মুখাগ্নি তিনি করেছেন। ছেলের অনুপস্থিতিতে শ্রাদ্ধকর্ম তাঁর করার কথা। কিন্তু এখন চতুর্দিকে যদি শ্রাদ্ধবার্তা রটে যায় তা হলে তো তিনি তাঁর কাজ শেষ হবার আগে ফিরে যেতে বাধ্য হবেন।

একটু ভেবে তিনি বললেন—'দিদির শ্বশুরবাড়ির দিকেও তো কারও কারও থাকবার কথা!'

রত্না বলল, 'আমার দুই ননদ আছে, তাদের তো খবর দিতে হবেই। আর কেউ আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। খুড়ো শ্বশুরের পরিবার কাছেই ব্যারাকপুরে থাকে, কখনও খোঁজ খবর নেয় না।'

—'সে কি তোমার মামারাই কেউ নেয়।'

—'ওই বিয়ে-থাতে কার্ড আসে, মাঝেমধ্যে চিঠি আসে।'

বিজু বললেন, 'এক কাজ করো, তোমার ননদদের চিঠি দাও। আর সুখচরের বাড়িতেই কাজের আয়োজন করো। গুড্ডু কাজ করুক। পাঁচের ওপর বয়স তো হয়েছে। আমি কাগজে একটা খবর দিয়ে দিচ্ছি। ছেলে যে কালে বেপাত্তা, অত কার্ড-টার্ড করার তো কিছু নেই।'

—'ওর কথাটা ভাবলেন কিছু? মামাবাবু?'

—'ভাবছি, আরও কিছুদিন সময় দাও রত্না।'

মণিময়রা আগেই ফিরে গিয়েছিল। তিনি অস্থি না নিয়ে ফিরতে পারছিলেন না। ওরা থাকবে বলেছিল, কিন্তু পরদিন সবাইকারই অফিস। তিনি জোর করেই ওদের পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর ফিরতে এগারোটা হল।

হরিহর বসে বসে ঝিমোচ্ছিল সম্ভবত। দরজা খুলে দিল। বিজু সিঁড়ির ওপর বেশ খানিকটা উঠে গেছেন, হরিহর হঠাৎ চাপা গলায় ডাকল, 'বাবু!'

বিজু ঘুরে দাঁড়ালেন। হরিহর বলল—'সাইমন সন্ধেবেলায় এসেছিল। এই প্যাকেটটা দিয়ে গেছে।' একটা পাতলা প্যাকেট ব্রাউন পেপারে মোড়া, সে বিজু রায়ের হাতে তুলে দিল। তারপর নিজের জায়গায় আবার ফিরে গেল। এবার বোধহয় নিশ্চিন্তে ঘুমোবে।

বিজু গঙ্গা থেকে চান করে এসেছিলেন। ঘরে গিয়ে আবারও হাত পা ধুলেন। জামাকাপড় বদলালেন। তারপরে শোবার ঠিক আগে প্যাকেটটা খুলে ফেলেন। একটা বড় চৌকো ব্রাউন পেপারের খাম, দুদিকে স্টেপল করে আটকানো। ভেতরে একটা সানডে পত্রিকা। এরই জন্য এত? সানডেটো বেশ পুরনো। কত পুরনো দেখবার জন্যই তুলতেই ভেতর থেকে ঠক করে একটা লম্বা ব্রাউন পেপারের খাম পড়ল। খামটা হাতে করেই বিজু রায় বুঝতে পারলেন এর মধ্যে টাকা আছে। সাবধানে মুখটা ছিঁড়ে ফেলে দেখলেন একগোছা বেশ নতুন নোট। গুনতে লাগলেন। একশ টাকার পাঁচশটা নোট। অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার। বারে মজা! নলিনী কর যখন পঞ্চভূতে মিলিয়ে গিয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে, ঠিক তখনই তার কাছে 'সানডে'র প্যাকেটে পঞ্চাশ হাজার টাকাটা দিয়ে গেল সাইমন? 'পঞ্চাশ হাজার' এই পরিমাণটা তাঁর মাথার মধ্যে টরে টক্কা টক্কা টরে করে কী যেন বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু বিজু রায় এতই অবাক এবং এতই ক্লান্ত যে কিছুতেই সে সংকেত উদ্ধার করতে পারলেন না। নলিনী করের বোতল থেকে এক পেগের মতো হুইস্কি খেলেন তিনি জলে মিশিয়ে। খেয়ে কেমন একটা অপরাধবোধ হল। আপন মনেই বললেন 'শোধ দিয়ে দেব।' পরক্ষণেই নিজের মনে

হেসে উঠলেন, কাকে শোধ দেবেন? নলিনী করের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। পঞ্চাশ হাজার টাকার প্যাকেট বালিশের নীচে।

বেশ ভোরবেলা। তখনই ভাল করে মানুষজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, এমন সময়ে দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে একটা মিহি বালিকা-কণ্ঠের ডাক ক্রমাগত ডেকে যাওয়া পাখির নাছোড়বান্দা ডাকের মতো তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিল। —'ও দাদু, ও দাদু, ও টগুদাদুর বন্ধু; ও দাদু, ও দাদু!' তিনি গা থেকে চাদরটা খুলে দক্ষিণের জানলায় দাঁড়ালেন, ও দিকের ছাদে মণিদীপিকার ছোট্ট মুণ্ডু দেখা যাচ্ছে। ও তাঁকে দেখতে পেয়েছে। —'একবার এদিকে এসো না, ও দাদু!' ব্যস, হঠাৎ তাঁর মস্তিষ্ক কম্পিউটারের মতো দক্ষতায় টরে টক্কা সংকেতের মর্ম উদ্ধার করে দিল। 'পাত্তি টু পাত্তি চান্স নিতে হবে একবার। জিতলে পঞ্চাশ। হারলে পাঁচ। কুছ পরোয়া নেই। জীবন জুয়ায় অমৃত বা বিষ যা উঠল তা আমার। লক্ষ্মী যদি ওঠে তো সে দাদু পাবে।' পঞ্চাশ মানে তা হলে পঞ্চাশ হাজার! তিনি চেঁচিয়ে বললেন—'আসছি।' কলঘরে গিয়ে চোখে মুখে ভাল করে জলের ঝাপটা দিতে চোখে যেন ছুঁচ ফুটতে লাগল। আরেকটু ঘুম তাঁর শরীরের প্রাপ্য ছিল বোধহয়। পাঁচিলের ধারে গিয়ে তিনি দেখলেন, অল্প কুয়াশায় শুধু মণিদীপিকাই নয়, অদূরে ভাল করে চাদর দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা একটি মেয়েও রয়েছে।

মণিদীপিকা বলল—'ও মা, ও মা, এই তো টগুদাদুর বন্ধু। বলো, বলো না কথাটা!'

মেয়েটি একটু সংকোচের সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল,—'আমি আপনার নাম-টাম কিছুই জানি না। কী বলব ভেবে পাচ্ছি না। আজ মণির জন্মদিন। প্রত্যেক বছর এই দিনে উনি মানে নলিনীকাকা আমাদের বাড়িতে খেতেন। উনি মণিকে ভীষণ ভালবাসতেন। আপনি, মানে আপনি কি আসবেন?'

বিজু রায় দেখলেন মেয়েটি নেহাতই অল্পবয়সী। রত্নার চেয়েও। কিংবা হয়তো অপুষ্টির জন্যে এমন দেখাচ্ছে। খুবই রোগা পাতলা। ভিতু-ভিতু মুখ। মুখের আদলটা যেন মণিদীপিকারই মতো। এই ভোর-কুয়াশায় মেয়েটির চোখে জল দেখতে পেলেন তিনি। '—উনি আসতেন।' ঠাণ্ডা হাওয়ার মতো আবার মেয়েটির গলার স্বর ছুঁয়ে গেল তাঁকে। তিনি বললেন—'নিশ্চয়ই আসব। কখন যেতে হবে?' শেষ কথাগুলো তিনি বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে বললেন। সে বলে উঠল—'আমি আর তুমি এগারোটার সময়ে লাল পায়েস খাবো। আর যদি টগুদাদু এসে পড়ে, তো বলব আড়ি, আড়ি, আড়ি।' মণিদীপিকা তার বুড়ো আঙুল তুলে দেখাতে লাগল। কবেকার খেলা এ সব? বিজু রায়ের মনের ভেতরটা যেন ঝনঝন করে নড়ে উঠল। পুরনো দরজা জানলা। জানলার শিক, দরজার শেকল সব ঝনঝন করছে। আড়ি, আড়ি, আড়ি, ভাব ভাব ভাব। এই রকমই কচি একফোঁটা আঙুল, দোপাটির মতো নরম গাল, ঠোঁট, নাক, কপাল। ছেলেবেলায় তাঁদের এমনি আড়ি-ভাব ছিল বড্ড। তিনি ডিসেম্বরের ফিকে হতে থাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন—'ছুটকি তুই কোথায়? আমি যে কিছুতেই তোকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

মাঝে মাঝে ছোটদের সবাইকে নিয়ে লুকোচুরি খেলা হত। বিজু ছোটখোকা চোখ বুজলেই সব দুদ্দাড় করে লুকোতে ছুটত। লুকানোর চোটে মায়ের ভাঁড়ারঘর শোবার ঘরের খাটের তলা সব উস্তম খুস্তম হয়ে যেত। এক এক করে সব কটাকে টেনে টেনে বার করতে পারত বিজু। ভোঁদড়, রাজা, নীলি, পল্টু, শোভা, মিনু সব, স-ব। কিন্তু এক এক দিন ছুটকিকে কিছুতেই খুঁজে পেত না। অবশেষে সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসত। খেলুড়িরা আর দেরি করতে চাইত না। সব যে যার বাড়ি চলে যেত। অন্ধকার ছাদে দাঁড়িয়ে বিজু ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলত। —'ছুটকি, তুই কোথায়?' সে যেন আর কোনও দিনই ছুটকিকে খুঁজে পাবে না। ছুটকি চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। লুকোতে গিয়ে সে পৃথিবীর আস্তরগুলো সরাতে সরাতে এমন জায়গায় চলে গেছে যেখান থেকে আর ফিরে

আসা যায় না। রুদ্ধ কান্না ক্রমে চড়া আওয়াজে পৌঁছত। তারপর একসময়ে হঠাৎ পেছন থেকে চোখ টিপে ধরত ছুটকি।

—'দূর পাগল—এই তো আমি!'

—'কোথায় ছিলি?'

—'সে আমার লুকানো জায়গা, বলব কেন রে?'

—'তা হলে আর তোর সঙ্গে কোনওদিন খেলব না।'

—'খেলিসনি। কিন্তু সে জায়গাটা আমি কক্ষনো, কাউকে বলব না।'

—'কেন?'

—'তোরা জেনে গেলেই তো খুঁজে বার করবি। তখন? জিততে পারব?'

ছুটকি তুই তোর গোপন জায়গাটার কথা আমাকে কোনও দিনও বললি না। জেতার নেশায় না কিসের নেশায়, তা জানি না। কিন্তু এমন লুকোন লুকোলি যে সত্যিই তোকে আর কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারলুম না। দ্যাখ ছুটকি, এখন খেলা ভাঙার খেলা শুরু হয়ে গেছে, সবাই যে যার বাড়ি চলে যাচ্ছে। কার কাছে জিতবি আর? শুকনো চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিজু রায়। সান্ত্বনাহীন।

—'বাবু, চা!' হরিহর। তার গায়ে আজকে একটা পাঁশুটে রঙের চাদর উঠেছে। অধোবাস সেই এক। ঝলঝলে ইজেরের ওপর গামছা। হরিহর তাঁর খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে। কেন কে জানে! নলিনী করের পোশাক পরিচ্ছদগুলো তিনি হরিহরকে দিয়ে দিয়েছেন। জামেয়ারটা বাদে। জামেয়ারটাও দেবেন। কিন্তু কদিন বাদে। এ সব পুরনো জিনিসের অনেক দাম পাওয়া যায়। জিনিসটা তো হরিহর কোনও দিন গায়ে দিতে পারবে না। তিনি জিনিসটা যথাস্থানে বিক্রি করে দামটা হরিহরকে দেবেন, ঠিক করেছেন। বলেই করবেন।

পাঁশুটে রঙের চাদরটা দেখিয়ে হরিহর বলল—'আপনার টাকা দিয়ে কিনলুম বাবু!' তার মুখে অনাবিল হাসি। নলিনী করের এই লোকটির কাছে অনেক ধার ছিল, শোধ করতে পারেনি। প্রধানত সেই কথা মনে করেই তিনি একে এই কদিনেই বেশ কিছু টাকা দিয়েছেন। হরিহর সেগুলোকে কাজে লাগিয়েছে দেখা যাচ্ছে। তিনি ভোরবেলায় বেড-টি খান, সেটা জানিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা করেছে হরিহর। যেসব বড় হোটেলে কাজকর্ম উপলক্ষে তাঁকে উঠতে হয়, সেখানে সার্ভিস চার্জ ছাড়াও কতজনকে কত টাকা বকশিশ দিতে হয়, যে সেবার দাম চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তার জন্যেও। বেড-টি, নলিনী করের জীবন রহস্যের উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রয়োজনীয় কলকাঠি নাড়াতে সাহায্য করা এগুলো তো হরিহরের নিত্যসেবার মধ্যে পড়ে না, তাকে কিছু দেওয়াই তাঁর উচিত। এইভাবেই তিনি বোঝেন জিনিসটা। কিন্তু হরিহর কখনও এ ভাবে পায়নি। সে ভাবে সে উপরি পাচ্ছে। তাই তার ভক্তিটা ক্রমশই গাঢ়তর হচ্ছে।

হরিহর যখন চা-পাউরুটি দিতে এল তিনি নেমন্তন্নর কথাটা জানালেন হরিহরকে। আজকে নো মিল। এ বেলায়। চান-টান করে একটু বাজারের দিকে বেরোলেন তিনি। ক্যাডবেরি কিনলেন কয়েকটা। কিন্তু মণিদীপিকার যে দাঁতে পোকা! তা ছাড়া তিনি দুদিনের জন্য এসে তাকে ক্যাডবেরির স্বাদ চিনিয়ে দিয়ে চলে যাবেন। তারপর সে যদি রোজ রোজ বায়না করে? কয়েকটা ক্যাডবেরি কিনতে এত ভাবনা তাঁকে কখনও করতে হয়নি। তিনি নিউ মার্কেটে চলে গেলেন। একটা ঠিক মাপসই ফ্রক কিনতে হলে তাঁকে মাপটাও বলতে হয়। কিন্তু দোকানদারের কোনও প্রশ্নেরই তিনি জবাব দিতে পারলেন না। কত বছরের মেয়ে? কত বয়স মণিদীপিকার? সাতের কম। তার এখনও দুধে-দাঁত পড়েনি। হাত দিয়ে মেপে-মেপে অনেক কষ্টে একটা পছন্দ করলেন। গোলাপি রঙের ফ্রক তাতে সাদা লেস দেওয়া, ডোনাল্ড ডাক বসানো ঘেরের ওপর। তাঁর আরও কিনতে হচ্ছে করছিল, কিন্তু আবারও তাঁকে ভাবতে হল। নিজের হাতে বাচ্চাদের ফ্রক কেনা তিনি বোধহয় জীবনে এই প্রথম

করলেন। তাঁর ছেলেমেয়ের পোশাক-আশাক তনুশ্রীই কিনেছে বরাবর। চকলেটও তিনি কমই কিনেছেন। বিশেষত তাঁর ছেলেমেয়ের, অন্তত ছেলের কথা তো মনে পড়ছেই, খুব দ্রুত চকলেটে অরুচি এসে গিয়েছিল। পছন্দের জন্যে দোকানদারের ওপরই নির্ভর করলেন তিনি। ফ্রকটা সত্যিই খুব সুন্দর। এক গোছা গোলাপফুলের মতো। এটা ওই রোগা কচি মেয়েটাকে উপহার দিতে ভাল লাগবে তাঁর। ও খুব খুশি হবে। ওর মা নিশ্চয়ই আরও খুশি হবে। বস্তুর মূল্য বড়রা ছোটদের চেয়ে অনেক ভাল বোঝে।

দোকানি ভাল করে বাক্সের মধ্যে জামাটা ভরে প্যাক করে দিতে, সেটা হাতে নিয়ে বেরোবার সময়ে বিজু রায়ের হঠাৎ খেয়াল হল তিনি এখনও ভাবছেন এই ফ্রকটা উপহার পেয়ে মণিদীপিকা বেশি খুশি হবে না তার মা। সচেতন হবার পর তাঁর বড় লজ্জা হল একটি শিশুকে এই দামি ফ্রক উপহার দিতে গিয়ে এত চিন্তা তিনি করছেন কেন? এর চেয়েও দামি উপহার তাঁর ব্যবসা-বন্ধুদের ছেলে-মেয়ে বা নাতি-নাতনিকে দেবার সময়ে তো এ সব কথা মনে আসেনি! বিজু রায় আবিষ্কার করলেন তিনি মণিদীপিকা এবং তার মাকে দয়া করছেন। এবং সবচেয়ে খুশি হচ্ছে মণিদীপিকাও নয়, তার মা-ও নয়। তিনি নিজে। ওটা একটা সাড়ে তিনশো টাকা দামের ফ্রকের প্যাকেট নয়। তাঁর দম্ভের প্যাকেট। দম্ভটাকে সুন্দর মোড়কে সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে তাকে চেনা না যায়। ব্যাপারটা আবিষ্কার করে তিনি বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। এবং এইরকম বিষণ্ণ হয়েই মণিদীপিকাদের বাড়ি ঢুকলেন।

বাড়িটার একতলায় একটা প্রেস। ময়লা, ঝুল, পানের পিকে ভর্তি একটা সরু প্যাসেজ পার হয়ে, একই রকম নোংরা সিঁড়ি। দোতলায় উঠে তিনি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, ডানদিকের একটা ঘরের কপাট খুলে মণিদীপিকার মা বেরিয়ে এল। —'আসুন কাকাবাবু এদিকে।'

রক্তহীন ফর্সা বউটি। সিঁথির সিঁদুরটা কপালেরও খানিকটা অবধি নেমে এসেছে। কপালে একটা সিঁদুরের টিপ। ডুবে শাড়ি পরা, মাথায় ঘোমটা, পানপাতার মতো মুখ, স্বাস্থ্যহীন এইরকম নারীরা এখনও, এ যুগেও আছে? বিজু রায়ের মনে হল তাঁকে যেন কে বা কারা ষড়যন্ত্র করে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অনেক দিন আগে। এখন জানেন সেটা ছিল দুর্ভিক্ষের বছর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। চারিদিকে, এ বাড়ি ও বাড়ি তিনি এইরকম নারী, অনেক এ রকম মা, দিদি, বউদি, মাসি-পিসিদের দেখেছিলেন। দলে দলে ভিখারি আসত। তাদের কঙ্কালের মতো চেহারা, মেয়েদের খোলা গায়ে ন্যাতানো মাছের পটকার মতো বুক, কোটরাগত চোখ পাঁজরাসার শিশু, মায়ের বুকের বোঁটা প্রাণপণে আঁকড়ে আছে। সেই হাহাকারের সামনে এইরকম শান্ত, নিরুপায়, অসুস্থ নারীরা, হাতে শাঁখা, ছেঁড়া কাপড়ের আঁচল মাথায় তুলে দিচ্ছে। এনামেলের কাঁসিতে করে ফ্যান ঢেলে দিচ্ছে। তিনি দেখেছেন। দেখেছিলেন। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন। এখন তিনি যেখানে ঘোরাফেরা করেন, সেখানে মেয়েরা টেনিস বল বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেলুন থেকে নিখুঁত করে তুলে আসে সমস্ত দাগ। টানা ভুরু, আঁকা চোখ, সাটিন-কোমল ত্বকের মেয়েরা সব—ট্রাউজার বা সালোয়ার কামিজ, কদাচিৎ শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়। এই রকম রং, ফর্সা হলেও সেখানে অচল, এই পানপাতা মুখ কেউ ফিরেও দেখবে না। কিন্তু বিজু দেখলেন। ভাবলেন দুর্ভিক্ষ এখনও আছে, রাজপথ ছেড়ে অন্ধগলিতে আশ্রয় নিয়েছেন, তাই সহসা চোখে পড়ে না। তিনি ভেবেছিলেন বাঁধাঘাট থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছে। এখন দেখলেন, না। তাঁর ধারণাটা ঠিক নয়। একেবারেই ঠিক নয়।

মণিদীপিকাও এবার কলকল করতে করতে বেরিয়ে এল। বলল,—'টঙদাদুর বন্ধু, এমন সময়ে এসেছে যে আমি নেলপালিশ পরছিলুম।' তার কচি আঙুলের নখে লাল টুকটুকে ছোপ।

তার মা লজ্জা পেয়ে বললেন—'দেখুন না, এমন বায়না করে...'

বিজু তখন ফ্রকের বাক্স আর চকলেটের প্যাকেটগুলো তার হাতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মা চকলেটগুলো তার হাত থেকে নিয়ে নিল—'ওর ভীষণ কিরমি কাকাবাবু জানেন তো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রোজ যেন ফুটকড়াই চিবোবে।'

ফ্রকের বাক্সের ডালাটা খুলে বউটি অবাক হয়ে তাকাল। ভয়ে ভয়ে বলল—'এত দামি জামা এনেছেন...'

তার বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে বিজু বড় লজ্জা পেলেন। কোনও রকমে বললেন—'বেশি দামি নয় বউমা, ওটাই খুকুর জন্যে আমার পছন্দ হল।'

—'কিন্তু আমার পুতুল?' মণিদীপিকা এবার গালে আঙুল রেখে বলল, 'যাঃ পুতুলটা তো আনতে ভুলে গেছ! চলো না। এক্ষুনি চলো, ছাদ দিয়ে গিয়ে নিয়ে আসি। টানাতেই তো আছে!'

তার মা যথাসাধ্য বকুনি দিয়ে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেও সে কিছুতেই শুনল না। পাঁচিল টপকে বিজু রায়কে মেসবাড়ির ছাদে যেতে হল। চিলেকোঠার ঘরের তালাচাবি খুলে ড্রয়ার থেকে পুতুলটা বার করতে হল। আবার পাঁচিল টপকে এদিকে এলে, মণিদীপিকা কৈফিয়ত হিসেবে বলল—'পুতুলও যে আজ আমাদের সঙ্গে খাবে। ওরও তো আজ জন্মদিন..।'

ওই ঘরটিতেই আসন করে খেতে দিল বউটি। পাশাপাশি দুটি আসনে। তিনি আর মণিদীপিকা, আর মণিদীপিকার কোলে অবশ্যই তার পুতুল। একটা আধছেঁড়া ভালুক, তার গলায় লাল ফিতে এবং একটি কাঠের কুকুরও সঙ্গী হল, তাদের মণিদীপিকা, তার পাতের উল্টোদিকে সাজিয়ে রাখল।

বিজু রায় একটু ইতস্তত করে বললেন—'খুকুর বাবা? বাবা খাবেন না?'

বউটি সঙ্কোচের সঙ্গে বলল—' ট্রেনে ট্রেনে ঘুরতে হয় তো, খুব সকালবেলাই চলে যেতে হয়।'

মণিদীপিকা বলল—'আমার বাবা রোজ ট্রেনে চড়ে জানো তো দাদু! বাবার কাছে ম্যাজিক ওষুধ থাকে, সব সেরে যায়।'

তার মা আরও সঙ্কোচের সঙ্গে বলল—'আপনি নলিনীকাকার কতদিনের বন্ধু কাকাবাবু, আগে কখনও আপনাকে দেখিনি তো!'

কিন্তু তার কথা বিজু রায় যেন শুনতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল নিতাইদা! নিতাইদার মতোই একজন কেউ তা হলে এই ছোট্ট খুকুটির বাবা! ভজহরি ভুজিয়াওয়ালার কাছে বসলে বাড়ির লোকে ঠিক ধরে ফেলবে। গৌরাঙ্গদা মুখে 'না বলব না। না বলব না' করলেও ঠিক বাড়িতে বলে দেবে বিজু স্কুল পালাচ্ছে। এদিকে ফাইনাল পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। মা আজকাল খিটখিটে হয়ে গেছে খুব, শুনলে ধরে পিটুনি দেবে। কিন্তু নিতাইদা বড় মাই ডিয়ার লোক। সপ্তাহে একদিন দুদিন চাটনি-লজেন্স বিককিরি করতে চাইলে উৎসাহই দেয়। এক একদিন আবার মুড থাকলে বলবে—'এই যে দেখছেন আমার ছোট্ট ভাইটি, নিজে লেখাপড়া শিখিনি, কষ্ট করছি, ভাইটাকে মানুষ করব বলে। বলুন দাদা, মানুষ হবে না ভাইটা আমার? পড়াশোনায় খুব মাথা!' বিক্রি চট করে বেড়ে যেত। হয়তো ওদিক থেকে এক মহিলা এক ঠোঙা কিনলেন। এদিকের এক প্রৌঢ় অমনি গম্ভীরভাবে পকেট থেকে টাকা বার করতে করতে বলে উঠলেন—'দাও হে, আমাকেও দাও গোটা বারো।' পরে সব বিকিয়ে গেলে কোনও একটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পাথরের বেঞ্চিতে বসে কচুরি আর ছোলার ডাল খেতে খেতে দুজনের কী হাসি! শেষকালে শালপাতার ঠোঙাটা জিভ দিয়ে চেটে ফেলে দিতে দিতে নিতাইদা বলত 'জানিস তো পৃথিবীর সব বড় লোকেরাই ল্যাবেঞ্চুস চানাচুর বিককিরি করে বড় হয়েছে।'

বিজু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, একটু সন্দেহাকুল হত—'লজেন্স না হয় সব দেশেই পাওয়া যায়। কিন্তু চানাচুর? সে তো পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায় না।'

নিতাইদা ঢোক গিলে বলত—'বলিস কী? চানাচুর পাওয়া যায় না এমন দেশও আছে? তাহলে ধর দাদের মলম, কিংবা খবরের কাগজ?....তুই বড় বড় লোকেদের লাইফ–হিস্টরি পড়, ধর সুভাষ বোস, কিম্বা মাউন্টবাটেন...।'

বিজু বলত—'কী যে বলো নিতাইদা! সুভাষ বোস খুব বড়লোকের বাড়ির ছেলে, এলগিন রোডে ওঁদের বিরাট বাড়ি, আর মাউন্টব্যাটেন তো লর্ড, লর্ড মানে জমিদার!'

নিতাইদা এবার মাথা চুলকোচ্ছে। 'কিন্তু আমি শুনেছি যে...'

বিজুই তখন আলোক দিত নিতাইকে—'মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক এডিসন খবরের কাগজ বিক্রি করতেন এরকম গল্প আছে। এব্রাহাম লিংকন সম্পর্কেও বলে—"ফ্রম লগ কেবিন টু দা হোয়াইট হাউস"...'

নিতাইদা উৎসাহে খাড়া হয়ে যেত, বেঞ্চিতে চাপড় মেরে বলত—'তবে? তবে? বলিনি? তাই যদি না হবে তো ফ্রম র‍্যাগ্‌স্ টু রিচেজ কথাটা কোত্থেকে এল বল তো! বলতে পারিস?'

বিজুর জীবনে যখন কথাটা সত্যি হয়েছিল, তখনই একমাত্র সে জেনেছিল র‍্যাগস্ আর রিচেজ-এর মাঝখানের ফাঁকটা কী দিয়ে ভরাট হয়। অন্তত সে কী দিয়ে ভরেছিল। নিতাইদার পাত্তা তখন নেই যে তাকে ওয়াকিবহাল করা যাবে এ বিষয়ে। অবশ্য পাত্তা পাওয়া গেলেও যে বিজু তাকে ঠিকঠাক চিনতে পারত তা নয়। একজন কর্মবীরের ব্যস্ত মধ্যাহ্নে অল্প বয়সের চানাচুর ফেরিঅলা দাদাকে চেনা গেলেও কি ঠিক সে ভাবে চেনা যায়? যে ভাবে তারকেশ্বরের প্ল্যাটফর্মে বেঞ্চে বসে চেনাশোনা হত? তখন নিতাইদাকে চেনা হত একজন হ্যাংলা-চেহারার ভিখারিসদৃশ নিতাই পাল বলে, যার চোখে বিজু রায়ের প্রতি সম্ভ্রম দৃষ্টি। 'র‍্যাগস টু রিচেজ'-এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ সে চাক্ষুস করছে। এইরকমই কিছু একটা হত। গৌরাঙ্গদার ক্ষেত্রে তাই-ই হয়েছিল। তিনি একেবারেই চিনতে পারেননি গৌরাঙ্গদাকে। ময়লা জামাকাপড়, একমুখ কাঁচা পাকা দাড়ি, চোখে মোটা পাওয়ারের নিকেল ফ্রেমের চশ্‌মা। কী করে চিনবেন। টেবিলের ওধারে ওই আর এধারে সাদা ধবধবে শার্ট। হালকা ব্রাউন ট্রাউজার্স। চুল থেকে ক্রিমের চেকনাই দিচ্ছে। চোখের সামনে প্রভাবশালী পুরুষ মহিলাদের মুখ সব সময়ে। গৌরাঙ্গদা কিছুক্ষণ পর ক্ষুব্ধ গলায় বলে উঠল—'চিনতে পারলি না তো?' 'তুই' শুনে অদূরে বসা সেক্রেটারি ভুরু কুঁচকে তাকাল। গৌরাঙ্গদা বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে পেছন ফিরে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল। আরও মিনিটখানেক পর মাথার মধ্যে ফ্লিক করল। গৌরাঙ্গ দাস, গৌরাঙ্গদা ছাতুবাবুর ঘাট, গঙ্গায় ঝাঁপাই। রামসীতার মন্দিরের চাতালে গেঁজেল বলু ঠাকুর। ওঃ সে কি এ জন্মের কথা। মে মনে থাকবে?

বউটি তার কথার জবাব না পেয়ে খুব অপ্রস্তুত হয়েছে। না জানি সে কী গর্হিত কথা জিজ্ঞেস করে ফেলেছে। এই ভদ্রলোককে দেখলেই বোঝা যায় বড় বনেদি ঘরের মানুষ। রুপোলি জিনিস প্রচুর থাকার চাকচিক্য সর্বাঙ্গে। নলিনী করও বনেদি ছিলেন। কিন্তু এই রুপোলি চাকচিক্য তাঁর ছিল না। সন্দেহ নেই, নলিনীকাকার এ রকম বন্ধু থাকতেই পারে। সে তাড়াতাড়ি উঠে নতুন গুড়ের পায়েস নিয়ে এল।

বিজু বললেন—'আমি এত খাব না বউমা, একটু কমিয়ে দাও। আমার আবার ব্লাড শুগার আছে কি না।'

মণিদীপিকা বলল—টঙ্‌দাদুরও তো ডাক্তারের বারণ। তা-ও খায়। লাল পায়েস খেতে টঙ্ দাদু ভীষণ ভালবাসে।

তার মায়ের দিকে একবার চাইলেন বিজু রায়, সে মৃদুস্বরে বলল—'অনেক কিছুই বারণ ছিল, শুনতেন না, গেরাহ্যি করতেন না কিছুকে।...' বলতে বলতে তার গলা ধরে এল।

খাওয়াদাওয়ার শেষে খুকুকে আদর করে তিনি বেরিয়ে এলেন—দিদির মৃত্যুসংবাদ ও শ্রাদ্ধের খবরটা কোনও কাগজে দিতে হবে। কাছাকাছি যে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন কাউন্টার থাকবে সেখানেই দেবেন। তারপরে একবার সুখচর যেতে হবে।

খান্না সিনেমার কাছ থেকে বাস ধরলেন বিজু রায়। আটাত্তর নম্বর। প্রথম যেদিন যান, ট্রেনেই গিয়েছিলেন। মুখ লুকিয়ে। সোদপুরে নেমে অনেকটা রাস্তা রিকশায় যেতে হয়। দিদির অসুখ, দিদিকে আনা-নেওয়া, খবরাখবর ইত্যাদি তাড়াতাড়ির সময়ে ট্যাকসি, কখনও অ্যাম্বুলেন্স। আজকে কী রকম সংকোচ হল। মণিদীপিকাদের বাড়ি থেকে আসার পরই কি? চারিদিকে পিলপিল করছে মানুষের ভিড়। গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে সব শীতেও। মহিলারা অদ্ভুত দৃশ্য সৃষ্টি করে দৌড়চ্ছেন। জীবনে কখনও

খেলার মাঠে দৌড়ননি এঁরা। মাঝবয়সে এসে বাস ধরতে দৌড়চ্ছেন। এমন চমৎকার শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে বিজু রায় কেমন করে বাস এড়াবেন?

দিদির বাড়ি পৌঁছে দেখলেন সদর দরজায় তালা মারা। খুব ঘটা করে। তিনি জানেন খিড়কির দিকে খোলা আছে। কিন্তু সেখান দিয়ে চোরের মতো ঢোকায় তাঁর মত হল না। শাঁটুল তাহলে এখনও যায়নি? অথচ রত্নাকে তিনি কাল স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন এ বাড়িতেই শ্রাদ্ধ হবে। শাঁটুলকে অতএব অন্য কোনও জায়গা খুঁজে নিতে হবে আপাতত। তিনি বিরক্ত হয়ে ফিরছেন, এমন সময়ে চাপা মেয়ে-গলায় ডাক শুনলেন—'মামাবাবু।' জানলা ফাঁক করে রত্না ডাকছে—'আপনি যাবেন না। ওদিকে দরজা খুলে রেখেছি, আসুন।' রত্নার গলায় ভীষণ আর্তি। অগত্যা, ইচ্ছে না থাকলেও, এবং ভেতরে ভেতরে রাগ হলেও বিজু বাড়িটাকে পরিক্রমা করতে আরম্ভ করলেন। বেশ বড় বাড়ি। অন্ততপক্ষে সাত কাঠার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে তৈরি হয়েছে। বাইরেও বাগানের অংশে পাঁচ ছ কাঠার মতো হবে। বাড়িটার সমস্ত অঙ্গ থেকে গাছপালা বেরিয়েছে। বাগানও জঙ্গল। পেছনের দিকের দরজাতেও তালা মারা। একটা ছোট্ট দরজা ফাঁক করে রত্না দাঁড়িয়ে আছে। ঢুকতে ঢুকতে বিজু বুঝলেন এটা জমাদার যাওয়া-আসার পথ। তিনি নাকে রুমাল দিলেন। রত্না বলল—'মামাবাবু, আর কোনও উপায় ছিল না, আপনি দয়া করে কিছু মনে করবেন না।' বিজু উত্তর দিলেন না। রত্নার পরনে কোরা লাল পাড় শাড়ি। চুল রুক্ষ। সে অশৌচ পালন করছে। কলঘরের ভেতর দিয়ে উঠোনে এসে পৌঁছলেন তিনি। নাক থেকে রুমাল সরিয়ে বললেন—'এরকম দিন-দুপুরে খিড়কি দিয়ে যাতায়াত করলে তো লোকে টের পাবেই। তখন!'

রত্না বলল—'আমি যে হররোজ আসিই বাড়ি সাফা করতে আশে-পাশে সবাই জানে। এতটা বাগান চট করে ভেতরে লোকের নজরও পড়ে না।'

বিজু বললেন—'ওটা তোমার মনে হওয়া। যাক গে। শাঁটুলকে কি এখনও অন্যত্র সরাতে পারোনি?'

রত্না কিছু না বলে একটা ঘরের দরজা খুলে ধরল। ভেতরে একটা পুরনো পালঙ্কে কেউ শুয়ে আছে মনে হল। তিনি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন রত্নার দিকে। সে মৃদু গলায় বলল—'বুখার খুব।'

চটি খুলে ভেতরে ঢুকলেন বিজু। পালঙ্কের বিছানায় একটি যুবক। তারও পরনে থান, গলায় কাছা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর বাকরোধ হয়ে গেল। কথায় বলে নরাণাং মাতুলক্রম। কিন্তু সেটা এতদিন কথার কথা বলেই মনে করেছিলেন তিনি। এ যুবকটিকে কিন্তু যে কেউ দেখলে বলবে—এ তাঁর ছোট ভাই। ওই একইরকম ঢেউ খেলানো একরাশ চুল। তাঁর মাজা রং, এখন রুপোর উজ্জ্বলতা পেয়েছে। এ ছেলেটি শ্যামবর্ণ। জ্বরের জন্য লালচে দেখাচ্ছে মুখটা। তাঁরই মতো কপাল। ঠোঁটের ঢেউ। বিজু রায়ের ভয় হল শাঁটুল চোখ খুললে, তাঁর কি নিজেরই সঙ্গে চোখাচোখি হবে? নিজের যৌবনের সঙ্গে? শাঁটুলের চুলে অল্প পাক ধরেছে। দু-চারটে করে সাদা চুল তার অজস্র এলোমেলো চুলের মধ্যে। তিনি কপালে হাত রাখলেন। শাঁটুল একটু শিউরে উঠল। জাগল না। বেশ ভালরকম জ্বর। রত্না বলল—'রোজ বুখার হচ্ছে বলেই নাকি এখানে এসেছিল, আমায় বলেনি কিছু। এখন বলুন এই বিমার লোককে কী করে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলি!'

—'না, না, তা তো হয় না' বিজু বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে বেরিয়ে এলেন—'চিকিৎসার কিছু হয়েছে?'

—'কী করে হবে? ডাক্তার ডাকতে পারছি না। জ্বর কমার দাওয়া দিয়ে যাচ্ছি। দুটো করে। যখন দিই ঘাম দিয়ে দু ডিগ্রি বসে যায়। আবার ওঠে চড়বড় করে।

বিজু রায় নিরুত্তর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর রত্না বলল—'আমরা আপনাকে খুব, মানে আপনি খুব পরেশান হচ্ছেন আমাদের জন্যে।'

বিজু রায় ভাবনায় মগ্ন ছিলেন, কথাগুলো তাঁর কানে ঢুকলেও মাথায় কোনও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল না। একটু পরে তিনি বললেন—'সিমটমগুলো চট করে বলো তো। সর্দি-কাশি আছে?'

—'না, একদম না।'

—'জ্বরটা বাড়ে কখন?'

—'বেলার দিকে। সকালে কম থাকে।'

—'আর কিছু?'

—'খেতে চায় না। পেটটা ভারী।'

—জ্বরটা একবার দেখো তো। 'রত্না জ্বর নিয়ে বলল—'চার ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

—'বলো কী? শিগগিরই মাথা ধোয়াও। আমি সাহায্য করব?'

—'না, না। একটা বড় কেতলি আছে, আমি ধুয়ে দিচ্ছি।'

—'এখানে কাছাকাছি কোথাও ফোন বুথ আছে?'

—'বেরিয়ে ডানদিকে বেঁকলে যে রাস্তায় পড়বেন, ওখানে একটা বড় দোকান আছে। ওদের ফোন আছে। বড় একটা ব্যবহার করতে দেয় না।'

বিজু বেরিয়ে গেলেন।

অগতির গতি ডক্টর পি. চ্যাটার্জি। লক্ষ্মণাদি শুনে বললেন—'কোথা থেকে বলছেন?'

—'সুখচর।'

—'ও আপনার দিদির বাড়ি?'

—'হ্যাঁ, ওর ছেলে; আমার ভাগ্নেরই অসুখটা।'

—'ও আচ্ছা। এনটারিক মনে হচ্ছে। ওষুধগুলো বলছি লিখে নিন।'

লিখে নিয়ে বিজু বলে—'প্রেসক্রিপশন ছাড়া দেবে?'

ফোনের মধ্যে হাসলেন ডাক্তার, বললেন—'চেনা লোককে দিয়ে দেয়। নেহাত না দিলে ফোনে আমার সঙ্গে একটা যোগাযোগ করিয়ে দেবেন।'

বাড়ি ফিরে তিনি দেখলেন রোগীর মাথা ধোয়ানো শেষ। সে উঠে বসে মিছরির শরবত জাতীয় কিছু একটা খাচ্ছে। তিনি রত্নাকে কাগজটা দিয়ে বললেন—'তোমার চেনা দোকান থেকে নিয়ে এসো। সেরকম চেনা দোকান আছে তো?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি আমার নিজের পাড়া থেকে আনছি।' বিজু টাকা বার করতে যাচ্ছিলেন, রত্না বলল—আমার কাছে আছে। আপনি তো বহোত দিয়েছিলেন। কিছুই বিশেষ খরচ হয়নি।' সে একরকম দৌড়ে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে রোগীর সামনে বসলেন বিজু রায়।

শরবতটা খাওয়া হয়ে গেলে গ্লাসটার জন্য হাত বাড়ালেন।

ক্ষীণ গলায় শাঁটুল বলল—'আপনি কে? ডাক্তারবাবু?' রত্না তাহলে ইতিমধ্যে একে কিছুই বলেনি। তিনি বললেন—'শমিত, আমি তোমার ছোট মামা।'

শাঁটুল যেন একটা শক খেল। চোখ তুলে বিজুর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল। তারপর চোখ নামিয়ে নিল। বড় বড় পল্লব ঘেরা নিষ্পাপ চোখ। এত বড় ছেলের এমন চোখ বিজু বহুদিন দেখেননি। এ চোখ শাঁটুল কোথায় পেল? এ তো তাঁর চোখ নয়? এরকম মেয়েলি, মায়াবী চোখ। কোথায় দেখেছিলেন এমন চোখ? বিজুর ভেতরটা কেমন করতে লাগল। এই ছেলে লোক ঠকিয়ে খায়? জোচ্চোর?

শাঁটুল হঠাৎ বলল—'আপনি কি আমার পুলিশে ধরিয়ে দেবেন?'

—'এখন তুমি অসুস্থ। এসব কথা থাক শমিত।'

—'না। থাকবে না। সুস্থ হবার পর? তখন নিশ্চয়ই...'

—'এত যদি ভয় পাও তো গোলমেলে কাজ করেছিলে কেন?'

—'বিশ্বসুদ্ধুলোক দু নম্বরি করে খাচ্ছে! আর আমি করলেই কেচ্ছা। আপনিই বলুন।'

বিজু সামান্য হেসে বললেন—'সবাই সব পারে না শমিত। এটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। যে পারে সে পেরে যাচ্ছে। তার কথা আমি বলতে পারব না। কিন্তু তুমি যদি অন্ধকারের জগতে চলে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে চাও, বেঁচে বর্তে থাকতে চাও একজন সাধারণ সুখী মানুষের মতো তাহলে আমি তোমাকে পরামর্শ দিতে, সাহায্য করতে রাজি আছি।'

শাঁটুল আবার তাঁর দিকে তাকাল। সেই চোখ, সেই দৃষ্টি। এতদিন, দিদির বাড়ি আসার দিন থেকে বিজু রায় ভাবছেন। ক্রমাগত ভেবে চলেছেন কী করবেন, কী করা উচিত। ঠগ জোচ্চোরের হাজতবাসই ভাল। যারা মনে করে দুনিয়ার সব পয়সাওয়ালা লোক অসদুপায়ে উপার্জন করেছে, তাদের শিক্ষা হওয়া ভাল। এমন ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন যে ভাগ্নে মামার সম্পর্কে অতি নীচ ধারণা পোষণ করে, আবার বিপদে পড়ে সেই মামার কাছ থেকেই লাখেরও বেশি টাকা এবং আনুষাঙ্গিক নানা সাহায্য চায়, যে সবের তলায় একটা চতুর, ঠগ মন কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি অনায়াসে চিনতে পেরেছিলেন, সেই ভাগ্নেকে কোনওরকম সাহায্য করতে গিয়ে তিনি বিপদে পড়ে যেতে পারেন। হঠাৎ এই চোখ এই দৃষ্টি তাঁকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করল, সাহায্য নয়, বরং বলা চলে পৌঁছে দিল। সিদ্ধান্তও নয়, সংকল্পে।

তিনি আবারও বললেন—'রত্নার কাছে তুমি যে ব্যাপারটা সাজেস্ট করেছ, সেটাতে আমি রাজি আছি। অবশ্য আমার নিজেরও কিছু শর্ত থাকবে।' তিনি চুপ করে রইলেন। একটু পরে শাঁটুল বলল—'বলুন কী বলবেন।'

—'তুমি লোকগুলির নাম ঠিকানা আমায় দাও। কে কত পায় তার একটা হিসেব দাও। আমি তোমার ওপর থেকে ওয়ারেন্ট তুলে নেবার ব্যবস্থা করছি।'

—'তারপর?'

—'তারপর, ওই টাকাটা আমি তোমার হয়ে দিয়েও দেব, এই বাড়ির এগেনস্টে। মানে বাড়িটা ধরো আমার কাছে বন্ধক থাকবে।'

—'সে কী, বারো কাঠার বাড়ি আপনি নিয়ে নেবেন এই এক-দেড় লাখ টাকা দিয়ে?'

—'নিয়ে নেব তা তো বলি নি শমিত।'

—'কিন্তু আমি ওই টাকা শোধ করব কী করে। শোধ করতে না পারলেই...'

—'শোনো, তোমার দিদিদের কাছ থেকে "এ বাড়ির ভাগ তাদের চাই না" এই মর্মে কিছু সই-সাবুদ দরকার। তারপর এ বাড়িটা তুমি প্রোমোট করবে। মানে আমিই করব, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। যতটা আমরা তুলতে অনুমতি পাব, তার তেত্রিশ পার্সেন্ট কি ধরো চল্লিশ পার্সেন্ট তুমি পাবে। তোমার দিদিরা ভাগ ছাড়তে না চাইলে, ওই তোমার চল্লিশ পার্সেন্টের ভেতর থেকেই তাদের দিতে হবে। বাড়িটা আউটরাইট সেল করে দিলে যা পাবে, তার চেয়ে অনেক বেশি আসবে এই প্রোমোটিং অ্যান্ড ডেভেলপিং থেকে।'

এই সময় রত্না এসে ঢুকল। সে ওষুধগুলো পেয়েছে। তবে দোকানি বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছে। সে ভীষণ উত্তেজিতভাবে বলল। জ্বরের লালের তলায় তলায় শাঁটুল ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে শুয়ে পড়ল।

বিজু রায় বললেন—'জল নিয়ে এসো বউমা, ওষুধগুলো এক্ষুনি পড়া দরকার।'

ওষুধ খেয়ে শাঁটুল বলল, 'আমার ভীষণ শীত করছে। এখুনি কিছু একটা করুন মামাবাবু। আমাকে...আমি...কিছুতেই জেলে যাব না...তার আগে বরং ঝুলে পড়ব...।'

রত্না ধমক দিয়ে বলল—'কী বাজে-আজে বকছ। মামাবাবু কীভাবে মার জন্যে করেছেন, জানো? আমাদের এ কদিন দেখ্‌ভাল স-ব।'

—'আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না, যা হয় করুন। যা-হয় করুন, যদি ঠকিয়ে নিতে ইচ্ছে হয় এ বাড়িতো তাই নিন, কিন্তু আমায় জেলের হাত থেকে বাঁচান।

শমিত ভীষণ উত্তেজিত গলায় কথাগুলো বলল।

রত্না বলল—'ওর মাথা ঠিক নেই, মামাবাবু, দয়া করে মনে করবেন না কিছু।'

বিজু রায় বললেন—'তুমি ঠগ্ বলে আমিও ঠগ হবোই এরকম ধারণা করে তুমি যদি কোনওরকম বিকৃত আনন্দ পেতে চাও শমিত, আমি বাধা দোব না। তবে তার আগে আমার আরও কিছু জানা দরকার। অনেক টাকা পাবে, এ বাড়ি প্রোমোট করলে, অত টাকা দিয়ে কী করবে?'

—'টাকাটাই তো আমাদের আসল প্রবলেম', রত্না বলল। 'টাকা পেলে সবটা ঠিক হয়ে যাবে।'

—'না, ঠিক হবে না। শমিতকে বলতে দাও। সে কী করবে। বসে বসেও খাওয়া যায় ওই টাকাতে। কিন্তু একটা সুস্থ সবল পুরুষ মানুষ তো ঠিক বসে বসে খেয়ে সুখী হতে পারে না।'

—'ব্যবসা করব', অসুখে ক্ষীণ শাঁটুলের গলা থেকে শব্দ বার হল।

—'ব্যবসা তো আগেও করেছ, সফল হয়েছ একবারও?'

শাঁটুল চুপ করে রইল। বিজু রায় বললেন—'এই মুহূর্তে আমি ভেবে ঠিকঠাক করতে পারছি না। শিগগিরই তোমার একটা ব্যবস্থা করব। সেই ব্যবস্থা তোমাকে মেনে নিতে হবে। হাতে একগাদা টাকা পাবে আর সেগুলো যা-তা করে উড়িয়ে দেবে সে হবে না। যদি রাজি থাকো তো এগোব, নইলে...থাক।'

রত্না বলল—'বলে দাও, বলে দাও, দের করছ কেন? বললাম না ওষুধের দোকানে সন্দেহ করছে।'

বিজু রায় বললেন—'প্রেশার দিয়ো না বউমা। ওকে শান্তমনে ঠিক করতে দাও সব। ইতিমধ্যে যদি পুলিশ আসে, সে না না হয় আমি অ্যান্টিসিপেটরি বেলের বন্দোবস্ত করছি।'

—'না, না', শমিত এবার প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল। 'একবার থানা-পুলিশের দাগ লাগলে জীবনে কখনও মাথা তুলতে পারব না। কোনও কাজ করতে পারব না। মামাবাবু যা হয় করুন। খালি...খালি...'

বিজু রায় আস্তে বললেন—'শোনো শমিত। জীবনে কখনও কখনও এমন সময় আসে যে কাউকে নিঃশর্তে বিশ্বাস করতে হয়, করতেই হয়। আমাকে আমমোক্তারনামা মানে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিতে হবে তোমায়, আমি এক্ষুনি উকিলের ব্যবস্থা করছি। নাম আর অ্যামাউন্টগুলো চটপট দুজনে মিলে একটা লিস্ট তৈরি করে ফেল।'

॥ ৮ ॥

চারদিক থেকে অন্ধকার নেমে আসছে। দিনের প্রখর আলোতেও সে অন্ধকার সরে না। চারদিকে উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন আসবাব, ছবি, কার্পেট, সুশোভন গাছ, ফুলদান, সব বস্তুপিণ্ড। প্রাণ নেই, মানে নেই, আনন্দ দেবার, সুস্থিতি দেবার কোনও ক্ষমতাই নেই। সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় মুঠো মুঠো ঘুমের বড়ি গিলে চেতনাকে হত্যা করা যাক। কে তুমি তনুশ্রী রায়? আসলে তুমি কেউ না। তুমি যেটুকু বিজু রায়ের স্ত্রী সেইটুকু তোমার অর্থ আছে। সামাজিক পরিচয়। বিজু রায় আছেন, কোনও কারণে আসতে পারছেন না, তুমি শর্মার ছেলের বিয়ের পার্টিতে গেলে। ঠিক আছে। কিন্তু বিজু রায় নেই। বিজু রায়ের বিশাল ব্যবসার সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছে, অব্যবহৃত জীর্ণ প্রাসাদের মতো। ভগ্নস্তূপ, খণ্ডহর। তুমি আসলে একটি প্রেতিনী। তুমি কোথায় যাবে? কেউ তোমায় ডাকবে না। যদি অগত্যা ডাকেও, গেলে সব তেরছা চোখে চাইবে, নানা ছলছুতো করে সরে যাবে। অন্যত্র। অন্য কারও কাছে। যে এখনও গোটা আছে, ভাঙেনি, তার কাছে। ঠিক এরকম একটা ঘটনা সম্প্রতি একটা পার্টিতে ঘটতে দেখেছে তনুশ্রী। মিঃ সরকার প্রধানত স্টিল পারমিটের সুবাদে ধনী। পারিবারিক ব্যবসাও আছে বহুদিনের। রোলিং মিল। ভাইয়েরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করল। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদে পলিটিক্যাল প্রভাব গেল ভাইয়েদের দিকে, মিঃ সরকার একরকম

নিঃস্ব হয়ে গেলেন। খুব দিল দরিয়া মেজাজের লোক ছিলেন, লোককে খাওয়াতে, পান করাতে, ভালবাসতেন, ভদ্রলোক সুইসাইড করলেন। বছর খানেক পরে মিসেস সরকার এইরকম একটা বিয়ে না কিসের পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সাদা শিফন শাড়ি, রুপোর গয়না। একসময়ে খুব সুন্দরী ছিলেন মিসেস সরকার। ভাগ্য বিপর্যয়ে কেমন লাবণ্যহীন, ম্যাড়মেড়ে, ওই খশুহর। তনুশ্রীকে ধরেছিলেন, দুজনে কথাবার্তা বলেছিলেন ওয়াইন হাতে নিয়ে, মিসেস শর্মা ছলছুতো করে ডেকে নিয়ে গেলেন—'ওটার সঙ্গে এত কী কথা বলছিলেন?' 'দ্যাট উওম্যান' এই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন মিসেস শর্মা। এখনও মনে আছে স্পষ্ট। এই মহিলাই একদিন কত জমকালো পার্টির কর্ত্রী, এঁর কৃপাদৃষ্টি পেলেই তনুশ্রী তো কোন ছার, মিসেস শর্মাই বর্তে যেতেন। পার্টি যখন খুব জমে উঠেছে তখন একবার দেখতে পেয়েছিলেন দূরে একটা কোণের সোফায় চুপ করে বসে আছেন মিসেস সরকার। বেয়ারারা ট্রে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওঁর কাছটা এড়িয়ে যাচ্ছে। ওই বেয়ারা কেন, মাটি, ঘরের মেঝেটা, কার্পেটটাও চেনে কে সম্পন্ন, কে নয়, সে সম্পূর্ণ, কে ভাঙা। তখন তনুশ্রীরও মনে হয়েছিল 'উইচ, শী ইজ আ উইচ', রেণুকা শর্মার মতো। মনে হয়েছিল। এখন তনুশ্রী বুঝতে পারছেন না উইচ নয়, এক ভাগ্যহীনা, একাকিনী, কৃপার পাত্রী, তা-ও নয়, মর্মান্তিক ট্রাজেডি এক। তনুশ্রী শিউরে উঠলেন।

হঠাৎ তিনি চমকে বিছানায় উঠে বসলেন। সত্যিই তো। বিজু রায়ের বিজনেসের কী হবে? যদি সত্যিই না ফেরে? মাস ফুরিয়ে আসছে, সবাইকেই মাইনে-পত্র দিতে হবে। সব চেকেই নিশ্চয়ই বিজু রায়ের সই চাই। রাশি রাশি বিল আসবে কদিন পর থেকেই। তনুশ্রীর নিজস্ব অ্যাকাউন্ট আছে। তাতে তাঁর নিজের খরচ চলে, তনুশ্রী দু হাতে খরচ করেন। ছেলের মেয়ের নির্দিষ্ট হাত খরচ আছে, তাদেরও নিজস্ব অ্যাকাউন্ট আছে, তা থেকেই চলে। সংসার খরচের জন্য প্রতি মাসে বিজু রায় তাঁকে একটা মোটা অঙ্কের চেক দেন, তা ছাড়াও আছে কিছু জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। কিন্তু তার পাস বই, চেক বুক সবই থাকে বিজু রায়ের কাছে। বিজু রায়ের টাকাপয়সার বন্দোবস্তের কথা এর চেয়ে ভাল জানেন না তিনি। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কাকে ডাকবেন? ছেলেকে? অপদার্থ একটা। শিখেছে খালি শ্রাগ করতে আর ইংরিজি গালাগাল দিতে। মেয়েকে? মেয়েকে ডাকবেন? যা দেমাকি! কিসের এত দেমাক কে জানে। তনুশ্রীর মতো সুন্দরী নয়। লেখাপড়াতেও আহামরি কিছু নয়। কিসের অহঙ্কার এত। স্বামী ছাড়া প্রকৃতপক্ষে তাহলে একজন সন্তানবতী নারীরও কিছু থাকে না। তনুশ্রীরও বিজু রায় ছাড়া কেউ নেই। তনুশ্রী মাঝের বিশাল দরজাটা খুলে বিজু রায়ের ঘরে গেলেন। পরিষ্কার গোছানো। বিছানা টান-টান। দেয়ালে আলনা আলমারি। থাক থাক ড্রয়ার। ওয়ার্ডরোব। চাবি কোথায়? খাটে। বালিশের তলায়। গদি উল্টে ফেলে দেখছেন, হাঁফাচ্ছেন। সেরেছে। চাবিও নেই।

—'মা, এখানে কী করছ?' পেছনে মেয়ের গলা।'

প্রথমেই প্রচণ্ড রাগ হল তনুশ্রীর। তাঁর স্বামীর ঘরে ঢুকে কী করছেন তিনি, মেয়েকে কৈফিয়ত দিতে হবে?

পরক্ষণেই কুটো আঁকড়াবার মতো করে তিতির হাত আঁকড়ে লণ্ডভণ্ড বিছানার ওপরে বসে পড়লেন তনুশ্রী। এই শীতেও দরদর করে ঘামছেন। নিজের চুন্নির প্রান্ত নিয়ে মায়ের ঘাম মুছিয়ে দিতে তিতি বলল—'এত ঘামছ কেন? এ কী?' সে ছুটে গিয়ে এয়ার কুলারটা চালিয়ে দিল। তারপর মায়ের পাশে বসে পড়ে কাঁধে নরম করে হাত রেখে বলল, 'মা, তুমি এত নার্ভাস হচ্ছ কেন?। আমরা তো সবাই আছি। সত্যি বাবা যে কী করে এমন একটা কাজ করল...'

তনুশ্রী আতঙ্কিত দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন—'কী কাজ! খোঁজ পেয়েছ?'

—'খোঁজ পাব কী করে?' তিতি অবাক হয়ে বলল।

—'তবে যে বললে কী করে এমন কাজ! তোমরা তাহলে ধরেই নিয়েছ বাবা ইচ্ছে করে চলে গেছে? চলে গেছে আমায় ছেড়ে?'

—'ভুল হয়ে গেছে মা, তা ছাড়া বাবা গেলে তো শুধু তোমায় ছেড়ে চলে যায়নি, আমাদের সবাইকেই ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু বাবা স্বেচ্ছায় ও ভাবে গেছে ভাবাটা ঠিক নয়।'

'কিন্তু ধরো যদি কোনও কারণ থেকে থাকে, যদি ধরো অন্য কেউ, মানে অন্য কাউকে, মানে অন্য কারুর...'

—'কী বলছ মা? ঠিক করে বলো।' তিতি মায়ের হাত দুটো ঝাঁকিয়ে বলল, তনুশ্রী তখনও বড় বড় ভয় পাওয়া চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তখন সে বুঝল। ভেতরটা হিম হয়ে গেল। অনেক কষ্টে গলায় স্বর এনে আস্তে আস্তে বলল—'এরকম কেউ ছিল? তুমি জানো?'

তনুশ্রী কেঁদে ফেললেন—'না জানি না, কী করে জানব? শর্মাজি যখন তাঁর আগেকার বউকে ডিভোর্স করলেন সেক্রেটারি রেণুকাকে বিয়ে করবার জন্যে তখন সেই আগেকার বউ, অযোধ্যা অঞ্চলের দেহাতি মেয়ে নাকি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মিসেস বসাকের কাছে শুনেছি। সে এতই মুখ্যু যে তাকে বিশেষ কিছু দিতেও হয়নি শর্মাজির।...'

তিতি বলল—'কিন্তু মা, শর্মাজির সেই বউ মুখ্যু, দেহাতি হতে পারে। তুমি তো তা নয়। তুমি কি তেমন কিছু...মানে এরকম ভাবার কোনও কারণ আছে কি তোমার?'

—'আমি জানি না। জানি না তিতি। আমি ওকে বিশ্বাস করতাম। এখন বুঝতে পারছি তোমাদের বাবাকে আমি বোধহয় খুব ভাল করে জানি না।'

মায়ের উদ্‌ভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তিতি ভেতরে ভেতরে কেমন ভয় পেয়ে গেল। তার পায়ের তলা থেকে কে যেন কার্পেট, মাটি, জমি, পৃথিবীটাই সরিয়ে নিচ্ছে। মায়ের কথাটা যেন মায়ের কথা নয়, একটা উদ্ধৃতি। 'তোমার বাবাকে আমি বোধহয় খুব ভাল করে জানি না।' সে নিজে, তিতি, সে-ইই কি বলতে পারে খুব ভাল ছেড়ে একটুও জানে কি না সে তার বাবাকে তার মাকে তার দাদাকে? তারাই কি কেউ একটুও জানে তাকে? কী ভয়ঙ্কর এই না জানা! এক ছাতের তলায়, এক পরিবারের মানুষ তারা, হঠাৎ একদিন একজন না-ফিরলে অন্যরা বলতে পারবে না সে কোথায় যেতে পারে, কেন গেল। সে, যখন অর্জুনদের চুঁচুড়ার বাড়িতে গিয়েছিল, শুধু বলে যায় বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে। কোথায়, কী বৃত্তান্ত কিছুই বলে যায়নি। তখন যদি তাকে বাড়িতে খুব দরকার হত! ধরা যাক, তার বাবার হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছে কি মায়ের হঠাৎ হার্ট-ব্লক, তাহলে? তাহলে তাকে খবর দেবার কোনও উপায় কারও থাকত না।

তিতি বলল—'মা, সেজজ্যাঠার বাড়ি একটু খবর দিই। দিব্যদাকে বলি...

—'না, না' তনুশ্রী অস্থির হয়ে উঠলেন।

—'কিন্তু কেন?'

—'যদি স্ক্যান্ডাল কিছু হয়, আত্মীয়রা...না না তিতি না...।'

তিতি বলল—'মা, স্ক্যান্ডাল তো না-ও হতে পারে। যদি এটা বাবার প্রাণ সংশয় ব্যাপার হয়? তখন?' বলতে বলতে তার গলা কেঁপে যাচ্ছি। 'তখন কিন্তু সবাই আমাদের খুব দোষ দেবে। এখনই অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

তনুশ্রী কিছু বলতে পারছেন না। ভয়ে একদম বোবা, হাতটা নেড়ে শুধু 'না না' বোঝাবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অদ্ভুত দৃশ্যটা।

একটু পরে বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়ে তনুশ্রী বললেন—'ঘরটা ভাল করে দেখো। দেখতে হবে, যদি কিছু থাকে। টাকাকড়িরও দরকার। আমি কোনও চাবি পাচ্ছি না।'

ডুপ্লিকেট চাবি রাখবার লুকোনো জায়গাটা তিতিই খুঁজে বার করল। ওয়ার্ডরোবটা খোলাই ছিল। ভেতরে কোণের দিকে একটা হ্যাঙারে বাবার জোব্বা ঝুলছে। জোব্বাটার পেছনে একটা ছোট্ট আংটা, সেটাতে টান দিতে একটা ছোট্ট খোপ খুলে গেল, তার মধ্যে চাবির গোছা। তিতি অবাক হয়ে গেল দেখে, মা এর কিছুই জানত না। জানে না। একবার মনে হল জিজ্ঞেস করে—'তুমি কোন জগতে

বাস করো?' অনেক কষ্টে প্রশ্নটাকে গিলে নিল। ড্রয়ার খুলতে পারল কয়েকটা। থাকে থাকে বাড়ির ট্যাক্সের রসিদ, টেলিফোনের, বিজলির সব আলাদা থাক করা। পাস বই দুই চারটে। ত্রিশ চল্লিশ হাজারের মতো প্রত্যেকটাতে। জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট এগুলো তনুশ্রীর সঙ্গে। যদিও তনুশ্রী কোনও দিন ব্যবহার করেননি। তিতি দেখে-শুনে বলল—'মা, আমাদের বাড়ির খরচ-খরচার ভাবনাটা আপাতত ঘুচল।'

টেলিফোনটা বাজছে ওদিকে। থেমে গেল। কেউ ধরেছে। কে? চিন্টু? একটু পরে চিন্টু ঘুমে ভারী চোখ, ভারী গলায় এ ঘরে ঢুকে বলল—'শর্মাজি ফোন করছেন মাম্মি, ড্যাডের খবর নিচ্ছেন, বলে দিয়েছি, হাই টেম্পরেচার।'

—'কেন? একথা বললি কেন?' তিতি জিজ্ঞেস করল, সে এই মিথ্যে কথা আর গোপনতার দুর্গ থেকে বেরোতে চায়। তার মন বলছে তারা নিজেদের চারপাশে ক্রমশই একটা শক্ত জাল বুনে চলেছে। এর ফলে নিজেরাই বিপদে পড়বে।

চিন্টু বিরক্ত গলায় বলল—'তাহলে কী বলব? পুলিশে খবর দিতে দেবে না। কাউকে কিছু বলা বারণ, আমার যা মনে আসে বলে দিয়েছি।'

তিতি বলল—'এভাবে চলবে না কিন্তু মা। কারুর না কারুর সাহায্য আমাদের নিতেই হবে। থাকগে, তুমি এখন চান করতে যাও।'

ঠেলে-ঠুলে তনুশ্রীকে চানে পাঠিয়ে সে বলল—'দাদা, আমাদেরই পরামর্শ করে ঠিক করতে হবে কী করা উচিত। মার কিন্তু বুদ্ধি কাজ করছে না।'

হঠাৎ চিন্টু ঘরের ভেতরে চলে এল, দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর হ্যাঁচকা টানে ওয়ার্ডরোবের পাল্লাটা খুলে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

তিতি বলল—'ওটা কী করছিস, ওভাবে খুলতে পারবি? চাবিটা নে।'

চাবিটা হাতে নিয়ে চিন্টু অবাক চোখে তিতির দিকে তাকিয়ে বলল—'চাবি? ড্যাডের চাবি নাকি? কোথায় পেলি?'

—'পেলাম। বাবা ঠিক যেখানে রেখেছিল সেখানে।' সে রহস্যময় একটা হাসি হাসবার চেষ্টা করল, যদিও হাসিটা খুব শুকনো দেখাল।

একটার পর একটা পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে ওয়ার্ডরোবের চাবিটা যেই লেগে গেল, একটা হ্যাঁচকা টান মেরে পাল্লাটা খুলে ফেলে চিন্টু দু লাফে সরে দাঁড়াল। তারপর কী রকম হতভম্ব মুখ করে তিতির দিকে তাকিয়ে রইল। তিতি বলল—'কী খুঁজছিস?'

—'তুই একটু দেখবি, ভেতরটা?'

—'একটু আগেই তো দেখলাম। ওয়ার্ডরোবটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেই তো চাবির গোছাটা বার করতে পারলাম।'

'ও দেখেছিস? তো খাটের বক্সটা একটু দ্যাখ তো।'

—'কেন?'

—'যদি কিছু পাস?'

—'কী পাব?'

—'ধর, কোনও ইন্ডিকেশন যে একটা লোক এখানে মার্ডার্ড হয়েছে, কি এই ধরনের কিছু। এ ঘরটা দেখা হলে মাম্মির ঘরটাও দেখব।'

—'কী বলছিস কি তুই? এই ঘরে, মার্ডার! মা থাকছে, বুঝতে পারবে না।'

—'হয়ত জানে।'

তনুশ্রী কোনওরকমে হাত পা মুখ ধুয়ে বাথরোবটা চড়িয়ে চানঘর থেকে বেরোতে বেরোতে চিন্টুর শেষ কথাগুলো শুনতে পেলেন। মড়ার মতো ফ্যাকাশে মুখে তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন।

কী বলছে চিন্টু? এ সব কথার মানে কী? কে মার্ডার হয়েছে। বিজু? তাঁর ঘরে? তিনি জানেন? বাইরে গলার আওয়াজ। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। প্রমীলা চট করে গলা বাড়িয়ে জানিয়ে গেল শর্মাজি আসছেন। চিন্টু বেরিয়ে যাচ্ছে। তনুশ্রী বিছানায় শুয়ে পড়লেন। যেন তাঁর শরীরে আর এক ফোঁটাও শক্তি নেই। চিন্টু কী ভেবে কথাটা বলল? তিনি জানেন? বিজু মার্ডার্ড? তাঁর ঘরে? এ রকম অদ্ভুত ধারণা চিন্টুর, তাঁর নিজের ছেলের, তাঁর সম্পর্কে? কী ভয়ানক মুখ তাঁর? কী বীভৎস? খুনি মনে হয় তাঁকে? অথচ এতদিন তিনি আয়নাতে দেখেছিলেন—সুন্দর। ভারী সুন্দর। উঃ হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যেন?

তিতি ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল—'মা, মা, তুমি অমন করছ কেন?'

দরজার গোড়া থেকে শর্মাজির গলা শোনা গেল—'আসতে পারি?'

তিতি মায়ের গায়ে একটা কম্বল চাপা দিয়ে দিল, বলল—'আসুন আঙ্কল।'

চিন্টুকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকে শর্মাজি বললেন—'আমি কাছাকাছি এক বন্ধুর বাড়ি এসেছিলাম। খোঁজ নিতে নীলাদ্রি বলছে বাবার হাই টেম্পারেচার কিন্তু এসব কী শুনছি? এতো দেখছি মিসেস রয় শুয়ে আছেন? আমাকে ব্যাপারটা একটু খুলে বলবে? নানা রকম কানাঘুষো শুনছি।'

তনুশ্রী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। তিতি সমস্তটা বর্ণনা করে বলল—'মা লজ্জায় আত্মীয়স্বজনকে পুলিশকে কাউকেই খবর দিতে দিচ্ছে না।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তনুশ্রীর দিকে একবার তাকিয়ে শর্মাজি বললেন—'দ্যাটস অলরাইট। মিসেস রয় ঘাবড়াবেন না কিছু। আমি দেখছি। একটা প্রাইভেট কনসার্ন আছে ভাল, তাদের দিয়ে...কোনও ভাবনা নেই।'

শর্মাজি তিতি আর চিন্টুকে চোখের ইশারায় বাইরে ডেকে নিলেন। অতি বুদ্ধিমান লোক, শুধু বললেন—'ডোন্ট ওয়ারি, দেখি কী করা যায়।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফোনের বোতাম টিপতে লাগলেন।

'হালো। আমি কে.ডি. শর্মা বলছি, রক্সি আছে?' তিতি আর চিন্টু দুজনেই বসে ওঁর কার্যকলাপ দেখছে।

—'রক্সি! একটা কেস আছে, আটমোস্ট সিক্রেসি নীডেড। ...হ্যাঁ। আমি পার্টিকে নিয়ে যাচ্ছি, থাকো একটু। ...হ্যাঁ উইদিন সে, টোয়েন্টি মিনিটস।' ফোন ছেড়ে বললেন—'নীলাদ্রি চলো আমার সঙ্গে। এরা খুব কমপিটেন্ট, ডিসক্রীট। ঘাবড়িয়ো না।'

চিন্টু বলল—'এক মিনিট।' গতকাল সারা রাতই প্রায় সে বাড়িতে ছিল না। ছিল তাদের নিজস্ব একটা গোপন ক্লাবে। ভোরের দিকে ফিরে একটু ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু এখন সে চট করে, একটা জিন্‌স গলিয়ে নিল, আর একটা সোয়েট শার্ট গলিয়ে নিল, পায়ে স্নীকার্স। চুলে একটু চিরুনি চালাল কি না চালাল। বেরিয়ে এসে বলল—'চলুন আঙ্কল।'

—'দ্যাটস লাইক আ স্মার্ট বয়'—শর্মা হাসলেন। তিতির দিকে চেয়ে বললেন—'তুমি তোমার মাকে দেখো। বড্ড আপসেট হয়ে পড়েছে।'

তিতি ঘরে ঢুকে দেখল মা সিলিঙের দিকে চেয়ে কাঠের মতো শুয়ে। চোখ দুটো লাল। সে বলল—'রাতে কি ঘুমোওনি?'

তনুশ্রী জবাব দিল না। সে আসলে তিতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। তার চোখের সামনে ভাসছিল সরু গলির মধ্যে একটা দোতলা বাড়ি। টানা বারান্দা। কতকগুলো ছাগল বাঁধা। ভেতরে ফরাস পাতা একটা ঘর। প্রচুর লোক বসে। সে-ও বসে। এক এক জনের ডাক আসছে, সে উঠে যাচ্ছে। ভেতরের একটা ঘরে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসছে। কপালে একটা সিঁদুরের ফোঁটা। তনুশ্রীর ডাক এল। ভেতরের ঘরটা ছায়া-ছায়া, একতলায় ভেতর দিকের ঘর, আলো ঢোকে না। কম পাওয়ারের একটা বিজলিবাতি জ্বলছে। লাল কাপড় পরা জটাধারী একজন তান্ত্রিক বসে আছেন। পেছন ফিরে। তনুশ্রীর সামনে ছত্রিওলা খাটের মতো দেখতে একটা সিংহাসনে একটা লাল জিভ।

জিভ শুধু, ফুলের ভারে আর সব ঢাকা পড়ে গেছে কিংবা নেই, বোঝা যাচ্ছে না। জিভটাকে বেড়ে লাল বেনারসী কাপড়ের আভাস চোখে পড়ল। আর চকচকে মোহরের মালা। মোহর কি না কে জানে কিন্তু মোহরের মতো।

বজ্রগম্ভীর গলায় তান্ত্রিক বললেন,—'তোর আবার কী হল?' যেন কতদিনের চেনা।

গলার আওয়াজে কাঁপুনি ধরে গেল তনুশ্রীর। সে বলল—'স্বামী পাঁচদিন হল নিরুদ্দেশ।'

—'জয় মা, জয় মা,' হুঙ্কার দিয়ে বলতে লাগলেন তান্ত্রিক। তারপর হঠাৎ দ্বিগুণ হুঙ্কার দিয়ে ভয়ঙ্কর সব মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন আর মুঠো মুঠো জবাফুল ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন কালীমায়ের জিভের তলায়। পরপর বললেন—'জয় মা হিরণ্যকালী, জয়, জয়। যাঃ তোর কাজ হয়ে গেছে।' এ পাশ ফিরলেন। সিংহাসনটার একদিকে টাঙানো রাশীকৃত জবাফুলের মালার মধ্যে একটা টেনে নিয়ে দুবার ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিলেন তনুশ্রীর দিকে। মালাটা নির্ভুল লক্ষ্যভেদে তার গলায় পড়ল। সামনে গোলা-সিঁদুরের বাটি থেকে বুড়ো আঙুলে করে সিঁদুর গোলা তুলে নিয়ে তনুশ্রীর কপালে টিকা দিয়ে দিলেন।

কোনওক্রমে তনুশ্রী বলতে পারল—'কী হল? কী বুঝলেন বাবা?'

—'বুঝলি না? বাণ মেরে দিলুম।'

—'ক কাকে? ক্ কোথায়?'

—'ওই যে সর্বনাশী তোর গড়া ঘর ভাঙছে! একেবারে সোজা বুকের মধ্যে গিয়ে লাগবে। যাঃ ভয় নেই, তোর স্বামী ফিরে আসবে, আবার স্বামীসোহাগী হবি।'

তনুশ্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলছিলেন সাধুটি। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। তনুশ্রী কেমন বিহ্বল হয়ে টাকার পার্স তার ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে থেকে বার করতে লাগল—এ বেটি সোনা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। জানিস তো! এক কণা হলেও সোনা দিয়ে যাস। নইলে বেটির আমার বড্ড বদরাগ। জয় মা হিরণ্যকালী!

তনুশ্রী এক কণা সোনা কোথা থেকে পাবে? সে তার বাঁ হাতের মধ্যমা থেকে টেনে টেনে মুক্তোর আংটিটা খুলল। সাধুর হাতে দিতে গেল।

—'ওইখানে দে। আমার হাতে কেন?' সিংহাসনের সামনের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন সাধু চিমটে দিয়ে। তনুশ্রী আংটিটা সেখানে রাখল, কী যেন একটা রাখা ছিল তার ওপর। রাখার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের মধ্যে দিয়ে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। সে সভয়ে হাত তুলে নিল।

—'কী হল? বেটি নিলে তাহলে।' সাধু আবার হুঙ্কার দিলেন। 'তোর মনোরথ পূর্ণ হলে মুক্তোটা নিয়ে যাস। এ বেটি সোনা ছাড়া কিছু বোঝে না।' গলায় জবাফুলের মালা। কপালে সিঁদুরের টিপ, হাতে একটা চ্যাঙারিতে প্রসাদ, তনুশ্রী বেরিয়ে আসতে একটি বব চুল আধুনিকা মহিলা আকুল হয়ে বললেন—'আপনার কাজ হল?'

—'হবে তো বললেন।' তনুশ্রী যেন যন্ত্রের মতো বলছে—'আপনার কী?'

—'ছেলের লিউকিমিয়া বলছে ডাক্তার', মহিলা রুমাল দিয়ে নিজের মুখটা চেপে ধরলেন। একজন অপেক্ষমাণা শান্ত চেহারার শ্রীমতী মহিলা বললেন—'যান না দিদি যান, মায়ের কৃপা হলে ছেলে ভাল হয়ে যাবে। আমার স্বামীর লাং ক্যান্সার সেরে গেছে।'

—'সেরে গেছে'? ভদ্রমহিলা ব্যাকুল গলায় বললেন। 'একেবারে? তাহলে এসেছেন?' শান্ত চেহারার মহিলা বললেন—'উনি একেবারে ভাল হয়ে গেছেন। এবার এসেছি ছেলের চাকরির জন্যে। আমরা সব সময়ে মার কাছেই আসি, মা-ই ভরসা। গলায় হাত দিয়ে ব্লাউজের মধ্যে থেকে একটা মোটা বিছে হার টেনে বার করলেন তিনি।

—'ওর আরোগ্যের জন্যে এটিও দেব,' বলে তিনি হাত দুটো জড়ো করে নমস্কার করলেন।

তনুশ্রী বেরিয়ে এসেছে। যেন ভাল করে চলতে পারছে না। কোনওমতে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

তাহলে তার অনুমানই ঠিক? বিজু রায় এই বয়সে অন্য কোনও মহিলার, কিংবা কে জানে হয়ত মেয়ের, অনেক ছোট মেয়ের মোহে পড়লেন? তনুশ্রী আর ভাবতে পারছে না, ভাবতে পারছে না। কাগজে এই 'সাধুবাবা'র বিজ্ঞাপন পড়ে সে ছুটে এসেছে। বাণ মেরে দিয়েছে। সম্ভব এভাবে বাণ-টান মেরে দেওয়া? আসলে বোধহয় ওইটুকুই ঠিক। বিজু রায়ের অন্য নারীর মোহে পড়ে চলে যাওয়াটা। বাকিটা কি আর ঠিক হবে? বাণ-টান এই যুগে?

তিতি বলল—'মা, তুমি এত কী ভাবছ? তুমি কিন্তু এখনও বাথরোব গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে, ওঠো, ড্রেস করো।' সে পাশের ঘর থেকে মায়ের হাউস কোট টোট নিয়ে এল। জোর করে একটু তুলে ধরল মাকে। এমন সময়ে টেলিফোনটা আবার বাজল।

তিতি দৌড়ে গিয়ে ধরল।—'হ্যালো?'

—'নীলাদ্রি আছে?' মেয়ে-গলা।

—'এইমাত্র বেরিয়ে গেছে। কিছু বলতে হবে?'

—'আপনি কে কথা বলছেন?'

—'আমি নীলাদ্রির বোন।'

—'আচ্ছা আঙ্কল ফিরে এসেছেন?'

—'আপনি কে জিজ্ঞেস করতে পারি?' তিতির গলা সতর্ক, রুক্ষ।

—'আমি শুক্তি। নীলাদ্রির বন্ধু। ভীষণ ওয়ারিড হয়ে রয়েছি। নীল কোনও খবরও দিচ্ছে না।'

—'না। বাবা এখনও ফেরেননি।' তিতি টেলিফোনটা রেখে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল। আচ্ছা নাছোড়বান্দা মেয়ে তো! গোপনতা সে পছন্দ করছে না ঠিকই। তাই বলে যে যেখানে আছে সে-ই তাদের পারিবারিক সমস্যার ব্যাপারে নাক গলাবে নাকি? আরও রুক্ষ হওয়া দরকার এই সমস্ত বড় নাকওয়ালিদের সঙ্গে।

—'হ্যালো।'

—'তিতি আছে?'

—'বলছি।'

—'আমি অর্জুন। কোনও খবর পেয়েছিস?'

—'না।'

—'ও। কোনও ব্যবস্থা করা হচ্ছে খোঁজার?'

—'প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি।' সংক্ষেপে বলল তিতি।

—'ও, তনুমাসি কেমন আছেন?'

—'ভাল না।'

—'ও।'

—'তিতি।...শুনছিস?'

—'শুনছি।'

—'ভাবিস না। আমি আছি।'

তিতি বলল—'ও'। বলে ফোনটা রেখে দিল।

তিতি সেন্টার পার্লারে ঠিক ভ্যান গখের আত্মপ্রতিকৃতিটার তলায় বসল। একটা পিঠ হেলানো চেয়ার ওখানে। হাতলগুলোর প্রান্ত বাঘ সিংহের থাবার মতো। পৌলোমীর বাবা নেই। মানে চলে গেছেন। অন্য এক মহিলাকে নিয়ে থাকেন। পৌলোমীর মা দাঁতে দাঁত চেপে আছেন। কিছুতেই ডিভোর্স দেবেন না। এইরকম অবস্থাতেই পৌলোমী বারো বছর থেকে উনিশ বছরের হয়ে উঠেছে। ছোটবেলায় পৌলোমীদের বাড়িতে গিয়ে অনেক আদর খেয়েছে তিতি। সে মাসিকে স্নেহশীলা বলেই জানত। এখন যায় না। যদি কখনও যেতে বাধ্য হয়, তার সামনেই উনি পৌলোমীকে অতি তুচ্ছ

কারণে বিশ্রীভাবে বকাবকি করেন। রুক্ষ, শ্রীহীন চেহারা। তেমনি রুক্ষ স্বভাব। পৌলোমী মেয়েটা ভিতু-ভিতু, নরম প্রকৃতির। একেক সময়ে বলে—'আমার তেমন সাহসও নেই রে তিতি যে সুইসাইড করি।' তার আরেক বন্ধু অনুভবের তো আরও খারাপ অবস্থা। বাবা কিছু না বলে, এতটুকু টের পেতে না দিয়ে কোনও বিদেশি য়ুনিভার্সিটিতে গিয়ে চাকরি নিয়ে বসে আছেন। সবাই অনুমান করে তিনি সেখানে দ্বিতীয় সংসার পেতেছেন। অনুভবের মা অনেক কষ্টে একটা ক্যানটিন করেছেন। সেইটা দিয়েই সংসার চালান। অনুভব ক্রমশই গম্ভীর, আরও গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে। তাকে নিয়ে অনেকে ঠাট্টা তামাশাও করে। তিতি একদিন বলেছিল—'তুই ওরকম দূরে দূরে থাকিস কেন রে?'

—'জানিস না?' অনুভব বলেছিল—'আয়্যাম আ লেপার।'

তিতির মা বাবা উভয়েই আছে। যদিও তাদের কারও সঙ্গেই তার মনের কোনও যোগ নেই। কিন্তু সে যা চায় তাই পায়। তেমন ভাবে চায় তেমন ভাবে। অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছে তার বাবা-মা। তার বন্ধু শ্রীরাধাদের বাড়িতে সকলে খুব অন্তরঙ্গ। বাবা মা ঠাকুমা, ওরা দুই বোন, এক ভাই। একসঙ্গে খায় রাত্তিরে। বাবার সঙ্গে খুনসুটি করে, মাকে মনের প্রাণের কথা বলে, দোষ করলে ঠাকুমার আঁচলের তলায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু খুব আঁটোসাঁটো নিয়মও আছে তেমনি। কোনও আউটিং, এক্সকারশনে চট করে যাবে না, বলবে—'জানিস না তিতি, ঠাকুমা বুড়ি রাত্তিরে ঘুমোতে পারবে না। ওই রে রাধু বুঝি ধর্ষিত হয়ে গেল। আমার দুঃখের কথা আর বলিস না রে।'

ওদের সবাইকার ভীষণ আড্ডা জমে যায় কোনওদিন, সাতটা বাজলেই শ্রীরাধা লাফিয়ে উঠবে—'ইস্ আমি যাই।' কী ব্যাপার, না 'বাপিন এসে রাধুকে না দেখতে পেলে ফিট হয়ে যাবে।' তিতি তাই অন্তরঙ্গতা চায়নি। তার বাড়িটা নীরস-এটা সত্যি। কিন্তু নিজের মতো চলবার উপায়টা তো আছে। আবার এই স্বাধীনতাও তো একটা আপেক্ষিক ব্যাপার? বাবা না থাকলে তিতির নিজেকে-নিয়ে-ব্যস্ত থাকতে ভালবাসা মা যদি হঠাৎ পৌলোমীর মায়ের মতো বাঘিনী হয়ে যায়, যদি হয়ে যায় অনুভবের মায়ের মতো নিঃস্ব ভিখারিনী। তিতিও তো হয়ে যাবে আরেক অনুভব। হয়তো আরেক পৌলোমী। এই বাড়ি, আসবাব, দাস-দাসী? বিলাস, গাড়ি, সম্মান সব, সবই তো বাবার! তার নিজস্ব নয় তো কোনওটাই।

সিঁড়ি বেয়ে শব্দহীন কিন্তু দ্রুত পায়ে উঠে আসছে অর্জুন। তিতি এতই চিন্তামগ্ন যে সে দেখতেও পাচ্ছে না। বুঝতেও পারছে না। অর্জুনের পরনে একটা পা চাপা যোধপুরী পায়জামা, একটা খাদির পাঞ্জাবি। একটা গরম জহরকোট। সিঁড়ির মাথায় চটি জোড়া খুলে একপাশে সরিয়ে রেখে সে এদিক ওদিক দেখল। আগে দু একবার সে এখানে এসেছে। তিতির বন্ধুর দলের সঙ্গে। মোটামুটি তিতির ঘরটা চেনে। কিন্তু ঘর অবধি যাবার দরকার হল না। ভ্যান গখের নীচে অবিকল ওইরকম অসুখী চেহারা নিয়ে বসে আছে তিতি। সে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তিতি চমকে তাকাল। বলল—'তুই?'

—'কাছেই একটা পাবলিক বুথ থেকে ফোন করছিলাম। চলে এলাম। তনুমাসি কোথায়!'

বাবার শোবার ঘরের দিকে আঙুল দেখাল তিতি। অর্জুন খুব স্বচ্ছন্দ ঋজু ভঙ্গিতে চলে গেল ঘরটার দরজার আছে। পর্দায় হাত রেখে বলল—'আসব?'

—'কে?'

—'তনুমাসি আমি। আমি অর্জুন। মঞ্জুর ছেলে। চুঁচড়োর মঞ্জু। মঞ্জু পাঠাল আমায়।'

তনুশ্রী অবাক হয়ে উঠে বসলেন। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—'মঞ্জুদি? চুঁচড়োর?'

—'হ্যাঁ। তোমার যদি কিছু দরকার থাকে তো বলো। আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারো। আমি অনেক রকম জানি। জানি। পারি।'

—'কী পারো। কী জানো?' তনুশ্রীর অবাক হওয়া এখনও ফুরোয়নি।

—'এই ধরো মন্ত্রতন্ত্র, ঝাঁড়ফুক' ঠাট্টার মতো করে বলল অর্জুন, তারপরে আরেকটু গম্ভীর হয়ে বলল—'মেসো রেসপনসিব্‌ল লোক, এতগুলো মানুষ চরাচ্ছেন, এত ভয় পাচ্ছ কেন? ঠিক চলে আসবেন?'

—'কিন্তু যদি গুণ্ডাদের হাতে পড়ে থাকে?' তনুশ্রী এতক্ষণে বললেন।

—'সেটাই। কিন্তু কেন পড়বেন?' অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

—'মঞ্জুদি কেমন আছে? আর হরিশঙ্করদা?'

—'মা ভালই আছে। আর ছোটকাকা? ছোটকাকা তো আজ চার বছর তিন মাস বাইশদিন হল নেই।'

—'নেই?' তনুশ্রী কীরকম ফাঁকা গলায় বললেন।

—'নেই।' অর্জুন হাসল।

'মেসোকে আমরা খুঁজে বার করবই—তুমি ভেবো না।' অর্জুন বেরিয়ে এল। তিতি এই পুরো ব্যাপারটায় কোনও অংশ নেয়নি। সে হাঁ করে দেখছিল, যেন একটা নাটক। অর্জুন যখন একটু নুয়ে তার বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল তার অর্জুনকে খুব লম্বা লাগল। অর্জুন লম্বাই। কিন্তু আরও যেন লম্বা লাগল। তার পেছন পেছন তনুশ্রী বেরিয়ে এসেছেন।

'অর্জুন, এই তিতি, আমার মেয়ে, তিতি, অর্জুন আমার মাসতুতো দিদি মঞ্জুদির ছেলে। মঞ্জুদি আমায় ভীষণ ভালবাসত। এখন তোর বাবার খবর জানতে পেরে অর্জুনকে পাঠিয়ে দিয়েছে। অর্জুন তুমি খেয়ে যাবে, তিতির সঙ্গে গল্প করো। তিতি হয়ত তোমারই বয়সী হবে।' সমস্তটাই ধৈর্য ধরে শুনে গেল দুজনে। তিতি শেষকালে বলল, 'মা, অর্জুন আর আমি যে একসঙ্গে পড়ি। ও আমাদের বাড়ি আগেও এসেছে।'

—'সে কী? কখনও বলিসনি তো!'

—'না, মানে জানতুম না তখন, সম্প্রতি জেনেছি' অর্জুন আরও খানিকটা লম্বা হয়ে বলল।

—'আমি একটু তেতলার ঘরে যাব? মাসি?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ যাও না।' তনুশ্রী সাগ্রহে বললেন কেন কে জানে! শ্বশুরবাড়ির কাউকে জানানো তাঁর মত নয়। কিন্তু বাপের বাড়ির দিকে কেউ যখন জেনে গেছে! মঞ্জুদি ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে, মনে হচ্ছে বেশ বুদ্ধিমান, বলিষ্ঠ, নির্ভরযোগ্য ছেলে তখন...তনুশ্রীর এতক্ষণের ভারী-হয়ে-থাকা বুকটা যেন একটু হালকা লাগছে। এই বিপদের মুহূর্তে মা-বাবা না-থাকাটাই যথেষ্ট দুঃখের। দিদিরাও সব দূরে দূরে। কিন্তু মঞ্জুদি। মঞ্জুদি আছে। খোঁজ নিচ্ছে। অর্জুন এসেছে, অর্জুন। আ-হ!

অর্জুন আর তিতি ওপরে চলে যাবার পর ফোনটা আবার বাজল। ওরা কেউ নেই, যে ধরে? তনুশ্রী ফোন-যন্ত্রটার দিকে বিরক্ত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলেন। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে বেজে যেতে দেওয়া তো ঠিক নয়! একটু পরে তাঁকে ধরতেই হল।

—'তনুশ্রী আছে?'

'বলছি।'

'আমি সেজদিভাই। আজকের 'আনন্দবাজারটা' দেখেছ?'

'আনন্দবাজার' তাঁদের বাড়িতে আসে না। কিন্তু এত কথা তনুশ্রী বললেন না। সংক্ষেপে বললেন—'না। কেন?'

—'বড়দি মারা গেছে। শাঁটুল কাগজে দিয়েছে। আমি এইমাত্র দেখলুম তোমার ভাসুর দেখালেন। কী কাণ্ড! বলা নেই, কওয়া নেই। কতদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই! হুট করে...'

তনুশ্রী বললেন, 'বয়স হয়েছিল...'

—'তাই বলে এমন হুট করে? মা তো কমাস আগেই গেলেন। তখনই দেখেছিলুম অবশ্য চেহারাটা খুব খারাপ। তা তোমরা কী ভাবছ?'

—'কী ভাবব? আমি তো এইমাত্র শুনলাম।'

—'বিজুকে অফিসে একটা ফোন করো না, আমাদের সবারই তো কিছু সামাজিক কর্তব্য আছে! এ সময়ে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো দরকার। সবাই মিলে একসঙ্গে যাওয়াই তো ভাল!'

তনুশ্রী চুপ করে রইল। সেজজা বললেন—'কী হল?'

—'আমি এখন কিছুতেই যেতে পারব না সেজদিভাই!' একেবারে ন্যাড়া-ন্যাড়া গলায় বলতে বলতে কীরকম ফুঁপিয়ে উঠলেন তনুশ্রী।

সেজজা বললেন—'কী হয়েছে? তোমাদের অ্যাসোসিয়েশনের কিছু চলছে নাকি? তুমি যদি যেতে না-ও চাও বিজুকে তো যেতেই হবে।'

'না না, ও যেতে পারবে না।' তনুশ্রী কথা শেষ করতে দিলেন না।

সেজজা তনুশ্রীর খেয়ালিপনার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত। দু চোখে দেখতে পারেন না এসব। তবু ধনী মানী আত্মীয়। সেভাবে কিছু বলতে পারেন না। আজ উষ্মা সামান্য প্রকাশ করে ফেললেন—'বিজু কি নিজে বলেছে যে সে তার একমাত্র দিদির মৃত্যুর খবর শুনেও যাবে না? তুমি না হয় যেতে পারো। তোমার সেজদা বলছেন দিব্যকে ওর অফিস থেকে গাড়ি জোগাড় করতে বলবেন, দিব্যর অফিসের গাড়িতেই আমরা চলে যাব, বিজুকে ওর অফিস থেকে তুলে নেব না হয়। তুমি বরং বিজুকে একটা ফোন করে রেখো। আচ্ছা আমিই করছি।'

সেজজা গাড়ির ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই বললেন। তাঁদের গাড়ি নেই। কিন্তু দিব্য ইচ্ছে করলে গাড়ি পেতে পারে। এখন সে সি. ই. এস. সি-তে রয়েছে। এই ধনী আত্মীয়রা একসঙ্গে কোথাও যাবার প্রসঙ্গ উঠলেই মনে করে তাদের গাড়িগুলোর সুবিধে আদায় করার জন্যে সবাই মুখিয়ে আছে। নিজেরা নিজেদের অকাজে শত সহস্রবার বেরোবে। স্বামীর আলাদা, স্ত্রীর আলাদা, ছেলের আলাদা, মেয়েরও বোধহয়। কিন্তু কোনও সামাজিক কাজে ব্যবহারের সুদূরতম সম্ভাবনা দেখলেই এরা গুটিয়ে যায়। তিনি এসব জানেন। তাই আশ্বস্ত করলেন ধনী ছোটজা-কে। কিন্তু তনুশ্রী রিসিভারের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন—'না না, সেজদিভাই ওকে অফিসে ফোন করতে হবে না, কোরো না।'

খুব অপমানিত বোধ করলেন সেজজা। ইচ্ছে হল বলেন—তিনি ফোন করলে কি বিজুর অফিসখানা ক্ষয়ে যাবে? কিন্তু এইসময়ে তাঁর কানে ধরা পড়ল ফোনের ওদিকে তনুশ্রীর গলাটা যেন কেমন বিকৃত। তিনি বললেন—'কী হল, তনুশ্রী, তোমার কি শরীর খারাপ? বিজুর কিছু হয়েছে?'

'ও এখানে নেই।' এখনও গলাটা কেমন বিকৃত। সেজজা বললেন—'আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখা যাক, আমরাই...আচ্ছা ছাড়ছি।'

ফোনটা রেখে অদূরে-বসা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'কী ব্যাপার বলো তো? তনুশ্রীকে খুব ডিসটার্বড্ মনে হল! বিজুর সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে, নাকি?'

'ওদের ব্যাপার ওরাই জানে।' বিজু রায়ের সেজদা কাগজটা পাট করতে করতে বললেন। ...'যাবে না বলেছে যখন, না-ই যাক। বিজুর সঙ্গে বড়দির কি-ই বা সম্পর্ক! বড়দি আমাদের যতখানি ছিল...' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কাননবিহারী।

'কই কোনদিন তো বড়দির সঙ্গে তোমাদের তেমন কোনও 'এসো বসো' দেখিনি!'

'সে বড়দি দূরে থাকত, শ্বশুরবাড়ি খুব গোঁড়া...' ঢোক গিলে বললেন কানন।

'সুখচর এমন কী দূর! গোঁড়ার সঙ্গে সম্পর্ক কী!'

কোনও জবাব পেলেন না ভদ্রমহিলা। পরিবর্তে তাঁর স্বামী বললেন,—'বলছে যখন যেতে পারবে না, নিশ্চয়ই কিছু অসুবিধে আছে। কী দরকার ঘাঁটিয়ে। থাকতে দাও না নিজেদের মতো!'

'তাই বলে নিজের দিদির মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে একবার গিয়ে দাঁড়াবে না? কিছু মনে কোরো না—অমন বড়লোকের মুখে আগুন।' বলে মহিলা আর দাঁড়ালেন না। স্ত্রী একেবারে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেলে, কানন ধীরে-সুস্থে মেজদা গগনের বাড়ি ফোন করলেন। হ্যাঁ মেজদা জানে,

ওরাও কাগজে দেখেছে। চিঠি আসেনি শাঁটুল নিজে এল না সুতরাং মেজদা যেতে চায় না। কানন বললেন—'কাজে যাবে কি না সে না হয় পরে ঠিক করা যাবে। আপাতত তো ঘুরে আসা যাক।'

'দিদিকে দেখতে পাব না। শাঁটলোটা বকে গেছে। কী একটা বেজাত বিয়ে করেছে শুনতে পাই। কার কাছে যাব? অসুখের খবরটা পর্যন্ত জানতে পারলুম না!' সখেদে বললেন মেজ গগন।

'হয়তো অসুখ কিছু হয়নি। হঠাৎ সেরিব্রাল কি করোনারি অ্যাটাক!' কানন বললেন।

'হ্যাঁ, তা অবশ্য হতে পারে। আমায় দুটো দিন সময় দাও। তোমার বউদির আর্থরাইটিসটা বড্ড বেড়েছে।'

এবার বিজুর অফিসে ফোন করলেন কানন।

'বি. বি. রায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'আপনি কে বলছেন।'

'আমি ওঁর দাদা, সেজদা।'

ফোনটা হাতে নিয়ে সাধন বিশ্বাস খুব দ্রুত চিন্তা করে নিলেন। বউদি ওদিকে থেকে আদেশ দিয়ে রেখেছেন কেউ যেন জানতে না পারে। এদিকে সাহেবের নিজের দাদা ফোন করছেন। তিনি বললেন—'উনি তো এখন, অর্থাৎ এখানে নেই।'

'কবে ফিরবে?'

'তা তো কিছু জানিয়ে যাননি।'

'আচ্ছা। উনি এলে জানিয়ে দেবেন ওঁর বড়দি, সুখচরের, মারা গেছেন হঠাৎ।' ফোনটা চুপ হয়ে গেল। রিসিভারটার দিকে বিচলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সাধন বিশ্বাস। তিনি ছাপোষা মানুষ, ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করেন। এ কী কাণ্ড! সাহেবের দিদি মারা গেলেন, তিনি জানতেও পারলেন না? কোথায় গেলেন? ছেলেমেয়ে বউদিদি সবাই অদ্ভুত ব্যবহার করছে! সাহেব কি কোনও বিপদে পড়েছেন? এতদিন হয়ে গেল না একটা খবর, না কিচ্ছু!

।। ৯ ।।

আজ রাতটা খুব ভাল ঘুমোলেন বিজন। কদিনের প্রচণ্ড খাটাখাটুনি শেষ। শমিতের ব্যাপারটার বেশ ভালভাবে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। সব কিছু অরিন্দম দত্ত বলে একজন অ্যাডভোকেটের হাতে তুলে দিয়ে এসেছেন। তাঁর নিজের লিগ্যাল অ্যাডভাইসার সুখেন্দু। কিন্তু এ ব্যাপারে সুখেন্দুর কাছে তিনি যাননি। অরিন্দমকে দিয়েও খুব মাঝে মাঝে তিনি কাজ করিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারটা অরিন্দমই যা করার করবে। শমিত এখন একরকম মুক্ত। দু-একটা পার্টি খুব হম্বিতম্বি করছিল, কিন্তু অরিন্দম সেটা সামলে নিতে পেরেছে। দিদির কাজ উপলক্ষে খুকি-টুকি উভয়েই আসছে। শমিত বাড়ির ব্যাপারে ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করুক। তিনি তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন—এ নিয়ে যেন অনর্থক ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে সে না যায়। দিদিরা যদি ভাগ চায়, ন্যায্য ভাগ তাদের দিতে হবে। তবে আপাতত যে বাড়ি মর্টগেজ দিয়ে সে তার ব্যবসায়ে ক্ষতির টাকাটা জোগাড় করতে বাধ্য হয়েছে, এটাও যেন সে দিদিদের বলে। এবং সবকিছু থেকে ছোটমামার নামটা তারা উহ্য রাখবে—এ প্রতিশ্রুতি আদায় করে এসেছেন। এটাতে শমিতের না হলেও রত্নার আপত্তি ছিল খুব। 'বাঃ আপনিই সব করলেন, কাউকে কিছু বলব না! কাজেতেও আসবেন না? কেন? আমাদের এত পাপের ভাগী করে যাচ্ছেন মামাবাবু?' তার চোখ ছলছল করছে। এ কদিনে সম্পর্কটা অনেক সহজ হয়ে গেছে, বিশেষত রত্নার সঙ্গে। বিজু তাকে হাসাবার জন্য বললেন—'শমিতও তো কত মাস ছুপিয়ে ছিল, এ ব্যাপারটা তো অন্তত তোমার জানার কথা বউমা। আমিও কিছুদিন যে কারণেই হোক ছুপকে থাকতে চাইছি।'

হাসার বদলে রত্না গম্ভীর বিষণ্ণ হয়ে গেল। তখন বিজু রায় বুঝতে পারলেন তিনি বেফাঁস বলেছেন,

এবং তিনি বিজু রায়। শুধু বিজু নন। শেষে বললেন 'বউমা যা হবার হয়ে গেছে, অতীত নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না একদম। সবসময়ে পাপ-পাপ করবে না। আমি বিশেষ কারণে বাইরে যাচ্ছি। ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাই। তোমরা মন দিয়ে দিদির কাজ করো। আমি কাজ শেষ হলেই আবার আসব। 'শ্রাদ্ধের বাজার টাজার রত্নাকে নিয়ে অনেকটাই করে দিয়ে এলেন বিজন। পর দিনই কাজ। তিনি এবার ডুব মারবেন।

কদিন পর রাত্রে মেসে ফিরতে হরিহর একটা ভারী প্যাকেট দিল। বেশ ভারী। বলল—রফিকের লোক দিয়ে গেছে। কেমন একরকম চোখে বিজুর দিকে তাকাল হরিহর। বিজু বললেন—'হরিহর তোমার টাকাটা রাখো। পার্সে আলাদা করে ছহাজার টাকার একটা প্যাকেট রেখেছিলেন তিনি।

'এত টাকা, বাবু?'

'তুমি যে ধার দিয়েছিলে নলিনীদাকে! সুদসুদ্ধ ফেরত দিলাম। 'হতভম্ব হরিহরের চোখের সামনে দিয়ে বিজু রায় ওপরে উঠে গেলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে রফিকের দেওয়া প্যাকেটটা খুলে দেখে তিনি হরিহরের চেয়েও হতভম্ব হয়ে গেলেন। নলিনী করের ট্রাঙ্কের মধ্যে রেখে দিলেন প্যাকেটটা। তারপর আর দাঁড়াতে পারলেন না। ভয়ানক ঘোরাঘুরি, খাটুনি যাচ্ছে। হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লেন। এত দিনে ভাল শীত পড়েছে। এ রকম জাঁকিয়ে শীত পড়লে তাঁর ঘুম ভাল হয়। টেনশন সত্ত্বেও।

সকালে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন। একে একে মণিময়, নিতাই ভটচাজ, চাঁদু মিত্তির আর প্রতুল বিশ্বাস এসে ঢুকলেন।

'আরে আসুন আসুন'—খুশির গলায় বললেন বিজন।

তক্তাপোশের ওপরে বসল ওরা চারজন।

—'কী ব্যাপার?' চায়ে চুমুক দিয়ে বলল বিজন।

মণিময় মাথা চুলকোচ্ছে।

'কিছু বলবেন মনে হচ্ছে?' বিজন অবাক হয়ে বললেন।

'হ্যাঁ মানে এ-ভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না বিজনদা।'

'কীভাবে? কী ব্যাপার?'

'আমরা আপনাকে জাস্ট আউট অফ কার্টসি নলিনীদার ঘরখানা দিয়েছিলুম তার মানে এই নয় যে....'মণিময় চুপ করে গেল।

'কী আবার? আপনি জানেন না?' তেরিয়া হয়ে নিতাই ভটচাজ বললেন, 'দিনের পর দিন এখানে বসে বসে নলিনীদার টাকা আত্মসাৎ করছেন?'

'ও।' বিজু রায়ের ভেতরটা কেমন নিভে গেল। এ কদিন যা-ই করুন, যেখানেই যান, যত পরিশ্রমই হোক কেমন একটা চোরাস্রোতের মতো আনন্দধারা বইছিল। বইছিল যে সেটা তিনি সচেতনভাবে বুঝতে পারেননি, এখন সেটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বুঝতে পারলেন। তিনি নিজের ভাবান্তর যথাসাধ্য গোপন করে বললেন—'আমাকেই তো আপনারা নলিনীদার ওয়ারিস সাব্যস্ত করেছিলেন, সমবেত ভোটে। করেননি?'

'সেটা তো ঠাট্টা, জাস্ট কার্টসি।'

'তাই বুঝি? আমি সেটা তলিয়ে বুঝিনি। তা নলিনীদার টাকা আত্মসাৎ করছি, কে বললে?'

'সে যে-ই বলুক, সাইমন বলে বেঁটেমতো লোকটা ঘাঘু পেনসিলার ছিল, সবাই জানে, নলিনীদা সাট্টা ফাট্টা, রেস-টেস করে জীবনধারণ করতেন। আমরা সবাই জানি।'

'ও, জানতেন?'

'আপনি ওরকম ব্যঙ্গ করে কথা বলছেন কেন? নিতাইবাবু খেঁকিয়ে উঠলেন। 'আমরা সবাই ভদ্দরলোক মশাই।'

'আমিও কিন্তু নিজেকে ভদ্রলোক বলেই মনে করি।'

'আমরাও করেছিলুম, এখন আর করছি না। নলিনীদার পাওনা-গণ্ডা সব ওই সাইমন আর রফিক চুকিয়ে দিয়ে গেছে। মোটা টাকা। আপনি নিঃশব্দে হজম করেছেন, তারপর থেকে আপনাকে আর ভদ্দরলোক ভাবতে ইচ্ছে করছে না।'

মণিময় বলে উঠল—'আহা হা হা, কী করছেন নিতাইদা, অত উত্তেজিত হলে কী করে চলে? বিজনদা আপনার কিছু বলার থাকলে নিশ্চয়ই শুনব। বলুন।'

বিজন বললেন—'যখন আপনারা ঠাট্টা করেই হোক, কার্টসি করেই হোক আমাকে নলিনীদার ওয়ারিস বললেন, আমি কিন্তু জিনিসটাকে গুরুত্ব দিয়েছিলুম। ঠাট্টা ভাবিনি। এখন ওয়ারিস যেমন সম্পত্তি পায়, তেমনি বকেয়া ঋণ-টিনও তাকেই মেটাতে হয়—এটা জানেন তো? তা সবচেয়ে বেশি অঙ্কের যে ঋণটা সেটা কিন্তু আমি গতকালই মিটিয়ে দিতে পেরেছি। আর উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছি—তা-ও আপনাদের সামনে রাখছি। হরিহরকে ডাকুন, সে-ই একমাত্র সাক্ষী।'

হরিহর এসে দাঁড়াল। তার মুখে আজ একটা উদ্ধত ভাব। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মুখচোখের ভাবের এমন পরিবর্তন হতে পারে বিজন কল্পনাও করেননি। তিনি বললেন—'হরিহর তুমি আমাকে সাইমনের দেওয়া প্যাকেটটা দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, আপনি বলেছিলেন কাউকে না বলতে।'

'কাউকে না বলতে বলিনি। সাইমন আর রফিক নামে এই লোকগুলিকে চট করে নলিনীদার মৃত্যুর খবরটা দিতে বারণ করেছিলুম।' হরিহর গোঁজ মুখে চুপ করে রইল।'

ট্রাঙ্কটা তক্তাপোশের তলা থেকে বার করে আনলেন বিজন। প্যাকেট দুটো বার করে সবাইকার মাঝখানে বিছানার ওপর রাখলেন, বললেন—'কোনটা সাইমনের দেওয়া, কোনটা রফিকের দেওয়া বুঝতে পারছ তো?'

'কেন পারব না!' হরিহর গোঁজ হয়েই বলল, 'ওই তো বালি কাগজের প্যাকেটটা সাইমন এনেছিল, আর ওই চটের ভারীটা কাল রফিক...।'

'ঠিক আছে চিনতে পেরেছ। আচ্ছা মণিময়, তুমি কাইন্ডলি প্যাকেটগুলো খোলো তো। 'পাতলাটাই খোলো না হয় আগে!'

মণিময় ইতস্তত করতে লাগল। বিজন বললেন—'নলিনীদার ওয়ারিস তো আমি তোমরা বললেও হতে পারি না মণিময়, এক হতে পারো তোমরা সবাই, তাঁর এতদিনের প্রতিবেশী, আর হতে পারে সে যাকে তিনি দিয়ে গেছেন। খোলো, খুলে দ্যাখো।'

নিতাইবাবু সাগ্রহে বললেন, 'আমি খুলছি।' প্যাকেট খুলে তিনি টাকার গোছাটা বিজয়ীর মতো বার করে আনলেন। চোখ চকচক করছে।

'ওতে পঞ্চাশ হাজার আছে। গুনে দেখুন।' বিজন বললেন, 'নলিনীদা সাট্টা খেলতেন। একটা রিস্ক নিয়েছিলেন পাত্তি টু পাত্তি খেলেছিলেন, পাঁচ টাকার। লাক ফেভার করল, কিন্তু মৃত্যুর পর। ওপ্‌নের খেলায় পাঁচ পাঁচশ হয়ে গেল। ক্লোজের খেলায় পাঁচশ ইনটু একশ হল পঞ্চাশহাজার। খুব রেয়ার লাক। কিন্তু ঘটল। আপনারা অনুধাবন করতে পারছেন নিশ্চয় ব্যাপারটা।'

সবাই চুপ। বিজন বললেন। 'যাক পুরো সংখ্যাটা যোগ দিয়ে কী দাঁড়ায় সেটা দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য। অন্য প্যাকেটটা খুলুন নিতাইবাবু। ওতে কত আছে...।'

নিতাইবাবু অসহিষ্ণুভাবে খুলতে লাগলেন প্যাকেটটা। বললেন, 'ওইটুকু পাতলা প্যাকেটে যদি পঞ্চাশ হাজার ধরে থাকে, তা'লে এটাতে পাঁচ লাখ, কিংবা হয়তো তারও বেশি। ...তা এটা তো আপনি ভাল করে খোলেনইনি দেখছি।' পোস্ট অফিসের পার্সেল যেমন হয় তেমন চটের' থলের ভেতর প্রচুর কুচো কাগজ, তুলে ফেলতে লাগলেন নিতাইবাবু। তারপরে তিনি হঠাৎ হিঁক করে

একটা ভয় পাওয়া আওয়াজ করে পিছিয়ে এলেন। সবাই ঝুঁকে দেখল একটা নীলচে রিভলভারের নল যেন তাঁদের দিকে তাক করে আছে।

বিজন বললেন—'এই হল নলিনীদার উত্তরাধিকার। পঞ্চাশ হাজার প্লাস একটি থার্টি এইট অটোম্যাটিক কোল্ট। যোগ করুন কী দাঁড়ায়। এছাড়া ঋণ ছিল হরিহরের কাছে পাঁচ হাজার। সেটা কবে নিয়েছিলেন জানি না, পুরো ছহাজার করে দিয়ে দিয়েছি কাল রাত্রে নিজেরই পকেট থেকে। কী হরিহর? দিইনি।'

হরিহরের মুখটা হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল।

'কী হরিহর, নলিনীদা তোমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার ধারতেন?' মণিময় জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের তো ব্যাটা চাইলে অনেক ভ্যানতাড়া করে তবে দেড়শো দুশো দিস কি না দিস। কাবলিঅলার মতো সুদ কাটিস। নলিনীদার শুকনো কাঠামোয় কী রস পেলি? যে একেবারে পাঁচ হাজার?' নিতাই ভটচাজ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন।

হরিহর গোঁজ মুখ করে বলল, 'বাবু যে আমায় ছহাজার টাকা দিয়েছেন তার প্রমাণ কী? বাজে কথাও তো বলতে পারেন।'

'অস্বীকার করছ না কি?' বিজন আশ্চর্য হয়ে বললেন। আশ্চর্য হবার শক্তি মানুষের চট করে ফুরোয় না। 'তুমি যে নলিনীদাকে পাঁচ হাজার কর্জ দিয়েছিলে তারই বা কী প্রমাণ আছে, হরিহর?'

মণিময় বলল, 'অফ কোর্স। তারই বা কী প্রমাণ আছে? আশ্চর্য বিজনদা কোনও প্রমাণ ছাড়াই আপনি অতগুলো টাকা ব্যাটাকে গ্যাঁট গচ্চা দিয়ে দিলেন? অদ্ভুত মানুষ তো।'

বিজন বললেন, 'কী? পঞ্চাশ হাজার প্লাস রিভলভারের যোগফলটা করতে পারলেন নিতাইবাবু?'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এই ব্যাটা হরিহর, তুই নিশ্চয়ই কিছু জানিস।'

হরিহর কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল—'রফিক মাগলার, খুব ডেঞ্জার লোক, আমি আর কিছু জানি না বাবু। সাইমন পেনছিলারের সিলিপ করবাবু বেরোবার সময়ে আমার হাতেই দিয়ে যেতেন। কিন্তু রফিকের কোনও সিলিপের কারবার ছিল না।'

মণিময় বলল, 'বিজনদার ছহাজার টাকা গেঁড়িয়েছিস, স্রেফ মিছে কথা বলে। শিগগির যা, ফিরিয়ে দে।'

'না না। থাক।' বিজন বললেন, 'নলিনীদার প্রাপ্য পঞ্চাশ হাজার কিন্তু ও নিয়ে নিতে পারত। নেয়নি। ওকে কিছু দিতে হবে না। তবে একটা কাজ করতে হবে। এটা আমরা যেমন ছিল আবার প্যাক করে দিচ্ছি। এটা ওকে ওর কাছেই রাখতে হবে।'

হরিহর একেবারে হাঁউমাউ করে উঠল। 'না বাবু না; ট্যাকা আমি ফেরত দিয়ে দিচ্ছি, ও জিনিস আমি রাখতে পারব না। দয়া করুন বাবু।' সে বিজনের পায়ে পড়ে গেল।

বিজন বললেন, 'তোমাকে শাস্তি দেবার জন্যে এটা করছি না হরিহর। বুঝে দ্যাখো, নলিনীদা মারা যাওয়ায় রফিকের সঙ্গে যোগাযোগ তোমার ছাড়া তো আর কারওই নেই!'

'রফিকের সঙ্গে আমার কিচ্ছু নেই বাবু, বিশ্বাস করুন। নলিনীবাবু না থাকলে স্রেফ দরজার ওপাশ থেকে প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলে—'নলিনীবাবু এলে দিয়ে দিবি, খবর্দার বেইমানি করে খুলবি না, যাঃ শালা ভাগ্।'

'ভালই তো হল। ও আবার আসবে। তখন প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, নলিনীবাবু নেই, মারা গেছেন। প্যাকেট নিয়ে যাও।' বিজন বললেন।

'কিন্তু যদি বলে কবে বাবু মরেছে, আগে বলিসনি কেন?'

'বলিস, ঘুমচোখে খেয়াল ছিল না।' মণিময় বলল।

বিজন বললেন, 'নিজের জিনিস ফেরত পেয়ে গেলে ও আর তোমাকে বিরক্ত করবে না।' তিনি যত্ন করে প্যাকেটটা যেমন ছিল তেমন করে রাখলেন; তারপরে হরিহরের হাতে দিয়ে বললেন—'যাও।'

প্যাকেট হাতে, চোখ মুছতে মুছতে হরিহর চলে গেল। মণিময় বলল, 'ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই আমরা বুঝতে পারলুম না, আপনি পেরেছেন বিজনদা।'

বিজন বললেন, 'নাঃ। স্মাগলিং-এর জিনিস যদি নলিনীদার কাছে রাখতে এসে থাকে, তো মাত্র একটা কেন? আবার হতেও পারে, ছোট স্মাগলার। হয়ত সময় সুযোগমতো ওটা বিক্রির সুবিধে পেলেই নিয়ে যেত। তখনই রাখবার মজুরি হিসেবে নলিনীদাকে কিছু পেমেন্ট করত। বুঝতে পারছি না ঠিক। আবার এ-ও হতে পারে খুনে গুণ্ডা। খুন-টুন করে অস্ত্রটা ওঁর জিম্মায় রেখে যেত। এইভাবে উঞ্ছবৃত্তি করেই পেট চালাতেন মানুষটা!' সবাই চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পর বিজন বললেন, 'যাক, ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে কী করব তার একটা নির্দেশ আমি নলিনীদার নোটবুকে পেয়েছি। উনি দাদু কাকে বলতেন, কেউ জানেন?'

'ওই তো, পাশের বাড়ির বাচ্চাটাকে?' দু-তিনজন বলে উঠলেন।

নোটবুকের লেখাটা মণিময়কে চেঁচিয়ে পড়তে বললেন বিজন। পড়ে মণিময় বলল, 'বিজনদা এর থেকেই ধরলেন, নলিনীদা কিছু টাকা পেতে পারেন, না?'

'হ্যাঁ।' বিজন হেসে বললেন, 'আর তা-ই দাদার মৃত্যুর খবরটা হরিহরকে চেপে রাখতে বলেছিলাম। সাইমন টের পেয়ে গেলে কি আর টাকাটা দিত? মাঝখান থেকে নলিনীদার দাদু ফাঁকে পড়ত।'

সবাই হাসতে লাগল। প্রতুলবাবু বললেন, 'কিন্তু বিজনবাবু, অভাবের সংসারে ও পঞ্চাশ হাজার টাকা আর কদ্দিন, দেখবেন হয়তো নেশা-ভাং করেই উড়িয়ে দিল।'

'করে নাকি? নেশা ভাং?' বিজন বললেন।

'কে না করে? আমি আপনি ভদ্দরলোক ছোটলোক, কে বাদ আছে নেশা করতে আজকালকার দিনে সেটাই বলুন না মশায়! কী আছে এই শালার জীবনে, স্বস্তি নেই, শান্তি সুখ নেই, আনন্দ নেই, কলুর বলদের মতো খালি ঘুরেই মরছি, ঘুরেই মরছি! নেশা কে না করে?'

'তা অবশ্য', বিজু চিন্তিত হয়ে বললেন, 'তবে বাচ্চাটা বা তার মা তো নেশা করবারও সুযোগ পায় না। আপনাদের যদি অনুমতি থাকে তাহলে আমরা টাকাটা খাটিয়ে তার ইন্টারেস্টটা দিয়ে খুকিদের সংসারে একটু সচ্ছলতা আনতে পারি। না হয় ওরা না-ই জানল সবটা। খুকি বড় হলে এটা পাবে। কী বলেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো করাই যায়।' মণিময় খুশি হয়ে বলল।

'তা হলে খামটা মণিময় তোমার হেফাজতে রাখো এখন, আমি দেখছি কী করা যায়।'

'আমার হেফাজতে কেন? বেশ তো ছিল!'

বিজন হেসে বললেন 'তা হবে না। একবার যখন সন্দেহভাজন হয়েছি, ও টাকাটা আমি আর রাখতে পারব না। আপনারা যেখানে নিরাপদ মনে হয় রাখুন, পরে ব্যবস্থা করে আপনাদের জানালে আপনারা যদি অ্যাপ্রুভ করেন তো নিয়ে যাব।'

মণিময়ও কিছুতে নেবে না। বিজনও কিছুতেই রাখবেন না। অবশেষে বিজনই জয়ী হলেন। প্যাকেটটা নিয়ে ওরা নীচে নেমে গেল। মেসমালিক প্রফুল্লবাবুর কাছে জমা রইল জিনিসটা। তিনি রীতিমতো রসিদে সই-সাবুদ করে দিলেন।

ভাল করে চান করে, দুপুরের খাওয়াটা একা একা সারলেন বিজন। সবাই যে যার অফিস চলে গেছে। শূন্য মেসবাড়ি। বিজন তেতলার কুঠুরিতে এসে চিঠিপত্রের তাড়া খুলে বসলেন।

"মা,

বিজুর সাফল্যের খবর শুনে গর্বে আনন্দে আমার বুক ভরে যায়। খালি মনে হয় একবারটি যদি দেখতে পেতুম! বিজু, সেই ফাজিল, স্কুল পালানো, গোঁয়ার বিজু আজ এত বড় হয়ে তোমাকে এত সুখে রেখেছে, এর জন্য কী বলে কাকে ধন্যবাদ জানাব ভেবে পাই না। কারণ মা, বিজুর যতই কৃতিত্ব থাক, লাক-ফ্যাক্টর একটা থেকেই যায়। তুমি লিখেছ বিজুর সংসার তার ছেলে মেয়ে

বউ আমার দেখতে ইচ্ছে করে কি না। দুঃখ পেয়ো না মা। করে না। আমার জগতে তো ওরা ছিল না। আমি আমার সেই বাঁধাঘাটের ছাদের রোগা হাফ প্যান্ট পরা, বড়-বড় দুষ্টু ভিতু চোখ বিজুকে দেখতে চাই। তাকে আর দেখতে পাব না মা। সেই দিনগুলো আর ফিরে আসবে না। কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কাউকে দোষ দিচ্ছি না। যা ঘটবার তা সব ঘটে যায়। আর ফেরে না। আর কখনোই ফেরে না। এই না ফেরা যে কী ভয়ঙ্কর যাকে অল্পবয়স থেকে নির্মূল হয়ে আসতে হয়, সে জানে। যে দেখতে পায় না ভাই কী করে বড় হল, মা-বাবা কী করে বুড়ো হল, দাদা-দিদিরা কীভাবে আরও বড়, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ হল। সে বড় অভাগা মা। তার জীবন থেকে অনেকটা সময় চুরি হয়ে যায়। এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়। তোমার জামাই, নাতি-নাতনি ভাল আছে। নাতি-নাতনির নাম জানতে চেয়েছ? একজনের নাম স্বপ্নেন্দু, আরেকজন ঈপ্সিতা। ওই বলেই ডাকি। প্রণাম নিয়ো।'

অনেক উল্টে-পাল্টে দেখলেন বিজু, ঠিকানা তো নেইই। পোস্ট অফিসের ছাপও নেহাতই অস্পষ্ট। অনেক কষ্টে, নলিনী করের ড্রয়ার থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা বার করে জানলায় আলোর ধারে নিয়ে গিয়ে গঞ্জ শব্দটা বুঝতে পারলেন। কিন্তু এ বালিগঞ্জ বা টালিগঞ্জ না করিমগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ? গঞ্জ তো একটা নয়!

এই একইভাবে বয়ে যাচ্ছে ছুটকির সকল চিঠির ধারা। মায়ের অসুখের খুঁটিনাটি, সুলতা ও শিবানীর কথা, আর ছুটকির একটা প্রশান্ত আকুলতা ভাইবোনেদের জন্যে, মায়ের জন্যে, বিশেষত বিজুর জন্যে। অবশেষে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে একদিন একটা চিঠির পোস্ট-অফিসের নাম উদ্ধার করতে পারলেন বিজন। চিনসুরা। বাস, শুধু একটুকু! এইটুকু তথ্য সম্বল করেই কি তিনি বেরিয়ে পড়বেন? বিজু ভেবে দেখলেন তিনি যখন অল্প বয়সে সৌভাগ্য খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন, তাঁর এই কুটোটুকুও সম্বল ছিল না। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। দ্বিতীয়বার বি-কম-এ বসতে হবে, বাড়ির এই অবধারিত নিয়মে ক্ষুব্ধ হয়ে, ছুটকি ফিরে আসবে বা কোনও খবর দেবে এই রকম একটা আশাকে শেষপর্যন্ত ছলনা, মায়া, মোহ বলে চিনতে পেরে, একদিকে বাড়ির প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণায় আরেক দিকে উপার্জন করবার, অনেক অনেক উপার্জন করবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন। ফল খারাপ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেকে একজন ভাগ্যের সুনজরের মানুষ বলে চিনতে পারেন আজকাল। যখন যেটাতে হাত দিয়েছেন, সফল হয়েছেন। মনের সুখ-শান্তির কথা আলাদা। স্বতন্ত্রভাবে তা খোঁজেনওনি তিনি কোনওদিন। বিপুল পরিমাণ কর্ম ও কর্মের মোহ, মোহই তো? তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। আর একটা জিনিস তাঁর দেখা হল, এই দ্বিতীয়বার তিনি বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। পালিয়ে দিদির সঙ্গে দেখা হল, দিদি যাবার সময়ে তাঁকে বড় ভালবেসে ডেকে গেল। দিদির ছেলেটির হয়ত একটা সুরাহা করে দিতে পারবেন, দীপিকার সঙ্গে ভাব হল, এই মেসবাড়ির মানুষগুলির কাছে সততার অগ্নিপরীক্ষায় পাশ করে গেলেন তিনি সসম্মানে, এই সমস্তই কিন্তু সাফল্য। নিঃসন্দেহে। হরিহরকে তিনি চিনতে পারেননি, সে বিশ্বাসঘাতকতার কাজটা করল। কিন্তু সাফল্যের তুলনায় এটুকু ব্যর্থতা কিছুই না। তাহলে তাঁর যে আসল লক্ষ্য, ছুটকিকে খুঁজে বার করা তাতেই বা তিনি বিফল হবেন কেন? অন্তত চেষ্টা করতে দোষ কী?

পরের দিন দশটা পনেরোয় ব্যাণ্ডেল লোকালে চেপে পড়লেন বিজন। যথেষ্ট ভিড়। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে মোটামুটি একটা সিট পেলেন। বসেই গোটা মুখটা বাইরের দিকে ফিরিয়ে বসলেন। আরও সকালের ট্রেনে যেতে পারলে বেশি নিরাপদ হতে পারতেন, কিন্তু পোস্ট অফিস খোলবার পরে তাঁকে যেতে হবে। পোস্ট অফিসই আপাতত তাঁর গন্তব্য। কেউ দেখে ফেললে একটু মুশকিল, ঠিকই। কিন্তু কী করা যাবে! এই ঝুঁকি নিয়েই তিনি কদিন আগে আটাত্তর নম্বরে সুখচর গেছেন।

একটা সাইকেল রিকশা নিলেন বাইরে বেরিয়েই।

'কোন দিকে যাবেন বাবু? হুগলির দিকে যাব? না এদিকে?' বিজু ইতস্তত করছেন দেখে রিকশাচালক

বলল 'ঠিকানাটা বলুন? দেখছি।'

বিজু বললেন, 'পোস্ট অফিসটা কোনদিকে?'

'কোন পোস্টাফিস? চুঁচড়া মেন?'

বিজু বললেন—'হ্যাঁ।'

তাঁর 'হ্যাঁ-এর মধ্যে দ্বিধার ভাব টের পেতে দেরি হল না রিকশাঅলার। এসব বিষয়ে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অনুকম্পনের সঠিক ব্যাখ্যা করা এদের কাছে কিছুই না। সে বলল, 'বাবু কি এদিকে নতুন? চলুন না চুঁচড়ো শহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসি! ডাকাতে কালী, ক্লক-টাওয়ার, জজের বাংলো, কমিশনারের বাংলো, ডাচ বাংলো, লঞ্চ ঘাট, ভূদেব মুখুজ্জের বাড়ি, অনেক দেখবার আছে এখানে। তিরিশটা টাকা দেবেন। বাস।'

বিজু বললেন—'পোস্ট অফিস খুব দূরে!'

'আজ্ঞে না তো! এই তো ঘড়ির মোড় পেরোলেই....'

'ওখানেই নিয়ে চলো।'

শন শন করে হাওয়া দিচ্ছে। যদিও রোদও যথেষ্ট! হুডটা এতক্ষণে নিশ্চিন্তে খুলে দিলেন তিনি। উল্টো দিক থেকে সারে সারে সাইকেল আসছে। এখান থেকে যারা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে তাদের অনেকেই নিশ্চয় সাইকেলে যায়। স্টেশনের বাইরে বোধহয় কোথাও সাইকেল জমা রাখে। ফেরবার সময়ে আবার নিয়ে নেয়। যারা যাচ্ছে বেশির ভাগই বয়সে তরুণ। ছাত্র গোছের। মেয়েও আছে। আরও বড় চাকুরে জাতীয় লোকও আছে। যুবক তরুণ যারা যাচ্ছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিজনের মনে হচ্ছিল এদেরই কেউ হয়ত স্বপ্নেন্দু। ছুটকির ছেলে। ছেলে কত বড়? ছেলে বড় না মেয়ে বড় এসব ছুটকি লেখেনি। যদি তার সেই বয়সের আশেপাশেই জন্মে থাকে, তা হলে স্বপ্নেন্দু আজ দিব্য-টিব্যর চেয়েও বড়, উপযুক্ত উপার্জনশীল যুবক। কিন্তু কেন কে জানে তাঁর ভাবতে ভাল লাগছে ছুটকির ছেলেমেয়ে তাঁরই চিন্টু-তিতির বয়সী। বেশি বড় নয়। ছেলেটার সবে দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে। নরম-নরম। এই রকম বয়সের ছেলের ওপর কি তাঁর দুর্বলতা আছে? এ দুর্বলতা আগে কখনও টের পাননি তো! চিন্টুকে কতদিন দেখেন না। চিন্টুটা ছেলেবেলায় তাঁর ভীষণ ন্যাওটা ছিল। এখন চিন্টু কী রকম হয়েছে? কী অদ্ভুত! তিনি চিন্টুর ছেলেবেলার মুখটা আবছা আবছা মনে করতে পারলেও এখনকার মুখটা ঠিকঠাক স্মরণ করতে পারছেন না। তিতির মুখটা বরং এক একবার চমক দিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। ওরা কোনও খবর কাগজে দিল না কেন? এটা খুব অদ্ভুত! তনুশ্রী! তনুশ্রীর মুখটাও ভাল করে মনে করতে পারলেন না তিনি। কী ভাবছে ওরা? পুলিশে খবর-টবর দিয়েছে তো? নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই নিশ্চয়! তবে ওদের কারও বুদ্ধির ওপরই কোনও ভরসা নেই তাঁর। তনুশ্রীটা তো একেবারে গাড়ল! আর ছেলেমেয়ে দুটো? কী পড়ছে? তা পর্যন্ত মনে করতে পারলেন না বিজু রায়। স্কুল পেরিয়ে গেছে। কলেজে তো নিশ্চয়ই! কিন্তু ঠিক কোন পর্যায়ে! জানতে হলে তাঁকে এখন এদের বয়স হিসেব করে দেখতে হয়।

রিকশাঅলা বলল, 'পোস্ট অফিস এসে গেছে বাবু।'

বিরাট হলুদ রঙের বিল্ডিংটার সামনে নেমে ভাড়াটা মিটিয়ে দিলেন তিনি। গেট ঠেলে ঢুকলেন। অনেকগুলো কাউন্টার। বেশ সরগরম চুঁচড়ো পোস্ট অফিস। তিনি টিকিটের কাউন্টারে দাঁড়ালেন। এঁদের কাছে কী বলে খোঁজ নেবেন তিনি? ঠিকানা নেই। পদবিটা কী? সেটা পর্যন্ত তিনি জানেন না। কোনওদিন বলা হয়নি তাঁকে।

'আচ্ছা দাদা, একটা খবর দিতে পারেন?' বিজু রায় কপাল ঠুকে জিজ্ঞেস করলেন।

শুকনো মতো বুড়ো ভদ্রলোকটি কিছু গোনাগাঁথা করছিলেন, একটু পরে মুখ তুলে বললেন, 'বলুন!'

'আমাকে দশটা খাম দেবেন?' বিজু রায়ের হঠাৎ মনে হল এটাই প্রশস্ত।

ভদ্রলোক বললেন, 'খাম তো অতগুলো হচ্ছে না, চারটে ইনল্যান্ড দিয়ে দেব নাকি?'

'তাই দিন।'

'আচ্ছা কেয়া, মানে শ্রীমতী কেয়ার নামে কোনও চিঠি...'

'কেয়া রায় তো? এই গোবিন্দ! গোবিন্দ!' তিনি একজনকে ডাক দিলেন। পিওনের পোশাক পরা লোকটি। 'বাঁ দিকের সর্টিং আপিসে যান এর সঙ্গে আমি বলে দিচ্ছি।' ভদ্রলোক বললেন।

গোবিন্দর পেছন পেছন বেরিয়ে বাঁ দিকে একটি বড় ঘরে অবাক হয়ে ঢুকলেন বিজন। ভেতরে কয়েকটি বড় বড় টেবিলে বসে বেশ কয়েকজন কাজ করছেন। একদম বাঁ দিকে খোপ খোপ কাটা একটা আসবাব। চিঠিপত্র ঢোকানো হচ্ছে সেখানে।

গোবিন্দ নামধারী হেঁকে বলল—'কেয়া রায়ের কোনও চিঠি এসেছে কিনা খোঁজ করছেন ইনি।'

টেবিলে-বসা একজন মুখ তুলে বললেন, 'রয়েছে দুটো। ওঁর কী হল? নিজেই তো নিয়ে যান। অসুখ-বিসুখ নাকি?'

বিজু সম্মোহিতের মতো বললেন, 'হ্যাঁ, জ্বরে পড়ে আছেন।'

'আপনি? লেটার অফ অর্থরিটি এনেছেন?'

ভদ্রলোক নিজের কাজে মগ্ন হয়ে গেলেন।

বিজু ভাবলেন—'ছুটকি নিজে আসে। এই পোস্ট অফিস থেকে নিয়ম করে এসে চিঠিপত্র নিয়ে যায়। যদি এখন, এই মুহূর্তে ছুটকি আসে? গয়নাগাঁটি পরা দোহারা চেহারার চওড়া পাড়-টাড়ের শাড়ি-পরা ছুটকি? ছুটকি কি তাঁকে চিনতে পারবে? রোগা-প্যাংলা সেই বিজুকেই ছুটকির মনে আছে। কিন্তু তিনি? ছুটকিকে দেখবামাত্র চিনতে পারবেন। তিনি ঠিক জানেন।

'কেন? মানি-অর্ডার-টর্ডার কি রেজিস্টার্ড কিছু এসেছে না কী? সেসব দিতে হবে না। সাধারণ চিঠি যদি কিছু থাকে তো দিন না। তার জন্য আবার অথরিটি লেটার-ফেটার কী হবে?' বিজন বললেন খুব সপ্রতিভভাবে, হেলাফেলার সঙ্গে। ভেতরে ভেতরে উল্লাসে তিনি ফেটে পড়ছেন। একেই বলে স্ট্রাইকিং পে ডার্ট। এখন শেষ রক্ষা হলেই হয়।

ভদ্রলোক নিঃশব্দে দুটো চিঠি এগিয়ে দিলেন। একটা ছাপানো পোস্ট কার্ড। কোথায় কোন সাধুর জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ। আরেকটা ইনল্যান্ড। পত্রপ্রেরকের নামের জায়গা নিজের সল্টলেকের বাড়ির ঠিকানা দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলেন বিজু রায়। হাতের লেখাটা অচেনা। কিন্তু ঠিকানাটা তাঁরই। চিঠি দুটো নিয়ে পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে একটু হেঁটেই অদূরে দেখলেন বিরাট পাঁচিল ঘেরা বাগান। গাছে গাছে। মনে হয় সরকারি বাংলো-টাংলো হবে। নিমেতে কাঠটগরেতে মিলে একটু ছায়া করেছে। পাঁচিলের ধারে সেইখানটায় দাঁড়িয়ে ইনল্যান্ডটা খুলে ফেললেন তিনি। কোনরকম বিবেক দংশনই হল না।

'সাবিত্রীসমানেষু মা ছোটখুকু,

নিজের হাতে লেখার শক্তি নেই, তাই শিবানী আমার নার্স মেয়েটি বড় ভাল মেয়ে তাকে দিয়ে লেখাচ্ছি মা। ওরাই আমার চিঠি ফেলে। কন্যার অধিক সেবাযত্ন করে। তোমার সেবা পাব সে ভাগ্য করে তো আসিনি মা সব কিছুই অত সহজ নয়। আমার কর্মফলে আমি ভুগছি তোমার দোষের চেয়ে বেশি দোষ আমার। পেটে ধরলেই মা হওয়া যায় না মা, তুমি তোমার ভালবাসার ডালি নিয়ে এসেছিলে মা, আমি তোমার পাপটাই দেখেছিলুম। আজ সর্বান্তঃকরণে বলে যাচ্ছি মা আমাকে মাপ কোরো আমি পাপ-পুণ্যের কিছু বুঝি না, জীবনে অনেক দেখলুম তোমাকে তোমার ছেলে-মেয়েকে আমার ছোট জামাইকে দেখবার সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল। সামনাসামনি আশীর্বাদ করবার সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল। একটু তোমায় বুকে টেনে চুমু খাবার জন্যে প্রাণটা আমার আঁকুপাঁকু করছে মা। সারাজীবনই করেছে। তোমার বাবা তোমার নাম মুখে নিয়ে স্বর্গে গেছেন। আমিও তাই যাব ছোটখুকু। তোর ঠিকানাটা মাকে কোনওদিনও দিলি না। ভালই করেছিস। আমার কর্মফল। খুকু মরতে

বড় দেরি হয়ে গেল মা। যদি ফিরে আসি যেন তোর মেয়ের কোলে ফিরে আসি আবার। নাতনিকে বুকে নিয়ে মনে করিস তোর ইতি, আঃ মা।”

চিঠিটা শেষ করে বিজন পাঁচিলের গায়ে হেলান দিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর হাত এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, পা দুটো এত শক্তিহীন, তাঁর কোথাও বসে পড়তে ইচ্ছে করছিল। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি কাঁদেননি। উননব্বই নব্বুই বছরের মায়ের মৃত্যুতে আটান্ন উনষাট বছরের ছেলের হয়ত কাঁদবার কিছু নেই। কিন্তু তিনি বড় শোকার্ত হয়েছিলেন। জীবনের সবচেয়ে বড় স্নেহের ভালবাসার বাঁধন ছিঁড়ে গেল টের পেয়ে তিনিও ভেতরে ভেতরে ছিন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু সে শোক তাঁর ভেতরেই বসবাস করছিল। আজ মফঃস্বল শহরের এক ছায়াময় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তাঁর চোখ দিয়ে ভীষণ গরম জল অনর্গল বেরোতে লাগল। এবং একবার কাঁদতে আরম্ভ করে তিনি দেখলেন তিনি কিছুতেই কান্না থামাতে পারছেন না। গোঙানির মতো শোকের হাহাকার বেরিয়ে আসছে। বুক ব্যথা করছে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে।

‘আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে? পেছন থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করল। ‘বুকে ব্যথা?’ আরেকজন।

কী বলবেন তিনি? চোখের জলে সমস্ত ঝাপসা দেখছেন। কোনওমতে চিঠিটা দেখিয়ে বললেন, ‘মায়ের...মৃত্যু সংবাদ...।’

‘আমরা কি আপনাকে একটু ধরব? একটু কোথাও বিশ্রাম করবেন? জল খাবেন?’

‘না, এখুনি সামলে যাব।’ এবার একটু স্পষ্ট করে বললেন বিজু রায়। রুমাল বার করে চোখ মুখ ভাল করে মুছলেন। কার্ডের চিঠিটাতে দেখলেন ঠিকানা লেখা রয়েছে স্পষ্ট অক্ষরে।

একটা খালি রিকশা যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি সেটা ধরে ঠিকানাটা বললেন তিনি। খুব লজ্জা পেয়েছেন। কত জনে তাঁকে এভাবে বেসামাল অবস্থায় দেখল কে জানে! কী দেখল? একটা আধবুড়ো লোক গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদছে। প্রকাশ্য রাস্তায়। কিন্তু তিনি তো এভাবে নিজেকে দেখেন না! দেখছেন না আর। তিনি তো আসলে বিজন, বিজু। একটা কুড়ি-একুশ বছরের ছেলে, গালে অল্প কুচো দাড়ি। এখনও ক্ষুর পড়েনি। যেসব বন্ধুর তাড়াতাড়ি দাড়ি গজিয়েছে তারা বলত—মাকুন্দ। সেই বিজু একেবারে কাঁচা, যার সদ্য ভগ্নীবিয়োগ হয়েছে, সে একরকম আত্মবিয়োগও তো বটে! মা বাবা দাদা দিদি সবাইকে ছেড়ে অচেনা-অজানা দুনিয়ার পথে একলা যাত্রী। বিজন।

মায়ের চিঠিটাতে তারিখ তেসরা অক্টোবরের। মা শিবানীকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছে। এতকাল পরে সেই চিঠি! পোস্টের গণ্ডগোল! এইরকম! অক্টোবরের চিঠি আসতে আসতে বছর ফুরিয়ে গেল? তিনি আবার পোস্টের ছাপটা পরীক্ষা করতে লাগলেন, পোস্ট করবার তারিখটা ভালই পড়া যাচ্ছে। সতেরো, বারো, বিরানব্বই। তার মানে? এ চিঠি মা শিবানীকে পোস্ট করতে দিয়েছিল। পোস্ট হয়েছে সতেরো বারোয়। মানে প্রায় আড়াই মাস পরে? আরে! বিজনের মনে পড়ল তেসরা রাত থেকেই মায়ের বুকের কষ্টটা শুরু হয়। তারপর দুটো দিন আর নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত ছিল না। শিবানীর তো নিশ্চয়ই ছিল না। মা মারা গেল, কাজের দিন অবধি শিবানী ছিল। তার পরেই বোধহয় মাইনে চুকিয়ে দিয়েছিলেন। চলে গেল চোখের জল মুছতে মুছতে। শিবানী কি ভুলে গিয়েছিল চিঠি ফেলতে? তার ব্যাগেই পড়েছিল চিঠিটা এতদিন! না কি বিজুর ভাগ্যই তাকে ভুলিয়ে রেখেছিল, তাকে দিয়ে পোস্ট করিয়েছিল ওই সতেরো বারো তারিখে যাতে বিজু পায়, বিজু হদিশ পায়। মায়েরও। ছুটকিরও।

রিকশাঅলা বলল, ‘এ তো অনেক্ দূর। নতুন সব ঘরবাড়ি হয়েছে এদিকে। জলা-জঙ্গল ছিল বাবু। ওসব মিউনিসিপ্যাল এরিয়া নয়। পঞ্চায়েতের। তবে সুন্দর সুন্দর বাড়ি উঠেছে আজ্ঞে। একতলা, দোতলা স্টেশন থেকে কাছে পড়বে।’

দূর থেকে পাড়াটা চোখে পড়ল। স্টেশন রোড থেকে ডাইনে নেমে যেতে হবে। একসার দোকান।

তারপর মাটির রাস্তা। উঁচু দোতলা বাড়ি। ছকোনা জলের ট্যাঙ্ক। আরও বাড়ি রয়েছে। এদিক ওদিক। তারাও সুন্দর। কিন্তু এটি যেন সগর্বে মাথা তুলে আছে। রিকশাঅলা বলল, 'বাতিঘর। ওই বাড়িই আমাদের নিশানা বাবু।'

চমৎকার বাড়িটি। ঢালু টালির ছাদ। এগুলো আসলে টালি নয়। সিমেন্ট জমিয়ে ওইভাবে করা। আজকাল করে। ফিকে লাইল্যাক রং বাড়িটাতে। জানলা-দরজাগুলো বন্ধ। ঘিয়ে রঙের। কার্নিসেও মেটে লাল রং। বাড়ির পাশ দিয়ে একতলার জমি থেকে দোতলার ছাদ বেয়ে ট্যাঙ্কের পাশে পর্যন্ত উঠে গেছে চমৎকার ঝিরিঝিরি লতা। ফুল নেই। কিন্তু লতাটিরই বাহার খুব। আশেপাশে অল্পস্বল্প জমি। রিকশাঅলা বাড়িটার কাছাকাছি হতে বিজন অবাক হয়ে দেখলেন—এই ঠিকানাই। "বাতিঘর"। নামটা দেওয়া নেই। কিন্তু ঠিকানা এটাই। তাই তো! তিনি অবাক হচ্ছিলেন কেন? বাতিঘর! অথই জলে নিরুদ্দেশ, কূলহারানো নাবিক ওই বাতিঘর দেখেই তো ভরসায় ফিরবে!

তিনি নেমে আগে রিকশাটিকে বিদায় করলেন। এখন অনেক চমক, চেনাচেনি, জানাজানি। অনেক অপ্রস্তুত নীরবতা। হিল্লোলিত আনন্দ। বাইরের কেউ সাক্ষী না থাকে। তিনি সন্তর্পণে বেলটা একবার বাজিয়েই হাত নামিয়ে নিলেন।

বাড়ির ভেতরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বেলের আওয়াজ। নিবিষ্টমনে শুনছে বিজু। দরজা খুলে গেল। বেগুনি পাড় একটা সাদাসিধে শাড়ি পরা রোগামতো মহিলা দরজা খুলে দিলেন। অনেক কালো চুলের মধ্যে অনেক সাদা চুল। কপালের ওপর দুটো সমান্তরাল রেখা। আনুভূমিক। ছোট্ট নাক, ঢেউ খেলানো ঠোঁট। মাজা কালো রঙের এক পাতলা মিষ্টি প্রৌঢ়া। বিজন হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে।

'কাকে চান?' কোনও কথা বলতে পারছে না বিজন। হাঁ করে দেখছে, সে যেন মিলিয়ে যাবে এখুনি ওই সাদা-কালো চুলের ঢালে, ওই বড় বড় পল্লব ঘেরা চেরা চোখের সাদায়, ওই ছোট্ট নাকটিতে।

'কাকে চান?'

বিজন বলল, ছুটকি, আমি বিজু রে!'

প্রৌঢ়া তার দিকে তাকিয়ে যেন পাথরের প্রতিমা হয়ে গেলেন। অনেক, অনেকক্ষণ পরে বিজন বলল, 'তোর বাড়িতে আমায় ঢুকতে দিবি না? ছুটকি?'

নীরবে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন প্রৌঢ়া।

বিজন ঢুকল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। একটা মস্ত চৌকো দালান। কয়েকটা চমৎকার বেতের সোফা সাজানো, কয়েকটা মোড়া। দালানের ওদিক থেকে দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে। চকচকে পেতলের পাত দিয়ে মোড়া তার ওপরটা। যতটা দেখা যায়, ওপর থেকে একটা পেতলের পাত্র থেকে অর্কিড ঝুলে রয়েছে।

'বসতে বলবি না, ছুটকি?'

'বোস'—বোজা গলায় প্রৌঢ়া বললেন।

'তুই বসবি না?'

দূর থেকে একটা মোড়া টেনে এনে বসলেন প্রৌঢ়া।

'ছুটকি, তুই খুশি হোসনি?'

প্রৌঢ়া দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল গলছে। দু হাতের ঢাকার মধ্যে মুখটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বিজন বুঝল এ কোনও প্রৌঢ়া নয়, ঊনষাট বছরের। এ সেই কুড়ি একুশ বছরের তরুণী, যে তার মা-বাবা-দাদা-দিদি বিশেষত যমজ ভাই বিজুকে সাংঘাতিক ভালবাসত, কিন্তু ভাগ্যের ফেরে আরও বেশি ভালবেসে ফেলেছিল এমন একজনকে যাকে তার ভালবাসা উচিত নয় আদৌ। স্বাভাবিকও নয়। বয়সে অনেক বড়, সম্মানে ঐশ্বর্যেও অনেক অনেক বড়, ভিন্ন জাত। যাকে বলে ছোট জাত এবং বিবাহিত। অমোঘভাবে বিবাহিত একটা সন্তানের জনক। বিজু আজও

তাঁর নাম জানে না। পরিচয় জানে না। তার বাড়ির লোকেও জানত কি না সন্দেহ। ছুটকি জানত কেউ মেনে নেবে না। কেউ ক্ষমা করবে না। তাই ছোট্ট একটা চিঠি লিখে রেখে চলে গিয়েছিল। সে লিখে গিয়েছিল—তার ভালবাসার মানুষটির বয়স চল্লিশের ওপর, তিনি ষোলো সতেরো বছরের একটি পুত্রের পিতা। বিশাল ধনী। কিন্তু তিনি খুবই অসুখী। ছুটকিতেই তার সব সুখ। তিনি ছুটকিকেই বিয়ে করবেন। মা-বাবা যদি মেনে নেন এ ভালবাসা, যদি ক্ষমা করেন, তাহলে তার নির্দেশক হিসেবে অন্তত একমাস যেন প্রতিদিন তার হলুদ কালো খড়কে ডুরে শাড়িটা ছাদে মেলে রাখেন। সে তখন স্বামীর সঙ্গে এসে সবাইকে প্রণাম করে যাবে।

স্তম্ভিত পরিবারের সবাই। বজ্রাহত। কখনও এমন ঘটে, ঘটতে পারে কেউ ভাবেনি পর্যন্ত। কে এ লোক? কোথায় এর সঙ্গে পরিচয় ছুটকির? চল্লিশ বছুরে। বাড়িতে বউ ছেলে মেয়ে সব আছে! তাকে ছুটকি! ছি, ছি, ছি! প্রথমে ঠিক হল ছুটকি যেমন বলেছে তেমনি হবে। হলদে-কালো ডুরে শাড়িটা ছাদে মেলে রাখা হবে। ছুটকি আসবে, তারপর তাকে ঘরে আটকে রাখা হবে। চোরের মার দেওয়া হবে। আর সেই লোকটিকে? সে যদি আসে? আসবেই। ছুটকি একা আসবে না। বিরাট ধনী যে! নাকি কোটিপতি! তাকে অত সহজে মার খাওয়ানো যাবে? রাইটার্সের ছাপোষা কেরানি বঙ্কুবিহারীবাবুর দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে ভাবতে গিয়ে। এমন সময় মা ছুটে গিয়ে সেই হলুদ-কালো খড়কে ডুরে শাড়িটা এনে উঠোনের মাঝখানে স্রেফ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে সেটাকে কুটি-কুটি করে ফেলল। বলল, 'ওর নাম আর কেউ তোমরা আমার সাক্ষাতে উচ্চারণ করবে না। ও মরে গেছে। মরে গেছে ধরে নাও।' মায়ের চোখ-মুখ ভয়ঙ্কর পাগলিনীর মতো।

ছুটকির মুখ থেকে হাত সরে গেছে। চোখ বোজা। সে বুকের কাছটা আঁকড়ে ধরেছে। ভিজে মুখ এখন মড়ার মতো ফ্যাকাশে, ভেতরের যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। বিজু বুঝতে পারল ছুটকি এখন তার সেই পাওনা মারটা খাচ্ছে। সেই চোরের ঠ্যাঙানি যা দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনবার কথা ভাবা হয়েছিল।

'ছুটকি! তোর বড্ড কষ্ট হচ্ছে?' কুড়ি বছরের তরুণ বিজু এখন। তার গলা বুজে যাচ্ছে।

প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করে ছুটকি বলল, 'তুই কী করে এলি?'

বিজন হেসে বলল—'আমি বিজু, যা অন্যে পারে না, তা পারি। এই নে তোর চিঠি। মায়ের চিঠিটা খুলে পড়েছি। তার জন্য যা শাস্তি ইচ্ছে হয় দিস।'

চিঠি দুটো নিল ছুটকি। মায়ের চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল। পড়তে পড়তে সে প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে বুঝতে পারে বিজু। কিন্তু পারছে না, ছুটকি পারছে না। সে বসে বসে টলছে। যেন তার ভার্টাইগো হয়েছে। বিজু উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ধরল। কতদিন পরে সেই প্রিয় স্পর্শ। বিজন উপবিষ্ট ছুটকির মাথাটা নিজের কোলের মধ্যে নিল। ছুটকি বলল, 'কেন এলি, বিজু, কেন এলি?' তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে একরকম দৌড়ে চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন আবার এসে দাঁড়াল বিজু দেখল চোখ মুখ সে ভাল করে ধুয়ে এসেছে। কিন্তু মুখটা ফুলে গেছে। সে বলল, 'আমাদের গত সাতাশে অক্টোবর আটান্ন পার হয়ে উনষাট হল। ভুল করিসনি ছুটকি, এখন আর মান-অভিমানের দিন নেই। জামাইবাবু কোথায়? তুই ডাকবি না আমি যাব?'

'নেই রে।'

তখন ছুটকির পোশাকের দিকে তার চোখ পড়ল। মাথায় সিঁদুর নেই। হাতে কিচ্ছু নেই। সাদা, সরু পাড় শাড়ি। বিজু মুখ নিচু করল, তারপর একটু পরে বলল 'এ জীবনে দেখা হল না, আমার দুর্ভাগ্য, ছুটকি, ছেলেমেয়েরা কোথায়?'

'নেই বিজু।'

'মানে? কোথায়?'

'নেই। কোনওদিন ছিল না।'

'স্বপ্নেন্দু, ঈপ্সিতা...মাকে লিখেছিস যে!'

'ভোলাতে।'

আশ্চর্য হয়ে বিজু বলল, 'ভোলাবার কী আছে? জামাইবাবুর চলে যাওয়ার খবর দিসনি ভালই করেছিস। কিন্তু ছেলে মেয়ে না হওয়া—এমন কী ব্যাপার, যে বানিয়ে বলতে হবে?'

ছুটকি চুপ করে রইল।

বিজু বলল, 'আজ কিন্তু তোর বাড়িতে থাকব, নড়ছি না এখান থেকে সহজে। তোর হাতে খাব।'

'তা হয় না বিজু!'

'সে কী? আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছিস?'

তখন ছুটকি মুখ নিচু করে বলল, 'বিজু, এ আমার বাড়ি নয় ভাই, আমি এ বাড়ির রাঁধুনি।'

।। ১১ ।।

নীলাদ্রি, সাহেবের ছেলে অফিসে বসছে। রোজ। সাধন বিশ্বাস অনেকটা নিশ্চিন্ত। আইন মাফিক কিছুই করতে পারবে না এখনও নীলাদ্রি। কিন্তু কাজগুলো দেখছে, বুঝে নিচ্ছে একটু একটু করে। সাহেবের এগজিকিউটিভ চেয়ারটা শূন্য দেখতে হচ্ছে না। এটা, এটাও অনেক। ফ্যাকটরিতেও যাচ্ছে নীলাদ্রি। রোজ একবার করে। ক্যানিং স্ট্রিট থেকে বেলিলিয়াস রোড। সময় নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে আসছে। অনেক দিন আগে থেকেই কর্পোরেশনের নোটিস এসে পড়ে আছে। ঘুসুড়ির বাড়ি ওরা ডিমলিশ করে দেবে। সাধন বিশ্বাস—সাহেব বাইরে ট্যুরে গেছেন বলে অনেক হাঁটাহাঁটি করে অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছেন। আজ নীলাদ্রিকে ঘুসুড়ির বাড়িটা দেখাতে যেতেই হবে। কারখানায় যাবে না। ঘুসুড়ি যাবে। নীলাদ্রি আজকে তার ডার্ক ব্রাউন স্যুটটা পরেছে। বড় বড় চেক-কাটা চওড়া টাই। লিগ্যাল অ্যাডভাইসার সুখেন্দু দত্ত একটু আগেই কতকগুলো কাগজপত্র 'ফর' দিয়ে সই করা যাবে, জানিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। 'মে আই কাম ইন, সাহাব!'

নীলাদ্রি মুখ তুলে দেখল সুইং ডোরের ওপর থেকে শ্রীমান সোহনের মাথাটা উঁচিয়ে আছে। আর সুইং ডোরের তলায় দুজোড়া পা। অর্থাৎ দুজন আছে। সোহন চাপা গলায় বলল, 'প্লিজ, স্টে লাইক দ্যাট।' বিদ্যুতের মতো ক্যামেরা তুলে ক্লিক করল, ফ্ল্যাশগান ঝলসে উঠল। 'দ্যাটস লাইক আ গুড বয়', মন্তব্য করল সোহন। 'এগজিকিউইটভ নীলাদ্রি রায়ের একটা ছবি নিলুম।'

সোহন ভেতরে এসে বসল। পেছনে অবধারিত ভাবে শুক্তি। নীলাদ্রি গম্ভীর। বলল, 'কী মনে করে? হঠাৎ?'

সোহন বলল, 'শুক্তির নতুন নামকরণ হয়েছে। সেটার অনারে একটা খানাপিনা নাচাগানা হবে, চিন্টু রায় না থাকলে জ্যাকসন মার্কা নাচটা করবে কে?'

—'আমার এখন ওসব বাজে ব্যাপারে সময় দেবার মতো সময় নেই। তোমরা আসতে পারো।'

—'যাচ্চলে, নামটা আগে শোন, হাতের কাছে পড়েছিল মাইরি, চোখে পড়েনি। সেই আছে না? আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাইনি তোমায় দেখতে আমি পাইনি। নামটা হল শুঁটকি। জাস্ট একটা চন্দরবিন্দু। আর একটু বর্ণ বিপর্যয়। দুর্দান্ত একটা কনোটেটিভ প্রপার নেম হয়ে গেল।

শুক্তি বলল, একটা দন্ত্যবর্ণ ছিল তো সেটা মূর্ধন্যবর্ণ হয়ে গেল। সেটাও বল।'

চিন্টু হঠাৎ সব কিছু ভুলে বলল, 'তুই রাগিসনি যে বড়? আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে দেবার কথা তো তোর সোহন শালাকে।'

'রেগে গিয়েছিলুম, বিশ্বাস কর, রেগে একেবারে যাকে বলে অগ্নিশর্মা, সোহনটা এত পাজি যে

কোকের একটা ক্যান ধরিয়ে দিলে, ওর জাহাজি দাদা রেগুলার সাপ্লাই মানে নিয়মিত সরবরাহ করে জানিস তো? তো তারপর নামটার উইটটা আমাকে এমনভাবে আক্রমণ করল, আচ্ছন্ন করে ফেলল যে আমি হেসে ফেললুম, রাগটা একেবারে জলে গেল রে নীল।'

—'তা বেশ করেছিস। এখন ফোট, কাজ আছে।'

—'একটা ঠাণ্ডাও খাওয়াবি না?' শুক্তি করুণ মুখ করে বলল।

এই সময়ে বেয়ারা তিন কাপ কফি নিয়ে প্রবেশ করল। একটা করে ছোট্ট কাঠের ম্যাট সামনে রেখে কফির কাপগুলো নিঃশব্দে নামিয়ে রাখল। সোহন বলল, 'থ্যাংকিউ ভাই।'

—'নে, খেয়ে নে' নীলাদ্রি কফিটা মুখে তুলল।

—'কোথায় যাবি রে এখন? নীচে সমরদা বলছিল।'

—'ঘুসুড়িতে একটা বাড়ি হচ্ছে। সেখানে।'

—সল্টলেক থেকে ঘুসুড়ি এসে থাকবি? মাইরি তোর ব্রেইন আছে।' সোহন কফিতে চুমুক দিয়ে বলল।

—'আজ্ঞে না। এটা মাল্টিস্টোরিড। ড্যাড করছিল। দেখাশোনা করতে হয় এবার।'

—'আমি যাব।' শুক্তি ঘোষণা করল।

—'আমিও যাচ্ছি', সোহন সঙ্গে সঙ্গে বলল।

'ওটা নাচাগানার জায়গা নয়। ইটস ক্রুড রিয়্যালিটি। উই আর ইন ট্রাবল ওভার দ্যাট ব্লাস্টেড মাল্টিস্টোরিড।'

'কঠিন বাস্তব আমি ভালবাসি।' শুক্তি দ্বিতীয়বার ঘোষণা করল।

সোহন বলল 'মনে হচ্ছে কয়েকটা ইন্টারেস্টিং ছবি তুলতে পারব। কর্পোরেশন প্ল্যান এবং নিয়মকানুনকে কলা দেখিয়ে ঘুসুড়িতে কোটিপতির বহুতল, ধসে পড়তে যাচ্ছে, রাজমিস্ত্রি কেয়ারটেকার তলার শুত, একেবারে, চেপ্টে গেছে, বেশ ভালই খাবে কাগজগুলো।'

—'মাফ করতে হচ্ছে, তুমি বা তোমরা জাহান্নামে যেতে পারো, ঘুসুড়ি যাচ্ছ না।'

'জাহান্নাম তো ঘুরে এসেছি' সোহন অবাক চোখ করে বলল, 'এক জায়গায় কি দুবার যেতে ভাল্লাগে রে চিন্টু?'

নীলাদ্রি উঠে দাঁড়িয়ে সুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে এল। সাধন বিশ্বাসকে বলল, 'সাধনকাকা আমি বেরোচ্ছি, ঘুসুড়ির ফাইলটা দিন, আর আমার অফিসের দরজা বন্ধ করে দিন।' সে হুড়হুড় করে নেমে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল—'সমর স্টার্ট দাও, কুইক।'

সমরও গাড়ি ছাড়ল। পেছনে সোহনের মোটরবাইকও সগর্জনে চালু হল। সোহনের পেছনে শুক্তি ওরফে শুঁটকি।

সমর বলল, 'দাদা আপনার বন্ধুরা তো গাড়িতেই যেতে পারতেন।' চিন্টু কোনও জবাব দিল না। হতে পারে বস নিরুদ্দেশ। হতে পারে বস একটা ধনী, খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। ব্যবসাতে 'বাটার ওন্ট মেল্ট ইন হিজ মাউথ' টাইপদের কোনও স্থান নেই, এটাও সে মানতে পারে। কিন্তু বস জেনেশুনে একটা ইললিগ্যাল বাড়ি করছে আর পাঁচটা কমন প্রোমোটারের মতো, এ সাজেশ্চন অসহ্য, অপমানকর। কী ভেবেছে সোহন! কবে একটা সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রি নিয়েছিল খড়্গপুর থেকে, আর লন্ডন থেকে ফটোগ্রাফির কোর্স করে এসেছে বলে সবজান্তা হয়ে গেছে? ব্লাডি ফুল! হোয়াট ডাজ হি থিংক অফ হিমসেলফ?

বাড়িটার সামনে এসে সমর গ্যাড়ি পার্ক করল। চিন্টু একবার চেয়ে দেখে নিল চেহারাটা তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। তার পেছন পেছন যেতে যেতে শুক্তি মন্তব্য করল, 'কী সুন্দর দেখেছিস সোহন? জানলার ওপর ওইরকম তেকোনা টুপি আমার ভাল লাগে, আর ঝুল বারান্দা!'

নীচে ভাবী অ্যাসোসিয়েশনের ঘর। শিবশঙ্কর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। চিন্টু টেবিলের সামনে গম্ভীরভাবে চেয়ার টেনে বসল। সোহন বলল, 'হোয়াটস দা ট্রাবল ম্যান?' তার কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ। দু হাত কোমরে দিয়ে পা ফাঁক করে হিরো-হিরো স্টাইলে দাঁড়িয়েছে।

শিবশঙ্কর কাকে জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। এরা কে? চিন্টুবাবু গুণ্ডা নিয়ে এসেছে? সঙ্গে আবার একটা বাচ্চা মেয়ে। সে সোহনকে ভয়ে ভয়ে বলল, 'বাড়ির প্ল্যান ভাল নয়। বলছে কর্পোরেশন। বলছে সিমেন্ট বাজে কোয়ালিটির, লোহা মাপমতো নয়।'

—'প্ল্যান তো স্যাংশন হয়েছিল, না কি?'

—'অবশ্যই। তবে সে হল গিয়ে আগেরবারে। ইলেকশনের পর এ ওয়ার্ডে নতুন কাউন্সিলর।'

—'তাই বলে তো স্যাংশনড প্ল্যান বাতিল হয়ে যেতে পারে না? পারে?' সোহন এক ধমক দিল।

—'না, তা নয়। ওই বিল্ডিং মেটিরিয়ালস...'

—'কনট্র্যাক্টর কে?' সোহনের গলা কড়া থেকে কড়াতর।

—'আজ্ঞে আমি।'

—'আপনি গঙ্গা মাটি চালিয়েছেন? সাহস তো কম নয়?'

—'না না। আমি যথাসাধ্য ভালই সব দিয়েছি। দিচ্ছি। তবু কর্পোরেশন বলছে...'

—'চলুন, চলুন তো দেখি। চিন্টু আয়, শুক্তি আয়।'

সোহনের পেছন পেছন শিবশঙ্কর। তার পেছনে শুক্তি, সবার পেছনে চিন্টু উপরে উঠতে লাগল। দোতলা তেতলা ঘুরে ঘুরে দেখল।

শিবশঙ্কর বলল,—'সব হাজার তিরিশ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট। কাটিং কী চমৎকার দেখুন। সব দুটো বড় বড় ঘর, ড্রয়িং, ডাইনিং, দুটো ডাবলু সি, কিচেনে সব ঢালাইয়ের তাক-টাক রেডি। মোজেইকটা দেখুন। সে জুতোর ডগা দিয়ে মেঝের আবর্জনা প্লাস্টারের গুঁড়ো কিছুটা খুঁচিয়ে পরিষ্কার করে দিল।

সোহন উবু হয়ে বসে ভাল করে পরীক্ষা করে বলল, 'ক্লাস ওয়ান। চমৎকার। এই যে গ্রিনের এতগুলো শেডের পাথর দিয়েছেন এ কি আপনিই পছন্দ করলেন?'

—'না, না, ওসব বিজুবাবু মানে সাহেবই করেছেন।'

সোহন তার বাহিনী নিয়ে তেতলায় উঠল। ডাই করা রয়েছে সিমেন্টের বস্তা, বালির স্তূপ, লোহা রয়েছে একদিকে কিছু। লোহাগুলো কিছু উঠিয়ে নিয়ে ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল সোহন, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিকই আছে তো! সিমেন্ট দেখান তো?'

ওপর থেকে একটা বস্তা নামিয়ে দিল শিবশঙ্কর।

—'কোম্পানির নাম তো খুব। ভেতরে কি দু নম্বরি করেছেন?'

—'না, না, আজ্ঞে না!'

সোহন বলল, 'একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে আমি সাম্পল নিয়ে যাব। শিগগির আনুন।'

'শিবশঙ্কর দুড়দাড় করে নীচে নেমে গেল।'

—'এইরকম মেনিমুখো দেখতে একটা লোককে আঙ্কল বিশ্বাস করেন কী করে? আশ্চর্য!'

সোহন বলল, 'আই ডেফিনিটলি স্মেল রটন ফিশ।'

একটু পরে শিবশঙ্কর ওপরে উঠে আসছে দেখা গেল। পেছনে-পেছনে আর একটি লোক। সাদা ধবধবে মাখন জিনের প্যান্ট। কালো টি শার্ট একটা। ইয়া মাস্‌ল। বুকের ছাতি। গলায় একটা মোটা সোনার হার। ফর্সা রং এখন গাঢ় তামাটে হয়ে গেছে।

শিবশঙ্করের হাতে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট। লোকটি বলল, 'নমস্কার বাবুসাহেব, আপনি কে হচ্ছেন?' সে সোহনের দিকে তাকিয়ে বলল।

—'হু আর য়ু?' সোহন প্যাকেটটাতে সাবধানে সিমেন্ট ভরতে ভরতে বলল।

—'হামি ভানপ্রতাপ।' লোকটি এমনভাবে বলল, যে বোঝাই গেল তার পদবি-টদবির মতো উদ্বৃত্ত জিনিস দরকার হয় না।

—'এ সাইটে আপনি কেন? সোহন সোজা তাকিয়ে বলল।

—'হামি ধরুন কেয়ারটেকার আছি।'

—'ধরতে হবে কেন? সত্যি সত্যি কেয়ারটেকার নন?'

—'ইয়ে বহোত খতরনাক এরিয়া আছে সমঝলেন? তো কেয়ারটেকার সমশের হমাকে রাতে থাকতে বলে।'

—'বাঃ আপনি তো খুব পরোপকারী লোক ভানপ্রতাপজি!' ভানপ্রতাপ একটা সিগারেট ধরাল, খুবই আত্মতৃপ্তভাব। প্যাকেট খুলে বাড়িয়ে ধরল। সোহন ছাড়া কেউ নিল না।

—'কত পাচ্ছিলেন বি. বি. রায়ের কাছ থেকে?'

একটু ইতস্তত করে ভানপ্রতাপ বলল, 'উ সব ছোটি ছোটি বাত আছে, কোনও কুছু ঠিক হয়নি এখনও সাব। তো আপনি কে হচ্ছেন? বললেন না তো?'

—'আমি সোহন সিং। কলেজ স্ট্রিটের জাভেদ আনসারিকে চেনেন?'

ভানপ্রতাপ চমকে উঠল।

—'আচ্ছা আজ চলি।' সোহন প্যাকেটটা নিয়ে সিঁড়িগুলো তরতর করে নেমে গেল। পেছনে পেছনে শুক্তি, চিন্টু।

নেমে এসে অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে ঢুকে সোহন হঠাৎ কাগজপত্র দেখতে দেখতে নাটকীয়ভাবে ঘুরে গেল পেছনে দাঁড়ানো শিবশঙ্করের দিকে, ভানপ্রতাপ বাইরে দাঁড়িয়ে, হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'টেক কেয়ার শিবশঙ্করবাবু।' কথাটা বাইরে ভানপ্রতাপের কানে গেল নিশ্চয়ই। সোহন বাইরে বেরিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার ফোন নম্বরটা রাখুন ভানপ্রতাপজি' হিপপকেট থেকে সে একটা নোটবই বার করল, তার ভেতর থেকে ছোট্ট একটুকরো কাগজ। তার ওপর খসখস করে ফোন নম্বর লিখল। তারপর গটগট করে বেরিয়ে মোটরবাইকে স্টার্ট দিল, চেঁচিয়ে বলল, 'শুক্তি তুই চিন্টুর সঙ্গে যা। আমার কাজ আছে।'

শুক্তি বলল, 'নীল লাঞ্চ টাইম তো হল, চল তোকে আজ খাওয়াই।'

চিন্টু বলল, 'ভাল লাগছে না রে শুক্তি।'

—'চল না ট্রিলিয়নস-এ যাব। দারুণ দারুণ মেয়ে আসে। কলকাতার যত সুন্দরী মেয়ে—সিন্ধি, পার্সি, পাঞ্জাবি, বাঙালি, দক্ষিণী—সব ওখানে ঢুঁ মারে। দারুণ রে জয়েন্টটা।'

চিন্টু বলল, 'ট্রাই টু গ্রো আপ শুক্তি, হোয়াট ডাজ আ সুন্দরী মেয়ে মীন? অ্যাবাউট ফিফটি টু পাউন্ডস অব ফ্রেশ, সাম ফ্যাট, অ্যান্ড দা এক্সক্রিটরি সিস্টেম! জাস্ট অ্যান অ্যানিমল!'

হাসি চেপে শুক্তি বলল, 'তুই যে প্রায় বিবেকানন্দর মতো কথা বলছিস রে চিন্টু।'

—'মে বী, বিবেকানন্দ টু ওয়জ ইন মাই পোজিশন। ড্যাড নিরুদ্দেশ। তেইশ দিন হল। কোনও খবর নেই। একটা ডিটেকটিভ এজেন্সিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। নাথিং ডুয়িং। আমার অ্যাকাউন্টে সব টাকা শেষ। তিতির মানে আমার বোনের অ্যাকাউন্টে আছে কিন্তু ও দিচ্ছে না, বলছে যখন তখন কাজে লাগতে পারে। ওর একথা বলার রাইট আছে। শী সেলডম ইউজেস আ কার। মোস্ট ইনএক্সপেনসিভ ক্লোদস পরে। মা-ও গাড়ি চড়ছে না। শর্মাজি আমার বাবার বন্ধু কাঁচা রসিদে টাকা ধার দেবেন বলেছেন, তাই দিয়ে ফ্যাক্টরির, অফিসের যাবতীয় খরচ আপাতত মেটাতে হবে। কী সব অর্ডার ক্যানসেল হয়ে গেছে, টের পেয়েছে বি. বি. রয় নেই। কিন্তু নেই, একদম নেই এর কোনও প্রমাণ না দিতে পারলে আমাদের সবাইকার হাত-পা বাঁধা। লিগ্যালি কিচ্ছু করতে পারব না। কোনও লোকাস স্ট্যান্ডই নেই। আ গ্রিম ডার্ক নাইট ইজ ডিসেন্ডিং

অন আস। আই ডোন্ট নিড উওমেন, শুক্তি, আই নিড ফ্রেন্ডস, রিয়্যাল ফ্রেন্ডস!'

—'বাট ইউ হ্যাভ গট দেম? হ্যাভ্‌ন্ট য়ু?' শুক্তি চিন্টুর হাত ধরে তার দিকে তাকাল, নরম গলায় বলল, 'শিগগির একটা না একটা কিছু বার হবে। দ্যাখ না, অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন?'

—'একটা না একটা কিছু মানে তো ড্যাডের ডিকম্পোজড ডেড বডি, ফ্রম সাম ডোবা অর পুকুর, মাইলস অ্যাওয়ে ফ্রম হোম!'

শুক্তি শিউরে উঠে বলল, 'না, না, পজিটিভ চিন্তা কর, নীল, এভাবে ভাবিস না।'

—'তা আর কী ভাবব বল? এইরকমই তো ঘটে! সবচেয়ে ট্র্যাজিক ব্যাপার আমরা—আমার মা, বোন আর আমি নিজে দিস ব্লাস্টেড ফুল অব আ ম্যান আমরা দিনের পর দিন জিনিসটাকে হালকাভাবে নিয়েছি। ড্যাড? ওহ তার কথা আমাদের চিন্তা করবার কিছু নেই। ড্যাড? ওহ দ্যাট মানি স্পিনিং ওল্ড ফুল? হি ক্যান শিওর টেক কেয়ার অব হিমসেলফ। লাস্ট ফোর ইয়ার্স আমি ড্যাডের সঙ্গে কতবার খেতে বসেছি, গুনে বলে দিতে পারি। অ্যান্ড আয়্যাম শিওর, আমারই জন্য কেউ, কোনও গুণ্ডাদল অনেক টাকা ক্লেইম করেছিল, সেটাই ড্যাড দিতে গিয়েছিল। যে ভোরে দু ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে ড্যাড বেরিয়ে গেল, কেউ ছিল না যে সামান্য একটা ইন্ডিকেশন, একটা ক্লু দিয়ে যাবে। খুঁজেছিল সবাইকে। পায়নি। মা, তিতি আমি আমরা সব যে যার মতো ফুর্তি করছিলুম। ডু য়ু নো হোয়্যার আই ওয়জ? অ্যাট জুনিপার্স, ড্রাঙ্ক, উইথ আ গার্ল অন ইচ সাইড, ডান্সিং অ্যান্ড হ্যাভিং ফান।'

—'দাদাবাবু!' হঠাৎ সমর হাউমাউ করে গাড়িটা ঘ্যাঁচ করে রাস্তার পাশে থামিয়ে দিল। তখন চিন্টু সমরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হল। সে অনেক কথা বলে ফেলেছে অসাবধানে। যদিও বেশিরভাগ ইংরেজি। তবু কিছুটা সমর ধরতে পেরেছে। সে হাউমাউ করে কাঁদছে—'দাদাবাবু, সাহেব আমাকে আঠারো বছর বয়স থেকে নিজের হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছেন, দিদিমণি, আমার সাহেবের মতো মানুষ হয় না, তাঁর জন্যে আজ আমার দেশে বাড়ি, ছেলে ডাক্তারি পড়ছে বর্ধমানে। আমার মেয়েটার অ্যাপেন্ডিসাইটিস ফেটে গেছিল, সাহেব না থাকলে...' স্টিয়ারিং-এর ওপর মাথা রেখে সমর এমন করে কাঁদতে লাগল যে মনে হল তাকে আর কোনওদিন সান্ত্বনা দেওয়া যাবে না।

শুক্তি বলল, 'সমরদা, সমরদা, তুমি এত ভেঙে পড়ছ কেন। চিন্টুদাদা ভয় পেয়ে ওসব বলেছে। আমরা সবাই সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কাকুকে ঠিক পাওয়া যাবে।'

চিন্টু বলল, 'সমরদা আমরা সব এক নৌকায়। আমাদের কী হবে আমরা জানি না। সত্যিই জানি না।'

—'হ্যাভ কারেজ, হ্যাভ সাম কারেজ নীল' শুক্তি এবার মৃদু ধমক দিল। চিন্টু বলল 'আমার বোনটা সাইটস এন সাউন্ডস-এ বসছে। কলেজ করতে পারছে না। গড নোজ আর হয়ত কোনওদিন করতেও পারবে না। অত দূরে দোকানটা, প্রায় গড়িয়ার কাছে, গাড়ি নেয় না। বাসে যাতায়াত করে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সাড়ে আটটার সময়ে, লাঞ্চ প্যাক নিয়ে যায়। ফিরতে ফিরতে নটা।'

শুক্তি বলল, 'এক কাজ করা যায় না, আমরা ওখান থেকে তিতিকে তুলে নেব, তারপর খাব।'

—'শী ওন্ট কাম শুক্তি, শী ইজ টু রেসপনসিবল টু ডু দ্যাট। তাছাড়া এই অ্যামবাসাডর নিয়ে এখন গড়িয়া যাওয়া মানে, অনেকটা পেট্রল খরচ। আমাদের বুঝে চলা উচিত। সামনে কী আছে জানি না তো! বরং চলো, আমাদের অফিসেই ছোট্ট ক্যানটিন আছে মোটামুটি করে দিতে পারবে কিছু। যাবে?'

শুক্তি বলল, 'তা-ই-ই চল।'

নির্ধারিত দিন কেটে গেল, কর্পোরেশন থেকে ঘুসুড়ির বাড়ি ডিমলিশ করতে কিন্তু এল না। বরং তার কদিন পরেই কর্পোরেশন থেকে নো অবজেকশন্‌স্ সার্টিফিকেট গোছের কিছু একটা বার

করে নিয়ে এল সোহন। সে নিজে পাশ করা সিভল এঞ্জিনিয়ার, যদিও কোনও চাকরিতে ঢোকেনি, তার কাকা দুঁদে উকিল। তা ছাড়া দেখা গেল ভানপ্রতাপ তাকে সাংঘাতিক খাতির করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কাগজপত্রে রয়েছে এ বাড়ির প্রোমোটর বি. বি. রায় এবং তনুশ্রী রায় যুক্তভাবে। তিনতলার থেকে আরম্ভ করে যারা ফ্ল্যাট বুক করেছিল তারা সবাই এবার তাদের দেয় টাকা দিতে থাকল। খালি শিবশঙ্কর আর কেয়ারটেকার সমশের বরখাস্ত হয়ে গেল। নীলাদ্রি, সোহনের পরিচিত একজন কনট্রাক্টরকে নিয়োগ করল। সমশেরের বদলে রইল ভানপ্রতাপ স্বয়ং। ঘুসুড়ির বাড়ির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল। নীলাদ্রি একদিন সোহনকে জিজ্ঞেস করল, 'কী করে কী করলি রে?'

সোহন ভীষণ ব্যস্ত। 'উলটপুরাণ' নাম দিয়ে সে ঘুসুড়ির বাড়ি নিয়ে সত্যিই একটা ফিচার লিখেছে। সঙ্গে যথেষ্ট ফটো। তার প্রতিপাদ্য সারা হাওড়ায় যেদিকে তাকাও বেআইনি বহুতল উঠছে। পনেরো কুড়ি ফুট চওড়া রাস্তায় ছ তলা সাত তলা বাড়ি আখচার। বহু বাড়ি আইনমাফিক জায়গা ছাড়েনি। স্যাংশনড প্ল্যানের বাইরে কাজ করেছে, জলের বন্দোবস্ত করেনি, লিফটের বন্দোবস্ত করেনি। কিন্তু কর্পোরেশন নীরব। অথচ ঘুসুড়িতে একটা বাড়ি একেবারে কাঁটায় কাঁটায় নিয়ম মেনে চলেও কর্পোরেশনের আক্রোশে পড়ে গেছে। কেন? কেন? কেন? ফিচার রাইটারের প্রশ্ন। পাশ করা সিভল এঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং মেটিরিয়াল দেখে এসেছেন, একেবারে ঠিকঠাক, কিন্তু কর্পোরেশনের ইন্সপেক্টর যে-ই দেখতে যাচ্ছে সে ভেজাল সিমেন্ট, বাজে লোহা দেখতে পাচ্ছে। কী করে? কী করে? কী করে? ফিচার রাইটারের প্রশ্ন। বেশ শোরগোল তুলে দিয়েছে খবরটা।

—'এসব কী করেছিস?' নীলাদ্রি অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

—'আরে অ্যাদ্দিনে একটা সাবজেক্ট জুটিয়ে দেবার জন্যে তোকে ধন্যবাদ' সোহন বলল, 'অনেকদিনের সাধ জার্নালিস্ট হব।'

—'কী ব্যাপারটা পুরো বলবি তো?'

—'কী আর ব্যাপার? লোকাল মাল কিছু থাকে এসব জায়গায়, জানিস না? আঙ্কল সে সব না বুঝে বা না গেরাহ্যি করে বাড়ি তুলে দিচ্ছেন, সবাই মিলে বখেড়া বাধিয়ে দিয়েছে। কেয়ারটেকারটা আর শিবশঙ্কর ওদের ভয়ে যোগসাজস করে এইসব কারবার করছিল। বিল্ডিং মেটিরিয়াল দিনের পর দিন বদলে রাখছে। ভানপ্রতাপকে বাদ দিয়ে ওখানে কেউ কিছু করতে পারে না। ওকে মোটা টাকা দিতে হবে।'

—'মানে? কিছু করবে না, শুধু শুধু টাকা?'

—'হ্যাঁ রে চিন্টু। না দিলেই এমনি ফাঁদে ফেলে দেবে।'

—'তো শিবশঙ্করের লাভ? ও তো ফেঁসে গেল।'

—'গেল। ব্যাপারটা প্রথমেই ওর জানানো উচিত ছিল আঙ্কলকে। কীভাবে আরও মোটা লাভ করা যায় তারই অঙ্ক কষছিল বোধ হয়। খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে কাল হল তাঁতির এঁড়ে গরু কিনে।'

—'তা ভানপ্রতাপ তো টাকা পেল না! তুই দিলি নাকি?'

—'ভানপ্রতাপ একা নয়। আরও আছে ভেতরে। অন্ততপক্ষে লাখ তিনেক টাকার ধাক্কা! আমি কোথায় পাব?'

—'তবে?'

—'আমি এই ফিচারটা লিখলুম আর আমার ফ্রেন্ড জাভেদ আনসারিকে জানিয়ে দিলুম। ভানপ্রতাপ যদি বাবা হয়, তা হলে জাভেদ হল গিয়ে ওরে বাবা। বুঝলি কিছু?'

—'এইসব সাঙ্ঘাতিক গুণ্ডাদের সঙ্গে তুই মিশিস?'

—'আমি তো আর বাপের লালটুস পুত্তুর নই।' নীলাদ্রির থুতনিটা নেড়ে দিয়ে সোহন বলে, 'বাপ-মরা, মা-মরা। সিংগিবাড়ির ওই ব্যাচেলর কাকা না থাকলে কবে মায়ের ভোগে চলে যেতুম, দুনিয়ার প্রতিটি ইঞ্চি জমি লড়ে জিততে হয়েছে। ঘাবড়াস না। যা বাড়ি যা।'

রাতে খেতে বসে তিতি বলল—'মা, তোমার অ্যাসোসিয়েশনের কাজ নেই? বেরোচ্ছ না তো!'

তনুশ্রী খাবার নাড়াচাড়া করছিলেন। বললেন, 'কী হবে?'

—'মানে? মা, আমাদের যথাসাধ্য স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে হবে। তুমি এরকম ব্রুড করলে আমরা জোর পাব কোত্থেকে?'

চিন্টু বলল—'কাল অফিস বেরোবার সময়ে আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। ফেরাটা...আমার তো একটু দেরি হবে, তুমি একা পারবে না? না হয় বসাক আঙ্কলকে বলে দেব...।'

—'না না' তনুশ্রী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। তারপর প্রায় কিছু না খেয়েই উঠে গেলেন।'

চিন্টু তিতির দিকে তাকাল। তিতি বলল—'তুইও আবার খাবার-টাবার ছেড়ে উঠে যাস না। আমি তো বারেবারেই বলছি মা ভীষণ দুর্বল প্রকৃতির। আমাদেরই শক্ত হতে হবে। তা ছাড়া তুই সেদিন যা করলি...'

—'আমি কী করলুম!'

—'সেই ওয়ার্ডরোবের ভেতরে...বাবাকে খোঁজা। ...ছিঃ।'

চিন্টু বলল—'আমার মাথার ঠিক ছিল না। মা কিছুতেই পুলিশে খবর দিতে দিচ্ছিল না, স্ট্রেঞ্জ বিহেভ করছিল...'

—'তাই বলে ওইরকম ভাববি? থ্রিলার পড়ে পড়ে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

—'হতে পারে', চিন্টু মেনে নিল। তারপর বলল—অপরাধী গলায় বলল—'মা কি ওই জন্যে খাচ্ছে না!'

—'আমি জানি না। হতে পারে!' তিতি বলল।

—'মাফ চাইব?'

—'দাদা, প্লিজ যথেষ্ট বোকামি করেছিস। আর করিস না।'

তনুশ্রী হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লেন। যদি জানেন ঘুম আসবে না সহজে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ওষুধ খেতে হবে। তারপরেও দুঃস্বপ্ন দেখতে হতে পারে। তাঁর সমস্যা সম্পূর্ণ আলাদা। অতি জটিল। ছেলে-মেয়ের সঙ্গে তা আলোচনাও করা যাবে না। তিতি ঠিকই বলেছে। সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা স্বাভাবিক চেহারা দেবার জন্য তিনি অ্যাসোসিয়েশনে যেতে চেয়েছিলেন। শর্মাজিই তাঁকে ফোনে জানিয়ে দেন তিনি যখনই বেরোতে চাইবেন শর্মাজি গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। তনুশ্রী তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে জানান, তাঁর তো নিজের গাড়ি রয়েছেই। ইচ্ছে হলে তিনি বেরোবেন। গাড়ি পাঠাবার দরকার নেই। পরদিন চিন্টু তিতি বেরিয়ে যাবার পরই শর্মাজি এলেন, চা খেলেন, বললেন—'মিসেস রয়, এখন কিছুদিন তেল কম খরচ করুন, আমি যাচ্ছি ওদিকে—চলুন পৌঁছে দিচ্ছি। বাড়ি বসে ব্রুড করবেন না।' তনুশ্রী তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন। শর্মাজি নিজেই ড্রাইভ করছেন। নিজের পাশের দরজাটা সসম্মানে খুলে ধরলেন। তনুশ্রী উঠে বসলেন। ডায়মন্ডহারবার রোডে পড়বার পর থেকেই রাস্তা মোটামুটি নির্জন। তবু শর্মাজির গাড়ি মাতালের মতো আচরণ করছিল, এক-এক ধাক্কায় হেঁচকি তোলে আর তনুশ্রী অতর্কিতে শর্মাজির গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন এবং সলজ্জভাবে দুঃখপ্রকাশ করেন। শর্মাজি তাঁর পাকা চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে বলেন—'প্লেজার প্লেজার।' এই ধরনের রসিকতা শর্মাজির পক্ষে একটু বিসদৃশ। রাজেশ পাইন কিংবা বসাক করলে মানিয়ে যেত।

তাঁকে নামিয়ে দিয়ে শর্মাজি বললেন—পাঁচটার সময়ে আবার তুলে নিতে আসবেন। তনুশ্রী তিনটে বাজতেই বসাককে ফোন করলেন।

—'একটু গাড়িটা নিয়ে আসতে পারবে। আমারটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। আমার শফার আলি ফোন করেছিল।'

—'ওহ শিওর।'

মিনিট পনেরোর মধ্যে বসাক গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। রেসকোর্সের পাশ দিয়ে আসতে আসতে বসাক হঠাৎ ভিক্টোরিয়ার দিকে গাড়ি ঘোরাল। পার্ক করে বলল—'তোমাকে কয়েকটা কথা বলা দরকার ভাবী। য়ু চুজ ইদার মি অর রাজেশ।'

তনুশ্রী বললেন—'কী বলছ আজেবাজে? প্রথম বললে বলে লাইটলি নিচ্ছি। আর কখনও বললে অপমান মনে করব কিন্তু!

বসাক অনেকক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তনুশ্রীর দিকে। আস্তে আস্তে বলল—'সজনেখালির ব্যাপারটা আমি জানি। রাজেশ নিজেই আমাকে বলেছে। উই আর ফ্রেন্ডস। সোজা আঙুলে যদি ঘি না ওঠে তো বিজুদা তো রইলই। টুরে গেছে না কি শুনছিলাম—আসলে বলা যাবে তাকেই।'

তনুশ্রীর ওপর দিয়ে কদিনই ঝড় বইছে। এই কথার পর তিনি ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। অজ্ঞানের মতোই হয়ে আছেন।

আজ ছেলে সেই বসাক আঙ্কলকে মায়ের এসকর্ট করতে চাইছে, যেচে।

তনুশ্রী জানেন না, তিনি কী করবেন। এমনকি, এখন বিজু রায় ফিরে আসা ভাল না খারাপ তা-ও তিনি বুঝতে পারছেন না। বিজু রায় না এলেও সামাজিকভাবে তিনি নিশ্চিহ্ন। আর এলে? এলেও বোধহয় তাই। শুধু তাই নয়। কী লজ্জা! কী অপমান! এখন কী হবে? তনুশ্রী জানেন মিসেস শর্মা, রাজেশের স্ত্রী, প্রীতা সোম, রবিনা, এরা যা-খুশি করে। কেতাদুরস্তভাবে যা খুশি। মিসেস শর্মা ছিলেন শর্মাজির সেক্রেটারি, অন্তত চার-পাঁচ বছর দুজনে খোলাখুলি বাস করবার পর বিয়ে করেছেন। আর তিনি একবার, মাত্র একবার গণ্ডির বাইরে পা বাড়িয়েছেন বলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল? এ কী রকম বিচার? কার বিচার? তনুশ্রী মাথার ওপর সিলিং ফ্যানটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিউরে ওঠেন, শেষপর্যন্ত ওই-ই কি তাঁর নিয়তি? না না বরং স্লিপিং পিল। জোগাড় করতে হবে—এ দোকান ও দোকান থেকে। একটু একটু করে জমাতে হবে। আর বোধহয় কোনও উপায়, কোনও পথই নেই।

ছেলে-মেয়ে দেখছে মা খায় না, সাজগোজ করে না, কেমন অবিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। রোগা, জৌলুসহীন হয়ে যাচ্ছে। তারা স্বভাবতই ভাবে—বাবা, বাবার অন্তর্ধানই এর জন্য দায়ী। খুবই স্বাভাবিক। তবে তিতি চিন্টু মনে মনে খুব গোপনে ভাবত—যে বাবার প্রতি তাদের মায়ের আন্তরিক টান জিনিসটা একটু কম। তিতি ভাবত—শুধু বাবা কেন? মা একটু অগভীর ধাতের, ছেলে-মেয়ের প্রতিও তেমন টান নেই। কেমন যেন! এখন মায়ের চেহারা, মায়ের আচরণের দিকে চেয়ে তিতি নিজেকে ধিক্কার দেয়। এগুলো সে খোলাখুলিই আলোচনা করে অর্জুনের সঙ্গে।

অর্জুন, অর্জুন এসেছে সাইটস এন সাউন্ডস-এ। তিতি ক্যাশ কাউন্টারে। চুপচাপ ক্যাশ কাউন্টারে বসে থাকা আর মাঝে মাঝে ক্যাশমেমো দেখে টাকা নেওয়া, ভাঙানি দেওয়া—এই একঘেয়ে কাজের মধ্যে অর্জুন এলে তার দিনটা ঝলমল করে ওঠে। এই দোকানটাই এখন তিতিদের বড় ভরসা।

অর্জুন খুব সমালোচনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে, তারপর বলে—'তুই না খেয়ে থাকলে তো মেসো তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন না! আসবেন।'

—'আমি যথেষ্ট খাই, আসলে আমার চেহারাই এমনি। তুই সেদিন ঠাম্মার ঘরে কী কাগজপত্র পেলি, দেখালিও না, কিছুই না।'

—'নাথিং ইমপর্টান্ট, বাট ইনটরেস্টিং।'

—'বাবাকে খোঁজার কাজে লাগবে?'

—'লাগতেও পারে, আবার না-ও পারে।'

—'তবে তুই আমাদের ফ্যামিলি-পেপার্স নিয়ে কী করছিস, দিয়ে দে।'

—'এক্ষুনি দিয়ে দিতুম, কাছে থাকলে।' আহত গলায় অর্জুন বলে, 'পরের দিন দিয়ে দেব।'

তিতি গম্ভীরমুখে বলে—'আমি তাই বলেছি?'

—'বললি তো?'

—'তুই খুব ভাল করেই জানিস কোনটা আসল বলা আর কোনটা নকল। তাড়াতাড়ি কিছু কর অর্জুন। মায়ের অবস্থা আর চোখে দেখা যাচ্ছে না। আর যদি বুঝিস ওই ডকুমেন্টটা পেলে ওই "রক্সি"দের কোনও সুবিধে হবে, তো ওদের দিয়ে দে। ওরা আফটার অল প্রোফেশন্যাল।'

অর্জুন হঠাৎ বলল—'কিছু মনে করিস না তিতি, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। মেসো-র কোনও বাল্য-প্রেম ছিল?'

—'মনে করব কেন?' তিতি বলল, 'থাকতেই পারে, সেভেনটি পার্সেন্টের থাকে। আবার বাবাদের যুগের লোকেরা যা রোম্যান্টিক ছিল! ছাদে-ছাদে, জানলায়-জানলায় প্রেম হত। তবে আমি জানি না দুঃখের বিষয়। বাবার সঙ্গে আমার এমন রিলেশন ছিল না যে বাবা আমাকে ডেকে ডেকে বলবে—"তিতি তিতি শোন, আমার না একটা বাল্য-প্রেম ছিল।"

অর্জুন হেসে ফেলল, তারপরেই চিন্তিত মুখে বলল—'না, এমন কেউ যাকে ঠাম্মাও খুব চিনতেন, ভালবাসতেনও অথচ বোধহয় মেনে নিতে পারতেন না।'

তিতি বলল—'বলছি তো থাকতেই পারে এসব ঘটনা, তবে আমি জানি না। তুই কি বলছিস এতদিন পরে হঠাৎ সেই শৈবলিনীর খোঁজে বাবা বিবাগী হয়ে গেল? মোস্ট আনলাইকলি। হী ইজ দা মোস্ট লেভ্ল-হেডেড পার্সন আই হ্যাভ সীন। ভেরি প্র্যাকটিক্যাল!'

অর্জুন বলল—'কিন্তু মনে করিস না তিতি, মাসির সম্পর্কেই বা তোর কী ধারণা ছিল? ধারণাটা তো বদলাতে বাধ্য হয়েছিস? তোদের ফ্যামিলিতে পরস্পরের মধ্যে বিরাট বিরাট কমিউনিকেশন গ্যাপ, তোরা কেউ কাউকে কোনও দিন বুঝিসনি।'

তিতি জানে কথাটা সত্যি, তবু ঝেঁঝে উঠে বলে—'তুই একাই সব বুঝিস, না?'

অর্জুন থেমে থেমে বলে—'বুঝি না। তোদের কথা আমার বোঝার ব্যাপার না। কিন্তু চেষ্টা করছি।'

ওই ডকুমেন্ট বা চিঠিটা অর্জুনের মুখস্থ হয়ে গেছে। সে তিতির কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করে বসে বসে, আর মনে মনে চিঠিটা ভাঁজে। তিতিকে জানতে দেয় না।

'মাগো,

আমি কে বলো তো? এতদিনে বোধহয় ভুলেই গেছ মা বলে ডাকবার তোমার আরও কেউ ছিল? বিজু, বিজুও নিশ্চয় ভুলে গেছে। নিজের সংসার অত সম্পদ পেয়ে বিজু কি আমাকে ভুলে গেল? মা, তুমি যতই মনকে চোখ ঠারো, নিশ্চয়ই জানো বিজু আর আমি পরস্পরের আধখানা। আমি সবার অবহেলা, সবার বিরহ সইতে পারি। শুধু বিজুরটা পারি না। আমি নিশ্চিত জানি একদিন না একদিন বিজুর সঙ্গে আমার মিলন হবেই। তুমি যদি দয়া করে এ চিঠির উত্তর দিতে চাও, শ্যামবাজার পোস্ট অফিসে দিয়ো। আমি সংগ্রহ করে নেব। আমার প্রাণভরা ভালবাসা নিয়ো। সমস্ত হৃদয় নিয়ে মাথা নত করছি তোমার পায়ের কাছে। নেবে না?—ইতি।

চিঠিটার ওপরে উননব্বই সালের মার্চ মাসের ঠিকানা। চিঠিটা মেঝেয় ঠাম্মার পালঙ্কের ভারী পায়ার কাছ ঘেঁষে পড়েছিল। অর্জুনের ধারণা, মেসো ঠাম্মার আলমারি আর সিন্দুক ঘেঁটেছিলেন খুব। যা নিয়ে গিয়েছিলেন তা একরাশি কাগজপত্র। সম্ভবত চিঠি। কারণ আলমারির মধ্যে গরম জামা, শাল ইত্যাদির ভেতর থেকে এক থলি হাজারখানেকের মতো চকচকে রুপোর টাকা এবং আরও শ'পাঁচেকের মতো নোট পাওয়া গেছে। তিতির যুক্তি হচ্ছে, সিন্দুকে গয়না থাকতে পারে। আরও অনেক টাকা থাকতে পারে, সে টাকার কাছে এই সামান্য দেড় হাজার কিছুই না। কিন্তু অর্জুন মাসির কথাকে গুরুত্ব দিয়েছে। মাসি নাকি বলেছে—ও সিন্দুকে কিছু মূল্যবান থাকত না। মাসি মূল্যবান বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ টাকাপয়সা, গয়নাগাঁটি তা অর্থাৎ ছিল না। তবু সিন্দুকটা বন্ধ ছিল। এবং ভেতরটা নিশ্চয় ফাঁকা ছিল না। অর্জুন ওর ভেতরে খুব পুরনো ইনল্যান্ডের টুকরো

পেয়েছে, একটা সরু ফিতে পেয়েছে হলুদ রঙের। তার অনুমান ঠাম্মার কাছে যা মূল্যবান, অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের চিঠিপত্র, তাই-ই ছিল সিন্দুকটায়। এবং মেসো সেগুলোই নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। তিতি হেসে উড়িয়ে দিলেও তার মনে হয়েছে—মেসো ওই চিঠির মেয়েটিকে, মানে ভদ্রমহিলাকে খুঁজতে গেছেন—যিনি ওইভাবে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন বিজুর সঙ্গে নাকি একদিন তাঁর মিলন হবেই। তিনি আর বিজু নাকি পরস্পরের আধখানা।

অর্জুন সন্তর্পণে এটা পকেটস্থ করেছিল। তিতিকে দেখায়নি। বলেছিল—'ঠাম্মাকে তো অনেকেই চিঠি লিখত, তেমনি একটা সাধারণ চিঠি। তবু নিয়ে যাচ্ছি যদি অনুমতি দিস।' —আসলে ব্যাপারটা সে তনুমাসির কাছেই গোপন করতে চায়। তনুমাসির ধারণা হয়েছে এবং ভেতর নারীঘটিত কিছু আছে। সে সংশয় তিনি তিতির কাছে প্রকাশ করেছেন। যেটা বোঝেননি সেটা হল—এ বর্তমানের কোনও ব্যাপারই নয়। এ সুদূর অতীতের ইতিহাসের কোনও আনারকলি। যে তার কবর ঠেলে উঠে পড়েছে। যার সঙ্গে মেসোর সম্পর্কে এত নিবিড় যে, মেসো তার ডাক কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারেন না। তবে সোজাসুজি মেসোর কাছেই বা উনি লেখেননি কেন, সেটাও একটা প্রশ্ন। একটা সমস্যা। এগুলো নিয়ে অর্জুন ভাবছে। শ্যামবাজার পোস্ট অফিসে খোঁজ করেছিল সে। উননব্বই সালে কেন আরও অনেক সময়ে অনেকেই পোস্ট অফিস থেকে চিঠি নিয়ে যেতেন। যান। সে সব নাম তাঁরা অর্বাচীন এক ছোকরার কাছে প্রকাশ করবেন না। পুলিশ বা গোয়েন্দা হলেও বা কথা ছিল!

॥ ১১ ॥

বিজনের মনে হল তিনি চোখে অন্ধকার দেখছেন। এ কী নীরন্ধ্র আঁধার যার ওপারে ছুটকি দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর প্রার্থনা তাঁর ভালবাসা ওকে ছুঁতে পারছে না। দুর্ভেদ্য বর্মের মতো এই অন্ধকারজালিকা। প্রমীলা। তাঁর চোখে ঝলক দিয়ে যাচ্ছে তাঁর সল্ট লেকের বাড়ির সেই মহিলা। রাঁধুনি! তাকে তো তাঁরা ঠিক মানুষ বলে মনে করতে অভ্যস্ত নন। মানুষ যদি বা হয়, নিচু, খুব নিচু শ্রেণীর মানুষ। তার শ্রেণীতে আর বিজু রায়ের শ্রেণীতে যে সমুদ্র পরিমাণ ফারাক তা পোষা জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গেও বোধহয় মানুষের থাকে না। তিনিই যদি চোখে এমন অন্ধকার দেখেন, তা হলে ছুটকি, ছুটকি কী দেখছে? তিনি প্রাণপণে গলা থেকে বাষ্প পরিষ্কার করে বললেন—'ছুটকি, শুনেছিলুম জামাইবাবু নাকি কোটিপতি লোক। তোর জন্যে কোনও সংস্থান করে যেতে পারেননি? শেষপর্যন্ত ছুটকি তোকে...জামাইবাবু এ কী করলেন? ছি ছি ছি।'

ছুটকি বলল—'বিজু, তোর জামাইবাবু বলেও কেউ কোনও দিন ছিল না রে! সেই তিপ্পান্ন সালের এপ্রিল মাস থেকেই আমি একা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরে আমাদের সম্পর্কের আয়ু পুরো এক মাসও ছিল না।'

—'তুই বলছিস কী?' বিজুর মনে হচ্ছে তাকে কে গুলি করেছে। ঠিক বুকের মাঝখানে।

—'ঠিকই বলছি রে, সেই রাত্রে আমি গলির মোড়ে এসে তার পেল্লাই স্টুডিবেকারে উঠলাম। আমাকে নিয়ে গেল পুরনো কলকাতার এক গলিতে। একতলায়। মোটামুটি সাজানো বাড়ি। কপালে সিঁদুর দিয়ে দিল। আমি বললুম, কেউ সাক্ষী রইল না যে! সে বলল—"আমাদের অন্তরাত্মা সাক্ষী। তোমার জন্যে বালিগঞ্জ প্লেসে নতুন বাড়ি হচ্ছে। সতীনের সঙ্গে তো আর থাকতে পারবে না! আমিও সেখানেই থাকব। তুমিই আমার আসল, আর সব তুচ্ছ, বাজে। তবে ব্যবসাপত্রের ব্যাপার, বোঝোই তো! মাঝে মাঝে যেতেই হবে। দু-চার দিনের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক বিয়ের ব্যবস্থা করছি। যত তাড়াতাড়ি পারি। কিছু বন্ধুবান্ধবও আসবে! তা দিনের পর দিন কাটতে লাগল। বিজু, তার প্রেম উথলে উথলে উঠছে, সে আমাকে দু চক্ষে হারায়, তার আগেকার বিয়েটা নাকি বিয়েই নয়,

কোনও দিন সে সুখী হতে পারেনি। কিন্তু সেই প্রত্যাশিত বিয়ের দিন আর এল না। তারপর একদিন ভোরবেলায় উঠে দেখলুম—চলে গেছে। প্রথমে ভেবেছিলুম যেমন কাজে যায় গেছে। তারপরে কেমন গা ছমছম করল, দেখলুম তার শৌখিন জামাকাপড়ে ভরা সুটকেস, দু-তিন জোড়া জুতো, এসেন্স, শেভিং-এর জিনিসপত্র—সব নিঃশেষে নিয়ে গেছে। মায় অ্যাশট্রেটা পর্যন্ত। কোনও পুরুষ কোনও দিন ছিল ঘরগুলোতে তার কোনও প্রমাণ নেই। খালি আমার বিদ্ধ শরীরে ছাড়া।" ছুটকি মুখ নিচু করে আঁচল দিয়ে মুখের নীচের দিকটা চেপে ধরল।

বিজু বললেন—'ছুটকি তুই একটা অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে, আমি ফেল করা ছেলে হতে পারি কিন্তু তুই যে ফিলসফিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছিলি! তুই এমন কাঁচা কাজ করলি কী করে? কী করে?' তাঁর ভেতর থেকে ক্রোধের আক্ষেপের অগ্নিশিখা লক লক করে বেরিয়ে আসছে। যদি পান, যদি সে লোকটাকে একবার পান।

ছুটকি শোনা যায় না এমন স্বরে বলল—'তুই তাকে সে সময়ে দেখিসনি বিজু, তার কথাও শুনিসনি। আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি। আমার বুদ্ধি-বিদ্যা কোনও কাজে লাগেনি। আমার বুদ্ধি নাশ হয়েছিল।'

'তো। তারপর?'

'যেদিন সকালে ওভাবে চোরের মতো চম্পট দিল, পাগলের মতো বাঁধাঘাটে ছুটে গেলুম, মাথায় একগলা ঘোমটা টেনে। লিখে এসেছিলুম এক মাস আমার একটা প্রিয় ডুরেশাড়ি ছিল সেটা ছাদে মেলে রাখতে, যদি মা-বাবা আমাকে ক্ষমা করে। বিজু ছুটে গিয়ে দেখলুম তোরা সবাই আছিস মা-বাবার ভুবন ভরে, খালি আমি নেই। ছাদ ভর্তি করে শুকোচ্ছে জামা-পায়জামা, ধুতি, শাড়ি, চাদর, খালি আমার সেই হলুদ ডুরে শাড়িটা যেটা উঁচু তারে টাঙানো থাকার কথা সেটা নেই। মা নেই, বাবা নেই, তুই নেই বিজু, আমি নেই।' বলতে বলতে ছুটকি অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। এবং বিজু এক চমকে সেই দৃশ্যটা পুরো দেখতে পেলেন। উঠোনের চারপাশে তাঁরা। বাবা দাঁড়িয়ে। মাঝখানে মা। দাঁত দিয়ে ছুটকির হলুদ-কালো খড়কে ডুরে, ছুটকির জীবন, প্রাণ, মন কুটিকুটি করে ফেলছে ভয়াবহ হিংস্রতায়।

ছুটকি একবার মুখ ঢাকছে। আবার ঝাঁকি দিয়ে খুলে ফেলছে মুখের আঁচল। উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির কাছে চলে যাচ্ছে, আবার এসে বসছে। মাথাটা খালি নাড়ছে যেন কার কথার জবাবে সে ক্রমাগত না না বলে যাচ্ছে। অস্বীকার করতে চাইছে যা ঘটেছে, ঘটে গেছে সেই সমস্ত পুরাঘটিত অতীতের বীভৎস নিষ্ঠুরতা। অবশেষে বিজুর কাছে এসে সে জোর করে তার মুখটা কোলের কাছে টেনে নিল। রুদ্ধগলায় বলল—'কেন এলি বিজু? কেন? যা চলে যা। এরা সব বাড়িসুদ্ধু দক্ষিণ ভারত বেড়াতে গেছে। কবে ফিরবে বলে যেতে পারেনি। রিটার্ন টিকিটের কনফার্মেশন পায়নি। তো আমি সব সময়ে প্রস্তুত থাকি। তা ছাড়া আশেপাশে প্রতিবেশীরা টের পেতে পারে।'

—'কী টের পাবে?' বিজন অনেকক্ষণ পরে বলতে পারলেন, 'আমি তোকে আজই এখনই নিয়ে যাব। আর একটা দিনও এখানে থাকতে দেব না।'

—'তা হয় না, বিজু। আমার একটা দায়িত্ব আছে।'

—'ঠিক আছে, তুই এরা এলে এদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিবি। তারপরে নিয়ে যাব। কিন্তু ছুটকি তুই একটা বি. এ. অনার্স ডিগ্রিঅলা মেয়ে। তুই...তোর আর কোনও কাজ জুটল না? তোকে শেষপর্যন্ত লোকের বাড়ি রাঁধুনিগিরি করতে হবে?'

ছুটকি করুণ হেসে বলল—'পরনের কাপড় ছাড়া কিচ্ছু তো আর সঙ্গে আনিনি! বি.এ-র সার্টিফিকেট বা অন্য কোনও পরীক্ষার মার্কশিট-টিট কিচ্ছু আমার কাছে ছিল না। কোথায় প্রমাণ দেব আমার বিদ্যের! আর রাঁধুনিগিরি তো করছি গত কুড়ি-একুশ বছর, তার আগে? অনেক অনেকবার চেষ্টা করেছি মাথা তুলে দাঁড়াতে, পারিনি। কিছুতেই পারিনি।'

বিজু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'ছুটকি, এ বাড়িটার মধ্যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চল আমরা বাইরে কোথাও খেয়ে নেব, কোথাও, অন্য কোথাও বসব।'

—'কিন্তু এখানে আমাকে সবাই চেনে, কোথায় যাবি? বাজার, পোস্টাপিস, সব, সব-ই আমার চেনা-জানার মধ্যে।'

বিজু বললেন—'অত ভাবিসনি। তুই বাড়িতে চাবি দিয়ে আয়। আমার সঙ্গে যাবি। ভয় কী?'

ছুটকি খানিকটা ইতস্তত করল। তার পরে সত্যি সত্যিই তালাচাবি নিয়ে ঘরে তালা দিতে লাগল। বাইরে বেরিয়ে মস্ত বড় একটা নবতাল লাগিয়ে, সে বলল—'দাঁড়া, পাশের বাড়িতে চাবিটা রেখে আসছি।'

—বিজু চেঁচিয়ে বললেন, 'বলে আসিস, দেরি হবে। বলবি তোর ভাই এসেছে অনেক দিনের পর।' বলবার সঙ্গে সঙ্গে যেন বিজু একটা ছায়া সরে যেতে দেখলেন। একজোড়া ব্লু-জিন্‌সের পা, যা আজকাল সব যুবক সব প্রৌঢ়েরও পা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা যেন ধূসর রঙের স্লিভলেস সোয়েটার। যুবকটি পেছন ফিরে কিছু একটা কুড়িয়ে নেবার ভঙ্গি করল। একটা রিকশা ধরে যখন দুজনে গঙ্গার দিকে চলতে আরম্ভ করলেন, তিনি বুঝলেন একটা সাইকেল পেছন পেছন আসছে। পাছে ছুটকি ভয় পায় তাই ফিরে দেখলেন না। কিন্তু তিনি জানেন, তার নীল জিন্‌সের পা, ধূসর উলের বুক। চোখে মুখঢাকা কালো সানগ্লাস। তা হলে তনুশ্রী ডিটেকটিভ লাগিয়েছে! যাক, তনুশ্রীকে যতটা মস্তিষ্কহীন, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ধরনের ভেবেছিলেন দেখা যাচ্ছে সে ততটা নয়!

বিজন একটা সোনার সরু পাটিহার বার করে ছুটকির গলায় পরিয়ে দিলেন। বললেন—'পর। মা'র আলমারিতে এই একটাই উপহার রাখা ছিল, ছোটখুকুর জন্যে।' গঙ্গায় এখন ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। শীত বলে শীর্ণতোয়া। কিন্তু মাঝগঙ্গায় সেই শীর্ণতা টের পাওয়া যায় না। চারদিকে রোদ চমকাচ্ছে। পালতোলা নৌকায় কত বছর পর! এত বড় ছইঅলা নৌকাখানা একা মানুষটি ভাড়া নিয়েছেন। লঞ্চঘাট থেকে খুঁজতে খুঁজতে আসছেন। ভাগ্যে জগন্নাথঘাটে সে মজুত ছিল! বিকেল পজ্জন্ত ভাসবেন। দুশ টাকা ভাড়া কবুল করেছেন। বলেছেন—লাঞ্চো খাওয়াতে হবে। দুই ছেলেকে নিয়ে নৌকো ভাসিয়েছে চাঁদমাঝি।

চাঁদমাঝি বলল—'পিপুলপাতির দোকান থেকে দুধের সর চাল নিয়েছি। ঝাল ঝাল করে ক্যাঁকড়া রাঁধছি কত্তা। আর আলুটারে শুখনো ঝাল আর পিঁয়াজ দিয়ে মাখাব। হবে তো?'

—'কী রে?' ছুটকির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বিজন। ছুটকি কিছু বলল না। শুধু হাসল। তার মাথা থেকে এখন ঘোমটা খসে গেছে। বেরিয়ে পড়েছে সেই সাদা-কালো কেশের প্রাচুর্য। এখন সব মিলিয়ে মুখটার যা চেহারা হয়েছে তাতে বিজনের সঙ্গে আদল স্পষ্ট। যদিও একজন শীর্ণ, আরেকজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

জলের ওপর চিকচিকে রোদের দিকে তাকিয়ে ছুটকি বলল, 'আর শুনতে চাসনি বিজু। আর বলা যায় না। যখন শুনলে কাজ হত, তখন...। অবশ্য এ কথা বলা আমারই ভুল।' ছুটকি কাঁদছে।

বিজন বললেন—'সারা জীবন ধরে তোকেই খুঁজে বেড়িয়েছি ছুটকি। তুই হারিয়ে গেলি বলে বাড়ি ছাড়লুম। তুই হারিয়ে গেলি বলে *জীবনে কাউকে কোনওদিন সেভাবে আপন ভাবতে পারিনি।* মা-বাবাকে, দাদা-দিদিদের পুরো শ্রদ্ধা দিইনি কখনও সুদ্ধু তোকে ত্যাগ করেছিল বলে। যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতুম, তুই কোথায় আছিস—সেই দিনই ছুটে চলে যেতুম। তুই এত কাছে ছিলি, মায়ের কাছে তোর চিঠি...আর আমি...পাগলের মতো শুধু কাজই করে যাচ্ছি। তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই, শুধু কাজ, কাজ করে যাচ্ছি। টাকা জমছে। টাকা উথলে পড়ছে। থামতে পারছি না। থামলেই শূন্য খাদ...।

ছুটকি বলল—'একজনের ঘর তো ভাঙতে গিয়েছিলুম, তারই শাস্তি এ সব। বুঝি। জল, চারিদিকে

জল রে বিজু, শুধু একফোঁটা খাবার জল নেই। চারিদিকে থই থই করছে মানুষ, বাড়িঘর, বাজার, টাকার লেনদেন, আমি একা সব কিছুর বাইরে দাঁড়িয়ে। প্রতিদিন কাশী মিত্তিরের ঘাটে যেতুম ভোরবেলা, ডুবে মরব বলে। প্রতিদিন ফিরে আসতুম। তিন মাসের আগাম বাড়ি ভাড়া দেওয়া ছিল, যা টাকাপয়সা ছিল টিপে টিপে খরচ করছি। মুড়ি জলে ভিজিয়ে খেয়ে কাটিয়ে দিচ্ছি দিনের পর দিন আর প্রতিদিন আশা করছি লোকটা ফিরে আসবে। বিবেকের দংশন বলেও তো একটা জিনিস আছে! কিন্তু এবার এলে আর ভুলব না। শুধু আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থাটা করিয়ে নিতে হবে। তিনটে মাস দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এল, কোথায় কে? কোনও পাত্তাই নেই। একটা চিঠি পর্যন্ত না।'

—'নাম কি লোকটার।' কোথায় থাকে ঠিকানা জানতিস না?'

—'বালিগঞ্জের দিকেই থাকে, পুরো ঠিকানা জানতুম না, জানলেও যেতে পারতুম না বিজু। এত দিনেও যাইনি কখনও। এ নিদারুণ লজ্জা বিজু সব্বাইকার সামনে প্রকাশ করব কী করে? আমি যে ভদ্রঘরের মেয়ে।'

—'এখনও বেঁচে আছে? জানিস?'

—'হ্যাঁ, কাগজে জন্মদিনের অভিনন্দন-টন্দন দেখি তো। আগে দেখতুম কোথায় কি এগজিবিশন কি কোনও সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেন্টার ওপন করতে যাচ্ছে। কত ছবি, মালা, ভাষণ।'

—'নামটা বল'—ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বিজু বললেন।

—'কী করবি?' ছুটকি হাসল।

—'ঠিক কী করব জানি না। তবে উচিত শিক্ষা দেব।'

ছুটকি বলল—'যাই করিস আর তাই করিস, আমার জীবনের আটত্রিশটা বছর তো আর ফিরবে না! বরং যেটুকু বাকি আছে আরও ঘুলিয়ে উঠবে।'

বিজন দেখলেন নামটা ছুটকির মুখ থেকে কোনও অসতর্ক মুহূর্তে বার করে নিতে হবে—এভাবে হবে না। বললেন—'তারপর কী হল? বল!'

—'গঙ্গার ঘাটেই একদিন বিধবা এক ভদ্রমহিলা কপালে ফোঁটা কাটছিলেন, আমাকে দেখে বললেন—"রোজই চান করতে এসে দেখি মা শুকনো মুখে বসে আছ, কী ব্যাপার বলো তো? আমি তোমার দিদিমা-ঠাকুমার মতো তো হবোই!" কেমন মরিয়া হয়ে গেলুম। বললুম—আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করে চলে গেছেন মা, একটা কাজকর্মের কিছু খোঁজ দিতে পারেন? ভদ্রমহিলা বললেন—"রান্না-বান্না জানো?" আমি কী বলব। প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। আমি ফিলজফিতে বি.এ. পাশ, কান্ট, হেগেল, লক, হিউম, বার্কলি পড়া একটা ভদ্রবাড়ির মেয়ে, আমার চেহারায় এমনই কিছু একটা ছিল যে একটা রূপবান, কোটিপতি, বয়স্ক লোক মাথার ঠিক রাখতে পারেনি, আমি...আমাকে রান্নার কাজ দেবার কথা ভাববে লোকে? দ্যাখ বিজু, বলতে গিয়ে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

ছুটকি চুপ করে গেল। গঙ্গার হাওয়ায় তার যেন শীত ধরেছে। একটু একটু কাঁপছে। বিজু নিজের গা থেকে গরম আলোয়ানটা খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দিলেন।

—'একবার ভাবলুম বলি, বলি আমি গ্র্যাজুয়েট, সেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ আমার কণ্ঠস্থ। তারপর ভাবলুম কী-ই বা লাভ! আমি তো প্রমাণ করতে পারব না কিছুই। "দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রব/মন বলে এ যে অসম্ভব এ অসম্ভব।" যদি এখন আবৃত্তি করি? কিংবা "ক্যানসট নট দাউ মিনিস্টার টু এ মাইন্ড ডিজীজড? প্লাক ফ্রম দা মেমরি এ রুটেড সরো..." তারপর ভাবলুম এ একরকম ভালই হল, কাউকে মুখ দেখাতে হবে না। কী করে এ ভয়ানক সংসারে নিরাপদে থাকব সে ভাবনা ভাবতে হবে না...। তখন কি ছাই জানতুম, নিরাপত্তা অত সহজ নয়!'

বিজু বললেন—'কত দিন ছিলি সেখানে? নিরাপদে-ছিলি না?'

—'প্রথমটা ভালই ছিলুম। ভদ্রমহিলার দারুণ শুচিবাই। দিনের মধ্যে নিজেও চারবার চান করতেন।

আমাকেও করিয়ে ছাড়তেন। যা বলতেন তা-ই করতুম। শুধু রান্না নয়, সবই। করতুম আর ভাবতুম আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। পাপক্ষয় হচ্ছে। পুরোপুরি ক্ষয় হয়ে গেলে তখন হয়ত, হয়ত আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব। কিন্তু ভদ্রমহিলার এক ভাগ্নে আসত মাঝে মাঝে, সে আমাকে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়ত।'

'তারপর সে বাড়ি ছেড়ে খুঁজে খুঁজে গড়িয়াহাটার এক দোকানে সেলস গার্লের কাজ নিলুম। কিন্তু থাকব কোথায়? দোকান মালিক নিজের বাড়িতে থাকতে দেবেন বললেন। গিয়ে দেখি, সে একা থাকে, পরিবার দেশে। তিন-চার দিনও সে কাজে টিকে থাকতে পারিনি। তারপর, একের পর এক কাজ আর বাড়ি পাল্টাতে পাল্টাতে বয়স বাড়ল। ক্রমে এই ঘাটে এসে টিকে গেলাম। একদিন গৌরাঙ্গদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। সে-ই তোর খোঁজখবর দিল। ঠিকানা দিল, তারপরেও অনেক অনেক দিন সাহস করিনি, একদিন হিসেব করে দেখলুম মায়ের বয়স নব্বুইয়ের কাছাকাছি এসে গেছে। তখন আর থাকতে পারলুম না। ভাবিনি মা জবাব দেবে।'

খাওয়াদাওয়া হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে দুজনে ছইয়ের মধ্যে শুয়ে শুয়ে জলের ছলাত ছলাত শুনতে লাগলেন। তারপর ছুটকি উঠে বসে বলল—'এবার ফের বিজু, আমার বড্ড দেরি হয়ে যাবে।'

—'তুই কি সত্যি-সত্যি ওখানে ফিরে যেতে চাস নাকি?'

—'তো কোথায় যাব?'

—'তার মানে? আমি এতদিন পরে এত খোঁজ করে এলুম কী জন্যে?'

—'তা হয় না বিজু। তুই ভুল করছিস। তোর কতদিকে কত কাজ, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে ওঠা-বসা, ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী নিয়ে ভর্তি সংসার। এতদিন পরে আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বিব্রত হওয়া ছাড়া কিছু লাভ হবে না।'

বিজন বললেন—'এখন আমার মনে হচ্ছে, সংসার নামক দানোটা আমাকে একটার পর একটা কাজ ঘাড় ধরে করিয়ে নিয়েছে, ক্রীতদাসকে যেভাবে মালিক করায়। আমি এবার নিজে নিজের মালিক হয়ে দেখব ছুটকি। আমার বাড়িতে যেতে যদি তোর ভাল না লাগে, না লাগতেই পারে, আমারও লাগে না, আমরা দু ভাই-বোনে আলাদা একটা ছোট বাড়ি নিয়ে থাকব। বাড়ি কি ফ্ল্যাট!' তিনি সুখচরের কথা ভাবছিলেন।

ছুটকি বলল—'তোতে আমাতে? সে কী তোর ছেলে মেয়ে বউ?'

—'তোর দায়িত্বজ্ঞানটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে রে, ছুটকি। সবই তো গেছে, তবু অন্যকে মনে করতে ছাড়বি না?'

'ঠেকে শিখেছি রে বিজু! তা নয় তো দায়িত্বজ্ঞানের কী পরিচয়ই বা আমি জীবনে দিয়েছি বল! নিজের কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়লুম স্রেফ স্তোকবাক্য শুনে, মোহে মুগ্ধ হয়ে, তার ফলে আমার যা অবস্থা হয়েছিল বোধহয় শেয়াল-কুকুরে টেনে কাঁচা মাংসগুলো জ্যান্তে খেয়ে নিত। রোজ জানালার কাছে লোক ঘুরঘুর করছে, সকালবেলা তা-ও পিছু নিচ্ছে। সেলস-গার্লের কাজ করতে গেছি, ডিউটির পর মালিকের অফিসে গিয়ে কম্পানি না দিলে মাইনে পাব না। বিজু তুই জানিস না ওই একটা ভুলের মধ্যে দিয়ে আমি জীবনের চেহারাটা একেবারে ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পেয়ে গেছি। এত দুঃখের মধ্যেও ওটাই আমার একমাত্র লাভ।'

—'লাভ? লাভ বলছিস একে?'

—'লাভ বই কি? মানুষ যখন প্রথম জন্মাল এই পৃথিবীতে, ধর প্রথম মানুষ-মা সে তো তার সন্তানকে কদিন পালন করেই তারপর অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের মতনই তাকে ফেলে চলে গিয়েছিল। তারপর শুধু আদিম জঙ্গল তার ভয়াল হিংস্রতা নিয়ে, আর একটি মনুষ্য শাবক। সেই মনুষ্য শাবক কেমন করে বেঁচেছিল, আমি বুঝতে পারি বিজু। কিংবা আদিম পৃথিবীতেও যাবার দরকার কী! এই দেশের শহরে শহরে, ফুটপাতে ঝোপড়িতে কত শিশুর জন্ম হচ্ছে, একটু বড় হয়ে একেবারে

অনাথ হয়ে যাচ্ছে বেশিরভাগই, তখন একটা শিশু, বিশেষ করে নারী-শিশু কেমন করে কাল কাটায়, তার অনেকটাই এখন আমি বুঝি। আমি কুড়ি বছর বয়সে পৌঁছেছিলুম। ঘর সংসার, আত্মীয়, ভালবাসা, স্কুল-কলেজ, খেলাধুলো এই জীবনটা পুরোপুরি পেয়েছিলুম। তারপর একদিন স-ব পরিচয়, সব পরিচিত খসে পড়ে গেল চারপাশ থেকে। জন্মদাত্রী জননী পর্যন্ত মুখ দেখতে চাইলেন না আর। যাকে ভালবেসেছিলুম, যে বলেছিল আমায় না পেলে সে সেই মধ্যবয়সে আত্মহত্যা করবে, সেও বিনা বাক্য ব্যয়ে চুপি-চুপি চলে গেল, আমাকে যে নিরাত্মীয় নিরালম্ব করে বাইরের জগতে টেনে বার করেছে সে কথার বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিল না, কোনও ব্যবস্থা করল না, তারপর সংসার অরণ্যে কী করে প্রাণ বাঁচাব, মান বাঁচাব, বাঁচব কিনা, বাঁচাবার যোগ্য কি না এই প্রাণ এই মান, এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে করতে অবিরত যুদ্ধ করতে করতে একদিন দেখলাম বাঃ অদ্ভুত তো! আমি মোটেই আমি নয়। আমি আই. এ তে বৃত্তি পাওয়া, ফিলজফির ছাত্রী কেয়া রায় নই মোটেই, আমি একজন নামহীন বামুনদি। খুব ভাল রাঁধি, রোগীর সেবা করতে পারি নির্ঘৃণায়, বাচ্চাদের একাহাতে মানুষ করে তুলতে পারি, খুব ভদ্র, শান্ত, শালীন এবং দায়িত্বশীল। এই প্রশংসা-পত্র, এই পরিচয় পত্র নিয়েই অনেক অনেক দিন কেটে গেল রে বিজু। ওরা চলে গেলে খবরের কাগজগুলো পড়ি, শেলফে রাখা গল্পের বইগুলো পড়ি। ইংরিজি বইয়ে আবার আমার হাত দেওয়া বারণ।'

—'কেন?'

ছুটকি হেসে বলল—'একদিন বই ঝাড়তে ঝাড়তে সেই বিখ্যাত নভেল দুটো তাকের ওপর দেখছি "আনা কারেনিনা" আর "রেজারেকশন", কৌতূহলে অধীর হয়ে নামিয়ে নিয়ে পড়ছি, এমন সময়ে বাড়ির বড় ছেলে দেখতে পেয়েছে, সে হেসেই অস্থির "বামুনদিদি তুমি আনা কারেনিনা নিয়ে কী করছ? যাক উল্টো করে ধরোনি তবু ভাল!" সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলুম—বামুনদিদি পরিচয়ের সঙ্গে আনা কারেনিনা খাপ খায় না। একবার তো মোটামুটি এই রকমই একটা কারণে একটা বাড়ি থেকে উৎখাত হয়েছিলুম।'

—'কি রকম?' বিজু ছুটকির কোলে মাথা রেখে জিজ্ঞেস করলেন।

—'সে এক কাণ্ড। বাড়িতে মা-বাবা কেউ নেই, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবে ছেলে, ইংরেজি ট্রানস্লেশন নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। 'ত্যাজ্য-পুত্র করা' কী হবে, শেষে তার কান্না দেখে বললুম দেখো তো বোধ হয় "ডিজওন" হবে কিংবা "ডিজইনহেরিট"। "প্রায়োপবেশন" কী হবে? বললুম বোধহয় "ফাস্ট আনটিল ডেথ"। বাবা-মা এলে সে উৎসাহ করে বলেছে বামুনদিদি এই বলেছে। তার মা আমাকে রাত্রে একা ডেকে থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি কে?" মুখটাসুদ্ধু থম থম করছে। আমি কী বলব? তিনি আমার জবাব শুনতেও চাইছিলেন না, বললেন "যত তাড়াতাড়ি পারো অন্য জায়গায় কাজ খুঁজে নাও!" তা বিজু আমি আজও জানি না আমি আসলে কে? জন্মপরিচয় বংশপরিচয় মুছে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় তা-ও লুপ্ত হয়ে গেল। কেয়া নামে কোনও রাঁধুনি হয় না। কারও বাড়ি কাজ নেবার সময়ে শুধু বলতুম নামে কী হবে? আপনারা আমাকে বামুন-মেয়ে বলে ডাকবেন।'

বিজু বললেন—'কী আশ্চর্য! লেখাপড়া জানিস বুঝতে পেরে কোথায় তোকে সাহায্য করবে....অদ্ভুত মানুষ তো! তা তুই সেই থেকে বই পড়া ছেড়ে দিলি?'

ছুটকি হাসল, বলল 'তোর কি মনে হয় কেয়া রায় বই হাতে পেলে ছেড়ে দেবে?'

—'উঁহু, মনে হয় না, আমি যেমন যেদিকে বই তার উল্টো দিকে হাঁটতুম, তুই ছিলি, তেমনি বইয়ের পোকা। —তারপর ব্যবসা দাঁড় করবার জন্যে প্রচণ্ড খাটতে হয়েছে, কাগজ আর জার্নাল-টার্নাল ছাড়া বিশেষ কিছু...'

ছুটকি বলল—'তাহলে আমি তোর থেকে বেশিই পড়বার সুযোগ পেয়েছি কিন্তু। সেই প্রথম যুগে যে বিধবা মহিলা আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁকে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, ব্যাখ্যাসুদ্ধু গীতা, কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়ে শোনাতে হত। পরে এক শয্যাশায়ী ভদ্রলোকের আয়ার কাজ করেছি। তাঁর

কাছে থাকতেও বহু বই আমায় পড়ে শোনাতে হত। রাসেল, বিবেকানন্দ, রাধাকৃষ্ণান, সোয়াইটজার, এমন কি! বলে ছুটকি হাসতে লাগল।

—'এমন কি...'

—এমন কি হ্যাভেলক এলিস, লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার, ট্রপিক অফ ক্যানসার...।'

—'বলিস কী?'

—'একটা একুশ বাইশ বছরের মেয়ে তাঁকে এইসব পড়ে শোনাচ্ছে এটাই ছিল ভদ্রলোকের আনন্দের ধরন। ডানদিকটা পুরো প্যারালাইজ্‌ড। ষাটের ওপর বয়স। ঘরে কেউ উঁকি দিয়েও দেখতে আসত না।'

—'সে কাজটা তো তোর এক হিসেবে বেটার ছিল। ছাড়লি কেন?'

ছুটকি ম্লান হেসে বলল, 'একটা ওই বয়সের সহায়সম্বলহীন মেয়ের জন্যে শুধু দুটো পথ খোলা থাকে বিজু। একটা আদি ব্যবসা। আরেকটা কোনও মিশন-টিশনে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া, সেটাও খুব সহজ নয়। মাঝামাঝি কোথাও বেশি দিন টিকে থাকা যায় না। তুই কি ভাবছিস পড়ানোর কাজ আমি খুঁজিনি! কিন্তু আমার যে থাকার সমস্যা ছিল! বাড়িতে থাকতে দিতে হবে শুনেই লোকে অস্বস্তিতে পড়ত। বি.এ-র মার্কশিট দেখতে চাইত। চেনাশোনা কারুর রেফারেন্স চাইত। বাড়িঘর কোথায়, থাকতে দিতে হবে কেন এ সব প্রশ্নের সদুত্তর চাইত। আমি তো কিছুই দিতে পারতুম না। আমার এ-ও মনে হত, কোনও ভাবে চেনা বেরিয়ে পড়ে যেন বাবা-মা ভাইবোনেদের মুখ আর হেঁট না করতে হয়!'

সূর্যাস্ত হচ্ছে। আবির গোলা জলের মধ্যে দিয়ে ছপাত ছপাত করে নৌকো কূলে ভিড়ল। বিজন ছুটকিকে নামতে সাহায্য করলেন। তারপর গলা কঠিন করে বললেন—'ছুটকি তোর আর ও বাড়ি ফিরে যাওয়া হবে না। হতে পারে না।'

—'তা হয় না বিজু।'

—'তুই কি মনে করেছিস আমি নিজের কাজে মেতে তোকে ভুলে যাব? অবহেলা করব?'

—'না, তা নয়। জানি তোর এখন অনেক সামর্থ্য। আমার কোনও একটা উপায় কি আর তুই করে দিতে পারিস না! কিন্তু বিজু আমি এখন কি রকম অদ্ভুত হয়ে গেছি। কিছু না দিয়ে কারও কাছ থেকে আর কিছু নিতে পারি না। ভালবাসার দাবিতে...না, না, ও দাবি আমার জীবন থেকে কেমন শুকিয়ে গেছে। আর তার দরকারই বা কী! এত দিনে আমার সামান্য কিছু সঞ্চয় তো হয়েছেই! যৎসামান্য। ধর ত্রিচীবর আর ভিক্ষাপাত্র, তবু সে আমার নিজের উপার্জনা করা। কুড়ি বছর বয়সের পর থেকে যেটুকু পেয়েছি, অতি সামান্য, তবু তা কুল, অর্থ, এমন কি বিদ্যাও নয়, পেয়েছি আমার নিজের শ্রম, নিজের চরিত্রের জোরে। ভেবে দ্যাখ একটা মানুষের নিজস্বতম সত্তার অর্জন সেটুকু। এখন তাই আর কিচ্ছু চাই না।'

বিজু দেখলেন ছুটকির এ অভিমান সহজে যাবার নয়। খুবই স্বাভাবিক! কৈশোরের দিনগুলোতে ছুটকিকে যতটুকু চিনেছিলেন এই অভিযান, এই জেদ তার ছিল। কিন্তু ষাট বছর বয়স হতে চলল এখনও ছুটকি শারীরিক পরিশ্রম করে অন্নসংস্থান করবে? বিজন থাকতে? এ হয় না, হতে পারে না! কিন্তু অভিমান যে যুক্তির ধার ধারে না! কী করে বোঝান এখন তিনি ছুটকিকে! তাঁকে তাহলে বারবার আসতে হবে। বারবার বোঝাতে হবে। ফেরাতে হবে। ফেরাতেই হবে।

যদি রায়-পরিবারের পুরনো আবহাওয়ায় বা নতুন প্রেক্ষিতে না-ও হয়, অন্তত পক্ষে বিজুর কাছে, শুধু বিজুর কাছে ছুটকি ফিরে আসুক। ছুটকি তার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—'রাগ করিসনি বিজু, কিন্তু একজনের জিনিস চুরি করেছিলুম, সেই পাপের শাস্তি কী, কখন কোথায় তার শেষ আমায় বোধহয় এইভাবেই জানতে হবে।'

তখন বিজু দেখলেন তাঁর গোপন কথা বলবার সময় এসেছে। তিনি আস্তে আস্তে বললেন—'অনেকক্ষণ

থেকে চুরি চুরি, পাপ-পাপ করছিস ছুটকি। তাহলে শোন। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। উদ্দেশ্যহীন। কাশীর টিকিট কিনে দুন এক্সপ্রেসে চড়ে বসেছি। চাপাচাপি ভিড়। পাশে বসেছে এক ভুঁড়োপেট অবাঙালি। মাঝরাত্তিরে ঘুমের মধ্যে শুনলাম কামরায় গোলমাল। যেন পুলিশ উঠেছে। সকালে কাশীতে নামবার সময়ে ব্যাগটা অসম্ভব ভারী লাগল। সেই চেক-চেক ডাকব্যাকের ব্যাগটা মনে আছে? দু-চার দিনের জন্যে কোথাও খেলতে-টেলতে গেলে যেটা নিতুম? কাশীতে নেমে একটা ধর্মশালায় উঠেছি। লাক্সার রোডের কাছে। ব্যাগ থেকে জামাকাপড় বার করতে যাব, চানে যাব বলে, চেনটা টেনেই আমার চক্ষুস্থির। থাকে থাকে একশো টাকার নোট। গুনে-গেঁথে দেখলুম পুরো এক লাখ। ভাবতে পারিস? আমার ব্যাগটাতে ছিল দুটো গেঞ্জি, দুটো প্যান্ট, দুটো পুরনো শার্ট, একটা গামছা আমার খেলার বুটজোড়া দু-চারটে নিম-দাঁতন। বদলে গেছে। পাশের লোকটাকে মনে পড়ল। প্রথমে ভেবেছিলুম, নিশ্চয়ই জাল টাকা। পুলিশ উঠেছিল হয়তো এরই জন্যে। তারপর দেখি সুতো-টুতো সব ঠিক আছে। নোটের নম্বরও এলোমেলো। ব্যাংকের নম্বর মিলানো নোট নয়। দু-চার দিন অপেক্ষা করলুম যদি মালিকের সন্ধান পাই। পেলুম না। স্রেফ মেরে দিলুম। আজও জানি না সে কার টাকা, কিসের টাকা। স্মাগলারদের? না ব্ল্যাকমানি কেউ কোথাও সরাচ্ছিল। কিন্তু সেই টাকা থেকেই আজকে আমার 'রায় ইন্ডাস্ট্রিজ।' কীভাবে তাকে কাজে লাগিয়েছি, কার কার পরামর্শ নিয়েছি, কীভাবে ছোট থেকে বড় আরও বড় ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছি সে এক ইতিহাস। অন্য ইতিহাস। কিন্তু ভিত হল স্রেফ কুড়িয়ে পাওয়া টাকা। চুরিও বলতে পারিস। ছুটকি আমরা জোড়া ভাইবোন, তুই দু ঘণ্টা চোদ্দ মিনিটের বড়, দু জনেই দুটো পুঁটলি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। পরিত্যক্ত পুঁটলি। চুরি বলিস চুরি, কুড়নো ধন বলিস কুড়নো ধন। এখন তাকে যদি পাপ বলে সারা জীবন শিটিয়ে থাকতে হয়, তো আমারও তো এক্ষুনি প্রায়শ্চিত্তের জন্যে কিছু করা দরকার। সমস্ত বিলিয়ে-টিলিয়ে দিয়ে ভ্যাগাবন্ড হয়ে যাব, না কী। বল!'

ছুটকি বলল—'তা নয় বিজু। তুই পেয়েছিলি টাকা, জড় বস্তু। তাকে আঁকড়ে থাকলে সে থাকে। বাড়াতে পারলে বাড়ে। আমি পেয়েছিলাম ভালবাসা, সজীব শক্তি। আঁকড়াতে চাইলেই সে থাকবে কোন মানে নেই। তা ছাড়া বিজু তুই আর আমি দুইয়ে মিলে এক। চাঁদের এ পিঠ আর ও পিঠ। আমার পিঠে শুধু অন্ধকার।'

ছুটকি পাশের বাড়ি থেকে চাবি এনে তালা খুলল। আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকছে। বিজু দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। অপেক্ষা করছেন। কতক্ষণ! শেষে হতাশ বিজু পেছন ফিরলেন। এ কাজ একদিনে হবার নয়। হঠাৎ শূন্য বাড়ির ভেতর থেকে আর্ত গলায় ছুটকি ডেকে উঠল—'বিজু...!' যেন ডুবন্ত মানুষের আর্তনাদ। একলা দ্বীপে দণ্ডিতকে নামিয়ে দিয়ে যেন জাহাজ চলে যাচ্ছে। শূন্য দ্বীপের পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খাচ্ছে ছুটকির ডাক 'বিজু! বিজু!'

চকিতে ফিরে দাঁড়িয়ে বিজু ছুটকির আর্তনাদে নিজের আর্তনাদ মিশিয়ে বললেন—'ছুটকি, ছুটকি, এই তো আমি! তোর বিজ্! তোকে নিতে এসেছি। এক্ষুনি চল। চলে আয়।'

ছুটকি জলভরা চোখে তাঁর দিকে চেয়ে বলল—'না বিজু, তুই আগে বল, আগে কথা দে তুই পারবি?'

—কী পারতে হবে?'

—'আমাকে আমার সমস্ত পরিচয়সুদ্ধ, সেই কুল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া মেয়ে, সেই একজনের ভোগ করে এঁটো পাতের মতো ফেলে যাওয়া নারী, সেই আয়া, রাঁধুনি, সেলসগার্ল, দাসী, দূর দূর করে খেদিয়ে দেওয়া টিউশনি খুঁজতে আসা মেয়ে, বামুন-মা—এই সমস্ত পরিচয়সুদ্ধ যেখানে বসাতে চাইছিস, তোর পাশে তোর বোন বলে, দিদি বলে। পারবি? বসাতে?'

তখন বিজু রায় বুঝতে পারলেন ছুটকিকে। পুরোটা হয়তো নয়। তবে অনেকটাই। বোঝাটা এল

ঝলকে ঝলকে। ছুটকি জীবনে নিষ্ঠুর আঘাত খেয়েছে একটার পর একটা। সমাজের চোখে সে হয়তো অনেক নীচে নেমে গেছে। কিন্তু এই সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে সে শেষ পর্যন্ত জীবনকে আবিষ্কার করেছে। যে জীবনকে আড়াল করে থাকে সমাজ, সম্পর্ক। নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছে ছুটকি। জেনেছে যা তার স্ব-রূপ। নিজের সেই নিজত্বটুকু তার যুধিষ্ঠিরের কুকুর। তাকে ত্যাগ করে সে স্বর্গে যেতেও চায় না।

একটু দেরি হল জবাব দিতে। তারপর নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—'পারব ছুটকি। ঠিক দু দিনের মাথায় তোকে নিতে আসছি। তৈরি থাকিস।' বলে বিজু হঠাৎ নিচু হয়ে ছুটকির পায়ের ধুলো নিলেন, একটা চুরি, চুরির ফলই বলো কিংবা প্রতিফলই বলো, তারই ওপর তাঁদের দুজনের জীবন দাঁড়িয়ে আছে অথচ তিনি ক্রমশ আত্মবিস্মৃত এবং ছুটকি ক্রমশই আত্মসচেতন। ক্রমশই আরও আরও অন্বেষু এবং আত্ম-নির্ধারণের কঠিন পথে বহু বহু দূর অগ্রসর হয়ে গেছে বুঝতে পেরে।

।। ১২ ।।

রাত্তির প্রায় দশটার কাছাকাছি। পথঘাট সুনসান। শীতের হিম-কুয়াশায় পথ-আলোর পেছনে বাড়িগুলো জলের তলার ছবি বলে মনে হয়। রায়-ভবনের বিরাট গ্রে হাউন্ড কঙ্ক পল্লী বিদীর্ণ করে চিৎকার করে উঠল। বাগানের পেছনের কোণ থেকে সে জকিবিহীন রেসের ঘোড়ার মতো অপরূপ তীব্র ভঙ্গিতে দৌড়ে আসছে। দৌড়ে আসছে। কঙ্ক বাগানময় ঘোরাফেরা করে। পেছনের কুকুর-ঘরে ঘুমোয়। তাকে বড় একটা বাড়ির ভেতরে ঘুরতে দেওয়া হয় না। সারারাত সে রায়-ভবনের গোটা খোলা এলাকায় ঘোরে। বিরজু ঘুমিয়ে পড়লেও কঙ্ক আছে। কঙ্ক আছে। বিজু রায়ের পায়ের কাছে এসে সে পেছনের পা ছড়িয়ে দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, গরররর, গরররর করছে এখন, লেজটা বিদ্যুদ্বেগে নড়ছে, ডাইনে-বাঁয়ে। সে যেন তার মালিককে প্রণাম করছে, কিংবা জানাচ্ছে তার আকুল অভিমান। নিচু হয়ে তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিলেন বিজু রায়, মৃদু গলায় বললেন—'ঠিক আছে, ঠিক আছে কঙ্ক। সব ঠিক হ্যায়।' বিরজু এসে সেলাম করে দাঁড়াল। বীরখা ঘুম ভেঙে ছুটে আসছে। কঙ্ক ছুটে যাচ্ছে ওপরে। দু-চার সিঁড়ি উঠছে আর পেছন ফিরে ফিরে দেখছে তার ইউলিসিস আসছে কি না। বিজু উঠছেন। ধীরে ধীরে। তাঁর পায়ে অদ্ভুত জড়তা, অনেক দিন আগে যখন নিরুদ্দিষ্ট পুত্র বাড়ি ফিরেছিলেন তার চেয়েও দ্বিধাগ্রস্ত, এ যে অন্যের বাড়ি। কিংবা বলা যায় ভীষণ দুষ্টু ছেলের লজ্জা তাঁকে পেয়ে বসেছে। তবু তিনি উঠে যাচ্ছেন এবং উঠতে উঠতে সাহস সংগ্রহ করে নিচ্ছেন। যা করতেই হবে তা করাই ভাল। বিজু রায় উঠছেন, মাঝখানে সামান্য ফাঁক রেখে তাঁর পেছন পেছন নিঃশব্দে সিঁড়ি উঠতে থাকছে নীল জিনস্-এর একজোড়া পা, একবুক ধূসর উলের সোয়েটার। কালো চশমা এখন মাথায়। সিঁড়ির প্রথম ল্যান্ডিং পর্যন্ত উঠে বিজু রায় আস্তে পেছন ফিরে তাকালেন চকমকে চোখে হেসে বললেন—'তাহলে টিকটিকি মশাই। আপনি ধরে ফেলবার আগেই যদি হারানিধি ফিরে এল তো পুরস্কারটা আপনি পান কেমন করে?'

নীল জীনস চট করে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল—'আমি টিকটিকি নই তো মেসোমশাই। আমি তিতির বন্ধু অর্জুন। সকালে কলেজে আসতে আপনাকে চুঁচড়ো পোস্ট অফিসের কাছে ডিস্ট্রিক্ট জাজের বাংলোর গাছের তলায় দেখতে পেয়ে গেলুম দৈবাৎ। তখন থেকেই...'

—'দৈবাৎ!' বিজু রায় হেসে উঠলেন, 'তবে তো তুমি কামালই করেছ হে!' একেবারে দৈবাৎই না কি?

ওরা আওয়াজ পেয়েছে। কঙ্কর। বিজুর। ওরা ছুটে আসছে। ঘাউ ঘাউ করতে করতে আসছে কঙ্ক। পেছন পেছন চিন্টু, তিতি, প্রমীলা, বদন। একদম শেষে, পা টেনে টেনে ফ্যাকাশে মড়ার মতো মুখে তনুশ্রী।

চিন্টু বলল—'ড্যাড, ড্যাড, ড্যাড এসে গেছে। ওহ্ ড্যাড। ওহ মাই ড্যাড্ড! ওহ্ হো।' সে চোখের জল ভেতরে পাঠাবার প্রবল চেষ্টায় ক্রমাগত মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে পেছনে হেলাচ্ছে। বিজু ডান হাতটা বাড়িয়ে—তাকে আলিঙ্গন করে ধরলেন। বললেন—'দেয়ার দেয়ার দ্যাটস অল রাইট মাই বয়, অল রাইট।' চিন্টু মুখ ঢেকে ফেলল। তিতির মুখে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি, সে তার লম্বা কালো স্কার্ট আর পাতলা সাদা উলের ব্লাউজ পরে বাবার বুকের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার চুলগুলোয় আদর করতে করতে বিজু বললেন—'তুই যদি চাস তোকে ওই ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে দেব। দেখিস!'

—'কোন ছেলেটা?' তিতি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

বিজু তার মাথাটা পরম মমতায় বুকের ওপর চেপে ধরে বললেন—'ওই যে তোর ঘরে টিভি-র ওপর যার ছবি যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছিস?'

তিতি বাবার বুক থেকে মাথাটা একটু তুলে হেসে উঠল, বলল—'সে কী? ও তো সুকান্ত! আমাদের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য! কোন কালে মারা গেছেন!'

বিজু ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে হার-না-মানা জেদের সঙ্গে বললেন—'তাই বুঝি? তবে এই অর্জুন, এটাকেই...!'

—'দূর!' তিতি আরও জোরে হেসে উঠল—'ও তো ভাই! চুঁচড়োর মঞ্জুর ছেলে!'

খুব মৃদু গলায় অর্জুন বলল—'যেমন ছুটকির আপনি!' বিজু চমকে উঠলেন। তার সঙ্গে চোখাচোখি হল।

তারপর বিজু রায় অশান্ত বালকের মতো এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। প্রমীলা লজ্জা-লজ্জা মুখ করে, মাথায় কাপড় টেনে বলল—'বউদি যে ওদিকে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন!'

চিন্টু হই-হই করে বাবার হাত ধরে মায়ের ঘরের দিকে যেতে চাইছিল। তিতি চোখের ইশারায় তাকে থামতে বলল। পোশাক পরা এবং না-পরা মেয়ে ব্যাপারটার সঙ্গে তার পরিচয় থাকলেও একজন প্রোষিতভর্তৃকা নারী আর বিরহী পুরুষের মাঝখানে তার ভূমিকা কী হওয়া উচিত দেখা গেল তিতি তার চেয়ে ভাল জানে।

একা-একা ঘরে ঢুকে বিজু দেখলেন বিছানার সঙ্গে মিশে কালো, রোগা তনুশ্রী একটা আধময়লা শাড়ি পরে শুয়ে আছেন। চোখ বোজা। তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচু হয়ে তনুশ্রীর বাঁ গালে একটা চুমো দিলেন, বললেন—'এ কী করেছ? কী হয়েছে তোমার? ছি ছি ছি!' তনুশ্রী কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন—'আমি...আমি তোমার যোগ্য নই জানি...কিন্তু তোমায় ভালবাসি...তুমি যা বলবে তাই হবে। যা শাস্তি দেবে তাই মাথা পেতে নেব।'

—'শাস্তি?' বিজু অবাক হয়ে বললেন, 'শাস্তি-ফাস্তির কথা উঠছে কেন? যোগ্যতা-অযোগ্যতারই বা কী হল?' তারপর বললেন—'আমি...আমিও তোমায়...' তিনি তনুশ্রীর ডান গালে একটা চুমো দিলেন।

বাইরে থেকে চিন্টু হেঁকে বলল—'ড্যাড, বসাক কাকা আর শর্মাজি আসছেন।'

'এসো'—তিনি তনুশ্রীর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন।

তনুশ্রী মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে প্রায় মৃত গলায় বললেন—'তুমি যাও, আমি আর পারছি না গো!'

বিজু বললেন—'তুমি যে গৃহিণী, হোস্টেস। চলো, আমি তোমায় ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।'

শর্মাজি বললেন—'আধঘণ্টা আগে "রক্সি" আমায় ফোন করে জানাল বি. বি. রায় হাওড়া স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে তাঁর বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। বসাক বসেছিল। নিয়ে চলে এলাম।'

বসাক দেখল স্বাস্থ্যল, সুঠাম বি. বি. রায় ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে এক মলিন মুখ শ্রীহীন, ক্ষীণদেহ নারীকে নিয়ে আসছেন। তার ভাবীকে চিনতে শরবিন্দু বসাকের খুবই কষ্ট হল। সে

বলল—'কংগ্র্যাচুলেশনস ভাবী। আমরা সব খবরই রাখি বিজুদা, খবর কাকের মুখে ছড়ায়। জানেন তো? তা রিটার্ন অফ দা প্রডিগ্যাল হাজব্যান্ড সেলিব্রেট করার বন্দোবস্ত করতে হয় তো!'

ভাবীর দিকে সে চোখের কোণ দিয়ে তাকাল। এই শ্রীহীন ম্যাড়মেড়ে নারীকে বসাক চায় না। কোনওদিনই চাইবে না আর।

শর্মাজি বললেন—'রয় তুমি দেখালে বটে। হোয়াটস দা বিগ আইডিয়া?'

বিজু হেসে বললেন—'মে বি, জাস্ট টু সি হু ইজ এ ফ্রেন্ড অ্যান্ড হু ইজ্‌ন্‌ট্‌?'

শর্মাজি বললেন—'থ্যাংক গড, আমি সে পরীক্ষায় বোধহয় পাশ করে গেছি।'

চকচকে সাদা কনটেসাটা বড্ড বড়। দিল্লি রোড, জি.টি. রোড কোথায় তাতেও খুব অসুবিধে হয়নি। চুঁচুড়া স্টেশনের তলার জল-ভরা গাড্ডায় ঝপাং করে বসে পড়েছিল। অনেক কষ্টে-সৃষ্টে উঠল। এখন স্টেশন রোড দিয়ে মসৃণভাবে ভেসে চলেছে। বিজন নিজে চালাচ্ছেন। তাঁর পাশে অর্জুন, পেছনে তিতি। বিজু এদের আনতে চাননি। তিনি জানেন তাঁর আর ছুটকির মধ্যে নির্জনতার প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি। কিন্তু তিতি তাঁকে বুঝিয়েছে—'পিসিমণি আমাদের দেখলে বুঝতে পারবে, শুধু তুমি নও, আমরা সবাই মিলে তাকে কত চাইছি। মাকেও আনা দরকার ছিল। কিন্তু মার শরীরের যা অবস্থা!'

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে বাড়িটা। বাতিঘর। মেটে লাল টালি দৃশ্যমান হচ্ছে ক্রমে। মাটি থেকে দোতলার ছাদ পেরিয়ে তরুলতার ঝিরিঝিরি সবুজ। এখন রোদে ম ম করছে চারদিক। নতুন রং করা নতুন বাড়ি সেই রোদ মেখে হাসছে। বিজনের বুক শিরশির করছে বাড়িটা দেখে। কোনও একটা মুহূর্তে বাড়িটাকে দম বন্ধ করা কারাগার মনে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে একটুকরো স্বর্গ। ওই ঘিয়ে রঙের দরজা খুলে ছুটকি আসবে। তাঁর হারিয়ে-যাওয়া অর্ধাঙ্গিনী। থোকা থোকা চুল উড়বে। চোখের তারায় ঝিলিক। ঠোঁটের হাসিতে স্বপ্ন। ফ্রকের ঘের উড়বে, শাড়ির আঁচল উড়বে। হলুদ-কালো খড়কে ডুরে। তারপর আনন্দ। আনন্দ। পূর্ণ। পূর্ণ সব। যে জীবন এতদিন প্রতিবন্ধী ছিল, সে তার হাত-পা-মস্তিষ্ক সব ফিরে পেয়ে ভাগ্য-বিধাতার জয়গান গাইবে। প্রকৃতপক্ষে, জীবনের হাত থেকে তাঁর এত পাওনা ছিল, এত, বিজু রায় কোনওদিন আশাও করেননি। তাঁর অনেক অক্ষমতা, অনেক ত্রুটি, কিন্তু বড় ভাগ্যবান মানুষ তিনি—স্বীকার করতেই হয়।

'তোরা বোস'—বলে একলা নামলেন তিনি। বেল বাজালেন। ভেতরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শব্দটা। ঠিক সেদিনের মতো। একটু পরে দরজা খুলে গেল। একটি তরুণ। এরা এসে গেছে তাহলে? ভালই হল।

বিজু বললেন—'কেয়া রায়কে ডেকে দিন! আপনাদের বামুন মা।'

—'আপনার নাম কি বিজনবিহারী রায়?' তাঁকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে তরুণটি জিজ্ঞেস করল।

—'হ্যাঁ।'

—'ও, একটু দাঁড়ান।' সে ভেতরে চলে গেল। একটু পরেই একটা লম্বা সাদা মুখ আঁটা খাম নিয়ে ফিরে এল। বলল—'বামুন মা কালই চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। আপনি আসলে এই চিঠিটা দিয়ে দিতে বলেছেন।'

তরুণ খামটা বাড়িয়ে দিতে দিতে সসম্ভ্রমে বিজুর দিকে চাইল। কনটেসাটার দিকে তাকাল দ্বিগুণ সম্ভ্রমে। ভেতরে উপবিষ্ট অর্জুন আর তিতির দিকেও পাঠাল তার কৌতূহলী দৃষ্টি। তারপরে একটু ইতস্তত করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। স্খলিত পায়ে বিজন ফিরে এলেন। পেছনের দরজা খুলে, কোনওমতে সিটের ওপর নিজের শরীরটাকে ফেলে দিলেন। চোখ বুজলেন।

তিতি বলল—'কী হল বাবা? পিসিমণি কই?'

বিজন শুধু মাথা নাড়তে লাগলেন। নেই, নেই, ছুটকি নেই।

—'নেই?' তিতি হতাশ গলায় বলল।

—'ছুটকি কোথায়? কী বলল ওই ছেলেটি?' অর্জুন জিজ্ঞেস করল—'চিঠি দিল না একটা? নিশ্চয়ই কোনও কারণে...চিঠিতে লিখে গেছেন নিশ্চয়ই!'

চিঠিটা তিতির দিকে শক্তিহীন হাতে বাড়িয়ে দিলেন বিজু রায়। শুকনো, তেষ্টা-পাওয়া গলায় বললেন—'তুই পড়।'

বেশ মোটা চিঠি। মুখটা ছিঁড়ে উল্টো করে ধরতেই ভেতর থেকে ঠুক করে কী একটা পড়ে গেল। তিতি নিচু হয়ে দেখল চিকচিক করছে। তুলে ধরল। একটা সোনার হার। মা দিয়েছিল ছুটকিকে। মায়ের শেষ আশীর্বাদ। মেয়ের প্রতি মায়ের ভালবাসা যা সমস্ত সম্পর্কের ধ্রুবপদ, সেই জিনিস ফিরিয়ে নেবার অনপনেয় অপরাধের জন্য ব্যাকুল ক্ষমা প্রার্থনা, অন্তর্দাহ। ক্ষরিত রক্তবিন্দু স্নেহবিন্দু সব স্বর্ণবিন্দু হয়ে জ্বলছে। ছুটকি ফিরিয়ে দিয়েছে। তিতি চিঠি মেলে ধরল। পরপর কাগজগুলো সাজাচ্ছে। তারপর অবাক হয়ে বলল—'এ কী?'

খামের ভেতরে কয়েকটা ধবধবে সাদা পাতা খালি। একেবারে শূন্য।

ঝড়ের খেয়া

মেয়েটা নিপাট ভিজছিল।

পেছনে ক্রমশ হাইজ্যাক হয়ে যেতে থাকা ময়দান।

সামনে গ্র্যান্ড হোটেল, আরও কিছু গ্র্যান্ড দোকান পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত।

পুব থেকে এক একটা প্রবল অথচ সূক্ষ্মবিন্দু বায়ুতাড়িত বৃষ্টির ঝাপটা আসে, আর সমস্ত জলরঙের ইমপ্রেশনিজম হয়ে যায়।

অজস্র গাড়ি, মিনিবাস, সারাই হতে থাকা রাস্তার টিনের উঁচু ঘের, বিপদে পড়া পিঁপড়ের মতো ছত্রভঙ্গ পদাতিকের দল। সমস্তটাই জঙ্গম।

গাড়িগুলো থেমে আছে। ট্র্যাফিক লাইটে। কিন্তু জঙ্গমতা তাদের যন্ত্র-শরীরে উন্মুখ যেমন উড়ব-উড়ব পাখির শরীরে থাকে।

একমাত্র স্থাবর বিন্দু কতকগুলো ডাকাতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে যাওয়া গাছ।

আর ওই ফুটকি।

দুটো ঝাপটার হাইফেন-পথে বোঝা যাচ্ছে ওর অঙ্গে সালোয়ার কামিজ। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। বাস। আর কিচ্ছু না এবং কেউ না।

এত বড় করে ক্যানভাসটা আঁকবার দরকার ছিল না। এক ফুটকি তো একটা মেয়ে! কিন্তু ওই যে টলস্টয় একটা অর্ধসত্য বলে গিয়েছিলেন। মানুষের নাকি সাড়ে তিন হাত জায়গা লাগে। আরে সে তো কফিনের মাপ, শবের মাপ! জীবিত, জ্যান্ত, জিয়ল মানুষকে গোটা পৃথিবীটা ধরে দিলেও অনেক সময়ে কম পড়ে যায়। কার কতটা জায়গা লাগবে বলতে পারে সে যার জায়গা লাগবে, এবং হয়তো আরও ভাল করে সে যে তাকে দেখে, তার প্রয়োজনের চেহারাটা ছবির মতো ফুটে উঠতে দেখে। যেমন আজকে অদিতি দেখছিল। এই হট্টগোলময় কেজো যন্ত্রজগৎ, ওই খাবলা খাবলা ময়দান, রম্য প্রাসাদের এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রভুত্ব, জ্যাম-জট, অক্টারলনি-শহীদ মিনার, এই ঝরো ঝরো ঝরিছে—সব সব দরকার ছিল একটা একফোঁটা মেয়ের চুপচাপ নিপাট ভেজার দৃশ্যটা দেখবার জন্য, বোঝবার জন্য।

স্টিয়ারিং হাতে অদিতির চোখে কেমন একটা ঘোর লেগে যায়। ব্লচ, ব্লচ, ব্লচ, ওয়শ, ওয়শ। প্রায় নীল-সাদার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে প্রায়-সবুজ, প্রায়-ধূসর, প্রায়-সাদা এবং আরও প্রায়-রং। মিশে যাচ্ছে, ধুয়ে যাচ্ছে, তবু থাকছে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে অস্থির জলের তলার প্রতিবিম্বের মতো। ওই কম্পমান প্রতিবিম্বের মূল্য যেমন তার উপকরণের মিশ্র-বহুতায়, ঠিক তেমনই ওই একফোঁটা নিশ্চলতায়। ওটাই কেন্দ্রবিন্দু। যদিও সত্যি-সত্যি ও কেন্দ্রে নেই, একটু ডান দিকে সরে আছে। তাতেও ওর কেন্দ্রীয়ত্ব থেকে কিছু কম পড়ছে না।

হঠাৎ ঘোর কেটে যায়, এক্ষুনি ট্র্যাফিক লাইট বদলাবে। বাঁ দিকের ধোঁয়াটে কাচটা ঝুঁকে পড়ে নামাল সে—তাড়াতাড়ি উঠে এসো, উঠে এসো শিগগিরই।

ঝাপসা চোখ-মুখ, কেমন, কোথাকার, কী বৃত্তান্ত কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে ফিরেছে।

শিগগির উঠে এসো—বিপজ্জনকভাবে দরজা খুলে ধরে অদিতি। সালোয়ার পায়ে সেঁটে গেছে। কাঁধ বেয়ে ভিজে চুল, চুপচুপে। এক পা, দু'পা করে এগিয়ে এল—আমাকে বলছেন?

—আর কাকে?

—আমি তো...

—আগে তো উঠে এসো, তো-টো পরে হবে। কুইক।

কেমন একটা অগত্যা-ভঙ্গিতে উঠে এল। মোটেই বাব্বাঃ বাঁচা গেল ভঙ্গিতে নয়। খুলে-ধরা দরজাটার বাধ্যতামূলকতার ফাঁদে পড়ে যেন। চালিকার মান রাখতে, বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে। তেমন করে ডাকতে পারলে উঠে আসবেই এই বিশ্বাস।

আস্তে আস্তে ছাড়ছে, অদিতি প্রস্তুত, সমস্ত মনোযোগ সামনে, কানে এল—আপনার গাড়ি তো নদী হয়ে গেল।

—তুমি নিজেও তো নদী হয়ে গেছ। ঘাড় না ফিরিয়ে সে জবাব দেয়।

—সত্যি বলছেন? কেমন একটা খুশির হাসি চমকে উঠল গলা থেকে। ও কি নদী টদি হতে চেয়েছিল নাকি? কোনও কোনও মানুষের আবার মানব-অস্তিত্বকে বড় সীমাবদ্ধ মনে হয়। তারা কেউ রোদ্দুর হতে চায়, কেউ আকাশ হতে চায়, কেউ ঝরনা, এ মেয়েটি তা হলে নদী হতে চাওয়া, সীমাবদ্ধ-মানবতা থেকে মুক্তি পেতে চাওয়া কোনও মানুষ। নাকি অদিতি একটু বেশিই ভেবে ফেলছে।

—তোমাকে কোথায় নামাব?

—তুললেন কেন? মানে তুললেনই বা কেন?

—আচ্ছা—এবার সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের ভেতর ঢুকে পড়া গেছে। অতএব ফিরে তাকাবার একটু অবসর। বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে অল্প বয়সের নিশ্ছিদ্র মসৃণ, শপশপে ভিজে চুল সেঁটে গেছে মাথার সঙ্গে। লেপটে আছে। কানে, কপালে। বেশ লম্বা চুল, তলার দিকটা কেমন কোঁকড়া মতো, এত ভিজেও যখন সোজা হয়নি, তখন পার্লারি নয়।

—একা একা ভিজছ। আকাশ থেকে তো গোটা গঙ্গা-গোদাবরীই ঢালছে মনে হচ্ছে, তুলব না?

—বা, বিপদে পড়তে পারেন না?

—এখনও সন্ধে হতে দেরি। ছেলে-ছোকরাও নয়, তুলতে অসুবিধে কী? পিস্তলধারিণী বালিকা দেখতে আমার এখনও বাকি আছে।

পাশ থেকে একটা ছোট্ট হাসি এল।

—কোনও ভদ্রলোকের গাড়িতে উঠতে কিন্তু তোমাকেও ভাবতে হত। অপর পক্ষে ভদ্রলোককেও। এ ক্ষেত্রে সে সব ঝামেলা নেই...যাক তোমাকে কোথায়...।

—এখানেই নামিয়ে দিন না, একটু বাঁ দিক ঘেঁষে রাখুন...আমি নেমে যাচ্ছি।

—আশ্চর্য, অমনি তোমার রাগ হয়ে গেল। আমি কি তোমাকে যেখানে-সেখানে নামতে বলেছি। তোমার বাড়ি বা গন্তব্য, যাই হোক, সেখানেই নামাব। এখানে পথের মাঝখানে! বৃষ্টি তো তুমুল।

—তাতে কী হয়েছে।

এবার হেসে উঠল, বেশ শব্দটা হাসির। বলল, নামাবেন কোথায়? আমি তো এদিকে থাকিই না!

—তবে?

—সাউথে। আপনি নর্থে না ইস্টে?

—নর্থ। তুমিও তো নর্থের দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়েছিলে...যা ভিজেছ এ অবস্থায় বাড়ি ছাড়া আর কিছুর কথা কেউ ভাবে না... ন্যাচারালি...আমিও ...

—আপনি তা হলে বাড়ি ফিরছেন?

—হ্যাঁ। কেন?

—যদি অসুবিধে না হয় আপনার বাড়িতে নিয়ে যাবেন?

ভেতরে ভেতরে খুব চমকে গেল অদিতি। বলে কী? পাগলটাগল নয় তো? কিংবা ডাকাতদলের চর?

নিজের ভাবনায় অবশ্য নিজেরই হাসি পেয়ে গেল তার।

পাগল এ নয়। অন্তত পুরো পাগল তো নয়ই। সিকি পাগল হলেও হতে পারে। আর ডাকাতদল? ডাকাতদলের চরণী এমন যোগসাজশ করল যে তাকে গাড়ি থামাতে হল। চরণীর কোনও আবেদন ছাড়াই তাকে তুলতে হল। সে ক্ষেত্রে তো রীতিমতো লং ডিস্ট্যান্স সম্মোহন প্র্যাকটিস করতে হয় এই খুদে ডাকাতকে। নয়তো ম্যাজিক। সেই তাসের খেলা আছে না। তোমাকে যে-কোনও একটা তাস টানতে বলবে। কিন্তু পুশ করার এমনই কায়দা যে ম্যাজিশিয়ানের চেনা তাসটাই তুমি টানবে!

—তোমার যদি কোনও অসুবিধে না থাকে, আমারও নেই। তবে আমার কিন্তু বাড়ি-ভরতি লোক। একটা বিছানা তোমাকে দিতে পারব, কিন্তু তেমন প্রাইভেসি হয়তো...অনেকের আবার খুব কৌতূহলও।

আবার একটু ছোট্ট হাসি, বলল, আমার সবকিছু অভ্যেস আছে।

—বেশ।

লাল আলো, হাঁড়ল হাঁড়ল গর্ত। বৃষ্টিতে চটা-উঠে-যাওয়া রাস্তা, রোড বাম্প। বেজায়গা দিয়ে পার হতে থাকা বেআক্কিলে। ভাববার আর সময় নেই। তলিয়ে ভাবতে গেলে সামনের গাড়ির বাম্পারে নির্ঘাত ভিড়িয়ে দেবে। তাই ওপর-মন দিয়ে খুব আলতো করে ছাড়া ছাড়া ভাবতে লাগল সে।

ট্রপিক্যাল-মেডিসিন এসে গেছে...এককথায় রাজি হয়ে গেল সে? ডান দিকের ঝুপড়িতে গরম গরম ভাঁড়ের চা খাচ্ছে কিছু কুলি শ্রেণীর লোক। ঝুপড়িটা কিছুটা তেরপলের, কিছুটা প্লাস্টিকের, ভেতরে উনুনের গনগনে আঁচ। তার আলোয় এক থুত্থুড়ে বুড়ির মুখ, চা খাচ্ছে। এই ইয়াং কুলিদের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক? মা? না ও-ই চা-ওয়ালি। উনুনের ধারে বসে রয়েছে যখন। আপাদমস্তক কালো একটা বিরাট কেটলির ঢাকনাটা খুলে ভেতরে একটু গুঁড়ো দুধ ছিটিয়ে দিল...একটা অজানা অচেনা উটকো, কিছুর মধ্যে কিছু নেই ভিজছে। সাউথে থাকে বলছে। অথচ ডেফিনিটলি নর্থের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল... ফলঅলা পলিথিনে ঢাকা ফলের ঝুড়ি সরাতে গিয়ে কাত করে ফেলেছে, পেভমেন্টে গড়াচ্ছে মুসাম্বি...আপেল—দুটো ভিজে-কাক বাচ্চা হেসে লুটোপুটি... চৌরঙ্গিতে একা একা ভিজছে...গন্তব্য নেই...খুব গোলমেলে কিছু হলে? মেয়েটা যদি তার বাড়িতে গিয়ে সুইসাইডফাইড করে? 'হ্যাঁ' বলল কেন? কেন সে রাজি হল? নিঃসংকোচ চাওয়ার জবাবে অন্য কিছু বলতে পারেনি। তাই?

হবেও বা। এ কথা সত্যি যে সে অনুরোধ এড়াতে পারে না। দুম করে মুখের ওপর এ রকম একটা অনুরোধ কেউ করতে পারে, সেটাই ধারণায় ছিল না। এই না গাড়িতেই উঠতেই চাইছিলি না! উঠতে-না-উঠতেই একেবারে গেস্ট হওয়ার অনুরোধ? অনুরোধও নয়। যেন প্রচ্ছন্ন দাবি! বসতে পেলে শুতে চায়।

হঠাৎ সে বেকায়দায় পড়ে গেছে।

হেদুয়া পেরিয়ে যাচ্ছে, এপারে বেথুন ওপারে স্কটিশ চার্চ।

—এ জায়গাটা চেনো?

হাসছে।—আপনি আমাকে কী ভাবেন?

—কোথায় পড়াশুনো করেছ?

—এখানে নয়।

প্রত্যেকটি কথার জবাব এড়িয়ে যাচ্ছে।

—বাড়ি থেকে পালিয়েছ নাকি বলো তো! মুখে একটা হালকা হাসি টেনে অদিতি ছুঁড়ে দিল, সে খুব ভাবিত। এই খুব-ভাবনাটা যেন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে।

—তা হলে তো আপনাকে আবার গাড়ি ঘুরোতে হয়। .

—কেন?

—ভবানী ভবন? বাড়ি পালানোদের তো সেখানেই—খুঁক খুঁক করে হাসতে লাগল। ফাজিল খুব।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থামল গাড়িটা।

—নামো, এসে গেছি—অদিতি বলল।

রাস্তাটা কচ্ছপের পিঠের মতো, ধারে স্রোতের মতো জল বইছে। ওপরেও হালকা জল। তবে বৃষ্টি যেভাবে চলছে তাতে শিগগিরই ডুবে যাবে, কোনও সন্দেহ নেই।

—তুমি চট করে সিঁড়িটায় উঠে সদর দরজার কাছে দাঁড়াও। আমি গাড়িটা গ্যারাজ করে আসছি।

বহুকালের পুরনো বাড়ি। একশো বছর হবে বোধহয়। বয়স সঠিক হিসেব করতে হলে ঠিকুজি নিয়ে বসতে হয়। বাইরের ঝুল-বারান্দাগুলোর লোহার ফ্রেম তুবড়ে মরচে মেখে একেক্কার। তিনতলা বিরাট বাড়িটার গায়ে আগাগোড়া খোসপাঁচড়ার মতো ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া দাগ। কোথাও চটা উঠে যাওয়া, কোথাও চুনবালির চাঙড় খসে পড়া, কোথাও আবার স্রেফ বৃষ্টিটিষ্টির একটা কালচে শ্যাওলা ছাপ। কতদিন সারাই-ঝালাই হয়নি, কে জানে! খুব ছোটবেলায় একবার সব খসিয়ে নতুন করে দেয়ালটেয়াল হয়েছিল আবছা মনে পড়ে। বালি দিয়ে খেলার স্মৃতিটা একটা ছোট্ট লাল টিপের মতো মনের ভেতরে।

—চলো। অদিতি বুঝতে পারছে অদিতির সঙ্গে বাড়িটাকে মেলাতে পারছে না খুদেটা। মনে মনে সে খুব খানিকটা হেসে নিল।

ভেতরে ঢুকে, একটু বাঁয়ে একটা চৌকোনা বড় উঠোন, মাটির, তাতে গুচ্ছের আগাছা, শ্যাওলার ওপর যদি পা পড়ে তো হড়াস্। একটা মাঝারি সাইজের হৃষ্টপুষ্ট ছাতিম গাছ। পাশেই নিমের পাতা বৃষ্টিতে ঝুরছে। উঠোনের তিন দিক দিয়ে বাড়িটা উঁচিয়ে উঠেছে, নিম-ছাতিমের মগডাল ছাড়িয়ে। উঠোনের চারপাশে চওড়া রোয়াক। বাঁ দিকে ঘুরেই সেকেলে কাঠের সিঁড়ি। ওদের পাশ দিয়ে দুটো হুলো বেড়াল তীব্র গতিতে ফ্যাঁশ্‌শ্‌ আওয়াজ করে নেমে গেল। এক্ষুনি বৃষ্টিটা থেমে গেলেই উঠোনটাতে ধুন্ধুমার ঝগড়া শুরু করবে। হুলো দুটোর অহি-নকুল সম্পর্ক।

দোতলায় উঠে কোলাপসিবলের তালা খুলল সে। কোলাপসিবলের পেছনে দরজাটা সাবেক নয়। চাবি ঘুরিয়ে খুলল—এসো।

তার বারান্দার লাল সিমেন্ট জায়গায় জায়গায় ক্ষয়ে গেছে। কিন্তু বাকিটুকু অদ্ভুত চকচকে। বাঁ দিকে কিছুটা গিয়ে একটা দরজার তালা খুলল অদিতি। হেসে উঠল ভেতরটা।

ফুটকি বলল—আপনি ভাল ড্রাইভ করেন না।

—শোনো এ ঘর থেকে বেরিয়ে ডান দিকের দরজাটাই বাথরুম। তোয়ালেটোয়ালে আছে। আমার একটা বাথরোব আছে—কাচা। শুকনো হয়ে নাও। ওটা পরতে পারো। আমি একটু আসছি।

এই সময়ে কালো কি ছবি কাউকে পাওয়া গেলে ভাল হত। কিন্তু এই বৃষ্টিতে কোনও আশাই নেই। অন্য হাতের তৈরি চা খাওয়ার বিলাস আজ হবার জো নেই। রান্নাঘরে গিয়ে অতএব কফির জল-দুধ চাপাল গ্যাসে। তারপর সিঙ্কে ভাল করে হাত ধুতে লাগল। রান্নাঘরটা খুবই বড়। আসলে তো এটা রান্নাঘর নয়, শোবারই ঘর। ছোটকাকুর। অবিবাহিত ছোটকাকুর ঘরটা আদরের ভাইঝির ভাগে পড়েছে। এটা খাবার ঘরও। পাথরের টপওয়ালা গোল টেবিলের চার পাশে তিনটে চেয়ার। টেবিলটা প্রাচীন, চেয়ারগুলো আধুনিক।

চিঁড়ে-বাদাম-কাঠি ভাজার সাড়েবত্রিশ ভাজাটা একটা বড় স্টিলের বাটিতে ঢালল অদিতি। স্টিলের পটে কফি, দুটো কাপ-ডিশ, দুটো বড় চামচ।

ফুটকি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। একেবারে মাঝখানে, গোল জাজিমটার ওপর, চারপায়া সেন্টার টেবিলটার পাশে। এ রকম জায়গায় দাঁড়াবার একটাই মানে হয়। পাখাটা পাওয়া। কিন্তু ও চালায়নি। অদিতি টেবিলের ওপর ট্রেটা রেখে বলল—ফ্যানের সুইচটা ওই দিকে দরজার পাশে। চুলটা ভাল করে মুছেছ? তবে আমার ড্রায়ার আছে, চট করে তো শুকোবে না, আগে খেয়ে নাও

একটু...ঠান্ডা হয়ে যাবে। বসো।

গোলাপি তোয়ালের বাথরোবের মধ্যে ছোট্ট শরীরটা ডুবে গেছে, ভিজে চুলের গোছায় মুখটা প্রায় ঢাকা। বসল। এখনও সেই অগত্যা ভঙ্গিতে।

—তোমাকে ক' চামচ?

—যা হোক।

কফি ঢেলে কাপটা এগিয়ে দিতে হঠাৎ বলল—আমার ভিজতে ভাল লাগছিল।

—তাই? রাগ করেছ?

—না, তা নয়, এটাও বেশ ভাল।

একমুঠো চিঁড়েভাজা মুখে পুরে অদিতি বলল—চামচটামচ দিয়ে মুড়ি-চিঁড়েভাজা পোষায় না। যাই বলো। মুঠো করে তুলে মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে এক ধাক্কায় চালান করে দিতে হয় ভেতরে। তুমি কী বলো? খাও! আচ্ছা তো।

একটু নিল, চামচ করে। এক চুমুক কফি।

—ভাল হয়েছে কফিটা?

—কী জানি, ভাল-মন্দ কিছু বুঝতে পারছি না।

মানুষ তো ভদ্রতার খাতিরেও ভালটাল বলে! এর সে বালাই নেই।

—তোমার জামা কাপড়গুলো মেলে দিয়েছ তো? ভাল করে নিংড়ে?

—হ্যাঁ বাথরুমে একটা রড ছিল।

—সে কী! বাইরে বারান্দায় দেখছ না? কত বড় দড়ি টাঙানো রয়েছে। ওইখানে দাও। হাওয়ায় শুকিয়ে যাবে।

—কালকের আগে শুকোচ্ছে না।

অদিতি মনে মনে ভাবল—যাক, কমনসেন্স ফিরে আসছে তা হলে।

মুখে বলল—জলটা টেনে যাক, তারপর ঝেড়ে ইস্ত্রি করে দেব। আমার শাড়ি বার করে দিচ্ছি, যদিও ব্লাউজ তোমার হবে না। পরে, কাঁধের ওপর দিয়ে টেনে নিতে পারো। ওটা অবশ্য ফ্যাশনেবল নয়, আই নো।

কোনও উত্তর দিল না। আনমনে চিঁড়েভাজা খেয়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝেই কফিতে লম্বা চুমুক। এবার বোধহয় আরাম লাগছে কফিটা খেতে। কিছু জিজ্ঞেস না করেই ওর কাপে আর একটু ঢেলে দিল, চিনি দিল, নিজেও নিল।

এই সময়ে আবার দ্বিগুণ জোরে একেবারে ঝমাঝঝম শব্দে বৃষ্টি নামল। বিরাট একটা বাজের ডাক আকাশের এ মোড় থেকে ও মোড় পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। পরক্ষণেই চোখ-ঝলসানো ঝিলিক ঢুকল ঘরের ভেতর।

—আজ কলকাতা ভেসে যাবে—অদিতি উঠে গিয়ে আকাশের দিকে তাকাল—জানলা ভরতি কালো মেঘ। নড়বার লক্ষণ দেখছি না। ফিরে বলল ইশ্‌। কী করে যাবে?

—যেভাবে এসেছিলাম...

—আমি তোমাকে একটা ছাতা দিতে পারি। শাড়িটাড়িও...কিন্তু এ বৃষ্টিতে কি ছাতা কোনও কাজে লাগবে?

—ওসব দরকার নেই।

—তার মানে?

—চলে যাব ঠিক।

—আমি কিন্তু তোমাকে চলে যাবার কোনও ইঙ্গিত টিঙ্গিত দিইনি। ডোন্ট মিসান্ডার্স্ট্যান্ড মি। এই সাঙ্ঘাতিক বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কেউ কোথাও যেতে পারে না। জল যা জমেছে, হাঁটু

পর্যন্ত। তুমি যা পলকা। জল ঠেলতেই পারবে না। সন্ধে হয়ে আসছে, আসছে কেন এসে গেছে। পড়ে যাবে, ডুবে যাবে... যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। আমি অ্যাকচুয়ালি ভাবছিলুম তোমার বাড়ির কথা। দে'ল গেট ওয়ারিড।

ওদিক থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

অদিতি বলল—তুমি বরং বাড়িতে এইবেলা একটা ফোন করে দাও। আমার নম্বর আর ঠিকানাটা দিয়ে দেবে।...এইবেলা, কেননা এত বৃষ্টি হলে দেখেছি আমাদের ফোনটা চলে যায়। কী হল, কিছু বলছ না যে? এ ছাড়া কোনও উপায় নেই—ইউ'ল হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইট—রাইট?

এবারও কোনও উত্তর নেই। সে হেয়ার-ড্রায়ারটা বার করে আনল। প্লাগটা লাগিয়ে দিয়ে বলল—শুকিয়ে নাও চুলটা। অতটা চুল, ভিজে থাকলে ঠান্ডা লেগে যাবে। আচ্ছা, এক কাজ করো, বাথরুমে লাগিয়ে দিচ্ছি। ওখানেই শুকিয়ে নাও। এখানে তারটা সোফা পর্যন্ত যাচ্ছেই না। চলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি...

হাতটা বাড়াল। ড্রায়ারটা নিল, বিনা বাক্যব্যয়ে বাথরুমে চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে দু'কদম এগিয়ে ওর চামড়ার মুখবন্ধ ঝোলাটার চেন চররর করে খুলে ফেলল অদিতি। দুটো কবিতার বই, একটা রিলকে অনুবাদ, আর একটা অক্সফোর্ড বুক অব ইংলিশ ভার্স। একটা পার্স। হ্যাঁ এই যে একটা শক্ত মলাটের ডায়েরি। চটপট ডায়েরিটা খুলে দেখল—অনোহিতা সাহা রায়। ফোননম্বর মনে হচ্ছে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডটোড হবে। যথাস্থানে ডায়েরিটা ঢুকিয়ে রেখে সে বাথরুমের দরজা পেরিয়ে ওদিকের শোবার ঘরে চলে গেল। চটপট ডায়াল করল। বাজছে...বাজছে। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সাহা রায় স্পিকিং...সরি টু হ্যাভ মিসড ইয়োর কল। প্লিজ লিভ ইয়োর ফোননাম্বার অ্যান্ড মেসেজ। ওয়েট ফর দা বিপ। থ্যাঙ্কস ফ' কলিং।

সামান্য একটু ছায়া নেমেছিল তার মুখে। পরক্ষণেই বিপটা শোনা যেতে সে তাড়াতাড়ি বলে গেল—অনোহিতা আজ আমার বাড়িতে থাকছে। বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিল। লিফ্‌ট দিয়েছিলুম। আমি অদিতি সরকার। ফোন ২৫৫৫-৩৯১৯।—বাস, মা-বাবা রাতে বাড়ি ফিরে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন। একটা ফোন তাকে নিশ্চয়ই করবেন। মেয়ের সঙ্গে কথা বলুন না বলুন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ব্যাপারটা থাকছে না।

আলমারি থেকে একটা ছাপা শাড়ি, ব্লাউজ আর পেটিকোট বার করে ফেলল। তারপর বাথরুমের দরজায় টোকা দিল। খুলে গেল দরজাটা। দাঁড়িয়ে রয়েছে। হেয়ার-ড্রায়ার হাতে, চুপচাপ। শাড়ি ব্লাউজগুলো সে র‍্যাকে রাখল। তারপর ড্রায়ারের সুইচটা টিপে ওর হাতে দিয়ে বলল নাও, শুকোও। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল হাওয়ায় বাদামি চুল উড়ছে। বিলি কাটছে ও চুলের ভেতর। ড্রায়ারটাকে ভালই তো বাগিয়েছে। শাড়ি-ব্লাউজগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল—পরে নিয়ো। একটু অসুবিধে হবে। কিন্তু কী আর করা যাবে।

এতটা চুপচাপ কেন? বৃষ্টিতে অসাগর ভিজছিল। সঙ্গে এল, কিন্তু বাধ্য হয়ে, অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে। দেখলে খানিকটা সম্পন্নই মনে হয়, চেহারায় অল্পবয়সি লালিত্যের সঙ্গে মিশে রয়েছে একটা মার্জিত ছাপ। তা ছাড়া ব্যাগের বইগুলো তো বলেই দিচ্ছে—ভালই শিক্ষিত। ইংরিজিতে এম এ টেম এ পড়ে হয়তো। আপাতদৃষ্টিতে উড়নচণ্ডী। কিন্তু নোঙরহীন মনে হয় না ওকে। মেয়েটা কি খুব শকটক পেয়েছে? মা-বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছে? পরীক্ষায় ফেল? প্রেম চটকে গেছে?... এগুলো ছাড়া আর তো কিছু মনে আসছে না। যাক, ওই বৃষ্টিতে যে বেপরোয়া মেয়েটা ভেসে যায়নি, কিংবা বদ হাতে পড়েনি এটাই যথেষ্ট। অদিতির জায়গায় যদি কোনও ভূপতি টুপতি ওকে লিফটটা দিত, এবং এমনি না-না করে ও সেটা নিত, লোকটার যদি বদ মতলব থাকত, আনমনা মেয়েটা যদি নিজেকে বাঁচাতে না পারত, তা হলে এতক্ষণে এ পুলিশ-কেস। এতগুলো 'যদি' লাগিয়ে নিজেরই হাসি পেয়ে গেল অবশ্য।

খুট করে শব্দ হল। দু' সেকেন্ড পরেই লাল ছাপের শাড়ি ঢিলে ব্লাউজ পরে, বাদামি চুল এলো করে এলেন। ঢিলে ব্লাউজটাকে ঢাকবার চেষ্টাও করেনি। ফ্যাশন অ-ফ্যাশনে ওর কিছু যায়-আসে না, যেমন কফিতে চিনি ঠিক আছে কি নেই তাতে বা বৃষ্টিতে ভিজে কাক হয়ে এসপ্ল্যানেডের শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকতেও কিছু এসে যায়নি। কিছু মেয়ে!

—নামটা জানতে পারি কি? আমি অদিতি সরকার।

'তোমার নাম কী খুকি'টাই ঠিক হত। কিন্তু এ তো মেয়ে মেয়ে নয়!, মেজাজি নিশ্চয়! একটু অসরাসরি জিজ্ঞেস করাই ভাল। নামটা সে জানে, মিলিয়ে নিতে পারবে—মিথ্যে বলছে কিনা।

ঠিক! নাম ভাঁড়াচ্ছে, গম্ভীর মুখে বলল—তনিকা।

—তনিকা?

—আমি পদবি ইউজ করি না।

এ বয়সে সবাই অল্পবিস্তর বিদ্রোহী থাকে। তারও অনেক রকম বিদ্রোহ ছিল। কিছুতেই কাউকে প্রণাম করত না। এক বিজয়ার দিন ছাড়া। দিদিমা ব্যাপারটা খেয়াল করে একদিন বলেছিলেন কী রে বনি, আমার পায়ে হাত দিলি না?

—তোমার পায়ে কি আর তুমি আছ দিদিমা। আছে যত রাজ্যের গরগরে ধুলো।

—'পায়ের ধুলো' নেওয়াই তো বলে কথায়।

—পা যদি ধুলো প্রোডিউস করত, গুরুঠাকুরদের ম্যাজিক-ভস্মের মতো, তা হলে ভেবে দেখতুম দিদিমা। কিন্তু ও ধুলো জীবাণু আর নোংরায় ভরতি রাস্তার ধুলো। লক্ষ্মীটি।

বলেটলে অবশ্য সে এক ছুটে দিদিমার গলা জড়িয়ে চুমু খেয়েছিল, বলেছিল, তুমি তো আমার প্রাণের বন্ধু, দিদিমা, বন্ধুকে কেউ প্রণাম করে?

দিদিমা নিজের গালে আঙুল রেখে বলেছিলেন—আর এই যে তুই তোর মুখামৃত দিয়ে আমার গালটা এঁটো করে দিলি? সেটা বুঝি নোংরামি নয়!

—একটি ফোঁটাও পাবে না। বেশ চলো। সাবান-ডেটল দিয়ে তোমার গাল ধুয়ে দিই।

দিদিমা বলেছিলেন—দেখিস রাণু তোর এই সৃষ্টিছাড়া মেয়েটা নির্ঘাত সাহেব বিয়ে করবে।

দিদিমা জেনে গেলেন না তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

পদবি ব্যবহার বা অব্যবহার নিয়ে অদিতি কোনও হালকা মন্তব্য করল না। কে জানে বাবা, কী ভাবে নেবে।

—একটু শুয়েটুয়ে নেবে?—সে বলল।

—যখন-তখন শুই না।

—তো করবেটা কী? কথাই তো বলছ না। বাড়ি কোথায়?

—সাউথে, বললাম তো!

—সাউথ তো অনেকখানি! ঠিক আছে না বলতে চাও না-ই বললে। তবে কারণটা বুঝলুম না। আমি তো একজন ভদ্রমহিলা। কোনও ভদ্রলোককে ঠিকানা টিকানা না দেওয়াই ভাল। কিন্তু...

কোনও উত্তর দিল না। উঠে র‍্যাকের বইগুলো দেখতে লাগল। অদিতি আঘাত-পাওয়া মুখে বসে আছে। ছদ্ম অবশ্য। তার একটু মজা লাগতে শুরু করেছে।

হঠাৎ ফিরে ফিক করে হাসল।

—হাসলে যে?

—হাসিরও এক্সপ্লানেশন দিতে হবে?

—তা দিতে হবে বই কী। কারণ ছাড়া হাসলে তাকে পাগল বলে।

—ব্ল্যাকমেল করছেন? ইমোশন্যাল? যদি এইসব বিশেষণের চাপে বলে ফেলি।

—আরে! আমি তো সোজাসুজিই জিজ্ঞেস করলুম। আচ্ছা মেয়ে তো তুমি।

—কৃতজ্ঞতা নেই, বেপরোয়া, ছন্নছাড়া...আধপাগলা না?

ঝিলিক ঝিলিক হাসতে লাগল।

যাক বাবা হাসছে। তেমন গুরুতর কিছু হয়নি তা হলে! তবে চালাক খুব। খুব কটকটেও আছে।

—ক্যাটক্যাট করে কথা বলে, না?—অদিতি চমকে তাকাল। মুখটা খুঁজে খুঁজে দেখল—হাসি হাসি ভাবটা নেই, তবে দুঃখী দুঃখীও নয় ঠিক। কী রকম যে তা তার বোধগম্য হল না।

—তোমার খিচুড়ি চলে?

—আমার কথায় উত্তর দিলেন না তো!

—দ্যাখো অনো...মানে তনিকা, তোমার কৃতজ্ঞতা আছে কি নেই, পরোয়া করো কি করো না, ক্যাটক্যাটে কি ক্যাটকেঁটে নয় এসব বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছিলুম জাস্ট অপরিচিত কারওর সঙ্গে দেখা হলে ওটাই স্বাভাবিক তাই। আর কোনও কারণ...

—চলে—ও বলে উঠল।

—চলে? কে চলে?

—কেউ নয়। আমার খিচুড়ি চলে। আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন না?

—তা হলে, এখন ধরো আটটা, আর আধঘণ্টা পরে চাপিয়ে দেব, হবে তো?

—খুব—যাক, এতক্ষণে একটা সোজা কথার সোজা জবাব পাওয়া গেল।

—তুমি বরং বইটই দেখো। আমি একটু কাজ করে নিই।

কম্প্যুটার খুলে গোটা তিনেক ই-মেল পেল সে। একটা মনীষার। অদিতি চলে আসবার পর থেকেই তার নাকি একদম ভাল লাগছে না। সে-ও ফিরে আসবে ভাবছে।

সর্বনাশ! মনীষা বড্ড নাছোড়বান্দা আর সেন্টিমেন্টাল টাইপের মেয়ে। তার ওপর খ্যাপাটে। চলে আসবে মানে? পাবলিশিং হাউসের অমন চাকরিটা ছেড়ে দেবে? এই নিয়ে তা হলে তিনবার হবে।

দ্বিতীয়টা আঁদ্রের। শিগগির দিল্লি আসছে 'মাতিস'-এর কাজ নিয়ে। ফরাসি আর ভারত সরকারের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান, কাজটার ভার পেয়েছে সে। কলকাতা ইনটারেস্টেড কিনা জানতে চেয়েছে। আশ্চর্য! দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করতে অদিতিকে দরকার পড়ল না, কলকাতা বলেই দরকার পড়ে গেল? এখানে সরকার নেই? সে তো নিজেই এসেছে—চার বছর পোরেনি এখনও। নিজের আতলিয়ে গড়তেই দিন গেছে। তেমন যোগাযোগ এখনও হল কই? প্রথম দেড় বছর মা ছাড়া আর কিছু ভাবেনি সে।

তৃতীয়টা রাজর্ষির। এটাই সবচেয়ে বিরক্তিকর। রাজর্ষির মা বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে থাকেন, তাঁর শরীর খারাপ হয়েছে। অদিতি কি একবার যেতে পারবে? অবশ্যই যেন যায়। রাজর্ষি খুব চিন্তিত হয়ে আছে। এ অনুরোধ মানেই আজ্ঞা। এর আগেও দু'বার এ আজ্ঞা পালন করেছে সে, এইভাবে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায় ও। সে ভালই বোঝে। কিন্তু রাজর্ষির মাকে সে একেবারে পছন্দ করে না। কেন করে না তার অনেক কারণ আছে, তবে স্থূলতম কারণটা হল উনি একদিন তার সম্পর্কে বলেছিলেন— 'সাহেবের এঁটো'। ছিঃ। এ কথা যে মহিলা বলতে পারেন তাঁকে অপছন্দ করবার হক তার আছে। এমনকী ঘেন্নাও। কিন্তু মুশকিল হল—ঘেন্না জিনিসটা তার চট করে আসে না। ইংরেজিতে সে বলতে পারে আই হেট দিস, হেট দ্যাট, বা আই হেট য়ু। কিন্তু ইংরেজি হেট আর বাংলা ঘেন্নার অনেক তফাত। সে যাই হোক, ঘেন্নার জায়গায় তার যে অনুভূতিটা হয় সেটা হল বিরক্তি। দূর দূর! তা রাজর্ষির সংক্রান্ত সব ব্যাপারেই তার এই 'দূর!'টা মনে হয়। ধু—র!

মনীষাকে জবাবটা দিয়ে দিল চটপট। না হলে মুশকিল আছে। দিবারাত্র অদিতির কাছে এসে মড়াকান্না কাঁদবে। একবার যদি এসে পড়ে। ওটাই মনীষার স্বভাব। যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না। ওকে প্রথম স্কলারশিপটার খোঁজ দিয়েছিল অদিতিই। মড়াকান্নায় অস্থির হয়ে গেল। প্রথমটা ডগোমগো। দারুণ ভাল, দারুণ ভাল সব। দারুণ কাজ করছে। তখন অদিতি

গ্লাসগোতে স্কুল অব আর্টে ট্রেনিং নিচ্ছে, মনীষা লন্ডনে পোস্ট ডক্‌। ও মা, কাউকে বলা নেই, কওয়া নেই, কাজকর্ম ডকে তুলে চলে গেল ইন্ডিয়ানা, খুব নাকি ভাল অফার পেয়েছে। ছ'মাসও গেল না, বিয়ে করে ফেলল ইন্ডিয়ানারই আর এক প্রফেসারকে, অঙ্কের লোক প্রফেসর রাও, দারুণ ভাল। বিয়ে যে কী জিনিস। কিছুদিনের মধ্যেই অদিতিকে লম্বা চিঠি, বিয়ে করে ভীষণ ভুল করেছে, এক পেশার লোককে কক্ষনও বিয়ে করতে নেই। অদিতি যেন ও ভুল না করে। রাও ওকে চাকরি ছেড়ে দেবার জন্যে চাপ দিচ্ছে। ও সংসারে মন দিচ্ছে না—এই নালিশ করছে অহরহ। ডিভোর্স করল, ইন্ডিয়ানা ছাড়ল, তারপর খুঁজে পেতে প্যারিসে এসে অদিতির ঘাড়ে চাপল। কোন পাবলিশারের অফিসে কাজ করছে, থাকার পয়সা কম পড়ছে, অদিতি যদি ওর ঘরটা শেয়ার করে। লাইফ হেল করে দিয়েছিল একেবারে। বড্ড অব্যবস্থিতচিত্ত আসলে। খুব স্বার্থপরও। এবং ভীষণ সেন্টিমেন্টাল। কথায় কথায় ঠোঁট ফোলানো টাইপ। তুই বোধহয় আমায় পছন্দ করছিস না।

অদিতি আমি আবার না তোর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াই।—এই রকম, আর এখন অত ভাল চাকরি করছে। ছেড়ে দেবে?

মনীষাকে অগত্যা খানিকটা স্তোক এবং খানিকটা মিথ্যে কথা লিখতে বাধ্য হল। এতদিনে একটা মনের মতো চাকরি হয়েছে। সেবার পোস্ট ডক্‌টা ছেড়ে টিচিংয়ে আর আসতে পারলি না। এবার যদি কাজ ছাড়িস জীবনে তোর মুখ দেখব না। কলকাতায় যা পলিউশন তাতে তোর মতো হেঁপো রুগি—মাসখানেকও টিঁকবে না। শুধু কলকাতা নয়, দিল্লি মুম্বই চেন্নাই সর্বত্র পলিউশন লেভেল ভয়াবহ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনীষা একেবারে যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী। কিন্তু ওই অস্থির পরনির্ভর স্বভাবের জন্য এখনও কেমন না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে রয়েছে। নামকরা প্রকাশকের এডিটোরিয়াল বোর্ডে রয়েছে। তবু পালাই পালাই।

কম্প্যুটারটা বন্ধ করে, পেছন দিকে তাকাল। ঘরের মধ্যে নেই, বুকের মধ্যেটা ঢিপ করে উঠল। নাঃ ওই যে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। কী দেখছিস বাবা? শ্যাওলা?—দ্যাখ! সে রান্নাঘরে চলে গেল। ফ্রিজ থেকে রম্‌-এর বোতলটা বার করল, কোকের সঙ্গে পরিমাণ মতো মিশিয়ে তৈরি করে ফেলল ড্রিঙ্কটা। একটু একটু করে খেতে খেতে হয়ে যাবে রান্নাটা।

—আমি হেলপ করব?

তনিকা-অনোহিতা রান্নাঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখ পানীয়র গ্লাসের দিকে। অদিতি পাত্তা দিল না। বলল—তুমি পারো?

—কিছু কুটতে হলে ছুরি লাগবে।

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে অদিতি বলল আমিও তো ছুরিই ব্যবহার করি। দিচ্ছি। ক্রিসপারটা দেখল। নাঃ খিচুড়িতে দেবার মতো কিছু নেই। কটা ফ্রেঞ্চ বিন পড়ে আছে। দিয়ে ফেলা যাক। টোম্যাটো বার করল। আলুর ঝুড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল—আলু আর বিন ছাড়া আর কিছু তো নেই দেবার। আলু কয়েকটা ছাড়িয়ে আধখানা করে ফেলো। পেঁয়াজ? না, পেঁয়াজ আমি কেটে নিচ্ছি।

—থ্যাংকিউ।

চাল-ডাল ধুতে লাগল অদিতি। জল বসিয়ে দিল গ্যাসে।

—আপনি এইভাবে রান্না করেন?

—অর্থাৎ?

গ্লাসটার দিকে চিকচিকে চোখে তাকাল।

—চেখে দেখবে? অত বৃষ্টিতে ভেজার পর ভাল।

—চলবে।

আর একটা গ্লাস তৈরি করল অদিতি। বলল—ধীরে ধীরে খাবে।

নিজের গ্লাসটা অদিতির গ্লাসে ঠেকিয়ে খুব অভ্যস্ত গলায় বলল 'চিয়ার্স'। পাকা পক্কান্ন একেবারে। তারই বোঝা উচিত ছিল। আজকালকার মেয়ে। সে যখন 'আজকালকার' ছিল তখন এসব কেউ কল্পনাও করতে পারত না। মেজদা সেবার স্কটল্যান্ড থেকে একটা অপূর্ব পারফিউম পাঠিয়েছিল। কলেজ যাবার সময়ে ঢেলেছিল এককোঁটা। মা স্তম্ভিত চোখে চেয়ে বলেছিলেন—তুত্তুই সেন্ট মেখে কলেজ যাচ্ছিস? এটা তাদের বাড়ির বাড়াবাড়ি। কিন্তু এই রকমই। ওদিক থেকে বলে উঠল—কই?

—কী কই?

—ওই যে, আপনার বাড়ি ভরতি লোক?

হেসে ফেলল অদিতি, রান্নাঘরের দরজার দিকে ইশারা করে বলল—ওই দিকে। অনেক। এদিকে আমি একা।

চাপা হাসিতে মুখটা ঝিকিয়ে উঠল।

—আর কৌতূহল?

—নেই।

দু'জনেই হেসে ফেলল।

পরের দিন বেলের আওয়াজে ঘুম ভেঙে দরজা খুলতে গিয়ে দেখল উঠোনটা রোদে ভাসছে। বৃষ্টি বলে কোনও জিনিসই যেন ছিল না কোনওদিন।

কালোকে পাশের ঘরেও এক কাপ চা দিতে বলে সে বাথরুমে গেল। কিছুক্ষণ পরে কানে এল—কই গো দিদি, এ ঘরে তো কেউ নেই?

তাড়াতাড়ি বেরোল অদিতি। শোবার ঘরের খাটের ওপর তার শাড়ি ব্লাউজ সব পাট করা। পায়ের কাছে কাঁথাটাও। ভাঁজটা অসমান, সে এভাবে করে না। মানে শুয়েছিল। সকাল হতেই নিজের আধ ভিজে জামাকাপড়গুলো গলিয়ে পালিয়েছে।

যাবি তো যা। ঠিক আছে। আসতে আসতেই তো যাই যাই করছিলি? আজ সকালে যে চলে যাবি সে তো জানা কথাই। তাই বলে এমন না বলে কয়ে। ভদ্রতা বলেও তো একটা জিনিস আছে!

দুই

মনের মধ্যে একটা আলপিন ফুটে থাকে। নড়েচড়ে। কী রে বাবা। জেনারেশনে জেনারেশনে এমন দুর্লঙ্ঘ্য তফাত? দুর্লঙ্ঘ্য এবং দুর্বোধ্য। সে খুব বেশি দিন পশ্চিমি দুনিয়ায় ছিল বলেই কি তার বেশি খারাপ লাগছে? কিন্তু থ্যাংকস আর সরি-র বাইরেও যে একটা ভারতীয় ভদ্রতা আছে! সেটাও কি এমনি বদলে যাবে?

এদিকে আবার কী রকম শরীর খারাপ হয়েছে ভদ্রমহিলার কে জানে। হার্টের গণ্ডগোল, বয়সও তো পঁচাত্তর ছাড়িয়েছে বোধহয়। একদম একা, একটি দিবারাত্রের মহিলাকে নিয়ে থাকেন। বিরাট হাতা-ওয়ালা বাড়ি। কোনওদিনই অবশ্য অনেক লোকের বাস ছিল না। কিন্তু বহু লোক শ্বশুরমশাইয়ের কাছে যেত, তাদের অনেক সময়ে থেকে যেতেও হত। এখন কেউ নেই। অত বড় বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। কে জানে মহিলার কেমন লাগে। একা একা।

আজব কথা। সে নিজেও তো একা। তার এই বাড়ি তো এক যৌথ পরিবারের বাড়ি। তার বিদেশ যাওয়া পর্যন্ত গমগম করত। খ্যানখ্যানও করত অনেক সময়ে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা তাদের, অন্তত তাদের প্রজন্মের কাছে খুব মজাদার ছিল। এখন বুঝতে পারে, মায়েদের হয়তো খুব ভাল লাগত না। খাটতে হত বেশি। নিজের পছন্দমতো কিছু করার উপায় ছিল না। ভেতরে সবাইকারই চাপা অসন্তোষ বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কাজ করত। তা নয়তো দাদা মারা যাবার ছ'মাসের মধ্যে বাড়িটাড়ি ভাগাভাগি হয়ে গেল কেন? সে যাই হোক ওইরকম একটা যৌথ পরিবারে কাটিয়েও

তো সে একা-একা থাকছে। তার কী লাগে? শেষ ট্রাম চলে যাচ্ছে বিধান সরণি দিয়ে, জানলায় ঝুলে আছে তৃতীয়ার চাঁদ। সেই চাঁদের আধা-ভৌতিক আলো তার বারান্দায়, উঠোনে। কুকুরদের কামড়াকামড়ি শুরু হল। স্তব্ধতা চিরে দিচ্ছে, কিন্তু মোটেই খুব সুখশ্রাব্য নয় এই আওয়াজ। সে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায় এ ঘর থেকে ও ঘর। কেমন যেন দমবন্ধ লাগে। আবার খালি খালিও লাগে। গান চালিয়ে দেয়, শান্ত হওয়ার বদলে একেকদিন উত্তাল হয়ে ওঠে বুক। এক্ষুনি যেন হাড়ের খাঁচা, চামড়া, ব্লাউজ টাউজ কেটে বেরিয়ে যাবে। পালিয়ে যাবে কোথাও। গান যত চড়ে, সরগম যত দ্রুত হয় তত দ্রুত হয়ে যায় রক্তের চলা। অবশেষে মাঝরাতে সে তুলি তুলে নেয়। রং ঢালে, পিগমেন্টের সঙ্গে টারপেনটাইন মেশায়, লিনসিড মেশায়, ক্যানভাসের ওপর আস্তে আস্তে স্থির হতে থাকে আঙুল, মন, হৃদয়। বেল বাজে, ঘুম ভেঙে দেখে ভোর সকালের আলো বারান্দায়। সে সারারাত তার ছবিঘরের কৌচে ঘুমিয়েছিল, হাতটা বাইরে ঝুলছে। শরীরটা কোনওক্রমে জড়ো।

তার আর্তি আছে। দমবন্ধ আছে। আবার একেকদিন এমন বেয়াড়া হাওয়া দেয় যেন সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে, এ যেন সেই সুখু-দুখুর হাওয়া। ঠিক তুলোর মতোই হালকা সে, তাকে উড়তে হয় সেই হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। একটা অদ্ভুত আলো, সেটাও আলো না হাওয়া বোঝা যায় না। প্রত্যেকটা ঘর তার খুঁটিনাটি নিয়ে তখন এমন জীবন্ত হয়ে যায় যে তাদের সঙ্গে প্রায় কথা বলে ফেলে সে।

—এই দক্ষিণের দেওয়াল, মিষ্টি খাচ্ছি, বুঝেছিস? সরপুরিয়া।

—খা। আমার ত্রিসীমায় ফেলিসনি, পিঁপড়ে হবে।

—এই ফ্রিজ, একটা ইনস্টলেশন আজ শেষ করলুম, কেমন হয়েছে রে?

—উঃ আমি যে হাঁটতে পারি না, সে কথা বারবার ভুলে যাওয়া হয় কেন?

—ওহ সরি, সরি, আমি এনে দেখাব এখন।

এনে অবশ্য দেখায় না। সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। পাগলামি ছেলেমানুষি কিংবা একরকমের ন্যাকামি। কথা বলতে পারলেই হল। নিজের সঙ্গে। দেওয়ালের সঙ্গে।

কিন্তু সে তখন তার পুরনো মার্বল টেবিলের গায়ে হাত বুলোয়। কতকাল বেঁচে আছিস তোরা, পাষাণ রে, কত কী-ই না দেখলি জীবনে। বল তো বিয়ের দিনে মেজদার আমাকে মনে পড়েছিল কিনা? বল তো বাবা যখন মারা গেলেন, কথা বন্ধ হয়ে গেল, তখন কি বনি-বনি করে ডাকতে চেয়েছিলেন, নাকি মৃত্যু তখনই তাঁকে সব মমতার ওপারে পৌঁছে দিয়েছিল?

এই সব সময়ে একাকিত্বটাকেই উপভোগ করে সে। সেই সময়ে যদি ছবি কি কালো এসে পড়ে, সে ভেতরে ভেতরে গোমড়া হয়ে যাবে, কোনও বন্ধুবান্ধব, বা ক্রেতা—কেউই অবশ্য না ফোন করে আসে না, তবু যদি দৈবাৎ এসে পড়ে তার ভাল লাগে না।

একাকিত্বের এই আলোছায়া, চাঁদের এ পিঠ ও পিঠ কি মাধুরী দেবীর জানা? সব সময়ে যদি অমাবস্যা থাকে তা হলে তো সে ভয়ানক কষ্টের ব্যাপার। এমন সন্তান হয় কেন মেয়েদের? মা বুড়ো হচ্ছেন, শেষ পাঁচ বছর রাজর্ষি একবারের জন্যও আসেনি। না এসেছিল। বাবা মারা যেতে শ্রাদ্ধ করতে। সে বরং ঘুরে গেছে। আর ইদানীং তো...। ওঁর সত্তর পঁচাত্তর হল। দুটোতে বিরাট ফারাক। তবু একবার মাকে দেখতে এল না!

***

আপাতত সে সবে 'মাধুরী প্রকাশে'র প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। তার কাঁধে একটা ওভারনাইট ব্যাগ। শাড়িটা লাট খেয়ে গেছে। চুলগুলো আলুথালু। চিরুনি তো সব সময়ে সঙ্গেই থাকে, এবং ছোট চুল এলোমেলোও হয়ে থাকে, কেন আঁচড়ে নেয়নি, সে জানে না, এখনও জানে না সে আলুথালু। কেননা, এই বাড়িও একরকম স্মৃতির মহেঞ্জোদরো যাতে সে প্রত্ন সব নিদর্শনে ডুবে আছে।

এক্স-শাশুড়ি এক্স-বউমাকে বললেন—এসেছ? এত দেরি হল যে! কী বুক ধড়ফড় কী বুক ধড়ফড়। সুবোধ ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়ে কোনওমতে জিইয়ে রেখেছে। এখানে আর থাকা যাবে মনে হচ্ছে না। দু'দিন অন্তর ধড়পড় ধড়ফড়...

—কোথায় থাকবেন?—অদিতির মুখে কোনও ভাব নেই।

চোখটা সরিয়ে নিলেন উনি। সত্যি কথাই, কী বিপদেই পড়েছেন। কলকাতায় ওঁদের কোনও আস্তানা নেই। থাকতে হলে এক্স-বউমার কাছেই থাকতে হয়।

শ্বশুরমশাই ছিলেন ষোলোআনা বিষ্ণুপুরী। চাকরি-জীবনে দিল্লি-কলকাতা করলেও কখনও আস্তানা গাড়েননি। বিষ্ণুপুরেই ওঁর আসল কাজকর্ম। পুরো ইতিবৃত্তটা ছিল হাতের মুঠোয় ধরা। শ্যামরায়ের মন্দির জোড় বাংলা, রাধাগোবিন্দ, টেরাকোটা মন্দিরগুলোর পোড়ামাটির প্লেট, পঞ্চরত্ন মন্দির—এসব নিয়েও যেমন, এখানকার সংগীত ঘরানা, তাঁত শিল্প, মৃৎ-শিল্প, রেশম এসব নিয়েও তেমন তাঁর বিশদ কাজকর্ম ছিল। শেষ করে যেতে পারেননি। দুটো খণ্ড পাওয়া যায়। তৃতীয় খণ্ডের কাজ করবার সময়েই হঠাৎ স্ট্রোকে চলে গেলেন। তার ধারণা ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখেশুনেই এমনটা হয়েছিল। প্রেশারের রোগী—টেনশন, মনঃকষ্ট, আত্মগ্লানি, রাগ—এর কোনওটাই তো শরীরের পক্ষে ভাল নয়।

এখন ইনি বুঝুন। অবশ্য বুঝবেনই বা কী! ছেলে নিজে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে হলে হবে কী! মায়ের সব প্রয়োজনের বিলিব্যবস্থা রিমোট কন্ট্রোলে করে যায়। তা ছাড়া অদিতি তো আছে। এক্স-বউমা! সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা পর্যন্ত অদিতির উকিলই করে দিলেন। বউমাকে এত অবিশ্বাস করেছিলেন, কার্যকালে দেখা গেল তার ওপরেই দিব্যি জোরজুলুম!

—আপনার ছেলে আসুক! সে দেখেশুনে করবে এখন।

—রাজা? তা হলেই হয়েছে! সে গুড়ে বালি। সব চুরিচামারি হয়ে যাবে। তার কী বউমা! সে তো আর আসছে না!

—আমাকে বউমা ডাকবেন না।

—অ। তা ঠিক। কিন্তু অভ্যেস যেতে চায় না। মনে কিছু কোরো না।

জীবনের যে-কোনও ঘটনা সুখেরই হোক, দুঃখেরই হোক, ভুলে যাবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল স্মৃতির চিত্রময়তা। স্মৃতি সবকিছুই আলমারিতে, দেরাজে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দেয়। এক ড্রয়ারে খেলাধুলো, শৈশবসঙ্গী,—হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে চায়।

—বনি বনি বনি। তুই আমার দলে।

—না না কাল ও তোমার দলে ছিল, আজ আমার।

চু-কিতকিত খেলায় তার নাম কইমাছ, কেননা সে পিছলে পালায়, ধরা পড়ে না, ধরা দেয় না, নট আউট ব্যাটসম্যানের মতো শেষ পর্যন্ত না-মোর, অধরা।

আরেক ড্রয়ারে আছে মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন।

জ্বর হয়েছে। বেশ জ্বর। লালচে মুখ। চোখ ছলছল। মা নেই। মা কোথায় কোন দাদার সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসতে গেছেন। রাউরকেলা কি?

—মা, ও মা, মা! বনির ঘ্যানঘ্যান প্রায় কান্নার আকার নিচ্ছে।

বাবা মাথার কাছে। জলপটি লাগিয়ে প্রাণপণ হাওয়া করছেন। অনেকক্ষণ সান্ত্বনা দেবার, ভোলাবার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। অবশেষে অভিমানী স্বরে বলছেন,

—কেন মা, আমি তো আছি! আমি কি কেউ নই!

বাবার সেই আহত মুখচ্ছবি ড্রয়ার-ভেতর থেকে চেয়ে থাকে। কোনও তাকে স্কুলের, কোনও তাকে কলেজের অসমাপ্ত দিনগুলো কেমন ধোপদুরস্ত তোলা থাকে। তার পাটে পাটে কত রঙিন ফ্যাব্রিক পেন্টিং, লকারে থাকে কিছু গোপন একান্ত সঞ্চয়। কিন্তু আলমারির তলার তাকে গোঁজা থাকে সব গরমিল, দুঃখ, হতাশা, ক্লান্তি, ধাক্কা, ধিক্কার। অনেকদিন পার হয়ে গেলেও সেগুলো

ধোপার বাড়ি পাঠানো হয় না। থাকে তেমনই মলিন, বিবমিষাময়। মগজে অমাবস্যা, হৃদয়ে অগ্ন্যুৎপাত।

যখনই এই মহিলা, অর্থাৎ শ্রীমতী মাধুরী গুপ্তর সঙ্গে ফোন বা দেখা সাক্ষাৎ হয়, তলার তাকের ময়লা কাপড়গুলো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। খুব ইচ্ছে করে এক্ষুনি ওই পুরো বোঝাটা লন্ড্রিতে পাঠিয়ে দিয়ে চিরদিনের মতো দুর্গন্ধমুক্ত হয়ে যেতে। হয় না, কী অসীম শক্তি যে ওই ময়লা তাকের!

বাইরের চওড়া বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। দূরে কয়েকটা খেজুর গাছের জট। পাশ থেকে শুরু হয়েছে রাঢ় দেশের বিখ্যাত শাল। ধূলিধূসরিত, কিন্তু স্বাস্থ্যবান, মর্যাদাময়। ওইখানে গেলেই তার গান, কবিতা আসত। ছুটিছাটাতে যখনই বিষ্ণুপুরে আসত, সন্ধেরাত্তিরগুলো কাটত শ্বশুরমশাইয়ের কাছে। নিবিড় মনোযোগে। আর ভোরের আলো ফোটার আগে, কিংবা গোধূলি-বিকেলে সে ছুটে যেত সবার অলক্ষ্যে ওই শালের পরিধিতে। অনেক সময়ে কাঠফাটা দুপুরেও। বাঁকুড়ার শুকনো তাত, বেকিং আভেনের মতো। কাকচিল যখন ডাকে না—

'ছুটে কে তুলিলে শালবন, বাহুবন্ধন চারিধারে। ...ঘন বন্ধন চারিধারে।' সে সময়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে আপাদমস্তক বোঝা যেত। বিস্ময়, হর্ষ, রোমহর্ষ। এই বাহুবন্ধনের ছবি সে এঁকেছিল। ধূসরের মধ্যে থেকে শত শত বাহু উঠে দাঁড়াচ্ছে মুঠির কাছটা গাছ, ধূলিবসন শালপ্রাংশু মহাভুজ। 'ইকোলজিক্যাল স্টেটমেন্ট' বলে ছবিটার নাম হয়েছিল খুব। 'আর্মস অ্যান্ড দা ট্রি' নাম দিয়েছিল বোধহয়। কোনও পরিবেশবাদী সংস্থা অনেক দাম দিয়ে সেই বাহুবন্ধন কিনে নেয়।

—চা দিয়েছি বউমা!—শীলাদি। সেই মহিলা যার সঙ্গে আজ অনেক বছর হল মাধুরী দেবীর দিনরাত।

বিরক্ত চোখে তাকাল অদিতি। এই বিরক্তির মানে ষোলোআনা বোঝে শীলাদি। চোখ নিচু করল—তুমি পাতলা পরোটা দিয়ে আলুচচ্চড়ি খেতে ভালবাসো।

—এত সবের কী দরকার ছিল?—এ বাড়ির আত্মীয়তা সে চায় না।

—বাঃ, এতখানি পথ। কত যে যত্নআত্তি পাও সে তো চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।—শীলাদি ছাড়বে না।

বুকের ভেতরটা কেমন কুলকুল করে ঠান্ডা বয়। শীলাদি! শ্বশুর গেল, শাশুড়ি গেল, শ্বশুর-শাশুড়ির ছেলে গেল—বাড়ির হাউসকিপার, সব কাজের কাজি শীলাদির জন্যে এই কুলকুলে ঠান্ডা। শ্বশুরমশাই ডাকতেন—শীলাবতী-ই। শীলাবতী-ই!

—তাড়াতাড়িতে তোমার জর্দা আনা হয়নি, শীলাদি।

—না হোক গে।

—জর্দা অবশ্য খুব ভাল জিনিস নয়।

—ওই একটাই তো জোর, টিঁকিয়ে রাখে মা!

খুব সাবধানে এবার বউমাটা এড়াল শীলাদি। আরাম চেয়ারটার ক্যাম্বিসের দিকে চেয়ে বলল—তুমি বোসো। আমি একটা টিপাই আনছি।

—দরকার নেই। হাতে করেই হয়ে যাবে।

—প্লেট ধরেছ, আবার চা ধরবে কোন হাতে?

—তা-ও তো বটে। চা-টা বরং পরে এনো।

—তা হয় না। একটু করে গলা না ভিজিয়ে তুমি কি খেতে পারো?

সব মনে আছে শীলাদির। সব-ই কি? পুরনো সম্পর্ক, পুরনো স্নেহ-ভালবাসার সূত্র ধরে এখনও এই যত্ন, এখনও এমনি করে মনে রাখা। কে জানে শীলাদির আলমারিতে ক'টা তাক আছে অদিতির জন্য? শীলাদিদের লকারে কোনও গোপন তাকে কি? বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো প্রকাশ গুপ্তর বাড়ি আশ্রয় পেয়ে বর্তে যাওয়া বালবিধবা! সমস্ত স্মৃতিই কি ওর গুপ্ত পরিবারের সুখদুঃখের সঙ্গে

জড়ানো? ভাবতে খুব কষ্ট হয় একটা মানুষের নিজস্ব কোনও অস্তিত্ব নেই, নিজস্ব সুখ-দুঃখ, স্মৃতি-বিস্মৃতি নেই। কী অসম্ভব রিক্ততা! সে তুলনায় এত অপমান এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও নিজেকে তার খুব ঐশ্বর্যশালিনী বলে মনে হল।

—খুব ভাল হয়েছে শীলাদি। কী করে এমন পাতলা করো গো!

—ও মাথার ওপরে, করতে করতে আন্দাজ হয়ে যায়। বাবা ভালবাসতেন...তুমি... খোকা...ইতস্তত করে থেমে যায় শীলাদি।

—আর এই আলুচচ্চড়িও। এটা আমার লোকেরা করতে পারে না একদম। কী রকম শক্ত শক্ত থাকে।

—বোধহয় নুন-হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে নেয় না গোড়ায়। মোটা মোটা করে আলুর খোসাও দিতে হয় চাট্টি। তারপর যেমন কালোজিরে কাঁচালঙ্কা...

অন্যমনস্কভাবে অদিতি বলল—বলব ওদের। শুনবে কিনা জানি না অবশ্য। আদৌ রান্না জানে কিনা...কী যেন একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল শীলাদি।

প্রথম যখন এ বাড়িতে আসে তাকেই শাশুড়ি ভেবে প্রণাম করতে গিয়েছিল সে। এত সৌম্য, ভদ্রদর্শন, তবে রাজর্ষির মা হবার পক্ষে একটু বেশি অল্পবয়সি। তবে সে সময়েও তো অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হত, মা হতে হত। বলা উচিত নয়, মাধুরী দেবীকেই সে তুলনায় নিম্নপদস্থ মনে হত। খেঁকুরে-মার্কা, ঝগড়াটি ভাবটা চাপা দেবার জন্যেই কি মুখটা শক্ত করে থাকতেন?

বিষ্ণুপুরে শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে মা তাকে স্ল্যাকস-টপ ছাড়ালেন। এলোমেলো ছোট চুলের ভেতর থেকে অল্প একটু সিঁথি বার করে সিঁদুর পরালেন। আর কড়া গলায় বললেন—সব বড়দের প্রণাম করবে। বিদেশে যা করেছ তা করেছ। এঁরা আবার একরকম গ্রামের লোক। ভুলেও কোনও আধুনিক অসভ্যতা করবে না।

শীলাদির পরনে ছিল চওড়া ভোমরা-পাড় শাড়ি, কালো চুল সারদা মায়ের ছবির মতো ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সামনে এসে পড়েছে। জর্দার গন্ধে ভুরভুর করছে চারদিক।

—ও কী করছ বউমা...ছি ছি... পা সরিয়ে শীলাদি ততক্ষণে পগার পার। কী কুক্ষণেই পাঁকাটি জ্বালিয়ে দুধ ওথলাতে গিয়েছিল।

সকলেই অপ্রস্তুত। সমবেত মহিলাদের মুখ হাঁড়ি। শ্বশুরমশাই ওরই মধ্যে পরিস্থিতি সামলে নিয়ে বলছেন—সে কী কথা! বউমার যদি তোমাকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়, নিশ্চয় করবে। তুমিই তো আমাদের খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে-বর্তিয়ে রেখেছ। তবে হ্যাঁ, অদিতি, আগে তোমার মাকে প্রণাম করো...তার পর। বুদ্ধিমান লোক, অদিতিকে বুঝিয়ে দিলেন...সে-ও বুদ্ধিমতী মেয়ে, বুঝে নিল—ইনি কে। কী! কিন্তু শাশুড়িকে দেখে তার কেমন একটা প্রিমনিশন হয়েছিল। চেহারার ওপর তো মানুষের হাত নেই! একশোবার। মাধুরী দেবী এককালে তো বেশ ঝরঝরেই ছিলেন ছবিতে দেখেছে। সুন্দর নয়, কিন্তু সপ্রতিভ, মার্জিত চেহারা, লম্বা, বেশ সুন্দর ব্যক্তিত্ব। ভুগতে ভুগতে, ক্রমাগত মেজাজ খারাপ করতে করতে মনটাও গেছে, শরীরটাও গেছে। অথচ সেই ভাঙা শরীর নিয়েই, স্বামীর বিরহ, ছেলে-বউয়ের সম্পর্ক ভাঙা সবকিছু ছাড়িয়ে ছাপিয়ে দিব্যি আছেন। শীলাদিকে উদয়াস্ত ব্যস্ত রাখেন। আর মাঝে মাঝেই এই শরীর ভীষণ খারাপ। কলকাতায় না নিয়ে গেলে এখন তখন অবস্থা। এটা ওঁর একটা বাহানা। ছেলেকে এবং পূর্বতন বউমাকে ব্যতিব্যস্ত করবার। কী সুখ যে পান! লজ্জাও করে না!

স্থানীয় ডাক্তার সুবোধবাবু এসেছেন। আবার ভাল করে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখলেন। পোর্টেবল মেশিন এনেছেন, ইসিজি করলেন। বেশ সময় নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ইসিজি। প্যাথলজিক্যাল টেস্টের রিপোর্টগুলো দেখলেন। রোগিণীকে বললেন... আরে বউদি, আপনি তো অনেক ভাল আছেন? ইচ্ছে হয়েছে কলকাতা ঘুরে আসুন। কিন্তু আপনার ইসিজি ভালই। এখন আন্ডার কন্ট্রোল।

হাত ধুতে যাবার ছল করে অদিতির সঙ্গে কথা বললেন উনি—দেখো বউমা, এনলার্জড হার্ট, হাই প্রেশার, মাঝে মাঝে প্রবলেম হবেই। কিন্তু এ তো তোমার পেসমেকারের কেস নয়। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি টাস্টিরও নয়। বড় নার্সিংহোমের আরাম খেতে ওঁর মাঝে মাঝেই ইচ্ছে হয়। বয়সটাও তো অবুঝপনারই। এটুকু করেই দাও।

সুবোধ ডাক্তারবাবু তাদের সম্পর্কের ডিটেল কিছুই জানেন না বোধহয়। কোথায় সুদূর প্যারিসে কী ঘটেছে, আপাতদৃষ্টিতে ব্যবস্থাপনার কোনও বদল না হলে তিনি বুঝবেনই বা কী করে! হাঁকডাক করে তো কিছু করা হয়নি। ছেলে বিদেশে মহাব্যস্ত, বউ কর্মোপলক্ষে কলকাতায় থাকে, শাশুড়ির সঙ্গে তেমন বনিবনা নেই—এটুকুই তাঁর জানা। ভাল, এটুকু সে করেই দিচ্ছে মানবিকতার খাতিরে। স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির অ্যাম্বুল্যান্স ঠিক করা হল। সুবোধ ডাক্তার নিজে একজন নার্সসহ সঙ্গে যাবেন। এস.টি.ডি. করে নার্সিংহোমের কেবিন বুক করল অদিতি। এই নিয়ে তৃতীয়বার হল। ওঁরাও চিনে গেছেন। বললেন—মিসেস মাধুরী গুপ্তা, ওহ্ ইয়েস, কেবিন নাম্বার টু?

সব ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর একটা নতুন কাজ করল অদিতি। শীলাদিকে বলল—ওঁর সঙ্গে তুমিও একবার ঘুরে আসবে চলো শীলাদি।

শীলাদি বোধহয় এমন কথা কখনও শোনেনি। তার জীবনকাল কেটে গেছে বাঁকড়ো জেলায় সোনামুখীতে ছোটবেলা...তারপর বিয়ে হয়ে কিছুদিন শিহড়। তারপর আবার সেই সোনামুখী। বাবা-দাদার গলগ্রহ। তারপর একধরনের মুক্তি। বাঁকুড়া শহরের উপান্তে এই গুপ্ত বাড়ি। ওঁরা কত জায়গায় ঘুরেছেন, বেড়িয়েছেন, শীলাবতী সব সময়ে ঘর আগলে থেকেছে। কাজের লোক ঠিকমতো ঘর পরিষ্কার করল কিনা, কর্তা-গিন্নির ফেরবার সময়ে সব ঘরের বিছানা, জাজিম, কুশন-কভার সব কাচা ঝকঝক করবে, রান্নাঘর দেখলে মনে হবে ব্যবহার হয় না—শুধু সাজানো আছে। এই ফাঁকে বইয়ের আলমারিগুলো ঝাড়াঝুড়ি—এ সমস্তই শীলাবতীর দায়িত্ব।

—আমি?—শীলাদি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

—ঘরদোরের কী হবে বউমা?

—কেন? দীনুদা তো রয়েছে। একদিন অন্তর তোমাদের লোকটিকে দিয়ে সব পরিষ্কার করিয়ে রাখবে।

—মা ছাড়বেন কেন বউমা।

—সেটা আমার ভাবনা।

—মা তো গিয়ে হাসপাতালে ভরতি হবেন। আমাকে সেখানে থাকতে দেবে?

—না, সেখানে থাকতে দেয় না। কোথায় থাকবে-না থাকবে সেটাও আমায় ভাবতে দাও।

—আমি কখনও যাইনি।

—জানি।

—মা যদি রাগ করে?

—কী আশ্চর্য, বললুম তো ওটা আমার ভাবনা।

তিন

আনসারিং মেশিনে তিনটে মেসেজ পেল অদিতি। একটা অবধারিতভাবে রাজর্ষির। মাকে যোগাযোগে পাচ্ছে না, ই-মেল করেছে তাকে, তারও কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। তাই সরাসরি ফোন। মায়ের খবর কী? ব্যবস্থা হল? বাবার মৃত্যুদিবস আগামী উনিশে, সে কি মনে করে একটা ইনসার্শন দেবে কাগজে! দিলে স্মরণকারীদের নামের মধ্যে যেন অদিতির নামটাও থাকে। অদিতিকে বাবা ভালবাসতেন।

মজা মন্দ নয়, হঠাৎ কেমন রাগ চড়ে গেল মাথায়। অদিতিকে বাবা ভালবাসতেন! হুঁ! যদিও তাঁর ছেলে বাসে না। ইনসার্শনটাও তাকে দিতে হবে কেননা বাবা তাকে ভালবাসতেন। মায়ের অসুখ করলেই ছোটো বিষ্ণুপুর, নিয়ে এসে ভরতি করো নার্সিংহোমে। রোজ ফলমিষ্টি নিয়ে দেখা করতে যাও। তারপরে আবার তিনি নিজেকে সুস্থ মনে করলে বিষ্ণুপুরে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। কেন? না তাঁকে দেখবার কেউ নেই, এবং ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও অদিতি মানবিক মানুষ। তার মানবিকতাটাকে সমানে এক্সপ্লয়েট করে চলেছে লোকটা। চিরকাল।

পরের মেসেজটা নাছোড়বান্দা মনীষা দেবীর। তিনি ই-মেলটা পেয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী মেলের উত্তর পাচ্ছেন না। কী গণ্ডগোল আবার হল রে কম্প্যুটারটার? মনীষা দেবী কৃতজ্ঞ চিরদিনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু অদিতির সুপরামর্শে। তিনি অর্থাৎ মনীষা দেবী মাঝে মাঝেই অমন অস্থির হয়ে যান। তখন তাঁকে স্টেডি করতে কাউকে দরকার। যতদিন না তিনি যোগ্য বান্ধব পাচ্ছেন, ততদিন অন্তত অদিতি যেন এমনি করে তাঁকে সাহায্য করে।

যাক। বাঁচা গেল। মনীষা আসছে না। মনীষাকে ঠেকাতে অদিতি সবকিছু করতে পারে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ও দেশেই একটা বর/বান্ধব জুটিয়ে দিতে পারে। রাজর্ষিকে অনুরোধ করবে নাকি? এত কথা সে রাখছে লোকটার, তার একটা অনুরোধ কি আর ওর রাখা উচিত নয়? আবার মনীষা তো ওরই ক্লাস-মেট। তবে ভরতের আত্মীয় যত, সকলেই ভরতের মতো। রাজর্ষির সাঙ্গোপাঙ্গরাই বা কী হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য হবে? মনীষাও খুব সুবিধের ব্যাপার নয়! সে যেমন মনীষাকে ভয় পায়, বহু লোকেরই তেমন ভয় পাওয়া সম্ভব। ওর সুবিধে হচ্ছে ও বড্ড সুন্দর। বান্ধব পেতে ওর অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বিউটি অ্যান্ড ব্রেন দুটোই এই মাত্রায় থাকলে বান্ধব যেমন তেমন, বিবাহিত বরই কি বেশিদিন সহ্য করবে? বিশেষত এত অ্যাডভান্টেজ থাকার যত মন্দ ফল সবই মনীষাতে বর্তেছে। অভিমান যা অহংকারেরই ও পিঠ তা পুরোপুরি বর্তমান। কোনও শারীরিক পরিশ্রম সে একেবারে ষোলোআনা বাধ্য না হলে করবে না। হাউসকিপিং, হোম-মেকিং ওসব ফুঃ ফুঃ। সে সেবা পেতে ভালবাসে। আদায় করে নেবার জন্যে যত খুশি নীচে নামতে পারে।

তৃতীয় মেসেজটা অনোহিতার মায়ের। মিসেস সাহা রায়। অদিতি সোজা হয়ে বসল। থ্যাংকস জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি অদিতির সঙ্গে কথা বলতে চান, মুখোমুখি, না বাড়িতে নয়, কোনও রেস্তোরাঁয় হতে পারে। অদিতি যেন রিং ব্যাক করে।

কিন্তু আসল লোকটির কোনও খবর নেই। অর্থাৎ তনিকা ওরফে অনোহিতা। একটা খবর। চলে যাচ্ছে, অদিতি ঘুমোচ্ছে তাই জাগাচ্ছে না ইত্যাদি, একটা শুকনো ধন্যবাদ পর্যন্ত না। অথচ অদিতি ওকে নিজের বাথরোব ব্যবহার করতে দিয়েছে। না দিতেই পারত। কাউকে সে দেয় না। নিজের হাতে রান্না করে খিচুড়ি-ডিমভাজা খাওয়াল। খিচুড়িতে প্যাকেটের মটরশুঁটি যতটা ছিল সবটাই সে দেয়। তদুপরি ডিম ফেটাবার পরে কর্নফ্লেক্স গুঁড়িয়ে দেবার একটা কায়দা সে নিজে আবিষ্কার করেছে। খুব ফোলে। বড়ও হয়। সেইভাবে তৈরি ডবল ডিমের ডিমভাজা সে নিজে ভেজে গরম গরম ওকে খাইয়েছে।

ভাবতে গেলে এটাই অবশ্য ওর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায়। নদী হতে চায়। বৃষ্টিতে উপুরচুপুর ভেজে। অচেনা মহিলার বাড়ি যেচে অতিথি হয়, অথচ তাকে নাম পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে না। দিদি বলে ডাকা তো দূরের কথা। গুজগুজেমতো অথচ হঠাৎ হঠাৎ হেসে ওঠে। মেজাজ খারাপ বা গোপনীয়তার চিহ্নমাত্র নেই সে হাসিতে। দিব্যি কায়দা করে ড্রিংকটা চেয়ে নিল! প্রবলেম গার্ল। স্বভাবতই তার মা অদিতির সঙ্গে আড়ালে কথা বলতে চেয়েছেন।

—ও কী শীলাদি। তুমি দাঁড়িয়ে আছ এখনও! বাকসটা রাখো! শীলাবতী দামি পুরনো চামড়ার সুটকেস হাতে বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাড়ি! বাঁকুড়ার মতো ছড়ানো বাগানঅলা দোতলা এ নয়। একশো বছরের পুরনো জীর্ণ ভাঙাচোরা বাড়ি। অত বড় মানুষের ছেলের বউ।

অত বড় মানুষের বিয়ে-করা শাস্তরের মন্তর-পড়া বউ! এর এই দশা? সে যতদূর শুনেছিল বউমাও মা-বাপের একমাত্র সন্তান। সম্পত্তি পেয়েছে। নিজেও কাজকর্ম করে ভাল! এ-ই?

উঁচু চৌকাঠ পার হয়ে হাঁ করে কাঁচা উঠোন। তাতে বেড়ালের ঝগড়া, ছন্নছাড়া দুটো গাছ, শ্যাওলা, জায়গায় জায়গায় ব্লিচিং পাউডারের ছাপকা! কোলাপসিবলের তালা খুলে দরজা খুলে যখন ভেতরে ঢুকল, বসবার ঘরে নিয়ে গেল, তখন অবশ্য সে একটু সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে। না ভেতরটা ভালই। তাদের 'মাধুরী-প্রকাশ' বাড়ির মেঝে চকচকে লাল সিমেন্টের। কিন্তু মাঝে মাঝে ফাটল ধরেছে। বউমার বাড়ি একেবারে রাজবাড়ির মতো রুইতন রুইতন সাদা-কালো মার্বেল দিয়ে মোড়া, দু'-দুটো বসার জায়গা আর দেওয়ালময় ছবি ছবি ছবি। ছবির সামনে থেকে আলো।

—চলো তোমাকে ঘর দেখিয়ে দিই।

আগে নিজের শোবার ঘরে ঢুকল অদিতি।—তোমার বাকসটা হাত থেকে নামাও! ঘরটা কালো একটু ঝেড়েঝুড়ে দিতে গেছে। বসো শীলাদি, ওই চেয়ারটাতে বসো।

শীলাবতীর চোখে জল টলটল করছে। দেরাজের ওপর বউমা আর খোকার ছবি—বিয়ের আগের, বিয়ের সময়ের, বিয়ের পরেকার। একটাই ফ্রেমে বাঁধানো। চমৎকার ফ্রেমটা, বিলিতি বোধহয়। দেখে মনে হচ্ছে না সময় গেছে, অন্যায় অবিচার প্রেমহীনতা বিচ্ছেদ জীবন সব, সব বয়ে চলে গেছে সময় বেয়ে।

একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। শীলাদি এগিয়ে গিয়ে ছবিটা তুলে নিয়ে নিজের আঁচল দিয়ে মুছল যত্ন করে।

—বউমা! তার রুদ্ধ গলা।

—শুধু শুধু কান্না খরচ করছ কেন শীলাদি! অদিতি নরম সুরে বলল।

—এ রকম হয়। কত হয়। না বনলে এ রকম আলাদাই ভাল, বোঝবার চেষ্টা করো।

—তা হলে এটা? ছবিটা বাড়িয়ে ধরল শীলাদি।

—এবার? এবার কী করে বোঝাবে সে? এ যে অতি জটিল মনস্তত্ত্ব! এর গিঁট খুলতে সে অপরাগ। চেষ্টাও করে না। ছবিগুলো যখন তোলা হয়েছিল তখনকার আনন্দটা তো এখনও সময়ের পুটে কোথাও-না-কোথাও ধরা আছে! ধরা আছে তার অন্দরেও। ওই রাজ এক আলাদা মানুষ, তাকে অদিতি চেনে। গাঢ় আবেগে বন্ধুতায় আপ্লুত হয়ে ভালবাসে। এখনও তাকে স্বপ্নে দেখে সে। কখনও উৎকণ্ঠা, কখনও রোমান্টিক, কখনও একেবারে সরাসরি যৌন স্বপ্ন। আর্দ্র হয়ে যায়। ঘুম ভাঙলে বাস্তবে ফিরতে সময় লাগে। দারুণ বিপদের সময়ে তার কাঁধে মাথা রেখেছে। সে-ই ভুলিয়েছে। পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে গেছে। এখনকার রাজর্ষি গুপ্তর সঙ্গে ওগুলোর কোনও সম্পর্ক নেই। সত্যিই নেই। এ রাজর্ষি জাস্ট পরিচিত মানুষ। তার বেশি কিছু নয়। এত কথা শীলাদিকে বোঝানো সম্ভব নয়। দরকারই বা কী! প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব প্রতিক্রিয়ার জগৎ আছে। স্বতঃস্ফূর্ত। তার কোনও ঠিক বেঠিক নেই।

সে হেসে বলল—রয়ে গেছে!

***

ডক্টর রায়চৌধুরী বললেন—শুনুন মিস সরকার, সিচুয়েশন খুব ভাল নয়, আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই। —হার্ট ডাইলেটেড হয়ে গেলেই তার কাজটা মন্থর, কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। তার ওপর কোলেস্টেরেল হাই। আর্টারিগুলো থিক হয়ে গেছে। ব্লাডপ্রেশার হাই। সমস্ত অর্গ্যানগুলোর কাজগুলোই ক্রমশ ধীর হয়ে যাচ্ছে। আপনি সাবধানে রাখতে পারেন। নিয়ম করে মাপা খাওয়াদাওয়া, ওষুধ যা দেওয়া হল খাওয়া। হালকা চলাফেরা। প্রথম ক'দিন এখান থেকে গিয়ে বেড রেস্টে রাখবেন। কিন্তু ওই... যে-কোনও সময়ে...।

কোনও উপায় নেই। পালাবার পথ নেই। স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, কর্তব্যবোধের কথা ছেড়েই দাও.... একবার মানবিকতার জালে পড়েছ তো তুমি পঞ্চতন্ত্রের জালবদ্ধ মৃগ। কিছুতেই ছাড়া পাবে না। স্টিয়ারিংয়ে হাত, মনে অসীম বিরক্তি, সেই সঙ্গে নিরুপায় করুণা,—একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে যায় অদিতি। আঁদ্রের সঙ্গে যখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল! এই রকম, এই রকম একটা অনুভূতি হয়েছিল। অবিকল নয়, কিন্তু কাছাকাছি। অদিতিকে না ছাড়লে সে পিতৃসম্পত্তি পাবে না, অনেক সে সম্পদ। ওর বাবা ওকে মার্কেট ইকনমি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট পড়তে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলে ঘুরঘুর করত গ্যালারিতে গ্যালারিতে। ল্যুভ-এর ক্লাসে। আর্টিস্ট পাড়ায়। হয়ে গেল ডাকসাইটে শিল্পবোদ্ধা। দু'হাতে ছবি কেনে, ক্রমশ নিজস্ব গ্যালারি বা সালঁ করে ফেলল। যখন আর্টিস্ট পাড়ায় নীলচোখ-সোনালি চুল আর শ্যাম রং-কালো চোখের দেখা হত, নিছক উৎসাহে, উভয়ের আবেগের জিনিস শিল্পের সম্পর্কে কথা বলতে বলতে হঠাৎ হঠাৎ আঁদ্রের চোখ স্থির হয়ে যেত কালো চোখের ওপর। যেন প্রসঙ্গ ভুলে গেছে,—কী হল? কী যেন বলছিলে?

—ও হ্যাঁ, না...অপ্রস্তুত নীরবতা।

তারপর একদিন বলেই ফেলল—চলো আজ রাতটা আমরা একসঙ্গে কাটাই।

অদিতি ততদিনে নীল চোখে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। কিন্তু ক্ষীণ, অতিক্ষীণ একটা সংস্কারের স্বর তার ভেতরে কথা বলছিল। বলে যাচ্ছিল। প্রেম নিবেদন নয়, দুটো রোমাঞ্চের কথা নয়, প্রথম পদক্ষেপেই যখন আঁদ্রে রাত কাটাতে চাইল, সে এত ক্ষুব্ধ, এত অপমানিত বোধ করেছিল যে ভাষায় তা প্রকাশ করা চলে না। সে কাঁপা কাঁপা হাতে তার ব্যাগটা তুলে নিয়ে, ছাইমাখা মুখে উঠে গিয়েছিল। আঁদ্রে পিছু ডেকেছিল, উঠে এসেছিল, সে শুধু একবার পিছু ফিরে বলেছিল—সিন ক্রিয়েট কোরো না।

অন্তত সপ্তাহখানেক সে নেহাত প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোয়নি। একোলে বা মঁমার্তে যাওয়া তো দূরস্থান। সেই সময়টা অনেক ভাবনা-চিন্তা তাকে পেয়ে বসেছিল। ভেবে দেখতে গেলে আঁদ্রে কোনও অন্যায় করেনি, তাকে সস্তা মেয়েটেয়ে ভেবে কোনও অপমানও সম্ভবত না। এখানে এসব জলভাত। যখন-তখন যে-যার সঙ্গে ইচ্ছে থাকতে চলে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন কেউ কারও সঙ্গে ধারাবাহিক থেকে গেলেও কোনও অধিকার জন্মায় না। আর তার দিক থেকে তো কোনও ভুল নেই-ই। সে ভারতীয়। আর্টিস্ট পাড়া সোজাসুজি এমন প্রস্তাব না দিলেও আকারে ইঙ্গিতে তো বহু দিয়েছেও। ল্যুভ-এ পিকাসো মিউজিয়ামে সব ক্ল্যাসিক স্টাডি করছে তারই মধ্যে। তার কঠিন মুখ, কিংবা প্রসঙ্গ পালটানোর ধরন দেখে ঘাবড়ে গেছে। আর এই ছেলেটা যে যখন-তখন তার চোখে হারিয়ে যায়, গালে এনে দেয় লাল, এই ছেলেটা, নিঃশেষে যার কাছে আত্মসমর্পণের জন্য সে প্রস্তুত, সে কিনা একবার হাতটা ধরল না, একবার ভালবাসার কথা বলল না, একটা চুম্বনের জন্যও কোনও আর্তি দেখাল না, যখন তাদের চারপাশে জোড়ায় জোড়ায় চুম্বনের স্রোত বয়ে চলেছে, মঁমার্তে, পোঁ দ্য লা কঁকর্দে, প্লাস দ্য ফ্রুস্তাবের ছোট্ট রেস্তোরাঁয়, একেবারে শয্যায় নিয়ে তোলবার কথা তুলে ফেলল। ইন টার্মস অব বেড! হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ভারতীয় মনে ভালবাসার সঙ্গে আগে মিশে থাকে মন, তখন শরীর-মন আলাদা করে চেনা যায় না। পরে, সামান্য পরে শরীরী প্রেম শুরু। কিন্তু ইউরোপীয় মনে হয় দুটো আসে একসঙ্গে, নয় শরীর আগে মন পরে আসে আবার আসেও না। এরা দরকারও মনে করে না। মুহূর্তে বাঁচে, মুহূর্তে লয় পায়। প্রেমের তোয়াক্কা করে না। কিন্তু এতটুকু পূর্বরাগ ভাষায় ও ভঙ্গিতে ও প্রকাশ করতে পারল না। ধিক, ধিক তোমাকে আঁদ্রে, ধিক আমাকে।

এমন করেই সে ভাবছিল, যখন ঝোড়ো কাকের মতো আঁদ্রের উদয় হল। দরজা খুলেই সে সাত হাত পিছিয়ে গেল আগে, কেননা ওর দেহভাষায় এমন এক প্রবল বেগ, প্রবলতর সংরাগ যেন সব বাধা ভেঙে দেবে এমন একটা ঝড় বইছে।

—ভাল দার্জিলিং চা আছে, খাবে?

হকচকিয়ে গেল আঁদ্রে। একেবারে। সে অন্য কিছু ভেবেছিল। অদিতিও ভাবেনি সে এই কথা বলবে। সে চলে প্রধানত ইনস্টিংটের বশে, কখনও বা ইনটুইশনে। এই ইনস্টিংটের ভেতরে এত গভীর মনস্তত্ত্ব জ্ঞান লুকিয়ে থাকে যে তা বিশ্লেষণ করলে বোধহয় অধ্যায়ের পর অধ্যায় লিখে ফেলা যাবে। সে নিজেই লিখে ফেলতে পারবে।

আসলে ওই সহজ সুরে গতানুগতিক অতিথি ভাষা—আগুনের ওপর আছড়ে পড়া জল। পুরো পরিস্থিতির আগ্নেয়তা এক ঝাপটায় শেষ। আগের প্রসঙ্গ তোলা নয়, কোনও ক্ষমাপ্রার্থনার জায়গা ছেড়ে দেওয়া নয়, মান-অভিমান, ক্রোধ-অভিযোগ এসবের যে-কোনওটা ঘটাতে পারত অগ্ন্যুৎপাত। তাই তার বিধির ভেতর থেকে অমন সহজ বোধের সংকেত—ভাল দার্জিলিং চা আছে, খাবে?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আঁদ্রে ভেতরে ঢুকে এল।

এই চা মা পাঠিয়েছে এবার। শ্রেষ্ঠ চা। দুটি পাতা একটি কুঁড়ি। সুগন্ধে ম' ম' করছে চারদিক। এই চা-য়ের সঙ্গে সত্যি কথা বলতে কি কিছু চলে না। বিস্কিট, কুকিজ, কিচ্ছু না—রসভঙ্গ হয়। কেননা প্রত্যেক খাবারের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, সেটা দার্জিলিং চায়ের সুরভির মধ্যে ছন্দপতনের মতো ঢুকে পড়ে। তবু চায়ের সঙ্গে কিছু দেশি ডালমুট পরিবেশন করল অদিতি। এইটা আঁদ্রে খুব ভালবাসে। শুধু আঁদ্রে কেন, অনেককেই সে ডালমুট ধরিয়েছে।

একটু ডালমুট মুখে পুরে আঁদ্রে বলল—তা হলে তুমি মনে রেখেছ!

—কী। একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল অদিতি।

—এই...ডালমুট আমি ভালবাসি।

—শুধু তুমি কেন, আমার সব ফরাসি, স্প্যানিশ, ইতালীয় বন্ধুরাই এটা ভালবাসে।

আঁদ্রের মুখে ছায়া নামল।

—কিন্তু আমি তোমাকে পরামর্শ দেব, আগে দু'-এক চুমুক চা খাও।

—তাই?

অদিতি নিজের কাপটা মুখের কাছে তুলল। সাদা ধবধবে টিউলিপ ফুলের মতো দেখতে কাপ। সাদা ছাড়া বস্তুত এই চায়ের হালকা রংটা খোলে না। এখন টিউলিপের গা দিয়ে আভা বেরোচ্ছে।

—দারুণ। আশ্চর্য!—আঁদ্রে বলল—মের্সি,

—কথা বোলো না, শুধু উপভোগ করো।

খুব নীরবে চা-পান সমাপ্ত হল। আঁদ্রে খুব কোমল নম্র গলায় জিজ্ঞাসা করল।—জাপানিদের চা-পান অনুষ্ঠানের কথা পড়েছি। ভারতীয়দেরও আছে তা জানতাম না।

ভেতরে ভেতরে অদিতির মজা লাগছিল। খুব সিরিয়াসলি বলছে। সত্যিই ভেবেছে এটা একটা রিচুয়্যাল।

—কত জিনিসই তো আমরা জানি না, জানতে চাই না। যাক, কিছু নাকি পিকাসো এসেছে অকশনে। সত্যি!

—হ্যাঁ গোড়ার দিকের আঁকিবুকি। কত তো এঁকে এখানে-সেখানে ফেলে দিত।

—কিনছ নাকি?

—নাঃ।

—কেন? ভাল ইনভেস্টমেন্ট হত!

—তুমি ভুলে যাচ্ছ অদিতি, আমি আর্টকে বিজনেস প্রপোজিশন বলে দেখি না।

অদিতি চুপ করে রইল।

একটু পরে আঁদ্রে বলল—তুমি কি ভুলে যেতে চাইছ, মনে রাখতে চাইছ না?

এইবারে অদিতির মস্তিষ্কের মধ্যে কড়কড় করে বাজ ডেকে উঠল। সেই অশনিসংকেত বেরিয়ে

এল গলা দিয়ে—ভুলে যাব! সম্ভব? জীবনে কোনওদিন ভুলে যাব না, একজন সহমর্মী বন্ধু যুবক আমাকে খুব সহজে, হেলাফেলায় কু-প্রস্তাব দিয়েছিল।

—তোমরা প্রাচ্যদেশীয়রা খুব রক্ষণশীল আমি জানি, আঁদ্রের চোখে মিনতি।

—তোমরা পশ্চিমারা খুব উচ্ছৃঙ্খল আমিও জানি, অদিতির উত্তর সঙ্গে সঙ্গে।

—আমরা এভাবেই বড় হয়েছি। নিশ্চয় সেটা দোষ নয়।

—আমরাও এভাবেই বড় হয়েছি। সেটাও নিশ্চয় দোষ নয়!

—আমি...আমি তোমার জন্য কামনায় চুরমার, চুরমার হয়ে ভেঙে যাচ্ছি।

—আমি...আমি তোমার প্রতি বিতৃষ্ণায় চুরমার হয়ে যাচ্ছি।

—আমার এই ক্ষুধা...ক্ষুধাটাকে তুমি বুঝতে পারছ না। অদিতি তুমি না আমার বন্ধু?

—ক্ষুধা মেটাতে তোমাদের এই প্যারী শহরে অনেক বন্ধু আছে, তাদের কাছে যাও না আঁদ্রে।

বজ্রাহতের মতো বসে রইল আঁদ্রে। কাপ-প্লেটগুলো ট্রে-তে গুছিয়ে তুলে পেছন ফিরে রান্নাঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল অদিতি। সে অনুভব করছিল একটা হতাশা, একটা সংরক্ত বিষাদ তাকে পেছন থেকে বিঁধছে।

আঁদ্রে বলতে লাগল।

—আমি...আমি স্বীকার করছি আমি ভার্জিন নই। শুধুমাত্র সেক্স হলে সেটা আমি মিটিয়ে নিতেই পারতাম। কিন্তু আমি যে প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে গেছি ওদিৎ। আমার কী উপায় হবে, ভাবো...ভাবো একবার। আমি, আমি কি যথেষ্ট পুরুষ নই!

কোথায় আঁদ্রের লেগেছে এবার ভাল করে বুঝতে পারল অদিতি। ঠিক কোন জায়গাটায়। তার দয়া হল না। বিতৃষ্ণা বেড়ে গেল। সে বাসনগুলো ধুয়ে মুছে অর্থাৎ বেশ সময় ব্যয় করে তবে আবার এসে লাউঞ্জে আঁদ্রের মুখোমুখি হল। ও তেমনই বসে আছে। কিছুক্ষণ পর বলল—আমার কথার জবাব দিলে না? আমি জানি প্রবল পুরুষ না হলে ভারতীয় নারীদের আকৃষ্ট করা শক্ত। আমার মতো এ রকম...মানে নরম...চেহারার একজন যুবক...

এ ছেলেটাকে ভারতীয় নারী সম্পর্কে এত জ্ঞানগম্যি কে দিয়েছে? ভাবল অদিতি। সে যাই হোক, কীভাবে এগোলে সে সাড়া দিতে পারবে সে সম্বন্ধে এ একেবারে অজ্ঞ। কোনও চৈতন্যই নেই। সে কি সোজাসুজি বলবে, লাভ-মেকিং বলে তোমাদের যে কনসেপ্টটা আছে, আমাদের কাছে সেটার মানে কিন্তু কূজন। অনেক শব্দ-স্পর্শ-দর্শন-শ্রবণের ফোর-প্লে পার হয়ে প্রেম, অনেক প্রেম পার হয়ে তবে তোমাদের লাভ-মেকিং। অন্তত্তপক্ষে প্রথম প্রথম, পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে কী হয় না হয় প্রত্যক্ষভাবে তার জানার কথা নয়। কিন্তু অনুমানে তো জানেই। চারদিকে যা দেখছে তার থেকেই জানে। সেসব ভবিষ্যতের কথা। ভেবে লাভ নেই। কিন্তু ওর ওই স্বীকারোক্তি! ভার্জিন নই! জানে তবু সে সেভাবে জানে না। পাশ্চাত্য সভ্যতায় তরুণ হওয়ামাত্র সদ্য-জাগা শারীরিক কামপ্রবৃত্তিকে তুষ্ট করতেই হবে। অন্তত কোনও বাধা নেই। যে সে কাজ করে না সেই বরং অপাংক্তেয় হয়ে যায় বন্ধুদের কাছে। এ এদের বহুদিনের ঐতিহ্য। রাশিয়ানরা মস্কোয় বা প্যারিসে পড়তে এসে রীতিমতো রক্ষিতা রাখত। না রাখলে তাদের আভিজাত্য প্রমাণ হত না। অনেকটা হুতোম প্যাঁচাদের কালের বঙ্গ যুবকদের মতো। এদের এখন আর রক্ষিতা রাখতে হয় না। তরুণী মেয়েদের মধ্যেও এখন ক্ষুধা-প্রকাশের একই তরিকা। সুতরাং কাম পেলেই শুয়ে পড়ো, কিংবা লিভ টুগেদার করো। প্রকৃতপক্ষে সেই সনাতন প্রস্তাবই তাকে দিচ্ছে ছেলেটি।

—তোমার আর কিছু বলবার আছে?

—এত, এত, যে কীভাবে শুরু করব, কোনখান থেকে শুরু করব বুঝতে পারছি না।

—বোঝার কাজটা শুরু করে ফেলো, যখন গুছিয়ে উঠতে পারবে তখন এসো। এখন তুমি গেলেই আমি স্বস্তি বোধ করব।

তার পরেও আঁদ্রে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বেশিরভাগটাই মাটির দিকে, কিংবা দেওয়ালময় নানান ক্লাসিকের প্রিন্টের দিকে চেয়ে। পোস্টারের দিকে। অদিতিরই করা। তারপরে মিয়োনো গলায় বলল—যাই তা হলে!

—হ্যাঁ এবার যাও।

এত বোকা লোকটা, এরপর তার কাছে বিয়ের সম্মানজনক প্রস্তাব নিয়ে এল। মানে বিছানায় তোলার অধিকার।

অদিতি বলল—তুমি কি ভেবেছ আমি তোমাকে লাইসেন্স বার করতে বলেছি?

—আমি জানি ভারতীয় মেয়েরা বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের কৌমার্য রক্ষা করে।

—এক কাজ করো আঁদ্রে তুমি বরং একটা বই লিখে ফেলো।

—হঠাৎ?

—এই সাবজেক্টটার ওপরে। ভারতীয় মেয়ে। তারা কী চায় না চায়, কী রক্ষা করে না করে।

—তুমি কি আমাকে ভালবাসো না? আমার ধারণা ছিল—বাসো।

—আমারও তো তাই ধারণা ছিল।

—ছিল? মানে এখন নেই?

—আমি তোমাকে, তোমার ধরনধারণকে পছন্দ করতে পারছি না আঁদ্রে।

এতদিনে, এই এতদিনে বোধহয় আঁদ্রের সহজাত বোধে কিছু ধরা দিল। বন্ধুভাবে মেলামেশা করতে লাগল, বাড়িতে আসতে লাগল, এই বাসন ধুয়ে দিচ্ছে, এই দেওয়ালের ছবিগুলো ঠিক করে সাজিয়ে দিচ্ছে। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা আলোচনা চলছে দু'জনের—কবিতা, উপন্যাস, বালজাক, জোলা, আঁদ্রে জিদ, বদলেয়র, পিসারো, সেজান। ছবি আঁকছে অদিতি সে ধৈর্য ধরে ঠায় পাশে বসে। মোড়কে করে খাবার আনছে, যাতে অদিতিকে রান্না করতে না হয়। অনেক রাত। ফেরবার সময়ে আরক্ত মুখে একবার চায়, তারপর অদিতির হাতে চুমো রাখে, চলে যায়। কোনওদিন গালে বিদায়ী চুম্বন। একেক সময়ে তার বুকটা টনটন করে। নিকট হলেই ঘিরে ধরে একটা মোহ, মুগ্ধতা, ইচ্ছে করে ওর কাঁধে মাথা রাখে। আঁদ্রে খুব বেশি লম্বা নয়, অদিতি বেশ লম্বা। দু'জনের দৈর্ঘ্যের অনুপাতটা যেন আশ্লেষের জন্যই তৈরি। তবু তবু...

চার

দরজা খুলে দিল শীলাদি। অদিতি চাবি বার করতে যাচ্ছিল অভ্যাসমতো। এমন সময়ে দরজাটা খুলে গেল। ও পাশে সন্ধ্যাপ্রদীপের মতো শীলাদি। বোধহয় জানলা দিয়ে দেখতে পেয়েছে। কী যে অদ্ভুত ভাল লাগল! সেন্টিমেন্টাল নয় অদিতি। কিন্তু আজকে কেন কে জানে তার চোখ সামান্য স্বচ্ছ হয়ে এল! তাতে শীলাদির কালো পাড় শাড়ি পরা ছায়া। একা, সম্পূর্ণ একা থাকাটা যে সে শুধু মেনে নিয়েছে, ভালবাসেনি কখনও—এটা সে যেন এতদিনে বুঝতে পারল। শীলাদি কি কিছু বুঝতে পারল? খুবই সংবেদনশীল মানুষটি। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাব পরিবর্তন বুঝে ফেলতে পারে এ অদিতি অনেকবার দেখেছে। বুঝলে বুঝেছে। অদিতি নিজের সব ভাব সবার কাছ থেকে লুকোতে চায় না।

—অমন ভিড়ে ঠাসা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাও কী করে মা? প্রথমেই মনিবানির কথা থোড়ি জিজ্ঞেস করল শীলাদি। মানুষটিকে যে অদিতি তার অতিরিক্ত বিবেকী স্বভাবের জন্য সহ্য করছে শুধু, এতটুকুও ভালবাসছে না, শ্রদ্ধা সম্ভ্রম করছে না এটুকু শীলাদির কাছে জলের মতো পরিষ্কার।

—অভ্যেস হয়ে গেছে। সবাই চালাচ্ছে, আমিও চালাচ্ছি। এর মধ্যে কোনও 'কী করে' নেই—সে হাসল—তুমি কি দেরি দেখে ভাবছিলে আমার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে!

—বালাই ষাট। ও কথা ভাবতে যাব কেন বউমা, তোমার মতো পুণ্যবতী মেয়ের কখনও ওসব হয়? ষাট ষাট।

—যারা অ্যাকসিডেন্টে যায় তারা সব তা হলে পাপী বলছ?

—অত জানি না বাপু! বললুম কথা একটা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ।

—ওই একটা ডিফেন্স যে তুমি কতবার ব্যবহার করবে!

—কী ফেনস?

—ডিফেন্স! ডিফেন্স! আত্মরক্ষা, অজুহাত,—মুখ্যুসুখ্যু!

—কেমন আছে মা?

—খুব একটা ভাল না...অদিতি অন্যমনস্ক হয়ে বলল।

আর কিছু জিজ্ঞেস করল না শীলাদি। বলল চা না কফি?

—কফি করতে পারবে?

—কেন পারব না?

—তা হলে করো। তোমারও করো। নিশ্চয়ই খাওনি।

শীলাদি চলে গেল। যে ঘরে তনিকা-অনোহিতা শুয়েছিল সেই ঘরে শীলাদিকে থাকতে দিয়েছে সে। ঘরটা তার, সাজসজ্জা, আসবাবপত্র সব তার বাবা-মা'র। বাবা-মা'রও নয়, দাদা-দিদির। দাদা মারা যাবার সময়ে তাঁর যা কিছু এয়ারলুম ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। বেশ কিছু এই ধরনের অ্যান্টিক আসবাব পড়েছিল মা-বাবার ভাগে। মায়ের বিয়ের আসবাব দুটো খাট, আলমারি সব অদিতির শোবার ঘরে, এ ঘরে ওই অ্যান্টিক। শীলাদি ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকিয়েছিল। কোণ থেকে একটা গোটানো কার্পেট টেনে নিল, বলল—আমায় দুটো চাদর দিয়ো। একটু পুরনো দেখে। কড়কড়ে জিনিসে শুয়ে আরাম পাই না।

এই ব্যাপারটা নিয়ে অদিতি একটা প্রচণ্ড দ্বিধা এবং আত্মগ্লানির মধ্যে ছিল। শীলাদি যদিও রান্নাবান্না করে বিষ্ণুপুরে, ও তো শুধু রান্নার লোকই নয়, আত্মীয়ের বাড়া। পরিষ্কারও খুব। ওকে সে একদা প্রণাম করতে গিয়েছিল। অত ভদ্র মার্জিত চেহারা শীলাদির, তা সত্ত্বেও বাবা-মা'র পালঙ্কে শীলাদিকে শুতে বলতে পারেনি সে। আধুনিকা, দীর্ঘদিন বিদেশে থাকা, অনেক দেশীয় সংস্কার মুক্ত নাকি সে। কিন্তু পারেনি। নিজের ঘরে মেঝেতে একটা ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু একে তার ঘরে অন্য লোক ভাল লাগে না। উপরন্তু এ ব্যবস্থাটা শীলাদির জন্যে তার ঠিক মনে হয়নি। মায়ের পালঙ্কে...মায়ের পালঙ্কে....অথচ কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে অনোহিতাকে ওখানে শুতে দিতে তো তার একবারও ভাবতে হয়নি! নিজের ওপর ঘৃণা হচ্ছিল, কিন্তু যা স্বাভাবিকভাবে আসছে না, তা সে কেমন করে করবে? হিপক্রিসিকে প্রশ্রয় দিয়ে কী লাভ?

গোটানো কার্পেটটা টেনে নিয়ে শীলাদি তাকে মুক্তি দিল। সে শুধু বলল—মেঝেতে শুতে পারবে?

বিষ্ণুপুরে শীলাদির আলাদা ঘর তাতে তক্তপোশ, ভাল ধবধবে বিছানা।

—কার্পেটটাও সরিয়ে দিতে পারি, তা যদি বলো বউমা। তোমার মেঝে এত সুন্দর ঠান্ডা।

—ওসব করতে যেয়ো না, শেষকালে ব্যথাট্যথা হবে।

পুরনো আলাদা চাদর তার কোথা থেকে থাকবে! সে নিজের ভাল চাদর ও বালিশ দিয়ে খানিকটা গ্লানিমুক্তি অনুভব করেছিল।

কফি খেতে খেতে, মোড়ায়-বসা শীলাদির দিকে তাকাল অদিতি। অদ্ভুত মহিলা, সোফা, ডাইনিং চেয়ার ইত্যাদিতে বসবে না। আবার মেঝেতেও বসবে না। ঠিক যেমন কার্পেট খুঁজে নিয়েছিল তেমনই খুঁজে নিয়েছে একটা মোড়া। মোড়াটা শীলাদির সঙ্গে সঙ্গেই চলাফেরা করে।

খুব চিন্তিত মুখে ধীর গলায় অদিতি বলল—ওঁকে বোধহয় এখানেই নিয়ে আসতে হবে। ডক্টর রায়চৌধুরী এখন বিষ্ণুপুরে যেতে বারণ করছেন।

—কী হবে তা হলে? তোমার তো ভীষণ অসুবিধে... শীলাদি থেমে গেল।

—ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে! না হলে ওই রোগীকে নিয়ে তো আমি বিপদে পড়ে যেতাম। সারাদিন বাড়ি থাকি না। বাইরের আয়াটায়াকে...একলা রেখে যাওয়া...

কী আশ্চর্যের কথা! রাজর্ষি গুপ্ত, যার সঙ্গে তার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, তার মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে থাকতে আসছেন তার বাড়িতে! শুধু রাজর্ষির মা বলে নয়, মহিলা চিরকাল তাকে বিষ নজরে দেখেছেন। কত আশ্চর্যই না তার কপালে ঘটল!

তার মুখ হয়তো একটু কঠিন বিরক্ত হয়ে গিয়ে থাকবে, শীলাদি বলল—একটা কথা বলব বউমা! বলল বেশ দ্বিধা ও ভয়ে—বলল—তুমি কেন এত দায় নিতে যাবে? যার মা সে ব্যবস্থা করুক। তুমি তাকে ই না এ সেই কী বলে তাই একটা করে দাও। সে আসুক, যা বোঝে করুক।

—যদি আসেও, একটু তো দেরি হবেই। ততদিন ওঁরা ওখানে রাখতে চাইছেন না। বেড আটকে রয়েছে তো!

—তা হলে দাও আবার অ্যাম্বুলেন্সে করে বিষ্ণুপুরে পাঠিয়ে। উনি ভিতু মানুষ। ওঁকে কিছু বলতে হবে না। পাঠিয়ে দাও। আমি আছি। সুবোধ ডাক্তারবাবু আছেন। কিচ্ছু হবে না। আর যদি হয়ই, দুঃখ তো কিচ্ছু নেই। বয়স হয়েছে, নানা রকম অসুখ শরীরে, মনেই কি আর শান্তি আহ্লাদ কিছু আছে! কিচ্ছু না। যদি সময় এসে গিয়ে থাকে তো যাবে! নিজের ভিটে, নিজের জায়গা। কোনও অযত্নের ভয় নেই, সে তো ভাল যাওয়া মা!

'ভিতু মানুষ' কথাটার একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল অদিতির মনে। একটা অনন্ত আর্তির মুখ, অনেক লোকের মুখহীন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে রয়েছে। প্রতিবেশটা রেমব্রান্ট-নাইট ওয়চ, ফিগারগুলো এল গ্রেকোর, মুখটা রবীন্দ্রনাথের আঁকা। তাঁর পুরো আলোছায়া, মুখাকৃতির লম্বাটে ছাঁচ, অন্ধকার চোখ, ঘাড়ের সটান ভঙ্গি যেন পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সবটার রং, সমস্ত সুদ্ধ গোটা একটা ছবি। সে কোনও কথা বলল না, সাংসারিক কথাবার্তার মধ্যে ছবি বড্ড হারিয়ে যায়। সে স্বপ্নগ্রস্তর মতো উঠে আস্তে আস্তে তার স্টুডিয়োর দিকে চলে গেল।

শীলাবতী অবাক হয়ে চেয়ে রইল। পেছন পেছন গেল। তারপর স্টুডিয়োর দরজায় আরও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ইজেলে টান টান করে ক্যানভাস বিছোনো। সামনে অদিতি একটা নিচু টুলে। হাতে পেনসিল। সে সাধারণত একটা খুব হালকা লাইন ড্রয়িং করে নেয়। অদিতির পেছনে, সামনে মেঝেতে কোণে ঠেস দেওয়া ছবি, বাঁধানো-না-বাঁধানো, সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ—রং রেখা ভাবের এক বিশাল সমারোহ। শীলাবতী তার এককোঁটাও বোঝে না। কিন্তু সম্ভ্রমে-বিস্ময়ে 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

এ ঘরটা তালা দেওয়া থাকে। সে এই প্রথম দেখল।

* * *

একটা বোবা কষ্ট, ভীত যন্ত্রণার্ত—এ মুখ আঁদ্রের। আঁদ্রের সত্যিই একটা মানসিক ভয়জাত পুরুষত্বহীনতা ছিল। সে ভার্জিন নয়, কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। বাহাদুরি করে কথাটা বলেছিল অদিতিকে। বিয়ের পরে প্রথম রাতেই তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হয়েছিল বেচারিকে। খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। এই জন্যেই কি ওর অত তাড়া ছিল। শরীরে জোয়ার থাকতে থাকতে কূলে তরী ভেড়াবার?

—তুমি কি কাঁদছ আঁদ্রে?

—না। সে হাসল। সে হাসি কান্নার বেশি।

—শোনো, এসব কিছু নয়, আমি তোমাকে ভালবাসি। এটা তোমার একটা সাময়িক অক্ষমতা।

ভয় পাচ্ছ কেন? ঠিক হয়ে যাবে।

—কিছু ঠিক হবে না অদিতি। আমি এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। তোমাকে...তোমাকে আমি ঠকালাম। আমি তোমাকে ছাড়া...নাঃ আমি ভাবতে পারছি না।

—আশ্চর্য। তুমি আচ্ছা বোকা, ভিতু তো। এত দুর্বল তুমি? আমি বলছি ঠিক হয়ে যাবে।

—বলছ।—নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল আস্তে আস্তে। দেবদূতের মতো নিষ্পাপ মুখ। কাঁধ অবধি সোনা সোনা চুল, তীক্ষ্ণ নাক, বেদানা রঙের ঠোঁট। ঘুমন্ত আঁদ্রেকে দেখে অদিতির মনে হয়েছিল—এ এমনই কাঁচা, কিশোর কিশোর এক মানুষ যার প্রতি কাম জাগা তার পক্ষেও সম্ভব না হতে পারে।

মাস ছ'য়েকের মতো মানসিক চিকিৎসা, কাউন্সেলিং চলল। আস্তে আস্তে ভরাট হল আঁদ্রের শরীর, পেশিতে ঢেউ, মুখে আত্মবিশ্বাস। ততদিনে ওর সালঁ দাঁড়িয়ে গেছে, রীতিমতো ব্যবসাদার। আর তখনই এক গভীর আধ-ঘুমন্ত রাতের আলোয় আঁদ্রের অলৌকিক যাত্রা সম্ভব হল।

পরবর্তী কয়েক বছরের হাস্যোচ্ছল সবল আঁদ্রের ভেতর থেকে এই ভয়কাতর মুখশ্রী এতদিন পর তার কাছে এসে অমরত্ব যাচ্ঞা করছে? রাত প্রায় তিনটে অবধি চলল কাজ। টেনে বাড়ানো লম্বা লম্বা বাইজানটাইন ফিগার, পেছন দিকে রবিঠাকুরীয় মুখ। শেষ করতে মাসখানেক অন্তত লাগবে। কিন্তু শেষরাতে বিছানায় ঢুকতে ঢুকতে ক্লান্তিতে অসাড় শরীর মেলে দিয়ে তার মনে হল—মুখটার অভিব্যক্তি তার মনে চিরতরে খোদাই হয়ে গেছে। আর হারাবে না। কে ও? ও কি আঁদ্রে নাকি? নাকি মাধুরী গুপ্ত। নাকি শীলাবতী। তবে কি ওই সব অন্ধকার মুখের আড়ালে একটি মুখই? সে মুখটা কি তার? কাতর। অন্ধকার। কালো পৃথিবী হাতড়ে হাতড়ে অভিব্যক্তি খুঁজে ফিরছে?

* * *

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে মাধুরী গুপ্ত গোয়াবাগান যাত্রা করলেন। সন্তুষ্ট তৃপ্ত মুখ। একবারও সংকোচ প্রকাশ করলেন না। একবারও বিষ্ণুপুর যেতে চাইলেন না। অদিতির বাড়িতে এলেন যেন নিজের বাড়িতে আসছেন। দোষের মধ্যে খালি বাড়িটা অচেনা! সম্পূর্ণ অচেনা অবশ্য নয়। একবার, একবারই মাত্র এসেছিলেন, তখন মা বেঁচে, ওদিকে জেঠিমা, ছোটকাকু, দাদারা সবাই গায়ে গায়ে ছিল। ভাগাভাগি হয়েছে। কিন্তু ছোটকাকু তাঁর ভাগের ঘরটা নিয়ে মায়ের কাছেই থাকতেন। তখন সাজসজ্জা এ রকম ছিল না আদৌ। এসব ঘরের।

—তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম, এটুকু অন্তত বলবেন আশা ছিল অদিতির। কিচ্ছু না।

স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সের লোকেরা তুলে দিল। সেই মাতৃ পালঙ্কের ওপরই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। যাঁকে ভালবাসে না শ্রদ্ধা করে না, যিনি তার ভালমানুষির সুযোগ নিচ্ছেন বলে সে আপাদমস্তক বিরক্ত, তাঁকে তার পবিত্র স্মৃতিসম্পন্ন পালঙ্কে দিব্যি জায়গা দিতে পারল সে, কিন্তু যার প্রতি তার মমতা, খানিকটা ভালবাসাও আছে, আছে এক ধরনের শ্রদ্ধাও সেই শীলাদি মাটিতেই শুয়ে রইল।

পালঙ্কে শুয়ে মাধুরী দেবী প্রসন্ন চিত্তে, প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন—

এই বেশ হল। সেই নির্বান্ধব নির্জন পুরীতে কে যায়! যেন গিলতে আসে। মা গো। তোমার এ বেশ ভাল ব্যবস্থা।

—এখানেও কিন্তু পুরী নির্জনই। আমি সারাদিন বেরিয়ে থাকি। একেক দিন ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। এখানেও আপনি আর শীলাদি দু'জনে দু'জনের মুখ দেখবেন। মহা বিরক্তিতেও অদিতির হাসি পেল।

—রাত্তিরে তো ফিরবে গো, না তা-ও ফিরবে না? তোমাদের আজকালকার আর্টিস্টদের এই হয়েছে এক ঢং। কোনও নিয়ম-নীতি নেইকো।

যেন উনি সেকালের আর্টিস্টদের রীতি প্রকৃতি জানেন।

শুরু হল। অদিতি বিরক্তিতে সরে যায়।

সে যখন স্কেচবুক হাতে শালজঙ্গলের মধ্যে যেত তখন জিনস পরত। কিংবা লং স্কার্ট। ছোট চুলগুলো মাথার উঁচুর দিকে ক্লিপ দিয়ে আটকানো থাকত। মায়ের অনুশাসন সে খুব বেশিদিন মানতে পারেনি। বিষ্ণুপুরের বাড়ির মধ্যে যখন আঁকত, অনেক সময়ে বাবারই প্রয়োজনের আঁকা, তখনও একটা মিডি স্কার্ট মতো পরে থাকত। সুবিধে হত মেঝের ওপর উপুড় হয়ে আঁকতে।

প্রথমদিন দেখে উনি বললেন—এ কী? এই ধিং নারায়ণ হয়ে বাইরে যাবে? লোকে বলবে কী?

—আহ্ হা! —ওরা এইসব পরেই অভ্যস্ত। শ্বশুরমশাই হয়তো বললেন।

—অভ্যস্ত? তাই বলে গুপ্তবাড়ির বউ এমন নির্লজ্জের মতো বেরোবে? কুকুর ছুটবে যে পেছনে।

—ছুটুক। ও বুঝবে। ঢিল নিয়ে যাও তো অদিতি পকেটে করে। মেরে কুকুর তাড়িয়ো।

পাঁচ

খাটের মাথার দিকের পাশে একটা মাঝারি টেবিল, তাতে ওষুধপত্র, ফ্লাস্ক, জলের বোতল, বিছানায় রাবারক্লথ, খাটের তলায় বিদেশি ফাইবারের বেডপ্যান, উলটো দিকে মেঝেয় শোবে শীলাদি। একটা আলমারি আর একটা দেরাজ ঘরে। দেরাজটার দুটো ড্রয়ার ফাঁকা করে দিয়েছে অদিতি। এঁদের দু'জনের জামাকাপড় তোয়ালে ইত্যাদি থাকে এইখানে। সে লোক রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু শীলাদি রাজি নয়। বলল—উনি আমার হাতের ছাড়া সেবা নেবেন না, বউমা—আরও আশ্চর্যের কথা যেটা শীলাদি বলল—আমিই বা কী করে ওঁকে ভাড়া করা লোকের হাতে ছাড়ি। সে আমি পারব না, আমার তো এখানে কিছুই করতে হচ্ছে না। আমার কোনও কষ্ট হবে না।—তারপরে যা বলল শীলাদি সেটা তৃতীয় আশ্চর্য বা অষ্টম আশ্চর্য যা-ই বলা যাক। বলল—আর এক উনি নিতে পারেন তোমার হাতের সেবা।

—আমার?

—না গো। তোমাকে কিছু করতে বলছি না, করতে পারবেই বা কেন?

অদিতি মনে মনে বলল—এ ভাবেই আমি মায়ের সেবা করেছি। সেবা করতেই প্রধানত চলে এসেছিলাম। যদি জানতে শীলাদি।

—মানে তুমি তো করছই। কত কাল ধরে করছ মা, বিপদে পড়লে উনি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ডাকেন না। জ্ঞাত-গুষ্টি কি আর নেই! মায়ের বাপের বাড়ির দিকেও কিছু আছে। কিন্তু না, প্রত্যেকবারই বলবে—বউমাকে খবর দাও।

খুব আশ্চর্য হয়ে, প্রায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অদিতি চলে এল। বলে কী! তোষামোদ? সে এত করছে বলে? ভেতরে ভেতরে এত বিরক্ত বলে? শীলাদি ডিপ্লোম্যাসি করার মতো চতুর বলে কখনও মনে হয়নি তার। বোকা একেবারেই নয়। কিন্তু সরল, আন্তরিক, সংবেদনশীল এবং ...এবং একেবারেই বোকা নয়।

যাক—আজকে একটা লম্বা কাজ আছে, অ্যাকাডেমিতে আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ছবির একটা অভিনব প্রদর্শনী। সে বিচারক। অন্যতম। কান্তিদা আর সে। দু'জনে আলাদা আলাদা যাবে। একেবারে পরামর্শ না করে প্রতিক্রিয়া বদলাবদলি না করে যার যার মতামত লিপিবদ্ধ করবে। তারপরে মতানৈক্য বা আর কোনও অসুবিধে হলে বসবে ভাস্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে। সকালে সে যায় তার নিজস্ব সংস্থা 'চিত্রভানু'তে। সেখানে প্রচুর পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রছাত্রী। এটা একটা ফরাসি ধরনের আতলিয়ে এখানে

যে-যার ইচ্ছে মতো ছবি আঁকে। যাদের আঁকাজোকা করার জায়গা নেই তারা অনেকেই এখানে স্রেফ নিজের কাজ করবার জন্যে আসে। রং তুলি তেল সব নিজস্ব, ক্যানভাস বা নানা রকম হ্যান্ডমেড পেপার সে দেয় এবং এইসব ছবি বিপণন করে। তারই একটা ভাগ তার প্রাপ্য। কিন্তু এইসঙ্গে আছে কিছু শিক্ষার্থীও। তারা শেখে। স্টুডিয়ো সামলানো, শেখানো, এবং বিপণন তিনটে কাজই একসঙ্গে করতে হয়। সময়সাধ্য, শ্রমসাধ্যও বটে। আজই যেমন মিসেস কানোরিয়া কতকগুলো পছন্দসই ছবি নিয়ে যেতে বলেছেন। এসব করবার জন্য ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া আর কেউ নেই তার।

অন্যমনস্কভাবে খাচ্ছিল সে। ভাতের গ্রাসের সঙ্গে মুখে কী তুলল না তুলল সে খেয়ালই নেই। তার অন্যমনস্কতাকে এক চমক দিয়ে জ্ঞানে ফিরিয়ে দিল কী যেন একটা স্বাদ।

—কী রেঁধেছ ছবি? এটা?

—কোনটা?

—এক্ষুনি যেটা খেলাম।

—ও, ওটা কী যেন শীলাদি রেঁধেছে।

—কী? এটা?

—নিজেই কেটেছে, কুটেছে—আমি জানি না দিদি। ভাল?

—খুব ভাল।

—ও শীলামাসি, শীলামাসি...ই অমনি ছবির হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল।

—কী?

—কী রেঁধেছ গো। খুব ভাল লেগেছে দিদির।

—গুগলি রেঁধেছি। আমাদের ওখানে তো খুব পাওয়া যায়। বাড়িতে এনে বিক্রি করে যায়। ছাতুর সঙ্গে খুব ভাল লাগে। মায়ের মুখে সোয়াদ নেই, খেতে চাইল...

—খুব ভাল হয়েছে। তা কাকে দিয়ে আনালে? ছবি তো বলছে কিছুই জানে না।

—তোমাদের হাতিবাগানের বাজার তো এই দোরগোড়ায় গেলুম, নিয়ে এলুম।

—কলকাতার রাস্তাঘাটে স্মার্টলি চলাফেরা করতে শিখে গেলে? শীলাদি?

লাজুক হেসে শীলাদি বলল—ওটা আবার একটা কথা হল? কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর যেতে হলে কিন্তু পারব না।

তার হালকা নীল শিফনের কুঁচি ঠিক করতে করতে অদিতি ভাবল—সত্যি তো কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বর এগুলো কলকাতার প্রধান আকর্ষণ। বিশেষ করে শীলাদিদের কাছে। মাধুরী যখন নার্সিংহোমে ছিলেন, তখনই একদিন নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মুখ ফুটে একবার বলতে হয়। এখন রোগীকে ফেলে ও যাবে কী করে? নিজের ওপর একটু রাগও হল। যখন শীলাদিকে আসতে বলল তখন তো ওর একটু হাওয়া-বদলের জন্যই বলেছিল। কলকাতা দেখানোও। নিজের এই ভাঙা বাড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখায়নি এখনও পর্যন্ত।

চোখের কোলে হালকা করে বাদামি পেনসিল বুলোল। চুলগুলো আঁচড়ে আঁচড়ে ঝাঁকিয়ে ফুলিয়ে নিল। লম্বা আয়নায় ঘুরেফিরে দেখল নিজেকে। আজ মিসেস কানোরিয়ার ওখানে যেতে হবে। আর একটু সাজলে হত। মার্কেটিংয়ের জন্য একটু সাজগোজ দরকার হয়, বিশেষ করে মেয়েদের। ছেলেদের লম্বা চুল আর না-কামানো দাড়ি, জিনসের ওপর ছোট ঝুলের হাফ পাঞ্জাবি, কি লম্বা ঝুল খদ্দরই সাজ। কিন্তু মেয়েদের নানাভাবে নিজেকে সজ্জিত করতে হয়। অত ভাবনায় কাজ কী? সে নিজেই সাজতে বিলক্ষণ ভালবাসে। আগে এটা একটু চড়ার দিকে ছিল, সে সময়ে 'ভাবুনি' 'সাজুনি' ইত্যাদি বিশেষণ তার যথেষ্ট জুটেছে। এখন তার সাজসজ্জা আরও অনেক পাকাপোক্ত। রুচি পরিণত। মিসেস কানোরিয়ার ঘরের দুগ্ধশুভ্র দেওয়ালের পটে তার এই হালকা নীল বড় ভাল খুলবে। একটা সময় ছিল যখন সে প্রাইমারি কালারগুলো ছাড়া পরত না। সে একদিন গেছে। বন্ধু-বান্ধবরা চেঁচামেচি

করত কলাভবনের সেইসব দিনগুলোতে—আজও হলুদ, তুই কি চির হেমন্ত নাকি রে, বনি?—তারপর তার গোপন পলিসিটা আবিষ্কার করে ওদের সমবেত সংগীত—আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে—সে আর গান থামতে চায় না—অরুণিকা, মেহের, শিল্পশ্রী, তুষার, রঙিন, মাধবন, কাদের... সব স-ব।

মুখে একটু, সামান্য একটু হাসি ফুটেছিল। ছবি বলল—দিদি ফোন। আশ্চর্য! এত মগ্ন ছিল সে রুদ্রপলাশের রঙে যে রিং শুনতেই পায়নি। এমনই তার হয়। এই তদ্‌গত তন্ময়তা, তখন কোনও কিছু দেখে না, শোনে না। শুধু সেই এক অদ্বিতীয় ধ্যানবস্তু ছাড়া। যেমন এখন রুদ্রপলাশ! শান্তিনিকেতনের বসন্ত-ভরতি রুদ্রদর্শন নয়, অথচ রুদ্রপলাশ।

—হ্যালো।

—আমি মিসেস সাহা রায় বলছি। আপনি অদিতি সরকার তো?

—হ্যাঁ।

—আপনি কি আমার মেসেজ পাননি?

—হ্যাঁ পেয়েছিলাম। স্যরি মিসেস সাহা রায়। আসলে আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় খুব অসুস্থ। নার্সিংহোম, ডাক্তার... এখন আবার আমার বাড়িতেই আছেন। সময় পাইনি। ভুলেও গিয়েছিলাম। খুব দুঃখিত।

—না, না, তাতে কী! অসুখ যখন। জিভে একটা চিকচিক আওয়াজ করলেন ভদ্রমহিলা সহানুভূতির, তারপরে বললেন—আজ একটু সময় দিতে পারবেন? খুব দরকার।

—অনোহিতা কি বাড়িতে আছে?

—না।—ভদ্রমহিলার গলাটা কেঁপে গেল—সেই থেকে ফেরেনি।

—সে কী? পুলিশে খবর দিচ্ছেন না?

—পুলিশের ব্যাপার নয়। আপনি আসুন, তারপরে বলব, ফোনে কথা হবে না। অনেক কিছু এক্সপ্লেন করতে হবে। প্লিজ আজকে একটু সময় দিন।

—আজ তো...ভীষণ ব্যস্ত...।

—প্লিজ...দ্রুত ভাবতে লাগল অদিতি। কোনটাকে বাদ দিতে পারে? কানোরিয়া? নাঃ। পাগল করে দেবেন। ফসকে যেতে পারে অনেক ভবিষ্যৎ ডিল। আর্ট এগজিবিবিশনে জাজগিরি? সম্ভব নয়। আরও কয়েকদিন আছে প্রদর্শনী। কিন্তু তার মধ্যেই পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিদের গায়ে লেবেল আটতে হবে। একমাত্র—একমাত্র 'চিত্রভানু'টাই বাদ দিতে পারে সে।

—মিস সরকার।

—ইয়েস, ভাবছিলুম। আপনি এক কাজ করুন। এখুনি চলে আসতে পারবেন?

—শিয়োর।

—কোথায়?

—আপনি তো নর্থে থাকেন। ওদিকে কিছু জানা নেই আমার, এক কলেজ স্ট্রিট কফি হাউজ...।

—আমি সাউথে যাচ্ছি। যেতে হবে থিয়েটার রোডে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে দেড়টায়। আপনি এক কাজ করুন, থিয়েটার রোডের মুখে একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁ আছে, কিংবা কাছাকাছি চৌরঙ্গির ওপর 'এমব্যাসি'। এই দুটোর একটাতে চলে আসুন। প্লিজ খেয়ে আসবেন না, কারণ আমার লাঞ্চ এইমাত্র শেষ হল, রেস্তোরাঁয় কথা বলতে হলে যা-যা অর্ডার দিতে হবে সব আপনাকেই খেতে হবে কিন্তু।

—ঠিক আছে। এমব্যাসি যাচ্ছি।

—তা হলে সাড়ে এগারোটা।

'চিত্রভানু'তে ফোন করল অদিতি। স্টুডেন্টরা কেউ আসেইনি এখনও। এসেছে শৌনক, একজন শিল্পী, সে-ই ধরল।

—আমি দিদি বলছি। আমার ক্লাসের কেউ এলে বলবে—কাল যে ছবিগুলো সিলেক্ট করেছিলাম, সেগুলো যেন ওরা ভাল করে প্যাক করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ২৫/১ শেক্সপিয়র সরণিতে পৌঁছে যায়। ঠিক দেড়টা নাগাদ। আগে নয় পরে তো নয়ই। আগে গেলে অপেক্ষা করতে হবে। বুঝেছ?

—হ্যাঁ দিদি, এটা কানোরিয়া হাউজ, না?

—হ্যাঁ।

—আমারও কিছু আছে ওর মধ্যে, না? ওর গলায় প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ, উৎসাহ।

—হ্যাঁ, ছেড়ে দিচ্ছি।

আর দেরি করল না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অদিতি চটপট বেরিয়ে পড়ল। শীলাদি বা মাধুরী দেবীকে বলে আসতেও ভুলে গেল বেমালুম। এমনিতেও তো অভ্যেস নেই!

মিসেস সাহা রায়ের কথা সে যে কী করে ভুলে গেল! উচিত হয়নি কাজটা। বোঝাই যাচ্ছে একটা পাগলি মেয়ের মা তিনি। মেয়েটা একেবারেই খেয়ালখুশি মতো চলে। সেই থেকে ফেরেনি? কেলেঙ্কারি। ভদ্রমহিলা, পেছনে ভদ্রলোকও আছেন নিশ্চয়, তো তাঁরা এতদিনেও কিচ্ছু না করে বসে আছেন? পুলিশের ব্যাপার নয়? তার মানে ওঁরা তার খবর রাখেন, খবর পান।

মেয়েটা যে রকম রহস্যজনকভাবে চলে গেল, তখন তার অভদ্রতা মনে হয়েছিল, নিউ জেনারেশনের মার্কামারা অভদ্রতা, এখন বুঝছে রহস্যজনকই, সন্দেহজনক, আসলে ভয় পেয়েছে এর পরে আরও পরিচয় বার হয়ে পড়বে। সেটা হতে দিতে চায়নি। অনাহূত রবাহূত কেমন চলে এল? সেটাও সন্দেহজনক। ঠিক করতে পারছিল না কী করবে। রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে সব। উনি আকাশ পাতাল ভাবছেন আর কী! কোথায় গেলে কী করলে বাবা-মাকে আরও জ্বালানো যায়। তা অযাচিতভাবেই আশ্রয় মিলে গেল। রাতের মধ্যে ভাবনা-চিন্তা ইতি-কর্তব্য স্থির হয়ে গেল বোধহয়, কেটে পড়ল। বাস। আর কে তার তোয়াক্কা করে!

রেস্তোরাঁটা চলে কী করে কে জানে! সব সময়েই খুব কম লোক থাকে। এসেছে হয়তো বার পাঁচেক। খুব কনভিনিয়েন্ট জায়গাটা। আজ কিন্তু বেশ লোক। লাঞ্চ-টাইম তো! লোক জমতে শুরু করেছে। লাঞ্চের জন্য টেবিল সাজানো। কয়েকটাতে আবার রিজার্ভড নোটিস। সে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কোনও চিহ্ন, কিছু বলাবলি হয়নি। সে বোধহয় ধরেই নিয়েছিল শূন্য থাকবে জায়গাটা, একটিমাত্র মহিলা সূর্যের মতো বিরাজ করবেন তার অপেক্ষায়।

কোণ থেকে একজন উঠে দাঁড়ালেন। হাত নাড়লেন।

—আসুন।

—কতক্ষণ এসেছেন?

—জাস্ট।

—অনেক দূর?

—না, আয়রনসাইড রোড।

—মোটের ওপর দূরই তা!—বলছিল আর ভদ্রমহিলাকে জরিপ করছিল অদিতি। খুব ফরসা রং। মুখ নাকগুলো একটু ভোঁতা ভোঁতা। একধরনের সৌম্যশ্রী আছে। বয়ছাঁট চুল। ঘাড় গলা রীতিমতো বলিষ্ঠ। ভাস্করদের পছন্দসই। পুরো চেহারাটার মধ্যেই একটা শক্তির ছাপ আছে। রাফ পাথরে তৈরি করলে দারুণ হবে। সিমেন্টে চিপস মিশিয়ে বা সুরকি ধরিয়ে শৌনক মাঝে মাঝে করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অনোহিতা মায়ের কিছুই পায়নি। একেবারেই পলকা-হালকা। রং মাজা। চোখমুখের বিচার করা অত সোজা নয়। কেননা মেয়ে এখনও ধারালো, মা খানিকটা তো ধেবড়ে গেছেনই। যাই হোক, কোনও আদল নেই।

উনি বললেন—আপনি আর্টিস্ট অদিতি সরকার, না?

—হ্যাঁ।

—আমি আপনাকে টিভি-তে কোনও চ্যাট শোয়ে দেখেছি। ফোটো, এমনি এগজিবিশনেও... অ্যাকচুয়ালি 'আমি ছবি ভালবাসি।

অদিতি মুখে একটা আলগা হাসি নিয়ে অপেক্ষা করছে।

—অনোহিতাকে আপনি কোথায় কীভাবে পেলেন?

অদিতি বলল সব। কীভাবে। কখন। কোথায়। খালি কেনটাই তার জানা নেই।

—ভিজছিল? একা?—একাটার ওপর খুব ঝোঁক দিলেন ভদ্রমহিলা।

—ওর কি একা থাকার কথা নয়? একটু ইতস্তত করে সে জিজ্ঞেসই করে ফেলল।

—কী জানেন—অদিতি...বলতে খুব খারাপ লাগছে—কিন্তু ও প্রায় ওর বাবার বয়সি এক বিবাহিত ভদ্রলোকের কাছে আছে আমরা জানি। এই নিয়েই ওর বাবার সঙ্গে. আমার সঙ্গে খুব...চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। ওর বাবা খুব মেজাজি। মেয়েও তাই।

—মেয়ে তা হলে মাকেও মানে না।

—মা থাকলে তো মানবে?

—আপনি ওর মা নন?

—না। আমি ওর মায়ের বন্ধুস্থানীয়। ওর মায়ের মৃত্যুর পর, বছর দুয়েক পর আমরা, মানে আমি আর ওর বাবা বিয়ে করেছি।

এইবার সমস্যার আসল জটিলতার জায়গাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

—আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। কিন্তু এই বিয়েটার আগে ও আমাকে ওর মায়ের চেয়েও ভালবাসত।

কেন যে অতিরঞ্জন করছেন ভদ্রমহিলা! বুঝছেন না এতে ওঁর বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাচ্ছে। মা'র থেকে ভাল কেউ কাউকে বাসে?

—ওর মা, আমার বন্ধু খুব ভালমানুষ ধরনের। ভিতু, নির্বিরোধী ধরনের মেয়ে ছিল। মানসিক সাহায্যের জন্য ও আমার কাছেই আসত।

এবং আপনি পুরোপুরি তার সুযোগ নিতেন। ভাবল অদিতি।

—অনোহিতা একমাত্র সন্তান। ওর বাবা খুবই ব্যস্ত। বড্ড আদুরে, মানে একটু স্পয়েল্টই বলা যায়।

সৎমাদের কাছে সৎমেয়েরা সব সময়েই স্পয়েল্ট হয়। এই ছকটা অদিতির চেনা। স্ত্রীয়ের বন্ধু। ক্রমশ জাল বিস্তৃত করছে। ইনি তো সব কথা ভাঙবেন না!

—আমি ওদের স্কুলের প্রিন্সিপ্যালও। বড্ড উইলফুল, রাগী, আমাকেই একমাত্র মানত। ওর সঙ্গে আমার একটা স্পেশ্যাল রিলেশনশিপ ছিল।

—সেটা কি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে?

—খুব সম্ভব।

—আপনি ওর বাবাকে বিয়ে করেছেন বলে?

—খুব সম্ভব।

—ওর মা হঠাৎ, বয়স তো...।

—আমার মতোই হবে, স্কুল থেকে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি আমরা, শারীরিকভাবেও খুব কমজোরি ছিল শ্রীলা। হিসটেরেকটমি করতে হয়েছিল। মারা গেল। থ্রু আউট আমি... আমি একা তখন... আর কোথাও....কেউ...

ভদ্রমহিলা চুপ করে গেলেন। ওঁর নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। অদিতি মুখ নিচু করে চিকেন চাওমিনের প্লেটের দিকে তাকিয়ে রইল। এই গলা ধরে যাওয়া শোকটা সত্যি, অভিনয় মনে হল না।

—এর বাবা ছিল লন্ডনে। আর ও বন্ধুদের সঙ্গে এক্সকারশনে গিয়েছিল।

—মায়ের অপারেশনের কথা জেনেও?

—জেনেও—দ্যাটস দা প্রবলেম উইথ হার, শি ইজ ভেরি ভেরি সেলফিশ। ত. ছাড়া আমার ওপর এমন একটা ফেথ ছিল। জাস্ট বলে গেল— তুমি মাকে দেখো, আমি জাস্ট দু'দিনের জন্যে...

—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

—আমার অনধিকারচর্চা হচ্ছে মিসেস সাহা রায়। কিন্তু মেয়েটি যখন একরাত আমার বাড়ি কাটিয়ে গেছে এবং সেই সূত্রে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন জেনেও যে আমি আর ওর সম্পর্কে কিছু জানি না।...

—আপনাকে অত কৈফিয়ত দিতে হবে না। উনি একটু দুঃখের হাসি হেসে বললেন—কী জানতে চান জিজ্ঞেস করুন।

—ওর বাবা কেন সে সময় ছিলেন না।

—আপনি কি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের প্রেশারের কথা কিছু জানেন? ওরা কিচ্ছু মানে না, যেতে হবে তো যেতে হবেই। এখন, হিসটেরেকটমি একটা মেজর অপারেশন হলেও মোটামুটি রুটিনই তো! ভাল ডাক্তারের হাতে ছিল। আমার ওপরও ও খুব নির্ভর করত। কিছু করতে পারলাম না। ...তবে কী জানেন—ক্ষতি যা হয়েছে সবচেয়ে বেশি আমারই...।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল অদিতি।

—আপনি বুঝতে পারবেন না, শ্রীলা আর আমি ঠিক কী জাতীয় বন্ধু ছিলাম। আমি তো অনেকদিনই উইডোড্। একা থাকতাম। বন্ধুদের ফ্যামিলি তাদের ছেলেমেয়ে এটা আমার পৃথিবীর একটা...

—বুঝলাম। আমি এখন কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি সেইটাই বুঝতে পারছি না।

—আপনি অদিতি সরকার। আপনি হয়তো পারবেন। আপনি ভাস্কর চক্রবর্তীকে চেনেন নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো? —আশ্চর্য হয়ে বলল অদিতি।

—উনিই সেই লোক যাঁর মোহে ও...

বেশ কিছুক্ষণ অদিতি কথা বলতে পারল না। অবশেষে ধাক্কা খাওয়া গলায় বলল, আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না মিসেস...

—আমার নাম সর্বাণী, আমি আপনার চেয়ে বয়সে যথেষ্ট বড়, ইচ্ছে হলে দিদি ডাকতে পারেন।

—ভাস্করদা তো আমার চেয়ে অনেক বড় বটেই, আপনার চেয়েও বড়।

—হ্যাঁ, প্রায় ওর বাবার বয়সি। একটু জুনিয়র। বন্ধু।

অদিতি সেই একইভাবে চিকেন চাওমিনের প্লেটের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কিছু ভাবতেই পারছে না। বলা তো দূরের কথা। চারদিকের পৃথিবী ধূসর। চোখে ভাসছে কাঁচা মেয়েটার মুখ। বৃষ্টিতে ভিজছে। গলে যাচ্ছে মাটির পুতুলের মতো।

—আপনি আর্টিস্ট অদিতি সরকার, শিয়োর হয়েই আমি আপনাকে অ্যাপ্রোচ করেছি। যদি ভাস্করকে বলে কিছু করতে পারেন। ওর বাবা এখন এখানে নেই। ছ'মাসের জন্যে লন্ডন গেছেন। এর মধ্যে কিছু একটা করতেই হবে।...

ধূসর থেকে ধূসরতর হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে কাচের বাসনের মতো। শুধু কোনও শব্দ নেই।

* * *

মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের দেখা হলেই যদি সামান্যতম চেনাশোনা থাকে, শাড়ির প্রসঙ্গে উঠবেই।

কুসুম কানোরিয়া হুইল চেয়ারে বসেছিলেন। বয়স বছর ষাট। চুলে মেহেন্দি করেন। একটা আগুনে কমলা বড় মাথা। উজ্জ্বল রং, উজ্জ্বল চেহারা, নাক এবং চোখ তীক্ষ্ণ। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিকঠাক, কোনও একটা নার্ভের রোগে গত দশ-বারো বছর বেচারি এমন হয়ে গেছেন। এত ধনী, সারা পৃথিবী ঘুরে এসেছেন চিকিৎসার জন্যে, কিন্তু কিচ্ছু হয়নি।

উনি বললেন—ইয়ে শিফন বহোৎ বড়িয়া হ্যায়, অদিতিজি আপনার ওপর খুব ভাল লাগছে। খরিদ কিধারসে কিয়া? পার্কি স্ট্রিট?

—প্যারিস থেকে।

—দ্যাটস ইট।

—এখানেও শিফন আজকাল চমৎকার পাওয়া যাচ্ছে কুসুমজি।

—আপনাকে লাগছেও খুব সুন্দর। ফ্রেশ।

—আপনি চলাফেরা করেন হুইল চেয়ারে। কিন্তু আপনাকে দেখলে কেউ বলবে না আপনার কোনও অসুখ আছে। একদম ফ্রেশ।

অসুখের ব্যাপারটা নিয়ে আগেও ওদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, তাই এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারল অদিতি। কোনও ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই, বা হীনম্মন্যতা নেই ভদ্রমহিলার। খুবই সাহসিনী। এত প্রফুল্ল থাকেন যে কে বলবে ওঁর একটা এত বড় অক্ষমতা আছে। জন্মগত নয়। সারাজীবন চমৎকারভাবে ছোটাছুটি করে যদি শেষ-চল্লিশে কারও পা অকেজো হয়ে যায়, কী দারুণ ডিপ্রেশন আসতে পারে মানুষের আন্দাজ করা যায়। সে ডিপ্রেশন গোড়ার দিকে ওঁর নিশ্চয় ছিল, কিন্তু অনেকদিন কাটিয়ে উঠেছেন। উনি ছবি ভালবাসেন। কিন্তু খুব একটা বোঝেন না। এ বিষয়ে অদিতির ওপর নির্ভর করেন উনি। ওঁর একটা বড় গুণ ছবি-বিষয়ে উনি বড় বড় নামের পেছনে ছোটেন না। উঠতিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কুসুম কানোরিয়ার রুচি খুবই বিশেষত্বের দাবি রাখে। উনি সংগীত ভালবাসেন। বড় বড় উস্তাদ তো নিশ্চয় শোনেন। কিন্তু শিক্ষার্থী, খানিকটা শিখেছে, তালিমে আছে এখন, অল্প বয়স—এদের গান শুনতে উনি অসম্ভব ভালবাসেন। এখনও একটা চালানো ছিল। ভোরের কোনও রাগ। অদিতি অত চেনে না, কিন্তু ভোর আর মধ্যরাতের রাগগুলোর সময় বুঝতে পারে, কেননা সময়কে নির্ভুল ধরে এইসব রাগ।

ছবির বোঝাটা কুসুমের লোক কার্পেটের ওপর নামিয়ে গেছে, অদিতি বসল মুখোমুখি রাখা একটা চেয়ারে। কুসুম বললেন—শুনেছেন, কী ফ্রেশ ভয়েস! একদম পিয়োর, নোটগুলো ছুঁচ্ছে দেখুন, কেয়া সিনসিয়ারিটি! আলাপ, উও সির্ফ আলাপ করেগা, ঔর কুছ নহি।

—কে ছেলেটি?

—কেউ না অদিতিজি, উও তো কোই নহি অব, জানতি নহি কোই হোগা ইয়া নহি। বাট আই ডোন্ট কেয়ার। মেরে লিয়ে এহিই কাফি হ্যায়।

ভোরের সুরে সত্যিই মিসেস কানোরিয়ার নাতিআসবাব ঠান্ডা ঘরে গ্রীষ্মের সাদা বেল জুঁই ফুটছিল। একটা সুরবলয়। নিজের চারধারে এই রকম একটা বলয় তৈরি করে বসে থাকেন কুসুমজি। ছবি...গান...পছন্দসই সঙ্গ...।

—ওয়া, ওয়া, বহোৎ খুব। মাথা নেড়ে বলে উঠলেন।

গান শেষ হওয়া অবধি বসে থাকতেই হল তাকে। ভাল লাগছিল খুব। এই আবহ অতি সুন্দর, শরীর-মনকে সুখে আরামে লালিত্যে ভরিয়ে দেয়। কিন্তু তার ভেতরে আর এক তাড়া। পৌঁছোতে হবে অ্যাকাডেমিতে, তিনটে গ্যালারি ভরতি কাজ। মতামত দেওয়ার আগে তো তাকে দেখে উঠতে হবে সব। তারপর...তারপর ভাস্করদা... ভাস্কর চক্রবর্তী...। কী বলবে, কেমন করে বলবে। কিছুই জানে না এখনও। ভাবতেও চায় না। ভাস্করদা শুধু চিত্রশিল্পী নন। আবার কবিও। বেশ নাম আছে।

টিভি-তে কোনও সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে—মাথাভরতি ঝিলিক দেওয়া সাদা চুল, কানের শুধু লতি বেরিয়ে আছে, সিগারেটে প্রায় কালো ঠোঁট, তীক্ষ্ণ নাসা, বসা চোখ, হিলহিলে চেহারার ভাস্কর চক্রবর্তীকে সেই বোকা বোকা প্রশ্নটা সে করতে শুনেছে—আঁকেনও আবার লেখেনও? কী করে মেলান?

—মেলাই না তো! মেলে না আদৌ।

—তবে? ঘাবড়ে গেছে পুতুল পুতুল মেয়েটি।

—কবিটা আর আঁকিয়েটা আলাদা। কবিটা কথা বলায় আর আঁকিয়েটা তুলি চালায়।

অদিতির মনে হয়েছিল কবিতায় আর চিত্রশিল্পে তো মাধ্যমগত ছাড়া আর কোনও ফারাক নেই? যদি কোনও কবি আবার কর্পোরেট হাউজের ব্যস্ত এগজিকিউটিভ হন, তখন এ প্রশ্নটা করা যেতে পারে। কিন্তু কবিতা আর ছবি পরস্পরের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ। সে দিক দিয়েই গেলেন না ভাস্করদা। শোম্যানশিপে ওঁর জুড়ি মেলা ভার। যেমন পাবলিক রিলেশন, তেমনই শোম্যানশিপ। বরঞ্চ এই প্রশ্নটা ওঁকে করা যেত, কবিতা বা চিত্র যে মগ্নতা, যে ধ্যান চায়, তা তাঁর মতো বাজারসন্ধানী জনসংযোগসর্বস্ব মানুষ কী করে দ্যান। বা উলটোটা। তবে এসব বলেও ওঁকে কায়দা করা যাবে না। নির্ঘাত বলবেন—কবিরে/শিল্পীরে পাবে না তার জীবনচরিতে।

—শঙ্কর পরসাদজির নাম শুনেছেন। হুইল চেয়ার চালিয়ে মিউজিক ডেকটার দিকে গেলেন কুসুমজি, বন্ধ করে দিলেন।

—না না, উনি কে? আমি ঠিক...

—উনি সারেঙ্গির উস্তাদ। পহেলা সারের নয়, অনেকেই চিনে না। লেকিন বহোৎ হোনহার টিচার উনি, ওঁর সঙ্গে আমাদের জান-পহচান অনেকদিন। আমার ছোট বোন ওঁর কাছে শিখত। সরোজ চাঢ্‌ঢা, মোটামুটি নাম ছিল একসময়ে। এখন সব ছেড়ে দিয়েছে। তো ওঁর কাছ থেকে কেসেট করিয়ে আনি। বেনারসে থাকেন। এ ছেলে আপনাদের বঙ্গালি কিন্তু। সাম মজুমদার ঔর তরফদার। মনে হচ্ছে না তো। সাম দার। আচ্ছা... আপনার দামের সময় নষ্ট করছি, অদিতিজি ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ, অকেলি ঔরত...দুসরি মিললো তো বহোৎ বকবক করল।

অদিতি একটা শুভ্র হাসি হেসে ওঁকে আশ্বস্ত করে। তারপরে ছবিগুলো একে একে বার করে, যেটা দূরে নিয়ে যাবার যায়। দেওয়ালের ওপর রেখে, আলোর তলায় দেখায় যেটা কাছ থেকে দেখবার পাশে বসে ওঁর কোলের ওপর রাখে।

—এইটার স্পেশ্যালিটি কী অদিতিজি। জাস্ট একটা সফেদ কাগজ। এক দিকে একটা মুখের আউটার শেপ দেখছি।

—ওই ওইটুকু দিয়েই মুখটা, তার টুপি, তার ঘাড়ের কাছে চুলের ছাঁট, একজন ফপ-টাইপের লোক আর কী... এটা ফুটিয়েছে। উইথ দা ভেরি মিনিমাম।

—ওয়েল আই ডোন্ট লাইক দিস ফপ-ম্যান। এ খুব চলছে কি?

—যার যে রকম পছন্দ। আপনাকে আলাদা আলাদা স্টাইল দেখাব বলে এনেছি।

—আরে! মহাত্মা গাঁধীকে ক্রুসে দেখিয়েছে? ভেরি ক্লেভার অব হিম।

—দেখুন কুসুমজি এ ছেলেটি একটা সিরিজ এঁকেছে, মহামানবেরা ক্রুসবিদ্ধ—এই বুদ্ধ, এই রবীন্দ্রনাথ, কত রকম অ্যাঙ্গল থেকে এঁকেছে দেখুন। এই বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র...

—ওয়ান্ডারফুল, মোস্ট ওয়ান্ডারফুল...

শৌনকের সিরিজটা পঞ্চাশ হাজারে বিক্রি হয়ে গেল।

—কেয়া মাস্‌লস্‌ দিয়া রবীন্দ্রনাথকো ইনহোনে। বুড্ডা থে না টেগোর?

অদিতি হেসে ফেলল—চিরকাল তো টেগোর বুড্‌ঢা ছিলেন না কুসুমজি, তা ছাড়া উনি ছোটবেলায় কুস্তি করতেন। ওঁর ত্রিশের ঘরে বয়সের একটা ছবি আছে সেটা অনেকটা খ্রিস্টেরই মতো। খালি ওঁর চোখে গভীর অতল বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ছাপ।

—সমঝ গিয়া। লেকিন উও তো সফেদ দাড়ি সফেদ বাল হি দিয়া না ইনকো।

—ইয়া— কুসুমজি বোঝবার চেষ্টা করুন এই শিল্পী শৌনকের এটা ভিশন অব রবীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ বৃদ্ধ, সাদা রুপোলি চুলদাড়ি। কিন্তু পেশিময় দীপ্ত শরীর,—ওঁকে বীরপুরুষ হিসেবে দেখেছে শিল্পী। আ কারেজাস ম্যান অ্যান্ড ওয়রিয়র, ওঁর বার্ধক্যটা যেন সভ্যতার এই সংকটের জন্য বীর-শরীরে এসে যাওয়া এক বিষাদ-বার্ধক্য।

—ওয়ান্ডারফুল—কুসুমজির বিস্ময় ও প্রশংসা আর ফুরোতে চায় না।

নিজের ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটা ছবিও বিক্রি করল অদিতি। নন্দিনী মিনিয়েচার আঁকে। কিন্তু ওর মডেলরা একেবারে আধুনিক। কত্থক নর্তকী, গণেশ , মা-শিশু, সাজানো বাগান। খুবই অদ্ভুত এফেক্ট ছবিগুলোর।

অবধারিতভাবে একটা ইমপ্রেশনিস্টিক ল্যান্ডস্কেপও কিনলেন কুসুমজি। কিনবেনই। প্রত্যেকবার। ইমপ্রেশনিজম নিয়ে ওঁর মুগ্ধতা আর কাটতে চায় না। খুবই ভাল কাজ করেছে অবশ্য রোশন। খুব খেটেছে। তক্ষুনি তক্ষুনি ক্যাশে পেমেন্ট করে দিলেন উনি। লোহার আলমারির লকার খুললেন আর দিয়ে দিলেন। ভাল, ভাল। ছেলেমেয়েগুলো হাতে-গরম কাঁচা টাকাগুলো পাবে। কবে বিখ্যাত হবে, তখন লক্ষপতি, কোটিপতি হওয়ার কাল, আদৌ হবে কি না...সবাই তো হতে পারে না। অথচ জীবনকে চলতে হবে।

চটপট একবার 'চিত্রভানু'তে ফেরা যাক। টাকাগুলো হাতে পেলে বড় খুশি হবে, নিশ্চিন্ত হবে ছেলেমেয়েগুলো। নন্দিনী তো আকাশে উড়বে। এখনও তো শিক্ষানবিশি শেষ হয়নি। এ রকম আরও কত আছে আর্টের ইতিহাসে। দালি তো প্রচলিত কোনও শিক্ষা, রীতিনীতিরই ধার ধারেননি। কিছুই পছন্দ হয় না। কিচ্ছু না। স্কুলে বলে প্রচণ্ড প্রতিভা কিন্তু একেবারে উন্মাদ এ ছেলে। প্রকৃতপক্ষে, শৌনকের ক্রুসবিদ্ধ মহামানবদের সিরিজের মধ্যে দালি বিশেষভাবে আছেন। 'ক্রাইস্ট অব দা সেন্ট জন অব দা ক্রস', 'লাস্ট সাপার'। বিবেকানন্দর ক্রুসটা আবার মিকেলেঞ্জেলোর 'লাস্ট জাজমেন্ট'-এর অটল-অচল ক্ষমাহীন, বীরপুরুষ ক্রাইস্টের কথা মনে করিয়ে দেয় যিনি করুণাময়ী মাতা মেরির অনুনয়ও উড়িয়ে দিচ্ছেন। যথার্থ পাপীদের তিনি যথার্থ শাস্তি দেবেনই। ছবিগুলো বর্তমান সভ্যতার সংকটে খুবই প্রাসঙ্গিক। এই ক্রুসের প্রতীকটা খুব সাবলীলভাবে আসে ছেলেটার, হয়তো ক্রিশ্চান বলেই।

শৌনক মেঝের ওপর একটা ডিগবাজি খেল। বোলার ব্যাটসম্যানকে আউট করলে যেমন একটা মুঠি পাকিয়ে ঝাঁকিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গি করে, সেই রকম করে বলল—মার দিয়া কেল্লা। দিদি তোমায় একটা চুমু খাব?

—খা! অদিতির মুখটা শক্ত করে ধরে দু'গালে চকাস চকাস করে চুমো খেল শৌনক, তারপর মাটিতে শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।

রোশন বলল—আমারটা কী করে পুশ করলে দিদি। মোস্ট কনভেনশন্যাল...।

—তাতে হয়েছেটা কী! ভাল লাগা মানে ভাল লাগা। তোর এই সূর্যাস্তের রং লাগা গাছপালা ঘরবাড়ি অলিগলি এসব তো আমি নতুন করে দেখছি। এঁকেবেঁকে থাকা ভিখারিটা ভাল করে লাইন ড্রয়িং করে নিয়েছিলি না? আর রিকশাওলা?

—হ্যাঁ। তো উনি ওটা নিজে নিলেন না তুমি...

এই রোশনের বড্ড দোষ। একেবারে আত্মবিশ্বাস নেই। সেই জন্যে শৌনকের মতো বোল্ড আইডিয়া এখনও ওর মাথায় আসতে পারছে না। ও সেই গায়কের মতো যে তার শিক্ষকের কিংবা যে-কোনও গায়কের গান অবিকল গলায় তুলে নিতে পারে। কে জানে হয়তো ও ক্ষতিগ্রস্ত ছবি উদ্ধার কিংবা কপি করার পেশা নেবে। তাতেও ভাল টাকা। খুবই ভাল।

নন্দিনী ঢুকতেই বাকিরা হইহই করে উঠল— পুটপুটি, চুনোপুটি। নন্দিনীর মিনিয়েচারদের এবং তাদের দরুন নন্দিনী বেচারিরও নাম ওই—পুটপুটি। চুনোপুঁটি।

তোরা তোদের টাকাপয়সাগুলো নিয়ে আমায় ছাড়।

—আইসক্রিম আনতে দিয়েছি, না খেয়ে কোথাও যাচ্ছ না।

—টাকাগুলো এভাবে বাজে খরচ করিসনি। জমা। এখনও বটগাছের ছায়ায় আছিস, বুঝছিস না। রং তুলি আর বিড়ি-সিগারেটের খরচটা সরিয়ে রেখে বাকিটা জমা।

এই শেষ উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে সে যখন বেরোল তখন পাঁচটা বেজে গেছে। সাতটায় প্রদর্শনী শেষ। চল্লিশে স্পিড তুলল অদিতি। কিন্তু পোস্ট-পাঁচটা চৌরঙ্গিতে চল্লিশও রাখা যায় না, বারবার ব্রেক, বারবার গোঁত্তা। হঠাৎ কেন কে জানে মনে পড়ে গেল—আপনি কিন্তু ভাল ড্রাইভ করেন না।

ছয়

বর্ষা এসে গেছে। বেশ গুমোট আজকে। অ্যাকাডেমিতে ঢুকতে কিন্তু খুব ভাল লাগল। আজকাল গ্যালারি অনেক হয়েছে। প্রদর্শনীও যথেষ্ট হয়। কিন্তু ভিড়গুলো হয় নামকরা আর্টিস্ট থাকলে। সেখানে সাংবাদিক, চিত্র-সাংবাদিক, কাঁধে ভিডিয়ো ক্যামেরা। আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শনীতে সে প্রত্যেকবার যেত বাবার সঙ্গে, স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে। খুব ভাল লাগত। সেখানেই প্রথম দেখে গোইয়ার 'অ্যালিগরি অব স্পেনে'র সুষমা, ক্লোদ মনের 'বেদার্স অ্যাট লা গ্র্যানুয়ালিয়ের'-এর রঙিন আলোছায়া, রেনোয়ার আমব্রেলাজ-এর ভিজে নীল, লত্রেকের মুল্যাঁ রুজের মত্ত ছন্দ। এইসব ক্লাসিক কপি করা শিল্পশিক্ষার একটা বড় ধাপ। বেঙ্গল স্কুলের ধাঁচেরও প্রচুর ছবি থাকত—অবনীন্দ্র-নন্দলাল। একবার গগনেন্দ্রনাথের কপি দেখে সে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। কত কিউবিস্ট ছবি দেখল, কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ মস্তিষ্কের মধ্যে দৃঢ় গাঢ় রঙে ছাপা হয়ে রয়ে গেছেন।

যাক, এখনও এদের ছবি দেখতে দিব্যি ভিড় হয়। পাঁচটার পরটাই বেশি, কেননা অফিস-কলেজ কাজ ফেরত আসতে হচ্ছে। ঢুকেই বাঁ দিকের চেয়ার-টেবিলের জটলায় রুপোলি ঝিলিক মাথায় নিয়ে ভাস্কর চক্রবর্তী। যেন একটা বাম্পে ধাক্কা খেল অদিতি। উনি উঠে এলেন—দুপুর দুপুর আসবে তো! ফাঁকা তখন। এখন কাজ করতে খুব অসুবিধে হবে। উনি তার কাঁধে একটা অন্তরঙ্গ হাত রাখলেন।

অদিতি খুব চেষ্টা করে একটা শুকনো মতো হেসে মাথা নাড়ল। না, অসুবিধে হবে না। সরে গেল।

—কান্তি তো তিনটে নাগাদ চলে গেল। এখন ছেলেমেয়েগুলোও তোমাকে লক্ষ করবে।

খুব ব্যস্ত হবার ভান করে অদিতি নিজের ব্যাগ খুঁজতে লাগল, একটা নোটবই আর পেনসিল।

সে দ্রুত চলে গেল। জলরং, জলরং, প্যাস্টেল, জলরং, টেম্পারা, কালির স্কেচ, অয়েল, অয়েল, হঠাৎ তার চোখ-বোধ-মন-মস্তিষ্কের ওপর একটা প্রকাণ্ড আক্রমণ হল। সাউথ গ্যালারির ডান দিকের দেওয়াল থেকে তার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে দুটো গাবদা বেড়াল বা বেড়ালের ভূত। সবুজ চোখের মণিতে মারাত্মক জ্বালা। কেমন আগুনে লাল রং বেড়ালগুলোর। যেন খেপে উঠেছে। এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। রং ঢেলে দিয়েছে দুটো গাছে, বেগুনি-গোলাপি ছাতিম আর কটকটে সবুজ নিম। আর মেঝেতে নীল শ্যাওলা—তাতে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া ব্লিচিংয়ের ছাই-সাদা দাগ, কতকগুলো অসমান বৃত্তের মতো। মোজেইক ছড়িয়ে রয়েছে। সে জানে তাই। নইলে এগুলো অত্যাধুনিক খামখেয়ালিপনা বলেই মনে করবে যে-কেউ। একদম কোণে আধখানা ভারমিলিয়ন সূর্য। চব্বিশ বাই তিরিশ ইঞ্চির মতো লম্বাটে ক্যানভাসটার ওপর ঝুঁকে পড়ল অদিতি। কোণে লেখা 'তনিকা'। ক্যাপশন 'আ ফেলাইন মর্নিং।'

মাথা ঝিমঝিম করছে। কোথাও একটা বসতে পারলে হত। এ ছবি কোনও দেওয়ালের ঠিক

মাঝখানে রাখা উচিত ছিল। প্লেসিং ঠিক হয়নি।

—ইট'স প্যাশনেট, রিয়্যালি—পাশ থেকে কে বলে উঠল। এক শ্বেতকায় যুগল।

ছেলেটি মেয়েটিকে বলল—ডোন্ট য়ু থিঙ্ক ইট ইজ টেরিবলি সেক্সি?

নট রিয়্যালি, মাথা নাড়ল মেয়েটি। আই ফিল ইট ইজ অ্যাঙ্গার। লুক অ্যাট দা আইজ অব দোজ ক্যাটস্। অ্যান্ড দা রেডিশ অরেঞ্জ বডি।

মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিল অদিতি। ছবিটার আক্রমণ তাকে মোহগ্রস্ত করেছে। বেরিয়ে আসতে না পারলে সে অন্য ছবিগুলোর ওপর সুবিচার করতে পারবে না।

এখন প্রায় সাড়ে সাতটা। জনাকীর্ণ, যানাকীর্ণ চৌরঙ্গি দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে অদিতি। নিতান্ত অভ্যাসে কাজ করে যাচ্ছে হাত-পা-চোখ। তার জাজমেন্ট শিটটা সে ভাস্কর চক্রবর্তীর হাতে দিয়ে এসেছে। বিভিন্ন বিভাগে আলাদা আলাদা নম্বর। যোগ করে দেখা যাচ্ছে—'আ ফেলাইন মর্নিং'—ফার্স্ট এসেছে। ভাস্কর চক্রবর্তী বললেন, ওই ফোব্ ছবিটা তোমার এত ভাল লাগল? হোয়াট অ্যাবাউট দ্যাট 'সানি ডে ইন সেপ্টেম্বার।'

—ভাল। দিয়েছি তো। ওটা বোধহয় থার্ড এসেছে, আ ক্লোজ থার্ড।

—তোমার কাছে দেখছি সেকেন্ড এসেছে ধরমভির—'আড্ডা ইন টোয়াই লাইট।' কান্তি এটাকেই ফার্স্ট দিয়েছে। 'সানি ডে' সেকেন্ড, তোমার 'ফেলাইন মর্নিং' ওর কাছে একটা সান্ত্বনা পুরস্কার পেয়েছে। থার্ড 'ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অব সিভিলাইজেশন।'

অদিতি ভুরু কুঁচকাল। ছাড়া ছাড়া ভাবে কতকগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপার এঁকে দিয়েছে এ ছেলে। ফাঁকিবাজ নাম্বার ওয়ান। শেষকালে একটা নিউক্লিয়ার বম্বিংয়ের ব্যাঙের ছাতা মেঘ। আইডিয়াটা ভালই। কিন্তু এটা একটা হিস্ট্রির এগজিবিশন হলে যেত ভাল। চার্ট। ছবি নয়।

—কী দেখলে তুমি ওই 'ফেলাইন'-এ?

অদিতি মনে মনে বলেছিল—তুমি কী বুঝবে? সারাজীবন বিকৃত ন্যুড এঁকে গেলে, তোমার সব ছবি সিনিসিজমের চূড়ান্ত। সিনিসিজম দিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আর্ট হয় না।

মুখে বলল—পেন্টিংয়ের ব্যাপারে মতভেদ থাকবেই ভাস্করদা।—আপনার যা ভাল লাগে তা আমার না-ও লাগতে পারে।

—ঠিক। কিন্তু যত ব্যক্তিগত হোক না কেন—ড্রয়িং, কম্পোজিশন, কালার, মানে ব্যাকরণসম্মত একটা কমন গ্রাউন্ড তো থাকবে।

—আছে তো! নিশ্চয় আছে। সত্যি কথা বলতে কী খুবই ভাল ভাল কাজ দেখলাম আজ। জাজমেন্ট দিতে খারাপই লাগছিল। তবে এ কথাও তো ঠিক, নতুন বৈপ্লবিক তুলি নিয়ে যখনই যাঁরা এসেছেন, প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, হননি? দিন গেলে সেই মাতিস, সেই রেনোয়া-পিসারো-মোনে, সেই ভ্যানগগ-গগ্যাঁকে নিয়েই মাতামাতি করেনি লোকে?

—'ফেলাইন' তা হলে তোমার মতে কলকাতা—থুড়ি ভারতবর্ষের পোস্ট-মডার্ন মাতিস।

অদিতি কাঁধ নাচাল।—ফাইনাল জাজমেন্ট তো আপনারই হাতে ভাস্করদা। এত তর্কাতর্কির কী আছে? এসব কথা তো সবাই জানে।

সে যে বিরক্ত হয়েছে, একটু ক্ষুব্ধ অপমানিতও তা বেশ স্পষ্ট।

—আরে চটছ কেন, চটছ কেন? ওই মেয়েটা একটা পাগলি।

—পাগলি। তা হলে আর্টিস্টকে চিনে সেই চেনা দিয়ে ছবির বিচার করা হচ্ছে নাকি আজকাল? বাই দা ওয়ে—ও মেয়েটি কে? পাগলি! তনিকা?

—কে আবার, জাস্ট একজন ছাত্রী। ফাইনাল ইয়ার হয়ে গেল ন্যাচার্যালি। খেয়ালি, মেজাজি, তুমি ঠিকই বলেছ—রেবেল টাইপ। কিন্তু রেবেল হলেই তাতে প্রতিভা হতে হবে এ লজিকে আমি বিশ্বাস করি না।

—থাকে কোথায়? এখানে আছে নাকি? কাছাকাছি।

—আমি কী করে জানব? অফিস-রেজিস্টারে ঠিকানা থাকবে। কেন তুমি প্রোমোট করবে নাকি? চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন—না এখানে নেই।

—প্রোমোট করলে আপনার আপত্তি আছে? এনিওয়ে আপনাদের নিয়মে যদি না আটকায় ছবিটা আমি কিনছি।

বস্তুত সে আর্ট কলেজের নিয়মকানুন সেভাবে জানে না। কলেজে এক বছর শেষ করেই চলে গিয়েছিল শান্তিনিকেতনে। কলাভবনের শেখানোর পদ্ধতি আলাদা। তার পরেই স্কলারশিপ নিয়ে প্রথমে কয়েক মাস গ্লাসগো স্কুল অব আর্ট, তারপর প্যারিস—'একোল দে বোজার'-এ। এঁদের খুব একটা বুঝে চলবার দরকারও হয় না। তার নিজের ছবি সাধারণত বিক্রি হয় ইউরোপে। আঁদ্রে তার এজেন্ট। এখানেও হয়। কিন্তু এখানে সে তার 'চিত্রভানু'কেই যথাসম্ভব পাদপ্রদীপের আলোয় আনবার চেষ্টা করে। ভালই ক্রেতা পেয়ে যাচ্ছে তো। আসলে বিপণনের নিয়মকানুন তরিকা সে নিজেরই অজান্তে আঁদ্রের কাছ থেকে শুষে নিয়েছে। খোশামোদ করে না, নিজের ডাঁটে থাকে, কিন্তু সাধারণ ক্রেতাকে ছবির গুণাগুণ বুঝিয়ে তার মন গলাতে অদিতির জুড়ি নেই। আজকাল ছবি সম্পর্কে মানুষের একটা সচেতনতা এসেছে। অনেকেই ছবি কিনে ঘর সাজাতে চান। প্রিন্ট নয়, ক্রাফট নয়, মৌলিক ছবি, অথচ অত পয়সা নেই। এঁদের লক্ষ্য করেই সে প্রধানত তার বিপণন পদ্ধতি ঠিক করে। কুসুম কানোরিয়ার মতো উদার খেয়ালি ধনী কমই আছেন। সব্বাইকার নজর ইনভেস্টমেন্টের দিকে।

কিন্তু তনিকা তা হলে সত্যিই তনিকা। নাম ভাঁড়ায়নি। মিথ্যে নামে ছবিতে যদি বা সই করা যায়, স্কুল-কলেজে তো চলবে না। এবং সে ঠিকই ধরেছিল—মেয়েটা খুবই খেয়ালি। এত খেয়ালি যে তার মাস্টারমশাইরাই তাকে পাগলি বলছেন। এবং আনোহিতা যে নাকি তার বাবা ও সৎমায়ের আশ্রয় থেকে বাউন্ডুলের মতো পালিয়ে বাপের বয়সি সিনিক এই শিল্পীর কাছে চলে এসেছে সে আলাদা মানুষ। তনিকা এবং তার ছবি ওই সময়টায় তাকে এমন অধিকার করে রেখেছিল যে ভাস্করদাকে অনোহিতার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি। অত লোকের মাঝখানে কী-ই বা জিজ্ঞেস করত। যা ঠোঁট কাটা লোক, বলতেই পারতেন আমার ইচ্ছে হয়েছে আমি বন্ধু-কন্যার আত্মনিবেদন নিয়েছি। সে মেয়েও সাবালিকা। তাতে তোমার বাপের কী?

তনিকা ও অনোহিতা আলাদা। অনোহিতা বাড়ি থেকে পালিয়েছে। সে স্বার্থপর, মেজাজি। আপাতত বাবা মাতৃবন্ধুকে বিয়ে করায় ক্ষুব্ধ, রুষ্ট। আর, তনিকা এগজিবিশনে ছবি দেয়, ভাল আঁকে খুবই, ফাইনাল ইয়োরের ছাত্রী, পরীক্ষা দিয়েছে আর্ট কলেজে। খামখেয়ালি, পাগলি টাইপ। তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই মুহূর্তে জানা যাচ্ছে না, তবে বাড়িতে না বলে-কয়ে যখন সারারাত অন্যের বাড়ি থাকতে পারল তখন চূড়ান্ত বোহেমিয়ান, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কও আলগা। এবং... এবং যে ভাবেই হোক অনোহিতার সঙ্গে তনিকার সম্পর্ক আছে। কেননা অনোহিতার ডায়েরি তনিকার ব্যাগে। বই ছিল। বইয়ের ভেতর খুলে সে দেখেনি। ইশ্‌শ্‌ ওখানে কোনও ক্লু থাকতে পারত! ডায়েরিটা পেয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল।

কী আশ্চর্য। সে অদিতি সরকার, অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্যা তার জীবনে, মরছে নিজের জ্বালায় সে কিনা গোয়েন্দার মতো ক্লু সাজাচ্ছে, দুটি অজানা মেয়ের পরিচয় ও তাদের সম্পর্ক জানবার জন্য।

এই সময়ে সে সেই জায়গাটায় পৌঁছোল। ডান দিকে গ্র্যান্ড, বাঁ দিকে ময়দান। ওই তো ঠিক ওই জায়গাটায় ফুটকি দাঁড়িয়ে ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার। তার অন্তরাত্মা ওকে চিনতে ভুল করেনি একটুও। ও একা, ও অন্য রকম, ও প্রাকৃতিক ঘটনা ও দৃশ্যাবলীর সঙ্গে একাভূত হয়ে যেতে পারে, চায়, এবং ও নির্ভীক ও মৌলিক।

—তোমাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন বউমা? শীলাদির নজর তীক্ষ্ণ। চা দিল। সুন্দর করে চিজ-ওমলেট ভেজে দিল। একটু মুড়ি দিল বাটিতে করে।—বাঁকুড়ার মুড়ি খেয়ে দেখো। ভাজা

জিনিসের সঙ্গে মুড়ি খেলে অম্লদোষ কেটে যায়।

অদিতির জীবনে কোনওদিন শারীরিক অম্লদোষ ছিল না। ভাগ্যে ছিল অম্লদোষটা। কিন্তু তাকে যে কুসুমজি অত ফ্রেশ ট্রেশ বললেন, দেড়টার সময়ে? দেড়টা থেকে প্রায় সাড়ে আট। কুসুমজির বাড়িতে এ. সি তার গাড়িতে এ. সি। সে কেন শুকিয়ে গেল তা হলে? এত কী দুশ্চিন্তা দুটো পাগলিকে নিয়ে?

—কী বউমা, কিছু বলছ না যে? কিছু হয়েছে?

আজকাল আর শীলাদির বউমা ডাকে সে বাধা দেয় না। একটা ডাক তো শুধু। ও কী-ই বা বলবে? অদিতি? মা? মা-টা অবশ্য মাঝে মাঝে বলে। কিন্তু একটা সম্পর্ক ধরে কত দিন 'বউমা' ডেকেছে, এখন ওর জিবে শব্দটা এসেই যায়।

—না কী আবার হবে? অনেক ঘোরাঘুরি করেছি তো!

—সে তো একশোবার। কোন সকালে সেই একমুঠো খেয়ে বেরিয়েছ।

অদিতি হাসল। ভালও লাগে, আবার এক এক সময়ে কেমন বিরক্তও লাগে। যেমন এখন। এত খবরদারি তার অনেকদিন অভ্যাস নেই।

—মা কেমন আছেন?

—আজ দুপুরবেলা তো খুব বুক ধড়ফড়। তুমি কোথায় জানি না। 'বউমাকে ডাকো বউমাকে ডাকো' করে হাঁপাচ্ছে। আমি প্রেসক্রিপশন দেখে ডাক্তারকে ফোন করলুম মোবাইলে। উনি ওষুধ বলে দিলেন।

—ছিল?

—হ্যাঁ, ঘুমের ওষুধ।

—তা তুমি তো দারুণ স্মার্ট হয়ে গেলে শীলাদি। নিজে নিজে প্রেসক্রিপশন দেখে নম্বর বার করা। বুদ্ধি করে মোবাইলে ফোন করা, এক্সপার্ট যে একেবারে!

শীলাদি বলল—এটুকু পারব না, বলো কী বউমা? কতদিন এই মানুষকে নিয়ে একলা একলা ঘর করছি বলো তো?

—তা ঠিক।

মাধুরীর ঘরে ঢুকল অদিতি। ঘুমটা ছেড়েছে। একটা কম পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। উনি জড়ানো গলায় বললেন—কে এলি? শীলা? দূর হয়ে যা আমার সুমুখ থেকে। তোর ও কালামুখ আমি আর দেখব না। আমারই খাবি আমারই সব্বোনাশ করবি...

ঘোরে আছেন। কথাগুলো আস্তে আস্তে আরও জড়িয়ে যাচ্ছে। পেছন ফিরে দেখল শীলাদি থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে জল।

—আরে দূর—ফিসফিস করে বলল অদিতি, ঘোরের মধ্যে রোগী অমন অনেক কিছু বলে থাকে। তুমি কি একটু ছাতটাত থেকে ঘুরে আসবে? আমি না হয় বসছি।

—মাথা খারাপ? সারা দিনের পর কোথা না কোথা থেকে ঘুরে এলে, এখন তুমি রুগি সামলাবে? ঘরে যাও, বিশ্রাম করো বউমা। আমার তো কোনও কাজই নেই। যাও।—একটু যেন জোর দিয়েই বলল শীলাদি।

বেড়াল দুটো কী বিশ্রী চিৎকার করে ঝগড়া করছে। রীতিমতো গর্জন। গোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ ফ্যাঁচ। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ গোঁ-ও-ও। দু'জনে দু'জনের শরীর তাক করে ঘুরে যাচ্ছে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে টুদ্ধে যেমন যায়। কী বিশ্রী সবুজ চোখ। যেন সবুজ আগুন জ্বলছে। সবুজের মধ্যে একটা স্নিগ্ধতা থাকে, এদের সে বালাই

নেই। সাদা রঙের বেড়ালগুলো আস্তে আস্তে রাগে লাল হয়ে যাচ্ছে, আগুন রঙা, নীল শ্যাওলার পিচ্ছিলে থাবা রেখে ঘুরে যাচ্ছে। কই বেড়াল তো নয়। দুটো মেয়ে, চোখ-মুখ কিছু বোঝা যায় না। অস্পষ্ট, পোশাকটা বোঝা যায়, জিনস আর ঝোলা টপ। নন্দিনী বা চৈতালি যেমন পরে। কিন্তু ওরা অমন করছে কেন? যেন পরস্পরকে মারবার সুযোগ খুঁজছে। পেছন থেকে এক ঝাপটায় নিমগাছটা হুড়মুড় করে পড়ল। অদিতির ঘুম ভেঙে গেল। একটা প্লেন চলে গেল দমদমের দিকে। দক্ষিণের জানলা দিয়ে আশ্চর্য হাওয়া দিচ্ছে, তারাদের উড়িয়ে নিয়ে অন্য কোনও মহাশূন্যে ফেলবে যেন। তখন এ আকাশ নক্ষত্রহীন—আদি অন্ধকারে রাত্রি থাকবে সম্পূর্ণ তামসী।

কী যে আবোলতাবোল দেখল, 'আর ঘুম আসছে না। শুয়ে শুয়ে ভেড়া গুনতে লাগল অদিতি। ভেড়াগুলো ক্রমে গাড়ি হয়ে যেতে লাগল, রকমারি গাড়ি, বড়, ছোট, মাঝারি, তারপরে সমস্ত আধো-জাগর চেতনা জুড়ে বৃষ্টি নামল। ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড বাত্যায় বৃষ্টির ধারা, উড়ে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে...। অদিতি আর অপেক্ষা করে না। আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে, পা টিপে টিপে স্টুডিয়োয় চলে যায়। অসমাপ্ত ক্যানভাসের পাশে আর একটা ছোট ইজেলে কাগজ আঁটে। অনন্য অভিনিবেশে এঁকে যায়, ভেজায়, টেনে নেয় গুলে নেয় জল রং, গড্ডলিকা এবং গাড়ি, গড্ডলিকা এবং গাড়ি এবং সবই বৃষ্টিতে মুছে মুছে দেয়। মাঠ, ঘাস, প্রাসাদ, সব। মোছা মোছা জলে, প্রায় প্রবহমান একটা মূর্তি, ফিগার সমস্তটাকে আলিঙ্গন করে জেগে থাকে দিগন্ত ছুঁয়ে।

ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল। ঘুমের নেশায় চক্ষু লাল, হাত থেকে তুলি খসে পড়ে, টুলে মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ে। টুলময় ছড়িয়ে থাকে বাদামি চুল। হাত দুটো দিয়ে মাথাটা ঘেরা। রাতপোশাক-পরা শরীরটা শিথিল, অথচ শিথিল নয়।

সাত

আজকে লেবেল সাঁটা হবে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পাঁচটা সান্ত্বনা পুরস্কার আছে। ভাস্করদা ডেকেছেন। এখনও এগজিবিশন খোলেনি, শূন্য দরজা ও বন্ধ ঘরে একটা ছোট টেবিলের তিন দিকে তিনজনে একহাতে পেনসিল নোটবই ও হাতে।

কান্তিদা বললেন—অদিতি য়ু আর রাইট। ওই সিভিলাইজেশনটা জাস্ট একটা গিমিক। ওকে বাদ দিয়ে দাও।

—কিন্তু প্লেস তো দিয়েছিলেন প্রথমে। সেটা কেন? আপনার যুক্তিটা শুনি। নিশ্চয়ই কিছু ভেবেছিলেন...।

—আসলে কী জানো? খুলেই বলি। আমার বন্ধুর ছেলে। মহা বদমাশ। কোন দায়িত্ববোধ নেই, ধৈর্য নেই, গুণ একমাত্র এই আঁকার ক্ষমতা, ড্রয়িংটা খুবই স্ট্রং লক্ষ করেছ নিশ্চয়। ছেলেটা এমন যে কৃতিত্বের কোনও স্বীকৃতি না পেলেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বাপের ব্লাড প্রেশার বাড়াবে। তাই একটা থার্ড পোজিশন দিয়েছিলাম। আফটার অল টিচার তো আমরা। এদের ভাল-মন্দের একটা নৈতিক দায় থেকেই যায়। হি হ্যাজ গট আইডিয়াজ। এই গাঁটটা যদি পেরোতে পারে, ওর বাবা হয়তো ওকে কম্প্যুটার গ্রাফিকসের একটা চাকরিতে ফিক্স করতে পারবে। বাস, আমি পরিষ্কার সব বলে দিলুম ভাই। এবার আমি হাত ধুয়ে ফেলছি। তোমরা যা বলবে তাই হবে।

অদিতি অনেকক্ষণ পর ভাল করে হাসল। বলল—বুঝলাম কান্তিদা। আই আন্ডারস্ট্যান্ড য়ু পার্ফেক্টলি। কিন্তু একটা কথা ভাবুন, এর পরিস্থিতির বৃত্তান্ত আপনি জানেন বলে করুণাবশত আপনি ওকে একটা ফেভার করছেন। অন্যদের কার কী পরিস্থিতি তা তো আপনি জানেন না। আরও খারাপ হতে পারে।

ভাস্করদা বললেন—রাইট। ওই ফাঁকিবাজটা কিন্তু চালাক কম নয় কান্তি। ও জানে ও ফাঁকি দিয়েছে। ও বুঝবে তুমিই ওকে ওই থার্ড পোজিশনটা পাইয়ে দিয়েছ। হেনসফোর্থ ও সব সময়ে ফাঁকি দিয়ে জিততে চাইবে। অর্থাৎ তোমার 'নৈতিক দায়'-এর যুক্তিটা খাটল না। ভাল করতে গিয়ে তুমি ছেলেটার ক্ষতিই করবে। আর সত্যিই ওর কিন্তু আইডিয়া আছে, ও কেন কমার্শিয়াল নিয়ে পড়ল না আমি জানি না। তুমি ওর বাবাকে এই কমার্শিয়ালের আইডিয়াটা দিতে পারো। এনি ওয়ে ওকে কি পাঁচটার মধ্যে একটা সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে? অদিতি তুমি একমাত্র এক্সটারনাল। তুমি না বললে আমরা পক্ষপাতিত্বর দায়ে পড়ব।

অদিতি বলল—ঠিক আছে। কী করা যাবে কান্তিদা আপনার মান আমি রাখছি। ও একটা কনসোলেশন পেতে পারে।

—আচ্ছা এবার অদিতি তোমার যুক্তি আমি শুনব, ওই 'ফেলাইন'কে তুমি ফার্স্ট কেন দিলে?

—আপনাদের যদি মনে হয় সে মেরিট ওর নেই, তা হলে দেবেন না। অদিতি হাসি হাসি মুখে বলল, যদিও ভেতরে ভেতরে সে রাগে জ্বলে যাচ্ছিল।

—আহা চটছ কেন? ভাস্করদা বললেন—কান্তি তার ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করেছে। তুমি তোমারটা করো।

—টেকনিক ছাড়ুন। টেকনিক ছাড়িয়ে মেয়েটা একটা বিশুদ্ধ প্যাশনের জায়গায় পৌঁছেছে। ওর রঙের ব্যবহার, কনট্রাস্ট, তারপর ওই হুলো বেড়ালের ইমেজারি। ইট হ্যাড আ ট্রিমেনডাস ইমপ্যাক্ট অন মি। দ্যাটস অল।

—শেষ বিচারে অবশ্য ইমপ্যাক্টটাই আসল—কান্তিদা বললেন, আসলে এত যত্ন করে কষ্ট করে আমরা লাইন ড্রয়িং, রং মেশানো, মেলানো, কমপোজিশনের হার্মনি শেখালুম। সব উলটে দিয়েছে গো।

—মানে আপনাদের কোনও ছাপ নেই, এই তো? অদিতি বলল—আমি তর্ক করব না—আমার যুক্তি আমি বলেছি। এবার আপনাদের সিদ্ধান্ত। যতই এক্সটারন্যাল হই, আমার একার কথায় কিছু হতে পারে না, আমি সেটা চাইব না।

—ঠিক হ্যায়, ছবিটা হিস্টিরিক, কিন্তু পাওয়ারফুল। ওকে আমরা সেকেন্ড পোজিশনটা দিচ্ছি, কান্তি ঠিক আছে? তোমার 'আড্ডা' যেমন প্রথম ছিল, প্রথম রইল, খালি 'সেপ্টেম্বরের মর্নিংটা', চলে যাচ্ছে তৃতীয় স্থানে—কী কান্তি? অদিতি?

—অবশ্যই ঠিক আছে। অদিতির যুক্তি আমি মানছি। অদিতি 'আড্ডাটা' ভাল না?

—খুবই ভাল। এবার আমি যাই?

—খুশি হয়ে যাচ্ছ তো? কান্তিদা বললেন।

—দেখো আবার আমাদের নিন্দে কোরো না।—ছদ্ম ভয়ে ভাস্কর চক্রবর্তী বললেন।

—ও হো, লেবেল সাঁটা হতে থাক, আর চারটে কনসোলেশন ঠিক করে ফেলি। অদিতি আর দশ মিনিট।

—প্লিজ কান্তিদা আমার 'চিত্রভানু' হাঁ করে বসে থাকবে। ওটা আপনারা ঠিক করুন। আমার সম্মতি রইল।

—তা হলে সইগুলো করে দিয়ে যাও।

—ও হ্যাঁ। আচ্ছা ওই ছবিটা আমি পেতে পারি কি? একটু ভেবে বলবেন।

দুই মাথা একত্র হয়ে 'সান্ত্বনা'র ব্যবস্থা করছেন এই দৃশ্য দেখে অদিতি চলে এল। সে ভাস্করদার ব্যবহারে একটা অস্বস্তি লক্ষ করেছে। কে জানে, হয়তো কল্পনা হতে পারে। কিন্তু তার কেমন মনে হচ্ছিল—তনিকার ওপর উনি খুশি নন। মেয়েটার বৃহস্পতি কুপিত। নিজের মনেই হাসতে হাসতে ফিরল অদিতি।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ 'চিত্রভানু'র ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আবার অ্যাকাডেমিতে আসতে হল। ওদের দেখা ডচিত। শৌনকরাও ছিল জনাচারেক।

ঢোকবার মুখে বাইরের কফি স্টলটা দেখে আহ্লাদি নন্দিনী বলল,—দিদি, কফি খাব।

—দেখছ না কী ভিড়, খুব দেরি হবে।

—কিচ্ছু না। আমি আর শৌনকদা যাচ্ছি। যেতে গিয়ে একটি বিরাট লম্বা-চওড়া ছেলের সঙ্গে ধাক্কা গেল শৌনক। স্যরি বলে এগিয়ে যাচ্ছে। অদিতি শুনল—আই হেট ফুচকা। তোরা কী করে খাস বল তো।

—আরে ওই তো দাদফাদ চুলকে সেই হাতে আলু মাখে লোকটা,—মোটা ছেলেটা হে হে করে হেসে বলল—দাদ আবার অস্থানে কুস্থানে হয়, জানিস তো। তাতেই সোয়াদটা বেড়ে যায়।

—দু'তিনটে হাত উঠে মোটা ছেলেটার ওপর আবোলতাবোল পড়তে লাগল, ছেলেটা হাসতে হাসতে মাথাটা নিচু করছে, ঘাড় গুটিয়ে নিচ্ছে। অদিতি একটু এগিয়ে গিয়ে বলল—তনিকা।

ডেনিমের মিডি-স্কার্ট পরা, লম্বা চুল জড়িয়ে হাতখোঁপা বাঁধা তনিকা হতভম্ব চোখে তাকিয়ে বলল আ.. আপনি?

—এই শৌনক, নন্দিনী, এদিকে এসো...তনিকা এরা আমার বন্ধু। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করাও। —অদিতি এমন করে বলল যেন কত দিনের চেনা। ভেতরে ভেতরে অবশ্য সে জাল পাতছে।

—এ-এ সুবীর, ও নয়না, এটা রাস্না, জগদীশ এদিকে আয়। এ-ই বাবুল...

সুবীর বলে মোটা ছেলেটি বলল—ম্যাডাম নমস্কার। আমরা আজকে একটা জিনিস সেলিব্রেট করছি। এবার উন্মাদিনী একটা মেডেল ঝেঁপেছে।

—তনিকা চেঁচিয়ে উঠল—খবর্দার বলছি সুবীর...

—আরে মাকড়াটা তোকে সেকেন্ড প্রাইজ দিল শেষ পর্যন্ত, ভাবতে পারিস?—ওহ্ সারি ম্যাডাম।

হাসি চেপে অদিতি বলল, আমি খাওয়াচ্ছি—কতজন আছ?

সুবীর বলল, উঁহু ওটি হবে না ম্যাডাম। খাওয়াব বলেছি খাওয়াব।

নয়না বলে মেয়েটি বলল—সুবীরের বাবার অনেক টাকা ম্যাডাম, স্মাগলার তো!...সব্বাই হা হা করে হাসতে লাগল, খালি শৌনকরা এবং তনিকা অপ্রস্তুত মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কফি খাওয়া হতে, প্লাস্টিকের কাপগুলো জড়ো করতে করতে সুবীর জিজ্ঞেস করল, আপনার পরিচয়টা ম্যাডাম... ঠিক...

—আমার নাম অদিতি সরকার।

—অ-দিতি? ম্যাডাম আপনি কোন অদিতি? আর্টিস্ট?

শৌনক বলল হ্যাঁ, উনি অদিতি সরকার। তোমাদের এই কমপিটিশনটাতে এক্সটারন্যাল—

অদিতি বলল, আহ শৌনক। চলো ছবি দেখতে যাওয়া যাক।

একটু এগিয়ে পেছন ফিরে বলল—তনিকা, সুবীর তোমরা এসো! সে দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না তনিকা আসে। ওকে সে আজ পাকড়াও করবেই।

যেহেতু অত বড় একটা দল ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছে, অন্যান্য আর্টিস্ট-ছাত্ররাও তুরন্ত এসে যোগ দিল।

—হু ইজ শি? রাস্না!

—অদিতি সরকার।

—সেই অদিতি সরকার? মানে অদিতি বোর্দো সরকার? এক্স?

—উঁহু অদিতি বোর্দোগুপ্ত সরকার, যিনি...

—ওরে বাবা। কী বলছেন অত?

—ওঁর ছাত্রছাত্রীদের এগজিবিশন দেখাতে নিয়ে এসেছেন।

এগজিবিশনে যারা ছবি দিয়েছে তাদের অনেকেই আজ উপস্থিত। 'চিত্রভানু'র প্রাচীর ডিঙিয়ে তারা সেইখানে পৌঁছোতে চায় যেখানে 'আড্ডার' ফর্ম নিয়ে 'পোর্ট্রেট অব আ বেগার' 'মস্তানি' দা ফুড-লাভার্স' প্রত্যেক ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছেন, অন্যদের মন্তব্য শুনছেন, জিজ্ঞাসাবাদ করছেন অদিতি সরকার।

যে মেয়েটি এইমাত্র এসে পৌঁছোল, একটা বাটিকের র‍্যাপ অন আর ঝোলা গুজরাতি কাজ করা টপ পরে, যথেষ্ট উমনোঝুমনো হওয়া সত্ত্বেও সে বড় মুগ্ধকর। কীসে ঠিক যে তার এই লাবণ্যের চাবিকাঠি বোঝা শক্ত। চোখ কি? বড় বড় নয়, ভাসা ভাসা নয়, একটু বরং বসা-ই। চোখের চারপাশে একটা হালকা কালিমা। এই বয়সে এ-রকম কালিমা স্বাভাবিক নয়। হয় মেয়েটি রাত জাগে, তা নয়তো সর্বক্ষণ পড়াশোনা করে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে, আর তা নয়তো চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা অনিয়মে সে নিমজ্জিত। আবার এ সবের কোনওটাই ঠিক না হতে পারে। অনেকের এ রকম থাকে। টিভি অ্যাডে চোখের কালি দূর করবার জন্য অনেক রকম অব্যর্থ মলমের খোঁজ পাওয়া যায়। কাগজেটাগজে কত রকমের সৌন্দর্য উপদেষ্টার কলাম বেরোয়। শশা কিংবা আলু চাকা চাকা করে কেটে চোখের ওপর চাপা দিয়ে আধঘণ্টা শুয়ে থাকুন। তারপরে গোলাপজলের মিশ্রিত ঠান্ডা জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন জোরে ঝাপটা দেবেন না কিন্তু। চোখের ক্ষতি হবে। আলতো করে ধোন। বারবার করে। এ ছাড়া অ্যাপ্রিকট বেটে নিয়ে একের চার ভাগ মসুরডাল বাটার একটা মিশ্রণ তৈরি করুন। সামান্য এক ফোঁটার মতো ডক্টর্স ব্র্যান্ডি মিশিয়ে নিলে ভাল হয়। এই মিশ্রণটি তর্জনীর ডগা দিয়ে আলতো করে চোখের চারপাশে লাগিয়ে দিন ঘুমোবার ঠিক আগে। গোলাপ জলে তুলো ভিজিয়ে বন্ধ চোখের ওপর চাপা দিন। দেখবেন আবার যেন ঘুমিয়ে পড়বেন না। আধঘণ্টাটাক পরে ঘুম আসার আগে তুলোটি খুলে ফেলুন। ঠান্ডা জলে ভেজা তুলো কিংবা নরম কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন। এবার শুয়ে চোখ বন্ধ করে চোখের ওপর তর্জনী রেখে হালকা মাসাজ করুন। ক্লক-ওয়াইজ, অ্যান্টি ক্লক-ওয়াইজ।

মেয়েটি কি টিভি দেখে না? বিউটিশিয়ানদের কলাম, সুন্দর প্রসাধন-প্রজ্ঞাবতী অভিনেত্রীদের কলাম পড়ে না? আশ্চর্য। ওর কি পুরুষ নয়নের মুগ্ধ সম্পাতের লোভ নেই? আকাঙ্ক্ষাময় কর্কশ আঙুল ছুঁয়ে যাবে ত্বক, চোখের ওপর নেমে আসবে কামাতুর চুম্বন। এই যে নারীজীবনের নারীরূপের একমাত্র সার্থকতা তা কি মেয়েটি জানে না? সবাই জানিয়ে দিচ্ছে, তবু জানে না?

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল, খঞ্জন গতিতে। কয়েক পায়ে এগিয়ে এল জটলাটার পাশে। চাপা গলায় হিসহিস করে ডাকল—তনি! এই তনি!

প্রথমে শুনতে পায়নি, পরক্ষণে কোনও বন্ধুর ঠেলায় পেছন ফিরল তনিকা।

—আমার ডায়েরিটা দিয়ে দে।

এতজন মানুষ জমে আছে, তবু কোনও পরোয়া নেই।

—দিবি, না দিবি না?

—আমার কাছে নেই।

—নেই? লায়ার।—ঠিক একটা কেউটে সাপের মতো তনিকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটি। চড় মারছে, খামচে দিচ্ছে, মাঝে মাঝে বলছে—নেই, না? দেখাচ্ছি কেমন নেই।

তনিকা প্রথমটা দু'হাত তুলে নিজেকে আড়াল করবার চেষ্টা করল। তারপর সে-ও পালটা মার দিতে থাকল।

হতচকিত ভিড়ের মধ্যে থেকে সুবীর আর শৌনক দু'জনকে ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, অদিতি এগিয়ে এসে কঠিন গলায় বলল—অনোহিতা, এটা মারামারি করবার জায়গা নয়।

এক হাতে তনিকার খোঁপা খুলে-যাওয়া চুলের গোছা। অনোহিতা অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল। আর সামনে ঢোলা প্যান্টের ওপর সাদা চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি গায়ে, অফ-হোয়াইট রঙের

এক দীর্ঘাঙ্গী মহিলা দাঁড়িয়ে, মাথায় এলোমেলো বাঙালি-বাদামি চুল, একটু পুরু ঠোঁটে গোলাপি মায়া, কালো চোখে শান্ত বিদ্যুৎ।

সে যদি নাগিনী হয় এ তা হলে রানি নাগিনী।

পেছনে সভাসদবৃন্দ।

পশ্চাৎপটে খুনে লাল দুটো হুলো, চোখে সবুজ আগুন। পেছনে বেগুনি-গোলাপি সপ্তপর্ণীতে নিরাসক্ত আত্মস্থতা, কটকটে সবুজ নিমে উচ্চকিত অট্টহাসি।

পেছল শ্যাওলায় পা হড়কে যায়। অপার বিস্ময়ের চোখে মহিলার দিকে তাকিয়ে পিছু হটতে লাগল মেয়ে। তারপর এক ঝটকায় পেছন ফিরে চলে গেল, দুলতে লাগল অবিন্যস্ত চুল মাঝ-পিঠ পর্যন্ত। ঝুলতে লাগল কাঁধের বাঁধনি-কাজের ঝোলা।

আট

আমার যা খুশি করব। ইচ্ছে হলে খাব, নইলে খাব না, মদ খাব, বারে গিয়ে চুরমার করে দেব টেবিল-চেয়ার, লম্বা-ডাঁটির মদ-গেলাস, বোতল। গোপন ডিসকোয় যাব। উন্মাদ নাচব। তারপর হাশিস-সিগারেট ফুঁকে শুয়ে পড়ব, ড্রাগার্ডগুলো হামলে পড়বে। আমি খুলে দেব স্কার্ট, একটানে ছিঁড়ে ফেলে দেব ব্লাউজ। আর যেই হামলে উঠে আসবে কোনও খচ্চর, দেব এক থাপ্পড়। থাপ্পড়ের পর থাপ্পড়। থাপ্পড়ের পর থাপ্পড়। এই ট্যাক্সি, হেই ট্যাক্সি—হে-ই।

দরজা খুলে দমকা হাওয়ার মতো উঠে পড়ল সে।

—থামাচ্ছিলেন না কেন? মারমুখী প্রশ্ন।

—সুনা নেই।

—কানে কালা? চোখে কানা? হাতে-পায়ে বাত? ব্রেক চাপতে পা কনকন করে? ঝড়ের ঝাপটা।

—আরে এ ক্যা লড়কি? বদ্‌তমিজ। উতার যাও। উতার যাও—ঘ্যাঁচ করে ট্যাক্সি থামল হাজরার ধার ঘেঁষে।

অনেকটা পথ উড়ে এসেছে সে। মুখ লাল। ঘাম ঝরছে। কপালে কানে লেপ্‌টে গেছে চুল। নেই জায়গা?

দাড়ি চুমরে সর্দারজি বলল—কিধর, ঠিকসে বোলো।

—তারাতলা রোড।

—উও তো জাদা দূর হ্যায়।

—তো কেয়া?

—জেব মে রুপেয়া হ্যায় ক্যা?

রাগে কথা বলতে পারল না সে। অনেক কষ্টে পার্সটা সর্দারজির মুখের ওপর ছুড়ে মারবার লোভ সংবরণ করল।

দিল না? দিল না ডায়েরিটা? নেই ওর কাছে? আর কার কাছে যাবে? ঝোলা-মার হয়ে গেল নাকি? কবে কবে সে ভিড় বাসে, মিনিতে উঠেছিল? সাধারণত সে অটো চড়ে। মারমার কাটকাট করতে করতে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে যায় অটোগুলো। এমন ব্রেক কষে যে তুমি হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সামনের লোহার রডে ঠুকে যাবে মাথা। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে আলু। তারাবাজি। রোজই সে আশা করে নাক সোজা করে অটোটা কোনও মিনিফিনির সঙ্গে ধাক্কা লাগাবে। ড্রাইভার ফিনিশ, প্যাসেঞ্জার ফিনিশ, সে-ও ন্যাচার‍্যালি ফিনিশ। চেপটে যেতে কেমন লাগবে? সে কি বুঝতে পারবে? না তার আগেই হাওয়া গাড়ি!

এই যে অনেক লোক মরছে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও, অর্থাৎ রীতিমতো ডজনখানেক মরণসঙ্গী পাচ্ছে সে—এই আইডিয়াটার একটা তীব্র আবেদন আছে তার কাছে।

কিন্তু মহিলাটি কে? একতাল কনকনে বরফের চাঁই যেন তার আর ওই বিশ্বাসঘাতকটার মাঝখানে নামিয়ে দিলেন! সে সেটা পার হতে পারল না। এ রকম তার হয় না। ও সব পার্সন্যালিটি ফ্যালিটি অনেক দেখা আছে তার। আসল কথা, ওসব কিছু নয়, অপরিচিতা মহিলার মুখে নিজের নাম শুনে হড়কে গিয়েছিল সে। কী করে জানলেন? যে-ই হোন উনি। অবভিয়াসলি ছবিটবিতে ইনটারেস্টেড। তনিই নিশ্চয় বলেছে তার কথা। একদম একপেশে একটা গপ্পো। স্পর্ধা কী! কিন্তু এমন কোনও মহিলার কথা কোনওদিন তনির মুখে কখনও শোনেনি তো? তনির হাড়হদ্দ তার চেনা। এমন কোনও কথা নেই যা তিনি তাকে বলেনি। তবে তনি বলে অল্প কথায়, তার মতো উদগীরণ ওর হয় না। হয়তো কোনও সময়ে আভাসে-ইঙ্গিতে বলেছে। সে খেয়াল করেনি। বাঁ গলার কাছটা জ্বলছে, আঁচড়ে দিয়েছে রাক্কুসিটা। বড় নখ রাখছে নাকি আজকাল ন্যাকাচণ্ডীগুলোর মতো! চেঞ্জ করে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তনিকা। কে জানে কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো আন্টি-মাসির মতো হয়ে যাবে। ওই আরেক মহিলা! ওকে দেখে নেবে সে।

—তারাতলা তো মিল গিয়া। অব কিধর জানা! সর্দারজি গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল।

—আর একটু। ততোধিক গম্ভীর গলায় উত্তর দিল সে।

হোটেল ম্যানেজমেন্ট...ম্যারিন এঞ্জিনিয়ারিং...আই আই সি পি... বাস রোকো।

—মিটারটা গলা বাড়িয়ে দেখল, টাকাগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে গুঁজে দিল সর্দারজির হাতে।

—মিলা? আপকো রুপেয়া? রুপেয়া দেখাতা হ্যায়! হুঁঃ।

—রইস লোগোঁকে বেটি ক্যা? তমিজ সিখো, তমিজ।

—দরজাটা দমাস করে বন্ধ করে নেমে দাঁড়াল। মুখ নাড়িয়ে হাত নাড়িয়ে ঝগড়াটির মতো বলল—তুমহারা ক্যা? হাঁ? তুমহারা ক্যা?

হুস করে গাড়ি ছেড়ে দিল সর্দারজি।

চতুর্দিক থেকে উপদেশ বর্ষণ হচ্ছে। নাঃ। এরা পাগল করে ছেড়ে দেবে তাকে! গ্রিলের লোহার আংটাটা খুলে সে ভেতরে ঢুকল। ঘাস মাড়িয়ে গেল কিছুটা। ঘাসের ওপর লম্বা ঢ্যাঙা একটা খেঁকুরেপনা মূর্তি। স্কালপচার। ভাস্কর্য! হুঁঃ। ও রকম অনেক সো-কল্ড স্কালপ্চার তার দেখা আছে। ফুঃ! দু'ধাপ উঠে চাবি ঘোরায় সে। প্রথমে কোলাপসিব্লের তালা, তারপর দরজার চাবি।

ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। নতুন রংয়ের একটা উগ্র গন্ধ ঘরে। ছড়ানো কতকগুলো মোড়া আর একটা ডিভান। চটি দুটো পা থেকে ছুড়ে ছুড়ে কোণের দিকে পাঠাল। ঝোলাটা নামাল ডিভানের ওপর। তারপর পাশের ঘরে ঢুকল। ঢুকতেই চোখ পড়ল আড় করে রাখা ইজেলটার ওপরে। দেওয়ালে ঠেস দেওয়া আছে, ছবি। গুটোনো, পাইল করা। ইজেলের ছবিটা খুব অদ্ভুত। সোজাসুজি ঝাঁপিয়ে আসছে একটা ন্যূড। মুখ কাঁধ, হাত দুটো, অর্ধেকটা বিশাল, ঝাঁপাচ্ছে তো! পা পর্যন্ত পুরো বাকি বডিটা ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে গেছে। হাতের পাতা দুটো এত বড় যেন এখুনি এসে গলা টিপে ধরবে। বুক দুটো মাটির দিকে মুখ, ঝুলন্ত। বৃন্তদুটো ডগডগ করছে রঙে। পার্পল মনোক্রোম ছবিটা। শুধু চোখের তারা আর স্তনবৃন্ত দুটো একটা অদ্ভুত দ্যুতিময় লাল।

ছবিটার দিকে জ্বলন্ত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সে, তারপর ছুটে চলে যায় রান্নাঘরে, ড্রয়ার থেকে বার করে আনে আনাজ-কাটা ছুরিটা, তারপর এ কোণ থেকে ও কোণ চড়চড় করে কেটে দেয় ছবিটা। কাটাকুটি পুরো। ঠোঁট বাঁকিয়ে একটা মাতাল মতো হাসি হাসে, ঢকঢক করে জল খেয়ে নেয় আধ বোতল, তারপর কোণের সরু তক্তপোশটার ওপর ঢেলে দেয় শরীর। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। খুব বিপজ্জনক কিনারে, প্রায় সিকি ভাগ ঝুলছে। চুলগুলো অর্ধেক মাথার পেছনে চেপটে, অর্ধেক ঝুলছে।

রাত আট-সাড়ে আট হবে, দরজার চাবির খুট শব্দ হল। দ্বিতীয় কেউ ঢুকল। চটি-পরা দুটো শক্তপোক্ত পা পার হল প্রথম ঘর। হা-হা করে আলো জ্বলছে একদিকে, বনবন করে পাখা ঘুরছে। মেয়েটা মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে। স্কার্টের ঘের উঠে গেছে, পা দুটো প্রায় মড়ারই মতো। শুকনো চ্যালাকাঠ যেন। ঘুমোক। হা-ঘরের মতো ঘোরে দিনমান। পা-ভরতি মাথা-ভরতি ধুলো, ময়লা। ঘুমের মধ্যে মানুষের ত্বক শিথিল, মসৃণ হয়ে যায়, এর ত্বকে, ভুরুতে চিবুকে এখনও ভাঁজ।

রান্নাঘরে গেলেন। বেসিনে হাত ধুলেন। আধ বোতল জল রয়েছে, গলায় ঢাললেন আস্তে। ঝোলার থেকে একটা-দুটো প্যাকেট বার করলেন। প্লেট নামালেন দুটো। এক্ষুনি বার করবেন না। ঠান্ডা হয়ে যাবে। এখানে তিনি রোজ আসেন না। চাল-ডাল-আনাজপাতি-ডিম-পেঁয়াজ, চাও-ফাও কিনে রেখে যান। যা পারে রান্না করে খাক। কিন্তু যেদিন যেদিন আসেন ভাল জায়গা থেকে ভাল ভাল জিনিস কিনে আনেন। আজ এনেছেন বিখ্যাত দোকানের চিকেন বিরিয়ানি। ও মাটনটাই ভালবাসে কিন্তু তাঁর আজকাল রেড মিট চলছে না। সুগন্ধে ঘর ভরে যাচ্ছে। এবার ওকে তুলতে হবে। রান্নাঘর পেরিয়ে ফিরতি পথে থমকে দাঁড়ালেন। ঘরের আবছা দিকটায় আড় করে রাখা ইজেলটার দিকে নজর পড়ল। বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। প্রায় দুই লাফে পৌঁছে গেলেন। হতভম্বের মতো লাট খাওয়া ছিন্ন ক্যানভাস তুলে তুলে দেখছেন। ছেড়ে দিলেন, মুখ ফেরালেন। ক্রমে চোখে রক্ত ছুটে আসছে। চুলের মুঠি ধরে টেনে তুললেন।

—কে কেটেছে? কে কেটেছে ছবি? বল হারামজাদি বল।

কালীর হাতে নরমুণ্ডের মতো ঝুলছে মাথাটা। আচমকা হ্যাঁচকা। কিছু বুঝতে পারছে না। টালুমালু চোখে তাকাচ্ছে। কোনওক্রমে চোখ ওপরে তুলে এবার স্থির হয়ে গেল। পলক পড়ছে না। ঠিক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো একটা ভয়াল মুখ।

—চুল ছাড়ো, ছাড়ো বলছি চুল। ছাড়ো,—কবজিতে আচমকা মারে ডান হাতের পাঞ্জাব ধার দিয়ে। কারাটে শিখেছে নিশ্চয় কোনও এক সময়ে।

—এটা কী করেছিস? কেন?

—এ রকম জঘন্য করে আঁকবে কেন তুমি আমাকে? কেন? কেন? মাথা ঝাঁকিয়ে চুল ঝাঁকিয়ে আঙুল তুলে শাসাচ্ছে।

—কে বলেছে ওটা তুই?

—আমি জানি।

—চিনতে পারিস তা হলে? ওটা তোর ভেতরটা, ওয়াইল্ড, বুনো জান্তব—

—মুণ্ডু তোমার। তোমার মুণ্ডু। জন্তু কে? তুমি তো! তুমি তো! তুমি! কে আমাকে... সবলে মুখ চেপে ধরলেন।

—তুই কম নাকি? এইটুকু একফোঁটা মেয়ে, ছেনালিতে বেশ্যাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিস! লজ্জা করে না!

লাফিয়ে উঠে সপাটে একটা চড় মারল, ঝাঁপিয়ে পড়ে, খামচে-খিমচে পাঞ্জাবি ছিঁড়ে...।

ফিরতি চড় এল একটা। গরম জল বেরিয়ে এল চোখ থেকে। পাগলের মতো রাগী কান্না কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল।

—তুমি আমাকে মারলে? মারলে...।

—আমার কী ক্ষতি করলি জানিস? একটা ফাইভস্টার হোটেলের লবির জন্যে আঁকছিলুম। অনেক টাকার কাজ।

—আরেকটা আঁকবে। আমি যেমন তেমন করে।

—তুই কেমন তুই জানিস?

—আমি সুন্দর। ইউক্যালিপটাসের পাতার মতো, আমার গায়ে ইউক্যালিপটাস গন্ধ, আমি নেপালি

কুকরির মতো, বাঁকা, ঝকঝকে, বেজায় ধার, প্রতিপদের চাঁদ যেমন হয় তেমন যদি সূর্য হত আমি সে রকম...।

—থামলি কেন? বলে যা বলে যা...।

—যথেষ্ট বলেছি।

—এক কাজ কর, নিজেকেই নিজে আঁক তা হলে। আর একটা পুকুরের পাড়ে উপুড় হয়ে পড়ে, জলে নিজের ছায়া দ্যাখ। আমাকে এবার ছেড়ে দে। ওফফ।

তক্তপোশে শুয়ে পড়ে দুটো হাত জড়ো করে তার ওপর মাথা রাখলেন।

—স্যরি কাকু।

—ওই তো একটাই সভ্য কথা শিখেছিস জীবনে। ভেতরে কোনও সার নেই। তুই এবার বাড়ি ফিরে যা মিমি প্লিজ। আমি আর পারছি না। কী ভীষণ বদনাম হয়ে যাচ্ছে আমার জানিস?

—শিল্পীদের ও রকম একটু-আধটু বারদোষ থাকে। সবাই জানে। দুশ্চরিত্তির। যত বুড়ো হবে তত রস, যত বাচ্চা হবে তত লাল। গড়িয়ে গড়িয়ে পড়বে একেবারে। ...শয়তানির মতো হাসি হেসে বলল।

—এ সব কথা যে বলছিস, কিছু করেছি আমি তোকে? সে রকম কিছু?

—অন্য কেউ হলে পারতে। নেহাত কাকু কাকু ছোট্ট থেকে। চকলেট, লজেন্স...পুতুল ফুতুল...তাই আটকে গেল। তনিকা হলে আটকাত না। তনি, তনিকা। ...হেসে উঠল। তেতো তির্যক হাসি।

পাশ ফিরে হাতে মাথা রেখে তাকালেন—আমার মতো একটা আধবুড়োকে নিয়েও তোর জেলাসি? আচ্ছা তো!

—আধবুড়ো সেটা স্বীকার করলে তা হলে? ধরনধারণ দেখলে তো মনে হয় নব কার্তিক! লাল পাঞ্জাবি, কালো শার্ট, পাঞ্জাবির গায়ে কাঁথা কাজ গুর্জরি কাচ, নেহাত চুলটাই যা রং করোনি। নোয়িং ফুললি ওয়েল যে চুলগুলো সেক্সি। মেয়ে ধরতে, খদ্দের ধরতে কাজে লাগবে। ডিজাইনার পাঞ্জাবি, ডিজাইনার চুল।

চোখে সামান্য কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল, বললেন—খিদে পেয়েছে তো? খেয়ে নে। বিরিয়ানি এনেছি।

—খিদে পেয়েছে কিন্তু খাব না।

—কেন?

—মেরেছ কেন? খারাপ খারাপ কথা বলেছ, কান জ্বালা করছে আমার।

—তুই আমাকে মারিসনি? আঁচড়ে কামড়ে দিসনি? হাতে তোর দাঁতের দাগ বসে আছে। আর খারাপ কথা? তুই কী বলতে বাকি রেখেছিস? শোন, রান্নাঘরে যা। এতক্ষণে বিরিয়ানিটা ঠান্ডা হয়ে গেল। একটু গরম কর। তারপর দ্যাখ তোকে কেমন খাইয়ে দিই। আমি একটুবাইরে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আসি। ওফফ্।

সদর দরজাটা লক্ করে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। পকেটে হাত দিলেন। মোবাইলটা নেই তো! কোথায় ফেললেন? কাছেই একটা ফোন বুথ, তিনি ছুটে গিয়ে কাচ-দরজা বন্ধ করলেন। নম্বর ঘোরাচ্ছেন।

—সর্বাণী। আমি ভাস্কর কথা বলছি।

অন্যদিকে নীরবতা।

—শোনো, ওকে লক করে রেখে এসেছি, গিয়ে খাব। খেতে একটু সময় লাগবে। তার মধ্যে চলে এসো, কুইক। নিয়ে যাও।

—কী করে?

—যে ভাবে হোক। আমি মরে যাচ্ছি। সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে আমার।

—বাঃ। নিয়ে যেতে পারলে একেবারে ছিনিয়ে, এখন তোমার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে বলে আমাকে নিয়ে আসতে হবে?

—ওফ। আমার উপায় ছিল না। বোঝবার চেষ্টা করো। একটা সাবালক মেয়ে যদি নিরাশ্রয় হয়ে আমার স্টুডিয়োয় এসে হামলা করে কী করতে পারি বলো?

—নিরাশ্রয়?

—ওই হল। ও ভাবছে যে ও নিরাশ্রয়।

—আমি কী করে আনব ওকে? ওর বাবা আসুক। পুলিশ নিয়ে যাবে একেবারে..।

—পুলিশ নিয়ে কিচ্ছু করতে পারবে না। ও স্বেচ্ছায় চলে এসেছে সৎমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে—এমনটাই বয়ান দেবে ও। তুমিই বরং বিপদে পড়ে যাবে। এনিওয়ে কাল থেকে ও সত্যিই নিরাশ্রয় হবে। নতুন তালা কিনে চাবি দিয়ে যাব। ঢুকতে পারবে না। আমাকেও কোথাও খুঁজে পাবে না। তালা মেরে আমি একটা ওয়ার্কশপ করতে চলে যাব—বম্বে।

—কী বলছ সব বুঝতে পারছি না। একটা ক্রস কানেকশন হচ্ছে তখন থেকে। তোমার ফোনে।

—উহুঁ তোমার। হ্যালো হ্যালো করছে, রেখে দিতে বলছে। শুনুন, আপনি গোল্লায়— যান। ছাড়ুন একটু ফোনটা। জাস্ট দু'মিনিট। তারপর যত খুশি বকম বকম করতে পারবেন।

নীরব হয়ে গেল তৃতীয় আওয়াজ।

—সর্বাণী শুনছ। মিমিকে নিয়ে যাও। আমি হেলপ করছি। ধরো যদি জলের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ দিই। এনিওয়ে ওর ট্রাংকুলাইজার লাগবেই। প্রচণ্ড হাইপার। কথা শোনো, ও ঘুমিয়ে পড়বে। তুমি গাড়ি নিয়ে আসবে। আমি তুলে দেব। সঙ্গেও যাব এখন।

—তারপর? ঘরে লক করে রেখে দেব? রাখা যায়?

—শোনো, ডাক্তার কনসাল্ট করো, একজন সাইক্রিয়াট্রিস্ট। উনিই বলবেন কী করতে হবে।

রেখে দিলেন, আর কথা বাড়াতে চান না। বাড়ালেই বাড়ে। কে ভেবেছিল, যে কিশোরী মেয়েটিকে মাঝেমাঝেই বাচ্চার মতো কোলে বসিয়ে আদর করতেন, কাকু-আদরের ছলে নরম তুলতুলে গালে, পিঠে, ঠোঁটে। শেষ পর্যন্ত নাভিতে এবং জানুতেও চুমো দিতেন সে এরকম ভয়ংকর দাবি নিয়ে একদিন ওলোটপালট করে দিতে চাইবে জীবন-ছক? এমন প্রিয় নকশা জীবনের? কিছুটা গৃহী, কিছুটা সন্ন্যাসী, কিছুটা দেহময়, কিছুটা মনোময়? চমৎকার ব্যালান্স ছিল একটা।

সর্বাণী ফোন নামিয়ে রাখছিলেন। ওদিক থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলল—মিসেস সাহা রায়, আমি অদিতি সরকার বলছি। অনেকক্ষণ থেকে ট্রাই করছি, যদি বা পেলাম ক্রস কানেকশন... এনিওয়ে আমি হাল ছাড়িনি, লোকটি হুমকি দিচ্ছিল ছেড়ে দেবার জন্য... আপনাকে খবর দিই, অনোহিতাকে আমি দেখেছি। আজকে। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ। আমার কাছে যে ছিল সে নয়। সেই মেয়েটির সঙ্গেই মারামারি করছিল। আচ্ছা ওর বয়স কত?

—তেইশ মতো।

—খুব ছোট তো নয়। দেখায় পনেরো-ষোলো। কিছু মনে করবেন না— ও কি স্বাভাবিক? দশ-বারো বছরের বাচ্চার মতো মারামারি করছিল।

—ওর হিস্ট্রি তো খানিকটা আপনাকে বলেইছি। তাতে যতটা স্বাভাবিক মনে হয়।

—আমি এখনও ভাস্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। খুব শিগগির বলব।

—তার আর দরকার নেই। উনি ফোন করেছিলেন মিমিকে উনি আর রাখতে পারছেন না। আমাকে গিয়ে নিয়ে আসতে বলছেন।

—মানে?

—উনি বলছেন—উনি কাল বম্বে চলে যাচ্ছেন। স্টুডিয়োয় তালা দিয়ে যাচ্ছেন। ও ঢুকতে পারবে না। আমি যেন নিয়ে আসি।

—ওই গাড়ি নিয়ে যাওয়া ঘুমের ওষুধ-টষুধ...উনিই কথা বলছিলেন নাকি?

—উনিই। ভাস্কর চক্রবর্তী। এখন আমি কী করি বলুন তো। ওর বাবা বাড়ি নেই। আছে একটি সর্বক্ষণের কাজের মেয়ে আর আমি। ড্রাইভার থাকে নীচে। একটা অত বড় মেয়েকে ধরে নিয়ে এসে আটকে রাখতে পারি?

—এত সহজে উনি দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেললেন?

—ও বলছে ওর দোষ নেই, মেয়ে যদি ওর কাছে গিয়ে থাকতে চায় ও কী করবে?

—বাঃ। এক কাজ করুন আপনি স্টুডিয়োর ঠিকানা আর লোকেশনটা একটু বলুন। আমি যাচ্ছি।

—আপনি...আসছেন?

—আপনি আমার হেল্প চাননি?

—হ্যাঁ কিন্তু এই এত রাতে।

—রাত-টাত কোনও ব্যাপারই না। আমি সারারাত জেগে কাজ করতে পারি। সারা রাত গাড়ি চালাতে পারি। বাট আই ওয়ান্ট দ্যাট স্কাউন্ড্রেল টু ফেস মি।

ফোনটা রেখে দিয়ে তার মনে হল কাজটা কি সে ঠিক করল? সত্যি কী করবে কীভাবে হেল্প করবে সর্বাণী সাহা রায়কে সে এখনও জানে না। খুব কঠিন সমস্যা। মেয়েটির, তার দ্বিতীয় মায়ের। কী ভাবেই বা ভাস্কর চক্রবর্তীকে শায়েস্তা করবে? খুব উদ্ভুট উদ্ভুট জিনিস তার জীবন ঘিরে। কিন্তু বলেছে যখন যেতে তো হবেই। ঠিক এই মুহূর্তে তার নাগালের মধ্যে কোনও জায়গায় হয়তো অন্য সমস্যা ধোঁয়াচ্ছে। প্রকৃতিটা এক না-ও হতে পারে কিন্তু। খুব খুব জরুরি। অন্য কেউ হয়তো সর্বাণী বা অনোহিতা সাহা রায়ের চেয়েও বেশি বিপদের মধ্যে। সে কিছু করতে পারছে না, কেননা জানে না। জানলে কি একসঙ্গে তিন-চার জায়গায় দমকল নিয়ে ছুটে যেত। দমকল নামটা তাকে রাজর্ষি দিয়েছিল। তোমার দোষ কি জানো বনি? ইউ রাশ টু টেক কেয়ার অব পিপল হু শুড বি এবল টু টেক কেয়ার অব দেমসেলভস। একে বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

রাত দশটা বেজে পাঁচ। তিন নম্বর আয়রনসাইড রোডে একটা বাড়ি। একজন মাত্র মহিলা। একটি ড্রাইভার আছে সহায়। তাঁর উপস্থিতি, অবস্থান এই বাড়িতে খুব অনিশ্চিত। স্বামী বিদেশে, তাঁর পূর্বপক্ষের তরুণী মেয়ে রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। এই রাতে খবর এসেছে, তাকে তারাতলার একটা জায়গা থেকে এক্ষুনি নিয়ে আসতে হবে। হিংস্র মেয়ে একটা। সবচেয়ে বেশি রাগ ওই মহিলারই ওপর। সে যখন জানে, যখন তাকে জানানো হয়েছে যাওয়া ছাড়া তার গতি কী।

অদিতি মোবাইলটা বার করে একটা নম্বর টিপল। যদি মোবাইল অফ করে ঘুমিয়ে পড়ে থাকে, তা হলেই হয়ে গেল।

—শৌনক বলছি। কী ব্যাপার দিদি?

—আমার সঙ্গে তারাতলা রোডে একটি জায়গায় যেতে পারবি? এক্ষুনি?

—অব কোর্স। ঠিকানা দাও আমি পৌঁছে যাচ্ছি।

একবারও জিজ্ঞেস করল না—কেন, কী হয়েছে, এক পায়ে খাড়া একেবারে। এতটা আনুগত্য কেউ কারওর থেকে আশা করে না। কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে সে। অদিতি শীলাদিকে ডেকে জানিয়ে দিল সে বেরোচ্ছে।

—এত রাতে?

—এখন তোমাকে সবটা বোঝাবার সময় নেই শীলাদি। আসছি। সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গাড়ি বার করল।

কেন? এত আনুগত্য! ছবি আঁকার জায়গা, পরিবেশ দিয়েছে বলে? তার বিনিময়ে মূল্যও তো সে নেয়। ছবি বিক্রি করে দেয়। খুব সফল মার্কেটিং করে। তার জন্যও একটা পার্সেন্টেজ

পায় সে। সামান্য, তবু পায়। এই সবের জন্য কি? এর আগে একবার বাঁকুড়ায় যেতেও শৌনকের সাহায্য নিতে হয়েছিল তাকে। বেশ কতকগুলো ফরমাসি জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। তার প্রবল জ্বর। তখন সে টিকিট কাটতে দিচ্ছিল এজেন্টকে। শৌনক বলেছিল—দিদি তোমার ভাইর‍্যাল ফিভার, কোথায় যাবে? সব শুনে অনায়াসে বলে দিল—অ্যাড্রেসটা দিয়ে দাও। আমি চলে যাচ্ছি। যাই হোক ছেলেটা বড় ভাল।

—শৌনক। রাস্তায় নেমে দাঁড়াও, তোমায় তুলে নিচ্ছি।

—দরকার ছিল না, জায়গাটা আমি বুঝতে পেরে গেছি, ওখানে ভাস্কর চক্রবর্তী বছর দুই হল একটা স্টুডিয়ো করেছেন।

—ওখানেই।

—আচ্ছা। তোমাকে ঘুরতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি—ফোন অফ হয়ে গেল।

আচ্ছা ছেলে তো? ভেবে দেখতে গেলে, ও থাকে বেহালাতেই। তারাতলা চলে যাওয়া ওর পক্ষে সোজা তবে এত রাতে যদি ট্যাক্সি না পাওয়া যায়? শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এখন ট্যাক্সি যেতে চায় না। এ শহর এখন বিভীষিকা নগরী। প্রায়ই ট্যাক্সি চালক খুন হয়, ছিনতাই করে নিজেদের প্রয়োজনমতো গাড়ি ও ড্রাইভারকে ব্যবহার করে গুণ্ডারা! যাক, একটা সমর্থ জোয়ান ছেলে সে যা-হয় একটা ব্যবস্থা করবে। সে বিরলযান পথ দিয়ে ড্রাইভ করতে করতে ক্রমশই স্পিড বাড়াবার আনন্দ অনুভব করতে থাকে। আশুতোষ কলেজের পর থেকে শুরু করে পুরো চেতলা মাঝেরহাট ব্রিজ। দুর্গাপুর ব্রিজ গাঁটহীন। তারাতলার হাঁড়ল হাঁড়ল গর্ত। একটাতে পড়ে হেঁচকি তুলে সতর্ক হয়ে যায় সে। বাঃ, জায়গাটা বেশ তো। গাছপালা, চওড়া রাস্তা, বড় বড় ইনস্টিট্যুট-বিল্ডিং।

লোকবসতি নেই যতদূর দেখা যাচ্ছে। অদিতির বিদেশি অভ্যেস। কখনও কাউকে রাস্তা বা ঠিকানার বিশদ বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করে না। দুটো রোড ম্যাপ আছে কলকাতার। তাই দিয়েই চালায়। সল্ট লেক, যোধপুর পার্ক, লেকটাউন, লেক গার্ডেনস এসব জায়গায় একটু অসুবিধে হয়। ওখানে পারলে সে আগে থেকে ল্যান্ডমার্কগুলো জেনে রাখে। এই তারাতলা রাস্তায় সে আগে কখনও আসেনি। জায়গাটা বেশ, আবার গাছপালার বাড়বৃদ্ধি তেমন নিয়ন্ত্রিত নয় বলে এই ঝুপসি রাতে একটু ভুতুড়েও বটে।

ওই তো শৌনক। একেবারে প্রায় মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে।

—দিদি! দিদি!

মসৃণভাবে গাড়ি থামায় অদিতি। শৌনকের পাশে দাঁড়িয়ে একটা ফুটকি। প্যান্ট আর টপ। মাথার চুলগুলো ঘাড়ের কাছে পুঁটলি পাকানো।

এখনও অবাক হবার সময় পায়নি অদিতি। ছায়ায় দাঁড়ানো একটা কালো হন্ডা। কালো বলেই চোখে পড়েনি। সর্বাণী এগিয়ে এলেন। —আমি এই পাঁচ মিনিট হল পৌঁছেছি এখনও ভেতরে ঢুকিনি। কীভাবে কী করব...

এত বড়সড় চেহারার দস্তুরমতো ব্যক্তিত্বঅলা মহিলাকে এমন উদভ্রান্ত দেখে, হঠাৎ অদিতির ভেতরে ভেতরে একটা রাগ হতে লাগল। এই পরিস্থিতিটা যে তৈরি হতে পারে উনি কি একেবারেই ভাবেননি? মেয়েটিকে তো উনি গোড়া থেকেই চেনেন! এ-ও আশ্চর্য, এই একুশ শতকে কত লোক বদলে যেতে থাকা সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে, অথচ অত্যাধুনিক পরিবারের একটি মেয়ে, নেহাত বাচ্চা নয়, সাবালক নিজের পায়ে দাঁড়াবার বা বিয়েটিয়ে করার সময় হয়ে গেছে, সে বাবা আর মায়ের বান্ধবীর বিয়েটা মেনে নিতে পারছে না?

পেছন থেকে তনিকা এসে দরজার বেলটা দিল। পরমুহূর্তেই খুলে গেল দরজা। ভেতরের আলো যেটুকু পাশ-মুখে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে উৎকণ্ঠিত।

—তুমি?

—হ্যাঁ, মিমিকে নিতে এলাম।

—আমি তো...মানে সর্বাণী...

—ওই যে। পেছন দিকে আঙুল দেখাল তনিকা।

সর্বাণী খুব থতমতভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন, শৌনক সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—কে? সর্বাণী, ড্রাইভার বদলেছ?

সর্বাণী কোনও উত্তর দিলেন না। এরপর অদিতিকে দেখে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন লোকটি। মুখে কোনও কথা নেই।

আধখোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে এল সবাই। কেউই লোকটির মুখের দিকে তাকাচ্ছে না। তনিকা বাঁদিকের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। তক্তপোশের ওপর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে অনোহিতা। সেই দুপুরের পোশাকে। ঘাম আর ময়লা বসে সমস্ত চেহারাটার ওপর একটা কালো ছাপ বসে আছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ও একটা ঘোরের মধ্যে আছে। বলল—কে এল কাকু?—জড়িয়ে যাচ্ছে গলা।

—আমি। মিমি আমি রে, দ্যাখ—তনিকা ওকে ঝাঁকাল।

হঠাৎ মাথাটা ঝাড়া দিয়ে চোখ মেলে দেখল ও—তনিকা, তুই?

—কাকু বুঝি তোকে...

—আরে তোর কাকু তোকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন অজ্ঞান করবার জন্য।

—কেন?—ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছে—ও ফোকাস করতে পারছে না।

—যাতে তোকে তুলে এখান থেকে ফেলে দিতে পারেন! হোয়াট এলস!

—অ্যাঁ।

—তনিকা, এসব তুমি কী বলছ? হুড়মুড় করে এগিয়ে এলেন ভাস্কর।

—চুপ, ঠিক বলছি। আর একটাও কথা বলবেন না। তনিকা তর্জনী তুলল। তারপর বলল—মিমি আমার সঙ্গে আয়। অনেক চেষ্টায় তক্তপোশ থেকে মাটিতে পা নামাল অনোহিতা। কিন্তু দাঁড়াতে পারল না। শৌনক এগিয়ে গিয়ে ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চলে গেল। একবার মুখ ফিরিয়ে বলল—দিদি, কালো গাড়িতে তুলব তো?

—হ্যাঁ।

সর্বাণী বললেন—কী দিয়েছ ওকে? ওর তো চোখ উলটে যাচ্ছে দেখছি। কী দিয়েছ?

—তেমন কিছু নয়, ওর খাওয়ার অভ্যেস নেই, তাই এফেক্টটা বেশি। তা ছাড়া একটু অ্যালকোহল...।

—এগুলো লিখে দাও কোনটা কত দিয়েছ...

—মুখে বলছি তো।

—না লিখে দিলে বোঝা যায় না—এই নাও। সর্বাণী নোটবুক বার করলেন একটা।

—লেখো, কী ওষুধ, কী পাওয়ার—

ভাস্কর লিখলেন।

—লেখো, অ্যালকোহল কী দিয়েছ, কতটা।

—সেটাও দরকার? ও তো রাতদিন খাচ্ছে।

—ঠিক আছে। এটা আমার জ্ঞাতসারে। জানতে চাই। লিখতে লিখতে ভাস্কর বললেন—ওই জন্যেই ও তোমার কাছ থেকে পালায়। অতবড় মেয়ে, খবরদারিটা ছাড়ো।

এখন লজ্জাটা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন। সর্বাণী বললেন—তোমার নামটা তলায় লেখো।

—আরে! কেন? কী আশ্চর্য!

—ধরো তোমার অটোগ্রাফ নিচ্ছি। এতবড় শিল্পী।

—ঠাট্টা করছ?

—ঠাট্টা করার অবস্থা আমার নয়, ভাস্কর। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার মেয়ের দায়িত্বটা আমার, সেটাই পালন করছি।

—তার জন্য সই?

—সইটা দিতেই বা তোমার এত আপত্তি কেন বুঝছি না তো।

কঠিন মুখ করে অদিতি এবার তাকাল—সর্বাণী বললেন, এটা তো ফ্যাক্ট যে তুমি এই জিনিসগুলো ওষুধ, অ্যালকোহল ওকে দিয়েছিলে, না কি?

—সে তো এখানে থাকতেও দিয়েছিলাম।

—বেশ তো যে পিরিয়ডটা ও এখানে থেকেছে সেটাও লিখে দাও।

—আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড।

—বোঝবার আছেটা কী? আমাকে ওর বাবার কাছে জবাবদিহিটা তো করতে হবে। সে তো বলতেও পারে, সবটাই আমার মনগড়া।

—আচ্ছা গোঁয়ার তো। দাও সই করে দিচ্ছি।

খসখস করে কায়দার সইটা করলেন ভাস্কর চক্রবর্তী।

নোটবইটা তুলে নিয়ে সর্বাণী বললেন—ওর যদি কিছু হয়, কাঠগড়ায় কী করে তুলতে হয় তোমায়—আমি জানি।

বেরিয়ে গেলেন, পেছন পেছন অদিতি।

—অদিতি!

সে পেছন ফিরে তাকাল।

—তুমি বোঝবার চেষ্টা করো। কেসটা খুব কমপ্লিকেটেড। মেয়েটা একেবারে স্পয়েল্ট। ছোট্ট থেকে চিনি। বাবার বিয়েতে এত্ত আপসেট হয়ে গেছে...

অদিতি একবার তাকাল। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণে তার সর্বাণীর প্রতি একটু শ্রদ্ধা হচ্ছে। যতটা ন্যাকা-বোকা দেখাচ্ছিল ততটা নয়। সে বলল—এবার? সর্বাণীদি!

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিলে বোধহয় ছোট করা হবে আপনাকে, আপনি...আপনারা না থাকলে...

—এবার ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে...

—তনিকা যাচ্ছে সঙ্গে। তনিকা ওর ভীষণ বন্ধু। যতদিন না সুস্থ হয় তনি থাকবে বলেছে। আশা করি সামলাতে পারব।

—কোনও অসুবিধে হলে আমি...আছি। অদিতি বলল।

গাড়িতে উঠে শৌনক বলল—দিদি, কেসটা কী? কিছুই তো বুঝলাম না!

অদিতি এবার সত্যিই একটু হেসে ফেলল—কেস তোরা যাকে বলিস—জন্ডিস।

নয়

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অদিতি ভাবল—আমি আছি। অসুবিধে হলে আমি আছি—এই বাক্যটা তার খুব চেনা-চেনা লাগছে। খুব চেনা। যেন অনেকবার শোনা। কে বলেছিল, কে? কাকে? তাকে কি? কিন্তু তার অসুবিধেতে তো কেউ ছিল না, কেউ নেই। তা হলে? তা হলে এই মিথ্যে প্রতিশ্রুতি কে দিয়েছিল? সুদ্ধু একটা কথার কথা? জাস্ট? ওঃ হো। কথাটা সে-ই অসংখ্যবার বলেছে। তারই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে বাক্যটা। এইটাই তার সবচেয়ে স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া। কথার কথা

হিসেবেও বলা নয়। সাধ্যমতো সে কথাটা রাখতে চেষ্টা করে। সেটাও আবার তার স্বভাব। অস্তিত্বের ভেতরে কোথাও একটা নিজ প্রজাতি আপামর মনুষ্যসাধারণের কাছে একটা দায়বোধ। যেন নিজে টিকে থাকার জন্যও। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে যে মানুষের জ্ঞান, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতিবিরোধী হবার জন্য প্রচণ্ড প্রতিরোধ, তার ফলে নেমে আসে প্রকৃতির করাল প্রতিহিংসা। তার বিরুদ্ধে মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে একটা পারস্পরিকতার সম্পর্ক চাই। এইটাই যেন জৈব মানুষকে ছাড়িয়ে ওঠা মনোময় মানুষের ভেতরের দায়। তারই ফলে একজন আরেকজনকে সাহায্য করে।

কিন্তু এই কথা সে কতবার বলেছে? কত যে অদ্ভুত-অদ্ভুত পরিস্থিতিতে। আঁদ্রে তাকে, তার বিবাহিত স্ত্রীকে ছাড়তে চাইছে না। তার বাবাও পণ করেছেন—এই বিয়ে নাকচ না হলে আঁদ্রে তাঁর সম্পত্তি পাবে না। বাবা প্রায় মৃত্যুশয্যায়, সমস্ত চলে যাবে—ভাগনের হাতে আর চ্যারিটিতে। মা কাতর অনুনয় করছেন। মায়ের অনুনয়টা তার কাছেও পৌঁছেছিল। মধ্যযুগীয় প্রায়। তবে তাঁর প্রস্তাবটা ছিল আরও অদ্ভুত। আঁদ্রে তাকে ডিভোর্স করে বাবার কাছে জিফ-সুর-ইভেৎ-এ চলে যাক। বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারটা চুকে যাক, বাবা মারা গেলে, ও আবার ফিরে এসে অদিতিকে বিয়ে করুক। মায়ের কোনও আপত্তিই নেই। একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ যাকে বলে। চালাকি? চালাকিই তো! ওর মায়ের কাছে ব্যাপারটা যত প্র্যাকটিক্যাল মনে হয়েছিল, আঁদ্রের অবশ্য তা হয়নি। সে ততদিনে অদিতিকে, তার মানবতার দায়গুলোকে বুঝতে শুরু করেছে। অদিতি শুধু বলেছিল—আমি তৈরি।

—আমি তৈরি নই!

—কিন্তু তুমি যদি আমার জন্যে এত মান সম্মান, বিষয়সম্পত্তি হারাও, একদিন না একদিন তোমার আমার ওপর রাগ হতে থাকবে আঁদ্রে।

—আমার প্রকৃতির সবই কি তুমি জেনে গেছ?

—তোমার নয়, সাধারণভাবে মানব প্রকৃতি। আমার সহজ বোধ। তোমার স্যাক্রিফাইসটা আমি বইতে পারব না আঁদ্রে।

—তা হলে মা যা বলছেন তাতেই তুমি রাজি?

—সে পরে দেখা যাবে। আগে তো ডিভোর্সটা করো।

—মানে? তুমি কথা না দিলে আমি ওদিকে যাবই না।

—আমি কোনও কথা দিতে পারছি না আঁদ্রে। আমি তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি। তুমি টাকাপয়সার লোভ করছ না, আমি জানি, কিন্তু তোমার মা-বাবার জিনিস সব বাবার বোনের ছেলের হয়ে যাবে—এইটা মেনে নিতে পারছ না—কী ঠিক না?

আঁদ্রে আর্দ্র গলায় বলেছিল—তোমার চেয়ে বেশি আমায় কেউ বোঝে না।

—তা হলে ডিভোর্সটা নাও।

—তুমি কথা দাও আগে।

—পরে দেখা যাবে, বললুম তো, আমি তো আছি!

আঁদ্রে কী বুঝল কে জানে। 'আমি তো আছি'র ভরসায় ডিভোর্স করে চলে গেল। পরবর্তী দশ মাসের মধ্যে আসতে পারল না। মেট্রোতেই তো চলে আসা যেত। কতটুকুই বা দূর! বাবা তো তাঁর গ্রামের বাড়িতেই রোগশয্যায় ছিলেন। বোর্দোতে তো ছিলেন না! কতগুলো কাতর চিঠি এসেছিল সে সময়ে, কিন্তু অদিতি ততদিনে অন্য ঠিকানায় চলে গেছে। বুকের ভেতর কী পাথর! কী পাথর! সমস্ত বুঝেও! আঁদ্রের তার প্রতি আন্তরিক টান বুঝেও। কেউ বলেনি সে সময়ে আমি তো আছি। ভেতর থেকেও কোনও ভরসার স্বর শুনতে পায়নি। বাবা-মা তো দুঃখিত ছিলেনই। কোনওদিনই আঁদ্রের সঙ্গে বিয়েটা সেভাবে মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের ডিভোর্সের খবর শুনিয়ে কষ্ট বাড়াতে সে চায়নি। এই অতি সাম্প্রতিক তাঁদের ফরাসি জামাই সম্পর্কে সহনশীলতাটুকু তৈরি হয়েছিল। এরই মধ্যে তাঁদের ধারণা সত্যি হয়ে গেল।

বাবার মৃত্যুর পর খুঁজে খুঁজে অদিতির ঠিকানায় হাজির সে।

—ঠিকানা বদলালে কেন?

—ওখানে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। তার সংক্ষিপ্ত সহজ উত্তর।

চুপ করে মুখ নিচু করে রইল কিছুক্ষণ।

—উনি ভাল আছেন?—সে জিজ্ঞেস করল।

—কে?

—তোমার বাবা!

—কেন? তুমি কাগজে পড়োনি? উনি চলে গেছেন। একটু থেমে বলল—শেষ পর্যন্ত। দাঁতে দাঁত চেপে বলা শেষ কথাগুলো। কী করা যাবে? শুধু রক্তের সম্পর্কের খাতিরে কোনও শ্রদ্ধা, কোনও ভালবাসা জিইয়ে রাখা যায় না। তিনি যদি ছেলের সুখের পথে এমনি অনৈতিক ব্ল্যাকমেল খাড়া করে থাকেন তো এই দাঁতে দাঁত চাপা আক্রোশ, তাঁর মৃত্যুতে সন্তানের এই নিষ্কৃতি বোধ তাঁর পাওনা। কড়ায়গণ্ডায়।

—অদিতি! আমি তা হলে নোটিশ দিই?

—র'সো র'সো। আরে বাবা হুট বলতেই তো আর সব হয়ে যায় না।

মুখটা রক্তহীন হয়ে গেল। এই ফরসা লোকেদের এইটাই মুশকিল। রক্তহীন হওয়া, রক্তবর্ণ হওয়া সমস্তই মুখের চামড়ায় ফুটে ওঠে। কিন্তু অদিতির দয়া হয়নি।

—তাড়াতাড়ি করতে আপত্তি কোথায়?

—তাড়াতাড়ির দরকারই বা কী?

আরও চেপে ধরলে সে বলেছিল—তোমার বাবার শর্তটা কিন্তু অত হালকা ছিল না আঁদ্রে। বোঝবার চেষ্টা করো। তিনি বিদেশিনীকে পছন্দ করতে পারেননি, নিজের সম্পত্তির বিনিময়ে তিনি তো আমার থেকে তোমার মুক্তিই চেয়েছিলেন! তিনি যদি তোমাকে অবিশ্বাস করতেন, তা হলে কিন্তু শর্তটা আরও কড়া হত। কোনওদিনই আমাকে বা তাঁর অপছন্দের কাউকে বিয়ে না করার শর্তটাও লেখা থাকত। তিনি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলেন। এক হিসেবে আমাকেও বিশ্বাস করেছিলেন।

—আমিও তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম। আঁদ্রে ক্রোধে কষ্টে আরক্ত হয়ে বলেছিল।

—আমি কি ভুল করেছিলাম তোমায় বিশ্বাস করে?

—না, তা নয়, নিজের অস্বস্তি গোপন করতে সে ঠান্ডা করা হোয়াইট ওয়াইন এবং মেওয়া নিয়ে এল।

কোনও কিছুই ছুঁল না আঁদ্রে।

—মা-ও কিন্তু....

—হ্যাঁ মা-ও। মা-ই। কী ভাববেন বলো তো আমাকে? সাগরপারের একটা নীতিজ্ঞানহীন মেয়ে যে তাঁর শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি ভোগ করার লোভে মুমূর্ষু মানুষের সঙ্গে একটা চালাকি খেলেছে।

—মা তা ভাববেন না। আঁদ্রে ঘুঁষি মারল একটা টেবিলে। ছিটকে গেল কয়েকটা আখরোট। ছলকে গেল ওয়াইন।

—এবং সত্যিই যদি তা ভাবেন, তাতেও আমার, আমাদের কিছু আসে যায় না। যেতে পারে না। জীবনটা আমাদের। ভালবাসাটা আমাদের। ওঁর, ওঁদের নয়। ওঁদের ভাবনার জন্যে আমি আমার জীবন নষ্ট করতে পারি না। পারি কি?

—আঁদ্রে, তুমি জানো আমি কত অহংকারী। আমি যা নই, লোকে আমাকে তা ভাবলে আমার গায়ে ছ্যাঁকা লাগে।

—তবে কি আমাকে মায়েরও মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে?

অদিতি হতভম্ব।—তুমি বলছ কী? কী বলছ জানো?

—জানি। মা-বাবা আমার অতীত, তুমি আমার বর্তমান।

—কিন্তু ভবিষ্যৎ-ও কি? ওই কথা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না।

—তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে একটা কথার খেলা খেলে যাচ্ছ অদিতি। এটাও চালাকি। এটাই আসল চালাকি। অন্যটা ছিল ভীমরতি ধরা এক বৃদ্ধকে ছেলে-ভুলোনোর প্রশ্ন। এটা, তোমার এই চালাকিটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। এটা একটা সুস্থ, সবল, প্রেমিক, স্বামীকে দূরে রাখবার চালাকি।

—এ চালাকি আমি করব কেন? অদিতিও তেতে উঠতে শুরু করেছে।

—কেন সেটা তুমিই ভাল বলতে পারবে। তবে শুনতে পাই রাজর্ষি গুপ্তার সঙ্গে তোমাকে খুব দেখা যাচ্ছে আজকাল।

—মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আঁদ্রে। রাজর্ষি আমার কলেজের বন্ধু।

—জাহান্নমে যাক তোমার কলেজের বন্ধু! রাজর্ষি মালকে আমার চেনা আছে। কত রাত কাটিয়েছ ওর সঙ্গে?

এক মুহূর্ত বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়েছিল অদিতি। তারপর খুব শান্ত গলায় বলেছিল, ইভেৎ নদীর ধারে ফিরে যাও কিংবা তোমাদের বোর্দোর রিফাইনারিতে বাবার সম্পত্তির অনেক বিলি ব্যবস্থা লাগবে, আমাকে আর বিরক্ত কোরো না।

সে ঠান্ডা পায়ে নিজের শোবার ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। আঁদ্রের শত প্রার্থনাতেও আর দরজা খোলেনি।

কত ছোট ছোট কথায় কত বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় মানুষ! কথা, কথা, কথার হুল সাংঘাতিক। অসহ্য বেঁধে, কিছুতেই ভুলতে দেয় না। বিঁধেই থাকে।

দরজা খুলে দিল শীলাদি। ঘুম চোখ।

—যাও শীলাদি, ঘুমোতে যাও।

—কারও কোনও বিপদ-আপদ তো নয়?

—নাঃ।

বিপদ-আপদ তো বটেই। কিন্তু শীলাদির তো জানবার দরকার নেই। এইসব সময়গুলোতে সামান্য বিরক্তি হয় তার। এই অনর্থক জানতে চাওয়া, এগুলো ভারতীয় অভ্যাস। তার মা হলে জানতে চাইতে পারতেন। কিন্তু শীলাদি কেন? ইশ্‌শ্‌। লজ্জায় জিভ কামড়ে ফেলল অদিতি। রুক্ষ, রূঢ় শোনায়নি তো তার 'নাঃ' টা? রুক্ষ না হলেও রূঢ় তো বটেই। তোমার ব্যাপার নয়, তোমার শোনবার দরকার নেই। বিনা কারণে তো রাত দশটায় কেউ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায় না! এখানে!

আমি কি একাচোরা, একালষেঁড়ে, দাম্ভিক প্রকৃতির হয়ে যাচ্ছি? নিজেকে শুধোয় সে। বিছানার আশ্রয়ে এমন একটা স্বপ্নহীন অথচ বিক্ষিপ্ত ঘুম আসে যা অনেকদিন আসেনি। ভুরু কুঁচকে আছে। ভেতরে অনেক প্রশ্ন, জবাব চাই, জবাব দাও। তুমি কে? কেমন? কোনটা তোমার প্রকৃত অন্বেষা? তুমি যা যা করেছ সবই কি অন্যের ব্যবহারের প্রেক্ষিতে? প্রতিক্রিয়ায়? তোমার নিজের কোনও দায় নেই? সত্যি কি তুমি আঁদ্রের প্রতি একটা কৃপামিশ্রিত ক্রোধ হতাশা পোষণ করোনি? যখন দেখতে আঁদ্রে তার বাবা বা মায়ের চিঠি নিয়ে বসে আছে। মাঝরাতে উঠে বারবার টয়লেট যাচ্ছে। একটা হুইস্কি নিয়ে বসল, হঠাৎ কথার জবাব দিল না, শুনতেই পায়নি, তখনই তো তুমি বুঝেছিলে সে চিন্তিত, ভীষণ। চিন্তার কারণ বই কী! কিন্তু তার স্ত্রীর যদি তার প্রথম চিন্তা হত তা হলে তো ওই মাঝরাতে হুইস্কি নিয়ে বসাটা হত না। দ্বন্দ্ব? দ্বন্দ্ব কেন থাকবে? আমি অনেক ভালবেসে, বেশ দুরূহ কোর্টশিপের সিঁড়ি পার হয়ে বিয়ে করেছি। কেউ যদি দাবি করে তুমি তাকে ত্যাগ না করলে তার সম্পত্তি পাবে না, তাতে তুমি ভাববে? ভাববার কী আছে এতে? সিদ্ধান্তই বা কী! এমন নয় যে আঁদ্রে বোর্দো তুমি দরিদ্র ছিলে। দিব্যি শিল্প ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলে, কখন কোনটা বাজারে কাটে ভাল তা পর্যন্ত বুঝে ফেলতে শুরু করেছিলে। 'ত্রোঁপ এস্প্রি' অর্থাৎ মানসিক ধাপ্পা যাকে বলে।

কে একটা ছোঁড়ার বুদ্ধি রোগা ও ব্রায়েন একটা ছোট ছেলেকে নানান তেল রং মাখিয়ে ক্যানভাসের ওপর দিয়ে টেনে নিচ্ছিল। সেটা যে বাজারে ধরবে তা তো তুমি বুঝে গিয়েছিলে, সে ছেলেটাকে কম তোলোনি। কাজেই তোমার অর্থকষ্ট ছিল না, আমি তখনও সেভাবে প্রতিষ্ঠিত নই, কিন্তু নিজেরটা তো নিজে চালিয়ে নিতে পারতুমই। মনে কেন দ্বন্দ্ব আসবে আদৌ?

—এইটাই ভেতরে ভেতরে ওয়ার্নিং বেল হয়ে বেজেছিল। এ যে ভাবছে! অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। বারবার চিঠিগুলো পড়ছে রে! উত্তর দিচ্ছে, অদিতিকে পড়েও শোনাচ্ছে আবার—বাবা, এভাবে রি-অ্যাক্ট করাটা তোমার ঠিক হচ্ছে না। অদিতি আমার বিবাহিত স্ত্রী। তোমার উত্তরাধিকার পাবার জন্য আমি তাকে ত্যাগ করব? তা হয় নাকি? তা ছাড়া, অদিতি কত ভাল মেয়ে তা তুমি জানো না।

চিঠিটা তো এরকম হতে পারত : বাবা, অদিতি আমার স্ত্রী, তাকে কোনও কারণেই কখনও আমি ত্যাগ করব না। তোমার টাকা-পয়সা নিয়ে তুমি যা-খুশি করো গে যাও। মা?—ঠিক আছে, মা যদি আইনত কিছু না-ও পায়, আমি মাকে দেখতে পারব, কিন্তু আমি জানি—মা পাবেই। আর আমাকে এরকম চিঠি দ্বিতীয়বার লিখো না। মাকেও বারণ করে দিয়ো লিখতে।

কিন্তু চিঠি তো এসেই যাচ্ছিল, এসেই যাচ্ছিল। ফোন আসছিল মা'র কাছ থেকে। দীর্ঘ, অনুনাসিক ফোন! ঠিক আছে আঁদ্রে তুমি আস্তে আস্তে পোড়-খাওয়া ব্যবসাদার হয়ে উঠছিলে। তুমি শ্যাম কুল দুটোই রাখতে চেয়েছিলে। হয় না।

ব্যস সেই যে অদিতি তোমার মনের মধ্যে কাঁটা বিঁধল, ঘুরতে-ফিরতে খচখচ করত! দুধটা টকে গেল। হতে পারে অহংকার। কিন্তু এটুকু অহংকার তো যে-কোনও আর্থিক স্বাধীনতাসম্পন্ন চিন্তা-কল্পনা-মেধা সম্পন্ন মেয়ের থাকবেই। তুমি তাকে কথা দিয়েছিলে 'তুমি তো আছ।' সে কথাটার খেলাপ তো তুমি করোনি। আঁদ্রেকে দ্বিতীয়বার গ্রহণ করা তোমার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না, কিন্তু অন্য সব রকম সাহায্য তো তুমি করেছ। তার সালঁ সাজানো, ছবি বাছা, অকশনে যাওয়া, মার্কেটিংয়ে সাহায্য করা, যা থেকে তুমি নিজেও আজ মার্কেটিংটা এত ভাল শিখেছ। আঁদ্রে তোমার ওপর থেকে যদি ভালবাসা হারিয়ে থাকি, তা হলে তা কিন্তু আমার কৃপণতা নয়। কোনওখানে দোকানদারি ঢুকে পড়লে ভালবাসা দোকানদারিকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। আর ফেরে না। তোমার মুখের কথা ছিল—'না'। কিন্তু মনে মনে যে তুমি দ্বিধায় কম্পমান তা বুঝতে কি অদিতির বাকি ছিল? কাজেই ওসব কথাটথা নয়, চালাকিও নয়। যা একেবারে অন্তর্গত সত্তার সত্য তাকেই আমি স্বীকার করেছি আঁদ্রে। নিজেকে ভোলাইনি, তোমাকেও ভোলাইনি। আমি এটুকু আজ পরিষ্কার উচ্চারণে বলতে পারি আঁদ্রে, তোমাকে ধরে রেখেও আমি বিয়েটা বাঁচাতে পারতুম না। তুমিই নিষ্কারণে হারাতে আমার ওপর থেকে তোমার আকর্ষণ। সেই দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়বার আগেই সরে এসেছি। আর পরে জোড়া লাগানো? আমার দ্বারা হল না আঁদ্রে। দুঃখিত।

দশ

বাইরে ফটফট করছে সকাল। এ ঘরে এখনও পরদা-টানা ঠান্ডা অন্ধকার। এ সি চলছে, পাখা চলছে। ঘুমের মধ্যেই সাবধানে গরম জলে বাথ সল্ট মিশিয়ে স্পঞ্জ করিয়ে দিয়েছেন। হাত-পাগুলো থেকে ধুলো-ময়লা তোলা আরও কয়েক দিনের ব্যাপার। ড্রেস বদলে দিয়েছেন, সারা গা পাউডারে সাদা। ঠিক ওইভাবেই ঘুমোচ্ছে এখনও। পাশ থেকে সাবধানে উঠে এসেছে তনিকা।

—আন্টিমাসি!

—কী রে! উঠল?

—না।

—আর কতক্ষণ?—সর্বাণীর মুখে উদ্বেগের ছায়া।

—ঘুমোক না, যতক্ষণ খুশি।

—তা অবশ্য। ওষুধের এফেক্টটা পুরো কেটে যাবার আগে তুললে হ্যাং-ওভার থেকে যাবে। তখন খিটখিটোনি শুরু হবে।

—আমি একটু ঘুরে আসি।

—কোথায়? কেন?—ভীষণ ত্রস্ত হয়ে বললেন সর্বাণী।

—জামাকাপড় আনিনি তো কিছু। তা ছাড়া বোঝোই তো মিসেস উইলিয়ামস ভাববেন। শেষকালে ঢুকতে না দিলে বিপদে পড়ব।

—জামাকাপড় তো মিমিরই পরতে পারিস ক'দিন। আর উইলিয়ামসকে তো ফোন করে দিলেই হয়।

—ফোন করে দিলে বিশ্বাস না-ও করতে পারেন। যা সন্দেহবাতিক। আগে একদিন হয়েছিল। সকালে ফিরতে ওয়ার্ডরোবের ভেতরে টাঙানো জামাকাপড়গুলো হিঁচড়ে হিঁচড়ে ফেলে দিতে লাগলেন।

—অত কীসের তনিকা। চলে আয় না এখানে, অসুবিধে কী তোর? আমিও খানিকটা নিশ্চিন্ত হই।

—তা হয় না। আমিও পারব না। ও-ও না। জানো তো সবই।

হঠাৎ সর্বাণীর কানে বাজতে লাগল—অনোহিতা আমার কাছে আছে, আমার নাম অদিতি সরকার, ফোন—।

বললেন—আমিই ফোন করে দিচ্ছি বরং। তা হলে ভাববেন না। সত্যি এটা আমার আগে ভাবা উচিত ছিল।

তিনি নম্বরটি পেলেন। ওদিকে বেজে যাচ্ছে, বেজে যাচ্ছে, তারপরে কণ্ঠস্বর শোনা গেল— মি. অ্যান্ড মিসেস উইলিয়ামস স্পিকিং। উই আর নট অ্যাভেলেবল জাস্ট নাও। লিভ ইয়োর মেসেজ...হ্যালো...পুরুষ কণ্ঠ। মানে মি. উইলিয়ামস।

—আমি মিসেস সাহা রায় বলছি। হ্যাঁ অনোহিতার মা। তনিকা আমার কাছে কালও ছিল, আজও থাকবে। ক'দিনই থাকবে। আসলে অনোহিতা খুব অসুস্থ। হ্যাঁ, মিসেস উইলিয়ামসকে বলে দেবেন। আমার শুভেচ্ছা জানবেন দু'জনে। তনিকার খেয়াল রাখার জন্য আপনাদের কত যে ধন্যবাদ দেব।

ফিরে দেখলেন তনিকা মুচকি মুচকি হাসছে।

—সুযোগ পেয়ে খুব তেল দিয়ে নিলে। এক যুগ প্রিন্সিপ্যালগিরি করে কী করে পারো আন্টিমাসি!

—আমার কপালটাই ওই রকম, সর্বাণী হেসে বললেন—অভিভাবকদের সঙ্গে, টিচারদের সঙ্গে ছাত্রীদের সঙ্গে সবার সঙ্গেই এইভাবে চলে এসেছি। না হলে তনিকা—অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, তারপর হঠাৎ বললেন—ক'দিন আগে আনসারিং মেশিন চালিয়ে ঠিক এই এক মেসেজ পেয়েছিলাম—অনোহিতা আমার কাছে আছে। ভাববেন না। আমি অদিতি সরকার, ফোন নং এই। মিমি কিন্তু ছিল না। উনি মিমি বলে কাকে ভুল করলেন বল তো।

—আমাকে, তনিকা মুচকি হেসে বলল—উনি নিশ্চয়ই আমার ব্যাগ ঘেঁটেছিলেন, মিমির ডায়েরি ছিল। তার থেকে যা নাম, ফোন নম্বর পেয়েছেন ফোন করে দিয়েছেন। ভাবলেন খুব একটা চালাক চালাক মুভ নিলাম। তা হলে ওই জন্যেই ওঁকে তুমি ডেকেছিলে?

—হ্যাঁ। তো ব্যাগ ঘাঁটতে হবে কেন? তুই কি ওঁকে তোর নাম-ঠিকানা বলিসনি?

—নামটা বলেছিলাম। আর কিছু বলতে চাইনি। আন্টিমাসি আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না। আমি বলব না। আর ভুলেও ডায়েরিটার কথা উচ্চারণ করবে না।

—বেশ। আমি আমার লক্ষ্মণের গণ্ডি জানি। বিষণ্ণ মুখে বললেন সর্বাণী।

—ওখানে তোকে ওরা কী ব্রেকফাস্ট দেয়?

—ওই ডিম কলা টোস্ট, টোস্ট ডিম কলা, কলা ডিম...

—কী খাবি?

—যা হোক।

—দুধ কর্নফ্লেক্স? ফ্রেঞ্চ টোস্ট, টোম্যাটো-চিজ অমলেট?

—এনিথিং। তোমার যেটা সুবিধে। খাবার-দাবার নিয়ে ফাস করতে আমার ভাল লাগে না।

এ-ও এক ধরনের লক্ষ্মণের গণ্ডি। সেকেলে মা-ই হন, আর এ-কেলে মা-ই হন, যখন ঘরকন্না করতে নেমেছেন, তখন কে কী খাবে, খেতে ভালবাসে জানতে চাওয়াটা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। দু'-তিনটে বিকল্প যখন তিনি দিতে পারছেন, পারবেন বলেই তো দিচ্ছেন, বিশেষত অতিথি, কন্যাসম, যার কাছে স্বামীর মেয়েটির কাছেও যেমন, তেমনই নিজেকে প্রমাণ করবার দায় তিনি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছেন। কিন্তু, এই, স্নাবিং খাচ্ছেন অনবরত। আন্টিমাসি হিসেবে, অর্থাৎ এদের জুনিয়র স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল এবং অনোহিতার মায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার সূত্রে যে শ্রদ্ধা ভালবাসা তিনি অনায়াসে পেয়েছিলেন, অনোহিতার সৎমা হিসেবে তার সবটাই যেন ধূলিসাৎ। এই মেয়েটি, অনোহিতার বন্ধু, তাঁর যেমন শ্রীলা। এ-ও তাঁকে কথার থাবড়া মারে। অবশ্য শ্রীলা সর্বাণীর বন্ধুত্বের সঙ্গে অন্য কোনও বন্ধুত্বের আগেকার বা আজকের, তুলনা হয় কি না, তিনি জানেন না। তাঁদের মধ্যে এতটুকুও ঈর্ষা, ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ছিল না। তিনি হলেন সবল মেয়ে। শ্রীলা দুর্বল। শারীরিক বা মানসিকভাবে। বরাবর তিনি শ্রীকে রক্ষা দিয়ে এসেছেন। শ্রী উজাড় করে দিয়েছে নিজেকে তাঁর কাছে। একটা সময়ে তাঁরা হোস্টেলে থাকতেন। শ্রীর বাবা টাটায় চাকরি করতেন, বরাবর মেয়েকে কলকাতায় রেখে পড়িয়েছেন। আর তাঁর বাবার সরকারি চাকরি ছিল। দু'বছর অন্তর নিয়ম করে বদলি। এই হোস্টেলই, হোস্টেল-জীবনই পরিষ্কার দেখিয়ে দেয় কতটা পরিপূরক তাঁরা পরস্পরের। সে সময়ে তিনি অ্যাথলিট হিসেবে খ্যাত ছিলেন। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির গণ্ডিতে। শ্রী-ও ওই গণ্ডিতেই গায়িকা হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিল। প্রত্যেকবার তাকে কলেজ-সোশ্যালে গাইতে হত, স্টেজে ওঠবার আগে বলত—দ্যাখ সর্বাণী, আমার হাত-পা কেন ঠান্ডা হয়ে গেছে। এদিকে কান দুটো গরম! কী গরম!

—যা তো ওঠ গিয়ে, চোখ বুজে গেয়ে দিবি।

প্রত্যেকটা গান উতরোত কিন্তু প্রত্যেকবার তার ওই একই রকম হাত-পা ঠান্ডা। তিনি আগুনের মতো ফরসা। দীর্ঘাঙ্গী, শক্তপোক্ত, তখন থেকেই চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ। আর শ্রী পাতলা, শ্যাম, অনির্বচনীয় তার মাধুর্য, তার লাজুক নম্রতা। তাঁদের দু'জনের বন্ধুত্বের একটা ভুল ব্যাখ্যা সে সময়ে করেছিলেন হোস্টেলের সুপার। শ্রীর কথা তো ওঠেই না, তিনিও জানতেন না এ রকম হয়। হতে পারে। জ্ঞানোদয় হল সুপারের কথায়। দু'জনেই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। পরমুহূর্তেই শ্রী ধপাস। জল আন। বাতাস কর, ডাক্তার ডাক।

ডাক্তার আসতে তিনি সোজা সুপারের দিকে আঙুল তুলে বলেছিলেন—ডক্টর মজুমদার, জেনে রাখুন এই ভদ্রমহিলা আমাদের দু'জনের বন্ধুত্বকে নিয়ে খোলাখুলি এমন বিশ্রী কথা বলেছেন যে, আমার মতো শক্ত নার্ভ স্পোর্টস-উওম্যানের মাথায় আগুন জ্বলে গিয়েছিল, আর শ্রীর কথা তো জানেনই, লো-প্রেশার, লো শুগার, ভিতু, অত্যন্ত ভদ্র টাইপের মেয়ে। ডাক্তার সুপারের দিকে চেয়ে বলেন—মিসেস সিং আপনি যে এত বড় কথাটা টপ করে বললেন, আপনার হাতে কোনও প্রমাণ ছিল?

—এ টাইপগুলো আমার জানা। একজন পুরুষালি, একজন মেয়েলি।

—তা থেকেই এমন একটা কংক্লুশনে এসে গেলেন? বলতে পারলেন? লজ্জা করল না? আপনি জানেন না, এই বয়সের মেয়েদের, ছেলেদের মধ্যে খুব নিবিড় বন্ধুত্ব ডেভেলপ করেই থাকে।

ইনসেপারেবল কাপল খুব দেখা যায়। কিন্তু তার মানে অত সরল সোজা নয়। তার জন্য জন্মগত প্রবণতা চাই। সুপার আছেন, এদের ভালমন্দের দিকে নিশ্চয় নজর রাখবেন। কিন্তু হঠাৎ কোনও কারণ ছাড়া অনুমানের ওপর নির্ভর করে এসব...

জ্ঞান ফিরতে শ্রী বলেছিল—আমি আর তোর সঙ্গে এক ঘরে থাকব না সর্বাণী।

—কিন্তু তাতে তো ওই মহিলা জিতে যাবেন।

—কে জিতল না জিতল তাতে আমার কিছু এসে যায় না।

—কিন্তু তাতে প্রমাণ হয়ে যায় যে ওঁর কথায় সত্যি ছিল।

—কী করে?

—তুই-ই ভাব।

শেষ পর্যন্ত নতুন আসা ফার্স্ট ইয়ারের একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ওরা থ্রি-সিটার করে নেয় ঘরটাকে। সেই মেয়ে গার্গী—এখনও ক্যালিফর্নিয়া থেকে তাঁকে চিঠি লেখে। শ্রীলা হয়তো বন্ধুত্ব বাঁচাতে অতটা পটু ছিল না। তার মনের মতো, তার বিশ্বাসের যোগ্য হওয়া বড় শক্ত ছিল।

কিন্তু সেই জোর, সেই ব্যক্তিত্ব আজ কোথায় তাঁর? অতদিন, প্রায় পনেরো-ষোলো বছর অধ্যক্ষগিরিও তো করেছেন, বাচ্চারা মেনেছে, তাদের বাবা-মা'রা মিসেস সেনের ব্যবহারে খুশি, তাঁর কাছে অভিভাবকদের যতটা প্রশ্রয় ছিল, অতটা তো সাধারণত এসব স্কুলে থাকে না। বাইরে থেকে চেহারাটা যতই গম্ভীর জোরালো মনে হয়, ভেতরে ভেতরে তো তা আর নেই তিনি! বাইশে বিয়ে সাতাশে স্বামীহারা সন্তানহীন। সেই সময়ে একদিকে স্কুল একদিকে মা, ক্যান্সারের রোগী নিয়ে তিনি কতটা ভেঙে গিয়েছিলেন সেকথা শ্রী জানত। শ্রী-ও তো এক হিসেবে তাঁর আশ্রয় ছিল। আবার শ্রীর স্বামী যে তাকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখে, মেয়েকে প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলেছে, অতিরিক্ত মদ্যে ও নারীতে ডুবে থাকে তা-ও তিনি জানতেন। একমাত্র তাঁকে, তাঁকেই শ্রীর স্বামী নবগোপাল কিছুটা শ্রদ্ধা-সমীহ করতেন। যে-কোনও বড় সিদ্ধান্তে তাঁর মতামত নিতেন। নবগোপালকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এমন একটা বিশ্বাস শ্রীর ছিল। বলত—কী জানিস, ও ভেতরে ভেতরে খুব দুর্বল, ইনসিকিওর, অনাথ ছেলে, খুব স্ট্রাগল করে এত উঁচুতে উঠেছে, আমার কাছ থেকেও তেমন কোনও জোর পেল না। তারপর একটু থেমে বলত—আমার জায়গায় তুই থাকলে ওর ভাল হত। সেই ভালটার কথা যে কত দিন কতভাবে বলেছে শ্রী।—মেয়েটাকে আমায় অবজ্ঞা করতে শেখাচ্ছে সর্বাণী, কীভাবে কথা বলে!

—ঠিক আছে আমি দেখছি—

—বাড়িতে মাতাল হয়ে ঢুকছে, লোকজন সব দেখছে, মেয়ে দেখছে, কী লজ্জা, কী চিন্তা সর্বাণী!

—ঠিক আছে আমি দেখছি...

—মোটে চোদ্দো বছর...মেয়েটা একটা পাঞ্জাবি ছেলের সঙ্গে বিশ্রীভাবে ঘুরছে। ওর বাবাকে বলতে গেলে বলে—সভ্য উন্নত দেশে চোদ্দো থেকেই ছেলেমেয়েরা যৌন-স্বাধীনতা পায়। এটা তাদের যৌবনোদ্‌গমের সময়। এখন তো নতুন পাওয়ার আনন্দ, শখ মেটাতে চাইবেই।

—আমি দেখছি।

সে সময়ে কিন্তু পেরেছিলেন। নবগোপাল একটু যেন ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতেই বলত—ছেড়ে দেব, আস্তে আস্তে সব ছেড়ে দেব, দেখো সর্বাণী। একটা রুগ্‌ণ, ভিতু, সিঁটকে থাকা, প্রাণহীন মহিলা যদি স্ত্রী হয় তা হলে মানুষের এই অবস্থাই হয়।

—ও-ও তো বলতে পারে নবগোপাল, একটা রুক্ষ, রূঢ়ভাষী, মদ্যপ মানুষ স্বামী হলে মেয়েদের এই অবস্থাই হয়!

—তা অবশ্য বলতে পারে। মানলাম। কিন্তু অত ভুগলে কি চলে? তুমিই বলো, বিয়ের অভিজ্ঞতা তো তোমারও আছে।

—ভুগছে সেটা কি ওর দোষ? ওর শরীরটাই ডেলিকেট। যাতে জোর পায় তার জন্য ডাক্তার-টনিক সবার বড় শান্তি-টনিকের ব্যবস্থা করো। কী ব্যবহারই করো—দেখতে পাই না মনে করেছ নাকি?

—দেখো সর্বাণী, ওর শরীর ডেলিকেট, মন ডেলিকেট সেটা তো আমার দোষ নয়। আমি কেন তার জন্য ভুগব। আমি বাড়িতে যা না পাই, স্ত্রীর কাছ থেকে যা না পাই—তা অন্য জায়গায় পেলে আদায় করে নেব।

একটা ডোন্ট কেয়ার বারফাট্টাইয়ের মতো করে বলেছিল কথাগুলো। তিনি রাগে ওখানে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শ্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হত রোজই। যে সময়ে নবগোপাল থাকত না সেই সময়ে। দশ-বারো দিন পর দুম করে স্কুলে এসে হাজির।

—তুমি?

—কী হল হঠাৎ তোমার? যাচ্ছ না! বন্ধুর শরীর মন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা সব ভ্যানিশ?

তিনি চুপ করে কাজ করতে লাগলেন।

—তোমরা দু'জনে দু'জনকে বিয়ে করলে না কেন সর্বাণী? পার্ফেক্ট জুটি।

—আচ্ছা, সত্যি বলো তো তোমাদের মধ্যে কোনও লেসবিয়ান রিলেশন ছিল কি না।

ভেতরে ভেতরে চমকালেও তিনি অখণ্ড মনোযোগে কাজ করে যেতে থাকলেন।

—শনি-রবিবার সন্ধেগুলো যা হোক একটু খোলামেলা গল্পগুজব করে হাসি-ঠাট্টায় সময়টা কাটছিল। আর কাটবে না। উইকএন্ডগুলো ক্লাবেতেই...নবগোপাল উঠে পড়ল—আচ্ছা তুমি কাজ করো। আমি উঠি।

আর তখনই সর্বাণী বুঝতে পারলেন প্রথম, কোনও অজ্ঞাত কারণে নবগোপালের ওপর তাঁর একটা প্রভাব আছে।

অপারেশন থিয়েটারে ঢোকবার আগে শ্রী বলেছিল—স্বামী নেই, মেয়ে নেই, তুই শুধু তুই-ই আছিস আমার। সর্বাণী কেউ আমায় না চাইলেও আমি তো ভাবনা এড়াতে পারি না। মানুষটা অ্যালকোহলিক হয়ে যাচ্ছে, মেয়েটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে—তুই বাঁচা।

গেল, আর ফিরল না।

দু'বছর সমানে যাতায়াত করেছেন, শ্রীর সংসারটাকে একেবারে মাথায় করে রেখে দিয়েছিলেন। দিব্যি চলছিল সব, নবগোপাল বাড়ি আসছিল, মাতাল হচ্ছিল না, মেপে মেপে খেত, তিনিও একটু-আধটু খেতেন। আর মিমি? অনোহিতা। নামটা তাঁরই দেওয়া। অনেক ভালবেসে। জরথুস্ত্রীয় ধর্ম সম্পর্কে পড়তে পড়তে পারস্যের প্রাচীন সব দেব-দেবীর প্রসঙ্গে পেয়েছিলেন নামটা। অনোহিতা। জরথুস্ত্র-পূর্ব সময়ের দেবী। অনেকটা আমাদের সরস্বতীরই মতো। গল্প করছিলেন শ্রীর কাছে। তোর মেয়ে হলে নাম রাখব—অনোহিতা। দারুণ পছন্দ শ্রীর। তা সেই অনোহিতা মায়ের মৃত্যুর পর একটু তো সমঝেছিল। তাঁকে ভয়ও করত, মানতও আর ভালবাসত বলেই তো তিনি জানেন। কোনও জানাটাই সম্পূর্ণ নয় দেখা যাচ্ছে। বাবার সঙ্গে বিয়ের পর খ্যাপা, উন্মাদ মতো হয়ে গেল। অথচ নবগোপাল যখন প্রস্তাবটা দিয়েছিল তখন ওদের দু'জনকেই বাঁচাবার, ওদের একটা ঘর দেবার তাগিদ থেকেই তো তিনি রাজি হয়েছিলেন। তাঁর নিজের দিক থেকেও কি একেবারে কিছুই ছিল না? একলা থাকতে কার ভাল লাগে! শুকনো জীবন কার ভাল লাগে? এ একটা গড়া সংসার, চেনা মানুষ, অনেকটা তাঁরই হাতে গড়া। একমাত্র নরগোপালের সঙ্গে নিভৃত সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর একটা গূঢ় শুচিবাই ছিল।

—কী করে? প্রিয়তম বন্ধুর স্বামী যে!

—আমি আসছি যাচ্ছি। বেশ তো চলছে, চলুক না!

নবগোপাল অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে বলেছিল—তুমি কি জানো সর্বাণী, গত পাঁচ-ছবছর শ্রীর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না। আর পাঁচ বছরই বা কেন, সারা জীবন কতটুকুই বা পেয়েছি!

আমার কি স্ত্রীর মতো স্ত্রী পাবার অধিকারও নেই?

খুব অপ্রস্তুত সর্বাণী। দ্বিধা কাটিয়ে বলেছিলেন—তোমার চরিত্র নিয়ে ও যা শুনত তাতে বিতৃষ্ণা আসাই সম্ভব।

—তুমি যদি আসো, শুনবে না।

—কথা দিতে পারো?

—হানড্রেড পার্সেন্ট।

—ড্রিংক, স্মোকিং?

—স্মোকিংটা তো তেমন কিছু ব্যাপার নয়, ড্রিংকটাই। ছেড়ে দেবার ইচ্ছে আছে। শরীর, অভ্যাস বাদ সাধে। আমি চেষ্টা করছি। করব।

—তোমার ওই উদ্ভুটে-বিদঘুটে ধারণাগুলো মেয়ের মাথায় ঢোকাবে না?

—দিস ইজ ডিফিকাল্ট। ঢুকিয়ে ফেলেছি যে। এখন উলটো আচরণ করলে ও... আমি জানি না—সর্বাণী চেষ্টাটা তুমিই করো। আমি হেল্প করব।

***

—তোরা আমাকে আনলি কেন?

পরদাগুলো সরিয়ে এখন যথেচ্ছ আসতে দেওয়া হচ্ছে পাকা আপেলের মতো সকালের রোদকে। একটা চেয়ারে বসে তনিকা একটা বই পড়ছিল। শুনতে পেল ক্ষীণ গলায়—তোরা আমাকে আনলি কেন?

তনিকা মুখ তুলে তাকাল—ফেরত যাবি? যা! অ্যালকোহলের সঙ্গে কড়া ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাইয়ে বাড়ির থেকে বাইরে কোথাও ডাম্প করে দিচ্ছিল। নেহাত আমরা জানতে পারি তাই। যেতে চাস যা। আপাতত তালা ঝুলছে। ভাম বম্বে গেছে।

—কেন?

—মালা জপতে বোধহয়। কোনও হাই-টেক গুরুর কাছে মেডিটেশন শিখবে।

—এখানে আনলি কেন?

পাতা উলটিয়ে তনিকা বলল—এটাই তোর বাড়ি বলে। সবচেয়ে সোজা কারণ।

—এটা আমার বাড়ি নয়।

—তোর বয়সটা এখন আর বাও কি তেও নেই, এটা বুঝতে চেষ্টা কর।

—বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্টে হিয়ার।

—বেশ তো আমার ঘরে থাকবি? পার্ক সার্কাস? মিসেস উইলিয়ামসের গাউনচ্ছায়ায়।

—ওই ভদ্রমহিলা কে রে?

—কোনজন?

—ওই যে অ্যাকাডেমিতে আমার নাম ধরে ডাকলেন—অনোহিতা, এটা মারামারি করার জায়গা নয়।

—উনি একজন বেশ নামকরা চিত্রশিল্পী।

—উনি কী করে আমাকে চিনলেন?

—আন্দাজে।

—মানে?

—নিশ্চয়ই আমি ওঁকে কিছু বলেছিলাম যা থেকে ক্লেভার-গেস করে নিয়েছেন একটা।

—কতদিন জানিস ওঁকে?

—খুব অল্প, দু'-এক দিন।

—তারই মধ্যে আমার কথা নাম-ধাম বলে দিলি? বন্ধুত্বের মধ্যে একটা প্রাইভেসি থাকবে না?

—নামের মধ্যে প্রাইভেসি থাকে আমার জানা ছিল না। ওইসব ছোটা সাকিল, রাজু ভ'ই, আফতাব ভাই—এদের নামেতে অবশ্য থাকে। তুই ভেবে দ্যাখ তুই কোন শ্রেণীতে।

—তুই নিশ্চয়ই শিগগিরই বম্বে যাচ্ছিস!

—কে বললে? কেন? এবার আশ্চর্য হয়ে তনিকা মুখ তুলল।

—না, ওই ভাম যাকে বলছিস তার সঙ্গে ভাব জমাবার জন্যে, তোর কেরিয়ার, তোর ছবি, এগজিবিশন-টন, বিক্রি...সবই তো...।

—আমার এসবের জন্যে ভাম লাগবে না। তোর লাগতে পারে অবশ্য।

—কাকুর স্টুডিয়োতে তুই গিয়েছিলি—আমি জানি, আমাকে তোদের রান্নাই বলেছে।

—যাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কী আছে? আমার টিচার। তাঁর ছবি আঁকার প্রসেস দেখবার জন্যে তিনি যদি উদার আহ্বান জানান—প্রত্যাখ্যান করাটা কি ঠিক?

—তারপর 'আ গলে লাগ যা—'

—মিমি, তোকে একটা কড়া কথা বলবার সময় হয়েছে। আমি তোর মতো সস্তা, মিন নই।

—আমি সস্তা? আমি মিন?

—মূলত না। কিন্তু যেভাবে চলছিস, তাতে লোকের এই ধারণাই হবে, আর ধারণা হলে লোকে ক্রমশ তোর সস্তামির মিননেসের সুযোগ নেবে। যেমন নিচ্ছে।

—ঠিক আছে আপাতত তোর কথাগুলো হজম করলাম। পরে উত্তর পারি।—আপাতত বল ভাস্কর চক্রবর্তীর স্টুডিয়োতে গিয়ে তুই কী পোজ দিলি!

—আমি কোনও পোজ দিইনি তো! তুই দিয়েছিস দেখলাম। দু'-চারটে চারকোল স্কেচ, ইংক স্কেচ, আমি নিজে ছবি আঁকি, মডেল নিয়েও এঁকেছি। কিন্তু তোর পোজগুলো আমার ভাল লাগেনি। আর পোজ, তোর ভাস্কর চক্রবর্তীর পোজও দেখলাম, বাথরুমে চান করতে ঢুকে বললে—তনিকা, আমার পিঠটাতে একটু সাবান ঘষে দেবে?

—তারপর?

—তারপর তো আমি আর জানি না! প্রচণ্ড বৃষ্টি আসছিল। রাগে পাগলার মতো হুড়মুড় করে বেরিয়ে যে বাসে পারলাম উঠে পড়লাম। এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলাম ভিজতে লাগলাম ভিজতে লাগলাম...সারা রাত ভাবতে লাগলাম ভাবতে লাগলাম...ভাবতে লাগলাম...

—কী এত ভাবলি?—ছোট একটু হাসি ওর গলায়।

—এই, তুই কোথায় চলেছিস...আমি কোথায় চলেছি...জীবন...পৃথিবী কোথায় চলেছে!

—এত ভাববার কী আছে! জীবন...পৃথিবী কিছুর ওপরই আমাদের কোনও কন্ট্রোল নেই। মাঝখানে একটা হাইফেনের মতো আমাদের জীবন। যে যেরকম ভাবে পারি এনজয় করব। এর মধ্যে ভাবনার জায়গা কোথায়?

—আমার মনে হয় ভাবনার আছে, তোর মনে হয় নেই—এটাই আমাদের তফাত। তোকে ভাস্কর চক্রবর্তী কোলে বসিয়ে চুমো খেল। তুই তার গলা জড়িয়ে ধরলি, আমাকে পিঠে সাবান ঘষতে বলল—আমি ঘেন্নায় অপমানে পাগল হয়ে গেলাম।...এখন মুখ-টুখ ধো, খাওয়া-দাওয়া কর। মনে হচ্ছে অনেকদিন কিছু জোটেনি।

—কে বললে? কালই সুলেমনের বিরিয়ানি খাইয়েছিল, ড্রিংকটার পরে। দা-রুণ। অনোহিতা ফিক করে হাসল।

রাগত চোখে প্রায় অবিশ্বাসের চোখে তার দিকে তাকিয়ে তনিকা মুখ ফিরিয়ে নিল। বাইরে রান্নাঘর পর্যন্ত গিয়ে বলল—পঞ্চমীদি, মিমি উঠেছে ওর খাবারটা...

—কী খাবে?

—যা খায় সাধারণত, তাই দাও না। অত কী।

ট্রের ওপর সব সাজিয়ে দিল পঞ্চমী। ট্রেটা নিয়ে অনোহিতার ঘরে ঢুকল। মুখে ব্রাশ, নাইটিটা কাকতাড়ুয়ার জামার মতো ঢলঢল করছে, অনোহিতা বলল—যাগ, তুই হেঠেঠিৎ। ভয় করথিল হাবার টিনি না আঠেন। অর্থাৎ যাক তুই এসেছিস। ভয় করছিল আবার তিনি না আসেন।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ট্রেটা টেবিলে রাখল তনিকা।

মুখ-টুখ ধুয়ে তিনি এলেন—চোঁ করে দুধটা খেয়ে নিলেন—আঃ, ঠান্ডা দুধ, ভ্যানিলা দেওয়া—কতদিন খাইনি রে! তা নবগোপালের মিস্ট্রেসটি এখন কী করছে?

এক সেকেন্ড উত্তর দিতে দেরি হল তনিকার—ভাল করে চোখ ধুসনি মিমি। তোর বাঁ চোকে পিচুটি লেগে আছে।

—ইঃ খারাপ খারাপ কথা বলিস কেন? চোখে ময়লা বললেও তো বোঝা যায়।

—বেশ করেছি, বলেছি, যে নিজের মাকে নবগোপালের মিস্ট্রেস বলে, তার চোখে পিচুটিই হয়, তার কানে খোল নাকে শিকনি।

—আর হাতে কুষ্ঠটা বললি না? ভুলে গেলি?

—সব মুখ দিয়ে কি আর অভিশাপ বেরোয়?

—তা মন্দ কী বলেছি? ও আমার নিজের মা কবে থেকে হল?

—তোর নিজের কথাই কোট করছি, নইলে সত্যি তো নিজের মা নন।

—কোট? কী কোট?

—নিজের মায়ের ওপর তো নালিশের শেষ ছিল না তোর। সব সময়ে শুয়ে থাকে, একটা ভাল কিছু খাবার বানিয়ে দিতে পারে না। বাবা রাত্তির বেলা বাড়ি ফিরলে কাছে যেতে দেবে না। আন্টিমাসি যদি আমার নিজের মা হত!—বলিসনি! আমার মাথার ক্যাসেট রিপ্লে করলাম। নিজেরটা রিভিউ করলে তুইও পেয়ে যাবি।

—বলেছিলাম বুঝি! তা হবে! আসলে তখন তো মাকড়সা জাল বুনছে—মাদিটা ধরা পড়েই আছে, মদ্দাটাও পড়ো পড়ো। কাজেই খুদে মাছিটার জন্যেই যত জাল। আর দ্যাখ তনিকা, মা সম্পর্কে ও রকম অনেক নালিশই ছেলেমেয়েরা করে, তার মানে এই নয় তারা মাকে ভালবাসে না। কেমন চালাকিটা করল? নবগোপালকে সরিয়ে দিল লন্ডন, মিমিরানিকে এক্সকার্শনে পাঠিয়ে দিল সুন্দরবন। কোস্ট ক্লিয়ার, এবার প্রাণের বন্ধু শ্রীর নাক থেকে অক্সিজেন-মাস্কটা খুলে নিয়ে প্রাণটা বেরিয়ে গেলে আবার পরিয়ে দাও। কম্মো ফতে! না কী বলে কেল্লা ফতে!

শুনতে শুনতে তনিকার চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছিল। সে একটু পরে বলল—তুই যখন সেবার সুন্দরবনের বাঘ দেখতে গেলি—তখন তো একবারও তোর মুখে শুনিনি কেউ তোকে জোর করেছে। এমনকী মাসির অপারেশন হবে তা পর্যন্ত জানতাম না।

—ঠিক যেমন অপারেশনটার কথা জানতিস না, তেমনই মিমি দু' দিনের জন্যে তো যাচ্ছিস, ঘুরে আয় না, আমি তো আছি—টাও জানিস না।

—তো তার থেকে তুই এই কংক্লুশনে এসে গেলি যে...তুই একটা রাক্কুসি মিমি। ঠিক একদিন তোর রাক্কুসিটা তোর চেহারার ওপর ফুটে উঠবে।

—ছবির ওপর ফোটে, আসল চেহারায় না, 'ডরিয়ান গ্রে' পড়িসনি? 'পিকচার অব ডরিয়ান গ্রে?' বলতে বলতে ওমলেট দিয়ে পাউরুটির টুকরো গেঁথে মুখে পুরল অনোহিতা।

—ও হ্যাঁ, তনিকা বলল—তোর রবি শাস্ত্রীকে আমি ছেড়ে দিয়েছি।

তাড়াতাড়ি পাউরুটিটা গিলতে গিয়ে বিষম খেল অনোহিতা। তনিকা জলের বোতল আনল।

—ছেড়ে দিয়েছিস?

—ধরিইনি কোনওদিন, ও-ই তনিকা তনিকা করে আসত, আমার ভাল লাগত ওকে। হ্যাঁ একটু-আধটু ঘোরাঘুরি করেছি, কিন্তু যেদিন বুঝতে পারলাম ও তোর সঙ্গে ইনভল্‌ভড্ আর ঘেঁষতে দিইনি।

—তুই কি আরমানের কথা বলছিস?

—ইয়া। হু এলস্।

চোখ সরু করে অনোহিতা বলল—ও রবি শাস্ত্রী কবে থেকে হল?

আমাদের আর্ট কলেজের ছেলেরা ওকে তা-ই বলত। এই তনিকা, রবি শাস্ত্রী তোর খোঁজ করছিল, এই তনিকা কাল রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিলি—এই।

চোখ আরও সরু করে অনোহিতা বলল—ও আমার সঙ্গে ইনভল্‌ভড্ তোকে কে বলল? জানলি কী করে?

—ও-ই বলে থাকতে পারে!

—বলে থাকতে পারে? তার মানে বলেনি। তনিকা তুই? তুই?

—যে ভাবেই হোক জেনেছি। ব্যস, এরপর আর আমার সঙ্গে কোনও রকম বেয়াদবি করবি না। আমি আন্টিমাসি নই। সহ্য করব না।

ফোন বাজছে, তড়াক করে উঠে পড়ল অনোহিতা—বাপি, নিশ্চয় বাপি।

—বাপি আমি মিমি বলছি।

—মিমি কি তোমার ডাকনাম?

—হ্যাঁ। আপনি?

—আমার নাম অদিতি সরকার। তোমার বন্ধু তনিকা আমায় চেনে। তুমি ভাল আছ?

—ভাল থাকব না কেন?

—না, কালকে তোমাকে খু-ব খারাপ অবস্থায় দেখেছি তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

—কাল...আপনি...আমাকে

—ভাস্করদার তারাতলার স্টুডিয়োয়, রাত তখন প্রায় এগারোটা। একরকম অচৈতন্য ছিলে, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম।

—আ...আমি ঠিক হয়ে গেছি।

—আর একটু ভাল হয়ে ওঠো, তারপর একদিন তনিকা আর তুমি আমার স্টুডিয়ো 'চিত্রভানু'তে আসবে, হ্যাঁ? নিমন্ত্রণ রইল। ঠিক আছে, রাখছি।

ফোনটা থপাস করে রেখে দিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসল অনোহিতা।

তনিকা বলল—তুই কী করে ভাবলি তোর বাবার ফোন, আই. এস. ডির রিং ও রকম হয়?

—উনি...উনিও কালকে ওখানে গিয়েছিলেন?

—কে?

—অদিতি সরকার?

—হ্যাঁ, তা ছাড়া ওঁর স্টুডিয়োর আর একজন আর্টিস্ট শৌনক ভিভিয়ান বিশ্বাস। খুব প্রমিসিং...

—ও-ও?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—তুই জানিস না মিমি কী মেস তুই করেছিস। চতুর্দিকে কী সাঙ্ঘাতিক স্ক্যান্ডাল?

ভাস্কর চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে ওঁর স্ত্রী ছেলে আন্টিমাসিকে দিনের-পর-দিন গালিগালাজ করেছেন। তোর সো-কলড্ কাকু—আন্টিমাসি রাত দশটায় ফোন করে বলেন—এ বেয়াদপ, বেহায়া ছুঁড়িটা আমার স্টুডিয়ো থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। আমার ওপর হামলা করছে, আমার জীবন, কেরিয়ার

সব সর্বনাশ করে দিল। ওকে কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছি। তোমরা নিয়ে যাবে তো যাও। না হলে মাঝরাতের ট্রাক-ড্রাইভাররা তুলে নিয়ে যাবে। তা উনি কী করবেন—একা? তার ওপর এই তো রিলেশন করে রেখেছিস। উনি অদিতিদির সঙ্গে যোগাযোগ করেন, আমার সঙ্গেও। অদিতিদি শৌনককে নিয়ে এসেছিলেন।

অনেকক্ষণ অনোহিতা বড় বড় চোখ করে শুনল। তারপর। এক ছুটে বিছানায় গিয়ে মুখ গুঁজে আছড়ে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তনিকা। পিঠটা কি কাঁপছে? কাঁদছে? না। সুদ্ধু মুখটা এই মুহূর্তে দেখাতে পারছে না। যাক লজ্জাটা তা হলে এখনও ওর আছে।

এগারো

আজ আর একটা ই-মেল পাঠাল সে রাজর্ষিকে।—মা আমার কাছে আছেন। কিন্তু ভাল নেই। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসো। শিগগির জানাও কী ঠিক করলে।

এই নিয়ে তিনটে চিঠি গেল। আগের দুটোর উত্তর পায়নি। তবে কি রাজর্ষি বেরিয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই? তা হলে তো এই চার-পাঁচদিনের মধ্যে তার এসে যাওয়ারই কথা!

—বউমা!

—বলো।

—মা তোমায় ডাকছেন।

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। যতদিন এখানে আছেন মাধুরী গুপ্ত একদিনও কোনও অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। শীলাদি বুঝতে দেয়নি—বাড়িতে দু'জন অতিরিক্ত মানুষ, তার মধ্যে আবার একজন সংকটাপন্ন রোগী। এবং আশ্চর্যের কথা, চরম আশ্চর্যের কথা, কথাটা এক্ষুনি তার মনে হল, তার একদিনের জন্যও কোনও বিরক্তি, অভিমান...এসব হয়নি। এবং বাড়ি ফিরতে খুব ভাল লেগেছে। রোজ। রোজ। প্রকৃতপক্ষে আয়নায় কালকে নিজের চেহারাটা দেখে চমকে উঠেছিল সে। বেশ ফরসা ফরসা। একটু কি পুরেছে? বেশ সুন্দরভাবে চারিয়ে গেছে অতিরিক্ত মেদটুকু। 'বউমা' ডাকটাও কানে লাগে না আজকাল।

রাত মন্দ হল না। ন'টায় খাওয়া শেষ করে একটু ঘুরে ফিরে কম্প্যুটারে বসেছিল সে। মাতিস নিয়ে আদ্রেঁ দিল্লি আসছে। কলকাতাতেও আসবে সে ব্যবস্থা হয়েছে। অদিতিকে বাদ দিয়েই। মাধুরী দেবীর ঘর থেকে এ সময়ে আর কোনও সাড়াটাড়া পাওয়া যায় না। তার খাওয়ার একটু পরে শীলা এসে খেয়ে নেয়। অনেকদিন অদিতি বলেছে তারই সঙ্গে খেতে। শীলাদি এখন বুঝে গেছে একসঙ্গে খেতে গেলে এক জায়গায়ও খেতে হবে। অদিতির সঙ্গে এক টেবিলে চেয়ারে বসে ওভাবে খেতে অস্বস্তি আছে তার। তাই ঠিক সেই গোটানো কার্পেট আর মোড়াটার মতো খাওয়ার সময়টা নিয়েও একটু চালাকি করেছে সে। অদিতি সেটা মেনে নিয়েছে। জোরাজুরি করে শ্রেণীবৈষম্য কি সে ভাঙতে পারবে? শীলাদির মধ্যে? তার নিজের মধ্যে?

এ সময়ে তো ওঁর ঘুমিয়ে পড়ার কথা। অনেকদিন অবশ্য টেবিল ল্যাম্পের আলোয় শীলাদি কিছু পড়ে শোনায় ওঁকে। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন। যে দিন সে সারারাত ছবি আঁকে, দেখে তখনও অন্ধকার কাটেনি, ও ঘরে আলো জ্বলে উঠল। অর্থাৎ ওঠেন যথেষ্ট ভোরে। এই সকাল সকাল উঠে পড়া এ ওঁদের খোলামেলায় থাকবার দরুন অভ্যাস। বাঁকুড়ার বাড়িতে তেমন পরদার বালাই ছিল না। বিশেষত জানলায়। সকালে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আলো ঝাঁপিয়ে আসত। সকাল হয়ে গেল? উঠে পড়ে মুখটুখ ধুয়ে দেখে আরে সাড়ে পাঁচটা। একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসা যাক।—উপুড় হয়ে শুতে শুতে রাজর্ষি বলত—জানলাগুলোয় একটু তোমার শাড়িফাড়ি কিছু

টাঙিয়ে দাও না। উঃ। একটু ঘুমোতেও দেবে না এরা।

—মা ডাকছিলেন? নিজের মুখে নিজের মা-ডাক ফিরে গিয়ে নিজের কানে ধাক্কা দিল। অনেকদিন বলেনি। আজ খুব স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে এসেছে।

—এসো, একটু বসবে?

—এই তো! শীলাদি বেরিয়ে গেছে। শীলাদির মোড়াটা টেনে নিয়ে সে বসল।

—বউমা, বলছিলুম কী শীলাকে একটু কলকাতার দেখবার শোনবার জিনিসগুলো মানে ধরো কালীঘাট, ভিক্টোরিয়া, দক্ষিণেশ্বর, মা কালীর ওপর খুব ঝোঁক ওর।

—কথাটা আমার আগেই মনে হয়েছে। কিন্তু নিয়ে যেতে হলে আমাকেই যেতে হয়। সে না হয় গেলুম। কিন্তু আপনার কাছে কে থাকবে? আমার এ লোকগুলো তো বাড়ি-বাড়ি কাজ করে বেড়ায়। ওরা তো সময় দিতে পারবে না। যদি বা দু'-চারদিন পারেও আমি ওদের ওপর নির্ভর করতে পারি না। আমি ভাবছিলুম...রাজর্ষি আসুক...তখন...চিঠি তো আজও আরেকটা দিলুম।

—আগেও দিয়েছ তো।

—হ্যাঁ আপনি এখানে আসার পরে চারটে দিয়েছি সবসুদ্ধ। প্রথমটার জবাব পেয়েছিলুম—যত শিগগির পারি আসছি। তারপর তো আর...মনে হচ্ছে ও নেই...কম্প্যুটার খুলছেই না। হয়তো স্টার্ট করে গেছে, দিন সাতেকের মধ্যে এসে যাবে।

—কী জানো বউমা, যে সাত বছরের মধ্যেও এসে উঠতে পারল না, সে সাত দিনের মধ্যে এসে পড়বে এ আশা আমি আর করি না।

অদিতি স্তব্ধ হয়ে গেল।

উনি বললেন—নাড়ির সুতো কেটে গেছে। তা ছাড়া...একটু চুপ করে থেকে বললেন—যে স্ত্রীয়ের সঙ্গে বেইমানি করে সে যে মায়ের সঙ্গেও বেইমানি করবে না—তার কী গ্যারান্টি আছে? বলো?—কী, বলো?

অদিতি আস্তে আস্তে বলল—আর যদি এসে পড়ে, তখন? তখনও কি এত অভিমানের কথা বলতে পারবেন?

—অভিমান টভিমান নয় বাবা, এ হল লোকচরিত্র জ্ঞান। আমি তোমাকে বাজি ধরে বলতে পারি রাজা আসবে না, ক'দিন পরে কোনও একটা খবর দেবে, কাজ পড়েছিল, কি অসুখ করেছিল...আসছি...আবার তুমি লিখবে...আবার জবাব পাবে না। ...এই করতে করতে তোমার এখানে আমি শেষ নিশ্বাস ফেলব, তারপর হয়তো বাড়িঘর টাকাপয়সার বিলি-বন্দোবস্ত করতে আসতে পারে।

—এ কী বলছেন? কেন?

—কী বলছি! ওই বললুম—নির্ভুল লোকচরিত্র জ্ঞান। কোনওদিনই লোক চিনতে ভুল হয়নি আমার। আর কেন?—তোমার সঙ্গে যে বেইমানিটা করল তারপর বাবার বা মায়ের সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস হয়নি ওর। হবে না। উনি মারা যেতে চক্ষুলজ্জায় শ্রাদ্ধশান্তি করে গেছে। তখন তো আমার সঙ্গে মুখোমুখি বসবার দরকার হয়নি। সেটা আসা নয়। এবার এলে আসাও হবে, মুখোমুখিও হতে হবে।

—উনি মাধুরী গুপ্ত এই ধরনের কথা তাকে অদিতি সরকার, এক্স-বউমাকে বলবেন—এ কথা সে কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি।

মাধুরী বললেন—তুমি ভাবছ—বউ-কাঁটকি শাশুড়ি—এসব কী বলছে। তাই না? কী জানো অদিতি ... প্রত্যেক মায়ের সাধ থাকে তার একটি মনোমতো বউমা হবে, পায়ে পায়ে ঘুরবে। মা বলে শ্রদ্ধা করে আদর করে ডাকবে। তো আমারও তেমন ছিল, তোমার সঙ্গে সে ছবি মেলেনি। তুমি ভাবো, একমাত্র ছেলে, বিদেশে প্রায় বলতে গেলে না-জানিয়ে এক সাহেবের ডিভোর্সি বউকে বিয়ে করেছে। আমি গ্র্যাজুয়েট ছিলুম হয়তো, কিন্তু তার মানেই যে খুব লিবার্যাল হয়ে গিয়েছিলুম তা

কিন্তু কখনও নয়। ওটা তোমরা ভুল করো। তাই হয়তো গোড়ায় গোড়ায় একটু কড়া ছিলুম। তুমি তো মা মুখ্খু শাশুড়ির দিকে কোনওদিনও সেভাবে ফিরে তাকাওনি। বিদ্বান, পণ্ডিত, বিখ্যাত শ্বশুর—তাঁকে নিয়ে মগ্ন থাকতে। এখন বোঝো, তুমিও আমাকে কিছু দিতে পারোনি, আমিও তাই তোমাকে কিছু দিতে পারিনি। দোষ দিচ্ছি না, শোনো অদিতি তোমরা দেশ-বিদেশ ঘোরা বিদ্বান অশেষ গুণী মেয়ে, একজন সাধারণ গ্রাম্য গ্র্যাজুয়েট শাশুড়িকে তোমরা কী দেবে? কীভাবে কমিউনিকেট করবে? আমার তো কোনও রূপ গুণ ছিল না।

—মা, আপনি ...আপনার সঙ্গে আমার জগতের অনেক তফাত ছিল ঠিকই, কিন্তু আমার মা-ও তো আপনারই মতো...

—কিন্তু তিনি তোমার নিজের গর্ভধারিণী মা, তাঁকে কি কেউ এভাবে দেখে? তাঁর সঙ্গে কমিউনিকেশনে কোনও বাধা হয় না! কিন্তু শোনো মা, আমি তোমাকে চিনতে ভুল করিনি। যতদিন গেছে তত বেশি করে চিনেছি। দায়িত্ব, কর্তব্য, শত মানসিক কষ্টেও অবিচলিত থেকে নিজের কাজ করে চলেছ দিনের-পর-দিন...বাইরের জগৎকে কোনওদিন বুঝতে দিলে না... দু'দুটো লোক তোমার সঙ্গে কত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! আর আজকে যে লোকটা তোমার অনুপস্থিতিতে তোমারই বন্ধুকে নিয়ে নিজের ঘরে তুলেছে দিনের পর দিন...তারপরে লজ্জাকরভাবে ধরা পড়ে ডিভোর্স দিতে বাধ্য হয়েছে, তারই মাকে দিনের-পর-দিন...দিনের-পর-দিন... মাধুরী দেবীর গলা বুজে গেল কান্নায়।

অদিতি হাতটা রাখল ওঁর মাথার ওপর, সে উঠে দাঁড়িয়েছে। মা আপনার শরীর ভাল নয়। এখন এত কথা বলবেন না।

—তুমি কি আমাকে মাফ করলে?

—যে অপরাধ আপনি করেননি, তার জন্য আপনাকে মাফ করার প্রশ্ন উঠছে কেন?

—জানি না। নিজের ভেতর অপরাধবোধে আমি দিনের-পর-দিন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছি মা। তার বাইরের প্রকাশটা ভাল হচ্ছে না, বুঝেও আমার কিছু করার ছিল না। কিন্তু আমি সারা জীবনে তোমাকে যত ভরসা করেছি, আর কাউকে ততটা করিনি— তোমার শ্বশুরকেও না।

—আচ্ছা, অনেক হয়েছে মা, আপনি এবার চুপ করুন.....আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, ঘুমিয়ে পড়ুন।

একটু ছটফট করলেন। অনেক সংকোচে তার হাতটা মাঝে মাঝে ধরলেন তারপর নিবিড়ভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন।

শীলাদিকে ডেকে দিয়ে বাইরে চলে এল অদিতি। চাঁদের আলোয় ভুতুড়ে হয়ে আছে তার উঠোন, নিমের পাতা কেমন চলকাচ্ছে, সপ্তপর্ণী তার পাতার অঞ্জলিতে যেন চাঁদের টুকরো ভরে ভরে রাখছে। তলায় যে শ্যাওলা তা বোঝা যাচ্ছে না। জ্যোৎস্না সবকিছুকে অলৌকিক করে দিয়েছে। একদিক থেকে দেখতে গেলে ভুতুড়ে, যাকে বলে অকাল্ট, যেন মরজীবনের ঠিক ওপারে যে একটা অশরীরী স্তর আছে, সেটাই যতদূর সম্ভব দৃশ্যমান হয়ে ওই উঠোনটায় পড়ে রয়েছে এখন, অনেকক্ষণ দেখতে দেখতে অদিতি একটা ছায়ার জগতে চলে যেতে থাকল। সেখানে কখনও রোদ ওঠে না, আলো জ্বলে না, কোনও স্পষ্ট আকার নেই কিছুর, জেলির মতো অর্ধতরল কিছু পদার্থ বয়ে যেতে যেতে এক একটা ফর্ম নেয়। আবার ফর্ম ভেঙে আর একটা, আর একটা। তরঙ্গ উঠছে ছায়ার, তরঙ্গ ভাঙছে, কী এসব? কারা? আমাদের সঙ্গে কী সম্পর্ক? অদিতি বুঝতে পারল সে আজ ঘুমোতে পারবে না। স্টুডিয়ো-ঘরের দরজা খুলল। তালা খোলার একটা শব্দ হল, ভেতরে ঢুকে দরজার দিকে ফিরে দেখল, মায়ের ঘরের দরজায় শীলাদির ছায়া। আওয়াজ শুনে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। অদিতি আজ বিরক্ত হল না। শীলাদির সাদা কাপড়ের ওপরও টুকরো টুকরো চাঁদ। নানান বিভঙ্গে। মাথাটা অন্ধকার, অথচ ধড়টা আছে। কবন্ধ। ঘর বন্ধ করে দিল অদিতি। ফ্রেমে আটকাল একটা কাগজ, তার ওপরে ফেভিকল লেপে দিল কোথাও পাতলা কোথাও মোটা করে। অনন্যমন। সমর্পিত

ঘোরে ফোটাতে লাগল ছায়ার জগৎ, সেই ছায়ারা যারা নিজেরাই বোঝে না নিজেদের প্রকৃতি, বারে বারে গতি বদলায়, গাঢ়তা বদলায়, আকার বদলায়। বদল শুধু বদল, কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়, নির্দিষ্ট নয়।

ভোরের আলো এসে পড়েছে। আস্তে আস্তে আলো আরও উজ্জ্বল হয়, আরও উজ্জ্বল, ছায়ারা মিলিয়ে যেতে থাকে, অলীক মরীচিকা-প্রতিম মনে হয়। সমস্ত ঘর ঝলমল করছে। রোদের একটা তির্যক কিন্তু নরম রেখা এসে পড়েছে ঘরের মাঝখানে। অদিতির পেছন ফেরা চুল, ঘাড় পিঠ বেয়ে ভেঙে যাচ্ছে রেখাটা। তুলি নামিয়ে রাখল। সময় লাগেনি বেশি, সারারাত, এগারোটা থেকে পরদিন সাতটা। সাতটাই কি? আট ঘণ্টা। অনেক সময়ে আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রায় কোনও কানেক্টিং ফ্লাইট ধরতে কোনও বিমানবন্দরে এতক্ষণই বসে থাকতে হয়। শুকোক। এবার সে বুভুক্ষুর মতো ঘুমোবে।

* * *

—শৌনক একটা কাজ করে দিতে পারবি?

—শিয়োর। বলো।

—শৌনক ভিভিয়ান লম্বা লিকলিকে একটু আলগা আলগা হাত-পায়ের ছেলে। কাটা কাটা চোখ-মুখের, কিন্তু অবয়বগুলো এমন যেন কাচের, শক্ত করে ধরলে ভেঙে যাবে। কিন্তু ওই কাচের মতোই নিরেট তার শক্তি, সহবৎ। রীতিমতো পেশিদার ছেলে। আসলে ওর প্রধান ভালবাসা ছিল—ভাস্কর্য। পাথর, ব্রোঞ্জ নিয়ে কাজ করতে করতে নিজেই শক্ত ধাতুর হয়ে গেছে। একমাথা চুল, খুব এলোমেলো থাকে। ভাস্কর্য বিকোয় না চট করে। সময়ে সময়ে ফরমাশি কাজ করে, কাজে সহায়তা করে, ছবিই আঁকছে আজকাল। ওর ছবিতে ভাস্কর্যের প্রকৃতি পুরোপুরি বজায় থাকে। কিন্তু ভাস্কর্যই ওর প্যাশন। বেচারা তাই অস্থির থাকে একটু।

—কাজটা কিন্তু খুব আনইনটারেস্টিং।

—কেন? আবার কোনও খুকিকে ভাস্কর চক্রবর্তীর স্টুডিয়ো থেকে তুলে আনতে হবে নাকি? হাসি চিকচিক করছে কালো মুখে। হাসতে গিয়ে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল অদিতি। কী যেন? কে যেন? এই রকম, কালো, চাঁদ চিকচিক? ওঃ হো। ও তো সেই সেদিনের ছবিটা। এই মুহূর্তে শৌনকের অকাল্ট ধরা দিল দিনের আলোয় তার চোখে। সেদিন সে দেখেছিল শীলাদির কবন্ধ। এইভাবেই দেখতে দেখতে কোনও-না-কোনওদিন আয়নায় ধরা পড়বে তার অন্ধকার, তার নিজের অকাল্ট।

—কী বলছিলে দিদি।

—বলছিলুম কাজটা খুব আনইনটারেস্টিং।

—ঠিক আছে। বলোই না।

—আমাদের বাড়ির শীলাদিকে দেখেছিস তো?

—ওই তোমার শাশুড়ির কম্প্যানিয়ন?

—হ্যাঁ তাই। ওকে একটু দক্ষিণেশ্বর-বেলুড় ঘুরিয়ে আনবি? উইক-এন্ডে, ধর শনিবার, কি রবিবার।

—অসুবিধে কী? রোববার হলে তো ভালই হয়।

—আমার খুব খারাপ লাগছে। তোর ছুটিটা...আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?

—কী?

—ধর তুই একা কেন? তুই, কাজল, নন্দিনী যে ক'জন যেতে চায় একসঙ্গে শীলাদিকে নিয়ে চলে যা। একটা গাড়ি ভাড়া করে দেব।

—তোমার গাড়িটা কি এনগেজড্ থাকবে?

—না। কিন্তু আমার তো ড্রাইভার নেই।

খুব লজ্জিত, সংকুচিত হয়ে শৌনক বলল—আমার কিন্তু ড্রাইভ করতে খুব ভাল লাগে। পারি-ও ভাল।

—তাই?

—অন্যের গাড়ি চালাতে চাওয়া উচিত নয়। কেউ দেয়ও না। তবু বলে ফেললাম, তোমার ইচ্ছে না থাকলে কিন্তু সংকোচ করবে না, স্পষ্ট বলবে।

—ইচ্ছে নেই শৌনক রিয়্যালি, কিন্তু তুই একদিন চাইছিস...

—তোমার জেনটা যা স্লিক না? লোভ লাগে। প্লিজ দিদি।

—ঠিক আছে নিয়ে যা। কিন্তু তা হলে তোকে নিয়ে চারজনের বেশি না। আর সাবধান। তুই কত দিন চালিয়েছিস?

—আরে অনেক দিন। এখনও চালাই। জেঠুর গাড়ি তো জেঠু সব সময়ে ড্রাইভ করতে পারে না আজকাল, চায় না। আমাকে ডেকে নেয়।

—ঠিক আছে।

বাঁ হাতের পাতায় ডান হাতের ঘুঁষি মেরে শৌনক চেঁচিয়ে উঠল—ইয়ে-এ-এ।

—কী হচ্ছে?

—বাঃ, টেলিভিশন শেখাচ্ছে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, শিখতে হবে না?

অদিতি হেসে ফেলল, ফাজিল, তোর বয়স কত?

তোমার থেকে ঠিক এক বছরের ছোট।

—ইয়ারকি। ফক্কুড়ি!

—সত্যি বলছি দিদি। স্পিরিট। আসল কথা স্পিরিট, তোমার থেকে একটু, জাস্ট একটু কম।

আসলে, অনেক ভেবে এই সমাধানটাই বার করতে পেরেছে অদিতি। মাধুরী চান না অদিতি শীলাকে নিয়ে ঘোরে, অদিতিও ওঁকে ঠিকে লোকেদের ভরসায় রাখতে পারবে না। অথচ শীলাদির মুখ দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। এ জন্মে বোধহয় আর মা কালী হল না!

বারো

উইলিয়ামসদের বাড়ির মেজানিনে বসে আকাশের দিকে অব্যক্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটি। ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে মনে হয় তার কোনও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু চুল আর গাত্রত্বক নিয়ে একটু আছে মনে হয়। ছোট্টখাট্টো, পাঁচ ফুট বড় জোর। মাথার প্রচুর চুল শ্যাম্পু করা, মাথায় তোয়ালে বাঁধা। মুখে বোধহয় একটা কোনও প্যাক লাগিয়েছে।

মিমিকে নিয়ে ক'দিন যা গেল! কবে যে মেসো আসবেন। ইতিমধ্যে পাগলটাকে ধরে রাখতে পারলে হয়। আপাতত এত অপুষ্টিতে ভুগছে, শরীর এত দুর্বল, হাঁউ হাঁউ করে খাচ্ছে খালি। তার ওপর তনিকা ওকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলেছে—মিমি তোর চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে। ডোন্ট মাইন্ড, তোকে একটা ভিখিরির মতো দেখাচ্ছে।

সে তো দমবার মেয়ে নয়, বলল—বেগার মেড? তাদের স্কুল পাঠ্য ছিল টেনিসনের এই ন্যাকা ন্যাকা কবিতাটা। ভিখারিনি এসে দাঁড়াল, তার রূপে রাজসভা আলো হয়ে গেল। রাজা তাকে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন।

—রাজা মানে কতকগুলো গ্ল্যামারাইজড লোচচা। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই লাল ঝরবে, সিংহাসনে বসাল না আরও কিছু—কোলে বসিয়েছিল বোধহয়। ভিক্টোরীয়গুলো আবার কোলটোল শব্দ উচ্চারণ করতে লজ্জা পেত।

—না, না বেগার মেড নয় রে একেবারে কলকাতার রাস্তার ধারে, ফ্লাই-ওভারের তলার ভিখিরি। সত্যি কথা বলতে কী মেয়ে না ছেলে তা-ও বোঝা যাচ্ছে না।

—ইয়ারকি?

—সত্যি। আয়না দ্যাখ! নিজেই দ্যাখ না!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, চোখ টেনে টেনে, গালের চামড়া টেনে টেনে দেখল।

—কী কালি! খসখসে কালো লাগছে।

—খসখসে নয়, বলে খসকা। খসকা কালো, ভুসকো কালো!

—কী হবে? আমি কি লুম্পেন হয়ে গেলাম?

—তুই কিছুদিন বিশ্রাম নে। একদম এই দারুণ গ্রীষ্মের রোদ গায়ে লাগাবি না। কিপ ইনডোর্স। ভাল করে খাওয়াদাওয়া কর। শরীরের যত্ন নে, আর মিমি, মনেরও। মনটাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে। যা তা ভাবলি, মুখে যা এল বলে দিলি এতে করে মুখে একটা সাতবাড়ি ঠিকে কাজ করা ঝি-ঝি ভাব এসে যায়।

এইভাবে ওকে মোটিভেট করে সে চলে এসেছে। কারও বাড়িতে থাকতে তার ভাল লাগে না। মিমির বাড়িতে তো আরওই নয়। ওদের বাড়ির একটা গন্ধ আছে, দুঃখের গন্ধ, উচ্ছৃঙ্খলতার গন্ধ, হয়তো বা বিকৃতির গন্ধও। বাড়িটা যখন প্রথম হয়েছিল চারপাশে বোধহয় তেমন বাড়িঘর হয়নি। এখন হয়ে গেছে। বিরাট বিরাট ঘর কেমন অন্ধকার অন্ধকার, সাজসজ্জা সেই কোন কালের, আন্টিমাসি কিছু বদলাতে গেলেই মিমি তুলকালাম করে, মেসো বলেন—থাক না থাক, ও যখন চাইছে না। ওর ভাল লাগছে না বলে বাড়ি রং করা হবে না, সোফার কভার, পরদা, নতুন অন্য রঙের করা চলবে না, এইগুলোতে নাকি ওর মায়ের চিহ্ন আছে, ছোঁয়া আছে। শুনলে হাসি পায়। আর সেইসব আদ্যিকালের অন্ধকার অন্ধকার জিনিসের দরুন বাড়িটা কেমন মনমেজাজ দমিয়ে দেয়। মিমি নিজেই সহ্য করতে পারে না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। বলে—দূর! এখনও ওখানে ওষুধ আর অ্যান্টিসেপ্টিকের গন্ধ ঝুলে আছে।

তার ঘরে সে সাদার ওপর কমলালেবু ফুটকি ফুটকি মিকি ডোনাল্ড মেশানো পরদা টাঙিয়েছে। মেঝের ওপর বিছিয়ে রাখে রঙিন চৌকানা দরি। তার সিঙ্গল খাটে, খাটটা বেশ বড়ই, একদিন-দু'দিন মিমিকে নিয়ে শোয়াই যায়, কিন্তু তার বেশিদিন শুতে হলে তার অসুবিধে হবে। খাটটার ওপর সে একটা চৌখুপি টুকরো টুকরো কাপড়ের খুব সুন্দর কাঁথা বিছিয়ে রাখে। তলায় ধবধবে চাদর। দুটো তিনটে পাতলা রঙিন কুশন। দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার আছে, এক একটা ক্ল্যাসিকাল ডান্স নিয়ে এক একটা পাতা। তার নিজের আঁকা জল রং আছে একটা দু-ফুট দু' ইঞ্চি বাই এক ফুট।

সেবার কলেজ থেকে নিমডি বলে একটা জায়গায় গিয়েছিল তারা। আদ্রা-চক্রধরপুরে রাত দশটায়। ভাঙাট পাহাড়। পেছনে দূরে দলমা রেঞ্জ। তখন বেশ গরম বসন্ত। পলাশ আর কুসুম দেখে নেশা লেগে যায়। এত অপূর্ব পলাশ সে শান্তিনিকেতনেও দেখেনি। দেখবেই বা কী করে? দোলের বেশ আগে থেকে ওরা সমস্ত পলাশ মুড়িয়ে তুলে নিয়ে যায়, ফ্রিজে রেখে দেয় বসন্তোৎসবে পরবে বলে। এখানকার পলাশে কেউ হাত দেয় না। উদ্যত অঞ্জলির মতো পুষ্পবান স্বাস্থ্যবান দীর্ঘ পলাশবৃক্ষরা দাঁড়িয়ে থাকে। তার সঙ্গে থাকে কুসুম গাছের লাল, সমস্ত পাতা লাল হয়ে যায়। ওরে বাবা, সে এক মোহগ্রস্ত দৃশ্য। গাছগুলো, দালমা, ধু ধু মাঠ, সরু কপিলা নদী, উঁচু-নিচু পথ সব যেন লাল স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছে। সেটাই সে জল রঙে এঁকেছিল হ্যান্ডমেড পেপারের ওপর। অনেক কিছুই জানত না তখন। ছবিটা একটু যেন ফেড করে গেছে। কিন্তু এ ছবিটা তার বিশেষ প্রিয়। কেন? ওই দৃশ্য, ওইসব দিন মনে পড়ে। রুদ্রাংশু মানে রুদ্রাংশুদার সঙ্গে ওখানেই খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। সন্ধে থেকে তাদের বেড়ানো আর যেখানে-সেখানে বসে পড়া শুরু হত। এক এক দিন মাঝরাত শেষ হয়ে ভোরে খুব ভোরে শুকতারার সঙ্গে সঙ্গে মুচকুন্দ চাঁপা ফুটতে দেখত। কী

সুবাস! মৃদু কিন্তু মাতাল করা। তখন অনিবার্যভাবেই সে রুদ্রাংশুর খুব কাছে চলে গিয়েছিল, সারা রাত কত কথা! এর কোলে ওর মাথা, ওর মাথা এর কোলে। একদিন এই ভাস্কর চক্রবর্তী দেখে ফেলেছিলেন। বাস! কী দুর্নাম, কী দুর্নাম, তনিকা একটা বখে-যাওয়া ক্যারেকটারলেস মেয়ে। রুদ্রাংশু তখন ঝুমুর শিল্পীদের নিয়ে একটা সিরিজ আঁকছিল। ভাস্কর চক্রবর্তী বলেছিলেন—তুমি যে এমন ওম্যানাইজার-টাইপ তা তো জানতুম না। তোমাকে তো ওইসব জায়গায় ছাড়া যাবে না। বলেছিলেন এই ভাস্কর চক্রবর্তী। এই লোকটাই। রুদ্রাংশু কেমন ঘাবড়ে গেল। তার কিন্তু ভয়ডর ছিল না। সে একদিন এক বোঝা কলার বাসনা না কী বলে টানতে টানতে ওদের থাকবার জায়গায় ঢুকল, একটা বড় চত্বর সেটা। কত গাছ, কত—এখানে-ওখানে মাটির ঘর, খড়ের চালা। একটা আশ্রম। লোকাল মাহাতোরা ওখানে হাতের কাজ শিখতে আসত। সব্বাই বললে—কী নোংরা, কী উদঘুটে বিদঘুটে! কী করবি এটা দিয়ে? স্টিল লাইফ আঁকব। এক বোঝা কলার বাসনা, পাখির বাসা পড়ে আছে পাশে, একটা লাল প্লাস্টিকের মগ মুচকুন্দ চাঁপার তলায়। কেন তোদের গোল টেবিলের ওপর চিনেমাটির ফুলদানে সূর্যমুখী ফুল আর অ্যাশট্রের ওপর সিগারেট ছাড়া স্টিল লাইফ হয় না! অ্যাক্রিলিকে করেছিল ওটা ক্যানভাসে। কী সাংঘাতিক যে হয়েছিল! কলা বাসনার এলোমেলো বোঝার মাঝে মাঝে শেড, কী রকম গামছার বুনটের মতো ধারগুলো। বাঁধনটার মোটা গিঁট, পাখির বাসাটা যেন বাসনাগুলোর পাশে গুনগুন করে কাঁদছে, আর লাল মগটার অট্টহাসি।

পীযুষ তো দেখে মুগ্ধ—নাঃ তোর হবে তনিকা, হবে।

—নতুন কথা কী বললি? তনিকা আধখানা মুখ তুলে বলেছিল।

রুদ্রাংশু বলল—কী জানিস তনিকা তোর কোনও ইনহিবিশান নেই।

কী বলতে চেয়েছিল রুদ্রাংশু, সে আলাদা করে জিজ্ঞেস করেনি। ওটা কি প্রশংসা না নিন্দা? এই সরল ঋজু প্রকাশকে কি তুমি পছন্দ করছ? ভালবাসছ? মুগ্ধ হচ্ছ? না কুঁকড়ে যাচ্ছ? রুদ্রাংশুর কথার টোনে মনে হয়েছিল দ্বিতীয়টা। নিন্দাসূচক বা বলা ভাল অস্বস্তিসূচক মন্তব্যটা। সে কিছু বলেওনি, মুখও তোলেনি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব খেপে গিয়েছিল। তারপর যখন রুদ্রাংশু এখানে এসেও সম্পর্কটাকে চালাতে চাইল সে খুব শীতল মুখে বলেছিল—কোথায় যাচ্ছিলিস যেন রুদ্র? রবীন্দ্র সদন? একাই যা। আমার সময় হবে না।

—কেন কী করছিস? কাজকর্ম? আমি তো কিছু দেখছি না তেমন।

—আমার কাজের তুই কী বুঝবি? জানলার ধারে বসে থাকাটাও আমার কাজ, শুয়ে থাকাটাও কাজ। আমার সময় নেই, হবে না, যা।

—যা বাব্বা। রাগটাগ নাকি? কেন?

সে কোনও জবাব দেয়নি। বেশিক্ষণ তার ঘরে কোনও ছেলে থাকলেই মিসেস উইলিয়ামস একবার এসে পড়তেন। সেদিনও এলেন। অনর্থক গল্প জুড়লেন। রুদ্রাংশু পালাতে পথ পেল না। তার পরেও অনেকবার চেষ্টা করেছে রুদ্রাংশু, কিন্তু সে আর মুখ ফেরায়নি। সময়টা তখন খুব খারাপ গেছে তার। মন অন্ধকার হয়ে থাকত, সেই মুচকুন্দ চাঁপার তলার তারাজ্বলা মাঝরাতগুলো মনে পড়ত। খুব কষ্ট হত। কিন্তু তবু সে রুদ্রাংশুকে আর কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। কেননা তার কাছে সেটা পজিটিভ ইতিবাচক, রুদ্রাংশুর চোখে সেটাই নেগেটিভ। এটা হল স্বভাবের মৌলিক তফাত।

এই যে ইতিবাচক এই ব্যাপারটা ওই অদিতি বোর্দো গুপ্ত সরকারের আছে। তবু, দু'বার বিয়ে করলেন, দু'বারই কেস কেঁচে গেল? প্রথম যেদিন উনি বৃষ্টির সন্ধেতে তাকে গাড়িতে তুললেন, সেদিন অনেকক্ষণ সে কোনও রকম লক্ষই করেনি ওঁকে। তার ভেতরটা তখন এমন জ্বলছে! এমন জ্বলছে! মনে হচ্ছে—বৃষ্টিতে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকলেও অপমান ধোবে না। কী মনে করে কি লোকগুলো নিজেদের? একটু নামটাম হয়েছে, অধ্যাপক হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ মুঠোর মধ্যে রেখে দেবে? সেই জন্যে তাদের নিজের ব্যক্তিগত লোভ মেটাবার জন্যে ইউজ করবে? লজ্জা করে

না নিজেদের নাঙ্গা চেহারাটা ছোটদের সামনে বেরিয়ে পড়লে? অদিতিদি কি জানতেন লোকটা ওই রকম? সেদিন কী রকম ঠান্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন? ভামটা যা শক খেয়েছিল না! একেবারে যাকে বলে হিসি করে ফেলেছিল। আশ্চর্য! সে অদিতি সরকারের নাম জানত ঠিকই, কিন্তু কখনও ছবি দেখেনি বলেই কি না কে জানে, বুঝতে তো পারেইনি! ওঁর বাড়ির দরজায় নেমপ্লেট ছিল। প্লেট নয় ঠিক, পেতল দিয়ে টানা হাতের লেখায় ছিল নামটা, সে লক্ষও করেনি। যাঁর বাড়িতে এসে উঠল তিনি কে এ সম্পর্কেও তখন তার কোনও মাথাব্যথা ছিল না। এটা যেন প্রতিদিনের সাতপুরনো ঘটনাগুলোর একটা। অচেনা মহিলা তাকে লিফ্‌ট দেবেন। বাড়িতে নিয়ে যাবেন। তার জামাকাপড়ের ব্যবস্থা করবেন। খাওয়াবেন নিজে রেঁধে। ওঁর বাড়িতে অনেক ছবিও দেখেছিল সে। কোনওদিকে তাকায়নি। কোনও ভাবনাই দেয়নি বাড়িটাকে। একমাত্র তার অদ্ভুত উঠোনটাকে ছাড়া গুরুত্ব দেয়নি তার মালিককে, কোনও সভ্যতা-ভদ্রতা করেনি। অমন গরম গরম অভ্যর্থনার পরও নিজে ঠান্ডা থেকেছে, নির্বেদ জিইয়ে রেখেছে। উনি কোনও জোরাজুরি করেননি। মানুষটা যে অন্য মানুষকে চট করে অনুভব করতে পারেন, তা খুব স্পষ্ট। সে ফিক করে হেসে ফেলল—তার ব্যাগ থেকে ঝপ করে ডায়েরিটা পেয়েই অনোহিতার বাড়িতে ফোন। কী লাড্ডু। বাপ রে বাপ! ভেবে দেখতে গেলে সেদিনের সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটেছিল শ্রীমতী অনোহিতার সৌজন্যে। মিমি যে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে তা সে জানতই। মিমি কবে কোনখান থেকে তাকে খবর দেবে তার জন্যে সে রেডি ছিল। শেষ তো তার সঙ্গেই দেখা হয়। তার সঙ্গে নিউ মার্কেটের ম্যাগনোলিয়ায় দেখা করল। চোখগুলো ঢুকে গেছে, হিংস্র মুখ—তনি বাড়িতে আমাকে খুঁজবি না। আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি।

—কেন?

—কেন তুই জানিস না? ন্যাকামি হচ্ছে? বাড়িতে পেতনি বসে ঘাড় মটকানোর মওকা খুঁজছে আমি ওই বাড়িতে থাকব? বাবা ফিরে এলে দেখা যাবে।

—কোথায় আছিস?

—তোর সব কথায় দরকার কী? নিজের কেস-হিস্ট্রি আমায় দিস? দরকার হলে আমি যোগাযোগ করে নেব।

এল, মিল্কশেক খেল, মিল্কশেকের গোঁফ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুছতে মুছতে চলে গেল।

—আমি বেরোবার পাঁচ মিনিট পরে বেরোবি। বেশি চালাকি করে, গোয়েন্দাগিরি করবার চেষ্টা করবি না।

—আমার বয়ে গেছে। যা তুই জাহান্নমে যা।

জাহান্নমে গেল, কিন্তু জাহান্নমটিকে ম্যাগনোলিয়ার সিটে ফেলে গেল। একটা মোটা ব্রাউন ডায়েরি। তা সেটা না তুলে নিয়ে তনিকা কী করে? সেটা না পড়েই বা সে কী করে? আর পড়ে চমৎকৃত না হয়েই বা সে কী করে থাকে!

মাসিকে ফোন করল। উনি বললেন—ও ওর ভাস্করকাকুর কাছে আছে। ওঁর সঙ্গে...থাকছে...। এইভাবে ইতস্তত করে দাঁতে দাঁত চেপে কথাগুলো বলেছিলেন আন্টিমাসি।

তা সেই ভাস্কর চক্রবর্তী যখন তনিকাকে নিজের স্টুডিয়োয় তাঁর আধুনিকতম টেকনিক দেখাতে নিয়ে যেতে চাইলেন, সে প্রথমেই প্রস্তাবটা নিয়ে নিল, কেননা, নিজের চোখে দেখতে পাবে মিমি সত্যিই ওখানে রয়েছে কি না। আর যদি থাকে, তবে মিমি থাকা সত্ত্বেও ভাস্কর চক্রবর্তী যদি তাকে ডাকতে পারেন...তা হলে 'ও...ওঁর সঙ্গে...থাকছে'—এই ধারণাটা ঠিক নয়। কৌতূহলে, প্রায় মতলব নিয়ে বলা চলে—গিয়েছিল। মিমির চিহ্নও দেখল না, মাঝখান থেকে কয়েকটা ছবি দেখিয়ে কী কমপ্লিকেটেড এচিং করছেন দেখিয়ে, গাবিয়ে বললেন—তনিকা, তুমি একটু বসো।

—ভীষণ গরম আর ক্লান্ত লাগছে। চান করে অ্যাসি। এসে তোমাকে চা খাওয়াব।

সে 'ভালমানুষের মতো বলেছিল—আমি চা করছি, আপনি চান করে আসুন না সার!

—করবে? করো! যেন হাঁফ ছাড়লেন।

রান্নাঘরে গিয়ে ও মিমিকে দেখে। সিঙ্কে শুকনো প্লেট নামানো, ডিমের কুসুম আর আলুর খোসা পড়ে আছে। এখানে চায়ের কৌটো ওখানে কফির প্যাকেট। রাবার ব্যান্ড দিয়ে মুখ আটকানো। চিনি ছড়ানো তাকে। থিকথিক করছে পিঁপড়ে। তার বন্ধুর চেহারাটা ঘরময় ছড়িয়ে আছে। উপরন্তু আর একটা চেনা ঘাঘরা, একটা দড়ি থেকে লটপট করে ঝুলছে।

সে সব গুছিয়ে নিয়ে, চায়ের জলটা ফুটিয়ে, চা পাতা দিচ্ছে। 'তনিকা তনিকা' ভাস্কর চক্রবর্তী জলের আওয়াজের ওপর গলা তুলে কেমন করে যেন ডাকছেন। সে ঘাবড়ে গেছে, কী রে বাবা স্ট্রোক টোক হল না কি?

ছুটে গিয়ে দ্যাখে বাথরুমের দরজা হাট। শাওয়ারের তলায় ভাস্কর চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে, পরনে তোয়ালে—তনিকা আমার পিঠটাতে একটু সাবান ঘষে দেবে? সে পিছু হটে এসেছিল। ওর মুখ ওদিকে ছিল দেখতে পায়নি। ভেবেছিল, ফাইন্যাল পরীক্ষা সবে শেষ। এখন ছাত্রীকে পিঠে সাবান কেন, গা মুছিয়ে পাউডার মাখিয়ে পাজামা পরিয়ে দিতে বললেও দেবে। ওর চরিত্রজ্ঞান মিমির থেকে প্রাপ্ত কিনা। মিমিকে ও ওই বয়সের মেয়েদের প্রতিনিধি ভেবে নিয়েছে।

সদর দরজা বন্ধ করে নিমেষের মধ্যে সে রাস্তায় নেমে এসেছিল। তখন প্রকাণ্ড একটা ধূম্র পাহাড়ের মতো মেঘ সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলছে। যা পেয়েছে উঠে পড়েছে। টলি-ব্রিজ পার করে নেমে পড়েছে। ধুন্ধুমার বৃষ্টি। কোথায় তার বাড়ি? ও পার্ক সার্কাস। এখন পার্ক সার্কাস সে যাবে না। আরমান? উঃ আরমানের কথা যা মিমির ডায়েরিতে পড়ল, তারপর আর তার কাছে যাওয়া যায় না। সে সামনে ট্রাম পেল তারপর রাসবিহারী, গড়িয়াহাটের মোড় এসপ্ল্যানেডের বাস ধরল। ভিজে চুপচুপে। এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল। ভিজতে লাগল,...ভিজতে লাগল। কোনও চৈতন্য নেই, প্রথম শক—মিমি। দ্বিতীয় শক মিমির ডায়েরির হঠাৎ উলটে-পড়া পাতা, তৃতীয় শক—ভাস্কর চক্রবর্তী দা গ্রেট। সেই একই ঘোরে কাটছিল ক'দিন, তারপর চতুর্থ শক—অ্যাকাডেমি...'ফেলাইন মর্নিং' সেকেন্ড এসেছে, বন্ধুদের হাল্লাবাজি, হঠাৎ এক অলক্ষ দেওয়ালের ওপর থেকে—তনিকা!

ভাবতে গেলে—তার ওই নির্লিপ্ত ব্যবহারের পরও উনি—তনিকা! ছবিটা ভাল লেগেছে দ্বিতীয় নির্বাচন করেছেন ঠিক আছে। বুঝতেও তো নির্ঘাত পেরেছেন ওই তনিকাই এই তনিকা, কিন্তু বিচারপতি অধ্যাপকের অহমিকা নিয়ে তো এড়িয়ে যেতেই পারতেন। বিশেষত যখন তার ভদ্রতার অভাব নির্লিপ্ত দেখতে পেয়েছেন, বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু খুঁজে বার করলেন বন্ধুদের পাহাড় ডিঙিয়ে, সুবীরের পাহাড় ডিঙোনো তো যে-কোনও মানুষের পক্ষেই শক্ত! এবং সোজাসুজি শাঁখ বাজিয়ে দিলেন—তনিকা!

সেই প্রতিধ্বনির কথা আছে না। পাহাড়ের উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছ তুমি। তোমার চারপাশ ঘিরে পাথুরে দেওয়াল, তুমি গান গাইলে, সে গান যেমন প্রত্যেকটা দেওয়াল আবার তোমার শুনিয়ে দেয়, দিতে থাকে। এও সে রকম। তার হৃদ্‌বস্তুর অলিন্দ-নিলয়গুলো তাকেও ফিরিয়ে ফিরিয়ে শোনাচ্ছে যেন একটা উদাত্ত পিট সিগার বা গ্রামীণ লোকসংগীত। খোলা গলায় গাওয়া খোলা আকাশ বাতাস মাঠের মধ্যিখান থেকে।

ভাস্কর-ঘোরটা কেটে গেছে। এই ঘোরটা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আসলে এই ঘোরটাই ভাস্কর-ঘোরটাকে কাটাতে সাহায্য করেছে, নইলে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলে সেটা বহুদিন চলে। বহু দিন।

উনি ঠিক কী? কী রকম? অন্তরঙ্গ হলে কেমন লাগবে? ওঁর ছাত্রছাত্রীরা তো মনে হল খুব ঘনিষ্ঠ, একটা পূজার ভাবও আছে, প্রেমের ভাবও আছে। কিন্তু কোনও বাঁধা খালের মৃদু একমুখী স্রোতে গা ভাসাতে তার ভাল লাগে না। ওদের মতো করে সে কিছু পারবে না। তার ভাল লাগে

প্রকৃতি পর্যায়। নদীতে জোয়ার এসেছে জোয়ারের জলে ফুলে ফুলে ওঠো। ভাটির টান....ফিরে চলো ধীর সুখে সমুদ্রের দিকে, দুরন্ত পদ্মার পাড় ভেঙে ভেঙে পড়ছে, আতঙ্কে নীল হয়ে তুমিও ভেঙে পড়ছ, তারপর আবার দুর্দম চড়া হয়ে জেগে উঠছ। বেগুনি আকাশে হারিয়ে গেলে সন্ধেবেলা, প্রথম সূর্য হয়ে ফুটলে। রোদ হয়ে উঠলে তারপর হঠাৎ গুরু গুরু গুরু গুরু স্বননে বেজে উঠলে মেঘ ঘর্ষণের দামামা থেকে। দামাল বৃষ্টিপাত।

হঠাৎ তার মনে হল এইখানে, ঠিক এইখানেই তার মিমির সঙ্গে মিল। এই জন্যেই সে মিমিকে বোঝে। মিমিও তাকে ধরতে পারে খানিকটা। কিন্তু কেউই কাউকে পুরোটা নয়। মানুষে মানুষে কিছু তফাতের রহস্য তো থাকবেই। রহস্য থাকে থাক, কিন্তু একই প্রকৃতির মধ্যে এত তফাত কেন? কেন সে মিমির মতো হয়েও মিমির মতো নয়! কেন মিমি তার মতো হয়েও তার মতো নয়? শ্রীলামাসির সঙ্গে আন্টিমাসির বন্ধুত্বের কথা সে শুনেছে। দেখেওছে। ওঁদের মধ্যে কোনও ভুল বোঝাবুঝি ছিল না। আর শ্রীলামাসি তো প্রতিটি ব্যাপারে বন্ধুর ওপর নির্ভর করতেন, পরামর্শ চাইতেন। 'সর্বাণী এল না কেন? এখনও কী করছে? সাতটা বেজে গেল যে!' একথা যে কতবার শুনেছে ওদের বাড়িতে গিয়ে! তখনও পরদা-টরদার রংগুলো জ্বলে যায়নি, সোফাকভার, কুশন সব ঠিকঠাক পরিষ্কার হত। ছবিগুলো বাঁকা থাকত না। ক্যালেন্ডারের পাতা বদলাত। শ্রীলামাসি তো সবটা দেখে উঠতে পারতেন না, আন্টিমাসিই বেশিটা দেখতেন। এখন উনি থাকা সত্ত্বেও বাড়িটা ঠিকঠাক নেই। কেন? না মিমির ঝগড়ুটে চিৎকার যার ভয়ে সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। শ্রীলামাসির সামনে, তার সামনে ধেড়ে মেয়ে মিমি তখন চকাস চকাস করে আন্টিকে কত চুমু খেয়েছে। কাল আসোনি কেন? এ রোববার সারাদিন আমাদের কাছে থাকতে হবে।—সবই তো তার দেখা! যেন কোলে বসে বাচ্চার মতো আদর খাবার বায়না করবে এক্ষুনি। আর কী আবদার! কী আবদার!—আজ এই রান্না করে দাও, কাল ওই করে দাও। খাওয়া নিয়ে কিছু ফাস করতে পারত ওই মেয়ে! শ্রীলামাসি তখন ক্ষীণ স্বরে বলতেন আজকে ওকে ছেড়ে দাও মিমি। ইয়ার এন্ডের ঝামেলা সেরে এসেছে। সর্বাণী আজ বড় ক্লান্ত।

—তুমি কেন সবেতে বাগড়া দাও বলো তো, আন্টিমাসি বলুক ও ক্লান্ত, ওর কথা ও বলতে পারবে। তোমাকে বলতে হবে না।

—সত্যিই আমি আজ পারছি না রে, পঞ্চমীকে ডাক আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি ঢাকাই পরোটা কী করে করতে হয়। ও-ই করে দেবে।

—নাঃ আমার দরকার নেই। ঠোঁট ফুলিয়ে দুমদাম করে চলে গেল একটা আঠারো উনিশ বছরের না তার চেয়েও বড় মেয়ে।

আন্টি উঠতে যাচ্ছেন। শ্রীলামাসি হাত চেপে ধরলেন—উঠতে পারবি না সর্বাণী। একদম না।

আন্টি হেসে বলতেন—যদি না খায়।

—না-ই খাক। বাজে আবদার শোনা হবে না তাই বলে। দিন দিন বড় হচ্ছে না ছোট হচ্ছে?

আন্টি বলতেন—এই শক্তটা আগে হলে পারতিস শ্রী।

কত সুন্দর সুন্দর আলাপ-আলোচনা চলত দু'জনের মধ্যে। গান বাজাতেন শ্রীলামাসি। যখন শরীরটা খুব খারাপ হত, কথা বলতেন না, দু'জনে চুপ করে শুধু বসে থাকতেন। কত সুন্দর দৃশ্য দেখেছে সে। রাতে সে ওদের বাড়ি থাকবে বলে গেছে। মিমি এত ঝিং-চ্যাক বাজাচ্ছে আর এত নাচতে নাচতে হাসতে হাসতে পাগলামি করছে যে তার শেষ পর্যন্ত বিরক্ত লাগছিল। একবার বলেছিল মাসির শরীরটা খুব খারাপ আজ, এত আওয়াজ করিস না।

—ওহ্, তা হলে কোনওদিনই কিছু করা হবে না—আবার শুরু করে দিল, এবার হিন্দি ঝিং চ্যাক।

দরজা বন্ধ করে সে নীচে চলে এসেছিল। মাসির ঘরের পাশেই একটা বড় লাউঞ্জ মতো, সেখানে

একটা টিভি থাকে, কয়েকটা বুক শেলফ। ঝাড়বাতিটা জ্বালিয়ে সে অনেকক্ষণ সেদিন পড়েছিল—কী যেন। 'তাও অব ফিজিক্স।' কী অদ্ভুত বইটা। কাপরা বলে একজন বিজ্ঞানী সমুদ্রের ওপর আমাদের নটরাজের নৃত্য উপলব্ধি করেছেন। সৃষ্টি, সৃষ্টি হচ্ছে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত বই ও বাড়িতে। কে আনত! কতকগুলো বইয়ে শ্রীলামাসির নাম লেখা। কিন্তু বেশিরভাগই নাম-না-লেখা। রমাঁ রল্যাঁর 'লাইফ অব শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট' বলে একটা বই। 'দা ম্যান হু ডায়েড'—দারুণ। সমান দারুণ গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'গীতা ভাষ্য'। সে অবশ্য ভূমিকাটার পর আর বেশি পড়েনি। কিন্তু ওইটুকুতেই চমৎকৃত। বেশ রাত্তির। সে উঠে মাসির ঘর পার হয়ে ওদিকে যাবে, তার খিদে পেয়েছে, দেখল মাসির ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে, মাসি শুয়ে, পাশে আন্টিমাসি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ধীরে ধীরে। ডান দিকের মুখটা দেখা যাচ্ছে আন্টির। গালটা কেমন চকচক করছিল, উনি কি কেঁদেছিলেন? কী যে মমতামাখা! তারপর আস্তে গায়ের চাদরটা মাসির গায়ে টেনে দিলেন। মুখ নিচু করে খুব আলতো করে কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে মাসির কপালে একটা চুমু খেলেন। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছেন দেখে সে তাড়াতাড়ি আবার লাউঞ্জে ফিরে যায়। আন্টি এসে বললেন—তোরা খাবি না?

—মিমি খাবে কি না, জানি না, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমি দেখছি কী আছে, খেয়ে নিচ্ছি।

—চল ওকে একটু ডেকে দেখি!

ওদের বাড়ি সবাই একসঙ্গে খেতে বসত কমই। বেশিরভাগ সময়েই যে যার মতো টেবিল থেকে নিয়ে খেয়ে নিত।

আন্টির সেই আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলোনো, সেই সাবধানে চাদর টেনে দেওয়া আর সেই নিচু হয়ে দীর্ঘক্ষণ চুমো খাবার দৃশ্যটা সে স্মৃতির ঘরে আলো জ্বাললেই দেখতে পায়। কেমন ঘুম এসে যায় তখন। খুব মমতার, খুব গভীর স্নেহের, প্রেমের দৃশ্য সেটা। মা যেমন মেয়েকে, কিংবা প্রেমিক যেমন প্রেমিকাকে...কোনটা ঠিক ঠিক তুলনা হবে সে বুঝতে পারেনি। আজও পারে না।

মিমি যাবে কিনা জানে না, আপাতত মিমি না গেলেই সে খুশি হবে। আর দু'-একদিনের মধ্যেই সে 'চিত্রভানু'তে যাচ্ছে।

তেরো

আকাশ নীল দোপাট্টাটা অদিতি গলা থেকে আলগা করে নিল। খুব গরম হচ্ছে। অ্যারাইভ্যাল লাউঞ্জে প্রচুর লোক। দু'-একজন মাঝে মাঝেই উঠে গিয়ে ফোন করছে। এক ভদ্রমহিলার বিশাল বুক থেকে একটি ক্ষীণকায় বাচ্চা থেকে থেকে ঝুঁকে পড়ছে—ড্যাডি, ড্যাডি কব আয়গা! হু-উঁ-উঁ কান্নার সুর ধরে বাচ্চাটা।

—আয়গা আয়গা। অব্‌ভি আ জায়গা। বাস, বাস, রোও মৎ রাহুল বেটা, বাস করো। অন্যমনস্কভাবে শুনতে শুনতে অদিতির মনে হল—আরে! যে যেখানে আছে সব আজকাল রাহুল হচ্ছে। এ কি রাহুল দ্রাবিড় নামে ক্রিকেটারটির সৌজন্যে? বুদ্ধদেবের ছেলের জন্য এ ফ্যাশন নিশ্চয় নয়। কোনও ফিল্ম স্টার টার আছে নাকি এই নামে? কত রকম স্টার সুপারস্টার হয়েছে আজকাল। এতবড় ভারতবর্ষ, এত লোকসংখ্যা। পিলপিল করছে লোক। কিন্তু বাঁচে খালি স্টাররা। ফিল্ম স্টার, ক্রিকেট স্টার, পলিটিক্যাল স্টার, ইদানীং রাইটার স্টারও হচ্ছে। সেলিব্রিটি-পাগল দেশটা, যা-কিছু ভালবাসা টাকাপয়সা সব উজাড় করে দেয় সেলিব্রিটিদের পায়ের তলায়। নিজেদের আর বেঁচে দরকার নেই। নিজেদের জন্য কোনও মান-সম্মান দরকার নেই। খাবার জিনিস, ওষুধ, নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর দাম রোজ রোজ বেড়ে যাচ্ছে। ঝপ ঝপ করে বছরে তিন-চারবার করে দাম বাড়ছে এটা ওটা

সেটার। রান্নার গ্যাস, ইলেকট্রিকের ইউনিট, ফোন। এরা একরকম সুদ ঘোষণা করে মাঝপথে সুদ অর্ধেক করে দেয়, এক পলিটিক্যাল পার্টির টিকিটে দাঁড়িয়ে জিতে আর এক পার্টির ল্যাজ ধরে এগোয়, এমন বেইমানি একটা দেশের নির্বাচিত সরকার দেশের মানুষের সঙ্গে করছে, করে যাচ্ছে, কিন্তু জনগণেশের হেলদোল নেই। তারা সচিন-সৌরভের গন্ধ পেলেই দৌড়াবে, এই ঘুঁটের মালা পরাচ্ছে, তো ওই সেই একই ব্যক্তির নামে রাস্তা, অঞ্চল, মন্দির-টন্দির বানাচ্ছে। বম্বে থেকে কোন ফিল্মস্টার বম্বের ফ্লাইটটায় এল আজ। কী নাকি ফিল্ম করেছে প্রোমোট করবে, চারদিক থেকে কমান্ডো পরিবেষ্টিত হয়ে খোলা গাড়িতে হাসিমুখে হাত নাড়তে নাড়তে চলে গেল নায়ক-নায়িকা। এয়ারপোর্টে আজ আসতে কী বেগ পেতেই না হয়েছে তাকে। উল্টোডাঙা থেকে শুরু করে পুরো ভি.আই.পি. রোড দলে দলে ছেলে, বুড়ো সব চলেছে ফিল্মস্টার দেখতে। বেশ ভুলিয়ে ভালিয়ে রেখেছে এরা দেশভরতি লোককে। মাথায় হাত বুলোচ্ছে। বোধহয় আড়ালে হো-হো করে হাসে। ফ্রান্স হলে তো বটেই, ব্রিটেন হলে, জার্মানি বা ইউ.এস.এ হলেও ঝান্ডা উঠে যেত শত শত। এই জিনিসগুলো ইদানীং লক্ষ করছে সে। কয়েক বছর হল পাকাপাকি বাস করছে। কিন্তু আসলে সেভাবে বাস করেনি। কেননা সে আসলে প্যারিসেই বাস করছিল। ইয়োরোপে। আদৌ ভারতবর্ষে বা কলকাতায় নয়। তার বাড়িটাই তো একটা পুরনো ইউরোপীয় বাড়ির মতো। মাত্র কয়েক মাস হল হঠাৎ ও ভারতীয় কলকাত্তাই বাস্তবতায় জেগে উঠতে শুরু করেছে। সমস্ত দেশটা জোচ্চুরিতে ভরে গেছে। জোচ্চোর আর গুন্ডা। মাঝে সেলিব্রিটি-পাগল জনতা। আর মুষ্টিমেয় লোক প্রাণপণে নিজের কাজটা করে যাচ্ছে। থাকতে পারব তো এখানে আমরণ? মা চলে যাবার পর তো সে ফিরেই যাচ্ছিল নিউইয়র্ক কলেজ অব ভিসুয়াল আর্টসে। অফার পেয়েছিল ভাল। কী রকম লাগবে দেখতে একবার ঘুরে এল। ভাল লাগল না। প্যারিস, প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায়, একোলে, নোৎর, ল্যুভ-এ, লিল দ্য লা সিতেয় নোৎর দাম, চিত্রিত মেট্রোপথ, সবুজ কান্ট্রিসাইডে তার জীবন পড়ে আছে। কিন্তু প্রতিদিন সেখানে রাজর্ষি আর সুজানের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। কী অপ্রস্তুত! কী অপ্রস্তুত! যেসব রোডসাইড কাফেতে সে কতবার রাজর্ষির সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়েছে সেখানে রাজর্ষির সঙ্গে সুজান, যে ব্রিজ দিয়ে সে পার হয়েছে সেন নদী রাজর্ষির সঙ্গে, সেখানে রাজর্ষির কনুই ধরে সুজান। তারই বন্ধু। যার সঙ্গে ইয়ুথ হোস্টেলে হোস্টেলে সারা ইয়োরোপ একসময় চষে বেড়িয়েছে সে। সেই সুজান যে ভিয়েনা থেকে তাকে ফোন করামাত্র সিতে ইউনিভার্সিতের গেস্ট হাউসে জায়গা থাকা সত্ত্বেও সে নিজের বাড়িতে বাস করবার জন্য ডেকেছিল।

—যতদিন একটা পাকাপাকি আস্তানা না পাই, বুঝলে অদিতি।

—শিয়োর। তোমাকে শেকড় গাড়তে তো সময় একটু দিতেই হবে!

সুজান একটু লালু-ভুলু প্রিটি-প্রিটি দেখতে মার্কিন মেয়ে। এই রকম চেহারার এখন আর কদর নেই সারা পাশ্চাত্য দেশে। চুলে কার্ল। গালে লাল। কে জানে অত মনস্তত্ত্ব বা সেক্সোলজি সে জানে না। কিন্তু সুজান গ্লাসগোর ইনস্টিট্যুটে নিজের কাজে, সাধারণ্যে, কোনও ছাপই ফেলতে পারেনি। সে যখন প্যারিসে এল, তখন তার দুটো বিয়ে ভেঙে গেছে, একটা বাচ্চাকে বাবা-মা'র কাছে রেখে দিয়েছে। ঝাড়া হাত-পা। দিনের পর দিন রাজর্ষি ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরেছে, দিনের পর দিন সে অনুপস্থিত থেকেছে, কিচ্ছু তো মনে হয়নি তার? তার ধারণা সুজানও তখন তার আতলিয়েতে কাজে ব্যস্ত।

একদিন রোজকার মতো ফিরে চাবি ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকে দেখল দু'জনে তারই বিছানায়। সে দাঁড়িয়েই ছিল, দাঁড়িয়েই ছিল। পুরো ব্লু-ফিল্মটা অসীম আগ্রহ ও বিস্ময় নিয়ে দেখছিল। তারপর ফিল্ম চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছোবার আগেই রাজর্ষি মুখ তুলে তাকে দেখতে পেল। ব্যস একেবারে চিত্রার্পিত। এদিকে সে—ঝোল্লা পাঞ্জাবি আর জিনস পরা। কানে বড় বড় মাকড়ি। এলোমেলো চুল। কাঁধে মস্ত বড় ঝোলা, হাতে পার্স। ওদিকে দুটি নাঙ্গা মানব-মানবী। রাজর্ষি নিজেকে কী করে ঢাকবে

বুঝতে পারছিল না, সুজান তো চিত, তারা মাথা অদিতির দিকে পেছন ফিরে।

সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে বাথরুমে ঢুকেই বেসিনের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল। প্রবল বমি। জীবনে প্রথম নীল ছবি দেখার বমি।

—কী হল? কী হল?—রাজর্ষি ছুটে আসছে।

সে শান্ত হাতে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল—কমোডের ওপর বসে পড়েছিল। বিনবিন করে ঘাম দিচ্ছে সারা শরীরে। উঠতে পারছে না। সোজা হয়ে বসতেও পারছে না। ভেতর থেকে প্রবল একটা বেগ বেরিয়ে আসছে। কাঠ বমি। কিছু বেরোচ্ছে না শুধু সারা শরীরে আলোড়ন। অকথ্য আলোড়নের যন্ত্রণা। তারপর একটা সময় এল যখন সে বাথরুমের মেঝের ওপরই শুয়ে পড়ল। তারপর কী হল কে জানে—নীলফুল, লালফুল, বেগুনি, হলুদ চরকি।

জ্ঞান ফিরতে দেখল সে হাসপাতালে—লাপিতাল স্যাঁ নেকের। তাদের বাড়ির কাছেই। মাঝরাত বোধহয়, মৃদু একটা আলো জ্বলছে। ভ্রমণরত কোনও সিস্টার বোধহয় বুঝতে পারলেন—সে জেগেছে। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন বোধ করছ?

—আমার কি স্ট্রোক হয়েছে?

—পাগল? তোমার একটা বিশ্রী স্টম্যাক আপসেট হয়েছে। আজ ড্রিপ চলছে চলুক, কাল তোমাকে খেতে দেব।

সকালবেলায় সিস্টার আসতেই সে বলল—আমার পার্স?

—পার্স কোথায় পাব।

—আমার কাছে ছিল তো।

—আপনি ভুল করছেন মিসেস গুপ্ত, আপনি তো ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন না? আপনার স্বামী আপনাকে এখানে ভরতি করে দিয়েছেন। কেন? পার্সের খোঁজ করছেন কেন?

—না, ওর মধ্যে আমার ক্রেডিট কার্ড, টাকাপয়সা ছিল। আমি আপনাদের পে করে বেরিয়ে যেতে পারতাম। আমি এখন একেবারে ঠিক হয়ে গেছি।

—বেশ তো। তাড়ার কী আছে? সকালেই আপনাকে ছেড়ে দেব। উনি আসুন।

—উনি আসবার আগেই আমি বেরিয়ে যেতে চাই।

—সো, আপনারা ঝগড়া করেছেন?

—আমাকে একটা ফোন দিতে পারেন? আছে আপনার কাছে?

—এনে দিচ্ছি।

সে মনীষাকে ফোন করল—একটা চেঞ্জ আর ক্রেডিট কার্ডটা নিয়ে শিগগিরই চলে আয়—

—সে কী রে! তুই হাসপাতালে? কী হয়েছে? কী কাণ্ড? রাজর্ষি কি বাইরে গেছে, নেই?

—না।

—কে ভরতি করল? নিজে এসেছিস? কখন হল? কী?—একঝাঁক প্রশ্ন।

অদিতি বলল—তুই যেমন আছিস তেমনি চলে আয়। মনীষা আমি আর বকতে পারছি না।

ব্যস, সেই শেষ। মনীষা গিয়ে নিয়ে এসেছে তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র। প্যাকারদের দিয়ে প্যাক করিয়ে তিনদিনের মধ্যে সে নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। গ্রামাঞ্চলে। চারদিকে সবুজ নিবিড়।

রাজর্ষি এসেছে, সুজান এসেছে... মনীষার বাড়ি। কিছুতেই যাবে না তাকে না নিয়ে।

—বিশ্বাস করো অদিতি এটা কেমনভাবে হয়ে গেল। আমাকে মাফ করো।

—অদিৎ, আমি তোমাদের বাড়ি থেকে চলে গেছি।

অদিতি চুপ করে বসে থেকেছে যেন ওখানে কেউ নেই। কিছু নেই। কেউ কোনও কথা বলছে না।

—মনীষা ওকে একটু বল!—রাজর্ষির কাতর অনুনয়।

মনীষা বলেছিল—তুই যদি এই মুহূর্তে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে না যাস রাজর্ষি, আমি এক কেটলি গরম জল তোর মুখের ওপর ছুড়ে মারব। যা! যা! কুকুর-কুকুরি!

মা খুব রাগ করেছিলেন—ভুলটা তো তোরই বনি। একটা মেয়ে তার ওপরে আবাপ ও দেশের, কোনও ঘেন্না-পিত্তি থাকে না ওদের। কিছুর মধ্যে কিছু না, তাকে বাড়িতে এনে তুললি! চারদিকে জনমনিষ্যি নেই! ছি! ছি! নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছিস।

তখনও সে কিছু বলেনি। কী বলবে? মাকে কি বোঝাতে পারবে, কুড়ুলটা তার অনেক আগেই মারা হয়ে গিয়েছিল। তার বন্ধুর জায়গায় যদি ওর কোনও বন্ধু থাকত। মাঝে মাঝে তো থাকতই, হয়তো সপ্তাহান্তে, কিংবা এখনও বাসস্থান খুঁজে পায়নি। রাজর্ষি তখনও ফেরেনি, সে ফিরেছে, রাজর্ষির বন্ধু ডেরেক, রজার, পিয়ের সুনন্দ এদের কারও-না-কারও সঙ্গে কি তাকে অনেক ঘণ্টা একা কাটাতে হয়নি! দু'জনে পোর্নো কি পোর্ট হাতে বসেনি কি মুখোমুখি! শোনেনি কি দুর্দান্ত পুরুষ গলার স্তুতি। ভাল লাগে। খারাপ তো লাগে না। কিন্তু তোমার মধ্যে তো সেই তুমিটা বসতি করে আছে, যে জানে তুমি কার ডাকে সাড়া দেবে! মানুষকে কি অমন জৈবভাবে দেখা যায়?

টিভি স্ক্রিনে অনেকক্ষণ থেকেই ভাসছে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের দিল্লি-কলকাতা ফ্লাইটটা এসে পৌঁছে গেছে। ঠিক কী ব্যবস্থা করেছে আঁদ্রে? ছবিগুলো কি ওর সঙ্গেই কারগোতে আসছে? পরে ছাড়াবে নিশ্চয়, নয়তো ওর অনেক দেরি হবে। কেন বলল এয়ারপোর্টে আসতে?

—ওদিৎ, ওদিতি!

ওই তো আঁদ্রে!

ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। যাতে একটা স্যুটকেস কাঁধে ট্র্যাভেলিং ব্যাগ, আঁদ্রে দু' কদম এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল চুমু খেল। তারপর দু'হাতে তাকে একটু দুরে সরিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বলল—দেখি! দেখি! আমার সেই ওদিৎ কালো চোখের, অনির্বচনীয় রঙের ওদিৎ কী রকম হয়েছে! একটু কি গায়ে লেগেছে?

—হবে। তুমি কিন্তু আরও বলিষ্ঠ হয়েছ, মানে মাসকিউলার। তা ছবি?

—মাথা খারাপ? এখনও আসেনি। কাস্টমস থেকে ছাড়াতে দিন দুয়েকের মধ্যে আসব।

—কী রকম হল দিল্লিতে? গভর্মেন্টি গ্যালারিতে?

—না। ললিতকলা।

ললিতকলায় করা উচিত হয়নি। ওখানে সিকিউরিটি ভাল না।

—ছিল। ভালই ছিল।

—কেমন হল!

—ভাল। বেশ ভাল। তবে ওই।

—মানে?

—ওই বোদ্ধারা, ললিতকলার সঙ্গে জড়িত লোকজন, সরকারি আমলা, হু'জহু, ব্যবসায়ী বড়লোক। সার্টন গ্রেসফুল উইমেন, অ্যান্ড দেয়ার ডিসগ্রেসফুল হাজব্যান্ডস্।

—তা তো বটেই। ময়ূর জাতি তো ময়ূরীকে সুন্দরী দেখবেই।—অদিতি হাসল।

—কোথায় তোমার বুকিং?

—যদি বলি অদিতি আন্ডারস্কোর এম. অ্যাট. হট মেল. কম্।

—বললেই হল, আমার শাশুড়ি এখন ওখানে রোগশয্যায়।

—শাশুড়ি? তুমি আবার বিয়ে করলে কবে?—আঁদ্রের মুখটা কালো হয়ে গেল।

—আবার নয়, পুরনো।

—অর্থাৎ?

—রাজর্ষির মা। বাঁকুড়া বলে একটা টাউনে থাকেন। তা অসুস্থ হলে তো আমিই দেখাশোনা করি!

—আচ্ছা! আর রাজর্ষির কী খবর? সেই সন অব আ বিচ?

—রাজর্ষিকে ওই পরিচয় দিলে কিন্তু ওর মায়ের গায়েই বেশি লাগবে আঁদ্রে।

—ঠিকই।

নিজের সোনালি খুদে খুদে দাড়ি গজানো চিবুকটাতে একবার হাত বুলিয়ে নিল আঁদ্রে।

—আমার এজেন্ট এই হোটেলটায় বুকিং করেছে। পকেট থেকে পার্স বের করে বলল—ত্যাজ ব্যাংগল্।

অদিতি হেসে বলল, তাজ বেঙ্গল।

—চেনো?

—চিনি বই কী!

—ঠিক তেমনই, তেমনই আশ্চর্যজনক আছ তুমি ওদিৎ। ঠিক তেমনই। তুমি সব জানো, সব পারো, সব সময়ে আছ, আছ না। আমার জন্য?

হেসে ফেলল দু'জনেই। আঁদ্রে কি হাসির আড়ালে একটু বিঁধল? বিঁধতেই পারে।

কেন যেন তাজ বেঙ্গলের স্যুইটের লাউঞ্জে দু'জনের মাঝখানে একটা নীরবতা নেমে এসেছে। আঁদ্রে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী এত দেখছে? এ রকম চোখ এখন আর সহ্য করতে পারে না অদিতি। কী যেন বলতে চাইছে, বলতে পারছে না। অদিতির ভেতর তেমন কোনও প্রতীক্ষা নেই। একটা ধূসর আনন্দ আছে। কতদিন পরে দেখা, সেই আঁদ্রে যার সঙ্গে তার প্রথম এবং একমাত্র কৈশোর প্রেম, বয়সের হিসেবে কৈশোর না হলেও তো সে কৈশোরই। প্রথম রোম্যান্টিক প্রেম। সব প্রেমের মধ্যেই রোমাঞ্চ নিশ্চয় আছে। প্রেম জিনিসটাই তো একটা বিচিত্র ম্যাজিক। তবু যেন রোমাঞ্চে রোমাঞ্চ সামান্য তফাত হয়। অনভিজ্ঞ তারুণ্য। প্রেমের লাবণ্য সেখানে কী নিবিড় রোমহর্ষেই না ফোটে। পরে সে আরও অভিজ্ঞ, শরীরে ও মনে। অব্যক্ত আকুলতাগুলোর মানে বুঝতে শুরু করেছে। সেই হারিয়ে যাওয়া, সুগন্ধ গোলকধাঁধায় নিঃশেষে হারিয়ে যাওয়া আর তো হয় না।

রাজর্ষিকে তো সে তার কলেজ-জীবন থেকে চেনে। দারুণ ডিবেট করত। একটু চৌকো ধরনের কর্কশমতো চেহারা, মেয়েরা খুব পছন্দ করত। অদিতির সঙ্গেও যথেষ্ট তর্কাতর্কি হয়েছে। জ্ঞানের আদানপ্রদান হয়েছে। তারপরে তো এক বছর পরেই ও কলাভবনে চলে গেল। দু'জনের পথ একেবারে আলাদা হয়ে গেল। সেই পথ আবার প্যারিসে এসে মিলবে কে ভেবেছিল?

—হাই অদিতি!

—আরে রাজর্ষি। তুই কোত্থেকে।

—এসে পড়লাম। কর্নেল থেকে পোস্ট-ডক করলাম। কাছাকাছি পেয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু প্যারিস, খোদ প্যারিসে, পাস্তুর ইনস্টিট্যুটে কাজ করতে পারব—ধারণা ছিল না। তা ছাড়া জানতাম তো তুই আছিসই।

—হ্যাঁ আমি তো আছি। তাতে কী? তোর কোনও অসুবিধে হচ্ছে?

—ধুর। অসুবিধে আবার কীসের? আরে তুই আছিস বলেই তো খুঁজে খুঁজে চলে এলাম।

—ইয়ারকি মারছিস?

—অনেস্ট।

এইভাবেই তো এগোল আঁদ্রের সঙ্গে যখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সময়টা তো খুব যন্ত্রণাহীন কাটেনি। যত সে যন্ত্রণা পেয়েছে, তত কাছে এসেছে রাজর্ষি। সে তার কাঁধে মাথা রেখেছে নীল মুখে। রাজর্ষি তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছে।

তারপর একদিন বলল—যদি বা আমার সুদিন এল, তুই এমন করছিস যে আমার সব মাটি হয়ে যাচ্ছে।

—সুদিন? কী হয়েছে তোর? আরও বেশি অফার পেয়েছিস?

—নাঃ অফার আর পেলাম কোথায়! অফার করছি নিজেকে। কবে থেকে তোর পেছনে ছুটছি অদিতি তুই ফিরেও তাকাচ্ছিস না! তোর জন্যে ডক্টরেট করলাম, ফেলোশিপ নিয়ে বস্টন গেলাম। নিজেকে সর্বগুণান্বিত করে ফেলেছি হেনকালে অঘটন। অদিতি সরকার আর সরকার নেই, বোর্দো হয়ে গেছে। ভাবতে পারছিস আমার অবস্থাটা!

—আমি তো এসব কোনওদিন জানতুম না!

—তুই ছাড়া আর সবাই-ই জানত বোধহয়। মৃণাল, নন্দন, শমিত সব কী নাম দিয়েছিল জানিস আমার?

—কী?

—এ.ও.আর।

—মানে?

—অদিতি অবসেসড রাজর্ষি। ফুট করে এমন কেটে পড়লি! মনীষার কাছে অনেক পরে জানতে পারলাম তুই সেজান হতে গেছিস।

কতক্ষণ চুপ করে বসেছিল অদিতি। তার জীবনের এত বড় ঘটনাটা তার অজান্তে ঘটে যাচ্ছিল!

আস্তে, খুব আস্তে রাজর্ষিকে নিতে পেরেছিল সে। যা প্রথমে পারস্পরিক ছিল না, একান্তভাবেই রাজর্ষির ছিল, তা তার নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হতে দেরি হয়েছে, কেননা সে ইতিমধ্যেই পোড়-খাওয়া। কিন্তু যখন একবার নিল, তখন মনেপ্রাণে নিয়েছিল। খুব উজ্জ্বল, আনন্দময় ছিল সেসব দিন। কত কাজের সকাল, দৈনন্দিন খুঁটিনাটি দু'জনে মিলেমিশে করা, তাকে আস্তে আস্তে ছবি চেনানো, কত সাহিত্য পড়াল রাজর্ষি তাকে। ক্ল্যাসিক। বিজ্ঞানের লোক হলেও অক্লান্ত সাহিত্য পড়ুয়া ছিল সে। কত ভ্রমণ। খুঁটে খুঁটে ফ্রান্স দেখা। ইয়োরোপ দেখা ছিল না রাজর্ষির। আবার তার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখা। একটা অসম্ভব বন্ধুতায় পূর্ণ কানায় কানায় ভরা দিঘির মতো সম্পর্ক। নষ্ট হয়ে যায়? এসব নষ্ট হয়ে যায়? যেতে পারে? রাজর্ষি যেন আলাদা কেউ নয়, তার নিজের হাত-পা'র মতো একান্ত নিজস্ব। কেউ কি ভাবতে পারে সেই হাত সেই পা একদিন নিজ শরীরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে? কেউ কি ভাবে তাকে এইভাবে কেটে বাদ দেওয়া যায়? এবং তখন সে অঙ্গ এমন অসাড় যে কোনও ব্যথা লাগে না!

তুমি একটা অলীক মানুষের সঙ্গে বাস করছিলে অদিতি। একটা ধারণার সঙ্গে, সে ধারণা মানুষটির আচরণ থেকেই তৈরি হয়ে উঠেছিল ঠিকই। কিন্তু তবু তুমি তার ভেতরে মিথ্যে মানুষটাকে দেখতে পাওনি। সবটাই মিথ্যে কি! রাজর্ষি মনীষার কাছে পরে কান্নাকাটি পর্যন্ত করে গেছে, অদিতিকে ছেড়ে সে থাকতে পারছে না। সে অদিতিকে ভালবাসে। ওটা একটা ভুল। পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়েছিল সে। তুই বনিকে বল, বল।

—আমি বলতে পারব না রাজ, তুই হয়তো বাসিস, আমি তোকে বিশ্বাস করছি। কিন্তু বনি আর তোকে বাসে না। কী করবে বল। ট্রমা, একটা মারাত্মক ট্রমা ওকে তোর থেকে আলাদা করে ফেলেছে। তা ছাড়া বুঝিস না কেন, ও একেবারে অন্য রকম। সেন্ট পার্সেন্ট সিনসিয়ার, সরল, অথচ আবার এত ওস্তাদ খেলোয়াড়ও। ও বুঝতে পারে, প্রথমে না পারলেও পরে পারে। একটা গা-ছমছমে ক্ষমতা আছে ওর। তখন নিজেকে নানা কৌশলে সরিয়ে নেয়। মরে যাবে তবু মিথ্যেকে কখনও সহ্য করতে পারবে না ও। কম্প্রোমাইজ করবে না।

তখন অদিতি শিল্পীমহলে বেশ পরিচিত নাম। কত যে গুণমুগ্ধ ছিল। প্রচণ্ড স্ক্যান্ডাল হল। সবাই ভীষণ দুঃখিত। আহত অদিতির তরফে। কেউ কেউ অবশ্য বলেছিল—এসব অদিতির বাড়াবাড়ি। এ রকম মুখ বদলানো তো মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক। যা স্বাভাবিক তাকে তো স্বীকার করাই ভাল। আঁদ্রেই একমাত্র বলেছিল—ওদিৎ খাদ্য বা খাদক-জাতীয় নয়। কী করা যাবে! শি কান্ট হেল্প হারসেলফ, ক্যান শি?

কোনও-না-কোনও মিথ্যা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে নিতে আজ সে এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। এই কলকাতায়, তার নিজের পোড়ো বাড়িতে, দ্বিতীয় স্বামীর মাকে শেষ শয্যায় সেবা করছে। আর তাজ বেঙ্গলের এই সজ্জিত ঘরে—এখন তার সামনে বসে তার প্রথম স্বামী আঁদ্রে বোর্দো। যার সুবাদে 'সাহেবের এঁটো' নামটি তার জুটেছিল! আর যার জন্য কলকাতার বিদগ্ধ কলারসিক মহলে আড়ালে মাঝেসাঝেই তার উল্লেখ করা হয় অদিতি বোর্দো গুপ্ত সরকার বলে। বস্তুত অনেক শিল্পী-দাদা ভাবেন খুব সহজেই তাঁরা অদিতি নামে মেয়েটিকে পেয়ে যেতে পারেন কেননা সে তো দু'বার বিয়ে করেছে, দু'বার বিয়ে ভেঙেছে, এবং তার সন্তানও নেই। এ অপ্সরী ক্লাস না হয়েই যায় না!

—কী হল ওদিৎ, কোথায় বিচরণ করছ? স্মৃতিতে কি?

—বোধহয় সত্তায়। কী হয়ে গেল, কেন হল, কী লাভ হল এসবে, মানে কী এর? খুঁজছি নিজের মধ্যে। বোধহয়। আঁদ্রে আমি ঠিক জানি না।—অদিতি হাসল।

—ওদিৎ, আমি কিন্তু সম্প্রতি মাতৃহীন হয়েছি। আমি কি তোমার করুণা পেতে পারি না?

—নিশ্চয়। খুব দুঃখিত আমি আঁদ্রে। তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। আমারও মা তো আমার হাতের ওপরেই গেলেন।

দু'জনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। আঁদ্রে বলল—কষ্টটা কার জন্যে হচ্ছে বুঝতে পারি না ওদিৎ। বোধহয় স্মৃতির মা। যিনি সবুজ ঘাসের ওপর টলটল করতে করতে পড়ে গেলে ধুলো ঝেড়ে আবার তুলে দাঁড় করিয়ে দিতেন। যিনি মাঝরাত্তিরে উঠে এসে দেখে যেতেন, ছেলে ঠিকঠাক ঘুমোচ্ছে কিনা। অসুখ করলে যিনি পাশে বসে থাকতেন।

—আমি যে মায়ের জন্য কষ্ট পাই আঁদ্রে তিনি সর্বক্ষণ আমার ভেতরে থেকে আমাকে পাহারা দিচ্ছেন। তাই আমার কিচ্ছু হয় না জানো? কিন্তু সেই মাকে যে আমি আর বাইরে দেখতে পাই না, ছুঁতে পারি না—এই কষ্টে মাঝরাতে কেঁদে উঠি। সকাল হলে আবার কাজে যাই। হইহল্লা, কাজকর্ম। এই ধরো এখন তোমাকে আনলুম—গল্প করছি এই কেমন।

—তোমার মাঝরাত্তিরের কষ্টে আর কেউ নেই ওদিৎ?

—স্বপ্নে আছ আঁদ্রে, কষ্টে আর নেই।

—রাজর্ষির জন্য কষ্ট কি আমার জন্য কষ্টকে চাপা দিয়ে রেখেছে! আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না আমার জন্যে তোমার কোনও কষ্ট নেই।

অদিতি সোজা হয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে হাসল, তারপরে বলল—কী করে বললে কথাটা, তোমরা ছেলেরা বড় ইনসেনসিটিভ।

—কেন?

—তুমি বুঝতে পারো না রাজর্ষি আমার অ-সুখ নয়? আনহ্যাপিনেস নয়, ও আমার এক রোগ, ডিজিজ। রোগকে কেউ মনে রাখে? রাখে, যে রোগের শিয়রে মা, তাকে নিশ্চয়ই মনে রাখে।

—রাজর্ষি যদি তোমার মৃগী রোগটোগ হয়ে থাকে, আমি তা হলে আবার জার্মান মিজল্‌স্ নই তো?

হাসতে হাসতে কথা শেষ হল তখনকার মতো। আঁদ্রে চান করতে গেল। ঘরে খাবার আনিয়ে দু'জনে নানান গল্প করতে করতে খেল। আস্তে আস্তে বেলা পড়ে আসতে লাগল। অদিতি তার নীল ওড়না গলায় পেঁচিয়ে নিয়ে বলল—আমি চলি। মা আবার ভাববেন।

—মা?

—রাজর্ষির মা।

—ও—হ্।

—আঁদ্রে, আমরা বন্ধু, কেমন?

অদিতি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। আঁদ্রের মুখের ছায়া সে দেখতে চায় না। আবার তা হলে সে ছায়া স্বপ্নে তাকে তাড়া করবে। আবার একটা ছায়ার ছবি! এত ছায়া-ছবি সে আঁকতে চায় না। চায়নি কোনওদিনই। তার সামনে বরাবর লাফাত ছটফটে হলুদ সকাল। পাখির গোলোকধাঁধায় উড়ে উড়ে বেড়াবার নবীন আহ্লাদ, তার সামনে ফুটে উঠত অলৌকিক গাছেরা, ঘাস ঝরত জ্যোৎস্নার মতো। নদীরা এপাশ-ওপাশ করত তার চিত্রী-চেতনায়, মজুর মেয়ের ভালবাসা আবক্ষ নুয়ে পড়ত মজুর যুবকের প্রতি। আঁদ্রে বলত, আরও অনেকেই বলত—তুমি আনন্দের শিল্পী ওদিৎ। প্যারাসলের তলায় পানরত প্যারিস নাগর-নাগরীদের চুম্বন, ভেজিটেব্‌লসের এইসব রং, শাগালের মতো মমতাময়, কত রকম নীল তোমার সমুদ্রে তোমার আকাশে। দেখো আবার পুরোপুরি বিমূর্তে চলে যেয়ো না।

চোদ্দো

একটা চমৎকার শান্তি আজ! তাঁর হৃদয়টা এবার স্থির হয়ে এসেছে। আত্মবিশ্বাস বরাবরই আছে। মাঝে মাঝে ধাক্কা খায়। মানুষ জীবন কাটাতে কাটাতে কোথাও না কোথাও তো ভুল করে ফেলে। অন্যায় করে ফেলে, ফেলতেই পারে। কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই সে একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করে। সেই অন্যায়ই প্রকৃত অন্যায় যার জন্য নিজের মনের কাছে জবাবদিহি করতে হয়, কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। পার পাওয়া যায় না। খুব ভাল করে মনের আঁতিপাঁতি খুঁজে দেখেন তিনি অনেক সময়ে। তেমন কিছু করেছেন কিনা। ভুল তো অনেক করেছেন। ভুল করেছেন খেলা ছেড়ে দিয়ে বা বলা ভাল খেলার সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে। কেননা খেলা তো তিরিশের পরে ছাড়তেই হয়। দম নিচ্ছেন, দম নিচ্ছেন, মাটিতে হাত। হুইস্‌ল বাজল, মুহূর্তে বন্দুকের ভেতর থেকে গুলির মতো ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে সবাই। পাশে পাশে দৌড়োতে থাকছে খড়ির রেখা। কী আরাম! আহ! পৌঁছে গেছেন! দৌড়োতে দৌড়োতে দৌড়োতে দৌড়োতে লম্বা লাফ, বালিতে কোলে করে নিয়েছে এখন। পর্যাপ্ত, পর্যাপ্ত আহ্লাদ। লেখাপড়ায় যদি আর একটু খারাপ থাকতেন তা হলে বোধহয় স্পোর্টস-কেরিয়ারটা চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু সেটা তো ভালই হচ্ছিল। আরও মনোযোগ দাবি করছিল। দিতে ভালও লাগত। তা ছাড়া রোখ ছিল। দাদা বলেছিল—তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না, ওই হনুমানের মতো লম্ফঝম্প করেই জীবন কাটবে। এখন সেই দাদা কোথায়? তাদের আদরের বনির যখন বিয়ে দিয়েছিল বিশাল অঙ্কের ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে, তিনি রাজি হয়েছিলেন। সেটা আরেকটা ভুল। পাঁচ বছর, মাত্র পাঁচ বছর, চেনাশোনা হতে-না-হতেই কী অজ্ঞাত রোগে সাগরেই চলে গেল। তারপর তিনি বি. এড. করলেন। এক মারোয়াড়ি বন্ধুর সঙ্গে মিলে একটা নার্সারি স্কুল করলেন। দু'-এক বছরের মধ্যেই স্কুল যখন রমরম করে দাঁড়িয়ে গেল, তখন একদিন স্কুলের টয়লেটে যেতে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। এ কার মুখ? একজন গম্ভীর গম্ভীর, খুব ফ্যাশনদুরস্ত হেডমিস্ট্রেস। প্রিন্সিপ্যাল। চোখে ভাবনা, ঠোঁট চাপা, ফরসা রং উজ্জ্বলতর, কেননা এখন আর মাঠে যান না। সন্ধেবেলায় সাউথ ক্লাবে টেনিস। ব্যস, এইটুকু। তাতে শরীরটা ফিট থাকে, কিন্তু কোথায় সেই প্রাণোজ্জ্বল হাসিতে ফেটে পড়া টেবল-চাপড়ানো অ্যাথলিট মেয়ে!

কিন্তু শ্রীলার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া? এটা কি তাঁর ভুল, না অন্যায়? তিনি পাশে পাশে না থাকলে শ্রীলা যেটুকু পেরেছে সেটুকুও কি পারত? দু'জনেরই ভাল ভাল বিয়ে হবে কী খুশি দু'বন্ধু! গলাগলি করে হাসছে। আদতে দেখা গেল সর্বাণী চিরবিরহের জালে বন্দিনী। আর শ্রীলা যেন তেমন মধুর হাসে না আর। চেহারাটা শুকিয়ে যাচ্ছে, হাসিটা কেমন ধরা-পড়ে-যাওয়া ছিঁচকে চোরের মতো। চোখ খরগোশের মতো চকিত কখনও, কখনও নিবে-যাওয়া প্রদীপের মতো ম্রিয়মাণ। কী হয়েছে রে শ্রী? কিছু তো হয়নি! তুই তো...তোর বর তো দিনের পর দিন জলে। তুই আমার কাছে ছুটির দিনে সারা দুপুর, সারা সন্ধে থাক সর্বাণী।

থাকতে থাকতে বুঝতে পারলেন কী এক অনির্দেশ্য গরমিল এদের দু'জনের মধ্যে। কিছুতেই যেন একটা বিন্দুতে এসে মিলতে পারে না। তাঁর শৈশব অমন ছিল না। যখন বাড়ি আসত, কতটা প্রতীক্ষা নিয়ে আসত। আর যখন তিনি ওর সঙ্গে ভাসতেন, তখনও কী আনন্দ! কোথাও কোনও খিঁচ ছিল না। একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেছিল, তাঁর যদি বাইশ তো তার ছত্রিশ, সাঁইত্রিশ। চমৎকার স্বাস্থ্য, টেনিসে তো ও-ই স্থিত করাল তাঁকে। বলত, আর তেরোটা বছর চাকরি করব ব্যস। তারপর একটা ছোটখাটো কিছু ব্যবসা করব, আর লাইফ এনজয় করব। সে সুযোগ হল না। তাঁকে 'ধনী বিধবা' করে রেখে সে পাঁচ বছরের মধ্যে চলে গেল। নবগোপালকে শ্রীর যত খারাপ লাগত তাঁর কোনওদিনই তত খারাপ লাগেনি কিন্তু। আসল কথা নবগোপালের একটা স্পোর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল। ক্রিকেট খেলত, পরে টেনিসে বেশি ঝোঁক এসে যায়। অনেক স্পোর্টসম্যানের একটা স্থূল একরোখা সব উড়িয়ে দেওয়া স্মার্টনেস থাকে। সূক্ষ্ম ভাবনাচিন্তা, পড়াশোনা, এসবের ধার ধারে না। কাঠখোট্টা। নবগোপাল ছিল ওই রকম। একত্রে টেনিস খেলতে খেলতে বোধহয় তাঁদের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়ে যায়। তাই অসুখী শ্রীলা আর অশান্ত নবগোপালের মধ্যে হাইফেনের মতো তিনি বিরাজ করতেন। শ্রীলার সব সুখে দুঃখে তিনি তার পাশে থেকেছেন। পরামর্শ দিয়েছেন, ওদের দাম্পত্য-সংকটে মধ্যস্থতা করেছেন কতবার। মিমি যতটা শ্রীর হাতে ততটা তাঁর হাতেও মানুষ হয়েছে। মাঝখানে বাবার অনুপস্থিতির বড় বড় ফাঁক আর সেই ফাঁক আদরে প্রশ্রয়ে ভরিয়ে দেওয়া। দু'জনেরই। কী যে আঁকড়ে ধরেছিল শ্রী মিমিকে! ফুটফুটে মেয়ে-বাচ্চা সারা বাড়ি যেন ভরে রাখত, কোথায় উধাও তখন অশান্তি, ভয়, অস্থিরতার সেই চাপা হাওয়া। ঝলমল করছে সমস্ত বাড়ি। যত বড় হল, তত অন্য রকম হয়ে গেল। স্কুলে যখন ঝগড়া করত, এর চুলের ঝুঁটি ধরে, ওকে ভেঙিয়ে, তিনি শুধু সামনে এসে দাঁড়ালেই শান্ত। কত ভালবাসত তাঁকে?

নবগোপাল যেদিন বিয়ের প্রস্তাব করল সেদিনই তাঁর খুব বিভ্রান্ত একটা অবস্থা হয়েছিল। তবে কি নিজের অজান্তে তিনি এই পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছিলেন? শ্রীর স্বামীকে কি তিনি ভেতরে ভেতরে কেড়ে নিচ্ছিলেন? তাঁর নিজের না হলেও নবগোপালের কি তাঁর ওপর আসক্তি জন্মাচ্ছিল? খুব গোপনে। কখনও প্রকাশ পায়নি! কক্ষনও না! শ্রী কি কিছু ভেবেছিল? আন্দাজ করেছিল? একদিন যখন শ্রীর সামনেই ওই পাগলি মেয়েটা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল—তুমি কেন আমার মা হলে না আন্টিমাসি? ওর মুখের অবস্থা তক্ষুনি কী হয়েছিল তা তো তিনি দেখতে পাননি। তিনি তখন হালকা করে বকলেন ওকে—আমি মা? তা হলে আর তোমাকে এত আবদার আর শয়তানি করতে হত না মিমি!

পরে কিন্তু শ্রী বলেছিল—ও ঠিকই বলেছে। আমি কারও মা হবার যোগ্য নই সর্বাণী।

—ও-ই কি মেয়ে হবার যোগ্য?—মেয়েরও কিছু দায়িত্ব থাকে।

—আমি যেমন মানুষ করেছি। দুর্বল হাত দুর্বল মন।

—ছোট বয়সটা কেটে গেলে কিন্তু এসব চলে যায় রে শ্রী! ওর যাচ্ছে না। এটা ওর নিজের স্বভাবের ব্যাপার।

এই পর্যন্তই। আর সেই ও.টি.-তে নিয়ে যাবার আগে—আমার কেউ নেই, মেয়ে, স্বামী...শুধু তুই-ই আছিস। কিন্তু আমাকে কেউ না চাইলেও আমি তো ভাবনা এড়াতে পারি না। মানুষটা অ্যালকোহলিক হয়ে যাচ্ছে, মেয়েটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে—তুই বাঁচা।

অপারেশন টেবলেই চলে গেল। কী বিবর্ণ সন্ধে! তিনি অপেক্ষা করে বসে আছেন। একা। বন্ডে সই করে চলে গেছে নবগোপাল। থাকত, কিন্তু জরুরি কল, যেতেই হবে—লন্ডন। বলে গেল—তুমি তো আছ!

মিমি এসে আবদার ধরল—এক্সকার্শন, সুন্দরবন অঞ্চলে তিনদিন। সব নাকি ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

—যাই আন্টি?

—মায়ের যে অপারেশন রে!

—ও তো কিছুই না। আর তুমি তো আছ! জাস্ট দু'দিন।

গিয়ে মুখ দেখলেন। শান্ত, করুণ, মধুর, যেমন কলেজের দিনগুলোতে, হোস্টেলের দিনগুলোতে ছিল। এই সূক্ষ্ম অতিভঙ্গুর মোমের মানুষটাকে কেউ বুঝল না? তাঁর শৈবাল বলত—মেয়েরা সাধারণত এমন হয় যে তাদের রক্ষা করা একটা খুব সুন্দর দায় হয়ে থাকে আমাদের। বেশিরভাগ ছেলেই এমনি বউ চায়। আমি চাইনি। কেননা আমার সে দায় নেবার উপায় নেই। তোমাকে খুব ভাল লেগেছিল, আকর্ষণীয়। কিন্তু একটু কথা বলেই বুঝতে পেরেছিলাম—ইউ ক্যান টেক কেয়ার অব ইয়োরসেল্‌ফ। এইটেই আমার কাছে তোমার সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট। তা শ্রী তো সেই রকম মেয়েই ছিল যাকে রক্ষা করতে আগলাতে ভাল লাগে নবগোপালদের। তা হলে? লন্ডনে ফোন গেল। শব রইল ঠান্ডাঘরে। বিপর্যস্ত নবগোপাল এসে প্রথম কথাই বলল—পারলে না? পারলে না বাঁচাতে!—তার গলাতে তখন আকুল খেদ। অনুশোচনা।

কিন্তু এ কী কথা। তিনি বাঁচাবার কে? সবাই মিলে যাকে তিলে তিলে মেরেছ, তার মৃত্যু আমি আটকাব কী করে নবগোপাল?

কথাটা তিনি বলেছিলেন নবগোপালকে।

মাথা ঝুলিয়ে বসেছিল অনেকক্ষণ।

যাক তবু পোস্ট-মৃত্যু অনুশোচনাটুকু পেল শ্রী।

আর মেয়ে?—কী হিস্টিরিয়া! কী হিস্টিরিয়া!—মা তুমি ফিরে এসো আর তোমাকে বকব না। মা তুমি ফিরে এসো তোমার সব কথা শুনব। হেঁচকি তুলে তুলে কাঁদছে।

শ্রীর আলমারির চাবি তো তাঁর কাছে ছিল না। কত শাড়ি সেখানে না-পরা পড়ে রয়েছে। তিনি নতুন কালো নকশা পাড় টাঙাইল কিনে পরিয়ে দ্যান। লাল মোটে পছন্দ করত না শ্রী।

—ওঠো মিমি, এবার ওঠো!

—পারলে না! তোমার কাছে রেখে গেলাম! কত নিশ্চিন্তে গিয়েছিলাম!

শ্রী মারা গেল, তার শেষ সময়ে স্বামী কন্যা কেউ ছিল না, সুতরাং তিনি অপরাধী। কী অদ্ভুত এদের প্রতিক্রিয়া!

তারপর প্রতিদিন স্কুলে যাবার পথে, স্কুল থেকে ফেরবার সময়ে একবার করে ওদের সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসা। তখন আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এসেছে মিমি। বাচ্চা মেয়ের মতো তাঁর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত এক এক দিন কলেজ থেকে ফিরে এসে। কী নিশ্চিন্ত নির্ভর! ছোটবেলা থেকেই মেয়েটা তাঁর বড় প্রিয় ছিল। যদিও তার ধরনধারণ পছন্দ করতে পারছিলেন না। একটু একটু করে কঠিন হচ্ছিলেন। খুব একটু একটু। রাগেও আসছিল কিন্তু।

অ্যাডভার্টাইজিং পড়লি, এবার একটা চাকরিটাকরি কর, দেখবি খুব ভাল লাগবে। আর বিয়ের ব্যবস্থা তো তুই বললেই করতে পারি।

—খবরদার আন্টিমাসি। বিয়ে আমি নিজে করব, যাকে ইচ্ছে, পছন্দ না হলে ছুড়ে ফেলে দেব। আবার করব, না-ও করতে পারি। এই জায়গায় কেউ হাত দিতে আসবে না।

—তা বেশ। কিন্তু একটা কাজ নিয়ে তো থাকবি। তনিকা যেমন দ্যাখ ছবি নিয়ে মজে আছে!

—সে তনির ট্যালেন্ট আছে। আমার যদি না থাকে তো আমি কী করতে পারি!

—তা হলে তোর এখন প্ল্যান কী!

—দেখি, ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সটা করব ভাবছি।

মনে মনে বললেন—কবে তোমার কোর্স শেষ হবে মিমি! যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে। কিন্তু কোনওটা ভাল করে করবে না। এক একটা পড়তে যাবে, আলাদা আলাদা বন্ধু জোটাবে আর হি হি হা-হা। আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরছে দশটা। এগারোটা একদিন। সেটা দেখেন বিয়ের পর।

বাবার বিয়ের পরই খেপে গেল একেবারে। দু'জনে রেজিস্ট্রি অফিস থেকে ফিরে এসে দেখেন

বিছানা লন্ডভন্ড। চতুর্দিকে ভাঙা বাসন পড়ে আছে, রক্তাক্ত পায়ে মিমি বসে আছে।

—এ কী! পঞ্চমী! মিমি একটা পা কেটেছে! কী করে?

পঞ্চমী বলল—কী জানি, যেই তোমরা বেরিয়ে গেলে মাসি, অমনি সব ভাঙচুর শুরু করল। আমি তো নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসেছিলাম ভয়ে।

ডাক্তার ডাকা হল, পা থেকে টুকরো টুকরো কাচ বার হল, ওষুধ হল, ব্যান্ডেজ হল। ক'দিন ঘরবন্দি। বেরোতে পারছে না। তিনি খাবার দিতে গেলে মুখ ফিরিয়ে নিল।

বলল—পঞ্চমী দেবে।

তিনি নবগোপালকে বললেন—সামলাও এবার।

—এ রকম করবে তো বুঝতে পারিনি! তুমি পেরেছিলে!

—একটুও না।

নবগোপাল গিয়ে রাগ রাগ গলায় ডাকলেন—মিমি!

উত্তর নেই।

—এ রকম করেছ কেন? ভাঙচুর, চুরমার, নিজের পা-ফা কেটে একসা।

—যাও যাও, নতুন বউয়ের কাছে যাও।

—মারব এক থাবড়া। অসভ্যতা করবে না একদম। আমার নতুন বউ হতে পারে কিন্তু ও তোমার অনেক পুরনো মা, মনে রেখো। ও করতে চায়নি। আমিই জোর করেছি। আমার সংসার ভেসে যাবে, তুমি ভেসে যাবে বলে।

—আমার কথা কাউকে ভাবতে হবে না—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে।

নবগোপাল মাথায় গিয়ে হাতটা রাখলেন, নরম গলায় বললেন—তোমার মা তো কিছুতেই আর ফিরে আসবে না। আমাদের স্বার্থে আর তুমি ভালবাসো বলে তোমার মাসিকেই এনেছি। এ নিয়ে কোনও কম্‌প্লিকেশন আমি কিন্তু সহ্য করব না। তুমি ছেলেমানুষ নও। উইটনেস হিসেবে তোমাকেও আমরা ডাকতে পারতাম। তোমার ওপর এত কনফিডেন্স ছিল আমাদের। তুমি সবই জানো, বলে রেখেছি, এমনকী কাউকে খাওয়াইনি পর্যন্ত। তোমাকে নিয়েই আমরা আজ খেতে যেতাম। এ কী? এ রকম করবে তাই বলে?

মুখ গুঁজে ছিল, মুখ তোলেনি, খায়ওনি।

—আনপ্রেডিক্টেবল—নবগোপাল বলেছিলেন।

সকালে অবশ্য ফ্রিজ দেখে সর্বাণী বুঝেছিলেন ও খেয়েছে ঠিকই। পাউরুটির প্যাকেট খোলা, মাখন পড়ে আছে টেবিলে। দুধের গ্লাস সিঙ্কে নামানো, আইসক্রিমের থেকে স্ল্যাব কাটা, আপেল মনে হল একটা কম।

যাক। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক হচ্ছিল না। তার ওপর ভাস্কর চক্রবর্তীর ব্যাপারটা বোধহয় বহুদিনের। শ্রীই প্রথম বলেছিল—খুব মিমি মিমি করে আদর করে, চকলেট আনছে, খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে, আমার ভাল লাগে না সর্বাণী।

—বলিস কী রে? বাবা অর্ধেক সময়ে থাকে না, মেয়েটা বাবাকে পায় না, একটা কাকু পেয়েছে বলে তো খুব খুশি ছিলি।

—তখন বুঝতে পারিনি। এখন কেমন সন্দেহ হয়। তখন মিমি ছোট ছিল। এখন বড় হয়ে গেছে, ওর বাবার বন্ধু ওর কাছে আসবে কেন? বল তো? আর আর্টিস্ট মানুষ ওর অত কী গল্প ওই একটুকরো মেয়ের সঙ্গে।

এমন নয় যে সবাই একসঙ্গে কোনও গল্পগাছা হত না। হয়তো শ্রী তিনি ভাস্কর সবাই আছেন পঞ্চমী চা-টা দিয়ে গেল। মিমি ঢুকল একটা র‍্যাপ অন পরে, অক্সিডাইজ্‌ড্ দুল ঝুলছে কান থেকে—কাকু

উ-উ—ব্যাগটা একদিকে চটি দুটো আরেক দিকে ছুড়ে ছুড়ে দিল। দুই গালে চকাস চকাস করে চুমু। ব্যস তারপরেই সে একা কথা বলবে কাকুর সঙ্গে। মা বা মাসি কথা বলতে চেষ্টা করলেই—দূর চলো তো আমার ঘরে কাকু। হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাবে।

—আহ্, আহ্—কী হচ্ছে মিমি...এখানে তো বেশ সবাই গল্প হচ্ছিল।

—দূর যত বুড়োটে বুড়োটে গল্প।

—আমাদের বুড়ো বানিয়ে দিলি?

আহ্, আহ্, করলে কী হবে, ভাস্কর চলে ঠিকই যেতেন।

—ওপরে গিয়ে একবার দেখে আসব? শ্রী?

—শ্ শ্ শ্—শ্রী মুখে আঙুল রেখেছে। বলবে আমার ওপরে স্পাইগিরি করছ?

তখন সর্বাণী পঞ্চমীকে ডেকে মিমির খাবার, আর তার কাকুর জন্যে আরও এক কাপ চা ওপরে পাঠিয়ে দিতেন।

—পঞ্চমী, পায়ের শব্দ করতে করতে যাবি না। ভাল লাগে না।

পঞ্চমী নেমে এল, কাগজ দেখতে দেখতে খুব সহজ গলায় সর্বাণী বলতেন—কী করছে রে মিমি?

—ওহ, মিমির কথা আর বোলো না, বক বক বক বক। যত বকবকানি কাকুর সঙ্গে।

—শুয়ে পড়েছে বোধহয় মিমি।

—না তো! খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে বক্ বক্...।

দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসতেন। শ্রী বলত—ওহ্ মিমিটা না!

সর্বাণী বলতেন—খাবার পছন্দ মিমির? ভাস্করবাবুকে চা-টা কোথায় দিলি?

—কোথায় আবার? পড়ার টেবিলে। ওখানেই তো বসে আছেন উনি। খাবার আবার পছন্দ হবে না, তুমি নিজের হাতে করেছ না? পুডিং তো আগে এক চামচ কাকুকে খাইয়ে দিল।

—ওঁকে তো এখানে সবই দিয়েছি।

—দিলে হবে কী! সে তো উনিও বলছেন। ও আহ্লাদি কি শুনবে?

এই রকম। শ্রী চলে যাবার পর বাড়াবাড়িটা নবগোপাল নিজের চোখে দেখলেন।

—আচ্ছা ভাস্কর তুই এখনও সেই রকম ইয়ে রয়ে গেলি? মিমিটা পাগলি বলে তুইও কি ওর সঙ্গে পাগল হলি। কোলে বসবে কী রে তোর? একুশ-বাইশ বছরের মেয়ে।

—একুশ-বাইশ। তোর মেয়ে দশ-এগারোর পর আর বাড়েনি।

—ঠিকই—চিন্তিত মুখে বললেন নবগোপাল। সিগারেট ধরালেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন—বলেছিস ঠিকই। কিন্তু তুই তো আর নব কার্তিকটি নোস। বি কেয়ারফুল ভাস্কর। আই ডোন্ট লাইক হোয়াট আই সি।

সবটা মিমির সামনেই হচ্ছিল। মিমিকে শুনিয়েই।

ভাস্কর মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে হেলাফেলার সঙ্গে বলেছিলেন—দেখছিস মিমি। আর এসব মানায় না। বড় হয়ে গেছিস। বোঝ একটু!

তারপর একদিন নবগোপালের পুনর্লন্ডনযাত্রা। প্রতিদিন অবাধ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে যাচ্ছে যেন সর্বাণীকে দেখিয়ে দেখিয়ে। তিনটে ছেলে এল। ঘর বন্ধ করে তিনঘণ্টা কী করল কে জানে। দরজা খুলতে ভক ভক করে বিশ্রী সিগারেটের গন্ধ। আর তো সহ্য করা যায় না।

—মিমি!—ছেলে তিনটে চলে গেছে। তিনি ডাকলেন—মিমি!

—চোখ তুলে তাকাল।

—কে ওরা?

—কে আবার? বন্ধু! তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল।

—দরজা বন্ধ করে রেখেছিলে কেন?

—বেশ করেছি।

—এখন বড় হয়ে গেছ, ছোটবেলার শাস্তিগুলো কিন্তু ভুলো না। আর একদিনও যেন না দেখি!

—কে? কে তুমি এসব বলবার? আমাকে!

—আমি কেউ হই বা না হই কথাগুলো শোনো। শুনে রাখো।

—আমার মায়ের জায়গা কেড়ে নিতে লজ্জা করেনি?

—মায়ের সঙ্গে দিনের পর দিন চূড়ান্ত অসভ্যতা করতে তোমার লজ্জা করেনি? মায়ের কথা তুমি বোলো না। তোমার এ সমস্ত নাটুকেপনা আমি বুঝি।

—লাগাবে? লাগাবে বোধহয় এবার বাবাকে! সৎ-মা গিরি শুরু হয়ে গেল। আমি এখানে থাকব না।

পরদিন সকালে দেখলেন নেই। সর্বনাশ!

তিনি হতভম্ব। চেনাশোনা যত বন্ধুর নম্বর ছিল তাদের ফোন করলেন, তনিকার কাছে যায়নি, রমিতার কাছে যায়নি, অর্ণব, সৌকান্ত, অনীশ কেউ জানে না, তিনি ভাবছেন—এবার পুলিশে খবর দেবেন নাকি। ঝনঝন করে ফোনটা বেজে উঠল।

—আপনি কে আমি জানি না জানতে চাই না। আমি ভাস্কর চক্রবর্তীর স্ত্রী। আপনাদের বাড়ির একটা শয়তান মেয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে থাকছে তার স্টুডিয়োতে। মিস্ট্রেস। জানালাম। যা বিবেকে বলে—করবেন।

যাক। এতদিনে ধাক্কা খেয়ে সেই ঘৃণ্য অধ্যায়টা শেষ হল।

পনেরো

তনিকা পরেছে একটা নাগাল্যান্ডের র‍্যাপ অন। টপটা অবশ্য বিদেশি। টপও ঠিক নয়। স্লিপ গোছের, হাত-কাটা। ওপরে একটা লেস লেস উপরাংশ আছে তার, কিন্তু সে সেটা পরেনি। অক্সিডাইজ্‌ড্‌ ধাতুর ওপর লাল পুঁতি বসানো ঝোলা দুল, গলায় দু'তিন ছড়া পুঁতির মালা, হাতে পরেছে একটা কাঠের মোটা বালা, কোনও একটা ট্রেড-ফেয়ার থেকে কিনেছিল। লাল রং। রাজস্থানি গালার বালা একটা, সেই সঙ্গে অক্সিডাইজ্‌ড্‌ মোটাসোটা চুড়ি-বালার মধ্যবর্তী কিছু। পায়ে একটা ফটাস ফটাস চটি গলিয়ে নেয়। চেহারাখানা দেখবার মতো। লম্বা আয়না এ ঘরে নেই। মিসেস উইলিয়াম্‌সের কাছে ওপরে চলল। শুকনো ঝাড়ন দিয়ে মুছে মুছে কাচ পালিশ করছেন উইলিয়াম্‌স।

—আন্টি, তোমার ঘরে কেউ আছে?

—কী?—আমি একজন ভদ্রমহিলা, এই সকালে আমার ঘরে কে থাকবে?

—উঃ। তনিকার ঠোঁট দুটো প্রসারিত হয়, —আমি তোমার লম্বা আয়নাটায় নিজেকে একটু দেখব।

—ফ্র্যাঙ্ক! ফ্র্যাঙ্ক! বেরিয়ে এসো।

তড়বড় করতে করতে সাদা ভুরুর ফ্র্যাঙ্ক বেরিয়ে আসেন।

—কী ব্যাপার? কী ব্যাপার? ডাকাত?

—টনিকার আজ সকাল থেকে পার্টি। শি হ্যাজ ড্রেসড্‌ আপ।

—আরে দেখি দেখি!—ফ্র্যাঙ্ক ভাবলেন—তাঁকে পার্টি-সাজ দেখতে ডাকা হচ্ছে, তাড়াতাড়িই বেরিয়ে এলেন, চশমা গলাতে গলাতে।

—আহ্‌! জংলি কোনও পার্টি নাকি? উইথ অল সর্টস অব ট্রাইব্যাল্‌স্‌! ইতিমধ্যে তনিকা শুট করে ঢুকে গেল। লম্বা আয়নাটা দেওয়াল থেকে ঝুলছে। পুরো চেহারাটা দেখা যায়। দুটো আঙুল ঠোঁটের ওপর চাপা দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। এদিক-ওদিকে একটু ঘুরল। ফ্র্যাঙ্ক আঙ্কল-ই

অবশ্য আয়নার কাজটা করে দিয়েছেন। এইটাই তার পছন্দ। ঠিক এইটাই। র‍্যাপ অনটার সঙ্গে টপটা একেবারে যাচ্ছে না। তার সরু সরু হাতে অনেকগুলো চুড়িবালা। বেশ ঢলঢল করছে। প্রথমেই তার হাতের ওপর চোখ পড়বে লোকের। চোখের কাজলটা সে একটু ধেবড়ে নিল। এবার মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো এলোমেলো করে দিল। যেটুকু বা যত্নের ছাপ ছিল, এবার সেটা চলে গিয়ে একটা বেশ 'ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা' গোছের এফেক্ট। সে আন্টিদের হাত নেড়ে একছুটে নীচে নেমে যায়। তনিকা আজ 'চিত্রভানু'তে যাচ্ছে।

ঝড় বৃষ্টি গরম—সবই চূড়ান্ত হয়ে গেল বেশ কয়েক বার। পার্ক সার্কাসের রাধাচূড়াগুলো কিন্তু এখনও সমান সতেজ। লেক পেরিয়ে সে চিত্রভানুতে যাবে। দু'ধারে কৃষ্ণচূড়া। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে সে বলল গাড়িটা একটু লেক-ক্লাবের দিকে রাখুন না।

—কী করবেন?

—আমি না আপনি। ওই যে ওই বেঁটে কৃষ্ণচূড়াটা! ওর তলার ডাল থেকে আমাকে একটু ফুল পেড়ে দেবেন?

—আচ্ছা, আপনি গাড়ির মধ্যে বসুন।

দিব্যি এনে দিল। একঝাঁক উজ্জ্বল হাসির মতো কৃষ্ণচূড়া।

যখন নামল, বুকের ওপর ফুলগুলো আঁকড়ে নামল সে।

একটা পার্কের ধারে বাড়িটা। বাইরে কিছু লেখা আছে নিশ্চয়। ঠিকানাটা সে জানে। কিন্তু এইসব অঞ্চলে ঠিকানা খুঁজে পাওয়া দায়।

ওঃ ওই তো! একটা কঠের দরজা, তার সারা অঙ্গে ছবি আঁকা। নিশ্চয় ওইটা। শিয়োর, ওরই ভেতরে লেখা 'চিত্রভানু'।

দরজাটা আধখোলা ছিল। ঢুকেই সিঁড়ি। ডানদিক দিয়ে ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখল, একটা মস্ত বড় ঘেরা দালান, চারদিকে কাচ বসানো বড় বড় জানলা। দুটো-তিনটে ইজেলের সামনে কাজে মগ্ন দু'-তিনজন। পাশে উঁচু টুলের ওপর রঙের পেলেট।

পেছন থেকে মনে হল—ওটাই শৌনক। ইচ্ছে করে চটিটাতে একটু শব্দ করে এগোল সে। একজন পেছন ফিরল।

—দিদি আছেন?

এবার শৌনক ফিরে তাকাল।

—তুমি...সেদিনের তারাতলার সেই...মিমি...।

—আমি তনিকা।—একটু ক্ষোভের সঙ্গেই বলল সে। কেন যে তার সঙ্গে মিমিকে লোকে গুলিয়ে ফেলে। একই ধরনের চেহারা ঠিকই, কিন্তু তারা তো এক দেখতে নয়! ইমপ্রেশনটাও এক হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া তার এই এতখানি লম্বা-চওড়া চুলটাই তো প্রথম দর্শনে তাকে চিনিয়ে দেয়।

—স্যরি, আমার নামটাই গুলিয়ে গিয়েছিল। তোমাকে তো আগেও দেখেছি সেই অ্যাকাডেমিতে—দুর্দান্ত ছবিটা এঁকেছিলে...লাল বেড়ালের। ভার্মিলিয়নের সঙ্গে ঠিক কী কী মিশিয়েছিল বলো তো? ব্যাপক, বীভৎস।

—দিদি নেই?

—আসছেন! জাস্ট একটু পরে।

আরও কতকগুলো ছেলেমেয়ে উঠে এল। কলকল করতে করতে একটা ঘরে ঢুকে গেল।

তুমি...চটিটা—শৌনক বলল।

—ওহ্ স্যরি।

সে সিঁড়ির এক পাশে চটি জোড়া খুলে এল। একটু বেশি নীচে নামতে হল, কেননা প্রত্যেক ধাপে একজোড়া করেই জুতো বা চটি।

বেশ শৃঙ্খলা। এই রকম ভাল লাগে তার। ছড়ানো ছিটোনো ব্যাপার তার দুটি চক্ষের বিষ। তবে হ্যাঁ বিশৃঙ্খলাও আবার। বিশৃঙ্খলা নয় বৈষম্য—যেমন তার ড্রেস।

—ফুলটা কি দিদির জন্য এনেছ?

—তোমার জন্যে নিশ্চয় নয়।

তুলি রেখে ছেলেগুলো সব ঠা-ঠা করে হেসে উঠল। ভেতরের ঘর থেকে ওরা বেরিয়ে এল—আমাদের বাদ দিয়ে কী এত হাসি মারছিস রে? ডেকে নিবি তো! এবার ভাল করে চোখ পড়ল তনিকার ওপর। দু'-তিনজন ওকে চিনতে পারল বোধহয়? শৌনক বলল—এই কাজল, ওই রুদ্ধ মানে অনিরুদ্ধ আমরা রুদ্ধ বলি, এটা গিয়াস—গিয়াসুদ্দিন বলবন আর কী! প্রাক্তন সম্রাট। আর রুদ্ধ অ্যান্ড কোং এই তনিকা। আগামী দিনে আমাদের ভাত মারতে আসছে।

—সত্যি, তনিকা তুই 'চিত্রভানু'তে আসছিস। একটি মেয়ে বলল—কী ভাল হয়! জানিস তো এখানে আমরা মাইনরিটি। আমি আর চৈতালি ছাড়া আর কোনও মেয়ে নেই। এইবার দুই থেকে তিন হলাম।

—এক ঘড়া গঙ্গাজলে তিন ফোঁটা চোনা—কাজল বলে ছেলেটা বলে উঠল...

হংস মধ্যে বক বলতে পারতিস তো! রুদ্ধ বলল, এটাই চুজ করলি কেন?

—আরে বক, হংস, হংসবলাকা ও সব এখন রবিঠাকুর থেকে হেমন্ত মুখোর গানে ঢুকে বসে আছে। লোকসাহিত্য থেকে এইটেকে টেনে তুললাম। পোস্ট-মড বলতে পারিস।

—এই-এই-এই কাকে এত হিড়িক দিচ্ছিস রে...বলতে বলতে ওপরে উঠে এলেন অদিতি। সেই প্যান্ট আর কুর্তা। আঁকাআঁকির মধ্যে থাকলে বোধহয় উনি এমন ড্রেসই পরেন।

—আরে! অনো...দূর তনিকা...সমস্ত মুখে একটা দীপ্তি ছড়িয়ে গেল।

—আপনি আসতে বলেছিলেন...।

—এই এই—দিদিকে আপনি বলছে রে। গিয়াস বলল—এবার বোধহয় আমাদেরও পেন্নাম করবে।

—এই পেন্নাম বলতে নেই, বল কদমবুসি। পলিটিক্যালি কারেক্ট।

—চন্নামিত্তিরও খেতে পারে।—কাজল উদাসভাবে বলল।

—দিদি আমি যাচ্ছি।—তনিকা রেগে লাল হয়ে পেছন ফেরে...।

—না, না কোথায় যাবে? তাড়াতাড়ি এসে হাত ধরলেন। শরীরের ভেতরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল একটা।—ওদের কথা বাদ দাও। ওরা সব পাগল। খ্যাপা।

—শেয়ানা পাগল! তনিকা বলল, ভাবলেশহীন মুখে।

খুব একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল 'চিত্রভানু'তে।

—এই যে বাবা, পথে এসো, এতক্ষণে 'পাস-ওয়ার্ড'টা বললে।—কাজল চোখ দুটো মজার মতো করে বলল।

—তা তুই-ও তো খ্যাপা কম না তনিকা, আর....আর...বেশ শেয়ানাও। হেসে ফেললেন অদিতি—চল তোকে সব দেখাই।

ভেতরে তিনটে ঘর, একটা পুরোই পার্মানেন্ট প্রদর্শনী এটা।

—দ্যাখ ওদের ফিনিশ্‌ড ছবিগুলো এখানেই থাকে, ক্লায়েন্ট এলে দেখাই। অনেক সময়ে নিয়েও যাই।

—দিদি! অবাক চোখে তনিকা চেয়ে আছে—দেওয়ালে ওর 'ফেলাইন মর্নিং।'

—ওটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছেন তোমার মাস্টারমশাইরা। আমি চেয়েছিলাম। কিনতেই চাই। কিন্তু ও রকম নিয়ম বোধহয় নেই, কলেজের সম্পত্তি নাকি। ওঁরা উপহার দিয়েছেন। আর এখন আমি ওটা চড়াদামে এক ফরাসি আর্ট কালেক্টরকে বিক্রি করব...

—ফরাসি।...তনিকার চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ ফরাসি। দামটা হাঁকব খুব...উনি প্রোমোটও করেন শিল্পীদের। আর ওই টাকাটা তুমি পাবে।

—আমি? আমি কেন?

—বা ওটা তো তোমারই।

এখন তো আপনার!

যদি বিক্রি করার সুযোগটা না পেতুম, তা হলে ওটা আমারই থাকত। কিন্তু ওই ভদ্রলোক—এই ডিসপ্লেটা দেখে গেছেন। বেশ কয়েকটা পছন্দ করেছেন। এদের সবার মন আজ খুব ভাল তাই। ছবিটা যেখানে ছিল চুপচাপ থেকে যেত। এবার ছবিটা দেশভ্রমণ করবে। তুমিও। নিশ্চয়। টাকাটা তোমারই প্রাপ্য।

—না, তা...।

—এ রকম গাঁইগুঁই করলে কিন্তু শুধু ছবি আঁকাই হবে তনিকা, ছবি বিকোনো হবে না। আমি যতটা আর্টিস্ট, তার চেয়ে বেশি এখন আর্ট প্রোমোটার। রাইট?

ঠিক আছে। আত্মসংযম, ডোন্টকেয়ার...সব সত্ত্বেও তনিকার মনটা ভরে যাচ্ছে। কেমন একটা ডানা মেলে শাঁ শাঁ করে উড়ে যাবার ইচ্ছে। নিজের হাতে ছবি এঁকে রোজগার! পাশ করার পর প্রথম বছরেই! এর আগে কয়েকটা ওয়ার্কশপে বা বড় কাজের মধ্যে অন্যতম শিল্পী হিসেবে কাজ করে রোজগার হয়েছে তার। কিন্তু এটা দাদা-বউদিকে একটা মস্ত চমক দেওয়া হবে। দাদার একেবারে ইচ্ছে ছিল না সে ফাইন আর্টসে আসে। কিছু না হোক অন্তত কমার্শিয়াল! কিন্তু সে জেদ ধরে ছিল। বউদিও বলে—ওর অত ভাল হাত। করুক না! এখন কিন্তু আগেকার সে সব দিন আর নেই!

সে বলেছিল—বাবা আমার বিয়ের জন্যে যে টাকাপয়সা, গয়না রেখে গেছে, সেই থেকে দে। তোকে দিতে হবে না।

—তোর বিয়ের টাকা দিয়ে তোর পড়াশোনা! আঁকাজোকা!

বউদি খুব রাগ করে...দ্যাখ তনি, তোর দাদা তোর চেয়ে অনেক বড়। বেশি চালকি করবি না।

—ইন এনি কেস, আমি তো ডাউরি দিয়ে লোক খাইয়ে বিয়ে করব না! ওসব গয়নাও আমি পরি না।

—সে তখন যা ইচ্ছে কোরো। এখন ও টাকাতে, গয়নাতে হাত দেওয়ার কথা ভুলেও উচ্চারণ কোরো না।

—বন্ধুর কী খবর?

—ভাল।

অদিতি তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। স্বল্পভাষী মেয়েটির ওই ছোট্ট করে বলা 'ভাল'টুকু অনেক কথা বলে। ওদের মধ্যে নির্ঘাত ঝগড়া হয়েছে। যেমন তার আর মনীষার মধ্যে হত, আর...আর... তার আর সুজানের মধ্যেও। সুজানের ভাবনা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না সে, মন থেকে ছিঁড়ে উপড়ে ফেলতে চায় ওর স্মৃতি। আশ্চর্য! ও মেয়ে, ও জানে মেয়ে সাধারণত অসহায়, তবু মেয়ের ওপরেই ওর রাগ। কেন? রাজর্ষির জায়গাটা অসাড় হয়ে গেছে, কিন্তু সুজানের জায়গাটা হয়নি। কেন? বোধহয় মেয়েদের ওপরেই বেশি ভরসা বেশি বিশ্বাস বলে।

—তোরা কাজ কর আমি একটু আসছি।

অদিতি তনিকাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

—চলো তোমাকে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে নিয়ে যাই।

—কিছু চলছে? আপনার?

—উঁহু, 'মাতিস' আসছে। যেমন তোমাদের 'লাগান' আসে 'শ্বশুরবাড়ি-বাপের বাড়ি' আসে। মিটিমিটি হাসি তার মুখে। তনিকা বলল—সত্যি?—ও তো দিল্লিতে এসেছে।

—ছিল, এবার কলকাতায় আসছে। এখনও তেমন প্রচার ঘোষণা এসব হয়নি। আমি বারণ করেছি। সিকিউরিটির কারণেও বটে।

—সিকিউরিটি বুঝলাম, তা ছাড়া?

—তুমি তো রদ্যাঁর ভিড় দেখোনি? রদ্যাঁ এসেছিল, এই বিড়লাতেই। কিউ গিয়েছিল পুরো শরৎ বসু রোড পার হয়ে। আগে থেকে জানালে লোকে হয়তো সাতদিন আগে থেকেই পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বসে পড়বে।

—আমরা ও রকমই—তনিকা একটু গোঁয়ারের মতো বলল।

—অমনি গায়ে লেগে গেল? মোটেই তুমি ও রকম নয়। তুমি বেশ অহংকারী। চলো, এখন ছবিগুলো ক্রেট থেকে বেরোচ্ছে, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গেও তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

—কে?

—যিনি তোমার ছবিটা কিনছেন? আঁদ্রে বোর্দো।

চমকে উঠল তনিকা। অদিতি বোর্দো গুপ্ত সরকারটা তার শোনা ছিল। চমকটা চোখ এড়াল না অদিতির।

—চেনো?

মাথা নাড়ল তনিকা।

—নামটা জানো, না?

খুব জোরে মাথাটা আবার নেড়ে দিল তনিকা।

—ঠিক যেমন জানো না নিজের পদবি, ঠিকানা, নয়?—দিদি হাসছেন সে বুঝতে পারে গলার স্বরে, কিন্তু চলতে চলতে ততটা হাইটের তফাতে চকিত হাসি দেখা যায় না।

অদিতি ভাবে—এই মেয়ের গোপনতাপ্রিয়তা আর তার আকাশ-বাতাসের মতো বেআব্রু জীবন। দুটো যেন দুই মেরুতে। সে কখনও লুকোতে চায়নি আর একদা বোর্দো বা গুপ্ত পরিচয়। রাগও সে পুষে রাখতে পারে না। একটা দাগ রেখে চলে যায় রাগ, জায়গাটা অনুভূতিশূন্য, খালি শূন্য হয়ে থাকে।

বিড়লা অ্যাকাডেমির দোতলায় গ্যালারিতে কাজ চলছে। মাঝখানে বসে আছে, মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে দেওয়াল জরিপ করছে আঁদ্রে। পেছন থেকে অদিতি গিয়ে পিঠে হাত রাখল।

—ওদিৎ! আঁদ্রে অ্যাবাউটটার্ন করে প্রথমেই তাকে জড়িয়ে ধরল, গালে চুমো। তারপরে তার নজর পড়ল পাশে।

—আঁদ্রে এই সেই তনিকা যার বেড়ালের ছবিটা তুমি....

—ওহ, দিস কিউতি! রিয়্যালি! শি হ্যাজ সাচ ত্রিমেন্দাস পাওয়ার!

তনিকার গালে হালকা চুমো খেল আঁদ্রে, নিচু হয়ে।

—ওকে তোমার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দিয়ে গেলাম, সাজাও তোমরা, আলাপ করো। আমি কাজ ফেলে এসেছি। তনিকা, এটা একটা মস্ত বড় সুযোগ, কাজ শেখবার। তুমি যেন না কোরো না। আঁদ্রেদার কাছ থেকে তুমি অনে—ক শিখতে পারবে।

আঁদ্রে নয়, মঁসিয়ে বোর্দো নয় আঁদ্রেদা। এত স্বাভাবিক এত সুন্দর শোনাল ডাকটা অদিতিদির মুখে। তার সমস্ত সংকোচ নতুন আলাপের আড়ষ্টতা উধাও হয়ে গেল।

—ক্রনোলজিক্যালি রাখবেন? আঁদ্রেদা?—'আঁদ্রেদা'র সংগীতটা ফুরোবার আগেই সে যেন সুরটা ধরে নিল।

—না, আমার সেটা....বেশ তো তোমার মত কী বলো? কী সহজ ভদ্রলোক। তার মতো একজন শিক্ষার্থীকে কত সহজে জিজ্ঞেস করছেন!

তনিকা একটু, খুব সামান্য থমথম খেল। তারপর বেশ স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভঙ্গিতে বলল—আমার কোনও মত নেই। আমি তো জানি না...আপনি বলুন...।

—আমি আসলে বিষয় অনুযায়ী রাখতে চাইছিলাম।

আঁদ্রেদা কথা বলেন ইংরেজিতে, টবর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণগুলো নরম উচ্চারণে। কোনও ব্রিটিশ বা মার্কিন অ্যাকসেন্ট নেই। এবং সবচেয়ে মজা, খুব বাংলা শব্দ ব্যবহার করেন। আমি রিয়্যালি রাখতে চাই অ্যাকর্ডিং তু বিষয়। এমনিতেই ফরাসি উচ্চারণে ইংরেজি শুনতে খুব ভাল লাগে, তার ওপর বাংলার পাঁচফোড়ন, মোহিত হয়ে যেতে হয়।

অদিতিদি এত চেষ্টা করে সুন্দর বাংলা শিখিয়েছেন। এত সুন্দর বন্ধু, যেমন সহজ অথচ সাহসিক ব্যক্তিত্ব অদিতিদির, তেমনই মধুর অথচ বলিষ্ঠ এই আঁদ্রে বোর্দো। দু'জনে যখন কথা বলেন, আঁদ্রেদাকে কী রোম্যান্টিক লাগে, যেন ভিক্টর হুগো কিংবা আলেকজান্ডার দুমার পাতা থেকে উঠে এসেছেন। একদম প্রেমে পড়ে যাবার মতো লোক! অদিতিদি অতটা রোম্যান্টিক না হলেও, কেমন স্বচ্ছ, একটা কাকচক্ষু দিঘির মতো ব্যাপার আছে ওঁর মধ্যে। কী অদ্ভুত একটা আস্থা হয়, ভরসা হয়, কোনও বাড়াবাড়ি নেই অথচ মুহূর্তে আপন করে নিতে পারেন। তাকে কী রকম বিনা দ্বিধায় গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন! নিজের বাথরোব জামাকাপড়..সম্পূর্ণ অচেনা একটা মেয়েকে যে ঠিকানা বলতে চাইছে না। খিচুড়ি খাওয়ালেন নিজে রেঁধে। খাওয়া নিয়ে তার অত প্যানপ্যানানি নেই, কিন্তু ওঁর খিচুড়িটা খুব ভাল হয়েছিল।

কী হল দু'জনের মধ্যে? শুধু দেশের, সংস্কৃতির তফাতের জন্যই কি এমনটা হল? কিন্তু সে যতটা দেখেছে, বুঝেছে, অদিতিদি কেমন একটা আন্তর্জাতিক মানুষ। সে অবশ্য সমুদ্র পারে কখনও যায়নি, কিন্তু ফিল্মে, ডিসকভারি চ্যানেলে, বইয়ের পাতায় তো অনেক দেখেছে। শুনেছে! তার মনে হয় অদিতিদি সব জায়গায় স্বচ্ছন্দে মানিয়ে যাবেন। রেনোয়ার 'সুইং' ছবিটাতে আঁদ্রেদা আর অদিতিদি থাকলেও ভারী সুন্দর একটা চিত্রসংগীত রচিত হয়। সে কোনও-না-কোনও দিন তার এই আন্তর্জাতিক অনুভূতির কথা ছবিতে লিখবে। আরণ্য আলোছায়ার মধ্যে তার ভাললাগা দু'জন মানুষ। আদ্রেঁদাকে কি বাঙালি ফুলবাবু সাজাবে? কুঁচানো ধুতি আর কাঁথা-কাজ করা পাঞ্জাবিতে? উঁহু কুঁচনো ধুতিটা সামহাউ তার পছন্দ হয় না। কেমন লম্পট বাবু-বাবু দেখায়। এক কাজ করা যায়, প্যান্টের ওপর একখানা পাঞ্জাবি পরিয়ে দিলে হয়, আর দিদি? দিদি কি শাড়ি পরবেন? 'সুইংটার গাউনের এফেক্টটা শাড়িতে আসবে ভাল। দিদিকেও প্যান্ট পরালে...না ছবিটা অন্য রকম একটা মেসেজ দেবে—ইউনিসেক্স, ইউনিসেক্স। তারা সবাই পোশাকেআশাকে এখন একলিঙ্গ হয়ে যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু শাড়ির মহিমা কে অস্বীকার করবে! আঁদ্রেদার সোনালি চুলের পাশে দিদির ডার্ক ব্রাউন যা মানাবে না! যেন 'আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা, গড়িব না।' সত্যিই, যতই রোম্যান্টিকই দেখাক আঁদ্রেদাকে, কাজের মধ্যে এমন একটা মগ্নতা, দায়িত্ববোধ। আর দিদির? কমিটমেন্টেই যেন দিদির চেহারা বেশি খোলে! যখন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ঘোরেন, তাদের ছবি বিক্রির জন্য দৌড়োদৌড়ি করেন, যখন...যখন...যখন... যে সব সময়ে সে ওঁকে দেখেনি, সে সব সময়েও যেন সে দেখেছে ওঁকে। তবে এই স্বপ্নের অভীষ্ট ছবি আঁকতে হলে তাকে টেকনিক আরও আয়ত্ত করতে হবে। সে জানে তার আইডিয়া খুবই শক্তিশালী, রং-ও তাই, রঙের ব্যবহার নিয়ে তার নিজের প্রতি কোনও নালিশ নেই। কিন্তু টেকনিক। টেকনিক আরও শিখতে হবে। কোথায়, কোথায় সোজাসুজি ক্ল্যাসিক্সগুলোর

কপি করতে পারবে? নিউ ইয়র্ক? ন্যাশানাল আর্ট? নাকি সুবিখ্যাত স্মিথসোনিয়ান? নাকি বিখ্যাততম, চিত্রকরের স্বপ্ন ল্যুভ? ভেতর থেকে একটা লকলকে উৎসাহ আর আনন্দের শিখা বেরিয়ে আসে।

—মাতিস সম্পর্কে তোমার রেসপন্স কী, তনিকা?—আঁদ্রেদা জিজ্ঞেস করলেন।

—দেখো, মাতিস তো আসলে একজনই। কেউ সেভাবে ওঁকে ফলো করেনি, যেমন করেছিল মানের ইমপ্রেশনিজম, পিকাসোর কিউবিজম। যদিও ব্রাক বা পিকাসো তাঁদের কিউবিস্ট ছবিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বেশি গুরুত্ব দিতে চাননি, তবু পৃথিবী ভরে গেল কিউবিস্ট ছবিতে। এদিকে মাতিস বেচারি! সত্যিকারের মৌলিক শিল্পী, চাপা পড়ে গেলেন জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের তলায়।

—সেটা তো ভালই আঁদ্রেদা। ওঁকে কেউ নকল করল না, উনি অদ্বিতীয় রয়ে গেলেন।

—সত্যিই রইলেন কি? আঁদ্রেদা মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

তনিকার মুখটা একটু লাল হল—আমার ছবিটা কি একেবারেই মাতিসের কপি হয়েছে?

—আরে না না, একেবারেই না। টেম্পারামেন্টের দিক থেকে তোমার মাতিসের সঙ্গে মিল। দেখো, এ রকম হয়েই থাকে, খুব বন্যভাবে রং ব্যবহার করেছ, উগ্রতা আছে। বিদ্রোহ আছে চিৎকারও আছে, কিন্তু তুমি জানো তুমি কী করছ। তোমার নিয়ন্ত্রণ একেবারে চমৎকার। তবে কী জানো, মাতিস এই সময়ে আবার সমাধি থেকে উত্থিত হচ্ছেন।

ক্রেট থেকে ছবি নেমেছে অনেকগুলো। আঁদ্রেদা তুলে নিলেন 'জিপসি ওম্যান'। চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

—লেৎ আস স্তার্ত উইথা ব্যাং, কী বলো? আঁদ্রেদা ওর অভিভূত মুখের দিকে চেয়ে বললেন।

সবুজ, হলুদ, লাল, নীল, সাদা কালো কী নেই এই একখানা আবক্ষ ছবিতে। বাঁকা হাসি, ফুল্ল চোখ। একই সঙ্গে যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে আবার উপহাস করছে। মোটা মোটা পোঁচড় রঙের। যাযাবর জীবনের বর্ণময় উৎসবে ভরতি ছবি।

—এরপর কি একটা নরম রঙের ছবি দেব, তনিকা?

—না আঁদ্রেদা, এই রকমই পোট্রেট-টাইপ দিন। জিপসিটা দেখলে আরও আরও রং-চং-সঙের জন্য খিদে জাগবে। অন্তত আমার।

—ওয়েল, এই প্রদর্শনী শুধু তোমারই জন্যে হোক। বলে আঁদ্রে বোর্দো বাছলেন।

—আ ওম্যান উইথ আ হ্যাট। টুপি কী? রঙের ফোয়ারা।

—দেখো এবার মাদাম মাতিসের ছবি রাখছি। তারপর অঁরি মাতিসের সেলফ পোর্ট্রেট।

লাল পোশাক-পরা ঘন নীল চুলের ব্যক্তিত্বশালিনী মাদাম যাঁর অর্ধেক মুখে গোলাপি উদ্ভাস, বাকি অর্ধেকে সবুজ হলুদ।

মাতিসের নীল সবুজের সংগীতপূর্ণ আত্মপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তনিকা বলল—উনি নিজেকে স্বপ্নের মতো, দূরের ভাবুক দেখতেন কিন্তু আঁদ্রেদা। আর দেখুন এই যে দির‍্যাঁর পোর্ট্রেট এঁকেছেন এর মধ্যে কিন্তু আবার জিপসির বর্ণোৎসব ফিরে এসেছে। খানিকটা মুখোশ-মুখোশ ব্যাপার।

—বর্ণোৎসব, আঁদ্রে চেষ্টা করে উচ্চারণ করেন, সেটা কী?

—বর্ণ তো আপনি জানেন, তারপর উৎসব, সন্ধি হয়ে গেছে, ফরাসিদের তো সন্ধি চট করে ধরতে পারার কথা।

—ঠিক...বলতে বলতে আরও দুটি বিখ্যাত ছবি বেরোলে—'লাক্সারি:কাম অ্যান্ড ভোলাপচুয়াস,' এবং 'ওম্যান উই থা প্যারাসল'। প্রথমটা সমুদ্রতীর। মহিলারা নানা ভঙ্গিতে কেউ ভিজে চুল উঁচু করে সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। কেউ হাত ফিরিয়ে বাঁধবার উদ্যোগ করেছেন। কেউ শুয়ে আছেন পাশ ফিরে হাতের ওপর ভর, চূড়ান্ত শৈথিল্য...পিকনিকের আয়োজন...এইভাবেই বার হল—'হার্মনি ইন রেড', 'স্টিল লাইফ ইন ভেনিশিয়ান রেড', 'রেড অনিয়নস'—কোথাও রঙের নিমন্ত্রিত হোলি, কোথাও স্বপ্নিল পশ্চাৎপটে আঁচড় দিয়ে দিয়ে রঙের বিন্যাস।

চারপাশে রং, শুধু রং। তার মাথার চিন্তাগুলো সুদ্ধু রঙিন হয়ে যাচ্ছে। নীল হতাশা, সবুজে-লালে অনন্ত ঊর্ধ্বে ওঠার আর্তি, ধূপছায়া রঙের প্রেমাকাঙ্ক্ষা তার। প্রত্যেকটি চিন্তা, মনোভঙ্গি, মেজাজের রং সে চিনতে পারছিল আলাদা আলাদা করে। এভাবে এত কাছ থেকে এত নিভৃতে একজন সত্যিকার রসিক ও বোদ্ধার সঙ্গে ছবি দেখা, মৌলিক ছবি একেবারে! মাত্রাটাই আলাদা। মাতিসের হাতের ছোঁয়া লেগে আছে এ সব ক্যানভাসে, এ এক অলৌকিক অনুভূতি। কী আশ্চর্য এই আঁদ্রেদা, কোয়াইট ডেফিনিটলি এখন থেকে রুদ্রাংশুরা আউট, আঁদ্রেদা প্রবল ভাবে ইন। ভাস্কর চক্রবর্তী ফুঃ, অদিতি সরকার ওহ্ ফ্যানটাস্টিক। ওরা সব ঠিকঠাক শিল্পী নয়। ছন্দ মিল আয়ত্ত করলেই যেমন কবিতা হয় না, ড্রয়িং আর রং লাগাবার টেকনিক জানা থাকলেই তেমন শিল্পী হয় না। তার মনের গভীরে কোথাও বিশ্বাস আছে সে মৌলিক এবং সে শিল্পী। স্তর কী সেটা আলাদা কথা, কিন্তু সে শিল্পী। না হলে এমন চিত্রময় কেন তার জগৎ! এই যে কিছুক্ষণ আগে 'চিত্রভানু'তে দেখে এল দৃশ্যটা! চার-পাঁচটি ছেলে তন্ময় হয়ে ইজেলের সামনে। এই ছবিটা এখনও তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। চুলোয় বাক ড্রয়িং, সে মোটা মোটা ব্রাশ-স্ট্রোক দিয়ে বহুবর্ণ করে আঁকবে ওই ছবি আঁকার ছবি। শৌনক পেছন ফিরে, কাজলের তদ্‌গত পাশ মুখ, গিয়াস রং মেশাচ্ছে, অনিরুদ্ধই বোধহয়, সিলিংয়ের দিকে মুখ। কিছু ভাবছে, হাতে উদ্যত তুলি যেন উদ্যত রিভলভার। একটা বিস্ফোরক ছবি। কেন বিস্ফোরক! সে জানে না। যা-ই আঁকুক তার মধ্যে একটা প্রবল আত্মঘোষণা থাকে তার, যেন কুরুক্ষেত্র শুরু হবে পাঞ্চজন্য বাজছে, নেপোলিয়নের সঙ্গে জারের যুদ্ধ রণতূর্য বাজছে, বিউগলের আকাশফাটানো নৃশংস সুর। এত চড়া সুর কি হওয়া খারাপ! আড়চোখে দিরাঁার পোর্ট্রেটা দেখে সে, 'জিপসি'টা দেখে। কোথায় একটা তুমুল সমর্থন, একটা উত্তাল উদ্বেল ভরসা পেতে থাকে। এমন একটা আলোড়ন, যা তার মনে অস্পষ্ট দ্বিধা-দ্বন্দ্বগুলোর সামনে দাঁড় করিয়ে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করে তাদের। চোখ দুটো কাচ-চকচক হয়ে ওঠে। চোখ লুকোতে সে ক্রোটের পরবর্তী ছবিগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে, সাবধানে।

—ছবিতে তিয়ার্স পড়লে কিন্তু মিলিয়ন দলার্স ফাইন।

তনিকা ঝট করে মুখটা ফিরিয়ে নেয়। লজ্জা পেয়ে যায় খুব কিন্তু উত্তেজনাময় আবেগের চুড়ো থেকে তক্ষুনি নামতে পারে না। খুব লজ্জার সঙ্গে রুমাল বার করে, জানলার দিকে চলে যেতে থাকে। কী হবে, কী বলবে আঁদ্রেদা যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন। এই কান্নার মধ্যে কি আঁদ্রে বোর্দোও নেই! অদিতি সরকারও নেই! দুটো দারুণ জোরালো চুম্বক-ব্যক্তিত্ব যা তাকে লোহাচুরের মতো টেনে নিচ্ছে অন্য এক আবহমণ্ডলে।

কিন্তু আঁদ্রে বোর্দ্রো কিছুই জিজ্ঞেস করেন না। মহৎ এবং প্যাশনেট শিল্পের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের ভেতরের নিরুদ্ধ আবেগ এভাবে বেরিয়ে আসে কিন্তু জানেন। ভ্যান গগ্-এর সানফ্লাওয়ার্স চাক্ষুস দেখার পর, পিকাসোর গ্যেরনিকা প্রত্যক্ষ করার পর কি তিনি কাঁদেননি! হতে পারে এই কান্নার মধ্যে মেয়েটির কোনও ব্যক্তিগত দুঃখও আছে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। ছবি আর দর্শকের মধ্যে একটা নিরন্তর দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ছবি দিচ্ছে, এটা তো বোঝাই যায়, কিন্তু প্রত্যেকটি সমঝদার দর্শকও কিছু দিয়ে যায় ছবিকে, তাদের স্ফুরণের ঐশ্বর্যে আরও মণ্ডিত হয়ে ওঠে ছবি, যেমন অজন্তা হয়েছে, মুঘল মিনিয়েচার হয়েছে। দিল্লি থেকে কতদূর অজন্তা। কিন্তু তিনি তো না দেখে থাকতে পারেননি। আর সেই ক্ষীয়মাণ অলৌকিক শিল্পের সামনে দাঁড়িয়ে জলের ধারা বয়েছিল অঝোরে।

অনেকদিন আগে, অদিতি গুপ্তর একটা ছবি দেখেছিলেন, কোনও প্রদর্শনীতে। শুধু কতকগুলো বলিষ্ঠ রঙিন রেখায় আঁকা সঙ্গমী নরনারী, নারীর মুখ পাশ ফেরানো। একটি মাত্র বিরাট চোখ, দৃষ্টি অনুসরণ করলে দেখা যায় বেশ কিছু ভারতীয় পাম, যাদের বলে কোকোনাট পাম, পেছনে ম্লান তারার দল ঝরে পড়ছে। 'দা পাম-লাভার'। লাভার্স নয়, লাভার। অর্থাৎ পামের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি

মেয়েটিই ওই ছবির বিষয়, সঙ্গম নয়, পুরুষও নয়। মেয়েটি যেন বলছে, তুমি যখন শরীর নিয়ে এমন উন্মাদ, তখন আমি কেন পাম-যূথের দিকে, অস্ফুট তারাদের দিকে কাতর চেয়ে থাকি, কখনও ভাবো কি? সেবারও তার সোনালি গাল বেয়ে নেমে এসেছিল জলের ধারা। পুরুষ ও নারীর যৌনতার মধ্যে কী বিশাল ফারাক—ছবিটা ছন্দে বলেছিল। ছন্দে এবং ছন্দোভঙ্গে। চেষ্টা করেও ছবিটা কিনতে পারেনি সে। কোনও সুইডিশ আর্ট কালেক্টরের কাছে আগেই চলে গিয়েছিল।

—হয়তো স্পষ্ট জানি না, কিন্তু কুয়াশার মতো বুঝি ওদিৎ কেন তুমি অমন সময়ে পামগুচ্ছ আর তারার দিকে তাকিয়ে থাকো। তুমি আর তোমার মতো মেয়েরা।

সন্তর্পণে গলার আর্দ্রতা মুছে নিয়ে তনিকা বলল—আঁদ্রেদা, আপনি কি মনে করেন আমার ড্রয়িং নিয়ে আরও মাথা ঘামানো উচিত? বন্ধুরাও কেউ কেউ কেউ বলে রং চাপিয়ে আমি ড্রয়িংয়ের উইকনেস ঢাকি?

—তনিকা। আমি কিন্তু শিক্ষক জাতীয় নই। তোমার সৃজনের মধ্যে যদি সত্যি সৃষ্টি থাকে তা হলে আর ভাববার দরকার নেই। ও সব প্রি-ইমপ্রেশনিজম্-এর যুগের ভাবনা। তবে একটা কথা, পিকাসো, ব্রাক বা মাতিসেরও ড্রয়িং কিন্তু খুব খুব স্ট্রং।

ষোলো

বাইশে শ্রাবণ শীলাদিরা জোড়াসাঁকো যাচ্ছে। দেখে, রবীন্দ্রসদন থেকে গান শুনে ফিরবে। নন্দিনী, চৈতালি, আর শৌনক সঙ্গে যাচ্ছে। আজ মাধুরীর শরীরটা ভাল লাগছে না, শীলাদি যেতে চায়নি, কিন্তু মাধুরীই জোর করে পাঠিয়েছেন। অদিতিকে থাকতেই হচ্ছে তাঁর কাছে। তার অবশ্য আপত্তি নেই। প্রত্যেক রবিবারেই শীলাদিকে তার ছাত্র সহযোগে এখান-ওখান পাঠাচ্ছে সে। ফলে শীলাদি অসম্ভব স্মার্ট হয়ে গেছে আজকাল। অল্পবয়সিদের হইহল্লার সঙ্গে ঘোরবার জন্য কিনা কে জানে, একটু যেন বেশি হাসিখুশি, বয়স যেন কমে গেছে।

কবির প্রয়াণপক্ষে দুর্দান্ত ভ্যাপসা গরম! এই বাড়ির গাঁথনি আগেকার বলে, বিশ ইঞ্চি মোটা দেওয়াল আর উঁচু সিলিংয়ের মধ্য দিয়ে তাত তেমন আসতে পায় না, এই রক্ষা। জানলাগুলোতে খসখসের পরদা লাগানো থাকে। সহনীয় গরম ঘরে। বাইরে থেকে এলে মনে হয় বুঝি বাতানুকুলিত। অদিতি একটা ইজেল টেনে আনে এ ঘরে, বসে বসে আঁকে। তার ফাঁকে ফাঁকে কথাও বলে। এ সময়টা খেলা-খেলা আঁকা। আজকে একটা স্কেচবুক নিয়ে বসেছিল। অলস আঙুলে স্কেচ করতে করতে মাধুরীর দিকে চোখ পড়ল। উনি একটা আরাম চেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন, পায়ের কাছে একটা মোড়া, পা তুলে দিয়েছেন তার ওপরে। জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে অর্ধেক মুখে। মুখটা খুব অদ্ভুত। এতদিন সে খেয়াল করেনি। রবীন্দ্রনাথের রহস্যময়ী নারী যেন ওঁর চামড়ার তলা থেকে ফুটে উঠছে। উলটোদিকের দেওয়ালের দিকে মুখ, আপাতদৃষ্টিতে শান্ত। কিন্তু কীসের যে অত কাটাকুটি মুখে। সারাজীবন খুব দুঃখ পেলে, সে দুঃখ নিজের ভেতরে অবিরত আটকে রাখলে চাপা কষ্টে, রাগে এমন চেহারা হতে পারে। সাধারণত প্রতিকৃতি সে আঁকে না। হঠাৎ মনে হল এমন জীবন্ত বিষয় সামনে, আঁকলেই তো হয়। একটা ছবি কম্পোজ করতে হলে আইডিয়ার জগতে মগ্নচৈতন্যের ঘরে বড় হাতড়াতে হয়। লাগে অনেকটা তন্ময়তা। আপাতত তার মন বড় বিক্ষিপ্ত। সে পারছে না। এই সময়ে বিষয় যদি সামনে উপস্থিত থাকে তা হলে মনের, আঙুলের একটু সুবিধে তো হয়ই। আর যেহেতু বিষয় ভেতরের নয়, বাইরের, তাই একটা মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়। 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া' যাকে বলে। দ্রুত হাতে কয়েকটা রেখা টানল সে। মাধুরী যেন চটকা ভেঙে জেগে উঠলেন।

—আজকে ইজেলের সামনে তো বসলে না বউমা

—না, এমনি স্কেচ করছি।

—তোমার শ্বশুরের জন্যে কত স্কেচ করে দিয়েছ মনে আছে!

ছবির রেখার দিকে মন, অদিতি বলল—হ্যাঁ—অ্যা। ওঁর বইয়ে সেগুলো তো বেরিয়েছে। মন্দিরের রোয়াকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা....মা মুখটা প্লিজ একভাবে রাখুন।

—কেন? আমাকে আঁকছ নাকি?

—আপনি রাখুন না মুখটা। অমনি নয়, ঠিক আগের মতো। একটু বাঁদিকে হেলে...—হ্যাঁ...

—তা হলে কথা বলতে বারণ করছ?

—কথা বলুন না, ভঙ্গিটা ঠিক রেখে। থ্রি ফোর্থ আসছে মুখটা।

—কী আঁকছ? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন আঁকবার কী অবশিষ্ট আছে? অদিতি হেসে ফেলল—মা। ছবি হল ছবি। বাইরের আকৃতি, ভেতরের প্রকৃতি যেই মিলব মিলব করে অমনি একটা ভাল ছবি হয়। তার সঙ্গে বয়স বা দৈহিক সৌন্দর্যের কোনও সম্পর্ক নেই।

—সর্বনাশ। তুমি কি আমার ভেতরটা আঁকবে নাকি?

—ভেতরটা আঁকা কি খুব সহজ মা? আঁকলেও সেটা হয়তো আপনার ভেতর হবে না। আমারই ভেতর হবে। ইন্টারপ্রিটেশন যাকে বলে।

—বুঝলাম না। একটু বুঝিয়ে দাও।

—ধরুন, আপনিই একটা উদাহরণ দিন রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপিয়রের চরিত্র থেকে, এগুলো তো আপনি খুব পড়তেন।

—কে বলল?

—কে আবার বলবে, আমি দেখেছি। তা ছাড়া বাবাও বলতেন।

—কী বলতেন?

—এই, রবীন্দ্রনাথ আপনার কণ্ঠস্থ মুখস্ত। শেক্সপিয়র ভালবাসতেন বলে বাবা আপনাকে কত পড়িয়ে দিয়েছেন শেক্সপিয়র।

—এইসব কথা তোমাদের হত?

—হত না?

—আর কী বলতেন? মেয়েটি আমার প্রথম ...তার কথা।

—নিশ্চয়। এ তো তাঁরও চাপা কষ্ট ছিল!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন— কী যে উদাহরণের কথা বলছিলে?

—ইন্টারপ্রিটেশন বোঝাবার জন্যে। যে-কোনও একটা চরিত্র বলুন, রবীন্দ্রনাথ থেকেই হোক, শেক্সপিয়র থেকেই হোক...

—তা হলে ধরো ডেসডিমোনা...

—আচ্ছা বলুন ডেসডিমোনাকে আপনার কী লাগে? কী মনে হয়? অন্যে কে কী বলে—ছাড়ুন। আপনার কথা বলুন।

—তা যদি বলো অদিতি ডেসডিমোনাকে আমার খুব বোকা মনে হয়, ওই আরেকটা মেয়ে জুলিয়েট। —ও দুটোই রামবোকা। তবে কী জানো। কতই বয়স। ভুল করবারই বয়স! বেঘোরে চলে গেল। ও তোমার রোমিও-ও যেমন পাঁঠা, ওথেলোও তেমন একটা নিষ্ঠুর, গোঁয়ারগোবিন্দ। আবার এ-ও বলি, বেশ কিছু বোকা আর গোঁয়ার না মিললে একটা ট্রাজেডিও হয় না। কে তোকে বউয়ের কথা শুনে ডানকানকে খুন করতে বলেছিল? কী করতে যাচ্ছিস তা তো ভালই বুঝেছিলি! এমনও নয়, তোর ব্যক্তিত্ব বউয়ের চেয়ে কিছু কম! একবার একটা মার্ডার করার পরে তো তুই বউয়ের গাউনের তলা থেকে বেরিয়েই এলি! তখন তো তার একটি কথাও আর শুনলি না!

—বাঃ—অদিতি মুখ ভাসিয়ে হেসে বলল। আপনার প্র্যাকটিক্যাল ইনটারপ্রিটেশন। এটা আপনার নিজস্ব। আপনি গল্পের সারটুকু নিয়ে তার থেকে আপনার ব্যাখ্যাটা দাঁড় করিয়েছেন। এটাই আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যা। ছবির ক্ষেত্রে ব্যাপারেও যদি কোনও পোর্ট্রেট আঁকি, মানুষটার যে ভাব আমার কাছে ধরা পড়ছে সেটাই আমার ছবিতে ফুটে উঠবে। ফুটিয়ে তুলব। ধরুন খুব সুন্দর বা সুন্দরী কাউকে যদি আমার অন্তঃসারশূন্য মনে হয়, আমার আঁকা ছবিতে সেটা ধরা পড়বে। না পড়লে সে ছবির কোনও মানে থাকবে না।

—তা আমার এই জীর্ণ মুখখানার কী ব্যাখ্যা তুমি দিচ্ছ?

—সেটা আমি এখনও জানি না মা। একটা রাফ স্কেচ আগে করে নিই। তার ওপর ভিত্তি করে ছবিটা আঁকব। আপনার মুখ আমার কাছে কীভাবে ধরা দেবে তা তো জানি না! আচ্ছা এবার আপনার ফলের রসটা আনি।

রসটা তৈরি ছিল, ফ্রিজ থেকে বার করে ঠান্ডাটা কাটানো হচ্ছিল এতক্ষণ। উনি রসের গ্লাসটা হাতে ধরে বললেন—কার কাজ! কে করে!

এ কথার কোনও উত্তর হয় না।

—আমার মেয়েটা আজ বেঁচে থাকলে হয়তো তার সেবা পেতাম। তবে সে-ও যদি বিয়েথা হয়ে দূর দেশে চলে যেত তবে...

অদিতি মুখ তুলে তাকাল—চোখে যেন একটা দুষ্টু হাসি...বলল.. এ হল বউমারই কাজ!

এ কথারও উত্তর হয় না।

উনি বললেন—কী হল কিছু যে বললে না?

—কী বলব?

—তোমার কখনও মনে হয় না, কী অদ্ভুত এই পরিস্থিতি! আমি তোমার ছেড়ে দেওয়া বরের মা, তোমার বাড়িতে বসে তোমার হাত থেকে সেবা নিচ্ছি।...আর আর বউমা, আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে। তোমার খুব বিরক্ত লাগছে, আমি জানি।

—না, আপনি ভুল ভাবছেন। অদিতি একটু স্নেহের হাসি হেসে বলল—গোড়ায় গোড়ায় হতাম। পরিস্থিতিটা তো সত্যি অদ্ভুত। কিন্তু এখন আর কিছু লাগে না।

—কেন বলো তো? অভ্যাস?

—তাই হবে বোধহয়।

—না বউমা। অভ্যাস নয়। তুমি একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে, তুমি আরও একটু তলিয়ে ভাবলে ধরতে পারতে, এটা শুধু অভ্যাস নয়। যে তোমার সঙ্গে বেইমানি করেছে, সে আমারও সঙ্গে বেইমানি করেছে। এই থেকেই আমাদের সম্পর্ক...

—কিন্তু মা ওটা আপনার ভাবনা, আমি ওভাবে ভাবি না। আর কেনই বা ভাবছেন ও আপনার সঙ্গে বেইমানি করেছে! দূর থেকে ও কি খেয়াল রাখছে না?

—অমন খেয়ালের আমার কী দরকার বলো? আমি একলা মানুষ, রাজার বাবা আমার জন্যে যা রেখে গেছেন, তা-ই আমার যথেষ্ট। আমি কি ওর ডলারের তোয়াক্কা করি নাকি! ছেলের কাছে মায়ের কি শুধু ডলারই পাওনা?—কী রকম একটা বিতৃষ্ণার মুখ করে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন উনি। অদিতি শুনছিল। কিন্তু দেখছিল আরও মন দিয়ে। লোকে মুখে কথা বলে বিতৃষ্ণা জানায়। কিন্তু উনি মুখের রেখায় রেখায় বিতৃষ্ণা জানাচ্ছেন। খুবই অভিনব এই অভিব্যক্তি। যদি ছবিতে সে তুলতে পারে তা হলে এ হবে এক চিরন্তন প্রশ্নচিহ্ন। এই বৃদ্ধা কি রাগ করছেন? ঘৃণা করছেন? ক্ষুণ্ণ হচ্ছেন? নাকি তাচ্ছিল্য অবজ্ঞা করছেন কাউকে? কাকে? কোনও নিকট সম্পর্ককে? নাকি সারা পৃথিবীকেই, সভ্যতাকে? মোনালিসার হাসির কী মানে? উনি কি দাঁত তুলিয়েছিলেন? উনি কি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন? নাকি হাসলে তাঁর মুখের পেশিগুলো ওইভাবেই বিন্যস্ত হত?

মুসাম্বিটা শেষ করে উনি পাশের টেবিলে রাখলেন।

—আমি একটু উঠি এবার। একটু হাঁটাহাঁটি করি। না না তোমায় ধরতে হবে না। চেয়ারের হাতলে ভর রেখে উনি উঠে দাঁড়ালেন। ক'দিন এইটুকু হাঁটাহাঁটি করছেন। ডাক্তার বলেছেন। তবে সব সময়ে কারও-না-কারও উপস্থিতিতে। আস্তে আস্তে ঘর পার হয়ে বাইরে এলেন। বারান্দার পাটি ধরে ধরে বেশ এগোচ্ছেন।

—বেশ বাড়ি তোমার। সেখানে যেন অত বড় বাড়িটা হাঁ-হাঁ করে খেতে আসে।

অদিতি মনে মনে বলল—আমাকেও যে এ বাড়ি খেতে আসে না মাঝে মাঝে তা নয়। তবে কাজের মধ্যে থাকলে, নিয়মিত বেরোলে অত খারাপ লাগে না।

—কোথায় ছবি আঁকো, ঘরখানা দেখাবে?

—চলুন।

ছবির ঘরে এসে উনি বসলেন। এখানেও একটা আরামচেয়ার আছে, আর একটা ডিভান। আরামচেয়ারে বসলেন গিয়ে উনি। বললেন—তোমাদের বেশিরভাগ ছবিই আমি বুঝি না মা। ...কী এঁকেছ ওটা কালো কালো সাদা সাদা ভূত প্রেত নাকি?

—তা ভূতই একরকম। আচ্ছা এটা দেখুন তো।

বৃষ্টিতে ধুয়ে যেতে থাকা পথ গাছপালা, বাড়ি...আর ওপরে ভাসমান প্রবহমান এক খুব তন্বী মূর্তির আভাস।

—অতশত না বুঝলেও ভাল লাগছে। রংগুলো লাগালেই যদি তবে আবার যেন ধুয়ে দিয়েছ! কেন?

—ভাল লাগছে বলছিলেন যে!

—আচ্ছা অদিতি আমার ছবি তো আঁকতে চাইছ, শীলার একখানা আঁকো না!

—আমার আঁকতে ইচ্ছেটা তো হওয়া চাই!

—অমন সুন্দরী, ওকে ছেড়ে আমাকে?

—আমি তো আগেই বললুম মা, বাইরের আকার কিছু নয়।

—তা হলে তুমি বলছ ওর ভেতরটায় তেমন কিছু নেই।

—তা বলিনি। এখন এই মুহূর্তে আপনার মুখটাই আমার আঁকতে ইচ্ছে হচ্ছে।

—তবু, তুমিই তো একদিন আমাকে ফেলে ওকেই প্রণাম করতে গিয়েছিলে মা!

সর্বনাশ। সেই কথা এখনও মনে রেখেছেন উনি? ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ পুষে রেখেছেন? সেই জন্যেই কি অমন রুক্ষ ব্যবহার করতেন?

সে বলল—শীলাদিই বরণডালা হাতে সামনে ছিল মা।

—না, না, দুধ ওথলাচ্ছিল। বরণডালা রোয়াকের পাঁচিলে রাখা ছিল। তুমি খেয়াল করোনি, আমার বড় জা তোমায় বরণ করেছিলেন পরে।

—সে যাই হোক, সামনে রয়েছে, দেখতেও ভদ্র, আমি কী করে জানব! তারপর বাবা বুঝিয়ে দিতেই...

—একটা কথা আমাকে বলবে?

—কী?

—কথা দাও এই বৃদ্ধাকে মিছে কথা বলবে না।

—মিছে কথা? কেন?

—কথা দাও, কিছু মনে করবে না?

কী জিজ্ঞেস করবেন উনি? অদিতি মাথা হাতড়ায়। রাজর্ষির সঙ্গে তার বিচ্ছেদের কারণ তো উনি জানেন। বেইমানি। কিন্তু কী ধরনের বেইমানি তা হয়তো জানেন না। বেশ, উনি যদি এ কথা

জিজ্ঞাসা করতে পারেন, সে-ও বিবৃত করতে পারবে। কিন্তু কথাটা হল ব্যাপারটা তার ভাল লাগবে না। মনমেজাজ খিঁচড়ে যাবে। দিনের পর দিন ভুষোকালিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে পৃথিবী।

—মিছে কথা বলে আমার কী লাভ বলুন! আর মনে করা? তার ওপর তো আমার কোনও হাত নেই! তেমন কিছু হলে না.হয় না-ই বললেন!

—এতখানি বয়সেও যদি বুকের কথা বুকে চেপে রাখতে হয়, মরণের আগে যদি প্রশ্নগুলোর ঠিকঠাক উত্তরগুলো না পাই, তুমি মনে করো না আমার মৃত্যুতেও কোনও শান্তি থাকবে না! সান্ত্বনা থাকবে না!

—বলুন, বলে ফেলুন। অদিতি ওঁকে এতটা বিচলিত দেখে হেসে ব্যাপারটা সহজ করে দিতে চায়।

—এই যে রাজ তোমার অনুপস্থিতিতে একটা কাজ করে বসল। জঘন্য কাজ, তোমার কখনও মনে হয়নি—এটা ওর তোমরা যাকে বলো জেনেটিক? অদিতি চমকিত হল। জঘন্য কাজ! তা হলে উনি নীল দৃশ্যটার কথা জানেন।

সে বলল—জেনেটিক? এক অর্থে তো বটেই। পুরুষরা মোটের ওপর একটু অসংযত প্রকৃতির হয়। বেসামাল। মেয়েরাও যে হয় না তা নয়, কিন্তু তারা সংযমকে মূল্য দিতে শিখেছে মা অনেক যুগ ধরে।

—না। আমি জিজ্ঞেস করছিলুম রাজ কি তার বাবার থেকেই স্বভাবটা পেয়েছিল?

—বলছেন কী মা! ও কথা ভাবতে যাব কেন? দোষ করল একজন। সে দোষের দায় চাপাব তার পিতৃপিতামহের ওপর?

—তুমি কি সত্যিই মনে করো তোমার শ্বশুরের কখনও মতিভ্রম হয়নি। হতে পারে না!

অদিতি এবার বুঝতে পারল, কেন উনি মনে না করার কথা তুলেছিলেন। তার নিজের বাবা-মা'র বাইরে অদিতি সত্যিই এতটা শ্রদ্ধা আর কাউকে করেনি। তার বাবা-মন দু'জনেই খুব স্নেহশীল ছিলেন। চরিত্রের জোর ছিল। ব্যক্তিত্ব ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ভালবাসা তাঁর মা-বাবা বলেই। কিন্তু প্রকাশ গুপ্ত অগাধ পণ্ডিত, নিরভিমান, অথচ বলিষ্ঠ মনের মানুষ। তাঁকে সে সম্পর্কের কারণে তো শ্রদ্ধা করেনি, করেছিল তিনি বলেই। আর ভালবাসত, তিনি ভালবাসার মতো আচরণ করেছিলেন তাই। ইনি কি সে জন্যে এতই ঈর্ষাতুর যে...তার মুখটা কঠিন হয়ে যেতে থাকল। এ কেমন মহিলা যিনি শ্রদ্ধার সম্পর্ক বুঝতে পারেন না, স্নেহের সম্পর্ক বুঝতে পারেন না!

খুব কাতর গলায় মাধুরী বললেন—তুমি কি সত্যিই মনে করো শীলার সঙ্গে ওঁর কখনও কিছু হয়নি।

প্রায় বজ্রপাতের মতো এল কথাটা। বজ্রপাত তো তার জীবনে হয়েছে। কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত ভালবাসার ক্ষেত্রে। শ্রদ্ধা-ভক্তির ওপর এমন আঘাত! ...যদি আজ কোনও খ্রিস্টভক্ত শোনে— যিশুখ্রিস্ট পতিতালয়ে যেতেন নিয়মিত, কিংবা রবীন্দ্রনাথ লম্পট ছিলেন...।

—কিছু বলছ না যে? রাগ করলে! অদিতি কিছু মনে কোরো না, তুমিও ওই ডেসডিমোনা, জুলিয়েটের ধরনের বোকা মেয়ে! নইলে কেউ মাসি নয় পিসি নয়, একটা যুবতী মেয়েকে এনে ঘরে তোলে। অমন সুন্দর সুযোগ করে দেয়।

তার মনে হল, ভাগ্যে সে তথাকথিত সুযোগটা করে দিয়েছিল। তাই তো সময় থাকতে রোগটা ধরা পড়ল।

মাধুরী বললেন—আমি তোমার মতো অতটা সরল না হলেও কিন্তু বিশ্বাস করতুম। মেয়ে গেছে, ছেলে থাকে দূরে দূরে বোর্ডিংয়ে, কিন্তু উনি আছেন, আমার মস্ত ভরসা। কিন্তু যেদিন কোথা থেকে একটি সুন্দরী অল্পবয়সি বিধবা এনে আমাকে বললেন—এ-ই এবার থেকে রান্নাবান্না করবে মাধু—আমি কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। সত্যি বলছি, তখন শীলার আরও অল্প বয়স। সত্যিকারের রূপসি।

না-ই রইল তোমাদের মতো শহুরে পালিশ। ওকে ডেকে ওর সব ইতিবৃত্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিই। উনি গিয়েছিলেন সোনামুখী...ওখানকার রেশম সম্পর্কে কিছু খবরাখবর নিতে। সেখানেই নাকি শীলার দাদা ওঁকে ধরে পড়ে, বোনটির একটি গতি করে দিতে। তা গতি উনি আর কোথায় করবেন? অগতির গতি এই আমারই ঘাড়ে এনে ফেললেন। সারা জীবনটা আমার কী যে আতঙ্কে উৎকণ্ঠায় কেটেছে আর কাউকে সে কথা বলতে পারিনি। এই প্রথম বললাম তোমাকে। এই শেষ। মরণের আগে জেনে নিতে চাই, যে মানুষটাকে আমার শ্রদ্ধা ভালবাসা বিশ্বাস দিয়েছিলাম সে তার যোগ্য ছিল কিনা। ও সব বিদ্যা গুণ ঢের ঢের দেখা আছে অদিতি। যার যত বিদ্যা সে তত বিদ্যাধর, ওসবের মূল্য আমার কাছে কানাকড়িও নেই। আসল কথা মানুষটা হৃদয়ে কেমন। মানুষটা আমার কাছ থেকে যে বিশ্বস্ততা পেয়েছিল, দাবি করত, ততটাই আমাকে দিতে পেরেছিল কিনা। অদিতি আমাকে ভাল ভাবো, মন্দ ভাবো, তাতেও আর আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু একমাত্র তোমার বুদ্ধিবৃত্তির ওপরই আমার আস্থা আছে। তুমি এই কাজটুকু আমার করে দাও। সান্ত্বনা নয়, মিথ্যে নয়। একেবারে তুমি যা ঠিক বলে বুঝছ তাই। যদি আমার সন্দেহ ঠিক হয়, তাতেও আমার কিছু দুঃখ নেই। বিশ্বাস করো, শেষ জীবনে এই তুমি আর ওই শীলা-ই আমার সত্যিকারের আপনজন। ওকে এ কথা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। তোমাকে তাই...।

কী অদ্ভুত পরিহাস! যে শীলাকে চিরদিন সন্দেহ করে এসেছেন, ঈর্ষা করে এসেছেন, সেই শীলাই ওঁর আপনজন। যে অদিতিকে উনি উঠতে বসতে বকাঝকা করতেন সেই অদিতিই আজ ওঁর একমাত্র আস্থার পাত্র! আশ্চর্য।

—প্রথমেই আপনাকে বলে দিই মা, —সে সামান্য গম্ভীর হয়ে বলল—আপনার সন্দেহটা আমার একেবারে অবাস্তব লাগছে। আর দ্বিতীয় কথা গোয়েন্দাগিরি করতে আমি যে খুব পটু নয় সে কথা তো আপনি জানেনেই। তার ওপরে ফেলে-আসা দিন চলে-যাওয়া মানুষ নিয়ে এমন গোয়েন্দাগিরি!

—তুমি যদি মনে করো, তা হলে পারবে। সেই বুদ্ধির ধার তোমার আছে।

ছবি-আঁকার মেজাজ তার একেবারেই চলে গেছে। সকাল ঘন হচ্ছে। দু'জনেরই চান সারা। খাওয়ার সময় হল। তার ভেতরটা কেমন অস্থির-অস্থির লাগছে। তোলপাড় হয়ে গেল বোধ-বুদ্ধি। যা মনে হয়নি কখনও, যা জানার তার দরকারও নেই, তারই চিন্তায় তাকে নামতে হবে?

খাবার টেবিলের দু'পাশে দু'জন। মুখোমুখি।

—ওই জন্যেই কি শীলাদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বেড়াতে? সে মুখে ভাত তুলতে তুলতে বলল।

—এই তো বুঝতে শুরু করেছ, তোমাকে বলতেও আমাকে একটু সাহস করতে তো হয়েছেই? তবে ওকে একটু ছুটি দেওয়া, আনন্দ দেওয়া এ-ও আমার ইচ্ছে বই কী! কী পেয়েছে ও জীবনে?

অদিতি অবাক হয়ে চেয়ে রইল।—যদি জানতে পারেন, আপনার সন্দেহ সত্যি নয়, তবু ধরুন যদি সত্যি হয়, তা হলেও কি ওর প্রতি এই করুণা আপনার থাকবে?

—করুণা কী গো?—উনি হাত থামিয়ে বললেন—আমি যে ওকে আমার ছোট বোনের মতো দেখি। সইতেও পারি না একেক সময়ে, আবার ফেলতেও পারি না। শুধু নিজের স্বার্থে মনে কোরো না কিন্তু। আজ যদি ও চলে যায়, আমি হয়তো ওরকম সেবা কারও কাছে পাব না, তবু কিছু-না-কিছু ব্যবস্থা আমি করে নিতে পারব। কিন্তু আমি রয়েছি, অথচ ও সেখানে নেই...না। এ আমি ভাবতেও পারি না। বড় দুঃখী বঞ্চিত, অনেক ছোটও তো বটে।

একটু পরে গলাটা পরিষ্কার করে সে জিজ্ঞেস করল—আপনার সন্দেহের মুলে কিছু যুক্তি নিশ্চয় আছে। সেগুলো যদি বলেন... আমার খুব সংকোচ হবে শুনতে...।

—আমার ছিয়াত্তর বছর বয়স হল মা। কালরোগে ধরেছে, যে-কোনও সময়ে চলে যেতে পারি। আমার কোনও সংকোচ নেই। মানুষের জীবন আর কতটুকু। যে-ই ইহকাল থেকে পরকালে পাড়ি দেয় অমনি সব শেষ। যেটুকু থেকে যায় সে শুধু অন্য মানুষের মনে। কত স্নেহ, কত দরদ, কত

বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল মানুষটার। মগজে একজন যত বড়ই হোক, মগজ দিয়ে তার মনুষ্যত্ব আমি মাপি না। সে কতটা খাঁটি ছিল তাই দিয়েই মাপি। রাজের ওপর কি আর আমার মাতৃস্নেহ নেই! এতদিন অব্যবহারে তাতে খানিকটা মরচে পড়ে গেছে, কিন্তু আছে। তবু সে যদি একবারও আমার কাছে এসে ক্ষমা না চায়, তার আসায় আমার কোনও দরকার নেই। সে একটা মিথ্যে মানুষ। ভুল মানুষ। আমার যে ছেলেকে আমি চিনি, গড়ে তুলেছি, সে নয়। তার খোলসে অন্য কেউ। যাকে তোমরা বলো—ইমপস্টর।

ওঁর দিকে একবার তাকাল অদিতি। জটিল মানুষ, কিন্তু কুটিল নন। বিদ্বান নন, কিন্তু ক্ষুরধার বুদ্ধি। চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে আবেগের কী অদ্ভুত সঙ্গতি ওঁর!

—তোমার শ্বশুর অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতেন একেক দিন। একটা-দুটো। আমি দশটার সময়ে ঘড়ি ধরে শুয়ে পড়তাম। আবার অনেকদিন উনি খুব ভোরে উঠে যেতেন, ধরো সাড়ে তিনটে, চারটে। শীলা শুত একতলায়। আমি কিন্তু কখনও নিশ্ছিদ্র ঘুমোতাম না। বিশেষ করে উনি না থাকলে ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম হত। একদিন মনে হল তিনটে বেজে গেছে, উঠে দেখি সাড়ে তিনটে। এত দেরি তো কখনও করেন না। কী হল? পড়ার ঘরে গিয়ে দেখি নেই। তারপর দেখি নীচ থেকে উঠে আসছেন।—'কোথায় গিয়েছিলে? এত রাতে?'—'মাথাটা জ্যাম হয়ে গিয়েছিল, একটু বাইরে বাগান থেকে ঘুরে এলাম'—'চলো শুতে চলো' আমি বলি। শুয়ে আছেন কিন্তু ঘুমোচ্ছেন না, এপাশ-ওপাশ করছেন। 'কী হল? ঘুমোও।' হঠাৎ পাশ ফিরে আমাকে আঁকড়ে ধরলেন। তারপর যেন...ছিঁড়েখুঁড়ে ফেললেন। এই প্রকাশ গুপ্ত আমার অচেনা। একেবারে অচেনা।

চোখ নিচু করে রইল অদিতি। একটু পরে বলল—আর কিছু?

—নাঃ, আর তেমন কিছু...ওই থেকে থেকেই শীলাবতী, শীলাবতী-ই। সে-ও বাবার সুবিধে-অসুবিধেয় একপায়ে খাড়া।

'বাবা', শব্দটা খট করে লাগল তার কানে। বলল—শীলাদি ওঁকে বাবা' বলত মনে রাখবেন মা। এটা একটা মস্ত প্রমাণ। এই ডাকের দেওয়াল কেউ ডিঙোতে পারে বলে আমার জানা নেই।

—কিন্তু উনি তো মেয়ে বলতেন না। উনি তো ডাকতেন—শীলাবতী-ই শীলাবতী-ই।

—কোনও অবৈধ সম্পর্ক হলে অত সহজে আদরের নাম ধরে ডাকতে পারতেন না মা।

--তা হলে ওঁর চোখে অনেক সময় যে অপরাধের ছাপ দেখেছি তা মিথ্যে বলছ?—আমি সেদিনের পর থেকে তো খুব সাবধান হয়ে যাই। দোতলার গেটের কোল্যাপসিব্‌ল লাগিয়ে চাবি রেখে দিতাম নিজের বালিশের তলায়।

—পরদিন কেউ জিজ্ঞেস করেননি, হঠাৎ এই ব্যবস্থা কেন?

—নাঃ।

—করেননি? শীলাদি না, বাবা নয়?

—নাঃ।

—টের পেয়েছিল?

—নিশ্চয়। আমি বেশ শব্দ করেই গেটটা বন্ধ করতাম তো! ওঁর শুনতে পাবার কথা। আর শীলা পরদিন ভোর-ভোর এসে ফিরে গেছে। আবার এসেছে পরে। কেন গেট বন্ধ, তো কই একবারও জিজ্ঞেস করল না।

—চলুন এবার শুতে চলুন।

আস্তে আস্তে ঘরে গেলেন। খাটটা তো ইংলিশ খাট নয়, পালঙ্ক। একটু উঁচু। উনি তারই মতো লম্বা মানুষ বলে পারেন উঠতে। তবু একটু ধরল অদিতি।

—আমার স্যুটকেসটা একটু খোলো তো মা!

—এখন?

—হ্যাঁ, এখনই। দেখো স্যুটকেসের একেবারে তলায় একটা ফাইল আছে। পেয়েছ?

—হ্যাঁ।

—ওটা নিয়ে এসো।

নীল রঙের কভার ফাইল। হাতে করে উনি বললেন—এই ফাইলটা আমি চলে যাবার পর খুলবে। ওতে কিছু নির্দেশ আছে। না, না, নিয়মকানুন...কী ভাবে..কী... সে সব কিছু নয়। তবে আগে দেখো না। একটু পরে বললেন—তোমারও খটকা লেগেছে, না?

চমকে উঠে অদিতি বলল—খটকা? না, ভাবছি...।

—এই যে ভাবছ, আমাকে স্তোক দিলে না—এই জন্যেই তোমায় ভরসা করি মা। তার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। আর সেই ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চোখে জল এসে গেল তার। সে আবেগপ্রধান মানুষ নয়। তার অন্তরের যা কিছু নিহিত আবেগ সে প্রকাশ করে তার ছবিতে। কিন্তু মাধুরীর সুপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ এমন একটা প্রতিবিম্ব দেখতে পেল! ভাল কিছু খুব নিজস্ব কিছু যদি সহসা খানখান হয়ে ভেঙে যায়! বড় কষ্ট হয়। সে কষ্টের অভিজ্ঞতা তার আছে। হয়তো পার হয়ে এসেছে অনেকটা। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে জ্বালা করে। বড় জ্বালা করে।

সতেরো

পরদা, কুশন কভার সব পালটে দিয়েছেন এবার। উজ্জ্বল কমলা রঙে ঝলমল করছে বাড়ি। বদলেছেন পাপোষ। তোয়ালে। শক্তি বলে একটি ছেলে মাসে মাসে পরিষ্কার করে দিয়ে যায় সব। মেঝে ঝকঝক করছে। পেতলের টব, ফুলদানি থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। আসবাবপত্র সব ভাল করে মুছে চকচকে করে দিয়ে গেছে। অন্ধকার বাড়ি! অন্ধকারে আর ঢুকতে হবে না নবগোপালকে। যতই ভালবাসুন শ্রীকে, এ বাড়ির আবহাওয়া, চেহারা কোনওদিনই ভাল লাগেনি তাঁর।

—হ্যাঁরে শ্রী, পরদাটরদা কাচতে দিস না?

—ও হ্যাঁ তা মাঝে মাঝে দিই তো, পঞ্চমীকে বলা আছে।

—বললেই হবে! নিজে একটু-আধটু দেখলেও তো হয়।

—ধোপার বাড়ি দিলেই কেমন রং জ্বলে যায়, বুঝলি!

—ধোপার বাড়ি দিবি কেন। ওয়াশিং মেশিনে কাচা।

—কে মেশিন চালাবে রে! পঞ্চমীকে বলব, হয়তো মেশিন বিগড়ে বসে থাকবে, তখন ধুন্ধুমার বকুনি খাব।

—মেয়ে তো যথেষ্ট বড় হয়েছে, ওকে ইনভল্ভ কর।

—ও না হলে, হতে চাইলে আমি কী করব বল।

—একটা আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে শুধু হোটেলের মতো ব্যবহার করবে বাড়িটাকে? কোনও মায়া মমতা রুচি কিচ্ছু থাকবে না? ওর ঘরটা দেখেছিস?

—আগে দেখেছি। অনেক শিখিয়েছি। শি রিফিউজেস টু লার্ন।

—শ্রী, ওর কি একটু কাউনসেলিং দরকার? বয়সটা টিন-এজ পেরোচ্ছে তো? ভেতরে কোনও জটিলতা তৈরি হচ্ছে না তো? তুই নবগোপালের সঙ্গে কথা বল।

—তুই-ই বল না সর্বাণী।

—আমি বলবার কে? তুই থাকতে তোর মেয়ের কথা আমি বলব?

—তুই এ-বাড়ির অনেক। আর আমি মা হতে পারি। কিন্তু তুই তো ওর টিচারও।

শ্রীলার কোনও শখ, ইচ্ছাশক্তি কিচ্ছু ছিল না। এমন অদ্ভুত চরিত্র আর দেখেননি সর্বাণী। যেহেতু নবগোপালের সঙ্গে বনিবনা হল না, তার বাড়ি-সংসার কিছুকেই কোনওদিন আপন মনে করতে পারল না শ্রী। একমাত্র মেয়েটি ছিল তার দায়, তার আনন্দ। সেই মেয়েও যখন দূরে সরে যেতে থাকল, গোঁয়ার, উচ্ছৃঙ্খল, স্বার্থপর হয়ে উঠতে লাগল—শ্রী দ্বিতীয় দফায় সরিয়ে নিল নিজেকে। আর যেন তার কোনও কর্তব্য রইল না। নিজে ডুবে যেতে থাকল নিজের গভীরে। সেখানে কোনও ইতিবাচক কিছু ছিল কিনা তা বুঝতে পারেননি সর্বাণী। পরলোকে বা পরজন্মে বিশ্বাস। ঈশ্বর অথবা ঠাকুরদেবতা। দুর্বল, হতাশ মানুষরা যখন ঠাকুরদেবতা, ধ্যান-পূজা এসব আঁকড়ে ধরে, তখন এক হিসেবে বেঁচে যায়। কেননা কোথাও-না-কোথাও মানুষের একটা নোঙর থাকা দরকার, নোঙর অথবা শেকড়। শ্রীর কোনওটাই ছিল না। জামশেদপুরের মেয়ে। ওর মা ওর বিয়ের অল্প পরেই মারা যান। বাবার দেখাশোনা করতে মাঝে মাঝে জামশেদপুরে যেত শ্রী। নিজের সংসার যে সামলাতে পারে না, সে বিপত্নীক প্রৌঢ় বাবার ছোট্ট ফ্ল্যাটের সংসারটি কেমন সুন্দর সাজিয়ে রাখত। হাতের কাছে সব, লোকজনেদের কড়া নির্দেশ, কেউ দিদির কথা অমান্য করবার সাহস পেত না। অবশ্য, ওর বাবাও খুব গুছোনো ধরনের মানুষ ছিলেন। দীর্ঘদিন টিসকোয় কাজ করেছেন। জীবনটা একটা ছন্দে বাঁধা। তাঁরও স্ত্রী খুব জোরালো ছিলেন না। এই অক্ষম শরীর-মন কি শ্রী মা'র কাছ থেকেই পেয়েছিল?

যাই হোক মিমির বছর দশ-এগারো বছর বয়সের সময়ে তিনিও মারা গেলেন। এইবারে শ্রীর আর কোনও আশ্রয় রইল না।

—চল তোদের সোনারির ফ্ল্যাট থেকে ক'দিনের জন্যে ঘুরে আসি। তুই, আমি আর মিমি।

—ও ফ্ল্যাট তো বিক্রি হয়ে গেছে সর্বাণী।

—কেন?

—কে দেখবে? বাবার সব ফার্নিচার বইটই সবসুদ্ধু বিক্রি হয়ে গেছে। নবগোপাল বলল ওর পক্ষে দেখাশোনা সম্ভব নয়।

—কেমন সুন্দর একটা বেড়াবার জায়গাও তো ছিল আমাদের।

—তো চল না, পুণে, গোয়া, বাঙ্গালোর, উটি—নব সব ব্যবস্থা করে দেবে, তুচ্ছ জামশেদপুরি ফ্ল্যাট তোকে কী ছুটির স্বাদ দেবে রে সর্বাণী! কিচ্ছু না। তা ছাড়া টাকাটাও তো আমারই অ্যাকাউন্টে জমানো আছে। যা খুশি করতে পারি।... একটু থেমে বলেছিল, খালি আমার সেই খুশিটার কোনও দেখা নেই।

বাইরে থেকে দুর্বল। কোনও প্রতিরোধ নেই। প্রতিকূল পরিবেশকে বাগে আনবার কোনও ইচ্ছেই নেই। পরিবেশটা যে প্রতিকূল এটাই তার অভিমান। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভীষণ জেদ। দাওনি যখন পাবেও না, গ্রহণ যখন করোনি, তখন আমারও কোনও গ্রহণ করার প্রশ্ন নেই। সারা জীবন ধরে এমন জেদ এই মনোভঙ্গি টিকিয়ে রাখতেও তো কম শক্তি লাগে না, কম অহংকার লাগে না। সর্বাণী এমনটা ভাবতে পারেন না। তাঁর দর্শন হল—ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট। জীবনকে হাসিখুশি ঝলমলে মালিন্যহীন রাখবার চেষ্টা করো, যেন একটা খেলার মাঠ। উঁচু-নীচু সব ভেঙেচুরে সমান করা হয়েছে। চারপাশে গ্যালারি, অথবা গ্যালারিহীন শান্ত ভোরবেলা। পায়ের তলায় উচ্ছ্বসিত সবুজ। এইবারে তুমি সেই ঘাস-না-ছাঁটা সমান পথ পরিক্রমা করো। খড়ির দাগ আছে। গণ্ডি আছে। তুমি যদি মসৃণ ছোটো তা হলে তুমি ঠিকঠাক নিজস্ব ট্র্যাকেই ছুটবে। গণ্ডিটার কথা ভুলে যাও। ভোরের হাওয়া তোমার ঘামে এসে লাগছে। ভেতরে তোমার রক্ত জোরসে ছুটছে। ধমনী বেয়ে নির্ভুল পথে হৃদয়ে। স্বাস্থ্যকর ছন্দে গাইছে হৃৎপিণ্ড। তোমার শরীরে স্বাস্থ্য, প্রাণে শক্তি, মননে স্বচ্ছতা, হৃদয়ে দরদ। ব্যস এবারে তুমি মোকাবিলা করতে পারবে সব রকম সমস্যার। জীবনে কোনও সমসা হবে না, তা তো আশা করা যায় না! হবেই! কিন্তু শরীর, প্রাণ, মন, হৃৎ যদি স্বচ্ছন্দে চলে

তা হলে মুখোমুখি হওয়া যায় সব বিপদের। বিপদে আমি না যেন করি ভয়। ওই যে ওই মেয়েটি অদিতি সরকার! তনিকার কাছে শুনেছেন ওর জীবনের বাইরের কথাগুলো। দু'বার ডিভোর্স হয়েছে। তনিকাও জানে না কেন, তিনিও না। কিন্তু যে কারণেই হোক, ওর নিজের কারণে না হওয়াই সম্ভব। এত স্থিরবুদ্ধি, এতটা সাহায্যশীল! নমনীয় বলেও মনে হয়েছে তাঁর। এ যে কাউকে ক্ষমার অতীত বলে মনে করতে পারে তা যেন ধারণায় আসে না। সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছেন তিনি শুনে যে এখন ওর বাড়িতে ওর দ্বিতীয় স্বামীর মা। রোগশয্যায়। আর মানুষ কী করতে পারে!

—তনি তোদের বয়স অল্প, তাতেই অনেক কথা জেনে গেছিস। আমরা হয়তো এতটা জানতাম না। কিন্তু জানা মানেই জানা যায়...জানতে হলে দৃষ্টান্ত দিয়ে জানতে হয়, অভিজ্ঞতা দিয়ে জানতে হয়। যদি তা প্রত্যক্ষ হয় ভাল। কিন্তু যদি হয় পরোক্ষ, তা হলে অন্যের সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের মনের গভীরে নাড়াচাড়া করতে হয়। এ কথা যদি তোদের ধাঁধার মতো লাগে তা হলে বুঝতে হবে তোরা অপরিণত আছিস। বড় হয়েছিস শুধু। অনেক তথ্য তোদের হাতের মুঠোয়, কিন্তু মনটা কাঁচা।

মিমিও ছিল। নিঃশব্দ। ওপরের দালানে বসার জায়গায় একটা জরুরি দোলনা আছে। তাইতে বসে আস্তে আস্তে দুলছিল। তিনি তনিকেই বলছিলেন। কিন্তু মিমিকে তো বাদ দিয়ে নয়। কিন্তু এই জায়গায় মিমি একলাফে দোলনা ছেড়ে উঠে ঘরে চলে গেল।

—যাই বলিস আর তাই বলিস। মেয়েটিকে আমার বড় ভাল লেগেছে। অত নামকরা আর্টিস্ট। প্যারিসের বিখ্যাত স্কুলের অ্যাওয়ার্ড পাওয়া মেয়ে, কী নিরভিমান। ওগুলো যেন ওর বাইরে পড়ে আছে। ও হল আসলে একটা মানুষ যে ছবি আঁকে।

—তা সবাই-ই তো তাই আন্টিমাসি—একজন মানুষ যে ছবি আঁকে। একজন মানুষ যে লেখে...

—না, একটা সূক্ষ্ম তফাত আছে। তোদের ওই ভাস্কর চক্রবর্তী! ও হল আগে ছবি আঁকিয়ে তার পরে মানুষ, অদিতি আগে মানুষ পরে তার ছবি।

—তুমি তো ওঁর ছবি দেখোনি মাসি, ওঁর আঁকার সময়েও ওঁকে দেখোনি, তখন এই যে এত মিশুকে, এখান থেকে ওখান দৌড়ে বেড়াচ্ছেন—এসব বোঝা যায় না।

—কেমন তখন?

—একেবারে মগ্ন। কে পাশে দাঁড়িয়ে আছে টের পাবেন না। আমি একদিন গেছি, শীলাদি বলে ওঁর বাড়িতে একজন থাকেন, তিনি বললেন—আঁকার ঘরে আছে। তুমিও তো আঁকো। যাও না, যাও। আমি পাশে একটা মোড়া টেনে বসলাম। একটু পেছন দিকে। ডান দিকে টুলের ওপরে রঙের বাটি বসানো। একটা পোর্ট্রেট করছিলেন অয়েলে। উনি মগ্ন হয়ে থাকলে মনে হয় উনি কারও নন। উনি ছবির। সেই মুহূর্তের ছবিটার।

—সে তো হবেই। তোর হয় না?

—আমি? খানিকটা আঁকব, তারপর জল খাব, আবার কাজ করছি, হঠাৎ উঠে পড়লাম। একটু ঘুরে এলাম। আমার ছবি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় মাসি। না হলে আমার ধৈর্য থাকে না।

—তাই কি অমন ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া ছবি আঁকিস?

—আসলে আমি ছবি আঁকি না মাসি, আমি একটা ...মানে... একটা মেজাজ, একটা মানসিক অবস্থা আঁকি।

—অন্যের মেজাজও আঁকিস বোধহয়। নিজের ঘরের দরজার কাছ থেকে মিমি বলল।

—মেজাজ?

—ওই যে তোর সুবীর রাস্না সব বলছিল সে দিন তোদের চুলোচুলির ছবিটা চুলোচুলির আগেই আঁকলি কী করে?

—সে আবার কী।

—ওই যে সেই দুটো বিচ্ছিরি বেড়াল এঁকেছিলি! প্রাইজ পেলি। যেদিন অ্যাকাডেমিতে তোর সঙ্গে আমার একহাত হয়ে গেল।

—ও, যেদিন রাতে ভাস্কর চক্রবর্তীর স্টুডিয়ো থেকে তোকে পাঁজাকোলা করে তুলে আনা হল? উনি দূর করে দিয়েছিলেন রাতে? সেদিন?

কুটিল চোখে তার দিকে তাকিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল মিমি।

—খ্যাপাচ্ছিস কেন শুধু শুধু?—সর্বাণী বললেন।

—খ্যাপাচ্ছি না, মনে করিয়ে দিচ্ছি।।

উঠে গিয়ে দরজায় টোকা দিল তনিকা—মিমি, মিমি...দরজা খোল। একটু পরে খুলে দিল—এবার আবার কার কথা মনে করাতে এলি? তস্কর?

—না, তনিকা হেসে বলল—তোকে নিয়ে 'চিত্রভানু'তে যেতে বলেছিলেন অদিতিদি। আমি ঘুরে এসেছি। যাবি?

চোখ সরু করে মিমি বলল—ও ঘুরে আসা হয়ে গেছে? আমার নামে আরও এক দফা বলে এলি বোধহয়।

—তোর কথা কাউকে, আবার অদিতির মতো সেলিব্রিটিকে বলা যায়?

—যেখানে যেখানে আমার যাওয়ার থাকে, ঠিক আগে আগে পৌঁছে, যাস, না?

আবার একটা কথা কাটাকাটি শুরু হতে যাচ্ছে দেখে, সর্বাণী বলেছিলেন—নীচে আয়, রান্না রেডি। দেরি করবি না। ডাক্তার মিমিকে খুব সময়ে খাওয়াদাওয়া করতে বলেছেন। ওর কিন্তু আলসারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তিনি নেমে গেলেন। শুনতে পেলেন মিমি বলছে—তনি, তোকে হাত করে নিল, বাবাকে হাত করে নিল। কিচ্ছু করতে পারলাম না। এখন ডাক্তারগুলোকেও হাত করে নিচ্ছে।

মিটিমিটি হেসেছিলেন তিনি। এত সহজে রসবোধ যায় না ওঁর।

দুঃখের বিষয়, বেরোতে শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই আবার অনিয়মিত হয়ে যেতে শুরু করেছে মিমি। শরীরটা সেরেছে। কী সুন্দর দেখায় আজকাল। পোশাক পরিচ্ছদগুলো সব ড্রাই ক্লিন করিয়ে দিয়েছেন। সেই রকম জিপসি জিপসি পোশাকই পরে, কিন্তু এখন ওগুলো বেশ ঝকঝক করে। কিছুটা টিফিন নিতে ওকে বাধ্য করেন তিনি। ডাক্তারের কড়া নির্দেশ। কিন্তু আজ এখনও ফিরল না।

—এত রাত? মিমি?

খাবার টেবিলের ওপর হাত রেখে বসেছিলেন। মেয়ে ঢুকতে একদিন বললেন। পঞ্চমী দরজা খুলে দিয়ে চলে গেছে।

কোনও জবাব দিল না।

—দেখো মিমি, রাত এগারোটা বাজছে। এসব চলবে না। যদি কিছু হয়, আমার নিজের ভাবনাচিন্তা টেনশনের কথা ছেড়েই দাও। তোমার বাবাকে কী কৈফিয়ত দেব বলো তো! একটু বোঝবার চেষ্টা করো। কলকাতা এখন খুব আনসেফ। আমার ভয় করে।

—আমি খেয়ে এসেছি। আমার জন্যে এত রাত অবদি না খেয়ে বসে থাকবার দরকার নেই। আমার নিজের মা-ও বসত না। আমি এসব পছন্দ করি না।

বলতে বলতে তিন লাফে ওপরে চলে গেল মিমি।

এই গেল একদিন।

আজ সকাল ন'টার সময় কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেছে। বাড়ি ঢুকল রাত দশটা।

—মিমি কাউকে কিছু বলে যাওনি কেন? ঘরে ঘরে খুঁজছি আমরা। এইভাবে ভাবাবে আমাকে? আমি কিন্তু এবার স্টেপ নেব।

বলে চলে এলেন। ঘুম আসছে না। ঘুম আসছে না। রাত তিনটে নাগাদ ফোন করলেন—

—হ্যালো।

—সর্বাণী বলছি। আমি মিমিকে হ্যান্ডল করতে পারছি না। আমার খুব ভয় করছে।

—কেন? কী হল আবার।

—এত ক্যাজুয়েলি কথা বোলো না নবগোপাল। ও আমাকে একেবারেই মানছে না। এত রাত করে বাড়ি ফেরে আমার প্রচণ্ড টেনশন..

—আরে, মিমি কি তোমার সেই স্কুলের মেয়েটি আছে? শি ইজ কোয়াইট এব্‌ল টু টেক কেয়ার অব হারসেলফ।

—ও যে মাস দেড়েকের ওপর ভাস্করের কাছে চলে গিয়েছিল ওর স্টুডিয়োতে ছিল—ও কথা তোমাকে জানাইনি। এখন জানিয়ে দিলাম। অনেক কষ্টে নিয়ে এসেছি।

—হোয়ট?

—হ্যাঁ, অনেক কষ্টে নিয়ে এসেছি। খুব শরীর ভেঙে গিয়েছিল। সেরে উঠেছে, আবার উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু করেছে। তুমি শিগ্‌গিরই এসো।

ফোন নামিয়ে খাটে বসতে গিয়ে দেখলেন জ্বলন্ত চোখে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠিক যেন একটা কেউটে সাপ।

—কাকে? কাকে ফোন করছ?

কথার কোনও জবাব দিলেন না। ভেতরে ভেতরে চমকে গেছেন খুব।

—কী লাগাচ্ছিলে, বাবার কাছে? আমার বাবার কাছে আমার বিষয়ে?

ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় কেমন একটা ঘাম দিচ্ছে তাঁর। তিনি কথা না বলে শুয়ে পড়লেন।

দু'পা এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল হঠাৎ। আঁচড়ে কামড়ে দিচ্ছে, চুল ধরে হিড়মিড় করে টানছে—কে তোমাকে বলেছিল বাড়ি সাজাতে, কেন সাজিয়েছ আমাকে জিজ্ঞেস না করে?

সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে দূরে ঠেলে দিলেন তিনি। যথাসম্ভব ঠান্ডা চোখে চেয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন, তুমি আলোচনা করলে আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হত না। কিন্তু ঢুকলে কী করে ঘরে?

—বাবাকে কী বলছিলে, বলো?

—সে কথা জেনে তোমার লাভ নেই। তুমি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি যা করার কাল সকালে করব। যা-ও।

—কী করবে? পাগলাগারদে পাঠিয়ে দেবে? চমৎকার। মাকে খুন করেছ, এবার মেয়েকে পাগল বানাচ্ছ। চমৎকার খেলছ!

—কী বলছ! আমার ধৈর্য চলে যাচ্ছে। চলে যাও বলছি।

—মায়ের মুখের অক্সিজেন মাসক খুলে নাওনি? খাবি খেতে খেতে মরে গেলে আবার রিপ্লেস করে রাখোনি? আমি কিছু জানি না মনে করেছ, না? বাবা আসুক তোমার কীর্তির কথা সমস্ত ফাঁস করে দিচ্ছি।

তিনি বাক্যহীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কিচ্ছু ঢুকছে না মাথায়, কী শুনছেন? কে বলছে? এ কী? এসব কী?

হঠাৎ তাঁর শরীরে একটা প্রচণ্ড বেগ এল। মন কাজ করছে না, শুধু শরীর। তিনি ড্রয়ার খুলে গাড়ির চাবিটা নিলেন। উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে গেলেন। ঝড়ের মতো দরজা খুললেন। একটার পর একটা দরজা খুললেন। শব্দ হতে লাগল। পঞ্চমী ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে। তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন। নিজের গাড়িটা বার করলেন। তারপর বেরিয়ে গেল গাড়ি।

—কী হল? পঞ্চমী চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল—কার কাছে? কোথায় যাচ্ছে মাসি? কারও কোনও খারাপ খবর...মিমি?

মিমি তখন সিঁড়ির ধাপে আস্তে আস্তে বসে পড়ছে।

—মাসি যে নাইটি পরে বেরিয়ে গেল গো? বাবুর কিছু হয়নি তো? এয়ারপোর্ট থেকে কিছু...

মিমি আস্তে আস্তে সিঁড়ির ওপর শুয়ে পড়ছে।

—কী হল মিমি? তোমার তোমারই শরীর খারাপ? না কি?

মিমির গায়ে ঘাম দিচ্ছে। কথা বলতে পারছে না।

খবরটা সকালে পড়ল অদিতি। রেড রোডে অদ্ভুত অ্যাকসিডেন্ট। শেষ রাতে একটা নেভি ব্লু সান্ট্রো রেড রোডে ছোটাছুটি করছিল। তারপর স্কিড করে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। সাদার ওপর নীল ফুল নাইটি-পরা এক ভদ্রমহিলাকে মারাত্মক আহত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কোনও ব্যাগ, কোনও পরিচয় বা লাইসেন্স কিচ্ছু নেই। তাঁকে এস. এস. কে. এম.-এ সংকটজনক অবস্থায় ভরতি করা হয়েছে। ছবিটা দেখবামাত্র চিনতে পারল অদিতি। মিসেস সর্বাণী সাহা রায়।

আর তারপরেই ফোনটা বাজল..

—দিদি আমি তনিকা বলছি। মিমি মানে আনোহিতার বাড়ি থেকে।

—দেখেছি—সংক্ষেপে বলল অদিতি,—কী ব্যাপার বলো তো?

—দিদি আমরা আপনার কাছে এক্ষুনি যাচ্ছি। আপনি একটু শৌনককে যেতে বলবেন? আমাদের তো হাসপাতালে যেতে হবে।—তনিকার গলা কাঁপছে।

—এসো—অদিতি চায়ের কাপটা তুলে আবার নামিয়ে রাখল। কাগজটা আবার তুলে ধরল। ইনি শেষ রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এত তাড়া, এত বিপদ যে নাইটিটা পর্যন্ত বদলাননি। কিন্তু উনি কোথাও যাচ্ছিলেন না। রেড রোডে ওঁর গাড়িটা ছোটাছুটি করছিল। উনি হঠাৎ কোনও কারণে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। কোনও চৈতন্য ছিল না। না হলে অন্তত... বড় অস্থির লাগছে।

আজ প্রথম আঁদ্রে তার বাড়িতে আসছে। ব্রেকফাস্টের নেমন্তন্ন করেছে সে। ছবি দেখাবে, মাধুরী ও শীলার সঙ্গে পরিচয় করাবে। বলে রেখেছে ওঁদের। শীলাদি চান করে উঠেই জলখাবারের আয়োজন শুরু করে দিয়েছে। ওকে কি ফোন করে বারণ করে দেবে? মাথাটা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। টেবিলের ওপর মাথাটা রাখল সে। এত নার্ভাস বোধহয় কখনও হয়নি। মেয়েটি একেবারে একা...তার বাবা বাইরে কোথাও। খুব গোলমেলে মেয়ে।

—কী হল বউমা? শীলাদি মাথায় হাত রেখে আস্তে জিজ্ঞেস করল, চা খেতে খেতে নামিয়ে রেখেছ?

সে কোনওমতে কাগজটা দেখিয়ে বলল—চিনি। এঁকে।

কাগজটা তুলে নিল শীলাদি।

—বলো কী? তোমার চেনা? যেন চেনা না হলে অ্যাকসিডেন্টটা কম মারাত্মক হত।

মাথা নাড়ল সে।

দরজায় বেল বাজল। খুলে দিতে চলে গেল শীলাদি। এত তাড়াতাড়ি এসে গেল মেয়ে দুটো? না। বিদেশি গলা শুনতে পেল। আঁদ্রে বলছে—একটু সকাল সকাল এসে গেছি। ভোরবেলায় কলকাতা দেখতে বেরিয়েছিলাম। তোমাদের কোনও অসুবিধে করলাম না তো?

শীলাদি কোনও উত্তর দিচ্ছে না। একটু পরে মাথায় ঘোমটা শীলাদি আর তার পেছন পেছন আঁদ্রে এসে ঢুকল তার বসবার ঘরে।

সাহেব আসবে বলে ক'দিন ধরেই খুব বাড়ি সাফ করছে শীলাদি। উঠোনটিকে একেবারে শ্যাওলা-মুক্ত, পরিষ্কার করিয়ে নিয়েছে। অদিতির বসবার ঘরে একটা বিরাট রাজস্থানি কলসি ছিল। পাথরের ওপর মিনে কাজ করা। সেইটা নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছে নিমতলায়। কয়েকটা ফুলের টব, বোধহয় ফুলসুদ্ধু কিনে এনেছে। জড়ো করে রেখে আড়াল করে দিয়েছে পেছনে ড্রেনের অংশ, আর কিছুতেই পরিষ্কার না হওয়া উঠোন আর ভাঙা রোয়াক।

—অদিতি!

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে অদিতি। চুপ করে বসে আছে। শান্ত। একটু ফিকে হেসে আঁদ্রেকে বসতে বলল।

—কী হয়েছে? তোমাকে যেন কেমন দেখাচ্ছে।

—কিচ্ছু না। চলো আমার শাশুড়ির সঙ্গে আলাপ করবে।

শীলাদির সঙ্গেও পরিচয় করাল।—ইনি ওঁর বোনের মতো। সব সময়ে সঙ্গে থাকেন।

তারপর শীলাদিকে বলল—যা হয়েছে খাবার দিয়ে দাও।

শীলাদি চোখ তুলে তাকাল একবার তার দিকে।

চোখে চোখে তার দিকে চেয়ে অদিতি বলল—দাও।

আঁদ্রে বলল—অনেকটা হেঁটেছি। খিদেও পেয়েছে খুব। বলে হাসতে গিয়ে আবার চাইল—তুমি যেন ভীষণ ডিসটার্বড মনে হচ্ছে? ওদিৎ কী হয়েছে বলো তো?

কী আশ্চর্য কতদিন পরে এলে। গল্প করো না! উত্তরে সে বলল,—কী রকম দেখলে কলকাতা?

—খুব স্বাস্থ্যচর্চা হচ্ছে, দেখলাম রাস্তার সাইডওয়াকে লোক হাঁটছে। ইয়াং পিপল দৌড়োচ্ছে দেখলাম। দারুণ উৎসাহ। স্পোর্টস প্রায়রিটি পাচ্ছে এখানে দেখছি।

—আমাদের এখানে খুব বেশি খোলা জায়গা তো নেই!

—জানি। জানি। তোমাকে তোমার শহরের হয়ে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

শীলাদি খাবার নিয়ে ঢুকেছে। সাজিয়ে দিয়েছে দুটো প্লেটে।

—বাঃ এটা কী? স্টাফড্ ডাম্পলিং মনে হচ্ছে?

একটা মাংসের শিঙাড়া তুলে নিয়ে বলল, এটা দিয়েই শুরু করি!

—এটা চাটনি। এইটে দিয়ে খাও—শুকনো হেসে বলল অদিতি।

—তুমি খাও।

—আমার আর সেই আগের অভ্যেস নেই আঁদ্রে। ব্রেকফাস্ট বেশি খেতে পারি না। তোমাকে সঙ্গ দিতে খাচ্ছি একটু। এখানে আমরা সামান্য লাঞ্চ খেয়ে কাজে বেরোই।

—কী খাও?

—ভাত, ডাল, মাছ।

—ওহ্, দারুণ সুস্বাদু তোমাদের মাছ। খাচ্ছি ক'দিনই। মনে আছে সাঁজেলিজে গেলেই তুমি ভেন্ডরদের থেকে ক্রেপ কিনে খেতে?

—আর রাত্তিরে রান্নার ভয়ে বাগেৎ আর চিজ নিয়ে বাড়ি ফেরা!

—রান্নার ভয় তোমার ছিল, আমার ছিল না। আমি তোমার জীবনে আসবার আগে তুমি ড্রাই ফ্রুটস, ক্রোয়সোঁ আর চিজ বাগেৎ খেয়েই দিন কাটিয়ে দিতে। আর ফল। তাই না?

—দুধ। দুধও খেতাম। আইসক্রিম।

—তাই বেশ গোলগাল ছিলে। এখন অনেক কালো হয়ে গেছ ওদিৎ। রোগাও।

শীলাদি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকল।

অদিতি চা ঢেলে দিল। নিজেও এক কাপ তুলে নিল।

—তুমি যে আমার জন্য আবার আলাদা করে ড্রেস করোনি, তোমার হাউজকোটেই দেখা দিয়েছ, এ জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি। একটু নিচু গলায় বলল আঁদ্রে।

—কেন?

—না, এই ইনফর্ম্যাল আচরণ আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে তুমি সেই আগেকার ওদিৎ, আমি সেই আগেকার আঁদ্রে। মাঝখান দিয়ে আদ্রিয়াতিক, ভূমধ্য সাগরের জল বয়ে গেছে, কিন্তু আমরা বদলাইনি।

—তুমি আমাকে কাপড় বদলাবার সুযোগ দিলে কোথায়? হাসিটা তার মুখে ফুটব ফুটব করেও ফুটল না পুরোপুরি। একটা সৌজন্যের ভঙ্গির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

—চা-টা কিন্তু তোমার সেই চায়ের মতো অত দুর্ধর্ষ নয়।

—কী চা?

—ওই যে চা দিয়ে বলেছিলে চুপ করে খাও, কথা বোলো না...

—বাৎ হোয়াৎস্ রঙ্ মা শেরি!

টুকরো টুকরো জবাব দিয়ে, আঁদ্রের খাওয়াটা সে শেষ করাতে পেরেছে। বলল—আঁদ্রে আসলে সকালে কাগজে একটা খবর পড়ে আমি বড় অস্থির হয়ে পড়েছি।

—কী খবর?

কাগজটা তুলে ওর হাতে দিল অদিতি, বলল—আমি এঁকে চিনি। খুব ভাল করে। ওঁর কাছে হসপিটালে যেতে হবে আমাকে, এক্ষুনি।

—শিয়োর। চলো যাওয়া যাক।—মুখের ভাব বদলে গেল, উঠে দাঁড়াল আঁদ্রে।

—না, তুমি নয়। আমাদের হাসপাতালের চেহারা তুমি দেখতে পারবে না আঁদ্রে। তোমাকে আমি দেখাতে চাই না। তুমি আজ ফিরে যাও। আবার একদিন গল্পসল্প হবে।

—নেভার। কখনও না। তোমাকে এত কষ্টের মধ্যে, বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে, নোংরার ভয়ে হাসপাতালে যাব না, এতটা স্বার্থপর তুমি আমাকে পাওনি। তুমি কিছুতেই আমাকে এড়াতে পারবে না। কে ইনি?

—ধরো, আমার একরকম দিদি।

—তুমি কাপড় বদলে এসো, আমি বসছি।

এর চেয়ে বেশি তর্কাতর্কি করবার এখন ক্ষমতা নেই তার। সে চট করে তার ঢোলা প্যান্ট আর পাঞ্জাবি পরে, চুলে চিরুনি চালিয়ে ক্লিপ দিয়ে মাথায় আটকে নিল। আরও কয়েক মিনিট অস্থির হয়ে বসবার পর বেল বাজল। কয়েক কদম এগিয়ে দরজা খুলে দিল সে। তনিকা। একা।

—ও কোথায়?

—হিস্টিরিক হয়ে গেছে দিদি, খালি বলছে আন্টিমাসি মরে যাবে, বাবা আমায় দূর করে দেবে, আমার আর কেউ রইল না। পঞ্চমীদির কাছে ওকে রেখে আমি ছুটে এসেছি। শৌনককে পেয়েছি। ও সোজা এস. এস. কে. এম.-এ চলে গেছে।... দিদি আপনি কি যাবেন?

—তোমার সন্দেহ আছে? কিন্তু নিজের আত্মীয় কারও যাওয়া দরকার। না হলে হাসপাতালে অসুবিধে হবে।

—আমি...আমি মেয়ে ধরুন।

—তাতে কি হবে, তনিকা?

বুকে প্রচণ্ড জখম। একবারের জন্যই জ্ঞান ফিরেছিল। কাউকে খুঁজেছিলেন। কাকে? কে জানে? তারপর একটা হেঁচকি তুলে চলে গেলেন। ক্লিয়ার কেস অব সুইসাইড। বডি মর্গে যাচ্ছে।

অদিতি হাসপাতালের করিডরে কাঠের বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। তনিকা দু'হাতে মুখ ঢেকেছে। তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে প্রপাত। কেঁপে কেঁপে উঠছে শরীরটা। আঁদ্রে শৌনককে নিয়ে চলে গেছে। পুলিশ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনেক কথা বলাবলি, ব্যবস্থাদি আছে।

দাহকার্য সেরে শুকনো মুখে নবগোপাল বললেন—আপনাদের কী বলে যে ধন্যবাদ দেব, জানি না, আপনারা আমাদের কেউ নন, তবু বিপদের সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তনি তোমাকে আর কী বলব! ভাল থাকো মা।

গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। একটু অপেক্ষা করলেন—অনোহিতা এল না। হুস করে গাড়ি ছেড়ে গেল।

ফ্যাকাশে মুখে অনোহিতা বলল—বাবা আর আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। আমি কোথায় যাব?

—চলো, তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি—অদিতি বলল।

নবগোপাল ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে আছেন। একবারও মেয়ের দিকে তাকাননি। একটা কথাও তার সঙ্গে বলেননি। পঞ্চমী তাঁকে খাবার সময়ে খাবার দিয়ে আসছে ঘরে। একটু ফাঁক দরজা, তার ভেতর দিয়ে দেখা যায়, সেই এক পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে বসে। সামনে টেবিলের ওপর হুইস্কির বোতল ও গ্লাস।

—তনি...বাবাকে বারণ কর। এত হুইস্কি খেলে বাবা মরে যাবে।

—মরে গেলে তো ভালই মিমি। তোকে আর কেউ কোনও বিষয়ে বাধা দেবে না। ভাল থাকবি।

—তনি এমন করে আমাকে বলিস না....আমার বুকের ভেতরটা যে কী হচ্ছে!

—ন্যাকামি করিস না মিমি। শোন, কাল সকালে আমি চলে যাব। তারপরে এটা তোর সংসার, তোর বাবা, তুই সামলা।

—আমি পারব না। পারি না।

—পারতে হবে। সামনে আর কোনও বিকল্প নেই।

—অদিতিদিকে ডেকে দিবি?

—তোকে নম্বর দিয়ে দিচ্ছি, তুই ডাক। আমি এর মধ্যে নেই!

—আমার সাহস হচ্ছে না।

—তা হলে ডাকিসনি! আমি শুতে যাচ্ছি।

অনেক রাতে গুটিসুটি হয়ে তার পাশে শুয়ে পড়ল মিমি।

ঠিক পাঁচ দিন পর সামান্য শ্রাদ্ধকার্য শেষ হয়ে গেলে আবার লন্ডনে ফিরে গেলেন নবগোপাল। নিজের স্যুটকেসটা তুললেন, চলে গেলেন।

পঞ্চমী বলল—আমাকে ছুটি করে দাও মিমি। আমি আর এখানে কাজ করব না।

—কেন? পঞ্চমীদি!

—আমার সব সময়ে মনে হয় মাসি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ করছে!

—ও তোমার মনের ভুল। এ রকম একটা কাণ্ড হলে ভয় হয়।

—বেশ আমার তাই হচ্ছে। তুমি মাইনে দেবে দিয়ো। নইলে আমি চললুম। ওহ্—জলজ্যান্ত মানুষটা গো! আজ বিশ বছর ধরে...কী করাটাই না...

মুখে কাপড় দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল পঞ্চমী।

কেউ জানে না ঠিক কী হয়েছিল। জানে একমাত্র তনিকা। দুর্বল মুহূর্তে প্রবল কষ্টে অনুশোচনায় তাকেই শুধু বলে ফেলেছিল। তা ছাড়া এ কথাটা সে আগেও তনিকাকে বলেছে। অনেকভাবে আঘাত সে মাসিকে করেছে। কিছুতেই কিছু হয়নি। কোনখানে আঘাত করলে মাসির বিষদাঁত ভেঙে যাবে সে ঠিক বুঝতে পেরেছিল। ফল হবে এতেই। কিন্তু যা হল তা তার ধারণাতেও ছিল না। নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে সে। স্পষ্ট করে জানে না কার জন্য। নিঃশব্দে। কেননা এখন তার চিৎকার আর কেউ শুনবে না।

আঠারো

—মেয়েটি তা হলে মারাই গেল? বউমা?

—হ্যাঁ মা।

—এইটুকুনি বয়সে...

—কোনও কোনও সমস্যা থাকে মা মৃত্যু ছাড়া তার হয়তো আর কোনও সমাধান থাকে না। এ-ও হয়তো তেমনই কিছু।

—সৎমেয়ে সৎমাকে সহ্য করতে পারছিল না?

—তেমনই তো শুনছি।

—অথচ তুমি তোমার বিশ্বাসঘাতক ছেড়ে-যাওয়া বরের মায়ের সেবা করছ। এ কি সম্পর্কে সম্পর্কে তফাত? না মানুষে মানুষে?

—আমি জানি না মা।

—তুমি একটু আমার কাছে সরে এসো।

পালঙ্কের কাছে সরে বসল অদিতি যাতে উনি হাত পান। মাথায় হাত রাখলেন।—বড্ড ঘা খেয়েছ, না? মাথায় হাত বুলোচ্ছেন।

চোখের জলে বিছানা ভিজে যাচ্ছে।

কষ্টে প্রাণ বেরিয়ে গেছে। আঁদ্রেকে ছাড়তে, রাজর্ষির ব্যবহারে, কাঁদেনি অদিতি। মায়ের মৃত্যুর পর তিন বছর আগে তার শেষ কান্না। আর আজ এই। নিষ্পর একটা মানুষ, যার সঙ্গে মোটে দু'দিন সেভাবে দেখাশোনা। ফোনে কথা হয়েছে অবশ্য বেশ কয়েকবার। কিন্তু দেখা হয়েছে মাত্র দু'বার, কিন্তু এমন ব্যক্তিগত সংকটের মুহূর্তে, মানুষের কাছে মানুষের আর আবরু থাকে না। এই যে বিপদে, সংকটে, বেআবরু সাক্ষাৎ এবং পাশাপাশি অতি বিপজ্জনক সমস্যার মোকাবিলা করা...এতে বোধহয় পুরো এক জন্মের পরিচয় হয়ে যায়। খুব বিপদে পড়ে তো তিনি অদিতির সাহায্য চেয়েছিলেন। এবারও তো চাইতে পারতেন। অন্ধকার রাত, তারাতলার বৃক্ষচ্ছায়ায় ঝুপসি বাংলো, স্বপ্নালোকে দাঁড়িয়ে বলছেন—জিনিসগুলো ওকে তুমিই দিয়েছ তো। তা হলে লিখে দিতে আপত্তি কীসের?... ওর যদি কিছু হয় কাঠগড়ায় তোমাকে কী করে তুলতে হয় তা আমি জানি।

অত শক্ত হাতের মানুষটা! রাতের পোশাক পরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে এসেছেন। ওই রকম মানসিক অবস্থায় দুরন্ত বেগে গাড়ি চালিয়েছেন, কোনও গন্তব্য ছিল না। কাগজে লিখেছিল—সান্ট্রো গাড়িটা রেড রোডে ছোটাছুটি করছিল, ছোটাছুটি? গাড়িটা নয়। গাড়ির চালকই তো সেটা। 'ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো/আছো কি বীর কোনও?'—আবেদন, এ রকম একটা মূক আবেদন কি ওঁর অস্থির উন্মত্ততার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। ওঁর কি একবারও মনে হল না চূড়ান্ত বিপদে উনি একজনের সাহায্য চেয়েছিলেন, একজনকে ডেকেছিলেন। সে সাড়া দিয়েছিল এক ডাকে! সম্পূর্ণ বুদ্ধিভ্রংশ না হলে এ রকম কেউ করে? কী হয়েছিল? তনিকা বলছে—মিমির সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছিল, আচ্ছা, তেইশ বছরের একটা অপরিণত মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে, তার ডবল বয়সি কোনও মহিলা এই রকম উন্মাদ হয়ে যাবেন?

যত আদর করছেন মাধুরী ততই কান্না বেড়ে যাচ্ছে তার। যেন বহুদিনের অবরুদ্ধ গুমোট ভেঙে আষাঢ়ের বৃষ্টি নামল। এসব বুঝি তার জমানো ছিল। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যার কাছে এভাবে কাঁদা যায় বলে। মনীষা! সে সমসাময়িক, বন্ধু, কিন্তু কঠিন, রাগী, স্বার্থপর, সে বাইরের আচরণটা অপমানটা দেখে, অপমানের উত্তরে ঘৃণা করার, ঘৃণা শেখাবার শক্তি জোগায়, আর কিছু নয়। আঁদ্রে তুমি নিজেকে প্রমাণ করতে পারোনি। মানুষের কাছ থেকে খুব বেশি দাবি করা অন্যায়, করতে নেই জানি। কিন্তু আমার মা-বাবার মতামতের আমি পরোয়া করিনি। দারুণ দুঃখ দিয়েছিলাম তাঁদের, লিখেছিলাম—মা, আমি তোমাদের একমাত্র সন্তান, তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসায় কোনও খাদ নেই, কোনওদিন থাকবে না। কিন্তু কন্যা-পরিচয়ের বাইরেও যে আমার একটা অন্য পরিচয় আছে। অন্য জগৎ আছে। সেখানে যে আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে। যদি ভুল করি করব, তার শাস্তিও পাব, কিন্তু সে আমার ভুল। তোমাদের নয়। ভুল করবার স্বাধীনতা আমাকে দাও মা।

তা তাঁরা দিয়েছিলেন। না দিয়ে উপায়ই বা কী! কে তোয়াক্কা করছে স্বাধীনতা দেওয়ার বা না দেওয়ার! তাই যখন সে ভুলই প্রমাণিত হল, মায়ের কোলে মাথা রেখে কাঁদতে পারেনি, বাবাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা চাইতে পারেনি।...তুমি কিন্তু আঁদ্রে, এই ত্যাগ করতে পারোনি। অথচ তোমার কোনও অসুবিধে ছিল না। তা ছাড়া তোমাদের সমাজে এমনিতেই প্রেম-ভালবাসা-বিয়ের ব্যাপারে কেউই মা-বাবার তোয়াক্কা করে না। কত সীমাবদ্ধ ছিল তোমার হৃদয়ের ক্ষমতা! আর রাজর্ষি! সে ঘটনার পর পাছে কেউ তাকে করুণা করে, কৃপা করে, কিংবা কৌতুক করে তাই সে কঠিন-গম্ভীর কাজে-মগ্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। কেউ যেন তার ক্ষতি, তার ক্ষত দেখতে না পায়। বুঝতে না পারে! তার মন কি আর কাঁদেনি? 'আছো কি বীর কোনও?'—এ আবেদন কি তার অন্তরাত্মা থেকেও উঠে আসেনি? সে তার গলা টিপে রেখেছে। মা তখন থেকেই অসুস্থ। বাবার মৃত্যুর শোক কাটাতে পারছেন না। মা তার কাছে কাঁদবেন, না সে মা'র কাছে? তখন তো তাকে মায়ের মা হয়ে উঠতে হয়েছে। তা ছাড়া ব্যাপারটাতে মা তার নির্বুদ্ধিতাই দেখতেন, তার বিশ্বাসের আন্তরিকতা তার মনুষ্যত্ব তো তিনি দেখতে চাইতেন না! পারতেন না!

কোনও কোনও শোক থাকে তার এমন তাপ যে ভেতরের দীর্ঘদিনের শৈত্য গলিয়ে দেয়। হিমবাহ গলে ঝরনা হয়ে, নদী হয়ে নামতে থাকে। নিষ্পর সর্বাণীদির শোকে নিষ্পর মাধুরীর মিতবাক্য সান্ত্বনা সেই উত্তাপ। সুতরাং, অদিতি সারা জীবনের কান্না একসঙ্গে কাঁদছে।

রাত হয়ে যাচ্ছে। একটু স্যুপ খেয়ে শুয়ে পড়েছে অদিতি। ফোনটা বাজল। মোবাইল এস.এম.এস—দিদি কাল সকালে আপনার কাছে একবার যাব। তনিকা।

* * *

বড় ভয়াবহ একটা স্বপ্ন দেখল অদিতি। স্বপ্ন বলে সে বুঝতেও পারেনি। প্রাণগোপালবাবু বলে একজন এসেছেন। একটা প্রদর্শনী হচ্ছে। উদ্বোধনের জন্য নিয়ে যাবেন তাকে। সে একটা জমকালো ওড়িশি সিল্ক পরেছে। শাড়িটা কিন্তু তার আদৌ নেই। কোনও ওড়িশি নৃত্যশিল্পীকে এই শাড়িতে দেখেছিল বোধহয়। কেমন চোখে লেগে গিয়েছিল। এ শাড়িটা তার সংগ্রহে কী করে যে এল! নীল রং, হালকা, তাতে লালচে পাড়, বমকাই কাজের। অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। কেন? ওদের কি আর গাড়ি নেই? সেই অ্যাম্বুলেন্সটা না? যেটা বাঁকুড়া থেকে মাধুরীকে এনেছিল? একটা প্রাসাদের সামনে গাড়ি থেমে যায়, সে নামে, সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রেচারে করে প্রাণগোপালবাবু। আশ্চর্য! নেমেই সটান উঠে দাঁড়ান। ভেতরে ঢুকছে। আরে এ যে সেই ফরাসি শাতো! উঁচু উঁচু ওক কাঠের প্যানেল, তার ওপর ছবি, পাথরের মেঝেতে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কার্পেট।

—বেসমেন্টে।

—বেসমেন্ট!

—হ্যাঁ।

একটা সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নামছে সে, পেছনে আলো হাতে প্রাণগোপালবাবু। বেসমেন্ট টেন্ট নয়, এটা একটা অন্ধকুঠি। সেলার-জাতীয়—তবে তার চেয়ে অনেক বড়।

সামনে আঙুল দিয়ে দেখালেন। ঘরের মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো আছে চৌকোনা কতকগুলো বাকস। সাদা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে মোড়া। সে গিয়ে খুলছে—ভেতরে একটা ভাঁজ-করা শব। ঠিক যেভাবে শাড়ি ভাঁজ করা হয় আঁচলটা ওপরে রেখে! মুখটা ওপরে রেখে পুরো শরীরটা তেমনি ভাঁজ করা রয়েছে। পেট বুকের ওপর পা দুটো তারপর ওপর থেকে পাটে পাটে নেমে এসেছে হাত। সমস্ত বাকসগুলো খুলে গেছে। প্রত্যেকটাতে একটা করে শব আলাদা আলাদা লোকের। আঁদ্রের, মাধুরীর, তনিকার, অনোহিতার, মায়ের, বাবার...চেহারাগুলো ঠিক ওদের নয়, তবু সে জানে

ওদেরই। তার শরীর ভয়ে কেমন-কেমন করছে, একটা চিৎকার করল, চিৎকার ফুটল না। জেগে উঠল, জল খেল অনেকটা। কী অদ্ভুত স্বপ্ন! সুররিয়্যালিস্ট ছবির মতো! দালি কি এই রকম স্বপ্ন দেখেই ছবি আঁকতেন?

চুপচাপ শুয়ে রইল বিছানায়। ঘুম আর আসবে না। জানলা দিয়ে দক্ষিণ আকাশে তাকাল, ওইখান দিয়ে ফুটতে দেখবে ভোরের আলো। একদা বাবা বলেছিলেন—কী রে ঘুমের মধ্যে চেঁচাচ্ছিলি? কী স্বপ্ন দেখছিলি?

—বাবা, দেখলুম—তুমি আর মা মরে গেছ! আমার ভয় করছে। ভীষণ...

দূর পাগল, কারও সম্পর্কে খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী হয় জানিস তো?

—কী?

—যার সম্পর্কে খারাপ দেখলি—তার ভাল হয়, উন্নতি হয়।

* * *

ঘুমিয়ে পড়েছে সে। মানুষের শরীরে মনে আর কত সয়। বাবা চলে গেছে। তাকে একটা কথাও বলে যায়নি। হয়তো আর ফিরবে না। হয়তো লন্ডনের শাখাতেই থেকে যাবে এবার থেকে। টাকা পাঠাবে কি? বোধহয় পাঠাবে না। এখানে তার দুটো জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে। একটা মায়ের সঙ্গে, আরেকটা...আরেকটা আন্টিমাসির সঙ্গে...। পঞ্চমীদিকে কিছুতেই ধরে রাখা গেল না। তনিকা কাল নিমডি যাবে। পুরুলিয়ার বর্ষা দেখতে। আঁকতে যাবে, সবাই। 'চিত্রভানু'র। চলে গেছে। তনিও বোধহয় চলে গেছে। এত বড় বাড়িটাতে সে একা। মেজানিনে খালি বিশ্বেশ্বর থাকে, তাদের ড্রাইভার। ঘুম যদি বা আসে, ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন দেখে সে।

একটা পথ দিয়ে যাচ্ছে। এমন চকচমকে পথটা যে তলায় আয়নার মতো তার ছায়া পড়েছে। হঠাৎ দেখে সে সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়েছে। পথটা ভেসে আছে...দু'পাশে ঢেউ, যতদূর দেখা যায় জল। ক্রমশ সরু হয়ে যাচ্ছে পথটা। সে জলের মধ্যে পড়ে গেল। প্রাণপণে সাঁতরাতে চেষ্টা করছে কিন্তু কোনদিকে যাবে? চারিদিকে শুধু জল, শুধু জল। হাবুডুবু খেতে খেতে সে উঠে বসল। জল খেল। টয়লেট গেল। ওপরের লাউঞ্জের এক কোণে বাবার সেলার। খোলা। খুঁজে পেতে এক বোতল হুইস্কি পেল। ঢালল গ্লাসে, একটু চুমুক দিল। মুখটা কড়া ওষুধ-ওষুধ স্বাদে বিকৃত হয়ে গেল। এভাবে হুইস্কি খেতে সে অভ্যস্ত নয়। সে খায় ওয়াইন, কিংবা ককটেল। বেসিনের মধ্যে ঢেলে দিল হুইস্কিটা। ফিরে দাঁড়াল।

বিশেষ কিছু খায়নি রাতে। পেটের ভেতর থেকে একটা টক জল উঠে আসছে। গা গুলিয়ে উঠল। ফ্রিজ খুলে আইসক্রিম বার করল। খেতে খেতে গা-বমি ভাবটা কেটে গেল। ফিরে দাঁড়িয়েই সামনে ছবি। সমুদ্র, সমুদ্রতটে বালির ওপর হাওয়া খেলে গেছে, ছোট ছোট অসমান ঢেউ উঠেছে, একদিকে একগুচ্ছ পাম গাছ। একটা পোস্টার এটা। আরেক দিকে আর একটা ছবি, একটা বিরাট গাছের গুঁড়ি চারপাশে হলুদ হলুদ ফুল ঝরে রয়েছে, কেমন মোটা পাপড়ির হালকা হলুদ ফুলগুলো। একটা টকটকে লাল মগ। একবোঝা কলার থোড়ের খোলা, একটা পাখির বাসা। এটা তনি দিয়েছিল বেশ কিছু কাল আগে। অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে সে, শূন্য চোখে। উঠে পড়ে। সব আলো জ্বেলে দেয়, নীচে নামে। মায়ের ঘর। সর্বত্র উজ্জ্বল কমলারঙের পরদা দুলছে। মেঝেটা অনেককাল পরে ঝকঝক করছে, আসবাবগুলোতে পালিশ। আলো পিছলে পড়ছে। মায়ের ঘরে একটা গেরুয়া রঙের কার্পেট পাতা, বিছানায় চিত্রবিচিত্র জাজিম। ড্রেসিংটেবিল একইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খালি তার বুকে কোনও বস্তু নেই—ট্যালকাম পাউডার, কিংবা ও ডি কলোন, পার্ফুম মাখত না মা। একদিকে দেরাজ। এর ভেতরেই মায়ের জামাকাপড় সব থাকত। দেরাজটার ওপর তিনটে

ছবি। একটা সে খুব ছোট্ট, স্বগীয় শিশু একটা স্বর্গীয় হাসি হাসছে। আর একটা মা আর আন্টি মাসি, মা বসে মাসি দাঁড়িয়ে, দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসছে, এটা মায়ের কলেজ-দিনের ছবি। মা কী সুন্দর এক তরুণী, তারই মতো বয়স হয়তো তখন, কিংবা আরও ছোট। দেখাচ্ছে একেবারে রোম্যান্টিক। আর আন্টি, সতেজ, সজীব, শক্তি আর স্ফূর্তির গাছ যেন একটা। তৃতীয় ফটোটা তাদের পুরো পরিবারের। পেছনে বাবা দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবি পরা। কাঁধে লম্বা উত্তরীয়। তখনও বেশ পেটা ছিল চেহারাটা। বসে, খুব কাছাকাছি মা আর মাসি, দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে। মাসির কোলে হেলান নিয়ে। সাত-আট বছর বয়স বোধহয়।

মা-মাসির ছবিটা তুলে নিল সে। মায়ের বিছানায় শুয়ে পড়ল। ছবিটা দু'হাতে করে দেখছে। কিচ্ছু ভাবতে পারছে না। শুধু দেখছে নির্নিমেষে। কী দেখছে মাকে, মাসিকে? না বন্ধুত্বকে? এত বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা তার নেই। দেখতে দেখতে আবার কখন চোখ জুড়ে এসেছে।

একটা বিরাট মুখ। এমন মুখ কখনও দেখেনি সে। কী রকম একটা আক্রমণের ভঙ্গি করল মুখটা সঙ্গে সঙ্গে সে যেমন আছে তেমন বেরিয়ে গেল। ড্রয়ার থেকে বাড়ির চাবিটা নিল। সে একটা গাড়িতে বসে। গাড়ি চালাচ্ছে। নাইট ড্রেস পরে। চালাচ্ছে দিশেহারা আতঙ্কে। যতটা জোরে সে চালাচ্ছে তার চেয়েও জোরে চলছে গাড়িটা। গাড়িটার ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই তার। হুড়মুড় করে চলেছে ভীষণ বেগে, একটা জোর ধাক্কা খেল। তার সামনে পড়ে আছেন অদিতি সরকার। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে। সে চিৎকার করল—আন্টিমাসি!!! আন্টিমাসিই!!!

উঠে বসল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল কিছুক্ষণ। ...চেম্বারটার ভেতরে গনগনে আগুন। শিখা নেই। শুধু আগুনে আলো। ঢাকাই শাড়ি-পরা ওঁর শরীরটা ঢুকে গেল। দপ্। শাটার পড়ে গেল। সে দেখল, মা-মাসির ছবিটা মাটিতে পড়ে গেছে। ইশ্‌শ্, যাঃ। খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে চটি পরল, ঘরের কোণ থেকে ঝাঁটা নিয়ে কাচগুলো জড়ো করে তুলল। তারপর সেগুলো ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলে দিল। ছবিটা মুছে দেরাজের ওপর রেখে দিল। তারপর আস্তে খুব আস্তে মোবাইলটা তুলে নিল।

সাড়ে ছটা মতো বাজে। অদিতি মুখ ধুয়ে নিয়েছে। চুলে একটু চিরুনি চালিয়ে হাউসকোটটা গলিয়ে নিয়েছে। বসবার ঘরে বসেছে, সামনে চায়ের পট, এখনও সে হাত দেয়নি। একবার ঘড়ি দেখল। এইবার বাজছে। বেল। শীলাদি বলল—বোসো বউমা, আমি খুলে দিচ্ছি।

ঘরে এসে ঢুকল অনোহিতা। একটা জিনসের ওপর আলগা একটা টপ পরেছে। মুখে যেন এখনও জল চকচক করছে। খুব শান্ত মুখটা। কোনও ধার নেই। কেমন অবর্ণনীয়। দু'পাশ দিয়ে চুল ঝুলে আছে।

—বোসো।

—দিদি আমি মাসিকে খুন করেছি। আমি পুলিশের কাছে যাব। ধরা দেব।

—কী বলছ?

—হ্যাঁ এমন কথা মাসিকে বলেছি যে মাসি পাগল হয়ে গিয়েছিল। তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে।

—কী বলেছিলে অনোহিতা?

—বলেছিলাম—তুমি মাকে খুন করেছ অক্সিজেন মাস্কটা খুলে, মা মরে গেলে আবার পরিয়ে দিয়েছিলে কিছুক্ষণ পর।

চমকে অদিতি বলল—কোনও কারণ ছিল বলার? এ কথা কেন মনে হল তোমার?

—একটা আক্রোশে বলেছি। টিভি. সিরিয়ালে দেখায় না? আমার মা অপারেশন টেবিলেই মারা যায়।

—আক্রোশ? আক্রোশ কীসের?

—আমি জানি না। আন্টিমাসিকে আমি খুব ভালবাসতাম। কিন্তু আমার বাবার পাশে—সহ্য করতে পারিনি। রাগ হত ভয়ানক।

—মাকে পারতে? সহ্য করতে?

—বোধহয় পারতাম না। ভাল লাগত না। বোধহয়।

—তা উনি যখন জানেন কথাটা মিথ্যে এবং তুমি ওঁকে এত...ট্রাবল দিচ্ছ...দিয়েই তো যাচ্ছ... উনি ও রকম জ্ঞানহারা হয়ে গেলেন কেন?

—আমি একেবারেই বুঝতে পারিনি...অমন হবে। আসলে মাসি মাকে যত ভালবাসত অমন আর কাউকে বাসত না। মা-ও তাই। অদ্ভুত একটা লয়্যালটি। আমি জ্ঞান হয়ে থেকে দেখছি।

মুখ নিচু করল সে—একটু পরে মুখ তুলে বলল—মা আর মাসি যেন যমজ। মাসি খুব স্ট্রং ছিল। আমি বুঝিনি ওই কথায় মাসির...অমন লাগবে। আমি বুঝিনি...। আমার থানায় যেতে খুব ভয় করছে। আপনি একটু সঙ্গে যাবেন?

—চা নাও। এক কাপ সে এগিয়ে দিল অনোহিতার দিকে।

—নাও! বসে থেকো না।

কাপটা তুলে নিল, আঙুলগুলো কাঁপছে। কোনওক্রমে মুখে ঠেকাল। তারপর নামিয়ে রাখল।

—বাড়িতে এখন কে কে আছেন?

—কেউ নেই। বাবা লন্ডনে চলে গেছে। আমাদের লোক পঞ্চমীদি চলে গেছে। ক'দিন সারারাত আমি বাড়িতে একা কাটিয়েছি। পঞ্চমীদি চলে গেল তো!

—খাওনি?

—হ্যাঁ, ফ্রিজে রুটিমাখন ছিল, আইসক্রিম—খেয়েছি।

—তুমি রান্না করতে পারো না?

—পারি। কিন্তু এখন পারছি না।

—অনোহিতা, একা বাড়িতে ফিরে গিয়ে তোমার কাজ নেই। এখন। তুমি বরং বাবাকে ফোন করে জেনে নাও কবে আসবেন। ততদিন অন্য কোথাও—একটু হালকা সুরে বলল অদিতি।

বাবা আসবে না। আমাদের কাউকে না বলে চলে গেছে। আমার কেউ নেই কলকাতায়। বাবার খুড়তুতো ভাই থাকেন হুগলিতে। ওঁরা জানেনও না খবরটা।

—আত্মীয়স্বজনকে খবর দাওনি?

—কোথায় আত্মীয়? মামার বাড়িতে তো দাদু দিদা নেই। আন্টিমাসির কারা যেন থাকেন কোথায় কোন দেশের বাড়িতে। নদিয়ার দিকে। খুব অসুস্থও। ওঁদেরও কোনও খবর...এক যদি কাগজ দেখে।...

—শোনো,—বাবাকে ফোন করো। যতদিন না আসেন আমার কাছে থাকো।

—আমাকে থানায় যেতে হবে না?

—না, ও কেস ক্লোজড্ হয়ে গেছে। শোনো তুমি একটু কিছু খাও, তারপর বাবাকে...

—বাবাকে ফোন করার আমার সাহস নেই দিদি। তার গলা মৃদু, তাতে শীত লাগার কাঁপন।

—আচ্ছা আমি যোগাযোগ করছি। আমাকে দাও নম্বরটা। শোনো, কিছু খাও। কী খাবে। বলো? আইসক্রিম?

পুতুলের মতো ঘাড় নাড়ল মেয়েটি।

সে আইসক্রিম কেটে এনে ওর সামনে রাখল।

একটু একটু করে খেল। খেয়ে নিল।

—এবার একটু ঘুমোও, হ্যাঁ!

—ঘুমোব? এখন তো সকাল!

—ঘুমোচ্ছ না তো কদিন, একটু ঘুম দরকার।

—ওষুধ দেবেন? ঘুমের?

—হ্যাঁ, দাঁড়াও...

সে মাধুরীর ঘর থেকে ওষুধ নিয়ে এল।

—তুমি দেখে নাও অনোহিতা কী দিচ্ছি। এই যে অ্যালজোলাম। মোটে .5। খেয়ে ঘুমোও। চলো। সে নিজের ঘরের একটা খাটে ওকে শুইয়ে দিল। পরদা টেনে অন্ধকার করে দিল ঘর। একটা সেতার চালিয়ে দিল বিলায়েৎ খানের। পাশে বসে রইল অনেকক্ষণ। যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ে।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তনিকাকে একটা ফোন করল।

—তনিকা শোনো তোমার পুরুলিয়া যাওয়া হচ্ছে না। চলে এসো আমার এখানে। এখুনি।

তারপর লন্ডনের নম্বরটা টিপল।

এখন মাঝরাত, কিন্তু কী করা যাবে?

—হ্যালো, কে বলছেন? ভারী, বিরক্ত কণ্ঠ।

—আমার নাম অদিতি সরকার, আমি সর্বাণীদির বন্ধু।

—বলুন।

—আপনার মেয়ে খুব অসুস্থ।

—কী হয়েছে?

—মানসিকভাবে। অনেকদিন ধরেই ওর এই মানসিক প্রবলেমটা—আপনারা কেউ কেন লক্ষ করেননি জানি না। কবে আসবেন জানান। যত শিগগির সম্ভব। ততদিন আমি রাখছি। আমার নম্বরটা নিন। কাইন্ডলি প্রতিদিন ফোন করবেন, যতদিন না আসছেন। নম্বর বলে সে ফোন নামিয়ে রাখল।

এমনিতেই আজ 'চিত্রভানু' যাওয়ার ছিল না। ওরা নিমডি যাবে পুরুলিয়া এক্সপ্রেসে, বর্ষার দলমা দেখবে, আঁকবে। কোথায় একজন ডাক্তার পাওয়া যায় এক্ষুনি? একজন মনোবিদ! কুসুমজি একজনের কাছে কাউনসেলিংয়ের জন্য যেতেন। প্রথম প্রথম প্যারালাইজড্ হয়ে যাবার পর। এখনও বোধহয় মাঝে মাঝে যান। কাউনসেলিং। ঠিক ডাক্তার তো নয়। সে বুঝতে পারছে না, মনোবিদদের কাছে যেতে হবে কিনা। এঁদের আবার একটু ভয়ই করে। একগাদা ট্র্যাংকুইলাইজার... দিয়ে...দিয়ে...। তেমন রিসক্ সে নিতে পারে না ওর বাবা না আসা পর্যন্ত। দুঃখের বিষয়, ওর বাবার ওপরও তেমন ভরসা করা যায় না। যিনি একমাত্র মেয়েকে অমন ট্রমার মধ্যে ফেলে, কথা নয়, বার্তা নয়, বিদেশ চলে যেতে পারেন তিনি কতটা পরিণতমনস্ক, ঘোর সন্দেহ আছে। পুরো বাড়িটাতে একমাত্র ম্যাচুয়োরিটি ছিল সর্বাণীদির। তিনি হঠাৎ এমন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেলেন? ওঁর উচিত ছিল এর গালে কষে একটা থাপ্পড় কষানো। উনি তো নিজে শিক্ষকও ছিলেন, ছোট্ট থেকে দেখে আসছেন ওর যা কিছু নষ্টামো। আপাতদৃষ্টিতে শান্ত, শক্ত, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আড়ালে কোথায়-ছিল এই দুর্বল চিত্ত? এ কেমন বন্ধুত্ব যা উটকো দোষারোপে এমন ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। খুব জটিল—এ মনস্তত্ত্ব। সে সামান্য সংশয়ে ভোগে, কিন্তু স্থির আঙুল কিছুর ওপর রাখতে পারে না।

—কী ব্যাপার দিদি? শৌনক ঢুকল প্রথমে। পেছনে পেছনে তনিকা।

—আস্তে শৌনক, আস্তে।

—খ্ খী ব্যাপার?—শৌনক ফিসফিস করে বলে আবার।

—তনিকা, তুমি না ওর বন্ধু! ওকে একা ফেলে কী করে চলে এলে?

—কেন? কী হয়েছে দিদি?—তনিকার চোখে উদ্বেগ।

—হতে পারত। হতে পারত ভয়ানক কিছু। এখনও আমার ঘরে ঘুমোচ্ছে। থাক এখানে কিছুদিন, তুমি এক কাজ করো। ওর ব্যাগ থেকে বাড়ির চাবিটা নিয়ে চলে যাও। সব বন্ধটন্ধ করে চলে এসো। কেউ নেই ওখানে।

—কেউ নেই? পঞ্চমীদি? বিশ্বেশ্বররদা?

—পঞ্চমী মেয়েটি নেই, বিশ্বেশ্বরদা কী ভাবে থাকে আমার জানা নেই।

—ও মেজানিনে থাকে দিদি। নিজেই রান্না করে খায়।

—বিশ্বাসী?

—তাই তো জানি।

—ঠিক আছে তোমরা দু'জনে চলে যাও, সব ঠিকঠাক করে ওর কিছু জামাকাপড় চাবিটাবি নিয়ে চলে এসো।

নিচু হয়ে অনোহিতার ব্যাগ থেকে চাবি নিতে গিয়ে, তনিকার ঝোলা থেকে একটা ব্রাউন রঙের শক্ত মলাটের ডায়েরি পড়ে যায়। তনিকা তুলে নিতে গেলে অদিতি বলল—থাক, ওটা থাক, অনোহিতার, না?

—হ্যাঁ, মুখ নিচু করে রইল তনিকা, ইতস্তত করে অবশেষে বলেই ফেলল—দিদি আমি তো ওর বন্ধু, আমার কাছেই থাক না ওটা।

—বন্ধু তো আমিও হতে পারি!

—দিদি ওটা আপনি...পড়বেন...না।

—সে আমি বুঝব। তোমরা চলে যাও।

ডায়েরিটার দিকে ভীত করুণ চোখে চেয়ে চলে গেল তনিকা, পেছন পেছন শৌনক। অদিতি তুলে নিল ডায়েরিটা।

দু'জনের আসা এবং চলে যাওয়ার ধরন দেখে কেমন মনে হল, ওদের মধ্যে একটা নতুন সম্পর্কের বীজ উপ্ত হয়েছে। কাছে আসুক, দুঃখে, বিপদে, নিজেদের যদি না-ও হয়, অন্যের। তবে হয়তো শক্ত হবে পরিচয়ের ভিত। কারও কারও চারপাশ অনেকে থাকে, অথচ সত্যিকার কেউ থাকে না। যেমন অনোহিতা। কারও আবার আশেপাশে কেউ না থাকলেও সম্পর্ক তৈরি হয়ে যেতে থাকে। একটা সমঝোতা। যেমন তনিকা।

ডায়েরিটা সে ওলটায়। উলটেপালটে দেখে। এই মুহূর্তে কেউ নেই। কী এমন লেখে ও!

—আর এর সঙ্গে হলদিয়া গিয়েছিলাম। দারুণ কাটল। এই আমার প্রথম সেক্স। আরও অনেকবার চান্স এসেছে। হতে হতে হয়নি। আরমান দারুণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম—অভিজ্ঞতা আছে নাকি রে?

—তুইও যেমন—এসব ইনস্টিংট। অভিজ্ঞতা লাগে নাকি?

—বাজে কথা ছাড়। যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দে। অভিজ্ঞতা আছে কি না? ইয়েস অর নো।

—আমার তো মনে হচ্ছে তোরই অভিজ্ঞতা আছে।

—উলটো চাপ দিচ্ছিস। তবে রে?

আমাদের ঝগড়াটা অবশ্য আর একটায় শেষ হল। ও বলল—তোর মধ্যে থেকে তোদের ঠানদিরা কথা কয়ে উঠছে কেন? যদি অভিজ্ঞতা থাকে, তোর কি আমার, কী এসে যায়? মোদ্দা কথা আমরা পরস্পরকে এনজয় করছি কি না।

ধুর—সো-কলড্ ঠানদি কিনা জানি না। আমার মুডটাই নষ্ট হয়ে গেল। আরমান আমার। অন্য কারও হবে কেন?

আসল মজা, মজার মতো মজা কাকুর সঙ্গে। হি ইজ ফান। এই দেখছ ছবি আঁকছে। ন্যুড হয়ে বোস তো। হ্যাঁ এইভাবে। পায়ের ওপর পা ক্রস কর। দু'হাতে পেছন দিকে ভর দে। আঁকার প্রথম স্কেচটা হয়ে গেলেই হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসবে। বুড়ো একটা। কিন্তু দুর্ধর্ষ সেক্সি। তবে কাকু বোধহয় ইমপোটেন্ট। দুটো ধেড়ে ধেড়ে ছেলেমেয়ে আছে, ওর বউটা যা খেপি! মনে হয় ও ইমপোটেন্ট হয়ে গেছে ইদানীং। ব্যাড লাক।

অদিতি ডায়েরিটা বন্ধ করল। ড্রয়ারের মধ্যে রেখে চাবি দিল।

ঘুমন্ত মানুষকে বড় নিষ্পাপ দেখায়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। আঁটো জিনস্ পরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বালিশের ওপর মুখটা এক কাতে ঝুলে পড়েছে, তাতে দেখাচ্ছে আরও অসহায়। করুণা জাগায়। কে জানে, হয়তো এই রূপটাই সত্য। ঘুমের মধ্যে যা দেখায় তা-ই তার আসল পরিচয়। স্বপ্নে। ভয়ের, ভালবাসার, উদ্বেগের, কষ্টের এই অনুভূতিগুলোই মানুষের আসল। বাইরে অপরিচিত পৃথিবী তার জটিল সমাজ, প্রশাসন, পারিবারিক দাবি সমস্ত নিয়ে আক্রমণ করে। তখন আসল মানুষটা কুঁকড়ে যায়, বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। শুধু স্বপ্নে বাঁচে। সুস্বপ্নে এবং দুঃস্বপ্নে। সেই বাঁচা ফুটে ওঠে ঘুমন্ত মানুষের মুখের আদলে, শরীরের সমর্পিত শিথিলতায়।

ওর একটা হাত ঝুলছিল। খুব সাবধানে তুলে দিল।

উনিশ

—আমি তোমাকেই আঁকব। এই যে দেখো, ওই দিদার ছবি এঁকেছি। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভাল লাগছে কি না দেখো তো? সে যেন কোনও বাচ্চাকে বলছে, কিন্তু ভঙ্গিটা বড়দের।

—আমি ছবি বুঝি না।

—ভাল না লাগলে 'না' বোলো।

—এই বুড়ো মুখ আমার ভাল লাগছে না।

—তনিকা তোমার?

—হলুদের মনোক্রোম করে দিদি এমন একটা আলো এনে ফেলেছেন ছবিটার মধ্যে মনে হচ্ছে...মনে হচ্ছে... বার্ধক্য একটা—কী বলব...সুন্দর জিনিস...শ্রদ্ধার...ভালবাসার।

—অনোহিতা এই হলুদ আলো তোমার ভাল লাগছে না?

—না।

—এত এঁকেছি, দেখো কোনওটাই কি পছন্দ হচ্ছে না তোমার? আমি কিছু মনে করব না।

—ওই বৃষ্টিটা ভাল লেগেছে। অতগুলো গাড়ি... ওটা কোন রাস্তা?

—একটু দেখো বুঝতে পারবে।

—চৌরঙ্গি? শহিদ মিনারটা বেঁকে গেছে কেন?

—বৃষ্টিতে।

—একটা হিউম্যান ফিগার রয়েছে, ওটা কার?

—কার আর। এই বৃষ্টির সঙ্গে যে বৃষ্টি হয়ে যেতে চায় তার! অদিতি তনিকার দিকে আড়চোখে তাকাল। তনিকা অপ্রস্তুত হেসে মাথা নিচু করল।

—আমার ছবি আঁকবেন না। আমার ভেতরটা খুব বীভৎস। সেইটাই সবাই আঁকে।

—আচ্ছা আগে তো আমি আঁকি খানিকটা পরে যদি তোমার অপছন্দ হয়, তা হলে না হয় মুছে দেব।

দ্রুত হাতে চুল, চুলের প্রান্তরেখা, মুখের ডৌল প্রায় একটানে এঁকে, গ্রীবার কাছে এসে থামল অদিতি। বলল—ওই ঘরে যে দিদা আছেন, ওঁকে কি তোমার বুড়ো বলে ভাল লাগে না?

—তা নয়। উনি তো মানুষ। কিন্তু ওঁর ছবিটা শুধু...শুধুই বুড়ো।

—বুড়োমানুষ নয়?

—না।

—আচ্ছা তোমায় আঁকি। দেখো এটা কেমন মানুষ হয়।

—আমি তো মানুষ নই, আমাকে মানুষ করে আঁকবেন কী করে?

অবাক হয়ে অদিতি বলল—তুমি মানুষ নও? তুমি তবে কী? বৃষ্টি, রোদ, হাওয়া?

—আমি ওয়াইল্ড, জন্তু একটা।

—আমার তো তোমাকে একটা গাছের পাতার মতো মনে হয়। ধরো ইউক্যালিপটাস।

চমকে উঠল অনোহিতা।

—পাতলা, ধারালো পাতা। ভীষণ ডেলিকেট। কিন্তু ক্ষুরধার। আর ভীষণ সুগন্ধ।

শান্ত হয়ে বসে রইল অনোহিতা।

—আপনি কী করে জানলেন?

—কী?

—যে আমি ইউক্যালিপটাস পাতার মতো!

—মনে হল। কবিদের, শিল্পীদের এ রকম অনেক কিছু মনে হয়। মানুষের সঙ্গে গাছ, নদী, বৃষ্টি সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ঘটনার আদল খুঁজে পায় তারা।

একটা সম্পূর্ণ মুখের ছবি আঁকল অদিতি ঘণ্টা দুই ধরে। তারপর তনিকাকে বলল—শেষ করো। আমি একটু মাকে দেখে আসি।

উনি খেতে বসেছেন। আরামচেয়ারটার দুটো হাতলের ওপর একটা কাঠের ট্রে বসানো হয়েছে। তার ওপরেই ছোট থালাবাটিতে ওঁর সামান্য খাবার। অদিতিকে দেখে বললেন—কী করছে, ওরা?

—একজন আরেকজনকে আঁকছে।

খাওয়া হয়ে গেলে শীলাদি সব তুলে নিয়ে মুখ ধুইয়ে গেল, উনি ন্যাপকিনে মুখ মুছে বললেন—এ সৎমা তো সে সৎমা নয় বউমা?

—কেমন তা হলে?

—দ্যাখো মা, জীবন বড় বিচিত্র—সব সৎমাই কিছু স্নো হোয়াইট কি সিন্ডারেল্লার সৎমা নয়। ইনি নিশ্চয় খুবই অসাধারণ মা ছিলেন, নইলে মেয়েটির এমন অবস্থা হয়? একটু না হয় ঝগড়াই হল। আদুরে মেয়ে কী বলতে কী বলে ফেলেছে তার জন্যে একেবারে আত্মহত্যা? কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল বলো তো? মেয়েটার, তার বাবার, তাঁর নিজেরও কি কম ক্ষতি হল? কী চমৎকার মেয়ে, একটু বুঝে চলতে হয়। ডিপ্লোম্যাসি সংসারে বারে বারেই লাগে। লাগে না?

—নিশ্চয়। অদিতি একটু হেসে বলল।

—কিন্তু তোমাকে আমার অন্য কয়েকটা কথা বলার আছে।

—বলুন।

—একটা এখন বলছি, আরেকটা সময় হলে বলব।

—এখনকারটা তো বলুন।

—তুমি আঁদ্রের সঙ্গে চলে যাও।

চমকে একটু চুপ করে রইল সে। তারপর অনিচ্ছুকভাবে বলল—মা ওই যে বলছিলেন জীবন

বড় বিচিত্র, সৎমাও যেমন একরকম হয় না, অন্য সম্পর্কগুলোর মধ্যেও তেমন অনেক হেরফের থাকে।

—কেন? অসুবিধে কী? বোঝাও তোমার হেরফের, যদি নেহাত বোকাসোকা মা বলে মনে না করো।

অদিতি বলল—আপনি তো এখন একটু বেড়াবেন? উঠুন দেখি।

একটু বেড়ালেন, তারপর বললেন—জানি মা তোমরা আজকালকার মেয়েরা নাক-গলানো পছন্দ করো না। কিন্তু কী করি! মা তো! কতকগুলো জিনিস পরিষ্কার জলের মতো দেখতে পাই।

—যেমন?

—যেমন, ওই ছেলেটি ওই সাহেবটি তোমাকে সত্যিকারের ভালবাসে। ও বোধহয় বলতে পারছে না। আর...

—আর?

—তুমিও কিন্তু ওকে ভালবাসো। কেন বোঝো না জানি না।

—আপনি এবার শুয়ে পড়ুন। ওঁকে শুইয়ে অদিতি খাবার ঘরে গেল। টেবিলে তিনজনের প্লেট পড়ে গেছে। ছবি ভাতের ফ্যান গালছে। শীলাদি জিজ্ঞেস করছে—কোনগুলো এবেলার, কোনগুলো ওবেলার বলবি তো?

—তনিকা, অনোহিতা খাবে এসো। সে ডাকল।

শীলাদিতে ছবিতে ছোটখাটো একটা ঝগড়া লেগে গেছে।

—তুই কোনদিন থাকিস বল। আমিই তো সব গুছিয়ে দিই, জানিস? কোনটা দিতে হবে। কী গো বউমা তুমি কাচের এই বড় গোল বাটিটাতে মাংস রাখতে বলো না? আর এই ডিমের মতো ছাঁচের এটাতে স্যালাড।

—ঠিক, একদম ঠিক।

তনিকা বলল—ছবিদি রেঁধে যাবে, শীলাদি পরিবেশন করবে। এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান, আর এক কন্যে গোঁসা করে বাপের বাড়ি যান।

অনোহিতার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। কীসে, কোনটাতে ওর লাগল কে জানে!

আজ বেলুড় দক্ষিণেশ্বর যাবার পালা অদিতির। শীলাদি থাকবে মাধুরীর কাছে। বিকেল তিনটে নাগাদ বেরিয়ে পড়বে। আঁদ্রে আসবে। ক'দিনই যেখানে যাচ্ছে আঁদ্রে যাচ্ছে সঙ্গে। তাকে কলকাতা দেখানোও একটা কাজ। তনিকা, অনোহিতা রেডি হয়ে গেছে। আঁদ্রে এসে গেছে, অনোহিতা বলল, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।

—যেতে ইচ্ছে করছে না? আঁদ্রে বলল—তোমায় কাঁধে করে নিয়ে যাব।

—না, আঁদ্রেদা। আজ থাক।

—না আঁদ্রেদা আজই হয়ে যাক।

দক্ষিণেশ্বর ঘুরে এসে বেলুড়ে পৌঁছোল, তখন সাড়ে ছ'টা। আর কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যারতি শুরু হবে।

গঙ্গার ধারে বসল কিছুক্ষণ।

—এত বড় চওড়া নদী আমাদের নয়, বুঝলে তনিকা। সেন নদী এর আর্ধেকেরও কম। তার ওপর কিছুটা অন্তর অন্তরই ব্রিজ। আমরা বলি পোঁ, পোঁ দ্য ইয়েনার, পোঁ দ্য কঁকর্দ।

—আমার খুব ইচ্ছে করে যে জায়গাটা মোনে এঁকেছিলেন সেইটা আঁকব। তনিকা বলল।

—দুঃখের বিষয় সে জায়গা আর সে রকম নেই।

—ওল্ড প্যারিসে ও রকম জায়গা কিছু পেতেও পারো—অদিতি বলল।

—আমরা ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে তিরতিরে জল দেখতাম। সন্ধের ছায়া, নদীর গভীরে আলো জ্বলে উঠল, তবু নদী সেই আলো গিলেই শুয়ে থাকে অজগরের মতো। নাপোলিয়ঁ বলতেন এই নদীই পারীর প্রকৃত রাজপথ।

—প্যারিসের জন্য আমার মন কেমন করে—বলল তনিকা।

—তুমি কবে গিয়েছিলে?

—গত জন্মে।

—কী ছিলে?

—একজন ব্যর্থ পেন্টার আঁদ্রেদা, আমি তুলুজ লত্রেকের সঙ্গে কাজ করতাম। এত যাচ্ছেতাই করতেন আমাকে উনি। বড্ড খিস্তি করতেন। স্যরি দিদি!

—আচ্ছা। তা সত্ত্বেও এ জন্মে মনে রেখে দিয়েছ? কোনও ভালবাসার কথা আমুর-এর কথা মনে নেই?

—নাঃ। আর্টিস্টদের ভালবেসে কাজ নেই। এত উড়নচণ্ডী হয় না?

অনোহিতা উঠে পড়ল, আস্তে আস্তে দূরে চলে যাচ্ছে।

কখন কীসে ওর লেগে যাচ্ছে!

সন্ধ্যারতির সময়ে বিশাল হলে গমগমে সংগীতের মধ্যে বসে আছে চারজন। অদিতি, তনিকা দু'জনেই গাইছে। আঁদ্রেও চেষ্টা করছে সুরটা ধরবার। অনোহিতা খালি মূক। কিন্তু অন্যমনস্ক নয়, শুনছে। কিছুক্ষণ পরে তার চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

কীসে যে ওর কান্না পায়! অন্যরা শুধু অন্যদিকে চেয়ে থাকে। না-দেখার ভান করে। কেউ কারও দিকে চায় না। চোখের জল গালে শুকিয়ে যায়। একটা ময়লা মতো দাগ লেগে থাকে।

আঁদ্রে বলল—ওর একটা হাওয়া বদল দরকার, বুঝলে ওদিৎ!

—বুঝছি। কিন্তু নিজের দায়িত্বে সেটা করতে পারি না। ওর বাবাকে আসতে দাও।

আঁদ্রে হেসে বলল—এনি ওয়ে দায়িত্ব তো অনেকটাই নিচ্ছ! সেটারও ঝুঁকি আছে। তোমাদের এখানে ছেলেমেয়েদের ওপরে বড্ড গার্জেনগিরি করতে হয়!

—হ্যাঁ, তা হয়।

—কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলে।

—থেমে যাওয়াই তো ভাল। আটকে যাচ্ছে যখন!

—তবু!

—কী জানো আঁদ্রে এই যে গার্জেনগিরি এটা কিন্তু শুধু ইনটারফিয়ারেন্স নয়, এর ভেতর অভিজ্ঞ স্নেহ-ভালবাসার একটা মস্ত বড় ভূমিকা থেকে যায়। আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, ছন্নছাড়া হয়ে যাওয়া...এগুলো তোমাদের মধ্যে বেশি বেশি ঘটে। কেউ দেখে না। দেখবার কেউ নেই।

—তার মানে দেখো, অ্যাডভেঞ্চারের কোনও স্থান নেই তোমাদের জীবনে।

—আছে ঠিকই। বাড়ি থেকে একসময়ে খুব পালাত ছেলেমেয়েরা। তবে সেটা স্বভাবে থাকত বলে। সঠিক পথ দেখাবার লোকের অভাবে, যত্ন নেওয়া বা ভালবাসার অভাবে সব সময়ে নয়। তা ছাড়া তোমাদের মধ্যেও তো পারিবারিক মূল্যবোধ যথেষ্ট দৃঢ়। তোমরাই কি বাবা-মার গার্জেনি মেনে নাও না? যার বাবা-মা'র চালচুলো নেই সে হয়তো নেয় না। ধনী বাবা-মা'র সন্তান হলে তাকে তাঁদের নির্দেশ মেনে চলতেই হয়।

অনেকক্ষণ বিবর্ণ মুখে চুপ করে রইল আঁদ্রে। ওরা বসেছিল ময়দানে ঘাসের ওপর। অদূরে প্রেস ক্লাবের তাঁবু। এখনও সন্ধে হল না, জ্বলজ্বল করছে আকাশ। তনিকা আর অনোহিতা গেছে আইসক্রিম খেতে। ইচ্ছে করেই মাঝে মাঝে ওদের একা একা থাকতে দেয় সে। জনাকীর্ণ এই

গর্জমান রাজপথ দিয়ে দু'জনে হেঁটে যাক। দোকানে দোকানে পসরা। খদ্দের। রেস্তোরাঁগুলো উপছে পড়ছে। লোভনীয় খাদ্যের গন্ধ ভাসছে বাতাসে—'আমাদের জন্যে দুটো চিকেন রোল আনিস।' চতুর্দিকে বহতা জীবনধারা প্রবেশ করুক ওর মধ্যে। 'কোনও কথা কাটাকাটির মধ্যে যাবি না, কোনও পুরনো কথা তুলবি না, ও কী বলতে চায় শুনবি।'

আঁদ্রে বলল—এই একটা কারণে তুমি এখনও আমার ওপর রেগে আছ?

—আমি রাগিনি তো!

—ঠিক আছে। রাগোনি। দুঃখ, শক। এইজন্যে সারা জীবন আমায় কষ্ট দেবে?

—না তা-ও না।

—তবে?

—আমার মধ্যে কী যেন একটা মরে গেছে আঁদ্রে। তোমাকে সত্যি খুব ভালবাসি। খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু দু'জনে নতুন করে জীবন শুরু করতে আমি ঠিক উৎসাহ পাই না। যা হয়ে গেছে, তা তো হয়েই গেছে!

—না, হয়ে যায়নি। তুমি কি জানো এই এতগুলো বছর আমি শুধু তোমার অপেক্ষা করে আছি। রাজর্ষির সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে শুনে, তিনদিন আমি ঘর থেকে বেরোতে পারিনি। যখন আমাকে রিফিউজ করলে তখন থেকে মায়ের সঙ্গে দরকারের বেশি কথা বলিনি একটাও।

—এ রকম কেন করলে আঁদ্রে? মায়েরও তো মন আছে! ছেলে হয়ে মাকে কষ্ট—

—অত হিসেব করে কি মানুষ চলতে পারে? নিজের আবেগকে কি বোঝানো যায়? অনুভূতিকে বোঝানো যায়? তুমি পারো? পারছ? তুমি খুব ভাল করে জানো আসলে তুমি আমারই স্ত্রী। মাঝে রাজর্ষির দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে মাত্র। তবু তোমার যে এই কুঁকড়ে যাওয়া, পুরনো জায়গায় ফিরে যাওয়া নিয়ে দ্বিধা—এটা তোমার একটা ফিলিং। এটাকে বোঝাও। নিজে আগে পেরে দেখাও। তারপর আমাকে উপদেশ দিতে এসো।

আঁদ্রে উঠে পড়ল। উত্তেজিত। রেগেও গেছে বোধহয়।

দূর থেকে দুটো ফুটকিকে আসতে দেখা গেল। হাতে মোড়ক।

—এই নাও, আঁদ্রেদা খেয়ে দেখো, কেমন!

—দেখব মানে? আমার ইতিমধ্যে অনেকবার দেখা হয়ে গেছে। আমার নেশা লেগে গেছে। আর কিছু না হোক, এই রোলের ব্যবসা করলেই ইন্ডিয়ানরা লাল হয়ে যাবে। ফ্রান্স আমেরিকায়, কনটিনেন্টে ইন জেনারেল।

—তোরা কী খেলি, অনোহিতা।

—রোল খেয়েছি, তা ছাড়া আইসক্রিম পার্লারে গিয়েছিলাম। আমি একটা মিল্ক শেক খেয়েছি।

—আমার পরে, দুধ ভালবাসে এমন মেয়ে আমি খালি তোকেই দেখছি।

একটু ইতস্তত করে অনোহিতা বলল—মা-ও, আর... মাসি-ও বাসত।

—তোর সঙ্গে তা হলে খুব মিল বল। মায়ের চেহারাটা তো হুবহু পেয়েছিস।

অনোহিতা চুপ। কাঁদছে না, কিন্তু কান্না থমকে আছে, মেঘাচ্ছন্ন মুখ।

রাতে অনোহিতার বাবার ফোন এল। রোজ না হলেও ক'দিন অন্তর অন্তরই করছেন। কথা অদিতির সঙ্গেই হয়।

—মিস সরকার। আমি নবগোপাল সাহা রায় বলছি।

—বলুন।

—ও কেমন আছে?

—শোকটা সামলে উঠতে এখনও পারেনি। তবে শান্ত।

—আর সিন ক্রিয়েট করছে না?

—না।

—যাক, শেষ পর্যন্ত শ্মশানের শান্তি তা হলে এল আমার জীবনে। কি আমার সঙ্গে কথা বলবে?

—দেখছি। ...অনোহিতা বাবা ডাকছেন।

তনিকা বলল—ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

অদিতি ফোনের মধ্যে বলল—ওকে কাইন্ডলি একটা চিঠি দিন। সব যোগাযোগ ফোনে হয় না। একটু সাহস একটু স্নেহ দিন।

মিমি,

জীবনে এই প্রথম তোমাকে চিঠি লিখছি। চিরকাল এত সংক্ষেপে, এত মুখোমুখি কথা বলে আমরা অভ্যস্ত যে চিঠিতে কী লিখব, কেমন করে এটা একটা সমস্যা। তুমি যদি আমাকে একটা পালটা চিঠি দাও, তা হলে হয়তো ব্যাপারটা আমার কাছে সহজ হয়ে যাবে। আমি একলা একটা হোটেলের ঘরে আছি, একটা লবি আছে অবশ্য। আমি ভাবছিলাম—তুমি যদি চলে আসো, তা হলে কিছুদিন এখানে কাটিয়ে আমরা একটু কনটিনেন্ট ট্যুর করতে পারি। কী বলো?

বাবা।

অনোহিতা চিঠি লিখল না। তবে এবার ফোন এলে ধরল।

—মিমি! কতদিন পর তোমার গলা শুনলাম।

—বাবা, কেমন আছ?

—ভাল।

—তুমি?

—ভাল।

—আমার চিঠির কি হল?

—তোমার পড়ার সময় হবে না বাবা।

—আমি ঠিক সময় করে নেব।

—তোমার যদি বা সময় হয়, আমার ইচ্ছে হয় না।

—কী করে সময় কাটাও?

—জানি না। কথা বলি নিজের সঙ্গে। আর...আর ঘুমোই... খুব ক্লান্ত লাগে। অনেকটা ঘুমোতে ইচ্ছে করে।

—খুব বেশি ট্র্যাংকুলাইজার খাচ্ছ নাকি?

—একটুও খাচ্ছি না তো। কিন্তু তুমি! তুমি কি স্মোকিং আর ড্রিঙ্কিং বন্ধ করতে পেরেছ।

—চেষ্টা করছি। স্মোকিং তো বন্ধই হয়ে গেছে প্রায়। ড্রিংক্স নিয়ে একটু বসি এই পর্যন্ত।

—ড্রিংক্সে, অফিসকে সময় দিয়ে যখন তোমার হাতে আমার জন্যে সময় থাকবে তখন যাব।

—ঠিক আছে।

—মিস সরকার?

—বলুন?

—আমাকে একটা ছবি মানে ফটো কে মেল করল বলুন তো! আপনি?

—না তো! কী ফটো?

—আমার স্ত্রী আর সর্বাণী, মানে দুই স্ত্রীর একসঙ্গে একটা ফটো। পেছনে আমি। ওদের কোলের কাছে মিমি। তখন বাচ্চা।

—ও-ই পাঠিয়ে থাকবে!

—ওকে কি একটু জিজ্ঞেস করবেন?

—কী দরকার! বোঝাই যাচ্ছে ও-ই পাঠিয়েছে।

—তাতে কি বুঝব ও সর্বাণীকে শেষ পর্যন্ত, তার মর্মান্তিক মৃত্যুর পর, মেনে নিল? মানে এই দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারটা!

—আপনি বোঝেননি। ও অনেকদিনই মেনে নিয়েছে। ওর তো মাসির ওপর প্রধান রাগটা তিনি ওকে কন্ট্রোল করতেন বলে, আর...আর..আপনি ওর কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছিলেন বলে।

—আমি!

—হ্যাঁ আপনাদেরও মেয়ের বড় হয় ওঠার সময়ে একটা দায় থেকে যায়! আচ্ছা রাখি।

আঁদ্রেদার সঙ্গে দুই বন্ধুকে ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়াম দেখতে পাঠিয়েছে অদিতি। 'চিত্রভানু' পুরুলিয়া থেকে এসে গেছে। কিন্তু সে একটু ঢিলে দিচ্ছে। ব্রাউন মলাটের ডায়েরিটা সে খুলে ধরে—

—আমি তনিকে ভালবাসি। কিন্তু হিংসেও করি। বেশি বেশি ভালমানুষি দেখিয়ে মায়েদের কনফিডেন্স আদায় করে নিতে ওস্তাদ। মায়েরা ভাবে তনিকার মতো ভাল মেয়ে হয় না! কত গুণ! কত বিবেচনা! বাধ্যতা! আসল রূপটা একদিন হাট করে খুলে দেখিয়ে দেব! বুঝবে মজা! ওদের আর্ট কলেজের কতগুলো ছেলের সঙ্গে যে ওর লটঘট। ভাব দেখায় যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। নির্দোষ, নিষ্পাপ বন্ধু সব। এনি ওয়ে, ওই ছেলেগুলোকে নিয়ে আমার কোনও হিংসে নেই। কেমন ন্যাকা ন্যাকা। আমার কাছে ঘেঁষতে এলে দেখিয়ে দিতাম। তবে শ্রীমতী তনিকা সব জায়গা থেকেই যে অমন সার্টিফিকেট জোগাড় করে কী করে জানি না। আমার আগের বয়ফ্রেন্ড সন্দীপন বলছিল—ও নাকি ভীষণ অ্যাট্রাক্টিভ। ড্রিমি। অল্প কথা বলে। ও নাকি কবিতার মতো। অর্ধেকটা বোঝা যায়, অর্ধেকটা যায় না। ভাল বাবা, তোরা কবিতা থাক আমাদের ভাগ্যে শূন্য খাতা।

খুব অদ্ভুত একটা কথা বলেছিল সন্দীপন। অনেকদিন আগে। বলল কী তোর মা আর মাসি লেসবিয়ান। আমি ওকে একটা চড় মারি। গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—আজকাল আমরা রকমসকম দেখে বুঝতে পারি। তোর বাবা-মা'র রিলেশন ঠিক হল না কেন?—ওই জন্যে। তোর মাসি কেন মাকে আগলে পড়ে থাকে? ওই জন্যে। খেয়াল রাখিস একদিন বুঝতে পারবি। আমি অবশ্য খেয়াল রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। একদিন বাড়ি ফিরেছি ন'টা। পঞ্চমী বলল—মায়ের শরীর ভাল না। অজ্ঞানমতো হয়ে গিয়েছিল নাকি। আমি যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল পা টিপে টিপে যাই। দেখি তো!

মাসি বলছে—আর কথা বলিস না—এবার ঘুমো শ্রী। আমি আলোটা নিভিয়ে দিই।

মা বলল—আমি তো সব কথা বলতে পারি না সর্বাণী। সাধ্য নেই। তুই একটু বসে থাক। এই আলোয়। তোর মুখে, তোর চোখে যে কী ভরসা!

তারপর মা মাসি দু'জনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। মাসিরটা দেখতে পাচ্ছিলাম না, মায়ের চোখে অত আকুল দৃষ্টি আমি কখনও দেখিনি।

আমার ভীষণ ভয় করল। চট করে ঢুকে পড়লাম।—মা তোমার কী হয়েছিল?

—খুব মাথা ঘুরে গিয়েছিল মিমি।

মাসি বলল—ডাক্তার বলছে প্রেশার বড্ড লো। বলে মাসি মায়ের মাথায় হাত বুলোতে লাগল। মা তখন প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে, মাসি মায়ের কপালে একটা চুমো খেল।

—ঘুমো, শ্রী, ঘুমো।

বলতে বলতে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

চুমু খাওয়াটা লেসবিয়ান? কপালে তো। লুকিয়েচুকিয়েও নয়। তবে তনি আর আমি দু'জনে স্কুল ডেজ থেকে ভীষণ বন্ধু। কিন্তু কেউ কখনও অন্যজনকে চুমু খাইনি।

একটা কবিতা পড়লাম। 'ফনের দিবাস্বপ্ন'। মনটা কেমন অন্য রকম হয়ে গেল। আমি কবিতা, গান, ছবি...এসব নিয়ে ন্যাকামি করতে পারি না। ভাল লাগলে লাগবে। এনজয় করব, না হলে করব না। স্রেফ চলে আসব, বইয়ের পাতা উল্টে যাব। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কে কী আঁকিবুঁকি কেটেছে দেখাও আমার ধৈর্যে নেই। কাকু যে ছবিগুলো আঁকে আমার জঘন্য লাগে। আমি কাকুকে বলি এগুলো তোমার অবদমিত কাম। আর কিচ্ছু না। একটা অপূর্ব সুন্দর হিউম্যান ফিগার আঁকো তো! চারপাশে গাছপালা, তার মাঝখানে আর একটা প্রাকৃতিক বস্তুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষ-মূর্তি। কিংবা অনেক উঁচুতে আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে।

কাকু বলল—ও তো কিছুই না। একটা অ্যাপলো কিংবা ডেভিড তো এঁকে দেওয়াই যায়। আমি অবিশ্বাসে হাসি—চেষ্টা করো, পারবে না। তুমি ওই ডিস্টর্শনই আঁকতে পারো।

কাকু বলল—তুই ছবির কিছুই বুঝিস না মিমি। ডিস্টর্শনটা বাইরের পৃথিবীতে, আমি শুধু সেটা দেখতে পেয়েছি। ইটস মাই রেসপনস টু রিয়্যালিটি। পিকাসো মাত্র পনেরো বছরে বয়সে নিজের মায়ের একটা প্যাস্টেল এঁকেছিলেন, ন্যাচারালিস্টিক। দাঁড়া তোকে দেখাই। অ্যালবামটা ঘেঁটে ছবিটা দেখাল কাকু। কী সুন্দর। সফট ফোকাসে ছবি তুললে যেমন একটা নরম এফেক্ট হয়, মায়ের ড্রেস, তাঁর বাঁধা চুল, কানের টপ...। এগুলো সবই আছে কিন্তু কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া।

—এ রকম তুমি আঁকতে পারবে?—ফুঃ!

আমি এরকম তাচ্ছিল্য করলে লোকটা খেপে যায়। তখন আমার ভারী মজা লাগে। এই লোকটা ছোট্ট থেকে আমার সঙ্গে এমন করেছে, যে আমি...ঠিক বুঝি না, আমার ওর প্রতি, ওর বাড়িটার ওপর কেমন একটা প্রচণ্ড লোভ জন্মে গেছে। ওর আঙুল দেখলে আমার গা শিরশির করে। ওর চুল দেখলে আমার ভেতরটা লাফিয়ে ওঠে। চশমার ভেতর দিয়ে যখন তাকায়, আমার তখন ইচ্ছে করে, একটা দুরন্ত ইচ্ছে করে। কিন্তু ও থেমে যায়। কিছু দূর এগিয়ে থেমে যায়। আমার ভেতরটা রাগে কাঁপতে থাকে, মনে হয় ওকে মেরে দুমড়ে মুচড়ে দিই। আর তাই সন্দীপন কী আরমান কী সুরেশ ভাটিয়া যার সঙ্গেই প্রেম করতে যাই, যে-ই দেখি বুকের মাঝখানে চুল নেই, কিংবা ঘন চুল, কিংবা দুটো তিনটে পাকা চুল, যেই দেখি মুখগুলো মসৃণ, কোথাও কোনও ভাঁজ নেই, আমার ইচ্ছে উবে যায়। ...আর লোকটাকে ওই জন্যে আমি ঘেন্নাও করি। এটাই আমার রেসপন্স টু রিয়্যালিটি, রিয়্যালিটি, লাভ অ্যান্ড ফিজিক্যাল প্যাশন। এই ঘেন্না আর টানের দড়ি টানাটানিটা বেশ উপভোগ করি আমি। ভাল এককাপ কফির মতো। কী চিজের মতো!

কুড়ি

মেয়েটাকে বোঝবার একমাত্র চাবিকাঠি তা হলে কি এই ডায়েরিটা? সাইকিয়াট্রিস্ট বলেছেন এটা একটা পার্সন্যালিটি ডিজঅর্ডার। ওকে কতকগুলো সিটিং দিতে হবে অ্যানালিস্টের কাছে, যদিও এখন রেজিস্টার্ড অ্যানালিস্টের খুবই আকাল। ওর ভেতর থেকে লুকোনো কথাবার্তা অনুভূতি বাসনা কামনা সব নাকি বেরিয়ে আসবে, তাতেই সবচেয়ে উপকার। কিন্তু এই ডায়েরিতে তো ও সব প্রকাশ করে ফেলেইছে। খুবই ইনটারেস্টিং ডায়েরি। আঠারো বছর বয়স থেকে বোধহয় লিখছে। অনিয়মিত। যখন কোনও কিছু বলবার ইচ্ছে হচ্ছে, ডায়েরির সঙ্গে কথা বলছে। সে অনোহিতার ডায়েরিটা ড্রয়ারে কাগজপত্রের তলায় রেখে চাবি দিয়ে দিল। তারপর আর একটা ড্রয়ার খুলল। ছাত্রছাত্রীরা, ডাক্তার, ক্রেতারা নানা রকম টুকটাক জিনিস উপহার দিয়ে থাকেন। টেবিল ক্যালেন্ডার আর ডায়েরির তো পাহাড়। বেশিরভাগই সে বিলিয়ে দেয়। কিছু থাকে। একটা ভাল দেখে ডায়েরি সে বার করল। গাঢ় নেভি ব্লু মলাট। স্পঞ্জ দেওয়া। বেশ হ্যান্ডি। ঝোলার মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়াই যায়। ভেতরে লিখল—অনোহিতাকে—অদিতিদি, জন্মদিনে। খাটের পাশের সাইড টেবিলে রেখে দিল, পাশে নিজের একটা খুব ভাল পেন। এটা দিয়েছে আঁদ্রে। রেখেই মনে হল আঁদ্রের দেওয়া কলম সে উপহার দিয়ে দিল? তবে কি আঁদ্রের সম্পর্কে তার কোনও অধিকারবোধ নেই? অধিকারবোধ ছাড়া পৃথিবীর ভালবাসা দাঁড়ায়?

কেন যে এ রকম হয়! এ রকম হচ্ছে কেন? যে বিশ্বাসের জায়গাটা আঁদ্রে হারিয়েছে, সেটা কিছুতেই ফিরে পাচ্ছে না কেন? তার ভেতরটা এত কেন ঠান্ডা? গতকাল খুব মুখ চুন করে সে চলে গেল। অদিতির বুক ফেটে যাচ্ছিল। আঁদ্রেকে সে এত বন্ধুত্বে পেল এ ক'মাস আর এর আগে পেয়েছে এত করুণায় যে আঁদ্রে ওদিত বলে এসে দাঁড়াবে না, তার দায়িত্ব এই মেয়ে দুটিকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা, আলোচনা এসব করবে না, বেড়াতে যাবে না, 'চিত্রভানু'তে তার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ওয়র্কশপ করবে না, প্যারিসের দীর্ঘদিনের সাঁল ঐতিহ্য, মঁমার্ত ঐতিহ্য, তার সঙ্গে জড়িত চিরায়ত সব শিল্পীদের বিশেষত্ব, তাঁদের জীবন নিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ সে সব সেশন। মাতিস দেখাতে এসে সে একমাসের জায়গায় আড়াই মাস কাটিয়ে গেল! এই ক'মাসে তার কত অজানা দিক অদিতি জেনেছে। যেমন সে অনেক অনেক পরিণত। অনেক শিখেছে। জীবিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সেখানে সে প্রায় জ্ঞানতপস্বী, বিশেষজ্ঞ, ভালবাসা ও সংরাগে সে ছবির জগৎকে দেখে। এবং জিফ্-সুর-ইভেৎ-এ তার শাতো, তার আপেলবাগান, কমলাবাগান, তার বোর্দোর বিষয়সম্পত্তি, সবই এখন শিল্পের সেবায় নিযুক্ত।

ওই বাগানে সেবার অতিরিক্ত ফলন হয়েছিল। তার মনে পড়ে। অদিতি, মনীষা গিয়েছিল। ছিলেন আঁদ্রের মা, বাবা আরও তার অনেক কাজিন। তখন তো আঁদ্রে শুধুই এক সদ্য-যুবক, প্যাংলা চেহারা, দাড়ি অল্পস্বল্প, ছাঁটে না, নীল চোখ দুটো একেবারে নিষ্পাপ। অদিতি মনীষা আরও ছোট। মনীষা ধারালো সুন্দরী। পাতলা শাণিত নাক, শাণিত চোক, পাতলা ঠোঁট, ও যেন কতকটা ইরানিদের মতো দেখতে ছিল। আর অদিতি? নিজেকে তো নিজে দেখা যায় না, সে ছিল শ্যামলা, ছিপছিপে, নেহাত কিশোরী-কিশোরী চেহারার। মাথায় তখন লম্বা চুল, একটা কিংবা দুটো বিনুনি করত। খুব সাজুনি ছিল বলেই আয়নায় নিজের ছায়াটা তার মোটামুটি মনে আছে। ফটোর সাহায্য লাগছে না। সে একটা ছোট্ট টিপ পরত। বিন্দুর মতো। সেটা তার ফরাসি বন্ধুদের খুব পছন্দ ছিল। নিজের মুখে আলাদা করে তেমন কোনও সৌন্দর্য সে দেখতে পেত না। লিপস্টিক লাগাবার সময়ে বুঝত ঠোঁট দুটো খুব করুণ, কেন কে জানে, এমন মনে হত। চোখে কাজল দেবার সময়ে দেখত সমঝদারি জ্বলজ্বল করছে তাতে, তীক্ষ্ণতা ও অভিনিবেশ। ওরা বলত সে নাকি খুব ব্রাইট লুকিং, উজ্জ্বল, দীপ্ত কিন্তু সেই সঙ্গে মধুর। আঁদ্রেদের আপেলবাগানে সেবার সবাই মিলে আপেলগুলোর সদগতি

করতে লেগে গিয়েছিল। কেননা ফ্রস্টে সব নষ্ট হয়ে যাবে। জ্যাম হচ্ছে, মোরব্বা হচ্ছে, সে এক কাণ্ড। সে খুব সাড়া জাগিয়েছিল, কেন তাও জানে না। আঁদ্রের এক মাসতুতো বোন বলেছিল—তোমার কী সুন্দর গায়ের রং, কী মখমল কোমল। আঁদ্রের মা-বাবাও খুব সুন্দর ব্যবহার করেছিলেন। বোঝা যাচ্ছিল খুব পছন্দ করছেন। সেই তাঁরাই...। যে সর্বাণীকে সে অত ভালবাসত—তাঁকেই মা হিসেবে একদম নিতে পারল না অনোহিতা। অধিকারবোধ যেমন ভালবাসার একটা বৈশিষ্ট্য, তেমন কি ঘৃণারও? অপছন্দেরও? সর্বাণী কি চলে গেলেন অনোহিতার সমস্ত বিকার, অসুস্থতা সঙ্গে নিয়ে? আঁদ্রের মা কি চলে গেলেন অদিতির পথ পরিষ্কার করে? আঁদ্রের মায়ের জন্যে বড্ড খারাপ লাগছে। মা-বাবাদের সঙ্গে সন্তানদের ব্যক্তিগত সুখের এত বিরোধ কেন? তার মা-বাবাও বড্ড কষ্ট পেয়েছিলেন। একমাত্র মেয়ে, বড় আদরের। সে বিদেশে বিদেশি বিয়ে করল মানেই সে নিজেও বিদেশি হয়ে যাবে, তার সন্তানরা হবে বিদেশি। বয়স হলেই মানুষ পরিচিতের গণ্ডির বাইরে দিশাহারা হয়ে যায়। সে বেশ দৃঢ়ভাবেই জানিয়ে দিয়েছিল সে আঁদ্রেকেই বিয়ে করবে। কত কষ্ট না জানি মা-বাবা পেয়েছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে সয়ে যায়। আঁদ্রেকে নিয়ে সে যখন এক বছরের মাথায় এল, তার ব্যবহারে এবং অদিতির প্রতি তার ভালবাসায় বাবা-মা খুবই গলে গিয়েছিলেন। আঁদ্রে আবার মাকে সান্ত্বনা দেয়—আপনি মনে করেছেন এখানেই থাকবেন? তা হবে না—আপনাদের আমরা নিয়ে যাব, এখানেও থাকবেন, ওখানেও থাকবেন। আঁদ্রের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা সে মা-বাবাকে জানায়ইনি। তারপর রাজর্ষির সঙ্গে বিয়ের সময়ে অগত্যা জানাতেই হয়। কী যে মলিন হয়ে গিয়েছিল মা-বাবার মুখ। আর রাজর্ষির সঙ্গে ছাড়াছাড়ির সময়ে বাবা বেঁচে ছিলেন না। মা দারুণ ধাক্কা খেয়েছিলেন। মেয়ের জন্যে ভাবনা—কাতর হয়েই মারা গেলেন। বিশ্বাস করে গেলেন না মেয়ে একা জীবনের হাল ধরতে তৈরি। পারবে। কেন অমন গোঁ ধরলেন মঁসিয়ে ও মাদাম বোর্দো! ছেলের আনুগত্য পেলেন, ভালবাসা হারালেন।

সে তার ছবিঘরে কোলের ওপর বোর্ড বসিয়ে—ছোট ছোট পেনসিল স্কেচ করে। ল্যান্ডস্কেপ, ফিগার, গ্রাম-জীবনের নানা দৃশ্য। একটা তিনখণ্ডের বইয়ের জন্য ছবি আঁকার অনুরোধ এসেছে। গবেষণামূলক বই। সেই শ্বশুরমশাইয়ের 'বিষ্ণুপুর বৃত্তান্ত'র পর এই দ্বিতীয়বার বইয়ের ইলাস্ট্রেশন। মন অন্যত্র। কিন্তু হাত এখন মনের কাজটা অনেকটাই ধরে নিয়েছে। খসখস করে পেনসিল চলছে আপন খেয়ালে।

বেল বাজছে। ওরা এল বোধহয়।

গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শৌনকের গলা না?

—দিদি, ব্যস্ত আছ?

—না, না আয়!

শৌনকের ছবি বেশ বিক্রি হচ্ছে। কতকগুলো বরাত পাচ্ছে ভাল। একটা নিয়মিত রোজগারে এসে দাঁড়িয়েছে এখন। ওর মুখ-চোখের চেহারা এখন অনেক উজ্জ্বল। বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখতে লাগে। ওর সেই ক্রুশবিদ্ধ মহামানবদের ভাস্কর্যপ্রতিম ছবি বেশ সাড়া জাগিয়েছে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শিল্প সমালোচকরা খুব খুশি নয়। কিন্তু দর্শকদের নজর কেড়েছে। আজকাল বলা হচ্ছে—শৌনক ভিভিয়ান বিশ্বাসের ছবি নাকি 'পেন্টিং উইথ আ স্টেটমেন্ট।' নানান শহরের টাউন হলে, প্রেক্ষাগৃহে, বিমানবন্দরে ওর এই স্টেটমেন্টমূলক ছবির চাহিদা বেশ। সবচেয়ে অদ্ভুত কথা—ও মঞ্চসজ্জার জন্য খুব ডাক পাচ্ছে এবং এই কাজটা ওর খুব ভাল লাগছে।

—তোদের সেই 'রৈভ'র ব্যানার রেডি হল?

—তা তো হচ্ছে, প্রায়। কিন্তু দিদি আজ একটা পরামর্শ করতে এসেছি।

—কী বল!—কালো! কফি দিয়ে যা...শৌনকদার জন্যে। —সে আঁকাজোকা সরিয়ে রাখল।

—আঁদ্রেদা ফ্যাক্সে একটা ফর্ম পাঠিয়েছে। বলেই গিয়েছিল। ওদের ওখানে কোথায় একটা বিরাট

ম্যুরাল হবে। বোধহয় কোনও থিয়েটার হলে। সেইটাতে কাজ করার জন্যে।

—তো ভাল তো। ফিলআ্যাপ করে পাঠিয়ে দে।

—কিন্তু এদিকে একটা ভাল ফরমাশ পেয়েছি যে!

—কী?

—এই গঙ্গার ধার বিউটিফাই করবে পুরসভা। কিছু ভাস্কর্যের কথা ওরা ভাবছে। ওগুলো স্পনসর করবে কতকগুলো কর্পোরেট হাউজ। আমাকে প্রথমে একটা করতে বলছে। সেটা যদি পছন্দ হয়, তা হলে আরও কয়েকটা পেতে পারি।

—ক্ল্যাশ করছে?

—বুঝতে পারছি না। আঁদ্রেদার কাজটার কনট্র্যাক্ট ছ'মাসের। এদিকে এটাও মাস দু'য়েকের মধ্যে দিতেই হবে। তুমি তো জানো, স্কালপচার করতে পেলে আমি কী রকম আনন্দ পাই।

—তুই এক কাজ কর না, একটা ছোট কাজ কর। ধর তিনফুট মতো। এমনিতেও তো ওটা স্ট্যান্ড। খুব বড় কিছু ভাল লাগবে না। তুই লম্বাটা বড় কর। অন্যগুলোর জন্যে দু একটা মাকেট করে দিয়ে যা। গিয়াসরা বড় করবে।

—তা সত্ত্বেও প্যারিসের কাজটাতে আমি এখনই যোগ দিতে পারছি না। অথচ, বুঝতেই পারছ ওটা নিতেও আমার ভীষণ ইচ্ছে। প্যারিস যাবার সুযোগ। আঁদ্রেদা না হলে কি পেতাম?

—তুই আঁদ্রেকে একটা ই-মেল করে দে। ও নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।

—আমি একটা ব্যবস্থার কথা ভেবেছি।

—বল।

—তুমি কি জানো, তনিকার কাজ দেখে উনি খুব ইমপ্রেস্‌ড্? উনি তনিকাকে একটা স্কলারশিপ জোগাড় করে দেবেন বলেছেন। দেবেন যখন বলেছেন, তখন দেবেনই। কিন্তু একটু তো সময় লাগবে। ইতিমধ্যে যদি এই কাজটাতে ও-ও যোগ দেয়, আমি পরে গিয়ে জয়েন করি... অত বড় ম্যুরাল, আর্টিস্ট লাগবেও তো অনেক।

—তুই বলে দ্যাখ!

—উনি কিছু মনে করবেন না তো!

—কী মনে করবেন?

—এই তনিকাকে পুশ করছি।

—সে তো করছিসই। অদিতি মিটিমিটি হেসে বলল—ছ'মাস প্যারিসে থাকবি, নির্বান্ধব দেশ, একজন কেউ, জাস্ট একজন সঙ্গে গেলে...। পুশ করাকে পুশ করা মনে করলে আপত্তি করলে চলবে? তবে কী জানিস, তোদের মতো সমসাময়িক শিল্পীরা কখনও একজন আরেকজনকে পুশ করে না। গুরুই শিষ্যকে সাহায্য করে না। যদি খুব ট্যালেন্টেড হয়! তুই করছিস, ব্যক্তিগত কারণেই হয়তো, তবু এটা সুন্দর।

শৌনক ভিভিয়ানের মুখ লাল হয়ে গেছে।

—শৌনক, দু'জনে এক প্রফেশনে থাকলে খুব প্রবলেম হয় রে! একটু সতর্ক হোস।

—এক প্রফেশনে না থাকলেই কি হয় না, দিদি?

ও কি অদিতিরই কথা বলছে! অদিতির জীবনের কার্যগুলো ওরা জানে। কারণগুলো জানে না।

—তা অবশ্য হয়, আমি শুধু তোকে চেতাবনিটুকু দিয়ে রাখলুম। আজ আমাদের সঙ্গে খেয়ে যা। ওরা এক্ষুনি এসে যাবে।

—বেশ। ততক্ষণ তোমার স্কেচগুলো দেখি। ...কীসের ইলাস্ট্রেশন দিদি!

—'পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম : জীবন ও শিল্প'। গত একশো বছরের। এগুলো জেনারল্ স্কেচ। কিছু কিছু ল্যান্ডমার্কস ওরা ফটো পাঠিয়ে দেবে। সামান্য কিছু ফিল্ড ওয়ার্ক আমাকে করতে হবে, বুঝলি?

—এতে ওদের যা খরচ হবে, পোষাবে? না তোমাকে দিয়ে মাগনা খাটিয়ে নেবে? 'দিদি, দিদি, আপনারা যদি এত কমার্শিয়াল হন, আমরা কোথায় যাই...' বলে কেঁদে পড়ল হৃষ্টপুষ্ট একটা দামড়া, অমনি তুমি গলে গেলে, সেবার সেই একটা ফিলমে যেমন করেছিল!

—অত সোজা নয়। অদিতি সরকার কোনওদিনই ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না, বুঝলি? তবে হ্যাঁ মাঝে মাঝে গুড কাজের জন্যে একটু বিবেচনা করতে হয়। দাঁড়া আমি মাকে একটু দেখে আসি।

শৌনক বসে দাঁড়িয়ে ছবিগুলো দেখতে থাকে। রোল খুলে খুলে। তার মনটা এখন একটা অদ্ভুত মন খারাপে আক্রান্ত। সে চলে যাবে, তনিকা তো মিল হি গয়া। মিল গয়া। তনিকা উচ্ছৃঙ্খল নয়, কিন্তু ভীষণ স্বাধীন মনের মানুষ। তার ওপরে খুব কুয়াশাচ্ছন্ন, এখনও তনিকার তল সে খুঁজে পায়নি। এখন তাকে খুব পছন্দ করছে তনিকা। কিন্তু একদিন কী যেন একটা বলেছিল সে...অত রাত অবধি আড্ডা দিস না।

—কত রাত?

—এই ধর দশটা!

—দশটায় না পৌঁছোলে মিসেস উইলিয়াম্‌স্‌ আমায় ঢুকতে দেবেন না, তা জানিস? কাজেই দশটা অবধি আড্ডা দেওয়ার আমার উপায়ই নেই। না হলে একদিন উধাও হয়ে যেতাম।

—উধাও! সর্বনাশ! কোথায়!

—যেখানে ইচ্ছে! ধর হরিপাল, হুগলি জেলায়। লোকেদের ঘরের পাশে ধানখেত। অমন আমি কোথাও দেখিনি। ধানখেতের ধারে সারাদিন ছবি আঁকব, বকেরা বসে আছে ঠ্যাং তুলে। লম্বা পুকুরে কচুরিপানা, চিকচিক করে ব্যাঙাচি যাচ্ছে এদিক ওদিক। শালুক খুব দেখবি কলকাতা ছাড়ালেই। আর নিম, শিরীষ, এমনকী অশ্বথ, চিনতে পারবি না। কী বিরাট মহীরুহ এক একটা তেঁতুল। ইউক্যালিপটাসের মতো সাদা গুঁড়ি অশ্বত্থের। ইউক্যালিপ্টাসকে ওরা বলে সাহেব গাছ। ঘুরব, বসব, আঁকব, গাইব, কবিতা পড়ব। বাঁশের খুঁটির ওপর একচালা দোকান, সেখানে থেকে কড়া দুধ দেওয়া চা আর গাবদা মতো পাউরুটি খাব।

—থাকবি কোথায়?

—তা তো ভেবে দেখিনি!

—এর আগেও এমন ঘুরেছিস নাকি!

—শিয়োর!

—একা একা!

—না, ছিল একজন কুশল বলে, তারপর সুবীরটা, মহা বেরসিক তবু ওর সঙ্গে গেছি। কাউকে না পেলে একা একা যাব।

—যাসনি ও রকম, তনিকা!

—দ্যাখ, কর্তাত্বি ফলাবি না আমার ওপর। আমি আমি তুই তুই। এই তফাতটা মেনে বন্ধু হতে চাস ঠিক আছে।

শৌনক ভিভিয়ান আরও অনেক গৃহস্থ স্বভাবের ছেলে। কাজ ভালবাসে, নিপুণ অভিনিবেশে করে, ভাবে, প্রচুর পড়ে, কিন্তু শৈশবে বাবা মারা যাওয়ায় মায়ের প্রতি তার একটা দায়িত্ব বর্তেছে। মা একটা ছোট বাচ্চাদের স্কুলে কাজ করেন বটে, কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত শৌনকের দায়। মাকে গভীর ভালবাসে সে। দু'জনে দু'জনকে আঁকড়ে দিন কাটিয়েছে। জ্যাঠামশাই আছেন ভিন্ন বাড়িতে, একটু-আধটু দেখাশোনা সাহায্যও যে করেন না তা নয়। কিন্তু মায়ের শেষ ভরসা শৌনকই। সে তনিকার সঙ্গে তাল রাখতে পারবে তো? প্যারিসে যদি তারা দু'জনেই যেতে পারে তা হলে ওর সঙ্গে আরেকটু ঘনিষ্ঠতা হবে। আর একটু বুঝতে পারবে পরস্পরকে। আর একটা কথা। দিদি। অদিতিদি। সে জানে না এটা কী!! দিদির সম্পর্কে এমন একটা ফিলিং তার! একটা অন্য সম্পর্ক।

দিদিও তার একটা দায়। দিদি হয়তো চান না। কিন্তু যে মুহূর্তে আর সবাইকে ছেড়ে তাকেই ডাকেন, তারই ওপর নির্ভর করেন, তার ভেতরটা কেমন একটা আনন্দে ফুলে ওঠে। দিদি যেন এক মানুষ-দেবী, মাতা মেরি বড় সুদূরের, তিনি শুধু শিশুকে স্তন্য দিতে পারেন, ক্রুশ থেকে বাঁচাতে পারেন না। কিন্তু এই দিদি...এই দিদি কী? কে? মা না দেবী? না দেবী-প্রেয়সী। সরস্বতীকে দুর্গাকে যে মন নিয়ে পুজো করে হিন্দুরা, সেই মন নিয়ে সে যেন দিবারাত্র দিদির ভক্ত হয়ে আছে। দিদির কাছ থেকে চিরবিচ্ছেদ সে কি সইতে পারবে? তনিকাও দিদি সম্পর্কে খুব মুগ্ধ। ও অল্প কথার মানুষ। উচ্ছ্বাসের মধ্যে নেই। কিন্তু দিদির কাছে ওর সমর্পণ দেখে মনে হয় ও-ও দিদির মধ্যে কিছু একটা দেখে, কিছু একটা পায় যার কোনও ব্যাখ্যা নেই, যাকে অস্বীকার করা তো যায়ই না। মোট কথা, দিদি হাতের কাছে না থাকলে তার বুকের মধ্যে কেমন একটা খামচে ধরবে। দিদিকে বাদ দিয়ে যে তনিকা নিরুদ্বেগ স্বভাবের, তাকে আয়ত্ত করতেও তাকে প্রচণ্ড বেগ পেতে হবে।

কোনও খবর দ্যাননি আগে। নবগোপাল সাহা রায় অদিতির বাড়িতে এসে নিশ্চুপ বসে আছেন। তনিকা নিজের ডেরায় চলে গেছে। তবুও অনোহিতাকে সময় দেয়। আজ ম্যাটিনিতে সিনেমা গেছে।

—চা খাবেন?

—হ্যাঁ...তা...দিন। ...আপনাকে আমি আগে মানে হাসপাতাল, শ্মশানেরও আগে কোথায় যেন দেখেছি!

—বলতে পারব না, আমার মনে পড়ছে না আপনাকে।

—এতদিন আমার মেয়েকে রাখতে হয়েছে বলে কি আপনি খুবই...।

—আমি খুবই...কিন্তু আপনার মেয়েকে রাখতে হয়েছে বলে নয়, আপনি ওকে ফেলে চলে গেছেন বলে।...ডোন্ট মাইন্ড...কী করে পারলেন?

—শোক...মিস সরকার...আমি অত শোক...চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক। মাঝারি লম্বা। একটু অ্যালকোহলিক ফ্যাট তো হয়েইছে। আবার অ্যালকোহল তার সঙ্গে রঙের, চেহারার একটা জেল্লাও দিয়েছে। মাথায় প্রচুর কাঁচাপাকা চুল। প্যান্ট আর একটা টি শার্ট পরে এসেছেন।

নিজেকে সামলাচ্ছেন। —আপনি এতদিন ধরে ওকে...নিশ্চয়ই সব জানেন। সর্বাণী...সর্বাণী আমার কী ছিল আর কী ছিল না...আমি কাউকে বোঝাতে পারব না। —মানুষটা আমি খুব সহজ সরল নই...ও আমাকে বুঝত। কী যে হতাশা...আর ওই মেয়ে কী ট্রাবল যে দিয়েছে। সর্বাণীই ওকে সামলাত। যখন...মা ছিল না তখন থেকেই...! কী যে হল! খুব শক্ত ধাতের মানুষ ছিল সর্বাণী, পজিটিভ। অপটিমিস্টিক! কী এমন ঝগড়া হল, কী বলল মিমি... আমি কিছুতেই ওকে মাফ করতে পারছি না।

—একটু পরেই ও আসবে। দেখুন মাফ করতে পারেন কিনা। ওর ভেতরে একটা শূন্যতা আছে। বাবা হয়ে একটু খেয়াল করলেন না? কিছুই নয়! সামান্য ব্যবহারের হেরফের একটু স্বাভাবিক ফ্যামিলি-লাইফ। পৃথিবীতে ওকে একা ছেড়ে দিলেন!

—সর্বাণী তো ছিল, ওর মা ছিল!

—সবাইকেই থাকতে হয় মিঃ সাহা রায়। সব্বাইকে। মন তো সকলের সমান হয় না। সবাই এই ভ্যাকুয়াম সইতে পারে না। ভ্যাকুয়াম অন্য কিছু দিয়ে ভরাতে চেষ্টা করে, সে চেষ্টাটা সব সময়ে সমাজের অনুমোদিত হয় না, শুভও হয় না!

—আপনি কি মনোরোগের ডাক্তারও?

—না, আমি সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলেছি। পুরো হিস্ট্রি দিয়েছি। একবার ভদ্রলোককে

বাড়িতে ডেকেও ছিলুম। বুঝতে না দিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলেছেন।

—ও কি তা হলে পাগল বা আধা-পাগল?

—ও আধা-সিকি কোনও রকমের পাগলই নয়। তবে আপনাকে মানে বাবাকে সারা জীবন খুব মিস করেছে।

চায়ের সঙ্গে শীলাদি কয়েক রকমের বাড়িতে তৈরি বিস্কুট দিয়েছে।

অনোহিতা এসে ঢুকল। একটা গোলাপি বাটিকের সুতি সালোয়ার-কামিজ পরেছে। কাঁধ থেকে একটা ফোমের ব্যাগ ঝুলছে। সে ঢুকল, বাবার দিকে তাকাল, কিন্তু তার চোখে কোনও চমক ছিল না। নবগোপাল খুব সহজ হবার চেষ্টা করে বললেন—কাল এসেছি মিমি বুঝলি? লোক ডাকিয়ে বাড়ি পরিষ্কার করাই। ওঃ যা ধুলো হয়েছিল! হ্যাঁ আজ বিশ্বেশ্বর একজন কুক, আরও দু'জন কাজের লোক জোগাড় করেছে, ভাল বলেই তো মনে হচ্ছে। তুমি প্যাকট্যাক করে নাও, এবার তো যেতে হবে!

—দিদি, আপনার কি খুব অসুবিধে হচ্ছে? অনোহিতা খুব শান্ত অনুৎসাহিত গলায় জিজ্ঞেস করল।

—না, একেবারেই নয়, আমার খুব ভাল লাগছে। কিন্তু বাবা তো তোমাকে নিতে এসেছেন। তুমি না গেলে...

—ফর দা রেস্ট অব মাই লাইফ আ'ল হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ মেন। বাবা অর নো বাবা।

নবগোপাল বোকাটে ফ্যাকাশে মুখে তাকিয়ে রইলেন।

—দিদি, আমার দুই মা আমাকে অনেক টাকা দিয়ে গেছেন। ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সটা শুরু করেছিলাম। ওটা শেষ করে, কোনও-না-কোনও কাজ পেয়ে যাব। অ্যাডের কোর্সটাও তো আমার করাই আছে। আমার কোনও অসুবিধে নেই। আপনার অসুবিধে হলে আমি কোনও পি.জি. অ্যাকমোডেশন নিয়ে নেব।

—মিমি, তুই, তুই আমার ওপর এতটা রাগ করেছিস? আমার দিকে একবার ফিরে তাকা! আমার অবস্থাটা বোঝ। বোঝবার চেষ্টা কর।

—রাগ করিনি বাবা, তোমার জীবনে আমি কোনওদিনই কোনও ফ্যাক্টর ছিলাম না। সেটা আমি বুঝতে পারিনি। তাই বোধহয়...। সে যা হোক, এখন আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি। তুমি লন্ডনে থাকো কি নিউ ইয়র্কে থাকো, তোমার সঙ্গী হোক ড্রিঙ্কস কি অন্য কিছু, অন্য কেউ। তুমি চিরকাল যেভাবে বেঁচে এসেছ, এখনও সেভাবেই বাঁচো। নিশ্চিন্তে। আমি রইলাম না। মা রইল না। মাসি রইল না। তুমি আরেকটা বিয়েও করতে পারো। যাই হোক, যেভাবে হোক। আমি তো বড় হয়ে গেছি। আমার জন্যে আর তোমায় ভাবতে হবে না। —তার কোনও কথার মধ্যেই বাড়তি উত্তেজনা নেই। অভিমান রাগ এসব নেই। অনোহিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অদিতি অবাক হয়ে বসে রইল।

নবগোপালের মুখটা কালো হয়ে গেছে। উনি হাঁটুর ওপর কনুই রেখে মাথাটা দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে বসে রইলেন।

অদিতি একটু পরে নিচু গলায় বলল—মিঃ সাহা রায়, আপনি এতটা হতাশ হবেন না। এটা ওর ফার্স্ট রি-অ্যাকশন। ওকে এমন অবস্থায় আপনি একা ফেলে গিয়েছিলেন...। ইউ হ্যাভ টু উইন ইয়োর ডটার ব্যাক। ইতিমধ্যে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ও আমার কাছে রইল। আর...আর ও যা বলছে আপনাকে নিজের মতো লাইফ কাটাবার স্বাধীনতা দিচ্ছে...সেটাও আপনি...মানে শি মিনস ইট। এখন আপনার বুদ্ধিবৃত্তি যা বলে!

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন ভদ্রলোক। তারপর খুব মিয়োনো গলায় বললেন—ঠিকই... আমি ওকে তেমন... মানে আদর দিয়েছি খুব... টয়েজ, ড্রেসেজ, টাকাপয়সা...কিন্তু শি ইজ সো

গ্রোন-আপ নাও। আমি এখন কী করি। আমার জবটাই তো এমনি। আমাকে ঘুরতে হবেই।

অদিতি বলল—যতদিন আছেন রোজই রাতে আপনি আমাদের সঙ্গে খান। স্বাভাবিক ভাবে কথা বলুন। ওকে একটু সময় দিন। আপনার ওপর ভরসাটা ওর একেবারে চলে গেছে।

একুশ

আজ আবার ঝড় উঠেছে। বিলম্বিত কালবৈশাখী। রাস্তা ধুলোয় ধুলোয় অন্ধকার। আকাশ লাল। গাছপালা ভীষণ দুলছে। ট্রাফিকে আটকে বসে সে দেখছে। ডান দিকে ধবধবে গ্র্যান্ড হোটেল। আরও কিছু গ্র্যান্ড দোকান পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত। বাঁ দিকে অক্টারলনি শহিদ মিনার, তার দর্শনে যা ক্রমাগত লম্বা তালগাছের মতো নুইছে। রাস্তা জুড়ে যতদূর চোখ যায় গাড়ি গাড়ি গাড়ি মিনিবাস মোটরসাইকেল স্কুটার...সব আটকে রয়েছে। তবু জঙ্গমতা ওদের শরীরে থমকে, যেন উড়ব-উড়ব পাখির মতো। সমস্তটা একটা উধাও স্রোত, ঠিক প্লামিংকের ছবির মতো। বাঁ দিকে ধু ধু ময়দান। বৃষ্টি নামছে। ধুন্ধুমার বৃষ্টি। এদিক থেকে ওদিক উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কলকাতা। খুব গরমের পর মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার গভীর আহ্লাদে ভরা বৃষ্টি। অনেক চেষ্টা করলেও ছাতা-ছাতা-ছাতা রেনোয়া ছবির মাঝখান থেকে বিপুল পরিসর, সমুদ্রসমান আকাশ আর একটি ছোট্ট প্রাণীর নিশ্চিন্তে নীরব অবিচল বৃষ্টিস্নান দেখা যায় না। ওই ছবি বুঝি জীবনে একবারই দেখা যায়। কিংবা বুঝি একযুগে। কেননা বিষয়, দ্রষ্টা আর প্রেক্ষিত এই সবক'টা শর্ত ক'বারই বা মেলে। জীবনানন্দের কবিতা, নন্দলালের ছবি আর ক'বারই বা ঘটে?

তনিকা স্কলারশিপ পেয়ে গেছে ল্যুভ-এর আর্ট-স্কুলে। স্বপ্ন দেখেছিল, সত্যি হবে ভাবেনি। শৌনক ভিভিয়ান কাজ করছে আঁদ্রের সালঁয়। তবে শোনা যাচ্ছে শিগগিরই ফিরে আসছে। তার জীবনে মায়ের টান শিল্পের টানের থেকে অনেক বেশি। মাস ছয়েকের মতো নাকি একসঙ্গে ছিল ওরা—তনিকা আর শৌনক। তারপর পথ বেঁকে গেছে দু'জনের দু'দিকে। কেউই অবশ্য কিছু বলেনি তাকে। সংবাদদাতা—মনীষা। তনিকা প্যারিস-মুগ্ধ কান্ট্রি-সাইড মুগ্ধ চিঠি লেখে। রোদ্যাঁ মিউজিয়াম, পিকাসো মিউজিয়াম, মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট, সুড়ঙ্গ পথে আলোকিত বৈভব, পোস্টার, বিখ্যাত শিল্পীদের মাস্টারপিস দিয়ে সাজানো, ঐতিহাসিক সেতু পোঁ আলেকসান্দ্রা, আলোয় ঝলমল সাঁজেলিজে, প্লাস দ্য লা কঁকর্দ, বৃক্ষচ্ছায়া? মনোরম বুলেভারের পর বুলেভার। আর্ক দ্য ত্রিঁয়োঁফ থেকে প্রশস্ত অ্যাভিনিউ, প্লাস ভাঁদোম। নোৎরদামের স্থাপত্য, মাইয়লের ভাস্কর্য...পড়তে পড়তে মনে হয় সে ফিরে গেছে তার পঁচিশ বছর বয়সে। যেন কেউ তখনকার লেখা তার এক রোজনামচার বই পর্বে পর্বে পাঠাচ্ছে তার কাছে।

শৌনক ই-মেলে ব্যাকুল শ্রদ্ধা জানায়। তার লেখা ছত্রগুলোর তলে তলে অব্যক্ত কিছু খুঁজে পায় অদিতি, অস্পষ্ট একটা শিহরন, শুধু শ্রদ্ধা নয়, শুধু আনুগত্য নয়, প্রেম কি? না, তা-ও বুঝি নয় সবটা। ব্যাখ্যার অতীত কোনও জটিল অনুভূতি অদিতি যার পরিচয় জানে না, কিন্তু মেল সামনে ধরে সে বসে থাকে মন কেমন করা এক গোপন বসন্তের বাতাস-লাগা প্রত্যূষ গোধূলিতে, আমূল মুকুলিত, কিন্তু বিষণ্ণ। শৌনক তুই ভাল থাকিস। ব্যাখ্যা হয় না এমন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে পড়িস না। যদি পড়িসও তো শিল্পে তার স্বাক্ষর রেখে যা। ভাল থাকিস শৌনক।

গত মাসে মাধুরী মারা গেলেন। চমৎকার ছিলেন। রাতে একটু খই-দুধ আর নরমপাকের ছানার মিষ্টি খেলেন। তারপর অদিতিকে ডাক পাঠালেন। সে তো যেতই আর একটু পরে, শুভরাত্রি জানাতে, কিন্তু উনি ডাকলেন।

বললেন—তোমাকে একটা গোয়েন্দাগিরি করতে বলেছিলাম, মনে আছে বউমা?

—হ্যাঁ মা, অদিতি একটু ইতস্তত করে বলল—এমন সব ঘটনায় জড়িয়ে পড়লাম যে...।

—আমার সে অনুরোধ আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি মা। যা মৃত তাকে মৃত থাকতে দেওয়াই ভাল। কোনও দুঃখ আমার আর নেই।

অদিতির হাত জড়িয়ে ধরে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে পড়লেন উনি। এখানে থাকতে থাকতে কিছুটা যেন চিকন হয়েছেন। সামান্য একটু মাস লেগেছে শরীরে। মুখের রেখাগুলো তেমন তীক্ষ্ণ নেই আর। এমন ওঁর পোর্ট্রেট করলে সেটা হবে একটা অন্য পোর্ট্রেট, হয়তো আগের ছবিটার উত্তরসূরি বলে তাকে চেনাই যাবে না।

ক'দিন পর ভোরবেলায় শীলাদি এসে জানাল উনি ঘুমের মধ্যেই চলে গেছেন। তখনও গা গরম। রাজর্ষি তড়িঘড়ি এসেছিল মৃত মুখে আগুন দিতে, নির্ভুল চরিত্রজ্ঞানে ঠিক যেমনটি উনি বলেছিলেন। কাজকর্ম করে চলে গেছে।

যাবার সময়ে অদিতিকে বলে গেল—তুমি বোধহয় জানো না বনি, এই সময়টা আমার কেমন কেটেছে, সুজান চলে গেছে, একটা বাচ্চা হয়েছিল, ছেলে। রোনাল্ড গৌতমকে নিয়ে চলে গেছে। আমার জীবনটা...শুকনো...আই টেরিব্লি মিস দ্যাট চাইল্ড।

অন্য কোনও মন কেমনের কথা বলবে বলে সে দাঁড়িয়েছিল, অদিতি তাকে সাহায্য করতে পারেনি।

নীল ফাইলটা খুলে দেখা গেল সেটা মাধুরী গুপ্তর উইল। তাঁর স্বামী সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিঃশর্তে স্ত্রীকে দিয়ে গিয়েছিলেন। মাধুরী দেবী বাড়ি ও সংলগ্ন বাগান দিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় কোনও মিউজিয়ামকে। গহনাও সব তাদেরই। একটি হিরের লকেট একজোড়া টপ অদিতির। আর সমস্ত সম্পত্তির ট্রাস্টি অদিতি ও সুবোধ ডাক্তারবাবু। শীলাবতী আজীবন সুদ ভোগ করবে। তার জীবনান্তে টাকাটা পুরোই চলে যাবে ওই মিউজিয়ামের রক্ষণাবেক্ষণে।

লাইট হলুদ হচ্ছে। স্টার্ট দিল। ধারালো বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পথ কেটে কেটে এগোনো। ভিজে কাক হচ্ছে রাস্তার বাচ্চারা। পলিথিন ঘোমটা মাথায় দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল মজুর শ্রেণীর কিছু লোক। কলুটোলার ফুটপাথে সেই ঝুপড়িটা কেন নেই কে জানে। চা ছাঁকছে না কোনও প্রৌঢ়া। ফলওলারা অনেক আগেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে।

পৌঁছোতে পৌঁছোতে সন্ধে। গোড়ালি জলে ছপছপ করতে করতে বাড়ি। শীলাদি দরজা খুলে দিল—মিটিমিটি হাসছে। ভেতরে গিয়ে দেখে তার গোলাপি বাথরোবটা পরে ড্রায়ারে চুল শুকোচ্ছে অনোহিতা।

—উহ দিদি, যা ভিজেছি না! নিংড়োলে একটা নদী হয়ে যাবে। খুশির হাসি। বৃষ্টিতে ভেজার ছেলেমানুষি উত্তেজনা চলকে পড়ছে হাসি থেকে। ভঙ্গি থেকে।

একটা হাঁচি এল—হ্যাঁচ্চো!

—কী রে। ঠান্ডা লাগালি নাকি, অনোহিতা!

—ওহ্, ফ্যানটাস্টিক দিদি!

—কী!

—এই, তোমার মুখে অলওয়েজ অনোহিতা, মিমি বলো না কেন আমাকে?...কী মনে হয় জানো? আমি যেন আমি নই, অন্য কেউ, আমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ভাল কাউকে ডাকছ...কেন দিদি?

—কী জানি...অন্যমনস্ক হয়ে গেল অদিতি।—মিমিটা আদরের...শিয়োর...অনোহিতাটা...কী জানি বোধহয় এক ধরনের অ্যাডোরেশন...

—সত্যি? দিদি?

—শিয়োর। তবে তোর চোখ লাল। নির্ঘাত ঠান্ডা লাগিয়েছিস...।

—ধুৎ, এইটুকুতে ঠান্ডা লাগে? চমৎকার এক কাপ কফি খাওয়াল শীলাদি। কোত্থেকে আনাও গো কফিটা? দারুণ!

—ওটা কফি-বিন্‌স্ থেকে। আঁদ্রে দিয়ে গিয়েছিল। আর একটা পার্কোলেটর। তো আরেক কাপ হয়ে যাক! আমি অবশ্য ঠিক নদী-নদী ভিজিনি! তবু হয়ে যাক!

এক লাফে অদিতির সোফায় ঝাঁপিয়ে তার গালে গাল রাখল অনোহিতা।

—তোমাকে এমন খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে কেন বলো তো?

—খেয়ে ফেলবি কী রে? আমার লাগবে না?

—মানে...তোমাকে আমার ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। সব সময়ে থাকবে আমার সঙ্গে। এনিওয়ে তোমার কাছে ঘেঁষে বসে যদি এমনি কাঁধে মাথা রেখে থাকি!—ন্যাকা, ন্যাকা লাগবে না তো!

—তা তো একটু লাগবেই। অদিতি হেসে বলল,—তৃতীয় ব্যক্তি দেখলে।

—লেট দা তৃতীয় ব্যক্তি গো টু হেল!

অনেকক্ষণ ওর মাথাটা তার কাঁধে রইল।

অদিতি পোশাক পালটে এল। শীলাদির কফি এসে গেছে। চুমুক দিয়ে সে বলল—অনেকদিন আসিসনি কিন্তু।

—কী করে আসব? শ্রীমান বাবা যে সন্ধে সন্ধে ফিরবেন। একটু মিমি—জাস্ট একটু...দু'পেগ...তা তাঁর জন্যে সব ব্যবস্থা করে রাখো। কবে তাঁর রাম লক্ষ্মণ কবে আবার তাঁর উইশ কী। আবার ককটেলেরও ফরমাশ হতে পারে। তার অরেঞ্জ জুস, টোম্যাটো জুস, উর্স্টার সস, টোব্যাসকো সস্...।

—তা তুইও কম্প্যানি দিচ্ছিস নাকি?

—একটু, জাস্ট একটু, নইলে শ্রীমান বোর্‌ড্ হবেন।

—দেখিস, আবার না নেশা ধরে যায়!

—পাগল! তুমি জানো না হেন লিকর নেই যা আমি খাইনি। কোনওদিন ভাল লাগেনি। তবু জেদ করে খেয়েছি। আমার এসবে কিচ্ছু হয় না। এনিওয়ে দুটো জমজমাট খবর আছে।

—কী?

—এক নম্বর আমি একটা বাংলা মিউজিক চ্যানেলে অ্যাঙ্কর সিলেক্টেড হয়েছি। পরের মাস থেকে জয়েন করছি। আর দু'নম্বর আঁদ্রেদা আমাকে একটা জরুরি ই-মেল করে তোমাকে একটা কথা জানাতে বলেছে।

—তোকে? কেন? হঠাৎ?

—টপ সিক্রেট। লাস্ট মোমেন্টে জানাতে বলেছে।

—তার মানে আসছে? না? কবে?

—কালই। তিনমাস থাকবে তোমার কাছে, অন কন্ডিশন তুমি থাকবে পরের তিন মাস প্যারিসে, জিফ-সুর-ইভেৎ-এ।

—তোর বাবা বুঝি বাইরে?

—হ্যাঁ। আবার লন্ডন! আজ আমি তোমার কাছে থাকি, হ্যাঁ?

—মানে, এই বৃষ্টিতে যাবি কোথায়? শাড়ি বার করে দিচ্ছি, পর। ব্লাউজটা ঢিলে হবে। শাড়ি দিয়ে ঢেকে নিবি, ওভাবে পরা ফ্যাশনেব্‌ল্ নয়, আই নো।

—ছাড়ো তো! তোমার খিচুড়ি চলে? তা হলে আজ আমি রাঁধব।

অদিতি স্মৃতিবিধুর হাসি হেসে বলল—চলে!

দৌড়

রবি যেদিন প্রথম এসে বলল—'মা আমার সেলস ট্রেনীর চাকরিটা হয়ে গেল। ভাগ্যিস মোটরবাইকটা কিনেছিলুম!' ঠিক সেই দিনই রাত্তিরবেলায় শুতে গিয়ে আমার হঠাৎ মনে হল আমি রাতটাকে একটা মানুষের মতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। বেশ নীল রঙের কেষ্টঠাকুরের মতো, যদিও তার হাত পা চোখ মুখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোথায় কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি বলতে পারব না। কালচে নীল রঙ, চাঁদ ওঠেনি। আকাশময় তাই তারার ঝকমকানি। কেষ্টঠাকুরটি রাজকুমার হলেও তো গোপরাজকুমার! তারাগুলো কি আর চিরকিশোর সেই মূর্তির অলঙ্কারের মণি-মাণিক্য হবে? এত কথা আমার মনে এল। কেন না আমি আজকাল কিছু বললেই আমার তিন ছেলে মেয়ে বলে ওঠে—'কেন? কেন? কেন?' এই কেনর জবাব দেবার ক্ষমতা সব সময়ে আমার থাকে না। তাই মনে কোনও কথা উঠলেই তার কার্য কারণটা ভেবে রাখবার চেষ্টা করি। কেন যে কেষ্টঠাকুরের কথা মনে এল! কী জবাব এর? ভেবে ভেবে জবাব বার করি—আসলে এই সব পুরাণ কথা দেবদেবী আমাদের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে বসে আছে যে আর অন্যভাবে আমরা ভাবতে পারি না। হ্যাঁ, কী বলছিলুম? রাতটাকে আমি একটা বিরাট পুরুষের মতো দেখতে পেলুম! বিরাট, অসীম শক্তিধর, কিন্তু কিশোর। কালপুরুষটা জ্বলজ্বল করছে। কালচে নীলার মতো মখমল আকাশে। অন্ধকারের কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ আছে, টের পেলুম। তোমরা বলবে রাতে কতরকম ফুল ফোটে তারই গন্ধ পেয়েছো। হবেও বা। কিন্তু রাতের কয়েকটা ফুলের গন্ধ তো আমি চিনি! এ সেরকম না। এ যেন কিরকম একটা রহস্যময়, বিশাল, অজানার গন্ধ। গন্ধটা বাইরে থেকে আমার ভেতরে ঢুকে গেল, আচ্ছন্ন করে দিল আমাকে। যেন আমি আর আমি নেই, আমার ভেতরে যেন আর কেউ এসে আস্তে আস্তে বসছে। অনেকক্ষণ আমাদের বাড়ির একফালি ছাতে পায়চারি করতে করতে সেই রাত-কিশোর, সেই অজানার গন্ধ, সেই নিজের ভেতরে অন্য কারুর পা টিপে-টিপে প্রবেশ সব বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলুম। উপভোগও করতে লাগলুম। তারপর যখন মনে হল এইভাবে আমি একেবারে হারিয়ে যাচ্ছি, তখন হঠাৎ যেন খেলা ভেঙে দিয়ে হেরো খেলুড়ির মতো দুড়দাড় করে নিচে নেমে এলুম। দুড়দাড় করে বললুম বটে কিন্তু সেটা আমার ভেতরের তাড়ার কথা ভেবে। আসলে আমার পায়ের শব্দ হয় না। শব্দ না করে কীভাবে চলতে হয়, নিঃশব্দে কীভাবে হাসতে হয়, বা খুব বেশি হাসি পেলে আঁচল দিয়ে তাকে আড়াল করতে হয়, কীভাবে না চেঁচিয়ে কথা বলতে হয় এ আমার হিতৈষিণীরা কতদিন ধরে শিখিয়েছিলেন।

নিচে নেমে দেখি ওরা তিনজনে মিলে খুব গল্প আরম্ভ করে দিয়েছে। ওদের খেয়াল নেই ঘড়ির কাঁটা এগারটার দিকে যাচ্ছে। খুব তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। যদিও তার মধ্যে রাগারাগি নেই, কিন্তু বেশ তীব্রতা আছে। রবি, বিলু আর রিণি।

বললুম—'কি রে, খাবি না?'

—'এই তো তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম। তাড়াতাড়ি তোমার খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকোও তো! আজ একটা দারুণ লেট নাইট ফিল্ম আছে।'

—আমার গলায় উদ্বিগ্ন প্রতিবাদ উঠে এল, ভেতরে যেটা খুব উদ্বিগ্ন, বাইরে অবশ্য সেটা খুব নরমভাবে বেরোয়। ছবিটা আমি জানি, বড্ড বেশি এ-মার্কা। তিন ভাইবোনের একসঙ্গে বসে দেখবার নয়। থাকতে পারলুম না, বলে ফেললুম—'ওই ছবিটা আর না-ই দেখলি।'

ওরা তিনজনে হেসে উঠল সমস্বরে। রবি, বিলু আর রিণি। আমার তিন ছেলেমেয়ে। বড় রবি

বাইশ। মেজ বিলু কুড়ি। আর ছোট রিণি সতেরো। রবি, নতুন-চাকরি-পাওয়া রবি বললে—'মা, তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছ! খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়।' শোনো কথা, আমি রবির প্রায় ডবল-বয়সী, আমি হলুম গিয়ে ছেলেমানুষ, আমাকে অ্যাডাল্ট ছবির আওতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। আর ওঁরা তিনজন পূর্ণবয়স্ক বাইশ, কুড়ি, সতেরো নিশ্চিন্তে রাত দেড়টা কি দুটো পর্যন্ত ছবিতে নর-নারীর জীবনের যতেক গোপনতার উদ্‌ঘাটন দেখবেন বসে বসে। খাবার জন্যে যে ছোট্ট জায়গাটা রান্নাঘরের সামনে রয়েছে সেইখানেই ছোট্ট টিভিটা বসানো আছে। আমি ওদের রুটি আর ডিমের ঝোল বেড়ে দিয়ে নিজের খাবারটা নিয়ে টিভির দিকে পেছন ফিরে বসলুম। খেতে খেতেই বোধহয় ছবিটা আরম্ভ হবে। গোড়াতেই একটা বেড-রুম সিন দিয়ে আরম্ভ। যাই হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেয়ে নিয়ে ছেলেমানুষ আমি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। জানি না কখন রিণি এসে আমার পাশে শোবে। হয় ফিল্ম শেষ হলে, নয় তার আগেই, ওর যদি ভাল না লাগে।

শুয়ে শুয়ে আমার ঘোর আসতে লাগল, আর ঘোরের মধ্যে আমি রবির গলা শুনতে লাগলুম, —সামান্য একটু হাসি মেশানো গলা 'মা তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছ!' মা এখনও তুমি ছেলেমানুষ...ছেলেমানুষ কথাটা আমাকে ধাক্কা দিতে লাগল। আমি কখনও ছেলেমানুষ ছিলুম, যে ছেলেমানুষ থাকবো! হঠাৎ মনে পড়ে গেল মামার বাড়ি গিয়ে খাটের তলায় শুয়ে 'ক্রৌঞ্চ-মিথুন' বলে একটা বই পড়ে আমার কী বমি পেয়েছিল, তারপর আমার মাসতুতো বোন যে নিয়মিতি নিষিদ্ধ বইয়ের সরবরাহ করে যেত, সে আমার অবস্থা দেখে বেরসিক বলে বই দেওয়া বন্ধ করল। আমিও বেঁচে গেলুম। কিন্তু আরও একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমার এক স্কুল-টিচার দিদি আমাদের ভাল ভাল গল্প, উপন্যাস, রম্য রচনা পড়ে শোনাত। কিন্তু যতবড় উপন্যাসই হোক আমাদের হাতে কখনও ছাড়ত না। আমি আর আমার এক বোন মিলে শেষকালে ঠিক করলুম দিদির অনুপস্থিতিতে বই খুলে দেখতে হবে—কেন! তক্কে তক্কে রয়েছি। দিদি স্কুলে চলে গেছে। দুপুর বেলা দিদির আলমারির চাবি যোগাড় করে বার করলুম সেই বই—'ঝিন্দের বন্দী'। পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছি, অবশেষে আমার বোন বলে উঠল—'পেয়েছি।' গৌরীশংকর আর কস্তুরীর প্রেমের দৃশ্য। একটুখানি। সেইটুকু দিদি সাবধানে বাদ দিয়ে গেছে! তখন আমাদের চোদ্দো-পনের বছর বয়স। দুজনে হেসে কুটিকুটি। এইভাবে 'ইছামতী'র নিস্তারিণীর অবৈধ প্রেমকাহিনী এবং 'ভবানী তখন তিলুকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন গোছের একটা লাইনও খুঁজে বার করেছিলুম। আর হেসে কুটোপাটি হয়েছিলুম।

একদিন আমার মেজছেলে বিন্দু এসে বলল—'মা হাজার পাঁচেক টাকা পাবো?'

—'কেন রে?'

'আমরা কয়েক বন্ধু, তুমি তাদের চেনো অলক, সামন্ত, টুটুল আর রুমি ছবি করব ঠিক করেছি।'

—'ছবি করবি? ছবি?'

—'মানে ফিল্ম, ডকুমেন্টারি করে সেল করব।'

—'সে কি রে? কোনদিন এ সব বিষয় কিছু জানলি না, হঠাৎ ফিল্ম অমনি করলেই হল? তাও আবার পাঁচ হাজার টাকা! পাঁচ হাজারে ফিল্ম হয় নাকি?'

—'ওহ, মা, য়ু নো নাথিং। আমার বইয়ের র‍্যাকে যে ম্যাগাজিন আর বইগুলো আছে একটু উল্টে পাল্টে দেখো? টুটুল আর রুমির পুনের ট্রেনিং আছে। অলক রবীন্দ্র ভারতীর ফুল কোর্স করছে। সামন্তর অনেক টাকা। আমার ইম্যাজিনেশন। তা ছাড়া যে যেরকম পারি টাকা দেবো। আমি তো জানি তুমি পাঁচ হাজারের বেশি চাইলে হার্ট ফেল করবে তাই...'

—'তো কিসের ওপর ছবি করবি!'

—'শের।'

—'সে কি রে? চিড়িয়াখানার বাইরে কোনদিন বাঘ সিঙ্গি দেখেছিস? বাঘের ওপর ছবি করবি কি রে? মাথা খারাপ। ও সব মতলব ছাড়ো বিলু।'

বিলু বলল—'উঃ, মা, তুমি একটা ইমপসিব্‌ল্‌, শের মানে উর্দু কবিতা, আজকাল হায়েস্ট ফ্যাশন, অর্ডার অব দ্য ডে। সেই কবিতার ওপর করব! হয়েছে তো? দাও এবার টাকাটা দাও। তুমি বড্ড ব্যাকডেটেড মা!'

পাঁচ হাজার টাকা ওকে দিলুম। টাকাটা জলে দিচ্ছি ভেবেই দিলুম। কিন্তু মাস ছয়েক পরে ও টাকাটা আমাকে ফেরত দিল। ভীষণ ব্যস্ত গলায় বলল—'এবার মা কেরলের দিকে যাব, ট্যুরিজমের একটা কাজ পেয়েছি। ট্যুরিজমের একটা কাজ যদি ভালো করে করতে পারি তো একেবারে চেইন! পর পর পর পর পেয়ে যাব! এইবার প্রফিট আসতে শুরু করবে!'

'ছেলেটা আমার বি-এসসি পাশ করে বসেছিল। এম-এসসিতে চান্স পায়নি বলে কয়েক মাস খুব গোমসা মুখে ঘোরাফেরা করত। আমি মনে মনে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। তারপর কবে যে কি সব যে ট্রেনিং ফেনিং নিল, বন্ধুদের সঙ্গে মিলে পরামর্শ করতে আরম্ভ করল খেয়ালই করিনি। আমি বললুম—'হ্যাঁ রে পরের বছর এম-এসসি'র জন্যে চেষ্টা করবি তো?'

বিলু বলল—'ওহ্‌ মা, কারেন্ট ইয়ারের ছেলেরাই চান্স পাচ্ছে না। তার আগের বছর! ও সব ছাড়ো তো! তুমি না বড্ড ব্যাকডেটেড। এম-এসসি পড়ে কী হয়? কিস্যু হয় না।'

সুটকেস গুছিয়ে, রুকস্যাক ঘাড়ে নিয়ে পরদিনই দেখি বেরিয়ে যাচ্ছে—মা কবে আসব বলতে পারছি না!

বললুম—'সে কি রে? এই কোত্থেকে এতদিন পর ঘুরে এলি। এক্ষুনি আবার চলে যাচ্ছিস? কদিন একটু জিরিয়ে গেলে পারতিস।'

'বিলু টান-টান হয়ে উঠে দাঁড়াল জুতোর ফিতে বেঁধে। তারপর বলল—'পান চিবোতে চিবোতে পকেটে টিফিনকৌটা নিয়ে ধীরে-সুস্থে আপিস যাবার দিন চলে গেছে মাম্মি। য়ু আর হোপলেসলি ব্যাকডেটেড।' গটগট করে বিলু চলে গেল।

কথাটা ওর মুখে কয়েকবারই শুনলুম—ব্যাকডেটেড, ব্যাকডেটেড। টু ব্যাকডেটেড। হোপলেসলি ব্যাকডেটেড।

একটা লম্বা বারান্দা আমাদের চলে গেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। বড্ড সরু। কাপড় শুকোতে দেবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। আর রাজ্যের পায়রা ওপর থেকে বকম বকম করে বারান্দাটা নোংরা করে। ঝুলঝাড়া দিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করলেও যায় না। তখনকার মতো চলে গেলেও আবার রাতে ফিরে এসে বক বকুম, বকুম, কুম, বকুম কুম করতে থাকে। সকালবেলায় বারান্দাটার আগাপাশতলা আমায় ধুতে হয়। পায়রাগুলো ফিরে আসলে আমার ভাল লাগে। কি রকম ঘুমপাড়ানিয়া, সুখজাগানিয়া পায়রার ডাক। বাকুম, কুম, কুম, বাকুম বাকুম। যেন ডাকটা মুখ ফুটে বেরোয় না। গলার কাছেই আটকে থাকে। আমার ভাল লাগে। আমাদের বাড়িতে অমনি পায়রা ভিড় করে থাকবার জায়গা ছিল। দুপুরে সারা দুপুর ঝটপট ঝটপট, বাকুম, বাকুম রাত্তিরেও ঝটপটাপট মাঝে মাঝে, আর কুম কুম কুম। যদি ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করে—পায়রার ডাক তোমার ভাল লাগে কেন? ওরা ফিরে এলে খুশি হও কেন? কেন? কেন? তা হলে কি বলব? জবাবটা ভেবে রাখতে গিয়ে এইসব কথা আমার মনে এসে যায়। ওরা স্মৃতিজাগানিয়া পায়রা। সুখস্মৃতি। যখন মা বাবা, ভাই বোন। যখন স্কুল, গান, মুগ্ধ দিদিমণি, যখন দিদিমা, আদর, পান মুখে দিয়ে ধীরে-সুস্থে অফিস যাওয়া—টিফিনে আজ লুচি, আলুর দম, তোদের চিংড়ি মাছ দিয়ে পেয়াজকলির চচ্চড়ি আছে। কি আনবো অফিস-ফেরতা? কি আবার আনবে, ফলফুলুরি যদি কিছু সুবিধের পাও। পেয়ারা পাতায় নুন তেল দিয়ে দাঁত মাজ, ঝকঝকে হবে। হাসলে দাঁত ঝিকঝিকিয়ে উঠবে, রেলগাড়ি চলে গেল—ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক কু...উ...উ। তাই আমি পায়রাদের ফিরে-আসা পছন্দ করি। আমার তো ভবিষ্যৎ নেই। আছে শুধু রোমন্থনের অতীত। আর বর্তমান। বর্তমান! বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালে আকাশটাকে, শহরের রাস্তাঘাট, বাড়ি-টাড়ি কেমন কাটা-ছেঁড়া লাগে। যেন অপারেশনের রুগী। কাটা

ছেঁড়া হয়েছে, সেলাই এখনও হয়নি। কোনদিন হবে কি না জানিও না। আমাদের গলিটা আঠার ফুট মতন। মাঝে মাঝে হাঁড়ল গর্ত। দু-তিনটে বাড়ি বাদ দিয়ে এক এক জায়গায় আবর্জনার স্তূপ জমে আছে—তরকারির খোসা, মাছের আঁশ, ছেঁড়া কাগজ, ন্যাতা কঁ্যাতা, আরও সব জঘন্য নোংরা, অদূরে মানে বড় রাস্তার ওপর বেশ কয়েকটা লম্বা বাড়ি উঠেছে। ছ তলা, আট তলা। ফলে আরও দূরের দিকে তাকিয়ে যে বড় রাস্তায় গাড়ি চলা, মানুষজনের অবিরাম চলাফেরা, দোকানের আলো এ সব দেখতে পাব তার জো নেই। ঝকঝকে বাড়িগুলো। পিনু মানে পিনাকী, আমার মামাত দেওর, ওদের বাড়িটা আর দেখা যায় না। আমার এক ননদ কাছেই থাকেন, ওঁদের উঠোনে লম্বা তারে ধুতি শাড়ি শুকনো তা-ও আর দেখা যায় না। উঁচু, ঝকমকে বাড়িগুলোর পাশে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইছে, মিয়োনো, দোতলা-তেতলাগুলো। শ্যাওলা ধরা, গাছ-গজানো, জানলার পাল্লাগুলো খাপছাড়াভাবে রং করা। ও মা! একটা ছ' তলা তো রুবিদের বাড়ির ওপরই উঠেছে মনে হচ্ছে, তা হলে রুবিরা কোথায় গেল? যাঃ, আজকাল কেউ কারও খেয়াল রাখে না। কবে যে রুবিদের ওপর অমনি তেধেড়েঙ্গে একটা বাড়ি উঠল আমি জানিই না। খুব ব্যস্ত হয়ে ডাকি 'রিণি রিণি', রিণি ঘরের ভেতর কি ম্যাগাজিন পড়ছিল, উঠে এসে বলল—'কি মা? কী হয়েছে?'

—'রুবিরা কোথায় গেল? রুবিদের বাড়ির ওপর...?'

—'কী আশ্চর্য! রুবিরা ওখানেই আছে! ওর ভেতরেই ওদের ফ্ল্যাট দিয়েছে। বড় রাস্তার দিকে মুখ করে ওদের ফ্ল্যাটটা তো তাই দেখতে পাও না।'

—'এত ভাববার কী আছে! তুমি না...'

'আমি একটা বিশেষণের জন্যে অপেক্ষা করি। কিন্তু রিণি তার কথা শেষ করে না।' না বলে একটা টান দিয়েই অসমাপ্ত ম্যাগাজিনের কোলে ফিরে যায়। নাঃ। আমার সামনে লম্বা লম্বা বাড়ি। দৃষ্টি রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে তাকিয়েও কোনও লাভ নেই। আশপাশে হাঁড়ল গর্ত।

আবর্জনা, মোটরবাইকের গরগর, রুকস্যাক, চকচকে ম্যাগাজিনের মধ্যে রক্তের ফোয়ারা নগ্নপ্রায় নারী, ভিখারী শিশুর পাঁজরের ছবি। তাহলে আমি পায়রাদের দিকে ফিরব না কেন? বাক বাকুম, বাকুম, কুম, কুম,—উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রার পিঠে চড়ে আমি সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে কেন নিচু আকাশ দিয়ে ছেৎলাপড়া, বেমানান রঙের বাড়ি আর বহুতলের অ্যানটেনা সঙ্কুল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাবো না চঞ্চল পাখনায় যেখানে মুগ্ধ দিদিমণি, সব পেয়েছির আসর, ডালে সম্বরার গন্ধ আর কু ঝিক ঝিক, ঝিক ঝিক, ঝিক...। শুধু যদি ওরা বারান্দাটা এমন করে নোংরা না করত!

রিণি বলল 'মা তুমি চা-টা খুব ভাল করো। কিন্তু কফিটা ঠিক এসপ্রেসো হয় না। তুমি সরো। আমি করে নিচ্ছি।'

ডিমগুলো ও আগেই ভেজে রেখেছে। কী সুন্দর টোপর হয়ে ফুলছিল ওমলেটগুলো। বেকিং পাউডার দিল। ডালের কাঁটা দিয়ে খুব করে ফেঁটানো, ভেতরে পেঁয়াজকুচি, চীজের টুকরো আর টোম্যাটো কুচি দিয়ে কী সুন্দর ভাঁজ করে ফেলল। নন-স্টিক প্যানে কী চটপট হয়ে গেল। একটু হলদেটে সাদা। যেন কাঁটালি চাঁপার রঙ। প্যানটা রবি প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই কিনে এনেছে। কী রকম দৃষ্টি দেখ। জামা না, শাড়ি না, একটা নন-স্টিক প্যান। কী সুবিধেই যে আমার হয়েছে! আমার ছেলে, তালে-গোলে যে বড় হয়ে উঠেছে সে এইরকম বিবেচক হবে আমি ধারণাই করতে পারিনি!

আমি সরে এলুম। দেখলুম রিণি প্রত্যেকটা কাপে কফি চিনি সঙ্গে সামান্য দুধ-মেশানো জল দিয়ে প্রাণপণে ফেটাচ্ছে, কেমন সুন্দর ওপর থেকে গরম দুধ-জল ঢালছে চামচ নাড়তে নাড়তে, আর আধ ইঞ্চি করে ফেনা উঠছে কাপের ওপর। ঠিক দোকানের মতো। কাপ-প্লেটগুলোও খুব সুন্দর, পাতলা, বিলু যাবার সময়ে কিনে দিয়ে গেছে। মিষ্টি না, শাল দোশালা না, একটা চমৎকার টিসেট। রিণি ট্রে বয়ে নিজেই নিয়ে গেল, আজ ওর ক'জন বন্ধু এসেছে। তারা ঝুপঝাপ মাসি-মাসি

করে আমায় পেন্নাম-ঠুকলো, একজন খুব বাবার সঙ্গে বিদেশে ঘোরে সে গালে চকাস করে চুমু খেল। তারপর ওরা গল্পে মেতে গেল। পিরভা করণ, ইকোলজি, অলটারনেটিভ এনার্জি, সুষীম চৌধুরীর ডাঁট ভাঙতে হবে। উইকলিটা দারুণ। ইস্‌স্‌ শেরগিলের লাইফ...। 'এই সমস্ত ছেঁড়া-ছেঁড়া কথা আমার কানে এল। কিচ্ছুই বুঝতে পারলুম না। কিন্তু রিণিটা আগে রান্নাঘরের ধার মাড়াত না। আজকাল এত ভাল পারছে ও এসব। আজ ওর খুন্তি ধরা, প্যান ওল্টানো, ওমলেট ভাঁজ করবার কায়দা, কফির জল একবার নামানো একবার বসানোর ধরন, গ্যাসের নবটা চট করে সিম করে দেওয়া আবার বাড়িয়ে দেওয়া—এ সব দেখে আমি তাজ্জব বনে গেলুম। যে রিণিটা...। আজ এত ভাল পারছে! আশ্চর্য! কোনও আলাদীনের দৈত্যকে তো আমি পুরনো পিদিম ঘষে ডাকিনি! বলিনি ওদের স্বাবলম্বী করে দাও। ওদের বিবেচক, বুঝদার করে দাও! বলিনি তো আমি আর পারছি না। জীবনের এতগুলো বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতে পারিনি, হে দৈত্য আমায় মুক্তি দাও। 'গুপী গাইন, বাঘা বাইন'-এর হুল্লার রাজার মতো আমার ছুটি-ছুটি-ছুটি..ছুটি করে বাড়িময়, ছাতময়, রাস্তাময়, ময়দানময়, পৃথিবীময় এলোপাথাড়ি ছুটে বেড়াতে ইচ্ছে করল।

এতক্ষণ রিণির বন্ধুরা এসে বসে, রিণিকে সাহায্য করতে হবে বলে গা ধুতে যেতে পারিনি। এবার গেলুম। বাথরুমে দাড়ি কামানোর সুবিধের জন্যে রবি একটা বড় আয়না লাগিয়েছে। তাইতে আমার বুক পর্যন্ত পুরোটা দেখা যায়। মুখখানা ভাল করে দেখলুম। অন্যদিনও দেখি। চুল বাঁধতে দেখি, দাঁত মাজতে দেখি, মুখে সাবান দিয়ে সাবান ধুয়ে দেখি। রোজকার অভ্যেসের দেখা। কিন্তু আজকের দেখাটা অন্যরকম। দেখতুম একজন প্রাপ্তবয়স্ক তিন ছেলেমেয়ের প্রৌঢ়া বিধবা মাকে। আজ দেখলুম তেতাল্লিশ বছরের একজন মানুষকে, যে প্রকৃতির কোন রহস্যময় খেলায় বা নিয়মে মানুষ মেয়ে। এবং আবারও জীবনের কোনও অমোঘ চাঞ্চল্যকর নিয়মে বা খেলায় যে একই সঙ্গে ছেলেমানুষ এবং ব্যাকডেটেড। দেখলুম আমার আধা-ফর্সা রঙে একটা কালচে ছোপ পড়েছে। শীতকালে যেমন সমস্ত গাছপালার ওপর পড়ে, চুলগুলো আমার এখনও, অনেক অযত্নেও অনেক, অনেক। পাকা-টাকা দেখতে পেলুম না। আমার যে বয়স তার থেকে মাত্র চার বছর বেশি বয়সে ঠাকুমা আপাদমস্তক বুড়ি হয়ে মারা গিয়েছিল। গরমের ছুটির দুপুরে তাঁর পাকা চুল তোলার কথা আমার খুব মনে পড়ে। আমার চিবুকের ডানদিকে একটা তিল। যারা তিলতত্ত্ব জানত, তারা মুখ গম্ভীর করে মাথা নেড়ে বলত ডানদিকে না হয়ে যদি ওটা বাঁদিকে হত তাহলে ওর ভাগ্য খুলে যেত। কিন্তু দক্ষিণ অঙ্গে তিল স্ত্রীলোকের ঠিক...। কিন্তু চিবুকটা দেখে আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল ষোল বছর বয়সে তোলা (নিশ্চয়ই বিয়ের জন্য) আমার একটা ছবি দেখে আমার বাবা এই চিবুকটা নেড়ে দিয়ে বলেছিলেন ছবিতে চিনুমার চিবুকটা ঠিক আসেনি। এই চিবুকটাই ওকে চিরকাল ষোল বছরের করে রেখে দেবে। এসব কথার গুরুত্ব তখন বুঝতুম না। মেয়ে নিয়ে বাবারা অনেক আদিখ্যেতা করে থাকেন। আমার সমগ্র মুখে-চোখে নাকে, চুলে, কোথাও কিছু বলবার মতো না পেয়ে বাবা হয়ত আদরের মেয়ের চিবুকটা নিয়েই পড়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখলুম,—না, বাবা তাঁর পরিণত দৃষ্টি দিয়ে ঠিকই দেখেছিলেন। আদিখ্যেতা করেননি। চিবুকটা সত্যি ঠিক তেমনি আছে। তিনকোনা। তলার দিকটা সামান্য একটু গোল ভাব ছুঁয়ে গেছে। মাঝখানে ভাঁজ। অতিরিক্ত মাংস জমেনি আশপাশে, তলায় কোথাও আর ডানদিকে শুকতারার মতো ফুটফুট করছে সেই অশুভ তিল যা নাকি বাঁদিক ঘেঁষে হলে চিনুর ভাগ্য খুলে যেত। ডান অঙ্গে তিল স্ত্রীলোকের ঠিক...। চিবুকটা তেমনি আছে। ষোল বছরের চিবুক। কিন্তু মুখটা? সমস্ত মুখটা মলিন, চিন্তিত, কেমন বুড়োটে। আমার শোবার ঘরের আলমারিতেও একটা লম্বা আয়না আছে। রিণিই এটা বেশি ব্যবহার করে, শাড়ি পরবার সময়। পাট পাট করে কুঁচি দেবে। লম্বা আঁচল ভাঁজে ভাঁজে ঝুলিয়ে দিয়ে পিন করবে। তারপর পায়ের গোড়ালি দিয়ে টেনে টেনে এ দিকের শাড়ি ওদিকের শাড়ি সব সমান করবে। তো আমি আজ তার সামনেও গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখি আয়না কী বলে? আয়না তো স্নো-হোয়াইটের

সৎমাকে অনেক কিছু বলেছিল, বলত। দেখি সে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি, বড়াইবুড়ি, ছেলেমানুষ, ব্যাকডেটেড চিনুকে কী বলে? আয়না বলল—'চিনু তুমি রোগাও নয়, মোটাও ঠিক নও, তুমি বাপু কেমন থপথপে। কোনও খাঁজ-খোঁজ নেই, আকার নেই তোমার, সত্যি বলছি। কোনও গতি নেই শরীরটার মধ্যে।' অথচ সেই ষোল বছর বয়সে যখন আমার থুতনি নেড়ে আদর করেছিলেন তখন আমি রোজ স্কিপিং করতুম। চু-কিত্-কিত খেলার সময় বিরোধী দলের কবল থেকে এমনভাবে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বেরিয়ে আসতুম যে খেলুড়িরা আমার নাম দিয়েছিল—কই মাছ। আমি নাকি এমন পেছল যে হাজার বেড়াজালেও আমাকে ধরা যায় না। অথচ অথচ ...এমনি মজা যে জীবনের প্রথম জালেই আমি ধরা পড়ে গেলুম। পরের বছর মা মারা গেলেন। বাবা তার পরের বছরই দিশেহারা হয়ে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন। পরের বছর, রবি, দু বছর বাদে বিলু, তিন বছর বাদে রিণি। আর তার পাঁচ বছর বাদেই ঠিক যেমন আমার মা দুম করে চলে গিয়েছিলেন, রবি-বিলু-রিণির বাবাও তেমনি বিনি নোটিশে দুম করে চলে গেলেন। তারপর সংসার ভাগ হল, ভাসুর দেওররা, আমার বাড়ির ভাগ, শাশুড়ির গয়নার ভাগ, দেশের জমির ভাগ সব বুঝিয়ে দিয়ে আলাদা করে দিলেন। এই সব, আর আমার স্বামীর জমানো কিছু টাকা, ইনসিওরের টাকা, ক্ষতিপূরণের টাকা এই সব দিয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে ঘাড় গুঁজে তিনটি শিশু নিয়ে এতকাল কাটিয়ে এসেছি। কীভাবে এতগুলো বছর চলে গেছে টের পাইনি। তাই যখন রবি একদিন এসে বলল—'মা, সেলস ট্রেনির চাকরিটা আমার হয়ে গেছে', বিলু যখন ছবি করবার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আবার সেটা ফেরত দিল, আর হাতে সুটকেস, পিঠে রুকস্যাক নিয়ে গট গট করতে করতে বেরিয়ে গেল, রিণি যখন কফির কাপের ওপর আধ ইঞ্চি ফেনা তুলতে লাগল তখন আমার আলাদীনের দৈত্যটার কথা মনে পড়েছিল। আমি কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। যেন একটা ঘোরের মধ্যে থেকে জেগে উঠলুম। যেন আমার জ্বর-বিকার হয়ে অনেকদিন কোমা ছিল, সবে জ্ঞান ফিরে এসেছে। রিণি যখন ফেনাগুলো তুলছিল জানতুম, চুপসে যাবে, কিন্তু যতক্ষণ ফেনাটা থাকে বুদবুদগুলো দেখতে মজা, চুমুক দিতেও মজা। আমারও ওই ফেনার দশা হবে না তো। এই ক'মাস আগে সামনের বাড়ির প্রীতিদি বিয়ে করলেন। ছোটভাইবোনদের মানুষ করে। তাদের বিয়ে-থা দিয়ে তারপর নিজের এক সহকর্মীকে বিয়ে করলেন। পাড়াময় সব কী হাসি! সমালোচনা! মাথায় ফুল দিয়েছিলেন বলে টিটকিরি। আমার খারাপ লাগেনি। সত্যি বলতে কি, প্রীতিদির জন্যে ভালবাসায়, শুভকামনায় মনটা ভরে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে হল প্রীতিদি আমার চেয়েও দু'বছরের বড়। তবে কি আমি সত্যি ছেলেমানুষ! সত্যি ব্যাকডেটেড!

আমাদের বাড়ি একটু অলি-গলি দিয়ে শর্টকাট করলে লেকের বেশ কাছেই। চিলড্রেন্স পার্কের দিকটা দিয়ে ঢোকা যায়। যদি কোনওদিন ভোরবেলা রিণিকে নিয়ে যেতুম তো দেখতুম অনেকে হন হন করে হাঁটছে, অনেকে আবার ছুটছে। কিছু কিছু তরুণ যুবক অল্পবয়স্ক মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাবার উদ্দেশ্যে আবার শরীর ফিট রাখবার জন্যেও ওই সময়ে বেরিয়ে পড়ে। রথ দেখা, কলা বেচা দুইই হয়। আমি রিণিকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম—'ওই যে সব লম্বা কিরকমের ড্রেস পরে ছুটছে ওগুলোকে কী বলে রে?' রিণি বলল 'ট্র্যাক স্যুট।' ক'দিন পরেই এরা দু ভাই-বোন কলেজ অফিস বেরিয়ে গেলে আমি দোকান খুঁজে ওইরকম এক ট্র্যাক স্যুট আর একজোড়া ক্যামবিসের জুতো কিনে আনলুম। আর তার পর দিন ট্র্যাক স্যুটটা পরে তার ওপর একটা তোয়ালে আর চাদর চাপিয়ে হন হন করে হাঁটতে লাগলুম লেকের দিকে। পৌঁছেও হাঁটছি, হন হন করে হাঁটছি, হাঁপিয়ে পড়লে একটু বসছি, আবার হাঁটছি। যত বেলা বাড়ছে, পরিচিত মুখগুলোও বাড়ছে। আমি হয়ত চিনি না, কিন্তু তারা আমাকে চেনে। মাসিমা, হাঁটতে বেরিয়েছেন?' 'মাসি ডায়বিটিস নাকি? ডাক্তার বলেছে?' জগিং করুন, জগিং করুন।' এইসব কথা আমার হনহন হাঁটার তালে তালে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে-যাওয়া হাওয়ার মতো পৌঁছয়, আমি সবেতেই কোনমতে ঘাড় নেড়ে, গটগট করে

বেরিয়ে যাই। অর্থাৎ হ্যাঁ, আমি হাঁটতে বেরিয়েছি, হ্যাঁ আমার ডায়াবেটিস হয়েছে, হ্যাঁ ডাক্তার বলেছে, ঠিক আছে আমি জগিং করব। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে বাড়ি ফিরে যাই। তোয়ালে দিয়ে ঘামগুলো বেশ করে মুছে ফেলি, একটু বিশ্রাম নিই। তারপর যখন ছেলেমেয়েরা ওঠে, দেখে আমি লম্বা ভিজে চুল মেলে মেঝের এক প্রান্তে বসে আনাজ কুটছি।

তারপর দেখলুম একটু দেরি হয়ে গেলেই বড্ড চেনা মুখের সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে। মাসি, কাকি, চিনুদি আরে! কখনও তো দেখিনি! দ্যাটস ভেরি গুড! ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া আমার পায়ের পেশীগুলো বেশ টাইট হয়ে গেছে। আমার এখন দৌড়তে ইচ্ছে করে। টেনে দৌড়। কিন্তু ওই ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নি, বোনপো-বোনঝি, ছোটভাই-ছোটবোনদের সামনে দৌড়তে আমার কেমন যেন কেমন-কেমন লাগে। এদের মধ্যে কেউ একজন রবি-রিণিকে বলে দিয়ে এলেই হল তোদের মা'র মাথাটা দেখা। গোলমালের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তাই একদিন সবচেয়ে ভোরবেলার বাসে চড়ে আমি প্যাঁ পোঁ করে ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছে যাই। সে-ও একরকম দৌড়। খালি রাস্তা পেয়ে বাস-ব্যাটা বোঁ, বন বন করে ছোটে, আমার কানের পাশের চুলগুলো শাঁ শাঁ করে পেছনে উড়তে থাকে, মুখের ওপর দুরন্ত দস্যি হাওয়ার ঝাপট, মাঝে মাঝে অতর্কিত ব্রেক কষার জন্যে একটু সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। ভোরের বাস, যাত্রী বিশেষ নেই। কন্ডাক্টর এগিয়ে এসে বলে, 'দিদি লাগল না তো! এই ডেরাইভার, শালা রঘুনাথ, থোড়া দেখকে চালা না বাবা, দিদির যে লাগল।'

ভিক্টোরিয়ায় ভারি অদ্ভুত দৃশ্য। ঠিক হিপোপটেমাসের মতো একটি দুটি মাংসপিণ্ড, স্পোর্টস গেঞ্জি আর শর্টস পরে, ম্যামথের শুঁড়ের মতো থাই নাচিয়ে নাচিয়ে দৌড়চ্ছেন। ছোটার তালে তালে থাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জায়গার অতিরিক্ত মেদ চর্বিগুলোও কত্থক নাচছে, দুনি তালে। বেশ কিছু মহিলাকে দেখলুম একদম সীলমাছের মতো, কি সিন্ধুঘোটকের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে দৌড়চ্ছেন আর দরবিগলিত ঘর্মধারা মুছে যাচ্ছেন। এঁদের কাছে আমি শিশু। হিমালয়ের পাশে নেংটি ইঁদুরের ছানা। সুতরাং এক নং পুকুর, অর্থাৎ ক্যাথিড্রাল রোডের দিকের পুকুরটার পাশ দিয়ে মোটামুটি বেড় দিয়ে দৌড়তে থাকি, এক পাক দৌড়ে অশ্বারোহী মূর্তির তলায় বসি, আবার দৌড়ই। আমার পাশ দিয়ে নতুন ওঠা ঘাস আর জলের গন্ধ বয়ে হাওয়া শনশন করে আমার পাশে পাশে দৌড়য়। বলে চিনু, চিনু, আর একটু জোরে, আর একটু ... তোমার উড়ন তুলোর গুছিগুলো পেয়ে গেলেও যেতে পারো। আর যদি আরও জোর পারো, তাহলে একেবারে চাঁদের মা বুড়ির দেশে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আমি সত্যি সত্যি হাওয়া হয়ে যাব। তারপর দুই ডুবে তুমি কী নেবে না নেবে সে তোমার ব্যাপার! তুলোর পেঁটরা চাও না অলঙ্কারের প্যাঁটরা চাও না রাজজকুমারের প্যাঁটরা চাও সে তোমার ব্যাপার! আমি দৌড়তে দৌড়তে বলি, আগে তো ছোটার জন্যে ছুটি, তারপর হাওয়া তোমার সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতাহীন প্রতিযোগিতা, কেন না তোমাকে তো আমি সত্যি-সত্যি হারাতে পারব না। তবে তুমি যদি একটু ভালেবেসে আমার সহ দৌড়বাজ হও তো চাঁদের মা বুড়ির তুষারশীতল, মন-প্রাণ-ঠান্ডা করা শান্তির দেশে একমাত্র জীবিত মানুষ হয়ে উজ্জীবিত কিশোরী হয়ে আমি প্রবেশ করলেও করতে পারি বটে। তারপর বর, প্যাঁটরা ও সব আমার ব্যাপার। একটা মুশকিল হতে লাগল, অন্য যাঁরা দৌড়তে আসেন—বেশিরভাগই গাড়ি চড়ে। কাজেই অদ্ভুত বেশে বাড়ি ফিরে যাওয়ার তাঁদের কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু ফেরবার সময়ে ট্র্যাকস্যুট পরে আমার ট্রামে-বাসে একটু অসুবিধে হয়। আর একটা মুশকিল আমার মোটা বেণীটা, ছোটবার সময়ে শপাং শপাং করে আমার পিঠে চাবুক মারে। ভেবে-চিন্তে চুলটা কেটে অর্ধেক করে ফেললুম। পেছনে শক্ত করে একটা ঝুঁটি বেঁধে নিই। একজন বয়স্ক মহিলা আসেন মুরঅ্যাভেন্যু থেকে। অশ্বারোহীর তলায় বসে তাঁর সঙ্গে ভাঙা হিন্দি আর ভাঙা ইংরেজিতে ভাব জমিয়ে ফেললুম। ফেরবার সময়ে তিনিই আমায় আমার গলির মোড়ে ছেড়ে যান। ভদ্রমহিলার মহা চিন্তা। ডাক্তার দু-স্লাইসের বেশি রুটি দিচ্ছে না। ক্লিয়ার চিকেন স্যুপ। দু-টুকরো চিকেন, কচি মাছ পঞ্চাশ গ্রাম, বাঁধাকপি আর জল খেতে বলেছে। খিদে পেলেই

জল। নো চকলেট, নো আইসক্রিম, নো ফ্রুটস বাট কিউকামবার, অ্যান্ড টী উইদাউট মিল্ক অ্যান্ড শুগার। আই অ্যাম সো ফন্ড অফ পোট্যাটোজ—ইন এনি ফর্ম। হী ডাজন্‌ট লেট মী হ্যাভ ইভন এ হ্যান্ডফুল অফ গ্রেপস। হাই মেনি টাইমস ক্যান ওয়ান হ্যাভ গ্রেপফ্রুট জুস? ভদ্রমহিলা ককাতে থাকেন। সবেতেই নাকি প্রচুর প্রচুর ক্যালোরি। তাঁর ব্লাড শুগার তিনশ পঁয়ত্রিশ। হার্টে মেদের চাপ পড়ছে। ডাক্তার বলেছে ইদার য়ু ফলো দিস রেজিমেন অর য়ু ডাই। ভদ্রমহিলা আমার পরামর্শ চান কোনটা গ্রহণ করবেন। আমি দ্বিতীয়টা অপছন্দ করি না। কিন্তু সে কথা তো তাঁকে বলা যায় না। তাঁকে প্রাণপণে বোঝাতে থাকি শাক খান, শাকে মিনার‍্যালস আর ভিটামিন আছে। তিনি নিশ্চয় রোগা হবেন। ব্লাড শুগার কমবে, প্রেশার কমবে। একটু-আধটু আলুভাজা, আম, আঙুর, এইসব তাঁর প্রিয় জিনিস খেতে পারবেন। তবে হ্যাঁ বুঝেসুঝে।

আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। কোন বড় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আমাকে বললেন আই টেক ইন্‌স্‌পিরেশন ফ্রম ইউ। তুমিও নিশ্চয়ই একদিন আমারই মতো ছিলে ডাক্তারের পরামর্শমতো খেয়ে আর ছুটে ছুটে এখন এত সুন্দর স্লিম হয়ে গেছ। ইয়োর স্কিন ইজ গ্লোয়িং। য়ু আর লুকিং লাইক আ বাডিং অ্যাথলিট।

আমি ভদ্রলোকের ভুল ভাঙিয়ে দিই না। আমি যে কোনদিনই তাঁর মতো কুমড়োপটাশ ছিলুম না, শুধু ছিলুম কিছুটা আকারহীন, থপথপে থলথলে, সেটা তাঁর কাছে ভাঙি না। চুপ করে হেসে যাই। তিনি অবশ্য দূরের দিকে দুঃখিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন—'বাট ইউ আর ইয়াং। লেট টোয়েনটিজ কি আর্লি থার্টিজ-এ পারা যায়, তা কি আর ফিফটিজ-এ হয়?' আমি চমকে উঠলুম। গ্লোয়িং স্কিন, বাডিং অ্যাথলিট, লেট টোয়েনটিজ, এসব আমায় চমকে দিল। কিন্তু এখনও আমায় আরও দৌড়তে হবে।

আলমারির গায়ে লম্বা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। শায়া, ব্লাউস, ধনেখালি সরু পাড় শাড়ি, না কুঁচিয়ে পরা, তা সত্ত্বেও আকার বোঝা যাচ্ছে। মুখের চামড়া, টান টান হয়ে আছে, যেন পাতলা করে কিছু ক্রিম মেখেছি। চুলগুলো, দাঁত সব ঝকঝকে করছে। চলতে ফিরতে পারি যেন হাওয়ায় ভেসে, বাঁক নিতে উঠতে বসতে কোনও কষ্ট নেই। একদিন দরজায় বেল শুনে তুরতুর করে নেমে দরজা খুলতে যাচ্ছি দেখে, রিণি মন্তব্য করল—'মা তোমার কী হল? হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবার একটা কাণ্ড করবে দেখছি?' আমি তাড়াতাড়ি সামলে নিই।

এরপর আমি যোগ আর সাঁতারে ভর্তি হই। সেই সঙ্গে লাইব্রেরিতে। সাঁতার আমি চিৎ উপুড় সব জানি। ওসব আমায় শেখাতে হবে না। যোগও আমার অল্পবয়সে অভ্যেস ছিল। সাধা গলায় গান তুলে নেবার মতো, এতেও কোনও অসুবিধে হয় না। শুধু দৌড়টা সম্পূর্ণ করবার জন্যে এসব করি।

তারপর একদিন দোকানে গিয়ে দরকারমতো কিছু কেনাকাটা করি। সুটকেস গুছিয়ে নিই। হাতব্যাগ গুছিয়ে নিই। রাত্তিরবেলায় ছেলে মেয়েকে খেতে দিয়ে, নিজে খেতে খেতে বলি,—'রবি চেকবইটা রাখ। হঠাৎ যদি দরকার হয় তুলবি। রিণি, দুজনের মতো একটু রান্না করে নিতে পারবি না? রবিও সাহায্য করবে।' ওরা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায় বলে—'কেন? কী ব্যাপার? তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

—হ্যাঁ, কাল ভোরের ট্রেনেই।

—সে কি? কে সঙ্গে যাবে? একা একা কোথায়... কেন! নিরুদ্দেশ হচ্ছো নাকি? কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে? টিভি-তে ছবি? কী করেছি আমরা?

আমি হেসে বললুম—'এতগুলো প্রশ্নের জবাব কি করে দিই বল তো? আমার সঙ্গে কাউকে যেতে হবে না। আমি একাই পারবো। না, নিরুদ্দেশ হচ্ছি না। বড় জোর মাস ছয়েক। নিয়মিত চিঠি দিয়ে যাব। ভাবিস না। না তোরা কিছু করিসনি। আবার করেছিসও। ভাল করেছিস। কোথায় যাচ্ছি?'

—'বলব না।'

—'এত রহস্য কেন? মা তুমি কি চুপিচুপি কাউকে খুনটুন করে পালাচ্ছো?' রিণি বলল।

—'মা, ডোন্ট মাইন্ড, ইলোপ-টিলোপ করছ না কি কোনও মামু কাকুর সঙ্গে?'

—রবি বলল।

আমি বললুম—'যতই কেন আমায় ক্ষেপাও আর তাতাও, আর একটা কথাও আমার মুখ দিয়ে বার করতে পারবে না। এইটুকু শুধু বলছি ভাবনার কিছু নেই। মাস ছয়েকের মধ্যে ফিরে আসব। চিঠি পাবে। তোমাদের যদি কিছু বিপদ-আপদ হয়, বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে। না হলে আমি সময় হলেই ফিরে আসব।'

লেকের কিছু কিছু গাছ চিনতুম। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার বাগানে প্রায় কোন গাছই চিনতুম না—সর্বজয়া বা ক্যানার ঝাড় ছাড়া। গাছ প্রদীপের মতো দুধারে লালচে শক্ত শক্ত পাতা মেলে দাঁড়িয়ে থাকত ও কী গাছ? জানা ছিল না। গাছটা দেখলেই আমার মনের মধ্যে শত শিখায় প্রদীপ জ্বলে উঠত। গুঁড়ি গুঁড়ি পাতায় কুয়াশার মতো ওটাই বা কী গাছ? যেন রহস্যের ঘেরাটোপ পরে আমায় ডেকেই যাচ্ছে। ডেকেই যাচ্ছে। ডাকও নয় হাতছানি? কিন্তু এখানকার সব গাছপালা আমি মোটামুটি চিনি। সকলেই চেনে। কোথায় এসেছি? বলব না । এমন কি কোন ইস্টিশান থেকে কোন ট্রেন ধরে এসেছি সে সবও বলব না। তোমরা ভীষণ চালাক ধরে ফেলবে। অজ্ঞাতবাসের সময়ে পাণ্ডবেরা কী করেছিলেন? নিজেদের পুরনো পরিচয় মুছে ফেলে অন্য মানুষ হয়ে গেছিলেন না? কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিয়েছিলেন নিজেদের গতিবিধি? নিজেদের পরিচয়? ভীম নিরুপায় হয়ে প্রায় ধরা দিয়ে ফেলেছিলেন আর কি! যাই হোক কোনও সূত্র আমি কাউকে দেব না। শুধু এইটুকু বলি যে কু ঝিকঝিক করে যাওয়া হল না। ভোঁ করে দেবদত্ত কী পাঞ্চজন্যের পিলে চমকানো আওয়াজ চড়ে গিয়েছিলুম।

২

কত কত দিন হয়ে গেছে, তবু আমি এ জায়গায় অন্ধিসন্ধি চিনি। গলির মুখে জোড়া নিমগাছ। পাশ দিয়ে সরু একটা নোংরা গলি বেরিয়ে গেছে। গলির মুখে একটা টিউবওয়েল হয়েছে দেখছি। ডান দিকে অশথ গাছের তলায় গোল একটা পাথর তার ওপর কিছু ফুল বেলপাতা। একটু সাদা সাদা কস গড়াচ্ছে। অর্থাৎ দুধও ঢেলেছে কেউ। যতদিন যাচ্ছে মানুষের দেবতায় ভক্তি ততই বেড়ে যাচ্ছে। জীবনটা বড্ড অনিশ্চিত হয়ে গেছে তো! ওই তো ইস্টিশানের রেলিং-এর ধার ঘেঁষে মস্ত বড় শিরীষ গাছ। ইসস্ ঠিক তেমনি আছে। হাতির শুঁড়ের মতো কালো নল বেঁকে আছে, ওইখান থেকে এক্সপ্রেস মেল ট্রেনরা জল নেয়। মাথায় করে ছোট ছোট ঝুড়িতে কয়লা বয়ে ডেঁয়ো পিঁপড়ের মতো ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে এক সারি কয়লাকুড়ানি। শিরীষ গাছটার পেছন থেকে রিকশা স্ট্যান্ড আরম্ভ হয়েছে। একটা রিকশাতে উঠে বসে গন্তব্য বলে দিলুম। অমনি হাওয়ায় উড়তে লাগল খোকাটা। আমার বিলুর বয়সী হবে হয়ত।—'এখখুনি পৌঁছে দিচ্ছি ছোড়দি।'

নির্দিষ্ট বাড়িটার কাছে এসে আমি অবাক। পলেস্তারা খসে গেছে। যেখান সেখান থেকে গাছ বেরিয়েছে। দরজা জানলায় রঙ নেই। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তবু কড়া নাড়লুম। বেশ কিছুক্ষণ নাড়ার পর এক দশাসই চেহারার মহিলা এসে দরজা খুলে দিলেন। খুলেই বললেন—'আমাদের কিছু কেনার নেই, সাবান, পাউডার, ধূপ, সিঁদুর কিছু না। আপনি আসতে পারেন।' দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। আমি বললুম—'এটা ব্রজনাথ সিংঘির বাড়ি না?'

ভদ্রমহিলা একটু থতিয়ে গেলেন। বললেন—হ্যাঁ, তো কি?'

—'আসলে আমি একটা ঘর ভাড়া খুঁজছিলুম। শুনলুম ব্রজনাথ সিংঘির বাড়ি অঢেল জায়গা। আমার একটু স্থান হতে পারে।'

—'তুমি ক্যা?'

—'আমার নাম চিন্ময়ী চক্রবর্তী। আমি কলকাতায় চাকরি করি। তা ওখানে কোনও হোস্টেলে জায়গা পেলুম না। তাই এই মফস্বল টাউনে এসেছি। একটু থাকবার জায়গা, আর খাবার ব্যবস্থা যদি হয়। মাসে এক হাজার টাকা করে দেবো।'

—'কি বলল্যা? হাজার?' মহিলার মুখ হাঁ হয়ে গেল। বুঝলুম এখনও এই টাউনে টাকার দাম বেশিই আছে। আমি তাড়াতাড়ি বললুম—'আমি কলকাতায় খুঁজছি। পেলেই চলে যাব। মাস ছয়েকের মধ্যেই একটা পাওয়ার কথা আছে।'

—'না না সে কথা বলছি না। বলছি আমাদের ঘর দুয়োর তোমার পছন্দ হবে কেন গো মেয়ে, আমাদের খাওয়া-দাওয়া...'

'আমি বললুম—'এখনও তো দেখিইনি, একটু যদি দেখান।'

—'তুমি কী কর, মেয়ে?'

চিন্ময়ী চক্রবর্তীর পরনে গোলাপি রঙের সালোয়ার আর সাদার ওপর গোলাপি বুটির কামিজ। একটা সাদা ওড়না বাঁ কাধ থেকে ভাঁজ করা অবস্থায় ঝুলছে। চুলগুলো মাথায় ঝুড়ির মতো হয়ে আছে, কপালে ছোট্ট একটা গোলাপি টিপ। নখ সুন্দর করে কাটা। পায়ে কালো স্যান্ডাল।

আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রশ্নটা করলেন মহিলা। চিন্ময়ী বলল—'আমি জার্নালিজম করি। মানে সাংবাদিকতা।'

ভদ্রমহিলা হাঁ করে রইলেন।

বললুম—'খবরের কাগজে লিখি। খবরের কাগজের কাজ করি।'

—'ওরে বাবা, ও পুঁটু, ধানু, জংলু খবরের কাগজের লোক এয়েছে রে।'

মুহূর্তের মধ্যে বাড়ির ভেতর থেকে এক দঙ্গল ছেলে বার হয়ে এল, এবং একটি মেয়ে। রোগা, পাকানো চেহারা উল্টোপাল্টা জামাকাপড় পরা কিন্তু চোখগুলো জ্বলছে, মুখগুলোও বেশ উজ্জ্বল।

—'কী চান। কী চান!' —একজন বলল।

আরেকজন বলল—'তুই সর বে, কে আমি দেখছি, কোন সালী, কোন বাঞ্চোৎ।

চিন্ময়ী হাত তুলে থামাতে ইঙ্গিত করল ওদের। তারপরে বলল, ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকবার জন্য এসেছিলুম। এ বাড়িতে অনেক জায়গা আছে, কে একজন মহিলা ভাল রান্না করতে পারেন শুনে। তা আপনাদের এত আপত্তি থাকলে আমি চলে যাচ্ছি।'

পেছন ফিরতে ফিরতে চিন্ময়ী বুঝতে পারল মহিলা ছেলে মেয়েগুলোকে চুপি চুপি কিছু বলছে। মেয়েটিও কোমরে হাত দিয়ে ডাকল 'এই যে শুনছেন?'

ফিরে দাঁড়িয়ে চিন্ময়ী বলল, 'কী?'

—খাওয়া থাকার জন্যে দিমাকে আপনি হাজার টাকা দেবেন বলেচেন?'

—'বলেছি।'

—'তো থেকে যান!'

—'এখানে আমার পোষাবে না মনে হচ্ছে—' চিন্ময়ী আবার ফিরে দাঁড়াল।

—কেন? তিন-চারটে মিশ্রিত গলায় শোনা গেল।

চিন্ময়ী বলল—'এইরকম বে-টে, শালী-টালি, মারমুখো ভাব এসব আমার চলবে না। কে জানে ভেতরে কিসের আড্ডা। মস্তানি-টস্তানি; ড্রাগ-ট্রাগ; সাট্টা-ফাট্টা। থাক আমি অন্য কোথাও খুঁজে নিচ্ছি। অনন্ত ঠাকুরমশায়ের বাড়িটাও তো আছে?'

ছেলেমেয়েগুলো সব পেছন থেকে এক দৌড়ে সামনে এসে চিন্ময়ীর পথ রোধ করে এসে

দাঁড়াল।—'অনন্ত ঠাকুরের ছেলের বউ মরে গেছে। ছেলে হাত পুড়িয়ে খায়। বাড়িতে তিনটে খোকা-খুকু সব সময়ে খাই-খাই করচে। তোমাকে আস্ত গিলে খেয়ে নেবে।' একজন বলল।

—আর একজন বলল—'হুঁঃ ড্রাগ! ফ্যান ভাত জুটলে বেঁচে যাই, শাক সেদ্ধ আর আলুসেদ্ধর সঙ্গে, আবার ড্রাগ! আর সাট্টা-ফাট্টা রিকশঅলারা খেলে—আমাদের রেস্ত কোথায়?'

চিন্ময়ীর রিকশাঅলাটা তখনও বোধহয় মজা দেখতে দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়েটা কোমরে হাত দিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল, 'এই মদ্না, তুই সাক্ষী দে না আমরা সাট্টা খেলি না তোরা খেলিস!'—উত্তরে মদনা এবার সাইকেলে প্রাণপণে প্যাডেল করতে করতে বেরিয়ে গেল।

—'দেখলেন তো!' মেয়েটা তেমনি কোমরে হাত দিয়ে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বলল।

চিন্ময়ী বলল—'ওই সব শালী-টালি চলবে না আমার।'

—'সরি ম্যাডাম'—একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল—'ও সব আমাদের নিজেদের মধ্যে আদরের ডাক। আর বাইরের পার্টিকে ভড়কাতে খুব কাজে লাগে।

—'ভড়কাতে হয় কেন?—চিন্ময়ী একটু কঠোর গলায় বলল।

—'ভড়কাতে ...মানে...হয়... এই আরকি!' ছেলেটা স্পষ্ট করে কিছুই বলে উঠতে পারল না। তখন মহিলা এগিয়ে এসে বললেন—'ও হতভাগারা বলতে পারবে নে। আমি বলচি। সিঙ্গি মশাইয়ের ছেলে আমাকে এই বাড়ি দেকাশোনার ভার দিয়ে চলে গেল। বিদেশ থেকে মাসে মাসে ট্যাকা পাঠায়। এই পুঁটুটা আমার বোনঝির মেয়ে, পটলটা ভাইপোর ছেলে। ওদের কেউ নেই তাই ঠাঁই দিয়েছি। সে কতা তো আর বাবু জানে না। আর এই সব বাকিগুলো সব হাড়-হাভাতের দল। ছোটলোকের বাচ্চা, সর্বক্ষণ এখানে পড়ে আচে। সোনার নাতি-নাতনি আমার সঙ্গদোষে বজ্জাত হয়ে যাচ্চে মা। তুমি এখানে থাক। বিনিবামনীর রান্নার সুখ্যাত শুনে যখন এয়েচ!"

'ছোটলোকের বাচ্চা' পর্যন্ত শুনেই বাকি ছেলেগুলো আহত অভিমানে অস্বাভাবিক গম্ভীর করে চলে যাচ্ছিল। যেতে যেতে একজন বলল—'চোর বাটপাড় থেকে বাঁচাতে হলে বোলো দিমা, খুব বাঁচাব।'

চিন্ময়ী চেঁচিয়ে ডাকল—'এই ছেলেরা শুনে যাও।' ওরা দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু কাছে এল না।

চিন্ময়ী বলল—'আমি এ বাড়িতে থাকলে তোমাদের আপত্তি আছে? আমার যখন-তখন কাজ, বেরিয়ে যাই। জিনিসপত্র থাকবে। তোমরা একটু পাহারা না দিলে...। আমাকে অবশ্য কেউ কাবু করতে পারবে না। আমি কারাটে কুংফু সব জানি...।' বলে সে ডান পাটা সোজা উঁচুর দিকে ধাঁই করে ছুঁড়ল।

—'স-ব?' পুঁটু এগিয়ে এল—'আমায় শিখিয়ে দেবেন!'

—'শেখা কি অত সহজ? শরীরটা আগে দুরস্ত করতে হবে পিটে পিটে!' সঙ্গে সঙ্গে বলা নেই, কওয়া নেই, পুঁটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সটান পেছন দিকে হেলে হেলে চাকা হয়ে গেল। তারপর আবার অবলীলায় উঠে পড়ে হাত দুটো নামিয়ে হাতে ভর দিয়ে পা দুটো ওপর দিকে তুলে পীকক হয়ে গেল, তার ফ্রকের ঘের তলার দিকে ঝুলে পড়েছে, লাল সালুর ঝালর দেওয়া ইজের বেরিয়ে পড়েছে। সে দু-হাতে হন হন করে চলতে লাগল। ওদিকে পটলা পাক খেয়ে গোরুর গাড়ির চাকা হয়ে অন্তত বিশগজ চলে গেছে। তারপর আবার চক্রাকারে ফিরে সে বলল—'মাসকুলগুলো দেখুন!' হাত ভাঁজ করে সে তার বাইসেপস ট্রাইসেপস দেখাতে লাগল, দু'জনেই বলল—এতে হবে না?'

'হবে, হবে'—হেসে ফেলল চিন্ময়ী, 'তবে সব কি আর শেখাতে পারব? কয়েকটা মোক্ষম প্যাঁচ শিখিয়ে দিতে পারি। কি হল? ধানু জংলু তোমরা বললে না তো কিছু?'

—'পটলার দিমার ট্যাঁক ভারী হবে, তো আমাদের ছোটলোকের বাচ্চাদের কী বলবার আচে?' এই সময়ে দিমা এগিয়ে এসে বললেন—'আর ঢঙে কাজ নেই। অনেক ঢঙ দেখিয়েচ। বিকেলে মুড়ি ভেজে রাকবো, তেলেভাজাগুলো নিয়েসো দয়া করে। আপনি আসুন মা।'

ভেতরে ঢুকেই চিন্ময়ী একটা শক খেল। উল্লাসের শক, আবার আঘাত পাবার শক। চেনার ধাক্কা, চেনাকেও না চেনার ধাক্কা। সেই চতুষ্কোণ উঠোন। চারপাশে উঁচু দাওয়া। দাওয়ার ওপর সারি সারি লম্বা চওড়া দরজা। ওই তো রান্নাঘর। তার পাশেই খাবার ঘর, তারপর খানিকটা ফাঁক, চওড়া সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। তার পাশে জ্যাঠামশাইয়ের চেম্বার-ঘর, তারপর এজমালি বৈঠকখানা। দাওয়ার উত্তর দিকে একটা দরজা। দুপাশে দুটো কলঘর। তার পাশে বামুনঠাকুর আর টেকন চাকরের আস্তানা। শুদ্দুরের সঙ্গে থাকতে হচ্চে বলে নীলকণ্ঠর বড্ড আফশোস ছিল। মাঝখানের দরজা দিয়ে ওপারে গেলেই, আর একটা মহল। ঠিক এই রকম ক্যারামবোর্ডের মতো আর একটা উঠোন। সিংঘিবাবুদের। মেজদা বলত 'সিঙ্গিমশাই, সিঙ্গিমশাই মাংস যদি চা-ও।' অমনি জেঠিমা বেরিয়ে এসে বলতেন 'কী হচ্ছে ভুতু, উনি তো আমাদের কোনও ক্ষতি করেননি! গুরুজনদের নামে ছড়া-কাটা আমি পছন্দ করি না।' মেজদা হেসে বলত—'বা রে, অমনি গোঁপ আর এমনি ঘ্যাঁক করে আওয়াজ করলে যদি আমার ছড়া মনে আসে! ছড়া তো ভাল জিনিস। ছড়া থেকে পদ্য, পদ্য থেকে কবিতা আর কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথ!' জেঠিমা হাতের খুন্তিটা নীরবে নেড়ে, চোখ পাকিয়ে একটা রাগত ভঙ্গি করে রান্নাঘরে ঢুকে যেতেন। কচুর শাক রান্না হচ্ছে, কষতে কষতে জান বেরিয়ে যাবে তবে সেই অমৃতময় স্বাদ বার হবে।

সিংঘিবাবুদের উঠোনটার চারপাশে চারটে নর্দমার গর্ত ছিল। ছোড়দি বলত—'দ্যাখ এটা হল দৈত্যদের ক্যারামবোর্ড।' চিনু বা ছোটরা জিজ্ঞেস করত—'দৈত্যরা কখন খেলে ছোড়দি!' ছোড়দি বলত—'অবশ্যই রাতে, সব্বাই, বিশ্বসংসারের স-ব ঘুমিয়ে পড়লে!' চিনু বলত 'ঘুঁটি কই? দৈত্যদের?' ছোড়দি পাল্টা প্রশ্ন করত 'বল দিকিনি, পারিস কি না!' অনেক ভেবে, নিজের কল্পনাকে অনেক দূর টেনে-হিঁচড়েও দৈত্যদের ঘুঁটির খবর চিনু বার করতে পারত না। তখন ছোড়দি রহস্যময় হেসে বলত 'আরে বোকা, আমরা, আমরা সবাই। সিংঘি জ্যাঠার ছেলেমেয়েরা কালো ঘুঁটি, আমরা সাদা ঘুঁটি। আর চিনু তুই রেড। তোকে নিয়ে সে কী লড়ালড়ি হয় তা যদি জানতিস!' চিনু ভয়ে কাঁটা হয়ে যেত, দৈত্যদের ঘুঁটি হওয়াই যথেষ্ট ভয়াবহ। তার ওপর রেড, যার ওপর দু-দলেরই ঝোঁক। সারারাত তাকে নিয়ে লড়ালড়ি হয়? সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করত—'স্ট্রাইকার কই, ছোড়দি।' ছোড়দি তখন এমন সোডার বোতল খোলার মতো হেসে উঠত, যে উত্তরটা বোঝাই যেত না। অবশেষে তার চোখের জলে নাকের জলে অবস্থা থেকে অনেক কষ্টে বার হত স্ট্রাইকার হলেন সিংঘিমশাই আর আমাদের জ্যাঠামশাই।

—'আমরা কেউ বুঝতে পারি না তো!' চিনুর বোন মিনুর প্রশ্ন।

—'বুঝতেই যদি পারবি তো আর দৈত্যদের কাণ্ডকারখানা বলেছে কেন। ঘুমের মধ্যে আমরা সব গুটিয়ে গোল হয়ে চাকতি মতো ঘুঁটি হয়ে যাই। তবে চিনু একটু একটু বুঝতে পারে।'

—'কই পারি না তো?'

'ঘুমের মধ্যে চেঁচাস না?'

সত্যি ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে-ওঠা, বিড়বিড় করে কথা বলা এইসব চিনুর অনেকদিন পর্যন্ত অভ্যেস ছিল। মা তার জন্যে একটা নোয়া পরিয়েছিলেন। জ্যাঠামশাই ওষুধ দিতেন। অব্যর্থ প্রমাণ। ঠিক ডমরুধরের কোমরে কুমীরের দাঁত পরিয়া থাকার মতো অব্যর্থ।

আপাতত সিংঘিবাবুদের সেই ক্যারামবোর্ড দেখা যাচ্ছে না। চক্কোত্তিদের অংশেরটা দেখা যাচ্ছে। ঝোপ, ঝাড় শ্যাওলা, পেছল, কতদিনের আবর্জনা, সব সব। যাচ্ছেতাই। এইখানে তারা ব্যাডমিন্টন খেলত। শাটল্‌ককটা একদিন মাছের ঝোলের মধ্যে পড়ে গেছিল সেই থেকে রোববার সকালে ব্যাডমিন্টন বন্ধ। বড়দা দুদিকে দুটো দুশ ওয়াটের বাল্‌ব লাগিয়ে দিয়েছিল। বিকেল থেকে সন্ধে, অনেক সময় রাত্রে, রান্না হয়ে যাবার পর রান্নাঘরে শেকল তুলে খেলা হত।

তার মুখ কুঁচকে উঠেছে দেখে দিমা ভয়ে ভয়ে বললেন—'কী মা, পছন্দ হচ্ছে না?'

—'এত নোংরা! পরিষ্কার করা যায় না।

—'কেন যাবে না?' পটলা এগিয়ে এল—'দুদিন সময় দিন, একেবারে মোজাম্বিক করে দোব।'

—'দিও। এখানে তো ব্যাডমিন্টন খেলা যায়। তা দিমা আপনি কোথায় থাকেন?'

—আমি মা পটলা আর পুঁটুকে নিয়ে ওই ও-ই ঘরটায় থাকি।'

জ্যাঠামশায়ের চেম্বারটি এখন তাহলে দিমার দখলে। রাশভারি জ্যাঠামশাই, দজ্জাল দিমা।

—'ওপরের ঘরগুলো কী হয়?'

—'তালা দেওয়া আছে মা। ব্যাভার করার হুকুম নেই।'

—'আমার তো দোতলার দক্ষিণ-পুবের ঘরটা ছাড়া হবে না।'

—'তালা তোড় দেগা'—জংলু বলল।

দিমা বলল—'তার দরকার হবে না। চাবির থলো আমার কাছে নুকোনো আছে, এই জংলু খবদ্দার কথাটা পাঁচ কান করিসনি। ওতে সব ফার্নিচার রয়েচে কি না! তা তুমি ছ'মাসের জন্যে থাক, তার মধ্যে কি আর সিংঘিবাবুর ছেলে দিল্লি থেকে আসবে? আসবে না কো!'

—তবে আমি ওপরেই থাকব। ফার্নিচার না হলে আমার চলবে কেন? বলতে বলতে চিন্ময়ী ওপরে উঠতে লাগল। সিঁড়িময় ধুলো, বেড়ালের কম্মো, ইঁদুরের নাদি। চিন্ময়ী চক্কোত্তির পেছন পেছন উঠতে থাকে ছেলেমেয়েদের দল এবং দিমা। চিন্ময়ী লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, আর 'ইস কী করে রেখেছে?' বলছে মাঝে মাঝেই। পটলাও লাফাতে লাফাতে চলেছে আর বলছে 'স-ব মোজাম্বিক করে দেবো।'

পুব-দক্ষিণের ঘরটাতে বেশ হাওয়া আসে, ফ্যানও ঝুলছে একটা সিলিং থেকে। আলোও জ্বলে একটা। সিঙ্গল বেড খাট, ভাল বিছানা, মোটা—রঙচটা সতরঞ্চি দিয়ে ঢাকা, একদিকে একটা আলমারি। চাবি দেওয়া, দেয়ালে র‍্যাক কয়েকটা। একটা আয়না ধূলিধূসরিত, একটা টেবিল, দুটো গদিমোড়া চেয়ার। একটা কোল পেতে-বসা ভালুকের মতো কৌচ।

দিমা বললেন—'পাশেই কলঘর আছে মা।'

চিনু জানে। এটা আসলে জ্যাঠামশাইয়ের ঘর। তাদের ভাইবোনেদের অসম্ভব লোভ ছিল এই ঘরটার ওপর। জ্যাঠামশাই যখন নিচের চেম্বারে রুগী দেখতে ব্যস্ত সেই সময়ে চিনুরা ক' ভাইবোন হুড়মুড় করে ঘরটাতে ঢুকে, কেউ খানিকটা জানলা ধরে বাঁদরের মতো ঝুলে নিত। কেউ বাথরুমে গিয়ে খামোকা বেসিনে মুখ ধুয়ে নিত। কেউ আবার কাচের আলমারিতে বইয়ের সারির দিকে অভিনিবেশ সহকারে দেখত কিছুক্ষণ। কেউ চট করে টেবিলের ওপর-রাখা মেমসাহেব-নাচা ঘড়িটাতে অ্যালর্মের দম দিয়ে দিত, অমনি মেমসাহেবটা নাচতে আরম্ভ করত টুং টাং বাজনার সঙ্গে সঙ্গে। এসব জিনিস জ্যাঠামশায়ের রুগীদের উপহার। তা ঠিক সেই সময়ে টেকন চাকর কাঁধে লাল গামছা নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে ঘরে ঢুকত—'কী করছি? অ মা, এ মিনিদিদি, অ চিনিদিদি, নুটুদাদা, যাও, যাও বলুচি।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমাকে বেলুচিস্তানে পাঠিয়ে দিয়ে যাব' বলতে বলতে তিন ভাই বোন দৌড় দৌড়।

ঘরটার মাঝখানে ধুলোর মধ্যে চটিশুদ্ধ পায়ের ছাপ ফেলে চিনু দাঁড়িয়ে রইল। সেই ঘর, যার জন্যে ছোটবেলা থেকে আকণ্ঠ লোভ। সেইখানে অবশেষে চিনু থাকতে পাবে। ঘরটা আর ঠিক সেই ঘর নেই। নেই সেই মেমসাহেব পুতুলঅলা ঘড়ি। সেই হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর ঝকঝকে কাচের নিচে নানা দেশের সুন্দর সুন্দর ছবি। কাচের আলমারিতে পরপর সাজানো বাঁধানো বই। দেয়ালে বাবা-জ্যাঠামশায়ের-বাবা-মা'র যুগল তৈলচিত্র। ছোট্ট ঠাকুমা নাকে নোলক, বেনারসী সামলাতে পারছেন না, এক পা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। গুঁফো ঠাকুর্দা টোপর হাতে চেয়ারে বসে। গোঁফের ফাঁকে সামান্য হাসি। নিশ্চয়ই নতুন-বউ-প্রাপ্তির। কিছু নেই। সবই বদলে গেছে। তবু সবই আছে। স-ব এনে ফেলতে চিনুর অসুবিধে হবে না। অসুবিধে হলে সে এত করে এত দূর দৌড়ে

আসবে কেন? সে টেবিলের ওপর নিজের হালকা সুটকেসটা নামিয়ে রাখল, তারপর বলল—'দিমা, এই আমার জিনিস রইল, কলকাতায় যাচ্ছি। ফিরতে হয়ত বিকেল হবে, তার মধ্যে এইসব গুছনো ফিটফাট চাই। এই নিন আপাতত একশো টাকা। আজকে মুরগী হবে, রাত্তিরে। এরা সবাই খাবে। আর আমাকে তুমি বললেই হবে। এই ছেলেমেয়েরা তোমরা আমাকে চিনুদি বলবে। তরতর করে সে নেমে গেল। দু-তিন কদমে রাস্তায়। তারপর চলতি একটা রিকশায় চড়ে ইস্টিশান।

কোথায় গেলাম? বলব না। আচ্ছা আচ্ছা বলব। সারা দুপুর একটা চমৎকার লাইব্রেরিতে কাটিয়ে, শেষ দুপুরে একটা কোর্স নিচ্ছি, তার ক্লাস করলুম। মাঝখানে একটা মাদ্রাজি রেস্তোরাঁয় একটা মহাকায় মশলা ধোসা আর কফি খেয়ে দুপুরের ভোজন সারলুম, বিকেলের দিকে এক গ্লাস ফলের রস খেয়ে কাজুবাদাম কিনে ট্রেনে উঠলুম। রিকশাতে উঠে সিংঘিবাবুর বাড়ি আসতে আসতেই দূর থেকে দেখলুম দোতলার পুব-দক্ষিণের ঘরে খুব ঝকঝকে আলো জ্বলছে। খুশি-খুশি মনে কড়া নাড়তেই পুরো বাহিনীসহ দিমা দরজা খুলে দিলেন। ঢুকতেই উঠোনটা দেখলুম আধা সাফ হয়েছে, কিন্তু দাওয়া, সিঁড়ি, ওপরের চকমিলোনো বারান্দা, এবং সর্বোপরি আমার থাকবার ঘরটি ঝকঝক করছে।

পুঁটু বলল—'এত দেরি কেন?'

পটলা বলল—আমাদের মুড়ি-তেলেভাজা খাওয়া হয়ে গেল। তেলেভাজা ঠান্ডা হয়ে গেল।'

চিনু বলল—'আমার শুধু চা হলেই চলবে। গা ধুয়ে নিই।'

রাত্তিরবেলা খাবার সময়ে হল মুশকিল। দিমা বললেন—'আমি বামুনের মেয়ে মা, মুরগী ছুঁই না, তাই পাঁঠার মাংস করেছি।'

চিনু বলল—'বেশ তো।' কিন্তু প্রথম গ্রাস মুখে দিয়েই সে হড়হড় করে বমি করে ফেলল। বমি সামলাতে চলে গেল উঠোনে। মুখে-চোখে জল দিল, তবু বমি ভাব যায় না।'

দিমা বললেন—'কি রে ধানু বোকা পাঁঠা আনলি না কি?'

ধানু বলল—'ইস্‌স্‌, দিলেই হল। ধানুকে ফজল বোকা পাঁঠা দেবে! ঘাড়ে ক'টা মাথা! তাছাড়া খেতে তো ফাস্টো কেলাস হয়েচে।

দিমা অপ্রস্তুত গলায় বললেন—'ওমা, মেয়ে বোধহয় পাঁঠা খেতে পারে না গো, তাই মুরগীর কতা বলেছিল।'

ততক্ষণে চিনু নিজেকে সামলে নিয়েছে। আসলে বারো বছর সে মাংস খায়নি। এরকমটা যে হতে পারে তা তার মনে আসেনি। ছেলেমেয়েদের তো প্রায়ই রান্না করে দিয়েছে, এরকম গা-বমি তো করেনি! সে বললে—'রান্না খুব ভাল হয়েছে দিমা। আমার শরীরটা কেমন খারাপ খারাপ লাগছে।'

—'তা হলে কি খাবে মা?'

—'কিছু না খাওয়াই তো ভাল, বমি যখন হয়ে গেল। আপনার কি রান্না করেছেন?'

—'আমি বেগুন পুড়িয়ে নিয়েছি মা। আর এখো গুড় আচে। খাবে?'

—'না, না। গা-বমি করছে তো।'

—'রাত-উপুসী থাকবে মা!'

চিনু মনে মনে ভাবল একটা হরলিক্‌স্‌-টিক্‌স কিনে রাখা দরকার।

যেদিন সত্যি-সত্যি উঠোনখানা মোজাম্বিক হয়ে গেল, এবং ওপর থেকে চিনুদিদি ব্যাডমিন্টনের নেট, শাটল কক আর র‍্যাকেট নিয়ে নেমে এল, সেদিন পটলা ধানু জংলু পুঁটুর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। একবার এ চাকা হয়ে যাচ্ছে, একবার ও। জংলু বলল—'জাল খাটাবার খুঁটি কোথায় পোঁতা হবে দিদি?'

চিনু বলল—'দেখ ভাল করে। মাঝখান বরাবর দু'পাশে গর্ত পেয়ে যাবি।'

—'সত্যি তো! কী করে তুমি জানলে দিদি?'

—'আমি কিছু কিছু ম্যাজিক জানি।'

—'ম্যাজিক? আমায় শেকাবে?'—কোমরে হাত দিয়ে পুঁটু এগিয়ে এল।

—'কত কি তুই শিখবি? কারাটে কুংফু। ম্যাজিক। আপাতত ব্যাডমিন্টনটাই শেখ।'

তারপর কিছুদিনের মধ্যেই দুর্দান্ত খেলা আরম্ভ হয়ে গেল।

মিক্সড ডাবলস্। এদিকে চিনু আর ছোড়দা। ওদিকে মিনু আর মেজদা।

ছোড়দা বলল—'তোর ব্যাকহ্যান্ডটা ভাল। ফোরহ্যান্ড হোপলেস। নইলে মিনুর ওই সোজা শটটা তুলতে পারলি না? একটু ছুটে সামনে এগিয়ে গেলেই...'

মেজদা অর্থাৎ ভুতু স্ম্যাশের পর স্ম্যাশ করে যাচ্ছে। মিনু টুকটুক করে ড্রপ শট। মেজদা আর মিনুর জুটি জিতে গেল। চারপাশে দাওয়ার ওপর ভিড় করে দাঁড়িয়েছে বড়দা, ছোড়দি, সিঙ্গিমশাইয়ের বাড়ির ছেলেমেয়েরা। সবাই মিলে হল্লা করছে। এদের গেমটা হয়ে গেলেই আরও চারজন নামবে। কোনও দলকেই বেশি চান্স দেওয়া হবে না। নইলে অতজন খেলা শেষ করবে কী করে? দিমার রান্নাঘরের শেকল তোলা। পিঁড়ির ওপর পা ছড়িয়ে বসে দিমা খেলা দেখছে, আর মাঝে মাঝে হাই তুলতে তুলতে টুসকি দিচ্ছে। চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে জ্যাঠামশাই দু'দণ্ড জিরিয়ে খেলা দেখে গেলেন। মন্তব্য করলেন—'তোমাদের ঠিক ব্যালান্সড টিম হয়নি ভুতু। চিনুটার তাকত নেই, দম নেই। ব্যাডমিন্টন দমের খেলা। মেয়েটা খেতে পারে না। রাতে বিড়বিড় করে।'

—'কিরমি আছে, কিরমি আছে। তাই মেয়েটা বাড়তে পারছে না।' মা মাথায় ঘোমটাটা তুলতে তুলতে বলল—'ওষুধ দিন না বটঠাকুর।'

—'ওষুধ তো দিচ্ছি। মেয়েটাকে একটু তেতো খাওয়াতে পারছো না?'

—'কী করব? ওয়াক তুলে ফেলে যে! আর জানেন তো, শুধু হাতে গুড়ের নাগরি থেকে মুঠো মুঠো গুড় তুলে চেটে চেটে খায়।'

—'খাবেই! কৃমি ওকে ঘাড় ধরে খাওয়াবে বউমা। ওর দোষ কি?'

—গো-হারান হেরে চিনুদি দাওয়ায় উঠতে উঠতে বলল—'হ্যাঁ, আমি সারাদিন কোথায় না কোথায় ঘুরে ঘুরে সাংবাদিকতা করে বেড়াই, আর তোরা খেলে খেলে সে সময়ে হাত দুরন্ত করে ফেলিস।' 'হেরো! হেরো! হেরো!' জংলু আর পুঁটু দুয়ো দিতে থাকে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চিনু বলে—'এটা কিন্তু নিয়ম নয়। নিয়ম হল খেলার শেষে হেরো পার্টি আর জেতা পার্টি হ্যান্ডশেক করবে, এই এমনি করে'—এগিয়ে গিয়ে সে দেখিয়ে দিল। তারপর বলল—'খেলা মানে আনন্দ, খেলা মানে ব্যায়াম, খেলায় হার-জিত আছেই। হেরে গেলেই হারা নয়, আবার জিতে গেলেই জেতা নয়।'

সারা সন্ধে একেক দিন গপ্প হয়। গঙ্গায় বাইচ খেলার গপ্প বলে ওরা, চিনু বলে ক্যাসিয়াস ক্লের মহম্মদআলি হওয়ার গল্প, মারাদোনার ভাঙা পা নিয়ে মরণপণ খেলার গল্প, ফ্যারাডের বিজলি-বাতি আবিষ্কারের গল্প। বিদ্যাসাগরের দুধ খাওয়া ছাড়ার গল্প, খবরের কাগজের হকার এডিসনের ল্যাবোরেটরি তৈরি করার গল্প। শুনতে শুনতে খাওয়ার কথা মনে থাকে না। শুধু ওরা নয়। আরও জুটেছে ন্যাংলা, পচা, খেঁদি, কেষ্টা, ঝুমু, বালিশ। ভীষণ গাবদা গোবদা বলে ওর নাম বালিশ। দিমা এসে বলে—'আজ কিন্তুক শুদ্ধু ছোলার ডাল, রুটি আর দুধ। এতগুলি রাবণের গুষ্টিকে খাওয়াতে হলে মা আমার দ্বারা এর চে বেশি হবে নে।'

চিনু বলে—'ডালে কুচি কুচি করে নারকেল দিয়েছো তো? ও দিমা!'

জ্যাঠাইমা বলে—'ওঃ মেয়ের যেমন তেমন হলে চলবে না, সব যার যেটি তার সেটি চাই। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে যখন কুমড়োর ঘ্যাঁট খেতে হবে, তখন?'

চিনু বলে—ঘ্যাঁট কেন? কুমড়ো দিয়ে, আলু দিয়ে পটল দিয়ে, ছোলা দিয়ে কুমড়োর ছক্কা আর লুচি। নীলকণ্ঠ ঠাকুর করবে, তোমরা হাত দেবে না।'

বটুয়া থেকে পান বার করে মুখে পুরতে পুরতে নীলকণ্ঠ মহাগর্বের হাসি হাসছে।

দিমা বলল—'ভাল হয়েচে তালে? আমি বলি কি জানি শহরের ফ্যাশনেল মেয়ে...'

—'বাঃ, আমি তো তোমার রান্নার কথা শুনেই আরও—দিমা কচুর শাক খাওয়াবে?'

—'কচুর শাক? তার জন্যে এত আহিংকে? ওমা, আমি কোতায় যাব গো! এই জংলু, তুলে আনিস তো কাল। নারকেলের তো অভাব নেই মা! তা নিরিমিষ্যি খাবে, না ইলিশমাছের মুড়ো দিয়ে?'

—'নিরিমিষ্যি, নিরমিষ্যি!' চিনু চেঁচিয়ে বলে ওঠে।

ধানু গম্ভীরভাবে বলে—ইলিশ মাছ আলাদা হবে, একেবারে ঘাট থেকে নিয়ে আসব।'

পুঁটু বলে—'মুড়োটা আর ন্যাজাটা দিয়ে অম্বল কোরো দিমা। ন্যাজার লালগুলো সব আমার! মা করত।'

—'ইস্স্, আগে অম্বল চাই? মেয়ের রকম দেখ! টক আর মিষ্টি পেলে আর কিছু চাই না!'

মিনু আড়চোখে চাইল—'দিদি, আর ঝাল?'

দুজনে মিলে ছুটির দুপুরবেলা তেঁতুল, লঙ্কা আর গুড় দিয়ে আচ্ছা করে জরিয়ে আঙুল চেটে চেটে খাওয়া আর হুস হাস। নাকের জলে, চোখের জলে। উঃ কি ঝাল দিয়েছিস রে দিদি! ঝাল না হলে জমে। মেজদা নামতে নামতে বলছে—'হ্যাঁ, নামবে যখন তখন টের পাবি কিরকম জমে! পুরো ইনটেসটিন জ্বলিয়ে দিয়ে নামবে। তখন বলিস হে তেঁতুলের দেবতা, হে লঙ্কার দেবতা, আর করব না, আর করব না।'

মস্ত বড় কলেজের ঘাসে-ছাওয়া মাঠে নীল জিনস আর আলগা শার্টপরা একটি মেয়ে বসে। মাথায় ঝুঁটি। ওর কি কোনও বন্ধু নেই? ফাইল খুলে একমনে পড়ছে? না পড়ার ভান করছে? পাশ দিয়ে একদল ছেলেমেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

—'ওঃ পি. কে. সি. আজ যা পড়ালেন না, দুর্দান্ত!'

—'আরে কীটসের ওপরেই তো ওঁর থিসিস। অক্সফোর্ডের। চালাকি নয়।'

—'হ্যাঁরে, নীতা, ফ্যানি ব্রন আর কীটস-কে নিয়ে লেটেস্ট বইটার কী যেন নাম বলছিলেন পি. কে. সি.?

—'আমি খেয়াল করিনি!'

—'কী খেয়াল করিস তোরা? পি. কে. সি.-র ডোরাকাটা শার্ট, আর গ্যাবার্ডিনের পেন্টুল?'

—'ভালো হবে না ঋত্বিক। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি শেষ হতে চলল এখন কীট্স নিয়ে আর কে মাথা ঘামায় রে! যত্ত সব!'

—'তো কী নিয়ে মাথা ঘামাবি! অ্যালেন গিনসবার্গ! লোকটা শেমলেসলি গে জানিস তো? ওই জন্যে অস্কার ওয়াইল্ড বেচারির জেল হয়ে গেল আর এখন সব যে যত পার্ভাটেড, আর তত নামডাক!'

—'মেয়েদের মধ্যেও আছে, পুরনোকালে স্যাফো, ইদানীং এর মধ্যে মার্টিনা। কী রকম ডাঁটে থাকে!'

দলটা পাশ দিয়ে চলে গেল। একবারটি আড়চোখে তাকিয়ে দেখল জীন্স-পরা মেয়েটি। দলের মধ্যে কোনটা কোনটা মেয়ের কথা, কোনটা ছেলের কথা বোঝবার জো নেই!

জ্যাঠামশাই বলছে—'না। কিছুতেই না। কো-এডুকেশনে দিলে মেয়ে বখে যাবে। নমুও তো মেয়ে-কলেজেই পড়েছে, ওর শিক্ষা-দীক্ষা কিছু কম হয়েছে? বাবা বলছেন—মেয়েটা অত ভাল রেজাল্ট করল দাদা, অত শখ...আর দেখুন বাবা গলা খাটো করে বললেন—এখানেও তো এত ছেলের সঙ্গে মিশেছে, সিঙ্গিবাবুর সুকৃতির সঙ্গে তো হলায় গলায়। গণ্ডগোল হলে তো এখানেও হতে পারে!'

—'তা অবশ্য।' জ্যাঠামশাইয়ের চিন্তিত গলা। বাইরে আড়িপাতা দলের ফিসফিসে হাসি।

য়ুনিভার্সিটির ক্লাস নতুন আরম্ভ হয়েছে। ব্লু জীন্স্, আলগা শার্ট, মাথায় ঝুঁটি ঢুকে পড়েছে।

নোটস নিচ্ছে। ভীষণ মনোযোগ দিয়ে। 'তুমি কোন কলেজ থেকে এসেছে ভাই!' পাশের মেয়ে জিজ্ঞেস করছে।—'শ্রীরামপুর কলেজ।'

—'সে কী? আমিও তো শ্রীরামপুর কলেজ থেকেই এসেছি। তোমায় চিনি না তো!'

সেরেছে। আরে আমি তোমাদের থেকে অনেক সিনিয়র। মাঝখানে নানা কারণে পড়া বন্ধ হয়ে গেল। 'তাই বলো!'

—'য়ু দেয়ার হুইচ দা শর্টেস্ট ট্র্যাজেডি অফ শেক্সপীয়র?'

ব্লু জীন্স্ উঠে দাঁড়াচ্ছে।—'ইজ ইট ম্যাকবেথ সার?'

বহু আষাঢ়ের ওপার থেকে উত্তরটা ভেসে আসছে। মেঘের আড়ালে আবছা হয়ে। সো য়ু হ্যাভ ডাউটস! সীট ডাউন অ্যান্ড ডোন্ট টক।'

পাশের মেয়েটি বললে—'সরি। ভাই, আমার জন্যে তুমি বকুনি খেলে।'

আজকের কত লাইব্রেরির কাজ সারা। ধোঁয়া কাটাতে কাটাতে গোলাপি বুটির সালোয়ার কামিজ, খোলা চুল, ঢুকে যাচ্ছে। একটাও পুরো খালি টেবিল নেই। একটাতে একটি মাত্র ছেলে বসে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। সামনে আধ-খাওয়া কফির কাপ।

গোলাপি কামিজ বলল 'এক্সকিউজ মি প্লিজ, আপনি কি কারও জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

'ওহ নো, নট অ্যাট অল। আই ক্যান ওনলি ওয়েট ফর গোদো, হু আই নো উইল নেভার অ্যারাউভ!'

'বসবার জায়গা পাচ্ছি না। বসতে পারি?' ভড়কানো প্রশ্ন।

'নো অবজেকশন।'

কফির অর্ডার। পকোড়া। ছোট ছোট কামড়। অল্প স্বল্প চুমুক। কোলের ওপর একা পত্রিকা নিয়ে অভিনিবেশ সহকারে পড়া। পত্রিকা ছাড়া গতি নেই।

'ডোন্ট মাইন্ড, আপনি কি রিসার্চ স্কলার?' ছেলেটির প্রশ্ন।

'খানিকটা।'

'খানিকটা মানে!'

রহস্যময় অথবা বোকা-চালাকির হাসি—'আপনি?'

'আমি কেউ না। কিছু না জাস্ট একটা ভয়েড।'

'সে কী? আপনি ভূত নাকি?'

'ভূতই বটে!' ছেলেটির মুখে আত্মবিদ্রূপের হাসি—'গোস্ট অফ দিস কনজিউমারিস্ট সোসাইটি, গোস্ট অফ দিস ওয়ার্ল্ড ব্লাইন্ডেড বাই দা ড্যাজলিং র‍্যাভেজেস অফ সায়েন্স। গোস্ট অফ দিস মকারি অফ এ সিভিলাইজেশন!'

'রাগী যুবকরা তাহলে এখনও আছে', গোলাপি সালোয়ার আত্মগত বলল।

'কিছু বললেন?' ছেলেটি বলল, তারপর চোখ ঘুরিয়ে বলল—'এই তো দেখছেন টেবিলে টেবিলে গণ্ডা গণ্ডা যুবক-যুবতী বসে আছে। আড্ডা দিচ্ছে। জাস্ট আড্ডা স্প্লেনডিড আনকনর্সান!'

'ডু দে থিংক হোয়ার দিস মকারি অফ ডেমোক্র্যাসি ইজ হেডিং ফর? ডাজ ওয়ান থিংক?'

'আপনি কি বিপ্লবী?'

'বিপ্লবী? হাসলেন! অল দা রেভোলিউশনস অফ দিস ওয়ার্ল্ড হ্যাভ এডেড দা ওয়ার্স্ট টাইপ অফ অটোক্র্যাটস। ফ্রম রোবস্ পীয়ের টু স্ট্যালিন অ্যান্ড চাওসেসকু। দা ভেরি কনসেপ্ট অফ রেভল্যুশন হ্যাজ বীন গিলোটিন্ড।'

'আপনি তাহলে কে? কী?' গোলাপি সালোয়ার ভয়ে ভয়ে বলল।

'কেন কবে, কোথায় গুলো জিজ্ঞেস করলেন না?'

'ভয় করল। একটা দুটোর উত্তর দিলেই বর্তে যাব।'

তখন ছেলেটি সিগারেট ফেলে দিয়ে দম ছেড়ে হো হো হা হা করে হাসল।

তারপর বলল আমার নাম শ্রীমান সুশান্ত তালুকদার, এই হল কে। আমি একজন ফ্রি-লান্স জার্নালিস্ট—এই হল কী এম-এসসি ইন ইকনমিক্স, লো সেকেন্ড ক্লাস, 'গরিবি হঠাও'-এর ওপর একটা বিস্ফোরক প্রবন্ধ লিখেছিলুম বলে খুব সম্ভব। পছন্দসই চাকরি পাইনি—এই হল কেন। উনিশ শ উনষাট, বারোই জুলাই এই হল কবে। আর কোথায় হল—হট্টমন্দির।

'ফ্রিলান্স জার্নালিস্ট, ফ্রিলান্সটা কী?'

'আপনি কোন যুগে বাস করেন? নাকি মঙ্গলগ্রহ থেকে আসছেন? এখন তো ফ্রিলান্সেরই যুগ! সব কিছু নিজস্ব উদ্যোগ। গমেন্ট আমাদের স্বাবলম্বী হতে বলছে না?'

'আপনি নিজে নিজেই খবর যোগাড় করে বেড়ান? লেখেন? ছাপায়?'

'হ্যাঁ, আমি নিজে নিজেই খবর বা স্টোরি যোগাড় করে বেড়াই। লিখি, ফটো তুলি। কখনও ছাপে, কখনও ছাপে না।'

'তাতে আপনার চলে? কিছু মনে করবেন না!'

'ওই জন্যেই তো বললুম হট্টমন্দিরে থাকি। একটা অবসলিট মেসে। ম্যানেজারবাবুর আমার ওপর বড্ড মায়া। একটি বিবাহযোগ্য কন্যা আছে। বড্ড দজ্জাল! কাউকে গছাতে পারছেন না। চিতাবাঘ যেমন ঝোপের পেছনে গুঁড়ি মেরে থাকে, শিকার কখন পাল্লার মধ্যে এসে যাবে তার অপেক্ষায়, তিনিও তেমনি বসে আছেন।'

চিনুর ভীষণ হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। সে কফির কাপ মুখে তুলে বিষম খেল।

'আপনার পরিচয় কিন্তু আমি এখনও পেলুম না'—যুবক বলল।

'আমি সত্যিই মঙ্গলগ্রহের লোক আপনাদের গ্রহে বেড়াতে এসেছি। নাম চিন্ময়ী চক্রবর্তী। আমিও ফ্রি-লান্স জার্নালিস্ট।

সুশান্ত তালুকদারের মুখ গোল-হাঁ হয়ে গেল—তাহলে ফ্রি-লান্স জার্নালিস্ট মানে জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন?'

'আসলে হতে চাই। এখনও হইনি। আপনি যদি একটু অন্ধি-সন্ধিগুলো বাৎলে দ্যান।'

'নিজে পায় না শুতে আবার শংকরাকে ডাকে। সুশান্ত ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমার নাম সুশান্ত হলেও আমি কিন্তু আসলে খুব অশান্ত। টের পেয়েছেন আশা করি।'

'মোক্ষম। তবে পথগুলো আপনি বেশি রাগ না করে বাৎলে দেবেন তা-ও বুঝতে পেরেছি।'

আবার সিগারেট নামিয়ে হো হো হা হা।

এমন সময়ে ডান চোখের পাশ দিয়ে গোলাপি সালোয়ার একটি ভীষণ চেনা মেয়ে মুখ দেখে প্রায় টেবিল উল্টে উঠে পড়ল। বলল—'আমি চললুম। টাকা রাখলুম, বিলটা প্লিজ মিটিয়ে দেবেন। চেনা মুখ আপাতত ডান দিকের শাখায় চলে গেছে। চিনু হুড়মুড় করে নিচে নেমে আবার হ্যারিসন রোডের দিকে হুড়মুড় করে ছুটল। রিণি কি দেখতে পেয়েছে? হঠাৎ দেখতে পেলে পরিষ্কার চিনতে পারবে না। কিন্তু সন্দেহ হবে। বাস স্টপে ভীষণ ভিড়। উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে, পেছন থেকে আচমকা প্রশ্ন হল—'বৎসে, তুমি কি বাড়ি হইতে পলায়ন করিয়াছ?' চমকে পেছন ফিরে চিনু দেখল সুশান্ত। সুশান্ত বলল, 'না কি কোনও ভদ্র যুবককে সদ্য-সদ্য ল্যাং মারিয়াছ?'

এক সপ্তাহ পরে সুশান্ত তালুকদার ও চিন্ময়ী চক্রবর্তী দুজনে মিলে একজন নাম করা অর্থনীতিবিদ-এর সাক্ষাৎকার নিতে গেল। অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো সুশান্তর, জীবন জগৎ সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো চিন্ময়ীর। সাক্ষাৎকারটি একটি বিখ্যাত বাংলা দৈনিকের রবিবাসরীয় সংখ্যায় বেরোল। দক্ষিণাটা অর্ধেক করে চিন্ময়ীকে দিতে গেলে চিন্ময়ী বলল, 'আমার ভাগটা এবারের মতো তোমায় দিয়ে দিলুম, সুশান্ত, গুরুদক্ষিণা।'

'ঘুষ নয় তো?' সুশান্ত অশান্ত চোখে চেয়ে বলল।

'ঘুষ কী?' ওঃ চিনুদি, য়ু আর সামথিং আই মাস্ট অ্যাডমিট' সুশান্ত বলল।

এইভাবেই চলছিল কিন্তু, একদিন সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরতে, দিমা নিঃশব্দে দরজা খুলে দিয়ে বললে

'ওমা আমি কোতায় যাব গো মেয়ে! দিল্লি থেকে সুককিতিবাবু এয়েচে গো। আমার ওপর কী চোটপাট! আমাকে বোধহয় ছাইড়ে দেবে গো মা! শোনো টাকাকড়ির কতা আমি কিছু বলিনি, শুধু বলেছি ভদ্দরলোকের মেয়ে বড় আতান্তরে পড়েছিল...।' দিমার সহজে চোখে জল আসে না, কিন্তু এখন কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। চিনু বলল—'পথ ছাড়ো দিমা। আমি দেখছি।'

'ওমা কী সব্বনেশে মেয়ে গো, সে যে একেবারে রেগে বাঘ হয়ে আছে।'

'সিঙ্গি হয়ে আছে বল?' পটলা আর পুঁটু ফিকফিক করে হেসে ফেলল।

তোদের আর কি নংকাপোড়া। হেসে দিলেই হল। দিমা আছে, দিমা ঠিক খাওয়াবে। পরাবে। ভিক্ষে করে হোক, সিক্ষে করে হোক।'

চিনু বললে—'দিমা, আমার জন্যেই তো তোমাদের এই অবস্থা। আমি খবরের কাগজের লোক। কাউকে ভয় পাই না। আমি বোঝাঁপড়া করে নিচ্ছি। কোনও ভয় নেই।'

আজকে তার পরনে হালকা বেগনি প্রিন্টের একটা শাড়ি। হাতে মস্ত বড় ব্যাগ। প্র্যাকটিস করবার জন্যে একটা ক্যামেরা তাতে, ভরে দিয়েছে সুশান্ত। দিমার যা গতর তাকে সহজে ঠেলা যায় না, তবু একরকম ঠেলে ঠুলেই ওপরে উঠল চিনু। চটির বেশ শব্দ করে জানান দিয়ে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ভালুক কৌচের কোলে বসে জনৈক ভদ্রলোক খুব মনোযোগ সহকারে চিনুর রেখে যাওয়া একটা ম্যাগাজিন পড়ছেন। চটির শব্দ তুলে তাকিয়েই তিনি চিত্রার্পিত হয়ে গেলেন।

এ কি? 'চিনু না! তুই কোত্থেকে?'

'আমি না হলে তোমার মতো সিঙ্গি মশাইয়ের ঘরে হুজ্জোতি করে ঢোকবার সাহস কার হবে বল? তার ওপর দিমার মতো ওই রকম জাঁদরেল পাহারা। ...তা মাথাটা কী করেছো!'

বেলের মতো মাথাটাকে হাত বুলিয়ে সুকৃতি সিংহ বললেন, 'কি জানিস। টাক হলে টাকা হয় ছোট্ট থেকে শুনে আসছি। তাই চেষ্টা চরিত্তির করে টাকটা করেই ফেললুম।'

'তাহলে আগে যা ছিল তার চেয়েও এখন আরও অনেক টাকা হয়েছে?'

'হয়েছে। বোনগুলো সব বাইরে পড়ল। দুটো দাদা বিদেশে পটাপট শেষ হয়ে গেল। বাবা কাকা সব্বারই সব তো এখন আমার!'

'তবে!'

'তবে কী?'

'তবে, সিংঘিবাড়ির এমনি দশা কেন যে আমি কোনকালের ভাড়াটের মেয়ে আমাকে দুযুগ পরে এসে মোজাম্বিক করাতে হয়।

'মোজাম্বিক? কী বকছিস?'

'নিচের উঠোন, ঘরদোর, দালান-বারান্দা, সিঁড়ি কলঘর সব দেখা হয়েছে? মোজাম্বিক হয়নি? পটলা আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল দুদিন সময় দিলেই সব মোজাম্বিক করে দেবে। তা দিয়েছে। রোজ পালিশ করছে। এই রকম লাল-সবুজ পেটেন্ট স্টোনের মেঝে ইদানীংয়ের মধ্যে দেখেছ? পটলা পুঁটু, জংলু, ধানু দিমা এরা করেছে...।

ও হো হো হো সুকৃতি বুঝতে পারার হাসি হাসতে লাগলেন 'তা পটলা, পুঁটু, এরা কারা?

'এরা কারা? জ্যাক অ্যান্ড জিল ওয়েন্ট আপ দা হিল, জানো তো?'

'তা তো জানি কিন্তু...'

এরা সেই জ্যাক অ্যান্ড জিল। জ্যাকেরা পড়ছে। ডাউন দা হিল। মাথাগুলো বিগড়ে যাচ্ছে, আর জিলরাও পেছন পেছন হুড়মুড় করে পড়ছে তো পড়ছেই।

'তুই তা হলে এখনও ধাঁধা ভালবাসিস? ঠিক সেই আগেকার মতো?'

সামনের আয়নায় এতক্ষণে দুজনের ছায়া পড়েছে। হঠাৎ সুকৃতি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আরে চিনু, তোকে আমি উনিশ বছর বয়সের পর থেকে দেখিইনি! তোকে আমি কি করে এত দিন পরে চিনতে পারলুম বল তো? তুই তো খুব বেশি বদলাসনি। খালি কেমন ডাগর-ডোগর গেছো টাইপের হয়ে উঠেছিস। কিন্তু আমি তো দেখছি বুড়ো হয়ে গেছি। মাথায় বেল, উদরে ডাব, মুখ ময় থলে? তুই আমার চেয়ে ক' বছরের ছোট ছিলি? কাকাবাবু এখান থেকে আসানসোল বদলি হয়ে গেলেন, তার পরেই শুনলুম কাকিমা নাকি? তোর আর মিনুর নাকি এক লগ্নে, তোর নাকি তিনটে...ভুতুর কাছ থেকে শুনছিলুম...।

—'সব নাকিগুলোই ঠিক শুনেছো। আবার যা নিজের চোখে দেখছ তা-ও ঠিক। আমি ভূত নই।'

—'তবে কি তুই ভবিষ্যৎ?'

চিনুর চোখে এবার স্বপ্ন চিকচিক করছে। সে বলল—'বলছো? সত্যি বলছো? থ্যাংক ইউ। কিন্তু তোমার ইতিবৃত্ত আমি কিছুই জানি না সুকুদা।'

—'সে তো অনেক কথা! ভুতু তোকে কিছু বলেনি?'

—'ভুতু কোত্থেকে বলবে? সে তো জার্মানিতে ইন্ডিয়ার ভূত!'

সুকৃতি মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—'আমিও তো ওয়েস্ট জার্মানিতেই ছিলুম। সেখান থেকে সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং-এর ইয়াবড় ডিগ্রি নিয়ে সুইডেন গেলুম। আমার চে' একহাত লম্বা সুইডিশ মেমসাহেব বিয়ে করলুম। তারপর একদিন ঝগড়ার মুখে সে আমার সেই কোঁকড়ানো কালো চুলগুলো ধরে আচ্ছা করে ঝাঁকিয়ে বললে—'হোয়াই কান্ট য়ু বি ব্লন্ড! ব্লন্ড! ব্লন্ড!' বলে আমায় ছেড়ে চলে গেল। ব্লন্ডের খোঁজে। এখানে কিছুদিন হল ফিরে এসে দিল্লিতে নিজের ফার্ম খুলে বসেছি। তখন চুলগুলো সবে উঠতে শুরু করেছে। আবার একটা বিয়ে করেছিলুম পাঞ্জাবি। তো সেটাও টিকল না। সেও একদিন ঝগড়ার মুখে বললে– হোয়াই আর য়ু সো শর্ট! শর্ট! শর্ট! সে-ও টলের খোঁজে চলে গেল। তার পরেই টাক। আর ছপ্পড় ফুঁড়ে টাকা!'

—'কী গুলতাপ্পিই দিতে পারো, বাব্‌বা! তা এখানে কি করতে হানা দিয়েছো!'

—'ভাবছি এই হানাবাড়িটা বিক্‌কিরি...'

—'খবরদার!' চিনু বসে ছিল। সটান উঠে দাঁড়াল,—'খবর্দার, এই বাড়ি বিক্রি করতে পারবে না। এ বাড়ি আমি অধিগ্রহণ করব, এ আমার মিউজিয়াম, এইখানে আমার ছোটবেলা, এইখানে আমার কৈশোর, এইখানে আমরা দুটো বিশাল উজ্জ্বল সুখী পরিবার, এইখানে আমরা প্রতাপ-শৈবলিনী, এখানে এসে আমি সব ফিরে পেয়েছি। এই বাড়ি আমি যা বলবো, তাই করতে হবে। পটলা ধানুদের ওপর আমি একটা স্টোরি করছি, যদি এতটুকু বেচাল দেখি, তো তোমাকে ভিলেন বানিয়ে দেব। পেছনে ল্যাজ, উল্টোবাগে পা।'

—'আর বেচাল না দেখলে?'

—সান্টাক্লজ, ফারের পোশাক, রুপোর টুপি।'

—'তো তুই এ বাড়িটা নিয়ে কী করবি?'

—'দিমার তত্ত্বাবধানে এদের গড়ে তুলব। মারাদোনা, গাভাসকর, কাপ্রিয়াতি, স্টেফি গ্রাফ, ব্রুস লি...'

—'বলে যা, বলে যা থামলি কেন? স্বপ্নে পোলাও খেলে ঘি বেশি করে ঢালতে হয়।'

—'আমি একা ঢালছি না আজ্ঞে। তোমাকেও ঢালতে হবে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ছোটাছুটি...'

—'তো বদলে আমি কী পাব?'

—'লবডঙ্কা। তবে তেমন লেগে থাকতে পারলে নোবেল প্রাইজ ফর পিসটা পেতে পার। প্রচারে আমি আর সুশান্ত তালুকদার সাহায্য করব।'

—'তথাস্তু। তা শৈবলিনী কি চন্দ্রশেখরের কাছে ফিরে যাবে?'

—'চন্দ্রশেখর নেই।'

—'তাহলে কি প্রতাপের কাছে থেকে যাবে?'

—'প্রতাপও নেই।'

—'ওই বেটা সুশান্ত তালুকদার লরেন্স ফস্টর ও-ই তবে এখন প্রতাপ হয়ে গেছে?'

—'লরেন্স ফস্টরও নেই।'

সুকৃতি খুব দুঃখিতভাবে মাথার টাকটায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগলেন। যেন টাকটাই যত অনর্থের মূল।

৩

বিলু খুব উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে বলল—'মা-ও বলল, তোরাও অমনি যেতে দিলি? হোপলেস! প্যাক অব ফুলস্! একটা মধ্যবয়সী মহিলা, জীবনে কোনদিন নিজের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে বেরিয়েছে কি না সন্দেহ! মাসে একটা দুটো করে চিঠি পাস—'ভালো আছি, কিছু হলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিস্!' বাস! ছি! ছি! ছি! চিঠিগুলোর পোস্টগুলোর পোস্ট অফিসের ছাপগুলোও তো দেখবি!'

—'দেখেছি! দেখেছি! রবি বলল—'তুই দ্যাখ্, এক একটা এক এক জায়গা থেকে পোস্ট করা। শ্যামবাজার, কলেজ স্ট্রিট, পার্কসার্কাস, গড়েহাট। দ্যাখ, আমিও তো মোটরবাইক নিয়ে সারা কলকাতা দাপিয়ে বেড়াচ্ছি। দুটো চোখ সব সময়ে খোলা রাখি। কোথাও ভদ্রমহিলার টিকিটিও দেখতে পাই না। অথচ চিঠি আসছে সব কলকাতারই ভিন্ন ভিন্ন পোস্ট অফিস থেকে!'

—স্ট্রেঞ্জ! মানে মা ভদ্রমহিলা স্রেফ ইচ্ছে করে লুকিয়ে আছে, বলছিস! আমি যখন ছিলুম না তখন তোরা মাকে কে কী বলেছিস! নিশ্চয়ই মনে খুব কষ্ট পেয়েছে। কিছু একটা করেছিস!' বিলুর উত্তেজিত পায়চারি আরও তেজোদৃপ্ত হয়ে ওঠে। 'শী ইজ এ কোয়ায়েট টাইপ, কিন্তু ভীষণ অভিমানী!'

—'অন গড ছোড়দা। আমরা কেউ কিছু বলিনি। কিচ্ছু করিনি!'

—'তোদের কিছু না করাটাই একটা করা। তোরা মার দিকে কোনদিন চেয়ে দেখেছিস! সেই কোন ছোটবেলায় বাবা মারা গেল। জ্যাঠা-কাকারা নিজেদেরটা গুছিয়ে দূর করে দিল। মুখ বুজে এতগুলো বছর একটা বাচ্চা মেয়ে, উঃ, আমি ভাবতে পারছি না। কোনদিন আমরা চেয়ে দেখেছি মা কী খায়? কী পরে! কী করে সময় কাটায়? নিজেদের বন্ধু-বান্ধব নিয়েই মত্ত! এখন কী হবে?'

হঠাৎ রিণি ভীষণ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল—'দাদা, ছোড়দা, মা সেই রসময়ীর রসিকতার মতো করেনি তো। কাউকে দিয়ে আগে থেকে লেখা চিঠিগুলো পোস্ট করাচ্ছে। মা হয়তো আর...'

বিলু বলল—'স্টপ ইট রিণি, স্টপ ইট আই সে। ঠিক আছে ছ'মাসের জায়গায় আট মাস পার হয়ে গেছে। বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক।'

রবি বিষণ্ণ মুখে বলল—'ড্রাফ্‌টটা তুই-ই কর বিলু। আমার মাথাটা কেমন...!'

বিলু বলল, 'রিণি তুই কর।'

একটু পরে রিণি কাঁপা কাঁপা হাতে তার খসড়াটা এগিয়ে দিল। বিলু পড়ল—'মা, তোমার এ কেমন রসিকতা! তোমার ছ'মাসের মেয়াদ অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। আমরা তিনজনে খুব চিন্তিত। ফিরে এসো।' পড়ে বিলু বলল—'ওয়ার্থলেস। কেউ যদি একটা কাজ ঠিক করে পারিস। অভিমানে একটা মানুষ বাড়ি ছেড়ে গেল, তাকে অ্যাকিউজ করছিস! রসিকতা! খুব ফিরে আসবে!' তারপর সে নিজেই খসখস করে লিখল লিখে পড়ে শোনাল—মা, তোমার বিলু কেরালা থেকে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে ফিরে এসেছে। লাংস ক্যান্সার। মৃত্যুশয্যায়। শেষ দেখা যদি দেখতে চাও তো অবিলম্বে ফিরে এসো।'

এমন সময়ে হাতে সুটকেস, পিঠে রুকস্যাক, সাদার ওপর নীল ছাপ শাড়ি পরে, মাথার ঝুঁটি বেঁধে রবি-বিলু-রিণির মা চিন্ময়ী চক্রবর্তী সিঁড়ি দিয়ে টকাটক উঠে এলেন।

বললেন—'কার লাংস ক্যান্সার? কে মৃত্যুশয্যায়? নিচের দরজা খোলা কেন? বাড়ির জিনিসপত্তর সব ঠিকঠাক আছে তো? আমার ননস্টিক প্যান? বোন চায়নার টি-সেট? না চুরি ডাকাতি হয়ে গেছে?' তিনজনেই সমস্বরে বলে উঠল—'মা!'

চিন্ময়ী বললেন—'দ্যাখো বাপু, আমার হাতে বেশি সময় নেই। চান করে, রিণি যদি কিছু রেঁধে-টেঁধে থাকে তো খেয়ে, নইলে না খেয়ে বেরিয়ে যাব। একজন ভীষণ খিটখিটে সাহিত্যিকের সাক্ষাৎকার নিতে যাব। তারপর পার্কস্ট্রিটে যাব ফটোগুলো নিতে। আমাতে আর সুশান্ততে মিলে 'আর্চিন্‌স্ অর ফলিং আর্কএঞ্জেলস্!' বলে একটা স্টোরি করেছি। এ-ক্লাস ম্যাগাজিনে বেরোচ্ছে—পিক্‌স্ মৃন্ময়ী চক্রবর্তী। দেরি হতে পারে, ভেবো না।'

'মা'—রবি ভয়ে ভয়ে বলল—'সুশান্ত কে?'

চিন্ময়ী হেসে বললেন—'সে এক ভীষণ অশান্ত তালুকদার। আমরা দুজন ফ্রিলান্স জার্নালিজ্‌ম্ করছি! আসবে এখন চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে, দেখিস!'

বিলু বলল—'তুমি সাহিত্যিকের সাক্ষাৎকার নিতে যাবে? স্টোরি করছ? ফ্রিলান্স? আর্চিন্স অর... কি ব্যাপার বল তো?'

রিনি বলল—'জানি তোমার আজকাল একটু একা একা লাগত। তাই বলে এই বয়সে...' বলে রিণি হঠাৎ গোঁত্তা খেয়ে খেয়ে থেমে গেল। সে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল—'মা মা, হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান টু ইয়োরসেলফ্! হাউ ডু য়ু ম্যানেজ টু লুক সো ইয়াং...'

বিলু আর রবি পর পর বলল—'কোথায় গেছিলে? এতদিন কোথায় ছিলে?'

চিন্ময়ী হেসে বললেন—'টাইম মেশিন পড়েছিস? এইচ. জি. ওয়েলসের? সেই টাইম মেশিনে চড়ে ছিলুম। তারপর দীর্ঘযাত্রা।

পেছনে, অনেক পেছনে।
আবার সামনে, অনেক সামনে।
যাতে তোদের পেতে গিয়ে সময়টা শূন্য হয়েছিল
সেটা ঠিকঠাক ভরাট করে
আবার তোদের সঙ্গে সমানতালে
দৌড়তে পারি।

যে যেখানে যায়

লেক গার্ডনস ফ্লাই ওভারটার দু'পাশ জুড়ে কৃষ্ণচূড়া ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। বেগুনি ফুল ঝুপ্পুস দুলছে লেকের বাইরে, ভেতরে। বসন্ত আসতে না আসতেই চিকচিকে সবুজ, ঝকঝকে দুলদুলে পাতা। ফেশিয়াল করে এসেছে যেন। ফাইন! এদিকে চৌকিটার এইসা জোর হয়েছে গায়ে যে, চেনটা ধরে রাখা যাচ্ছে না। তাকেই বরং দৌড় করাচ্ছে ব্যাটা। উঃ, ক্রিকেট কোচিংয়ের স্কুলটা শেষ অবধি এসে গেল। তিন রাউন্ড হল, এখনও এক রাউন্ড বাকি। মধুবন বলল—উফ একটু জিরোতে দে রে চৌকি! প্লিজ! মুশকিল হচ্ছে, জিরোতে হলেও সেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিরোতে হবে। একবার চেন আলগা দিলেই গেছ! এই বিদঘুটে কাজটা তার বাবার। কিন্তু মেদ কমানোর জন্য যেহেতু তার প্রাতঃহন্টনের দণ্ড হয়েছে এবং বাবা আপাতত দিল্লি গেছে, বাবার জায়গায় মধুবনকে ফিট করা হয়েছে। প্রাতঃহন্টনের পর বাড়ি গিয়ে সে সামান্য কিছু খেতে পাবে। প্রচুর জল প্রথমেই। তারপর ঝিঁঝির পাতের মতো পাতলা দুটো মাখনহীন টোস্ট, এক কাপ স্কিন্‌ড মিল্ক, গুটিকতক শসা। পড়াশোনার কাজটা এই 'শসাফাস্টে'র পরেই করে থাকে সে। দু'খানা হাতেগড়া রুটি, গাজর, বিন, পেঁপেসেদ্ধ টিফিনে ভরে দেয় মা। চোখ পাকিয়ে বলে—'ক্যান্টিনে বসে কাটলেট ধ্বংস কোরো না আবার। এত দিনের পরিশ্রম জলে যাবে। মনে রেখো, পঁচাত্তর কেজি ওজন ইকোয়াল্‌স—হার্ট, প্রেশার, বাত, ডায়াবিটিস...। যখন স্কুল চলে তখন এইরকম।

আচ্ছা মা, নিজের মেয়ের জন্যে এতগুলো মারাত্মক মারাত্মক অসুখ প্রেসক্রাইব করতে বাধছে না তোমার?

অসুখ প্রেসক্রাইব করছি? মারব এক চড়। যা, বেরো এবার।

অন্য লোকের মায়েরা যখন মালাই নিয়ে ছেলেমেয়েদের সাধাসাধি করছে, তখন তার মা গরম টোন্‌ড মিল্কের ওপর পড়া সরটাও শ্যেনদৃষ্টিতে দেখছে এবং চামচ দিয়ে নির্মমভাবে তুলে ফেলে দিচ্ছে। সেই সব বালকবালিকা, কিশোরকিশোরী যারা দুধ এবং দুধের সরের নামে নাক কুঁচকোয়, মধুবন তাদের দলে পড়ে না। সে ভালবাসে বেশ মোটা সর-পড়া গোদুগ্ধ। সম্পূর্ণ দুধ যাকে বলে। সে ভালবাসে তাজা ক্রিম। নানারকম টুকরো টুকরো করে কেটে একটা বড় কাচের বাটিতে রাখো। তারপর তাতে দরাজ হাতে ক্রিম ঢালো। এক মুঠো বড় দানার সাদা সাদা চিনি। ব্যস।

এবং যেহেতু সে এরকম ভালবাসে তার জানাশোনা মাসি-পিসিরা যাঁরা যাঁরা ছেলেমেয়েদের দুগ্ধজাত খাওয়াতে পেরে ওঠেন না তাঁদের সমস্ত স্নেহরস ঝরে পড়ে মধুবনের ওপর বা ঠিকঠাক বলতে গেলে তার খাদ্যাখাদ্যের ওপর।

মিল্কশেক করেছি মধুবন। খাবি তো?

আইসক্রিম ফ্লোট ভাসিয়েছ কি মাসি?

শিয়োর শিয়োর! আইসক্রিমের বাক্সটা তা হলে আছে কী করতে?

আমাকে যেন স্ট্র দিয়ো না। ওভাবে শেক খাওয়া যায় না। তা হলে তো কোক, থামস আপ খেলেই হয়!

সব মাসিরাই তাকে ভালবাসেন। কিন্তু পাবলোর মা যশোমাসি একটু স্পেশ্যাল।

স্পেশ্যাল। কেননা, তাঁরও ওই একই রোগ। তাঁরও ব্লাউজের তলায় মোটা মেদের বেল্ট, তারও মুখ আর ধড়ের মাঝখানে ঘাড় অদৃশ্য। তাঁকেও হাঁসফাঁস করতে করতে প্রাতঃহন্টন করতে দেখা

যায় এবং মধুবনকে মিল্কশেক দিয়ে তিনি নিজেও অন্য একটি মিল্কশেক নিয়ে মুখোমুখি বসবার পক্ষপাতী। কিন্তু দু'জনেই এখন প্রভূত বিপদে পড়ে গেছেন।

সে দিন বাড়ি এসেই মধুবন বলল—ব্যস দু'কেজি কমে গেছি।

হ্যাঁ। এক কেজি হাঁটার জন্যে। আর এক কেজি চৌকির জন্যে। যা ছুট করিয়েছে, বাপস!

তা হলে তো তোর এক মাসে তিরিশ দু'গুণে ষাট কমে যাচ্ছে। বাকি রইল বারো কেজি, বাঁচবি কী করে রে?

মা, নিজের মায়ের পাঁচফোড়ন হল—আবার আইসক্রিম, সর, ক্রিম, রেওয়াজি পাঁঠার গরগরে ঝোল। চড়চড় করে উঠে যাবে। যশোমাসি আছে কী করতে?

এক হপ্তা পরে ডাক্তারখানায় গিয়ে সে সত্যি দেখে এল—এক কেজির মতো কমেছে। ডাক্তারকাকু বললেন,—ঘাবড়াচ্ছ কেন? এসব আলগা ফ্যাট শটাশট ঝরে যাবে। কিন্তু ডায়েট মেনটেন করতে হবে স্ট্রিক্টলি।

যশোমাসি আর মধুবনের যখন এইরকম বিপদ তখন আরমান আর সম্পৃক্তার কেস শুনুন। সম্পৃক্তার প্রবলেম হল ও যতই খায় আটচল্লিশ কেজির বেশি ওঠে না।

কোথায় ওয়েট নিস? সিনেমা হলে? শপিংমলে?—মধুবনের স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে।

আজ্ঞে না। রীতিমতো ডাক্তারখানায়। ক্লিনিকে।

অনেক ডাক্তার গড়বড় যন্ত্র কমদামে কিনে এনে চেম্বার সাজায়, তুইও আটচল্লিশ, হাতিও আটচল্লিশ।

আর তুইও আটচল্লিশ। তো চল আজই তোকে নিয়ে যাই।—সম্পৃক্তা সঙ্গে সঙ্গে রেডি।

অগত্যা মধুবন পিছু হটে। অন্য পথ নেয়। আসলে তুই খাস না—উত্তর হল—ওই আনন্দেই থাক।

খাচ্ছেদাচ্ছে ওয়েট বাড়ছে না। সম্পৃক্তার ডেলি রুটিন কী! দাঁড়া ব্যাটা, একটু গোয়েন্দাগিরি না করলে আর চলছে না।

প্রথমেই মধুবন যশোমাসির ইন্টারভিউ নেয়। কারণ যশোমাসি সম্পৃক্তার সাক্ষাৎ মাসি। এবং বলতে গেলে এক বাড়িতেই থাকেন। যশোমাসির বাবা বহুত বড়লোক ছিলেন। সেই বিশাল বাড়ি তাঁর দুই মাত্র মেয়ে যশোধারা আর মধুক্ষরাতে বর্তেছে। যশোমাসির ছেলে পাবলো আর মধুমাসির মেয়ে সম্পৃক্তা দু'জনেই মধুবনের ইয়ার। সেকেন্ড কাজিনও বটে। ওদের বাড়ির মাঝখানে একটা দরজা। এ-দিকে যশোমহল। ও-দিকে মধুমহল।

মধুবন জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা যশোমাসি, শম্পি কখন জিমে যায় গো!

শম্পি জিমে? যায় না তো! কেন যাবে? এমনিতেই তো ডিগডিগুনি!

না খেয়ে থাকলে আর ডিগডিগে হবে না তো কী?

যশোমাসি বললে,—শম্পি না খেয়ে থাকে? তোকে বলেছে বুঝি? পাউরুটিতে মোটা মাখন লাগিয়ে তার ওপর মুঠো মুঠো চিনি ছড়িয়ে খায়টা তবে কে? ছানার মালাই কোফতা রেসিপি এনে আমাকে দিয়ে তবে কে রাঁধাল? আমাকে চোখ রাঙিয়ে বললে, মাসি, খবরদার কিন্তু টেস্ট পর্যন্ত করবে না। তা হলেই ফেটে যাবে। পাবলোকে একটা-দুটো দিল কি না দিল। সে অবশ্য কেয়ারও করে না। তা সে যাই হোক ন'-দশটা বাকি ছিল। নিজে সব ক'টি সাঁটাল। শম্পি নাকি না খেয়ে আছে! ওর ধাতই ওইরকম।—ওর বাবার মতো কেঠো ধাত। তুই আমি জল খেলেও ফুলছি। আর ওরা খাচ্ছেদাচ্ছে ফুরফুরেটি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একেই বলে ভগবানের বিচার। বলতে বলতে মাসি ফোঁস করে নিশ্বাস ফেললে।

আরমান এদিকে সকালে জিম, বিকেলে ফুটবল, সন্ধেয় যোগাসন বা ইয়োগা, রাত্তিরে খাওয়ার পর এক ঘণ্টা বাদে পাঁচ মাইল হাঁটে। সুদ্ধু নাকি ফিট থাকবে বলে। পাবলো বলে, ফিট থাকবে

বলে? বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাসনি। খাবে বলে, স্রেফ গাঁউগাঁউ করে খাবে বলে। এদিকে ওজন বাড়লে ওর কোচ বাঁড়ুদা ওকে ইয়া খিস্তি করবেন না। তাই আরমান যা খায় সব চেষ্টাচরিত্র করে পুড়িয়ে ফেলে। খাওয়ার জন্যে এটুকু কষ্ট নাকি ওর নস্যি। যে-কোনও রকমের মিষ্টি, সে বালুসাই-ই হোক আর কদমাই হোক, রসমুন্ডিই হোক আর শোনপাপড়িই হোক, কেক পেস্ট্রি চকোলেট সব রকমের দিশি-বিদেশি মিষ্টির দারুণ সমঝদার আরমান।

ভোরবেলা বেশ কিছু মেসো পিসে গোছের ভদ্রলোক শর্টস পরে কেডস পায়ে হনহন হাঁটেন, কারও হার্ট, কারও ডায়াবিটিস। এই সময়টাই পছন্দ করে মধুবন। সবাই তখন খুব নিবিষ্ট হন্টক। এর ওর তার দিকে দৃষ্টি দেবার সময় বা ইচ্ছে কোনওটাই নেই। ভুঁড়ি হার্টের ওপর ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে, কোলেস্টেরল হাই, ইউরিক অ্যাসিড বাড়ছে রক্তে, গাঁটে গাঁটে ব্যথা। কে তখন অন্যের মেদ নিয়ে মাথা ঘামায়। বিকেল হলেই ক্রাউডটা হয়ে যাবে মহিলাপ্রধান এবং তার মধ্যে বেশিরভাগই চেনাশোনা। বড়দের থেকে পরামর্শ, সমবয়স্কদের থেকে টিটকিরি ইয়ারকি একেবারে খইবৃষ্টির মতো চার দিক থেকে ছুটে আসতে থাকে এবং বর্ষিত হয়। 'কী রে মধুবন, কমল? যশোধরাদির বাড়ি যাওয়া বন্ধ কর, বন্ধ কর—এক্ষুনি হাঁটা সেরেই তো তিনটে আইসক্রিম সাঁটাবি, কমবে কী করে?'

ও-দিক থেকে একজন দু'হাত দোলাতে দোলাতে চলতে চলতে বলবে—এই ভাবে হাঁটো ভাই, এইভাবে, হাত পা ছুড়ে ছুড়ে। তবে না তোমার আর্ম আর থাইয়ের মাংস খসবে! কেউ বুঝবে না, তার হাতে রয়েছে চৌকি নামে একটি বিশালাকায় অ্যালসেশিয়ানের চেন। হাত সে ছুড়বে কী করে! আর পা? সে তো চৌকিই ছোড়াচ্ছে! সেটা লোকে দেখতে পায় না।

বেল্টটা চমৎকার! আর একজন কেউ মন্তব্য করে গেল। বেল্ট বলতে কী বোঝায় মধুবন এখন ভালই বুঝে গেছে, কিন্তু কাউকে ধরার উপায় নেই।

এই আমাকে বেল্ট বললে কেন?—এটা বলা যায়? বিশদ করে বলতে হবে,—আমার কোমর থেকে পাঁজরের নীচ পর্যন্ত বেড়ি সদৃশ্য যে চর্বির চাকা বিরাজ করছে, তাকে বেল্ট টেল্ট বলে ইয়ারকি মারলে কেন!—এভাবে বললে নিজেকেই নিজে কনডেম করা হয়। আবার কেউ বলতে বলতে যাবে—ভাল বেশ। শীত করবে না।

জিরো ডিগ্রির তলাতেও?

জিরো ডিগ্রির তলাতেও। মাইনাস চার-পাঁচ হেসে খেলে চলে যাবে।

বলতে গেলে বলবে—আমরা নিজেদের মধ্যে আবহাওয়া, সেন্টিগ্রেড, শীতের জামাকাপড় নিয়ে কথা বলছি। তুমি কে হে? গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এসেছ!

ম্যাক্সিমাম হল একজন বলল—ট্যাপারি।

দ্বিতীয়জন বলল—ধ্যার গোলগাপ্পা।

তৃতীয়জন বলল—ট্যাপারিটা বেশি জুতসই। গোলগাপ্পা তো কামড় দিলেই ফুট্টুস।

এ ক্ষেত্রেও কিছু করবার নেই।

তাই বিকেলবেলাটা মধুবন জিমে যায়। সে প্রাণপণে ম্যানুয়াল ট্রেডমিল করে যায়। পাশে একটি হিপোপটেমাস ওয়েট নিয়ে কসরত করতে করতে বলে—কবে যে অন্তত তোমার মতো হব!

আহা কী মধুর! মধুর! কেউ অন্তত পৃথিবীতে তার মতো হতে চাইছে। তার পরেই অবশ্য, সনা সেরে স্লিম বিউটি বেরিয়ে আসেন একজন। সিরিয়ালে অভিনয় করেন। কৃপার দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকান, একটু হাসেন, চলে যান। হিপো এবং সে পরশ্রীকাতরতায় বড্ড কষ্ট পায় সে সময়টা।

কিন্তু ভোরবেলাতেও শত্রুপাত হল। আরমানের মূর্তিতে। আরমানের আপাদমস্তক পেটা চেহারা। ফুটবল খেলে। কালীঘাট ক্লাবে। তিনি দৌড়োচ্ছেন। কৃষ্ণচূড়াগুলো মুহূর্তেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল মধুবনের চোখে।

কী রে মৌবটিকা? তুই হন্টন ধরেছিস নাকি?

মধুবন ওকে এড়িয়েই যাচ্ছিল। কিন্তু আরমান ছাড়বে কেন?

হুঁ। এক অক্ষরে উত্তর মধুবনের।

কাল নেমন্তন্ন ছিল, বুঝলি, একেবারে এই পর্যন্ত—গলাটা দেখিয়ে দিল আরমান। জগিং করতে করতে বলল ল্যাম চপ, ঢাকাই পরোটা, বিরিয়ানি, জিলিপি গরমাগরম ভেজে দিচ্ছিল, বুঝলি! আর আজকাল তো আইসক্রিম পার্লার বসাচ্ছেই। কুলফিও ছিল। দুটোই খেলাম। ন্যাচার‍্যালি। বহুত হয়ে গেল। সো পোড়াচ্ছি।

যা ক্যালারি পুড়ে
জিলিপি যা উড়ে।

মধুবন আর থাকতে পারল না। বলল—

ক্রিম ক্ষীর যা জমে চর্বিগুলো ক্রমে
গালের ওপর গাল হোক
পেটের ওপর পেট
তোর জন্মদিনে কোক পাঠাব
ক্রেটের ওপর ক্রেট।

বুড়ো আঙুল নেড়ে আরমান জানিয়ে দিল তাতেও ওর কিস্যুই হবে না।

বাড়ি এসে এক চক্কর। ক'দিন ধরেই বাড়িতে কুরুক্ষেত্র চলছে। মায়ের ভার্শন সর্বকর্ম সম্পাদক বা আপ্তসহায়ক যা-ই বলো বিদায় নিয়েছে। বিদায় নিয়েছে বলতে সে তার 'গেরামে' গেছে। মহা চালু। কিছু দিন অন্তর অন্তরই তাকে 'গেরামে' পায়, ইতিমধ্যে মাকে ফুসলে ফাসলে ব্ল্যাকমেল করে করে সে বেশ কিছু হাতিয়ে নিয়েছে বলে বাবার সন্দেহ। এখন হাতানো কমপ্লিট। দেশেঘরে বা গেরামে জমি-জায়গা বাড়িটাড়ি সব হয়ে গেছে তাই পরের চাকরিতে ইস্তফা। 'ইস্তফা দিবি তো তা-ই দে না বাপু।' মা ঝম্পক তালে বলে। 'না বলে এমন ফেরার হবার মানেটা কী?' 'মানে আলমারিতে খোঁজো'—বাবার উপদেশ—তোমার আলমারি থেকে তো সদাসর্বদা চাবি ঝুলছে। সবাইকার সামনে ঝনাত করে খুলছ আর টাকা বার করছ, শাড়ি বার করছ, গয়না বার করছ।

দ্যাখো, তুমি গা জ্বালানো কথা বলবে না। ও আমার আটপৌরে আলমারি। ওতে ওসব থাকে না। আর গয়না কোথাওই থাকে না। জানো না যেন সে-কথা!

আর ক্যাশ টাকা?

মা মধুর হাসে—টাকা তো ব্যাঙ্কে ডার্লিং। হাতে একশো টাকায় এসে ঠেকলে তখন রাত বিরেতে ঢং করে এটিএম থেকে তুলে আনো। টিপে টিপে! পিঁপড়ের পেছন টিপলেও এর চেয়ে বেশি মধু বেরোয়।

আচ্ছা মা, আটপৌরে আলমারিটা কী?—মধুবনের দাদা ঋজুরুস্তম জিজ্ঞেস করে।

মা দুই কোমরে হাত রেখে রণং দেহি মূর্তিতে দাঁড়ায়।—আটপৌরে! আটপৌরে? আটপৌরেটা নিয়ে তোমার অসুবিধে না আলমারিটা নিয়ে।

আলমারি ইজ অল রাইট, বাট হোয়াট ইজ আটপৌরে!

মিনস ক্যাজুয়াল—মাই ডিয়ার

মানে তোমার ক্যাজুয়াল ড্রেস রাখো মামণি, না?—মধুবন মাকে সাহায্য করতে চায়।

আজ্ঞে না। শুধু জামাকাপড় না, আর যা কিছু রোজ দরকার হয়, তেমন দামি নয় সে সবই।

ঋজু বলে—বাট আটপৌরে—আলমারি! আই জাস্ট কান্ট টেক মাম্মি।

মা গম্ভীরভাবে বলে—তোমাদের দাসী খাটতে খাটতে ব্যাকরণ-ট্যাকরণ ভুলে গেছি তবু চেষ্টা করছি—আটপৌরে জিনিস রাখার আলমারি। কর্মধারয় সমাস—বাংলা মতে। ইংরেজি মতে—ট্রান্সফার্ড এপিথেট। আলমারির জিনিসগুলো আটপৌরে, জিনিসগুলোর বিশেষণ ট্রান্সফার্ড হয়েছে আলমারিতে—ঢুকল মাথায়?

ওরে বাপ—মাদার এ তো ক্যালকুলাসের চেয়েও শক্ত!

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার কাছে জলের মতো সোজা, তোমাদের মতো বিজ্ঞান-নবিশদের কাছে ইটের মতো শক্ত। আই কিউ সবেতেই লাগে ঋজুরুস্তম। আর তাই যদি বলো তো তোমার নামটির মানেই আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো না!

নাথথিং—ঋজুরুস্তম সব উড়িয়ে দেওয়া হাসি হাসে—ঋজু মিনস স্ট্রেট অ্যান্ড রুস্তম মিনস্ আ ব্রেভ ম্যান, হিরো।

তা হলে দাঁড়াল একজন স্ট্রেটফরোয়ার্ড হিরো। যেটা নাকি সোনার পাথর বাটি।

অতশত জানি না। তোমরা ঋজু নাম দিয়েছিলে। আমার পছন্দ ছিল রুস্তম, দুটো জুড়ে নিয়েছি—এই তো আমার অপরাধ!

ঋজুরুস্তম নামটির পেছনের ইতিহাস এই। ঋজু নামটি ঠাকুরদার দেওয়া। কিন্তু স্কুলে বহু ভাষাভাষী বহু প্রদেশীয় বহু ধর্মীয় বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে ঋজুর মনে হয়েছিল তার নামটি যথেষ্ট আন্তর্জাতিক নয়। অন্ততপক্ষে সর্বভারতীয় বা এশীয় হলেও তার এমন জাত যেত না। বেশিরভাগই তার স্কুলে হসন্তান্ত—প্রসন্, অক্শয়, সাদিক, রোহান্, কুলদীপ, তাই সে নিজেকে সময় সুবিধে মতো ঋজুরুস্তম-এ পরিণত করেছে। বাবা ততটা খেয়াল করেনি। কেননা বাবার কাগজ পড়বারও সময় নেই। কিন্তু মাতৃদেবী প্রচুর রাগ করেন।

তোমার জন্ম যেমন দিয়েছি, নামটাও তেমন আমরা গুরুজনরাই দিয়েছি। তুমি যদি নতুন নাম নাও সেটা ছদ্মনাম বা পেননেম হতে পারে। তুমি কি লিখতে শুরু করছ?

পাগল নাকি?

ঠিকই। পাগল না হলে কেউ তোমাকে একজন দায়িত্বশীল কল্পনাপ্রবণ পড়ুয়া লেখক হিসেবে কল্পনা করবে না। মায়ের রাগত প্রস্থান।

যাই হোক, মধুবন মা আর দাদার এইসব দ্বৈরথে থাকে না। পাঁচ-ছ'রাউন্ড প্রাতঃহন্টন সেরে গলদঘর্ম হয়ে বাড়ি ফিরে সে দেখল—একটি ঝিঁঝির পাতের মতো মেয়ে তার মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মা তাকে দু'হাত নেড়ে কী সব সমঝাচ্ছেন। মেয়েকে যে এখন কিছু খেতে দিতে হবে মায়ের এ খেয়ালই নেই। অভিমানে দশখানা হয়ে মধুবন তোয়ালে দিয়ে ভাল করে নিজেকে মুছল তারপর স্রেফ শুয়ে পড়ল এবং শুয়ে পড়লেই যেহেতু তার ঘুম পেয়ে যায় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাজখাঁই আওয়াজে ঘুম ভাঙল। কে আর? মাতৃদেবী।

আজ কোচিংয়ে যেতে হবে না না কী?

চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল মধুবন। জঠরে দাবানল। ব্যাপারটা সে এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না। মাতৃদেবী তাকে জানিয়ে দিয়েই সরে পড়েছেন। মধুবন দেখল তার সামনে ঝিঁঝির পাতের মতো দেখতে সকালের সেই মেয়েটা। মধুবন কাতরে উঠল পেটে হাত দিয়ে। ওরে বাবা উঃ, কী আগুন জ্বলছে রে বাবা।

মেয়েটা খুব নিশ্চিন্ত গলায় বলল—ওব্বেস হয়ে যাবে।

মানে? আমার পেট ব্যথা করছে আর তুমি বলছ অভ্যেস হয়ে যাবে।

পেট ব্যথা তো নয়। আগুন জ্বলছে বললে না দিদি! তাই বললুম—খিদে, খিদের আগুন জ্বলে জ্বলে ঠিক একদিক খাক হয়ে যাবে তখন আর তত কষ্ট হবে না।

যা ব্বাবা! মধুবন তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে ধপাস করে খাটের ওপর বসে পড়ে।

প্রথম প্রথম মাথা ঘুরবে অমন—ঝিঁঝির পাতা বলে ওঠে।

মা! ও মা!—মধুবন রান্নাঘরের দিকে হাঁউ মাউ খাঁউ করে যেতে থাকে, তখন মেয়েটা বলে—আমি তো তখন থেকে তোমার খাবার টেবিলে ঢাকা দিয়ে দাঁইড়ে আছি। এই নাও।

ওর হাত থেকে প্লেটটা ছিনিয়ে নেয় মধুবন। দু'খানা আটার রুটি। পেঁপে মরিচ, গাজর শসা

বিন দিয়ে স্যালাড। মধুবন প্রায় একটা গোটা রুটিই মুখে পুরে দিচ্ছিল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে হবে, এবং এই ফুচকা দু'খানা রুটি দু'গরাসে পেটে চালান হয়ে গেলে খাদ্যের সেই অপূর্ব স্বাদ সে আর পাবে না।

ও বাবা। মেয়েটা বাটি খুলে একটা সেদ্ধ ডিম বার করছে।

ওটা কার?

তোমার।

তুই কি জিনপরি!

নির্বিকারে ঘাড় নাড়ল সে, বলল—জিনপরি নই। শুধু পরি।

পরিই বটে। ফুঁ দিলেই তো উড়ে যাবি।

হ্যাঁ গত এক বছরে খুব রোগা হয়ে গেছি।—জবাব হল।

এবার মেয়েটা সেই সরহীন দুধ বার করছে। পরম আধো গরম সেই দুধে চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ একবার চোখ তুলেছিল মধুবন। দেখে মেয়েটা নির্নিমেষে জানলার দিকে তাকিয়ে আছে। পেছন ফিরে জানলা দিয়ে রোদ খাঁ খাঁ রাস্তা ছাড়া কিছু তো দেখা গেল না।

দুধটা শেষ করে ওর হাতে গ্লাসটা দিয়ে মধুবন বলল—কী দেখছিলি ওখানে?

কিছু তো না। মেয়েটা কেমন জড়সড় হয়ে গেল। তার মনে হল মেয়েটা তার খাওয়াটা দেখতে চাইছিল না। কেন রে বাবা?

আজ থেকে কাজে লাগলি, না কী?

হ্যাঁ দিদিমণি।

আবার মণিফণি নয়। স্রেফ দিদি। কোথায় বাড়ি?

বাড়ি? বাড়ি ঘর নেই—বলে পরি আর দাঁড়াল না।

ঘড়িতে বারোটা বাজছে। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলে কোচিংয়ের দিকে রওনা দিল মধুবন। বড্ড সুখী-সুখী লাগছে আজ। অনেক দিন পরে গরম গরম লাঞ্চ খেয়ে বেরোতে পারছে সে। শান্তি আর কাকে বলে। আহা, তাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে মায়ের মনে ক্ষুধিত মেয়ের জন্যে করুণা জেগেছে। নিজের কঠোর ভাবমূর্তি পাছে গলোগলো হয়ে যায় তাই জিনপরিকে পাঠিয়ে দিয়ে চান করতে ঢুকে গেছে। আর তাই-ই আজকে ডিমটা এক্সট্রা।

আরএনজি-র ক্লাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন হঠাৎ মধুবন খেয়াল করল সে এখনও ডিমের কথা, নরম গরম রুটির কথা ভেবে যাচ্ছে। শম্পি যখন ক্লাসের শেষে বলল—তুই একখানা দেখালি বটে মৌবটিকা, না হয় একটু দেরিতেই ঢুকেছিস। তাই বলে আরএনজি-কে ওইরকম একস্ট্রা মনোযোগ দিতে হবে?

পাবলো বলল—যাকে বলে অভিনিবেশ! মুখখানা এক্কেবারে গোলগাপ্পা হয়ে গিয়েছিল। স্যারসুদ্ধু হাঁ হয়ে গেছেন।

তো মুখে একটা সেদ্ধ ডিম পুরে দিলে পারতিস। মধুবন রাগ করে ক্লাসরুম থেকে বেরোতে বেরোতে শোনে—শম্পি বলছে—দেখেছিস পাবলো মধুবন সব সময়ে, অলয়েজ টকস ইন টার্মস অব ফুড আইটেমস। সেদিন আমাকে বুড়োআঙুল দেখিয়ে বলল—কাঁচকলা! ক'দিন আগে কাকে যেন বলছিল কোচিংয়ের কেমিস্ট্রি সারের পেটটা ঠিক তরমুজের মতো।

এ তো ভাল, স্বাভাবিক। কাঁচকলাটলা আমরা বলেই থাকি। কিন্তু পরশু দেখি নীলাঞ্জন আর পিকলু উত্তেজিত হয়ে তর্কাতর্কি করছে, গদগদ করে তোর কাজিন এগিয়ে গেল, বলল—কী রে পাপকর্ন ভাজছিস নাকি?—পাবলো বলল।

আই অবজেক্ট। তোর কাজিন মানে কী? মধুবন কি তোঁরও কাজিন নয়। নাকি ডিজওন করছিস?

করছি না এখনও তবে অদূর ভবিষ্যতেও ও যদি ওরকম নদগদে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, করতে পারি।

এই পর্যন্ত মধুবনের কানে গিয়েছিল।

পাবলো, সেই পাবলো যার সঙ্গে সে একটা গলদা চিংড়ি ভাগ করে খেয়েছে, যাকে সে তার ফেভারিট নলি হাড় এবং মেটের টুকরো দিয়ে দিয়েছে কত কত বার, কেক কাটতে গিয়ে টুকরো অসমান হয়ে গেলে সানন্দে বড় টুকরোটা যে পাবলোকে দিয়েছে। সে-ই পাবলো তাকে ডিজ...ওন করবে? কা...জিন বলে স্বীকার করবে না!!! গদ্দার! গদ্দার! অসম্ভব সব প্রতিহিংসার দুঃস্বপ্ন মধুবনের মনে ধোঁয়ায়। সে মিলিটারি ভঙ্গিতে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে।

বসন্ত বলে ইদানীং আর কিছু নেই। রোদে ফেব্রুয়ারির শেষ থেকেই লঙ্কার ঝাঁঝ আর ঘাম। সেই সঙ্গে হাঁসফাঁস করো। প্রাণ বেরিয়ে যায় একেবারে। মধুক্ষরা মুখার্জি যশোধরা ব্যানার্জিকে বললেন—কী রে, মার্চ এপ্রিল কি এখানেই পচব আমরা? শহর তো নয় এ যেন সাহারা-কালাহারি। এইবেলা ব্যবস্থা না করলে এপ্রিলের শেষে বেরোনো যাবে?

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম! যশো হাত উলটে বললেন।

মানে? তুই বলতে চাইছিস সুহৃৎদা তোর কথায় ওঠেবসে না!

দ্যাখ মধু, তুই খুব ভাল করেই জানিস আমার কথায় কেউ ওঠেবসে না। শুধু তোর সুহৃৎদা কেন? সুহৃৎদার ছেলে, ছেলের মাসি, মাসির মেয়ে, সেই মেয়ের বাবা কারও ওপর যশোধরা বাঁড়ুজ্যের কোনও ইনফ্লুয়েন্স নেই।

তাই বলে তুই এই স্কোয়াডে আমাকেও ইনক্লুড করবি?

তো কী? তুই-ই বল না, তুই আমার একটা কথা শুনিস, রাখিস? তোকে বলেছিলুম হকি না খেলে নাচ প্র্যাকটিস কর, করেছিলি?

বলিস কী রে? সে যে আমার ১৩/১৪ বছর বয়সের কথা! সেই কথা এখন তুলছিস!

যশোধরা এসব কানেই নিলেন না, বললেন—তোর কাছ থেকে একটা, একটা মাত্র তিলের নাড়ু চেয়েছিলুম আর আমসত্ত্বর ছেঁড়া কোণ, দিয়েছিলি?

মধু হাঁ করে দিদির অভিমানাহত থমথমে মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। কেননা দিদি আরও পিছিয়ে গেছে।

আমার পিচকিরিটা কাজ করছিল না। তোরটা একবার মাত্র চেয়েছিলুম, ব্যাঙাদাকে রং স্প্রে করব বলে, ধার শুধু, কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। ব্যাঙাদা পাস করে গেল, মুখ তুলে আমাদের যথারীতি ভেঙিয়ে গেল—'এই যে দুষ্টু সরস্বতী, এইবারে ছিলি খুলেছে। বাঁদুরে রংটা কে মাখালে? তার বেশ রসজ্ঞান আছে দেখছি!' তোর মনে না থাকতে পারে, আমার মনে দগদগে হয়ে জেগে আছে। শুধু একটি পিচকারি—ব্যাটাকে নাইয়ে দিতুম—দিলি না।

সে তো ভালই হয়েছে রে! তখন ব্যাঙাদাকে পিচকিরি আবির গুলাল ছোড়ার কী মানে হত বল তো!—এতক্ষণে ভাষা খুঁজে পায় মধুক্ষরা—মানে হত ব্যাঙাদার প্রেমপত্তরের উত্তর দেওয়া। ব্যস লেগে যেত তাক ধুম ধুম, তুই ব্যাঙাদার সঙ্গে গঙ্গার হাওয়া খেতে যাচ্ছিস, ভাবতে পারছিস দিদি?

যশো কোমরে আঁচল গুঁজে নেয়—মানে? মানে? প্রেমপত্তর আবির গুলাল, গঙ্গার ধারে হাওয়া খাওয়া—এ সব কী? মাথায় এল কী করে?

ব্যাঙাদার ওই সব চ্যাটাং চ্যাটাং কথার আসল মানে যে পিরিত সে তো আমি তখনই বুঝতুম। তুইও নিশ্চয় বুঝতিস। তোর নিশ্চয় ব্যাঙাদের সঙ্গে ভিড়ে যাবার মতলব ছিল না! কী রে কিছু বলছিস না যে বড়?

যশোধরা ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—তুই যে বরাবর আমার শত্রুতা করে যাচ্ছিস তা টের পেয়েও কেন যে পেলুম না এটাই বিস্ময়।

মানে?

দেখ, আমি বুঝতে পারিনি, পারিনি, তুই আমাকে বোঝাতে পারতিস ব্যাঙাদার প্রেমের কথাটা।

বুঝে কী করতিস?

সান্ত্বনা। সান্ত্বনা পুরস্কার। তোর তখন এক বাইরে ঘর ভরতি প্রেমিক। আমারও একটা আছে—চ্যাঙা হোক ব্যাঙা হোক, এই সান্ত্বনা। আর কী! যশো বিয়ের পিঁড়িতে বসছে অথচ পাড়া বেপাড়ায় কারও বুক ফেটে যাচ্ছে না, কেউ সন্ন্যাসী হওয়ার কথা ভাবছে না, এ যে কত বড় কলঙ্ক একটা মেয়ের পক্ষে তা তুই ভাবতে পারছিস! আমার সে জোর কই, কনফিডেন্স কই যে, তোর সুহৃৎদাকে ওঠাব বসাব?

কলঙ্ক কীসের? কার কেচ্ছা হচ্ছে! বলতে বলতে এই সময়ে পাবলো ঢুকল।—কে আমার বাবাকে ওঠবোস করাতে চায়!

তোর মাসি—বলে যশোধরা বন্দ্যোপাধ্যায় সরে পড়লেন।

বছর দশ বয়স থেকে পাবলো বাড়ির ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গেছে। বাবা কোথায় গেছে, মা কী করছে, কার মন খারাপ, কেন কার মন ভাল তাই-ই বা কেন...এ সব পাবলো ভাবে না। বাড়িটাতে সে পরম আরামে বাস করে, চমৎকার খাওয়া-দাওয়া করে। এদিকে বাবা-মা ওদিকে মাসি-মেসো যে সামনে পড়ে তার সঙ্গেই কথাবার্তা বলে। কেউ দেখলে বা দু'দিন বাস করলে বুঝবে না যে পাবলো আলগা হয়ে বাড়ির বোঁটাটিতে ঝুলছে। কিন্তু প্রকৃত সংবাদ হল এই যে, পাবলোর একটি বিশাল বন্ধুকুল আছে। তার মনপ্রাণ সেই বন্ধুদের কাছেই গচ্ছিত আছে। বাড়িতে সে যা বলে তা হল কাজের কথা—পাজামাটা কোথায়? জিনসটা কাচতে দিয়েছে কে? বারবার বলেছি না আমার জিনিসে হাত দেবে না! বাঃ আজ পরোটা মাংস? চমৎকার মেনু করেছ মাম্মি। তোমার হবে। হ্যাঁ বাবা, পড়াশোনা ভাল হচ্ছে। কিন্তু এগুলো ওই কথার পিঠে কথা। আসল গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তার জন্যে আছে রোহন, পঙ্কজ, আমন, উন্নীতা, বল্লী ইত্যাদি ইত্যাদি। তার মাসতুতো বোন সম্পৃক্তা বা শম্পিও এই বন্ধুকুলের মধ্যে পড়ে। আছে ফুটবলার আরমান, এবং পরিধির কাছে যারা ঘোরাফেরা করছে তাদের মধ্যে রয়েছে মধুবন।

স্কুলের পর পাবলো বাড়িতে একবার টুঁ মেরেছে প্রধানত একটু চান করে নেবার জন্যে। এবং গৌণত নিয়মরক্ষার জন্যে। তার মা যশোধরা ভীষণ রক্ষণশীল, ঘোর নিয়মবাদী। ছেলে বিকেলবেলায় বাড়িতে না ঢুকলে মায়ের ফিটটিট হতে পারে, আর তা যদি না হয় তো পাবলোরই ফিটটা হবে, কেননা মা পাবলোকে খেতে শুতে চান করতে তিষ্ঠোতে দেবে না। বকেই যাবে, বকেই যাবে। পাবলো অশান্তি পছন্দ করে না। সে বিদ্রোহী। কিন্তু নীরব গোত্রের।

মধুমাসি অমনি সাতখানা করে বলতে বসল—দেখ না দিদিকে বকছিলুম ঠান্ডা কোথাও ঘুরে আসি, তা তোরা সবাই, ইনক্লুডিং সুহৃৎদা যে দিদির কত অবাধ্য সেই পুঁটলি খুলে বসল। এই গরমে টেকা যায়, তুই-ই বল।

পাবলো হাঁ করে মাসির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল—আচ্ছা মাসি, তোমার ওজন তো বেশি নয়!

আমার ওজন? ওজনের কথা উঠছে কেন?

না, ধরো ঊনষাট-ষাট ওজন এমন কিছু বেশি নয়। তাই না?

অ্যাঁ?

তোমার তার বেশি হবে না। অবশ্য ঊনআশি-টাশি হবে।

মোটেই না। দিদি বড়জোড় পঁচাত্তর হবে। বাজে বকিসনি।

কথাটা তা না। কথাটা হচ্ছে চর্বির লেপ যার গায়ে যত বেশি তার গরমও তত বেশি। এখন মাসি, তোমাদের এই পিতৃভবনের কথা ধরো। এটিতে কুড়ি ইঞ্চির দেয়াল। পনেরো ফুটের হাইট।

গরম তোমাদের লাগে কী করে? রোদ তো দাঁত ফোটাতে পারছে না তোমাদের বাড়ির ইনসাইডে। সন্ধেবেলা পেল্লাই পেল্লাই জানলাগুলো খুলে দিলে দক্ষিণ সমুদ্দুরের হাওয়া হু হু করে বয়ে যেতে থাকে। যাবে পঙ্কজদের বাড়িতে?

কে পঙ্কজ? তার বাড়ি আমি যেতে যাব কেন? আচ্ছা তো!

উঃ, যেতে বলছি না। কমপেয়ার করছি। ওদের টপ ফ্লোরের ফ্ল্যাটে এসি চলছে গদাম গদাম করে, কিন্তু নো ঠান্ডা, নো রিলিফ। পঙ্কজের মা একখানা মসলিনের না কীসের সি-থ্রু নাইটি পরে ঘোরেন।

পাবলো! অসভ্যতা হচ্ছে!

বা রে, অসভ্যতাটা কি আমি করছি? ভেবে দেখতে গেলে পঙ্কজের মাকেও দোষী করা যায় না। তাঁকেও তো টিকতে হবে রে বাবা! আমাদের মতো তো আর শর্টস পরে, খালি গায়ে বসে থাকতে পারেন না! পারেন? কিন্তু তোমাদের কেস আলাদা। এইরকম ন্যাচার‍্যালি এয়ার কন্ডিশনড্ আর্কিটেকচার এখন অর বেশি নেই। তা-ও তোমাদের যখন এত গরম হচ্ছে, মনে হচ্ছে প্রবলেমটা অন্য কোথাও। প্রেশার মাপিয়েছ?

চুপ কর।

আহা রাগ করো কেন? মেসোর কি আরও টাকা হয়েছে?

ভাল হবে না বলছি পাবলো।

কী আশ্চর্য। আমি মাওবাদী নই যে, মেসোর টাকায় আপত্তি করব। গরমটা টাকার কি না সেটাই বুঝতে কথাটা তোমায় জিজ্ঞেস করলুম।

পাবলো আর দাঁড়াল না। তিন লাফে দোতলার সিঁড়ি টপকে বাথরুমের দিকে রওনা দিল। আর্কিটেকচারের সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়ির মেজাজ মর্জি সাজসজ্জা সবই জমিদারি। বাথরুমটাই একখানা ঘরের মতো। তাতে পেল্লায় এক বাথটব। অনেক দিনের পুরনো। প্রচুর যত্ন সত্ত্বেও তাতে সামান্য একটু হলদেটে ভাব এসেছে, কিছু কিছু চিড় খাওয়া জায়গার ওপর পট্টি লাগানো হয়েছে। কিন্তু তাতে কী! বাথটবটাতে পাবলো তার পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বাই ছড়িয়ে আরামসে চান করে আর চান করে।

পাবলিক প্রসিকিউটরকে সংক্ষেপে কী বলে? পি পি। কিন্তু পি পি-র প্রচলিত মানে হচ্ছে পাবলো-পঙ্কজ। জুটিটি অবিচ্ছেদ্য বলে বিখ্যাত। কিন্তু ইদানীং এদের মধ্যে একটা ডিফারেন্স দেখা যাচ্ছে। পঙ্কজের ইচ্ছে সে স্টেটস-এ যাবে। পাবলো স্টেটসকে ঘৃণা করে। কেন? বুশ-এর জন্যে? ইরাক-আফগানিস্তানের ওপর বুশী হামলার জন্যে? না। একেবারেই না। কে কোথায় কার ওপর হামলা করছে সে সব নিয়ে ঘেন্না-পিত্তি থাকলে তো আর এ-পৃথিবীতে টেকা যাবে না। গুড বাই জানিয়ে বেহেস্ত্-জাহান্নম যে-দিকে হোক কেটে পড়তে হবে। আসলে বড্ড কমন, ভালগার হয়ে গেছে। তবে কি পাবলো অস্ট্রেলিয়া যেতে চায়? আজকাল লোকে খুব অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। হাজার হাজার ডলার খরচ করে ক্যানবেরা সিডনির ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাচ্ছে। আর ফিরছে না। অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর তৃতীয় মেল্টিং স্পট হতে যাচ্ছে। প্রথমটা রবীন্দ্রনাথ নামে গুরুদেব ভদ্রলোকটি দাগিয়ে গিয়েছিলেন—'শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।' দ্বিতীয়টি অবশ্যই আমেরিকা। বিশ্বসুদ্ধু সায়েন্টিস্ট জড়ো করে অ্যাটম বোমা বানাল, বলল আমেরিকার উদভাবন। ভাল বাবা কর। তৃতীয় মেল্টিং স্পট হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া। একরের পর একর খালি জমি পড়ে রয়েছে সেখানে। ভারত স্বাধীন হবার পর দলে দলে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দেন, বিকল্প হোম।

আর এখন অস্ট্রেলিয়া তার খালি জমি, চাষবাস, খামার-টামার, ক্রিকেট-টিকেট, বিশ্ববিদ্যালয়-টয় নিয়ে ডাক পাঠাচ্ছে দিকে দিকে। এসো, এসো আমাকে ধনী করো, যেমন করেছ আমেরিকাকে। লোকে যাচ্ছেও, খুশিতে যাচ্ছে। খুশিতে থেকে যাচ্ছে। কিন্তু পাবলো অস্ট্রেলিয়াতেও যেতে চায়

না। উঃ পাবলো যে কী চায়! সে ম্যানেজমেন্ট পড়বে না। ডাক্তার হবে না। ইঞ্জিনিয়ার হবে না। আর্টিস্ট হবে না। তবে পাবলো কী হতে চায়! পঙ্কজ ধুধুরিয়ার আইকন হচ্ছে বিল গেটস। সে আই টি-তে যাবে, ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোবে। প্রথমে বি পি-ও জয়েন করবে একটা কেননা তার এগ্রিগেট রেজাল্ট তেমন সুবিধের হচ্ছে না। সে যাই হোক সে ক্রমে ক্রমে উর্ধ্বে উঠবে, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিংয়ের জন্যে যা যা থাকা দরকার পঙ্কজ ধুধুরিয়ার সে সবই আছে। স্মার্টনেস, চটপট চিটিরপিটির কথা বলবার ক্ষমতা, অ্যালার্টনেস যাকে বলে। কম্পিউটারের বেসিকস তো সে কবেই জেনে গেছে। সে বি এস সি-টা করবে, তার পরে বি পি ও, তার পরে সিলিকন ভ্যালি স্ট্রেট। বাড়িতে গোড়ায় গোড়ায় টাকা পাঠাবে। তারপর প্রথমে ভাইকে তারপরে বাবা-মাকে ওখানে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। এবং যদি ম্যানেজ করতে পারে তো নিয়ে যাবে বল্লীকে বল্লী ধুধুরিয়া করে। মুশকিল হচ্ছে বল্লী ঠাকুর হচ্ছে অতি ধুরন্ধর মেয়ে। পঙ্কজ যদি চলে ডালে ডালে তো বল্লী চলে পাতায় পাতায়। এবং বল্লী ঠাকুরকে ন্যাশন্যালিস্ট পোকায় কেটেছে। বল্লী মনে করে, সে না থাকলে ভারতবর্ষকে আর দেখবার কেউ থাকবে না। তাই সে স্টেটস অস্ট্রেলিয়া তো কোন ছার, হাতের কাছে মায়ানমার কি চায়না পর্যন্ত যেতে চায় না।

এখন বন্ধু মহলে পি-পি বলতে যেমন পঙ্কজ পাবলো বোঝায় তেমন পি বি এক্স বলতে টেলিফোনের প্রাইভেট বক্স এক্সচেঞ্জ বোঝায় না। বোঝায় বল্লী কমন ফ্যাক্টর কিন্তু পি-টি কোন পি? পাবলো? না পঙ্কজ? সেইজন্যেই শেষে এক্সটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন পি সেটা পি-রাও জানে না, বল্লীও জানে কি না সন্দেহ আছে। এই নিয়ে একটা সূক্ষ্ম টেনশন যে তাদের মধ্যে নেই তা নয়। কিন্তু কোনও মনোমালিন্য এখনও নেই।

পাবলোর কম্পিউটার-সম্পর্কিত চাকরির ওপর ভীষণ ঘেন্না। প্রচুর মাল ছাড়ে কোম্পানিগুলো তারপর তোমাকে স্রেফ কিনে নেয়। কারও ক্রীতদাস হবার সাধ পাবলোর নেই। তার বাবা সুহৃৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তার খাটুনিটা খেটে দিচ্ছেন, বাবার এক ছেলে সে, আর্থিক দিক থেকে যাকে বলে সাউন্ড। টাকার জন্যে দাসত্ব করার মতো গাঁইয়ামি করবার পাত্র পাবলো নয়। তবে সে কী করবে? ক'দিন পরই আই এস সি পরীক্ষা। তার মধ্যেই ঠিক করে ফেলতে হবে। বাবা জিজ্ঞেস করছে, মধুবন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করছে।

কী রে পাবলো, কী ঠিক করছিস?

কোনও একটা নির্দিষ্ট দিন থেকে পাবলোর মাসতুতো বোন মধুবন কেমন একটু তেতো, তির্যক, বিদ্রূপাত্মক হয়ে উঠেছে। এটা একটা ডেফিনিট চেঞ্জ। কেননা মধুবন চিরকাল পাবলোর খুব বন্ধু। মধুবন পাবলোর মায়েরও খুব বন্ধু। হেন জিনিস নেই পৃথিবীতে যা মধুবন আজ অবদি পাবলোর সঙ্গে ভাগ করে নেয়নি। সে চকলেট- ফুচকাই বলো, আর মধুবনের নিগূঢ় প্রেমাকাঙ্ক্ষা, তার নিদারুণ ডিপ্রেশন সে মোটা বলে কেউ তাকে সিরিয়াসলি নেবে না...ইত্যাদি ইত্যাদি সে পাবলোর সঙ্গে যত সহজে আলোচনা করে, শম্পির সঙ্গেও ততটা নয়। যদিও পাবলো মোটেই তার গোপন কথাবার্তার ভাগ মধুবনকে দেয় না। যাই হোক, যে-মধুবন সব সময়েই তার নিজস্ব বন্ধু হয়ে টিকে ছিল, সেই মধুবন হঠাৎ কেমন খামখেয়ালিনী তিক্ত হয়ে উঠেছে।

কী রে পাবলো, কিছু যে বলছিস না! ভ্যারেন্ডা ভাজবি নাকি?

কেন। তুই জেনে কী করবি? তোর এত কৌতূহল কেন?

বাঃ চিরকাল সব আমাকে বলে এসেছিস, হঠাৎ এখন মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট স্টেপটা বলছিস না।

বেশ তো তুই বল না তুই কী করছিস।

আমি তো ভাই বহুত দিন আগে থেকেই বলে দিয়েছি সায়েন্সই পড়ি আর যাই করি শেষ পর্যন্ত আমি ইংলিশ হন্‌স্ নিয়ে পড়ব, মাস্টার্স করব, তারপর ড্যাংডেঙিয়ে কলেজে পড়াব। মধুবনদি। মধুবনদি, ম্যাডাম, ম্যাডাম বলে ছাত্র-ছাত্রীগুলো ঘিরে ধরবে। এই আমার অ্যাম্বিশন।—হতে পারে

ছোটখাটো। কিন্তু আমি জানি আমি কী চাই। তোদের মতো অন্ধকারে ঢিল ছুড়ি না।

বলে মধুবন বেশ কায়দা মেরে চলে গেল। পাবলো এখন বাথটবে গা ডুবিয়ে ভাবছে, সত্যিই সে কী করবে! ছোট থেকে এত কিছু সে করেছে যে, এখন নিজেকে বাঁশবনে ডোম কানা মনে হচ্ছে।

পাবলোর দারুণ ড্রয়িংয়ের হাত বুঝলেন আনন্দবাবু। আপনি যদি ওকে একটু...। যশোদা-মা গদগদ। পাবলোকে 'বসে আঁকো'-ফাঁকোতে না বসালে চলছে না। ফুল আর্টিস্ট কিন্তু নয়, পার্ট টাইম আর্টিস্ট হতে হবে।

আনন্দ গোস্বামীর কাছে পাবলো আঁকা শিখেছে। ড্রয়িং, স্কেচ, জলরং, তেলরং, ওয়াশ, সবই।

পাবলোর সুরতালজ্ঞান সাংঘাতিক বুঝলে যশো—সুহৃৎবাবুর উক্তি। কেননা পাবলো সব চলতি হিন্দিবাংলা গান গাঁক গাঁক করে গেয়ে দিত। যত ধাঁই ধপাধাপ টাইপ হবে তত ফুরতি। সুতরাং, তাকে নাচের ক্লাসে ভরতি হতে হল। ক্রিয়েটিভ ডান্স। সেই সঙ্গে গানও। জ্ঞানদা তালুকদারের কাছে। গোটা দশেক রাগ সে ভক্তিভরে শিখেছে। বাড়ি ঢোকা থেকে শুরু করে ঘুমোতে যাবার আগে পর্যন্ত গান গুনগুন করে থাকে। এক-এক সময় এক-একটা গান তাকে পেয়ে বসে। এক সময়ে ছিল 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা'—মধুবন একদিন বলল—আর য়ু অ্যান ওল্ডি?

শম্পি বলল—যা বলেছিস! তারপরে সে ধরল 'ডম ডম ডিগা ডিগা'। মা তাকে শুধু মারতে বাকি রাখত তখন। 'উফফ পাবলো আমার মাইগ্রেন শুরু হয়ে গেল।'

তুই একটু থামবি?

ইদানীং সে গাইছে 'আশিক বানায়া'।

ফোটোগ্রাফিতেও দারুণ শখ পাবলোর। পোর্ট্রেট বিশেষ করে। রীতিমতো কালেকশন তার। গোটা তিনেক ক্যামেরা কোডাক, ক্যানন, নাইকন, আলাদা আলাদা লেন্স। ফিল্টার। ডার্করুমের কাজও সে জানে। যেখানে যায়, ক্যামেরাবাবু সঙ্গে যান। ডিজিটাল ক্যামেরায় তার শখ নেই। সে আর্টিস্টিক ছবি তুলতে চায়। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পছন্দ করে।

এত গুণ, এত শখ নিয়েও পাবলো বাথটবের মধ্যে স্রেফ লক্ষ্যহীন ভাবে শুয়ে থাকছে। বেশ কিছু দিন। মায়েরটা তবু পাশ কাটানো যায়।—উফ আগে আই এস সি-র ধাক্কাটা সামলাতে দাও! মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে আছে বুঝলে মাদার?

ব্যস মা গলে জল। মাদার ডাকলেই কি মায়ের নিজেকে মাদার টেরিজা মনে হয়, না গোর্কির মাদার, কে জানে কিন্তু মাদার ডাকে মা খুশি হয়ে যায়—এক্কেবারে পাবলোর পরীক্ষিত সত্য।

বাবাকে পাশ কাটানো অত সোজা নয়। রোববারের মধ্যাহ্নভোজন পর্যন্ত মোটামুটি এড়িয়ে থাকা গেল, তারপর চটি চটাস চটাস করতে করতে সুহৃৎ ব্যানার্জি ঘরের ভেতর ঢুকে আসবেন—পাবলো খাবি না! চল!

ভাত ভেঙেই প্রথম প্রশ্ন—শরীর স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখছ তো? ওজন বাড়িয়ে যাওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়।

মাতৃদেবীর ঝংকার সঙ্গে সঙ্গে—কেন ওজন বেশি বলে কোন কাজটা আমি হালকা করে করছি? তোমার অসুবিধে হচ্ছে কোনও?

আমাদের নয়। তোমার, অসুবিধেটা তোমার, এই সিম্পল কথাটা না বুঝলে তাকে বলে সিম্পলটন।

থাইরয়েড টেস্ট করাও। বারবার তো বলছি আমার হাইপোথাইরয়েড হয়েছে। চোখের পাতা পড়ে যাচ্ছে। ক্লান্ত লাগে সব সময়ে তা জানো?

ফোন রয়েছে, তুলে দিয়ে জাস্ট একটা কল দাও না অরূপ ল্যাবরেটারিতে।

কেন? আমার অসুখে আমি করব কেন? তোমাদের অসুখের বেলা তো তখন আমাকেই সব করতে হয়। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ খাওয়ানো, পথ্য করা—আমার বেলা কেন আলাদা হবে! আমি

কাউকে ফোন করব না। চুপচাপ মোটা হতে হতে একদিন ফটাস করে পটল তুলব। তখন দু'হাত তুলে নেচো।

মা হাঁসফাঁস করতে করতে চলে গেল।

ব্যস সুহৃৎ ব্যানার্জির মনোযোগ ছেলে থেকে স্ত্রীর দিকে ঘুরে গেল।—এ হে হে, এটা তো আমার মনে হয়নি। ডাক্তারের কাছেও নিয়ে যাওয়া হয়নি। থাইরয়েডটা—এহে হে...বাবার প্রবল বিবেক দংশন হচ্ছে দেখে পাবলো বলে, ডাক্তার না হলেও হাফ-ডাক্তার দেখেছেন।

হাফ ডাক্তার? বাবার চোখ গোল হয়ে যায়—হাফ ডক্টারস আর ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস পাবুল।

না বাবা। ওই মধুবনের জিম মাস্টার। তাঁর সঙ্গে তো মায়ের খুব ভাব। বিকেলবেলা হাঁটতে তো উনিই মাকে পাঠিয়েছেন। উনিই বলেছেন ডায়েট মানতে হবে।

তা তোর মা কি মানছে না?

পাবলো কাঁধ নাচাল—আমি কী করে বলব। সারাদিন থাকি? একা বাড়ি। কোথাও কেউ নেই। মা কী করছে না করছে, আইসক্রিম খাচ্ছে না রসগোল্লা খাচ্ছে কে দেখতে যাচ্ছে!

তা তুই থাকিস না-ই বা কেন? বাবা মাছভাজা খেতে খেতে নিষ্পাপ চোখে জিজ্ঞেস করে।

বোঝো। একটা আঠারো বছরের ছেলে। সে নাকি মা আইসক্রিম খাচ্ছে কি না নজরদারি করবার জন্যে বাড়ি বসে থাকবে। পারেও বটে এরা।

তুমি থাকো না কেন?

আমি? সুহৃৎবাবুর মাছভাজা খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।—আমি? হো হো হো! না ভাল বলেছিস পাবুল। আমি, অ্যাঁ?

কতক্ষণ বাবার এই 'আমি আমি' বিস্ময় চলবে কে জানে তাই পাবলো বলল—আমার কলেজ নেই? কোচিং নেই? খেলা নেই?

বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডার কথাটা কেয়ারফুলি বাদ দিয়ে গেলি, কেমন?—বাবা চশমার ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকাল।

ওটা হল অকুপেশন্যাল হ্যাজার্ড। থাকবেই বাবা।

কী বললি? কী হ্যাজার্ড? অকুপেশন্যাল? বলি তোর অকুপেশনটা কী?

স্টুডেন্ট। পড়াশোনা, কলেজ করা—ছবি আঁকা, গান-নাচ, তালিম, সব জায়গায় গোছা গোছা বন্ধু। ও তুমি আটকাতে পারবে না, আমিও পারব না। উঠি বাবা, অনেক কাজ হ্যাঁ?

না না, উঠিস না। হাত ধুয়ে এসে টেলিফোন বুকটা দে, আমার সেলফোনটা টেবিলে আছে এনে দে। এইখানে আমার পাশটিতে দাঁড়িয়ে অরূপ ল্যাবে ফোন কর।

অগত্যা পাবলোকে তাই করতে হয়।

ফোন করে নিয়ে পাবলো বলে—বাবা, জিজ্ঞেস করছে কী টেস্ট?

থাইরয়েড।

থাইরয়েডের কী জিজ্ঞেস করছে।

ওই সব টি এইট এস, টি এইচ ওয়ান টু থ্রি যা আছে সব।

বাবা, ডক্টরের নামটা চাইছে ওরা।

বাবা বললেন,—ডক্টর সুহৃৎ ব্যানার্জি বল।

নির্বিকার মুখে নামটা বলে ফোন অফ করে দিয়ে পাবলো বললে, বাবা, তোমার বিরুদ্ধে এবার কিন্তু কেস হবে।

কেন? আমি কি ডক্টর নই!

তুমি ডক্টর অফ সায়েন্স, ওরা মেডিক্যাল ডক্টর চাইছে।

সে তো বটেই। কিন্তু আমার হল কাজটা চটপট হয়ে যাওয়া নিয়ে কথা, এবং মিথ্যে না বলা

নিয়ে কথা—বলে বাবা 'যশো যশো ইটস ডান, তোমার স্বামী তোমার থাইরয়েড টেস্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, ওর রাগঝাল করে থেকো না। একটু খাওয়া-দাওয়া করো।'—বলতে বলতে চলে গেল।

এই বলছে খায় কি না নজর রাখিস। আবার এই বলছে একটু খাওয়া-দাওয়া করো—এই মা-বাবা জাতীয় লোকগুলোকে পাবলো আজও বুঝে উঠতে পারল না।

মাঝে মাঝে ক'দিন খুব ঝড় দিচ্ছে। দু'চারটে গাছ পড়ছে। ছিটকিনি না লাগানো জানলার কাচ মুড়মুড় করে ভেঙে যাচ্ছে, শুকোতে দেওয়া কাপড়-চোপড় ক্লিপসুদ্ধ ছিটকে উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঝড় পরবর্তী বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির এখনও দেখা নেই। গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে করতে যশোধরা তৃতীয় বার চান করে, সারা গায়ে ট্যালকম পাউডারের বৃষ্টি ঝরিয়ে স্লিভলেস একখানা ব্লাউজ গলিয়েছেন, দরজায় বেল বাজল। বেলের আওয়াজটা বিশ্রী। একেবারে চ্যাঁ ভ্যাঁ মতন। শুরু করলে থামতে চায় না। কিন্তু যশোধরা এই বেল বদলাতে দেন না। এটা বাবা লাগিয়েছিলেন। বাবার জীবনের শেষ বেল। সুহৃৎ যদি বলেন—ওফ এটা তো দেখছি মরা মানুষকেও দাঁড় করিয়ে দেবে।

পাবলো ফোড়ন কাটবে—মারকুটেও করে দিতে পারে। বেলটা শুনলেই মনে হয় দরজাটা খুলেই বেলঅলাকে দিই এক থাপ্পড়।

না না এতটা রি-অ্যাক্ট করিস না। তোর রি-অ্যাকশনগুলো আজকাল বড্ড স্ট্রং হয়ে যাচ্ছে রে পাবুল। সামলে। সামলে।

যশোধরা বলেন—যার বাড়িতে আরামসে থাকতে পারছ, প্রেমসে খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা, মজা মারতে পারছ, তার বাড়ির বেল-কে একটু সহ্য করতে হবে।

'হবে'টা অতিরিক্ত জোর দিয়ে বলে যশোধরা পাউডার মাখতে থাকেন। আজ কেউ নেই। যশো নিজের মনেই বলেন—বাবা রে বাবা বেল বটে একখানা। পিলে চমকে যাবে। তাড়াতাড়ি করে শাড়িখানা কাঁধে ফেলতে না ফেলতেই আবার চ্যাঁ!

উঃ লোকে বোঝ না প্রথম বেলে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না মানে গৃহকর্ত্রী ব্লাউজ পরছেন, শাড়িটা এখনও দুরস্ত হয়ে ওঠেনি। এই সামান্য কথাটা না বুঝলে...উফ্‌ফ্‌।

তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে যশোধরা দেখেন একটি যথেষ্ট সরু মেয়ে সিড়িঙ্গে মতন প্যান্ট পরা, ওপর দিকে একটা বেঁটে মতো টপ, পাশে একটি গাবদা গোবদা ছেলে। তার পরনে বারমুডা, পাতলা আদ্দির মতো কোনও কাপড়ের একটা ফতুয়া, এত পাতলা যে, ভেতরে পইতে দেখা যাচ্ছে।

মেয়েটি বললে—স্যরি ফর দা বেল।

আমার বেলের জন্যে তুমি কেন স্যরি হতে যাবে ভাই?—যশোধরা মোলায়েম করে বলেন।

মেয়েটি বলল—আপনারা স্যরি না হলে আমাদেরই হতে হয়। একটু হাসল—কিছু মনে করবেন না আমি একটু ট্যাঁক ট্যাঁক করে কথা বলি। বেলটা পালটে নিলেই পারেন। না পাবলোবাবুর সেটুকু উদ্যোগও নেই!

বেলটা পাবলোবাবুর নয় ভাই, বেলটা আমার, আরও ভাল করে বলতে গেলে আমার বাবার। বাবার লাগানো শেষ বেল। পালটাবার উপায় নেই।

ফ্যামিলি এয়ারলুম? ছাওয়ালটি এতক্ষণে বলল।

রাইট।

পাবলো কি বাই এনি চান্স বাড়িতে আছে?

নো চান্স—যশোধরা বলেন, তা তিনি আবার কোথায় উধাও হলেন? তাঁর ক'টি ঠেক!—মোটের ওপর?

জানলে তো বলব! ভেতরে আসতে বলবেন না?

কে জানে, ভেতরে আসতে বললে আবার স্যরি-টরি বলবে কি না!

দুই মক্কেল ভেতরে ঢুকে এল।

আ-হ। কু-ল—ছেলেটি বলল।

মেয়েটি বলল—আর্কিটেকচার।

ছেলেটি বলল—ওল্ড ইজ গোল্ড।

মেয়েটি বলল—প্ল্যাটিনাম।

এতক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি হল যশোধরার। এসে সোফার ওপর গদিয়ান হয়ে বসেছে ছোকরা-ছুকরি, বসে নিজেদের মধ্যে একাক্ষরে প্রায় কথা বলছে। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল মধুকে ডেকে আনেন। এদের বেয়াদপি দেখান। তারপর দুই বোন মিলে একেবারে দূর করে দেন। একা একা অতটা সাহস হয় না। আজকালকার ছেলে! কখন তেরিয়া কখন মরিয়া!

তোমরা কে বলো তো!

পাবলোর বন্ধু অবভিয়াসলি। আপনি কি পাবলোর মা না মাসি না পিসি না দিদি!

এত কথার উত্তর আমি দিই না। পাবলোকে খুঁজতে ভর সন্ধেবেলা এখানে কেন?

ও যে বলে বাড়িটা ওর সন্ধেবেলার চান করার জায়গা।

কী বলে? বিস্ময়ের আর কূল পান না পাবলোর মা।

বলে বাড়িটার প্রধান ইউটিলিটি হল বাথটব একটা। ছেলেটি হাত ছড়িয়ে দেখায়—এত বড়। খুব মোটা লোকও ধরে যাবে। গড়িয়ে গড়িয়ে চান করতে পারবে।

রাগে গরগর করতে করতে যশোধরা বললেন—গেট আউট। জাস্ট গেট আউট। এক্ষুনি। ওঠো ওঠো। তিনি আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে বলতে লাগলেন।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হতভম্ব ছেলেটি বলল—কী আশ্চর্য রেগে যাচ্ছেন কেন? অত রেগে যাচ্ছেন কেন? রাগ তো আমাদের করবার কথা! পাবলো ইজ দা কালপ্রিট। চুরিটুরি করে এখন লুকিয়ে পড়েছে।

সে তার সঙ্গে বুঝে নাও। এ-বাড়িতে আর এক দণ্ড নয়। যাও, যা-ও।

এই সময়ে মধুমহলের দিকের দরজা খুলে মধুক্ষরা ও তার মেয়ে সম্পৃক্তা ঢোকে।

আরে কার্জন, উন্নি তোরা? ও কী? মাসি? ওরকম ফুঁসছ কেন? দাপাচ্ছ কেন? ওরা আমাদের বন্ধু যে!

কী রকম বন্ধু করেছ যে, সে আমার বাড়ি বয়ে এসে গাল টিপলে দুধ বেরোয় আমাকে মোটা বলে যায়! এত বড় সাহস? বলতে বলতে দেখা গেল যশোধরা ভীষণ টলছেন। শম্পি দৌড়ে এসে মাসিকে ধরে। তার মা আসে। ছেলেমেয়ে দুটিও হাত লাগায়। এবং সবাইকেই প্রায় সঙ্গে নিয়ে যশোধরা ব্যানার্জি নিজের বাইরের ঘরের সোফার ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান।

মধু দৌড়োতে দৌড়োতে বরফ নিয়ে আসেন। শম্পি ডাক্তারকে কল দেয়, মধু জামাইবাবুকে কল দেন, উন্নি মোবাইলে একটার পর একটা কল করে যায়।—তোরা কেউ পাবলোর নম্বর জানিস? জানলে খবর দিয়ে দে। ওর মা সেন্সলেস হয়ে গেছেন। খুব সিরিয়াস কেস!

এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, ডাক্তারের আসার আগেই রোগীর জ্ঞান ফিরে আসে। সুবল ডাক্তারবাবু ঢুকে প্রথমেই হৃষ্ট হয়ে হাতে হাত ঘষে বললেন—এই তো চোখ চেয়েছেন।

মধুক্ষরা কণ্ঠে বিষ ঢেলে বললেন—সে তো আপনি সেন্সে আসার সময়টুকু ইচ্ছে করে পার করেই ঢুকলেন সুবুলদা! মোড়ের মাথায় আপনার ডাক্তারখানা, এইটুকু আসতে আধঘণ্টা লাগে? এতক্ষণে অজ্ঞান থাকা মানে তো সিভিয়ার হার্টঅ্যাটাক!

ম্যা-সিভ—যশোধরা ক্লান্ত গলায় বললেন।—যাক মধু, তুই সুবুলদার সঙ্গে ঝগড়া করিসনি। এখন আর ঝগড়া করা মানায় না।

তুই চুপ কর।

ডা. সুবল মিত্রও স্টেথোস্কোপ বার করতে করতে বললেন—আপনি চুপ করুন, পেশেন্টের অত কথা বলা ঠিক নয়। হ্যাঁ জোরে জোরে শ্বাস নিন। জোর পাচ্ছেন না? একটু চেষ্টা করুন, ডাক্তারের সঙ্গে কো-অপারেট করতে হয় ম্যাডাম।

ইতিমধ্যে শম্পি তার দুই বন্ধুকে নিয়ে ঘরের এক কোণে সরে গেছে। খুব উত্তেজিত ভাবে নিচু গলায় কথা বলছে। খুব সম্ভব পেশেন্টকে নিয়ে নয়।

মধুক্ষরা বললেন—ওহে মাসির আদরের বোনঝি, একবার এদিকে এসো। দিদি নেয়ে গেছে, তার জামাকাপড় পালটাতে হবে, নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে।

ডাক্তার মিহি গলায় বললেন—এরকম কি আগেও হয়েছে!

মধু বললেন—আপনি জানতে পারতেন না, হলে? হাউস ফিজিশিয়ান বলে যে-কোনও এমার্জেন্সিতে আমরা তো আপনাকেই কল দিই।

ব্ল্যাকআউট জিনিসটা ভাল না—ডাক্তার তাড়াতাড়ি বললেন—ইমিডিয়েটলি একটা ই সি জি আর ব্লাড সুগার করানো দরকার।

খসখস করে প্রেসক্রিপশন লেখার কথা। কিন্তু সুবুল ডাক্তার লিখলেন কাঁপা কাঁপা হাতে। মধুক্ষরা মুখার্জির ধমকে বিলক্ষণ ভড়কে গেছেন।

উন্নি নামে মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছিল, কোমরে হাত দিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়ে বলল—এরকম ট্রেমেলো কেন? কেসটা কী?

একজন মাসি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন আর তুমি আলতু-ফালতু বকছ? মধুক্ষরা ধমকে উঠলেন।

উন্নি পাত্তা দিল না। শম্পির দিকে তাকিয়ে বলল—গলায় ট্রেমেলো হাতে ট্রেমেলো। কেসটা কী রে শম্পি?

শম্পি অবাক হয়ে বলল—কী বকছিস বল দিকি?

এই সময়ে ভিজে জবজবে পেশেন্ট ক্লান্ত গলায় বললেন—ধরেছ ঠিকই, গুড! কেস প্রতাপ—শৈবলিনী।

মিনস?

ওহ তোমরা আবার বঙ্কিমচন্দ্র-টন্দ্র পড়ো না। প্রতাপ শৈবলিনী একটি বাল্যপ্রেমের কেস যা সারাজীবন টানা হয়েছিল। বুঝলে কিছু!

আই সি!—উন্নি চকচকে মুখে বলল।—কেসটা আপনার না ওঁর। সে অপাঙ্গে মধুক্ষরার দিকে চাইল।

আমার কোনও কেস নেই, ফাইল নেই। আমি খোলা পাতা। জীবনের ঝরাপাতা এখন।

ওহ মাসি, মাত্র এক বার দু'সেকেন্ডের জন্যে অজ্ঞান হয়েছ বলে অমনি ঝরাপাতা হয়ে গেলে। তোমরা অ্যাত্ত সেন্টিমেন্টাল না!—শম্পি বকে উঠল।

ডাক্তারবাবু কাঁপা কাঁপা হাতে প্রেসক্রিপশনটা শম্পির দিকে এগিয়ে দিয়ে একরকম পালিয়ে গেলেন।

উন্নি বলল—হাউ সুইট! আমরা এবার চলি!

মানে? বাড়িতে একটা ব্যাটাছেলে নেই, আমার দিদি অজ্ঞান আর তোমরা তোমরা—চলে যেতে চাইছ?—মধুক্ষরা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

আমি কিন্তু ব্যাটাছেলে নই আন্টি। ব্যাটাছেলে ওই কোণে বসে দাঁতে নখ কেটে যাচ্ছে তখন থেকে, আরেকজন একটু আগেই ভোঁ-কাট্টা হয়ে গেলেন।

তা যদি বলো তুমি ব্যাটাছেলের বাড়া—শুয়ে শুয়ে 'অজ্ঞান' দিদিটি বললেন।

চমৎকার। আই টেক ইট অ্যাজ আ কমপ্লিমেন্ট। কিন্তু আমার মনে হয় আপনারা দুই আন্টি নির্ঘাত আঙ্কলদের থেকে বেশি স্মার্ট। কোনও ক্রাইসিসের মোকাবিলা করাটা আপনাদের কাছে কোনও ব্যাপার না। তাই আমি বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই যাচ্ছি। পাবলোর কাছে খবরও চলে গেছে। তার মায়ের ফিট সে এসে সামলাক। এটুকু কর্তব্যও যদি না করে তো তার ত্যাজ্যপুত্র হওয়া উচিত। আমার সোজা কথা।

পেশেন্ট এবার জোর গলায় বলে উঠলেন—ফিটটা যে তোমাদের জন্যে হল! সে দায় কে নেবে? মারল একজন, গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনা হচ্ছে আরেকজনকে। ভেবেছ যা খুশি বুঝিয়ে যাবে, না?

উন্নি বলল—আই সি, এইভাবেই আপনারা পাবলো ব্যানার্জিকে স্পয়েল করে আসছেন। তাই আজ সে একটা ইরেসপন্সিবল, গুড-ফর-নাথিং—বাঃ। বুঝলাম, তবে আন্টি একটা কথা—আমরা আপনাকে মোটা বলিনি। কিন্তু—সে একটু অর্থপূর্ণ বিরতি দিয়ে বলল—কিন্তু মোটা বললেই যদি আপনার ফিট হয় তা হলে আপনার ও রোগ ভগবানের বাবা এলেও সারাতে পারবে না। পাবলো তো কোন ছার! চলি! উন্নি পত্রপাঠ টকাটক টকাটক করে সদর দরজা খুলে চলে গেল। কোণে বসে থাকা ব্যাটাছেলেটিকে নিয়ে গেল না। তাকে অবশ্য কেউ লক্ষই করছিল না।

ইতিমধ্যে জামাকাপড় পালটাতে যশো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ওরে মধু—আলমারি থেকে নীল-ছাপ কোটাটা নিয়ে আয়। ম্যাচিং ব্লাউজ ওখানেই ঝুলছে। শম্পি, পেটিকোট একটা দেখেশুনে আন বাবা। আলনায় আছে। বলে যশো ফটাশ করে শাড়িটা খুলে ফেললেন। তখন কোণের দিক থেকে একটা ভীত গলা শোনা গেল—আমি আছি, আমি আছি।

তিনটে মাথাই একসঙ্গে কোণের দিকে ঘুরে গেল।

মধুক্ষরা বললেন—এই যে ক্যানিং, ইয়ারকি পেয়েছ! হাইলি সাসপিশাস! কোণে বসে বসে কী করছ? ভয়ারিজম? তোমায় পুলিশে দেব।

ক্যানিং নয় মা কার্জন—শম্পি মাকে শুধরে [illegible]

যশো বলেন—ওকে পালাতে দিসনি। আটক [illegible] আটক [illegible]। শম্পি, ওকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে কার্জন বলল—এই শ[illegible], খ[illegible]র বলছি। খবরদার আমার গায়ে হাত দিবি না। বন্ধ করে রাখবি মানে! আমি কি ইচ্ছে ক[illegible] এখানে ব[illegible]সে আছি!

তবে কোন কর্মে বসে আছ শুনি একঘর লেডিজদের মধ্যে! মধুক্ষরা গর্জন করলেন।

কার্জন বলল আমি পাবলোর জন্যে ওয়েট করছিলুম। সে আমার কিছু দরকারি জিনিস নিয়ে হাপিস করে দিয়েছে। আঙুল তুলে শাসানোর ভঙ্গিতে সে বলল, এখন যাচ্ছি, কিন্তু আমি আবার আসব। পাবলোকে বলে দেবেন।

কার্জন নামে ছেলেটি চলে গেলে যশো শম্পিকে চা করতে পাঠিয়ে দিলেন। শম্পি চলে যাওয়ামাত্র ফিসফিস করে বললেন—এখনও, বুঝলি মধু, সুবুলদা এখনও তোর চক্করে পড়ে আছে।

হ্যাঁ তোমাকে বলেছে! দিব্যি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে ঘর করছে।

তা করুক না। তাতে প্রেম আটকায় না। এ হল বাল্যপ্রেম। অভিশপ্ত। চিরকাল কাঁপাবে।

হ্যাঁ যখন মাসের শেষে মোটকা বিলটা পাঠাবে?

তুই একেবারেই কচিখুকি রয়ে গেলি। বিলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক কী! ডাক্তার ডাক্তারি করেছে ফি নেওয়া তার কর্তব্য। জীবিকা। জীবিকার জন্যে যা করার করে যাচ্ছে। সবাই কি আর মরতে পারে রে?

তাই বলে শুধু শুধু একগাদা টেস্ট লিখে দেবে।

শুধু শুধু! বলিস কী রে! আটচল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেছে, ব্ল্যাকআউট। ভীষণ খারাপ জিনিস!

দিদি, আমাকে ন্যাকা পাওনি, তোমার চালাকি আমি জানি না। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে না আরও কিছু। কী মতলবে চোখ বুজে মটকা মেরে ছিলে বলো তো এবার!

ইসস, তুই চিরদিনের ছোট্ট স্নেহের বোনটি হয়ে আমার মধ্যে মতলব দেখছিস! সত্যি বলছি মাথাটা কেমন বাঁই করে ঘুরে গেল। পড়ে যেতে যেতে মনে হল চোখ দুটো প্যাঁট প্যাঁট করে খোলা রাখাটা ঠিক হবে না। দ্যাখ মোটা মানুষ পড়ে গেলে লোকে হাসবেই। কিন্তু যদি অজ্ঞান হয়ে যায়! তখন তো তার হাসতে হচ্ছে না!

এত কথা তুমি ওই ক'সেকেন্ডে ভেবে নিলে! নাঃ, তোমার মাথা বটে একখানা!

শুধু মাথা নয়। চোখ কান সবই আমার খুব দুরন্ত। ওই ক্যানিং না কার্জন নির্ঘাত শম্পির ক্যান্ডিডেট, বিওয়্যার অব হিম। আর পাবলোটা কী হাপিস করেছে বল তো! প্রেমপত্র? ক্যানিংহামের কাছে শম্পির প্রেমপত্র। দু'জনে কীরকম গুজগুজ করছিল দেখেছিলি? শম্পি আর ওই ক্যানিংহোম!

ওহ দিদি, তোমার মাথাটা প্রেম প্রেম করে এক্কেবারে গেছে। ওরা কি পত্র-টত্র লেখে নাকি আর? ওরা চ্যাট করে, ই-মেল পাঠায়, মোবাইলে এস এম এস রাখে।

তা-ও তো বটে!—উদাস হয়ে গেলেন যশো। প্রেমপত্র? আহা সে যে কী জিনিস তা যদি এরা জানত!

এইরকম উদাস-উদাস ভাবেই যশো জামাকাপড় বদলালেন, চা খেলেন, ছাড়া জামাকাপড়গুলো জড়ো করে ধোবি-বক্সে দিয়ে দিলেন। শম্পি যখন বিদায় চাইল, সস্নেহে তাকে বিদায় দিলেন। এমনকী মধুক্ষরা পর্যন্ত টেলিফোন এসেছে বলে অপসৃত হলেন, যশোধরা তখনও একই রকম ঘোরে। কালীঘাটের অতিপরিচিত পটের মতো। খালি, হাতে তালপাখার বদলে পেল্লাই এক চায়ের মগ। একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছেন আর ডুব দিচ্ছেন। কোথায়? কোন পুকুরে? অতীত পুকুরে, যৌবন পুকুরে। ডুব গালছেন কিন্তু কান চোখ সব খোলা রেখে। ওদিক থেকে ঘাই মেরে উঠল একটা ধাড়ি কাতলা। একমাত্র বাবরি চুল, মাথাটা বেশ বড়সড়, ফুল-গ্রোন ডাবের মতো। বিজয়মুকুলদা না?

কী চাও বিজয়মুকুলদা?

ইয়ে মানে তুই আজকাল কী করছিস যশো?

কী আবার করব? বি এ পাশ করে বসে আছি।

নাচ ছেড়ে দিয়েছিস?

মা ছাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে এত বড় মেয়েকে আর ধেইধেই করে নাচতে হবে না। কেন তুমি কি ট্রুপ খুলছ?

বিজয়মুকুলদা তার বংশীবাদনের জন্য বিখ্যাত। সামান্য একটু বেসুর হয়ে যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু বাঁশের বাঁশির মেঠো সুরটি বার করে চমৎকার।

তুই-ই যদি না থাকিস তো ট্রুপের বক্স-আর্টিস্ট হবে কে?

কাতলা পুকুর তোলপাড় করে ডুবে গেল। যৌবন পুকুরের ঘাটে বসে যশো ভাবেন—ওটা কীসের তাগিদ? ট্রুপ খুলে ব্যাবসার তাগিদ সংস্কৃতির তাগিদ, না... না...বিজয়মুকুলদা আরও কয়েকবার কারণে অকারণে ঘাই মেরেছে। কেন? কেন? কীসের তাগিদে?

আবার ডুব দেন যশোধরা। একেবারে পাতলা রাজ্যে পৌঁছে যান। এখন তিনি আবার ইউনিভার্সিটিতে ভরতি হয়েছেন। আব কী-ই বা করতে পারেন। মা নাচ বন্ধ করে দিয়েছেন, বাবা হকি বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁদের মনোমতো পাত্রও জোটেনি। সুতরাং এম এ পলসায়েন্স। সরু সরু লম্বা লম্বা ওগুলো কী মাছ রে বাবা। ম্যাকারেল নাকি? পুকুরে তো হয় না? তবে এ-পুকুর তোমার সে-পুকুর নয়। যৌবন পুকুর। এখানে সামুদ্রিক মাছের সঙ্গে, ভেড়ির মাছ, পুকুরের মাছ,

নদীর মাছ, এমনকী বাহারি লালনীল মাছ পর্যন্ত একই সঙ্গে বিহার করে।

অ্যাই যশো, কাল এসেছিলি?

হুঁ।

তোর খাতাখানা দে তো মাইরি। একটা বিশাল কাজ ছিল, বেজায় খাটুনি আসতে পারিনি।— হালকা দাড়ি গোঁফওয়ালা মুখখানা খরচোখে তাকিয়ে বলে উঠল।

কালকের খাতা আজকে আনিনি।

ইয়ারকি হচ্ছে? বিনুনি সুদ্ধু মুন্ডু ঘুরিয়ে দেব কিন্তু।

যাও খাতা পাবে না।

দে না, মিনতি করছি দ্যাখ, কমলেশ সিনহা মিনতি করছে তোকে। ভাবতে পারছিস!

না খাতাটা সে দেয়নি। সত্যিই খাতাটা ছিল না। আরেক বার কমলেশ তার খাতা নিয়ে হাপিস করে দিয়েছিল। এখন সন্দেহ হয়, নোটস নয়, খাতাটা, জাস্ট যশোর খাতাটার জন্যেই কমলেশের আকিঞ্চন ছিল। হাপিস খাতাটাও আসলে হাপিস হয়নি। কমলেশের নিজ ডেস্কে রক্ষিত আছে সযত্নে। দ্বিতীয় না-দেওয়া খাতাটা যশো মনে মনে ফেরত পায়। মনে মনে খুলে দেখে পলসায়েন্সের অকিঞ্চিৎকর ক্লাস নোটসের পাশে পাশে মার্জিনে লেখা। কী লেখা? যশো, যশোধরা, আমি তোকে মানে ইয়ে, বুঝিস না কেন? কে এসব খাস্তাগজা নোটস চায় রে? কমলেশ চায় তোর হাতের লেখা, তোর হাতের ছোঁয়া, তোকে, মানে তোকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন যশো। এটাও মিস। কে এমন নাছোড়বান্দা প্রেমিক আছে জগতে যে, তুমি না বুঝলেও তোমাকে বোঝানোর জন্যে অনন্তকাল অপেক্ষা করবে! হে প্রেমের ভগবান রতিকান্ত, যশোকে এত বোকা করলে কেন?

একমাত্র রামলাখন অপেক্ষা করেছিল। রামলাখন তাদের স্কুলের দারোয়ানের ছেলে। সে-ও পড়াশোনা করত বিস্তর, কিন্তু জিভের আড় ভাঙেনি।

এ যশোধরা, এ খোঁখি।

উঃ, কী বলছ? আমি কি এখনও খুকি আছি।

না রে যশোধ্‌রা, তোকে দেখলেই আমাদের ধউলি গাইটার কথা মনে পড়ে যায়। মুলুকে ফেলে এসেছি।

যশো সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবাউট-টার্ন। রামলাখন পেছন পেছন আসতে থাকে। সবে বকনাবাছুর থেকে জওয়ান হয়ে উঠেছে। কী চিকন গা, দুধসফেদ, আঁখ কী! মালুম হয় কি তোদের মতো কাজল দিয়েছে আঁখে। লেজের বালগুলো ঠিক তোর এই বিনুনির শেষে ছাড়া বালগুলোর মতো যশো। যশো, তোকে ঠিক হামি বহুত পেয়ার করি। তুই আমার ধউলি, আমি তোর মার্তণ্ড। ধউলি, আরে যশো শোন শোন।

একটা কথাও শুনব না। তুমি আমাকে গোরুর সঙ্গে তুলনা করছ? সাহস তো কম নয়।

আরে!—একটা অবাক বাজখাঁই আওয়াজ দিল রামলাখন।

আরে ভঁইস নয়, লেকেন গাই তো দুনিয়া কি সবসে আচ্ছি চিজ হ্যায় রে। তার ওপর ধউলি সবসে খুবসুরত।

এরপরে তার বিরক্তি বুঝে রামলাখন ধউলির তুলনা ত্যাগ করেছিল। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল সে যশোর প্রেমে পড়েছে। তার বাবা স্কুলের দারোয়ান হতে পারে। কিন্তু ভাগলপুরে তাদের মস্ত বড় ফার্ম। দুধের ব্যবসায় তারা সেখানকার তিন নম্বর। সে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে। ফার্ম মডার্নাইজ করবে, ভাগলপুরে গঙ্গার ধারে বেস্ট জায়গায় মকান বানাবে। তত দিনে বাংলা জবান শিখে যাবে জরুর। যশোধরার সঙ্গে তার বাংলাতেই প্যার কি বাত হবে।

দ্য ওনলি ওয়ান। যশোর মরুভূমিতুল্য প্রেমহীন জীবনে রামলাখনই একমাত্র জেনুইন প্রেমিক।

সে জাত, শ্রেণি, প্রদেশ, সব বাধা ত্যাগ করেছিল। পরিষ্কার মনের কথা জানিয়েছিল যশোকে। দেখতেও রামলাখনকে খুব ভাল ছিল। ফরসা, ব্যায়াম করা—লম্বা চওড়া অথচ অতি সুকুমার চেহারা। মুখখানা নিষ্পাপ। দেখলেই চুমু খেতে ইচ্ছে করে। যদিও খোকন হিসেবে।

এবার অতীতের কল্পনাপুকুর থেকে অতীতেরই বাস্তব ঘাটে ওঠেন যশোধরা। হেঁটে হেঁটে ঢোকেন বাস্তবের ড্রয়িংরুমে। চার দিকে ঢাউস সোফাকৌচ। কোন কালের একখানা কার্পেট ডাঙায় কুমিরের মতো ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে। দেয়ালে দেয়ালে ঠাকুমা-ঠাকুরদাদের অয়েল পেন্টিং। মহারানি ভিক্টোরিয়ার একখানা আর বর্তমান রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের একখানা ছবিও আছে। যখনই কোনও অতিথি আসে যশোধরা, মধুক্ষরা, তাদের বাবা, মা সবাই কৈফিয়ত গাইতে থাকেন জাস্ট শিল্পমূল্য, ছবিমূল্যের জন্যেই ছবিগুলো আছে। এর মধ্যে কোনও কলোনি-মনোবৃত্তি কেউ যেন না খোঁজে। যাই হোক, সেই বৈঠকখানার কোণের দিকে তেপায়ায় একটি মার্বলের বাচ্চা ছেলের মূর্তি, বল হাতে চমৎকার ভঙ্গিতে আধা পেছন ফিরেছে। আরেক কোণে চোঙঅলা গ্রামোফোন।

এই ঘরে ঢুকেই মুখোমুখি তিনটি তরুণের সামনে পড়ে গেল যশো। একটি ধলো একটি কালো আরেকটি বাদামি। তার দিকে পেছন ফিরে দুটি বিনুনি। মাঝে ঘাড়, তার তলায় ছিটের কামিজের পেছন। মধু বসে বসে হাসছে, কথা বলছে, দৌড়ে ভেতরে চলে যাচ্ছে, ট্রে-তে করে চা নিয়ে এল।

এই তোরা চা খাবি তো?

খাবে না মানে? যশো মনে মনে বলে—ওদের ঘাড় খাবে। মধুক্ষরা চাটুজ্যের হাতে করে আনা চা বলে কথা!

এই আমার দিদি। দিদি, দ্যাখ একটা তরুণ।

যশো মনে মনে বলে—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। মুখে বলে ও, তরুণ বুঝি? আমি তো ভেবেছিলুম বৃদ্ধ।—তার এই রসিকতায় ফরসা ছেলেটির মুখ হাঁড়ি হয়ে যায়। প্রেম মানুষকে বড্ড রসকষহীন করে দেয়। বোকা, ভ্যাদভেদে মার্কা।

কীসে আমাকে বৃদ্ধ দেখলেন? রোজ ব্যায়াম করি তা জানেন?

যশো হেসে বলে—মাসকুল আছে? গুলি?

পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে ছেলেটি প্রাণপণে মাসল ফোলাবার চেষ্টা করে।

যশো বিচ্ছুর মতো হাসে—লুচি ফুলল না তো! বুঁচি, তোর অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে।

এ হল কৃষ্ণেন্দু।

সেটিও মালুম হচ্ছে—ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে যশো—এ যেন বেড়াল এঁকে দাগিয়ে দেওয়া।

এ-ছেলেটির একটু রসবোধ আছে, বললে—আরে সত্যি বেড়াল হবে তবে তো দাগাবে দিদিভাই। কৃষ্ণ আবার ইন্দু কী?

কেন অমাবস্যার চাঁদ?

উঁহু যে-জিনিস দেখাই যাচ্ছে না তাকে কোনওভাবে ডিফাইন করা চলবে না। বাড়িতে ভরতি ইন্দু, পুষ্পেন্দু, কমলেন্দু, অমলেন্দু, শরদিন্দু, .তাই অবশেষে কৃষ্ণেন্দু।

শুধু কৃষ্ণ রাখলেই হত, দিব্যি কদমগাছের তলায় তিনবেঁকা হয়ে দাঁড়ানো যেত।

ততক্ষণে মধু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে।—আহ্ দিদি, কী হচ্ছে?

না না বলতে দাও না। বেশ জমেছে। আজকাল আর তিনবেঁকা হয়ে দাঁড়ালে হয় না দিদি। ডেজ হ্যাভ চেঞ্জড। এখন সটান বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে হয়। বাঁশির বদলে হাতে স্টেনগান, নেহাত না জুটলে চপার।

আচ্ছা আচ্ছা, অনেক হয়েছে মধু বলল—ওর সঙ্গে পরিচয় করবি না, ওর নাম মিহিরকিরণ।

আন্দাজ করতে পারনেনি তো!—দাঁত বার করে বাদামি ক্যান্ডিডেট বলল—

যশো বলল—যেই কথা বললে অমনি ধরা পড়ে গেলে ভাই। মিহি মিহি গলা। ওইটুকু তো অন্তত মিলল। মিহি-র কিরণ!

বলে যশো অন্দরের দিকে পা বাড়ায়। পরে মধু এসে দিদিকে এই মারে তো সেই মারে। তুই ওদের সামনে আমার ডাকনাম ধরলি কেন, কে তোকে বুঁচি বলে ডাকতে বলেছিল! ঠাকুমা ছাড়া কেউ তো ও নামে ডাকেই না। তুই নিজে ডাকিস! তোর চালাকি আমি বুঝি না?

দিদি বলে—আরে বাবা বুঁচি বললেই কি আর তুই বুঁচি হয়ে গেলি? তোর এমন বাঁশির মতো নাক!

বিচ্ছিরি নাম। কেউ লোকের সামনে বলে? মান রইল না।

কী যে বলিস মধু, মধু বললেই কি তোর মান থাকত? মধু কাদের নাম হয় বল তো? অনেক দিনের পুরনো কাজের লোকেদের। ম্যয়নে চাকর রাখো জি! মধো, মেধো—বাবুরা ডাকত।

ভাল হবে না দিদি, আমিও তোকে যশো বলে পরিচয় করিয়ে দেব। যশোও কাজের লোকদের নাম হয়। বাসন মাজার যশো।

অম্লান বদনে সে বলে—তো বল না। আই ডোন্ট মাইন্ড।

আসল কথা কাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেবে! তার এমন বাইরে ঘরভরতি ক্যান্ডিডেটই নেই। দ্বিতীয় কথা—বিশ্বসুদ্ধু লোক তাকেই ইতিমধ্যেই যশো বলে ডাকে। এক রামলাখনই সমীহ করে যশোধ্‌রা বলেছিল।

মা-আ-আ—ওদিক থেকে ভাঙা গলায় একটা ডাক উঠল এই সময়ে।

অতীতমোক্ষণ এমনই অভিভূত, ডুবন্ত ছিলেন যশোধরা, হঠাৎ মা ডাকে মনে হল—ধ্যাত্তেরিকার মা, এখানে কারুর মা-ফা থাকে না। যতই আকাশ ফাটিয়ে চ্যাঁচাও।—কথাটা বলেই ফেললেন।

সামনে পাবলোসুন্দর দাঁড়িয়ে, দু'কোমরে হাত।

কী মা মা করে চ্যাঁচাচ্ছ হে ছোকরা পাশের বাড়ি দ্যাখো, এখানে সুবিধে হবে না—বলে যশো গালে হাত দিয়ে বিছানায় ডুবে গেলেন। পাবলো কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বলল—অ্যাক্সিডেন্ট কি জানান দিয়ে আসে যে, মজুত থাকব! খবর পেয়ে তো সঙ্গে সঙ্গে গিটার ফেলে চলে এসেছি। এমন রাগারাগির কোনও মানে হয়?

যশো আশ্চর্য হয়ে বললেন—অ্যাক্সিডেন্ট? কার অ্যাক্সিডেন্ট? কখন? গিটারই বা কার? জিনিসটা কী? কে হে তুমি পরের বাড়ি ঢুকে আলটুফালটু বকছ! ইয়ারকি পেয়েছ নাকি?—ও রামলাখন, রামলাখন দ্যাখো না তোমার দেশোয়ালি এক এঁড়ে বাছুর এসে আমায় গুঁতিয়ে দিচ্ছে।

এবার পাবলোর মুখখানা দেখবার মতো হল। সে তিরবেগে পাশের মধুমহলে পগারপার হল।—মাসি ও মাসি, মায়ের হঠাৎ পা পিছলে গেছে, স্ট্রোক এইসব বলে উন্নি আমাকে ডেকে পাঠাল, এসে তো দেখছি মা'র পাগলামির লক্ষণ! তোমরা সবাই কি সত্যি কথাটা চেপে গিয়েছিলে?

মধুক্ষরা একটা ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিলেন—বললেন কে পাগল? তুই না তোদের বন্ধু উন্নি, না ক্যানিং। না তোর মা। বদসঙ্গ, বিশেষ করে পাগলসঙ্গ ছাড় পাবলো, নইলে...

আহ। মা আমাকে চিনতে পারছে না। আর তুমি...

কে চিনতে পারছে না? মা, তোকে? তুই কি চেনার মতো আছিস? ক্রমশই অচেনা হয়ে যাচ্ছিস। কোথায় আমাদের সেই পাবলোসুন্দর, যে কথায় কথায় ঠোঁট গোল করে মাসিকে হামি খেত, কোলে চড়ে জাহাজের আলো দেখে বলতো চাঁদের রাস্তা, কোথায় সেই ছেলে যে নারকোল নাড়ু দিলেই হাত ঘোরাত...

আহ মাসি, তুমিও তা হলে পাগল হয়ে গেছ। শিগগির চলো ও-বাড়ি, মা যেন কেমন করছে। শম্পি কোথায়?

শম্পি তো বেরিয়ে গেল!

আশ্চর্য। বাড়ির মেয়েরা যদি এইভাবে যখন-তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়!

উত্তরে মধুক্ষরা বললেন—আশ্চর্য! বাড়ির ছেলেরা যদি এইভাবে যখন-তখন বাড়িতে ফিরে আসে!

মানে কী? মানে কী এর?

মানে তুই বুঝলে আর দুঃখ থাকত না রে।

যাই হোক, চৌকাঠ পার হয়ে যশোমহলে পা টিপে টিপে চলল দু'জনে। একটু হেঁড়ে গলায় গান ভেসে আসছে। বঁধু গো—এই মধু মাস বুঝি বা বিফলে গেল—শচীনদেব বর্মনের গান।

মধুক্ষরা বললেন—দিদি নাচটা ভাল শিখেছিল, গানটায় সুবিধে করতে পারেনি। কিন্তু মিড়গুলো দিব্যি আসছে তো! ও দিদি। কী হল তোমার?

শোবার ঘরে ঢুকে দেখা গেল যশোধরা চিতপাত হয়ে শুয়ে একটা গোলাপি উলের জামা বুনছেন এবং গান গাইছেন।

ও দিদি! কী করছ!

ভ্রূক্ষেপই করলেন না যশো।

ও দিদি, কার জামা বুনছ!

একটি শিশুর।

কে শিশু!

পৃথিবীতে ওই একটি জিনিসের এখনও অভাব হয়নি। যদিও তাদের মেরেধরে, কেটে ছিঁড়ে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছ। তবু...কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল।

ও দিদি, তোমার নিজের শিশুটি যে কাঁদোকাঁদো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গো, তাকে একটু কাছে ডাকো!

কাচের মতো চোখে পাবলোর দিকে তাকালেন যশো—এই ধেড়ে কার্তিকটিকে শিশু বলছ! কে তুমি পাগলিনী?

যাঃ মাসি, তোমাকেও মা চিনতে পারছে না।

যশো গাইলেন—ভুঁলে গেছ তুমি সেই মধু নামে ডাঁকা। বঁধু গো...উপায় না দেখে মধুক্ষরাও সঠিক সুর ধরিয়ে দিলেন—এই মধুমাস বুঝি বা বিফলে গেঁল অঁ।

এই দ্বৈতসংগীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাবলো ঘামতে লাগল। হঠাৎ মনে হল সরু মোটা দুই গলায় গানটা তো দিব্যি জমাটি! সে-ও হঠাৎ খসখস করে নোটবুক বার করে কী সব লিখে নিল। তারপর গাইতে লাগল—

এই কলকাতা বুঁঝি বা ঝঁলসে গেঁল, বঁধু গো,
ভুলে গেছ তুঁমি বালিগঞ্জের বাঁসা
মোড়ে মোড়ে কত চাঁদামুখ খাঁসাখাঁসা
এই বালিগঞ্জ, এই কালীঘাট ঝুঁঝি বা ঝঁলসে গেঁল ও ও...

দি আইডিয়া! দি আইডিয়া, তিন তুড়ি দিয়ে পাবলো একটা ঘুরপাক খেয়ে নিল। মা, শেষপর্যন্ত মা-ই তাকে পথ দেখিয়ে দিলে। সে বলল—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। বলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রমাণ করল।

দৃশ্যটি যখন এইরকম—যশো শুয়ে শুয়ে উল বুনতে বুনতে হেঁড়ে গলায়, মধুক্ষরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু হাতে প্রাণ দিয়ে প্যাশন দিয়ে মধুমাস বিফলে যাওয়ার গান গাইছেন, পাবলো মেঝেতে সাষ্টাঙ্গ—ঠিক এই মুহূর্তে দুটি মানুষ ঢুকল, সুহৃৎ ব্যানার্জি আর মধুবন।

কী ব্যাপার? দরজা খোলা। কোথাও কেউ নেই। নীচেটা একেবারে, এ কী! আমি শুনলাম যশো জ্ঞান হারিয়েছে! খোকা এভাবে মাটিতে পড়ে আছে কেন? পাবুল ও পাবুল! সুহৃৎবাবু কাতরে

উঠলেন। দেখা গেল তিনি স্ত্রীর চেয়ে ছেলের জন্যেই বেশি কাতর! হবে নাই বা কেন? স্ত্রী বহাল তবিয়তে গান গাইছেন, কিন্তু ছেলে মাটির ওপর সটান উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

মধুবনও খুবই উচাটন, পাবলোর জন্যে—আমি শুনলুম মাসি পড়ে গিয়ে সেন্সলেস হয়ে গেছে। পাবলো সেন্সলেস এ-কথা তো কেউ বলেনি।—সেও খুব উতলা দেখা গেল। পাবলো, এই পাবলো!

মধুবনকে দেখেই যশো জ্ঞানে ফিরলেন।

এসেছিস মধুবন, আয় কাছে আয়।

মধুবন কাছে যেতে গোলাপি উলের বোনাটা তার গায়ের ওপর ফেললেন।—নাঃ একটু যেন ছোট হয়ে গেছে।

বলে পড়পড় করে বোনাটা খুলতে লাগলেন।

পাবলো ততক্ষণে উঠে পড়েছে।

তোর কী হয়েছে রে পাবুল! তার বাবা জিজ্ঞেস করেন।

আমি মাতৃদেবীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছিলাম বাবা। আমার সারা জীবনের কৃতজ্ঞতা। মা আমাকে জীবনের পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

তা যেন হল—সুহৃৎবাবু বোকার মতো বললেন—আমি ফোন পেলুম শম্পির। কার অসুখ, কী অসুখ এখনও পর্যন্ত তো কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা না একটা রোগী তো থাকবে!

যশো বললেন—এ-ও তো হতে পারে যে, তুমিই আসল রুগি। বুঝতে পারছ না। কিছুতেই রুগিকে কায়দা করতে না পারলে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে ওষুধ খাওয়াতে হয়, না হয় না?

চতুর্দিকে চোখটা ঘুরিয়ে এনে সুহৃৎ বললেন—তা তোমাদেরও কি তাই-ই মত!

মধুবন বলে উঠল—কাকু, এই সামান্য জিনিসটা বুঝলে না? এখানে দু'জন শুয়ে আছে। এক যশোমাসি, আরেক পাবলো। পাবলো শুয়ে শুয়ে কী সব মন্ত্র-তন্ত্র বলছিল। আমার মনে হয় মধুমাসি ওঝা ট্রাই করেছিল। তারই নির্দেশে পাবলো অমন...যশোমাসি এই গরমে উল বুনছে, আমার ছোটবেলার সাইজ। কিছু একটা গোলমাল তো হয়েছেই। সিরিয়াস গোলমাল।

মধুক্ষরা বললেন—ওঝা? ওঝা ট্রাই করেছি আমি, সায়েন্সের মেয়ে? তোর কি মগজেও ফ্যাট ঢুকে গেছে!

মগজে তো ফ্যাট থাকেই মাসি। ঘিলু বলে না? আমি একটা ভীষণ ঘনীভূত রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। যতই কথা ঘোরাও!

কী হয়েছে কেউ আমাকে বলবে?—এবার সুহৃদের গলা বেশ কড়া। 'আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে' গোছের ভাব।

তখন যশো বালিশের তলা থেকে ডক্টর সুবল মিত্রের প্রেসক্রিপশনখানা বার করে দেন। ই সি জি, প্রেশার, ব্লাড কোলেস্টেরল...। সব ইনভেস্টিগেট করতে হবে।

তোমার হার্টের ট্রাবল, আর তুমি গান গাইছ? অবাক হয়ে সুহৃৎ বললেন।

যেরকম হাঁসফাঁস হাঁসফাঁস করো, তাতে করে এ সন্দেহটা আমার আগেই হয়েছে। এখন তুমি চুপটি করে শুয়ে থাকবে আর পাবুল আমাদের চা-টা দেবে। পাবুল যা—ও। চা কারো। মধুবন তুই দ্যাখ তো 'টা' বলতে কী আছে? প্রচণ্ড টেনশন নিয়ে এসেছি। এখন আমার খিদে পেয়ে গেছে। বলে—সুহৃৎবাবু কোণ থেকে একটা চেয়ার হড়হড় করে টেনে এনে যশোমাসির বিছানার কাছে বসলেন—এই আমি নজরদার বসলুম। দেখি কে কী অনিয়ম করতে পারে।—তিনি হাত বাড়িয়ে যশোর হাতটা টেনে নিলেন, তারপর কবজি টিপে ধরে ঘড়ির দিকে চেয়ে রইলেন।

মধুবন বলল—চ পাবলো চ। রাত প্রায় আটটা বাজছে। তোমরা কে কে চা খাবে?

সব্বাই—মধুক্ষরা বললেন।

রান্নাঘরে ঢুকে পাবলো হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। মধুবন বলল—নে, জল চাপা।

কোথায় চাপাব, আমার মাথায়? মায়ের রান্নাঘর এত ডিজরগ্যানাইজড!

বাজে কথা বলিসনি। ওই তো হুক থেকে সসপ্যান ঝুলছে। ওই দেখ সারি সারি কাপ। মেপে মেপে জল নিবি। পাঁচ কাপ।

তো তুই কী করতে আছিস?

আমি চলে যাব? বেশ তাই যাই। বলে মধুবন পেছন ফিরল।

আরে শোন শোন। আমি চা করতে জানি না।

সহজ কাজ। শিখে নে। কাজে দেবে। আমি শুধু সুপারভাইজ করতে আছি। তোর বিদ্যের দৌড় তো জানা আছে।

যা যা বাজে বকিসনি। ভারী একটা কাজ, চা করা।

এই এই তোর চায়ের জল ফুটে উঠেছে। ওই যে চা-পাতার কৌটো। গুনে গুনে চার চামচ দে। আরে অত ভরতি ভরতি নয়। তুই একটা হোপলেস!

সুবিধে পেয়ে খুব ডিং নিচ্ছিস, না?

বাজে কথা না বলে, ঘড়ি দ্যাখ, পাক্কা দেড় মিনিট রাখবি। কাপগুলোয় চিনি দে। যশোমাসির আর আমার সুগার-ফ্রি। বাকি তিনটে এক চামচ করে চিনি দিবি। যাঃ সুগার-ফ্রিটা আবার কোথায় গেল!

কিছুক্ষণ খুঁজে পেতে বড়িগুলো পেয়ে গেল মধুবন। বললে, নিজের রান্নাঘরের কোথায় কী আছে জানিস না, অ্যাঁ? লজ্জায় মুখ লুকো।

পাবলো নিবিষ্ট মনে ঘড়ি দেখছিল। এবার পটে ঢালতে গিয়ে মেলাই ফেলে দিল।

যাঃ। একজনের কম পড়ে গেল। ঠিক আছে আমি খাব না। পাবলো বলল—অ্যামি খ্যাব না! তোর ঘাড় খাবে। এই সময় নাগাদ চা-টা খেলে রাতে তোর খিদে কম হবে। আপসে ডায়েটিং হয়ে যাবে।

আমার ডিনার হয়ে গেছে।—গম্ভীরভাবে মধুবন বলল।

এর মধ্যে কী খেলি?

বাঁধাকপির সুপ, গাজর পেঁপে, বিন সেদ্ধ। একবাটি মুশুর ডাল, একখানা রুটি।

ওহ মধুবন কী কৃচ্ছ্রসাধনটাই না করছিস! অনেক করেছিস। ফ্রিজে বোধহয় আইসক্রিম আছে, একটু খেয়ে যা প্লিজ, এক স্কুপ।

একবার বলছিস চা খা, আরেক বার বলছিস আইসক্রিম খা, মাথাটাথা গন্ডগোল হয়ে গেল, না কী?

মধুবন পরম অবজ্ঞার সঙ্গে ট্রে-তে কাপগুলো সাজাল, বলল—যা নিয়ে যা এগুলো। আর শোন—আমি আরও চার কেজি কমেছি। এখন আমায় ব্রতচ্যুত করবি না।

মধুবনকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে পাবলো বলল—তুই কি ডিটারমিনড?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এবং যখন আমি কোনও সংকল্প করি তখন সেটা করেই ছাড়ি।

চায়ে চুমুক দিয়ে সুহৃৎ বললেন—বা, বা, বা, বেশ চা করেছিস তো পাবুল! গুণ আছে ছেলেটার।

মধুবন বলল—আজ্ঞে না কাকু। উনি শুধু নেড়েছেন আমি বলে দিয়েছি। মানে হাতে-কলমে কাজ শেখানো আর কী!

পাবলো বেরিয়ে আসতে আসতে বলল—উঃ, আমার রিহার্স্যালটা মাঠে মারা গেল। এই বাবাগুলো এত স্ত্রৈণ হয় না!

মধুবন বলল—তাই বুঝি! যশোমাসির অসুখ শুনে কাকুর আসা উচিত হয়নি বলছিস! ভাল ভাল। চমৎকার এক ছেলে।

আসতে কে বারণ করেছে! সেই থেকে হাতটা ধরে পালস রেট দেখে যাচ্ছে। যাই বলিস এইরকম

ডোর-ম্যাট টাইপের লোকগুলোকে আমার সহ্য হয় না।

মধুবন ঘেন্নার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল—বটে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে মধুবন ভাবল তার আর পাবলোর জীবনদর্শন একেবারে আলাদা। পাবলো বাড়ির এক ছেলে। তাকে লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছেন যশোমাসি। আর কাকুর তো কথাই নেই। পাবুল আর পাবুল। আর এই এত ভালবাসা প্রশ্রয় পেয়ে পাবলো ভাবছে তার আর কারুর জন্যে কিছু করার নেই। সে-ই সূর্য। বাকি সব গ্রহতারা তার চার দিকে ঘুরছে। বাঃ চমৎকার ফিলসফি, আর সে মধুবন! স্ট্রিক্ট শাসন তোমার জন্যে। মা'র শাসন, বাবার শাসন এমনকী পাঁচ বছরের বড় দাদা ঋজুরুস্তম পর্যন্ত তার গার্জেনি করবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। কিন্তু তাইতে কি মধুবনের মা-বাবার প্রতি ভালবাসা একটুও কমেছে? তার বাবা কি মা যদি এমন অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর প্রাণপণে শচীনদেব বর্মন গাইতে থাকেন মধুবন কি এক মিনিটও অপেক্ষা করবে? ডাক্তার সাইকায়াট্রিস্ট, যে যেখানে আছে মধুবনের বিনতি শুনে তাদের বাড়িতে ডাক্তারি বক্স নিয়ে উপস্থিত হবেন না?

ছোটবেলায় যখন কাড়াকাড়ি করে যশোমাসির বাগান থেকে কুল পাড়া হত, ফুলের জন্যে ডাক্তার বিশ্বাসের বাগানে হানা দেওয়া হত তখন তারা বালক-বালিকা ছিল। অমিলগুলো বোঝা যায়নি। এখন যত বড় হচ্ছে ততই তাদের তফাতটা—অর্থাৎ পাবলোর স্বার্থপরতা আর তার নিজের পরোপকারিতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে মধুবন। জীবন জীবন, তুমি আর কত অমিল পরিস্ফুট করবে? লাইফ ইজ আ চেন অব ডিস্যাপয়েন্টমেন্টস। চেন না হিস্ট্রি। ভাবতে ভাবতে নিঝুম হয়ে সে বাড়ি ফিরল। মা কোথায়? রান্নাঘরে খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে। রান্নাঘরে বোধহয়। তা মাকে খুঁজতে গিয়ে রান্নাঘরে জিনপরিকে পেয়ে গেল মধুবন। পাউরুটিতে মোটা করে মাখন লাগিয়ে, তার ওপর জ্যাম ঢেলে খাচ্ছে বসে বসে। তাকে দেখে গলায় আটকে দম বন্ধ হয় আর কী! মধুবন আস্তে আস্তে তার ঘাড়ে থাবড়া মারে। এক গ্লাস দুধ বার করে বলে—পরি রে, সলিড জিনিস খাচ্ছিস, একটু লিকুইড কিছু রাখিসনি পাশে? নে একটু করে দুধ খা, আর একটু করে পাউরুটি।

পরির খাওয়া শেষ হওয়া অবধি মধুবন ঠায় রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে রইল।—আর কিছু নিবি?

সলজ্জ গলায় পরি বলল—এখন এই-ই যথেষ্ট। এর পর তো আবার রাত্তিরে খেতে হবে। যাকে তোমরা বলো ডিনার?

এটা তা হলে তোর কী? টিফিন?

বলতে পারো। দিদি, মাকে বলে দেবে না তো!

পাগল! বাড়িতে দুধ মাখন চিনি যত কমে যায় ততই তো ভাল, আমার জন্যে কোনও প্রলোভন থাকবে না।

অন্যায় করেছি দিদি। আমায় মাপ করো।

যা বাব্বা খিদে পেয়েছিল, খেয়েছিস। মাকে বলে খেলে আর কিছুই ঝামেলা ছিল না। তো তুই চার বেলা ভাল করে খেতে পাস তো? মা কী কী দেয় রে তোকে?

মা খুব ভাল—পরি অনুতপ্ত গলায় বলল—সকালে তো প্রথমেই আমার রুটি হয়। ফ্রিজে কিছু না কিছু থাকে। তাই দিয়ে চারখানা রুটি খাই। চা-খাই এক গেলাস।

তার পর?

তার পর—দুপুরে ভাত। অনেকটা ভাত খাই দিদি। লজ্জা লাগে। ডালও অনেকটা দেন মা। তারপরে সেদিন যা তরকারিপাতি হয়, খাই।

মাছ মাংস?

হ্যাঁ...রাত্তিরে নয়। সকালে যা হোক একটা থাকে। মা কী ভাল মাংস রাঁধে গো! ইচ্ছে করে

বাতাসি, পাঁচু, ইতু সব্বাইকে ডেকে ডেকে খাওয়াই।

এরা কারা? কুকুর!

ওমা কুকুর কেন হতে যাবে? আমার ভাইবোন ওরা।

মা এখন কোথায়?

মা'র কোন বন্ধু অজ্ঞান হয়ে গেছে, মা দেখতে গেছে।

আবার কে অজ্ঞান হল? মা'র অঢেল বন্ধু তা যদি বলো। কিন্তু সে তো যশোমাসির বাড়িতে মাকে দেখেনি! আসবার সময়ে পথেও তো দেখতে পেতে পারত। যশোমাসিও যোধপুর পার্ক। তারাও যোধপুর পার্ক। আবার কে জ্ঞান হারাল রে বাবা!

এমন সময় পেছন থেকে খুব ভাঙা গলায় কে বলে উঠল—পাবলো কি কোনও বান্ডিল-বুন্ডিল তোর কাছে রাখতে দিয়েছে? সত্যি কথা বলবি।

ফিরে সে দেখে কার্জন। একটা পাতলা ফতুয়া পরেছে। ভেতরে পইতে দেখা যাচ্ছে। বছর খানেক আগে কার্জনের পইতে হয়েছে। একটা রংচটা জিনস্, থ্রি-কোয়ার্টার, সুতো ঝুলছে।

কী রে? কিছু বল! পাবলোর বেস্ট ফ্রেন্ড! বান্ডিলটা দিয়ে দে। ভাল যদি চাস।

আর না চাইলে?—অকুতোভয় মধুবন কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল রণং দেহি ভঙ্গিতে।

না চাইলে নক আউট করে দেব—এইভাবে—বলে ঘুসি বাগিয়ে কার্জন যে-ই এগিয়ে এসেছে, হঠাৎ দেখা গেল সে কুপোকাত। পেছন থেকে পরি ল্যাং মেরে তাকে শুইয়ে দিয়েছে।

উঃ আঃ করতে করতে কার্জন এঁকেবেঁকে উঠে দাঁড়াল। মধুবন বলল—পরি, যা বরফ নিয়ে আয়।

আমি পারব না। গুন্ডো বদমাইশ, তোমাকে বাড়ি বয়ে মারতে আসে। আমি বরং পুলিশে ফোন করিছ।—পরি খরখর করতে করতে চলে যাবার উদ্যোগ করে।

এই পরি। এ-ই পরি। থানা পুলিশ করিসনি। এটা আমার বন্ধু।

কার্জন বলল—আমি কি সত্যি-সত্যি মারতুম নাকি! মধুবন, তুই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলি, না রে?

আমি একটুও ভয় পাইনি। চোর ডাকাত ফেরেববাজদের আমি ভয় পাই না।

তা হলে তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে ল্যাং মারল কেন!

সেটা ওকেই জিজ্ঞেস কর।

আচ্ছা মাফ করে দিলুম, পাবলো যে-বান্ডিলটা তোকে দিয়েছে—!

পাবলো আমাকে কোনও বান্ডিল দেয়নি। আমি পাবলোর মতো অকম্মা ছেলের বেস্ট ফ্রেন্ডও হতে পারি না। এবার যা-ও।

তবে যে বললি। স্বীকার গেলি যে নিয়েছিস!

স্বীকার করিনি তো! তুই ভাল চাসটাস বলে আমার ভয় দেখালি, তাই বললুম—না দিলে?—তার মানে কি দাঁড়ায় জিনিসটা আমার কাছে আছে! কী ছিল বান্ডিলটাতে?

সেটা তোকে বলতে আমি বাধ্য নই।—দু'হাত বুকে আড়াআড়ি রেখে কার্জন বলল।

তা নোস। কিন্তু এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে তুই বাধ্য। এক্ষুনি আমার দাদা রুস্তম এসে পড়বে। সে হামলাকারীদের প্রশ্রয় দেয় না।

তা হলে কতক চাট্টি বরফ অন্তত দে। ওঃ খুব লেগেছে রে!

পরি বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে বরফ আইসব্যাগে ভরে এনে দিল। প্রাণপণে আইসব্যাগ হাঁটুতে, পায়ের গোড়ালিতে চেপে ধরতে লাগল কার্জন নামে আহত ছেলেটি।

একটু পরে বলল—প্রত্যেক বন্ধুর বাড়িই দেখছি একই রকম ডেঞ্জারাস। একজনের বাড়ি থেকে তার মা মাসি বার করে দেয়, বিতিকিচ্ছিরি অ্যালিগেশন আনে, আরেকজনের বাড়ি থেকে স্বয়ং

বন্ধুই বার করে দিতে চায়। আগে চ্যালাচামুণ্ডা দিয়ে মার খাইয়ে। সত্যি ইয়ারদোস্ত ব্যাপারটা আর টিকে থাকছে না।

তুই আইসব্যাগসুদ্ধু এবার ফুটে যা কার্জন। দাদা ফিরে এসে যদি সব শোনে তোর আর রক্ষে নেই।

আইসব্যাগটা নিয়ে যাব? তারপরে বলবি ঝেড়ে দিয়েছি।

দে ঝেড়ে। আমাদের বাড়ি অমন ডজনে ডজনে আইসব্যাগ আছে। প্রত্যেক বার দরকারের সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক বার নতুন আসে। আজই প্রথম খুঁজে পাওয়া গেল।

কার্জন খুব বিমর্ষভাবে চলে যায়। আজকে দিনটাই বেচারার খারাপ যাচ্ছে। উন্নি, ওই উন্নির জন্যে। উন্নিটা থাকলেই যত ঝামেলা। চ্যাটাং চ্যাটাং চলবে, কটাং কটাং বলবে। ফলটা ভুগতে হবে তাকে। এখন বান্ডিলটা কোথায় পায় সে? পাবলোকে দেখলে বোঝা যায় না, কিন্তু সে অতি ধড়িভাজ ছেলে। তার কার্যকলাপ, তার হোয়্যারঅ্যাবাউটস সবই খুব কষ্টকর খুঁজে বার করা।

মীনাক্ষী, অর্থাৎ মধুবনের মা যশোধরার মূর্ছা ও পতনের খবর পেয়েছিলেন পাবলোর থেকেই। মনে হয় পাবলো মায়ের যতজন আত্মীয়-বন্ধু জড়ো করা যায় তার একটা চেষ্টা চালাচ্ছিল। ওই যে উন্নির ফোনটা! সিরিয়াস কেস! সেই শুনেই সে সম্ভবত খুব দায়িত্বশীল পুত্রের কাজ করে। উন্নির ফোনটা এসেছিল আরমান মারফত। পাবলো তখন পঙ্কজের সঙ্গে প্র্যাকটিস করছিল। তার হাতে গিটার। সঙ্গে সঙ্গে পঙ্কজের চিলেকোঠা থেকে লাফ দিয়ে সে বার হয়। সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে রাস্তা ভাঙতে ভাঙতে সে ক্রমাগত যার ফোন নম্বর মনে আছে বা স্টোর করা আছে সবগুলিতেই তার শোকসংবাদটি রাখছিল। মীনাক্ষীমাসি—মায়ের খুব শরীর খারাপ। সিরিয়াস কেস!

আলোমাসি—মায়ের হঠাৎ শরীরটা কেমন খারাপ হয়ে পড়েছে। না না ঘাবড়িও না। তবে সিরিয়াস কেস।

বিজয়মামা—শোনো একটা খারাপ খবর আছে। আমার মা মানে তোমার ট্রুপের যশোধরা ব্যানার্জির স্ট্রোক হয়েছে। হাঁ, না আজকাল মেলাই ওষুধ বেরিয়ে গেছে, ভয় কী!

মীনাক্ষী যশোধরার বাড়ির গেট থেকেই একটা কোলাহল মতন শুনতে পেলেন। অনেক কথা বললে যেমন হয় আর কী! দরজাটা আধ খোলা। ঠ্যালা মারতেই খুলে গেল। সেই বিকট বেলটা আর বাজাতে হল না। রাত প্রায় সাড়ে আটটা। এ সময়ে সদর খোলা! এমনই ক্রাইসিস, না কী? মীনাক্ষীর বুক টিপটিপ করতে লাগল। যশোর সঙ্গে তাঁর প্রায়ই ঝগড়া লাগত। কত তুচ্ছ কারণে তিনি যশোকে কত যাচ্ছেতাই করেছেন। মীনাক্ষী লেখাপড়ায় তুখোড় হওয়া সত্ত্বেও টিচারটা কেন কে জানে যশোকেই বেশি ভালবাসতেন। বাপ রে। সেই নিয়ে কম হিংসেহিংসি। তিনি একেবারে মুখের ওপর বলে দেন এক বার—আহ্লাদিগিরি করিস্ তো দিদিদের সঙ্গে! তোদের শাড়ির দোকানে থার্টিফর্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিস। সব দিদিকে কিনে রেখেছিস। নইলে আর যশোধরা চ্যাটার্জি ক্লাস ক্যাপ্টেন হয়? রাতদিন তো নিজেই গুজগুজ ফুসফুস করছিস। দারোয়ানের ছেলের সঙ্গে পর্যন্ত প্রেম করছিস।

ইস ছি ছি, এইটা যশোর খুব লেগেছিল। সবাই জানে রামলাখন স্কুল-দারোয়ান ভগৎরামের ছেলে। কিন্তু ছেলেটা কেমন তা তো দেখতে হবে! অত হ্যান্ডসাম ওদের ধারেকাছে কেউ ছিল না। আর অত ক্লাস কনশাস হবেই না কেন তারা? রামলাখন তো পাঁড়ে, বিহারি ব্রাহ্মণ! মুচি, ছুতোর, জেলে, মিস্ত্রি এদেরও যদি লেখাপড়া জানা হ্যান্ডসাম ছেলে থাকে, তা হলে কি মীনাক্ষী বা যশোধরাদের মতো আধুনিক মনের মেয়েদের আপত্তি থাকা উচিত? সমস্তটাই একটা কেলো। যশো অবশ্য জানে না রামলাখনের কথা সে-ই যশোর মা মিনতিমাসিকে বলে দেওয়ায় যশোর হুস করে বিয়ে হয়ে গেল। অবিশ্যি খারাপ কিছু হয়নি। ভাগলপুরে থাকার চেয়ে কলকাতার দক্ষিণে নিজ গৃহে থাকা হাজার গুণে ভাল। সুহৃৎদাও রামলাখনের চেয়ে লক্ষ গুণ ভাল। যশোকে কত

ভালবাসেন, মানেন। মীনাক্ষীর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সেই সুখী গৃহকোণ আঁধার করে, গৃহকর্তাকে অনাথ করে এত অল্প বয়সেই যশো চলল!

সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভাঙতে থাকেন মীনাক্ষী। এত আস্তে চলা আস্তে বলা তাঁর অভ্যাস নেই। রীতিমতো একটি নারীসমিতি চালাতে হয় তাঁকে। আজ গ্রান্টের জন্য সরকারি আপিসে ছোটো। কাল ছোটো ব্যাঙ্কে লোনের জন্য। সমিতির মেয়েদের হাতের কাজের এগজিবিশন করতে তাঁর ঘাম ছুটে যায়। যশোর মতো থপথপে হলে তাঁর চলে না। বলতে কি তাঁর খুব সন্দেহ তাঁর কন্যা মধুবনকে যশো ইচ্ছে করে, ইনটেনশন্যালি খাইয়ে-দাইয়ে ভাগলপুরী গাইটি বানিয়েছে খুব সূক্ষ্মভাবে তাঁর ওপর শোধ নিতে। ছোটবেলাকার রেষারেষি এইভাবেই সারাজীবন জিইয়ে থাকে। যাই হোক মধুবনকে নিজের ফ্রেমে এনে ফেলে যশোকে তিনি একহাত নেবেনই। এই রে! মীনাক্ষীর চট করে মনে পড়ে যায়। কীভাবে একহাত নেবেন তিনি যশোর ওপরে? সে তো চলল! যদি নাও যায় সে তো আর আগেকার যশোটি হয়ে থাকবে না! ছি ছি বাল্যসখীর দুঃসময়েও এসব ছেঁদো কথা তাঁর মনে এল কী করে? মীনাক্ষীর লজ্জায় দুঃখে নিজের দু'গালে চড় মারতে ইচ্ছে করল। স্বভাব সত্যিই মরার আগে যায় না। ছ্যাঃ।

মীনাক্ষী দোতলায় পা দিয়েছেন। চার দিকে একটা ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখতে পেলেন। পাবলো রয়েছে। পাবলোর বন্ধুবান্ধব ক'জন। ও দিকে সুহৃৎদার জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে যার সঙ্গে মীনাক্ষীর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। ভেতর থেকে সরু মোটা নানান গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। মীনাক্ষী পাবলোকে পাকড়ালেন—আমি কি কোনও হেলপ করতে পারি?

শিয়োর—পাবলো বলল—তুমি যদি আইস বার করে দাও, আমি স্প্রাইটের সঙ্গে আমপানা মিশিয়ে একটা ফার্স্টক্লাস পাঞ্চ করে দিতে পারি।

মানে?—মীনাক্ষীর হাঁ বুজতে চায় না—ডাক্তার শরবত খেতে বলছে? গরমে ভিরমি লেগেছে। না কী?

ভিরমিই বটে মাসি। এতগুলো ছেলেবুড়ো মেয়ে-মদ্দর ভিরমি সামলানো আমার একার কম্মো! তুমি প্লিজ একবারটি ফ্রিজে যাও!

কে এয়েচে রে? ঘরের ভেতর থেকে যে-কণ্ঠস্বরটি বেরিয়ে এল সেটি যশোর বলেই তো মনে হল।

পাবলো ফিসফিস করে বলল—দারুণ ক্রাইসিস মাসি। তুমি ওদিকে যেয়ো না। আমি শম্পিকে এক্সট্রা গ্লাস আনতে পাঠিয়েছি—তুমি ফ্রিজে যাও। আমি আসছি। উঃ প্রথমে চা, তার পরে শরবত, তার পরে যে কী!

পাবলোর চক্করে পড়িসনি। কে এলি?—যশোর কি মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিল? পাবলো ওদিকে যেতে বারণ করছে। যশো আবার পাবলোর দিকে আসতে বারণ করছে। কিন্তু মীনাক্ষী অত সহজে ঘাবড়াবার পাত্র কিনা! তিনি সুহৃৎদার জ্যাঠতুতো দাদার সঙ্গে নিজের বিয়েটা ঠেকাতে পেরেছেন। আরও কতজনকে সারাজীবন ধরে ঠেকিয়ে আসছেন। তাঁর বীরত্ব চ্যালেঞ্জে পড়লে আরও বেড়ে যায়। তিনি পাবলো একটু মুখ ফেরাতেই সো-জা যশোর ঘর।

বাপ রে! এই নাকি সিকরুম! সমস্ত ঘরটা গমগম ঝনঝন করছে লোকে। এদের পুরো গুষ্টিই বোধহয় যশোকে দেখতে চলে এসেছে।

যশো বলল—লে মধু, মিনিও এসে গেছে, তুই এবার ওর সঙ্গে মিলে মেনুটা ঠিক করে ফ্যাল। মিনি, তুই আর গপ্পো করতে বসিস না। আমি দ্যাখ জেরবার হয়ে গেলুম।

মীনাক্ষী হাঁ করে দাঁড়িয়েই আছেন। মধু রয়েছে। তার বর মিহিরকিরণও উপস্থিত। সুহৃৎদা যশোর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বসে রয়েছেন। সুহৃৎদার সেই জ্যাঠতুতো দাদা পরিমল সার এক জোড়া কাঁচা-পাকা গোঁফ নিয়ে হাজির। তাঁর স্ত্রী ছোট্টখাট্টো কলিবউদিও মজুত। সোমা নামে তাঁদের

আরেক বন্ধু এবং তার মেয়ে এসে গেছে। অল্প বয়স্ক কয়েকটি ছেলেমেয়েও ঘোরাফেরা করছে— তাদের মধ্যে আরমানকেই একমাত্র চিনতে পারলেন মীনাক্ষী। বিজয়মুকুলদাও রয়েছে আসর আলো করে। মাথায় বাবরি চুল ফুলিয়ে।

কী রে মিনি—তোর যে বাক্য হরে গেল? বল ঐক্য, বাক্য, মানিক্য!—

মীনাক্ষী অনেক চেষ্টায় নিজেকে দুরস্ত করে বললেন—তুই আছিস কেমন? হয়েছেটা কী? সেই আউপাতালিগিরি? আর কত অ্যাটেনশন দেবে তোর বর?

যশো হেঁকে বললেন—তুই চিরকালের শত্রু আমার। আমি মলে বাঁচিস। গেছি কি না দেখতে এসেছিলি। খুব ডিস্যাপয়েন্টেড। না রে? তোর বর যদি তোকে অ্যাটেনশন না দেয় তো আমার বর তুলে খোঁটা দিবি? যার ভাগ্য তার তার বুঝলি মিনি?—গলা উত্তরোত্তর চড়ছে দেখে যশোর জ্যাঠতুতো দাদা পরিমল বলে ওঠেন—আহাহা। এত উত্তেজিত হবার কী আছে যশো, বন্ধু বই তো নয়। দুটো ঠাট্টা তামাশা করতেই পারে। ওটা হল গিয়ে রিলিফ, বন্ধুকে ভাল দেখে ফুর্তি হয়েছে তো। তাই ঠাট্টা।

তোমার কুড-হ্যাভ-বিন পত্নীকে বুঝিয়ে বলো বড়দা। আমি নাটক করিনি। নাটক আমার আসে না।—লো সুগার, লো প্রেশার। সিচুয়েশন খুব খারাপ না হলে—ব্ল্যাক-আউট ভাল জিনিস না সুবুল ডাক্তার বলে গেছে।—বলে যশো বিশাল শরীর উলটে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুলেন।

মধুক্ষরা বলল—মিনিদি, একবার বাইরে এসো।

দালানে বেরিয়ে এসে বলল এই সব্বাইকার রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এখন। প্রথম দফায় শরবত, সেটা ছোটদের দায়িত্ব। এখন আমায় নাকি ডিনারের ব্যবস্থা করতে হবে। দিদির হুকুম। কী বে-আক্কেলে দেখো।

মীনাক্ষী বললেন—স্রেফ না করে দে। কে কবে শুনেছে অসুখের বাড়ি রাত ন'টায় ফিস্ট হয়। এটাও যশোর একটা অ্যাটেনশন সিকিং প্লয় বুঝলি?

বুঝি না আবার!—মধুক্ষরা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল। মিনিদির সঙ্গে মধুক্ষরার খুব ভাল বোঝাপড়া। ওই যে একটা ফর্মুলা আছে না তোমার শত্রুর শত্রু হল তোমার বন্ধু। সেই আর কী!

কিন্তু এখন কি আর না করা যায়! সব বসে আছে। খেয়েদেয়ে যাবে। সবাইকারই তো একটা রিলিফ হয়েছে!

না করা যাবে না বলছিস! তা হলে, 'এসো বোসো।'

মানে?

জানিস না। 'এসো বোসো' বলে একটা সার্ভিস চালু হয়েছে। টেক-অ্যাওয়ে রেস্তোরাঁ। ফোন করে দিচ্ছি। ক'জন গুনে আয়। যেমন বলবি দিয়ে যাবে।

একটু পরেই সেলফোন বার করে মীনাক্ষী অর্ডার দিয়ে দিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ। সিম্পল মাছের ঝোল আর ভাত, একটু আলুসেদ্ধ দেবেন। হ্যাঁ। এই গরমে আবার কী! আটত্রিশ ডিগ্রি আজ নির্ঘাত।

এই সময়ে পাবলো আর শম্পি—শরবতের গেলাস ভরতি ট্রে নিয়ে দেখা দেয়। মধুক্ষরা আর মীনাক্ষী পটাপট দুটো গ্লাস তুলে নেন। ব্যাজার মুখে দু'জনে সিকরুমের দিকে এগোতে থাকেন। দুটো গ্লাস কমে গেল!

কার্জন খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে। মাঝে মাঝে নিচু হয়ে আইসব্যাগটা চেপে ধরছে। বড্ড লেগেছে। একটা একফোঁটা মেয়ে সে কিনা পেছন থেকে লেঙ্গি মেরে তাকে ধরাশায়ী করল? মধ্যপ্রদেশে মেয়ে ডাকাত-ফাকাত আছে সবাই জানে। থেকে থেকেই শোষণের বিরুদ্ধে সেখানকার লোকেরা বাগী হয়ে যায়। চম্বলের বেহড়ে ঘোরে। ডাকাতদল গঠন করে। কিন্তু এই মেয়েটাকে তো এম পি-র বলে মনে হল না। তবে কি আজকাল মেদিনীপুর-টুরেও মেয়েরা বাগী হয়ে যাচ্ছে! চম্বল উপত্যকার

বদলে কলকাতা শহর, এবং ঠাকুরদের বদলে কলকাতার সাধারণ নাগরিকদের তাক করছে! রীতিমতো অর্গ্যানাইজড্‌ বলে মনে হল। এবং এর মধ্যে মধুবনও আছে। জেনে বা না জেনে। আজ যে-মেয়ে তার বন্ধুকে লেঙ্গি মারল, কাল যে সে মধুবনকেও মারবে—এই সামান্য সত্যটা মধুবন বুঝছে না। উঃ হাঁটুটা খচখচ করে উঠল।

প্রায় সাড়ে আটটা বাজছে। কিন্তু বান্ডিলটার একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত কার্জন বাড়ি ফিরতে চায় না। সে পঙ্কজদের বাড়ি চলল। সামনে যে-অটোটা পেল, উঠে পড়ল। পাবলোর বেস্ট ফ্রেন্ড হল পঙ্কজ ধুধুরিয়া। এবং ধুধুরিয়া বেশ ঘুঘুমাল। ঘুঘুরিয়া পদবি হলে ভাল মানাত। ওই ঘুঘুই চোরাই মালটি রেখেছে নিজের ভল্টে। নিশ্চয়ই!

পঙ্কজদের বাড়ির সদর অনেকক্ষণ অবধি খোলা থাকে। একজন খেঁকুরে মতো কেয়ারটেকার টুলে বসে ঢোলে। সে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে লিফটে উঠে পড়ল।

কে? কে? কে?—তালপাতার সেপাইয়ের ঘুম ভেঙেছে। তাকে দেখে বলল—ও পঙ্কজখোকার বন্ধু! কী যেন নাম ক্যানিং না ম্যানিং। ইংরেজি নামের ছেলেদের হেভি রেলা। যাও যাও ওপরে যাও।

লিফট থেকে বেরোতেই লোডশেডিং। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। পঙ্কজদের দরজায় বিশাল ঘুসি মেরে কার্জন চেঁচাল—পঙ্কজ, দরজা খোল!

নিশ্চয় আই হোল থেকে কেউ তাকে জরিপ করছিল। কিন্তু জরিপের রেজাল্ট শূন্য। কেননা অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। এই সামান্য সেন্সটুকু পঙ্কজের বাড়ির লোকেদের নেই।

সে হেঁকে বলল—অন্ধকারে কী দেখছেন? শুনুন, কান পেতে শুনুন। দিস ইজ কার্জন ফ্রম একডালিয়া। সার্চ ওয়ারেন্ট ইন হ্যান্ড!

দরজাটা একটু খুলল—পঙ্কজ মুখ বাড়িয়ে বলল, আবার এসেছিস? কী মনে করে? বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

নিজের বডিটা দরজার ওপর ফেলে দিল কার্জন। ঢুকে পড়ল। বলল—বার কর, বার কর।

য ব্বাবা এ যে দেখি ডাকাত।

আর তুমি যে বাটপাড়? তোমার বন্ধু পাবলো যদি চোর হয়, চোরাই মাল যদি তোমার কাছে থাকে হে বাটপাড়। তা হলে তো আমাকে হয় ডাকাত নয় পুলিশ হতেই হয়!

ডেলিরিয়াস! পঙ্কজ মন্তব্য করল। অন্ধকারের অন্তর থেকে একটা মোটা গলা বলে উঠল টেম্পারেচার কিতনা? দেখ না! আরে প্যারাসিটামল দো দো খিলা দে ইয়ার। সব ঠিক হো জায়েগা।

এবার একটা অপেক্ষাকৃত সরু কিন্তু যথেষ্ট জোরালো গলা বলে উঠল—ঠাকুরজি সব ঠিক কর দেগা।

সিরিয়্যাল—পঙ্কজ বলল।

যতই আনশান বকিস আমি আজ খানাতল্লাসি করব। করবই।

কার্জন মেঝেতে পা ঠুকল, এবং সঙ্গে সঙ্গে উ-হু-হু করে উঠল।

দেখলি তো! খানাতল্লাশি-টাশির মতো বাজে কথা বলতে বাড়ির ফ্লোরটাই তোকে শাস্তি দিয়ে দিল। পানিশমেন্ট।

ফ্লোর না আরও কিছু। পা, হাঁটু। ব্যাপক লেগে গেছে।

ওষুধ দরকার? তা সে-কথা বললেই পারতিস! যখন-তখন যেখানে-সেখানে লোডশেডিং হচ্ছে। লোকে ধাক্কা খাবে কি কুপোকাত হবে এ আর বেশি কথা কী! আয়, আমার কাছে একটা স্প্রে আছে। সঙ্গে সঙ্গে আরাম পাবি।

পঙ্কজ আদর করে কার্জনকে নিয়ে যায় হাত ধরে ধরে কেননা তাদের বাড়ি ফার্নিচারে ঠাসা। তাতে ঠোক্কর খেলে কার্জনের সাড়ে সর্বনাশ।

অন্ধকারেই ড্রয়ার হাতড়ে স্প্রে-টা বার করল পঙ্কজ। কার্জনকে একটা চেয়ারে বসিয়ে ছ'ইঞ্চি দূর মাপল। তারপর স্প্রে-টা করল।

আহ! কী আরাম!

আরাম তো! দ্যাখ ইয়ার, এবার চুপচাপ দশ-পনেরো মিনিট বসে থাক এমনি। অ্যাকশনটা না হলে হবে না।

গুনে গুনে দশ মিনিট। তার পরই সব আলো ঝলমলে হয়ে উঠল। একটা হো মতো শব্দ উঠল চার দিক থেকে!

ওই তো আমার বান্ডিল—কার্জন ঝাঁপিয়ে পড়ল পঙ্কজের টেবিলের ওপর।—সে একটা মোটা মতো কাগজের বান্ডিল তুলে নিয়ে নিজের পকেটে ঢোকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। মুখে শুধু বলছে, মাফ করে দিলুম। পেয়ে তো গেছি। আর কোনও শত্রুতা মনে রাখব না। বন্ধু ইজ বন্ধু। হাতটা বাড়া পঙ্কজ, লেটস সে স্যরি।

পঙ্কজ হাত বাড়াল না। বলল—আমার কেমিস্ট্রির নোটস নিয়ে যাচ্ছিস কেন? শালা তুই না কমার্স পড়িস!

ঢপ কাকে দিচ্ছিস! কার্জন মৈত্র অত সহজে ঢপ খায় না। সদরের দিকে পা বাড়াল কার্জন।

আরে! একেবার দেখ তো সহি। কিসকা নোটস। কেয়া লিখ্‌খা হ্যায়।

বাড়ি যাব আগে। চান করব ফার্স্টক্লাস। খাওয়া-দাওয়া করব, তার পরে খুলব, দেখব আমার বান্ডিল।

তবে রে! ভাল কথার কেউ নয়। এ পিতাজি দেখিয়ে তো এক বদমাশ মেরা কেমিস্ট্রি নোটস লেগে ভাগতা হ্যায়।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পঙ্কজের বাবা এসে উপস্থিত হন।

আরে ক্যা হুয়া! এ বাচ্চালোগ বহোত বদমাশ! ভদ্রলোক আড়ে-দিঘে বিরাট।

মিনমিন করে কার্জন বলল দেখুন না আঙ্কল, আমার বান্ডিল, ও বলছে ওর নোটস।

ক্যায়া থা, তুমারা বান্ডিল মে!

নেই বলুঙ্গা—দু'হাত বুকে আড়াআড়ি রেখে কার্জন বলল। ভদ্রলোক বললেন—স্ট্রেঞ্জ! তো জরা দেখনে তো দো! কার্জন আর কী করবে বান্ডিলটি ধুধুরিয়াজির হাতে সমর্পণ করল। তিনি খুলে বললেন—আরে, ইয়ে তো কেমিস্ট্রিকিই হ্যায়, বহোত ফর্মুলা—উলা, গ্রাফ, দেখো ভাই, খুদ দেখ লো।

দেখে কার্জনের প্রায় কান্না পেয়ে গেল। না তার বান্ডিল নয়, অথচ তারই বান্ডিল। কাগজগুলো স্টেপল করে একটা সাদা বড় খামে ভরেছিল। তারপর পুরো জিনিসটা রোল করে বড় বড় দুটো রবার-ব্যান্ড দিয়ে আটকানো ছিল। একটা নীল, একটা হলদে। এ রবার-ব্যান্ড এখানের নয়, আমেরিকার। কার্জনের মামা কী সব পাঠিয়েছিলেন, তাতেই ছিল। সাদা খামটা একটু ময়লা হয়ে গেছে।

তার কাঁদোকাঁদো মুখ দেখে পঙ্কজের বোধহয় দয়া হল, সে বলল আরে ইয়ার, রোও মত্। বান্ডল জরুর মিল জায়েগা।

হ্যাঁ মিল জায়েগা। তুমিই হাপিস করেছ। এই খাম কোথায় পেলে?

হ্যাপি স্টোর্স থেকে।

এই রবার-ব্যান্ড?

আমার মেটারন্যাল আঙ্কল আমেরিকা থেকে কী সব পাঠিয়েছিল, তাতেই ছিল।

কার্জন একেবারে হাঁ হয়ে গেল। হ্যাপি স্টোর্স না হয় বোঝা গেল। কিন্তু রবার-ব্যান্ড ঠিক এই রঙের পাঠানোর জন্যে সেই আমেরিকাতেই বসে রয়েছেন পঙ্কজের মামা। এরকম কাণ্ডে আনহ্যাপি ছাড়া আর কী হতে পারে সে!

খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে লিফটের দিকে চলল। পঙ্কজ খুব ভালমানুষের মতো বলল—ক্যা থে উস বান্ডল মে’ লভ-লেটার?

যা খুশি ভ‍াবতে পারিস, বলতে পারিস, আমি বলব না।

কার্জন ব্যর্থ খানাতল্লাশি শেষে নিজের বাড়ির দিকে যাত্রা করল, মুখ কাঁদোকাঁদো, কাঁচুমাচু, ঠিক যেন এক ফেলটুস ছেলে।

পাবলো নয়, পঙ্কজ নয়, উন্নি নয়, একমাত্র বল্লীকেই তার গোপন প্রজেক্টের কথা সামান্য বলতে চেয়েছিল কার্জন। কাউকে না কাউকে বলতে তো হবে! চার পাশে এতগুলো ইয়ার দোস্ত। পেট ফুলবে যে না বললে! ইয়ারকিতে সব এক। সিরিয়াস কিছু করো। একজনের সঙ্গে আর একজনের থোড়ি মিলবে! পাবলো যেমন তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা একমাত্র পঙ্কজকেই বলে থাকে। পঙ্কজ অবশ্য তা নয়। সে সোজাসুজিই বলে তার টাকা চাই। প্রচুর টাকা। কোনও না কোনও এক দিন সে অন্ততপক্ষে ভারতীয় ধনকুবেরদের মেরিট লিস্টে নাম লেখাবেই। পঙ্কজ বলে, দ্যাখ, যাবতীয় কোয়ালিফিকেশন আমার আছে ধনকুবের হবার। দ্যাখ, ফার্স্ট থিং, আমি লেখাপড়ায় ভাল নই, অমনোযোগী, মিলে গেল কি না? দ্যাখ আমি প্রচণ্ড স্মার্ট। কখনও কোনও অবস্থাতেই তোরা আমাকে অপদস্থ করতে পারবি না। হাতেনাতে চুরি করছি এমন অবস্থাতেও যদি ধরিস ঠিক পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাব।—ঠিকই বলে। আজই তো হাতেনাতে ধরা পড়েছিল। কার্জনের চুরি করা বান্ডিল ফুসমন্তরে হয়ে গেল কেমিস্ট্রির নোটস! আরও গুণ আছে পঙ্কজের। আলাদা আলাদা নামে অর্থাৎ বেনামে প্রপার্টি কেনবার মতো প্রচুর বিশ্বস্ত আত্মীয়স্বজন। পঙ্কজ উপরন্তু খুব খাটিয়েও। এবং তার বাবা সামান্য স্টেশনারির অর্ডার ধরার ব্যবসা থেকে এখন হিন্দুস্তান পার্কের মতো জায়গায় ফ্ল্যাট কিনেছেন। ঘরে ঘরে এসি। মারুতি ৮০০ বিক্রি করে এখন হোন্ডা সিটি কিনেছেন। এমন এলেমদার বাবার উদাহরণ সব সময়ে চোখের ওপর থাকতে পঙ্কজ পথ হারাবে—এ কথা ভাবা শক্ত।—ডোভার লেনে পড়ে, বালিগঞ্জ নিউ মার্কেটের পাশ দিয়ে সে গড়েহাটা রোডে পড়ল।

আরমান তো এখনই কেরিয়ারে ঢুকে গেছে। ফুটবল ওর নেশা, ভলিবল, বাস্কেটবল সবরকমের বল গেমই ওর আসে। খেলতে খেলতেই ও একটা ঘ্যাম চাকরি পেয়ে যাবে। তারপর যত দিন পারে খেলবে আর খেলবে। খেলতে খেলতে কোচ হয়ে যাবে। কোচিংয়ে বহুত ঝামেলা বলে ও কমেন্টেটরও হয়ে যেতে পারে। সেটা অবশ্য ক্রিকেটের। আরমান হল গিয়ে স্পোর্টসম্যান। রাস্তা পার হয়ে একডালিয়ার দিকে ঘুরল কার্জন।

মধুবন বলে থাকে সে—পড়বে। কিন্তু কার্জনের ধারণা মধুবন নিজেকে বিয়ের জন্যে তৈরি করছে। হঠাৎ এত হাঁটা, এত জিম, ডায়েট। ফিগারের পেছনে এত খরচ, পরিশ্রম, সময়! এর ওই একটাই মানে হয়। বেশ নিরাপদ একটি ম্যারেজ কেরিয়ারই হল তার লক্ষ্য।

শম্পি মানে সম্পৃক্তা ল পড়বে, ফর দা সিম্পল রিজন যে ওর বাবা অ্যাডভোকেট, উন্নি আর বল্লী হল দুই মিস্ট্রি ওদের মধ্যে। এরা যে কী চায়, কী করতে চায় কেউই বুঝতে পারে না। নিজেরা কিছু করবে টরবে না কারুর ঘাড়ে বসে খাওয়ার মতলব আঁটছে—ঘুণাক্ষরেও কেউ বুঝতে পারে না। তবে কার্জন নিশ্চিত যে, উন্নি জয়েন্ট আই আই টি এনট্রান্সে বসছেই। অল্প কথার মেয়ে। প্রচণ্ড তুখোড়। লেখাপড়াতে কোনওদিন এ প্লাসের কম পায়নি। হাঃ উন্নি। লেখাপড়াতে এমন তুখোড় হয়েও তুই কার্জন মৈত্রিরের কাছে হেরে যেতে চলেছিস। জানিস না, মানবি কি না তা-ও জানি না। কিন্তু কার্জন তার মনে মনে পুরো ছকটা কষে তো নিয়েছে। বল্লীও কম কথা বলে, ধারালো মেয়ে। বন্ধুর জন্যে উন্নী-বল্লী জান লড়িয়ে দেবে। কিন্তু বল্লী একটু বেশি সহানুভূতিসম্পন্ন, একটু বেশি বুঝদার। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে না।

সেদিন বান্ডিলটি নিয়ে সে বল্লীর কাছেই গিয়েছিল। বান্ডিলটা তার পকেট থেকে বেরিয়ে ছিল।

ও মিসাইলটা কীসের রে?—বল্লীই জিজ্ঞেস করে। কী করে বলবে সে? পাবলো, পঙ্কজ দুই মূর্তিমানই মজুত। পাবলো বললে—অগ্নি থ্রি। পঙ্কজ বললে শেয়ার, শেয়ার। সব পকেটমানি তা ছাড়াও যেখান থেকে যা ঝাড়তে পারছে সব শালা সার্টিফিকেট কিনে রাখছে। মাল্টিপ্লাই করতে করতে ওর চব্বিশ বছর বয়সে, পাঁচ লাখপতি। অ্যানাদার সিক্স ইয়ার্স—বারো লাখপতি...ওদের উপস্থিতিতে কার্জন কী বলবে? তবে হ্যাঁ ওটা পকেটে নিয়ে বসতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে সে বান্ডিলটা টেবিলের ওপর রাখে। এবং আড্ডা দিতে দিতে একেবারে ভুলে যায়, ক্ষমার অযোগ্য এই ভুল। ঝোঁকের মাথায় গল্পসল্প করে বেরিয়ে পড়েছিল। মোড় ঘুরতেই মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রিটার্ন টিকিট। বল্লী আছে। বাট নো পঙ্কজ, নো পাবলো, নো বান্ডিল।

কী রে বল্লী, আমার বান্ডিলটা!

কীসের বান্ডিল। যেন আকাশ থেকে পড়ল।

ওই যেটাকে মিসাইল বলছিলি।

বল্লী গম্ভীরভাবে বললে—মিসাইল তো মিস হবেই।

বাজে ইয়ারকি করিসনি। দিয়ে দে বান্ডিলটা।

আমি সত্যিই জানি না ওটা কোথায়?

এখানেই তো রেখেছিলুম।

তখনই বল্লী বলেছিল—দ্যাখ পাবলোরা হয়তো তোকে নাচাবে বলে সরিয়েছে ওটা।

বল্লী আর যাই হোক মিথ্যে কথা বলবার লোক নয়। বিকেল থেকে ঘুরছে সে। অথচ এখন সন্ধের ঝোঁকে একটু লেখাপড়া করে নেবার মতলব ছিল তার। যতনই যাই হোক, পরীক্ষাটা যে কাছে চলে এসেছে এটা তো মিথ্যে নয়! কার্জন অগত্যা বাড়ি চলল। সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো ভেতরটা। পুরো দিনটাই জলে গেল আজ।—বাড়ি এসে গেল।

সদর দরজার সামনে জেঠু দাঁড়িয়ে, কী হে, বিশ্ব ভ্রমণ করে ফিরলে?

উত্তরে হাঁটু ধরে ধরে কার্জন জেঠুর পাশ দিয়ে বাড়ি ঢুকে যায়।

ন্যাংচাচ্ছ কেন? কে মেরেছে? তুমি তো আগে মারামারির মাল ছিলে না, গুণ বাড়ছে দেখছি।

উঃ জেঠু, পড়ে গিয়ে আমার ভীষণ লেগেছে, একটু চুপ করবে?

তবে যাও, গিয়ে মা-জেঠিমার কাছে আদর খাও। তবে জেনে রেখো তোমার বাবা আগতং। তার কাছে আজ তোমার হচ্ছে!

বন্ধুদের বাড়ি যেমন ডেঞ্জারাস, ওর নিজের বাড়িও তেমনই। সেখানে যদি বন্ধুর মা, মাসি কিংবা অ্যাসিস্ট্যান্ট, এখানে তেমনই জেঠু, বাবা, মা, দাদা। জেঠিমাই একমাত্র বন্ধুভাবাপন্ন। বোঝেন। তার বিপন্নতা তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। সে যে শুধুই ভ্যারেন্ডা ভাজার ছেলে নয়। আই এস সি পরীক্ষার আগেটায় কোনও বিকেলে বেরিয়ে সে যদি রাত ন'টা পনেরোয় বাড়ি ফেরে তো তার সংগত কারণ আছে। এটা একমাত্র জেঠিমাই বিশ্বাস করে। অন্যদের রি-অ্যাকশন একদম সুবিধের না!

যাই হোক কার্জন ভয় পায় না। যা ফেস করার তা ফেস করতে হবেই। এই জানুয়ারিতেই তার আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে। এর পরের ভোটে সে অংশগ্রহণ করবে। এখন কথায় কথায় ভয় পাওয়া শোভা পায় না।

সে নিজের ঘরে মানে দাদা ও তার ঘরে গিয়ে ঢুকল। দাদা যথারীতি নেই। তিনি দিনে চাকরি করে রাতে ম্যানেজমেন্ট পড়ছেন। সবার মাথা কিনে নিয়েছেন সুতরাং। তাঁকে নিয়ে বাড়িতে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। সে সত্যিই ক্লাসে যাচ্ছে না বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা মারছে কেউ খোঁজ নেয় না। জানতেও চায় না। অথচ একদিন লেক রোডের কাফে কফি ডে'তে দুটি বান্ধবীর সঙ্গে দাদাকে আড্ডা দিতে সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে। লাগানি-ভাঙানি স্বভাব তার নয়। তবু যখন তার দিকে অভিযোগের তির ধেয়ে আসে সে তো না বলে পারে না।

দাদা কী করছে খোঁজ রাখো না? ক্লাস না করে সে কাফেতে বসে আড্ডা মারছিল গত মঙ্গলবার!

মা অম্লান বদনে বলে দিলে—একটু রিল্যাক্সেশনও তো দরকার। ছেলেটা নিশিদিন খাটে।

নাও কী বলবে বলো।

সে গা ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এই পা ব্যথা নিয়ে সে এতটা পথ হেঁটে হেঁটে এসেছে। আলোটা টুক করে নিবিয়ে দিল। বান্ডিলটা কার কাছে থাকতে পারে! পঙ্কজের কাছে নেই, বল্লীর কাছে নেই, পাবলোর সঙ্গে এখনও মোলাকাত হয়নি। ওর কাছেও যদি পাওয়া না যায় কার্জন কী করবে? ভাবতে ভাবতে যা অবশ্যম্ভাবী তাই হল—সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ওদিকে হচ্ছে এক নাটক। বোকা একচোখাদের বাড়িতে যা হয় আর কী। ল্যাপটপ নিয়ে মগ্ন ছিলেন কার্জনের বাবা ঋতম্ভরবাবু। কার্জনের জেঠিমা রত্নমালাদেবী তাঁকে ক'বারই তাড়া দিয়েছেন।—ও ঋৎ খেতে এসো না। আমরা কতক্ষণ হাত-পা কোলে করে বসে থাকব!

কোল থেকে নামিয়ে বোসো।

উঃ আর পারি না।

রাত দশটার সময় টেবিল পড়ল। ঋতম্ভরবাবু তাঁর স্ত্রী সঙ্ঘমিত্রা, রত্নমালাদেবী তাঁর স্বামী বিশ্বম্ভরবাবু সবাই হাজির। গরহাজির শুধু দুই ছেলে।

বিশ্বম্ভর বললেন—লাটসাহেব তো ন'টা নাগাদ ঢুকেছিলেন একবার, তোমাদের কারও সঙ্গে দেখা হয়নি?

রত্না বললেন—ওমা! কই না তো! আমার সঙ্গে দেখা না করে সে যাবে কোথায়! আহা রে!

বিশ্বম্ভর ঋতম্ভর কোরাসে বলে উঠলেন—বাহা রে! এমনি করেই ছেলেটার মুন্ডু চিবোচ্ছ।

সঙ্ঘমিত্রা বেশি কথার মানুষ নন, কাজের মানুষ। তিনি স্রেফ ফোনটা তুলে—পর পর কয়েকটি ফোন করে গেলেন।

এসেছিল? সন্ধের ঝোঁকে? কী হয়েছে যশোধরার? ও, যাক। পরের ফোন—হ্যাঁ মধুবন, কার্জন এখনও বাড়ি ফেরেনি। এসেছিল? বলিস কী? আচ্ছা ঠিক আছে।

হ্যাঁ বল্লী আছে? বলছিস? কার্জন তো এখনও বাড়ি আসেনি। শেষ দুপুরে? বলিস কী!

সঙ্ঘমিত্রা এবার ফোনের দিকে পেছন ফিরে বললেন লালবাজারে করব কি! ও মোটের ওপর সব বন্ধুবান্ধবের বাড়িই গিয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে চলেও এসেছে। ওকে নাকি উদ্‌বিগ্ন, টেনসড দেখাচ্ছিল। কোনও শত্রু-টত্রু?

বিশ্বম্ভর বললেন—অসম্ভব নয়। লেখাপড়ায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা নেই। আমাদের ছেলে বেশি মার্কস পেয়ে কারও ঈর্ষার উদ্রেক করবে না। নিশ্চিতা। কিন্তু আরও একটা ক্ষেত্র রয়েছে।

কী ক্ষেত্র?—রত্না ভীষণ চিন্তিত স্বরে বললেন।

প্রেম! প্রেমে রাইভ্যালরি সাংঘাতিক জিনিস।

প্রেম! কার্জন! রত্নমালা হেসে ফেললেন—ওইটুকু বাচ্চা নাড়ুগোপাল ছেলের সঙ্গে কার প্রেম হবে গো!

আহা হা , একেবারে নাড়ুগোপাল, সঙ্ঘমিত্রা ঠিকরে উঠলেন। তোমার কেষ্টঠাকুরও নাড়ুগোপালই ছিলেন দিদি।

কিন্তু নাড়ুগোপাল অবস্থায় কি তিনি প্রেম করেছিলেন? রত্নার জিজ্ঞাসা।

খুব বেশি দিন দেরিও লাগেনি। ষোলো বছর বয়সে তো মথুরাতেই চলে গেলেন। গোপীপর্ব তার আগে। সেকালে আমাদের ছেলের তো আরও দু'বছর বয়স পেকেছে।

এই সময়ে বেল বাজল। বিশ্বম্ভর দরজা খুলে দিলেন তাড়াহুড়ো করে। না কার্জন না, তার দাদা অজিন। ওরফে পল্টন।

ওফফ কী গরম! আমি চান করে এসে বসছি বাবা। অজিন-পল্টন চলে যায়। সে মিনিট পনেরো

পরে ঠান্ডা হয়ে যখন ফিরে আসে তখনও কৃষ্ণপর্ব চলছে।

শ্বতম্ভর বলছেন—ও-সব গপ্পোকথা গপ্পোকথা। উঠতি বয়সে ছোকরাদের একটু ছোঁকছোঁক হয়। কৃষ্ণ গোয়ালার ঘরে মানুষ কিন্তু আসলে প্রিন্স। ধারেকাছে ব্রজবালা ছাড়া আর কাউকে পায়নি।

অমনি ফোঁস করে উঠলেন সঙ্ঘমিত্রা—ব্রজবালা বলে কি তারা ফ্যালনা নাকি! আজকের দিনে এই ধরনের ক্লাস-কনশাসনেস, জাতপাত ছিঃ। ধিক তোমাকে।

পল্টন বলল কী নিয়ে লাগ ধুম ধুম লেগে গেল এই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার?

জেঠু বললেন—কথা হচ্ছিল কার্জন কেন এখনও ফেরেনি তাই নিয়ে তো তার থেকে তার প্রেম। তার নাড়ুগোপাল স্টেজ। এই পর্যন্ত আমি আর তোর জেঠি যোগ দিয়েছি। এবার তোর বাবা-মা'র মধ্যে জাতপাত, সংরক্ষণ ক্লাস-ট্লাস সবসুদ্ধু এসে গেছে।

পল্টন রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল—কে বলল কার্জন ফেরেনি।

অ্যাঁ?

নাহ্। তোমরা সত্যিই হোপলেস ওল্ড ফুলস। ঘরটা একবার দেখোনি? সে তো ঘর অন্ধকার করে পাখা চালিয়ে ঘুম মারছে।

যা ব্বাবা। একটা ইনটারেস্টিং সম্ভাবনা জলে গেল।—জেঠু বললেন, জেঠিমা বললেন—তা তুই ওকে তুলে আনলি না? খাবে না ও!

আচ্ছা জেঠিমা, কার্জন খেয়েছে কি না খেয়েছে আমি জানব কী করে? সত্যিই তো! সত্যিই তো! চার দিক থেকে একটা রব উঠল। তারই মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে রত্নমালা বেরিয়ে গেলেন। এ-বাড়িতে তাঁরই একমাত্র মেয়ে। মেয়ের যত দিন বিয়ে হয়নি সঙ্ঘমিত্রা সেই সংহিতা-অন্ত প্রাণ ছিলেন। রত্নমালা আবার কার্জন-ভক্ত। যশোদা-মা টাইপ। সংহিতা সুদূর বিদেশে মন্ট্রিয়ল না কোথায় বসে আছে। এখন কার্জনই এঁদের একমাত্র স্নেহের ধন। পল্টন হাত থেকে বেরিয়ে গেছে।

রত্নমালা আলো জ্বেলে দেখলেন—একটা নোংরা বারমুডা পরে, গায়ে পাতলা ফতুয়া, ধূলিধূসর পদদ্বয়, যশোদাদুলাল নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন।

এই কার্জন, কার্জন। রাগ করিস না বাবা, খাবি চল।

কয়েকবার এই পদাবলি আউড়ে যাবার পর, কার্জন অস্ফুটে বলল—কী বিরক্ত করছিস মাঝরাত্তিরে, হাটা তোর অ্যাসিস্ট্যান্টকে নইলে একদিন ও-ই তোকে স্টান্ট দেবে। বুঝবি মজা!

কী বকছিস। এই কার্জন! আমি জেঠিমা রে।

কার্জন অর্ধেক চোখ খুলল।

মাঝ রাত্তিরে ডাকাডাকি করছ কেন?

তুই যে খাসনি বাবা, রাত-উপুসি থাকলে হাতিসুদ্ধু পড়ে যায়। আমার ঠাকুমা বলতেন।

কার্জন তড়াক করে উঠে বসল।—আমি খাইনি?—নিজের শরীরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল আমি চানও করিনি?

হ্যাঁ পা-ও ধুসনি। নোংরা ঘেমো জামা পড়ে শুয়েছিস।

নামতে গিয়ে—কার্জন গর্জে উঠল—উহ্‌হ্।

ও কী রে? লেগেছে?

লেগেছে। লেগেছে। লেগেছে। না-ও কী করবে করো। তোমারও লাগেনি তোমাদের পেয়ারের পল্টনচন্দ্রের লাগেনি। লেগেছে এই বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানোর। হল তো।

রত্নমালার চোখ ছলছল করে উঠল।—এমন কথা তুই বলতে পারলি? পেছন থেকে বাবার গম্ভীর গলা ভেসে এল—বাজে না বকে চানফান করে এসে খেয়ে নাও।

রাত এগারোটার সময়ে বল্লীর ফোন এল। কার্জন ফিরেছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ ফিরেছে। হাঁটুতে খুব লেগেছে।

পাঁচ মিনিট পরে মধুবনের ফোন। ঘুমঘুম গলায়—জেঠিমা, কার্জন ফিরেছে?

হ্যাঁ ফিরেছে। হাঁটুতে খুব লেগেছে কী করে কে জানে?

আইস প্যাক দিয়েছিলুম তো!

তোর সামনেই পড়ল! কী করে?

একদম শুকনো ডাঙায় আছাড় খেল জেঠিমা, আর বলবেন না।

তা যদি বলো মধুবন, শুকনো ডাঙায় এই বয়সের ছেলে আছাড় খায় না। তোমরা অত্যন্ত কেয়ারলেস। জলটল ফেলে রেখেছিলে আর কী। আজ কার্জনের হাঁটুর ওপর দিয়ে গেছে। কাল তোমার হাঁটুর ওপর দিয়ে যাবে। গুরুজন কথাটা বলছি। কান পেতে শোনা। জল-ফলগুলো পড়ে থাকলে মুছে নিয়ো। নিজে নিচু হতে না পারো, তোমাদের কাজের লোককে বলো।

নিচু হতে না পারা কথাটা মধুবনের খুব লেগেছিল। মাসিমা পর্যন্ত! টেলিফোন রেখে সে নিঝুম হয়ে বসে রইল।

আর পাঁচ মিনিট পরে উন্নির ফোন।

মাসি, কার্জন ফিরেছে? ওর জিনিস পেয়েছে?

ফিরেছে। কী জিনিস?

তা তো জানি না, সারা বন্ধুমহল চষে ফেলেছে। আচ্ছা রাখি।

রত্নমালা সঙ্ঘমিত্রাকে বললেন—একটা জিনিস লক্ষ করেছিস। উতলা হয়ে কার্জনের খোঁজ যাঁরা করল তারা সকলেই নারী।

দ্যাখো দিদি—এইসব উন্নি, মধুবন, বল্লীদের নারী বলে নারীদের অপমান কোরো না। ওরা জাস্ট মেয়ে, এখনও টিন। পেছন থেকে ছেলে কি মেয়ে বোঝা যায় না। সামনে থেকেও তোমার কার্জনের যা আছে উন্নির তা নেই। হুঃ নারী!

আমি যেটা বলতে চাইনি সেটা হল—প্রেমের সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রেমে রাইভ্যালরির ব্যাপার একটা হয়ে থাকতেই পারে। ছেলেটা খুব ডিপ্রেসড!

তুমি তো সব সময়েই ওকে ডিপ্রেসড কি রিপ্রেসড দেখছ। ইমপ্রেস করতেই খালি দেখা যাচ্ছে না।

আচ্ছা আচ্ছা—রত্না রণে ভঙ্গ দিলেন। কিন্তু মনের ভেতর খটকাটা তাঁর থেকেই গেল।

আই এস সি পরীক্ষার শেষ দিন আঁজ। এদের সব আজ মুক্তির দিন। প্রহর গোনা শেষ হল। গনগন করছে রোদ। সে সব উপেক্ষা করে দলে দলে মা ইতি-উতি বসে রয়েছেন। লনের ধারে। গাছের তলায় গুচ্ছ গুচ্ছ মা। সকলেই খুব টেনশনে। কিন্তু সাজ দিতে কারও ভুল হয়নি। টিপ, কাজল, লিপস্টিক।

মীনাক্ষী বলছেন,—যশোঁ, তোকে তো চেনাই যাচ্ছে না।

এই তো দিব্যি চিনতে পেরেছিস?

ক' কেজি নামালি?

যশোধরা দু'হাতের আঙুল মেলে দেখালেন ছ'কেজি। তাঁর বোন মধুক্ষরা বলল—শুধু শুধু হয়েছে নাকি? সুবুলদা ভয় দেখিয়ে গেল।

কে সুবুল? সেই তোর ক্যান্ডিডেট? এখনও লেগে আছে!

ধ্যাত। কী যে বলো মিনিদি। ডাক্তার তো বাড়ির।

মিহির জানে?

উফ। মিহিরের প্রেশার কে রেগুলার মাপে?

উদাস চোখে তাকিয়ে মীনাক্ষী বললেন—দ্যাখ প্রেশারের কারণ হয়তো ওটাই। প্রেশার মাপতে

তো কম্পাউন্ডারই যথেষ্ট। ডাক্তার কী করবে!

সাইড-ট্র্যাক করে যাচ্ছিস কেন? যশোধরা আপত্তি করে উঠলেন।

জানিস দু'মাস নো ভাত। নো আলু, সিরিয়্যাল বলতে পাউরুটি-টোস্ট উইদাউট মাখন, পেঁপে সেদ্ধ, গাজর সেদ্ধ, বিনস সেদ্ধ, শসা নুন দিয়ে ছানা।

আর? এসব তো জানি?

হন্টন। সকালবেলায় চার রাউন্ড, বিকেলবেলায় চার রাউন্ড। প্লাস যোগাসন। তা ছাড়া ওপর নীচে। তিনতলা একতলা ছ'বার এ-বেলা, ছ'বার ও-বেলা। মিথ্যে বলব না, এ দু'মাস আমার সংসার মধুই দেখেছে।

মধুক্ষরা বললে—মাসাজও নিয়েছে দিদি। বেশ হয়েছে না? দেখো ওপর হাতের থলথলে ভাবটা চলে গেছে। গাল গলা দিব্যি ট্রিম।

আচ্ছা আচ্ছা তোকে এই পাবলিকে এখন আমার ফিগার ব্যাখ্যা করতে হবে না।

মধুবন কদ্দুর?

মীনাক্ষী হতাশায় হাত উলটে বললেন একটু কমেছিল। যেই পরীক্ষা ঘাড়ে এসে গেল, জিম, হাঁটা সব বন্ধ হয়ে গেল, খাওয়া-দাওয়াও তেমন রেস্ট্রিক্ট করতে খারাপ লাগল বুঝলি? খালি পেটে কি আর পড়া হয়! দেখা যাক এরপর।

এরপর জয়েন্ট আছে। না যদি দেয় তো এ-কলেজ সে-কলেজে অ্যাডমিশন টেস্ট আছে। তখনও তোর মায়ের প্রাণ খুঁতখুঁত করবে। ও আর হতে হচ্ছে না। ধাতই ওইরকম। বাপের ধাত পেয়েছে। ঠাকুমাও অমনি নোদলগোদল ছিলেন।

রত্নমালা, সঙ্ঘমিত্রা দু'জনেই এসেছেন। এঁরা বেশ একটু সিনিয়র। তার ওপরে রত্নমালা পটনার মেয়ে।

সঙ্ঘমিত্রা সাদা চিকনের শাড়ি পরে এসেছেন। গলায় শাঁখের মালা, কপালে চন্দনের টিপ।

মধুক্ষরা বললেন—হ্যাঁগো সঙ্ঘমিত্রাদি, এমন 'যোগিনী হইয়া যাব সেই দেশে' কেন গো?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সঙ্ঘমিত্রা বললেন—বলেছিস ভাল। আমার রত্নটিকে তো আর জানো না। তাঁর রেজাল্টও বেরোবে আমিও গৃহত্যাগ করব।

তারপর এখন কোথায় কী ফিল্ম চলছে, কোনটা কোনটা দেখা হল না। নিজেদের পরীক্ষায়ও স্যাক্রিফাইস। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায়ও স্যাক্রিফাইস! সকলেই খুব ক্ষুব্ধ। মেয়েদের জীবনে স্যাক্রিফাইসের আর শেষ নেই।

হ্যাঁ কার্জন ছেলেটির মনমেজাজ উড়ুউড়ু—যশো বললেন।

রত্নমালাকে এঁরা চেনেন না। তিনি এক পা এগিয়ে এসে উঠলেন কার মন উড়ুউড়ু নয় ভাই, আপনি কার মা? উন্নির! সে তো ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে। মানে উড়েই আছে।

ইনি কে হলেন? যশো একটু যেন অসন্তুষ্ট।

সঙ্ঘমিত্রা বললেন—ইনি হলেন বিন্দুবাসিনী। আমার বড় জা।

বিন্দুবাসিনী নাম?—স্লিভলেস ব্লাউজ পরা টাঙাইল মোড়া ভদ্রমহিলাকে দেখতে দেখতে আশ্চর্য হয়ে যশো বলে।

তোর চিরকালই সেনস অব হিউমারটা কম—সঙ্ঘমিত্রা বললেন।

আমার ছেলে কার্জনকে দিদিই নিয়ে নিয়েছে। কার্জনের ভালমন্দ সব ওর ভাবনা।

তুমি ঝাড়া হাত-পা সঙ্ঘদি! মধুক্ষরা বললেন।

ঝাড়া হাত-পা কি আজকাল আর হওয়া যায় ভাই! এক একটা ছেলের নানান ফ্যাঁকড়া।

কার্জন না ক্যানিং সে যদি তোমার ছেলে হয় সঙ্ঘদি আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ও একটু ইনকনসিডারেট। একটু মানে গোলমেলে।

গোলমেলে কে নয়? ওদের পুরো জেনারেশনটাই প্রচণ্ড গোলমেলে।—রত্না বললেন—সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভাই কিছু মনে কোরো না, তোমার উন্নি অনেক বেশি গোলমেলে।

কে বলেছে উন্নি আমার?—যশো হেঁকে উঠলেন—আমার কোনও মেয়েফেয়ে নেই।

তার মানে তুমি নিজে মেয়ে হয়ে অ্যান্টি-মেয়ে? রত্নার যেহেতু একটি কন্যা, তাঁরই গায়ে লেগেছে সবচেয়ে। তিনি হেঁকে বললেন।

অ্যান্টি-মেয়ে হতে যাব কেন? মেয়ে নেই এটা ফ্যাক্ট। আমার বোনেরই তো একটি মেয়ে। তাকে কি আমি নিজের মেয়ের মতো ভালবাসি না? বিন্দুবাসিনী হয়তো হতে পারিনি আপনার মতো। তবে হ্যাঁ অ্যান্টি-মেয়ে না হলেও আমি কিন্তু অ্যান্টি-উন্নি—তা বলে দিচ্ছি। ওরকম কাঠখোট্টা তেরিয়া মতো মেয়ে আমাদের পোষায় না। আমার মেয়ে হলে আমি ওর মলাট পালটে দিতুম।

মধুক্ষরা ভীষণ আহত হয়ে বললেন—দিদি, এবার ইনকনসিডারেট হচ্ছে কে? সেদিন উন্নি খবর না দিলে তোমার পাবলো অত তাড়াতাড়ি আসত। সঙ্গে করে কতক চাট্টি বন্ধুবান্ধবও এনেছিল। তারা কত কাজ করে দিল। অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

ইতিমধ্যে ঘণ্টা পড়ে গেছে দলে দলে ছেলেমেয়ে বেরিয়ে আসছে।

কী রে উন্নি? কী রকম হল?

এ প্লাস। তোর?

পাবলো বলল বি ফর বেঙ্গল। বল্লী, তোর?

বল্লী ঠোঁট উলটে বলল লেখার কথা লিখে দিয়েছি এখন কেমন হল, কী মার্কস হবে এসব ভাবতে যায় কোন হাঁদা। ছাড়।

পঙ্কজ বলল—বলবি না তাই বল। এই বান্ডল তোর কেমন হল?

মনমরা গলায় কার্জন দু'দিকে ঘাড় নাড়ল। তারপর সোজা জেঠিমার কাছে গিয়ে চোঁচা করে একটা পেল্লাই ডাবের জল খেয়ে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে চলে গেল। ডাইনে তাকাল না। বাঁয়ে তাকাল না।

আসলে এদের মধ্যে দু'জন পরীক্ষাটা দিতে হয় দিয়েছে। আনমনে। কী এমন হাতি-ঘোড়া আছে পরীক্ষায়? বসে গেলেই তো হল। তাদের মন পড়ে রয়েছে অন্য কোথা অন্য কোনওখানে। সকলেই জয়েন্টে বসছে। পাবলো বসছে না। কার্জন বসছে না। যদি বাই চান্স র‍্যাঙ্ক এসে যায় বাড়ি থেকে চাপাচাপি করবে সবাই। ও সিনেই তাই নেই ওরা। দু'জনের বাড়ির অন্তঃপুরে খুব গুমোট তাই। সঙ্ঘমিত্রার ধারণা রত্নমালার প্রশ্রয়েই এতটা বেড়েছে কার্জন। ভেতরে ভেতরে তাঁর একটা গোঁসা তৈরি হচ্ছে। নিজের মেয়েটিকে তো বেশ ইলেকট্রনিক্স পড়িয়ে কানাডা পাঠিয়ে দিয়েছ সেখানে সে সাহেব বিয়ে করেছে প্লাস করে খাচ্ছে। আমার ছেলেটির বেলায়—তাতে কী হয়েছে? সবাইকেই কি ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার হতে হবে!

কথাটা মনের মধ্যে গুলোচ্ছে, সঙ্ঘমিত্রা বলেই ফেললেন। রত্না শুনে অবাক এবং আহত।

দ্যাখ সঙ্ঘ, সংহিতা তোরই বেশি ন্যাওটা ছিল। তুইও জানিস, আমিও জানি কারও আদর তাকে তার সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি। সেই যে ক্লাস এইটে পড়তে ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলল, অর্জুনের মতো পাখির চোখটা ছাড়া আর কিছু দেখল না। কোনও দিন সেকেন্ড হয়েছে মেয়েটা?

ও, তার মানে বলতে চাইছ আমার ছেলেটা এলেবেলে। মাথা নেই। তাই তার কিস্যু হবে না—এটাই অবধারিত।

ডিফারেন্স! ডিফারেন্স!—ঠিকরে উঠলেন রত্নমালা, হাতের পাঁচটা আঙুল এক রকম হয় না কিন্তু প্রত্যেকটা ইমপর্ট্যান্ট। এক একটাকে দিয়ে এক এক রকম কাজ হয়। বুড়ো আঙুল লবডঙ্কা দেখায়। আজকাল অবশ্য ভিক্টরি দেখাচ্ছে। তর্জনী দিয়ে শাসানো হয়। মধ্যমা না থাকলে কিছু টিপে ধরে তোলা, অসাধ্য। অনামিকা আংটি পরে। আর ছোটটা? ধর কান সুড়সুড় করছে, কোন আঙুল

ঢোকাস? কড়েটাকেই তো! সরু গর্ত, কেউ ঢুকবে না। কড়ে ঠিক ঢুকে যাবে। মানুষ এইরকম আলাদা আলাদা।

তা তোমার কার্জনসুন্দর কোন কম্মে লাগবেন? তোমায় কিছু গুপ্ত কথা বলেছেন?

তা হয়তো বলেনি। কিন্তু আমি যদি প্রকৃত মা-জেঠিমা হই তা হলে ওর গুপ্ত হোক সুপ্ত হোক বাসনাটি ক্রমশ আমার কাছে প্রকাশ পাবেই।

ভাল। ওই আনন্দেই থাকো। সঙ্ঘমিত্রা কখনওই তাঁর এই পটনাই জায়ের সঙ্গে কথায় পেরে ওঠেন না। তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন।

জয়েন্ট এনট্রান্স শেষ হয়েছে। ঘোর গ্রীষ্ম। বল্লী মায়ের এসি রুমে গল্পের বই নিয়ে শুয়ে। পড়বার চেষ্টা করছে, ঘুম এসে অধিকার করছে তাকে, ঢুলে পড়ছে, আবার পড়ছে। এমন সময়ে সেলফোনটা বাজল। বল্লী সব সময়ে ফোন ধরে না। বাজছে বাজুক, বেজে যাক। তার এখন মুড নেই, কিন্তু ফোনটা চুপ করেই আবার বেজে উঠল। তুলে দেখে পাবলো।

পড়েছিস!

শনৈঃ শনৈঃ।

মানে?

মানে আস্তে আস্তে। হাতের লেখা খুব খারাপ তো!

ধুর অত ধরে ধরে লিখলুম! শচীনদেবের প্যারডি, কেমন?

হঠাৎ বল্লী সতর্ক হয়ে গেল। বলল হ্যাঁ যতদূর সাধ্য চেষ্টা করেছিস।

তোর কী মনে হচ্ছে, হবে?

সেটা নির্ভর করছে টোট্যাল এফেক্টটার ওপর। তুই কি সিরিয়াস?

তবে? আরে ইয়ার! এই জন্যেই তো তৈরি পাবলো।

পিকাসো না নেরুদা?

কিছুটা এ কিছুটা ও! সুরটা এক্সট্রা। —সুররিয়্যালিজম্। বুঝতেই তো পারছিস?

হুঁ।

ঝেড়ে কাশ না। ঢোঁক গিলছিস কেন?

বলছি তো টোট্যাল এফেক্টটার ওপর নির্ভর করছে। এখন বিরক্ত করিস না। ঘুম আসছে। ছাড়ি।

পাবলো দেখল মিসড্ কল তার ফোনে। পরে করবে ভাবছে আবার ফোনটা বেজে উঠল। ভারী ভাঙা গলা ওধার থেকে—পাবলো আমার বান্ডিলটা দিয়ে দে প্লিজ। সারাজীবন তোর ক্রীতদাস হয়ে থাকব। যা বলবি তাই করব। পাবলো! পাবলো!

কতবার তোকে বলব তোর বান্ডল্ আমি নিইনি। নিইনি নিইনি।

বললেই তো হবে না পাবলো কনভিন্সিং হতে হবে। তুই সবচেয়ে বিচ্ছু। পাহাড়ি বিচ্ছু একেবারে। দ্যাখ তোর সুযোগ ছিল। ইচ্ছে ছিল, মোডাস অপারেন্ডাই...পাবলো-পাবলো। প্লিজ আমি তোকে কিচ্ছু বলব না। হ্যাভ পিটি অন মি।

আরে, আরে থাম তো জরা। বকেই যাচ্ছিস, বকেই যাচ্ছিস। কীসের সুযোগ?

আরে ভাই, বান্ডিলটা বল্লীর টেবিলে রেখেছিলুম, ক্লোজেস্ট বসেছিলি তুই। একটু দূরে পঙ্কজ। সারাক্ষণ তোর নজর ছিল বান্ডিলটার দিকে। ওটাকে মিসাইল বললি, আরও কত কী বললি!

ইচ্ছেটা হবে কেন? মোটিভটা কীসের?

জাস্ট একটা প্র্যাঙ্ক।

প্র্যাঙ্কের পক্ষে সময়টা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? তুই আজ দু'মাস ধরে বান্ডুল বান্ডুল করে যাচ্ছিস। এতদিন ধরে তোকে ল্যাজে খেলানোর কী মানে? মোডাস অপারেন্ডাটাই বা কীরকম?

কেন? তোর কার্যকলাপ সব কেমন চুপিসাড়ে, তুই সিক্রেটিভ আছিস। তোর ডান হাত একটা কাজ করলে বাঁ হাত জানবে না।

বা বা বা? চমৎকার অ্যাসেসমেন্ট তোর। সব্বাইকে জিজ্ঞেস কর কার্জন, আমার মতো ফ্র্যাঙ্ক, খোলামেলা ছেলে আর একটাও ধারেকাছে নেই। তুই-ই কি কম সিক্রেটিভ না কি? কী ছিল তোর ওই রোল করা পেপার্সটাতে। সেটা তো বলছিস না। এটা বুঝি সিক্রেটিভনেস হল না?

তুই তো জানিসই।

জানি? বা বা বা। গেস করতে পারি। কারও কাছ থেকে লভ-লেটার পেয়েছিস—

ধুর। কে আমাকে লভ-লেটার দেবে তোরা থাকতে?

তবে কোনও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের চ্যাপটারের জেরক্স!

সে তো পরীক্ষা ওভার। চুকেই গেছে তা হলে। এখনও খোঁজ করে আমার লাভ?

তা হলে...তা হলে...

বল কী তা হলে? তুই নিশ্চয় জানিস, বলছিস না। পাছে আমি ধরে ফেলি। চালাক কম না কি?

অনেস্টলি কার্জন, আমি তোর বান্ডল্ নিইনি।

তা হলে কে নিয়েছে? বার কর, তোর ব্রেন আছে গোয়েন্দাগিরি কর, বন্ধুর একটা উপকার।

ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি ভাবব। তুই শিয়োর যে ওটা পকেটে করে নিয়ে যাসনি? রাস্তায় পড়ে গিয়ে থাকতে পারে!

না। আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছি। দেখি দুই পি হাওয়া, বল্লী একা বসে সুডোকু খেলছে।

ঠিক হ্যায় কার্জন, জাসুসি করুঙ্গা তেরে বান্ডুলকে লিয়ে। খুশ?

আর খুশ!

যশোধরা আর মধুক্ষরা কারও কথা শোনেনি। সোজা দার্জিলিং চলে এসেছে। স্বামীদের নিরুৎসাহ দেখে, স্রেফ ছেলেমেয়েদের বলল—ভোটাধিকার হয়ে গেল, সংসার সামলাতে শেখো। কবে যে তারা হোটেল বুক করেছে, কাকে দিয়ে যে কাঞ্চনজঙ্ঘার টিকিট কাটাল কেউ বোঝেনি। তবে দীর্ঘ দিনের রুদ্ধদ্বার বৈঠকেরই ফল এসব বোঝাই যাচ্ছে। পাবলো এবং শম্পি আকাশ থেকে পড়েছিল।

সংসার সামলানো মানে? দু'জনেই চলে যাচ্ছ? বাঃ চমৎকার। হলিডের দরকার তো আমাদের। আমরাই পরীক্ষা দিয়ে উঠলুম, শম্পি বলে।

হ্যাঁ, সব দরকারই তো তোমাদের। গিন্নিদের মায়েদের আর কোনও দরকার অধিকার থাকতে নেই। ও-সব আমরা জানি।

কিন্তু মানছ না—এই তো! পাবলো বলে—ঠিক আছে। কিন্তু আমরা আমাদের মতো চালাব। সেখানে কোনও রিমোট কন্ট্রোল চলবে না।

হুঁ, রিমোট কন্ট্রোল। যশো হাসে, দড়িদড়া ছিঁড়ে চলে যাচ্ছি। কোনও পিছটান রাখছি না। তবে সার কথাটি শুনে রেখো, সুহৃৎবরণ আর মিহিরকিরণ খেটেখুটে এসে যেন শোবার বিছানা, চানের জল, খাবার-দাবার পায়। এই খবরটি রাখব।

দুঃখের বিষয় কাঞ্চনজঙ্ঘার এসি টু-তে বহু পরিচিতর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মিনি, তাঁর স্বামী বিজেনদা প্রথমেই।

এ কী মিনি? তোরা যাচ্ছিস জানতুম না তো!

নেমে যাবি ভাবছিস নাকি!

কী যে বলিস! তা মধুবন কই?

সে-ও বেড়াতে গেছে।

বন্ধুদের সঙ্গে?

উঁ। তারা দু'ভাইবোন গেছে পরিদের গাঁয়ে। ঋজু কী সব পেপার করছে। পরিদের গ্রাম টার্গেট। ঝুলোঝুলি করে মধুবনও গেছে। আমরা ফ্রি।

পরি কে? জলপরি না স্থলপরি।

ও আমাদের কাজের মেয়ে। মুড়কিশোলা বলে একটা গ্রামে থাকে।

বলো কী! অমনি পাঠিয়ে দিলে! যদি অ্যাবডাক্ট হয়ে যায়! মধু বলল।

দেব না কেন? বড় হয়েছে, নিজেরা ঘুরুক ফিরুক দেখুক শুনুক।

বিজেন বললেন—আরে ভাবছেন কেন! আমাদের রুস্তম হয়েছে সঙ্গে। পরি মেয়েটাও খুব রেসপন্সিবল্।

আর আপনাদের চৌকি?

তাকে কেনেলে দিয়েছি। সে-ও হলিডে কাটাচ্ছে।

ট্রেন ছাড়তেই ওদিক থেকে একটি উল্লসিত পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল—আরে যশো না! মধুও তো রয়েচিস!

সামনে এগিয়ে আসছে ব্যাঙাদা। মাথা-ভরতি পাকা চুল। দাড়িফাড়ি কামায়নি, আজকাল এই এক ফ্যাশন হয়েছে।

ওগো এদিকে শুনে যাও একবার—গলা ছেড়ে ডাকলেন ব্যাঙাদা। ওদিক থেকে একটি পুতুল-পুতুল সুন্দরী মহিলা উঠে এলেন।

আলাপ করো। এই হল যশোধরা ব্যানার্জি—একসময় দারুণ নাচত। আমাদের হার্টথ্রব ছিল। আর এই ওর বোন মধুক্ষরা—মধুর মতোই গলা ছিল, আহা। সিরিয়াস হলে আজ অনেকের ভাত মারতে পারত। যশো দেখ—এই হল তোদের শান্টুবউদি। ফিগার দেখছিস তো। শ্যামা সাজে। চিত্তপ্রসাদের ট্রুপে।

আহ্ তোমার যত্ত—শান্টুবউদি বলে উঠলেন।

ভালই হল। তোরাও দার্জিলিং আমরাও।

হেঁ হেঁ—যশোর মুখে এর চেয়ে বেশি কথা জোগাল না।

চলে যেতে নিচু গলায় মধু বলল—তুমি যাও দুর্জয়লিঙ্গে ব্যাঙা যায় সঙ্গে।

তুই চুপ কর। ব্যাঙার বেঙিটিকে দেখলি।

হুঁ, চালু মাল। কত তফাত হবে বল তো বয়সের?

বছর কুড়ি বলে মনে হচ্ছে, তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। চুলটা পরচুলো।

সে কী রে? কী করে বুঝলি?

নাট্যশালা, বুঝলি না! দ্যাখ না কত রকম চুলের কায়দা বেরোবে। অন্তত তিন-চারখানা উইগ নিয়ে এসেছে।

তার মানে কি ন্যাড়া? না টাক?

ভগবান জানেন, ক্রমশ প্রকাশ্য।

যাই বল দিদি। তুই একটু বেশি ক্রিটিক্যাল, রাইভ্যাল তো! হিংসে হয়েছে!

হুঃ হিংসে। হিংসে! হিংসে করার আর লোক পেল না যশো।

জলপাইগুড়িতে নামতে দেখা গেল স-শাশুড়ি পঙ্কজের বাবা বিনোদ ও মা সন্তোষ হাজির। এঁদের যশোরা চিনত না। কিন্তু ওঁরা কোন ছবিতে এঁদের দেখেছিলেন। তাতেই চিনে গেলেন। কী ছবি? না 'রোজগেরে গিন্নি'। তাতে যশো, মধু, তাদের ছেলেমেয়ে (প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও) উপস্থিত ছিল। খুবই উৎসাহ নিয়ে যশোর নাচ দেখেছিলেন ওঁরা। যশোর নাচ, মধুর গান।

সঙ্ঘমিত্রও নামলেন স-স্বামী।

তুমিও?

অসুবিধে হল? সঙ্ঘমিত্রা হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

ছেলে?

বাড়িতে আছে। জ্যাঠাইমার তত্ত্বাবধানে। আমরা কেটে পড়েছি।

পড়ে যশো তার বোনকে বলে—সঙ্ঘদির হাসিটা কীরকম গা-জ্বালানি দেখলি?

মধু আবারও বলে—আমি তো তেমন কিছু দেখলুম না। তুমি একটু বেশি ক্রিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছ দিদি।

যাক ভাল ওদের হোটেলে অন্তত কেউ ওঠেনি। কোনও চেনা মুখ না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দু'জনে দুটো চেয়ারে কাত হল।

যশো বলে—কী মজা হাঃ হাঃ হাঃ।

মধু বলে—শেষ পর্যন্ত ফিরি। যা হালকা লাগছে। যেন দু'মনি বোঝা চেপেছিল ঘাড়ে। অমন জানলে কে বিয়ে-থা করত?

যশো বলল—বাবার যা ছিল দু'বোনের হেসেখেলে চলে যেত, বল। আজ দার্জিলিং, কাল গোয়া...

মধু বলল—পরশু সিঙ্গাপুর তরশু ইউরোপ। সত্যি এই সংসারের ঝক্কি ঝামেলা...

এই রে! হঠাৎ যশো তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

কী হল?

চাবিটা আলমারিতে ঝুলিয়ে এসেছি।

তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। লোকজন আসার আগে পাবলো দেখে ফেলবে এখন।

ওইখানেই তো ভয়! ও ছেলে যে কী হাপিস করবে আর কী করবে না—বন্ধুবান্ধব মিলে...

মধু বলল—ইসস্ আমিও তো একটা মহা ভুল করে ফেলেছি!

কী?

মিহিরের ব্লাড সুগার এসেছে। খাওয়া-দাওয়ার রেসট্রিকশন করতে বলেছে। আমি তো শম্পিকে কিচ্ছু বলে আসিনি! এমনকী মিহির নিজেও জানে না।

তা হলে তো ফোন করতে হয়।

দু'জনেই ফোনে অনেকক্ষণ টেপাটেপি করেও কোনও কল পেল না। সমানে বলে যাচ্ছে—সুইচড্ অফ্, সুইচড্ অফ্।

আসলে কী জানিস তো। ওই যে বলল রিমোট কন্ট্রোল চলবে না, তাই বোধহয় বন্ধ করে রেখেছে।

তাই বলে একটা পৌঁছোনোর সংবাদ দেব সে প্রভিশন রাখবে না। তা ছাড়া মোবাইল অফ করে রাখলে ওদের চলবে? হাজার গন্ডা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গুলতানিটা হবে কী করে?

ল্যান্ডফোনও দেখা গেল পিঁ পিঁ করছে। রাত্তিরে অবশেষে ডক্টর সুবল মিত্রর বাড়ি ফোন গেল—

মিসেস সুবল ধরেছেন।—বউদি আমি যশোধরা বলছি, আমাদের বাড়ির কোনও ফোন কাজ করছে না। একটা মেসেজ দিয়ে দেবেন? কিছু না পাবলো বা শম্পি যাকে হোক। ওদের বাবাদের হলেও কোনও ক্ষতি নেই। জাস্ট বলে দেবেন, পাবলো যেন আলমারি বিষয়ে সাবধান হয় আর শম্পি যেন বাবাকে সুগার-ফ্রি ডায়েট দেয়।

এতক্ষণে ডাক্তার-গিন্নি কথা বললেন—কিন্তু মেসেজটা দেবে কে? গম্ভীর গলা।

কেন? মানে...

মানে আমাদের তো সন্তানদি নেই। আমি নিজেও ব্যস্ত। মেট্রন হয়ে গেছি। ডিউটি নিয়ে জেরবার।

কেন? মানে ডাক্তারবাবু!

উনি তো দার্জিলিং-এ বেড়াতে গেছেন।

অ্যাঁ?

আপনি কোত্থেকে বলছেন?

যশো ততক্ষণে ফ্যাকাশে হয়ে ফোন রেখে দিয়েছে।—সব্বোনাশ!

কী হল? মধুক্ষরা বলল।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। সুবলদা তোর পেছন পেছন এখানে ধাওয়া করেছে।

সুবলদা? এখানে? তাতে আশ্চর্যের কী আছে! আসতেই পারে।

বেছে বেছে এখানেই আসতে হবে! দিঘা ছিল, পুরী ছিল, মিরিক, কালিম্পং, কার্শিয়ং সবই তো ছিল। লাভা লোলেগাঁও যেতে পারত। সিকিম, ভুটান সব তো হাতের কাছে আয় আয় করে ডাকছে। আসলে তুই, মধু যেখানে সুবল ভ্রমর সেখানেই তো আসবে!

দ্যাখ দিদি, বাড়াবাড়ি করছিস। মধুক্ষরা ভারী বিরক্ত হয়ে বলে—দার্জিলিংটাই গরমে লোকের আগে মনে পড়ে। আমরাও যে কারণে এসেছি সুবলদাও...

না রে মধু, ভোলাটাকে টিকিট করতে দিয়েছিলুম। ও ব্যাটা বোধহয় সুবলদারও এজেন্ট। এজেন্ট মারফত জেনে গেছে। ওখানে তো বউ বাঘিনির মতো বসে আছে।

তো কী? কী করবে? কী করবেটা কী শুনি!—মধুক্ষরা একেবারে রণং দেহি মূর্তিতে ধেয়ে এল।

যশো তার মূর্তি দেখে আপস করতে বাধ্য হয়। ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে। সুবলদা এমনি এমনি এসেছে। একেবারে এমনি এমনি। আমরা যেমন এমনি এমনি হরলিক্স খাই।

এরপর দুই বোন আরও কয়েক বারের চেষ্টায় ল্যান্ডফোনটা পেয়ে যায়। ধরেছেন মিহিরকিরণ।

কী হল! ল্যান্ডফোনটা তো খারাপ ছিল, এত তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে গেল?

কে বললে খারাপ হয়েছিল। রিসিভারটা ঠিক করে ক্রেডলে রাখেনি সব। এমন একেকখানি উদোমাদা ছেলেমেয়ে তৈরি করেছ! ভালভাবে পৌঁছেছ তো?

সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ফার্স্ট থিং তোমার জন্যে বড্ড চিন্তায় আছি!

আমার জন্যে? মধু ডিয়ার, সে তো বিয়ের আগে আগে থাকতে। এখন...

বাজে কথা বোলো না। আজ কী খেয়েছ?

তা ভালই ব্যবস্থা তোমার মেয়ের। ময়রার দোকান উঠিয়ে এনেছে। অফিস থেকে ফিরে মিষ্টিযোগ—রসগোল্লা, বালুসাই, ক্ষীরমোহন যা যা ভালবাসি।

অ্যাঁ?

তারপরে শোনো না। রাতে আজ এত গরমে প্রাণটা ভাতের জন্যে আইঢাই করছিল। বেশ করে ভাত দিয়ে চিংড়িমাছের মালাইকারি, শেষ পাতে রাবড়ি।

উ হু হু, চুপ করো চুপ করো।

কেন?

তোমার ব্লাড সুগার। বলা হয়নি। সে দিন ব্লাড টেস্ট হল না?

তাতে কী হল?

তাতে সুগার এসেছে। দুশোর কাছাকাছি। এক বেলা এক কাপের বেশি ভাত খাবে না। মিষ্টি নো। চায়ে স্যাকারিন। শম্পিকে দাও।

শম্পিকে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে মধুক্ষরা টেলিফোনটি রেখে দিলেন।

প্ল্যাটফর্মহীন এক শূন্য মাঠে একটা নড়বড়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেন এসে দাঁড়াল। ব্যাকপ্যাক নিয়ে নামল তিন মক্কেল। মধুবন তার দাদা ঋজুরুস্তম এবং জিনপরি বা শুধু পরি। পরিরও ব্যাকপ্যাক, মধুবন গুছিয়ে দিয়েছে—নতুন জামা, জাঙিয়া, প্যান্ট, টি-শার্ট, পুরনো সালোয়ার কামিজ, ধারের দিকে ছোট

করা। মধুবন ক্রমশই আড়ে বেড়েছে, তার সালোয়ার কামিজগুলো নানান স্টেজে পরিত্যক্ত হয়েছে। সেই বিভিন্ন স্টেজের সালোয়ার কামিজ প্রায় নতুন। এই প্রায়-নতুন সালোয়ার কামিজের এবং শাড়ির একটি অতিকায় বান্ডিল ঝুলছে পরির হাত থেকে। আরও কী কী আছে এদের হাতেনাতে সে সব ক্রমশ প্রকাশ্য বলে মনে হয়।

কিন্তু আপাতত টাকপড়া এক এবড়ো খেবড়ো মাঠ। একদিকে এক চিলতে স্টেশন ঘর-টিকিট কাউন্টার, একখানা টিনের বেঞ্চ, তার ওপরে ছায়া করে রেখেছে বিরাট এক শিরীষ গাছ। টিনের বেঞ্চিটি পক্ষীবিষ্ঠায় ভরতি। অদূরে একটি টিউবওয়েল। আশ্চর্যের বিষয় ওরা তিনজন ছাড়া আর কেউ এখানে নামল না। বিকেল প্রায় শেষ। ঘষা কাচের মতো আকাশ, যেন ঘষা কাচের দেয়াল। বোঝাই যাচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাসদের না বেরোতে দেবার মতলবে আকাশ এই ব্যবস্থা করেছে।

ঋজুরুস্তম পাঁচ এগারো লম্বা। রং ফরসা। মুখচোখ কেমন, তার চেয়ে আগে চোখে পড়ে তার ক্ষুরধার বুদ্ধি। চার দিকে চোখ। কোনও কিছু দেখলেই যেন সেটা তিরের মতো বিঁধে ফেলবে চোখ দিয়ে। তার পরনে খাকি রঙের ডেনিম, ছাপা কুর্তা গায়ে। চোখে গাঁধীচশমা, বাঁ হাতে মোটা রুপোলি ধাতুর ব্যান্ডসুদ্ধু গাবদা ঘড়ি। তার নাম ঋজু, মাথার চুলও ঋজু, অর্থাৎ খাড়া খাড়া। আজকাল চুল শজারুর কাঁটা করবার একটা ফ্যাশন এসেছে। তা কোনও লোশন, স্প্রে, কোনও কায়দা ছাড়াই ঋজুর চুল এমনই। বর্তমান ফ্যাশনের সঙ্গে মানিয়ে যাওয়ায় প্রথম দর্শনেই ঋজুরুস্তম খুব সমীহ পায়। অনেকে মনে করে ঋজু শিগগিরই মডেলিংয়ে নামবে। তার চলাফেরা, টুক করে লাফিয়ে খানা-খন্দ পার হওয়া, হেলান দিয়ে দাঁড়ানো দুটো পা ক্রস করে, অপাঙ্গে তাকানো, কখনও হেলেদুলে কখনও সোজা হেঁটে আসা—সবই মডেলোপম। তাকে পারতপক্ষে কিছুই শিখতে হবে না। নামটিও অনুকূল। শুধু পদবিটা বর্জন করলেই ঋজুরুস্তম একটা দারুণ শো ম্যান নাম।

কিন্তু হায়!

এ জগতে হায় সে-ই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি। ঋজু আরও চায়। সে কেন আরও চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হল না, এর জন্যে সে মনে মনে তার বেঁটে বাবাকে দোষ দেয়। কেন তার গায়ের রং আর একটু কালো হল না। এর জন্যে সে সোজাসুজি তার মাকে দোষ দেয়। কেন তার আরও বুদ্ধি হল না, এর জন্যে সে কলঘরে তার চোদ্দোপুরুষকেই গালাগালি করে। সে খুব খু-উ-ব একজন বিশেষ মানুষ হতে চায়। এইচ এস-এর পর সে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বলে একটা বিষয় পড়তে ক্যানবেরা ইউনিভার্সিটিতে চলে যায়। সেখানে পি এইচ ডি করবার আহ্বান নিয়ে সে বিষয় বেছেছে ভারত/প ব। ফিরে এসেছে এবং কাজ করছে। কখন সে যে কোথায় থাকে, কোথায় থাকে না, বলা মুশকিল। তবে এবারে পরির সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েছে এবং পরিদের 'গেরাম' যে তার গবেষণাপত্রের জন্য 'স্বপ্নস্থান' সেটা বুঝতে পেরে সে তুরন্ত এদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে।

মধুবন ৫'২" এবং একটি গোল মাখনের ডেলা। তার ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিকস্ ৪২-৪২-৪৮। সে অনেক কষ্টে অধ্যবসায়ে একটু নেমেছিল। কিন্তু আই এস সি পরীক্ষা দিতে গিয়ে মায়ের আদরে একটু বেশি খেয়ে ফেলে আবার আগের জায়গায় ফিরে গেছে। মধুবনের রং খুবই ফরসা। তাতে একটু হলুদ আভা আছে—তাইতে মাখনের ডেলার সঙ্গে তার তুলনাটা আরও যথাযথ মনে হয়। তার চুল বব-ছাঁট। মুখশ্রী খুব কাটাকাটা, সুন্দর কিন্তু সবই মাখনে ডোবানো। মধুবন একটা পাতলা কাপড়ের গোলাপি ঢোলা প্যান্ট বা পাতলুন আর সাদার ওপর গোলাপি ছাপা টপ পরেছে। তার পায়ে ড. শূলজ্-এর ডিজাইনের জুতো। পরি, যাকে এরা ভাইবোনে মাঝে মাঝেই জিনপরি বলে ডেকে থাকে সে একটি এ কাটের ম্যাগিয়া হাতা ফ্রক পরেছে। ৫'২" লম্বা। ভীষণ রোগা ছিল। কিন্তু মাস তিনেক খাওয়া-দাওয়া করেই তার চেহারা ফিরে গেছে। সে যে নেহাত খুকিটি নয়, মধুবনের চেয়ে ছোট মোটেই নয়, সেটা বোঝা যাচ্ছে। তার চুল সে বিনুনি করে সযত্নে কাঁটা দিয়ে খোঁপা করে রেখেছে। রং ময়লা কিন্তু তাতে এখন নগুরে চাকচিক্য। মুখচোখগুলো ফুটে বেরিয়েছে। দেখা

যাচ্ছে সে বেশ চটপটে চালাককতুর চটকদার একটি কিশোরী যার বাস্তব অভিজ্ঞতা বাকি দু'জনের থেকে অনেক বেশি। জায়গাটা তার নিজের। কাজেই তার স্মার্টনেসও এখন বেশ বেড়ে গেছে।

শিরীষগাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মধুবন, গরম মতো কী তার মাথায় পড়ল।

এ মা দিদি গো। তোমার মাথায় যে কাগে হেগে দিল। গাছের তলায় দাঁড়াতে আছে?

মধুবন ভ্যাটকা মুখে উবু হয়ে বসে এবং পরি গাছের পাতা, তার নিজের রুমাল (তার অনেক রুমাল, বেশিরভাগই নিজের হাতে এমব্রয়ডারি করা) দিয়ে—টিউকলের জল ব্যবহার করে মধুবনের মাথা পরিষ্কার করে দেয়।

তুই আবার হ-য়ে একার গ-এ একার বললি? মধুবন বিরক্ত মুখে বলল।

কাগের ইয়েকেও কি পটি বলতে হবে নাকি? হিহি।

ওহ্ তোকে নিয়ে আর পারা যায় না।

ইতিমধ্যে ঋজুরুস্তম বেশ খানিকটা তত্ত্বতালাশ করে এসেছে। টিকিট কাউন্টার থেকে জেনেছে, একটা ভ্যান গাড়ি খারাপ। আর একটা এক্ষুনি মাল নিয়ে গেছে। গো-গাড়ি আগে থেকে বলা না থাকলে পাওয়া যাবে না। অতএব আজ মুড়কিশোলা পৌঁছোতে হলে হন্টন। তিন-চার ক্রোশ হবে। টিকিটের ঘর থেকে বলেছে।

তিন ক্রোশ মানে তিন হাজার হাত গুনে নিয়ে রুস্তম হাঁটা দিল। তার সামনে-পেছনে পরি আর মধুবন। হাঁটছে তো হাঁটছেই। হাঁটছে তো হাঁটছেই। হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে...। হাঁটছে তো হাঁটছেই।

মধুবন বলল একেই কি বলে তেপান্তরের মাঠ?

কেউ জবাব দিল না। সবাইকারই ভেতরটা গরম হয়ে উঠেছে। মাঠের মধ্যে যদি ঘাস থাকত, গাছপালা থাকত তা হলে হাঁটার একটা মানে হত। কিন্তু এ-মাঠে ঘাসটাস নেই। গাছ আছে ছোট বড় দূর দূর। কিছুক্ষণ পর মধুবন বলল একেই বোধহয় ডেজার্ট বলে। মরুভূমি।

কেউ জবাব দিল না। পরি আগে আগে হাঁটছে। এই দিক-দিশাহীন মাঠে সে-ই একমাত্র ঠিকানা-অলা লোক, সে-ই সেথো, দিশারি। একটা আলাদা দায়িত্ববোধ এসেছে তার চলাফেরায়। একটা বেশ কর্তৃত্বের ভঙ্গি হাঁটাচলায়। শহুরে দাদা-দিদিকে সে নিজের গেরাম দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। সোজা কথা! সোজা দায়িত্ব?

কিছুক্ষণ পর মধুবন বলল—এরই নাম কি কান্তার? দুর্গমগিরি কান্তার মরু...। কেউ কোনও জবাব দিল না।

জবাব দিচ্ছিস না যে বড়? এবার সে রেগে গেছে।

কিছু বললি?—রুস্তম বলল।

ভালই শুনতে পাচ্ছিস।

তুই আগে ঠিক কর তেপান্তর না মরুভূমি না কান্তার। অতগুলো জবাব একসঙ্গে দেওয়া যায়? যাই হোক তুই যে কথা বলার অবস্থায় আছিস এই-ই যথেষ্ট। ক্রোশ বলতে এরা কী বোঝায় সেটা আমায় জানতে হবে।

সামনে থেকে পরি মুখ ফিরিয়ে বলল—পা চালিয়ে দাদা-দিদি, সন্ধে হয়ে গেলে মহা মুশকিল হবে—এখানে তো আর রাস্তায় আলো নেই।

আমার কাছে পাঁচ সেলের টর্চ আছে—সংক্ষেপে বলল রুস্তম। এবং বলা নেই কওয়া নেই মধুবন হঠাৎ নদগদ করতে করতে ছুটতে লাগল।

এ কী রে বাবা, মাথা খারাপ হয়ে গেল, নাকি? রুস্তম আপন মনেই বলে।

পরি বলল—সন্ধে নামার কথায় দিদি ঘাবড়ে গেছে। কিন্তু একটু ছোটাই বোধহয় এখন ভাল।

হঠাৎ ঘষা কাচের মতো আকাশটা ঘষা বেগুনি হয়ে গেল এবং অদূরে সূর্যটি টুপ করে ডুবে গেল। শুকনো মাঠে এখনও এ-দিক ও-দিক আলো ছড়িয়ে রয়েছে। তার প্রকৃতি অদ্ভুত, ভৌতিক।

পরি বলল—একে আমরা বলি সুযযি-ডোবা-আলো। পা চালিয়ে দাদা।

রুস্তমকে টর্চ বার করতে হল। মধুবনও একটা টর্চ বার করল। একজন রাস্তার দিকে আলো ফেলছে আর একজন চোখের সোজা। কিন্তু অন্ধকারকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা গেল না। হুড়ুম করে লাফিয়ে পড়ল মাঠভরতি অন্ধকার। এমনই নিকষ যেন নিরেট দেয়াল। একমাত্র ভরসা আকাশে একটি-দুটি তারা ফুটিফুটি করছে।

উই যে গেরাম।—মধুবন তিন বার ঠোক্কর খাবার পর পরির গলায় উল্লাস শোনা গেল।

অনেক দূরে টিমটিম করে কিছু চলন্ত আলো। শুধু আলোই, জোনাকির মতো। সে আলোয় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে কী আছে, কারা আলোকধারী। কিছুই না।

রুস্তম বলল—এদের ফর্ম আছে তো রে!

মধুবন বলল—খবরদার ভয় দেখাবি না দাদা।

মাঠের মধ্যে দিয়ে পরি এবার ছুটতে লাগল—ও বাবা! ও মা! আমি পরি এইচি গো! আলো দেখাও শিগগিরই।

মুখের দু'পাশে হাত জড়ো করে পরি চেঁচাচ্ছে, কিন্তু তেপান্তরের মাঠ সর্বস্ব গিলে নিচ্ছে। অন্তত অন্য দু'জনের তাই মনে হল।

মধুবন এবার বসে পড়ল—আমি আর পারছি না। কেউ আলো নিয়ে আসুক তবে উঠব।

পরি চেঁচিয়েই যাচ্ছে। সে প্রস্তাব দিয়েছিল এগিয়ে গিয়ে লোক ডেকে আনবে। কিন্তু মধুবন তাকে যেতে দেয়নি—চালাকি পেয়েছিস না? তারপর নিজের লোকেদের কাছে যাবি আর আমাদের কথা বেমালুম ভুলে যাবি। ও সব চলবে না। কবে তোকে কখন বকাঝকা করেছি এমনি করে তার শোধ নিচ্ছিস? গদ্দার কোথাকার!

পরি আর দ্বিতীয়বার ও প্রস্তাব করেনি। তবে দু'-দুটো টর্চ জ্বেলে নিবিয়ে জ্বেলে নিবিয়ে ওরা বারবার জানান দিয়েছে যে, এখানে মনুষ্য আছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে গোটা দুই কঙ্কালসার লোক অন্ধকারের মধ্যে আরও এক পোঁচ অন্ধকারের কাঠি হয়ে এগিয়ে এল। রুস্তম বলল—আনন্দমঠ।

কে?

আমি গো! পরি! সঙ্গে আমার দাদা দিদি। যেনাদের বাড়ি আমি কাজ করি।

আবার দাদা দিদি। একজন লোক ব্যাজার হয়ে বলল।

অন্যজন বলল—আপনি পায় না খেতে শংকরাকে ডাকে।

রুস্তম বলল—যা ব্বাবা!

পরি বলল—কী বাজে কথা বলছ! দাদা দিদির বাড়ি ফ্রিজ-ভরতি খাবার। ওরা কি তোমাদের এখানে খেতে এয়েচে নাকি! সনাতন কাকা, আমার মান রেকে কথা বোলো। এখন আমি রোজগেরে মনিষ্যি, যে সে নেই আর।

হাতমুখ নেড়ে নেড়ে পরি ইত্যাকারে সব বলবার পর লোক দুটি বলল—তা আসেন।

মধুবন গোমড়া মুখে বলল—রাতটা কোনওমতে কাটিয়ে কালই আমরা ফিরে যাব দাদা।

সে দেখা যাবে—দাদার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

গেরামে যখন ওরা পা দিল যে যেখানে আছে সব একধার থেকে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে সারে সারে কঙ্কাল।

পরির বাবা জনার্দন মাজি এগিয়ে এসে বলল—একটা পোস্টোকার্ড তো লিকে দিবি!

দিয়েচি তো! পাওনি!

কোতায়!

পরি বলল—দাঁড়াও আমি ব্যবস্থা করছি। আগে একটু জল দাও ওদের। কতটা পথ হেঁটে এসেচে জানো তো!

রুস্তমের ব্যাগ থেকে প্লাস্টিকের মগ বেরিয়ে এল। সে বলল—টিউবওয়েল কোথায়? আমি ভরে নিচ্ছি।

টিউকল ঢনঢন করচে—জনার্দন জবাব দিল—কুয়োর ঠেঙে জল দিচ্চি—আসেন।

এদিকে পাবলোদের বাড়িতে জোর জলসা জমেছে। উলটোনা হাঁড়ি বাজাচ্ছে পঙ্কজ ধুধুরিয়া। স্প্যানিশ গিটার হাতে ট্যাং ট্যাং আওয়াজ তুলে গাইছে পাবলো।

গরমেতে হাঁসফাঁস করবি?
না জলে ডুবে মরবি?
তার চেয়ে শীতে জমে শিলালিপি-ই-ই
নর্থ পোল গলে আসা হিজিবিজি হিবিজিপি-ই
সুনামির জল রোজ বাড়ছে
কোল থেকে কালো জমি কাড়ছে
তার চেয়ে এই বেলা জমি-জমা নদী-টদি নালা-টালা ছেলেপুলে
বেচে-বুচে টাকাকড়ি বুঝে নিয়ে চলো কাকা
আমেরিকা আমেরিকা আমেরিকা

হাঁড়ি বাজাতে বাজাতে সমঝদারি মাথা নাড়ছে পঙ্কজ। মাঝে মাঝে পাবলো হাঁক দিচ্ছে—শম্পি-ই কিছুমিছু এনে দে না বিন্দাস। এটা গানেরই অঙ্গ না শম্পিকে অনুরোধ বা অর্ডার বলা যাচ্ছে না। শম্পি দু'বার এসে ফিরে গেল। দ্বিতীয় বার এসে বলল মাংসের পুরটা তৈরি হয়ে গেছে। একটু দাঁড়া। শিঙাড়াগুলো গড়ছে।

উহুঃ ডাকিনি তো কোনও ডাক ডাকিনীকে।

একই ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে পাবলো গেয়ে উঠল।

আমায় ডাকিনী বললি? খাওয়াচ্ছি মাংসের শিঙাড়া, শম্পি তেড়ে আসে।

গিটারটা রেখে পাবলো বলে—শোন, জীবনের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে যেখানে যা কিছু খেলা করে স-ব সমস্ত গানের বিষয়। কাউকে ডাকছি কাউকে বকছি, চুকলি কাটা হচ্ছে, কেচ্ছা, সেলফ-পিটি, হেভি খাওয়া, জমল না খাওয়া—এভরিথিং পসিবল্ আন্ডার দা স্কাই।

শম্পি গালে হাত দিয়ে বসল। বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খেয়ে পাবলো বোতলটা পঙ্কজকে এগিয়ে দিল। বলল মুখ লাগিয়ে খাবি না। ছোত ছেলে দুদু খায়।

পরের গান এইখান থেকেই শুরু হল।

ছোতো ছেলে পঙ্কজ দুদু খায়
এত্তুখানি বড় হয়ে মদু খায়।

আর এত্তু বড় হলে উকারটা বাদ দেবে—ব্যাটা ছেলে কে দিচ্ছো উঁকিঝুঁকি? দিয়ো নাকো।

বলো খোকা ঢুকু খায়
ঢুকু ঢুকু ঢুলু ঢুলু চুল্লু খায় (খাওয়াচ্ছি)

এইরকম সময়ে সেই চ্যাঁ বেল বাজিয়ে আদি অকৃত্রিম কার্জন ঢুকে এল। এ ক'দিনে বেচারির চেহারায় একটা বড় রকম বদল হয়ে গেছে। সে খুব ম্লান হয়ে গেছে। বিষণ্ণ। চুপচাপ এসে একটা টুল টেনে নিয়ে বসল।

শম্পি রান্নাঘরের দিক থেকে হেঁকে বলল, কেউ এসে শিঙাড়ার ঝুড়িটা নিয়ে যা।

যাবি নাকি কার্জন?

যদি তোরা দয়া করিস!—কার্জন এলোমেলো হেঁটে চলে গেল।

কী ব্যাপার বল তো? কার্জনটা কি মদ খেয়েছে নাকি? পাবলো জিজ্ঞেস করল পঙ্কজকে।

পঙ্কজ কাঁধ নাচাল, বলল—দ্যাখ সব লোকের বাড়িতেই বড়রা নেই। আমার বাড়ি ফাঁকা, তোর বাড়ি ফাঁকা। কিন্তু আমরা কি এই স্বাধীনতা মিসইউজ করছি? আমরা সিগারেট বিড়ি খইনি পানপরাগ পর্যন্ত খাইনি; মদ কফ সিরাপ-গাঁজা—এসবের কথা ছেড়েই দে। মাঝখান থেকে কার্জনটা বয়ে গেল। স্যাড!

আর কোনও কারণ নেই বলছিস? পাবলো চোখ সরু করে বলল।

আবার কী কারণ থাকতে পারে?

আরে ইয়ার, ও পুয়োর ফেলো কা বান্ডুল ছোড় দো না ভাই। উসমে বহোত সারে লভ-লেটার্স হ্যায়।

তার মানে? আমার দিকে অমন গোয়েন্দা-গোয়েন্দা চোখে তাকাবার মানে? অ্যাকিউজ করছিস?

আরে ভাই দে দো না। উসকো নেই বাতাউঙ্গা। কী করছিস পঙ্কজ, ব্ল্যাকমেল-ফেল করে ব্যবসার ক্যাপিটাল জোগাড় করার তালে আছিস, না কী? মেয়েটা কে? মালদার নাকি?

পঙ্কজ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল—আই অবজেক্ট। আমার নিজের বন্ধু আমাকে সন্দেহ করছে। আবার যাচ্ছেতাই সব অ্যালিগেশন!

ইতিমধ্যে একটা ছোট ঝুড়িতে গরম গরম মাংসের শিঙাড়া নিয়ে কার্জন প্রবেশ করে। বেচারা বেচারা মুখ করে পঙ্কজের কাছে যায়, করুণ কণ্ঠে বলে—শিঙাড়া নে, বান্ডিল দে ভাই।

তারপর সে পাবলোর কাছে যায়, করুণতর কণ্ঠে বলে—বান্ডিল দে, শিঙাড়া নে ভাই।

আরে তুই কি খেপে গেলি নাকি? আমাকে ডিটেকটিভ এমপ্লয় করে আমাকেই আসামি ঠাউরাচ্ছিস?

ভাঙা গলায় কার্জন বলল—সবচেয়ে মারাত্মক সেই গোয়েন্দা গল্পই যেখানে গোয়েন্দাই খুনি। আজও লেখা হয়নি। হয়তো ভবিষ্যতে লেখা হবে।

শম্পি পেল্লাই একটা চায়ের পট নিয়ে এসে গেল। বাঁ হাতে প্লাস্টিকের কাপ। নে নে চটপট করে নে চা-টা। আমাকে উদ্ধার কর খেয়ে। ভবিষ্যতে কী লেখা হবে রে কার্জন?

পাবলো বলল—গোয়েন্দাই খুনি।

কে লিখবে? তুই না কার্জন?

ওরা কেউই লক্ষ করেনি কার্জন ক্রমাগত পা বদল করছে যেন ভীষণ নার্ভাস। সে বলল—শম্পি, কেন দিক করছিস ভাই। ইউ আর লাইক মাই সিস্টার। দিয়ে দে না।

অ্যাঁ?—শম্পির বিষম খাবার জোগাড় হয়। —আমি কী দেব?

তুই জানিস তুই কী দিবি। আমিও জানি। আমি শিয়োর এখন যে তুই-ই নিয়েছিস বান্ডিলটা। এমন কতকগুলো ইন্ডিকেশন দিলি!

আশ্চর্য তো! শম্পি ঝাঁঝিয়ে উঠল, সে দিন মাসির হঠাৎ অসুখ করল সেই দিন উন্নিকে নিয়ে আমাদের বাড়ি বান্ডিল খুঁজতে এসেছিল, তখন ওর সন্দেহ ছিল পাবলোকে। এখন আমাকে সন্দেহ করছে। মাথাফাতা দেখা রে কার্জন। কেমন অবসেসিভ টাইপ হয়ে যাচ্ছিস!

মাংসের শিঙাড়া ভেঙে ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করতে করতে পাবলো বলল—শম্পি এর মধ্যে আসছে কোত্থেকে? তোর ডিডাকশনে মেলাই ভুল। বান্ডিল নিয়ে তুই গিয়েছিলি বল্লীর বাড়ি সেখানে বল্লী ছাড়া ছিলুম আমি আর পঙ্কজ। শম্পি তো ছিল না!

এবার ধূর্ত চোখে তাকাল কার্জন—ফ্রম পাবলো টু শম্পি—খুব কি ঘুরপথ হয়ে গেল! পাবলো, অত গাধা আমি নই।

কী করলে তুই বিশ্বাস করবি আমরা নিইনি।

অন্য কোনও জায়গা থেকে ওটাকে প্রোডিউস করলে।

দ্যাখ হয়তো ডাস্টবিনে চলে গেছে।

শিউরে উঠল কার্জন।—পাবলো!!! হোয়াই ডাস্টবিন!

ফর দা সিম্পল রিজন যে ওটা নিশ্চয় তোর পকেট ফকেট থেকে পড়ে গিয়ে রাস্তায় লুটোচ্ছিল, ন্যাচারাল কোর্সে ডাস্টবিনে চলে গেছে। তুই লভ-লেটারগুলোর আশা ছেড়ে দে কার্জন। ভাল কথা বলছি শোন, মাথাটা ঠিক থাকলে লভ-লেটার অনেক পাবি। এই তো সবে কলির সন্ধে।

কার্জন একটা শিঙাড়া নিয়ে পাবলোর লম্বা নাক লক্ষ্য করে ছুড়ল। তারপর রেগেমেগে ঝড়ের বেগে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

এ তো মহা সিরিয়াস ব্যাপার হয়ে গেল দেখছি—পাবলো বলল—ছেলেটা তো একেবারে ডিস্ট্র্যাক্টেড হয়ে রয়েছে। তোর কী মনে হয় পঙ্কজ!

পঙ্কজ বলল—ফার্স্ট থিং জিনিসটা কী তা আমাদের বলছে না। ও কি নতুন কোনও বোমার ফর্মুলা বার করেছে? এত সিক্রেটিভ কেন?

পাবলো একটু ভাবল—তুই চিন্তাটাকে একটা নতুন খাতে বইয়ে দিলি। বোমার ফর্মুলা হয়তো নয়। কিন্তু এমন কিছু যা ও ডিসক্লোজ করতে চায় না। তার মানে পেটেন্ট নিতে চায়। পেটেন্ট নিয়ে শাঁই শাঁই করে বড়লোক হয়ে যাবে মণি ভৌমিকের মতো।

শম্পি হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল—কার্জনকে হঠাৎ তোরা সায়েন্টিস্ট বানাতে লাগলি কেন? ও তো কমার্সের ছাত্র!

পঙ্কজ বলল—ঠিক আছে। কমার্সেও তো কিছু না কিছু আছে বেসিক প্রবলেম, প্রিন্সিপল্। কম্পুটার হতে পারে। হ্যাকিং ট্যাকিং করার কিছু মেথড বার করেছে, কি নতুন কোনও সফটওয়্যার।

তো সেটা তো কম্পুটারেই থাকতে পারে! শম্পি বলল।

দুই বন্ধুই নখ খাচ্ছে প্রবল বেগে।

শম্পি বলল—নখ খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেললে শিঙাড়াগুলো ঢুকবে কোথায়? নে খেয়েদেয়ে ভাব।

·

আবহাওয়াটা ভিজে ভিজে। সমানে মেঘ ভেসে আসছে। জামাকাপড় ভিজিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। বেশিরভাগ লোকেই অবশ্য চামড়ার জ্যাকেট বা উইন্ডচিটার পরেছে। মধুক্ষরাও প্যান্টের ওপর জ্যাকেট পরেছে। খালি যশোরই হয়েছে মুশকিল। তবে তার গায়ে একটা মোটাসোটা টুইডের কোট। মাথায় স্কার্ফ, ভিজলেও জলটা ভেতরে ঢুকছে না এই যা রক্ষা। পাইন আর ফার গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে শনশন করে হাড় কাঁপানো হাওয়া দিচ্ছে। সূর্য ডুবলেই আর বাইরে থাকা যাচ্ছে না।

মীনাক্ষী আর তার স্বামীর সঙ্গে সঙ্ঘমিত্রাদের খুব পটে গেছে। চারজনে একসঙ্গে হ্যাপি ভ্যালি ঘুরে এলেন। যশোধরাদের বলা হয়েছিল মধুক্ষরা রাজিও হয়েছিল। কিন্তু যশো বললে—আমি স্রেফ ঠান্ডাটা উপভোগ করতে এসেছি। পাঁচটা লোকের মুখ দেখতে পচে গেছে। গোটা চেনা কলকাতাটা দার্জিলিঙে উঠে এল গো! মল দিয়ে হাঁটতে বেরোলেই এখানে বিজয়মুকুলদা ওত পেতে, ওখানে ব্যাঙা-বেঙি হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছে। সেখানে সন্তোষ তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে পনিতে চড়েছেন। পনিটা হাঁপাচ্ছে। হিলকার্ট রোড না গড়িয়াহাট রোড বোঝা দায়।

তুই সামাজিকতা কর যত খুশি—বোনকে ঢালাও অনুমতি দিয়ে যশো নিরালা নিভৃত খোঁজে। চুপচাপ রুম হিটারের কাছাকাছি বসে একটু করে চায়ে চুমুক আর আত্মসমীক্ষা। যশোর এমনটাই চলছে।

তুই যা না। তোকে কে বারণ করেছে। তুই আর কত আমার মুখ দেখবি। ছোট বোনকে সকাল হলেই ঠেলে বার করে দেয় যশো।

নানান কথা মনে ওঠে। এই যে দড়িদড়া ছিঁড়ে নিজের উদ্যোগে পাহাড়ে চলে এল, কেন? গরমের জন্যে? সংসার করতে করতে অতিষ্ঠ লাগছিল বলে? একঘেয়েমি এসে গিয়েছিল জীবনে?

সব প্রশ্নের উত্তরই বেরোয় হ্যাঁ, খানিকটা, কিন্তু সবটা নয়। নিজের মনোবীক্ষণ করতে করতে অবশেষে যশো আবিষ্কার করল তার বৈরাগ্য এসেছে। এই যে জীবনে পাওয়া আর না পাওয়ার মধ্যে অহর্নিশ দ্বন্দ্ব চলছিল সেই লড়াইয়ে সে ক্লান্ত। সুহৃৎবরণ খুবই ভাল স্বামী। কিন্তু কেমন যেন আনমনা। পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে বেশ অভিনিবেশ সহকারে যশোর সঙ্গে প্রেম বা দাম্পত্য তিনি করেননি। কিছু বলবার নেই। কিন্তু একটা অভাববোধ থেকে গেছে যশোর লভ-লাইফে। বড্ড ইচ্ছে ছিল প্রেমের বিয়ে করে। মধু তো তার উমেদারদের মধ্যে থেকে মিহিরকিরণকে বেছে নেবার সুযোগ পেল। বাইরে থেকে দুই দম্পতিকে দেখলে অবশ্য কেউই বুঝবে না বড়রটি অ্যারেঞ্জড্ ম্যারেজ, ছোটরটি লভ-ম্যারেজ। দুটোই একই রকমের একঘেয়ে। আসল কথা যশোর রোম্যান্টিক মন। চির-রোম্যান্টিক। সেই রোম্যান্টিক মনটুকু বড্ড উপোসি থেকে গেছে।

লোকে যা চায় সেই টাকাপয়সার অভাব নেই। নিজেরই অঢেল। একটি ছেলে। ছোটতে ছেলেকে নিয়ে যশো অবশ্যই খুব মেতে ছিল। কিন্তু যত বড় হল—পাবলো দূর থেকে দূরে সরে গেল। সে বুঝতে পারে পাবলোর মনের মধ্যে আর মাতৃমূর্তি সদা-জাগরূক নেই। এখন থেকেই। তবে? কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ শাস্ত্রে কি সাধে বলেছে! এই আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ বছর বয়সেই যশোর সব সাংসারিক কর্তব্য সারা হয়ে গেছে। এরপর বাবার মতো পাবলোও আপিস-কাছারি করবে, খুব ধুমধাম দেখনাই করে ছেলের বিয়ে দেবে নিশ্চয়ই সুহৃৎ-যশো। কিন্তু সবই যেন কেমন গতানুগতিক। জীবনে কি আর নতুন কিছু নেই? কোনও চমক? কোনও আচমকা আনন্দ?

ভাবতে ভাবতে যশোর নাক ডাকতে লাগল। এই গুণটা তার আছে। খুব চট করে সে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে ভাবনাচিন্তা করতে গেলেই দুম করে ঘুম এসে যায়। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে। কে যেন কানের কাছে বলল—কীসের ক্লান্তি মা। কীসের অবসাদ! ওঠো, জাগো, তোমার জন্যে নির্দিষ্ট কাজ আছে। জগৎ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ঘুমের মধ্যেই যশো ছড়িয়ে জড়িয়ে বলল—আমার জন্যে কারও অপেক্ষা নেই গুরুদেব। আমি একা, বাতিল। দিনগত পাপক্ষয় করছি।

ঝট করে ঘুমটা ভেঙে গেল। সেই ঘর। জানলার কাচ দিয়ে ঝকঝকে রুপোর মুকুটের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘার আধখানা দেখা যাচ্ছে। বাকি অর্ধেক মেঘে ঢাকা। ঘরে কেউ নেই। সোফায় নেতিয়ে রয়েছে সে। সামনে নিচু টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। ড্রেসিং টেবিলে ফুলদানে গোলাপি বেগুনি অর্কিড সাজানো, ঘরের দেয়ালে শেরপার ছবি। মাউন্ট এভারেস্টের ছবি। সে কি স্বপ্ন দেখল? কিছু তো দেখেওনি! খালি শুনেছে! নাঃ মাথাটা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল যশো। বড্ড বেশি একা একা থাকা হয়ে যাচ্ছে। তাকে কি ভূতে পাচ্ছে নাকি! বেশ ভাল রোদ উঠেছে আজ। বাইরেটা এতক্ষণে তার কাছে ডাক পাঠাচ্ছে। ক্লজেট থেকে মোটা অ্যাঙ্গোরার কার্ডিগ্যানটা গলিয়ে নিয়ে মাথায় স্কার্ফ, ঘরে চাবি লাগাল যশো। তারপর নীচে নেমে গেল। কাউন্টারে চাবি রাখতে গিয়ে দেখে সেখানে মেলাই লোক। সাহেব, মেম, বাঙালি, মাড়োয়ারি সব নিজেদের মধ্যে কথা বলছে এবং তার পরই দরজা দিয়ে ঢুকলেন গৈরিক পরনে এক সাধু। আহা কী রূপ! কালো ভ্রমরকৃষ্ণ দাড়িগোঁফ। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত। এই শীতে গেরুয়া আলখাল্লা আর গেরুয়া চাদর তার ওপরে। ব্যস। মাথায় কানঢাকা বিরিঞ্চিবাবা টুপিটা পর্যন্ত নেই।

সবাই সসম্ভ্রমে জায়গা করে দিল। একটি মেমসাহেবের সঙ্গে তিনি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দিকে চলে গেলেন। যাবার সময়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে যশোর চোখে চোখ রাখলেন। যশো স্থাণু হয়ে রইল। লাউঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এঁরা সব বসে নানা আলোচনা করছিলেন। বোধহয় ভ্রমণসূচি নিয়ে। যশো মন্ত্রমুগ্ধের মতো একজনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল—উনি কে?

উনি? ওঁকে চেনেন না? চিনবেন কী করে? প্রচার ভালবাসেন না। হৃষীকেশে থাকেন। আর মাঝে মাঝে বিদেশ যান। উনি অভীপ্সানন্দ মহারাজ।

আপনারা?

আমরা ভাগ্যবান। ওঁর মন্ত্রশিষ্য।

কেমন একটা ঘোরের মাথায় যশো লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে কাউন্টারে যায়।—মহারাজজি কওন রুম পে হ্যাঁয়।

দোসো সাত।

যশো রোদ ঝলমলে দার্জিলিং প্রকৃতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বপ্নচালিতের মতো দোতলার সাত নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় সামান্য শব্দ। দরজা খুলে গেল। সামনে মেমসাহেব। বেশ বুড়ি তবে চটপটে। অদূরে অভীপ্সানন্দ একটি আরামচেয়ারে বসে স্ট্রেট যশোর দিকে তাকিয়ে আছে। যশো হরিণশিশুর মতো এগিয়ে যায়। কার্পেটের ওপর বসে পড়ে। মহারাজ বলেন—মা, বড় ক্লান্ত না?

হ্যাঁ বাবা। বড্ড।

মধুক্ষরা মুখার্জি অভ্যাস মতো আগে ক্যাভেন্টার্স-এ ঢুকেছিলেন। সেখানে স্বভাবতই আরও অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সবাইকে হাই হ্যালো করে মধুক্ষরা মাঝখানের একটি টেবিলে একলা বসে চা আর চকোলেট পেস্ট্রি অর্ডার করল।

তোর দিদি কি হারিয়ে গেল?—মীনাক্ষী রসিকতা করলেন।

সঙ্ঘমিত্রা বললেন—ঝগড়া হয়েছে দু'বোনে।

মিটিমিটি হেসে মধুক্ষরা চায়ে চুমুক দিল। দিয়েই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল! ডক্টর সুবল মিত্র ঢুকছেন। আড়চোখে দেখেছিল। প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে এখন আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে মধুক্ষরা।

মিহিরকিরণের গলা মিহি ছিল। ছিল কেন এখনও আছে। কিন্তু সুবলদার গলায় বল নেই। কেমন উইক উইক। তা নয়তো বেশ স্লিম চেহারা, সুবলদা যোগশিক্ষা দিয়ে থাকেন,অর্থাৎ নিজেও করেন। নিয়মিত। চেহারায় সেই ব্যায়াম আর সংযমের ছাপ আছে। কত ছোট থেকে সুবুলদাদের সঙ্গে চেনাশোনা তাদের। আসা যাওয়া তেমন ছিল না। ওই দূর থেকে। তাই আপনি-আজ্ঞেটা আর ঘুচল না।

যাঃ, মধুক্ষরার সামনের খালি চেয়ারটাতেই সুবুলদা এসে বসলেন।

বসতে পারি?—বসেটসে বললেন।

আপনি বসুন। তবে আমি এখুনি উঠব।

ম্যাডাম কোথায়?

দিদি?—হোটেলে।

কেন? আবার শরীর খারাপ?

উঁহু, মন খারাপ।—বলেই মনে মনে জিব কাটলেন মধুক্ষরা। সুবুলদার চোখ হাসিতে চিকচিক করছে। বললেন,—আর তোমার?

আমার শরীর-মন বেশ তরতাজা ঝরঝরে আছে।

সেটাই তো তোমার চার্ম মধু। ডাক্তারেরা সবচেয়ে কী অপছন্দ করে বলো তো।

মধুক্ষরা অবলীলায় বলে দিলেন—পছন্দ করে নার্স। কিন্তু অপছন্দ কী করে তা তো জানি না!

হাঃ হাঃ হাঃ। বলতে পারলে না?—অসুখ, অসুখ, ডিজিজ। রোগ দেখলেই ডাক্তারদের রাগ হয়ে যায়, মেজাজ খিঁচড়ে যায়, মনে হয় সব ব্যাটাকে খুব কষে কান মুলে দিই।

রোগীকেও?

দ্যাট ডিপেন্ডস। রোগীর আশেপাশে যারা থাকে তাদেরও হতে পারে।

আপনি অনুপযুক্ত সুবুলদা। ডাক্তার হওয়াটা আপনার আদৌ উচিত হয়নি।

হয়নি-ই তো। কিন্তু তুমি তো জানো ক্ষরা আমাদের যুগে কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। এবং কর্তা তখন দুটি ইচ্ছে করতেন। হয় ডাক্তার নয় ইঞ্জিনিয়ার। অঙ্কটায় তেমন সুবিধে করতে পারতুম না। এদিকে বায়ো-ক্লাসে অবলীলায় আরশোলা থেকে কেঁচো, কেঁচো থেকে ব্যাং কেটে যাচ্ছি। অতএব...

ইঃ! নিন, আপনি আরশোলা কেঁচোর কথা ভাবুন আমি চলি।

যাবে?—মিটিমিটি হেসে সুবুলদা বলল—যাও। তবে যাবে আর কোথায়?

মধু ট্রাউজার্স পরা স্মার্ট পা ফেলে জ্যাকেটের পকেটের হাত ঢুকিয়ে গটগট করে বেরিয়ে এল। বলে কিনা যাও, তবে যাবে আর কোথায়! সাহস তো কম নয়!

আজ আর হিলকার্ট রোড ধরে বেড়াতে ইচ্ছে করছে না। আবহাওয়া ভাল বলে কাঁড়ি কাঁড়ি লোক জমেছে। সব বাঙালি। দেখলেই পিত্তি জ্বলে যায়। সোজা পার্কে উঠে গেল মধুক্ষরা। এখানেও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছে। তাদের বাবা-মা'রাও চার দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কিন্তু মধু একটি নীরব নির্জন বেঞ্চ পেয়ে গেল।

সুবুলদা যে এরকম স্মার্ট কথাবার্তা বলতে পারে, এমন গটগট করে হাঁটে, এমন মিটিমিটি হাসতে পারে কস্মিনকালেও কেউ ভেবেছিল! দার্জিলিঙে এসে সুবুলদার মলাটখানাই পালটে গেছে। সাতসকালে সুবুলদা নিশ্চয়ই পান করে আসেনি। কোনও গন্ধও তো পায়নি মধু কথা বলবার সময়ে। আশ্চর্য, আশ্চর্য এবং আশ্চর্য!

কলকাতায় যে-লোক কথা বলতে গেলেই তো-তো করে, কাঁপা গলায় ওষুধের নাম বলে, কাঁপা হাতে প্রেসক্রিপশান লেখে, ঈষৎ কুঁজো হয়ে চলে, সোজাসুজি চোখের দিকে তাকায় না, দার্জিলিঙে সেই লোক এমনি? তাজ্জব কি বাত! এ সবই কি সুবুল বউদির সৌজন্যে! বউদি মেট্রন, নার্স মানুষ, রাশভারী হবে তাতে আর বিচিত্র কী! কিন্তু তাই বলে পুরো অন্যরকম হয়ে যাবে! কলকাতার সুবুল, দার্জিলিঙে সু-বল। আহা, সুবুলদা আমি খুব খু-উব পাকা মেয়ে ছিলুম। তোমার মনোভাব কি আর আমি টের পাইনি? কিন্তু মিনমিনে টাইপের মানুষ আমার কোনওদিন মানে ধরে না। কত ক্যান্ডিডেট এল গেল জীবনে। খুব ভাব সবার সঙ্গেই। কিন্তু—সিনেমা যাবি?—ধুত, রেস্তোরাঁয় যদি ঢোকো তো পরদা-ফরদার মধ্যে নয়, একেবারে হট্টমেলার মধ্যিখানে চাটুজ্জেবাড়ির রূপসি মেয়েকে নিয়ে বসবার সাহস হয় তো বসো বাবা। নইলে এসো। ছোঁকছোঁকেদের কোনওদিন পাত্তা দেয়নি মধুক্ষরা মুখার্জি। ছিনে জোঁকদেরও না। ঠগ বাছতে বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে গেল, কেউ মধুর মন পেল না। শেষপর্যন্ত মন্দর ভাল মিহিরকিরণ মুখুজ্জে। সেন্স অব হিউমার, ব্রঞ্জের মতো রং, খয়েরি রঙের একমাথা চুল আর অফুরন্ত বাক্যি। বাক্যবাগীশ একেবারে। বাক্য দিয়েই বাবাকে মাকে বাগিয়ে নিল। মধুক্ষরা প্র্যাকটিক্যাল মানুষ, দেখলে বাছতে গেলে সর্বত্র খুঁত বেরোবে। তার চেয়ে হাসিখুশি যুবকটিতেই সম্মতি দেওয়া যাক।

সুবুলদাকে কোনওদিন ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি মধুক্ষরা। শুধু মিনমিনে ব্যক্তিত্বই না। সুবুলদারা ইয়ে মানে বড্ড মিডল মিডল ক্লাস। সুবুলদার বাবা লুঙ্গি পরেন বাড়িতে, চেক-চেক বিচ্ছিরি লুঙ্গি। সুবুলদার মা বাইরে বেরোলেই মাথায় একটু ঘোমটা, সিঁদুরের টিপ, শাঁখা লোহা তাবিজ নানানখানা। বাড়িটা অবশ্য নিজেদের। কিন্তু কী-ই বা বাড়ির ছিরি। যখন যে যেটুকু পেরেছে যোগ করে দিয়েছে—প্ল্যান না কিছু না। রাস্তার লেভেল থেকে নিচু একতলা। ঠ্যাঙা ঠ্যাঙা সিমেন্টের চৌকাঠ। ঘরে আলো-হাওয়া ঢোকে না। দোতলাটায় যদি বা ঢোকে সেটাকে বোকার মতো ভাড়া দিয়েছে। তার ওপর সুবুলদার তিন তিনটে বোন। এক দিদি, দুই বোন। দিদির বিয়েতে মাংস কম পড়ে গিয়েছিল। সে এক কেলো। বরযাত্রীরা বলে মাংস না খেয়ে আমরা নড়ছি না। লোকে বাজার গেল, মাংসের দোকানের ঝাঁপ খুলিয়ে কাকুতিমিনতি করে পাঁঠা কাটিয়ে আনলে, সেই পাঁঠা রান্না হল। ততক্ষণ বরযাত্রীরা এঁটো হাতে খোশগল্প করেই যাচ্ছে, যেন কিচ্ছুই হয়নি। কোনও ব্যাচ বসতে পাচ্ছে না। বেশিরভাগ লোক—দুচ্ছাতার নেমন্তন্ন বলে বাড়ি চলে গিয়েছিল। খালি যশো আর মধু কিছুতেই

আসেনি। মাটন রান্না হলে ওই বরযাত্রীরা কতক্ষণে খাবে দেখতে বসে ছিল। মাংস মুখে দিতেই টাকরা পর্যন্ত জ্বলে গেল। উস আস হুস হাস করে বরযাত্রীরা সব লন্ডভন্ড করে আর কী! সুবুলদার বাবা হাতজোড় করে মাফ চান—আর ভাই তাড়াতাড়িতে একটু ঝাল বেশি পড়ে গেছে তো রসগোল্লা খান, পানতুয়া খান। বোকা বরযাত্রীগুলো তাইতে ভুলে গেল। আসল কথা সুবুলদার বাবা আর রান্নার ঠাকুর দু'জনে মিলে এই কীর্তিটা করেছিলেন। বরযাত্রীরা উঠে গেলে জ্যাঠামশাই নিজে এসে যশো-মধু এবং অন্যদের চুপিচুপি বলে গেলেন কিনা—বোসো বোসো আঝালা মাংস আছে। খেয়ে যাবে। সেই সময় সুবুলদাকে বলতে শুনেছিল—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।—ওদের দেখতে পায়নি সুবুলদা। সে তখন মেডিক্যাল থার্ড ইয়ারের ছাত্র। ভাল বেশ। আপন মনেই মিচকে মতন হাসতে হাসতে বলেছিল। এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে মধুর। তার একটু আশ্চর্য লেগেছিল। কেননা সুবুলদা নিরীহ মতো ছেলে কারুর সাতেপাঁচে থাকে না। তার এমন কথা! মিচকে হাসি!

এখন মধুক্ষরা বুঝতে পারছে, সুবুলদা ইচ্ছে করে নিজের অমন একটা ইমেজ বানিয়ে রেখেছিল। বোধহয় বাবা-মাকে ভড়কি দিতে। এখন বউদিকে ভড়কি দিচ্ছে।

তার দিদির কিন্তু এ বিষয়ে কতকগুলো স্বাভাবিক জ্ঞান আছে। সে বলে থাকে যে-লোক চোখে চোখ রেখে কথা বলে না, যারা হাত কচলায় আর যারা স্পন্ডিলাইটিস না থাকলেও কুঁজো হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে গন্ডগোল আছে। খবরদার তাদের বিশ্বাস করবি না। তারা দু'মুখো। জেকিল-হাইডের মধ্যে হাইড অ্যান্ড সিক চলছে।

এক হিসেবে তাকেও তো ভড়কিই দিয়েছে সুবুলদা। জানতে দেয়নি আসলে সে কত চালাক-চতুর, কত কৃতী। দেখেশুনে শাঁসালো কর্মীমেয়ে বিয়ে করেছে। শোনা যায় পৈতৃক বাড়ি ভেঙে এখন সুবুলদার জয়পুরী পিঙ্ক মার্বলের মেঝেঅলা চমৎকার দোতলা বাড়ি। তাতে নাকি জাকুজি আছে। লেকগার্ডেন্সের চেম্বারটিও খুব মনোরম করে সাজিয়েছে সুবুলদা। কখনও গিয়ে দেখে দেয়ালের ছবি সব যামিনী রায়, কখনও সব চিনে জাপানি, ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল। ওয়েটিং রুমটাতে যথেষ্ট গদিআঁটা সোফা, প্রচুর পত্রিকা, ওয়াটার কুলার, চমৎকার বাথরুম। জি-পি তো ইদানীং খুব কমে গেছে। সুবুলদা ইলেত-বিলেত যায়নি। এম ডি করে এখানেই জেনারেল প্র্যাকটিস করছে। কার্ডিওলজিতেও ডিগ্রি আছে। সুবুলদার একমাত্র ছেলে কানাডায় ডাক্তারি করছে। একমাত্র মেয়ে জাপানে ডাক্তারি করছে। ভাবা যায়? আর মধুর একমাত্র বর দিনরাত মক্কেলের সঙ্গে ঘ্যানর ঘ্যানর। চেম্বারটা একটা গুদাম বিশেষ। মধুর একমাত্র মেয়েও সেই পথেই যাবে বলছে। কোম্পানি ল' পড়বে নাকি! দিগদিগন্তে কোথাও, কোনও কৃতিত্বের ছোঁয়া নেই।

তবে কি সে ভুল করল? অত কাঁটা বাছাবাছি করতে গিয়ে ইলিশ মাছটাই খাওয়া হল না! মধুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কিন্তু সুবুলদা যে-ধরনের তুখোড় লোক আসলে বলে মনে হচ্ছে, সে ইচ্ছে করলে মধুকে হাসিল করতই। তার মানে ইচ্ছে করেনি। অথচ ইচ্ছে এরকম ভাব দেখিয়েছে। সবটাই চালাকি! যাতে মধু তার দিকে না ঝোঁকে। দারুণ সাইকলজি বোঝে তো লোকটা!

বেশ রেগেমেগে মধুক্ষরা নেমে এল। খটখট গটগট করে এক চক্কর দিয়ে হোটেলে ফিরে এল। ঘরে গিয়ে দেখে চাবি। দিদি বেরিয়েছে। কাউন্টার থেকে চাবি নিয়ে সে ঘরে যায়। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। একটু ঘুমিয়েও নেয়। বেলা দুটোয় ঘুম ভাঙে। চোখ খুলে দেখে নো দিদি। সন্ধেবেলাও দিদি এল না। দিদি কি ভ্যানিশ হয়ে গেল?

মুড়কিশোলা গ্রামে মোট একশো ঘর লোকও নেই। কিন্তু যে ক'ঘর আছে তারা ঝেঁটিয়ে এসেছে শহরের দাদা-দিদিদের দেখতে। পরি ক্রমাগত বলে যাচ্ছে—আহ, ভিড় জমাচ্ছ কেন? পালিয়ে তো আর যাচ্ছে না।

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল দু'জনের। গায়ে, হাতে, পায়ে খুব করে মশার ওষুধ লাগিয়ে

মশারিবিহীন শুয়েছিল। অন্যরা সব দাওয়ায় মশারি টাঙিয়ে শুয়েছে। ওদের একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছিল। হাতপাখা ছিল, কিন্তু বড্ড গরম। বরং বাইরে হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। ভোরে উঠে পড়ে আগে মধুবন।—দাদা, এই দাদা, এদের তো টয়লেট-ফেট আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওঠ, আমাকে নিয়ে চল। ঋজুরুস্তম জেগেই ছিল, কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। ঠিক তো! সে তড়াক করে উঠে বসল। অন্তত পাঁচ মাইল যাওয়া পাঁচ মাইল আসা, তবে প্রাতঃকৃত্য হয়। ফিরে আসতে দেখল পরি আর পরির বাবা উদ্বিগ্ন মুখে খোঁজাখুঁজি করছে।

বেড়াতে গিয়েছিলুম—মধুবন বলল।

পরি বলল—সাপ-খোপ বিছেটিছে কত কী আছে, কে তোমাদের বলেছিল অত দূরে যেতে! মনোহরদাদুর বাড়ি কলঘর আচে সেখানেই ব্যবস্থা করেছিলুম।

বাধিত করেছ—রুস্তম বলল।

এবার রুস্তমের ব্যাগ থেকে চা বেরোল। হাঁড়িতে জল বসল, খড়কুটোর আঁচে। রুস্তম চটপট গোটা দুই পাউরুটি বার করে ফেলল। বাড়ির সবাই ভিড় করে এসেছে। পরির চার ভাইবোন, মা বাবা ঠাকুমা। কৌটো থেকে মাখন বেরোল। মোটা মোটা রুটিতে মাখন মাখিয়ে সবাইকে বিতরণ করল রুস্তম।

ঠাকুমা মন্তব্য করল—নাঃ ছাওয়ালটা ভাল।

পরির বোন বাতাসি ওরা এসে থেকেই মধুবনকে খুব পছন্দ করে ফেলেছে। সে মধুবনের গা ঘেঁষে বসে। খুব সন্তর্পণে আঙুল দিয়ে মধুবনের হাত-ফাত টিপেটুপে দেখে। এখন সে মন্তব্য করল—এই দিদিটা মাখন পাউরুটি দিয়েই তৈরি। দেখলেই ইচ্ছে করে খেয়ে নি।

রুস্তম এবার তার নোটবই-টই নিয়ে ডেটা কালেকশনে বেরিয়ে পড়ল। পরির ঝুলি থেকে এইবার সমবেত পরিবারের সামনে বার হতে লাগল—মায়ের জন্যে চারখানা শাড়ি। দুই বোনের জন্যে চারটে সালোয়ার কামিজ। ভাইয়ের জন্যে শার্ট প্যান্ট দু'সেট। বাবার জন্যে শার্ট প্যান্ট—দেখে বাবা মহালজ্জা পেয়ে বলল—এই বুড়া বয়সে ছোকরা সাজতে পারবনি। ঠাকুমার জন্যে তিনখানা ধুতি বেরোল। সব নতুন। সবই মধুবনের বাবার। ঠাকুমা একগাল হেসে বললে—জেবনের বাকি তিন বছর চলে যাবে। তা আমার জন্যে সালোয়ারকামিজ আনতে পারতিস। বলে বুড়ি ফিক ফিক করে হেসে উঠল।

কত বয়স আপনার ঠাকুমা?—

সে কি আর খ্যাল আছে রে ভাই। গাছ পাতর নাই। তা ধরো দু'কুড়ি দশ হবে। আমার পনেরো বছরে পরির বাপ হয়েছিল, পরির বাপের বিশ বছরে পরি হল। তা সে এখন ষোলো বছুরে তো হয়ে উঠল। তবে হিসেব করো।

মধুবন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এই মহিলার একান্ন বছর বয়স? তার বাবার চেয়েও দু'বছরের ছোট তার মানে? চুল যেটুকুই আছে কালচেই আছে। কিন্তু শুধু মুখ সমস্ত শরীরটাই তাল তোবড়ানো। দাঁত পড়ে গেছে বেশ কিছু। চোখ কোটরে, ভুরু নেই। গায়ের চামড়া খসখসে মোটা অদ্ভুত। কিছুতেই এঁকে তার বাবার সঙ্গে মেলানো যায় না। বাবাকে এঁর ছেলে মনে হবে।

একটু পরেই হঠাৎ দেখা গেল আশেপাশের কুঁড়ে থেকে ছোট ছেলেমেয়ে এবং মহিলারা ছুটে আসছে।

এখানে নাকি কাপড় দিচ্ছে?

তখনও এদের কোলেপিঠে শাড়ি-ধুতি ইত্যাদি পড়ে রয়েছে। এক মহিলা ছোঁ মেরে একটা শাড়ি তুলে নিল। আরেকটি ছোট মেয়ে বাতাসির সঙ্গে সালোয়ারকামিজ নিতে গিয়ে হাতাহাতি লাগিয়ে দিল।

কোমরে হাত দিয়ে মুখ বাঁকিয়ে ওরা বলতে লাগল—হ্যাঁ, সব একজনা নেবে, না? আমরা আর মানুষ না। আমাদের সব ন্যাংটো পোঁদে থাকলেই চলবে। বাঁদর কিনা।

উঃ, মধুবন কানে আঙুল দিল।

কতা ভাল লেগতেছে না, না গো শহুরে বিবি! গেঁয়ো ঘেয়ো মনিষ্যি আমরা।—দু'-তিনজন মহিলা তেড়ে এল।

পরির মা উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল—খবরদার বলছি যমুনামাসি, পরির মুনিব আমাদের অতিথি। দু'দিনের জন্যে এয়েচে। যা-তা বলবি না। বলি তোদের জন্যে কাপড় আনবে কেন? তোরা খেতে দিবি? দু'বেলার খোরাকি এখন কোত্থেকে জোগাড় করি তার নেই ঠিক। উনি এলেন কাপড় মাঙতে।

মহিলাটি একটু মিইয়ে যায়। যুক্তি বোঝে। বলল—তা বটে, তা বটে। তো অ শহরের মেয়ে আমাদের জন্যে কিছু হবে না?

মধুবন ক্ষীণ গলায় বলল—এতজনের কাপড় কি বয়ে আনা সম্ভব? আপনিই বলুন। আমরা বাড়ি ফিরে দফায় দফায় কিছু পাঠিয়ে দেবোখন।

আর দিয়েচ মা!

সত্যি বলছি। কেউ আমাদের সঙ্গে গেলে তার হাতে কিছু পাঠিয়ে দিতে পারি। কিন্তু পুরো গ্রামের কাপড় জোগানো কি আমার পক্ষে সম্ভব, আপনারাই বলুন।

খুব বুঝদারের মতো ভিড়টি মাথা নাড়ল। তখন মধুবন তার ঝোলা-ঝুলি হাতড়ে মুঠো মুঠো চকলেট আর চিকলেট বার করে আনল। বলল, বাচ্চাদের জন্যে লজেন্স এনেছি।

হরির নুট দাও গো মা। হরিবোল বলে ছুড়ে দাও। কুড়িয়ে কাড়িয়ে সব নেবেখনি।

না, তা হবে না। আমি হাতে হাতে দেব। বাচ্চারা কিউ করো। লাইন করো। পরি, ওদের লাইন করে দাঁড় করা।—দেখতে দেখতে গ্রামের যত ছোট ছেলেপিলে কোত্থেকে খবর পেয়ে হরির নুটের জন্যে ভিড় করে এল। ভাগ্য ভাল। প্রত্যেকে কিছু না কিছু পেল।

দুপুর একটা নাগাদ রুস্তম ফিরল। এদিকে রান্নাও হয়ে গেছে গরম গরম ফ্যানাভাত কলমি শাক সেদ্ধ আর তেঁতুলের টক।

ঠাকুমা বললেন—কেমন রান্না হয়েচে গো? ও শহরের ছেলে-মেয়ে?

ভাল, খুব ভাল—রুস্তম হাত চাটতে চাটতে বলল। মধুবন করুণ কণ্ঠে বলল—ভাল।

বাকি দুপুর রুস্তম বাড়ির বাইরে গাছের ছায়ায় বসে কাজ করতে লাগল। পুরুষ—১০০, এর মধ্যে ৩০ জন বৃদ্ধ।

নারী—৯৭।

শিশু—২০১।

জীবিকা—চাষবাস, খেতমজুরি, দু'ঘর ছুতোর আছে।

ধর্ম—১৩ ঘর মুসলমান।

মাথাপিছু গড় আয়—সাড়ে সতেরো পয়সা।

প্রধান খাদ্য—কলমি ইত্যাদি শাক, সবজি নিজেদের জমিতে যেটুকু ফলে। ভাত রোজ নয়। গম জাতীয় শস্যের চল নেই।

চাষ--ধান ও সবজি।

মধুবন লজেন্স দিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েদের খুব প্রিয় হয়ে গেছে। সে দল বেঁধে পাড়া বেড়াতে লাগল। বিকেলবেলার দিকে খুব চু-কিতকিত খেলা হল। প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। সে পরিকে বলল, তোদের বাড়িতে গোরু নেই?

চাষের বলদ আছে, গোরু নেই।

কারুরই নেই?

হ্যাঁ আছে কারও কারও।

দুধ দোয় না!

পরি বললে—তোমার খিদে লেগেছে না গো! যারা গরু পোষে দুধ তো সব বিককিরি করে দেয়। আচ্ছা চলো তো দেখি।

এদের গাঁয়ে সবগুলোই মাটির ঘর। খড়ের চাল। কারও কারও টিনের, অ্যাসবেস্টসের চালও আছে। মাটিটা বড্ড রুক্ষ।

রুক্ষ, কাঁকুরে। গাছগুলোও যেন কেমন গিঁট গিঁট, হাড় সার। সেই ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় গ্রাম মোটেই নয়। সকালে সব খেত খাটতে বেরিয়ে গেছে। বিকেল ঘুরে গেলে ফিরছে। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে পরি বলল—উইদিকে সব ধানখেত, বোরো হয় না, আমাদের হচ্ছে আউশ। যেটুক জমি আছে সব খেটেখুটে দোফসালি করেচে। শীতে কিছু ধান, কিছু সবজি হয়। গোরু-বাছুর পোষা খুব একটা পোষায় না। কেন বলো তো! খাবার নেই ওদের। মুড়িয়ে একবার ঘাস পাতা খেয়ে নিলে আবার গজাবে তবে খাবে। খড়-বিচালি সব আমরা বিককিরি করি। নিজেরা খেতে পাই না, গোরুকে কী দেব।

গ্রামে কোনও স্কুল নেই। কোনও ডাক্তার-বদ্যি নেই। বাড়ি এসে একধামা মুড়ি নিয়ে বসল সবাই। মুড়ি খেয়ে পেট ভরে জল খেয়ে নাও—পরি মধুবনকে নির্দেশ দেয়।

রাত্তিরবেলা আবার মুড়ি, রাঙালুসেদ্ধ, গাঁঠি কচু পোড়া।

মাঝরাত্তিরে ঘুমের মধ্যে মধুবন স্বপ্ন দেখল যশোমাসি তাকে বলছে—খা খা। কচুপোড়া খা।

দু'বেলা এখানে কেউ রান্না করে না।—অত জ্বালানি কোথায়? একবেলা যা হল হল। রাত্তিরে ওই মুড়ি চিঁড়ে খেয়ে থাকা।

গভীর রাত্তিরে রুস্তম চুপিচুপি বোনকে বিস্কুট দেয়, বলে—খেয়ে নে।

খাব? উচিত হবে?

কী করা যাবে! কাল এদের হাট বসে। একটু হাটে যাব, তুই যাবি? আর শোন, জিওলিন ছাড়া জল খাবি না।

হ্যাঁ। হাটে যাব। ওরা তো জিওলিন দেয় না।

ওরা অভ্যস্ত। ইমিউন। আধপেটা খেয়ে কীভাবে বেঁচে আছে আবার উদয়াস্ত খাটছে, ভাবতে পারিস?

ট্যাঙস ট্যাঙস করতে করতে রোদের মধ্যে দিয়ে হাঁটা। মাইল পাঁচ তো হবেই।

মধুবন বলল—দাদা, জিলিপি ভাজছে। তেলেভাজা।

ধারেকাছে কোনও ডাক্তার হাসপাতাল নেই মধুবন, উলটোপালটা খেয়ে অসুখ করলে কে দেখবে?

তোর রিসার্চের কদ্দূর?

হচ্ছে, আরেকটু বাকি আছে। মৌজাটাই পুরো এইরকম, চাষবাস তেমন হয় না। ক্যাশ ক্রপ বলতে কিছু নেই। ইল্ড খুব সুবিধের নয়। একটা খাল আছে। বর্ষায় ছাড়া তেমন জল নেই। কুয়ো ইঁদারা আছে। কিন্তু টিউবওয়েল তেমন নেই। তোকে কি কলকাতায় রেখে আসব?

না, কেমন গোঁয়ারের মতো মধুবন বলল—তুই যদি পারিস তো আমিও পারব।

হাট থেকে টাটকা কুচো মাছ আর ডিম কিনল রুস্তম। মুশুর ডাল দশ কেজি। বেশ কিছু সবজি। সবই অবশ্য শুকনো শুকনো। আলু কিনল, তা-ও কুড়ি কেজি। দু'জনে ভাগাভাগি করে মালগুলো নিল। মুড়ি তেলেভাজা খাওয়া হল।

আহ্লাদে আটখানা ঠাকুমা। বললেন—ছাওয়ালটার মন ভাল। দেকেই আমি বুজেচি।

মাছ কিছু পাশের বাড়ি দেওয়া হল। ঠাকুমা বললেন—দ্যাকো মেয়ে আমি কেমন বাটি চচ্চড়ি রাঁধি। মাছ বেছেধুয়ে নুন হলুদ তেল প্যাঁজ দিয়ে চড়িয়ে দোব, দ্যাখ না দ্যায় হয়ে যাবে।

অনেক দিন পর আলু, অনেক দিন পর মাছের আঁশ গন্ধ। রাত্তিরের জন্য পাতলা করে ডাল রান্না করে রাখা হচ্ছে। মুড়ির সঙ্গে খেয়ে রাত্তিরে পেটটা একটু ভরে।

রুস্তম তার টেপরেকর্ডার নিয়ে আরও দূরে দূরে যেতে শুরু করেছে। মধুবন বাচ্চাগুলোকে জড়ো করে পড়াচ্ছে। মহিলারাও এসে বসছে।

হঠাৎ একদিন ভারী বৃষ্টি নামল। সে কী তুমুল বৃষ্টি রে বাবা। চার দিক ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার আওয়াজে কান পাতা যায় না। যার যেখানে যা হাঁড়িকুড়ি বালতি কলসি আছে সব জল ভরে। বৃষ্টির জল একটু থামে বৃষ্টি আবার নামে। কারও দেয়ালই ধসে গেল। কারও চাল উড়ে গেল। চাল দিয়ে জল তো পড়ছেই। বাইরে আর শোয়া যাচ্ছে না। ঘরের মধ্যেই সব গুঁতোগুঁতি। তবু কী আনন্দ! কী আনন্দ!

শহর কলকাতায় তখনও হা বৃষ্টি যো বৃষ্টি। একেক দিন আকাশ মেঘলা হয়। আরও ভ্যাপসা গরম। তার ওপর থেকে থেকে লোডশেডিং শুরু হয়েছে। নিয়ম মেনে নয়, যখন তখন। দুপুর দুটোয় চলে গেল। রাত্তির একটায় চলে গেল। পঙ্কজদের কমপ্লেক্সে লোকে এইসান এ সি চালিয়েছে যে ওভারলোড হয়ে একদিন গদাম গদাম করে একটার পর একটা মিটার বোমার মতো ফেটে আগুন ধরে গেল। বাপ রে সে কী আগুন! সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামা যাচ্ছে না। মিটারগুলো সিঁড়ির নীচেই। পঙ্কজ আজকাল নানান কিসিমের তালবাদ্য সিনথেসাইজার নিয়ে পড়েছে। একমনে বাজাচ্ছিল। ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে। এমন সময়ে গদাম গদাম গদাম। সঙ্গে সঙ্গে পঙ্কজ খাটের তলা খুঁজছে। যাচ্চলে এসব খাটের তো তলা নেই। সব বক্স। কী করে পঙ্কজ! টেবিলের তলায় ঢুকে পড়ল। ঠকঠক করে কাঁপছে। টেবিলের ওপর থেকে সব বইখাতা কলমদানি খাটের ওপর সরিয়ে সিনথেসাইজারখানা সেখানে রেখেছিল। তা ছাড়া দুটো ড্রাম। চেয়ারটাকে ধাক্কা মেরে সেই টেবিলেরই তলায় সেঁধিয়ে গেছে পঙ্কজ। কাঁপুনি একটু থামলে ভাবছে—মাওবাদী না কে এল ও না আলফা, না কি আলকায়দাই ঢুকে এল? পকেট থেকে সেলফোনটা বেরিয়ে আছে। পঙ্কজ এস এম এস পাঠাল পাবলোকে—পাবলো, হেল্প! পুলিশে খবর দে, আমাদের বাড়িতে জঙ্গি হামলা।

কী বলছিস!

আর কী বলছে! পঙ্কজ তখন আরেকটা হেল্প লাইন ধরেছে—কার্জন পুলিশ ডাক, আমাদের বাড়িতে আলকায়দা...

কার্জন ঠান্ডা গলায় বলল—বন্ধুলোকের সঙ্গে কায়দা করলে আলকায়দা আসবেই।

পঙ্কজ শুনল, কিন্তু তার মাথার মধ্যে কিচ্ছু ঢুকছে না। এমন সময়ে জানলা দিয়ে ঘন কালো ধোঁয়া ঢুকতে লাগল। চার দিকে আওয়াজ—আগুন আগুন।

বল্লীর ফোন বাজল—বল্লী, আগুনে পুড়ে মারা গেলাম। বাই।

উন্নির ফোন বাজল—উন্নি। তোদের পঙ্কজ শেষ। বাই।

পঙ্কজের বন্ধুদল যখন ওদের বাড়ি পৌঁছোল, তখন পুলিশ থিকথিক করছে। দমকলের পাইপের মুখ থেকে গ্যাস বেরোচ্ছে আগুন নিভে গেছে, কিন্তু তখনও ধোঁয়া প্রচুর।

কার্জন একজন কনস্টেবলকে জিজ্ঞেস করল—আলকায়দার জঙ্গিটাকে ধরতে পেরেছেন?

অ্যাঁ? কনস্টেবল চমকে উঠে লাঠি উঁচিয়ে কার্জনকে তাড়া করল।

পাবলো এগিয়ে গিয়ে বলল—নিরীহ গোবেচারা মানুষ দেখলেই আপনাদের লাঠি ওঠে, না? লন্ডনের টিউব স্টেশনে এইভাবেই একজন ইনোসেন্ট মানুষকে খুন করেছিলেন।

অ্যাঁ? আমি আবার কাকে খুন করলুম! আচ্ছা ফ্যাসাদের চাকরি হয়েছে! একজন বলছে আলকায়দা, একজন বলছে লন্ডনে গিয়ে খুন করে এসেছি। মহা পাগলা পাবলিক তো!

পঙ্কজদের ব্লকের সবাই ছাদে উঠে গিয়েছিল। ধোঁয়ায় তাই অতটা কাবু হয়নি। কিন্তু পঙ্কজ যেহেতু

টেবিলের তলায় মুখে খবরের কাগজ চাপা দিয়ে গোঁয়ারের মতো বসে ছিল, সে প্রচুর ধোঁয়া খেয়েছে এবং অজ্ঞান মতো হয়ে গেছে।

পুলিশ দরজা ভাঙে, দমকল নির্বিচারে চতুর্দিকে জল ছিটিয়ে যায় এবং বন্ধুরা টেবিলের তলায় পঙ্কজকে আবিষ্কার করে। সে নার্সিংহোমে যায়। সুবুল ডাক্তারের নার্সিংহোম—পাবলোই ব্যবস্থা করে দিল। সেখানে দু'দিন ডাক্তার-নার্সদের আদর খেয়ে পঙ্কজ খোকা বাড়ি ফিরলেন। তবে নিজের বাড়িতে নয়। এক নম্বরের বন্ধু পাবলোর বাড়ি।

পঙ্কজের হল একটু মুশকিল কেননা পাবলোর বাবা সুহৃৎবাবু ও মিহিরকিরণ সুযোগ পেলেই তাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করেন। পেছনে পড়ে আছেন যাকে বলে। পঙ্কজ দিব্যি চায়ের সঙ্গে মুচমুচে পকোড়া খাচ্ছিল, সামনে পাবলো আর তার বোন শম্পি সকরুণ মমতাময় দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রয়েছে, তারাও পকোড়া খাচ্ছে, কিন্তু পঙ্কজের নার্সিং সম্পর্কে তারা খুব যত্নশীল।

সুহৃৎবাবু কাগজ পড়তে পড়তে বললেন—স্ট্রেঞ্জ, তুমি টেবিলের তলায় গেলে কেন? বাড়িতে ডাকাত-টাকাত পড়লে বেগতিক দেখে মানুষ লুকোয় বটে। আগুন ঢুকলে কি তোমাকে টেবিলের তলা বলে ছেড়ে দিত?

শম্পির সাততাড়াতাড়ি কথা বলা চাই—না মেসো, ও ভেবেছিল আলকায়দার আক্রমণ!

তখন মিহিরকিরণ বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলেন—অ্যাঁ, তুমি কি তলে তলে জঙ্গি-টঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখো! সেক্রেটারিয়েট গেল, অ্যাসেমব্লি গেল, হাইকোর্ট গেল, আলকায়দা একেবারে বেছে বেছে পঙ্কজ ধুধুরিয়ার বাড়ি, কী যেন কমপ্লেক্সটার নাম 'সংকেত'। হ্যাঁ 'সংকেত' আক্রমণ করে বসবে? তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখতে হচ্ছে তো!

সুহৃৎবাবু সমানে মাথা নাড়ছেন—না হে, কাজটা তুমি ভাল করোনি। তোমার উচিত ছিল...

আচ্ছা বাবা, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আবার এত সময় নষ্ট করা কেন? পাবলো বাবাকে ধমকায়।

নেক্সট-টাইম যখন আগুন লাগবে একটা কম্বল গায়ে দিয়ে ছাদে উঠে যাবে। ওপেন জায়গায়। এবং পাবলোরও আগে দমকলকে ফোন করবে। জিরো ডায়াল করে লালবাজারেও করতে পারো ফোনটা। দে উইল টেক কেয়ার অব দমকল। আসল কথা পঙ্কজরাম, বুঝলে—তুমি একটু মানে বেশিই ভিতু। না না এটা ঠিক নয়। এতটা ভয়! তোমার বয়সের একটা ছেলে হবে ডাকাড়ুকো, নওজওয়ান তোমরা। তুমি টেবিলের তলা! নাঃ এটা ঠিক...

আচ্ছা বাবা, একে ও শেকি হয়ে রয়েছে, ওকে আবার নেক্সট টাইম আগুন লাগার ভয় দেখাচ্ছ?

মিহিরকিরণ বললেন—এ তো দেখছি ভয়ে জুজুবুড়ি টাইপ! নাঃ এই বয়সের ছেলে! তোরা ওর একটা কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা কর। সত্যিকারের বিপদ হলে ও কী করবে?

দুই ভায়রাভাই মিলে নিজেরা এদের বয়সে কত ডাকাবুকো ছিলেন সেই সব গল্প মারতে লাগলেন। পঙ্কজ প্লেটে পকোড়াগুলো নাড়াচাড়াই করছে কাঁচুমাচু মুখে। লজ্জায় মুখে তুলতে পারছে না।

কী রে খা!—লজ্জা পাচ্ছিস কেন?

মিহিরকিরণ চলে যাচ্ছিলেন নিজের বীরত্বকাহিনি পেশ করার পর, থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—আবার লাজুকও? নাঃ পাবলো, তোদের জেনারেশনে লাজুক-টাজুক আমি এই ফার্স্ট দেখলুম। টেবিলের তলা—লাজুক—নাঃ।

এরপরে পঙ্কজ জেদ ধরে সে বাড়ি চলে যাবে। তাদের বাড়ির ইলেকট্রিক কানেকশন যে সি ই এস সি কেটে দিয়েছে, ধোঁয়ার কালিতে, সব কালো হয়ে আছে—সে সব সে মানতে চায় না।

দার্জিলিঙে খবর গেল। পঙ্কজের বাবা বিনোদ ধুধুরিয়া বললেন—ফায়ার? তো অব্ তো সব ঠিকঠাকই হ্যায়। ক্যা বোলা? পঙ্কজকো নার্সিংহোম ভেজনা পড়া? উও উল্লু একদম ফার্স্টক্লাস ডরপোক হ্যায়।

পাবলো কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল—সব বাবাই একই রকম সেলফিশ অ্যান্ড ইনসেনসিটিভ।

শম্পি বলল—এর মধ্যে সেলফিশনেসের কী দেখলি? তুই যা-ই বল, আমাদের বাড়িতে ওরকম কিছু হলে আমি অন্তত টেবিলের তলায় লুকোতুম না।

পঙ্কজ দু'কানে আঙুল দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—ওফ টু মাচ, ইটস টু মাচ।

পাবলো বলল—রিয়্যালি শম্পি, আফটার অল আমরা হলুম শিল্পী। একটু ভয়, একটু লজ্জা, একটু হেজিটেশন, একটু প্যানিক আবার হঠাৎ অ্যাগ্রেশন...এরকম একটু ক্রমশই গ্রো করতে থাকবে আমাদের ভেতর। তুই খেয়াল কর। এই চেঞ্জটা উচ্চৈঃস্বরে বলে দিচ্ছে আমরা ঠিকঠাক পথেই এগোচ্ছি! চল পঙ্কজ, আমরা রিহার্স্যালে যাই। তুই লজ্জা ঘৃণা ভয় সব ঝেড়ে ফ্যাল। দু'জনে প্রেমসে লেগে পড়ি। পঙ্কজকে প্রায় বগলদাবা করে পাবলো লম্বা দিল।

শম্পি বলল—যা ব্বাবা! এটাও তো দেখছি খেপে গেল!

সুহৃৎবাবু কাগজটা তুলে নিয়ে যেতে এসেছিলেন, বললেন—আমি তো বরাবর জানি পাবুলটার মাথার স্ক্রু ঢিলে। তুই আজ জানলি!

বাজার-হাট, যানবাহন, দোকানপত্তর, হাজার হাজার মানুষজন, তাদের চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, হই-হল্লা এইসব দু'পা গেলেই, অথচ তোমার বাড়িটা নির্জন নিভৃত, শান্তির নীড়। সেখানে ওই আওয়াজ ওই হট্টমেলা পৌঁছোয় না। এরকম জায়গা কলকাতার দক্ষিণে একটাই আছে। সে হল ফার্ন রোড। এ দিকে গোলপার্ক ও দিকে গড়েহাটা। কোলে বালিগঞ্জ গার্ডেন্স ঝমঝম করছে—সব সময়ে সার দিয়ে সব খাবার দোকান, রাস্তায় ঠ্যালাগাড়িতে চাওমিন রোল। তার পাশেই ভাঁড়ের চা। ফুল চাও? ফুটপাত জুড়ে ফুলঅলারা বসে গেছে। বিয়ে কি শ্রাদ্ধ কি জন্মদিনের বাড়ি চাও? আছে, ভাড়া দেয়। টাঙাইল শাড়ির সেল—বিশুদ্ধ ফুলিয়া। পুরাতন নয়। টোয়েন্টি পার্সেন্টি রিডাকশন। ভেজিটেবল ডাইয়ে নিজ শিল্পীদ্বারা ছাপা শাড়ির এগজিবিশন—ওই বালিগঞ্জ গার্ডেনেই। সোজা চলে গেলে তুমি খিড়কি দিয়ে গড়িয়াহাট মার্কেটের মধ্যে ঢুকে যেতে পারছ। দু'পা হেঁটে রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে সারাদুপুর পড়াশোনা করে হেলে দুলে বাড়ি ফিরে এলে। ট্যাক্সি চাও? চলতিই পেয়ে যাবে, মোড়ে গেলে তো ভাবনাই নেই। ফার্ন গাছের যেমন একটা একটা ডাঁটি থেকে সরু সরু পাতা বেরোয় সবটা মিলিয়ে তবে একটা পাতা, ফার্ন রোডও তেমন বালিগঞ্জ গার্ডেন্স থেকে সরু সরু করে বেরিয়েছে। তিন চারটি সরু-লম্বা গলি। দু'ধারে সব তালঢ্যাঙা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গলিতে ঢুকলে, আর শব্দবিজ্ঞানের কী আজব নিয়মে কে জানে টুপ করে ডুবে গেল হট্টরোল। এই গলিদের দ্বিতীয়টায় ঢুকে এগোও। এ-গলিটা বাঁ দিকে বেঁকে গেছে, এইখানে কর্নার প্লটে তিনতলা বাড়ি। একতলায় রেশন দোকান, ব্লাউজের দোকানের কারখানা। নিশিদিন সেখানে সেলাই চলছে, মেশিন তো চলছেই সেই সঙ্গে হেম সেলাই, বোতাম ঘর, বোতাম বসানো। চুপচাপ সব কাজ করে চলেছে। সামনের দিকে অবশ্য গ্যারাজ। একটি গাড়ি আর একটি মোটরবাইক রাখা আছে। দোতলায় দক্ষিণমুখো ঘর। জানলা দিয়ে রোদ আর হাওয়া লুটোপুটি খাচ্ছে। কোলে ছোট্ট বারান্দা। চেয়ারে বসে টেবিলে কিছু রেখে মেয়েটি নিবিষ্টচিত্তে পড়ছে। রং ময়লা। চকচকে চোখে সরু কালো ফ্রেমের চশমা-আঁটা। চুলগুলো খুব কোঁকড়া, মাথার ওপর ঝুড়ির মতন হয়ে আছে। হাফ প্যান্ট আর ঝোল্লাঝাল্লা টপ পরে আছে। ইনি হলেন বল্লী ঠাকুর। হঠাৎ দেখলে কম বয়সের ছেলে বলেই মনে হবে। ইনি আরও অনেকের মতো দুই পি অর্থাৎ পাবলো ও পঙ্কজের হার্ট থ্রব।

কী পড়ছে বল্লী?—স্টেপল করা একতাড়া কাগজ পড়ছে। 'একটি অজ্ঞাত পরিচয় মনুষ্যের আত্মজীবনী।'

"আমি একটি বাপে-তাড়ানো, মায়ে-খেদানো, ভাইয়ে ঠোকরানো, পিয়ার—পীড়িত, অশান্ত, সান্ত্বনাহীন, প্রান্তিক মানুষ বিশেষ। বাবা-মা বড্ড আদর করে নাম দিয়েছেন ক্যাবলা। তাকেই নানা ভাবে বেঁকিয়ে চুরিয়ে নানান ভ্যারাইটি (বৈচিত্র্য) বার করে নেয় লোকে যেমন—ক্যাবলরাম,

ক্যাবলাকান্ত, কেবল, ক্যাবলাচরণ, ক্যাবলাপদ, এমনকী বললে বিশ্বাস যাবেন না ক্যাবলাকুসুম, কেবলসুন্দর পর্যন্ত। নামের অষ্টোত্তর শতনাম যতই হোক, ক্যাবলটি থাকেই।—উচ্চারণ করার সময়ে প্রত্যেকে নিজের নিজের মৌলিক প্রতিভাজাত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ উচ্চহাস্য মিশিয়ে নিজস্ব কায়দায় ক্যাবলটি উচ্চারণ করে থাকেন, যাতে করে আমি ক্যাবলা হই বা না হই, একেবারেই ক্যাবলা প্রতিপন্ন হই। "হোয়াটস ইন আ নেম" কোন মহামতি যেন বলেছিলেন—শেক্সপিয়র কিংবা মোক্ষমুলর—তিনি মানবচরিত্রের কিছুই জানতেন না। প্রকৃতপক্ষে নামই সব। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা—অন্য কিছু মহাজন বলেছেন। ঠিক বলেছেন। একটি মানুষকে কী করে শুধু নাম দিয়ে ছোট, অধম, মূল্যহীন, এলেবেলে করে দেওয়া যায় আমার নামটি তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার উলটোটাও সত্যি। নামের দাপে গগন ফাটে, শুধু নাম দিয়ে একটি অকিঞ্চিৎকর মানুষকে অনেক অনেক ওপরে তুলে দেওয়া যায়। নাম একটি মই বিশেষ। উদাহরণ: আমার দাদার নাম—আলোকসুন্দর। আলোক বলেই তাকে ডাকা হয়ে থাকে। তার বেলা অন্য কোনও ডাকনাম নেই। সে ভ্যাবলা বা ন্যাপলা বলে যে আমার ক্যাবলা নাম তা কিন্তু নয়। খুব আদুরে মুহূর্তে আমাদের মাতৃদেবী তাকে 'বাবু বাবু' করে ডেকে থাকেন। যদিও বাবু ডাকবার বয়স তার চলে গেছে বলেই আমি মনে করি। মধু ঝরে ঝরে পড়ে তা থেকে। প্রসঙ্গত আলোকসুন্দরের সঙ্গে মিলিয়েই বোধহয় আমার পরম পূজনীয় গুরুজনরা আমাকে ক্যাবলাসুন্দর বলে ডেকে থাকেন মর্জি-মেজাজ অনুযায়ী। আমার একটি পোশাকি বা ভাল নাম অবশ্য তাঁরা কৃপা করে দিয়েছেন। কিন্তু সেখানেও কিছু শব্দজব্দ রসিকতা আছে—অচ্যুতনন্দন। তাঁরা কি জানতেন না এ-নামে কেউ কখনও কাউকে ডাকতে পারে না! নিজের নামের বানান শিখতে গিয়ে কি আমার কম পেনসিল ভেঙেছে শৈশবে! তার পরে নামের মানে! তাই নিয়েই কি কম হেনস্থা নাকি? বলা বাহুল্য পূজ্যপাদ মাস্টারমশাইরা অক্লেশে আমাকে অচ্ছুৎ অচ্ছুৎ করেন, হরিজনদের জন্য মন্দির খুলে দেওয়ার এই যুগে তাঁরা যে নিজেদের কত দুর্গতিশীল প্রমাণ করছেন না বুঝেই। সহপাঠীরা অবিলম্বে ডাকনামের খোঁজ পেয়ে যায়। কেননা অচ্ছুৎ শব্দটা এই প্রজন্মের কাছে র‍্যাগিংয়ের জন্য যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ নয়। তারা সহর্ষে 'ক্যাবলা এই ক্যাবলা' করে আমার কান ঝালাপালা করে দেয়। দরকারে যত না অদরকারে ডাকে তার চেয়ে ঢের বেশি এবং বড়ই আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। ক্লাসের ক্যাবলাতম ছেলেও আমাকে ক্যাবলা ডাকতে ডাকতে কলার তোলে।

তুলনা ও প্রতিতুলনায় অর্থাৎ কমপেয়ার ও কনট্রাস্টে আলোকসুন্দরের ও অচ্যুতনন্দনের সম্বন্ধে কী কী তথ্য বেরিয়ে আসে দেখুন।

১। আলোকসুন্দরের চুল খাড়া খাড়া, সে সবেতেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে খ্যাঁকশেয়ালের মতো হাসে। অপর পক্ষে অচ্যুতনন্দনের চুল মাথায় সহজেই পাট করা যায়, সে অত্যন্ত ভদ্র। তার হাসিতে সাধারণত আওয়াজ হয় না। হলেও তা স্বাভাবিক কিশোরসুলভ। আলোকসুন্দরের নাম—বিদ্রূপসুন্দর দিলে কি অনেক মানানসই হত না?—পাঠকের কী অভিমত?

২। আলোকসুন্দর মোটেই আলোকপ্রাপ্ত নয়। তার ন্যাবা হয়েছিল, জনৈক হাতুড়ের পরামর্শে তাকে আমাদের মাতৃদেবী একটি মালা পরান। তাতে সে আপত্তি করেনি। মালা পরে হলুদ চোখে যখন সে ইতি-উতি তাকাত তাকে অনেক বেশি ক্যাবলা এবং অন্ধকারসুন্দর দেখাত। অপর পক্ষে অচ্যুতের জলবসন্ত হওয়ায়, তাকে মৎস্য মাংস বঞ্চিত করার চেষ্টা হয়েছিল। যদিও ডাক্তারের পরামর্শ ছিল প্রোটিন আহারের পক্ষে। সে সময়ে অচ্যুত মৎস্য-মাংস ব্যতীত হাঙ্গার স্ট্রাইক করবার সিদ্ধান্ত নেয়। মৎস্যাদির লোভে নয়, বিজ্ঞানের স্বার্থে, লোকশিক্ষার স্বার্থে। সে প্রমাণ করেই ছাড়ে যে জৈব প্রোটিন আহারে সে অনেক শীঘ্র দেহবল ফিরে পেয়েছে। তার পর থেকে বাড়িতে কারও জলবসন্ত হলে আর নিরামিষ ও বার্লি-পথ্যের অবতারণা হয়নি। কুসংস্কার দূরীকরণে এটি কি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নয়?

৩। আকৃতি-প্রকৃতিতেও আলোকসুন্দর আদৌ সুন্দর নয়। দৈহিক রূপ ঈশ্বরদত্ত বা বলা যায় জিনদত্ত। তা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি সভ্য মানুষের লক্ষণ নয়, আমি সভ্য উদার সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ। এ নিয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। কিন্তু যখন আলোকসুন্দর, যথেষ্ট কৃষ্ণবর্ণ, গুলি চক্ষু, উদ্ধতকর্ণ ও ব্যোমকেশ হওয়া সত্ত্বেও 'হ্যান্ডসম' ও পুরুষোচিত খ্যাতি পায় এবং আঠারোতেই কর্কশ দাড়ি-গোঁফাক্রান্ত তাকে বালসুলভ 'বাবু, বাবু' ডেকে আদিখ্যেতা করা হয় এবং অচ্যুত গৌরবর্ণ ও চোদ্দোয় দাড়ি-গোঁফহীন সুকুমার থাকে বলে তাকে মেয়েলি, মাকুন্দ বলা হয়ে থাকে তখন বাইরের আকৃতির প্রসঙ্গ না এসে কি পারে?

প্রকৃতিতেও আলোক স্বার্থপর। প্রমাণ সে নিজের টি-শার্ট একই সাইজ হওয়া সত্ত্বেও কখনও ভাইকে ধার দেয় না এমনকী পিতৃদেব একদিন একটি পরে ফেলেছিলেন বলে সে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে। অচ্যুত পরার্থপর—সে অকাতরে দান করে। দরিদ্রকে অন্নদানে করার সামর্থ্য তার এখনও হয়নি, কিন্তু দরিদ্রের ছেলেকে সে নিজের, দাদার এবং বাবার জামাকাপড় দিয়ে থাকে। কেউ টের পায় না। বাড়িতে তুলকালাম হয়, সে নীরব থাকে। দাদার টিউটোরিয়ালের বিশেষ নোটের খাতা জেরক্স করে সে দাদারই টিউটোরিয়ালহীন বন্ধুদের সাপ্লাই দেয়। নিজের অঙ্কের খাতা, ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর লেখা খাতা সে নির্বিচারে ক্যাবলা বন্ধুদের ধার দেয়, ঠিক এবং ভুল অঙ্ক, ঠিক এবং ভুল তারিখসমেত। আকবরের দীন-ইলাহির মর্মকথায় সে বাহাই-ধর্মের উল্লেখ করায় কালাতিক্রমণ দোষ ঘটেছে বলে তিরস্কৃত হয়। সেই উত্তরপত্রটিও সে অকাতরে পরখাতা-পিপাসু সতীর্থদের দিয়ে থাকে।—তিন তফা প্রমাণাদি দাখিল করলাম পাঠক ভেবে দেখুন। অভিমত দিন। আপনাদের অভিমত পাঠাবেন ৭৫৭৫ নম্বরে এস এম এস করে...'

এত মন দিয়ে বল্লী পড়ছিল যে এর মধ্যে যে দরজার ঘন্টি বেজেছে, তাদের কাজের লোক খুলে দিয়েছে সে কিছুই টের পায়নি। ঘরের মধ্যে যে মার্জার চরণে দুই মূর্তি ঢুকেছে তা-ও সে বুঝতে পারেনি। পেছন থেকে একটি হাত এসে খপ করে কাগজগুলো তুলে নিল। বল্লী চমকে মুখ তুলে দেখে ফরসা গোলমাল একটি মুখ সরে যাচ্ছে—কার্জন। পেছনে দাঁড়িয়ে পাবলো বলল—নিজেই দ্যাখ রে কার্জন গদ্দার কে, মিথ্যুক কে! ঠিক বলেছিলুম কি না!

দু'জনে দুটো মোড়া টেনে বসল। বল্লী হেসে বলল—কী করে ধরলি?—সে একটুও অপ্রস্তুত হয়নি।

সিম্পল ডিডাকশন, ওয়াটসন। সার্কামস্ট্যানশ্যাল এভিডেন্স—পাবলো বলল। পঙ্কজ বল্লী পাবলো তিনজনের উপস্থিতিতে কাগজের রোলটা কার্জন বল্লীর টেবিলে রাখে। ভুলে চলে যায়। দু'মিনিটের মধ্যে ফিরে আসে--নো পঙ্কজ, নো পাবলো, কাগজ ভ্যানিশ। পাবলো জানে সে নেয়নি। পঙ্কজ হ্যাজ বিন ক্লোজলি এগজামিন্ড। সে নেয়নি। পড়ে রইল বল্লী। সোজা হিসেব সে-ই নিয়েছে, ব্যস। প্রথমে, বল্লী নিয়েছে অথচ স্বীকার করছে না—এটা বল্লীর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না। তাই টিকটিকি একটু মিসলেড হয়। তারপর দেখা গেল লজিক বলছে—বল্লী ইজ দা কালপ্রিট। তখন টিকটিকি চরিত্রের ব্যাপারটা ন্যাচার্যালি ইগনোর করে।—এখন দ্যাখ ধরার কাজটা চ্যালেঞ্জ ছিল ধরে দিয়েছি। কেন নিয়েছিস, কী মতলবে, সে কৈফিয়ত তুই কার্জনকে দিবি। আমার কথা আমি রেখেছি। এবার তোরা বোঝ—বলে টলে দু'লাফে পাবলো ঘরের বাইরে চলে গেল।

মুচকি হেসে বল্লী বলল—খাসা লিখেছিস কিন্তু প্রান্তিক, সহর্ষে, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব...র‍্যাগিংয়ের ইঙ্গিতবহ...গুলি-চক্ষু উদ্ধতকর্ণ...এত সব ভাল ভাল বাংলা সংস্কৃত কোত্থেকে শিখলি রে?

তোরা যখন ঘাড় গুঁজে সিলেবাস পড়িস আমি তখন হরেক কিসিমের বই পড়ি। বই পড়া ছোট থেকে আমার ভীষণ নেশা। বঙ্কিম টু বুদ্ধদেব বসু সব পড়ে ফেলেছি।

তার পরের?

সব সব। আগেকারটা কত পড়েছি বোঝবার জন্যে বললুম কথাটা। তোর কেমন লাগল?

বললুম তো খাসা। শেষ কর। মজাদার একটা উপন্যাস।

আমি তো তোকে পড়াব বলেই এসেছিলুম। কী ছাইভস্ম হচ্ছে, সেকেন্ড ওপিনিয়ন চাই তো একটা!—তোর চুরি করার কী দরকার ছিল?

জাস্ট কিউরিয়সিটি। বিশ্বাস কর। আনহোলি কিউসিরিটি মানছি। যেভাবে আগলে আগলে আনছিলি আমি ভেবেছি লভ-লেটার। কে দিল, না তুই কাউকে দিচ্ছিস, খুব কৌতূহল হল বুঝলি? খুলে পড়তে গিয়ে দেখি আরে এ যে একটা স্টোরি! তোর লেখা বলে মনেই হয় না। সত্যি তুই লিখেছিস?

সত্যি না তো কি মিথ্যে?

আমি ভেবেছিলুম কোথাও থেকে টুকলিফাই করেছিস। তারপর দেখলুম, বেশ কিছু ক্যারেক্টার চিনতে পারছি। তুই তা হলে রাইটার হচ্ছিস?

ইচ্ছে তো তাই—কার্জন লাজুক মুখে বলল—পরিস্থিতি প্রতিকূল। আমাকে সি এ ফি এ পড়তে হবে। নইলে কম্পুটার লাইনে কি ম্যানেজমেন্ট ঢুকিয়ে দেবে। কী করি বল তো! লাইফ হেল হয়ে যাবে ওসব লাইনে গেলে। তা ছাড়া আমার সময় চাই। অনেক অনেক সময়। তা তুই কি আজই সবে ওটা নিয়ে বসেছিলি?

বল্লী বলল—একরকম তাই ধর। উলটেপালটে একটু দেখে নিয়েছি যে শেষ হয়নি। তারপর তুই এমন ধরপাকড় শুরু করলি! আমি দিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু তখন একটা জেদ চেপে গেছে। মজাও আছে। একটু পড়ে ইন্টরেস্ট পেয়ে গেছি। তারপর তো পরীক্ষা এগিয়ে এল। শেলফের পেছনে রেখে ভুলে মেরে দিয়েছি। মামার বাড়ি গিয়েছিলুম ক'দিনের জন্যে। এসেই হঠাৎ মনে পড়ল দেখি তো! আচ্ছা কার্জন, তোদের বাড়িতে কেউ লেখক আছেন? ছিলেন?

আরে আমার বড়মামাই তো লেখক ছিলেন। মানে হতে চেয়েছিলেন। তা কেউ হতে দিলে তো! দিদিমা কান্নাকাটি শুরু করলেন—ছেলেটা না খেতে পেয়ে মরবে। দাদু হুংকার ছাড়লেন একখানা, মামা সুড়সুড় করে এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে গেলেন। ডি ভি সি-র এঞ্জিনিয়ার। বাড়ি ভরতি বই। তাকের পেছনে তাড়া তাড়া খাতায় পদ্য। মামা আমাকে খুব উৎসাহ দিচ্ছে বুঝলি! বলছে আমার প্রতিভা শেষ করে দিয়েছে সবাই মিলে। তুই লেগে থাক। আদা-জল খেয়ে লাগ। তবে একদম স্পিকটি নট। আমি দুটো পদ্য লিখেই ধরা পড়ে গিয়েছিলুম। তুই স্ট্রিক্ট সিক্রেসি মেনটেন করবি। কাকপক্ষী যেন টের না পায়। খবরদার ঝোলা ব্যাগ নিবি না, প্যান্টের ওপর পাঞ্জাবি পরবি না। চোখের দৃষ্টিটা তোর আনমনা আনমনা হয়ে থাকে, ওটা পালটা। চতুর্দিকে নজর রেখে যাবি। ট্রেনে বাসে বাজারহাটে রাস্তাঘাটে বাড়িতে। মানুষ কীভাবে কথা বলে, কীভাবে চলে ফেরে।

কার্জন বলল—মামার পদ্য আমার গদ্য। লাইন একটু আলাদা। মামার লাইব্রেরি থেকে মেলা বই পড়েছি রে। এই সিক্রেসি মেনটেন করতে গিয়েই যত্ত ঝামেলা। জানিস বল্লী, আমি একটা ছোট, ব্যাটারি সেট টেপ রেকর্ডার কিনেছি। হাতে করে নিয়ে বাজারে, দোকানে ঘুরি। কথাবার্তা টেপ করি।

লড়ে যা। আমি আছি—বল্লী বলল।

এটা জাস্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট বুঝলি?

তা বুঝেছি। কিন্তু আত্মজীবনী এভাবে লিখতে গেলি কেন?

অসুবিধে কী!

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সব নিজেদের ভূত দেখবে যে!

কার্জন হাসল। বল্লীও হাসি হাসি মুখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

তোর ভূত দেখেছিস?

না।

তবে কার দেখলি?

অবভিয়াসলি তোর নিজের, তোর দাদার, বাবা-মা'রও বোধহয়!

কার্জন একটা বেশ বোদ্ধার হাসি দিল, —সিবলিং কনফ্লিক্ট বা সিবলিং জেলাসি একটা খুব কমন থিম, বুঝলি? এটা সিরিয়াসলিও নেওয়া যায়, আবার এটা নিয়ে বেশ মজাও করা যায়। মজাটা করেছি। পড়ে তুই যদি বুঝে থাকিস সত্যিই আমি একটা অ্যাগ্রিভড পার্টি, দাদা বেশি অ্যাটেনশন পাচ্ছে বলে খেপে আছি, বন্ধুরা আমাকে নিয়ে মজা করে, মাস্টারমশাইরাও, তবে বুঝতেই পারছিস খুব ভুল করবি। আমি প্র্যাক্টিক্যালি আমার মা-জ্যাঠাইমার গোপাল। দাদাও আমার প্রচণ্ড বোঝে, বন্ধুদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন তা তো তুই জানিসই। আমার জেঠু বীভৎস মজাদার মানুষ। বাবা গম্ভীর। কিন্তু ঝুনো নারকোল, ফাটালেই ফোয়ারা। আমার দিদি মানে জ্যাঠাতুতো দিদি একটা এক নম্বর ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। চিরকাল। দাদা বা আমি কেউই ওর ধারেকাছে নেই। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের বাড়িতে কোনও টেনশন, কোনও প্রেশার কিচ্ছু নেই। দিদি নিজেও প্রচণ্ড মজা করতে ভালবাসে। যা এক একখানা মেল পাঠায় না। হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবে।

এখন কথা হল ফিকশন বলে কেন? তুই দেখবি ফ্যাক্ট যতই অদ্ভুত হোক তা নিয়ে লেখা, মানে বিশুদ্ধ তথ্য দিয়ে লেখা চট করে সার্থক হয় না। কল্পনা। কল্পনা হচ্ছে সেই জিনিস যা ঠিক পরিমাণে মেশালে তবে জীবন থেকে সাহিত্য পাওয়া যায়। কী রে বোর করছি?

বল্লী বলল প্লিজ, ডোন্ট স্টপ, গো অন।

'আমি'টা কেন নিয়েছি বল তো? ওতে ক্যারেক্টারটার সঙ্গে আইডেন্টিফাই করতে সুবিধে হয়। ওই ক্যাবলা নামে চরিত্রটার মধ্যে ঢুকে গেলুম। মোটামুটি আমাদের বাড়ির যা সেট আপ সেইরকম একটা সেট-আপ কল্পনা করে নিলুম। সুবিধে হল।

বল্লী বলল—দাদাকে না নিয়ে দিদি বা বোনও তো নিতে পারতিস!

বোন বা দিদি? একটু মিন হয়ে যায় না একটা টিন-এজ ছেলের দিদি বোনের সঙ্গে হিংসেহিংসিটা? বোনে বোনে যতটা হয় ভাইয়ে ভাইয়ে যতটা হয় ভাই-বোনে অতটা হয় না। সিরিয়াস হয়ে যেতে পারে। এনিওয়ে, দাদার সঙ্গে খুনসুটির ধরনটা আমার জানা ছকের মধ্যে পড়ে। ওটাই সহজে এসে গেল। কিন্তু এটাই আমার একমাত্র নয়। পোয়েটিক জিনিস লিখেছি, ক্রিটিক্যাল জিনিস লিখেছি, কবিতাও লিখেছি।

তো সেগুলো কবে পড়াবি?

তুই সত্যি ইন্টরেস্টেড?

তবে? আমিও তো একটু আধটু...মানে ওই আর কী!

লিখিস! তুই! বলবি তো।

ধ্যাত বলবার মতো কিছু নয়। তোর মতো এত ভালই নয়। বল্লীর মুখে লজ্জার আভা।

কালই আসছি। তোরগুলো রেডি রাখিস। ঠিক আছে?

ঠিক।—কার্জন উদ্ভাসিত মুখে বেরিয়ে গেল—সি ইউ!

সুহৃৎবরণ শ্যালিকার ফোন পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। একই বাড়িতে ওরা থাকে ওধারে। চব্বিশ ঘণ্টা না হলেও গড়ে তিন-চার ঘণ্টা করে তো দেখছেন রোজ, তবু শালি—তৃষ্ণা যায় না। শালি চিরসবুজ, চিরনতুন, চিরকালের অপ্রাপ্য পরকীয়া। তার সঙ্গে ফস্টিনস্টি জামাইবাবুদের জীবনের মহত্তম সুখ।

কী হে কী খবর! আর কতদিন আমাদের বিরহজ্বালায় জ্বালাবে?

আপনার বোধহয় চিরবিরহ শুরু হতে যাচ্ছে সুহৃৎদা।

কেন? ফ্ল্যাট কিনেছ? মধুমহল ছেড়ে চললে?

ধুত। মধু মধুমহলেই আছে কিন্তু যশো যশোমহলে ফিরছে না।

অ্যাঁ?

দিদি সন্ন্যাস নিচ্ছে।

বলো কী! দার্জিলিঙে গিয়ে সন্ন্যাস? কী, হিমালয়টয় দেখে, না কী?

না হিমালয়ের চেয়েও জ্যান্ত কিছু। জনৈক সন্ন্যাসী বাবা মহারাজকে দেখে।

বুড়ো?

উঁহুহু। মধুক্ষরা খুব সময় নিয়ে অর্থপূর্ণ ভাবে বলল—আপনার বোধহয় একবার আসা দরকার। পাবলোরও।

সুহৃৎবরণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এই সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী আধ্যাত্মিক-আধ্যাত্মিক বাই এই বয়সটাতেই মেয়েদের চেপে ধরে। স্বামী চাকরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। লড়াই শেষ। ছেলে বড় হয়ে গেছে। মাকে আর তেমন দরকার নেই। খাঁ খাঁ শূন্যতা চতুর্দিকে। অমনি ভগবান হাতছানি দ্যান—কোনও সুদর্শন বা যুবক বা দুইই মহারাজের মাধ্যমে। আয় আয়, সংসারের পঙ্কে আর কত ডুবে থাকবি! হল তো সব! এবার আমায় দ্যাখ। সুহৃতের নিজের মা-ই গুরুঅন্ত প্রাণ ছিলেন। সংসার টংসার ছেড়ে দেওঘরের আশ্রমে গিয়ে বসে থাকতেন। বাবা মারা যাবার সময়েও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কি সাধে ঘরজামাই হয়েছেন? মায়ের ষড়যন্ত্র। ছেলে অন্যত্র চলে যাবে, আর দেখাশোনা করতে হবে না। ড্যাংডেঙিয়ে রাজি হয়ে গেলেন। তাঁর দিদি অবশ্য মাকে ও তাঁর গুরুদেবকে খুব ভক্তি করত। তার আর কী! তাকে পড়ালেখা শেষ করিয়েই বিয়ে-থা দিয়ে তবে মা ভক্তিমতী হয়েছেন। শাশুড়ির সঙ্গে তো জেনেটিক মিল থাকার কথা নয়। সাংসারিক মিলমিশও হয়নি। শাশুড়ি নিয়ে ঘর করতেই হয়নি যশোকে। তা হলে? দুটো কেসের মধ্যে কমন ফ্যাক্টর তিনিই একমাত্র। তবে তাঁরই মধ্যে কি এমন কিছু আছে যা মাদের স্ত্রীদের সংসার ত্যাগ করতে প্ররোচিত করে!

পাবলো সেদিন রাত সাড়ে এগারোটায় বাড়ি ফিরে একেবারে বাঘের মুখে পড়ে গেল। গর্জন করছে বাবা—ইয়ারকি পেয়েছ? এটা হোটেলখানা? যখন খুশি আসছ যাচ্ছ, কোনও দায়িত্বজ্ঞান নেই, বাবা-মা কেউ কিছু নয়। খালি বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু এদিকে তো বাপের হোটেলেই খাও। এখনও মা কোলে বসিয়ে পাবুল পাবুল করে ডুডু খাইয়ে দেয়। সেই মা-বাপের কী হল না হল কোনও খেয়ালই নেই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—রাগে গনগনে মুখে সুহৃৎ অপসৃত হলেন।

পাবলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে, একেবারে বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জীবনে কোনওদিন সে বাবার কাছে বকুনি খায়নি। মা বকেছে, দু'ঘা দিয়েছে, কিন্তু বাবা কখনও না। পাবুল বলে সত্যি কথা বলতে কী, মা কোনওদিন ডাকেনি, ডেকেছে বাবাই। বেশি আদরের মুড থাকলে আবার শুধু পাবুল নয় পাবুল বাবুল, যার জন্যে ছোটবেলায় তার বন্ধুরা তাকে বাবলগাম বলে খেপাত। তার ওপর আবার 'বাপের হোটেল?' ওরে ব্বাপ—এমনতর অশ্লীল কথা পাবলো জীবনে শোনেনি। তবে কি ভেতরে থেকে তার রেজাল্ট জেনেছে বাবা? খুব খারাপ? সি গ্রেড? নাকি বাবার হঠাৎ প্রেশার চড়ে গেছে!

শম্পি উঁকি মারছে।—কী হল রে, চেঁচামেচি শুনলুম যেন?

পাবলো ফ্যাকাশে মুখে বসে আছে, মুখে কথা নেই।

শম্পি তাকে ঝাঁকিয়ে দিল—কী রে, বল।

বলব আর কী! জীবনযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল—বুঝলি! কুলি খেটে কি রিকশা চালিয়ে কোনওরকমে যা হোক কিছু...।

তুই-ই বা এত দেরি করলি কেন? মাসি নেই, মেসোর একা-একা লাগছে এগুলো তো একটু ভাবতে হয়!

আরে রিহার্স্যালে মেতে গেছি। খেয়াল নেই।

মেসোর ঘরে উঁকি মেরে এসে শম্পি বলল—মেসো বাগডোগরার দুটো টিকিট বুক করল রে। কালই। ঠিক বলেছি। মাসির জন্যে মেসোর মন কেমন করছে বুঝলি!

তাই বলে অমন অগ্ন্যুৎপাত! এ তো পুরো ভলক্যানো রে! তা দুটো টিকিট কার? বাবার আর মেসোর?

কী জানি! বাবাকে তো কিছু বলতে শুনিনি। বাবা বরং খুশিতে আছে, মায়ের খবরদারি নেই তো! আমি বকেঝকে যা হোক করে ম্যানেজ করছি। মিষ্টির তো পোকা—বাবাটা। এদিকে সুগার এসেছে ব্লাড-টেস্টে।

পাবলো কড়িকাঠের দিকে মুখ করে চিতপাত হয়ে শুয়ে আছে। মাথার তলায় দুটো হাত। ডান পা-টা বাঁ পায়ের উঁচু করা হাঁটুর ওপর তোলা। তার চোখ সাদা। ঘুম নেই। সে খায়নি। মানে খেয়েছে। কিন্তু বাবার সঙ্গে বা সামনে নয়। রান্নাঘরে গিয়ে দেখল রাঁধুনি চিকেন স্টু আর রুটি করে রেখে গেছে। তুলে নিয়ে তার যা ভাগের মোটামুটি খেয়ে নিয়েছে।

সুহৃদ খেতে যানইনি। মিহির এসে বললেন—তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে দাদা।

খাওয়া? সুহৃৎ অবাক হয়ে তাকালেন। খাওয়া কথাটা যেন জীবনে এই প্রথম শুনলেন।

শম্পি, শম্পি-ই—মিহির ডাক পাড়লেন। শম্পিই অবশ্য বেগতিক দেখে বাবাকে পাঠিয়েছে। সে কাছেপিঠেই ছিল।—কী বাবা! বলে এসে দাঁড়াল যে কিচ্ছুটি জানে না।

আরে সুহৃৎদাকে পাবলোকে খেতে দে!

শম্পি বলল ও মেসো, তুমি বাবার সঙ্গে কথা বলো আমি তোমার খাবার এনে দিচ্ছি।

সে মাইক্রোওয়েভ চালু করে দিল। রুটি মাংস সব সুচারুরূপে সাজিয়ে ট্রেতে করে এনে বলল—খাও মেসো, অনেক রাত হয়ে গেছে।

যশো! পাবুল!—বোকার মতো সুহৃৎ বলে উঠলেন।

পাবলো খেয়েছে। মাসিও নিশ্চয় খেয়েছে। তুমি এখন খাও বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে। বাবা, তোমার ওভালটিনটা এখানে দেব নাকি?

ওভালটিন? হ্যাঁ হ্যাঁ দিবি বইকি! তা সুহৃৎদা, কাল তোমার কী প্রোগ্রাম?

মিহিরকিরণ উকিল মানুষ, তিনি জানেন ভালমানুষ সেজে কীভাবে লোকের পেটের কথা টেনে বার করতে হয়।

কাল? কাল তো দার্জিলিং যাচ্ছি। আমি আর পাবুল।

তাই নাকি? হঠাৎ?

যশোর হঠাৎ খুব অসুখ করে গেছে। বুঝলে হে! না গেলেই নয়। জানো তো তোমার শালিটি কেমন আউপাতালি, আর অসুখ-বিসুখ করলেই...জানোই তো—একটু যেন লজ্জা লজ্জা হাসি ফুটল তাঁর মুখে।

দিদির অসুখ! কই মধু তো বলল না কিছু?

কিচ্ছু-উ বলেনি?—ঘোর সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন সুহৃৎ। কতটা জানে এই ঘোড়েল ভায়রাভাইটি! মধু কি আর ওকে বলতে বাকি রেখেছে? এই বয়সে যশো গৃহত্যাগী হতে চাচ্ছে সেটা কার ডিসক্রেসিট! অবশ্যই তাঁর! এই নিয়ে চতুর্দিকে কত জল্পনা-কল্পনা হবে এখন! তার চেয়েও বড় কথা যশো, সেই বাচ্চা হাতির মতো সাদা ধবধবে নরম-নরম যশো আর তাঁর নেই। কোন যেন মহারাজের হয়ে গেছে।

পাবলো জানে, সে যাবে?—মিহিরের কথায় চটকা ভাঙল তাঁর।

ও হ্যাঁ না। মানে সকালে বলব, গুছোতে আর ক'মিনিট লাগবে।

কিন্তু তার আগেই যদি পাবলো গৃহত্যাগ করে?

গৃহত্যাগ? পাবলো? কেন? সে কী? পাবুল পাবুল—সুহৃৎবাবু চটাস, চটাস করতে করতে উর্ধ্বে

চললেন। —পাবুল—কাল আমরা, মানে তুমি আর আমি দার্জিলিং যাচ্ছি। বুঝলে? গৃহত্যাগ-ফ্যাগের মতলব ছাড়ো।

পাবলো উঠে বসল আমি? দার্জিলিং? কেন?

তোমার মা'র অসুখ করেছে। তাকে ফিরিয়ে আনতে।

কী আবার হল মায়ের? তো আমি কেন?

তুমি কেন? মানে? মানে কী কথাটার? জবাব দাও। মানে কী? মায়ের বিদেশবিভুঁইয়ে অসুখ করেছে শুনেও তোমার হেলদোল নেই? আমি কেন! আচ্ছা! এই পুরস্কার। এই রিটার্ন। ছ্যা ছ্যা যশো এই ছেলে তৈরি করেছে!

পেছন থেকে মিহির বললেন—পাবলো, ভাল চাস যদি তো তোর বাক্স গুছিয়ে নে। সত্যিই তো—আমি কেন—মানেটা কী! তোর মা-বাপের অসুখ করলে তোর দায়িত্ব থাকে না?

পাবলো মাথা চুলকে বলল—আসলে আমরা তো আর কাঁধে করে মাকে নিয়ে আসব না যে দু'জন লোক লাগবে! একজন গেলেই তো হল! তা ছাড়া তেমন কিছু হলে সোজা অ্যাম্বুল্যান্সে।

বা বা বা বা!—সুহৃতের গলায় এত জোর, এত রাগ ছিল তিনি নিজেই জানতেন না—শি ইজ রাইট। যা'র একমাত্র ছেলে এইরকমের ক্যালাস তার, তাদের গৃহত্যাগ করাই উচিত। আই আন্ডারস্ট্যান্ড য়ু যশো।—ফুললি ফুললি—বলতে বলতে সুহৃৎ বেগে নিজের ঘরে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

সত্যি দিস ইজ টু মাচ পাবলো—শম্পি বলল।

কাঁধে করার কথাটাই বা তুই উচ্চারণ করলি কী বলে? মিহির খুবই বিরক্ত।

দ্যাখো মেসো, আমি মাকে খুব জানি। মা খুব ঘোড়েল। এর আগে একদিন খবর পেলুম মা'র নাকি স্ট্রোক হয়েছে—অজ্ঞান। দৌড়োতে দৌড়োতে সব কাজকর্ম ফেলে বাড়ি এসে দেখি—ফিস্টি হচ্ছে। মেলা লোক। সবাইকার জন্যে শরবত সাপ্লাই দাও। রাখাল বালক যেমন বাঘ বাঘ বলে মিছিমিছি চেঁচাত!

কিন্তু তার পালে সত্যিই তো একদিন বাঘ পড়ল। বাবা-মা তো পাড়ার লোক নয় যে, মিথ্যে অ্যালার্ম বলে তোমরা উড়িয়ে দেবে। এসব কথা ভাল নয় পাবলো। আমি অ্যাপ্রুভ করছি না। হাইলি অবজেকশবেল।

মেসো, পরশু আমাদের প্রথম শো যে—কাতর কণ্ঠে পাবলো বলল, হল বুক হয়ে গেছে, ইনভিটেশন লেটার চলে গেছে। এখন আমিই মূল আমিই পরিচালক—

কীসের শো? কী নাটক পরিচালনা করছিস?

নাটক নয় ব্যান্ড, মেসো—নিচু গলায় পাবলো বলল।

কীসের ব্যান্ড পার্টি? তুই শেষপর্যন্ত ভ্যাঁপপপোর ভ্যাঁপোর করতে করতে ব্যাগ পাইপ টাইপ বাজাতে বাজাতে রাস্তা দিয়ে প্রসেশন করবি?

উঃ তোমরা যে কোন যুগে আছ! বিটলস শোনোনি? রোলিং স্টোন? স্পাইস গার্লস শোনোনি? বাংলা ব্যান্ড শোনোনি?

তোরা ব্যান্ড বেঁধে গাইবি?

গাইব, বাজাব, র‍্যাপ করব, নাচবও।

বলিস কী রে, তুই তা হলে শিগগির বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছিস? সেলেব? বাব্বাঃ হাতে হাত মিলাও ইয়ার। নাম কী ব্যান্ডের?

ভ্যাগাবন্ড।

বাঃ দারুণ। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। একদম ঠিক।

সত্যি বলছ মেসো!

সত্যি না তো কি মিথ্যে? তোদের জেনারেশনের ছেলেগুলোদের দেখে একদম ঠিক এই কথাটাই এই শব্দটাই মনে আসে। ভ্যাগাবন্ড। সারাদিন কানে মোবাইল, ইয়ার-প্লাগ, জনবহুল রাস্তা দিয়ে লক্ষ্যহীন চলছে। জিনসের পকেট ফেটে ঝুলে গেছে। ফতুয়া ফ্যাতফেতে। চুলে পনিটেল। এক কানে মাকড়ি, এক হাতে বালা। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কিছু বোঝা যায় না। এমনকী—জেন্ডার পর্যন্ত বোঝার বাইরে। ভ্যা-গা-ব-ন্ড। ঠিক! তোমার কেস বুঝলুম। কিন্তু তুমি কাল দার্জিলিং যাচ্ছ। মায়ের অসুখের ওপর আর কোনও ব্যান্ড নেই।

পরে শম্পি বাবাকে বলে—মাসির কখনও অসুখ করেনি। করলে মা আমাদের বলত না? আমাকেও ফোন করেছিল তো। কিছু বলেনি। অন্য কিছু।

মিহির বললেন তুই শিয়োর? ডেঞ্জার টেঞ্জার কিছু?

তা হলেও বলত। অন্য কিছু। মায়ের নানারকম দুষ্টুবুদ্ধি খেলে তো?

তা খেলে। আমাকে কম নাকাল করেছে!

কোনও একটি রহস্যময় কারণে মা মেসোকে দার্জিলিঙে নিয়ে ফেলতে চায়। কিছু একটা মজা!

কিন্তু পাবলো! পাবলো কেন!

পাবলোটা হয়তো মেসোর নিজের আইডিয়া।

একটি বড় ঘর। মেঝেতে কার্পেট পাতা। এক প্রান্তে একটি প্রশস্ত হাতলঅলা আরাম চেয়ারে বসে আছেন অভীপ্সানন্দ মহারাজ। ভ্রমরকৃষ্ণ চুল ও দাড়ির মধ্যে থেকে ফুটে আছে তাঁর গোলাপফুল রং হাসিমাখা মুখখানি। সামনে হাঁটু মুড়ে সমবেত শিষ্যকুল। একেবারে সামনে যশোধরা। স্বামীজি মহারাজের মুখের দিকে তাকিয়ে তদগত। তন্ময়।

তার বোনের হয়েছে বিপদ। এখন দার্জিলিঙে নানা মজা। পরিচিত মানুষকুলকে এখানে দেখে দিদির ভাল না লাগতে পারে, মধুক্ষরার কিন্তু মোটেই খারাপ লাগছে না। তা ছাড়া মধুক্ষরা এখানে নিত্য নতুন অবতারে। বেশিরভাগ দিনই ফুল প্যান্ট, জ্যাকেট। কোনও কোনও দিন সালোয়ার কামিজের ওপর কার্ডিগান। লং স্কার্ট পরেও সে অবতীর্ণ হয়েছে। তার চলন পালটে গেছে। পকেটে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে পাহাড়ি চলা সে রপ্ত করেছে। অচেনারা তো মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেই, চেনার, যেমন মিনিদি সঙ্ঘদি এরাও বলে—তোর যে দশ বছর বয়স কমে গেছে রে মধু! ওদিকে রয়েছে ব্যাঙা-বেঙি। বেঙি যতই বয়সে ছোট হোক, মধু তাকে টেক্কা দিয়েছেই দিয়েছে। বিজয়মুকুলদা চিরকুমার সুতরাং চিরহরিৎ। সুবুলদা আর বিজয়মুকুলদার সঙ্গেই তার আড্ডা জমে সবচেয়ে ভাল। অথচ দিদি এইসব বাধিয়েছে। দিদিকে চোখে চোখে রাখতে হচ্ছে। দিদি রোজ মহারাজের ওখানেই প্রসাদ গ্রহণ করছে। রাত্তিরে শুতে আসে যখন, চোখের তারা শিবনেত্র। শুয়ে শুয়ে জপ করে। ভোরে উঠে প্রাণায়াম। বলে—মধু, নশ্বর জীবন, একটা কি লক্ষটা কে জানে, নষ্ট করিস না। নষ্ট করিস না। কথামৃত শুনবি আয়।

কথামৃত আমি পড়েছি দিদি।

আরে এ যে নতুন যুগের নতুন কথামৃত রে! যুগে যুগে যেমন পৃথিবী পালটায়, সমাজ সংসার মানুষ পালটায় তেমন কথাও পালটায়। না শুনলে বুঝবি না।

এই তো অবস্থা! আসল কথাটা অবশ্য মধু একটু একটু বুঝতে পারে। দিদির চিরকেলে রোম্যান্টিক মন।—নতুন, অ্যাডভেঞ্চার, অজানার দিকে তার চিরকালীন টান। দিদি বড্ড চেয়েছিল একটি জম্পেশ লভ ম্যারেজ। তো বাবা-মা অবিলম্বে তাকে সুহৃদ্দার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। সুহৃদ্দা আদৌ খারাপ নয়। গুণী কৃতি মানুষ, দিদির যত্ন নেয়। অসুখ-বিসুখ করলে তো বিছানার পাশ থেকে নড়ে না। কিন্তু দিদির তাতে মন ওঠে না। একখানা উত্তমকুমার কি বিনোদ খান্না দিদির সঙ্গে দুর্ধর্ষ প্রেম করবে, দিদি তার সঙ্গে ইলোপ করবে। মা-বাবা কাঁদবে, পুলিশে খবর দেবে, অভিশাপ দেবে—কিন্তু দিদি

ফিরবে না। দিদি তার উত্তমকুমারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। প্রেমের এই আটলান্টিক উদ্দামতা আর প্রশান্ত মহাসাগরীয় গভীরতা দেখে শেষপর্যন্ত বাবা-মা মেনে নেবেন। প্রবল ঘটা করে বিয়ে হয়ে যাবে। তারপরে দিদি চিরকাল অমিত রায় লাবণ্যর দীপক-মানসী গোছের একটা জীবনযাপন করবে। দিদির ইচ্ছের খুঁটিনাটি অবশ্য সে জানে না।

কিন্তু সে অনেক সময়েই ঠারে ঠোরে দিদিকে বোঝাতে চেয়েছে প্রেমের বিয়েও ক্রমে ক্রমে একই রকম ম্যাদামারা হয়ে যায়। তাকে আর মিহিরকে দেখেও কি দিদি বোঝে না? সর্বক্ষণ মোটা মোটা আইনের বই নিয়ে বসে আছে, চেম্বারে, আর বক বক বক। কোথায় গেল সেই সপ্রেম চাউনি, সেই কাতরতা! সেই কামনাতুরতা! তার চেয়ে বরং সুহৃদ্দা অনেক অনেক বেশি মনোযোগী স্ত্রীর প্রতি। তার তো সুহৃদ্দাকে বেশ লাগে। বেশ মজাদার মানুষ। দিদিটা চিরকালের গোঁয়ার এবং ভোঁদা। কী যে মাথায় প্রেম সেঁধিয়ে বসেছে। এখন অভীপ্সানন্দকে নিয়ে গদগদ। ভক্তি না আরও কিছু! ভগবান না ঘণ্টা! আবার ফোঁস ফোঁস করে প্রাণায়াম করা হয়। দু'মিনিট পরেই অবশ্য ফোঁস ফোঁসটা ভোঁস ভোঁস হয়ে যায়। ভোঁসলে একটা।

তিন-চারদিন হল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। উত্তর প্রদেশীয়, যুগেশকুমার। খুব জমে গেছে। কে কুইন অব হিল স্টেশনস—শিমলা না মুসৌরি না দার্জিলিং এই নিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা উড়ে যায়। সুবুলদা ঘুরঘুর করতে থাকে। সুবুলদা যদি ভেবে থাকে সে-ই একমাত্র মধুর গপ্পো করার লোক, তো ভুল ভেবেছে। আবার যুগেশকুমার যদি ভেবে থাকে সেই একমাত্র, যদি কোনওরকম আপারহ্যান্ড নেবার সম্ভাবনা দেখা যায় অমনি সে সুবুলদার সঙ্গে জমে যাবে। অত সস্তা না। যুগেশকুমার, সুবুলদা, ব্যাঙা-বেঙি এদের সঙ্গে সে টাইগার হিল ঘুরে এসেছে। দিদি কিছুতেই গেল না—আমি শান্তির জন্য এসেছি মধু, বোঝবার চেষ্টা কর। টাইগার হিল-এ সূর্যোদয় অনেক দেখেছি। এখন জীবনে নতুন সূর্যোদয় হচ্ছে। তুই যা না, ঘুরে আয়।

সূর্যোদয় অবশ্য দেখা হল না। মেঘ সরল না। তবু ঠান্ডায় জমে দই হয়ে ভোর চারটের সময়ে টাইগার হিল যাওয়া তো হল! মধুর এই পথ চলাতেও আনন্দ।

এইরকম এক কনকনে ঠান্ডা, কনকনে হাওয়া, আর ঝুপঝুপ বৃষ্টির মধ্যে সুহৃৎবরণের ডাকোটা মানে ল্যান্ডরোভারটি দার্জিলিং মল-এ পৌঁছোল। হোটেল সানশাইন-এ আর ঘর নেই। সব ভরতি।

আমার ওয়াইফ রয়েছে—যশোধরা ব্যানার্জি। আমি সেই ঘরেই থাকব। তিনি গোঁয়ারের মতো বললেন—

কিন্তু যেখানে তো মিসেস মুখার্জিও রয়েছেন। কী করে যেতে পারেন আপনি!

তিনিও আমার আপনজন, স্ত্রীর মতোই।

অ্যাঁ? তিনিও আপনার স্ত্রী?

উফফ, স্ত্রী যেমন আপনজন তিনিও তাই। আমার সিস্টার ইন-ল।

আপনি দেখা করে আসতে পারেন। কিন্তু ডবল বেডরুমে, চারজনকে আমরা জায়গা দিতে পারি না। দু'-দুজন জেন্টলম্যান।

রেগে-মেগে সুহৃৎ—আয় রে পাবুল—বলে হোটেল ত্যাগ করলেন।

পাশের হোটেলে একটি ডিলাক্স সুইট পেলেন। নিয়ে নিলেন। পাবলো গোমড়া মুখে সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমে চলে গেল। দার্জিলিং-ই হোক আর যা-ই হোক সে এখন চান করবে।

বৃষ্টি থেমেছে। রোদ হেসেছে। আকাশ ক্লিয়ার। চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে সামান্য জানলা ফাঁক করে সুহৃৎ দেখতে পেলেন—একটি সুন্দরী মড যুবতি হোটেল সানশাইন থেকে বেরিয়ে এল। দু'পা যেতেই এক পুলোভার পরা পুঙ্গব এগিয়ে গেল; দু'জনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছে। আরে সুবুল ডাক্তার না? খুব জমিয়েছে মনে হচ্ছে! এ কী! এ তো মধু! তাঁদেরই মধু! মধু সার্টেনলি সুবুলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেল। ওদিক থেকে আর একটি পুঙ্গব এসে যোগ দিল।

বাইনোকুলারটা ঠিকঠাক ফোকাস করেও লোকটাকে ঠিক ধরতে পারলেন না সুহৃৎ। কদম কদম এগিয়ে চলেছে মধুক্ষরা, তাঁর শ্যালিকা, দুই পুরুষের মধ্যবর্তিনী হয়ে।—ক্যামেরা, ক্যামেরাটা পাবুল! তিনি চিৎকার করলেন।

পাবলো পোশাক পরছিল, বলল—কী? কাঞ্চনজঙ্ঘা বেরিয়েছে নাকি?

আজ্ঞে না। বেরিয়েছে তোমার মাসিমণি, দু'পাশে দুই কলাগাছ মধ্যিখানে মহারাজ।

এইটুকু বলে সুহৃৎ নিজেকে সামলে নিলেন।

ক্যামেরা তো আনা হয়নি বাবা!

বলিস কী! ক্যামেরা তো তোর ব্যাগে সব সময়ে মজুত থাকে!

অন্য ব্যাগ এনেছি যে!

তোর একবারও মনে হল না দার্জিলিঙের মতো সুন্দর জায়গায় বেড়াতে এসেছিস ক্যামেরাটা অবশ্যই আনিতব্য?

কিন্তু বাবা তুমি ভুলে যাচ্ছ আমরা দার্জিলিং বেড়াতে আসিনি, অসুস্থ মাকে নিয়ে যেতে এসেছি। এখনও পর্যন্ত মাকে দেখতেই পেলুম না! কী অসুখ কী বৃত্তান্ত জানলুমই না! স্ট্রেঞ্জ! আমার তো মনে হয় না মায়ের কোনও অসুখ করেছে।

অসুখ গুরুতর। সংক্ষেপে বললেন সুহৃৎ। চল, লাঞ্চটা খেয়ে নিই। তারপর তোর মাকে গিয়ে পাকড়াব।

পাবলো হাঁ করে তাকিয়ে রইল। মিস্টিরিয়াস! এ ভদ্রলোক কখনও রেগে ফায়ার হয়ে যাচ্ছেন। কখনও বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে মাসিকে বেরোতে দেখছেন, আবার মাসিমণি! মায়ের অসুখ গুরুতর অথচ নিশ্চিন্তে মুরগির ঠ্যাং চুষছেন। তার পিতৃদেবকে এত এলোমেলো এত রহস্যময়, তাঁর কথাবার্তায় এমন দ্বিমুখী তাৎপর্য পাবলো কখনও দেখেনি শোনেনি। ইন্টরেস্টিং!

গুরুদেবের ঘরটা কোথায়?—হোটেল 'সানশাইন'-এর কাউন্টারে গিয়ে পাবলোর কান বাঁচিয়ে বললেন সুহৃৎ। পাবলো অবশ্য তখন হোটেলের লাউঞ্জে তন্ময় হয়ে বব ডিলানের পোস্টার দেখছে। তার অন্যতম আইকন। রোল মডেল। মাইনাস বিদ্রোহ। এখন বিদ্রোহের দিন নয়, সমারোহের দিন, সামঞ্জস্য ও সংহতির দিন। সাধু ভাষা, চলিত ভাষা, পরিশীলিত শব্দ, স্ল্যাং, কৃষক মজদুর মেট্রোবাসী সবাইকে গানের মাধ্যমে এক করার দিন। লিরিকের সীমাবদ্ধতা ভেঙে দেবে ভ্যাগাবন্ড। গানের সীমাবদ্ধতাও। কবিতা আসবে, গদ্য আনবে। ব্যাপক ভাবনা-চিন্তার ব্যাপার। আর এই সময়ে বাবাটা তাকে ফালতু দার্জিলিঙে টেনে নিয়ে এল। শো'টা ক্যানসেল করতে হল। খুব, খু-ব ক্ষতি হয়ে গেল। পঙ্কজটা গেঁতো বলে তারা খানিকটা বেঁচে গেছে। খবরের কাগজে অনুষ্ঠানের খবরটা পাঠায়নি। চেনাশোনার মধ্যেই আমন্ত্রণগুলো গেছে।

অভীপ্সানন্দ মহারাজ এখন তো কনফারেন্স রুমে। লেকচার দিচ্ছেন।

কোথায় সেটা?

লাউঞ্জের ও-দিকের দরজাটা খুলে চলে যান।

আয় রে পাবুল!

মঞ্চের ওপর অভীপ্সানন্দ মঞ্চ আলো করে বসে ইংরেজি হিন্দি মিশিয়ে বক্তৃতা করছেন। থেকে থেকেই বলছেন—ভাইয়োঁ ঔর বহেনো।...

একজন বললেন—কোনও গুরুদেবকে কখনও শিষ্যদের ভাইবোন বলে অ্যাড্রেস করতে শুনেছ! হি ইজ আ গ্রেট ম্যান।

হ্যাঁ। বিবেকানন্দ একেবারে, সাক্ষাৎ।—সুহৃৎ মন্তব্য করলেন।

ভিভেকানন্দজিকে ফির আনেকা টাইম হো গিয়া ভাইয়া, কওন জানে মহারাজজি ভিভেকানন্দজিকেই অবতার হ্যাঁয় ইয়া নহি।

পাবলো বলল—ও বাবা, ওই তো মা ফার্স্ট রো-এ বসে বসে দুলছে।

দেখতে পেয়েছিস? কই কই? দোলা তোর মায়ের রোগ। ঠিক ঠিক ওই তো দুলছে। যেন নামতা মুখস্থ করছে।

আরে সিট ডাউন। বইঠ জাইয়ে। —চতুর্দিক থেকে চাপা গর্জন ভেসে এল। সুহৃৎ ভাল করে যশোকে দেখতে পেলেন না।

অসুখ করেছে বলে তো মনে হল না!—পাবলো ফিসফিস করে বলল।

অসুখ গুরুতর, গুরুত্ব দে, তা হলেই বুঝতে পারবি—চাপা গলায় বললেন সুহৃৎ। পাশের ভদ্রমহিলার ভ্রূকুটিতে বললেন—আর বলব না, স্পিকটি নট। এই চুপ করলুম।

তা-ও তো মন্দ বলছেন না। বলব না-টাও একরকম বলা। আওয়াজ সৃষ্টি করা, অমৃতবাণী শুনতে বাধার সৃষ্টি করছে।

বাইরে যান, বাহার যাইয়ে। বাহার যাকে গপসপ কিজিয়ে—চার দিক থেকে আওয়াজ উঠল।

অভীপ্সানন্দ বললেন, দিস ইজ লাইফ। অবাঞ্ছিত আওয়াজ। চতুর্দিক থেকে আসছে, আমাদের অন্তরাত্মার ধ্যান ভাঙিয়ে দিচ্ছে। নিজেতে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। ছোট্ট মেয়েটি ভিড়ে হারিয়ে গেছে। বলছে 'হারিয়ে গেছি আমি'। বিশ্ব নিখিল চেয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না। এখন বালিকাটি কী করবে? দিস ইজ আ কোয়েশ্চেন!

রোয়েগি, কাঁদবে, শি উইল ক্রাই। চার দিক থেকে জবাব এল।

রাইট। তখনকার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এই কান্না! দিস টু ইজ আর কোয়েশ্চেন।

কেউ কেউ বলল—স্নেহশীল মানুষজন।

রাইট। কিন্তু আরও দুই ধরনের মানুষ। এক নম্বর প্রতারক, শিশু পাচারকারী, ভুলিয়েভালিয়ে তাকে নিয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় হল—পুলিশ। তার কর্তব্যই হল আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা। একটি ছোট মেয়ে হারিয়ে গেছে এটাও একমাত্র সে-ই কর্তব্য বোধে দেখবে। সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নেবে। ঠিক কি না?

সবাই মাথা নাড়তে লাগল।

এমন সময়ে এক মহিলা উঠে দাঁড়ালেন—মহারাজজি, হোয়াই ছোট মেয়ে? ছোট ছেলে নয় কেন? হারানো অন্তরাত্মার প্যারাডাইম কী করে মেয়ে হয়! অন্য সময়ে তো আপনারা বয়, ম্যান, হি ব্যবহার করেন। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড গুরুজি। আপনিও? আপনিও হয়তো আপনার অজ্ঞাতসারেই পেট্রিয়ার্কির জালে ধরা পড়ে গেছেন। দিস উই রিজেক্ট।

অনেকে হইচই করে উঠল। কিন্তু স্বামীজি দু'হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিলেন। বললেন—প্রশ্ন। প্রশ্ন হল সাধনার পথে উত্তরণের প্রথম সিঁড়ি। অজস্র প্রশ্ন মাথা তুলবে। তার জবাব খুঁজবে প্রাণ। এক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল তো আবারও এক প্রশ্ন। এইভাবে একদিন আপসে প্রশ্ন শেষ হয়ে যাবে। তখন সংসারময় শান্তি, সংগতি দেখবে প্রাণ। আমি জবাব দিচ্ছি মা আপনাকে। আমাদের এই সমাজ সভ্যতার ইনফ্রাস্ট্রাকচারে একটি ছোট ছেলের চেয়েও একটি ছোট মেয়ে অনেক অসহায়, ভালনারেবল, সে স্বভাবতই অনেক ভিতুও।

সকলেই সায় দিল। ভদ্রমহিলা তবু বললেন—এই জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনটা ঠিক কী বলব, আপনার মুখ থেকে মহারাজ ....না ঠিক...

স্মিতমুখে মহারাজ বললেন—বাস্তবকে তো স্বীকার করতেই হবে। আমি আদর্শ সমাজের কথা বলিনি। এখন সমাজ যেরকম তার কথাই বলেছি। যাই হোক—গুরু হলেন—এই সস্নেহ কর্তব্যশীল পুলিশ। হারিয়ে যাওয়া অন্তরাত্মাগুলিকে তিনি প্রথমে তাঁর মিসিং স্কোয়াডে জড়ো করেন। তারপর শুরু হয় কাউন্সেলিং। প্রশ্নোত্তর। এইভাবে কার কী ঠিকানা জেনে সেখানেই তাকে পাঠান। প্রত্যেকের ঠিকানা, চাহিদা, প্রয়োজন আলাদা ভাইবোনেরা। সবাই মহামায়ার অনন্ত আঙুলের একটি মাত্র। দুটো আঙুল কি কখনও এক হয়?

ক্রাইস্ট দা শেফার্ড-এক লালমুখো গুর্খা ভদ্রলোক বললেন। তিনি ঘনঘন মাথা নাড়ছেন। পছন্দ হয়েছে তুলনাটি।

এই সময়ে পাবলোকে অবাক করে দিয়ে তার বাবা উঠে দাঁড়ালেন। আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?

চারদিক থেকে অস্বস্তির রব উঠল। কিন্তু মহারাজজি সব হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে বললেন—কোয়েশ্চনস আর অলওয়েজ ওয়েলকাম। বাতাইয়ে জি।

সুহৃৎ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—একটি ছোট মেয়ে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু একজন অ্যাডাল্ট, বিবাহিত, সন্তানের জননী যদি বলে 'হারিয়ে গেছি আমি', সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য? তিনি গেলে বলব না কি ইচ্ছে করে গেছেন? কর্তব্য থেকে পালিয়েছেন? তাঁর মতলব মোটেই ভাল নয়।

যশো মুখ ফেরাল। পাবলোর সঙ্গে মায়ের চোখাচোখি হয়ে গেল। চোখ দুটো আস্তে আস্তে বড় বড় হয়ে যাচ্ছে। সুহৃৎ কিন্তু সেদিকে তাকাচ্ছেনই না।

চার পাশে সব আপত্তি করে উঠল।—আহা, ছোট মেয়ের কথা বলা হচ্ছে নাকি? সে তো পথ হারানো মানবাত্মার উদাহরণ প্রতীক। য়ু সিলি ফুল!

ব্যস এইটুকুই আমার বলার ছিল। ওঠ রে পাবুল আমরা চলে যাই। বেলা হল। যাবার। বলে পাবুলোর হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলেন সুহৃৎ। চেয়ার-ফেয়ার ঠেলেঠুলে বেরিয়ে এলেন বাইরে। কনফারেন্স রুমে একটা হইচই উঠল। যশোও ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলেন। সুহৃৎ তখন হোটেলের দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছেন এবং মধুক্ষরা, জিনস ও উইন্ডচিটার পরা মাথায় স্কার্ফ বাঁধা, ঢুকছে!

এ কী জামাইবাবু! পাবলো! কখন এলি! কিছু বলিসনি তো!

পেছন থেকে যশো এই অবসরে তড়িঘড়ি গিয়ে সুহৃতের সামনেটা অবরোধ করে দাঁড়ায়।

তু তুমি... তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

এই বয়সে কোনও মহিলা যদি মহারাজের মিসিং স্কোয়াডে যেতে চায়, তার আপনজনের হক আছে তাকে ওয়ার্নিং দেবার, তার মহারাজকে ওয়ার্নিং দেবার।

চলুন চলুন সুহৃদ্দা। ওপরে আমাদের ঘরে চলুন। মাথা ঠান্ডা করুন।

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী। চল রে পাবুল।—সুহৃৎ হনহন করে নিজ হোটেলের দিকে যাত্রা করলেন। দুই বোনও পেছন পেছন এসে পড়ল।

কেউ কোনও কথা বলছে না।—বাঃ ভারী সুন্দর সুইটটা পেয়েছেন তো সুহৃদ্দা! মধুই শেষে বলে।

যশো এতক্ষণে বললে—তুমি শুধু শুধু আমাকে পাবলিকলি অপমান করলে, আমার এতদিনের স্বামী হয়ে?

এতদিনের স্ত্রী যদি হঠাৎ একটা উটকো মহারাজের সঙ্গে গৃহত্যাগ করতে চায়, স্বামী হ্যাজ এভরি রাইট টু ইন্টারফিয়ার।

কে বলেছে গৃহত্যাগ করেছি? আবার মহারাজের সঙ্গে? ছি ছি! ছেলে শুনছে!

কেউ নিশ্চয়ই বলেছে—মধুর চোখের দিকে চেয়ে সুহৃৎ বললেন। কেননা সে প্রাণপণে চোখ টিপছে।

রং ইনফর্মেশন। আমি দুটো স্পিরিচুআল কথা শুনতে পাব না তাই বলে?

হ্যাঁ স্পিরিচুআল কথা না আরও কিছু। হাঁ করে দেখছিলে তো ওই মহারাজটার দিকে। দিব্যি চেহারাটি বাগিয়েছে, টিপিক্যাল গিন্নি-ভোলানো চেহারা।

পাবলো আর পারল না। তার ভীষণ হাসি পাচ্ছে। সে মাসির হাত ঠেলে ঘরের বাইরে টেনে আনল।

আচ্ছা মাসি, তুমি বুঝি বাবাকে এইসব বলেছ? মায়ের অসুখ বলে বাবা আমাকে নিয়ে এল।

নাঃ, বাবার রাগ আর জেলাসি এই প্রথম দেখলুম। ফ্যান্টাস্টিক। ব্রেভো মাসি!

না রে, সিরিয়াসলি। আমি দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। দিদি দিবারাত্র ওই মহারাজের কাছে পড়ে আছে। বেরোয় না, আমার সঙ্গে খায় না। খালি প্রসাদ ভক্ষণ হচ্ছে। সে একেবারে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। দেখি ঝগড়া কদ্দুর এগোল?

মধুক্ষরা মুখটা বাড়িয়েই চট করে বের করে আনল।

পাবল বলল ঝগড়া কদ্দুর?

মাসি বলল—অনেক দূর। চল, আমরা দু'পাক ঘুরে আসি। খেয়েছিস?

বৃষ্টি। বৃষ্টি! বৃষ্টি—দারুণ চাঁদিফাটা গরমে যখন চড়চড় করে প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়েছিল—মুড়কিশোলা গ্রামে মহোৎসব পড়ে গিয়েছিল। সবাই বাইরে বেরিয়ে এসেছে দৌড়ে। বৃষ্টিতে সব সপাটে ভিজছে। গাছপালা দুলছে। পাখিরা সুদ্ধু গাছের ডালে বসে নিশ্চুপ ভিজছে। কোত্থেকে চাট্টি গঙ্গাফড়িং অবধি এসে গেল। এদের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

পরি বলল, ঠাকমা, খিচুড়ি চাপাও।

পরির মা বলল—না, না। খিচুড়িতে তুক আছে। বিষ্টি থেমে যাবে। প্রথম দফায় বৃষ্টি তো মাটি শুষে নিল।

তা দ্বিতীয় দফার বৃষ্টিটা নামল একদিন মাঝ রাত্তিরে। মুষলধারে বৃষ্টি সঙ্গে উথালপাথাল ঝড়।

সকালেও অন্ধকার, তুমুল হাওয়া। তুমুল বৃষ্টি। রুস্তম বলল, সাইক্লোনিক বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু বৃষ্টি থামল না। একটু থামছে কি আবার দ্বিগুণ জোরে নামছে। দু'দিন এই রকমই চলল নাগাড়ে।

'এক ছেলের মা কে আছ গো?'—বিষ্টি মাথায় করে দল বেঁধে একদল মেয়ে এল। এক ছেলের মা কেউ নেই। সবাইকার কোলে কাঁখে। অবশেষে পরির ঠাকুমা বললেন—ওমা, আমিই তো এক ছেলের মা।

কিন্তুক তুমি বেওয়া বটে!

এটাও ঠিক। কী ব্যাপারে? না সধবা এক ছেলের মা ভোরে উঠে বাসি মুখে বাসি কাপড়ে একটি বাটি নিয়ে গাছতলায় পুঁতে দেবে। তা হলেই বৃষ্টি থেমে যাবে। কিন্তু এক ছেলের মা পাওয়াই তো দুষ্কর।—মধুবন বিড়বিড় করে বলল—ইসস যশোমাসি যদি থাকত! কে জানত মুড়কিশোলায় যশোমাসির দরকার পড়বে।

তার তিন দিন পরে আর কারও বাড়ি রান্না হচ্ছে না। কাঠকুটো সব ভিজে গেছে। আগুন জ্বলবে না। দুর্যোগে কেউ বেরোতে পারছে না। জামডুবির মাঠে একজন বজ্রাঘাতে মারা গেল। মুড়ি-চিঁড়ে মুড়কি ফুরিয়ে এল।

রুস্তম বলল—যার বাড়িতে যত কাঠকুটো আছে জড়ো করুন। এক জায়গায় রান্না হবে। সবাই চাল দেবে। যা হবে সবাই খাবে।

তিন-চারটে উনুন জ্বলল। ভাত বসল। প্রথম প্রথম তাতে আধটু একটু আলু-টালু পড়ল, তারপর স্রেফ ফ্যানভাত।

সাতদিন প্রায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর দেখা গেল ফণা তুলে জল আসছে। বান বান—চতুর্দিকে রব উঠল। নদী অনেক দূর। চুটকি নদী গন্ধেশ্বরী। কিন্তু নদী তো! তার সঙ্গে কংসাবতীর যোগও বোধহয় আছে। সেই নদী দিয়েই বান ঢুকে পড়েছে খেজুরপটির খালে। খাল উপচে এখন সব ভাসাচ্ছে। এই খালকে একটা আধ-শুকনো নালা ছাড়া কিছু মনে হত না। সে এখন ফুলে ফেঁপে সব ভাসাচ্ছে।

মধুবন ক্ষীণস্বরে বলল, কোথাও থেকে হেলপ আসবে না, দাদা!

কী জানি, বুঝতে পারছি না। স্টেশনে যাব ভাবছি।

না না আমায় ফেলে তুই যাবি না।

ইসস মধুবন, তোকে অনেক আগে বাড়িতে রেখে আসা উচিত ছিল আমার।

তোর বিপদটাও তো বিপদই, নাকি।

রুস্তম বলল—এদের বিপদটাও বিপদ। খরা-বন্যার কথা, আমলাশোল, চা-বাগান, উত্তরবঙ্গের কথা শুনি, পড়ি। দিস ইজ দা ফার্স্ট টাইম উই নো হোয়াট ইট ইজ।

বেশ কিছু পুরুষ এসে রুস্তমকে বলল—চলুন দল বেঁধে যাই কিছু যদি খবরাখবর দেওয়া যায়।

তুই গেলে আমিও যাব—মধুবন গোঁ ধরল।

তুই এমনিই খুব উইক হয়ে গেছিস। চিঁ চিঁ করছিস, পারবি না, তোকে নিয়ে বিপদে পড়ব।

অনেক বুঝিয়েসুজিয়ে তাকে পরির জিম্মা করে জিওলিনের স্টক ধরিয়ে দিয়ে দশ-বারো জনের দলের সঙ্গে রুস্তম বেরিয়ে পড়ল। ভোর-ভোর। জামডুবির মাঠের ওপর দিয়ে জল বইছে। তবে বেশি নয়। বেশিরভাগ জায়গাতেই গোছ-ডোবা জল। রুস্তমের হাতে টর্চ। ভাগ্যিস সে বেশি ব্যাটারি সঙ্গে এনেছিল। অন্যদের হাতে টিমটিমে একটি লণ্ঠন। যখন দরকার হবে জ্বেলে নেবে।

বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে সমানে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, হঠাৎ দমকাবৃষ্টি। শনশন হাওয়া। তিন ঘণ্টা জল ঠেলে হেঁটে স্টেশনে পড়ল ওরা। যত দূর দেখা যায় জল শুধু জল। লাইন জলের তলায়। স্টেশন মাস্টারের ঘর ফাঁকা। কোয়ার্টার্স ফাঁকা। তালা দেওয়া। চলো পরের স্টেশন পর্যন্ত। রাস্তায় বড় বড় গর্ত। পা পড়লে আর দেখতে হচ্ছে না। জনার্দন বলল, চলো আমরা হাইরোডে উঠি গিয়ে। বাঁকড়ো ঘুর হবে। কিন্তু পথে ট্রাক পাওয়া যেতে পারে।

বিকেল নাগাদ কী ভাগ্য একটা ট্রাক আসছে দেখা গেল। সবাই মিলে জলভরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রাক থামায়।

আপনারা ফিরে যান, আমি এই ট্রাকে গিয়ে দেখি কত দূরে যাওয়া যায়। খবর দিতে হবে। কিছু খাবারদাবার চাই। গ্লুকোজ চাই।

জনার্দন বলল—তা হবে না শহুরেবাবু, আমাদের বিপদে ফেলে তুমি পালাবে।

কী আশ্চর্য! পালাব কেন? আমার বোন রয়েছে না আপনাদের কাছে!

পেটের খিদের কাছে ভাইবোন কেউ নয়—একজন হিংস্রভাবে বলল।

ঠিক আছে আর একজন আমার সঙ্গে আসুক। তা হলে হবে তো।—সুতরাং মাধব সামন্ত চলল।

সকাল থেকেই সন্ধে, সন্ধে থেকেই রাত এখন। অন্ধকার কুপকুপ করছে। ঝিঁঝি আর ব্যাঙের চিৎকারে কান পাতা যায় না। পরিদের ঘর একটু উঁচুর দিকে, তাতেও সব তক্তপোশে উঠে বসেছে।

হঠাৎ একটা হল্লা মতো শোনা গেল। অনেক লোক যেন চিৎকার করতে করতে আসছে। দেখতে দেখতে পরিদের ঘরের সামনে একদল মারমুখো মেয়েপুরুষ এসে দাঁড়াল। চেঁচাচ্ছে—আমাদের বাচ্চাগুলো পটাপট মরে যাচ্ছে। আজ সিকন্দরকে মাটি দিয়ে এলুম। গতকাল যুগলো গেল। তোদের ঘরের ওই কটা ডাইনিটাকে বার করে দে। কালবিষ্টি আর বান নিয়ে এয়েচে। দে ওকে বার করে। ডাইনি নিকেশ করে তবে শান্তি স্বস্ত্যেন করব—অনেক গলা। এ একটা বলছে তো ও আর একটা বলছে। সব ছাপিয়ে খ্যানখ্যান করে উঠল ঠাকমাবুড়ির শান দেওয়া গলা। হাঁটু জল ভেঙে উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে বুড়ি।—কার এত বড় বুকের পাটা? এগিয়ে আয় সামনে। ওদের আনা লজেন, বিস্কুট, চাল, চিনি খেতে মনে ছিল না? ওই যে ছাওয়ালটা দুয্যুগ মাতায় করে খপর দিতে গেল? ওষুদ দিয়েছে সমানে। উপোস করচে আমাদের সঙ্গে—ডান। থুঃ, ডান হলি তোরা! এক কড়ার মুরোদ নেই। ছেলেগুলোকে যে গুড়-নুনের জল খাওয়াতে বলে গেল। খাইয়েছিলি। সমানে গেরাম সুদ্ধু ওষুধের গুলি বিলোচ্চে কে? লজ্জা করে না!

পরি ঘরে এসে হাতড়ে হাতড়ে মধুবনকে ছুঁল। দিদি—ও দিদি।—মধুবন কাঁপছিল, কাঁদছিল নিঃশব্দে।

অন্ধকারে পরি তার মুখটা আন্দাজে খুঁজে কিছু একটা গুঁজে দিল—একটু খাও। —বেশ নরম নরম, গরম গরম, পোড়া-পোড়া গন্ধ।

কী দিলি এটা? তোরা খেয়েছিস? এটা কি মাশরুম? ব্যাঙের ছাতা?

খেয়েছ খাও। আমরা কতরকম খাই, সব কি তুমি জানো? না জানার দরকার! আমরা সবাই খেয়েচি।... জনাকাকারা তো এই ফিরল। হাইরোডে টেরাক পেয়েচে। দাদা আর মাধবকা চলে গেছে খবর দেবে। কাঁদচ কেন? শোকেতাপে মানুষের মাতা এমনি খারাপ হয়ে যায় গো! দেকো না দাদা গেছে, এইবার একটা উপায় হবেই।

মীনাক্ষী বিজেনকে বললেন—ছেলেমেয়ে দুটো গিয়ে অবদি একটা খবর দিল না! একটা ফোনটোন তো করবে!

ওখানে টাওয়ার কোথায়? কী যে বলো!

তা হলে চিঠি! চিঠি তো দিতে পারে!

তুমিও যেমন! রুস্তম লিখবে চিঠি! চিঠি কাকে বলে জানে?

দিনটা যশো-সুহৃতের বিবাহবার্ষিকী। হোটেল সানশাইন-এ পার্টি। কলকাতার পরিচিতরা সবাই এসেছে। এখানকার পরিচিতও কেউ কেউ। মীনাক্ষীরা সঙ্ঘমিত্রাদের সঙ্গে গ্যাংটক ঘুরে এসেছেন। বহুদিন পর এমন বেরোনো! কালই বেশিরভাগ ফেরত যাবেন? একমাত্র যশো মধু আর সুবুল ডাক্তার ছাড়া সব্বাই দার্জিলিংকে কেন্দ্র করে প্রচুর ঘুরে নিয়েছে। ব্যাঙাদারা গিয়েছিল ফালুট। বিজয়মুকুলদা ট্রেকিং করে এল সন্দকফু। যুগেশকুমার লাভা লোলেগাঁও। সব রং কালো, ফাটাফোটা রুখু মুখ সব। ব্যাঙাদার মিসেস পরচুলা বদল করেছে।

ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থাও আছে। পাবলো সব তদারক করছে—দেখো আবার ছেলের সামনে ঢলাঢলি কোরো না, যশো বলল সুহৃৎকে। মধু বললে—সুহৃৎদা এমনি যা করছে বটে হুইস্কি পড়লে আর দেখতে হবে না!

সুহৃৎ বললেন—ছোঁবই না হুইস্কি। বাঘের মুখ থেকে ফিরে এসেছি বাবা!

বাঘ? বাঘ কোথায় পেলেন এখানে?—সুবল ডাক্তার জিজ্ঞেস করেন।

বাঘ? বাঘ বললুম বুঝি। সিঙ্গিও বলতে পারো। যা কেশর।

কী ব্যাপার? সুবল একবার এর দিকে একবার ওর দিকে তাকান।

মধু বলল—ও একটা ফ্যামিলি জোক আমাদের আপনি বুঝবেন না সুবুলদা।

মিহির এবার চিতার হাত থেকে ফিরে এলে হয়—শালির দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে সুহৃৎ বললেন।

মধু বললে—ভাল হবে না সুহৃৎদা! কোনও চিতা, নেকড়ে, হায়না সিনেই নেই।

সুবল বললেন—এটাও কি ফ্যামিলি জোক?

মধু জোর গলায় বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ। এসব আমাদের নিজেদের ব্যাপার। নাক গলাতে আসবেন না।

ওদিকে মীনাক্ষী পার্টি মাটি করে আর কী! চিকেন তন্দুরি মুখে দিয়ে বলেন—কী রকম ইঁদুর-ইঁদুর গন্ধ ছাড়ছে যেন!

ব্যস আর যায় কোথায়। মেয়েরা সব হাত গুটিয়ে বসল। বিজেন শুঁকেটুকে বলেন—ইঁদুর পোড়া, ব্যাং পোড়া কিন্তু খেতে ভাল, সাঁওতাল টাওতাল আদিবাসীরা তো খায়ই। চিকেনের সঙ্গে এইটুকুই তফাত যে ওগুলো আরও তুলতুলে।

আপনি খেয়েছেন নাকি দাদা? সুহৃৎ সোৎসাহে জিজ্ঞেস করলেন।

মহামাংস ছাড়া সবরকমের মাংস আমার টেস্ট করা আছে ভাই। অক্টোপাস ভাজা, ডলফিনের মাংস, সাপ, সব।

যশো ওয়াক তুলে বললেন—আমি ওয়াক আউট করব বিজেনদা। ছি ছি কী ঘেন্না। মীনাক্ষী বললেন—নাঃ তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই।

বাঃ তুমিই তো শুরু করলে!

সুহৃৎ আর সুবল তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে হোটেলের রান্নাঘরে কমপ্লেন জানিয়ে এলেন। তারা কিচেন খুলে দিল, দেখে নিন সার।

কোথাও কিছু নেই। তবু মীনাক্ষী চার দিকে ইঁদুর-ইঁদুর গন্ধ পেতে থাকেন।—আমার শরীরটা কেমন করছে ভাই। আমি উঠি।

জলটা ফুটোনো খাচ্ছেন তো?—সুবল ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

ফুটোনো বলেই তো জানি।

শোবার আগে মীনাক্ষী বেশ খানিকটা বমি করে এলেন। ভাগ্যিস পরের দিনই টিকিট কাটা আছে। সোজা বাগডোগরা। সেখান থেকে ঘণ্টা দেড়েক কলকাতা।

পনের দিনের দীর্ঘ ট্যুর সেরে দু'জনে বাড়ি ফিরলেন। এত ছুটি আগে কখনও ম্যানেজ করতে পারেননি বিজেন। বাড়িতে তালা। মানে তারা ফেরেনি। টেলিফোনে কি কোনও মেসেজ আছে?—না। লেটার বক্সে কোনও চিঠি?—নাঃ।

বিজেন তেড়ে-ফুঁড়ে অফিস করতে লেগেছেন। কিন্তু মীনাক্ষী না পারছেন নারীকল্যাণ, না পারছেন সংসার। ছেলেমেয়ে দুটো তো আশ্চর্য! একটা চিঠি তো অন্তত...! একদিন স্বপ্ন দেখলেন সমুদ্রের মধ্যে একটা বেলুনে বসে তিনি ভাসছেন। কোথা থেকে পাবলো এল। পাবলো তবু সে পাবলো নয়। তিনি বললেন, একটু ঠেলে দে না রে বাবা, নইলে চলছে না। এক দিনে পাবলোকে খুব পছন্দ করে ফেলেছেন মীনাক্ষী। ঋজুর মতোই খানিকটা তবে ঋজু অনেক সিরিয়াস ধরনের। কখন কী করছে বা করতে চায় সে সম্পর্কে বাবা-মা'র সঙ্গে কোনও আলোচনা করে না। পাবলো কী সুন্দর শরবত ড্রিঙ্ক পরিবেশন করে। বাবার সঙ্গে দার্জিলিং যায়। বাবা-মা'র বিবাহবার্ষিকীতে কী সুন্দর মজা করল। গান করল। ভাবতে ভাবতে তাঁর ঋজু-মধুবন-তৃষ্ণা এমনই জোরালো হয়ে উঠল যে তিনি যশোকে একখানা ফোনই করে ফেললেন?

কী রে যশো? ফিরলি? বেশ হাল ফ্যামিলি মজা করে, বল!

আর বলিস না মিনি। টিকিট কি পাওয়া যায়! শেষে বিজয়মুকুলদা আর সুবুলদা স্যাক্রিফাইস করল। ওদের টিকিটে এঁরা এলেন। ধরলে কী হত জানি না। নট ট্রান্সফারেবল লেখা থাকে তো! পাবলো কী করে ৫৪/৫৫-র সুবুল ডাক্তার হয় তাই ভাব।

কী আবার হত। পাত্তি দিলেই সব মাফ। এ দেশে সবই চলে। তোকে এমন ভাব করতে হবে যেন হাতে মাথা কাটতে পারিস, আর চাই পাত্তি। যা খুশি কর, সার্টিফিকেট বেরিয়ে যাবে।

যা বলেছিস—যশোর কথাবার্তায় কেমন একটা নতুন নতুন ছলকানি। সামহাউ যশো খুব খুশিতে আছে।—তা মধুবনরা ফিরল?

না রে খুব ভাবনা হচ্ছে, ফিরল না কোনও খবরও নেই। পাবলো কিছু জানে?

পাবলো? পাবলো কী জানবে? জানলেও বলবে নাকি? সে বান্দাই নয়। বন্ধুদের সিক্রেট তার প্রাণভোমরা।

কেন তোর ছেলেটা তো খুব নেটিপেটি। কী সুন্দর ফ্রাঙ্ক, মা-বাবার বন্ধুদের জেনারেশানের সঙ্গে কী চমৎকার মেশে।

যশো হো হো করে হাসল—পাবলোকে তুই এই বুঝেছিস? ও শালা বহুরূপী। এই দ্যাখ হলদে, দ্যাখ না দ্যাখ সবুজ হয়ে গেছে। মহা সেয়ানা।

তুইও কম সেয়ানা নোস। তোর ছেলে সেয়ানা হবে এ আর বেশি কথা কী?

সেই সময়ে বাঁকুড়া দুর্গাপুর হাইওয়ে দিয়ে এ গণ্ডগ্রামের দিকে এগোচ্ছিল চার-পাঁচটি ট্রাক। বাঁকুড়ার ডি এম এ-র সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রুস্তম।

অঞ্চলের খবর পৌঁছেছে সরকারি দফতরে। ত্রাণ যাচ্ছে। চিঁড়ে গুড়, চিনি, চাল, কেরোসিন তেরপল, ওষুধ, গুঁড়ো দুধ, লবণ। বাঁকুড়া শহরের গেরস্তদের থেকেও তোলা হয়েছে পুরনো জামাকাপড়ের বোঝা। চাল-ডাল। রুস্তম নিজে কিনেছে পাউরুটি, বিস্কুট। শুকনো মিষ্টি, গ্লুকোজ প্রচুর। জলের গাড়ি আসছে পেছন পেছন।

জামডুবির মাঠ থেকে জল সরে গেছে। কাদা থকথক করছে সেখানে।

ডি এম গ্রামের নামই শোনেননি মনে হল। বৃষ্টিতে হাল সব জায়গাতেই খারাপ। কিন্তু গন্ধেশ্বরী নদীর দরুন এমন একটা বান হয়ে যেতে পারে, কেউ ভাবেনি। এখন বাঁকুড়া শহরে শুকনো খটখট করছে। আর একটু বৃষ্টি হলে ভাল হত যেন।

লোক্যালাইজড রেন সব, অদ্ভুত। ডি এম বললেন—তা ভাই তুমি ওখানে মানে কী করে গেলে?

বাংলার একটা গ্রাম স্টাডি করার দরকার পড়েছিল।

তা এত গ্রাম থাকতে অমন ধাপধাড়া গোবিন্দপুর! মুড়কিশোলা?

ভাগ্যে গিয়েছিলুম। তা নয়তো চেহারাটা দেখতে পেতুম না। আপনার ঠিকেদারের মধ্যে দিয়েই আমার গোটা ভারতের ঠিকেদারদেরও চেনা হয়ে গেল।

সে আবার কী করল?

কী করল না সেটাই বলুন। চালটা পচা। গুঁড়ো দুধে ময়দা মেশানো, চিঁড়েতে গন্ধ বেরোচ্ছে। পুরনো তেরপল আর প্লাস্টিক শিট নিয়ে নতুনের দাম নিচ্ছে। এত ভেজাল সত্ত্বেও আবার প্রত্যেকটি জিনিসের ওজন কম। আর বলবেন না।

আমার পক্ষে কি আর ওজন দেখা সম্ভব, কাজ কি একটা? তুমিই বলো ভাই।

ওজন হয়তো পার্সন্যালি দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু কারচুপি করলে সাজা হবে এ ভয়টাও তো ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।

সমস্ত ওজন করাতে, গোনাগাঁথা করাতে, বাজে জিনিস ফেলে দিয়ে জেনুইন জিনিস তোলাতে, প্যাক করাতে পুরো আড়াইটে দিন শুধু শুধু নষ্ট হয়ে গেল আমার। কে জানে কতগুলো মানুষ মারা গেল। পরের ট্রাকগুলো দয়া করে পাঠাবেন ঠিক।

তাই ঠিকাদার তোমার ওপর অত খাপ্পা!—মানুষ মরার কথাটা কানেই তুললেন না ভদ্রলোক।

আমি কমপ্লেন লিখে দিয়ে যাচ্ছি ওর ঠিকেদারির বারোটা যদি না বাজাই তো আমার নাম ঋজুরুস্তম নয়।

কী নাম? কী নাম? ঋজুরুস্তম? নিউ জেনারেশনের অদ্ভুত সব নাম হচ্ছে। কে দিল ভাই?

বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোক আবহাওয়াটাকে হালকা করতে চাইছেন।

রুস্তম কোনও জবাব দিল না। তার দেরি হয়ে যাচ্ছে। বোনটা কী অবস্থায় আছে কে জানে!

জামডুবির মাঠ অর্ধেকটা যেতে না যেতেই প্রচুর লোক গাড়ি ঘিরে ধরল। তেঁতুলতলা, মুড়কিশোলা, আমড়াতালি... তাদের তক্ষুনি ত্রাণ চাই। এ ওকে মাড়িয়ে, ভেদ করে ছুটে আসছে।

ঠিকেদারের লোক বলল—আমরা এইখানে সব ডাম্প করে দিয়ে চলে যাচ্ছি। এই হাড়-হাবাতের দল এক্ষুনি লুটপাট মারধর করবে।

ইয়ারকি নাকি!—রুস্তম তার কাউন্টি ক্যাপটা উলটো করে ঘুরিয়ে দিয়ে কোমরে হাত দিয়ে বলল—ভাল চাও তো ট্রাক চালিয়ে চলো।

গাঁয়ের রাস্তায় ট্রাক চলবে না।

আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন তো চলো।

লোকগুলো সরে না যে—মানুষ মারবে নাকি? আচ্ছা লোক তো মশাই আপনি!

আমি কেমন লোক দেখাচ্ছি। —রুস্তম লরির ওপর থেকে দু'হাত মুখের দু'পাশে ধরে চিৎকার করে বলল—আপনারা ক'জন এখান থেকে চলে যান। গ্রামে ফিরে গিয়ে এক্ষুণি সব সার বাঁধিয়ে দাঁড় করান। সব্বাই যা বরাদ্দ তাই পাবে। নইলে ট্রাক ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কয়েকজন এখানে আসুন, লরিতে চড়ুন।

অনেক কষ্টে এই দাদা জিনিসপত্তর জোগাড় করেছে—মাধব চেঁচিয়ে বলল। সবাই সব পাবি—একদম বেইমানি করবি না। গাঁয়ের নাম খারাপ করবি না।

খুট খুট করতে করতে জামডুবির মাঠ শেষপর্যন্ত পার হল ট্রাক।

গাঁয়ের সব লোক সার বেঁধে বেঁধে দাঁড়িয়েছে। জনা প্রতি বস্তা আলাদা বাঁধিয়েছে রুস্তম। পরপর সব বিতরণ করতে করতে এক জায়গায় এসে থেমে গেল রুস্তম। মধুবন দাঁড়িয়ে আছে।

নে হাত পাত, ত্রাণ নে—রুস্তম হেঁকে বলল।

মধুবন করুণ স্বরে বলল—দে।

শহরে যে গেলি বাড়িতে একটা খবর দিয়েছিস? বোন বলল।

দাদা বলল—আমার মাথার ঘায়ে তখন কুকুর পাগল, বাড়িতে খবর! কী খবরটা দেব?

জল সরে গেছে। ঠাকমা বলল—সেই আমার ন্যাংটো কালে একবার এরকম বান দেখেছিলুম। বাব্বাঃ।

মীনাক্ষী জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, দুটো ট্যাক্সি এসে থামল। ভেতর থেকে কারা নামছে ওরা? একদল ভিখিরি মতন! একজন আবার জিনস পরা, একটা রোগা মতন আধ-ফরসা মেয়ে ওপর দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—মা! ও মা!

ও কী? ও যে মধুবন? নিজের মেয়েকে চিনতে পারছেন না মীনাক্ষী। আরে ওই তো জিনস-এর এক হাতে বালা, এক কানে মাকড়ি। ও তো ঋজু!

এ কী দশা! পেছনে পিলপিল করে ক'টা মেয়ে নামল। পরি... তাই তো! কী চেহারা হয়েছে! ব্যাক টু স্কোয়্যার-এ। তার চেয়েও খারাপ।

মধুবন লিড করছে, প্রসেশন বাড়ি ঢুকল। রুস্তম নীচ থেকে চেঁচিয়ে বলল—মা আড়াইশো টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দাও শিগগিরই।

বিস্ময়ে, ভয়ে মীনাক্ষীর মুখ দিয়ে কথা সরছে না।

পরি প্রণাম করে বলল মা, এ আমার বোন বাতাসি। এ পাশের বাড়ির তুলসী, এই যমুনা, এদিকে আয়, গঙ্গা দাঁড়িয়ে রইলি কেন? লক্ষ্মী! শোভা! মাকে সব পেন্নাম কর।

মধুবন কোনওমতে বলল—ওরা সব আমাদের বাড়ি কাজ করবে মা। বলে-টলে সে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সুবুল ডাক্তারের কাছেই কল গেল। সব্বাইকে একধার থেকে পরীক্ষা করে তিনি ভিটামিন লিখে দিলেন, বললেন—সব ম্যালনিউট্রিশনের কেস। স্রেফ ভাতমাছ খাওয়ান, দু'দিনে চাঙ্গা হয়ে যাবে। সব প্রেশার লো। সুগারও খুব লো মনে হচ্ছে।

চানটান করে ধোপদুরস্ত পাজামা-পাঞ্জাবি পরে রুস্তম বাইরে এসেছে। বলল—তোমার নারীকল্যাণ সমিতির ভরসাতেই এদের আনলুম মা। তুমি যে কত বড়, কত বেসিক একটা কাজ করছ সত্যি আমি আগে বুঝিনি মাম্মি। শুধু শুধু ঠাট্টা-তামাশা করেছি।

ওরা সব চান করেছে। ভাতমাছ খেয়েছে। নীচের খাবার ঘরে ঢালাও কার্পেট পেতে, পাখা চালিয়ে এখন মড়ার মতন ঘুমোচ্ছে। ঋজুরুস্তম আর মধুবনেরও সাড় নেই কোনও। মীনাক্ষী একবার এর কপালে একবার ওর কপালে হাত রাখলেন। ইসস, মধুবনের কি সত্যিই বারো না হোক বত্রিশ কেজি ওয়েট হয়ে গেল? ঋজুটা খাড়া আছে। অসম্ভব মনের জোর। তবে টসকেছে ঠিকই। জামাকাপড়গুলো ঢলঢল করছে। মুখটা পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে। সরু হয়ে গেছে মুখটা। পা টিপে টিপে ফোনের কাছে যান মীনাক্ষী।

যশো, যশো আছিস!

হ্যাঁ রে মিনি, আছি, কী খবর?

ভাল খবর। কাজের লোক খুঁজছিল না?

কখন আবার খুঁজলুম! আমার তো রান্নার, বাসন মাজার সব লোক রয়েছে।

তা জানি না বাবা, দেশ থেকে আনিয়েছি। খুব ভাল মেয়ে। তোদের অত বড় বাড়ি। ঝাড়াপোঁছা করতে, হাতেনাতে কাজ এগিয়ে দিতে একটা ফরমাশের লোক লাগবে না! কী করেই যে দিনরাতের লোক ছাড়া থাকিস! কিছু মনে করিসনি যশো, জ্যাঠামশাই বড্ড কঞ্জুষ ছিলেন। তোর অবশ্য দিল দরাজ। তোদের দু'বোনেরই। দু'জনে দুটো রাখ। ভাল দেশের মেয়ে সব। যদি বলিস তো আমি নয় হপ্তাখানেক ট্রেনিং দিয়ে পাঠাব। মধুকে ডাক। তার দিল তোর চেয়েও দরাজ। সে একটা রাতদিনের লোকের মর্ম আরও ভাল বুঝবে। শোন বাজারদর অনুযায়ী মাইনে দিবি নইলে আমার ছেলেমেয়ে আমাকে আস্ত রাখবে না। ছাড়লুম।

আর একটা নম্বর ডায়াল করলেন মীনাক্ষী।

কে সঙ্ঘদি?

না আমি রত্নাদি।

আমি মীনাক্ষী বলছি, সঙ্ঘকে একটু দাও না।

সঙ্ঘদি রে, কপাল জোরে ভাল কাজের লোক পেয়েছি। দেশ থেকে এসেছে। ফাইফরমাশের লোকের কথা বলছিলি না?

ফাইফরমাশের লোক আমার বড্ডই দরকার রে মিনি। ছেলেগুলো আর তাদের বাবাগুলোর পেছনে বড্ড খাটতে হয়।

বেশ, তোকে দু'দিনের মধ্যে লোক পাঠাচ্ছি। আমি নিজে যাব।

ডায়াল আবার ঘুরল—

সন্তোষজি! ইয়ে আপ কি বহেন মীনাক্ষী হ্যায়, কাম কাজকে লিয়ে একঠো লোক মাঙা না আপনে! খুশি কি বাত কি উও মিল গয়ি। বহোত আচ্ছি লড়কি!

আরে ইয়ার, আমাদের তো ফুলচাঁদ একাই একশোখানা। সব করে। খানা পাকানা আমি খুদ করি।—বাংলাতেই বললেন সন্তোষজি।

কী কঞ্জুষি করছেন সন্তোষজি? এত খাটেন, আপনার হাত-পা টিপে দিতেও তো একটা লোকের দরকার।

ও ভি তো ফুলচাঁদ হি করতা!

ফুলচাঁদ? ওই দামড়া লোকটা আপনার গা-হাত-পা সব টিপে দেয়! বহোত শরম কি বাত, সন্তোষজি খবরদার ও কাজ করবেন না। লোকটা খুব সন্দেহজনক। আপনার মতো ইয়াং লেডির হাত-পা টিপে দিচ্ছে—এ কখনও ভাল কথা হতে পারে না। সে দিনই তো কাগজে দেখলুম—প্রেমচাঁদ নামে একটা লোক বাড়ির গিন্নিকে খুন করে আলমারি ভেঙে পাঁচ লাখ নগদ, পাঁচ লাখের গয়না নিয়ে পালিয়েছে।

আরে বাপ রে! বলছেন কী মীনাক্ষী বহেন। লোকেন ইয়ে তো হাম লোগোকাঁ আদত হ্যায়। জওয়ান নোকর সব আচ্ছা সে সাফা রাখে গা।

বেশ তো নোকর থাক না। পার্সন্যাল কাজকর্মের জন্যে একটা ছোট মেয়ে রাখুন না। আপনার হাসব্যান্ড অত বড় বিজনেস ম্যাগনেট, আপনাদের বাড়ি একটা চটপটে ফাইফরমাশের মেয়ে না থাকলে স্টেটাস থাকে!

উও বাত তো ঠিকই হ্যায় লেকিন উও ছোটি লড়কি, ঔর উও জওয়ান ফুলচাঁদ...এ ভি তো আচ্ছি বাত নেই হ্যায় মীনাক্ষীজি! রিসকি হোচ্ছে না?

ছাড়ুন তো! আপনি বাড়িতে সব সময়ে মজুত থাকতে সাহস পাবে? মেয়েটা খুব ভাল।

উনকো পুছনা হোগা।

পুছিয়ে, লেকেন জলদি কিজিয়ে। হামারি সোসাইটি কি প্রেসিডেন্ট ভি ঢুঁড় রহি। আপকি মাফিকই স্টেটাস, বিজনেসম্যান...

ব্যস বাড়ি সাফ। শেষ মেয়েটি সোসাইটির ঘরদোর সাফ করবে, গুছিয়ে গাছিয়ে রাখবে। মিটিংয়ের দিন চা-টা করবে। রাত্তিরে এ-বাড়ি এসে পরির কাছে শুয়ে থাকবে।

ঋজুরুস্তম চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে গম্ভীরভাবে বলল—মা তোমার নারীকল্যাণ সমিতির নামটা পালটে দাও।

কেন নামটা আবার কী দোষ করল?

ডোমেস্টিক হেলপ সার্ভিস! কমিশন নেবে পার পার্সন। ভাল রোজগার।

মীনাক্ষী ছেলের গঞ্জনা হজম করলেন। কিন্তু আর কী তিনি করতে পারেন। তাঁর সমিতিতে দুঃস্থ মেয়েরা সেলাই করে, আচার, জেলি, জ্যাম বড়ি তৈরি করে। তাঁরা সেগুলো মার্কেটিং করেন। থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত তো সেখানে নেই। কী করবেন তিনি এই শহরে অনভ্যস্ত আনাড়ি, প্রায় নিরক্ষর মেয়েগুলোকে নিয়ে। ক'মাস পরেই এই মেয়েগুলোই চোখালো মুখোলো হয়ে যাবে। গায়ে গত্তি লাগবে। বাড়িতে টাকা পাঠাবে। সেই টাকায় বাপ-জ্যাঠারা সার, বীজ কিনবে, কেরোসিন, জামাকাপড় কিনবে, এক পয়সা খরচ নেই, মাস মাস পুরো টাকাটা। খারাপ হল? এরা সব আকাশে পা দিয়ে হাঁটে। কোনও প্র্যাকটিক্যাল সেন্সই নেই।

বোনকে রুস্তম বলল—যে-সময়টা জিমে আর হন্টনে দিতিস সে সময়টা এদের পড়ানোর কাজটা চালিয়ে যা। একটা সময় ঠিক করে দে। ওরা সব এসে তোর কাছে পড়ে যাবে।

আই এস সি-র রেজাল্ট বেরিয়ে গেল। মেয়েগুলো সব্বাই একধার থেকে ভাল করেছে। ছেলেগুলোর হয়েছে একরকম মোটামুটি। পঙ্কজের বাবা বললেন—ব্যাস, কারবারে লাগো। কী ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে ভোঁ ভোঁ করছ।

পঙ্কজ চুপচাপ গিয়ে পাবলোর সঙ্গে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভরতি হয়ে এল। কেমিস্ট্রি হনস। কার্জন ঢুকে গেল গোয়েঙ্কায়। উন্নী চলে গেল কানপুর আই আই টি। এবং সব্বাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে বন্নী প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাস নিয়ে ভরতি হয়ে গেল। মধুবন কাছাকাছি জে-ইউতে ঢুকল ইংরেজি নিয়ে।

বন্নী জয়েন্টে চান্স পেয়েছিল, উন্নী তাকে অনেক বোঝাল। হিস্ট্রি নিয়ে করবিটা কী?

হিস্ট্রি ইজ ওয়ান অব দা বেসিক সায়েন্সেজ অব সিভিলাইজেশন। আমি চেষ্টা করলে সবই পারব। কিন্তু ইচ্ছেটা আসল। আমি হিস্ট্রি পড়তে চাই। কীভাবে সভ্যতার গ্রাফ চলছে। আপ অ্যান্ড ডাউন। আজকের জেনারেশনের কোনও হিস্টরিক্যাল এক্সপ্লানেশ্রন আছে কি না আমায় জানতে হবে।

মধুবনের মা মীনাক্ষীর আজকাল খুব রেলা। একমাত্র মেয়ে ইংরেজি নিয়ে জে ইউ-তে। মেয়ে

স্লিম। তবে তিনি সাবধান আছেন। তাঁর চেয়েও সাবধান আছে মধুবন নিজে। তবে কেউ জানে না—আসলে মধুবনের খাদ্যের ওপর সেই প্রচণ্ড আকর্ষণটাই চলে গেছে। সে চায় কিন্তু পারে না। মাটন মুখে তুলতে গিয়ে ইঁদুর মনে পড়ে যায়। চিকেনে ব্যাং ব্যং গন্ধ। আইসক্রিম মুখে তুলতে গেলে সারিসারি কালো কালো ভুখা মুখ চোখের সামনে ফুটে ওঠে। নিজেকে কী রকম হৃদয়হীন, অপদার্থ, হ্যাংলা মনে হয়।

এখনও সলিড খাবার খেতে পারছিস না? কত দিন চলতে তোর এই রোগ?

প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট তো বলছে সব ঠিকঠাক আছে।

মা আমাকে দুধভাত দাও।

খাবি? খাবি? দুধভাত খাবি—তিন লাফে মীনাক্ষী রান্নাঘরে চলে যান।

গেলাস-ভরতি গো দুগ্ধ, ওপরে মোটা সর। থালায় বাসমতীর ভাত। মেয়ে খাবে বলেছে।

মধুবন দুধের ওপর থেকে সরটা তুলে একটা বাটিতে রাখে, বলে মা সর খেয়ে খেয়ে আবার যদি পঁচাত্তর হই আবার একটা মুড়কিশোলার দরকার হবে। তুমি দুধের সর পরিকে দিয়ো। খাটেখোটে ওর কিছু হবে না।

সুতরাং মধুবন দুধ পায়, পরি সর পায়। পরির চেহারায় চেকনাই আসে। মধুবন আগের থেকে কালো, রোগা থাকে। মেদের থাকের ভেতর থেকে তার আসল মুখখানি বেরিয়েছে।

যশোমাসির বাড়িতে ঢুকছে সে, পাবলোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দরজা খুলে পাবলো বলল—কে তুমি খুকু!

বাজে বকিস না। যেতে দে।

কী করে ঝরালি? সত্যি আমি তোকে চিনতে পারিনি। একদম চিনতে পারিনি। অন গড বলছি। আমার ঘরে একটা ছোটবেলাকার গ্রুপ ছবি আছে। সেইটার জন্যেই তোকে মেলাতে পারতুম। হ্যাঁরে তুই নাচতিস না?

তা নাচতুম! তো কী!

আমাদের ব্যান্ডে জয়েন কর।

তুই ব্যান্ড করছিস।

আরে সব রেডি। ব্যাপক বন্দোবস্ত। সবাই আছে গুরু। লেগে পড়।

ব্যান্ডে ক্ল্যাসিক্যাল ডান্স চলে না।

চলবে চলবে আমাদের ব্যান্ডে চলবে।

কেন? আমকে কাজিন বলে স্বীকার করতিস না যে!

যা বাব্বা কবে? পাবলো আবার কবে এই সব সম্পক্ক টম্পক্ক নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে! মধুবন ইজ মধুবন। কাজিন না ফ্রেন্ড তাতে কী এল গেল?

রোগা মধুবন কাজিন সে তোর ব্যান্ডে নাচবে, মোটা হলেই মধুবন আর মধুবন থাকে না, তখন তাকে হ্যাক থু করিস! শেম শেম! বলে মধুবন ভেতরে ঢুকে গেল।

পাবলোর মনে দৃঢ় সংকল্প জন্মাল মধুবনকে ব্যান্ডে আনতেই হবে। অত ভাল কত্থক আর ভরতনাট্যম আর কেউ জানে না। কবে যে সে মধুবনকে কাজিন বলতে অস্বীকার করেছিল তা তার মনেই নেই। যাচ্চলে!

মীনাক্ষীর রেলা শিগগিরই আরও বেড়ে গেল। তাঁর ছেলে ঋজুরুস্তম একটা দশ লাখ অস্ট্রেলিয়ান ডলারের প্রজেক্ট আপাতত পেয়েছে, তার মুড়কিশোলা গ্রাম পর্যবেক্ষণের পুরস্কার হিসেবে। প্রথম কিস্তি। ক্যানবেরা ইউনিভার্সিটি ভীষণ ইমপ্রেসড়। এই প্রজেক্টের ফলে মুড়কিশোলা এবং সংশ্লিষ্ট

অঞ্চলের ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং তার হাতে, খোদ অস্ট্রেলিয়া থেকে দু'জন আসছে তার সঙ্গে কাজ করতে। শিগগিরই ঋজু ফিরছে। কথাবার্তা সেরে। মীনাক্ষীর সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না! ছেলে ডলারে রোজগারও করবে, আবার দেশেও থাকবে। আপাতত বাঁকুড়ার ডি এম তাকে তাঁর বিশাল বাংলোর একটি বিশাল ঘর অফিস করবার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। ঋজু এক্সপার্টদের পরামর্শ নেবার জন্য নানান জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। জমির পার্থক্য পশুপালনের খুঁটিনাটি, মৌ-চাষ, জল সংরক্ষণ।

রত্নমালা-সঙ্ঘমিত্রা খুব দমে গেছেন। সঙ্ঘমিত্রার মুখে আর চটপট মজাদার ফাজলামি শোনা যায় না। ছেলে পল্টন মাকে সাবধান করে দিয়েছে কার্জনকে কিছু বোলো না যেন, ও ভীষণ সেন্টিমেন্টাল। কী থেকে কী হয়!

রত্নমালা শিউরে উঠেছেন—কী বলিস তুই? যা করেছে ভাল করেছে। আমি তো ওকে খারাপ কিছু দেখছি না—দুঃখী-টুঃখি! একটু যেন উদাস উদাস, অন্য কোথাও চলে গেছে মনে মনে—তো এটা ওর বরাবরই আছে। কী বল সঙ্ঘ?

সঙ্ঘমিত্রা ঠোঁট উলটে বলেন—তুমিই ভাল জানো বিন্দুবাসিনী তোমার অমূল্যধনের মন-মেজাজ। আমি কে? আমি কেউ না।

মধুবন দেখে যশো মূর্ছা যান আর কী! তুই? তুই কী করে এমনটা হলি!

মধুবন হেসে বলল—স্রেফ না খেয়ে মাসি। দিনের পর দিন না খেয়ে আধপেটা খেয়ে।

ধ্যাঃ। কোথায় যে বেড়াতে গেছিস শুনলাম!

ওই তো গঙ্গা যমুনা তোমাদের বাড়ি কাজ করে ওদের 'গেরামে।'

বলিস কী রে! সেখানে গোয়ালে গোরু, দিঘিতে মাছ, গাছে ফল, ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা চলে। তোকে না খেয়ে থাকতে দিলে?

কে বলেছে তোমায়? মাছ, ফল, ধান....এসব!

কে আবার বলবে। গঙ্গাই বলছিল। যমুনাও সায় দিল।

কী বলছিল গঙ্গা?

ওই বলছিল—ওদের তো সবই বাড়ির খাঁটি জিনিস। খাঁটি দুধ, খাঁটি ডিম, খাঁটি মাছ, খাঁটি সবজি। একটু দুধ নইলে বেচারিরা ভাত খেতে পারে না। তা না হয় খেল। এ-বাড়িতে দুধ দুধের সর যত কম হয় ততই ভাল। কী বল।

তা তো বটেই।

একটা কী সুবিধে জানিস। সরু চাল খেতে পারে না। চালের খরচটা আমার কম পড়ে। ভাবছি শঙ্করীটাকে ছাড়িয়ে দেব। গঙ্গাই সব করবে।

না, না অমন কাজও কোরো না মাসি। শঙ্করীকে কী দোষে ছাড়িয়ে দেবে গো!

তাছাড়া গঙ্গা যমুনা লেখাপড়া করছে। সব করতে হলে...

লেখাপড়া করছে? গঙ্গা যমুনা? কোথায়? কখন?

ওই করে আর কী!

সর্বনাশ!

কেন মাসি!

অমন কাজের লোকটা আমার! লেখাপড়া! শিখলেই ডানা গজাবে রে! মিনিটার এলেম আছে। কেমন ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়েছে।

মধুবন বলল—মাসি, গঙ্গা লেখাপড়া শিখে চলে গেলে তোমাকে আর একটা গঙ্গা এনে দেব

গো। গঙ্গাদের শেষ নেই।

তা ভাল—তবে মেয়েটার ওপর মায়াও পড়ে যাচ্ছে। মেয়ে নেই তো? মেয়ে সন্তান দেখলেই বুকটা হু-হু করে বুঝলি!

তুমি যে বলতে আমিই তোমার মেয়ে!

সে তো বটেই। তুই হলি মেয়ে। আর গঙ্গা-টঙ্গা হল মেয়ে মেয়ে। তা এক গ্লাস মিল্কশেক খাবি? করি? এখন নিশ্চয় তোর রেসট্রিকশন উঠে গেছে।

মধুবন বলল—কী জানি! মিল্কশেক খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি মাসি।

তবে কী খাবি। এতদিন পরে এলি।

এক গ্লাস জল আর দুটো বাতাসা।

বাতাসা? বাতাসা কোথায় পাব? আচ্ছা মেয়ে তো তুই। ঠাট্টা করছিস।

মধুবন বলল,—জল-বাতাসা খুব ভাল জিনিস মাসি। জল আর গ্লুকোজ। সবচেয়ে সস্তা। ও কী মাসি! ওটা কার ছবি!

ছবিটার দিকে চেয়ে যশো নমস্কার করলেন।—ওটি আমাদের গুরুদেবের ছবি। অভীপ্সানন্দ মহারাজ।

তুমি গুরু করেছ!

তবে! বেলা যে পড়ে এল জলকে চল কবি বলেছেন কেন? একা আমি নই তোর মেসোও আছে।

বলো কী! মেসো যে একের নম্বরের নাস্তিক ছিল!

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তো মানুষের পরিবর্তনও হয়। তা ছাড়া আমাকে চোখে চোখে রাখতে হবে না?

তোমাকে? কেন?

তোর মেসোর ধারণা আমি সংসার ত্যাগ করতে পারি। ওর মা করেছিলেন তো। ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।

তাই বুঝি? তা তোমার কি সত্যি সত্যি সংসার ত্যাগ করার বাসনা হয়?

হয়েছিল, তোকে চুপিচুপি বলি, ইদানীং মনে হত কে বা কার কে তোমার! আমার বলতে কেউ নেই এ বিশ্ব সংসারে। একজন সারাদিন আপিস করছে আর একজন সারদিন আড্ডা দিচ্ছে। বন্ধুই জ্ঞান বন্ধুই ধ্যান। তাই আমি গুরুতে মন দিলুম। অমনি গুরুই তাড়াহুড়ো করে সব ফিরিয়ে দিলেন। দেখলুম সব কিছুর সেন্টারে বসে আছি—এই আমি যশোধরা মুখুজ্জে। বুঝলি? ভগবানের সঙ্গে টাচটাও রইল। সংসারও বজায় রইল। গুরুদেব যখন হৃষীকেশ থেকে আসবেন তোদের ডাকব—অমৃতবাণী শোনাব এখন। তোর হবে। বুঝলি! তুই খুব ম্যাচিওর হয়ে গেছিস। আই এস সি-তে এ প্লাস করে তোর মলাট পালটে গেছে। তোর চোখের চাউনি দেখেই বুঝতে পারছি আমাদের সেই আহ্লাদি মধুবন আর নেই।

আশ্চর্য! এত লোকের মধ্যে যশোমাসিই একমাত্র এ-কথা বলল। তার পরিবর্তনটা ধরতে পেরেছে অনেকেই। কিন্তু সেটা ওপর ওপর। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে সেই বলছে,—কী রোগা হয়ে গেছিস! চেনা যাচ্ছে না তোকে। বল্লী সুদ্ধু, আজ পাবলোও সেই প্রসঙ্গই তুলল। মা খুব ব্যস্ত হচ্ছে যে তার খাবার রুচি চলে গেছে, মুড়কিশোলায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে মেয়ে। হাজাররকমের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা, ডাক্তার, পথ্য। মা এই নিয়ে ব্যস্ত।

তার গোটা মনটাই যে পালটে গেছে, এটা কেউই ধরতে পারেনি। সবচেয়ে তরল, সবচেয়ে আহ্লাদি, বোকাসোকা যাকে ভাবা যেত সেই যশোমাসিই অবলীলায় ধরে ফেলল তাকে। কারণটা ধরতে পারেনি।

কিন্তু আসল জিনিসটা ধরেছে। এমনকী সে নিজেও ঠিক এভাবে বোঝেনি নিজেকে। যশোমাসিই বুঝিয়ে দিল। সেই আহ্লাদি মধুবন আর নেই। তার মলাট ললাট সবই পালটে গেছে। সে বড় হয়ে গেছে মুড়কিশোলার ভয়াবহ, বিভীষিকাময় ঘটনায়।

ভেতরটা কি তার দমে গেছে? একটা খুব হালকা মজাদার সহজ স্বচ্ছল জীবনের মধ্যে বেঁচে ছিল। জীবনটা তো আদৌ এরকম নয়। এত রকম আলাদা আলাদা জীবন আছে! থাকে! রাত্রে ক্রিম মাখবে না—এটাই তো সে ভাবতে পারত না। দেখল রান্নার তেলই নেই। শাকভাত ছাড়া খাবার নেই, তা-ও যথেষ্ট নয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাবার জোগাড় করা, খাওয়ার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকা। শুনেছে খুব গরিব মানুষ আছে। বি পি এল বিলো পভার্টি লাইন শুনছে তো। কিন্তু বোঝেনি। আদৌ বোঝেনি। দুর্যোগে জলবন্দি। কোনও দিকে যাওয়ার উপায় নেই। কোথাও থেকে কেউ আসছে না। সন্ধে থেকেই কুপকুপ করছে অন্ধকার। মশার ঝাঁক। ব্যাং ডাকছে, কেমন ভৌতিক ডাক। অন্ধকারে যাতায়াত চলছে কঙ্কালসার মানুষগুলোর। ছেলেটার খুব পেট কামড়াচ্ছে, ছটফট করছে, দাদা ওষুধ আছে? ও শহুরে দাদা। দাদা ওষুধ নিয়ে বেরিয়ে গেল। এমনকী কিছু লোক মেয়ে ও ব্যাটাছেলে দুই-ই তাদের অপয়া ডাইনি-টাইনি বলতে শুরু করেছিল। কী ভয় করছিল তার। দাদা পর্যন্ত নেই। তারপর ভয়টা কেমন চলে গেল, মনে হল এই-ই তা হলে হবার ছিল। এইভাবে অপয়া ডাইনি-টাইনি বলে তাকে এরা মেরে ফেলবে। ফেলুক। তখন পরির পরিবার দশ হাতে তাকে আগলেছে। অপয়া! অপয়া! দিদি দাদার জন্যে যে মাছ ভেজে গেলে, শহুরে বিস্কুট লজেঞ্চুস খেলে মনে নেই, না? কে ওষুধ দিয়ে বাঁচাল চুনিকে, অঘোরদাদুকে, কে এখন ত্রাণ আনতে গেছে। থুঃ মড়ার দল। অপয়া।

খিদেয় নিঝুম হয়ে পড়েছিল সে। তখন ইঁদুরের মাংস, ব্যাঙের মাংস খাইয়ে টিকিয়ে রেখেছে তাকে পরিরা। কে জানে হয়তো সাপও খাইয়েছে। সে তখন জানতেও পারেনি। বুঝতেও পারেনি। কিন্তু প্রাণে বেঁচেছে। নাঃ এ অভিজ্ঞতা তার বন্ধুদের কারও নেই। বললেও বুঝতে পারবে না।

হঠাৎ তার মনে হল যশোমাসিরও একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। সংসারে কেউ কারও নয়। তা হলে গুরুতে মন দেওয়া যাক। যশোমাসির মতো উচ্ছল, হাসিখুশি ইয়ারকিপ্রিয় মানুষের পক্ষে একেবারে আশ্চর্য। এবং যশোমাসিও বদলেছে। না হলে তাকে আর কেউ বুঝল না, যশোমাসি বুঝল কী করে?

মধুবন বাড়ি এসে মাকে জানান দিল। মায়েরা ভাবে। মায়েরা অনুভব করে। মায়েদের জানাতে হয়। সে ছাদে চলে গেল। জুলাই মাসের আকাশ। আজকে অল্প অল্প মেঘ, তারাগুলো ফিকে ফিকে। মুড়কিশোলা গ্রামে বৃষ্টির আগে গ্রীষ্মের আকাশে সে দুর্দান্ত কালো রং আর তারাদের ঝকমকানি দেখেছিল। চাঁদের আলোয় জামডুবির মাঠে গিয়ে ছোটাছুটি করেছিল। মধুবন পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েই আছে, দাঁড়িয়েই আছে। এই বিশাল আকাশের তলায় কলকাতাও আছে মুড়কিশোলাও আছে, আছে আরও কত জনপদ। কত বিচিত্র মানুষ কী অদ্ভুত নিঃস্ব তাদের জীবনযাপন। তার বুকের মধ্যেটা খাঁ খাঁ করতে লাগল। তা হলে কী লাভ। কিছু মানুষ যদি এমন নিদারুণ অভাবে সংকটে থাকে তা হলে বেঁচেই বা শেষপর্যন্ত কী লাভ। পাবলোরা জানে না, বল্লীরা জানে না। তাই ওদের চলনবলনে কী আত্মবিশ্বাস যেন যা করছ ঠিক করছে। কোথাও কোনও ভুল নেই। সবটাই সত্যি। অথচ এই পুরো শহরটা জীবনটা তার কাছে কী ভীষণ অলীক হয়ে গেছে। পাঁচিল দিয়ে ঝুঁকে সে নীচটা দেখতে লাগল। অন্ধকার রাস্তা। আলো জ্বলছে। একটা দুটো লোক আসা-যাওয়া করছে। বাড়িগুলো সব চুপচাপ। 'উর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি ইঙ্গিত করি তোমা পানে আছে চাহিয়া।' যদি সে এখন এখান থেকে ঝাঁপ দেয় নীচে, ভীষণ টানছে তাকে নীচের রাস্তাটা।

পড়ে মরে যাবে। ব্যস এই সমাধানহীন অন্তহীন সমস্যার শেষ হয়ে যাবে। অন্তত তার নিজের জীবনে। তার এখন কারও কথাই মনে হচ্ছে না। মা, বাবা, দাদা—কারও কথা নয়। শুধু মনে হচ্ছে এভাবে চলবে না, চলতে পারে না। এ জীবনের কোনও মানে নেই। 'নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া।'

হেই হেই। এই মধুবন!

চমকে উঠেছে সে। অদূরে দাদা। এগিয়ে এল।

কী করছিস। মৌবটিকা!

হঠাৎ মধুবন দাদার বুকের ওপর মুখ রেখে কেঁদে উঠল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। দাদা কিছুক্ষণ মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। দাদাটাও যেন কেমন বদলে গেছে। মধুবনকে খ্যাপানো তার একমাত্র কাজ ছিল। দাদার মুখটা এখন অভিভাবকের হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ভরসার মুখ। দাদা অনেক অনেক কাছের মানুষ হয়ে গেছে তার।

বেরিয়ে আয়। এই মুডটা থেকে বেরিয়ে আয়। চল নীচে চল তো!

আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

ভাল লাগাতে হবে। মুখ হাঁড়ি করে থাকলে চলবে? তুইও তো করছিস। প্রথম কথা নিজেকে তৈরি করছিস। দ্বিতীয় কথা এই মেয়েগুলোকে তৈরি করবার চেষ্টা করছিস। কাজ কর। করে যা। বাস।

আর ঠিক পাঁচ বছর পরে মধুবন যখন স্কলারশিপ জোগাড় করে আইওয়ায় পড়তে যাবে, ছুটিতে ছুটিতে হিচ-হাইক করে দু'-একটি বন্ধুর সঙ্গে ঘুরবে, ক্যানিয়ন ভিলেজে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের মহান প্রাকৃতিক স্থাপত্য ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আলোছায়া ও রঙের খেলা দেখবে, প্রকৃতি-সৃষ্ট ব্রহ্মামন্দির, শিবমন্দির দেখবে, বৌদ্ধ স্তূপের ওপর, তখন তার সঙ্গে আলাপ হবে তার চেয়েও ছোট, কিন্তু দেখতে বিরাট এক রেড ইন্ডিয়ান কিশোরের সঙ্গে। অত বড় শরীর কিন্তু কী বিনীত, এমনকী যেন একটু বা সন্ত্রস্তও। সামারে খাটতে এসেছে। রোজগার করবে। আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। একেবারেই আমেরিরকানদের মতো নয়। অথচ সে-ই প্রকৃত আমেরিকান।

বল্লী—সে তার বন্ধুকে ই-মেল করবে। তুই ঠিক বিষয় বেছেছিস। ইতিহাস। মানুষ, মানুষের সমাজ কীভাবে ভাঙছে গড়ছে, কীভাবে সভ্যতার কোপ কার ওপর গিয়ে পড়ছে। কেন—এইসব জানা খুব, খুব জরুরি। আমি বুঝতে পারি। না জানলে আমি কেন, কোথায় দাঁড়িয়ে, এইরকম কেন মানুষের জীবনের, মনের গড়ন—একটুও বুঝতে পারব না। আমি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বুঝছি, বোঝবার চেষ্টা করছি—আলেক্স হেইলি, টোনি মরিসন, নাদিন গার্ডিনার পড়ছি। এই অজানা বিশ্বের মনুষ্যযূথকে আমি জানতে চাই। পড়ছি হার্ডির ওয়েসেক্স টেলস, ডিকেন্স আবার। খালি মগজের খেলা আমার ভাল লাগে না। খুঁজে খুঁজে বার করতে হয় আশ্চর্য সব জনগোষ্ঠীর কথা। এক হিসেবে আমিও তাই ইতিহাসই পড়ছি।—মধুবন।

মেলটা পাঠিয়ে সে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকবে। তখন তার মনে পড়বে সেই ফিকে তারার রাত। জুলাইয়ের আকাশ। নীচের রাস্তার তাকে টেনে ধরা চুম্বক টানে। মনে পড়বে—হেই মধুবন! কী করছিস!...বেরিয়ে আয় এই মুডটা থেকে। দাদার সেই ভরসা—তুইও তো কাজ করছিস!

তার মনে পড়বে দাদা বিপদ বুঝে তাকে কাউন্সেলিং করেছিল অনেক দিন। তার মনে পড়ে কীভাবে দাদা পাবলোর 'ভ্যাগাবন্ড'-এর সঙ্গে মিশে তাকে দিয়ে নাচিয়ে গাইয়ে, হইচই করিয়ে, পরিদের দিয়ে ওদের টুসু গান গাইয়ে ভ্যাগাবন্ড-এর আসর জমিয়ে দিয়েছিল। তবু তার ভেতরের ডিপ্রেশন ঘোচেনি। দাদা তার প্রজেক্ট ওয়র্ক দেখাতে মুড়কিশোলা নিয়ে গেল জিপে। সেই জনাকাকা, সনাকাকারা

ছুটে এল। ঠাকমা বলল—কী গো সাদা-ডাইনি, এলে আবার? অস্ট্রেলিয়ান নীল আর শন তাকে বুঝিয়ে ছিল ফার্মিংয়ের খুঁটিনাটি। দেখিয়েছিল মুরগির খামার। তার বিশাল ব্যবস্থাপনা। বান হয়ে নাকি ওদের জমি অনেক ভাল হয়ে গেছে।

রবি-চাষ হচ্ছে তখন। চিনে, বাদাম, তিসি তিল, নানারকম সবজি। মাঠেঘাটের চেহারা পালটে গেছে। শীত বইছে শনশন করে। গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঠাকুমারা রোদে বসে।

তবু কি তার ডিপ্রেশন ঠিকঠাক ঘুচল!

দ্বিতীয় মেলটা সে দাদাকে পাঠাবে, ক্যানবেরায়—

দাদা, কেমন আছিস? তোর নিশ্চয় নিজের কথা ভাববার সময় নেই। তুই সব সময়েই কিছু না কিছু হিউম্যান প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত। কত জরুরি মেল আসে তোর। বেশি পড়বারও সময় নেই। দাদা, তুই এই বিশাল পৃথিবীতে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিস। আমি বোধহয় হারিয়ে গেছি। যে-কাজটা নিয়েছিলুম, পারলুম কই। ওদের কাউকেই তো পুরোপুরি শেখাতে পারলুম না। গঙ্গা যমুনা বিয়ে করে পালিয়ে গেল। বরেদের মার খেয়ে, লোকের বাড়ি কাজ করে দিন চলছে। তুলসীটা অবশ্য মায়ের সমিতিতে বেশ সেলাই শিখেছে। রোজগার ভালই। মা দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছে। শোভার খবর ভাল না। বুঝতেই পারছিস! লক্ষ্মী এখনও পঙ্কজ ধুধুরিয়াদের বাড়িতে কাজ করছে। দেখ, পরিটারই মাত্র পড়াশোনার মাথা ছিল। কী চটপট সব শিখে নিত। পাটিগণিত একেবারে হাতের মুঠোয়। বাংলা হাতের লেখা কী চমৎকার! ম্যানার্স কী শিখেছিল! কে বলবে মুড়কিশোলার মেয়ে! টিভি দেখে দেখে কী যে মাথা ঘুরে গেল! সিরিয়ালে অ্যাক্টো করতে চলে গেল। নগণ্য সব রোল, তার জন্যে যে ওকে কী করতে হয় আর না হয়! ভগবান জানেন। মা তো বলছে বাড়িতে আর থাকতে দেবে না। অনেক কষ্টে মাকে আটকেছি। কাউকেই শিখিয়ে পড়িয়ে মুড়কিশোলায় ফিরিয়ে দিতে পারলুম না। কী আর পারলুম তবে!

রুস্তমের জবাবটা আসবে সঙ্গে সঙ্গে।—এখন অনেক রাত। তোর মেলটা পড়লুম। কে বলল তুই হারিয়ে গেছিস! হারিয়ে যাওয়াও একরকম খুঁজে পাওয়া। প্রত্যেকটা কাজে সেন্ট পারসেন্ট সাফল্য আশা করিস না, হয় না। যা করেছিস খুব করেছিস। আমাদের কাজ হিউম্যান ফ্যাক্টর নিয়ে। আনপ্রেডিক্টেবল। আমরা তো কোনও সিস্টেমের সাহায্যও পাইনি! ওরাও পায়নি। একেবারেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। এখন মুড়কিশোলার চেহারা পালটে গেছে। দ্যাখ কার ভেতরে কী আছে, কে ঠিক কী চায় শেষপর্যন্ত সে নিজেই ঠিক করে। ওরা তোর কাছ থেকে কিছুটা রসদ সংগ্রহ করেছে। যে যার নিজের মতো বাঁচছে। ওদের ব্যাপারে তোর কাজ, তোর দায়িত্ব শেষ। সবাই কি আর যে যার মুড়কিশোলায় ফিরে যেতে পারে? আমি পারব কি না জানি না, তুইও পারবি কি না জানিস না। এই এক্সোডাস যদি রুটি-রুজির জন্যে বাধ্যতামূলক না হয়, যদি এর সঙ্গে আবিষ্কারের চৈতন্য থাকে তা হলে যেখানেই যাস তোর মূল ঠিক বেঁচে থাকবে। ভাবিন সা। উঁহুঁ, ভুল বললুম—ভাবিস।—দাদা।

আপাতত সে জানে না তার এই অনাগত ভবিষ্যৎ। আপাতত সে নাচছে। পাবলোর কোরিওগ্রাফি। যশোমাসি হেলপ করেছে। ওদের হাত-পা ছুড়ে কত রকমের ক্রিয়েটিভ ডান্স। তারই মধ্যে সে আপন মনে তিল্লানা নেচে যাচ্ছে। কোনও কস্টিউম নেই। সাধারণ একটা ছাপা শাড়ি, কুঁচি তুলে পরেছে। মাথায় তার কাঁধ পর্যন্ত গোছা গোছা চুল ক্লিপ দিয়ে বাঁধা। নিরাসক্ত হয়ে শুনছে কার্জন কী সুন্দর খানিকটা গদ্য পড়ল। ক্রিটিক্যাল লেখা। তাদের জেনারেশন পৃথিবীকে কীভাবে দেখে, কী চায়, কী পায়। পুরো গ্রন্থনাংশটাই ওর আর বল্লীর। কার্জন কবিতা লিখবে, এত সুন্দর গদ্য লিখবে কেউ কি কখনও ভেবেছিল? কিন্তু সামহাউ তার আশ্চর্য লাগে না। আনপ্রেডিক্টেবল। হিউম্যান ফ্যাক্টর ইজ অলওয়েজ আনপ্রেডিক্টেবল। এ সব যেন হবারই ছিল। হতেই পারে। পাবলোর নিজের

হাতে আঁকা 'ভ্যাগাবন্ড'-এর পোস্টার চারদিকে। তারাও রং বুলিয়েছে। 'ভ্যাগাবন্ড' দা ব্যান্ড অব দা জেনারেশন ওয়াই। আ টোট্যাল এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড আ স্টেটমেন্ট।' দৃঢ় রেখায় আঁকা স্কেচ, কালিতে রঙে, চারকোলে। কার হাতে স্প্যানিশ গিটার, কার হাতে একতারা, কে আবার ডুগডুগি নিয়ে পোজ দিয়েছে। পাবলো কী স্বতঃস্ফূর্ত গাইছে! ও চিরকালই খুব ঘ্যাম গায়। তাই বলে নিজে এমন দুর্দান্ত ক্যাচি আবার মন গলানো কান্না নিংড়োনো মজাদার সব সুর দিয়ে গাইবে? এমন সব লিরিক? দাদা ছবি তুলছে। পাবলিসিটিতেও লাগবে। হল-ভরতি গমগম করছে। বল্লীও গাইছে, আরমান আর দাদা হেঁড়ে গলায় হাঁকার দিচ্ছে মাঝে মাঝে—ধ্যাত্তেরিকা! যাচ্ছেতাই। ব্যাটাচ্ছেলে! খাওয়াচ্ছি! সবাই হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে। পঙ্কজ সিনথিসাইজারে। তুলসী-পরি-শোভা-গঙ্গার গলায় পল্লিগীতি। একদম আলাদা গলা। আলাদা সুর। উচ্চারণ।

"আমার টুসু য্যামন অ্যামন, তোমার টুসু ভালা
উদের টুসু ফাস্টো কেলাস ঘর করেছে আলা—উদের ঘর করেছে আলা!
টুহুসু রে! ও টুহুসু রে!..."

পার্কাশনে একজন এক্সপার্ট ছেলে পাওয়া গেছে স্কটিশের স্যন্দন। স্পেশ্যাল এফেক্ট বিজয়মুকুলদার ছেলে বিনয়মুকুলদা। ওদের সবাই দাদা। বাবাও ছেলেও।

আমরা সবাই দাদা, আমাদের এই দাদার রাজত্বে।

মিটিং দাদা, মিছিল দাদা, তোলা দাদা ভোলা দাদা গ্যালো গ্যালো দাদার রাজত্বে আমরা সবাই ভ্যাদা।

দাদা যা বলে তাই শুনি
আমরা লেজকাটা টুনটুনি
এক টুনিতে টুনটুনাল লক্ষ টুনির ন্যাজ কাটাল
নাক কাটাল, কান কাটাল,
দাদার বড্ড গ্যাদা।
দাদাদের এই গ্যাদার রাজত্বে
আমাদের সবার গ্যাদা!

পেট উঁচু করে করে কাঠের পুতুলের মতো হেঁটে হেঁটে পাবলোরা তুমুল হাসির রোল তুলে সব জম্পঝম্প এক্কেবারে থামিয়ে দিল। এখন শব্দহীন প্রেক্ষাগৃহে গর্ভগৃহে কার্জনের বয়ঃভাঙা গলা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

আলো অন্ধকারে যাই, ঘুমে বা নির্ঘুমে,
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে, যা যা কাজ করে
ভাবনা, বাস্তব, ঘটনা কল্পনা
আশা হতাশা আত্মঘাত, অন্তর্ঘাত, অপঘাত
ধনাত্মক, ঋণাত্মক যা যা খেলা করে
লাল নীল হলদে কালো মাছেদের মতো
শ্যাওলার প্রবালের জলজের মতো

শূন্যের ওপর দিয়ে
যত রং, যত মেঘ বায়ুকণা, পাখি পোকা চামচিকে উড়ে যায়
মরুঝড়ে যত বালুকণা
নদীবুকে যত জলকণা
আমাদের এই সব শহরের নির্গত নিশ্বাসে বিশ্বাসে
যত ধূম, বিষকণা
যত টক্সিন, যত ইনটক্সিক্যান্ট
সমস্ত কিছু মুঠোয় করে মুঠোয় করে মুঠোয় করে ... ছড়িয়ে দিলাম।

এবার পাবলোর গিমিক। প্রেক্ষাগৃহ থেকে গাইয়েরা গাইতে গাইতে উঠে যাচ্ছে, গ্রুপে, একে, ভাগ করে গাইছে :

যে যেখানে আছ পেরেন্টস টিচার্স শোনো শোনো
যে যেখানে করে খাচ্ছ লিডার্স শোনো শোনো
আঠারো বছরে ভোটই হয় না বিবেকও হয়
ছড়িয়ে যাচ্ছে দংশন, শুধু দংশন সারা বিবেকময়।
মদের পাউচ, সেক্সি আউচ। ড্রাগের কাউচ ভোটের বাক্স রক্তমাংস
সমস্ত ছুঁয়ে সমস্ত ছেয়ে বিবেক বইছে বিবেকময়। বিবেকময়।
(সমবেত গর্জন) কী করবে করো। কী করবে করো।

তারপর সব চুপ। দর্শক শ্রোতাদের বুঝতে সময় লাগল যে অনুষ্ঠান শেষ। তবু শেষ নয়।।

খারাপ ছেলে

কালবৈশাখ

এরকম বিদঘুটে অন্ধকার জায়গা সে আগে কখনও দেখেনি। এটা কি তারই বাড়ি? তা হলে কি সে ঘুমিয়ে থাকাকালীন হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেছে? আজকাল তো সেভাবে বিদ্যুৎ যায় না! যায়, সাতগেছেয় তার বাপের বাড়িতে যায় খুবই। অনেক সময়ে ভোল্টেজ খুব কমে থাকে।.... কোথা থেকে একটা মৃদু আওয়াজ আসছে না? খট খট খটাখট খট খট। খট খট খটাখট খট খট! কে যেন অবিশ্রান্ত কড়া নেড়ে যাচ্ছে। জোরে নয়, আস্তে, খুব ধৈর্যে কিন্তু খুব গোপনে। এত গোপন যে প্রায় নৈঃশব্দ্যের কাছাকাছি, ইশারা, শুধু ইশারা আছে এই মৃদু কড়া নাড়ায়। যেন সবাইকে জাগাতে চায় না। সবাই ঘুমিয়ে থাক। একঘেঁয়ে আওয়াজের ঘুমপাড়ানিতে আরও গভীর হোক ঘুম। শুধু একজন, বিশেষ একজন, যার দায়িত্ব বেশি, যার কর্তব্যের কোনও মাপজোক নেই, সে এসে চুপচাপ দরজাটা খুলে দিক। দরজার ওদিকে কে? চোর নয়, অথচ চোরের মতো, চেনা অথচ চেনার মতো নয়! ভেতর থেকে একটা দুর্বার কাঁপুনি আসছে। শীত করে জ্বর আসছে যেন। জিভ শুকিয়ে কাঠ। জল, একটু জল দাও কেউ। চতুর্দিকে বাঘের গায়ের দুঃসহ গন্ধ। বুনো, বোঁটকা। এবার সে বুঝতে পারে ধূর্ত মানুষখেকোটা অনেকক্ষণ তার পিছু নিয়েছে। গুঁড়ি মেরে মেরে আসছে তাকে লক্ষ্য করে। বাঘের বাড়ি তো জঙ্গলে! এটা কি তা হলে জঙ্গল? না তো! অন্ধকারের মধ্যে কবরখানার ফলকের মতো ঘরবাড়ি সব আবছা হয়ে ভেসে আছে যেন! লোডশেডিং-এর ফাঁকেই কি বাঘটা লোকালয়ে চলে এসেছে? জনবহুল শহরের অলিগলি দিয়ে, লোকজন ট্রাম, বাস, রিকশা, ঠ্যালাগাড়ির পাশ কাটিয়ে ভয়াবহ দুলকি চালে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে বাঘটা। চোখের হাড় হিম-করা সবুজ আলো যেন জাহাজের সার্চলাইট, ঘুরছে চুনবালি খসা পাঁজরাসার বাড়িগুলোর গায়ে। হাত-পা সব কোলের মধ্যে টেনে নেয় সে, ছোট্ট একটা পুঁটলি হয়ে যায়, মালভর্তি ট্রাকের পাশে মাথা গুঁজে কুঁকড়ে থাকে, আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকে আরও অন্ধকার কোণে, কানাচে। গলি পায়, পাথর পাতা সরু নোংরা, টিপি-টিপি আবর্জনা মাড়িয়ে মাড়িয়ে, ঘেন্নায় ভয়ে দিশেহারার মতো সে ছুটে চলে দু-পাশের পুরনো বাড়ির রোয়াকে রোয়াকে ধাক্কা খেতে খেতে। হুড়ুম করে একটা শব্দ। হুংকার দিয়ে লাফিয়ে পড়ছে বাঘটা। লাফিয়ে, লাফিয়ে, লাফিয়ে পড়ছে।

চিৎকার করে দিবানিদ্রা ভেঙে উঠে বসল সে। গোল গোল না-বোঝা চোখে বোবা আতঙ্ক। নড়ছে দরজা-জানলা, ঠাস করে জানলার পাট পড়ল কোথাও, সমস্ত ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। গড় গড় করে মেঘের ডাক। তীব্র বিদ্যুতের ঝলক বন্ধ খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঘরে দপ করে সাদা আলোর মশাল জ্বালিয়ে নিবে গেল। বাঘ নয়। ভূমিকম্প নয়, কালবৈশাখী। এ বছরের প্রথম। কিন্তু ঝড়ের তাণ্ডবের মধ্যেও দূর থেকে নির্ভুল ভেসে আসছে ধৈর্যশীল খট খট খটাখট খট খট খট খট...

সে বুঝতে পারছে অন্য ঘরগুলোর কোথাও জানলা খুলে গেছে ঝড়ের দাপটে। বন্ধ করা দরকার। কিন্তু হাত-পাগুলো অবশ হয়ে আছে। এখনও পুরোপুরি না-ভাঙা ঘোরে, ভয়ে। নামতে গেলে

যদি খাটের তলা থেকে দুটো লোমশ থাবা.... খাট থেকে নিরাপদ দূরত্বে লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল। ভীষণ লেগেছে। কিন্তু সেসব অগ্রাহ্য করে কোনওক্রমে খিল খুলে সে দালানের অপর প্রান্তের দরজাটায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'জিনা! জিনা! জিনা!' শেষের দিকে গলার স্বর আর্ত কান্নার মতো শোনাচ্ছিল।

খুলেছে। খুলেছে। ওই তো জিনা! খোলা দরজার ওপারে দীর্ঘ কাফতান, অভয়দাত্রী বরদা।

—এ কী! তুমি যে পড়ে যাচ্ছ? কী হয়েছে দিদিভাই?

দরজাটা কোনওমতে ধরে যেন ডুবন্ত মানুষের মতো হাঁকপাক করছে মল্লিকা।

—ভরদুপুরে কে দরজা নাড়ছে...

—এ তো ঝড়ের আওয়াজ...

—না... না... ওই শোন.... ওই আবার...

—আমি দেখছি। তুমি ভেতরে এসে বসো তো... তারপরে সে বলল... দরজা নাড়লেই বা কী?

কী, তা জিনা বুঝবে না। জিনা কেন, কেউ বুঝবে না। কেউ না কেউ না। এতক্ষণ পরে আশ্বাস পেয়ে মল্লিকার চোখ দিয়ে গরম জল নামতে থাকে। ভয়ের অশ্রু। প্রায় ফুটছে এত গরম।

সত্যিই দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। ফুটো আছে একটা। কিন্তু ওপারে ঠিক জায়গায় না দাঁড়ালে কিচ্ছু দেখা যায় না। খুলতেই দমাস করে হাট হয়ে গেল পাল্লাদুটো। কোনওক্রমে দু হাত দিয়ে সেগুলো সামলাতে সামলাতে জিনা দেখল রোগামতো একটি লোক, কাঁধে ঝুলি, —ওহ্ ক্যুরিয়ার সার্ভিস। একটা কার্ড।

উলটো দিকে স্কটিশচার্চ কলেজ আর হেদুয়ার দক্ষিণে আকাশ নীলচে কালো, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ক্রমাগত নীচ থেকে ওপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। গরম হাওয়ার স্তর ভেদ করে একঝলক কনকনে এস্কিমো হাওয়া বরফজলের ঝাপটায় মুখের ওপর গলার ওপর আছড়ে পড়ল। নিখিল দে সরকারের নামে কার্ডটা। জনৈক 'ল' পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক নববর্ষে, ক্রিসমাসে আসে। লোকটি দরজা ভুল করেছে। ঠিক দুপুরবেলা লোকের বাড়ির দরজা ঠেঙিয়ে এভাবে কার্ড পাঠাবার মানেটা কী? সবাই জানে এসময়ে ঘুমন্ত গিন্নিবান্নি আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ থাকে না। লোকে দরজা খুলবেই বা কী ভরসায়? এইসব ক্যুরিয়ারদের কী নিয়ম সে জানে না। কিন্তু এরা তো সন্ধেবেলাতেও আসতে পারে! এসেও থাকে! বলতে গিয়ে দেখল লোকটি অনেক দূরে চলে গেছে। ঝড়ের মুখে একটা কুটোর মতো উড়ে গেছে বোধহয়।

দোতলায় উঠতে উঠতে বিস্ময়টা আবার ফিরে এল। ঠিক আছে। দরজায় কেউ কড়া নাড়ছে। তো ভয়ের কী আছে? এত ভয়? আঁচল লুটোচ্ছে, নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে, ঠোঁট শুকনো, চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেছে! এ কী!

—ক্যুরিয়ার, নিখিল দে সরকারের চিঠি। কার্ড একটা। ওর বন্ধু মি. ল'-এর কার্ড। দিদিভাই। স্বপ্ন দেখেছিলে, না?

মল্লিকা দরজার কাঠে ঠেস দিয়ে দু হাত পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দিশেহারা আতঙ্কের ভাবটা এই মুহূর্তে নেই। কিন্তু মুখটা সাদা হয়ে আছে। কেমন অবসন্ন।

—বেল তো ছিল। দরজা ঠক ঠক করছিল যে!—কোনওক্রমে শুকনো গলায় বলল মল্লিকা। অসংলগ্ন।

সত্যি তো! বেল না বাজিয়ে লোকটা ঠক ঠক করছিল কেন! আসলে বেলটা একটু ওপরে। ছোট ছেলেরা বাজিয়ে কান ঝালাপালা করে দেয়। সেই উৎপাত থেকে বাঁচতেই ওপরে লাগানো হয়েছে বেলটা। দেখতে পায়নি বোধহয়। সেই কথাই বলল জিনা।

—চলো তো। নির্ঘাত স্বপ্ন দেখছিলে। চোরের না ডাকাতের?

চমকে উঠল মল্লিকা। জিনা ফ্রিজ থেকে এক গ্লাস ঠান্ডা জল নিয়ে এসে বলল—খাও তো

জলটা। সে মল্লিকার আঁচল গুছিয়ে তুলে দিল।

—তুমি ঝড় ভয় পাও দিদিভাই, না? অনেকে পায়। আমার ভাই ছোটবেলায় খাটের তলায় ঢুকে যেত দু কানে আঙুল দিয়ে। আমার কিন্তু ঝড় দুর্ধর্ষ লাগে। চলো প্লিজ। ছাতে চলো, তোমার ভয় আমি ভেঙে দেব।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই হিড়হিড় করে মল্লিকাকে টানতে থাকে সে।

মল্লিকা বলল, দাঁড়া, কোথায় জানলা পড়ছে, বন্ধ করে আসি।

—পারবে? না আমি যাব? ঘরে যদি ডাকাত লুকিয়ে থাকে?

জিনা হাসছে। শিউরে উঠল মল্লিকা, একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, তুই যা, আমি আসছি।

—ঠিক তো? আসবে তো? না এলে ভাল হবে না কিন্তু।

জিনা ভয়ের কী জানবে? জিনার চারপাশে কত অভিভাবক, কত রক্ষক, কত আলো, কত সঙ্গীসাথী! কত রকম সম্পর্ক থেকে জিনা তার অজস্র প্রাণশক্তি সঞ্চয় করেছে। টগবগ করছে যেন সব সময়ে। বিদ্যুৎহীন গ্রামাঞ্চলের ঝোপেঝাড়ে, গোয়ালে, উঠোনে, ঘরের কোণে, তক্তপোশের তলায় কীরকম ঝুঁঝকো আঁধার থাকে সে কি জানে? জানে মা না-থাকার ভয়, বাবা থেকেও না-থাকার ভয়, একমাত্র দিদির বিয়ে হয়ে যাওয়ার ভয়? আরও কত, কত!

ইস্, ঝুম্পা-মাম্পির ঘরখানা একেবারে হুলুট-থুলুট হয়ে গেছে। বালিশ থেকে ঢাকা উড়ে গেছে, টেবিলের ওপরে কাগজপত্র লুটোপুটি খাচ্ছে, ধুলোয় ঘরখানা বোঝাই। জানলাটা বোধহয় ভাল করে বন্ধ করে যায়নি ওরা। ছিটকিনিটা ঠিক জায়গায় পড়েনি। ভাল করে জানলা বন্ধ করে ঝাঁটা আনতে যাচ্ছিল। নাঃ, এসব পরে হবে, এখন ছাতে না গেলে জিনা এক্ষুনি হুড়মুড় করে নেমে আসবে।

—কই, দিদিভাই? দু-তিন সিঁড়ি টপকে টপকে ঠিক নেমে আসছে।

—যাচ্ছি—

দুড়দাড় করে আবার উঠে গেল জিনা। পেছনে মল্লিকা। ছাতে দমকা হাওয়া। জিনা এখন আর ডাফ স্ট্রিটের বাড়ির ছোটবউ নেই। হয়ে গেছে আপাদমস্তক দমদম মতিঝিলের জিনপরি। ওর জ্যাঠামশাই ওকে 'জিনপরি' বলে ডাকেন। বোনেদের সঙ্গে পড়িমরি করে সে এখন ছাতে উঠছে। প্রকাশিত উদ্দেশ্য কাপড় তোলা, আসল উদ্দেশ ঝড়বৃষ্টিতে দাপাদাপি। সবাই মিলে হাসতে হাসতে ছুটোছুটি হবে এখন। এ ওর পেছনে। ও এর পেছনে। মেজজেঠুর ধুতিটা বাগানো গেল তো ঠাকুমার থান ওই উড়ে যায়। বেজায় মোটা সেজজেঠুর ফতুয়া হাত টান-টান করে শুকোতে দেওয়া, সেটা প্রবল বেগে দুলছে। যেন সেজজেঠু নিজেই ফতুয়ার মধ্যে গলে বসে আছে। ঝড়ে ফতুয়াও দুলছে। সেজজেঠুও দুলছে এতোল বেতোল। কে কাকে বলল কথাটা। বাস, হাসির রোল উঠল। ছোট ছোট শার্ট, প্যান্ট, ফ্রকগুলো ক্লিপ খোলামাত্র লাট খেয়ে উড়ে পড়ছে পাঁচিলে। ওমা। সীতা যে লক্ষ্মণের গণ্ডি পেরিয়ে গেল—সেজদির চিৎকার। একটা প্যান্ট উড়ে চলে গেছে। ক্ষুরধার বৃষ্টিতে এবার সব ভিজে জাব। কাপড়ও, কাপড় তুলুনিরাও। যত বৃষ্টি তত হাসি। যত হাওয়া তত নাচ।

—ও মা গো! কাপড় তুলছে না আরও কিছু, ও বড়দি দেখে যাও, কাপড় তোলার নাম করে মেয়েগুলো কাকভেজা ভিজছে। কাপড়চোপড় সব ভিজে গোবো-ওর। কাকিমার তারস্বর নালিশ ডুবিয়ে দিয়ে আকাশচেরা বিদ্যুৎ ঝলসে বাজ পড়ল।

আকাশে গড়গড় করে রোলার গড়ানো শুরু হয়ে গেল। গম্ভীর আওয়াজে ভরে যাচ্ছে চরাচর। ছাতের পাঁচিলের নিচু ধাপে পা রেখে সে অবলীলায় শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে দেয়, তারপর মুখটাকে ওপরের দিকে হাসি হাসি করে তুলে ধরে, ঝড় খায়।

'বেড়া ভাঙার মাতন নামে এ উদ্দাম উল্লাসে/আসে আসে'—গাইতে গাইতে লাফ দিয়ে নামে সে, ধাপ থেকে ছাদে।

—দিদি ভা-ই—দু হাত দুদিকে ছড়িয়ে এরোপ্লেনের মতো সে ছুটে যায় ছাতের এক দিক থেকে আর এক দিকে।

—এবার জাগ রে হতাশ আয় রে
এবার জাগ রে হতাশ আয় রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে
বুঝি এল এল তোমার পথের সাথী বিপুল অট্টহাসে
আসে আ-সে। গাইতে গাইতে সে ছুটে এসে দু হাত দিয়ে মল্লিকার গলা জড়িয়ে ধরল।

—দুর্ধর্ষ, না?

—কোনটা?—এতক্ষণে মল্লিকার মুখে কথা ফুটেছে!

—এই স-ব। হাত দিয়ে সমস্তটাকে সাপটে নিয়ে জিনা বলল এই ঝড়, গান, দুপুর, গরম, আমি, তুমি, তোমার স্বপ্ন, ভয়, সব... স...ব!

দূরের দিকে তাকিয়ে মল্লিকা দেখল দুটো নারকোল গাছ দক্ষিণ থেকে উত্তরে বেঁকছে, বেঁকছে, বেঁকছে। একেবারে এক গতিতে, পুরো একটা ঝাঁটা হয়ে গেছে। আবার উঠল, সোজা হল। ঝাঁকি দিয়ে পশ্চিমের দিকে ঝুঁকে পড়ল এবার। ধুলোর ঘূর্ণি উঠছে। কুটোকাঠি, পাতাপুতি, সব পাকিয়ে পাকিয়ে ঘুরছে, সেই ঘুরনের কেন্দ্রে একটা মেয়ে। সে? জিনা? না ঝুম্পা? না মাম্পি? হতে পারে সবাই। কিন্তু তার এখন মনে পড়ছে বৃষ্টিভেজা মাটির গন্ধ। সন্ধে করে বৃষ্টি থেমেছে। এবার হু-হু করে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে মেঘের দল, তলা থেকে বেরিয়ে পড়ছে, তকতকে করে মোছা নীল আকাশ। সন্ধে, তাই রংটা একটু গাঢ়, কালো মেশানো নীল, তারা ফুটে উঠছে,—যাক, এক পশলা হয়ে গরমটা একটু কমল...

রাস্তা দিয়ে পিছল বাঁচিয়ে পা টিপে টিপে চলতে চলতে কেউ বলল।

—এই শুরু হলও বলতে পার। এইবার চাল উড়বে, ঝড়ের এমন দাপট হলে আমার রান্নাঘরের দেওয়ালখানা নিয্যস পড়বে। তোমার আর কী! পাকা করে নিয়েচ।

—গরমটার কথা বলো, গরমটার কথা বলো... ঘামাচি হয়ে হয়ে, ঘামাচি হয়ে হয়ে...
বাইরে শুতেও আজকাল সাহস হয় না।

—শুনছ-ও, কে আছিস, মল্লি-ই ছাতাটা ধর দেখি।

কাকা আগড় খুলে ঢুকছেন। পা কাদায় কাদা। সে জল ঢেলে দিচ্ছে প্লাস্টিকের লাল মগে করে।

কাকিমা বেরিয়ে এল। হাতে শাঁখ। একটা দাঁত উঁচু। ওপরের দিকে মুখ করে শাঁখে ফুঁ দিল, তারপর বলল, বুঝলে? মল্লির হিল্লে হয়ে গেল।

—মল্লির? হিল্লে? কীরকম?

—ও বাড়ির আরতিদি এসেছিলেন আজ। গলা থেকে হার খুলে মল্লিকে পরিয়ে দিয়ে গেছেন।

—বল কী? তা ব্যাপারখানা....

—আরে আরতিদির বড় ছেলেটি তো চার্টার পাস করে চাকরিতে ঢুকেছে আর বছর। চাকরি পাকা হল। বুঝলে না? মল্লিকে বুক করে গেলেন।

—বলেছেন কিছু?

—বলেনি। বলবে, দুদিন যেতে দাও।

—তা না বলবার কারণটা কী?

—কে জানে! ঘোড়েল মহিলা। হয়তো আর পাঁচটা দেখছে।

—অন্য কোথাও পছন্দ হলে হারের কী হবে?

—কী আবার হবে? একখানা চিলতে সোনার হার আর ওদের গায়ে লাগে না।

মল্লি সরে যাচ্ছে ছায়া থেকে অন্ধকারের দিকে, অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকার। নাকি আলো!

কোনটা অন্ধকারে কোনটা আলো সে জানে না। কলেজের বাইরে একটা মজা পুকুর। সারের লেকচার শুনতে শুনতে ওই মজা পুকুরের দিকে চোখ চলে যায়। একদলা কচুরিপানার ওপর একটা মাছরাঙা বসেই উড়ে গেল। কোঁচড়ে করে গুগলি তুলছে একটি বউ। একটা ছাগলি ভারী পালান নিয়ে পুকুরধারের আগাছা খেয়ে বেড়াচ্ছে। পড়াশোনাটা তত ভাল লাগে না মল্লিকার। কলেজ ভাল লাগে। অন্য মেয়েদের সঙ্গে দেখাশোনা, কথাবার্তা। সার, ম্যাডাম। শুধুই তো সবসময়ে সংবিধান আর মার্কসীয় তত্ত্ব পড়াচ্ছেন না, অন্য গল্পও করছেন। কেউ কেউ বেশ মজার গল্প করতে পারেন। সারেদের সব্বাইকার মল্লিকার ওপর খুব ঝোঁক। যে সার গোমড়ামুখো, অন্য দিকে চেয়ে পড়ান সেই দীপ্তেন সারেরও। ওঁরা মল্লিকাকে বিদ্যাদিগ্‌গজ বিদ্যাধরী না করেই ছাড়বেন না।

—কালকে কী বলছিলাম? পয়েন্টসগুলো মল্লিকা বলো—

দূর বাবা, বলছিলেন তো আপনি, আমি কী করে জানব? মল্লিকা ভাবে।

অর্ধেক মনোযোগ দিয়ে এই মজা পুকুর, কচুরিপানা, গেঁড়িগুগলি, সংবিধান, সন্ধে হতে না-হতেই ওই আঁধার, এ আর কতদিন? হয়তো আরতিদি, ওপাড়ার আরতিদিই ভাল। ওই মাছরাঙাটার মতো তাকে ঠোঁটে করে উড়ে যাবেন। কোথায় যাবেন, সে তাঁর খাদ্য হবে না খেলা হবে এ প্রশ্ন বোধহয় অবান্তর। মায়েরা যে কেন মারা যান! বেশ তো ছিল তারা! হেলথ্ সেন্টারের কম্পাউন্ডার ছিলেন বাবা। তো অর্ধেক চিকিৎসা সেই আধা শহরে বাবাই করতেন। কত কল আসত। তারা বাবাকে ডাক্তার বলেই জানত। সবাই ডাক্তারবাবুই বলত। মাকে বলত ডাক্তার বউদি। স্বয়ং ডাক্তার বউদিরই কোনও চিকিৎসা হল না। একটি বারো, একটি আট, দুই মেয়েকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন অসহায় ডাক্তারবাবু। বছর চার-পাঁচ কোনওরকমে কাটালেন, তারপর নিজেও এসে গ্রামে বসে গেলেন। এখানেও রোগী হয়। চিকিৎসা করেন, কিন্তু কেমন আলাভোলা মতো হয়ে গেছেন। কাকা-কাকিমা বলে উদোমাদা।

কিন্তু এ কেমন আচরণ? সে জানল না, বুঝল না, দেখল না, মতামত দিল না, কেউ জিজ্ঞেসও করল না। একজন গিন্নিবান্নি মানুষ তাঁর ইচ্ছেমতো তাকে 'বুক' করে গেলেন? সত্যি বলছি জিনা ভেতর থেকে হু হু করে কান্না আসছিল। কিন্তু যার কান্না বোঝবার কেউ থাকে না, তার চোখের জল চোখেই শুকোয়।

—দিদিভাই। তোমার কারও সঙ্গে প্রেম হয়নি?

—ভ্যাট!

—অনেস্টলি দিদিভাই, যদি বল হয়নি, আমি এক কড়াও বিশ্বাস করব না। সব মেয়ের চোদ্দো-পনেরো থেকে প্রেম হতে শুরু করে, কেমন কিনা?

—তুই-ই বল আমি শুনি।

—শুনলে হবে না বলতে হবে। আচ্ছা, আমি কি দাদাকে বলে দিতে যাচ্ছি?

—বলে দিলে কী হবে? সে কি আমার হাতে মাথা কেটে নেবে?

—তবে? তবে বলবে না কেন?

—ঠিক আছে, বলব। তুই আগে বল, চোদ্দো-পনেরো কী সব বলছিলি?

—খুব মজা, না? আমারটা জেনে নেবে, তারপর নিজের বেলায় বলবে গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি মারিসনি। তোমাকে আমি চিনি না? হেভি চালাক।

—সত্যি সত্যি তিন সত্যি করছি, বলব।

—না, আমি বলছিলাম কি প্রথমে ভেতরে একটা প্রেম প্রেম ভাব হয়। নিজেকে নিয়ে নিজেই গদগদ। এই ধর পাড়ার দাদা, বন্ধুর দাদা, নিজের কাজিন-টাজিন, মল্লিকা মিটিমিটি হাসে—তারপর?

—তারপর ধর ফিলমের হিরো, গল্প-উপন্যাসের হিরো, বন্ধুর দাদাটা কনটিনিউ করতে থাকে, যদি না তার মাইনাস পয়েন্টগুলো একেবারে জ্বলজ্বলে হয়ে বেরিয়ে পড়ে।

—আর কাজিন?

—কাজিন আউট, ওরে ব্বাবা, অনেকে নিষিদ্ধের থ্রিল পেতে ঝুলে পড়ে বটে দিদিভাই, কিন্তু মোস্ট আনরিওয়ার্ডি।

—কেন?

—কেন আবার কী? নতুন তো কিছু নেই! পিসি-মাসি পিসে-মেসো এদের তো তুমি ইনসাইড আউট চেনো। নতুন বোতলে পুরাতন? কবি বলেছেন না? পুরানো জানিয়া চেয়ো না, চেয়ো না.... আধেক আঁখির কোণে। জিনার গলায় উচ্ছ্বসিত হাসি। প্রেম নতুন কিছু চায়, বুঝলে দিদিভাই! দেশভ্রমণে যাওয়ার মতো! কিংবা একেবারে ভিন্নদেশে সেট্‌ল করার মতো। তবে সবচেয়ে কমন হল কলেজ য়ুনিভার্সিটি প্রেম। ব্যাচমেটকে আজকাল তা বলে হাফ পার্সেন্টও পাত্তা দেয় না, স্পোর্টস বা টেস্ট-ফেস্ট-এ এ প্লাস পেলে কটা দিন একটু স্বপ্নে আসা-যাওয়া করে বাস, ফুলস্টপ। এরা কতটুকু করে জান? একটা প্রেমের উপক্রমণিকা তৈরি করে দেয়। ঠিকঠাক একটা মেজাজ। তবে যদি হায়ার ক্লাসের হয় তো একটা বীভৎস ঝুলোঝুলি হয়। আচ্ছা এবার চালাকি ছেড়ে তোমার কেস বলো দিকি! ইয়ার্কি।

—আরে আমি গাঁয়ের মেয়ে। আমার আবার প্রেম কী?

—তবে রে? গাঁয়ে আর পাড়ার দাদা, বন্ধুর দাদা থাকে না? গাঁয়ের মেয়ের আর কাজিন নেই?

—কমন ক্যানডিডেট সব তো বলেই দিলি। ওইরকমই আমারও ঘটেছিল নিশ্চয়। কোনওটাই তেমন স্পষ্ট নয়। ওই তোর উপক্রমণিকাই।

—একদম বাজে কথা বলবে না দিদিভাই, তুমি হলে গিয়ে টিপিক্যাল ম্যান'স উয়োম্যান।

—মানে? তুই বাগে পেয়ে গুরুজনকে যা-তা বলছিস?

—এই তো! 'গুরুজন' তাসটা যে তুমি বেগতিক বুঝলেই খেলবে সেটা তো আমি আগেই বলে দিয়েছি। তা খারাপ তো কিছু বলিনি দিদিভাই। তোমাকে বিধাতা খুব অ্যাট্রাকটিভ করে গড়েছেন। বাস।

—কেন? তুই অ্যাট্রাকটিভ নোস। যেখানে যাস, মুণ্ডু তো সব তোর দিকে ঘুরে যায়।

—সত্যি সত্যি যায় কি না জানি না। তবে যতই সাজপোশাক করি, তোমার কাছে আমি কিছুই না। মানে ওই চার্ম-এর দিক থেকে। আমার হয়তো এক ফোঁটা ব্যক্তিত্ব, তোমার এক পুকুর চার্ম। —বুঝলে আর পুঙ্গবগুলো ব্যক্তিত্বফেক্তিত্ব দেখলে হেভি ঘাবড়ে যায়।

—একমাত্র নিখিলবিশ্ব দে সরকার ছাড়া।

দুজনে লুটোপুটি খেয়ে হাসে।

জিনার মতো সুখী জীবনের মেয়েকে বোঝানো শক্ত, কী কঠিন সংকট আর মনখারাপের মধ্যে তার কৈশোর কেটেছে। সেই দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার করা দিনগুলোতে... বাবা দিন দিন অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছেন, খোঁজখবর পর্যন্ত নেন না মেয়েরা কোথায় আছে, কেমন আছে... কাকা-কাকিমার তাচ্ছিল্য বাবাকে এবং তাদের.... দিদি ছিল আরও দুর্বল। ফাঁক পেলেই কাঁদত আর কথায় কথায় রেগে যেত, যত রাগ মল্লির ওপর। সেই সময়ে প্রেমট্রেমের বিলাসিতা যে একেবারে উদ্ভট চিন্তা ছাড়া আর কিছু না, তা কাউকে বোঝানো শক্ত। তবে কি অন্যদের নজর, অন্যদের কৌতূহল, ঘুরে ঘুরে কাছে আসা, বুড়োদের ছুঁকছুঁকুনি এসব বুঝতে পারেনি? কিন্তু সে তো প্রেম নয়! একমাত্র একটা ঘটনাই মনে আছে। অল্প বয়সি প্রোফেসর ছিলেন ইংরেজির। সলিল সেন। তিনিও ক্লাসে কারও দিকে চাইতেন না। দেয়ালের দিকে চেয়ে পড়াতেন। কিন্তু যখন-তখন শুধু মল্লিকার সঙ্গেই তাঁর চোখাচোখি হয়ে যেত। চোখের ভাষা শুধু। সলিল সেন কী একটা পড়াশোনার কাজ নিয়ে দিল্লি ইউনিভার্সিটি গেলেন। স্টাডি লিভ নিয়ে। একদিন কলেজের বেয়ারা এসে একটা মস্ত লেফাফা এনে দিল, বলল—সলিল সার দিয়ে গেলেন, দিদিমণি এর মধ্যে ইস্পেশ্যাল নোটস আছে। খুলে দেখে ওমা! গুচ্ছের সাদা

কাগজ। তার মধ্যে একটায় বড় বড় করে লেখা—'রিমেমবার মি।' মানে কী এর? শুধু স্মৃতিতে আবছা ছবি হয়ে থাকতে চায়? না জ্বল-জ্বলন্ত হয়ে থাকতে চাইছে আবার ফিরে আসবে বলে! স্পষ্ট করে অপেক্ষা করার কথাও তো কিছু লেখেনি? এ কী রকমের কাপুরুষ, অপুরুষ ভালবাসা, যদি ভালবাসাই হয়? বিমানের মা যে হারছড়া দিয়ে তাক 'বুক' করলেন সে মোটেই বুঝতে পারেনি। উনি বলেছিলেন—বা, বা, নরেনদার এমন মেয়ে? চমৎকার মেয়ে, গলা থেকে হারছড়া খুলে পরিয়ে দিলেন—এমন মেয়ের মুখ কি শুধু হাতে দেখতে আছে? কাকিমা চৌকাঠের পাশে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বলছে—হিল্লে হয়ে গেল—কাকিমার সেই ঘাড় ফেরানোর ভঙ্গিটা, কানের তলায় গুঁড়ো চুল, একটা লাল পাথর চিকচিক করছে কানে—এখনও স্পষ্ট মনে আছে দৃশ্যটা।

কেন যে কান্না এসেছিল? হয়তো কান্নার মধ্যে ইংরেজির সার সলিল সেনও মিশে ছিলেন। কিন্তু আশা হয়ে নয়, বরং ক্রোধ হয়ে। আশাভঙ্গ হয়ে। মা-মরা, বাপের খোঁজ-না-নেওয়া একটা মেয়ে। তার আবার মতামত? এই তাচ্ছিল্যই আসলে তাকে অপমানের কান্না কাঁদিয়েছিল। আশ্চর্য, এখনও, এত দিনেও, বড় মেয়ে আঠারো পার হল, এখনও সেই অন্ধকার, অনিরাপদ, অপমানময় সন্ধ্যা তার অনুভূতিতে ফিরে ফিরে আসে। ফিরে আসে বিবাহোত্তর সেই বাড়ির দ্বিপ্রাহরিক নির্জনতাও। দুটি যুবক একটি তরুণী, এক প্রৌঢ় এক প্রৌঢ়া। সেই অস্বস্তি, অস্বাচ্ছন্দ্য, অসুবিধের কথা, আতঙ্কের কথা কাউকে না বলতে পারার অন্ধকার।

বৃষ্টিতে চুরচুর ভেজা হয়েছে। ভাগ্যিস মাম্পি বাড়ি নেই। থাকলে ভিজত। নির্ঘাত গ্ল্যান্ড ফুলত, জ্বর হত। পায়ের জলছাপ ফেলে ফেলে মল্লিকা কলঘরে গেল। বৃষ্টির জলের পর কলের জল গরম লাগে। কে জানে কেন, আজকের জলটা যথেষ্ট কনকনে। আরামে শিউরোচ্ছে গা। কেন যে দুপুরে ঘুমোতে গিয়েছিল। দুপুর-ঘুমেই এ বিশ্রী স্বপ্নগুলো আসে। বাঘ, চোর, মাঝে মাঝে ম্যমির স্বপ্ন আসে। একটা বিরাট দৈত্যের মতো লোক। মুখে মাথায় কোথাও কোনও চুল নেই। চোখদুটো কাচের মতো। চৌকো চোয়াল। বিরাট বিরাট থামের মতো পা ফেলে এগিয়ে আসছে। সে প্রাণপণে চিৎকার করছে কিন্তু আওয়াজ বেরোচ্ছে না। মাঠঘাট পেরিয়ে ছুটছে। কিন্তু দূরে যেতে পারছে না। এই লুটিয়ে পড়া আঁচল পায়ে বেধে যাচ্ছে।

—দিদিভাই দিদিভাই?

—আবার কী হল? —ভেতর থেকে সে সাড়া দিল।

—শিগগির বেরিয়ে এসো। আমার বন্ধু এসেছে। সেই মুকুট গো!

হঠাৎ যেন ভয়টা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে রাত শেষের বাদুড়ের মতো দূরে মিলিয়ে গেল। জিনার বন্ধু, মুকুট, বিদেশে থাকত, কাজ করে, একা একা, এসেছে। যেন বাইরের হাওয়া নিয়ে এসেছে। এই নির্জন দুপুরের ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা ভেঙে যাচ্ছে। দুপুরটা ভাল নয়, দুপুরটা অনিরাপদ, দুঃসহ, যত দুঃস্বপ্ন সে দুপুর-ঘুমেই দেখে। বিকেল হয়ে গেলে মেয়েরা ঘরে ফিরবে, শুধু তার ঘরে নয়, সব ঘরে। আর একটু পরে সন্ধে হবে, অফিস-ফেরত মানুষের ঢল নামবে মহানগরীর বুকে, এই বাড়ির অতীতভরা খাঁ খাঁ দুপুর তখন লেজ তুলে দে দৌড়। তাড়াহুড়ো করে সাবান মাখতে থাকে সে। কলঘর ভরে যায় ল্যাভেন্ডারের গন্ধে।

কল্যাণবাবুর আত্মীয়স্বজন

কল্যাণবাবুর নারীভাগ্য ভাল। মা অবশ্য তাঁর কপালে বেশিদিন টেঁকেননি। কিন্তু যে জেঠিমার কাছে তিনি প্রধানত মানুষ, তিনি তাঁকে চিরকাল বুক দিয়ে আগলেছেন। এক ছেলে হওয়ার দরুন ঠাকুরদাদার ভূ-সম্পত্তির মধ্যে, বরানগরের গোটা একখানা বাড়ি, তা ছাড়া বেশ কিছু টাকাপয়সাও তিনি একলা পাবেন, এ নিয়ে অন্যান্য কাকাদের মধ্যে একটা রাগ-বিরক্তি ছিল। বাবা কর্মোপলক্ষে বিদেশে থাকতেন। ছেলেটি সম্পূর্ণ পরিজনদের করুণানির্ভর, অনেক ক্ষতিই তো হতে পারত। কিছুই হয়নি। জেঠিমা সব সময়ে নজর রাখতেন। বিয়ে যখন করলেন, দেখা গেল স্ত্রীও চমৎকার মানুষ। আমুদে, সংসার চালনায় অতি দক্ষ। এই বাড়ি দুজনে পছন্দ করে কিনলেন। বাড়ি টিপটপ রাখা, পাঁচ বছর অন্তর অন্তর স্বামীকে ধরে-করে চুনকাম, সারাই-ঝালাই করানো—এ সব তিনি একেবারে নিয়ম করে করতেন। কল্যাণবাবু চিরকাল উচ্চপদে চাকরি করছেন। কিন্তু সৎ মানুষ, বিলাসিতা করার মতো উপার্জন করেননি।

কিন্তু স্ত্রীর প্রবল বাস্তববুদ্ধির জন্য কোনওদিন কোনও অসুবিধের মধ্যে পড়েননি। পিতৃসূত্রে পাওয়া সম্পদ দিব্যি দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে গেছে। মানুষ হিসেবে আরতি কতটা ভাল, কতটা উদার ছিলেন তার অবশ্য কোনও সত্যিকার পরীক্ষা হয়নি। কোনও ভাগীদার তো কখনও ছিল না! নিজের বাপের বাড়ির দেশ থেকে প্রায় অনাথা একটি শান্তশিষ্ট রূপসী মেয়েকে বড় ছেলের জন্য সংগ্রহ করে আনলেন। চালাকিটা কি আর তিনি বোঝেননি? গরিবের মেয়ে, মাতৃহীন, তার ওপর দেশঘরের। এত আদর, এমন ঘর-বর পেয়ে সে তো স্রেফ কৃতজ্ঞতাতেই চিরটাকাল নুয়ে থাকবে! ছেলেও শান্ত প্রকৃতির, তাকে যৌবন থেকেই ব্রিজের নেশা ধরেছে, সে বরাবর মায়ের অনুগত। যেমন ছিল তেমনই রইল। তবে বউমা কি আর এত সত্ত্বেও শাশুড়ির হিসেব উলটে দিতে পারত না? কিন্তু দেয়নি। মল্লিকা বড় ভাল মেয়ে। শান্ত, ঘরোয়া, কল্যাণবাবুর সঙ্গে তার আপন কন্যার মতোই সম্পর্ক হয়ে গেছে। তার একটাই মাত্র দোষ। সে বড় ভুলো, অগোছালো, সুগৃহিণী নয়। হতে পারে, শাশুড়ি অতি সুগৃহিণী ছিলেন বলেই সে ওরকম হতে পারল না, আদেশ পালন করতে করতে আদেশ দেওয়া কী জিনিস, পরিচালনা করা কী জিনিস শিখে উঠতে পারল না। তবে এ নিয়ে তাঁরা সবাই, এমনকী, মল্লিকার মেয়েরাও খালি মজাই করে। কোনও নালিশ নেই।

—দাদু আজকে হরিমটর। মায়ের ভাঁড়ারে চাল, ডাল, তেল, আটা, নুন সব বাড়ন্ত। শাকভাত এমনকী নুনভাত খাবারও উপায় নেই!

—সে কী! বউমা! বউমা!—

—কী বাবা!

—তোমার নাকি সব বাড়ন্ত? আমায় বলনি কেন? এনে দিতুম।

—কে বললে আপনাকে এসব?

—ঝুম্পা।

—ওদের আসলে আজকে হোটেলে খাবার ইচ্ছে হয়েছে, তাই আপনাকে গুচ্ছের বাজে কথাগুলো লাগিয়ে গেছে।

ঝুম্পা কিছুটা বাড়াবাড়ি করলেও একেবারে বাজে কথা কিন্তু মোটেই বলেনি। সত্যিই সব রান্না শেষ করে—মল্লিকা ভাত চাপাতে গিয়ে সেদিন দেখে আধ কুনকেটাক চাল মাত্র পড়ে রয়েছে।

একদিন কল্যাণবাবু রাত্রে শুতে এসে দেখেন পরিপাটি করে বেডকভারটি পাতা রয়েছে। কিন্তু তার তলায় তোশক বালিশ চাদর কিছু নেই। রোদে দেওয়া হয়েছিল। তুলতে ভুল হয়ে গেছে। তোলা-পাড়ার কাজটা হয়তো হাতেকলমে তার করার কথা নয়। কিন্তু তত্ত্বাবধানের দায়টা তো তারই।

এতখানি জিভ কেটে মল্লিকা বেচারি যখন ছাতে ছুটছে, লজ্জায় প্রায় চোখে জল এসে গেছে। তখন কল্যাণবাবু তার সঙ্গে ছাতে গিয়ে তাকে নিরস্ত করেন। ক্রন্দনমুখী বউমাকে আশ্বস্ত করে,—তোশক, বালিশ নামিয়ে আনেন। কেন যে এত ভুল, কেন যে এত অগোছালোপনা সে কথা কল্যাণবাবু মাঝে মাঝেই ভাবেন। কেন না তিনি জিজ্ঞাসু মানুষ। প্রশ্নহীন নিরুত্তর টাইপের তিনি নন। কেন মেয়েটি এত আনমনা হয়ে থাকে? আরতি যখন বেঁচেছিলেন, তখন এটা ছিল কি না তিনি খেয়াল করেননি। কিন্তু আরতির আড়ালটা সরে যেতেই এই ভুলোমনের মেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

অনেকদিন ধরে লক্ষ করে করে, ভেবেচিন্তে শেষে একদিন বউমাকে ডাকলেন তিনি। সন্ধেবেলা। বাড়িতে আর কেউ নেই। ছেলে তো ফিরে কোনওমতে কিছু গলাধঃকরণ করেই তার ব্রিজ-ক্লাবে চলে যায়। ঝুম্পা-মাম্পি হয় পড়তে গেছে, নয় গানটানের স্কুলে গেছে। কবে যে ওদের গান, আর কবে যে ওদের ছবি আঁকা, তিনি হিসেব রাখতে পারেন না। আর ছোট ছেলে কোনওদিনই আটটার আগে ফেরে না। ডাকতে মল্লিকা এসে বলল, এক কাপ কফি খাবেন, বাবা?

—কেন? তোমার খেতে ইচ্ছে হয়েছে? সঙ্গী চাই?

—তাই বলছি না কি? ও মা! —লজ্জা পেয়ে যায় মল্লিকা।

—বললে হয়েছেটা কী? তোমার এক কাপ সান্ধ্য-কফির আকাঙ্ক্ষা হতে পারে না?

—তা নয়।

—তাই-ই। ভাব শ্বশুর-ব্যাটা নিজেরটি ছাড়া আর কিছু বোঝে না।

—এ মা! ছি ছি!

—ছি ছি বললে কী হবে, আজ অবধি তো তোমাকে স্বীকার করতে দেখলুম না যে তোমার শ্বশুর হল—শ্বশুর উইথ এ ডিফারেন্স।—একটু তরল হলেন কল্যাণবাবু।

—এ মা। আমি আপনাকে বাবা বলে ডাকি, বাবাই ভাবি।

—তা হলে তোমার মন কেন এত খারাপ সে কথা তো বলছ না!

—মনখারাপ? কে বললে?—মল্লিকা আকাশ থেকে পড়ল।

—মন খারাপ নয়?

—না তো!

—তা হলে এমন উদাস দেখি কেন? সব ভুলে ভুলে যাও। সংসারে মন দেখি না কেন মা? ভাল লাগে না?

—ব্যস। অমনি মল্লিকার চোখ ছলছল।

—আমি একেবারে অপদার্থ, বাবা, এবার থেকে চেষ্টা করব।

—শোনো, কলাণবাবু উঠে বসলেন—তুমি আমাকে ভুল বুঝলে। আমি কিন্তু তোমার বিচার করছি না। সেনসার নয় এটা। একেবারেই নয়। সবাইকার সব কিছু ভাল লাগে না, এটা ফ্যাক্ট। আমি জাস্ট জানতে চাইছি। না ভাল লাগে তো আর একটা লোক রেখে দাও।—দৈনন্দিন কাজগুলো সত্যিই বড় ক্লান্তিকর।

মল্লিকা বলল, আরও একটা লোক? তা হলে আমি কী করব? আর তো কিছু করতে শিখিনি!

—বেশ তো! খেদ থাকে তো কিছু শেখো না!

—এই বয়সে?

—শেখার আবার বয়স আছে না কি?

—না বাবা, আমার কিছু শিখতেটিখতে ইচ্ছে করে না। একটু বেরোতে পারলে অনেক সময়ে ভাল লাগে। কিন্তু সে তো আপনার ছেলের সময় হয় না।

—নিখিল তো প্রায়ই থিয়েটার-টার যাবার জন্য সাধাসাধি করে?

উত্তরে মল্লিকা বলল, বাবা, ওর এবার বিয়ে দিন না!

কল্যাণবাবু হেসে বললেন, তাতে নিখিলের সমস্যার সমাধান হবে, তোমার সমস্যার হবে কি?

—হবে! ঠিক হবে। —নিখিলের বিয়ের জন্যে মল্লিকা এমন ধরে পড়েছিল, যে পরদিন থেকেই উঠে-পড়ে লাগতে হল তাঁকে।

কল্যাণবাবুর কোনও ছেলেই খুব একটা কিছু নয়। বিমান অধ্যবসায়ী, বাজে খেয়াল এক তাস ছাড়া আর কিছু নেই। তাসের নেশাটা অবশ্য সে পেয়েছে বাবার কাছ থেকেই। কল্যাণবাবু একসময়ে চুটিয়ে ব্রিজ খেলেছেন এবং বহু পুরস্কার জিতেছেন, তারপরে একটা সময় এল যখন তাস তাঁর একেবারে বিষ লাগতে থাকল। একদম ছেড়ে দিলেন। ক্লাবের আড্ডার বন্ধুরা বলতে লাগল—কী হে কল্যাণ সন্ন্যাসী হয়ে যাবে না কি? তাসের নেশা যার ছোটে তার বউ-বাচ্চা ঘর-সংসারের নেশাও ছুটে গেছে, কিংবা ছুটল বলে। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে দিয়ে কল্যাণবাবু দিব্যি অফিস-বাড়ি, বাড়ি-অফিস করতে লাগলেন। গৃহিণীর সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটার করতে লাগলেন, বড় ছেলেটিকে সাধ্যমতো মাজাঘষা করতে থাকলেন, ছোটটি গোঁয়ার। তাঁকে এড়িয়ে গেল। এবং এইসময় থেকেই কল্যাণবাবু টুকটাক পথশিশুদের পড়ানো, ব্লাইন্ড-স্কুলে গল্পের ছলে বিজ্ঞান—এইসব করতে লাগলেন। তাঁর ধারণা সব ভারতীয়রই ব্যক্তিগতভাবে দেশের মানুষের জন্য কিছু করা উচিত। কেননা এখানে রাজনীতি বলতে যা আছে তা হল আত্মনীতি লুঠেরা নীতি। সরকার একটা জ্ঞানপাপী অকর্মা। গোষ্ঠীর ভাঁড়ার ভর্তি করার উদ্দেশ্য নিয়ে চলে। কবে যে বিমান বাবার ক্লাবে ঢুকে গেছে, শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলেছে তিনি জানতেনও না। এক তাসুড়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে সে-ই বলল—'তোমার ছেলে যে কালবার্টসন-ফন্ ব্রিজতত্ত্ব সব গুলে খেয়েছে হে!' তা খেলুক। শুধু সময় কাটাতে তো খেলছে না। বুদ্ধির চর্চা করতেই খেলছে। তবু তাসের নেশায় সংসারকে যে সে খানিকটা অবহেলাই করে এটা তাঁর ভাল লাগে না। মেয়েদু'টিকে গোড়ার দিকে নতুন নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনায় খুব দেখাশোনা করত। এই বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে। এই গল্পের বই কিনে দিচ্ছে। এই এনসাইক্লোপিডিয়ার পুরো সেট এনে ফেলল। এখন উৎসাহে ভাটা পড়ে গেছে। এক ধরনের লোক আছে মুড়ির মতো, একটু হাওয়া লাগল কি না লাগল মিইয়ে যায়। এখন নাতনিদের তিনি খানিকটা দেখেন। বাকিটা কোচিং। তবে এক বছর অন্তর এল. টি. সি-র দরুন পুরো পরিবার নিয়ে বেড়াতে যাওয়াটা বড় ছেলে নিষ্ঠার সঙ্গে করে আসছে। এসব সময়ে মল্লিকাদের খানিকটা সজীব, খুশি খুশি লাগে। এটাই তা হলে ওর আসল সমস্যা! একাকিত্ব! দুই মেয়ের বাপ হওয়া ছেলেকে কি আর বলা যায় বউয়ের দিকে একটু মন দাও বাবাজীবন! কিন্তু কথাটা তাঁর বলতে ইচ্ছে করে। অনেক কষ্ট করে—আত্মসংবরণ করেন। স্ত্রীর প্রতি মনোযোগের অভাব তাঁর তো কোনওদিন হয়নি! তাঁর স্ত্রী বলতেন—সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে।

নারীভাগ্য ভাল হলে পুরুষের দু'রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। একটা হল মেয়েদের পড়ে-পাওয়া বলে গণ্য করা। বিমানের মা সুদক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ, স্নেহশীল ছিলেন।—স্ত্রী রূপসী, লেখাপড়া জানে, অনুগত, সে-ও স্নেহশীল ও কর্তব্যপরায়ণ, ফলে বিমানবাবু ধরেই নিয়েছেন মায়েরা ও স্ত্রীয়েরা এইরকমটাই হয়ে থাকে। হওয়া উচিত। সুতরাং তাদের জন্য আলাদা করে কোনও ভাবনা-চিন্তা খাতির-খয়রাত করবার দরকার নেই। মেয়েমাত্রই এইরকম হয়। ঝুম্পা-মাম্পিও বাবার দেখাশোনা আদর যত্ন ছাড়াই এমনটাই হয়ে উঠবে। বিমান তাদের বিশেষ আদর দিক বা না দিক তারা বাবাকে ঠিকই যত্নআত্তি, সেবাশুশ্রূষা করবে। কল্যাণবাবুর এটা ভাল লাগে না। তাঁর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াটা হয়েছে দ্বিতীয় রকম। মেয়েদের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা এবং করুণা। কোনও মেয়েকেই তিনি ঠিক 'খারাপ' ভাবতে পারেন না। কেউ যদি নিজেকে 'মন্দ' প্রমাণ করে তা হলে সেটা হল ঘটনাচক্র। এমনটাই তাঁর থিয়োরি।

তবু বিমান কিছুটা তাঁর আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু নিখিলকে তিনি ততটা ঘনিষ্ঠভাবে জানেন না। একটু বড় হতে না-হতেই তার বিশাল নিজস্ব বন্ধুবাহিনী হয়ে গেল। লেখাপড়ার জন্যেও সে কখনও

বাপের ধার ধারেনি। সবই বন্ধুদের পরামর্শে ও সাহায্যে। বেসরকারি অফিসে এগজিকিউটিভ পদে প্রতিষ্ঠিত হতে তার একটু সময় লাগছিল। বিমানের যে বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন, নিখিলের সে বয়সটা পার হয়ে গেল। তারপর স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি খানিকটা দমেও গিয়েছিলেন। বড় বউমার ব্যস্ততায় তিনি নিখিলকে ডেকে পাঠালেন। উঠতে-বসতে তাঁকে তাড়া দিচ্ছিল মল্লিকা।

—তোমার এবার বিয়ের একটা ব্যবস্থা করতে হয়। নিজের কেউ পছন্দটছন্দ আছে।

—না!

—তা হলে কি আমরা দেখব?

—হ্যাঁ।

—দেখে প্রাথমিকভাবে পছন্দ হলে তোমাকে বলব দেখে আসতে, না কী?

—হ্যাঁ।

—কোনও বিশেষ চাহিদা আছে তোমার?

—না।

একাক্ষরী এইমতো উত্তরে কল্যাণবাবু আরও দমে গেলেন। কিন্তু দু-চারটি পাত্রীকে ছেলে অপছন্দ করায় বুঝলেন—না, যতটা উদাসীন ভেবেছিলেন, বাবাজি ততটা নয়। শেয়ানা আছে।

জিনাকে প্রথমে তিনি আর মল্লিকা দেখতে গিয়ে ভীষণ পছন্দ করে এসেছিলেন। নিখিলেরও পছন্দ হল।

মেয়েটি মল্লিকার ঠিক উলটো। পরিপূরক যাকে বলে। কল্যাণবাবুর ঘর হাসিতে খুশিতে ভরে উঠল। সবাইকার সঙ্গেই জিনার বন্ধুত্ব। ঝুম্পা-মাম্পি তার ডান হাত বাঁ হাত। একের নম্বরের বন্ধু মল্লিকা। বিমানকেও সে রেয়াত করে না। 'বটঠাকুর' বলে ডাকতে শুরু করে তাকে হাসিয়ে ছাড়ল। বিমান বলল, 'দোহাই বউমা সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, বাঁদর যা খুশি বলো আমাকে, ওই বটঠাকুরটি বলো না।'

—আপনিও তা হলে বউমা বলবেন না। আর ঘোমটা দিয়ে থাকবেন না। একটু সকাল সকাল বাড়িও আসবেন, কেননা আমার ঠিক ন'টায় খিদে পায়। আর... বিমান বলল, তোমার এই শর্তাবলির কি কোনও ল্যাজামুড়ো আছে? না এ চলবেই?

মল্লিকা তো আত্মসমর্পণ করে বসেই আছে। ইগো বলতে মেয়েটার কিছু নেই। কিন্তু জিনার স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান দেখে তিনি চমৎকৃত হলেন। এত সহজে সে দিদিভাইকে ওপরে বসাল অথচ তাকে সব কিছুতে সাহায্য করে সংসারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে দিল যে তার মুনশিয়ানার বাহবা দিতেই হয়। একদিন দেখলেন, বিমান দুই বউমাকে নিয়ে থিয়েটারে যাচ্ছে, একদিন কোনও মিউজিক কনফারেন্সে গেল। কল্যাণবাবুকে নিয়েও সে যথেষ্ট টানাটানি করে। কিন্তু তিনি জানেন, বেশি বাড়াবাড়ি ভাল নয়। জিনার ব্যবহারে লোক দেখানো কিচ্ছু নেই, এ বিষয় তিনি আঠারোআনা নিশ্চিত। কেননা তার দমদমের বাপের বাড়ি একটা নামকরা হুল্লোড়ে বাড়ি। গিয়ে দেখেছেন, মানুষগুলি কতকগুলো নিয়ম মেনে নিজেদের বেশ একত্রে ধরে রেখেছেন। জিনার জ্যাঠামশাই খুব জমাটি লোক। বলেন—বুঝলেন দাদা, আমাদের পিতৃদেবটি ছিলেন বিশেষ শেয়ানা, না হলে পাঁচটি পুত্তুর একেবারে এক পদের হয়? ভাবতে পারেন পাঁচটি ভাই-ই আমরা ইন্দিরা গান্ধীর ন্যাশন্যালাইজেশনের সুফল পেলুম একেবারে নিক্তি মেপে? বড় দু'জন আমরা অয়েলে, ছোট তিনটি ব্যাংকে। দুটি বোন, কেউ কারও চেয়ে কম বুঁচি নয়। ঈশ্বর এবং পিতৃদেব উভয়ে ষড়যন্ত্র করে যদি একান্ন পীঠের আইডিয়্যাল কনস্টিট্যুশন তৈরি করে থাকেন তো একটা প্রমোদ বা একটা প্রবীর নাগের বা তাদের নাগিনীদের সাধ্য কী তা নাকচ করে?

জিনার জেঠিমা-ও খুব রসিক মানুষ। তিনি বললেন—শুধু তাই না কি? জানেন দাদা, আমার আর মেজর বিয়ে হয়ে গেছে, সেজর জন্যে কত অপ্সরী, বিদ্যাধরী আসছে। কে কলেজ লেকচারার,

কে ডক্টরেট, কে ডাবলু বি. এস. এস, কে দুধেআলতা, কে বা তপ্তকাঞ্চন, ইনি ঘটককে কী বললেন জানেন?—উঁহু, এসব চলবে না। ঘটক বললে—পাত্রী খারাপ হল? কত খুঁজে পেতে আনুলম। তা ইনি বললেন—পাত্রী সব সোনার চাঁদ। রাজরানি হোক। সে কথা নয়, আমার আর আমার মেজভাইয়ের পত্নী উভয়েই ঘেঁদিবুঁচি, কোনওমতে পাস। তা সেজভাইয়ের কি বউদিদিদের মনে দুঃখু দিয়ে অপ্সরী বিদুষী বিয়ে করা উচিত? ভাল করে দেখে শুনে পাঁচাপাঁচি আনুন। পাঁচাপাঁচি আনুন।

সেই বাড়ির মেয়ে হয়ে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকের ম্যাজিক তাঁর ছোট বউমা আয়ত্ত করেই এসেছে। তার ওপরে, সে কোনওদিক দিয়ে সত্যি সত্যি লঘিষ্ঠ নয়। গুণের সঙ্গে যদি কাণ্ডজ্ঞান ঠিক পরিমাণে মেশে তা হলে একটা জিনা তৈরি হয়। কল্যাণবাবু বড় বউমাকে ভালবাসেন। ভালবাসার সঙ্গে একটু করুণা, মমতা মিশে থাকে। কিন্তু ছোট বউমাকে তিনি বেশ অ্যাডমায়ার করেন, গর্ব করার কারণ খুঁজে পান। তবে তিনিও খুব কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন, বিবেচক মানুষ, মনের কোনও ভাবই কখনও মুখে প্রকাশ করেন না। আরতি থাকলে হয়তো কোনও দাম্পত্য আলাপের দুর্বল মুহূর্তে বলে ফেলতেন। কিন্তু সে-পরিস্থিতি না থাকায় তাঁর ব্যবহারে বিচক্ষণতা, সমদর্শিতা, প্রসন্ন সহযোগিতা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া শক্ত।

তবু যে, ছোট পুত্রের বিয়ের বছর দুইয়ের মধ্যে বাড়ি ভাগ করতে হল, তার জন্যে কল্যাণবাবু পুত্রবধূদের দায়ী করেন না। সমস্তটাই তাঁর গোঁয়ার, দুর্মুখ ছোট পুত্রেরই কীর্তি। এখানে আর দ্বিতীয় কোনও পক্ষ নেই। একটা সুখী পরিবারের মধ্যে থেকেও বেয়াড়া সন্তান বেরোতে পারে দেখা যাচ্ছে। চমৎকার শান্তি আর আনন্দের পরিবেশ ছিল। নিখিল চন্দরের সেটা পছন্দ হল না। তার বউ যে সবার বন্ধু হবে, সবার সঙ্গে হেসেখেলে থাকবে এটা তার চক্ষুশূল হল। সে জিনাকে তার একার সম্পত্তি করে রেখে দিতে চায়। এমন অশান্তি, অভদ্রতা শুরু করল যে বিরক্ত হয়ে তিনি বাড়ি ভাগ করে দিলেন। তাঁর ঘরটা পড়েছিল জিনাদের অংশে। ছেড়ে চলে আসছিলেন। ছোট বউমাই কেঁদে কেটে আটকাল। পুরো ব্যাপারটা তাঁর অত্যন্ত অরুচিকর ঠেকেছে। অরুচিকর এবং অপ্রয়োজনীয়। সন্দেহ নেই, অন্যদেরও তাঁরই মনোভাব। ঝুম্পা-মাম্পির স্বতঃস্ফূর্ততা কমে গেছে। তারা আর কাকিমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হবার উচ্চকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে বলে মনে হয় না. বিমান আবার নিজের অ্যালফা-বিটা ক্লাবে ফিরে গেছে, মল্লিকা একা! জিনা আরও একা। কেননা, আশ্চর্যের বিষয়, নিখিল জিনাকে যৌথ পরিবার থেকে ছিঁড়ে আলাদা করে ফেললেও, খুব যে বউকে সময় দেয়, এমন মনে হয় না। আগে ফিরত নটা, এখন দশটা, কখনও কখনও এগারোটাও হয়ে যায়। আগেও জিনাকে নিয়ে মাঝে মাঝেই বেরোত, এখনও বেরোয়, নতুনের মধ্যে, বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের খুব ডাকে। এবং বছর পাঁচ-ছয় হয়ে গেল ওদের কোনও বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। অর্থাৎ 'ম্যান প্রপোজেস গড ডিসপোজেস' বলে আপ্তবাক্যটির যে আধুনিক পাঠ তৈরি হয়েছে 'ম্যান প্রপোজেস, উয়োম্যান ডিসপোজেস' বলে, তার একটি আধুনিকতর ও বিশেষ পাঠ তৈরি হতে দেখলেন কল্যাণবাবু। 'ওয়ান ম্যান প্রপোজেস, অ্যানাদার ম্যান ডিসেপোজেস।' অবশ্য তাঁর কোনও কৃতিত্ব কোনওদিনই সেভাবে ছিল না। পরিবারটা তাঁর আপনা থেকেই হয়ে উঠছিল। তাঁর ভূমিকাটা ছিল শুধু তাকে রক্ষা করবার। সে ভূমিকা তিনি পালন করেছেন। সবাইকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। কোনও জায়গাতেই কঠোর কর্তৃত্ব ফলাতে যাননি। তাঁরই ছোট পুত্র যে সেই সংসারকে সম্পূর্ণ বিনা কারণে এভাবে দু টুকরো করে দেবে, দিতে পারবে, এ তিনি কখনও ভাবেননি। হ্যাঁ, কোনও না কোনওদিন হয়তো দরকার পড়ত। দুই ভাই যখন। তখন ভবিষ্যৎ হাঙ্গামা এড়াতে তিনি নিজেই হয়তো দুজনের অংশ আলাদা করে নির্দেশ করে দিয়ে যেতেন। কিন্তু নিখিল যা করল, তার কোনও মানে হয় না। সেই নিখিল তাঁর আঙুল ধরে হেদুয়ায় বেড়াতে যেত। সেখানেই সাঁতার শিখল বেশ ছোট বয়সেই। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার ডাইভ খাওয়া না দেখলে বাবুর রাগ হত। আর ঠাকুর দেখতে যাওয়া? ওরে বাবা! 'ও বাবা, ফায়ার ব্রিগেড হয়নি।' 'ও বাবা মহম্মদ আলি পার্কে রাত্তিরবেলায় নিয়ে চলো।' 'ও বাবা কাল সাউথে

নিয়ে যেতে হবে!' কত বায়না! কবে থেকে, কখন থেকে, কেন যে বাপের সঙ্গে তার অসম্পর্ক তৈরি হল তিনি ভেবে পান না। বড় হয়ে গেলে ছেলেরা আর বাপের কাছে ঘেঁষে না, তাদের নিজের মতো চলতে দেওয়াই ভাল, এটা তিনি মানেন। এমন সেন্টিমেন্টাল লোক নন যে কথায় কথায় অভিমান করবেন। কিন্তু নিখিলের আচরণটা তাঁর হিসেবে মেলে না। জিভের ভেতর একটা বাজে কষা মতো স্বাদ বরাবরের জন্যে রেখে দিয়ে গেছে যেন।

জিনার দিনকাল

—জিনা-আ, জিনা-আ—উগ্রমেজাজি চিৎকারটা মাঝের দরজা দিয়ে ঢুকে ফাটা বোমার ধোঁয়ার মতো ঘরে ঘরে ঢুকে যায়, সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে নীচে নামতে থাকে। মাম্পি ঝুম্পার দিকে চায়, ঝুম্পা ছুটে বেরিয়ে যায়। তার হ্যান্ডলুমের কাফতান পায়ের ওপর কড়া ঝাপটা মারে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ডাকে —কাকি-ই, ও কাকিমা! তারপর তরতর করে নীচে নেমে যায়, ঝংকার দিয়ে ওঠে—উঃ কাকিমা, ওদিকে যে পারা ক্রমে চড়ছে। শুনতে পাচ্ছ না! কতবার বলেছি না, কাকা থাকলে এদিকে আসবে না!

জিনা ধীরেসুস্থে বেরিয়ে, হঠাৎ দুপদাপ করে সিঁড়ি ভাঙতে থাকল। পেছন ফিরে ফিক করে হেসে বলল—দেখেছিস? হনুমতী। চিলিম্পা।

দরজা পার হবার সময় তার গতিবেগ প্রায় মেল-ট্রেনের সমান হয়ে যাচ্ছে দেখা গেল। ঝুম্পা তার মায়ের দিকে তাকিয়ে অর্ধেক-রাগ অর্ধেক-মজায় বলল, উঃ কাকিমাটা পারেও। তারপরে সুর পালটে বলল, রোজ রোজ ভাল লাগে না। তোমরা না.....

মল্লিকা বলল, আমি কিন্তু ওকে ডাকিনি। ও-ই চেতল মাছের গাদা নিয়ে এসে বসল। ছাড়িয়ে দাও। আমি কাঁটা ছাড়াতে পারি না, করিনি কখনও....।

—আর সময় পায় না?

—আহা মাছটা তো সকালেই আসে, তোর ওই কাকাই তো শখ করে এনেছে।

হন্তদন্ত হয়ে জিনা ঘরে ঢুকতে তোয়ালে পরা নিখিল ফেটে পড়ে—আমি বলে অফিস বেরোচ্ছি, এখন তোমার গালগপ্পো মারবার সময়?

—গালগল্পের চিতলমৎস্য কে এনেছে? কাঁটা ছাড়াচ্ছিলুম! কন্টক!

—গুষ্টির পিণ্ডি!

—রাতে যখন পড়বে পাতে তখন বলো পিণ্ডি না মণ্ডা!

—আমার রুমাল?

—এই তো।

—গ্রে মোজা-জোড়া?

—জুতোরে সঙ্গে রেখেচি, নীচে।

—শার্ট? প্যান্ট?

—কী আশ্চর্য! এই তো সামনে রেখেছি, দেখতে পাচ্ছ না?

—তুমি যা রাখবে তাই পরতে হবে? পিন-স্ট্রাইপটা দাও, সাদার ওপর নীল।

ঝট করে আলমারি খুলে ফট করে ইপ্সিত শার্ট বার করে দেয় জিনা।

—আর কিছু?

—কেন? ও বাড়ির রান্নাঘরে মন পড়ে আছে নাকি দ্রৌপদী মহারানির।

জিনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসে। আর কী-ই বা সে করতে পারে! কারও রাগী মেজাজের

সামনে মুখে মুখে তর্ক করতে নেই, জবাব দিতে নেই। দমদমের বাড়িতে দেখেছে জেঠু রেগে তুলকালাম করলে জেঠিমা একেবারে চুপ। আবার জেঠিমা রাগলে মা-কাকিমারা চুপ। এ ওর দিকে আড়ে আড়ে চায়। কেউ কান্না চাপছে, কেউ হাসি চাপছে। কিন্তু ভুলেও একটি কথা না।

নিখিলবাবু শার্ট বদলালেন, তোয়ালের ভেতর দিয়ে প্যান্টফ্যান্ট গলালেন। একটু যে বে-আব্রু হলেন না তা নয়, সে সময়ে জিনা চট করে কড়িকাঠের দিকে চোখ ফেরাল। চুলে একবার ব্রাশ চালালেন। গরগর করে বললেন, টাইটা তো বউরাই বেঁধে দেয় জানি।

—বউরা গলায় গামছা বাঁধে, আর নাকে দড়ি। টাইটা আজ নিজেই বাঁধতে হবে আজ্ঞে—সাতসকালের তুলকালামের জন্য জিনা তার বরকে এটুকু দণ্ড বিধান করে।

—ও—আয়নার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সটাসট টাইটা বেঁধে ফেলতে লাগলেন নিখিলচন্দ্র। বাঁধতে বাঁধতে মুরুব্বি স্টাইলে বললেন, ভাসুরঠাকুরের টিফিন তৈরি করার জন্যে তোমায় আনা হয়নি। শ্বশুরঠাকুরকে ফুলতুলসী দেবার জন্যেও না। আনা হয়েছে এই নিখিলচন্দ্রের জন্যে, নিখিলচন্দ্রের সুখসুবিধের জন্যে।

জিনা বলল, যা বাব্বা, আমি তো ভেবেছিলুম আসছি আমার নিজেরই সুখসুবিধের জন্যে। কাটবার জন্যে বেশ ভারী একটা পকেট পাব, ঠোনা মারবার একটা গাল পাব, চাপবার একটা কান পাব, তেমন দরকার পড়লে ঘাড়টা মটকাতেও পারি—

নিখিলচন্দ্রের মুখে একটু হাসি ফুটব ফুটব করেও শেষ পর্যন্ত ফুটল না। বললে, ও বাড়ির দরজাটা কি সিল করে দেব?

—কেন জানতে পারি?

—সেই কথায় আছে না, ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে তোরে পেলাম কাছে।

—ভূতটা কে? দাদা? দিদিভাই? ওদের ওপর তোমার এত রাগ কেন বলো তো? নিজেরই তো দাদা-বউদি! তোমার কোন বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে?

—এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি অনবরত জিনিস চলে যাচ্ছে। এই চেতল না পেতল সেটাও যাবে।

—যাবেই তো। দিদিভাই কদিন আগেই তো কচুরশাক দিয়ে গেল। খাওনি?

বিদ্রূপ ফুটে ওঠে নিখিলচন্দ্রের মুখে—কচুরশাক? কচুরশাক মাঠেঘাটে ফলে থাকে জিনুরানি, আর চেতল মাছ নগদ আড়াইশো টাকা কিলো দরে বাজার ঢুঁড়ে কিনে আনতে হয়। উপরন্তু এপারে মাত্র দুজন, ওপারে শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে পাঁচজন।

জিনা ছি ছি করে ওঠে। বলে, তুমি এইসব মেয়েদের ব্যাপারে নাক গলাবে না তো! আমার ঘেন্না করে। যা দিচ্ছ তাইতে আমি চালাতে পারলেই তো হল? বেশি চেয়েছি তোমার কাছ থেকে? ইন ফ্যাক্ট তুমি এগজ্যাক্ট কত মাইনে পাও তা পর্যন্ত আমি জানি না। জানি?

উত্তরে নিখিল বলল, হুঃ!

নিখিল বেরিয়ে গেলে জিনা চটপট রান্না সেরে ফেলল। এরপর খাওয়া ছাড়া সত্যি কথা বলতে কি তার আর কোনও কাজ নেই। চানটা সে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে করে। চানের আগে পরে, যোগাসন, হাত-পা ঘষা, চুলের পরিচর্যা অনেক রকম আছে তার। নতুন বাথরুমটা ভাল বানিয়েছে তার বর। একটা ছোটখাটো ঘরই। বাথটব বসেছে একটা। ডুবে চান করার মজা এই যে উঠতে মনে থাকে না। জলের মধ্যে শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল ভাবনা আসে। শুধু চানই বা কেন, কোনও কাজই তার বহতা চিন্তাস্রোতকে বন্ধ করতে পারে না। আশাবাদী, ইতিবাচক চরিত্রের মানুষ সে। অথচ খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়। এটা তাদের পরিবারেরই চরিত্র। মুশকিল হচ্ছে আশাবাদ-এর 'আশা' আর ইতিবাচকের 'ইতি'টুকু যদি জীবনে একটা কথার কথা মাত্র না হতে হয়, তা হলে সেগুলোর ওপর তার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ দরকার। কিন্তু সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। জিনার 'কিছু-না-মনে-করা' 'আচ্ছা-বাবা-ঠিক-আছে' 'সব ঠিক হয়ে যাবে'.... আনুগত্য, রসবোধ কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সে

অনেক কিছু মেনে নেয় বটে, কিন্তু সেটা বোকা বলে নয়, অলস বলেও নয়। ভাল পাসটাস করেছে, গান শিখেছে, অথচ কোনও কেরিয়ারে তার মন নেই। অবশ্য, পাশের বাড়ির মিতালিদির মতো গোল্ড মেডালিস্ট হলে, কিংবা বন্ধু সুনন্দিনীর মতো স্বর্ণকণ্ঠী হলে কী হত বলা যায় না। সে যতটুকু ভাল, তাতে করে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে তাকে অনেক লড়াই করতে হবে—এই তার ধারণা! জিনা জানে না, সব ব্যাপারেই 'ভাগ্যং ফলতে' বলে একটা কথা আছে। হয়তো মিতালিদির কিছু হল না, সুনন্দিনীর কিছু হল না অথচ জিনারই হয়ে গেল, এরকমটা ঘটতেই পারত। কিন্তু সে চেষ্টার পথে সে যায়ইনি। নাগ-বাড়ির বেশিরভাগ মেয়ের ক্ষেত্রেই কুড়ি-একুশ বড় জোর বাইশ হলেই পিতৃব্য-মহলে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। যা খুশি করো, কিন্তু আগে আমাদের দায় থেকে মুক্ত করো—এই তাঁদের বুলি। জিনার এক দিদি বিয়ের পর এম ফিল করে কলেজে পড়াচ্ছে, আর এক দিদি স্বামীর সহায়তায় আর্ট-স্কুল খুলেছে। কিন্তু বেশিরভাগই বিশুদ্ধ গৃহিণী। কারওই সে নিয়ে খেদ নেই। বেশ আছে। কাজেই জিনার যখন অতি সহজেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এগজিকিউটিভ বর জুটে গেল, ঘর পছন্দ, দু পক্ষে চমৎকার মনের মিল তখন কেউই দ্বিধা করেনি। জিনাই একমাত্র এত বড় বর বিয়ে করতে চায়নি। এগারো-বারো বছরের বড়? ওরে বাবা, সে তো একটা লোক! নাগ-বাড়িতে সব রকমের নজিরই আছে। ছোট কাকা নিজেই একটি কেস। বললে—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হবার এমন চান্স আর পাবি না। নিয়ে নে। সারা জীবন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারবি, তোর কাকি যেমন আমায় ঘোরাচ্ছে।

এখন, কে কাকে ঘোরাচ্ছে ছোট কাকাকে ডেকে এনে দেখাতে ইচ্ছে যায়। এইজন্যেই জিনার ধেড়ে কার্তিক লোককে বিয়ে করতে অনিচ্ছে ছিল। সব বিষয়ে কর্তাত্বি ফলাবে। সব সময়ে একটা হামবড়া আদেশের ভাব। ধুত। ঝুম্পা-মাম্পি-দিদিভাইকে নিয়ে কী চমৎকার একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছিল তাদের, উপদেষ্টার ভূমিকায় দাদা আর বাবা। এই বেরসিক লোকটা সব ভেস্তে দিল। কেন রে বাবা? সে কী সুন্দর মাম্পিকে স্কুল থেকে আনতে যেত এক এক দিন। ওই ছুতোয় একটু বেরোনো আর কি। পায়ে যে মরচে পড়ে গেল! তা ফট করে একদিন হবি তো হ, সাদা মাতিজের সামনে। মাতিজে স্টিয়ারিং ধরে নিখিলচন্দ্র। একেবারে ক্যাচ, কট, কট। তক্ষুনি দুজনকে গাড়িতে তুলে নিল, পৌঁছে দিয়ে ডাঁটের মাথায় সাঁ করে চলে গেল, তারপর রাতে বাড়ি ফিরে সে কী তুলকালাম! আমার বউ কারও দাসী-বাঁদি নয়, মেয়ে-আনুনি ঝিগিরি তাকে দিয়ে করানো চলবে না। জিনা যত বলে আমি নিজে গেছি, কেউ আমাকে বলেনি, ততই সে ঝটকা মারে। জিনা বলল—আমি তবে করবটা কী? চুপচাপ বসে থাকব? উত্তর হল—বসে থাকতে না পার তো শুয়ে থেকো।... কী লজ্জার কথা! কী দুঃখের কথা! বাবা বাড়ি ছিলেন। তাঁর মুখের ওপর সুদ্ধু চোপা করল। তারপরই বাবা দু ভাইকে আলাদা করে দিলেন।

কেন? এটাই জিনা অবাক হয়ে ভাবে। জিনার জন্যে ভেবে ভেবে ঘুম হচ্ছে না, কী বউয়ের আঁচল ধরে বসে থাকতে পছন্দ করছে এমনটা তো নয়। কতটুকু থাকে বাড়িতে? নটায় বেরিয়ে আবার নটায় ফেরা। বেশিরভাগ দিনই আরও রাত হয়। অফিসের পর ক্লাবে যায় নাকি এক এক দিন, ক্লায়েন্টফ্লায়েন্টের সঙ্গে নাকি সর্বক্ষণই দরকার তার। শনি-রবিবারে অবশ্য প্রায়ই তাকেও ক্লাবে নিয়ে যায়। কিন্তু এই যে এতক্ষণের অনুপস্থিতি এতে জিনার খারাপ লাগছে কি না, সে কেমন ছিল এ নিয়ে তো ভদ্রলোকের কোনও মাথাব্যথা নেই? দমদমে, কি কোনও বন্ধুর বাড়িটাড়ি যেতে চাইলে কোনও আপত্তি নেই। খালি নিজের দাদা-বউদিদি আর তাদের পরিবারকেই সে একেবারে দেখতে পারে না। তার বিয়ের আগে কোনও টেনশন ছিল না। দুই ভাইয়ের সম্পর্ক অবশ্য কোনওদিনই খুব স্বাভাবিক নয়। দাদা এমনিতেই খুব কম কথা বলেন। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বয়সের তফাতও অনেকটা। কিন্তু মাত্র দুটি-ভাই, তাদের মধ্যে কোনও আদানপ্রদান নেই এটা তার কেমন অদ্ভুত লাগে। কিন্তু এরা এইরকমই। বড় হয়ে যাবার পর যে-যার নিজের জগতে বাস করে। কিন্তু ব্যাপারটার

মধ্যে কোনও মনোমালিন্য ছিল বলে তার মনে হত না। দাদা হয়তো কোনওদিন খেতে বসে বললেন, অমলকে তোমার মনে আছে?

ভাই বলল, কোন অমল?

—ফুটবলের। তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তোমার কথা খুব জিজ্ঞেস করছিল।

—আচ্ছা! আজকাল আছে কোথায়?

—জে সি টি-তে আছে বলেই তো জানি।

ব্যাস।

আবার কোনওদিন ছোট ভাই উবাচ—

—তোমাদের ক্লাবের শিবেন ব্যানার্জি কেমন লোক, জান?

—কেন? মানে কী সেন্সে!

—এই অনেস্ট কি না।

—খুব একটা মনে হয় না। কেমন একটু সিক্রেটিপ টাইপ। কেন?

—আমাদের অফিসে একটা টেন্ডার ধরেছিল, খুব ঢুকতে চাইছে, ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে।

—ওহ্।

অর্থাৎ মনোমালিন্য থেকে কথা বন্ধ এমনটা নয়। দুজনের জগৎ, বন্ধুবান্ধব, ভাল লাগার জিনিস সবই এত আলাদা যে কোনও বিষয় নেই ওদের কথা বলার। জিনাদের ভাইয়েরা একত্র হলেই ফুটবল, ক্রিকেট নিয়ে তাদের উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। রাগারাগিও হয়ে যায়। হাতাহাতির ঠিক আগেটায় জেঠিমা কি মা কি কাকিমা প্রত্যেকের মাথায় একটা কেটলি করে একটু একটু জল ঢেলে দিয়ে যান।

—এটা কী হল?

—এ হেহে আমার নতুন পাঞ্জাবিটা....

—কী হল কাকিমা, মোস্ট আনপার্লামেন্টারি। এই শীতে মাথায় হঠাৎ ঠাণ্ডা জল...

—তা হলে কি গরম জল দেব বলছিস?

—তাই বলে কথা বলব না?

—কথা বলতে কেউ বারণ করেনি বাবা, মারমুখো হতে শাপশাপান্ত করতে বারণ করা হচ্ছে...

—মারমুখো? কে মারমুখো হল?

—শাপশাপান্ত? সে আবার কী?

পাঁচ-ছয়জন নানা বয়সের 'ইয়াং ম্যান' আকাশ থেকে পড়ে।

কোনও তর্কের মধ্যে আর মাতৃকুল ঢুকতে চান না। মারমুখো কে, শাপশাপান্ত কী, এসব অব্যাখ্যাত থেকে যায়।

শ্লেষের হাসি হাসতে হাসতে 'ইয়াং'রা খাওয়া শেষ করে। সকলেই একমত এই ওল্ড 'জেনারেশন'কে নিয়ে আর পারা গেল না। একটা 'ফ্রেন্ডলি' হচ্ছিল, বুঝল না।

আমাদের ইডিয়ম তোমরা বুড়ো-বুড়িরা বুঝবে না...

ছোট কাকিমা আস্তে করে ফুট কাটবে—ইডিয়টের আবার ইডিয়ম—পেছন থেকে, নিরাপদ দূরত্ব ও আড়াল থেকে।

ব্যাস, আর যায় কোথায়। বিরোধীরা সব এককাট্টা।—কে বলল? কেন বললে? তাকে সারেন্ডার করা হোক। না হলে খুব খারাপ হয়ে যাবে... আসলে ওদের ধারণা বোনেরা কেউ বলেছে। জিনার ওপরেই সবচেয়ে বেশি সন্দেহ। বাতাবরণ ঘোরালো হতে জেঠিমা তাঁর চওড়া ভোমরা পাড় দাঁতালো শাড়ি আর জমজমে গলা নিয়ে ফ্রন্ট লাইনে এগিয়ে আসবেন—এই নে, আমি বলেছি বেশ করেছি, করছি সারেন্ডার। কী করবি কর। শেষ পাতে আলুবখরার চাটনি ছিল, পাবি না।

জিনা এইরকম সম্পর্ক দেখেছে। হুল্লোড়, মজা, এসব না-ই থাক। সম্পর্কটা তো থাকবে? সে

নিখিলকে জেরা করতে ছাড়ে না।

—প্রথম প্রথম তো দেখেছি একসঙ্গে খেতে বসা হচ্ছে। মাঝে মাঝে কথাও বলছ পরস্পর। ক্রমশ কী হল?

—ধান্দাবাজি আমার ভাল লাগে না।

—ধান্দাবাজি কার?—জিনা আকাশ থেকে পড়ে।

—ওই তো। রান্না করছ, পরিবেশন করছ, বাসন মাজছ, সবই তো আস্তে আস্তে মিসেস নিখিলের কাঁধে উঠে আসছে।

—ওমা! বাসন মাজলাম কোথায়? সেদিন আমার নিজের বোনচায়নার ডিনার সেট আমি নিজে পরিষ্কার করে নিয়েছি। ডলিকে দিলে যদি ভেঙে যায়? ঝুম্পাকেও হাত লাগাতে দিইনি। আর রান্না? ও তো সবই দিদিভাই করছে, আমি একটু সাহায্য করি শুধু, পরিবেশনটা আমিই করি তাই বাড়িতেও করতুম, ভাল লাগে আমার।

—ও-ই করো! স্টেটাস যে বোঝে না, তাকে কী বোঝাব?

—স্টেটাস? সেদিন কোথায় পড়ছিলাম ইন্দিরা গান্ধী সুদ্ধু রাতে ডিনারের সময়ে টেবিলে বসে ছেলেদের এটা-সেটা পরিবেশন করতেন। এসব কেউ আমার ওপর চাপিয়ে দেয়নি। ছিঃ ছিঃ!

—এখন কি তুমি আমায় ম্যানার্স শেখাবে না কি?

জিনা দুঃখিত গলায় বলেছিল, বিয়ের পর স্বামীদের অভদ্রতার দায় বউয়েদের ওপরেই পড়ে, এটা অন্তত মনে রেখো।

—কেন, দিনরাত যে সব্বাইকে তেল মারছ?

জিনা মনে মনে হাসে। মনে মনেই বলে তোমাকেও কম তেল মারি না বাবা। ফল হচ্ছে না কেন কে জানে!

অথচ সে বিয়েটাতে প্রায় এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল একটু বেশি স্বাধীনতার জন্যে। তাদের দমদমের বাড়িতে কতকগুলো অদৃশ্য, অকথিত নিয়ম আছে। সেগুলো মেনে চলতে হয়। কেউ জবরদস্তি করে না, কিন্তু সবাই-ই মানে। নিয়মগুলো বলাই বাহুল্য মেয়েদের ক্ষেত্রেই বেশি প্রয়োগ হয়। যেমন বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও রাত কাটানো চলবে না, অর্থাৎ এক্সকার্শন—নো। দেশান্তরে, প্রদেশান্তরে, বাড়ি ছেড়ে একা একা পড়াশোনা কাজকর্ম করতে যাওয়া চলবে না। তার পিসতুত দিদি ইয়েল য়ুনিভার্সিটি থেকে ডাক পেয়েছিল, ভাল স্কলারশিপ, উপরন্তু পার্ট টাইম কাজ ক্যাম্পাসের মধ্যে। শুনতে পেয়ে জেঠু গোটা পঁচিশ যুবকের ছবি বায়োডেটা সহ নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেন। ক্ষমতা আছে বটে মানুষটার। দিন দশেকের মধ্যে বিদেশ যাবে পাত্রী খুঁজছে এমন পঁচিশটা কেস জোগাড় করেছেন।

বললেন—নাও পছন্দ করো।

—কী ব্যাপার? কাকে পছন্দ? কেন পছন্দ!

—রুমা বিলেত যেতে চায়, এই তো কথা! তা যাক, এইসব সোনার চাঁদেদের খবর এনেছি। এদের কারও সঙ্গে সিঁদুরটিঁদুর পরে একেবারে যাক।

—সে কী? ইয়েল-এ যে... পিসেমশাই হতবাক।

—আচ্ছা সুবীর, তোমারও যা বয়েস আমারও তাই বয়স, আমিও য'টাকা মাইনে পাই তুমিও ত' টাকা মাইনে পাও। মাথায় গ্রে ম্যাটার এত কম হয়ে গেল কী করে। রুমু একা একা ইয়েলে যাবে, তারপর কোনও সাতঘাটের জল খাওয়া সায়েব ওকে পাকড়াও করলে? জান, ওরা দাঁত মাজে না!

—সে কী! ওরা কোনকালে দাঁত মাজা চান করা সব শিখে গেছে।

—তুমি আর 'সে কী' 'সে কী' করো না। কথায় কথায় আকাশ থেকে পড়া তোমার একটা রোগ। টিভি দেখ? যে কোনও সায়েব হাসলেই দাঁতগুলো খেয়াল করে দেখো... আমাদের যেমন বাঁধা গোয়ালা, ওদের তেমনি বাঁধা ডেনটিস্ট।

—তা যদি বলেন বাঁধা গোয়ালা ওই আপনাদের নাগ-বাড়িতেই এখনও টিকে আছে, এখন কেউ বাঁধা...

চুলোয় গেল ইয়েল, চুলোয় গেল রুমাদির ভাল রেজাল্ট, স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশ যাবার আশা। কটা বাড়িতে এখনও গোরুর দুধ খায়, তার পরিসংখ্যান নিয়ে দুজনে ধুন্ধুমার তর্ক লেগে গেল। অবশেষে কাঁদো কাঁদো মুখে রুমুদি একটা ছবি তুলে নিয়ে বলে বড় মামু এইটে পছন্দ, ঠিক যেন শাড়ি পছন্দ করছে।

অতঃপর সেই সানাই, সেই পাঁচশো লোক, লুচি থেকে আইসক্রিম, সেই তত্ত্ব। এখন রুমু জামাইবাবু স্টেট য়ুনির্ভাসিটি অফ মিনেসোটায়। রুমুদিদি রুম্যানি বীক্ষ্য করেছে।

মেয়েদের বাড়ি-ফেরা নিয়ে জেঠু এত বাতিকগ্রস্ত যে পাশের বাড়ির মিতালিদি পর্যন্ত যতক্ষণ না বাড়ি ফেরে জেঠু ঘরবার করে। মিতালিদি ফিজিক্সের মেয়ে, পি এইচ ডি করছে, স্বভাবতই তার ফিরতে দেরি হয়। এক এক দিন তো বেশ দেরি। তার নিজের বাড়ির লোকের মাথাব্যথা নেই, জেঠু ঠায় সদরে দাঁড়িয়ে থাকবে। গলির মোড়ে মিতালিদির হিলের খুটখুট শোনা যাবে, তবে জেঠুর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়বে।

—মিতু এলে মা? খবর সব ভাল তো?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, খবর খারাপ হবে কেন?

—না। রাস্তাঘাটে বিপদআপদ আজকাল লেগেই আছে কি না!

—একটু জ্যাম ছিল, আর কিছু না।

জেঠিমা রাগ করে বলেন, তোমার খবরদারির কী দরকার বলো তো! মেয়েটা কী মনে করে কে জানে!

—কী আবার মনে করবে? আমি একটা পিতৃতুল্য মানুষ। মেয়েটার ভাল-মন্দর জন্যে চিন্তা-ভাবনা করছি। এতে আবার মনে করার কী আছে? রাত দশটা পর্যন্ত ঘরের মেয়ে বাইরে থাকলে ভাবনা হয় না? দিনকাল জান? যেখানে সেখানে মেয়েগুলোকে মুখে কাপড় বেঁধে আরবে চালান করে দিচ্ছে। জান না তো আর....

—হ্যাঁ, অমনি চালান করে দিলেই হল। দুনিয়ার মেয়ে তা হলে দোরে খিল এঁটে কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে বসে থাক!

—কাজকর্মটা কী শুনি? কী? মাদাম কুরি হবে?

হয় মাদাম কুরি নয় হাতা বেড়ি। এই দুটোই জেঠুর কাছে একমাত্র গ্রহণীয় বিকল্প। এইটে নাগ-বাড়ির জীবনদর্শনের অন্ধকার দিক। তাই একটা সময়ের পরে মুক্তির জন্যে প্রাণটা একটু আঁকুপাঁকু করে বই কী! জিনার ধারণা ছিল বিয়ে মানে সেই মুক্তি। বিয়ে মানেই তুমি একটা গোটা লেডি হয়ে গেলে। তোমার মাথায় সিঁদুর, সুতরাং সম্ভাব্য সব অনাকাঙ্ক্ষিত ক্যানডিডেটরা জানবে এ কেস খতম। এ দিকে আর নজর দিয়ে লাভ নেই। দ্বিতীয়ত, তুমি গৃহিণী। মানে কর্তৃকারক। নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেবে, নিজের মতামত দেবে, নিজের বিদ্যাবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে চলবে এখন থেকে।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা ভালই ছিল। সব আত্মীয়স্বজনের বাড়ি জোড়ে নেমন্তন্ন সারতে সারতেই বছর পার। প্রত্যেক রবিবার বা ছুটির দিন নতুন নতুন শাড়িটাড়ি পরে সাজগোজ করে বরের সঙ্গে বেরোনো। ফুরফুরে মেজাজ, হাসি, রসিকতা, বরের বন্ধুদের মনোযোগ আর বরের তো কথাই নেই। চক্ষে হারাচ্ছে। দুঃখের বিষয় এ সবই জীবনে বাসি হয়ে যায়। পাটভাঙা, ধোপদুরস্ত অবস্থায় যতটা আকর্ষক থাকে, পরে কিছুতেই আর ততটা থাকে না। শুধু তাই নয়। আগের হাসি আনন্দ তামাশার

মধ্যে থেকেও অনেক খুঁত বেরোতে থাকে। অনেকটাই যেন ঠকে যাওয়া, ফাঁকি। যেটাকে প্রশংসা বলে মনে হয়েছিল সেটা ঈর্ষা, স্নেহটা স্নেহ নয়—তোষামোদ, অন্তরঙ্গতাটা আসলে হাঁড়ির খবর জেনে নেবার কৌশল। এইরকম। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির গণ্ডির মধ্যে তার তেমন খেদের কোনও কারণ ছিল না। মল্লিকার সঙ্গে তার খুব পটে গেছে। যদিও মল্লিকার কিছু কিছু দোষ আছে। সে বাইরের জগতের কোনও খোঁজ রাখে না। ভয়ানক ভিতু, অকপট নয়, নিজের সব কথা জিনা যেমন উজাড় করে বলে দেয়, মল্লিকা তেমন নয়, কিন্তু এগুলোর কোনও গুরুত্বই থাকে না, তার গুণের পরিচয় একবার পেলে। এত স্নেহ, এত আন্তরিক মনোযোগী ভালবাসা আর কোথাও পেয়েছে বলে জিনা মনে করতে পারে না। দিদিভাইয়ের কোনও ইগো-প্রবলেম নেই। জিনাকে নিয়ে তার গর্বের শেষ নেই। জিনা এই পারে, জিনা ওই পারে। সে নিজে যে হোটেলের শেফদের হার মানিয়ে দেবে অনেক রান্নায় সে কথা কে বলে! জিনার গুণপনায় তার চোখ কপালে উঠেই আছে। মল্লিকার ধারণা তার বুদ্ধি বলে কিছু নেই। তাই সে সব ভুলে যায়। এলোমেলো করে ফেলে। জিনা দেখেছে বুদ্ধি না থাকার কথাটা ঠিক নয়। কোনও একটা মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে মল্লিকার ভুলের। ছোটবেলায় মা মারা যাওয়ায় নিরাপত্তার অভাববোধ? শাশুড়ি কি খুব দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিলেন? দাদার শীতলতাও একটা কারণ হতে পারে। মেয়েদুটো বুদ্ধিমতী, কাকিমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হবার জন্য এক পায়ে খাড়া। ওদেরও খুব ভালবাসে জিনা। আর শ্বশুরমশাই? একটু চুপচাপ, ভাবুক ধরনের। কত যে পড়েন, কত যে জানেন, কত রকমের আগ্রহ, ওঁকে এখনও জিনা বুঝতে আরম্ভ করতেই পারেনি। তবে একটু দূরের মানুষ, নিঃসন্দেহে। বাড়ির দুই ছেলে অর্থাৎ তার ভাসুর এবং তার পতিদেব—এরা দুজনেই তাকে নিরাশ করেছে। দাদা তো দিদিভাইয়ের উপযুক্ত বর বলেই তার মনে হয় না। এ আবার কী! যার এমন সুন্দরী গুণী স্ত্রী, এত সুন্দর প্রাণোচ্ছল দুটো মেয়ে, তিনি এরকম তাসে-সমর্পিত-প্রাণ হয়ে থাকতে পারেন কী করে? কী ভীষণ চুপচাপ, ঠাণ্ডা প্রকৃতির। প্রথম প্রথম জিনা তার স্বভাবমতো ওঁকে ঠেলাঠেলি করতে ছাড়েনি। উনিও কদিনের জন্য নড়েচড়ে বসেছিলেন। কিন্তু কদিন। ক'মাস। ব্যস আবার যে কে সেই। আর নিখিল? নিখিল এক হিসেবে দাদার উলটো। সব সময়ে তপ্ত লোহা, ছ্যাঁক করে উঠলেই হল। নিখিলের সব কাজকর্ম কথাবার্তার কার্য-কারণ সে সত্যিই বুঝতে পারে না। সে নিজেকে সবটা দিতে চায়। পারে না। কোথাও নিখিলের মধ্যে একটা লৌহকপাট আটকানো আছে। তা ছাড়া ভীষণ গোঁয়ার। অহমিকা সাঙ্ঘাতিক। যদি একবার বুঝতে পারল কোনও জিনিস তার মতে হচ্ছে না, জিনার মতটাই জিতে গেল, অমনি বেঁকে বসবে। অমন বাবার ছেলে, জীবনে কোনও কিছুর অভাব হয়নি, বাইরে পালিশ আছে, সবই ঠিক। কিন্তু ভেতরে কোথাও একটা ভীষণ রূঢ় অমার্জিত মানুষ বাস করে যাকে জিনা চেনে না, স্বীকার করতে চায় না, কিন্তু আশা ছাড়ে না, একদিন না একদিন তাকে সে বুঝবেই, পোষ মানাবেই।

ইতিমধ্যে সে ধৈর্য ধরে আছে। সুতো ছাড়ছে। সময় দিচ্ছে। যাদের জীবনটা সম্পূর্ণ স্বামী-নির্ভর সে তো সে জাতীয় নয়ও। আরও তো আছে। অনেক অনে-ক রকম আছে। তাদেরও তো দুর্ধর্ষ লাগে তার! ঝুম্পার সঙ্গে ওয়ার্ড-মেকিং, মাম্পির সঙ্গে সাপলুডো, দিদিভাইকে নিয়ে একজনদের জন্মদিনের আর একজনদের অন্নপ্রাশনের উপহার কিনতে যাওয়া। টিভি সিরিয়াল নিয়ে ফোনে মায়ের সঙ্গে তুমুল তর্ক। হঠাৎ কলেজ-জীবনের তিন-চার জন বন্ধু বাড়িতে হাজির। একেবারে অপ্রত্যাশিত। তার ওপরে সে উপন্যাসের পোকা, বিশেষ করে থ্রিলার। 'হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে।' জাতীয় মন নিয়ে বরের মুখ চেয়ে থাকতে তার বয়ে গেছে।

ঋত্বিকের প্রজেক্ট

গরমের দীর্ঘ দুপুর শেষ হবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না যদিও এখন তিনটে। মুকুটের মনে হল একটা বিরতি নেওয়া দরকার। এশিয়াটিক সোসাসটির রিডিং রুমটাও ফার্নেস লাগছে। বারোটার একটু আগেই সে টেবিলে বসেছে। ঋত্বিকের আসার কথা ছিল অথচ এখনও তো এল না। যা কাজপাগল ছেলে! দেখো কোথায় কোন কাজে আটকে গেছে। সেইজন্যের সে বাইরে কোথাও 'মিট' করবার ঝুঁকি নেয়নি। রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথাখারাপ হয়ে যাবে।

—ওই তো, ওই তো ঋত্বিক! হাতে হেলমেট, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কোন দিকে যাবে বুঝতে পারছে না। এশিয়াটিকের রিডিং রুমটার সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। মুকুট উঠে দাঁড়াল। খাতাপত্রগুলো ফাইলের মধ্যে ভরে নিল, একটা হাত তুলে ঋত্বিককে দাঁড়াতে বলল। বই ফেরত দিয়ে, ঝোলাটা সংগ্রহ করতে করতে বলল, কী রে, তোর বাইকে চড়তে হবে না কি এখন? এই রোদ্দুরে?

—তা ছাড়া কী? আজকে তো সোজা বাইপাস, জায়গাটা তোকে দেখিয়ে আনি।

—সব ঠিকঠাক হয়ে গেল?

—সব হয়নি। প্রবলেমটা গিয়ে বলব।

—এই ঋত্বিক প্লিজ, পাশেই একটা রোল-এর দোকান আছে। ভীষণ খিদে পেয়েছে, সেই এগারোটায় বেরিয়েছি।

—নে। নিয়ে নে—ওখানে গিয়ে খাবি।

—না রে। তখন বিশ্রী হয়ে যাবে। একটু সময় দে....

পার্ক স্ট্রিট থেকে ইস্টার্ন বাইপাস নেহাত কম দূরত্ব নয়। তারপর শেষ দুপুর হলে হবে কী, গাড়িতে বাসেতে এখনও ছয়লাপ রাস্তাঘাট। এক এক দিন কপাল এমন খারাপ থাকে, পুরো একটা লাল করিডর দাঁড়িয়ে থাকে সারা পথ জুড়ে। তুমি যাও বঙ্গে লালও যায় সঙ্গে। সুতরাং ওয়ান ওয়ের ভুলভুলাইয়ায় ঘুরতে ঘুরতে ওরা যখন গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছোল, তখন আকাশজুড়ে কমলা আলো।

জমিটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভেতরে একটা ছোট পুকুর। একটা চালাঘর। গাছের মধ্যে, কটা নারকোলগাছ, কিছু দেশি আমগাছ, একটা শিশু, একটা তেঁতুল, বকুল আর দুটো মাঝারি শিরীষ গাছ রয়েছে, ছড়ানো, ছিটোনো। মুকুট বলল, এ তো অঢেল জায়গা রে! পুকুরটা নিশ্চয়ই বোজাবি না, বড় গাছগুলোও কাটাকাটি করবি না।

ঋত্বিক বলল, মাথা খারাপ? আমার অলরেডি ভাবা হয়ে গেছে পুকুরটাকে কীভাবে ব্যবহার করব। গাছগুলোর তলা বাঁধিয়ে দিয়ে, বেশ চাতাল মতো করে দিলে, সেখানে বসে ক্লাসও নেওয়া যাবে। ওই বকুলটা দেখ।

—শান্তিনিকেতন?

ঋত্বিক হাসল—বলল, শান্তিনিকেতন কে না গড়তে চায়, শান্তি গিয়ে অশান্তিতে না ঠেকে। যাক, চট করে দেখে নে, ঝপ করে অন্ধকার নেমে যাবে, এখানে এইসব আগাছাটাগাছার জন্যে বিশ্রী সব পোকা আছে, কামড়ে জান বার করে দেবে।

বাইরে বেরিয়ে উলটোদিকে ধাবাটা চোখে পড়ল মুকুটের। মাটির উঁচু চুড়োর মতন উনুন। তার ওপর বিরাট ডেকচিতে কিছু একটা চেপেছে। ওদিকে সর্দারজির পাগড়ি দেখা যাচ্ছে। ফেলে-রাখা বেঞ্চিগুলোর ওপর গোধূলির আলো পড়ে আছে। মুকুট বলল, চল ওখানে একটু বসা যাক। দুটো লস্যি অর্ডার দিয়ে বাইরের একটা বেঞ্চিতে বসল ওরা।

ঋত্বিক একটা অদ্ভুত ছেলে। কলকাতা মেডিকেল থেকে ডাক্তারি পাস করে এফ. আর. সি. এস. করতে সে ইংল্যান্ডে যায় কিন্তু সেসব না করে সে সেখানে রেডক্রসের সঙ্গে জুটে যায়। মুকুট অ্যান্টি এডস প্রোগ্রামে ডাবলু. এইচ. ওর. সঙ্গে কাজ করতে করতে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, নরওয়ে হয়ে ইংল্যান্ডে গেলে একটা কনফারেন্সে ঋত্বিকের সঙ্গে আলাপ হয়। ঋত্বিক তখন ঠিকই করে ফেলেছে রেডক্রস ছেড়ে দেবে, দেশে ফিরে আসবে এবং বাচ্চাদের জন্য কিছু কাজ করবে। মুকুটকে ও অনুরোধ করে ওর সঙ্গে যোগ দিতে। কর্নেল থেকে ডক্টরেট ডিগ্রিটা নিয়ে ডাবলু. এইচ. ওর. সাহায্যে পরিচালিত একটা সংস্থার কাজ নিয়েই মুকুট দেশে এসেছে। দেখে ঋত্বিক ঠিক এসে গেছে, তার যে কথা সেই কাজ। সে অনাথ বাচ্চাদের জন্য একটা প্রতিষ্ঠান খোলবার কাজে তখন মেতে।

একটা বাইক এসে থামল। কালো গগলস্ পরা, জিনস্ আর কালো টি-শার্ট পরা দুটো ছেলে। দেখে সর্দারজি যে রকম শশব্যস্ত হয়ে উঠল, তাতেই ওদের মনে হল এনারা স্থানীয় মস্তান হবেন, একজন বাইক থেকে নেমে সর্দারজিকে নিচু গলায় কীসব জিজ্ঞেস করল। অন্যজন বাইরে বসেই রইল। একটু পরেই রাস্তা কাঁপিয়ে চলে গেল দুজনে।

নিচু গলায় মুকুট বলল, কী রে! তোর শান্তিনিকেতনে এদের উৎপাত হবে না তো!

—আমিও ওই কথাই ভাবছিলাম। কনস্ট্রাকশন শুরু হলেই এসব মাল এসে যাবে। আমার ধারণা ছিল কাছাকাছি লোকালয় নেই, কাজেই.... এখন দেখছি ধারণাটা ভুল, যেখানে গুড় সেখানেই মাছি। যাক গে, ওসব কনট্রাক্টর বুঝবে। ওরা জানে কাকে কী মন্ত্রে তুষ্ট রাখতে হয়। আমাদের ওর মধ্যে মাথা না গলালেও চলবে। নামটার কথা কিছু ভাবলি?

—ভেবেছি কয়েকটা। 'সত্যকাম' নামটা কেমন?

—সেই 'অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরে?' শুনতে ভাল মুকুট, বুঝতে ভাল নয়।

—তা হলে যদি 'জীবক' দিস?

—ইনি কে বটেন?

—এঁকে তোর চেনা উচিত। শিশুচিকিৎসক ছিলেন। আড়াই হাজার বছর আগে। শল্যচিকিৎসা প্লাস্টিক সার্জারি এইসবে নাম করেন।

—তাই নাকি?

—আরও প্রাসঙ্গিকতা আছে ভদ্রলোকের। ওঁর জন্মপরিচয় জানা যায় না। বনের ধারে কাঠকুটো পাতাটাতার মধ্যে পড়েছিলেন। বাঁচবার কথা নয় তবু বেঁচেছিলেন তাই জীবক। খুব সম্ভব রাজগৃহের নটী শালবতীর ছেলে। মানুষ করেন বিম্বিসারের এক ছেলে। চারপাশে কাক ঘুরছিল। কিন্তু ঠোকরায়নি।

—সেই কুকুরগুলোর মতো? ডাস্টবিনে পড়ে থাকা একটা বাচ্চাকে পাহারা দিচ্ছিল।

—ঠিক বলেছিস। একজন ফিল্মটার বোধহয় দত্তক নিলেন।

—আশ্চর্য ব্যাপার দ্যাখ, কুকুরেরাই বাগে পেলে হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ড থেকে বাচ্চা টেনে নিয়ে যায়। আবার সেই কুকুরই.... নাঃ, কুকুরের মতিগতিও মানুষের মতোই আনপ্রেডিক্টেবল।

মুকুট বলল, যা বলেছিস। ঠিক মানুষের মতো।

—জীবক, রিবক, সেবক... আওড়াতে আওড়াতে ঋত্বিক বলল, বড্ড কাঠ কাঠ শোনাচ্ছে না? তা ছাড়া যে কারণে 'সত্যকাম'টা চাইছি না, সেই একই কারণ 'জীবক'-এও এসেছে। আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া নটীর ছেলের পরিচয়টা সারাজীবন বয়ে বেড়াবার পক্ষে বড্ড ভারী নয়? যেখানেই যাবে বলবে 'জীবক' থেকে এসেছে, জীবক-এর রেসিডেন্ট।

—সে তো অন্য নাম দিলেও বলবে, অনাথ তো বটে!

—হ্যাঁ বলবে, কিন্তু ঠিক কাদের নিয়ে তৈরি হয়েছে সেটা তো একটু অস্পষ্টও থাকবে! মায়ের জীবিকার পরিচয়ে সারাজীবন ওদের পরিচিত হতে হবে। দিস ইজ ভেরি আনজাস্ট। আচ্ছা, নামটা 'রচনা' দিলে কেমন হয়? মানুষ রচনা করা হচ্ছে। গড়বার চেষ্টা করা হচ্ছে!

—খারাপ না। একটা ও-কার লাগিয়ে দে তা হলে—'রোচনা'।

—'রোচনা'? শুনতে তো খুবই ভাল লাগছে। মানে কী?

—'রোচনা' মানে দীপ্তি, শোভা।

—থ্যাঙ্কস, মুকুট। এটাই থাক।

সামনে, আশেপাশে তাকালে কচুরিপানায় ভর্তি। লম্বা লম্বা ঘাসে আর আগাছায় ছাওয়া জলাজমিই বেশি দেখা যায় জায়গাটায়। দূরে দূরে কিছু নতুন বাড়ির খাঁচা। কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। বাজি ফেলে বলা যায় আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এসব জায়গা কংক্রিটের জঙ্গল হয়ে যাবে। চারদিকে এখন ছড়ানো ঝুপড়ি, ন্যাংটা মাটি-মাখা বাচ্চাকাচ্চা। অপুষ্ট অর্ধনগ্ন এইসব পুরুষ-মহিলা পপুলেশন অচিরেই ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে। কোথায় যাবে? কোথায় যায় স্থানচ্যুত এইসব বাস্তুহীন? এদের কোনও দেশ নেই। প্রথমটা দেখা যাবে এইসব কনস্ট্রাকশনের ভাঁজে ভাঁজে বালির ঝুড়ি নিয়ে গাঁইতি শাবল নিয়ে ওঠানামা করছে ওরা। যতদিন কাজ চলবে ততদিন। তাতে এমন কিছু সংস্থান করে নিতে পারবে না। কোনও ভূখণ্ডে স্থায়ী আস্তানার কোনও প্রশ্নই নেই, নেই কোনও বিশেষ জীবিকা। পোকামাকড়ের মতো অনিশ্চিত, স্বল্পমেয়াদি জীবন। রাজনৈতিক দলগুলো 'জনগণ' 'মানুষ' এইসব গালভরা নামের গৌরবে ওদের ভূষিত করে থাকে ভোটের স্বার্থে, তারপর বাদলাপোকার মতো এ জীবনগুলো কবে কাবার হয়ে যায়, খোঁজ রাখবারও প্রয়োজন কেউ মনে করে না। পুরুষের পর পুরুষ বয়ে চলেছে এমনই। এদের জন্ম দেবার অধিকার কেউ নিয়ন্ত্রণ করে না। কিন্তু জাত শিশুর পালিত হবার অধিকারটাও যে থাকার কথা, কেউ ভাবে না। তারা খেতে পাবে না, খাটলে পিটুনি খাবে, ভাড়া খাটবে, বিক্রি হয়ে যাবে। তবু আইন হবে না পালন করার ক্ষমতা না থাকলে পৃথিবীতে শিশু আনা দণ্ডনীয় অপরাধ। আইন করলেও অবশ্য কিছু স্ত্রীলোকই ছেঁকে তোলা যাবে শুধু, যেন স্ত্রীলোকে পুরুষকে ব্যতীত বাচ্চার জন্ম দিয়ে থাকে।

—কী যেন ভাবছিস? ঋত্বিক লস্যিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—ধর তুই যদি তোর 'রোচনা'য় এইসব বাচ্চাগুলোকেও নিতিস .... দূরের দিকে হাত দেখাল মুকুট।

ঋত্বিক বলল, ওয়ান অ্যাট এ টাইম মাদমোয়াজেল। ওভাবে আবেগে সেন্টিমেন্টে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে গেলে চলবে? তাছাড়াও আমাদের কাজের গণ্ডিটা নির্ধারিত করছে অন্য একটা ফ্যাক্টর।

—কী?

—জমিটা হল একজন পতিতার। তিনি চান 'পতিতা'দের বাচ্চাদের জন্যই জমিটা ব্যবহার হোক।

—তা হলে তো অন্য প্রশ্নই নেই। কে এই মহিলাটি?

—জনৈকা ললিতা দাসী। এক ব্যারিস্টার সাহেবের রক্ষিতা ছিলেন।

—ছিলেন। এখন?

—এখন সাহেব গত। মেমসাহেব বিগতযৌবনা। টাকাপয়সা বিষয়সম্পত্তির অভাব নেই। চ্যারিটিতে মন গেছে। স্বজাতির কল্যাণ চান।

—ভাল তো! তা তুই কি সেইজন্যেই আমায় চাইছিস?

ঋত্বিক মুখে একটা মজা-পাওয়া হাসি নিয়ে বলল, তোকে ইন এনি কেস চাইছি মুকুট, সেটা কি তুই জানিস না?

মুকুট বলল, রোম্যান্স মচাসনি, রোম্যান্স মচাসনি। আসল কথাটা বল।

ঋত্বিক বলল, ঠিক হ্যায় বাবা, কাজের কথাটা হল ঘটনাচক্রে সত্যকামদের নিয়েই যখন কাম, তখন তোর অভিজ্ঞতা তো কাজে লাগবেই। এখন একটা মুশকিল আসান কর দেখি।

—কী?

—এই ললিতা দাসী বোর্ডে থাকতে তো চাইছেনই। প্রেসিডেন্ট টেন্টও হতে চাইছেন বোর্ডের।

—বোর্ডে থাকতে অসুবিধে কী? আর প্রেসিডেন্ট তো উনি ইচ্ছে করলেই হতে পারবেন না। সেটাতে তো ভোটাভুটির ব্যাপার থাকছে।

—উনি হয়তো সেটাও অ্যারেঞ্জ করতে চাইছেন।

—কীভাবে?

—ওঁর চেনাশোনা অনেককে বোর্ডে ঢোকাতে বলছেন আর কি!

—ইউনিসেফ বোর্ডের কম্পোজিশনের ব্যাপারে কোনও শর্ত দেয়নি?

—দিয়েছে। একজন ফিল্ড-ওয়ার্কের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সোশ্যাল সায়েন্সের লোক চাই, সেখানে তোকে ভাবছি। একজন মেডিক্যাল বা প্যারামেডিক্যাল পার্সন, সেখানে আমি আসছি। একজন মাদার'দের প্রতিনিধি চাই, সেখানে উনি ঢুকতে চাইছেন, যদিও উনি কোনও 'মাদার' নন; এছাড়া তিনজন যে কোনও শিক্ষিত দায়িত্বশীল নাগরিক হতে পারেন। এখন উনি চেয়ারপার্সন হলে এবং সঙ্গে ল্যাংবোট নিয়ে এলে আমি কাজ করতে পারব বলে মনে হয় না। ওঁকে আমি ছেড়েই দিতাম, কিন্তু তুই তো জানিস প্রথমে কিছু কাজ এবং কিছু নিজেদের খরচাপাতি, আর্থিক সামর্থ্য দেখাতে হয়, না হলে ইউনিসেফের ফান্ডও পাওয়া যায় না, প্রজেক্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকেও কিছু পাওয়ার আশা বৃথা। আমার সঞ্চয় তো আমি সবটা ঢালছিই। কিন্তু এই ললিতা ম্যাডামের জমিটা আমাদের একটা বড় অ্যাসেট। এটাই আমার প্রোপজালের প্রধান অংশ। তুই এঁদের সাইকোলজি জানবি। অনেক ডিল করেছিস। দেখ না তুই যদি ব্যাপারটা একটু ম্যানেজ করতে পারিস।

—তা, তুই ওঁকে ডিটেইলস বলতে গেলি কেন?

—ঘোড়েল মহিলা ভাই, তুমি চল ডালে ডালে তো ইনি চলেন পাতায় পাতায়। ব্যারিস্টারের ব্যাপার। বুঝছ না! আমি খুব চিন্তায় আছি।

—চল। আজই চল তা হলে। কাল থেকে আবার পর পর তিনদিন আমার বউবাজারে কাজ। সময় পাব না।

—তা হলে দাঁড়া। একটা ফোন করি ওঁকে।

পার্ক সার্কাসে যে ফ্ল্যাটবাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা, সেটা অনেক দিনের। বেশ নামকরা। চরিত্রটাও বহুজাতিক। ওরা ঢুকতে ঢুকতেই দেখল একটা ওপেল অ্যাস্ট্রা বেরিয়ে যাচ্ছে। চালাচ্ছেন একজন সিন্ধি বা পার্শি ভদ্রলোক, পাশে যে মোঙ্গোলীয় মুখের মেমসাবটি বসে তিনি চিনা না কোরীয় বোঝা শক্ত। কয়েকজন হিপি ধরনের বিদেশি খালি গায়ে তাপ্পি-মারা শর্টস পরে বেরিয়ে গেল। লিফটে ওদের সঙ্গে উঠলেন একজন তামিল বা কেরলীয় ভদ্রলোক।

লিফটের গহ্বরটা ঝুলে ভর্তি। মুকুট বলল, ছিঁড়েটিঁড়ে পড়ে যাবে না তো? ঋত্বিক কাঁধ নাচাল। সহযাত্রী তামিলের কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। লিফটম্যান অবশ্য বিরক্ত চোখে চাইল। অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশীয় বা বিহারি দেখতে হলেও সে বাংলা বোঝে।

ললিতা দেবীর ফ্ল্যাটে অবশ্য রং-চটা কোনও জিনিসই নেই। বরং একটু বেশি চকচকে সবই। ওয়লপেপার দিয়ে মোড়া ঘর। মাস্টার্ড রঙের কার্পেট। হলুদ সোফা-সেট। তাতে নীল-লাল নানা রঙের কুশন। সামনের দেয়ালে আবার একটা বিরাট আয়না। যেখানেই বসুক, আয়নায় অতিথির প্রতিবিম্ব পড়বেই। সামনে আয়নায় নিজের ছবির সামনে বিশ্রী অস্বস্তি নিয়ে বসে থাকতে হয়।

বেশ একটু পরে ওদের পেছনের কোনও করিডর থেকেই আয়নায় ছায়া ফেলে এলেন ললিতা দেবী। অর্থাৎ নিজে যেমন অন্তরাল থেকে অতিথিদের দেখে নেবার সুযোগ নেন, অতিথিদেরও তেমনই নিজে আসার আগেই চেহারাটা দেখিয়ে দেন। বয়স তিয়াত্তর চুয়াত্তর তো নিশ্চয়ই হবে। সাদা চুল, মাশরুম কাট। মাঝারি উচ্চতার আধা-ফরসা মহিলা। কোনও সময়ে হয়তো সুন্দরী ছিলেন, এখন খুবই প্রসাধিত ও কেতাদুরস্ত। একটু মোটার দিকে গড়ন। সুরমা দেওয়া চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ।

ঋত্বিক বলল, ম্যাডাম এই হল মুকুট রায়, যার কথা আপনাকে বলেছিলাম। ওর বিদেশে বহু কাজের অভিজ্ঞতা আছে। জায়গাটা ওকে দেখিয়ে আনলাম।

উনি বললেন, নাম ঠিক হল?

—ভাবছি। এখনও ফাইন্যাল হয়নি।

এবার মুকুটের দিকে চাইলেন—পছন্দ হল? জায়গাটা?

—হ্যাঁ, খুব সুন্দর। শহর থেকে বেশি দূরে নয়। অথচ পরিবেশটা বেশ গ্রাম গ্রাম। যাতায়াতের অসুবিধে নেই।

—যাতায়াত? কেন? তোমরা ওখানে থাকবে না।

উনি ঋত্বিকের দিকে তাকালেন, তারপর মুকুটের দিকে।

—না, থাকব কেন? —মুকুট বলল, নিয়মিত দেখাশোনার জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট, মেট্রন এসব ঠিক করতে হবে।

—বেশ কথা। আমি জনাকয়েক ছেলেমেয়ে ঠিক করে দেব এখন।

মুকুট বলল, আপনি কীরকম ছেলেমেয়ের কথা বলছেন জানি না। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞাপন দিয়ে সব ঠিক করতে হবে। নিয়মমাফিক।

—বাঃ—কর্কশ শোনাল ললিতা দেবীর গলা—তা হলে যাদের মঙ্গলের জন্য করা, তারাই কাজ পাবে না?

—ব্যাপারটা ঠিক তা নয় মাসিমা, আপনি যাঁদের কথা বলছেন দরখাস্ত করে যদি তাঁরা যোগ্য বোঝা যায় তো তাঁদেরও নিতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু আমরা তো গ্র্যাজুয়েট, টিচার্স ট্রেনিং, মন্তেসরি ট্রেনিং, অন্যান্য কারিগরি ট্রেনিংও খুঁজব। আমি যদ্দুর জানি কোনও এন. জি. ও-ই এখনও পর্যন্ত সেরকম ব্যাচ বার করতে পারেনি। সে সময়টাই আসেনি এখনও।

—আমার চেনাপরিচিত কিছু সজ্জন আছেন, আমায় ভক্তি করেন, তাঁদের পরামর্শ আমাদের কাজে লাগবে। এঁরাও শিক্ষিত লোক তোমাদের জোগাড় করে দিতে পারবেন। তা ছাড়া 'অ আ ক খ' শেখাতে গ্র্যাজুয়েট, ট্রেনিংমেনিং দরকার হবে কেন, আমি বুঝি না।

মুকুট গ্র্যাজুয়েট ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার জন্যে একটা বক্তৃতা আরম্ভ করতে যাবে, হঠাৎ ঋত্বিকের গলা শুনে সে থমকে গেল। ঋত্বিক বলছে, আপনার পছন্দমতো একটা প্রতিষ্ঠান তো আপনি ইচ্ছে করলে চালু করতেই পারেন। আপনার আদর্শ, আপনার ধারণামতো। সেক্ষেত্রে আমাদের কোনও দরকার আপনার থাকছে না। প্রজেক্ট ওয়ার্ক, গ্রান্টের টাকাপয়সার জন্য কাগজপত্র তৈরি... এসবও অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপ। ললিতা দেবী হকচকিয়ে গেছেন। তাঁর চোখ ঋত্বিকের ওপর স্থির। একটু পরে উনি কেটে কেটে বললেন, তোমার কথা আমি বুঝলাম না বাছা।

—বোঝার কিছু নেই ম্যাডাম। শর্তসাপেক্ষে আপনার জমি আমি নিচ্ছি না। জমিটা দিলে পুরো ব্যাপারটাই আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। 'পতিতা'দের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজটা করব, এই শর্তটুকু আমি মেনেছি। কিন্তু এরপর আপনার যদি কোনও রকম মালিকানার ইচ্ছে, কনট্রোল করবার ইচ্ছে থাকে, তা হলে জমিটা আপনি বরং দেবেন না। আমরা যদি ফান্ড আনতে পারি, তা হলে কাজটা করব একেবারে আমার মনের মতো করে, আমার পছন্দমতো লোক নিয়ে, আমার নিয়মে।

প্রত্যেকটা 'আমার'-এর ওপর কড়া ঝোঁক দিয়ে ঋত্বিক কথা শেষ করল। ললিতা দেবীর মুখ লাল হয়ে গেছে, বেশ উত্তেজিত। বললেন, বেশ কথা। এই যে এত ভদ্র-সজ্জন ব্যক্তি স্কুল-হাসপাতাল এসবের জন্য জমি বাড়ি দান করছেন, সেখানে তাঁরা চেয়ার নিয়ে থাকছেন না? তাঁদের মা-ঠাকুমার নামে স্কুলটুল হচ্ছে না? খালি আমার বেলাই নিয়ম আলাদা হবে? জানি। বিনোদনী দাসীর টাকায় তৈরি হল কিছুতেই তাঁর নামে হতে দিলে না কেউ। তা সে না-হয় ছিল আগেকার দিনের কথা। এখনও...।

—আপনি ভুল করছেন। এই শর্তে আমরা তথাকথিত ভদ্র-সজ্জনের কাছ থেকেও জমি বা অন্য কিছু নেব না। আপনার কেস আলাদা কিছু না।

—আমি তো ভেবেছিলাম আমার দিদিমা নীহারিকা দাসীর নামে ইস্কুলটা হবে... নীহারিকা স্মৃতি। ধরো... তোমরা তো নাম খুঁজেও পাচ্ছ না।

—একটা নাম আমরা মোটামুটি ভেবে রেখেছি—মুকুট তাড়াতাড়ি বলল।

ঋত্বিক বলল, আপনার মা-দিদিমা এঁদের নামে প্লাক ওখানে রাখাই যায়। কিন্তু নীহারিকা স্মৃতিটৃতি আজকাল চলে না। ... আর এটা তো শুধু স্কুলও নয়। নামটার কোনও অর্থই সেভাবে ... বলতে বলতে ঋত্বিক উঠে দাঁড়াল।

একটি মেয়ে ট্রে ভর্তি খাবার নিয়ে ঢুকলেন। ললিতা দেবী বিমূঢ়ভাব কোনওক্রমে সামলে বললেন, একটু মিষ্টিমুখ করে যাও অন্তত, ও মেয়ে!

মুকুট একটা মিষ্টান্ন তুলে নিয়ে বলল, এই নিলাম, ঠিক আছে মাসিমা?

ঋত্বিক শুকনো গলায় বলল, আমায় ছেড়ে দিন প্লিজ। এমনিতেই আমার খুব অনিয়ম হয়ে যায়...

ললিতা দেবী তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না।

বাইরে বেরিয়ে মুকুট বলল, তুই তো যথেষ্ট কড়া লোক! আমায় নিয়ে যাওয়ার কোনও দরকারই ছিল না তোর।

ঋত্বিক বলল, সামহাউ তুই থাকাতে কথাগুলো বলবার জোর পেয়ে গেলাম। কেন, কীভাবে তা বলতে পারব না। মাইন্ড করলি?

—আমার একটু খারাপ লাগছিল। মহিলা বোধহয় চেয়ারপার্সন নীহারিকা স্মৃতি গোছের কিছু একটা হওয়ার আশা করছিলেন। ওইভাবে জাতে ওঠা আর কি! ব্যারিস্টার সাহেব ওঁকে সুখ, ঐশ্বর্য, বিলাসের বস্তু সবই দিয়েছেন। খালি কোনও সমাজ, সম্মান দিয়ে যাননি। তোরা বুঝিস না খুব করুণ ব্যাপারটা।

ঋত্বিকের ভুরু কুঁচকে ছিল। সে অধৈর্যভাবে স্টার্টারে লাথি মারছিল। বাইক স্টার্ট নিতেই বলল, বোস। তারপরে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল অফিস-ফেরত ভিড়ের রাস্তাঘাট মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে। খুব রেগেছে।

মুকুটকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়েই চলে যাচ্ছিল। মুকুট বলল, শোন, এক কাপ কফি খেয়ে যা।

—ধুত! ঋত্বিক বলল, মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল।

—খারাপ হয়ে যাবার কী আছে? ওঁর দিক থেকে একটু ভেবে দেখ।

—তোর সঙ্গে আমার মতে মিলবে না মুকুট। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দান যদি স্বার্থের কথা ভেবে হয়, উদ্দেশ্যমূলক, তা হলে সে দান না করাই ভাল। সে কোনও পতিতাই হোক আর মহাত্মাই হোক। পতিতা বলে আহা উহু করতে থাকলে—কাজটা হবে না। ওভাবে কিছু হয় না।

মুকুট অবশ্য ঋত্বিকের হতাশাটা বুঝতে পারছিল। নিজের কেরিয়ারের কথা না ভেবে একটা পাস করা ডাক্তার সমাজের প্রতি দায়বোধে বাচ্চাদের জন্য কিছু করবার চেষ্টা করছে। তার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি, ভাবনাচিন্তা করে প্রত্যেকটা ধাপ পার হচ্ছে। একটা অতি নগণ্য কারণে যদি এভাবে বাধা পড়ে! কিন্তু সে বলল, দেখ, ওঁর নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা না হয় ছাড়। কিন্তু মেয়েদের কোনও বিকল্প ব্যবস্থার ভীষণ দরকার। হলে ভাল। উনি খারাপ কিছু বলেননি।

দু-তিন লাফে ওপরে উঠে এল ঋত্বিক। বেল-এর ওপর আঙুল রেখেছে। মুকুটের মা খুলে দিলেন। ওঁর দিকে আবছাভাবে চেয়ে একটা আনমনা হাসি দিল ঋত্বিক। তারপর বলল, মুকুট, যখন কোনও কাজ করবি তোকে আগে থেকে ঠিক করে নিতে হবে তুই কী চাইছিস। একেবারে ষোলোআনা পেশাদারি টেকনিক্যাল অ্যাকিউরেসির সঙ্গে। তোর টার্গেট এরিয়াটা কী? এটা খুব জরুরি।

মুকুটের মা হেসে বললেন, ঋত্বিক ভেতরে এসে তর্ক করো।

—ও হ্যাঁ, স্যরি মাসিমা—ঋত্বিক অন্যমনস্ক হাসল। তারপর কয়েক পা এগিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, ধর এই ব্যাপারটায় তোর কাজটা কাদের নিয়ে? পতিতারা? না তাদের ছেলেমেয়েরা?

—ছেলেমেয়েরা অবভিয়াসলি।

—ঠিক আছে। তোর টার্গেট কী? বাচ্চাগুলোর জন্যে ক্রেশফ্রেস তৈরি করতে চাইছিস কি? ব্যবসার সময়ে ওদের জমা রাখা যাকে বলে। ব্যবসার সময়ে রাস্তায় লুটোপুটি খাবে না, বিরক্ত করবে না, ওষুধ-পথ্য পাবে, এই?

—না রে বাবা। ওদের মানুষ করে তুলতে চাইছি। টোট্যাল এডুকেশন। যাতে বড় হয়ে অন্য স্ট্রিমে যায়। প্রসটিটুশন ব্যাপারটার সঙ্গে একেবারে যুক্ত না থকে।

—রাইট। তা সেটা কি শুধু 'অ আ ক খ' শেখালেই হবে। তার জন্যে একটা সুস্থ, স্বাভাবিক, সামাজিক পরিবেশ চাই, না চাই না? সেখানে যদি এই প্রফেশনের ঘুণ কেউ এসে এদের সুপার হয়ে বসে যায়, পরিবেশটা মাটি হয়ে যাবে না? মানুষ তার পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে মুকুট। ওদের কথাবার্তায়, চালচলনে, এমনকী আদর বা শাসনের ধরনেও ওদের অভিজ্ঞতার জগৎটা বেরিয়ে পড়তে বাধ্য। তাতে বাচ্চাগুলোর ক্ষতি। এটা বুঝতে তো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়?

মুকুট বলল, ওদের মায়েরা? তাদের সঙ্গে যোগাযোগের কী হবে?

—মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাবে। সম্পর্ক থাকবে, কিন্তু মাখামাখি থাকবে না।

—জিনিসটা একটু অমানবিক না?

—গোটা ব্যাপারটাই অমানবিক মুকুট। এই বারাঙ্গনা বৃত্তি, তাদের সন্তান হওয়া। সেসব সন্তান যেভাবে বড় হয়, জীবনকে ফেস করতে বাধ্য হয়, সমস্ততাই চূড়ান্ত অমানবিক মুকুট। আমার চেয়ে কম জানিস না তুই। সংস্কার-প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট ধাপে কঠিন হতে হবেই। নইলে উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এনি ওয়ে, হস্টেলে যারা মানুষ হয় সেইসব ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও বাড়ির বন্ধন একটু আলাদা হয়ে যায়ই। স্বীকার করিস বা না করিস।

—বাচ্চাগুলো বড় হয়ে মায়েদের ঘৃণা করতে শিখলে?

—ঘৃণা করতে তো শেখানো হবে না। কিন্তু আমরা ওদের নারকীয় পরিবেশ থেকে তুলে এনে সুস্থ পৃথিবীর জলহাওয়ায় বাঁচতে দিতে চাই। তার প্রথম শর্তই হল কিন্তু ভুলে যাওয়া। নরকবাসের সময়টা। এখন এই ভুলে যাওয়া, সুস্থ ভ্যালুজ নিয়ে বড় হয়ে ওঠা মানে যদি অসুস্থতাকে ঘেন্না করা হয় কারও কারও ক্ষেত্রে কিছু করার নেই তা হলে। মায়েরা যদি ওদের বদলের সঙ্গে তাল রাখতে না পারে, সেই পুরনো জায়গায় থেকে যায়, তা হলে কোনও না কোন সময়ে মায়েদের সঙ্গে ওদের বিচ্ছেদ হবেই। আমরা চাইব বড় হয়ে সব বুঝে ওরা মায়েদের এই দুরবস্থা থেকে মুক্ত করুক। কিন্তু ঘৃণা যদি না-ও করে শ্রদ্ধা করা শক্ত হবে। অতটা আমি প্রমিস করতে পারছি না। যাই হোক, সেটা পরের কথা। বি প্র্যাকটিক্যাল মুকুট। হয়তো করুণা করবে। করুণাও খারাপ জিনিস না। ভবিষ্যৎ কীরকম হবে, সে সম্পর্কে নির্ভুল আন্দাজ দেওয়া সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে কোনও ললিতা বিশাখার আবদারই আমি শুনতে রাজি নই।

কফি এসে গেছে।

মুকুট বলল, ঠিক আছে। এবার একটু হাস।

মুখের পেশি সামান্য আলগা হল ঋত্বিকের। কিন্তু সে আদৌ হাসল না। বলল, কাজটা হাত থেকে বেরিয়ে গেল রে! আবার কোথায় হা জমি জো জমি করে ঘুরব!

মুকুট বলল, কী আশ্চর্য! এখনই অত হতাশ হবার কী আছে? উনি কি একবারও বলেছেন জমিটা দেবেন না?

জবাবে ঋত্বিক নীরবে কফিটা শেষ করে ফেলল। বলল, চলি রে! দু-তিন কদমে পগার পার।

সত্যিই। ঋত্বিকের মতো কঠিন সংকল্প, নিজের ধ্যানধারণায় অবিচল থাকার মতো মনের জোর মুকুট আজও আয়ত্ত করতে পারল না। তার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি, কিন্তু ঋত্বিকের জোর, দৃঢ়তা তার নেই। ভাবা যায়! এফ. আর. সি. এস-টা কমপ্লিট করল না জাস্ট ওয়েবসাইটে ভারতীয় শিশুদের ওপর কতকগুলো ছবি আর ডেটা দেখে? তিনদিন তিনরাত নাকি খালি পায়চারি করেছে আর ভেবেছে। তারপর সেই যে নিজের পথ ঠিক করে নিয়েছে, আর একচুলও নড়েনি।

চুলের আমি চুলের তুমি

—চুল তুমি কার?

—আগে ছিলাম মাথার, এখন মাটির।

পার্লারের মেঝেয় ছড়িয়ে থাকা অসহায় চুলের গোছাগুলোর দিকে চেয়ে জিনার বুক ঠেলে কান্না এল। সে বলল, প্লিজ, চুলগুলো আমাকে দিয়ে দিন।

—আগে বলবেন তো! মেঝেতে পড়ল! ঠিক আছে ওয়াশ করে দিচ্ছি।

গোছা করে চুলগুলো সযত্নে তুলল মেয়েটি। এলোমেলোগুলো বাদ দিয়ে দিল, তারপর শ্যাম্পু লাগিয়ে চড়া জলের ধারার তলায় ধুয়ে, ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে, রাবার ব্যান্ড আটকে ওর হাতে তুলে দিল। বলল, এত মন খারাপ তো কাটলেন কেন ম্যাডাম? আমাদের ব্যবসা, আমরা তো বলবই চুল কাটুন, ডাই করুন, ব্লিচ করুন।.....

জিনা হাসল, বলল, স্বীকার করছেন তা হলে!

মেয়েটি বলল, দুপুরবেলা, আর কাস্টমার নেই, আমাদের ম্যাডামও লাঞ্চে গেছেন তাই বলে ফেললাম। সাহেবের শখ, না?

জিনা চমকে উঠল, এ কথা কেন মনে হল আপনার?

—বা! সাহেবের শখেই তো বেশির ভাগ কাস্টমার চুল কাটে। আপনার মতো এমন সুন্দর ন্যাচার‍্যাল ওয়েভঅলা চুল যাদের, তারা বড় জোর একটু শেপ করে নিতে ভালবাসেন। আমাদের এমন কাস্টমারও আছে, জানেন, হাঁটু ছাড়িয়ে ঘন চুল। পার্লারে এসে শ্যাম্পু করাতে হয় এত। কিছুতেই চুল কাটবে না। চুল কাটে কারা? বয়স হয়েছে, চুল কমে বিশ্রী হয়ে গেছে, কী করলে ভাল লাগবে বুঝতে পারছেন না...... আপনার বয়সে আপনার মতো চুলে.... ওসব সাহেবদের শখ।

জিনার হঠাৎ একটু স্বস্তি বোধ হল। যাক বাবা, আর পাঁচজনেরও তার মতো বর আছে। সে একলাই দুখিনী নয়।

টাকা মিটিয়ে সে একটা রিকশা নিয়ে বাড়ি চলে এল। বর্ষার আকাশ থমথম করছে। যে কোনও মুহূর্তে ঢালতে পারে। ভিজে স্যাঁতসেঁতে দিন। চাবি দিয়ে নিঃশব্দে দরজাটা খুলল সে। দরজার কপাট, ভেতরের দেয়াল, পিয়ানো-রিড সিঁড়ি সব তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। চিনতে পারছে না। 'কে তুমি রঙ্গিণী, আগে তো দেখিনি' গোছের ভাব। নিজের বাড়িতেই জিনা চোরের মতো পা টিপে টিপে চলাফরা করছে। বাবা যদি উঠে পড়েন! এই সময়টায় উনি ওঁর আরামচেয়ারে পড়তে পড়তে টুক করে একটু ঘুমিয়ে পড়েন। পাতলা একটা ফুরফুরে নাক ডাকার শব্দে উঁকি মেরে সে দেখেছে দৃশ্যটা। কিন্তু খুব পাতলা ঘুম। এক্কেবারে বোনচায়নার মতো ভঙ্গুর। নিজের নাকের ডাকেই ভেঙে যায়। চুপচাপ নিজের ঘরে গিয়ে সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল সে। বাথটবে জল ভরল, ও ডি কলোন দিল। তারপর পা খালি করে করে আস্তে আস্তে ছলাত ছলাত। এই ব্যাটা বাথটবই যত নষ্টের গোড়া।

বাবু বাথটব বসালেন, একসঙ্গে নাকি চান করবেন। এমা! ঠিক আছে বাবা তাই তা-ই। আয়না

বসিয়েছে একখানা মানুষ-মাপের। টব থেকে উঠে তাকে যে এড়িয়ে যাবে তার উপায় নেই। একটা লেসের ঢাকা দিয়ে তাকে মোটামুটি ঘোমটা দিয়ে রাখা গেছে। তা এই টবে যুগল-স্নান করতে করতে গোছাসুদ্ধু তার চুলগুলো ধরে একদিন মারল এক টান। এই বাথটবে এরকম চুল মানাচ্ছে না যা-ই বলো। কেমন ঠাকুর ঠাকুর লাগছে। এখানে ঠাকুর নয়, মেমসাহেব দরকার। চুলগুলো কেটে ফেলো।

মানে? ভেরি অবজেকশনেব্‌ল্! তোমার বাথটবের সঙ্গে ম্যাচ করার জন্যে আমার চুল কাটতে হবে? সাব্বাস, কোনওদিন বলবে তোমার মুন্ডুটা বেডরুমের সঙ্গে যাচ্ছে না, তখন কি মুন্ডুটাও ঘ্যাঁচ করে...

—ঠিক আছে, আর বলব না। আমার ভাল লাগা না-লাগায় তোমার যদি কিচ্ছু এসে না যায়, কী আর করা যাবে!

অভিমান? বাব্বাঃ, নতুন জিনিস! জিনার গায়ে পুলক লাগে। গ্যাটম্যাট রাগ নয়, লাল-চোখ আদেশ নয়, মুখ-কুঁচকোনো ঘেন্না বা তাচ্ছিল্য নয়। তার বরের অভিমান হয়েছে। পুরনো ইয়ার্কিবিলাসী মন তাকে সুড়সুড়ি দেয়, সে মিটিমিটি হেসে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—আমার ভাল লাগা না-লাগাতেও তো তোমার কিচ্ছু যায় আসে না। দাও না বাবা তোমার নেয়াপাতিটুকু স্লাইস করে কেটে। ভুঁড়িতে সে আচ্ছা করে কাতুকুতু দেয়।

এই কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? নিখিল হাসতে হাসতে কেশে ফেলে। জলে খানিকটা খাবি খায়। জল গিলে ফেলে। জিনা বাথরোব গায়ে জড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পগার পার।

কিন্তু রোজ যদি একই ঘ্যানঘ্যান করে? ভাল লাগে? বিনুনি করা কি হাতখোঁপা করা বাঙালি মেয়ে রান্নাঘরে মানায়, ক্লাবে মানায় না। কেমন ভেতো ভেতো লাগে, কিছু না হোক চুলগুলো সোজা করে খুলে রাখো।

—আমার হালকা চুল বাবা, উড়বে, এলোমলো হয়ে যাবে, চুল খুলে রাখলে আমার ভীষণ অস্বস্তি হয়। কেন? তোমাদের ওই মিসেস শিবদাসানি তো আমার খোঁপার কত প্রশংসা করলেন।

—বোঝো না। ওটা প্রশংসা নয়।

—ব্যাজস্তুতি?

—ইয়েস।

—জিনা কষে সাবানের ফেনা তোলে, বিজ্ঞাপনের মেয়েদের মতো। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে। নতুন জিনা আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে মুখ ভ্যাংচায়, বলে—তুই আর তুই নেই।

কত লোকেই তো চুল কাটে। ভালও দেখায়, নতুন দেখায়। নিজেকে নতুনরূপে দেখবার জন্যেই তো এত কাণ্ড! জিনার একারই কেন এমন স্যামসনের মতো অবস্থা! মাথাটা হালকা লাগছে, মান মর্যাদা গরিমা সব কিছুই কেন হালকা লাগছে? বাইবেলে গল্প আছে স্যামসনের চুল কাটলে শক্তি কমে যেত। তারও নিজেকে কেমন বলহীন, সত্যিকারের অবলা লাগছে। বিয়ের সময়ে শুনেছিল এই চুলই নাকি বিশেষ পছন্দ হয়েছিল নিখিলের। সে যখন খোলা চুলে পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল সেই দৃশ্য নাকি নিখিলের চোখে লেগে আছে, চিরকাল থাকবেও। জিনা এমনিতে নিজের কোনও বিশেষ অঙ্গের প্রশংসা শুনতে ভালবাসে না। তার কেমন অস্বস্তি হয়। কেউ যদি বলে—ইস জিনা তোর হাতগুলো কী সুন্দর!

—দেখিস আবার, হাতগুলোকেই আমি ভেবে বসিস না।

যখন ষোলো-সতেরো বছর বয়স কে এক বন্ধু হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

—কী রে, আমাকে দেখছিস?

—তোর স্কিন দেখছি। কী মাখিস রে?

—ব্রণ উঠলে ডাকব দেখে যাস—জিনা রাগ করে বলেছিল। এ এক অদ্ভুত বিদঘুটে ছেলেমানুষি, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবা। কিন্তু নিখিল যখন প্রথম বিয়ের পর তার চুল নিয়ে

আদিখ্যেতা করত, তার খারাপ লাগেনি। যেন গোড়ার থেকে জানাই ছিল, তার থেকে প্রায় বারো বছরের বড় এই লোকটা তাকে খণ্ডখণ্ডভাবে ছাড়া দেখতে পাবে না। হাত পা চুল চোখ নাক কান বুক—এ সবের ক্যালাইডোস্কোপ। কিন্তু সেই চুলই অমন নির্মমভাবে কেটে ফেলতে বলল? তার মানে কি ও খণ্ড থেকে শেষ পর্যন্ত জিনার সামগ্রিকতায় পৌঁছোল? নাকি সমগ্রকে দেখতে পেল না, আবার খণ্ডও গেল! এই জাতীয় কিছু অস্পষ্ট ভাবনা তার ভেতরে কাঁকরের মতো ফুটছিল। নতুন চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তার মনে হচ্ছিল—এই খুশি করার কি কোনও শেষ নেই? 'খুশি থাকো, আমার পানে চেয়ে চেয়ে খুশি থাকো' এই তো ছিল তার নিজের মনোভাব। মানুষটা রাগী, জটিল, খেয়ালী, দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক। ঘটনাচক্রে যদি এমন মানুষের সঙ্গেই জড়িয়ে পড়তে হল তাকে, কুছ পরোয়া নেই, মতিঝিলের নাগিনী ওতে ঘাবড়ায় না। যাতে খুশি থাক, খুব অদেয় না হলে তাই-ই দিচ্ছি। বন্ধুদের আসরে যেতে হবে? ডাকতে হবে? বানাচ্ছি কাবাব, শিখে নিচ্ছি ককটেলের কায়দা। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। একদিন বাড়ি ফিরে নিখিলবাবুর ক্রুদ্ধ মন্তব্য—খুব যে। এবার কি ওই রণেনকে নিয়েই কাটবে না কি?

রণেন ওর এক নম্বরের বন্ধু। তার বাড়িতেই সবচেয়ে জমাটি আসরগুলো বসে।

—কাটতে হবে কেন? তোমার কি তা হলে ভাস্বতীকে নিয়ে কাটতে সুবিধে হয়?

ভাস্বতী রণেনের স্ত্রী। তার সঙ্গে নিখিলের ফস্টিনস্টি খুব জমে। রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে নিখিল বলল—মেরে মুখ ভেঙে দেব একেবারে।

শুনে—জিনা হাঁ। নিজেকে চিমটি কেটে দেখে স্বপ্ন দেখছে কিনা। বলে কী রে লোকটা? সত্যি সত্যি মারবে না কি? তুমি ঢিল ছুড়েছ আমিও একটা ছোট্ট করে পাটকেল ছুড়ে দিয়েছি। এতে মারধরের কথা ওঠে কেন? নাগ-বাড়ির চৌহদ্দিতে কোনও মারধরের ব্যাপার নেই। জিনা যাকে বলে শক্‌ড্।

আর কিছুতেই সে যাবে না। কোনও বন্ধুবান্ধবের জমায়েতে সে যাবে না তো!

সাধাসাধি শুরু হল তখন।—প্রেসটিজ থাকছে না আমার। সব্বাই জিজ্ঞেস করছে তোর বউয়ের কী হল!

—বলোগে বউ ফিউজ হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে বাবা, যত খুশি ঢলাঢলি করো, আর কিচ্ছু বলব না।

—ঢলাঢলি? মানে? যাব না, আমি কিছুতেই যাব না।

বললেই কি আর জেদ বজায় থাকে! বন্ধুরাই সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হয়। টুকটাক রাঁধতেও হয়, বোতলও খুলতে হয়, হাসি-ঠাট্টাতেও যোগ দিতে হয়। কিন্তু সে প্রবলভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ জারি রাখে। তার স্বাভাবিক দমদম-সুলভ ফুর্তিবাজ স্মার্টনেসকে, তার বর লাস্যফাস্য ভেবে খেপে ষাঁড় না হয়ে যায়। খুশি থাকো বাবা, খুশি থাকো।

কিন্তু এই সবটাই জিনার কাণ্ডজ্ঞান। তার আপসপ্রিয়তা, শান্তিপ্রিয়তা। এর চৌহদ্দিতে কোথাও ভয় নেই। নিখিলের বহু নির্দেশ সে পালন করে চলে। যেমন চায় তেমনই থাকে, সবই ঠিক, কিন্তু এ সবই তার অকৃপণ দান। সে ইচ্ছে করলেই না দিতে পারত। যেখানে দেবে না ঠিক করে, সেখানে সে অনায়াসে নিজের মতো চলে। যেমন, শ্বশুরমশাইকে সে তাঁর নিজের ঘর থেকে সরতে দেয়নি। তিনি বলেছিলেন আমি থাকলে তোমাদের ভাগে একটা ঘর কম পড়বে। শুধু ঘর কেন, শান্তির জন্য আমি আরও অনেক বেশি স্যাক্রিফাইস করতে পারি ছোট বউমা।

মনে মনে জিনা বলেছিল—আমিও।

কিন্তু কিছুতেই ওঁকে ঘর ছাড়তে দেয়নি। দিদিভাইদের পরিবারের সঙ্গে সে ঠিক আগেকার মতো সম্পর্ক বজায় রেখেছে। এখনও গিয়ে সে দিদিভাইয়ের ভাঁড়ার গুছিয়ে দিয়ে আসে। ঝুম্পা-মাম্পিকে গান শেখাতে বসে। এখনও দাদার সঙ্গে ইয়ার্কি মারে। ভাল কিছু রাঁধলেই বাটি করে ওদের দিয়ে

আসে। নিয়েও আসে। একেবারে শতকরা শতভাগ সহজ স্বচ্ছন্দ, যেন মাঝখানে কোনও পাঁচিল নেই। তোমার প্রয়োজনে তুমি পাঁচিল তুলেছ তোলো, আমার কাছে ওর অস্তিত্ব নেই। তোমার রাগারাগি করে নিজের গুরুত্ব জাহির করতে ইচ্ছে হয় করো, আমি দমছি না। ডিজাইনার ড্রেস এনে দিয়েছ? পরলে ভাল দেখাচ্ছে না। এটা আমার বিচার, তোমার চোখের বিচার বলছে ভাল। ঠিক আছে বাড়িতে পরলাম, নিভৃতে। এই জর্জেট কাপড়ের নদীস্রোতের মতো ড্রেস পরে আমি কোনও পার্টিতে যাচ্ছি না। চুল কাটতে বলেছিলে, ঘ্যানঘ্যান করে কানের পোকা বার করে দিচ্ছিলে, ঠিক আছে চুলগুলোও আমার শান্তিপ্রিয়তার আর তোমার খুশি থাকার বেদিমূলে নামিয়ে রাখলাম। কিন্তু এটা আমার পক্ষে বড্ড বেশি, মানে টু মাচ হয়ে যাচ্ছে, হয়ে গেল, এত বেশি ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করলে একটা উলটো প্রতিক্রিয়া হয়। তুমি যদি একটা ভারী জিনিসকে ঘুসি মার, তোমার হাতে লাগবে, তখন তোমার মলম লাগবে। ব্যথাহারী মলম।

জিনা ফোনটা তুলে নিল।

—মুকুট? যাক বাবা ফিরেছিস। আমি জিনা বলছি বুঝতে পেরেছিস তো?

—বুঝতে পারব না, এমন ধারণা তোর হল কী করে? কেন?

—কী জানি বাবা, এক পৃথিবী লোকের সঙ্গে তোর ওঠা-বসা, গলা গুলিয়ে যাওয়া কোনও ব্যাপারই না।

—লোক যতই এক পৃথিবী হোক, ছোটবেলার বন্ধুর গলা একটাই হয়। যাক, কেমন আছিস?

—ভাল। শোন আমার দুপুরবেলা একদম সময় কাটে না। তুই কীসব সোশ্যাল ওয়ার্কটোয়ার্ক করিস, আমাকে একটু কাজে লাগা না।

—তোকে? সোশ্যাল ওয়ার্ক?

—কেন রে? আমি কি খুব আনসোশ্যাল, না কি অ্যানটিসোশ্যাল?

হাসির শব্দ শোনা গেল—তুই একদম একরকম আছিস।

—দু'রকম হবার চান্স আর পেলাম কই?

—জিনা তুই তো অনেক আগেই স্কুলে-কলেজে চেষ্টা করতে পারতিস!

—তোকে কি খুব বিপদে ফেললুম?

—মানে?

—যা আগে হয়ে গেছে, হতে পারত, সেসব নিয়ে কে ভাবে রে মুকুট? করিনি, করার ইচ্ছে হয়নি। এখনও করতে চাইব না। আমি একটু অন্য ধরনের কিছু চাইছি। পারিস যদি তো দেখ, তাড়া কিছু নেই।

—জিনা ফোনটা রেখে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে বাজল ফোনটা। মুকুট।

—কী রে? কী হয়েছে?

—কই? কিছু হয়নি তো!

—রাগ করলি কেন শুধু শুধু?

—অনুরাগের ভাগটা আমার দিক থেকে বোধহয় একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। সব জায়গায়। জিনার চোখে জল আসছে। প্রাণপণে চাপল জল। গলায় আসতে দেওয়া হবে না। মুকুট বলল, কাল যাব। থাকবি তো?

—কোথায় আর যাব?

—ঠিক আছে। কাল কথা হবে।

ফোনটা রেখে দিলে মুকুট বারান্দায় এসে বসল। বৃষ্টি নেমেছে। ঝমঝম করে না হলেও ঝিরঝিরেও বলা যায় না। একটু একটু ছাট এসে গায়ে লাগছে। এইভাবে বৃষ্টি গায়ে লাগলে খুব আরাম লাগে।

চেয়ারের পিঠে মাথা হেলিয়ে রেখে বারান্দার গ্রিলে পাদুটো তুলে দিল সে। আজ মুকুট পৃথিবীর কাঁহা কাঁহা মুলুকে একলা একলা কাজ করছে। কত দায়িত্ব তার, কত গুরুত্ব। আর জিনা দুপুরে—কী-করবে-ভেবে-না-পাওয়া কর্মহীন অবলা। কিন্তু দমদমের যে স্কুলে পড়তে গিয়ে ওর সঙ্গে ভাব সেখানে ওদের ভূমিকা ঠিক উলটো ছিল। জিনা ঝকঝকে স্মার্ট করিৎকর্মা ক্লাস-মনিটর। আর মুকুট ভিন্ন স্কুল থেকে আসা ভ্যাবাচাকা একটা মোটাসোটা গোলগাপ্পা মেয়ে, যাকে সব্বাই মিলে উঠতে বসতে র‍্যাগিং করছে। বাবা তখন সবে কলকাতায় বদলি হয়েছেন। ওরা থাকে এয়ারপোর্টের কাছে। মুকুট ছিল ভীষণ লাজুক, নতুন স্কুলে তার একদম ছোট করে ছাঁটা চুল, ভালমানুষ ভালোমানুষ গোল মুখ আর থতমত ভাব নিয়ে সবাই যত মজা পাচ্ছে, সে ততই গুটিয়ে যাচ্ছে। টিচাররা পর্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন এবং সে বলতে পারছে না। জিনা তার প্রতি যে কী শুভ দৃষ্টি দিল, ঈশ্বর জানেন। তার মধ্যস্থতায় পুরো ক্লাসের সঙ্গে মুকুটের সম্পর্ক সহজ হয়ে গেল।

জিনাদের সেই বিশাল বাড়ির কথা ভোলা যায় নাকি?

—বাবা এয়ারলাইনস-এ কাজ করেন? ও মা। ও দিদি দেখো জিনুর বন্ধু এসেছে-এ। এইটুকু বয়সেই এগারোবার প্লেনে চড়েছে-এ। জিনার এক কাকিমা চেঁচিয়ে ঘোষণা করলেন—আমি একবারও চড়িনি—তারপরেই তাঁর খেদোক্তি। সঙ্গে সঙ্গে লুচি রাবড়ি আলুভাজা এসে গেল। জিনার যেসব দিদি দাদা ভাইরা বাড়ি ছিল, সব্বাই ভাব করে গেল। মুকুট-জিনার এই জুটি গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত অটুট ছিল। তার পরেই দুজনের পথ আলাদা হয়ে গেল। জিনা রয়ে গেল—আশুতোষ বিল্ডিং-এ, মুকুট চলে গেল রাজাবাজার। তখনও যোগাযোগ ছিল, কিন্তু মুকুট ক্রমশই জড়িয়ে পড়ছিল তার কাজে। চলে গেল প্রথমেই থাইল্যান্ড। সেখান থেকে মালয়েশিয়া নরওয়ে কত দ্রুত কত কী শিখল। তারপর গেল স্টেটস। তার মামা গ্যারান্টর ছিলেন, আরও সুবিধে। মাঝখানে লন্ডনে কনফারেন্সে যোগ দিয়েছে। স্টকহোলমে গেছে। সত্যি সত্যিই বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরেছে সে। জিনার বিয়ের সময়ে সে ছিল না। জিনা ফট করে বিয়ে বসে যাওয়ায় সে একটু অবাকই হয়েছিল। এমন নয় যে নিজে প্রেমট্রেম করে আহ্লাদে গলে গিয়ে জিনা বিয়েটা করছে। ঠিক এইরকম ব্যাপারটা মুকুটের বাড়িতে কেউ ভাবতে পারে না। গলদটা সম্ভবত জিনাদের বাড়ির মনোভাবে, পরিবেশে। ঋত্বিকের সেই 'পরিবেশ'।

অনেককাল পরে কালবৈশাখীর মেঘ ঝড়বৃষ্টির মাঝখানে জিনাকে দেখল সে। চেহারায় খুব একটা বদল হয়নি। চোখা ভাবটা একটু ভোঁতা হয়ে গেছে। মোটা না হলেও একটু ভরা ভরা। খুব খাওয়াল, অনেক হাসল, ফাজলামি করল। কিন্তু কেন যেন মুকুটের ওর বাড়ির পরিবেশ ভাল লাগেনি। এমনিতেই উত্তর কলকাতার পুরনো বড় বড় বাড়িগুলোর মধ্যে কেমন একটা প্রাচীনতা গুমোট বেঁধে থাকে। তার মধ্যে অবশ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। ঘরের মধ্যে ঘোরানো সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। খুব কায়দা। জিনিসপত্র অনেক। কিন্তু তার মনে হল এই জিনিসগুলোই যেন এখানে মানুষদের ব্যবহার করে। জিনাকে ব্যবহার করে। এই সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না।

জিনার বরের সঙ্গে দেখা হয়নি। ছবি দেখল। বেশ নবকুমার নবকুমার চেহারা। মাংসল মুখ, চকচকে চুল। জিনার জা বললেন জিনাকে চক্ষে হারায় নাকি! ছ বছর বিয়ে হয়ে গেছে এখন জিনার একটা বাচ্চা হওয়ার কথা। প্রথম দিনেই এসব প্রশ্ন তো করা যায় না! যতই বন্ধু হোক! কিন্তু প্রশ্নটা তার মনে উঠেছে। দম্পতির উভয়েই চাকরি করলে, বাচ্চার জন্মটা অনেকেই পিছিয়ে দেয়। জিনার তো সেরকম কারণ নেই। এবং আজ যেভাবে ও কাজকর্ম চাইছে, দুপুর না কাটার কথা জানাচ্ছে, তাতে মুকুট প্রায় নিঃসন্দেহ বাচ্চা নিয়ে একটা কোনও সংকট এসেছে জিনার জীবনে।

তার কাজকর্ম নিয়ে কেউ জিজ্ঞেস করলে মুকুট ভাসা ভাসা উত্তর দিয়ে থাকে। তার কারণ সে দেখেছে এই সোশ্যাল ওয়ার্ক ব্যাপারটা এখানে বেশিরভাগ লোকই বোঝে না। অনেকে মনে করে এটা ভ্যারেন্ডা ভাজা, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো গোছের একটা ব্যাপার। অনেকে আবার

ভাবে এটা একটা মহান কাজ। প্রচুর আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ আছে এর মধ্যে, আর বাকিরা ভাবে এটা একটা চালাকি। সোশ্যাল সার্ভিসের আড়ালে আবডালে অনেক কুকর্ম হচ্ছে, মুখোশের আড়ালে অনাচার। সবগুলোই হয়তো আংশিক সত্য, কিন্তু কোনওটাই যে পুরো সত্য নয়, এটা লোককে বোঝানো শক্ত। সোশ্যাল ওয়ার্ক যে রীতিমতো একটা উপার্জনের রাস্তা আজকাল, পেশাদারি দক্ষতার সঙ্গে উপযুক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মীদের দিয়ে কাজটা চলে, এবং সেখানে আবেগতাড়িত নভেলি ব্যাপারস্যাপারের কোনও জায়গা যে নেই, সোশ্যাল ওয়ার্ক করা মানেই যে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী হয়ে যাওয়ার দরকার হয় না—এসব আমজনতাকে বোঝানো শক্ত। তার অনেক আত্মীয়ই সভয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে থাকেন—বন্যাত্রাণে যাস? ভয় করে না? আমেরিকার জায়গায় জায়গায় তো ফ্ল্যাশ-ফ্ল্যাড হয় বলে শুনেছি। ভয়াবহ টর্নেডো হয় পশ্চিমে। বাপরে সেখানে যেতে হয় তো! এরা ভাবে সোশ্যাল সার্ভিস মানেই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটলেই সেখানে ছুটে যাওয়া। যায়নি শুনে আবার অনেকের মুখে শ্লেষের হাসি খেলে যায়। ভাবটা—দিব্যি গা বাঁচিয়ে চলছ বাবা!

এর পরে নিজের কাজের ক্ষেত্র নিয়ে কথা? ওরে বাবা। তা হলে আর দেখতে হবে না। তার অত আলোকপ্রাপ্ত বাবা মা? তাঁরাই কি খুব খুশি! ঋত্বিক বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছে শুনে দুজনেই নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। —বুঝলি মুকু। তুইও আস্তে আস্তে ঋত্বিকের প্রজেক্টটাতে চলে যা। এটা অফ করে দে।

—কেন বাবা?

—না, বাবা ঢোঁক গেলে, ঋত্বিককে তো তোর সাহায্য করা দরকার।

—সে তো করছিই। এর চেয়ে বেশি সাহায্য ওর লাগবে না, ব্যাস। আমার কাজটা আলাদা, আলাদাই থাকবে।

মা বলবে, তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি। কেন, দুজনে মিলে একটা কী সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবি, এটাই তো ভাল।

মুকুট হেসে ফেলে। বলে—এটাও ভাল। ওটাও ভাল মা, বুঝলে তো? কিন্তু সবার চাইতে ভাল নিজের কাজ আর নিজের সুখ।

এখন জিনা যে সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে চাইছে সে ওই আত্মত্যাগের, সন্ন্যাসীর স্পেশ্যাল ওয়ার্ক নাকি স্রেফ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সোশ্যাল ওয়ার্ক? সেটাই কথা।

এপার-ওপার

মাঝখানের দরজাটা টুক করে খুলে জিনা ওদিকে গিয়ে দাঁড়াল। চুলগুলো খুলে দিয়েছে। গতকাল খালি মাথার পেছনে একটা পুঁটলি বেঁধে বেঁধে ঘুরে বেড়িয়েছে। কারও সামনে আসেনি। আজ একটু সাহস বেড়েছে, মন খারাপ কমেছে।

'মাম্পি-ই'—নাঃ মনে হচ্ছে মাম্পি এ তল্লাটে নেই।

ও কী। ও কী করেছিস রে!—সিঁড়ির তলায় মল্লিকা দাঁড়িয়ে উর্ধ্বমুখ। একটা সাধারণ করে পরা নীল খড়কে ডুরে। চুলগুলো পেছন দিকে জড়ো করে একটা না-বড় না-ছোট হাতখোঁপা করা, কয়েকটা খুন্তিওয়ালা রুপোর কাঁটা গোঁজা তাতে, কপালে একটা সিঁদুরের টিপ। এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে হঠাৎ যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সৌন্দর্য, সাবলীলতা, অকৃত্রিমতা, কেমন একটা জ্যোতির্মণ্ডল যেন দিদিভাইকে ঘিরে, যার বাইরে সে বোধহয় চিরনির্বাসিত। সে চেয়ে থাকে রুদ্ধবাক যেন কোনও দেবীর দিকে চেয়ে আছে। সত্যি দেবী কি না জানে না, আর কারও দেবী কি না জানে না, কিন্তু তার উপাস্য দেবী। হয়তো শুধু তারই। কেননা ক্রমশই তার ধারণা হচ্ছে সে ছাড়া দিদিভাইয়ের

পূর্ণ তাৎপর্য আর কেউই বুঝতে পারেনি। সম্পন্ন পরিবারে একটি মোটামুটি সুন্দর-সুশ্রী বধূর দরকার হয়। তার উৎস বড় ঘর হলে ভাল, না হলে আরও ভাল। সে ক্ষেত্রে তাকে বিনা বাধায় ভোগ করা যায়। বেচারি দিদিভাইয়ের বাপের বাড়ি যাওয়া নেই। দিদি থাকেন সুদূর চেন্নাই, বাবা মারা গেছেন, কাকা কাকিমা ছাড়া কোনও আত্মীয়স্বজনের কথা আজ পর্যন্ত শোনেনি সে। বৃন্তহীন একটা মানুষ। তর্ক, ঝগড়া, নিজের মতামত জোরদার করে প্রকাশ করা—এসব নেই। তাই বলে কি ও বোবা? না মূর্খ! কোনওটাই নয়। একদিন তার অসীম ধৈর্য নিয়ে জিনা নালিশ করেছিল, তাতে মল্লিকা প্রথমে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে প্রশ্নটা, বলে—তোরই বা ধৈর্য কি কম? আমি তো বুঝি তুই কতটা সইছিস! সবই তো শান্তির জন্যে?

জিনা তারপরেও তাকে চেপে ধরে, বলে, কথা ঘুরিয়ো না দিদিভাই, আমার কথার জবাব দাও।

মল্লিকা বলেছিল, আমি মতামত জাহির করবার মতো করে দিলে কে শুনবে সে মত? কে আমি? কী আমার পরিচয়? গ্রামের কলেজে পড়েছি, বি.এ-টা কমপ্লিট করিনি, সব সময়ে কারও না কারও দয়ায় বেঁচেছি। হ্যাঁ পেতাম তোর মুকুটের মতো কাউকে, তা হলে হয়তো অনেক দিন আগেই কনফিডেন্স আসত। এখন কেউ শুনবে না, আমার অন্য কোনও উপায়ও নেই। কিন্তু একটা না-একটা দিন আসবেই যেদিন আমি বলব, অন্যে শুনবে। ঝুম্পা মাম্পিকে বড় হতে দে।

—কিন্তু তুমি তো এই বাড়ির বড় বউ, গৃহিণী!

—আমার গৃহিণীত্ব ভীষণ ঠুনকো জিনা! সবাই ভাবতে ভালবাসে আমি অক্ষম, আমার জোর কম।

—বাবাও? বাবা যে তোমাকে এত ভালবাসেন!

—ঠিকই, বাবা খুব ভালবাসেন, দিদিভাই দুঃখিত গলায় বলে, কিন্তু ভালবাসা অনেক রকমের হয় জিনা, বাবার ভালবাসাটাতে করুণ মেশানো আছে। বাবার দোষ নেই। মা ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বের মানুষ, তিনিও ভালবাসতেন। অমনি করুণা মেশানো ভালবাসতেই ভালবাসতেন, সেটাই উনি বাবার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন।

—তা হলে তোমার এই চুপচাপ থাকা, মুখ বুজে কাজ করে যাওয়া, তোমার এত ভুল.... তুমি নিজেই বল তুমি অগোছালো... এ সবই তোমার একটা পলিসি?

—দূর, তুইও যেমন... একটু চুপ করে থেকে মল্লিকা বলেছিল, আমার কিছু ভাল লাগে না জিনা। সেই ভাল-না-লাগাটাকে বাগ মানাতেই মানাতেই আমার সময় কেটে যায়। জীবনও কেটে যাচ্ছে।

ভাল-না-লাগাকে বাগ মানাতে মানাতে একটা অদ্ভুত ধরনের বিষণ্ণ ব্যক্তিত্ব এক এক সময়ে ভীষণ প্রকট হয়ে ওঠে মল্লিকার চেহারায়। খুব মাঝে মাঝে। তখন তাকে চেনা যায় না। সেই চেহারা এখন। কথা বলছে পরিচিত অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে। ঘরোয়া ভাষা, ভাব। যেন কিচ্ছুটি জানে না। কিন্তু আসলে সে যেন এক আমূল রহস্যময়ী, ছায়াবৃতা। মল্লিকা শুধু দিদিভাই নয়।

নিজের ঘোরটাকে কাটাতে জিনা তরতর করে নেমে আসে। হঠাৎ গলা জড়িয়ে ধরে, দিদিভাই! যাচ্ছেতাই দেখাচ্ছে, না?

—যাচ্ছেতাই দেখাবে কেন? অন্যরকম দেখাচ্ছে! শুধু চুলের জন্যে এমন পালটে যায় চেহারা! আশ্চর্য!

—বদলটা কীরকম বলবে তো?

—তোর মধ্যে একটা দুষ্টু সরস্বতী দুষ্টু সরস্বতী ভাব ছিল, বুঝলি? এখন একটা ক্লিওপেট্রা ক্লিওপেট্রা ভাব এসেছে।

—বাপ রে! তা সে-ও তো দুষ্টুই!

—দুষ্টু কি না জানি না, একটা ক্ষমতা ... প্রতাপ। ধর যেন ঘরের মেয়ে ছিলি, এখন রাজদণ্ড হাতে নিয়েছিস... গোছের।

—জান তো দিদিভাই—জিনা অমনি গলে জল—ক্লিওপেট্রা শুনলে আর কে না জল হবে। জলের চেয়েও তরল কিছু থাকত তো তাই হত।

—জান। দেড়দিন ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। বাবা কী ভাববেন?

—কী আবার ভাববেন? আর, কিছু যে বলবেন না সেটা তো তুই জানিস।

—বলবেন না। কিন্তু অদ্ভুত চোখে তাকাবেন, তাতেই আমার লজ্জা করবে। তোমাদের এ বাড়ি বড্ড জটিল যাই বল। আমাদের বাড়িতে বড়রা যা বলবার সোজাসুজি বলে, ধমকায় সেটা বুঝি....।

—তা যদি বলিস, এত বড় মেয়েকে ধমকানোই কি ভাল? তার যদি চুল কাটতে ইচ্ছে হয়! এটুকু ইচ্ছে পূরণ করতে পারবে না!

—ধমকানো মানে কি আর সেরকম সিরিয়াস কিছু? আমার বাবা হলে বলত—ক'দিন আসিসনি আমার সামনে। একটু সয়ে নিতে দে। জেঠিমা হলে বলত—এই যে রূপের ধুচুনি এলেন। এগুলো তো ইচ্ছেয় বাধা দেওয়া নয়। কিন্তু বেশ স্পষ্ট সমালোচনা।

মল্লিকা হেসে বলল, হয়েছে হয়েছে, আমি তো যথেষ্ট সোজাসুজি ধমকালুম! তাতেও হয়নি!

—তুমি তো আর এ বাড়ির নও!—কেমন অভিমানে বলল জিনা, যাই হোক দেখো তো তোমার ফ্রিজে গোটাদুই ডিম আছে কিনা! আমার দেখেছি ডিম ফুরিয়ে গেছে। আচ্ছা দুটো কেন ছ'টা থাকলে ছ'টাই দাও। সবটাই করি।— বলতে বলতেই সে চমকে ওঠে।—ওই বেল বাজছে। মুকুট বোধহয় এসে গেল। —দাঁড়াও দিদিভাই... জিনা ছুট লাগাল।

মুকুট এসেছে শুনেই মল্লিকার একটা দুরন্ত আহ্লাদ হয়। কেন যে মেয়েটাকে তার এত ভাল লাগে, কেন যে এত আশ্বাস ওর সান্নিধ্যে তা সে বলতে পারে না। 'আধুনিকা', মুকুট আগাগোড়া 'আধুনিকা'। সে কি মল্লিকার ইচ্ছাপূরণ? আধুনিকা নানান প্রকারের হয়। সাজ-পোশাক-প্রসাধনে চলাফেরায় আধুনিকা একরকম। কথায়বার্তায় মতামতে আধুনিকা সে আরেকরকম। কিন্তু মুকুটের আধুনিকতা একদম স্বাভাবিকভাবে গজিয়ে ওঠা একটা গাছের মতো। প্রথম যেদিন এল—প্রচণ্ড একটা দুঃস্বপ্নের শেষে! জিনস্ আর শার্ট পরা। সোজা চুল কানের তলা পর্যন্ত ছেঁটে নিয়েছে, পায়ে স্পোর্টস শু। হাতগুলো খালি, শুদ্ধ, নির্মল, ঘাম চমচকে মুখটা রুমাল দিয়ে মুছে নিচ্ছিল। কানে ছোট ছোট রিং। সোজা ভুরু, আকাশের মতো চোখ, একটু থ্যাবড়া নাক। বেশ পুরু, সুন্দর, গোলাপি ঠোঁট। মুখটা যেন ভাবুক বালিকার মতো, পুরো পুরুষ পুরুষ পোশাক সত্ত্বেও কোথাও কোনও উগ্রতা নেই। আসলে ও তো এ দেশের বাইরে বহুদিন কাজ করেছে। এই পোশাকে অভ্যস্ত। এটাতে ওর সুবিধে হয়, তাই অতশত ভাবেনি, এরকমই পরে। বাইরেটা সম্পর্কে এই একেবারে না ভাবা, সোজাসুজি ভেতরে পৌঁছে যাওয়ার অভ্যাসটা কী অদ্ভুত আরামের। যখন মল্লিকার সঙ্গে আলাপ হল, সোজা চোখের দিকে চাইল। —আপনি স্বপ্ন দেখে খুব ভয় পেয়েছিলেন? জিনা বলছিল!

—হ্যাঁ আর বলো না! দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়লে বড্ড স্বপ্ন দেখি।

—চিৎকার করেন?

—করি। আওয়াজ ফোটে না—বলতে বলতে মল্লিকা হেসে ফেলল, কেন? চিকিৎসা করবে?

—করতেও পারি একটা ব্যবস্থা—হাসিমুখে বলল মুকুট, আমার কিছু ট্রেনিংও আছে কিন্তু....।

এইজন্যে জিনা ডিম চাইছিল? কী করবে? কী? চট করে ভেবে নিল মল্লিকা। একটা বাটি করে ডিমগুলো নিয়ে মাঝের দরজা দিয়ে সোজা চলে গেল জিনার রান্নাঘরে। ওর ফ্রিজে কী আছে? টোম্যাটো, ক্যাপসিকাম, বোতলের মটরশুটি। চিজ, পেঁয়াজ, বাঃ সবই তো আছে। নরওয়েজিয়ান ওমলেট তৈরির ইচ্ছে ছিল বোধহয় জিনার। তো হয়ে যাক। ওদের গল্পের টুকরোটাকরা ভেসে আসছে।

—তুইও তো কেটেছিস!

—আ রে!—বেশ করেছিস! চোখে পড়ল তাই...।

—হ্যাঁ ঠিকই ধরেছিস।

—একদিন যাব মাসিমার কাছে... তুই নিজে নিজেই চলে যাস না... হ্যাঁ রে সেবন্তীর কী খবর?

এইসব টুপটাপ কথাগুলো চারপাশে ঝরে পড়ছে। এক পৃথিবী থেকে অন্য পৃথিবীর দরজায় দাঁড়িয়ে মল্লিকা। কফির উগ্র গন্ধে জিনা ছুটে এল।

—ও মা দিদিভাই!

—হয়ে গেছে—ওমলেট কাটতে কাটতে বলল মল্লিকা, নিয়ে যা... আমি কফি নিয়ে আসছি।

—আচ্ছা মল্লিকাদি, আমাকে জিজ্ঞেস করবে তো!—মুকুট বলল। —জিনা তুই জানবি আমায় কাজে কখন কোথায় ঘুরতে হয়। খিদে পেলেই আমি যেখানেই থাকি ঠিক কিছু না-কিছু খেয়ে নিই। তাই-ই আমার আলসার হয় না। কফিটা ঠিক আছে... সে কফির কাপটা তুলে নিল।

মল্লিকার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে মুকুট বলল, ঠিক আছে, যা রং আর চেহারা তোমার ওমলেটের, একটু না খেলে খেদ রয়ে যাবে।

তিনজনেই ওমলেট ভেঙে মুখে দিল। মুকুটের চোখগুলো প্রশংসায় বড় বড় হয়ে উঠেছে। —ইস, মল্লিকাদি একটা দোকান দিলে পার! আজকাল ফাস্ট ফুডের যা চাহিদা!

আগের দিন 'আপনি' বলেছিল, আজকে কত সহজে, বিনা অনুমতিতে 'তুমি' বলল, জিনার পথ ধরে যে 'দিদিভাই' বলল, তা-ও না। মল্লিকাদি! সেই স্কুল কলেজের দিনে নিচু ক্লাসের মেয়েরা যেভাবে ডাকত, তাদের ছাড়া আর কখনও কারও মল্লিকাদি হয়নি তো মল্লিকা। হয় বউমা, নয় মা, নয় মল্লি, নয় দিদি। কতটুকু জগৎটা তার? এখনও কোন চৌকাঠ পার হতে পারেনি, মুকুটের মতো মেয়ে সে কখনও দেখেনি। টি. ভি-র পরদায় এই পোশাক কি আর দেখা যায় না! যায়! কিন্তু সেসব পুরোদস্তুর ত্বক-সচেতন, কেশ-সচেতন, পুং-সচেতন পোশাক, পোশাকও, মেয়েও। কে পুরুষের স্পর্শের লোভে ক্রিম মাখছে, কে বিয়ের লোভে ব্রণ সরাচ্ছে, ছোট ছোট মেয়েরা সহপাঠিনীকে ব্রণ-ফুসকুড়ি নিয়ে খেপাচ্ছে! মেয়েদের পৃথিবীটা কি সত্যি এরকম! কে জানে! মল্লিকা জানে না। তার কাছে বাইরের পৃথিবীর খোলা জানলা তো ওই টি.ভি. স্ক্রিনই। তার অগোচরে কখন পুরো মেয়ে-পৃথিবীটা এরকম বদলে গেল? নিজের মেয়েদের দেখে অবশ্য অতটা বুঝতে পারে না মল্লিকা। ওদের স্কুল খুব কড়া, এতটুকু অতিরিক্ত সাজগোজ বরদাস্ত করে না। বড় মেয়ে সদ্য কলেজে ঢুকেছে। আরেকটু স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু তার অভ্যেস রয়ে গেছে স্কুলের। শুধু য়ুনিফর্মটাই বাদ। সেই টান টান চুলে বিনুনি। সেই ঘষামাজা তেলা মুখ, টিপ পরতে এখনও ভীষণ লজ্জা। কিন্তু সে হয়তো তারা মল্লিকার মেয়ে বলে, একজন প্রায় অনাথা অতি ভালমানুষ প্রতিবাদহীন গ্রামের মেয়ে। কিন্তু তার খুব ভয় করে। হঠাৎ যদি কোনওদিন দেখে ঝুম্পা তার মায়ের চৌকাঠ পার হয়ে গেছে! চোলি আর হাফপ্যান্ট পরে চোখ মারছে কোনও পুরুষের দিকে চেয়ে! ওদের বয়সি ছেলেরা! তারাও তো টি.ভি.-র পরদায় কেমন বদলে যাচ্ছে। কী সুন্দর নবীন সবুজ ছিল, বেড়ে ওঠা ছেলেদের একটা আলাদা খেলাধুলোর জগৎ থাকে। পড়াশোনার ব্যাপারেও, বিজ্ঞান, মেকানিক্স—এসবের আশ্চর্য জগৎটার ভেতর আস্তে আস্তে ঢুকে যায় তারা। মোটরবাইক জড়ো করে মেয়েদের কলেজের বাইরে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিতে তাদের নবীন সবুজ পুরুষত্ব ধাক্কা খায় না? লজ্জা করে না? ড্রাগ নেয় কেন? একটা ফ্যাশন হয়েছে। ড্রাগ নেওয়া। এসব আগে করত মস্তানরা। চিরকালই ছিল। কিন্তু একটা আলাদা জাত। সাধারণত যারা বছরের পর বছর এক ক্লাসে পড়ে থাকত তারাই এসব ড্রাগফাগ খেত, আওয়াজটাওয়াজ দিত। এখন কি মস্তান ছড়িয়ে চারিয়ে গেল সব কিশোরের তরুণের মধ্যে? না কি এ-ও বিজ্ঞাপনের তৈরি। ফিলমের তৈরি একটা ভুয়ো জগৎ! মিথ্যার জগৎ! নিজের সীমাবদ্ধ চলাফেরা দিয়ে সে বুঝতে পারে না।

প্লেটগুলো তুলে নিয়ে সে বলল, তোরা কথা বল, আমি আসছি।

মুকুট বলল, বসো না! কাজ আছে?

জিনা বলল, একটু বসতে তোমার যে কী হয়?

কিন্তু মল্লিকা জানে, মুকুট জিনার খুব বন্ধু। কতদিন বাইরে ছিল। যদি-বা ফিরে এসেছে রোজ রোজ তো আর দেখা হচ্ছে না। ওদের একটু নিজেদের মধ্যে কথা বলার সুযোগ চাই। সে বলল, হ্যাঁ মেয়েরা যে কোনও সময়ে আসবে, আমি যাই।

—ওরা এসে গেলে, আবার এসো—জিনা বলল।

মুকুট বলল, ঘুরে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

একটু পরে জিনার দিকে চেয়ে মুকুট বলল, তোর জন্যে একটা কাজ ঠিক করেছি।

—এরই মধ্যে?

—কেন তুই কি তৈরি নয়?

—না রে! আশ্চর্য লাগল, কাল বললুম আর আজই...।

মুকুট বলল, আমাদের একটা অ্যাডাল্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম আছে। দুপুরবেলা যখন ভাতঘুম দিয়ে মোটা হবার সবচেয়ে রিস্‌ক তখন ক্লাসটা হয়।

—কোথায়?

—এখান থেকে বাস নিয়ে জাস্ট সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ চলে যাবি। ডাইনে হাঁটতে হবে কিছুটা, বাঁ দিকে কয়েকটা গলি পরে দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট চিনিস?

—দুর, আমি এদিকে কিচ্ছু চিনি না।

—ঠিক আছে আমি তোকে প্রথম কদিন নিয়ে যাব। 'বান্ধব সমিতি' সাইনবোর্ড লেখা একটা ক্লাবঘর পাবি। ওইখানেই একটা গলির মধ্যে। কোর্সটা তোকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেবে একজন। ওই অঞ্চলের মেয়েরা, ধর বারো-তেরো জন আসবে।

জিনা চুপ করে আছে দেখে মুকুট বলল, বাংলা, আর খানিকটা ইংরেজি লিখতে পড়তে বুঝতে শেখানো হয় এদের, আর বেসিক অঙ্ক।

—শহর কলকাতায় থাকে, বাংলা পড়তে লিখতে পারে না এমন লোকও আছে?

মুকুট হাসল, তোদের বাড়িতে কাজ করে যেসব মেয়ে। ওরা? ওরা পারে?

জিনা বলল, ওহ্। ডলি মলি? ওদের তো বাবা মানে আমার শ্বশুরমশাই-ই লেখাপড়া শেখান। এরা কে রে? বস্তিটস্তির?

মুকুট বলল, না রে এরা গণিকা, যাকে বলিস প্রস্টিট্যুট।

জিনা হাঁ। কিছুক্ষণ কথা বার হচ্ছে না ওর মুখ থেকে। শেষে বলল, মুকুট, প্রস্টিট্যুট আমি কখনও চোখে দেখিনি রে! কীরকম দেখতে হয়।

মুকুট হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না, বলে, জিনা সত্যি তুই আমায় হাসালি। কীরকম দেখতে হয় কী রে? দুটো হাত, দুটো পা আছে আমাদের মতোই...

ঢোক গিলে জিনা বলল, গল্প-উপন্যাসে অবশ্য খুব পড়া যায়। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' বলে একটা গল্প পড়েছিলাম। আমার গা এত ঘিনঘিন করেছিল! একটা শিউরে ওঠার ভাব করলে সে।

মুকুট বলল, 'হিঙের কচুরি' বলে বিভূতিভূষণের একটা গল্প আছে খুব সুন্দর, পড়িসনি?

জিনা বলল, তুই বললি বলে মনে পড়ল। ব্যাপারটাকে এত ক্যাজুয়ালি নিয়েছেন, নেন এঁরা যে... আমার ভাল লাগেনি, ভাল লাগে না।

মুকুট বলল, কথাটা তুই বেশ নতুন বললি তো? ক্যাজুয়ালি নেওয়া।

—না সত্যিই দেখ, মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান, মেয়েদের... নারীত্বের এত কুৎসিত ব্যবহার—এই নিয়ে লেখকরা বেশ বিলাসিতা করেন। ভাল গল্পের মেটেরিয়্যাল। শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো', 'দেবদাস'-এ কীভাবে গ্ল্যামারাইজ করা হয়েছে ব্যাপারটা। আর তার পরের লেখকরা তো রিয়্যালিজ্‌মের নামে—উঃ। হ্যাঁ রে, এঁরা কি নিয়ম করে এদের কাছে যাতায়াত করেন?

—দুর—মুকুট হেসে ফেলল, বেশিরভাগই ওপর ওপর দেখে, কল্পনা থেকে লেখা। অনেকে

আবার উপাদান সংগ্রহের জন্য যান। শিল্পী লেখকদের সঙ্গে অবশ্য লালবাতি এলাকার একটা যোগ থাকেও মনে হয়। আমি খুব একটা দেখিনি।

—উপাদানটা ব্যবহার করে এঁরা নিজেরা নাম, টাকা পান। আর মেয়েগুলোর কী হয়?

—কিছু হয় না। কিছু হওয়া শক্ত জিনা। একজন দু'জনের চেষ্টায় কী হবে? তাই অনেকে মিলে চেষ্টা করছে। করবি কাজটা?

—আমি? ওদের পড়াতে যাব?

—তাতে কী? তোর মতো কত মেয়ে এদের বিভিন্ন সেন্টারে পড়াচ্ছে। গেলে দেখতে পাবি। কেউ তোর চেয়ে বড়, কেউ ছোট। মানে ভদ্রঘরের, শিক্ষিত। ওখানে তোর ক্লাসরুমের ঠিক পাশেই একটা ক্লিনিকও আছে। সেখানে স্বাস্থ্যপরীক্ষা, ছোটখাটো চিকিৎসাও হয়।

জিনা বলল, জানলে আমায় কুটে ফেলবে।

—কে? তোর বর?

—আবার কে? অন্যরাও পছন্দ করবে না শিয়োর।

—হ্যাঁ ট্যাবু তো আছেই, তা তুই নিজে? তোর কী মত?

—আমার গা শিউরোচ্ছে। অনেস্টলি বলছি মুকুট।

—তা হলে থাক। অন্য কাজও আমাদের আছে। কিন্তু সেখানে আপাতত ভেক্যান্সি নেই। দূরেও। এটাই তোর সবচেয়ে কাছে ছিল। ঘণ্টা দেড়েক পড়াতিস। একটা থেকে চারটের মধ্যে সপ্তাহে তিন দিন। তোরও সময় কাটত। একটা স্যাটিসফ্যাকশনও থাকত যে মেয়েদের জন্যে কিছু করলি। সামান্য কিছু উপার্জনও হত। তোর নিজের, একেবারে নিজের উপার্জন।

—তুই এসব কাজের খোঁজ পেলি কী করে?

—বা! আমি এম এসসি-র রেজাল্ট বেরোবার আগেই থাইল্যান্ড চলে গেলাম না? তখন থেকেই এদের নিয়ে কাজ করছি। ডাবলু. এইচ. ও-র সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আছি। সেই হিসেবে অনেকগুলো এন. জি. ও-তেই উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছি।

—তার মানে তোকে পড়াতে হয় না, ওখানে যেতে হয় না, সোজাসুজি ওদের সঙ্গে...।

—না রে জিনা, —বিভিন্ন সেন্টারে পড়ানো, ট্রেনিং, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও সবের ওপর হাতেকলমে যে কাজগুলো হয়, সেগুলোর খবরদারি করে কয়েকজন, আমি তাদেরও ওপর খবরদারি করি। এখন বেশির ভাগটাই ডেস্‌ক ওয়ার্ক। তবে পরিদর্শন করতেই হয় নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর। সমীক্ষা যাকে বলে।

—এইসব ইয়েদের নিয়ে?

—হ্যাঁ।

—কেন করিস মুকুট? যারা জাহান্নমে যাবে ঠিক করে নিয়েছে....

মুকুট তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, তুই কাগজ পড়িস না!

—পড়িই তো! শব্দজব্দগুলো রেগুলার করি, ক্রস ওয়ার্ড। মিসেলেনিগুলোর ভাল লেখাটেখা থাকলে পড়ি। পলিটিক্স আমি ছুঁই না। আর তো সব খুন, রাহাজানি, রেপ, দাঙ্গা.... কী পড়বটা কী?

—এবার থেকে আর একটু ভাল করে পড়বি। দেখবি এখানে সেখানে বাচ্চা মেয়ে বড় মেয়ে পাচার হচ্ছিল। ধরা পড়েছে। গ্রামে, মফস্বলে। এগুলোর মধ্যে কিছু চুরি, কিছু জোচ্চুরি, আবার কিছু জেনেবুঝে নিজের লোকেরা বিক্রি করে দিয়েছে।

—বলিস কী? নিজের লোকেরা? মানে? মানুষ বিক্রি করা যায় নাকি?

—যায় না। কিন্তু জিনিসটা হয়। এরাই প্রধানত লালবাতি এলাকায় এসে পড়ে। তুই কখনও পড়িসনি?

—ইস মুকুট, পড়েছি হয়তো, সেভাবে মাথায় ঢোকেনি।

—শুনে রাখ জিনা দারিদ্র্য আর অশিক্ষার প্রথম শিকার মেয়েরা। দরিদ্র ঘরে যেই একটা মেয়ে জন্মাল অমনি তাকে নিয়ে যা-খুশি করবার অধিকার জন্মে যায় তার পুরুষ অভিভাবকদের। তার মা ঠাকুমা যারা কর্ত্রীপদে আছে তারাও সেইমতোই আচরণ করে। সবচেয়ে কম খাবার তার জন্যে নির্দিষ্ট হয়, সবচেয়ে বেশি কাজ। কোনও সময়েই ভারবাহী পশুর চেয়ে বেশি তাকে মনে করা হয় না। উপরন্তু এই পশু যেটুকু যত্ন পায়, এরা তা-ও পায় না। কিন্তু মেয়েরা দুগ্ধবতী গাভীর মতোই লাভজনক। যৌবনোদ্গম হলেই সে যৌন পণ্য। তাকে নানারকম দামে বিক্রি করা যায়। যত অল্প বয়স হবে ততই লাভ। ধর ন-দশ বছরের...

—প্লিজ মুকুট....।

—এ কী জিনা, তুই কাঁদছিস? আ রে কাঁদিসনি, কী ছেলেমানুষ তুই? কত রকমের অত্যাচার, পাশবিক, নৃশংস, চলছে কত কাল থেকে তার তুই কিছুই জানিস না। ছেলে-শিশুদের দিয়েও ব্যবসা আছে। যৌন-ব্যবসা, জকি-ব্যবসা, ভিখারি-ব্যবসা! সেসব শুনলে তো অজ্ঞান হয়ে যাবি।

—তোরা এদের জন্যে কাজ করছিস? —অনেক টাকাপয়সা লাগে তো! কোথা থেকে পাস? জিনা ভিজে গলায় বলল।

—অনেক সোর্স থেকে আসে। বিভিন্ন ধনী দেশ দেয়, অনেক প্রতিষ্ঠান দেয়, ব্যক্তি দেয়। ধর একজন বারবনিতা তাঁর অনেকখানি জমি আমার এক বন্ধুকে দিয়েছেন এদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে।

—শেষেরটা বুঝলুম—জিনা বলল। কিন্তু ধনী দেশটেশ দেবে কেন? ওরা তো খালি নিজেদেরটাই বোঝে।

—কথাটা 'তুই' বললি? —হাসিমুখে মুকুট তাকায় জিনার দিকে।

—কেন, কী হয়েছে?

—না, তুই বললি না খালি 'শব্দজব্দ' 'ক্রসওয়ার্ড' এসব করিস! তা তুই যেখান থেকেই তোর এ জ্ঞান সংগ্রহ করে থাকিস জিনা, তোর হবে।

—ঠাট্টা করছিস?

—না রে। ঠাট্টা করিনি। আসলে জিনা, পৃথিবীটা, সরি মানুষ খুব জটিল আর মিশ্র জীব। বড় বড় ব্যবসাদার যারা ওষুধে ভেজাল মেশায়, দুধে খড়ির গুঁড়ো, কিংবা যারা কর্মচারীদের সঙ্গে পশুর মতো ব্যবহার করে তারাই দেখবি কাঙালিভোজন করায়, কুম্ভে গঙ্গাসাগরে সাধুদের ভাণ্ডারা দেয়, লঙ্গরখানা খোলে। সবটাই যে পুণ্যের লোভে তা নয়। একটা কীরকম বিবেকের তাড়নাও ভেতরে ভেতরে থাকে। তেমনই যে দেশ নানাপথে নিজেদের মজুত অস্ত্র বিক্রি করে আমাদের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে, বাতিল ওষুধ বাতিল শস্য পাঠিয়ে সংকট সৃষ্টি করছে, তারাই আবার অনাথ শিশুদের কল্যাণের জন্যে টাকা দেয়।

—একেবারে নিস্বার্থ? মুকুট আমার বিশ্বাস হয় না।

—তুই ঠিকই বলেছিস, গণিকাদের ব্যাপারে ওদের প্রধান স্বার্থ এডস-নিবারণ। এডস তো পুরো সভ্যতার মৃত্যুদূত হয়ে দেখা দিয়েছে কিনা! পীতরা, কালোরা, ব্রাউনরা গেলে হয়তো সাদাদের কিছু এসে যায় না। কিন্তু সাদারাও তো বাঁচবে না বাঁচছে না, তা এইভাবেই একটার সঙ্গে আরও অনেক ইস্যু জুড়ে যায়। স্বাস্থ্য, বিশেষত যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে বেসিক জ্ঞান কনডোমের ব্যবহার... তারপরে ধর চাইল্ড লেবর নিষিদ্ধ করার পেছনেও ওদের মার্কেট বিষয়ক কোনও স্বার্থ কাজ করতে পারে। কোনটাই যে শুধু স্বার্থ এমন কথা বলা শক্ত। বিক্রির স্বার্থই যে একমাত্র সবসময়ে তা নয়। যা-ই হোক। যা-ই থাক। যা পাচ্ছি, সেটাকে ব্যবহার করে যদি কাজের কাজ কিছু করতে পারা যায় তো মন্দ কী? চতুর্দিকে প্রচুর প্রতিষ্ঠান, স্বার্থলোভী লোক সব হন্যে হয়ে ঘুরছে, গ্রান্টটান্ট জুটিয়ে যদি

নিজেরটা গুছিয়ে নিতে পারা যায়। আবার সত্যি সত্যি কাজ করতে চায় এমন লোকও আছে।

—তুই নিজের সারা জীবনটা এইভাবে উৎসর্গ করবি?

—আ রে! উৎসর্গটর্গ নয়। এটা আমার পেশা। ঠিক যেমন লোকে ব্যাকটিরিয়া নিয়ে, জিন নিয়ে রিসার্চ করে, আমিও তেমন করছি। যে কোনও কাজে পেশাদারি দক্ষতা দরকার হয়, অধ্যাপনা, ম্যানেজমেন্ট, হিসেবনিকেশ সবেতে। এটাতেও তেমনি। শুধু স্যাক্রিফাইস দিয়ে বা আইডিয়ালিজ্‌ম্ দিয়ে কিছু হয় না রে! জনকল্যাণ কিছু চাকরিও তো সৃষ্টি করছে!

—যেমন এই অ্যাডাল্ট এডুকেশনের টিচারদের?

—রাইট। আমি এবার চলি রে জিনা, কাল খুব সকালে ট্রেন ধরতে হবে।

—তুই রাগ করলি?

—না, রাগ করব কেন! এটাই গড়পড়তা রি-অ্যাকশান। ও ভাল কথা, মল্লিকাদিকে একটু ডাক তো!

একটু পরে মল্লিকা এসে দাঁড়ালে মুকুট বলল, মল্লিকাদি, তোমার সেই বাঘের স্বপ্নটা যে সেদিন শুনলাম, ওটা নিয়ে অনেক ভেবেছি জান! যে ভাবেই ভাবি একটা ব্যাখ্যাতেই পৌঁছোচ্ছি।

মল্লিকা বলল, দুর, তুমি ও নিয়ে ভাবা ছেড়ে দাও। ওর কোনও মানে নেই।

—নাঃ, মানে আছে। স্বপ্নটা আমার কেমন চেনা চেনা লাগছিল। একেবারে টেক্সট বুক ড্রিম যেন। কদিন আমার ডায়েরিগুলো খুঁজছিলাম। একটি অল্পবয়সি ধরো তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে, খুব স্যাড কেস, মেয়েটিকে তার জনৈক বয়স্ক আত্মীয় রেপ করত, কাউকে ও বলতে পারত না। এই ধরনের স্বপ্ন দেখত। একটা বাঘ আকাশ থেকে লাফ দিয়ে ছাতে পড়ল, ছাত থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, ঘর বাড়ি সব ভেঙে... কী হল? কী হল?

জিনা বলল—যা, মুকুট তোর কোনও সেন্স নেই। দিদিভাই! শরীর খারাপ লাগছে? সোফায় বসে পড়েছিল মল্লিকা, কুলকুল করে ঘামছে। চোখের সামনে অন্ধকার। কত দূর থেকে যেন জিনাদের গলা ভেসে আসছে। জলের ছিটে পড়ছে মুখে।

মুকুট বলল, জিনা তুই বরফ দিয়ে ভাল করে এক গ্লাস শরবত করে নিয়ে আয় তো! জাস্ট নুন-চিনি-লেবুর শরবত। চিনিটা ঠান্ডা জলে গুলতে চায় না। ভাল করে মিশিয়ে নিবি। আমি দেখছি।

জিনা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মুকুট দ্রুত এগিয়ে এসে মল্লিকার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিল। বলল, মল্লিকাদি জিনা এক্ষুনি আসবে, চট করে কতকগুলো কথা শুনে নাও। তোমার বাঘ যদি অতীতের হয়, তো ভুলতে চেষ্টা করো। ফিফটি পার্সেন্ট মেয়ের এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়, সো-জা ভুলে যাও। আর ব্যাপারটা যদি বর্তমানের হয়, তা হলে ভয় পেয়ে কোনও লাভ নেই, প্রতিবাদ করো। কড়া প্রতিবাদ, সে তোমার স্বামী হলেও। সহ্য করতে থাকলে তোমার মানসিক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। তোমারও সেই লোকটিরও, ন্যাচার্যালি তোমার পরিবারেরও।

গণ্ডির বাইরে

—অনিলা দাসী!

—উপস্থিত

—বনমালা রাহা

—উপস্থিত

—সর্বজয়া দাসী

—উপস্থিত

—পূর্ণিমা দাসী...

—লক্ষ্মী দাসী

রোলকল বন্ধ রেখে জিনা বলল, তোমরা বেশির ভাগই দেখছি দাসী লেখ! তোমাদের পদবি কি দাস?

নানা বয়সের মেয়েগুলি চোখ মটকে একে অন্যের দিকে চেয়ে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল।

জিনা বিরক্ত হয়ে বলল, একটু সোজা হয়ে বসতে পার না? তোমাদের কি শিরদাঁড়া নেই? সব সময়েই হেলছ! না হেসে আমার কথার জবাব দাও।

প্রায় দু'মাস হয়ে গেছে। এতদিনে জিনার জড়তা খানিকটা কেটেছে। মুকুট চলে যাবার পর সে কয়েক দিন খালি ভেবেছে, ভেবেছে আর ভেবেছে। ভাবতে ভাবতে মনে হল সত্যি কী উদ্দেশ্যহীন জীবন তার! আহার-নিদ্রা-মৈথুন। দিনের পর দিন। দিনের পর দিন। স্বামীকে তার পেশাতে সাহায্য করার উপায়ও তার নেই। বাড়ির কাজকর্ম সে ইচ্ছে ক'রে করে বটে, কিন্তু সে না করলেও আটকাবে না। সামাজিক মেলামেশার সুযোগ কম। কেমন যেন শূন্যতায় আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে সে ইদানীং। একটা বাচ্চাটাচ্চা হলে নিজেকে এরকম অপদার্থ লাগত না। হলেই হয়। অথচ কিছুতেই হচ্ছে না। এ নিয়ে হা-হুতাশ করতে তার ভাল লাগে না। আর মুকুট? দিনরাত্র ব্যস্ত, ব্যস্ত, ব্যস্ত। সবাই ব্যস্ত। নিখিল ব্যস্ত তার চাকরি নিয়ে, দাদা ব্যস্ত তাঁর তাস নিয়ে, দিদিভাই ব্যস্ত তার সংসার, মেয়েদের চৌকশ করে তোলা নিয়ে। শ্বশুরমশাই ব্যস্ত তাঁর চ্যারিটি-ক্লাস নিয়ে। একমাত্র পূর্ণ মাত্রায় অলস, কর্মহীন সে। জিনা। দাঁতে নখ কাটার বদভ্যাসটা তার এখনও যায়নি। ভাবতে ভাবতে ডান হাতের তিনখানা আঙুলের নখ চিবিয়ে সে শেষ করে দিল। তারপর ভেবে-চিন্তে শ্বশুরমশাইয়ের ঘরে গেল।

—বাবা?

ধড়মড় করে আরামচেয়ারে উঠে বসলেন কল্যাণবাবু।

—কিছু বলছ?

—হ্যাঁ বাবা, তার ওড়নাটা জিনা ডান হাতে সাত পাক জড়িয়েই ফেলল।

—আমার বন্ধু মুকুটকে দেখেছেন তো!

—হ্যাঁ—সেদিন তো আলাপ হল।

—ও বলছিল। মানে দুপুরে তো কোনও কাজ থাকে না, তা ছাড়া এনগেজ্‌ড্ থাকা ভাল।

জিনা এত কিন্তু কিন্তু? এটা নতুন ব্যাপার মনে হল কল্যাণবাবুর।

বললেন, হ্যাঁ বলো না।

—যদি অ্যাডাল্ট এডুকেশনের একটা ক্লাস করি। একটা থেকে চারটের মধ্যে। আপনি বেরোবার আগেই ফিরে আসব।

কল্যাণবাবু বিকেলে নিয়ম করে বেড়াতে বার হন।

—আমার ফিরে আসা না-আসার জন্যে তোমার ভাববার কোনও দরকার নেই। আমাকে একটা চাবি দিয়ে দিলেই তো হয়! কিন্তু তুমি যাবে কিনা... ছোট বউমা, আমি তো তোমার গার্জেন নই!

—কেন নয়!—জিনা অপ্রস্তুত মুখে বলল—ঠিক আছে কাজটা... কাজ করাটা সম্পর্কে আপনার কী মনে হয় বাবা!

কল্যাণবাবু মনে মনে ভাবলেন এ মেয়ের এবার একটা বাচ্চা হওয়া খুব দরকার। এরা যে কী করছে! ডাক্তার-টাক্তার দেখাক। তিনি আরও ভাবলেন—জিনা করবে অ্যাডাল্ট এডুকেশন? সম্পন্ন বাড়ির আহ্লাদি মেয়ে, বড় চাকুরের বউ। এমনিতে খুবই কর্মদক্ষ, সুন্দর স্বভাব, হাসিখুশি, ভাল। বুদ্ধিমত্তাও খুব, কিন্তু একটু কি তরলমতি, হালকা সুখী সুখী নয়?

তিনি বললেন, তুমি তো জানো মা, আমি নিজেই অনেক দিন থেকে স্ট্রিট বয়েজদের একটা-দুটো ক্লাস নিই। এডুকেশন যাকেই দাও, যখনই দাও—আমার খারাপ মনে হবার কোনও কারণই নেই।

জিনা অমনি এগিয়ে গিয়ে টিপ করে একটা প্রণাম ঠুকল তাঁকে।

—তা হলে কাজটা আমি করছি বাবা, বলেই প্রায় ছুট।

—শোনো, শোনো,—কল্যাণবাবু ব্যস্ত হয়ে পিছু ডাকলেন—আমার মতের ওপর নির্ভর করে কিছু করো না। আবারও বলছি আমি তোমায় অনুমতি দেবার কেউ নই মা!

মাথাটা হেলাল জিনা। খুব বুঝেছে।

কিন্তু নিখিলের কাছে সে আদৌ সেভাবে অনুমতি নেয়নি। স্টেপকাটিনী বউকে নিয়ে নিখিল ইদানীং খুব মেতেছে। বুটিক থেকে দামি ডিজাইনার সালোয়ার-কামিজ কিনে দিল, দুদিন শহরের দুটো বিখ্যাত নাইট-ক্লাবে নিয়ে গেল। মাতিজ ছুটিয়ে দিঘা ঘুরিয়ে নিয়ে এল। তারই ফাঁকে জিনা বেমালুম বলে দিল—আমি একটা অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টারে যাচ্ছি, জান?—দারুণ লাগছে!

—তাই? ভাল লাগল?

—হ্যাঁ, আমি বলে দিলুম, সপ্তাহে তিনদিন পড়াব, দুপুরবেলায়। কেউ তোমরা বাড়ি থাক না। বসে বসে মোটা হই আর বোর্ড হই!

—অমনি তুমি ঠিক করে নিলে? আমাকে একবার জিজ্ঞেসও করলে না!

—আহা! তুমি কি আমার গার্জেন নাকি?

—ও, আমি তোমার গার্জেন নই? তো সেটি আজকাল কে হচ্ছেন?

—কে আবার? আমি একটা তিরিশ ছুঁই ছুঁই ইয়াং লেডি। একটা ক্লাস নেব, সমাজসেবা করব তার আবার অনুমতি! গার্জেন! জিজ্ঞেস! রাখো তো!

জিনার কূটনীতির কাছে নিখিলের এই প্রথম হার। হেরে যে গেল সেটা বেচারি বুঝতেই পারেনি। কী যেন একটা সামান্য মাসির বাড়ি, দিদির বাড়ি যাওয়া বিষয়ে তাকে জানাচ্ছে, এরকম একটা উড়িয়ে দেওয়া লঘু ভঙ্গি জিনার। নিখিল কিছু বলেনি।

জিনা প্রথম প্রথম যেত যেন সে-ই সমাজ পরিত্যক্তা, অপরাধিনী, চোখ তুলে চাইতে পারত না। যখন প্রথম সংকোচটা কাটল, তখন আবার শুরু হল দ্বিতীয় সংকোচ। তার মহার্ঘ শরীর, তার ত্বকের দামি জেল্লা, বসনভূষণের ঔজ্জ্বল্য, রুচি, তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের সৌগন্ধ, সমস্ত কী মিলিয়ে সে যে ওই কালিপড়া বালিখসা ঘরে নানা বয়সের জীর্ণ মেয়েগুলির পাশে একটা ভীষণ বেমানান প্রশ্নচিহ্ন, এই বোধ কিছুতেই তাকে সহজ হতে দিচ্ছিল না। এখন কিছুটা হয়েছে। সে এদের মনে করে তার সাবালক বড় জোর বয়স্ক ছাত্রী। এর চেয়ে অন্যরকম কিছু না। সাধারণ স্কুলে যে ধরনের সভ্যতা, শৃঙ্খলা, মনোযোগ ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে দাবি করা হয় সেটাই সে এদের থেকে আশা করে। এদের আগের দিদিমণি এত কড়া ছিলেন না। একটু শিখলেই তিনি কৃতার্থ হয়ে যেতেন। শাবাশ দিতেন। যেন তারা ছেলেমানুষ। সেটাতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এ দিদিমণি সমানে সমানে মেশেন না তাদের সঙ্গে। একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। এতে প্রথম প্রথম একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ক্রমশ তারা বুঝতে শিখেছে এটা ঠিক 'দেমাক' নয়। দিদিমণি তো! দূরত্বটা দিদিমণিত্বের।

সবচেয়ে যেটা তাদের টানে সেটা হল দিদিমণির গল্প বলা। খুব ভাল ভাল গল্প বলেন। প্রথম দিন দুয়েক গল্প বললেন—একটা লোক চাকরি করতে গিয়ে এক নির্জন পাষাণপুরীতে আশ্রয় নেয়, সেখানে সে কীরকম সুন্দরী মেয়ের ভূত দেখে, বাদশা সুলতান, হাবশি খোজাদের ভূত দেখে, একজন আধপাগল লোক সকাল হলেই 'সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়' বলতে বলতে ঘুরে বেড়ায়। প্রথম দিনেই এই গল্পটা বলে ছাত্রীদের মোহিত করে দেন দিদি। দ্বিতীয় দিন শোনালেন এক কিপটে বুড়ো কীভাবে ভুল করে তার নিজের নাতিকেই মাটির তলার ঘরে জ্যান্ত বন্দি করে যখ বানিয়ে

দেয় সেই লোম-খাড়া-করা গল্প। মাঝে মাঝে আবার নতুন দিদিমণি তাদের টুকটাক মজাদার জিনিস খেতে দেন। এগুলো তাঁর নিজেরই হাতে করা কিনা সে নিয়ে জল্পনা চলছে। একজন জিজ্ঞেস করতে গিয়ে ধমক খেয়েছিল।—সে খোঁজে তোমাদের দরকার কী? হাসি হাসি মুখখানি দিদিমণির। কিন্তু কড়া আছে।

—কী হল? জবাব দাও।

—একজন বলল, দাস নয়, আমরা দাসী-ই।

—দাসী বলে কোনও পদবি আমি কখনও শুনিনি, জিনা বলল। তখন আরেকজন বলল—আমাদের আবার পদুবী কী? বংশ নেই, ধারা নেই, বাপ নেই!

—মায়েরও তো কোনও না কোনও পদবি ছিল।

—মা-ও দাসী।

ক্লাসের শেষে, যখন সবাই চলে গেল, সবচেয়ে ভাল ছাত্রীটি যাকে সে 'ক্ষীরের পুতুল' পড়তে দিয়েছে, সে রয়ে গেল। এ প্রায় প্রতিদিনই রয়ে যায়। কিছু না-কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তার। যেমন, যকের গল্পটা সত্যি কিনা, তাদের গ্রামে এরকম দু-তিনটে যক ছিল, একজনের চেহারা সে ছোটবেলায় দেখেছে। একেবারে সাধারণ মানুষের মতো, খালি হাঁ করলেই কুমির-দাঁত দেখা যায়, আর নখের ডগা ছুরির ফলার মতো। তার নিজের নখ ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। দিদিমণি এর কোনও প্রতিকার জানেন কিনা... ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজ তার টাস্‌ক্ ছিল—'ক্ষীরের পুতুল'-এর গল্পটা নিজের মতো করে লিখে আনা। জিনা ক্লাসরুমে বসেই লেখাটা দেখে দিল। অজস্র বানান ভুল সত্ত্বেও গল্পটা দাঁড় করিয়েছে।

জিনা বলল, ভাল হয়েছে বনমালা, বই দেখে দেখে বানানগুলো শুধরে এনো। তাদের এখানকার পদ্ধতিতে বানানটানান নিয়ে মাথা ঘামাতে বারণ করাই থাকে। তা হলে নাকি এদের শেখার উৎসাহ চলে যাবে। কিন্তু সে দেখেছে, বানান বা বাক্য রচনারীতির ওপর জোর দিলে মনটা পড়ায় বসে ভাল। তা ছাড়া সবার ক্ষমতাও তো এক নয়। যারা পারবে বলে মনে হয়, তাদের এগিয়ে যেতে সে সবসময়ে উৎসাহ দেয়।

আজ বনমালা মুখ খুলল, দিদিমণি, আমাদের আসল পদবি থাকলেও কইতে নাই, মানা আছে।

—কে মানা করেছে।

—বাড়ি থেকেই।

—বাড়ি থেকে? মানে?

—মেসোর কাছ থেকে বিককিরি হয়ে তো আসি! এমনি ধরুন বাপের কাছ থেকে, সোয়ামির কাছ থেকে বিককিরি হয়েও তো মেয়েছেলে আসছে। তাদের বলে দেয়, তোর আর পদুবি রইল না, বলবি দাসী।

—তুমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, জানতে?

—মিথ্যে বলব না দিদি, জানতুম। তবে সে বিককিরির ঠিক মানেটা কী, তা কি আর বুঝেছি! মেসো-মাসির সাতটা ছেলেপুলে, আমি বাপ-মা মরে গিয়ে উঠলুম, আটটা হয়ে গেল। খেতে দিতে পারে না। দিন রাত খ্যাঁক খ্যাঁক আর খাটুনি। একদিন একটা লোক এল, এখন বুঝি আড়কাঠি। তার আমাকে পছন্দ হল, তখন আমার ন বছর বয়স। পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল মেসোকে। মেসো বলল—যা তুই বিককিরি হয়ে গেলি, খাটবিখুটবি, খেতে পাবি পেট ভরে। আমাদের ভুলে যা। এ পদুবি এ নাম নিবি না খবদ্দার। অতশত তো বুঝতুম না। গাঁয়ে নাম ছিল বনলতা, এখানে মাসি বলল বনমালা বেশি ভাল শোনাবে। তাই, তা-ই।

—তা তুমি যে রাহা বল? ... জিনা মনে মনে বলল—'সেন' হলেই তো ষোলোকলা পূর্ণ হত।

—ওই আড়কাঠিটা তো রাহা ছিল। ওর সঙ্গেই তো প্রথম ক মাস... বলতে বলতে দিদিমণির

ছাইয়ের মতো মুখের দিকে তাকিয়ে বনমালা থেমে গিয়ে মুখ নিচু করল।

—তারপরে? —জিনা জিজ্ঞেস করে। ন'বছরের মেয়ে? ন বছর? এরা কারা? এই আড়কাঠি ... এই মাসি... এদের খদ্দের... কারা?

—মুখ দিয়ে একদিন রাহা বেরিয়ে গেল দিদি। সেই থেকে রাহা হয়েই আছি। তা ওই পারুল? ওর সোয়ামি তো পুরুতঠাকুর! ভটচাযি্য বামুন। ও-ও তো নিজেকে দাসী বলে। গাঁজা, আফিম, মদ কিছু বাকি ছিল না বরটার। মেরে ধামসে দিত একেবারে। তারপর নেশার জোগাড় করতে ঘরেতেই লোক জোটাতে শুরু করে। পারুল দেখলে এ তো মজা মন্দ নয়! তার গতর-বেচা টাকা দিয়ে নেশা করে লোকটা তাকেই উপুসি করে পেটাচ্ছে। ও পালিয়ে এল।

—আর?

—সর্বজয়াদিদি এখানকারই। তিন পুরুষে বেশ্যা। ওর দিদিমা ভাল নাচতে গাইতে পারত। সর্বজয়াদিদি গাইতে পারে সুন্দর। তা এখন তো খদ্দের গান শুনতে চায় না। ক্যাসেট রয়েছে কত। ওই যে দেখেন অনিলাদিদি। লোকের বাড়ির ঝিয়ের কাজ করত। এক বাড়ির বাপ ছেলে দুজনেই ওকে নষ্ট করে... গতি না দেখে....

—চুপ করো বনমালা। ঘরে যাও।

জিনা হনহন করে বেরোতে গিয়ে চৌকাঠে ঠোক্কর খেল। আজ তার একটু দেরিই হয়ে গেছে। গলিটার যেন ঘুম ভাঙছে। সে তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় পড়ে একটা রিকশা নিল। বাড়িতে ঢুকেই সোজা বাথরুমে। সোম বুধ শুক্র তিনদিনই—এই তার রুটিন। প্রথম দু-চারদিন এমনই গা ঘিনঘিন করেছিল যে রাত্রে খেতে পারেনি। মুখে খালি জল কেটেছে। কী যে মাখে এরা? কী তেল? কী পাউডার? কী সেন্ট? উৎকট রকমের উগ্র একটা গন্ধ বেরোতে থাকে। অনেকবার মুখে এসেছে—প্লিজ তোমরা এই তেলটেলগুলো মেখে এসো না।

কিন্তু এ কথা কি বলা যায়? ওরা গন্ধ ভালবাসে। মাথায় সুবাসিত তেল ঢালবে, শাড়ির ভাঁজে সস্তার সেন্ট। মলিনা আবার কতক চাট্টি ধূপ এনে জ্বালিয়ে দিল একদিন। সেদিন জিনা আর থাকতে পারেনি, বলে ফেলেছিল—ধূপগুলো নিয়ে যাও প্লিজ, আমার মুখের মধ্যে ধোঁয়া ঢুকে যাচ্ছে, দেখো!

—দিদিমণির রকম দ্যাকো... হেসে গড়ায় সব।

সরু গলির দু ধারে বড় বড় বাড়ি। এক একটা তো বহুতলও আছে। পুরনোই বেশি। দুপুরবেলা সব চুপচাপ, নিঝুম। একতলার ঘরগুলো অন্ধকার। 'বান্ধব সমিতি' লেখা সাইনবোর্ডটা হেলে পড়েছে। বাইরের ঘরটা ক্লিনিক। কড়া টিউবলাইটের তলায় নড়বড়ে টেবিলচেয়ার, গোটা তিনেক বেঞ্চি। একটা ওষুধের আলমারি। বহু ডাক্তার তাঁদের পাওয়া ওষুধের সাম্প্‌ল্ এখানে দান করেন। পার্টিশনের গায়ে বাংলা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। ওদিকে তার ক্লাস। ব্ল্যাকবোর্ড। মেঝেতে মাদুর পাতা, তার জন্য একটা নিচু চেয়ার আর টেবিল।

আগে যে পড়াত সেই সবিতা মাত্রই স্কুল ফাইন্যাল পাস। সে এখন কলেজে পড়তে গেছে!

—তুই অমন সিঁটিয়ে বসে আছিস কেন? এখানে তো কোনও নোংরা নেই! —মুকুট বলল ফিসফিস করে। সামনে বসা একটি মহিলা ঠিক শুনতে পেয়েছে। কালো লম্বা চেহারা। কপালটা টিবির মতো। মুখটা খুব চালাক-চতুর। বেশ স্মার্ট। বলেছিল—ইস্কুলঘরে আমরা লোক বসাই না গো দিদিমণি! ভয় পেয়োনি। জনা দুই খিলখিল করে হেসে উঠল। একজন ধমক দিল—কাকে কী বলতে হয় জান না সর্বজয়াদিদি! ছিঃ!

এই সর্বজয়াই তাকে সবচেয়ে বেশি র‍্যাগিং করে। মহিলা সহজাত বোধে তার কুঁকড়ে যাওয়া, ভেতরের ঘৃণা, অস্বাচ্ছন্দ্য বুঝতে পারে। একদিন ক্লাস-শেষে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। শুনতে পেল সর্বজয়া বলছে—ওরকম ঘরের বউ ঢের দেকা আচে, কে ঘরের মধ্যে কী করে, কী কোরে ভাতকাপড় জোটে সবাই জানে।

শুনে জিনার মধ্যে রাগ লকলকিয়ে উঠেছিল। সেই প্রথম। শুনতে পায়নি এমন ভাব করে সে চলে যেতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। দাঁড়িয়ে পড়ে ফিরে তাকিয়েছিল। বলেছিল—লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছে হলে আসবে। এর মধ্যে কোনও জোরজুলুমের ব্যাপার নেই। আমাদের আর কী! শিখতে পারলে তোমাদেরই মঙ্গল। কিন্তু শিখতে যদি আস, ভদ্র বাধ্য ছাত্রীর মতো আসবে। ক্লাসে ডিসিপ্লিন মানতে হবে, টিচারকেও মানতে হবে।

পরের দিন আসতে ইচ্ছে করেনি। অনেক দিনই নিজের অনিচ্ছার সঙ্গে একটা লড়াই করে তাকে আসতে হয়। মুকুট অনেক বড় মুখ করে কাজটা তাকে দিয়েছে তো! ভেবেছিল সর্বজয়া দাসীকে দেখবে না। কিন্তু না। ওই তো এক দিকে থানা গেড়ে বসে আছে। পরের কয়েক দিন সে সর্বজয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল। তারপর একদিন বলল—শুনেছি, অনেকে ভাল গান গাও, একটু গেয়ে শোনাও দেখি—

কয়েকজন সর্বজয়াকে ধরল, তখন সে-ও উৎসাহ দিল—গাও না, গাও।

অবশেষে সর্বজয়া তার জোরালো সুরেলা গলায় শ্যামাসংগীত ধরল—সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি...

গান শেষ হলে, জিনা বলল—বাঃ! ভাল গাও তো তুমি!

—দিদিমণি—এখন আপনি একটা গান, সবাই সমস্বরে বলে উঠল।

জিনা বলল—আমি কিন্তু এত ভাল গাইতে পারি না। সে ভেবে-চিন্তে ধরল—যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।

কেন এই গান বাছল সে জানে না। গাইবার জন্যে সে একেবারেই তৈরি ছিল না। ইদানীং খুব নিয়মিত সংগীতচর্চা হয়ে ওঠে না। ঝুম্পা-মাম্পি দুজনেরই লেখাপড়ার চাপ বেড়েছে। গানে আর নিয়ম করে বসতে পারে না। সে এক এক দিন আপন খেয়ালে সন্ধের মুখে গীতবিতান নিয়ে বসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাবার করে দেয় একটার পর একটা গানে, যতক্ষণ না নিখিল বাড়ি আসে। কিন্তু সেটা পুরোপুরিই তার মর্জির ওপর। গাইবার সময়ে অবশ্য দেখল এভাবে অনিয়মিত সেধেই হোক আর সং গেয়েই হোক, গলাটা ভালই আছে। গানটা খুব সচেতনভাবে বাছা নয়। কিন্তু এটুকু খেয়াল তার ছিল যে এখানে কোনও ভালবাসার গান সে গাইবে না। সে বড় ঠাট্টার ব্যাপার, অশ্লীল ব্যাপার হবে। দেশভক্তির গান? সে-ও হবে নিদারুণ ঠাট্টা। দেশ কোথায় এদের? আর ঠাকুরদেবতা? সর্বজয়া যেমন গাইল? কে জানে ভক্তিসংগীতও যেন কেমন অপ্রাসঙ্গিক এখানে। সাধারণ মানুষ তো ভক্তিসংগীত গেয়ে থাকে কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে মুখ করে। সে টিচার হিসেবে অনুভব করে সেসব আশা-আকাঙ্ক্ষার থেকে কত দূরে এসব জীবন। যে মিথ্যে শোনাতে চায়, শোনাক। তার উপলব্ধির বিরুদ্ধে সে যেতে পারবে না। মুকুটদের প্রতিষ্ঠান তার কাছ থেকে কী চায়, নির্দিষ্ট করে কিছু চায় কিনা, তার জানা নেই। কিন্তু তার ভেতরে একটা দেওয়ার অস্পষ্ট রূপরেখা গড়ে উঠছে। সে তার বোধের অনুগত হয়ে চলে। সে যখন সাজপোশাক করে, যেমন অবধারিতভাবে তার হাতে উঠে আসে হালকা রং, প্রসাধন করতে গিয়ে রং দিতে হাত ওঠে না, গান করবার সময়ে তেমনই গলায় উঠে এল এমন সুর এমন বাণী, যা এই অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটের একতলার এঁদো ঘরের উপর্যুপরি পুরুষসহশ্রক্লিষ্ট বিকৃত গর্তের জীবনের দিনগত বাস্তব থেকে দূরে। হয়তো ওদের ভাল লাগবে না। না সুর, না ভাষা। কিছু বুঝবে না। কিন্তু তার যদি এদের কিছু দেওয়ার থাকে তা হল এই যৌনতার বাইরের জগৎ, বাইরের ভাব।

—দিদিমণি আপনি কি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন?—বনমালা জিজ্ঞেস করল।

—এ কথা বলছ কেন?

—ওই যে বিদায়বেলার গান করলেন? বনমালার চোখ কি একটু ছলছল করছে? অন্য মেয়েগুলিও তাকিয়ে আছে—চুপচাপ।

তবে? তবে কি এরা তাকে ভালবাসছে? বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করতে থাকে। সে বলল—না তো! যাবার কোনও ইচ্ছে তো এখনও পর্যন্ত নেই।

মুকুট প্রায়ই আসে। এখানে, বাড়িতে। আসলে এখানে জিনাকে লাগিয়ে ও বোধহয় একটা দায়ের মধ্যে পড়ে গেছে। জিনার কেমন লাগছে, জিনা কেমন আছে, এখনও অস্বস্তিতে আছে কিনা, এইগুলো হয়তো জানতে চায়।

একদিন বলল তোর মেয়েগুলোর প্রোগ্রেস খুব ভাল রে জিনা। কী করিস রে?

—কীরকম টিচার দেখতে হবে তো! জিনা হেসে বলল।

মুকুট বলল—সত্যি রে! খুব লো-কোয়ালিটি টিচার দিই আমরা। ওদেরই মধ্যে যে একটু লিখতে-পড়তে শিখেছে তাদেরই সাধারণত কাজটা দেওয়া হয়। আইডিয়াটা হল নিজেদের লোকের কাছে ওরা স্বচ্ছন্দ বোধ করবে। করেও অবশ্য। তোকে এনেছিলাম জাস্ট একটা খেয়ালে। রেজাল্ট দেখে সবাই চমকে যাচ্ছে।

—কেন? কোনও পরীক্ষা তো....

—না রে সে সব না। ওরা প্রথমত পড়াশোনা করতে চায় না। বুঝতেই তো পারিস সমাজের কোন-স্তর থেকে এসেছে বেশিরভাগ! তার ওপর সন্ধে থেকে সারা রাত ওই কাজ! মাথায় কিছু ঢোকে না। কনসেনট্রেশন বলে কোনও পদার্থ নেই। খালি প্রথম রিপু উসকে দিতে আর স্যাটিসফাই করতেই শেখে এরা। তোর মেয়েগুলোর চালচলন পালটে যাচ্ছে। বেশ কয়েকজন খবরের কাগজ পড়ছে শুনছি।

—হ্যাঁ, আমি পড়াই তো।

—হ্যাঁ রে ওরা নাকি গল্পগুচ্ছের গল্প বলতে পারে! নমিতাদিকে 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' শুনিয়েছে একটা মেয়ে আর একজন সেই জয়কালী নামে একজন শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবা নিজের রাধাকান্তর মন্দিরে একটা শুয়োরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন!

—হ্যাঁ। 'অনধিকার প্রবেশ' ওরা বলেছে? সত্যি?

জিনা গল্প বলে ঠিকই। বলে বলার আনন্দে। খানিকটা কৌতূহলেও। ওদের বুঝতে না দিয়ে সে লক্ষ করে গল্পগুলোর কী ফল হল, কীভাবে নিচ্ছে ওরা সেগুলো। বাইরের জীবনকে ওদের কাছে হাজির করার অন্য আর কী উপায়ই বা আছে? এদের মধ্যে বেশিরভাগই এই পল্লিরই মেয়ে। পুরুষানুক্রমে এই করছে। কোনও সমাজ, কোনও সভ্যতাকে কখনও ভেতরে ঢুকে দেখেনি। চৌকাঠ থেকে উঁকি মেরে কতটুকুই বা বোঝা যায়! এদের সমাজ নারীপ্রধান। মা, দিদিমা, মাসি... মাতৃকুলের দিকে একমুখী বিস্তার। শিক্ষা তো নেই-ই। সামাজিক বা পারিবারিক দৈনন্দিন কাজকর্মের বৈচিত্র্যও নেই, সাধারণ রুটিন নেই। সন্তান পালন যেটুকু আছে, এদের জীবনে তার ভূমিকা খুবই গৌণ। বেশিরভাগই সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। একটা জৈব মাতৃত্বের অনুভূতি ছাড়া কিছু নেই। সেটাও বেশিদিন থাকে না। ওরা জানে এই সন্তানদের কী ভবিষ্যৎ। বা, বলা ভাল, জানে এদের ভবিষ্যৎ ঠিক কী! লেখাপড়া শেখাবার তেমন কোনও গরজ নেই, সুযোগও নেই, বাইরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না। মেয়েরা বারো-তেরো বছর বয়স হলেই ব্যবসায় নেমে পড়বে। ছেলেগুলো দালালি করবে, মারামারি, চুরি, ছিনতাই, মস্তানি। শৈশব বলে কিছু নেই। পুরুষকে এরা মাত্র একটা ভূমিকাতেই চেনে। খদ্দের। পিতা, রক্ষক, পুত্র, পালক, ভাই, বন্ধু আর কোনও পরিচয়েই নয়। যেসব মেয়েরা বাইরে থেকে এসেছে, কেউ স্বামীর অত্যাচারে পালিয়ে এসেছে, কেউ ভালবাসার লোকের কাছে ঠকে এসেছে, কেউ বা পিতা বা পিতৃতুল্য কারও কাছ থেকে বিক্রি হয়ে এসেছে। এদের সবারই কাছে পুরুষ এক ভয়াবহ, বিপজ্জনক প্রবঞ্চক, চতুর ক্রেতা। কী করে এতকাল ধরে এতগুলো দেশে মানুষ মানুষকে এমন অমানুষিক গর্তের জীবনে বন্দি করে রাখতে পারল? এইরকম একটা পৈশাচিক বাস্তব তাদের ঘরের পাশেই জিয়োনো রয়েছে অথচ তাদের চেতনায় এদের জন্য কোনও মমতা,

কোনও মুক্তির ভাবনা কোনওদিনও দেখা দেয়নি। পুরুষরা এদের ব্যবহার করে, সতর্ক চতুরতার সঙ্গে সম্পর্কহীন একটা শ্রেণী তৈরি করে রেখে দেয়, আর মেয়েরা এদের ঘৃণা করে। যেমন সে করত। এদের কাজকর্ম, চালচলন, কথাবার্তা—এখনও করে।

একটা মজার খেলা আজকাল শুরু করেছে জিনা। তার ছাত্রীদের মোটামুটি অক্ষর পরিচয় তার আগের মেয়েটিই করিয়ে গিয়েছিল। এরা নাম সই করতে পারে। বাংলায়, ইংরেজিতে। কিন্তু পড়বার ধৈর্যটা অনেকেরই নেই। লেখবার তো নেই-ই। যাদের আছে তাদের সে পড়তে লিখতে দেয়। কিন্তু অন্যদের বেলায় এসব করে একেবারে পড়াশোনা বিমুখ করে দেবার ঝুঁকিটা সে নেয় না। অনেক সময়ে সে একটা গল্প অর্ধেকটা বলে থেমে যায়। গল্পটা কীভাবে শেষ হবে সেটা নিয়ে এবার ওরা ভাবুক, জল্পনাকল্পনা করুক। এটাই হল খেলা। এ খেলাটা ওদের খুব পছন্দ হয়ে গেল। 'দেনা পাওনা'র অর্ধেকটা শুনে ক্লাসসুদ্ধু মেয়ে রায় দিল, নিরুপমা শাশুড়ির অত্যাচারে মারা যাবে, তার বর আবার বিয়ে করবে। আশা বলে একটি মেয়ে বলল—এবার আরও বেশি টাকা চাইবে গো!

রবীন্দ্রনাথের কল্পনার সঙ্গে এদের কল্পনা কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাচ্ছে দেখে সে চমৎকৃত। 'অতিথি' শুনে জবা নামে একজন বলল—'ব্যাটাছেলে বলেই না বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে। মেয়েছেলে হলে মা মেরে ধামসে দিত, কাজ কর তবে খেতে পাবি। আর অমনি পালালে? দ্যাখ না দ্যাখ লাইনে ভর্তি হয়ে যেত।' তারাশংকরের 'কালাপাহাড়' শুনে সবিতার মন্তব্য—'নির্য্যস ফিরে আসবে মোষটা, আহা অবোলা জীব গো। মানুষের চেয়ে ওদের টান বেশি।' 'ডাইনি' গল্পের সূক্ষ্মার্থ সবটাই মাঠে মারা গেল। প্রত্যেকেই ধরে নিল, মেয়েটি সত্যিই অশুভ শক্তির অধিকারিণী। বেচারি নিজেও জানে না সে ডাইনি-সমাজের অন্তর্গত, জন্ম থেকেই ডাকিনীবিদ্যা তার রপ্ত। কে কবে ডাইনি দেখেছে, ডাইনির কথা শুনেছে, প্রচণ্ড উত্তেজনাময় সেই আলোচনাতেই সেদিনের ক্লাস শেষ হল।

—কী ব্যাপার? তোর যে খুব পা হয়েছে! কোথায় কোথায় যাস দুপুরবেলায়?

মল্লিকার সঙ্গে প্রায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল বাড়ির দরজার কাছে। জিনা আসছিল আপন মনে। যেন একটা ভাবনার সুতো হাতে নিয়ে আনমনে কোনও গোলকধাঁধা পার হচ্ছে। এরকম সময়ে রাস্তার গাড়ি-ঘোড়া পথ-চলতি মানুষ, ধারের আবর্জনা সবই অভ্যাসে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু চেনা মানুষকে চেনা যায় না। কেননা যে মনের দ্বারা চেনাচেনিগুলো হয় সেটা অন্যত্র ব্যস্ত থাকে। তাই জিনা ভীষণ চমকে গেল।

—আরে দিদিভাই! তুমি? কোথায় গিয়েছিলে?

—তোর পাশে পাশেই তো আসছিলুম। প্রথমে ছিলুম ও ফুটপাতে, তোকে ইশারা করলুম, —'এই! এই যে শুনছেন!' বলে ডাকলুম...

—'এই যে শুনছেন!' জিনার মুখ হাসিতে ভরে গেল।

—তা কী বলব! রাস্তার মাঝখানে তোর নাম ধরব? তুই শুনতে তো পেলিই না, রাস্তা ক্রস করে তখন থেকে তোর পেছন পেছন আসছি দেখতেও পাচ্ছিস না।

—আমার বুঝি পেছনে দুটো চোখ আছে? চলো—দরজার চাবি ঘোরাল জিনা—এ দিক দিয়ে ঢুকি।

আজও জিনার দেরি হয়ে গেছে। বাবা বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন। সে বলল—দিদিভাই, প্লিজ বসো, আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি। তারপর চা করব।

গা ধুয়ে বেরিয়ে সে দেখে মল্লিকার চা করা হয়ে গেছে। বলল—এত দেরি করলি? রাস্তায় কিছু মাড়িয়েছিসটিস নাকি?

জিনা অপ্রস্তুত হয়ে বলল,—না, তেমন কিছু না। গরম হচ্ছিল।

চা খেতে খেতে মল্লিকা বলল,—বললি না তো কোথায় গিয়েছিলি? কোথায় যাস?

—তুমি দেখেছ? আমি রোজ যাই?

—রোজ কি না জানি না, প্রায়ই দেখি বেরিয়ে গেলি বা ফেরত এলি।

—বাবা কিছু বলেননি?

—বাবা? বাবা কেন বলবেন?

জিনা বলল—একটা কাজ করছি।

—কাজ? চাকরি?

—চাকরি ঠিক নয়। কাজ... কাজ দিদিভাই। বয়স্ক-শিক্ষা।

—পড়াচ্ছিস? সত্যি? কাদের?

—বয়স্ক মেয়েদের, ধরো সতেরো-আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ কী তারও বেশি বয়স!

—এ মুকুটের কাজ, না?

—ঠিক ধরেছ। সারাদিন কিচ্ছু করবার নেই। কোথাও যাবার নেই। কোনও মানুষের মুখ দেখি না। নবাববাহাদুরের অবরোধে একা একা। ভাল লাগে নাকি?

—এখন ভাল লাগছে?

—খুব। কারও জন্যে কিছু করছি, করতে পারছি। পরিবার-পরিজনের একেবারে বাইরে কারও জন্যে—এটা ভাবতে ভাল লাগে দিদিভাই। তারপরে আবার ইনসেনটিভ রয়েছে টাকাটা।

—এই যে বললি—চাকরি নয়!

—নয়ই তো। ওটা ধরো পথ-খরচা, বা বলো সম্মান-দক্ষিণা।

প্রথম প্রথম জিনা টাকাটা নিতে লজ্জা পেয়েছিল। এই রাস্তার চতুর্দিকের হতশ্রী দীনতা, উপরন্তু মেয়েগুলির জীবিকা! পেটের জন্য যাদের শরীর বেচতে হয়, সেই দুর্ভাগিনীদের পড়িয়ে সে টাকা কী করে নেয়? কিন্তু মুকুট বলেছিল—জিনা তোর পুরনো সমাজসেবার কনসেপ্টটা তুই ভুলে যা। আমরা যে সেটআপটা তৈরি করেছি সেখানে বাইরে থেকে অনেক টাকা গ্রান্ট আমরা পাচ্ছি। সব কর্মীর জন্যে দক্ষিণা ঠিক করা আছে। যে যা করবে দায়িত্ব নিয়ে করবে। তার সামর্থ্য, তার ইচ্ছা সবটারই মূল্য দেওয়া হচ্ছে। মনে করার কারণ নেই যে এটা ওদের স্রেফ ভিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

—কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম এঁরা কি কাজের জন্য টাকা নেন? এঁদের কি সেজন্য দায় কম থাকে?

এঁরাও নেন। অনবরত নিচ্ছেন। ব্যক্তিগতভাবে নিচ্ছেন না, কিন্তু এঁদের সঙ্ঘ, মিশন অজস্র দান পায়। তাই দিয়ে যেমন সেবামূলক কাজ চলে তেমন সেবকদের ভরণপোষণ ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনই মেটানো হয়। এঁরা যে স্কুল-হস্টেল ইত্যাদি চালান, সেখানে কি টাকা নেন না? আমরা কোনও সঙ্ঘে নেই। আমাদের পরিবার আছে, ব্যক্তিগত প্রয়োজন আছে, সেগুলো মিটবে কী করে? মেয়েরা তো টাকাটা দিচ্ছে না। আর যদি দিতও, তোর সেটা নেওয়া উচিত হত।

—কেন?

—কেন নয়? প্রথমত, ওদেরও তো মানসম্মান আছে! উপার্জন করছে, পয়সা খরচ করে কেনাকাটা করতে পারবে বলেই তো! আর দ্বিতীয়ত, ওরা যেভাবেই রোজগার করুক, তুই তো আর অসৎ কাজ করে টাকা নিচ্ছিস না!

এই যুক্তি জিনার পছন্দ হয়নি। কিন্তু তাকে স্বীকার করতেই হয়, টাকাটা তাকে অতিরিক্ত দায়বোধ দিয়েছে। চ্যারিটি করছি, সুতরাং মনের ঔদার্যে যখন যতটুকু দিচ্ছি, খুব দিচ্ছি—এ মনোভাবটা তৈরি হতেই পারল না। সে চিন্তা করে কীভাবে এগোলে, অল্প সময়ে বেশি শেখাতে পারবে, কীসে ওদের ভাল লাগবে, কীভাবে ওদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বেশি আগ্রহী করে তোলা যায়। প্রত্যেকবার টাকাটা হাতে দেয়, আর ভেতর থেকে কী যেন তাকে কামড়ায়, আশা এখনও যুক্তাক্ষর কায়দা করতে পারল না। সর্বজয়া পারে কিন্তু পড়বে না। পুতুল উসখুস করে কিছুতেই মন বসে না তার, কী

করে এগোবে? কীভাবে...

মল্লিকা বলল, তোর নবাববাহাদুরকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছিস তো!

—জিজ্ঞেস করার কী আছে? তার টাইমের সঙ্গে তো আর ক্ল্যাশ করছে না!

—ক্ল্যাশ করুক আর না করুক... জিনা, অনুমতি নিসনি, না?

—শাজাহানকে বলেছি।

—শাজাহানকে? মানে? ও, তা ঔরংজেব কবে শাজাহানের কথা মানল?

জবাবে জিনা বলল,—আমি তো আর দাসী-হাটে বিক্রি হয়ে আসিনি।

—বিপদে পড়বি জিনা।

—যেদিন পড়ব, সেদিন ভাবব। কুড়মুড় করে নিমকি চিবোতে চিবোতে বলল, জিনা।

—কোথায় তোদের সেন্টারটা?

—ওই তো ওই দিকে, সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু থেকে অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিট...

—ওরে বাবা। ও জায়গাটা একেবারে ভাল না জিনা।

—কেন গো?

—খারাপ পাড়া। তোর সঙ্গে কে থাকে? মুকুট?

—যদি কেউ না থাকে? শুধু আমি থাকি আর আমার ছাত্রীরা?

—তোর পক্ষেও নিরাপদ নয়, তোর ছাত্রীদের পক্ষেও নয়। ওরা কি আর জায়গা পেল না? যত উলটোপালটা লোক যায় ওখানে।

—সত্যি, কারা যায় ওসব জায়গায় বলো তো দিদিভাই!

—কী জানি বাবা, মেয়েরা যায় না, পুরুষরাই যায় এটুকুই জানি।

—কীরকম পুরুষ? ধরো তারা কি কারও বাবা? কাকা? জ্যাঠা? স্বামী? দাদা? ভাই?

—উঃ, তোর মুখে কি কিছুই আটকায় না!

—আটকাবার কী আছে? যারা যায় তারা তো আর নিঃসম্পর্ক নয় রে বাবা। কারও না কারও ছেলে তো বটেই। বাবা-কাকা, ভাই-বেরাদর তো বটে!

—ইস, কী বিশ্রী! কখনও ভাবিনি এ নিয়ে।

—তা হলে এখন একটু ভাবো।

—কেন? হঠাৎ এখন আমার কী দায় পড়ল যে খারাপ মেয়েদের কথা ভাবতে বসব? তুই এমন এক একটা কথা বলিস!

—খারাপ মেয়েদের কথা ভাবতে বলিনি গো! খারাপ ছেলেদের কথা ভাবো। কারা সেই ধিনিকেষ্ট, যাদের মজার জন্যে পাড়া ভর্তি করে করে মেয়ে পুষে রাখতে হয়, যে মেয়েদের বাবা নেই, ভাই নেই, স্বামী নেই, ছেলে নেই, ছেলেবেলা নেই, বন্ধু নেই, দিন নেই, রাতও নেই রাতের মতো। পেটের দায়ে যারা যৌনাঙ্গ ভাড়া খাটায়!

মল্লিকা বলে উঠল, ছি! ছি! জিনু দু দিন বেরিয়েই তোর মুখের ভাষা কী হয়েছে রে? গঙ্গাজল দেব? মুখ ধুয়ে আসবি?

—ধুয়েছি তো! এসেই সাবান ঘষে ঘষে সর্বাঙ্গ ধুলাম দেখলে না? আমি যে ওদেরই পড়াতে যাই?

—কাদের? —স্তম্ভিত হয়ে মল্লিকা জিজ্ঞেস করল।

—'খারাপ' মেয়েদের দিদিভাই। 'খারাপ' ছেলেদের এখনও হাতের কাছে পাইনি। হাতে যদি একবার পাই...

গল্পগুচ্ছ ও কল্যাণবাবু

শেষ সেপ্টেম্বরের এক সন্ধ্যায় দুর্গাচারণ মিত্র স্ট্রিট থেকে জিনাকে বেরোতে দেখলেন কল্যাণবাবু। দেখলেন বাস থেকে। তিনি শ্যামবাজারের মোড় অবধি গিয়ে বাস বদল করবেন। জিনা একটা উজ্জ্বল সাদা রংয়ের পোশাক পরে ছিল। চুলগুলো খোলা। কপালে একটা ছোট্ট কালো টিপ। তিনি প্রথমে তাকে চিনতে পারেননি। তাঁর বুড়ো চোখে এখন অল্পবয়স্ক মেয়েমাত্রই ভাল লাগে। একটি মেয়ে, যেন জীবন-যৌবন, প্রাণের যত আনন্দ সব কিছুর মূর্তি ধরে এসে দাঁড়াল। হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছে—এরকমটাই তিনি দেখলেন। উচ্ছল নয়—ধীর, চঞ্চল নয়—গভীর। যে জিনাকে তিনি বাড়িতে দেখেন সে তো এমনটা নয়। সে ছটফটে, দৌড়ে বেড়াচ্ছে, প্রাণচঞ্চল, বকবক করছে তো করছেই। আসলে, কল্যাণবাবু প্রকৃত জিনাকে দেখেন না। যে ছোট বউমাটিকে তাঁরা সবাই খুব পছন্দ করে নিয়ে এসেছিলেন, এবং যে সমস্ত সাংসারিক ওঠা-পড়া মন-কষাকষির মধ্যেও আশ্চর্যভাবে নিজের হালকা হাসি দিয়ে বাড়িটাকে তার বাতাবরণকে লঘু, সুগন্ধ রেখেছিল, সেই জিনাকেই তিনি দেখেন। জিনা যে একটু একটু করে বড় হয়ে গেছে, বদলে গেছে সূক্ষ্মভাবে তা তিনি খেয়াল করেননি। কে-ই বা করে। কাছের মানুষকে কেউই চিনতে পারে না। এখন দূর থেকে অন্য মেয়ে অন্য মানুষ হিসেবে যখন দেখলেন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। জিনা, না? তারপরে তিনি আর একটা সন্দেহজনক দৃশ্য দেখলেন। জিনার পেছনে পেছনে, সাবধানে দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছে দুটো লোক। ঠিক গুণ্ডা-মস্তান টাইপের না হলেও, তাদের ধরনধারণ ভাল লাগল না তাঁর। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তারা জিনাকে অনুসরণ করছে। জিনা সেটা জানে কি না তিনি বুঝতে পারলেন না। তারপরেই জিনা একটা রিকশায় উঠে পড়ল। এবং রিকশা বেশ জোরে জোরেই ছুটে চলল দক্ষিণমুখে। জিনা বাড়ি ফিরছে। লোকদুটি একটা হার্ডওয়্যারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল, কথা বলতে লাগল। এর পরেই সিগন্যাল পেয়ে কল্যাণবাবুর বাস ছেড়ে দিল।

পাইকপাড়ায় বন্ধুর বাড়িতে আজ বেশিক্ষণ বসতে পারলেন না কল্যাণবাবু। গল্পগাছাও তেমন জমল না। অজিত যে এত বুড়ো হয়ে গেছে, ব্লাডপ্রেশার, ব্লাডসুগার আর ইউরিক অ্যাসিড ছাড়া তার আলোচনার আর কোনও বিষয় নেই তা তিনি আগে বুঝতে পারেননি। অজিতের গিন্নি তো অজিতেরও এককাঠি বাড়া। তার আবার আছে উপরন্তু বউমার নিন্দে। ছেলে তাঁর যথারীতি সোনার চাঁদ, বউয়ের পরামর্শেই সে কানাডায় থেকে গেল। তখন কল্যাণবাবু তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানেন সোনার চাঁদ ছেলেরও নিজস্ব মাটির পা বেরোয়, তার প্রতিমাতেও প্রচুর খড় থেকে থাকে, কাজেই এইসব একপেশে কথাতে তাঁর আজকাল একটু বিরক্তিই লাগে। বিশেষত এই জন্য আরও লাগে, যে তিনিও তো জিনাকে গোড়াতে দোষ দিয়েছিলেন, মনে মনে। নিখিল যে খুব বাপের সুপুত্র নয়, কাঠগোয়ার একটা, এটা পুরোপুরি জেনেও তো তিনি জিনাকেই দোষারোপ করেছিলেন। পরে নিজের ভুল যে বুঝতে পেরেছেন তাই-ই শুধু নয়, এ-ও দেখেছেন যে এক হাতেও তালি বাজে। এত সব অভিজ্ঞতার পর আর পক্ষপাতের কথা শুনতে তাঁর ভাল লাগে না। তিনি উঠে পড়লেন।

তখন সাড়ে সাতটা। চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলেই শুনতে পেলেন জিনা গান করছে।

আমার বেদনা আমি নিয়ে এসেছি,
মূল্য নাহি চাই যে ভালবেসেছি
কৃপাকণা দিয়ে আঁখিকোণে ফিরে দেখো না।
ডেকো না।

ঝুম্পা-মাম্পির গলাও এবার শুনতে পেলেন কল্যাণবাবু।

দূরে যাব যবে সরে তখন চিনিবে মোরে

আজ অবহেলা ছলনা দিয়ে ঢেকো না

ঢেকো না।

বারে বারে ঘুরে ঘুরে গাইছে। অর্থাৎ সংগীতশিক্ষার আসর বসেছে ওদের। তিনি নীচের ঘর দিয়ে সিঁড়িতে পৌঁছোলেন, সিঁড়িগুলো উঠলেন, দালান দিয়ে নিজের ঘরে গেলেন, মাঝের দরজাটা খোলা রয়েছে, ওপারেও আলো জ্বলছে। ঘরের মধ্যে হালকা আলো জ্বলছে—ধূপের গন্ধ। তিনি ছিলেন না। কিন্তু ঘরটা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আলো জ্বালিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত ছিল। তিনি হাতমুখ ধুয়ে এলেন, জামাকাপড় বদলালেন, আলো জ্বালালেন না, আরামচেয়ারে কাত হয়ে চোখ বুজিয়ে গান শুনতে লাগলেন। অনেকদিন পর খুব বেশি করে স্ত্রীর কথা মনে পড়তে লাগল। একটা মেয়ের বড় শখ ছিল আরতির। হয়নি। ছেলেদের দস্যিপনায় অস্থির হয়ে যেত। আজ থাকলে চার-চারটি বিভিন্ন বয়সের মেয়ের উপস্থিতি দেখতে পেত। এতো শুধু দেখারই জিনিস নয়। শোনার জিনিস, অনুভব করবার জিনিস। তাঁর ভাগ্য, তিনি দেখতে শুনতে পেলেন। রবীন্দ্রনাথের গানের অভিমানের সুর যেন তাঁকে লক্ষ্য করেও ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে আসছে। এরকম তাঁর মনে হল। তারপরে তাঁর মনে হল নাতনিদুটিকে কি তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দেন? মল্লিকাকে? জিনাকে? বিমানকে? নিখিলকে? বিমানের সঙ্গে যাও-বা রাত্রে খাবার টেবিলে কথাবার্তা হয়, নিখিলের সঙ্গে সেসব বন্ধ। যবে থেকে সে অশান্তি করতে শুরু করেছে, তার ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়েছে, তখন থেকেই তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। এটা কি ঠিক? ওদের জন্যে তাঁর মনখারাপ করে কি? খুব কম। তিনি যেন নিজের জীবনে ছেলেদের প্রয়োজন ছাড়িয়ে উঠেছেন। এ বাড়িতে তাঁরা থাকেন তিনজন আধা-পরিচিত মানুষের মতো। বিমান-নিখিলের থেকে মল্লিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেক বেশি। আর তাঁর প্রতি টান? ছেলেদের কি তাঁর প্রতি কোনও টান আর অবশিষ্ট আছে? বড়র যদি-বা কিছু থেকে থাকে, ছোট? বউমারা তাদের কর্তব্য অবশ্যই করে, ষোলোআনার জায়গায় আঠারোআনা। কিন্তু সত্যি সত্যি ভালবাসে কি? মেয়ে হলে যেভাবে বাসত। ক্রমশ ক্রমশ রবিঠাকুরের গানের অভিমান তাঁর নিজের হয়ে যেতে থাকল। তাঁর বয়সের হয়ে যেতে থাকল। পৃথিবীর যত যুবক-যুবতী, তাদের প্রতিই যেন তাঁর অভিমান, সমস্ত বুড়োমানুষের হয়ে। বয়স্করা তো অল্পবয়সিদের কৃপারই পাত্র। তাদের সমস্ত যত্ন-আদর সবটাই ছলনা। সত্যি তো একজন বৃদ্ধ হল বাতিল মানুষ, তার যা দেবার সব দেওয়া হয়ে গেছে। আর নতুন কিছু তার ভাণ্ডারে নেই। বাকি জীবনটা যাকে বলে আনপ্রোডাক্টিভ। আধুনিক পৃথিবী তো অনুৎপাদক মানুষকে মূল্য দেয় না। কর্ম ছাড়া আধুনিক সভ্যতার তালিকায় আর কিছু নেই। ভালবাসা একটা বাজে সেন্টিমেন্ট। সম্পর্কের টান পায়ের বেড়ি, হাতের শেকল। এগিয়ে চলতে হলে ওসব ভেঙে ফেলাই ভাল।

তিনি গান শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' একখণ্ড নিয়ে বসলেন। অবসর নেওয়ার পর থেকে কল্যাণবাবুর বইপড়া অনেক বেড়ে গেছে। এক ধরনের বই তিনি পড়েন না। পপুলার সায়েন্স, সহজ দর্শন, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস... নানা রকমের বইয়ে আগ্রহ তাঁর। আজকে গল্পগুচ্ছর একটা বিশেষ গল্প পড়ছিলেন। 'বিচারক'। গল্পটা পড়তে পড়তে তাঁর একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। এই গল্পটা 'মোস্ট আনরাবীন্দ্রিক'। এইভাবেই তিনি ভাবলেন। পতিতাদের কথা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আর রবীন্দ্রনাথ কতটুকু জানবেন? জানতেন না। সেইসব লোক যারা একটি স্বাভাবিক মেয়েকে 'পতিতা'য় পরিণত করে কিন্তু নিজেরা বেশ উঁচুতেই 'অপতিত' অবস্থান করে তাদেরও তিনি স্বরূপে জানতেন কিনা সন্দেহ। তবু, তাঁর স্বভাবজ পবিত্রতাবোধ, মানুষের প্রতি তাঁর অচল বিশ্বাস, তাঁর আভিজাত্য। সমস্ত সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এরকম একটা গল্প লিখলেন কেন? গল্পটা তিনি যদ্দূর বোঝেন—ভাল হয়নি। বড্ড সাজানো যেন। যে বিনোদ ক্ষীরোদাকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল, তাকেই জজ হয়ে বিগতযৌবনা ক্ষীরিকে ফাঁসির হুকুম দেওয়ার জন্য আনতে হল এবং তাকেই হঠাৎ ক্ষীরির অনুতাপ হয়েছে কিনা

দেখতে জেলখানার ভেতরে গিয়ে ক্ষীরির আংটিতে নিজের প্রতিকৃতি দেখাতে হল। সন্দেহ নেই একবার প্রলোভনে বাইরের পৃথিবীতে পা দিলে অবলা বালিকাদের ক্ষীরির গতিই হয়, এতেও সন্দেহ নেই প্রলোভনকারীর অনায়াসেই ভবিষ্যতে জজ-ব্যারিস্টার হয়ে সমাজের মুকুটমণি হয়ে ওঠাও কেউ আটকাতে পারে না। অবিচারের ধাঁচটা এরকমই, সেটাকেই রবিঠাকুর বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু কেন? রবিঠাকুরের মেজাজের সঙ্গে যেন গল্পটার বিষয়বস্তু খাপ খাচ্ছে না।

কল্যাণবাবুর মনে এ প্রশ্ন জাগছিল, কেননা এই বয়সে, পুরো একটা জীবন কাটাবার পর তিনি কোনও বই-ই আর শুধু সময় কাটাবার জন্যে পড়েন না। সময় কাটাবার হলে তো তিনি তাঁর বড় ছেলের মতো ব্রিজের আড্ডাতেও যেতে পারতেন। তিনিও খুব ভাল ব্রিজ খেলতে পারেন। আর তাসে যেমন সময় কাটে অন্য কিছুতেই তেমন কাটে না। আসলে তাঁর মনে হয় সারাজীবন তিনি কিছু শেখেননি, কিছু বোঝেননি, কিছু অনুভব করেননি, অথচ জীবনটা কী ভীষণ জটিল, পৃথিবীটাও কঠিনে কোমলে কী অদ্ভুত একটা জায়গা। জানা হল না, অথচ মৃত্যু থাবা গেড়ে অদূরে বসে আছে। মৃত্যু মানে শেষ। একটা অধ্যায়েরও শেষ হতে পারে, একেবারে শেষও হতে পারে। কিন্তু যাই হোক, তিনি ঠকে গেলেন। একেবারে শেষ যদি হয়, তো আর পাঁচজনে যা শেখে, যা জানে, যা গড়ে তিনি তার কিছুটা করলেন না, একেবারে নিরর্থক একটা অস্তিত্ব তাঁর। আর যদি একটা অধ্যায় হয় তা হলে এ অধ্যায় থেকে কিছু সংগ্রহ না করেই তিনি পরবর্তী অধ্যায়ের পাতা উলটোচ্ছেন। কল্যাণবাবু তাই এখন পড়েন প্রচণ্ড আগ্রহে, দাগ দিয়ে দিয়ে, এক কথা বার বার, এক বই বার বার। কোনও বিষয়ে আগ্রহে বেড়ে গেলে বইয়ের শেষে উল্লেখপঞ্জী দেখেন। আরও পড়েন।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, মৃদু ডাকে চোখ মেললেন।

—বাবা, ও বাবা, খাবেন না?

দিনেরবেলায় কল্যাণবাবু জিনার সঙ্গে খান। রবিবার বা ছুটির দিনে নিখিল থাকলে নয় অবশ্য। একেবারে না খেলে জিনার ভীষণ অভিমান হয়। আর সত্যিই তো, সে তো কোনও অপরাধ করেনি। শুধু শুধু তার মনে কষ্ট দেবেন কেন? কিন্তু রাত্তিরবেলায় তাঁর খাওয়া বড় বউমার রান্নাঘরে। চারজনে একসঙ্গে বসেন। মোটামুটি সব এগিয়ে দিয়ে মল্লিকাও বসে পড়ে। নাতনিদের গল্পস্বল্প, খুনসুটি, বিমানের স্বল্পবাক মন্তব্য, হাসি, মল্লিকার গল্পগাছা—সব মিলিয়ে রাতের আসরটা বেশ জমজমাট হয়।

আজ দেখলেন মল্লিকা তাঁর খাবার নিয়ে এসেছে। ছোট একটা টেবিলে রেখে টেবিলটা এগিয়ে আনছে। তাঁর শরীর-টরির খারাপ হলে অবশ্য এরকম ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু আজ শুধু শুধু....। তিনি বললেন, কেন বউমা? তোমরা কি ভাবলে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি বলে আমার শরীর খারাপ? কিচ্ছু হয়নি। এদের গান শুনতে শুনতে পড়তে পড়তে ঘুম এসে গিয়েছিল।

মল্লিকা বলল, কটা বেজেছে দেখেছেন?—সে আলোটা জ্বেলে দিল। সাড়ে দশটা।

—ওরে বাবা। ডেকে দিলে না কেন?

—ঝুম্পাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। বলল—অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ভাবলাম হয়তো কোনও কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। একটু ঘুমিয়ে নিন। ওদের সব খাইয়ে দিয়েছি বাবা।

—তার মানে তোমার হয়নি।

—এই আপনার হয়ে গেলেই...

—না, তোমারটাও নিয়ে এসো। একসঙ্গে খাই। কিংবা চলো টেবিলে যাই। আবার দুজনে নীচে নামলেন। খেতে খেতে মল্লিকা একটু কিন্তু কিন্তু করে বলল—একটা কথা বলব ভাবছিলুম বাবা।

—বলো—মনে মনে একটু শঙ্কিত বোধ করলেন তিনি। দুই পুত্রকে আলাদা করে দেওয়ার পরেও অশান্তি যায়নি। অশান্তির উৎস অবশ্য একটাই। ইদানীং জিনা খুব বুঝে চলে বলেই হয়তো অশান্তি খুব একটা টের পান না। অন্তত অশান্তিটা তাঁর কাছ পর্যন্ত পৌঁছোয় না। এক ছেলে তাস পিটে, আর এক ছেলে টাকা পিটে রাত করে বাড়ি ফেরে। দুই বউমা-ই একা। দুজনেই নিজের নিজের

মতো ভাল। তবে ছোটর সন্তানহীন জীবনে প্রকৃত শূন্যতাই থাকার কথা। এ তিনি বোঝেন। কিন্তু তাঁর তো কিছু করার নেই। যা তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে, আগ বাড়িয়ে সেই সমস্যায় নাক গলিয়ে তিনি করবেনটা কী? এখন ঘটা করে বড় বউমা কী বলতে চায়? নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু। ঠিক ভয় না পেলেও, তিনি সতর্ক এবং অনিচ্ছুক। ঝুম্পা যদি নিজে কোনও ছেলেকে পছন্দ করে থাকে? সেই কথা? সেই বিষয়েও তাঁর কোনও বক্তব্য নেই। বিমান-মল্লিকা তাদের মেয়ে সম্পর্কে যা ঠিক করবে তাই হবে। নাতনির ওপর জুলুম হলে তিনি হয়তো হস্তক্ষেপ করবেন। নইলে নয়।

—বাবা, কথা দিন কাউকে কিছু বলবেন না। যার সম্পর্কে বলছি তাকেও না।

—সর্বনাশ। এত শর্ত কেন? কী হয়েছে বউমা।

—জিনা বোধহয় আপনাকে বলেছিল ও একটা বয়স্ক-শিক্ষার ক্লাস নিতে যায়।

—হ্যাঁ, কিন্তু এই বয়স্করা কারা বলেছে কি?

—না তো। কারা।

—মানে ওই, ওই দিকে সোনাগাছির মেয়েরা... অনেক কষ্টে কথাগুলো বলে মল্লিকা মুখ নিচু করে।

—সোনাগা... বলতে বলতে প্রচণ্ড বিস্ময়ে কল্যাণবাবু হাতের গ্রাস নামিয়ে রাখলেন। তাঁর হাতটা একটু একটু কাঁপছে। একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটায় কাঁপছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ। রবিঠাকুর। উত্তর দিয়ে গেলেন। তাঁর সারাজীবনে কল্যাণবাবু কখনও এমন আবেগমথিত হননি। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। অবাক হচ্ছিলেন। কেন? 'ক্ষুধিত পাষাণ, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'অতিথি', 'মেঘ ও রৌদ্র'র রবিবাবু কেন 'বিচারক' গল্পটা লিখতে গেলেন? উত্তরটা এইমাত্র রবিঠাকুর দিয়ে গেলেন। তিনি ওটা লিখেছিলেন এক অনস্বীকার্য দায়বোধ থেকে। তিনি লেখক, যে-মুহূর্তে গল্প-উপন্যাসের জন্য কলম ধরলেন অমনই মনুষ্যসমাজ যা গল্প-উপন্যাসের প্রধান বিষয় তা দশভুজ মূর্তিতে উঠে এল তাঁর সামনে। দশভুজ, শতকোণী, সহস্রক্ষতচিহ্নিত মানুষের সমাজ। যখন তিনি সার্চলাইটের মতো তাঁর দৃষ্টি ঘোরাচ্ছিলেন এই অন্ধকার কোণে আলো পড়ল। শিউরে উঠে তিনি ভাবলেন এ নিয়ে লেখেননি তো। ভাবেননি তো! ভাবলেন, যতটা ভাবলেন লিখে উঠতে পারলেন না। রোমান্সের হাত ছিল, করুণার হাত ছিল, কিন্তু ঘৃণার হাত ছিল না তাঁর। তাই ক্ষীরির হাতে ফাঁসির সময়েও প্রেমের আংটি নিয়ে আকুলতার কথা তিনি লিখতে পারেন। আজকের লেখকদের হাতে পড়লে ওই আংটিটাকেই ক্ষীরি আগে ফাঁসি দিত। কিন্তু সত্যিই দিত কি? তিনি জানেন না পতিতাদের মধ্যে ঘৃণাও শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে কি না।

শ্বশুরের রকম দেখে মল্লিকার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। কী দুর্বুদ্ধি যে তার হয়েছিল।

কল্যাণবাবু বললেন, একটা এন. জি. ও-র স্কিমে কাজ করছে না জিনা!

—হ্যাঁ, ওর ওই বন্ধু মুকুট... আপনি একটু ডেকে যদি বলে দেন, কাজটা ভাল নয়.... তা হলেই...

—কেন বউমা? এর মধ্যে তুমি খারাপ কী দেখলে? আশ্চর্য হয়ে বললেন কল্যাণবাবু, এডুকেশনের কাজ, সে তুমি যাদের জন্যই কর, সব সময়ে ভাল, এটা জানবে মা। এত বড় দেশ। এত সমস্যা। একা সরকারের সাধ্য কী সব দিকে খুঁটিয়ে নজর দেয়। আমাদের সাধারণ নাগরিকদের, যাদের হাতে সময় আছে, অসুবিধে নেই, তারা যদি একটুও পারে, সে তো মস্ত আশার কথা। আমরা সকলেই যদি ভাবি—আমার ছেলেমেয়ে করবে না, ওরা করুক, ওদের ছেলেমেয়ে করুক, তা হলে আর কী করে কাজ হবে?

মল্লিকা দ্বিগুণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেনই বা বাবার প্রথমে অমন বাকরোধ হয়ে গেল? তারপর কেনই বা এত উদারতা দেখাচ্ছেন? মানুষটি রহস্যময়। এতদিনেও তাঁকে সে বুঝতে পারল না।—কিন্তু বাবা, জিনার ফিরতে প্রায়ই আজকাল সন্ধে হয়ে যাচ্ছে। ও নিজেই বলছিল ওই সময়ে আজেবাজে লোক ঘোরাফেরা করে। যদি কোনওদিন বিপদে পড়ে?

কল্যাণবাবুর দপ করে মনে পড়ে গেল—দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটের মোড়ে জিনা দাঁড়িয়ে আছে মাধুর্য

ও গরিমা বিস্তার করে, পেছনে দুটো সন্দেহজনক লোক। তিনি সামান্য একটু ভেবে নিয়ে খুব সহজভাবে বললেন, পাঁচটা নাগাদ তো? আমি ওকে আনতে গেলে হবে?

অতঃপর কল্যাণবাবু আসেন, যান। জিনার ছাত্রীরা বলে ওঠে—'ও দিদিমণি, ওই আপনার চলনদার এসে গেছেন।' জিনা কবজি উলটে দেখে তাই তো কাঁটা অনেকক্ষণ চারটে ছাড়িয়ে গেছে। দু-চারজন মেয়ে ক্রমে সাহস করে কাছে এসে বলে, মেসোমশাই পেন্নাম হই।

—আহা হা কর কী! কর কী। রোজ রোজ আবার পেন্নাম কী? কল্যাণবাবুর মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, তাঁর প্রৌঢ় মুখের সঙ্গে মানানসই ধবধবে সাদা চুল, মুখের শান্ত, ধীরভাব এগুলো মেয়েদের আশ্বস্ত করেছে। কাছে টেনেছে।

দুজনে ধীর কদমে বেরিয়ে আসেন। জিনা আর রিকশা করে না। হাঁটতে হাঁটতে চলে। কল্যাণবাবু জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে জিনা পড়ায়, কী কী শেখায়। সে যে যোগাসন, আর গানও শেখাচ্ছে, সিলেবাসের বাইরে হলেও, শুনে সমর্থনের মাথা নাড়েন তিনি। 'গল্পগুচ্ছ' আর 'গীতবিতান' অবলম্বন করে জিনা এগিয়েছে শুনে হতবাক হয়ে ছোট বউমার দিকে চান তিনি। বলেন, ঠিক বুঝেছ, এই মানুষটি একসঙ্গে এমন কাছে আবার এমন দূরে! জিনা মানে জিজ্ঞাসা করে এ কথার। তখন তিনি ব্যাখ্যা করেন কাছের রবীন্দ্রনাথকে ধরে কীভাবে দূরে সুদূরে নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার পাথেয় তিনি নিজে পান। চেনা মানুষ, চেনা ঘটনা অথচ কোথাও এক জায়গায় তারা অচেনা হয়ে যান, আমাদের দৈনন্দিতার জড়ানো পাঁক থেকে উঠে আসবার জন্যে ডাক দেন। এই ডাক আছে ঘটনাক্রমে চরিত্রগুলোকে উপস্থাপিত করবার ধরনে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে আছে ভাষায়। বাড়ি ফিরে দুজনে ঝুঁকে পড়েন 'গল্পগুচ্ছ'র ওপর। 'গীতবিতান' নিয়ে বসেন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর। 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া/বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া' কিংবা 'বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে'—এইসব অতি পরিচিত পঙ্‌ক্তির জীবনে কতরকম প্রয়োগ হতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা চলে। ক্রমশ এই আসরে মল্লিকাও যোগ দেয়। এবং অনতিবিলম্বে জিনার পাশে আর একটা ঘর জোগাড় করে আর একদল মেয়ের ক্লাস নিতে আরম্ভ করেন কল্যাণবাবু। এরা বাচ্চা মেয়ে, বালিকা, কয়েকটি ছেলেও আছে। গণিকাদের সন্তান। কয়েকটি মেয়ের তো ব্যবসায় নামবার বয়স হয়ে এসেছে। মুকুটের মতে—এদের বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই মায়েরা চাইছে না এরা ব্যবসায়ে নামুক। কিন্তু অন্য দিক থেকে চাপ আছে। খুব বেশিরকম। এবং সেই চাপ দেনেওয়ালরা চাইছে না কল্যাণবাবু বা আর কেউ এদের নিয়ে ক্লাস করুন।

জিনা বলল, কেন রে?

—ওদের ধারণা এইসব ক্লাস করলে মেয়েগুলোকে ব্যবসায় নামানো শক্ত হবে। মা আর মেয়ে দুজনে মিলে বেঁকে দাঁড়ালে ওদের মুশকিল।

কিন্তু তোদের সংস্থা যে এখানে কাজ করছে, এই এত মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, তাতে তো ওদের আপত্তি হচ্ছে না?

—হচ্ছে না, কেননা মেয়েগুলো তো ব্যবসা ছাড়ছে না। ছাড়লেই ওদের কাট-মানিতে টান পড়বে, তখনই ওদের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে।

—কিন্তু তোদেরও তো শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য এদের জন্যে অন্য ব্যবস্থা করা...

মুকুট একটু ইতস্তত করে বলল, জিনা তুই বোধহয় একটু ভুল বুঝেছিস রে। এখনও এইরকম টার্গেট আমাদের নেই।

—তা হলে?

—আমরা চেষ্টা করছি ওদের বেসিক এডুকেশন দিতে। স্বাস্থ্য-সচেতনতা জাগাতে। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক করে দিয়েছি, কতকগুলো ট্রেনিং সেন্টারও খুলেছি। যারা এইগুলো অবলম্বন করে স্বেচ্ছায়, নিজেদের কৃতিত্বে বাইরে চলে আসতে পারে আসবে। তবে দুঃখের বিষয়, বয়স্ক বা যাদের এখানে

রুজি নেই তারা ছাড়া বড় একটা আসছে না কেউ এখনও পর্যন্ত। এতজনের কর্মসংস্থান করি, সে সাধ্য আমাদের কই? তাই ওসব বলি না।

জিনার হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় মুকুটের অস্বস্তি হল। সে বলল, দারিদ্র আর জনসংখ্যা এই দুটো ফ্যাক্টর সমস্ত উন্নয়নের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় রে জিনা! তুই আগে জীবন রক্ষা করতে পারবি, তবে তো গুণমানের প্রশ্ন উঠবে? এত জীবন, এত! এত! একেবারে দুঃস্থ। পোকামাকড়ের মতো জন্মে যাচ্ছে। এরা তো তবু নিজেদেরটা যেমন করে হোক জুটিয়ে নিচ্ছে। আরও কত মানুষ আছে কোনওক্রমে আস্তাকুঁড় ঘেঁটে জীবনধারণ করছে। কতজন আছে—কৃষক ছিল, জমি গেছে, কারখানার শ্রমিক ছিল, কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। দেখছিস তো কাজ জানা লোকগুলো না খেতে পেয়ে কীভাবে আত্মহত্যা করছে।

উত্তরে জিনা বলল, তা হলে.. তা হলে মুকুট এডস্‌ তো বেশ ভাল জিনিস ছিল রে! জনসংখ্যা কমাবার নিশ্চিত উপায়। হোক না। হয়ে যাক না। বাধা দিচ্ছিস কেন?

—বলছিস কী? পুরো সভ্যতা, পুরো মানবসমাজই যে শেষ হয়ে যাবে রে?—মুকুট অবাক!

—সভ্যতা কাদের নিয়ে বল—জিনা বলল। সমাজটাই বা কাদের জন্যে? সবাইকে নিয়েই তো সভ্যতা। না কী? জীবনের গুণমান উন্নত করার নামই তো সভ্যতা! তা বেশিরভাগ মানুষই যদি এইভাবে বাঁচে, তা হলে মুষ্টিমেয়র সুখ আর নিরাপত্তার জন্যে প্রাণপণ এইসব চেষ্টায় তো ঠিক সভ্যতার বাঁচার প্রশ্ন থাকে না আর। সম্প্রদায়ের বাঁচা হয়ে যায়—সেটা সভ্যতা না অসভ্যতা। বেশ এসেছিল এডস্‌টা সময় বুঝে। কী সুন্দর ফাঁকা হয়ে যেত রাস্তাঘাট। বেড়ে উঠত বনজঙ্গল, বহুতল উঠত না, গ্রাউন্ড ওয়াটার শূন্য হয়ে আসত না। ইতিহাসে লেখা থাকত—কী করে মৃত্যু হল এই সভ্যতার। বইপত্তরের তো আর এডস্‌ হয় না! তারপর যে কটি লোক বেঁচে থাকত আবার নতুন করে শুরু করত। তাদের গাইড করার জন্যে বইপত্তরগুলো রয়ে যেত।

মুকুট আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল জিনার তীব্র মুখভঙ্গির দিকে। সুদ্ধু সময় কাটছে না বলে যে সুখী সম্পন্ন গৃহবধূ মেয়েটিকে সে সামান্য একটা আংশিক সময়ের প্রোগ্রামে ঢুকিয়েছিল, সে যে এমন সব প্রশ্ন তুলতে পারে তা তার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয় শত হোক এ তো সেই জিনাই যে ক্লাস-মনিট্রেস ছিল। আন্তরিকভাবে যে ক্লাসে শৃঙ্খলা ও সুবিচার রাখার চেষ্টা করত। সেই জিনা যে একটি মুখচোরা নতুন মেয়েকে ক্লাসসুদ্ধু মেয়ের ও টিচারদেরও মানসিক অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছিল। পরে, নিজেদের পরিবারের দাবি ওর ওপর ক্রমাগত বেড়ে গেছে। পরিবারের সংস্কার পরিবেশ ওকে একটা ঘরোয়া, নিষ্ক্রিয় জীবন বেছে নিতে বাধ্য করেছে। তবু এ তো সেই জিনাই। একেবারে সেই যাকে সে ছোটবেলায় কিশোর বয়সে চিনেছিল!

রোচনা

ঋত্বিকের 'রোচনা' চলছে রমরম করে। আসল বাড়িটা শেষ হওয়ার আগেই এক দিকে একতলা সাময়িক হস্টেল খাড়া করা হয়েছে। কিছুটা জমি একবার নিরঙ্কুশ খেলার মাঠ হিসেবে পিটিয়ে সমান করা। পুকুরটা চতুর্দিক থেকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। বাচ্চাদের দোলনা, স্লাইড ইত্যাদি হয়েছে একটা আলাদা পার্কে। পঞ্চাশজন বোর্ডার দিয়ে শুরু হয়েছিল রোচনা। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এদের। নানান বয়সের ছেলেমেয়ে। ঠিক কারা কোন কোন জায়গা থেকে আসবে এ নিয়ে মুকুটের সঙ্গে ঋত্বিকের একটু মতভেদ হয়। ঋত্বিকের মতে শুধু ছ'বছরের বেশি, এবং বারো বছরের কম বয়সি ছেলেমেয়েদের রাখা হোক। যত জনকে বিনা বাছাবাছি রাখা যায় ততই ভাল, এ বিষয়ে অবশ্য দুজনেই একমত ছিল। কিন্তু জায়গা সীমিত, একটা না-একটা মানদণ্ড স্থির করতেই হয়।

মুকুটের ইচ্ছে ছিল দশ বছর থেকে শুরু করে ওপরের দিকে যত দূর পর্যন্ত পারা যায়, ঋত্বিক তার যুক্তি এই বয়সটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। মেয়েগুলোকে এই সময়ে ব্যবসায় নামানোর তোড়জোড় শুরু হয়। এবং কী মেয়ে, কী ছেলে এই সময়টায় সচেতন হয়ে ওঠে। তারা কে, তাদের অবস্থান কী, সমাজ তাদের কী চোখে দেখে, এসব সম্পর্কে জ্ঞান টনটনে হয়ে উঠতে থাকে এই সময়টাতেই। কিছু কিছু মা মেয়ের জন্য ভিন্ন ভবিষ্যৎ চায় বই কী। কিন্তু সেখানেও একটা 'বিয়ে' বাদে আর কিছু দেখতে পায় না। মেয়ে বিয়ে করে ঘরসংসার করবে এটাই তাদের সবচেয়ে বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা। স্থানীয় ছেলে, অর্থাৎ বারাঙ্গনাদেরই পুরুষ সন্তানদের সঙ্গে এদের তথাকথিত বিয়ে যে হয় না, তা নয়, কিন্তু শেষোক্তদের বলতে গেলে কোনও উপার্জনই নেই। তারা বউকে খাটিয়ে, তার রোজগারেই খায়, আর মস্তানি করে। এই অপেক্ষাকৃত বড়দের কিন্তু ঋত্বিক 'রোচনা'য় স্থান দিতে একেবারেই ইচ্ছুক নয়। সে বলে—আমরা এখানে রিফর্মেটরি স্কুল খুলছি না মুকুট। পুনর্বাসনও আমাদের লক্ষ্য নয়। যদিও রিফর্মেটরি ও রিহ্যাবিলিটেশনেব গুরুত্ব আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমাকে ঠিকঠাক দক্ষভাবে কাজ করতে হলে আমার লক্ষ্যবস্তু স্থির করে নিতে হবে আগে; তারপর সেই লক্ষ্যবস্তুর চারপাশের অনাবশ্যক বাহুল্য ছেঁটে ফেলে দিতে হবে। আমার লক্ষ্যবস্তু হল এই যাচ্ছেতাই আবহাওয়া থেকে বাচ্চাগুলোকে বাঁচানো। কে কোথায় জন্মাবে সেটা যখন বেচারিদের হাতে নেই, তখন যে-শিশুরা দৈবাৎ বারোয়ারি মাতৃগর্ভে জন্মেছে, তাদের জীবনগুলো যাতে অভিশপ্ত হয়ে না ওঠে, সেটা দেখাই আমাদেব লক্ষ্য। ওদের একটা চান্স পাওয়া উচিত। ছয় থেকে দশের মধ্যে ছেলেমেয়েগুলোকে এখানে এনে শিখিয়ে পড়িয়ে যদি স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তা হলেই যথেষ্ট। এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে আরও কাজ হতে পারে, কিন্তু সেটা হবে আলাদা। তোদের প্রজেক্টে তোরা এরকম কিছু করার চেষ্টা কর না, সাহায্য করব। কিন্তু আমার কাজ হল—এইটা।

পঞ্চাশটা বাচ্চার জন্য আপাতত পাঁচটা ছোট ছোট ডর্মিটরি হয়েছে। প্রত্যেক ডর্মে একজন করে সুপার বা দিদি থাকেন। এই দিদিরাই এদের খাওয়াদাওয়া খেলাধুলো পডাশোনা সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ কবেন। রান্না ও অন্যান্য কাজের জন্য মোট চারজন লোক আপাতত রাখা হয়েছে। আর আছে বন্দুকধারী দারোয়ান। সকালে একজন, বিকেলে একজন। মাস্টারমশাইরা বাইরে থেকে যাতায়াত করেন। প্রতি মাসে একবার করে ঋত্বিক নিজে এদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। রবিবার এদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। একটা বাস কিনে দিয়েছেন একজন শুভার্থী। বেডাতে যাবার দিনে এদের সঙ্গী হয় পরিচালন-সমিতির সভ্যরা, নিজেদের ইচ্ছে এবং সুবিধামতো বাচ্চাদের মায়েদেরও পালা করে তাদের সঙ্গে বেডাতে যাবার সুযোগ দেওয়া হয়।

বাচ্চাদের এখানে নেবার আগে প্রত্যেক পল্লিতে ঋত্বিকরা ঘুরে ঘুরে প্রচার করে। সেই প্রচারের ফলে, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় যারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের 'রোচনা'র অভিভাবকত্বে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে, তাদেরই নেওয়া হয়েছে। অল্পস্বল্প প্রতিবন্ধী বাচ্চাদেরও ফেরায়নি ঋত্বিক। একটি মেয়ে আছে কুশ পা, একটি ছেলের মাত্র তিনটি আঙুল। একটি আছে বামন। কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে স্বাভাবিক। এদের যথাসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও সে করেছে। বলা বাহুল্য, আরও অনেক আবেদন এসেছিল। তাদের মধ্যে থেকে প্রথম পঞ্চাশটি গ্রাহ্য হয়েছে।

ভালভাবে চালু হয়ে গেছে প্রতিষ্ঠান। একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। এইসময়ে দুটি স্থানীয় মস্তানের সঙ্গে বেশ কয়েকটি মেয়ে তাদের এক 'বাবু'র নেতৃত্বে এসে হাঙ্গামা শুরু করল।

—কী ব্যাপার? কী চান আপনারা?

—আপনি যৌনকর্মীদের ছেলেমেয়েদের হস্টেলের নাম অনাথ আশ্রম দিয়েছেন কেন? ওরা তো অনাথ নয়।

'রোচনা'র পরিচয় হিসেবে প্রচারপত্রে বলা আছে এটি একটি পরীক্ষা ও গবেষণামূলক উচ্চশ্রেণীর অনাথ আশ্রম।

ঋত্বিক জবাব দেয়, স্ট্রিক্টলি স্পিকিং, ওরা অনাথই! নাথ কথাটার মানে এখানে বাবা। শিশুদের দায়িত্ব বাবারই নেবার কথা। সেই হিসেবে...

বাবুটি বলল, বাবা নেই, কিন্তু মা আছে। আমি একজন যৌনকর্মীর ছেলে। বুক বাজিয়ে বলব—ইয়েস, আমি যৌনকর্মীর ছেলে, তো হয়েছে কী?

—কিছু হয়নি। ঋত্বিক বলল, আবার হয়েছেও।

—কী বলতে চান আপনি? এখন উন্নত দুনিয়ায় 'সিঙ্গল পেরেন্ট' সিস্টেম চালু হয়ে গেছে। শুধু মায়ের পরিচয়েই পরিচয় গ্রাহ্য হচ্ছে। আর এখন আপনি বলছেন এরা অনাথ!

—দেখুন, সিঙ্গল পেরেন্ট বলতে যা বোঝায় এদের সেরকম কিছুও নেই। এদের মায়েরা এদের রক্ষণাবেক্ষণ, পালন করতে পারে না। এরা স্রেফ রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়, পড়ে থাকে।

—সে তো পালন অনেকেই করে না। আপনাদের বড় বড় চাকুরে বিবিরা কে কত বাচ্চা দেখে তা জানা আছে।

—অনেকে দেখতে পারে না ঠিকই। কিন্তু তবু বাচ্চাটার তো একটা আশ্রয় থাকে! সন্ধে থেকে তো তাকে ঘর থেকে বার করে দেয় না মা। দেয়? দেখাশোনা করার জন্য কাউকে মাইনে দিয়ে হলেও রাখা হয়। অনেক সময়ে হস্টেলেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

—বেশ তো সেইসব হস্টেলের নাম কি অনাথ আশ্রম?

—তা অবশ্য নয়। তবে যদি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবৈতনিক, দান-নির্ভর হয়, তাকে তো 'অরফ্যানেজ'ই বলবে। যেমন অনেক ক্রিশ্চান 'অরফ্যানেজ' আছে। বহু দরিদ্র মা, বাবা, বা দুজনেই সেখানে ছেলেমেয়েদের অনাথ পরিচয় স্বীকার করেই দিয়ে আসে।

—ও, চ্যারিটি বলেই এত অছেদ্দা?

—অছেদ্দাফেদ্দা নয় মশাই। আর শুনুন চ্যারিটি করছি বলে নয়। কিন্তু দেহ-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এই পরিচয়ে বড় হলে ওদের পরবর্তী জীবনে কাজকর্ম পেতে অসুবিধে হবে, বড় হলে পরিচয়টার মানে যখন জানবে, তখন নিজেদেরই হয়তো ছোট চোখে দেখবে।

—কেন দেখবে? আমি তো দেখি না! ইন ফ্যাক্ট, আমি গর্বিত।

ঋত্বিক এবার বিরক্ত হয়ে বলল, যাচ্চলে, গর্বিত হবার তো কোনও কারণ দেখি না। হ্যাঁ, এই পরিস্থিতিতে জন্মেও আপনি যদি বড় কিছু করতে পারেন, তখন গর্বটর্ব করতে পারবেন। না হলে জন্ম নিয়ে গর্ব করবার মতো কী ঘটেছে? আপনার মতো সৎসাহসই বা কতজনের আছে? আপনি পাড়ার গণ্ডির বাইরে কাজটাজ করতে গেছেন কি? যাননি। 'রোচনা'র ছেলেমেয়েদের আমরা নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। ছেলেরা যদি বা ওই পরিচয়ে বাঁচতেও পারে, মেয়েদের অসুবিধে হাজার গুণ। কেউ সুস্থভাবে বাঁচতে দেবে না।

—কেন? আমরা কি সুস্থভাবে বেঁচে নেই?

—একথার জবাব দিয়ে লাভ নেই। আপনি কি চাইছেন আপনাদের পাড়ায় যে মেয়েগুলো জন্মাচ্ছে, তারা ঘুরে-ফিরে এই ব্যবসাতেই আবার ফিরে আসুক?

পিছনে মেয়েগুলির মধ্যে একজন এইসময়ে বলে উঠল, আমাদের ব্যবসা খারাপ কী? ভিক্ষে তো করছি না। লোকে চাইছে তাই দিচ্ছি। এর মধ্যে আমরা অন্যায় কিছু দেখি না।

ঋত্বিক বলল, যাঁরা এরকম ভাবছেন, তাঁদের মেয়েদের আমরা রাখতে পারব না, তাদের এখান থেকে নিয়ে যান।

ছেলেটি বলল, কথাটার তো জবাব এড়িয়ে গেলেন। অন্যায় কী দেখলেন, বোঝান?

ঋত্বিক বলল, মাফ করতে হল ভাই, এ প্রশ্ন যে করতে পারে, তাকে ন্যায়-অন্যায় বোঝানো আমার কর্ম নয়। আর দেখুন একটা সময় ছিল, যখন এই মেয়েরা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারত দেহ বিক্রি করে শুধু যৌনতা-সম্বল প্রাণী হয়ে থাকা অপমানকর, লজ্জাকর, অমানবিক, কিন্তু এখন

আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ডকে গ্রাস করার জন্যে যে প্রচার আর চক্রান্ত চলেছে, তাতে এদের আপনাদের সহজ বুদ্ধিটি ঘেঁটে যাচ্ছে। এরপর তো বলবেন শিক্ষকরা বিদ্যা বিক্রি করেন, ডাক্তাররা চিকিৎসা বিক্রি করেন, লেখকরা কল্পনা বিক্রি করেন। সেক্স বিক্রিটা আলাদা কীসে? ওসব বহুৎ শোনা আছে আমার, আমি আমার নিজের শর্তে সুস্থ মানুষ তৈরি করব এখানে। যাঁরা এখানে ছেলেমেয়ে পাঠাচ্ছেন তাঁরা এই শর্তই পছন্দ করছেন। আপনারা এবার আসুন।

স্থানীয় মস্তানদুটির দিকে একবারও তাকাল না সে। খুব ভাল করেই তার জানা আছে কনট্র্যাক্টরের কাছ থেকে মোটা দর্শনী আদায় করে ছেড়েছে ছোকরাদুটি। এখন অন্য ফ্রন্টে ভিড়ে চাপ সৃষ্টি করার মানে কী? দুর্নীতিরও একটা নিয়ম আছে। সেটা পালন না করলে বিপদে পড়তে হয়। তারও ওপরমহলে কিছু মামা-কাকা আছে। বেশি ত্যান্ডাইম্যান্ডাই করলে সে এদের দেখে নেবে।

মুকুট জিনাকে নিয়ে সেদিন সামান্য আগে ঢুকেছিল। গোলমাল দেখে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। দলটা ক্যাচরম্যাচর করতে করতে চলে গেল। মেয়েগুলোর দাপট ছেলেটির দ্বিগুণ। চোখ ঘুরছে, হাত নড়ছে, মুখ নড়ছে।

ঋত্বিকের ভুরু কুঁচকে ছিল। মুকুটের সঙ্গে তার বান্ধবীকে দেখেও সোজা হয়নি। রুক্ষ স্বরে বলল, কী রে? বসতে বলতে হবে নাকি?

মুকুট মিটিমিটি হেসে বলল, এত মেজাজ খারাপ করলে হবে?

—দেখ মুকুট—ঋত্বিক বলল, এটা আমার কেরিয়ার ঠিকই। কিন্তু মিশনও। আমি আমার স্বার্থের জন্যে কালোকে সাদা আর সাদাকে কালো বলতে পারব না। অন্য কেউ বলবার চেষ্টা করলে, কেন বলছে বুঝতে তো আমার বাকি থাকে না। দাবড়ানি খাবেই।

—ধৈর্য! ধৈর্য ধরে না বোঝাতে পারলে তোর কাজটাই মার খাবে।

—রাখ তো! অন্ধকে তুই আলো চেনাতে পারবি? জন্মান্ধকে যদি বলিস এই যে ভাই এই ফুলটা লাল, এখন চাঁদ উঠেছে, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে চারদিক, সে বুঝতে পারবে? তাকে প্রথমে মেনে নিতে হবে। মেনে নিয়ে এবার সে তার অন্য বোধগুলো দিয়ে ধরবার চেষ্টা করুক চাঁদ ওঠাটা কেমন, ফুলের লাল রংটা কেমন...। নিজের মতো করে বুঝুক। এখন যদি কেউ তাকে বোঝায়—ও হে, ওসব চক্ষুটক্ষু কিছু নেই, পৃথিবীটাকে তুমি যেরকম বুঝছ পৃথিবীটা সেরকমই। আর এই যে তোমার চারপাশে অন্ধকার এটা নিয়ে দুঃখু বরবার কিছু নেই, এটা একটা চমৎকার অবস্থা। তা হলে সেই লোকগুলোকে কী বলতে ইচ্ছে করে বল!

জিনার দিকে তাকিয়ে ঋত্বিক গলা নিচু করে বলল, স্যরি। তারপর মুকুটের দিকে তাকিয়ে বলল, যা না তোরা যা, আমি একটু পরে আসছি।

মাঘের রোদ বাসন্তী রঙের। ঘাসের রং গাঢ় সবুজ। ইংরেজি বড় হাতের ই-শেপ বিল্ডিংটার ঢালাইয়ের কাজ হয়ে গেছে। কাজেকর্মে, মিস্ত্রিদের জটলায় ওদিকটা সরগরম হয়ে আছে।

জিনা আগে যখন এসেছে কাজ এতটা এগোয়নি। এখন ব্যাপারটা কত বড় ভাল করে বোঝা যাচ্ছে। শ'তিনেক বাচ্চার ব্যবস্থা থাকছে। বারোজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার, একজন চিফ।

সকলকেই তো মহিলা-ই রাখতে হবে। —জিনা জিজ্ঞেস করল।

—এইটাই আমাদের খুব ভাবাচ্ছে রে জিনা.... মুকুট বলল, ছেলেগুলোর একটু পুরুষ-অভিভাবক চাই-ই চাই। আর ছেলেমেয়ে সবারই একটা ফাদার ফিগার প্রচণ্ড দরকার। সেইজন্যেই মাস্টারমশাইদের সবাইকে পুরুষ রাখা হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে রাখতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তাতে বিপদ আছে বুঝিসই তো। হস্টেলে যেটা হয়, ছেলেদের হস্টেলে ছেলে, মেয়েদের হস্টেলে মেয়ে—এই ভাগটা এখানে করা যাচ্ছে না, বুঝলি?

—কেন? ছেলেদের আর মেয়েদের একদম আলাদা ব্যবস্থা করলেই তো পারতিস!

—সেটা সংখ্যার ওপর খানিকটা নির্ভর করছেই। ধর এখন যে পঞ্চাশজনকে নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে তাদের মধ্যে চল্লিশজনই মেয়ে।

—বলিস কী রে? এরকম কেন?

—এইরকমই রেশিও ছেলেমেয়েদের। এটা আমরা আগে বুঝিনি। কাজ করতে গিয়ে নজরে এসেছে। এ নিয়ে কোনও সার্ভে নেই। এখন সত্যি রেশিও এই, না মেয়েগুলোকেই এরা হস্টেলে বেশি পাঠাচ্ছে, আমরা বুঝতে পারছি না। সবচেয়ে বড় যাদের নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে মোটে তিনজন ছেলে। ধর, বারো বছর থেকে মোটামুটি ওদের মেল সুপারের কাছে থাকা দরকার বলে আমরা মনে করি। বছর তিনেক সময় হাতে পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে ভেবে-চিন্তে ঠিক করতে হবে কী করা যায়। বিদেশি মডেলগুলো স্টাডি করতে হবে। মুশকিল কী জানিস? এসব কাজে 'মেল' পাওয়াও এখানে খুব দুষ্কর। মানে 'কোয়ালিটি মেল'। তুই বিজ্ঞাপন দে, অজস্র দরখাস্ত পাবি, কিন্তু বাচ্চাদের নিয়ে, বিশেষত এই বাচ্চাদের সারাদিন দেখাশোনা করতে রাজি হবে এরকম 'মেল' তুই পাবি না। বকাটে ছেলে, কিংবা একেবারে ভোঁদা, কোথাও কোনওরকম গতি হচ্ছে না, এরকম আছে। কিন্তু তাদের নিলে কাজের থেকে অকাজই হবে বেশি। অথচ তুই ফিমেল খোঁজ যথেষ্ট পেয়ে যাবি। ভদ্র, সভ্য, বাচ্চাদের ওপর একটা স্বাভাবিক মমতা আছে, দরকার হলে শাসন করতেও পারে, ডিসিপ্লিন্‌ড্‌, সবচেয়ে বড় কথা ইচ্ছুক, দক্ষতা যদি একশো ভাগ না-ও থাকে, কিছু এসে যায় না। শিখে নেয়।

—তা উপায় যখন নেই, ফিমেল দিয়েই চালা।

মুকুট বলল, কী জানিস, ফ্যামিলির গঠনে পুরুষদের একটা মস্ত বড় ভূমিকা থাকে। যতই তুই 'সিঙ্গল পেরেন্ট' কনসেপ্ট চালু কর।

—সেটা তো নিরুপায় হয়েই করা, তাই নয় কি?—জিনা জিজ্ঞেস করল।

—তা তো বটেই। পরিবার হবে ব্যালান্সড্‌। নারী পুরুষ উভয়ে নিজের নিজের জায়গায় থাকলে ভারসাম্য থাকে। এইসব পল্লিতে পুরুষ-সংসর্গহীন যে ছেলেগুলো বেড়ে ওঠে তারা কেমন আধাপুরুষ মতো তৈরি হয়, এদিকে আধাপুরুষ, ওদিকে আবার অত্যাচারী শোষক টাইপ, মায়েরা খুব আশকারা দেয় তো। তো আমরা সেইজন্যেই টিচারদের সব পুরুষ রেখেছি। আর যখন ওরা বেড়াতে যায় তখনও মাস্টারমশাইদের ডিউটি দেওয়া হয়।

কথা বলতে বলতে দুজনে গাছের তলার দুটো ক্লাস পার হল। শীতের রোদ গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে গায়ে এসে পড়েছে। বছর আট-নয়ের জনা দশেক বাচ্চার দল। একটা দল নামতা মুখস্থ করছে, আর এক দল একসঙ্গে কবিতা বলছে—বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস বাপু রে...। বাকি তিরিশজন ভেতরের ঘরে পড়াশোনা করছে। আপাতত ওদের ছবি আঁকার সময়। রং-পেনসিল আর কাগজ নিয়ে বসে গেছে।

জানলা থেকে দৃশ্যটা দেখছিল দুজনে। ব্রাউন আর সাদাতে পোশাক ওদের। পরিষ্কার ইস্ত্রি করা। চুলগুলো পাট করে আঁচড়ানো; ছেলেমেয়ে উভয়েরই চুল ছোট করে ছাঁটা। দেখতে দেখতে জিনা বলল, দেখলে একদম বোঝা যায় না।

—কী?

—এই ... যে... বাবা নেই!

—বাবা তো একটা না-একটা আছেই—মুকুট হেসে বলল, তা ছাড়া সবাই কিন্তু পিতৃপরিচয়হীন নয়। কারও কারও পাড়াতেই বাবা রয়েছে, দালাল-টালাল। অনেকের আবার রেগুলার্স থাকে তো। 'বাবু' যাকে বলে। এদিকে আয়, ওই যে পুঁচকেটা বসে আছে দেখ... খাড়া খাড়া চুল, গোলচোখো... ওইটা তোর বনমালার ছেলে। বনমালার ভদ্রলোক বাবু আছে। তারই ছেলে।

—কী মিষ্টি বাচ্চাটা, বলতে বলতে জিনার মুখটা তালশাঁসের মতো সজল, ভারী হয়ে এল।

সে বলল, দেখ মুকুট, কোনও কিছু নিয়েই খুব একটা হা-হুতাশ করবার অভ্যেস আমার নেই। যারা পালন করতে পারবে না, তাদের না-চাইতেই কেমন বাচ্চা, অথচ আমি চাই, একটা হলে বেঁচে যেতাম, অথচ কী অবিচার দেখ...

মুকুট বলল, দূর, তোর কি সময় চলে গেছে? কতটুকু বয়স তোর?

—না আর হবে না—গোঁয়ারের মতো বলল জিনা।

—কেন? ডাক্তার দেখিয়েছিস। ছোটখাটো অসুবিধে থাকলে সার্জারি করিয়ে নে। চিকিৎসা করা।

—কিচ্ছু নেই। ডাক্তার দেখিয়েছি। আর চান্স নেই। জাস্ট ব্যাড লাক।

—ডাক্তার বলেছেন?

—বলেননি। আমি বলছি।

—যাঃ, তুই তো এ রকম হতাশ-টাইপ ছিলি না!

—এখনও নেই, এই ব্যাপারটাই আমার কেমন ডিফিডেন্স এসে গেছে।

—তোর বর? বরকে দেখিয়েছিস?

—ওরে বাবা, তাকে কে বলবে? এক ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দেবে। বলবে আমাকে যে কিম্পুরুষ প্রমাণ করবে সে এখনও মায়ের পেটে।

—খুব দোর্দণ্ডপ্রতাপ নাকি রে, তোর বর?

—ওরে বাবা!

—তা সে যত দোর্দণ্ডই হোক, অনেক সময়ে অনেক কারণে হয় না। ডাক্তারের পরামর্শ নে। নিতে বল। এটা ঠিক করছিস না।

এইসময়ে ঋত্বিক পেছন থেকে এসে বলল, খালি সব্বাইকে ঠিক করছিস না, ঠিক করছিস না.... ভেবেছিস কী বল তো!

ওরা চমকে পিছনে তাকাতে ঋত্বিক বলল, ঠিক করা না-করা বিষয়ে মুকুট নিজের সিদ্ধান্ত দিনে কতবার ঘোষণা করে জিজ্ঞেস করো তো জিনা...

সকাল দশটা নাগাদ নিখিল বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছে জিনা। বেশির ভাগ দিনই নিজের ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত থাকে। রোচনায় আসবার সময় পেলেও সারাদিন কাটাতে পারে না। আজ সারাদিনের প্রোগ্রাম করে এসেছে।

ঋত্বিক বলল, আমাদের একজন মূল্যবান যোগ হয়েছেন।

জিনা বলল, মানে?

মুকুট বলল, ভ্যালুয়েবল অ্যাডিশন বলতে চাইছে রে।... দুজনে হেসে অস্থির।

ঋত্বিক অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, একজন নতুন সুপার এসেছেন। চমৎকার মানুষ, ঠিক আছে তো?

যেখানে বাচ্চাদের ডাইনিং রুমে সব লাইন করে নিজেদের স্টেনলেস স্টিলের খোপ খোপ থালি নিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে এক বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে ইশারায় দেখাল ঋত্বিক। জিনা চাপা গলায় বলল, ইনি? তোমার মূল্যবান যোগ।

ঋত্বিক ঠাট্টা-ইয়ার্কি গ্রাহ্যই করল না। বলল, এঁর হিস্ট্রি শোনো। এক বৃদ্ধাশ্রমে তিন মাস ছিলেন। দুই ছেলে দুই বউ দুজনেই ছোট্ট ছোট্ট কৌটোর মতো ফ্ল্যাটে থাকে। ছেলেমেয়ে বড় হতে আর মায়ের জায়গা হতে চায় না। নিজের উইডো-পেনশন আর কিছু এফ. ডি-র সুদ হাতে ছিল, সেই সম্বল করে উনি বৃদ্ধাশ্রমে এসে উঠেছিলেন। ভাল লাগছিল না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে একদিন সোজা এসে উপস্থিত। বললেন—গ্র্যাজুয়েট মা হতে পারি, কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশনে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছিলুম। হিস্ট্রি, ইকনমিক্স, লজিক ছিল, ফোর্থ সাবজেক্ট ম্যাথমেটিক্স। শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র মুখস্থ, রবীন্দ্রনাথ সব পড়েছি বলতে পারব না, কিন্তু প্রায় সব। কত যে গল্প জানি তার ইয়ত্তা

নেই। নাতি-নাতনিদের সমস্ত ভার ছিল আমার। তুমি আমাকে এক মাস রেখে দেখো।

মুকুট বলল, উনি এদের পরিচয় জানেন?

—অফ কোর্স।

—কী বললেন?

বললেন?—ঋত্বিক হাসতে হাসতে বলল, উনি ছড়া কেটে বললেন—শিশু হল শিশু, শিশু মানেই যিশু, আমার কোনও ইতর বিশেষ নেই।

—তারপর?

—তারপর.... ওঁকে তো এরা দিদা বলে। ভীষণ পপুলার... রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর একটা গল্প বলার সেশন হয়। বাচ্চারাও শোনে, তাদের দিদিরাও শোনে। উনি আমার এক অমূল্য...

জিনা বলল, 'যোগ'—না না—ঋত্বিক বলল—মনে পড়েছে 'সংগ্রহ'—'অমূল্য সংগ্রহ'। থ্রি-টিয়ার ফ্যামিলি স্ট্রাকচারের সবচেয়ে ওপরের স্তরটা না চাইতেই এইভাবে পেয়ে গেছি। এর মধ্যে উনি আবার বাচ্চাদের জ্বর, পেটের গোলমাল, কানব্যথা এ সব আমাদের সাহায্য ছাড়াই সারিয়ে দিয়েছেন। সারা অঘ্রাণ মাস বড়ি দিলেন, ছেলেমেয়েরাও ওঁর সঙ্গে বড়ির নাক তুলল টেনে টেনে। আচারও করেছেন প্রচুর। সরস্বতী পুজো আসছে, বলছেন—কিচ্ছু ভেবো না বাবা, সমারোহ করে সরস্বতী পুজো করব। রান্নার মেনু ঠিক করেন, কীভাবে কী করতে হবে বলে দেন। সব্বাই বলে মা। সব্বাই মেনে নিয়েছে। আমরা বলি সুধাদি।

জিনা যেখানে পড়াতে যায় আর ঋত্বিকের এই 'রোচনা' দুটোতে পরিবেশের দিক থেকে আকাশ-পাতাল তফাত। খুব লোভ হচ্ছিল এখানে কাজে যোগ দেবার। কিন্তু তার কাজটাও তো একটা চ্যালেঞ্জ। সে কি চেষ্টা করলে এই বাচ্চাদের মায়েদেরও এরকম একটা সুন্দর জীবন দিতে পারে না? সবাইকে না পারে, কয়েকজনকে সে এ প্রফেশন ছাড়াবেই। খুব ভাল প্রোগ্রেস করছে তার পূর্ণিমা আর বনমালা। রাখিও মন্দ করছে না। বাকিদেরও মন লেগেছে। পূর্ণিমার লেখাপড়ায় মাথা বেশি। বিশেষ করে অঙ্কে। এত তাড়াতাড়ি সে পাটিগণিতের যাবতীয় সমস্যা ধরে ফেলতে পারছে যে তার দিদিমণিই এক এক সময়ে বেকায়দায় পড়ে যাচ্ছে। তাকে অঙ্কগুলো নিয়ে শ্বশুরমশাইয়ের কাছে বসতে হচ্ছে অনেক সন্ধ্যায়। বনমালা অত মেধাবী নয়। কিন্তু সে পড়তে ভালবাসে। গোয়েন্দাগল্প পড়ার শখ খুব। গান শিখেছে খুব ভাল। গলাটা অন্যদের মতো অমার্জিত নয়। বেশ একটা ঝঙ্কার আছে গলায়। কিন্তু জিনার জেদ, পূর্ণিমা আর বনমালাকে একসঙ্গে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসাবে। সিলেবাস ধরে ধরে একটু একটু পড়াতে শুরু করেছে সে। মুকুট অনেকবার বলেছিল—ওদের পরীক্ষা পাস করবার কোনও প্রয়োজন নেই। নিজেদেরটা বুঝে নেবার মতো শিখলেই হল। কিন্তু জিনা তার কথায় কর্ণপাত করেনি। মুখে সে আজকাল কিছু বলে না। তর্ক করে তো কোনও লাভ নেই। কিন্তু তার নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী কাজে কারওই বাধা দেওয়ার অধিকার নেই বলে সে মনে করে। কল্যাণবাবুও মোটের ওপর তার সঙ্গে একমত। যদিও তিনি জিনার মতো অতটা আশাবাদী নন।

একটা সেবামূলক কাজের পথ ধরে যে জিনার জীবনে একটা লক্ষ্য এসেছে, স্থিতি এসেছে, এতে কল্যাণবাবু ভেতরে ভেতরে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করেন। তাঁর ধারণা যদিও জিনা খুবই ভদ্র মেয়ে তবু এই সন্তানহীনতার সূত্রে স্বামীর সঙ্গে তার একটা তিক্ততার সম্পর্ক হয়ে যেতে পারত। নিখিলের কোনও হেলদোল নেই। সে পিতা হতে পারল কি পারল না, তার স্ত্রী সুখী কি সুখী নয়, যদি না হয় সেজন্য কী করা দরকার, কিছু করা দরকার কি না, এ সমস্ত চিন্তাই যেন তার চরিত্রের বাইরে। সে আজকাল রাত দশটা-এগারোটা করে বাড়ি ফিরলে নিজের ঘর থেকেই কল্যাণবাবু অনেক সময়ে শুনতে পান জিনা সিঁড়ির ওপর থেকে অর্ধেক হাসি অর্ধেক অনুযোগের সুরে বলছে—এই যে 'নমো যন্ত্র?' এলেন? নমো যন্ত্র, নম টাকায়, নম অফিসায়, নম অফিসস্য চেয়ারায়, নমো নমঃ।

নিখিল বলছে, ছ্যাবলামি করো না রাতদুপুরে।

—রাতদুপুরে বাড়ি ফিরলে ছ্যাবলামিটা তো রাতদুপুরেই শুনতে হবে। আর কখন শোনাব?

যেদিন ওদের ক্লাবে বা অন্য কোথাও পার্টিতে যাবার থাকে, জিনা ক্লাস সেরে তাড়াতাড়ি ফেরে, কল্যাণবাবুকেও তাঁর ক্লাস তাড়াতাড়ি ছাড়তে হয়। ফিরতে ফিরতে জিনা বলে—আচ্ছা বাবা, ওদের ক্লাবের মিসেস কাপুর, মিসেস নায়ার, মিসেস কারনানিদের একদিন করে একটু অবিনাশ কবিরাজে ক্লাস নিতে বললে কেমন হয়? বেশ বলব—দুপুরের কিটি-পার্টিটার বদলে একদিন আপনাদের একটা দুর্দান্ত জায়গায় নিয়ে যাব। বলেটলে... সার সার ওপেল, এস্টিম, হোন্ডা সব থাকবে সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু-এর ওপর... বলতে বলতে জিনা তার স্বভাবসিদ্ধ হাসিটা হাসতে থাকে। এখন সে কল্যাণবাবুর সঙ্গে অনেক স্বচ্ছন্দ হয়ে গেছে। পুরনো শ্বশুর-ছেলেবউ সম্পর্কটা যেন একটা নতুন সমীকরণে এসে দাঁড়িয়েছে। নিখিলের থেকে জিনা তাঁর অনেক বেশি কাছের মানুষ। এমনকী কাকে তিনি বেশি চেনেন, কার সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্কটা এটাও অনেক সময়ে গুলিয়ে ফেলছেন কল্যাণবাবু।

বিয়েবাড়ির পরে

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে অবশেষে ঋত্বিক-মুকুটের বিয়েটা ঘটল। দু জনেই জানে বিয়েটা হবে, অথচ কেউই উদ্যোগ করে কথাটা পাড়ছিল না। ঋত্বিকের দিকে বাবা-মা কেউই নেই। কিন্তু মুকুটের আত্মীয়স্বজন অগুনতি। মুকুটের মা শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন, মুকু, তুই-ই বরং ওকে প্রপোজ কর, ছেলেটা কাজপাগল তো। ভুলো-মতো।

মুকুট হাঁ হাঁ করে উঠেছিল। কিন্তু তার বাবা শ্লেষের হাসি হেসে যখন বললেন, 'এই তোর আধুনিকতা? এই তোর নারীবাদ!' তখন বেচারি হার স্বীকার করে নেয়। পরদিনই ঋত্বিককে গিয়ে বলে—তোর পাগলামোর জন্যে আমাকে আর কত গালমন্দ শুনতে হবে?

ঋত্বিক অবাক হয়ে বলে, আমার জন্যে তোকে? গালমন্দ? ব্যাপার কী বল তো!

—বিয়েটিয়ে করবি তো আমাকে? না শুধু ওয়ার্কিং পার্টনার? খোলাখুলি বল তা হলে আমি অন্য জায়গায় মানে অন্য পাত্রফাত্র খুঁজি।—মুকুট বলে।

—যাচ্চলে! তোর এ কথাটা এতদিন বলিসনি কেন? অন্য পাত্রফাত্র হাটা। আমি রেডি।

তবে বিয়ে উত্তর-আধুনিক। নো পুরোহিত, নো সপ্তপদী, নো সম্প্রদান, নো বরমাল্য, নো সিঁদুর। মুকুটের মা রাগ করে বললেন, রেজিস্ট্রেশনটাই বা তা হলে ইয়েস কেন? লিভ-টুগেদার করলেই বা ক্ষতি কী ছিল?

রিসেপশন হল মুকুটদের বাড়ির কমিউনিটি লন-এ। নিমন্ত্রিত বেশি নয়। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব। তবে জিনাদের পুরো পরিবার নিমন্ত্রিত। কেননা, ক্রমশ ক্রমশই জিনার দিদিভাই, জিনার বাবা অর্থাৎ শ্বশুর, জিনার দুই ভাসুরঝি এদের সঙ্গে মুকুটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। জিনা ছাড়াও মল্লিকার সঙ্গে মুকুটের কথাবার্তা হয় ফোনে। কল্যাণবাবুর সঙ্গে আলাপআলোচনাও মুকুটের কম হয় না ইদানীং।

দেখা গেল মুকুট আর ঋত্বিকই আদর-অভ্যর্থনা, খাওয়ানোদাওয়ানোর ব্যাপারটা সামলাচ্ছে। মুকুটের মা আশ মিটিয়ে সেজেছেন। কাকিমা, মাসিমা, বোনেরা সবাই। খালি মুকুটই কোনওমতে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীল রঙের একটা সিল্ক। কিন্তু বাকি চেহারা সেই একরকম। কোনও গয়না-ই সে পরবে না। পরলে নাকি তাতে গোরুচোরের মতো দেখাবে। ঋত্বিক আর এক কাঠি বাড়া, ধুতি পাঞ্জাবি তো নয়ই, পায়জামা পাঞ্জাবি পর্যন্ত নয়। সুটফুটও নয়। সে স্রেফ আগের দিনে পাটভাঙা ট্রাউজার্সের সঙ্গে একটা ধোপদুরস্ত শার্ট পরেছে। টি-শার্টটা নাকি কোনওক্রমে খোলানো

গেছে। তার ওপরে লেখা ছিল ক্যালিফোর্নিয়া ব্লু।

তবে জিনাদের উপভোগের ঘটনা বড় কম ঘটল না। এক মাসি মুকুটকে খুব সুন্দর কানবালা উপহার দিয়েছেন। তাঁর আবদার সেটা তাকে এক্ষুনি এখানেই পরতে হবে। মুকুট অবলীলায় জমকালো কানবালাগুলো কানে গলিয়ে নিল। কান পর্যন্ত ছোট চুল, তেলা মুখ, চুল উড়ে কপালটা ঢেকে গেছে। শাড়িটাকে অদ্ভুতভাবে পরেছে। আঁচলটা পুরো সামনে টেনে এনে কোমরে গুঁজে নিয়েছে। হঠাৎ কানে ঝলমলে কানবালা পরায় যে মজাটা হল তাতে ঋত্বিকও যোগ দিল। মুকুট বলল, দেখ আমার কোনও ইয়ে নেই। মাসি আদর করে দিয়েছে, না পরলে কান্নাকাটি করছে, তো ঠিক আছে বাবা, পরে নিচ্ছি।

সেই শুনে তার এক কাকিমা ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন, 'এত বড় কথা। মাসিরটা পরবি, আর কাকিরটাই দোষ করল? আমার হারটা যদি না পরিস তা হলে কেউ আর আজ আমাকে জলগ্রহণ করাতে পারবে না।' তিনি একটা জমকালো হার পরিয়ে দিলেন মুকুটের গলায়। এভাবেই হাতে বালা পরানো হল, কোন পিসি আত্মঘাতী হবেন বলায়।

তখন ঋত্বিকের কাকা একটা আংটি নাচিয়ে বললেন, 'বাপধন, সকলকার সব কথাই যখন থাকছে, তখন তোমার এই বৃদ্ধ কাকার কথা মেনে আংটিটা না হয় বউমার আঙুলে পরিয়েই দিলে!'

কাকার বয়স বোধহয় সবে পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে।

শুনে ঋত্বিক হঠাৎ তৎপর হয়ে বলল, 'আংটি? পরাতে যদি হয়ই কাকু তা হলে তোমার আংটি কেন, নিজের আংটি আমি নিজেই পরাব।'

ওস্তাদ জাদুকরের মতো সে শূন্যে হাত বাড়িয়ে একটা চমৎকার মুক্তোর আংটি বার করল এবং শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে সেটা মুকুটের আঙুলে পরিয়ে দিল।

মুকুটের মা নিশ্বাস ফেলে জিনাকে বললেন, যাক বাবা, তোর বন্ধুটা তা হলে একেবারে ছন্নছাড়া বাউন্ডুলের পাল্লায় পড়েনি। মিনিমাম একটা সেন্স্ আছে।

মুকুট কিন্তু রাগ করে বলল, ও যেন এক্সপেক্ট না করে আমিও ওকে এখন আংটি পরাব। কেননা, আমাদের মধ্যে পরিষ্কার কথা হয়ে গিয়েছে যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য কোনও রকম অনুষ্ঠানই আমরা পালন করব না। আংটিমাংটিই যদি হবে তা হলে মালাই বা কী দোষ করল?

বলবার সঙ্গে সঙ্গেই কে বা কারা রজনীগন্ধার দুটো মোটা মালা একটা মুকুটের হাতে আরেকটা ঋত্বিকের হাতে ধরিয়ে দিল। মালাবদলও হয়ে গেল তুমুল হল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে। ঋত্বিক সঙ্গে সঙ্গে মালাটা খুলে জিনার হাতে দিয়েছিল। মুকুট কিন্তু সেই মালা গলায় পাঁচমিশালি গয়না পরেই কোমরে আঁচল গুঁজে নিমন্ত্রিতদের খাওয়া-দাওয়ার তদারকি করতে লাগল।

বরকে অনেক কষ্টে নিয়ে এসেছে জিনা। বিমান কিছুতেই এলেন না। চেনেন না, শোনেন না, স্ত্রীর পরিচয়ে নেমন্তন্ন যাওয়া এমন কথা তিনি নাকি কখনও শোনেননি। নিখিল এসেছে জিনাকে নিয়ে। কল্যাণবাবু বাকিদের নিয়ে এসেছেন। নিখিলের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় ঋত্বিক এবং মুকুটেরও।

বাড়ি এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে এক এক করে গয়নাগুলো জিনা খুলছে, নিখিল একটা পা টুলটার ওপর তুলে দিয়ে বলল, তারপর জিনারানি! তোমার বন্ধুবান্ধবরা যে এত প্রোগ্রেসিভ তা তো জানা ছিল না?

জিনাও ওদের বাড়াবাড়িতে একটু বিরক্ত। যতই কেন সারা পৃথিবী ঘোরার অভিজ্ঞতা থাক, দেশাচার হল দেশাচার। সে বলল আমিই কি জানতাম। একটু সিঁদুর পরাতে কী আধুনিকতা নষ্ট হয় আমি বুঝি না বাবা।

—সিঁদুর? তোমার মুকুট সিঁদুরফিঁদুরের মর্ম কী বুঝবে? তুমি তো আগে বলনি মেয়েটির প্রস্টিটিউটদের সঙ্গে ওঠা-বসা।

—ওঠা-বসা আবার কী? ও তো একাধিক এন. জি. ও-র স্পেশ্যাল অ্যাডভাইজার। বিরাট

দেশজোড়া ব্যাপার। ওদের উন্নয়নের জন্যে... জিনা মনে মনে একটু ভয় পেয়েছে। এই যদি নিখিলের মনোভাব হয় তা হলে জিনার কাজকর্মের কথা জানতে পারলে ও কী করবে?

ঠুকে ঠুকে পাইপে তামাক ভরছিল নিখিল। পাইপটা এবার দাঁতে চেপে বলল, দুটোয় কোনও তফাত আছে বুঝি?

—তফাত নেই? জিনা অবাক।— ছ বছর থাইল্যান্ডে, নরওয়ে, ইংল্যান্ড, আমেরিকায় ইউ. এন. ও-র চাকরি করেছে মুকুট। সোসিওলজিতে ডক্টরেট ওর কর্নেল য়ুনিভার্সিটির।

—হাই-ফাই বেশ্যা কাকে বলে জান? নিখিলের গলায় সংযত শ্লেষ।

—বাজে কথা বলো না। ছিঃ!

—এইসব এন. জি. ও যারা চালায় তারা লেখাপড়া জানা ফান্ডা-অলা স্মার্ট আধুনিকা মেয়েদের কাজের নামে কবজা করে বুঝলে ম্যাডাম? তারপর তাদের সেরকম হাইক্লাস কাস্টমারের কাছে পাঠায়। ইউ. এন. ও-র অফিসার, এমব্যাসিট্যাসির সাহেবসুবো.... কে যে এজেন্ট আর কে খদ্দের বুঝতেই পারবে না তোমার মতো গর্দভরা... দেখো হয়তো ওই ঋত্বিকই ফার্স্টক্লাস এজেন্ট একটা। নামে বিয়েটাও রইল...

—তুমি চুপ করবে?

—সত্যি কথা শুনলে রাগ হয়ে যায়, না?—বলতে বলতে নিখিল জিনার গয়না খোলা ডান হাতটা হঠাৎ বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল—বেলেল্লাপনা অনেক দূর এগিয়েছে মনে হচ্ছে? আর কোনওদিন ওই মুকুটফুকুটের সঙ্গে দহরমমহরম করেছ তো, একটা মোচড় দিল সে জিনার হাতে, জিনা ককিয়ে উঠতে ছেড়ে দিল হাতটা।

—পতিতোদ্ধারিণী! হুঁঃ!

হাতটা টনটন করছে। হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে নিখিল।

একে কিছু বোঝাতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। এটুকু জিনা বুঝে গেল। এ থাকে এর নিজস্ব ধারণার জগতে। নিজেকে বা অপর কাউকে বদলাবার কথা ভাবে না। এর মনের বাড় নেই, ধ্যানধারণার অগ্রগতি নেই। তেমন তেমন জায়গায় এ আরও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। ডান হাতের লাল পলার মতো দাগটার দিকে সে একবার তাকাল। আদিম যুগের পুরুষ প্রথম কি এভাবে শাসন করেছিল তার নারীকে? সেই আদিম এখনও এইখানে বেরোবার সুযোগ খুঁজছে? সে ঘর থেকে বেরিয়ে ফ্রিজ থেকে বরফ বার করল, ঠাণ্ডা কমপ্রেস দিতে থাকল কবজিতে অনেকক্ষণ। বাড়ির এ অংশে তাদের একটাই শোবার ঘর, আর একটা শ্বশুরমশাইয়ের। তৃতীয় একটা ঘর আছে। সেটাকে তারা বলে টি.ভি-র ঘর। সোফা-কোচ এসব আছে। কিন্তু শোবার কোনও ব্যবস্থা নেই। তা হোক সে নিঃশব্দে টি.ভি-র ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। এই এটুকু ছাড়া তার কোনও আড়াল নেই। আর কোনও জায়গাও নেই।

অনেক অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারেনি জিনা। ভাবতে ভাবতে একসময়ে মনে হল সত্যিই তো সে কতটুকু জানে? বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে বলতে গেলে তার কোনও জ্ঞানই নেই। মুকুট আর ঋত্বিক তাকে যতটুকু দেখিয়েছে, যতটুকু বুঝিয়েছে তার ওপর নির্ভর করেই তো তার সব ধারণা। তবে ঋত্বিক যে সত্যি সত্যিই মাত্র বছর দেড়েকের মধ্যে বাচ্চাগুলোর মধ্যে একটা ভালর দিকে পরিবর্তন আনতে পেরেছে এটা সে দেখেছে নিজের চোখে। কিন্তু মুকুট? মুকুট কেন বলল এদের খানিকটা লেখাপড়া শিখিয়েই ছেড়ে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য! কেন নিরুৎসাহ করল জিনাকে যখন সে মেয়েদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার কথা বলল? নমিতাদি নামে যে প্রজেক্ট ডিরেক্টরের সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত, তিনি তো ওর কথা হেসেই উড়িয়ে দেন। এখন যদি জিনা বলে ওঁরা এইভাবে একটা সাক্ষর বারবনিতা সম্প্রদায় সৃষ্টি করবার চেষ্টা চালাচ্ছেন, সব দেশে চালান দিতে পারবেন বলে? কী উত্তর দেবেন ওঁরা? বিভিন্ন দেশে বসবাস এবং কথাবার্তা, কাজ চালানোর জন্যে যতটুকু দরকার

শুধু ততটুকু নিয়েই তো এঁদের মাথাব্যথা দেখা যাচ্ছে। পরীক্ষা দেওয়া বা ডিগ্রি ডিপ্লোমা লাভ করলেই যে স্বর্গলাভ হয় না, তা সবাই জানে। কিন্তু ওটা তো একটা ছাড়পত্র। যে কোনও চাকরি, উচ্চতর শিক্ষা, প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ-এ যাবার একটা অনুমতিপত্র। ন্যূনতম। এইটুকু থাকলে একটা মানুষের ভেতরে জোর আপনি আসে। পৃথিবীর দরজা তার সামনে খুলে যায়। সে বেরোতে চাক বা না চাক। অথচ এই সামান্য কথাটা নমিতাদিরা বুঝতে চান না। হয়তো নিখিল যা বলছে তা ঠিক, মুকুটের ক্ষেত্রে ঠিক নয়, কিন্তু অন্য অনেকের ক্ষেত্রে ঠিক। এবং মুকুট এটা জানে। এরকম ঘটনা ঘটছে, অথচ মুকুট জানে না এটা তো হতে প্যারে না। এত বছরের অভিজ্ঞতা। জিনার মতো ভ্যাবাকান্তও নয়, খাঁচার পাখিও নয়। এইসব ভাবতে ভাবতে তার মাথা গরম হয়ে যেতে থাকল। নিখিলের ভয় বা রাগ তো হতেই পরে। গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ, রাগও প্রচণ্ড, ওর দুশ্চিন্তার চেহারা ওইরকমই হবে। এর আগে কোনওদিন জিনার গায়ে হাত তোলেনি ঠিক, কিন্তু হাত না তোলার মতো মার্জিত, সুভদ্র মানুষ তার স্বামী নয়, এটা সে বুঝে গেছে।

এইভাবে কখনও ঋত্বিককে, কখনও মুকুটকে, কখনও নিখিলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে করাতে, তাদের হয়ে জবাবদিহি দিতে দিতে তার শেষ রাতের ঘুমটা এসেছিল। ঘুমের মধ্যে মানুষ অনেক কিছু বিস্মৃত হয়ে যায়। দরজায় টোকা শুনে সে পরিস্থিতি একেবারে ভুলে গিয়ে ঘুমচোখে দরজা খুলে দিল।

—খুব লেগেছে?—নিচু গলায় নিখিল জিজ্ঞেস করল, দেখি?

জিনা হাতটা সরিয়ে নিল। তার চোখ সহসা জল আসে না, এখন সে টের পায় ঘুমভাঙা চোখে অশ্রুর কামড়।

—জিনা, তুমি তো জান আমি একটু.... এসো, ঘরে এসো।

অনুনয়ের সুর তার গলায়। জিনা সামান্য একটু বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ও দিকের ঘর থেকে বাবার কাশির শব্দ পেয়ে সে আর দেরি করে না। পত্রপাঠ ফেরত আসে।

—তুমি তো জান, আমি কাজে এত ব্যস্ত থাকি ন'টা-দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারি না। তোমার জন্যে কি আমার ভাবনা হয় না। নিশ্চিন্ত থাকতে না পারলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তুমি ওই মুকুটটুকুটের সঙ্গে মেলামেশা করো না জিনা। শি ইজ ডেঞ্জারাস। এনিওয়ে ওদের সমাজটমাজ আলাদা। বাবা পাইলট ছিলেন, ওর মাকে দেখলে না? দিব্যি তো জিন উইথ লাইম পেগের পর পেগ ওড়াচ্ছিলেন। তুমিও তো আমার সঙ্গে পার্টিফার্টিতে গেছ, কখনও সফ্‌ট্‌ড্রিংক ছাড়া কিছু নিয়েছ! ওদের এড়িয়ে চলো। কোথায়, কখন, কী ফাঁদে পড়ে যাবে, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে না।

জিনার তর্ক করতে ইচ্ছে করছিল না। তখনও চোখে ঘুম জড়িয়ে আছে। শেষ রাত। তা ছাড়া এসব বিষয়ে ভাল করে ভাবনা-চিন্তা না করে, না জেনে-শুনে আলোচনার মধ্যে সে আর যাবে না। প্রথম সুযোগেই মুকুটকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞেস করবার আছে তার। সে পাশ ফিরে চোখ বুজল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল—ঘুম অত সহজ নয়। কেননা নিখিল বউয়ের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের শারীরিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে, এই শেষ রাতে। ভাল লাগছে না, তার এখন এসব ভাল লাগছে না, মন না থাকলে শুধু শুধু শরীরকে উত্তেজিত করে কিছু লাভ হয় না। এরকম মনহীন মিলনে সে আনন্দ পায় না। অন্যজনও কি পাবে? তার ভেতরের বিমুখতা স্পর্শ করবে না ওকে? কিন্তু উপায়ই বা কী!

বিপদ-আপদ

—হ্যালো

—মল্লিকাদি, কেমন আছ?

—ভাল, কিন্তু জিনা তো এখনও ফেরেনি মুকুট!

—জানি। তোমাকেই ডাকছিলাম।

'ডাকছিলাম।' কেমন অদ্ভুত কথাটা। কেউ তাকে ডাকে? ডেকেছে কখনও?

সে বলল, বলো।

—মুসৌরি যাচ্ছি। মল্লিকাদি, তোমরা যাকে বল 'হনিমুন'। তুমি গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, শাশুড়ি সহযোগে, পুরী।

হাসির শব্দ ভেসে এল।

—তুমি যা ভিতু, তোমার সব সময়েই একটা প্রোটেকশন দরকার হয়। না?

—না মুকুট। তুমি যা ভাবছ আমি সেরকম না।

—সেই দুপুরের স্বপ্নগুলো.... দেখ? ম্যমির মতো লোক তাড়া করেছে...

শিউরে উঠে মল্লিকা বলল, না। অনেকদিন দেখিনি। তুমি কি এখনও সেই নিয়ে ভাবছ?

—ঠিক আছে। কেন জানি না বেড়াতে যাবার সময় কথা মনে হল। ভাল থেকো।

মুকুট শেষ কথাটার জবাব দিল না।

—চেষ্টা তো করি। বিপদে পড়লে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকতেই হয়।—মল্লিকা বলল।

—'বিপদে আমি না যেন করি ভয়—' এই মন্ত্র জপ করবে। বুঝলে?

—বুঝলাম। যাও, তোমরা আনন্দ করে এসো। তাড়াতাড়ি ফিরো। আমাদের ভুলে যেয়ো না।

একই পৃথিবীতে নানান মানুষ জন্মাচ্ছে। প্রত্যেকের জিভে জীবনের স্বাদ কেন আলাদা রকম? সে বুঝতে পারে পৃথিবীটা কোথাও খুব সুন্দর, জীবনটাও খুবই চমৎকার। কিন্তু তার অনুভবে ব্যাপারটা ধরা দিতে দিতেও দেয় না। এই অল্প বয়সের দুঃখ-কষ্টের চোঁয়াঢেঁকুর কি সারা জীবনই উঠতে থাকবে? কেন? কেন সে এর ওষুধ খুঁজে পায় না? অথচ, তার তো সবই আছে। দিদি মাঝে মাঝে চিঠি লেখে—'মল্লি, তুই খুবই ভাল আছিস জানি। আমার একমাত্র ছেলেটা লন্ডনে সেট্‌ল করে গেল, কাউকে বোঝাতে পারি না এ কষ্ট।' এ কি কাউকে তেমন করে ভালবাসতে না পারার কষ্ট? এ কথাও মল্লিকার এক এক সময়ে মনে হয়। সে কাউকে ভালবাসেনি, তাকেও কেউ ভালবাসেনি। কেউ নেই যাকে বিশ্বাস করে নিজের সব কথা বলা যায়। শাশুড়ি যথেষ্ট আদর দিতেন, কিন্তু তাঁকে বলতে পারেনি, স্বামী সদাশয়, তাকেও বলতে পারেনি—সবাই যেন বড্ড দূরে দূরে। হাত বাড়িয়ে সে কাউকে ছুঁতে পারে না। ভেতরে কথা জমে, কান্না জমে, বুকটা পাথর হয়ে থাকে। তার যদি একটা সত্যিকারের বাবা থাকত। সেইসব গল্পের বাবার মতো যাঁরা মেয়ের সুখশান্তির জন্য কোনও কাজেই পিছপা হন না। একজন অগতানুগতিক বাবা!

গা ধুয়ে একটা হলুদ খড়কে ডুরে পরে সে আয়নার সামনে দাঁড়াল। কপালে ভাল করে একটা টিপ আঁকছে। রঙিন কুমকুম দিয়ে। ফোনটা বাজল। এইসময়ে সাধারণত রং নাম্বারগুলো আসে। ঝুম্পা-মাম্পির বন্ধুরা জানে ওরা এ সময়ে থাকবে না। জিনার বাপের বাড়ির ফোনগুলোও আসে সন্ধের পর।

—এটা কি তেত্রিশ নম্বর ডাফ স্ট্রিট?

—আপনি কাকে চাইছেন?

অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠ বলল, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ে ডক্টর সেনগুপ্ত'জ ক্লিনিক থেকে বলছি। মল্লিকা দেবী কি আছেন?

—হ্যাঁ। কেন? বলছি।

—আপনার বাবা কল্যাণবাবুর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আপনারা যে যে আছেন, চলে আসুন। ওঁকে হাসপাতালে রিমুভ করতে হবে।

মল্লিকার হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছিল। কেমন গা-বমি করছে। বাবা? অ্যাকসিডেন্ট? বাসের তলা, না ট্রাকের তলা! দলা পাকানো রক্তাক্ত একটা দেহ ছাড়া চোখের সামনে সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। কী করবে? এসব সময়ে কী করতে হয়? সে বিমানের অফিসে ফোন করল। বেজে যাচ্ছে। অফিস বন্ধ। বিমান বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে পারবে না। অন্তত ঘণ্টা দুই সময় তো লাগবেই। তা হলে? নিখিল? না, নিখিল না। কোনওক্রমেই নিখিল নয়। কিন্তু নিখিলও তো বাবার ছেলে। তারও তো খবর পাওয়া উচিত। বোতাম টিপল সে ফোনের। দীর্ঘদিন তার সঙ্গে বাক্যালাপ নেই মল্লিকার।

—হ্যাললো।

গলা কেঁপে গেল তার।

—বউদি বলছি। বাবার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ে ডক্টর সেনগুপ্ত'র ক্লিনিকে আছেন।

এক মুহূর্ত চুপ। তারপর কণ্ঠ ভেসে এল—বাড়িতে থাকো। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

প্রতি মুহূর্তে বিমানকে আশা করছে মল্লিকা। জিনা। অন্তত জিনাও তো আসতে পারে। কোথায় 'রোচনা' না কী এক প্রজেক্ট নিয়ে মেতেছে। —ঋত্বিকের ব্যাপার। ওরা সম্ভবত জিনাকে একটু দেখাশোনা করতে বলে গেছে।

বেলের শব্দ। কেমন শীত শীত করছে তার। সে দরজা খুলে দিল। নিখিল। সময় নষ্ট না করে বলল, এসো। দরজায় চাবি দিয়ে কোনওমতে গাড়িতে উঠল মল্লিকা।

সামনের দরজাটা খুলে ধরেছে নিখিল, অন্ধের মতো সে উঠে গেল।

—কী হয়েছে?

—কিচ্ছু জানি না। শুধু ওইটুকু বলেই ওঁরা ফোন রেখে দিলেন।

—জিনা কই?

—জানি না। কোথাও বেরিয়েছে। —খুব সাবধানে জিনার গন্তব্যস্থল গোপন রাখে মল্লিকা। ভীষণ রাগ হয় জিনার ওপর। সে যদি থাকত এরকম আতান্তরে পড়তে হত না তাকে। পরক্ষণেই রাগটা নিজের ওপর এসে পড়ে। একটা কাজও কি সে নিজে দায়িত্ব নিয়ে করতে পারে না! কী হত ফোনটা করেই ডক্টর সেনগুপ্তর ওখানে চলে গেলে। নিখিলের সঙ্গে এক গাড়িতে যাবার গ্লানি তা হলে তাকে ভোগ করতে হত না। বাড়িতে কাউকে কোনও মেসেজ দেওয়া গেল না। কারও কাছে চাবি নেই। সে বাড়িতে থাকে বলে, বিমান সবসময়ে ডুপ্লিকেট রাখে না। কী ভাবে ঢুকবে ওরা?

ক্লিনিকে গিয়ে পরিষ্কার হল ব্যাপারটা। পা ছড়িয়ে ডাক্তারের বেড-এ শুয়েছিলেন। মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন। মাথায় ব্যান্ডেজ।

ডাক্তার বললেন, মাথা ফেটেছে। সতেরোটা স্টিচ দিতে হয়েছে। কিন্তু বাঁ পায়ে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। হসপিট্যালে যেতে হবে। খুব সম্ভব অপারেশন করতে হবে।

—কী করে হল? রাস্তায় কি মাথা-টাথা ঘুরে পড়ে গেলেন?

—পড়ে যাবেন কী? ডাক্তার বললেন, মারা হয়েছে ওঁকে পেছন থেকে। লাঠির বাড়ি। সোনাগাছির ব্যাপার.... কী কারণে কার ওপর রাগ হয়েছে, মেরে দিল বুড়ো মানুষটাকে....

—সোনাগাছি? —নিখিলের হতবুদ্ধি মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার মুচকি হেসে বললেন—আরে—এদিকে উনি বাচ্চাদের কী সব ক্লাস-ট্লাস নেন।

—সোনাগাছিতে? —নিখিল মল্লিকার দিকে তাকাল—বাবা ক্লাস নেবার আর জায়গা পেলেন না?—মল্লিকা কোনও জবাব দিল না।

শ্যামবাজারের দিকে একটা নার্সিং হোমে তাঁকে ভর্তি করে পরের দিনই অপারেশনের প্রস্তুতির কথাবার্তা বলে ফিরতে ফিরতে রাত নটা বেজে গেল। মল্লিকা কয়েকবার ভাবল নিখিলের ওপর এবার সবটা ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। সেখানে নিশ্চয় এখন হুলুস্থুল পড়ে গেছে। কিন্তু নিখিল এত গম্ভীর আর বাবা এমন করে তার ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে আছেন! দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যন্ত্রণাও হচ্ছে খুব। সে কিছুতেই কথাটা বলতে পারল না।

কিন্তু বাড়িতে এসে দেখল, আলো জ্বলছে, অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না। নিজের চাবিটা সে খুঁজে পেল না, বেল শুনে দরজা খুলে দিল ঝুম্পা। পেছনে মাম্পি।—'কোথায় গিয়েছিলে মা?' বিমান নাকি স্থির করেছিল সাড়ে নটা অবধি দেখে পুলিশে খবর দিতে যাবে। জিনাই আগে আসে, সে-ই সবাইকে দরজাটরজা খুলে দিয়েছে। হারানো চাবিটার কথা কয়েকদিনের ডামাডোলে মল্লিকা বেমালুম ভুলে গেল।

জিনার অনুপস্থিতিতে আসলে তার কাজটা কদিন চালিয়ে দিচ্ছিলেন কল্যাণবাবু। পূর্ণিমা আর বনমালাকে তিনি একটু আলাদা করে কোচ করছেন। এদের দুজনেরই ক্লাস ফোর-ফাইভ পর্যন্ত বিদ্যা ছিল। মাথা ভাল। অন্যদের অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। সেদিন পাঁচটা বাজে দেখে তিনি উঠে পড়েছিলেন। তখনও দু-একটা শক্ত অঙ্কের সমস্যা মাথায় ঘুরছিল। অনেকদিন আগের বিদ্যে তো! মরচে পড়ে গেছে। বান্ধবসমিতির চৌকাঠ থেকে দশ-বারো গজও যাননি মাথার পিছনে একটা প্রকাণ্ড আঘাতে চোখে সর্ষেফুল দেখলেন কল্যাণবাবু, একটা লাঠি আর গোটা দুই মানুষের আবছা আকৃতি, ব্যস আছড়ে পড়লেন রাস্তায়। অজ্ঞান। লাঠির বাড়ি খেয়ে আঁক করে একটা শব্দ হয়তো করেছিলেন। শোনবার মতো কেউ কাছাকাছি ছিল না। দোকানপাটও তখন সব ঝাঁপ বন্ধ। পূর্ণিমাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরের সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল বনমালা। তখনই দেখে দৃশ্যটা। হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন কল্যাণবাবু, মাথা থেকে একটা রক্তের ধারা নেমে পাঞ্জাবির পিঠ ভিজিয়ে দিচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে দুজনে চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করে। তারপর তাদের সাহায্যে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তোলবার সময়ে একবার চিৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে যান কল্যাণবাবু। তখনই বোঝা যায় পা-ও ভেঙেছে। সামান্য পরে জ্ঞান আসতে বাড়ির ফোন নম্বর তিনিই বলেন।

পরের দিন তাঁকে দেখতে গিয়ে জিনা চুপিচুপি বলল, বাবা, ও কিন্তু এখনও জানে না আমিও ওখানে যাই। জানলে তুলকালাম করবে। কিন্তু আপনাকে মারল কে বলুন তো?

এ কথা কল্যাণবাবুও অনেক ভেবেছেন। তাঁর ধারণা লাঠিটা ছিল অন্য কারও জন্য। ভুল করে তাঁর মাথায় এসে পড়েছে। তবু তিনি আর ঝুঁকি নিতে চান না। জিনার আর ওসব জায়গায় না যাওয়াই ভাল। জিনাকে পাহারা দিতেই তো তিনি ওখানে ঢুকেছিলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল দুটি বাজে লোককে পিছু নিতে দেখেন তিনি বাস থেকে। তবে? তবে কি তাঁর মতো একজন সঙ্গীকে জিনার পাশ থেকে সরানোই কারও উদ্দেশ্য ছিল? এখন কতদিন তিনি অচল হয়ে থাকবেন কে জানে? জিনা একা যাতায়াত করবে?.... সর্বনাশ! যতক্ষণ না পরদিন বিকেলে জিনা নার্সিং হোমে এল তিনি ছটফট করতে লাগলেন।

বিকেল চারটে না বাজতেই আসে জিনা আর মল্লিকা। এ সময়ে ছেলেরা আসে না। নাতনিরাও নয়। এ সময়টুকু তাই প্রাইভেট। অপারেশনটা হয়ে গেছে। ফিমার ভাঙেনি এই রক্ষা। কিন্তু হাঁটুর তলায় সাপোর্টিং রড ঢোকাতে হয়েছে।

জিনা বলল, ইস বাবা, আমার জন্যেই আপনার এত দুর্ভোগ।

তখনই কল্যাণবাবু সুযোগ পেয়ে গেলেন, বললেন, বুঝে বলছ? না না-বুঝে কথার কথা বললে?

—কথার কথা? বাবা?—জিনা রীতিমতো অভিমান করে—আমি কি জানি না—আমার জন্যেই আপনি....

—কথাটা তা নয় জিনা। আজকাল ছোট বউমাকে জিনাই বলেন কল্যাণবাবু, যেটা আমাকে ভাবাচ্ছে সেটা হল কেন এই ঘটনাটা ঘটল।

মল্লিকা বলল, কেন ঘটেছে, অত বৃত্তান্ত ভাবতে হবে না। আপনারা তো দিব্যি মানবেন না। নইলে বলতুম আমার দিব্যি রইল—আপনারা দয়া করে আর ও পাড়ায় যাবেন না।

—আদেশ নাকি?—কল্যাণবাবুর মুখে মৃদু হাসি।

—তাই বলেন তো তাই। একটু হাসি মল্লিকারও মুখে। পরক্ষণে সেটা মুছে গেল। সে বলল, বাবা এত জানেন শোনেন, এভাবে বাস্তব বুদ্ধি কী করে লোপ পায় আপনাদের আমি জানি না। মুকুটরা করছে, তাদের পেছনে একটা পুরো প্রতিষ্ঠান আছে, আপনারা কার ভরসায় করছেন এসব? একার চেষ্টায় এসব করা যায় না বাবা!

জিনা বলল, একা তো নয়! আমাদের দায়িত্ব তো মুকুটদেরও আছে। আমারটা তো আছেই। আমাকে ওরা পে করে। বাবারও বইপত্তর, ব্ল্যাকবোর্ড সবই তো দিয়েছে। দায়িত্ব এড়াতে পারবে না।

মল্লিকা বলল, উঁহু, জিনা তুমি মুকুটদের কাজ পুরোপুরি করছ না। তুমি নিজের মতো করে করছ। ওদের গাইড-লাইন তুমি মান না, নিজেই বল সে কথা। বল না?

—দিদিভাই, তুমিও কি ওদের মতো বলবে—এইসব মেয়েরা এইভাবেই থাক। অন্ধকার পার হতে না পারুক। আমরা ভাল আছি, ভাল থাকব, আমাদের মুক্তির জন্য, ভাল থাকার জন্য কত চিন্তা, আর এই পৃথিবীতেই দেশে দেশে মেয়েদের একটা বিরাট অংশ এইভাবে.... তার মুখ কালো হয়ে গেছে।

কল্যাণবাবু বললেন, ঠিক আছে মা, এখন ক'দিন যাক না! পরে ভেবে দেখা যাবে কী করা যেতে পারে। কিছু না-কিছু একটা উপায় বার হবেই।

ফেরবার পথে ওরা নিখিল বা বিমানের সঙ্গে ফেরে। আলোচনা থেমে যায়।

সকালবেলা মল্লিকা একাই আসে। সেদিন এসে দেখল দুটি মেয়ে বসে আছে। তাদের সঙ্গে কল্যাণবাবুর রীতিমতো আলোচনা হচ্ছে কোনও এক অজ্ঞাত বিষয়ে। সে অবশ্য দুয়ে দুয়ে চার করতে পারল। কিন্তু সত্যিই, মেয়েদুটিকে দেখে বোঝবার জো নেই তারা কোথায় থাকে, কী করে। ছোটটি তার ঝুম্পার মতো, ঝুঁটি করে চুল বাঁধা একটা ক্লিপ দিয়ে। মেয়েটি মনে হয় খুব কান্নাকাটি করেছে, চোখদুটো লাল, ঈষৎ ফুলে আছে। শামলা রঙের মুখখানি ভেজা ভেজা। একটু দরিদ্রের ঘরে যেমন লাবণ্য অভাবের তলায় চাপা পড়ে থাকে, এর চেহারার জাত সেইরকম। তা নয়তো বেশ বাড়ন্ত, তরুণীসুলভ। সালোয়ার-কামিজ পরে রয়েছে মেয়েটি, ছাপা কাপড়ের। কোনওরকম প্রসাধন নেই। কলাণবাবু বললেন, এর নাম পূর্ণিমা, আমাদের ছাত্রী, ইনি মল্লিকা, তোমাদের দিদিমণিরও দিদিমণি। আর এর নাম বনমালা।

দুজনেই টিপ টিপ করে সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করে ফেলল। মল্লিকা বাধা দেবার সময় পেল না।

বনমালা মেয়েটি একটা মিলের ছাপা শাড়ি পরেছে। ছোটখাটো, মল্লিকারই ধরনের, তারই মতো দোহারা কাটাকাটা চেহারা, মুখের আদলটা প্রতিমা-ধরনের, যদিও তেমন কোনও শ্রী নেই। এর চুলও তারই মতো ঈষৎ কোঁকড়া। চুলটা ছড়ানো ছিল। মেয়েটিকে দেখে কী যে অদ্ভুত একটা অস্বস্তি হল মল্লিকার সে বলে বোঝাতে পারবে না। মেয়েটির মাথায় সিঁদুর, ভুরু প্লাক করা, মধ্যবিত্ত গৃহস্থবাড়ির বউয়ের মতো অবিকল।

পূর্ণিমা সঙ্গে করে একটা খাতা আর বই এনেছে। অঙ্ক বুঝে নিচ্ছে কল্যাণবাবুর কাছে।

ওরা চলে গেছে, তবু মল্লিকা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। ঝুম্পা আর পূর্ণিমা, সে আর বনমালা কীরকম এক অথচ আলাদা। ঝুম্পা ফিজিক্স নিয়ে বি. এসসি পড়ছে, আর একবার জয়েন্ট দেবে, চান্স পেলেই ইলেকট্রনিকস এঞ্জিনিয়ারিং-এ চলে যাবে। আর ঝুম্পার বয়সি এই মেয়েটি? দেহ খাটিয়ে

অন্নসংস্থান করে। কেউ নেই, বাবা, মা, ভাই, বোন, কোনও অভিভাবক যে একে পালন করবে। একভাবে জন্ম, আলাদা জীবন, আলাদা নিয়তি। আর ওই বনমালা? যদি ওর বদলে তারই কোনও অজগাঁয়ে গরিব চাষির ঘরে জনমজুর-খেতমজুরের ঘরে জন্ম হত, আর বনমালার কোনও বিপত্নীক কমপাউন্ডারের ঘরে! ও-ই যদি কোনও আরতি দে সরকারের চোখে পড়ে যেত! তা হলে তাদের ভাগ্য বদলাবদলি হয়ে যেত। আরতি দে সরকার যদি তাকে পছন্দ করে না ফেলতেন, তবে তারই বা কী গতি হত! ভাবতে ভয় পেয়ে গেল মল্লিকা। চুপচাপ সে টিফিন ক্যারিয়ারটা নিজের ব্যাগের মধ্যে থেকে নামিয়ে রাখল। ছোট্ট মিটসেফটার ভেতরে সন্দেশ জমে গেছে, বাকসোগুলো আয়াদের ডেকে দিয়ে দিল। পুরনো টিফিন ক্যারিয়ারটা ভরে নিল। দুটো বই নামিয়ে রাখল টেবিলে। আস্তে বলল—বাবা এবার যাই?

কল্যাণবাবু চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন। এবার খুলে বললেন, রাগ করো না বউমা।

মল্লিকা অবাক হয়ে বলল, রাগ? রাগ করব কেন?

—আমি তোমার আপত্তির কথা জানি। ইউ আর জাস্টিফায়েড। তোমার মতো একজন শুচিশুদ্ধ বাড়ির বউ এদের সংস্পর্শ সহ্য করতে পারবে না, পারার কথা নয়, এটুকু বুঝতে আর অসুবিধে কী! আমরাই কি আগে পেরেছি? জিনাও পারেনি। কিন্তু একবার ব্যাপারটার ভেতরে ঢুকলে বড় আত্মগ্লানি হয়! আজকের পৃথিবীতে, এখনও, এত মানবাধিকার কমিশন, এত নারীমুক্তি, এত সর্বহারার একনায়কতন্ত্র হচ্ছে, এরই মাঝখানে মেয়েদের এভাবে সেক্স-স্লেভ করে রেখে দেওয়াটা চলছেই। কারও মনে প্রশ্ন পর্যন্ত ওঠে না। একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া আর চিন কিছুকালের জন্য বন্ধ করেছিল জিনিসটা। এদের মধ্যে ভ্যালুজ গড়ে উঠতে পারেনি তেমন করে, তবু কাজটা জঘন্য, এরকম একটা বোধ এদের এখনও আছে। সেটাকেও কিন্তু নষ্ট করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। অর্গ্যানাইজড্ ইনস্টিট্যুশন্যাল লিগ্যাল একটা বিশ্বজোড়া মেয়েবাজার তৈরির চেষ্টা চলছে মা। আমাদের কতটুকুই বা শক্তি। কতটুকু পারব, প্রাণপাত করলেও পারব না। কিন্তু এই পূর্ণিমার মতো মেয়েগুলোর জন্য বড় কষ্ট হয়। স্বাভাবিক মেয়ে, বেশ মেধাবী। এসব পাড়ায় বেশির ভাগই বুদ্ধিবৃত্তিতে সাব-হিউম্যান স্তরে রয়ে গেছে। কিন্তু এ মেয়েটা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছিল। ইচ্ছে ছিল, আছে। ধরো, ও যদি সুযোগ পেত। কেন একটা স্বাভাবিক জীবনের সুযোগ ও পাবে না? মানব-সম্পদের কী বিপুল অপচয় হচ্ছে বুঝতে পার? প্রজননের ক্ষমতা আছে বলে মানুষ প্রজননের সীমা কোথাও টানবে না? পৃথিবী যত মানুষকে স্বচ্ছন্দে খাওয়াতে পারে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি ভার চাপিয়ে দেওয়া হবে তার ওপর, সৃষ্টি হবে উদ্‌বৃত্ত মানুষ, আর উদ্‌বৃত্তকে নিয়ে চলবে বাকি মানুষদের। প্রিভিলেজ্‌ড মানুষদের অমানুষিক ব্যবহার? বনমালার তবু একটা আশ্রয় আছে। একটি লোকের সঙ্গে থাকে। একজনই। ঠিক আছে বাবা, সামাজিক পরিচয় না-ই হল, তবু তো একটা অর্থ আছে, শৃঙ্খলা আছে তার জীবনযাত্রার! কিন্তু পূর্ণিমা? আর বনমালার ওই লোকটিই বা কী? কেন দেবে না পরিচয়? কেন এভাবে মার্জিন্যালাইজ করে রাখবে? কেন?

—বাবা, আপনি বড্ড বেশি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন, মাথায় সতেরোটা স্টিচ আপনার।—মল্লিকা বলল।

একটু অসন্তুষ্ট হলেন কল্যাণবাবু, বললেন, সত্যি, আমি অনর্থক নিজের চিন্তা নিয়ে তোমায় বিরক্ত করছি। তোমার নিশ্চিন্ত শান্তির জীবন। তুমি কেন এসব ভাবতে রাজি হবে! আমারই ভুল!

মল্লিকা ছিল তাঁর মাথার দিকে। লজ্জা পেল, দুঃখও পেল ভীষণ। বলল, বাবা, আমি আপনার কথা সব শুনেছি, সবটা বুঝেছি বা মানছি তা বলব না, কিন্তু আপনার উদ্‌বেগ, কষ্ট এ সবই আমি বুঝেছি বাবা। তবে কী জানেন, আপনারা যেটাকে মনে করেন নিশ্চিন্ত শান্তির জীবন, তেমন কিছুও কিন্তু খুব কম আছে। অনেক অনেক জট চারিদিকে, আমার মতো নিরীহ মেয়েরা হয়তো সেইসব জট কী করে খুলবে ভাবতে ভাবতেই জীবন কাটিয়ে দেয়। সে আবার আর একরকম অন্ধকার।

কল্যাণবাবু চমকে বললেন, তুমি একবার এদিকে আমার সামনে এসো তো!

তিনি একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কা খেয়েছেন। বড় বউমাকে এভাবে কথা বলতে তিনি কখনও শোনেননি। অন্ধকার? কীসের অন্ধকার? মল্লিকা কেন এত দুঃখ পেল তাঁর কথায়

মল্লিকা সামনে এসে দাঁড়াল। প্রশান্ত মুখ। বলল, এবার আসি? ওয়ার্নিং বেল বেজে গেছে। কল্যাণবাবুকে চিন্তিত রেখে সে নীচে নেমে গেল।

নীচে নামতেই কে ডাকল—দিদিভাই! পাশের দিকের একটা বেঞ্চে বসে আছে পূর্ণিমা আর বনমালা। অর্থাৎ তারই জন্যে অপেক্ষা করছে।

পূর্ণিমা এগিয়ে এসে বলল, দিদির সঙ্গে আমার খুব জরুরি দরকার। কী করি বলুন তো? দিদি তো এখন বেশ কিছুদিন আসবেন না!

মল্লিকা ভাবছিল। বনমালা বলল, যদি দিদির বাড়িতে যাই? একটুখানির জন্যে? ওখানে কি অনেকে থাকেন? বাইরের ঘর থেকে একটু কথা বলেই চলে আসব।

—কী কথা? আমাকে বলা যায় না! অবশেষে বলল মল্লিকা।

মেয়েদুটি মুখ নিচু করে চুপ করে রইল।

ওদের দিকে চেয়ে হঠাৎ মল্লিকার মনে হল চল্লিশের কাছে বয়স হল তার। আজ অবধি একটা বিষয়েও নিজের বুদ্ধিতে, কাউকে জিজ্ঞেস না করে সামান্যতম কাজও করেনি সে। আজ, এতদিন পরে, একটা না-হয় করলই। এখন সকাল এগারোটা। দুই বাড়িতেই কেউ থাকবে না। তার বাড়িতে তবু মলি নামে কাজের লোকটি থাকে এইসময়ে। জিনার বাড়ি একেবারে ফাঁকা। সে বলল, চলো।

—যাব?

—হ্যাঁ, এসো—সে বেরিয়ে একটা ট্যাকসিকে হাত দেখাল।

—আজই যাব?

—বলছিলে যে জরুরি? এখন গেলে কথা বলতে পারবে।

জিনার বেল টিপল মল্লিকা।

—খুলে অবাক হয়ে গেল জিনা। এদিক দিয়ে তো মল্লিকার আসার কথা নয়!

—কী ব্যাপার? দিদিভাই! পরক্ষণেই মেয়েদুটিকে দেখতে পেল সে।

—তোরা? —ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল জিনা।

মল্লিকা অপেক্ষা করল না। চলে গেল।

বনমালা বলল—দিদি পূর্ণিমার ওপর ওরা যা-নয়-তাই অত্যেচার করছে।

—কে?

—মাসি। পাড়া থেকে কেনাদের দলকে ডেকে এনেছে। কাল সারা রাত দফায় দফায় কেনাদা রবিগুণ্ডা সবাই মিলে ওকে রেপ করেছে। মাসি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করিয়েছে এসব। আমি খবর শুনে গিয়ে ছাড়াই।

শিউরে উঠে জিনা বলল—কেন? হঠাৎ?

—এর কোনও 'কেন' সবসময়ে থাকে না দিদি। ওদের পাওনা-গণ্ডার শেয়ার না দিলে, মাসির রাগ হলে এসব যখন-তখন হয়। ও আসলে বলে ফেলেছিল মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে, কলেজে পড়বে।

—কেন বললি? তোকে এসব বলতে বারণ করে দিয়েছিলাম না?

পূর্ণিমা ক্লান্ত কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—আমি অঙ্ক কষছিলাম দিদি। লোক বসাতে ভাল লাগছিল না। বলেছিলুম—আজকের দিনটা আমায় ছেড়ে দাও না! তাইতে বলল—কেন? বিদ্যেধরী, জজ-ম্যাজিস্টর হবি, না কি? তাতেই বলে দিয়েছি—হবই তো, এ পাড়া আমি ছাড়বই ছাড়ব, কলেজে পড়ব, আইন পড়ব.... তারপর তোমাদের দেখে নেব.... বলেছি স্বীকার করছি দিদি। আমার মনে

হচ্ছে মাসি আমাকে বিক্‌কিরি করে দেবে। কেনাদার সঙ্গে কাবলেমতো একটা লোক কথা বলছিল। আমার খুব ভয় করছে দিদি, ওরা আমাকে কোন দূরদেশে পাঠিয়ে দেবে।

তারই জন্য কি এ মেয়েটির জীবনে আরও অন্ধকার ঘনিয়ে এল? অন্ধকারেই ছিল। তাকে এত অন্ধকার বলে জানত না। এখন জানে। তার বাড়িতে থাকার জায়গা দেওয়া যায়। কিন্তু সেটা নিখিলের অনুমতিসাপেক্ষ। কত আর মিথ্যে কথা সে বলবে? দিদিভাইয়ের বাড়িতেও সেই এক প্রবলেম। তার ওপরে আছে দুটি কাজের লোক। তাদের অসীম কৌতূহল। পূর্ণিমার আসল পরিচয় খুঁজে বার করতে তাদের দশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। আচ্ছা 'রোচনা'য় নিয়ে গেলে হয় না? ঋত্বিকের অনুপস্থিতিতে সেই এখন কাজ চালাচ্ছে। কারও অনুমতি নেবার দরকার নেই। সে বলল—এক্ষুনি এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। এখুনি যেতে হবে কিন্তু।

—এখুনি? জামা কাপড়? টাকা পয়সা? সবই তো...

বনমালা তাড়া দিয়ে বলল, সেসব আনতে গেলে আর ফিরতে পারবি না পূর্ণিমা। ওরা কি তোর ওপর নজর রাখেনি ভেবেছিস? যা-ই এখন পুরো পাড়া ঘুমোচ্ছে, তাই বেরিয়ে আসতে পেরেছিস। দিদি যা বলছেন শোন—আমি তোর যতটুকু পারি উদ্ধার করে দেবার চেষ্টা করব।

জিনা বলল, জামাকাপড়ের প্রবলেমটা আমি এখুনি সল্‌ভ্ করে দিচ্ছি। দাঁড়া। সে চটপট নিজের কিছু শাড়ি, ব্লাউস, সালোয়ার-কামিজ ইত্যাদি একটা জুটের ব্যাগে ভরে ফেলল। টাকা পঞ্চাশেক নিজের সঞ্চয় থেকে একটা পার্সে ভরে দিল। তারপর জামাকাপড় বদলে এসে বলল, বনমালা তুই ফিরে যা। পূর্ণিমা চল।

পূর্ণিমা ভয়ে ভয়ে বলল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ দিদি? লোকের বাড়ি কাজ করতে কিন্তু আমি পারব না।

—না, লোকের বাড়ি কাজ করতে নিয়ে যাচ্ছি না। কিন্তু সেভাবেও অনেকে বড় হয় জানিস? কাজকে ভয় করিস কেন?

—কাজের কথা হচ্ছে না। পুরুষ মানুষ থাকলে সে-বাড়ি আমি যাব না দিদি—পূর্ণিমা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জিনা বিরক্ত হয়ে বলল, বললাম তো কারও বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি না!

—কোনও হোমটোমেও আমি যাব না।

—না রে বাবা, হস্টেল হয়েছে 'রোচনা' শুনেছিস তো? সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।

—ওখানে তো আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েও আছে, যদি জানাজানি হয়ে যায়?

—অত ভয় করতে হবে না। আমি তো আছি। ওখানে বন্দুক হাতে দারোয়ান পাহারা দেয়। যে-কেউ ফট করে ঢুকতেই পারে না।

'রোচনা'তে সুধাদির জিম্মা করে দিল সে পূর্ণিমাকে। বেশি কথা বলল না, খালি জানাল—মেয়েটি কিছুদিন থাকবে। একটু বিপদে পড়ে গেছে। তাকে যেন কোনওমতেই বাইরে পাঠানো না হয়।

আসবার সময়ে পূর্ণিমা ডাকল—দিদি!

—কী?

—তুমি কিন্তু আর অবিনাশ কোবরেজে যেয়ো না।

—কেন?

—তুমি আমাদের পড়াও বলে অনেকের রাগ।

—মুকুটরাও তো পড়ায়।

—ওঁদের পড়ানো আর তোমাদের...ও অনেক আলাদা দিদি। ওঁরা তো শুধু অক্ষর চেনান। মাসিরা সব জোট বেঁধে বেঁধে বলে—তোমরা আমাদের ব্যবসা ছাড়িয়ে দেবে। এত এত টাকার লোকসান

হয়ে যাবে। কেনাদা রবিদারা বলে অত লেখাপড়া শেখার তোদের কী দরকার? মেসোমশাই ওইজন্যেই লাঠি খেয়েছেন। তুমি থাকলে তোমাকেও মারত। অনেক খুনে গুন্ডা আছে ও পাড়ায়। তোমাকে ওরা মারের বাড়া করবে। বিশেষ, আমি চলে আসাতে। বনোদিদি ঠিকই বলেছে। আজ গেলে আমি আর ফিরতে পারতুম না।

কেউ তাকে মারতে চায়? মারের বাড়া? জিনা নামে উনত্রিশ বছরের একটি মেয়ে, যে পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম. এ পাস করে আর করার মতো কিছু না থাকায় বাবা-মা ইত্যাদি অভিভাবকদের কথায় চোখ বুজে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ে, যে ইদানীং হাতে কিছু কাজ না থাকায়, নির্দোষভাবে করবার মতো কিছু চেয়েছিল এবং বন্ধুর মাধ্যমে এই কাজটা পেয়ে সর্বান্তঃকরণে নিঃস্বার্থভাবে কাজটা করছিল, তাকে মারবে? প্রথমটা সমস্ত মন পঙ্গু হয়ে গেল তার। সব জায়গায় সে সম্মান, আদর, প্রশংসা এইসব পেতেই অভ্যস্ত। প্রথমত মেয়ে, দ্বিতীয়ত ভদ্র বাড়ির মেয়ে ও বউ, উপরন্তু আছে তার নিজস্ব রূপ-গুণ। জীবনে করবার মতো কাজ সে কিছুই করেনি কোনওদিন, করতও না, করতে হয় তা-ও জানত না। প্রথম যে কাজটা করতে গেল সেটাতেই গুবলেট করে বসে রইল? কই, মুকুট এত বছর ধরে কাজ করছে, ঋত্বিক করছে, নমিতাদি করছেন, এদের তো কোনও বিপদে পড়তে হয়নি? এরই নাম পেশাদায়িত্ব। মুকুট তাকে অনেকবার বলেছে—জড়িয়ে পড়িস না জিনা, বড্ড বেশি ইনভল্‌ভ্‌ড্‌ হয়ে যাচ্ছিস। এ রকম করলে কাজ করবি কী করে? আশ্চর্য! তার ধারণা ছিল লোকহিতকর কাজ করতে গেলে জড়িয়ে পড়তেই হয়। বিদ্যাসাগর মশাই নাকি বালবিধবাদের দুঃখে হাউ হাউ করে কাঁদতেন, বাছুরকে বঞ্চিত করা হয় বলে গোরুর দুধ খাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দের অমন স্পিরিচুয়াল কেরিয়ার? তাকে গৌণ করে দেশ, দেশবাসীর দারিদ্র, জাতিভেদ এই সমস্ত নিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে করতে অকালে জীবন দিলেন। একই কথা আরও বেশি করে খাটে সিসটার নিবেদিতার ক্ষেত্রে। সর্বোত্তম লোকহিতের এইসব নমুনাকেই তো চিরকাল আদর্শ বলে মেনে এসেছে সবাই। আর আজকে! হঠাৎ উলটো কথা শুনতে হচ্ছে? এত ইনভল্‌ভ্‌ড্‌ হয়ে গেলে কাজ করবি কী করে? কথাটা তো মুকুট ভুলও বলেনি। অতিরিক্ত ইনভলভ্‌মেন্টের জন্যেই কি আজ কাজের পথ তার সামনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না?

সোনাগাছির হালচাল

কল্যাণবাবু বাড়ি এসে বসবার ক'দিন পর জিনা কথাটা পাড়ল তাঁর কাছে। এ কদিন সে এ নিয়ে অনেক ভেবেছে। যদি তাদের বাড়িতেই একটা ক্লাস বসানো যায় দুপুরে? তা হলে আর কাউকেই ও পাড়ায় যেতে হয় না। মেয়েরা, যারা তাদের ক্লাস চালিয়ে যেতে চায়, নিজেদের পাড়ার সঙ্গে বোঝাপড়া যারা নিজেরাই করতে পারবে, তারাই শুধু আসবে। মুকুটদের সঙ্গে তেমন কোনও সম্পর্ক থাকবে না এটার।

কথাটা শুনে কল্যাণবাবু বুঝলেন জিনা মনে মনে বেশ জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তাঁকে তো আর ছেলেমানুষি করলে চলবে না। এমনিতেই বিমান একেবারে নিখিলের উপস্থিতিতেই তাঁকে অনুরোধ করেছে বার বার, এসব গোলমেলে ব্যাপারে তিনি যেন আর জড়িয়ে না পড়েন। কিছু ঘটলে যখন সেই ছেলেদেরই সামলাতে হবে তখন তাদের মতামতের মূল্য তাঁকে দিতেই হয়। মল্লিকারও সায় আছে বিমানের কথায়। তিনি বললেন, কাজটা একেবারেই ঠিক হবে না জিনা।

—আপনিও বলছেন এ কথা?

—শোনো জিনা, ব্যক্তিগত জীবন আর কর্মক্ষেত্র আলাদা রাখতে হয়। দেখো, আমিও তো স্ট্রিট বয়েজদের পড়াতাম। কোনওদিন কি তাদের বাড়িতে এনে তুলেছি? দুটো এক হয়ে যায় কোথায়?

সংঘে, সেবাশ্রমে। সেখানেও ব্যক্তিগত আব্রু, ব্যক্তিগত নিভৃতির প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করে না। এভাবে ভেবো না মা, কিছুদিন অপেক্ষা করো, একটা না-একটা উপায় বার হবেই। তা ছাড়া এ বাড়ি তো নিখিলেরও, তাকে না বলে এমন একটা স্টেপ তুমি নিতে পারো না।

—তা হলে যদি একজন-দুজনকে কোচ করার ব্যবস্থা করি।

কল্যাণবাবু হাসলেন, বুঝেছি, ওই পূর্ণিমা আর বনমালার ওপর তোমার বড্ড মায়া পড়েছে, তাই না?

জিনা চুপ করে রইল। সে বলতে চায় না, শুনতে চায়। পূর্ণিমা, বনমালা তার কাছে শুধু দুজন মেয়েই নয়, তার প্রচেষ্টার ফল, তার সাফল্য, তার সৃষ্টিও।

—ওরা যদি নিজেরা আসতে চায়, শুধু ওই মেয়েদুটিই...দেখো ভেবে। তবে জিনা...একটু হার মানতেও কিন্তু শিখতে হয় মা। আমাদের বেশি সামর্থ্য, বীরত্ব নেই। শহিদ হতে তো চাচ্ছি না। যা নেই তা স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। তোমার পরিস্থিতিতে তুমি যতটা পেরেছ করেছ, এরপরে...দেখছই তো, তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষের সাধ্য নেই এসব ঠেকানোর। কোথায় এখানে কার কী স্বার্থ জড়িয়ে আছে; বাইরে থেকে আমাদের বোঝবার উপায়ই নেই।

তখন জিনা তাঁকে পূর্ণিমার ব্যাপারটা পুরো বলল।

—এই মেয়েটিকে কি আমরা সাহায্য করতে পারি না?

তার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে কল্যাণবাবু বললেন, ও, তাই সেদিন মেয়েটিকে কেমন কেমন দেখলাম। আমি চেষ্টা করব যথাসাধ্য। কথা দিচ্ছি। কিন্তু এবার তুমি আমায় কথা দাও ও জায়গায় তুমি আর যাবে না।

জিনা হতাশ হয়ে বলল—ক্লাসই যদি না নিই, শুধু শুধু আর যাব কেন!

জিনা এখন মনে করবার চেষ্টা করে বছর দুই আগে ঠিক কীভাবে সে সময় কাটাত। কেমন ছিল সে, কী ছিল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা? আশ্চর্য হয়ে সে বোঝে তার স্পষ্ট কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল না কিন্তু। তার মা, কাকিমা, দিদিরা যেভাবে বেঁচেছেন, রান্না করে, খেতে দিয়ে, টি.ভি. দেখে, আড্ডা মেরে, দল বেঁধে বেড়াতে গিয়ে সেটাই তার কাছে ছিল বাঁচার মডেল। কিন্তু ভাবেনি, এসব নিয়ে কখনও ভাবেনি। সুখী ছিল কি? হ্যাঁ, খুব হাসিখুশি ছিল। মনের মধ্যে দিয়ে সবসময়ে একটা ফুরফুরে বাতাস বইত। সেটা যে কোন সুখের সমুদ্র থেকে বইত, কেন যে আদৌ বইত অনেক ভেবেও সে স্থির করতে পারল না। কিন্তু গত দেড়-দু'বছর সে এত নিমজ্জিত ছিল কতকগুলো কাজে, কতকগুলো চিন্তায় যে কতটুকু আড্ডা দিয়েছে, নিখিল কতটা মেজাজ খারাপ করল বা বাড়ি ফিরতে কতটা দেরি করল এগুলো নিয়ে মোটে মাথাই ঘামায়নি। উপরন্তু তার আগে মনে হত সে একজন যে-কেউ। জেঠুর জিনপরি ঠিকই। কিন্তু সে-তো একটা অতিরিক্ত প্রশ্রয়ের নাম ছাড়া কিছু নয়। অথচ এখন তার মনে হয় সে একজন, এক বিশেষ জন, অনেকের মাঝখানে সে আলাদা, সে জিনা। অন্য কেউ নয়। এখন উদ্দেশ্য ছাড়া কাজ ছাড়া বাঁচতে তার কেমন লাগবে? ঘরের দেয়ালে দেয়ালে তার চোখ ঘুরে যায়। অপরিচিত লাগে। এইসব দেয়ালের, দেয়ালে লম্বিত ক্যালেন্ডার, ঘড়ি, ছবি এসবের যেন কোনও মানে নেই। তবে কি সে কাজটা সম্পূর্ণ নিজের জন্যেই করতে গিয়েছিল? নিজেরই জন্যে করেছিল? পূর্ণিমা বা বনমালাদের জন্যে নয়?

আর একটু পরে তার মনে হল—নিজের ভাললাগার জন্যেই যদি তার কাউকে বাঁচাতে ভাল লাগে তো তাতেই বা দোষের কী আছে? সেভাবে দেখতে গেলে সব দায়বোধ সব ভালবাসাই তো স্বার্থপর। শিশুকে ভাল না লাগলে মা কি তাকে ভালবাসত! শিশু আর মায়ের চিন্তা মাথায় আসতেই তার বনমালার বাচ্চাটার কথা মনে হল। কুটুস। ছোট্ট পুঁচকে। এত মিষ্টি বাচ্চাটা যে বলার নয়। জিনার খুব ন্যাওটা হয়ে পড়েছে কুটুস। গোড়ায় গোড়ায় যখন সে রোববারে ওদের সঙ্গে বেড়াতে

যেত, তখন থেকে কুটুসের প্রতি তার একটু পক্ষপাতিত্ব জন্মেছে। সে কুটুসকে হাত ধরে বাঘের খাঁচার কাছে নিয়ে যাবে, সে কুটুসকে পাখি চেনাবে, সে কুটুসকে কোলে করে ঘরের মধ্যে শুয়ে-থাকা শজারু দেখাবে। ভারী সুন্দর একটা দুধে গন্ধ বেরোয় কুটুসের গা থেকে। অনেকবার চুপিচুপি কুটুসকে পিপারমিন্ট দিয়েছে জিনা। চুপিচুপি গল্প বলেছে। হঠাৎ তার চোখ চকচক করে ওঠে। সে ঋত্বিককে বলবে 'রোচনা'য় একটা কাজ দিতে। 'রোচনা'য় অবশ্য এখন সবচেয়ে দরকার সুপারিন্টেন্ডেন্টের। সুপারদের সারা দিনরাত থাকতে হয়। সেটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর কিছু? আর কিছু? যদি টাকা পয়সা না-ও দেয়, রাজি আছে, ওরা রাজি হলেই হয়। ওরা। ওদের সিসটেম।

—কী রে ঘুমিয়ে পড়লি? তোর ফোন।—মল্লিকা হ্যান্ড সেটটা জিনার হাতে দিল।

—কে?

—আমি মুকুট বলছি। কী হয়েছে রে মেসোমশাইয়ের?

—কেন, শুনিসনি? তোর লোকেরা বাবাকে মেরেছে!—জিনার গলা ঈষৎ রুক্ষ।

—আমার লোকেরা?—মুকুট অবাক হয়ে বলল—তোরা নাকি পুলিশে এফ. আই. আই. আর. পর্যন্ত করিসনি!

—অত সব জানি না, আমার বর ছিল আর দিদিভাই। তখন বাবাকে সামলাবে না এফ. আই. আর করবে?

—আশ্চর্য। তক্ষুনি করার তো দরকার ছিল না। কিন্তু পরেও তো করতে পারতিস!

মুকুট বলল, জিনা তোর জানা দরকার সোনাগাছির কোন গুন্ডার ক্ষমতা নেই যে আমাদের প্রজেক্টের কাউকে মেরে পার পাবে। এদের তুষ্ট করবার জন্যে আমরা যথেষ্ট পয়সা খরচ করি, চাকরি দিই, পুলিশের অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে প্রোটেকশন দিই। কাল তুই একটা নাগাদ প্রস্তুত থাকিস। আমি তোকে নিয়ে ওখানে একবার যাব। একটা মিটিং ডেকেছি। ঋত্বিক, নমিতাদি সবাই থাকবে। প্রজেক্টের আরও অনেকে। সাক্ষী হিসেবে বনমালা থাকবে, কালই একটা হেস্তনেস্ত করব।

—বাবাকে যে কথা দিয়েছি আর ওখানে যাব না।

—ও। ঠিক আছে, সে আমি মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে নেব।

পরের দিন মুকুট আসতে কল্যাণবাবু অবশ্য অনুমতিটা দিলেন, কিন্তু সেটা শুধু সেইদিনের জন্য। ও অঞ্চলে জিনার কাজ করায় তিনি স্পষ্টই আপত্তি করলেন। বললেন, দেখো মুকুট, জিনা অ্যাডাল্ট, কোনও কাজের জন্যেই ওর অনুমতি লাগার কথা নয়। কিন্তু ওর নিরাপত্তার কথা তো আমাদের ভাবতেই হয়। তুমি ওকে আর ও কাজ করার অনুরোধ করো না। তা হলে বিপদে পড়ে যাব।

—তা আমি করছি না মেসোমশাই। কিন্তু নিরাপত্তার ব্যাপারে আপনি যতটা উদ্‌বিগ্ন হচ্ছেন তেমন কোনও কারণ নেই, সেটাই আমি বোঝাতে চাইছি। তা ছাড়া এরকম একটা কাণ্ড ঘটে যাওয়ায় আমাদের তো কিছু স্টেপও নিতে হয়।

তখনই জিনা তার নিজের শর্তের কথা বলল, মুকুট আজ আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে, খালি একটা কথা দিতে হবে।

—কী কথা? সর্বনাশ! তুই আবার কথাটথা চাইছিস কেন?

—না, তেমন সর্বনাশের কিছু নেই। তোর জানা দরকার, তোদের না জানিয়েই পূর্ণিমাকে আমি 'রোচনা'য় আশ্রয় দিয়েছি। ওকে তোরা ভালভাবে বাঁচবার সুযোগ দিতে যা করতে হয় কর। মেয়েটা এখনও পর্যন্ত একরকম লুকিয়ে আছে।

—আচ্ছা সে হবে, এখন তো তুই চল।

পূর্ণিমার কেসটা মুকুট আগেই জানে। মুসোরি থেকে ফিরে এসেই খবরটা ওরা পেয়েছে। এই নিয়ে ঋত্বিক অত্যন্ত বিরক্ত। ঋত্বিক বলে মুকুট, আমার 'রোচনা'টা বাচ্চাদের হস্টেল, এক ধরনের সর্বোদয় কেন্দ্র। কিন্তু বাচ্চাদের। এটাকে যদি তোরা উদ্ধারাশ্রম বানাতে চাস আমি কিন্তু আপত্তি

করব। নষ্ট হয়ে যাবে আমার কাজটা। আজ একটা মেয়ে এসেছে, মেয়েটা সভ্য, ভদ্র আমি ওকে দেখেছি, ওর সম্পর্কে ভাল রিপোর্টই পেয়েছি। কিন্তু ওই পথ ধরে কালকে আরও মেয়ে আসতে শুরু করলে আমি কী করব? মেয়েগুলো আসবে, তাদের পেছনে পেছনে দালালফালাল, বাড়িওয়ালি মাসিফাসি আসতে থাকবে...আর জিনারই বা আক্কেল কী? উদ্ধার করতে চায় সে নিজে করুক, আমার ঘাড়ে বন্দুক রাখাটা আমি মোটেই পছন্দ করছি না।

মুকুট ওকে অনেক করে বোঝায়—জিনার পক্ষে স্বামীকে না বলে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। পূর্ণিমার পরিচয়ের কোনও মেয়েকে পরিবারের মধ্যে রাখাও অনেক ঝুঁকি। কিন্তু ঋত্বিকের সেই একই গোঁ। এভাবে সে তার 'রোচনা'র নিয়মকানুন নিয়ে ছেলেখেলা করতে দেবে না। পৃথিবীতে দুঃস্থ, দুঃখী, অত্যাচারিত, উদ্ধার প্রার্থী কোটি কোটি মানুষ আছে, তাদের সকলের দুর্দশা দূর করার সামর্থ্য ঋত্বিকের নেই। সে একটা বিশেষ শাখা বেছে নিয়েছে। ওভাবে এলোমেলোভাবে এগোনো যায় না।

ঋত্বিক যা বলছে তারও যুক্তি আছে। ঠিকই। আবার পূর্ণিমার কেসটাও অত্যন্ত জরুরি। জিনার যুক্তি, উপরন্তু আবেগও মানবিক। মুকুট কোনদিকে যাবে? অদ্ভুত সংকট। করছে সমাজসেবা, অথচ সমাজ যখন একটি অত্যাচারিত মুক্তিকামী মেয়ের বেশে তার দ্বারস্থ তখন তাকে ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবতে হচ্ছে সমাজসেবারই স্বার্থে।

মুকুট নমিতাদি তিন-চারজন ডাক্তার এবং আরও বেশ কয়েকজন অচেনা ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটের বান্ধব সমিতির ঘরে মজুত দেখল জিনা। এঁরা সকলেই মুকুটদের সংস্থার। ডাক্তাররা সবাই বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা করেন এদের। রাস্তার মোড়ে, পাশে জায়গা খালি রেখে একটা ছোট অনাড়ম্বর মঞ্চ তৈরি হয়েছে। একজন গম্ভীর দেখতে তরুণ ডাক্তার প্রথম মাইক্রোফোন হাতে নিলেন।

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। এই পাড়ার মধ্যে একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বয়স্ক ভদ্রলোকের মাথায় লাঠির আঘাত পড়েছে। এর দায়িত্ব গোটা পাড়ার। তাঁদের যেটুক রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে তা ব্যবহার করে তাঁরা সারা পাড়া রেইড করাতে পারেন ইচ্ছে করলে—এই তাঁর প্রথম ধমক। দ্বিতীয় ধমক হল, তাঁরা এই গোটা পল্লির স্বাস্থ্যের জিম্মাদারি নিয়েছেন। গত তিন বছর ধরে এই পাড়ার বুড়ো, নারী, পুরুষ এমন কেউ নেই যে এই চিকিৎসার সুফল পায়নি। গোটাটাই প্রায় দাতব্য। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলে যা-কিছু ঝামেলা তাঁদের সংস্থাই পোয়ায়। দ্বিতীয়ত, তাঁরা কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ব্যবস্থা করেছেন, যার ফলে এলাকার মেয়েরা এখন অনেক সচ্ছল। শুধু মেয়েরা নয়, মাসি-শ্রেণীর মহিলারাও। তাদের একটা ভবিষ্যনিধির মতো ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত সুযোগ সম্পূর্ণ বিনা খরচে পাচ্ছে তারা। উপরন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের লেখাপড়া শিখে মেয়েরা নিজেদের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পেয়েছে। —এই সুযোগগুলো সমস্ত বন্ধ করে দেওয়া হবে পত্রপাঠ, যদি তারা এই হামলার প্রতিকার করতে না পারে, এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে ষোলোআনা প্রতিশ্রুতি দিতে না পারে।

নমিতাদি উঠে বললেন—আমি খুব ভাল করে জানি এখানে কোন কোন স্বার্থচক্র কাজ করছে। কেন করছে। হয়তো একজনকে আমি শনাক্ত করতে পারব না, কিন্তু কারা কাজটা করে থাকতে পারে—আমি জানি। তাদের কীভাবে টিট করতে হয় তা-ও আমার জানা আছে। আমি এখুনি একটি তালিকা পড়ছি। তাদের ওপরই আমার সন্দেহ। সারা পল্লিকে আমি অনুরোধ করছি এদের বয়কট করতে। মানদা মাসি, কেনারাম আচার্য, রবি গুছাইত। এই তিনটি নাম এখুনি করতে পারি। সামনের শ্রোতাদের মধ্যে থেকে অমনি একটা রইরই রব উঠল,—কী প্রমাণ, এরা কেউ কাজটা করেছে, কোন অধিকারে তিনি পাড়ার মধ্যে বিভেদ ঘটাতে চাইছেন। মানদা মাসি ও কেনা মস্তান কোমর

বেঁধে সামনে এগিয়ে আসছিল। ডক্টর সাহা নামে এক ভদ্রলোক তখন বললেন—কল্যাণ সরকারকে কে মেরেছে আমরা ঠিকঠাক না জানলেও পূর্ণিমা দাসীকে কারা মেরেছে, কারা পাচার করেছে তা আমরা জানি। নারী-পাচার চক্রের পাণ্ডা হিসেবে মানদা ও কেনারামের বিরুদ্ধে থানায় এফ. আই. আর করে এসেছি আমরা। হাতে প্রমাণ মজুত।

প্রচণ্ড একটা হট্টগোল শুরু হল এবার। কেউ বলছে, হ্যাঁ, কেউ বলছে না। দু-চারটি বয়স্কা মহিলা অকথ্য গালাগালের স্রোত বইয়ে দিল। কিন্তু তারই মধ্যে বনমালা চেঁচিয়ে আঙুল তুলে তুলে সাক্ষ্য দিল সে কেনারাম, মানদা ও রবিকে পূর্ণিমার ওপর অত্যাচার করতে দেখেছে। সে গিয়ে না থামালে মেয়েটা মরেই যেত। পূর্ণিমার বয়সি অনেকগুলি মেয়ে তখন ক্যাচরম্যাচর করে বনমালাকে সমর্থন করল বটে, কিন্তু গজগজ করতেও ছাড়ল না।

বনোদিদির আর কী! ঘরে বাঁধা বাবু রয়েছে। আমাদের ওপর এরপর হামলা শুরু হবে। তখন যে কী করব?

তিন-চার শ্রেণীর স্ত্রীলোকের অশ্রাব্য গালিগালায় আর মস্তানদের চেঁচামেচি মুখখিস্তির মধ্যে পুলিশের গাড়ি এসে থামল। মুহূর্তে ফরসা হয়ে যেতে লাগল গলিপথ। টপটপ কয়েকজনকে গাড়িতে তুলে নিল পুলিশ। মানদা মাসি, কেনারাম উভয়েই উঠে গেল পুলিশের গাড়িতে।

সব ফাঁকা হয়ে গেলে ডক্টর সাহা বললেন, মুকুট এখুনি কিন্তু আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। সত্যিই মেয়েগুলোর ওপর হামলা হতে পারে। আমরা বরং ক্লাবঘরে একটু বসি।

বনমালা বলল, সেই ভাল। দিদিরা আপনারাও তা হলে আমার ঘরে একটু এসে বসুন না! যা ঝামেলা গেল!

নমিতাদি বললেন, সেই ভাল, চলো, এখানে তো আর জায়গাও নেই। ডক্টর সাহা আপনি ওই রবি গুন্ডাকে ডেকে বেশ করে একটু সমঝে দিন। কী মনে করেছে কী?

উঁচু উঁচু সিঁড়ির কোণে কোণে ছত্রিশ দেবতার টালি। তা সত্ত্বেও আশেপাশে পানের পিক। তা সে তো বড় বড় অফিসবাড়িতেও দেখা যায়, আবাসনের ফ্ল্যাটে পর্যন্ত দেখা যায়। সঙ্গে মুকুট এবং নমিতাদি, তার ওপরে সকাল থেকে কুৎসিত ভাষা, অঙ্গভঙ্গি, পুলিশ, সব মিলিয়ে জিনার মানসিক অবস্থা এমন বিভ্রান্ত ছিল যে খেয়াল ছিল না সে কোথায় যাচ্ছে। বনমালা যখন তালা খুলতে ব্যস্ত হঠাৎ ব্যাপারটা খেয়ালে এল তার। তাকিয়ে দেখল—সরু প্যাসেজের ধারে ধারে ঘর। টানা বারান্দার ওধারে উঠোন, বারান্দার গোঁজের ভেতর পায়রা বকবক করছে, তার কেমন গা ঘিনঘিন করে উঠল। সে একজন বারবনিতার ঘরে যাচ্ছে। এইসব ঘর অবৈধ, বিকৃত, দাম-দিয়ে কেনা যৌনক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট। তার মনে হল—দরজা খুললেই সে কোনও কুৎসিত দৃশ্য দেখতে পাবে।

বনমালা বলল, মুকুটদিদি এসেছে আগে, নমিতাদিও বোধহয় একবার, না নমিতাদি? আপনি কিন্তু একবারও আসেননি দিদি। তার মুখে খুশির বিগলিত হাসি। চোখে মুগ্ধতা। জিনাদিদি তাদের হিরোইন।

দুটো ঘর। প্রথমটা বসার। সোফা-কোচ দিয়ে দিব্যি সাজানো। মাঝখানে আবার একটা কার্পেট। ভারী পরদা ঝুলছে দরজায়। জানলায় ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড। বনমালা বেশ গর্বের সঙ্গে এ. সি. চালিয়ে দিল। তারপর ফ্রিজ থেকে ঠান্ডার বোতল বার করল। ফ্রিজ ভর্তি হুইস্কি, রাম, বিয়ারের বড় বড় বোতাল। পরিষ্কার সাদা গ্লাসে তিনজনকে ঠান্ডা পরিবেশন করল বনমালা, নিজেও একটা গ্লাস তুলে নিল। দু চুমুক খেয়েছে কি না খেয়েছে বাইরের দরজা ঠাস করে খুলে ঘরে ঢুকলেন এক উত্তর চল্লিশ সুপুরুষ ভদ্রলোক। পরনে গ্রে স্যুট।

—কী রে বনো, হঠাৎ আপিসে তলব? তোকে নাকি কারা থ্রেট্ন্ করছে?

কেমন একটা মস্তানি ভঙ্গিতে বললেন ভদ্রলোক। যা তাঁর পোশাক, চেহারা কিছুর সঙ্গেই যাচ্ছিল না। যেন আমের খোসার ভেতর থেকে চালতা বেরিয়ে এসেছে।

ঘরের চৌকাঠ পেরিয়েই গোঁত্তা খেয়ে থেমে গেলেন ভদ্রলোক। সামনে সারি সারি তিন মহিলা। একজনের হাত থেকে গেলাস পড়ে চুরমার হয়ে গেছে, কার্পেট খাচ্ছে এখন ঠান্ডা পানীয়। অন্য আর একজন চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রয়েছে, হাতে গ্লাস, মুখ হাঁ। বুনো ষাঁড়ের মতো একটা ঝটকা দিয়ে পেছনে ফিরল লোকটি। তারপর সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে যাবার একটা ঝড়ো শব্দ হল।

বনমালা বলল—কী হল? ফটিকবাবুকে দেখে আপনারা অমন ভয় পেলেন কেন? এমনিতে উনি তো খুব ভাল লোক।

জিনা মূর্তির মতো বসেছিল। আপাদমস্তক শক্ত, খাড়া, সাদা। ভারী অথচ পলকা। যেন এক ঘা মারলেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে।

—জিনা-আ—মুকুট ডাকল একটু পরে, এই জিনা! সে তাকে হাত দিয়ে সামান্য একটু ছুঁল। জিনা হঠাৎ কৌচের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। বনমালা না ধরলে একেবারে তালগোল পাকিয়ে পড়ত।

কোনওক্রমে কৌচের ওপর তাকে লম্বা করে শুইয়ে বনমালা ব্যস্ত হয়ে বলল—ডাক্তার ডাকব মুকুটদিদি? জিনাদিদির কি ফিটের ব্যারাম আছে নাকি গো?

—তুমি একটু ঠান্ডা জল আনো।

জলের বোতল বার করতে করতে বনমালা বলল, ফটিকবাবুই বা অত ঘাবড়ালেন কেন?

নমিতাদি আস্তে বললেন, সত্যিই। মালটি পালাল কেন? অফিসার লোক। মান গেল নাকি?

বলবে কি বলবে না মুকুট? কিন্তু এ তো চাপা থাকবার নয়, তাই মুকুট চাপা গলায় বলল, নমিতাদি, উনি জিনার স্বামী। নিখিল দে সরকার। নমিতাদি মুখটা হাঁ করেছিলেন কিছু বলবেন বলে, সেই অবস্থাতেই থেকে গেলেন।

বনমালা জলের বোতলটা ধুপ করে নামিয়ে বলল, কী বললে মুকুটদিদি? কী বললে?

—তোমার বাবুটি জিনাদিদির বিবাহিত স্বামী—শুনলে তো। মুকুটের গলার স্বর রুক্ষ।

—কী বলছ? এ হতে পারে না দিদি, তোমাদের ভুল হচ্ছে, উনি ফটিকবাবু। জে.সি.টি-তে মস্ত কাজ করেন।

—হ্যাঁ, তা করেন বোধহয়।

—উনি...উনি যে বলতেন...আধপাগল বউ...দেখতে কুচ্ছিত, ওঁকে খুশি করতে পারে না...ও মা! বলতে বলতে বনমালার মুখ ভেঙেচুরে যাচ্ছিল।

—চুপ করো বনমালা, প্লিজ চুপ করো, যে কোনও মুহূর্তে ওর জ্ঞান ফিরবে।

—কেন চুপ করব মুকুটদিদি? কেন? তোমরা অন্তত শোনো, আমি জেনেশুনে জিনাদিদির সব্বোনাশ করিনি গো! আমার জানতে ইচ্ছে হত বিয়ে-থা হয়েছে, বড়লোকের ছেলে, বড় কাজ করে সে কেন আমার মতো...বললে বিশ্বাস করবে না দিদি আধপাগল বউ সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরলে কী খোয়ার করে সেসব প্রতিদিন আমায় শোনাত! বিছানায় নিতে পারে না বউকে....সে এমন। নানা পাড়ায় ঘুরে তবে আমাকে পছন্দ হয়ে যায়। বলত, সম্পত্তি সব বউয়ের নামে। খান্ডারনি বউ...। ডিভোর্স দিতে পারছে না সেই নিয়ে কত কেচ্ছা...পাগল বউটাকে পার করতে পারলেই আমায় নিয়ে থাকবে...ওমা! কী সব্বনাশের কথা! ও জিনাদিদি গো...। আমায় দোষী ঠাউরো না গো...

—তুমি চুপ করবে বনমালা? এবার কিন্তু তোমায় একটা চড় মারতে হবে আমাকে—

—আমার কী দোষ? আমাকে কেন এতদিন পরে 'তুমি' করে বলছ মুকুটদিদি? আমি থাকতুম ঠিক গেরস্তর মাগের মতো গো! আজ ছ বছর অন্য লোক করিনি। জিনাদিদি যে আমাদের সরস্বতী ঠাকুর। হায়! হায়! মারো, মারো, তোমরা আমাকে খুব করে মারো গো—হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল বনমালা।

জিনা আস্তে আস্তে চোখ মেলল। সামান্য একটু ঠোঁট ফাঁক করে বলল, একটা ট্যাকসি।

ছুটে বনমালা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জিনার সারা শরীরে বিনবিন করে ঠান্ডা ঘাম। চোখের সামনে হলুদ কালো ফুটকি ফুটকি ফুটকি। অনেক দূর থেকে কার কণ্ঠ ভেসে আসছে...কোন উন্মাদিনীর...আধপাগল বউ...ভীষণ কুচ্ছিত...বিছানায় নিতে পারে না...চুপ করবে বনমালা? চুপ করবে? চুপ করো, চুপ করো, চুপ...চুপ...

ঘোরটা কাটবার পরও সে চোখ খুলতে পারেনি। চিরকালের জন্যে যদি চোখ বুজে থাকা যেত!

ন্যায় বিচার

প্রচণ্ড শকে মানুষের যেটা হয়, জিনার সেটা হল, সেটা আত্মপরিচয়লোপ। পাগলের মতো নয়। ঠিক তার আগেকার বিভ্রান্ত অবস্থা। হাত-পাগুলোর দিকে সে অপাঙ্গে তাকিয়ে থাকে, এ কার হাত? কার পা? এগুলো তো সে চেনে না। সে কি একটা স্বপ্নের মধ্যে বাস করছে? এই যে মানুষটার ছায়া পড়ে রোজ আয়নায়, লাল ব্লাউজ কালো তাঁত, নীল ব্লাউজ সবুজ ছাপ। গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ঘাড়ে পিঠে কাঁধের পাশে, চোখের তলায় কালি, নাকটা জেগে আছে,—এই মানুষটা কে? একে যেন কত জন্ম আগে কোন আলাদা গ্রহে চিনত সে—এ কোথা থেকে এল? 'জিনা জিনা' বলে কাকে ডাকছে ওই লক্ষ্মীশ্রী মুখ। ও-ই বা কে?

—হ্যালো...ও মাসিমা? হ্যাঁ আমি মল্লিকা বলছি। জিনা? জিনা তো বাথরুমে। বেরোতে একটু দেরি আছে। কিছু বলব মাসিমা?

—না, খোঁজ নিচ্ছিলাম। ভাল তো সব?

ভাল নয়। কিন্তু ভাল-ই বলতে হয়।—হ্যাঁ সবাই ভাল। হ্যাঁ বাবা একটা লাঠি নিয়ে; 'হ্যাঁ তেপায়া মতো লাঠি...। হিল দিয়েছে একটা। একটু তো দেরি হবেই।

ভারী নিশ্চিন্তে আছে দমদম।

—জিনা একটু খেয়ে নে...

—চিবোতে পারছি না...অবশেষে সে বলে।

মল্লিকা তরল খাবার আনে। খেয়ে নেয় জিনা। কল্যাণবাবুর পরামর্শে ওষুধ দেয় মল্লিকা, জিনা চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ে।

তৃতীয় দিনও নিখিল বাড়ি এল না। বিমান বলল, এবার তো একটা খোঁজ নিতে হয়। অফিসে খোঁজ নেব?

কল্যাণবাবু বললেন, তোমার দরকার থাকে নাও, আমার দরকার নেই।

ডাক্তার এনেছে মুকুট, সঙ্গে ঋত্বিক। পরীক্ষা করলেন। কঠিন খাবার গিলতে পারছে না জিনা। সব শুনেছেন ডাক্তার। ইশারায় সবাইকে সরে যেতে বললেন। তারপর সামনে বসে বললেন; আমার দিকে তাকান তো দেখি একবার। হ্যাঁ, দেখি! চোখের মণির মধ্যে আলো ফেলে কী দেখলেন তিনিই জানেন, বললেন, কিছু মনে করবেন না মিসেস সরকার, কার জন্যে জীবনপাত করছেন। এরা কি আপনার মন খারাপের যোগ্য? খুব বেঁচে গেছেন এ লোকের সন্তানের জন্ম আপনাকে দিতে হয়নি। লোকটাকে ঝেড়ে ফেলে দিন মন থেকে, মনখারাপও ঝরে পড়ে যাবে। নতুন করে জীবন শুরু করুন। এত সুন্দর স্বাস্থ্য, এত সুন্দর একটা জীবন আপনার...

শ্লেষে জিনার ঠোঁট বেঁকে গেল। উনি বললেন, আরে নতুন করে জীবন শুরু করা সহজ নয় আমি কি জানি না? কিন্তু কতটুকু বয়স আপনার? উঠুন, খাওয়া দাওয়া করুন, জীবন আপনিই শুরু হয়ে যাবে।

খুব শকে মানুষের যেটা প্রথম হয় সেটা হল আত্মপরিচয় লোপ। কিন্তু তারপর যেটা হয় সেটা

হল নতুন একটা আত্মপরিচয় লাভ। আস্তে আস্তে তার মনে হতে লাগল সে যা যা জানত তার সবই ভুল। নিজেকে সে যা ভেবেছিল তা-ও ভুল, তা হলে সে কে? একদিন উঠে সে চান করতে গেল নিজে নিজেই। খুব ভাল করে আয়নায় দেখতে লাগল নিজের মুখ। যদি কোথাও কোনও অভিজ্ঞান পাওয়া যায়। ওই প্রতিচ্ছবিরই ভুরুতে, কানের লতিতে, চিবুকের ভাঁজে, সেই আসল জিনাকে খুঁজতে থাকে সে অনেক অনেক ক্ষণ ধরে।

মল্লিকা একদিন দেখল তার প্রিয় সাদা সালোয়ার-কামিজ পরে বেরিয়ে এসেছে জিনা। ড্রেসিং টেবলের ড্রয়ার থেকে কী একটা স্প্রে বার করে সারা শরীরে সুগন্ধ ছড়াল। চুলগুলো পুরো ভেজায়নি। পেছনে একটা চিমটে মতো ক্লিপ দিয়ে আটকে রেখেছে। আলমারি থেকে এক থাক শাড়ি-পোশাক বার করল, ড্রেসিং টেব্‌ল থেকে প্রসাধনের জিনিস, ড্রয়ার থেকে সম্ভবত তার নিজের উপার্জনের টাকা, সব একটা সুটকেসে ভরতে লাগল।

মল্লিকা ভয়ে ভয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছিস, জিনা?

—কদিন থাকতে দেবে?—

—সে কী? থাকতে দেব মানে?

—ঝুম্পাদের ঘরে, জায়গা হবে?

—কেন হবে না? আয়।

সে বলল, আমি এখন একটু বেরোব। কিছু খেতে দেবে?

—আমার সব রান্না হয়ে গেছে। তুই আয় না।

খেতে বসে খাপছাড়াভাবে জিনা বলে উঠল, তোমরা আমার কাছ থেকে কী আশা কর? এখন?

—তুই কি আমাদের ছেড়ে চলে যাবি?

—'দের'টা কে?

—কেন আমি, আমার মেয়েরা, বাবা...

—জানি না। সময়ের নিয়মে সব ক্ষীণ হয়ে যায় তো যাবে। গেলে কিছু করার থাকবে না।

—এখন কোথায় যাচ্ছিস?

—ঠিক করিনি। আমায় একটু ভাবতে হবে। এখানে ভাবতে পারছি না।

—আমি সঙ্গে যাই না!

—পাতাল রেলে ঝাঁপিয়ে পড়ব ভাবছ! ওসব করছি না।

এইসময়ে সিঁড়ির মাথায় কল্যাণবাবুর স্বর শোনা গেল। লাঠি ঠুকে ঠুকে তিনি মাঝের দরজা দিয়ে এদিকে চলে এসেছেন জিনার খোঁজে।

—জিনা কি খাচ্ছে? বউমা?

—হ্যাঁ বাবা, বেরোবে।

—আচ্ছা, বেরোবার আগে ওকে একবার একটু ওপরে আসতে বলো।

জিনা বিরক্ত গলায় বলল, কী বলবার আছে আর এ-বাড়ির কারুর? আমাকে?

খাওয়া শেষ করে সে অনিচ্ছুক কঠিন মুখে ওপরে উঠে গেল।

বাইরে খুব উজ্জ্বল রোদ উঠেছে আজ। এখনও গায়ে বিঁধছে না ঠিক। কিন্তু শিগগিরই প্রবল হয়ে উঠবে জানান দিচ্ছে। শীতশেষের রোদের এই আসন্ন প্রখরতা, তীক্ষ্ণতা এসব সাপেদের, ভালুকদের, আরও নানা সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের ঘুম ভাঙাচ্ছে। প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে অনাগত প্রাণহীন শরীরে। ভেতরে কেমন একটা অজানা অচেনা স্পন্দন। পাতাল রেলের কামরায় বসে বসে জিনা নিজেকে বলতে লাগল—জীবনের প্রথম ত্রিশটা বছর আমার কেটে গেল শীতঘুমে। বেঁচে ছিলাম অথচ চেতনা ছিল না। ওইরকম নিশ্চৈতন্য সুখের ভাতঘুম আমাকে বছরের পর বছর শিখিয়েছিল আমার পরিবার। কেউ একবারও ভাবেনি, চাকরি ছাড়াও মানুষের কাজ থাকে, প্রজনন ও সন্তানপালন

ছাড়াও ভিন্নতর দায় থাকে। ভাবেনি বলেই কি নাগচৌধুরী পরিবারের ক্যাপসুলে-মানুষ মেয়ের জীবনে মহাজাগতিক অন্ধকার নেমে আসে? সে অন্ধকার কেমন করে পার হতে হয় পরিবার তো তাকে শেখাতে পারবে না। কী লজ্জা। উঃ জিনার বিয়েটা এমন দাঁড়াল। ছিঃ জামাই এরকম। কী দুর্দৈব! কারুর বেলা হয় না তো এমন! জিনাটারই ভাগ্য খারাপ! আস্তে আস্তে আদরে ময়লা ধরবে, পেতলে-ভরনে কলঙ্ক পড়ার মতো। তারপর জিনাকে নিয়ে বিব্রত হতে থাকবে সবাই। কত সহজে জেঠু এক একটা মেয়ের বিয়ে স্থির করেন! একটা মেয়েকে একটা লোকের সঙ্গে জুড়ে দিলেই হল। গাঁটছড়া একটা। ভাল চাকরি করে? বাড়ি আছে? পরিবারে সব বেঁচে-বর্তে আছেন তো? পড়শিরা কী বলছেন? নাঃ কোনও বদখেয়াল নেই। দাম্পত্য জীবনের যেসব তালিকা তাদের মেয়েমহলে আলোচিত হত, তার মধ্যে শাশুড়ি-ননদ প্রবলভাবে ছিল। কিন্তু বেশ্যা? কখনও শোনেনি। কারও সঙ্গে কারও বনল না, প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য কারণে। বিচ্ছেদ হয়ে গেল। কেউ বা অপরকে ভালবাসল, বিচ্ছেদ হয়ে গেল। এমনটা আবছার শোনা যাচ্ছে আজকাল। যদিও তাদের পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে এমন জিনিস ঘটেনি। কিন্তু তাকে বলতে হবে তার বিবাহিত স্বামী বিবাহের প্রথম দিনটি থেকেই তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, আর সে এতই বোকা যে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তার স্বামী বেশ্যাসক্ত। সেই জিনার স্বামী, যে জিনা সম্পর্কে পাঁচজনের ধারণা এ মেয়েকে নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না, কারণ এর ভেতরে অফুরন্ত আনন্দের উৎস আছে, মানিয়ে নিতে তার জুড়ি নেই, রূপ-গুণ সবই দেখবার মতো। সারারাত তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে উলটেপালটে সম্ভোগ করে, লোকটা আবার সন্ধেবেলায় চলে যেত ওই নোংরা গলির পানের পিক লাগা সিঁড়ি বেয়ে, নোংরা ভাষা গন্ধ স্পর্শের মধ্য দিয়ে একটি অতি সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মেয়ের কাছে যে নাকি ন'বছর বয়স থেকে দেহ-বিক্রি করছে? কী অপমান! কী ভীষণ ঘেন্না! নিজের শরীরটাকে তার নোংরা কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

দিন দুয়েক এরকম রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল সে। পাতাল রেলের টিকিট কাটে অফিস-টাইমটার পরে। এ-মুড়ো ও-মুড়ো বার বার যায় আসে, যায় আসে। ইচ্ছে হলে কামরা বদল করে, নয়তো এক জায়গাতেই বসে থাকে অনড়। এইভাবেই ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলে। পাতাল থেকে উঠে আসে একদিন। সারা দিন নানান কাজে ঘোরাঘুরি করে। ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে। পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় ডাকে কোনও কোনও দরকারি মানুষকে। চলেও যায় কারও কারও প্রাইভেট চেম্বারে, পরামর্শ নেয়।

এইজন্যেই মুকুটদের সঙ্গে মেলামেশায় বড্ড আপত্তি ছিল লোকটার। যদি জেনে ফেলে? এইজন্যেই মুকুটকে, ঋত্বিককে এত গালাগাল। ভাবতেও পারেনি ওর অগোচরে ইতিমধ্যেই জিনা পৌঁছে গেছে পাপের অন্দরমহলে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ নিয়ে। কিচ্ছু জানত না। জিনা কখনও ঘরের ঘেরাটোপ থেকে বেরোতে পারে? অমন সিল্কের পরদা দেওয়া রুপোলি খাঁচার ঘেরাটোপ। বয়স্ক-শিক্ষা। শখ হয়েছে দুদিন শখ করে হয়তো বস্তিটস্তিতে যাবে। যেমন তার খ্যাপা বাবা গিয়ে থাকেন। তারপর আর ভাল লাগবে না। ফিরে এসে নিজের ছেলেভোলানো খেলাঘর নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকবে। বাজার করবে, রান্না করবে ভাল ভাল, পার্টি জমাবে, সারা সন্ধে টিভি দেখবে, আড্ডা মারবে, আর সারা রাত্তির তাকে 'খুশি' করতে পারবে না।

সন্ধের বেশ পরে জিনা ডাফ স্ট্রিটের বাড়িতে ফিরে এল। মল্লিকা জানলায় ছিল, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ঝুম্পা কফি নিয়ে এল। মাম্পি—তিনটে প্লেটে তিনটে ধোসা। মল্লিকাকে দেখা যাচ্ছে না। সে আড়াল থেকে এইসব উদাসীনতা-ভেদী তির পাঠাচ্ছে। স্নেহ কাড়া মুখের মাম্পি। নিষ্পাপ, সদ্য কৈশোরের অকলঙ্ক সৌরভ তার গায়ে। ঝুম্পা, যে বুদ্ধি আর বৌদ্ধিক জগতের আকর্ষণে একদম আলাদা, সম্পর্কের জটিলতা, মানবীয় সমাজ-সংসারের-পাপের দিকে যার দৃষ্টি এখনও পড়েইনি। শুধু এই সঙ্গটুকুই জিনাকে ভোলাবে, ভোলাতে পারবে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও সে সহজ হবে।

কফি আর ধোসা শেষ করে জিনা ঝুপ করে শুয়ে পড়ল মাম্পির বিছানায়। তার হাতে মাম্পির একটা টেক্সট বুক, ইকোলজির চ্যাপ্টারটা উলটে পালটে খুলে আলগা চোখে আলগা মনে পড়ছে, বলল, রাত্তিরে আর খেতে পারব না। ঘুমিয়ে পড়লে ডাকিসনি। তোরা যতক্ষণ খুশি আলো জ্বেলে পড়। খালি বেশি চেঁচাসনি।

বাইরে সাদা মাতিজ এসে থামল। একটা হর্ন দেয়, তারপর ঘষ্‌ষ্‌ করে একটা আওয়াজ তুলে গ্যারাজে ঢুকতে থাকে গাড়িটা। শুধু জিনা নয়, বাড়িসুদ্ধু সবারই মুখস্থ এই শব্দ পরম্পরা। মাম্পি ঝুম্পার দিকে তাকাল। ঝুম্পা বইয়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। লজ্জাশৌচ শেষ হল নিখিলবাবুর।

রাত দশটা নাগাদ থালা-বাটিতে নিখিলের খাবার সাজিয়ে মল্লিকা এ ঘরে এল। নিচু গলায় বলল, দিয়ে আয়।

ঝুম্পা বলল, আমি না। মাম্পি তুই যা।

কী আর করা। মাম্পি থালাটা নিয়ে চলে গেল। ঠিক কী হয়েছে ওরা জানে না। এ বাড়িতে ছোটরা ছোটদের মতোই থাকে। কেননা এটা ছোট্ট ফ্ল্যাটের সংসার নয়। ছোটদের আর বড়দের মাঝখানে আড়াল রাখার জায়গা এখানে অনেক। ঝুম্পার উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত টিভি থাকত শুধু কল্যাণবাবুর ঘরে। ঝুম্পা অনুমান করেছে ব্যাপারটা নারীঘটিত। মাম্পি শুধু বোঝে সাঙ্ঘাতিক কোনও মনোমালিন্য হয়েছে দুজনের মধ্যে। দু-একবার দিদিকে বা মাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে ধমক খেয়েছে শুধু।

—কে পাঠাল? খাবার দেখে কাকা জিজ্ঞেস করল।

—মা।

—কাকিমা কোথায়?

—ঘুমোচ্ছে।

যাক, তবে সব ঠিক আছে।

দিন তিনেক সময়মতো খাবারদাবারের সরবরাহ পাবার পর নিখিল সন্ধেরাত্তিরে মাঝের দরজা খুলে দাঁড়াল। এখন সে সকাল সকাল বাড়ি ফিরছে।

—জিনা! জিনা কি এখানে আছে?

কেউ উত্তর দিল না।

পঞ্চম দিনে সে সোজা বাবার ঘরে চলে গেল।

—বাবা?

চোখ তুলে তাকালেন কল্যাণবাবু।

—আপনি ওকে একবার ডেকে পাঠান। আমার কতকগুলো কথা বলবার আছে।

—আমি ডাকলেই সে আসবে কেন?—বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়ে নিলেন তিনি।

—আমার সিরিয়াস কিছু কথা আছে। বাবা আপনি একবার...

হাতের কাছে বেলটা একবার বাজালেন কল্যাণবাবু।

ডলি এসে দাঁড়াল। তিনি বললেন, জিনাকে একবার ডেকে দাও তো! জিনা বউদি, ছোট বউদি এসব সম্পর্কবাচক শব্দ আর তিনি ব্যবহার করছেন না।

একটু পরে জিনা এসে ঢুকল। এই কদিনে সে এতটাই বদলে গেছে যে চমকে যেতে হয়। বেশ কয়েক কে.জি. ওজন কমে গেছে। গায়ের রং রোদ-পোড়া। কিন্তু সবচেয়ে পরিবর্তন তার চোখ এবং ঠোঁটের চেহারায়। এইগুলো সব সময়ে হাসত। এখন কঠিন ভাবহীনতা সেখানে। নিখিলকে দেখেই সে চলে যাচ্ছিল।

কয়েক পা এগিয়ে নিখিল তার পথ আটকাল। চাপা গলায় বলল, আমায় মাফ করো জিনা। এই দেখো আমি নাক-কান মলছি। এ একটা বিশ্রী অভ্যেস। বাজে। তুমি প্লিজ আমায়...আর কখনও এমন হবে না। আমি তোমাকে ভালবাসি। বাবা...ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন। আমি অনুতপ্ত, আমার ভুল হয়ে গেছে।

জিনার দেয়ালে পিঠ। সে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে রয়েছে।

—একটা বাজে অভ্যেস। স্বীকার করছি জিনা। এর জন্যে তুমি আমায় যে শাস্তি দাও যা করতে বলো—ক'মাস পরেই আমরা ইয়োরোপে ঘুরতে যাব।

তুমি প্যারিস দেখতে চেয়েছিলে! সব ঠিক হয়ে যাবে। একবার, একবারটির মতো...।

—আপনি বনমালা রাহাকে শাস্ত্রমতে হোক, রেজিস্ট্রি করে হোক বিয়ে করুন।

—কী-ই? —চিরে গেল নিখিলের রুষ্ট কণ্ঠস্বর।

—বেশ্যাকে বিয়ে? বাজারের বেশ্যাকে? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার?

—করতে আপনাকে হবেই। আপত্তি করলে শুনব না। আমি এক্ষুনি ডিভোর্স দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু শর্ত বনমালা রাহাকে বিয়ে করে স্বীকার করতে হবে, সে আপনার স্ত্রী। তার ছেলে আপনার ছেলে।

—কে কার ছেলে? মুখ ভেংচিয়ে উঠল নিখিল, ওই বেশ্যা মাগিটার ছেলে আমার?

—না হলেও ওকে অ্যাকসেপ্ট করতে হত। কিন্তু ও আপনার, সেটা আপনিও জানেন।

—সোনাগাছির বেবুশ্যে একটা! থুঃ! লাথি মারি আমি অমন বিয়ের মুখে।

কল্যাণবাবু বললেন, এ ঘর থেকে তুমি বেরিয়ে যাও।

পায়ের কাছে একটা মোড়ায় লাথি মেরে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেল নিখিল।

জিনা নীরস গলায় বলল, আমি ওর অফিসে সব খোঁজ নিয়েছি। পুরো ঘটনা জানিয়ে দিয়েছি। ওর বস, কোম্পানি ওর ওপর সন্তুষ্ট নয়। উনি ডিসিশন নিচ্ছেন শিগগির ওকে ভি. আর. এস. নিতে বলবেন। বেশি পাওনা ওর হবে না, যা শুনলাম জলের মতো দেনা করেছে। আমার ওপর নির্ভর করছে ওর চাকরি। ভাল করে ওকে বুঝিয়ে দেবেন ব্যাপারটা। সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

এইবার কল্যাণবাবু পুরোপুরি বুঝতে পারলেন জিনাকে। সে একই সঙ্গে শাস্তি এবং সুবিচার দুটোই দিতে চাইছে। তেমন করে হয়তো সে জানে না কিন্তু জিনা নিজেই একটা নতুন সামাজিক শক্তি। একা সে দাঁড়িয়েছে একটা দীর্ঘদিন চলে-আসা পাপাচরণের বিরুদ্ধে। তার সংস্থা নেই, প্রতিষ্ঠান নেই, ট্রেনিং নেই, অভিজ্ঞতা নেই, আছে খালি প্রবল ন্যায়বোধ আর ইচ্ছাশক্তি। এবং পৌরুষ, যদি এই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিকে পৌরুষ বলা যায়। জিনা একা। আজ হয়তো একা। কিন্তু সে একা যে প্রশ্ন তুলেছে অচিরে সেই প্রশ্ন যুগ-মানসে অনন্য দৃঢ়তায় খাড়া হয়ে যাবে। এভাবেই সব বিপ্লবের শুরু হয়। জনমানসে নয়, ব্যক্তিমানসে।

যুগের পর যুগ অসহায় নারীকে বহুভোগ্যা করেছে বহুলোভী কামুক। ভোগ করে উচ্ছিষ্ট ভাঁড়ের মতো ফেলে দিয়েছে। সমাজ-বেষ্টনীর ভেতরে স্ত্রী, বাইরে গণিকা। কাউকেই তার প্রাপ্য দেয়নি অথচ নিয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে সমস্ত সুখ। সুসজ্জিত শৃঙ্খলাবদ্ধ বিধিবদ্ধ সামাজিক জীবনের সুখ-শান্তি-জৌলুস, আবার স্বৈরাচারের নিষ্ঠুর মজা। সন্তান উৎপাদন করেছে গণিকালয়ে, তারপর নামহীন, পরিচয়হীন তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে পৃথিবীর আঁস্তাকুড়ে। এর জন্য অনেক করুণার অশ্রু বর্ষিত হয়েছে, আহা-উহুতে ভরে গেছে পৃথিবী। কিন্তু বিচারের কথা কেউ কখনও ভাবেনি। ব্যভিচারী নারীকে অক্লেশে শাস্তি দিয়ে গেছে সমাজ। ব্যভিচারী পুরুষের জন্যে ক্ষমা, ভয়, প্রশ্রয়, বড় জোর একটু ঘৃণা। পুরুষরা তো বহুচারী হয়েই থাকে। আহা! প্রকৃতিই এমন করে তৈরি করেছে এই বেচারা শক্তিমানদের।

প্রকৃতি একা পুরুষকেই এভাবেই সৃষ্টি করেছে এ কথা কি সত্যি? কল্যাণবাবু ভাবেন নানা দেশের প্রচলিত শাস্ত্রে-সাহিত্যে মেয়েদের সম্পর্কে প্রচুর কটূক্তি আছে। নারীরা বহুগামী, স্বৈরাচারী, স্বভাব শিথিল...অনেক অনেক। কেন এত কটূক্তি? এ সবই কি কপোলকল্পিত? না-ও তো হতে পারে? প্রথম যুগগুলোতে সকলেই তো ছিল স্বেচ্ছাগামী। বহু যুগের ওপার থেকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন সেইসব সুন্দরীদের, যারা স্বেচ্ছাবিহার করত। বসন্তোৎসবের নামে কুঞ্জ বনে বনে অবাধ যৌনলীলায় মেতে উঠত। পরিবারের প্রয়োজনে, সন্তান পালন, গৃহ ও সমাজকে ধারণ করবার জন্য একদিক

থেকে শেকল পরানো হতে লাগল তাদের ওপর। আর এক দিক থেকে চলল নীতিশিক্ষা বর্ষণ—পরপুরুষ গমন পাপ, না জেনেও তা করে অহল্যা পাষাণ হয়েছিলেন, এক পুরুষের প্রতি অনুগত থাকাই পুণ্য, তাতে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, এইভাবে চলতে চলতে একদিন মৃত পুরুষের চিতায় তাদের তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল সমাজ। এই পলিসি-মেকিং-এর রাশ যদি সে সময়ে নারীর হাতে থাকত তা হলে? তা হলে হয়তো আজ যাকে বেশ্যাপল্লি বলা হচ্ছে সেইরকমই হত নারীমহলের অন্দরের চেহারা। মেয়েরাও ইচ্ছামতো বিহার করত, তারপর ফিরে যেত ঘরের সুখ, শান্তি, স্বস্তির মধ্যে, নিশ্চিন্ততার জন্যে যেমন আজকের স্বেচ্ছাচারী পুরুষ যায়। সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত যদি হয় পরিবার, যদি সে পরিবার-প্রথাকে মান্য করতে হয়, তা হলে তো সবাইকেই তা করতে হবে। মেয়েদের মধ্যে যদি নিষ্ঠা দীর্ঘদিনের ট্রেনিং-এ ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে তা হলে পুরুষদের ক্ষেত্রেই বা তা হবে না কেন? ব্যতিক্রম চিরকাল ছিল, থাকবে। কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফলের নীতি থাকবে কেন?

জিনা পরিবারকে স্বীকার করার পুরো অর্থ সহজ বুদ্ধিতে এখন বুঝেছে—সমস্তটা নেব আর এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ মাত্র ফেরত দেব এ হয় না। পারিবারিক মর্যাদা ছাড়া নারীকে ব্যবহার করা মানে পরিবার-সিস্টেমকে অগ্রাহ্য করা। নারীর অমর্যাদা তো বটেই, এই কোণ থেকে মুকুটরা সমস্যাটাকে দেখেনি। তারা ভাবে—আর্থিক অবস্থা তৃতীয় পৃথিবীর যা, তাতে করে এইসব মেয়ের অন্নসংস্থানের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। সুতরাং যতই খারাপ হোক, ব্যাপারটা চলুক। বরং যদি মেয়েগুলোর দুর্দশা একটু কমানো যায়। এভাবে আপসমুখী চিন্তা করে কোনও সভ্যতা বাঁচতে পারে না। প্র্যাগম্যাটিক হও। কিন্তু লক্ষ্যটাকে অন্তত ঘোষণা করো, বাঁচিয়ে রাখো, যাতে জমি তৈরি হলেই আসল কাজ শুরু করতে পার। মুকুটরা যা ছ-সাত বছরে সম্ভব করতে পারেনি, জিনা তা পেরেছে মাত্র দেড় বছর সময়ে। মুক্তির ইচ্ছা জাগিয়েছে। মুক্তি সম্ভব করেছে একজনের। আর একজনেরটা করার দিকে পা বাড়িয়েছে। অথচ জিনার কোনও ট্রেনিং নেই।

বনমালাকে পুত্রবধূ ভাবতে তাঁর নিজের ভেতর থেকে প্রচণ্ড প্রতিরোধ আসছে। তিনি অস্বীকার করছেন না। এর ফলে হয়তো নিখিল, তাঁর নিজের পুরো পরিবার সামাজিক দিক থেকে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু পরিবারের একজন যদি রত্নাকর হয় অন্যদের তার পাপের ভাগ তো নিতেই হয়। তারা চাক বা না চাক। এবং এটাই সুবিচার। একবার যদি জিনিসটা সম্ভব করতে পারেন, একটা কাজের কাজ হয়। কী আর হবে? আগেকার মতো ধোপা-নাপিত তো আর বন্ধ করে দিতে পারবে না কেউ। মল্লিকার মেয়েদের দরকার হলে বিদেশে পাঠিয়ে দেবেন, এখানকার গণ্ডি থেকে দূরে। নিজেরা বুঝেশুনে বিয়ে করবে। জিনা অনায়াসেই সরে যেতে পারত নিজের পরিত্রাণ নিয়ে। কিন্তু সে জিনিসটাকে যতটা তার নিজের ওপর অবিচার হিসেবে দেখছে, ঠিক ততটাই দেখছে বনমালার প্রতি অবিচার হিসেবে। 'ফ্রেশ মাইন্ড' সজীব নতুন মন না হলে এ ভাবনা সম্ভব হত না।

সারাদিন ঘুরেফিরে একটা কথাই তাঁকে কুরে কুরে খেতে লাগল, নিখিল কেন এ কাজ করল। তার জীবনে জিনার আয়ু আর বনমালার আয়ু তো মোটের ওপর একই দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে কুসঙ্গে পড়ে যদি এ মতি তার হয়েই ছিল, জিনার মতো একটি মেয়েকে সে বিয়ে করতে গেল কেন? আবার করলই যদি কেন ফিরে আসতে পারল না? এখন তো দেখা যাচ্ছে, জিনাকে ছাড়তেও সে রাজি নয়?

অনেকটা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তিনি পরদিন নিখিলকে ডেকে পাঠালেন। সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরেছে নিখিল। ডল্লি কল্যাণবাবুর ঘরে দুজনের কফি দিয়ে গেল।

টাইটা খুলে ফেলেছে নিখিল। শার্টটা কোমরের কাছে মুচড়ে মুচড়ে আছে। পায়জামাটা নোংরা। ঘরে ঢুকে রুক্ষ স্বরে বলল, বিছানাটা ঘাঁটা, কেউ পরিষ্কার পর্যন্ত করেনি, জামাকাপড় কাচা হয়নি, সকালবেলায় এক কাপ চা পেলাম না। রাত্তিরে লঙ্গরখানার ভিক্ষে খেতে হচ্ছে, এভাবে আর ক'দিন চলবে?

একজনের জীবনটাই ঘেঁটে দিলে আর সামান্য বিছানা ঘাঁটা নিয়ে নালিশ করছ, বাপধন?—কল্যাণবাবু ভাবলেন। মুখে বললেন, তুমি বরং একজন লোক রেখে দাও।

—আপনিও সমানে আশকারা দিয়ে যাচ্ছেন, নইলে বাড়ির বউয়ের এত সাহস হয়? ভদ্রবাড়ির মেয়ে, ভদ্রবাড়ির বউ হয়ে খারাপ পাড়ায় যেতে লজ্জা করেনি ওর? কে বলতে পারে সেখান থেকে নষ্ট হয়ে এসেছে কিনা! ওসব এন জি ও ফি-ও অনেক দেখা আছে আমার।

কল্যাণবাবু এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে কথার মাঝখানে বাধা দিতে পারেননি। এখন শুধু বলতে পারলেন, তোমার স্পর্ধা তো কম নয়!

—বুড়ো বয়সে ভিমরতি ধরেছে আপনার। কার বাবা আপনি? আমার না ওর? দিনের পর দিন যে মেয়ে সোনাগাছি যায়...তার আর...

—তুমি অনাচার করতে যেতে পার আর অন্যের সেবার জন্যে গেলে গালি দিচ্ছ?

নিখিলের মুখে একটা বিচিত্র হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। সে বলল, আপনি নিজেও তো পুরুষ মানুষ না কী?

—তোমরা যেমন সন্তানই হও, আমি তোমাদের বাবা...

—তা হলে বোঝেন না কেন যাই?

—না বুঝি না।

—তা হলে আপনাকে বোঝানো আমার কর্ম না। পুরুষ হলে তার দরকার হয়।

—পুরুষের তো অনেক কিছুই দরকার হয়। বিড়ি-সিগারেট-মদ-ভাঙ-চরস-কোকেন-এল. এস.ডি-মরফিন-সাপের বিষ। আরও কিছু নতুন বস্তু উঠলে সেগুলোও দরকার হতে থাকবে। কেমন, কিনা?

—সেক্স হল বেসিক নিড।

—তো তারই জন্যে তো মানুষ বিবাহাদি করে!

—আপনি বুঝবেন না বিবাহিত স্ত্রী আর এইসব স্ত্রীলোকে অনেক তফাত!

—তা বেশ তো! আমি বুঝেছি তোমার কথা। ওই মেয়েটিকে তুমি নিয়ে এসো শাস্ত্রমতে। জিনা যেমন বলছে। ও তোমার স্ত্রীলোকের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। আর আমি যদ্দুর বুঝেছি স্ত্রী হতেও ওর তেমন অসুবিধে নেই। আমাদের সমপর্যায়ের নয়। তো কী করা যাবে? তুমি ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিজের সমাজের যোগ্য করে নাও। মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি শেখে। আমার কথা যদি বল তো বনমালা মেয়েটিকে অ্যাকসেপ্ট করতে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

—আমার হবে—নিখিল গরম হয়ে বলল, অ্যাবসার্ড টু দা পাওয়ার ইনফিনিটি। একটা বারোভাতারি মা...

—শোনো নিখিল, খারাপ কথা, গালিগালাজ দিতে হলে যেসব জায়গায় এসব চলে সেখানে যাও। আমি বুঝতে পারছি না, তোমার মতো বেয়াড়া ছেলে আমার হল কী করে!

—হয়তো আমি তা হলে আপনার ছেলে নই! —বিশ্রী হেসে উঠল নিখিল।

পাশ থেকে লাঠিটা তুলে নিলেন কল্যাণবাবু। তারপর সপাটে মারলেন এক বাড়ি। —জাহান্নামে যাও। এখানে তোমার স্থান নেই। এ বাড়ি আমি জিনাকে দিয়ে যাব, আর ওই কুটুসকে, যদি সৎভাবে মানুষ হয়ে ও একটা ভদ্রস্থ সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে। যা-ও।

নিশিদুপুর

মাথার ওপরে ছাতার মতো বকুলগাছ। তার ওপরে নিচু সূর্য। তার ওপরে আইসক্রিম-নীল আকাশ। ঘুড়ি উড়ছে একটা-দুটো। ঘয়লা, বামনা। এই নির্বান্ধব নির্জনে কোথায় কে ঘুড়ি ওড়ায় কে জানে। কোনও স্কুল-ছুট বালক। কোনও কর্মহীন যুবক? তারও উঁচুতে কয়েকটি চিল। আকাশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যেন মাছের সঙ্গে জলের। আকাশ-জলে সাঁতরায় চিল। মাঝেমধ্যে যখন নেমে আসে তীব্র হ্রেষায় চমকে ওঠে ইঁটকাঠ, গাছপালা। নির্বিকার নীল থেকে খসে পড়ে কালো ফুটকি, ব্রাউন, বড় হতে থাকে ক্রমশ। শিকার? নাঃ। শিকার নেই, স্বার্থ নেই। শুধু খেলা। দেখতে বেশ লাগে। একটা প্রশান্তি আসতে থাকে।

জিনার এখন বায়ুভূত নিরালম্ব লক্ষ্যহীন অবস্থা। সে নাগচৌধুরীতেও নেই, দে সরকারেও নেই। দমদমে যায়নি, ডাফ স্ট্রিটে সে ফিরেও ফেরে না। শরীরের মধ্যে মন নেই। আলাদা হয়ে ঘুরে বেড়ায় মনটা। 'রোচনা' সম্পর্কে সে মন স্থির করে নিতে চায়। ভাল লাগবে কি না। এটাই এখন তার একমাত্র চাকরির সুযোগ। ইতিমধ্যে দায়হীন আসা-যাওয়া চলছেই। প্রধান আকর্ষণ কুটুস। কেননা কুটুসেরও প্রধান আকর্ষণ জিয়া।

অন্য সবাই জিনাকে জিনাদিদি বলে। এখানে দিদি বা দিদা ছাড়া আর কিছু বলতে শেখানো হয় না। কুটুস অতটা বলে না, বলে 'জিয়া'। তার মুখে আধো আধো 'জিয়া' ডাক শোনবার জন্যেই সব্বাই তাকে বড্ডই বিরক্ত করে। দিদিরা বলে—ও কুটুস, ওই দেখ দূরে—কে আসছে রে?

কুটুস ভুরু কুঁচকে তাকায়, মুঠো গোল করে দূরবিন বানায়। দেখেটেখে বলে, 'জিয়া'।

—লাল ছাপ জামাটা তোকে কে দিয়েছিল রে?—'জিয়া'।

আবার চোখাচোখি হাসি।

—আজকে কার সঙ্গে লুডো খেলবি রে?

কুটুস বুঝে যায় তাকে নিয়ে মজা করা হচ্ছে, সে এদিক-ওদিক চায়, জবাব দেয় না।

বকুলতলায় বসে বসে আকাশ দেখছিল সবাই। বিকেলের নরম নীল আকাশ। কুটুস জিজ্ঞেস করল, জিয়া আঁকাশের মধ্যেও পিঁপড়ে থাঁকে?

—থাকেই তো। দেখিস না গর্জন করে ছুটে যায়।

—কে? সে তো পেলেন?

—ওরাই আকাশের পিঁপড়ে।

এখানকার নিয়মমতো পাঁচ বছর বয়স থেকে বাচ্চা নেওয়া হয়। কুটুসকে তার মায়ের নির্বন্ধে ও মুকুটের সালিসিতে আরও ছোট বয়সে নেওয়া হয়েছিল। তার মা তাকে অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটের 'বাবু'র ভাড়া করা ঘর থেকে সরাতে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কুটুসের জিবের আড় কিছুতেই ভাঙছে না। সে যেখানে-সেখানে চন্দ্রবিন্দু লাগায়। যুক্তাক্ষর তো উচ্চারণ করতে পারেই না। এটা ঋত্বিকদের ভাবাচ্ছে একটু। অন্য অনেক ছেলেই যুক্তাক্ষর ভাল করে উচ্চারণ করতে পারে না। কেননা তারা চারপাশে ওইরকম ভাঙা উচ্চারণই শুনে শুনে বড় হয়েছে। কিন্তু কুটুসেরটা স্পষ্ট আধো আধো। এই ব্যাপারটাই একটু ভাবাচ্ছে সবাইকে। চেহারাতেও সে ছোট্ট। কিন্তু আজকাল জিনা ওর মধ্যে পরিষ্কার কল্যাণবাবুর আদল দেখতে পায়। পুরোটা নয়। ঠোঁটের কাছটা। চোখের আকার, হাসির ধরনটা, কানগুলো ওর মায়ের মতো। কল্যাণবাবুর দুই ছেলে মোটামুটি লম্বাচওড়া হলেও উনি নিজে একটু ছোটখাটোই। ছোটখাটো সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ। কুটুস বোধহয় তার দাদুর ধরনটাই পেয়েছে। নিখিলের রং ছাড়া আর কোন চিহ্ন নেই তার শরীরে। নিখিলের মতো চৌকোটে ভরাট মুখ, চেরা চেরা নিষ্ঠুর চোখ, পাতলা নির্দয় ঠোঁট কুটুসের হলে তার স্নেহের ধারা কোন দিকে বইত বলা শক্ত। হয়নি যে এটা রক্ষা। কল্যাণবাবু এই শিশুটিকে তাঁর অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে

যেতে চাইছেন। কিন্তু জিনার ওপর তিনি নির্ভর করছেন। জিনা ওর ভার নেবে, ও যেখানেই থাকুক। স্পষ্ট করে না বললেও এমন ইচ্ছে তিনি হাবেভাবে প্রকাশ করছেন।

জিনা এ বিষয়ে এখনও কিছু বলেনি। এখনও পর্যন্ত সে দমদমের বাড়িতেও কিছু বলেনি। ও বাড়িতে তার সবচেয়ে কাছের লোক জেঠু। পিসতুতো দিদি রুমার সঙ্গেও তার খুব মিলত। কিন্তু সে তো এখন মিনেসোটায়। মা, বাবা, দিদি এদের কাউকেই কথাগুলো বলবার সাহস সে সঞ্চয় করতে পারছে না। অথচ কাউকে না কাউকে শিগগিরই তাকে তো বলতেই হবে। 'তোমরা যার সঙ্গে আহ্লাদ করে আমার বিয়ে দিয়েছিলে সে লোকটা দুশ্চরিত্র, ভাল করে জানবার চেষ্টা করনি। চাকরি, বাড়ি আর চেহারা এই তিনেই ভুলেছিলে। ওকে আমি ত্যাগ করেছি।'—এমন কিছু কথা নয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই জাতীয় কথাই তো অনেক মেয়েকেই বলতে হয়। কিন্তু সে সহজে বলতে পারছে না, রাগে অপমানে দুঃখে গা জ্বলে যাচ্ছে তার। আর এতগুলো বছর তো সে-ও নিশ্চিন্ত আহ্লাদে কাটিয়েছে। যেসব পারিবারিক সংকট এসেছে তার মুখ্যত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার সুবাদে উতরে গেছে সেসব। দমদম জানতেই পারেনি। এত তরল, অগভীর স্বভাবের মেয়ে সে যে সেসব কোনও দাগও রেখে যায়নি তার মনে। কোনও কিছু নিয়ে দুঃখ পেতে, প্রশ্ন করতেই যেন জানত না সে। ভেবে দেখতে গেলে নিখিল তো খুব পছন্দ করার মতো মানুষ ছিল না। রুক্ষ, রূঢ়, স্বার্থপর, কটুভাষী, অতিরিক্ত দাবি সব সময়ে। অন্য কোনও মেয়ে হলে হাজারবার নালিশ করত। প্রতিবাদ করত। সে তো করেনি! কেন করেনি। করলে হয়তো এই বিয়ের মধ্যেকার ফাঁকিটা আরও তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যেত। কোনওদিন যার সম্পর্কে অভিযোগ করেনি, তূরীয় আহ্লাদ দেখিয়েছে, আজ তার সম্পর্কে কুৎসিত নালিশ নিয়ে হাজির হলে গোটা দমদমের বাড়িটাই কি শকে হার্ট-ফেইল করবে না?

তাই এখনও ডাফ স্ট্রিটেই ফিরছে সে। ডাফ স্ট্রিট থেকেই যাতায়াত। এ বাড়িটা জানে তার অপমানের কাহিনী। অপমানের কালি এ বাড়ির গায়েও লেগেছে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তারা এক গোত্রের। এখানে কোনও কৈফিয়ত নেই, উৎকণ্ঠা আছে, আশ্রয় আছে। রোজ কল্যাণবাবুকে কথা দিয়ে বেরোতে হয় সে কোনও হঠকারিতা করবে না। বাড়িতে ফিরে কাউকে না-কাউকে দিয়ে খবর পাঠাতে হয় সে এসেছে। বিতৃষ্ণাটা এই বাড়ি সম্পর্কে আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। যদিও একেক সময়ে প্রচণ্ড একটা ক্ষোভ তাকে দিশেহারা করে দেয়। যতক্ষণ 'রোচনা'য় থাকে সব ভুলে থাকে। যে মুহূর্তে বাড়িতে পা দেয় হুড়মুড় করে ফিরে আসতে থাকে সব। একেকটা সিঁড়ি পার হয় আর ধাপে ধাপে চড়তে থাকে ক্ষোভের মাত্রা। সামনে যাকে পায় তার ওপরই প্রবল ঘৃণা আর রাগ হতে থাকে। একমাত্র মেয়েদুটি ছাড়া।

আজও মল্লিকা জানলায় চোখ পেতে ছিল। ডলি নীচে দরজা খুলে দিতেই ওপর থেকে সরে গেল তার উৎকণ্ঠিত ভিতু ভিতু মুখটা। কেমন অপরাধী অপরাধী। মল্লিকার এই ভাব কেমন একটা অস্বস্তি জাগায় তার মনে। আর কেউ তো এমন করে না। কল্যাণবাবু প্রথম দিনটি থেকেই দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন—তিনি নিজের ছেলেটিকে বিন্দুমাত্র চিনতেন না। ছেলেকে অপথ-কুপথ থেকে ফেরাবার জন্যে যারা বিয়েকেই একমাত্র ওষুধ মনে করে এবং একটি নির্দোষ মেয়ের সর্বনাশ করে তিনি সে দলের নন। তিনি এখনও মাথা উঁচু করেই থাকেন। দাদা জীবনে কখনও কারও সাতে-পাঁচে থাকেন না। এখনও তাঁর ভূমিকা নিষ্ক্রিয় দর্শকের। জিনা এখন বোঝে মানুষটি কাপুরুষ গোত্রের। ইদানীং তিনি ক্লাবে আড্ডার সময়টা আরও একটু বাড়িয়ে দিয়েছেন, যাতে জিনার মুখোমুখি হতে না হয়। কিন্তু মল্লিকা যেন এ বাড়ির সন্ত্রস্ত বিবেক। পরিবারের হয়ে জিনার প্রতি অবিচারের সমস্ত বোঝা যেন সে তার একলার কাঁধে তুলে নিয়েছে।

ওপরে এসে জিনা আগে হাত-মুখ ধুল। যতক্ষণ 'রোচনা'য় থাকে তার গায়ে লেগে থাকে খেলাধুলোর ধুলো। বাইরে বেরোবামাত্র সেগুলো হয়ে যায় বাস-লরি-অটোর কালিঝুলি, দূষণ, নোংরা,

ঘষে ঘষে ধুয়ে ধুয়েও যায় না সেসব। এইসময়ে মেয়েরা কোনও না কোনও কোচিং-এ যায়। সে একটু চেঁচিয়ে ডলিকে ডাকল, বাবাকে যেন তার আসার খবরটা দিয়ে আসে।

তারপরে অনেকদিন পরে ডাকল, দিদিভাই।

নিজের ঘর থেকে শশব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল মল্লিকা। বলল, চা করি? না কফি?

—চা দাও। আজ দুবার কফি খাওয়া হয়ে গেছে।

—আর কী দেব? চিঁড়ে ভেজে দেব? না গরম শিঙাড়া আনিয়ে দেব মদনের দোকান থেকে?

—কিছু না। তুমি বসো।

আজকে কি জিনার মেজাজ কোনও কারণে ভাল আছে?

মল্লিকা চা নিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে বসল।

দু-এক চুমুক চা খেয়ে জিনা বলল, দু-এক সপ্তাহ পরেই আমি 'রোচনা'য় চলে যাব ভাবছি।

—কেন?—মুহূর্তে মুখ শুকিয়ে গেল মল্লিকার।

—কতদিন আর তোমাদের ওপর এভাবে থাকব?

—আমাদের ওপর আবার কী? তুই আছিস তোর নিজের জায়গায়। বাবা বোধহয় উকিলের সঙ্গে পরামর্শ শুরু করে দিয়েছেন। ও বাড়ি তোর। টাকাপয়সা সব কিছুরই...

—তা হয় না দিদিভাই! বাবা দিলেই যা আমার নয় তা আমি নিতে পারি না।

—কেন নয় কেন? শ্বশুরবাড়িতে কি মেয়েদের কোনও অধিকার নেই? যে সম্পত্তি স্বামীর প্রাপ্য, তা কি স্ত্রীরও হয় না?

—পাগলামো করো না দিদিভাই। স্বামীটামি বলো না।

—তুই-ই পাগলামি করছিস জিনা, কাগজে-কলমে তুই ওর স্ত্রী-ই।

—কাগজে-কলমে যাতে সেটা না থাকে আর তার ব্যবস্থা করছি।

—কর। কিন্তু একবার যখন বিয়ে হয়েছে তোর কিছু অধিকারও তো আছে। তাছাড়া অত সহজে ও তোকে ডিভোর্স দেবে না জিনা। তোকে মামলা চালাতে হবে।

—চালাব।

—তুই খালি নিজের কথাই ভাবছিস। আমাদের কথা...

—তোমরা আমার কথা ভেবেছিলে?

মল্লিকার মুখ শুকিয়ে গেছে। সে টেবিলের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে রইল।

জিনা বলল, দিদিভাই, আই ডিডনট মিন ইট। তোমার কী দোষ? বরং তোমার সঙ্গেই কত দিনরাত কত আনন্দে কাটিয়েছি। মনের জ্বালায় এসব বলে ফেলি। কিছু মনে করো না।

মল্লিকা সজল গলায় বলল, আমার কথাটা একটু ভাব জিনা। এখানে থাক। এই তো আমাদের এ দিকে থাকবি। না হলে ও যে কী করবে আমার ভাবতেও হৃৎকম্প হয়।

—আশ্চর্য তো। কী করবে ও? মাঝের দরজাটা বন্ধ করে রাখবে। ও দিকে ও যা খুশি করুক না। দয়া করে খাবারটাবার পাঠাতে যেয়ো না। বনমালা এসে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বনমালাকে মানতে পারছ না জানি। তোমার সেন্টিমেন্ট আমি বুঝতে পারছি দিদিভাই। কিন্তু আমি বলছি দিদিভাই মেনে নাও। ওকে রিহ্যাবিলিটেট করতে সাহায্য করো। কোথাও না-কোথাও এই অন্যায়-শৃঙ্খলটাকে ভাঙা দরকার।

—তুই বড্ড ছেলেমানুষ জিনা। বনমালাকে ও কোনওদিনই বিয়ে করবে না।

—সে ক্ষেত্রে ওর চাকরি যাবে। বাবাও ওকে বার করে দেবেন, যদি আর বেয়াদবি করে। আর কাউকে যাতে বিয়ে করতে না পারে তার ব্যবস্থা আমি করব।

—ও আর কাউকে বিয়েও করবে না।

—ঠিক আছে। তো থাক—এইভাবেই একদিকে পড়ে থাক। আমি তো শুনেছি বাবা কুটুসকে

ওর সম্পত্তি লিখে দেবেন।

—তো ভালই তো। তুই কুটুসকে দত্তক নে। এখানে নিয়ে আয়। অতগুলো ঘর। নিখিল যেখানে থাকে থাক, তুই তোর মতো থাকবি।

—ডিভোর্সের কেস চলবে, আমি এখানে থাকব? এটা সম্ভব?

—বেশ তো, এখানে আমার কাছে থাকবি। সেটা তো আমার পক্ষে আরও ভাল। তুই আছিস জানলে ওর একটা ভয়ভীতি, একটা চক্ষুলজ্জা থাকবে।

—তোমার কথা আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না দিদিভাই। ভয়ভীতি? চক্ষুলজ্জা? কীসের? কেন? এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব হতে পারে না। এটা তুমি বোঝো...বোঝবার চেষ্টা করো। জিনা চলে গেল।

কোথা থেকে মামলার টাকাটা আসবে এটা সে এখনও জানে না। এটা নিয়ে তাকে ভাবতে হচ্ছে। বাবা-মাকে বলবে কি না এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি সে। জিতে গেলে অবশ্য সবটাই ও পক্ষের মিটিয়ে দেবার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে? ধার নিতে হবে। কার কাছে? মুকুট? ঋত্বিক? ওরা ছাড়া তার আর আছেই বা কে? অ্যালিমনিটা সে নেবে ঠিক করেছে। তার ক্ষতিপূরণ হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু লোকটাকে বেকায়দায় ফেলার জন্য যা করার সে করবে। টাকাটা নেবে একেবারে থোক। এই টাকাটা দিয়ে যদি পূর্ণিমার কোনও ব্যবস্থা করতে পারে। এখন বাবার সঙ্গে একটু কথা বলে সে ঘরে চলে যাবে। বসে বসে টিভি দেখবে। কিছুই তেমন করে দেখবে না, শুনবে না, তবু দৃশ্য আর শব্দগুলো তার ভেতরের দৃশ্য আর ধ্বনিগুলোকে অকেজো করে রেখে দেবে কিছুক্ষণ। সেটাই লাভ।

দালান। দরজা। দরজার ওপারে তার পুরনো বাড়ি। কদিন আগেও তার ছিল। তার সাজসজ্জা, পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কত ভাবনা ছিল। এখন নেই। সে জানে না বিছানার চাদর, খাবার টেবিলের ঢাকা বদলানো হচ্ছে কি না, বাথটব পরিষ্কার করা হচ্ছে কি না, সম্ভবত হচ্ছে না। কেননা ও বাড়ির বর্তমান বাসিন্দার এসব সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। তার ধারণা এগুলো কোনওটা মেয়েদের, কোনওটা জমাদারের কাজ, এবং এরা বিনা আহ্বানে, বিনা তদারকিতেই সব সমাধা করে থাকে। যাই হোক, এগুলো তার ভাবনার বিষয় নয়। কিন্তু বাবার ঘর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে।

—আমি অস্বীকার করছি। ও কখনও আমার ছেলে নয়—নিখিলের গলা।

—ও তোমারই ছেলে। ওকে দেখলেই বোঝা যায়। আমি ছোটবেলায় অবিকল ওইভাবে চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে কথা বলতাম।—বাবার গলা।

অপরিচিত একটা গলা বলে উঠল, বাচ্চাটি আপনার সন্তান হোক বা না হোক, আপনার পিতৃদেব নিজের ইচ্ছায় তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি একজন সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক অনাথকেও দিয়ে যেতে পারেন। ব্যাপারটা তাঁর ইচ্ছের ওপর। তাঁর নিজের উপার্জনে এই সম্পত্তি তিনি করেছেন।

—আজ্ঞে না—নিখিলের উত্তপ্ত গলা—উনি ওঁর বাবার থেকে যা পেয়েছিলেন তাতেই এসব হয়েছে।

—তা যদি মনে করেন, সেটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। করতে পারবেন না।

কল্যাণবাবুর গলা—জিনা ডিভোর্সের পর এসব নিতে চাইছে না। তাকে আমি কুটুসের কাস্টোডিয়ান করে দেব। কুটুস সাবালক হলে সম্পত্তি পাবে, তবে তখনও তার ওপর জিনার তদারকি দায়িত্ব আমি রাখছি।

—একটা বাস্টার্ডকে আপনি আমার প্রাপ্য অংশ দিয়ে দিচ্ছেন? আমি এ উইল কনটেস্ট করব। মগের মুলুক নাকি? দেখি কেমন করে আপনি এমন অন্যায় করেন—নিখিল শব্দ করে বেরিয়ে আসছে।

জিনা দ্রুত সরে গেল। সত্যি কথা বলতে কী কেন সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতগুলো কথা শুনল তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। সম্ভবত কল্যাণবাবু সত্যি সত্যিই নিখিলকে বঞ্চিত করে তার অংশ কুটুসকে দিয়ে যেতে পারবেন এটা সে মনে মনে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এই ধরনের আইনি বন্দোবস্ত হলে তার নিজের কী অবস্থা হবে। কাস্টোডিয়ান মানে কী? সে কতটা বাঁধা পড়ে যাবে এ বাড়ির সঙ্গে? সে মুক্ত হতে চাইছে। কুটুসকে চাইছে ঠিকই, কিন্তু মুক্তিও চাইছে। ছ-সাত বছরের বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা তার ভেতরে একটা চ্যালেঞ্জ জাগিয়েছে। তার সমস্ত সুনিপুণ গৃহিণীপনা, মেলামেশা-সামাজিকতায় দক্ষ আধুনিকাপনা। তার পত্নীত্ব, তার সৌন্দর্য ও রুচিবোধ সমস্ত যেভাবে অস্বীকৃত, অপমানিত হয়েছে তাতে সে ভেতরে ভেতরে জ্বলছে। কুটুসের পালিকার ভূমিকা পালন করলেই তার মোক্ষ মিলবে না। নিখিলের সঙ্গে বাড়ির দেওয়া বিয়েটা একটা বিয়েই নয়। শরীরে স্পর্শ করলেও মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। নিজে বুঝেসুজে, নিজের দায়িত্বে সে আবার বিয়ে করবে, দেখিয়ে দেবে সুখী হওয়া কাকে বলে। ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছিলেন তার খুব ভাগ্য যে এই লোকের সন্তান তাকে ধারণ করতে হয়নি। বিয়ে করবে, কিন্তু তার আগে নিজের দাঁড়াবার জায়গা তাকে খুঁজে নিতে হবে। তার যে সামর্থ্য নেই তা তো নয়। কারুর দয়ায় সে বাঁচবে কেন?

কিন্তু কতকগুলো নরম জায়গা তার ভেতরে ভেতরে তৈরি হয়ে গেছে এ বাড়িতে; সেটা সে অস্বীকার করতে পারছে না। দিদিভাই জানে না, সেই এক নম্বর নরম জায়গাটাই তার। যেন দিদিভাই নয়, সে-ই দিদিভাইয়ের দিদি, এমন একটা রক্ষাকর্ত্রীসুলভ মনোভাব। দুর্বল মেয়েদের প্রতি সবল মেয়েদের বোধহয় এই ধরনের একটা দিদিসুলভ দায়িত্ববোধ জন্মায়। আজ যে দুর্দৈব তার জীবনে এসেছে, দিদিভাইয়ের জীবনে তার কাছাকাছিও কিছু যদি কখনও আসত কী করত ও? ভেঙে যেত টুকরো টুকরো হয়ে। কিংবা নিজেই বোধহয় অপরাধীর মতো মুখ বুজে সংসারধর্ম পালন করে যেত। কী প্রচণ্ড ভয় নিখিলকে। যমের মতো ভয় পায় ও নিখিলের রূঢ়তাকে, প্রতাপকে। নিখিলও দিদিভাইকে ভীষণ অপছন্দ করে, সংসার আলাদা করার যা-কিছু ষড়যন্ত্র সে করেছে জিনাকে দিদিভাইয়ের প্রভাব থেকে সরাবার জন্যই। এখন এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পারে সে।

দিদিভাই ছাড়াও বাবার প্রতি তার একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে গেছে। ঘটনাচক্রে খুব কাছাকাছি এসে গেছে তারা। ভাবনা-চিন্তায়, ধ্যান-ধারণায়। সুদ্ধু জিনার কথা ভেবে, তার ওপর আস্থা রেখে উনি নিজেকে, নিজের সংস্কারকে যেভাবে ভাঙছেন, তাতে এককথায় উনি আশ্চর্য। তার নিজের জেঠু, বাবা—এঁরা সব বেশ সরল সহজ, বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ভাল লোক, তাঁদের দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা ও ঐক্যে বিশ্বাস আছে। কাণ্ডজ্ঞান যেমন রসজ্ঞানও তেমনি। কিন্তু কল্যাণ দে সরকারের সঙ্গে তাঁদের কোনও তুলনা হয় না। এই বাবার পাশে তার জেঠু যেন একটা ভাঁড়, ক্লাউন। এই পরিস্থিতিতে পড়লে জেঠু কী করতেন? বোধহয় নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপাতে হত; উচ্চতা পাঁচ ফুট সাড়ে নয় ইঞ্চি, স্থূলদেহ, গায়ের রং শ্যামবর্ণ, বয়স উনসত্তর, বিশেষ চিহ্ন চিবুকের ওপর কাটা দাগ। প্রমোদ নাগচৌধুরী। কেহ যদি খবর দিতে পারেন কৃতজ্ঞ থাকিব।

তৃতীয় নরম জায়গা ঝুম্পা-মাম্পিকে ছাপিয়ে কুটুস। শিশুর মায়া বড় মায়া। প্রথম দেখার দিন থেকে কুটুসের প্রতি তার যে কী অকারণ স্নেহ পড়েছে, কেন পড়েছে ভেবে সে কূলকিনারা করতে পারে না। ভারী মায়াময় বাচ্চা ও। তারও জিনার ওপর ভীষণ ঝোঁক। সোম, বুধ, শুক্র তিনদিন সে এখন 'রোচনায়' যায়। ঋত্বিক বলেছে—দেখো জিনা, ভেবে-চিন্তে কাজে যোগ দাও। তোমার মতো একজন চিফ সুপার পেলে আমরা বর্তে যাব। কিন্তু চিফ সুপারের দায়িত্ব অনেক। রেসিডেনশ্যাল তো বটেই। তুমি ভেবে নাও। চিফ হলে তুমি কোয়ার্টার্স পাবে, টাকাকড়িও ভাল দিতে পারব। অন্য দিকে টিচারের পোস্টে মাইনে কম, কিন্তু স্বাধীনতা বেশি। দুটোর মধ্যে যেটা ইচ্ছে তুমি নিতে পার। কিন্তু আগে ভাল করে ভেবে নাও।' জিনা এখন তিনদিন পড়াতেই যায়। কিন্তু অন্যান্য দিনগুলোতেও

কুটুস তাকে খোঁজে। সে গেলে কাছ থেকে আর নড়তে চায় না।

পরদিন 'রোচনা'য় গেলে ঋত্বিক বলল, জিনা, তোর জন্যে কুটুসের মা অনেকক্ষণ থেকে এসে বসে আছে। দেখ বোধহয় পূর্ণিমার ঘরে। বনমালার উল্লেখমাত্র ভেতরে একটা রাগ সাপের মতো ফণা তুলছে সে টের পায়। এর কোনও যুক্তি নেই। সে তো বনমালাকে মেনেই নিয়েছে। জানে না কি তার ভূমিকা তার জীবনের বিপর্যয়ের একেবারেই নিমিত্তের মতো? তবু এই রাগ, এই কুঁকড়ে যাওয়া সে থামাতে পারে না।

একটা ছোট ঘর আপাতত পূর্ণিমাকে দেওয়া হয়েছে। সে 'রোচনা'র জরুরি অবস্থার অতিথি। জিনা তার নিজের উপার্জনের থেকে পূর্ণিমার খরচ বহন করে। খুব সম্ভব তার নিজস্ব টাকাকড়ি যা মুকুটদের কো-অপারেটিভে আছে তার ব্যবস্থাও শিগগির হয়ে যাবে। তবে আহামরি কিছু নয়। পূর্ণিমা এখানে ভাল আছে মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। সুপারদের মধ্যে একটি সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট তাকে খুব সাহায্য করে। সুধাদির বাংলা জ্ঞানও কাজে লাগছে। ইংরেজি দেখিয়ে দেয় জিনা নিজে। অন্য সময়ে বাচ্চাদের একটু দেখাশোনা, তাদের সঙ্গে খেলাধুলো করে পূর্ণিমার সময় ভালই কাটে।

ঘরে ঢুকতেই বনমালা উঠে দাঁড়াল। তার মুখ নিচু। চোখ মাটির দিকে। জিনা ঈষৎ বিরক্ত গলায় বলল, কিছু বলবে?

বলতেই বনলতা উপুড় হয়ে তার পা জড়িয়ে ধরল। কাঁদছে।

জিনা আরও বিরক্ত হয়ে বলল, কান্নাকাটি করো না, আমার ভাল লাগে না। কী বলবে বলো। তোমার ওপর আমার কোনও রাগটাগ নেই।

সেই দিনের পর এই প্রথম বনলতার সঙ্গে তার দেখা। অনেক রোগা হয়ে গেছে মেয়েটি। তাকে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে।

—দিদি, বনলতা সজল গলায় বলল, আপনি ওসব বিয়ে-থার কথা তুলছেন কেন?

—কেন? সেটাই সভ্য সমাজের নিয়ম, এখনও সেটাই আমি মানি বলে।

—আমাদের কেউ কখনও বিয়ে করে?

—করে না। এবার থেকে করবে। আজ একজন করলে কাল আরও পাঁচজন করবে। তোমরাও প্রমাণ করতে পারবে তোমরা অস্বাভাবিক জীব নও। বাবাও তো রাজি হয়ে গেছেন।

—সে আপনি যা-ই বলুন, এ হয় না। আমিই বা কেন রাজি হব?

—সে তোমার ব্যাপার। কিন্তু রাজি না হলে কেন সেটা আমি জানতে চাইতেই পারি।

—আপনাদের চাপাচাপিতে যদি সত্যি সত্যি ওরকম কিছু ঘটেও, তাতেও কি উনি আমাকে সম্মান দিতে পারবেন?

—আমি ভদ্রঘরের মেয়ে ছিলাম বনমালা। মান উনি আমাকেও দেননি। আমি জানতাম না তাই ছিলাম। তুমি জানতে, কিন্তু তোমার আপত্তি হয়নি। এখন যদি তোমাকে ঘরে নিয়ে গিয়েও আগেকার মতো ব্যবহার করেন তা হলে তোমার অপমানিত বোধ করা উচিত নয়। এসব কথা ছাড়ো। আইনত স্ত্রী হলে তুমি অনেক সুবিধে পাবে, তোমার ছেলে তো পাবেই। ছেলে পিতৃপরিচয় পাবে। সবচেয়ে বড় কথা এই অনাচার থামা উচিত। তুমি কারও সম্পত্তি নও, কোনও মানুষ কারও সম্পত্তি হতে পারে না, তবু তোমাকে একজন বেচে দিল, অমনি তুমি তার দাসী হয়ে গেলে—এটা অনৈতিক তো বটেই, সম্পূর্ণ বেআইনি। নিরুপায় হয়ে তুমি এ জীবন মেনে নিয়েছিলে। আমি চাইছি তোমার ওপর অবিচারের প্রতিকার হোক।

—জিনা দিদি। এবার মুখ তুলে চাইল বনলতা, তার চোখে বেশ অবাধ্যতা—যদি বিয়ে করতেই হয় তা হলে নিখিলবাবুর মতো খারাপ লোককে আমি বিয়ে করব কেন, বলতে পার? আমাদেরও যে কখনওসখনও সত্যিকারের বিয়ে হয় না তা নয়, কিন্তু সে হয় ভালবাসায়। তার জন্যে বিশ্বাস চাই। আপনার উনি তো মিথ্যেবাদী। হপ্তায় তিন-চারদিন তিন-চার ঘণ্টার জন্যে আসে তাইতেই

তো হাড় কালি করে দেয়। যা হয় ওই তিন-চার দিনের ওপর দিয়ে যায়। ঘরে নিয়ে গেলে তো দিনরাত্তির যা খুশি করবে। উনিও যেমন আমাকে মান দিতে পারবেন না, আমিও তেমনি ওঁকে মান দিতে পারব না। একফোঁটাও নয়। জোচ্চোরকে কি বিশ্বাস করা যায় নাকি?

জিনা বিরক্ত গলায় বলল, কেন, তুমিই তো সেদিন বলছিলে উনি লোক ভাল। তোমার কাছে উনি ভালই থাকবেন।

—না দিদি, ওটা ওঁদের ফূর্তি করার জায়গা, কখনও বন্ধুবান্ধব নিয়ে, কখনও একা। সে ফূর্তির রকম আপনারা আন্দাজ করতে পারবেন না। আর মদ পেটে পড়লে তো আর দেখতে হবে না। সে চেহারা আপনাদের দেখতে হয় না, সেসব চোখরাঙানি আবদারও আপনাদের শুনতে হয় না। ভাল মানে কী! ভাল মানে পেমেন্ট ভাল। সেখানে জোচ্চুরিটা করেনি। এ দু মাস ওঁকে আমি ও ঘরে ঢুকতে দিইনি। পরের মাসে বাড়ি ভাড়ার অ্যাডভান্স শেষ হবে—আমিও ঘর ছেড়ে দেব।

—তারপরে? কোথায় যাবে? তোমার ছেলে? উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল জিনা।

—আমার ছেলেকে ঋত্বিক দাদারা যেমন দেখছে দেখবে। আর নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিতে পারব।

—আবার ওই...

—তোমার পা ছুঁয়ে বলছি দিদি, আমার ছেলের মাথার দিব্যি, আমি আর ও কাজ করব না। তুমি আমার কথা ভেবে মিছে কষ্ট পেয়ো না।

বনমালা বেরিয়ে গেল।

—শোনো, বনমালা শোনো—জিনা পেছন থেকে ডাকল—কিন্তু বনমালাকে ধরতে পারল না। চিন্তিত মুখে সে পূর্ণিমাকে জিজ্ঞেস করল, তুই কিছু জানিস? ও কোথায় যাবে, কী করবে? কী ঠিক করেছে ও?

পূর্ণিমা মাথা নাড়ল। সে কিছু জানে না।

এরই দু-তিন দিন পরে রবিবার পরেশনাথের মন্দিরে বেড়াতে গিয়ে ফিরল না 'রোচনা'র কয়েকটি বাচ্চা। কুটুস এবং আরও তিনটি। কুটুসই সবচেয়ে ছোট, অন্যরাও বছর ছয়-সাড়ে ছয়ের বেশি হবে না। নিয়ম অনুযায়ী ওদের সঙ্গে গিয়েছিল ওদের তিনটি দিদি, অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার, দুজন টিচার, গভর্নিং বডির পক্ষ থেকে গিয়েছিলেন ললিতা দেবী ছাড়াও সমরেশ চৌধুরী নামে এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক। নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা, এর ওপরে বাসের ড্রাইভার। তার হেল্‌পার। ললিতা দেবী ও সমরেশ চৌধুরী যান নিজস্ব গাড়িতে। এঁরাও প্রায়ই যান। বাচ্চারাও এঁদের ভাল করেই চেনে। বিশেষ করে ললিতা দেবী প্রায়ই হস্টেলে অনেক খাবারদাবার, খেলনা ইত্যাদি নিয়ে যান বলে তাঁকে সব বাচ্চাই ভালবাসে। ওদের গুনে গেঁথে বাস থেকে নামাতে হয়, গুনে গেঁথে তুলতে হয়। তোলবার সময়েই গুনতিতে চারজন কম পড়ে। পরক্ষণেই বোঝা যায় তারা ঠিক কোন চারজন। চিড়িয়াখানা বা বটানিক্যাল গার্ডন্‌স্-এর মতো বড়ো জায়গায় গেলে বাচ্চাদের দল হিসেবে ভাগ করে প্রত্যেক দলের সঙ্গে একজনকে রাখা হয়। নিক্কো পার্ক, সায়েন্স সিটি, পরেশনাথ—এসব জায়গায় দরকার হয় না। শেষ দেখা গেছে ওদের মাছের চৌবাচ্চার কাছে। একমনে মাছ দেখছিল।

সংখ্যায় গরমিল ধরা পড়ার পরে ওঁরা সারা পরেশনাথ মন্দির চত্বর আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছেন, অবশেষে স্থানীয় থানায় ডায়েরি করে এসেছেন। কিন্তু ঋত্বিক রবিবার রাত্রে দিল্লি থেকে ফেরায় সোমবার এগারোটার আগে খবর পায়নি। দিল্লি গিয়ে বেচারি আরও ফান্ডের ব্যবস্থা পাকা করে এসেছে। খুব খুশি মেজাজে ছিল। এসেই এই খবর। সারাদিন বেলগাছিয়া থানা, মিসিং পার্সনস স্কোয়াড, মিডিয়া এইসব নিয়ে ব্যস্ত ছিল ঋত্বিক-মুকুট দুজনেই।

রোববার থেকে জিনার জ্বর জ্বর। সকালে সে যেতে পারবে না জানিয়ে দিয়েছিল ঝুম্পাকে

দিয়ে। বিকেল চারটে নাগাদ সে মুকুটের ফোন পেল।

—জিনা একটা বাজে খবর আছে।

—কী? বনমালা? আমি তোকে শুক্রবার থেকে অনেকবার...

—বনমালার কিছু হয়নি। শুক্রবার ওর জন্যেই আমাকে একটু বাইরে যেতে হয়েছিল। ছিলাম না ক'দিন। খবরটা ওর ছেলের।

—কুটুসের? কী হয়েছে?

—কুটুস হারিয়ে গেছে।

—হারিয়ে গেছে মানে?

তখন মুকুট তাকে আদ্যোপান্ত বলল।

পুলিশ ইনভেস্টিগেট করছে, তুই ভাবিসনি।

জিনার মাথা ঝিম ঝিম করছিল।

—কে হারিয়ে গেছে? কী?—রিসিভার রাখতেই পেছন থেকে মল্লিকা জিজ্ঞেস করল।

—কুটুস হারিয়ে গেছে পরেশনাথের মন্দির থেকে।

কুটুস ইদানীং মাঝে মাঝেই এসে ডাফ স্ট্রিটের বাড়িতে থাকছে। জিনার সঙ্গে আসে। আবার একদিন পরে জিনার সঙ্গেই ফিরে যায়।

—কার বাড়িতে এসেছে কুটুস? —মাম্পি জিজ্ঞেস করে।

—জিয়া।

—কে তোমাকে মুড়ি খেতে দেয়?

—ঝুমা।

মুড়ি খেতে খুব ভালবাসে কুটুস। আলুসেদ্ধ দিয়ে মুড়ি। মেখে দেয় মল্লিকা। ঝুম্পা বসে বসে খাওয়ায়। মাটিতে মুড়ি পড়ে গেলে একটি একটি করে তুলতে থাকে কুটুস।

—খেয়ো না, পড়ে যাওয়া খাবার খেতে নেই।

—আঁলু?—আঁলু পড়ে গেলে? যদি খাওয়া না যায়? আলু ভীষণ ভালবাসে কুটুস।

—ফ্রান্স থেকে এসেছিস নাকি রে তুই?—ঝুম্পা জিজ্ঞেস করে।

কুটুস জোরে জোরে মাথা নাড়ে। —'নোচনা।' ফ্রান্স নয়, সে 'রোচনা' থেকে এসেছে।

আড়াল থেকে তাকে লক্ষ করেন কল্যাণবাবু। অনেক লক্ষ করে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন এ তাঁদের বাড়ির ছেলে। নিজেকে তো আর ছোটবেলায় দেখেননি। কিন্তু লোকের কাছে শোনা ছিল। তারপর আছে অ্যালবামে ছবি। একটা নিজের ছোটবেলার ছবি, বড় করে তিনি বাঁধিয়ে রেখেছেন, ফ্রেমসুদ্ধ ছবিটা সারা বাড়ি ভ্রমণ করে। কখনও মল্লিকার ঘরে, কখনও ঝুম্পাদের ঘরে, কখনও আবার ফিরে আসে কল্যাণবাবুর নিজের কাছেই। এই ছবিটা দিয়েই তিনি বোধহয় নিজের ও আর সবার মনের সংশয় কাটাতে চান। একজন অনাথ বাচ্চাকে মানুষ করার জন্য অর্থ সাহায্য করতেও কল্যাণবাবুর আপত্তি হত না। কিন্তু সম্পত্তির অংশীদার করতে গেলে নিশ্চিত হওয়া চাই।

ছবিটা দেখিয়ে কুটুসকে যদি বলা যায়—কে বল তো?

কুটুস অমনি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, আঙুল রাখে আয়নার প্রতিবিম্বের ওপর। বলে—কুটুস।

কুটুস হারিয়ে গেছে শুনে অদ্ভুতভাবে চুপ হয়ে গেলেন মানুষটি। রাত্রে শোবার আগে একটু দুধ খান। খেলেন না আজ। রাত আটটার পর সাধারণত তাঁর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আজ খোলা রইল। আলোর একটা চওড়া স্রোত দরজা থেকে বেরিয়ে দালানের ওপর পড়ে রইল।

জিনা বিছানায় মৃতের মতো শুয়েছিল। জ্বর একটু কমেছে। মল্লিকা খাবার এনেছে।

—জিনা, ওঠ, খেয়ে নে।

অনেক সাধাসাধির পর উঠে বসল জিনা। রাগে, চোখের জলে মুখটা মাথামাখি হয়ে গেছে।

চুলগুলো কপালে সাঁটা। সে তীব্র স্বরে বলল—যাও না যাও, আমাকে কেন? রান্নাঘরে যাও। দেখো আদরের দেবর বোধহয় এসেছেন, তাঁর জন্যে পঞ্চব্যঞ্জন সাজাতে হবে না? কবে থেকে বলছি—ওকে বুঝতে দাও, বুঝতে দাও সবাই ত্যাগ করলে মানুষের কী অবস্থা হয়। তা কে কাকে বলছে।

কল্যাণবাবু অপেক্ষা করছেন। নটা নাগাদ নীচের দরজা চাবি দিয়ে খুলে সে ওপরে উঠল। দালান অবধি পৌঁছোতেই তিনি ঘরের সামনে বেরিয়ে এলেন।

—শোনো—

নিখিল দাঁড়িয়ে গেল।

—বাচ্চাটি কোথায় আছে?

—কে বাচ্চা?

—বাচ্চা একজনের কথাই আমি জিজ্ঞেস করতে পারি তুমি জান।

—ওহ্ কী ব্যাপার? কোথায় সে?

—সেটাই জানতে চাইছি। কোথায় রেখেছ তাকে? আই অ্যাকিউজ য়ু।

—আপনার কথার মানে? আপনার আস্পদ্দা তো কম নয়?

কল্যাণবাবু ঘরে ঢুকে গেলেন। দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল।

নিখিল মাঝের দরজায় এসে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলল, সবাই শুনে রাখো, বেয়াদবির দিন শেষ হয়েছে। এ আমার বাড়ি। আমি যা খুশি করব। ইচ্ছে হলে পুরো শেঠবাগান-রামবাগান উঠিয়ে নিয়ে আসব। নন-স্টপ মাইফেল চলবে। চানস্ দিয়েছিলাম বোঝাপড়ার। হল না। এবার দেখবে আমি কী করতে পারি আর না পারি।—আজ সে বেশ খানিকটা মাতাল। তার চোখ লাল। মত্ততার চিহ্ন তার চলায় ফেরায়। বিমান যথারীতি এখনও অনুপস্থিত।

সকাল হতে আর দেরি করল না জিনা। কারও কথা শুনল না। একটা ট্যাকসি নিয়ে চলে গেল ঋত্বিকদের বাড়ি। যোধপুর পার্ক। দোতলার জানলা থেকে তার চলে-যাওয়া দেখল নিখিল।

বাড়ির দরজা পেরিয়ে প্রথম কথা বললো জিনা—তোরা রেইড করা।

—কোথায়?—ওই দুই আউটসাইডারের বাড়ি। আমার মনে পড়ছে প্রত্যেক নববর্ষে, ক্রিসমাসে নিখিল একটা করে বড় কার্ড পেত। নাম থাকত 'ল'। জিজ্ঞেস করলে বলত 'ললিত' নামে ওর এক পুরনো বন্ধু ওটা পাঠায়। ওইরকম মনোগ্রাম তার সব কিছুতেই। কখনও এই ললিতকে দেখিনি আমি। আমার ধারণা ওটা ললিত নয়, ললিতা। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল। দেখ, ওই 'ললিতা' হয়তো কোনও পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত।

—সুদ্ধু একটা ওয়াইল্ড গেস-এর ওপর নির্ভর করে কারও বাড়ি রেইড করানো যায়?—মুকুট বলল। কিন্তু জিনার কথায় সে বেশ বিচলিত হয়েছে।

—ওয়াইল্ড? তোরা এটাকে ওয়াইল্ড বলছিস। আমি, বাবা, আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিয়োর এটা নিখিলেরই কাজ। ওদের লক্ষ্য হল কুটুস। আর তিনটে বাচ্চাকে চোখে ধুলো দেবার জন্যে।

ঋত্বিক বলল—মহিলাকে তো আমার গোড়ার থেকেই ভাল লাগেনি। এইসব লাইনে যারা সারাজীবন ধরে ঘাগু হয়েছে তাদের মধ্যে বহু বড় ধরনের অপরাধ দেখা যায়। কে জানে শিশু-পাচার-চক্র না শুধুই নিখিল-চক্র? জিনা তুইও তো মহিলাকে হস্টেলে এসে বাচ্চাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখেছিস। তখন কী মনে হয়েছিল।

জিনা বলল, ভাল লাগেনি। অত বড়লোকি দেখানোর কী আছে? অত দেমাকই বা কেন? ও সমস্তই মুখোশ। যাই হোক, এখন এসব স্পেকুলেট করে লাভ নেই।

ঋত্বিক বলল, মহিলা যদি এর পেছনে থাকেনও, ওঁর বাড়িতে কখনও পাওয়া যায়, পুলিশে যা করার করছে। আমি একটু পরেই বেরোব। মুকুট, জিনাকে শুইয়ে দে। ওর বেশ জ্বর। প্যারাসিটামল

দিয়ে দে একটা। আমার প্রজেক্টটার বারোটা বাজিয়ে দিল এরা।

—হ্যাঁ, খালি নিজের কথাই চব্বিশ ঘণ্টা ভাব। —জিনা রাগ করে বলল।

—তোর খালি কুটুস জিনা, আমার কিন্তু আরও তিনটে আছে শানু, চিতু, শম্ভু। দুর্ভাবনা কারও চেয়ে কম নয় আমার। কিন্তু আমাকে মাথা ঠান্ডা করে চলতে হবে। আমি পুলিশকে তোর সন্দেহের কথা বলব। কোন মিনিস্টার, কোন আমলার সঙ্গে মহিলার দহরমমহরম তো জানি না, তবে আমি শেষ পর্যন্ত লড়ব। এবং তোদের সন্দেহ যদি সত্যি হয়, নিখিল দে সরকার বাঁচবে না।

জিনা চোখ বুজল। তার আর একটা কথাও বলতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে চারপাশে সব কিছুই ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়। যেখানে যা আছে। মনে হচ্ছে এইসব দরজা জানলা ভেঙে বেরিয়ে যায় একটা অতিপ্রাকৃত প্রাণীর মতো। তছনছ করে দেয় এই অনাচারে, শয়তানিতে ভর্তি পৃথিবীটার যাবতীয় সংসার। কিন্তু আপাতত তার ভীষণ ঘোর আসছে একটা। মাথায় যে দুরমুশ পিটছে। হাত পা সব যেন কুকুরে চিবোচ্ছে। সে মাথা পর্যন্ত তুলতে পারছে না আর। এত জ্বর। মুকুট মাথা ধুইয়ে দিচ্ছে ঠান্ডা জলে। তার চুলগুলো খাটের পাশ থেকে ঝুলে রয়েছে। হু হু করে পাখা চলছে। জ্বর মাপছে মুকুট, কাকে ফোন করল, সবই যেন স্বপ্নে ঘটছে, যা-কিছু এতদিন ঘটেছে সবই স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন। এক কালরাত্তির যেন তাকে ঘিরে ঘিরে ঘুরছে। কবে, কোথায় এর শেষ? একটা ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা ছড়িয়ে যাচ্ছে তার জ্বরগ্রস্ত মস্তিষ্ক থেকে। তরঙ্গে তরঙ্গে।

এইভাবেই ঘনিয়ে আসে সেই নিশ্ছিদ্র নিশিদুপুর। জ্বরে অচৈতন্য একজন, একজন নিরুদ্দেশ, আর একজন বসে আছে খোলা জানলার পাশে, করতলে তিনখণ্ড শক্ত মলাটে বাঁধাই গল্পগুচ্ছ। ভেতরে দুশ্চিন্তা, অশান্তি, ভুলে থাকবার একমাত্র উপায় বই। দুপুরে সে ঘুমোবে না স্থির করে, কিছুতেই ঘুমোবে না, কিন্তু এক এক দিন পেরে ওঠে না, আর ঘুমোলেই ম্যমি, ভয়াবহ ভুতুড়ে অন্ধকার, ঘুমোলে বাঘ। সুতরাং তেরোতলা বাড়ির ছাদ থেকে এক লাফে টি.ভি. টাওয়ারে উঠে যায় বাঘটা। মানচিত্র পরিষ্কার। আরেক লাফে নেমে আসে পার্শ্বনাথ মন্দিরের চুড়োয়। আর এক স্লো-মোশন লাফ। জাম্প কাট মানিকতলার মোড়, জাম্প কাট স্টেটবাসের মাথা, জাম্প কাট গোরাচাঁদ বোসের গলি। সরু সরু রাস্তার হেঁতাল ঝোপের পেছনে পেছনে গুঁড়ি মেরে সে এগোতে থাকে। ধূর্ত, নিষ্ঠুর, খল নারীখাদক।

সময়টা অদ্ভুত। দিন অথচ দিন নয়। সূর্য পশ্চিম কোণে ঝুলছে। চাঁদের মতো ক্ষীণ। মেঘের প্রতাপে ভিজে ভিজে নিবু নিবু। ভারী নিষ্প্রভ হাওয়ায় শহরময় ছড়িয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের বাঘের বুনো গন্ধ। ঘরময়, বারান্দাময়। তীব্র মানুষখেকো গন্ধের চোটে হাঁকপাঁক করে জেগে ওঠে সে। কখন সদর দরজা খুলে গেছে হারানো চাবির মোচড়ে সে টেরও পায়নি। অবসরের চুল মেলে নিশ্চিন্তে ছিল। তামাক-অ্যালকোহলে জড়ানো শরীরের বোঁটকা গন্ধ। খুট করে একটা শব্দ। দরজার আলোর আয়তক্ষেত্র উধাও। লুকোনো কোণ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বপ্নের বাঘ।

প্রাণপণে মুখ সরায় সে করাল মুখের কামড় থেকে। থাবা থেকে ছিঁড়ে আলাদা করে নিজের মাংস। শাড়ির ওপর দুর্বহ ওজন, হিঁচড়ে পালিয়ে যায় সে শাড়ি থেকে তারপর বইটা দিয়ে সজোরে আঘাত করে। চোখ ঘেঁষে গেছে চোটটা। দৌড়ে ছিটকিনি খোলে সে, চিৎকার বেরিয়ে আসে গলা দিয়ে, অকথ্য গর্জনে মুখ চেপে ধরছে বাঘটা। সে প্রাণপণে ছুটে যেতে চায় একবার নীচের সিঁড়ির দিকে একবার ছাতের সিঁড়ির দিকে। দরজা চাই, একটামাত্র খোলা দরজা। তাকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে সিঁড়ির মুখ থেকে টেনে আনতে থাকে বাঘটা, ঘরের দিকে। টুঁটি কামড়ে ধরেছে। থাবাদুটো বুকে। শরীর-মনের সমস্ত শক্তি জড়ো করে সে এবার এক ধাক্কা দেয়। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পড়ে গেছে বাঘটা, আরেকটা ধাক্কা দেয়, বিদ্যুতের মতো বেগে, হাত দিয়ে, পা দিয়ে, সমস্ত দিয়ে। গড়াতে গড়াতে নীচে পড়তে থাকে বাঘটা। ধপ্ করে একটা বিশ্রী শব্দ হয়। মাথা নিচু করে পড়েছে। তখন

সে ঝাঁপিয়ে পড়ে দালানের মাঝখানে সবুজ দরজার ওপর। তার সমগ্র বিবাহিত জীবনের সংকুচিত নীরবতার ওপার থেকে ভয়, লজ্জার দেয়াল দু হাত দিয়ে ভেঙে বিকৃত গলায় চিৎকার করে ওঠে। জিনা! জিনা! জিনা!

দরজা খুলে যায়!

এ কী! সায়া-ব্লাউজ পরা আলুথালু হতশ্রী সামনে দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে যান বৃদ্ধ।

ওই যে—সে কান্না আর চিৎকার মেশানো একটা তীব্র আর্তনাদ করে—মেরে ফেলেছি। ঠেলে ফেলে দিয়েছি। আর সইতে পারিনি। কতদিন সইব?

লাঠির ওপর ভর, আস্তে আস্তে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়ান তিনি। সিঁড়ির তলায় ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে তাঁর ছোট ছেলে, খারাপ ছেলে।

ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে। খোলা চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে, ব্লাউজ ছিঁড়ে ঝুলছে, উন্মাদিনীর মতো দৃষ্টি—ওপরে-নীচে বারকয়েক তাকিয়ে দেখলেন তিনি বোঝবার প্রবল চেষ্টায়। তারপর তীব্র কশাঘাতের মতো সত্য ধরা দিল। এত দিনের সমস্ত 'কেন'র কার্যকারণ বুঝে তিনি এক মিনিট তাঁকে আঁকড়ে-ধরা মেয়েটিকে ধরে রইলেন, তারপর এক হাতে লাঠি আর এক হাতে তাকে ধরে ধরে তার ঘরে নিয়ে গেলেন, আলনা থেকে একটা শাড়ি নিয়ে বললেন—পরে নাও, আমি তো পরাতে জানি না মা! নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন আস্তে আস্তে, তাক থেকে একটা ওষুধের পাতা নিলেন, ছিঁড়ে দুটি বড়ি হাতে দিয়ে বললেন—খেয়ে নাও দেখি, জল দিচ্ছি। নিজের আরামচেয়ারে বসিয়ে দিলেন ধরে ধরে। কুঁজোর জলে তোয়ালে ভিজিয়ে বললেন—মুখটুখগুলো ভাল করে মুছে নাও এবার। নিয়ে চুপটি করে শুয়ে থাকো, ঘুম এসে যাবে।...তুমি তো ফেলনি! টাল সামলাতে না পেরে ও আপনি পড়ে গেছে। টাল সামলাতেও তো জানতে হয়!

অপেক্ষা করবেন। তাঁকে এখন বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ও ঘুমিয়ে পড়বে। তারপরে তিনি কতকগুলো ফোন করবেন। বেশি নয়। মাত্র তিনটে। একটা বিমানকে, তার অফিসে, দ্বিতীয়টা 'রোচনা'য়, জ্বরগায়ে জিনা বোধহয় সেখানেই গিয়ে বসে আছে, বাচ্চাটার, বাচ্চাগুলোর যদি কোনও খোঁজ পাওয়া যায়। আর তৃতীয় ও সর্বশেষটা ডক্টর সেনগুপ্তকে, তাঁর মোবাইল নম্বরে।

—ডক্টর সেনগুপ্ত? কল্যাণ সরকার বলছি। হ্যাঁ ডাফ স্ট্রিটের। একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার বাড়িতেই। একদম একা, তার ওপরে খোঁড়া মানুষ, কী যে করি! ছোট ছেলেটি ইদানীং বেসামাল হয়ে বাড়ি ফিরছিল। আপনি তো সবই জানেন। সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে। ঘাড়টা দেখে ভাল ঠেকছে না। বেকায়দায় পড়েছে। আমি খোঁড়া নীচে নামতে পারছি না, বড় বউমাটি কীরকম ভিতু প্রকৃতির দেখেছেন তো! দেখেশুনে এমন ঘাবড়ে গেছে যে ট্রাংকুইলাইজার দিতে হল। আমাকে যেটা দিয়েছিলেন! হ্যাঁ টেন দিয়েছি।—বড় ছেলেকে ফোন করেছি। সে-ই এসে দরজা খুলবে। হ্যাঁ, জানি না এ কেন এমন অসময়ে ফিরল। ঈশ্বর জানেন, নিয়তি! কী বলব বলুন—পাপের বেতন কী তা সবাই জানে। তবু, শত হলেও তো বাপ! আপনি যত শিগগির পারেন...হ্যাঁ শক্ত আছি। শক্তই থাকব। নিশ্চয়।